ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৪শ সংখ্যা—২৫শ সংখ্যা

শুক্রবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৩—শুক্রবার, ৪ঠা কার্তিক, ১৩৭৩

Friday, 5th August, 1966—Friday, 21st October, 1966.

অমৃত

লেখক — বিষয় ও পৃষ্ঠা

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

ষষ্ঠ বর্ষ ১ম খণ্ড

অমৃত

১৪শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 5th August, 1966. শুক্রবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুহৃদকুমার বিশ্বাস

বিশ্বসাহিত্য ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

শ্লীল-অশ্লীলের সীমা নির্দেশ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কোনকালেই সম্ভব হয়নি এবং আগামী কালেও যে হবে তা আজকের পৃথিবীর হালচাল দেখে সহজেই বলা যায়। ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দেশ করা খুব সহজ। কিন্তু জীবন তো আর ভূগোল নয় যে, দাঁড়ি-ফিতে দিয়ে মাপ-জোক করে শ্লীল-অশ্লীলতার গন্ডী কেটে দেওয়া যাবে। জীবনে যার সীমারেখা নির্দেশ করা অসম্ভব সাহিত্যে তার সীমানা নিয়ে অযথা বচসা, সময়ের অপচয় মাত্র। আজ পর্যন্ত এ-নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে কিন্তু সঠিক উত্তর মেলেনি। অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে, অনেক লেখককে রাজদ্বার পর্যন্ত ছুটতে হয়েছে—এমনকি কয়েকজনের ভাগ্যে রাজদণ্ডও জুটেছে। কিন্তু ফল শূন্য। লাভ কিছুই হলো না। হতভাগ্য লেখকের দল অপদস্থ হলেন এই পর্যন্ত। হয়তো যে বইটি অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলো তাই আবার বিচারকের রায়ে বেকসুর খালাস পেয়ে জনমানসে জাঁকিয়ে বসলো। এরকম দৃষ্টান্ত বিশ্বের সাহিত্যে-ইতিহাসে ভুরি ভুরি জমা হয়ে আছে। এই সেদিনের কথা 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' নিয়ে গোটা ইউরোপে কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। তারপর অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে 'বইটি অশ্লীলতার দায়মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকার পেল। ক্যামী হিল ও ক্যান্ডী নিয়েও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অথচ বিচারকের রায়ে তারা আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করল। বংসায়নের কামশাস্ত্রও কিছুদিন আগে লণ্ডনে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এসব দিক দিয়ে ফ্রান্স বরাবর বেশ উদার। যেসব বই অন্যান্য দেশের প্রকাশকদের ছাপাবার সাহস হতো না, ফ্রান্স সেসব বই ছাপতো অকুতোভয়ে। কিন্তু ফল খুব একটা শুভ হলো না। অর্থাৎ উদারতার এই ঘোরাটুকুতে ছেদ টানা হলো। এখন এসব ছাপানো তো দূরে থাক—অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নিষিদ্ধ বইয়ের বিজ্ঞাপনও দেওয়া চলবে না। এমনকি দোকানের শো-কেসে সাজিয়ে রাখাটাও অপরাধ। কারণ, এটাও যে বিজ্ঞাপন। আর এভাবে সাজিয়ে রাখার জন্য একজন দোকানদারকে জরিমানা দিতে হয়। কিন্তু সবই তো হচ্ছে তবু শ্লীল-অশ্লীলের মাপকাঠির সন্ধান আজও পাওয়া গেল না।

সাহিত্য যদি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়ও তবু তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কোথায়। কারণ অশ্লীলতার কোন সীমারেখা যখন নেই। আসলে সবকিছুই নির্ভর করে মনের উপর। একজনের দৃষ্টিতে যেটা অশ্লীল, অপরজনের বিচারে তা গ্রাহ্য না হতেও পারে। তাই পশ্চিমী দেশগুলির অশ্লীলতা সম্পর্কে এরকম জুজুবুড়ির ভয় অর্থহীন এবং এ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করাটাও অযৌক্তিক। অমৃত পত্রিকার নবম সংখ্যায় প্রকাশিত শচীন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বসাহিত্য ও অশ্লীলতা' প্রসঙ্গে এই নিবেদন।

বিনীত
অলোকেন্দু বিশ্বাস,
কলকাতা—২৬।

॥ ভিক্ষাবৃত্তি ॥

সবিনয় নিবেদন,

কলকাতার সমস্যা অনেক। কলকাতার সমস্যা দূর করার জন্য পরিকল্পনা হয়েছে আরও অনেক। কিন্তু কলকাতার যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে একথা বলা যায় না।

আগে কলকাতা সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা ছিল কলকাতা ভিখারীতে ভর্তি। আজও সেই ধারণা বিদেশীরা বদলাবেন বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার ভিক্ষুক সমস্যা দিন দিন যেন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এদের অনেকেই দুরারোগ্য ব্যাধি বহন করে এবং ছড়ায়। ভিড়ের মধ্যে এদের অবাধ চলাচল বিশেষ চিন্তার বিষয়।

গত ১৫ই জুলাই-র অমৃতের 'অধিকন্তু' বিভাগে প্রকাশিত লেখাটিতে লেখক সার্থকভাবে এই সমস্যার দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

শুধুমাত্র অন্ধ, আতুরজনেরাই আজ ভিক্ষাপ্রার্থী নয়, সুস্থ-সবল ব্যক্তিও আজ ভিক্ষাপ্রার্থী। দেশের জনশক্তির এই অপচয় বাস্তবিকই এক বিরাট সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

শাস্ত্রে বলে ভিক্ষান্বারা নাকি কোন কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু আজ একথাটাকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া একটু কষ্টকর। কারণ খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায়, যে রাস্তায় যারা দিনকাটায় তারা অনেকেই মাসে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে থাকে।

যখন বিনা আয়াসেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা যায় তখন কেউ অন্য জীবিকার সন্ধান করে না। কারণ আজ এই বৃত্তিটাই বিশেষ 'লাভজনক ব্যবসাতে' পরিণত হয়েছে।

সক্ষম ব্যক্তিকে নির্বিচারে ভিক্ষা দেওয়া তাই আজ বন্ধ করা উচিত। আমরাই কি এদের এই রকম কর্মবিমুখ জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছি না?

কলকাতায় আজ ভিক্ষুকের সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় আইন করে সুস্থ, সবল এবং সক্ষম ব্যক্তিদের ('সিদ্ধযোটকবাবু'র মত লোকের তো অভাব নেই) ভিক্ষা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করা উচিত এবং এদের ভিক্ষা দেওয়াও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অবশ্য এদের জন্য যথোপযুক্ত কর্ম-সংস্থান করাও প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ করা বিশেষ দরকার যে ১৯৪৩ সনে যে 'ভিক্ষাবৃত্তি আইন' পাশ হয় (যার উদ্দেশ্য ছিল শিশু ও বয়স্ক ও ভবঘুরেদের চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ দিয়ে যথার্থ উপার্জনক্ষম নাগরিক হিসাব বাঁচবার উপায় করে দেওয়া) তা এখনও যথাযথভাবে কার্যে পরিণত হয়নি।

আশা করব, কর্তৃপক্ষ বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখবেন।

বিনীত—
সুশীলরঞ্জন রায়,
নাকতলা, কলকাতা-৪৭।

একটি প্রস্তাবের শবব্যবচ্ছেদ প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

৬ই শ্রাবণের 'সমদর্শী'র 'একটি প্রস্তাবের শবব্যবচ্ছেদ' এতই সুন্দর লেগেছে যে, ওর সম্বন্ধে দুই-একটা না বলে থাকতে পারছি না। সমদর্শীর বিশ্লেষণগুলি এতই সুন্দর হয়েছে যে, তার চিন্তাধারাগুলি আমাদের একটা সুস্পষ্ট পথের সন্ধান এনে দেয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কায়রো, বেলগ্রেড ও মস্কো সফরের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে সাত দফায় একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব পেশ করেন। আজ সমস্ত জগৎই শ্রীমতী গান্ধীর মূলে প্রস্তাবগুলোর বিষয় অবগত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কায়রোয় নাসের, বেলগ্রেডে টিটো, এবং মস্কোয় কোসিগিন এই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে শ্রীমতী গান্ধীকে হতাশ করেছেন। কেবলমাত্র বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়েছে। ফ্রান্স এবং চীনা সরাসরিভাবে এটা অগ্রাহ্য করেছে। এই নেতৃবৃন্দের যাই কেননা অভিমত হক—বিশ্বশান্তির পক্ষে শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্তাবটি বিশেষভাবে ভেবে দেখা উচিত ছিল। ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তির পর থেকে ভিয়েতনাম পরিস্থিতি নানা অবস্থার মধ্যে চলেছে। আমরা শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্তাবটিকে এই বলে স্বাগত জানাই যে আজকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শ্রীমতী গান্ধী যে এগিয়ে এসেছেন তাঁর বিশ্বশান্তির বাণী নিয়ে এটা সমস্ত দেশগুলিও পুনরায় ভেবে দেখুক। শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্তাবের মধ্যে আছে বিশ্বশান্তির মূলনীতি অন্তর্নিহিত। ওয়াশিংটন উত্তর ভিয়েতনামের ওপর বোমাবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করুক এবং ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তিতে ফিরে আসুক। আমেরিকার আসল সদিচ্ছার ওপর সবটাই নির্ভর করে। আমেরিকার উচিত শ্রীমতী গান্ধীর সব প্রস্তাবটাই মেনে নেওয়া এবং সেই ভিত্তিতেই এগিয়ে যাওয়া। কাজটা অবশ্য অতি জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল। তবে এই পরিস্থিতির অবসান অবিলম্বে ঘটা উচিত।

ভবদীয়
শ্রীকালীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-১৯

বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সেদিন দিল্লিতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের শান্তিস্বরূপ ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করার সময়ে দেশের বিজ্ঞানী সমাজকে বর্তমান জাতীয় সংকটে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদন নতুন নয়। পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ যখন ভারত গ্রহণ করেছিল তখনই বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কার্যকর প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। গত ১৬ বছরে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে অনেকগুলি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া অনেকদিনের পুরনো ও সুবিখ্যাত বিজ্ঞানকেন্দ্র তো ছিলই। এদের সকলকেই জাতীয় উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগের সর্ববিধ সুযোগ দেবার নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন।

দেশে তরুণ বিজ্ঞানীর অভাব নেই। অনেক বিদেশী জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানীও ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার উচ্চমানের কথা সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করে গেছেন। বছর দশ-বারো আগে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক জোলিও-কুরী কলকাতার বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলি দেখে বলেছিলেন, সামান্যতম যন্ত্রপাতি নিয়ে, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও এখানকার বিজ্ঞানীরা যে-উচ্চশ্রেণীর গবেষণাকর্ম করছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আরেকজন লব্ধকীর্তি বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. এস. হ্যালডেন তো ভারতের বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার জন্য ভারতীয় নাগরিকত্বই গ্রহণ করেছিলেন। এ-দেশের মাটিতেই এই বরেণ্য বিজ্ঞানীর শেষশয্যা রচিত হয়েছে। তিনি ভারতের তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনিও বলেছিলেন যে, এ-দেশে বিজ্ঞানকর্মের সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু প্রশাসনিক অব্যবস্থার দরুণ তরুণ বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। বিজ্ঞানজগতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি।

আজ শ্রীমতী গান্ধীও সে কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণার প্রকৃষ্ট সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কিনা সন্দেহ। অনেক সময়েই বলা হয় যে, দেশের মগজ বিদেশে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা এখানে কাজের সুযোগ না পেয়ে বিদেশে উন্নততর সুযোগের আশায় চলে যাচ্ছেন। তাঁরা আর দেশে ফিরে আসতে চাইছেন না। জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের মতো অনেক মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীকেই হয়তো আমরা হারাচ্ছি। ভারতের বিজ্ঞানীরা বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁদের শ্রম ও মনীষার সুযোগ পাচ্ছে বিজ্ঞানোন্নত দেশগুলি। অথচ আমাদের দেশ তাঁদের সেবা থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদেশ থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছেন। অনেক বিজ্ঞানকর্মী সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরেও এসেছেন এবং বৈজ্ঞানিক পুলের অন্তর্ভুক্ত থেকে কাজ করছেন। কিন্তু ঐখানে এসেই তাঁরা আটকে যাচ্ছেন। হাতেকলমে ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুযোগ কোথায়? প্রশাসনিক জট, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও সত্যিকারের বৈজ্ঞানিককর্মের স্বাধীনতার অভাবে অনেক বিজ্ঞানকর্মী হতাশ হয়ে আবার বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। এই অবস্থার কথা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী অবগত আছেন এবং সে কারণেই তিনি সেদিন ইঙ্গিত দিলেন যে,তরুণ বিজ্ঞানীদের কাজের আরও সুযোগ দেওয়া দরকার।

বিজ্ঞানের যুগে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার অর্থ নিজেদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা। শ্রীমতী গান্ধী ঠিকই বলেছেন যে, বর্তমানে ভারতের যে অর্থনৈতিক অসুবিধা দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে বিজ্ঞানের পথেই আমাদের যেতে হবে। কৃষি-অর্থনীতিতে ফিরে গেলে সাময়িক সংকটমুক্তি হয়তো ঘটতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা নির্ভর করছে অধিকতর উৎপাদন এবং বর্তমান অর্থনীতিকে প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়া। গাণিতিক মাপকাঠি দিয়ে বিজ্ঞান গবেষণার পরিমাণ করা ঠিক নয়। দেশে বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলিতে যত অর্থ নিয়োগ করা হচ্ছে, তদনুপাতে ফল পাওয়া যাচ্ছে না, এ-ধরনের অভিযোগ অর্থহীন। এই অভিযোগের বশবর্তী হয়ে বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থ নিয়োগ বন্ধ করে দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমরাই। স্বয়ংনির্ভরতা অর্জন করতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য আমাদের নিতে হবে এবং সেজন্য বিজ্ঞানীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে প্রচুরসংখ্যক তরুণ বিজ্ঞানী প্রতি বৎসর তৈরী হচ্ছেন। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আশার কথা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বয়ংনির্ভরশীলতা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। শুধু শ্লোগান দিয়ে এর কোনোটাই আমরা রক্ষা করতে পারবো না, অর্জন করতে পারবো না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি জাতীয় উন্নয়নকর্মের প্রতিক্ষেত্রেই দুনিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলে আমরা দেখতে পাবো যে, আমাদের সমস্যা দিনের পর দিন পুঞ্জীভূতই হচ্ছে, তার সমাধানের পথ খোলা নেই। এই কাজে বিজ্ঞানের সহায়তা যে কত অপরিহার্য প্রধানমন্ত্রী তা উল্লেখ করেছেন। আশা করি আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীরা বর্তমান জাতীয় সংকটে দেশবাসীকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন। তার সঙ্গে এ আশাও আমরা করতে পারি যে, বিজ্ঞানীদের সর্বপ্রকার কাজের সুযোগ দেবার পথে বর্তমানে যেটুকু প্রতিবন্ধকতা আছে তাও দূর করতে সরকার সচেষ্ট হবেন।

সাতকাহন

'একটা লেখা চাই স্যার!' বছর কুড়ি-বাইশের একটি ছেলে নমস্কার করে বলল।

'কোন্ কাগজ?'

'নতুন কাগজ। আমরা বন্ধুরা মিলে বার করছি।'

'এই প্রথম সংখ্যা?'

'হ্যাঁ।'

'দেখ, ইয়ে,' আত্মসমর্পণের সুরে বললাম, 'আমি তো ঠিক লেখক নই। আমার কাছে লেখা চাইতে এসে সময় নষ্ট করছ কেন? নাম-করা সাহিত্যিকদের কাছে যাও।'

'গিয়েছি দু-একজনের কাছে। বলেন, লেখা নেই।'

'সে তো আমারও নেই।' আমি বললাম, 'কিন্তু ইচ্ছে করলে ও'রা তবু লিখতে পারেন, আমি পারিনে।' বলে পরামর্শ দেওয়ার মত করে বলে উঠলাম,'—বাবুর কাছে যাও। উনি অনেক লিখছেন আজকাল। ভাল করে ধরে পড়লে দেবেন নিশ্চয়ই।'

'গিয়েছিলাম।' ছেলেটি বিষণ্ণভাবে একটু হেসে বলল, 'উনি বললেন, প্রথম আর দ্বিতীয় সংখ্যা বেরোবার পর কপি নিয়ে ও'র সঙ্গে দেখা করতে।'

'কেন?'

'উনি বললেন,' চোখ নামিয়ে আবার একটু হেসে ছেলেটি বলল, 'এসব কাগজের প্রথম সংখ্যা যদিওবা বেরোয়, দ্বিতীয় সংখ্যা নাকি বেরোতেই চায় না। দ্বিতীয় সংখ্যা বেরিয়ে গেলে নাকি বোঝা যায়, অন্তত মাস-ছয়েক কি এক বছর চলবে কাগজটা।'

'হুঁ। ভাববার কথা বটে।' আমি বললাম, 'আচ্ছা, দিন-চারেক পরে এস। দেখি, যদি কোন সাহিত্যিক বন্ধুর কাছ থেকে তোমাদের জন্যে কোন লেখা জোগাড় করতে পারি।'

ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে ওঠে দাঁড়াল। এবং নমস্কার করে সে বেরিয়ে গেল।

পর দিন সকালবেলায় কাগজ পড়ছি। চোখ আটকে গেল একটি খবরে—

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক সমীক্ষায় সম্প্রতি দেখা গেছে যে, অজস্র সংখ্যায় নতুন সংবাদপত্র, এবং পত্র-পত্রিকার যেমন জন্ম হচ্ছে প্রতি বছর, তেমনি তাদের মৃত্যুও হচ্ছে। প্রেস রেজিস্টারভুক্ত প্রায় দশ হাজার পত্র-পত্রিকার মধ্যে টি'কে আছে মাত্র হাজার পাঁচেক।

বুঝলাম, আগের দিন ঐ হবু-সম্পাদক ছেলেটি জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের যে অভিমত ব্যক্ত করেছিল তা কত খাঁটি। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সব বন্ধ হয়ে যাওয়া কাগজের বেশীর ভাগই লিটল ম্যাগাজিন।

এখন প্রশ্ন হল, এই যে প্রতি বছর সারা ভারতবর্ষে হাজার হাজার লিটল ম্যাগাজিন দেখা দেয় এবং এক সংখ্যা, দু সংখ্যা বা বছর-খানেক পরে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করে, এর কারণ কী?

প্রথম সংখ্যা বেরোবার পরে

দ্বিতীয় সংখ্যা বেরোবার আগে

লিটল ম্যাগাজিনের ক্রমবিবর্তন

কাগজ উঠে যায় কেন সেটা পরে দেখা যাবে, আগে বিবেচনা করা যাক, এত কাগজ জন্মায় কেন?

অন্য প্রদেশের কথা বলতে পারব না, কিন্তু বাংলা দেশে এর প্রধান কারণ হল সাহিত্য-যশোলিপ্সা। আমাদের একজন শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক সেদিন বলছিলেন, এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই বাঙালী যুবকদের উচ্চাশা তিনটি লক্ষ্যের কোন-না-কোন দিকে নিয়োজিত। মোহনবাগানের দৃষ্টান্তে ফুটবল খেলা, ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর আদর্শে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া, আর রবীন্দ্রনাথের অনু-সরণে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। কাজেই সাহিত্যের দিকে বাঙালী ছেলেদের এই টান দেখে অবাক হবার কিছু নেই।

প্রতি বছরই সেই জন্যে শ'য়ে-শ'য়ে লিটল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্য-যশোপ্রার্থী যুবক দু-একবার নামকরা কাগজে লেখা পাঠিয়ে হতাশ হয়ে নিজেই শেষ পর্যন্ত কাগজ বার করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। বন্ধু জোগাড় হতেও দেরী হয় না। নিজেরা যা পারে লেখে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছ থেকে লেখা না আনতে পারলে প্রেস্টিজ থাকবে না। শুরু হয় ছুটোছুটি। ক্রমে হতাশ হয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের মত নামকাটা লেখকের কাছে, বিষণ্ণ বিনয়ের সুরে আবেদন জানায়—'একটা লেখা চাই স্যার!'

কাগজ কিন্তু শেষপর্যন্ত টে'কে না। কয়েক সংখ্যা বেরোবার পরই লেখার জোগান কমে যায়, প্রেসের ধার বাড়তে থাকে, বিজ্ঞাপনের দাক্ষিণ্য সংকুচিত হয়, বাজার থেকে বিক্রী-করা কাগজের দাম তোলা শিবের অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, এবং একদিন লক্ষ্য করা যায়, নতুন নামের সেই কাগজখানি ফুটপাতের স্টল থেকে উধাও হয়ে গেছে।

দুঃসংবাদই বলতে হবে, এবং একদিক থেকে অপচয়ও বটে। কিন্তু সবটুকুই যে শেষ পর্যন্ত খরচের খাতায় চলে যায়, তা বোধ করি নয়। কাগজ উঠে যায়, কিন্তু একজন কি দুজন লেখককে তবু এনে দিয়ে যায় সাহিত্যের দরবারে।

আর যারা হারিয়ে যায় তারাও হয়ত ঠিক ব্যর্থ হয় না। শোঁয়া পোকা যেমন স্বভাবের অনিবার্য নিয়মে রূপান্তরিত হয় প্রজাপতিতে, এই সব অসমাপ্ত সাহিত্যিকের অনেকেই তেমনি হয়ে বসেন পেশাদার সভাপতি।

এ এক রকম মন্দ কি? দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে, সভা-সমিতিও বেড়ে চলেছে সেই সঙ্গে। আর এদেশে সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আকর্ষণ তো সর্বজনবিদিত। সভাপতির সাপ্লাইয়ে টান পড়লে চলবে কেন!

এমতাবস্থায় হায়ার সেকেন্ডারীতে যেমন ছাত্ররা অষ্টম শ্রেণীর পর হিউম্যানিটি বা সায়েন্স স্ট্রীমে চলে যায়, তেমনি হবু-লেখকরাও কিছুকাল সাহিত্য চর্চার পর সকলেই সাহিত্য-স্ট্রীমে না গিয়ে কেউ কেউ যে সভাপতি-স্ট্রীমে চলে যান, এ তো আমাদের বিলক্ষণ সৌভাগ্য।

—শ্রীচতুর্মুখ

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ

আমরা মাঝে মাঝে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির বিদেশী বা অন্য ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছি। আজ আমাদের বাংলা ভাষা ভারতবর্ষীয় চৌদ্দটি ভাষার অন্যতম একটি আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। বিদেশের যে সব রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার সমাদর আছে সেটুকু অনুগ্রহ মাত্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোথাও বাংলা ভাষা বিষয়ে তেমন আগ্রহের কথা জানা যায় না। দু-একজন মার্কিন গবেষক অবশ্য ব্যতিক্রম।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কিন্তু আজও আমাদের 'অহঙ্কারে'র সীমা নেই। কারণ, ব্যাঙের আধুলির মত বাঙালীর এই সম্পদটুকুই আজও কিঞ্চিৎ আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, গোষ্ঠীগত দলাদলি, উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রভৃতিতে বাংলা সাহিত্যের সমাজ আজ অতিশয় পঙ্কিল। বাংলা সাহিত্যের আজ আর কোনও সমাজ নেই। আগেকার দিনে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্যসেবী একত্রিত হয়েছেন, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করেছেন, সৎ সাহিত্যের প্রসার প্রকল্পে চেষ্টা করেছেন। এখন আর ব্যক্তিসম্পন্ন কোন লেখককে কেন্দ্র করে সাহিত্যের সমাজ ওঠা-বসা করে না। এখন সমাজের ভার অন্যত্র। এ ছাড়া পি এল ৪৮০ বা বৈদেশিক রাষ্ট্রানুকূল্যেও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে লাভ না হয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশী ঘটেছে।

সেই কালে প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল প্রবাসী, তার সম্পাদক ছিলেন শক্তিমান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ছোটখাট পত্রিকাগুলি খানিকটা সেই আদর্শেই চলত। ফলে সাময়িকপত্রেরও একটা ভূমিকা ছিল। ইদানীং সাময়িকপত্রের প্রচারাধিক্য ঘটলেও প্রভাব বোধ করি কমের দিকে। অনেক অযোগ্য এবং কদর্য রুচির সাময়িকপত্রেরও প্রচারাধিক্য আছে। এবং সেই সব পত্রিকাতেও কোন কোন লেখক প্রকাশের জন্য রচনা দান করে থাকেন। মোট কথা, সা হি ত্যি ক দে র বিশেষতঃ বাঙালী সাহিত্যিকদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। ফলে তাঁদের কারও কারও কিঞ্চিৎ বৈষয়িক লাভ হয়ত হচ্ছে এবং সেই নগদ নারায়ণেই তাঁরা তুষ্ট, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক উৎকৃষ্ট রচনাগুলির বিদেশে প্রচারের জন্য বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায় না। এই দায়িত্ব সভ্য দেশে রাষ্ট্রের। ভারত সরকার সাহিত্য একাদেমীর মারফৎ যৎকিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের কাছে বাংলা চোদ্দটি ভাষার অন্যতম। সুতরাং সকলকে সমভাবে দেখে বাংলার ভাগ্যে যেটুকু করুণা বর্ষিত হওয়া প্রয়োজন তার বেশী তাঁদের করণীয় কিছু নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে একেবারে শিবসদৃশ। তাঁরা যেন-তেন-প্রকারে বৎসরে একবার রবীন্দ্র পুরস্কার দান করে সাহিত্যিকদের প্রতি এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন। তাঁদের কর্তব্যকর্মটুকু সহায় ও সামর্থহীন সাহিত্যিকরা কিছু পরিমাণে পালন করার চেষ্টা করেছেন তার পরিচয় আশীষ সান্যাল সম্পাদিত "বেঙ্গলী লিটারেচর"। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ কই।

আমাদের এক সাংবাদিক বন্ধু দিল্লী শহরে থাকেন। দীর্ঘকাল, অর্থাৎ সেই ফরোয়ার্ডে'র যুগ থেকে তিনি বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলিতে কাজ করে আজ দিল্লীতে অবসরভোগী। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী প্রচারক, বহু বাংলা গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি তিনি আমাদের একটি চিঠিতে লিখেছেন :—

'অনেকদিন ধরেই আপনাকে বাংলা সাহিত্যের অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্পর্কে লিখব বলে ভাবছিলাম। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের হিন্দী অনুবাদ যথেষ্ট হচ্ছে, গুজরাটীতেও। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিতে এবং ইংরাজীতে খুব কম হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতে শরৎচন্দ্রের কিছু বই অনুবাদিত হয়েছে। ইংরাজীতে শরৎচন্দ্র সামান্যই অনুবাদ হয়েছে, (১) দিলীপকুমার কর্তৃক নিষ্কৃতি, (২) ক্ষিতীশ সেন কর্তৃক শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব; (৩) বিনয় চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'চরিত্রহীন'। চার বছর পূর্বে কলকাতার শিল্পী সংস্থার প্রচেষ্টায় গৃহদাহ এবং দত্তার অনুবাদ করেছেন শচীন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন গত ২৭শে জুলাই তারিখে কোট্টায়মে মালয়ালা মনোরমা পত্রিকার প্লাটিনাম জুবিলির উদ্বোধন করেন। সামনে বাঁদিক থেকে কেরালার গভর্ণর শ্রীভগবান সহায় এবং সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

অথচ এই বিষয়ে বাংলা দেশের কোন পত্রিকাতে আলোচনা প্রকাশিত হয় নি। বাঙালী প্রকাশকরা এই বিষয়ে উদাসীন।"

বাঙালী প্রকাশকদের বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। কারণ, তাঁরাই বাঙলা সাহিত্যের ধারক, ও বাহক প্রচারক এবং পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা যতটুকু করেন তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ। এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনে পাঁচশো গ্রন্থের নামোল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে যেটুকু লাভ করেন তাতেই তাঁরা তুষ্ট। এর বেশী কিছু করার উদ্যম তাঁদের নেই। অথচ শুধু মাত্র বাংলা গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের প্রকাশক হিসাবেও লাখপতি হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। জয়কো, রাজকমল প্রকাশন প্রভৃতির উদ্যমের কথা বাঙালী প্রকাশকদের চিন্তা করা উচিত।

'বাংলা সাহিত্যের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। অনেক কাল পূর্বে নীলিমা দেবী "পত্রবেণী" পত্রিকায় বাংলা ছোটগল্প ও কবিতার কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদ করেন, তারপর অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী লীলা রায় অনেক বাংলা গল্প ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর একখানি বাংলা গল্পের ইংরাজী সংকলন-গ্রন্থও আছে "ব্রোকেন ব্রেড"। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার ও প্রবোধ সান্যালের অনেকগুলি গল্প ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন কয়েকজন বাঙালী লেখক। জীবনানন্দ দাশের কবিতা অনুবাদ করেছেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অনুবাদ করেছেন ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা কবি স্বয়ং এবং পণ্ডিচেরীর নলিনীকান্ত গুপ্তও কয়েকটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করেছেন; কিন্তু কোন গ্রন্থ নেই। বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং অনেকগুলি নিজস্ব রচনা অনুবাদ করেছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' এবং ছোটগল্পের একটি সংকলনের অনুবাদ আছে। ইউনেস্কোর প্রচেষ্টায় শচীন্দ্রলাল ঘোষ 'পুতুল নাচের ইতিকথা' অনুবাদ করেছেন, ভারতের বাইরে তার প্রচার হবে। মনোজ বসুর 'জল-জঙ্গলে'র অনুবাদ করেছেন বারীন্দ্রনাথ দাশ, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'র অনুবাদ করেছেন লীলা রায় (ইউনেস্কোর প্রচেষ্টায়), ইউনেস্কো 'পথের পাঁচালী'র ইংরাজী এবং ফরাসী অনুবাদ করিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর আরও অনেকগুলি বিশিষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ হওয়া উচিত। তারাশঙ্করের ছোটগল্প এবং 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতির অনুবাদ ভারতের বাইরে পাঠান উচিত। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু প্রভৃতি লেখকবৃন্দের রচনারও উপযুক্ত অনুবাদ প্রয়োজন।

কিন্তু অনেক সময় অনুমতি লাভ করার ব্যাপারে অসুবিধা ঘটে। শরৎচন্দ্রের অনেক রচনার অনুবাদ বিদেশী প্রকাশকরা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীবৃন্দ অনুমতি দানে গড়িমসি করছেন। ডঃ শশধর সিংহ শরৎচন্দ্রের কয়েকটি বড়গল্প অনুবাদ করেছেন, সাহিত্য একাদেমী প্রকাশ করতে চান, কিন্তু অনুমতি অনুপস্থিত। অথচ আমরা জানি শরৎচন্দ্র স্বয়ং এককালে তাঁর রচনার অনুবাদের জন্য কতখানি আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

অনুবাদকর্ম অনেকটা মিশনারী কর্ম। অনুবাদকের কোন খ্যাতি নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, অখ্যাতিই বেশী। তথাপি তিনি সফল সাহিত্যিকবৃন্দের রচনা জগতের সামনে তুলে ধরেন, সেই কৃতিত্ব তাঁর, তার বিনিময়ে যে সামান্য অর্থপ্রাপ্তি তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। আমাদের মনে হয় যদি অবস্থা এইভাবে চলে তাহলে আমাদের বাংলা সাহিত্যের যেটুকু গৌরব আছে তার আর কতটুকু থাকবে?

অনুবাদকদের একটি গোষ্ঠী হওয়া উচিত, এবং একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া উচিত, যাঁরা প্রকাশ সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন, অনুমতি সংগ্রহ করবেন এবং কোন গ্রন্থ শুধু ভারতে প্রচারিত হবে এবং কোন গ্রন্থ বিদেশে যাবে তার ব্যবস্থা করবেন। তবেই সবদিক থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে।

আমাদের বন্ধু তাঁর পত্রে লিখেছেন :

"অনুবাদ সম্পর্কে আরও বলবার কথা এই, ভারতে প্রকাশিত অনুবাদের পাশ্চাত্যের বাজারে ঠাঁই হয় না। পাশ্চাত্যে প্রকাশিতব্য বইগুলিও, আমরা সাধারণতঃ যেগুলিকে ভাল বলি, সেগুলি সব সময়ে হয় না। এদেশি প্রেম বড় পানসে, রক্তহীন, সুতরাং পাশ্চাত্য জগৎ এ পছন্দ করে না। তারা চায় সমাজের বিস্তৃত পটভূমিকায় লেখা ঘটনাবহুল উপন্যাস।"

বাংলা সাহিত্যের বহির্জগতে প্রকাশের জন্য লেখক, প্রকাশক এবং যোগ্য অনুবাদককে এগিয়ে আসতে হবে। "রাইটার্স গিল্ড" বা 'রাইটার্স ক্লাব' প্রভৃতির পক্ষে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করা উচিত, পি ই এনেরও দায়িত্ব কম নয়।

আমাদের সাংবাদিক বন্ধুটি সাহিত্যপ্রেমিক, স্বদেশানুরাগী এবং সাহিত্যরসজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। বাংলার বাইরে বসে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা ভেবে তিনি সংকিত হয়েছেন। যাঁরা বাংলা দেশের মাটিতেই বসে আছেন তাঁদের এই বিষয়ে একটু বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই।

—অভয়ঙ্কর

বিভূতি স্মৃতি উৎসব

গত ২৪ ও ২৫ জুলাই মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিভূতি স্মৃতি-উৎসব। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ঘাটশিলা বিভূতি স্মৃতি-সংসদ।

গত ২৪ জুলাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, চিরউজ্জ্বল, চিরঅম্লান, চিরভাস্বর সাহিত্য রচনা করে তিনি নিজেই নিজের স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করে গিয়েছেন।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, সমাজে সাহিত্যিকদের মতো আর কেউ অরক্ষিত আছেন বলে তাঁর জানা নেই। 'দেবযানে'র বিভূতিভূষণ জানুন আমরা তাঁকে ভুলিনি।

উদ্বোধক শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ ঘাটশিলায় 'আরণ্যক' গড়ে তুলতে দেশবাসীকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান।

ভারতীয় সাহিত্য

শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সংসদের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেন।

মুলুকরাজ আনন্দের সম্মানলাভ

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ও প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীমুলকরাজ আনন্দ তাঁর বর্মী ভাষায় অনূদিত একটি গ্রন্থের জন্য বর্মা সরকারের একটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন। বোধহয়, ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেছেন।

প্রাচীন তামিল কবিতার অনুবাদ

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত কবি এ কে রামানুজম প্রাচীন তামিল কবিতা 'কুরুনটোকাই' থেকে আটটি কবিতা সম্প্রতি ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রেম। প্রশ্নোত্তরে এই কবিতাগুলি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত। যাঁরা তামিলভাষা জানেন না, তাঁরা এই অনুবাদের মাধ্যমে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারবেন।

বি, বি, সি'র ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

'বি বি সি'র উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক ছোটগল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের বাইরের লেখকরাই একমাত্র অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই কারণে ভারতীয় লেখকদের কাছেও তাঁরা একটি আবেদন পাঠিয়েছেন। যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন, তাঁকে যে পুরস্কার দেওয়া হবে তার পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রায় ২,১০০ টাকা। এ ছাড়াও বি বি সি'তে প্রচারের জন্য যাঁদের রচনা নির্বাচিত হবে তাঁদের দেওয়া হবে ৪২০ টাকা করে। প্রতিযোগিতার জন্য রচনা ইংরেজী ভাষায় এবং অপ্রকাশিত হতে হবে। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে আছেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সমালোচক এন্টনী বার্জেস, কবি লেনরী পিটার্স এবং কে যশোর। যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর।

ভারতীয় পুস্তক রপ্তানী

ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার রপ্তানী ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৫৭ সালে ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৬৪-৬৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে একমাত্র পূর্ব বাংলাতেই রপ্তানী করা হয় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের গ্রন্থ। বলা-বাহুল্য, পূর্ব বাংলায় রপ্তানীকৃত গ্রন্থের অধিকাংশই বাংলা ভাষায় রচিত।

সম্প্রতি কিন্তু ভারতীয় রপ্তানীকৃত গ্রন্থ-ব্যবসাও বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মানুভাই শাহ অবশ্য ২০শে জুন দিল্লীতে বলেছেন : "ভারতে প্রকাশিত থান-পঞ্চাশেক বইয়ের বাজার বিদেশে পাওয়া যাবেই।" কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত বই বা পত্র-পত্রিকার বাজার বর্মা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ছিল, তা ইংলণ্ডের ই এল বি এস বইয়ের ক্রমপ্রসারে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। আবার ভারতেও যে সমস্ত বই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তার সব কটিকে ভারতীয় বলা চলে কিনা সন্দেহ। কেননা, এখন ভারত থেকে যে সমস্ত বই রপ্তানী হচ্ছে, তার মধ্যে ২·২৫ কোটি টাকা লগ্নীকৃত হয়েছে গম কর্জ খাতের (পি এল ৪২০) টাকা থেকে। এর মাধ্যমে বহু মার্কিন প্রকাশক এবং তাঁদের পরিচিত প্রকাশক সংস্থাগুলি লাভবান হচ্ছেন। এতে ভারতীয় গ্রন্থ এবং প্রকাশক সংস্থাগুলির প্রকাশনার দিক দিয়ে ক্ষতি হচ্ছে। ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করতে হলে, এখনি এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

মালয়লা মনোরমা পত্রিকার প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব

'মালয়লা মনোরমা' পত্রিকার প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে পত্রিকার কার্যালয় প্রাঙ্গণে যে অনুষ্ঠান হয় তাতে পৌরোহিত্য করেন অমৃতবাজার পত্রিকা ও অমৃত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ এবং কেরলের রাজ্যপাল শ্রীভগবান সহায়, নায়ার নেতা শ্রীমন্নাথ পদ্মনাভন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত থাকেন।

স্বাগত ভাষণে শ্রীকে এম চেরিয়ান দেশসেবায় 'মনোরমা'র গৌরবময় ভূমিকা বর্ণনা করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসাবে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণকে এবং সভাপতি হিসাবে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে পেয়ে গভীর আনন্দ জ্ঞাপন করেন। শ্রীঘোষকে তিনি বর্তমানে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের সর্বাধিক সম্মানিত প্রতি-

দিদি ও জনকজুলা বলে অভিহিত করেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির পক্ষ থেকে 'মালবলা মনোরমা'কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

শ্রীপদ্মনাভন বলেন, কেরল তথা সমগ্র জাতির প্রতি 'মালয়লা মনোরমা'র সেবা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বিদেশী সাহিত্য

বৃটিশ ঔপন্যাসিকের চোখে বাঙালীর স্মৃতি

পঞ্চাশ বছর আগের কথা। ছোট্ট মেয়ে রুমের গডেন। বয়েস তার হবে তখন মাত্র আট বছর। কিন্তু এরই মধ্যে সে করতে চাইল অবিশ্বাস্য কাণ্ড। লিখতে শুরু করল উপন্যাস। তাতে মনে রাখার মত দু-একটা লাইনও যে লেখা হল না তা নয়। যেমন, "পেগি চারদিকে তাকাল। দেখতে পেল তাকে ঘিরেই যেন শুরু হয়েছে বাঘ আর সিংহের গর্জন। ছিঁড়ে খাবার জন্যে ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল তারা।" একথা লেখার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন প্রতিবাদ করে উঠেছিল পাশে বসে থাকা রুমেরই দিদি, ন' বছরের মেয়ে জন গডেন। বলল, "কিন্তু পেগি তো বাগানে ছিল। সেখানে বাঘ বা সিংহ আসবে কি করে?"

ছোট বোন অমনি চটপট জবাব দিল, "বাঃ, তাতে কি হল? এ তো সত্যি নয়, লেখা!"

সেদিনকার সেই আট-ন' বছরের বোন দুটি হচ্ছে আজকের সাফল্যমণ্ডিত বৃটিশ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। রুমের লিখেছেন ব্ল্যাক নার্সিসাস, দি রিভার প্রভৃতি উপন্যাস এবং জন সৃষ্টি করেছেন দি সেভেন আইল্যাণ্ডস, দি পীকক—এ রকম একাধিক গ্রন্থ।

কিন্তু তাঁরা যখন ভারতবর্ষকে তাঁদের উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেন তখন আমাদের দিক থেকে একটু কৌতূহল হওয়াই বোধহয় স্বাভাবিক। তার উপর পূর্ব বাংলার কাহিনী। সত্যি কথা বলতে কি, গডেন ভগ্নীদ্বয়ের লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বাংলা দেশের সোঁদা মাটির গন্ধ, নদী-নালার ছন্দোময় ভঙ্গী, শিউলি-অপরাজিতা আর গ্রাম-প্রকৃতির চোখ-ভোলান সৌন্দর্য। শুধু তাই নয়, তাঁদের রচনায় এসে ভিড় করেছে যেমন চাষী-তাঁতী, জেলে, খেটে-খাওয়া মানুষ, তেমনি সাহেব-সুবো, ছোট-বড় নানা ধরনের জমিদার। একদিকে পূর্ব বাংলার কৃষকদের দীর্ঘশ্বাস অন্যদিকে এক শ্রেণীর জমিদারের বিলাস-ব্যসন এই সবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁদের সৃষ্টিতে।

সম্প্রতি প্রকাশিত জন এবং রুমের গডেন-এর এক সঙ্গে লেখা 'টু আণ্ডার দি ইণ্ডিয়ান সান' প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি মনে এল। এই বইটিকে এক রকমের বলা যায় লেখিকাদের শৈশবের স্মৃতি-চিত্র। [illegible] আবার যত্ন করে গেঁথে তোলা হয়েছে এখানে। লেখিকারা সৃষ্টি করেছেন এক স্বপ্নময় পরিবেশ। জন এবং রুমের তাঁদের বাল্য-জীবন কাটিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। বাবা ছিলেন একজন স্টীমশিপের এজেন্ট। নানান কাজের ঝামেলায় মেয়েদের দিকে সব সময় নজর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। ফলে তাঁরা বেড়ে উঠেছিলেন গ্রাম-বাংলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। ফুরফুরে রঙীন প্রজাপতি আর ফড়িংয়ের পেছনে ধাওয়া করে কেটে গিয়েছিল কত সকাল-বিকেল, কুকুর আর গুবরে পোকার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তাদের বন্ধুত্ব।

বয়সের দিক দিয়ে এখন ষাটের কাছাকাছি এই গডেন ভগ্নীদ্বয়ের চোখের সামনে আজ ভেসে উঠছে পুরনো দিনের ছবিগুলো। বুঝতে পারছেন বুকের মধ্যে স্মৃতির রোমন্থনে শৈশবের সোনালী দিনগুলো কেমন যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। হাটে-বাজারে প্রতিমুহূর্তে লোকের আনাগোনা, দরকষাকষি, চেঁচামেচি সব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে; স্টীমারের হুইসিল, নৌকোর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আজও শুনতে পান তাঁরা; দেওয়ালীতে উজ্জ্বল আলোকমালা ও আতসবাজি পোড়ানোর দৃশ্য, দুর্গাপুজোর উৎসবমুখর দিনগুলো আর [illegible] বেদনার্ত শোকামিছিল, সব চোখের [illegible] একের পর এক ভেসে উঠছে। মনে পড়ছে সেই ছোট্ট ঘটনাটিও। তাঁদের বাড়ীর দারোয়ান গুরু নামক লোকটির সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের অপরাধে গডেনদেরই বাড়ীর ঝাড়ুদার নিতাইই কি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল নিজের মেয়েটিকে। মোটামুটিভাবে আলোচ্য গ্রন্থটিকে নিজেদের শৈশবের স্মৃতিই উপন্যাসের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

তাই বলে শুধুমাত্র "শৈশব স্মৃতি"র অজুহাতে একপেশে রায় দিলে লেখিকাদের উপর যথোচিত বিচার করা হবে না। বরং বলা যায়, এটি এমন এক শ্রেণীর সাহিত্য যার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রতিটি জীবনবোধের বিশ্লেষণ, শূন্যতার মাঝে আকুতি, অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ, ভালবাসার মধ্যে যন্ত্রণা এবং কবিসত্তার স্বপ্নময় জগৎ খুবই বাস্তব ও রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। জনৈক সমালোচক বলেছেন, "টু আণ্ডার দি ইণ্ডিয়ান সান"-এর প্রতি ছত্রে বিচ্ছেদ করুণ রাগিণী শুনতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশ একেবারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।"

নতুন বই

হুগলী: সেন্সাস রিপোর্ট: ১৯৬১

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জেলাগুলির মধ্যে হুগলী অন্যতম। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে ইতিহাসের আধুনিক পর্যায়ে হুগলী একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী এবং পাদ্রীদের আগমনে হুগলীর জনসাধারণ আধুনিক জীবনধারার সংস্পর্শে আসে সর্বপ্রথম। তেল, পাট সুতো, কাগজ প্রভৃতি এখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। হুগলী নামকরণটি খুব প্রাচীন নয়। সম্ভবত পর্তুগীজদের আগমনের পরবর্তীকালেই এই নামটির প্রচলন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে হুগলী একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সেনসাস অপারেশনের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীবিশ্বেশ্বর রায়ের সম্পাদনায় **ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যাণ্ডবুক অফ হুগলী** (সেন্সাস ১৯৬১ খৃঃ) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। হুগলী জেলার বিবরণ-সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। প্রায় দুই শত পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা, চব্বিশখানি মানচিত্র, আঠারখানি চার্ট, ডায়াগ্রাম এবং সেন্সাস রিপোর্ট সমেত এই গ্রন্থখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা আট শতাধিক। সেন্সাস রিপোর্টটি দুটিভাগে বিভক্ত। বিভিন্ন শিল্প, নারী-পুরুষ, চাকুরীজীবী, শিক্ষিতের হার, ধর্ম, মাতৃভাষা, আদিবাসী, কৃষিব্যবস্থা, বৃষ্টিপাত, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, খাদ্যদ্রব্য পশু এবং পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা, অরণ্য-সম্পদ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, ইনসুরেন্স, [illegible], [illegible], [illegible], ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টার, শিক্ষা, আনন্দ-দানমূলক প্রতিষ্ঠান, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, পঞ্চায়েৎ, মিউনিসিপ্যালিটি, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, হাট-বাজার, মেলা, উৎসব, বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের সুদীর্ঘ পরিসংখ্যান আছে এই গ্রন্থে। চুঁচুড়া, পলবা, ধনিয়াখালি, পাণ্ডুয়া, বলাগড়, মগরা, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুড়, হরিপাল, তারকেশ্বর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা, জঙ্গীপাড়া, গোঘাট, আরামবাগ, খানাকুল, পুরসুরা থানাগুলির গ্রাম ও শহর সংখ্যা, থানাগুলির কার্যপরিধি, লোকসংখ্যা প্রভৃতি বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে। হুগলী জেলার বিশেষ ঘটনাগুলির কালানুক্রমিক বিবরণ গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। সমাজ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে হুগলী জেলার তথ্যমূলক বিবরণ সংগ্রহে সম্পাদক এবং তাঁর সহযোগীরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন নিঃসন্দেহে।

অবশ্য এই ধরনের কিছু কাজ যে এর আগে হয়নি এমন নয়। হাণ্টারের স্টাটিসটিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অফ বেঙ্গল এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রচেষ্টা। হুগলী জেলার প্রথম সুসমৃদ্ধ বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন হাণ্টার তার তৃতীয় খণ্ডে। ১৮৮৮ খৃঃ প্রকাশিত হয় এ স্কেচ অফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ফ্রম ১৭৯৫ টু ১৮৪৫। ১৯১১ খৃঃ প্রকাশিত হয় ওমলে এবং মনোমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অফ হুগলী। পরবর্তীকালে

হুগলী জেলা সম্পর্কে আরও অনেক গ্রন্থ ও বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবিনয়েন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টটিতে হুগলী জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির বিবরণ রয়েছে। সম্ভবত ইতিপূর্বে এমন নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমে বাংলাদেশের কোন জেলার ওপর কাজ করা হয়নি।

District Census Hand Book — Hooghly : Edited by B. Ray. Published by the Superintendent, Govt. Printing West Bengal. Price : Rs. 25.00.

●

ছোট গল্প সংকলন

বাংলা ছোটগল্প নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু সখেদে একটা কথা স্বীকার করতেই হয় আজকাল যে সব ছোট-গল্প লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশ নিয়ে আর সেরকম গর্ব করা যায় না। কারণ এইসব গল্প কোনক্রমেই ছোটগল্পের মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারছে না। এসকল ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে সাহিত্যের ভার বাড়ছে বটে, লাভ কিছু হচ্ছে না। আবার এরই মধ্যে দু'একজনের মেলে সত্যিকারের গল্পকারের সন্ধান। এদের উপর ভরসা করে সাহিত্যের এই শাখাটির উপর নতুন করে আশা করা যায়। অতীন্দ্রিয় পাঠক এরকম একজন ছোট-গল্পকার। তাঁর গল্পের ঋজুময়তা, সুঠাম বাঁধুনী এবং ঘনত্ব পাঠকচিত্তকে প্রসন্ন করে। 'স্থবিরের চোখ' তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত ছোট-গল্পের সংকলন। এই সংকলনে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই গুণগত উৎকর্ষে উজ্জ্বল না হলেও কয়েকটি গল্প যে বেশ উৎরেছে সেটা নিঃসন্দেহ। 'স্থবিরের চোখ', 'অমূর্ত বন্দনা', 'চেতনা বহুরূপী', 'প্রভাতের জন্ম হল' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে যথার্থ ছোটগল্পের স্বাদ পাওয়া যায়।

লেখকের কাছ থেকে আরও পরিণত চিন্তার ফসলের প্রত্যাশা রইল।

স্থবিরের চোখ : অতীন্দ্রিয় পাঠক। প্রকাশক—অন্বয়, ২৯সি মুগীপাড়া লেন, কলকাতা—৬। দাম—৪·০০ টাকা।

ভারত সম্পর্কে নতুন চিন্তা

'নয়া ভারতের কোষ্ঠীবিচার' গ্রন্থে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা পরবর্তী-কালের ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পায়ন সমস্ত দিকের পরিচয়দানের চেষ্টা করেছেন।

নয়া ভারতের কোষ্ঠীবিচার : (আলোচনা)— নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রকাশনী। ১।৭বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলকাতা-৯। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

একটি নূতন উপন্যাস

'দুই ঝড় এক মেঘ' উপন্যাসখানির কাহিনী স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। লেখকের বর্ণনাভঙ্গীও বেশ আকর্ষণীয়।

দুই ঝড় এক মেঘ (উপন্যাস) নিত্য-গোপাল সামন্ত। ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন। ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা-৯। মূল্য ২-৫০ পয়সা।

* * *

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের নতুন শিল্পসংস্থা

অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর মৃত্যুর পর তাঁর শিল্পসৃষ্টির হদিশ নেবার চেষ্টা হয়। কখনও কখনও তাঁদের সৃষ্ট শিল্পের অভাবনীয় আর্থিক মূল্যবৃদ্ধি হতেও দেখা যায়। কেউ কেউ বা জগতের শিল্প-ইতিহাসে চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভও করে থাকেন। কিন্তু এসব ঘটনা আমাদের দেশে বড় একটা ঘটতে দেখি না। এখানে জীবিত থাকার কালে শিল্পীরা কোন মতে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে যান। কেউ কেউ কিছুটা সমৃদ্ধিও লাভ করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁদের শিল্পসৃষ্টির হদিশ নেওয়া বা সেগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কোন কিছুই ঘটে ওঠে না। শিল্পীর শিল্পসংগ্রহ বা পুস্তক সংগ্রহ-গুলিও অনেক সময় তাঁর বংশধরদের পক্ষে রাখা সম্ভব হয় না। অল্পদিন আগেই এক লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীর সযত্ন সংগৃহীত দুয়েকটি বই কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে বিক্রী হয়ে যেতে দেখেছি। আমাদের শিল্প-সংগ্রহশালারও অভাব আছে। কখনও কখনও অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস কিছু কিছু শিল্পসংগ্রহের ব্যবস্থা করে থাকেন। গত রবিবার ২৪শে জুলাই অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ এধরনের একটি শিল্প সংগ্রহ করলেন।

কিছুদিন আগে এই অ্যাকাডেমীতেই পরলোকগত শিল্পী ফ্র্যাঙ্ক ব্রুঙ্গার স্ক্যালানের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী হয় গত ২৭শে মে থেকে ২রা এপ্রিল। প্রদর্শনীর আয়োজন করেন মিঃ এ ফিলিপস। এঁর জিম্মাতেই মিঃ স্ক্যালানের ছবিগুলি ছিল। এ সম্বন্ধে অমৃতের প্রদর্শনী বিভাগে

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

সংবাদও বেরিয়েছিল। তাঁর সমগ্র ছবিগুলি থেকে ছাব্বিশখানি এচিং অ্যাকাডেমীকে উপহার দেওয়া হল। এ ছাড়া স্বর্গত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা মিঃ স্ক্যালানের প্রতিকৃতিটিও অ্যাকাডেমী গ্রহণ করেন।

অ্যাকাডেমীর মাঝের হলে মিঃ স্ক্যালনের এচিংগুলির সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। ছবিগুলি ইতি-পূর্বেই শিল্পরসিকদের কাছে পরিচিত হয়েছে। দ্বিতীয় সাক্ষাতেও তাদের রস-বস্তুর বিশেষ হানি হয়নি দেখা গেল। ষোল বছর হল মিঃ স্ক্যালানের মৃত্যু হয়েছে। মারা গিয়েছেন তিনি প্রায় আশী বছর বয়সে। দীর্ঘকাল ভারত ও ভারতের বাইরে নানা জায়গায় ভ্রমণের দলিল হিসেবে ছবিগুলির একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। মিঃ স্ক্যালানের এচিংগুলির মধ্যে স্থাপত্যের রূপায়ণের সাফল্য বিশেষভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিল্লীর আজমীর গেট (১৯১৮), লাহোরের সিটি গেট (১৯১৭) দিল্লীর বাজার (১৯৩৬) প্রভৃতি ছবিগুলি এর সাক্ষ্য বহন করে। ভেনিস এবং ফ্রান্সের তিনখানি দৃশ্যে আবার তাঁর বাড়ী ও জলের ওপর ছায়ার নক্সার এবং সূক্ষ্ম টোন সৃষ্টির চাতুর্য মুগ্ধ করে। কলকাতার চিৎপুরের খাল, বালিগঞ্জের পুকুর এবং খিদিরপুরে লস্করদের চায়ের দোকানের ছবিগুলি ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের কলকাতার কয়েকটি সুন্দর চিত্র। চিৎপুরে খালের ছবির আলো-ছায়ার সম্পাতে একটা বিশেষ মুড সৃষ্টির সার্থকতাও লক্ষ্য করার মত। তাঁর ১৯২৪ সালের প্রাইজ পাওয়া ছবি লাহোরের কাশ্মীরী ভিখারী রেখার সংযমে প্রকাশভঙ্গীর একটি সুন্দর নিদর্শন। এছাড়া মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীঘাট, নদীর ধারের মন্দির, কাশীর প্রহ্লাদঘাট প্রভৃতি ছবিগুলিও সমান উল্লেখযোগ্য। একখানি ডেকরেটিভ ইলাস্ট্রেশন 'মেঘদূত' একটু অন্য মেজাজের ছবি। ভারতবর্ষের অনেক-গুলি জায়গার ছবি তিনি এইভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। মিঃ স্ক্যালানের ছবি-গুলি রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমি, প্যারিস সালোঁ, শিকাগো সোসাইটি অব এচারস এবং ফরাসী এচারদের সংস্থায় প্রদর্শিত হয়েছিল এবং তিনি এর কোন কোন সমিতির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ম্যাকমিলন, ব্ল্যাকি, লংম্যান প্রভৃতি প্রকাশকদের অনেক বইয়ের ছবিও তিনি এঁকেছেন।

কলকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের এই শিল্পীর জীবনী ও শিল্পকর্মগুলির সংগ্রহের জন্যে নিখিল ভারত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমিতির কলকাতা শাখা বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করছেন। তাঁর জীবন ও শিল্প-কর্ম নিয়ে একটি বই বের করার প্রস্তাব হয়েছে। এ-কাজটি যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তবে বাংলাদেশের আধুনিক যুগের শিল্পচর্চার ইতিহাসে একটা নতুন সংযোগ হবে। ইতিমধ্যে আমরা আশা করব যে, বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে (অর্থাৎ গত একশ' বছরের) যেসব শিল্পীরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের শিল্পকর্ম এবং জীবনী সংগ্রহের যেন একটা চেষ্টা হয়। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের মত একটি সংস্থা উদ্যোক্তা হয়ে এলে এ-কাজ অসম্ভব হবে না।

হারীতকৃষ্ণ দেব

ভাবতেও অবাক লাগে প্রখ্যাত ভারতবিদ, সুপণ্ডিত হারীতকৃষ্ণ দেব আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২২ জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর বিদায়ের সংগে সংগে আমরা এমন একজন মনীষীকে হারালাম যাঁর স্থান কোনকালেই পূর্ণ হবে না।

কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব জন্মেছিলেন শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজ পরিবারে—মে, ১৮৯৪। প্রাচীনকালের সমৃদ্ধি ও সমারোহ অনেকাংশে অন্তর্হিত হলেও তাঁর পৈত্রিক ভবনে সাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চার আবহাওয়া এখনও বর্তমান ছিল। পিতামহ উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাংলায় সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন, এক সময়ে তার খুবে আদর হয়েছিল। শৈশবে হারীতকৃষ্ণ অন্যান্য নাতিনাতনীদের সংগে তাঁর কাছে অনেক রঙ্গরসের কাহিনী শুনতেন। তাঁর শ্লেষ ও কৌতুকপ্রবণতা হয়ত এইভাবে শিশুকাল থেকে লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল। পিতা অসীমকৃষ্ণের লাইব্রেরীতে নানাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংগ্রহ ছিল। এইসব বই তিনি আগ্রহের সংগে পড়তেন। গ্রীস, রোম, আরব, ভারত, ঈজিপ্ট সম্পর্কে তাঁর নতুন ধরনের নানা অভিমত ছিল। নিজের বৈঠকখানায় বন্ধুদের কাছে মাঝে মাঝে হাজির করতেন সে সব। তবে অভিজ্ঞ মহলে প্রতিষ্ঠা পেতে যে প্রকারের অনুসন্ধান বা পরিশ্রম করার দরকার হয় তাতে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না। শোভাবাজারের রাজবাটীতে বৈঠকী নৃত্যগীত সাহিত্য নাটক আলোচনার ঐতিহ্য বহুদিনের। অসীমকৃষ্ণ গানবাজনার মধ্যেই নিবিড় আমোদ পেতেন, নিজে হারমনিয়ম বাজাতেন অপূর্ব সুন্দর! অনেক বিখ্যাত সুরকার, গায়করা তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করতো, মাঝে মাঝে বাড়ীতে বসতো বিখ্যাত গায়ক-বাদকদের জলসা।

তিনি মানুষ হয়েছিলেন এই আবহাওয়ার মধ্যে। নিজে ভাল গাইতে পারতেন, যত্ন করে শিখেছিলেন টপ্পা ঠুংরি ও রবীন্দ্রসংগীত। সমকালীনদের মধ্যে সমজদার বলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

প্রথম কয়েক বৎসর স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশুনা করে শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজীতে এম-এ পাশ করেন। আইন শিক্ষা সুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময়ে প্রমথ চৌধুরী মশায় ল'-ক্লাসে অধ্যাপনা করতেন। হারীতকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর এক ছাত্র।

প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী প্রবন্ধগুলি বের হয়ে গিয়েছে। চলতি বনাম সাধুভাষা আন্দোলনের দেশে তখন ভরা জোয়ার! 'সবুজপত্র' বের হচ্ছে। চৌধুরী মশায়ের ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে বসতো সাহিত্যের আসর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কখনও কখনও সেখানে দেখা যেত, সংগীতের আসরে দিলীপ রায় প্রমুখ গান-বাজনা করতেন। পরিণত বয়স্ক যশস্বী কৃতবিদ্যদের সংগে অনেক নবীনদেরও সেখানে যাওয়া-আসা ছিল। উত্তরকালে তাঁরা নানাভাবে যশস্বী হয়েছেন। নবীনদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ স্নেহের পাত্র। তাঁর সংগী হারীতকৃষ্ণও সেখানে যাওয়া-আসা

হারীতকৃষ্ণ দেব

করতেন। চৌধুরী মশায় চাইতেন নবীনেরা কলম ধরুক, বাংলাভাষায় ইতিহাস বিজ্ঞান কাব্য দর্শন সব বিষয়েই নিজেদের স্বকীয় মতবাদ প্রবন্ধ লেখাতে ব্যক্ত করুক। এইভাবে তাঁরই উৎসাহে—হারীতকৃষ্ণ এবং আরও অনেকের বাংলা লেখায় হাতেখড়ি হয়।

প্রায় সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাশে প্রথম পড়াবার ব্যবস্থা হল প্রাচীন ভারতের ও পৃথিবীর ইতিহাস। ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রথম থেকেই ছিল। এবং পিতার নিত্য-সংগী হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন শুধু পাঠে তাঁর তৃষ্ণা মিটবে না। তাই অনুসন্ধানীদের সাহচর্যে গবেষণার কাজে নেমে পড়লেন। ডিগ্রী তাঁর লক্ষ্য নয়—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভাণ্ডারকর সকলের কাছে যাচ্ছেন নতুন কথা জানতে ও পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে।

আইন পড়া বন্ধ হলো। পিতার নানা কৌতূহলোদ্দীপক নতুন বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজবার আগ্রহ জাগলো। সুরু হলো সংস্কৃত, পালি, ভাষাতত্ত্ব, শিলালেখ, তাম্রশাসনের আলোচনা, পুরান মুদ্রার পরিচিতি ইত্যাদি। নিজের পরিশ্রমে ও সাধনায় একাজে সুনাম ও সিদ্ধি অর্জন করলেন। বিক্রমাদিত্য অশোক উদয়নের বিষয় নতুন কথা বলেছেন। ভারতে প্রাচীন পদ্ধতির বর্ষগণনার আলোচনা করেছেন। জ্যোতিষের আলোচনা করেছেন বা শক-যবনের কথা অথবা বেদে উল্লিখিত পণি, কপর্দী ও পৌলস্ত্যের আন্তর্জাতিক স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াস করেছেন।

সারা জীবন এই সব নিয়েই হারীত-কৃষ্ণ ব্যস্ত থাকতেন। শেষের কয় বৎসর ইচ্ছা হয়েছিল নিজের কতকগুলি মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এর জন্য আবার নতুন উদ্যমে অধ্যয়ন আলোচনা সুরু করেছিলেন। তবে নানা ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির দরুন কাজটি শেষ করে যেতে পারেন নি—এটি আমাদের পক্ষে বেশ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

কিশোর বয়স থেকেই তাঁর সুদর্শনকান্তি সৌজন্য ভদ্র ব্যবহার মধুর কণ্ঠস্বর ও রঙ্গ-রস প্রবণতা বন্ধুমহলে তাঁকে একান্ত প্রিয়জন করেছিল। সব সমাজেই তিনি অন্তরঙ্গের মত মিশে যেতে পারতেন। তাঁকে দেখা যেত হেদুয়ার সাঁতারের ক্লাবে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের নাট্য অয়োজনে, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে, সাহিত্য ও সংগীতের আসরে, কিশোর কল্যাণ পরিষদে ও আরও কত জায়গায়!

প্রথম বয়সে তিনি বিজ্ঞান গণিত ও ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন সুরু করেছিলেন। পরে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র', শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়ের' গোষ্ঠির সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের বিপুল প্রয়োজনীয়তা।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রিয় বন্ধু-বিচ্ছেদে শোকাভিভূত হয়ে বলেছেন, "বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর কাছে আমরা বরাবর প্রেরণা ও সহানুভূতি পেয়ে এসেছি। বিজ্ঞান প্রচারের নানা সভায়, পরিষদের আয়োজিত নানা উৎসবে এত বৎসর তাঁকে সব সময় কাছে পেয়েছি—এতদিন! বিজ্ঞান কলেজের বহু কর্মীদের সংগে তাঁর আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণে সকলে ভাবছি—একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারালাম।"*

---

*আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব' নিবন্ধ অবলম্বনে।

অন্য ভুবন ॥ ৩ ॥

'বিশ্বাস করো, সবসময় আমার নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছি। কান পাতলেই আমি যেন অস্তিত্বের অবলুপ্তির শব্দ শুনতে পাই। সত্যিই, কেন জানি জানি না, আমি কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছি। আলো, বাতাস, রোদ্দুর, অন্ধকার সবাই যেন আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। বিশ্বাস করো, আমি একটুও বানিয়ে বলছি না। একটুও মিথ্যে বলছি না।' বলতে বলতে মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

কি জানি, সেই মুহূর্তে মনে হলো মেয়েটির প্রতিটি কথা, যেন সে তার সমস্ত সত্তায় ডুবিয়ে-ডুবিয়ে বলছে। বিষন্ন তার আত্মার ছবি আমাদের চোখের সামনে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য তার যন্ত্রণার অংশীদার না হয়ে পারিনি। তার যন্ত্রণা যেন ভিমরুলের মতো আমাদেরও মস্তিষ্কের ভিতরে এসে আঘাত করছিল। আমরা কেউ বা রুমালে চোখ মুছছিলাম, আবার কেউ বা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম।

তারপর আলো জ্বলতে আমি লক্ষ্য করলাম সবারই চোখে-মুখে কেমন একটা বেদনার ছাপ। বিষন্নতার সমুদ্র থেকে সবাই যেন এইমাত্র স্নান করে উঠলো।

পরে আরও অনেক ঘটনা ছিলো। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। আর আত্মহত্যা করবার আগে সে শেষবারের মতো ঘোষণা করেছিল, 'আমি মুক্তি চাই'। এ বন্ধন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে মুক্তি দাও তোমরা।'

নাটকের একটি চরিত্র। অমলা। কিন্তু সেই মুহূর্তে একবারের জন্যও মনে হয়নি, আমি নাটক দেখছি। চরিত্রের সংগে এমন সুন্দর মিশে গিয়েছিল মেয়েটি যে সে-যে প্রকৃত অমলা নয়, একথা ভাবতেও বিস্ময় জাগছিল। আর তাছাড়া, কি অদ্ভুত বাচন-ভঙ্গি কি অপূর্ব অভিব্যক্তি। প্রতিটি অভিব্যক্তির কি অসামান্য ব্যঞ্জনা! দর্শক-চিত্তকে জয় করবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে মেয়েটির। তা সে যে স্তরের দর্শকই হোক না কেন! হল ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় অমলার সেই অসহায় বেদনার্ত মুখের ছবি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আমি সারা রাত শুধু ঐ একটি মুখের ছবিই দেখেছি। আমার বার বার মনে হয়েছে, সত্যিই আমরা কেউ ওকে বাঁচাতে পারিনি। আর যে মেয়েটির অভিনয়ক্ষমতা আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করছিল, সমস্ত সত্তাকে ভেঙে-দুমড়ে তছনছ করে দিচ্ছিল, মনে-মনে তাকে নমস্কার করেছি। মনে হয়েছে, কি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী মেয়েটি।

পরে মেয়েটির সংগে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কারণ, যে-নাটকের মূল নায়িকা অমলার চরিত্রে অভিনয় করে মেয়েটি আমার সারা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তার পরিচালক ছিলো আমার বন্ধু অশোক।

অভিনয়ের কয়েকদিনের পরের ঘটনা। হঠাৎ অশোকের সংগে দেখা। দুই বন্ধু গিয়ে চায়ের দোকানে বসেছি। আকস্মিকভাবে অশোক প্রশ্ন করল, সেদিনের নাটক কেমন লাগলো? অশোকের ধরনই ঐরকম। না-জানিয়ে, না-বুঝিয়ে আকস্মিকভাবে গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন করে চলে।

অসাধারণ, মার্ভেলাস! চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমি বললাম।

যা, বসজলামি ছাড়! সত্যি করে বল, কেমন লাগলো? আমার বিশেষণ ব্যবহারকে ঠিক মতোন নিতে পারলো না অশোক।

আমি সোজা হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, নারে, সত্যিই দারুণ ভালো লেগেছে।
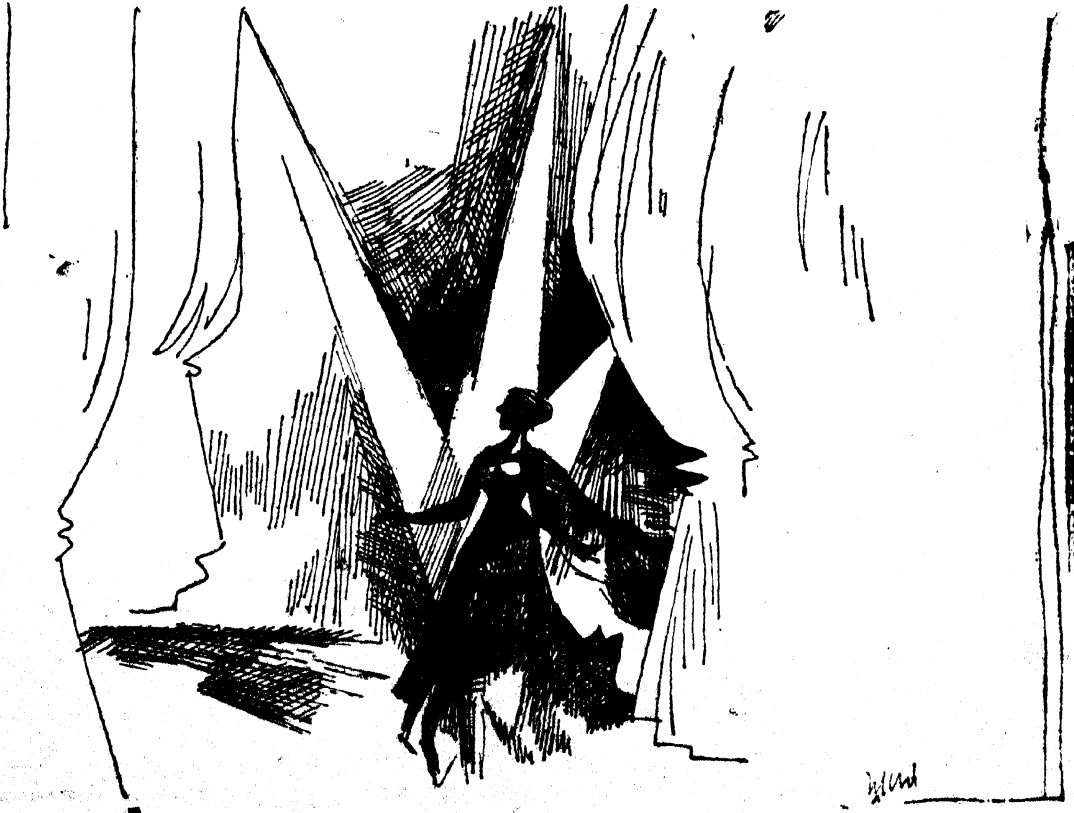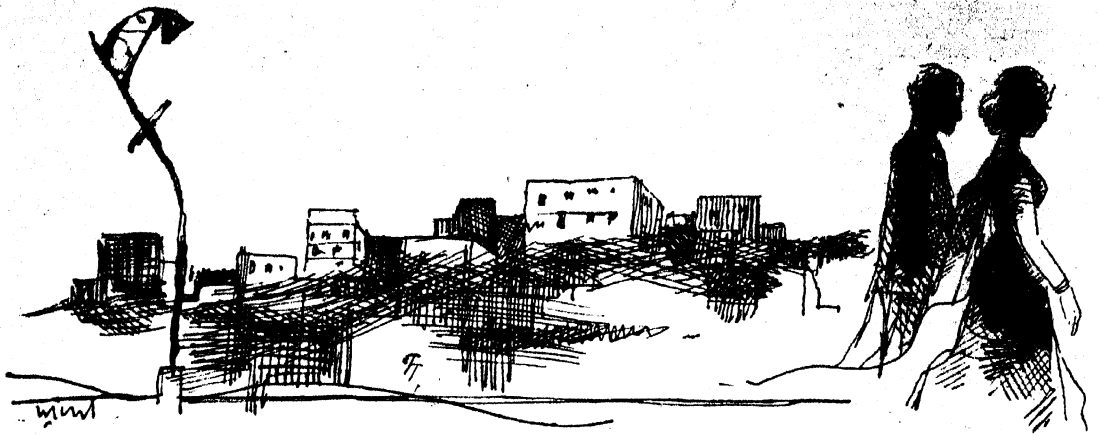
দুটি বোবা মানুষ যেন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে

অশোক বুঝলো আমি হাল্কাভাবে কথা বলছি না। সে একটু নড়ে-চড়ে বসলো।

আমি টেবিলে দুই হাত রেখে অশোকের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললাম, অমলার চরিত্রে যে অভিনয় করেছিল, ও মেয়েটি কে রে?

অশোক রহস্যের হাসি হাসলো। তারপর একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে বললো, কেন?

বিশ্বাস কর, অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতা মেয়েটির। মেয়েটির অভিনয় আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমি সারা রাত ঘুমুতে পারিনি।

আমার বলার মধ্যে হয়তো একটু আবেগ ফুটে বেরিয়েছিল। ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটিয়ে অশোক বললো, এন্দুর!

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, ইয়ার্কি নয়। অসাধারণ, এক্সেপশানাল অভিনয় করেছে মেয়েটি। যখন বলছিল, অস্তিত্বের অবলুপ্তির শব্দ...

অশোক বাধা দিলো, থাক। ওর সমস্ত ডায়লগ একেবারে মুখস্ত করে ফেলেছিস দেখছি। একটু থেমে আবার বলল, মেয়েটির সংগে পরিচয় করতে চাস?

আমি সোৎসাহে বললাম, আলবৎ, একশবার। কবে পরিচয় করিয়ে দিবি বল?

সামনের সোমবার। আমাদের রিহার্সাল রুমে আসিস। তবে ভালভাবে যদি পরিচয় করতে চাস, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

কতোক্ষণ?

ধরে নে, সারাজীবন।

বলাবাহুল্য দুই বন্ধু এক কথায় একই সঙ্গে হেসে উঠলাম।

যথারীতি সোমবারে আমি অশোকদের রিহার্সাল রুমে গিয়েছি। অশোক তার কথা রেখেছে। মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তার পর কেন এবং কিভাবে ঠিক বলতে পারব না, মেয়েটি অর্থাৎ সবিতার সঙ্গে ধীরে-ধীরে আমি সুপরিচিত হয়ে উঠেছি। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে কেমন যেন কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। সবিতাও আমার কাছে সহজ হয়ে উঠেছে।

তারপর একদিন। রিহার্সাল শেষ হওয়ার পর অশোক আমাকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে, বাড়ী ফেরার সময় তুই আজ একটু সবিতাকে পৌঁছে দিয়ে যাস? অশোক হয়ত একটু যাচাই করে নিতে চাইছিল আমাকে। কিন্তু তার মনের ভাব আমি আমল দিলাম না, অবলীলাক্রমে বলে বসলাম, নিশ্চয়ই। এ আর এমন কি?

সবিতা প্রতিবাদ করল, না, না থাক্। আমি একাই যেতে পারব। এই তো সামান্য পথ। কাছেই তো!

আমার কেমন যেন সম্মানে আঘাত লাগল। বললাম, না, তা হয় না। অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি থাকে তবে থাক। কথাটি বলে আমি সবিতার চোখের ভাব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম।

সামান্য একটু সময়। কি যেন ভাবল সবিতা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, না, তা ঠিক নয়। তবে—বলে বিনুনির ডগা হাতের আঙুলে পাকাতে লাগল।

অশোক লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। আমার পিঠে একটা প্রচন্ড থাপ্পড় মেরে বলল, ও-সব ভনিতা থাক। ফেরার সময় সবিতাকে পৌঁছে দে।

কেউ কোন কথা না বলে দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তারপর পথে বেরিয়ে মুখে কোন কথা নেই। দুটি বোবা মানুষ যেন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। এবং বেশ দূরত্ব বাঁচিয়ে।

আমিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম। কি, এরকম চুপ করে গেলেন কেন?

না, এমনি। ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে।

সত্যিই! আমি সমবেদনা প্রকাশ করলাম।

তারপর সবিতা কথা পাড়ল। আপনি অভিনয় করেন না কেন?

পারি না বলে! আমি সোজা জবাব দিলাম।

পারেন না আবার কি? আমিও কি পারতাম নাকি? সবিতা বলল।

পারতেন কিনা জানি না। তবে এখন আপনি যা অভিনয় করেন, তার কোন তুলনা হয় না, আমি বললাম। আমার চোখের সামনে সবিতার সেদিনকার অভিনয়দৃশ্য ভেসে উঠল। যেদিন থেকে মনে মনে আমি সবিতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, অন্তত তার অভিনয়ক্ষমতার।

সবিতা কোন কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। প্রশংসা শুনলে মেয়েরা বোধহয় একটু লজ্জা পায়।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা লেক ছাড়িয়ে যাদবপুরের দিকে এসে পড়েছিলাম। সবিতা হঠাৎ বলল, আপনি যান। এটুকু আমি একা চলে যেতে পারব। বলতে-বলতে সেখানের সরু পথের দিকে পা বাড়াল সবিতা। আমি বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। বুঝতে পারলাম না, এখানে সবিতা কোথায় থাকতে পারে। আমার চোখের সামনে থেকে সবিতা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন পরের কথা।

অশোকদের রিহার্সাল রুমে আর যেতে পারি নি। নানারকম কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বাইরের জগৎ থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে বাধ্য হয়েছি।

সেদিন ঢাকুরিয়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। ফেরবার সময় যাদবপুরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম তার সঙ্গে। সিগারেটের ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে হাঁটছি। কিন্তু হঠাৎ যেন আমি চমকে উঠলাম। এমন একটা মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, যাকে এখানে দেখব আমি আশা করি নি। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বন্ধু ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারল না। আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, কি হল?

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম, সবিতা যে এখানে থাকে একথা ভাবতে আমার একদম ইচ্ছে করছিল না। ভালও লাগছিল না। কেন, ঠিক জানি না।

পথের ওপাশে বাস্তুহারাদের ছোট্ট-ছোট্ট যে আস্তানা গড়ে উঠেছে সেখান থেকে উন্মুক্ত আলোর ঠিক অরণ্যকুমারীর মত বেরিয়ে আসছিল সবিতা। চোখে-মুখে ঘুমের জড়তা। কি জানি আমার মনে হল, আমার সঙ্গে [illegible] [illegible]। এখানে আমাকে সবিতার না দেখাই ভাল।

কিন্তু আমার ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগে সবিতা সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নিজের অজান্তেই মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। বন্ধুটি কোন কিছুই ঠিকমত বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মাটির পুতুলের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে সবিতা বলল, কি ব্যাপার, প্রাতর্ভ্রমণ করছেন নাকি? আমার চোখের বিস্ময় বোধহয় সবিতা বুঝতে পারল। সামনের ছোট আস্তানা-গুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এই তো, এখানেই আমি থাকি। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম কথাকটি বলবার সময় এক-বারের জন্যও সবিতার চোখে-মুখে কোন-রকম লজ্জা বা জড়তা ফুটে উঠল না। যেমন সহজভাবে সে আমার সংগে পরিচিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি সহজভাবে কথাকটি বলে গেল সে।

আমি ভদ্রতার হাসি হাসলাম, তাই নাকি? এই জন্যে সেদিন রাস্তা থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। আমি তো ভাবলাম... আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। নিজের কথায় নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম।

কি ভাবলেন? কোন বিশেষ ব্যক্তির সংগে আগে থেকে মীট করার কথা ছিল,... তাই তো? ঠাট্টার সুরে বলল সবিতা।

আমার নিজেকে বড় অসভ্য মনে হল। সত্যি, ভেবেচিন্তে কথা না বলার এমন খারাপ অভ্যাস আমার!

কিন্তু সবিতা কিছু মনে করেছে বলে মনে হল না। কণ্ঠে একই রকম ঠাট্টা ঢেলে সে বলল, না মশাই, এখানেই আমি থাকি।

লজ্জায় আমি একেবারে চুপসে গেলাম।

সবিতা আবার মুখ খুলল, যাকগে, কি হয়েছে আপনার, ওদিকে আর আসেন না কেন?

পারিবারিক ব্যাপারে হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। লজ্জা কাটিয়ে উঠে আমি জবাব দিলাম।

ও! বলে একটু চুপ করলো সবিতা। তারপর খেলার ছলে চোখেমুখে ছড়িয়ে-আসা চুলগুলোকে ঠিক করতে করতে বললো, সামনের রবিবার ফ্রি আছেন?

থাকতে পারি। কেন?

তাহলে আমাদের অভিনয় দেখতে আসুন।—বলে সে জায়গাটা জানাল।

কি ব্যাপার? আপনার নতুন কোন অভিনয় আছে নাকি?

হ্যাঁ। ছোট্ট জবাব দিলো সবিতা।

কি বই?

আগে বলা বারণ।

তাই নাকি?

নিশ্চয়।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। বন্ধুটির এতোক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। গলা ঝেড়ে সে-কথা সে জানান দিলো। স্বাভাবিক। আমি সবিতাকে বিদায় দিলাম। আসার সময় ছোট্ট করে বলে আসলাম, রবিবার চেষ্টা করবো। আকাশের মতো চোখ মেলে সবিতা আমার দিকে তাকালো। কোন কথা বললো না। ঠোঁটের কোনে শুধু একটি ছোট্ট হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললো।

আমি ফিরে আসতে বন্ধুটি হৈ-চৈ করে উঠলো, কি ব্যাপার বল তো?

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর-ভাবে জবাব দিলাম, কই, কিছু নয় তো?

মানে? বন্ধুটি অধৈর্য হয়ে উঠলো।

আমি আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকা-লাম। ওর কৌতূহলে আমার খুব মজা লাগছিলো। মুখের মাঝে একরাশ ধোঁয়া টেনে নিয়ে আমি রিং করে করে ছাড়তে লাগলাম।

বন্ধুটি কৌতূহল আর চাপতে পারলো না, মেয়েটি কে?

সবিতা।

বন্ধুটি ভ্রূ কোঁচকালো। সবিতা! সে আবার কে?

মেয়েটি। আমি ইচ্ছে করেই ওকে চটাতে চাইলাম।

ও সত্যিই চটে গেল, ইয়ার্কি ছাড়। মেয়েটি কে?

আমি সামান্য একটু সুতো ছাড়লাম। বললাম, অভিনয় করে।

অভিনয় করে? কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভংগী করলো বন্ধুটি, অভিনয় করার সংগে তোর কি সম্পর্ক?

আমি অভিনয় দেখতে ভালবাসি।

তা অভিনয় ভালবাসার সংগে পরিচয়ের কি সম্পর্ক আছে?

আমি অভিনয়ের গভীরে যেতে চাই।

ও! বলে চুপ করলো বন্ধুটি। আমি বুঝলাম, ও ভীষণ রেগে গেছে। কেন জানি না, ও যতোই রেগে উঠছিলো, ততোই যেন ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছিল আমার।

কিন্তু আমার সমস্ত ইচ্ছে একেবারে পাথর হয়ে গেল যখন ও দুম্ করে বলে বসলো, এদের সংগে বেশি মেশা কিন্তু ঠিক নয়।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার রক্ত রেসের ঘোড়ার মতো কেমন টগবগ করে খেপে উঠলো। এ জাতীয় কথা ও বলবে আমি কল্পনা করতে পারিনি।

আমার চোখের ভাব বোধহয় লক্ষ্য করলো বন্ধুটি। আরও জোর দিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইলো, বিশ্বাস কর, আমি জানি ভাল করে। আমি ঠিকই বলছি।

আমি কঠিন স্বরে বললাম, এ-সব নোংরা কথার মধ্যে আমি যেতে চাই না। যাকে আমিও ভাল করে চিনি না, তুমিও ঠিক চেনো বলে মনে হলো না, তাকে নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো বোধহয়।

তুই আমাকে ভুল বুঝছিস। বন্ধুটি প্রতিবাদ করলো।

বাকি পথটুকু আমরা কেউ কোন কথা বলিনি। দুজন যেন দুটি ভিন্ন জগতের মানুষ।

রবিবারের সন্ধ্যাটা আমি নষ্ট করতে চাইনি। নির্ধারিত স্টেজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র নাট্যরূপ। বিমলার চরিত্রে অভিনয় করেছিল সবিতা। বিমলা আমার ছেলেবেলা থেকেই প্রিয় চরিত্র। কিন্তু এমন জীবন্ত রূপ আমি কোনদিন কল্পনাতেও আঁকতে পারিনি। সন্দীপের সংগে যখন বিমলা তার দেশের প্রতি গভীর ভালবাসার কথা বলছিল, তখন চোখের কোনে দাউ-দাউ করে যেন আগুনের শিখা জ্বলছিলো। বিষণ্ণতার সাগরে সদ্য স্নান করে ওঠা অমলা, আর আগুনের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত বিমলা দুটি সম্পূর্ণ

বিপরীতধর্মী চরিত্র। কোনরকমভাবেই এদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু কি আশ্চর্যভাবে ভিন্নধর্মী দুটি চরিত্রকে দর্শকদের মাঝে জীবন্ত করে তুললো সবিতা! বিস্ময়ে-আনন্দে আমি নিশ্চল হয়ে উঠেছিলাম।

অভিনয়শেষে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। আমার মনে হলো, মামুলী অভিনন্দন জানাবার অনেক ঊর্ধ্বে সবিতা।

পরের দিন আমি নিজের থেকেই সবিতাদের বাড়ী গেলাম। ঠিক কোন্ বাড়ীটা না জানলেও জায়গাটা সেদিন আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল।

পথের মাঝে একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছিলো। কুকুরে আমার ভীষণ ভয়। তাই বেড়ার বাঁশ ধরে চোখ দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম, কোথায় সবিতাদের বাড়ী হতে পারে।

একটি বছর-দশেকের ছেলে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। আমার কুকুর-ভীতি ছেলেটি বুঝলো। কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে জিগ্যেস করলো, কাকে চান?

আমি সবিতার নাম বললাম। ছেলেটি খুব আপ্যায়ন করে আমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল। আপ্যায়নের অর্থ পরে বুঝেছিলাম। অভিনয়ের জন্যে সবিতার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অনেকেই এখানে আসেন। ছেলেটি সেরকমেরই কিছু মনে করেছিল আমার বিষয়ে।

আমাকে দেখে সবিতা একটু অবাক হয়েছে মনে হলো। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপর শাড়ীতে হাত মুছতে মুছতে আমার কাছে এগিয়ে এসে সহজভাবে বললে, কি সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন!

মামুলি ভদ্রতা আমার কেমন যেন লাগলো। বললাম, কেন, আসতে নেই?

না, তা বলিনি। নিন বসুন। বলতে বলতে সামনের উঠোন থেকে একটা ভাঙা চেয়ার আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি অবাক চোখে সবিতার দিকে তাকিয়েছিলাম। কেমন যেন অন্যরকম লাগছিলো সবিতাকে। পরনে একটি কম দামের লাল-পাড় শাড়ী, খালি পা, চুল খোলা, কপালে মস্তবড় টিপ। চিবুকে আর ঠোঁটের কোনে ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে আরও যেন সুন্দর লাগছিলো।

কয়েক হাত দূরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে বিড়ি টানছিলেন। হাওয়ায় বিড়ির গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছিলো। ভদ্রলোকের খালি গা। গায়ের রং রোদে-পোড়া তামাটে। এককালে ফর্সা ছিলো মনে হয়। বুকের হাড়গুলো বেরিয়ে এসেছে।

একটি সুন্দর মেয়ে মুহূর্তের জন্য উঁকি মেরে আবার মুখ সরিয়ে নিলো। সবিতার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে মেয়েটির।

বিস্ময়ভরা চোখে আমি সবাইকে দেখছিলাম। সবিতা ইশারায় [illegible] দিলো, আমার বাবা, আমার ছোট বোন। তারপর কি জানি কি ভেবে বললো, চলুন বাদাম-তলায় গিয়ে বসা যাক। এখানে বসে কখনো কথা বলা যায়!

আমি উঠে পড়লাম। সবিতা আগে আগে চললো। একই পোশাকে। খালি পায়ে। খোলা চুলে।

একটু দূরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা বাদামগাছ, তার নিচে বাঁশের মাচা বাঁধা। সামনে একটি ছোটো পুকুর। অবসর-যাপনের বারোয়ারী ব্যবস্থা বুঝি এখানেই। দু'-একটা বাচ্চা ছেলে এদিকে-ওদিকে খেলছিল। বসলাম আমরা গিয়ে সেই মাচারই এক পাশে।

সবিতা কথা বলছিলো। আর আমি অবাক হয়ে তার প্রতিটি বলার ভঙ্গী, প্রতিটি কথা অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম। সবিতা কেন যে তার জীবন-কাহিনীর পাতা আমার সামনে মেলে ধরলো, তা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হলো, এ যেন সেদিনের মঞ্চের অমলা আর বিমলার মিশ্র চরিত্রে অভিনয় করছে সবিতা। একদিকে বিষণ্ণতা, আর অন্যদিকে অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র প্রতিজ্ঞা।

সবিতা অভিনয়-জগতে আসবে কোনদিন কল্পনাও করেনি। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। সাধারণ লেখাপড়া শিখে স্বামীর সংসার করাই স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু যেদিন তাদের খড়কুটোর মতো ছিটকে এসে কলকাতার শহরতলীতে অস্থায়ী আস্তানা গড়তে হয়েছিল, হাঁপানীর রুগী বৃদ্ধ বাবা যেদিন অসহায় হয়ে গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন, সেদিন থেকেই সবিতা বুঝেছিল তার জীবনের ধারা অন্যদিকে বইতে শুরু করেছে। বাড়ীর বড় মেয়ে সবিতা সেদিন অসহায়তাকে অস্বীকার করে মাটিতে শক্ত পা ফেলে ফেলে হাঁটবার চেষ্টা করেছিলো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে অন্য এক জগৎ অর্থাৎ অভিনয়-জগতে এসে আটকে গেছে সবিতা। সে-জগতে তার অন্য পরিচয়। যে-পরিচয়ে আজ আমি এখানে এসেছি। যে-পরিচয়ে মনে মনে তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখেছি।

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সবিতা, যাকগে, বাদ দিন। আপনার কি খবর বলুন? নিজের কথা বলতে পারলে কেউ আর থামতে চায় না।

সবিতার বিষণ্ণতা তখন আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি কয়ুণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, একটা কথা জিগ্যেস করবো, কিছু মনে করবেন না?

সবিতা হাসলো। বললো, বলুন।

আচ্ছা, আপনি কিরকম পান এতে এখন?

সবিতা একটা ছোট্ট ঢিল তুলে পুকুরের জলে ছুঁড়ে মারলো। জল কেঁপে কেঁপে অজস্র রিং তৈরী হতে লাগলো। সেই মুহূর্তে আমার অসম্ভব ছেলেমানুষ মনে হলো সবিতাকে। জলের রিংগুলোর দিকে তাকিয়ে সবিতা পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনার কতো মনে হয়?

আমি হাসলাম, কি করে জানবো?

জলের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেই সবিতা বলল, এখন যে খুব খারাপ হয় তা নয়। যে-কোনো অভিনয়েই আমি একশ' টাকা করে পাই। তবে, আমার আসল সুনাম অফিস ক্লাবে। আমাকে এখন ও'রা দু'শো টাকা করে দেন। অবশ্য রিহার্সাল সমেত।

এরকম ক'টা অভিনয় এখন মাসে করেন? আমি আবার জিগ্যেস করলাম।

সবিতা একটু ভাববার চেষ্টা করলো। তারপর বললো, মাসে তিন-চারটে। তবে, সব মাসে তো সমান যায় না। গড়ে মাসে বোধহয় দু'টো পড়ে।

ও! আমি চুপ করলাম।

সবিতা একটু হাসলো। তারপর বললো, জানেন, এখন তো আমার একটু নাম হয়েছে। প্রথমে আমাকে দিয়েছিলো মাত্র কুড়ি টাকা। তখন আমি নতুন। অভিনয়ের অ-আ-ক-খ-ও বুঝি না। আর তাছাড়া কতোরকম শুভানুধ্যায়ীর পাল্লাতেই না পড়েছি। এখন তো অনেক বড় হয়েছি। তখন তো একেবারে এইটুকুনি ছিলাম।

শুভানুধ্যায়ী মানে? আমি প্রশ্ন করলাম।

সবিতা খিল খিল করে হেসে উঠলো। আপনি একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। শুধু কি অভিনয়ের সুযোগ, আমার ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার মহান দায়িত্ব যে কতো লোক নিতে চেয়েছে!

আমি হাসলাম। ও, তাই নাকি? তা সে-সব মহাপুরুষরা কোথায়?

অন্ধকারের জীব অন্ধকারেই আছে হয়তো কোথাও, সবিতা বলল, তবে এ-কথা আমি জোর দিয়েই বলব, সংসারে ভালো-মানুষের সংখ্যাই অনেক—অনেক বেশি। আর সত্যিকারের নাটকপ্রিয় লোক এ-জগতে যথেষ্ট। বরং তাঁদের সংখ্যাই এখন বাড়ছে। নতুন-নতুন নাটক তাঁরা করছেন। সেখানে অভিনয় করে সত্যি আমার খুব আনন্দ লাগে। এখন বুঝতে পারি, গোপনে-গোপনে সত্যিই আমি অভিনয়কে ভালোবেসে ফেলেছি।

সবিতা চুপ করলো। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে, যাওয়া যাক।

আমি উঠে পড়লাম। সবিতাকে বিদায় দিলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পায়রার খুপরীর মতো তার সেই ছোট্ট আস্তানায় আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে সবিতা।

সাধারণ, খুবই সাধারণ একটি মেয়ে। কিন্তু শিল্পবোধ করেছে তাকে শ্রীময়ী, আর জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে দিয়েছে ব্যক্তিত্ব। তার চলায় ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে সেই নতুন ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

—সত্যকাম

পথের দুপাশে

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম

> পথের দু পাশের অসংখ্য মানুষ, অগুণতি স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন গৃহ, অসংখ্য মন্দির, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যায় ছায়াছবির মত। কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা হাসি-অশ্রু বিজড়িত তাদের পিছনের ইতিহাস কি ভেবে দেখেছি আমরা। সেই ভাবনারই ফলশ্রুতি এই পথের দু পাশে।
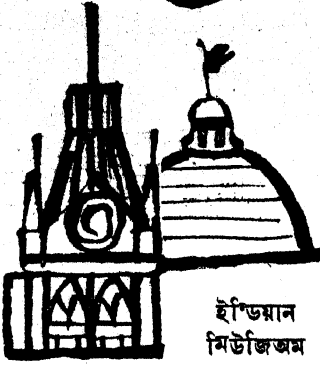
কলকাতা আকর্ষণের প্রাণবিন্দু ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম। ডান দিকে সদর স্ট্রীট, সামনে চৌরঙ্গী আর খোলা মাঠ। বাম দিকে আর্ট কলেজ ও জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অফিস। তার পাশে কীড স্ট্রীট। বিরাট এই গৃহটির গাম্ভীর্য শতবর্ষব্যাপী মানুষের মনকে এক জাদুকরীর স্পর্শে টেনে নিয়ে আসছে। জাদুঘরের জাদু কোথায় অনেকেই তার খবর রাখেন না। বাইরের রূপটি দেখেই মোহিত হন। মিউজিয়ম নয়নমুগ্ধকর নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ হল জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অতীত গৌরব উপলব্ধি এবং আধুনিক মানবসভ্যতার প্রকৃতি অনুধাবন করে আমাদের শিক্ষার মর্যাদা বাড়াতে হলে মিউজিয়ম অন্যতম মাধ্যম।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরূপ নিকেতন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, কারুশিল্প, ললিতকলা প্রভৃতির অমূল্য সম্ভার সংগৃহীত হয়েছে এখানে।

যুদ্ধপরবর্তীকালে মিউজিয়মের পুনর্বিন্যাস ঘটাবার চেষ্টা চলছে নানাভাবে। বিশেষ করে বর্তমান ডিরেক্টর মিঃ এ কে ভট্টাচার্যের উৎসাহে এবং প্রচেষ্টায় চলেছে নতুনভাবে মিউজিয়ম সাজানোর কাজ। কিভাবে জনসাধারণকে আরও সচেতন করা যায়, তাদেরকে আকৃষ্ট করা যায় কিভাবে, সে সম্পর্কে তিনি চিন্তা করে থাকেন। বহু নতুন গ্যালারী প্রতিষ্ঠা এবং পুরনো গ্যালারীগুলির পুনর্সজ্জার কাজে তাঁর ত্রুটির অন্ত নেই।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য বর্তমানে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার মূল্য সব থেকে বেশী। প্রতি শনিবার দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ছাত্রদের মিউজিয়ম দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাদের দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্যালারীগুলি দেখান হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চলে আকর্ষণীয় ও জ্ঞান বৃদ্ধিমূলক ফিল্ম শো। এক সঙ্গে ত্রিশজন ছাত্রের এক একটি ইউনিট গাইডের সাহায্যে বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে। ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গাইডেরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেও থাকেন। অবশ্য ছাত্রদের দেখার ব্যবস্থার জন্য মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্বেই যোগাযোগ করা ভাল। প্রায় নব্বুই-জন ছাত্রকে তিনটি ভাগে এক সঙ্গে মিউজিয়ম দেখান সম্ভবপর। নতুন চিলড্রেন্স গ্যালারী তৈরীর একটা প্রস্তাবও আছে। এখানে ছাত্রদের উপযোগী জিনিসগুলি এনে সাজিয়ে রাখা হবে।

মিউজিয়মে গত মে মাসে যে কেমিস্ট ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে, তা হল এদের নিজস্ব কেমিক্যাল ইউনিট। লাইব্রেরীতে মূল্যবান গ্রন্থ থাকায়, এটি সকলের জন্য মুক্ত নয়। গবেষণা কর্মীরাই মাত্র ব্যবহার করতে পারেন। প্রতি শুক্রবার কলকাতা ইউনিভার্সিটির ক্লাসের ব্যবস্থা আছে মিউজিয়মে। ঐ দিন সকলের পক্ষে প্রবেশ সীমাবদ্ধ।

মিউজিয়মের একটি নিজস্ব 'বিক্রয় কেন্দ্রও আছে। এই বিক্রয়-কেন্দ্রে পিকচার, পোস্টকার্ড, ফোল্ডার, কাস্ট কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন মূর্তির কাস্ট স্বল্প মূল্যে বিক্রীর ব্যবস্থা হচ্ছে। উপহারের পক্ষে এমন সুন্দর জিনিস খুব কমই দেখা যায়। এর থেকে সরকার বহু অর্থ উপার্জন করতে পারেন। গাইড বুকও কিনতে পাওয়া যায় এই বিক্রয়-কেন্দ্রে।

মিউজিয়মের সংগ্রহ নানান গ্যালারীতে সাজান রয়েছে। গ্যালারীর সংখ্যাও কম নয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাল অপেক্ষা এখন এই গ্যালারীগুলি সাজান অনেক আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক। গ্যালারীগুলির মধ্যে প্রত্নবিদ্যার বিভাগটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের অধীন। সম্প্রতি এখান থেকে কিছু ভাস্কর্যের নিদর্শন দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর শিল্প-নিদর্শন এখানকার অন্যতম আকর্ষণ, (১) মৌর্য, (২) সুঙ্গ গ্যালারী, (৩) ভারহুত, (৪) গান্ধার, (৫) গুপ্ত, (৬) মধ্যযুগীয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, (৭) জাভা এবং কাম্বোডিয়ান, (৮) প্রাগৈতিহাসিক, (৯) মুদ্রা, (১০) ব্রোঞ্জ, (১১) এপিগ্রাফি গ্যালারীগুলির আকর্ষণ
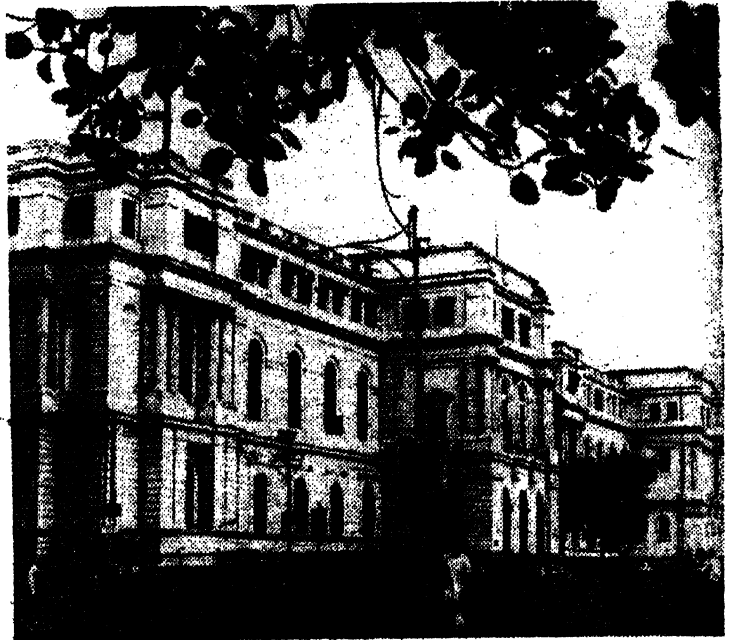
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম

কোন অংশে কম নয়। গান্ধার শিল্পের অপরূপ ভাস্কর্য, পূর্ণাবয়ব মানুষের প্রতিকৃতি, কুশান যুগের শিল্পকর্ম, ভারহুতের তোরণদ্বারের শিল্পরূপ, গুপ্ত যুগের শিল্পসুষমা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নানাবিধ শিল্পকর্ম ইণ্ডিয়ান মিউজিঅমের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীনের শিল্পকর্মও এখানে আছে। হিন্দু-মুসলমান শিল্প সমন্বয়ের মনোরম নিদর্শন দেখা যায় এর গ্যালারীতে। দেব-দেবী থেকে শুরু করে মোগল যুগের শিল্পকর্ম ও রাজনৈতিক আদেশাবলীর আকর্ষণও কম নয়। বিভিন্ন যুগের শিল্পকর্মের বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ তক্ষশীলা, নালন্দা, মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, কৌশাম্বী প্রভৃতির হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস একালের মানুষের চোখে বিস্ময় উদ্রেক করে। তাম্র বা প্রস্তর ফলকে খোদিত বিবরণ ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনে।

অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বা নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্যালারী তিনটিতে আছে (১) ট্রাইবাল অ্যান্ড প্রভিনশিয়াল পিপলস অফ ইণ্ডিয়া, (২) ড্রেসেস, ওএপ্যানস অ্যান্ড আদার অ্যাকসেস্যারিস গ্যালারী, (৩) মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট গ্যালারী। এই গ্যালারীগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির এক আশ্চর্য নিদর্শন কয়েক সহস্র নিদর্শনের মধ্যে উপস্থিত। এখানে আসাম, নাগা, আওনাগা, মিরি, ডফলা, মিশমি, মিকির, আন্দামানী, নিকোবরীদের জাতিতত্ত্বমূলক বিবরণ ও নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। উপজাতীয় ও গ্রামীণ জীবনধারার রূপ শহরজীবী মানুষের চোখে বিস্ময়ের বস্তু নিঃসন্দেহে। মাছ ধরবার সরঞ্জাম, কৃষি সরঞ্জাম, আত্মরক্ষামূলক প্রতিশোধমূলক যুদ্ধাস্ত্রও সংগৃহীত হয়েছে। মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট গ্যালারীটির অতি সম্প্রতি উদ্বোধন হয়েছে। একানব্বইটি বাদ্যযন্ত্র আছে এখানে। বীণা, সেতার, এসরাজ, তানপুরা, রবাব, সারেঙ্গী, বাঁশী, ড্রাম, সরোদ এবং কয়েকটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য বাদ্যযন্ত্র।

ভূতত্ত্ব বিভাগটি হল মিনিস্ট্রী অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ-এর অধীন। Siwalik, মীটিয়ারাইট মিনরল এবং ফসিল এই চারটি গ্যালারী আছে এখানে। তাছাড়া এখানে আছে ইনভ্যারটিব্রেট গ্যালারী এবং 'মিনরলস ইন ইণ্ডাস্ট্রি' সেকসন।

পৃথিবীর সব থেকে আশ্চর্যতম সংগ্রহ এবং এশিয়ার সর্ববৃহৎ এই সংগ্রহ দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে সব থেকে বিস্ময়ের বস্তু। নানাবিধ খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরীভূত মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম সুন্দরভাবে সাজান আছে এখানে। যুগে যুগে ভূত্বক গড়ে উঠেছে যে নানা উপাদানে তারই বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ ছড়িয়ে আছে এখানে।

পরবর্তী সংখ্যায়
কলিকাতার চিড়িয়াখানা

জুলজিক্যাল (জীববিদ্যা বিভাগ) বোধহয় সব থেকে আকর্ষণীয়। এটি হল কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অধীন। সমস্ত সংগ্রহটি দু ভাগে বিভক্ত। এখানকার আকর্ষণীয় ছয়টি গ্যালারী হল ইনভারটিব্রেট গ্যালারী, ইনসেক্ট গ্যালারী, ফিশ গ্যালারী, অ্যামফিবিআন, রেপটিলিআন গ্যালারী, বার্ড গ্যালারী, একটি বৃহৎ ম্যামল গ্যালারী ও একটি ক্ষুদ্র ম্যামল গ্যালারী। এই সমস্ত গ্যালারীতে ভারতে পাওয়া যায় এমন জীবজন্তুর প্রায় সমস্ত প্রকারের নমুনা রাখা হয়েছে। কয়েকটি কেসের মধ্যে আছে বিদেশী জীবজন্তুর নমুনা। প্রাণীজগতের এই সুবিপুল সংগ্রহ বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে মানুষকে ভাবিত করে। কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, উভচর প্রাণীর নমুনার নিদর্শন আছে এখানে।

১৮৭৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত কলা (আর্ট) বিভাগের আধুনিকীকরণ করা হয় ১৯১১ খৃঃ। বিভাগটি মিউজিঅমের ট্রাস্টী বোর্ডের অধীন। কলা বিভাগে আছে (১) টেক্সটাইল গ্যালারী, (২) টিবেটিয়ান অ্যান্ড নেপালীজ ব্রোঞ্জ গ্যালারী, (৩) আইভরি অ্যান্ড সেরামিকস গ্যালারী, (৪) নাহার গ্যালারী অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট, (৫) উডকার্ভিং গ্যালারী (তিনতলায়), (৬) মিনিয়েচার গ্যালারী (তিনতলায়), (৭) সান্যাডস অ্যান্ড ফারম্যানস গ্যালারী।

ঢাকার বিখ্যাত মসলিন যাঁরা দেখেননি, তাঁরা এখানে এসে সেই দুর্লভ বস্তুটি স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন। প্রাচীন আমলের নানাবিধ কারুকার্যময় বস্ত্র, পারস্য থেকে আনা অপরূপ সজনী, তিব্বতের রঙীন পতাকা চিত্র সকল শ্রেণীর মানুষকেই আকৃষ্ট করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনা ধাতু-নির্মিত সুন্দর শিল্পমূর্তি, মাটির তৈরী পাত্রের মনমাতানো রঙ আর সূক্ষ্ম হাতের কাজ প্রাচীন যুগের মানুষের শিল্পবোধের পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হাতীর দাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, বিদ্রির কাজ, হিমরস, পাটোলা, রেশমী বস্ত্রশিল্প এক গৌরবময় যুগের স্মৃতিকে তুলে ধরে। ভারতীয়, তিব্বতীয়, পারসিক শিল্পকলার অপরূপ নিদর্শন, রাজস্থানী, শিখ, মোগল, পাহাড়ী শিল্পকলার মাধুর্য, বিভিন্ন বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্পীর আঁকা চিত্রশিল্পের নিদর্শন দর্শকমাত্রকেই আকৃষ্ট করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর জলরঙে আঁকা রাজপুত ও মোগল চিত্রকলার নিদর্শনও আছে।

উদ্ভিদ জগৎ থেকে যে সমস্ত দ্রব্য শিল্পকর্মে ব্যবহৃত হয় তার নিদর্শন সংগৃহীত হচ্ছে কিছু কাল যাবৎ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেকসনটি হল কেন্দ্রীয় খাদ্য ও

কৃষি দপ্তরের অধীন। এখানে আছে আসাম এবং বাংলা দেশ থেকে সংগৃহীত একশত রকম ধানের নমুনা, সুখাদ্য ফল, ওষুধ তৈরীর উদ্ভিদ, নানাবিধ খাদ্যশস্যের নমুনা। তাছাড়া কুইনাইন, আফিঙ, কাগজ, দেশলাই তৈরীর প্রক্রিয়াও দেখান হয়েছে এখানে। বিভিন্ন প্রকার আঁশ বা তন্তু থেকে তৈরী দ্রব্যাদির দেখান হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়। গত কয়েক বৎসরে এই বিভাগটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এখানে একটি 'হ্যারবেরিয়াম'ও আছে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিঅম প্রথমে ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সোসাইটির নিজস্ব সংগ্রহ এত বেশী হয়ে গিয়েছিল যে, এগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব।

ডেনিস উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচের মনে মিউজিঅম প্রতিষ্ঠার কথা আসে। সোসাইটির সংগৃহীত দ্রব্য নিয়ে ১৮৪৪ খৃঃ ২ ফেব্রুয়ারী তিনি মিউজিঅম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। সোসাইটি সম্মতি জানায়। তিনিই অনারারী কিউরেটর নিযুক্ত হন; নিজস্ব সংগ্রহ থেকে অমূল্য দ্রব্যসম্ভার দান করেছিলেন। সোসাইটির সংগৃহীত দ্রব্যাদি দু ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব। সোসাইটির গ্রন্থাধ্যক্ষের হাতে ছিল প্রথম বিভাগের ভার। ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওয়ালিচ। ডাঃ টিলার, কর্ণেল স্টুয়ার্ট, জেনারেল ম্যাকেঞ্জীও তাঁদের মূল্যবান সংগ্রহ দান করেছিলেন মিউজিঅমে। মিউজিঅমের দ্রব্য সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। পিতলে খোদাই করা অনুশাসন, দেব-দেবীর মূর্তি, মন্দির, মসজিদ বা স্মৃতিস্তম্ভের নিদর্শন, প্রাচ্যের যুদ্ধ সরঞ্জাম, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি, পূজার বাসন-কোসন, ভারতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি, শুষ্ক ভারতীয় পশুপক্ষী, জীব-জন্তুর কঙ্কাল, যুদ্ধাস্ত্র, গাছপালা, ফল, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ওষুধপত্র, বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য, — এই সমস্ত জিনিসপত্র সংগৃহীত হবে বলে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

মিউজিঅম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল... for the reception of all articles that might be sent to illustrate oriental manners and history, or to elucidate the peculiarities of Art or Nature in the East."

সোসাইটি কর্তৃপক্ষ মিউজিঅমের ওপর নজর রাখতেন। ওয়ালিচ স্বল্প বেতনে কিউরেটর নিযুক্ত করলেন। এই পদে ডঃ জে টি পিয়ার্সন, ডঃ ম্যাকলিল্যাণ্ড এবং ডঃ এডওয়ার্ড ব্লিথের নাম উল্লেখযোগ্য। ওয়ালিচের পরবর্তীকালে কিউরেটর পদের বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা থেকে দু' শত টাকা। সামান্য অর্থও সঞ্চিত হয়। পামার অ্যাণ্ড কোং ছিল সেকালের বিখ্যাত এজেন্সী হাউস। এই এজেন্সী হাউসে ছিল মিউজিঅমের সঞ্চিত অর্থ। এটি ফেল পড়ায় মিউজিঅম বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। কিউরেটরের পদের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে সরকারের নিকট আবেদন করা হয় ১৮৩৩ খৃঃ। কিছুকাল পরে সরকার মাসিক তিনশত টাকা সাহায্য দান শুরু করেন কিউরেটর পদের জন্য। ১৮৪১ খৃঃ কিউরেটর নিযুক্ত হন এডওয়ার্ড ব্লাইথ।

রাণীগঞ্জ কয়লাখনিতে কাজ শুরু হলে ক্যাপ্টেন জে বি ট্রেমোহিয়ার লণ্ডন যান এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। ভূতত্ত্বের যে সমস্ত নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, সেগুলি সোসাইটি ভবনে মিউজিঅমে দান করা হয়। তখন কিউরেটর ছিলেন পিডিংটন।

১নং হেস্টিংস স্ট্রীটে সরকারী ব্যবস্থা মতে ভূতত্ত্ব বিভাগের অফিস খোলা হয় ১৮৫৬ খৃঃ। ভূতত্ত্ব বিষয়ক জিনিসপত্র ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়। জায়গা খালি হলেও ক্রমশ সংগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। সোসাইটির পক্ষে সমস্ত জিনিসপত্রের সংরক্ষণ ছিল অসম্ভব।

১৮৫৬ খৃঃ সোসাইটি ইম্পিরিয়াল মিউজিঅম প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানায়। সোসাইটি গ্রন্থাগার বাদে সমস্ত সংগ্রহ মিউজিঅমে দান করবে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ এবং অর্থাভাবে সরকারের পক্ষে কিছু করা ছিল অসম্ভব। কিন্তু সরকার পূর্ব থেকে একটি প্রস্তাব করেছিল যে, সমস্ত দ্রব্য ভূতত্ত্ব বিভাগে নিয়ে যাবে। এবারেও তারা সেই প্রস্তাব করে। সোসাইটি মিউজিঅম প্রতিষ্ঠা না হলে ঐ সকল দ্রব্য সরকারের হাতে দেবে না জানিয়ে দেয়।

সোসাইটি এবার লণ্ডনে ভারত সচিবের নিকট আবেদন করে। ১৮৬২ খৃঃ ভারত সরকার মিউজিঅম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব স্বীকার করেন। সোসাইটি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। স্থির হয় একটি ট্রাস্টী বোর্ড গঠিত হবে। সোসাইটির প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহ এই ট্রাস্টী বোর্ডের অধীনে আসবে। মিউজিঅমে সোসাইটিকেও স্থান দিতে হবে। ১৮৬৬ খৃঃ ইণ্ডিয়ান মিউজিঅম অ্যাক্ট পাশ হয়। ১৮৬৬ খৃঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ট্রাস্টী বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার বার্ণস পীকক। প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হন ফ্রি চার্চ কলেজের (এডিনবরা) প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ জন এণ্ডারসন।

১৮৭৫ খৃঃ মিউজিঅম ভবন নির্মিত হয়। ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্বের জিনিসে মিউজিঅম প্রায় ভর্তি হয়ে যায়। সোসাইটি নিজস্ব অস্তিত্ব লোপের ভয়ে মিউজিঅমে যেতে অরাজী হল। দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে তারা মিউজিঅমে যাওয়ার দাবী ছেড়ে দেয়।

১৮৭৬ খৃঃ ১৭ ডিসেম্বর নতুন মিউজিঅম আইন পাশ হয়। সরকার মিউজিঅমের ভার তুলে দেন ট্রাস্টীসভার ওপর। ট্রাস্টী বোর্ড সদস্যের সংখ্যা তের থেকে ষোল হয়। ১৮৮৭ খৃঃ এই সংখ্যা হয় একুশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অফ কমার্স, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রতিনিধি ট্রাস্টী বোর্ডে নির্বাচিত হতেন।

নতুন সদস্য নেওয়ার ক্ষমতা ট্রাস্টী বোর্ডের ছিল।

মিউজিঅমের উন্নতি ঘটতে থাকে। গভর্নর স্যর জর্জ ক্যামবেল ১৮৭৪ খৃঃ 'ইকনমিক মিউজিঅম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডালহৌসী স্কোয়ারে। এখানে ছিল বাংলা দেশের কৃষি ও শিল্পের নমুনা। ক্যামবেলের পর গভর্নর হন স্যর রিচার্ড টেম্পল। টেম্পল মিউজিঅমের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন বিভিন্ন জেলায়। ঐ সমস্ত শাখা থেকে কৃষি দ্রব্য এসে জমা হত মিউজিঅমে। তাঁর সময়ে বাংলা দেশের আটশত রকম ধানের নমুনা মিউজিঅমে সংগৃহীত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ কলকাতায় আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী হয়, মিউজিঅমটির প্রশংসা করেন সকলে। ইণ্ডিয়ান মিউজিঅমের পাশের জমিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে ইকনমিক মিউজিঅম উঠে আসে ১৮৮৫-৮৬ খৃঃ এবং গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ খৃঃ ১ এপ্রিল নতুন আইনে ইকনমিক মিউজিঅম ইণ্ডিয়ান মিউজিঅমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মিউজিঅমের উত্তরে সদর স্ট্রীট। এখানে ছিল সদর নিজামত ও সদর দেওয়ানী আদালত। মিউজিঅমের লাগোয়া ছিল এই বাড়ী। সরকার এই বাড়ী ও জমি ক্রয় করে ইণ্ডিয়ান মিউজিঅমের জন্য। ফাঁকা জমিতে নতুন বাড়ী ওঠে। ১৮৯১ খৃঃ এখানে ইকনমিক মিউজিঅম উঠে আসে। একটি আর্ট মিউজিঅমও প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্কিওলজির একটি গ্যালারীর সামনে দুজন দর্শক

১৮৯২ খৃঃ সেপ্টেম্বর মিউজিঅম সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৮৯৩ খৃঃ স্থাপিত হয় জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্যালারী। দেশীয় কারুশিল্পের বিশেষজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইকনমিক ও আর্ট মিউজিঅমের অ্যাসিসট্যাণ্ট কিউরেটর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

স্যর চার্লস আলফ্রেড এলিঅট বাংলার গভর্নর ছিলেন ১৮৯০—৯৫ খৃঃ। তখন মিউজিঅমের অনেক উন্নতি ঘটে। ১৮৯৪ খৃঃ মে মাসে মিউজিঅমের ট্রাস্টী বোর্ড সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। অশোকের অনুশাসনগুলি ছিল অসংরক্ষিত অবস্থায়। এগুলি সংরক্ষণের আবেদন জানান হয় সরকারের নিকট। সরকার বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ না করলেও গভর্নর এলিঅট এ বিষয়ে অনেক কিছু করেছিলেন। অনুশাসনের ছাপ ও প্রতিচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। নেপাল থেকে ছাপ আনাবার ব্যবস্থা হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকারকে এই কাজ করবার অনুরোধ জানান হয়। অনুশাসনগুলির একপ্রস্থ মিউজিঅমে সংরক্ষিত আছে।

মিঃ এ কে ভট্টাচার্য লিখেছেন:—

> At the beginning, the collection of the Museum, as has been stated already started with archaeological and zoological material, but later on, was added up with those relating to art and economic products, while the geological material quite enormous as it was remained with the Geological Department. This anomalous position was soon cleared up by a proposal of the Trustees that the Museum be divided into five sections, viz., zoological and ethnological, archaeological, art and industrial, which received statutory sanction on 1910".

মিউজিঅমের জিনিসপত্র বেড়ে যাওয়ায় আরও স্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চৌরঙ্গীর দিকে মিউজিঅমের বাড়ীর জন্য যে খালি জমি পড়েছিল সেখানে বাড়ী নির্মাণ শুরু হয় ১৯০৪ খৃঃ। শেষ হয় হয় ১৯১১ খৃঃ। এই বাড়ীর ওপর তলায় গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের গ্যালারী স্থাপিত হয়। এটি মিউজিঅমের অঙ্গীভূত হলেও আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের অধীনে। নীচের তলায় প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন সংরক্ষিত।
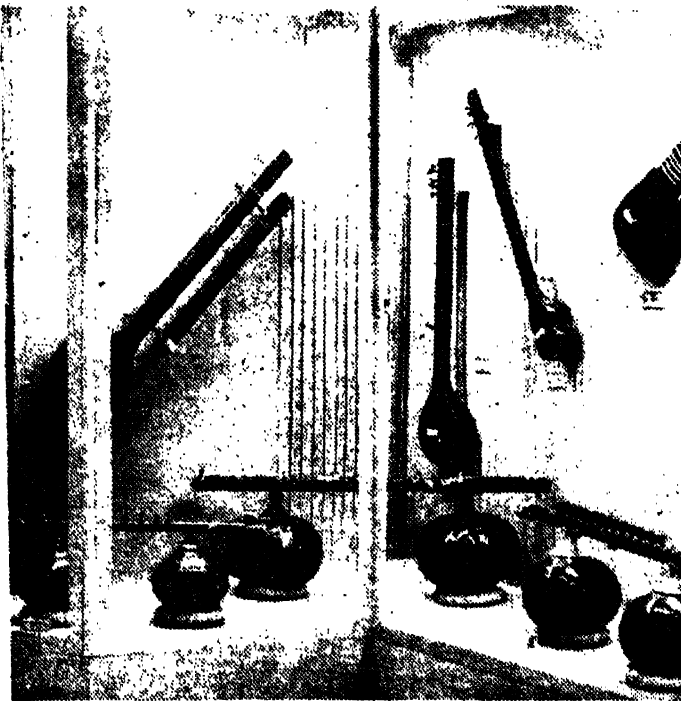
মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট গ্যালারী

(উপন্যাস)

।। দুই ।।

বিয়ে যে বিশ্বজগতের মধ্যে শুধু বিশাখারই হয়েছে তা নয়। এই বাড়িরই আছে একটি — অণিমা। জয়া থেকে প্রোমোশান পেয়ে ইদানীং দস্তুরমত জননী। দু বছরের বাচ্চা ছেলে কোলে। অণিমার মুখে উল্টো কথা। বাপের বাড়ি এসে মায়ের উপর তেড়ে পড়ে : বিয়ে দিচ্ছ নাকি পুনির ?

তরঙ্গিণী বলেন, দেবো বললেই তো হয় না। খরচপত্রের ব্যাপার। এ বাজারে সংসার চালিয়ে তার পরে দশটা টাকাও তো এক সঙ্গে করা যায় না। রিটায়ার করবার সময় প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা পাবেন, বিয়ে-থাওয়া যদি হবার হয়, তখন।

অণিমা বলে, তখনও নয়। বিয়ের যা খরচা, সেই টাকায় পড়াও তোমরা পুনিকে। মেয়ে হলেই সাত-তাড়াতাড়ি পরঘর করে দেবে — কেন মা, পেটে জায়গা দিয়েছিলে তো ঘরে কেন জায়গা দেবে না? লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, ইচ্ছে হয় তো তারপরে বিয়ে করবে। পোড়া বিয়ে না হলেই বা কি!

এইমত্র নয়। পূর্ণিমা বাইরে কোথায় গিয়েছিল, তার জন্যে ওত পেতে আছে। বাড়িতে পা দিতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকল : শোন্, ওদের কথা কানে নিবিনে। খবরদার, খবরদার। মেয়ে যেন সংসারের আপদ-বালাই — বিদেয় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। লেখাপড়া শিখে চাকরি-টাকরি জুটিয়ে আগে আখের গড়ে নে, বিয়ের কথা তারপর। বিয়ে তোকে কেউ করবে না, তুই করবি পছন্দসই পুরুষ দেখে নিয়ে। তোর কেউ মালিক নয় — নিজের মালিক তুই নিজে।

ওরে বাবা, কানের কাছে মোহমুদ্গর শ্লোক আওড়াস। এই তিনটে বছরে একেবারে যে ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছিস দিদি।

পূর্ণিমা খিল-খিল করে হেসে উঠল : আমায় এত সব বলছিস, আর নিজের বেলা সেজেগুজে দিব্যি তো হাসতে-হাসতে সেদিন কনে-পিঁড়িতে বসেছিলি। ভুলি নি দিদি, সে ছবি মুখস্থ করে রেখেছি। আমাকেও তো করতে হবে তাই।

অণিমা বলে, বিয়ে না বিয়ে — তলিয়ে বুঝতাম কি তখন? আমার তো কোন বড় বোন ছিল না, যে আমায় সামাল করে দেবে। মায়ে-বাবায় তোর জামাইবাবুর সম্বন্ধে কথা হত, লুকিয়ে-লুকিয়ে শুনতাম। মনে হত, পক্ষীরাজে চড়ে না-জানি কোন রাজপুত্তুর আসছে—

পূর্ণিমা কথা আর বেশি এগুতে দেয় না, প্রবীণার মতো ঘাড় নেড়ে বলে, জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে বুঝি এসেছিস? মুখে চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি — বুঝি লো বুঝি, কপালে চাঁদের সাইজের ফোঁটা, পা দুটো আলতায় রাঙানো, ছেলে কোলে এখন নিঃশ্বাস ছাড়ছিস কতক্ষণে সে মানুষ মান ভাঙাতে আসে।

কিন্তু ভোলান যায় না, তামাশায় মনের আগুন নেভে না। অণিমা বলে, সিঁদুর-ফোঁটায় কপাল জ্বালা করে আমার, লোক-লজ্জায় মুছতে পারিনে। পেটের ছেলেটাই বা কোলে না নিয়ে কি করি—

বলতে-বলতে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলে, তা-ও ইচ্ছে করে ছেলের জন্মদাতা বাপের কথা যখন মনে পড়ে। ইচ্ছে হয় কোলের ছেলে ছুঁড়ে ফেলে দিই, সিঁদুর মুছে বিধবার বেশ ধরি।

পূর্ণিমা হঠাৎ ছোঁ মেরে দিদির কোল থেকে ছেলে তুলে নিল। নিয়ে ছুট। অণিমা দুধ খাওয়ানোর আয়োজনে বসেছিল, তরঙ্গিণী দুধ নিয়ে আসছিলেন। দুধের বাটিও পুনি মায়ের হাত থেকে নিয়ে নিল।

ব্যস, নিশ্চিন্ত। মাসি-বোনপোয় আদর-সোহাগ-হাসাহাসি এবারে। কাউকে তাকিয়ে দেখতে হবে না। বাচ্চা থাকবে ভাল, পূর্ণিমাও।

অণিমা পানটা কিছু বেশি খায়। কোল খালি তো মায়ের ঘরে গিয়ে পানের-বাটা নিয়ে বসল। পান সেজে তরঙ্গিণীকে দেয়, নিজে মুখে ফেলে। আর সেই সঙ্গে দুঃখের কাঁদুনি : এত খরচ-খরচা করে জামাই নিয়ে এলে, শোন মা তোমাদের জামাইয়ের কথা—

কলের পুতুলের মতো মুখ বুজে অহর্নিশ খেটে যাচ্ছে, তারই মধ্যে পান থেকে চুনটুকু খসলে আর রক্ষে নেই। পুরুষসিংহ তুলসীদাস, চোখা-চোখা বচন, রেখে-ঢেকে বলবার মানুষ নয়। বলে, বিয়ের ঝামেলায় কি জন্যে গেলাম — আরামে থাকব বলেই না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার — রোজগার করে খাওয়াচ্ছি-পরাচ্ছি কত সুখে রেখেছি। তোমাদের হল ছাতের তলে পাখার নিচে শুয়ে-বসে গতর বাগানো, আর অবরে-সবরে পতির একটু খেদমত করা —

রোজগার আছে বটে, তবে সেটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ব্যাপার নয় এবং তার জন্যে তুলসীদাসকেও কিছু করতে হয় না। চীনাবাজারে খেলনার দোকান, পিতামহ তৈরি করে গেছেন — খুব নাম ছিল এক সময়, টাকা রোজগারের কামধেনু বিশেষ ছিল। এখন পড়ে যাচ্ছে। কর্মচারীরা বেধড়ক চোর, দু হাতে ফাঁক করছে। তুলসীদাসেরও হয়েছে দিনগত পাপক্ষয়। খরচ-খরচা চলে গেলেই হল — চোর ধরা কিম্বা ব্যবসা বাড়ানোর মাথাব্যথা নেই।

আর কি সুখে রেখেছে, তা-ও বলি শোন। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে কোন আড্ডাখানায় চলে যাবে, সেখানে গিয়ে নাকি তাস-পাশা খেলে। মিছে কথা, মিছে কথা মা। খেলা হয় বটে সেখানে, কিন্তু তাস-পাশার চেরে ঢের-ঢের মজাদার। শেষ রাত্রের দিকে বাড়ি ফিরে খুট-খুট করে দরজা নাড়বে। জেগে বসে থাকি, পলকের মধ্যে উঠে দরজা খুলে মানুষটাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দিই—

মায়ের কাছে অণিমা বিড়বিড় করে বলে, আর চোখের জল মোছে। পূর্ণিমা কখন এসে পড়েছে, সে বলে ওঠে, না দিস যদি দিদি?

রক্ষে আছে তবে? একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দুয়োর খুলতে বোধহয় মিনিট দুই-তিন দেরি হয়েছে। ও অবস্থার লজ্জা-ঘেন্না থাকে না তো—

ছেলে আচমকা মাসির কোল থেকে ঝাঁপিয়ে মায়ের কোলে পড়ল। কথা সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। দেখাচ্ছে কী সুন্দর— পাউডার ঘষে ময়লা ছেলে আহা-মরি করে দিয়েছে। চোখে কাজল, কপালে টিপ, নখ বড় হয়েছিল, পরিপাটি করে কেটে আলতা দিয়েই বোধহয় এমন রাঙা করেছে। দুধ খাওয়ানো সেরে এতক্ষণ এই সমস্ত করছিল পূর্ণিমা। বাচ্চা কাছে পেলেই মেতে ওঠে — সে বাচ্চা আপন হোক, আর পরের হোক।

বাবুঘাট : কলকাতা ফটো : অমৃত

অণিমার অশ্রু-ভেজা চোখে হাসি চিক-চিক করে। ছেলে আদর করছে : মাসি-মণি তোমায় একেবারে মেয়েছেলে করে দিয়েছে রঞ্জু — কী লজ্জা, কী লজ্জা!

হাতে মুখ ঢেকে রঞ্জু অমনি লজ্জার অভিনয় করে। এ-ও মাসিমণির শেখানো। বুঝি কোন কাজের কথা মনে পড়ে, তরঙ্গিনী উঠে চলে গেছেন। অণিমা শুধায় : ছেলের বড্ড সাধ তোর?

জানিস তো সবই। জেনেশুনে তবু গাড়ি ভাড়া করে বাগড়া দিতে আসিস। কত রকম ভয় দেখাস।

অণিমা বলে, মিথ্যে একটুও নয়। রাত দুপুরে নিত্যি দিন কী লাঞ্ছনা! দুয়োরে লাথি, গালি-গালাজ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমি গুম হয়ে থাকি। তবু রেহাই নেই। বলে, গাই-বাছুর সবসুদ্ধ বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে আসব, সেইখানে থাক গিয়ে।

বলতে বলতে অণিমা গর্জন করে উঠল : বাবা-মা শত্রুতা করেছে আমার সঙ্গে। আবার তোর উপরে পড়ছে। আমার ছোট বোন তুই, তোকে এই জ্বালায় জ্বলতে না হয়—

কণ্ঠ ভারী, বর্ষণ শুরু হয় বুঝি আবার। পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি বলে, কথা দিচ্ছি দিদি, একটা ছেলে-টেলে কোলে পাই তো বিয়ের নাম মুখাগ্রে আনব না। খাস কন্দর্প মালা নিয়ে এলেও মালা ছিঁড়ে মাথা ঘুরিয়ে নেব। রাগের মাথায় কবে তুই ছেলে রাস্তায় ছুঁড়ে দিবি — আমি বলি কি, রঞ্জুকে দিয়ে দে আমায়। দিয়ে হাত-পা ঝাড়া হয়ে নিশ্চিন্তে বরের সঙ্গে কোন্দল করগে যা। এস রঞ্জু, আমার কাছে থাকবে তুমি, কুঁদুলে মায়ের কাছে যাবে না।

হাত বাড়ানোর মাত্র অপেক্ষা—রঞ্জু এসে আঁকড়ে ধরে। আদরে-আদরে অস্থির করে দেয় পূর্ণিমা। ছেলেটাও তাই চায়, খিল-খিল খিলখিল—হেসে-হেসে খুন।

অণিমা ওদিকে বিড়বিড় করে বলছে, কোন্দল আমি করিনে, চুপ করে থাকি। বলতে গেলে আরও তো বাড়াবে, পাড়ার লোক হাসবে। কাটা-কান তাই চুলে ঢেকে বেড়াই—

পূর্ণিমা বলে, একটা কথা বলি দিদি। জামাইবাবু যত যা-ই করুক, রঞ্জুর হাত-খানা ধরে বুকের উপর বুলিয়ে দিস, দেখবি সব দুঃখ জুড়িয়ে গেছে। দিন-রাত্তির ভেবে-ভেবে নিজে তুই জ্বলেপুড়ে মরছিস, আমা-দেরও মন খারাপ করে দিস।

এমনি সময় অফিস-ফেরতা তারণকৃষ্ণকে দেখা যায়। চোখ পাকিয়ে পূর্ণিমা শাসন করে : বাবার কাছে, খবরদার, প্যান-প্যান করবিনে। দিনভোর খেটেখুটে এলেন, রাতের ঘুমটুকু ও'র নষ্ট করে যাসনে।

তা সামলে নিল বটে অণিমা। বলে, তোমার জন্যে আছি এতক্ষণ বাবা। একটু-খানি চোখে না দেখে কেমন করে যাই। রাত হয়ে গেছে, আসি এবার—

তারণ নাতির গাল টিপে একটু আদর করে দুটো-একটা কথা বলে হাত-মুখ ধুতে কলঘরে ঢুকে গেলেন।

অণিমা ডাকে : আয় পুনি, বাসে তুলে দিবি। এখন বাসে ভিড় হবে না।

দুই বোনে পথে বেরুল। পূর্ণিমার কোলে রঞ্জু। এখন বড় গম্ভীর পূর্ণিমা। যেতে যেতে বলে, মায়ের কাছে কান্নার বন্যা খুলে বসেছিলি—ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে মুখ চেপে ধরি তোর। থাবড়া মারি মুখের উপর। তাই হয়তো কোনদিন করে বসব, দিদি বলে মানব না।

অণিমা বলে, কত বড় দুঃখের কান্না সে তুই কি করে বুঝবি। বুঝতে না হয় যেন জীবনে। ভগবানকে ডাকি : বিধবা করে দাও ঠাকুর। নয়তো নিজেই কোনদিন আত্মঘাতী হব।

তিক্তস্বরে পূর্ণিমা বলে, বিধবা হতে ভগবান লাগবে কেন, নিজের হাতেই আছে। আছে তোর সে সাহস?

শিউরে উঠে অণিমা বলে, কী বলছিস তুই?

না, খুন-খারাবির কথা নয়। বর খুন করে বিধবা হওয়া — অত হ্যাঙ্গামার দরকার পড়ে না আজকাল। আইন হয়ে গেছে — প্যান-প্যান না করে সাহস থাকে তো ডিভোর্স-কোর্টে চলে যা। উকিল-মোক্তাররা মুকিয়ে আছে — ফী পেলে সত্যি-মিথ্যের গেঁথে কেস তুলে দেবে। তোকে কিছু করতে হবে না, গোটা কয়েক সই মেরে খালাস। বলিস তো আমিও না হয় সঙ্গে থেকে তদ্বিরের জোগাড় দেব।

বাস-স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জুকে মায়ের কোলে দিয়ে পূর্ণিমা আবার বলে, চরম হলে একেবারে সেই কোর্টে গিয়ে মুখ খুলবি — সেই পর্যন্ত ঠোঁটে কুলুপ এঁটে থাক। প্যান-প্যান করে প্রতিকার নেই — লোকে মজা দেখে। নিজেই তো বললি কাটা-কান চুলে ঢেকে রাখবার কথা। পারিস তো উল্টোটাই বরঞ্চ অভিনয় করে দেখা। পতিদেবতাকে যেন পলকে হারাস — এক জোড়া চখাচখি, প্রেমে গলে গলে পড়ছিস। মুখে লোকে আনন্দের হাসি হাসবে, মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলবে : হায়রে হায়, মেয়েটার এত সুখের কপাল! দুটো মিথ্যে কথার গুণে পরের বুকে আগুন জ্বালানো—এর চেয়ে মজাদার জিনিস কি আছে!

অণিমার দুঃখ পূর্ণিমা কানে নিল না—তাকে অভিনয় করে যেতে বলে। মনটা কিন্তু সেই থেকে ভারী। কে জানে, বিশাখারও হয়তো অভিনয়—মনের রঙিন স্বপনগুলো মিছামিছি গল্প বানিয়ে বলে। গল্প বলে লোভ ধরিয়ে ফাঁদে ফেলতে চায় তাকে। লেজ-কাটা শিয়াল যেমন চায় শিয়ালমাত্রেই লেজহীন হোক। নিজেকে অবারিত করে এক পুরুষের হাতে সঁপে দেওয়া—কে জানে কেমন সে বস্তু। বিয়ের চিন্তায় কৌতুক আছে, আশঙ্কাও আছে রীতিমত।

আর এক জোড়া আছে — শহর কলকাতার নয়, দূর মফঃস্বলে। শিশির ও পূরবী। উঁহু, পূরবী নয়, রাণী। শিশির নাম দিয়েছে — চুপিসারে শিশির ডাকে রাণী বলে। জগতের মধ্যে গুপ্তনাম জানে মাত্র ঐ দু-জন। মাথার উপরে মা-জননী আছেন, তিনি জানেন না। কতটুকুই বা জানেন তিনি নবীন-নবীনার ছলাকলা!

বড়বন্দী দুজন। বাইরে দেখবেন বনিবনাও নেই, নালিশ আর নালিশ,

শাশুড়ির কাছে ঠোঁট ফুলিয়ে পূরবীর কাঁদুনি : শিশির এটা করেছে, সেটা করেছে। শিশিরও মায়ের কাছে যেটুকু সময় থাকতে পারে, অমনি সব কথা। উভয়কেই মা প্রবোধ দেন : বকে দেবো। বকেনও সময় সময় : দিন-রাত্তির খিটি-মিটি — কী তোরা হয়েছিস বল তো। আর জন্মে ঠিক লড়ুয়ে সেপাই ছিলি—তা মুখে মুখে অনেক তো হল, লাঠি-বন্দুক ধর এবারে।

বকুনিতে কিছুমাত্র ফল হয় না, উল্টে নতুন কলহের উৎপত্তি। বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন তো সে বলবে, মিথ্যে মিথ্যে বলে আপনার কান ভাঙিয়েছে মা, আপনি আমায় আর দেখতে পারেন না। ছেলের দিকে তাকালেন তো সে বলে, জানি জানি, নিজের ছেলে পর করে দিয়েছে বাইরে থেকে কুচুটে মেয়ে এসে। ধরগিন্নীর এমনি দোর্দণ্ড প্রতাপ, কিন্তু এদের এই বিচারের মধ্যে পড়ে দিশা করতে পারেন না। বুড়ো মানুষের নজর খাটো, নইলে দেখতেন, ঠোঁট ফুলিয়ে বলছে বটে বউ কিন্তু চোখের কোণে হাসি চিকচিক করছে। কানও তীক্ষ্ণ নয়—নয়তো ধরে ফেলতেন, যে-সুরে শিশির ঝগড়া করছে, তার মধ্যে রাগ-দুঃখ কণামাত্র নেই, উছলে পড়ছে আনন্দ।

শিশির আর পূরবী জড়াজড়ি হয়ে ঘুমোয়। কমবয়সী দম্পতিরা যেমন করে। মাঝরাতে হয়তো ঘুম ভেঙে জেগে উঠল একবার পূরবী। আলো-নেভানো ঘর, জানলার পথে ধবল জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে শয্যায় এসে পড়েছে। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে শিশির। সারা দিনমানে লহমার জিরান নেই, সকালবেলা উঠেই চাষের জমিতে ছুটোছুটি, মাহিন্দারকে দিনের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া। তারপর পুকুরে পড়ে ঝাপুসঝুপুস ডুব এবং নাকে-মুখে চাট্টি খাওয়া সেরে মায়ের পায়ে প্রণাম করে সাইকেলে উঠে কিড়িং-কিড়িং বেল দেবে কয়েকটা। পূরবী ত্রিসীমানাতেও নেই। খিড়কি পুকুরে স্নানের নামে চলে গেছে, পুকুরপাড়ে গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে। হাসবে শিশির, জবাবে হাসবে একটু পূরবী—আর কিছু নয়। এবারে সাঁ-সাঁ করে অতি দ্রুত চালিয়ে মাইল-দুই দূরের মহকুমা শহরে ছুটল—সেখানকার হাই-ইস্কুলের মাস্টার শিশিরকুমার ধর, বি-এ। নিত্যিদিন প্রায় একই রকমের ব্যাপার। কর্মস্থল থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মাহিন্দারের কাছে সমস্ত কাজ জেনে-বুঝে নিয়ে এবারে বিশ্রাম। উঁহু, বিশ্রাম নয়, কলহ। সকালে নাওয়া-খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে যা একটু হয়েছে, নিশ্চিন্তে বসে সেই জিনিস এবারে ফলাও হয়ে চলল।

দুপুর রাতে চাঁদের আলোয় দিনমানের সদাব্যস্ত সেই মানুষটি কী রকম অসহায় এখন। তাকিয়ে তাকিয়ে অকস্মাৎ মমতার বন্যা এসে যায় পূরবীর মনে। সে-ও এই মুহূর্তে আর এক মানুষ—শুধুমাত্র স্ত্রী নয়, ঘুমন্ত অসহায় বয়স্ক শিশুটির পাশে খানিকটা মা-ও যেন। পাশ ফিরে আলগোছে এলোমেলো কয়েকটা চুল শিশিরের কপাল থেকে সরিয়ে দেয়, হাত বুলিয়ে দেয় কপালের উপর। তারপরে ছোট্ট একটু চুম্বন। শিশিরও ঘুমের মধ্যে জড়িতকণ্ঠে ডেকে ওঠে : রাণী—। মুখখানা পালাতে দেয় না, নিবিড় করে ঠোঁটের উপর ধরে রাখে।

রাণী নাম সংসারের মধ্যে দুটি প্রাণী শুধু জানে—যে-জনের এই নাম, আর যে-মানুষটি নামকরণ করেছে। চুপিসারে এক-জনে ডাকে, অন্যে সুগোপনে সাড়া দেয়। সেই রাণী রান্নাঘরে বাটনা বাটেন—হাতে-কাপড়ে হলুদের দাগ। কুটনো কোটেন, রান্না করেন, বাসন মাজেন, গরুকে ফ্যান-জল দেন। কালো রোগা, সামান্য লেখাপড়া-জানা গ্রামবধূ, তা সত্ত্বেও রাণী, মহারাণী—নিশিরাত্রে নিভৃত শয়নঘরে একটিমাত্র বশম্বদ প্রজার কাছে।

রাণীর মাথায় এসেছে গ্রাম ছেড়ে শহরের বাসিন্দা হবে। ষড়যন্ত্র চলছে। আজেবাজে শহর নয়, খাস কলকাতা। মেটেঘর এবং পাড়াগাঁ জায়গায় রাণীর পক্ষে নিশ্চয় বেমানান। কারণটা এই হতে পারে। প্রশ্ন তুললে পূরবী কিছু বলে না, ফিক-ফিক করে হাসে। বরেরও এভাবে আর মাস্টারি করা চলবে না। 'মাস্টারমশায়' 'মাস্টারমশায়' ডাক ছাড়ে অঞ্চলের লোক—গা ঘিনঘিন করে তার। মাস্টার বলতে বুড়োহাবড়া হাবাগবা যে-নরচিত্র মনে এসে যায়, শিশিরের সঙ্গে তার মিল কোথায়? জপাচ্ছে তাই অহরহ : কলকাতায় চাকরি দেখ। মাস্টারি নয়, ভালো কিছু।

শিশির নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, বেশ তো আছি। কী দরকার?

হয়তো বা পূরবীকে ক্ষেপাবার জন্যে। পূরবী করকর করে ওঠে : আজকে বেশ আছ, কাল থাকবে না—

হুবহু মামার কথা। চিঠিতে মামা লিখেছিলেন, পূরবী কথাগুলো মনে গেঁথে নিয়েছে। লিখেছিলেন, বীরপাড়া ছেড়ে নিরুদ্দেশে যাচ্ছি। আমার এমন সাধের বীরপাড়া ছাড়ব, কোনোদিন কি স্বপ্নে ভেবেছি, বিশেষ করে এই বয়সে? আমি পারছি, তোমাদের কেন সাহস হবে না?

মামা অবিনাশ মজুমদার। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক। তিনিই। স্বদেশী করে বহুবার জেল খেটেছেন, রীতিমত নাম ছড়িয়েছিল সে-আমলে (আপনার দেখছি মনে রয়ে গেছে, আশ্চর্য)। নাম ক্রমশ চাপা পড়ে গেল, বয়স হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তিনি, মস্তবড় ভারতবর্ষের সমস্যা ছেড়ে নিজের গ্রামখানা নিয়ে পড়লেন। ছেলেপুলে নেই, স্বামী আর স্ত্রী—স্ত্রী-ও লেগে আছেন স্বামীর সঙ্গে। মনের মতন করে গ্রাম গড়ে তুললেন, যেন পরিপূর্ণ ছবি একখানা। রাস্তাঘাট, লাইব্রেরী, বারোয়ারি আটচালা, সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা বাজার, ফ্রী প্রাইমারী ইস্কুল, মায় মেয়ে ইস্কুল অবধি। গ্রামের নাম বীরপাড়া—নতুন চেহারা দেখে লোকে এবার টাউন-বীরপাড়া বলতে লাগল।

দেশ ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল, অবিনাশ ক্ষেপে গেলেন তখন। রাজত্ব করবি, তার জন্যে কয়েকটা বছর আর সবুর করতে পারলিনে? পৃথিবীর কত দেশ স্বাধীন হয়েছে, আরও কত হতে যাচ্ছে—ধড়-মুণ্ডু আলাদা হতে কে হাড়িকাঠে গলা ঢোকায়? ঘুঘু রাজনীতিক ইংরেজ স্বাধীনতা বলে যে-জিনিস দিল, আসলে সেটা কোন্দলের পাহাড়। দু রাজ্যে তোরা মাথা ফাটাফাটি করে মরবি, আলগোছে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে ইংরেজ। দুনিয়াসুদ্ধ দেখবে।

ডেরাডাণ্ডা তুলে অবিনাশ হিন্দুস্থানের পারে চলে যাবেন। বলেন, গলাধাক্কা খাওয়ার আগেই মানে মানে সরে পড়ি রে বাবা। বাড়ী বিক্রী করবেন, খদ্দেরও আসছে। যে-সে খদ্দের হলে হবে না, সৎ খদ্দের। ঘরবাড়ী ঠিক রাখবে, বাগানের গাছ কাটবে না, যেমনটি আছে—ঝকঝকে তকতকে অবস্থায় তেমনি রাখতে হবে। অবশ্য মূল্য দিয়ে কিনলে জোর করবার কিছু নেই—কথার উপরে বিশ্বাস। কথার যে মর্যাদা রাখবে, তেমনি খদ্দের চাই।

ভাগনেকে এই সময়ে চিঠি লিখলেন : জমাজমি, বাড়ী-ঘরদোর বেচে চলে যাবার তালে আছি। একসঙ্গে যাই চলো। চলে এসো আমাদের সঙ্গে। দিব্যচক্ষে দেখছি, বেশিদিন আর ঐভাবে নয়। শিক্ষা, উদ্যম, আত্মমর্যাদা আছে তোমার, বয়স আছে। নতুন করে আবার সব গড়ে তুলব।

চিঠি নিয়ে শিশির মাকে দেখায় : মামা তো এইসব লিখেছেন।

অবিনাশ বয়সে ছোট ধর-গিন্নীর চেয়ে। তাঁর প্রসঙ্গে গিন্নী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : চিরকেলে বাউণ্ডুলে। মাঝে ক'টা বছর স্থিতি হয়েছিল, আবার পথের টান ধরেছে। তোদেরও পথে বের করবার [illegible]। খবরদার, খবরদার! আছিস ভালো—কাজ-কর্ম করছিস, খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, এমন ঘর-বাড়ী পাড়াপড়শি ছেড়ে কোন্ দুঃখে আমরা যেতে যাব?

দুঃখ আজ না থাকুক, কোন একদিন হতে পারে। তখনকার উপায়? এই তো, আমাদের হেডমাস্টারমশায়, বিশ বছরের পাকা চাকরি ছেড়ে সরে পড়লেন—

অর্থাৎ ছেলের মনও উড়ু-উড়ু। জাদু জানে অবিনাশ, চিরকাল ধরে দেখছেন, মানুষ পটাতে ওর জুড়ি নেই। ছেলেকে নয়, পূরবীকে বলেন, জবাবটা আমিই দেবো বউমা। আমি বলে বলে যাচ্ছি, তুমি লেখো। আচ্ছা করে গালমন্দ দেবো, ভিটে ছেড়ে চলে যাবার উস্কানি কখনো যাতে না দেয়।

হল তাই। ধরগিন্নী বলছেন, হাঁটুর উপর পোস্টকার্ড রেখে পূরবী লিখে যাচ্ছে। লিখল : তোমার পত্রে সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমাদের চেষ্টা সফল হউক, নূতন জায়গা-জমি লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসতি করো, ঠাকুর লক্ষ্মী-জনার্দনের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীমান শিশিরকেও

যাইতে লিখিয়াছ, কিন্তু এখনই তাহা কি করিয়া সম্ভব। চাকরি ছাড়িয়া বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া যাইতে কিছু সময়ের আবশ্যক। তাহার জন্যও তুমি একটি ভাল জায়গা দেখিবে এবং একটি চাকরির চেষ্টা করিবে। কোনপ্রকার সুযোগ হইলেই পত্র লিখিবে। এখানে থাকিবার তিলার্ধ ইচ্ছা নাই। অভিভাবক বলিতে একমাত্র তুমিই বর্তমান—তাহার ভবিষ্যৎ তোমাকেই দেখিতে হইবে...

সাহস কী দুর্দান্ত! বাঘের মতন শাশুড়ি—আক্রোশভরে বলে যাচ্ছেন। প্রতিটি কথা অখণ্ড মনোযোগে পুরবী শুনে যায়, তারপর খসখস করে লেখে। লিখেছে এই-সব যে-কথা বলছেন, একেবারে তার উল্টো।

শাশুড়ি বলেন, কি লিখলে পড়ো দেখি বউমা। স্মৃতিশক্তি পুরবীর বেশ প্রখর—পড়বার সময় শাশুড়ির কথাই মোটামুটি শুনিয়ে যায়। নিশ্চিন্ত আছে, নিজে তিনি পড়তে পারবেন না। এক বয়সে নাকি ছাপা বইয়ের দু-চার ছত্র পড়তেন, চালশে-ধরা চোখে এখন সব অক্ষর একাকার—হাতের লেখা অক্ষরের তো কথাই নেই। আরও নিশ্চিন্ত, শাশুড়ির আদরিণী বউ—ছেলের উপর না থাক, এই বউয়ের উপর তাঁর অগাধ আস্থা।

এবং বাইরে-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে ডাক-বাক্স। বাক্সে এক্ষুনি চিঠি ফেলে আপদের শান্তি করবে। শাশুড়ির হাত দিয়েই বরঞ্চ ফেলবে এই চিঠি। (ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

যথেচ্ছাচার যদি গণতন্ত্রের ভিত্তি না হয়, তাহলে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে একটা ন্যূনতম দায়িত্ব স্বীকার করা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গত ২৫ জুলাই ভারতীয় সংসদের যে বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে, তাতে গোড়া থেকেই এই ন্যূনতম দায়িত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি?

গত ষোল বছরের সাংবিধানিক ইতিহাসে সংসদে এই ধরনের তুলকালাম কাণ্ড আর ঘটেনি। গণ্ডগোল এত চরমে উঠেছিল যে, স্পীকারের নির্দেশে ছ'জন সদস্যকে (লোকসভা থেকে চারজন, রাজ্যসভা থেকে দু'জন) বহিষ্কার করতে হয়েছিল। আগে কোন একটি সময়ে এতজন সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়নি। রাজ্যসভা থেকে পায়ে ধরে সদস্যদের বার করে দিতে হচ্ছে এমন ঘটনাও আগে কখনো ঘটেনি। গোলমালের জন্যে রাজ্যসভা মুলতুবী রাখতে হচ্ছে, সেরকমও আগে আর দেখা যায়নি।

গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে। এক, উত্তরপ্রদেশের ধর্মঘট পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধী সদস্যরা লোকসভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব এবং রাজ্যসভায় দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব তুলতে চাইলে তা অগ্রাহ্য করা হয়।

দুই, অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরী ডিভ্যালুয়েশন-পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে চাইলে স্বতন্ত্র দল বাদে বিরোধী পক্ষের বাকি সদস্যগণ দাবী জানান যে, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীহীরেন মুখার্জি সরকারের বিরুদ্ধে যে-অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, সকলের আগে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

এই দুটি বিষয়ে কি কংগ্রেসী, কি বিরোধী উভয় পক্ষই অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। চীৎকার আর চেঁচামেচির কোন সীমা ছিল না। স্পীকারের নির্দেশকে উপেক্ষা করে যে-যার খুশিমত চেঁচিয়ে গেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুসারে ঐ বিকট চেঁচামেচিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম হয়েছিল। বারবার নির্দেশ অমান্য করায় স্পীকার যখন শ্রী এস এম ব্যানার্জির নাম করে তাঁকে সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন, তখন কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রীহোমি দাজী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সভায় যদি রক্তপাতও হয়, তবু শ্রীব্যানার্জিকে তাঁরা সভার বাইরে নিয়ে

সর্দার হুকুম সিং
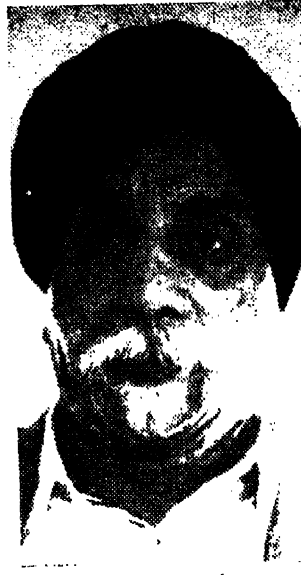
যেতে দেবেন না। উত্তেজনা প্রায় ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ ও সংসদীয়-বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ জানালেন যে, সরকার বিরোধী পক্ষের দাবীদুটির কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করবেন না। পরের দিন শ্রীচৌধুরী যখন তাঁর ঘোষিত বিবৃতিটি আবার পড়বার চেষ্টা করেন, তখন আরেক দফা তুমুল হট্টগোলের মধ্যে অধিকাংশ বিরোধী সদস্যই সভা থেকে বেরিয়ে যান।

সংসদের কাজকর্ম এইভাবে যখন একটা চূড়ান্ত অচলাবস্থার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আকস্মিক হস্তক্ষেপে মোটামুটি একটা মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব হয়। তিনি বলেন যে, যে-কোন অধিবেশনের আগে সেই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলির বিবরণ পেশ করা নিয়মসিদ্ধ; তবে তিনি স্বীকার করেন যে, সভার সামনে যদি কোন অনাস্থা প্রস্তাব থাকে, তাহলে অনাস্থা প্রস্তাবের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিষয়ে বিতর্ক না হওয়াই উচিত। তিনি আশ্বাস দেন যে, সরকার এরপর থেকে এই নিয়মই মেনে চলবেন।

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের পর সংসদের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিরোধী পক্ষ সন্তুষ্ট, কংগ্রেসীরা যদিও একটু অবাক তবু এই রায় মেনে নিয়েছেন। সাধারণত, এরপর হয়ত আর দোষ বণ্টনের ব্যাপারে অগ্রসর হতে চাইবেন না। কিন্তু যেহেতু এটা কোন সাময়িক সংকট বা সংকট মোচনের ব্যাপার নয়, যেহেতু এটা কোন বিশেষ পক্ষকে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট করার প্রশ্নও নয়, যেহেতু এই ধরনের বিশৃঙ্খলা এর আগেও—যদিও এতটা গুরুতর আকারে নয়, সংসদে ফিরে ফিরে এসেছে, যেহেতু এর সঙ্গে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের প্রশ্নটি জড়িত রয়েছে, সেহেতু এখন সময় এসেছে, বিশেষ করে অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে বলেই, বিচার করে দেখবার যে ২৫ ও ২৬ জুলাই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপর্যয় কেন ঘটেছিল।

কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য কেবল সরকার পক্ষের বা কেবল বিরোধী পক্ষের ওপর নির্ভর করে না। কোন একটি পক্ষের আচরণই ঐ গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তার সাফল্যের জন্যে চাই দু পক্ষেরই দায়িত্ববোধ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। সেজন্যে উভয় পক্ষেরই অপর পক্ষের সুবিধে-অসুবিধে সম্পর্কে একটা সহানুভূতিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ-কথা ঠিক যে, গোলমালের সময় স্পীকারের নির্দেশকে বারবার অমান্য করে বিরোধী সদস্যগণ, খুব কম করে বললেও, অত্যন্ত অন্যায় করেছিলেন। সভার কাজে যদি কেউ অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে তিনি সভা ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু বিরোধীরা তা না করে প্রথম দিকে স্পীকারের মর্যাদাকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছিলেন সেটা কোন বিচারেই শোভন নয়। এই যদি তাঁদের মনোভাব ও কৌশল হয়ে থাকে, তাহলে ভারতে গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত পড়তে খুব বেশী দেরী নেই।

কিন্তু এটাও কি ঠিক নয় যে, অনাস্থা প্রস্তাব ও অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি নিয়ে যে-গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল, সেটা দানা বেঁধেছিল সরকারী মুখপাত্রদের আচরণের জন্যেই? বিরোধীদের দাবীর কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করব না, শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ যদি এই হুংকার না ছাড়তেন, তাহলে কি অবস্থা এতদূর গড়াতে পারত? তাছাড়া তাঁর ঐ মনোভাব গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা আছে কি? যেখানে একটি অনাস্থা প্রস্তাব রয়েছে, সেখানে ঐ প্রস্তাবের আগে যে অন্য কোন বড় বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত নয় এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে এই কথাটাই মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা দু'দিন আগে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি কেন? অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ হঠাৎ একদিনে দেওয়া হয়নি। তবু সরকার আগে থাকতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী রাখেননি কেন? এই অপ্রস্তুতি, আগের ও পরের বক্তব্যের মধ্যে এই অসঙ্গতি গণতন্ত্রের শক্তি কিভাবে বৃদ্ধি করবে? সরকারের এই অপরিপক্ক আচরণের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ যদি উত্তেজিত হয়ে থাকেন, তবে খুব

অন্যায় হয়েছে কি? (যদিও আমরা আগেই বলেছি, ঐ উত্তেজনার প্রকাশটাও গণতন্ত্র-সম্মত হয়নি)।

এই দুই পক্ষের মাঝখানে আছেন স্পীকার। সর্দার হুকুম সিং-কে আমরা সহানুভূতি জানাই, কেননা, ২৫ ও ২৬ জুলাই তাঁকে যে মানসিক পরিশ্রম সহ্য করতে হয়েছে, গত ১৬ বছরে আর কখনো এতটা হয়নি। কিন্তু এত পরিশ্রম করেও ঐ দুদিন তাঁর পক্ষে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

এ-কথা এখন বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, স্পীকারের সেদিনের অসহায়তাই বিরোধীদের আরো বেশী, ট্রেজারী বেঞ্চের কঠোর মনোভাবের চাইতেও বেশী, উত্তেজিত করেছিল। সর্দার হুকুম সিং দুঃখ করে বলেছেন, উত্তেজনা এক সময় থেমে যাবে, সভার কাজকর্মও আবার আরম্ভ হবে, কিন্তু ঐ দুদিনে স্পীকারের মর্যাদার যে ক্ষতি হয়েছে, তার পূরণ কোনদিন হবে না।

এই অসহায়তা, এই খেদোক্তি গণতন্ত্রের সুস্থতা প্রমাণ করছে না।

২৯।৭।৬৬ —সমদর্শী

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

একটি বিষাদজনক দলিল

ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরী গত ২৫শে জুলাই তারিখে পার্লামেন্টে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষার যে রিপোর্ট পেশ করেছেন সেটি একটি বিষাদজনক দলিল। বাস্তবিকপক্ষে, দেশের বৈষয়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে এর চেয়ে হতাশাজনক কোন চিত্র সম্ভবত সরকারের কোন কঠোর সমালোচকও আঁকতে পারতেন না।

ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে অন্ধকার দিকগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলি হচ্ছে ঃ—

(১) সর্বশেষ যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে প্রকাশ যে, ১৯৬৫-৬৬ সালে অনুমান ৭ কোটি ২৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে, পূর্ববর্তী বৎসরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। একমাত্র আখ ছাড়া অন্যান্য সব অর্থকর ফসলেরও উৎপাদন কমে গিয়েছিল। বাদাম তেলের উৎপাদন কমে ৫৯ লক্ষ মেঃ টনের স্থলে ৪০ লক্ষ মেঃ টন অর্থাৎ ৩২ শতাংশ কম হল। কাঁচা পাটের উৎপাদন ৬০ লক্ষ গাঁটের স্থলে কমে ৪৫ লক্ষ গাঁটে এসে দাঁড়াল। তুলার উৎপাদন সামান্য হ্রাস পেল—৫৭ লক্ষ গাঁটের জায়গায় ৫৬ লক্ষ গাঁট। কফির উৎপাদন কমল, চায়ের উৎপাদন কোনক্রমে অপরিবর্তিত থাকল। সব মিলিয়ে কৃষির ফলন ১৯৬৪-৬৫ সালের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ কমল। ১৯৫৭-৫৮ সালে কৃষি ফলন ৬·৮ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার পর এইবারই ফলন সবচেয়ে বেশী কমল।

(২) ১৯৬৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে যেখানে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা সাড়ে দশ ভাগ সেক্ষেত্রে পরবর্তী তিন মাসে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা মাত্র ৪·৩ ভাগ। সমগ্রভাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে শিল্পের উৎপাদন বেড়েছিল শতকরা মাত্র ৩·৮ ভাগ হারে। সে-জায়গায় গত পাঁচ বৎসরের বিকাশের হার ছিল শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ।

অধিকাংশ ইঞ্জিনীয়ারিং ও কেমিক্যাল কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হল। কিছুকাল টায়ার কারখানাগুলি সপ্তাহে একদিন কম কাজ করেছে। একটি বড় টিন প্লেটের কারখানায় ও একটি বিশেষ মার্কার মোটর কারখানায় উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। লোহেতর ধাতুর অভাবে গ্যালভানাইজিং কারখানাগুলির কাজ গুরুতরভাবে ব্যাহত হল। সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানাগুলি ও সেই অ্যাসিডের ওপর নির্ভরশীল শিল্পের কারখানাগুলিরও একই দশা ঘটল। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে চটকলগুলির উৎপাদন দশ শতাংশ কমিয়ে দিতে হল এবং মে মাসে এক সপ্তাহকাল চটকলগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হল। প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ তেলের অভাবের দরুন বনস্পতি উৎপাদকরা তাঁদের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ কমিয়ে দিলেন। অন্যান্য যেসব শিল্পের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হল সেগুলির মধ্যে আছে ঃ—স্টোরেজ ব্যাটারি, তারের দড়ি, বিজলী পাখা ও দাড়ি কামাবার ব্লেড।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ডিজেল ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী, তামা, সোডা অ্যাশ, কস্টিক সোডা, টায়ার ও টিউব, সিমেন্ট ও চট শিল্পে উৎপাদন আরও হ্রাস পেল। একমাত্র কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল।

(৩) ১৯৬৫-৬৬ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারগুলির বাজেটের ঘাটতিও বাড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি দাঁড়াল ১৪৪ কোটি টাকা, রাজ্য সরকারগুলির ঘাটতি দাঁড়াল ১৯৬ কোটি টাকা। সরকারী ঋণের দরুন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে টাকা দিয়েছেন সেটা হিসাবে ধরলে বাড়তি নোট ছাপিয়ে সরকারী ব্যয়সংকুলানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৫ কোটি টাকা। নূতন আমদানী কর বসান সত্ত্বেও এবং মোট ১১১ কোটি টাকার নূতন কর ধার্য করা সত্ত্বেও এই বিরাট ঘাটতি হয়।

(৪) ১৯৬৩ সালের এপ্রিলের প্রথম থেকে ১৯৬৬ সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত তিন বৎসরে বাজার দর বেড়েছে শতকরা ৩৬·৫ হারে। খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য বেড়েছে ৪২·১ শতাংশ হারে এবং শ্রমিক
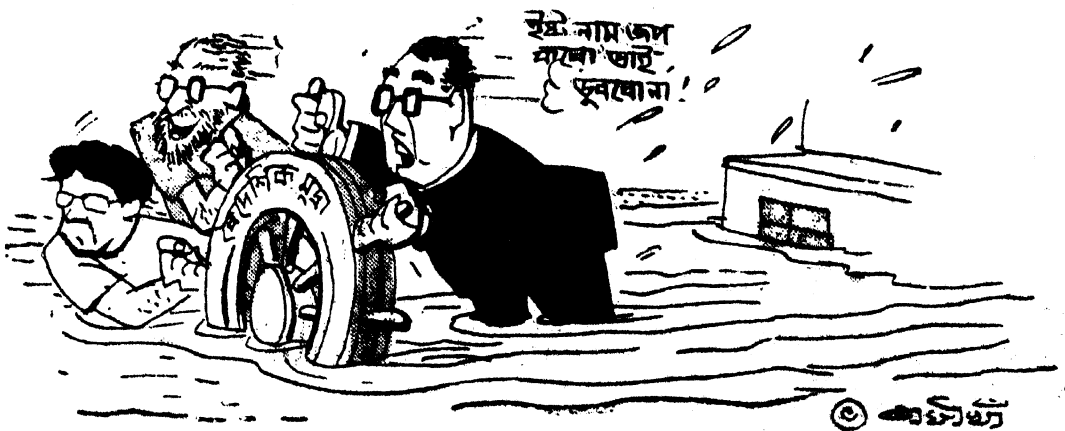
শ্রেণীর জন্য ভোগ্যপণ্যের মূল্যের সূচক সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৩·৮ ভাগ।

গত বৎসর কৃষির ফলন হ্রাস পাওয়ায় বাজার দরের উপর আরও চাপ পড়েছে এবং ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের শেষ থেকে ১৯৬৬ সালের ৪ঠা জুন পর্যন্ত (অর্থাৎ টাকার বাট্টা হ্রাসের প্রাক্কালে) পাইকারী দাম ৫·৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেল। ১৯৬৪ ও ৬৫ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৪·৬ ও ৪·৪ শতাংশ। সবচেয়ে বেশী বাড়ল খাদ্যের দাম—৮·৬%—যে-জায়গায় গত বৎসর এই সময়ের মধ্যে খাদ্যের পাইকারী দাম বেড়েছিল মাত্র ৪·৭%।

অ-কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধাতুর দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ধাতুর দর চড়ে ৫৬·৩ শতাংশ।

(৫) বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমরা মোট ৮১৬ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করেছিলাম, ১৯৬৫-৬৬ সালে রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াল ৮১০ কোটি টাকা। মোট রপ্তানী পণ্যের শতকরা ৭০ ভাগের দরুন রপ্তানীকারকদের কোন না কোন রকম আর্থিক সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও এইভাবে রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে আমদানী বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ভিতরে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার দরুন বিদেশ থেকে খাদ্যের আমদানী বাড়াতে হয়েছে এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামাল আমদানী করতে হয়েছে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ২৩ হাজার মেট্রিক টন, এপ্রিল মাসে সেই অংক বেড়ে দাঁড়াল ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার মেট্রিক টনে। মে ও জুন মাসে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ও ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়েছে। এইসব আমদানীর দরুন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ বেড়েছে। কেননা যে চাল আমদানী করা হয় তার দামটা আমাদের নিজেদেরই বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করতে হয় আর পি. এল ৪৮০ অনুযায়ী যে খাদ্য আমদানী করা হয়েছে তার দাম বৈদেশিক মুদ্রায় দিতে না হলেও এই আমদানীর দরুন জাহাজভাড়াটা সম্প্রতি বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করতে হচ্ছে।

খাদ্যশস্য ছাড়াও, কাপড়ের কলগুলি চালু রাখার জন্য বর্তমান বৎসরে আমাদের ৭ লক্ষ গাঁট তুলা আমদানী করতে হচ্ছে, বনস্পতি কারখানার জন্য আমদানী করতে হচ্ছে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন সয়াবীন তেল ও ১০ হাজার মেট্রিক টন সূর্যমুখী ফুলের বীজের তেল এবং সম্প্রতি চটকলের জন্য কাঁচা পাটও আমদানী করতে হচ্ছে। সারের আমদানীও বাড়াতে হয়েছে। এই সবকিছুর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় বেড়েছে।

এছাড়া বৈদেশিক ঋণের কিস্তি শোধ করার দরুন বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় বাড়ছে। মুনাফা, রয়্যালটি ও টেকনিক্যাল ফি বাবদও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রমেই বেশী খরচ হচ্ছে।

১৯৬৩-৬৪ সালে যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ছিল ৫২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে সেখানে ঘাটতি দাঁড়াল ৭৬৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসেই ঘাটতির অঙ্ক এসে দাঁড়াল ৪৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায়।

উপরের এই পাঁচদফা অর্থনৈতিক অবনতির যোগফল হল :—

"(৬) সব মিলিয়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রকৃত জাতীয় আয় সম্ভবতঃ হ্রাস পেয়েছে।"

এই প্রায় সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক অবনতির কারণ হিসাবে অর্থমন্ত্রীর সমীক্ষায় চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণগুলি হল :—

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদার চাপ বৃদ্ধি, (২) প্রধানতঃ অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি, (৩) অনাবৃষ্টির দরুন যোগানে ঘাটতি এবং (৪) আমদানীকরা কাঁচামাল ও উপাদানের অভাব।

আর একটি বড় কারণ যদিও এই সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়নি তথাপি সেই কারণটি সমীক্ষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য এই যে, তার ঘোরতম অনাবৃষ্টির বৎসরটিই আবার পাকিস্থানের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের বৎসর হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই সংঘর্ষের অজুহাতে ভারতবর্ষের সাহায্যকারী দেশগুলি সাহায্য দেওয়া মুলতুবী রাখল। বর্ষার অভাবে যখন ফলন নষ্ট হচ্ছে, শিল্পের কাঁচামালের অভাব দেখা দিচ্ছে, জলবিদ্যুতের জলাধারগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাঁটাই করতে হচ্ছে ঠিক তখনই বৈদেশিক মুদ্রার সংকট গভীরতর হল, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপাদানের ব্যাপক অভাব ঘটল।

বলা বাহুল্য, অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরী এই শোচনীয় অবনতির চিত্র এঁকেছেন টাকার বাট্টা হার হ্রাসের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য। তাঁর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, "টাকার বাট্টা হ্রাসের সিদ্ধান্ত, এক অর্থে, যে পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছিল তারই স্বীকৃতি।"

কিন্তু আজ আমরা যে অবস্থায় এসে পড়েছি তার থেকে বেরোবার রাস্তা কি টাকার বৈদেশিক বিনিময়মূল্য হ্রাসের মধ্য দিয়ে পাওয়া যাবে? অর্থমন্ত্রী কিন্তু সেখানে কোন স্পষ্ট আভাস দিতে পারেন নি। তিনি বরং বলেছেন, "টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাস করার সিদ্ধান্তের ফলে অর্থনীতির কোন প্রকৃত সমস্যারই রূপান্তর ঘটে যায় নি। আমাদের যেসব সমস্যা রয়ে গেছে অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলির মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তাই এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।"

অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী এটা আশা করেন না যে, টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে, তবে তিনি মনে করেন যে, টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে বর্তমান দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

এই ব্যবস্থাগুলি কি? তার ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রীর সমীক্ষায় দেওয়া হয়েছে :—সরকারী ব্যয় সঙ্গতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, রপ্তানী বাড়াতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যাঙ্কের দাদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অথবা, অন্য কথায়, উৎপাদন ও সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

টাকার বৈদেশিক বিনিময়মূল্য হ্রাস করার পর দেড় মাসের বেশী সময় কেটে গেছে। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তের যে ফল দেখা গেছে সেটা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে একটা স্থিতাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানীকারকদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারী সহায়তা দেওয়ার যেসব পরিকল্পনা এতদিন চালু ছিল সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, এই পরিকল্পনাগুলির অপব্যবহার করা হচ্ছিল। কিন্তু পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফল ভাল হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার উপলব্ধি করছেন যে, কোন না কোন ধরনের রপ্তানী-সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করতেই হবে। অর্থমন্ত্রী ঘোষণাও করেছেন যে, নূতন রপ্তানী-সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি কি হবে সে বিষয়ে সরকার এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেন নি।

সবচেয়ে বড় কথা, টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসের সরকারী সিদ্ধান্তের পিছনে সরকার কোন ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে দুটি স্তরে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ও কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিতে। উভয় আলোচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত সরকারের নিজের দলের মধ্যে টাকার বাট্টা হার হ্রাসের সার্থকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ও অবিশ্বাস আছে। এখন বিষয়টি পার্লামেণ্টে আসছে। সেখানেও এই সরকারী সিদ্ধান্ত প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হবে বলে মনে হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রীর সমীক্ষার যে দিকটি সবচেয়ে হতাশাজনক সেটি হল এই যে, ভারতবর্ষের অর্থনীতি এখনও মূলতঃ প্রকৃতি-নির্ভর। সবকিছুই শেষ পর্যন্ত আবহাওয়ার মুখাপেক্ষী তাই ডিভ্যালুয়েশনের গুণগান করার পরও অর্থমন্ত্রী বলতে বাধ্য হয়েছেন, "অর্থনীতির ভবিষ্যৎ এখনও নির্ভর করছে ফসল কিরকম হয় তার উপর। এই বৎসর কৃষির যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি, আবহাওয়ার অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে, ফলন বেশ কিছুটা বাড়বে বলে আশা করা যায়। আমদানী সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করার ফলে শিল্পের উৎপাদনও আগামী তিন চার মাসের মধ্যে বাড়তে আরম্ভ করবে বলে আশা করা যায়।"

অধিকণ্ড

হিমানীশ গোস্বামী

শেষপর্যন্ত সভায় পেঁছুতেই দেরি হয়ে গেল, যদিও আমার পক্ষ থেকে ঠিক সময়ে পেঁছুনোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ঠিক সময়ের অন্তত আধ ঘণ্টা আগেই সভায় পেঁছব বলে আশাও করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। নৈহাটি থেকে ঘণ্টা তিনেক আগেই বেরিয়েছি বালীগঞ্জের দিকে। ট্রেনই ধরতাম কিন্তু হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। সে তার মোটর গাড়িতে করে কোলকাতায় ফিরছিল। বন্ধু বলল, চলে এস বেশ মজা করে যাওয়া যাবে। আমিও মজা পাবার উদ্দেশে মোটর গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বন্ধু বলল, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, বালীগঞ্জে একটি সভায় বক্তৃতা করতে আমি আহূত হয়েছি। একটু গর্বের সঙ্গে বললাম—ভাবলাম এতে গাড়িওলা বন্ধুটির আত্মায় একটু আঘাত লাগবে।

কিন্তু আত্মায় বোধ হয় আঘাত লাগল না। সে বলল, সভায় বক্তৃতা দিয়ে কি হয়? একথায় আমার মনে হল আমার বন্ধুর বুদ্ধি একটুও বাড়েনি। সভায় বক্তৃতা দিয়ে কি হয়? এরকম প্রশ্ন আমি এর আগে শুনিনি, কখনো শুনব বলে মনেও করিনি। আমাদের দেশের যতখানি উন্নতি হয়েছে তা এই সভাসমিতির ফলেই যে হয়েছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অবশ্য যাত্রা, থিয়েটার, তরজাও আমাদের দেশকে অনেক উন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার বন্ধু এসব কিছু জানে না। আর জানবেই বা কেমন করে। সকালে আটটার সময় অফিসে বেরয়। সেখানে গিয়েই ফাইল নিয়ে বসে, দেশের উন্নতির জন্য কতগুলি কারখানা প্রয়োজন কিসের কারখানা প্রয়োজন এইসব নিয়ে যত সব বাজে বাজে সময় নষ্ট করে, ও সভাসমিতির মর্ম বুঝবে কি?

আমি বন্ধুর কথার জবাব না দিয়ে আমার বক্তৃতাটি পকেট থেকে বার করে পড়তে সুরু করলাম। যদি কোথাও ভুল টুল থেকে থাকে তাহলে সংশোধন করে নিতে হবে। বন্ধু আর কথা বলল না। নিজের মনে গাড়ি চালাতে লাগল আর নিজের মনেই রাস্তার যাবতীয় লোককে গালাগাল করতে লাগল, অবশ্যই তারা গাড়িটার সামনে এসে পড়ছিল আর গাড়িকে আস্তে চালাতে হচ্ছিল।

বক্তৃতাটি দেখলাম বেশ উত্তম লেখা হয়েছে। এত হাসির কথা এর মধ্যে আছে যে লোকেরা নিশ্চয় হাসতে হাসতে অস্থির হবে। এর মধ্যে সারবান কথাও রয়েছে প্রভূত পরিমাণে। অর্থাৎ কিনা এটি একটি ব্যালান্সড বক্তৃতা। এরকম বক্তৃতা অবশ্যই আমার দ্বারা লেখা সম্ভব হত না যদি না চৌরঙ্গীর একটা দোকানে আদর্শ বক্তৃতাবলী নামের একখানি মার্কিন বই আমার হাতে না আসত। বইটি কিন্তু অদ্ভুত। প্রায় সমস্ত বিষয়েই বক্তৃতা তৈরি করাই আছে, কেবল বলে গেলেই হয়। তবে বক্তৃতাগুলি রয়েছে ইংরিজিতে, তা থেকে বাংলা করাটা যা একটু সময়সাপেক্ষ। অবশ্য একটু এডিটও করতে হয়। যেখানে নিউইয়র্ক রয়েছে সেটাকে নিউ দিল্লী করতে হয়, যেখানে ডলার সেখানে টাকা যেখানে জ্যাক রয়েছে সেখানে জ্যোতি।
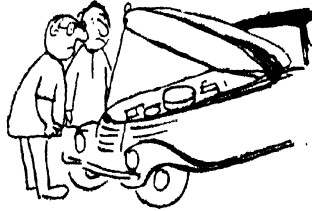
মোটর গাড়িতে বসে বক্তৃতাটি পড়ে ফেললাম। অদ্ভুত বক্তৃতাটি— সভাতে বহু শিক্ষিত লোক সমাগম হবার কথা, যদিও এটা বিরাট জনসভা না হবারই সম্ভাবনা। তবে শ' দুয়েক গণ্যমান্য লোক থাকবেন। বাংলাদেশের এঁরাই হলেন সংস্কৃতির স্তম্ভ। সেখানে বক্তৃতা দেওয়াটা আমার সৌভাগ্য। একটু একটু নার্ভাসও হয়ে পড়ছিলাম যেন। যত কোলকাতার দিকে গাড়ি এগুচ্ছিল আমার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছিল।

এই স্পন্দনকে কেমন করে মেরামত করব ভাবছি এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল যার ফলে হৃদয়ের স্পন্দনটা একবারে থেমে যাবার মত হল। হঠাৎ ক্যাঁক ক্যাঁক আওয়াজ করে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধু তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে দেখল, তারপর বলল এ গাড়ি আর চলবে না।

আমার তখুনি উচিত ছিল গাড়িটাকে পরিত্যাগ করে একটা বাস ধরা। হরদম পথ দিয়ে বাস চলছিল, তেমন ভীড়ও ছিল না। কিন্তু বন্ধুর বিপদে তাকে পরিত্যাগ করে যাওয়াটা কেমন দেখায় তাই আমিও গাড়িটার এঞ্জিন দেখতে লাগলাম। আমি এঞ্জিন বুঝি না, খারাপ

এঞ্জিন মেরামত করতে তো পারিই না, কিন্তু তবু মনে হল গাড়ির এঞ্জিন দেখে মুখ গম্ভীর করে থাকলে বোধ হয় বন্ধু খুশী হবে। বন্ধু কোথায় চলে গেল কি একটা গাড়ির অংশ কিনতে আর আমি গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম, আর সময় কাটানোর জন্য নিজের বক্তৃতাই একটু জোরে পড়ে অভ্যেস করতে লাগলাম। বক্তৃতা পড়তে সুরু করতেই হৃদয়টা আবার দ্রুত চলতে লাগল।

বন্ধু এল প্রায় আধ ঘণ্টা পর। তারপর গাড়ি মেরামত করতে লাগল। দেড় ঘণ্টা সময় ওতেই চলে গেল। তারপর গাড়ি চালু হল।

সভায় পেঁছে গেলাম সভা আরম্ভ হবার প্রায় এক ঘণ্টা পর। আমি যেতেই উদ্যোক্তারা বললেন, এই যে এসে গিয়েছেন ভালই হয়েছে। প্রথম বক্তৃতা হয়ে গিয়েছে—বিখ্যাত সমাজসেবক ব্রতীন্দ্রনারায়ণের বক্তৃতা হয়ে গেল এক্ষুনি। যা সুন্দর বললেন উনি, আপনি দারুণ মিস করেছেন কিন্তু।

এরপর আমার বক্তৃতা। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আমি আর ভূমিকা না করে পড়তে সুরু করলাম আমার বক্তৃতাটি। যেখানে প্রতি মিনিটে হাসির আওয়াজ আশা করছিলাম সেখানে প্রতি দু'মিনিটে কাশির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

অতগুলি লোকের একসঙ্গে কাশি হওয়াতে আমি একটু থেমে পড়তেই লোকেরা একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল। সে হাততালি আর থামতে চায় না। তারপর যত বার বক্তৃতা দিতে যাই লোকেরা ততই হাততালি দিয়ে একটা কথা বলতে দেয় না। আমার কেমন যেন লাগতে থাকে। একটু বিচলিত হয়ে পড়ি। উদ্যোক্তাদের একজনকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করি, মশাই ব্যাপারটা কি? উদ্যোক্তা মশাই আমাকে বললেন, লোকেদের দোষ নেই তেমন। ঐ একই বক্তৃতা, একটু আগেই আপনার আগের বক্তা ব্রতীন্দ্রনারায়ণবাবু দিয়ে গেলেন। একই বক্তৃতা দুবার এঁরা শুনতে চান না।

এরপর আর কি করা যায়। তাড়াতাড়ি সরে পড়ি—একই বই যে ব্রতীন্দ্রনারায়ণবাবুও পড়বেন সেটা আমি ভাবলে কখনো ঐ বক্তৃতা দিই?

(২৬)

মঙ্গলবার রাত্রে হেমন্তর সঙ্গে হিসেব-পত্তর করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। টাকার দুর্ভাবনাটাই হোল প্রধান। দলের এতগুলো লোক—তাদের পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে হোটেলের বিল চুকিয়ে কলকাতায় যে কি করে পাঠাব—সেইটাই হল আমার প্রধান চিন্তা। তার ওপর সি-এ-পি-কে 'শো' বাতিল করে দিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে হবে—এই সব নানা দুশ্চিন্তায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না।

বিপদে না পড়লে মানুষ সাধারণত ভগবানকে ডাকে না—সেদিন রাত্রে আমি আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে সেই বিপদতারণকে ডাকতে লাগলাম। আশ্চর্য, আমি যখন একমনে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানকে ডাকছি, তখন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল মার শান্ত করুণা-ময়ী মূর্তি। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়ে বলছেন: কোন ভয় নেই মধু, সব ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ আমার মনটা আশা ও আনন্দে ভরে উঠল। যত কিছু দুর্ভাবনা সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরদিন অর্থাৎ বুধবার সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ একটু দেরীই হয়ে গেল—কারণ আগের দিন শরীর ও মনের ওপর দিয়ে যা ঝড় বয়ে গেছে। দরজায় একটা সশব্দ করাঘাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপর সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম দেখে যে সাধনা এরি মধ্যে বিছানা থেকে উঠে হাত-মুখ ধুতে বাথরুমে গেছে। আগের দিন যে অন্যের সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না—আর আজ কিনা সে একা-একা উঠে নিজেই বাথরুমে গেছে! ভাবলাম ভগবান কি তবে আমার প্রার্থনা শুনেছেন!

বসবার ঘরে এসে দরজা খুলতেই দেখি চা নিয়ে এসেছে চামান। এখানে এই চামানের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। পাহাড় যেমন আমাদের পরিবারের 'পুরাতন ভৃত্যে'র পর্যায়ে পড়েছিল—চামানও সেই পর্যায়ে আজ উঠেছে। আমার বিয়ের পর থেকে সে আমাদের কাছে কাজ করছে এবং আজও সে আমাদের কাছে আছে—প্রায় চৌত্রিশ বছর হতে চলল। চামানের ভাই আসগরও আমাদের কাছে প্রায় দশ-বার বছর কাজ করেছিল। চামানের মত সেও খুব ভাল এবং বিশ্বাসী চাকর ছিল— দুঃখের বিষয় সে খুব অল্পবয়সেই মারা যায়। বোম্বেতে এরা দুজনেই ছিল। চামান শুধু আমাদের ঘরের কাজই করত না—স্টেজ-শো'র সময় যখন আমরা সফরে বেরুতাম তখন চামান প্রোডাকশান ম্যানেজারকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করত। আমার সহকারী হেমন্ত মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত: আপনার চামান যে রকম কাজের লোক হয়ে উঠেছে—আর প্রোডাকশান বিভাগকে যেভাবে সাহায্য করছে তাতে তো পরের 'ট্যুরে' আর প্রোডাকশান ম্যানেজারের দরকার হবে না। বেশ একজনের খরচা বেঁচে যাবে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বাথরুম থেকে ফিরে এসে সাধনা আমাকে আরও অবাক করে দিল এই বলে: মধু, আমি এখন অনেকটা সুস্থবোধ করছি। আমার মনে হয় আমি কাল থেকে আবার স্টেজে নামতে পারব।

আমি বললাম: ওসব বিষয় নিয়ে এখন আর কিছু ভাবতে হবে না। এখন বিশ্রাম কর—সন্ধ্যার সময়ে কেমন থাক দেখে সেই মত ব্যবস্থা করা যাবে। এই বলে তাকে তখনকার মত সান্ত্বনা দিলাম।

নিজের মনে কিন্তু অনেকটা শান্তি পেলাম। দেখলাম যে সত্যিই সাধনা অনেকটা সুস্থ—অনেকটা সামলে নিয়েছে। আমি কিন্তু তাকে কিছুই বললাম না যে প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে দলকে আমি কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি—এবং গত রাত্রে কলকাতায় হেমাদকে ট্রাঙ্ককল করেছি টাকা পাঠাবার জন্যে। আমি জানতাম যে তাকে একথা বললেই সে অত্যন্ত মন-মরা হয়ে যেত, ফলে হোত কি, সে যে আরোগ্যের পথে চলেছিল, তা ব্যাহত হোত। সুতরাং ভাবলাম যে টাকা এলে যখন দলকে কলকাতা পাঠাবার সময় হবে তখন বললেই হবে। শুধু ওকে এইটুকু বললাম যে হেমাদকে ট্রাঙ্ককল করে ওর অসুখের কথা জানানো হয়েছে আর কিছু টাকা পাঠাতে বলেছি। হেমাদ যে টেলিফোনে 'অভিনয়ে'র অভাবিত সাফল্যের বিষয় জানিয়েছে সে খবরটা তাকে ভাল করে বললাম। তাকে আরও জানালাম: হেমাদ বলছে 'আলিবাবা'র মত 'অভিনয়'ও বক্স অফিস হিট—তোমার অর অহীনবাবুর অভিনয় লোকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে।

এই খবর শুনে সাধনা তো আনন্দে ফেটে পড়ল। সে বলল: ভগবানের কি অসীম করুণা—দেখলে মধু! কলকাতা ছাড়বার আগে আমাদের কি দুর্ভাবনাই না হয়েছিল ছবির পরিসমাপ্তি নিয়ে। এত বোল্ড কনসেপশন লোকে নেবে কি না—একজন কুমারী মেয়ে যখন বলছে—'আমি শুধু ওর বাগদত্তা নই-ওর ভাবী সন্তানের মা।' যাক, লোকে নিয়েছে এখন আমরা নিশ্চিন্ত। তারপর দেখ, কাল রাত্রে পর্যন্ত আমি এত দুর্বল ছিলাম যে বম্বেতে আবার 'শো' করতে পারব বলে ভাবতেই পারিনি, কিন্তু এখন ভাবছি যে আমি আবার স্টেজে নামতে পারব। ভগবান সত্যিই করুণাময়।

আমি বললাম: হ্যাঁ সাধনা—ভগবানের অদৃশ্য হস্ত আমাকে অনেকবার অনেক বিপদ থেকে আশ্চর্যভাবে উদ্ধার করেছে, এবারও করবেন। তুমি তো জান, মা প্রায়ই বলতেন 'ভগবানে বিশ্বাস রাখো—সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানো—যখন বিপদে পড়ি শুধু তখনই ভগবানকে মনে পড়ে।

সেই সময় সাধনার ভাই সুনীত আর তিমির আমাদের ঘরে এসে জানালেন যে, হেমন্ত এবং আরও কয়েকজন আমার জন্যে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জের দিকে যাবার সময় মনে হতে লাগল সাধনার এই দুর্বল শরীরে কি করেই বা তাকে স্টেজে নামতে বলি—সে তো মহা অমানুষিক কাজ হবে।

* * *

সকালবেলায় ডাঃ ভারুচা সাধনাকে দেখতে এলেন। কিন্তু ডাঃ ভারুচা সাধনাকে পরীক্ষা করার আগেই সাধনা বিছানা থেকে উঠে খানিকটা নেচে ডাঃ ভারুচাকে বোঝাতে চাইল যে সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং মোটেই দুর্বল নয়।

ডাঃ ভারুচা তো দেখে অবাক! কাল বিকেলে যে রোগী খাট থেকে উঠতে পারছিল না আর আজ কিনা সে নাচতে সুরু করেছে!

সাধনা ডাঃ ভারুচাকে বলল: আমি আবার কাল থেকে 'শো' করতে চাই ডাঃ ভারুচা। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, আমার কোনো কষ্ট হবে না।

ডাঃ ভারুচা মৃদু হেসে বললেন: এতো খুব ভাল কথা মিসেস বোস, তার আগে আপনাকে আমি পরীক্ষা করে দেখি—তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

ডাঃ ভারুচা সাধনাকে পরীক্ষা করে বললেন: হ্যাঁ, আগের থেকে শরীর আপনার অনেকটা সুস্থ হয়েছে বটে, কিন্তু তবুও আমি আপনাকে স্টেজে নামবার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ এই নাচের পরে দৈহিক পরিশ্রমের ফল খারাপ হতে পারে।

কিন্তু সাধনা জিদ ধরে বসল যে 'শো' সে করবেই এবং কাল থেকে। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল—যে কলকাতার শো কবে থেকে আরম্ভ হবার কথা। আমি বললাম: ৩০ সেপ্টেম্বর। তবে আমি ফোনে হেমাদকে বলে দিয়েছি যে এম্পায়ারের ম্যানেজারকে বলতে এখন যেন টিকিট বিক্রি সুরু না করে। দু'-একদিন যেন অপেক্ষা করে। আমরা আবার ফোন পেলে যেন তারিখ ঘোষণা করে টিকিট বিক্রি সুরু করে।

সাধনা একথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল: আবার পরে জানাবে একথা বলতে গেলে কেন? তুমি আজই হেমাদকে ট্রাঙ্ককল করে বলে দাও যে ৩০ সেপ্টেম্বর

'স্ট্রীট ডান্সার্স' নৃত্যে সাধনা বসু ও যমুনা প্রসাদ

কলকাতায় এম্পায়ারে শো হবে......হ্যাঁ ভাল কথা...আজ কত তারিখ?

আমি বললামঃ আজ ২১—

—ও, তাহলে তো আর সময় নেই মধু। কাল থেকেই এখানে আমাদের 'শো' করতে হবে—অন্ততঃ তিনদিন......আর যদি হাউস ভর্তি যায় তো চারদিন।

আমি বললামঃ একেবারে চারদিন—এই দুর্বল শরীর নিয়ে?...

—আমার শরীরের জন্যে ভেব না মধু—আমি ঠিক পারবো—

—আচ্ছা—সে দেখা যাবে পরে—বললাম আমি—

—পরে নয়—এই বলে, বিছানার পাশেই টেলিফোনটা রাখা ছিল—হঠাৎ টেলিফোনটা উঠিয়েই হোটেলের টেলিফোন অপারেটরকে বলল ক্যাপিটাল সিনেমায় যোগাযোগ করে লাইনটা দিতে।

ডাঃ ভারুচা বাংলা বোঝেন না, তবে হাব-ভাবে মাঝে মাঝে ইংরাজী কথার টুকরো থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝেছিলেন। আমি তাঁকে বললামঃ দেখছেন তো ডাঃ ভারুচা—সাধনা তো একরকম স্থির করেই ফেলেছে যে শো সে করবেই কাল থেকে—

ইতিমধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগ হতেই সাধনা কথা বলতে লাগল মিঃ সিদ্‌ওয়ার সঙ্গে— 'হ্যাঁ-হ্যাঁ মিঃ সিদ্‌ওয়া—এখন আমি একেবারে সুস্থ হয়ে গেছি—কাল থেকে শো করতে পারব নিশ্চয়ই।... কি বলছেনঃ ডাক্তার কি বলেছে। ...এই তো ডাঃ ভারুচা সামনেই বসে আছেন...আর মিঃ বোসও আছেন। নিন, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।' বলে টেলিফোনের রিসিভারটা আমার হাতে দিয়ে বললঃ আমি কিন্তু শো করবই—তুমি যেন যা-তা বলো না।

আমি মিঃ সিদ্‌ওয়াকে শুধু এইটুকুই বললামঃ আমি বিকেলে আসছি—তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি যেন কাল কোন ছবি দেখাবার প্রোগ্রাম রাখবেন না।

এই বলে রিসিভার রেখে দিলাম।

ডাঃ ভারুচা এতক্ষণ নির্বাক দর্শকের মত বসে ছিলেন। এতক্ষণে মৃদু হেসে বললেনঃ মিসেস বোস, আপনি তো মিঃ সিদ্‌ওয়াকে এমনভাবে বললেন যে আমি যেন কাল আপনাকে নাচবার অনুমতি দিয়েছি।

সাধনা বললঃ আপনি তো আমায় পরীক্ষা করে বললেন যে আমি এখন অনেকটা সুস্থ। আপনি আর আপত্তি করবেন না ডাঃ ভারুচা। আমি যদি শো করতে না পারি তাতে যে পরিমাণে হতাশ হব, দুঃখ পাব, তাতে আমার শরীর আরও খারাপ হবে।

সাধনা এমনভাবে কথাগুলো বলল যে, ডাঃ ভারুচা আর কিছু বলতে পারলেন না। উঠবার সময় বললেনঃ ঠিক আছে মিসেস বোস—আজ বিকেলে কেমন থাকেন দেখে, যা হয় বন্দোবস্ত করা যাবে।

লিফট দিয়ে নামবার সময় ডাঃ ভারুচা আমায় বললেনঃ আমার মতে মিসেস বোসের এই দুর্বল শরীর নিয়ে স্টেজে না নামাই উচিত—এখন উনি যে রকম জিদ ধরেছেন—তাতে আপনি বিচার করুন মিঃ বোস—কি করবেন না করবেন।

তিনি চলে যাবার পর সেদিন আমি হোটেলে ডাইনিং হলে বসে লাঞ্চ খাচ্ছি—আমার পাশের টেবিলে কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক যাঁরা লাঞ্চ খাচ্ছিলেন, তাঁদের এক-জনের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। দেখলাম আমাকে লক্ষ্য করে আমার বন্ধুটি অন্যদের কি যেন বলছে। লাঞ্চের শেষে আমার বন্ধুটি এসে বলল যে, ওর টেবিলে যাঁরা আছেন তাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমার তখন কারোর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার মত মনের অবস্থা নয়—কিন্তু বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বন্ধুর টেবিলে প্রায় আট-দশজন ছিলেন, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সকলের মুখেই সেই একই প্রশ্ন 'শো' কি আর হবে না? সাধনা বোস এখন কেমন আছেন? —খুবই দুঃখের বিষয় বাকী 'শো'-গুলো বাতিল করে দিতে হয়েছে ইত্যাদি...। এঁদের মধ্যে ডাঃ সালদানা নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। কি যেন কেন—ডাঃ সালদানার সঙ্গে পরিচয় হবার পর মনে হোল যে ইনি যেন ঈশ্বরপ্রেরিত এক বন্ধু। জীবনে আরও দু-একবার আমার ঠিক এই রকমই মনে হয়েছিল এবং কোন-বারেই আমার অনুমান ভুল হয়নি।

ডাঃ সালদানার বয়স বেশী নয়, দেখতেও সুপুরুষ—বিলাত থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে ভাল ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। খুব কম কথা বলেন—আমায় শুধু বললেনঃ 'খুবই দুঃখের বিষয় মিঃ বোস—এত ভাল 'শো' বাতিল করে দিতে হল'—এই কয়েকটি কথার মধ্যেই তাঁর প্রচুর সহানুভূতি প্রকাশ পেল। তাঁর স্ত্রীও সেখানে ছিলেন—পরে

জানলাম তিনিও একজন পাশকরা লেডী ডাক্তার।

লাঞ্চ শেষ হবার পর—ডাঃ সালদানা, মিসেস সালদানা ও আমি ডাইনিং রুমের সামনের বারান্দায় এসে বসলাম। তাজমহল হোটেলে এই বারান্দাটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা—সামনেই ইণ্ডিয়া গেট—বিশাল সমুদ্র—কত জাহাজ—ছোট ছোট লঞ্চ আসছে-যাচ্ছে।

আমি ডাঃ সালদানাকে অনুরোধ করলাম যে একবার সাধনাকে পরীক্ষা করবার জন্য। অনুরোধ করলাম দুটি কারণে—এক নম্বর হল আমার টাকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সুতরাং ডাঃ ভারুচার মত অতবড় ডাক্তারকে 'ফি' দেবার মত টাকা পাব কোথায়? আর দ্বিতীয় নম্বর হল সাধনা যখন জিদ ধরেছে যে সে নাচবেই, তখন তাকে বাধা দিতে গেলে ফল মোটেই ভাল হবে না—অথচ ডাঃ ভারুচার এ বিষয়ে একেবারে মত নেই।

রোগী একজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকলে অন্য কোন ডাক্তারকে দেখাতে হলে প্রথম ডাক্তারের অনুমতি নেওয়াটা উচিত। সেইজন্যে আমি ডাঃ সালদানাকে বললামঃ আমি ডাঃ ভারুচার অনুমতি নিচ্ছি—আপনি সাধনাকে দেখুন।

কাছেই ফোন ছিল—আমি সেখান থেকে ডাঃ ভারুচাকে ফোন করে ডাঃ সালদানার কথা বলতে তিনি বললেন যে, তিনি ডাঃ সালদানাকে ভালরকম চেনেন।

আমি তখন ডাঃ সালদানাকে ফোনে ডেকে দিলাম। তিনি ডাঃ ভারুচার সঙ্গে ফোনে কথা বললেন, তারপর আমায় বললেন : ঠিক আছে মিঃ বোস, আপনি যদি নেহাৎ চান আমায় মিসেস বোসের চিকিৎসার ভার নিতে—আমি নেব।

ডাঃ এবং মিসেস সালদানার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। কি যেন কেন মনে হল—এঁরা যেন অনেকদিনকার পুরনো বন্ধু। আমাদের এই অবস্থার মধ্যে দেখে এবং কয়েকটা শো বাতিল করে দিতে হয়েছে দেখে ডাঃ এবং মিসেস সালদানা দুজনেই খুব দুঃখপ্রকাশ করলেন। তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি আমার অন্তর স্পর্শ করল। আমি মনের আবেগে তাঁদের অনেক কথাই বলে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আসল কথাটিও বলে ফেললামঃ ডাঃ ভারুচা খুব বড় ডাক্তার সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁকে বারবার ডাকার মত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমানে আমাদের নেই। আর তাছাড়া সাধনা যখন অনেকটা সুস্থ, তখন ডাঃ ভারুচার মত বিশেষজ্ঞকে ডাকার প্রয়োজন দেখছি না।

শেষকালে এও বললামঃ আজ আমায় বেলা পাঁচটার মধ্যে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কাল 'শো' হবে কিনা, সুতরাং ডাঃ সালদানা যদি বেলা চারটে নাগাদ এসে সাধনাকে ভালভাবে পরীক্ষা করেন তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

ডাঃ সালদানা বললেনঃ চারটার সময় তো আসা একটু মুস্কিল আছে কারণ তাঁর একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ঐ সময়। তবে তিনি সাড়ে চারটার সময় নিশ্চয় আসবেন।

ডাঃ এবং মিসেস সালদানা এই বলে তখনকার মত চলে গেলেন। আমি মিঃ সিদ্দওয়াকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম যে আমি সাড়ে পাঁচটায় আসছি এবং সেই সময় পাকা কথা হবে।

ডাঃ সালদানা এলেন ঠিক সাড়ে চারটেয়। আমি আগেই সাধনাকে বলেছিলাম ডাঃ সালদানা ও মিসেস সলাদানার কথা—আর এও বলেছিলাম যে ডাঃ সালদানাই এখন থেকে ওর চিকিৎসা করবে—এবং এ সম্বন্ধে ডাঃ ভারুচার অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এ খবর শুনে সাধনা খুশীই হল—ওর মনে ধারণা হয়েছিল ডাঃ ভারুচার চিকিৎসায় থাকলে তিনি কখনও ওকে আবার মঞ্চে নাচবার অনুমতি দেবেন না। ডাঃ সালদানা আসতেই সাধনা ওর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিল—তারপরেই বললঃ ডাঃ সালদানা, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। এখন আবার আমায় মঞ্চে নামবার অনুমতি দিন।

তাতে ডাঃ সালদানা বললেনঃ আগে আপনাকে ভাল করে পরীক্ষা করি তারপর সে সব কথা হবে এখন।

ভাল করে পরীক্ষা করবার পর ডাঃ সালদানা বললঃ এখন ত আপনাকে সর্বদিক থেকেই ভাল মনে হচ্ছে তবে—

—তবে কি! জিজ্ঞাসা করল সাধনা।

ডাঃ সালদানা বললেন, ডাঃ ভারুচা ত দেখছি টনিক দিয়ে গেছেন এবং খাওয়া-দাওয়ার কথাও নিশ্চয়ই বলে গেছেন।

—ডাঃ ভারুচার নির্দেশ মত খাওয়া-দাওয়া করছি—টনিকও খাচ্ছি—এবং এখন মোটেই দুর্বল মনে হচ্ছে না—বলল সাধনা।

একথা শুনে ডাঃ সালদানা একবার আমার দিকে তাকালেন—সাধনা সেটা লক্ষ্য করে আমায় বললঃ আমাকে যদি তোমরা স্টেজে নামতে না দাও তাহলে আমি নিজে থেকে মিঃ সিদ্দওয়াকে টেলিফোন করে জানিয়ে দেব যে আমি ভাল হয়ে গেছি, তা সত্ত্বেও তোমরা জোর করে আমায় আটকে রেখেছ—এই বলে টেলিফোনের রিসিভার তুলল। আমি বাধা দিয়ে বললামঃ মিঃ সিদ্দওয়াকে ফোন করবার দরকার নেই। ওঁর সঙ্গে ত আমার দেখা করবার কথা আছে আজ বিকেলে।

সাধনা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললঃ তোমার সঙ্গে তো সাড়ে পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট—তুমি শিগগির যাও। কাল থেকে যাতে আবার শো হয়, তার বন্দোবস্ত করে এস।

আমি বললামঃ হ্যাঁ আমি যাচ্ছি—তবে 'শো'এর পাকাপাকি করবার আগে ডাক্তারের অনুমতি ত প্রয়োজন।

সাধনা বাধা দিয়ে বললঃ ডাঃ সালদানা কখনও আপত্তি করবেন না। কি বলেন ডাঃ সালদানা?

'আমার আপত্তি থাকবে কেন মিসেস বোস'—বললেন, ডাঃ সালদানা—'আমি ত আপনার নাচ দেখেছি—আর কি রকম পরিশ্রম হয় তাও খানিকটা অনুভব করতে পারি। এই দুর্বল শরীরে অতটা পরিশ্রম আপনার সহ্য হবে কিনা—আমি শুধু এই কথাই ভাবছি। আফটার এফেক্ট... কি দাঁড়াবে...'

—আফটার এফেক্ট কিছুই হবে না ডাঃ সালদানা—বরং আপনারা যদি আমায় নাচতে না দেন তাহলেই মানসিক অশান্তিতে শরীর আরও খারাপ হবে।

ডাঃ সালদানা বললেন, আপনি যখন মনস্থির করেই ফেলেছেন মিসেস বোস তখন আমি আর কি বলব বলুন। তবে ডাক্তার হিসেবে আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না—

এই বলে ডাঃ সালদানা ওষুধের এবং খাবারের সমস্ত নির্দেশ দিয়ে সাধনার কাছ থেকে আপাততঃ বিদায় নিলেন।

যাবার আগে সাধনা ডাঃ সালদানাকে অনুরোধ করল যদি রাত্রে একবার আসেন। আগেই বলেছি ডাঃ সালদানা এবং তাঁর স্ত্রীর কথাবার্তায় আমাদের জন্যে প্রচুর সহানুভূতির পরিচয় পেয়েছিলাম। এখনও তিনি যাবার সময় বলে গেলেন যে তিনি তাজমহল হোটেলের খুব কাছেই থাকেন—এবং ডিনারের পর একবার এসে সাধনাকে দেখে যাবেন।

ডাঃ সালদানার সঙ্গেই লিফটে নামবার সময় তিনি আমার বললেন, 'মিসেস বোস হয়ত মনের জোরে প্রথম শো'টা করে যাবেন, কিন্তু আমার মনে হয় মিঃ বোস, এই পরিশ্রমটা অসুস্থ শরীরে তাঁর পক্ষে ভাল পরিণাম হবে না। তাঁর অসম্ভব আগ্রহ আছে, মনের জোরও আছে—আমি ওঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ডাক্তার হিসেবেই বলুন আর বন্ধু হিসেবেই বলুন—আমার দ্বারা যতখানি সম্ভব, সবই করতে প্রস্তুত আছি। এখন আপনি স্থির করুন, কি করবেন আপনি।'

এ বলে ডাঃ সালদানা বিদায় নিলেন—যাবার আগে বলে গেলেন ডিনারের পর আবার আসবেন—নটা নাগাদ।

আমি নীচে হোটেলের লাউঞ্জে বসে কিছুক্ষণ ভাবলাম—তারপর ছুটলাম ক্যাপিটল সিনেমায়। মনে হল কে যেন আমায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল সেখানে। সেখানে মিঃ সিদ্দওয়া এবং মিঃ কুকার সঙ্গে দেখা করে বললাম যে সাধনার শরীর এখন অনেকটা ভাল—এবং কাল থেকে সে স্টেজে আবার নামতে পারবে। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার—২২ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর—অবশ্য রোজ একটা করে শো। এই শুনে মিঃ সিদ্দওয়া বলে উঠলেনঃ তারপর যদি দেখা যায় যে মিসেস বোসের শরীর ভালই আছে তখন না হয় আরো দুটো শো করা যাবে ২৪ এবং ২৫ কি বলেন মিঃ বোস?

সেটা আমি ঠিক করব ২৩ তারিখে।

তারপর নতুন কন্ট্রাক্ট সই করলাম। তাতে ক্যাপিটল সিনেমার কর্তৃপক্ষরা একটি বিশেষ সর্ত রাখলেন যে যদি কোন কারণে শো বন্ধ হয়ে যায়— তাহলে আমি প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব। আমার মনে তখন এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেল যে আমি এই সর্তেই রাজী হয়ে গেলাম।

ঠিক হল আপাততঃ ২২ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর—এই দুদিন রোজ একটা করে

'নমস্কার নৃত্য' (কথক)

শো হবে। সেইভাবেই সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমি যখন ফিরে এসে সাধনাকে নতুন কন্ট্রাক্টের কথা বললাম তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে একরকম তখনই নাচতে সুরু করে দিলে। আমি তখন তাকে বোঝালাম যে এখন থেকে অত উত্তেজিত হয়ো না—এখন যতটা সম্ভব বিশ্রাম নাও।

অবশ্য নতুন কন্ট্রাক্টে বিশেষ সর্তের কথা সাধনাকে কিছু বললাম না।

রাত্রে ডিনারের পর ডাঃ সালদানা এলেন—সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও এলেন। ডাঃ সালদানা সাধনাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন এবং সে যে এত তাড়াতাড়ি এতটা ভাল হয়ে গেছে দেখে বেশ আশ্চর্যান্বিত হলেন। জ্বর ত একেবারেই নেই বা কোন উপসর্গও নেই—তবে অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর মনে তখনও সন্দেহ ছিল যে, কাল থেকে 'শো' সে করতে পারবে কিনা, কিন্তু যখন শুনলেন যে আমি সব বন্দোবস্ত আমি পাকা করে এসেছি, তখন আর কিছু বললেন না।

চমৎকার মহিলা মিসেস সালদানা। প্রথম আলাপেই আমাদের তিনি এত আপনার করে নিলেন এবং বিদায় নেবার আগে তাঁরা দুজনেই বলে গেলেন—শুধু ডাক্তার হিসেবে নয়—বন্ধু হিসেবে যখন যা দরকার হবে যেন ও'দের টেলিফোন করে জানান হয়।

আমি ডাঃ সালদানাকে বললাম : 'যখন আপনারা আমাদের বন্ধু হিসেবে নিয়েছেন—তখন একটা বিশেষ অনুরোধ আমার আছে—কালকের শো-এর সময় ডাঃ সালদানা যদি স্টেজের ভিতরে থাকেন, আমরা মনে অনেক বল পাব। অবশ্য জানি যে I am taking advantage of your goodness —

কিন্তু ডাঃ সালদানা আমায় বাধা দিয়ে বললেন : বন্ধুদের মধ্য অ্যাডভানটেজের প্রশ্নই আসে না মিঃ বোস। আপনাদের যদি মনে যদি আমার স্টেজের ভিতরে থাকলে আপনারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন—আমি নিশ্চয় আসব। কাল কখন থিয়েটারে যাচ্ছেন আপনারা?

আমি বললাম : আমরা ঠিক করেছি যে, সাধনা হোটেলেই মেক-আপ করবে, সুতরাং শো আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা আগে এখান থেকে বেরুলেই হবে।

বেশ—আমি এখানেই আসব এবং আপনাদের সঙ্গেই যাব' এই বলে ডাঃ ও মিসেস সালদানা বিদায় নিলেন।

পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় নাকি কোন কাজ সফল হয় না, সেইজন্যে কোন নতুন বা শুভ কাজ চট করে অনেকে করতে চায় না। কিন্তু আমার জীবনে এই বৃহস্পতিবারের বারবেলা থেকে শুভদিন বোধহয় আর আসে নি।

ঠিক শো'র আধ ঘণ্টা আগে আমি আর ডাঃ সালদানা সাধনাকে নিয়ে গেলাম থিয়েটারে। আমাদের সঙ্গে সাধনার আয়া ও চামন গেল। গিয়ে দেখলাম হাউস ভর্তি হয়ে গেছে, অতিরিক্ত সীটের বন্দোবস্ত করতে হয়েছে এবং তাতেও অনেক লোক ফিরে যাচ্ছে টিকিট না পেয়ে।

পর্দা তোলবার সময় এগিয়ে আসতে লাগল। লোকজন আসতে শুরু করল। যত সময় এগিয়ে আসে ততই আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি। যাই হোক, পর্দা তোলবার সময় হয়ে এল। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে পর্দা উঠল।

প্রোগ্রামের প্রথম অর্ধেই ছিল "ওমরের স্বপ্ন কথা"—এখানে সাধনার 'সাকী'র অংশে বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ নাচ ছিল না। এই নাচটি যখন শেষ হল তখন দেখলাম যে, সাধনা ঠিকই আছে, শুধু একটু হাঁপিয়ে পড়েছে এই যা। ডাঃ সালদানা সঙ্গেই ছিলেন, তিনি একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে খানিকটা বিশ্রাম করতে বললেন।

পরবর্তী অংশ ছিল 'সাধনা বোস ও তাঁর ব্যালে'। তৃতীয় নৃত্যটিও বেশ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল, যদিও এ নাচটি খুব শক্ত এবং সাধনাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কিন্তু ভগবানের দয়ায় বেশ সুন্দরভাবেই শেষ হল। সারা প্রেক্ষাগৃহ বিপুল করতালি-ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করল। এর পরের নাচটি ছিল 'স্ট্রীট ড্যান্সার'। এই নাচ সম্বন্ধেই আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল আর এর জন্যে সাধনাকে খাটতে হত প্রচুর। এই নাচটির পরেই ইন্টারভ্যাল।

নাচটির আগে আমি ও ডাঃ সালদানা বিশেষ করে সাধনাকে বলে দিলাম যেন আগের মত অতটা মেতে না ওঠে। এবং তিমিরকেও আমি বললাম যে, যদি দেখে সাধনা বেশী মেতে উঠেছে—যেন নাচের এক্সিট-এর বাজনা আরম্ভ করে দেয়। এই নাচটি আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ যন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল—তাদের ঘন-ঘন করতালি ও অভিনন্দনে শিল্পী ভীষণ মেতে উঠল—ফলে হত কী—তাকে থামান যেত না এবং আমাদের নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেক বেড়ে যেত। তারপর 'এনকোর' তো পড়তই—শিল্পীদের আবার খানিকটা নাচতে হত। এই নাচে সাধনার নৃত্যসঙ্গী ছিল যমুনাপ্রসাদ পান্ডে; তাকেও আমি বার-বার করে বলে দিলাম, নাচটাকে ছোট করে ফেলতে, কারণ সাধনার তো এদিকে তখন হুঁস থাকে না।

তখন ক্যাপিটাল সিনেমায় বৈদ্যুতিক উপায়ে পর্দা ফেলবার উপায় ছিল না—

হাতে করে ফেলতে হত। পর্দাটাও ছিল অত্যন্ত ভারী, সুতরাং দু'জন লোক লাগত পর্দাটাকে ফেলতে। আমি কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটার থেকে দুজন লোক নিয়ে গিয়েছিলাম—তাদের বলে দিলাম যে, আমি ইসারা করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তারা পর্দা ফেলে দেয়। আমি দুরু-দুরু বক্ষে উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর ভগবানকে ডাকতে লাগলাম যেন ভালয়-ভালয় নাচটা শেষ হয়।

নাচ তো শুরু হল—আমি যা ভেবেছিলুম তাই হল।

নৃত্যের তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। সাধনার দ্রুত ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নাচের টেম্পো উঠতে লাগল। আমি আর ডাঃ সালদানা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম — কিন্তু তখন আমাদের করার কিছুই ছিল না। অসহায় অবস্থায় অপেক্ষা করতে লাগলাম কতক্ষণে নাচ শেষ হয়। আমরা যত জায়গায় শো দিয়েছি এই নাচটিতে সর্বত্রই সমস্ত দর্শক উচ্ছ্বসিত আনন্দে ফেটে পড়ে এবং অভিনন্দনের যৌতুকস্বরূপ স্টেজের উপর টাকা-পয়সা, নোট সব ছুঁড়তে থাকে—যেমন পথের নাচ-ওয়ালীদের পয়সা দেয়। সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে একটা দারুণ হুল্লোড়ের সৃষ্টি হত।

দর্শকদের আনন্দোচ্ছ্বাসে সাধনা যেন নিজেকে ভুলে গেল। যমুনাপ্রসাদ যতই চেষ্টা করে শেষ করবার কিন্তু সাধনার সেদিকে খেয়াল নেই। 'অর্কেস্ট্রা পিটে' তিমিরকে আমি ইসারা করলাম—তিমির আগের বাজনার সঙ্গে মিলিয়ে নাচের শেষের বাজনা আরম্ভ করল। এতক্ষণে সাধনা বুঝতে পারলে যে নাচ শেষ করতে হবে—তখন যমুনাপ্রসাদের সঙ্গে নাচতে-নাচতে মঞ্চ থেকে এক্সিট করল। বিপুল করতালি ধ্বনির সঙ্গে পর্দা নেমে এল। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে সাধনার দম একেবারে ফুরিয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। আমি, হেমন্ত, ডাঃ সালদানা সবাই দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরাধরি করে ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেলুম। এর পর ইন্টারভ্যাল।

এই বিরতির সময় স্টেজের ভিতরে গ্রীনরুমে সাধনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে, ভক্তদের এবং ছবি তুলবার জন্যে প্রেস-ফটোগ্রাফারদের সাংঘাতিক ভীড় শুরু হল। তাদের আটকে রাখা শক্ত হয়ে পড়ল। অনেক অনুনয়-বিনয় করে সাধনার অসুখের কথা বলে তাদের বোঝালুম—তাতে কি তারা শুনতে চায়? শেষে ডাঃ সালদানাকে জনতাকে আটকে রাখার কাজে সাহায্য চাইলাম। আমরা সকলে তাদের বহু কষ্টে বোঝালাম যে, ডাক্তারের উপদেশ তার শরীরের যা অবস্থা তাতে কারুর সঙ্গে দেখা করা একেবারে নিষেধ। যদি নেহাৎ আপনারা না ছাড়েন তাহলে শো'র শেষে আসবেন—তখন দেখা হবে।

এই সময় ইন্টারভ্যাল শেষ হবার প্রথম ঘন্টা পড়ল। তখন ভক্তের দল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক এক করে চলে গেল—
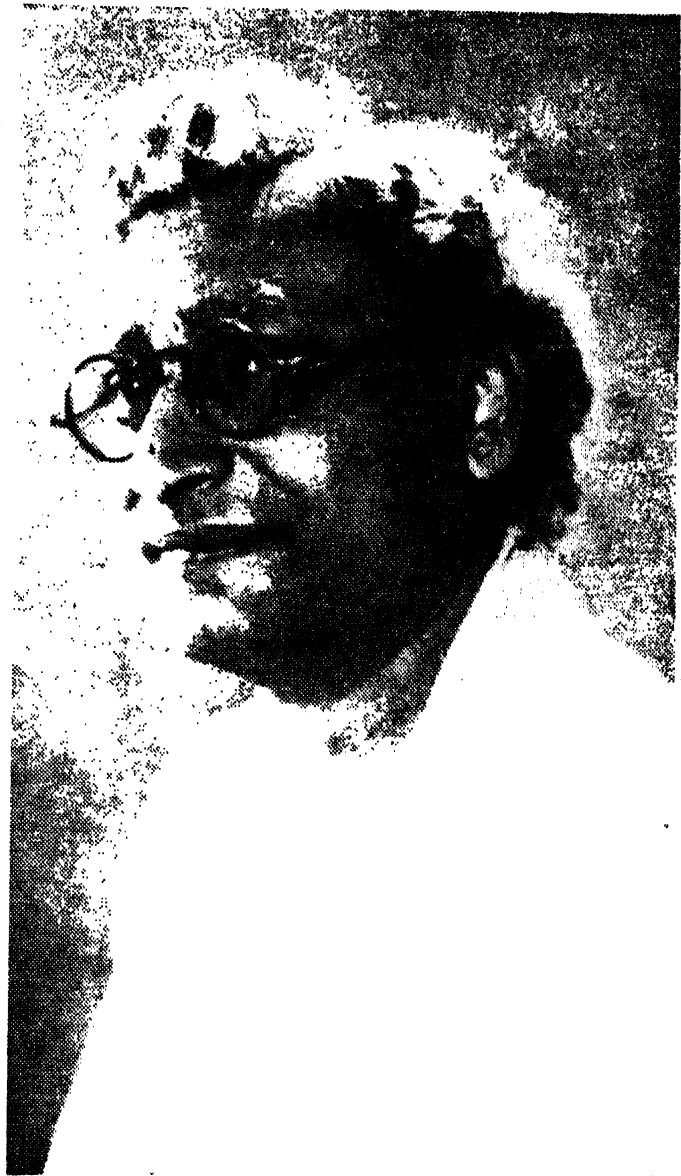
অভিনয়ে পীতাম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

শুধু রেখে গেল অজস্র ফুলের স্তবক এবং মালা।

গ্রীনরুমে আমি আর ডাঃ সালদানা সাধনাকে বললাম যে, সে যখন এতটা পরিশ্রান্ত হয়েছে তখন না হয় আমি বাকী দু-একটা নাচ বাতিল করে দিচ্ছি, যদিও পরের নাচগুলি এতটা পরিশ্রমসাপেক্ষ নয়। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে এমন একটা নেশা আছে যাতে শিল্পীর পক্ষে মঞ্চ থেকে সরে থাকা অসম্ভব। সাধনা জিদ ধরে বসল যে, কোন নাচই বাদ দেওয়া চলবে না।

যাক, শেষ পর্যন্ত ভগবানের দয়ায় সেদিনের প্রোগ্রাম শেষ হল। সর্বশেষ নৃত্য ছিল 'শিব-পার্বতী', সাধনা আর মাধব মেনন। সাধনা পার্বতী আর মাধব মেনন শিব। এই নাচটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জয়ধ্বনির সঙ্গে শেষবারের মত পর্দা নেমে এল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নাচের শেষে দর্শকদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে সমস্ত শিল্পীদের স্টেজে দাঁড়িয়ে করার রীতি আছে। আমি আর ডাঃ সালদানা বাধা দিয়ে বললাম যে, আর পাদপ্রদীপের

সামনে যাবার দরকার নেই, তুমি এবার বিশ্রাম করগে যাও।

কিন্তু কে শোনে আমাদের কথা? দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন-ধ্বনিতে ওখন তার রক্তে লেগেছে নেশা। এ নেশা ত্যাগ করা বড় মুস্কিল। তাদের প্রশংসা নিজের কানে শোনার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। যাই হোক, মাধব মেনন তাকে ধরে নিয়ে এল স্টেজের উপর। মুগ্ধ ভক্তের দল ছুটে স্টেজের সামনে 'অর্কেস্ট্রা পিটে', সঙ্গে নিয়ে এল অজস্র ফুলের তোড়া। অটোগ্রাফ-শিকারীর দল ছুটে এল অটোগ্রাফ নেবার জন্যে। আমি মাধব মেননকে ইসারা করতেই সে একরকম জোর করেই সাধনাকে ওখান থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল পর্দার পিছনে। দর্শকরা কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে গেল না কেউ, সমানে হাততালি চলতে লাগল। আমি শেষকালে বেরিয়ে স্টেজের ওপরে হাতজোড় করে বললাম যে, মিসেস বোসের শরীর খুব অসুস্থ। এই অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি মঞ্চে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। এখন ডাক্তারের উপদেশে তিনি বিশ্রাম করছেন। আপনারা দয়া করে তাঁকে আজকের মত ক্ষমা করুন।

দর্শকরা তাতেও শোনে না—পরে তারা স্টেজের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে চায়। একবার দেখা না করে আর অটোগ্রাফ না নিয়ে তারা যাবেই না। সৌভাগ্যক্রমে স্টেজ থেকে বেরুবার আর একটি দরজা ছিল পিছন দিকে সেই দিক দিয়ে কোনমতে তিমির, হেমন্ত আর ডাঃ সালদানা সাধনাকে বার করে নিয়ে গাড়ীতে তুলল। গাড়ী তৈরী ছিল ওখান থেকে একেবারে সোজা হোটেল।

ভগবানের দয়ায় প্রথম শো'টি নির্বিঘ্নে শেষ হল। এখন চিন্তা হল এই পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া কিছু হয় কিনা! ডিনারের পর সেদিন রাত্রে ডাঃ সালদানা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আবার এসে সাধনাকে দেখে গেলেন, সত্যিই ডাঃ সালদানা আমাদের যে রকম সাহায্য করেছিলেন তার তুলনা হয় না। এজন্য চিরজীবন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সালদানা দম্পতি আমাদের ওখানে রইলেন। যাবার সময় আর একবার সাধনাকে পরীক্ষা করে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যে, আর কোন ভয় নেই।

পরদিন সকাল—ভগবানের যে কি ইচ্ছা তা আমার মত সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে রোগীর মধ্যে অনেক কিছু উপসর্গ এসে জোটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সাধনা একেবারে সম্পূর্ণ আগের মত সাধারণ অবস্থায় ফিরে এল। ডাঃ সালদানা সকালবেলায় এসে যখন পরীক্ষা করলেন তখন তিনিও তাজ্জব বনে গেলেন।

বসবার ঘরে এসে তিনি আমায় বললেন মিঃ বোস, আমি সত্যিই তাজ্জব বনে গেছি। ডাক্তার হিসেবে এটা আমার একটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা হল যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে যে এ রকম সাফল্যজনকভাবে নৃত্য প্রদর্শন করতে পারে এ আমার ধারণার অতীত ছিল। ভগবানের অশেষ করুণা না থাকলে এ জিনিস সম্ভব হয় না।

সালদানা দম্পতি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক এবং প্রকৃত খ্রীশ্চান। ভগবানের উপর তাঁদের ছিল অগাধ বিশ্বাস।

• • •

বিকেলে যখন ক্যাপিটল সিনেমায় গেলাম—মিঃ সিদ্ওয়া আমায় জিজ্ঞাসা করলেন : কি ঠিক করলেন মিঃ বোস? আরও দুটি শো কি করবেন। মিসেস বোস তো দেখছি সম্পূর্ণ সুস্থ এখন।

আমি তাতে বললাম : হ্যাঁ, আমরা ঠিক করেছি যে, কাল এবং পরশু রোজ একটা করে শো করা যেতে পারে। এই শুনে মিঃ সিদ্ওয়া ও মিঃ বুকা দুজনেই বলে উঠলেন : কাল শনিবার ও পরশু রবিবার—আমাদের মনে হয় অন্ততঃ রবিবারে দুটি শো দিলেও—হাউস ভর্তি যাবেই।

—তা হয়ত যাবে, বললাম আমি, কিন্তু মিসেস বোস এখনও দুর্বল আছে সুতরাং অতটা পরিশ্রম ও'র পক্ষে ভাল হবে না। তাছাড়া রবিবার হল ২৫—আমরা ২৬ কলকাতার জন্যে রওনা হব—ওখানে আবার ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শো।

ঠিক হল শনিবার এবং রবিবার একটা করে শো হবে। সেইভাবেই সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সেদিনের অর্থাৎ শুক্রবারের শো ভালই হয়ে গেল। দেখা গেল যে, স্পীট ড্যান্সার নাচের অত্যধিক পরিশ্রমের পরও সাধনা ঠিক আছে।

ইতিমধ্যে মিঃ হেমাদের কাছ থেকে টাকা এসে গেছে।

আমি সেদিন রাত্রেই ও'কে ট্রাংককল করে ধন্যবাদ দিলাম, এও বললাম যে, টাকা তিনি পাঠিয়েছেন তার আর এখন দরকারে লাগল না, কারণ সাধনা এখন একবারে সুস্থ—দুটি শো ভালয়-ভালয় হয়ে গেছে এবং আরও দু দিন শো হবে স্থির করা হয়েছে কারণ রোজই অতিরিক্ত সীটের বন্দোবস্ত করেও হাউস ভর্তি যাচ্ছে। মিঃ হেমাদকে আরও বললাম যে, এম্পায়ার থিয়েটারের ম্যানেজারকে বলতে যে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শো হবে।

• • •

পরের দিন শনিবার ২৪ আমি আমার সহকারী হেমন্তকে পাঠিয়ে দিলাম কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে ৩০ সেপ্টেম্বরের শো'র পাব্লিসিটির ব্যবস্থা করতে।

শনিবার এবং রবিবারের শো হয়ে গেল অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। রবিবার রাত্রেই হাউস থেকে আমি আমাদের অংশের টাকা নিয়ে এলাম। তার পরদিন সকালের হোটেলের পাওনা এবং প্রত্যেকটি লোকের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে আমি একটি বগী রিজার্ভ করেছিলাম। বোগীতে ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর কুপে, দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা ও একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরা। এ ছাড়া একটি ল্যাগেজ ভ্যান ছিল, আমাদের সাজ-সজ্জার বাক্সগুলির ও স্টেজের সেটিং-এর জন্য। আগেই বলেছি, আমাদের সমস্ত সফরটাই আমরা এইভাবে করেছি। তবে বোগীটি কখনও কোন মেল ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেবার নিয়ম ছিল না। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ও রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্বর্গীয় নলিন সেন, ব্যবস্থা করলেন যে, বোগীটি সোমবার রাত্রে বোম্বাই মেলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে।

সোমবার ২৬ সেপ্টেম্বর আমরা বোম্বাই ছাড়লাম। প্ল্যাটফর্ম লোকে-লোকারণ্য। ভক্তের দল প্রচুর ফুল নিয়ে এসেছে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে। শুধু আমাদের কামরাই নয়—বোগীর প্রত্যেকটি কামরাই ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেল।

খুব খুসী মন নিয়ে আমরা সবাই বোম্বাই ত্যাগ করলাম। এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আমি আবার বলব, যে ডাঃ সালদানা আমাদের জন্যে যা করেছিলেন, তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

(ক্রমশঃ)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'দিবারাত্রির কাব্য'** অবলম্বনে **নাবিক** প্রযোজিত প্রথম চিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন স্বর্গত লেখকের সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহরৎ দৃশ্যের শিল্পী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

নৃত্য, গীত ও নাটকলা সম্পর্কে দু'একটি কথা :

চৌষট্টি কলার তিনটি কলা হচ্ছে নৃত্য, গীত ও নাট্য। এবং নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্য আলেখ্য বা অঙ্কনবিদ্যা ও প্রতিমালা বা ভাস্কর্যের মতো ললিত বা সুকুমার কলারূপে স্বীকৃত। কিন্তু অঙ্কন ও ভাস্কর্যে যে চিত্র ও মূর্তি প্রস্তুত করা হয়, সেগুলিকে বারংবার দেখে শিল্পীর নৈপুণ্য বিচার করা হয় এবং চিত্র ও মূর্তিকে সুরক্ষিত ক'রে রাখতে পারলে অঙ্কন-শিল্পী ও ভাস্করের কৃতিত্বও বহুদিন, এমনকি বহু শতবর্ষ ধ'রে রসিকদের চোখের সামনে বিরাজ করতে পারে। অজন্তা, ইলোরার চিত্রাবলী, রেমব্র্যান্ট র‍্যাফেলের অঙ্কিত চিত্র, গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শন, মহাবলীপুরম, তাজের প্রভৃতির স্থাপত্যের নিদর্শন যুগ যুগ ধরে বেঁচে রয়েছে। **অপরপক্ষে নর্তক, গায়ক বা** অভিনেতা যে সুকুমার কলার চর্চা করেন, আজ তাকে সবাক চলচ্চিত্র বা রেকর্ডের মাধ্যমে কিছুটা ধ'রে রাখা সম্ভব হচ্ছে বটে, কিন্তু আগে তা ছিল না। নটই যে যে শুধু 'দেহপটে সনে সকলি' হারাত, তা নয়, সংগীতশিল্পী এবং নৃত্যশিল্পীরও ঐ একই অবস্থাই ছিল। স্যার হেনরি আর্ভিং, এলেন টেরী, আমাদের গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, তিনকড়ি বা বিনোদিনী কেমন অভিনয় করতেন, তা যেমন আজ আর জানবার উপায় নেই, তেমনই উপায় নেই আনা পাভলোভা, ইসাডোরা ডানকান, নিজিনস্কি বা কালুকাবুন্দারীন, গুরু নাম্বুদ্রি প্রভৃতি কতখানি নৃত্যকুশলী ছিলেন কিংবা মিঞা তানসেন, ভাতখণ্ডে, যদু ভট্ট বা ওদেশের ক্যারুসো, জেনী লিন্ড, নর্ডিকা প্রভৃতি কি রকম গানের যাদুকর ছিলেন, তা জানবার। এঁরা সকলেই আজ আমাদের মধ্যে মাত্র নামে বেঁচে আছেন—তার বেশী কিছু নয়। এঁদের গুণপনা সম্পর্কে এঁদের সমকালীন সমঝদার বা রসিক সমালোচকরা যত কথাই বলুন না কেন, তার থেকে এঁদের অভিনয় বা নৃত্য প্রত্যক্ষ করা কিংবা গান স্বকর্ণে শোনার আনন্দ উপভোগ করা কোনো **মতেই সম্ভব নয়।** এঁরা দিনের পর দিন জীবনভোর যা সৃষ্টি ক'রে গেছেন, তা নিশ্চিতভাবেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

এরও ওপর কথা আছে। অঙ্কনশিল্পী একবার যে-ছবিটি এঁকে শেষ করেছেন, ভাস্কর একবার যে-মূর্তিটি গড়ে ফেলেছেন বা স্থপতি একবার যে-মন্দির বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন, সেই শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে সেই হচ্ছে শিল্পীর শেষ ও চূড়ান্ত কথা; তা' আজও যেমন, দশদিন বাদেও তেমন। কিন্তু অভিনেতা, নর্তকী বা গায়ক তাঁদের কোনো একটি শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে ঠিক এইভাবে শেষ কথা বলতে পারেন না। একজন সৃজনীশক্তিসম্পন্ন অভিনেতা একটি চরিত্রে দু'বার কখনই হুবহু একই রকম অভিনয় করতে পারেন না; কারণ অভিনয়কালে তিনি ক্রমাগত নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে 'সীতা' নাটকে 'রাম'-এর ভূমিকায় আমি অন্তত চোদ্দ দিন দেখেছি এবং প্রতিদিন তাঁকে নূতন ব'লে বোধ হয়েছে। নৃত্যশিল্পী ও সংগীতশিল্পী সম্পর্কেও সমান কথাই প্রযুজ্য। আনা পাভলোভার "ডাইং সোয়ান" বা উদয়শংকরের "হরপার্বতী নৃত্যস্পন্দন" যতদিনই দেখেছি, ততদিনই নতুন দেখছি ব'লে মনে করতে বাধ্য হয়েছি। বড়ে গোলাম আলি

খাঁ সাহেবের কণ্ঠে "বাজু বন্ধ খুলু খুলু যায়" কি কখনও পুরোনো ব'লে মনে হ'তে পারে?

নর্তকী শুধু তার দেহকে আশ্রয় ক'রে তাঁর গুণপনা দেখান, কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী আশ্রয় করেন তাঁর কণ্ঠকে। কিন্তু অভিনেতাকে আশ্রয় করতে হয়—দেহ এবং কণ্ঠ, দুইই। এই কারণে তাঁর দেহ ও কণ্ঠের অবস্থা অনুযায়ী তাঁর অভিনয়ে তারতম্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক; যদিও অভিনেতা, গায়ক ও নর্তকের কর্তব্য তাঁদের দেহ ও কণ্ঠকে সকল সময়েই সুস্থ, সবল ও সতেজ রাখা, তবু প্রাকৃতিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও কণ্ঠে অল্পবিস্তর পরিবর্তন অনিবার্য। এবং সেই অল্পবিস্তর পরিবর্তনের ফলে তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হ'তে বাধ্য।

কথাপ্রসঙ্গে এইখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতে হয়।

রক্তরেখা চিত্রে শুভেন্দু চ্যাটার্জি, দ্বিজু ভাওয়াল ও বিজয়া চৌধুরী। ফটো : অমৃত

কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পীর জনপ্রিয়তা কি শুধু তার শিল্পগত নৈপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল? না, তার কণ্ঠের স্বরমাধুর্য তাকে জনপ্রিয় হ'তে সাহায্য করে? সঙ্গীতবিদ্যায় অধিকতর পারদর্শীকে স্বরমাধুর্যের অভাবে সুস্বরবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত কম পারদর্শীর কাছে বারংবার পরাজয় স্বীকার করতে দেখা গেছে। ঠিক সমান কথাই অভিনেতা ও নর্তক সম্বন্ধেও বলা চলে। উদয়শঙ্করের আশ্চর্য সুগঠিত দেহ কি তাঁকে সাফল্যের পথে অগ্রসর ক'রে দিতে কম সাহায্য করেছে? ভূমিকানুযায়ী সুন্দর দেহ ও কণ্ঠ একজন সাধরণ অভিনেতাকে তার থেকে শক্তিধর অভিনেতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিভাবে জয়ী ক'রে তুলতে পারে, তার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে ইংল্যন্ডের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লন্ডনের রঙ্গমঞ্চে ডেভিড গ্যারিকের যখন অখণ্ড প্রতিপত্তি, তখন হঠাৎ রোমিওর ভূমিকায় তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্প্র্যাঞ্জার ব্যারী নামে একজন মধ্য স্তরের অভিনেতা। ব্যারীর দেহটি যেমন সুগঠিত, তার আয়ত চক্ষুবিশিষ্ট মুখমণ্ডলও তেমন নয়নবিমোহন। বলা বাহুল, রোমিও বেশে তাকে মানিয়েছিল চমৎকার। গ্যারিকের চেহারা কিন্তু আদৌ রোমিও সাজবার উপযোগী ছিল না এবং মাত্র এই কারণে ব্যারী এই ভূমিকায় গ্যারিককে প্রায় পরাস্ত করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। পরে রাজা লীয়ারের ভূমিকায় দুজনকে দেখে লন্ডনের নাট্যরসিকদের ভুল ভেঙে গেল; তাঁরা খড়িমাটি ও ক্রীমের পার্থক্য অনায়াসেই ধ'রে ফেলেছিলেন।

সুনাম অর্জনের জন্যে অভিনেতা, গায়ক বা নর্তকের শিল্পগত নৈপুণ্যের সঙ্গে আরও যে-দুটি জিনিস থাকা প্রয়োজন, সে হচ্ছে ব্যক্তিত্ব এবং উপস্থাপনা কৌশল বা শোম্যানশিপ। ব্যক্তিত্বের সহায়ক হচ্ছে আকৃতি ও কণ্ঠস্বর এবং ব্যক্তিত্ব আহরণ করতে হয় গাম্ভীর্যপূর্ণ বাচনভঙ্গী ও চতুর্দিকে একটি স্বাতন্ত্র্যের আবরণ সৃষ্টি দ্বারা। আর শোম্যানশিপ বা উপস্থাপনা কৌশল হচ্ছে সেই বিশেষ আর্ট, যার দ্বারা শিল্পী দর্শকমনে তাঁর সম্বন্ধে একটি চাহিদা সৃষ্টি করতে পারেন, তাদের মনে তাঁকে আরও দেখবার আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে পারেন। মঞ্চে হয়ত কোনো প্রথিতযশা অভিনেতার আবির্ভূত হবার কথা; কিন্তু তিনি হয়ত দেখছেন, তাঁর সুযোগ রয়েছে দু'পাঁচ সেকেন্ড পরে অবতীর্ণ হবার। তাই তিনি তখন দর্শকের মনে আকুলতা বৃদ্ধি করবার জন্যে ঐ দু'পাঁচ সেকেন্ড পরেই আত্মপ্রকাশ করেন। আবার সমানভাবেই কোনো একটি দৃশ্যে চমৎকর ক্লাইম্যাক্স তুলেই মুহূর্তে অন্তর্হিত হন—দর্শকের মনে তখন তাঁকে আরও একটু দেখবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। গানের আসরে দেখা যায়, জনপ্রিয় শিল্পী প্রথম গানের পরে দ্বিতীয় গানটিতে সমবেত শ্রোতাদের একেবারে মাত্ত করে দিয়েই বিদায় নেন এবং এতে তাঁর গান শোনার আকাঙ্ক্ষা শ্রোতাদের মনে বাসা বেঁধে থাকে। উদয়শঙ্কর তাঁর নাচের সময়টুক এমন সুন্দরভাবে বাঁধতেন যে, প্রতিটি নাচের পরেই দর্শকের মনে হ'ত নাচটি আরও কিছুক্ষণ চললে ভালো হ'ত অর্থাৎ দর্শকের মনে তাঁর নাচ আরও দেখবার

আকাঙ্ক্ষা থেকেই যেত। আমাদের দেশের একজন গুণী মার্গসঙ্গীতশিল্পীর গান শুনেতে যাবার আগে শরৎচন্দ্র যে-প্রশ্ন ক'রেছিলেন, সেটি হচ্ছে : ওস্তাদজী গানত' ভালই গান, শুনেছি; কিন্তু তিনি থামতে জানেন ত'? এই থামতে জানাটা হচ্ছে শোম্যানশিপের একটি বড়ো অঙ্গ। এবং এই থামতে না জানার ফলেই আমাদের দেশের অনেক ওস্তাদ গাইয়ে ও নাচিয়ে শ্রোতৃবৃন্দের কাছ থেকে তাঁদের প্রাপ্য সমাদর লাভের পরিবর্তে অনাদরের হাত-তালি পেয়ে থাকেন। মিষ্টিও যে বেশী খেলে তেতো লাগে, এ-বোধ শিল্পী-মাত্রেরই থাকা উচিত।

চিত্র-সমালোচনা

হারানো প্রেম (বাঙলা) : প্যারাডাইস প্রোডাকসন্-এর নিবেদন; ৩,৬৫৩·১৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়; কাহিনী : শ্রীপ্রহ্লাদ; সংগীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : ননী দাস; শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : গৌর পোদ্দার; সম্পাদনা : তরুণ দত্ত; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণ : সুপ্রিয়া চৌধুরী, সুস্মিতা সান্যাল, ছায়া দেবী, নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, অসীম ভট্টাচার্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, জয়ন্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি। চিত্রস্থান ও মালঞ্চ চিত্রম্-এর (কলিকাতা) পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২২-এ জুলাই থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

নায়িকা সংবাদ চিত্রে উত্তমকুমার এবং অঞ্জনা ভৌমিক

প্যারাডাইস প্রোডাকসন্-এর 'হারানো প্রেম' যে-কাহিনীর মারফৎ আমাদের স্বর্গীয় আনন্দ (হ্যাপিনেস অব প্যারাডাইস) উপভোগ করাতে চেয়েছেন, তার আরম্ভ হচ্ছে এই রকম :

একটি হাসপাতালের মধ্যে কর্মব্যস্ত এক তরুণ ডাক্তার। হঠাৎ বন্ধ দরজার কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল, এক তরুণী এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেদিকে চোখ পড়তেই ডাক্তার দরজা খুলে সেই তরুণীর সম্মুখীন

হলেন। তরুণী তাঁকে এক জনবিরল স্থানে নিয়ে গিয়ে জানাল, সে অন্তঃসত্ত্বা, কাজেই তাদের বিবাহ হওয়া আশু প্রয়োজন। উত্তরে তরুণ ডাক্তার জানালেন, বিবাহের কথা তিনি তাঁর মা-বাপের কাছে হঠাৎ উত্থাপন করতে পারবেন না, কিছু সময়ের প্রয়োজন। 'তাহলে আমার কি হবে?' তরুণীর আকুল জিজ্ঞাসা। ডাক্তারের জবাব : সেজন্যে ভাবনা কি? মনে রেখো, আমি ডাক্তার। 'তুমি এত নীচ, এত হীন!'—বলে কাঁদতে কাঁদতে তরুণীর প্রস্থান। ডাক্তারপুঙ্গব মুহূর্তের জন্যে কি যেন চিন্তা করলেন: পরে তাঁর এক সহ-কর্মীকে তাঁর হয়ে ঐ সময়ের জন্যে কাজ চালিয়ে নিতে অনুরোধ জানিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং পরে একা মোটর চালিয়ে এসে উপস্থিত হলেন আগ্রায় যেটি হচ্ছে আসল ঘটনার অকুস্থল।

কাহিনীর প্রারম্ভভাগেই নায়ক ডাক্তারের চরিত্রকে এইভাবে চিত্রিত করলে তা যে কাহিনীর পক্ষে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, দর্শকমনে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এটুকু বোঝবার ক্ষমতা কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক এবং প্রযোজক—এই চারজনেরই থাকা উচিত। এর পর আগ্রায় তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে অশরীরিনী কল্যাণীর প্রেম! যেই মাত্র সুকান্ত মুখোপাধ্যায়ের মা জানালেন, তাঁদের পরিবারে তাঁরা মা ও ছেলে—এই দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দর্শক বুঝে ফেলেন, ঐ কল্যাণী হচ্ছে কোনো অশরীরিনী, যে সুকান্তকে একদিন ভালোবাসত। কিন্তু তারপরে? কাহিনীর আর অগ্রগতি কৈ? গল্প কোথায় কোন্ নতুন ঘটনার মাধ্যমে মোড় ঘুরছে বা উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে? ক্রমাগতই দেখা যাচ্ছে, কল্যাণী তরুণের নাকে দড়ি দিয়ে এখানে-ওখানে ছুটিয়ে হয়রান করছে এবং নিজেকে বলছে—দীর্ঘশ্বাস। এবং তাও এমনভাবে যে, কিছুক্ষণ দেখবার পরেই কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারের পাগলামি দেখে বিরক্ত হয়ে ওঠা ছাড়া উপায় নেই।

সুপ্রিয়া চৌধুরী, সুমিতা সান্যাল, ছায়া দেবী, নির্মলকুমার, বিকাশ রায় প্রভৃতি কৃতী ও যশস্বী শিল্পী এই 'হারানো প্রেম' ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁদের আপ্রাণ সু-অভিনয়ও ছবিটিকে একান্ত ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

ছবির চারখানি গান রচনা ও সুর-সংযোজনার দিক দিয়ে যথেষ্ট আবেদনপূর্ণ। কিন্তু সমগ্র ছবি যেখানে ব্যর্থ, সেখানে এদের স্থান কোথায়? ছবির একটি জায়গায় সাসপেন্স সৃষ্টির প্রয়াসে যে-আবহসংগীত রচনা করা হয়েছে, ছবির পরিস্থিতিগুণে তা হাস্যোদ্রেকই করে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণের কাজ বহুলাংশে প্রশংস-নীয়। সম্পাদনায় আরও কাঁচি চালাবার অবসর ছিল। শব্দানুলেখন ও সংগীতানু-লেখন নিখুঁত।

'হারানো প্রেম'-এর মতো ছবি আজকের দিনে যত কম নির্মিত হয়, ততই বাঙলা চিত্রজগতের পক্ষে মঙ্গল।

লাডলা (হিন্দী) : এ-ভি-এম্ প্রোডাক-সন্স-এর নিবেদন; ৪,৩৫৫.০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ-ভি মায়াপ্পান; পরিচালনা : কৃষ্ণন পাঞ্জু; কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত; সংলাপ ও গীতিরচনা : রজেন্দ্রকৃষ্ণ; সংগীত পরিচালনা : লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারে-লাল; চিত্রগ্রহণ : ডি রাজগোপাল; শব্দানুলেখন : সি-ডি বিশ্বনাথন; সংগীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : মিনু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশন : এ-কে শেখর; সম্পাদনা : পাঞ্জাবী-ভিট্টল; নৃত্যপরি-চালনা : এ-কে চোপরা; রূপায়ণ : নিরূপা রায়, পান্ডারীবাঈ, কুমুদ ছুগানি, শাম্মী, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, বলরাজ সাহনী, মনমোহন কৃষ্ণ, জগদীপ, সুধীরকুমার, মুকরী, জনি হুইস্কি, পরশুরাম প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৯-এ জুলাই থেকে রক্সী, প্রিয়া, লোটাস, গ্রেস, নাজ, রূপালী, খান্না, ভবানী, পার্কশো হাউস এবং অপরাপর চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত 'মায়ামৃগ' উপন্যাস একদা নাট্যাকারে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এবং পরে বাংলা চলচ্চিত্রাকারে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আজ সেই "মায়ামৃগ"ই মাদ্রাজের এ-ভি-এম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের পতাকা-তলে "লাডলা" নামে হিন্দী চলচ্চিত্রাকারে রূপায়িত হয়ে কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন শহর ও শহরতলীতে প্রদর্শিত হ'তে শুরু করেছে।

সন্তানবঞ্চিতা এক নারী তার নিজের ভগ্নিপুত্রকে নিজ পুত্ররূপে শিশুকাল থেকে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে মানুষ করবার পরে কেমন ক'রে দৈববিড়ম্বনায় নিজের ভগ্নীকে তার আসল মা ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল তার ফলে মানসিক যন্ত্রণায় অতিমাত্রায় কাতর হবার পরে সত্যকে সহজভাবে মেনে নিতে সমর্থ হল, তারই হাসিকান্নামিশ্রিত কাহিনী হয়েছে "মায়ামৃগ"-এর হিন্দী সংস্করণ 'লাডলা'। মূল-কাহিনীর গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃশ্যগুলির পাশে দর্শন ও বর্ষার প্রেমের দৃশ্যগুলিই যথেষ্ট লঘু ও উপভোগ্য। কিন্তু ছবির নির্মাতা আরও হাসির অব-তারণা করবার জন্যে ধনী সাবিত্রীর বাড়ীতে বহু পোষ্যের স্থান দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে দুই প্রকান্ড ইঁদুরের আমদানী করে বেশ কিছুটা রসবিকার ঘটিয়েছেন।

অভিনয়াংশে সাবিত্রীর স্বামীর ভূমিকায় বলরাজ সাহনী অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন কাহিনীর মধ্যে

এই একটি চরিত্রই আছে, যা সব সময়ে ধীর স্থির এবং সহজ যুক্তিদ্বারা চালিত। বলরাজের বাচন এবং অভিনয়ভঙ্গী এই চরিত্রটিকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরের সন্তানকে সর্বপ্রকারে নিজের করে নেবার জন্যে অতি মাত্রায় আকুল সাবিত্রীর চরিত্রটিকে রূপ দিয়েছেন নিরূপা রায়; পালিত সন্তানের প্রকৃত পরিচয়কে গোপন করবার মর্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা এবং তার প্রকৃত মা সীতা যে-কোনও দিন তাকে নিজের সন্তান বলে দাবি করতে পারে, এই ভীতি তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে অতি সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। পালিতপুত্র দর্শনের ভূমিকায় সুধীরকুমার একদিকে মাতৃবৎসল, অপরদিকে অপরের দুর্দশায় সহানুভূতিপূর্ণ চরিত্রটিকে অনায়াসভঙ্গীতে রূপায়িত করতে পেরেছেন। প্রেমিকরূপেও তিনি হিন্দী চলচ্চিত্রোচিত সার্থক অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয়ে কিশোরকুমারের কিছুটা প্রভাব উঁকি দেয়। দর্শনের হতভাগ্য ও সর্বদিক দিয়ে বঞ্চিত পিতা রতনলালের চরিত্রটিকে অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন মনমোহন কৃষ্ণ। দর্শনের প্রণয়িনী বর্ষার ভূমিকাকে নৃত্য, গীত এবং সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন সুন্দরী তরুণী নায়িকা ববিতা। এছাড়া অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন জগদীপ, মুকরী, শাম্মী, গায়ত্রী, জনি হুইস্কি, পান্ডারীবাঈ প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে এ-ভি-এম-এর উচ্চমান বজায় রাখবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। সাদাকালো ফোটোগ্রাফীতে ভি. রাজগোপাল প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শিল্পনির্দেশ ও সম্পাদনা সম্পর্কেও সমান কথাই বলা চলে। ছবির সাতখানি গানই সুরসমৃদ্ধ ও সুগীত। এদের মধ্যে "পাস আকর তো না হাম শরমাইয়ে", "দিল এ দিল, তেরী মঞ্জিল", "সিনে মে মহব্বত কা পহলা অরমান তুমহারী দৌলত হৈ" এবং "য়া মালিক দিলওয়া দে ইক লড়কী ভোলী ভালী" গান চারখানির জনপ্রিয়তালাভের প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

এ-ভি-এম-এর নবতম নিবেদন "লাডলা" হাসিকান্নায় ভরা একটি জনপ্রিয় গার্হস্থ্য চিত্র। —নান্দীকর

কলকাতা

ফিল্ম ক্র্যাফট-র দ্বিতীয় প্রয়াস 'পঞ্চশর'

ফিল্ম ক্র্যাফট-এর প্রথম ছবি, 'বনারসী' পরিচালনা করার পর পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'পঞ্চশর'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু করেছেন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। সুবোধ ঘোষ রচিত 'আবিষ্কার' অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য বিধৃত। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন রুমা গুহঠাকুরতা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, রবি ঘোষ, জহর রায়, সীতা মুখোপাধ্যায় ও ব্রতীন ঠাকুর।

ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বি, কে, প্রোডাকসন্সের 'নায়িকা সংবাদ'

রাধা ফিল্মস স্টুডিওর অঙ্গনে পরিচালকগোষ্ঠী বি কে প্রোডাকসন্সের 'নায়িকা সংবাদ' ছবিটির নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ সুসম্পন্ন করছেন। প্রশান্ত দেব রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, সার্বন্দর, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্তা ও জহর রায়। সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রাঞ্জলী ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

রাজেন তরফদার পরিচালিত 'আকাশ-ছোঁয়া'

অভিনেতা দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত সার্কাস পটভূমিকায় রচিত 'আকাশ-ছোঁয়া' চিত্রটি পরিচালনা করছেন রাজেন তরফদার। মহাশ্বেতা দেবী লিখিত এ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ন বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সোমেন চক্রবর্তী, অরুণ রায়, পারিজাত বসু ও

পাড়ি চিত্রে ধর্মেন্দ্র, দিলীপকুমার, বিদ্যা রাও, প্রণতি ভট্টাচার্য, অজিত ভট্টাচার্য

শিখা ভট্টাচার্য। এছাড়া পাঞ্জাব সার্কাসের শিল্পীবৃন্দ এ ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন। কলাকুশলী বিভাগে রয়েছেন আলোকচিত্র-গ্রহণে দীনেন গুপ্ত, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত, শিল্পনির্দেশনায় রবি চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীত পরিচালনায় সুধীন দাশগুপ্ত।

চলচ্চিত্রে 'দিবারাত্রির কাব্য'

নবগঠিত চিত্রসংস্থা 'নাবিক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' অবলম্বনে তাঁদের প্রথম চিত্রনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। গত ১৯শে জুলাই নিউ থিয়েটার্স দু' নম্বর স্টুডিওতে এই চিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠান চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চিত্র-সাংবাদিকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হল। মহরৎ অনুষ্ঠানের পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করেন যথাক্রমে পাহাড়ী সান্যাল ও বিভূতি লাহা। ক্ল্যাপস্টিক দেন স্বর্গত লেখকের সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা বন্দ্যো-বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চিত্রের অন্যতম প্রধান শিল্পী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে নিয়ে মহরৎ শট গৃহীত হয়। অন্যান্য শিল্পী হলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, অঞ্জনা ভৌমিক, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমকুমার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উপন্যাস ও একটি অপ্রকাশিত স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী। ছবির কলা-কুশলীদের মধ্যে রয়েছেন চিত্রগ্রহণে কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সম্পাদনায় সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশনায় রবীন ঠাকুর, সঙ্গীত পরিচালনায় প্রশান্ত সরকার এবং সাহিত্য-বিষয়ক পরামর্শে যুগান্তর চক্রবর্তী।

বোম্বাই

'নীলকমল' চিত্রের নায়িকা ওয়াহিদা

পরিচালক রাম মহেশ্বরী তাঁর রঙিন ছবি 'নীলকমল'র নায়িকা চরিত্রে মনোনীত করেছেন ওয়াহিদা রেহমানকে। নায়ক-চরিত্রে রয়েছেন মনোজকুমার। প্রধান দুটি পার্শ্বচরিত্রে রূপদান করছেন রাজকুমার ও বলরাজ সাহনী। পান্নালাল মহেশ্বরী প্রযোজিত এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ফণী মজুমদার। রবি ছবিটির সঙ্গীত পরি-চালক।

'অফসানা' চিত্রে অশোককুমার

দীর্ঘ পাঁচ মাস অসুস্থ থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে অশোককুমার পুনরায় চলচ্চিত্রাভিনয়ে যোগ দিয়েছেন। সম্প্রতি রঞ্জিত স্টুডিওয় মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'অফসানা' চিত্রের শেষ অংশের অভিনয় করলেন অশোককুমার। দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ছবিটি পরিচালনা করেছেন ব্রীজ।

জি পি সিপ্পির নতুন ছবি 'রজ'

প্রযোজক জি পি সিপ্পির নতুন ছবি 'রজ'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে কারদার স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেশ খান্না, ববিতা, আই এস জোহর ও সাপ্রু। রবীন্দ্র দেব পরিচালিত ছবিটির [illegible]

সলিল সেন পরিচালিত **অজানা শপথ** চিত্রে মাধবী মুখার্জি ও নবাগত সোমেন চক্রবর্তী।
ফটো : অমৃত

স্টুডিও থেকে বলছি

জীবনের সূচীপত্রে প্রতিটি মানুষের এক-একটি কথা-মুখ কে যেন আগে থেকেই রচনা করে যায়। নির্দিষ্ট জীবনের গতি-পথকে ডিঙিয়ে যাওয়ার অধিকার আমাদের নেই। কান্না-হাসির দোল-দোলানোর মাঝে মানব-জীবনের এ দর্শন চিরসত্য। ভাগ্যপটে লেখা জীবনের ধারাকে মেনে নিয়ে চলতে হবে। থামতে হবে। ভাগ্য যতটুকু পথ ততটুকুই।

জীবনের আরম্ভে বর্তমানের আমি পথ চলতে চলতে কত স্বপ্ন দেখি। কত শপথ নিয়ে ঘুরি-ফিরি। কিন্তু চলার পথে সব পাওয়ার আশা তো পূর্ণ হয় না। যার যতটুকু প্রাপ্য সে ততটুকুই পাবে। অজানা শপথের কোন মূল্য নেই। স্বাধিকার নেই। আমরা তো শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

তাহলে একটা গল্প বলি শুনুন। তিন-বন্ধুর কাহিনী। সত্য, শংকর আর মণি-মোহন। তিনবন্ধু একাত্মা বলতে পারেন। একই হৃদয়। একই শপথ। চলার পথে এরা বিচ্ছিন্ন হবে না। ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবার সময় সত্য, শংকর এবং মণিমোহন লটারী করে। ভাগ্য এদের পথ বলে দেয়। সত্য ব্যারিস্টার, শংকর ইঞ্জিনীয়ার আর মণিমোহন ডাক্তার।

প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনা চলে। সত্য, শংকর এবং মণিমোহন ভবিষ্যতের পথে শপথ নিয়ে এগিয়ে চলে। সত্যর পাশের বাড়ীতেই চন্দ্রনাথবাবু থাকেন। অবসর [illegible] তাঁর। একমাত্র মেয়ে শ্রীমতীর বিয়েটা দিতে পারলেই তিনি শেষ কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পান। মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য চন্দ্রনাথবাবুকে প্রায়ই শ্রীমতীর মা জোর করেন।

অথচ সত্য আর শ্রীমতী কবে যে নিজেদের মধ্যে ভালবাসার জগৎ রচনা করেছে তার খবর কেউ জানে না। সত্য ইচ্ছে করেই এই ভালবাসার কথা বন্ধুদের কাছে গোপন রেখেছে। যদি প্রেম ব্যথা যায়, সেই ভয়ে সত্য-শ্রীমতী চুপিসারে চলে। পাশাপাশি জানলায় দুটি ভালবাসার হৃদয় কখন যেন এক হয়ে গেছে। এরা শপথ নিয়েছে ভবিষ্যতে ঘর বাঁধবে।

দেখতে দেখতে তিন বন্ধুর পরীক্ষা-পাশের খবর বেরিয়ে যায়। সত্য, শংকর আর মণিমোহন সফল হয়েছে। জীবিকার পথে একজন ব্যারিস্টার, একজন ইঞ্জিনীয়ার আর একজন ডাক্তার। সত্যর বাবা-মা তিন-জনকেই পুত্র-স্নেহে আশীর্বাদ করেন। শ্রীমতী চুপিচুপি প্রিয়তমর সফলতা কামনা করে নতুন নামে ডাকে—'সোমেন।' সত্য নাম রাখে 'আশা।' সবার অলক্ষ্যে শুধু দেবতাকে সাক্ষী রেখে সেই শুভদিনে দুটি হৃদয়ের মালাবদল হয়ে গেল। এদের পরি-ণয়ের কথা কেউ জানল না।

জীবিকার অন্বেষণে তিন বন্ধু পৃথক হলেও ছুটির অবসরে সত্যর কাছে শংকর আর মণিমোহন ছুটে আসে। তিন বন্ধুর প্রাণের শিহরনে সারা বাড়ী মাঝে মাঝে মুখরিত হয়। এই ভাললাগার মুহূর্তটি আর একজনও অনুভব করে। সে শ্রীমতী।

কিন্তু নিয়তি? সে-কি এদের অজানা

শপথকে সফল হতে দেবে ? সে যে ভয়ঙ্কর ! তার ভাগ্যলিখন তো মিথ্যে হবার নয়। অলক্ষ্যে তার হাসিটুকু বড়ই করুণ। সে যেন বলতে চায়, 'সোমেন-আশা'র মিলন কোনদিন হতে পারে না।

তাইতো ঘটনাটাও হঠাৎ ঘটে গেল।

শ্রীমতী তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। চন্দ্রনাথবাবু মেয়ের এই কলঙ্কের সংকেত পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধে হাতের কাছে বন্দুক পেয়ে তিনি সারাবাড়ী কাঁপিয়ে তুললেন। শ্রীমতী আতঙ্কিত। দিশাহারা চন্দ্রনাথবাবু নিজের ঘরে ছুটে গেলেন। এ বাড়ীর গিন্নী তখন বাপের বাড়ী গেছেন। শ্রীমতী একা। বাড়ী শূন্য।

বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে ভীত সত্য ছুটে এসে দেখে পাশের বাড়ীর সদর দরজায় তালাবন্ধ। কোনরকমে ছাদ ডিঙিয়ে শ্রীমতীর ঘরে এসে সত্য দেখে বন্দুকটা পড়ে আছে। শ্রীমতী অজানা ভয়ে বিহ্বল। একে একে সবকথা জানিয়ে শ্রীমতী এ কলঙ্কের হাতথেকে মুক্তি চাইলো। অপ্রস্তুত সত্য ভেবে পায় না কোনদিকে সে যাবে। কি করে এই কলঙ্কের কথা সবাইকে জানাবে। ভেবে নেয় একমুহূর্ত। তারপর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সত্য বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করে। শ্রীমতী জ্ঞান হারায়।

সত্যর খবর নিতে এসে মণিমোহনও জড়িয়ে পড়ে। সত্য যে এমন কাজ করবে মণিমোহন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচাতে মণিমোহন সেই মুহূর্তে শ্রীমতীকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রতিবেশীদের খবর পেয়ে পুলিশ আসে। শংকরও যথাসময়ে হাজির। তখনও সত্য বেঁচে। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। যখন সত্যর জ্ঞান ফিরে আসে তখন শংকর শয্যার পাশে একা বসে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সত্য নিজের কলঙ্কিত জীবনের সব কথা শংকরকে জানিয়ে গেল। এতবড় ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইলো শংকর। সত্য মারা গেল।

সত্যিকারের ঘটনাটি চেপে যাওয়ায় শংকরের জেল হয়ে যায়। শ্রীমতীকে নিয়ে মণিমোহন আত্মগোপন করে। মণিমোহনের কোন খবর না পেয়ে শংকর অন্য কিছু সন্দেহ করে। সে ভাবে এ ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মণিমোহন।

বহু তীর্থপথে ঘুরে শেষে বিহারের এক অপরিচিত অঞ্চলে এক কারখানার মালিকের বাড়ীতে শ্রীমতী আর মণিমোহন এসে আশ্রয় নেয়। ডাক্তারী জীবিকায় শ্রীমতীর সংসার চালিয়ে নিয়ে যায় মণিমোহন। শ্রীমতীর মেয়ে হয়। সত্যর সন্তান। নাম নিয়তি।

এর মধ্যে অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। নিয়তির বয়স বেড়েছে। শ্রীমতী আর মণিমোহন এখন বৃদ্ধ। শংকরও জেলথেকে ছাড়া পেয়েছে। একদিন নিয়তির শুভ বিবাহের খবর পেয়ে শংকর এসে হাজির হয়।

নিয়তির এই শুভদিনে শুধু সত্য অনুপস্থিত। শংকর আর মণিমোহন কিছুতেই বন্ধুর বিয়োগের ব্যথা ভুলতে পারে না। শ্রীমতী যেন নিয়তির মধ্যে তার 'সোমেন"কে খোঁজে। কিন্তু আশার মৃত্যু ঘটে গেছে বহুদিন।

এ কাহিনীর নাম 'অজানা শপথ।' সলিল সেন রচিত জনপ্রিয় নাটক 'সন্ন্যাসী' অবলম্বনে এটির চিত্রকাহিনী বিধৃত। এ-ছবিটি পরিচালনা করছেন নাট্যকার এবং পরিচালক সলিল সেন। সরকার প্রোডাকসন্সের তরফ থেকে ছবিটির প্রযোজনা ভার গ্রহণ করেছেন। প্রযোজক দিলীপ সরকার। গত সপ্তাহ থেকে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দু' নম্বরে ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন সত্য, শংকর এবং মণিমোহনের ভূমিকায় নবাগত সোমেন চক্রবর্তী, দিলীপ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতীর চরিত্রে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। সত্যর বাবা ও মায়ের ভূমিকায় রূপদান করছেন প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং রেবা দেবী। এছাড়া কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অংশগ্রহণ করছেন পাহাড়ী সান্যাল, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী ও রেণুকা রায়।

কলাকুশলী বিভাগে আলোকচিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে বিমল মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, কার্তিক বসু ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এ ছবিতে পরিচালক শ্রীসেন কয়েকজন নতুন অভিনেতার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করে দেবেন। প্রথম দিনের দৃশ্য গ্রহণের সময় সত্যর ভূমিকায় নবাগত সোমেন চক্রবর্তীর অভিনয় দেখে মনে হয়েছে অভিনয় জীবনের ভবিষ্যৎ বিশেষ সম্ভাবনাময়। নায়কোচিত চেহারা, সুদর্শন শ্রীচক্রবর্তীর অভিনয় আপনাদেরও খুশী করতে পারবে।

মঞ্চাভিনয়

।। 'আনন্দমে'র নাট্যপ্রযোজনা ।।

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থাগুলোর মধ্যে 'আনন্দম্' অন্যতম। এই গোষ্ঠীর অনেক নাটক পূর্বে অভিনীত হয়েছে এবং তা নাট্যানুরাগীর স্বীকৃতিও অর্জন করেছে। সম্প্রতি 'রঙমহলে'র মঞ্চে এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ পরিবেশন করেছে 'রূপোর বাক্স' নাটক। নাটকটি বিশ্ব-বিখ্যাত নাট্যকার গল্সওয়ার্দি'র 'সিলভার বক্স' অবলম্বনে রচিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীদীপক রায় নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেছেন।

সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নৈপুণ্যের নজীর রেখেছেন সতীপ্রসাদ গুহ। তাঁর অভিনয়ের সাবলীলতা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। সমীর ঘোষ ও দীপক রায়ের অভিনয়ও সুন্দর। রবিন দাস, শক্তি ঘোষ, বিলীন দাস, অসিত নন্দীর অভিনয়ে কিছু সম্ভাবনা প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় খুব মর্মস্পর্শী হয়নি।

।। দীপালি সংঘের নাটক ।।

সম্প্রতি 'দীপালি সংঘে'র শিল্পীবৃন্দ শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নাটক মঞ্চস্থ করেছে রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম রঙ্গমঞ্চে। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন জ্যোতি সর্বাধিকারী, প্রভাতরঞ্জন ঘোষ, শ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবাকর ভট্টাচার্য, দীপালি ঘোষ, মঞ্জুশ্রী রায়-চৌধুরী, বীণা সেন। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

'কাঠের পুতুল' অভিনয়

গত ৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র নিবাস মঞ্চে তরুণ যুবক সংঘের শিল্পী-বৃন্দ সাফল্যের সংঙ্গে মঞ্চস্থ করেন শচীন ভট্টাচার্যের নতুন নাটক 'কাঠের পুতুল'।

নাটকটির দলগত অভিনয় অনবদ্য। অভিনয়ে বিশেষ করে যাদের নাম করতে হয় তারা হলেন সনৎ মিত্র (বিকাশ), রঞ্জিৎ ঘোষ (তপন), অনিত চক্রবর্তী, (বিভূতি), তপন রায় (লাটটু), মলি মুখার্জি (তমা), সবিতা সমাদ্দার (কৃষ্ণা), নমিতা ঘোষ (স্মরিতা), এবং শ্রীমন্ত দত্ত (প্রিয়ব্রত)।

দৃষ্টিকোণ

'দৃষ্টিকোণ' দক্ষিণ কলকাতার একটি নতুন নাট্যসংস্থা। সম্প্রতি এই সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে একটি নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে সংস্থা-সভ্য শ্রীবরুণ গাঙ্গুলীর 'কুয়াশা' ও শ্রীশৈলেন গুহ নিয়োগীর 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' অভিনীত হয়।

'কুয়াশা' নাটকের মধ্যে ঘটনা ও নাট্যরসসৃষ্টিতে কোন নতুনত্ব চোখে পড়েনি। অতিপুরাতন প্লটের পুনরাবৃত্তি হয়েছে এখানে, কিন্তু এতে যদি নাট্যোপযোগী সংলাপ থাকতো, তাহলে নাটকটি গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হোতে পারতো। কিন্তু সেদিক দিয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি অর্জন করতে পারেনি। নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও যথেষ্ট দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি শিল্পীরই চরিত্র রূপায়ণের জন্য আরো অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। আবহসংগীত ও আলোকসম্পাত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' নাটকের লঘু চপলতা মোটামুটি অভিনয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

'যাযাবরে'র নাট্যাভিনয়

'যাযাবরে'র তরুণ শিল্পীরা সম্প্রতি মিনার্ভা রংগমঞ্চে সলিল সেনের 'স্বীকৃতি' মঞ্চস্থ করেছে। তাঁদের প্রথম নাট্য প্রযোজনা 'লবণাক্ত'র মতোই এই মঞ্চরূপায়ণ মোটা-মুটি সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয় সুন্দর এবং তাই নাটকীয় ঘটনার গতিকে পরিণতির প্রান্তে উন্নীত করেছে। নাট্যনির্দেশক শ্রীঅজয় বসুর নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য।

'কঙ্কাবতীর ঘাট'

কিছুদিন আগে স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের নাট্যশাখার প্রযোজনায় মিনার্ভা থিয়েটারে ৪৩তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

নাটকটি মোটামুটিভাবে পরিচালনা করেন শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, চণ্ডীচরণ দে, হিমাংশু নাগ, কানু বর্ধন, প্রণব রায়, সনৎ ঘোষ, রমেন মুখার্জি, গোবিন্দ মল্লিক, দিলীপ ঘোষ, হারাধন দত্ত, প্রণব ব্যানার্জি, শুভাশীষ ঘোষ, মঞ্জুলা মুখার্জি, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী, গোপা ব্যানার্জি।

'চতুরঙ্গে'র সফল নাট্য-প্রযোজনা

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ক্লান্তি বরণ করে যে রুক্ষ মাটির বুকে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষীর জীবন থেকে মেঘ এখনো দূরে সরে যায়নি। জমিদার গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জোতদার—বড়ো, মেজো, সেজো কেউ যায়নি। এদের কুচক্রান্তের বিষ এখনো চাষীর সরল-জীবনকে জর্জরিত করে তুলছে, ভূমি বণ্টন আইন থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত জমি চাষীদের ভাগ্যে মেলেনি। তাই তাদের চলার পথের 'আবর্ত' ক্রমশ প্রসারিত হোচ্ছে। জমছে সেখানে অনিশ্চয়তার তমিস্রা। জমিতে মালিকানা স্বত্ব না দিলে চাষী বাঁচবে না, জমির অধিকার তাকে সম্পূর্ণ দিতে হবে, নইলে ওদের জীবনের ছন্দ কোনদিন মিলবে না, 'আবর্ত'ও থাকবে অনন্তকাল। সমরেশ বসুর এই জীবননিষ্ঠ ছোটগল্পের নাট্যরূপ সম্প্রতি মিনার্ভায় পরিবেশন করলেন 'চতুরঙ্গে'র বলিষ্ঠ শিল্পিবৃন্দ। 'আবর্ত' ভূমিহীন চাষীর জীবন-নাট্য। সার্থকভাবে নাট্যরূপ দিয়েছেন সন্তোষ দাশগুপ্ত ও বরুণ দাশগুপ্ত।

শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়ে যথেষ্ট বলিষ্ঠতা চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন মিহির চ্যাটার্জি, বরুণ দাশগুপ্ত, সুজন সেনগুপ্ত, অর্ধেন্দু সেনগুপ্ত, সুবিমল মুখার্জি, লতিকা বসু প্রভৃতি। নাট্যনির্দেশনা ও মঞ্চপরিকল্পনায় ছিলেন বরুণ দাশগুপ্ত। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীতে তাপস সেন ও মুরারী ভড় উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের নজীর রাখতে পেরেছেন। পুনরভিনয়ে 'আবর্তে'র অভিনয় আরো সুন্দর হবে আশা করি।

গানের জলসা

ভারতীয় সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

সম্প্রতি বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ভারতীয় সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অনুপস্থিতিতে উৎসবে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র। উৎসবের উদ্বোধন করেন কলকাতা পৌরসভা-নায়ক ডাঃ প্রীতিকুমার রায়চৌধুরী এবং পুরস্কার, অভিজ্ঞান ও উপাধি বিতরণ করেন সরকারী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শিকা শ্রীযুক্তা শান্তি দত্ত। সভাপতি এবং উদ্বোধক উভয়েই তাঁদের ভাষণে সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মক্ষমতার প্রশংসা করেন এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

এই উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শ্রীলোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত রচিত 'অবিস্মরণীয় স্বদেশী যুগ' নামক এক অভিনব অথচ হৃদয়গ্রাহী সংগীত-বিচিত্রা মঞ্চস্থ করেন। ১৮৬০ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯১১ সাল পর্যন্ত দেশের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই সংগীত-বিচিত্রাটি রচিত। ঠিক এ-ধরনের অনুষ্ঠান আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। এটি খুবই সময়োপযোগীও বটে। এতে লর্ড কার্জন ও ক্ষুদিরামের ভূমিকায় চায়না বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায় সুমিত্রা সমাদ্দার, নিবেদিতার ভূমিকায় শান্তা মৈত্র, রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকায় সুস্মিতা রায় এবং আরও কয়েকজনকে সুঅভিনয়ের জন্য দর্শকবৃন্দ রৌপ্যপদক প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। সংগীত-বিচিত্রাটি পরিচালনা করেন শ্রীপ্রভাত ঘোষ। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন শৈলেন দত্তরায়, রত্না সেনগুপ্তা, যূথিকা রায়, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, এনাক্ষী কর্মকার, জয়ন্তী রায়চৌধুরী, অমিতা দাশগুপ্তা ও বনানী ঘটক এবং নেপথ্য একক সংগীতে ছিলেন অরবিন্দ বিশ্বাস।

এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও মহিলাবৃন্দের সঙ্গে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার শ্রীপূর্ণ সেন ও বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বর্গের সমাগম ঘটে।

অডিশন বোর্ডের নতুন সদস্য

খ্যাতিমান সংগীতবিদ এবং বাংলার একমাত্র সংগীত-পত্রিকা 'সুরছন্দা'র সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণীর উত্তর ভারতীয় সংগীত-বিষয়ক কেন্দ্রীয় অডিশন বোর্ডের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সংগীতাচার্য সর্বশ্রী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, ডাঃ বিমল রায় প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীজনের নিকট সুদীর্ঘকাল সংগীত শিক্ষা করে সংগীতের ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক—উভয় পক্ষেই ইনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁর সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থগুলি সাহিত্য ও সংগীতে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত। পূর্বে তিনি বহুকাল যাবৎ 'সচিত্র ভারত' ও 'হসন্তিকা' সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদনায়

ব্যাপৃত ছিলেন। অতঃপর গত বারো বছর থেকে 'সুরছন্দা' সংগীত-পত্রিকার সম্পাদক এবং কলকাতার অভিজাত মহাবিদ্যালয় 'ভারতীয় সংগীত সমাজ'-এর অধ্যক্ষ, 'গান্ধর্বী'র অধ্যাপক ও ঝাড়গ্রাম 'সংগীতায়ন'-এর পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে পরিপূর্ণভাবে সংগীতসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

উদীচীর শ্রাবণগাথা

সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী সমিতির উদ্যোগে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণগাথা সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। নটরাজের ভূমিকায় নাট্য-পরিচালক রতীশ রায়ের অভিনয় ও গান প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। একক সংগীতে সুশীল মল্লিক, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিংহ, সুনন্দা রায় ও প্রার্থনা মুখোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সমবেত সংগীতগুলিতে যে নতুনত্বের প্রবর্তন হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সুখশ্রাব্য। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শৈলেন ভড়। নৃত্যাংশে—কল্যাণ বক্সী (পরিচালক), দেবযানী মুখোপাধ্যায়, তুলসী রায়, সবিতা বসু, রিন্না বসু রবীন্দ্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। আলোক সম্পাদনায় কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষিত হয়েছে।

'ইন্দিরা' সংগীত-শিক্ষায়তনের অনুষ্ঠান

'ইন্দিরা'-র শিল্পীগোষ্ঠী ২৪ জুলাই দক্ষিণীর মাসিক অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান পরিবেশন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার একটি ধারা সংগীতকে কতখানি পুষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে—এই সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করে তার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন সংগীতরচয়িতার সংগীতগুলি একসঙ্গে শ্রবণ করার সৌভাগ্য না হলে এই পরিচয় সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না। বিদেশী সুর ছাড়াও (কেননা রবীন্দ্র-সংগীতের বিদেশী সুরের আমদানীতেও তাঁর প্রভাবের কথা সর্বজনবিদিত) স্বদেশী রাগ-রাগিণীতে তাঁর কত দখল ছিল এইদিনের অনুষ্ঠান শুনে সে পরিচয়ও পাওয়া গেল।

এই মহান সুরকারের রচিত গানগুলি পরিবেশন করে একদিকে তাঁরা যেমন তাঁদের শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করেছেন, তেমনি শ্রোতাদেরও তৃপ্তি সাধন করেছেন। সম্ভবত এই একমাত্র অনুষ্ঠান যেখানে কেবলমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করা হলো। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুপরিকল্পিত ও সুপরিবেশিত।

এই অনুষ্ঠানে পরজ-বসন্ত, বাহার, সিন্ধু, সাহানা, ভৈরোঁ, পিলু-বারোয়াঁ, ভূপালী, যোগিয়া অনেক রাগের স্পর্শে সঞ্জীবিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত 'লা-মার্সেইয়েজ'-এর বঙ্গানুবাদ ওজস্বিতাপূর্ণ 'আয়রে আয় দেশের সন্তান' 'ইন্দিরা' শিল্পীগোষ্ঠীর সমস্বরকণ্ঠে পরিবেশিত হয়—যা অভিনবত্বে চমৎকার হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে 'বাহারে' রচিত 'হৃদয়ের মম যতনের ধন' ধ্রুব গুপ্তের কণ্ঠে সুগীত হয়েছে। 'হে অন্তরযামী ত্রাহি' 'সিন্ধু'তে রচিত এই গানটি সুপর্ণা চৌধুরী সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। গীতা ঘটকের কণ্ঠে 'যোগিয়া'য় রচিত 'মুরলী কি গুণ জানে' গানটিও উল্লেখযোগ্য। কণ্ঠসঙ্গীতে সুপূর্ণা চৌধুরী, নীতা ঘটক, সুমিত্রা ঠাকুর, সুপর্ণা লাহিড়ী, ধ্রুব গুপ্ত, ললিত মুখোপাধ্যায়, নীতিন বসু ও অমীশ ঘটক অংশগ্রহণ করেন। এই অভিনব সংগীতানুষ্ঠানটি পরিচালনা করে সুভাষ চৌধুরী যথাযোগ্য দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বেতারশ্রুতি

কলকাতার আকাশবাণী অনেক দিন ধরে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছেন। অনুষ্ঠানটির নাম 'এ মাসের গান'। এই অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য যতদূর অনুমান করা যায় তা হচ্ছে জনগণের ভেতর স্বাদেশিক গানের মাধ্যমে দেশপ্রেমের বীজ রোপণ করা। এ ধরনের অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে হয়ত যুক্তির অভাব হবে না। আমার আপত্তি হচ্ছে গানগুলির কথা সম্পর্কে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে স্বাদেশিকতার নামে অনিপুণ, অপরিপক্ক, অপাংক্তেয় গানের হাস্যকর আস্ফালন। ভাবতে অবাক লাগে, জনসাধারণকে একেবারেই অপরিণত মনে করে প্রতি মাসে 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'—এই ধরনের উপদেশ সংবলিত গান আজো কি করে শুনিয়ে যাচ্ছেন একদল সবজান্তা সর্বজ্ঞানী লোক। দেশপ্রেম সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য তাঁদের কতদূর সফল হচ্ছে এ সম্বন্ধে জনসংযোগকারী কোন ব্যক্তি যদি একবার পরীক্ষামূলকভাবে বাড়ী বাড়ী খোঁজ নেন—তাহলে তিনি যা নিশ্চিত জানতে পারবেন সেকথা কাগজে-কলমে লেখা সম্ভব নয়।

'এ মাসের গানের' রচয়িতা শ্রীসরল গুহ। আকাশবাণীর নাট্যবিভাগের একচ্ছত্র অধিকারী দু-তিনজনের ভেতর ইনিও একজন। যদি অবিশ্যি স্বদেশী গানের রচয়িতা আর নাট্যকার—প্রযোজক সরল গুহ একই ব্যক্তি হন। এ'র গান এ মাসে শোনা যাবে। তাঁর গানের আরম্ভের দিকটার কয়েকটি লাইন আপনাদের আগে থেকে জেনে রাখা ভালো।

"দেশ আমাদের বীর সেনানীর
চাঁদ প্রতাপের দেশ রে।
শুনি প্রাণে অগ্নি বীণার,
মাভৈঃ বীণার রেশ রে।।

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের পরও এই ধরনের চিন্তাহীন পদ্য যে গান বলে চালান যেতে পারে তার চাইতে বিরাট ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে?

।। রূপসী বাংলা ।।

আকাশবাণীর পক্ষ থেকে দেশবাসীর প্রতি এই নির্মম উদাসীনতার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে শুনতে পেলাম কয়েকটি কবিতা থেকে আংশিক আবৃত্তি। এতটুকুও অতিরঞ্জিত না করে বলছি, আমি সত্যি চমকে উঠেছিলাম। মন-প্রাণ দিয়ে সে কবিতাগুলি শুনেছি। অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলাম এ কোন নবজাগরণের কবির আবির্ভাব হল! কবিতাগুলি বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের গ্রামকে নিয়ে লেখা। বাংলা মায়ের ঘরোয়া রূপকে নিয়ে এমন করে কবিতা লেখার জুড়ি বোধহয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। অনেক দেশপ্রেমিক কবি বাংলা মাকে নানারূপে-বর্ণে-ছন্দে রূপায়িত করেছেন। তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখেই আমি একথা বলছি যে বাংলা মায়ের অন্তরের ছবি এ কবিতাগুলিতে যতটা মূর্ত হয়ে উঠেছে—তেমনটি খুব কমই আমি দেখতে পেয়েছি।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত যে সে কবিতাগুলির কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করতে পারলাম না। কারণ শোনবার নেশায় আমি এতটা ব্যস্ত হয়েছিলাম যে লিখে নেবার কথা মনেই হয়নি। কবির নাম জীবনানন্দ দাস। সর্বপরিচিত জনপ্রিয় কবি। এর সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথা আমরাই একবার নিবেদন করেছিলাম আকাশবাণীর পক্ষ থেকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু-বার্ষিকী পালন উপলক্ষে। এই অনুষ্ঠানটির জন্যে সেজন্য আকাশবাণীকে ধন্যবাদ জানাই।

বিবিধ সংবাদ

আমেরিকান চলচ্চিত্রের ইতিহাস সংবলিত খণ্ডচিত্র :

যাঁরা গেল ২৬-এ জুলাই, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউ-এস-আই-এস অডিটোরিয়মে উপস্থিত হয়ে "প্রথম যুগের চলচ্চিত্র" নামে প্রতিটি আধঘণ্টা স্থায়ী খণ্ডচিত্র দু'খানি দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ঐ খণ্ডচিত্রের ধারাবিবরণদানকারীর সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করবেন যে, ১৯০৩ থেকে শুরু ক'রে ১৯১৪ সালের মধ্যে নির্বাকচলচ্চিত্র গঠনে কল্পনা, নাটক, কলাকৌশলের অভিনবত্ব ও ক্যামেরা-চাতুরীর দিক দিয়ে যে-সব সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছিল, আজও পর্যন্ত তার থেকে নতুন কিছু করা সম্ভব হয়নি। এমনকি টমাস এডিসন ১৯১৫ সালে ছবিকে কথা পর্যন্ত বলিয়েছিলেন; তবে সেই কথা বলানোর প্রক্রিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে দৃশ্যগুলিকে তিন মিনিট থেকে দীর্ঘতর করা যায়নি। ১৯০৩ সালের সেই ইতিহাসবিখ্যাত খণ্ডচিত্র 'ফার্স্ট ট্রেন রবারি'কে কেউ কেউ প্রথম ওয়েস্টার্ণ চিত্র বলে সম্মানিত করলেও আসলে প্রথম কাউবয় 'ব্রঙ্কো বিলি' নাম ভূষিত হয়ে দর্শক-সম্মুখে উপস্থাপিত হয় জি এম অ্যান্ডারসন-এর দ্বারা। এই যুগে সবচেয়ে বেশী অভিনবত্ব আমদানি করেন 'ক্লোজ আপ'-এর জন্মদাতা পরিচালক-প্রযোজক-চিত্রশিল্পী ডি ডাবলু গ্রিফিথ। তিনি ১৯০৯ সালে প্রথম কার্টুন ছবি তৈরী করেন এবং ১৯১২ সালে কার্টুনের সঙ্গে জীবন্ত নর-

উদয়শংকরের **'প্রকৃতি-আনন্দে'র** রিহার্সাল অবকাশে আলাপরত সোভিয়েট **নৃত্যশিল্পী** বারটনফ এবং উদয়শংকর ও অমলাশংকর

নারীকেও দেখান। বর্তমানে কোনো কোনো ফ্রেমকে ফ্রিজ করা একটা বিশেষ মুহূর্ত' সৃষ্টি করার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রিফিথ ১৯০৫ সালে এই 'ফ্রিজ' প্রথার অবতারণা করেছিলেন। ১৯০২ সালে প্রথম 'রকেট টু দি মুন' ছবি, ১৯০৯ সালে 'রেজারেকশান' (গ্রিফিথ), ১৯১২ সালে 'ক্লিওপেট্রা' (নায়িকা—মেরী পিকফোর্ড), ১৯২০ সালে বেটি ব্লাইট অভিনীত রইডার হ্যাগার্ড-এর 'শী' এবং ১৯১৩ সালে এলমো লিংকন ও মিস্ মার্টি অভিনীত প্রথম টার্জন চিত্র নির্মিত হয়। ১৯০৫ সালের রাশিয়া বিদ্রোহকে অবলম্বন করে প্রথম প্রোপাগান্ডা ফিল্ম নির্মিত হয় ১৯১৭ সালে। ১৯২০ সালে জন ব্যারিমোর অভিনীত প্রথম আতঙ্ক-চিত্র 'ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড' হলিউড চিত্রজগতে একটি নতুন পথ নির্দেশ করে। আজ ছবি সবাক, রঙীন, ৭০ মিঃ মিঃ চওড়া, স্টিরিয়োফোনিক, সিনেমাস্কোপ ও ভিস্টাভিশান সংবলিত। কিন্তু কি গঠন, কি আঙ্গিক বা কি চিত্রোত্তরীর দিক দিয়ে হলিউডের ঐ প্রথম যুগের চিন্তাভাবনাকে অণুমাত্র অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

চারণ শিল্পীগোষ্ঠী

গত রবিবার ২৪ জুলাই '৬৬ বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী হলে চারণ শিল্পীগোষ্ঠী মহাকবি কালিদাস স্মরণে নৃত্যগীতি আলেখ্য পরিবেশন করেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবার কথা ছিল যথাক্রমে নাড়াজোলের মহারাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং শ্রীরামপদ মাঝি। কিন্তু বিশেষ কার্য উপলক্ষ্যে উভয়েই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। উভয়েরই দুটি মনোজ্ঞ ভাষণ সভায় পাঠ করে শোনান সুরকার শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চারণ শিল্পীগোষ্ঠীর এই অনুষ্ঠান সার্থক বলা চলে। প্রকৃতি ও বাক্তিমনের উপর বর্ষার প্রভাব সংগীতে, নৃত্যে ও আবহসঙ্গীতের মাধ্যমে এরা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। আলেখ্য রচনা ও পরিচালনায় শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্যপরিচালনায় শ্রীমতী রাধা ভট্টাচার্যের নৈপুণ্য সর্বাপেক্ষা প্রসংশনীয়। বাউলবেশে শ্রীমতী রাধা ভট্টাচার্যের নৃত্য অপূর্ব। শ্রীমতী ভট্টাচার্য একজন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীরূপে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একক নৃত্যে স্বপ্না দে ও শিবনৃত্যবেশী রত্না সোমের নৃত্য অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসার দাবী রাখে। নৃত্যাংশের অন্যান্য ভূমিকায় কৃষ্ণা রায়, বুলু ভট্টাচার্য, সংঘমিত্রা মুখার্জির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীতিমিরেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দু সিংহের প্রযোজনা অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছিল। আলোক সম্পাত খুবই দুর্বল মনে হল। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।
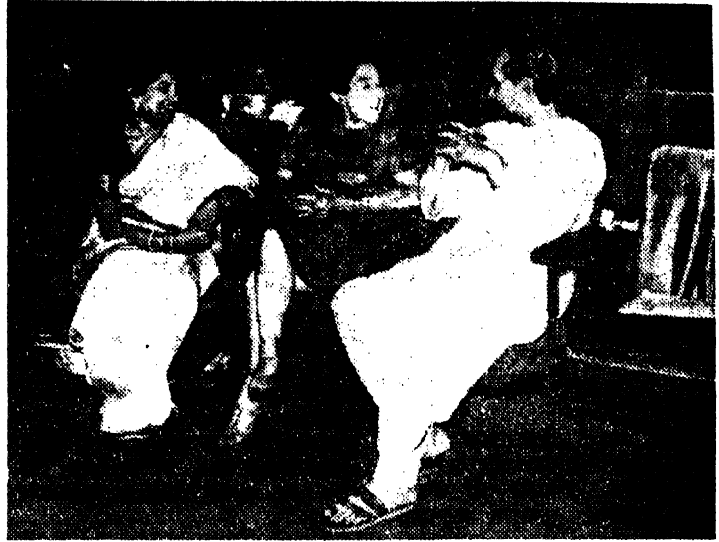
বাউল নৃত্যে শ্রীমতী রাধা ভট্টাচার্য

কলকাতায় বিদেশিনী নৃত্যশিল্পী

ইসরাইলের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যবিশারদ শ্রীমতী ডিবোরা বারটনফ দিল্লী থেকে কেরালা অবধি ঘুরে কলকাতায় এসেছিলেন উদয়শংকরের নৃত্যশিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। উদয়শংকর কালচারাল সেন্টারে যোগ দেওয়ার পর তিনি মন্তব্য করেন, "প্রত্যেক নৃত্যশিক্ষার্থীরই একটা নিজস্ব প্রকাশ বৈশিষ্ট্য থাকবেই। অন্ধভাবে গুরুকে অনুকরণ করাটাই সত্যিকারের শিক্ষা নয়। অমলার শিক্ষাপদ্ধতি দেখে এই সত্যকেই যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম।" তিনি আরও বলেন, "অমলাশঙ্করের শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের শেষদিন অবধি আমার মনে থাকবে।"

মহাজাতি সদনে উদয়শঙ্কর প্রথম 'প্রকৃতি আনন্দ'র রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত তখন এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী বারটনফ বলেন, "আমার সকল স্বপ্ন যখন ভেঙে যেতে বসেছিল, হতাশার অন্তরভরা, ঠিক এমন সময়ে অমলার শিক্ষাপদ্ধতি যেন আলোকশিখা হয়ে দাঁড়াল সামনে।"

'সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা'র উদ্যোগে ফরাসী চিত্রের প্রদর্শনীঃ

ফরাসী কনস্যুলেট জেনারেল ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ-এর সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা 'জ্যাজি ইন দি মেট্রো' এবং জাঁ ককতো পরিচালিত 'বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট' নামে দুখানি ফরাসী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্যাজি নামে একটি বছর দশেকের মেয়ের চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে প্যারিস শহর থেকে যে অপরূপ অভিজ্ঞতা হল, যার ফলে সে বলতে পারল ঃ এই চব্বিশ ঘণ্টায় আমি অনেক বড়ো হয়ে গেছি, তাই প্রধানত হাসির উপাদানে বিচিত্রভাবে চিত্রিত হয়েছে 'জ্যাজি ইন দি মেট্রো'তে। দ্বিতীয় ছবিখানি আমরা দেখতে পারিনি।

সায়েন্স-ফিক্‌শান সিনে ক্লাব-এর উদ্যোগে 'ভয়েজ টু দি বটম্ অব দি সী'ঃ

গেল রবিবার, ৩১-এ জুলাই সকালে সোসাইটি সিনেমায় এস-এফ সিনে ক্লাব-এর উদ্যোগে আরউইন অ্যালেন পরিচালিত আমেরিকান চিত্র 'ভয়েজ টু দি বটম্ অব দি সী' প্রদর্শিত হয়। সাবমেরিণের সাহায্যে সমুদ্রের অতলতলে পৌঁছে তার থেকে বার হয়ে বিপজ্জনকভাবে তথ্য আহরণ করার দৃশ্য সত্যই লোমহর্ষক।

এর নাম কি বিশ্ব ফুটবল!

অজয় বসু

বিশ দিনের আসর গুটিয়ে নেওয়ার আগেই ঘোলা জলের পাঁক ওপরের দিকে ভেসে উঠেছে। এর জন্যেই কি জুলে রিমে কাপ বা বিশ্ব ফুটবলের আয়োজন করা হয়েছে? আশ্চর্য!

জুলে রিমে কাপ বিশ্বের সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতা। শীর্ষ পর্যায়ের খেলোয়াড় ও সংগঠকেরা হলেন এই আয়োজনের নায়কমন্ডলী। কিন্তু তাঁদের ভূমিকাতেই এবারের অনুষ্ঠানের সম্ভ্রম, মর্যাদা, সুনাম, সবকিছুই কি শূন্যে মিলিয়ে যায় নি!

খেলার নামে খেলোয়াড়েরা গা-জোয়ারির কসরৎ দেখালেন। গভীর চক্রান্তের দায়ে সংগঠকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোলো। হাতাহাতি, চুলোচুলি, মতদ্বৈধের জের টেনে ফুটবলের দুনিয়াকে দু ভাগে টুকরো টুকরো করে ফেলার মতলব এখনও ভাঁজা হচ্ছে। কাজেই বিশ্বের প্রধান প্রতিযোগিতার মর্যাদার অবশিষ্ট কিই বা রইলো!

১১ই জুলাই ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে ইংলন্ডেশ্বরী এলিজাবেথ জুলে রিমে কাপের অষ্টম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে আসার আগে ভারপ্রাপ্ত সংগঠক ইংলন্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঢাক পিটিয়ে বলা হয়েছিল যে সাংগঠনিক সাফল্যের জ্বলজ্বলে নজীর গড়ে ইংলন্ড এবার সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দেখে বিস্মিত হওয়া তো দূরে থাক, আমরা রীতিমতো বেদনাবোধ করছি।

লিভারপুলে পর্তুগালের বিরুদ্ধে বিশ্ব ফুটবল কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার প্রথম গোল। গোলরক্ষক পেরেরাকে সম্পূর্ণরূপে অসহায় করে বল জালে ঢুকেছে। এই খেলায় পর্তুগাল ৫—৩ গোলে জয়ী হয়।

একথা সত্যি যে ব্যবস্থাপনার নমুনায় দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডল আজ বীতশ্রদ্ধ। দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডলের প্রতিনিধিরা আজ দুর্নীতি ও অবিচারের প্রতিবাদে সোচ্চার। বিচারের দাবীতে তাঁরা আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের (সংক্ষেপে ফিফা) কাছে আর্জি পেশ করেছেন। এই দাবী যদি বৃটিশ সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউজের নেতৃত্বাধীন ফিফা কানে না তোলেন তাহলে দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডল আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে।

শ্বেত সম্প্রদায় প্রভাবিত ফিফার রীতি-নীতিতে তামাম আফ্রিকা অসন্তুষ্ট। আফ্রিকা জুলে রিমে কাপের অষ্টম অনুষ্ঠান বয়কট করেছে। অতঃপর ক্ষুব্ধ ও আহতচিত্তে দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডল যদি আফ্রিকার সঙ্গে হাত মিলেয় তাহলে ফিফার অবস্থাটা কি হবে? অবস্থাটা সত্যিই সুবিধের নয়। এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে ক্রীড়াগত উৎকর্ষের মূল্যায়নে দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডল ইউরোপের চেয়ে কম নয়। কাজেই পরিস্থিতি যে রীতিমতো ঘোরালো হয়ে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ কি!

দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডলের ক্ষোভ ও উষ্মার প্রধানতম কারণ ইংলন্ডের ম্যানেজার আলফ র‍্যামজের এক অশালীন মন্তব্য। র‍্যামজে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে পরোক্ষে বৃটেনের অন্য প্রতিযোগীদের পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন, ওরা খেলার বিশেষ ধার ধারেন না, জেতার সংকল্পে পাশবিক প্রবৃত্তিকে আঁকড়ে ধরেন।

অন্য প্রতিযোগীদের দলে দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডলের উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা পড়ে যেহেতু জুলে রিমে কাপের প্রাথমিক লীগ ও নক-আউটে উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা ইংলন্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কাজেই র‍্যামজের নোংরা কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়ার অধিকার দক্ষিণ মার্কিণ মন্ডলের আছে। ফুটবল উত্তেজনা জোগায়। বিশ্ব ফুটবল উপলক্ষ্যে সেই উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। অতীতেও উত্তেজনা মাখানো বহু অঘটন ঘটে গিয়েছে জুলে রিমে কাপের আসরে। কিন্তু কোনো এক জাতীয় দলের কর্মকর্তাকে কখনো আলফ র‍্যামজের মতো ভদ্রতার ক্ষীণ খোলসটুকু বিসর্জন দিয়ে এমন নগ্ন মূর্তি ধরতে দেখা যায় নি। র‍্যামজে নিজেই নিজের তুলনা! এক কদর্য কান্ডের নায়ক হিসেবে খেলা-ধূলার ইতিহাসে তিনি চিরদিন কুখ্যাত হয়ে থাকবেন।

ফুটবল বা জুলে রিমে কাপের অষ্টম অনুষ্ঠান সংগঠনে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন বা ফিফার পক্ষ থেকে নানান কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। এমনি একটি কমিটির নাম শৃংখলা নিয়ামক কমিটি। বিভিন্ন প্রতিযোগী দলের সদস্যদের শৃংখলা বজায় রাখায় বাধ্য করাই হলো এই কমিটির কাজ। শৃংখলা যেমন মাঠেও তেমনি মাঠের বাইরেও বজায় থাকা চাই।

খেলার মাঠে যে খেলোয়াড় শৃংখলা বজায় রাখতে চান নি শৃংখলা নিয়ামক

কমিটি তাঁকেই শাস্তি দিয়েছেন। যে কর্মকর্তা মাঠের ধারে শৃঙ্খলা ভেঙ্গেছেন যথা আর্জেন্টিনার ম্যানেজার তাঁকেও এই কমিটি শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু মাঠের বাইরে হলেও প্রকাশ্যে এবং দুনিয়ার মানুষকে শুনিয়ে ইংলন্ডের ম্যানেজার আলফ র‍্যামজে যখন অপমানকর উক্তি ছুঁড়লেন ইংলন্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির উদ্দেশ্যে তখন ফিফার শৃঙ্খলা নিয়ামক কমিটি শুধু মিনমিনে শাসানি শুনিয়ে আলফ র‍্যামজের ব্যাপারটা ইংলন্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের বিচার বিবেচনার জন্যে পাঠিয়ে দায় খালাসের অপপ্রয়াস পেলেন।

এই কি সুবিচারের নমুনা? না কুবিচারের?

আর্জেন্টিনার ম্যানেজার রুক্ষ মেজাজ দেখিয়ে শৃঙ্খলা ভেঙ্গেছিলেন বলে ফিফার শৃঙ্খলা নিয়ামক কমিটি স্বহস্তে তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আরও জঘন্য অপরাধে অপরাধী ইংলন্ডের ম্যানেজারের বেলায় ওই কমিটি পাশ কাটিয়ে গেলেন। একজনের বেলায় নিয়মের ফাঁস, অন্যের বেলায় অনিয়মের আলগা ব্যবস্থা দেখে আর্জেন্টিনা এবং দক্ষিণ মার্কিণ মণ্ডলের প্রতিনিধিরা যদি ক্ষেপেই গিয়ে থাকেন তাহলেও কি তাঁদের দোষ দেওয়া চলে? চলে না। অন্ততঃ এ ব্যাপারে তাঁরা দোষী নন। বরং বলতে পারা যায় যায় যে তাঁরা বিচারপ্রার্থী। আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত।

যে ব্যক্তি নৈতিক অপরাধে অপরাধী তাকে দক্ষিণ মার্কিণ মণ্ডলের প্রতিনিধিরা ন্যায় ও সত্যের খাতিরে কাঠগড়ায় চড়াতে চাইছেন। যে আন্তর্জাতিক সংস্থা বিচারের প্রহসনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন সেই সংস্থার মেকী মুখোশটি খুলে দিতেই তাঁদের উদ্যম। জুলে রিমে কাপের এবারের অনুষ্ঠান সংগঠনে ফিফা ও ইংলন্ডের এফ-এর নানান বদনাম হয়েছে। কিন্তু আলফ র‍্যামজেকে শাস্তি দিতে তাঁরা যে টালবাহানার প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাতেই সবচেয়ে নোংরা কলঙ্ক তাঁদের মুখ পড়েছে। দীর্ঘসূত্রতার জের টেনে দূর ভবিষ্যতে যদি র‍্যামজেকে শাস্তিও দেওয়া হয় তাহলেও দক্ষিণ মার্কিণ মণ্ডলে ক্ষত স্থানে মহৌষধের প্রলেপ পড়বে কিনা সন্দেহ।

যে সব রেফারীর ওপর এবারের জুলে রিমে কাপের খেলা পরিচালনার ভার পড়েছিল তাঁদের কারুর কারুর, বিশেষ করে বৃটিশ ও জার্মান রেফারীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। মূল অভিযোগ, ইংলন্ড ও জার্মানী যাতে ফাইনালে উঠতে পারে এবং অন্যেরা যাতে আগেভাগে ছাঁটাই হয়ে যায় তার জন্যে ওরা ষড়যন্ত্র করেছেন। এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড়গলা আর্জেন্টিনারই।

এই অভিযোগের সত্য মিথ্যে দূর থেকে যাচাই করা কঠিন। কঠিন কেন, অসম্ভব! কারণ, মানসিক গঠন বিন্যাসে যাঁরা প্রকৃত খেলোয়াড় নন তাঁদের পক্ষে হেরে যাওয়ার পর রেফারীর মুণ্ডপাত করা বিচিত্র নয়। হারলেই রেফারীকে দুষতে হবে, ফুটবল দুনিয়ার সমস্ত অ-খেলোয়াড়ই নিষ্ঠাভরে এই রীতি অনুসরণ করছেন। কথাটার সমর্থনের নজীর খুঁজতে আমাদের ইংলন্ড পর্যন্ত দৌড়তে হবে না। কলকাতার গড়ের মাঠে নজর ফেরালেই অ-খেলোয়াড়দের রীতি-নীতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে। গড়ের মাঠে ইঁট পড়ে এবং ফুটবল রেফারীদের বাপান্ত করা হয় তখনই যখন একদলের হারের সম্ভাবনা ও আশঙ্কা বড় হয়ে দেখা দেয়। কাজেই রেফারীং সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ নতুন কোনো কথা নয়। অভিনব ঘটনাও নয়। এবং সত্যিকারের স্পোর্টসমেন বলতে আমরা যাঁদের বুঝি আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা যে সেই গোষ্ঠীভুক্ত এমন সুনামের মূলধনও তাঁদের কোনোদিন ছিলনা, বা আজও নেই।

তার ওপর হেরে গিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছাঁটাই হওয়ার পরই আর্জেন্টিনা রেফারীদের সম্বন্ধে জেহাদ সুরু করে দিয়েছে এবং হারা-পার্টিদেরই সঙ্গে নিয়ে দল ভারীর চেষ্টা করছে। প্রতিযোগিতা থেকে ছাঁটাই না হওয়া পর্যন্ত আর্জেন্টিনা রেফারীদের সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনে নি। হারলেই রেফারীদের মুণ্ডপাত করতে হবে, এ কেমন ধরণের রীতি?

কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নের মতো খেলে পর্তুগাল যেদিন সেমি-ফাইনালে ইংলন্ডের কাছে হারলো সেদিন অনেকে বিস্মিত হলেন। অনেকে অধীর হলেন সমবেদনায়। ইউসেবিওর কান্না বুঝি সেদিন আরও অনেকের নেপথ্য অশ্রুজলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল! কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ইংলন্ডের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলায় পর্তুগালের আরও দুটি পেনাল্টি কিক্ প্রাপ্য ছিল, ইতালীয় রেফারী পর্তুগালকে পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু কই? তা নিয়ে তো পর্তুগাল আর্জেন্টিনার মতো ঘোট পাকায় নি? আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার পরও পর্তুগালের কেউই রেফারীর সঙ্গে তর্ক করতে এগোন নি।

সেমিফাইনালে জার্মানী - রাশিয়ার খেলায় রেফারী রুশ উইং ফরোয়ার্ড চিসলেঙ্কোকে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর সতীর্থরা রুষ্ট হন নি। এবং এক রুশ খেলোয়াড় (অধিনায়ক মেবোজভ) প্রকাশ্যে বলেছেন, চিসলেঙ্কো লাথি চালাবার পুরস্কারই পেয়েছেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য ভূমিকার হদিশ পেতে আজ আমাদের অসুবিধে হয় না। আক্রেরথটকে মাঠ থেকে বার করে দিতেই আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়, ম্যানেজার সবাই মারমুখী হয়ে ছুটেছিলেন রেফারীর উদ্দেশ্যে। আর এক খেলায় অধিনায়ক রাত্তিনকে রেফারী অনুরূপ শাস্তি দেওয়ায় চড়া মেজাজের আস্ফালনে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা মাঠের মধ্যে এমন নাটুকেপনা সুরু করে দেন যে পুলিশ ডাকার আগে খেলা পুনরারম্ভ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে র‍্যামজের অসভ্যতার দাওয়াই বাৎলাতে আর্জেন্টিনা সঠিক পথে পা ফেললেও রেফারীং সম্বন্ধে তাঁরা যা করেছেন তা সমর্থনীয় নয়। যাঁরা নিজেরা আইন, আদর্শ ভাঙ্গাতে ওস্তাদ তাঁরাই বরং অন্যপক্ষের দোষ ধরার আগে নিজেদের বিবেকের দর্পনের সামনে দাঁড় করান। তাহলেই অনেক ঝামেলা মিটে যাবে।

তবে এতো কথা বলার মানে এ নয় যে জুলে রিমে কাপের খেলা পরিচালনায়ও অনুষ্ঠান সংগঠনে সব রেফারী ও তত্ত্বাবধায়ক কমিটি সর্বদাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন।

কথা যখন রটেছে তখন তার মধ্যে সত্যের ছিটেফোটা থেকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এবং সেকথা আর্জেন্টিনা বা যে দলের এক খেলোয়াড় খেলা ভাঙ্গার পর রেফারীকে লাথি কষিয়েছিলেন সেই বেয়াড়া, বেয়াদপ উরুগুয়ে দলেরও নয়। সে কথা ব্রেজিলের, ফ্রান্সের এবং আরও কয়েকটি দেশের যথা সুইস পত্রিকা 'ডার স্পোর্ট", রোমের 'ডেলো স্পোর্টের', ইংলন্ডের ডেইলি এক্সপ্রেসের সুস্থ সমালোচনা দিয়ে।

ব্রেজিলের পেলে বলেছেন যে খেলার নামে যদি গা-জোয়ারি ফলানো হয় তাহলে মাঠে রেফারীর অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রান্সের এক প্রতিনিধি কোনো কোনো রেফারী সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এবং অনেকেই পর্তুগাল-ইংলন্ডের সেমিফাইনাল খেলাটিকে লিভারপুল থেকে ওয়েম্বলীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের গন্ধ টের পেয়েছেন। তাছাড়া ইংলণ্ড ও জার্মানীর কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা দুটি পরিচালনার ভার বেছে বেছে জার্মান ও বৃটিশ রেফারীর ওপরই বা পড়লো কেন? এ সন্দেহ কি যাবার!

যুক্তি আছে বলেই এইসব অভিযোগে অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। এবং সেই অর্থ যাদের মনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত তারা কেউই ফিফা বা তদারকী সংস্থা ইংলন্ডের এফ এ-কে সন্দেহের হাত থেকে রেহাই দিতে চাইবেন না। আমিও চাইছি না। আশ্চর্য এই যে জুলে রিমে কাপের মতো মহত্তম প্রতিযোগিতা সংগঠনেও ফিফা বা এফ এ, কেউই সুনাম অর্জনে নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পারলেন না। নামের যেটুকু সংগতি ছিল তা যেন ধুলিসাৎ করে দিলেন একদল বে-হিসেবী কর্মকর্তা। ওঁরা জুলে রিমে কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। ওঁদের হাতে বিশ্ব ফুটবলের ভবিষ্যত এবং খেলাধুলার মহান আদর্শও নিরাপদ নয়।

এই যদি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠনের আদর্শ নমুনা হয় তাহলে আর আশা কোথায়? কবে এই অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে? অসন্তোষ ও নৈরাশ্যের অন্ধকার ছিঁড়ে কোন্ লগ্নে আশা ও আশ্বাসের আলো উঠবে ফুটে?

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব ফুটবল কাপ

লণ্ডনের বিশ্ববিশ্রুত ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে আয়োজিত অষ্টম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইংল্যাণ্ড ৪—২ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে জয়লাভের পুরস্কার জুলে রিমে কাপ জয়ী হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা এবং প্রথম জুলে রিমে কাপ জয়। অপরদিকে পশ্চিম জার্মানীর দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলা। পশ্চিম জার্মানী ১৯৫৪ সালের ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—২ গোলে শক্তিশালী হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে জুলে রিমে কাপ জয়ী হয়েছিল। আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলার নির্দিষ্ট ৯০ মিনিট সময়ের মধ্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। দুই দলই দুটি করে গোল দিয়েছিল। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড আরও দুটো গোল দিয়ে ৪—২ গোলে জয়ী হয়। ইংল্যাণ্ডের এই জয়লাভের মূলে ছিলেন দলের লেফট ইন জিওফ হার্স্ট। ইংল্যাণ্ডের চারটি গোলের মধ্যে হার্স্ট একাই তিনটি গোল দিয়ে দলকে জয়যুক্ত করেছিলেন। ১৯৩৪ সালের পর বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথমবার ফাইনাল খেলার অতিরিক্ত সময়ে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হল। ১৯৩৪ সালের ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ইতালী একটা গোল দিয়ে শেষ পর্যন্ত ২—১ গোলে জয়ী হয়েছিল। আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই নিয়ে উপর্যুপরি চারটি বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে যে দল প্রথম গোল খেয়েছিল তারাই শেষ পর্যন্ত খেলায় জয়ী হল। ইতিপূর্বে পশ্চিম জার্মানী ১৯৫৪ সালে এবং ব্রেজিল ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালের ফাইনালে প্রথম গোল খেয়ে শেষ পর্যন্ত খেলায় জয়ী হয়।

ফাইনাল খেলা

ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামের ফাইনাল খেলায় ৯৭,০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ১০,০০০ হাজার জার্মান দর্শক স্বদেশের পতাকা নিয়ে খেলা দেখতে আসেন। প্রথমার্ধের ১২ মিনিটের মাথায় পশ্চিম জার্মানীর হেলমুট হাল্লার প্রথম গোল দেন (১—০)। কিন্তু জার্মানীর এই অগ্রগমন বেশীক্ষণ স্থায়ী ছিল না। খেলার ১৮ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের জিওফ হার্স্ট মাথা দিয়ে গোলটি শোধ দিলে খেলার ফলাফল তখনকার মত সমান ১—১ দাঁড়ায়। বিরতির সময় খেলার ফলাফল সমান ১—১ ছিল। প্রথমার্ধের খেলায় দুই দলই আরও গোল দেওয়ার সুযোগ হাত-ছাড়া করে।

খেলার ৭৮ মিনিটের মাথায় ইংল্যাণ্ডের পিটার্স দলের ২য় গোল দিলে ইংল্যাণ্ড ২—১ গোলে অগ্রগামী হয়। এই গোল দেওয়ার পর ইংল্যাণ্ড দ্বিগুণ উৎসাহে পশ্চিম জার্মানীকে চেপে ধরে। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ সেকেণ্ড আগে জার্মানীর ওয়েবার অপ্রত্যাশিতভাবে দলের ২য় গোল দিলে খেলার ফলাফল সমান (২—২) দাঁড়ায়।

অতিরিক্ত সময়ের ১১ মিনিটের মাথায় ইংল্যাণ্ডের হার্স্ট বিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে যে বল মারেন তা বারের নীচের অংশে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। রেফারী নিজের থেকে কোন সিদ্ধান্ত নেননি। রাশিয়ান লাইন্সম্যানের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত তিনি গোলের যে নির্দেশ দেন তা জার্মান খেলোয়াড়রা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। খেলা ভাঙার শেষ মুহূর্তে হার্স্ট দলের চতুর্থ গোলটি দেন।

ফাইনালে ইংল্যাণ্ড দলের খেলার পদ্ধতি ছিল ৪—৩—৩। অর্থাৎ রক্ষণভাগে

৪ জন, মধ্যভাগে ৩ জন এবং আক্রমণভাগে ৩ জন খেলোয়াড়। খেলার গতির সংগে তাল রেখে মধ্যভাগের ৩ জন খেলোয়াড় আত্মরক্ষার ভূমিকা ত্যাগ করে আক্রমণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। অপরদিকে জার্মানীর খেলার পদ্ধতি ছিল ৪—২—৪। ১৯৫৮ সালে ব্রেজিলই এই ৪—২—৪ পদ্ধতিতে খেলে বিশ্ব ফুটবল প্রতি-যোগিতায় জুল রিমে কাপ জয়ী হয়েছিল। সেই থেকে ব্রেজিলের এই সার্থক ৪—২—৪ ক্রীড়াপদ্ধতি অল্প সময়ে পৃথিবীর ফুটবল মহলে খুবই জনপ্রিয় হয়। সদ্য সমাপ্ত অষ্টম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশগুলিও এই ৪—২—৪ পদ্ধতিকে তাদের খেলার ভিত হিসাবে কাজে লাগিয়েছিল।

কাপ জয়ের পথে ইংল্যান্ড

শেষ লীগ পর্যায়ের খেলা :

ড্র (১) : উরুগুয়ের সঙ্গে ০—০ গোলে

জয় (২) : মেক্সিকোর বিপক্ষে ২—০ গোলে এবং ফ্রান্সের বিপক্ষে ২—০ গোলে

নক্-আউট পর্যায়ের খেলা :

কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ১—০ গোলে, সেমি-ফাইনালে পর্তুগালের বিপক্ষে ২—১ গোলে এবং ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে ৪—২ গোলে জয়।

সেমি-ফাইনাল

পশ্চিম জার্মানী ২ : রাশিয়া ১

প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় পশ্চিম জার্মানী ২-১ গোলে রাশিয়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রথমার্ধের ৪২ মিনিটে হালার এবং দ্বিতীয়ার্ধের ১৯ মিনিটে বেকেনবয়ার পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে গোল দেন। খুব বেশী গায়ের জোরে খেলার দরুন দর্শকসাধারণ বিজয়ী জার্মানীর উদ্দেশ্যে ধিক্কারধ্বনি দিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। খেলায় রাশিয়াকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। পায়ের আঘাতের ফলে ইওসিক সাবো প্রায় সারাক্ষণ খুঁড়িয়ে খেলেছিলেন। খেলার ৪৪ মিনিটে বে-আইনী খেলার দরুন রেফারীর নির্দেশে রাশিয়ার রাইট উইং ইগর চিসলেঙ্কো মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিজয়ী জার্মান দলের খেলা ক্রীড়া-নৈপুণ্যের দিক থেকে দর্শকমনে কোনরকম রেখাপাত করতে পারেনি। এমনকি রাশিয়া যে সময়ে নয় জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলেছিল তখনও জার্মানী রাশিয়াকে কোনঠাসা করতে পারেনি।

ইংল্যান্ড ২ : পর্তুগাল ১

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ড ২-১ গোলে পর্তুগালকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। খেলার ৩১ এবং ৮০ মিনিটের মাথায় ববি চার্লটন ইংল্যান্ডের

জিওফ হার্স্ট (ইংল্যান্ড)

পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় গোল দেন। দ্বিতীয় গোলের ৩ মিনিট পর বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় ইউসেবিও একটা গোল শোধ করেন (২-১)। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় গোলটি শোধ করার জন্যে পর্তুগাল খেলার শেষ কয়েক মিনিট ইংল্যান্ডকে যে বিক্রমে চেপে ধরেছিল তাতে ইংল্যান্ডের সমর্থকমহলে দারুন আতঙ্ক দেখা দেয়। ইংল্যান্ড প্রায় কোনঠাসা হয়ে পড়ে। খেলা ভাঙার শেষ মুহূর্তে পর্তুগালের মারিয়া কলুনা দূর থেকে যে প্রচন্ড সট করেছিলেন তাতে ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক ব্যাঙ্কস কোনরকমে বারের উপর দিয়ে বলটির দিক পরিবর্তন করে দলকে বিপদ মুক্ত করেন। এবারের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড পর্তুগালের ইউসেবিও দলের পরাজয়ে মাঠের মধ্যেই শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়েন। মূল প্রতিযোগিতায় দলের ১৫টি গোলের মধ্যে তিনি একাই ৮টি গোল দেন। ইউসেবিওর এই ৮টি গোলই এবারের মূল প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সর্বাধিক গোলের রেকর্ড।

উদ্যোক্তা দেশের সাফল্য

যে দেশের মাটিতে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসে সেই উদ্যোক্তা দেশ কয়েকটি বিশেষ সুখ-সুবিধা লাভ করে—যেমন পরিচিত জলবায়ু এবং পরিবেশ। এই সুবিধাগুলি প্রতিযোগিতায় অপর যোগদানকারী দেশগুলির তুলনায় উদ্যোক্তা দেশকে খেলায় প্রাধান্যলাভে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিগত আটটি প্রতি-যোগিতায় এই তিনটি উদ্যোক্তা দেশ স্বদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে জুল রিমে কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে : ১৯৩০ সালে উরুগুয়ে, ১৯৩৪ সালে ইতালী এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড। বাকি পাঁচটি প্রতিযোগিতায় উদ্যোক্তা দেশের পক্ষে জুল রিমে কাপ জয় সম্ভব না হলেও দুটি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা দেশ রানার্স-আপ হয়েছে—১৯৫০ সালে ব্রেজিল এবং ১৯৫৮ সালে সুইডেন।

ইংল্যান্ড বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে ১৯৫০ সালে। বিগত ৫টি বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় (৪র্থ—৮ম) ইংল্যান্ডের খেলার ফলাফল :

১৯৫০ (**স্থান ব্রেজিল**) : প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদানের বছরে ইংল্যান্ড বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম খেলায় চিলিকে ২—০ গোলে পরাজিত করে পরবর্তী খেলায় ইংল্যান্ড ০—১ গোলে আমেরিকা এবং ০—১ গোলে স্পেনের কাছে পরাজিত হয়। ফলে ইংল্যান্ড মূল প্রতি-যোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করতে পারেনি।

১৯৫৪ (**স্থান সুইজারল্যান্ড**) : মূল প্রতি-যোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড ২—৪ গোলে উরুগুয়ের কাছে পরাজিত হয়।
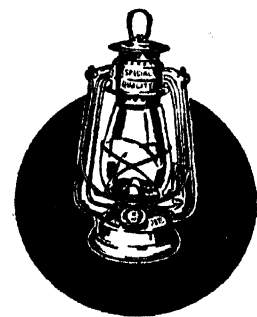
১৯৫৮ (স্থান সুইডেন) : ব্রেজিল এবং রাশিয়ার সঙ্গে খেলা ড্র করে। রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায় ইংল্যান্ড পরাজিত হলে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি।

১৯৬২ (স্থান চিলি) : কোয়ার্টার ফাইনালে ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালের জুলে রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিলের কাছে ১—৩ গোলে ইংল্যান্ড পরাজিত হয়।

১৯৬৬ (স্থান ইংল্যান্ড) : ফাইনালে ইংল্যান্ড ৪—২ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে পাঁচবারের চেষ্টায় জুলে রিমে কাপ জয়ী হয়।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলা

গ্রুপ ১

বেলজিয়াম ১ : ইস্রায়েল ০
বুলগেরিয়া ৪ : ইস্রায়েল ০
বুলগেরিয়া ৩ : বেলজিয়াম ০
বেলজিয়াম ৫ : বুলগেরিয়া ০
ইস্রায়েল ০ : বেলজিয়াম ৫
ইস্রায়েল ১ : বুলগেরিয়া ২

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বেলজিয়াম	৪	৩	০	১	১১	৩	৬
বুলগেরিয়া	৪	৩	০	১	৯	৬	৬
ইস্রায়েল	৪	০	০	৪	১	১২	০

প্লে-অফ : বুলগেরিয়া ২ : বেলজিয়াম ১
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : বুলগেরিয়া

গ্রুপ ২

পঃ জার্মানী ১ : সুইডেন ১
পঃ জার্মানী ৫ : সাইপ্রাস ০
সুইডেন ৩ : সাইপ্রাস ০
সুইডেন ১ : পঃ জার্মানী ২
সাইপ্রাস ০ : সুইডেন ৫
সাইপ্রাস ০ : পঃ জার্মানী ৬

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পঃ জার্মানী	৪	৩	১	০	১৪	২	৭
সুইডেন	৪	২	১	১	১০	৩	৫
সাইপ্রাস	৪	০	০	৪	০	১৯	০

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : পশ্চিম জার্মানী

গ্রুপ ৩

যুগোশ্লাভিয়া ৩ : লুক্সেমবার্গ ১
লুক্সেমবার্গ ০ : ফ্রান্স ২
লুক্সেমবার্গ ০ : নরওয়ে ২
ফ্রান্স ১ : নরওয়ে ০
যুগোশ্লাভিয়া ১ : ফ্রান্স ০
নরওয়ে ৪ : লুক্সেমবার্গ ২
নরওয়ে ৩ : যুগোশ্লাভিয়া ০
লুক্সেমবার্গ ২ : যুগোশ্লাভিয়া ৫
ফ্রান্স ১ : যুগোশ্লাভিয়া ০
যুগোশ্লাভিয়া ১ : নরওয়ে ১
ফ্রান্স ৪ : লুক্সেমবার্গ ১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ফ্রান্স	৬	৫	০	১	৯	২	১০
নরওয়ে	৬	৩	১	২	১০	৫	৭
যুগোশ্লাভিয়া	৬	৩	১	২	১০	৮	৭
লুক্সেমবার্গ	৬	০	০	৬	৬	২০	০

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : ফ্রান্স

গ্রুপ ৪

পর্তুগাল ৫ : তুর্কী ১
তুর্কী ০ : পর্তুগাল ১
চেকোশ্লোভেকিয়া ০ : পর্তুগাল ১
রুমানিয়া ৩ : তুর্কী ০
রুমানিয়া ১ : চেকোশ্লোভেকিয়া ০
পর্তুগাল ২ : রুমানিয়া ১
চেকোশ্লোভেকিয়া ৩ : রুমানিয়া ১
তুর্কী ০ : চেকোশ্লোভেকিয়া ৬
তুর্কী ২ : রুমানিয়া ১
পর্তুগাল ০ : চেকোশ্লোভেকিয়া ০
চেকোশ্লোভেকিয়া ৩ : তুর্কী ১
রুমানিয়া ২ : চেকোশ্লোভেকিয়া ০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পর্তুগাল	৬	৪	১	১	৯	৪	৯
চেকোশ্লোভেকিয়া	৬	৩	১	২	১২	৪	৭
রুমানিয়া	৬	৩	০	৩	৯	৭	৬
তুর্কী	৬	১	০	৫	৪	১৯	২

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : পর্তুগাল

গ্রুপ ৫

নেদারল্যান্ড ২ : অ্যালবেনিয়া ০
নদার্ন আয়ারল্যান্ড ১ : সুইজারল্যান্ড ০
অ্যালবেনিয়া ০ : নেদারল্যান্ড ২
সুইজারল্যান্ড ২ : নদার্ন আয়ারল্যান্ড ১
নদার্ন আয়ারল্যান্ড ২ : নেদারল্যান্ড ১
অ্যালবেনিয়া ০ : সুইজারল্যান্ড ২
নেদারল্যান্ড ০ : নদার্ন আয়ারল্যান্ড ০
সুইজারল্যান্ড ১ : অ্যালবেনিয়া ০
নদার্ন আয়ারল্যান্ড ৪ : অ্যালবেনিয়া ১
নেদারল্যান্ড ০ : সুইজারল্যান্ড ০
সুইজারল্যান্ড ২ : নেদারল্যান্ড ১
অ্যালবেনিয়া ১ : নদার্ন আয়ারল্যান্ড ১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
সুইজারল্যান্ড	৬	৪	১	১	৭	৩	৯
নঃ আয়ারল্যান্ড	৬	৩	২	১	৯	৫	৮
নেদারল্যান্ড	৬	২	২	২	৬	৪	৬
আলবেনিয়া	৬	০	১	৫	২	২	১

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : সুইজারল্যান্ড

গ্রুপ ৬

অস্ট্রিয়া ১ : পূর্ব জার্মানী ১
পূর্ব জার্মানী ১ : হাঙ্গেরী ১
অস্ট্রিয়া ০ : হাঙ্গেরী ১
হাঙ্গেরী ৩ : অস্ট্রিয়া ২
হাঙ্গেরী ৩ : পূর্ব জার্মানী ২
পূর্ব জার্মানী ১ : অস্ট্রিয়া ০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
হাঙ্গেরী	৪	৩	১	০	৮	৫	৭
পূর্ব জার্মানী	৪	১	২	১	৫	৫	৪
অস্ট্রিয়া	৪	০	১	৩	৩	৬	১

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : হাঙ্গেরী

গ্রুপ ৭

ডেনমার্ক ১ : ওয়েলস ০
গ্রীস ৪ : ডেনমার্ক ২
গ্রীস ২ : ওয়েলস ০
ওয়েলস ৪ : গ্রীস ১
রাশিয়া ৩ : গ্রীস ১
রাশিয়া ২ : ওয়েলস ১
রাশিয়া ৬ : ডেনমার্ক ০
গ্রীস ১ : রাশিয়া ৪
ডেনমার্ক ১ : রাশিয়া ৩
ডেনমার্ক ১ : গ্রীস ১
ওয়েলস ২ : রাশিয়া ১
ওয়েলস ৪ : ডেনমার্ক ২

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
রাশিয়া	৬	৫	০	১	১৯	৬	১০
ওয়েলস	৬	৩	০	৩	১১	৯	৬
গ্রীস	৬	২	১	৩	১০	১৪	৫
ডেনমার্ক	৬	১	১	৪	৭	১৮	৩

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : রাশিয়া

গ্রুপ ৮

স্কটল্যান্ড ৩ : ফিনল্যান্ড ১
ইতালী ৬ : ফিনল্যান্ড ১
পোল্যান্ড ০ : ইতালী ০
পোল্যান্ড ১ : স্কটল্যান্ড ১
ফিনল্যান্ড ১ : স্কটল্যান্ড ২
ফিনল্যান্ড ০ : ইতালী ২
ফিনল্যান্ড ২ : পোল্যান্ড ০
স্কটল্যান্ড ১ : পোল্যান্ড ২
পোল্যান্ড ৭ : ফিনল্যান্ড ০
ইতালী ৬ : পোল্যান্ড ১
স্কটল্যান্ড ১ : ইতালী ০
ইতালী ৩ : স্কটল্যান্ড ০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইতালী	৬	৪	১	১	১৭	৩	৯
স্কটল্যান্ড	৬	৩	১	২	৮	৮	৭
পোল্যান্ড	৬	২	২	২	১১	১০	৬
ফিনল্যান্ড	৬	১	০	৫	৫	২০	২

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : ইতালী

গ্রুপ ৯

রিঃ আয়ারল্যান্ড	১	:	স্পেন	৪
রিঃ আয়ারল্যান্ড	১	:	স্পেন	০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
স্পেন	২	১	০	১	৪	২	২
রিঃ আয়ারল্যান্ড—	২	১	০	১	৪	২	২

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : স্পেন

প্লে-অফ : স্পেন ১ : রিপাবলিক আয়ারল্যান্ড ০

গ্রুপ ১১

পেরু	১	:	ভেনিজুয়েলা	০
উরুগুয়ে	৫	:	ভেনিজুয়েলা	০
ভেনিজুয়েলা	১	:	উরুগুয়ে	৩
ভেনিজুয়েলা	৩	:	পেরু	৬
পেরু	০	:	উরুগুয়ে	১
উরুগুয়ে	২	:	পেরু	১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
উরুগুয়ে	৪	৪	০	০	১১	২	৮
পেরু	৪	২	০	২	৮	৬	৪
ভেনিজুয়েলা	৪	০	০	৪	৪	১৫	০

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : উরুগুয়ে

গ্রুপ ১২

কলম্বিয়া	০	:	ইকুয়াডোর	১
ইকুয়াডোর	২	:	কলম্বিয়া	০
চিলি	৭	:	কলম্বিয়া	২
কলম্বিয়া	২	:	চিলি	০
ইকুয়াডোর	২	:	চিলি	২
চিলি	৩	:	ইকুয়াডোর	১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
চিলি	৪	২	১	১	১২	৭	৫
ইকুয়াডোর	৪	২	১	১	৬	৫	৫
কলম্বিয়া	৪	১	০	৩	৪	১০	২

প্লে-অফ : চিলি ২ : ইকুয়াডোর ১

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : চিলি

গ্রুপ ১৩

প্যারাগুয়ে	২	:	বলিভিয়া	০
আর্জেণ্টিনা	৩	:	প্যারাগুয়ে	০
প্যারাগুয়ে	০	:	আর্জেণ্টিনা	০
আর্জেণ্টিনা	৪	:	বলিভিয়া	১
বলিভিয়া	২	:	প্যারাগুয়ে	১
বলিভিয়া	১	:	আর্জেণ্টিনা	২

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
আর্জেণ্টিনা	৪	৩	১	০	৯	২	৭
প্যারাগুয়ে	৪	১	১	২	৩	৫	৩
বলিভিয়া	৪	১	০	৩	৪	৯	২

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : আর্জেণ্টিনা

গ্রুপ ১৫ (ক)

কিউবা	২	:	জামাইকা	১
জামাইকা	১	:	কিউবা	০
কিউবা	১	:	নেঃ অ্যানটিলেস	০
নেঃ অ্যানটিলেস	১	:	কিউবা	০
জামাইকা	২	:	নেঃ অ্যানটিলেস	০
নেঃ অ্যানটিলেস	০	:	জামাইকা	০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
জামাইকা	৪	২	১	১	৪	২	৫
কিউবা	৪	২	০	২	৩	৩	৪
নেঃ অ্যানটিলেস—	৪	১	১	২	১	৩	৩

গ্রুপ ১৫ (খ)

ত্রিনিদাদ	৪	:	সুরিনেম	১
কোষ্টারিকা	১	:	সুরিনেম	০
সুরিনেম	১	:	কোষ্টারিকা	৩
কোষ্টারিকা	৪	:	ত্রিনিদাদ	০
সুরিনেম	৬	:	ত্রিনিদাদ	১
ত্রিনিদাদ	০	:	কোষ্টারিকা	১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
কোষ্টারিকা	৪	৪	০	০	৯	১	৮
সুরিনেম	৪	১	০	৩	৮	৯	২
ত্রিনিদাদ	৪	১	০	৩	৫	১২	২

গ্রুপ ১৫ (গ)

হণ্ডুরাস	০	:	মেক্সিকো	১
মেক্সিকো	৩	:	হণ্ডুরাস	০
মেক্সিকো	২	:	ইউ, এস, এ	০
ইউ, এস, এ	২	:	মেক্সিকো	২
হণ্ডুরাস	০	:	ইউ, এস, এ	১
ইউ, এস, এ	১	:	হণ্ডুরাস	১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মেক্সিকো	৪	৩	১	০	৮	২	৭
ইউ, এস, এ	৪	১	২	১	৪	৫	৪
হণ্ডুরাস	৪	০	১	৩	১	৬	১

গ্রুপ ১৫ : ফাইন্যাল রাউণ্ড

কোষ্টারিকা	০	:	মেক্সিকো	০
জামাইকা	২	:	মেক্সিকো	৩
মেক্সিকো	৮	:	জামাইকা	০
কোষ্টারিকা	৭	:	জামাইকা	০
মেক্সিকো	১	:	কোষ্টারিকা	১
জামাইকা	১	:	কোষ্টারিকা	০

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মেক্সিকো	৪	৩	১	০	১২	২	৭
কোষ্টারিকা	৪	১	২	১	৮	২	৪
জামাইকা	৪	০	১	৩	৩	১১	১

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : মেক্সিকো

গ্রুপ ১৬

নর্থ কোরিয়া	৬	:	অস্ট্রেলিয়া	১
নর্থ কোরিয়া	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	১

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
নর্থ কোরিয়া	২	২	০	০	৯	২	৪
অস্ট্রেলিয়া	২	০	০	২	২	৯	০

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : উত্তর কোরিয়া

১০নং গ্রুপে ছিল প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ ইংল্যান্ড এবং ১৪নং গ্রুপে গতবছরের (১৯৬২) জুলে রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিল। প্রতিযোগিতার নিয়মে এই দুটি দেশকে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে খেলতে হয়নি, সরাসরি শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবার অধিকার পায়।

দ্রষ্টব্য : শেষ লীগ পর্যায়ের এবং কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার ফলাফল গত ১৩শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১০১০)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

আলোচ্য সপ্তাহে (জুলাই ২৫—৩০) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যে ১৬টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ১১টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ৫টি খেলা ড্র।

আলোচ্য সপ্তাহে গত চার বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দুটো ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে—বালী প্রতিভার বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ী হয়ে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে ০-১ গোলে পরাজিত হয়। ফলে মোহনবাগানের উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুযোগ একরকম হাতছাড়া হয়ে গেল। অপরদিকে গত বছরের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ-চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আলোচ্য সপ্তাহে তারা ৫-০ গোলে বাটা স্পোর্টস ক্লাব এবং ১-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। বর্তমানে (৩০শে জুলাই) ইস্টবেঙ্গল ২৫টা খেলায় ৪৬ পয়েন্ট পেয়েছে। অপরদিকে তালিকার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মোহনবাগান ২৪টা খেলায় সংগ্রহ করেছে ৪২ পয়েন্ট।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

বিকেলের রাঙা রোদে সবে ঘুম থেকে উঠেছে চা নিয়ে এল যমুনা।

শোভন বললে, 'বসুন।'

যমুনা বললে, 'কাজ আছে যে।'

'অতিথিকে সম্মান করাও গৃহস্থের কর্তব্য নয় কি?' শোভন বললে।

'আপনার সঙ্গে কথায় পারব না। আপনি লেখক মানুষ।'

'সত্যি, আপনি আমার লেখা পড়েছেন?'

'বাড়িতে পত্রিকা আসে। পড়ি বইকি। এমন বানিয়ে-বানিয়ে লেখেন আপনারা!'

'ভালো লাগে?'

'আমরা মুখ্যু মানুষ অত বুঝিনে।'

শোভন একটু আহত হল কী।

যমুনা হঠাৎ সাহস করে বললে, 'আচ্ছা, মেয়েদের মনের কথা আপনারা কী করে বোঝেন বলুন তো?'

শোভন গর্ববোধ করল। 'কেন?'

'আমরা মেয়েরা, কখনো ওভাবে ভাবতে পারিনে।'

'বোধহয় আপনারা নিজেকে চেনেন না, তাই......'

'হবে।' যমুনা হাসল: 'সত্যি যদি আপনাদের গল্পের মেয়ে হতে পারতাম।'

'গল্পের মেয়ে!'

'নয়তো কী। সত্যি-সত্যি কোনো মেয়ে কী ওরকমভাবে, ওরকম কাজ করে '

শোভন বোকার মতো চুপ করে গেল। যমুনা চলে গেল।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বুদ্ধিমানের মতো ভাবল শোভন: আসলে মেয়েটার গল্প-উপন্যাস পড়ার মেজাজ গড়ে ওঠেনি, রসবোধ দানা বেঁধে ওঠেনি। কিন্তু এত বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও শোভনের সাহিত্যিক অহংকার আহত হয়। এই একফোঁটা মেয়ের কাছে কোথায় যেন হার হচ্ছে তার।

আর-একদিন যমুনার সঙ্গে সাহিত্য-প্রসঙ্গে আলোচনা করবার আগ্রহ রয়ে গেল তার।

সেদিন ভাগীরথীর তীরে আবার কথাটা উঠল।

যমুনা হাসল। 'আপনি আমাকে শুধু-শুধু জেরা করছেন। আমি কিছুই জানিনে।'

শোভন বললে, 'না-জানা থেকেই শুরু হোক।'

যমুনা বললে, 'অপরাধ নেবেন না। আমি যেটুকু ভাবতে পারি তাতে মনে হয় অভিজ্ঞতার বাইরে না-যাওয়াই ভালো।'

'কী রকম?'

'নিজের কথা লেখাই নিরাপদ। তাহলে ঠকতে হয় না, বিষয়টা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।'

'তার মানে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই?'

'নেই বলিনি।' যমুনা হাসল: 'আছে। লেখেন না।'

শোভন রাগ করে কিছু জবাব দিল না।

'দেখলেন তো আমি কিছুই জানিনে, আমার মূর্খতা কেবল আপনাকে রাগিয়ে দিচ্ছে।'

'দিক। তবু আমি শেষ পর্যন্ত যেতে চাই—'

'কোথায় যাবেন? গন্তব্য জানা আছে?' যমুনা ফের হাসল। 'আচ্ছা শোভনবাবু, গল্প মনেই কী মেয়ে, আর কোনো বিষয় নেই? কে বলেছে মেয়েদের নিয়েই লিখতে হবে? শরৎবাবু সকলে হন না।'

শোভন আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মেয়ে ছাড়া গল্প—'

যমুনার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। 'কেন, মেয়েরা মানুষ নয়? আমাকে দেখছেন না? সংসারের আরো দশটা প্রাণীর মতোই আমাদের ভাবতে হয় কী বাজার আসবে, কী ভাইপোশি দিয়ে বাড়ির লোকদের পেট ভরাব, দাদার কলেজের টাকা পাঠানো, ভায়ের বই কেনা, সমস্ত কিছুই ভাবতে হয়। আপনাদের লেখা পড়ে মনে হয় মেয়েরা যেন হাত ধুয়ে বসে রয়েছে প্রেমে পড়বার জন্যে!'

শোভন রেগে উঠে বললে, 'তার মানে তুমি বলতে চাও প্রেমট্রেম বলে কিছু নেই?'

যমুনা জলের দিকে চোখ রেখে বললে, 'জানিনে। তবে চামচ দিয়ে একেক টুকরো কেটে নিয়ে বলব এইটেই সত্য, এইটেই সম্পূর্ণ, তার মতো মিথ্যে কিছু নেই। যদি আমি আপনাকে নিয়ে লিখি 'আপনি শুধু লেখেন' তাহলে কী সেটা সত্য হবে? আপনি খান ঘুমোন কলেজে যান মা-বাবার কথা ভাবেন, এইগুলিই আপনাকে সম্পূর্ণ করে, গোটা মানুষ করে, নয় কি? দোহাই আপনার রাগ করবেন না, লক্ষ্মীটি।'

শোভন আবার ভাবল: এই মেয়েটি যেন তার সাহিত্যিক অহংকারকে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে বলে কোমর বেঁধেছে। অথচ ব্যাপারটাকে ওর কোনোরকম হীনমন্যতা, বলে যদি ভাবতে পারত, তাহলে সান্ত্বনা

পেত শোভন। অন্তত, এ মেয়েটির বক্তব্য এবং বিশ্বাসে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এমন মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়া যায় না, অথচ গ্রহণ করাও কষ্টকর। অপিচ এর স্তাবকতা-মুক্ত সাহচর্য প্রয়োজনীয়।

চলে আসার আগের দিন নিভৃতে পেয়ে শোভন বললে, 'চলে যাচ্ছি। এরপর ভুলে যাবে তো?'

যমুনা বললে, 'মনে রাখার দায় তো কারুরই নেই। যদি ভুলে যাই আপনার খুব ক্ষতি হবে কী?'

শোভন বললে, 'হবে।'

যমুনা হাসল। 'চিন্তায় ফেললেন। আমার মতো সামান্য মেয়েকে মনে রেখে আপনার কী লাভ?'

শোভন স্তব্ধগলায় বললে, 'কেউ মনে রেখেছে একথা ভাবতে পারলে মাঝে মধ্যে ফিরে আসবার ইচ্ছেটা খাঁটি মনে হয়।'

যমুনা চোখ নামাল। 'এখানে আসতে আপনার কোনো অজুহাতের দরকার হবে না।'

শোভন ওর হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিল। বললে, 'সাহিত্য করি বলে নয়, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে নির্ভরতা চায়, বিশ্বাস, প্রীতি, বন্ধুত্ব—'

'আপনি অমন করে বলবেন না, আমি তো আমার শক্তিকে চিনি। বেশ তো আপনার ভালো লাগলে যখন খুশি চলে আসবেন।'

'যমুনা—'

'এসো। আমি—আমরা অপেক্ষা করব।'

তখন বটগাছে বাদুড়গুলো চক্রাকারে ঘোরাচ্ছিল। আর, সূর্য ডুবছিল ওপারের গাছের শিরে।

যমুনার দৃষ্টি সামনের দিকে। মাথাটা দু পায়ের জোড়ের ওপর। একটু কুঁজো হয়ে বসে।

'আশ্চর্য, এমনও হয়...' ফিশফিশ করে বললে যমুনা।

শোভন ওর দিকে চেয়ে রইল।

'সত্যি বলছি, দাদার সঙ্গে তোমাকে দেখে খুব রাগ হয়েছিল। প্রাণপণে এড়িয়ে চলেছিলাম, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমি কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। এই বয়েসে মিথ্যা ছাড়া কিছু দেখিনি, হয়তো এই ভালো হয়েছে, দ্বিতীয়বার আর-একটা মিথ্যায় পড়ে ক্লান্ত হইনি।'

শোভন মৌন।

যমুনা বাহু প্রসারিত করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। 'দেখেছ একটু আরাম পেলেই ঘুমোতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের স্বভাব।'

শোভন হাসল। 'ছেলেটি কে?'

যমুনাও হাসল। 'কেন? তুমি কী তার সঙ্গে লড়াই করতে যাবে? সে এখন কলকাতায়, ডাক্তারী পড়ছে। না, দ্যাখো পরিমলের ওপর আমার কোনো রাগ নেই। ও আমার অনেক ক্ষতি করতে পারত, করেনি।'

শোভন বললে, 'তাহলে আমার কাহিনী শোনো—'

যমুনা হাসল। 'বুঝেছি দুজনেই ঘর-পোড়া গরু। তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনো মেয়েই তার প্রিয়জনের পূর্বপ্রণয়ের কাহিনী ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে না।'

'কেন নিজে ঘরপোড়া হলেও?'

'হ্যাঁ। মেয়েরা চায় সমস্ত অগৌরব, সমস্ত দুঃখ যেন তারা একাই বহন করে, আর তাদের পুরুষটি যেন এই সমস্ত গ্লানির ঊর্ধ্বে থাকে।'

'তাহলে তো আমার নীরব থাকাই ভালো।'

'তাই থাকো।'

শোভন বললে, 'চিঠি দেবে তো?'

যমুনা বললে, 'না।'

'কেন?'

'যখনি খারাপ লাগবে চলে এসো।'

'এঁরা কী ভাববেন?'

যমুনা হাসল। 'কিছুই ভাববেন না। আমার মা-বাবা মানুষকে বিশ্বাস করতে পেরে বেঁচে গেছেন।'

'আচ্ছা একটা কথা বলবে, সত্যি কী মনে করো আমার কিছু হবে?' শোভন জিগেস করল।

যমুনা বললে, 'কিসের?'

'বলছি আমার দ্বারা লেখাটেখা হবে কী?'

যমুনা হাসল। 'না-হলে হবে না। চেষ্টা করতে দোষ কী।'

'এই, সত্যি বলো না—'

'আমার বলার ওপরেই কী নির্ভর করছে—'

'এই—'

'ভীষণ ছেলেমানুষ তুমি। নিজের প্রশংসা অত শুনতে নেই শোভনবাবু। চলো, এবার ফেরা যাক।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে যমুনা বললে, 'শোনো, দাদাকে আমাদের কথা কিছু বোলো না।'

আবার কলকাতা।

দীর্ঘ ছ বছর পর।

অজয় কবিতা লিখেছে। পৃথিবীকে কল্পনা করেছে জননীর সঙ্গে, সন্তানের দীর্ঘ রোগভোগের পর আরোগ্য খবরে প্রথম রাত্রিতে ক্লান্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ছেন মা। মুখে গোধূলি সূর্যের সৌন্দর্য।

বাবার চিঠিতে বাবা অভিযোগ করেছেনঃ শোভন নাকি পড়াশোনায় বিলক্ষণ অমনোযোগী হয়েছে এবং আড্ডা হই-হুই করে মূল্যবান ছাত্রজীবনকে ক্ষয় করছে।

যমুনার চিঠি আসেনি। অথচ সপ্তাহে একটি করে চিঠি লিখতে সে ভোলেনি। আজ দুটো হপ্তা তার খবর নেই। অজয়কে জিগ্যেস করেও কোনো সদুত্তর পায়নি। একেক সময়ে মনে হয় যমুনার সঙ্গে অজয়ের কোথায় একটা বিরোধ আছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যে উৎরে লালবাগ পৌঁছল শোভন।

কাল রাত্রে বোধহয় এদিকে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় জল-কাদা। আর, কয়েকটি খড়ো ঘরের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করল শোভন।

অজয়ের বাবা বললেন, 'কে শোভন? এসো বাবা। যমুনা-মা বলছিল তোমার আসার কথা। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

শোভন প্রণাম করল। 'আপনি বেরুচ্ছেন নাকি?'

'আর বলো কেন? টিউশানি। তুমি বিশ্রাম করো।'

যমুনা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ওর দিকে এগিয়ে এল।

'সত্যি এলে তাহলে?' যমুনা হাসল।

শোভন গম্ভীর হয়ে বললে, 'আসব না জানলে কী এমন হাসি বেরুত?'

যমুনা বললে, 'রাগ করছ না তো? হঠাৎ তোমাকে ছুটিয়ে নিয়ে এলাম।'

'তোমার কী মনে হয়?'

যমুনা হাসল না। বললে, 'তুমি রোগা হয়ে গেছ।'

'তাই বুঝি?'

'বোসো। তোমার খাবারের ব্যবস্থা করি।'

শোভন ওকে আটকাল। 'আগে বলো কেন ডেকেছ?'

যমুনা বললে, 'এখন নয়। রাত্রিরে।'

শোভন বললে, 'আচ্ছা তুমি গল্প লেখো না কেন? এমন সাসপেন্সে রাখতে পারো মানুষকে।'

'এসো। মুখ-হাত ধুয়ে নেবে।'

'মা কোথায়?'

'পুজোর ঘরে।' যমুনা বললে, 'এই, তুমি যে আসছ দাদা জানে? জানে না তো? ভালোই হয়েছে।'

নারকেল গাছের মাথায় হলুদ চাঁদ উঠল।

ছাদে মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে যমুনা। শোভন চাঁদের দিকে চোখ রেখে বসেছিল।

সিঁড়িতে যমুনার পায়ের আওয়াজ। গা ধুয়ে আসতে ওর দেরি হয়েছে। যমুনা কাশছিল।

শোভন বললে, 'আবার কাশিটাশিও হচ্ছে দেখছি।'

যমুনা আবার কাশল। 'কাল ঠান্ডা লেগেছে।'

শোভন বললে, 'তাহলে এই বৈকালীন বিলাসটুকু না করলেই তো চলত।'

'ওরে বাবা, এই গরমে—'

শোভন চাঁদের বুকে চোখ রাখল। যমুনা ছাদের আলিশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওকে একটু অস্থির মনে হচ্ছে কী। শোভন ওর গতির দিকে চোখ নামাল। ওধারের ছাদে কে গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। গানের কলি-গুলো বোঝা না-গেলেও ভাঙা-ভাঙা সুর হাওয়ায় জুঁইফুলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

যমুনা পায়ে-পায়ে শোভনের দিকে এগিয়ে এল। তারপর বসল মাদুরের প্রান্তে। হাঁটুর ভাঁজে মুখ রেখে নরম করে তাকাল শোভনের দিকে।

'কী ভাবছ?' যমুনা হঠাৎ নীরবতা ভাঙল।

'কিছু না।'

'আমি তোমাকে দেখছি। এমন করে...'

শোভন চুপ করে রইল।

যমুনা একটু থেমে বললে, 'পরিমল গত সপ্তাহে এসেছিল..'

শোভন একটু চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'ও নাকি ভীষণ অনুতপ্ত, আমার মার্জনা পেলে ও তার অন্যায় সংশোধন করতে পারে...' যমুনা হাঁটু থেকে মাথা তুলল: 'তুমি শুনেছ তো?'

শোভন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'ও যে এমন করবে, বুঝতে পারিনি, আমার হাত ধরে যখন সে কাঁদছিল, আমি দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম...'

শোভন মূক।

যমুনা কাশছিল। তারপর কাশি থামিয়ে বললে, 'তারপর এক সময় সে চলে গেল। আমি ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারিনি।'

শোভন চুপ।

'তারপর সেদিন ওর চিঠি পেলাম। কলকাতা থেকে লিখেছে। তুমি দেখবে চিঠিটা?'

শোভন বললে, 'না।'

যমুনা বললে, 'তবে থাক। আচ্ছা, ও আমাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলল কেন? বলো তো এখন আমি কী করি?'

চাঁদের ওপরে পাতলা মেঘের আস্তরণ। জ্যোৎস্নায় ছায়া ঘনায়।

'অথচ—ভেবেছিলাম যদি ও কোনোদিন আবার আসে ভীষণ অপমান করে তাড়িয়ে দেবো। কিন্তু পারলাম না তো। ও এমন বিশ্রীভাবে কাঁদছিল...। বুঝতে পারছিলাম এখন ওর কান্নার কোনো মানে হয় না, অন্তত আমার কাছে তার কোনো দাম নেই। ও আমাকে আবার অপমান করে গেল, আর আমি কিছুই বলতে পারলাম না।' যমুনা কাঁদছিল।

শোভন প্রস্তরের মতো জমাট হয়ে রইল।

'কারুর কাছে একথা আমি বলতে পারিনি, এই কয়েকদিন নিজে জ্বলেছি। না-পেরে তোমাকে আসতে লিখলাম। আমি তোমার কাছে মিথ্যা হতে চাইনি, তুমি আমাকে বুঝবে...'

শোভন একটু থেমে বললে, 'তোমার কী ওর জন্যে কোনো দুর্বলতা এখনো আছে?'

যমুনা ভাঙা গলায় বললে, 'নেই কী করে বলি? অনেক ছোটো বয়েস থেকে ওকে দেখেছি, ও আমাদের বাড়িতে এসেছে, এক-সঙ্গে খেলেছি, ঝগড়া করেছি, মারামারি করেছি। আমরা বড় হয়েছি...'

শোভন বললে, 'ও যদি সত্যি অনুতপ্ত হয়ে থাকে—'

'সে কী করে হয়। ও নিজেকেই বিশ্বাস করে না, ওর নিজেরই জোর নেই। আমি তো জানি ও আবার নিজেকে সরিয়ে নেবে, আবার অনুতাপ করবে। আমিও তো মানুষ, ওর অনুতাপগুলোকে আমি ভালো-বাসতে পারিনে।'

শোভন আবার মৌন হয়ে রইল।

'জানো ও এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে যে কালকের চিঠিতে সে দাদার সুপারিশ সঙ্গে করে পাঠিয়েছে।'

'দাদা!'

'হ্যাঁ দাদা।' যমুনা মুখে আঁচল দিয়ে কাশির ধমক থামাল: 'ওর পক্ষে যেটা সহজ ছিল সেটা সে কোনোদিনই করতে পারেনি। তার মানে ওর নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। এরপর ও যদি লালবাগের সমস্ত মানুষকে এ-ব্যাপারে লাগায়, আশ্চর্য হব না।'

শোভন আবার চুপ করে রইল।

'এই—' যমুনা ডাকল: 'তুমি অমন চুপ করে থাকলে আমার একটুও ভালো লাগবে না।'

শোভন হাসল। 'কী বলব?'

'কেন? কিছু বলতে পারো না, করতে? পারো না আমার ভার নিতে?'

শোভন কাঁপুনি বোধ করল।

'চলো না আমাকে নিয়ে কোথাও, দূরে, অনেক দূরে—'

শোভন মৃদু গলায় বললে, 'যাব।'

'যাবে? সত্যি বলছ?'

'যাব।' রুদ্ধনিশ্বাসে জানাল শোভন।

যমুনা হেসে উঠল, কাশির ধমক, দম নিয়ে বললে, 'দেখলে তো কী বোঝা তোমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি, আমরা এমন স্বার্থপর...'

শোভন ঘন গলায় বললে, 'আমি কারুর ভার বহন করতে পারি এটাও কী আমার কাছে কম গৌরবের!'

'কিন্তু, আমি কী দেবো তোমাকে, আমার ইচ্ছে আবেগগুলো...' যমুনা যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল: 'কেন আগে তুমি আমার কাছে এলে না?'

শোভন বললে, 'পরে আসার জন্যে আমার তো কোনো লোকসান হয়নি, যমুনা।'

'হয়েছে হয়েছে। তুমি জানো না।'

শোভনের কোলে উপুড় হয়ে-পড়া যমুনার দেহ ফুলে ফুলে উঠছে।

শোভন চাঁদের দিকে তাকাল। নারকেল গাছের পাতাগুলো দুলছে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ।

শোভনের মনে হল এই অনন্ত আকাশের তলায় সে যেন বড় হয়ে গেছে। আর, তার মাথা স্বর্গকে ছুঁয়েছে। শোভন ওর পিঠে হাত রাখল, আঙুলগুলো দিয়ে সে যেন সময়ের চুলে বিলি কাটছে।

শোভন কলকাতায় ফিরে এল। ওর স্বভাবের চারদিকে যেন সহস্রজট নিঃশব্দতা নেমে এসেছে। গম্ভীর এবং চিন্তাক্লিষ্ট।

টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করল শোভন।

সুনন্দ বললে, 'বাবা তোকে একবার দেখা করতে বলেছেন।'

শোভন বললে, 'আমাকে!'

'হ্যাঁ।'

শোভন তেতলার ঘরে বহুদিন পর পা দিল।

'এসো শোভন। দ্যাখো কথাটা অনেক-দিন ধরে বলব-বলব ভাবছি। তোমার বাবাকেও কাল এই মর্মে চিঠি দিলাম। দেখছ তো দিনকাল, এই দুর্বৎসর—নায়েব লিখেছে এবার খাজনা আর আদায় হচ্ছে না। তাই এই দুর্দিনে বাধ্য হয়ে সংসারের খরচ কমাতে হচ্ছে। তোমার বাবাকেও তাই লিখে দিয়েছি। আর, এখন তো তোমাদের ওখানে কলেজ হয়েছে—'

শোভন বললে, 'আমাকে কবে যেতে হবে?'

'তোমার হাতে তো এখন টাকা নেই বোধহয়। মনে না করলে আমার কাছ থেকে ট্রেনভাড়া নিয়ে যেতে পারো।'

শোভন বললে, 'আচ্ছা।'

শোভন নতুন করে এই পৃথিবীর সম্মুখীন হল। দীর্ঘ ব্যাধির পর প্রথমদিন পথ্য খেয়ে রুগী যেমন বাইরের আলোতে হাঁটতে গিয়ে দুর্বলতা বোধ করে, শোভনেরও তেমন মনে হল।

দুপুরের টা-টা রোদে ফুটপাথ ধরে সে অনেকদিন পর হাঁটতে শুরু করল। অগণিত ব্যস্ত লোকের মুখ। এত মানুষ কোথায় যায়! এদের সকলেরই কী আশ্রয় আছে!

শোভন যেন আজ নিজেকে একলা পেয়েছে। নাকি সে চিরকালই একলা। তার এই জীবনটা তার নিজেরই, নিজের হাতে তৈরি। এই জীবনে কারুর ছায়া নেই। না বাবা, না মা। এখন তবে সে কিসের ভরসায় ও'দের কাছে ফিরে যাবে। ওরা কেউ তো তার জীবনকে চেনে না, বুঝবে না। তবু, ক্লান্ত বিহঙ্গের মতো তাকে বাড়িতেই ফিরতে হবে। বাবা-মার আশাহত ভাঙাচোরা মুখের চেহারা তার চোখের সামনে নড়ে ওঠে। বাবা কিছু বলবেন না, মা, মা হয়তো কাঁদবেন। তাঁরা সন্তানের ওপর অনেক আশা করেছিলেন। আশা! শোভন হাসল: বি-এ পাশ কেরানী জীবনের শখ-আহ্লাদ। ও'রা কেউ তার ডাক্তার কী হাকিম হবার স্বপ্ন দ্যাখেননি। শোভনের ও'দের জন্যে আন্তরিক দুঃখ হল।

আশ্চর্য, শোভন ভেবে চলল: এই মহা-নগরে সে একদিন ছিল। এবং দু-একদিন পরে আর থাকবে না। এই শহরের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। কারণ সে এ শহরে ছিল বটে, কিন্তু এ-শহরের ছিল না। সত্যি, ভাবতে গেলে, এতবড় শহরটাকে এর আগে এমন করে কোনোদিন দ্যাখেনি। কলেজ করেছে, বাড়ি এসেছে, পাড়ায় ঘুরেছে। অথবা সম্পাদকদের দপ্তরে। এই মহানগর তার কাছে কলেজ-বাড়ি-সম্পাদকীয় দপ্তর মাত্র! শোভন তাই এতদিন এ-শহরে ছিল, বলতে পারে না। সে শহরের ভেতরে গণ্ডীঘেরা আর একটি জগৎ গড়ে তুলেছিল। সে-জগৎ তারই বানানো। এবং যেদিন সে থাকবে না, সেদিন এই বানানো জগৎটিও অদৃশ্য হবে।

অথচ, সে অনেক কিছু করতে পারত। বৃহতের সমীপে মানুষ নাকি বৃহৎ হয়! কিন্তু এই বড় শহর তার ভাবনা-কল্পনায় কেন বড় আকারের ঐশ্বর্য ধরে দিল না।

শোভন এবার নিজেকেই শাসন করল: তুমি লেখাপড়া করতে এসেছিলে! করোনি। তুমি সুযোগের অসদ্ব্যবহার করেছ।

শোভন স্বীকার করল: করেছে। এর জন্যে সে কাউকে দায়ী করে না।

কে ডাকল তার নাম ধরে? শোভন ফিরে দাঁড়াল।

'অজয়বাবু—'

'কতক্ষণ থেকে আপনাকে ডাকছি। এই রোদে কোথায় চলেছেন?'

শোভন বললে, 'না। কোথাও নয়।'

অজয় আশ্চর্য চোখে চেয়ে রইল।

'একটু হাঁটছি। কী জানেন অজয়বাবু, এর আগে শহরকে কখনো এইভাবে দেখিনি।'

অজয় জিগোস করল: 'আপনি কী অসুস্থ? আপনাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে।'

শোভন বললে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

অজয় বললে, 'বাড়ি যাচ্ছেন?'

শোভন বললে, 'তাই।'

'কবে ফিরছেন?'

'অ্যাঁ। না ফিরছি নে।'

'সেকি! কেন?'

শোভন বললে, 'পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম কিনা। সকলের দ্বারা সব কাজ হয় না।'

অজয় অবাক হয়ে বললে, 'আপনার আজ কী হয়েছে বলুন তো?'

শোভন হাসল। 'ভারি মজার এই জীবনটা না, অজয়বাবু? এখন মনে হচ্ছে মানুষের দুটো জীবন দরকার। একটা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে, আরেকটা জীবন অভিজ্ঞতা-মাফিক কাজ করার জন্যে।'

অজয় বললে, 'আপনি বড় বেশি ভাবেন শোভনবাবু—'

শোভন বললে, 'না ভাই, ভাববার ভান করি। নইলে মা-বাবার একটি মাত্র লক্ষ্য আমার বি-এ পাশ করা, তাই পারলাম না।'

'আপনি টেস্টের রেজাল্টের জন্যে মন খারাপ করছেন। পড়াশোনা করেননি, নইলে আপনার মতো বুদ্ধিমান—'

শোভন আর কথা বাড়াল না। 'আচ্ছা চলি।'

অনেক বেলা করে শোভন যখন বাড়িতে ফিরল পা টলছে, সারাগায়ে আগুনের প্রদাহ, চোখ লাল এবং চোখের সামনে কেমন একটা অন্ধকার দলা পাকিয়ে নৃত্য করছে।

শোভন কোনোরকমে সিঁড়ি ধরে ধরে ভারি পাদুটো টেনে দোতলায় উঠল। ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ল বিছানার ওপর।

'শোভন—শোভন—কী হয়েছে তোমার?'

সুধন্য।

'আমি মরছি...' শোভন বিড়বিড় করে বললে।

'ইয়ারকি কোরো না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' সুধন্যর গলায় উদ্বিগ্নতা, আগ্রহ।

'সুধন্য, আমি তলিয়ে যাচ্ছি, আমাকে ধরো...'

'আঃ, কী হচ্ছে—চিৎকার কোরো না।'

'এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না...ফটিক বাবা আমার...'

'শোভন, তোমার অসুখ করেছে। শোভন, শুনছ?'

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিলি হায়, তাই ভাবি মনে—'

'শোভন, তোমাকে ঘুমোতে হবে। তোমার বিশ্রাম চাই।'

'নারকেল গাছের মাথায় কী প্রকাণ্ড হলুদ চাঁদ, আমরা সকলেই হলুদ হয়ে যাচ্ছি। যমুনা, বড় কষ্ট। Lady shall I lie on your lap?

সুধন্য জোর করে মাথার ওপরে ফ্যানটা ছেড়ে দিল।

শোভনের শরীর দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে! ওর চোখদুটো বড় লাল। আর, মাতালের মতো সে প্রলাপ বকছে।

ট্রেন রাত্রির বুক চিরে ছুটে চলেছে।

শহর, শহরতলী, কারখানার চিমনি, অট্টালিকা, পীচের রাস্তা, বিদ্যুৎস্রোত, যাবতীয় লেপেপুঁছে গিয়ে এখন ঘন গাছ-গাছালি, ক্ষেত, পুকুর, ডোবা, আর অর্ধনগ্ন মানুষের জটলা।

শোভনের চোখের পরদায় তার গোটা জীবনটা আর একবার ডুবে উঠল। জানালার বাইরে কালো নক্ষত্র-জ্বলা ভারি আকাশ, মায়ের কোলের মতো। মা, অস্ফুটে বললে শোভন: মা একটি বোধ, অনুভূতি। যমুনা এবং মা....। আজো কী আকাশে সেই হলুদরঙা চাঁদ উঠবে, নারকেলের পাতা কাঁপবে। শোভন নিজেকে রিক্ত মনে করল। এবং বুদ্ধিমানের মতো ভাবল: এই ভালো হল। এই আড়াই মাইল দূরত্ব থেকে যমুনা আর তার স্মৃতিকে রক্তাক্ত করতে পারবে না। এবং এই দূরত্বের ঢেউ ভেঙে পরস্পর কেউ কাছে আসতে পারবে না। যমুনা এক-দিন জানবে তার পলায়ন-কাহিনী। তারপর হেসে নিজের মনেই বলবে: 'ছেলেরা এমনি হয়।' তারপর একদিন শোভন নামক অস্তিত্বের চেতনাকে ভুলে যাবে, যাবে। এরপর আবার কী সে পরিমলকে নিমন্ত্রণ করবে!

শোভন মরে গেছে, বোধ-অনুভূতি অসাড়। এবং দূরত্ব থেকে জীবনকে দেখতে পারছে। পশ্চাতের জীবনভূমিটা আর এক-জনের। যদিও তারও নাম শোভন, কিন্তু সে নয়।

শোভন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়িতে পা দিল। আর বেরুল না বাড়ি থেকে। নিজেকে আটকে রাখল ঘরের মধ্যে। বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মা রাগ করলে চান করে খেয়ে আসে। আবার ঘরে এসে ঢোকে। সকাল গলে দুপুর হয়, বিকেলের চিতায় সন্ধ্যা জ্বলে। রাত্রি নামে গুমোট।

তারপর নিজের বাহ্যিক অস্তিত্বও সে ভুলে গেল। জামা-কাপড় ময়লা, গায়ের গেঞ্জি এবং পাতলুন তেলচিটে। মুখভরতি দাড়ি, যোগীর মতো দীর্ঘ পিঙ্গল চুলের বোঝা।

সেদিন দুপুরে নিঃশব্দে মালা এসে ওর শয্যার কাছে দাঁড়াল।

'শোভনদা—'

শোভন চোখ তুলে তাকাল। শাদা শূন্য চোখ।

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'মালা। কেমন আছ?'

'কই, আমাকে বসতে বললে না তো?'

'বোসো।'

মালা বসল।

'রাগ করেছ আমার ওপর? আমি কালকেই মামার বাড়ি থেকে ফিরছি।'

শোভন কিছু বললে না।

মালা বললে, 'আমার সঙ্গে কথা বলবে না বুঝি?'

শোভন বললে, 'তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ।'

মালা বললে, 'আমাকে কী তুমি ছোটো করে রাখতে চাও?'

শোভন হাসল শুধু।

'তুমি একেবারে বদলে গেছ। মাসিমা বলছিলেন : তুমি ও'দের সঙ্গে কথা বলো না। কেন, কী হয়েছে তোমার?'

শোভন চুপ করে রইল।

'আমরা তো তোমার কাছে কোনো দোষ করিনি। যারা ভালোবাসে তাদের কষ্ট দিতে হয় বুঝি?'

শোভন মালার দিকে চাইল, শাদাটে দৃষ্টি। সে ভীষণ ঘামছে। অসহ্য গ্রীষ্ম এ-ঘরে।

মালা ওর চোখের দিকে চাইছে, ওর কুঁজো-হয়ে বসা শরীরের দিকে।

শোভন স্থির, কপালে কুঞ্চন। জানালার বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। হঠাৎ মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল শোভনের, ঠোঁটদুটো কাঁপল। তারপর বললে, 'আমার কাছে আর এসো না, মালা।'

মালার চোখদুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। 'জানি, তুমি আমাকে অপমান করবে। কিন্তু তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারো না। যতদিন মাসিমা-মেসোমশায় আছেন ততদিন তোমার কোনো আদেশ আমি মানব না।'

শোভন চুপ।

'তুমি অমানুষ হয়ে গেছ, ছোটো হয়ে গেছ, শোভনদা—'

শোভন মূক।

'আজ তোমার কাছে সবকিছু খেলা হতে পারে, হয়তো আমরা, এই মফস্বলের সাধারণ মেয়েরা, তোমার কাছে খুব শস্তা। একদিন আদর করা যায়, একদিন ফেলে দেয়া যায়।'

'মালা, আমার এসব ভালো লাগছে না।'

'আমি নিরুপায়। হয়তো আর কোনোদিন এসব কথা বলা হবে না তোমার কাছে। আমি বিশ্বাস করে তোমাকে সবকিছু দিতে পেরেছিলাম বলেই কী আমি দোষ করেছি। তোমার কী ধারণা আমি সকলের কাছেই এইভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি?'

'মালা—'

'আমি জানিনে কী হয়েছে তোমার, জানতেও চাইনে। কিন্তু যাবার আগে বলে যেতে চাই এমন করে কোনো মানুষকে কষ্ট দিতে নেই। তাতে তুমিও সুখী হবে না।'

'মালা, একজন বেকার, অশক্ত লোকের কাছে তুমি কী চাও?'

'আমি জানিনে তুমি বেকার কিনা, অশক্ত কিনা; কিন্তু বেকার বলেই তোমাকে ছেড়ে দেবো এমন খেলো মেয়ে আমাকে ভাবলে কী করে, শোভনদা। ধরো যদি আমার শক্ত অসুখ হত, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারতে?'

শোভন আবার চুপ।

মালা বললে, 'শোভনদা, তোমার মতো আমি বড় শহর দেখিনি। এখানেই মানুষ, বড় হয়েছি, বিশ্বাস করেছি, ভালোবেসেছি। আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, তবে আমার ক্ষতি করবে কেন?'

'ক্ষতি!'

'নয়? শোভনদা, তুমি মেয়েদের চেনো না। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আমাদের নেই।'

শোভন আশ্চর্যচোখে তাকাল মালার দিকে। এ-মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে। কিন্তু মালা কী জানে জীবনটাও অনেক বড় এবং জটিল। এই জীবনযুদ্ধ, শোভন ভাবল : বিশ্বাস-প্রীতি-ভালোবাসা।

'শোভনদা, আমি যাচ্ছি—' মালা উঠে দাঁড়াল।

'একটু বোসো।' শোভন ক্লান্তগলায় বললে।

মালা বসল। 'তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে, শোভনদা—'

শোভন বললে, 'হ্যাঁ। খুব কষ্ট, মালা। আমি পারছিনে—'

'কোথায় কষ্ট তোমার?' মালা ওর বুকে হাত রাখল। 'কী করে তোমার শরীরকে নষ্ট করেছ বলো তো?'

'মালা—'

'কী?'

'তুমি আমাকে আজো বিশ্বাস করো?'

'তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই, শোভনদা। তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে?'

'মালা, আমি খারাপ হয়ে গেছি, নষ্ট হয়ে গেছি—'

'কেন নষ্ট হলে, কেন খারাপ হলে? আমার কথা কেন তোমার মনে থাকল না?'

'মালা—'

'আমাকে ভয় দেখিও না, শোভনদা। তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে একটু বাঁচতে দাও। তোমাকে বলিনি, মাসিমা জানেন। আমার বাড়ির লোক কেউ আমাকে পছন্দ করে না। আমার অপরাধ আমি ওদের মনোমত ছেলেকে বিয়ে করতে চাইনি।'

'মালা—'

'মাসিমা জানেন। আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারিনে।'

শোভন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আবার মস্তিষ্কে সেই গুরুভার যন্ত্রণাটা। চোখের সামনে অন্ধকার দুলছে। মালা তাকে কেন বিশ্বাস করল! সে তাকে কী দিতে পেরেছে। ওর বিশ্বাস এত জোর পেল কী করে! কান্নার মতো স্বাদ শোভনকে দুমড়ে মুচড়ে দিল : অথচ, মালার বিষয়টা এমন করে কোনোদিন তার ভাবনায় দানা বাঁধেনি। কেন? ও সবল বলে, বিনা পরিশ্রমে একে পেয়েছে বলে! হায়রে কৈশোর, আর তার মুগ্ধবোধ দিনগুলি!

'মালা, কাল দুপুরে একবার আসবে?'

'আসব। আমি যাচ্ছি শোভনদা।' মালা চলে গেল।

জানালার বাইরে নিস্পন্দ মধ্যাহ্ন। ইলিশের আঁশের মতো রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে।

সহসা একটা নিরবয়ব, মূক ভয় শোভনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। বুকে চাপ ধরছে, নিঃশ্বাস রোধ হয়ে আসছে। এই বেঁচে থাকার বোধগুলি তাকে অস্থির করে দিচ্ছে। এখন তার কত বয়েস হল একুশ না বাইশ। এই একুশ বছরের জীবনটা তাকে নাজেহাল করে দিয়েছে। একুশ বছরের পর আর মানুষের জীবন বাড়ে না। এই-ই শোভনের সম্পূর্ণ জীবন, যা তাকে বহন করতে হবে। এর হাত থেকে তার অব্যাহতি নেই। মানুষ যদি আরেকটা জীবন পেত, একটা ভুল করার, আরেকটা ভুলগুলিকে কাজে লাগানোর। হায়, মানুষের একটাই জীবন!

কিন্তু, মালাকে সে কেন কাল আসতে বললে। কী বলবে তাকে, জানিনে। শোভন সময় নিতে চায়। কিসের সময়? ভাববার। শোভন নতুন করে ভাবতে চায়, যেন সে এতদিন ভাবেনি। মালা, অনেক বড় হয়ে গেছে, এতবড় যে এখন শোভনের ভয় করে। এই মেয়েটি কৈশোর থেকে সবকিছু কৃপণের মতো সঞ্চয় করেছে, তার পুতুলের সংসার, পুরনো বলে কোনো কিছু নষ্ট করেনি, ফেলে দেয়নি। অথচ, ও যে এত সঞ্চয় করবে কে জানত। শোভনও জানে না। পুতুলের সংসার তার কাছে সত্য, জীবন্ত। সত্য তার শিবরাত্রির কামনাগুলি।

মালা মাকে সব বলেছে, তার কামনাগুলি, তার শপথগুলি। এবং মা—

শোভন ভাবল : এবং মা তাকে স্বীকার করেছেন! তার অর্থ মাও এমন একটি ইচ্ছা নিভৃতে লালন করতেন! অথচ, সে ভাবছিল এতদিন সে একা, স্বাধীন। এখন বুঝতে পারছে সে এতগুলো মানুষের ইচ্ছার শিকলে বাঁধা। শোভনের সমস্ত ব্যাপারটাই একটা জটিল ধাঁধার মতো মনে হয়।

তাহলে শোভনের কোনো স্বাধীনতা নির্বাচন নেই! ব্যক্তিগতভাবে সে কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। পারে না! তবে সেই খেলাছাদে হলুদ চাঁদের স্বপ্ন, নারকেলপাতার ঝিরিঝিরি। এবং...

লালবাগ থেকে এই শহরের দূরত্ব অনেক। এই দূরত্বের ঢেউ ভেঙে যমুনা কোনোদিনই আসতে পারবে না। যমুনা হাসবে, কারণ জীবনে বিশ্বাসভঙ্গ সে দেখেছে, দ্বিতীয়বার দেখবে।

কিন্তু, মালা...মালাকে কী সে ভালোবাসে। মালা...ভালোবাসা...। না, মালাকে সে ভালোবাসেনি। শোভন ভাবল : বোধহয় আজ, আজ থেকেই সে মালাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু, এই নতুন অনুভূতিই তাকে দীর্ণ করে দিচ্ছে। কারণ মালা আর তার সম্পর্কের মধ্যে একটা শূন্য গহ্বর রচিত হয়ে গেছে। এ-শূন্যতা কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। হবে না। আর, নিশিদিন অন্ধের মতো এই শূন্যতাকেই হাতড়াতে হবে।

শোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরদিন সকালে শোভনের আচরণ দেখে বাড়ির লোক অবাক হল। অনেক সকালে শয্যাত্যাগ করেছে তারপর অনেকক্ষণ ধরে আয়নার দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকর্ম করেছে। তারপর সে নিজের মনেই সাবান মেখে চান করল।

মা চা এনে দিলেন।

'মা—' শোভন হাসল।

'তুই কী কোথাও বেরুবি নাকি?'

'হ্যাঁ। একবার কলেজে যাব। দেখি যদি এখানে সীট পাওয়া যায়।'

মা হাসলেন না কাঁদলেন। 'একদিনে সুমতি হল তোর?'

শোভন বললে, 'মা তুমি খুশি হয়েছ?'

মা বললেন, 'তুই সুখী হলেই আমরা খুশি। যাই তোর বাবাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

শোভন বাড়ি থেকে বেরুল। বহুদিন পর সকালের প্রসন্ন আলোয় হৃদয় ভরে উঠল। এটা কী ঋতু, শোভন মনে করতে পারল না। ঋতুগুলি সব একরকম। আকাশের রোদ এখনো তরুণ। শোভন অনেক পথ হেঁটে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল।

অনেক বেলা করে ফিরল শোভন। মা বসে আছেন। বাবা কোর্টে বেরিয়ে পড়েছেন।

মা বললেন, 'কাজ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। কালকেই ভর্তি হয়ে যাব।'

'আয় খাবি আয়—'

খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে ফিরে এল শোভন।

তার মনে পড়ল একটা প্রয়োজনীয় কাজ বাকি রয়ে গেছে। শোভন টেবিলে কাগজ নিয়ে বসল। এখুনি জরুরি চিঠিটা লিখতে হবে। কলম খুলে তৈরি হল সে। কিন্তু, পত্র-রচনার মতো সামান্য কাজটাও যে এত কঠিন, এর আগে উপলব্ধি হয়নি। যেন তারই কোনো প্রিয়জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম দিচ্ছে। যমুনা যমুনা, যমুনা—অন্যমনস্কে কয়েকবার হিজিবিজি কাটল কাগজের বুকে। আর, কে জানত ওই অক্ষরগুলো ভেদ করে যমুনার মুখ জলছবির মতো জ্বলজ্বল করে উঠবে। যমুনার পিঠের ওপর ভিজে ভারি চুলের রাশ, সদ্যোস্নাত প্রতিমার মতো নরম ওর মুখ, এবং শরীরের ঘন গন্ধ…

শোভন স্থির হয়ে বসে রয়েছে। যমুনার ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি। ওর কপালের টিপ দপ দপ করছে।

এবং অকস্মাৎ হাওয়া-লাগা পালের মতো ওর সমস্ত শরীরটা ফুলে ফেঁপে ওঠে এই বন্ধ ঘরটাকে আচ্ছাদিত করে দিল। শোভন পুনরায় স্থির, পাথর। শোভন বিস্ফারিত চোখে ওর ওই বিশাল অস্তিত্বের দিকে তাকিয়ে রইল।

সহসা শোভনের মনে হল প্রচণ্ড একটা ধুলির ঝড়, অন্ধকার দামাল, আর সে হাহা প্রান্তরের খোলা আকাশের নীচে ঠা ঠা করে কাঁপছে। বুকের ভেতরে কী একটা ঠেলে উঠছে, ঠোঁট জ্বলছে…একটা মৃত্যুর মতো অনুভূতি বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে তাকে।

'পৃথিবী গোল, আবার আমাদের দেখা হবে…'

শোভন চিৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ করতে পারল না। তার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর কোনদিন তার গলায় আওয়াজ ফুটে বেরুবে না। শোভন ভয় পেল, মাকে কী ডাকবে সে। সত্যিই কী সে মরে যাচ্ছে। শোভন হুড়মুড় করে টেবিলের ওপর ভেঙে পড়ল।

'শোভনদা—'

কে? যমুনা?

'মালা!'

দরজার চৌকাটে মালার শরীর, মালা দরজা আটকে আছে। ওর পরনে ঘোর লাল রঙের শাড়ি। লাল রংটা যেন চোখের সামনে নাচছে, লাল, বেগুনী, খয়েরী, তারপর কালো হল।

'মালা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে—'

'এই তো আমি—'

'মালা, এত লাল কেন, বাইরে কোথাও কী রক্তপাত হচ্ছে?

'কী বলছ পাগলের মতো।'

'মালা, পৃথিবীর বয়েস কত হল?'

মালা হাসল। 'বাইশ—'

'মালা একটা গল্প শুনবে? একটা মেয়ের গল্প? নদীর নামে নাম—'

'কী নাম নদীর?'

'যমুনা, কাচের মতো রঙ, গ্রীষ্মে পায়ে হেঁটে তার বুকের ওপর দিয়ে মানুষ হেঁটে যায়, শীতে…'

'মহানন্দা?'

'না, যমুনা।'

'তারপর?'

'এক বর্ষায় যমুনা উঠে এল এক যুবকের কাছে। বলল: আমাকে গ্রহণ করো। যুবক অঞ্জলি ভরে তাকে পান করল।'

মালা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'যা: তোমার যত বানানো। নদী কী কখনো উঠে আসতে পারে?'

'তারপর একদিন যুবক চলে গেল, আর যমুনা বালির পাহাড়ের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল। যুবকটি বলেছিল: ফিরে আসব। ফিরে এল না।'

মালা বললে, 'বাবা, বাঁচা গেছে। ফিরে এলে তো আবার কাহিনী শুরু হত।'

শোভন বললে, 'মালা, সেই যুবক আমি।'

মালা হাসল। 'আর, সেই যমুনা?'

'যমুনা আর-একটি মেয়ে।'

মালা বললে, 'কোথায় থাকে?'

'মুর্শিদাবাদ, লালবাগ।'

'তাকে বুঝি তুমি কথা দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? যে কথা রাখতে পারবে না?' মালা একটু চুপ করে থেকে বললে: 'এই কথা বলবার জন্যেই তুমি আমাকে ডেকেছিলে?'

শোভন বললে, 'তাই।'

মালা কয়েক পা এগিয়ে এলো, তারপর জানালায় পিঠ রেখে সোজা শোভনের দিকে ফিরে দাঁড়াল। 'এ কথা আমার শুনে কী লাভ? আমি তো শুনতে চাইনি।'

শোভন বললে, 'আমি তোমার কাছে কোনো কিছু লুকোব না।'

মালা বললে, 'এ সব শুনে আমি কী করব?'

'আমাকে খাঁটি হতে হবে মালা।'

'খাঁটি!' মালা অপলকে ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। 'আরেকটু কম খাঁটি হলে তোমার কী খুব ক্ষতি হত, শোভনদা? তোমার ভালোবাসার কাহিনী শুনে আমার কী উপকার হবে? আমি তো গল্প লিখতে পারি নে, এই শহরে এরি মধ্যে আমাকে থাকতে হবে।' একটু থেমে: 'আচ্ছা শোভনদা' মানুষের তো একটা হৃদয়, সেই একটা হৃদয় নিয়ে যে কতবার ভালোবাসতে পারে?'

'মালা, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো—'

'শোভনদা, আমি অনেক ছোটো, জীবনের কিছুই জানিনে, সেইজন্যই বুঝি আমাকে মাড়িয়ে যাওয়া চলে—'

'মালা—'

'শোভনদা, আমি আঘাত সইতে পারি, কিন্তু তোমার অবহেলা নয়।'

'মালা, শোনো—'

'আমাকে বলতে দাও, শোভনদা। আমি ভয় দেখাতে জানিনে তাই আমাকে কেউ ভয় পায় না তুমি জানো: মালা তোমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে তাই নির্ভয়ে তুমি তোমার প্রেমের কাহিনী আমাকে শোনাতে পারো।'

'মালা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বুঝতে পারিনি তুমি আঘাত পাবে।' শোভনের মস্তিষ্কের প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে: 'মালা, আমি আমার কাজের কোনো সাফাই দিতে চাইনে তোমার কাছে। আমার ন্যায়-অন্যায় পাপপুণ্য বোধগুলি আমার একার। তার জন্যে ভুগতে হবে আমাকেই। হয়তো এখন, এই মুহূর্তে কেউ আমরা পরস্পরের কাছে সহজ হতে পারব না। কিন্তু আমার দিক থেকে এইটুকু বলতে পারি আমি চেষ্টা করব একটু একটু করে তোমার দিকে এগোতে, তোমার কাছে সহজ হতে, সত্য হতে।'

মালা চৌকাঠের বাইরে পা তুলেছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, পিছন ফিরে শোভনের কুঁজো-হয়ে-বসা শীর্ণ শরীরের ওপর চোখ রাখল। এই মানুষটিকে সে ভালোবাসে। কিন্তু সে এমন রিক্ত হয়ে এল কেন তার কাছে। মালা যে অনেক ভেবেছিল, অনেক স্বপ্ন-বাসনা। মালা ওকে শান্তি দিতে পারে, কিন্তু সে নিজেই কী এখন শান্তি পাচ্ছে না!

মালা লঘুপায়ে এগিয়ে এল।

'এই—'

শোভন কেঁপে উঠল। একটা উত্তাপ-স্পন্দন-সৌরভ তাকে জড়িয়ে ধরছে। শোভন কী বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই শোকের মতো একটা অনুভূতি তাকে ঘন করে রাখল। মালার শরীরটা যেন বিশাল হয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছে, শোভন প্রাণপণে সে-আশ্রয়কে জড়িয়ে ধরল।

মালা বললে, 'আমাকে একটু বাঁচতে দিও, আমি আর কিছু চাইনে তোমার কাছে।'

(সমাপ্ত)

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলকাতা এক একবার ধ্বংস হয়ে যায়
যেদিকে তাকাই, দেখি—বুকভাঙা বাড়িঘর, দেয়াল টপকে পথ চতুর্দিকেই ছুটছে
আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলকাতা এক একবার ধ্বংস হয়ে যায়
আকাশ ভেঙে পড়ে কলকাতার মাথার ওপর, মনুমেন্ট তছনছ, আধমরা গঙ্গা
যেদিকে তাকাই, দেখি—কলকাতা নিজের ওপর যথেষ্ট প্রতিশোধ নিয়েছে
সুন্দর যখন নিজেকে ভাঙতে চায়, তখন বুঝি এমন করেই ভাঙে!

তোমাকে সময় দিয়ে আসা, তোমাকে ছেড়ে-আসা নয়—এই কথাটা
এতোদিনেও কেন বুঝতে শিখলে না?
তোমাকে সময় দিয়ে আসা, তোমাকে ছেড়ে-আসা নয়!
বয়স তো অনেক হলো, এখনই নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার
এর পর হবে ব্যস্তসমস্ত, রাজবাড়িতে ঘন্টা উঠবে বেজে
দরজার কাছে গাড়ি এসে দাঁড়াবে—
তখন হাতের মুঠোয় শুধু যাবার সময়—শুধুই যাবার সময়!
তোমাকে সময় দিয়ে আসা, তোমাকে ছেড়ে-আসা নয়—এই কথাটা
এতোদিনেও কেন বুঝতে শিখলে না?

কলকাতার সেই ধ্বংসমাখা বুকে মুখ গুঁজে এক সময় অনেক কেঁদেছি আমি
যেমনভাবে মেঘ-বৃষ্টি কাঁদে তেমনভাবে অনেক কেঁদেছি আমি
যার কাছে এখন আলো আর অন্ধকার এক
তার সেই নানারকমের ছায়া নেই এখন আর
উঁচু-নিচু তেমন নেই গাড়িবারান্দা, অটোমোবিল, সংবাদপত্র
বদলি স্টেশনমাস্টারের মতন পুরোনো জায়গা ভেঙে
আজ সে কোথায় যেন নতুন স্টেশনে চলে গেছে—

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলকাতা এক একবার এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায়!

ভালোবাসার কবিতা ॥

পরিমল চক্রবর্তী

তোমার গভীর দু' চোখে ভয়ের আলো
মিটিমিটি কাঁপে যেন সন্ধ্যার তারা—
আমার হৃদয়ে লেগেছে সে-আলো ভালো,
যদিও বাউল মন কেঁদে কেঁদে সারা!

যদিও তোমাকে বোঝাতেও পারি নাকো
অশান্ত এই চেতনার হাহাকার;
তবু ভাবি : তুমি যেখানেই থেকে থাকো
শুনবেই এই প্রাণের অঙ্গীকার।

এখনো আমার দু' চোখে অশ্রুধারা
তোমার স্মরণে ঝরঝর শুধু ঝরে;
উদাস হৃদয় নির্বাক, দিশাহারা :
তোমাকেই শুধু, তোমাকেই খুঁজে মরে।

কোথায় রয়েছো, কোথায় রয়েছো তুমি?
সাড়া দাও, আহা, এবার করুণা করো;
বাসন্তী রাতে হৃদয়ের বনভূমি—
স্বপ্নের নীল ফুলে-ফুলে শুধু ভরো॥

আমি ভয়ে ভয়ে আছি ॥

কবিরুল ইসলাম

আমি ভয়ে ভয়ে আছি কি জানি কখন
তুমি এসে পড়তে পারো আলোর বাহিরে।
দুয়ারে ঢেউ-এর শব্দ
আমি ব্যস্ত পায়ে
দুহাত বাড়াবো।

ছায়ার সান্নিধ্যে ঘুরে আমি বহুকাল
পৃথিবীর ঈশ্বর দেখি না—
যেহেতু ছায়ার সংগে ঘর করে-করে
আলো হাওয়া জলের দর্পণে
নিজেকে দেখিনি।

আমি ভয়ে ভয়ে আছি কি জানি কখন
তুমি এসে পড়তে পারো আলোর আড়ালে।

চোখের বাহিরে ক্রূর ছলনার ছকে
ব্যবহৃত হতে-হতে আমি—
বহুকাল নিজেকে চিনি না।
আমি তাই ভয়ে আছি কি জানি কখন
তুমি এসে পড়তে পারো আমার আড়ালে॥

অঙ্গনা

প্রমীলা

পরীক্ষার ফল

গত বছরের মত এবারও বিভিন্ন পরীক্ষায় মেয়েদের সাফল্যের হার বেশ সন্তোষজনক। শুধু সাফল্যের হার নয়, তুলনামূলক ফলাফলেও মেয়েরা অধিকতর কৃতিত্বের অধিকারী। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় বিজ্ঞান-বিভাগে পাশের হার যেখানে শতকরা ৬৬·৫ জন, সেখানে মেয়েদের পাশের হার হলো শতকরা ৭৬ জন, আবার কলা-বিভাগে মেয়েদের পাশের হার শতকরা ৭১ জন মোট শতকরা ৫৬ জনের মধ্যে। পরীক্ষায় শীর্ষস্থানাধিকারীদের মধ্যেও মেয়েদের সিংহভাগ। এবারকার কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন কাবেরী মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, ছায়া সমাদ্দার, কে ভি লতা, কৃষ্ণা সেনগুপ্তা ও ইলা বসু, অর্চিতা বসু, শীলা বসু, অন্নপূর্ণা বান্দুসা ও ইন্দ্রাণী সেন। কলা-বিভাগে প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে মেয়েরাই দখল করেছে নয়টি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এবার কমার্স পরীক্ষায় কমার্স-বিভাগে অর্চিতা ও শীলার সাফল্য। ইতিপূর্বে কমার্সে মেয়েদের আগমন তেমন উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগাতে পারেনি। তাই আমরা ওদের সাফল্যে যেমন অভিনন্দন জানাই, তেমনি মেয়েদের আগমনকেও স্বাগত জানাই। এক্ষেত্রে মেয়েদের আগমন আরও বেশি সংখ্যায় ঘটুক— এটা আমাদের সকলের কাম্য। কারণ, কৃতিত্ব প্রদর্শনের অনেক সুযোগ এখানে অপেক্ষা করে আছে। উপযুক্ত ছাত্রীর আগমনেই সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার সম্ভব। আর বলতে দ্বিধা নেই যে, এক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য বিরাট যাত্রারই সূচক। অন্ততঃ আমাদের অনেকের তাই প্রত্যাশা।

বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য-বিভাগে মেয়েদের সমান সাফল্যে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল যে, মেয়েরা কোন বিশেষ বিভাগে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চায়। এটা যেমন আনন্দের কথা, তেমনি আশার কথা। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে কৃতিত্বের সম্যক পরিচয় অপ্রকাশিত থেকে যায়। সেদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে সর্ব বিভাগে কৃতিত্বের এই বিরাট আগ্রহকে আশার কথাই বলতে হয়। তাই এই আশাকে উজ্জীবিত রাখতে হলে মেয়েদের এই বহুমুখীতা প্রমাণ করতে হবে সর্বত্র। পরীক্ষা-পাশের পর গতানুগতিক কলেজে পড়ার মোহ ছেড়ে শিল্প-শিক্ষার বিরাট অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং নিজেদের স্থান করে নিতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে মেয়েদের প্রবণতা এমনিতেই কম। কিন্তু যুগের দিকে তাকিয়ে এবং দেশ ও জাতির প্রয়োজন বুঝে এদিকের গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, অ্যাকাউন্টেন্সী প্রভৃতি ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অংশ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা আর কোনমতেই সমীচীন নয়। সাফল্যের আনন্দে ভবিষ্যৎ-জীবনে দিক নির্ণয়ে যেন ভুল না হয়। সতর্ক পদক্ষেপে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করাই সঙ্গত।

শিল্প শিক্ষা মন্দির

কুটির-শিল্পের মাধ্যমে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গঙ্গানগর মহিলা শিল্প শিক্ষা মন্দিরের যাত্রারম্ভ। সে আজ প্রায় তের বছর আগেকার কথা। প্রথমদিকে স্বাভাবিকভাবেই নানারকম বাধা-বিপত্তি এসেছে। কিন্তু সেসব ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে শিল্প-মন্দির আজ দৃঢ়ভিত্তি লাভ করেছে। সেই ১৯৫৩ সালে গুটিকয় মাত্র শিক্ষার্থী নিয়ে সূচনা হয় গঙ্গানগর শিল্প শিক্ষা মন্দিরের। তখন মেয়েদের সুচের কাজ এবং ঝুড়ি-চুপড়ী বোনা ও আচার প্রভৃতি তৈরী করা শেখানো হোত। কালক্রমে শিক্ষাসূচীর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রতিষ্ঠান সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে এবং আর্থিক সাহায্যও জোটে। চারটি বিভাগে প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা বিস্তৃতি লাভ করে। শিশু বিভাগ, সূচীশিল্প, উৎপাদন বিভাগ এবং কাঁথা-শিল্প। অবশ্য কাঁথা-শিল্প উৎপাদন বিভাগেরই অন্যতম অঙ্গ।

শিশু বিভাগকে বলা হয় 'বালোয়াদি।' খেলা-ধূলার মাধ্যমে শিশুদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। মোট ষাটজন শিশু এখানে শিক্ষালাভ করে। শিশুশিক্ষার এই আসর বসে সকালে। দুজন শিক্ষিকা এই বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন।

শিল্প শিক্ষা মন্দিরের কাজের সূচনা সকালে হলেও শেষ হতে হতে দিনান্তের ঘণ্টা বেজে যায়। কেবল বারটায় বসে শিল্প-শিক্ষার আসর। প্রায় জনাচল্লিশ শিক্ষার্থী শিল্পবিভাগে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করে। সূচীশিল্প বিভাগে আছে কাটিং ও টেলারিং এবং লেডি ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা। উপযুক্ত শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। লেডি ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা তিন বছরের কোর্স। এর পরীক্ষা স্বতন্ত্র। এছাড়া ছাত্রীদের শিল্প অধিকর্তা কর্তৃক গৃহীত দুবছরের কোর্সও শেষ করিয়ে দেওয়া হয়। শিল্পবিভাগে আরো আছে তাঁত এবং বাটিক-শিল্প। সকল শিক্ষার্থীই শিল্পবিভাগের সকল শাখায় নিজের পারদর্শিতা প্রমাণ করতে উন্মুখ। তাই সূচীশিল্পের সঙ্গে সবাই তাঁত এবং বাটিক প্রিন্ট শিখতে সমান আগ্রহী। তাঁত এবং বাটিক-শিল্পের কর্মীরা কিছু রোজগারও করতে পারেন এই সুযোগে। নারকেল দড়ি দিয়ে বটুয়া ধরনের ব্যাগগুলি বেশ সুন্দর। কলকাতা এবং আশেপাশে নাকি এগুলির চাহিদা খুব বেশি। মেয়েদের সূচীশিল্পের কাজও প্রশংসনীয়। লেডি ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমার অন্তর্গত ছোটদের জামা, ফ্রক ও অন্যান্য জিনিষপত্রে মেয়েদের শিল্প-নৈপুণ্যের ছাপ স্পষ্ট। বাটিকের ছাপাও

কাঁথার কাজ
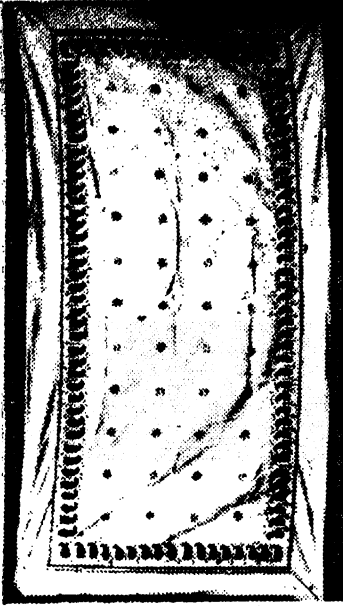
ভাক। তাঁতজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদিতে উচ্চ শিল্পমান রক্ষিত।

গঙ্গানগর মহিলা শিল্প শিক্ষামন্দির দুটি কেন্দ্রে বিভক্ত—গঙ্গানগর এবং ইচ্ছাপুরে। গঙ্গানগরে শিল্পবিভাগ ও শিশুবিভাগ এবং ইছাপুরে কাঁথাশিল্প বিভাগের কাজ হয়। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব কাঁথাশিল্পের পুনরুদ্ধারে। কাঁথা একান্তভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। কাশ্মীরের যেমন শাল, গালিচা, বাংলার তেমনি কাঁথা। কিন্তু দেশবিভাগের চাপে এবং রুচির পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বুক থেকে কাঁথা প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। প্রায়-লুপ্ত এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতী শিবাণী ঘোষাল যখন উদ্যোগী হন তখন অনেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন। তাঁদের মতে এ হচ্ছে অনকটা রকেটের যুগে গরুর গাড়িতে চড়ার শখ। কিন্তু নিন্দুকদের সব অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ইছাপুর কেন্দ্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাঁথা বিভাগ আজ উজ্জ্বল মহিমায় বর্তমান। বয়ন-শিল্পের দ্রুত উন্নতিতেই কাঁথার মহিমা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কাঁথা আজ আবার স্বমহিমায় অনেকের চিত্ত জয় করে নিচ্ছে।

সাধারণতঃ পুরোন কাপড় থেকেই কাঁথা তৈরী হয়। কাঁথার উপরে নানারকম কারুকার্য করা ছিল সেকালের মেয়েদের প্রধান শখ। এর ফলে কাঁথা যেমন আকর্ষণীয় হয় তেমনি শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় মেলে। বাংলাদেশে কাঁথা এককালে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, ছড়া, গল্প, গান প্রভৃতিতে পর্যন্ত কাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অনেক প্রাচীন কাঁথার দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছে। এর ফলে নতুন কাঁথা তৈরীর ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অনেক সুবিধা হয়েছে. এগুলি গাইড হিসেবে তাঁদের সাহায্য করে। তবে আধুনিক রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এঁরা পুরোন শিল্পরীতিতে নতুন জিনিষ তৈরী করে চলেছেন। সিল্কের স্কার্ফ, ট্রে-ক্লথ, টেবিল-ক্লথ, ব্যাগ, টিকুজি প্রভৃতি কাঁথা-শিল্পের অন্যতম অঙ্গ। এগুলিতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে। কাঁথার এই সব জিনিষ শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। দিনে দিনে চাহিদা বেড়েই চলেছে। সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত এখানকার কাঁথার স্কার্ফ প্রসারলাভ করেছে। এর অভূতপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে অভিভূত হয়ে এক মার্কিন রমণী একটি চিঠিতে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং ভারতীয় সূচীশিল্পের উচ্চমানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

কাটিং ও সেলাইয়ের কাজ

বাটিকের টেবিল ক্লথ

তাঁতে কাজ হচ্ছে

গঙ্গানগর মহিলা শিল্প শিক্ষামন্দির যাত্রা শুরু করেছিল বিরাট সম্ভাবনার আশা নিয়ে। তাদের সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা পূর্ণ হয়েছে। এই সুখ্যাতি তারই প্রমাণ। এই সুখ্যাতির সঙ্গে স্বীকৃতিও এসেছে সরকারী তরফ থেকে। সেন্ট্রাল সোসাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এবং ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়মিত অর্থ-সহায্য করেন প্রতিষ্ঠানকে। প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথ এর ফলে সুগম হয়েছে। সকলের আন্তরিকতায় এই প্রতিষ্ঠান সংকল্পসিদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে চলুক এবং এই গতি দ্রুততর হোক—এটাই আমাদের কামনা।

সেলাইয়ের কথা

জামার মাপ নেবার সময় ও কাটবার সময় কতকগুলি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমেই এ বিষয়ে নজর না দিলে সমস্ত জামাটাই হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে। মাপ ঠিকমত নিতে হবে এবং সেগুলো একটা কাগজে লিখে নিতে হবে, লিখে না রাখলে সব গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শরীরের ডান দিক থেকে সব সময় মাপ নিতে হবে।

কাপড় সাধারণতঃ লম্বা ও আড়াভাবে সুতোর টানায় বোনা হয়। তাই কাপড় কাটবার আগে লম্বা আড়া ভাল করে দেখে নিতে হবে; এবং কাপড় সব সময় লম্বা দিকে কাটা উচিত। কারণ লম্বা দিকে কাপড় সহজে ছেঁড়ে না, আড়া দিকে কাটলে বেশী দিন টেঁকসই হয় না। তারপর কাপড়ের উল্টো-সোজা দেখে নিয়ে এবং সব সময় উল্টো দিকে ড্রইং করতে হবে। যদি কোন ফুটো বা দাগ থকে কাপড়ে, ড্রইং-এর সময় চেষ্টা করতে হবে যেন ঐগুলো বাদ পড়ে যায়। কাপড় কাটবার আগে জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর ধুয়ে নিয়ে শুকিয়ে গেলে ইস্ত্রি করে নিয়ে তবে কাটতে হবে। তবে সানফোরাইজড বা অ্যান্টিক্রীজড কাপড় হলে ধুয়ে নেবার প্রয়োজন নেই।

কাপড় কাটবার আগে যে যে জায়গায় যতটা করে মার্জিন রাখতে হবে সেটা দেখে নিতে হবে। স্ট্রাইপ কিম্বা চেক কাপড় হলে ঠিকমত মিলিয়ে কাটতে হবে, অনেকে স্ট্রাইপ কাপড়ের স্ট্রাইপগুলো কোনাকুনি রেখে জামা করতে চান, তখন স্ট্রাইপ কাপড় ওরেয়া অর্থাৎ কোনাকুনিভাবে ভাঁজ করে কাটতে হবে। অনেক সময় ফ্রক, স্কার্ট, গাউন ইত্যাদির নীচের ঘের রুচি অনুযায়ী ওরেয়া করে কাটা হয়। কাপড় সব সময় ডবল ভাঁজে কাটতে হয়, যদি কাপড়ে দাগ বা ফুটো থাকে তবেই এক ভাঁজে কাটতে হয়।

সিল্ক, লিনেন, ভয়েল বা আর্টি-ফিসিয়াল কাপড় হলে আগে কাগজে ড্রইং করে নিয়ে সেই ড্রইং-কাগজ কেটে সেটা ঐ কাপড়ের সঙ্গে টাঁক সেলাই দিয়ে আটকে নিতে হবে, না হলে কাপড় সরে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। গরম কাপড়ের ওপর ড্রইং করে কাটবার পর মার্ক তোলবার জন্যে ড্রইং-এর ওপর দিয়ে টাঁকসেলাই করে মার্ক তুলতে হয়। কাপড়ের দাবাট অর্থাৎ মার্জিন ½" থেকে ১½" পর্যন্ত রাখা চলতে পারে, তার বেশী দাবাট রাখলে সেলাই করতে অসুবিধা হয় ও বিশ্রী দেখায়। সবসময় ব্যালান্স মার্ক-এর ওপর নজর রাখতে হবে, এই মার্কের ওপর জামার সমতা নির্ভর করে। তিনরকমভাবে এই ব্যালান্স-মার্ক দেওয়া যায়, যেমন—চক দিয়ে, মার্কিং হুইল দিয়ে ও সুতো দিয়ে।

সান-স্যুট

এবার প্রথমেই আমরা সান-স্যুট দিয়ে কাজ আরম্ভ করব। কারণ, এই নিদারুণ গ্রীষ্মে এই জামাটি শিশুদের পক্ষে খুব আরামদায়ক। এই স্যুটটি তৈরী করতে হলে কেবলমাত্র সিটের (অর্থাৎ পুরো পেছনটা ঘুরিয়ে) মাপ নিতে হবে। এই সিটের মাপ থেকেই আর সব মাপ বার করা যাবে। প্রথমে কাপড়টাকে সিটের ½ মাপ অনুযায়ী চওড়া ভাঁজ করতে হবে, পরে মাপ অনুযায়ী ড্রইং করে কাটতে হবে।

ফরমুলাঃ— মাপঃ—(১" = ½ স্কেল)

সিট — ২" = কোমর

অর্ধেক সিট — ২" = সেন্থ (½ সিট — ২")

সিটের চার ভাগের এক ভাগ — ১" = ইয়ক (¼ সিট — ১")

সেন্থ × ২ + ২" — ইয়ক = গ্যালিস

মাপঃ—

সিট — ২৪"

কোমর — ২২"

সেন্থ — ১০"

ইয়ক — ৫"

গ্যালিস — ১৭"

চ, গ ও ঘ-এর ½ (অর্ধেক)

ছ, খ ও ঘ-এর ½

চ ও ছ = সোজা লাইন

জ, চ ও ছ-এর ½ (অর্ধেক)

জ-ঝ = ½"

গ্যালিস

কোমর পট্টি

নিকার :—

ক—খ
গ—ঘ — সিটের ½ + ১" = ৯" লম্বা

ক—গ
খ—ঘ — সিটের ¼ = ৬" + ১½" = ৭½" চওড়া

(এই ১½" কুঁচির জন্যে)

ইয়ক :—

১—২
৩—৪ — ইয়কের লম্বা = ৫"

১—৩
২—৪ — ইয়কের চওড়া = ৬"

৪—৫ = ২"

১—৬ = ২"

৫ থেকে ৬ সেপ্ করা হবে।

সান-স্যুট সেলাইয়ের নিয়ম :

প্রথমে পায়ের মুহুরীতে সোজা পিঠে ওয়েফ (বেঁকাভাবে পটি কাটা) কাপড় দিয়ে ভেতরে মুড়ে হাতে হেম সেলাই দিতে হবে। দু'পাশে দু'পাটের কাপড় একসঙ্গে ধরে সেলাই দিয়ে পরে পেতে হেম সেলাই দিতে হবে। দু'পাশে খানিকটা জায়গা খোলা রাখতে হবে। পরে বোতাম-ঘর কেটে বোতাম বসাতে হবে। কোমরে ১" পরিমাণ চওড়া করে কোমর-পটি সেলাই দিয়ে লাগাতে হবে। কোমরের সামনের পার্টে ইয়ক জুড়তে হবে। গ্যালিসদুটো সামনের ইয়কের সঙ্গে ভেতর দিক দিয়ে জুড়ে গ্যালিসে অপর-দিকের প্রান্তে বোতাম-ঘর করে পেছনের নিকারের কোমর-পটির ওপর দু'ধারে দুটো বোতাম বসিয়ে দিতে হবে। আর কোমর-পটি লাগাবার সময় বাড়তি কাপড়টি দু'-পাশে প্লিট ভেঙে কোমরের মাপে কোমর-পটির সঙ্গে লাগাতে হবে। এইভাবে সান-স্যুট সেলাই করতে হবে।

—বসুধা

যদি কেউ ইচ্ছে করেন সান-স্যুটের ইয়কে এই ডিজাইনটি রঙিন সুতো দিয়ে এমব্রয়ে-ডারী করে দিতে পারেন। এটি বাচ্চাদের পক্ষে বেশ মজার ও পছন্দসই হবে।

সানস্যুটের ইয়কে এই ডিজাইনটি রঙীন সুতো দিয়ে তুলতে পারলে মানাবে সুন্দর।

ভিন্‌দেশী কর্মী মেয়ে

পশ্চিম জার্মানীতে মোট চাকুরীজীবীর প্রায় ৩৭.৩ শতাংশ হচ্ছে মেয়ে। ১৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে বয়স এরকম প্রায় ৯৫ লক্ষ এদেশে চাকুরীতে নিযুক্ত আছে। মেয়েদের মোট সংখ্যা হচ্ছে দু কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ এবং তাদের শতকরা চল্লিশ-জন হচ্ছে চাকুরীজীবী। ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে বা তারপর প্রায় কুড়ি লক্ষ বিবাহিত মেয়ে চাকরী করছে। ১৯৬৫ সালে বিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে তেইশ লক্ষ চাকুরীজীবী আবার নাবালক সন্তানের জননী। স্বাভাবিকভাবেই ঘর-বাড়ি সামলে চাকুরী করাটা তাদের পক্ষে বেশ কষ্টকর। এতে যেমন অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় তেমনি আবার পুরুষদের মত নিয়মিত চাকুরী করা মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিকও নয়। এজন্য অনেক মেয়েই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। এরা গিন্নীপনা করতেই চায়। তবু যে চাকুরী করে কারণ স্বামীর একার আয়ে কুলোয় না বলে। আরেকটা শখ তাদের গাড়ি কেনা। একখানা গাড়ি না হলে তাদের জীবন বৃথা বলে মনে হয়।

কিন্তু এদেশে ভাল চাকুরীতে মেয়েদের বড় একটা দেখা যায় না। বেশিরভাগ মেয়েরাই অদক্ষ বা আধাদক্ষ কাজ করে যার জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার হয় না। একমাত্র প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর চাকুরীতে শতকরা ৬২ জন মেয়ে কাজ করে। এছাড়া শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উঁচু ধাপে তাদের সংখ্যা শতকরা দুজন। তবে আজকাল অনেক মেয়ে মনিব সেজে বসেছে, কেউ ছোটখাট কল-কারখানা খুলেছে, কেউ বা দোকান-পশার ফেঁদে বসেছে, আবার কেউ বা পরিচর্যামূলক ব্যবসা শুরু করেছে—বিউটি সেলুন বা হেয়ার ড্রেসিং খুলে।

কিন্তু একথাও সত্যি যে মেয়েরা যদি এগিয়ে না আসতো তবে পশ্চিম জার্মানীতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প একেবারে অচল হয়ে পড়তো। সারা দেশে কর্মী নারীর সংখ্যা নয় লক্ষ। একমাত্র কৃষিতেই দু মিলিয়ন নারী কাজ করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা হলো :

৭৭০,০০০	কিংবা ৮.৫%	দোকানের মালিক
২,২৩৪,০০০	" ২৪.৫%	দোকানকর্মী
২,৪৪৯,০০০	" ২৭%	কেরানী
৩,০৭২,০০০	" ৩৪%	শ্রামক
১৪১,০০০	" ১.৫%	সরকারী কর্মচারী
৫১৭,০০০	" ৫.৬%	বৃত্তিমূলক শিক্ষানবিশী

অবশ্য পোষাক, তামাক ও মেঠাই শিল্পে নারীর আধিপত্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না।

সংবাদ

শ্রীমতী ডলি ভট্টাচার্য গীতিকা আয়োজিত নিখিল ভারত ও নৃত্য প্রতি-যোগিতায় কথাকলি ও রবীন্দ্রনৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

• • •

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় কমার্স বিভাগে শ্রীমতী অর্চিতা বসু দ্বিতীয় স্থান, শ্রীমতী শীলা বসু পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন। শ্রীমতী সুমিত্রা সেনগুপ্ত হিউ-ম্যানিটিজ-এ অষ্টম স্থান অধিকার করেছেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

টেলিফোনে মিত্রাদিকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন, সেই দুপুরেই তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গাড়িতে মোট আঠার-বিশ মাইল পথ ভেঙে জ্যোতিরানী তাঁদের ভাবী প্রতিষ্ঠান-ভবন দেখে এলেন। পুরনো ড্রাইভার, ভোলাও সঙ্গে ছিল। সম্পত্তি আপাতত একজন দারোয়ান আগলাচ্ছে। ভোলার মুখে খেদ কর্ত্রীর আকস্মিক আগমনের খবর পেয়ে সে বিমূঢ় ব্যস্ততায় ছুটে এল।

অপছন্দ হয়নি। জঙ্গল দেখে দুজনেরই গা ছমছম করেছে আবার ভালও লেগেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলে মন্দ দাঁড়াবে না। বাড়িটা বড়ই, আর খুব বেশি পুরনোও নয়, তবে অযত্নে দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা, ভালরকম মেরামতের দরকার হবে। আর ঘরও খুব বেশী নয়, ঢের জমি পড়ে আছে, দরকার হলে পাশেই আর একটা বাড়ি অনায়াসে তোলা যাবে। পুকুরটা মজে গেছে, সংস্কার করে নিতে হবে। খাবার জল আর ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা কিছু নেই, তাও করতে হবে। আর একটা অসুবিধে, কাছাকাছি দোকানপাট হাট-বাজার নেই। সাইকেল-রিক্সা চলাচল আছে দেখেছেন অবশ্য। তবু শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের নামে একটা গাড়ি কেনা হবে কিনা জ্যোতিরানীর মাথায় সেই চিন্তা। এখানে থেকে দেখাশোনা করবে যারা, দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটি তো তাদের হামেশা করতে হবে, তাছাড়া কতরকমের আপদ-বিপদ আছে, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগও সর্বদাই রাখা দরকার—গাড়ি ছাড়া হবে না বোধহয়। আর ইলেকট্রিক এলে টেলিফোনও সঙ্গে সঙ্গে আনা যাবে, সেটা কঠিন কিছু নয়।

মৈত্রেয়ী চন্দ শোনেন আর উৎফুল্ল উচ্ছ্বাসে জ্যোতিরানীকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চান। ফেরার পথে খানিকটা এগোতেই চপল আনন্দে বলে উঠলেন, বৌদিই লক্ষ্মী, ভাগ্যে তুমি ওকে স্টেশনে দেখেছিলে! বাড়ি গিয়েও ওকে ধরে গোটা পাঁচেক চুমু খাব—

—এই! ঠোঁটে হাসি চেপে ভ্রূকুটি করে জ্যোতিরানী সামনের দিকে ইশারা করলেন। ড্রাইভার অবাঙালী হলেও তার পাশে ভোলা বসে।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মৈত্রেয়ী হাসতে লাগলেন। একটু বাদে বললেন, কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে বেশ নাম-করা জনাকতক পেট্রন যোগাড় করতে হবে কিন্তু, প্রচারের যুগ এটা—আমার চেনা-জানা আছে জনা-কয়েক, টাকাও কিছু পাওয়া যাবে। তবে আমি একলা বেরুতে পারব না বাপু, তোমাকেও থাকতে হবে সঙ্গে—

এই প্রসঙ্গে একটা পুরনো অভিলাষ মনে পড়ে গেল জ্যোতিরানীর। জিজ্ঞাসা করলেন, গান্ধীজী এখনো ব্যারাকপুরে আছেন কিনা জানো? কোথায় আছেন স্মরণ হচ্ছে না বলে মনে-মনে নিজেই সংকুচিত একটু।

জানেন না মৈত্রেয়ীও। মাথা নাড়লেন।—কেন তাঁকে দিয়ে ওপেন করাতে চাও নাকি?

—পেলে মন্দ হত না, একবার দেখা করার ইচ্ছে ছিল।

সম্ভাব্য ব্যাপারটার মধ্যে পার্শ্ববর্তিনী যে তার থেকেও গভীরভাবে তলিয়ে গেছে, সেটুকু অনুভব করেই হয়ত মৈত্রেয়ী সাগ্রহে সায় দিলেন, তাহলে তো খুব ভালই হয়, আচ্ছা আমি খবর নিচ্ছি, থাকলে দুজনে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।

কিন্তু মৈত্রেয়ীর কাছে বাস্তব দিকটাই বড়, পাকাপাকিভাবে আর কাকে টানা যায়, তুমি ভেবেছ কিছু?

...মামাশ্বশুর আর দাদার কথা ভেবেছিলাম।

মৈত্রেয়ীর দুচোখ তাঁর মুখের ওপর থমকালো, দাদা মানে তোমাদের কালীদা?

তাঁর দিকে ফিরে জ্যোতিরানী মাথা নাড়লেন, মিত্রাদির প্রশ্নের সুরে বিস্ময়ের আভাস কি অপছন্দের, ঠাওর করা গেল না।

সেটা উনিই বুঝিয়ে দিলেন, তড়বড় করে বলে উঠলেন, তাহলে আমি এর মধ্যে নেই, আমাকে বাদ দাও! মুখে সকোপ বিড়ম্বনার হাসি, সর্বকাজে ফোড়ন আর হুলফোটানো সমালোচনার ভাবনা মাথায় নিয়ে আমার দ্বারা কিছু হবে-টবে না বাপু।

জ্যোতিরানীর দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর সজাগ হয়েছে একটু। মিত্রাদি আছে বলেই ওই একজনও এমনি মুখের ওপর জবাব দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন কিনা সেই সংশয় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। হেসেই জবাব দিলেন, তোমার ভাবনা নেই, সেই ভদ্রলোক আমাদের এ-কাজের সঙ্গে No-সম্পর্ক ঘোষণা করেইছেন।

—বাঁচা গেছে। মিত্রাদির এই স্বস্তিবোধের সবটুকু কৃত্রিম কিনা সঠিক বোঝা গেল না।

রাতের শয্যায় আর কোনো জটিল চিন্তার প্রশ্রয় দিতে আপত্তি জ্যোতিরানীর। পাশের ঘরের লোক কাল ফিরছে। সদার ব্যাপারে কৈফিয়ৎ নিতে আসবে কিনা ভেবে কাজ নেই। আগামীদিনের সার্থকতার

চিঠিটাতেই রঙ বেলানোর তাগিদ জ্যোতি-রাণীর। বিষয়সম্পদ আর সঞ্চয়ের হিসেব যা পেলেন মাথা ঘুরে যাবার দাখিল। দু'চার লাখের সম্বল নিয়ে নয়, একটু সহানুভূতি পেলে কালে দিনে দেশকে দেখাবার মতই বড় কিছু গড়ে তোলা যেতে পারে। মিত্রাদির সেদিনের ঠাট্টা মনে পড়ে গেল, টাকা আদায় করে বড়কিছু করার লোভে সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে মালিক বদলা-বদলি করতেও আপত্তি ছিল না তার। নিজের দখলে যা আছে দরকার হলে তার বাইরেও জ্যোতি-রানীই বা আদায় করতে পারবেন না কেন। অবশ্য সে-প্রশ্ন এখন ওঠেই না, কারণ নিজের দখলেই প্রয়োজনের দ্বিগুণ তিনগুণ আছে। তবু আরো যে ঢের আছে সেটাও কম ভরসা নয়।

এতবড় ভরসাটাকে এখন আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করতে চাইলেন জ্যোতিরানী। আশীর্বাদ বই-কি। সর্বদিকই ব্যর্থ হয়ে যায়নি সেটা যেন এই প্রথম অনুভব করলেন তিনি। শুধু নিজের হাতেই যে-সম্বল নিয়ে সংকল্পের দিকে পা বাড়াতে চলেছেন, ওপরঅলার আশীর্বাদ না হলে তাই বা আসত কোথা থেকে?...তাঁর এই পাশের ঘরের মানুষই এমন কিছু করে রেখেছে যা সচরাচর কেউ করতে পারে না। সকালেই কালীদা বলছিলেন, এমন কেরামতি দেখাতে দু'দশ লক্ষের মধ্যেও একজন পারে না। পারে না যে জ্যোতিরানী আজ সেটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছেন, করতে চেষ্টা করছেন।

এই একটি মাত্র কারণে রাতের নিঃসঙ্গ শয্যায় জ্যোতিরানী আজ পাশের ঘরের ওই অনুপস্থিত মানুষটির প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞ।

তবু...

তবু কি একটা বাস্তব আর কার একখানা মুখ নিভৃতের কোন্ অগোচরে অপেক্ষা করছে যেন।

পাশের ঘরের মানুষ কালই আসছে সেই বাস্তব।...মুখটা সদার।

শিবেশ্বর এলেন। একটানা এত বেশি-দিন বাড়ি-ছাড়া কমই হয়েছেন।

তাঁর উপস্থিতিতে বাড়ির হাওয়া যেমন বদলায় একটু তেমনি বদলেছে। জ্যোতিরানী লক্ষ্য রেখেছেন। ওই মুখে বিশেষ পরিবর্তনের ছাপ এঁটে বসতে দেখেছেন ঘন্টাদুই বাদে। শাশুড়ী সম্ভবত ছেলের খাওয়া-দাওয়া সারা হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তারপর মায়ের ঘরের দিকে যেতে দেখেছেন তাঁকে। একটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই, যত টাকাই হোক, মায়ের প্রতি আচরণ বদলায়নি। আগে যেমন, এখনো তেমনি। টান সত্যিই কত জ্যোতিরানী জানেন না, তবু ফাঁক পেলে খোঁজখবর একটুআধটু ওই একজনেরই নিতে দেখেন। অনেকদিন ছিলেন না তাই খাওয়া-দাওয়ার পর বসে দু'চার কথা বলতে গেছলেন হয়ত। অথবা সদাকে না দেখে মনে কিছু খটকা লেগে থাকবে। এমনও হতে পারে খাবারঘরে জ্যোতিরানী সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন বলেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়নি।

থমথমে পরিবর্তন দেখলেন ঘন্টাখানেক বাদে মায়ের ঘর থেকে ফেরার সময়। মুখো-মুখি পড়ে গেছলেন জ্যোতিরানী।...হয়ত বা ইচ্ছে করেই পড়েছিলেন।

বিকেল আর রাতের মধ্যে তারপর অনেকবার দেখা হয়েছে, অনেকবার লক্ষ্য করেছেন জ্যোতিরানী। কেবলই মনে হয়েছে একটা অসহ্য ক্রোধ এক আবরণে নীরবতার আড়াল নিয়েছে। অনেকবারই দেখা হয়েছে কারণ লক্ষ্য আসলে ওই পাশের ঘরের মানুষ তাঁকেই করতে চেয়েছেন। জ্যোতিরানী মুখ তুলতেই তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছেন।

তারপর রাতের শয্যায় অপেক্ষা করেছেন জ্যোতিরানী। প্রবৃত্তির তাড়নায় আসবে কি সদার বিদায়ের কৈফিয়ৎ নিতে জানেন না। জিজ্ঞাসা করলে তিনি কৈফিয়ৎ নেবেন কি দেবেন তাও না। আসবে, এই শুধু ধরে নিয়ে ছিলেন।

কিন্তু ব্যতিক্রম দেখলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, চোখ তাকাতে সকাল।

পরদিন থেকে পরিবর্তনটা আরো ভালো করে দাগ কাটতে থাকল জ্যোতিরানীর মনে। পর্যবেক্ষণের এই রীতি নতুন। মনে হল সামনে এসে দাঁড়াতে চায় না, চোখে চোখ রাখতে চায় না, শুধু অলক্ষ্য থেকেই কিছু যেন দেখে নিতে চায় আর বুঝে নিতে চায়। কখনো ঘরের পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে, কখনো খাবার টেবিলে বসে, কখনো বা জ্যোতিরানীর কাজের ফাঁকে।

কিন্তু অলক্ষ্য থেকে হঠাৎ তিনিই উল্টে আর এক মূর্তি দেখলেন মানুষটার। বিকেলের দিকে বারান্দার ও-ধারের একটা ঘরে পুরনো জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখছিলেন। ওই ঘরে আছেন টের পায়নি সম্ভবত। খুব ধীরে স্থির পায়ে ঘর থেকে এক-একবার তাকে বারান্দার রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেছেন আবার ঘরে ফিরতে দেখেছেন জ্যোতিরানী। অনেকবার মনে হয়েছে চোখে-মুখে ঠিক এই ধরনের উগ্র আক্রোশ আর বুঝি দেখেননি। ঘোলাটে চোখ, দাঁত-চাপা কঠিন দুটো চোয়াল মুখের চামড়া ঠেলে উঁচিয়ে আছে।

হঠাৎ কি মনে হতে অমন আঁতকে উঠলেন জ্যোতিরানী?

হ্যাঁ হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে এই ভয়াল আক্রোশ তাঁর ওপর নয়। তাঁর ওপর হলে মুখে না বলুক, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ওই দুটো চোখ দিয়েই কৈফিয়ৎ তলব করত। তারপর রাত্রিতে আসত। তাঁর প্রতি দুর্বার আক্রোশ আর প্রতিশোধের রীতি একযুগ ধরে খুব ভালো করে জানা আছে। সেই অসহিষ্ণুতার প্রতিটি রেখা চেনেন জ্যোতি-রানী। এই অব্যক্ত ক্রোধ তাহলে হাতের নাগালের মধ্যে যে নেই তার ওপর...সদার ওপর। সদা নেই বা আর আসবে না ভেবে ভয়ানক স্বস্তি বোধ করেছেন জ্যোতিরানী। অনেককাল আগে শাশুড়ীর মুখে শোনা একটা কাহিনী মনে পড়তে স্নায়ু কেঁপে উঠেছিল তাঁর। বউয়ের ওপর আক্রোশে দাদাশ্বশুর আদিত্যরাম তাঁর পুরনো অনুগত সবথেকে বিশ্বস্ত একটা চাকরকে কাটা-চাবুকের আঘাতে আঘাতে নাকি হত্যাই করেছিলেন প্রায়। এই মুখ দেখে জ্যোতি-রানীর সভয়ে মনে হয়েছে, হাতের কাছে পেলে সদারও ওই দশা হতে পারত বুঝি।

আবার বারান্দায় দেখামাত্র ঘর ছেড়ে জ্যোতিরানী আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছেন। দৃষ্টি সরাসরি তার মুখের ওপর। কিন্তু চোখে চোখ পড়তে শিবেশ্বর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তারপর সমনাসামনি হবার আগেই পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকে গেছেন আবার।

জ্যোতিরানী দাঁড়িয়ে সামনের পরদাটাকেই দেখেছেন একটু।

যতক্ষণ ঘুম না আসে, রাতের শয্যা থেকে খোলা দরজার দিকে চোখ রেখেছেন তিনি। কেউ আসেনি। পরদিনও না।

যে জন্যই হোক, জ্যোতিরানী বুঝে নিয়েছেন কৈফিয়ৎ তাঁকে দাখিল করতে হবে না। উল্টে আর একজনেরই বরং কোনো অজ্ঞাত কৈফিয়ৎ এড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু তবু জ্যোতিরানী প্রতীক্ষা করেছেন। সন্ধ্যার আগে স্নান করে পরিচ্ছন্ন বেশবাস করেছেন। যত্ন করে চুল বেঁধেছেন। রাতে খাবারের টেবিলে একজনের লুব্ধ বাসনার গোপন চাঞ্চল্যও অনুভব করেছেন। তারপর বিছানায় শুয়ে দরজার দিকে চোখ রেখেছেন। কৈফিয়ৎ যদি দাখিল করতে না হয়, সদার প্রসঙ্গ তিনিও তুলবেন না। কৌতূহল অসংযত হতে দেবেন না ভেবে রেখেছেন। আসার আগে মানুষটার একটা ক্ষমতার দরুন কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন। সেটুকুই সজাগ রাখতে চেয়েছেন। যে ক্ষমতা না থাকলে প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন বাতুলতার পর্যায়ে পড়ত। জ্যোতিরানী নিজে থেকে একটুও ক্ষোভের প্রসঙ্গ তুলবেন না।...এলে নিঃশব্দে আসে আবার নিঃশব্দেই ফেরে। কিন্তু সম্ভব হলে জ্যোতিরানী কথাও বলবেন। কোনো তিক্ত কথা নয়, কোনো শ্লেষের কথা নয়। তাঁরই সম্পদের জোরে নতুন কিছু করতে যাচ্ছেন তাঁরা, এই সংকল্পটা জানিয়ে রাখবেন।...কালীদার কোনরকম বিরূপ মন্তব্য কানে যাবার আগে জানিয়ে রাখা দরকারও।

কিন্তু পরপর তিন রাত্রের মধ্যেও শিবেশ্বর এলেন না। আশ্চর্য...! সদার বিদায় এর থেকে বেশি আর বুঝি মুখর হয়ে ওঠেনি কখনো।

পরদিন সকাল তখন দশটার কাছাকাছি। শামু এসে খবর দিল নীচের ঘরে বাবু ডাকছেন।

জ্যোতিরানী শামুর মুখের দিকে চেয়েই থমকেছেন একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন, বসার ঘরে আর এক বাবুও এসেছেন।

মাঝেসাজে এরকম ডাক না পড়ে এমন নয়। যেতে হয়, বড়লোকের ঘরণীর মতই আলাপ-পরিচয় করতে হয়, সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। অভ্যাগতের সামনে দুজনেই তখন হাসতে পারেন, কথাবার্তা কইতে পারেন, সহজতা বজায় রেখে চলতে পারেন।

এলেন। অভ্যাগত বিক্রম পাঠক। অনেকদিন পরে এলো। ঘরে পা দিতেই কলরব করে উঠল। ভাবীজীকে অনেকদিন না দেখে তার চোখে চড়া পড়ার দাখিল হয়েছে, ভাবীজীর হাসি না দেখে সময়টা বর্ষাকাল মনে হয়েছে, আর ভাবীজীর ভ্রূকুটি না দেখে সব কাজই নীরস লাগতে শুরু করেছে—তাই সকালে উঠেই ভাবীজী দর্শনের আশায় ছুটে এসেছে।

হাসিমুখে ভ্রূকুটিই করলেন জ্যোতিরানী, সকাল দশটায় উঠে?

শিবেশ্বরের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস, আর দৃষ্টিতে কিছু ফাঁক জোড়ার প্রয়াস। অতঃপর সর্বদিকেই দাদার ভাগ্যের প্রতি চিরাচরিত ছদ্ম ঈর্ষার পর্ব সম্পন্ন করল বিক্রম, তাদের তুলনায় দাদার ভাগ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার মতই উঁচু—এখন ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে হয় দাদাকে। আর তারপর জোরালো আরজি পেশ করল, একটা। কলকাতার হাইয়েস্ট সার্কেলের সবথেকে গণ্যমান্য ক্লাবের রাতের অধিবেশনে দাদার সঙ্গে ভাবীজীকে আজ যোগদান করতেই হবে। স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম অধিবেশন,

> আগামী সংখ্যা থেকে
>
> **শ্রীসুশীল রায়ের**
>
> বড় গল্প
>
> **সামান্য অসামান্য**
>
> প্রকাশিত হবে

অতএব মামুলি ব্যাপার নয়, সভাদের সঙ্গে তাদের ঘর-আলো-করা গৃহিণীরা সকলেই আসবে আজ—কিন্তু ভাবীজী না গেলে সে চোখে অন্ধকার দেখবে।

বছর তিনকে আগে এই ক্লাবে একবারই যাবার কথা হয়েছিল জ্যোতিরানীর—যেবার ঘরের লোকটি কলকাতার বিশিষ্টতম ওই ক্লাবের সভাতালিকাভুক্ত হতে পেরে গৌরববোধ করেছিলেন। শেষপর্যন্ত কেন যে যাননি এখন আর মনে নেই। কিছুকাল আগেও ওই ক্লাবে হাতে-গোনা দু'দশজন ভাগ্যবান ভারতীয় সাহেব ছাড়া দিশি লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্রমে কড়াকড়ি শিথিল হয়েছে, স্বাধীনতার দু'তিন বছর আগে থেকে ভারতীয়রাই দখল নিতে শুরু করেছে, এখন তো তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তবু এই ক্লাবের মর্যাদা আলাদা। সামগ্রিক আভিজাত্যের এত গৌরব আর কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। বিক্রম ওখানে ঢুকতে পেরেছিল শিবেশ্বর চট্টুজ্জের পরের বার—তাঁরই চেষ্টায়। সে প্রিয়পাত্র কারণ শুরু থেকে তারই সঙ্গে ভাগ্যের যোগ। বিক্রমের অবস্থাও ফিরেছে; কাগজের আপিসে চাকরি আর করে না। মস্ত ব্যবসা এখন, আর সেই ব্যবসার দাদাই খোদ পরামর্শদাতা। তবে দাদার নাগাল সে এই জীবনে আর পেল না, এই খেদ তার মুখে প্রায়ই শোনা যায়।

সাগ্রহে ঝুঁকে বসল বিক্রম পাঠক, ভাবীজী, সে ইয়েস! দাদা আমাকে বলল বলে দেখো যাবে কি না, আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, আলবৎ যাবে—দাদার কাছে আমার প্রেস্টিজ্ নষ্ট কোরো না।

বিক্রম বাঙালী নয়, উচ্ছ্বাসের মুখে আপনি-তুমির জের রাখে না। জ্যোতিরানীর কানে এখন আর লাগে না সেটা। পাশের মানুষের দিকে না তাকিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করলেন, কিছুই তো শুনিনি, আপনার দাদারই হয়ত আমাকে নেবার ইচ্ছে নেই।

বিক্রম চোখ পাকালো তৎক্ষণাৎ, দাদা ইজ্ এ স্কাউন্ড্রেল্! বাট্ ফর মি—সে ইয়েস!

জ্যোতিরানী ভেবে নিলেন কি। এসব যোগাযোগ এখন হেলাফেলা করা ঠিক নয় বটে, অনেক কাজে লাগতে পারে। এই বিক্রমকেও তাঁর দরকার হবে মনে হল। হেসে জবাব দিলেন, যাব কিন্তু আমার কিছু কাজ আপনাকে করে দিতে হবে।

—হুররে! অল্ওয়েজ্ ইওর সার্ভেন্ট, ফরমাইয়ে।

—এখন নয় পরে বলব।

শিবেশ্বরের দৃষ্টি আবার এদিকে, প্রচ্ছন্ন কৌতূহল। কাগজ-পত্র হাতে কালীদাকে পাশের খাস ড্রইং-রুমে ঢুকতে দেখা গেল। অর্থাৎ কিছু সই-সাবুদ করতে হবে। শিবেশ্বর ওঠার ফাঁক পেয়ে খুশি একটু। বিক্রমের দিকে ফিরে উঠে দাঁড়ালেন, কথা বলো, আমি ততক্ষণে কাজ সারি...আজ বিকেলে তুমি এখানেই চলে এসো, একসঙ্গে যাওয়া যাবে—

বিক্রমের মুখ দেখে জ্যোতিরানীর কেমন ধারণা হল এ-প্রস্তাবটা পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। তবু সানন্দে সায় দিল সে, থ্যাঙ্ক্ ইউ—

শিবেশ্বর ঘরের বাইরে পা দিতেই উৎফুল্ল মুখে সামনের দিকে ঝুঁকল।—ব্যাপারটা কি জানো ভাবীজী, আমাদের একটা মতলব আছে। এতবড় নামজাদা এরিস্টোক্রাট ক্লাব, ভারতের সেরা বলতে পরো—এখানে গুণী লোকেরও অভাব নেই মাল্টি-মিলিয়নেয়ারেরও না—কিন্তু দাদার মত এমন মাথাওয়ালা লোক আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ। তাই আমরা ঠিক করেছি সামনের ইলেকশনে দাদাকে প্রেসিডেন্ট করার জন্য আদা-জল খেয়ে লাগব। যদি পারি, দাদাই প্রথম ওই ক্লাবের বাঙালী প্রেসিডেন্ট।

দাদার সৌভাগ্য কল্পনা করেই বিক্রমের মুখ উদ্ভাসিত। বলে গেল, এইজন্যেই দাদাকে একটু পপুলার করা দরকার, পাঁচ-জনের সংগে আলাপ পরিচয় না করে তুমি ঘরে বসে থাকলে চলে! একি সোজা অনার নাকি? এখনকার প্রেসিডেণ্ট থাদানি ব্যাটার বউ আগের ইলেক্শনে অনেক আগে থাকতে সকলের সংগে শুধু সোশ্যাল রিলেশন চালিয়েই কেমন প্রোপাগেন্ডাটি করেছিল জানো?

জ্যোতিরানী ফাঁপরে পড়লেন যেন, কিন্তু আমার দ্বারা প্রোপাগেন্ডা-টোপাগেন্ডা হবে না তো।

—কিছু দরকার নেই, কিছু দরকার নেই, সোৎসাহে কাবাই করে উঠল বিক্রম পাঠক, হোয়েন ফুল মুন ইজ দেয়ার, স্টারস্ আর বাট এন্জেলস্ মিউট্। তুমি

দাদার পাশে একটু-আধটু থাকলেই তখন প্রোপাগেন্ডা হবে।

পেটে রাঙা-জল না পড়লে বিক্রম পাঠক চতুর বাক্-কুশলী।

বিকেলে প্রস্তুত হবার আগে জ্যোতিরানীর অনেকবার মনে হয়েছে, পাশের ঘরের পরদা ঠেলে একবার জিজ্ঞাসা করে আসেন, অমন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অধিবেশনে বিশেষরকমের সাজসজ্জা কিছু করতে হবে কিনা। পারা গেল না। ঠিক সন্ধ্যায় বেরুবার কথা। জ্যোতিরানী প্রস্তুত।

তকতকে চাঁপারঙের একটা দামী শিফন পরেছেন, গায়ে জ্বলজ্বলে সাদা চুমকি বসানো চাঁপা-রঙেরই পুরু ব্রোকেটের ব্লাউস। গায়ের রঙে শাড়ির রঙে মিশে আছে—ব্লাউসের চুমকিতে সাদা আলো ঠিকরোচ্ছে। দু'হাতে একটি করে হীরের বালা, দু'হাতের আঙুলে দুটো হীরের আংটি, কানে দুটো হীরের দুল, গলায় বড় একটা হীরের লকেট ঝোলানো হার, পায়ে জরির কাজ-করা চাঁপা-রঙা স্যান্ডাল। ...পছন্দ হবে কিনা কে জানে, কিন্তু এতেই লজ্জা-লজ্জা করছে জ্যোতিরানীর।

খবর পেলেন নীচে বিক্রম এসে বসে আছে। সে নিজেও দামী গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়। তাকে এখানে আসতে বলার একটাই কারণ খুঁজে পেলেন জ্যোতিরানী। পাছে কোনো কারণে আবার তিনি যাবেন না বলে বসেন সেই আশংকায় এই ব্যবস্থা।

শিবেশ্বর বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। জ্যোতিরানী ঘর থেকে বেরোলেন। পলকের দৃষ্টি-বিভ্রম থেকেই বুঝে নিলেন সাজ-সজ্জা পছন্দ হয়েছে। মর্যাদার গাম্ভীর্যে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার রীতিও কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলতে দেখেছেন।

আর, তাঁকে দেখে ফাজিল বিক্রম পাঠক হাত-পা আরো এলিয়ে দিয়ে সোফায় বসেই থাকল, আচমকা শেলবিদ্ধ যেন। গাম্ভীর্য সত্ত্বেও শিবেশ্বরের ঠোঁটে হাসি, চলো, দেরি হয়ে গেল—

নিজের গাড়ি ক্লাবে চলে যেতে নির্দেশ দিয়ে বিক্রম এই গাড়িতে উঠল। দু'পাশে দু'জন, মাঝে জ্যোতিরানী। উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, দাদা, কালকের কাগজে কটা মেম্বারের যে হার্টফেলের খবর বেরুবে ঠিক নেই।

জ্যোতিরানী সকোপে তাকালেন তার দিকে, গাড়ি থামাতে বলুন, নেমে যাই। বিক্রম হাসতে লাগল, কি মনে পড়তে ঈষৎ বিস্ময়ে জ্যোতিরানী জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী এলেন না যে?

বিক্রম গম্ভীর তৎক্ষণাৎ, তিনি হাসপাতালে।

যেভাবে বলল, এই হাসপাতালের অর্থ তক্ষুনি বোঝা গেল। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে শিবেশ্বর স্ত্রীর মুখে লালচে আভা দেখেছেন।

বিশিষ্ট স্থানের বিশেষ অধিবেশনেই বটে। একসংগে এত ছেঁকে-তোলা গণ্যমান্য অভিজাত সমাবেশে জ্যোতিরানী আর আসেননি। একে একে বহু মিসেস-যুক্ত মিস্টারের সংগে পরিচয় হল। কেউ শিল্পপতি, কেউ নামজাদা ব্যবসায়ী, কেউ মস্ত ডিরেক্টর কোনো কোম্পানীর, কেউ দশ-বার বিলেত-জার্মানী ফেরত নামকরা ডাক্তার কেউ বা ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। কর্মজীবনে অসার্থক একটি মুখও নেই এখানে। তাঁকে আনার একটা তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছেন। কুরূপ পুরুষ যদিও দুই-একজন চোখে পড়ছে, কুরূপা রমণী একটিও নেই বললে চলে। তবু যে-ভদ্রলোকের সঙ্গেই বিক্রম পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মার্জিতখুশির রূপটা একটু বেশি প্রসারিত হতে দেখেছেন জ্যোতিরানী। এসে দাঁড়ানো-মাত্র শুধু পুরুষের নয়, বহুজোড়া রমণীর চোখও ছেঁকে ধরেছিল। অবশ্য তার মধ্যেও সুমার্জিত ব্যবধান ছিলই। তারপর আলাপে অনেকের আগ্রহ দেখা গেছে—অবাঙালী অনেকের সংগে হাত মেলাতেও হয়েছে। আসন নিয়ে জ্যোতিরানী অনেককেই লক্ষ্য করেছেন। তাঁর ঘরের লোকের মত টাকার জোর এখানে অনেকেরই হয়ত, ঢের বেশি জোরও থাকা সম্ভব অনেকের। তাই টাকা এখানে শুধু প্রবেশপত্রের মত, এখানকার চটক আলাদা। তাঁর পাশে বিক্রম। তারপর শিবেশ্বর বসেছেন। অলক্ষ্যে জ্যোতিরানী ওই মুখখানাও নিরীক্ষণ করেছেন বইকি। ঠিক কোন্ মর্যাদার প্রত্যাশায় বিক্রমের মারফৎ তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, না দেখলে অনুমান করা যেত না। অথচ বাইরে মুখখানা প্রায় নির্লিপ্ত। অনেক বিশিষ্টবর্গ 'ওয়াইফ'কে আগে আর না আনার জন্য মার্জিত কৌতুকে তাঁকে অনুযোগ করেছেন, জ্যোতিরানী নিজের কানে শুনেছেন।

পান হল গোটা দুই, জনা কয়েকের ভাষণ হল, স্বাধীনতার নতুন কর্তব্য নতুন দায়িত্ব প্রসংগে সচেতন করালেন কেউ কেউ। এটা শুধু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের শিক্ষার স্বাস্থ্যের আর সংস্কৃতির খাতে বছরে যে মোটা টাকা খরচ হয় এখান থেকে—তার সার্থকতারও নজির উপস্থিত

করলেন দুই একজন। শুনতে শুনতে জ্যোতিরানীর হঠাৎ মনে হল, এদের কেউ কি কখনো বীথি ঘোষকে দেখেছে? শমী বোসকে দেখেছে?

জলযোগান্তে বিদায়পর্ব। এই পর্বেও জনাকতক হোমরাচোমরা সভ্যের সবিনয় দাবীর ফলে হাসিমুখে আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে হল জ্যোতিরানীকে। কোন্ সহযোগিতার প্রত্যাশী তারা ধারণাও নেই। বিক্রম এক ফাঁকে চুপি-চুপি উল্লাস প্রকাশ করল, কেমন বলেছিলাম কি না?

হাসি চেপে জ্যোতিরানী জবাব দিয়েছেন, কারা কারা এসেছেন এখানে সব হিসেব রাখবেন, এ'দের সকলকে আমার দরকার হতে পারে। কাজের কথা মনে আছে তো?

বিক্রমের মুখে সেই প্রগল্ভ উচ্ছ্বাস। —অলওয়েজ্ ইয়োর সারভেন্ট মাদাম, দরকার হলে তো ওরা বর্তে যাবে! কিন্তু কি ব্যাপার?

জ্যোতিরানী হেসে মাথা নাড়লেন, এখন না। পরে।

রাত্রি।

পাশের ঘরের মানুষের এই রাতে এ-ঘরে পদার্পণ ঘটবে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাবার সময় মনে হয়েছে, অধিবেশনে বসে মনে হয়েছে, ফেরার সময় আরো বেশি মনে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যে-মূর্তিটা সামনে এগিয়ে আসতে চেয়েছে, সেটা সদার মুখ। জ্যোতিরানী ঠেলে সরিয়েছেন।

ঘরে নীল আলো জ্বলছে। সেই অল্প আলোয় শয্যায় উপুড় হয়ে বুক-চেপে শুয়ে 'এ পিক্চার দ্যাট্ ফ্যানস্ উইল নট সী' পড়ছেন। নীল আলোয় পড়ার তাৎপর্য, পড়তে পড়তে ঘুম যদি এসে যায় তো গেলই। কিন্তু ঘুম আসার অনেক আগেই যে কেউ আসবে সন্দেহ নেই।

এলেন। জ্যোতিরানী বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন।

অন্ধকারে আনাগোনা করে অভ্যস্ত। তাই মুখে বিব্রত হাসির আভাস, আলপেও একেবারে অনিচ্ছা নেই মনে হল। ধীরে-সুস্থে বিছানায় বসে মন্তব্য করলেন, এই আলোয় পড়া উচিত নয়।...কি বই?

মুখের রেখাগুলোর সহজ অবস্থান একটুও নড়তে দিতে চান না জ্যোতিরানী, কিন্তু সেটা আয়াসসাপেক্ষ ব্যাপার যেন। জবাবে বইয়ের মলাটটা উল্টে দেখালেন।

ঝুঁকে নাম দেখতে হল যখন কাছে আর একটু আসতে হয়েছে বইকি।—ভালো বই?

মৃদু হাসি টেনে জ্যোতিরানী বললেন, মজার বই।

চুপচাপ দুই-এক মুহূর্ত। নীরবতার অস্বস্তি দুজনেরই। সহজ সুরেই জ্যোতিরানীর যা মাথায় এলো তাই বললেন, দিল্লী থেকে ফিরতে এবারে অনেক দেরি হল।

—হ্যাঁ, অনেকগুলো কাজ সেরে এলাম। ক্লাবে কি-রকম লাগল?

উপুড় হয়ে ছিলেন, সোজা হয়ে বালিশে শুলেন জ্যোতিরানী।—ভালোই। মস্ত ব্যাপার দেখলাম, এবারে তোমাকে প্রেসিডেন্ট করার ইচ্ছে শুনলাম ওদের?

শিবেশ্বর সচকিত একটু, বিক্রমটা বললে বুঝি?...সহজ ব্যাপার নয়, ভালো কথা, ওকে কি কাজের কথা বলছিলে সকালে?

মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জ্যোতিরানী।—কিছু টাকা তুলতে বলব, আমি আর মিত্রাদি একটা ব্যাপারে হাত দিতে যাচ্ছি।...তোমার টাকাতেই আরম্ভ করব অবশ্য।

এই সুরের আলাপ কি বছর কয়েকের মধ্যে হয়েছে? কোনদিনও হয়েছে কিনা জ্যোতিরানীর মনে পড়ে না। টাকা চাই বলতে কত টাকা বলেন নি, শিবেশ্বরও সামান্য ব্যাপার ধরে নিলেন। লুব্ধ দৃষ্টিটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অবাধ্য হয়ে উঠছে তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে চেকবইটই এক-আধটা নেই কিছু?

—আছে। সবই যে আছে তা বললেন না।

কিছু যেন মনে পড়ল শিবেশ্বরের, বললেন, সদাটা হঠাৎ চলে গেল...তোমাকে কিছু বলে গেছে নাকি?

নিমেষের জন্য দুই চোখ ওই মুখের ওপর প্রসারিত হল জ্যোতিরানীর। আপসের এই গোছের মুখ কোথায় দেখেছিলেন? মনে পড়ল। অনেক দিন হয়ে গেছে, অনেক বছর। তবু মনে পড়ল।...কথা বার করে নেবার উদ্দেশ্যে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছিল. অনেক কথা বলেছিল, তারপর অনেকটা এই সুরে শোভাদার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু জ্যোতিরানী কিছুই মনে রাখতে চান না। উপার্জনের যে ক্ষমতার কথা ভেবে গতরাতে কৃতজ্ঞবোধ করেছিলেন, এখনো সেটুকুই ধরে রাখতে চান শুধু।

—না, বলল তো বয়েস হয়েছে, আর পারছে না। তুমি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, তাও থাকল না। এত কালের লোক এভাবে চলে গেল কেন ভেবে পাচ্ছি না।

সংশয় একেবারে গেল না হয়ত, তবু অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে হল জ্যোতিরানীর। ঘরে আসার পরেও যে বিড়ম্বনার ছায়া দেখেছিলেন মুখে, এই জবাব পেয়ে সেটুকু সরে যেতে লাগল। লুব্ধ অবাধ্য দৃষ্টিটাকে বশে রাখারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে যেন।

সবুজ আলোটা নিজেরই এখন খারাপ লাগছে জ্যোতিরানীর।

...তিনি কৃতজ্ঞ বটে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে এক যুগের বিনিময়শূন্য নিভৃত অভ্যর্থনার রীতি বদলান সহজ নয়।

তবু, আর সব রাতের মত এই রাতেও অপূর্ণতার হিংস্র ক্ষোভ নিয়েই ফিরে যায় নি হয়ত। জ্যোতিরানীর এমনও মনে হয়েছিল রাতটা বুঝি এ-ঘরের এই শয্যার আশ্রয়েই কাটিয়ে যাবে।...না, নেমে গেছে এক সময়।

এতক্ষণ ধরে যে অবাধ্য প্রশ্ন আর চিন্তাগুলোর দিক থেকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন জ্যোতিরানী, ঘরের বাইরে পা দেওয়া মাত্র সেগুলো ভিতর ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইছে। দিল্লী থেকে ফেরার পর কটা দিনের অস্বাভাবিক আচরণ। অসহ্য রাগে ফুঁসেছে, আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াতে চায় নি, মায়ের নালিশ সত্ত্বেও কৈফিয়ৎ নিতে আসে নি। কেন? রাতে ছেলের পিঠের ছাল তুলে সকালে উঠেই সদাকে চাবুক মেরে তাড়াবে বলে শাসানো হয়েছিল কেন? সদা মুখের ওপর অত কথা বলে গেল কেন? সদা গেল কেন?

না—জ্যোতিরানী কিছু চিন্তা করতে চান না, কিছুই ভাবতে চান না। তিনি কৃতজ্ঞ। বীথিরা যদি হাসে, শমীরা যদি হাসে, তিনি কৃতজ্ঞই থাকবেন। চিন্তা করার অনেক কিছু আছে, ভাবার মত অনেক কিছু আছে।...নাম কি হবে প্রতিষ্ঠানের? খুব সুন্দর নাম চাই একটা। ভাবতে লাগলেন। মনের মত একটা নাম এক্ষুনি পাওয়া দরকার যেন।

সচকিত হঠাৎ। কি মনে পড়তে গায়ের রোমে রোমে শিহরণ। শ্বশুরের কথা। আর কেউ শোনে নি। শাশুড়ী না, ছেলে না, কালীদা না, মামাশ্বশুর না। চোখ বোজার দু' রাত আগে তাঁর দিকে চেয়ে শ্বশুর শুধু তাঁকেই বলে গেছলেন কথাগুলো।... মামাবাবু আর কালীদা এক ফাঁকে খেয়ে আসতে গেছেন, শাশুড়ী আহ্নিকে, ছেলে আসে নি, নাতি পাশের ঘরে ঘুমিয়ে। হঠাৎ দেখেন ঘোলাটে চোখ মেলে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন শ্বশুর। জ্যোতিরানী তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকেছেন, বুকে হাত রেখেছেন। সেই হাতের ওপর শ্বশুর নিজের একখানা হাত রাখতে পেরেছেন। তারপর মৃদু স্পষ্ট গলায় বলেছেন, প্রভুজী আছেন। দরকারে তাঁকে ডেকো। আমার মা ডেকেছিলেন। তিনি এসেছিলেন। প্রভুজী আমাদের ছেড়ে যান নি।

শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন জ্যোতিরানী। কি যেন ভাবছিলেন তিনি...বীথিরা যেখানে শোক ভুলবে, শমীরা যেখানে হাসবে, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম চাই একটা।

...নাম যদি হয় প্রভুজীধাম?

(ক্রমশঃ)

ব্যালে নৃত্য ও সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ

নীহারবিন্দু চৌধুরী

সঙ্গীত ও নৃত্যের সুখময় মিলন থেকেই ব্যালে বা নৃত্য-নাট্যের উদ্ভব। ইউরোপীয় শিল্প-সমালোচকদের মতে নৃত্যনাট্য সকল ললিত কলার মধ্যমণি। নৃত্যনাট্য সব চাইতে সুষমামণ্ডিত ও সৌন্দর্যান্বিত। সুললিত সঙ্গীতসমৃদ্ধ নৃত্যনাট্য নয়নাভিরাম, কর্ণাভিরাম, ও চিত্তাভিরাম। নৃত্যনাট্য-শিল্পীদের বর্ণাঢ্য-বিনোদ বেশ চিত্তহারী হয়ে থাকে।

নৃত্যনাট্যের নয়নানন্দ রূপ দেখে বিমুগ্ধ হয় না এমন লোকের অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য। ইউরোপীয় শিল্পকলার মধ্যে ব্যালে বা নৃত্যনাট্য গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্য জগতের সীমাতিক্রম করে ব্যালে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পানুরাগীদের চিত্তাকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। অপেরার ন্যায় ব্যালের আবির্ভাবও ইতালীতেই। কারো কারো মতে প্রাচীন রোমক পল্লী-নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যসম্বলিত প্রহসনাভিনয় থেকেই আধুনিক ব্যালের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন ইংলণ্ডেও সাম্প্রতিক ব্যালের পূর্বতন রূপের সন্ধান মেলে।

নৃত্যনাট্যের জন্মস্থান ইতালী হলেও ফ্রান্সেই এর আদর ও বিকাশ। ফরাসী রাজন্যবর্গেরা নৃত্যনাট্যের প্রভূত উন্নতি বিধান ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফরাসী রাজদরবারগুলিতে ব্যালের অভূতপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। সামন্তরাজ ও অভিজাত জমিদার সম্প্রদায় এই শিল্পের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। ফরাসী রাজ-দরবারের ক্যাথারিন দ্য মেদিসি ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরী থেকে নৃত্যনাট্যের ঐতিহ্য বহন করে আনেন।

দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর নৃত্য-বিলাসিনী সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন ইতালী থেকে বহু নৃত্যবিশারদ, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্য পরি-কল্পক প্রভৃতি গুণীবৃন্দকে আনয়ন করেন। তিনি বিশেষভাবে তাঁর তিন পুত্রের চিত্ত-বিনোদনের জন্য নৃত্য-সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠান ও এই বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্যই ইতালী থেকে নৃত্যকলাবিদদের আমন্ত্রণ করে আনেন। ক্যাথারিনের এই পুত্রত্রয় পরবর্তী-কালে ফরাসী রাজ্যপাটে অধিষ্ঠিত হন।

সঙ্গীতানুরাগিণী ক্যাথারিন ইতালী থেকে বিশিষ্ট বেহালা বাদক ও নৃত্য-পরিকল্পনা-রচয়িতা বালথাজারকে চাকুরী দিয়ে নিয়ে আসেন। বালথাজার সাহিত্যিক, সঙ্গীতকোবিদ, চিত্রকর প্রভৃতি গুণীদের নিয়োগ করে ব্যালের প্রচুর উন্নতি বিধান করেন। এইভাবে ফরাসী ব্যালে সারা ইউরোপে আদর্শরূপে স্বীকৃতি পায়। এবং ফরাসী শিল্পীদের প্রচেষ্টায় ব্যালে-জগতে এক অভিনব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় ব্যালের ইতিহাসে হোল এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন।

পূর্বে দরবারী ব্যালেতে শুধু সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠান ও পৃথক নৃত্যের অনুষ্ঠান হত; কিন্তু ক্যাথারিনের সময় ব্যালেতে নৃত্য ও নাটকের শুভ পরিণয় সংঘটিত হয়। এই সময় থেকেই নৃত্যের

মাধ্যমে গল্প ও নাটকীয় বিষয় পরিবেশিত হতে থাকে।

ফরাসী সম্রাট চতুর্থ হেনরী নিজেই একজন নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী ব্যালের কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাঁর পুত্র ত্রয়োদশ লুই-এর রাজত্বকালে নৃত্যনাট্যের অবনতি ঘটে—এ সময় এই শিল্প খানিকটা স্থূল ও নিম্নরুচির পরিচয়বাহী হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য তাঁর উত্তরাধিকারী সম্রাট চতুর্দশ লুই পুনরায় ব্যালেশিল্পের বিকাশসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। একাধিকক্রমে বিশ বৎসর সম্রাট স্বয়ং নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং স্বভাবতঃই পারিষদবর্গও তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে নৃত্যকলার পরিপোষকতা করেছিলেন। সেই সময়

একটি রমণীয় ভঙ্গীমায়

ইউরোপের অন্যান্য রাজদরবারগুলিও ফরাসী রাজদরবারের নৃত্যকলা-রীতি অনুসরণ করত। শেষের দিকে নানা কারণে চতুর্দশ লুই নৃত্যের প্রতি আগ্রহশূন্য হয়ে পড়েন এবং এর ফলশ্রুতি স্বরূপ দরবারের হোমরাচোমরারাও নৃত্যনাট্যের প্রতি ঔদাসীন্য দেখতে শুরু করেন। এতে ফল দাঁড়াল এই যে, দরবারী নৃত্য অবশেষে পাবলিক স্টেজে আশ্রয়লাভ করল।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট চতুর্দশ লুই নৃত্যনাট্যের একটি অ্যাকাদামি স্থাপন করেন। ব্যালের ইতিহাসে এই বৎসরটি একটি স্মরণীয় বৎসর রূপে সুচিহ্নিত থাকবে। সুখ্যাত নৃত্যশিক্ষক ও নৃত্যচিন্তক পিয়ের বিচাম (১৬৩৯-১৭০৫) এই আকাদামির প্রথম পরিচালকরূপে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি দরবারের ব্যালের ও নৃত্যসংচালকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ঐ সময় আকাদামিতে যে ব্যালের অনুষ্ঠান হত তাতে অপেরার প্রভাবই বেশী থাকত। সঙ্গে সঙ্গে এ সময় ব্যালে তার নিজস্ব রূপকল্পেরও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছিল।

রাশিয়ায় ক্যাথারিন প্রথমার (পিটার দি গ্রেটের বিধবা পত্নী) সময়ই প্রকৃত ব্যালের প্রবর্তন হয়। কিন্তু আসল উন্নতি হয় তাঁর উত্তরাধিকারিণী সাম্রাজ্ঞী আনার জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায়। ব্যালের আদি যুগে পৌরাণিক কাহিনী ও রূপকথার থেকে তার আখ্যানভাগ সংগৃহীত হত। তখন মুখোশ ও সাজ-পোশাক ছিল নৃত্যের বাধাস্বরূপ।

১৭২১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের অপেরায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ঐ সময় লা কামারগো নাম্নী এক বিখ্যাত নৃত্য-পটীয়সী এমন একপ্রকার নতুন পোশাক ব্যবহার করেছিলেন—যা নাকি পূর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ অভিনব রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ঐ পোশাকে নৃত্যরতা সুন্দরী যুবতীদের পদপ্রান্তযুগল আজানু অনাবৃত থাকত। তখনকার দিনে ঐটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

আটসাট পোশাক থেকে মুক্তি লাভ করে নৃত্যশিল্পীরা মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় তাদের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি অবাধে চালনা করতে পেরেছিলেন। এবং এতে প্রায় নগ্নঅবয়ব শিল্পীদের দেহসৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই উদ্ঘাটিত হতে পেরেছিল। অধিকন্তু অনাবৃত দেহের শালীন অঙ্গভঙ্গী নৃত্যের এক প্রধান উপজীব্য বিষয় রূপে প্রাধান্য পেল।

আকাদামির নেতৃত্বে নৃত্যের আঙ্গিক ও কলা-কৌশলের প্রভূত উন্নতি হয়। প্রখ্যাত নৃত্য-তারকা ও ব্যালে-মাস্টারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যালের মান আশাতীত উন্নীত হয়েছিল। জীন জর্জ নভেরী (১৭২৭-১৮০৯) নামে একজন নৃত্যনাট্য-বিশেষজ্ঞ ঐ সময় নৃত্য-জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। প্যারিসে জন্মগ্রহণ করলেও আসলে তিনি ছিলেন সুইডিশ। তিনিই প্রথম যিনি ব্যালেকে চারুশিল্পের মর্যাদায় ভূষিত করেন। সুরেকার গ্লুক অপেরায় যে সংস্কার সাধন করেছিলেন—ব্যালের ক্ষেত্রেও জর্জ নভেরী তুলনীয়ভাবে ঠিক সেইরূপই করছিলেন।

নভেরীর প্রভাব ইউরোপীয় ব্যালের উপর পুরোমাত্রায়ই পড়েছিল। চিরায়ত

ব্যালের একটি আবেগময় মুহূর্ত

নৃত্যের ক্ষেত্রেও তিনি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ফরাসী বিপ্লবের জন্য ব্যালে শিল্প প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। প্যারিস ছিল ব্যালের প্রাণকেন্দ্র—আবার ফরাসী বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্রও ছিল ঐ প্যারিস নগরী।

১৭৯১ খৃঃ থেকে ব্যালের প্রাণকেন্দ্র ইতালীতে স্থানান্তরিত হয়। ভেনিশ নগরে ভিগানো নামে একজন প্রথিতনামা নটগুরু ঐ সময় ব্যালের নানাবিধ সংস্কার সাধনে ব্রতী ছিলেন। পরবর্তীকালে ইতালীর নৃত্য-ভঙ্গীমা রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। এনরিকো কেচেত্তী (১৮৫৬-১৯২৫ খৃঃ) সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাজকীয় ব্যালের খ্যাতনামা নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। ইতালীয় নৃত্যের কলা-কৌশল রাশিয়ায় প্রবর্তন করে তিনি পথ-প্রদর্শকের গৌরবার্জন করেন।

১৯০৯ খৃঃ থেকে কেচেত্তী বিখ্যাত ডিয়াঘিলেভ কোম্পানীর ব্যালে-মাস্টার রূপে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র উচ্চাঙ্গ ব্যালের যে গঠন-রীতি দেখা যায় তার বেশীর ভাগই তিনি প্রবর্তন করেন

এবং এই কৃতিত্বের দাবীদারও তিনিই। এই নটগুরু দীপ্র প্রতিভার আকর ছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে ফরাসী ব্যালের রূপ খানিকটা প্রাণহীন, স্তিমিত ও গতানুগতিক হয়ে পড়ে। কিন্তু ফরাসী রোম্যান্টিসিজমের পর থেকে—আবার প্যারিস ব্যালের জগতে তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে।

ক্রমে ক্রমে রাশিয়ায় ব্যালে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্যকলা আনন্দ বিতরণের একটি লোকপ্রিয় মাধ্যম রূপে রাশিয়ায় গণ্য হত। ক্যাথারিন দি গ্রেটের সময় থেকেই অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের দাস ও অনুচরদের শিক্ষা দিয়ে নিজেদের ব্যালেদল গঠন করতেন। এভাবে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রাশিয়ায় ব্যালের সঙ্গে সর্বসাধারণের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল।

রাশিয়ায় লোকনৃত্যও খুব জনপ্রিয়। লোকনৃত্যও সেখানে ব্যালের উন্নতিতে নিয়ামক শক্তির ভূমিকা পালন করে। রুশ রাজদরবারও ব্যালের প্রসারকল্পে দরাজহস্তে অর্থসাহায্য করে ও নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দানে তাকে অগ্রসরী করে তোলে।

রাশিয়ার নৃত্যসাম্রাজ্ঞী আনা পাভলোভা (১৮৮২-১৯৩১) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা লাস্যময়ী সুন্দরী নটী (ব্যালেরিনা) রূপে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। নৃত্যপটীয়সী আনা পাভলোভা আজ পর্যন্ত

ব্যালের একটি জনপ্রিয় মুদ্রা

সারা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৃত্যপ্রতিভা রূপে স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় মেসিনী নামে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৃত্যগুরু ও কারিয়োগ্রাফার সংধ্বনি নৃত্যনাট্যের (সিম্ফনি ব্যলে) প্রচলন করেন। সের্গেই ডিয়াখিলেভ (১৮৭২-১৯২৯) রুশীয় ব্যালের সুউন্নতি কল্পে যথেষ্ট মনোযোগপরায়ন হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে একটি রম্য চিত্রকলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রুশ সঙ্গীত-শিল্পীদের নিয়ে প্যারিসে যান—এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রুশ অপেরা নিয়েও তিনি প্যারিসে যান। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত রুশ গায়ক শালিয়াপিন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। ভাসলে নিজিনস্কিও রুশ ব্যালের অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

ইতালী, ফ্রান্স, রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা, জার্মেনী প্রভৃতি দেশে ব্যালের অসামান্য প্রগতি ঘটছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে ব্যালের ও ব্যালেরিনার স্থান খুবই উঁচুতে। ইউরোপীয় দিকপাল সুর-স্রস্টারাও ব্যালের জন্য বহু মধুর ও ছন্দোময় সংগীত রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে সুরকার লিস্ত, ডেবুসী, স্ট্রাউস, চাইকভস্কি, রিমস্কিকর্সাকফ, রাভেল, বিথোভেন, স্ট্রাভিনস্কি, ওয়েবার, হ্যান্ডেল, শোপা, ব্রামস, প্রকোফিয়েফ প্রভৃতি গুণীবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যালের নৃত্য-কৌশলের সঙ্গে শারীরিক ব্যায়ামের (অ্যাক্রোব্যাটস) বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল-প্রদর্শনী ভাবরহিত হয়ে থাকে; কিন্তু ব্যালে বা নৃত্যনাট্য কলা বিবিধ রস ও ভাবান্বিত হয়। ব্যালেতে ললিত শিল্পের পরাকাষ্ঠা সূচিত হয়। ব্যালে অতীব প্রিয়দর্শন ও মনোরঞ্জক হয়ে থাকে। ব্যালের নটগোষ্ঠী আনন্দমেলা সৃষ্টিতে পারংগম।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ব্যালের আংশিক অনুসরণ করে গুটি কয়েক নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। আধুনিক যুগে নৃত্যনাট্য প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই বিষয়ে তিনিই প্রথম উৎসাহক ও পথিকৃৎ। তাঁর রচিত নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। নাট্যাচার্য রূপে রবীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যালে নৃত্য একক, দ্বৈত, ত্রয়ী ও যৌথভাবে সম্পাদিত হয়। একক নর্তকীর নৃত্যের সময় কালো পোষাক পরিহিত পুরুষ সহকারীর প্রয়োজন হয়। ব্যালের মাধ্যমে একটি বিশেষ ভাবকে রূপায়িত করা হয়। কখনো কখনো ব্যালের সাহায্যে একটি কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বা পূর্ণাঙ্গ নাটকও ব্যালের মাধ্যমে লীলায়িত। প্রাণবন্ত সঙ্গীত, নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রা ও নট-নটীদের যৌবন-দীপ্ত দেহসৌষ্ঠবই ব্যালে বা নৃত্যনাট্যের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের নৃত্য-পরায়ণা তরুণীদের (দেবদাসী) 'বালা' বলা হয়। ইউরোপীয় 'ব্যালের' সঙ্গে 'বালা' শব্দের ভাষাগত সাদৃশ্য তাৎপর্যবহ।

সুধীরকুমার চৌধুরী

আমার এক গুজরাটী বন্ধু 'দুটো বাজতে দশ মিনিট' ও 'দুটো বেজে দশ মিনিট' এই দুটো কথাকেই হিন্দীতে "দো বাজকে দশ মিনিট" বলতেন। অবশ্য "দো বাজকে দশ মিনিট আগে" গাড়ী নিয়ে আসার হুকুম পেলে তাঁর ড্রাইভার ঠিক সময়েই গাড়ী এনে হাজির করত। কথাটা অভিধানসম্মত না হলেও তার বুঝতে কিছুই অসুবিধা হত না।

আমাদের ভাষায় অভিধানসম্মতভাবেই কতগুলি কথার পরস্পর-বিরোধী বা প্রায় বিরোধী অর্থ হয়, আবার আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বা প্রায়-বিরোধী কতগুলি কথা প্রয়োগ হয় একই অর্থে। অর্থটা প্রয়োগের ক্ষেত্র বিচার করে বুঝে নিতে হয়।

মণ্টু কবে এল?

কাল।

ফিরে যাবে কবে?

কাল।

গতকালও কাল, আগামীকালও কাল। বিগত এবং আগামী পরশু-তরশুও তাই। মণ্টু আগামীকাল এসেছে এবং গতকাল ফিরে যাবে, তা ত হতে পারে না? তাই উপরের কথাগুলির মধ্যে কোন্ কালটা বিগত এবং কোন্‌টা যে অনাগত তা বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয় না।

ধরুন 'সিতিকণ্ঠ' নামটা। ওটার মানে নীলকণ্ঠ, শিব। কিন্তু অভিধানে 'সিতি' কথার অর্থ পাবেন শুভ্র, কৃষ্ণ, নীল। 'সিতিমা' কথাটার অর্থ পাবেন শুভ্রতা, কৃষ্ণতা, নীলিমা। একই শব্দের অর্থ সাদা এবং কালো, তার উপর আবার নীল।

এর পর নিন 'বিশ্রান্ত' কথাটা। অভিধানে এর অর্থ পাবেন ক্লান্ত, অতিশ্রান্ত, বিগতশ্রম, যে বিশ্রাম করিয়াছে। আপনি সারাদিন ভূতের বেগার খেটে যখন খুব পরিশ্রান্ত হয়েছেন, তখন আপনি বিশ্রান্ত। কিন্তু প্রচুর বিশ্রাম উপভোগ করার পর যখন আপনার ক্লান্তির নাম কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখনও ভাষার দিক দিয়ে দেখলে, তাতে আপনার ইতরবিশেষ কিছু হয় নি, বিশ্রান্ত ছিলেন, বিশ্রান্তই রয়েছেন।

'—কার' এই শব্দাংশটির অর্থ হল উক্তি, উচ্চারণ। যেমন ঝংকার, টঙ্কার, জয়-জয়কার, ধিক্কার, হুঙ্কার। কিন্তু আপনি হা-হা শব্দ করে হাসলে বলা চলবে না আপনি হাহাকার করছেন।

কবিরাজ আপনাকে বলেছেন, নুনে কম খাবেন, আর যেটুকু খাবেন তাও সৈন্ধব লবণ। এখন আপনি কি খাবেন? অভিধান দেখতে গেলে গোলে পড়ে যেতে পারেন, কারণ, দুটি অভিধানে দেখছি কথাটির অর্থ দেওয়া আছে, সমুদ্রজাত লবণ, সমুদ্রোৎপন্ন লবণ। লবণ সচরাচর আমরা রান্নায় ব্যবহার করি বা মেখে খাবার জন্যে লবণদানে রাখি, তা সমুদ্রজাত বা সমুদ্রোৎপন্ন লবণ আর আপনি ত তাই খাচ্ছিলেন। সুতরাং এই অভিধানগুলির উপর নির্ভর করলে আপনি মনের আনন্দে তাই খেতে থাকবেন এবং কবিরাজমশায় সেটা জানতে পারলে তাঁর বকুনিও কিঞ্চিৎ খাবেন কোনো এক সময়। এটা হবে না, যদি 'চলন্তিকা' দেখেন। তাতে আছে, "সৈন্ধব-সামুদ্র। সিন্ধুপ্রদেশ-জাত। ..সৈন্ধব লবণ—(বাং) পাথরের তুল্য খনিজ লবণ rock salt"। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, আপনি বাং অর্থাৎ বাংলা সৈন্ধব লবণ খাবেন, সংস্কৃত সৈন্ধব লবণ খাবেন না। কেউ যদি বলে, খনিজ লবণও মূলতঃ সমুদ্রজাত, ও তা জেনে রোগী হিসাবে আপনি কিছুই লাভবান হবেন না।

এর পর নিন 'অপরূপ' কথাটা। অভিধানগুলিতে এর অর্থ পাবেন অদ্ভুত, আশ্চর্য, বিস্ময়কর, অতুলনীয় রূপ, সচরাচর যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; কুরূপ, কুৎসিতাকার, বেয়াড়া কিম্ভুত-কিমাকার।

প্রয়োগের দুটি উদাহরণ :

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।"
(রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান ১ম খণ্ড)

"এই নানা সংস্কারে আঁকা, নানা প্রয়োজনে আঁটা আমির পর্দাটাকে মাঝে-মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চারি-দিকে দেখতে পাব, জগৎ কী আশ্চর্য অপরূপ!" (ঐ, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, সত্যবোধ)।

এই বাংলা দেশ এবং এই জগৎটাকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখতেন বা কি চোখে তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল সেটা জানি বলেই বুঝতে পারি যে, এদের তিনি কুরূপ, কুৎসিতাকার কিম্বা কিম্ভুতকিমাকার বলতে চান নি। প্রয়োগের ক্ষেত্রবিচার ত রয়েছেই। কিন্তু আপনি তাই বলে যেন প্রথম সাক্ষাতে কোন তরুণীকে দেখে বলে বসবেন না, 'আহা, কি অপরূপ!'

পাশের ঘরে মেয়েদের মজলিশ বসেছে। খুব হ্যাঁ ভাই, ও ভাই, তাই নাকি ভাই, বলিস কি ভাই, কানে আসছে। বাংলা-শিক্ষার্থী ইস্রায়েলী যুবকটিকে বোঝাচ্ছি, ভ্রাতা-জাতীয় জীব একটিও ওখানে নেই, আর এদের এই 'ভাই' পরস্পর-সম্বন্ধে অভিধানসম্মত সম্বোধন। ছেলেরা ঐদিক দিয়ে ভাল। লক্ষ্মী ছেলে বললে, ব্যাকরণ ভুলের কথা যদিও উঠবে না, কিন্তু ওরা নিজেরা যখন জটলা করে, অশ্রাব্য-কুশ্রাব্য আর যে সম্বোধনই পরস্পরকে করুক, হ্যাঁ বোস, ও বোস, তাই নাকি বোস বলে না।

আপনি আপনার চাকরকে ডাকলেন—'শ্যাম'! শ্যামের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে হলে, সে বলবে, 'আজ্ঞে যাই।' পূর্ববঙ্গে হলে বলবে, 'আইজ্ঞা, আসি।' যদিও 'আসি' আর 'যাই' এ-দুটি পরস্পর-বিরোধী কথা, তবু যেটাই বলা হোক, আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন যে, অবিলম্বে শ্যাম নামক ব্যক্তিটির দেখা পাবেন।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, আমার বিবেচনায় 'যাই'-এর চেয়ে 'আসি' ভাল। কারণ, যে বলছে 'যাই', সে যে কোথায় যাচ্ছে তা কিছু বলছে না; গলির মোড়ের আড্ডায় যদি যায় ত সে ফিরে এলে আপনি বলতে পারবেন না, সে ব্যাকরণের ভুল কিছু করেছে। কিন্তু যে বলছে 'আসি', তার কোনো আড্ডায় বা অন্য কোথাও যাবার জো কি?

বন্ধুকে বললেন, 'ওহে, ঢের খাওয়া হয়েছে, এবারে উঠে পড়।' বন্ধুটি ঘোরতর তার্কিক লোক হলেও উঠে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়বে না সেটা ঠিক, কিন্তু ইস্রায়েলী যুবকটি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, ওঠ এবং পড় এই দুটি স্পষ্টতঃ পরস্পর-বিরোধী কথাকে 'ওঠ' বোঝাতে কেন আমরা ব্যবহার করি।

'ওরা এসে গিয়েছে' শুনলে যুবকটি ভাবতে পারে, যাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা এসেছিল, কিন্তু চলে গিয়েছে। আসা এবং যাওয়া দুটি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী কথা ব্যবহার করে আমরা বলতে চাইছি, ওরা এসেছে।

বন্ধুদের সঙ্গে বসে ব্রিজ খেলছেন। হঠাৎ কি-একটা কথা মনে পড়ল, উঠে বললেন, 'দাঁড়াও, এক্ষুণি আসছি।' বন্ধুরা যে কেউ উঠে দাঁড়াবে না, তা আপনি জানেন এবং তাঁরা বসে থাকুন এইটেই আপনি ইচ্ছা করেন।

'উষসী' কথাটার অর্থ অভিধানে পাচ্ছি, দিবাবসান...বাং ঊষা। অতএব দিবাবসান বোঝাতে কথাটার প্রয়োগ করতে হলে পাছে

বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হবে সং, অর্থাৎ সংস্কৃত, এবং প্রত্যয় অর্থে ব্যবহার করতে হলে পাশে ঐরকম করে লিখে দিতে হবে বাং, অর্থাৎ বাংলা। এ কি সম্ভব? তাই 'উলসী' কথাটাকে বাংলায় কেউ আর ব্যবহারই করছেন না।

'প্রাণ' ও 'মৃত্যু' দুটি প্রায় পরস্পর-বিরোধী কথা। কিন্তু প্রাণদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড এ-কথাদুটো সমার্থক।

'ত্যাগ' ও 'রক্ষা' অর্থাৎ ফেলে-দেওয়া এবং রেখে-দেওয়া, দুটি পরস্পর-বিরোধী কথা। কিন্তু দেহরক্ষা ও দেহত্যাগ এ-দুটো কথার একই অর্থ—মৃত্যু। প্রয়োগের ক্ষেত্র-বিচারে তফাৎ আমরা কিছু করতে পারি, না-ও পারি।

ম্যাট্রিকুলেশনে একবার প্রশ্ন এসেছিল, ঋষির থেকে বিশেষণ কি হয় লেখ। আমার একজন আত্মীয়া কাগজ দেখছিলেন, দেখালেন, কয়েকটি ছেলেমেয়ে লিখেছে 'ঋষভ'। এরা অবশ্য নম্বর পায়নি। কিন্তু 'ঋষভ' কথাটার অর্থ অভিধানে পাবেন, বৃষ, অন্য-শব্দের পরে শ্রেষ্ঠ, প্রধান, শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যর্ষভ কথাটার অর্থ শ্রেষ্ঠ মানুষ, কিন্তু পরীক্ষার খাতায় কেউ যদি লেখে, নরদেহ-ধারী বলদ, তার নম্বর কাটতে পারা যাবে কি? হয়ত শ্রেষ্ঠ অর্থে ঋষভ কথাটার ব্যবহার যে-যুগে সুরু হয়, সে-যুগে বলদদের মানমর্যাদা এখনকার তুলনায় অনেক বেশী ছিল, যেজন্যে 'বৃষ' কথাটার অর্থের মধ্যে রয়েছে—ইন্দ্র, ধর্ম, শ্রীকৃষ্ণ, কন্দর্প ইত্যাদি। আবার সেইসঙ্গে বৃষ মানে ইঁদুর' তা বৃষ যেমন শিবের বাহন, ইঁদুরও ত গণেশের বাহন। গণেশ লোক-প্রিয় দেবতা, তাঁর বাহনটির খাতির কিছু কম হবার কথা নয়।

এবারে 'অবধি' কথাটাকে নেওয়া যাক। এর অর্থের মধ্যে একদিকে পাবেন—সীমা, অবদান, ইয়ত্তা; তাছাড়া 'হইতে' বা 'থেকে' —যেটাকে একজন অভিধানকার বলেছেন, 'উৎপত্তি বা মূলসূত্র ধারণ করিয়া বর্তমানে নামিয়া আসিবার ভাব।' অন্যদের মতে প্রথমারম্ভ সূচক। অন্যদিকে পাবেন সমাপ্তিসূচক 'পর্যন্ত'।

'কাল্লোহায়ং নিরবধি'—সীমা অর্থে 'অবধি'র ব্যবহার বহু যুগ ধরে অব্যাহত-ভাবেই চলছে। 'নিরবধি' কি, না যার আর শেষ নেই।

'অবধি জানিতে শুধাই কাহাতে।'
(চণ্ডীদাস)

'যোগের নিগূঢ় প্রণালীর জন্য ইঁহার লুব্ধতার অবধি নাই।' (রবীন্দ্রনাথ, গোরা)

'সত্য কেবলই জ্ঞানকে ফলদান করছে, জ্ঞান কেবলই সত্যকে সার্থক করছে, এর আর অবধি নেই।' (ঐ, শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, একটি মন্ত্র।)

প্রথমারম্ভ, অর্থাৎ 'হইতে/থেকে' বোঝাবার জন্যে কথাটার ব্যবহারও বহুকাল অবধিই চলছে। এই যে লিখলাম, 'বহুকাল অবধি' এটা মূলসূত্র ধরে বর্তমানে নেমে আসার অর্থাৎ ব্যাপ্তির একটা ভাব নয়, শুধু, এটা সোজাসুজি এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যাপ্তিই নির্দেশ করছে। যেমন :

'এইসব টালমাটাল করে বৎসরাবধি গেল।' (বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ।)

সূচনা বোঝাতে এর ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

'জনম-অবধি হম রূপ নেহারলুঁ।'
(বিদ্যাপতি)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থটির নামপত্রে রয়েছে :

'১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ অবধি
১৭৯৮ শকের ৪ ফাল্গুনে পর্যন্ত।'

এছাড়া আরও তিনটি অধ্যায়ের নাম-পত্রে এবং ব্যাখ্যানগুলির মধ্যে কয়েকবার প্রথমারম্ভ বা সূচনা বোঝাতে 'অবধি' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রাতঃকাল অবধি সায়ংকাল পর্যন্ত।'

'এখন অবধি সেই ভূমা পরমেশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে সমর্পণ কর।'

'যে অবধি জীবনধারণ করিয়াছি।'

অন্যদিকে ব্যাখ্যানগুলির প্রায় সম-সাময়িক 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে প্যারীচাঁদ মিত্র চন্দননগর প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ঐ শহর ফরাসীদিগের অধীন; অদ্যাবধি দেনদার ও ফৌজদারি মামলার আসামিরা কয়েদের ভয়ে ঐ স্থানে যাইয়া পলাইয়া থাকে।' 'অদ্যাবধি' এখানে শুরুর 'অবধি' নয়, শেষের 'অবধি'। অর্থাৎ ঐ সময়েও ইচ্ছা করলে মহর্ষি লিখে যেতে পারতেন :

'১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ অবধি
১৭৯৮ শকের ৪ ফাল্গুনে অবধি।'

দো বাজকে দশ মিনিট পিছে ও দো বাজকে দশ মিনিট আগে-র মত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে অর্থটা বুঝে নিতে হত। 'সে জন্মাবধি দুঃখ পেয়ে আসছে, মৃত্যু অবধি দুঃখই পাবে' স্বচ্ছন্দে লেখা চলে; কাল এসেছে, কাল ফিরে যাবে-র মত অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

সন-তারিখের সঙ্গে জুড়ে সূচনা বোঝাতে 'অবধি'র ব্যবহার আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি। এ-যুগে নিশ্চয় কেউ ওরকম করে কথাটাকে লিখবেন না। সেই অবধি, সেইদিন অবধি, শিশুকাল অবধি ধরণের কিছু কিছু কথা সে-যুগেও চলত, এখনও চলে।

'সে চলিয়া আসিল, সেইদিন অব[...] আমার সর্বস্ব ত্যাগ।' (বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনী।)

'সেই অবধি এই বুনো দেশে আমাদে[...] ছোট ছোট সাদা বড়ি দিয়ে চিকিৎস[া] করছি।' (প্রমথ চৌধুরী, চাহার দরবেশ।)

মনে হয়, মহর্ষি-পুত্র রবীন্দ্রনাথ 'অবধি' কথাটাকে কিঞ্চিৎ অবহিত হয়ে পরিহার করতেন। শুরু, ব্যাপ্তি এব[ং] সমাপ্তি, এই তিনটেই বোঝাতে যে-শব্দের ব্যবহার, হয়ত তার সম্বন্ধে তাঁর মনে কিঞ্চিৎ বিরূপতা ছিল। তাঁর শান্তি-নিকেতন ২য় খণ্ড ৪২৮ পৃষ্ঠার বই, এ[ই] বইয়ে একবার মাত্র কথাটাকে তিনি ব্যবহার করেছেন, আর তাও সীমা বা ইয়ত্তা অর্থে। আর সীমা বা ইয়ত্তা অর্থেই ব্যবহৃত কথাটার যে-দৃষ্টান্ত গোরা থেকে উপরে দিয়েছি, সেইটি ছাড়া প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটিতে কথাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে আর মাত্র একবার, সেই যেখানে গোরার প্রসঙ্গে মহিলা বলছে, 'ও হিন্দু হয়ে অবধি আমাকে দাদা বলে খুব মানে।' নৌকাডুবিতে রবীন্দ্রনাথ কথাটা ব্যবহার করেছেন দুবার :

'রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়ে অবধি তোমাকে একখানি চিঠি লিখলেন না।'

'যে হরির মা ছেলেবেলায় তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল, সে মারা গিয়া অবধি।'

চোখের বালিতে ব্যবহার করেছেন মাত্র একবার :

'তাঁহার মহীন জন্মাবধি কখনো এক-দিন মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই।'

তাঁর অনেক বইয়ে কথাটি নেইই মোটে। অবশ্য 'পর্যন্ত' কথাটিও রবীন্দ্রনাথ খুবই কম ব্যবহার করেছেন; সেটা একই কারণে কিনা জানি না। অনেক জায়গাতেই দেখেছি, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না...ততক্ষণ পর্যন্ত' না লিখে 'যতক্ষণ না...ততক্ষণ' লিখেছেন।

এক 'জন্মাবধি' ছাড়া উপরের দৃষ্টান্ত কটিতে একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'অবধি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'জন্মাবধি' কথাটাকেও আজকাল যখন আমরা ভেঙে বলি, তখন বলি না 'জন্ম অবধি', বলি 'জন্মিয়া/জন্মে অবধি।' অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'অবধি'র এই ধরণের ব্যবহার কখন শুরু হয়েছিল জানি না। সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি বই আবার পড়ে দেখেছি। একমাত্র দুর্গেশ-নন্দিনীতে একবারমাত্র 'অবধি'-র এইরকম ব্যবহার চোখে পড়ল। জগৎসিংহ বিমলাকে

ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

বলছেন, 'আমি তোমার সখিকে দেখিয়া অবধি কেবল যুদ্ধেই লিপ্ত আছি।'

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 'হইতে' বা 'থেকে' দিয়ে এই 'অবধি'গুলির অনুবাদ করা যায় না। তার কারণ হয়ত এই যে, এরা সূত্রপাত বা সূচনার আদিবিন্দু নির্দেশ করছে না। সূত্রপাত বা সূচনা নির্দেশ করতে আমরা অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করছি, আর ক্রিয়াতে যা অসমাপ্ত থাকছে, তার সমাপ্তি হচ্ছে 'অবধি'তে এসে। 'রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়ে অবধি' মানে 'রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়ে আজ অবধি।' একটি 'আজ' বা 'এখন' উহ্য রেখে কথাটা হয়ত আমরা ব্যবহার করি। এটা সম্পূর্ণই আমার অনুমান এবং ভুল হতে পারে। তারপর আমরা যেমন বলি, 'সে ছুটিতে বাড়ী এসে অবধি একদিনও বই নিয়ে বসেনি', তেমনি এও বলি, 'সে ছুটিতে বাড়ী এসে পর্যন্ত একদিনও বই লিখে বসেনি।' কেন বলি, সেটাও ভাববার বিষয়।

তবে শুরুর দিকের নয়, শেষের দিকের সীমা বোঝাবার জন্যে 'অবধি' ব্যবহারের দিকে বাংলা ভাষার প্রবণতা যে বেড়ে চলেছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহর্ষি এ-যুগের মানুষ হলে তাঁর বইয়ের নামপত্রে সম্ভবত লেখা হত :

'১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ হইতে
১৭৯৮ শকের ৪ ফাল্গুন অবধি।'

এবারে 'পর্যন্ত'র সঙ্গে একটু পরিচয় করা যাক।

'অন্ত' কথাটিকে নিজের মধ্যে বহন করছে বলেই সূত্রপাত বা সূচনা বোঝাতে এর ব্যবহার একেবারেই নেই তা ভাববেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীতে পশুপতি মনোরমাকে বলছেন, 'যে পর্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ সেই পর্যন্ত মনোরমা লাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে।'

'পর্যন্ত' কথাটির অর্থ অভিধানে পাই, অবধি, upto, ও,অপি, even, too, সীমা প্রান্ত, অবসান, পার্শ্ব, সমীপ, নিত্য, প্রত্যন্ত, শেষ সীমান্বিত। এছাড়া আরও একটি অর্থে কথাটাকে আমরা ব্যবহার করি। সে অর্থটি হচ্ছে 'পরিমাণ', স্থান-বিশেষে 'টুকু' দিয়ে যার অনুবাদ হয়। যেমন :

"তাহাকে গান শুনাইয়া আমার কি পর্যন্ত তৃপ্তি হয় তাহা বলিতে পারি না।" (বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ।)

"একবার দেখিব মাত্র, আপনার কাছে এই পর্যন্ত ভিক্ষা।" (ঐ, রাজসিংহ।)

"গোরা তাহাকে পরিহাস ও ভর্ৎসনা করিবে এই পর্যন্তই সে আশা করিয়াছিল।" (রবীন্দ্রনাথ, গোরা।)

পার্শ্ব, প্রান্ত, সমীপ, নিত্য, ও অপি এইসব অর্থে 'পর্যন্ত'র ব্যবহার এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

"তোমার সঙ্গে আমার এই পর্যন্ত সাক্ষাৎ" (বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ) অর্থাৎ এই শেষ সাক্ষাৎ।

"সেই নদীর চরে রমেশের সঙ্গে প্রথম মিলন হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই গাজিপুরে আসা পর্যন্ত" (রবীন্দ্রনাথ, নৌকাডুবি) অর্থাৎ আসা অবধি, upto।

অভিধানকার যেটাকে "উৎপত্তি বা মূল-সূত্র ধারণ করিয়া বর্তমানে নামিয়া আসিবার ভাব" বলেছে, সেই ব্যাপ্তির ভাবটা অবধির মত 'পর্যন্ত'তেও কিছু পরিমাণে থাকে, তাএদের আমরা সূত্রপাত বোঝাতেই ব্যবহার করি বা সমাপ্তি বোঝাতেই করি। সূত্রপাত সমাপ্তিকে লক্ষ্য করে, সমাপ্তির মধ্যে স্বভাবতই থাকে সূত্রপাতের ইঙ্গিত। ব্যাপ্তিটা এসেই যায় মাঝখানে। কিন্তু ইঙ্গিত বা ভাব নয়, ব্যাপ্তিটাই স্পষ্টত যার অবলম্বন, 'পর্যন্ত'র এরকম ব্যবহার আমাদের ভাষায় অজস্র। কয়েকটি উদাহরণ দিই :

"এখানে তাঁহার প্রেমমুখ এমন করিয়া দর্শন কর, যে তাহার আভা আর ছয়দিন পর্যন্ত হৃদয়ে থাকে।" (মহর্ষির ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যান।)

"কিন্তু তিন দিবস পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না।" (বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনী।)

"কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফউন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন, দুইদিন পর্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না।"
(ঐ, কপালকুণ্ডলা।)

"এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন।" (রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি।)

"কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।"
(ঐ, শেষের কবিতা।)

"এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তি-সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে।"
(ঐ, শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, সামঞ্জস্য।)

"এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটিও কথা কহে নাই।"
(শরৎচন্দ্র, বিলাসী।)

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই 'পর্যন্ত'-গুলি একটি সীমাবিন্দু নির্দেশ করছে না,

আর ব্যাপিয়া/ব্যেপে, ধরিয়া/ধরে দিয়ে এগুলিকে অনুবাদ করা যায়। বাক্যের শব্দ-যোজনার বৈশিষ্ট্যের জন্যে যেসব ক্ষেত্রে তা করা যায় না, অথচ ব্যাপ্তিই অবলম্বন, সূত্রপাত বা সমাপ্তি নয়, 'পর্যন্ত'র এই রকম ব্যবহারেরও একটি দৃষ্টান্ত দিই :

"যে-পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।" (রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, নববর্ষ।)

সূত্রপাত, ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি এই তিন-টিকে নিয়ে কারবার হওয়া সত্ত্বেও 'পর্যন্ত'র পরিচয় এখন অবধি আমাদের বেশী কিছু বিভ্রান্ত করতে পারেনি। কিন্তু এবারে আমরা এমন একটা এলাকায় প্রবেশ করব, যেখানে একে নিয়ে বেশ একটু বিতর্কের গোলযোগ এবং সেই হেতু অনেকখানি রয়েছে।

'আ' এবং 'ওয়া' দিয়ে নিষ্পন্ন নিক্রন্ত ধাতুর বাংলা রূপের সহযোগে 'পর্যন্ত'র ব্যবহার নিয়ে এই গোলযোগ।

"যে-পর্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না" (বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা) না বলে, কথাটিকে সংক্ষিপ্ত করে আমরা বলতে চাইছি, "সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না" "যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে, সে-পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার" (রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, বিশ্ববোধ) না বলে "নিদ্রা না আসা পর্যন্ত" দিয়ে সুরু করতে চাইছি।

এখন প্রশ্ন হল, এই সংক্ষিপ্ত কথাটা কি হওয়া উচিত। নিদ্রা না আসা পর্যন্ত, না, নিদ্রা আসা পর্যন্ত?

আ এবং ওয়া সহযোগে নিষ্পন্ন নিক্রন্তের সঙ্গে 'পর্যন্ত'র এই জাতীয় যোগাযোগ কখন যে সুরু হয়েছিল, বলতে পারব না। আমার পূর্ববর্তী এবং সম-সাময়িক লেখক-দের কারও লেখাতে এই যোগাযোগ আমার চোখে পড়েনি। হয়ত আছে, কিন্তু খুব যে অল্পই আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার সমসাময়িক শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের যে দুজন লেখকের দুটি বই হাত বাড়িয়ে প্রথম পেলাম, পেড়ে নিয়ে পড়ে দেখলাম, দুটিতেই দুবার করে 'পর্যন্ত' কথাটকে এইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় পেলাম :

"ছবি আঁকার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল, নাম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না।"

"শশী বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কুসুম কি গ্রামে থাকিতে পারিত না?"

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটিতে পাওয়া গেল :

"শিশু যেমন নূতন খেলনা পাইলে না-ভাঙা পর্যন্ত সেটিকে নিষ্কৃতি দেয় না, তেমনি আদরে-আব্দারে, চুম্বনে, আলিঙ্গনে বিব্রত হইয়া মটরু না কাঁদিয়া ফেলা পর্যন্ত সতীর তৃপ্তি হয় না।"

মনে হতে পারে এঁদের একজন নিদ্রা আসা পর্যন্তর দলে, অন্যজন নিদ্রা না আসা পর্যন্তর দলে। এখন আমরা কোন দলে ভিড়ব সেটা হিসাব করে দেখা কর্তব্য।

আমরা দেখেছি যে, সীমা-বিন্দু বোঝাতে যেমন, ব্যাপ্তি বোঝাতেও তেমনি 'পর্যন্ত' কথাটা ব্যবহৃত হয়। সমাপ্তিই যে-পরিমাণে হয়, তার আগের ব্যাপ্তিটা তার সম্পর্কে ঠিক সেই পরিমাণে না। সমাপ্তিটা আমার বক্তব্যের প্রধান লক্ষ্য হলে বলব, করা পর্যন্ত, হওয়া পর্যন্ত। আর যতক্ষণ একটা কিছু না ঘটছে, সমাপ্তির আগেকার সেই অবকাশটির কথাই যদি আমার মনে বেশী ক'রে থাকে, তাহলে বলব, না করা পর্যন্ত, না হওয়া পর্যন্ত। যেজন্যে আমরা বলি, বুড়ো না মরা পর্যন্ত বুড়ীর শান্তি নেই, শীতকালটা না কাটা পর্যন্ত এই হাঁপানির টানটা সারবে না; ও ঘুমিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওর গায়ে হাত বুলোও। সমাপ্তিটা যে আমাদের বক্তব্যের আসল লক্ষ্য নয়, তার আগেকার সময়ের ব্যাপ্তিটা লক্ষ্য, ঐ 'না' দিয়ে সেটা আমরা বোঝাচ্ছি।

মেয়েটির ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ না হলে তার বিয়ে দেব না এই যদি আমার মনে থাকে তাহলে বলতে পারি, তার ১৮ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কারণ, তার এই বয়ঃপূর্তি না হওয়ার সময়টাই আমার বক্তব্যের লক্ষ্য। ১৮ পুরলেই যে ভোরে উঠে প্রথম যাকে দেখব তারই সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেব তা নয়। বয়ঃসীমান্ত-বিন্দুটির গুরুত্ব এখানে শুধু অবকাশের সময়টাকে নির্ধারিত করে দিচ্ছে বলে। তার নিজস্ব গুরুত্ব থাকত যদি সেই বিশেষ দিনটিতেই একটা কিছু করবার সঙ্কল্প থাকত আমার মনে। সংসার ত্যাগ করব ঠিক করে রেখেছি, মাতৃহীনা, একমাত্র মেয়েটি আইনতঃ যেদিন সাবালিকা হবে, সেদিন আমার যথাসর্বস্ব তাকে দানপত্র করে লিখে দিয়ে চলে যাব জানিয়ে আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে লিখতে পারি, আমার মেয়েটির ১৮ বৎসর বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। অর্থাৎ, হওয়া দিনটি পর্যন্ত তারপর আর একদিনও নয়।

অসুস্থ মেয়েটির কাছে আমার অনু-পস্থিতির সময়টা একজন কেউ থাকা দরকার। চাকর এই সময়ে সচরাচর বাজারে যায়, তাকে বললাম, "বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" আর যদি এমন হয় যে, আমার ফিরে আসার ক্ষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তার জন্যে সভায় প্রতীক্ষা করতে বা আশাপথ চেয়ে থাকতে বলা যায় মানুষকে, ও হয়ত বলতে পারি, "ফিরে আসা পর্যন্ত"। মেয়ে জানতে চাইল, এবেলা কি রান্না হবে। তাকে বলতে পারি, "চাকর বাজারে গিয়েছে, কি পায় দেখা যাক, সে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

কিন্তু যেহেতু সে ফিরে না আসার সময়টা এক্ষেত্রেও আমার বক্তব্যের খানিকটা লক্ষ্য না হয়েই পারে না, 'সে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর' বলতে পেলেই আমি আরাম বোধ করব। ব্যাপ্তিটা আছে বলেই অপেক্ষা করার কথা উঠছে।

যে-জন্যে স্বচ্ছন্দে কেউ জানতে চাইতে পারেন, 'বাস থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন' কথাটা কি ঠিক? এ প্রশ্ন বহু বৎসর আগে একবার উঠেছিল তখন, সিদ্ধান্তটা কি হয়েছিল মনে নেই।

'পর্যন্ত' যে কেবল সীমাবিন্দুই নির্দেশ করে না সব সময়, ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করে যে তার ব্যবহার হয়, এ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এ পর্যন্ত যা বলেছি তা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলব, 'বাস থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন' বলতে পারি যদি এরকম অভিপ্রায় মনে থাকে যে বাসটা থামলে কাছাকাছি খাবারের দোকান থেকে খাবার আনিয়ে যাত্রীদের ভূরিভোজন করাব কিংবা লোকজন জড় করে তাঁদের প্রহার লাগাব। কিন্তু বাসটা থামলে কেউ উঠল কি নামল কি না দেখতে যাবার যদি আমার সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন না থাকে, গাড়ী যতক্ষণ চলছে অর্থাৎ না থামছে, কেবল সেই সময়টারই গুরুত্ব যদি আমাদের কাছে বেশী হয়, আমাদের বক্তব্য যদি কেবল এই হয় যে গাড়ীটা যতক্ষণ চলছে অর্থাৎ না থামছে ততক্ষণ কেউ ওঠানামা করবেন না, থামলে কে কি করবেন সে তাঁরা বুঝবেন, তাহলে 'গাড়ী না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন' বলাটা অপেক্ষাকৃত ভাল হবে।

অপেক্ষাকৃত বলছি এই জন্যে যে এ "অপেক্ষা করুন" কথাটাতেই আমার আপত্তি। ইংরেজী "Wait till the Car stops" -এর 'Wait' কথাটির মধ্যে বিরত থাকতে বলার যে ভাবটা রয়েছে বাংলা "অপেক্ষা করুন" কথাটির মধ্যে সেটা নেই। সেজন্যে কাউকে অপেক্ষা করতে বললে কোন ফললাভের জন্যে অপেক্ষা সেটা তাকে বলা প্রয়োজন হয়।

আমার ব্যাখ্যাগুলি সকলের মনঃপূত না হতে পারে এবং কেউ কেউ হয়ত এই নিয়ে তর্ক তুলতে চাইতে পারেন। কিন্তু আমি বলব, তার প্রয়োজন নেই। ধরে নেওয়া যাক, দুটোই হয়। "থামা পর্যন্ত" এবং "না থামা পর্যন্ত", আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী এই দুটো কথা একই অর্থে লেখা চলে, যেমন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী দেহত্যাগ ও দেহরক্ষা একই অর্থে আমরা লিখে থাকি।

কিন্তু খুব অল্প হলেও সংশয় যখন একটু আছেই কি দরকার এইসব গোল-যোগের মধ্যে যাবার? আমাদের মনের কথাটা বেশ সহজ ভাষায় সোজাসুজি লিখতে বাধা কি? "গাড়ী না থামলে ওঠানামা করবেন না" লিখলেই ত চুকে যায়।

বিজ্ঞানের কথা

শুভংকর

মহাকাশ অভিযানে বিস্ময়কর প্রয়াস

এমন দিন সম্ভবত আর খুব দূরে নয়, যখন একজন মহাকাশচারী রকেটযোগে কক্ষপথে চলে গিয়ে নিজের মহাকাশযান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবেন এবং তারপর মহাকাশে পদচারণা করে অপর একটি মহাকাশযানযোগে পরিক্রমারত মহাকাশযাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার তৃতীয় একটি মহাকাশযানযোগে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন।

পরীক্ষামূলকভাবে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ১৯ জুন জেমিনি-১০ মহাকাশযানযোগে দুজন মহাকাশচারী জন ইয়ং এবং মাইকেল কলিনস্‌কে মহাকাশে প্রেরণ করে। মহাকাশচারী দুজনের যাত্রার ঠিক ১০০ মিনিট আগে একটি এজিনা রকেটকে মহাকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রকেটটি পৃথিবীর ১৭৩ মাইল উঁচুতে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। তারপর এই এজিনা রকেট অভিমুখে দশম জেমিনিকে পৃথিবী থেকে প্রেরণ করা হয়। জেমিনি-১০ এক লক্ষ মাইল ধাওয়া করে এজিনা রকেটের সঙ্গে সম্মিলিত হয় এবং রকেটের এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ৪৭৪ মাইল উঁচুতে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয়ের কাছাকাছি উৎক্ষিপ্ত হয়। এর আগে মনুষ্যবাহী সোভিয়েত মহাকাশযান পৃথিবীর ৩১০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠে রেকর্ড স্থাপন করেছিল। দশম জেমিনি সে রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করলো। একটি বিচরণশীল রকেটের ইঞ্জিনকে আর একটি মহাকাশযানের গতি-সঞ্চারের প্রয়াসে নিয়োগ করার মধ্যে প্রভূত বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কলিনস এবং ইয়ং সে বিপদ অতিক্রম করে এমন জায়গায় পৌঁছেছেন, যার কাছাকাছি এ পর্যন্ত আর কোনো মহাকাশচারী পৌঁছতে পারেন নি।

দশম জেমিনির মহাকাশ পরিক্রমা তিন দিনের জন্যে পরিকল্পিত হয়েছিল। এই তিন দিনের শেষ পর্যায়ে এই যানের চালক কলিনস্‌ মহাকাশযান চালাবার ভার প্রধান চালক ইয়ং-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং স্বল্প দূরে পরিক্রমারত দ্বিতীয় এজিনা যানে (গত মার্চ থেকে পরিক্রমারত) গমন করেন। মহাকাশে স্বাধীনভাবে পরিক্রমারত কোনো যানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ সাধনের ঘটনা এই প্রথম সম্পন্ন হলো। এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মুক্ত হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতের মহাকাশচারীরা শিফটে কাজ করতে পারবেন। তাতে সুবিধা হবে এই যে, প্রধান চালককে বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হলে অন্য একজন মহাকাশচারী তাঁর স্থানে কাজ করতে পারবেন। এ ছাড়া, কক্ষ-পরিক্রমারত মহাকাশচারীরা কোনো সংকটে পড়লে পৃথিবী থেকে অন্য মহাকাশচারীকে তাঁদের সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করা যাবে। যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলেও অন্য মহাকাশযানযোগে কারিগর প্রেরণ করা যেতে পারে। যে সকল মহাকাশচারী দীর্ঘদিনের পরিক্রমা পরিকল্পনা নিয়ে মহাকাশে গমন করবেন, তাঁদের জন্যে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রেরণ করা যেতে পারে।
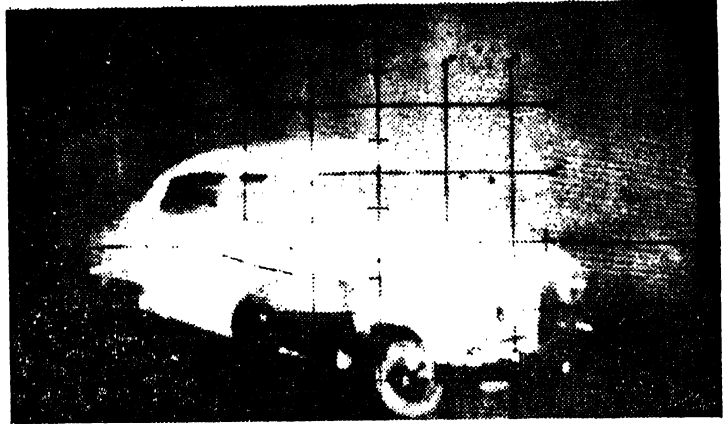
লেসার টেলিভিশন সেট : ওপরে এই অভিনব ক্যামেরার উদ্ভাবকদের এবং নীচে গ্রাহকযন্ত্রে পরিস্ফুটিত একটি বেতারচিত্র।

মহাকাশযাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্যে মহাকাশচারী মহাকাশযানের বাইরে এসেও অবাধে পদচারণা করতে পারেন। এর ব্যাখ্যা করে বলা যায়, পৃথিবীর ১০০ থেকে ২০০ মাইল ঊর্ধ্বে ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল গতিতে মহাকাশযানটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে এবং একই গতিতে মাহকাশচারীও পৃথিবী পরিক্রমা করছেন। এই গতিবেগই মহাকর্ষ শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে, ফলে মহাকাশযানটির মতো মহাকাশ-চারীও ভরশূন্য অবস্থায় পরিক্রমা করছেন।

মহাকাশযানের ভেতরের বায়ুর চাপ-মাত্রা হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে কলিনস্‌-এর মহাকাশে পদচারণাপর্ব শুরু হয়। তিনি মহাকাশযানের কামরা থেকে যেমন বাতাস বার করতে থাকেন, তেমনি তাঁর পোশাকটি মিশ্রিত গ্যাসে ভর্তি হতে থাকে। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে এবং পৃথিবীতে যে বায়ুচাপে তাঁরা থাকতে অভ্যস্ত ঠিক সেই পরিমাণ চাপ পোশাকের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

দশম জেমিনি মহাকাশযানে ৪২ পাউন্ড ওজনের একটি বাক্স ছিল। মহাকাশে পদ-চারণার সময় কলিনস্‌ ঐ বাকস্‌টি তাঁর বুকে বেঁধে নেন। ৫০ ফুট দীর্ঘ একটি রজ্জুর দ্বারা এটি মহাকাশযানের সঙ্গে বাঁধা ছিল। মহাকাশচারী কলিনস্‌ মহাকাশ পদচারণার সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে যে অক্সিজেন, যোগাযোগকারী সরঞ্জামের জন্যে যে বিদ্যুৎশক্তি এবং চালনার জন্যে ইন্ধন হিসাবে যে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় তা ঐ রজ্জুর মাধ্যমে মহাকাশযান থেকে ঐ বাক্সে জোগান দেওয়া হয়। এই বাক্সটির

নামকরণ করা হয়েছে মহাকাশযানের বাইরে জীবনরক্ষার ব্যবস্থা।

মহাকাশে পদচারণার সময়ে কলিনস-এর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, হৃদস্পন্দনের মাত্রা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ সম্পর্কে সকল সংবাদ ভূতলস্থিত চিকিৎসকদের মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় বেতারবার্তা প্রেরণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বদা সরবরাহ করা হয়। মহাকাশচারীর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর বুকে বাঁধা ছিল।

অতি শীতল বা অতি উষ্ণ তাপমাত্রায় এবং মহাকাশের বায়ুহীন অবস্থায় মহাকাশচারীর পোশাকের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। ঐ বাক্সের মাধ্যমেই তা করা হয়। রজ্জু অথবা তার পাম্পিং সিস্টেম কোনো কারণে অকেজো হয়ে গেলে ঐ জরুরী অবস্থায় বাক্সের সাহায্যে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল মহাকাশচারীকে অক্সিজেন সরবরাহ করা যেত।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিনস পিঠে বাক্সটি বেঁধে নিয়ে তাঁর পাশের দরজা খুলে উঠে দাঁড়ান এবং মহাকাশযানের বাইরে বেরিয়ে আসেন। নিজেকে চালনার জন্যে তাঁর হাতে যে সব সাজসরঞ্জাম ছিল সেগুলি নাইট্রোজেন জেটের সাহায্যে চালু করেন। তারই সাহায্যে তিনি ইচ্ছামত সামনে পেছনে পাশে যেভাবে খুশি চলাফেরা করেন।

ঐ সময়ে দশম জেমিনির মাত্র কয়েক ফুট দূরে ছিল দ্বিতীয় এজিনা রকেট। কলিনস কিছুক্ষণের জন্যে ঐ রকেটে গমন করেন। দ্বিতীয় এজিনার এক পাশে বাঁধা ছিল একটি ছোট্ট বাক্স। কলিনস সেটি খুলেছিলেন। এটিতে মহাজাগতিক উল্কাকণা সংগৃহীত ছিল। দশম জেমিনির ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের পর সেই সকল কণা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ঐ ছোট্ট বাক্সটি নিয়ে কলিনস নিজের মহাকাশযানের কামরায় ফিরে আসেন এবং দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর দশম জেমিনির প্রধান চালক ইয়ং তাঁদের কামরায় বায়ুর চাপমাত্রা বাড়িয়ে দেন এবং ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসার জন্যে প্রস্তুত হন।

দশম জেমিনির উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় মহাকাশ অভিযানে মানুষের আরও একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হলো নিঃসন্দেহে। তবে বিশেষজ্ঞদের অভিমতে মানুষের মহাকাশে চলাফেরা এবং কাজকর্ম করা সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানবার বাকী আছে।

অভিনব টেলিভিশন ক্যামেরা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি একটি অভিনব টেলিভিশন ক্যামেরা উদ্ভাবিত হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অন্ধকারেও দেখতে পায়। বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশনযোগে বার্তা প্রচারের জন্যে প্রচুর আলোর প্রয়োজন হয়। আলোর অভাবে এই বেতার বার্তা প্রেরণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় যেখানে আলো পাওয়া যাবে না সেখানেও কাজ ঠিকই হবে। কোন বস্তু বা ব্যক্তির টেলিভিশনযোগে বেতারচিত্র পাঠাবার সময় ঐ বস্তু বা ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ অন্ধকারেও থাকে, সে ছবিটি যেখানে পাঠান হবে সেখানে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। দিনের বেলায় অতি উজ্জ্বল আলোতে তোলা ছবির মতই সেটিকে সুস্পষ্ট দেখাবে।

এই অভিনব ক্যামেরায় 'লেসার' ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ বস্তু বা ব্যক্তিকে আলোকিত করে তোলা হয়। আমরা জানি 'লাইট অ্যামপ্লিফিকেশান বাই স্টিমুলেটেড এমিশান অফ রেডিয়েশান' এই কথাটির প্রধান শব্দগুলির ইংরেজী আদ্যক্ষর নিয়ে 'লেসার' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আলোক-তরঙ্গকে কোন কোন স্ফটিকের মধ্য দিয়ে পাঠালে অতি জটিল আণবিক ও পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় প্ররোচিত বিকিরণের সৃষ্টি হয়। তা থেকে পাওয়া যায় অতি শক্তিশালী সুসংহত আলোকরশ্মি। এর গতিপথের আকার একটা ফাঁপা নলের মত। অন্যান্য রশ্মির মত লেসারের আলো ছড়িয়ে পড়ে না। এই আলোর তীব্রতা খুব কম, প্রায় অদৃশ্য বললেই হয়। যার ফটো তোলা হচ্ছে সে হয়ত জানতেই পারল না কি ঘটে গেল।

এই ধরনের টেলিভিশনে হিলিয়ম-নিয়ন গ্যাস লেসার ব্যবহৃত হয়। এর আলোর তীব্রতা এত অল্প যে, এতে চোখের কোনরকম ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু তীব্রতা কম হলেও এই আলো খুবই শক্তিশালী। ক্যামেরা থেকে ৩০ ফুট দূরের কোন বস্তু বা ব্যক্তির সুস্পষ্ট ছবি তোলা যায় এবং অন্যত্র তা প্রেরণ করা যায়। ভবিষ্যতে এর আরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ক্যামেরার দূরত্বের মাত্রা বাড়ান যাবে বলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

লেসার টেলিভিশন সেটটির বর্তমান ওজন প্রায় ৬০ পাউন্ড এবং দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩০ ইঞ্চি ও উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি। উদ্ভাবকেরা বলছেন, ভবিষ্যতে এর চেয়ে অনেক ছোট আকারের ও হাল্কা ধরনের লেসার টেলিভিশন সেট তৈরী করা যেতে পারে।

এই ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা হয় এইভাবে : টেলিভিশন ক্যামেরায় এক জোড়া আবর্তনশীল আয়না থাকে। লেসার থেকে যে আলো বিকীর্ণ হয় তা ঐ আবর্তনশীল আয়নার সাহায্যে ক্যামেরার সামনে দৃশ্য বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়। সেকেন্ডের ৬০ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে তা হয়ে থাকে। ক্যামেরার সামনে যা আছে কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত লেসার আলো ফটো মাল্টিপ্লায়ার যন্ত্রে ধরা পড়ে। সেই আলোর ইলেকট্রনিক তরঙ্গ টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্রে গৃহীত হয়। ঐ গ্রাহকযন্ত্রে ক্যাথোড রশ্মি টিউবের সাহায্যেও আলোকোষের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক রশ্মি ও ক্যামেরার লেসার রশ্মি একই সময়ে নির্গত হয়ে থাকে।

অধ্যাপক দামোদর কোশাম্বী

সম্প্রতি আমরা এমন একজন ভারতীয় বিশিষ্ট গণিতজ্ঞকে হারিয়েছি যাঁর নাম সাধারণের কাছে এবং বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকের কাছেও সুপরিচিত নয়, অথচ যাঁর বিজ্ঞান-প্রতিভার পরিচয় উল্লেখের যথেষ্ট অপেক্ষা রাখে। এই প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ হচ্ছেন অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী। গণিতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তির স্বীকৃতিতে মাত্র ২২ বছর বয়সে এই মহারাষ্ট্রীয় তরুণকে অধ্যাপকপদে নির্বাচন করা হয়। এ থেকেই তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

এদেশে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর কোশাম্বী উচ্চতর শিক্ষার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর প্রধান পাঠ্যবিষয় গণিত ছাড়া অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করেন।

১৯২৯ সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুড়ি বছর গবেষণা করেন। আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে তিনি মৌলিক ধারণার পরিচয় দেন। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ডঃ আইনস্টাইন তাঁর গবেষণার বিশেষ প্রশংসা করেন। গণিতশাস্ত্রের পথ—জ্যামিতি ও 'অপারেটরস' বিষয়ে তিনি নতুন তত্ত্ব গড়ে তোলেন এবং সে তত্ত্ব তাঁর নামে সুপরিচিত। অধ্যাপক আর এ ফিশার সংখ্যায়নে যে জ্যামিতিক প্রণালী উদ্ভাবন করেন তার মূলে ডঃ কোশাম্বীর অনেকখানি অবদান আছে। বংশগতিতত্ত্বে তিনি এমন একটি সূত্রের সন্ধান দেন যার জন্যে
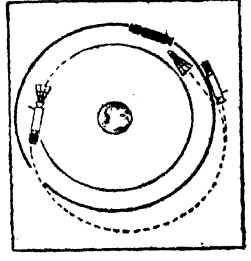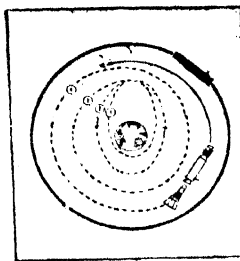
এজিনা রকেট এবং দ্বিতীয় এজিনা যানের (কালো রঙে অঙ্কিত) সঙ্গে দশম জেমিনির মিলনের রেখাচিত্র ; মাঝখানে মহাকাশে পদচারণাকালে কলিনসের আলোকচিত্র গ্রহণ।

বংশগতিতত্ত্ববিদেরা বহুকাল মাথা ঘামিয়েছিলেন। বলতে গেলে হঠাৎই তিনি এই সূত্রের সন্ধান পান এবং মাত্র ৪ পাতার একটি নিবন্ধে এটি ব্যাখ্যা করেন।

শুধু গণিতশাস্ত্রে নয়, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বেও অধ্যাপক কোশাম্বীর স্থান ছিল সুগভীর। তিনি 'ভর্তৃহরির শতক'-এর সুষ্ঠু সংস্করণ প্রণয়ন করেন। এ জন্যে তাঁকে চারশতটির বেশি পুঁথি পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃত এবং প্রাচ্যের আরও কয়েকটি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল গভীর এবং তিনি ফরাসী, ইতালী ও জার্মান ভাষাও ভালভাবে জানতেন।

১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা তাঁকে ইলেকট্রনিক গণনাযন্ত্রে কাজ করার জন্যে আহ্বান করেছিল, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিজস্ব গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রণ জানান। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বহু স্থানে তিনি বক্তৃতা দেন।

চুম্বকতাপজাত বিদ্যুৎ

সুমন্ত সেন

তাপ থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে তাকে কাজে লাগানোর কথা অবশ্য বাসি হয়ে গেছে। কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে তাপজাত বিদ্যুৎকে হিমায়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে — এটা বেশ নতুন আর চমকপ্রদ। প্রচলিত যে সব হিমায়নের ব্যাপার আমরা অহরহ দেখছি, যেমন শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত ঘর, রেফ্রিজেটর, হিমঘর ইত্যাদি—তা অন্য-রকম ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের দ্বারা তৈরী। সে ব্যবস্থা ও কলাকৌশলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পদার্থের কাঠিন্য-দশা সম্পর্কিত পদার্থবিজ্ঞান এবং এই কাঠিন্য-তত্ত্বের পরোক্ষ ফলাফলস্বরূপে পকেট সাইজ রেডিও থেকে বিশ্বব্যাপী উপগ্রহ-মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি পর্যন্ত সকল বিস্ময়কর অবদান আমরা দেখেছি। এ ছাড়াও আরও মজার ঘটনা—কাঠিন্যতত্ত্ব নাড়াচাড়া করতে গিয়েই আমরা আলো, তাপ শব্দ বা গতিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করতে পেরেছি।

উপরে যে তাপজাত বিদ্যুতের দ্বারা হিমায়ন সাধনের কথা বলা হল—বর্তমানে তা অবশ্য বাজারে সাধারণ পণ্যরূপে এখনও আসে নি। যাঁরা অভিনবত্বের প্রতি মুক্তহস্তে টাকা খরচ করতে পটু, তাঁদেরই আয়ত্বে রয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু সম্প্রতি আরেকটি নতুন গবেষণা জোর চলেছে বা উত্তম ফলাফলও পাওয়া গেছে—তা হচ্ছে চুম্বক-তাপজাত বিদ্যুৎ এবং হিমায়নের সকল রকম কাজে একে লাগান যাচ্ছে। থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর বা তাপজাত বিদ্যুৎ উৎপাদন-যন্ত্র এবং থার্মোইলেকট্রিক রেফ্রিজেটর বা তাপজাত বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হিমায়ক মোটামুটি এই দুটি ব্যাপারের উন্নততর বিকাশসাধনে এই নতুন চুম্বক-তাপ-বিদ্যুৎকে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রচলিত হিমায়নব্যবস্থা—যা বাজারে পণ্য হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে অদূরভবিষ্যতে এই নতুন ও সহজ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা শুরু হতে আর দেরী নেই।

একে বলা যায় ইলেকট্রনিক হিমায়ন। এর ফলে তাপাঙ্ক সর্বনিম্ন পর্যায় তো পেরিয়ে যায়ই; এমন কি দ্রবীভূত বাতাসেরও নীচের অঙ্কে নেমে যায়। সেই সঙ্গে নিম্নতম অঙ্কের তাপপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব হয়। ঘরের মধ্যে যে স্বাভাবিক তাপ আমরা অনুভব করি, সেই নিম্নস্তরের তাপ কোন জায়গায় সঞ্চিত করেও তার থেকে এই নতুন বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। রকেটে দ্রবীভূত অক্সিজেন কিম্বা অনেক ক্ষেত্রে জ্বালানীর জন্য দ্রবীভূত মিথেন গ্যাস (কার্বন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ) ব্যবহার করা হয়। এর জন্য ওই রকম সঞ্চয়স্থানের ব্যবস্থা থাকে। কিছুটা দ্রবীভূত যে কোন গ্যাস সঞ্চয়স্থানে রেখে তেমনি করে চুম্বক-তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এমন কি আবহাওয়া বা জলের স্বাভাবিক তাপ থেকেও এটা সম্ভব। যে দ্রবীভূত মিথেনের কথা বলা হল—তা জলচর জাহাজের নীচে প্রবাহিত জলের উত্তাপ দ্বারা জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করে। চুম্বক-তাপ-বিদ্যুৎ এই উত্তাপের সামান্যতম অংশ থেকেও উৎপাদিত হতে পারে। এই বিদ্যুৎকে যদি বলি হিমজাত বিদ্যুৎ, একটুও ভুল হবে না। চুম্বক-তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনযন্ত্র এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

চুম্বক-তাপজাত বিদ্যুতের কথা বলতে হলেও স্বভাবত পদার্থবিজ্ঞানের সেই কাঠিন্য-দশার তত্ত্ব এসে পড়ে। আমরা জানি ধাতু বলতে পদার্থের কাঠিন্যদশা যেমন বোঝায়, তেমনি বোঝায় যে তারা বিদ্যুৎ পরিবাহী। তার কারণ, তার মধ্যে প্রচুর স্বাধীন ইলেকট্রন বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা রয়েছে—অন্তত প্রতিটি পরমাণুতে একটি করে স্বাধীন ইলেকট্রন। কিন্তু উপধাতু বা উপপরিবাহী পদার্থে আরও কিছু বিদ্যুৎ-কণার অস্তিত্ব, তা ধনাত্মক এবং এইগুলিকে বলা হয় 'বিবর' — যা একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রনের অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। উপপরিবাহী বা আংশিক পরিবাহী পদার্থে ওই ধনাত্মক বিবর যেমন থাকে, তেমনি আবার অল্প কিছু ইলেকট্রনও থাকে—তাই তারা অংশত বিদ্যুৎপরিবাহী। উপধাতুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা আর বিবরের সংখ্যা সমান—যার ফলে এরা বিদ্যুৎপরিবহনে মধ্যপন্থী। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন ও বিবর সহাবস্থান করার কারণ হচ্ছে এর পরমাণুতে চমৎকার এনার্জি-ব্যাণ্ড বা শক্তিবেড়ের ব্যবস্থা। শক্তিবেড় হচ্ছে : একটি পরমাণুতে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীনের চার পাশে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনদের চক্র। কেন্দ্রীনের নিকটে ও দূরে পৃথক পৃথক শক্তিবেড়ের মাঝখানে ফাঁকগুলিকে বলা হয় শক্তিহীন অঞ্চল। যদি দুটি শক্তিবেড়ের মাঝখানে ফাঁকটা খুব বেশী হয়ে পড়ে—তাহলে ওইরূপ পারমাণবিক গঠনসম্পন্ন পদার্থখণ্ড হয়ে ওঠে ইনসুলেটর। উপ-ধাতুর ক্ষেত্রে কিন্তু শক্তিহীন অঞ্চল বা এনার্জিগ্যাপের পরিবর্তে দেখা যায় একটা শক্তিবেড় অপর শক্তিবেড়ের ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেছে কিছু দূরে। এখন, উপধাতু বলতে কী বোঝায়? এরা ঠিক মিশ্রিত ধাতুও নয়। যেমন বিসমুথ — এক রকম রক্তাভ সাদা পদার্থ, যেমন এ্যান্টিমনি—যা থেকে সুর্মা হয়, ইত্যাদি। বিসমুথে মোটামুটিভাবে প্রতি দশ লক্ষ পরমাণুতে একটি করে ইলেকট্রন এবং একটি করে বিবর রয়েছে। অথচ বিস্ময়ের কথা, এর ফলেই তার উচ্চ ধরনের বিদ্যুৎপরিবহন-ক্ষমতা তো রয়েছেই; উপরন্তু চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টিতে সে অতিশয় পটু।

বিসমুথের সঙ্গে অ্যান্টিমনি মিশিয়ে বা খাদমিশ্রিত উপধাতু সৃষ্টি করে, পরিশেষে বিসমুথ-টেলুরাইড মিশিয়ে, তাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে দেখা গেছে একশ ত্রিশ বছর আগে আবিষ্কৃত পেল্টিয়ের-তত্ত্বের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এক প্রান্তে তাপ, অন্য প্রান্তে শৈত্য দেখা দিচ্ছে। এবং মধ্যস্থলে চুম্বককেন্দ্র বিরাজ করছে। এই তত্ত্বের পাশাপাশি হচ্ছে সীবেকতত্ত্ব — যা তাপজাতবিদ্যুৎ উৎপাদনের নিয়ামক। এই দ্বিতীয় তত্ত্বের কার্যক্রমে পাওয়া গেছে দু-প্রান্তের তাপ ও শৈত্য ছাড়াও একটা বাড়তি ফল। তা হচ্ছে কিছু পরিমাণ বাড়তি বিদ্যুৎ বা ভোল্টেজ। এবং এই সব কাজে উপরোক্ত উপধাতুটি অর্থাৎ বিসমুথমিশ্রিত এ্যান্টিমনি অদ্বিতীয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শৈত্য বা উত্তাপ ছাড়াও বাড়তি বিদ্যুৎশক্তি এইসব প্রক্রিয়ায় পাওয়া সম্ভব। আর এর মূলে রয়েছে চুম্বকক্ষেত্রটি। বলাবাহুল্য এই পদ্ধতির মধ্যে দারুণ জটিল বিষয়গুলি রয়েছে। তা বিজ্ঞানীদের গবেষণার ও নিতান্ত টেক-নিকাল প্রসঙ্গের কথা। আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়, চুম্বকক্ষেত্র আর তাপ-সহযোগে যে নতুন বিদ্যুৎশক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা মানুষের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। স্বাভাবিক আবহাওয়া, জলের উপরিভাগের কিম্বা ঘরের মধ্যের স্বাভাবিক উত্তাপ কিছু অংশে সঞ্চয় করে ওইসব উপধাতুখণ্ডের মাধ্যমে আমরা প্রয়োজনীয় শীততাপনিয়ন্ত্রণ করতে পারব; সেই সঙ্গে কিছু বিদ্যুৎও পাব, যা বিচিত্র কাজে ব্যবহার করা যেতে পারবে। এই নতুন চুম্বক-তাপজাত বিদ্যুৎ পৃথিবীতে নতুন যুগ নিয়ে আসছে।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এক ইনিংসে ৪০০ উপরে কোন কোন ব্যাটসম্যান রান করেছেন?

(খ) টেস্ট ক্রিকেটে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও নবম উইকেটে রেকর্ড সংখ্যক রান কত?

বিনীত—
স্বপনকুমার ব্যানার্জী,
ল্যাংড়াবাগান, কাটিহার।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পূর্ব রেলওয়ে, পশ্চিম রেলওয়ে, দক্ষিণ রেলওয়ে, মধ্য রেলওয়ে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে এবং পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের হেড অফিস কোথায়? এই রেলওয়েগুলির জেনারেল ম্যানেজার, চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও চীফ মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়রের নাম কি?

(খ) গোহাটির নিকটে অবস্থিত 'ব্রহ্মপুত্র সেতু'র দৈর্ঘ্য কত?

(গ) সিরিয়া, বেলজিয়ম, ত্রিনিদাদ ও ইয়েমেনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের নাম কি?

(ঘ) লোকসভার ডেপুটি স্পীকার এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের নাম কি?

(ঙ) দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লেবানন, আইভরি কোস্ট, টাঙ্গানিয়া, বুরুণ্ডি, নাইজেরিয়া, সিলোন ও নেদারল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?

বিনীত
শিখা ও রমা দাশগুপ্ত
আলিপুরদুয়ার জংশন

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বৃটেনে কমন্স সভার আসনসংখ্যা কত? বর্তমানে কতগুলি আসন শ্রমিক দলের অধিকারে?

(খ) প্রথম অ্যাটম বোমা কোথায় তৈরী হয় এবং কোথায় বিস্ফোরণ হয়?

(গ) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজের নাম কি? এই জাহাজ কত টন জিনিষ বহন করতে পারে?

(ঘ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম কি কি?

(ঙ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন প্রধান প্রধান দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম জানতে চাই।

বিনীত
প্রবোধ, সত্যব্রত ও সুলেখা সান্যাল
কাটোয়া, বর্ধমান

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীজয়ন্তকুমার কর্মকারের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন কথা-সাহিত্যিক কে কে এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো ঐকামত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবু বিশ্বসাহিত্যের অধিকাংশ রসগ্রাহী পাঠকদের রায় অনুযায়ী নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা বিশ্বের শীর্ষ কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিম্নোক্ত বরণীয়দের নামোল্লেখ কোরতে পারি। কথাসাহিত্যের দুই ভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্প। দুটি ভিন্ন মেজাজের শিল্প। সেজনাই বিশ্বের শীর্ষ কথাসাহিত্যিকদের খোঁজা উচিত, আমার মতে, এই দুই ভাগের প্রত্যেকটিতেই স্বতন্ত্রভাবে।

বিশ্বের শীর্ষ পাঁচজন ঔপন্যাসিক :

লিও তলস্তয় (রাশিয়া); অঁরে দ বালজাক (ফ্রান্স); ফিওদোর দস্তয়েভস্কি (রাশিয়া); ভিক্টর উগো (ফ্রান্স); চার্লস ডিকেন্স (ইংল্যান্ড)।

এবং বিশ্বের শীর্ষ পাঁচজন ছোটগল্পকার :

আন্তন চেখভ (রাশিয়া); গী দ মোপাসাঁ (ফ্রান্স); এডগার অ্যালান পো (আমেরিকা); ও'হেনরী (আমেরিকা); হেরমান সুদেরমান (জার্মানী)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমগ্র নিখুঁত উপন্যাসের অভাবনীয় সমৃদ্ধি হোয়েছে যেমন ফ্রান্সে, তেমনি আমেরিকায় হোয়েছে ছোটগল্পের আশ্চর্য কর্ষণ। রাশিয়ায় কথা-সাহিত্যের দুই শাখার সমভাবে চর্চা ও সাফল্য ঘটেছে। রাশিয়া থেকেই এসেছেন উপন্যাস ও ছোটগল্পের চিরকালের শীর্ষতম দুই স্রষ্টা—তলস্তয় ও চেখভ।

নমস্কারান্তে ইতি—
বিনীত
অনিরুদ্ধ সরকার, কলি-৪৩
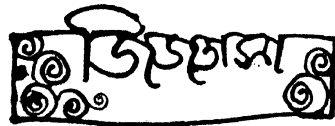
'সধবার একাদশী' দীনবন্ধু মিত্রের অবিস্মরণীয় প্রহসন। 'ইয়ং বেংগল' গ্রুপের মদ্যাসক্তির বিরুদ্ধে এই শ্লেষাত্মক রচনাটি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় এটি থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংলাপ তুলে দেওয়া হল। বাম দিকের সংলাপ স্তম্ভ ঠিক রেখে ডান দিকের বিশৃংখল নামগুলিকে ঠিকমত সাজাতে হবে। উত্তর আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর—(১) শিবনাথ, (২) হাসুবানু, (৩) নিখিলেশ, (৪) নীলাঞ্জন, (৫) নিমচাঁদ, (৬) ভূতনাথ, (৭) সর্বজয়া, (৮) কিরণময়ী, (৯) জেবউন্নিসা, (১০) ঘনাদা, (১১) কুসুম, (১২) ব্যোমকেশ।

(১) রাগ করো না বাবা, প্রমাণ দেব—না পারি, জুতো মারো, আমার মাতায় জুতো মারো, বাবার মাতায় জুতো মারো, বাবার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার Great grand বাবার মাতায় জুতো মারো, সহস্র পুরুষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্যকুব্জের মাতায় জুতো মারো—	(১) ভোলা
(২) নিমচাঁদ বলেচে পরিণয়-নিবারণী সভা স্থাপন কল্যে কোন ভদ্রসন্তান সুরাপান-নিবারণী সভার সভ্য হবে না।	(২) কাঞ্চন
(৩) এর আর প্যারা পারি কি, তুই যে খবর বলছিস হয় তুই সোনাগাছি গেচলি, নয় তোর ভাই তোকে বলেচে—"সৌদামিনী, তুমি বেশ গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড়-ভাঙা দ।"	(৩) অটল
(৪) বিলক্ষণ রসিক হইচিস, এমন কল্যে লোকে যে ঠাট্টা করবে। এ ত আরো গৌরবের কথা, অটলবাবুর মেয়েমানুষ নকুলবাবুর বাগানে গিয়েছিল; আবার তোমার বাগানে একদিন নকুলবাবুর মেয়েমানুষ আসবে।	(৪) কুমুদিনী
(৫) আই জাইন ইউ সার, আই জাইন ইউ সার, হোয়ের ইউ গো আই গো, সানইনলা জাইন ফাদার ইনলা, আই জাইন ইউ সার—	(৫) নিমচাঁদ

আমাদের দেশের কারিগর

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

নিজের উদরান্নের জন্যে যে শ্রম করে সে শ্রমিক।

শ্রমিককে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

এক : শ্রমের বিনিময়ে যে ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অথবা হাতুড়ি, ছেনি, গাঁইতি, কুড়াল কোদালের সাহায্যে উদরান্নের সংস্থান করে :

দুই : যে ব্যক্তি স্বয়ং হাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে শ্রমের দ্বারা কোন বস্তু নির্মাণ করে উদরান্নের সংস্থান করে :

প্রথমটিকে আমরা 'শ্রমিকই' বলবো, দ্বিতীয়কে 'কারিগর'। এমনি 'কারিগর' সংজ্ঞায় : রৌপ্য ও স্বর্ণকার, কর্মকার, মৃত্তিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, চর্মকার, রূপকার প্রভৃতি।

শ্রমিক নিয়ে অনেক বলা হয়েছে, অনেক লিখিত আলোচনাও হয়েছে। এমন কি অনেক বড় আন্দোলনও হয়েছে কিন্তু কারিগর নিয়ে প্রকৃত কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, বলতে গেলে আমরা এই তথাকথিত কারিগরদের নানাভাবেই উপেক্ষা করে আসছি। 'শ্রমিক' নামে আমাদের যত দরদ 'কারিগর' নামে একবিন্দু নয়।

অথচ, সেদিন কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় বোম্বের শিল্পীকেন্দ্রের উদ্বোধন প্রসঙ্গে একস্থানে বলেছেন :

'The craftsman was the unbroken link in the tradition that embraced both the producer and consumer with the social and religious fabric....'

যদি বলা যায়, কারিগরেরা জাতীয় সংস্কৃতির ধারক, তবে বোধহয় খুব অন্যায় হয় না।

সাহিত্য, সংগীত ও ললিতকলা যদি জাতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উপাদান বলে গণ্য হয়, তবে হস্তশিল্প কেন না জাতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে? মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পাপ্রাপ্ত 'পোড়ামাটির পুতুল' বা 'ভগ্ন-মৃৎপাত্র' আজকের বর্তমান সভ্যজগতে প্রাক্‌-আর্য সভ্যতার এক বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক ভগ্নাংশ। মিউজিয়ামে রক্ষিত অনেক দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হস্তকৃত কারু ও দারু শিল্প ভারতের নানা ধারার ঐতিহাসিক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার আজো উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। ঐ সমস্ত কারু ও দারু শিল্প শুধু নিপুণ ও সূক্ষ্মতম কারুকার্যেই পর্যবসিত নয়, গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গ। নির্মিত প্রতিটি বস্তুই মৌলিক ও রসাশ্রিত।

বর্তমানে এমন বস্তু প্রস্তুত হবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অতীত ভারতের নানা হস্তশিল্পের উত্থান-পতনের ইতিহাস তেমনি সম্ভাবনাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের রুচিবোধের প্রায়শঃ

নিম্নগামী বিবর্তন ঘটেছে বিপর্যস্ত রাষ্ট্রের নানাপ্রকার আর্থিক সংকটপূর্ণ পটভূমিকায়। ফলে, বস্তু ও মনন-রুচি দুই নির্বাসিত হয়েছে হস্তশিল্পের ভিটামাটি থেকে। বর্তমানে অবশিষ্ট তার কাঠামো। আর এই কাঠামোকেই আঁকড়ে ধরে আছে মুষ্টিমেয় কিছু বুভুক্ষু কারিগর।

অর্থাৎ অধুনা ভারতের কারিগর যে প্রকারের হস্তশিল্পের নমুনা প্রস্তুত করেন, তাতে ট্রাডিশন বা অন্ধ গতানুগতিকতাকেই 'মক্সো' করা আছে, নাই তথাকথিত প্রাণঢালা নিপুণতা। ঠিক এ কারণেই ব্যক্তির সঙ্গে কারিগরের সম্পর্ক আজকাল শুধু গার্হস্থ্যজীবনের প্রয়োজন মিটাতে ভালমন্দ রুচিবোধের প্রশ্ন এখানে গোণ।

বিভিন্ন প্রকারের হস্তকৃৎ শিল্পোৎকর্ষতায় জাতীয় সংস্কৃতিকে এরা জগতের পাদপীঠের সামনে অনায়াসেই স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলতে পারেন, যদি পারিবারিক উদরান্নের সংস্থান ওদের ঘটে ওঠে। অর্থাৎ ক্ষুধার অন্ন আয়াসলব্ধ হলেই হস্তশিল্পের মৌলিক ও সূক্ষ্ম-নিপুণ পথ অবারিত হতে বাধা থাকবে না।

অবশ্য এমনি অর্থসংকট বর্তমানে প্রায় সমগ্র জাতির—এদের শুধু নয়। তবু বিচার করে দেখতে গেলে, দিন-মজুর বা শ্রমিকদের চাইতে কারিগরদের আয় তুলনামূলক অনেক কম।
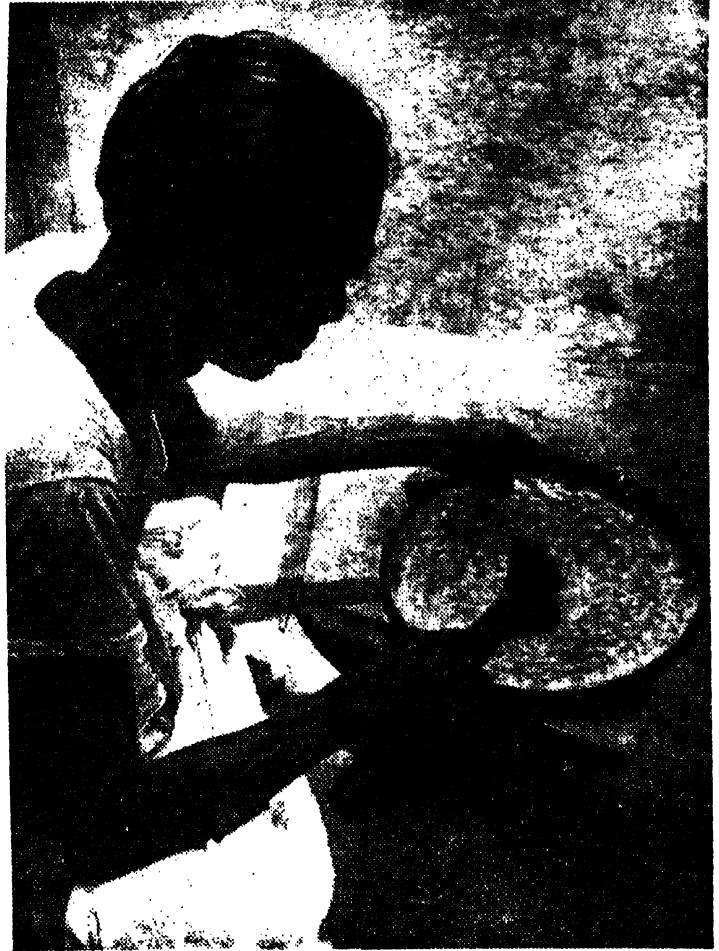
পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দৈনিক শ্রমিকের আয় যদি পাঁচ থেকে সাত টাকা হয়—তবে কারিগরদের তিন থেকে চার।

এর দুটি মাত্র কারণ : এক,—হস্তজাত বলে এদের সৃষ্ট শিল্পবস্তু উৎপন্ন কম হতে বাধ্য থাকে; দুই,—বাজার চাহিদা কম। প্রথমটির অর্থ বোঝা যায় কিন্তু দ্বিতীয়টি? অর্থাৎ বাজার চাহিদা কম কেন? প্রথমেই উল্লেখ করা গিয়েছে যে, মনুষ্যগোষ্ঠীর গতানুগতিক রুচিবোধের উপর ঐ সমস্ত হস্তকৃৎ শিল্পের মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। আর ঐ শিল্প যদি কারিগরদের পূর্বসূরীকৃত ট্রাডিশনাল পথ অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলে, তবে সাধারণের কাছে তার মূল্যায়ন বোধ কমে যায়।

সুতরাং সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি বা জনসাধারণের রুচিবোধের সঙ্গে হৃদ্যতা রেখে যদি কারিগরগোষ্ঠী হস্তজাত শিল্পের মৌলিক রূপায়ণে সক্ষম হন, (অবশ্যই কিছুটা ট্রাডিশনাল সমতা রক্ষা করে) তবে সর্বত্রই উক্ত শিল্পের মূল্যমান শুধু উন্নতই হবে না, বাজার চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু দেশের বর্তমান কারিগরগোষ্ঠী তেমনভাবে চলতে সক্ষম হবেন কিনা, জানি না, কারণ সবই নির্ভর করে ওদের সুষ্ঠুভাবে উদরান্নের সংস্থানের ওপর।

অবশ্য এ জবাবের ভার সমগ্রভাবে দেশীয় সরকারের। শুধু ক্ষুধার অন্ন জোগানই নয়, হস্তশিল্পকে নানাভাবে উন্নয়ন করার পথে যেসব অসুবিধা, যেসব বাধাবিপত্তি, সবটাই সরকারকে সমূলে নির্মূল করতে হবে, আর তাতেই দেশের কারিগরগোষ্ঠী হস্তশিল্পকে এক নূতন মর্যাদার পথে চালিত করতে সক্ষম হবে।

আশার কথা, সম্প্রতি কয়েক বছর হোলো, ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সর্বভারতীয় হস্ত কারিগরী সংস্থা ('All India Handicrafts Boards') যৌথ বা সমবায় সমিতির মাধ্যমে কারিগরদের নানাবিধ সমস্যাসমাধানের পথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 19th August, 1966 শুক্রবার, ২রা ভাদ্র, ১৩৭৩ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীবুলবুল চৌধুরী

অবহেলিত প্রাচীন শিল্পকীর্তি

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের অনেক প্রাচীন শিল্পকীর্তি এখনও বহু স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি বহন করছে। বাঁকুড়ার মন্দিরের ন্যায় শিল্পসৌকর্য-বিশিষ্ট দেব-দেউলাদি আজও বাংলা দেশের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সংস্কারাভাবে সেগুলি ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় আজও কোন প্রকারে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, এরকম কত শিল্পসম্পদ যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কে তার খবর রাখে?

ইংরেজ রাজত্বে লর্ড কার্জনের সময় পুরাকীর্তিগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছিল, কিন্তু আমাদের জাতীয় সরকারের আমলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আছে, সরকারী কর্মচারী আছে, তবুও এসব জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার কোন প্রচেষ্টা নেই। অবশ্য, এ সব প্রাচীন সম্পদগুলো রক্ষার ব্যবস্থায় আমাদেরও দায়িত্ব আছে, কিন্তু বর্তমান যন্ত্রণা-জর্জরিত যুগে ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যুগে স্থানীয় লোকেরও কোন আগ্রহ নেই। ফলে, এ প্রকার দুর্লভ যুগের সাক্ষী প্রাচীন নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হলে অচিরেই এগুলি লুপ্ত হয়ে কৃষ্টির ইতিহাস থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এরূপ একটি প্রাচীন শিবমন্দির এখনও তার শিল্পসমৃদ্ধি নিয়ে কোন প্রকারে দাঁড়িয়ে আছে মালদহ জেলার আইহো নামক একটি পল্লীগ্রামে। অবহেলিত মন্দিরের গর্ভগৃহ সংলগ্ন সম্মুখের ইষ্টক-খোদিত ফুললতাপাতাগুলি এখনও অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় আছে, শীর্ষ-দেশের ত্রিশূলসহ কিয়দংশ পড়িয়া গেলেও এবং মন্দিরটির উপরিভাগে কতকগুলি গাছ গজাইলেও মন্দিরটি এখনও সংস্কার-যোগ্য আছে।

শুনা যায়, মন্দিরটি লালগোলার রাজ-পরিবারের জায়া দেব্যা নামে প্রায় দু'শ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূজার ব্যয়-নির্বাহের জন্য কিছু জমি এবং মাসিক বরাদ্দও ছিল। বঙ্গবিভাগের পর এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরে জমি পাকিস্তান অন্তর্গত ও রাজপ্রদত্ত বরাদ্দও বন্ধ।

মন্দিরটির সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশু সংস্কারের জন্য জানাচ্ছি অনুরোধ।

বিনীত
কালীপদ লাহিড়ী
মালদহ

'সর্পচিন্তা' প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

৯ম সংখ্যা (১লা জুলাই ১৯৬৬) অমৃতে প্রকাশিত শ্রীতারাপদ পালের 'সর্পচিন্তা' প্রবন্ধটি মৌলিকতার দাবী না রাখতে পারলেও সাপ সম্পর্কে দু-একটি অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করার জন্য অবাক না হয়ে পারিনি। অবশ্য শ্রীযুক্ত পালমহাশয় সাপ সম্পর্কে যে আগ্রহশীল এবং মননশীলতার সঙ্গে সাপের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদার্হ।

তিনি লিখেছেন : সাপুড়ের বাঁশীর আওয়াজ শুনলে যেমন সাপেরা আকৃষ্ট হয়, বেরিয়ে আসে তাদের সুড়ঙ্গ থেকে, ছোবল তুলে খানিকটা শরীর মাটির ওপর সোজা দাঁড় করিয়ে দেয়,... । এরকম ধরনের ধারণা তাঁর কেন হল অথবা এ রকম অবৈজ্ঞানিক উক্তি তিনি কিভাবে বারবার করতে পারেন! যারা সাপ সম্পর্কে চিন্তা কিম্বা পড়াশুনো করে না তাদের মনে এই রকম ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, যাঁরা সাপের শ্রবণপটুতায় বিশ্বাসী তাঁরা শুনে দুঃখিত হবেন যে, কোন জাতের সাপই কানে শুনতে পায় না, কারণ শ্রবণ-পটু জীবের শ্রবণযন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ যে বহিঃকর্ণ অর্থাৎ সোজা কথায় কান থাকে, কোন সাপেরই তা নেই। ফলে বায়ুচালিত কোন শব্দই তারা শুনতে পায় না—বাঁশীর মিষ্টি মোহনীয় সুর তো দূরস্থান। কাজেই বাঁশীর আওয়াজ সাপকে পাগল-পারা কামমোহিত অভিসারিকার ন্যায় তার নিরাপদ এলাকা সুড়ঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে না। কানের অভাবহেতু বায়ু-চালিত শব্দ শুনতে না পেলেও সাপেরা অন্যভাবে শুনতে পায়—বায়ুর পরিবাহী ক্ষমতা আছে। মাটির ওপর যে শব্দই করা হোক না সেই শব্দের তরঙ্গ বা কম্পন মাটির মাধ্যমে বাহিত হয়ে মুল শ্রুতিযন্ত্রে পৌঁছায় আর সাপ তখন শুনতে পায়। তাছাড়া, উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে অর্থাৎ সাপকে ঘাঁটালে কিম্বা সাপ বাধা-প্রাপ্ত হলে অথবা বেকাদায় পড়লে বা পালাবার সুযোগ না পেলে দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খাড়াভাবে ফণা বিস্তার করে হিস হিস শব্দ করতে থাকে। আক্রমণের আশঙ্কায় আক্রমণকারীকে ভয় দেখানোর জন্য এরা এই রকম করে। তবে বেশী উত্তেজনাপ্রবণ সাপ আবার কারণেও ফণা বিস্তার করে তেড়ে করতে আসে। শহর-বাজারে সাপ নিস্তেজ বিষদন্তহীন সাপ খেলানো কি শ্রীযুক্ত পালের ধারণা হয়েছে—আওয়াজ শুনে সাপ "ছোবল তুলে খা শরীর মাটির ওপর সোজা দাঁড় ক দেয়?"

তিনি আরেক জায়গায় আবার স "একতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা"র রোমাঞ্চকর সিন্দবাদসুলভ ঘটনা ব করেছেন। শুনতে অবশ্য গল্প হি মন্দ লাগে না। তিনি যদি অনুসন্ধি হয়ে উল্লিখিত ঘটনাটি সম্পর্কে অনুস করতেন—তাহলে বুঝতে পারতেন: এক ধরনের অদ্ভুত কুসংস্কারসুলভ পল্ল গ্রাহী রঞ্জিত ঘটনার অবক্ষেপ মাত্র! সা "একতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা" এই দু শব্দ তিনি কোন অভিধায় প্রয়োগ করে জানি না। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন জাগে সাপ সৃষ্টির কোন স্তরের জীব? সাপে একতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা গুণ থাক পারে কিনা জানি না—তবে জীব-জন্তুদে মধ্যে যারা খানিকটা মননশীল, তাদে ভেতর ঐ সমস্ত গুণের কথ শোনা যায়। অবশ্য পালমশায়ের বিচারে সাপ যদি মননশীল জীবের (??) পর্যায়ে পড়ে থাকে!

তিনি লিখছেন : গোখরা সাপের দংশনে বিশেষ যন্ত্রণা হয় না। পালমহাশয় কি ইতিপূর্বে সর্পদষ্ট হয়েছিলেন? সর্প বিষ বিশেষজ্ঞরা বলেন : সাপ ছোবল দেবার সময় যদি ক্ষতস্থানে বিষ ক্ষরিত হয় তবে দংশনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা ও সেই সঙ্গে মৌমাছি বা বোলতার হুল ফোটানোর মত এক অসহ যন্ত্রণা হয়।

ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়ে এই দুই দেশে বাঘ, ভালুক, কুমীর ইত্যাদির মিলিত আক্রমণে যত না লোক মারা যায়, তার দশ গুণ মরে সাপের কামড়ে। এই দুই দেশ মিলিয়ে গড়ে ১০০ জন লোক প্রতিদিন মারা যায়। এই যেখানে অবস্থা সেখানে শ্রীযুক্ত পালমহাশয় উপসংহারে শুধুমাত্র সাপের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ না রেখে সাপ সম্পর্কে আরেকটু বিশেষ দিক দিয়ে যথা—নির্বিষ ও বিষধর সাপের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, সর্পবিষজনিত লক্ষণ, বিষের বিশেষ (প্রাথমিক) চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করলে জনসাধারণ সব থেকে বেশী উপকৃত হতে পারত সন্দেহ নেই।

বিনীত
সৈয়দ আনোয়ার আলম
মুর্শিদাবাদ।

স্বাধীনতার উৎসব

আমাদের স্বাধীনতার ঊনবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব গত ১৫ আগস্ট সারাদেশে উদযাপিত হয়েছে। এই দিনটি আমাদের কাছে পবিত্র এবং স্মরণীয়। শত শহীদের প্রাণের বিনিময়ে এই দিনটি জাতির জীবনে সংকল্পের বাণী বহন করে আনে প্রতি বৎসর। বর্তমানে ভারতবর্ষের দুঃসময় যাচ্ছে। জনসাধারণের জীবনেও নানাবিধ সমস্যা আজ স্বাধীনতার আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমাদের স্মরণীয় দিবসের পবিত্রতাকে আমরা কোনো কারণেই নষ্ট হতে দিতে পারি না। বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে যে-প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রয়োজন তা আমাদের মনে উদ্দীপিত করে ১৫ আগস্ট। তাকে আমরা সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে প্রতি বৎসরই স্বাগত জানাই।

গত উনিশ বছরে আমরা দুজন প্রধানমন্ত্রীকে হারিয়েছি। জাতির জনকরূপে যিনি নন্দিত সেই মহাত্মা গান্ধীকে স্বাধীনতার অল্পদিন পরেই আততায়ীর নির্মম হস্ত আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই দুর্যোগের দিনে জওহরলাল নেহরু ছিলেন দীপশিখার মতো। নতুন ভারতবর্ষের গোড়াপত্তন করে গেছেন তিনিই। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অবিচল বিশ্বাস রেখে তিনি একটি গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতি জাতিকে দিয়ে গেছেন। আমাদের কর্তব্য এই দুটি উত্তরাধিকারকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা এবং জনগণের দুঃখমোচনের জন্য তাকে কার্যকর করে তোলা। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হয়তো এতে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও একটি সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে ভেঙে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামো দাঁড় করা হয়েছে। প্রচেষ্টার ত্রুটি হয় নি। ব্যর্থতা হয়েছে তার রূপায়ণে। কিন্তু সৎপ্রচেষ্টারও মূল্য আছে। সংকটের সময়ে তা ভুলে গিয়ে যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দেশের অঙ্গচ্ছেদ করে স্বাধীনতা এসেছিল। তার জের এখনো কাটে নি। বহু লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে হয়েছে আমাদের। এখনও সেই স্রোত বন্ধ হয় নি। তদুপরি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বৈরী মনোভাব আমাদের সমৃদ্ধির পথে হয়েছে অন্তরায়। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা খাতে বহু অর্থব্যয় করতে হচ্ছে আমাদের। আমাদের গড়ে-ওঠা অর্থনীতি ও পরিকল্পনার অগ্রগতির ওপর তার চাপ পড়েছে গভীরভাবে। অথচ এ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না। কারণ, জনগণের সমৃদ্ধি যেমন কাম্য তেমনি কাম্য আমাদের দেশের নিরাপত্তা। এই ব্যয়ভার কষ্টসাধ্য হলেও আমাদের বহন করতে হবে। সব দেশেরই তা করতে হয়।

এছাড়াও আমাদের কতকগুলি সমস্যা আছে যা দেশের অখন্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিয়েছে। কাশ্মীরের ওপর ভারত-বিরোধীদের লুব্ধ দৃষ্টি এখনও আছে। আমাদের বহুজাতিক ও বহুভাষী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শের অগ্নিপরীক্ষা চলছে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। তার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক ভারতবাসীর। পূর্বসীমান্তে আরেকটি সমস্যা রয়েছে নাগাভূমিতে। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণভাবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় রত। সুতরাং আমাদের ব্যর্থতার কথা বড় করে বলার সময় এই দুরূহ সমস্যার বিষয় যেন আমরা ভুলে না যাই।

খাদ্যসংকট আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রগতিকে অনেকটা রোধ করে রেখেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে এই বাস্তব সমস্যাগুলি আমাদের আজ ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। পরনির্ভরতা সম্বল করে কোনো দেশের সমৃদ্ধি আসতে পারে না। তাই সবার আগে খাদ্যে স্বয়ংনির্ভরতার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার আহ্বান এসেছে। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেছিলেন যে, ১৯৭২ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরে দেশের সমস্ত মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পর্কে আশ্বস্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার শেষেই সর্বসাধারণের জন্য ডাল-ভাত-কাপড় দেওয়ার সংকল্প পূরণ করতে হবে। এটা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করতে পারলে আমাদের আরও বৃহত্তর সংকল্প সিদ্ধ হবার কোনো আশা নেই। কারণ, ক্ষুধা থেকে মুক্তি ও প্রতিদিনের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হলে শিল্প-প্রগতির উচ্চস্তরে পৌঁছুবার আশা দুরাশা।

সুতরাং স্বাধীনতার বার্ষিকী আমাদের শুধু সংগ্রামের স্মরণোৎসব নয়, বৃহত্তর ও কঠোরতর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন। সেই প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব সরকারের পক্ষে যেমন অপরিহার্য, দেশের মানুষের পক্ষেও তাই। অর্থনীতিক সংকট আছে, রাজনীতিক সংকটও আছে। কিন্তু জনসাধারণের সামনে যদি সততা ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় তাহলে শত দুর্যোগেও জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। পনেরোই আগস্ট আমাদের অগ্রযাত্রার পথে আরেকটি পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের মতো একটি বিশাল দেশকে ঐক্যবদ্ধ রেখে গণতান্ত্রিক শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্বে আমরা সাফল্য লাভ করেছি। এই সাফল্য সার্থকতর হবে জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতায়। গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে সামাজিক অসাম্য দূর করা নিশ্চিতই দুরূহ পরীক্ষা। অগ্রগতির মন্থরতার কারণও তাই। তাকে ত্বরান্বিত করার জন্য জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আজ সেকারণেই সবচেয়ে জরুরী। গণতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং সর্বসাধারণের জন্য নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি পালনের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতার সংকল্প সার্থক হোক।

সাতকাহন

আরো একবার ঘড়ির কথা তুলছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ঘড়ি সে ঘড়ি নয়। ইতিপূর্বে একবার মুর্শিদাবাদের একটি টাওয়ার ক্লার্ক চুরির ব্যাপার নিয়ে পুকুর-চুরি এবং সময়-চুরির কিস্‌সা ফেঁদেছিলাম। বর্তমান প্রসঙ্গটিও ঐরকম একটি জয়ঢাক-মার্কা ঘড়ি নিয়ে, কিন্তু এর অনুসিদ্ধান্তগুলি একেবারে অন্য জাতের। অতএব প্রণিধান করুন।

খবর বেরিয়েছে, খাস কলকাতা শহরের ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকায় একটি গম্বুজ-নিবাসী পাবলিক ক্লকের দুটি মুখে নাকি দুরকম সময় ঘোষণা একই সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে।

অনুমান করা যায়, এর ফলে বহুরকম তিক্ত-মধুর ঘটনার আবির্ভাব ঘটছে। যেমন ধরুন, একজনের নাম রামবাবু, তিনি সকালে আপিস যাওয়ার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারের পূর্বদিকে ট্রাম থেকে নেমে ছুটতে শুরু করে-ছিলেন, এবং ধরা যাক গম্বুজ-ঘড়ির পূব দিকের মুখে তখন পৌনে দশটা—কাজেই ডবল কুইক মার্চ থেকে স্লো করে তিনি তাঁর গতি শুধু কুইক মার্চে নামিয়ে আনলেন; কিন্তু, যেহেতু তাঁর আপিস-বাড়িটি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম দিকে, অতএব রাস্তা পার হ'য়ে তিনি উত্তরদিকে এলেন, এবং অভ্যাসবশত চোখ তুলে যেই গম্বুজ-ঘড়ির দিকে আরেকবার তাকালেন, অমনি তাঁর চোখে প্রতিভাত হল—এগারোটা বাজতে দশ, এবং কাজে কাজেই উর্ধ্বশ্বাসে উঠে এবার তাঁকে ছুটতে হল না, কুইক মার্চে নয়—একেবারে বেয়োনেট চার্জ করার স্পীডে।

কিম্বা মনে করুন, কোনো এক যুবক অবিবাহিত, নাম ধরা যাক সুজিত, এবং সে তার নিজের পছন্দমতো কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। সংসারে যেহেতু এই ধরনের স্বয়ংসিদ্ধ বিয়েতে নিজের ইচ্ছেই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়, এবং যেহেতু মেয়েটির ইচ্ছেরও একটা বড় অবদান থাকে, সেইহেতু আমাদের এই সুজিত বলে ছেলেটিও বছর তিরিশেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল। কিন্তু ইদানীং একটি মেয়ে, নাম মনে করা যাক সুমিতা, সুজিতের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাবে বলে মনে হচ্ছে। দিন দুয়েক ওরা বাড়ির বসবার ঘরে গুরুজন ও লঘুজনের নেপথ্য-উপস্থিতিতে আলাপ-পরিচয় করেছে, একদিন পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় সপরিবারে ডিনারও খেয়েছে, এবং আজ—মাত্র আজই প্রথম ওরা স্থির করেছে, দুজনে 'একা' ওরা ম্যাটিনী-শো-এ সিনেমা দেখতে যাবে। কথা ছিল সুমিতা ঠিক আড়াইটের সময় নির্দিষ্ট সিনেমা হলের সামনে এলেই দেখতে পাবে কোনো একটা কিছু বলে আপিস থেকে ছুটি নিয়ে আগেই সেখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুজিত।
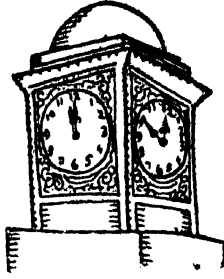
প্রতীক

ডাঃ জেকিল

মিঃ হাইড

তারপর একত্রে চা-পান এবং সিনেমা-দর্শন—নির্ভুল পূর্বরাগ-সম্মত প্রোগ্রাম। যাই হোক, লাঞ্চের পর সুজিত আপিস থেকে বেরিয়েও পড়ল ঠিকই, কিন্তু ক'দিন ধরে তার নিজের হাতঘড়িটা ভালো টাইম দিচ্ছিল না, তাই চোখ তুলে তাকাল গম্বুজ-ঘড়িটার দিকে, দেখল—মাত্র দুটো বেজে সাত। অতএব ট্রাম ধরার আগে কাছেই এক আপিসে গিয়ে তার এক বন্ধুর সঙ্গে একটা দরকারি কাজ সেরে নিল সুজিত এবং বন্ধুর অনুরোধে এক পেয়ালা চা এবং গোটা দুয়েক সিগারেটও ধ্বংস করল। তারপর রাস্তা পার হ'য়ে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে চোখ তুলল আবার ঐ গম্বুজ-ঘড়ির দিকে, কিন্তু এবার পশ্চিম দিকের মুখ, কাজেই সময়-ঘোষণা—দুটো বেজে পঞ্চাশ। মুহূর্তের মধ্যে হৃদ্‌স্পন্দন যেন বন্ধ হ'য়ে গেল সুজিতের, সমস্ত মুখ শাদা হ'য়ে উঠল, কিন্তু হঠাৎ কী ব্রেন-ওয়েভ এল, ঝাঁপিয়ে পড়ল সে পথ-চলতি একটা খালি ট্যাক্সির ভেতর।

কিন্তু পরিণাম কী হল, অনুমান করতে পারেন? সুমিতার সঙ্গে জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি? কিম্বা অতোটা গুরুতর না হলেও সিনেমা-দেখা ভণ্ডুল, আর সুমিতার তরফ থেকে অনুযোগ, ক্রোধ, এবং অশ্রু? না, এসব কিছুই ঘটেনি। কারণ, সুমিতা এসেই পৌঁছয়নি তখনো। কারণ, গম্বুজ-ঘড়ির দুটি দিকের টাইমের গোঁজামিল ছিল—আসলে তখন বেজেছিল মাত্র দুটো কুড়ি। সেদিন চা, সিনেমা সবই ওদের হ'য়েছিল, এবং বিয়েও হ'য়েছিল মাসখানেকের মধ্যেই।

তবে এ সবই আমার কল্পিত এবং গল্পিত বিষয়বস্তু। ঘড়ির দুই মুখে দুরকম অভি-ব্যক্তিই যে নিহিতার্থের দিক দিয়ে আমাদের এই যুগে সবচেয়ে মানানসই, সেইটেই বরং এ কাহিনীর সব থেকে উল্লেখযোগ্য মর‍্যাল। ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইড-এর অভিনয় একালে উপন্যাস থেকে সটান মনুষ্যজীবনে এসে প্রবেশ করেছে। আমরা সকলেই এইভাবে অন্যের সঙ্গে, এবং নিজের সঙ্গেও, লুকোচুরি খেলতে অভ্যস্ত।

যেমন ধরুন, একই সঙ্গে এদেশে শাদা-বাজার আর কালোবাজারের অস্তিত্ব। কিম্বা, ইদানীং যা দেখছি, খোলাবাজারে ক্রেতা-প্রতিরোধের জয়গান এবং ঢাকা-গলির ফাঁকে-ফুরসতে মাংস-ডিম ইত্যাদির জন্যে ব্যাকুলতা। এর সঙ্গে আমাদের ঐ ডালহৌসি স্কোয়ারের দুমুখো ঘড়ির রসিকতা দিব্যি খাপ খেয়ে যায়।

আর তেমনি মানানসই এটা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গেও। যেমন, মুখে আমরা সৎসাহিত্যের জন্যে অনর্গল আক্ষেপ করি, কিন্তু পড়বার বেলায় পড়ি ডিটেকটিভ গল্প বা প্রাগৈতিহাসিক উপন্যাস; অথবা আড্ডায় বসে বিদেশী সিনেমার উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ডের কথা তুলে লেকচার দিয়ে, দেখবার সময় গিয়ে ঢুকি বোম্বাই-ছবির আখড়ায়। নিজেদের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে এই যে আমাদের ডবল ডিলিং চলছে ডালহৌসির ঐ ঘড়ি কি তারই প্রতীক নয়!

—শ্রীচতুর্মুখ

বিচিত্র চরিত্র

বাবু মশায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লালপুর বাবুদের গ্রাম। আজকের কথা নয়, ষাঠ-বাষাট্টি বছর আগের কথা। তখন লালপুরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘরই ছিল বামুন জমিদারের ঘর। পাঁচগন্ডা সাড়ে সাতগন্ডা থেকে বড় পাঁচ আনি ছোট পাঁচ আনি ছ' আনি বাড়ীর অভাব ছিল না। পরগণে ভুরকুন্ডা-লাট কীর্তিহাটের শরীক সকলে। লালপুরের বাবুদের ছোট-বড় নেই। কারুর আদায় বছরে দুশো পনেরো টাকা দশ আনা ছ গন্ড দু কড়া দু ক্রান্তি, কারুর আদায় দশ হাজারের উপর। সকলেই জমিদার, সুতরাং সকলেই বাবুমহাশয়। কেউ দখিন পাড়ার জামতলা বাড়ীর বাবু, কেউ পিঁপড়ের গড়ে বেরকরা বাবু; কেউ বড়-বাবু, কেউ মেজবাবু, কেউ সেজবাবু, কেউ নরমবাবু, কেউ গরমবাবু, কেউ কোটবাবু, কেউ ফতোবাবু, কেউ মারকুন্ডে অর্থাৎ সবহোট্টাবাবু, এমনিতরো গ্রামময় বাবুর সংখ্যা বড় একটা দেখা যায় না। এবং কৃষ্ণের শতনামের মত নাম মুখস্থ ছিল সকলের। যে আমল বলছি, সে আমলের আগে বাবুদের সংখ্যা কম ছিল, মানে এই সব বাবুদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, কাজে-কাজেই সংখ্যাতেও কম ছিলেন। তবু বৈচিত্র্য ছিল বইকি, দয়ালবাবু, ক্ষ্যাপাবাবু, কর্তাবাবু প্রভৃতি নাম ছিল। এ আমলে এঁদের ধারা-ধরন বিচিত্র ছিল, ক্ষ্যাপাবাবুর ভাগ্নেরা সদরে ওকালতি করতেন। সদরে থাকতেন। তখন তাঁরা পুজোর সময় পাল্কীতে বাড়ী আসতেন। তাঁরা গ্রামে পৌঁছুলে সকলে ভিড় করে আসত, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করত। সে সমাদর গ্রামে বারোমাসথাকিয়ে ক্ষ্যাপাবাবুর পাবার কথা নয়, কিন্তু ক্ষ্যাপাবাবুর সেটা সত্যিই খারাপ মনে হ'ত। তাঁর ভাগ্নে, তাঁরাই তাদের বসবাসের বাড়ী জমি-জেরাত পুকুর বাগান দিয়েছেন, তাদের এত খাতির? না হয় হয়েছেই উকীল। অনেক ভেবে তিনি পুজোর আগে যেদিন তাঁর ভাগ্নেদের আসবার কথা সেদিন পাল্কী চড়ে গ্রাম থেকে ক্রোশ খানেক দূরে বট-তলাতে পাল্কী নামিয়ে অপেক্ষা করতেন; ভাগ্নের পাল্কীর হাঁক শোনা গেলেই পাল্কীতে চড়ে বসে বলতেন, হাঁকত পাল্কী। জোরসে হাঁক। হাঁ জোরসে।

তাঁর পাল্কীর বেহারারা হুম-হুম হাঁকতে-হাঁকতে গ্রামে এসে ঢুকত এবং যেখানে ভাগ্নেদের পাল্কী নামবে, সেখানে গ্রামের দশজনে জমে আছে, সেখানে পাল্কী থেকে নেমে বলতেন—এই সব ভাল তো। কি হে, ও রামলাল কথাই বল না যে!

দয়ালবাবু, অনতম উকীল ভাগ্নে ছিলেন, তিনি পুজোর আগে খোঁজ করতেন কোন কোন লোকের বাড়ী অভাবের দরুণ পুজোয় কাপড়-চোপড় হয় নি। তিনি কাপড়-চোপড় কিনে তার সঙ্গে এক হাঁড়ি বাতাসা শুদ্ধ দিয়ে সেই সব বাড়ীর কুটুম্ব-বাড়ী থেকে 'তত্ত্ব' আসছে বলে অপরিচিত লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিতেন। আবার এমন লোক ছিলেন যাঁর কাছে পাঁচ টাকা ধার নিলে সুদে-আসলে তাকে পাঁচশো করে তুলে তার জমি-জেরাত সব লিখিয়ে নিতেন। পাঁচ টাকা পাঁচশো টাকা অতিরঞ্জন মনে হতে পারে কিন্তু তা নয়, এরকম সুদ আজও রয়েছে। রয়েছে, রয়েছে গোপনে, ব্যক্তির কারবারে নয়, রয়েছে ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। এদের কাছে কুড়ি হাজার টাকা ধার নিলে কুড়ি বছরে সে টাকা সুদে-আসলে পঞ্চাশ হাজার দাঁড়ায়। কিন্তু সে থাক। মোট কথা এমন হিসেবী বাবুও ছিলেন।

এই সব নানান বাবুর মধ্যে শুধু বাবু ছিলেন একজন।

লোকের মুখে একটা প্রশ্ন ঘুরে বেড়াত, বাবু কবে আসবেন জান?

—কি দরকার? দরকার অনেক। কারও ছেলের চাকরী, কারও কন্যাদায়, কারও অসুখ-বিসুখ, কারও বড় কষ্ট, কারও ছেলের পড়ার খরচ নেই। দরকার অনেক রকম। কেউ একবার কলকাতা দেখতে যাবে, বাবুকে বলবে, বাবু নিয়ে যাবেন। কেউ বা একবার বাবুকে দর্শন করবে।

দর্শন করবার মত মানুষ। প্রায় ছ'ফিট লম্বা, সোনার বর্ণ গায়ের রঙ, মাথার চুল ধবধবে সাদা, নীলচে চোখ, পাকা এক জোড়া গোঁফ, সাদা থান ধুতি পরনে, গায়ে শক্ত কাফওয়ালা সাদা কামিজ, পায়ে এলবার্ট বা স্প্রীংওয়ালা জুতো। হাতে পিচের ছড়ি। পথ আলো করে চলতেন। মধুর মত মিষ্ট কথা। বাড়ী এসেছেন রাত্রে, সকালে বাড়ী থেকে কাছারী চলেছেন, আগে আগে চলেছে চাকর স্টীলের কাশবাক্স কাঁধে নিয়ে, তিনি চলেছেন পিছনে। বাড়ী থেকে বেরিয়েই একটি ঠাকুরবাড়ী, কালী দুর্গা শিব নারায়ণের সেবা আছে; সেই বাড়ীতে ছেলেরা খেলা করছে, পূজক পুজো করছে, বাবু প্রত্যেক মন্দিরে প্রণাম সেরে দাঁড়ালেন হাসি মুখে, ছেলেদের ডেকে বললেন—কি করছ হে সব? ভাল আছ? বাড়ীর সকলে ভাল আছেন? বাবা? মা? সব ভাল? আচ্ছা। আচ্ছা। আচ্ছা।

পথের সকল মানুষের সঙ্গেই কথা তাঁর।

নাম ছিল যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যবয়সে বড় গরীব ছিলেন। বড় গরীব। হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জজ শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যাঠামশাই ইনি। বাল্যকালে এত গরীব ছিলেন যে, প্রতিবেশী অবস্থা-পন্নদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। বর্ষার রাত্রে বৃষ্টি হ'ত, সে বৃষ্টিতে ভিজতে হ'ত তাঁদের। তাঁর মা বলতেন—

এই যে আমার ভাঙা কুঁড়ে
কুকশিমার বন
এই বনে যাদব আমার গড়বে
বৃন্দাবন।

মা বহুকাল গত হয়েছেন, কিন্তু যাদব-লালের মায়ের কথা পূর্ণ হয়েছিল। যাদব-লাল সামান্য ছাত্রবৃত্তি পড়ে পাঁচ টাকা মাইনেতে রাণীগঞ্জে, সে আমলের বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কয়লাখাদে মুন্সীর কাজ করতেন। যাদবলালের ভাগ্য আর কৃতিত্ব, তিনি ওই মুন্সী থেকে হয়েছিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানীর দেওয়ান। পরে স্বতন্ত্রভাবে কয়লাকুঠী কিনে ক্রমে ক্রমে এক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে-ছিলেন। গ্রামে সত্যই বৃন্দাবন গড়েছিলেন। বিরাট পাকা ঠাকুরবাড়ী, তিন মহলা বাড়ী, গ্রামে হাই ইংলিশ ইস্কুল, ইউ-পি গার্ল ইস্কুল, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী; বাবু বললে এই যাদবলালকে বুঝত সকলে।

বাবুর সঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ছে। বাবুর একটা আকর্ষণ ছিল, সেই আকর্ষণে তাঁর পিছন ধরেছিলাম সেদিন। আমার বয়স তখন সাত বা আট কিন্তু আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে। আমাদের গ্রামের 'নেচন ঠাকরুণ' ছিলেন গ্রামের মেয়ে, দরিদ্র বিধবা। দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে নিয়ে বাপের গ্রামে এসে বাস করছেন; অন্য ভদ্রজনের বাড়ীতে খেটে অর্থাৎ রান্নার কাজ করে খান, বড় মেয়েও রান্নার কাজ করে। ছেলে দুটিই চাকরী করত বাবুর আপিসে কলকাতায়। সেবার বড় ছেলে কলকাতা

থেকে অসুখ নিয়েই বাড়ী এসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ভুগেছে। অসুখ বেশ কঠিন হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের দয়ায় সেরেছে। বাবু কলকাতা থেকে বাড়ী এসে তাকে দেখতে গিয়েছেন। সঙ্গে অনেক লোক। তার সঙ্গে আমিও আছি। নেচন ঠাকরুণের মাটির বাড়ী। তাও সামান্য বাড়ী। মাটির বাড়ীরও বড়-ছোট আছে। নেহাতই ছোট। দরজা ছোট, জানালা ছোট, ঘর উঁচুতে ছোট, সবই ছোট-খাটো।

বাবু তার বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন কিছু ফল দিলেন। তার মাইনে বাবদ কিছু টাকা দিলেন। তারপর উঠলেন। কিন্তু ছ ফিট লম্বা মানুষটি হয়তো কোন কারণে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, ফলে তাঁর মাথা ওই পাঁচফুটে দরজায় ভীষণ জোরে আঘাত খেলে। বাবু একটু অস্ফুট শব্দ করে বসে গেলেন। লোকে হাঁ-হাঁ করে উঠল। জল, পাখা এল। কেউ পাখা করলে, কেউ ডাকলে বাবু-বাবু! তিনি হাসলেন সেই অবস্থাতেও। কে একজন এই সময় ওই দরিদ্র বিধবাটিকে তিরস্কার করছিল, এমন কিপটে, এমন ছোট দরজা, ছি-ছি-ছি! কি রকম বিবেচনা তোমার বল দেখি! তুমি না হয় এতটুকু মানুষ। কিন্তু দশ, দশ কেন, তোমার ছেলেরা, তারা তো তোমার মতন ছোট নয়। পাল্টে ফেল, দরজাটা পাল্টে ফেল বাপু।

বাবু ততক্ষণে সুস্থ হয়েছিলেন, বাবু একটু হেসে মিষ্ট কণ্ঠে, মিষ্ট ভাষায় বললেন—না-না নেচন, তুমি এ দরজা পাল্টাবার নাম করো না। এ দরজার মস্ত শিক্ষা কি জান, মানুষকে বিনয়ী করে, মাথা নীচু করতে শেখায় গো! দেখ, উগ্র হওয়া, দাম্ভিক হওয়া তো কঠিন নয়, কঠিন বিনয়ী হওয়া। আর তুমি কিছু লজ্জিত হয়ো না। এ আমার শিক্ষা হয়ে গেল।

অবাক লাগল। তার জন্যই সঙ্গ ছাড়লাম না। পিছন পিছন গেলাম। গ্রামের বাইরে তাঁর মস্ত এলাকা, সেখানে ইমারতের ইট চুন সুরকী হচ্ছে। একটা চালায়, তা চালাটা বিশ হাত চওড়া, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা হবে, কাঠের কাজ হচ্ছে। চারিদিকে স্তূপীকৃত কাঠ। কাঠের গাদার ফাঁকে ফাঁকে পথ। কাঠ চেরাই হচ্ছে এক দিকে। অন্য দিকে ছুতোর কাজ করছে, তিনি ছুতোরের কাজ দেখতে চললেন। কিন্তু ছুতোরের কাজ করবার জায়গায় যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে, ছুতোর নেই।

বাবুর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তিনি বললেন—এ লোকটা এমন ফাঁকিবাজ হয়েছে, যে বলবার নয়। কাজ ফেলে কোথায় পালিয়েছে। নাঃ এর ব্যবস্থা......

সঙ্গে সঙ্গে ওই কাঠের গাদার অন্য একটা ফাঁক থেকে উত্তর এল, না হুজুর আমি ফাঁকি দিই নি। এই আমি রয়েছি। একখানা ফালি কাঠ খুঁজছি—

বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখা গেল। বাবুর মুখখানি লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন—সে এক আশ্চর্য কণ্ঠস্বর, তার মধ্যে যেন কত অপ্রতিভতা, কত মিনতি—ও মতিলাল কিছু মনে করো না। তুমি ওখানে রয়েছ তা আমি জানতাম না। না-না-না। ভারী অন্যায় হল। ভারী অন্যায় হল।

বলতে বলতে যেন তিনি পালিয়ে আসছিলেন।

হঠাৎ থামলেন, ডাকলেন—মতি! শোন।

মতি এসে কাছে দাঁড়াল—আজ্ঞে!

তার হাত ধরে বাবু বললেন—কিছু মনে করনি তো!

—না বাবা না। কি মনে করব? কত বাবু কত গাল দেন।

—না-না-না। বাবা, তা দিতে নেই। ভারী অন্যায় হয়েছে আমার।

সেদিন বাবু দিনে খেতে বসেছেন। পাশে বসেছেন স্ত্রী আর বোন। সে বোনের প্রচন্ড প্রতাপ ছিল। স্ত্রীকে লোকে গিন্নী বলত। গিন্নীর প্রতাপও কম ছিল না। কিন্তু ননদের কাছে নয়।

ঠাকুর এসে শেষ ব্যঞ্জন—আমাদের দেশের বিখ্যাত কাঁচা মাছের অম্বল নামিয়ে দিলে। অম্বল খায় পাথরবাটীতে। ধাতুরবাটীতে অম্বল বিস্বাদ হয়ে যায়।

পাথরবাটী দেখে ননদ ভুরু কুঁচকে ভাজের দিকে তাকিয়ে বললেন—গিন্নী, আমার দাদা রাজা। আমার দাদাকে তুমি ভাঙা পাথরবাটীতে অম্বল দিয়েছ? এমন কৃপণ তুমি?

পাথরবাটীটা সত্যই খানিকটা ভাঙা ছিল এক জায়গায় এবং গিন্নীও একটু কৃপণ ছিলেন। অন্ততঃ এমন লক্ষ্মীমন্ত লক্ষপতি স্বামীকে ভাঙা পাথরবাটীতে খেতে দিতে মনে তাঁর লাগে নি, কিন্তু ননদ এমনভাবে গর্জন করায় তিনি অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কথা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর গৌরবর্ণ মুখ সাদা হয়ে গেল।

বাবু মুখ তুলে দুজনের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখে একটু হেসে বললেন—না অন্য, এ পাথরবাটীটা আমার শখের, ওটার কানা একটু ভেঙেছে বলেই শখ করে রাখতে বলেছি। ওই যে কানা-ভাঙা জায়গাটুকু, ওখান দিয়ে অম্বলের ঝোল গড়াতে যে কি সুবিধে, তা আর কি বলব।

বাবুর প্রথম স্ত্রী-বিয়োগের পর বাবু এই গিন্নীকে বিবাহ করেছিলেন, গিন্নীর প্রতাপও ছিল অসাধারণ। বাবু একটু ভয়ও করতেন। কিন্তু সেদিন বাবু খেয়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে বিছানায় বসেছেন, তামাকের নল তুলে নিয়েছেন, চাকরটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, গিন্নী এসে বাবুকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলেন।

বাবু একটু চমকে উঠলেন, বললেন—ওটা কি হল।

গিন্নী বললেন — বাবুকে নজরানা দিলাম বাবু।

সরকারী সংস্থার রপ্তানি ক্ষমতা

মনুভাই শাহ

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বৈচিত্র্য-সাধনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ভারত সরকার সক্রিয়ভাবে শিল্পোন্নয়নে অংশগ্রহণ করছেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের শিল্প-নীতি প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে কোন কোন শিল্পের উন্নয়নে সরকার উদ্যোগী হবে। যেসব শিল্পে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন বা যার ফল পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয় এবং প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যেসব শিল্প তা সরকারী উদ্যোগভুক্ত হয়েছে। আমাদের শিল্পনীতির লক্ষ্য হল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা। উভয়ে সম্মিলিতভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। রপ্তানী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেন না রপ্তানী উন্নয়নের উপরই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সরকারী উদ্যোগের সংস্থাগুলি তাদের ভূমিকা যথাযথ পালন করে যাবে। রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে জোরদার করার জন্যে এবং ঐ ব্যাপারে বেসরকারী সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য সরকার সরকারী উদ্যোগে অনেকগুলি বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠন করেছেন।

বর্তমানে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে অথবা মালিকানায় কমপক্ষে ৬০টি শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা রয়েছে। এ ছাড়া আরও দশটি সংস্থায় ভারত সরকার সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ না করেও কিছু মূলধন বিনি-য়োগ করেছেন। এর উপর আছে কয়েকটি বিভাগীয় সংস্থা (যথা চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা, ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী, ডাক ও তার কারখানা, গোলা-বারুদ কারখানা প্রভৃতি)। সরকারী উদ্যোগের প্রধান ছয়টি সংস্থা হল কর্পোরেশন ও অন্যগুলি কোম্পানী হিসেবে সংগঠিত।

সরকারী সংস্থাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইস্পাত কারখানা সমেত কয়েকটি সংস্থা হল উৎপাদনকারী সংস্থা। এ ছাড়া আছে বাণিজ্যিক লেনদেনকারী সংস্থা। আর আছে উন্নয়নকারী সংস্থা ও অর্থসংস্থা।

•

সরকারী উদ্যোগে ঐ সব ইউনিটগুলি স্থাপনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলা এবং আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। এইসব সংস্থায় তৈরী দ্রব্য বিদেশের বাজারে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। কাজেই আমাদের রপ্তানীর জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে হবে। এজন্য কল-কারখানা-গুলির সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে হয়ত আমরা বিদেশে ভারতে তৈরী বিমান বা জাহাজ বিক্রী করতে পারব না। কিন্তু বিদেশী ক্রেতাদের আমরা অন্যান্য ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করতে পারব। এইভাবে আমরা বিদেশে ভাল বাজার পেতে পারি। হিন্দুস্থান মেশিন টুলস কারখানায় যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই বিদেশের বাজারে চাহিদা তৈরী করতে পেরেছে—দিন দিন তার বিক্রী বেড়েই চলেছে।

প্রতিবেশী দেশে চাহিদা

গত কয়েক মাস ধরে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক চাহিদা দিনে দিনে বেড়ে গেছে। সেসব দেশে আন্তর্জাতিক টেণ্ডার প্রতিযোগিতায় ভারতীয় উৎপাদকরা সফল হয়েছেন। তাছাড়া উন্নতিশীল দেশের শিল্পপতিরা শিল্পোন্নয়নের কাজে বেসরকারী ভারতীয় সংস্থার সহযোগিতা পেতে বিশেষ আগ্রহী। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী সরকারী সংস্থাগুলির মোট উৎপাদনের একাংশ বিদেশে রপ্তানীর উপর বিশেষ জোর দিতেন। তিনি বলতেন, তাহলে তাঁরা যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করবে তার থেকেই তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ও উন্নয়নের কাজ চালান সম্ভব হবে। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে
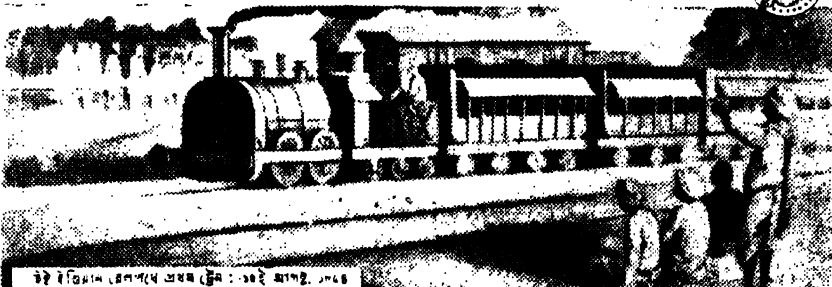
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একাধিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

রপ্তানীর সুযোগ

এই সব বৈঠকে পরবর্তী দু বছরের রপ্তানীর সুযোগ ও রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা-কালে দেশীয় চাহিদা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কেও সজাগ থাকা হয়েছিল। গত ৩০শে এপ্রিল বাণিজ্য পর্যদের নয়াদিল্লী বৈঠকেও এ সম্পর্কে আলোচনা হয়। গত বছর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হিন্দুস্থান স্টীল বিদেশে মোট ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার (৩০৭৭০ টোন উপজাত দ্রব্য ও ৩৯২০০০ টোন লোহ ও ইস্পাত) দ্রব্য রপ্তানী করে।

গত বছর এই সংস্থা ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্য নতুন দ্রব্য তৈরী শুরু করেন এবং আরও নতুন দ্রব্য (যথা জয়েস্ট, চ্যানেল ও ম্যাজগেল) তৈরীর চেষ্টা করছে। তাছাড়া তারা বিদেশে রপ্তানীযোগ্য পাইপ তৈরী করছে রাউরকেল্লা কারখানায়।

হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লেদ, মিলিং মেশিন, গ্রাইন্ডার, র‍্যাডিয়াল ড্রিল, টারেট লেদ প্রভৃতি তৈরী করছে। কারখানার পাঁচটি ইউনিটে বছরে ৫০০০ যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে। বাঙ্গালোর ইউনিটে ঘড়িও তৈরী হচ্ছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ঐ ইউনিটে ১০·৪৩ কোটি টাকার উৎপাদন হয়। ইউনিটটি এখন রপ্তানী উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। চলতি বছরে তারা এক কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করবে বলে স্থির করেছে।

ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজে দূর-পাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থার যাবতীয় যন্ত্র-পাতি ও টেলিফোন, ট্রাঙ্ক টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে। এখানে নানা রকম পরিমাপ যন্ত্রও তৈরী হচ্ছে। এর অধিকাংশ উৎপাদনই ভারতের ডাক ও তার দপ্তরকে সরবরাহ করা হয়। কারখানা এখন ট্রাফিক সিগন্যাল ও রিমোট কন্ট্রো যন্ত্রপাতি তৈরী আরম্ভ হয়েছে। ১৯৬৪ '৬৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানে মোট ১০·৩ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। কারখা ট্রাফিক সিগন্যাল, টেলিফোন যন্ত্র, প্রাইভে ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ ও কয়েক রকম যন্ত্রাং বিদেশে রপ্তানী করে। দিনে দিনে এ কারখানার রপ্তানী বেড়ে যাবে এবং আগাম কয়েক বছরের মধ্যেই তা কয়েক কো টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

হিন্দুস্থান টেলিপ্রিন্টার্স এখন বছরে ১৩০০ টেলিপ্রিন্টার তৈরী করে। ১৯৭১ সাল নাগাদ ৮৫০০-য়ে দাঁড়াবে। কোম্পানী আফগানিস্তান, কাম্বোডিয়া, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করছে।

ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস কারখানা সার্ভে আবহ, শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামতী করে। তারা মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানীর চেষ্টা করছে ভুপাল, হরিদ্বার, হায়দরাবাদ ও তিরুচিরা-পল্লীর ভারি বৈদ্যুতিক কারখানাগুলি বিদেশে যন্ত্রপাতি রপ্তানী করে। এইসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনও বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনটি সংস্থা নিয়ে গঠিত ভারি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশনের উৎপাদন-ক্ষমতা এখনও বেশী হয় নি। ক্রমে পুরো মাত্রায় উৎপাদন শুরু হলে কর্পোরেশন অনেক দ্রব্যই বিদেশে রপ্তানী করতে পারবে।

ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরীও এবার বিদেশের বাজারে ঢোকবার চেষ্টা করছে। ভারত ইলেকট্রনিকসও বিদেশে ভাল্ভ, ট্রানজিস্টার ও ডাওড প্রভৃতি রপ্তানীর চেষ্টা করছে।

মাজাগন ডকস ও গার্ডেনরীচ কারখানা ভারতের অন্যতম জাহাজ-নির্মাতা। তারা বিদেশী জাহাজ মেরামতি করেও যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। তাছাড়া দেশে জাহাজ তৈরীর দরুনও তারা বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ে সাহায্য করে।

হিন্দুস্থান য়্যান্টিবাওটিকস পেনি-সিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধ তৈরী করে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করছে তেমনি বিদেশে ওষুধ রপ্তানীও আরম্ভ করেছে সম্প্রতি।

হিন্দুস্থান সলটস আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভাল বাজারের সন্ধান পেয়েছে।

রপ্তানীর লক্ষ্য

সরকারী উদ্যোগভুক্ত সংস্থাগুলি ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট ১৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানীর লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছেন। আশা করা যায় আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে আমরা বছরে ১০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করতে পারব। ১৯৭১-৭২ সাল নাগাদ সরকারী সংস্থাগুলির সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হলে রপ্তানীর জন্য উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে।
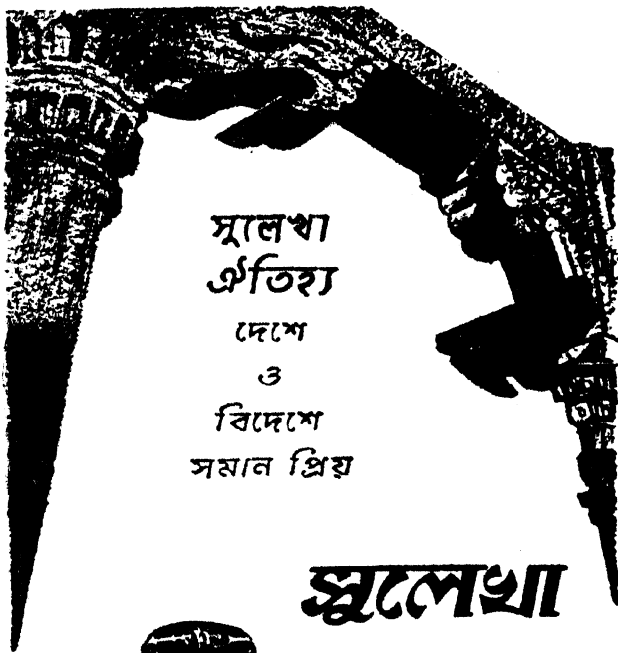
সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

একটি বাল-বিধবার কাহিনী (২)

মিস ক্রিশ্চিয়ানা লিনচের সঙ্গে দেখা করে অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্য আয়ার যখন বললেন যে, তাঁর একটি অল্পবয়সী বিধবা কন্যা আছে, সে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়ে, তারও অভিলাষ অনেকটা মিস লিনচেরই মত তখন মিস লিনচ বিস্মিত হলেন। এতখানি বৈপ্লবিক দুঃসাহস তিনি কল্পনা করতে পারেননি, কারণ তখনকার দিনে এসব ব্যাপারে সমাজচ্যুত হওয়ার আশংকা ছিল। মিস লিনচের আনন্দের আর একটি কারণ ছিল, তিনি সর্বদাই মনে মনে একটা সংশয় পোষণ করতেন যে একজন বিদেশিনী কিভাবে সমাজসংস্কারের এই প্রচেষ্টা সার্থক করবেন, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কি তাঁকে সাহায্য করবেন। এখন শুভলক্ষ্মীর স্নাতক হওয়ার পরই তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় তিনি খুশী হলেন। কিন্তু শুভলক্ষ্মীর প্রেসিডেন্সী কলেজের শেষ বছরেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। একদিন সকালে বিশালাক্ষী কইম্বাটুরে যখন গৃহস্থালীর কাজ করছেন তখন একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন. এরণকুলমে এই অংকের অধ্যাপকটির বাড়িতে বিশালাক্ষী, সুব্রহ্মণ্যম এবং শুভলক্ষ্মী একসময় আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁকে আর চেনা যায় না, কেমন যেন উদভ্রান্তের ভঙ্গী। ভদ্রলোকের কাছে জানা গেল যে তাঁর কন্যাটি সদ্য-বিধবা, কন্যাও এল, তারপর শ্বশুরবাড়ির নির্মম ব্যবহারের কথাও জানা গেল। আম্মকুট্টি অর্থাৎ তাঁর কন্যাটিকে এই বাড়িতে রান্নাবান্নার কোনো একটা কাজ দিয়ে একটু আশ্রয়লাভের জন্য তিনি প্রার্থনা জানালেন। বিশালাক্ষীর হৃদয় বেদনায় আকুল হল। তিনি আম্মকুট্টিকে আশ্রয় দিলেন, তাকে লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। শুভলক্ষ্মীর চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন ক্রমে এগিয়ে আসছিল, সে তখন পড়াশোনায় ব্যস্ত, তারপর সেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল বড় হেড-লাইনে যে, একজন ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা তরুণী অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে। চারিদিকে একেবারে ধন্য ধন্য রব।

অনেকরকম কাজের আমন্ত্রণ এল মহীশূর, ত্রিবাংকুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কিন্তু শুভলক্ষ্মী মাদ্রাজেই রয়ে গেলেন। মিস প্যাটারসন তাঁর পি টি স্কুলে একটা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কাজ দিলেন।

এখান থেকে তিনি টিচিং লাইসেন্স পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। এই সময়েই শুভলক্ষ্মী তাঁর নামের প্রথম দুটি অক্ষরের অর্থও জানলেন বিচিত্র ভাবে। স্কুলের পথে একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন দুজন স্ত্রীলোক তাঁকে রূঢ়-ভঙ্গীতে দেখছে এবং তিনি যখন কাছাকাছি এসেছেন তখন হঠাৎ মন্তব্য করে উঠল—এই মুখ দেখলাম এখন সব শুভ হলে হয়।

সুব্বা কথাটি এইভাবে প্রথম শুভ হিসাবে উচ্চারিত হতে শোনা গেল। তিনি বুঝলেন যে একজন বিধবা রমণীর মুখ দেখা অতিশয় অমঙ্গলজনক। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, অপরের কল্যাণ করতে হবে, যে ব্রত গ্রহণ করেছি সেই ব্রত সার্থক করে তুলতে হবে।

আরো তিনজন বিধবা পিপুলবাড়িতে বাস করতে এল। দুজন বেশ বড়োসড়, আর সবচেয়ে ছোটটির বয়স এগারো। তার নাম পার্বতী। সালেমের স্কুল-মাস্টার মুথুস্বামী আয়ারের মেয়ে। সালেমের ব্রাহ্মণরা অতিশয় গোঁড়ামির জন্য খ্যাত, আবার সংস্কারকও আছেন যেমন রাজাগোপালাচারী। এইসব সংস্করাকদের মধ্যে একজন তরুণ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম সেষু আইয়ার। সেষু প্রস্তাব করলেন যে, পার্বতীকে শহরে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হোক। পার্বতীর ন' বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। একদিন সে আর স্কুলে যেতে চাইল না, বললে ভালো লাগছে না। সেইদিনই সংবাদ এল তার স্বামীর দেহাবসান ঘটেছে। পার্বতী বাড়ীশুদ্ধ লোকের কান্নাকাটি দেখে হতবাক।

এরপর আর পার্বতী স্কুল যেতে চায় না। সে বুঝতে পারে এখন থেকে সবাই তাকে করুণার দৃষ্টিতে দেখবে, তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে। সহপাঠিনী এবং শিক্ষয়িত্রীদের কৌতুহল রোধ করাও কম কঠিন নয়। পার্বতীর বাবাও বললেন তাই হোক, সকালে লেখাপড়া করবে, ওপরের ঘরে থাকবে, রাতের বেলায় এসে আমি দেখব।

এইভাবে মেয়েটি পড়াশোনায় যথেষ্ট মেধার পরিচয় দিতে থাকে। তারপর একদিন পার্বতী এগমোরের সেই পি টি ইংলিশ স্কুলে এসে ভর্তি হল, শুভলক্ষ্মীর পর তিনি দ্বিতীয় ছাত্রী ব্রাহ্মণ পরিবারের বাল-বিধবা।

শুভলক্ষ্মী পার্বতীকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে এল, সেখানে আরো তিনটি অপেক্ষাকৃত বয়স্কা বিধবা ইতিমধ্যেই এসেছিলেন। চিট্টি তাদের দেখাশোনা করতেন, পরিকল্পনা চমৎকার কার্যকরী হল।

১৯১১-র শরৎকালে মিস লিনচের সঙ্গে শুভলক্ষ্মীর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

শুভলক্ষ্মীকে মিস লিনচ প্রশ্ন করলেন—তাঁর নামের আগে সিসটার কথাটি আছে কেন?

শুভলক্ষ্মী জানালেন, আরো দুটি বোন তাঁকে ঐ নামেই সম্বোধন করে তাই; তবে তিনি অল্পবয়সী সকল বিধবারই 'সিসটার' হতে চান। দুজনের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল। অনেক বছর পর মিস লিনচের নাম যখন ডাঃ ড্রাইসডেল তখনও তিনি এই ঘটনাটির উল্লেখ করতেন।

১৯১২-তে শুভলক্ষ্মী টিচার্স লাইসেন্স পরীক্ষায় পাশ করলেন। সেই বছর জুলাই মাসে দুই হাজার টাকা সংগৃহীত হল, সারদা লেডীজ ইউনিয়নই বেশীর ভাগ টাকাটা দিয়েছিলেন। একটি বাল-বিধবার বিবাহও ঘটে গেল রেঙ্গুনের এক পাত্রের সঙ্গে। সংস্কারের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে।

এমন সময় একদিন মিস লিনচ শুভলক্ষ্মীকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। টেবলের ওপর একটি চিঠি পড়ে আছে—চিঠির তলায় লেখা আছে—দি পাবলিক অব মাদ্রাজ'—অভিযোগ গুরুতর সিসটার শুভলক্ষ্মী তাঁর কাছে কয়েকটি বিধবা রমণী রেখেছেন। তাদের তিনি সঙ্গে করে বিধবা-বিবাহ সভায় নিয়ে গিছলেন।

সিসটার শুভলক্ষ্মী বললেন—আপনার কি মনে হয়, আমি অশোভন কিছু করতে পারি?

মিস লিনচ বললেন—না, সে আমি জানি। পত্রপ্রেরক চিঠির নীচে নামটাও সাহস করে সই করেননি। সুতরাং এই চিঠির মূল্য কি?

এরপর সুরু হল সুদীর্ঘ এবং সুকঠিন সংগ্রাম।

চতুর্দিক থেকে সাহায্য আসতে লাগল। মহারাজা ভিজিয়ানগ্রামের একটা দাতব্য স্কুলের ভার হাতে এল। ১৯১৩-তে নতুন স্কুলের উদ্বোধন হল। মিস প্রাগার বলে আর একজন বিদেশিনী মহিলা এসে যোগ দিলেন। ট্রিপলিকেনের এই স্কুলটি সাফল্য লাভ করল। বিধবাদের জন্য উইডোস হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হল। মাদ্রাজের একমাত্র মহিলা ভারতীয় ডাক্তার শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী এই হস্টেলের মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হলেন। ক্রমে সমালোচনার অবসান ঘটতে লাগল। সকলে এই আশ্রয়ে আনন্দ এবং শান্তি লাভ করলেন। শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী আজ জীবনের শেষপ্রান্তে, অনেক কথা অনেক অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে এই দুঃসাহসিকা সমাজসেবিকার জীবনে।

অভয়ংকর

A CHILD WIDOW'S STORY— By Monica Felton. Publishers Victor Gollancz. Price 20 shillings.

ভারতীয় সাহিত্য

কোলকাতায় হিন্দি কবি সম্মেলন ॥

কলকাতা যদিও হিন্দি ভাষার কেন্দ্রভূমি নয়, তবু হিন্দি কাব্য আন্দোলনের তীর্থ-ভূমি হিসেবে অনেকের কাছে পরিগণিত। এই কলকাতা থেকেই "তার সপ্তক" নামক হিন্দি কবিতা সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটির মধ্যেই হিন্দি কাব্য আন্দোলনের সর্বাধুনিক দিকটি পরিবেশিত বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

আধুনিক হিন্দি কবিতার ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়ের কবিতা সম্পূর্ণ বিবৃতি-ধর্মী। কবিতার প্রস্থানভূমিও ছিল এইযুগে প্রধানত ধর্ম এবং ঐতিহাসিক আখ্যানসমূহ থেকে। এই সময়ের সর্বাধিক উল্লেখ্য কবি হলেন মুকুটধর পাণ্ডে। এই যুগের হিন্দি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। পণ্ডিত হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী বা 'নিরালা'র মত প্রখ্যাত কবিরাও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন। আধুনিক হিন্দি কাব্যআন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'মিস্টিক' কবিতার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ হিন্দি কবি হলেন জয়শঙ্কর প্রসাদ। 'ঝর্ণা' কবিতায় তাঁর এই ভাবধারাটি প্রথম স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'কামায়নী'তে তাঁর এই ভাবধারার পূর্ণ প্রকাশ। সুমিত্রানন্দন পন্থ এই সময়েই আবির্ভূত হন এবং হিন্দি কবিতার দিগন্তকে সুদূরপ্রসারিত করেন। 'পল্লভ' গ্রন্থে তাঁর এই মিস্টিক চেতনার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে। "যুগবাণী" এবং "গ্রাম্য" গ্রন্থে তাঁর বস্তুচেতনার পরিচয় স্পষ্ট। এলাহাবাদের মহাদেবী ভার্মার কবিতাতেও এই ধারারই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এই সময়েই পণ্ডিত ভবানীপ্রসাদ তেওয়ারী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" অনূদিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে কলকাতাতেই। এই কালে প্রথম হিন্দি গদ্য কবিতা রচিত হয়। বিষয়বস্তু এবং ভাবধারাও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে। 'নিরালা', ভগবতীচরণ ভার্মা, রামবিলাস শর্মা, শামসের জঙ, 'অজ্ঞেয়', ধরমবীর ভারতী, কুয়র নারায়ণ, কেদারনাথ সিং প্রমুখ কবিরা ঐ পর্যায়ের কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই তিন কালের কবিদের অধিকাংশই কিন্তু জীবনের একটা বিরাট সময় কলকাতায় কাটিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও অনেকের বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও আছে। এমন কি তরুণ হিন্দি কবি, যাঁদের বয়স এখনও ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে যায়নি—রাজীব শকসেনা বা রাজকমল চৌধুরীদের মত কবিরাও আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। কলকাতা তাঁদের কবি-তীর্থ। অনেক তরুণ বাঙালি কবির কবিতা এর মধ্যেই হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে। বরং তরুণ হিন্দি কবিদের কবিতা বাংলায় এখনও তেমন অনূদিত হয়নি।

সম্প্রতি কলকাতায় একটি হিন্দি কবি-সম্মেলন হয়। এই কবিসম্মেলন প্রসঙ্গেই উপরের কথাগুলো মনে পড়ল। 'সঙ্গীত মন্দির' কর্তৃক আয়োজিত এই কবিসম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় 'হিন্দি হাইস্কুল হলে'। ডঃ শিবমঙ্গল সিং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। রামঅবতার ত্যাগী, ভবানীপ্রসাদ মিশ্র, পরস বরমার, কাকা হথরসি এবং ডঃ শিবমঙ্গল সিং কবিতা পাঠ করেন। রামঅবতার সিং-এর কবিতায় গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। কবি হিসেবে তাঁকে বাংলার কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। কবিতার আঙ্গিক প্রকরণেও তাঁর কবিতা আধুনিকতার দাবী করতে পারে বলে মনে হয় না। দিল্লীর কবি ভবানীপ্রসাদ মিশ্রের কবিতায় বরং কিছুটা মিশ্র আস্বাদ পাওয়া যায়। বর্তমান জীবনের দুঃখ-বেদনা-হতাশা ইত্যাদি তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। পরস 'বরমার'এর কবিতা আখ্যানমূলক। সভাপতি "মাথি কি ভারত" কবিতাটি পাঠ করেন।

কিন্তু কলকাতা যেখানে একদিক থেকে হিন্দি কবিতারও তীর্থভূমি, তখন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দি কবিতা সম্মেলনে আমরা এমন কবিতাই আশা করবো, যা সমকালীন হিন্দি কাব্য-আন্দোলনের স্বরূপটি তুলে ধরবে। নাহলে হিন্দি কবিতা সম্পর্কে সাধারণের মনে একটা অনীহা দেখা দিতে পারে।

ম্যাক্সমুলার ভবনে সাহিত্য সভা॥

কলকাতা ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে ৮ই আগস্ট অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভবনের অধ্যক্ষ ডক্টর গেয়র্গ লেশনার এবং অধ্যাপক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সমকালীন জর্মান ও বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে দুটি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১০ই আগস্ট সন্ধ্যায় তারই একটি সুন্দর ফলশ্রুতি অনুভব করা গেল। ঐ দিন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য থেকে জর্মান ভাষায় এবং জর্মান থেকে বাংলা ভাষায় সুনির্বাচিত অনুবাদ-কবিতা ও কথা-সাহিত্য পরিবেশিত হল। বিশিষ্ট শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কাছে এই আসরটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। যুগ্মসাহিত্য পরিবেশনের এই যুগোচিত কর্তব্যটি সেদিন যাঁরা নির্বাহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর লেশনার ও শ্রীমতী লেশনার, ডক্টর হারার, ফেল্‌বৎসিপার, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণব ঘোষ এবং শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। একদিকে যেমন বের্তোল্‌দ্‌ ব্রেশ্‌ৎ, গুন্‌টার আইশ, পাউল সেলান, হাইসেজবুটেল, গুন্‌টার গ্রাস প্রমুখ স্বনামধন্য লেখকদের রচনার বাংলা তর্জমা সেদিন শুনতে পাওয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রচয়িতার সৃষ্টির জর্মান তর্জমা শুনে মনে হল যথার্থ অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য বিশ্বপাঠকের উত্তরাধিকারে পরিণত হতে পারে।

বিদেশী সাহিত্য

আন্দ্রেই ভোজনেসেন্সকির কাব্যগ্রন্থ ॥

ত্রৈত্রিশ বছর বয়স্ক কবি আন্দ্রেই ভোজনেসেন্সকি হলেন সাম্প্রতিক সোভিয়েত কাব্য-আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা ও বহুবিতর্কিত নাম। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে এক লাখ কপির সংস্করণ মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে, দ্বিতীয় সংস্করণ বা মুদ্রণের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে থাকতে হয় অসংখ্য কাব্যানুরাগীকে। তাঁর কবিতা পাঠ শুনবার জন্যেও স্টেডিয়ামে যে বিপুলসংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ ঘটে তা অভাবনীয়। বলাবাহুল্য, ইয়েভগেনি ইভতুশেংকোর মতো ভোজনেসেন্সকির খ্যাতি আজ শুধু রাশিয়ার মধ্যে সীমিত না হয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আন্দ্রেই ভোজনেসেন্সকির একশো কুড়ি পৃষ্ঠার একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ 'অ্যান্টি ওয়ার্ল্ডস', এবং হার্বার্ট মার্শাল কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'ভোজনেসেন্সকি : নির্বাচিত কবিতা' নামে আরেকটি সংকলন। বই দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে তিনি প্রচুর প্রশংসালাভ করছেন।

সোভিয়েত সাহিত্যপত্রিকা লিটেরারি গেজেট তাঁর কবিতার বিশেষ সমালোচনা বের করেছেন। ভোজনেসেন্সকি সমালোচক-

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর প্রখর
চেতনা ও সেই সঙ্গে শিল্পীশৈলীর
র্বে। এ শৈলী তাঁর মৌলিকতার
য়ক এবং অপূর্ব কলাকৌশলগত
ায় তিনি জীবনের গতিশীল,
বল ও প্রাণবন্ত দিকগুলিকে তুলে
। আর তাতে থাকে সঙ্গীতময়তার
জ।

সমসাময়িক নাগরিকজীবনের দ্রুত পদ-
দ ও শ্রমশিল্পাঞ্চলের জীবনের দ্রুত
স্পন্দন যেন তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে
নি তাঁর রচনায় একটি বিশিষ্ট জায়গা
ড় রয়েছে অরণ্যের অনাবিল শান্তি ও
র্গপ্রকৃতি।

ভোজনেসেন্সকি হলেন ঐতিহ্য-
বাসী আত্মসচেতন কবি। তাঁর কবিতায়
। তাই খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন
ণদের চিন্তাভাবনা। 'আই অ্যাম গয়া'র
। এ ভাবনা বিশেষভাবে প্রতিফলিত
ছে।

"I am Goya
Of the bare field,
by the enemy's beak gouged
till the craters
of my eyes gape
I am grief
I am the tongue
of war, the embers of cities
on the snows of the year 1941
I am hunger
I am the gullet
Of a woman hanged
whose body like a bell
tolled over a blank square
I am Goya.............."

ভোজনেসেন্সকি নিজেকে একজন 'পেট্রিয়ট অব পোয়েট্রি' চিহ্নিত করে বলেন, 'বিশ্বের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রয়েছে। আমি চাই মানুষের অন্তর্জগত উদ্ঘাটন করতে। যখন আমি হাজার হাজার শ্রোতার সামনে কবিতা পড়ি তখন বিশেষ-ভাবে তাঁদের আবেগ উদ্দীপিত করার দিকে আমার ঝোঁক থাকে, তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরতে আমি চাই।'

ভোজনেসেন্সকির কবিতা সম্পর্কে কাব্যসমালোচক ভ্লাদিমির তুরবিন 'কম-সোমোলস্কাইয়া প্রাভদা'য় লেখেন যে, সোভিয়েত কবি তাঁর ঐতিহ্য বলতে বোঝেন সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতি ভান্ডারের যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য, তাই-ই। পশ্চিমের সংস্কৃতিরও যা কিছু ভাল, তাও তাঁর সৃজনশীলতার মধ্যে গ্রাহ্য। এবং তা রুশ চিরায়ত সাহিত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে তাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে।'

নতুন বই

করুণ মধুর ইতিহাস

ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে অনেক
লোচনা আছে, এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের
টি চমৎকার উক্তি মনে পড়ে—
থিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয়
যাহাদের সুখ-দুঃখ জগতের বৃহৎ
পারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থান-পতন
কালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে
দ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে
মহান কল-সঙ্গীতের সুরে তাঁহাদের
ক্তগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে
ক। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত
তে থাকে, তখন রুদ্রবীণার একটা
র মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের
শিষ্ট চার আঙ্গুলে পশ্চাতের সরু-
টা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা
চত্র গম্ভীর, একটা সুদূর বিস্তৃত
কার জাগ্রত করিয়া রাখে।" তারাশঙ্কর
দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস
না বেগম' পাঠ করে এই কথাগুলি মনে
গে। তারাশঙ্করের জীবনীর সঙ্গে
দের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয়ই স্মরণ
বেন যে প্রথম যৌবনে তিনি নাটকের
কে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং কয়েকখানি
কও লিখেছিলেন সেই কালে, তার
হু পান্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গেছে। এই
না বেগম' তাঁর সেই প্রথম যৌবনের
র আবেগানুভূতির অভিব্যক্তি, পরিণত
ল্পমানসের স্পর্শে আজ এক মহৎ
হিত্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থারম্ভে
খক বলেছেন—প্রথম যৌবনে তৃতীয়
নিপথের যুদ্ধ নিয়ে নাটক লিখে-
ছিলাম। সেই সময় গ্রান্ট ডাফের বই থেকে পড়েছিলাম এবং এই সময়ের বিচিত্র উত্থান-পতনের কাহিনী আমাকে আকর্ষণ করেছিল। পরে এই নাটক আবার নতুন করে লিখেছিলাম—'বালাজী রাও' নামে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।" লেখক এই নাটক রচনার সময় স্যার যদু-নাথের 'ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার' পাঠ করেন এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক ইতিহাস—তার মধ্যে পেয়েছিলেন 'গন্না বেগমে'র করুণ কাহিনী। স্যার উইলিয়ম জোনসের বক্তৃতামালার মধ্যে গন্না বেগমের একটি গজল সংগ্রহ করেন। গন্নার জীবনের মধ্যে যে ব্যক্তিটি দুঃস্বপ্নের মত আবির্ভূত হয়েছিল সেই ইমাদ-উলমুলক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের মানুষ, ইতিহাস এবং মানুষের জীবনের এক বিচিত্র উত্থান-পতন, ব্যথা ও বেদনার এক অপরূপ কাহিনী গন্না বেগম।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', 'লুৎফউন্নিসা', হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কণ চোর' 'শাহজাদা খসরু' ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ডঙ্কা নিশান' বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলার অন্যতম অগ্রণী লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গন্না বেগম' সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হল। শক্তিমান সাহিত্যশিল্পীর লেখনীস্পর্শে 'গন্না বেগম' একটি শিল্প-সমৃদ্ধ ঐতি-হাসিক উপন্যাসে পরিণত। সাম্প্রতিককালে প্রমথনাথ বিশী ও গজেন্দ্রকুমার মিত্রের দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সমালোচকের অকুন্ঠিত প্রশংসা অর্জন করেছে। তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেছেন, সমাজের বিচিত্র স্তর থেকে তিনি কাহিনী আহরণ করে তা রূপে রসে সঞ্জীবিত করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, আজ যখন ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে তখন তারাশঙ্করের মত একজন সিদ্ধ কথাশিল্পীর হাতে 'গন্না বেগমের' করুণ কাহিনী এক ইতিহাসসম্মত সার্থক উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

তারাশঙ্কর এই উপন্যাস রচনা উপলক্ষ্যে যে প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন তার পরিচয় কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কাল, দোর্দন্ডপ্রতাপ মুঘলদের আর সে বিক্রম নেই, তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগে সারা ভারতবর্ষের অঙ্গে এক অস্বস্তিকর বিশৃঙ্খলা সুরু হয়েছে, চারিদিকে ভীষণ অরাজকতা আর অসন্তোষ। এই ছবি তারাশঙ্কর এঁকেছেন শিল্পীর তুলিকায়, পন্ডিতের পাদটীকা-কন্টকিত, তথ্যভারাক্রান্ত নীরস গুরুভার গবেষণা নয়, নির্ভর স্বচ্ছন্দ গতিবিশিষ্ট কাহিনী তার ঐতিহাসিক কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে অগ্রসর হয়েছে। গন্না বেগমকে ইতিহাস শুধু উল্লেখ করেছে মাত্র, কিন্তু তার সেই ক্ষীণ সূত্রটিকে কুশলী লেখক প্রাণরসে উচ্ছল করেছেন, এইখানে স্রষ্টার ভূমিকা লেখকের। গন্না বেগমের জীবনের উত্থান-পতন ইতিহাসের সূত্রে গাঁথা। তারও জীবনে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা সেই-ভাবে ঘটেছে। আকবর আদিল শাহকে এঁকেছেন তারাশঙ্কর অপূর্ব মমতায়, তিনি বলেছেন : "তাকে আমি কল্পনায় গড়ে নিয়েছি। গড়ে নিয়েছি—ইতিহাসে তার ভূমিকা অনুযায়ী।" আর গন্নার চরিত্র কল্পনা করেছেন তার রচিত গজলটির ভিত্তিতে। গন্নার জীবনের দুষ্টগ্রহ ইমাদ-উলমুল্ক গন্নার জীবনের হয়ত মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, সে বেয়াকুফ তাই বন্দিনী গন্নাকে যখন বাদশাহ শাহ দুরাণীর বিচারসভায় এনে দাঁড় করানো হল তখন শৃঙ্খলিত ইমাদ-উল্মুল্ক বলে উঠল—শাহানশাহের সামনে খুদার নাম নিয়ে আমি এই ঔরৎকে তালাক দিচ্ছি।—সেই দিনই তালাক শেষ, সঙ্গে সঙ্গে উমধা বেগমের সঙ্গে সাদীও হল ইমাদ-উল-মুল্কের। উমধা দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত গন্নাকেই বাঁদী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আর্জি জানালো। গন্নার দুঃখের বুঝি আর শেষ নেই। সে গজল গায়, ফরমায়েসমাফিক গান। ইমাদ গন্না বেগমকে স্রেফ চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিল। গন্না বেগম খালাস পেয়েছিল আঠারো বছর পর। তখন তার বয়স চৌত্রিশ, দেহ শীর্ণ।

আমিনা বাঁদী, চাঁদ বাঁ, উধমা বেগম প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখক ইতিহাসের

কাহিনীতে প্রক্ষেপ করেছেন গল্পের বিকাশের প্রয়োজনে, চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত। গন্না বেগম অভাগিনী, লেখক প্রথম থেকেই সেই দুর্ভাগা রমণীর প্রতি সহানুভূতিশীল, তাই শেষপর্যন্ত গন্না বেগমের হৃদয়ের জ্বালা পাঠকের মনেও আনে এক করুণ মধুর বেদনার আস্বাদ।

'গন্না বেগম' তারাশঙ্করের সাহিত্য-অভিযানের এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন।

গন্না বেগম : (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আট টাকা।

●

কন্টেম্পোরারী ক্রাফট্‌স্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল

সমস্ত দেশ জুড়েই বর্তমানে শিল্পের নতুন রূপচর্চা চলছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত 'কন্টেম্পোরারী ক্রাফট্‌স্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় পশ্চিমবঙ্গে শিল্পচর্চা ও শিল্পরূপের প্রাঞ্জল পরিচয় বিবৃত হয়েছে। শিং, হাতীর দাঁত, ঢোকরা, শোলা, কাঠ, মাদুর, বেত ও বাঁশ, কাঁসা, চামড়া, তাঁত ও ছাপা শাড়ী এবং পার্বত্য শিল্প সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

বিদেশীদের কাছে বইটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিচয় সম্পর্কে গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে।

কন্টেম্পোরারী ক্র্যাফট্‌স্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত।

●

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বিভিন্ন ভাষায় রচিত ভারতবর্ষের কবিতাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করার মত কোন মুখপত্র এতকাল আমাদের ছিল না। 'পোয়েট্রি ইন্ডিয়া' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি সেই অভাব দূর করল। এইরূপে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত তরুণ কবি নাজিম ইজিকিয়েল যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা এর মধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ধরণের একটি পত্রিকা প্রকাশের ছিল 'সাহিত্য আকাদমীর'। লিটারেচারের' নামে একটি মুখপত্র আছে। কিন্তু এই পত্রিকাটিকে আরো প্রিয় করবার প্রয়োজন আছে।

প্রথম সংখ্যায় সংস্কৃত, মারাঠি, পাঞ্জাবি ও ইংরেজি কবিতার কিছু স্থান পেয়েছে। এছাড়া আছে, সমালোচনা এবং অন্যান্য কবিতা আলোচনা। প্রথম সংখ্যায় কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য না থাকায় পত্রিকাটির মূল কল্পনা সম্বন্ধে অবহিত করা গেল। তবে আরো বেশি সংখ্যক কবিতা এবং আরো আধুনিক কবিদের কবিতা সংকলিত হলে পত্রিকাটির মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। 'আন্তর্জাতিক বিভাগে' টমাস ব্লাকবার্ন, হাওয়ার্ড সার্জেন্ট, রয় ফুলার, লিন্ডা প্রে প্রমুখের কবিতা আছে। এই পত্রিকাটি সকলের সহযোগিতার দাবী রাখে।

Poetry India : Edited by Nissim Ezekiel Parichay Trust, 192, Hamam Street, Bombay-1. Price — 1.50 P.

প্রদর্শনী

শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা

ভারতশিল্পের প্রচার ও প্রসারের গোড়ার দিকে যাঁরা নিরলসভাবে শিল্প-প্রচারের জন্যে কাজ করে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে মনে রাখবার মত। যে সময়ে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা নতুন শিল্পরীতির প্রবর্তন করছিলেন তখন দেশের ও বিদেশের শিল্পপ্রেমিকদের সামনে এই নতুন রীতির প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যা করার কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ ইহজগতে নেই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। শুধু থাকা নয় আজও তিনি শিল্পকলার পরিচয় লোকসমাজে প্রচারের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। গত ৩১শে জুলাই রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় ২নং আশুতোষ মুখার্জি রোডে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বাসগৃহে তাঁর পৌত্রদের উদ্যোগে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক শিল্পী ও শিল্পামোদীরা তাঁর পঁচাশী বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধিত করবার জন্যে একটি সভার আয়োজন করেন। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন আলোচনা ও শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অকপটতায় সভাটি সুন্দররূপে পরিচালিত হয়েছিল।

কেমল্ড গ্যালারীতে মীরা মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য প্রদর্শনী

কলকাতায় ভাস্কর্যের একক প্রদর্শনীর সংখ্যা খুবই কম। ছবির চাইতে ভাস্কর্যের ক্রেতার সংখ্যাও সম্ভবতঃ কম এবং বোধহয় সেইজন্যই ভাস্কর্যের প্রদর্শনী বড় একটা বেশী দেখা যায় না। গত ৪ঠা থেকে ৭ই আগস্ট কেমল্ড গ্যালারী শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায়ের একটি একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী করলেন। ইতিপূর্বে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের কাজের সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় হয়েছে। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের প্রদর্শনীর সংখ্যা কলকাতায় খুব বেশী হয়নি। ভারত এবং জার্মানীতে তিনি প্রধানত শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন। বিদেশে তাঁর শিল্পকর্ম প্রশংসিত হয়েছে। গত দশ বছর তিনি ভারতের নানা স্থানে ঘুরে ঢোকরা ও অন্যান্য ধাতু-শিল্পীদের শিল্পকলা ও শিল্পপদ্ধতি মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করেছেন। তার কিছু নমুনা এই প্রদর্শনীতে পাওয়া গেল। ভারতের নৃতত্ত্ববিভাগ থেকে দু বছরের জন্যে একটি সিনিয়র ফেলোশিপ পাওয়ায় তাঁর রিসার্চের কাজের আরো কিছু সুবিধা হয়। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রকাশিতব্য পুস্তক আছে বলেও জানা গেল।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের তৈরী মূর্তিগুলি প্রধানত কাঁসা, পেতল, ভরণ প্রভৃতি মিশ্র ধাতুর তৈরী। তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানেই এগুলির ঢালাই হয়েছে। ছোট বড় মিশিয়ে সবশুদ্ধ তিনি প্রায় পনেরোখানি মূর্তি প্রদর্শিত করবার জন্যে দিয়েছেন। মূর্তিগুলির মধ্যে ভারতের প্রাচীন লোকশিল্পের ছাপ সুস্পষ্ট তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি লোকশিল্পের অন্ধ অনুসরণকে এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যে পদ্ধতিতে কাজ করেন তাতে খুব বড় মূর্তি সাধারণত তৈরী করা দুরূহ। তবে দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় তিনি প্রমাণ মাপের চেয়েও বড় মূর্তি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ছোট মূর্তিগুলির অধিকাংশই আমার কাছে একটু পুতুল জাতীয় মনে হয়েছে। তবে তিনটি ছত্রকে পর পর দাঁড় করিয়ে বুক এন্ড টি এর ব্যতিক্রম। সমস্ত মূর্তিটির মধ্যে আমাদের ঘরোয়া পঞ্চ-প্রদীপের মত একটা ভাব থাকলেও রসের দিক থেকে একটু ভিন্ন। দু দিকে দুটি ডেকরেটিভ গাছের মাঝখানে শিকারীর মূর্তিটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সরু তারের মত টেক্সচারে গড়া দীর্ঘাকার তরুণের মূর্তিটি আয়তন ও করণকৌশলে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গঠনের বিভিন্ন রকমের ভাঙ্গাচোরার মধ্যেও দেহভঙ্গিমার ছন্দ বেশ সুন্দরভাবেই তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই রীতিতে করা উপবিষ্ট একটি মূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর তৈরী বামনাবতারটির গ্রীবাভঙ্গী আমার একটু আড়ষ্ট লেগেছে। এটির মধ্যে, কেন জানি না, একটুখানি নৃতত্ত্বাবদের সংগৃহীত কোন আদিম শিল্পের নমুনার একটা ভাব আমার কাছে একটু স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিছুকাল পূর্বে আর্টিস্ট্রি হাউসে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের যে কয়েকটি ছোট ভাস্কর্যের নমুনা দেখেছিলাম সেগুলি আমাকে কোনরকম উৎসাহিত করেনি। কিন্তু বর্তমান প্রদর্শনীর সবগুলি ভাস্কর্য সম্পর্কে সেকথা আদৌ বলা চলে না। বিশেষ করে বড়গুলির সম্পর্কে ত নয়ই। আর একটি আনন্দের কথা এই যে ক্রেতারা শিল্পীর অনেকগুলি কাজই ক্রয় করেছেন। সেদিক দিয়ে প্রদর্শনীর সাফল্য অনস্বীকার্য।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

...-কৌতুকরসে প্রভাতকুমারের উত্তরাধিকার

...বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্য-...ক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রসংগটা ...ু করতে গিয়ে প্রথমেই একটা প্রশ্ন জাগে ..., সাহিত্যে হাস্যরসের স্থান কি সংকুচিত ... আসছে? শুধু বাংলা সাহিত্যের কথা ... বিশ্বসাহিত্যের কথা ধরেই বলছি, যদিও ...বসাহিত্য কথাটাই ব্যবহার করা হয়তো ... হোল না। আমরা সোজাসুজি ইংরাজী, ...কনী এবং ঘুরপথে ইংরাজীতে অনু-...দের মাধ্যমে কন্‌টিনেণ্টাল নামে প্রচলিত যে ...ত্যের পরিচয় পাই তারই কথা বলছি। ...শা মূল থেকে পড়বার লোকও যে আছেন ...থা জনান্তিকে স্বীকার করে নিয়েই।

...গাণিতিক হিসাবে এটা বিশ্বসাহিত্যের ... অংশ মাত্র। তবে সাহিত্যের এইটেই যে ...ষ্ঠ অংশ এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় ..., এবং এই সাহিত্যকে Standard ...আদর্শ বলে ধরে নিয়ে যদি মোটামুটি ...বীর সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বিচার করা ...তো নিশ্চয় ভুল হয় না। যতদূর মনে হচ্ছে ... সাহিত্যেও হাস্যরসের ধারাটি যেন আস্তে ...স্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে। আশার কথাটা ...র না হয় নদীতে ভাঁটার টান যাচ্ছেই বলা ...। যে-পরিবেশ-পরিস্থিতিতে রসের ...ীতি সম্ভব হয়ে গেছে এক সময় তা আবার ...রে এলে মনদরিয়ায় আবার নিশ্চয় জোয়ার ...লে আসবে; আপাতত কিন্তু জল অনেক ...চে, ভাঁটার টানই-না বলে উপায় নেই। ...থায় আর ডিকেন্স, ল্যাম্ব, থ্যাকারে, ...ক-টোয়েন প্রভৃতির সঙ্গে নাম করবার ...তো হিউমারিস্ট দেখতে পাচ্ছি? একেবারে ...দের কথা ছেড়ে দিয়ে জেরোম-কে-জেরোম ...ডবলু ডবলু জ্যাক প্রভৃতি মেজো, সেজো-...র দলের লোকই বা কোথায়—মনে হয় কেমন ... ভদ্রা পড়ে গেছে সাহিত্যের এদিকটায়। ...তে পারে, আমরা নিতান্ত ঐতিহাসিক ...রণেই এ সাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন ...য় পড়ছি, কিন্তু প্রাণখোলা হাসিতে আগে-...র মতোই আকাশ উচ্চকিত হয়ে উঠছেই, ...থচ কানে এসে পৌঁছাচ্ছে না, সত্যিই কি ...ত্তটা হয়ে পড়েছি বিচ্ছিন্ন এখনও?

নিজেদের এলাকায় ফিরে আসা যাক। ...থমে এই এলাকার বৃহত্তম পরিধির কথাই ...র, অর্থাৎ সর্বভারতীয় সাহিত্য, অবশ্য ...িংকালের জন্য বাংলাকে বাদ দিয়ে। ব্যাপ্তি আর বৈচিত্রে এও এক বিরাট সাহিত্য, কিন্তু মুশকিল হয়েছে, এই সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা আজও অজ্ঞ থেকে গেছি। সংবিধানের চৌদ্দটি ভাষা নেওয়া যাক। এদের সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের অনুবাদের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে; কিন্তু নানা কারণেই আমাদের দৃষ্টি এযাবৎ ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদের দিকে যায়নি বললেই চলে। আর তেরোটি তো দূরে স্থান, হিন্দী, যা আমাদের নিকটতম তা থেকেও অনুবাদ করা থেকে আমরা বিরত রয়ে গেছি। এই সেদিন পর্যন্ত; আজ হয়তো কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে, তবে তাও নিতান্তই নগণ্য।

মোট কথা, বঙ্গেতর ভারতীয় সাহিত্যে কোথায় কোন্ ভাষায় হাস্যরসের বর্তমান স্বরূপ কি, সেটা জানবার একরকম উপায় নেই অদ্যাবধি। তবে ঐ পূর্বের কথা ধরেই বলা যায়, যদি থাকতই তেমন কিছু আকাশ-

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

উচ্চকিত করা তো পাওয়াই যেত জানতেও। সাহিত্যই যখন, তখন একটু-আধটু হাসি এখানে-ওখানে থাকবেই, খিল-খিল বা খুক্‌-খুকের আকারে; কিন্তু সে ধর্তব্য নয়। সে-হাসি স্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের প্রিন্সিপ্যালেও হাসেন। আমি সেই আপন-ভোলা, প্রাণ-খোলা হাসির কথা বলছি যা না আমাদের পণ্ডিতমশাই হাসতেন—যখন আন-কোরা টোল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, যখন হাসিকে ডিসিপ্লিনের নিগড়ে বেঁধে ফেলতে হবে, সে-জ্ঞানটা পুরোপুরি অর্জন করা হয়নি। এ হাসিকে খুঁজে বের করতে হয় না, তাই মনে হয়, নেইও তেমন কিছু কোথাও। অন্তত হিন্দী জগৎটার ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আমি তো বসে আছি। গদ্যে বা পদ্যে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করে যাঁরা হিন্দী-সাহিত্য জগৎ পূর্ণ করে রেখেছেন—মৈথিলীশরণ থেকে নিয়ে মহাদেবী ভর্মা, বচ্চন প্রভৃতি পর্যন্ত—সবারই আওয়াজ কিছু কিছু কানে আসে, হাস্য-কৌতুক রসের তেমন কিছু থাকলে শুনতামই।

যাক আন্দাজের কথা। এবার এলাকাটাকে কমিয়ে একেবারে নিজেদের খাস এলাকায় আসা যাক, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের নিজের ঘরে। সাহিত্যজগতের অবিস্মরণীয় দাদা-মশাই কেদারনাথ গেলেন, পরশুরাম, রাজশেখর বাবু গেলেন, আসরের ধুয়া এখনও যে ক'জন ধরে রেখেছেন—প্রমথ-পরিমল-শিবরাম প্রমুখ—একা পড়ে গিয়ে তাঁরাও যেন সম-তালে সে জোর পাচ্ছেন না। কেমন একটা অসহায় বোধ, সেই সুর, অথচ এই হাওয়ায় যেন খুলছে না। শান্তিহাসের কথা বলছি না, মোটেই নয়। আমি বলছি, যা তাঁরাও নিশ্চয় উপলব্ধি করছেন যে, অন্য সব কোরাসের তুলনায় হাসির কোরাসে দলপুষ্টির যেন আরও বেশি প্রয়োজন। পুরানো কণ্ঠ নীরব হয়ে যাচ্ছে, অথচ নূতন কণ্ঠ এসে ফাঁকটাকে তেমন ভরে দিতে পাচ্ছে কৈ?

কথাটা যদি সত্য হয়—(সত্য যে, তা না মেনে উপায়ও তো দেখছি না)—তাহ'লে দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগে—কেন এমনটা হচ্ছে? হাস্যরসের দৈন্য যদি আজ জগদ্ব্যাপী তো তার কারণও নিশ্চয় জগদ্ব্যাপী—

প্রথম মত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই অশান্তির সূত্রপাত হয়েছে Totalitarian war-এর ফলে, তা বাহ্যত থেমে গেলেও জাতি—জাতির মধ্যে Cold war-রূপে জাতি মাত্রেরই জীবন সমস্যায়-সমস্যায় জর্জরিত করে দিচ্ছে। এই হিম-শীতল উত্তুরে বাতাসে হাসির দাক্ষিণ্য আশা করা দুরাশা। আর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় আমরা তার প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হব, না, অন্ধকার যেন ঘনিয়েই আসছে আরও।

এই কারণটা খুবই স্থূল, উদয়াস্ত প্রতি কাজেই আমরা এর প্রভাব অনুভব করছি। সুতরাং চিত্তের প্রসন্নতা, চিত্তের মুক্তি এবং মোটামুটি একটা নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের মধ্যে যে রসের উৎসারণ তা যে বহুলাংশে

হবেই স্বিধান্বিত এটা না মেনে পারা যায় না।

এবার দ্বিতীয় কারণটিতে আসা যাক। প্রসংগটা বিতর্কমূলক, সুতরাং অনেকের অপ্রিয়ও হবে। তবু, আমার বিশ্বাসে, এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

কারণটা পূর্বের মতো স্থূলও নয়। এবং সেই জন্যই এর প্রভাব সূক্ষ্ম আকারে সাহিত্য-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে কতখানি বিকৃত করছে, এ প্রশ্নটাকেও এড়িয়ে যাওয়া চলে না। আমি সাহিত্যে যৌন-বিকারের ছড়াছড়ির কথা বলছি, যা সারা বিশ্বসাহিত্যেরই রূপটাকে যেন বদলে দিতে বসেছে। দৃষ্টান্ত জড়ো করার প্রয়োজন দেখি না, কেন না কথা-সাহিত্যে নামে যে সাহিত্য চলছে, তাতে দিন-দিনই এইটে যে মুখ্য এ্যাপীল হয়ে উঠছে একথা এখন দিনের মতোই স্পষ্ট। এরপর, অবহেলার অভ্যাসে, নিতান্ত সর্বজন-স্বীকৃত না হোক, যদি বহুজন স্বীকৃতও হয়ে ওঠে তো অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে সহজেই অনুমেয়। এখন মোটামুটি এর স্বপক্ষে যে যুক্তিটা সবচেয়ে জোরালো তা এই যে, সাহিত্য হচ্ছে জীবনের মুকুর, সুতরাং, ইত্যাদি। তথাস্তু; কিন্তু মুকুরের প্রতি-বিম্বটাকে বিকৃত করার জন্য সেই সাহিত্যই আবার কতখানি দায়ী—এ জিজ্ঞাসাটাকেই বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় কি করে? কিন্তু যাক, বিতর্কের কথা ওসব।

আমার বক্তব্য moral, immoral, non-moral- সে সব কথা বাদ দিয়ে এই বস্তুটি হাস্যরসের মতো একটি সর্বজনাদৃত রসকে কিভাবে কোণঠাসা করছে তাই নিয়ে। এবং করছেও অতি সূক্ষ্মভাবে।

কথাটা হচ্ছে, যৌন অ্যাপীলই মানব-মনের ওপর সবচেয়ে শক্তিবান অ্যাপীল। এর থেকে পরিত্রাণও নেই এবং প্রকৃতির পরি-কল্পনায় এই রসের স্থানও যে সর্বাগ্রে সেটা মেনে নিয়ে বিদগ্ধ আলঙ্কারিক এর নামও দিয়েছেন আদিরস। আদি বলেই উগ্রতমও এবং সেইজন্যই এর পরিবেশন এবং সেবন সংযত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলেই এর দুরন্ত মাদকতায় জিহ্বা যে আর সব রসেরই স্বাদ হারিয়ে বসেছে এর দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

জানি না আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি কিনা। কিন্তু এ আমার ধান ভানতে শিবের গীত নয়। এই রসের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ হাস্যরসের প্রভূত ক্ষতি করছে, অনুপ্রবেশের বৃদ্ধির সঙ্গে যেন গাণিতিক অনুপাতেই হাস্যরসের চাহিদা, সুতরাং জোগানও দিন-দিন হ্রাস পেয়ে আসছে লক্ষ্য করেই আপনা-দের মনোযোগ এদিকটায় আকৃষ্ট করলাম।

হাস্যরসের দুরবস্থার আরও একটা কারণ আছে, যদিও তা উপরের ঐ দুটি কারণ থেকেই উদ্ভূত। সেটি হচ্ছে, যাকে এক কথায় বলা যায়, উত্তরাধিকার-বিস্মৃতি, অর্থাৎ আমাদের কি দিন ছিল সেটা ভুলে যাওয়া। যেমন বলা গেল, এটা প্রথম দুটি কারণ থেকেই উদ্ভূত। দুয়ে মিলে জাতির জীবনে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হয়ে পড়েছি। প্রভাত মুখো-পাধ্যায়কে আমরা ফিরে পাচ্ছি না, তার কারণ তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি। সাহিত্য অমূল-তরু নয়। তার মূল-কান্ড-শাখার সংগে তার শীর্ষের যোগ থাকা দরকার, তা হলেই সে নব-নব পল্লবে, নব-নব কিশলয়ে উজ্জীবিত হয়ে এগুবে; যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে তো সবই গেল, আংশিকভাবে ব্যাহত হলেও সেই পরিমাণে হয়ে পড়বে জীর্ণ, আড়ষ্ট।

এই সর্বনাশটিই যেন হতে চলেছে। প্রভাতবাবুকে ভোলা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আমরা তাঁর যুগটাকেই ভুলতে বসেছি—এবং স্বভাবতই তার সংগে সেই যুগ বা সেই সব যুগকে যার বা যাদের রসধারা তাঁর যুগের রসধারাকে করেছিল পুষ্ট। এবং ক্রম-পর্যায়ে যা সব এখন আমাদেরই ন্যায্য উত্তরাধিকার।

এই বিস্মৃত উত্তরাধিকারের একটা outline বা রেখাচিত্র এখানে দেওয়া বোধহয় ভুল হবে না। তাতে, সে-উত্তরাধিকার যে কী গরিষ্ঠ, ক্রম-বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা যেমন যাবে বোঝা, তেমনি কত বড় একটা সম্পদ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হয়ে রয়েছি সেটাও হবে স্পষ্টতর। তাছাড়া আমার এই নিবন্ধের প্রয়োজনেও এই উত্তরাধিকার প্রসংগটির একটু বিস্তার আবশ্যক, এবং সেইটেই অন্তত আমার কাছে আপাতত বড় কথা। আমাদের উত্তরাধিকারের পূর্বে প্রভাতবাবুর নিজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। অতঃপর তাঁর নিজের পরিবেশ। তারপর তাঁকে উপ-স্থাপিত করলে—তবেই তার পরিচয়টি ঠিক মতো পাওয়া যাবে, তার স্বরূপটি ঠিক খুলবে। মোট কথা সভা ঠিক মতো না সাজিয়ে, আসর ঠিক মতো না তৈয়ের করে তাঁকে এনে বসাতে পারছি না।

প্রভাতবাবুকে ভোলা যেমন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় একটা, প্রভাতবাবু নিজেও বাংলা সাহিত্যে তেমনি একটা আকস্মিক উদ্ভব নয়, বংগভারতীয় একটা হঠাৎ Freak বা খেয়াল-খুশি নয়।

চিরভংগ বংগদেশ তবু রংগভরা, একথাটা যে কত সত্য, মূলে সেটাই আজ আমরা ভুলতে বসেছি। রংগ এত রসঘন হয়ে, এত বিচিত্র আকারে আর কোন দেশে যে জাতির জীবনকে অভিসিঞ্চিত করে গেছে আমার জানা নেই।

এর বিবর্তনধারাও কৌতূহলোদ্দীপক। গোড়ায় যেন অনেকখানি crude অমার্জিত, বহুলাংশেই শ্লীলতা-বর্জিত, তারপর ধীরে ধীরে ঘোলা জল স্বচ্ছ হতে হতে বর্তমানে রসের পরিশুদ্ধ রূপ নিয়ে বয়ে চলেছে। গোড়ায় রাজদরবারে ভাঁড়। খোলা, আম-দরবারে কবি, তর্জা, হাফ-আখড়াই, লহর—তারপর...

থাক, সাঁটে সারব না।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একজন হাস্যরসিক এবং প্রভাতবাবুর সমসাময়িকও, যদিও [illegible]। 'খৃষ্টীয় [illegible] শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' না[illegible] একটি গ্রন্থ আছে। এতে শু[illegible] সাহিত্যে নয়, বাংলার সমাজজীবনেও [illegible] রসের ধারার ক্রম-বিবর্তন নিয়ে আ[illegible] করেছেন তিনি। বিষয়টি এত বিপুল [illegible] হিসাবে তাঁর আলোচনাও সংক্ষিপ্তই [illegible] হবে। তার থেকে কিছু কিছু উ[illegible] নেওয়া প্রয়োজন হবে আমার। অবশ্য [illegible] ধারাটিকে যেমন বুঝেছি সে সম্বন্ধে [illegible] নিজের মনের প্রতিক্রিয়া সন্নিবেশিত [illegible] যেতে থাকব। যেখানে প্রয়োজন বুঝব।

আমি প্রভাতবাবুর মনের রস-[illegible] সম্বন্ধে দুটি যুগ বা স্তরের কথা ব[illegible] প্রথমত তাঁর পূর্বের যুগ, যেটাকে [illegible] উত্তরাধিকার বলেছি, দ্বিতীয়ত তাঁর নি[illegible] কাল এবং পরিবেশ।

এই উত্তরাধিকারের গোড়ার ক[illegible] চারুবাবুর ভাষাতেই আরম্ভ করা যাক। [illegible] বলেছেন—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমা[illegible] দেশে কোন খ্যাতনামা সাহিত্যি[illegible] আবির্ভাব হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দী[illegible] শেষের দিকে বাংলার দুইজন প্রসিদ্ধ ক[illegible] তিরোভাব হয়—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর[illegible] মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে এবং রামপ্রসা[illegible] সেন কবিরঞ্জনের মৃত্যু হয় ১৭৭৫ সা[illegible] তাঁদের পরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য ক[illegible] বহুকাল বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন নাই। [illegible] রসপিপাসু হাস্য-রস-সন্ধানী বঙ্গ-বাসীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেকদি[illegible] পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের কবিতার দুই-চা[illegible] পঙক্তি আওড়াইয়াই সাহিত্যের রসাস্বাদে[illegible] সাধ মিটাইতেছিলেন।"

চারুবাবু কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমার প্রয়োজন অনতিবিধ, সুতরাং তা থেকে বেছে বেছে এখানে মাত্র দুটি দিলাম। বেছে বেছেই, তবু দেখা যাবে এতে হাস্যরসের আবেদনটা খুব কমই। ভারতচন্দ্র প্রকৃত অর্থে হাস্যরসের কবিও নয়। তবু চলছিল, খোরাকের অভাবেই বলা যায় একরকম, এবং জাতির রস-চৈতন্যটা তখনও অনেকটা যে স্থূলে একথাও অস্বীকার করা যায় না। কথাটা পরে আসবেই, তবু এখানেও বলে রাখি, সাহিত্যে হাস্যরসের প্রবর্তন এবং উৎকর্ষ—আরম্ভ হোল ঈশ্বর গুপ্ত থেকে।

ভারতচন্দ্র বলেছেন—

(১) আই আই এই বুড়া কি ঐ গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো

(২) যে কহে বিস্তর মিছা সে কহে বিস্তর
নারীর আশ্বাসে রহে সে বড় পামর
ময়ূরে চকোর শুকে চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।

আসরের অন্যদিকে রয়েছেন রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের খ্যাতি শ্যামাসংগীত রচয়িতা হিসাবে। বহুকাল ধরে তাঁর সংগীত বাঙালী ভক্তিরসের তৃষ্ণা আসছে মিটিয়ে, তবে কোন কোন গানে সেই রসেরই সংগে একটা অতি ক্ষীণ হাস্যরসের আমেজ মিশে গিয়ে ভক্তির এই রসের তৃষ্ণাটাও মিটিয়ে

স্মিত-হাস্য [illegible] জেগে [illegible]
। যেমন—

এবার কালী তোমায় খাব।

... ...

মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে
অম্বলে সম্বরা দিব।
কালী মুখে কালী মা,
সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
আসবে সমন, বাঁধবে কষে,
সেই কালী তার মুখে দিব।

... ...

তু তাঁর গান নিয়ে—হাস্যরসের
স্থলে অঙ্গের রসিকতাই উথলে উঠছে
তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই
নামলেন, যাকে বলা যায় তাঁর
। গাওনা' নিয়ে। যেমন ঐ গানটাই
াক। আজু গোঁসাই গাইলেন—

"সাধ্য কি তোর কালী খাবি?
—রক্তবীজের বংশ খেলে,
তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি?
ঙ্গে নয়, উভয় গালে
ভুষো কালী মেখে যাবি।
র কালেরে দেখাতে কলা
নিজেরে কলা দেখাবি।"

যে গানে হাস্যরসের ছিটে-ফোঁটাও নেই
গানও রেহাই পেত না এবং গাম্ভীর্যে-
য় মিলে যে রসের ভিয়েনটা দানা বেঁধে
তা সত্যই উপভোগ্য হোত—
রামপ্রসাদ গাইলেন,—

ডুব দেরে মন কালী ব'লে
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।

অমনি 'ওতোর' ধরলেন আজু
সাই—

হি লোভে তাঁতি নষ্ট মন,
মিছে কেন কষ্ট করি,
তুই ডুবিস নি মন, ধরগে ভেসে
শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী।
ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোর কোফো নাড়ী
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি
তোর হলে পরে জ্বরজাড়ি
যেতে হবে যমের বাড়ি।"

—সেই ভক্তিরসই, মাঝে হাসির একটা
বর্ত সৃষ্টি করে আবার নিজের সত্তায়
রে এসেছে, এটাও একটা লক্ষণীয় বিষয়।

এর সমান্তরালে অন্য ধরনের হাসি-
হোড়ের কতকগুলি ধারা প্রচলিত ছিল।
ঠিক সাহিত্যিক স্তরের নয়, তবু নীচে
কে ওপর পর্যন্ত সর্বস্তরে ছড়িয়ে থেকে
গ্র মনকে আরও যেন সরস করে রেখে-
ল। এগুলো হচ্ছে, কবির-লড়াই, হাফ-
খড়াই, তর্জা, খেউড়, লহর, পাঁচালি।
বোবার মতে এগুলোর প্রচলন একের পর
র এক, এই ক্রম-পর্যায়ে হয়ে এসেছে।
বর লড়াইয়ে দুই পক্ষ সামনা-সামনি হয়ে
রাণাদি থেকে প্রশ্ন তুলে সমস্যা সৃষ্টি
রত এবং অপর পক্ষ থেকে তার সমাধান
ইত। মুখে-মুখেই, খোলা আসরে। উৎপত্তি
ম্ভবত এই হলেও জিনিসটা ক্রমে অশ্লীল-
র এমন স্তরে নেমে আসে যে জাত
রিয়ে ফেলে বাঁচা যায়। এবং,
স্বাভাবিক, তাইতেই জনপ্রিয়ও

হয়ে পড়তে—পড়ে বেশি করল। আগে যা
রুচিসম্মত ছিল, জোরে-জোরে, জোরে-পুরুষে
একসঙ্গে বসে শোনবার মতোই, কালক্রমে
প্রশ্ন-উত্তর, যা কবিয়ালদের ভাষায়—'চাপান-
কাটানের' রেষারেষিতে ব্যঙ্গকৌতুক থেকে
লজ্জাহীন অশ্রাব্য গালাগালি প্রভৃতিতে নেমে
আসতে লাগল। কবি ফিকে হয়ে এসে ক্রমে
হাফ-আখড়াই—খেউর-লহরে নেমে এল।
একবার বাঁধ ভাঙলে রুচিবিকারের তো
শেষ নেই। যা এক সময় নির্দোষ মনোরঞ্জনের
সঙ্গে লোক-শিক্ষার সহায়কই ছিল, তাকে
ধীরে ধীরে সামাজিক জীবনের, অর্থাৎ সুস্থ
সামাজিক জীবনের বিধি-নিষেধের গণ্ডীর
ওধারে সরে যেতে হোল।

কিন্তু দেখা গেছে এসব ক্ষেত্রে গণ্ডীই
অঘটন ঘটায় বেশি, কেন না নিষিদ্ধ ফলের
মতো লোভনীয় ফল নেই। কথাটা আজকের
নয়, আদাম-ঈভের সময় থেকে চলে আসছে।
যে-বই বা পত্রিকায় "Not for gents"
ছাপ মারা, তার বিক্রি gent বা পুরুষ-
দের কাছেই বেশি। যেটা "Not for ladies'
অর্থাৎ গোঁফ না বেরুলে দেখা বারণ, সেখানে
অজাতগুম্ফদের 'কিউ'-ই সবচেয়ে বেশি
লম্বা। শুনেছি কবির লড়াই বাড়তে বাড়তে
নাকি এক সময় এমন অবস্থায় এসে
ছিল যখন কী gents, কী Ladies,
কী Teenagers কারুরই আর শোনবার
মতো ছিল না। আর তখনই বুড়ো থেকে
কচি পর্যন্ত একতরফা ভিড়। এ নিয়ে
একটি চমৎকার গল্পের কথা মনে আসছে।

গল্পটি নিতান্তই নিষিদ্ধ-জাতের নয়,
সুতরাং এখানে বলা চলবে—

বাজারের বারোয়ারিতলায় আসর বাঁধা
হয়েছে, নামকরা দুই কবির লড়াই হবে।
কবির গানের তখন বেশ বদনাম হয়ে
এসেছে। নামকরা কবিরা স্বভাবতই আরও
বেপরোয়া, সুতরাং বাড়ির কেউই যাচ্ছেন
না।

বড় ছেলে কলকাতায় একটা কলেজে
নীচুর দিকেই পড়ে। আজ বিকেলে এসেছে।
রাত নটা আন্দাজ বাড়ি ফিরল—এলে
বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজব করে
সাধারণত যেমন ফেরে। সদর দরজার কাছে
এসে দ্যাখে একটি ছোট ছেলে আধা
অন্ধকারের মধ্যে খুব সন্তর্পণে এদিকে-
ওদিকে নজর ফেলতে ফেলতে ভেতরের
দিকে এগুচ্ছে যেন।

'কে?'—প্রশ্ন করতে ছেলেটি চমকে
ঘুরে চাইল। চিনল প্রশ্নকর্তা। ছোট ভাই,
স্কুলের মাঝামাঝি একটা ক্লাসে পড়ছে।

'তুই যে [illegible] বড় একটা কবির লড়াই
শুনতে গিয়েছিল আজ, লায়েক হয়ে উঠে-
ছিস? চল, তোর আজ কি দশা করি দ্যাখ!'

কানটা ধরে কয়েক পা এগিয়ে দরজা
ডিঙোতেই কাকার সামনা-সামনি।

'এই যে এসে গেছ। তুমি—কি যে
বলে—বাজারের আসরে শুনলাম নাকি কবি
শুনতে গেছলে? এই জন্যেই বুঝি বলা
নেই কওয়া নেই, হঠাৎ কলেজ কামাই করে
বিকেলে এসে হাজির? ছি-ছি, তোমার না
সামনেই দুদিন বাদে পরীক্ষা? ছি-ছি।
ওকে সাজা দেওয়া কেন? যেমন দেখছে
তেমনিই তো শিখবে? আরে ছি-ছি!' কাকা
ধিক্কার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ভাইপোর
পায়ে সাড় এল। ছোট ভাইয়ের কান থেকে
হাত আপনিই কখন নেমে গেছে, পাশ
কাটিয়ে কাটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল কোন
রকমে।

এর পর আহারের সময়।

কর্তা বড় ভাই এমনিই গম্ভীর প্রকৃতির
মানুষ, আজ যেন বেশি গম্ভীর। চাইতে-
খেতে বেশি ভুলও করে ফেলেছেন, যেন কী
একটা রয়েছে পেটের মধ্যে।

শেষকালে প্রকাশও করে ফেললেন।
কনিষ্ঠের দিকে একটু ঘাড়টা ঘুরিয়ে চেয়ে
প্রশ্ন করলেন —'হ্যাঁহে, বলি তোমার আর
ঐ সব জায়গায় যাওয়া শোভা পায়?'

'আমি! আমায় বলছেন দাদা?'—
বিস্মিতভাবে চাইল ছোট ভাই। ছেলেদের
সেই কাকা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি!'

সাত-আটটি ভাই-বোনের পর সব ছোট
ভাই, বড়য়-ছোটয় বয়সের প্রভেদ অনেক,
কণ্ঠে একটু ধমকের সুরই এসে গেল
জ্যেষ্ঠের—এবং তাইতেই রাগের মাথায়
নিজের গলদের কথাটিও—

'নিজের চোখে দেখলাম—দাদাকে দেখে
খুঁটির আড়ালে মাথা নুকোচ্ছ আসরের
ওধারে বসে......আরে ছি-ছি! কলেজ থেকে
পাস করে বেরুলে—মার্জিত রুচি নিয়েই
বেরিয়ে এসেছে বলেই জানি তো সবাই, তার
এই পরিচয়? আরে ছিঃ!'

'কী হোল আবার? আফিমের মাত্রা
কমাও, আর ভাইকে সর্বদা টিক-টিক করা
চলে? হাজার ছোট হোক। ভাইপোদের
সামনে মাথা তুলতে পারছে না। ছি!'
—পরিবেশন করতে বেরিয়ে আসতে
আসতে আরম্ভ করলেন গিন্নি।

'বলতে হবে না? স্থান নেই, অস্থান
নেই......' একটু মাত্রা চড়লই কর্তার।
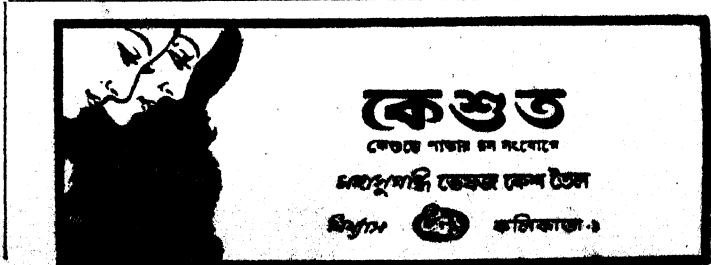
'সে আবার কি? স্থান-অস্থান!' গিন্নি থমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

"স্থান-অস্থান বলতে হবে না? বাজারে কোন এক কবির দলের গাওনা হচ্ছে, সেখানে বন্ধুদের নিয়ে..."

'ঝ্যাটা মারি অমন গাওনার মাথায়।'

—মুখের টানা-দেওয়া নথ দোল খেয়ে উঠল গিন্নির—'মুড়ো ঝাঁটা মারি। শেষে বৌ-ঝি নিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাই না গা!'

দুধের বাটি হাতে বৌয়ের আর বেরুনই হোল না হেঁসেলের চৌকাঠ পেরিয়ে।

অর্থাৎ গন্ডীসন্ধ। এবং গ্রামসন্ধ। তবে এরকম একটা অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে ধীরে ধীরে রুচির পরিবর্তন হচ্ছিল। শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, দেশের হাওয়াই বদলে যাচ্ছে. শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীয়দের রুচি এবং চিন্তাধারা ধীর-সঞ্চারে নীচের দিকেও ছড়িয়ে পড়ছে। সম্ভবত এই সন্ধিক্ষণেই আমরা কয়েকজন প্রতিভাবান কবিয়ালের সন্ধান পাচ্ছি যাঁদের কাহিনী রুচিসৌকর্যের জন্যই সেই ক্লেদের মধ্যে থেকে আত্মরক্ষা করে এখন পর্যন্ত আছে বেঁচে। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট তিনজন হলেন—হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা আর এণ্টনী ফিরিঙ্গি। শেষের এঁরা দুজন আবার পরস্পরের, যাকে বলা যায় মার্কামারা প্রতিপক্ষ।

এঁদের গাওনা কাশিমবাজার, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বড় বড় রাজবাড়িতে প্রায়ই হোত. এ-ভিন্ন কলকাতা ছাড়া শ্রীরামপুরের গোঁসাই এবং অন্যান্য স্থানের বড় বড় জমিদারদের বাড়িতেও। গাওনার বিস্তর ছড়া মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে, অবশ্য এখন ইতিহাসের বিষয় হয়েই। বেশি দৃষ্টান্ত সম্ভব নয়, এখানে একটি দেওয়া গেল—

এণ্টনী আসরে নেমে গীত ধরলেন—

"ভজন পুজন কিছু জানি না মা,
জেতেতে ফিরিঙ্গি
যদি দয়া করে তরো মোরে এভবে মাতঙ্গি।"

গান শুনেই ভোলা ময়রা ভগবতীর অভিনয় করে গেয়ে উঠলেন—

"তুই জাত-ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী
আমি পারব না তরাতে
তোকে পারব না তরাতে।
শোনরে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট
তুইরে নষ্ট মহাদুষ্ট
তোর কি ইষ্ট কালী-কৃষ্ট?
ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জেতে।"

অবশ্য এরকম personal attack বা ব্যক্তি-জীবন ধরে খোঁচা দেওয়া খুবই চলতি ব্যাপার ছিল তখন, বিশেষ করে এই সব ক্ষেত্রে। এতো অনেক ভদ্র.

"ওরে সাহেবের পো এণ্টনি
তোর ক'টা বাপ বল শুনি—
না বলতে পারলে দেখাব আজ
ভোলার কেমন শক্ত ঘানি।"

—এ ধরনের কদর্থ প্রক্ষেপও রসিকতা বলেই গ্রহণ করেছে লোকে।

তবুও একথাও ঠিক যে, সামনের দিগন্ত স্বচ্ছ হয়ে আসছে এবং থড়্ডিত-পড়্ডিত এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে পূর্ব অভ্যাসের জের বলে মার্জনা করতে বাধে না।

এই স্বচ্ছ দিগন্তে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে পাঁচালীর ওপর। পাঁচালীও অবশ্য ছড়াই, তবে এরই সোপান বেয়ে পূর্বেকার আসর-জমানো কবি-তর্জার ছড়া মার্জিত হয়ে এই যেন প্রথম সাহিত্যের কোটায় উঠে এল।

দাশরথি রায়ের নামটাই তার যথেষ্ট পরিচয়—

এই দ্বিতীয় স্তর, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত রুচিসম্মত হাস্যরসের বিবর্তনের কথা শুরু করবার আগে কবি-তর্জা অঙ্গের আর একটি রীতি যে ওদেরই সঙ্গে চলে আসছিল তার উল্লেখ করা অবাস্তব হবে না। এর নাম ছিল 'সমস্যাপূরণ'।

এগুলির ভঙ্গি এবং আবেদন অন্য ধরনের এবং নেপথ্যে রুচিবিকারের কিছু ছিল কিনা বলতে পারি না, তবে যতগুলি পেয়েছি তাতে বেশ একটি মার্জিত রুচির সঙ্গে সত্যিকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই জাতীয় জিনিষ আমাদের যৌবনকালেও বরযাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত থেকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রস-চর্চার সেই ধারাটা টেনে রেখেছিল। ক্রমে অচল হয়ে পড়েছে।

সমস্যা পূরণের দুটি ছড়াও এখানে চারুবাবু থেকে নিলাম—

সমস্যা হচ্ছে—'বড় দুঃখে সুখ' পূরণ করে প্রতিপক্ষ দাঁড় করালেন—

"চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে,
নিশায় নিবাদ আনি' রাখি দিল ঘরে।
চকা কয়, চকী প্রিয়া, এ-বড় কৌতুক
বিধি হতে ব্যাধ ভালো, বড় দুঃখে সুখ।

মুক্ত অবস্থায় চকাচকীর অভিশপ্ত বিরহ-কাহিনীর কথা সবাই অবগত আছেন। তাই মিলিত হয়ে পিঞ্জরের মধ্যেও তারা সুখী।

আর একটি দিই—সমস্যা—'গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর—'

এর পূরণ—

"মহারাজ নিজ ধাম হইতে বাহির।
বারোয়ারী মা ফেটে হলেন চৌচির॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

একদিকে বুদ্ধির দীপ্তি অন্যদিকে কৌতুকের সঙ্গে gratesque অর্থাৎ উদ্ভটের খানিকটা মিশে হাস্যের চমৎকার একটি স্মিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

একটা কথা এইখানে বলে দিলে ভালো হয়। যে-যুগের কথাটা শেষ হোল, কিম্বা আরও খানিকটা এগিয়েও, তাতে সত্যিকার wit, humour—জাতীয় উৎকৃষ্ট হাস্যরসের পরিমাণ যে বেশি ছিল এমন নয়. বেশির ভাগই বরং ভাঁড়ামি অঙ্গেরই। কিন্তু এইতেই বাংলার আসর তখন গুলজার. আজকের তুলনায় বাংলা তখন ঢের বেশি হাস্য-মুখর এবং প্রাণ-চঞ্চল।

একটু অনুধাবন করে দেখলে দুটি কারণ নজরে পড়ে—

প্রথম, যেমন পূর্বেই বলেছি, হা[স্য]রসের স্ট্যাণ্ডার্ডই তখন অনেকটা নীচু ছি[ল]। আজ যাতে আমরা হাসির তেমন কি[ছু] দেখছি না, হাস্যরসের বড় বড় দিকপাল [না] পেয়ে, সে-সময় তারা তখন তাইতেই হা[সির] ফোয়ারা ছোটাতে পারত।

আরও একটা কথা ছিল। এই সব ছ[ড়া-]কাটাকাটি ছিল জমাট আসরের ব্যাপা[র], যেখানে, হাসবার মন নিয়েই লোকে গি[য়ে] ভিড় জমাত। তাতে করে একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হোত যাকে বলা যায় mass—mood বা mentality অর্থাৎ জনতার একই-ভাবে ভাবিত হওয়ার মনোবৃত্তি। সামান্য একটু ওসকানিতেই হাসি পড়ত ফেটে।

এছাড়া ছিল অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি, যাকে বলা যায় ঢং, যা এই সব কৌতুক-রঙ্গের আসরের একটা অঙ্গই ছিল। এণ্টনী সাহেবের—

ভজন-পূজন জানিনে মা, জেতেতে ফিরিঙ্গি'র উত্তরে ভোলা ময়রা যখন বলছেন—

তুই জাত-ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গি
আমি পারব নাকো তরাতে'—

তখন, এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি, খপ করে নিজের কোঁচাটা খুলে গায়ে, মাথায় জড়িয়ে নিয়ে ভগবতীর নাটুকে রূপ ধরে উপযুক্ত ভঙ্গি সহকারেই মাতিয়ে তুলছেন আসর।

বলছিলাম, পাঁচালীতে ছড়া সাহিত্যের কোটায় উঠে এল। এর প্রায় সব যশটাই দাশরথি রায়ের প্রাপ্য। ভাষা অনেকখানি মার্জিত হয়ে সাহিত্যের স্তরে উঠে এসেছে। রুচি হয়েছে মার্জিত। তখনকার ছড়ার মধ্যে অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকত, দাশরথিতে এসে সেটা বাড়ে। দাশরথি ঠিক হাস্যরসিক বলে খ্যাত নন। তবু অনুপ্রাসের মধ্যে একটা যে হাস্যরসের আমেজ থাকে, ব্যঙ্গের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেটা হয়তো আরও বেশি করেই মনে সুড়সুড়ি দিত শ্রোতার। তারপর যদি সে রঙ্গ নিজের শ্বশুরবাড়ি নিয়েই হয়—

অতি ছাড় রাড় দেশ কি কহিব সবিশেষ
বলতে লজ্জা মানসে উদয়,
ধর্মহীন কদাচার যে সব দেখিনু, তার
বর্ণনে বিবর্ণ বর্ণ হয়।

পাঁচালীর যুগটা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয় না আমার। ছড়া আর গানের মিশ্রণে পাঁচালীতে যে নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি হয়, তাতেই রসের পরিবেশন এবং আস্বাদনে এক নতুন চেতনা সৃষ্টি করে হয় যাত্রার বিবর্তন। পালা বেঁধে, একসঙ্গে অনেক সং বা চরিত্র নিয়ে, একই আসরে নানা রস পরিবেশন করবার সঙ্গে হাস্য-রসে যাত্রার অবদান স্থায়ী হয়ে রইল তার নানা রকম ধরা-বাঁধা চরিত্রে। যেমন পালা ভেদে, রাজার বিদূষক, জমিদারের সম্বন্ধী, কোন বড় ঔদরিক, ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধহয় ছিল হনুমান। মনে আছে হনুমান তার লম্বা ল্যাজ নিয়ে 'হুপ' করে আসরে লাফিয়ে যে হাসির হররা সৃষ্টি করত তার জের মিটিয়ে পালা আবার আরম্ভ

করাই শক্ত হয়ে উঠত; তেমন স্টার হনুমান হলে তো কথাই নেই।

এইবার মজলিসী আসরের ইতিহাস শেষ করে খাস সাহিত্যের আসরে আসা যাক, যার সঙ্গে আমাদের বেশি সম্বন্ধ। সম্বন্ধ বেশি হলেও কিন্তু, আমরা যে আমাদের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছি একথা আমার উপস্থিত শ্রোতাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ধরে অনায়াসেই বলতে পারি। সুতরাং এখন আর বাগ-বিস্তার না করে এক্ষেত্রে যাঁরা হাস্যরসের ধারাটি প্রভাতকুমারের আমল পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়েছেন তাঁদের পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে আমার মূল বক্তব্যের অবতারণা করব—

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন প্রভাকর-এর ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং ভারতচন্দ্রের তিরোধানের পর এঁর পূর্বে আর এতখানি শক্তি নিয়ে কারুর আবির্ভাব হয়নি। তাঁকে সাহিত্যে এই নব-যুগের প্রবর্তক বললে বেশি বলা হয় না। বঙ্কিমের ভাষায়—ঈশ্বর গুপ্ত realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত satirist, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

তাঁর Satire বা ব্যঙ্গের মাধ্যমেই তিনি হাস্যরসেরও পরিবেশন করে গেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের জন্মকাল ১২১৩, মৃত্যু ১২৬৫। খৃষ্টীয় (১৭০৫—১৭৫৭)।

ঈশ্বর গুপ্তকে এই নব-যুগের প্রবর্তক বলে মেনে নিয়ে এইবার আমি এই যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট যুগন্ধরের নাম করে প্রভাতকুমারে এসে পড়ছি।

পূর্বেই বলেছি এইটি আমাদের বর্তমান যুগের লাগালাগি, পূর্ব-যুগের তুলনায় অধিকতর আলোচিত, এবং সেই জন্যই আমার উপস্থিত শ্রোতাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা ভেবে অনেকখানি পরিচিত বলে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং এদের বিশদ পরিচয়ে কালক্ষেপ না করে একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিয়েই ক্ষান্ত হব আমি। শুধু রস-রচনার দিক থেকেই। এবং নিতান্ত বিশিষ্ট যাঁরা তাদেরই তালিকা। ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং 'পাষণ্ড পীড়ক' পত্রিকার গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য।

এঁদের পরেই একটু যেন দীর্ঘ ফাঁক গেছে, তার পরেই তালিকাটি এইভাবে নেমে এসেছে—

(১) 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্যারীচাঁদ মিত্র, অন্য নামে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪—১৮৮৩)।

(২) রূপচাঁদ পক্ষী ১৮১৫। উদ্ভট শখ, খাঁচার মতো গাড়িতে করে সারা কলকাতায় টহল দিয়ে বেড়াতেন। ব্যঙ্গ-কৌতুক রসের রকমারি পদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত—

একটু নমুনা—

আমারে ফ্রড করে কালিয়া-ড্যাম তুই
কোথায় গেলি।
আই অ্যাম ফর ইউ ভেরি সরি, গোলডেন
বডি হোল কালি

ইত্যাকার।

(৩) 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকের রাম-নারায়ণ তর্করত্ন বা নাটুকে রামনারায়ণ (১৮২৩-১৮৮৪)।

(৪) বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং হাস্যরসিক 'নীলদর্পণ'-এর দীনবন্ধু মিত্র—১৮২৯-১৮৭৩।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র। হাস্যরসে 'কমলাকান্তর আসর,' 'মুচিরাম গুড়' প্রভৃতিতে অমর। ১৮৩৮-১৮৯৪।

(৬) কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসির দিকে 'বাঙ্গালীর মেয়ে' থেকে চির নতুন নমুনা একটু—

'খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে,
হায় হায়, ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে...'

—খুব আলোড়ন জাগিয়ে ছিল সে-সময়। কোন মহিলার উপযুক্ত জবাবে হাসির সে-আলোড়ন আরও আবর্তিত হয়ে উঠেছিল। কোথায় লিপিবদ্ধ আছে কিনা জানা নেই। আমার কোন মহিলা শ্রোত্রী যদি আক্রোশের বশেও খুঁজে বের করতে পারেন তো রগোড়টা আবার জমে।

(৭) চলতি ভাষায় প্রথম কথাচিত্র 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা'র কালীপ্রসন্ন সিংহ।

(৮) 'কংকাবতী' এবং মজলিসী ভুতুড়ে গল্পের প্রথম রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৮৪৬-১৮৯৬)।

(৯) 'খাস দখল', 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রভৃতি প্রহসন নাটকের রচয়িতা, অমৃতলাল বোস (১৮৫২-১৯২৮)।

(১০) কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ। ব্যঙ্গ-রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই ছিল তাঁর লক্ষ্যবস্তু। (১৮৬১-১৯০৭)।

(১১) কয়েকটি প্রহসন এবং অজস্র হাসির গানের রচয়িতা, সর্ববিধ রসেরই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ডি এল রায়। (১৮৬২-১৯১৩)।

(১২) রবীন্দ্রনাথ—১৮৬২-১৯৪১

(১৩) প্রভাত মুখোপাধ্যায় ১৮৭৩-১৯৩২।

(১৪) ভক্তি এবং বহু হাস্য-রসমূলক গানের রচয়িতা কবি রজনীকান্ত সেন। (১৮৬৫-১৯১৯)।

(১৫) লঘু স্যাটায়ার 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যের—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১০)।

চার 'ইয়ারী কথা'র—প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল'!

দেখা যাচ্ছে, এঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র, রূপচাঁদ, ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং দীনবন্ধু মিত্র ছাড়া সকলেই এক হিসাবে প্রভাতকুমারের সম-সাময়িক, অবশ্য কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ধরলে। টেকচাঁদের মৃত্যুর সময় প্রভাতকুমার দশ বৎসরের কিশোর। এরপর, আর সবার ক্ষেত্রেই প্রভাতকুমারের বয়সকাল এর ঊর্ধ্বেই। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের যাঁরা উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের মধ্যে গণ্য, তিনি তাঁদের সঙ্গে কলম চালিয়ে গেছেন এবং সর্বাধিক খ্যাতিও অর্জন করেছেন। এইটি হাস্য-রসে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট যুগও।

আমি গোড়াতেই প্রভাতকুমারের উত্তরাধিকার বা পূর্ব যুগের কথা বলেছি এবং তার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনাও করলাম। আমার নিজের বিশ্বাস বাংলার কবি-খেউড়-পাঁচালী, বা যে-আকারেই হোক এই ধারাটি বহতা না থাকলে পরবর্তী সাহিত্যিকরুচিসম্মত এই যুগটিও আসত না। এই অর্থে এটা বেশ ধরে নেওয়া যায় যে প্রভাতকুমার এই যুগ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, এবং ওর দ্বারা যতই অ-প্রত্যক্ষভাবে হোক, প্রভাবিতও হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ওঁর নিজের যুগ, নিজের প্রত্যক্ষ পরিবেশ ওঁকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবং সবচেয়ে যা বড়—কথা, তার মধ্যেও কে বা কারা।

আমার মনে হয় হাস্যরসের সৃষ্টিতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শটাই পরিলক্ষিত হয় প্রভাতকুমারের লেখায়। অবশ্য, পূর্বের রস-ঐতিহ্য যে মনের জমিটা তৈয়ের করে রেখেছিল এটা মেনে নিয়ে।

আমি ইচ্ছা করেই 'প্রভাব' কথাটা ব্যবহার করলাম না। আমাদের সাহিত্য-আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই এই শব্দটার ভ্রান্ত প্রয়োগ হয় দেখেছি—

Genius is imitative, Carlyle কি কে বলছেন ঠিক মনে পড়ছে না। শব্দার্থ ধরে দাঁড়ায়—প্রতিভা অনুকরণ-বিলাসী। কিন্তু প্রতিভা Imitative কি নীচ নকল-নবিশী অর্থে? তাহলে তার আর পদার্থ রইল কি? অথচ কথাটা সত্যও, এর মধ্যে একটা বড় তথ্য নিহিত রয়েছে। সেটা কিন্তু এই নয় যে, প্রতিভাবান ব্যক্তি নকল করেই প্রতিভাবান। আসল অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক প্রতিভার একটা বিশেষ প্রবণতা আছে এবং যেদিকে তা সেই বিশেষ প্রবণতার নিদর্শন দেখে সেই দিকেই ধাবিত হয়ে নিজের মুক্তি খোঁজে, ও তাই থেকে নিজের পুষ্টি সাধন করে। এক ধরনের Affinity বা সম-ধর্মের সন্ধান পাওয়া। নিন্দনীয় বা গোপনীয় কিছু নয়। প্রতিভা জালিয়াৎ নয়, ঠিক যেমন, জালিয়াৎ প্রতিভা নয়।

শুধু এই হিসাবেই আমি বলছি হাস্য-রসে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ প্রভাতকুমারের লেখার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পরিমার্জিত রুচি, সূক্ষ্মতা এবং বৈচিত্র্যে পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে।

তার পাশেই এই গুণগুলো পাচ্ছি এক প্রভাতকুমারের মধ্যেই। বাংলায় অন্য সব হাস্যরসিক, বা হাস্যরস নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছেন তাঁদের কাউকে এ-আলোচনার মধ্যে টানতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে, আমার উদ্দেশ্যও তা নয়।

সুধী বিচার করে নেবেন।

(ক্রমশঃ)

অন্য ভুবন ।। ৫ ।।

অসম্ভব! এ আমি পারব না।

মুখের উপর এ রকম জবাব আমি দেব হয়ত সুকুমারদা আশা করেন নি। বোবা চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ে বললেন, ঠিক আছে, জীবনে তোমার মুখ আমি দর্শন করতে চাই না। জেনে-শুনে একটা অন্যায়কে তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছ। বলে আমার দিকে আর একবার তাকালেন সুকুমারদা। তারপর নিঃশব্দে ক্লান্ত শরীর-টাকে টেনে-হেঁচড়ে যেন বাইরে নিয়ে গেলেন।

আমি দুঃখবোধ করলাম। অন্তত সেই মুহূর্তে সুকুমারদার জন্যে আমার খুবই খারাপ লাগতে লাগল। কিন্তু আমি অপারগ। সুকুমারদার অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জানি তাঁর মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। আর সেই আগুনে সেঁকে-সেঁকে তিনি আমার কাছে কথাগুলি বলছিলেন। মধুমিতার নাম তিনি সহ্য করতে পারেন না। মধুমিতার প্রতি যে-কোন রকমের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তার মন সব সময়ই ব্যগ্র। আর তার ফলেই দিনে-দিনে বিচারবুদ্ধি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কেমন এক হিংস্র চেতনা প্রতিমুহূর্তে তাঁকে যেন পরিচালিত করছে।

কিন্তু এরকম মানসিক অবস্থা যে সুকুমারদার হবে আমি জীবনেও কল্পনাও করি নি। চোখ বুজলেই আমি এখনও সেই আলো ঝলমল দিনগুলোকে দেখতে পাই। হাসি আর আনন্দের ঢেউয়ে নেচে-নেচে দুটি জীবন যেন পরিপূর্ণ হতে চলেছে একথাই তখন আমার মনে হত। বিকেলের পড়ন্ত রোদ যখন মধুমিতার রেশমের মত চুলের মাঝে খেলা করত, ভোরের শিউলি ফুলের মত সতেজ দৃষ্টিতে সে যখন সুকুমারদার দিকে আড়চোখে তাকাত, আমি তখন কাছে বসে লক্ষ্য করেছি কেমন মুহূর্তের মধ্যে আনমনা হয়ে উঠতেন সুকুমারদা। একটা প্রচণ্ড রাশভারী লোক মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে ছোট্ট শিশুর মত সরল হয়ে উঠতে পারে তা লক্ষ্য করে মনে-মনে আমি আনন্দ পেতাম। ভাবতাম, কি সুন্দর!

সুকুমারদার বিয়েতে আমিই ছিলাম প্রধান সাক্ষী। সারা দিন কি দুঃসহ উত্তেজনার মধ্যে আমার কাটল! তখন পৃথিবীতে সুকুমারদাকেই বোধহয় আমি সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি। তাঁর যে কোন কথাকেই আমার কাছে মনে হয় চরম সত্য। তার সামনে বা পিছনে আরও যে অনেক কথা থাকতে পারে তা ভাববার মত অবস্থা তখন ছিল না আমার।

আমি সুকুমারদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সব কথা আমার কাছে তাই তিনি খুলে বলেন না। আমিও জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নি কোনদিন। যদিও সুকুমারদার সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না, বরং এমন একটা সম্পর্ক থাকে বড়জোর পাড়া-প্রতিবেশীর সম্পর্ক বলা চলে, তবুও সে সম্পর্কের গভীরতা আমাকে এতটা জড়িয়ে ফেলেছিল যে তা কেটে বেরিয়ে আসবার কোন ক্ষমতা আমার সেদিন ছিল না। এমন একটা শ্রদ্ধার আসনে সুকুমারদাকে আমি বসিয়েছিলাম যেখানে জীবনে বোধহয় একজন লোকই বসতে পারেন।

আগের দিন রাত্রে মধুমিতার কথা আমাকে বললেন সুকুমারদা। মধুমিতার বাড়ীতে আপত্তি আছে। কাল কোন রকমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবে মধুমিতা আর তারপর বিকেল পাঁচটায় তাঁদের জীবনের নতুন ইতিহাস রচিত হবে। আমাকে একটা জায়গার কথা বলে দিলেন সুকুমারদা। মধুমিতা সেখানে বেলা তিনটেয় অপেক্ষা করবে। এবং একটা ট্যাক্সি করে মধুমিতাকে আমার নিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু আমি চিনবো কি করে? আমি তো কোনদিন দেখিনি! আমি নতুন এক সমস্যা তুললাম।

কি যেন এক মুহূর্তে ভাবলেন সুকুমারদা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোর চেনার দরকার নেই। সেই তোকে চিনে নেবে।

কি করে? আমাকে তো কোনদিন দেখে নি? আমি আবার সমস্যা তুলতে চাইলাম।

দেখার দরকার নেই। সুকুমারদা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন।

মানে?

মানে, কিছু নয়। গিয়ে দ্যাখ আগে!

সুকুমারদা ঠিকই বলেছিলেন। আমি বাস থেকে নামতেই একটি মেয়ে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি সত্যিই একটু বিস্মিত হয়ে গেলাম। আগে কোনদিন, কোন সময়, কোনভাবেই মেয়েটিকে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ল না, তবু কেন জানি মনে হল, এ নিশ্চয় মধুমিতা। একেই সুকুমারদার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পবিত্র কর্তব্য পালন করতে আমি এসেছি।

মেয়েটি আমার কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না। মাঝে মাঝে আড়চোখে শুধু আমার দিকে তাকাতে থাকল। আর আমি লক্ষ্য করলাম সব সময় খুব আলতো ধরনের কি রকম একটা হাসি মেয়েটির ঠোঁটের কোনায় লেগে রয়েছে।

মনে মনে একটা গৌরব অনুভব করছিলাম আমি। সব সময় মনে হচ্ছিল দারুণ একটা অসাধ্য কাজ সাধন করতে চলেছি। আমার উপর দুটি জীবনের ভাগ্য নির্ভর করছে। কোন রকম দ্বিধা, সংকোচ বা ভয় প্রকাশ করা আমার পক্ষে কোনমতেই উচিত নয়। তাই সাহসে ভর করে আমি খুব আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলাম, আপনার নাম কি মধুমিতা?

নিমেষের মধ্যে হাসিতে উদ্ভাসিত করে মেয়েটি তাকাল আমার দিকে এবং মুখে কোন কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, দাঁড়ান, ট্যাক্সি ডাকছি।

সেদিন সঠিক বন্ধুত্বের দায়িত্বই আমি পালন করেছিলাম। মধুমিতাকে ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছিলাম সুকুমারদার কাছে। আর তারপর তাদের জীবনের চুক্তিপত্রে প্রথম সাক্ষীর নামসইও করেছিলাম আমি। আমাকেই প্রধান সাক্ষী রেখে তারা তাদের পরস্পরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। আমি সেদিন মনে-মনে এই ভেবে আনন্দ পেয়েছিলাম যে, এদের দুজনের জীবন গড়ার পথে সামান্যতম ভূমিকাও আমি পালন করতে পেরেছি।

কিন্তু আজ? আজ কি আমার সেকথা মনে হচ্ছে? সেদিনকার সেই মানুষ দুটির সঙ্গে আজকের মানুষ দুটির কত তফাৎ? এক পথ ধরে দুজনে যে এতদিন একসঙ্গে হেঁটেছে তা বোঝার কোনরকম উপায় নেই। আর যে ভূমিকা পালনের গর্বে সেদিন আমি গর্বিত হয়েছিলাম, সে গর্ব আজ আমার মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। সুকুমারদা আজ অন্যায়-মানুষ। অন্যায়ভাবে আমাকে অনুরোধ করে গেলেন আমি যেন মধুমিতার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক না রাখি। আশ্চর্য! মানুষ কত সহজে কত আশ্চর্যভাবে পাল্টে যায়?

আমি জানি, মধুমিতা সম্পর্কে কোনরকম কথা বলার অধিকার আজ তাঁর নেই। সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তিনিই মূলত দায়ী বলে আমার মনে হয়। মধুমিতাকে তো অনেক দিন ধরে আমি চোখের সামনে দেখেছি। তার দিক থেকে বিশেষ কোন ত্রুটি ঘটেছে বলে আমার কোনদিন মনে হয়নি। তবে, হ্যাঁ, সততা তার মধ্যে ছিল। সহজ কথাটা সে সহজভাবে বলত।

শেষের দিকে প্রায়ই আমাকে বলত মধুমিতা, আচ্ছা তুমিই বল, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মূলে সূত্রটা কোথায়? সামান্যতম বিশ্বাসে যদি ফাটল ধরে তাহলে কি কখনও বাস করা সম্ভব? তুমিই বল। দুজন-দুজনকে অশ্রদ্ধা করবে, ঘৃণা করবে। অশ্রদ্ধা আর ঘৃণা নিয়ে কখনও কি দৈনন্দিন বাস করা সম্ভব? আর করবেই বা কেন? বিয়েটা কি জীবনের আনন্দ না বন্ধন? তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছ। বল না, আমি ঠিক বলছি কিনা!

আমি চুপ করে থাকতাম। সত্যিই বড় কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমি কেন, কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। মধুমিতার কথার মধ্যে যুক্তি আছে, বিচার আছে, মানবিক প্রশ্ন আছে, সবই ঠিক। তবু মেনে নিতে কেমন লাগে। হয়ত আমাদের মনের জড়তা, হয়ত দ্বিধা, সঙ্কোচ। সত্যকে সত্য জেনেও মেনে নিতে কেমন লাগে। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া কোন গত্যান্তর থাকে না।

মধুমিতার সঙ্গে যেন আমার বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুকুমারদার সম্পর্ক ছাড়াও একটি স্বতন্ত্র সত্তায় আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে মধুমিতা। তার কাছে যেতে আমার ভাল লাগে, তার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। কেমন যেন একটা যুক্তি আর সততা দিয়ে মোড়া একটি মেয়ে।

মধুমিতা আমার চেয়ে বয়সে ছোট। আমাকে দাদা বলে ডাকে। প্রথমে আমি বৌদি বলতাম। কিন্তু মধুমিতা আপত্তি করাতে নাম ধরেই ডাকি। যখন-তখন তাদের বাড়ী যাওয়ার আমার অবাধ অধিকার, সুকুমারদা থাকুক বা না থাকুক।

কতদিন মধুমিতা আর আমি বসে কত রকমের গল্প করেছি! সুকুমারদা প্রায়ই ঠাট্টা করত, দুজনেই সমান। জীবনেও সাবালক হবে না। ছেলেমানুষের মত গল্প, গল্প আর গল্প।

মধুমিতা জবাব দিত, তুমি বুড়োমানুষ সেজে মুখে মুখোস পরে জ্ঞান দিয়ে বেড়াও, দরকার নেই আমাদের সাবালক হওয়ার। কি বল? বলে আমাকে সাক্ষী মানত।

আমি 'হ্যাঁ' 'না' কোন জবাব না দিয়ে কেবল হাসতাম।

এমনিভাবেই দিনগুলো বেশ চলছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি লক্ষ্য করলাম, আমার চোখের সামনেই আবহাওয়া কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল, হাসি-ঝলমল বাড়ীটায় কেমন একটা থমথমে ভাব সব সময় বিরাজ করতে লাগল। মধুমিতা যদিও আমাকে দেখে অনেকটা সহজ হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সুকুমারদা তা পারেন না। বেশীর ভাগ দিনই আমার সঙ্গে কথা বলেন না। মুখে বই গুঁজে চুপচাপ বসে থাকেন।

আমি বুঝলাম, এ বাড়ীতে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি সরে দাঁড়ালাম। আসা বন্ধ করলাম।

তারপর একদিন আকস্মিকভাবে মধুমিতা আমার কাছে গিয়ে হাজির। ক' দিনেই চেহারায় কত পরিবর্তন ঘটেছে। চোখের কোণে কালি। ফুলের মত হাসি যেন চুপসে গেছে। রেশমের মত চুলগুলোয় অযত্নে জট ধরেছে। বিষাদ-সাগরে এইমাত্র যেন ডুব দিয়ে উঠে এসেছে মধুমিতা।

অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? কি মনে করে?

কেন? তোমার কাছে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে নাকি?

আমি বুঝেও না বোঝার ভান করলাম,
?

ন্যাকা সেজ না। আমি সরল মানুষ। নভাবে কথা বল। আমি বুঝলাম এ মিতা অন্য মানুষ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আমি চুপ করে থাকলাম। আর কোন । না বলাই শ্রেয় মনে হল।

তারপর মধুমিতা তার সেই কঠিন । আমার সামনে তুলে ধরল। এবং তার- থেকে বার বার সেই প্রশ্ন সে আমার নে তুলে ধরেছে। কিন্তু আমি কোন ব দিতে পারি নি। কোন দিনই নয়। সে প্রশ্নের সমাধান হয়ে গিয়েছে। ও আজও আমি তার জবাব দিতে র না।

সুকুমারদা-মধুমিতা তাদের জীবনের পত্র আজ ছিঁড়ে ফেলেছে। আর প্রথম নর মত আজও আমি প্রধান সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে সে ঘটনা দেখছি। সেদিনকার গ যদিও এ ভূমিকার অনেক তফাৎ, ও এ ভূমিকাকে আমি অস্বীকার করতে র না। মধুমিতাকে মুখে যে জবাব ম দিতে পারি নি, হয়ত এই নীরব ীর ভূমিকায় হাজির থেকে তার কিছুটা ন আমি দিতে পেরেছি। আর তাতে ম সান্ত্বনাও বোধ করেছি। তাই সুকুমার- সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলেও মধুমিতার গ সম্পর্ক ত্যাগ আমি করতে পারি নি। তে পারি নি বললে ভুল বলা হবে। ন, অন্ততঃ কিছুকাল ধরে কোনরকম যোগ মধুমিতার সঙ্গে আমার ছিল মধুমিতাও রাখে নি। আমিও রাখি প্রত্যেকেই যে যার পথে নিজস্ব তায় ছিটকে পড়েছিলাম। চুক্তিপত্র ড়বার পর সেই যে মধুমিতা ভিড়ের মিলিয়ে গেল তারপর থেকে তাকে র দেখিও নি।

তারপর হঠাৎ। হঠাতই বলব। কারণ, ভাবে আবার আমার মধুমিতার সঙ্গে া হবে ভাবতেই পারিনি। ইতিমধ্যে নেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি একটা লো চাকরী পেয়েছি। উত্তর কলকাতা ড় আভিজাত্যের মুখোশ এঁটে দক্ষিণ কাতায় আস্তানা গেড়েছি। দু' ঘরের দর একটা ছোট ফ্ল্যাট। একা থাকি। বই মেজাজে। মাঝে মাঝে সুকুমারদা সেন। গল্প করেন। দুজনের কেউই মিতার প্রসঙ্গ তুলি না। মনে মনে জনেই এরকমের একটা চুক্তি করে রেছি। এই ক'মাসে সুকুমারদা আরও ন অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। হাঁটবার য় মেরুদণ্ড অহেতুক কেমন যেন বেঁকে ।

যে আসনে সুকুমারদাকে আমি বসিয়ে- লাম আজ আর সেখানে বসাতে পারি না। কুমারদার প্রতি সে শ্রদ্ধা আজ আর ই। আমার বারবার মনে হয় জীবনের যে রণতির মুখোমুখি এসে তাঁরা দাঁড়ালেন, র জন্যে মূলত সুকুমারদাই দায়ী। ভিতর মধ্যেও যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা, ই একথা তিনি কিছুতেই স্বীকার তে চাননি। মধুমিতাকে তিনি পুতুল- খেলা সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। খেয়াল-খুশি মতো তিনি তার সৌন্দর্যটুকু পান করবেন। এ এক অদ্ভুত ধরনের ভালবাসা। এর সঙ্গে গভীর মনুষ্যত্বের কোনরকম সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয়নি। আমার সব সময় মনে হতো সুকুমারদার ভিতরে একটা জান্তব প্রকৃতি গোপনে লুকিয়ে আছে। সুযোগ পেলেই সে মাথা চাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

আমার সামনেই অনেকদিন মধুমিতা বলেছে, তুমি কেন বুঝতে চাও না, আমার ভয়ানক একা একা লাগে। কোন কাজ না করে মানুষ কখনো বাঁচতে পারে? ঘরে বসে বসে দিন কাটাবো তো আমি লেখাপড়া শিখেছি কেন?

সুকুমারদা চুপ করে থাকতেন।

মাঝে মাঝে আমিও প্রতিবাদ করতাম, এ সত্যি আপনার ভারি অন্যায় সুকুমারদা।

তারপর যেদিন সুকুমারদা ফস করে আমাকে বলে বসলেন, এ-ব্যাপারে তুমি কোন কথা না বললেই আমি খুশি হবো। সেদিন থেকে আমি চুপ করে গেলাম। বুঝলাম, সুকুমারদার ভিতরের একরোখা একটা জেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

তারপর ওদের দাম্পত্যজীবনের মাঝে আর আমি কোনদিন প্রবেশ করিনি। মধুমিতার প্রশ্নেরও কোন জবাব আমি দিইনি। শুধু বিচ্ছেদের মুহূর্তে সাক্ষীর ভূমিকাটুকু পালন করেছি। আর দিনে দিনে সুকুমারদাকে ঘৃণা না করলেও অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এবং তারপর থেকে আমার শেষ ভূমিকাটুকু পালন করা হয়ে গিয়েছে মনে করে ঐ প্রসঙ্গ আর কোনদিন উত্থাপন করিনি। সুকুমারদাও করেননি।

তবে মধুমিতা করেছিল। মধুমিতা করেছিল সেই প্রথম দিনই যেদিন আমি তাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম।

সেদিন আমি অফিস যাইনি। শরীরটা খারাপ। দুপুরে একটা ডিটেকটিভ বই মুখে গুঁজে নায়কের বিস্ময়কর কীর্তি-কলাপের জগতে হাবুডুবু খাচ্ছি এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

অত্যন্ত বিরক্ত নিয়ে দরজা খুলেই চমকে উঠলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে মধুমিতা। অতিআধুনিকার পোশাকে সজ্জিতা।

মধুমিতাও আমাকে দেখে বোধহয় একটু চমকে উঠলো। এক মুহূর্ত। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, ভিতরে আসতে পারি।

নিশ্চয়! বলে আমি পথ ছেড়ে দাঁড়ালাম।

সোজা আমার ঘরে গিয়ে সোফায় শরীর এলিয়ে দিলো মধুমিতা। তারপর সহজভাবে বলল, ফ্যানটা ছেড়ে দাও। ঘেমে একেবারে ভূত হয়ে গেছি।

এমনভাবে কথাকটি বললো, যেন এ-বাড়ীতে সে আদৌ নতুন নয়। নিত্যই তার আনাগোনা।

আমি অবাক চোখে মধুমিতাকে দেখছিলাম। এই এক বছরে অনেক বেশি সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। কথায়-বার্তায়, পোশাকে-আষাকে সর্বত্র আধুনিকতার ছাপ। রেশমের মতো চুলগুলোকে অদ্ভুতভাবে ছবির মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে বেঁধেছে মধুমিতা। উজ্জ্বল রূপের মাঝে যেন কিঞ্চিৎ উগ্রতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে পোশাক পরার মাঝেও কোথাও যেন সেই উগ্রতা লুকিয়ে আছে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মধুমিতার নতুন রূপ অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম।

মধুমিতা বোধহয় বুঝলো। বললো, অবাক হচ্ছো?

কিছুটা। আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

মধুমিতা হাসলো। তবে আগের সেই হাসির সঙ্গে এ-হাসির কতো বেশি তফাৎ!

শরীরটাকে সোফার মাঝে এলিয়ে দিয়েই মধুমিতা জিগ্যেস করলো, এখানে কতোদিন এসেছো?

মাস ছয়েক। তা তুমি জানলে কি করে? আমি জিগ্যেস করলাম।

জানি না।

তবে এলে কি করে?

ধরো আকস্মিকভাবে।

আকস্মিকভাবে, মানে?

মানে আবার কি? হঠাৎ চলে এলাম। বলতে বলতে এলানো শরীরটাকে তুলে সোজা হয়ে বসলো মধুমিতা।

একথার অর্থ কিছুই না বুঝে আমি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

মধুমিতা আবার হাসলো। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো। থাকগে। বেশ ভালোই আছি জানো। বাব্বা! একটা অসহ্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে একটু চিনতে পেরেছি। একাকীত্ব আমাকে আর 'বোর' করে না।

আমি বাধা দিলাম, ও-সব কথা থাক, মধুমিতা! যা চুকে গেছে, গেছে। তাকে আর না তোলাই ভালো।

সেকথা তো আমি তুলছি না। আমি শুধু আমার কথা বলছি। মধুমিতা সহজ-

ক্যানভাসার। ক্যানভাসারের কাজ। বেশ টেনে টেনে বড়ো বড়ো করে বললো মধুমিতা।

ক্যানভাসার? আমি ভ্রূ কোঁচকালাম।

কেন, তাতে মান গেল নাকি? মধুমিতা সোজা প্রশ্ন করলো।

আমি আমতা-আমতা করলাম, না, তা ঠিক নয়। তবে, তবে—।

তবে কি?

না, কিছু নয়। বলে আমি চুপ করলাম।

তোমরা সব পুরুষেরাই সমান। কেউই মেয়েদের কোন সম্মান দিতে জানো না।

মস্তবড় অভিযোগ। এ-ক্ষেত্রেও যুক্তি ও সত্যতা আছে। সুতরাং আমার চুপ করে থাকাই শ্রেয়।
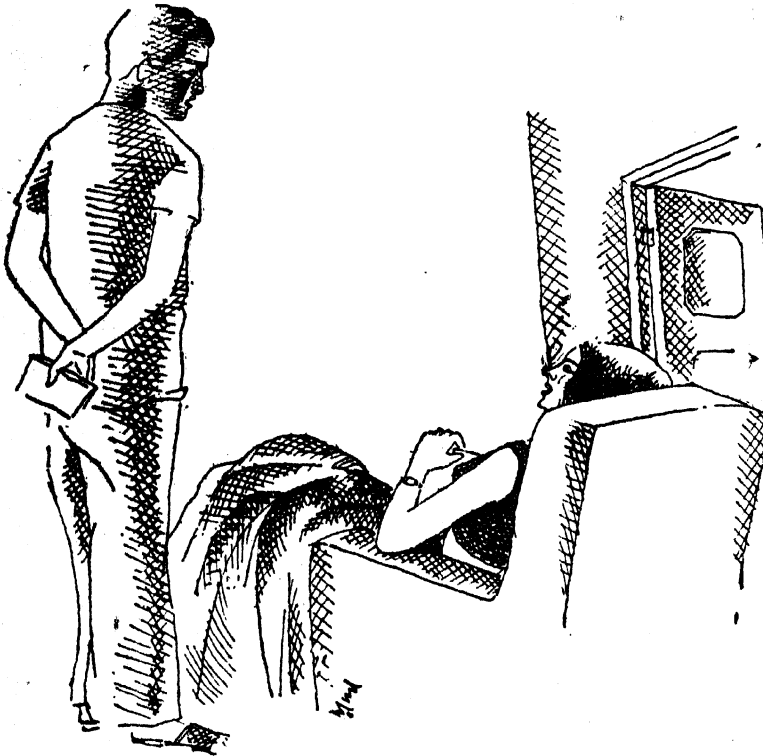
বললো, অবাক হচ্ছো?

ভাবে জবাব দিলো। ঠিক যেন সেই আগের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য।

থাকগে, কি করছো এখন? আমি প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইলাম। অনেকদিন পরে মধুমিতার সঙ্গে দেখা। পুরনো প্রসঙ্গ তুলে আমি আবহাওয়া গভীর করতে চাইছিলাম না।

মধুমিতা জবাব দিলো, বললাম তো! আকস্মিকভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কাজ।

হেঁয়ালি ছাড়ো। ঠিক করে বলো! আমি জোর করলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুজনের মাঝে একটা অপরিচিত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। দুজনেই বোধহয় আমরা ভেবে নিচ্ছি এরপর কার কি কথা বলা উচিত।

মধুমিতাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো, ভালো চাকরী পেয়েছ বুঝি! আমি মাথা নাড়লাম।

খবর নাও না কেন? মধুমিতা জিগ্যেস করলো।

কি করে জানবো কোথায় আছো? আমি জবাব দিলাম।

ইচ্ছে করলেই নেওয়া যায়।

তা অবশ্য ঠিক।

নিতে চাওনি বলো।

না, ঠিক তা নয়। তবে—।

তবে ভাবছিলে উচিত হবে কিনা। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মধুমিতা বললো। মধুমিতা সত্যিই আমার মনের কথাটা বলেছে। অনেকদিনই আমি মধুমিতার কথা ভেবেছি। কোথায় আছে কি করছে অনেকদিনই জানতে ইচ্ছে করেছে, কিন্তু ঔচিত্যবোধই বারবার আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মধুমিতা সেদিন অনেকক্ষণ আমার ওখানে ছিলো। অনেক কথাই আমি জানলাম। মধুমিতা নিজের হাতে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে জেনে শেষ পর্যন্ত আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছিলো।

শুনলাম, বিবাহ-বিচ্ছেদের দুমাসের মধ্যেই মধুমিতা চাকরী নিয়েছে। নিজের উপার্জনেই শ্যামবাজারের দিকে নতুন বাসা নিয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী সম্পূর্ণ স্বাধীন।

একটা বড়ো প্রসাধন প্রতিষ্ঠানে প্রসাধনদ্রব্য প্রচারের কাজ। বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচার করতে হয়। বাড়ীর মেয়েদের কাছে গুণাবলী জানানো তার দায়িত্ব পাউডার, স্নো, ক্রিম, সাবান, সুগন্ধী দ্র… ইত্যাদি। প্রথম প্রথম মধুমিতার খুব জড়তা লাগতো। বিশ্রী লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছে করতো। তখন… কতো রকমের লোক আছে। কতো রকমের ব্যবহার।

তবে এখন খুব ভালো লা… মধুমিতার। কতোরকম মানুষের সং… পরিচয় হয়। কতোরকম বিচিত্র স্বভাবে… মানুষ দেখা যায়। আর তাছাড়া কলকা… শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের রুচি-ফ্যাশ… চালচলন সম্পর্কেও সুন্দর একটা ধার… জন্মে।

শেষকালে আমি মধুমিতাকে জিগে… করলাম, তোমাদের কোম্পানী বেশ ভা… মাইনে দেয় নিশ্চয়।

হ্যাঁ। বেশ ভালোই বলা চলে।

এ-সম্পর্কে আর কোন প্রশ্নই ব… সমীচীন মনে না করে আমি চুপ করলা…

তারপর মধুমিতা আরও অনেকবা… আমার আস্তানায় এসেছে। আমিও শ্যা… বাজারে তার আস্তানা দেখে এসে… একদিন নিজে হাতে রান্না করে সুন্দরভা… খাওয়ালো মধুমিতা। নিজের মতোন ব… সুন্দর সংসার পেতেছে।

আমি অবাক হলাম মধুমিতা… আলমারী ভর্তি রাশি রাশি দেশী-বিদে… বই দেখে। মধুমিতার এ-দিকটা সতি… আমার জানা ছিলো না।

হেসে বললাম, এতো বই কার?

পাড়ার লোকের। মধুমিতা সংক্ষি… জবাব দিলো।

আমি কি সেই পাড়ার লোকে… একজন?

মধুমিতা প্রতিবাদ করে উঠলো, কক্ষ… নয়। খবরদার, কোন বইয়ে হাত দেবে না

নতুন চরিত্রে সত্যিই অদ্ভুত লাগল মধুমিতাকে।

সুকুমারদাকে আমি কোন কথা বলিনি। কিন্তু কিভাবে যেন সুকুমারদা মধুমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে-ছিলেন। তারপর আমার কাছে সেই অন্যায় দাবি, ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক তোমার রাখা ঠিক নয়।

কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

তুমি সবই জানো, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন?

জানি। কিন্তু, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোন কারণ আমি দেখি না।

তুমি তাহলে সম্পর্ক ত্যাগ করবে না? সুকুমারদা অন্যায় জিদ ধরলেন।

অসম্ভব! এ আমি কিছুতেই পারবো না।

বেশ! সুকুমারদা সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে গেলেন।

তবু আমি পারিনি। মধুমিতার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

নতুন এক রূপে, নতুন এক চরিত্রে আজ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে মধুমিতা।

মধুমিতা আমার কাছে স্বতন্ত্র, এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। আজো সে আমাকে দাদা বলে বটে, কিন্তু মনে মনে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।

—সত্যকাম

দেশে বিদেশে

নাগাভূমিতে পট-পরিবর্তন

একটি আকস্মিক অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে পড়ে নাগাল্যাণ্ডে শিলু আও মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে।

১১ আগস্টে রাজ্য বিধানসভায় যখন প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়, ট্রেজারী বেঞ্চে শ্রীআও'র সঙ্গে আর কেউ ছিলেন না। কিছু আগেই তাঁর ছজন সহকর্মী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। একদলীয়, ৪৬ সদস্যের বিধানসভার বাকী সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা এখন দূরে, আলাদাভাবে আসন নিলেন। এমনকি কৃষিমন্ত্রী শ্রীচিতেন জামির এ ক'বছর শিলু আও'র ডান হাতরূপেই যিনি কাজ করে এসেছেন, সেদিন তিনিও বসেছিলেন তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সরে, যদিও বিরোধীদের সঙ্গে একাসনে বসতে হয়ত তাঁর চক্ষুলজ্জায় বাধছিল।

একলা বসে, বিনা প্রতিবাদে শ্রীশিলু আও তাঁর ভাগ্যের বিপর্যয় দেখে গেলেন। বক্তারা একের পর এক উঠে অনাস্থা প্রস্তাব আনবার কারণ হিসেবে কতকগুলি অভি-যোগের ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন, যার মধ্যে প্রধান ছিল দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, পক্ষপাতদুষ্টতা ও কর্তব্যে অপদার্থতা এই চারটি অভিযোগ। শ্রীআও অভিযোগের উত্তর দেবার জন্যে স্পীকারের কাছে একদিন সময় চেয়েছিলেন। স্পীকার সে সময় দেন নি। এটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল কিনা তা, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের কাছে চিরকালই একটা প্রশ্ন হয়ে থাকবে।

সুতরাং সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শ্রীআও'র বিশেষ কিছু বলার ছিল না। তিনি অভিযোগগুলি অস্বীকার করে-ছিলেন; বলেছিলেন, "নাগাল্যাণ্ডের ও নাগা জনগণের কল্যাণের জন্যে আমি কাজ করেছি কিনা ইতিহাস তার বিচার করবে।" তারপর প্রস্তাবটি ভোটে দেবার আগে স্পীকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফলাফলের (৩২—৬) জন্যে অপেক্ষা করার কোন দরকার ছিল না।

শ্রীআও'র জায়গায় নাগা ন্যাশনালিস্ট পার্টির বিধানসভা দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন বিধানসভার স্পীকার শ্রীটি, এন অঙ্গামি। নাগাল্যাণ্ডের পরবর্তী সরকার তিনিই গঠন করবেন।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে স্বতন্ত্র নাগারাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হবার পর থেকেই শ্রীপি. শিলু আও মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার আগে, ১৯৬০ সাল থেকে, অন্তর্বর্তী সরকারের

শিলু আও

তিনি ছিলেন চীফ একজিকিউটিভ কাউন্সিলার। আজকে হঠাৎ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের কি কারণ ঘটল, আর এতদিন পরে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অপদার্থতার অভিযোগই বা উঠছে কেন?

এ সব প্রশ্নের কোন নিরপেক্ষ উত্তর কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু একথা ঠিক যে, অভিযোগগুলি যে রকম আকস্মিক ও অস্পষ্টভাবে আনা হয়েছে (আগে কখনো এ ধরনের অভিযোগের কথা শোনা যায় নি), তাতে সেগুলির নিজস্ব মূল্য খুব বেশী না থাকতে পারে। খুবই সম্ভব যে, অভিযোগগুলি অন্য কোন উদ্দেশ্যের শিখণ্ডী হিসেবে হাজির করা হয়েছে।

তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ঐ উদ্দেশ্য তিন রকম হ'তে পারে :

এক, ব্যক্তিগত রেষারেষি। শ্রীআও জাত রাজনীতিক নন। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্র থেকে তিনি রাজনীতিতে উঠে এসেছেন। অপর পক্ষে শ্রীঅঙ্গামি, শ্রীহোকিশে সেমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নাগা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং ক্ষমতায় আসার জন্যে তাঁদের আগ্রহ স্বাভাবিক।

দুই, সম্প্রদায়গত ঈর্ষা। শ্রীশিলু আও 'আও' উপজাতির লোক। সুতরাং নাগা রাজনীতিতে তাঁর প্রাধান্য বিস্তারে 'অঙ্গামি', 'সেমা' প্রভৃতি শক্তিশালী উপ-জাতি গোষ্ঠীর চাঞ্চল্যও অস্বাভাবিক নয়।

তিন, নীতিগত বিরোধ। একথা অনস্বীকার্য যে, নাগাল্যাণ্ডে আজ যে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশ কৃতিত্বই শ্রীশিলু আও'র। তাঁরই প্রবর্তনায় দু'বছর আগের আত্মগোপনকারী নাগাদের সঙ্গে ভারত সরকার আলোচনায় বসতে রাজী হন। নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে পারে, একথা জেনেও তিনি আলোচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। পাছে আলোচনা ভেঙে যায় এ জন্যে বৈরী নাগাদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে ছেদিমার আলোচনার টেবিল থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন। অপরপক্ষে একথাও ঠিক যে, তাঁর সরকারের ও তাঁর দলের অনেকেই শ্রীআও'র এই নরমপন্থী নীতি গোড়া থেকেই পছন্দ করেন নি, কারণ ভারত সরকার যদি বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোন মীমাংসায় আসেন তাহলে প্রথমেই যে তাঁদের অস্তিত্ব নিয়ে টান পড়বে এটা জানা কথা। এই দল মনে করেন যে, শ্রীআও যদি এতখানি উৎসাহ না দেখাতেন তাহলে আজকে বিদ্রোহীরা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত না। সুতরাং অবস্থা আরও খারাপ হবার আগেই ঘর সামলানো দরকার বলে তাঁদের মনে হলো।

এই তিনটি কারণ পৃথকভাবে কিম্বা একত্রে শ্রীশিলু আও'র অপসারণের পক্ষে কাজ করে থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিগত রেষারেষি হঠাৎ এই স্তরে দেখা দেওয়াটা একটু আশ্চর্যের, কেননা আজ যাঁরা শ্রীআও'র বিরোধিতা করছেন, ১৯৬০ সাল থেকে তাঁরাই তাঁকে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন এবং যেহেতু সম্প্রদায়গত ঈর্ষার কারণটিও এই প্রসঙ্গে একটু অবান্তর কেননা সত্যিই যদি আজকের নাগা রাজ-নীতিতে উপজাতীয় দলাদলি এতটা গভীর হয়ে থাকত তাহলে শ্রীটি, এন, অঙ্গামির নির্বাচন এতটা সহজ হত না; সেই কারণে তৃতীয় কারণটিই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নিয়ামক ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথম কারণ দুটি আনুষঙ্গিক প্রভাব হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে মাত্র।

এইটুকু যদি মেনে নেই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েঃ অনাস্থা প্রস্তাবটি ঠিক এই সময়ে তোলা হলো কেন? কয়েকদিন আগে বা কয়েকদিন পরে তুললে কি ক্ষতি হতো? এই বিষয়টা কারো নজর এড়িয়ে যায়নি যে, অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ যখন দেওয়া হলো, ঠিক সেই সময়েই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আত্মগোপনকারী নাগাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হতে চলেছিলেন।

এই ঘটনা দুটিকে যদি মিলিয়ে পড়া যায়, তাহলে অনাস্থা প্রস্তাবের সময় নির্বাচনের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনার কথা স্বভাবতই সবচেয়ে প্রথমে মনে আসে।

এক, দিল্লী আলোচনা হয় এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখান থেকে মীমাংসার একটা তটরেখা দিকচক্রবালে দেখা গেছে (মনে রাখা দরকার, দিল্লী আলোচনা ভেঙে যাবার উপক্রম এখন পর্যন্ত হয়নি) সেক্ষেত্রে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর এবং সে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। সুতরাং শিলু

আও'র বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত সরকারকে প্রকারান্তরে এই কথাটাই জানিয়ে দেওয়া হলো, বর্তমান শাসক দলের ক্ষতি করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা সহ্য করা হবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ-যোগ্য যে শ্রীটি এন অঙ্গামি এককালে আত্মগোপনকারী নাগাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বিদ্রোহী নেতা ফিজোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৫৪ সালে অবশ্য তিনি ফিজোর সঙ্গে সকল সংশ্রব ছিন্ন করেন, কিন্তু আত্মগোপনকারী-দের অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং নাগাল্যান্ডে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এখনো গভীর। তা উপেক্ষা করা সহজ হবে না। আর না হয়,

দুই, দিল্লী আলোচনা আনুষ্ঠানিক-ভাবে এখনো ভেঙ্গে না গেলেও হয়ত এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে ব্যর্থতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। ঐ রকম একটি সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই হয়ত সংশ্লিষ্ট কোন মহল আগে থেকেই নিজেদের ঘর সামলে রাখার আয়োজন করে রেখেছেন। একথা ঠিক, বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা যদি ভেঙ্গে যায় এবং যদি সশস্ত্র শক্তির দ্বারা তাদের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করার কোন ইচ্ছা না থাকে, তাহলে নাগাল্যান্ডে এমন একটা সরকার দরকার যাঁরা আরো ব্যাপকভাবে নাগাদের মনে সাড়া জাগাতে পারবেন। শ্রীশিলু আওকে দিয়ে হয়ত সেটা সম্ভব হতো না, কেন না শ্রীআও'র সততা, আন্তরিকতা ও কর্ম-ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকলেও একথা ঠিক—প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে গোড়া থেকে জড়িত না থাকার দরুণ তাঁর প্রভাব খুবই সীমিত। সেক্ষেত্রে শ্রীঅঙ্গামির আবেদন নিঃসন্দেহে অনেক বেশী। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে অনাস্থা প্রস্তাবের প্রাথমিক উদ্যোগ নিশ্চয়ই ন্যাশনালিস্ট পার্টির মহল ছাড়াও অন্য মহল থেকে এসেছে। সেই মহল কত উঁচু তা এখনো জানা যায়নি, সেই মহল দিল্লীও হতে পারে। মহল যেখানকারই হোক, সরকারের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তাঁরা বিদ্রোহীদের এই কথাটাই হয়ত মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তাঁরা নিজেদের যতই প্রভাব-শালী মনে করুন না কেন, তাঁদের মত প্রভাবশালী নেতা সরকার পক্ষেও আছে। যদি এটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং নাগা-ল্যান্ড সরকারের চরিত্র বদলে জনসাধারণের মন জয়ের জন্যে একটা সক্রিয় অভিযান আরম্ভ হয়, তাহলে নাগা রাজনীতিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে, কেননা বিদ্রোহী নেতৃত্ব নিজেই আজ বহুধা বিভক্ত।

যে দিক দিয়েই দেখা যাক, শ্রীশিলু আও'র পতন নাগা রাজনীতির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পরিকল্পনার আয়তন

১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে দুর্গাপুর কংগ্রেসে সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীকামরাজ বলেছিলেন, "আমাদের চারিদিককার দারিদ্র্য, দুঃখ, জীবিকাহীনতা ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য আমরা অধৈর্য হয়ে উঠেছি, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যাতে আমরা নিজেদের একটি আধুনিক সমাজে পরিণত করতে পারি তার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছি। সেই কারণে আমরা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু সেই সঙ্গে, আমাদের বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং এই বিচক্ষণতার দ্বারা চালিত হয়েই যেন আমরা বিবেচনা করি, যেসব সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আমরা অনুমান করছি বাস্তবিক সেগুলি পাওয়া যাবে কিনা। বৃহৎ আকারে অর্থ লগ্নী করলে মুদ্রাস্ফীতির যে-চাপ পড়বে তার প্রবল প্রতিক্রিয়া সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র অংশের উপর পড়বে।"

শ্রীকামরাজের এই বক্তৃতার সঙ্গে তুলনীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একটি সাম্প্রতিক বেতার ভাষণ। গত ৭ই আগস্ট তারিখে এই বেতার ভাষণে তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের স্থায়িত্ব বিপন্ন হচ্ছে দারিদ্র্যের দ্বারা এবং উন্নয়নেই এই দারিদ্র্যের প্রতিকার। সুশৃঙ্খল ও দ্রুত বিকাশের জন্যই অন্যান্যদের মত আমরাও পরিকল্পনা চালু করেছি।" তিনি বলেছেন, "আর্থিক স্থিরতার মধ্যে উন্নয়ন। মুদ্রাস্ফীতির ফলে আমাদের অর্থনীতি যাতে বিকল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর মতে, ক্ষুদ্র পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে দরিদ্র ও দুর্বল মানুষদের উপর দারিদ্র্য চাপিয়ে রাখা।

কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর এই দুই বক্তৃতার মধ্যে একই সঙ্গে পরি-কল্পনার আয়তন সম্পর্কে মতভেদের আসল বিষয়টি এবং এই সম্পর্কে নেতাদের সামনে যে উভয়সংকট দেখা দিয়েছে তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রীকামরাজ ও শ্রীমতী গান্ধী উভয়েই একমত যে, (১) ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের শত শত বৎসরের সঞ্চিত দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সমস্যার যথাসম্ভব দ্রুত নিরসন করতে হবে; এবং (২) তা করতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপ আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে।

দুজনের সামনেই উভয়সংকটটা হল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশী দূর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের দুর্বল
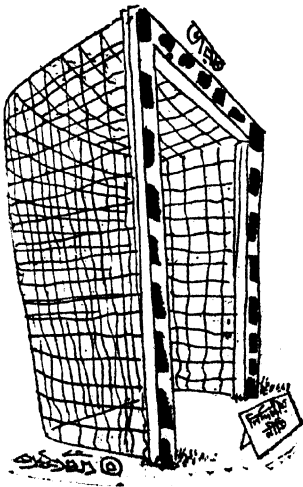
অর্থনৈতিক টাল সামলাতে পারবে না; আবার, অন্যদিকে ভারতবর্ষের কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষকে শুধু দুটি ভাত-কাপড়ের জন্যই আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে বলা রাজনৈতিক দিক থেকে বিপজ্জনক।

১৯৬৬ সালের ১৫ই আগস্ট, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় দুই দশক পরে, সংকট এইভাবে একই সঙ্গে দুই দিক থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এই সংকটের সামনে কর্তব্য কি? কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেস সরকারের নেতা দুটি ভিন্ন পথ বাতলাচ্ছেন। শ্রীকামরাজ দেখাচ্ছেন সতর্কতার পথ, শ্রীমতী গান্ধী দেখাচ্ছেন সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নিয়ে চলার পথ। শ্রীকামরাজ অনিশ্চিত আগামীকালের জন্য আজকের দিনটিকে বিসর্জন দিতে চান না; শ্রীমতী গান্ধী আজকের স্থায়িত্বের স্বার্থে আগামীকালকে বিসর্জন দিতে চান না। একজন সতর্ক, অন্য জন সাহসী; অথবা, অন্যভাবে বললে, একজন আত্মবিশ্বাসহীন, অন্য জন বেপরোয়া।

বিতর্কটা অবশাই শ্রীকামরাজ বনাম শ্রীমতী গান্ধীর নয়, বৃহৎ পরিকল্পনা বনাম ক্ষুদ্র পরিকল্পনার। এই বিতর্কের এক পক্ষে যেমন কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ আছেন তেমনি কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে আরও অনেকে আছেন; আবার অন্য পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে আছেন কংগ্রেসে ও কংগ্রেসের বাইরে আরও অনেকে।

দুর্গাপুরে কংগ্রেসে যখন শ্রীকামরাজ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখন তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হতে ১৪ মাস সময় বাকী ছিল, চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতের কাজ তখনও চলছিল। তখনও অবশ্য পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যুদ্ধ হয় নি, টাকার বাট্টা হার হ্রাসের সিদ্ধান্ত তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু অর্থনীতির উপর কতকগুলি চাপ তখনও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথমার্ধের ফলাফল সম্পর্কে সমীক্ষার রিপোর্ট তখন প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই রিপোর্টে কতকগুলি দিক থেকে পরিকল্পনার ব্যর্থতা উদ্ঘাটিত হয়েছে। খাদ্যের অভাব ও ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি তখন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ভারতীয় অর্থনীতির এই পরিপ্রেক্ষিতেই তখন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৫০০০ হাজার কোটি টাকা লগ্নী করার প্রস্তাব করেছিলেন এবং আশা করছিলেন যে, এতে চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে গড়ে বার্ষিক সাড়ে ছয় শতাংশ হারে অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে।

কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের কাছে এই অঙ্কটা খুব বেশী মনে হয়েছিল। যেখানে পরিকল্পনার প্রথম ১৫ বৎসরে মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৮৯০০০ কোটি টাকা সেখানে চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরেই পূর্ববর্তী ১৫ বৎসরের মোট লগ্নীর প্রায় ১·৩ গুণ টাকা পরিকল্পনায় নিয়োগ করা যাবে কিনা অথবা গেলেও তাতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশী হবে কিনা, এই সংশয় শ্রীকামরাজের মনে ছিল।

কংগ্রেসের উচ্চতম মঞ্চ থেকে যখন সর্বপ্রথম এই সংশয় প্রকাশ করা হল তারপর দেড় বৎসরেরও বেশী সময় কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির আরও অবনতি ঘটেছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ আরও বেড়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়েছে, পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ ও অনাবৃষ্টির পরিণতিতে শিল্পের উৎপাদন শ্লথ হয়েছে এবং কৃষির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বৃহৎ পরিকল্পনা বনাম ক্ষুদ্র পরিকল্পনার বিতর্ক নূতন গুরুত্ব লাভ করছিল। টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করার পর এটা অখণ্ডনীয় সরকারী নীতিতে পরিণত হয়েছে যে, টাকার নোট ছাপিয়ে সরকারী ব্যয় সংকুলানের পথে আর পা বাড়ান হবে না। "সাধ যেন সাধ্যকে ছাড়িয়ে না যায়"—এটা ডিভ্যালুয়েশনের পরবর্তী অর্থনৈতিক চিন্তায় একটি অপরিবর্তনীয় স্বতঃসিদ্ধের মত গৃহীত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ নূতন করে আরম্ভ করা হয়েছে। পাকিস্থানের সঙ্গে যদি যুদ্ধ না বাধত তাহলে গত এপ্রিল মাস থেকেই চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়ে যেত। কিন্তু গত বৎসর শরৎকালের যুদ্ধ ও তার পরিণামে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ সমগ্র ব্যাপারটাকে পুনর্বিবেচনার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনা এক বৎসরের জন্য পিছিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, নূতন পরিস্থিতি পরিকল্পনাকারদের সাহসের পথ পরিত্যাগ করে সতর্কতার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। বৃহৎ পরিকল্পনার পরিবর্তে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যই ভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছিল।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার ভাষণ বিপরীত চিন্তাটিকে প্রবাহিত করে দিয়েছে। ফলে, গত ১১ই আগস্ট শ্রীমতী গান্ধীর সভাপতিত্বে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বৈঠকের পর পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়াটি যে-আকারে গ্রহণ করেছেন তাতে পরিকল্পনাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র হবে বলে বোধ হচ্ছে না। কমিশন স্থির করেছেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট ২৩,৭৫০ কোটি টাকা লগ্নী করা হবে। এর মধ্যে ১৬০০০ কোটি টাকা সরকারী তরফে লগ্নী করা হবে, আর অনুমান করা হচ্ছে, বে-সরকারী ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে লগ্নী করা হবে ৭,৭৫০ কোটি টাকা। এই অঙ্কটা যদিও নিছক অঙ্কের দিক থেকে ১৯৬৫ সালের অঙ্কের চেয়ে ১২৫০ কোটি টাকা [illegible] তথাপি আসলে মূল্যের দিক [illegible] পার্থক্যটা অনেক বেশী। কেননা, এর [illegible] বৈদেশিক মুদ্রার যে অংশটা আছে [illegible] ডিভ্যালুয়েশনের ফলে মূল্যে [illegible] তুলনায় বেড়ে গেলেও বৈদেশিক মু[illegible] মূল্যে বাড়ে নি। ১৯৬৫ সালে যে[illegible] বার্ষিক সাড়ে ছয় শতাংশ হারে বৈ[illegible] বিকাশের জন্য পরিকল্পনা করা হ[illegible] সে-জায়গায় পরিকল্পনা কমিশনের বর্ত[illegible] খসড়ায় বার্ষিক বিকাশের হার গড়ে [illegible] শতাংশ ধরা হয়েছে।

কিন্তু, তাহলেও এই পরিকল্পনা [illegible] পরিকল্পনার সমর্থকদের সন্তুষ্ট ক[illegible] পারবে কিনা সন্দেহ আছে। অনুমান [illegible] হয়েছে যে, ঐ পরিমাণ অর্থ লগ্নী ক[illegible] গেলে আগামী পাঁচ বৎসরে সরকারী [illegible] বাড়াতে হবে ১৮০০ কোটি টাকা। [illegible] না ছাপিয়ে এই পরিমাণ নূতন স[illegible] সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা সে বি[illegible] সরকারী মহলেই কারও কারও [illegible] সন্দেহ আছে। রপ্তানী বাণিজ্য থেকে ৫১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক [illegible] পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা [illegible] সেটা সরকারের বাণিজ্য বিভাগের [illegible] ৩০০ কোটি টাকা ফাঁপানো।

সুতরাং, অনুমান করা যায় যে, চ[illegible] পরিকল্পনার আয়তন নিয়ে আবার বি[illegible] শোনা যাবে।

এই বিতর্কের অবসান কিভাবে [illegible] সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে এ[illegible] ঠিক যে, পরিণামে এই বিতর্কের মী[illegible] হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা, [illegible] অর্থনৈতিক বিবেচনার দ্বারা নয়। দারি[illegible] অভিশাপই এই যে, সে নিজের [illegible] তলিয়ে যায় বলে সহজে মাথা তুলতে [illegible] না। যে দরিদ্র, তার দারিদ্র্যবিজয়ের সং[illegible] থাকে না বলেই সে দরিদ্র। আবার দারি[illegible] জয় করার সংগতি নেই বলেই সে দ[illegible] এই দুষ্টচক্রের মধ্যেই পড়েছে আজ[illegible] ভারতবর্ষ। এই চক্র থেকে বেরোবার এ[illegible] মাত্র রাস্তা আছে। সেটা হচ্ছে, আগ[illegible] কালের সচ্ছলতার জন্য আজকের কষ্ট স্বীকার করার রাস্তা। আজ[illegible] দিনের সঞ্চয় আগামীকালের মু[illegible] ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন এটা সত্য, যে[illegible] জাতির ক্ষেত্রেও। পৃথিবীর সব [illegible] জাতিই অল্পবিস্তর এইভাবে অত[illegible] দুঃখক্লেশের ভিত্তির উপর আজকের সমৃদ্ধি গড়ে তুলেছে। আমাদের [illegible] নেতারা দেশের মানুষকে কি প[illegible] ক্লেশ বহন করতে সম্মত করাতে পার[illegible] কি পরিমাণে তাঁরা এই ক্লেশ যাঁরা [illegible] করতে পারেন তাঁদের উপর চা[illegible] পারবেন, আজকের কঠিন বাস্তবের ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নকে তাঁরা কত[illegible] বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারবেন—এ[illegible] প্রশ্নের শেষ মীমাংসা কোন অর্থনৈ[illegible] বিচারের দ্বারা হবে না, হবে নে[illegible] কুশলতার দ্বারা, রাজনীতির গতির [illegible]

(উপন্যাস)

।। চার ।।

ভোরবেলা—না, ভোর কোথা, রাত্রি আছে এখনো—ঘুম থেকে পূর্ণিমা ধড়মড় করে উঠে পড়ল। দোর খুলে বারাণ্ডায় আসে। ভোর কোথা, আকাশে তারা। তবে অন্ধকারটা কিছু ফিকে হয়ে এসেছে—দিনমানের পূর্বাভাস। সব দিন আসে আর চলে যায়, আজকের আসন্ন এক অপরূপ দিনমান। সারা দেহ চঞ্চল, বারান্ডায় থাকতে পারে না—লাফ দিয়ে গলিতে নেমে পড়ে। মোড় অবধি পাক দিয়ে আসে। যেন নতুন দিনকে ডেকে এলো সদর রাস্তা থেকে : এসো গো, তাড়াতাড়ি চলে এসো। আহা, কী ভালো যে লাগছে!

বেলা হয়েছে। চা খাচ্ছেন তারণকৃষ্ণ, চিন্তিত মুখভাব। সন্দেহ নেই, বিকালের পরীক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তিনি। হঠাৎ এক সময় ডাক দিলেন : পুনি, শোন্। তোর ভাল শাড়ি যে ক'খানা আছে, বের করে আন। আমার সামনে নিয়ে আয়। আরে, তুই দৌঁখ রান্নাঘরে ঢুকে আছিস—

বিষম চেঁচামেচি শুরু করলেন : কে বলেছে তোকে রান্নাবান্না করতে?

মা পড়ে আছে, কে রাঁধবে তবে শুনি? কুসমির রান্না মুখে দেওয়া যায় না—কালও তো রেঁধেছি আমি।

কাল রেঁধেছিস বলে আজকে?

পূর্ণিমা হলুদ বাটছিল। হাত ধুয়ে বাইরে চলে এলো। বলে, কামাই করলাম তো আজকে বেশিক্ষণ ধরে ভাল করে খান দুই তরকারি রাঁধব। মা অসুখে পড়ে তোমার দুপুরের খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে বাবা। সকালে আমার সময় থাকে না—কোন রকমে সিদ্ধ করে তাড়াতাড়ি নামানো। তাকে কি রান্না বলে, না সে জিনিস খাওয়া যায়?

তারণ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : রান্নাঘরের কালিঝুলি মেখে পেত্নী হয়ে থাকবি, সেইজন্যে বুঝি কামাই করতে বলেছি? ফের গিয়ে উনুনের ধারে বসেছিস তো উনুনে আমি জল ঢেলে দেবো।

খাওয়া দাওয়া হবে না তাহলে—উপোস?

তারণ খিঁচিয়ে উঠলেন : নিত্যিদিন রাজভোগ হবে, তার কোন মানে আছে? হোক না এদিক-ওদিক একটা দিন। কুসমি যা পারে করুক গে—আগুনের কাছে যাবিনে তুই, মানা করে দিচ্ছি।

অর্থাৎ স্বাস্থ্য তার মজবুত করবেনই বাবা। ইস্কুল কামাই করালেন, রান্নাঘরে গিয়ে আগুনের আঁচ লাগাতেও মানা। দায়ে পড়ে ঝি কুসমির আজ রাঁধুনির কাজে পদোন্নতি হয়ে গেল। পারলে মহামূল্য মণি-মাণিক্যের মতো ভেলভেটের বাক্সে রেখে বাবা নিশ্চিন্ত হতেন। ব্যাপার তাই বটে।

বলছেন, সাবানে হাত ধুয়ে ভাল শাড়ি যে ক'টা আছে বের করে নিয়ে আয়। এই নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা কর, একলা আমি আর পেরে উঠছি নে।

সতর্কতা এতখানি—রান্নাঘরে পা ছোঁয়ানো নিষিদ্ধ, মেয়ের রঙে দাগ ধরে যায় পাছে। সাজগোজ করা ছাড়া আজ অন্য কাজ নেই। পছন্দ না করিয়ে ছাড়বেন না ও'রা কিছুতে। সেজেগুজে পরীর মতন ঘুরবে সে, দূরে কাছে অনেক দৃষ্টি তার পানে অপাঙ্গে তাকাবে। একঘেয়ে কাজকর্মের জীবনে দস্তুরমতো এক রোমান্স।

শাড়ি বেছেগুছে চারখানা মাত্র হল। উল্টেপাল্টে দেখে তারণ খুঁতখুঁত করছেন : কচি-কলাপাতা রং হলেই মানাত ভাল। ম্যাড়ম্যাড় করছে, একদম চোখে ধরে না, পছন্দ করে পয়সা দিয়ে সেই জিনিস কিনিস। দামে সস্তা হলেও বুঝতাম সেই বিবেচনায় কিনেছিস।

তার মধ্যেও দুখানা বাতিল সঙ্গে সঙ্গে। আর দুটো পূর্ণিমার হাতে দিয়ে তারণ বললেন, এই শাড়িটা আগে পরে আয় দিকি। [illegible] কোঁচা দিয়ে পরিষ্কার করে আমার সামনে এসে দাঁড়া।

চুমুট ধরিয়ে তারণ বেশ গদিয়ান হয়ে বসলেন। শাড়ি পরে মেয়ে মিষ্টি ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়ায়। বাপ দেখছেন। বসেছিলেন, তড়াক করে উঠে পিছন দিকটায় একবার ঘুরে দেখে নিলেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি খুঁটিয়ে দেখে সর্ব অঙ্গের বিচার চলছে। মা উত্থানশক্তিরহিত, দিদির সেই কাশীপুর অবধি খবর দিতে অনেক ঝামেলা। একলা হাতে পূর্ণিমা কাপড়-চোপড় পরল, পরীক্ষা দিতে বাপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—লজ্জা করছে, তা হলেও লাগছে কিন্তু ভালই।

হয়েছে—। তারণ রায় দিলেন : আচ্ছা, এই শাড়ি বদলে অন্যটা এবারে পরে আয়—

কোন শাড়িতে বেশি ভাল দেখায়, তুলনামূলক পরীক্ষা। বড় গম্ভীর তারণ-কৃষ্ণ, শক্ত পরীক্ষার ব্যাপারে পরীক্ষকের যেমনটা হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ণিমা দ্বিতীয় শাড়ি পরে এসে দাঁড়াল। সেই নজর মেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত-ভাবে তারণ বললেন, আসছি আমি। এক কাজ কর্ পুনি, ভাল করে সাবান ঘষে চান করে নে। তার মধ্যে আমি এসে যাব।

সাঁ করে বেরুলেন। কে বলবে বয়স হয়েছে। সেই মুহূর্তে আবার ফিরলেন : একটা কথা মনে পড়ে গেল। তোদের কত সব আজকাল বেরিয়েছে—পাথুরে মেয়ে ঝকমকে ফর্সা হয়ে দাঁড়ায়, কুতকুতে চোখ পটলচেরা হয়—আছে তোর সে সব মশলা? ফর্দ করে দে একটা কাগজে।

লজ্জা, লজ্জা! বাপ হয়ে বলেন এই সব। আসলে সে যা নয়, তেমনিভাবে সাজিয়ে অন্যদের ধোঁকা দিতে চান। কষ্টও হয় বুড়ো মানুষটার ধকল দেখে। কন্যাদায় এমনি সাংঘাতিক।

পূর্ণিমা বাপের উপর তাড়া দিয়ে ওঠে : সমস্ত আছে। তোমায় ছুটোছুটি করতে হবে না।

হুঁ, আছে! তেমনি মেয়ে কিনা তুই—অবিশ্বাসে ঘাড় নেড়ে তারণ গজর-গজর করছেন : ভস্মমাখা সন্ন্যাসিনী—তুই কিনতে যাবি শখের জিনিস! ধাপ্পা দিসনে, কতই বা খরচ! বেশি হোক, কম হোক, করতে হবে সে খরচ।

বেরিয়ে গেলেন। সোয়াস্তি নেই আজ তারণের। সোয়াস্তি পূর্ণিমারও কি আছে? নিতান্ত মেয়েছেলে, তার উপরে নিজের বিয়ের ব্যাপার — বাইরে একটা নির্বিকার ভাব দেখাতে হয়। বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ চলে না। মা রোগের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, তিনি খাড়া থাকলে খানিকটা অন্তত রহস্যভেদ হত — কোথাকার সম্বন্ধ, ছেলে কেমন, পড়াশুনো কত দূর, কি কাজ করে। অণিমা মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি এসে পড়ে—সে-ও যদি আসত আজকের দিনে!

কিডব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে তারণকৃষ্ণ এসে পড়লেন। মেয়েকে [illegible] বসে আছিস [illegible] করে?

কাজে যেতে মানা, রান্নাঘরে ঢুকতে মানা। বসে না থেকে কি করব? বল তবে, গলির এমড়ো-ওমড়ো দৌড়ই—

চান করতে বললাম যে সাবান মেখে—

পূর্ণিমা বলে, বড় ব্যস্তবাগীশ তুমি বাবা। বেরুনো তো সেই চারটের পরে—সাত সকালে সাবান ঘষে যেটুকু চেকনাই হবে, সমস্ত বেমালুম মুছে তোমার মেয়ের আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়বে তক্ষুণে।

তারণকৃষ্ণ প্রতিবাদ করে ওঠেন : বলি আসল মূর্তিই বা নিন্দের হল কিসে? জাঁক করে বলি, আমার ছোট মেয়ের মতন চেহারা সমস্ত পাড়া খুঁজে দ্বিতীয় একটা পাবে না। তবে ভালর উপরে ভাল থাকে—কায়দা-কৌশল করে আরও খানিকটা যদি তুলে ধরতে পারি, ছেড়ে দেব কি জন্যে?

কিডব্যাগ খোলা হল। শাড়ি-ব্লাউজ কতকগুলো। তারণ বলেন, পূর্ণ-দা'র বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সুজাতাকে বললাম, বের কর দিকি রং-বেরংয়ের ভাল জিনিষ কতকগুলো। বড়লোক ওরা, অঢেল আছে। তার মধ্যে বেছেগুছে এই কটা নিয়ে এলাম।

রাগে পূর্ণিমা ফেটে পড়ে : তালুকেদার বলে এত জাঁক তোমার, পরের শাড়ি কাপড় চাইতে ইজ্জতে বাধল না? ফেরত দিয়ে এস, ভিক্ষে-করা জিনিষ আমি পরব না।

পূর্ণ-দা পর হবে কেন? আর দায়ে-বেদায়ে পড়শির একটা জিনিষ চেয়ে আনলে তাকে ভিক্ষে-করা বলে না।

এতটুকু হয়ে গিয়ে তারণ মেয়ের কাছে মিনতি করছেন : যা করবার করে ফেলেছি, ঘাট মানছি বাপু, তোর কাছে। কাপড় ফিরিয়ে দিলে ইজ্জৎ তো আর ফেরৎ আসবে না। এনেছি যখন, পরে আয় লক্ষ্মী-মা আমার। আগে দুবার পরেছিলি, দেখে রেখেছি। এক এক করে এগুলোও আয় পরে। আমার পছন্দে চল আজ — আজকের এই দিনটা শুধু! আর কোনদিন তো বলতে যাচ্ছি নে।

বাবা এত করে বলছেন — পরতে হল শাড়িগুলো, উপায় কি না পরে? তিনখানা তিনবার পরে এসে দেখায়। শেষেরটা পছন্দ হল তাঁর : ব্যস-ব্যস, দিব্যি দেখাচ্ছে। এইটা পরে যাবি, পাকা হয়ে রইল। চানে যা এবার। চান করে যা-হোক দুটো খেয়ে পাকা একখানা ঘুম দিবি। ঘুমের পর দেহ বেশ তাজা থাকে। তিনটের সময় উঠবি—সাজ-গোজের পুরো একটি ঘণ্টা চাই। তাড়া-তাড়িতে কাজ ভাল হয় না। বলিস তো পূর্ণর মেয়েকে ডাকব তখন, ডলাই-মলাই করে দেবে। ঐ জিনিষটা ওরা পারে খুব—দেখিসনে সর্বক্ষণ কেমন চকচকে হয়ে বেড়ায়।

বাবা! ডাক শুনে তারণের চমক লাগে : আবার ঐ সুজাতা অবধি যদি যাও—বলে দিচ্ছি বাবা, কোনখানে আমায় নিয়ে যেতে পারবে না। দরজা এঁটে বসে থাকব, দরজা না ভেঙে আমায় পাবে না।

চারটেয় বেরুনোর কথা—তার উপরে তারণকৃষ্ণ একটা মিনিটও দেরি হতে দিলেন না। হাত বড় দরাজ আজকে। স্ট্যাণ্ডে একটা অর্ধেক-খালি বাস এসে দাঁড়াল, তারণকৃষ্ণ উঠতে দেন না : না না, বাসে কেন যেতে যাব? ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—

ভাবখানা, ট্যাক্সি বিনা গড়ের মাঠে কেমন করে যাওয়া যায়! বাসভাড়া দুজনের তিন আনায় হয়ে যেত, সেখানে টাকা-তিনেক। তালুকদারের বনেদী রক্ত হঠাৎ যেন মগজে চড়ে বসেছে।

ট্যাক্সিতে উঠে তারণ মেয়েকে বলল, কাচ তুলে দে। নির্ঝঞ্ঝাটে দিব্যি যাওয়া যাচ্ছে। বাসে ধুলো ধোঁয়া বাঁচানো যায় না, চেহারা কাপড়-চোপড় লাট হয়ে যায়—

পাশাপাশি দুজনে। এক প্রান্তে তারণ একেবারে গুটিয়ে বসলেন : তোকে নিয়েই সমস্ত — ভাল করে বোস দিকি তুই, কষ্ট না হয়।

ঘণ্টা কয়েকের সম্রাজ্ঞী হয়ে গেছে পূর্ণিমা হঠাৎ। কোন রকমে যেন তার তিলেক অসুবিধা না ঘটে। বাবা যা বলেন, নির্বিচারে সে তাই মেনে যাচ্ছে—বিয়ের কনে কিনা! কনে বলতে যা বোঝায়, কোন কিছু মেলে না তার সঙ্গে—বয়স, শিক্ষাদীক্ষা সাংসারিক জ্ঞান ঢের-ঢের বেশি। কিন্তু কনে হয়ে ঐ সমস্ত জাহির করতে নেই। দিব্যি এক মধুরতা অভিভাবকের এমনি আজ্ঞা-বাহনের মধ্যে। দুটো-চারটে দিনের তো ব্যাপার—তারপরেই আবার বুদ্ধিপক্ক ঝুনো এক রমণী।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনাসামনি গাছতলায় বেঞ্চি খান দুই। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তারণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, গাছ-তলা থেকে পূর্ণ মুখুজ্জে এগিয়ে এলেন : এইখানে আসবে তারা। এসে পড়বে এক্ষুনি, জায়গা আমি ভাল করে বাতলে দিয়ে এসেছি।

পূর্ণ মুখুজ্জে ভারি করিতকর্মা। কাজের বাড়ি থেকে আহ্বান এলে খেটে-খুটে দায়দায়িত্ব নিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ তুলে দেন। অণিমার বিয়ের সময় তাই হয়েছিল—বাপ তারণকৃষ্ণ নন, পূর্ণই যেন আসল কন্যাকর্তা। এবারে এই পূর্ণিমার ব্যাপারে আরও যেন বেশি। ঘটক হঠিয়ে ঘটকালির ভারও তিনি নিয়ে নিয়েছেন। কোটরগত চক্ষুদুটোয় পূর্ণিমার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে তিনি অভয় দিলেন : ঠিক আছে। ভাবনা কোরো না ভায়া, পছন্দ আলবৎ করবে। না করে যাবে কোথায়?

বসে আছেন তিনজনে একটা বেঞ্চি নিয়ে। বসেই আছেন। তারণ ব্যস্ত হচ্ছেন : সন্ধ্যে হয়ে আসে, রাস্তার আলোয় দেখানো কি ভাল হবে? পূর্ণিমাও অস্থির মনে মনে। রংচঙে পুতুল হয়ে কতক্ষণ ঠায় বসে থাকা যায়? বাড়ি গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গা ধুয়ে সাফ-সাফাই হতে পারলে বাঁচে।

তারণকৃষ্ণ আচমকা বলে ওঠেন, রবি-ঠাকুরের পদ্য তোকে মুখস্থ করতে বলে-ছিলাম—

রাগ করে পূর্ণিমা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

পূর্ণ মুখুজ্জে লক্ষ্য করেছেন। অবহেলার সুরে বলেন, দু-চারটে ও-বয়সে মুখস্থ থাকেই। নতুন করে কি মুখস্থ করতে যাবে? কতক্ষণই বা থাকবে তারা—পদ্য শুনতে যাচ্ছে! তুমিও যেমন!
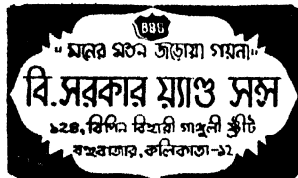
তারণ বলেন, না শোনে ভালই। তবে সব ঘাঁটিতে তৈরি থাকা ভাল, হেলা করা কিছু নয়। ফরমাস করে বসলে তখন বেকুব হতে না হয়।

পূর্ণিমাকে পূর্ণ সাহস দিচ্ছেন : যা-ই জিজ্ঞাসা করুক ঘাবড়ে যেও না মা। মিষ্টি করে ধীরভাবে জবাব দেবে। পছন্দ আমি করাবোই। জনম কাটল ওদের অফিসে। এক দরজার মাঝারি একটা ঘর নিয়ে শুরু, সেই তেতেল বাড়ি এখন পুরোপুরি নিয়ে নিয়েছে। এত করেছি, তার একটা খাতির হবে না?

ছিল পূর্ণিমা একেবারে অন্ধকারের মধ্যে, পরিচয়ে খানিকটা হঠাৎ প্রকাশ পেয়ে গেল। পূর্ণ-জেঠা যাদের চাকরি করতেন, পাত্র সেই ঘরের। দুর্দান্ত বড়লোক তারা—অত উঁচুতে হাত বাড়ানো ঠিক হচ্ছে কি? ঘটাচ্ছেন পূর্ণ-জেঠা — মেয়ে পছন্দ হলে বিনামূল্যে বউ করে নেবে, এমনি ধরনের কথা নিশ্চয় হয়েছে। হয়েও থাকে এমন, গল্প শোনা যায়। বিস্তর আছে তাদের, আরও গুচ্ছের যৌতুক-বরাভরণ নিয়ে হবেটা কি? ঔদার্য দেখাতে অতএব ও-তরফের অসুবিধা নেই। কিন্তু ঐশ্বর্যের নামেই যে গলে গেলাম তেমন পাত্রী আমি নই। শেষ বিচারটা আমার। বাবাকে গুছিয়ে বলব, পূর্ণ-জেঠাও শুনতে পাবেন।

ঝকঝকে অতিকায় মোটর এসে থামল। মোটরের আকৃতি দেখে পূর্ণিমার ভয়-ভয় করে। পূর্ণ মুখুজ্জে রাস্তার ধারেই ছিলেন, শশব্যস্তে গাড়ির পাশে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

নামল তিনজন—স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবা তিনটি, কাছাকাছি বয়স। সহজ কথাবার্তা। সাদামাঠা হাপসার্ট ও ট্রাউজার—কাজকর্মের পোশাক। ঐ মোটরগাড়িটা ছাড়া ঐশ্বর্যের ঝলকানি কোন দিকে কিছু প্রকাশ নেই।

তারণকে দেখিয়ে পূর্ণ বলেন, সহোদর ভাই নেই আমার, কিন্তু ভায়ার সঙ্গে ঠিক সেই সম্পর্ক। এঁদের জন্য যদি কিছু করতে পারো, সেটা আমাকেই করা হবে।

তিনজনে পাশাপাশি। মিষ্টি-মিষ্টি লাজুক হাসি মুখের উপর। দেবতাদের মধ্যে শোনা যায়, কন্দর্প সবচেয়ে রূপবান। এই বুঝি তিন কন্দর্প এসে দাঁড়িয়েছে—এ-বলে আমায় দেখ, ও-বলে আমায় দেখ। কিন্তু আসল মানুষ কোনজন এই তিনের মধ্যে?

একটি কথা বলে উঠল : অফিস থেকে সোজা চলে এলাম। কিন্তু এত হাঙ্গামা কেন কাকাবাবু—আপনার হুকুমই কি যথেষ্ট নয়? দেখাশুনোর কি দরকার?

ভারী বিনয়ী, ব্যবহার বড় সুন্দর। অত বড় ফার্মের মালিক এবং পূর্ণ জেঠা যতই হোক সেই ফার্মের এক ভূতপূর্ব কর্মচারী ছাড়া কিছু নন। তবু কাকাবাবু বলে কত সম্ভ্রম করে কথা বলছে। বড়লোক হলেই কি খারাপ হয়—স্বভাবের ভালমন্দ টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে না।

একটু আগের বিরূপতা ধুয়েমুছে গিয়ে পূর্ণিমার মন এখন নির্মল। পাত্র কোনটি এই তিনের মধ্যে? তিন নয় দুই—যেজন আগ বাড়িয়ে জেঠার সঙ্গে কথা বলল, তাকে স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বিয়ের বর যত আধুনিক হোক সংকোচ কিছু থাকবেই। কোনটি ঐ দুয়ের মধ্যে, দৃষ্টি ফেলে কিছুমাত্র বোঝা যায় না।

মুখপাত্র সেই ছেলেটি আবার বলে, হুকুম দিন কাকাবাবু, বাড়ি চলে যাই। আপনিও আসুন না। কাজ ছেড়েছেন বলে সম্পর্কও ছেড়ে দেবেন নাকি? মা খুব অসুখ থেকে উঠেছেন—তাঁকে দেখে আসবেন, চলুন।

তারণকৃষ্ণ এবং পূর্ণিমাকে নমস্কার করে তারা গাড়িতে উঠে পড়ল। তারণের দিকে পূর্ণ মুখুজ্জে অলক্ষ্য ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ফলাফল জেনে নিতে যাচ্ছেন। পূর্ণিমার বুক ঢিবঢিব করে, ছাত্রী অবস্থায় পরীক্ষার ফল বেরুনোর মুখে যেমনটা হত।

গাড়ি অদৃশ্য হল। তারণকৃষ্ণ যেন নিজেকেই বলে উঠলেন, লাগালে হয় এখন! পূর্ণিমার বুকের ভিতরের কথাও যেন তাই।

বাড়ি ফেরা যাক। ট্রামেই যাব।

পূর্ণিমা বলে, অফিস-ফেরতা ভিড় যে এখনও—

কথার মাঝেই তারণ খিঁচিয়ে ওঠেন : ভারি যে লাটসাহেবের বেটি! ভিড়ের ভয়ে মানুষজন উঠছে না বুঝি? কাজ চুকে গেল —গায়ের এক পর্দা চামড়া ছিঁড়ে গেলেই বা কী এখন!

তা বটে! যারা দেখবার, দেখেশুনে চলে গেছে। পছন্দেরও আভাস মিলেছে। মেয়ে এখন না থাকলেই বা কী! বাবার ভাবখানা এই। কিন্তু নিজেকে নিয়ে নয়। যুবতী মেয়ে কাছাকাছি পাওয়ার লোভে ভিড় মাত্রই আপনা-আপনি ফাঁক হয়ে যায়। তার উপরে আজ এমন বেশ করে এসেছে। বেশ তাই—বাবাকে আগে দিয়ে পিছন ধরে আমি গিয়ে উঠব।

(ক্রমশঃ)

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

ভদ্রলোক যখন নতুন বাড়িটায় উঠে এলেন তখন এমন ঝুপঝুপ ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে যে পাড়ার লোকেরা দেখতেই পেল না ভদ্রলোকের চেহারাটি। আরো দেখতে পেল না বাড়িটাতে কতজন লোক এল, তাদের আসবাবপত্রই বা কি কি। তাদের রেফ্রিজেরেটর আছে কিনা, থাকলে সেটা বিলিতি না দিশী, রেডিও আছে কিনা—এসব জানতে না পেরে অবিনাশবাবু তো বটেই, পাড়া সমেত প্রায় সবাই কেমন যেন বোকা হয়ে গেল। তারা মনে মনে ভাবল ভদ্রলোকের এরকমভাবে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি বদলানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। বিকেলেই তো বৃষ্টি থেমে গিয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখা গিয়েছিল, বিকেলে বাড়ি বদলালে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত?

অবিনাশবাবু বিকেলের দিকে বেরুলেন নতুন এই প্রতিবেশীর পরিচয় সংগ্রহের আশায়। সকলের সঙ্গে পরিচয় করে রাখায় তিনি অদ্বিতীয়। অবিনাশবাবু বলেন, কি থেকে কি হয় বলা যায় না, পরিচয় করে রাখা ভাল। অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে দু একটা প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলি বড় বড় কাগজে আজও ছাপা হয়নি। কিন্তু প্রবন্ধলেখক হিসেবে পাড়ায় তিনি যথেষ্ট খাতির পান। তিনি নিয়মিত মুদী, মাছওলা ইত্যাদি সর্বলোকের সঙ্গে তাঁর সর্বাধুনিক প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাঁর শেষ প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল মাস ছয়েক আগে, মফস্বলের একটি জলসা উপলক্ষে বাইশজনের লেখা একটা পুস্তিকা বেরিয়েছিল, প্রবন্ধটি তাতেই ছিল। ছমাস আগের প্রবন্ধটিই তাঁর সর্বাধুনিক। তিনি প্রায় সর্বদাই সেটি হাতের কাছে রাখেন এবং পরিচিত, অপরিচিত ইত্যাদিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যখন দ্রব্যমূল্যের প্রসঙ্গ ওঠে তিনি বলে ওঠেন, অবশ্য ব্যাপারটা যে আমি নতুন বলছি তা নয়। এই দেখুন ছ মাস আগেও আমি লিখেছিলাম, বলে একটা প্যারাগ্রাফই পড়ে ফেলেন তা থেকে। অবিনাশবাবু স্থির করলেন পাড়ায় নতুন ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচিত হবেন ও নিজেকে পরিচিত করবেন।

বাড়িটা নতুন। বাইরে একটা নেম-প্লেট লাগানো হচ্ছিল তা থেকে জানা গেল ভদ্রলোকের নাম ডাঃ কোরকসখা মজুমদার। খুশী হলেন তিনি ঐ ডাঃ কথাটি দেখে। তাঁর রোজই আজকাল পা ফোলে, তার একটা ওষুধ নেবেন বলে স্থির করেন। তাহলে আলাপও হবে এবং সেই সুযোগে তিনি যে প্রবন্ধলেখক সেটাও জানিয়ে দেওয়া যাবে।

তিনি দরজার কাছে গিয়ে নেমপ্লেটটা টাঙ্গানো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারবাবু আছেন নাকি?

যে ভদ্রলোক নেম-প্লেট লাগাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, ডাক্তারবাবু? এ বাড়িতে কোনো ডাক্তারবাবু নেই ত!

একথায় অবিনাশবাবু একটু হকচাকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ডাক্তারবাবু কোথায় তাহলে?

ভদ্রলোক বললেন, আপনার যদি ডাক্তার দরকার হয় তাহলে অন্যত্র যেতে পারেন। আমিই হচ্ছি ডাঃ কোরকসখা মজুমদার, তবে আমি রোগ হলে চিকিৎসা করি না।

ও বুঝেছি, আপনি একজন ডক্টরেট। তা জানেন আমিও প্রবন্ধ লিখে থাকি। মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ আপনাকে পড়াব একদিন। সে প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে মূল্যবৃদ্ধিই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম ধাপ। মূল্যবৃদ্ধি
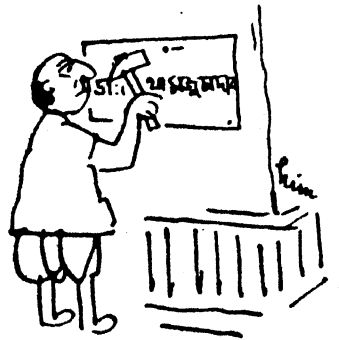
না হলে লোকেরা বেশি আয় করবার কথা ভাবে না। বেশি আয় না করবার কথা ভাবলেই......

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে আপনি ভুল করছেন, আমি ডক্টরেট হবার মত কোনো যোগ্য লোক নই। তাছাড়া আমি ডঃ নই। দেখছেন না লেখা ডাঃ?

এবারে অবিনাশবাবু পরাজয় স্বীকার করেন। বলেন, তবে আপনি কি?

ভদ্রলোক বলেন, আমি হচ্ছি ডাঃ কোরকসখা মজুমদার। আমার ঐ ডাঃ-এর মানে কিন্তু ডাক্তার নয়, ডক্টরেটও নয়। আমার ডাঃ-এর অর্থ হল, ডাকাত।

অবিনাশবাবুর অবিশ্বাস হয়। স্পষ্টতই তিনি দ্বিধায় পড়ে যান। কি বলবেন ভেবে পান না। প্রথমে মনে হল কোরকসখা মজুমদার রসিকতা করছেন।

ভদ্রলোক বলেন, আপনার বিশ্বাস হয় না?

অবিনাশবাবু কোনো জবাব দেন না। জবাব দেবার ক্ষমতাই আর তাঁর নেই।

ভদ্রলোক বললেন, অবিশ্বাস করবার ওতে কিছু নেই। আমি যুবকবয়সে নামকরা ডাকাত ছিলাম মশাই। বছর চারেক ডাকাতি লুঠপাট করবার পর ধরা পড়ি পুলিশের হাতে। ছ বছর জেল হয় আমার। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি আমার দলবল একবারে ভেঙে গেছে। আঠারো জন ছিলাম তার ছজন মারা গেছে, আটজন কেউ খাতা বাঁধাই-এর কাজ করছে, কেউ দেশত্যাগী হয়েছে, আর বাকী চারজনের কোন পাত্তাই নেই। যাই হক, আর ডাকাতি করতে না পেরে মনে খুব দুঃখ হল। কিন্তু কি আর করা যাবে, একা তো আর ডাকাতি করা যায় না তাই আমি বই বাঁধাই-এর একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললাম।

অবিনাশবাবু বললেন, তা আপনি যখন ডাকাতি ছেড়েই দিয়েছেন তখন আর ডাঃ কথাটা লেখাটা কি উচিত?

ভদ্রলোক বললেন, কোনটা উচিত আর কোনটা উচিত নয় কে জানে। আমি তো দেখি যিনি জীবনে দুমাস হয়ত কলেজে পড়িয়েছেন, তিনিও তাঁর নামের আগে সারাজীবন ধরেই অধ্যাপক কথাটা জুড়তে ভোলেন না। এমনকি অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষারা পর্যন্ত তাঁদের নামের আগে অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা লিখতে ভোলেন না। আমি তাই ভেবেছি তাঁরা যদি এটা করতে পারেন তাহলে আমিই বা ডাঃ কথাটা যোগ করব না কেন। আপনি হয়ত মনে করছেন যে, ডঃ কথাটা যোগ করে আমি লোককে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছি, মোটেই তা নয়। আমি যে ডাকাত ছিলাম তা আমি কাউকে গোপন করি না।

অবিনাশবাবু বললেন, তার মানে যিনি স্কুলের হেডমাস্টার তিনি তাঁর নামের আগে হেঃ মাঃ লিখতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন, তা পারেন, এমন কি যিনি হেড মিসট্রেস তিনি লিখতে পারেন হেঃ মিঃ, যিনি ড্রয়িং টিচার তিনি লিখতে পারেন ড্রঃ টিঃ কেন নয়, লিখলেই হল! আচ্ছা মশাই, আপনার নামটা কি বলবেন?

অবিনাশবাবু বললেন, কেন বলব না, আমার নাম প্রঃ লেঃ অবিনাশ সামন্ত।

'রূপকথা'র একটি দৃশ্যে (বাঁদিক থেকে : বিভূতি গাঙ্গুলী (হসন্ত)
সুশান্ত মজুমদার (দন্ত) ও বোকেন চট্টো (হন্ত)
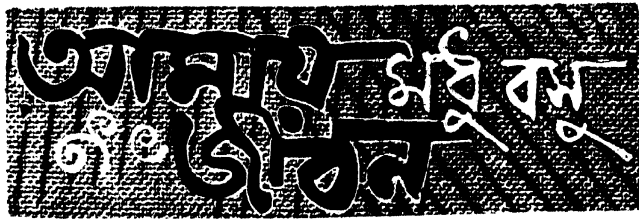
(২৮)

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার পর খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম—একটা নতুন কিছু করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?...এতদিন তো আমরা গুরুগম্ভীর বা সিরিয়াস নাটক করে এলাম—অবশ্য তার মধ্যে নৃত্যগীতের প্রাধান্য তো ছিলই। কিন্তু ক্রমাগত একই ধরনের জিনিস পরিবেশন করলে দর্শকদের কাছে সি এ পি'র নামের আকর্ষণটা কমে আসবে—সুতরাং নতুন কিছু দেবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

'ওমর খৈয়ামে' তিমিরের সুরসৃষ্টির অভাবনীয় সাফল্য দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলাম নৃত্যগীতকে পুরোভাগে রেখে এবং তাকেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিয়ে একটি গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করার কথা। মন্মথর সঙ্গে আলোচনা চলতে লাগল নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে। ঠিক করলাম যে, এবারে গতানুগতিকতার বাইরে যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল রূপকথা থেকে রাজপুত্র, রাজকন্যা, যক্ষ প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প লেখা হোক। তাই হল—নাম দেওয়া হল "রূপকথা"। রূপকথার ওপরই ভিত্তি করে নাটকের আখ্যানবস্তু গড়ে উঠল।

আমাদের ধারণা হল যে, এই ধরনের নাটক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে খুব জনপ্রিয় হবে। কারণ রূপকথার কাহিনী পড়তে তারা যেমন অসম্ভব ভালবাসে—আর যদি তাদের সেই আজব দেশের প্রিয় রাজপুত্র, রাজকন্যা, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, যক্ষরাজ অর্থাৎ দৈত্য, রাক্ষস-খোক্কস প্রভৃতিদের চোখের সামনে দেখে বিচিত্র সাজ-পোশাকে—তাহলে তাদের আরও ভাল লাগবে।

অহীনবাবু তো এযাবৎ বড় বড় গুরুগম্ভীর নাটকেই অভিনয় করে এসেছেন, কিন্তু এই হাল্কা ধরনের চরিত্রে নামতে রাজী হবেন কি! আমি যখন তাঁকে প্রস্তাব করলাম এই 'যক্ষরাজ' চরিত্রটিতে নামবার জন্যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে, চরিত্রটির মধ্যে নূতনত্ব আছে—আর তিনিও অনেকদিন একই ধরনের গুরুগম্ভীর চরিত্রে অভিনয় করে আসছেন—এবার একটু বৈচিত্র্য পেলে খুশী হবেন।

নাটক রচনা শেষ হল। সঙ্গীত ও নৃত্যকে পুরোপুরি প্রাধান্য দেওয়া হল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সুধাংশু চৌধুরী প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে দৃশ্য-সজ্জার পরিকল্পনা করে দিল। যদিও একটিই দৃশ্য এবং তারই মধ্যে যত কিছু নাটকের ঘটনা—কিন্তু সেই 'সেট'টি অপূর্ব হয়েছিল শিল্পসৃষ্টি ও আজব-দেশের পরিকল্পনার দিক থেকে। প্রায় ১৫ দিন ক্রমাগত রিহার্সালের পর "রূপকথা"কে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত করা হল ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৮ ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে। পুরো এক সপ্তাহ ধরে "রূপকথা" দেখান হল।

সংগঠনকারিবৃন্দ : নাট্যকার : মন্মথ রায়, প্রযোজনা ও পরিচালনা : মধু বসু, সুরসৃষ্টি : তিমিরবরণ, নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা : সাধনা বসু, দৃশ্য-পরিকল্পনা : সুধাংশু চৌধুরী, গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য, আলোক-নিয়ন্ত্রণ : গীতা ঘোষ।

ভূমিকা

রাজকন্যা—সাধনা বসু
দৈত্যরাজ—অহীন্দ্র চৌধুরী
রূপা—মধু বসু
রাজপুত্র—প্রীতিকুমার মজুমদার
সোনা—রীণা সেন
মুক্তা—শেফালী দে
হন্ত—বোকেন চট্টো
দন্ত—সুশান্ত মজুমদার
হসন্ত—বিভূতি গাঙ্গুলী
কবন্ধ—কালী ঘোষ

সি এ পি ব্যালে : মঞ্জু দে, শীলা দত্ত, বিনীতা দে, নির্মলা দত্ত।

'রূপকথা'র অভিনয় দেখে ক'একটি নামকরা পত্রিকা এবং একজন নামকরা সমালোচক যা বলেছিলেন তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি—

"সি এ পি সম্প্রদায় গত দশ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় নৃত্যকলার সাধনা এবং রঙ্গমঞ্চে উন্নত রস ও মার্জিত রুচি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের সেই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে...রূপকথার কাহিনীকে মঞ্চে রূপ দিবার চেষ্টা এ পর্যন্ত আমাদের দেশে দেখা যায় নাই; আখ্যানভাগের অভিনবত্বে, অভিনয় ও নৃত্যগীত মাধুর্যে, পরিচালনার গুণে, সঙ্গীতের মনোহারিত্বে, নাটকখানি আমাদের কাছে অপূর্ব বোধ হইল।

অভিশাপগ্রস্ত প্রেমের কাঙাল রুদ্র-রূপী যক্ষের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সাধনা বসু হাস্য, লাস্য ও নৃত্যগীতে সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। মুক্তার ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালী দে'র অভিনয়, নৃত্যগীত

বিশেষভাবে উপভোগ্য...এইরূপ একখানি অভিনব ও সুলিখিত নাটকের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি। গানগুলি রচনার জন্য শ্রীযুক্ত অজয় ভট্টাচার্যও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"

...আনন্দবাজার পত্রিকা (৬-১২-৩৮)

"রূপকথা"র সাফল্যের মূলে আছে উচ্চাঙ্গের প্রযোজনা নৈপুণ্য ও সুঅভিনয়। 'রূপকথা'র অভিনয়সাফল্যের মূলে এ দুটো সম্পদই তুল্যভাবে বর্তমান। তাই বাঙলার রসপিপাসু দর্শক ও সমালোচক আজ 'রূপকথা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই তাঁহারা ধন্যবাদ দিয়াছেন শ্রীযুক্ত মধু বসুকে...'রূপকথা'র সাফল্যের আর যাহারা অংশীদার তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরসুন্দর শ্রীযুক্ত তিমিরবরণের ঐকতান বাদনের মায়াজাল ও শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরীর নাট্যোপযোগী দৃশ্যপট পরিকল্পনা।"

...যুগান্তর (৭-১২-৩৮)

"An entirely new technique in the history of the Bengali stage has been achieved, with remarkable success by the well-famed C.A.P. in their new production "RUP-KATHA" . . . . Sj. Monmotho Roy , the noted playwright, has given it an exquisite dramatic shape, affording ample scope for music and dancing. ... Sm. Sadhona Bose's versatile dramatic leanings were thrown in bold relief against the background of phantasy. Her conceptional vision of the Princess was flawlessly brought out in her rendering........A nonetheless significant histrionic triumph was scored by Ahindra Chowdhury in the interpretation of what may be termed the strangest role of his career, as the cursed 'Yaksha' ..... Shefali De as "Mukta" proved a delectable find.......A brilliant feature of the production was the lavish and phantastically beautiful set designing by Sj. Sudhansu Choudhury ......Timir Baran's glorious musical accompaniment had much to do with the unstinted success of the show.....Modhu Bose can rightly compliment himself on his excellent production which is sure to add to the brilliant string of C.A.P.'s dramatic achievements".

— N. K. G. (Amrita Bazar Patrika) 6.12.38.

....."The show is rich in entertainment, pleasant music, spectacular dances, beautiful dialogues, superior acting and absorbing story combine to make 'Rupakatha' a complete success ....We congratulate Mr. Modhu Bose for this brilliant production".

— "ADVANCE" 7.12.1938.

সমস্ত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির নাট্য-সমালোচকরা 'রূপকথা'র তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং দর্শকদের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল এবং নূতনত্বের প্রয়াসী তাঁরাও বিদেশী ধারায় উপস্থাপিত এই রূপকথাকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা যা আশা করেছিলাম তা হল না। সাধারণ দর্শক ঠিকমত গ্রহণ করল না 'রূপকথা'কে। আমার মনে হয় তার একমাত্র কারণ হল যে আমাদের দর্শক-সমাজ গুরুগম্ভীর নাটকই বেশী পছন্দ করে — এ ধরনের হাল্কা fairy tale — এর তারা পক্ষপাতী নয়। "রূপকথা"য় তো নাটকীয় সংঘাতময় সিচুয়েশান বা করুণ রসের মাত্রাধিক্যে চোখের জলের প্রস্রবণ—এ সব কিছুই ছিল না—এতে ছিল শুধু নাচ, গান, হাসি, হুল্লোড়।

যদিও ফার্স্ট এম্পায়ারে 'রূপকথা' এক সপ্তাহ চলেছিল তবুও অর্থাগমের দিক অর্থাৎ যাকে বলে বক্স-অফিস—সেদিকটা মোটেই সন্তোষজনক হল না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রোডাকশানের আসল খরচটাই ওঠান গেল না। অবশ্য, সি এ পি'র অন্যান্য নাট্য-অবদানগুলির তুলনায় "রূপকথা"র খরচ একটু বেশীই হয়েছিল, বিশেষ করে 'সেটিংস', পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পাব্লিসিটিতে বহু টাকা খরচ হয়েছিল। একটি তিন-রঙা পোস্টার ছাপান হয়েছিল যাতে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্র উড়ে চলেছে আকাশপথে—তাতে বহু অর্থব্যয় হয়েছিল।

যাই হোক, প্রযোজক ও পরিচালক হিসাবে আমার একটা বিশেষ সান্ত্বনা এবং আনন্দ ছিল,—যদিও আমাকে এই নাট্য-প্রচেষ্টায় আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল তবুও সি এ পি'ই প্রথম কলকাতার দর্শকদের মঞ্চে রূপকথা—যাকে বলে Fairy tale উপহার দিয়েছিল, যে জন্যে সমস্ত নাট্য-সমালোচকরা এবং প্রগতিশীল দর্শকরা এই অভিনব প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সমস্ত প্রচেষ্টাকেই লাভ এবং ক্ষতির নিক্তিতে ওজন করলে চলে না—কিন্তু কোন নূতন শিল্পসৃষ্টিতে স্রষ্টা যদি আনন্দ পায় এবং সেই সঙ্গে শিল্প-রসিকদের জয়মাল্য তার লাভ হয়—এর থেকে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে?

ইতিমধ্যে রাজভবন থেকে একটি অনুরোধ এল—

King Emperor's Anti-Tuberculosis Fund for India (Bengal)

জন্য একটি চ্যারিটি শো করবার। তদানীন্তন বাংলার রাজ্যপালের মিলিটারী সেক্রেটারী এই সঙ্গে জানালেন যে, লর্ড এবং লেডী ব্র্যাবোর্নের ইচ্ছে "রূপকথা" দেখার—কারণ তাঁরা 'রূপকথা' সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন এবং কাগজেও পড়েছেন। তাঁদের অনুরোধ অনুসারে ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ সালে নিউ এম্পায়ারে "রূপকথা" মঞ্চস্থ করলাম। লর্ড ও লেডী ব্র্যাবোর্ন বিশেষ অতিথিরূপে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে টিকিটের মূল্য বিশেষ বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও হাউসে একটি সীটও খালি ছিল না।

* * *

এর পর মিঃ হেমাদ প্রস্তাব করলেন যে, লাহোরে এবং দিল্লীতে সাধনা বসু ও তার ব্যালের নৃত্য-প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করবার জন্যে।

ক্রমাগত 'শো' আর ঘোরাঘুরিতে আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মিঃ হেমাদকে আমি বললাম, জানুয়ারী মাসটা আমরা আর কোন 'শো' করব না—সুতরাং ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে লাহোরে এবং তারপর দিল্লীতে 'শো'র বন্দোবস্ত করতে।

ছায়া সিনেমার কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আগের থেকেই কন্ট্রাক্ট হয়েছিল যে, ২৯শে এবং ৩০শে ডিসেম্বর 'রাজনটী' এবং ১লা জানুয়ারী ১৯৩৯ 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ করব।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ছায়া সিনেমায় ২৯শে ডিসেম্বর থেকে 'শো' আরম্ভ হল। সাফল্যের বিষয় আর নতুন করে কিছু বলবার নেই—বিশেষ করে ১লা জানুয়ারী যেদিন 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ হল; অতিরিক্ত সীটের বন্দোবস্ত করেও অনেক লোক ফিরে গেল টিকিট না পেয়ে—সুতরাং আর একদিন 'শো' বাড়াতে হল।

এম্পায়ার থিয়েটারে 'রূপকথা'র দরুণ যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, সেটা পূরণ হয়েও ছায়ার শো' থেকে বেশ কিছু লাভ হয়েছিল।

এর পর কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম। ক্রমাগত 'শো' এবং ঘোরাঘুরিতে মার কাছেও বেশী যেতে পারি নি বলে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছিল। এখন আবার নিয়মিত যাওয়া শুরু করলাম।

* * *

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স তখন গৌরবের শীর্ষদেশে—কিছুদিন ধরে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ (ন্যাশনাল থিয়েটার) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

যখন আমার এই পরিকল্পনার কথা সি এ পি'র সভ্যরা এবং আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা জানতে পারল—তখন সকলেই আমায় উৎসাহ দিয়ে বলল : এখন সি এ পি'র যেমন সুনাম হয়েছে এই সময় তুমি যদি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর মধু, নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে।

এখন কোন 'শো' করবার তাড়া ছিল না—সুতরাং ভেবে-চিন্তে আমি একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা তৈরী করলাম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ ছাড়াও আমার পরিকল্পনায় ছিল প্রধান শিল্পীদের জন্য আলাদা সাজঘর, অন্যান্য শিল্পী ও নর্তক-নর্তকীদের জন্যও আলাদা ড্রেসিং রুম থাকবে। এ ছাড়া সাজ-সজ্জার জন্য, সেটিং-এর জন্য, স্টেজ-প্রপার্টির জন্য, রিহার্সালের জন্য, এবং মঞ্চ-সংক্রান্ত আরও যতগুলি বিভাগের দরকার—সমস্তর জন্য আলাদা আলাদা ঘর।

ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চের তিনটি প্রধান বিভাগ থাকবে : (ক) নাটক : এর সর্বময়কর্তা হিসেবে থাকবেন অহীনবাবু, (খ) নৃত্য : এর ভার থাকবে সাধনার ওপর এবং (গ) সঙ্গীতের ভার

থাকবে তিমিরবরণের ওপর। এই তিনটি বিভাগেই সি এ পি'র নাটকগুলি রিহার্সাল ছাড়াও নতুন শিল্পীদের এই তিন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করা হবে।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চে সি এ পি একটার পর একটা 'শো' মঞ্চস্থ করবে—এছাড়া সি এ পি'র শিল্পীদের নিয়ে ফিল্মও করা হবে, যেমন 'আলিবাবা' হয়েছিল।

এই পরিকল্পনার ভেতর একটি শিল্প বিভাগ থাকবে। যার ভার নেবে সুধাংশু চৌধুরী—এখানে দৃশ্যপট নির্মাণ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি তৈরী হবে। এর সঙ্গে থাকবে আলোক বিভাগ—এটির ভার নেবে গীতা ঘোষ।

এ ছাড়া থাকবে একটি আধুনিক ক্যান্টিন—একটি আধুনিক লাইব্রেরী, যাতে মঞ্চ এবং ফিল্ম সম্বন্ধীয় দেশী এবং বিদেশী মূল্যবান পুস্তক এবং এই সম্বন্ধে যেগুলি 'ক্লাসিক'—সেই সব পুস্তকের বিরাট সংগ্রহ থাকবে। খেলাধূলা এবং অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকবে।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিষয়টি আমি সংক্ষেপে বললাম—কিন্তু আসলে পরিকল্পনাটি হয়েছিল খুব বিস্তারিতভাবেই এবং পরে যেটা ছাপানোও হয়েছিল। সেই মুদ্রিত কপি আজও আমার কাছে আছে।

এর দীর্ঘ দিন পরে একদিন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে কি একটা ব্যাপারে দেখা করতে গেছি। সেটা বোধহয় ১৯৪৯-৫০ সাল হবে। আমি তখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে থাকি, তখন ডাঃ রায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত। এর মধ্যে সি এ পি ভেঙে গেছে, বহু ঘটনা-বিপর্যয় ঘটেছে এবং আমার জীবনেও বহু পরিবর্তন এসেছে, যাদের বিষয় পরে জানাব। ডাঃ রায়ের সঙ্গে কলকাতায় একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা হচ্ছিল, তখন আমি তাঁকে আমার এই পরিকল্পনাটির বিষয় জানিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, একটি মুদ্রিত কপিও তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সমস্ত দেখে-শুনে বললেন : তোমার পরিকল্পনা তো দেখছি ভালই, কিন্তু তোমার সি এ পি তো ভেঙে গেছে, আর এভাবে তো আমি করতে পারি না। তোমার স্কীম হল সমস্ত সি এ পি সম্প্রদায়কে নিয়ে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলা, কিন্তু আমাকে করতে গেলে তো সরকারীভাবে করতে হবে —on Governmental level.

কথাটা ঠিকই। সরকারীভাবে করতে গেলে তো একটা সম্প্রদায়কে সমস্ত পরিচালনা-ভার দিলে চলবে না, এর পরিচালক-গোষ্ঠীর মধ্যে বাইরের লোকও আনতে হবে। অতএব আমার জাতীয় রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পনার ওইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। এ নিয়ে আর কোন চেষ্টা করি নি।

মঞ্চকে আমি ভালবেসে এসেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। আজ এই চল্লিশ বছর চিত্র-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে এবং বহু ছবি পরিচালনা করা সত্ত্বেও মঞ্চ এবং তার পাদ-প্রদীপের আলোর জলে মনটা আকুলি-বিকুলি করে। মঞ্চে যে আমি শুধু

'রূপকথা'র একটি দৃশ্যে সাধনা বসু (রাজকন্যা) ও অহীন্দ্র চৌধুরী (দৈত্যরাজ)

নাটক প্রয়োজনাই করেছি তাই নয়। দশ বছর ধরে সি এ পি'র সব নাটকেই সেই ১৯২৮ সালে 'আলিবাবা' থেকে শুরু করে আর ১৯৩৯ সালে "রূপকথা" পর্যন্ত, প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছি। যে আনন্দ এবং তৃপ্তি পেয়েছি মঞ্চাভিনয়ে তেমনটি আমি কোন ফিল্মে অভিনয় করে পাইনি। অবশ্য আমি চিত্রজগতে মাত্র তিন-চারটির বেশী ছবিতে অভিনয় করি নি। একবার ম্যাডান কোম্পানীতে, তারপর হিমাংশু রায়ের দুখানি ছবিতে আর চতুর্থ হল 'আলিবাবা'। অবশ্য মঞ্চ ও চিত্রে দুইতেই 'আলিবাবা'য় আবদাল্লার ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি—কিন্তু তুলনামূলক বিচারে, চিত্রের অভিনয় আমার অত্যন্ত কৃত্রিম এবং যান্ত্রিক মনে হয়েছে। মঞ্চাভিনয়ের সে স্বতঃস্ফূর্ততা এখানে কোথায়?

দর্শকের সঙ্গে শিল্পীর যে প্রত্যক্ষ সংযোগ তার একটা আলাদা মাদকতা আছে যেটা ছায়াচিত্রে নেই। মঞ্চে শিল্পী সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারে তার শিল্প-সৃষ্টির কি রকম প্রতিক্রিয়া হল দর্শকের মনে। যদি অভিনয়, বা নাচ বা গান দর্শকের ভাল লাগে তবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশংসায় তারা মুখর হয়ে ওঠে এবং সেই প্রশংসা শিল্পীর মনে এক অপূর্ব পুলকের শিহরন জাগিয়ে তোলে। মোট কথা, মঞ্চাভিনয়ে যে মাদকতা, যে উন্মাদনা আছে, চিত্রাভিনয়ে তার কিছুই নেই।

এর বহুদিন পরে ১৯৫৫ সালে যখন আমি এস্টোরিয়া হোটেলে থাকি তখন আমি "পরাধীন" বলে একটি ছবি করি। "পরাধীনে" একটি বিশেষ ধরনের চরিত্র ছিল। আমার মতে সে চরিত্রে অহীনবাবু ছাড়া রূপ দেবার আর কোন শিল্পী ছিল না। অহীনবাবুকে এই ভূমিকাটির কথা বলায় তিনি বললেন যে চিত্রজগত থেকে তিনি একরকম অবসরই নিয়েছেন, তবে এটি একটি বিশেষ ধরনের চরিত্র বলে আমার কথায় রাজী হলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেইটাই বোধহয় তাঁর শেষ চিত্রাভিনয়।

আমি যখন তাঁকে বললাম যে স্টেজে তো তিনি এখনও অভিনয় করছেন তবে চিত্রজগত থেকে বিদায় নেবার এত তাড়া কিসের? এঁর মধ্যে চিত্রপ্রিয়দের তাঁর অবদান থেকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে? তাতে তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন : স্টেজ হল আলাদা জিনিস মিঃ বোস! চিত্রাভিনয়ের মোহ কাটানো সোজা, কিন্তু স্টেজের মোহ কাটান খুব শক্ত। এটা একটা নেশার মত। তবে আমার শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে

রূপকথার একটি দৃশ্যে রীণা সেন (সোনা) ও শেফালি দে (মুক্তা)

—জানি না, আর কতদিন স্টেজেও অভিনয় করতে পারব! তবে যতদিন পারব ততদিন স্টেজের মায়া কাটাতে পারব না। কারণ আমার ধারণা, যেদিন আমি স্টেজ থেকেও অবসর নেব সেদিন আমার আর বেঁচে থাকার কোন মানে হবে না।

সত্যিই মঞ্চ যেন একটা নেশার মত! দশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সি, এ পিকে দাঁড় করিয়েছিলাম। টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই পাইনি—কিন্তু যে আনন্দ, যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম—এতগুলো ছবি পরিচালনা করেও তার তুলনায় কিছুই পাইনি।

* * *

১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে যখন এই জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছিলাম তখন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার জন্যে সমস্ত পরিকল্পনাটাই তখনকার মত আমায় পরিত্যাগ করতে হলো।

এই সময় একদিন এক ভদ্রলোক আমায় ফোন করলেন। এঁর সঙ্গে আগে আমার কোনো পরিচয় ছিল না বা এঁর নামও আগে কোনদিন শুনিনি। ভদ্রলোকের নাম হল সুরেন্দ্র দেশাই—ইনি আসছেন বোম্বায়ের সাগর মুভিটোন থেকে—আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তিনি এলেন আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাটে। এসে প্রস্তাব করলেন যে আমি ও সাধনা তাঁদের হয়ে বোম্বায়ে একখানি দোভাষী ছবি (হিন্দী ও বাংলা) করতে রাজী আছি কি না। এর আগে আমরা যখন সি. এ. পি. দল নিয়ে বোম্বায়ে স্টেজ-শো করছিলাম তখন রঞ্জিত মুভি-টোনের স্বত্বাধিকারী শ্রীচন্ডুলাল শাহ আমাকে প্রস্তাব করেছিলেন ওখানে একখানি হিন্দি ছবি করতে রাজী আছি কিনা। তখন হিন্দি ছবি করতে রাজী হইনি। এখন শ্রীদেশাই প্রস্তাব করলেন হিন্দি ও বাংলা দোভাষী ছবির জন্য—বাংলা ছবির কথা শুনেই আমরা রাজী হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। একটা মোটামুটি সাধারণ চুক্তিও হয়ে গেল—যেটা অবশ্য কার্যকরী হবে গল্প মনোনয়নের পর। এ খবরটা এখন আমরা কাউকে জানালাম না। সুরেন্দ্রকে বললাম যে আর ক'দিন পরেই আমরা উত্তর-ভারত সফরে বেরুচ্ছি—ফিরে এসেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি নাগাৎ আমি গল্প ঠিক করে নিয়ে বোম্বায়ে যাব তাদের শোনাতে।

সুতরাং জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা তখনকার মত ধামা-চাপা পড়ে গেল। কায়া থেকে আবার ছায়াতেই ফিরে এলাম। রুপালী পর্দার মোহ ও আকর্ষণ মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোককে ছাপিয়ে উঠল সাময়িকভাবে। কিন্তু যখন এ পরিকল্পনা কার্যকরী হোতে পারত সে সুযোগ আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আসা সত্ত্বেও আমি সেটা হেলায় হারিয়েছিলাম। সেই কথাটাই বলব আপনাদের এখন—

১৯৩৭ সাল—ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। তখন আমরা "রাজনটী"র রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত। আসন্ন বড়দিনের সময় মঞ্চস্থ হবে ফার্স্ট এম্পায়ারে।

এমন সময় ললিতা একদিন আমায় বলল যে তার বাবা মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব একটা বিশেষ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমায় দেখা করতে বলেছেন।

আমি গেলাম "বিজয় মঞ্জীলে"। অনেকদিন কাজকর্মের চাপে যেতে পারিনি—সুতরাং আমাকে দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। কলকাতার নাট্যরসিকদের কাছে, সি. এ. পি যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার জন্য মহারাজা খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে তদানীন্তন ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো তখন কলকাতায় এসেছেন এবং মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ লর্ড লিনলিথগোকে সি. এ. পি'র শো'র বিষয় বিশেষভাবে বলেছেন। এতে ভাইসরয় বেলভেডিয়ার লাটভবনে আমাদের একটি নাটকের অভিনয় দেখতে চান।

এর আগে আপনাদের জানিয়েছি যে মহারাজার মঞ্চপ্রীতি ছিল অসাধারণ এবং তিনি ছিলেন আমার ও সাধনার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল যে আমাদের নিজস্ব একটি স্টেজ হয়—সারা বছর ধরে যাতে আমরা অভিনয় করে যেতে পারি। ভাইসরয় যদি আমাদের শো দেখে খুশী হন, তাহলে আমাদের নিজস্ব থিয়েটার করার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—সে অর্থ সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধে হবে না। মহারাজা আরও বললেন যে তিনি খুব শিগ্‌গীরই ভাইসরয়কে একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছেন—সে পার্টিতে তিনি আমাকে ও সাধনাকে নিমন্ত্রণ করবেন। সেইখানেই বড়লাট সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। তখনকার দিনে ভাইসরয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাকে লোকে একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার বলে মনে করত—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি ও সাধনা এইসব কেতাদুরস্ত পার্টিতে যাওয়া পছন্দ করতাম না—সেজন্য যেতামও না বিশেষ।

যিনি আমাদের এত ভালবাসেন, দের জন্যে এতখানি করতে চলেছেন, মুখের ওপর 'না' বলতে পারলাম না। থেকে না হলেও মুখে অন্ততঃ তাঁর রাজী হতে হল।

দুর্ভাগ্যক্রমে ডিনারের দু-এক দিন আগে সাধনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারল না। বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হল। ডিনারের পর মহারাজা- ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় দিলেন। চমৎকার মানুষ ছিলেন লিনলিথগো। আমি বড়লাটসাহেবের কথাবার্তা বলায় এবং তাঁদের সব কায়দার সঙ্গে সম্যক পরিচিত না মাঝে মাঝে 'Your Excellency' 'you' বলে ফেলেছিলাম। তাতে লর্ড লিনলিথগো কিছু মনে নি, কিন্তু তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী অন্যান্য সকলে খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে আমার মুখের দিকে অস্বস্তিসহকারে চ্ছিলেন।

যাই হোক প্রায় ১৫ মিনিট লর্ড লিথগো আমার সঙ্গে আলাপ করে- বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। লাপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীকে বলে দিলেন অবিলম্বে আমার যোগাযোগ করতে এবং বেলভেডিয়ারে ব্যাপারে সমস্ত বিষয়টা পাকাপাকি র ফেলতে।

তারপর দিন সকালে ভাইসরয়ের সেক্রেটারী কর্নেল ম্যাক্সওয়েল আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দেখা এলেন। এসে তিনি বললেন যে যদি একবার Viceregal Lodge গিয়ে যেখানে অভিনয় হবে সেখানটা আসি তাহলে বড় ভাল হয়। আমাদের দরকার না দরকার তার একটা বিস্তারিত জানাতে পারলে ভাল হয়।

আমি গেলাম বেলভেডিয়ারে ভাইস- লজে। গিয়ে দেখি এর মধ্যে সমস্ত কল্পনা পাকা হয়ে গেছে। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন কোথায় অভিনয় হবে। আমার নির্দেশ অনুসারে হল কোথায় বিশেষ অতিথিদের বসানো হবে। সাধনার জন্যে আলাদা ড্রেসিং এবং অন্যান্য শিল্পীরা কোথায় মেক- আপ করবে তার জায়গা। তিনি আমায় হলেও নিয়ে গেলেন যেখানে বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা শো'র আগে ডিনারে বসবেন। আমি এবং সাধনা কোথায় বসব তিনি আমাকে প্ল্যানে দেখিয়ে দিলেন সমস্ত জিনিসটাই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত।

সত্যি কথা বলতে কি, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের কাছ থেকে অনুরোধ এলেও ভাইসরিগ্যাল লজে আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে গিয়ে 'শো' করার ব্যাপারটায় আমার মন বিশেষ সায় দিচ্ছিল না। আমি বেশ ইতস্তত করছিলাম অথচ তাঁর মুখের ওপর 'না'ও বলতে পারছি না। ... গেলাম;

'অভিনয়ে'র একটি দৃশ্যে সাধনা বসু (মনীষা) এবং ধীরাজ ভট্টাচার্য (হীরক চৌধুরী)

সমস্ত ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটতে লাগল যে আমি কি করব স্থির করতে পারছিলাম না। আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে যতই চিন্তা করতে লাগলাম, ততই আমার মাথায় এই ধারণাটা বদ্ধমূল হতে লাগল যে কারুর বাড়ীতে দলবল নিয়ে গিয়ে 'শো' করাটায় নিশ্চয়ই সি, এ, পি'র সুনাম বৃদ্ধি করবে না—তা তিনি বড়লাটসাহেবই হোন আর যিনিই হোন। এদিকে আমাকে অবিলম্বে জানাতে হবে। শো'র দিন পর্যন্ত স্থির করা হয়ে গেছে।

আমি তখন সি, এ, পি'র প্রধান সভ্যদের এবং আমাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের নিয়ে এক আলোচনা বৈঠক ডাকলাম। সেই বৈঠকে ছিল—সাধনা, অহীনবাবু, মন্মথ, শুধাংশু, গীতা ঘোষ, হেমন্ত, জ্ঞানাঙ্কুর, জর্জি, এলা, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বেলভেডিয়ারে বড়লাটের ভবনে গিয়ে সি, এ, পি'র এই 'শো' করা উচিত কি না! বেশীর ভাগ সভ্যদেরই মত হলো যে এই 'বিশেষ শো' দিতে আপত্তি নেই, তবে সেটা একটা সত্যিকারের থিয়েটারের স্টেজে হোক, বেলভেডিয়ার লাট-ভবনে কেন? দু' একজন একথাও বলে উঠল : এ যেন মনে হবে আমরা যেন একটি যাত্রার দল বা ভ্রাম্যমাণ থিয়েট্রিক্যাল পার্টি। যেমনি কোন বড়লোক তাদের বৈঠকখানায় বা নাটমন্দিরে অভিনয় করতে ডাকল, আর অমনি আমরা ছুটলাম।

এই গেল কয়েকজনের মত, আবার কয়েকজন একথা বললেন যে বেলভেডিয়ার বড়লাট-ভবন তো আর যেখান-সেখান নয়, আর বড়লোকের বৈঠকখানাও নয় সুতরাং এতে অন্যায়টা কি আছে? তা ছাড়া এত বড় একটা সম্মান অন্য কোন নাট্য সম্প্রদায়ের ভাগ্যে ঘটেনি, আর ঘটবে কি না সন্দেহ ইত্যাদি।

যা হোক—শেষে অনেক তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর বেশীর ভাগ সভ্যদের মত হলো যে এই শো'টাকে এখনকার মত যে কোন উপায়ে মুলতুবী রাখতে হবে। অবশ্য সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাটা খুব খারাপ দেখাবে, সুতরাং এমন কোন উপায় বার করতে হবে যাতে সাপও মরে, অথচ লাঠিও না ভাঙে। কিন্তু এই শেষমুহূর্তে কিভাবে শো-টাকে এখন ধামা-চাপা দেওয়া যায়? খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম।

চিন্তা করতে করতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই

ঢাকা সফরে সি. এ. পি. সম্প্রদায় : মধ্যের সারিতে চেয়ারে বসে আছেন : (বাঁ দিক থেকে) বিভূতি গাঙ্গুলী, তিমিরবরণ, মধু বসু, সাধনা বসু এবং অহীন্দ্র চৌধুরী।

একটা উপায়ও বেরিয়ে পড়ল। ফার্স্ট এম্পায়ারে 'রাজনটী' অভিনয়ের জন্য এক সপ্তাহ আমাদের হাউস বুক করা ছিল ১৯৩৭ ডিসেম্বরের শেষ থেকে ১৯৩৮ জানুয়ারীর প্রথম কয়েকদিন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী কঃ ম্যাক্সওয়েল একটা দিন ধার্য করেছিল—এই হল উপায়। জর্জিকে বললাম, কেটে বেরিয়ে আসবার এই হল ফাঁকতাল। এই তারিখের সংঘর্ষকেই ভিত্তি করে আমাদের সানুনয় প্রত্যাখ্যান জানাতে হবে।

জর্জির আনন্দ আর তখন দেখে কে? সে সেইদিন রাত্রেই ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারীকে যে চিঠি লেখা হবে তার খসড়া করে ফেলল। চিঠিতে লেখা হল যে ফার্স্ট এম্পায়ার থিয়েটারের সঙ্গে পূর্বের চুক্তি অনুসারে বর্তমানে বড়লাটভবনে গিয়ে শো করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না, যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করা গেল না। ইতিমধ্যে সব শো'গুলির জন্য বহু অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বেলভেডিয়ার বড়লাটভবনে গিয়ে অভিনয় করতে পারলাম না বলে আন্তরিক দুঃখিত। এজন্য যেন আমাদের মার্জনা করা হয় ইত্যাদি।

এই সঙ্গে আমরা চিঠিতে আরও লিখেছিলাম যে আমরা তো ৭ দিন ফার্স্ট এম্পায়ারে 'শো' করছি এর মধ্যে যে-কোনো একদিন মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আমাদের শো দেখতে এলে আমরা অর্থাৎ সি. এ. পি নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবে।

এই কথা লেখায় অনেকে আমায় বললে : তাদের নিমন্ত্রণ তুমি প্রত্যাখ্যান করলে—এখন উল্টে তাদেরই আবার নিমন্ত্রণ করছ তোমার 'শো' দেখবার জন্যে? দেখো, ব্যাপারটা হয়তো ওঁরা খুব সুনজরে দেখবেন না!

কিন্তু আমার চিঠি পাবার পর বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল ম্যাক্সওয়েল আমায় টেলিফোন করে জানালেন : আপনার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ কিন্তু বড়লাট বাহাদুর এখন প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যার সময় খুব ব্যস্ত থাকবেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। তবে তাঁর ছেলেমেয়েরা একদিন দেখতে যাবেন। আপনি সব থেকে ভাল সীট ১০।১২ খানা রিজার্ভ করে রাখুন আর টাকা দিয়ে আমরা লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি—টিকিট আমরা কিনেই দেখবো।

সত্যিই কর্নেল ম্যাক্সওয়েল লোকটি খুব ভদ্র এবং বিবেচক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পূর্বে চুক্তির জন্যেই আমরা বড়লাটভবনে শো করতে পারিনি।

যাই হোক, একদিন 'রাজনটী' দেখতে লর্ড লিনলিথগো'র ছেলেমেয়েরা, কর্নেল ম্যাক্সওয়েল, ভাইসরয়ের এ. ডি. সি. এবং আরও অনেকেই প্রায় ৮।১০ জন হবে—সকলে এসেছিলেন।

এর কয়েকদিন পরে ললিতবাবু আমাদের ওখানে এসে বলল যে মহারাজাধিরাজ আমাকে একবার ডেকেছেন, বিশেষ কথা আছে। আমি তখনই বুঝতে পারলাম যে তিনি কেন ডেকেছেন। তিনি যে কতটা মর্মাহত হয়েছেন তাও বুঝতে পারলাম। যাই হোক, তিনি যখন ডেকেছেন তখন আমার যাওয়া উচিত মনে করে আমি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই বুঝতে পারলাম যে তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছেন। তিনি অনেক কথাই বললেন আমাকে যার মর্মার্থ হল : তোমার এবং সাধনার যাতে ভাল হয় তাই আমি করতে গিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে এই শো-তে অনেক বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী উপস্থিত থাকবেন আর ভাইসরয়ের অভিনয় ভাল লাগলে, তাঁর মুখের একটা কথায় বহু লোক তোমাকে একটা স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের জন্য যাবতীয় খরচ বহন করতে এগিয়ে আসবেন। এখন তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। চুক্তি যদি সত্যি হয়ে থাকে তা সে যত আগে এবং যেরকম চুক্তিই হয়ে থাকুক না কেন আমরা যে ফার্স্ট এম্পায়ারের কর্তৃপক্ষকে বলে কয়ে একটা দিন আগে-পিছু বা রদবদল করতে পারতাম না—এটা তিনি বিশ্বাসই করলেন না।

তাঁর শেষ কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে : তোমাদের এই সব ভ্রান্ত ধারণা, অর্থহীন আত্মসম্মানজ্ঞানই তোমাদের কাল হবে। নিজেদের স্বার্থ তোমরা নিজেরা বুঝলে না—এতে আমি আর কি করতে পারি বল। আজ যদি সি. এ. পি'র একটা নিজস্ব থিয়েটার হোত তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটি চিরকাল বেঁচে থাকত আর বাংলার মঞ্চ-জগতকে তোমরা অনেক কিছু দিতে পারতে। কিন্তু তা তো তোমরা করবে না। খালি স্টেজ ভাড়া করে বছরে দুটো, তিনটে চারটে শো করবে, এতে কি কখনও কোনো প্রতিষ্ঠান দাঁড়ায়? খুব ভুল করলে মধু, খুব ভুল করলে। একদিন বুঝবে। যাক, যা ভাল বোঝ, কর।

আজও আমার মাঝে মাঝে মনে হয়—সত্যিই কি আমি ভুল করেছিলাম? অবশ্য বর্ধমানের মহারাজা ঠিকই বলেছিলেন—হয়ত সি. এ. পি'র নিজস্ব একটা থিয়েটার হতে পারত। কিন্তু নিজের স্বার্থের উপরে আমি সি. এ. পি'র সম্মানকে স্থান দিয়েছিলাম—তাকে কি মিথ্যা আত্মসম্মানের দম্ভ বল, বাপু?

(ক্রমশঃ)

চিত্র-সমালোচনা

নতুন জীবন (বাংলা): রাধারাণী পিকচার্সের নিবেদন; ৩,৭৯০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী: গজেন্দ্রকুমার মিত্র; প্রযোজনা: কার্তিক বর্মণ; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা: অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত পরিচালনা: রাজেন সরকার; চিত্রগ্রহণ: বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখন: শিশির চট্টোপাধ্যায়; শব্দপুনর্যোজনা: শ্যামসুন্দর ঘোষ; প্রধান সম্পাদনা: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠদান: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণ: সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, সুমিত্রা সান্যাল, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, দীপিকা দাস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার প্রভৃতি। নর্মদা চিত্র পরিবেশনায় গত ১২ আগস্ট থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র এটি প্রদর্শিত হচ্ছে।

চিত্রনাট্যের কাহিনী বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তী বিধৃত হলেও সমাজজীবনের একটা নিটোল জীবন-দর্শনের সোচ্চার বক্তব্য 'সুখ বিত্তে নয়, চিত্তে'—এই সহজ সরল আবেদনে চিহ্নিত। সুতরাং এ ছবি সাধারণ দর্শকদের খুশি করবে বলে মনে হয়। এবং পরিচালক শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের এ প্রয়াস সার্থক বলা চলে।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র রচিত এ কাহিনীর পটভূমিকা কলকাতার এক ধনী পরিবারের জীবন—প্রাত্যহিকতায় বর্ণিত। পিতৃস্নেহে দুই পুত্র-কন্যা পালিত। বিত্তশালী এ সংসারে পিতার এক বন্ধু-পুত্র আশ্রিত। সহজ মেলামেশায় বাবার অমতে সং আশ্রিত ছেলেটিকে বিয়ে করে এ বাড়ির মেয়ে ঘরছাড়া হয়। অবশেষে একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েও মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সংসার-পিতা জেনে গেলেন, 'সুখ বিত্তে নয়, চিত্তে'। পিতার মৃত্যুর পর উচ্ছৃংখল পুত্র শেষ পর্যন্ত সম্পত্তি এবং স্ত্রীর সংস্পর্শ ছিন্ন করে গরীব বোনের সংসারে আশ্রয় নিয়ে জানতে পারে টাকায় সুখ-শান্তি সব কিছু কেনা যায় না।

বর্তমান সমাজজীবনের পথ পরিক্রমায় ধনী নির্ধন দুটি পরিবারের দৈনন্দিন জীবন এ চিত্রে পাশাপাশি নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন পরিচালক। জীবনের আরম্ভে আশ্রিত বিজয় ধনীকন্যা অরুণার ভালবাসার মধ্যে ভবিষ্যতের দৈতজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম সুযোগ পেয়ে যেভাবে ধীরে ধীরে একটা সুখের সংসার গড়ে তোলে, তার মধ্যে কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। বরং ঘটনার ঘনঘটায় ঘটন-অঘটনের যে পরিবর্তন তা নাট্যসৃষ্টির তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের আমেজটুকু হৃদয়কে স্পর্শ করে। আনন্দ-বেদনার [illegible] সংলাপে ধ্বনিত।

কাহিনীর আর এক নায়ক নির্মল। অরুণার উচ্ছৃংখল ভাই। অর্থের জোয়ারে অগণিত বন্ধুর সান্নিধ্যে তার অফুরন্ত যৌবন ভেসে চলেছে। পিতার বর্তমানে আর এক ধনী পরিবারের আধুনিকা স্বাধীন মেয়েকে বিয়ে করেও সে সুখী হতে পারে না। ফলে উচ্ছৃংখলতা বেড়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর একে একে সব সম্পত্তি বিকিয়ে দিয়ে নির্মল যখন সর্বস্বান্ত, তখন স্বার্থান্বেষী পত্নীও বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘোষণা জানিয়ে তাকে ত্যাগ করল।

কিন্তু অরুণা-বিজয়? দারিদ্র্যের মধ্যেও নির্মলকে তারা ফেলে দিতে পারেনি। অভাব অনটনের মধ্যে দাদার ভরণ-পোষণের খরচ বিজয় অনুদিন জুগিয়েছে। এমনকি নির্মলের অসুখের সময় নিজের দুগাছা চুড়ি পর্যন্ত অরুণা বিজয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। নির্মলের হার এখানেই। সামান্য বোনের কাছে দুঃসময়ে যে শিক্ষা সে পেল, তা কোনদিনই ভুলে যাবার নয়। তার [illegible] প্রতিবেশী পারুল প্রথম ভালবাসায় বকুল হয়ে ফুটল। বিবাহবন্ধনে নির্মল-পারুলের জীবন হল শুরু। প্রমাণিত হল 'সুখ বিত্তে নয়, চিত্তে'।

সামান্য ঘটনায় বিধৃত এ ছবির সংলাপ কাহিনীর বর্ণনায় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষ করে নির্মলের চরিত্রটি সংলাপ বলার জন্যই যেন সৃষ্টি। অনুত্তর কিছু মুহূর্ত রচনা করার অবকাশ ছিল। কাহিনীর শেষ ভাগে নির্মল-পারুলের প্রেম মুহূর্তগুলি নিয়ম মাফিক ধারায় বর্ণিত। যেন জোর করে মিলিয়ে দেবার একটা চেষ্টা। স্বাভাবিক গতি এখানে কিছুটা বাধা পেয়েছে বললে অন্যায় হবে না।

কাহিনীর সঙ্গে প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় সবেগে স্বতঃস্ফূর্ত। বিশেষ করে নায়িকা সন্ধ্যা রায় (অরুণা) দুইরূপে ধনী এবং গরীব পরিবেশে কুমারী এবং বিবাহিত জীবনের যে চরিত্রে তিনি রূপ দিয়েছেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার হৃদয়স্পর্শী অভিনয় হাসি-কান্নায় দোলা দেয়।

ছাপ্টে-বাজারে চিত্রের সংগীত গ্রহণ ও মহরত অনুষ্ঠানে কণ্ঠ-শিল্পী হেমন্ত মুখার্জি, ডাঃ বাগ্চী, বৈজয়ন্তীমালা ও পরিচালক তপন সিংহ। ফটো : অমৃত

এ কাহিনীর আর এক প্রাণ অনিল চট্টোপাধ্যায় (নির্মল)। তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়ে চরিত্রটি সারা ছবিতে একটা বিশেষ প্রাণাবেগ সৃষ্টি করেছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এক কথায় অপূর্ব। আদর্শবান এক বলিষ্ঠ চরিত্রে অনুপকুমার (বিজয়) স্বপ্রতিভায় উজ্জ্বল। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, সুমিতা সান্যাল, শোভা সেন, দীপিকা দাস, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, খগেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

পরিচালকের প্রয়োগ কুশলতায় আঙ্গিকের সহজ রীতি এ ছবির গল্পকে আরও বেশী প্রাণময় করেছে। আলোকচিত্রগ্রহণে বিজয় ঘোষ কাহিনীর পরিবেশানুযায়ী অন্তর্দৃশ্য এবং বহির্দৃশ্যের যথার্থ মিলন ঘটিয়েছেন। সম্পাদনার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। সঙ্গীত পরিচালনায় রাজেন সরকার পরিচয়লিপি থেকে শুরু করে বিলম্বিত সংগীত পর্যন্ত নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে আবহসঙ্গীতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। তবে শব্দপুনর্যোজনার সময় সঙ্গীত অনেকাংশে সোচ্চারে ধ্বনিত। এ ছবির চারটি গান সুগীত। গানগুলি জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা আছে।

সবশেষে বলা চলে, 'নতুন জীবন' সপরিবারে উপভোগ করার মত একটি সামাজিক চিত্র।

●

বাহারে' ফির ভী আয়েঙ্গী (হিন্দী) : গুরুদত্ত ফিল্মসের নিবেদন: ৪,৩৭৭·৮৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : আবরার আলভী; পরিচালনা : সাহিদ লাতিফ; সঙ্গীত পরিচালনা : ও পি নায়ার; চিত্রগ্রহণ : কে. জি. প্রভাকর; সম্পাদনা : ওয়াই. জি. চবন; শিল্পনির্দেশনা : সোরেন সেন; শব্দানুলেখন : পি. থাকেসে'; নেপথ্য কণ্ঠদান : আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি ও মহেন্দ্র কাপুর; প্রধান কর্মসচিব : আত্মারাম; রূপায়ণ : মালা সিনহা, ধর্মেন্দ্র, তনুজা, রেহমান, দেবেন ভার্মা, মাধবী, অমৃতা রায়, জনি ওয়াকর প্রভৃতি। গত ১২ আগস্ট রক্সি, লোটাস, গ্রেস, গণেশ, প্রিয়া, মিত্রা প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

পরলোকগত গুরুদত্তর ছবি 'বাহারে' ফির ভী আয়েঙ্গী'। এটি নির্মাণের স... তাঁর লোকান্তর ঘটে। আপন শিল্পকৃতি প্রতিভায় গুরুদত্ত ফিল্মসের মধ্যে তি... চিরদিন বেঁচে থাকবেন। সে স্বাক্ষর আ... এ ছবিতে পেয়েছি।

এ কাহিনীর নির্ভীক নায়ক সাংবাদি... জীতেন্দ্র আকবর পত্রিকায় সাংবাদিক... শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনভাবে সং... প্রকাশ করায় তার চাকরীটা চলে যায়। এ... যাবার সময় এই পত্রিকার মহিলা কর্ম-পরি... চালক অমিতাদেবীর কাছে জীতেন্দ্র প্রতি... বাদ জানিয়ে পত্রিকার পূর্ব খ্যাতির ক... স্মরণ করিয়ে দেয়। অমিতাদেবীর প... লোকগত পিতা এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা... ছিলেন। সৎ-সাংবাদিকতায় 'আকবর'... পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য বার্ত... সম্পাদক পদে পুনরায় জীতেন্দ্রকে বহ... করলেন অমিতা।

অমিতা এবং সুমিতা দুই বো... দেখতে দেখতে জীতেন্দ্রর প্রতি এদের ভা... বাসা জন্ম নেয়। অমিতা এবং সুমি... দুজনেই জীতেন্দ্রকে ভালবাসে। কি... ঘটনাচক্রে অমিতার নীরব ভালবাসার প্রেমি... বর্মার কথায় সুমিতা জানল, জীতেন্দ্রকে দিদিও ভালবাসে। এদিকে সুমিতাও যে জীতেন্দ্রকে চায় সে কথা অমিতা বোঝে। তাই প্রেমের আত্মত্যাগে অমিতা তার ছোট-বোনের সঙ্গে জীতেন্দ্রর বিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সুমিতা ভুল বুঝে দিদির আশ্রয় থেকে চলে যায়। অমিতা সেই দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত। পিতার প্রতিকৃতির সামনে উন্মাদপ্রায় অমিতা নিজের ভুলের জন্য বারবার ভেঙে পড়ে। শেষ সময়ে ছুটে আসে জীতেন্দ্র। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অমিতা তার শেষকথা জানিয়ে যায়, সুমিতাকে যেন জীতেন্দ্র গ্রহণ করে।

সত্যেন বসু পরিচালিত মেরে লাল চিত্রে দেবকুমার ও জনৈক শিশুশিল্পী।

কলকাতার পটভূমিকায় এ কাহিনী রচিত বর্ণিত। শহর জীবনের নানান ঘটনার স্থানে সুমিতা-জীতেন্দ্রর প্রেমগাথা গানে গানে মূর্ত হয়। নীরব ভালবাসার আর এক মুখ অমিতার আত্মদানে এ প্রেম কাহিনী আরও গভীরভাবে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। জীবন যেখানে প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত সেখানে ভালবাসা চিরদিন অপরাজিত। মিলনে বিরহে প্রেম যুগে যুগে। তাই কাহিনীর মূল সংগীত হৃদয়ে গভীর নাড়া দেয়।

'বদল যায়ে অগর মালী,
চমন হোতা নহী খালি
বহারে' ফির ভী আতী হৈ,
বহারে' ফির ভী আয়েগী
বদল জায়ে অগর মালী......'।

'বহারে' ফির ভী আয়েগী' চিত্রে গুরু দত্তর পূর্ব গৌরব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। অভিনয়াংশে অমিতার চরিত্রে মালা সিনহার অভিনয় অবিস্মরণীয়। নীরব প্রেমের অভিব্যক্তি ছাড়াও বিশেষকরে কাহিনীর শেষ দৃশ্যে পিতার প্রতিকৃতির সামনে যে ভেঙে পড়া জীবনের প্রকাশ তা কিছুতেই ভোলা যায় না। শ্রীমতী সিনহা যে একজন কৃতী শিল্পী তা এ চিত্রে আবার প্রমাণিত হল। নায়ক চরিত্রে ধর্মেন্দ্রর অভিনয় সপ্রাণ, স্বতঃস্ফূর্ত। সুমিতার চরিত্রে তনুজা সুন্দর। এ ছাড়া রেহমান, জনি ওয়াকর, দেবেন ভার্মা, মতাজ বেগম, অমৃতা রায় এবং মাধবীর স্বাভাবিক অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকুশলী বিভাগে চিত্রগ্রহণ, সংগীত-পরিচালনা, শিল্প-নির্দেশনা এবং সম্পাদনার কাজ বিশেষ প্রশংসনীয়। ছবির ছটি গান সুগীত। মূল সংগীতটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

গুরুদত্ত ফিল্মসের 'বাহারে' ফির ভী আয়েগী' প্রেমচিত্র হিসাবে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করবে।

হাটে-বাজারে চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বৈজয়ন্তীমালা ফটোঃ অমৃত

কলকাতা

'মেরে লাল'র শুভমুক্তি

সত্যেন বসু পরিচালিত হিন্দী ছবি 'মেরে লাল' এ সপ্তাহে ওরিয়েন্ট, দর্পণা, কৃষ্ণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বাদশা' কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রের কাহিনী বিধৃত। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন দেবকুমার, ইন্দ্রাণী মুখার্জী, অভি ভট্টাচার্য, মালা সিনহা, মহেশ ও রতন। সংগীত পরিচালনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। বাংলা অঞ্চলে ছবিটির পরিবেশনায় রয়েছেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

তপন সিংহ পরিচালিত 'হাটে-বাজারে'র শুভ মহরৎ

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবি 'হাটে-বাজারের' শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে গত ১১ই আগস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পালন করেন। শ্রীসিংহের সংগীত পরিচালনায় দুটি রবীন্দ্রসংগীতে কণ্ঠদান করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান দুটি হল 'ওগো নদী আপন বেগে' এবং 'সখী ভাবনা কাহারে বলে'। সংগীত গ্রহণের পর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দু' নম্বরে বনফুল রচিত এ কাহিনীর নায়িকা বম্বের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালার কয়েকটি 'মেক-আপ টেস্ট' গৃহীত হয়। মহরৎ উপলক্ষে বৈজয়ন্তীমালা বম্বে থেকে এখানে উপস্থিত হন। এছাড়া ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অশোক-কুমার, ছায়া দেবী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও চিন্ময় রায়। ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। প্রিয়া ফিল্মসের পক্ষ থেকে ছবিটি প্রযোজনা করছেন অসীম দত্ত।

প্রণতি ভট্টাচার্য প্রযোজিত পরবর্তী ছবি 'নটী বিনোদিনী'

'পাড়ি' ছবির সাফল্যের পর প্রযোজিকা প্রণতি ভট্টাচার্য তাঁর পরবর্তী ছবিটির নাম ঘোষণা করেছেন 'নটী বিনোদিনী'। জনপ্রিয় নটীর জীবন অবলম্বনে রচিত এ কাহিনীর নামভূমিকায় অভিনয় করবেন

প্রণতি ভট্টাচার্য। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল দত্ত।

অজিত গাঙ্গুলীর নতুন ছবি 'উকিল দাদুর নাতনি'

তরুণ পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী যে নতুন ছবিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার নাম 'উকিল দাদুর নাতনি'। শ্রীগাঙ্গুলী রচিত এ কাহিনী এক মধ্যবিত্ত পরিবারের দাদু এবং অনাথা নাতনির জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ছবিটির কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হবে বলে জানা গেল।

বোম্বাই

গুরু দত্ত ফিল্মসের পরবর্তী ছবি

গুরু দত্ত ফিল্মসের পরবর্তী ছবিটি পরিচালনা করছেন গুরু-ভ্রাতা আত্মারাম। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় রচিত কাহিনীর নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন ধর্মেন্দ্র ও আশা পারেখ। ছবির কাজ চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে। ছবির নামকরণ সম্পূর্ণ হয়নি। আসাম, মাইশোর, কেরালা এবং উত্তর প্রদেশের জঙ্গল অঞ্চলে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শংকর-জয়কিষণ।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'সম্রাট'

জি সি ফিল্মসের রোমাঞ্চকর চিত্র 'সম্রাট' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। মহীন্দ্র সাবারওয়াল পরিচালিত এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন অনিল চ্যাটার্জী, তনুজা, ডেভিড, নীনা, রাজ মেহরা, প্রতিমা দেবী, পূর্ণিমা ও অসিত সেন।

'দেবী চৌধুরাণী' চিত্রে নূতন-জীতেন্দ্র

মুকুল রায় প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'দেবী চৌধুরাণী'র নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন নূতন এবং জীতেন্দ্র। একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নবাগতা মমতা মরকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে।

নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত **হঠাৎ দেখা** চিত্রের দৃশ্যে জহর রায় ও সন্ধ্যা রায়।
ফটো : অমৃত

স্টুডিও থেকে বলছি

ভালবেসেছেন কখনো?

বলতে পারেন এ আর এমন নতুন কি কথা। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই তো প্রেম আসে। প্রেম-প্রেম খেলা তো চিরদিনের। নতুন তো কিছু নয়। বরং এটাই স্বাভাবিক। তবে প্রেমের বিচিত্র গতি। এর নানান কথা-কাহিনী।

তাহলে গৌতমের কথা বলি। কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। চৌধুরীবংশের উত্তরাধিকারী। বাবার বিরাট ব্যবসা। তাই দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে পার্টি, ক্লাব

ওর বন্ধুবান্ধবের মজলিসে গোতমের দিন গাড়িয়ে চলেছে। প্রেম-ট্রেম তার আসে না। মেয়েদের পেছনে লাগা তার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। যখন যাকে প্রয়োজন তাকে ম্যানেজ করতে গোতমের খুব বেশি দেরী লাগে না। কু-বুদ্ধিতে এর সঙ্গে পেরে ওঠা ভার।

এ হেন গোতম চৌধুরী শেষ পর্যন্ত প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ল। হঠাং দেখা বলতে পারেন। এ্যারোড্রম থেকে বাড়ী ফেরার সময় একটা জরুরী টেলিফোন করতে গিয়ে পেট্রোল পাম্পের টেলিফোন বুথের সামনে এক সুন্দরী মেয়েকে নির্লিপ্তভাবে টেলিফোন করতে দেখে হঠাং হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গোতম। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চেপে যায়—আলাপ করতে হবে। এমন সময় দূর সম্পর্কের বোন পিয়ালীর সঙ্গে গোতমের দেখা হয়ে গেল। কথায় কথায় জানতে পারে, এরা সব দল বেঁধে এখানে পিকনিক করতে এসেছে। এই মেয়েটিও তাদের বন্ধু। নাম শিবানী চট্টোপাধ্যায়।

আলাপের সূত্র পেয়ে গেল গোতম। বন্ধু লাট্টু বোসের সঙ্গে জোর পরামর্শ চলল। লাট্টুর সঙ্গে আবার পিয়ালীরও মনের দেয়া-নেয়া চলছিল। গোতমের প্ল্যান অনুযায়ী পিয়ালী প্রথম শিবানীকে নিয়ে হাজির হলো ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। সময় মতো পিয়ালীকে নিয়ে লাট্টু আলাদা হল। পড়ে রইলো গোতম আর শিবানী। খেয়ালের বশেই যথারীতি শিবানীকে একা পেয়ে গোতম বিদ্রূপ করে বসে। অপমানিত শিবানী ভীষণ চটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরী থেকে গোতমের বাবাকে টেলিফোন করে সব কথা আড়ালে জানিয়ে দেয়।

সেদিন বাড়ীতে ফিরেই রাশভারী পিতা ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর কাছে গোতম তার এই অসভ্যতার জন্য প্রচুর গালমন্দ খেল। সব কিছু হজম করে পিয়ালীর কাছে ঠিকানা জেনে সরাসরি শিবানীর বাড়ীতে হাজির হল গোতম।

শিবানীর বাবা রতন চট্টোপাধ্যায়। স্কুল মাস্টার। তখন বাড়ীতে ছিলেন না। এ বাড়ীর ঘনশ্যাম হালদার, অর্থাৎ ঘনা-মামাকেই গোতম এক কথায় কাৎ করে দেয়। ঘনামামার প্রশ্নের উত্তরে গোতম জানায়, এখান থেকে ধরে ধরে বানর চালান দিয়ে বিদেশের শুয়োর আমদানী করাই তার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসা। ঘনামামা ঘাবড়ে গিয়ে শিবানীকে ডেকে দেন। শিবানী হঠাং গোতমকে দেখে অবাক হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শিবানীকে বাইরে ডেকে গোতম আবার অপমান করে। শিবানী আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাং গোতমকে চড় মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।

গোতমের জীবনে এ ঘটনা তেমন অস্বাভাবিক নয়। কারণ মাঝে মাঝে মেয়েদের কাছ থেকে এমন উপহার সে আগেও পেয়ে এসেছে। তবে শিবানীর কাছে এ ব্যাপারটা খুবই খারাপ লাগে। সে এর জন্য বিশেষ অনুতপ্ত। পিয়ালীর কাছে শিবানী বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছে।

ভক্ত-ভগবান চিত্রের সংগীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে কণ্ঠশিল্পী চন্দ্রালী মুখার্জি ও সংগীত-পরিচালক কালীপদ সেন।

পিয়ালীও সুযোগ বুঝে আসল লোকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য গোতমের সঙ্গে শিবানীর যোগাযোগটা করিয়ে দেয়। চরম বিরাগ থেকে ক্রমশঃ গোতম-শিবানীর পরম অনুরাগ জন্মে যায়। এই প্রেম-বন্ধনে গোতমের বাবা এবং ঘনামামা বাধা হয়ে দাঁড়ান। ইন্দ্রনাথবাবু আগে থেকেই গোতমের জন্য সোসাইটি গার্ল শুভঙ্করীকে পছন্দ করে রেখেছিলেন। কিন্তু এ বিয়েতে গোতমের যে একদম ইচ্ছে নেই সেকথা সে বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। ফলে ইন্দ্রনাথ-বাবু ছেলের ওপর চটে যান। গোতম ভয়ে ভয়ে বাবাকে এড়িয়ে চলে।

হঠাং দেখার জের টানতে গিয়ে নানান মিথ্যের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকে গোতম। আগেই বলেছি গোতমের প্রেম-ট্রেম আসে না। কোন কিছু ভেবে সে কাজে নামে না। মেয়েদের পেছনে লেগে ক্ষেপিয়ে তোলা তার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু শিবানীকে নিয়ে শেষপর্যন্ত জড়িয়ে পড়বে সে মোটেও ভাবতে পারেনি। ঘনামামাইতো আসল গণ্ডগোলটা বাধালেন। গোতমের বিরাট এক্সপোর্টস-ইমপোর্টের ব্যবসা শুনে শিবানীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তিনি যেন উঠেপড়ে লাগলেন। তিনি গোতমের বাবার সঙ্গে দেখা করে পাকা কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চান।

এদিকে গোতম সমূহ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য লাট্টুর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে। ঘনামামাকে জব্দ করার জন্য লাট্টুর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে একটার পর একটা অভিনব ফন্দি বেরিয়ে আসে। পাড়ার নামকরা মোশন মাস্টার পরাশর ভর্মাকে দিয়ে মিথ্যে অভিনয় করিয়ে গোতম ঘনা-মামাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ে। ঘনামামা তবুও লেগে রয়েছেন। দাঁতের ডাক্তার অনঙ্গর সঙ্গে শিবানীর বিয়ে কিছুতেই তিনি হতে দেবেন না। তাছাড়া শিবানীরও এতে মত নেই।

এদিকে মাঝে মাঝে গোতমের সঙ্গে শিবানীর অভিমানের পালা চলে। গোতমই এগিয়ে এসে আবার প্রেম-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে

টেরেন্স ইয়ং-এর পরিচালিত একেন্ট ০০৭ মিশান ব্লাড মেরী চিত্রের একটি দৃশ্য
[illegible]

জানে। এর মধ্যে বাবার অনুপস্থিতিতে গৌতম তাদের বিরাট সাততলা বাড়ীতে শিবানীকে নিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলার জন্য গৌতমকে শিবানী তাড়া দেয়। গৌতম ভেবে পায় না, কি করে বাবার অমতে শিবানীকে বিয়ে করবে।

এদিকে গৌতম এবং শিবানীর বাবা ওদের ছেলেমেয়েদের সব ব্যাপারটা জানতে পেরে নিজেরাই পরস্পর দেখা করে আলাদা পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেন। ঘনামামার কাছে সব খবর পেয়ে শিবানী পাকা-দেখার দিন ভোর রাত্রেই বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে গৌতমের সঙ্গে রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করে নেয়। তারপর ভয় ভয়ে শিবানীকে নিয়ে গৌতম নিজের বাড়ীতে এসে হাজির হয়।

কিন্তু বাবার কাছে হাজির হতেই গৌতম অবাক হয়ে যায়। রাশভারী পিতা ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এমন কাজ করতে পারেন তা গৌতম স্বপ্নেও ভাবেনি। গৌতম শিবানীর অজান্তেই দুই বেয়াই পরামর্শ করে নিজেদের ছেলেমেয়েকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন।

গৌতমের হাত থেকে সদ্য বিয়ের রেজেস্ট্রী পত্রটা ছিঁড়ে ফেলে ইন্দ্রনাথ চৌধুরী শিবানীর সঙ্গে গৌতমের বিয়ের দিন স্থির করে ফেললেন। গৌতম জীবনে এই প্রথম হার স্বীকার করল। শিবানীর হাতে বন্দী হল।

হঠাৎ দেখায় কাহিনীর সূত্রপাত বলে এ গল্পের নামও 'হঠাৎ দেখা' রাখা হয়েছে। ছবির নামও তাই। তীর্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন তরুণ চিত্র-পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত। বর্তমান যুগের তরুণ-তরুণীদের ভালবাসা-হৃদয়কে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হাসির খোরাক থাকবে এ ছবিতে। দর্শকরা প্রাণখুলে বিভিন্ন মজার দৃশ্যে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। এ ছাড়া অভিনীত প্রতিটি চরিত্রে নতুনত্বের স্বাদ রয়েছে। পরিচিত শিল্পীদের নতুন রূপে দেখবেন।

শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্সের এ চিত্রে অভিনয় করেছেন, গৌতম—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শিবানী—সন্ধ্যা রায়, ল্যাট্টু বোস—অনুপকুমার, পিয়ালী—সুমিতা সান্যাল, ইন্দ্রনাথ চৌধুরী—পাহাড়ী সান্যাল, খতন চট্টোপাধ্যায়—প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঘনশ্যাম হালদার (ঘনামামা)—জহর রায়, পরাশর ভর্মা—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনঙ্গ ডাক্তার—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শুভঙ্করী—গীতালী রায় ও শিবানীর মা—রেণুকা রায়। এস, বি, ফিল্মস পরিবেশিত এ চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্যামলকুমার মিত্র। ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

মঞ্চাভিনয়

।। শিল্পীমনের 'দিগন্ত রক্তিম' ।।

গত ১০ই আগস্ট শিল্পীমন গোষ্ঠী মিনার্ভা রংগমঞ্চে প্রযোজনা করলেন সিরাজ চৌধুরীর 'দিগন্ত রক্তিম' নাটক। নাট্যকার এই নাটকে আজকের অবক্ষয়ী সমাজের চিত্র আর তার একটা সম্ভাব্য পরিণতির আভাস দিয়েছেন।

নাটকে কাহিনীর অভিনবত্ব যেমন আছে তেমনি আছে উপস্থাপনার অভিনবত্ব। অভিনয়ে যেমন গতি সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনি দলগত অভিনয়ের সুক্ষ্ম শিল্পরূপটি মঞ্চে ধরা পড়েছে।

চরিত্র চিত্রণে সদানন্দ (তপেন ভট্টাচার্য), মা (বাণী দাশগুপ্তা), স্বপন (নৃপেন ব্যানার্জি), তরুণ (সমর মিত্র) পরসাদজী (কালীপদ মণ্ডল) বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। সামসুলের ভূমিকায় দীপক ঘোষ অত্যন্ত মনোগ্রাহী অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রবীন পোদ্দার, নিতাই বিশ্বাস, বাসুদেব দত্ত, নারায়ণ সেনগুপ্ত, জগৎ বন্দ্যো, সুনীল রায়, সবিতা সমাজদার, মিনতি কুণ্ডু যথাযথ অভিনয় করেছেন।

সংগীতের আবেদন নাটকের মানে বিশেষভাবে পৌঁছতে পারেনি। মেকআপ প্রখর হওয়ায় কিছুটা দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছিল।

রূপ ও শিখা-র দুটি নাট্যাভিনয়

উত্তর কলকাতায় বিশিষ্ট নাট্য-সংস্থা রূপ ও শিখা-র প্রযোজনা ও পরিচালনায় গত ১৫ আগস্ট কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'বাঙালী' এবং 'দুই মহল' নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাটকের প্রধান চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সর্বশ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত, মমতাজ আমেদ, তারা ভাদুড়ী, লীলাবতী (করালী), রীতা হালদার, অমিতা বসু, সুলতা চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

গোপীমোহন স্পোর্টিং ক্লাব (নাটোর)-এর মঞ্চসফল নাটক 'কে?'

গত ৩রা আগস্ট রঙমহল মঞ্চে অধীর ভট্টাচার্য রচিত 'কে?' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন গোপীমোহন স্পোর্টিং ক্লাবের (নাটোর) সদস্যবৃন্দ। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেন সর্বশ্রী সুশান্ত বসু, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক ঘোষ, রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ও সুমিতা চট্টোপাধ্যায়। চৈতালী চরিত্রে সুতপা ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর বড়ই দুর্বল। অল্প অবসরে শ্রীচক্রবর্তীর অভিনয় উজ্জ্বল। আবহসংগীত ও সংগীতপরিচালনায় যথাক্রমে বিলিবাবু ও তাঁর সম্প্রদায় ও দেবু চট্টোপাধ্যায় প্রশংসার দাবী রাখেন। আলোক-সম্পাতে মিহির চক্রবর্তী দক্ষতার পরিচয় দেন। শিশির চক্রবর্তীর পরিচালনায় পরিচ্ছন্ন চিন্তার [illegible]

গানের জলসা

ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য

সেকালে কলকাতার গানের আসরে ধ্রুপদ গান গেয়ে সহজেই আসর জমাট করে দিতেন অমরনাথ ভট্টাচার্য তিনি একজন কৃতী সঙ্গীতশিল্পী। কালে বলতে হলো এই কারণে যে সম্প্রতি তাঁর বয়েস আশি পেরিয়ে নব্বইয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আর দৈহিক অসুস্থতার জন্যে গান-বাজনার আসরে তিনি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। তাই তাঁর উদাত্ত সুরেলা গমকী কণ্ঠস্বর প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো প্রকৃত সাংগীতিক সমাজে শোনা যায় 'সংগীত জগতে অমরবাবু এবং ললিতবাবুর মতো ধ্রুপদ গান গেয়ে আসর জমাতে খুব কম শিল্পীকেই দেখা গেছে—তা' তাঁরা বাংলার হন কিংবা ভারতেরই হন।'

১২৯১ সালে ২৪ পরগণার হরিণাভি গ্রামে অমরনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যও একজন খ্যাত ধ্রুপদী ছিলেন। অমরনাথ ভট্টাচার্য কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলেই বসবাস করেন পিতার সঙ্গে। কালীপ্রসন্ন শিষ্য ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর ... তাঁর কাছেই তিনি বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের সম্পূর্ণ তালিম নিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ ... ছিলেন।

অমরবাবু স্মৃতিচারণে বলেন, 'বিষ্ণুপুর ঘরানার গান বাবার মুখে খুব ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি। তারপর বড় হলুম, বাবা আমাকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কাছেই আমার ধ্রুপদ গানে হাতেখড়ি। তিনি আমাকে রীতিমত গান শিখিয়েছিলেন। দু'বছর আমায় শুধু গলা সাধিয়ে ছিলেন তিনি। এমনিভাবে দস্তুর-মত সারগম সাধবার পর তবে তিনি আমায় গান দিয়েছিলেন। আগেকার দিনে শেখাবার সেই রকম নিয়ম ছিল। ভাল গলা না সাধিয়ে কেউ গান শেখাতেন না।

বাবা আমায় যে গানগুলি শিখিয়ে-ছিলেন তা সমস্তই বিষ্ণুপুর ঘরানার। বিষ্ণুপুরী ঢঙের ধ্রুপদের সঙ্গে সেই আমার হাতে-কলমে পরিচয়। প্রথম বয়েসে যে সব গান গাইতুম, তা' সেইজন্যে বিষ্ণুপুর ঘরানার ছিল। তখন বাইরের আসরে বড় একটা গাইতুম না। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও আমার গায়কি বিষ্ণুপুরী চালের নয় কেন তা হোলো, সেকথাও বলছি। আমার যখন ২০।২১ বছর বয়স তখন আমার ধ্রুপদচর্চার নতুন পর্ব আরম্ভ হয়। তখনকার কালের নামজাদা গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে আমি সেসময় শিখতে আরম্ভ করলুম। অঘোরবাবু কলকাতায় থাকলে এখনকার কৈলাস বোস স্ট্রীটে কৈলাসবাবুর বাড়ীতেই থাকতেন। আমি সেখানে তাঁর কাছে গিয়ে শিখতুম। কলকাতায় আমরা যে বাড়ীতে থাকতুম সেখানেও তিনি আসতেন। তখনকার দিনে রাজা-জমিদারদের বাড়ীতেই গানের আসর বেশির ভাগ বসতো। এখন-কার মতো ঘন-ঘন সঙ্গীত সম্মেলনের রেওয়াজ ছিল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দামোদরদাস বর্মণ, এন্টালীর দেব-পরিবার কিংবা শিবপুরের বরদা দত্ত প্রভৃতির প্রাসাদে ও বাড়ীতে রসিকজন সমাবেশে গানের আসর বসতো। অঘোরবাবুর সঙ্গে গানের আসরে বহুবার গেছি। তিনি আমাদের দেশের লোক। পাশাপাশি গ্রামেই বাড়ী বলে তাঁর কাছে গান শেখা আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল। তিনি বাবার জ্ঞাতিভাই হতেন। বাবার চেয়ে বয়েসে ছোট ছিলেন এবং বাবাকে খুব খাতির করতেন। বাবাই তাঁকে বলে তাঁর কাছে আমার গান শেখার ব্যবস্থা করে দেন। অঘোরবাবু ব্যবসার খাতিরে অনেক সময় কলকাতার বাইরে পশ্চিমে থাকতেন। শেষ ক'বছর কাশীতেই বসবাস করেন। আমার প্রথম জীবনে তাঁকে কলকাতায় পাই এবং কলকাতাতেই তাঁর কাছে গান শিখি। পরে আমার চাকরী-জীবনে অনেক সময় বাংলার বাইরে থাকতে হতো। তখন বছরে একবার দুবার কাশীতে গিয়ে তাঁর কাছে গান নিতুম। তাঁর সংগে গানের আসরে আমি যেতুম। প্রথম প্রথম তাঁর গানের সংগে তানপুরা ছাড়তুম। তিনি আসরে সাধারণত ধ্রুপদই গাইতেন। তবে টপ্পা ও টপ্পাঙ্গের ভজনেও তিনি অপূর্ব দক্ষ ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে তাঁর একটি বিখ্যাত ভজন, 'গোবিন্দ মুখরাবিন্দ' রেকর্ড করা হয়। এইটুকু সময়ের মধ্যে তাঁর মাধুর্যপূর্ণ লয়দার গানের কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে তবে এ থেকে তাঁর গানের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া শক্ত। অঘোরবাবুর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি গানের আগে কখনো আলাপ পছন্দ করতেন না। বলতেন 'ওটা সময় নষ্ট।'

যাহোক, বাবার কাছে গানের পাঠ শেষ করে আমি যখন অঘোরবাবুর কাছে শিখতে আরম্ভ করলুম, তখন তাঁদের দুজনের গানের চাল ও ঘরানার পার্থক্য বুঝতে পারলুম। বাবার শিক্ষা বিষ্ণুপুর ঘরানার আর অঘোরবাবুর প্রধান ওস্তাদ ছিলেন বিখ্যাত আলী বক্স। তাছাড়া তিনি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী দৌলৎ খাঁর কাছেও গান শিখেছিলেন। আরো গুণীর কাছে তিনি গান নিয়েছিলেন। বাবার গান ও তাঁর গানের সঙ্গে পার্থক্য ছিল প্রধানত গমকের ব্যবহার নিয়ে। বিষ্ণুপুর ঘরানায় গমক নেই বললেই হয়। কিন্তু অঘোরবাবুর ধ্রুপদে গমকই ছিল একটা প্রধান জিনিস। গমক তাঁর দরদী, ভরাট গলায় চমৎকার খুলতো। তিনি তাঁর সেই গলায় চড়ার দিকে গমকের কাজ করতেন। গমক ছাড়া তিনি গাইতেন না। এমনকি অনেকবার বাবার কাছে শেখা বিষ্ণুপুর ঘরানার গান আবার অঘোরবাবুর কাছে শিখেছি। তখন তার চাল তিনি একেবারে পালটে দিয়েছেন শেখাবার সময়। এমন কি, উচ্চারণ পর্যন্ত তিনি বদলে ফেলতেন।

অঘোরবাবুকে যখন পেতাম না তখন বেতিয়া ঘরানার বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে আমি গান শিখতাম। তিনি কলকাতার তখন থাকতেন। বিশ্বনাথ রাও কলকাতার আসরে ধামারের প্রচলন করেছিলেন। সেজন্যে তাঁর নামই হয়ে যায় বিশ্বনাথ ধামারী। বিশ্বনাথ রাও খুব সারগমের কাজ করতেন। তাঁর অসাধারণ সারগমের কাজ অনেকের কাছে নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছিল। তৈরী গলায় দাপটের সংগে তিনি গান করতেন। তাঁর গলার স্বরে মিষ্টতা ছিল না বলে অঘোরবাবু তাঁর কণ্ঠস্বর নিয়ে ঠাট্টা করতেন। আমার উপরে অঘোরবাবুর প্রভাবই সবচেয়ে

মেন্দী। তাঁর গানই আমার আদর্শ। আমি সজ্ঞানে তাঁকেই অনুসরণ করে এসেছি সারাজীবন। এতকাল ধরে বহু আসরে তাঁর শেখানো গান এবং অন্য গানও তাঁরই চালে গাইবার চেষ্টা করেছি। কতদূর সাফল্যলাভ করেছি জানি না।'

ধ্রুপদের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে অমরনাথ ভট্টাচার্য আরো বলেন যে, 'গমকের কাজ না থাকলেও বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ আমার কাছে প্রিয়। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের বাণী শুদ্ধ আর সেজন্যে তার নিজস্ব একটা মাধুর্য আছে। তাই বিষ্ণুপুরী গানকে আমি খাটো করতে চাই না। আর ছেলেবেলা থেকে পরম যত্নে তা শিখে এসেছি বলে আমি নিজেকে বিষ্ণুপুর ঘরানার একজন বলে মনে করি। আর বিষ্ণুপুর ঘরানার গানও আমি মাঝে মাঝে গেয়েছি। তবু একথাও স্পষ্ট করে বলার দরকার যে আমি অঘোরবাবুর চালেই গাই, কারণ তিনিই আমার আদর্শ।'

অমরনাথ ভট্টাচার্য সাঙ্গীতিক কৃতিত্বে একদা বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। দুঃখের বিষয় বর্তমানে তিনি অসুস্থ। তবু সুখের কথা এই যে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভাকে স্মরণ করে সম্প্রতি এক সঙ্গীত সম্মেলন তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। আমরা তাঁর রোগমুক্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি কামনা করি।

গীতোর্মি-র বিশেষ অনুষ্ঠান

গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আই-আই-টি (খড়্গপুর) স্টাফ ক্লাবের নব-নির্মিত ভবনে স্থানীয় রবীন্দ্র-সঙ্গীত সংস্থা 'গীতোর্মি'র শিল্পীবৃন্দ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। সংস্থার শিল্পীদের দরদী কন্ঠের গান শুনে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রবিতীর্থের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস

রবিতীর্থের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে গত ৭ আগস্ট নিউ এম্পায়ার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যটি প্রদর্শিত হয়। এ অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হল, গীতি-নাট্যের গঠনরীতির আঙ্গিক কুশলতা। আজকাল প্রায়ই গীতি-নাট্যে নৃত্য-নাট্যের রেওয়াজ সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। তা থেকে রবিতীর্থ স্বতন্ত্র। কাহিনীর নাট্যরস সম্পূর্ণ গীতিনাট্যে পরিস্ফুট। নাম ভূমিকায় অমর রায়ের অভিনয় ছাড়াও শ্যামা-বন্দনার গানটি সংগীত বলা চলে। লক্ষ্মী এবং বালিকার চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও মানসী বসু। নৃত্যাংশে চন্দনা বসু, নিবেদিতা রায়চৌধুরী, [illegible] মতিলাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবিতীর্থের বাল্মীকি প্রতিভা প্রতিষ্ঠা-দিবসের [illegible] উজ্জ্বল সংযোজন।

বেতারশ্রুতি

।। রবীন্দ্রস্মরণে ।।

প্রতি বছরেই রবীন্দ্রমৃত্যুদিবসে কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা আকাশবাণী করে থাকেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরের অনুষ্ঠানগুলিতে বেশ কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে।

রবিবার ৭ই আগস্ট সকাল ৮-৩০ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীত এবং কবিতা সম্বলিত 'মরণ রে' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান দিয়ে ঐ দিনটির সূচনা হয়। শ্রীগোপাল দাশগুপ্তের পরিচালনা এবং প্রযোজনার গুণে অনুষ্ঠানটি উৎরে গেছে।

বেলা ১২-৩৫ মিনিটে কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড মাধ্যমে 'গীতিগুচ্ছ' নামে একটি অনুষ্ঠান বেশ উল্লেখযোগ্য। সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রাজেশ্বরী দত্ত, দেবব্রত বিশ্বাস এবং মালতী ঘোষালের গাওয়া কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হয়েছিল।

দুপুরবেলা ১টায় প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় ও পরিচালনায় 'ত্যাগ' নামে একটি নাটক পরিবেশিত হয়। খুব প্রশংসা করা না গেলেও খুব খারাপও বলা চলে না। চলনসই গোছের।

নাটকের রসহীনতার আক্ষেপ আমার সম্পূর্ণভাবে পুষিয়ে যায় বেলা দেড়টায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের হিন্দী রূপান্তরিত সঙ্গীতের কয়েকটি গান শুনে। সাধারণত এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হলে তার কিছু রসভঙ্গ হতে বাধ্য কিন্তু আমার বলতে দ্বিধা নেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই রূপান্তরিত হিন্দী সঙ্গীতে আমি বিন্দুমাত্রও রসহানি দেখতে পাইনি। এ ধরনের অনুষ্ঠানের বহুল প্রচার একান্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে হয়ত বলা অস্বাভাবিক হবে না, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরেজী—রূপান্তরিত অনেক-কটি গানের সংগ্রহ আকাশবাণীর আছে এবং সেগুলি অত্যন্ত সুন্দর। কেন যে তারা সেগুলি প্রচার করেন না বুঝে উঠা দায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ আজ শুধু বাঙালী নন—ভারতীয় নন—তিনি সর্বদেশের সর্বকালের। অ-বাঙালী শ্রোতাদের কাছে তাঁর এই হিন্দী এবং ইংরেজী-রূপান্তরিত সঙ্গীত বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

[রবিতী]র্থের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্য অভিনয়ের দৃশ্য।

আরো আনন্দ, আরো বিস্ময় আমার [জন্য] অপেক্ষা করছিল। বেলা দুটোয় [কবি]দের স্বকণ্ঠে গান ও কবিতার [অনুষ্ঠান —'তবু মনে রেখো'।

[এর আগে]ও অনেকবার শুনেছি কিন্তু [সে]দিনের ঐ বিশেষ দিনটিতে বিশেষ [করে] তাঁর কণ্ঠে সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী মনে হল। [আ]বৃত্তি 'বহুদিন মনে ছিল আশা' [আর] গান 'তবু মনে রেখো' সেদিন দুঃখ-[বেদ]না-বিষাদে-আনন্দে মেশা এক বিস্ময়-আবেশের সৃষ্টি করেছিল।

[বাংলা]দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি [...] জীবনস্মৃতির মাধ্যমে স্বরচিত [কবি]তা দিয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি [অর্পণ] করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন [রাণী] দেবী, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব [বসু] ও বিষ্ণু দে।

তারপর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি [রবী]ন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

রাত দশটা পনেরোয় জীবনস্মৃতিমূলক [আলো]চনার একটি কথিকা অনুষ্ঠানে অংশ [গ্রহণ] করেন ডঃ ডি এম বসু, মধু বসু [ও] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

রাত ১০-৩৫-এ রবীন্দ্রসঙ্গীত [সম্ব]লনে রচিত 'বাইশে শ্রাবণ' নামে একটি [গীতি]অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সমগ্র [অনু]ষ্ঠানটির সুন্দর এবং সুষ্ঠু পরি-[বেশনা] বিশেষ প্রশংসা পাবার দাবী রাখে। [পরিক]ল্পনা করেছিলেন পঙ্কজবিহারী সেন এবং সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেছিলেন 'রবিতীর্থের' ছাত্র-ছাত্রীদল।

আরো একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয় সাঁওতালীদের জন্যে সাঁওতালী ভাষায় রচিত 'রবীন্দ্রনাথের জীবন ও আদর্শ' বিষয়ক একটি কথিকা; এটি পরিবেশন করেন শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

বি-এফ-জে-এর নির্বাচন

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্টস অ্যাসো-সিয়েশনের ১৯৬৬-৬৭ সালের নির্বাচন সম্প্রতি শেষ হল। গত বাৎসরিক সভায় সংস্থার চিত্র-সাংবাদিকগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত করেন।

সভাপতি—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ; **প্রধান পৃষ্ঠপোষক**—শ্রীঅশোককুমার সরকার; **সহ-সভাপতি**—শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ ও শ্রীবি সি আগরওয়াল; **সম্পাদক**—শ্রীবি ঝা ও শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত; **সহ-সম্পাদক**—শ্রীআশীষতরু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীওয়াসি-মুল হক; **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীপশুপতি চট্টো-পাধ্যায়। এছাড়া পনেরজন সদস্য কার্যকরী সমিতিতে মনোনীত হয়েছেন।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার ডাচ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

আগামী ৩০শে আগস্ট কয়েকটি ডাচ অল্প-দৈর্ঘ চলচ্চিত্র (১) রাইথাম অব রটারডাম, (২) ফেসেস অব হল্যান্ড, (৩) বিগ সিটি ব্লুজ, (৪) প্যান, (৫) ডাচ মাস্টারপিস, (৬) গ্লাস ললিতকলা একাডেমী প্রেক্ষাগৃহে সন্ধ্যা ৬-১৫ ও রাত ৮-১৫ মিঃ প্রদর্শিত হবে। নয়াদিল্লীর ডাচ দূতাবাসের সহ-যোগিতায় এই স্বল্পদৈর্ঘ চিত্রগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন

গত ১৭ জুলাই হাওড়া টাউন ভবনে কৃষ্টি সংস্থা এক শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলনের আয়োজন করেন। সভাপতি এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও ডাঃ লক্ষ্মী ঘোষ।

শিশু এবং কিশোরদের জন্য নিয়মিত আলোচনার এই সম্মেলন আজকের দিনে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত বলা চলে।

পরলোকে প্রবীণ অভিনেতা

নির্বাক এবং সবাক চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় প্রবীণ অভিনেতা শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন। দীর্ঘদিন হাঁপানি রোগভোগের পর ৬৬ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন। চলচ্চিত্রে এঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯২৫ সালের নির্বাক 'লাইট অব এশিয়া' ছবিতে। সবাক চিত্রে প্রথম নিউ থিয়েটার্সের 'দেনা পাওনা'য় প্রথম যুক্ত হন। তারপর একে একে 'দিদি', 'রজত-জয়ন্তী', 'জীবন-মরণ', 'নর্তকী', 'পরাজয়', 'শোধবোধ', 'অভিজ্ঞান', 'মৌচাকে ঢিল', 'নার্স সি সি', 'অঞ্জনগড়', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি চিত্রে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন। 'পুষ্পধনু' তাঁর শেষ চিত্র। 'পরাজয়' চিত্রে তাঁর স্বকণ্ঠের গান 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি' আজও মনে পড়ে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগত আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করি।

রবীন্দ্র সদন

রবীন্দ্র সদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার চৌদ্দজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ : শ্রীসত্যজিৎ রায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীশম্ভু মিত্র, শ্রীতরুণ রায়, শ্রীপ্রমথ-নাথ বিশী, শ্রীজহর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যো-পাধ্যায়। কমিটির কার্যকাল তিন বৎসর।

কিংসটনে অষ্টম কমনওয়েলথ ক্রীড়ার উদ্বোধনের সময় উদ্যোক্তা দেশ জ্যামাইকার অ্যাথলিটরা ন্যাশন্যাল স্টেডিয়ামে মার্চ পাস্ট করছেন। গত ৪ঠা আগস্ট কমনওয়েলথ ক্রীড়ার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়।

কমনওয়েলথ ক্রীড়া

অজয় বসু

আগে নাম ছিল 'বৃটিশ এম্পায়ার অ্যান্ড কমনওয়েলথ গেমস', এখন থেকে বলা হবে শুধু কমনওয়েলথ ক্রীড়া।

এম্পায়ার শব্দটিতে বৃটিশ প্রভুত্বের গন্ধ স্পষ্ট। অনেকের নাকে এই গন্ধটি অধুনা উৎকট বলে ঠেকে। বৃটেন কমনওয়েলথের বড় সরিক বটে। কিন্তু সেখানে অন্যেরাও আছে। কাজেই অন্যদের মনের কথার মর্যাদা ধরে দিতে আজ এম্পায়ার শব্দটিকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। প্রগতিপন্থী আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে কাজটাকে মানানসই বলে মনে করা যেতে পারে।

খেলাধুলার মাধ্যমে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিকে বোঝাবুঝি ও শুভেচ্ছার বাঁধনে জড়িয়ে রাখাই হলো কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীরা ক্রীড়াভূমিতে এসে হাত পা ছুঁড়ে, লাফিয়ে, দৌড়ে, ঝাঁপিয়ে জীবনের সুস্থ পথে চলার দৈহিক সংগতি অর্জন করে নিক্ এবং পারস্পরিক মেলামেশায় মানসিক মূলধনও সঞ্চিত হোক্, এই উদ্দেশ্যে ও আদর্শে দৃষ্টি রেখেই কমনওয়েলথ ক্রীড়ার আসর পাতা হয়।

যে মহান ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার আয়োজনে সেই উদ্দেশ্যের বীজই কমনওয়েলথ ক্রীড়াভূমিতে অঙ্কুরিত। ওলিম্পিকের অনুসরণে ও অনুকরণে এর প্রতিষ্ঠা। অনেকে তাই কমনওয়েলথ ক্রীড়াকে ক্ষুদে ওলিম্পিক নামে অভিহিত করেন। সেই নাম যে নামে ভাগীদার ইওরোপীয়, এশীয়, প্যান-আমেরিকান ক্রীড়া এবং অনুরূপ আরও ক'টি আঞ্চলিক অনুষ্ঠান।

ওলিম্পিকের কাহিনী অনেক পুরানো। কমনওয়েলথ ক্রীড়া বয়সে নবীন। ওলিম্পিক ক্রীড়ার শুরু আজ থেকে প্রায় পৌনে তিন হাজার বছর আগে। গ্রীক ও রোমীয় যুগের অবসানে ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান দীর্ঘদিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আবার তার পথ পরিক্রমণ আরম্ভ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। কমনওয়েলথ ক্রীড়ার আরম্ভ তারও অনেক পরে।

আনুষ্ঠানিক মতে ১৯৩০ সালে। তবে আরম্ভেরও আরম্ভ থাকে বলেই কমনওয়েলথ ক্রীড়ার জন্মবৃত্তান্ত জানতে আমরা আরও বেশ ক' বছর পিছিয়ে যেতে পারি। পিছোতে পিছোতে ১৯১১ সালে।

১৯১১ সাল সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক কাল। বৃটিশ সাম্রাজ্যে তখন সূর্য ডোবে না। মহা ধুমধাম পড়ে গিয়েছে পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক ঘিরে। সুবিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে যেখানে ছিল সবাই ইংলণ্ডে আমন্ত্রিত। নানা জাতি, নানা প্রান্তের এই অভিনব সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিবিধ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হরেকরকম কাণ্ডের মাঝে 'ফেস্টিভ্যাল অব এম্পায়ার' নামে যে অনুষ্ঠান সেখানে খেলাধুলোই মুখ্য।

লণ্ডনের স্ফটিক প্রাসাদ বা ক্রিস্টাল প্যালেসে আয়োজিত এই উৎসবে যোগ দেন বৃটিশ এবং অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়াবিদেরা। অ্যাথলেটিকস, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, সাঁতার ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। সামগ্রিক হিসেবে কানাডার প্রতিনিধিরাই সেবার অন্যদের টেক্কা দেন।

অনেকে বলেন যে, একালের কমনওয়েলথ ক্রীড়া হল ১৯১১ সালের ফেস্টিভ্যাল অব এম্পায়ারেরই উত্তরাধিকারী। তবে ফেস্টিভ্যাল অব এম্পায়ারের অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে ধরা থাকলেও উত্তরাধিকারীকে বাস্তবে সামনে পেতে আরও অনেক প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে।

কমনওয়েলথের ক্রীড়ামানোন্নয়নে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তুলতে একটি ব্যাপক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন দরকার, একথা আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়া শুরু হওয়ার অন্ততঃ পাঁ… বছর আগে বৃটিশ চিন্তানায়ক … অ্যাসটলি কুপার প্রকাশ্যে বলেছিলেন। ১৯১১ সালে ফেস্টিভ্যাল অব এম্পায়ারের পর বহু কণ্ঠে আবার সেই দাবী উচ্চারিত হলেও ১৯২৮ সালের আগে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠনে কার্যকর উদ্যম দেখান হয় নি।

কার্যকর উদ্যমে নেতৃত্ব দিলেন এন এ… রবিনসন। রবিনসন ছিলেন কানাডার ওলিম্পিক দলের ম্যানেজার। দলের সঙ্গে ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমি আমস্টারডামে এসে ছিলেন। সেখানে দেখা বৃটিশ কমনওয়েলথের আর সব ক্রীড়া প্রতিনিধিদের দলের। সেই সুযোগে কর্মকর্তা …

র্ষকর পরিকল্পনা গড়া, যে পরিকল্পনা তবে রূপ নেয় দু বছর পর।

দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে নাডার হ্যামিলটনে আনুষ্ঠানিকভাবে মনওয়েলথ ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠান হয় বং প্রতিযোগিতা চলার সময়েই কর্মকর্তারা মস ফেডারেশন নামে একটি ক্রীড়া নয়ামক সংস্থা গঠনে সঙ্কল্প নেন। ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলেসে ওলিম্পিক পলক্ষ্যে সমাগত প্রতিনিধি সম্মেলনে কমনওয়েলথ ক্রীড়া ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হ্যামিলটনে এগারোটি দেশের চারশ ক্রীড়াবিদ হাজির ছিলেন। পরের বার অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে লন্ডনের হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে ষোলটি দেশের পাঁচশ প্রতিযোগী। এমনি করে যত দিন এগিয়েছে ততই কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় যোগদানকারীর সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৬২ সালে পার্থে এবং এ বছরে কিংসটনে আয়োজিত কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় হাজারেরও বেশী ক্রীড়াবিদ যোগ দিয়েছেন।

ওলিম্পিকের রীতি অনুসরণে কমনওয়েলথ ক্রীড়া প্রতি চার বছরে একবার করে অনুষ্ঠিত হয়। তবে ক্রীড়াসূচী প্রণয়নে দুটি আয়োজনে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বজায় রাখা হয়। ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর বিস্তৃত ও ব্যাপক। কমনওয়েলথ ক্রীড়াসূচী সে হিসেবে সংক্ষিপ্ত। কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় দলগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই। হ্যামিলটন, লন্ডন, সিডনী, অকল্যান্ড, ভ্যাঙ্কোভার, কার্ডিফ ও পার্থ ঘুরে কমনওয়েলথ ক্রীড়া এই সবে মার্কিন মণ্ডলের দিকে পা বাড়িয়েছে। আসছে বার হবে এডিনবরায়। আফ্রো-এশীয় অঞ্চলে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এখনও হয় নি।

তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে কমনওয়েলথ ক্রীড়াভূমিতে আফ্রো-এশীয় অঞ্চলের ক্রীড়াবিদরা যোগ্যের ভূমিকা নিয়েছেন এবং যোগ্যতর প্রতিষ্ঠা লাভে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। আমাদের অ্যাথলিট মিলখা সিং ও কুস্তিগীর লীলারাম কার্ডিফে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। পার্থে কেনিয়ার সেরু কিনো অ্যানটাও স্বল্পপাল্লার দুটি বিভাগই জয় করেছেন, ঘানার এম আহে ব্রডজাম্পে ও ই ব্লে লাইটওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। পাকিস্তানী অ্যাথলিট ও মল্লবীরদের সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কেনিয়ার কিপচো কিনো, উঠতি নাফতালি তেমু্রা কমনওয়েলথ ক্রীড়ার অষ্টম অনুষ্ঠানে স্মরণীয় কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। আফ্রিকা জেগেছে, জাগছে। এ কথা আরও জোর গলায় হাঁকবার উদ্দেশ্য উপজাতীয় তেমু যা করেছেন আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়। বাইরের মহলে যিনি অশ্রুত, অজ্ঞাত, তিনিই কিনা একাধিক বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলীয় তারকা রণ ক্লার্ককে নাজেহাল করে ছাড়লেন!

আমেরিকা, রাশিয়া যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও কমনওয়েলথ ক্রীড়ার মান নীচু নয়।
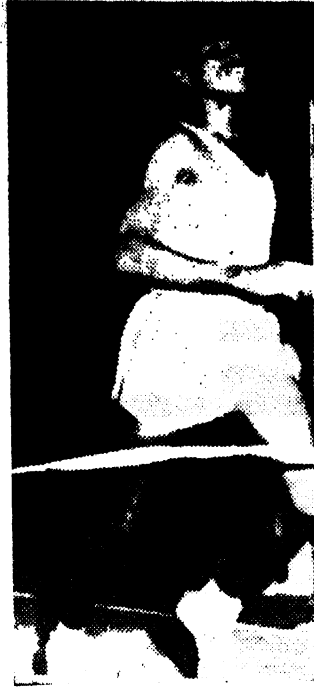
কিপচো কিনো

অনুষ্ঠানের প্রসার যত বাড়ছে এই মানও ততই উঁচুতে উঠছে। আন্তর্জাতিক মানের নিরিখে কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সাঁতার ও অ্যাথলেটিকের মানই সবচেয়ে আশ্বাসজনক।

কমনওয়েলথের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ক্রীড়াবিদ আছেন বা ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই-ই তাঁদের কালে কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় অংশ নিয়েছেন। এবং তাঁদের উপস্থিতির কল্যাণে কমনওয়েলথ ক্রীড়ার নানান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশ্বরেকর্ডও নতুন করে গড়া হয়েছে।

রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় কমনওয়েলথ ক্রীড়ার যুদ্ধোত্তরকালের ভূমিকাই সবচেয়ে স্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জামাইকা, ইংলন্ডে খুব কম সময়ের ব্যবধানেই বিশ্বের প্রথম সারির অ্যাথলিট ও সাঁতারুর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই এই পর্বের অনুষ্ঠানই সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সুপার অ্যাথলিট হার্ব ইলিয়ট কার্ডিফে মাঝারী পাল্লার দৌড়ের দুটি বিভাগই জয় করেছিলেন। পরের বার তাঁকে অনুসরণ করেন আর এক সুপার অ্যাথলিট নিউজিল্যান্ডের পিটার স্নেল। নিউজিল্যান্ডের আর এক ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মারে হলবার্জ পার্থে তিন মাইল দৌড়ের ফাইনালে নেমেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার রণ ক্লার্ককে হারাতে। ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ব্রডজাম্পার লিন ডেভিস এবারের আয়োজনে শীর্ষ মর্যাদায় অভিনন্দিত হয়েছেন।

জামাইকার হার্ব ম্যাকিনলে, আর্থার উইন্ট, রোডেন, জর্জ কার, কিথ গার্ডনার, কানাডার মাইক অগাস্টিন, বাহামার টি রবিনসন প্রমুখ নামী অ্যাথলিটরা তাঁদের কালে কমনওয়েলথ ক্রীড়াভূমিতে নিজেদের ক্রীড়াকৃতির অবিমিশ্র স্বাক্ষর এঁকেছেন। তা ছাড়া কমনওয়েলথ ক্রীড়ার এক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই এক মাইল দৌড়ে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার জন ল্যান্ডির সঙ্গে বৃটেনের রোজার ব্যানিস্টারের যে ক্ষুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেধে ছিল তার কাহিনী শুধু কমনওয়েলথ অ্যাথলেটিকসেরই নয়, আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মহিলা অ্যাথলিট অস্ট্রেলিয়ার বেটি কাথবার্ট ও ইংলন্ডের মেরী বিগন্যালও কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। মেলবোর্ণ ওলিম্পিকের তিনপদকী বেটি কাথবার্টের হেরে যাওয়ার নজীরই কার্ডিফে ক্রীড়ার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অধ্যায়। দুবছর আগে মেলবোর্ণের ট্র্যাক মাতিয়ে দিলেও কুমারী বেটি কাথবার্ট কার্ডিফে ১১০ গজ দৌড়ে স্বদেশীয় মার্লিন ম্যাথুজ উইলার্ড, ও বৃটেনের ইয়ং ওয়েস্টনের কাছে এবং ২২০ গজ দৌড়ে আবার মার্লিন ম্যাথুজ উইলার্ডের কাছে হেরে যান।

কমনওয়েলথ ক্রীড়ার জলক্রীড়ার ইতিহাস বিশ্ববিশ্রুত সাঁতারুদের ব্যক্তিগত সাফল্যের ছোঁয়ায় আরও সমৃদ্ধ। এবং এ সাফল্যে অস্ট্রেলিয়ারই ভাগ বেশী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে অস্ট্রেলীয় সাঁতারুরা বেশ কিছু দিনের জন্যে আন্তর্জাতিক পুলে অবিসম্বাদী নায়ক-নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এইসব প্রথম সারির সাঁতারুদের মধ্যে সবাই যোগ দিয়েছেন কমনওয়েলথ জলক্রীড়ায়।

অস্ট্রেলীয় তরুণ মারে রোজ, জন ডেভিট, জন হেনড্রিকস, জন কনরাডস, কণ্ডকটন, কেভিন বেরি, টেরি গ্যাথারকোল তরুণী ডন ফ্রেজার, লোরেন ক্র্যাপ, ইলসা কনরাডস প্রমুখেরা তাঁদের সন্তরণ দক্ষতার নজীরে কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সুইমিং পুলে বিপুল চাঞ্চল্য জাগিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। যিনি নন তিনি হয়ত বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী। অস্ট্রেলিয়ার এইসব কৃতী সাঁতারুদের পাশে কমনওয়েলথ পুলে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তথা বিশ্বের প্রথম সারির সাঁতারু বৃটেনের অনিতা লান্সবরো, জুডি গ্রিনহামও ছিলেন। কাজেই কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সন্তরণ প্রতিযোগিতার উঁচু মান যুদ্ধোত্তরকালে কখনই নামে নি। এবারের অনুষ্ঠানে সেই মান আরও উঁচুতে যে উঠেছে তারই প্রমাণ অগুন্তি বিভাগে বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে পড়ার বিবরণ।

কমনওয়েলথ ক্রীড়া কমনওয়েলথের ক্রীড়াবিদদের কাছে যে ছোটখাট এক ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের বল ইংল্যাণ্ডের বব্ বারবারের মিডল স্টাম্প মাটি থেকে তুলে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছে।

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৫০০ রান (৯ উইকেটে সমাপ্তি ঘোষণা। সোবার্স ১৭৮, নার্স ১৩৭, হাণ্ট ৪৮ এবং কানহাই ৪৫ রান। হিগস ৯৪ রানে ৪ এবং স্নো ১৪৬ রানে ৩ উইকেট।

ইংল্যাণ্ড : ২৪০ রান (ডি' অলিভেরা ৮৮, এবং হিগস ৪৯ রান। সোবার্স ৪১ রানে ৫, হল ৪৭ রানে ৩ এবং গ্রিফিথ ৩৭ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৫ রান (বারবার ৫৫ এবং মিলবর্ন ৪২ রান। গিবস ৩৯ রানে ৬ এবং সোবার্স ৩৯ রানে ৩ উইকেট)

প্রথম দিন (আগস্ট ৪) :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৩টি উইকেট পড়ে ১৩৭ রান ওঠে।

দ্বিতীয় দিন (আগস্ট ৫) :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স ৫০০ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যাণ্ড কোন উইকেট না খুইয়ে ৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিন (আগস্ট ৬) :

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানের মাথায় শেষ হলে ২৬০ রানের পিছনে পড়ে ইংল্যাণ্ডকে 'ফলো-অন' করতে হয়। এই দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১টা উইকেট পড়ে ৪০ রান উঠেছিল।

দর্শক

চতুর্থ দিন (আগস্ট ৮) :

লাঞ্চের পর ইংল্যাণ্ড মাত্র একঘণ্টা খেলেছিল; ২০৫ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৫৫ রানে জয়ী হয়।

লিডসে আয়োজিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ড দলের চলতি ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস ও ৫৫ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ৩—০ খেলায় (ড্র ১) অগ্রগামী হয়ে 'রাবার' জয় করেছে। হাতে আর একটা টেস্ট খেলা (৫ম) আছে। এই 'রাবার' জয়ের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল উপর্যুপরি দু'বার 'উইসডেন' ট্রফি জয়ী হল। ১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৩—১ খেলায় (ড্র১) ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে উভয় দলের পক্ষে প্রথম 'উইসডেন' ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছিল। ১৯৬৩ সালে প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জীর শততম সংস্করণ উপলক্ষে উক্ত পুস্তকের স্বত্বাধিকারী ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রতি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের খেলায় বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে এই সুরম্য 'উইসডেন' ট্রফি উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন, বর্তমান টেস্ট সিরিজের প্রথম চারটি খেলাতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হল। প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। খেলার মধ্যে কয়েকবার বৃষ্টি নামে; ফলে প্রতিবারই খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তা ছাড়া উপযুক্ত আলোর অভাব ঘটায় খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৪০ মিনিট আগে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছিল। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান ছিল ৮৭ (১ উইকেটে)। চা-পানের সময় সেই রান গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১১৯ (২ উইকেটে)। আর ১৩৭ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছিল। ওপনিং ব্যাটসম্যান হাণ্ট ১৬৪ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ব্যক্তিগত ৪৮ রানে ৭টা বাউণ্ডারী করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে আরও ৬টা উইকেট খুইয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পূর্ব দিনের ১৩৭ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে আরও ৩৬৩ রান যোগ করে; রান দাঁড়ায় ৫০০ (৯ উইকেটে)। এই রানেরই মাথায় অধিনায়ক সোবার্স ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সোবার্স (১৭৪ রান) এবং নার্স (১৩৭ রান)

...শ্চুরী করেন। সোবার্সের সরকারী টেস্ট ...লোয়াড়-জীবনে এইটি সপ্তদশ সেঞ্চুরী ...ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ম এবং বর্তমান ...স্ট সিরিজে ৩য় সেঞ্চুরী। আলোচ্য ...স্টে সোবার্স ১৭২ মিনিটে তাঁর শতরান ...র্ণ করেন, বাউন্ডারী মারেন ১৪টা। ...বার্স যখন প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮৩ ...ন সংগ্রহ করেন তখন সরকারী টেস্ট ...কেটে তাঁর ৫০০০ রান পূর্ণ হয়। সর- ...রী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সকে নিয়ে ...পর্যন্ত মাত্র ৯ জন খেলোয়াড় ৫০০০ ...ন (বা তার বেশী) সংগ্রহ করেছেন— ...ল্যান্ডের ৬ জন, অস্ট্রেলিয়ার ২ জন এবং ...য়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১ জন। তবে চৌকস ...লোয়াড় হিসাবে সোবার্স অদ্বিতীয়। ...রণ সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতি- ...সে ৩০০০ রান এবং ১০০ উইকেট ...গ্রহ করেছেন একমাত্র খেলোয়াড় গ্যারফিল্ড ...বার্স। আলোচ্য টেস্টে সোবার্স এবং নার্স ...ম উইকেটের জুটিতে ২৬৫ রান তুলে ...র্বের ৫ম উইকেট জুটির রেকর্ড রান ...৭৩—সোবার্স এবং বুচার, নটিংহাম) ...ন করেন। নার্স ৩০০ মিনিটে তাঁর শত ...ন পূর্ণ (বাউন্ডারী ১০ এবং ওভার- ...উন্ডারী ১) করেন। দ্বিতীয় দিনের ...ঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান ...ল ২৪৭ (৪ উইকেটে)। অর্থাৎ ২ ঘন্টার ...লয় তারা পূর্ব দিনের ১৩৭ রানের (৩ ...উইকেটে) সঙ্গে ১১০ রান যোগ করে- ...ন। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন সোবার্স ...৯ রান) এবং নার্স (৪৮ রান)। ৩১৯ মিনিটের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ২৫০ রান পূর্ণ হয়। চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ৩৯০ (৪ উইকেটে)। সোবার্স ১৫২ রান এবং নার্স ৮৫ রান সংগ্রহ করে অপরা-জিত ছিলেন। দলের ৪১৯ রানের মাথায় সোবার্স উদাসীনভাবে বারবারের বল খেলতে গিয়ে বোল্ড আউট হন। তাঁর মুখে ক্লান্তির চিহ্ন ছিল। সোবার্স ২৪৩ মিনিট খেলে তাঁর ব্যক্তিগত ১৭৪ রানে ২৪টা বাউ-ন্ডারী করেছিলেন। সোবার্সের পঞ্চম উই-কেটের জুটি নার্স ইংল্যান্ডের স্নো-র বল মাথার ওপরে তুলে টিটমাসের হাতে ধরা পড়েছিলেন। নার্সের ১৩৭ রান (বাউন্ডারী ১৪ এবং ওভার বাউন্ডারী ২) তুলতে ৩৪৫ মিনিট সময় লেগেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর ইংল্যান্ড খেলার বাকি সামান্য সময়ে কোন উইকেট না খুইয়ে ৪ রান সং-গ্রহ করেছিল।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১১টা উইকেট পড়ে যায়—প্রথম ইনিংসের ১০টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ১টা। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা ২৪০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ৫০০ রানের (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) থেকে ২৬০ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। এইদিন ইং-ল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ১টা উইকেট খুইয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করেছিল। ইং-ল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় বেসিল ডি' ওলিভেরা দলের যা-কিছু মুখরক্ষা করেছিলেন। দলের ৪২ রানের মাথায় যখন ৩য় উইকেট পড়ে তখন তিনি খেলতে নামেন এবং ১৭৯ রানের মাথায় বিদায় (৭ম উইকেট) নেন। ডি'ওলিভেরা ১২ রানের জন্য শতরান করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। সপ্তম উইকেটের জুটিতে ডি'ওলিভেরা এবং হিগস দলের মূল্যবান ৯৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিং-সের খেলা লঞ্চের পর একঘন্টা স্থায়ী ছিল। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৫ রানের মাথায় শেষ হলে দেড় দিনের খেলার সময় হাতে থাকতে চতুর্থ টেস্টে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৫৫ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে। চতুর্থ দিনের সকালের খেলায় অধি-নায়ক সোবার্স ইংল্যান্ডের বারবার এবং ডি'ওলিভেরাকে খেলা থেকে বিদায় দিয়ে ইংল্যান্ডের ভিত আলগা করেন। এরপর লান্স গিবস ৩৯ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের কোমর এবং হাড়গোড় ভেঙ্গে দেন। ৮৪ রানের মাথায় সোবার্সের বলে বারবারের মিডল স্টাম্প যখন মাটি থেকে ছিটকে যায় তখন ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যান্ডের আরও ১৭৬ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১২৮ (৫ উইকেটে)। অর্থাৎ লাঞ্চের আগেই চারটে উইকেট পড়ে যায়।

ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রথম বিভাগের ফিরতি লীগ খেলায় মহমেডান দলের গোলমুখে একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য।
ফটো : অমৃত

বজ্রমুষ্টি ক্যাসিয়াস ক্লে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ৬ই আগস্ট শনিবার রাত্রে লণ্ডনের আর্লস কোর্ট রিংয়ে বিশ্ববিজয়ী মুষ্টি-যোদ্ধা মহম্মদ আলী বা ক্যাসিয়াস ক্লে ও বৃটেনের ব্রায়ান লণ্ডনের মধ্যে যে লড়াই হলো তা যেন এ বছর বৃটেনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সব ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মহ নাটকের সমাপ্তিতে সাড়ে সাত মিনিটের এক চুটকী প্রহসন।

লণ্ডন যদি দুটি রাউণ্ডের হাস্যকর পরাজয়ের পর তৃতীয় রাউণ্ডে ১ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডের মধ্যে লজ্জাজনকভাবে ঘায়েল হয়ে না যেতেন তাহলে হয়তো মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসের পাদটীকায় তিনি এই বলে উল্লেখ্য হয়ে থাকতেন যে, দু-দুবার দুজন বিশ্বজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা প্রকৃত দুঃসাধ্য দুটি চ্যালেঞ্জের আগে তাঁর সঙ্গে লড়ে হাত পাকিয়েছিলেন। —ইতিপূর্বে ১৯৬৩ সালের জুন মাসে ক্লের বিরুদ্ধে লড়বার আগে সে সময়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান সনি লিষ্টন ব্রায়ানের সঙ্গে একবার স্বল্পাবতীর্ণ হন এবং বলাবাহুল্য তাঁকে অনায়াসে পরাস্ত করেন। আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর ক্লেও অনুরূপভাবে ইউরোপীয় হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান কার্ল মিলডেন-বার্গের চ্যালেঞ্জের জবাবে তাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান খেতাব রক্ষার জন্যে মুখোমুখি হবেন। তবে সেই বড় লড়াইয়ের আগে এই অপেক্ষাকৃত ছোট 'লড়াইটা' ক্লের অনুশীলনের কাজে লাগতো যদি সত্যিই এটাকে লড়াই বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু রিংয়ে প্রজাপতির পাখার মত লঘুপদ ব্রায়ান বজ্রের মত মুষ্টিধর ক্লের মুখো-মুখি হবার পর থেকে শঙ্কিত ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্বের প্রাক্তন লাইট-হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান কার্পেন্টার তাঁর অবশ্য বর্ণনায় বলেছেন যে, মনে হচ্ছিলো তিনি যেন ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ বিক্ষুব্ধ রাত্রে এক বিভ্রান্ত বিশালবপু শিশু।

রবিবাসরীয় ডেলি এক্সপ্রেস সক্ষোভে লেখে যে এই 'লড়াইয়ের' প্রহসন বৃটিশ বক্সিংয়ের ক্ষতি ছাড়া এতটুকু উপকারও করবে না। এবং এক্সপ্রেসের মতে এই লড়াইয়ের ৯০,০০০ পাউণ্ডই ক্লের সহজ-তম আয়।

লড়াইটি সম্পর্কে এই সর্বাত্মক প্রহসনের ধিক্কারের উত্তরে লণ্ডন বলেছেন, 'লড়াইটা যদি তামাসাই হয়ে থাকে তবে তার জন্যে বৃটিশ বক্সিং বোর্ড অব কন্ট্রোলই দায়ী আমি নই। এ লড়াই তাদেরই আয়োজিত।'

পরিবর্তিত ব্যক্তিত্ব ক্যাসিয়াস ক্লে

জর্জেস কার্পেন্টার বলেছেন, মুষ্টি-যোদ্ধা হিসাবে ক্লে তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে

ক্লের প্রণয়াভিলাষিনী বিংশতিবর্ষীয়া নর্তকী জন হ্যারিসন

•

ক্লে ও লণ্ডনের দৈহিক পরিসংখ্যান

দক্ষতার তুঙ্গে উপনীত হয়েছেন। আর তাঁর প্রতিরক্ষামূলক কৌশল নেই, কেবলমাত্র তিনি গতি ও পায়ের দ্রুততাল ভেলকীর ওপর নির্ভরশীল নন। এ এক বিপুল আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বিজিতদ্বিধা ভয়ঙ্কর যোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে।

কিন্তু যোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লের চেয়েও বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে সম্প্রতিকালের পরিবর্তিত মানুষ ক্যাসিয়াস ক্লে। সনি লিস্টনকে পরাভূত করবার আগে যে দম্ভী, দর্পী, উচ্চ কর্কশভাষ ক্যাসিয়াস ক্লে-কে জগৎ চিনতো তার সঙ্গে ধর্ম ও নামান্তরিত জগতজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলীর ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য খুবই কম। তাই লন্ডনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের ফলাফল যখন প্রায় সকলের কাছেই পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত তখন তিনি আশ্চর্য নম্রতার সঙ্গে বলেছেন, 'বিশ্বজয়ীর খেতাব সর্বদাই বিপদাপন্ন। প্রত্যেক মানুষেরই জেতবার সম্ভবনা আছে। এ এক মারাত্মক খেলা।'

পরাভবের পর লন্ডন ক্লে-কে অন্তরের প্রশস্তি জানিয়ে বলেন, "তুমিই শ্রেষ্ঠতম। তোমার দাবীই সত্য। তুমি নিজেকে যত বড় বলো তুমি তত বড়ই, আর তার চেয়েও বেশি কিছু। তোমাকে যে আরো ভালো লড়াই আমি দিতে পারিনি তার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি সর্ব বিষয়ে তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।'

ওদিকে ক্লেও তার পর্যুদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশ্যে লড়াই খতমের কয়েক মুহূর্তেই মধ্যে রিংয়ে দাঁড়িয়ে বলেন যে, লন্ডন ভদ্রজনোচিতভাবে খেলেছেন। তাঁর মারগুলির কোন গলদ ছিল না। তারপর উত্তেজনা-উন্মত্ত জনতার মধ্যে দিয়ে অবসর গ্রহণের পথে লন্ডনের সুন্দরী স্ত্রী ভেরোনিকার দুই গালে সস্নেহে চুম্বন করে ক্লে বলেন, 'ও ওর যথাসাধ্য লড়েছে।'

দুর্বোধ্য ক্লে!

এই লড়াইয়ের এগারো সপ্তাহ আগে ক্লে যখন ঐ একই রিংয়ে তাঁর বিশ্বজয়ী খেতাব রক্ষার জন্যে আরেকজন ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী হেনরী কুপারকে পরাস্ত করেন তখনো তাঁর ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত মাধুর্যে বিস্মিত সাংবাদিকরা তাঁকে তাঁর চারিত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে নানাকথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন যে, অপরকে দুঃখ দিয়ে তিনি জয়ী হতে চান না। কুপারকে মর্মান্তিকভাবে আঘাত করে তাঁর স্ত্রীর মনে গভীর বেদনা দেওয়ার চেয়ে তিনি পরাভব স্বীকারকে শ্রেয়তর মনে করেন।

তবে বিগত দিনে তাঁর নির্মম ও কঠিন কঠোর সব বাক্যবাণ ও আস্ফালনগুলি কি ছিল? —ক্লে অম্লান বদনে তার উত্তরে বলেছেন, সে সবই ছিল এক ধরনের উগ্র অভিনয়, নিছক প্রচার-কৌশল!

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ক্লের অন্তর্জ্বালা তীব্র হবার কি কোন কারণই নেই? —তিন বছর আগে আমেরিকার একটি জাতীয় পত্রিকায় একজন লেখক লেখেন যে, ক্লে শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করেন। —ক্লে-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি কাউকে খুন করে ঝোপঝাড়ে লুকোইনি। আমি কোন ব্যক্তিকে কিম্বা গীর্জাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিইনি। আমরাই ঘৃণা বা বর্ণবৈরীতার শিকার। আমি মনে করি জগতের সামনে কোন নিগ্রোকে সে ঘৃণা করে কিনা—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মূর্খামি। আমার মত কোন লোক যদি কোন কিছুকে ঘৃণা করে তা হলে সে ন্যায্য কাজই করবে। কারণ সে যে ব্যবহার পাচ্ছে তাকেই সে ঘৃণা করছে।

'আর সেই জন্যেই আমি ঘৃণা করি—আমার প্রতি যে ব্যবহার করা হয় তাকে আমি ঘৃণা করি। জেমস ম্যারিডিথের মত লোক যখন পথে পথে প্রেমের প্রচারে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হন তখন তা দেখলে আমি ঘৃণা করি। মানুষকে গুলিবিদ্ধ ও প্রহৃত হতে দেখলে ঘৃণা করি। আর আমার সে ঘৃণা অন্যায় নয়।'

এরপরে প্রশ্নকর্তা মন্তব্য করেন, 'রিংয়ে আপনি যতখানি সক্ষম, রিংয়ের বাইরে ততখানিই অক্ষম, কারণ আপনি নিগ্রোদের জন্যে লড়ছেন না।'

ক্লে উত্তর দেন, 'আমি নিশ্চয় লড়ে চলেছি। আমি কালো মানুষদের জন্যে লড়ছি, নিগ্রোদের জন্যে নয়। কারণ নিগ্রো বলে কিছু নেই। আমি কালো মানুষের অধিকার, তার রুটি তার স্বদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়ে চলেছি।'

তিন বছর পরে ক্লে তার মত বহুল পরিমাণে সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। কিন্তু মূলত বদলাননি। গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক-হেরাল্ড ট্রিবিউনের একটি সাক্ষাৎকারের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি আমেরিকার এমন একটি সম্প্রদায়ের লোক যাদের সংখ্যা তিন কোটি। সেই তিন কোটি লোকের সকলেই স্বাধীনতা, ন্যায় ও সমানাধিকারের জন্যে লড়াই করছে। আর এখানে এই আমি, জগতের হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ক্লে আমি আমার নিজ সম্প্রদায় যেভাবে স্বাধীনতা, ন্যায় ও সাম্যের জন্যে সংগ্রাম করছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নই।

'আমি বিশ্বাস করি সম্মান পেতে হলে নিজেদের সম্মান করতে শিখতে হবে। নিজেদের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং নিজেদের কিছু করতে হবে। আমাদের সর্বপ্রথম পৃথক হতে হবে তারপর নিজেদের একটা সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।'

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি জানেন যে আপনার অনুগামীদের অনেকে আপনার এই মতের বিরোধী?'

ক্লে উত্তর দেন, 'না, তারা সবাই সত্যিই সত্যিই এইভাবেই ভাবে। তবে আমি যে দুঃসাহসের সঙ্গে স্পষ্ট করে কথাগুলি বলি, তারা তার বিরোধী।'

শেষাংশে প্রশ্নকর্তাই ঠিক। আমেরিকার শ্রদ্ধেয় নিগ্রো নেতারা স্বতন্ত্রতাবাদী বা নিগ্রোস্থানের আন্দোলনকারী নন। কারণ তাতে সমস্যার সমাধান নেই। তাঁরা আমেরিকার সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই নিগ্রো সম্প্রদায়ের ন্যায্যাধিকার চান। তবু ক্যাসিয়াস ক্লের আচরণের অদ্ভুত ও বেখাপ্পা উগ্রতার মর্ম বুঝতে হলে উপরোক্ত আলোচনাটি অনুধাবনযোগ্য।

প্রেম বিভ্রাট

ক্যাসিয়াস ক্লে শুধু জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানই নন, তিনি অসাধারণ সুপুরুষও বটে। অতএব এমন এক পুরুষোত্তমের জন্যে দুনিয়ার দেশে দেশে প্রণয়ার্থিণীর ভীড় লেগে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

ইতিপূর্বে ক্লে সনজা নামে এক লাবণ্যময়ী কৃষ্ণকলিকে বিয়ে করেন। কিন্তু ক্লের মত এক দুরন্ত স্বামীকে বেঁধে রাখা সনজার পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই

ব্রায়ান লণ্ডনের পতন

গত বছর জানুয়ারী মাসে সনজার সঙ্গে ক্লের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সনজা আবার যতদিন না বিয়ে করছেন ততদিন ক্লে-কে বছরে ৫,৩০০ পাউণ্ড করে খেসারৎ দিতে হবে। ক্লে অসম্ভব অমিত-ব্যয়ী, ব্ল্যাক মুশ্লিম দলের তহবিলে দানে তিনি মুক্তহস্ত। তাছাড়া পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, মোসাহেব (যার মধ্যে আছে তার মেজাজ খুশ রাখবার জন্যে একজন ভাঁড়) প্রভৃতির জন্যেও তাঁর ব্যয় যথেষ্ট।

তবুও ক্যাসিয়াস ক্লে অমূল্য। যখনই তিনি যে দেশে যান তখনই তাকে ঘিরে নানা জাতের ও নানা ধরনের মেয়েরা ভিড় করে। ক্যাসিয়াস তাঁর সংক্ষিপ্ত অবসরের মধ্যেও তাঁদের সাধ্যমত আপ্যায়ন করেন, উপহার দেন। এ পর্যন্ত তা কিন্তু সমষ্টিগত সংলাপেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, ব্যক্তিগত সংযোগে পৌঁছোয়নি। ব্যতিক্রম ঘটেছে এবার।

ব্রায়ান লণ্ডনকে পরাভূত করার পরের দিনই লণ্ডনের বিচিত্রখ্যাত নাইটক্লাব পল্লী সোহোর এক বিংশতী বর্ষীয়া লাস্য-ময়ী কৃষ্ণাঙ্গী স্ট্রিপটিজ নর্তকী ডন হ্যারিসন মহম্মদ আলীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রণয়ের কথা ঘোষণা করে সংবাদ-পত্রের পাতায় ঝলক দিয়ে উঠলেন। অনামিকায় একটি বৃহৎ হীরে বসানো প্ল্যাটিনামের আংটির চমক জাগিয়ে বল্লেন যে, সেটি অঙ্গীকার অঙ্গুরী নয় বটে, তবে তা মহম্মদের ভালোবাসার দান।

তাঁর কাহিনী অনুযায়ী মুষ্টি-দ্বন্দ্বের পাঁচ দিন আগে মহম্মদের সঙ্গে তাঁর দেখা হতে মহম্মদ বলেন, 'তুমি সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা'। তারপর তাঁকে তিনি সিনেমায় নিয়ে যেতে চান। ডন যেতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরের দিন সকালে তিনি মহম্মদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ করতে যান এবং তদবধি প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

মহম্মদের প্রেমের মহিমায় ইতিমধ্যেই তিনি বৃটেনের ব্ল্যাক মুশ্লিমদের নেতা ম্যালকম এক্সের কাছে ইসলাম শাস্ত্র পাঠ শুরু করেছেন এবং প্রেমের জন্যে তিনি তাঁর নিজস্ব ধর্ম ক্যাথলিকবাদ ত্যাগ করতে রাজি আছেন। প্রকাশ, ক্লে ডন ও তাঁর মাকে আর্লস কোর্টের যুদ্ধে দুটি ছ গিনি দামের টিকিট কিনে দেন।

অবশ্য কোন প্রেমের কাহিনীই ত্রিভুজ না হলে জমে না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ডনের প্রেমের কাহিনী প্রকাশ পাবার সঙ্গেই জানা গেল শিকাগো থেকে জেনেট ফাউচার নামে আরেক কৃষ্ণাঙ্গিণী উড়ে এসে গভর্নর হোটেলের এক জমকালো সুইটে মহম্মদের জন্যে প্রেমের জাল পেতে বসে আছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে চ্যাম্পিয়ান তাঁর পাণিগ্রহণ করত চাইলেই তিনি তা দিতে রাজি হবেন।

জেনেটের কথা শুনে বক্র হেসে ডন বলেছেন, 'ও ভাবছে ঐ বুঝি চ্যাম্পিয়ান-চিত্ত-বিজয়িণী। কিন্তু সে এক মহা ভুল করেছে। আমি শুনেছি যে ও চ্যাম্পিয়ানের সঙ্গে বৃটেনে আসবার জন্যে তার সব টাকা খরচ করে বসে আছে। হায়! টাকাটার সবটাই অপচয় হয়েছে।'

জেনেট তার পাল্টা দিয়েছে, 'ঐ মেয়েটার সব কথাই ধাপ্পা। অনুশীলনের সময় ক্যাসিয়াস কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না।'

লণ্ডন ছাড়বার আগে বিমানবন্দরে ক্লে-কে কাগজে পল্লবিত প্রণয় কাহিনীর সত্যতা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'কত মেয়েই তো আসতো,—ইংরেজ, মিশরী, আফ্রিকান, আমেরিকান, ইরাণী, ইরাকী, ফরাসী, ইতালী, জার্মান! সাদা-কালো-বাদামী। ঠিক কোন মেয়েটার কথা আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন?'
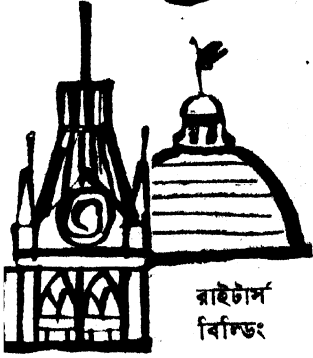
লালদীঘির দক্ষিণ পাড়ের লাল বাড়ীটির ইতিহাস অনেক দিনের।

রাইটার্স বিল্ডিং ইংরেজের ভারত শাসনের এক জ্বলন্ত সাক্ষী। এই বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া সেই সব দিনগুলিকে। এখানে বসেই একদিন বাঙলা দেশের ভাগ্যের অনেক দিক-নির্দেশ করেছিলেন ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরা। বাঙলার সম্পদ গেছে বিদেশে। লাল বাড়ীর ইমারত শক্ত হয়েছে দিনকে দিন। বাঙলা দেশের কত মানুষ অসহায় হয়ে গিয়েছে এখানে থেকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্ত ঝরেছে এখানে। ইংরেজের শক্তি বেড়েছে, তাদের দম্ভ গড়ে উঠছে—এই বাড়ীটির চারপাশ ঘিরে এর আরও অনেককিছু আছে—কিন্তু সব কথা বলতে গেলে সে এক ইতিহাস।

তরুণ ইংরেজরা এদেশে এসে ঘর চায়, বাড়ী চায়। থাকবার আবাস স্থান কৈ। টমাস লিয়নকে লালদীঘির পাড়ের এই জমিটা পাট্টা দেয় কোম্পানী। ১৭৭৬ খৃঃ ১৮ নভেম্বর রাইটারদের আবসগৃহ রাইটার্স বিল্ডিং তৈরী হল। তিনশ' টাকার কম মাইনে যাদের তারা এখানে থাকবে। চাকর, গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়া, খাওয়া সব মিলিয়ে ইংরেজ ছোকরারা কম পয়সা পেত না কোম্পানী থেকে। সব বন্ধ হয়ে গেল। নিয়ম হল সব মিলিয়ে একশ টাকা পাওয়া যাবে এই সমস্ত খরচের জন্য।

কিন্তু এতেও কি ঘাবড়ায় তারা। উপায়ের পথ তো অনেক। খরচের পথেরও শেষ নেই। কোম্পানী ভাবনায় পড়ল। রাইটার্স বিল্ডিং-এর রাইটার্স কোয়ার্টার নাচ-গান হৈ-হুল্লোড়ের আসর হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে কোম্পানী নিয়ম করল—দুজনের চাকর এবং বাবুর্চির বেশী চাকর-বাকর রাখা চলবে না। সাধারণ পোশাক আশাক ব্যবহার করতে হবে। ঘোড়া এবং বাগান-বাড়ী রাখা বেআইনী। রাইটারদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয় নি এর জন্য। কিছু-কাল অপেক্ষা করে তিনশ' টাকার ওপর মাইনে হলেই চলে এসেছে সাহেব পাড়ায়।
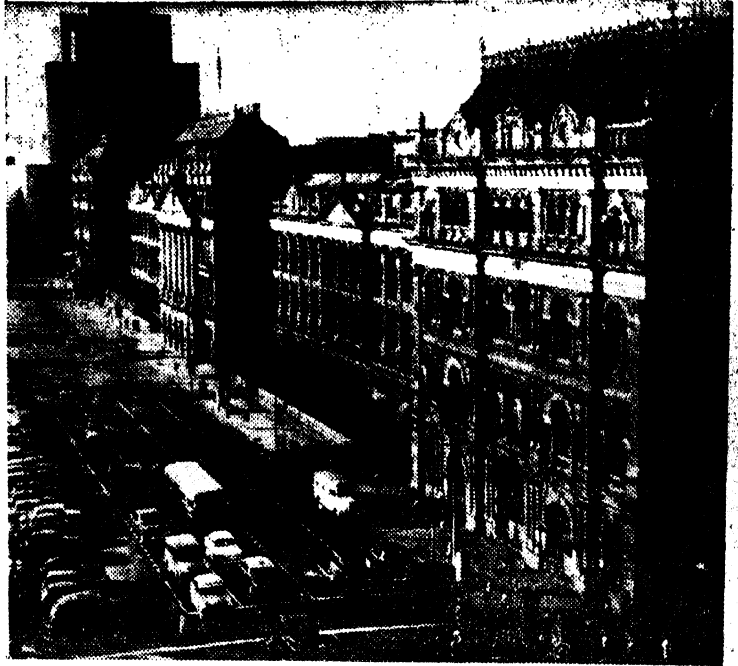
রাইটার্স বিল্ডিং — ফটো : অমৃত

কলকাতার প্রথম রাইটার্স বিল্ডিং তৈরী হয়েছিল ১৬৯০ খৃঃ। কাদা আর হোগলা দিয়ে তৈরী হয়েছিল সেই বাড়ীটা। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সে পুরনো অধ্যায়। তারপর আবার ১৭১৬ খৃঃ তৈরী হয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিং পুরোন ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে। সেখানে এখন তৈরী হয়েছে জেনারেল পোস্ট অফিস আর ফেয়ার্লি প্লেস। এই ফেয়ার্লি প্লেসেই হল ইস্টার্ণ রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার।

বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংটি তৈরী শেষ হয় ১৭৮০ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জুনিয়ার রাইটার এবং ক্লার্কদের বাসস্থান ছিল এই বাড়ীটি। বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বন্ধু মিঃ রিচার্ড বারওয়েল এই বাড়ীটির মালিক ছিলেন। পরে বারওয়েলের সন্তানদের পক্ষে একটি ট্রাস্টী বোর্ডের হাতে বাড়ীটি অর্পণ করা হয়। পাঁচ বৎসরের জন্য কোম্পানীকে বাড়ীটি লীজ দেওয়া হয়। উনিশটি ব্লক ছিল এখানে। এক একটি ব্লকের ভাড়া ছিল ২০০ আর্কট টাকা।

ইংরেজ রাইটাররা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং আনন্দানুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র করে তুলেছিলেন এই বাড়ীটিকে। দেশের অবাধ্য সন্তানদের বিদেশে এনে বাধ্য করা একটি বৃহৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কোম্পানী কর্তৃপক্ষের। এর জন্য বিভিন্ন সময়ে নানান নির্দেশও আসত বিলেত
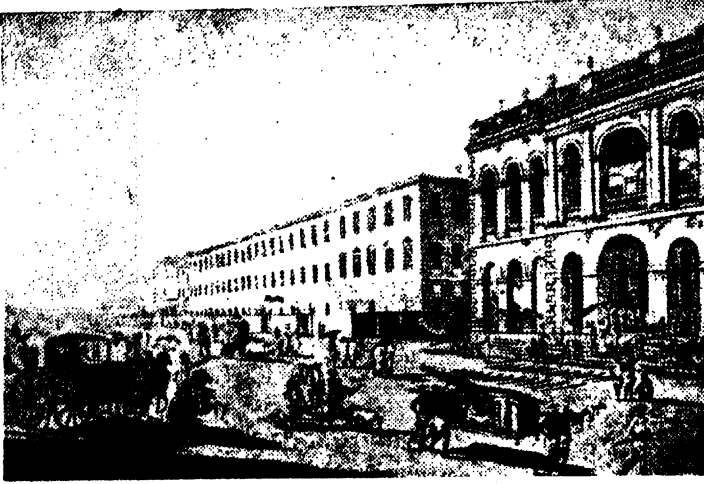
টমাস ডানিয়েলের আঁকা মেয়রস কোর্ট ও রাইটার্স বিল্ডিং ১৭৮৬

থেকে। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হত না।

১৮৩৬ খৃঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক রাইটার্স বিল্ডিং-এ ব্যক্তিগত বাবসা এবং ইচ্ছানুসারে ব্যবহার পরিবর্তন করেন। ১৮৭৭—১৮৮২ খৃঃ লেঃ গভর্ণর স্যার অ্যাসলি ইডেন রাইটার্স বিল্ডিংএ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রাণকেন্দ্র স্থাপন করেন। এটি হল রাইটার্স বিল্ডিং-এর তৃতীয় অধ্যায়।

বর্তমান বাড়ীটি ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে ২৩৫ গজ চওড়া এবং মোট তেরটি চারতলা বাড়ীর সমষ্টি। এক হাজারটি ঘর আছে এখানে। মোট ২·৮ একর জমির ওপর অবস্থিত। দশ একর হল মেঝের ভূমির পরিমাপ।

রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঘর সংখ্যা এক হাজার। প্রায় ছয় হাজার লোক কাজ করে এখানে। ছেচল্লিশটি ভেতরের এবং তেত্রিশটি বাইরের লাইন সমেত টেলিফোনের মোট জংশন লাইন আছে উনআশীটি। ৬০০ এক্সটেনশন লাইন আছে। বাড়ীটি সরকারী তত্ত্বাবধানে আছে। প্রায় তিন হাজার কল আসে প্রতিদিন। এর মধ্যে এক হাজার আভ্যন্তরীণ কল হয়। একটা ছোট-খাট শহরের অবস্থা।

সেন্ট্রাল ডেসপাচ অফিস থেকে প্রায় পনেরো হাজার জিনিসপত্র প্রতিদিন পোস্টে বা পিওনের দ্বারা প্রতিদিন বিলি হয়। দৈনিক পোস্ট খরচ দেড় হাজার টাকা। নিজস্ব পোস্ট অফিস আছে এখানে। সেটি যে কোন সাধারণ পোস্ট অফিসের মত ব্যস্ত থাকে সব সময়।

ছয়টি ক্যান্টিন আছে রাইটার্স বিল্ডিং-এ। ভীড় হয় বাইরের যে কোন রেস্টুরেন্ট থেকে বেশী। এখানকার ১৮৬৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত সেক্রেটারীয়েট লাইব্রেরীতে আছে ১০০,০০০ বই। আইন, শাসনব্যবস্থা ইতিহাস সংক্রান্ত মূল্যবান বই আছে লাইব্রেরীতে।

এখানে আছে একটি রেকর্ড অফিস। ১৭৫৮ খৃঃ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ল' অ্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড এবং ১৮৩৪ খৃঃ থেকে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সমস্ত রেকর্ড আছে।

১৮৫৭ খৃঃ পূর্ববর্তী রেকর্ড ১১,০০০ খন্ড এবং ১০,০০০ বান্ডিল, ১৮৫৭ খৃঃ পরবর্তী ৭,০০০ খন্ড এবং ৬,০০০ বান্ডিল আছে রেকর্ড রুমে। বহু মূল্যবান রেকর্ড আছে। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সই-করা সরকারী নথিপত্র আছে এর মধ্যে। এখানকার সমস্ত বিভাগ সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত নয়।

রাইটার্স বিল্ডিং ঃ বাঁ দিকে হলওয়েল মনুমেন্ট

নিউ সেক্রেটারিয়েট

স্থাপত্যকলার দিক থেকে নিউ সেক্রেটারীয়েট কলকাতার একটি বিশেষ আকর্ষণ। হুগলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এই বাড়ীটি। ১৯৫৪ খৃঃ নির্মাণ শেষ হয়। তখন বাঙলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাড়ীটির অভ্যন্তর ভাগও আকর্ষণীয়। ঘরের মেঝেগুলি মনোরম। বিশেষ অতিথিদের বসবার ঘরটির শিল্প-কাজ দর্শনীয়।

পরবর্তী সংখ্যায়
কালীঘাটের কালীমন্দির

হেস্টিংস স্ট্রীট এবং স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই বাড়ীটিতে আছে দুটি ব্লক। ব্লক এ হল তেরোতলা এবং ১৯৫ ফুট উঁচু। ব্লক বি ছয়তলা। ব্লক এ ২৭২ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৬০ ফুট চওড়া। মোট অফিস আয়তন হল ১৪৩,২৭০ বর্গফুট। ব্লক বি-এর দৈর্ঘ্য ১০৮ ফুট ৬০ ফুট চওড়া। অফিসের মোট আয়তন হল ২৬,৫০৭ বর্গফুট।

অ্যাসেম্ব্লি হাউস

নিউ সেক্রেটারীয়েটকে রেখে স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে এগিয়ে গেলে পড়বে অ্যাসেম্ব্লি হাউস।

অ্যাসেমব্লি হাউস ফটো : অমৃত
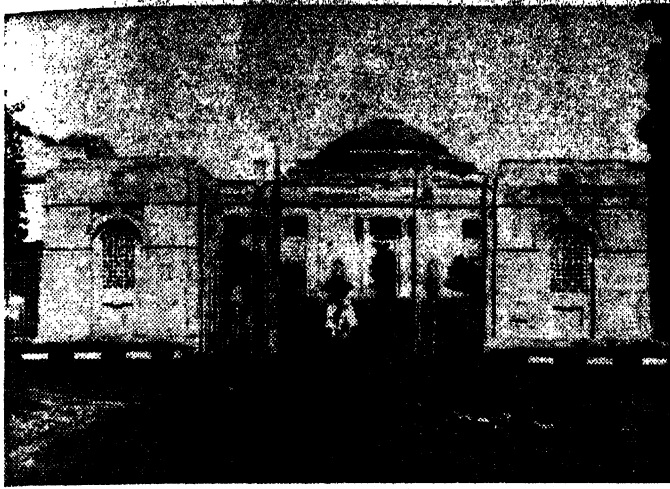
পশ্চিমবঙ্গের লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অধিবেশন বসে এখানে।

বর্তমান অ্যাসেমব্লি হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯২৮ খৃঃ জুলাই মাসে। ১৯৩২ খৃঃ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের স্থানীয় আবাসগৃহ হয় এটি।

সম্প্রতি এখানে যে টেপ রেকর্ডারটি স্থাপন করা হয়েছে তার ফলে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সুখ-সুবিধা হয়েছে। ভারতবর্ষে একমাত্র এখানেই এই ব্যবস্থা আছে। এখানে আছে অটোমেটিক ভোট রেকর্ডার। ২.২৫ লক্ষ খরচ পড়েছিল এর জন্যে। এই আধুনিক ব্যবস্থা একমাত্র পার্লামেন্ট ব্যতীত এশিয়ার অন্য কোন লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে নেই।

এখানে তিনশত মেম্বারের আসন আছে। দুই সভার অধিবেশন প্রয়োজনবোধে একসঙ্গে বসবারও ব্যবস্থা আছে।

এখানকার লাইব্রেরীতে আছে ৩০ হাজার বই। রেস্টুরেন্ট ও একটি প্রশস্ত লাউঞ্জ আছে।

প্রতি বৎসর হাউসের গার্ডেনে ফুলের প্রদর্শনী হয়। দর্শনীয় মনোরম।

রাজভবন

১৭৯৮ খৃঃ ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন মার্কুইস অফ ওয়েলেসলী। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজকে রাজশক্তিরূপে দেখতে। এই রাজশক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দেশ শাসন করবে। ইংরেজ ব্যবসায়ীরূপে কেবলমাত্র এদেশে পরিচিত হবে না। ক্যাপ্টেন ওয়াটলয়ে নামে একজন ইঞ্জিনীয়ারকে তিনি নির্দেশ দেন একটি বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা রচনার জন্যে। বাড়ীটির স্থাপত্য এবং আভিজাত্য হবে বৃটিশ শক্তির প্রাচুর্যমণ্ডিত। ডার্বিশায়ারের মেডলেসটন হলের আদর্শে গভর্নর হাউস নির্মিত হবে। অবশ্য এর জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের নির্দেশ নেওয়া হয় নি।

গভর্নর হাউস ১৭৯৯ খৃঃ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। এই বৎসরই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৮০৩ খৃঃ নির্মাণ শেষ হয়। মোট খরচ পড়েছিল ২৪ লক্ষ টাকা।

গভর্নর হাউস থেকে সমগ্র ভারত শাসিত হত। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত গভর্নর হাউসের গুরুত্ব ছিল সব থেকে বেশী।

বর্তমানে পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপালের বাসভবন এই গভর্নর হাউস। স্বাধীনতালাভের পর রাজাগোপালাচারী পশ্চিম বাঙলার গভর্নর হন। তারপর ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গভর্নর হন। বর্তমান গভর্নর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

রাজভবনের মধ্যে অনেকগুলি সুপ্রশস্ত ঘর আছে। এখানকার কাউন্সিল চেম্বারে শতাব্দীব্যাপী গভর্নর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভা বসত। উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রিন্স অফ ওয়েলস সুইট বড় বড় ছয়টি ঘরে ১৯২১ খৃঃ ডিউক অফ উইণ্ডসোর বাস করতেন। তৃতীয় তলার ডাফরিন সুইটে নির্দিষ্ট অতিথিদের সম্বর্ধনা জানান হত।

তাছাড়া আছে ওয়েলেসলী এবং হেস্টিংস সুইট। কেন্দ্রস্থলের বলরুমই এখন লাইব্রেরী। এখন আর এই সমস্ত সুইটের জমকাল নাম নেই। লর্ড কার্জন, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড ডালহৌসী, লর্ড ডাফরিন, লর্ড ল্যান্সডাউন এক সময় এখানে বাস করে গেছেন।

৩০ একর জমির ওপর অবস্থিত ১৩৭টি ঘর আছে।

সাধারণ দর্শকদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

নিউ সেক্রেটারিয়েট ফটো : অমৃত

খাই—ষোল আনা তৃপ্তি চাই !
ইন্টারভ্যালের সময়
১ —আরে অশোক যে ! সিনেমায় এলেই কি তোমার সঙ্গ দেখা হবে ?
—যা বলেছ ! আর আমার ঘাড়ে এক কাপ ক'রে চায়ের খরচা
—তাছাড়া সিজার্স তো আছেই।
২ —ভয় নেই বৎস, এবার আমিই সিজার্স বার করছি । আজকাল আমি সিজার্স ছাড়া খাচ্ছি না—বুঝলে ?
৩ —যাক্, এতদিনে সদ্‌বুদ্ধি হয়েছে । কিন্তু কি কারণ সিজার্স ধরলে বল তো ?
—কারণ আর কি—তোমার মন্ত্রণা । ঠাট্টা না—আমিও দেখেছি, সিজার্সে সত্যিকারের তৃপ্তি পাওয়া যায় । সিজার্সের স্বাদই আলাদা, অন্য কোনো সিগারেট এর কাছে লাগে না ।
W.D. & H.O. WILLS
SCISSORS
৩৮ পয়সায় ১০টি
সিজার্স-এর
স্বাদই আলাদা—
সব সময় তৃপ্তি দেয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু সংকল্প এক, বাস্তব আর।

সংকল্প যত অটুট হোক, বাস্তবের রূপে আঘাত যেখানে এসে লাগে, সেখান থেকে রক্ত ঝরে।

একটানা নীরবতার মধ্যে কেটেছে দুপুর অর প্রায় বিকেলও। এই স্তব্ধতা ক্রমে থিতিয়েছে, ক্রমে ভারী হয়েছে। ভারী হয়ে হয়ে বাতাস ভারী করেছে। জ্যোতিরানী তীক্ষ্ম সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন আসতে-যেতে বিশেষ করে কালীদাকে করেছেন। প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে অনুকূল মনোভাব মালিকের এই শহর মুহূর্তে ব্যক্ত করা হয়ে গেছে সেটা যেন মুখ দেখেই বুঝে নিতে চন তিনি।

বোঝা যায়নি।

বিকেল না হতে পাশের ঘরের মানুষ ফিরেছে। ঘুরে-ফিরে জ্যোতিরানীর দরজার ভারী পরদা থেকে ফিরে ফিরে ছে। আজও রাত্রিতে তাঁর ঘরে পা কিনা তিনি জানেন না। পড়েও যদি এই ক'দিনের মত হবে না, ঘরে নীল জ্বলবে না। আসেও যদি, অশান্ত তাঁর সত্তার ওপর উদ্‌ভ্রান্ত হানার তাড়না নিয়ে আসবে। জ্যোতিরানী অনভ্যস্ত নন। কিন্তু প্রতীক্ষায় থাকবেন না তিনি। কারণ অবকাশ জ্যোতিরানীর অবকাশ নয়। অনেক আগে ওই ভারী পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকবেন জ্যোতিরানী নিজেই। জোরের ওপর মিত্রদির আস্থা, আর দরুন নিজেও কৃতজ্ঞ তিনি— সব রকমে সংশয়মুক্ত করে নিতে চান। সঙ্কল্পটা খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে রাখতে চান। সকালে ওভাবে শাসানো হয়েছে বলেই তাঁর সংকল্প সম্পর্কে আর কোনো অস্পষ্টতার মধ্যে রাখতে চান না এই একজনকে অন্তত। তাই রাতের প্রতীক্ষায় থাকবেন না জ্যোতিরানী। অন্ধকারের অন্ধ প্রবৃত্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দরবার চলে না।

কিন্তু সংকল্প এক, বাস্তব আর।

সন্ধ্যে পার হতেই নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, কাগজ-ফাইল-দলিলপত্র বগলদাবা করে কালীদা আসছেন এদিকে। না, তাঁর কাছে নয়, তাঁর ঘরেও নয়। পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন কালীদা। জ্যোতিরানী গম্ভীর মুখই দেখলেন বটে তাঁর, কিন্তু চোখে নীরব কৌতুকও যে দেখেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

...দাঁড়িয়ে শুনবেন কি কথা হয়? একটা বাজে খেয়ালে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা অপব্যয় হতে যাচ্ছে, কোন্ সূত্রে সে-খবরটা জানিয়ে তাতিয়ে তোলার ইন্ধন জোগান কালীদা—শুনবেন দাঁড়িয়ে? দরকার নেই। জ্যোতিরানী ঘরে চলে এলেন। যেমন করে খুশি বলুক, তাঁর সংকল্পে কোনো দ্বিধার জায়গা নেই, তার এই জোরটার সঙ্গে কোনো কিছুর আপস নেই।

কিন্তু তিনি চান না চান চলে আসার পরেও কানদুটো সজাগ। আরো সজাগ কারণ, দেয়ালের ও-ধার থেকেও একটাই অসহিষ্ণু ভারী গলা কানে আসছে। সেই গলা কালীদার নয়। শয্যায় বসে থাকা সম্ভব হল না খানিকক্ষণের মধ্যে। ওই ভারী গলা চড়তেই লাগল। ক্রুদ্ধ গর্জন আর হুংকারে ফেটে ফেটে পড়তে লাগল। জ্যোতিরানী নিষ্পন্দের মত দাঁড়িয়ে খানিক। হতচকিত যেন। এই মর্মান্তিক আক্রোশ, এই হুংকার তর্জন-গর্জন কার ওপর?

পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন আবার। নিজের অগোচরেই বুঝি পাশের ঘরের দরজার সামনে এলেন। পরমুহূর্তে স্তব্ধ।

—আমি জানতে চাই কার হুকুমে তুমি পাস-বই চেক-বই বাড়ির দলিলপত্র সব বার করে দিয়েছ? কার হুকুমে দিয়েছ?

কালীদার মৃদু জবাব, তোর বউ চাইলে না দিয়ে কি করব?

—বউ চাক আর বউয়ের বাবা চাক, তুমি দেবে কেন? তোমাকে আমি বারণ করে দিয়েছিলাম না? অমন সুন্দর মুখ তোমাদের বউয়ের, চাইলে আর অমনি তুমি সব হাতে তুলে দিলে, কেমন? কেন তুমি আমাকে ট্রাংক-কলে জিজ্ঞাসা করে নিলে না দেবে কিনা? আবার জানাতে এসেছ ওর থেকে জ্যোতি আড়াই লক্ষ-তিন লক্ষ টাকা নেবে. আর ওই বাড়িটা—আড়াই-তিন লক্ষ টাকা আর ওই বাড়ি তোমার হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যায়, না?

আবারও মৃদু শান্ত জবাব কালীদার, আমার না যাক তোর যেতে পারে—ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা যে-রকম বাড়ছে, ওই গোছের কোনো চ্যারিটি ইউনিটে কিছু টাকা সরিয়ে দিলে হাঙ্গামাও কিছু বাঁচবে, তুই টেরও পাবি না কি গেল না গেল।

আবার সেই ক্ষিপ্ত গর্জন টাকার মালিকের।—তোমার এই বক্তৃতা আমি শুনতে চাই না! আমি দশগুণ ইনকাম ট্যাক্স ঢালব তাতে তোমার কি? আমি জানতে চাই কেন দেবে? কেন তোমার এত স্পর্ধা হবে?

হাতে করে কখন পরদা ঠেলে সরিয়েছেন জ্যোতিরানী জানেন না। চৌকাঠ পেরিয়ে

ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। টাকার এই মেজাজও আর কি দেখেছেন তিনি? এত বীভৎস এত কঠিন এত বিকৃত রোষে এ-ভাবেও কেউ অপমান করতে পারে কাউকে? কিন্তু আশ্চর্য, কালীদার মুখে এত বড় অপমানেরও বড় গোছের ছাপ কিছু পড়েনি। মানুষটা ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, আর কালীদা সামনে বসে চুপচাপ। কালীদা জাঙানি দেবেন ধরে নিয়েছিলেন, তা দেননি। কিন্তু এই সহিষ্ণুতারই বা কি রূপ। এরই নাম দাসত্ব? যে-চাকরির মায়ার কথা ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন সেদিন—সেই মায়া?

তাঁকে দেখা-মাত্র রুদ্ধ আক্রোশে থমকে দাঁড়ালেন শিবেশ্বর। দু'চোখের একটা আগুনের ঝাপটা এসে লাগল জ্যোতিরানীর মুখে। কালীদাও ঘাড় ফেরালেন। তার-পরেও কোনো অনুভূতির প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না মুখে। নির্লিপ্ত আহ্বান জানালেন, এসো জ্যোতি এসো—শিবুর ধারণা আমি মারাত্মক রকমের একটা অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলেছি, এখন ওর বক্তব্য শোনো আর কি বোঝাবে বোঝাও—আমি উঠি।

—শোনো! শিবেশ্বরের হুঙ্কারে কালীদা চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়িয়ে গেলেন।—আমি কারো কোনো কথা শুনতেও চাই না বুঝতেও চাই না। চেক-বই পাস-বই দলিল সব তোমার জিম্মায় ছিল—সে-সব যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক কাল তুমি আমাকে একটি একটি করে বুঝিয়ে ফেরত দেবে! কে নিয়েছে না নিয়েছে আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। কালকের মধ্যেই সে-সব আমার চাই মনে থাকে যেন। আমি না বললে, কারো কোনো খেয়াল মেটাবার জন্য আমার একটা পয়সা খরচ হবে না সেটা আজ শেষবারের মত তুমি বেশ ভালো করে বুঝে নিয়ে যাও—আমার টাকা দাতব্য করার জন্যে আমি তোমাকে এ-কাজে বসাইনি মনে রেখো।

জবাবে নির্লিপ্ত দৃষ্টিটা কালীনাথ শিবেশ্বরের মুখের ওপর থেকে ফিরিয়ে জ্যোতিরানীর মুখের ওপর বসালেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর একটি কথাও না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সরোষ পায়চারীতে বাধা পড়ল শিবেশ্বরের। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জ্যোতিরানী তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। শোনার জন্য আর তারপর হিংস্র আঘাত হানার জন্য শিবেশ্বরও প্রস্তুত। কিন্তু কিছু বলার আগে দেখছেন জ্যোতিরানী শুধু দেখছেন। চোখের গল-গলে আগুন দেখছেন, মুখের কঠিন টানা-টানা রেখাগুলো দেখছেন, প্রস্তুতি দেখছেন। এই আক্রোশ সেই অন্ধকারের আক্রোশ, দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে নারীসত্তা গ্রাসের সেই তিমির আক্রোশ।

কিন্তু এও দেখা আছে, জানা আছে। খুব ধীর ঠাণ্ডা সুরে জ্যোতিরানী জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ খেয়াল মেটাবার জন্যে আমার টাকার দরকার, ভালো করে জেনেছ?

চাপা শ্লেষ ঝরল শিবেশ্বরের গলায়, কেন? আমার জানার কি দরকার?

—জানলে বুঝতে পারতে এটা কোনো খেয়াল নয়।

দাঁতে দাঁত ঘষে শিবেশ্বর জবাব দিলেন, আমি কি-ছু জানতে চাই না, কি-ছু বুঝতে চাই না—আমার হুকুম ছাড়া আমার একটি পয়সা কোনো কিছুতে খরচ হবে না।

—হুকুম দাও তাহলে। টাকা আমার দরকার।

—টাকা তোমার দরকার! হুকুমটা তাহলে তুমিই দিচ্ছ? রক্তবর্ণ মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠছে আবার, তোমার ওই রূপ নিয়ে আর যার কাছে খুশি দাঁড়াওগে যাও, এখানে নয়। আমার খুব ভালো চেনা আছে, এখানে এক পয়সাও হবে না, তুমি আদর্শ নিয়ে মেতে উঠবে আমি তা হতে দেব না দেব না! বুঝলে?

—ঠেকাবে কি করে?

—কি? কি বললে?

—বললাম, ঠেকাবে কি করে? সকলে তোমাকে বুদ্ধিমান বলে, কালীদাকে এ-ভাবে অপমান করলে কেন? ব্যাঙ্কে আমার নামে টাকা, আমার সইয়ে টাকা ওঠে—বাড়ির দলিলে আমার সই, আমার নামে রেজিস্ট্রি করা। ব্যাঙ্কের চেক-বই পাস-বই হারিয়ে গেছে জানালে নতুন পাস-বই চেক-বই তারা দেবে না? রেজিস্ট্রি আপিসে বাড়ির দলিলের নকল পাওয়া যাবে না? পাস-বই চেক-বই বাড়ির দলিল সব চাই তোমার? একটা ছেড়ে দশটা করে চেক-বই এনে টাকা তুলতে পারি কিনা দেখবে?

দিশেহারা ক্রোধে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় বটে। শুনলেন যা তাও যে দুঃসহ সত্যি, সেটা নতুন করে উপলব্ধি করতে হল যেন। মুহূর্তের জন্য অসহায় বোধ করেছেন বলেই দ্বিগুণ উত্তেজনায় শিবেশ্বর চেঁচিয়েই উঠলেন প্রায়, আমি বলছি হবে না, হবে না—টাকা ঢেলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনে তোমাকে আমি তার আগে পাগল প্রমাণ করব, তোমার সইয়ে একটা পয়সাও উঠবে না, একটা টাকাও তুমি তুলতে পারবে না, লোকে জানবে শিবেশ্বর চাটুজ্জের বউ পাগল হয়ে গেছে—বুঝলে?

জ্যোতিরানী চেয়ে আছেন। দেখছেন দেখছেন দেখছেন। কয়েকটা নিমেষের মধ্যে অন্তহীন দেখা।—তাহলেই বা তুমি ধরে রাখবে কি করে? একজন বীথিকে নিয়েও আমি যে-কাজে নামতে যাচ্ছি, নামব। লোকের দরজায় দরজায় হাত পেতে ভিক্ষে করব। শিবেশ্বর চাটুজ্জের বউকে লোকে তখন কি বলবে?

—ও...! দৃষ্টি-দহনে আগুন ধরানো যায় না এটুকুই খেদ।—ধরে রাখা তোমাকে যাবেই না তাহলে?

—ধরে রাখার মত গুণ তোমার কমই আছে। চল্লিশ বছরের লোক সদাকে পর্যন্ত ধরে রাখতে পারোনি। আমাকে ধরে রাখা যাবে কিনা সেটা ভাবার সময় এখনো আসেনি। আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে তোমার এত আপত্তি কেন?

সদার প্রসঙ্গমাত্রে রোষারক্ত মুখের ওপর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া ছায়াপাত করে

গেল যেন। বিকৃত কণ্ঠে বলে
আপত্তি না করে আনন্দে তাহলে
উঠি, কেমন?

—নাচতে হবে না, আপত্তি
বলো।

—আপত্তি কেন? যত-সব
কথায় ভাবে ভেসে আমি তিন লক্ষ
আর অমন একখানা বাড়ি
করে ফেলব ভেবেছ তুমি? টাকা
ফলে? তিন লক্ষ টাকা একসঙ্গে
কখনো?

—না দেখব কেন, তুমিই দেখ
পিছন ফিরে তাকালেন একবার জ্যোতি
পিছনে শয্যা। মুখের ওপর চোখ
বসলেন। এই শয্যা অনেক কালের
স্পর্শও করেননি। ওখানে বসার ফলে
ব্যক্তিত্বের দিকটাই যেন আরো পুষ্ট
উঠল। বললেন, বোসো, আমি ছেলে
করতে আসিনি, বসে ঠাণ্ডা মাথায়
দাও। টাকার জন্যে তোমার আপত্তি
টাকা আর বাড়ি তোমার এত আছে যে
টাকা আর ওই একটা বাড়ির অভাব
টের পাওয়ারও কথা নয়—

কথার মাঝেই শিবেশ্বর বাধা
উঠলেন, এই জন্যেই আটঘাট বেঁধে কাল
থেকে খাতাপত্র তলব করে সব দেখে
কেমন? অনেক দেখেছ? আর ভেবেছ
কোনো দাম নেই—অপদার্থ লোকটা আ
হাত বাড়িয়েছে আর ওমনি সব
এসে গেছে—না?

—না। বরং তোমার শক্তির কথা ভে
তুমি এতটা পেরেছ বলেই এগোতে
করেছি। ভগবান তোমাকে এতবড়
দিয়েছেন বলেই আমার জোর বেড়েছে

শিবেশ্বরের স্নায়ু একটুও ঠাণ্ডা
দূরে থাক আরো বুঝি টানা
উঠল। কথার চিনিতে মন এ
গলবে না, কারণ এত বিদ্বেষ
আর এক পয়সাও দেবে না
মুখের ওপর এভাবে হুমকি দেওয়া
সংকল্প থেকে এক চুলও যে নড়ানো
—রমণীমুখে সেটুকুই সব থেকে
স্পষ্ট। চোখে-মুখে গলিত শ্লেষের
দিতে চেষ্টা করলেন আবার, এখন
কথা ভেবেছ, এখন আমার ক্ষমতার
নির্ভর! কেন এখন টাকার জন্যে
এসে হাত পাততে লজ্জা করে না তো

—লজ্জা করার কথা নয়,
এখানেই এসে হাত পেতে থাকে। অ
দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর স্থির তেম
আমার কথার তুমি জবাব দাওনি এ
আমি এ-কাজে হাত দিই তুমি চাও না

হঠাৎ কাছে এগিয়ে এলেন শিবে
খুব কাছে। প্রায় মুখের কাছে।
পা স্ত্রীর পাশ ঘেঁষে শয্যায় তুলে
আরো ঝুঁকলেন।—তোমার এমন
আদর্শের উৎসাহদাতাটি কে? এমন
আদর্শের কাজে আর কে থাকছে
পাশে? বিভাস দত্ত বোধহয়?

এত কাছে ঝুঁকে পড়া সত্ত্বেও
রানী একটুও নড়লেন না, মুখ

ষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দিলেন না।—
দেখিনি। উৎসাহ আমাকে কেউ দেয়নি,
সংগ্রহ করেছি। তোমার আপত্তি
তিনি থাকবেন না। কিন্তু তুমি
দেখাও, টাকার অসুখ সারে না।

ছিটকে সরে দাঁড়ালেন শিবেশ্বর।
র সত্তাগ্রাসী সেই হিংস্র অভিলাষ
শিরায় মুখের রেখায় আর চোখের
র এ'টে বসতে লাগল। এত রাগ, এত
 রোষ, এত অপমানে জর্জরিত করার পরেও নিজেই যেন তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। চিৎকার করে উঠলেন, আমার অসুখ বলে হাজারীবাগে বসে বিভাস দত্তর সঙ্গে তুমি ছবি তুলে বেড়াও, আমার অসুখ বলে তার সঙ্গে অন্ধকার ঘরে বসে তুমি অন্ধতামিস্র শোনো, আমার অসুখ বলে তার কুড়নো কে একটা মেয়েকে পরম আদরে তুমি বুকে তুলে নাও, আমার অসুখ সেই দুঃখে নিজের গাড়িতে করে বিভাস দত্তকে স্টেশানে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে যাও—কেমন? আমি ডাক্তার দেখাব আর আমার টাকায় পরম আনন্দে তুমি এই সব আদর্শের জোয়ারে সাঁতার কেটে বেড়াবে —অ্যাঁ?

শয্যা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতিরানী। কয়েক মুহূর্ত মাথার মধ্যে কি-সব ওলট-পালট হতে থাকল। সব থেকে বেশি নড়াচড়া করে বসল হাজারীবাগে বিভাস দত্তর সঙ্গে ছবি তুলে বেড়ানোর কটুক্তিটা। কিন্তু ভাবার অবকাশ

নেই। বললেন, এবারে তুমি সত্যি কথা বলেছ—এই জন্যেই তোমার আপত্তি, এই জন্যেই চাও না। বিভাস দত্তর আগেও তুমি এই রোগে ভুগেছ, এই বিভীষিকা দেখেছ। অল্প বয়সের গুলী খেয়ে মরা একটা ছেলেকেও এই রোগে ভুগে তুমি অপমান করেছ, তোমার এই রোগের প্রশ্রয় দিলে আজ কালীদা আর মামাবাবুকেও ছাড়তে হত, তোমার এই রোগ তাড়ানোর জন্যেই তোমার বাবা তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিলেন। আজ বিভাস দত্তর বিভীষিকা দেখছ তুমি, কাল হয়ত বিক্রম পাঠক আসবে। থাক্, তোমার রোগ ছাড়ে যদি, আর কাউকে না হোক বিভাস দত্তকে অন্তত বরাবরকার মত ছেঁটে দিতে রাজি আছি আমি—কিন্তু তাঁর ওই কুড়নো মেয়েটাকে নয়। এখন যা আমি করব ঠিক করেছি, করব। এর নড়চড় হবে না।

দরজার দিকে পা বাড়ালেন জ্যোতিরানী। পারলে শিবেশ্বর দু'হাতের থাবায় আবার তাঁকে টেনে এনে শয্যার ওপর আছড়ে ফেলেন। সেটা না পেয়ে চিৎকার করেই শেষবারের মত তাঁর সংকল্পটা তছনছ করে দিতে চাইলেন বুঝি।—হবে না, হবে না! একটি পয়সাও তুমি আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না, আমি যা চাই না তা তুমি করতে পাবে না —আমি করতে দেব না, কিছু হবে না—বুঝলে?

জ্যোতিরানী ফিরে দাঁড়ালেন, একটু চেয়ে থেকে শেষ কথা বুঝি তিনিও বলে গেলেন।—হবে। মিথ্যে বাধা দিতে চেষ্টা করে অশান্তি বাড়িও না।

রাত পোহালো। সকাল থেকেই এ-বাড়ির হাওয়া-বাতাস বুঝি থমকে রইল আবার। মেঘনা শামু ভোলা পারতপক্ষে কেউ মনিব বা মনিবানির মুখোমুখি পড়তে চাইল না। সিতু সারাক্ষণ এর মুখ তার মুখ চেয়ে শেষে একটু তাড়াতাড়িই গাড়ি চেপে স্কুলে রওনা হয়ে গেল।

বেলা গড়াতে লাগল। জ্যোতিরানী একটা বিশেষ কোনো ভাবনা নিয়ে বসে নেই। তিনি কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছেন না। সংকল্প নড়েনি, কিন্তু সংকল্পে এগনোর কোন্ রাস্তা ধরবেন তাও ভাবছেন না। অসংলগ্ন এক-একটা ছায়ার মত মাথার মধ্যে কি-সব আনাগোনা করে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা ছায়াই থেকে থেকে একটু ঘন হয়ে উঠছিল বুঝি।

এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কি একটু, তারপর বড় আলমারিটা খুললেন। এদিক-ওদিকে হাত চালিয়ে খোঁজাখুঁজি করলেন কি যেন। পেলেন না।...কোথায় রেখেছেন? ড্রেসিং টেবিলের বড় ড্রয়ারটা খুললেন। হ্যাঁ, এখানেই আছে।

বেশ মোটা দুটো অ্যালবাম। নানা আকারের ফোটো ভরতি। সব ছবি কুলোয়নি, অ্যালবামে আঁটা হয়নি। খামের মধ্যে রয়েছে অনেক। পাতা উল্টে আর খাম দেখে হাজারিবাগের ছবিতে এসে থামলেন তিনি। একে একে দেখে যেতে লাগলেন।

প্রথম ওমর খৈয়ামের সেই ফোটো দুটোর কপি চোখে পড়ল। কিন্তু যা খুঁজছেন সেটা কোথায়?...আছে, খামের মধ্যে বিভাস দত্তর দেয়ালে টাঙানো সেই ফোটোর কপিও আছে দেখলেন। বিভাস দত্ত তাঁর কপি এনলার্জ করিয়ে নিয়েছেন।

...কিন্তু আর একজন এই ছবির খবর কি করে পেল? বিভাস দত্তর ঘরের দেয়াল থেকে না বাড়ির এই অ্যালবাম থেকে? অ্যালবাম যথাস্থানে রেখে দেরাজ বন্ধ করলেন জ্যোতিরানী।

বিকেলের অনেক আগেই আজ পাশের ঘরের মালিকের উপস্থিতি টের পেলেন। পায়ে পায়ে জ্যোতিরানী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাশের ঘরের পুরু পরদা সত্ত্বেও ভিতরে অশান্ত পায়চারি করে চলেছে কেউ বোঝা গেল।

একটু বাদে পরদা ঠেলে শিবেশ্বর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশ-ভরা দৃষ্টিটা জ্যোতিরানীর মুখের ওপর থমকালো। সদার বিদায়ের পর যে মুখ আর চোখ বার বার স্ত্রীর লক্ষ্য এড়াতে চেয়েছিল—সে-রকম নয়। বারান্দায় পা দিয়েও সরাসরি চেয়েই আছেন। অশান্ত পায়ে বারান্দা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তারপর। মিনিট পনের বাদে ফিরলেন। জ্যোতিরানী সেখানেই দাঁড়িয়ে।

পরদা ঠেলে আবার নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকে যেতে দেখলেন তাঁকে। অসহিষ্ণু হাতের তাড়নায় বিক্ষিপ্ত পরদাটা স্থির হতে সময় লাগল। ঘরের মধ্যে আবার অস্থির পায়চারির আভাস পেলেন জ্যোতিরানী।

একটু বাদে ভোলা এসে খবর দিল, ঠাকুমা ডাকছেন।...ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে তাহলে মায়ের কাছেই কিছু বলে এসেছে বোঝা গেল।

তাঁকে দেখামাত্র শাশুড়ী খেদ-ভরা বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন যেন, তোমাদের সব হল কি, বাড়িটাতে এ কার চোখ পড়ল, অ্যাঁ? সেদিন সদা চলে গেল, আজ শুনছি কালীও কালই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কি ব্যাপার?

বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল জ্যোতিরানীর মুখেও।...এই জন্যেই পাশের ঘরের মানুষের অমন অশান্ত মূর্তি কি? অস্ফুট জবাব দিলেন, আমি জানি না তো...

—কেউ তো কিছু জানো না তোমরা, অথচ একে একে সব চলে যাচ্ছে। রোষ চাপতে চেষ্টা করলেন না শাশুড়ী, বলে উঠলেন, আপিসে শিবুর কাছে সব চাবি-টাবি পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনলাম। বারণ করা হয়েছিল শোনেনি, শিবু বলল আমার কথাও শুনবে না। সব গেলে খুশি যদি না হও, তাহলে ও আসামাত্র শোনো কি হয়েছে, ওকে আটকাতে চেষ্টা করো। কালীও যদি যায়, তারপর কোন্দিন আমাকেও তাড়াবে সেই আশায় আমি বসে থাকব এখানে ভাবো?

কালীদার জন্যে আলাদা ধরনের শ্রদ্ধার আসন পাতাই ছিল জ্যোতিরানীর মনে, মাঝের ক'টা দিন যেন সেখান থেকে সরে গেছলেন তিনি। খবরটা শোনার পর এখন আবার মনে হল, সেই আসনে বসে কালীদা হাসছেন মিটিমিটি। বেশ ঠাণ্ডা মুখেই জ্যোতিরানী জবাব দিলেন, আমি কাউকে তাড়াইনি। সদা কেন গেছে আর কালীদা কেন যাবেন সেটা আপনার ছেলের থেকে বেশি কেউ জানে না। সত্যিই যদি আটকানো দরকার মনে করেন, আপনার ছেলেকে ডেকে বলুন—কাল উনি যে অপমান হতে দেখেছি একটুও আত্মসম্মান থাকলে যেতে চাওয়ারই কথা।

দ্বিতীয় কথা শোনার জন্যে জ্যোতিরানী আর দাঁড়ালেন না শাশুড়ীর সামনে। সোজা নিজের ঘরে চলে এলেন। কালীদা চলেই যাবেন সেটা একটুও কম নয়, কিন্তু যেতে চেয়েছেন বলেই তাঁর মর্যাদা দ্বিগুণ বেড়েছে। তবু ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণী এক ধরনের জ্বালা-ধরা তুষ্টিই বোধ করছেন যেন। দেখুক, চারুক সকলের ওপরেই কতটা চলে দেখুক।

কালীদা সন্ধ্যার পরে এসেছেন টের পেলেন। জ্যোতিরানী নিজেই তাঁর খাবারটা দিতে যাবেন ভেবে এসে দেখেন মেঘনার খাবার দেওয়া সারা। ও কর্তব্যই করেছে, জ্যোতিরানী সামনে না থাকলে সদা দিত। এখন সদা নেই, ও দিয়েছে। তবু কালীদার ঘরে একবার ঢুকবেন কিনা ভাবলেন। খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু গিয়ে কি করবেন, কি বলবেন? ঘরেই ফিরলেন আবার।

ঘরেও ভালো লাগছে না। কিন্তু যাবেনই বা কোথায়। এতবড় বাড়িটা হঠাৎ যেন কেমন ছোট হয়ে গেছে। সেলফ্ থেকে সেই মজার বইটা টেনে নিলেন—এ পিকচার দ্যাট্ ফ্যান্স্ উইল নট্ সী। একদিনের প্রবঞ্চিত সর্বস্বলুণ্ঠিত নায়িকার প্রতিশোধের কাণ্ডকারখানাগুলো মজারই বটে। কিন্তু সেই থেকে পাতা আর এগোচ্ছেই না।

আজও এগলো না, একটু বাদেই রেখে দিলেন বইটা। সিতুকে ঘরে ডেকে এনে পড়াতে বসালে কি হয়। ছেলেটা অবাক হবে ভাবতে ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলেন। কিন্তু ওর ব্যবস্থা একটা করতে হবে। গতকাল টেলিফোনে শমীর নালিশ মনে পড়ল। শুধু অসভ্যতা করেনি, মায়ের কানে যাতে না ওঠে সে-জন্য মেয়েটাকে শাসিয়েছেও নিশ্চয়, নইলে ওকে কিছু বলতে অত করে অনুনয় করল কেন শমী। জ্যোতিরানী বলবেন না কিছু, ব্যবস্থাই করবেন। ব্যবস্থা একটা মনে মনে এঁচেই রেখেছেন, এখানে রাখবেন না ওকে। কিন্তু সিতুর চিন্তাও ভালো লাগছে না এখন. মনটা বার বার ঘর ছেড়ে অন্যদিকে ছুটছে। কালীদার ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে। পাশের ঘরের মানুষের মুখখানাও একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

যেতে হল না, পাশের ঘরের মানুষই এ-ঘরে এসে দাঁড়ালেন হঠাৎ। জেনে-চিনে

আশা নয়, অসহিষ্ণু ঝোঁকের মাথায় আমার মত।

—কালীদা কালই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে মায়ের কাছে শুনেছ?

—শুনেছি।

—তাকে আটকাতে চেষ্টা করবে না সে চলেই যাবে?

—অপমান তুমি করেছ, চেষ্টাও তুমি করো।

গলার স্বর একটু চড়িয়ে মাথা নেড়ে শিবেশ্বর বললেন, অপমানের জন্য সে যাচ্ছে না, যাচ্ছে তোমার জন্যে, তোমার প্রতি তাঁর দরদ উথলে উঠেছে—সেই জন্যে, খুশি হয়েছ?

জ্যোতিরানীর বোধগম্য হল না হঠাৎ। পরক্ষণে মনে হল, চেক বই পাস বই আর বাড়ির দলিল তাঁর কাছে আছে, সেগুলো কালীদা চেয়ে নিতে পারছেন না বলেই এই উক্তি। একভাবে বসে থাকতে দেখে শিবেশ্বরের ধৈর্য কমছে। আবার বললেন, ওভ্রু অফিসে চাবি-টাবি আর একটি অবধি সব কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়েছে, সকাল হলেই আর তাকে পাওয়া যাবে না, বুঝলে? এখন দয়া করে উঠে তুমি তাকে কিছু বলবে কি বলবে না?

—কেন, এত টাকার জোর তোমার, তুমি পারছ না ধরে রাখতে?

এক মুহূর্ত থমকে তেমনি অসহিষ্ণু পায়েই ঘর থেকে চলে গেলেন শিবেশ্বর। একটু বাদে জ্যোতিরানী উঠলেন আস্তে আস্তে। ...কালীদা চলে যাবেন বলেই বিকেল থেকে এই অশান্ত মূর্তি বুঝেছেন। শুধু অশান্ত নয়, উতলাও। প্রকারান্তরে অনুরোধই করতে আসা হয়েছিল তাঁকে। ক্ষোভের মুখে অনুরোধ যে-ভাবে করা যায়, তাই করা হয়েছে।

আলমারি খুলে চেকবই আর পাসবই-গুলো আর বাড়ির দলিলটা নিলেন। বেরিয়ে এসে দেখলেন আর একজনের এখন ঘর ছেড়ে বারান্দায় পায়চারি চলছে। জ্যোতিরানী তাকালেন না, সোজা কালীদার ঘরে এলেন।

তারপর অবাকই একটু। পায়ের ওপর পা তুলে কালীদা চেয়ারে বসে হাল্কা শিস দিচ্ছেন। কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে সেই আভাসও নেই। তাঁকে দেখে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।

—এগুলো নিন।

কালীদা অবাকই যেন একটু। —ফেরত দিচ্ছ যে? যা করবে ঠিক করেছ, করবে না?

—দেখি। এগুলো দিয়ে ফেলে আমার জন্য আপনি অনেক অপমান সহ্য করেছেন, আর না। এতটা হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। এখন কাল উঠেই আপনি কোথাও যাচ্ছেন না বলে দিয়ে ওঁদের নিশ্চিন্ত করুন।

চেকবই পাসবই বা বাড়ির দলিলের দিকে কালীদা ফিরেও তাকালেন না। হাসছেন মিটিমিটি। বললেন, ওগুলো তোমার কাছেই থাক, এক তোমায় ছাড়া আর কারো ওগুলোর দরকার হবে না বোধ-হয়...আর খুব সম্ভব আমিও যাচ্ছি না। আমি শিবুকে একটা আলটিমেটাম দিয়েছি, আজ রাতটা পর্যন্ত সময়, এর মধ্যে আমি যা চেয়েছি তাতে রাজি না হলে সকালে চলে যাব বলেছি। মনে হয় আমার কথা ও শুনবে।

সহজ সরল উক্তি। কিন্তু সবটাই দুর্বোধ্য জ্যোতিরানীর কাছে। আগেও বহুবার মনে হয়েছে একমাত্র এই ভদ্র-লোকেরই কোথায় যেন মস্ত একটা জোর রয়েছে বহুবিকৃত গোঁ আর দম্ভভরা বিপুল-ধনী বাড়ির ওই মালিকটির ওপর। কালীদার উক্তি এক বর্ণ না বুঝেও আজ সেই অজ্ঞাত জোরের দিকটাই যেন সব থেকে বেশি চোখে পড়ছে তাঁর।

বাইরে থেকে ঘরের মেঝেয় বড় ছায়া পড়ল একটা। শিবেশ্বর।

দুজনকেই দেখে নিলেন একবার। তারপর দু' পা ভিতরে এসে সরোষে কালীদার দিকে ফিরলেন। —কি, মত বদলেছে না যাবেই ঠিক করেছ?

নির্লিপ্ত মুখ করে কালীদা জবাব দিলেন, একটু আগে জ্যোতিকে বলছিলাম আমি থাকব কি যাব সেটা তোর ওপর নির্ভর করে।

—নির্ভরই করো তাহলে, দয়া করে থেকে যাও! নিরুপায় রাগে ক্ষোভে বিকৃত মুখ শিবেশ্বরের। —আমাকে তুমি এভাবে জব্দ করেছ সেটা আমার মনে থাকবে। জ্বলন্ত দৃষ্টিটা জ্যোতিরানীর দিকে ফেরালেন। তেমনি নিরুপায় শ্লেষে বলে উঠলেন, এবার তুমি মনের আনন্দে আদর্শে ভেসে যেতে পারো, বুঝলে? কালীদা আলটিমেটাম দিয়েছে—যেজন্যে বাড়িতে এতবড় বুক-ভাঙা ব্যাপার ঘটে গেল, এরপর তোমার সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠান হতে না দিলে এখান থেকে চলে যাবে—তোমার ওই চেকবই পাসবই বাড়ির দলিলের দিকে আমি হাত বাড়ালে সে এ বাড়িতে আর থাকবে না—তোমার ওপর এত দরদ আর পরের টাকায় এতবড় দাতা আর দেখেছ?

জ্যোতিরানী চিত্রার্পিত দর্শক না চিত্রার্পিত শ্রোতা? তিনি ঠিক শুনছেন না ঠিক দেখছেন? মুখ টিপে টিপে হেসেই চলেছেন কালীদা।

বড় একটা দম নিয়ে দু' চোখ ঘোরালো করে শিবেশ্বর বিড়বিড় করে আবার বললেন, কিন্তু টাকায় হাত না দিলেও কি-ভাবে কত বড় আদর্শের ব্যাপার গড়ে উঠতে যাচ্ছে আমি আগে সব দেখে শুনে বুঝে নেব বলে দিলাম। দুজনের দিকে শেষ অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই যেন এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে চলে গেলেন শিবেশ্বর চাটুজ্জে।

জ্যোতিরানী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছেন। কালীদাকেই দেখছেন বটে। হাসতে দেখছেন।

—কেরামতিখানা দেখলে তো আমার, কম লোক ভাবো নাকি? সেই চিরাচরিত চপল গাম্ভীর্য কালীদার। তারপর আবারও হেসেই বললেন, বেজায় চটেছে। ...ওগুলো জায়গামত তুলে রেখে দাওগে যাও।

রাত্রি। এক পাশের ঘরের লোক ছাড়া বাড়িতে আর কেউ জেগে নেই বোধহয়।

এমন নিশ্চিন্ত আরামের শয্যায় জ্যোতিরানী আর কি কখনো শুয়েছেন? এত হাল্কা আর কখনো মনে হয়েছে ভিতরটা? আদর্শের আলোটা থেকে-থেকে বড়ই হয়ে উঠছে। প্রতিষ্ঠান হবে। শমী বোসেরা আর বীথি ঘোষেরা হাসবে। কোনো বিঘ্ন নেই, কোনো বাধার আশঙ্কা নেই। তবু, এতবড় আনন্দের মধ্যেও কেবলই তিনি এ-পাশ ও-পাশ করছেন কেন?

...এই কালীদাকেই সন্দেহ করেছিলেন, এই কালীদাই বিরূপ মন্তব্য করে একজনের কান বিষোবেন ধরে নিয়েছিলেন তিনি। কত ছোট করেছিলেন এই কালীদাকে। আদর্শের আলো জ্বলবে, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে—এই আনন্দের অনুভূতিটা ভিতরে যে কতবার প্রণাম হয়ে উঠেছে ঠিক নেই। আর তক্ষুনি প্রণাম করার মত দুটো পা সামনে ভেসেছে জ্যোতিরানীর।

সেই পা কালীদার।

দরজার দিকে ঘাড় ফেরালেন হঠাৎ। কোনো ষষ্ঠ চেতনার ক্রিয়া কিনা কে জানে। না, ঠিকই টের পেয়েছেন। তাঁর অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটেছে পাশের ঘরের মানুষের।

আসুক...।

কি যেন ভাবছিলেন জ্যোতিরানী। ...আর বাধা আসবে না বিঘ্ন আসবে না, প্রতিষ্ঠান হবে, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠানের নামও তো ভেবে রেখেছিলেন তিনি।

ভেবেছিলেন নাম যদি হয় প্রভুজীধাম...

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

পুরাতনের প্রতি

আত্মতৃপ্তি নিয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুরই নামান্তর। সন্তোষ এবং তৃপ্তি জীবনে পরম কাম্যবস্তু। প্রতি মুহূর্তে অসন্তোষ নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। কিন্তু আত্ম-সন্তোষ এবং আত্মতৃপ্তি আমাদের স্থবির এবং স্থাণু করে ফেলে। নতুন কিছু করার উদ্যম এর ফলে অনেকাংশে ব্যাহত হয়। তাই সন্তোষ এবং তৃপ্তি আমরা কামনা করব কিন্তু সেখানে নিজেদের আটকে রাখবো না। জীবনকে সরস এবং সতেজ রাখতে নতুন উদ্যমের প্রয়োজন এবং নতুন উদ্যমই আমাদের নিয়ে যাবে জীবন-বৈচিত্র্যের পথে। আঘাত, বেদনা বা বঞ্চনার অভিশাপে অগ্রগতির পথ ক্লেশাক্ত হলেও সেখানে আমাদের বলিষ্ঠ প্রয়াসের স্বাক্ষর থাকবে। যত কঠিন এবং ভয়াল-ভয়ংকরই হোক না কেন আগামী দিনের জন্য পথ আমাদের প্রস্তুত করে যেতে হবেই এবং যে কোন কিছুর বিনিময়ে। না হলে ভবিষ্যতের নিরিখে আমাদের সমস্ত কীর্তি-কাহিনী লুপ্ত হয়ে যাবে—এমনকি চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যাবে।

অতীত আমাদের অনেককিছু দিয়েছে। অতীতকে নির্ভর করে বর্তমানকে সাশ্রয় করে আমরা নিজেদের সাফল্যের স্মারক স্থাপন করেছি সর্বত্র। তাই অতীতের কাছে যেমন আমরা ঋণমুক্ত তেমনি ভবিষ্যতের কাছেও উত্তমর্ণ। অবশ্যই বর্তমানের বিচারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্তমানের গতিছন্দের মহিমায় অতীতকে যেন বিস্মৃত না হই, ঐতিহ্যকে যেন অবজ্ঞা না করি। বরং প্রাণপণ চেষ্টায় ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে বর্তমানের পথ করে নেবার চেষ্টা করি। সব ব্যাপারেই অতীতের প্রতি অবজ্ঞা-মিশ্রিত অশ্রদ্ধা আমাদের আজকের পরিচয়কে পরিস্ফুট করে। অবজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রেই সামগ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন একটা ধারণা আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে যে, অতীতের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস সব কুসংস্কারাশ্রিত। তাই অতীতকে অস্বীকার করে আমরা বর্তমানে এগিয়ে যেতে চাইছি। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সব সময় শুভ হতে পারে না। অতীতকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েই আমাদের অগ্রগতির পথ করে নিতে হবে। নতুবা আমাদের সব প্রচেষ্টাই নস্যাৎ হয়ে যেতে বাধ্য।

আগে পরিবারের কর্তা ছিল একজন। পরিবারও ছিল যৌথ। কিন্তু আজ পরিবারের কর্তা অনেক। পরিবারও বিভক্ত। এর সুফল-কুফল সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা শক্ত। কিন্তু একটা কথা সহজেই বলা যায় পরিবারের দায়-দায়িত্ব আগে যেমন সুষ্ঠু-ভাবে পালিত হতো, এখন আর তা হয় না। অনেকের মতে এর ফলে পারস্পরিক তিক্ততা হ্রাস পায়। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্র তিক্ততা বেড়েছে বই কমেনি। তাই অতীতের যৌথ পরিবার সম্পর্কে আমাদের আর একবার ভেবে দেখা উচিত। বিশেষত অধিকাংশের স্বল্প আয় একত্রে সম্পদের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু বিভক্ত স্বল্প আয়ে কোনদিন স্বাচ্ছন্দ্যতা আসতে পারে না। একথাটাও আমাদের ভেবে দেখা কর্তব্য।

মিস অলিম্পিক

১৯৬৫ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব বধির এবং বোবাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী ফেইনা ভেরাকিনা 'মিস অলিম্পিক' নির্বাচিত হন। অলিম্পিক গ্রামে অনুষ্ঠিত সকলের সম্মতিক্রমেই সুন্দরী ও লাস্যময়ী ফেইনাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মিষ্টি হাসি, ধূসর রঙের চঞ্চল চোখ এবং হাল্কা সোনালী চুলওয়ালা এই মেয়েটির সাফল্যের ঝুলিতে 'মিস অলিম্পিক' ছাড়াও আছে একটি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক। এই দুটি সে অর্জন করে ওয়াশিংটনে শটপুট এবং ডিসকাস ছোড়ায়।

১৯৪১ সালে এক কৃষক পরিবারে ফেইনার জন্ম। পরিবারের সপ্তম কন্যা ফেইনা অজ আর বাবাকে ভাল করে মনে করতে পারে না। কারণ দেশ তখন নাৎসী আক্রমণে বিপর্যস্ত। দেশরক্ষার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার বাবা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু আর ফিরে আসেননি। গোড়া থেকেই সে কথা বলতে পারতো না। তারপর হঠাৎ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে সে শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে পড়ে। সাত বছর বয়সে ফেইনা বধির ও বোবাদের নির্দিষ্ট স্কুলে ভর্তি হয়। এখানে তাকে লেখাপড়া শেখানো হয় এবং কথা বলাও। ঠোঁটের নাড়াচাড়ার মাধ্যমে তার কথা বুঝতেও অসুবিধা হয় না।

এই স্কুলেই ফেইনা খেলা-ধুলায় আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রথমদিকে দৌড় এবং হাইজাম্প তার আগ্রহ ছিল বেশী। কিন্তু হঠাৎ একদিন ট্রেণার তাকে শটপুটে অংশ গ্রহণ করতে বলেন। আশ্চর্যজনকভাবে এতে তার দক্ষতারও পরিচয় মেলে।

শ্রীমতী ফেইনা ভেরাকিনা

বিশেষজ্ঞদের মতে ফেইনার জন্য অপেক্ষা করে আছে এক বিরাট এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ডিসকাসে তার সাফল্য অবধারিত। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর নামও ফেইনা। শেষোক্ত ফেইনা বিশ্বরেকর্ডধারিণী তমারা প্রেসের কৌশল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে ফেইনা ভেরাকিনার পক্ষে ফেইনা আন্টানোভার সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু বধির ও বোবাদের মধ্যে ভেরাকিনা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ওয়াশিংটন থেকে ফিরে সে একবার নিজের গ্রাম থেকে ঘুরে এসেছে। বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের শিক্ষার্থী ভেরাকিনার কিন্তু খেলা-ধুলার প্রতি আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে। পড়াশোনা নিয়ে সে যেন বেশী ডুবে থাকতে চায়। তবু এখনও ক্লাশের পর খেলার মাঠে যায়।

ওয়াশিংটন থেকে ফেরার পর তার দুই বন্ধুর বিয়ের আসরে ভেরাকিনাকে হাজির থাকতে হয়েছে। নিজের বিয়ে সম্বন্ধে সে কিন্তু এখনও বিশেষ আগ্রহী নয়। কারণ নিজের পড়াশোনা নিয়েই সে এখন ব্যস্ত।

সমস্ত কাজের মধ্যেও ভেরাকিনার 'মিস অলিম্পিক'-এর সব মাধুর্যই অক্ষুণ্ণ আছে।

ধীরে ধীরে

কোন কিছুর সূচনায়ই সাফল্যের স্বীকৃতি প্রত্যাশা করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেলে স্বীকৃতি একদিন আসবেই, হয়তো কিছু বিলম্বে। এই বিলম্বিত স্বীকৃতিই এসেছে আগনেস ডি মিলের জীবনে। চোদ্দ বছর আগে নর্তকী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন আগনেস মিলে। জীবনে অনেক ব্যর্থতা এসেছে, অনেক অসাফল্য তার জীবনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু সব বাধা-বিপদের মধ্যেও তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। অবশেষে সাধনার স্বীকৃতি এসেছে সুদীর্ঘ

চোদ্দ বছর পরে। আজ তিনি শিল্পীর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি 'কাপেজিও পুরস্কারে' বিভূষিত। এই পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়েছে শুধু মার্কিন নৃত্যকলা এবং মিউজিকাল থিয়েটারের উন্নতিকল্পে তার অবদানের স্বীকৃতিতে নয়, তিনি একাধারে লেখক, বক্তা, কোরিওগ্রাফার এবং শিল্প-নিষ্ঠায় অবিচল প্রতিভা। ইতিপূর্বেও অনেকেই এই জাতীয় সম্মান লাভ করেছেন কিন্তু কেউ ডি মিলের মত অবদানে ভাস্বর নন। হলিউডের অস্কারের মত কাপেজিও পুরস্কার মর্যাদাসম্পন্ন। সেদিক থেকে বিচার করলে ডি মিলের কৃতিত্ব অসাধারণ।

বাল্যকালেই ব্যালে নৃত্যের রহস্য আগনেসকে আকর্ষণ করে। এদিক থেকে তাঁদের পরিবারেরও একটা ঐতিহ্য ছিল। তার বাবা উইলিয়ম ডি মিলে ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যকার এবং তার কাকা ছিলেন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক। এদিক থেকে বলা যায় অভিনেত্রী হওয়াটাই তার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ভবিষ্যৎ জীবনের সূচীতে কিছুটা অদল-বদল ঘটালেন, নৃত্যকলা সম্পর্কে ক্রমেই আরো আগ্রহী হলেন। ইতিমধ্যে আর একটা সুযোগও এসে গেল। বাবার একটি নাটক প্রচণ্ডভাবে মার খেল। সপরিবারে তখন তিনি যাত্রা করলেন হলিউডের দিকে। উদ্দেশ্য চিত্র পরিচালনা। বাবার উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছিল তা আমাদের জানার দরকার নেই। কিন্তু আগনেস নিজ জীবনের পরিকল্পনার দিক থেকে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করলো। হলিউডে তিনি প্রথম বিশ্ববিখ্যাত ব্যালেরিনা আনা পাভলোভার নৃত্যশৈলী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করলেন। এদিকে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। আগনেসের বোনকে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন ব্যালে নৃত্যের নিয়মিত অনুশীলন করতে। আগনেস সুযোগ পেয়ে গেল এবং সব বোনেরা একসঙ্গে ব্যালে নৃত্য শিখতে লাগলো। ব্যালে ক্লাশে নিয়মিত হাজিরার জন্য বাবার প্রয়োজনীয় অনুমতিও জোগাড় করে ফেললো। নর্তকীর জীবন যেমন তার বাবার পছন্দ ছিল না তেমনি তারও কিছুটা সংশয় ছিল। সব সংশয় দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেল এবং চার বছর পর অনার্সসহ গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে এলেন আগনেস। বাবার কাছ থেকে দূরে থাকার ফলে নাচের প্রতি তার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল।

লস এঞ্জেলস থেকে ফিরে ডি মিলে মাকে নিয়ে এলেন নিউইয়র্কে। এখানে তিনি সমসাময়িক চিত্রকরদের তুলিতে পরিস্ফুট ব্যালের চিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে তিনি ব্যালে নৃত্যের দল গঠনে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সর্বত্রই তাকে হতাশ হতে হলো। কারণ ব্যবসাবুদ্ধি

আগনেস ডি মিলে

তখনও তার কম। হতাশায় ম্লান না হয়ে তিনি কোরিওগ্রাফী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং পাঁচ বৎসর তিনি শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। এই পাঁচ বৎসর যে কোন নর্তকীর কর্মময় জীবনের এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু তিনি কোনরকম ভ্রূক্ষেপ না করে পাঁচ বৎসর কোরিওগ্রাফীর শিক্ষার্থী হিসেবে কাটিয়ে দিলেন।

সেটা ১৯৩০ সালের কথা। সারা আমেরিকা জুড়ে ব্যালে নৃত্যের নব-রূপায়ণের চেষ্টা চলছে। ডি মিলে এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করলেন। মাঝে মধ্যে তার মনে হতো যে এত বড় কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়। সাধারণ 'এন্টারটেনার' ছাড়া কোন কাজ তিনি করতে পারবেন না। কিন্তু মনের এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে তার বেশিক্ষণ লাগলো না। নতুন উদ্যমে তিনি কাজ করে যেতে লাগলেন। কোরিওগ্রাফী শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মঞ্চে তবু ব্যর্থ হলেন। হতোদ্যম না হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে। প্যারিস, ব্রুসেলস, লণ্ডন সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়ালেন। ইংল্যাণ্ডের দূরতম প্রান্তে গিয়ে তিনি প্রাচীন লোক-নৃত্যে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এবার ডি মিলে কোরিওগ্রাফী শিক্ষার মূল্য পেলেন 'নক্ষ এরান্ট' মঞ্চস্থ করে। এরপর ফিরে এলেন নিজের দেশে। ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে। হলিউড অ্যাম্ফিথিয়েটারে তিনি ব্যালে নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' চিত্রে নৃত্য পরিচালনা করেন। আবার চলে যান লণ্ডনে। 'গ্রুপ ডান্সিং' সম্বন্ধে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে। ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরে তিনি দুটি ক্লাসে নিয়মিত নৃত্য শিক্ষা দেবার দায়িত্ব পান। ১৯৩৯ সালে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়, একটি নবগঠিত ব্যালে থিয়েটার থেকে তাকে আহ্বান করা হয়। এখানে তিনি 'ব্লাক রিচুয়াল', [illegible]

ভোজিল'-এ নৃত্য পরিচালনা করেন। এবং স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে 'রোডিও' মঞ্চস্থ করাই তার জীবনের এযাবৎ বড় কৃতিত্ব। এরপর আরো বড় কৃতিত্ব 'ওকালহোমা' মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে মঞ্চস্থ করেন 'ওয়ান টাচ অফ ভেনাস', 'ব্রিগেডুন' পেন্ট ইওর ওয়াগন', 'কোয়ামিনা' এবং আরো অনেক।

সাফল্যের স্বীকৃতিতে ও ডি মিলে উজ্জ্বল। অনেক সম্মান আজ পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন। নিউইয়র্ক ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড, আন্তোনোয়েৎ পেরী অ্যাওয়ার্ড, ডান্স ম্যাগাজিন' অ্যাওয়ার্ড এবং সর্বশেষে কার্পেজিও অ্যাওয়ার্ড তিনি পেয়েছেন। এছাড়া তিনি আবার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব আর্টসেরও সদস্য। টেলিভিসনে তিনি ব্যালে সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, বক্তা হিসেবেও তিনি বেশ সুনামের অধিকারী। এছাড়া তিনখানা বই তিনি লিখেছেন—'ডান্স টু দি পাইপার', 'অ্যান্ড প্রমোনেড হোম' এবং 'টু এ ইয়ং ডান্সার'। এছাড়া অসংখ্য পত্র-পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখিকা।

সংসারজীবনে ডি মিলে অত্যন্ত সুখী, স্বামী ওয়াল্টার প্রুডে একজন কনসার্ট ম্যানেজার। একটিমাত্র সন্তানের কলহাস্যে সংসার তাদের আনন্দমুখর।

সেলাইয়ের কথা

(৩)

ব্লাউজ

এর আগের সংখ্যায় বাচ্চাদের সান-স্যুটের বিষয় জানিয়েছি, এবার ব্লাউজের বিষয়ে জানাব। ব্লাউজ আজকাল নানারকমের গলা হয়, যেমন স্কোয়ার, গোল, বোটসেপ, স্কোয়ার ভি, দুদিকেই ডিপ ভি, সামনে গোল পেছনে ভি প্রভৃতি রুচি অনুযায়ী তৈরী হয়। আমি প্রথমে সাধারণ ব্লাউজ তৈরীর পদ্ধতি বলছি, নানারকম গলা বা সেপের কথা পরে জানাবো। কাপড় লম্বা-ভাবে ডবল ভাজ করে নিতে হবে।

কাপড়ের হিসেবঃ—যদি ৩১" বা ৩৬" বহরের কাপড় হয় তখন ২ ঝুল+৫" কাপড় নিতে হবে। যদি ৪৫" বহর হয় তখন ১ ঝুল+৫"+১ হাতা লম্বা আর যদি ২৭" বহর হয় তখন ২ ঝুল+৫"+২ হাতা লম্বা।

মাপ বার করার নিয়মঃ—ছাতির মাপ থেকে সমস্ত মাপ বার করা যায়। ফরমুলাটা নীচে দিলামঃ—

ঝুল=½ ছাতি+২"=ঝুল
পুট=১/৬ ছাতি+১½"=পুট
সেস্থ=½ ছাতি—৪"=সেস্থ
কোমর=ছাতি—৪"=কোমর
হাতা=⅓ ছাতি=হাতা
মুহুরী=⅓ ছাতি—১"=মুহুরী

সাধারণতঃ যার জামা হবে তাঁর শরীরের মাপ ফিতে দিয়ে ভাল করে মেপে নিয়ে ড্রইং করে তারপর কাপড় কাটা হয়। কিন্তু অনেক সময় মাপ নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা না হলে সেক্ষেত্রে শুধু ছাতির মাপটা পেলে বাকী আর সব মাপ ওপরের লিখিত ফরমুলা অনুযায়ী করে নেওয়া যায়।
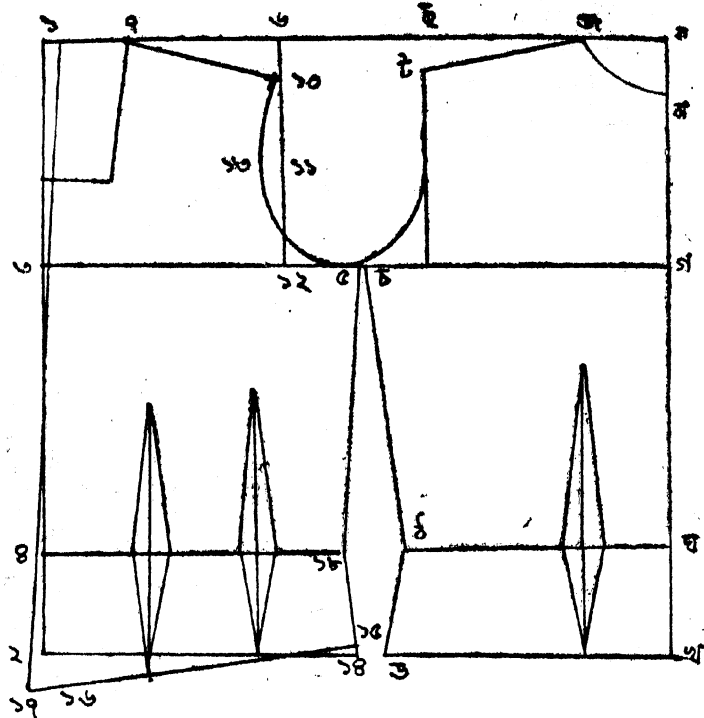
মাপঃ—
ছাতি— ৩০"
কোমর— ২৬"
সেস্থ— ১·৫"
ঝুল— ১৭"
পুট— ৬½"
হাতা— ১০"
মুহুরী— ৯"
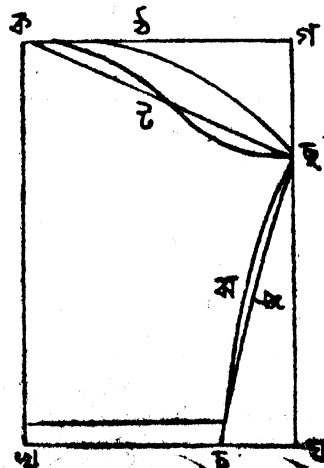
পেছন পটিঃ—
ক—খ=ঝুল+১"=১৮"
ক—গ=মোহরা=¼ ছাতি—১"=৬½"
ক—ঘ=সেস্থ=১·৫"
ক—ছ=পুট=৬½+¼" (সেলাই)=৬¾"
ছ—ট=কাঁধের সেপ ১"
ট—জ=সোজা লাইন
গ—চ=ছাতির ¼+১"=৮½"
(এলাউন্স শুদ্ধ ছাতি)
ক—ঝ=পেছন গলা ডিপ ১½"
ঘ—ঠ=কোমরের ¼+১"=৭½"
খ—ড=কোমরের ¼+১½"=৮"

পেছনের প্লিট এঁকে দেখানো হয়েছে, এবার ড্রইং অনুযায়ী ঝ, জ, ট, চ, ঠ, ড ও খ লাইন ধরে কাপড় কাটতে হবে।

সামনের পটিঃ—
১— ২=ঝুল+১"=১৮"
১— ৩=মোহরা=¼ ছাতি—১"=৬½"
১— ৪=সেস্থ=১৫"
১— ৬=পুট=৬½+¼" সেলাই=৬¾"
৬—১০=কাঁধের সেপ=১"
১— ৭=ছাতির ১/১২=২½"
৭—১০=সোজা লাইন
১—৩=৬-১২
১১—১০ ও ১২ এর মধ্যবিন্দু
১১—১৩=সামনের হাতার মোহরার সেপ ½"
৩— ৫=ছাতির ¼+১½" (এলাউন্সশুদ্ধ)
১— ৮=ছাতির ১/১২+১½"
(রুচি অনুযায়ী কম বেশী হয়)
৮— ৯=ছাতির ১/১২—½=২"

৯— ৭=সোজা লাইন
৪—১৮=কোমরের ১/৪+২"=৮১/২"
২—১৪=কোমরের ১/৪+২১/২=৯"
১৪—১৫=১/৪"
২—১৬=১"
১৬—১৭=১/২"

সামনের প্লিট দুটো এ'কে দেখানো হোল. এবার ড্রইং অনুযায়ী ৮, ৯, ৭, ৬, ১৩, ৫, ১৮, ১৫, ১৭, ৪, ৩, ৮ লাইন ধরে কাটতে হবে!

হাতা :—

ক—খ ও গ—ঘ=হাতা লম্বা+১/২"=১০১/২"
ক—গ ও খ—ঘ=ছাতির ১/৪—১"=৬১/২"
খ—চ=মুহুরীর ১/২+১/২"=৫"
গ—ছ=ক ও গ এর ১/২
ছ—চ=সোজা লাইন
জ— =চ ও ছ এর ১/২
জ—ঝ=১/২"
ছ—ক=সোজা লাইন
ট=ক ও ছ এর ১/২
ঠ=ক ও গ এর ১/২

এইবার ড্রইং অনুযায়ী ক, ঠ, ছ, ঝ, চ লাইন ধরে কাটতে হবে।

সেলাইয়ের নিয়ম :—

প্রথম কাঁধে ও দুপাশ সেলাই করে জুড়ে নিতে হবে, তারপর বাঁ দিকের বাড়তি পটি প্রথমে সোজা দিকে বসিয়ে সেলাই করে উল্টে ১" কিংবা ১/২" বাড়তি চওড়া রেখে উল্টে সরু করে মুড়ে সেলাই করতে হবে, ডানদিকের ফেলা পটি প্রথমে সোজা দিকে বসিয়ে উল্টে নিয়ে ১/২" চওড়া রেখে মুড়ে হাতে হেম সেলাই দিতে হবে।

গলায় ওরেফ করে ১/২" চওড়া কাপড় কেটে প্রথমে সোজা দিকে সেলাই করে নিয়ে উল্টে হেম সেলাই দিতে হবে।

মুহুরীতে ১/২" মুড়ি ভেঙে নিয়ে হেম সেলাই দিতে হবে।

বডির মোহরার সংগে হাতা টে'কে নিয়ে পরে মেসিন সেলাই দিতে হবে। যাঁরা হাতে করবেন তাঁরা টে'কে নিয়ে বখেয়া দেবেন।

পেছন ও সামনের প্লিটগুলো মেসিন সেলাই দিতে হবে। যাঁরা পুরো জামাটাই হাত সেলাই করবেন তাঁরা সব মেসিন সেলাই-এর জায়গায় হেম করবেন।

এবার টিপ বোতাম বা হুক বসালেই ব্লাউজ সেলাই সম্পূর্ণ হলো।

—বসুধা

শ্রীমতী কান্ত হাঁদা

সংবাদ

হাওড় জেলা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় হাওড়া রামকৃষ্ণপুর সেণ্ট মণিকা বালিকা বিদ্যালয় থেকে মোট একত্রিশজন পরীক্ষার্থী গত পরীক্ষায় পরীক্ষা দিয়ে সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত জেলা-ভিত্তিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলে জানা গিয়েছে যে, উক্ত বিদ্যালয়ের সাতজন ছাত্রছাত্রীই প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে। একই বিদ্যালয় থেকে সাতটি বৃত্তি লাভ করে এই বিদ্যালয়টি প্রাথমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এক নজীর সৃষ্টি করেছে।

• • •

শ্রীমতী মালবিকা দত্ত এ-বছর ইউ-পি বোর্ডের ইণ্টারমিডিয়েট অব আর্টস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

• • •

জামসেদপুর উওম্যান কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী বহ্নিকণা দালাল এ-বছর রাঁচী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

• • •

শ্রীমতী নন্দিতা বসাক এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার হিউম্যানিটিজে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। নন্দিতা শিবপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

• • •

খ্যাতিমান কথাশিল্পী শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যয়ের কন্যা শ্রীমতী উর্মিলা গঙ্গোপাধ্যায় প্রাগের চার্লস ইউনিভার্সিটি থেকে ভূতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীর এম-এস-সি ডিগ্রী নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শ্রীমতী উর্মিলার গবেষণার বিষয় ছিল প্যালিওলোজী। পাঁচ বছর ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও পোলান্ড ভ্রমণ করেন।

• • •

তিন সন্তানের জননী শ্রীমতী উষারাণী পাল এ বৎসর প্রাইভেট স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম চেষ্টাতেই উত্তীর্ণ হন। নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারের গৃহিণী শ্রীমতী পাল সংসারের কাজ-কর্মের অবসরে বিদ্যাভ্যাস করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁর প্রথম ও মধ্যম পুত্র যথাক্রমে তৃতীয় ও নবম স্থান অধিকার করেন।

• • •

শ্রীমতী মহাশ্বেতা চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী ফাইনাল পরীক্ষায় কলকাতা জেলার প্রায় সতের হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিলাভ করেছেন।

• • •

দক্ষিণ এশিয়ার মেথডিস্ট গীর্জার সাহিত্য ও প্রকাশনী সমিতির বাংলা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী স্মৃতি দাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেথডিস্ট গীর্জার মিশন পর্ষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সম্প্রতি আমেরিকা যাত্রা করেছেন। তিনি আমেরিকাতে কর্মসূচী এই প্রকল্পে যোগদান করবেন। এছাড়া লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব মেথডিস্ট নাম্নী সংঘ'-এর কয়েকটি সভায়, 'পারিবারিক জীবন' সম্মেলনে ও বিশ্ব মেথডিস্ট সমাবেশে তিনি ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকবেন।

শ্রীমতী দাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী।

• • •

ভারতীয় বিমানবাহিনীর চিকিৎসা শাখার ফ্লাইট লেফটনাণ্ট শ্রীমতী কান্তা হাঁদা গত বছর পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় তাঁর প্রশংসনীয় কাজের জন্য বিমান-বাহিনীর অধিনায়ক এয়ার চীফ মার্শাল অর্জন সিংয়ের প্রশংসা অর্জন করেছেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর মহিলা অফিসার-দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন।

• • •

অস্ট্রেলিয়ার মিস মার্গারেট স্মিথ জার্মান আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতি-যোগিতায় মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি ডবলস ও মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হয়ে ত্রি-মুকুট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

• • •

ওভালে অনুষ্ঠিত নিউজিল্যান্ড ও ইংলণ্ডের মহিলা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

কমলা দেবীর ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ

ভারতীয় সমবায় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টো-পাধ্যায়কে এই বৎসরে সমাজ সেবায় জন্য ম্যাগসেসাই পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তশিল্প ও সমবায় রাজনীতি, চিত্র-কলা ও থিয়েটারে দীর্ঘকাল সৃজনমুখী নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে শ্রীযুক্তা চট্টো-পাধ্যায়কে এই পুরস্কার (১০ হাজার মার্কিন ডলার) দেওয়া হবে।

বেহায়া সময় ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্রীনিকেতনের ঘোড়ায়
প্রেমিকযুগল দুপুর ওড়ায়।

সময় আকাশ থেকে
বিরক্ত : কে ওখানে হাসছে কে,

কিম্বা কারা? আহ্লাদী-অসুর?
শ্রীনিকেতনের ঘোড়া, না ডমরু?

ভাবতে-ভাবতে প্রধান প্রশ্ন থেকে
সরে গিয়ে মাধ্যাকর্ষ বেগে

সময় ঘোরে তূর্ণ কিন্তু ধীরে
সুরধামা ঘোড়াকে ঘিরে ঘিরে;

দুপুর যখন দাঁড়াল চৌকাঠে,
প্রেমিকযুগল বেড়াতে গেল মাঠে;
সময় তবু পুত্রকে দেখিয়ে
ঘরের মধ্যে ঘুরেছে ভায়া নিয়ে॥

যন্ত্রণার কাঙাল ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সূর্যের স্নেহের জন্য এতটা কাঙাল হলি তুই?
যন্ত্রণার প্রলোভনে চিরদিন রয়ে গেলি একা!
বেদেনীর স্মৃতি নিয়ে কোনো চিঠি নীল রক্তে লেখা
পেলি তুই? ঘুরে ঘুরে এতকাল বিদেশ বিভুঁই?
অসবর্ণা যুবতীর নিরুদ্দিষ্ট ঠিকানা ও নাম?

ঝাঁপিটা রয়েছে কাছে, করেছিস ওটাকে সম্বল।
তাই খুলে বারবার বক্ষে নিলি সহস্র ছোবল।
তার জন্যে কত চিঠি, রক্তাক্ষরে স্বীয় নাম ধাম
লিখে লিখে বিজ্ঞাপন চতুর্দিকে করেছিস বিলি।

দান্তের পাতাল নয়, পৃথিবীটা তবু নির্ভেজাল
স্বর্গ নয়, মর্তভূমি। এখানেও গোলাপের কাল
মাঝে মাঝে ফিরে আসে। ভেবে দ্যাখ কি ছিলি কি হলি।

মাছের চোখের মতো রুদ্ধ করে চৈতন্য ও মন
ঝাঁপিটাকে বক্ষে ধরে তবু খাবি স্মৃতির চুম্বন?

স্বীকৃতি ॥ প্রবাসজীবন চৌধুরী

আমার মানস-নভে কৃষ্ণপক্ষে ম্লান চাঁদ ওঠে,
শংকিত সংকোচ-ভরে শাখান্বিত ভাবনার পারে—
অনেক আগের কথা বহু যুগ পাড়ি দিয়ে জোটে
একটি বাণীর তরে, ভাষা দাও—এলে যদি দ্বারে।

কথা কও কানে কানে হে নীরব নিশীথিনী মোর,
সত্তার প্রথম ক্ষণে গুঞ্জরণে যে কথা বলেছ—
মন্ত্রের মতন যারে জপিলাম এ জীবন-ভোর!
মুগ্ধ মনে অর্থ কিছু নাহি জেনে—যে কথা খুঁজেছ।

আমারে খুঁজেছ তুমি বারবার, আজ বলো তাই,
নতুন ভাষায় মোরে, শৈশবের, যৌবনেরও নয়—
প্রাজ্ঞের ভাষায় বলো! প্রজ্ঞানের ঋজুতাই চাই,
প্রগল্ভ অজস্র রাত দেয়নি কো স্থির পরিচয়।

কম্পিত অধর ওই, দুই চোখে যুগের অভিধা—
লগ্ন এলো পরমের। বন্ধু, বলো! আর নয় দ্বিধা॥

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

মৃতদেহের রক্ত জীবন্ত দেহে সঞ্চালন

দুর্ঘটনায় পতিত বা রোগে সংকটাপন্ন মানুষের দেহে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন প্রায়ই দেখা যায়। সাধারণত সুস্থ জীবন্ত মানুষের দেহ থেকে সংগৃহীত রক্ত ঐভাবে মরণাপন্ন মানুষের দেহে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। কিন্তু রক্ত সঞ্চালনের জন্য মৃতদেহের রক্তও সদ্ব্যবহার করা যায় কিনা এ চিন্তা বিজ্ঞানীদের মাথায় বহুদিন থেকে ঘুরেছে। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম ... মাত্র ৩৫ বছর আগে ১৯৩০ ... এবং এই সাফল্যের কৃতিত্ব হচ্ছে ... একটি ইমার্জেন্সী ইনস্টিটিউটের ... চিকিৎসা বিভাগের প্রধান ডাঃ সারগেী ...।

মৃতদেহের রক্ত সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণার ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায়, ... সালে ... নিখিল ইউক্রেন শল্য-চিকিৎসক কংগ্রেসে ভি সামভ্ নামে জনৈক শল্যচিকিৎসক ও গবেষক কুকুরের ... মৃতপ্রাণীর রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কিত গবেষণার বিবরণ প্রদান করেন। ... গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রমাণ ... যে উদ্বর্তিত টিশু জীবিত ... থাকে এবং এমন একদিন ... যখন মানুষে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় এক ... দেহ থেকে এরূপ উদ্বর্তিত উপ-... অপর প্রাণীর প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার ... পারবে। সামভ্-এর এই বিস্ময়কর ... মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম বাস্তবে ... করেন ডাঃ ইউদিন। ১৯৩০ ... মার্চ মাসে মস্কোর স্ক্লিফাসোভ্‌স্কি ... ইনস্টিটিউটে ইউদিন আর একজন ... ফলে মৃতপ্রায় এক রোগীর ... মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত রক্ত সঞ্চালন ... প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন। ইউদিনের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এইভাবে মৃতদেহের রক্ত জীবন্ত দেহে ... সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত হয়। ... থেকে বিগত ৩৫ বছরে ৩৫ ... বেশি মৃতপ্রাণীর রক্ত সঞ্চালনের ... ব্যবহৃত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ... প্রায় ২ টন পরিমাণ এই ধরনের ... চিকিৎসাকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মৃত-প্রাণীর রক্ত চিকিৎসাকার্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ... হচ্ছে পথিকৃৎ এবং সেখানে এই ... বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সাধিত ... ও হচ্ছে। বর্তমানে মস্কো শহরে ... গবেষণা কেন্দ্রের মৃত-প্রাণীর রক্ত ... ও টিশু সংরক্ষণ পরীক্ষাগারের ... হচ্ছেন অধ্যাপক জর্জি আলেক-জান্দ্রোভিচ পাফোমভ্। ভারতে এই ... একটি গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনার ... ভারত সরকারের আমন্ত্রণে কয়েক ... আগে তিনি ও তাঁর এক সহকর্মী ... এসেছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে মৃত গরুর রক্ত মরণাপন্ন একটি কুকুরের দেহে সঞ্চালিত করা হচ্ছে।

অধ্যাপক পাফোমভের মতে চিকিৎসা-কার্যে সঞ্চালন মাধ্যম হিসাবে মৃতদেহের রক্ত জীবন্ত মানুষের দেহ থেকে সংগৃহীত রক্তের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। হঠাৎ যাঁরা মারা যান (যেমন শ্বাসরোধ বা দুর্ঘটনায় মৃত), তাঁদের দেহ থেকে সাধারণত সঞ্চালন উদ্দেশ্যে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংক্রামক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে অথবা দেহযন্ত্রের বিকৃতিদোষে মৃত মানুষের রক্ত এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না। তাই মৃতদেহের ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর কারণ যথাযথ জেনে রক্ত সংগ্রহ করা যায়। মৃত্যুর পর ৬ ঘণ্টার মধ্যে এই রক্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন, নইলে সেই রক্ত নির্বীজিত অবস্থায় থাকে না। গড়পড়তায় একটি মৃতদেহ থেকে ২ লিটার পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ করা যায়।

আমরা জানি, রক্তপাতের অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। কিন্তু আকস্মিকভাবে মৃত মানুষের দেহ থেকে সংগৃহীত রক্তে কয়েকটি অভিনবত্ব দেখা যায়। তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সংগৃহীত রক্ত জমাট বাঁধার পর আপনা-আপনি আবার তরল অবস্থায় ফিরে আসে। রক্তের মধ্যে অনেকগুলি স্বাভাবিক জমাটরোধক বস্তু, বিশেষত 'ফিব্রিনোলাইসিন' বস্তুটি থাকার দরুন এটা ঘটে। ১৮০২ সালে প্লানস্ক এবং মুলার বলেছিলেন, শ্বাসরোধজনিত আকস্মিক মৃত্যুতে এই ঘটনা ঘটে থাকে। ১৮৭৮ সালে হফম্যান বলেন, কেবলমাত্র শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুতে যে এটা দেখা যায় তা নয়, আরও কয়েকটি কারণজনিত মৃত্যুতেও এটা ঘটে। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে, একটি সুনির্দিষ্ট নিরোধক প্রক্রিয়াতেই রক্তের এই তারল্য বজায় থাকে। আরও দেখা গেছে, সংরক্ষণ দ্রবণের সাহায্যে মৃতের রক্তনালী ধৌত করলে মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ গড়পড়তায় আরও এক লিটার পরিমাণ বাড়ানো যায়।

মৃতদেহের রক্ত জীবন্ত মানবদেহে সঞ্চালিত হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার

টেলিভিশনের সাহায্যে যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্প্রতি ইংলণ্ডে চালু হয়েছে।

সম্ভাব্যতা একেবারে যে থাকে না তা নয়, তবে এই প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্যতা শতকরা মাত্র একটি ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য ও অর্থনীতির দিক থেকে মৃত-দেহের রক্তের যে-সব সুবিধা আছে, তার দরুন সোভিয়েত রাশিয়ায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই রক্ত জীবন্ত মানবদেহে সদ্ব্যবহারের জন্যে ব্যাপক চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশেও দিল্লীর একটি হাস-পাতালে মৃতদেহের রক্ত সংগ্রহের সর্বপ্রথম কেন্দ্র শীঘ্রই স্থাপিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে ভারতীয় চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবেন ডাঃ পফোমভ্ প্রমুখ সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা।

কৃত্রিম উপায়ে প্রথম প্রোটিন সংশ্লেষণ

পৌরাণিক কাহিনীতে মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের কথা যদিও আমরা শুনেছি, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের মৃতজনে প্রাণদানের প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসে বিজ্ঞানীরা আজ অনেকদূর এগিয়েছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা অনন্য সাফল্যও অর্জন করেছেন।

আমরা জানি, প্রাণীদেহের একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে প্রোটিন। কৃত্রিম উপায়ে এই প্রোটিন সংশ্লেষণের চেষ্টা বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে করে আসছেন। কয়েক বছর আগে প্রোটিনের উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদনের চেষ্টা সফল হয়েছে এবং তারপর অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত পেপটাইডও তাঁরা উৎপাদন করতে পেরেছেন। 'ইনসুলিন' নামে একটি ক্ষুদ্রাকার প্রোটিন কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনেকখানি অগ্রগতি সাধিত হয়।

আমরা জানি, এই ইনসুলিন দেহের অগ্ন্যাশয়-গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোন এবং রক্তের শর্করামাত্রা নি... এটি ব্যবহৃত হয়। দেহে ইনসু... অভাব ঘটলে প্রাণীদেহ থেকে নিষ্... ইনসুলিন প্রয়োগ করে তা পূরণ করা...

ইনসুলিনের রাসায়নিক গঠন প্রতিষ্ঠিত করেন বৃটিশ রসায়নবি... স্যাঙ্গার ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৫৫ এবং এই অনন্য কাজের জন্য তাঁকে নো... পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর পর ... বহু বিজ্ঞানী কৃত্রিম উপায়ে জটিল ... সুলিন যৌগিক সংশ্লেষণের চেষ্টা ক... থাকেন। ইনসুলিনের উপাদান অ্যা... অ্যাসিড থেকে পেপটাইড উৎপাদন এবং পেপটাইড শৃঙ্খলের সংযোগ ... তাঁরা ইনসুলিন সংশ্লেষণের চেষ্টা ক... গত তিন বছরে অন্তত তিনদল বি... এককভাবে পেপটাইড শৃঙ্খল সংশ্লে... সমর্থ হন কিন্তু সংশ্লেষিত পেপ... শৃঙ্খলের মধ্যে সংযোগ ঘটানো অ... দুরূহ।

১৯৬৩ সালের শেষভাগে প... জার্মানীর বিজ্ঞানীদল এ-কাজে সং... কৃতকার্য হন। তার দু' মাস পরে মা... বিজ্ঞানীদলও কৃত্রিম উপায়ে ইনসু... সংশ্লেষণে সাফল্য অর্জন করেন। ... এই উভয় দলের কেউই বিশুদ্ধ অ... ইনসুলিন উৎপাদন করতে পারেন... উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম জার্মা... বিজ্ঞানীদল যে-কৃত্রিম ইনসুলিন সংশ্লে... করেন, তার জৈবিক কার্যকারিতা ... অগ্ন্যাশয়-গ্রন্থি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃ... হর্মোনের তুলনায় শতকরা একভাগ ...

১৯৬৫ সালে একদল চৈনিক বিজ্ঞা... কৃত্রিম উপায়ে বিশুদ্ধ গোজাতীয় ইনসু... সংশ্লেষণে সফলকাম হয়েছেন। তাঁদের ... কৃত্রিম ইনসুলিন রাসায়নিক ও জৈবিক ... থেকে গো-জাতির প্রাকৃতিক ইনসুলি... অনুরূপ। তাঁদের এই সংশ্লেষণকে ... প্রথম সম্পূর্ণ প্রোটিন সংশ্লেষণর... অভিহিত করা যায় এবং বিজ্ঞানের ... সত্যকার একটি অনন্য কৃতিত্ব বলে ... অভিনন্দিত হবে। এই কৃত্রিম ইনসুলি... উৎপাদন-হার অতিসামান্য। সু... প্রাকৃতিক ইনসুলিনের সঙ্গে প্রতিযোগি... এই কৃত্রিম প্রোটিনটি দাঁড়াতে পারবে ... তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই গবেষ... সাফল্য অপরাপর প্রোটিন সংশ্লেষ... সম্ভাব্যতার দ্বার খুলে দিয়েছে। ... বিজ্ঞানের দিক থেকে এই সাফল্যের গ... অপরিসীম। হয়তো এই সাফল্যের পথ ... মানুষ একদিন প্রাণসৃষ্টির স্বর্ণদ্ব... উপনীত হবে!

*

গত ১৪শ সংখ্যা অমৃত-এ 'বিজ্ঞা... কথা'য় দশম জেমিনির উৎক্ষেপণের তারি... ভুলক্রমে ১৯ জুনে মুদ্রিত হয়েছে, প্রকৃ... পক্ষে ১৯ জুলাই হবে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জ্ঞানেন্দ্রমোহনেরও বয়স হয়েছে প্রায় ত্রিশ। ভুনীর মায়ের বয়সও কম না—চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। কপালে সিঁদুরের একটা টিপ আছে, কিন্তু সিঁথেয় সিঁদুরের দাগ নেই। দেখতে সুন্দরী না হলেও শ্রী। এই বয়স আর এই চেহারা নিয়ে এমন-একটা বস্তীতে অমন-একটা মেয়ে হয়ে কি করে বাস করছে ভুনীর মা—একথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হলেও জিজ্ঞাসা করা হয় না। অবশ্য সবই জানা আছে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের।

এত জানা সত্ত্বেও এমন সহজে এই দিনের আলোয় তিনি এখানে এসে উপস্থিত হতে পারেন নিজের ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে বলেই। কেবল নিজের উপর নিজের বিশ্বাস নয়, আর-পাঁচজনেরও বিশ্বাস আছে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উপর। তারা জানে, এ লোকটা এই অঞ্চলের একজন সাচ্চা লোক।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন জোড়াসন হয়ে বসে পা করে চলেছেন। বাতার দেয়ালে টাঙানো কতকগুলি রং-বেরঙের ছবি—মাঝে মাঝে সেগুলি দেখছেন। ছোট্ট জানলায় পর্দা লাগানো। বাতাস লেগে পর্দা একটু-একটু উড়ছে।

ভুনীর মায়ের দুটি ঘর। পাশে আর-একটি ঘর আছে। সে ঘরটা এ ঘরের চেয়ে একটু বেশি সাজানো। ওঘরে কখনো ঢোকেননি জ্ঞানেন্দ্রমোহন। ওঘরের বড় আয়নার সামনে দাঁড়ালে তাঁর সর্বাঙ্গের রোপানির ছায়া যে তিনি দেখতে পাবেন, খবর হয়তো জানেন, হয়তো জানেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন।

কিন্তু সেসব ব্যাপারে তাঁর কোনো কৌতূহল নেই। তিনি নির্বিকার নির্লিপ্ত মানুষ। সদাচারী সজ্জন পুরুষ তিনি। এখানে যারা বাস করে তাদের উপর করুণা হয়। তাদের সংসর্গে আসার তাঁর আগ্রহ। সমাজের নীচুতে যারা বাস করে তারা যে সমাজের একেবারে বাইরের লোক—একথা বিশ্বাস করেন না জ্ঞানেন্দ্রমোহন। একটু কদাকার বা কদর্য জীবন যাদের, তাদের সংস্পর্শে এলেই যে গায়ে দাগ লেগে যাবে, এ ভয় নেই জ্ঞানেন্দ্রমোহনের।

তার উপর মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ তিনি। সুতরাং অনেক দায় ও অনেক দায়িত্ব তাঁর আছে। নিবিড় কাছে থেকে যদি সকলকে দেখা না গেল, তাহলে সমগ্র সমাজের একটা সমগ্র চেহারা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে কী করে?

জ্ঞানেন্দ্রমোহন স্থির হয়ে বসে আছেন দেখে, ভুনীর মা মনে-মনে একটু যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। ছটফট ঠিক নয়, কিন্তু একটু চঞ্চল যেন হয়েছে ভুনীর মা।

—কি হল? একটু চাঞ্চল্য যেন লক্ষ্য করছি। বললেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, তাঁর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ন তাঁর অনুভূতি খুব সজাগ।

একটু বিব্রতবোধ করল ভুনীর মা, কিন্তু আসল কারণটা গোপন করে বলল, ভাবছি মেয়েটার কথা। বিকেল গড়িয়ে এল। এখনো ফিরছে না কেন।

সত্যি, গড়িয়ে এসেছে বিকেল। খোলার চাল ছেড়ে দিয়ে রোদ উঠে গেছে ওদিকের উঁচু কোঠাবাড়িটার মাথায়। পাখিরা ফিরে যেতে আরম্ভ করেছে তাদের বাসায়।

হয়তো লক্কা-পায়রা নামের পাখিরাও ডেরায়-ডেরায় ফিরতে আরম্ভ করেছে। এবং তাদের মধ্যের অনেকেই হয়তো আপন ডেরায় না ফিরে, অন্য কোনো ডেরার খোঁজে এদিক-ওদিক ঘুরতে-ফিরতে আরম্ভ করেছে।

এবং হয়তো এই জন্যেই ভুনীর মায়ের চোখের তারা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আটপৌরে সাজে সেজে আছে সে, কিন্তু এই সাজে থাকার কি সময় এখন?

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এতক্ষণে উঠি-উঠি করলেন দেখে একটু আশ্বস্ত হল বুঝি ভুনীর মা। আশপাশের খোলার ঘরে হাসা-হাসি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। একটু দূরের একটা ঘর থেকে কাঁই-কুঁই শব্দে বেজে উঠেছে হারমোনিয়ম।

ঐ সুরের রেশ কানে ঢুকেছে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের। তিনি বুঝি বুঝলেন যে, এ পাড়ায় এখন সাড়া জেগেছে। বললেন, তোমার মেয়ে [illegible] না এখনো। [illegible] নামটা রেখেছ কিন্তু বনবিহারিণী। নামের দাম ও রেখেছে।

কথাটা বোধহয় কানে গেল না ভুনীর মায়ের। সে বলল, ওর জন্যে ভাবিনে। ফিরবে নিশ্চয় এখনই। যাক, আপনাকে আর আটকাব না। আপনি কাজের মানুষ, কত কাজ আপনার। একদণ্ড কি সময় আছে আপনার?

জ্ঞানেন্দ্রমোহন উঠলেন। মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দু পাশে খোলার ঘরের সারি, তারই মাঝের সরু পথ ধরে এদিক-ওদিক একটু দৃষ্টিপাত করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন তাঁর আপন ডেরার দিকে।

এদিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, ওদিকে ভুনী কিন্তু তখন প্রফেসর পীতাম্বরের আসরে মশগুল হয়ে বসে। প্রফেসর পীতাম্বরের ম্যাজিক দেখছিল বনবিহারিণী।

পীতাম্বর একটা ময়লা হাফ প্যাণ্ট পরে বাচ্চাদের নিয়ে আসর জমিয়েছে। ছোটখাট ম্যাজিক দেখাচ্ছে তাদের। একটা তাস দেখাচ্ছে, আর তাদের চোখের সামনে তাসটার রঙ বদলে যাচ্ছে। একটা লাঠি ভেঙে টুকরো টুকরো করে আবার আস্ত লাঠিটা এনে ধরছে তাদের সামনে।

ফ্রকটা হাঁটুর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে দু-হাঁটুর উপর থুৎনি রেখে দু চোখ বড়-বড় করে ভুনী পীতাম্বরের ম্যাজিক দেখছে। এতে সে এমনি ডুবে গিয়েছে যে, সময় কেটে গিয়েছে কোনখান দিয়ে তা সে জানে না। সূর্য যে ডুবে গিয়েছে কখন সে খেয়ালও নেই তার।

একটা রুপোর টাকা নিয়ে ছিঁড়ে দুটো টাকা করে ফেলল পীতাম্বর। ভুনীর চোখ-দুটো ডবল বড় হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে হল, এই ম্যাজিকটা সে শিখে নেবে নিশ্চয়। তাহলে তার মায়ের মুখ থেকে টাকার ভাবনার ছাপ মুছে দিতে পারবে সে।

তার মায়ের মুখে সব সময়ই ভুনী নানা অসুবিধার কথা শোনে। তার মা বলে, বড় হয়ে ওঠ্ না শিগগির। আমি আর পারি[illegible] আমার যে বয়স হয়ে [illegible]

মায়ের কথাগুলো অনেক সময় বিশ্রী শুনতে লাগে ভুনীর। মায়ের বয়স হয়ে গেল বলেই তাকে বড় হয়ে উঠতে হবে কেন। সে বড় হয়ে উঠলে তো মায়ের খরচ আরও বাড়বেই। এখন একটা ফ্রকে চলছে, তখন দরকার হবে কত জিনিস—কত সায়া, কত শেমিজ, কত শাড়ি।

পীতাম্বর মনের আনন্দে ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে বাচ্চাদের। এর মধ্যে তার নিজের তিনটি বাচ্চাও আছে। তার স্ত্রী হরিদাসী তোলা-উনুন ঘরের বাইরে রেখে তাতে আঁচ দিয়েছে, তার ধোঁয়া এসে ঢুকছে ঘরে।

পীতাম্বরের চোখ জ্বালা করে উঠেছে। বলে উঠল, এত ধোঁয়া দিলে কেন, উনুনটা একটু ওদিকে টেনে নিলে পারতে!

ঘরের একটি কোণে লণ্ঠন জেবলে বসে বাটনা বাটছিল হরিদাসী, মাথা না তুলেই বলল, এত ম্যাজিক তো জানো, ধোঁয়াটাকে উড়িয়ে দিতে পার না?

উত্তর দিল না পীতাম্বর। ম্যাজিক মানেই তো ধোঁকা দেওয়া, লোকের চোখে ধোঁয়া দেওয়া। কিন্তু এই ধোঁয়া এসে লেগেছে তারই চোখে, একে সে এখন হটিয়ে দেবে কোন যাদুতে?

হরিদাসীর মন্তব্যটার মধ্যে অন্য মানেও আছে। তার সংসারের কথা আছে। এই সংসারটা নিয়ে পীতাম্বর একটু ম্যাজিক কেন যে করছে না—এইটেই বুঝি তার নালিশ। কিন্তু এ নালিশ স্পষ্ট করে জানাল না হরিদাসী।

বাতার দেয়ালের গায়ে পীতাম্বরের কালো প্যান্ট ও কালো কুর্তা ঝুলছে। লণ্ঠনের আলো পড়ায় বড় ভৌতিক আর বড় অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে ও দুটোকে। আসল পীতাম্বর এখানে বসে আসর জমিয়েছে, আর ও দেয়ালের গায়ে ঝুলছে যেন তার ছায়া।

পীতাম্বর তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, ম্যাজিক বোধহয় ভুলেই যাব। কতদিন হল ভেবে দেখ, কেউ একবার ডাকছে না?

তাই। ডাক আসছে না এখন কোনোখান থেকেই। লোকে কি ভুলে গেল প্রফেসর পীতাম্বরকে? কিন্তু তা বোধহয় না। মানুষের মর্জিটাই এই রকম। একেবারে চুপচাপ হয়ে থাকে তারা। হঠাৎ আবার একসঙ্গে জেগে ওঠে। একসঙ্গে ডাক পড়ে তার চারদিক থেকে। তখন এই চোরবাগান বস্তীর নগণ্য এই সামান্য মানুষটি হয়ে ওঠে গণ্যমান্য, হয়ে ওঠে অসামান্য। বাতার দেয়াল থেকে নেমে আসে কুর্তা ও প্যান্ট। ম্যাজিক-কাঠিটা তখন তলোয়ারের মত যেন ঝলমল করে ওঠে—পালিশ লেগে যায় তার গায়ে।

উনুনটা জ্বলে উঠেছে। ঘরের মধ্যে নিয়ে এল হরিদাসী। এখন রান্না হবে। কি-কি রান্না হবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করল না পীতাম্বর। কিন্তু মনটা তার কেমন-যেন এলোমেলো হয়ে গেল হঠাৎ। ম্যাজিক দেখানো সাঙ্গ করল সে।

ভুনী উঠে দাঁড়াল। বাইরে উঁকি দিয়েই সে প্রায় চমকে উঠল। বাইরেটা অন্ধকার। হঠাৎ কখন আর কি করে রাত্তির এসে গেল, তা সে জানেই না।

তার মা নিশ্চয় ভাবছে তার কথা। ভুনী দৌড় দিল তার ঘরের দিকে।

পীতাম্বরের মেয়ে মেনকা বলল, কাল আবার আসবি তো রে?

উত্তর দিল না ভুনী। হয়তো মেনকার গলা সে শুনতে পায়নি।

চোরবাগানের জীবন বয়ে চলেছে একই ভাবে। একই ভাবনা-বেদনা-কামনা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষের যে-জীবন, এখানকার জীবনও ঠিক তেমনি। এ-জীবনে কোনো বৈচিত্র্য হয়তো নেই, তবু একে একটা বিচিত্র জীবন বলতেও বাধা নেই।

মানুষের জীবনের কতটুকুই বা দেখি আমরা, কতটুকুই বা জানি? একটা খণ্ড জীবন দেখেই হয়তো একটা অখণ্ড উপাখ্যান দাঁড়িয়ে যায়। তখন মনে হতে পারে, মানুষের পূর্ণ পরিচয়টা পাওয়া গেল।

ভুনীর মায়ের জীবিকা যাদের উপর নির্ভর করে তারা স্বল্পবিত্তের মানুষ, যারা নিজেদের পরিচয় দেয় মধ্যবিত্ত বলে। চোরবাগানের খোলার ঘরে রাজা-বাদশারা আসবে কেন। সুতরাং ভুনীদের সংসারেও টানাটানি আছে। এক টাকাকে ছিঁড়ে দু টাকা করার ম্যাজিক শিখে নেবার জন্যে ভুনীর তাই খুব ইচ্ছে হয়েছিল।

কিন্তু ভরসা বলতে যা বোঝায় তা তাদের আছে। তারা কৃপাদৃষ্টি পেয়েছে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের।

দিনের বেলায় অনেক সময় ভুনী দৌড়ে চলে যায় চোরবাগানের মেস-বাড়িতে। সেখানে গিয়ে বইপত্তর গুছিয়ে দেয় জ্ঞানেন্দ্রমোহনের।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলেন, ভুনী, লেখাপড়া শিখবি?

ভুনী বলে, কি হবে পড়াশুনা করে?

—জ্ঞান হবে।

—কি হবে জ্ঞান দিয়ে?

ভুনীর একথার উত্তর দিতে পারেন না জ্ঞানেন্দ্রমোহন। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, ক্রমেই তুই মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছিস ভুনী। আয়, কাছে বোস। একটা গান গা।

—গান জানি নে।

—শিখবি গান?

—শিখব। ভুনীর চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন তাকে, বললেন, জ্ঞান দিয়ে তো কিছু হবে না বললি। কিন্তু গান যে শিখতে চাস, কি হবে সেই গান দিয়ে?

—বা রে! ভুনী বলল, পয়সা রোজগার করব গান দিয়ে।

একটা নিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। ভুনীকে একটু আদর করে বললেন, বেশ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কাছ থেকে সরে এসে ভুনী বলল, আর শিখব ম্যাজিক। একশ টাকাকে হাজার টাকা করে দেব।

ম্যাজিক? ভুনী ম্যাজিক শিখবে? ভুনী নিজেই যে একটা ম্যাজিক হয়ে উঠছে তা হয়তো জানে না সে। তার শরীরটা বেড়ে উঠছে, তার শরীর নিয়ে ম্যাজিকই করছে কেউ। একশ হয়তো লাখ টাকাই একদিন করতে সে। তার মায়ের কষ্ট দূর হবে তাতে

জ্ঞানেন্দ্রমোহন উঁচু তাক থেকে বই নামাতে-নামাতে জিজ্ঞাসা ক ম্যাজিক শিখবি কোথায়?

একথা শুনে যেন আকাশ থেকে ভুনী। বলল, জানেন না তাঁকে। চেনেন

—কাকে?

—প্রফেসর পীতাম্বর।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের চোখ-দুটো বড় হয়ে উঠল। এ নাম তো তিনি শোনে কখনো। বললেন, তিনি কে?

ভুনী বলল, তিনি একজন যাদুকর।

—কোথায় থাকেন?

—এই চোরবাগানেই। শ্রীমানি বা পিছনে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বুকটা একটু করে উঠল। একটু আগে তিনি ভুনীর হয়ে যাওয়া নিয়ে একটু চিন্তা করেছি ঐ পীতাম্বর তাহলে ম্যাজিক করতে করেছে নাকি?

গম্ভীর হয়ে গেলেন জ্ঞানেন্দ্রমো মনে-মনে বিড়বিড় করে কি-যেন লাগলেন। ভুনী তার কিছুই বুঝতে না। তিনি বলতে লাগলেন—প্র প্রফেসর, প্রফেসর। যত সব জোচ্চোর লম্পট! নামের সামনে একটা খেতাব নিলেই হল।

বললেন, ভুনী। তুমি কিন্তু অনেক বড় হয়ে উঠেছ। তোমার সাবধানে থাকা দরকার। যেখানে-সে যাবে না। যেখানেই যাবে, তোমার জিজ্ঞাসা করে যাবে।

ভুনী বলল, মা কিছু বারণ কর এখানে আসি, সেকথাও তো মাকে আসি নে।

বিরক্ত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বল এখানকার কথা আলাদা। কিন্তু যে সেখানে যাবে না।

ভদ্র সমাজ, ভদ্র পরিবেশ, ভদ্র হাওয়া—এই সবের মধ্যেই মানুষ হয়ে এই জ্যান্ত মেয়েটি, এই বর্নবিহা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের একান্ত ইচ্ছে হয়তো নামের আগে একটা প্রফেসর জুড়ে লোকে প্রফেসর হয়ে যায় না। তার বাড়ে না, তার বুদ্ধিও বাড়ে না তল্লাটেই আছে নাকি ঐ লোকটা, কিন্তু তিনি তো কখনো নামও শোনেননি জ্ঞানেন্দ্রমোহন নিরহংকার নির্লিপ্ত বিনয়ী বলে অনেকের কাছেই পরি কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁর গা-টা কেমন করে উঠেছে।

যাক গে। ও নিয়ে তিনি আর চান না।

ইতিমধ্যে ভুনী কখন চলে তিনি জানেন না। ভুনীর রকম-সকম রকম। আসার সময়ও বলে আসে না, সময়ও বলে যায় না।

ান থেকে বেরিয়ে সে সোজা চলে পীতাম্বরের ডেরায়। মেনকা তার মেনকার কাছে চলে গিয়েছে ভুনী। াজ পীতাম্বরের ঘরে গিয়ে তার বেশ াগল। সকলেই বেশ আনন্দ করছে। বেশ খুশি।

াক এসেছে নাকি পীতাম্বরের: এক- িনটে ডাক। তিন জায়গায়। বায়নাও দিয়ে গিয়েছে তারা। আজ তাই বাড়িতে বেশ ভোজের ব্যবস্থা । মেনকার মা খুব ব্যস্ত। দুটো -উনুনে গনগন করে জ্বলছে। ও পাশে এনামেলের থালায় ঢালা আছে মাংস। াসতে-হাসতে মেনকা বলল, বাবা অনেক দূরে যাবে রে। কুচবিহার, র রাজাভ তখাওয়া। অনেক টাকা ব এবার। আমাকে শাড়ি দেবে, মাকে গয়না। আর, ভাইদের পেন্টালুন।

আজ রাতের ট্রেনে প্রফেসর পীতাম্বর সফরে। যাবার জন্যে তৈরি করে হচ্ছে নিজেকে। কালো কোর্তা ও ময়লা হয়ে তেলচিটে হয়ে গিয়েছিল। একটু দূরে বারোয়ারি কলের বসে পীতাম্বর সাবান মাখাচ্ছে তার া-প্যান্ট। গায়ে যেন জোর এসে ছে পীতাম্বরের। বেশ জোরে জোরে হয়ে কাচছে সে।

মেনকার এক ভাই তার বাবার জুতো- । নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মায়ের একটা ছেঁড়া টুকরো নিয়ে সে জুতো জোড়া।

র থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বর বলল, পারবি নে, নীলু। রাখ, এসে করছি।

কন্তু পীতাম্বর ছাড়ল না। সে ার করতে লাগল জুতো। অনেক দিন ন হয়নি, ছাতা পড়ে গিয়েছে।

ঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল মেনকার। ক বলল, আয়, দুজনে মিলে করি। -কি করব?

-বাবার মেডেল। আয়-না তেঁতুল দিয়ে । চকচক ঝকঝক করবে। ঐ মেডেল লাগিয়ে বাবা যখন আসরে দাঁড়াবে, বাবাকে কী সুন্দর যে দেখাবে! র চোখ-দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দের এখানে খুব হৈ-চৈ কান্ড আজ। মহা-উৎসব যেন আজ পীতাম্বরের । পেঁয়াজ-রশুন-মশলার গন্ধে আজ আচ্ছন্ন। আনন্দে সারাবাড়ি ারা।

্যান্ট আর কোর্তা ঝুলছে দড়িতে। বর বসে গিয়েছে এবার জুতো করতে।

মন সময় সরু গলিতে কার যেন শব্দ পাওয়া গেল। পীতাম্বর ঐ ুনে মুখ তুলে তাকাতেই দেখল, জন আগন্তুক আসছেন।

জ তার একটা শুভদিন। অনেক দিন াক এসেছে তার। আবার কেউ এল নতুন একটা বায়না নিয়ে?

ন বায়নাই বটে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ন। ভুনীর মুখে এই মানুষটার কথা শোনার পর থেকে লোকটাকে দেখার তাঁর বড় ইচ্ছে হয়েছে। ইচ্ছেটা আর চাপতে না পেরে তিনি এখনি এসে পড়লেন এখানে।

পীতাম্বর উঠে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করল, কাকে চান?

জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটু ভাবলেন, পীতাম্বরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে পীতাম্বর নামে নাকি একটা লোক থাকে?

ঠিক। যা আন্দাজ করেছে পীতাম্বর নিশ্চয়ই তাই। নতুন বায়নাই তবে আবার এসেছে। বলল, আমিই। আমিই পীতাম্বর। আপনি আসছেন কোথা থেকে।

পীতাম্বরের আপাদ-মস্তক ভালো করে লক্ষ করে নিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বললেন, আসছি এই কাছে থেকেই। আমার নাম জ্ঞানেন্দ্রমোহন।

—ওঃ, আপনি? পীতাম্বর বলল, আসুন, আসুন। সত্যি আমার ভাগ্য। আমার ঘরে আপনার পদধূলি—

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। পীতাম্বরের কথার উত্তর দিলেন না, সেকথা তাঁর যেন কানেই যায়নি।

ভুনীদের ঘর হয়ে এসেছেন জ্ঞানেন্দ্র-মোহন। সেখানে নেই দেখে তিনি দেখতে এসেছেন এখানে আছে কি না। কিন্তু মুখে সেকথা তিনি প্রকাশ করলেন না। অমায়িক হাসি হেসে বললেন, ব্যাপার কি? আজ যেন এখানে একটা মস্ত ভোজের আয়োজন হয়েছে।

পীতাম্বর হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান, হাত-সাফাই তার কাজ, লোককে ধোঁকা দেওয়াই তার পেশা, কথার কারিকুরি তার কাজ না। তবু একটু হেসে সে বলল, ভোজ না, ভোজন। আজ বাড়িশুদ্ধ লোক একটু পেট ভরে খাব ঠিক করেছি।

—বেশ। কোথাও যাওয়া হবে বুঝি? জামা-কাপড় কাচা হয়েছে দেখছি, জুতো বুরুশ করা হচ্ছে।

পীতাম্বর সব বৃত্তান্ত বলল, তার মনের খুশি একটু যেন উপচেই পড়ছে।

সব শুনে জ্ঞানেন্দ্রমোহন আবার বললেন, বেশ।

ঘরের ভিতরে এক কোণে রান্নাবান্না চলেছে, আর এক পাশে ভুনী ও মেনকা উনুন থেকে শুকনো ছাই নিয়ে তাই দিয়ে মেডেল পালিশ করছিল। বাইরে কার যেন গলা শুনেছে কিছুক্ষণ থেকে। মেনকা উঠে এসে উঁকি দিয়েই চলে গেল। বেরিয়ে এল তারপর ভুনী। জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে দেখেই বলল, আপনি এসেছেন? চিনতে পারলেন বাড়িটা? ইনিই হলেন প্রফেসর পীতাম্বর— মস্ত যাদুকর। আজ বাইরে যাচ্ছেন যাদু দেখাতে।

বিনীত নত আর নম্র হয়ে গেল পীতাম্বর, বলল, কার কাছে কিসের গল্প করছ ভুনী। মস্ত মানুষ ইনি, কত গুণ ওঁর, কত জ্ঞান। আমাদের জীবনটা ঝুটা; মিথ্যা আর মেকী নিয়েই আমাদের কাজ। আমার মেয়ে মেনকার হচ্ছে ও বন্ধু। খুব ভাব ওদের। তাই আসে। ওর কাছে আপনার কথা কত শুনি। আজ আপনাকে দেখার ভাগ্য ঘটল। আপনার পায়ের ধুলো—

জ্ঞানেন্দ্রমোহন বললেন, আমি এখন। এখন বড় ব্যস্ত দেখছি সকলকে।

সত্যি তারা একটু ব্যস্ত আছে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি সে জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে। তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে বলল, আবার যেন পদধূলি দেন এখানে।

কোনো উত্তর না দিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। একটা বিশ্রী ধারণা নিয়েই বুঝি তিনি চলে গেলেন। প্রফেসর পীতাম্বর! প্রফেসর—প্রফেসর!

কিন্তু পীতাম্বরের ধারণা হল একেবারে বিপরীত। সত্যি কী মহৎ মানুষই-না উনি। সাজে-পোশাকে কত সাধারণ। ভিতরটায় ওঁর জিনিস আছে, তাই বাইরে কোনো বাহারের দরকার করে না। কিন্তু পীতাম্বরকে সাজতে হবে অনেক ঘটা করে— লোকের চোখে ধাঁধা লাগাবার জন্যে বুকে ঝোলাতে হবে মেডেলের মালা। সত্যি, সব মেকী, সব ঝুটা।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের নামটাই তার শোনা ছিল, আজ তাঁকে দেখে তাঁর উপর শ্রদ্ধা দশ গুণ বেড়ে গেল পীতাম্বরের।

মেনকাদের মেডেল-মাজা হয়ে গিয়েছে। জুতো পালিশ করা হয়ে গেছে পীতাম্বরের। জামা-কাপড়ও শুকিয়ে এল। ওদিকে রান্নাও প্রায় শেষ।

শ্রীমান বাজার থেকে দফে-দফে দু-একটা জিনিস কিনে নিয়ে আসছে পীতাম্বর। লঙ্কা, লবণ, গোলমরিচ। অনেকদিন এমন এলাহিভাবে রান্নাবান্না হয়নি, তাই অনবরতই একটা-না-একটা জিনিসের দরকার হয়ে পড়ছিল।

ভুনী আজ নেমন্তন্ন পেয়ে গিয়েছে এখানে।

বিকেলবেলা একেবারে তৈরি হয়ে নিল প্রফেসর পীতাম্বর। ফলেকাটা একটা টিনের স্যুটকেসে নিয়ে নিল জামা-কাপড়, মেডেলের বান্ডিল।

এছাড়াও আরও অনেক জিনিস যাবে সঙ্গে। রুমালের খেলা, চোঙের খেলা, গেলাশের খেলা—অনেককিছু খেলাই দেখাবে সে। চৌকীর নীচ থেকে সেসব সরঞ্জাম টেনে বের করে মস্ত একটা বান্ডিল তৈরি করে নিল।

অ্যাসিস্টান্ট ন্যাংটেশ্বরকে খবর দিয়েছিল। সে সময়মত এসে হাজির হল।

(দুই)

ভুনীদের পাড়াটা একটু যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। তাদের পাশের ঘরে নতুন ভাড়াটে এসেছে। ভাড়াটেটা নাকি একজন বাঈজি।

বাঈজির নাম গঙ্গামণি। যেমন গলা, তেমনি মেজাজ। খুব অহংকার আছে বাঈজিটার।

পাড়াটা সরগরম হয়ে উঠেছে। সারাটা দিন লেগেই আছে গান আর বাজনা। লোকের আনাগোনারও বিরাম নাই। থিয়েটারে গান গায় নাকি গঙ্গামণি, থিয়েটারের মঞ্চে উঠে সে নাকি নাচেও।

ভুনীর জীবনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। গতানুগতিক জীবনই হয়তো লেখা ছিল তার ভাগ্যে। এইখানে যে জীবন সকলের ভাগ্যে ঘটছে সেই রকমের একটা জীবনই তার পাওয়ার কথাটা যেন পাকা হয়েই ছিল।

কিন্তু ভুনীর জীবনে কৌতূহল আছে, আগ্রহ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। এক টাকা ছিঁড়ে দু টাকা করতে চায় সে। সে ম্যাজিক শিখে নিতে চায়।

গঙ্গামণির ঘরে গানের আসর বসে যখন-তখন। ভুনী সেখানে গিয়ে এক কোণে বসে-বসে শোনে সেই গান। প্রফেসর পীতাম্বরের ম্যাজিক দেখে যতটা আগ্রহ নিয়ে ঠিক ততটা আগ্রহ তার এখানেও।

রোজ সে গঙ্গামণির ঘরে অনেকটা সময় কাটায়। গায়ে তার একটা আধ-ময়লা ফ্রক। কিন্তু ফ্রক এখন-যেন তাকে মানায় না। বয়স বেড়েছে হয়তো দুটো বছর, কিন্তু শরীরটা তার বেড়ে গিয়েছে বয়েসের আগে-আগে।

গঙ্গামণির সঙ্গে ভাব-সাব হয়ে গিয়েছে ভুনীর মায়ের। ভুনীকে নিয়ে কত-যে তার ভাবনা সেকথা গঙ্গামণিকে অনেক বার বলেছে ভুনীর মা।

একদিন গঙ্গামণি ভুনীকে কাছে ডেকে বলল, গান শিখবি?

শিখবে। শিখবে। শিখবে। মনে-মনে সে বলল ঐ কথাগুলো, কিন্তু মুখে কোনো উত্তর দিতে পারল না ভুনী।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ভুনী বসে গেল গঙ্গামণির পাশে, তার গলায় গলা মিলিয়ে আরম্ভ করল গান।

খুব আনন্দ হল ভুনীর। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন একদিন তাকে গান গাইতে বলেছিলেন, সেদিন সে পারেনি গাইতে। আর, আর, আর—গান শিখলে নাকি পয়সা পাওয়া যায় অনেক। একথা যদি সত্যি হয় তাহলে কথাই নেই। তাহলে তার মায়ের হাতে সে তুলে দেবে সেই টাকা, মায়ের অনেক চিন্তা দূর করে দেবে সে।

গঙ্গামণি আশ্বাস দিয়েছে তাকে, বলেছে, হবে রে, তোর হবে।

গঙ্গামণির কাছে থিয়েটারের লোকজন আসে অনেক, তারাও ঐ একই কথা বলে। বলে, হবে, নিশ্চয় হবে।

এদের এইসব কথা শুনে ভুনীর শরীরটা শিউরে ওঠে। তাহলে সে হয়ে উঠতে পারবে একজন গাইয়ে?

মেনকার কথা মনে হয় তার। মেনকাও যদি এসে তার সঙ্গেই শিখে নেয় গান, তাহলে বেশ মজা হয়। কিন্তু মেনকারা কেন-যেন এদিকে আসে না, তাদের এই পাড়ায় কখনো ঢোকে না। তাকে তার বাবা-মা এখানে গান শেখার জন্যে কি আসতে দেবে?

গুন-গুন—গুন-গুন করে গান গায় বনবিহারিণী। গলাটা নাকি তার মন্দ না। গলা নাকি তার হবেই; আর, চেষ্টা নাকি বেশ ভালো গাইয়েই হয়ে উঠবে।

সারাটা দিন আজকাল তার কাটছে না। গঙ্গামণির ঘরে কত মানুষ দেখছে সে। কত বড়-বড় মানুষ এ ধরনের মানুষ বড়-একটা দেখা হয় তার। সারাটা দিন কত গান। সারাটা থিয়েটারের কত গল্প।

দিনটা কাটে মন্দ না। কিন্তু সন্ধ্যা এলেই ভুনী কেমন একা হয়ে যায়। মা ব্যস্ত হয়ে যায়, গঙ্গামণি চলে থিয়েটারে।

গ্যাসের আলোয় সামান্য আলো-গলিটা পার হয়ে ভুনী চলে আসে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কাছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাটায় এখানে।

লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভুনীকে অনেক নীতি শোনান। সে গান শিখেছে শুনে খুশি হয় না জ্ঞানেন্দ্রমোহনের।

কেবল বলেন, সব শিখে নেবে। চলতে হবে খুব সাবধানে। জানো। পথ বড় পিছল।

ভুনী জানত না। তাই উত্তরে কিছু বলেনি। কিন্তু ক্রমেই সে তা জানল।

কিন্তু কি সে জানল, সেকথা কখনো কারো কাছে সে ফাঁশ করেনি।

এদিকে শিখে চলেছে সে তার গান। একদিন সে একটা নতুন নাম শুনল আসরে—বিনোদিনী। খুব ভালো অভিনয় করতেন নাকি বিনোদিনী। খুব অল্প বয়স থেকে আরম্ভ করেন অভিনয়। এখনো অনেকে তাঁর অভিনয়ের কথা মনে রেখে[illegible]। বয়স যদিও খুব বেশি হয়নি তাঁর, অভিনয় করা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। অভিনয় ছেড়ে দিলেও নাটকের উপর [illegible] তাঁর খুব। তাই তিনি তৈরি করেছেন একটা কোম্পানী, তার নাম বিনোদিনী নাট্যসমাজ। গঙ্গামণি নাকি সেই সমাজের একজন, এখানে যাঁরা আসেন তাঁরাও সেই সমাজেরই লোক।

বিনোদিনী নামটা শোনার পর তাঁকে দেখার খুব ইচ্ছে হল ভুনীর। সে শুনেছে খুবই নাকি সুন্দরী তিনি। আর, নাকি অনেক টাকা।

বিনোদিনীর জীবনটাও ছিল অনেকটা ভুনীর জীবনের মতই। শিশুকাল থেকে অনেক দৈন্য ও দুর্ভাবনা গিয়েছে তাঁর জীবনে। কিন্তু তার ভিতরে শক্তি ছিল, সেই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। তারপর বিনোদিনী ক্রমশ বড় হল, ক্রমশ সে অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারল। তার নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা, সেই চেহারার আকর্ষণ কিছুটা, কিছুটা তার খ্যাতির টানে, বহু বহু গণ্যমান্য মানুষ মৌমাছির মত ভিড় করল এই মধুচক্রটির চারধারে।

অর্থ এল অনেক—অঢেল। [illegible] জীবনটা কেমন একটু জটিল হয়ে উঠল। টাকার জোরে যাদের অনেক প্রতাপ প্রতিপত্তি আছে তারা তাকে আকর্ষণ করে নাগাল বিভিন্ন থিয়েটারে। এই অবস্থা

...ছিল, তখন রঙ্গ-নাট্যশালার এই ...টি আর নাটক করবে না বলে ... করে মধুকরদের মনোরঞ্জন ...কাজেই আত্মনিয়োগ করল। কিন্তু ... উপর তার বিপুল টান, তাই গড়ে ... সে একটি নাট্যদল—বিনোদিনী ...জ।

...গামণির গলা যেমন ভালো, মেজাজও ... চড়া। তার গলার আকর্ষণে ভুনী ...ছে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে ... জন্যে যেমন তৈরি, তার মেজাজ ...তেমনি সে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে ...কতেও প্রস্তুত।

...লা রঙের একটা ফ্রক পরে রোজই ... ভুনী। গঙ্গামণি তা লক্ষ করে, কিন্তু ... কথা বলে না। কিন্তু তার চোখ-... ভাব দেখে মনে হয়, গঙ্গামণি এই ...র বিষয়ে কিছু যেন ভাবছে।

...নীর মাকে ডেকে পাঠাল সেদিন ...। বলল, মেয়েটার দিকে চোখ রেখ ... তার জন্যে নতুন জামা-কাপড় ... তোমার হাতে দিলাম। ওকে এই-... পরিয়ে এখানে পাঠাবে।

...নীর মায়ের চোখ-দুটো ছলছল করে ... তার অবস্থার কথা কারও অজানা ...গঙ্গামণিরও জানা। গঙ্গামণি বলল, ... কত খানদানি মানুষ আসে ...। তারা সব ভাববে কি!

...তুন জামা-কাপড় পরে ভুনীর ...ই হয়ে গেল আলাদা রকম। ছুই-... পড়েছিল যে চেহারা, সে চেহারা ...রে উঠেছে জৌলুসে। ভুনী নিজেও ... একটু বুঝতে পারল।

...বার একদিন গঙ্গামণি ডেকে পাঠাল ... মাকে। বলল, তোমার মেয়ে সুন্দর ...য়েছে। ওকে নাটকে নামালে অনেক ...তে পারবে। প্রথমে কিছু জল-...পানে।

... আপত্তি হবে কেন। এ তো ... হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত। ভুনীর ... নেড়ে রাজি হয়ে এল।

...জি তো হয়ে এল ভুনীর মা। কিন্তু ...কি রাজি না? ভুনী এমন মন-মরা ...ছে কেন কদিন থেকে? তার মুখের ...যেন চাওয়া যায় না, তার মুখ কেমন ফ্যাকাশে। কিছুই বুঝতে পারছে না তার মা।

—কি রে, করবি নে নাটক? গাইবি নে গান? কত ভালোবাসে তোকে গঙ্গাবাঈ। তোর জন্যে কত চেষ্টা করে চলেছে। আমি যে রাজি হয়ে এলাম।

মায়ের এত কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না ভুনী।

জীবিকার জন্যে যন্ত্রণার ছড়াছড়ি চার-দিকে। পরিশ্রমের উপর কারও বিতৃষ্ণা নেই। গঙ্গামণি গান গেয়ে চলেছে প্রায় সারাটা দিন, তার পর মঞ্চে উঠে নৃত্যকলাও দেখিয়ে আসছে; ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরার পরও লেগে আছে অভ্যাগতের আনা-গোনা। অনেক রাত পর্যন্ত শোনা যায় নূপুরের শব্দ, কখনো-কখনো শোনা যায় হট্টগোল। আবার, রাত্রি প্রভাত হবার কিছু পর থেকেই আরম্ভ হয় নতুন দিনের নতুন গলা সাধা। ওদিকে পীতাম্বর তার সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কখনো সাবান ঘষছে জামায়, কখনো জুতোয় লাগাচ্ছে পালিশ, পরিষ্কার করছে ঘর-দোর, তোষক টেনে বের করে দিচ্ছে রোদ্দুরে। সারাদিন খেটে-খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে হরিদাসী, মেনকাও খাটছে মায়ের সঙ্গে, নীলুও ফরমাস খেটে বেড়াচ্ছে মার ও বাবার। বাঁচবার জন্যে ভুনীরই চেষ্টা কম? গান শিখলে পয়সা রোজগার হবে, তাই সে গঙ্গামণির মেজাজের পাশে খুব সাবধানে বসে থেকেছে। গঙ্গা-মণি যা বলেছে তাই শুনেছে, গলার সুর আসছে না, তবু গলা দিয়ে বার করেছে সুর। ভুনীর মায়েরও বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। পুঁজি তেমন নেই, তবু সেই জীর্ণ পুঁজি নিয়ে করে যেতে হচ্ছে তার ব্যবসা।

এ এলাকার সব ঘরের খবর আমরা রাখিনে। কিন্তু যে কয় ঘরের খবর রাখার সুযোগ আমাদের ঘটেছে, সে সব জায়গাতেই মানুষ আছে কাজ নিয়ে। এতটুকু সময় বিনা কাজে খরচ করার উপায় যেন কারও নেই। কেউ গলা মেজে পালিশ করছে, কেউ উনুনে মাটি লেপে পালিশ দিচ্ছে তাকে, কেউ নিজের ঠাট বজায় রাখার জন্যে জুতোতে দিচ্ছে পালিশ।

যে কাজ নিয়ে এরা-সব আছে, তাতে বাইরের ঠাটটা চাই-ই চাই। গঙ্গামণির চাই, পীতাম্বরের চাই, ভুনীর মায়ের চাই, ভুনীর চাই। ভুনীরও চাই, তাই তো গঙ্গামণি তাকে সাজিয়ে তোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তাকে দিল জামা-কাপড়।

ভুনী তার সম্বন্ধে কিছু ভাবে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু ভুনীর মা ভাবে। ভুনীর মা ভাবে গঙ্গামণির কথা। সত্যি, মানুষটা বড় অদ্ভুত। মুখে এতটুকু মমতার কথা নেই, মনের মধ্যে তার মায়া বলে কোনো বস্তু আছে কিনা, তা বুঝবার উপায় নেই। অথচ, অথচ, অথচ—ভুনীর মা আর ভাবতে পারে না। বাতার দেওয়ালে ঝুলছিল ভুনীর নতুন জামাটা, সেই দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল মাত্র।

তার মেয়ের জন্যে অনেক ভাবছে গঙ্গামণি। এখন, গঙ্গামণির কদরটা ভুনী রাখতে পারে, তবেই চারদিক রক্ষা হয়।

কিন্তু ভুনীর রকম-সকম দিন কয়েক থেকে কেমন যেন অদ্ভুত বলে ঠেকছে। মেয়েটার হল কি? কদিন ধরে গান গাইতে যাচ্ছে না, ওকে নাটক করবার কথা বলেছে গঙ্গামণি—সেদিকেও তার যেন তেমন মন নেই!

চারদিকে চলেছে চিন্তা ভাবনা ছুটো-ছুটি। এরই মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে পরম আরামে দিন কাটিয়ে চলেছেন জ্ঞানেন্দ্র-মোহন। তাঁর হাতে সময় অনেক, সেই বিপুল সময়কে তিনি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বসে আছেন তাঁর ঘরে। কখনো ওল্টাচ্ছেন বইয়ের পাতা, কখনো খসখস করে কাগজে কি যেন লিখে রাখছেন। দিনে এতবার করে বেরিয়ে যান কাজে, কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার ফিরে আসেন—যেমন সাজে বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন অবিকল সেই সাজে; জামায় একটু দাগ লাগে না। মুখে একটু ক্লান্তি ফোটে না।

কোঠাবাড়িতে বাস করেন তিনি, তাঁর সমাজের কাঠামোই বুঝি আলাদাভাবে তৈরি।

দিন-কয়েক হল জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ঘরেও যাচ্ছে না ভুনী। হয়, সে ঘরে বসে থাকছে গুম হয়ে, নাহয় সে দৌড়ে চলে যাচ্ছে পীতাম্বরের বাসায়—মেনকার কাছে।

মেনকার কাছে কথাটা হয়তো আভাসে

বলেছিল ভুনী। হরিদাসী তা আঁচ করে। তারপর তা ওঠে পীতাম্বরের কানে।

ভুনীর মা অবশ্য আগেই একটু আঁচ করেছে। এসব কথা চাপা থাকে না। এক কান থেকে অন্য কানে চলে যায়ই। চোরবাগানের অনেকেই জেনে ফেলেছে কথাটা।

ভুনীর মায়ের যতটা চিন্তা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তায় পড়ে গেছে যেন পীতাম্বর। কাঁচ মেয়েটার [illegible]দুরবস্থা করেছে, কে সেই বেল্লিক? পীতা[illegible]র তাকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

কিন্তু ছেঁড়াছেঁড়ি নয়, মারামারি নয়—ওসবের মধ্যে যেতে চায় না ভুনীর মা। কেবল তার জানার ইচ্ছে—সত্যি, কে সেই বেল্লিক।

ভুনী কিছু বলে না। গুম হয়ে বসে থাকে। মুখ খোলে না।

মেনকাকে সে বলেছিল অন্য কারণে, তার বাবা তো যাদু জানে, এক টাকাকে দু টাকা করে, আবার আস্ত একটা হাঁস চোখের সামনে ধরে নিমেষে তা মিলিয়ে দেয় শূন্যে। তাসের খও যায় বদলে, একগোছা তাস হাত থেকে হাওয়া হয়ে যায়। তেমনি কি পারে না মেনকার বাবা ভুনীর এই বিপদটাকে হাওয়া করে দিতে?

পীতাম্বর ডেকে পাঠাল ভুনীকে। ডাক শোনা মাত্র চলে এল ভুনী। অনেক আশা নিয়ে এল। হয়তো এবার মেনকার বাবা তাকে নিয়ে ম্যাজিক করবে।

কিন্তু পীতাম্বর ম্যাজিক করার জন্যে তাকে ডাকেনি। ডেকেছে অন্য কারণে।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করল তাকে অনেক কথা। বলল, নাম বলো। লোকটাকে জবাই করব।

ভুনী উত্তর দিল না দেখে পীতাম্বর বলল, আমি ম্যাজিক জানি। এখনই এমন যাদু দেখাব যে, লোকটা এসে হাজির হবে এখানে।

একথা শুনে ভয়ার্ত চোখে তাকাল ভুনী। পীতাম্বর কি-যেন জিজ্ঞাসা করায় ভুনী নামটা বলল।

থাক। সে নাম এখন আমরা শুনতে চাইনে। পৃথিবীর উপর সমস্ত বিশ্বাস তাহলে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, মানুষের উপর যাবতীয় ভরসা তাহলে একেবারে লোপাট হয়ে যাবে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পীতাম্বর। কোনো কথা মুখ দিয়ে বের হল না তার।

চোরবাগানের কয়েকজন তিরিক্ষে লোক সব বৃত্তান্ত শুনে একটু তেতে উঠেছিল। কিন্তু পীতাম্বর তাদের ধরে নিয়ে এসে বসালো তার ঘরে। বলল, দুনিয়াটাই ম্যাজিক। এসো, ম্যাজিক দেখাই তোমাদের।

বলে উঠে দাঁড়াল পীতাম্বর। বলল, তোমাদের চোখের সামনে এই দেখ, দাঁড়িয়ে আছি আমি। আলোটা কমিয়ে দাও, একদৃষ্টে চেয়ে থাক আমার দিকে।

আলোটা কমিয়ে দিয়ে তিরিক্ষে মানুষে কয়টি একদৃষ্টে চেয়ে রইল পীতাম্বরের দিকে। দেখতে-দেখতে কেমন ফ্যাকাশে আর ফিকে হয়ে যেতে লাগল পীতাম্বর। তার পরেই দেখা গেল, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পীতাম্বর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা নরকঙ্কাল।

সকলে তাজ্জব হয়ে গেল। কালো পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে পীতাম্বর বলল, কেমন ধাঁধা দেখলে বলো! আসলে আমরা সকলেই এই। বাইরে একটা চামড়া দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখি—এই মাত্র।

অনেক ম্যাজিক ও অনেক তামাশা নিয়ে কাটাল পীতাম্বর অনেকটা সময়। তারপর বলল, সব ঠাণ্ডা হও ভাই। ওসব ঘাঁটিয়ে দরকার কি! মান্য মানুষের মান বাঁচাতে যদি না পারলাম, তবে আমাদের মত আহাম্মক আর কে!

পীতাম্বর বলল, ম্যাজিক জানি। ম্যাজিক শিখেছি। ভুনীকেও বাঁচাতে হবে বইকি!

যাদুবিদ্যা দিয়ে কতটা কি হতে পারে ভগবান জানেন। কিন্তু পীতাম্বর চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না।

চোরবাগানের হাওয়াটা কেমন থমথমে হয়ে গিয়েছে। ভুনীর মনটাও অমনি থমথমে।

কিন্তু পীতাম্বর আর ভুনীর মা কি সব শলা-পরামর্শ করে কি যেন ষড়যন্ত্র করে চলেছে। হরিদাসী একটু আন্দাজ করতে পারছে বটে, কিন্তু বাধা দিচ্ছে না। কেলেঙ্কারিকে ভয় করে না ভুনীর মা, কিন্তু ভুনীর যে ডাক এসেছে নাটক করার জন্যে।

(তিন)

দিন-কয়েকের মধ্যেই হাওয়াটা হাল্কা হয়ে এল। ভুনীও হাল্কা হয়ে গিয়েছে। সুস্থও হয়ে উঠেছে সে।

গঙ্গামণির কাছে ব্যাপারটা যে গোপন রাখা গিয়েছে, এইটেই যেন একটা মস্ত কথা।

ভুনী এবার নাটক করবে। বিনোদিনী নাট্যসমাজ একটা নতুন নাটক নামাবে, সরস্বতী থিয়েটারে মঞ্চস্থ হবে সেটি। নাটকের নাম বেণীসংহার। ছোট একটা ভূমিকা দেওয়া হয়েছে ভুনীকে, ভূমিকাটা হচ্ছে দ্রৌপদীর একটা সখীর।

একটু নিস্তেজ আর নরম হয়ে পড়েছিল ভুনী। কিন্তু এই নাটকের মহড়ার সময় সে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলল, নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিল ঐ ভূমিকার মধ্যে।

মহড়া হয় বিনোদিনীর বাড়িতে। অনেক খানদানি মানুষের ভিড় হয়। সেই ভিড় সম্মুখে রেখে পার্ট বলে চলে ভুনী। তার পরনে গঙ্গামণির দেওয়া শাড়ি ও জামা। বেশ মানায় তাকে ওই জামা-কাপড়ে।

মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গি দেখে একটু তফাতে বসে বিনোদিনী। বিনোদিনী যেন বিনোদিনী নয়, একজন রাজেন্দ্রাণী। ভুনীর চোখে সেই রকমই ঠেকে। যেমন চেহারা, তেমনি সাজ, গলায় সাতনরী [illegible] ঝিকমিক করছে।

ওই দিকে চোখ পড়ামাত্র ভুনী [illegible] ঘাবড়ে যায়।

বুঝতে পারে বিনোদিনী, গঙ্গাদিদি, ওকে বলো, খুব সুন্দর [illegible] ওর। ভয়ের কিছু নেই।

এই রকম বয়সে, কিংবা এর [illegible] কিছু কম বয়সে, বিনোদিনীকেও [illegible] দাঁড়াতে হয়েছিল পরীক্ষায়। কিন্তু [illegible] তাকে এভাবে ভরসা কেউ দেয়নি। [illegible] বিনোদিনী কারও ভরসা পায়নি বলেই [illegible] বেশি করে ভরসা দিচ্ছে ওই [illegible] মেয়েটিকে।

একটু দূরে বসে ছিল উমানাথ। [illegible] দিকে একদৃষ্টে এমনভাবে চেয়ে [illegible] মনে হচ্ছে দুই চোখ দিয়ে সে যেন [illegible] ভুনীকে। মুখখানা অমন কাঁচ, শরীরটা কি রকম মস্ত। [illegible] কাঠামোটা একেবারে প্রতিমার মত— টুলীর কুমোরেরা যে রকম মূর্তি [illegible] অবিকল যেন তেমনি। একেবারে [illegible] গড়ন।

বিনোদিনীর আর গঙ্গামণির [illegible] পেয়ে সে যেই একটু আবেগ আর [illegible] দিয়ে তার পার্ট বলতে যাবে, অমনি [illegible] চোখ পড়ে যায় ঐ লোকটার দিকে [illegible] উমানাথের দিকে, অমনি [illegible] যায় কথা।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ [illegible] নাকি ডরায়। কথাটা বোধহয় ঠিক। [illegible] জীবনে টাটকা একটা ঘটনা ঘটে [illegible] সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। [illegible] পুরুষ তার দিকে অমন চোখে ত[illegible] তখনই তার উপর তার বিতৃষ্ণা ধরে। [illegible] আসরের প্রায় সকলেই তার দিকে [illegible] নজর দিচ্ছে বটে, কিন্তু ঐ [illegible] লোকটার দৃষ্টিতে যেন একটা বেশি [illegible] আছে। এই জন্যে উমানাথকে তার [illegible] বিষ বলে ঠেকছে। অথচ, উমানাথের [illegible] বিশেষ কোনো দোষ নেই। মানুষটা [illegible] বেশ নরম, স্বভাবটা বেশ [illegible] চেহারাটা বেশ শক্ত আর তেজী। [illegible] মেয়ের তার প্রতি চট করে বিষদৃষ্টি [illegible] পারার কথা না। সবই উমানাথের অদৃষ্ট [illegible] কিন্তু তার ভাগ্যটাই বুঝি খারাপ।

নতুন মঞ্চে নেমেই বনবিহারিণী [illegible] দেয় তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ভূমিকা [illegible] ছোট, কিন্তু ঐ ছোট কয়েকটি কথার [illegible] সে তার অভিনয়দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে দি[illegible]

বিনোদিনী খুব খুশি, গঙ্গা[illegible] গর্বিত, ভুনীর মা আশ্বস্ত ও আনন্দিত [illegible] দর্শকেরা তার অভিনয় আবার দেখার [illegible] হয়তো একটু লালায়িতই হয়ে উঠেছে [illegible]

সরস্বতী থিয়েটারে বেণীসংহার [illegible] কয়েকবার মঞ্চস্থ হল। সব কয়বারই [illegible] বিহারিণী ওরফে ভুনী দর্শকদের প্র[illegible] পেয়েছে।

চোরবাগানের খোলার ঘরের বাসিন্দে বিধবা মায়ের মেয়ে ভুনী অমন উজ্জ্বল আলোর মধ্যে আর অত অজস্র দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে যে তার পার্ট বলতে পারবে, এ ধারণা তার নিজেরই ছিল না। অভিনয় সে জানে না, অভিনয় আগে সে কখনো করেনি; মঞ্চে উঠেও সে অভিনয় করেনি; সে যা বলেছে সেই কথা সে অকপটে বলেছে—এই মাত্র। তাতেই যদি লোকে খুশি হয়ে থাকে তবে ভালো কথা। তবে, তার মনে হয়, সে পারবে। যখন যে ভূমিকাই তাকে দেওয়া হোক না কেন, মন-প্রাণ দিয়ে সে তার কথা অকপটে বলে যাবে।

নিজের উপর কিছুটা বিশ্বাস এসে গেছে তার। তার যেন মনে হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ এখন তার হাতে। এখন, গঙ্গামণি আর ঐ বিনোদিনী তার উপর বিরূপ না হলেই হল। আর, সেই সঙ্গে ঐ লোকটা তাকে যদি একটু কম জ্বালাতন করে, তাহলে তো আরো ভালো।

মাইনে বলে কিছু ধার্য হয়নি বনবিহারিণীর। এখন সে পাচ্ছে সামান্য একটু হাতখরচ—যার নাম গঙ্গামণি দিয়েছে জলপানি। কিন্তু ঐটুকু পেয়েই সে খুশি।

কত কথা আজকাল মনে হচ্ছে বনবিহারিণীর। কোথায় যে কিভাবে ছিল, ঠিক এ কোথায় এসে হাজির হল। ছোট-ছোট লোক আর সামান্য-সামান্য মানুষের মধ্যে কেটে যাচ্ছিল তার দিন। ডিবের আর লণ্ঠনের আলোর মধ্যে অন্ধকার-অন্ধকার ছায়ারা চলাফেরা করত সকলের মুখ দেখা যেত না স্পষ্ট করে, কিন্তু আজ সে এমন জায়গায় এসে দাঁড়াতে পেরেছে যেখানে শুধু আলো, আর কেবল আলো, যেখানে মানুষেরা সব অসাধারণ আর অসামান্য। কী তাদের চেহারা, কী তাদের সাজ, কী তাদের চাল আর চটক।

এর মধ্যে মাথা ঠিক রাখাই কঠিন। এই মধ্যে কতজন তার কানের মধ্যে কত মিষ্টি মিষ্টি কথা ঢেলে দিয়ে গিয়েছে। সে সব কথায় বিশেষ কান দেয়নি অবশ্য সে, কিন্তু কথাগুলো শুনতে তার কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে। অমন খানদানি বাবুরা অমন তোষামোদ করে তার সঙ্গে কথা বলবে, একথা ভাবতে পেরেছিল কে?

তোষামোদের যে সব কথা বলছে সে সবই অবশ্য তার অভিনয় নিয়ে। এর পরের কোন বইতে তাকে কোন ভূমিকা দেওয়া হবে এই সব নিয়েই বেশির ভাগ কথা। কিন্তু ভুনী খুকি হলে কি হবে, বুদ্ধিতে এখন আর তেমন খুকি সে নয়। পুরুষদের মতিগতি এখন সে বোঝে, এবং বেশ ভালোভাবেই বোঝে।

বিনোদিনীকে সে দেখে আর ভাবে তাকে হয়ে উঠতে হবে ঐ রকম একজন মক্ষিরাণী। মধ্যবিত্ত মানুষদের সে অনেক দেখেছে, আর সে নিজেকে রাখতে চায় না ওদের এলাকার মধ্যে; এবার শুরু আরম্ভ করেছে সে, হঠাৎ যদি মাঝপথে কেনো বাধা না ঘটে তাহলে একদিন সেও হয়ে উঠবে ওই রকম একজন। বিনোদিনী নয়, বনবিহারিণী।

মেনকার কথা মনে হয়। তার বাবা বোধহয় রাজি হবে না, কিন্তু সেও যদি আসত তাহলে দুই বন্ধুতে মিলে বেশ থাকা যেত একসঙ্গে।

মেনকার মনের ইচ্ছেটা কি তা মেনকাই জানে। আস্তাকুড়ে পড়ে থেকে দগ্ধে-দগ্ধে মরণ ভুনী চায় না। তার মায়ের দশা দেখেছে সে। সে এখন চায় অন্য জীবন।

রঙ্গমঞ্চে নেমেছে যখন, পরিচয় তখন তার হয়েই গেছে। লোকে তাকে বলে নটী। নটী যখন হলই, তখন নামজাদা নটী হয়ে উঠবে বনবিহারিণী—এই তার ইচ্ছে।

সবই ঠিক। তবু ঐ উমানাথ মানুষটাকে কিছুতে বরদাস্ত করতে পারে না সে। লোকটার সবই ভালো, কিন্তু কেমন যেন হ্যাংলা।

একান্তভাবে যা চাওয়া যায়, তা নাকি পাওয়া চাই-ই। কারও হয়তো কিছু দেরি হয় পেতে, কেউ-বা পেয়ে যায় চাইতে-না-চাইতেই।

ভুনীর ভাগ্যটা মাঝামাঝি রকমের। খুব দেরিও হল না তার পেতে, আবার হাতে-নাতেই সে পেয়ে গেল না অবশ্য।

বছর-তিনেক তাকে লাগাতে হল। প্রথমদিকে ছোট-ছোট ভূমিকা, তারপর মাঝামাঝি ভূমিকা, অবশেষে সে হয়ে গেল নায়িকা।

বাংলাদেশে তখন থিয়েটারের সূত্রপাত সবে হয়েছে বলা চলে, শহর কলকাতাতে নাট্যমঞ্চ দু-একটা গড়ে উঠছে, তাও আবার সবগুলি পাকাবাড়িতে নয়। বিনোদিনী নাট্যসমাজের একজন প্রধান নটী বনবিহারিণী এমনি কত টিনের চালার নীচে নাট্যমঞ্চে দেখিয়েছে তার অভিনয়। অভিনয়ের আসরে তখন ভিড় জমে উঠেনি। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যাও বাড়েনি তেমন। এইজন্যে তখন নাম করা ছিল অনেকটা সহজ। এবং তার উপর যদি অভিনয়ে নৈপুণ্য থাকত তাহলে কথাই নেই। মুখে মুখে তাহলে চালু হয়ে যেত নাম।

বনবিহারিণীর বরাতে ঘটেছে সেই ঘটনা। তার নাম সকলের মুখে-মুখে। এবং এর চেয়েও বড় কথা—তাকে হৃদয়ে-হৃদয়ে ধারণ করার জন্যে শহর কলকাতার খানদানি বাবুরা সকলেই ব্যাকুল।

চেহারায় বনবিহারিণী হয়ে উঠেছে অসাধারণ। অভিনয়ে অসামান্য। গঙ্গামণির গলাটা যেন চুরি করে নিয়েছে সে, গানও গায় অপূর্ব।

এখন সে অন্য মেয়ে। এখন আর সে চোরবাগানের খোলার চালের ভুনী নয়। চোরবাগানও ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন হল। বিডন স্ট্রীটের কোম্পানীর বাগানের কাছে এখন সে থাকে একটা পাকা-বাড়িতে। সঙ্গে থাকে তার মা।

ভুনীর উন্নতি হয়েছে অনেক। এখন সে প্রায় বিনোদিনীর সমান হয়ে উঠেছে। অথচ, এতটুকু অহংকার তার নেই, নেই এতটুকু বেইমানি। এখনো সে বিনোদিনী নাট্যসমাজেরই একজন।

(ক্রমশঃ)

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ও সেমিফাইনালে রেকর্ড সংখ্যক গোল কত?

(খ) রণজি ট্রফিতে বিজয় হাজারে ও পংকজ রায়ের রানসংখ্যা কত?

বিনীত
শুভেন্দু মজুমদার
কলকাতা—৫০

•

সবিনয় নিবেদন,

'গুরু-পূর্ণিমা' নামের তাৎপর্য কি?

বিনীত
ফণিভূষণ সেন
ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা

•

সবিনয় নিবেদন,

আই এফ এ লীগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় এপর্যন্ত কোন দল সবচেয়ে বেশি গোল দিয়েছে এবং ব্যক্তিগত সর্বাধিক গোলদাতা কে?

বিনীত
কমলেন্দু ঘোষাল
মণিরুকপুর, ২৪-পরগণা

•

সবিনয় নিবেদন,

(ক) 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রথম কার সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে এবং কত সালে?

(খ) পৃথিবীর কোন কোন দেশ এপর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানে নোবল পুরস্কার পেয়েছে?

বিনীত
পরিমল বিশ্বাস
গৌহাটি

•

সবিনয় নিবেদন,

কার উদ্যোগে সর্বপ্রথম পোস্টকার্ডের প্রচলন হয়?

বিনীত
উমাশশী বর্মণ
শিলচর

•

সবিনয় নিবেদন,

(ক) কোন প্রাণী সবচেয়ে দীর্ঘজীবী? এই প্রাণীর আয়ুষ্কাল কত?

(খ) কোন পক্ষী সবচেয়ে দ্রুত উড়তে পারে? ঘন্টায় এই পাখির গতিবেগ কত?

বিনীত
সন্তোষকুমার গুপ্ত
ধুরুয়া, রাঁচী

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত ঝাড়গ্রামের মৃণালকান্তি দাশের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই, এসপেরান্তো (Esperanto) ভাষা কোন বিশেষ দেশের বা কোন নির্দিষ্ট জাতির ভাষা নয়। এই ভাষাটি এক পোলিশ চিকিৎসক ডঃ লাজারো লুডভিকো জামেনহফ (Dr. L. L. Zamenhof) সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে সুষ্ঠু ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে ও সহায়করূপে পৃথিবীতে অনেক আন্তর্জাতিক ভাষা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে (এক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে ১৮০০ সাল থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে অন্তত ৫৩টি ভাষার প্রস্তাব করা হয়েছে যেমন Volapuk, Novial)। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বা বহুলপ্রচলিত ও ব্যবহৃত ভাষাসমূহ থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করে এবং অতিসরল, সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর ওপর ভিত্তি করে ডঃ লাজারো লুডভিকো জামেনহফ ১৮৮৭ সালে Dr Esperanto ('আশা') এই ছদ্মনামে যে নতুন ভাষার বইটি ছাপান ও প্রকাশ করেন তার নাম, "First Grammar and International Vocabulary"। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে এসপেরান্তো ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশন, বেতার অনুষ্ঠান, বাৎসরিক মিলন-সভা প্রভৃতি হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু লেখা এই ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং খবরে প্রকাশ ভূদান আন্দোলনের নেতা বিনোবাজী পৃথিবীর বহু ভাষার মত এসপেরান্তোও আয়ত্ত করেছেন।

আমাদের বাংলা দেশে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপক এসপেরান্তো সোসাইটির এক বাংলা শাখা খুলেছে 'Bengali Esperanto Institute' । (William A. Getting -এর 'Essenti[al] Esperanto')

(খ) আন্তর্জাতিক ভাষা বলতে কৃত্রিম গবেষণাগারে সৃষ্ট 'ভোলাপু[ক]', 'এসপেরান্তো', 'ইদিওম নেউট্রাল', 'নোভি[য়াল]' প্রভৃতি ভাষাকে বলা যেতে পারে। তবে ভাষাগুলি কোন নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর দেশের মাতৃভাষা না হওয়াতে ইংরেজী ভা[ষা] ধীরে ধীরে আপন শক্তিতে পৃথিবীর এক সর্বজনীন ভাষার স্থান গ্রহণ কর[ে] ইংরাজী পৃথিবীর বহু অগ্রগণ্য দে[শের] মাতৃভাষা; বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তায়, সাহি[ত্য] বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের স্ব[ক] রচনাসৃষ্টিতে, অথবা দ্রুত ও সুষ্ঠু [ভাব] বাদের মাধ্যমরূপে, আন্তর্জাতিক বা[ণিজ্য] বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, খবরাখবর ও ভাব বি[নি]ময়ের অন্যতম বাহকরূপে, ইংরে[জী] ভাষাকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষা ব[লা] যায়। বহু বৎসর পূর্বেই বিখ্যা[ত] ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যক[ার] John Galsworthy যে ভবিষ্যদ্বাণী ক[রে] ছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়ে[ছে]

"Any impartial scrutiny made [at] this moment of time must pla[ce] English at the head of all la[n]guages as the most likely to b[e]come, in a natural, unforced wa[y] the single inter communating to[n]gue". (A. C. Baugh -এর 'A Hi[s]tory of the English Language' উধৃত)।

বিনীত
সুভাষচন্দ্র পাল
কলকাতা
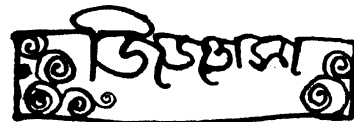
বর্তমান সংখ্যায় আমরা কয়েকজন খ্যাতনামা আধুনিক লেখকের প্রবন্ধ-গ্রন্থের নাম দিলাম। বামদিকের স্তম্ভে লেখকের নাম। ডানদিকের স্তম্ভে তাঁদের গ্রন্থ। বলাবাহুল্য, ডানদিকের নামগুলি ওলট্‌পালট্‌ভাবে রয়েছে। লেখক নামানুসারে সেগুলোকে সঠিকভাবে সাজাতে হবে। উত্তর আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর : (১) ফস্টর, (২) শৈবলিনী, (৩) প্রতাপ, (৪) চন্দ্রশেখর

লেখক	গ্রন্থ
(১) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	(১) সাহিত্যের ভবিষ্যত
(২) বুদ্ধদেব বসু	(২) কবিতার কথা
(৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র	(৩) সাহিত্যের সত্য
(৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	(৪) সঙ্গঃ নিঃসঙ্গঃ রবীন্দ্রনাথ
(৫) অমিয় চক্রবর্তী	(৫) বঙ্কিমচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য
(৬) জীবনানন্দ দাশ	(৬) আমরা ও তাঁহারা
(৭) অন্নদাশংকর রায়	(৭) কুলায় ও কালপুরুষ
(৮) অজিত দত্ত	(৮) মনন
(৯) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	(৯) সাম্প্রতিক
(১০) বনফুল	(১০) দেখা
(১১) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	(১১) লেখকের কথা
(১২) বিষ্ণু দে	(১২) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

বায়স—কাক। কাকচক্ষু জল, অর্থাৎ কাকের চোখের মত স্বচ্ছ নীল জল। ন্যায়-শাস্ত্রে "কাকতালীয়" বলে একটি ভ্রান্ত কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় কুপ্রতিপাদ্যের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আমাদের দেশে "কাকশাস্ত্র" বলে একটি লৌকিক শাস্ত্রও আছে। যাঁরা কাকের ভাষা বোঝেন তাঁরা নাকি কাকের মুখ থেকে অনেক শুভ-অশুভ সংবাদ দিতে পারেন। অগভীর অথচ সতর্ক নিদ্রাকে কাকনিদ্রা বলে। কাকের নিদ্রা অগভীর ও সতর্ক।

কৌতুকপ্রিয় লেখক মার্ক টুয়াইন বিভিন্ন দেশের কাকচরিত্র লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন —কাকের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করলে সেই দেশের নারী চরিত্র অনুধাবন করা সহজ হয়। কাক মানুষের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, কাজেই নারীকুলের সঙ্গেই তার পরিচয় অধিক। কলহপরায়ণা গৃহিণীর অনুকরণে কাকের কণ্ঠস্বর কর্কশ আকার ধারণ করে, আবার মধুরভাষা গৃহিণীর আশ্রয়ে তার কণ্ঠস্বর মধুর হতে বাধ্য। কৌতুকী মার্কটুয়াইনের এই উক্তিতে একটু ভুল আছে বটে, কিন্তু এই উক্তির সারবত্তা একেবারে অসমর্থিত নয়।

কাকের কু-রূপ, কণ্ঠস্বর কর্কশ, খাদ্যের ভেতর কু-খাদ্যে তার রুচি। এটা কাক-জীবনের একটি বদনাম। শুধু কি রূপ ও রুচি বদনাম, বুদ্ধিই বা কোথায়? 'কাকের বাসায় কোকিলের ছা' এই আবিষ্কারে তার বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া গেল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক পক্ষীতত্ত্ববিদরা কাকের বুদ্ধির যে অসামান্যতা ও অপূর্বতা লক্ষ্য করেছেন তা অকাট্য ও অভাবনীয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বুদ্ধির যে মাপ নিতে পক্ষীজাতীয় জীবের পরীক্ষায় কাক সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে। যে কোন পক্ষীর পায়ে একটি সুতো বেঁধে রেখে দেখা যাবে যে সে কিছুক্ষণ উড়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে সুতোর টানে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। কাকের পায়ে সুতো বেঁধে দেখা গেছে যে প্রথম থেকে উড়ে যাবার বৃথা চেষ্টা না করে ধীর-স্থির ভাবে বাধাটার সঙ্কট কোথায় সেই দিকে নজর দেয়। বৃথা নিজের দৈহিক শক্তির উপর পীড়ন না করে হয় গ্রন্থি খুলে ফেলতে চেষ্টা করে নচেৎ ধারালো চঞ্চুর আঘাতে সুতো ছিন্নভিন্ন করে দেয়। পক্ষী-তত্ত্ববিদরা এর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করে বলেছেন—"কাক আকাশের কৃষ্ণপ্রতিভা—(Black genius of the skies) একজন পণ্ডিত বায়স বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করে মানুষের বুদ্ধি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"If men were birds, few would be smart enough to be crows". বায়সকুলের এতে শ্লাঘা বোধ করবার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য যে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োজন জীবজগতে কাকের মত আর কারো তা আছে কিনা সন্দেহ। সব দেশেই পোকামাকড় ধ্বংস করার মত বায়সকুল ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি মানুষের ভেতর প্রবল, তবুও লক্ষ্য করে দেখা গেছে এই মারণযজ্ঞ অবজ্ঞা করে কাক ঠিক বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বিপদ কোন দিক থেকে কিভাবে আসতে পারে এ ব্যাপারে কাকের সতর্কতা অভাবনীয়।

আহার অন্বেষণে বের হবার সময় নিজ বাসস্থান থেকে এই বায়সকুল দলবদ্ধ হয়ে বের হয়। দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করা এদের স্বভাবজ। কুঁড়ি-পঁচিশ থেকে কয়েক শত মিলে এক একটি দল হয়। লোকালয়ে প্রবেশ করবার সময় দল খুব বড় হয় না। পঁচিশের ভেতরই সেই দল চলাফেরা করে। বনে-জঙ্গলে প্রবেশ করবার সময় বড় দল হয়ে যায়।

কোথায়ও আহার্যের সন্ধান পেলে যদি অনুমান করতে পারে যে সেই দলের যথেষ্ট [illegible]ও বেশী থাকবে তা হলে তৎক্ষণাৎ অন্য দলের কাছে খবর চলে যায়। এই জন্যে তাদের বার্তা প্রেরণের বন্দোবস্ত আছে এবং বার্তা বহনও এত দ্রুত হয়ে থাকে যে তার দূরত্বের সীমা লঙ্ঘনের দ্রুততা দেখলে বিস্ময় বোধ হয়। কোথায়ও আহার্যের সন্ধান পেলে ক্ষুধায় কাতর হয়ে অন্ধের মত খাদ্যের উপর গিয়ে লাফিয়ে পড়ে না। চারদিকে পাহারা বসিয়ে সমস্ত আটঘাট প্রথম সরেজ-মিন করে নিয়ে তারপর খাবারের কাছে যায়। এই পাহারাদার বায়সকুলের আশ্চর্য স্বাভা-বিক বিপদ নির্দেশ করা ও সংকেত করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে। শত্রু সন্ধান ব্যাপারে এদের সতর্কতা ও নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা এত প্রখর যে অনেকে মনে করেন এটা এদের একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি, এটা বুদ্ধির অগোচর। যে মুহূর্তে শত্রুর সন্ধান পাহারাদার বায়সের চোখে পড়লো দেখা গেছে চোখের পলকে সব কাক সতর্ক হয়ে পড়েছে।

স্বজাতির প্রতি এদের মমতাবোধ খুবই লক্ষ্যণীয়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে কোন একটি কাক কোনক্রমে আহত হয়ে অচল হয়ে পড়লে অন্য একটি কাক তার খাদ্য সংগ্রহ করে দিয়ে আহত কাকের ক্ষুধা নিবৃত্তির সাহায্য করছে। অসুস্থকে সেবা করা, আর্তজনকে রক্ষা করা এদের স্বাভাবিক ধর্ম। কোন কাকের আর্ত চিৎকার শোনা মাত্র অন্য কাক যে যেখানে থাক দলবদ্ধ হয়ে তাকে রক্ষা ও সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসে।

কাক শুধু দলবদ্ধ জীব নয়—এরা সমাজবদ্ধ জীব। এদের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু জানবার আছে। কাকের সমাজজীবনের ভেতর এমন একটি রহস্য পক্ষীতত্ত্ববিদদের চোখে পড়েছে যার সমস্যা এখনও মীমাংসা হয়নি। বায়স সমাজের ভেতর ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, বিচার আছে, বিচারালয় আছে এবং সেই আদালতে বিচার হয়ে কঠোরতম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেবার পেনাল কোড আছে।

বায়স বিচারালয় ও বিচার-পদ্ধতি বড়ই চমকপ্রদ। এই বিচারালয় অনেকটা 'গণ-আদালতে'র মত। বিচারকর্তারা দলবদ্ধ হয়ে এক জায়গায় সমবেত হন। আসামী অদূরেই আলাদা হয়ে একা বসে থাকে। বিচারের ব্যাপারে বেশ খানিকটা সময় যায়। অনেক সময় তিন থেকে চার ঘণ্টা সময়ও লাগে দেখা গেছে। সমবেত বিচারমণ্ডলীর

ভেতর প্রায়ই উত্তেজনা হয় বলে মনে হয়, কেননা হঠাৎ সমবেত চিৎকার, কোলাহল ইত্যাদিতে সমবেত বায়সসমাজে যে চাঞ্চল্য ও আন্দোলন দেখা যায় তাতে অনুমান করা যায় যে মতবিরোধ হচ্ছে, তর্ক হচ্ছে মীমাংসায় পৌঁছনো যাচ্ছে না। কণ্ঠস্বরের কোলাহল কখনও উঠছে কখনও নামছে। এইবার হয়তো মীমাংসা হয়ে গেল। জুরিরা তাদের মন্তব্য পেশ করলেন। যদি আসামী নির্দোষ বলে প্রমাণ হয় তাহলে সমবেত বায়সসমাজ গণ বড় রকমণ্ডলী আবার দল বেঁধে অন্যত্র উড়ে চলে যায়। আর যদি দোষী বলে প্রমাণ হয় তাহলে সেই সমবেত বিচারকমণ্ডলী সেই মুহূর্তে ঘাতকের স্থান অধিকার করে। সকলে মেলে সেই দোষীকে ঠুকরে প্রাণসংহার করে। বায়সসমাজের এই বিচারপদ্ধতিতে খুব তৎপরতা আছে বলে এই বিচারে কোন মতবিরোধ আর পরবর্তীকালে হাঙ্গামার সৃষ্টি করে না। এই বিচার-পদ্ধতির রহস্য আজও সমাধান হয়নি। এটা কি কোন বিচার-পদ্ধতি কিম্বা এটা একটা বায়সসমাজের সামাজিক অনুষ্ঠান (social rite) তার মীমাংসা হয়নি।

ফোটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

পঁয়তাল্লিশ রকম বিভিন্ন শব্দসংকেত ব্যবহার করে বায়সসমাজ নিজেদের ভেতর বার্তা বিনিময় করে থাকে। জীব জগতে মানুষ সকল জীবের শত্রু। কাক এই শত্রুকে চিনতে পারলেই বিশেষ সংকেত ব্যবহার করে থাকে। পক্ষী জগতে ফিঙে ও পেঁচকের সঙ্গে বায়সসমাজের বিরূপ শত্রুতা রয়েছে। এদের সমাগম ও আক্রমণ ব্যাপার জন্যে বিশেষ সংকেত রয়েছে। খাদ্যের প্রাচুর্য কোথায় আবার সেই আহার প্রাপ্তিতে কতটুকু নিরাপত্তা সে সম্বন্ধেও বিশেষ নির্দিষ্ট সংকেতধ্বনি রয়েছে। বায়সবার্তা বিনিময় পদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণ পরীক্ষা হয়নি—তবে এটা খুবই চমকপ্রদ!

দাম্পত্যজীবনে কাকের মত একনিষ্ঠ প্রাণী বিরল। গভীর অনুসন্ধানে প্রমাণ হয়েছে বায়স দম্পতির কোন একজনের অপঘাতমৃত্যু হলে বায়স বা বায়সী অন্যকোন বায়স বা বায়সীর সঙ্গে আর সংগত হয় না —আমৃত্যু বৈধব্য বা ব্রহ্মচর্য পালন করে।

বায়সকুলের কর্কশ কণ্ঠস্বরের বদনাম থাকা সত্ত্বেও এদের সংগীতপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আমোদপ্রমোদ ও সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে বায়সসমাজে এবং তা বেশ জনপ্রিয়। সমবেত কণ্ঠস্বর সংগীতই বেশী প্রচলিত তবে একক সংগীতও হয়ে থাকে। দেখা গেছে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী একক সংগীতজ্ঞকে অনেকসময় সংগীত শ্রবণের পর প্রবল উৎসাহে চিৎকার করে সাধুবাদ দিচ্ছে।

হরবোলা অর্থাৎ নানা শব্দঅনুকারী পক্ষী-জাতির ভেতর কাক সবচেয়ে দ্রুত শব্দানুকরণের যোগ্যতা অর্জন করে। কাকের শব্দানুকরণ সমস্ত পক্ষীজাতির চেয়ে অবিকৃত। কাক পোষ মানে না অনেকে বলেন। এটা সত্য নয়। কাক মুক্তজীবনের পিয়াসী তবে একবার বন্ধনের মোহে ফেলতে পারলে কাকের মত পোষমানা পাখী আর হয় না এবং তখন তার শব্দানুকরণ দেখলে অবাক হতে হয়।

খেলা আর আনন্দ উপভোগ করার ব্যাপারে কাকের সমকক্ষ আর পক্ষী নেই। গরু, ঘোড়া ইত্যাদির সঙ্গেও কাক অনেক-সময় খেলা করে। অনেকসময় গরু, ঘোড়া ইত্যাদিকে ক্ষেপিয়ে কাক আনন্দ উপভোগ করে। কাকের রস-রসিকতাবোধ (Sense of humour) আছে এটা হয়তো অনেকে জানেন না। মানুষের সঙ্গে পর্যন্ত কাক অনেকসময় ঠাট্টাইয়ার্কি করে। চাষী একটি একটি গর্ত করে আলু গুলি গর্তে বসিয়ে যাচ্ছে আর কৌতুকী কাক চাষীর পেছনে এসে সেই আলুগুলি গর্ত থেকে তুলে দূরে সরিয়ে রাখছে—এ দৃশ্য দেখে চাষী অবাক। আলুগুলি নষ্ট না করে কাক চাষীর সঙ্গে একটু রসিকতা করলে। পক্ষীজগতে কাকের কৌতুকপ্রিয়তা ও রসরসিকতাজ্ঞান নাকি তার চরিত্রের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট গুণ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

DISTRICT LIBRARY
COOCH BEHAR

টাটার ইস্পাত কর্মীদের 'শ্রমবীর' জাতীয় পুরস্কার লাভ

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে আজকের ভারতের শিল্পজগতের 'নয়া জওয়ান'—টেকনিশিয়ান ও কারিগরদের 'শ্রমবীর' জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। শ্রমশিল্পে খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় যাঁরা দেখাতে পারবেন তাঁদের প্রতিবছর এই সম্মান ও পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বছর মোট ২৭টি পুরস্কারের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি পুরস্কার সমেত পাঁচটি টাটা স্টীলের কর্মীরা পেয়েছেন—এ দেশে আর কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এত বেশী পুরস্কার পাননি।

জামশেদপুরে গত বিশ বছরে কর্মীরা ছোটখাটো নানারকম ব্যবস্থার দ্বারা যাতে উৎপাদন বাড়ানো যায় এরকম ১২,০০০ প্রস্তাব পেশ করেছেন, তার মধ্যে ১০০০টি কাজে লাগানো হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কারখানার কাজকর্মে নিরাপত্তা এনেছে আর দেশজ মালমসলা ও কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্পকে আত্ম-নির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কারখানার যাবতীয় শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্যে 'সাজেশ্চন বক্স' স্কীম আজ আমাদের দেশের শ্রমশিল্পে প্রচলিত হয়ে গেছে। এই স্কীমের প্রবর্তক হিসেবে টাটা স্টীলের গৌরব বড় কম নয়।

আর. সি. ভকৎ:
সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

এম. এম. মজুমদার:
সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

টাটা স্টীল

কে. বি. দুবে:
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

বলবন্ত সিং:
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

আফজল হুসেন:
৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 3274A

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 26th August, 1966 শুক্রবার, ৯ই ভাদ্র, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরথীন দাশ

লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে

মাননীয় মহাশয়,

গত ৫ই আগস্টের 'সাতকাহন'-এ শ্রীচতুর্মুখ 'লিটল ম্যাগাজিন' সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

একটি 'লিটল ম্যাগাজিনে'র সংগে সংশ্লিষ্ট থেকে বুঝেছি তাঁর আলোচনা কত বাস্তব। তবে শুধুমাত্র সাহিত্যযশের জন্যই নয় নিজস্ব মতবাদ প্রচারের জন্যও 'লিটল ম্যাগাজিনে'র সৃষ্টি হতে পারে।

আর একটা কথা, মাননীয় 'কার্টুনিস্ট' লিটল ম্যাগাজিনের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে যে চিত্র এঁকেছেন তা সমাপ্তিতে কেবল একটি বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এটাও বাস্তব সত্য; কিন্তু আমাদের মনে হয় বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মত অথবা শঙ্খে সমুদ্র সংগীতের মতই আমরা 'লিটল ম্যাগাজিন' থেকে ভবিষ্যৎ লেখকদের আভাস পেতে পারি।

'লিটল ম্যাগাজিন' সম্পর্কে একটি সাহিত্য পত্রিকায় শ্রীগোপাল ভৌমিক একটি 'লিটল ম্যাগাজিনে' যে আলোচনা করেছেন তার থেকে কিছু তুলে ধরলে 'লিটল ম্যাগাজিন' সম্পর্কে এ ধারণা স্পষ্টতর হবে বলে অনুমিত হয়।

'প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্র-পত্রিকার দরবারে 'লিটল ম্যাগাজিনে'র মর্যাদা যাই হোক না কেন, শিল্প সাহিত্যে সৃষ্টিতে লিটল ম্যাগাজিনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ...এই ভূমিকা হল সৃষ্টিশীলতার ভূমিকা। ...লেখক-লেখিকা সৃষ্টির মত একটি বিরাট দায়ভার বহন করে। লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে যাঁদের সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ একদিন ঘটে, পরবর্তীকালে তাঁরাই আবার প্রতিষ্ঠিত বড় সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলির দরবারে আসর জাঁকিয়ে বসেন।'

খেলাধুলার জগত থেকেও আমরা এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারি। কলকাতা ফুটবলের দুই বড় শরিক ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান অন্য ছোট ক্লাবের উঠতি খেলোয়াড়দের নিয়েই দল গঠন করেন। খেলোয়াড় তৈরী করায় তাঁদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। 'লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকাও এই ছোট ক্লাবগুলির মত। তারা লেখক-লেখিকা তৈরি করে, তাঁদের প্রথম প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেয় আর পরে তাঁরাই গিয়ে আসর জমান বড় প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রিকাগুলির দরবারে।'...

তাই মনে হয় 'লিটল ম্যাগাজিনগুলি না থাকলে আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রভূত ব্যাঘাত হত এবং নতুন লেখক-লেখিকার আবির্ভাবের পথও হয়ে যেতো বন্ধ। 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', 'কালি-কলম' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ প্রবর্তন আমরা দেখেছি।' ...এই পত্রিকাগুলিকে লিটল ম্যাগাজিন বলাই সঙ্গত।

'ইদানীংকালে শ্রীবুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতার ত্রৈমাসিক পত্র 'কবিতা' ছিল এমনই একটি লিটল ম্যাগাজিন। 'কবিতা' একাদিক্রমে ২৬ বৎসরকাল চলার পর কিছুকাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে। লিটল ম্যাগাজিনের ভাগ্যে এত দীর্ঘদিনের অস্তিত্ব সাধারণত দেখা যায় না। শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশাকে'ও আমরা লিটল ম্যাগাজিন বলতে পারি।

'লিটল ম্যাগাজিন' সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল 'লিটল ম্যাগাজিনগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রকাশ করেন তাঁরা যাঁরা নিজেরা সাহিত্যযশঃপ্রার্থী কিংবা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ মতবাদের ধারক। ফলে এইসব পত্র-পত্রিকার চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য থাকে......'

বাংলাদেশে যেমন শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী, সেই রকমই এই সমস্ত 'লিটল ম্যাগাজিনে'ও খুব বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারে না। কিন্তু 'চোখের উপর লোককে মরে যেতে দেখেও আমরা যেমন নিজেদের মৃত্যুর কথা সহজে ভাবতে পারি না—এদের অবস্থাও সেই রকম।' কিন্তু এই অল্পদিনের জীবনে 'লিটল ম্যাগাজিন' নতুন সৃষ্টির যে পথ করে যায় তাইতো আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ, তাই নয় কি?

তাই মনে হয় প্রতি বছর লিটল ম্যাগাজিনের মৃত্যুর হার বেড়ে গেলেও আমাদের আশংকার কোন কারণ নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে এদের স্বল্প দানটুকুও আমাদের কাছে অমূল্য।

বিনীত—
চুনীলাল রায়।
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা।

বেতারের অনুষ্ঠান-সূচী

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বেতার শ্রোতাদের পক্ষ থেকে নানারূপ মতামত প্রচার করে থাকেন। তাই আশান্বিত হয়ে আমি সর্বসাধারণের তরফ থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে বেতার কতৃপক্ষের হঠকারিতা ও ত্রুটিপূর্ণ অনুষ্ঠান পরিচালনা বিষয় আপনার গোচরে আনছি।

আজকাল প্রায়ই অনুষ্ঠান-সূচীর সংগে অনুষ্ঠান প্রচারের কোন মিল থাকে না। বহু পত্রাদি দিলেও বেতার কর্তৃপক্ষের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। সবরকম উল্টো-পাল্টো না কি তাঁদের 'অনিবার্য কারণে' (?)। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

পয়লা আগস্ট সকালবেলা 'বেতার জগতে' আমার পছন্দমত শিল্পীদের অন্যতমা শ্রীমতী জপমালা ঘোষের অনুষ্ঠান যথাক্রমে সকাল ৭-১৫ মিঃ ও ৯-৪৫ মিনিটে আছে দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর অনুষ্ঠান ৭-১৫ মিঃ স্থলে ৭-২০ মিনিটে শুরু হতে শুনলাম এবং তার ফলে দ্বিতীয় গানটির শেষ অংশের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিলো। রাত্রেও ৯-৪৫ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ মধ্যে নির্ধারিত শিল্পীর কোন গান শুনতে পেলাম না, পরিবর্তে এক ওস্তাদের সঙ্গে আর এক ওস্তাদের সাক্ষাৎকার শুনতে পেলাম। বলাবাহুল্য এই অনুষ্ঠান প্রচারিত না হওয়ায় আমার মত আধুনিক গানের অনুরাগীদের বিরক্তি ও হতাশা উদ্রেক করেছে। ঐ দিনই ৯টি উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত ও ৫টা উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল। 'বেতার জগতে' না থাকায় আমার ধারণা এই কথোপকথনের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানসূচী ছাপানোর পর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কোন উচ্চাংগ বা যন্ত্রসঙ্গীতের পরিবর্তে ঐ কথোপকথনটি প্রচার করা উচিত ছিল—আধুনিক গানের শ্রোতাদের মনঃক্ষুণ্ণ করে নয়। এই ত্রুটিপূর্ণ প্রচারের জন্য কোন বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়নি। বেতার কর্তৃপক্ষের এই হঠকারিতা ও ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য দায়ী কে?

নমস্কারান্তে ইতি—
জয়দেব চক্রবর্তী
কলকাতা-১২

সাহিত্যের অনুবাদ

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ৫ই আগস্ট-এর সংখ্যায় 'সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি'র পাতায় "অভয়ংকর" বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় 'রাইটার্স গিল্ডে'র কর্তব্য বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই আলোচনা যেমন সুচিন্তিত তেমনি সময়োপযোগী। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ।

"রাইটার্স গিল্ড"-এর পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি যে, বাংলায় রচিত উন্নত সাহিত্যকর্ম বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রচারের জন্যে গিল্ড ইতিমধ্যেই কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক ক্লাসিক রচনাগুলির ইংরাজী ভাষায় সংক্ষিপ্তসার (digest) ইংরাজনবীশ লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে প্রকাশ করা হবে

'A collection of best classics in Bengali literature' ও 'Fifty best Bengali Novels' -এর একটি সংক্ষিপ্তসার সংকলন গিল্ড-এর উদ্যোগে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হবে। এ সম্বন্ধে বিদেশের কয়েকটি বিখ্যাত সংস্থার সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর পর বিখ্যাত বাংলা বইগুলির একক অনুবাদ-কর্ম ধরা হবে।

আমাদের এই প্রচেষ্টায় আমরা বাংলা দেশের সকল সাহিত্যসেবীর সহযোগিতা কামনা করি।

বিনীত
শেখর সেন
যুগ্ম-সম্পাদক, রাইটার্স গিল্ড,
'রবীন্দ্রভারতী সমিতি ভবন'
কলকাতা-৭
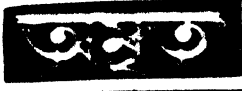
সম্পাদকীয়

সংসদে ঝড়

লোকসভা ও রাজ্যসভার এবারকার অধিবেশন দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পার্লামেন্টারী বিতর্ক গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবেই শুধু কাজ করে না, তার ভিতরকার রুদ্ধ বাষ্প বের করে দেবার একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য দায়িত্বও সম্পন্ন করে। সংসদ সদস্যদের মধ্যে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ, পরলোকগত ফিরোজ গান্ধী প্রমুখ সদস্যরা সদাজাগ্রত সতর্কচক্ষু পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে কীর্তিমান। সাম্প্রতিক অধিবেশনে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে পার্লামেন্টারী সতর্কতার ট্রাডিশনকে আবার প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এই অধিবেশন সরকারপক্ষের কাছে অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য সরকার ও বিরোধীপক্ষের এই ধরনের মোকাবিলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ঝড়ের সূত্রপাত হয়েছিল পাব্লিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট নিয়ে। এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত। এতে সংসদের উভয় কক্ষের সরকারী ও বিরোধীদলের সদস্যরা আছেন। এই কমিটির কাজ হল অডিটার-জেনারেলের রিপোর্টে যে-সমস্ত ত্রুটি ও নিয়মবহির্ভূত লেনদেন সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় সে বিষয়ে তদন্ত করে তার দায়িত্ব খুঁজে বের করা। সাম্প্রতিক রিপোর্টে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের কতকগুলি নির্দেশ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। তা থেকেই ঝড়ের আবির্ভাব। বিরোধীদলের সদস্যরা এ বিষয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করে তাঁদের পার্লামেন্টারী দায়িত্বই পালন করেছেন।

পাব্লিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণের নৈতিক দায়িত্ব সরকারের। সংসদে বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে তাকে কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে যাবার পথ সরকারপক্ষের নেই, অন্তত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। স্পষ্টতই দেখা গেছে যে মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে কতকগুলি বেফাঁস উক্তি করেছেন। যদিও তার দ্বারা লোকসভার অধিকারভঙ্গের অভিযোগের দায় থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন, কমিটির মন্তব্যের আসল ফয়সালা এখনো হয়নি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সরকারপক্ষ এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করেননি। মন্ত্রীমহোদয়ও কী করবেন তার হদিশ মিলছে না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাব্লিক একাউন্টস কমিটি তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে তদন্ত করছেন জানতে পেরে মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম কমিটির সামনে ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দেবার জন্য হাজির হন। ইতিপূর্বে অন্য কোনো মন্ত্রীকে এই সুযোগ দেওয়া হয়নি। যাই হোক, সন্দেহ নিরসনের ও নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দেবার পূর্ণ সুযোগ দেবার পরও কিন্তু পাব্লিক একাউন্টস কমিটি মন্ত্রীমহোদয়কে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে পারেননি। তাঁরা বলেছেন যে, আমিনচাঁদ প্যারেলাল কোম্পানীর অসদাচরণের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রীমহোদয় কেন যে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা সংশোধন করেছিলেন তা কমিটির কাছে 'অস্পষ্ট' রয়ে গেছে। কমিটি আরও বলেছেন যে, শাস্তি-ব্যবস্থার আংশিক প্রত্যাহারের সঙ্গে উক্ত কোম্পানীর একজন প্রতিনিধির ও মন্ত্রীমহোদয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সংস্রব থাকা বিচিত্র নয়। এই সন্দেহ প্রকাশ করছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী সম্পর্কে সংসদের পাব্লিক একাউন্টস কমিটি। এটা আর বিতর্কের বিষয় নয়। এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের কাজ। অথচ তা না করে সরকার এমন এক নীরবতা অবলম্বন করেছেন যা গভীরতর অস্বস্তির কারণ জোগাচ্ছে।

স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত ও সংসদ সদস্যের দ্বারা পরিচালিত কমিটির এই মারাত্মক মন্তব্য মন্ত্রীমহোদয়ের কার্যকলাপকে পরোক্ষে নিন্দাই করেছেন। এবং যেহেতু এর সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের প্রশ্ন জড়িত সেকারণে কেবিনেট মন্ত্রীর পক্ষে মর্যাদার কাজ হবে সেই সন্দেহ নিরসনের পূর্ণ সুযোগ সরকারকে করে দেওয়া। তা না করে এই বিতর্ক চালানোর অর্থ অযথা কালহরণ করা।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সরকার কী করবেন বা করতে চান সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। পার্লামেন্টকেও তাঁরা কিছু জানান নি। পাব্লিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট যদি এইভাবে বাদানুবাদের বিষয় হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য নানাবিধ বিভ্রান্তিকর উক্তি করতে থাকেন তাহলে কমিটির সার্থকতাই বিপন্ন হবে। সংসদে যে-ঝড় উঠেছে তা সরকারের আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। তা যদি তাঁরা না করেন, তবে সেটা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পক্ষে খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করবে না। একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদার চেয়ে গণতন্ত্রের মর্যাদা যে অধিক মূল্যবান তা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন।

সাতকাহন

সেই ইঁদুরগুলোর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই?—বিড়ালের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে শেষপর্যন্ত একদিন যারা সভা ডেকে বসেছিল এবং অনেক শলা-পরামর্শের পর স্থির করেছিল, আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হ'ল বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া—যাতে তার আসার সংকেত আগে থেকে টের পেয়ে ইঁদুরেরা সকলে সাবধান হ'তে পারে।

যুক্তির দিক দিয়ে এ-প্রস্তাব যে নিশ্ছিদ্র, তা কিন্তু গোড়াতেই আমাদের স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তবু যে কালক্রমে এই বিড়ালের গলার ঘণ্টা-বাঁধার পরিকল্পনা হাসির খোরাক জুগিয়েছে, তার কারণ ইঁদুরেরা বিড়ালের চেয়ে দুর্বলতর প্রাণী এবং নির্বান্ধব। ইঁদুর যদি কোনো উপায়ে মানুষের শক্তি ও বুদ্ধিকে নিজেদের দলে টানতে পারত, ঘণ্টা-বাঁধার প্রস্তাব সফল হ'তে একটুও অসুবিধে ঘটত না।

উপরের বাক্যে একটি 'যদি' আছে, আশা করি সকলেই সেটা লক্ষ্য করেছেন। ইঁদুরের ক্ষেত্রে মানুষের সাহায্য পাওয়া সত্যিই 'যদি'র পর্যায়ে ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কল্পনাও মাঝে মাঝে বাস্তব হ'য়ে দাঁড়ায়। ইঁদুর বিফল হলেও পাখিরা এ-ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছে। রয়টার প্রচারিত এক খবরে জানা যাচ্ছে—

কোরাল গ্যাবলস (ফ্লোরিডা), ১৩ই আগস্ট —ভ্রমণকারীদের প্রমোদক্ষেত্র এই শহরে সমস্ত বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার আইন জারি হ'য়েছে। পাখিদের সতর্ক করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

স্পষ্টই দেখা গেল, পাখিরা সৌভাগ্যবান প্রাণী। মানুষের স্বার্থেই অবশ্য ফ্লোরিডায় বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার আইন জারি হ'য়েছে—কেননা, ভ্রমণকারীরা সেখানে যায় বোধ করি প্রধানতই পাখি দেখতে এবং ভ্রমণকারী আসা মানেই বিদেশী মুদ্রার শুভাগমন—তবু স্বীকার করতে হবে, মানুষ নিজেদের এই ঈষৎ সুদূর স্বার্থের জন্যে যে উদ্যম দেখিয়েছে, তাদের অতি-নিকট স্বার্থ, যা নাকি অস্তিত্ব রক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ, তার বেলায় কিন্তু তারা ততো বেশি অধ্যবসায় দেখায় নি।

সংসারে মানুষের বিপদ কি একটা? সেই আদিযুগ থেকে একাল অবধি হিংস্র প্রাণীর আক্রমণেই যে কতো মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, তার হিসেব রাখলে তাজ্জব বনে যেতে হত। অন্য প্রাণীর কথা বাদ দিলেও, শুধু বাঘের পেটেই কতো লোক গেছে, ভাবুন দেখি! এই তো আমাদেরই এই বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে সুন্দরবন, সেখানে কাঠ, গোলপাতা আর মধু সংগ্রহ করতে প্রতি বছর বেশ কিছু মানুষ বাঘের খিদে মেটায়। কই, দক্ষিণ রায়ের পুজো করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গলায় ঘণ্টা বাঁধার

নর-খাদকের গলায় ঘণ্টা বাঁধা সহজ!

কিন্তু পরের গলায়…
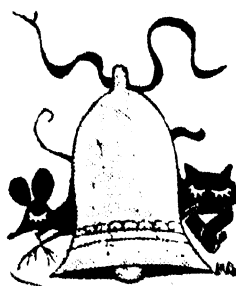
কথা তো আমাদের মাথায় আসেনি? সত্যি, নিমীলিত নেত্রে একবার ভেবে দেখুন, বাঘগুলোর গলায় কায়দা করে একবার যদি ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া যেত, জঙ্গলের মধ্যে কি আর বেঘোরে আমরা প্রাণ হারাতাম! তখন বাঘ যদি যেত 'ডালে ডালে', আমরা যেতাম 'পাতায় পাতায়'।

কিম্বা বাঘের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মানুষ? জঙ্গলে না-হয় না-গেলাম, তবে মানুষের সংসারে মানুষকে বাদ দিয়ে আমাদের চলে কি করে? অথচ সব মানুষই কি নিরাপদে মেশার যোগ্য! নাকি, মানুষের চেহারা নিয়ে ঘুরলেও অনেকেই আচরণের দিক দিয়ে বাঘের চেয়েও বেশি মারাত্মক নয়?

ধরুন, পকেটমার। জঙ্গলে নয়, আমাদেরই এই শহরে সর্বত্র তারা বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এবং কলমটা-মানিব্যাগটা সরাচ্ছে। এদের হাত-সাফাই বন্ধ করা কি সোজা কথা? শোনা যায়, কে নাকি নদীতে স্নান করছিল, জল থেকে উঠতে গিয়ে টের পেল হাঙরে তার গোটা পা-টাই কখন কেটে নিয়ে গেছে। কিন্তু জলচর ঐ হাঙরের চেয়ে স্থলচর পকেটমার আরো অনেক নিপুণ, কেননা, তার ক্রিয়াকর্মের জন্যে জলের অন্তরাল দরকার হয় না, হাজার মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকেই কাজ সারতে পারে সে।

অবশ্য মাঝে মাঝে যে এরা ধরা পড়ে না তা নয়, ধরা পড়ে এবং উত্তম-মধ্যম খায়, আর কখনো-কখনো শ্রীঘরও বাস করে। কিন্তু ছাড়া পেয়ে আবার যে-কে সেই। বরং ছাড়া পাবার পর এরা হ'য়ে ওঠে আরো চতুর, আরো হুঁশিয়ার এবং আরো বিপজ্জনক।

অথচ ইচ্ছে করলেই বোধ করি এদের হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারতাম। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো এদের গলাতেও যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যেত ঘণ্টা, রাস্তাঘাটে তাহলে আমাদের আর এত পকেট-সচেতন হ'য়ে ঘুরতে হত না।

কিম্বা ধরুন, যারা খাবার জিনিসে ভেজাল দেয়, অথবা ভেজাল মেশায় ওষুধে, কিম্বা ভেজাল না মিশিয়েও যারা কালোবাজারীর কেরামতিতে একেবারে অনাহারের দিকে ঠেলে দিতে চায় সমস্ত জাতিকে—তাদের গলায় যদি একবার ঘণ্টা বাঁধা যেত, কী উপকারই না হ'ত আমাদের!

অবশ্য জানি, প্রশ্ন উঠবে—মানুষ তো আর বিড়াল নয়, ঘণ্টা বাঁধলে, সে-ঘণ্টা খোলার ব্যবস্থাও অনায়াসেই করতে পারবে সে।

তা পারবে ঠিকই। কিন্তু অমুক-অমুক ব্যক্তির গলায় এই-এই কারণে ঘণ্টা বাঁধা হ'য়েছে এই খবরটা যদি একবার সারা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, ঘণ্টা খুললেও তার আসল উদ্দেশ্য তাহলে চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকবে না কি?

আমার এই মনুষ্য-বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার প্রস্তাবটি অতএব ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

—শ্রীচতুর্মুখ

বিচিত্র চরিত্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

• • • • •

মনের ঘরের বাইরের দরজায় টোকা পড়ল।

ভাবছিলাম। ভাবছিলাম যে-সব মানুষদের দেখেছি তাদের। এতবড় জীবন, কম তো নয়, অনেক হ'ল যে, প্রায় সোত্তোর। কতজনের সঙ্গে দেখা হল। কতজন কত রকমের ছাপ রেখে গেল। সেই ছাপ দেখে চিনতে চেষ্টা করছিলাম এ-ছাপ কার হাতের?

বাইরের যে মাটির দুনিয়া—তার উপর সে-সব রাজ্য-সাম্রাজ্য, তাতে রাজা-বাদশা বা পার্লামেণ্ট-এ্যাসেম্বলী, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালের পাঞ্জার দাম আছে, আর আছে গুণী-জ্ঞানীর পাঞ্জার দাম। সাধারণ মানুষের পাঞ্জার দাম নেই। কিন্তু আর একটা দুনিয়া আছে মনের দুনিয়া। সে দুনিয়া একটি মানুষের মনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে; আর অনেক লোকের মন জুড়েও সে-দুনিয়া বৃহত্তর দুনিয়া হতে পারে, সে-দুনিয়া বিচিত্র দুনিয়া, সেখানে সবার পাঞ্জারই সম্মান আছে। একটা এমনি পাঞ্জার ছাপের কাছে এসে থমকে গেলাম। কে? কার ছাপ?

মনের ঘরের বা মন-দুনিয়ার স্তব্ধতা ভংগ করে কে যেন সাড়া দিলে? মট্ মট্ করে যেন হাঁটুর হাড় ফুটল। পায়ের শব্দ খুব হাল্কা। বেড়ালের পায়ের যেমন শব্দ হয় না, তেমনি। খট্ খট্ শব্দ করে ইসারা দিলে।

সাড়া দিলাম—কে?

মৃদু সঙ্কুচিত কণ্ঠে সাড়া এল—আমি গো!

বললাম—সংসারে আমি তো সবাই বাবা। তুমি আমিটি কে?

সে নিবেদন করলে—আমি শশী।

শশী! শশী ডোম! যার অনেক কথা আমি লিখেছি। যে-শশীরা পুরুষানুক্রমে ধান-চোর। আজ শশীর ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের কথা আমি জানি। পরের এক-পুরুষ দেখছি আজও। সকলেই এই ধান চুরির নেশায় সুদীর্ঘ জীবনগুলো কাটিয়ে গেল। ওরা দুর্ধর্ষজাতির বংশ। সোত্তোরের আগে কেউ যায় না। এর মধ্যে অন্ততঃ পনের-কুড়ি বছর জেলে কাটে। তবু তারা অন্য কাজ করবে না। খেটে খাবে না। মজুরী করবে না চাষ করবে না। পুরুষদের জেল হলে মেয়েরা ভিক্ষে করে না; কখনও অন্যের বাড়ী অবশ্য সৎ গৃহস্থের বাড়ীতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করবে না।

শশীরা বিচিত্র। শশীদের স্ত্রী এবং বধূ পুত্রবধূরা বিচিত্র।

* * *

শশীকে আসতে দিলাম। মনের ঘরের দরজার খিল খুলে গেল আপনা থেকে। মনে পড়ল—অনেক দিন আগে একদিন রাত্রে—রাত্রি তখন প্রায় তিনটে, বাইরে বেরিয়েছিলাম; তখন ১৯৩০ সাল, সারাদেশ জুড়ে চাপা উত্তেজনা খনির তলায় উত্তাপের মত অসহনীয় হয়ে উঠেছে। একজন বিপ্লবী এসেছিলেন সন্ধ্যার পর, তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা ব'লে তাঁকে গ্রাম থেকে বের ক'রে দিয়ে ফিরছি। হঠাৎ একটা গলির ভিতর থেকে কে একজন মাথায় প্রকাণ্ড একটা কিছু নিয়ে খুব দ্রুতপদেই বেরিয়ে এল! চমকে-চীৎকারই করে উঠেছিলাম—কে?

উত্তরে সে-লোকটা সশব্দে একটা ধান-বোঝাই বস্তা আমার সামনে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল। দেখলাম, লোকটা ছুটল; তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যস—আর নেই। কিন্তু চিনতে বাকী রইল না যে, সে শশী।

পরদিন শশী এসেছিল ঠিক এমনি-ভাবেই, আজ যেমনভাবে শশীর আত্মাই বলুন আর স্মৃতিই বলুন, মনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। এবং ঠিক এই কথাগুলিই হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শশী চুরি কেন করিস? শশী বলেছিল—বাবু অন্য কাজে মন লাগে না। ভাললাগে না। চুরি তো রাতারাতি বড়লোক হবঁ ব'লে করিনে। তা হলে তো যা চুরি করেছি, তাতে তো দালান দিতাম। চুরির মালের দাম ১০০ টাকা হলে ১০ টাকাও পাই না। আবার তার জন্যে জেলও খাটি। কিন্তু তবু ছাড়তে পারি না।

নেশা আছে বাবু চুরির নেশা আছে, রাতের নেশা আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এতকাল পর আজ আবার এলে শশী, আজ আবার নতুন কথা কি বলবে? তোমার কথা তো অনেক বলেছি।

—তা বলেছেন। সবই বলেছেন। এমনকি একবার বাতে পঙ্গু হয়ে গিছলাম, অবস্থা দেখে বি-এল কেসের হাকিম (ব্যাড লাইভলিহুড কেসে) আমাকে সাজা দেয়নি। সেবার বাত ভাল হল, তবু বাতে পংগুর মত ভান করে থাকতাম দিনে দিনে কাতরাতাম, রাত্রে সোজা হয়ে দাঁড়াতাম, বাঘের মত ছুটতাম। পায়ে আমার মট্ মট্ শব্দ হয়, তাও লিখেছেন আপুনি। কিন্তু শেষকালের কথা আর লেখেনি।

—বল্, শেষকালের কি কথা তোর?

—আপনি তো দেখেছেন গো। যখুনি গাঁয়ে এসেছেন, আমার বাড়ী এসে দেখে গিয়েছেন।

বাধা দিলাম, বললাম—সেকথা আর কি লিখব শশী! আমি তোর খোঁজ করেছি, কিছু কিছু দিয়েছি, তা, আর তো তোর কথা নয়। সে তো আমার কথা!

—পেলেন না আমার কথা? এই দ্যাখেন!

—কি বল তো?

—সেও তো আমার মুখে আমার কথা হবে।

—মনে পড়েছে শশী! মনে পড়েছে।

—কি বলেন শুনি!

—তুই কখনও আমার বাড়ী ধান চুরি করিস নি।

—আপনি যখন থেকে স্বদেশী করেছেন তখন থেকে করিনি, তার আগে করেছি।

অনেক ভেবেই আমি বললাম—শেষকালটা বড় কষ্টে গেছে তোর—না? অনেক দুঃখ পেয়েছিলি।

—দুঃখু? উঁহু! উঁহু!

—দুঃখ পাসনি? কি বলছিস?

—হ্যা গো! ঠিক বলছি। বল না তুমি মরার বাড়া গাল আছে নাকি? বল? আর মৃত্যুর থেকে বড় অভিশম্পাং আর নেই কথাটা প্রচলিত আছে বটে! জিজ্ঞাসা করলাম—মরে তোর মনে হয়নি শশী যন্ত্রণা থেকে খালাস পেলি দুঃখ দারিদ্র্য অপমান এর থেকে পরিত্রাণ পেলি!

ভাবতে লাগল শশী।

ডাকলাম—শশী।

—ভাবছি বাবু!

—এরও ভাবতে হবে শশী?

—হবে বাবু। আমার পরিবার শুধিয়ো—মরবার আগে মরতে হবে দুখ লাগত। মরা থেকে সত্যিই দুখ নাই বাবু!

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর—তোর পুনর্জন্ম হবে। আবার জন্মাবি।

—তা করছি।

—কি হয়ে জন্মাবি?

—মানুষ। জন্তু আবার হয় নাকি!

হেসে বললাম—কিন্তু পেশায় কি হবি? আবার চোর?

সেও হেসে উঠল। বললে—ঠিক ধরেছ তো। আমার মরার পর আমার বউয়ের কাছে শুনেছ, নয়? ওকে বলেছিলাম। বলেছিলাম।— দেখ এবার জন্ম হলে চোর নয়—ডাকাত হব। হয়ে যারা যারা আমার ওপর অত্যাচার করলে তাদের ঘর মারব।

বললাম—না তা তো তোর বউ বলেনি। শ্রাদ্ধের জন্যে টাকা নিতে এসেছিল, বলেছিল—তুই বলেছিস—হরি, মা ফয়রা, এবার মানুষ জন্ম পেলে যেন সাধু হতে পারি মা!

বিষণ্ণ হয়ে গেল শশী বললে—হ্যাঁ তাই বলেছিলাম। আগে যা বললাম, তা রাগ হলে বলতাম। হ্যাঁ ঠিক বলেছ।

বাইরে কে যেন ডাকলে—দাদু। আমারই কোন নাতি।

—কি? সাড়া দিলাম।

—আমি উঠলাম গো! মনের ভিতর থেকে কে আর, শশী বললে।

—চমকে উঠলাম—শশী! বলে ডাকলাম। বারণ করব ভাবলাম, বলব, যেয়ো না। কিন্তু তার আগেই মনের ঘরের দরজাটি খুলে একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটিও বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরের বারান্দা থেকে নাতি রন্টু এসে বললে, একজন ভদ্রলোক এসেছেন।
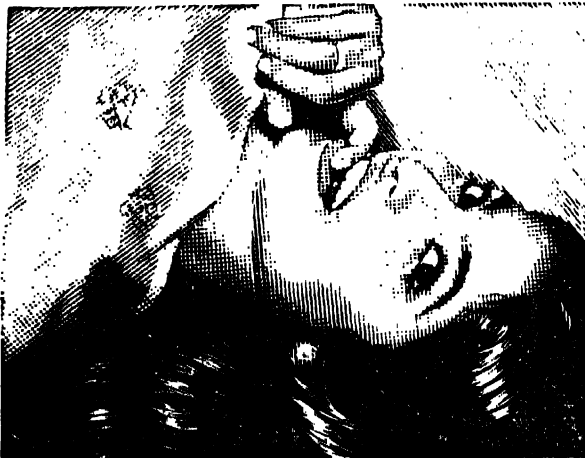
সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

॥ পুরোন দিনের স্মৃতি ॥

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের একটি ...ত বৈদ্য পরিবারে অধ্যাপক বিপিন- ...রী গুপ্তের জন্ম হয়, তাঁর পিতামহ ...ন খ্যাতনামা কবিরাজ, পিতা রেল ...রী। বিপিনবিহারীর অনুজ কৃষ্ণবিহারী ...ও একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক ছিলেন। ...পিনবিহারী আমাদের যৌবনকালে এক- খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন, রিপণ ...জে অনেকে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ...ন। ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিন- ...রীর অধ্যাপনার ভঙ্গী ছিল বিচিত্র। ...হাসের নীরস কাহিনী তিনি সুন্দর ...পর মত বক্তৃতার মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে ...বেশন করতেন। বিপিনবিহারী ১৯১০ ...াব্দে ভাগলপুরে একটি সাহিত্য ...মলনে যোগদান করেন, এবং সেই সভার ...টি সরস বিবরণ তাঁর প্রথম প্রকাশিত ...। এই রচনা প্রকাশের পর থেকেই ...পিনবিহারীর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠালাভ এবং সেই যুগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাবান ...কায় তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতে ... করলেন। বাংলা সাহিত্যের তখন ...যুগ, বিপিনবিহারীর রচনাগুলি যথেষ্ট ...দর লাভ করল। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে ...ন যে অমূল্য গ্রন্থটি রচনা করেন তা ...লা ভাষায় একশটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্যতম ... যায়। সরসভঙ্গীতে এবং জনপ্রিয় ...াকে এই জাতীয় অন্তরঙ্গ আলোচনার ...ম সূত্রপাত করেন বিপিনবিহারী।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন সে যুগের ... মহা পণ্ডিত ব্যক্তি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকমল সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে ...টি পত্রে লিখেছিলেন :

কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক— —he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine'.

...বিপিনবিহারী কৃষ্ণকমলকে প্রশ্ন করেন ...ন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আপনার ...নো 'কনট্রোভার্সি' হয়েছিল কি? এর ...রে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল বলেন—একবার ...নুবাদ হয়েছিল—'তোমরা জানো এই ...ড়ার সূত্রপাত কি লইয়া। স্টুয়ার্ট মিল ...ন রিপ্রেসেন্টেটিভ গভর্ণমেন্ট এবং ...ফ্রানচাইসমেন্ট অব উইমেন। কোঁৎ ঠিক ...ন্ধ মতের পরিপোষক—তাঁহার মতে ও ...টি ফাঁকা অসার বস্তু। আমাদের ঝগড়া ... কোঁতের ধ্রুব-দর্শন (পজিটিভিজম) ...য়া)।'

উপরোক্ত কথাগুলি আমরা সংক্ষেপিত ...রে দিলাম। এই সূত্রে আচার্য কৃষ্ণকমল ...তের জীবন এবং জীবন-দর্শন প্রসঙ্গে যে আশ্চর্য কথাগুলি বলেছিলেন তা বিপিনবিহারী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন পুরাতন প্রসঙ্গের পৃষ্ঠায় প্রথম পরিচ্ছেদেই।

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার হেতু এই যে পণ্ডিত কৃষ্ণকমলের পাণ্ডিত্য, বিপিন-বিহারীর লিপিবন্ধকরণের ক্ষমতা এবং সেকালের মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু সাধারণত কি জাতীয় ছিল একালের পাঠক তা কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারবেন।

আচার্য কৃষ্ণকমল ছিলেন মালদহের অধিবাসী। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রায় বিরানব্বুই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত তিনি রিপণ কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষও ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ছিলেন ঠাকুর আইন অধ্যাপক। তাঁর গ্রন্থাবলীও বিশেষ মূল্যবান। তিনি হিত-বাদীর প্রথম সম্পাদক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার পথ-প্রদর্শক।

এই পুরুষটির সংস্পর্শে এসেছিলেন বিপিনবিহারী, সম্ভবতঃ জ্ঞান ও অতীত কথার এই মহাসাগরের সান্নিধানে এসে স্বাভাবিক কারণেই তাঁর আগ্রহ হয়েছিল পুরাতন দিনের কথা জানার। যদি এইসব কথা লিপিবন্ধ করা না হত তাহলে তা আর কোনো কালেই উদ্ধার সম্ভব হত না। সম-সাময়িকের দৃষ্টিতে সমকালের মনীষীদের চরিত্র এই গ্রন্থে আশ্চর্য ফুটে উঠেছে।

উনবিংশ শতকের বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন মন্মথনাথ ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি গবেষকবৃন্দের দান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়। কিন্তু বিপিন-বিহারীর গ্রন্থটি ঠিক পুরাতনের গবেষণা নয়। সন তারিখ এবং পাদটীকায় কণ্টকিত নীরস ইতিহাসের নিছক ডকুমেন্ট নয়, এর মধ্যে রক্ত-মাংসের মানুষের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে।

লিটন স্ট্রাচির 'এমিনেন্ট ভিকটো-রিয়ান্স' কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের জীবনের রেখাচিত্র, কিন্তু বিপিনবিহারী গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছেন। সেই কারণেই তাঁর এই গ্রন্থের মুখ্য পাত্রগণ কোন একটি বিশিষ্ট ধারানুসারে সাজানো নয়। মনে হয় মূলতঃ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা সংগ্রহের আগ্রহ বিপিনবিহারীর ছিল। পরে পুরাতন প্রসঙ্গের সমধিক খ্যাতির জন্য তিনি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটেছিল তাঁদের কথাও লিপি-বন্ধ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস এইভাবেই গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে। এই গ্রন্থের পরিচয় সম্পর্কে ত্রি-পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে যা প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ উধৃত করছি :—

'পুরাতন প্রসঙ্গ কি?'

'যে যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্য ও সমাজ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর তর্কবাচস্পতি স্বয়ং অগাধ পাণ্ডিত্য লইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে যুগে গুপ্ত কবি ও দাশরথি রায়ের প্রভাবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ বাংলাভাষাকে অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধিশালিনী করে তোলেন, যে যুগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা প্রতিষ্ঠা হয়, যে যুগ দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ মনীষীগণের জ্ঞান-গরিমায় উজ্জ্বল, যে যুগে রামগোপাল ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার মন্দা-কিনীতে স্বদেশ ও ধর্মের তরণী ভাসাইয়া-ছিলেন, যে যুগ ভাবের ও ধর্মের, জ্ঞানের ও চিন্তার আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হইয়া-ছিল, যে যুগের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' সেই স্মরণীয় যুগের প্রসঙ্গ এবং তাহা সেই যুগেরই একজন মনীষী কর্তৃক কথিত হইয়াছে।'

বিপিনবিহারীর 'পুরাতন প্রসঙ্গ' সর্ব-প্রথম হেমেন্দ্রপ্রসাদ সম্পাদিত আর্যাবর্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেই সূত্রে সম্পাদক মন্তব্য করেন :—

'ইহা হইতে পাঠক তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের ইতিহাস জানিতে পারিবেন।'

আজ যদি হেমেন্দ্রপ্রসাদ জীবিত থাকতেন তাহলে এই গ্রন্থের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে হয়ত আরো অনেক কথা জানা সম্ভব হত। দীর্ঘকাল এই গ্রন্থের কোনো সংস্করণ বাজারে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

বিপিনবিহারীর পুরাতন প্রসঙ্গ দুই খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম দুই খণ্ড পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়, এখন সেই দুই খণ্ড এবং সেই সঙ্গে অপ্রকাশিত তৃতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হল।

প্রথম পর্যায়ের স্মৃতিকথক দুজন— আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন নাট্যকার এবং নাট্য-রচনায় একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক। নকশা বা প্রহসন রচনায় তিনি প্রবর্তক। 'বার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' গ্রন্থটি তাঁর রচনা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্মৃতিকথার কথক পাঁচজন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল

বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজমোহন মল্লিক ও রাধামাধব কর। তৃতীয় পর্যায়ের কথক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

বিপিনবিহারীর এই দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী সম্পাদনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের অক্লান্ত সেবক বিশু মুখোপাধ্যায়। ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে সমগ্র গ্রন্থটিকে সুসম্পাদনা করার সমগ্র কৃতিত্ব তাঁর। গ্রন্থটিতে উল্লেখিত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনীও বিশেষ শ্রমসহকারে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া নির্ঘণ্টটিও গ্রন্থ পাঠ করার পক্ষে সহায়ক। সম্পাদক আমাদের অভিনন্দনযোগ্য।

এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা রচনা করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। তাঁর ভূমিকাটি গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

প্রায় চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়। গ্রন্থটিতে অনেকগুলি আর্ট প্লেট থাকায় আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। —অভয়ঙ্কর

পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১ম, ২ ও ৩য় পর্যায়ের একত্রিত সংস্করণ। ভূমিকা—প্রমথনাথ বিশী। প্রকাশক: বিদ্যাভারতী। ৮বি, টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম বারো টাকা মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্য

একালের একজন মারাঠি কবি ॥

প্রখ্যাত মারাঠি ঔপন্যাসিক, কবি ও সমালোচক এম ভি আলটেকার একসময় দুঃখ করে বলেছিলেন :

> "Sometimes we think we know the English people better than the people nearer home. The best way to know people nearer home is to know their literatures...."

এক রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আমরা পরস্পর যে কত বিচ্ছিন্ন, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। আমাদের প্রতিবেশী মানুষ এবং তার শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে জানবার তেমন আগ্রহ আমরা অনুভব করি না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, বা ফরাসী দেশের সাহিত্য আন্দোলন এবং সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যত জানি, তার এক শতাংশও আমাদের প্রতিবেশী মানুষ, তার শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলন সম্বন্ধে জানি কিনা, সন্দেহ। ফলে, একই দেশে বসবাস করা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের কাছে কত অচেনা থেকে যাই। আমাদেরই দেশের অনেক শক্তিশালী লেখক সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, যা জানতে চেষ্টা করি না, অথচ 'বিট' কবিদের কে কোথায় কিভাবে, জীবনযাপন করছেন, কবে কোথায় কোন সভায় ভাষণ দিচ্ছেন, তার অনেক মুখরোচক কাহিনী আমাদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।

কথাগুলো মনে পড়ল, প্রখ্যাত মারাঠি কবি মারদেকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে। বাংলা-সাহিত্যরসিক পাঠকদের কাছে, যতদূর মনে হয়, তিনি তেমন পরিচিত নন। সম্প্রতি 'পোয়েট্রি ইন্ডিয়া' পত্রিকায় দিলীপ চিত্রী কর্তৃক অনূদিত তাঁর দশটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুবাদগুলি তাঁর পরিচিতির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে বলে আশা করি।

মারাঠি সাহিত্যে মারদেকারের আবির্ভাব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়ে। মারাঠি কবিতার প্রেক্ষাপট তখনও পর্যন্ত সুবিস্তৃত নয়। তুকারামের জীবন-দর্শন বা সাহিত্যিক আদর্শেই তখন পর্যন্ত মারাঠি কাব্য আন্দোলন প্রবাহিত। কেশবসুত-কে আধুনিক মারাঠি কবিতার জনক বলা হয়ে থাকে। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে রেভারেন্ড তিলক বা বালকবির নাম করা যায়। চন্দ্রশেখর একালের সর্বশ্রেষ্ঠ মারাঠি কবি বলে স্বীকৃত। কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি যেমন ক্ল্যাসিক্যাল রীতির অনুসারী, তেমনি ভাবগত প্রেরণা পেয়েছেন জয়দেব বা জগন্নাথের কবিতা থেকে। অর্থাৎ, বলা যায়, মারাঠি কবিতার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হলেও, আধুনিক ভাবধারায় এবং গুণগত আধুনিক কবিতার তখনও আরম্ভ হয়নি। মারদেকারই প্রথম এই চিরাচরিত সাহিত্যধারায় তীব্র আঘাত হানেন এবং তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ তাঁর আবির্ভাবের পরেই মারাঠি কাব্য আন্দোলনের নাম হল আধুনিক এবং অন্যটি তথাকথিত চিরাচরিত সাহিত্য আন্দোলন নামে চিহ্নিত হল।

মারদেকার-এর প্রথম গ্রন্থটির নাম 'কয়েকটি কবিতা'। ক্ষীণকায় এই গ্রন্থটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও ছিল বিচিত্র ধরনের। প্রকৃতপক্ষে এই প্রচ্ছদ-চিত্রটির মধ্যে তাঁর কবিতা সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। তাই একজন সমালোচকের ভাষাতেই প্রচ্ছদ চিত্রটির পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে :

> "The drawing on the cover showed the caricature of a nude male figure, debilitated, weak, impotent, sick and extremely anti-heroic. The genitals wickedly revealed the impotence. The absence of muscles emphasized the sick, weak and debilitated look of the familiar post-war rational animal. The face looked guilty and callous".

মারদেকারের সেই গ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্যে এই ভাবেরই প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। যাই হোক, অশ্লীলতার দোষে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বইটি বাজেয়াপ্ত হলেও কিন্তু অনেক কাব্য-সমালোচক মারদেকারের কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মারদেকার কোন দীর্ঘ কবিতা লেখেননি। তাঁর প্রতিটি কবিতার মধ্যেই গীতিময়তা বিদ্যমান। হিন্দু মেটাফিজিক্যাল চেতনার সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সমন্বয়ে তাঁর ইদানীং রচিত কাব্যে এক বিশেষ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। কখনও তা তীব্র তির্যক স্যাটায়ারে আবার কখনও সুর্‌রিয়ালিস্ট চৈতন্যে পরিবৃত। অনেকে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতারও অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেছেন। তিনি খুবই শক্তিমান কবি।

পাঠ্যপুস্তক ॥

সম্প্রতি লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলা বলেছেন যে, শিক্ষামূলক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের জাতীয় পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে। এই গ্রন্থগুলি ১৯৬৬-৬৭ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হবে। এই গ্রন্থগুলি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে জানান হয়েছে। এরই মধ্যে গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর ও ত্রিপুরা এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। অন্যান্য রাজ্যগুলিও সম্মতি জানাবেন বলে শ্রীচাগলা আশা প্রকাশ করেছেন।

রুশ ভাষায় প্রেমচাঁদের রচনা ॥

আধুনিক হিন্দী কথাসাহিত্যের ইতিহাসে মুন্সী প্রেমচাঁদ একটি স্মরণীয় নাম। তিনিই প্রথম স্তিমিতপ্রায় হিন্দী কথাসাহিত্য-ধারায় তীব্র প্রাণাবেগ সঞ্চার করেন এবং বলা যেতে পারে, তাঁর আবির্ভাবেই হিন্দী ছোটগল্প এবং উপন্যাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। উনিশ শতকীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ভারতীয় গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং সমাজসচেতনতাই তাঁর সাহিত্যের মৌল প্রেরণা। তাঁর 'সেবাসদন', 'প্রেম-আশ্রম', 'রঙ্গভূমি', 'গবন' এবং 'কর্ম'-ভূমি উপন্যাসে ভারতীয় গ্রামীণ মানুষের জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের কাহিনী শিল্পময় রূপলাভ করেছে। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'গোদান' হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত।

বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষায় প্রেমচাঁদের রচনা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মনে হয়, রুশ ভাষাতেই তাঁর গ্রন্থের অনুবাদের সংখ্যা সর্বাধিক। সম্প্রতি প্রেমচাঁদ জয়ন্তী উৎসবে রুশ ভাইস-কন্সাল ভি আই গুর্গেনভ এক ভাষণে লেতিয়েটে প্রেমচাঁদের রচনা প্রসঙ্গে

তুলভাবে আলোকসম্পাত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে:—

"Works of the outstanding Indian writer Premchand are wellknown in the Soviet Union. It will be no exaggeration to say that this great Indian writer is one of the most popular foreign writers in the Soviet Union."

প্রেমচাঁদের জীবিতকালেই প্রখ্যাত রুশ লেখক বরানিকভ প্রেমচাঁদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তাঁর কিছু ছোট-গল্পের অনুবাদ রুশভাষায় প্রকাশ করেন। বর্তমানে রুশ দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রেমচাঁদের গল্প এবং উপন্যাস অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেমচাঁদের 'সততার শাস্তি' নামক গল্পটি প্রথম ১৯৩০ সালে রুশ ভাষায় অনুদিত হয়। এরপর ১৯৫৫ সালে তাঁর একটি অনুদিত গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়। এর এক বৎসর পরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোদান' অনুদিত হয়। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০ হাজার। ১৯৫৮ সালে 'নির্মলা' এবং 'যুদ্ধক্ষেত্র' এবং ১৯৬১ সালে ফটকা'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

সোভিয়েটের পাঠক-সাধারণ প্রেমচাঁদের রচনা সম্পর্কে এত আগ্রহী কেন, এই প্রসঙ্গেও গর্গেনভ জানিয়েছেন:—

"The Soviet people value Premchand for his correct understanding of the causes behind the sufferings and privations of the Indian people."

তাঁর 'মহাজনী সভ্যতা' নামক প্রবন্ধটি সোভিয়েট জনসাধারণের কাছে একজন লেখকের রাজনৈতিক ইস্তাহার হিসেবে পরিচিত। কারণ এই প্রবন্ধে প্রেমচাঁদ স্পষ্টতই লিখেছিলেন, বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিকবাদ ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনকে চতুর্দিক থেকে পেষন করছে। অনেকে অবশ্য গোর্কির সঙ্গে প্রেমচাঁদের রচনার তুলনা করে থাকেন। এর সমর্থনে গর্গেনভের উক্তিই আবার উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

"One can fully agree with them in that like Gorky, Premchand exercised a powerful influence on the development of the progressive literature, in Hindi and Urdu. His works show how a writer can serve his people."

ভারতবর্ষে প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনে প্রেমচাঁদের অবদানের কথা রুশ জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত নয়। প্রেমচাঁদই সর্বপ্রথম 'সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই তাঁর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

প্রেমচাঁদ বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্য রচনার একটি উদ্দেশ্য আছে এবং তা হল, কুসংস্কার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের মানবিক বোধকে জাগ্রত করা। প্রেমচাঁদ স্পষ্টই বলেছেন, 'যে সাহিত্য আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে স্পর্শ করে না, যা আমাদের বোধকে পরিবর্তিত করতে অসমর্থ, যে সাহিত্য কেবল আমাদের যৌন-আবেদনকে চঞ্চল করে তোলে অথবা যা কেবলমাত্র স্বপ্নলোকের ছায়াছবি, সাহিত্য হিসেবে তা মৃত, এবং সত্য এবং জীবন থেকে তা বিচ্যুত।'

সোভিয়েতে প্রেমচাঁদ সম্পর্কে কিছু গবেষণাগ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি ভিক্টর বালিন প্রেমচাঁদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন—

"Premchand was convinced that the imperialists were mainly to blame for the sufferings of the Indian people. We considered that an end had to be put to the colonial plundering of India. The call to fight for democratic rights is the basic theme in Premchand's works."

সোভিয়েত বিপ্লব সম্বন্ধে প্রেমচাঁদের ছিল অপরিসীম সহানুভূতি। অক্টোবর বিপ্লবের এক বৎসর পরে তিনি লিখে-ছিলেন—'পশ্চিম দিগন্তে নব-সভ্যতার সূর্য উদিত হচ্ছে। এ ধনতন্ত্রকে করছে উৎপাটিত। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকলেই, যারা শারীরিক বা মানসিকভাবে কিছু করছে, তারাই এই রাষ্ট্র বা সমাজের অংশ বিশেষ।' প্রেমচাঁদ রুশ সাহিত্যের সঙ্গেও ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। টলস্টয়, চেকভ, তুর্গেনভ, ডসটয়ভস্কি প্রমুখের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। গোর্কির সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ব্যক্তিগতভাবে গোর্কির কিছু গ্রন্থও তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন। রুশ ভাষায় প্রেমচাঁদ সম্পর্কে এই সব গবেষণা এবং প্রেমচাঁদের গ্রন্থের অনুবাদের সংবাদ যে কোন ভারতীয় সাহিত্যরসিকের মনেই আনন্দ সঞ্চার করবে।

বিদেশী সাহিত্য

এ বছরের গোল্ডউইন পুরস্কার

প্রখ্যাত মার্কিন চিত্রপ্রযোজক স্যামুয়েল গোল্ডউইন প্রদত্ত 'গোল্ডউইন অ্যাওয়ার্ডস' এ বছরে লাভ করেছে একটি উপন্যাস ও নাটক। লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁদের লেখা উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি যে কোন ধরনের সাহিত্যকর্মের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছরে যে-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি দু হাজার ডলারের প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে, সেটি হল জেরাল্ড পোরো সসাইনের 'কুকেড চিলড্রেন'।

দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রেডারিক হান্টার তাঁর 'এ ম্যারেজ অব কনভিনিয়েন্স' নাটকটির জন্য। এই পুরস্কারটির আর্থিক মূল্য পাঁচশো ডলার। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে দুজন যুবক কিভাবে বসবাস করবার সবরকম বন্দোবস্ত করেছিল তাই নিয়ে এই কৌতুকরসের নাটকটি রচনা করা হয়েছে।

মিঃ গোল্ডউইন আজ থেকে বারো বছর আগে এই পুরস্কার দানের প্রথম ব্যবস্থা করেছিলেন এবং দিনকে দিন যতই এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে, আর্থিক মূল্যও ঠিক সেরকম বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমিত সবরকম সাহিত্য প্রতি-যোগিতায় এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ মূল্যের পুরস্কার। এ পর্যন্ত যাঁরা গোল্ডউইন অ্যাওয়ার্ডস লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে চিত্রনাট্যকার, টেলিভিশন লেখক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

স্টর্ম জেমসনের সাম্প্রতিক উপন্যাস

কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে স্টর্ম জেমসন-এর নতুন উপন্যাস 'দি আর্লি লাইফ অব স্টিফেন হাইন্ড'। এটি হল লেখিকার ২৪তম গ্রন্থ। ২৮৪ পৃষ্ঠার মাঝারি ধরনের এই বইটির নায়ক স্টিফেন

স্টর্ম জেমসন

হাইন্ড জীবনের ক্ষেত্রে এক উদ্দাম পথিক। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনের কাছাকাছি বস্তি অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করে সমাজের উঁচুতলার জীবনের সুন্দর দিকটি সম্পর্কে বিশেষ জানবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। ফলে নিজের কাছে তাঁর বাল্যজীবন

যথাযথ হলেও অন্য সকলের নিকট ভীষণ অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে।

স্টিফেন হাইন্ড অনেক সদগুণের অধিকারী। সুশ্রী চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুন্দর উচ্চারণ ভঙ্গি উচ্চ সমাজে তাঁর গতিকে অবাধ করতে সাহায্য করেছে। জীবন সম্পর্কে গভীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিরও তিনি অধিকারী। কারণ তাঁর মা ছিলেন একজন বারবনিতা। এই দুর্ধর্ষ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। বলা-বাহুল্য, স্টিফেন নিজের ভাগ্য তিনি নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ স্যর হেনরির চ্যাটেমির সেক্রেটারী পদে বহাল হন একসময়। হেনরির সাধ ছিল যে তাঁর আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত থাকবে। কিন্তু স্টিফেন প্রকাশকের কাছে গোপনে এই পাণ্ডুলিপি বিক্রির চেষ্টা করেন। এতে তাঁর দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব আসেনি। বিবেকের দংশনও তাঁকে সহ্য করতে হয়নি কখনো। সমাজের উপরতলায় নিজের বিস্তারকল্পে তিনি যতই এগিয়ে যেতে থাকেন, উপন্যাসে চরিত্রের আমদানীও ততই বৃদ্ধি পায়, এবং ঘটনাবাহুল্য হতে থাকে।

দৈত্য-সদৃশ এই মানুষটির তারুণ্যের চিত্রসমৃদ্ধ আলোচ্য উপন্যাসটি স্টর্ম জেমসন বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। স্টিফেনের জৈব-প্রবৃত্তিকেও লেখিকা মনোরম ভঙ্গিতে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য স্টিফেন যদি শুধু সম্পত্তির লোভে সন্তানবতী এক মহিলাকে বিয়ে করতেন তবে উপন্যাসটি অনেকাংশেই খেলো হয়ে যেতো।

চরিত্র-চিত্রণে মিসেস জেমসেন বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রিটিশ কুমারীর স্বাভাবিকতা অনুযায়ী নোংরা, অনুজ্জ্বল পোশাক, এবং জট-পাকানো চুলওলা বুড়ির চিত্র আমরা পাই স্টিফেনের মায়ের মধ্যে। আবার এমন একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের দেখা পাওয়া যায় যার চুল ঠিক গিরগিটির মতো, চোখ ফিকে সবুজ—অনেকটা আঙুর ফলের মতো। উপন্যাসের সর্বত্র জেমসনের স্বাভাবিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ। তবে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যে চিত্রটি উপহার দিয়েছেন তা যে অনেকটা সেকেলে, এবং একই কথা বহুবার বলা হয়েছে অপেক্ষাকৃত মনোরম ভঙ্গিতে।

নতুন বই

ছোট গল্পের নতুন সংযোজন

ছোটগল্প কি? গল্প অথচ ছোট। কিন্তু এটুকু বললেই ছোটগল্পের চরিত্র সম্পর্কে সবটুকু বলা হলো না। হ্যারিকেনের আলো যেমন চারপাশে আলোর একটি প্রতিভাস সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আলো ফেলে, ছোটগল্পও তেমনি জীবনের চারপাশে উঁকি-ঝুঁকি মেরে জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনার উপর তার দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। এদিক দিকে ছোটগল্প অনেকটা সংগীত বা লিরিকধর্মী কবিতার কাছাকাছি। উপন্যাস যেখানে ঐকতান, ছোটগল্প সেখানে একক সংগীত।

জাত বিচারে বাংলা সাহিত্যে ক'খানি ভালো উপন্যাস আছে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল, তবে ছোটগল্পের নিদর্শন সেখানে ভূরি-ভূরি। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ। এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের কাছাকাছি নয় শুধু একেবারে পাশাপাশি রয়েছে।

এই সুসমৃদ্ধ বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারে আরও একটি সুগ্রন্থ সংযোজিত হলো—দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ফুলের মতন'।

দক্ষিণারঞ্জন বসু কৃতবিদ্য সাংবাদিক। বাংলা সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের একটা স্বাভাবিক যোগ আছে। দক্ষিণারঞ্জন বসুর ক্ষেত্রে এ যোগ অনেকটা মণি-কাঞ্চন যোগের মতো। অর্থাৎ তিনি যতো বড়ো সাংবাদিক, ঠিক ততো বড়োই সাহিত্যিক। তাই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা—কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নাটক সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান সমান উজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান।

আলোচ্য গ্রন্থটি দক্ষিণাবাবুর লেখা মোট ষোলটি ছোটগল্পের সংকলন। এর ভেতর নানান জাতের, নানা স্বাদের গল্প আছে। তবে সবগুলির ভেতরই এমন একটা দরদ, মানুষের প্রতি অন্তহীন ভালবাসার স্পর্শ রয়েছে—যা মনকে সহজেই মোহিত করে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে **'এক স্বপ্ন: দুই শিল্পী'** গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। শিল্পী মাইকেল জন যখন ভাগ্যের মারে নুলো হয়ে আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরলো, তখন তার শোচনীয় অবস্থা। হাতে কাজ করতে পারে না। তবুও ছবি আঁকা ছাড়েনি সে। মুখে তুলি ধরে সে ছবি আঁকে। সে ছবি বিক্রী করে দু-চার আনা যা পায়, তা দিয়েই অতি কষ্টে তার দিন চলে। শিল্পী মাধবের সঙ্গে হঠাৎ তার দেখা। মাধব তখন শিল্পী হিসাবে সারা ভারতে সুপরিচিত। কিন্তু তবুও সে উপেক্ষা করল না এই একনিষ্ঠ শিল্পসাধককে। সে তাকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করল। 'আপনি কলকাতায় গিয়ে এই ঠিকানায় উঠবেন এবং এখানে আমার বাড়িতেই যতদিন ইচ্ছে থাকবেন'—শিল্পী মাধবের এই আমন্ত্রণের ভেতর দিয়ে সুকৌশলী লেখক এমন একটি দরদভরা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যা সহজেই পাঠক-মনকে আকর্ষণ করে।

'শিবির' গল্পটি আর একটি সুন্দর গল্প। ভারত-চীন সংঘর্ষের পট-ভূমিকায় লেখা এই গল্পটিতে এমন একটি পবিত্র দেশপ্রেমের বাণী ধ্বনিত হয়েছে, যা আমাদের তরুণ-তরুণীকে দেশপ্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত করবে। সীমান্ত যুদ্ধে আহত স্কোয়াড্রন লীডার নির্মল রায় এই আশ্বাস নিয়ে চিরকালের জন্যে চোখ বুজলো যে, এ দেশের বীরের শূন্যস্থান কোনদিনই অপূর্ণ থাকবে না। এক যাবে আবার নতুন এসে সে স্থান গ্রহণ করবে। এ গল্পের পরিবেশটি বেদনায় টলমল, তবুও এ বেদনার ভেতরও আছে এমন আদর্শনুরাগ, মানুষ মাত্রকেই যা মহৎ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করবে।

'দুই বৌ' গল্পটিও সুলিখিত। ইংরেজীতে অনার্স পাওয়া মেয়ে মন্দিরা একদিন বৌ হয়ে এলো সুধাময়ীর সংসারে। স্বামী প্রশান্ত বড়ো সরকারী চাকুরে। আয় ভালো। কাজেই অভাব-অনটন বলতে যা বুঝায়, সুধাময়ীর সংসারে তা কোনদিনই নেই। কিন্তু সুধাময়ীর আকাঙ্ক্ষা নাতির মুখ দেখার। মন্দিরা তাঁর সে সাধ পূর্ণ করতে পারেনি। দু-দুবার সন্তান পেটে ধরেও, মন্দিরা সে সন্তানকে তুলে দিতে পারেনি শাশুড়ী সুধাময়ীর কোলে। দুবারই 'সিজারিয়ানে' মন্দিরা বেঁচেছে, তার সন্তান বাঁচেনি। সুধাময়ীর এ নিয়ে আপশোষের শেষ নেই। মন্দিরা সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে। শাশুড়ীর আপশোষের কথা সে শুনেও যেন শোনে না। তবে তার অক্ষমতার গ্লানি মাঝে মাঝেই তার সকল উদ্যমকে ভেঙে দেয়।

প্রশান্তর ছোটভাই সুকান্ত। সুকান্ত গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীতে, উচ্চশিক্ষা নিতে। সুধাময়ীর সাধ ছিল, বড়ো ছেলের বেলায় তাঁর যে সাধ পূর্ণ হলো না, ছোট-ছেলেকে দিয়ে সে সাধ পূর্ণ করবেন। সুকান্তকে তিনি দেখেশুনে বিয়ে দেবেন।

ন্তু সুকান্ত তাঁর সে সাধে বাদ সাধলে। ...র অগোচরে সে একটি জার্মান তরুণীকে ...য়ে করলে। সুকান্তর দেশে ফিরবার দিন-...য়েক আগে সুকান্তের বন্ধু অপরেশের ...ধ্যমে সুধাময়ী জানতে পারলেন, সুকান্ত ...ধু বিয়েই করেনি, তার একটি ছেলেও ...য়েছে। সুকান্ত দেশে ফিরে আর এ ...ড়ীতে উঠবে না, হোটেলে উঠবে। ...নে সুধাময়ীর চোখে যেন সব অন্ধকার ...য়ে এলো। তাঁর মাথা ঘুরে গেলো। তিনি ...ড়ে যাচ্ছিলেন। মন্দিরা তাঁকে সামলালো। ...মলালোই না শুধু, এতোদিন পরে ...ধাময়ী যেন মন্দিরার কোলেই শান্তির ...শ্রয় খুঁজে পেলেন। 'দুই বৌ' গল্পটির ...ঠন বিন্যাস সুন্দর।

এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্প নিয়ে আলো-...র সুযোগ এখানে নেই। তবে প্রত্যেকটি ...ল্পই যে সুলিখিত, নির্দ্বিধায় সে কথা ...লা চলে। আজ যখন 'বাঈজী', 'গ্রীনরুম ...র্টি' অথবা ঠুনকো প্রেমের 'গল্পে' ...জার ছোটগল্পগুলির ভরপুর, তখন ...ক্ষিণারঞ্জন বসুর এই ছোটগল্পগুলির ...ধ্যে পাঠক নতুন স্বাদের আস্বাদন লাভ ...রবেন। কাজেই 'ফুলের মতন' এই গল্প-...ঙ্কলনটি পাঠকমহলের সমাদর লাভ ...রবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ফুলের মতন—(গল্পসংগ্রহ) দক্ষিণারঞ্জন বসু। অরুণিমা পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। দাম ৫্ টাকা।

●

তাঁর বাস্তববাদিতা নির্ভেজাল, এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না এ শুধু লেখকের একটি প্রবণতা অথবা ভান। তাহলে বইটির নায়িকা কারুত্তাম্মা, তার প্রথম প্রেমের পাত্র মুসল-মান ব্যবসায়ী পারীকুট্টি, তার স্বামী পালানি এবং তার মা-বাবার চরিত্র এমন জীবন্ত হত না।

দক্ষ চিত্রকরের মতো লেখক নিপুণ তুলির টানে বইটির ভয়ঙ্কর সুন্দর পটভূমি এঁকেছেন। সেই পটভূমিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মনোভাব নিয়ে উপস্থাপন করেছেন স্বভাব-সরল জেলে ও জেলেনীদের ভয়ংকর প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের জীবন। সেই সংগ্রামের মধ্যে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের নিজেদের কঠিন জীবন সম্বন্ধে সীমাহীন গর্ব ও আস্থার ভাবটি প্রত্যেকটি চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের প্রমাণ বইটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন সীঞ্জের কয়েকটি নাটক, পো-র একটি বিখ্যাত গল্প এবং হেমিংওয়ের একটি উপন্যাস এই বইটি পড়বার সময় অবশ্যই মনে পড়বে।

চিংড়ি— (উপন্যাস) তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। দাম সাত টাকা।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

'কবিতা সাপ্তাহিকী' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনায় শ্রীনিতাই ঘোষ এবং শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। বিষ্ণু দে, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখো-পাধ্যায়, সুনীল বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, শিবনাথ পাল, শংকর চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দেব, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, সুনীল-রঞ্জন রায়, শঙ্কর দে, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র দত্ত এবং আরো অনেকের, কবিতা, গল্প, কাব্য-নাটক স্থান পেয়েছে। কবিতার সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে 'কবিতা সাপ্তাহিকী'র আত্ম-প্রকাশকে আমরা পূর্বেই স্বাগত জানিয়ে-ছিলাম। বর্তমানেও পত্রিকাটি সুসম্পাদিত রূপে প্রকাশিত হচ্ছে, এর জন্য দুজন সম্পাদককেই আমরা ধন্যবাদ জানাই।

কবিতা সাপ্তাহিকী (২৫ বিশেষ সংকলন)ঃ যুগ্ম সম্পাদকঃ নিতাই ঘোষ ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১বি, অভয় সাহা রোড।

॥ একটি উপন্যাস ও গভীর আত্মপ্রত্যয় ॥

'চিংড়ি' তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের ...খ্যাত উপন্যাস 'চেম্মীন'-এর অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ঘোম্মানা বিশ্বনাথম্ ও ...লীমা আব্রাহাম। ১৯৫৬ সালে 'চিংড়ি' উপন্যাসটি প্রকাশের অনেক আগে থেকেই শিবশঙ্কর পিল্লাই সমকালীন মালয়ালাম সাহিত্যে সর্বাগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃত। 'চিংড়ি' প্রকাশের আট বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'দু' কুনকে ধান', যে বইটি শ্রীপিল্লাইকে প্রচুর খ্যাতি ও মর্যাদা দিয়েছে। এই কারণে 'চিংড়ি' উপন্যাসটির সর্বত্র লেখকের গভীর আত্ম-প্রত্যয় স্পষ্ট।

'চিংড়ি' প্রকাশের আগে পর্যন্ত শ্রীপিল্লাই কঠোর বাস্তববাদী লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই বইটিতে বাস্তবতার সঙ্গে এক নতুন রোমান্টিক ঐশ্বর্য মিশেছে। ছাত্রজীবনে এবং কর্ম-জীবনের সুরুতে কেরল প্রদেশের সমুদ্রোপ-কূলের জেলেদের সঙ্গে শ্রীপিল্লাইয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি সহানু-ভূতির চোখে দূরে থেকে মানুষের জীবন নিয়ে কল্পনার রঙে উপন্যাস লেখেননি।

প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে গ্রীষ্মের মধ্যকালীন প্রদর্শনীর দ্বিতীয় বর্ষ

এবারে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের গ্রীষ্মের মধ্যকালীন প্রদর্শনী একটু বিলম্বে আয়োজিত হল। গত মঙ্গলবার ১৬ই আগস্ট শ্রীজে জে ভাবা এর উদ্বোধন করলেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় শ্রীভাবা বলেন যে ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা দেশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আধু-নিক শিল্পকলা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে ট্র্যাডিশনকে তুচ্ছ করাই এঁদের অন্যতম লক্ষণ। তিনি আরো বলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের চর্চায় একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়; তা হল বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান। চিত্রশিল্পী ও ভাস্করকে সংগীত ও নৃত্য-শিল্প সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হত। কেবল-মাত্র একাগ্রচিত্তে তাঁর নিজের বিষয়টুকুর চর্চাই যথেষ্ট মনে করা হত না। শ্রীভাবা বলেন যে, আজকের দিনেও আমাদের এ সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখা উচিত এবং অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের মত একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সংগীত ও নৃত্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পীদের পরিচয় ও মিলন ঘটানো সম্ভব। এতে পরস্পরের উপকার হবে। আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেন। তিনি বলেন যে, আগেকার দিনে রাজা-মহারাজারাই শিল্প ও শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আজ আর রাজা-মহারাজা নেই। শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা সরকার কিছুটা করেন বটে কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এদিকে নজর দিতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় কি ছবি কেনা উচিত তা তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারেন না। এ বিষয়ে অ্যাকাডেমি যদি তাঁদের পরামর্শ-দাতার কাজ করতে পারেন ত শিল্প ও শিল্পীর উপকার হয়। বোম্বায়ে এ ধরণের ব্যবস্থা আছে। কলকাতায় না হওয়ার কোন কারণ নেই। কলকাতার অন্যান্য গ্যালারী-গুলির মাধ্যমে শিল্পীদের কিছু অর্থাগম হয় বটে কিন্তু এর ক্ষেত্র আরো বাড়াতে পারলে ভাল হয় এবং অ্যাকাডেমি এদিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারেন।

বর্তমান প্রদর্শনীটি অ্যাকাডেমির আয়োজিত অন্যান্য প্রদর্শনীর মতই ভাল-মন্দ, মাঝারি মিশিয়ে তৈরী। মাঝারির

দিকেই প্রবণতা একটু বেশী। জল রং-এর কাজের সংখ্যা খুব অল্প প্রদর্শিত ছবির অনেকগুলিই শিল্পীদের পুরোন কাজ। সুরেন দে, রামকিংকর, এবং সমরেশ চৌধুরীর তিনটি চলনসই ভাস্কর্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে বিজন চৌধুরী, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী, সেলিম মুন্সী, জ্যোতিরিন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম করা যায়। প্রবীণদের মধ্যে সুনীলমাধব সেন, রথীন মৈত্র, পরিতোষ সেন, কল্যাণ সেন, গোপাল ঘোষ, ইন্দ্র দুগার ইত্যাদি নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি নিয়ে উপস্থিত আছেন। তরুণদের মধ্যে গণেশ হালোই, রঞ্জন রুদ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে বিচিত্র ধরণের কাজ থাকলেও এমন একটা গতানুগতিকতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে যেটা দর্শকের মনকে শিল্পবস্তুর সামনে দাঁড়িয়ে সচেতন হওয়ার বদলে খানিকটা যেন স্তিমিত করে আনে। এর কারণ অনু-সন্ধানযোগ্য। অথচ বিক্রয়ের দিক দিয়ে প্রথম দিনের বিক্রয়-তালিকা আশাপ্রদ। আমার মনে হয় পুরোন ছবির সংখ্যার আধিক্য এই স্তিমিত মনোভাবের অন্যতম কারণ। যেহেতু আধুনিক শিল্পরীতির অন্যতম প্রধান উপজীব্য হল নতুনত্ব সেই-জন্যেই বোধহয় যে সব ছবি একবার দেখা হয়ে গিয়েছে সেগুলির পুনরায় উপস্থিতির মধ্যে অভিজ্ঞতার নতুনত্বের সম্ভাবনা কমে গিয়েছে। প্রদর্শনীর সজ্জার ব্যবস্থা আগের চাইতে অনেক উন্নত। ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকছে।

জৈন ভবনে জওয়ার চাঁদ দাসানীর চিত্র প্রদর্শনী

২৫ নম্বর কলাকার স্ট্রীটের জৈন ভবনে ১৩ই আগস্ট তরুণ শিল্পী জওয়ারচাঁদ দাসানীর একক শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। জৈন ভবনটি যদিও সাধারণ শিল্প-প্রদর্শনীর স্থান হিসেবে জনসাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য নয় তবু বর্তমান প্রদর্শনীর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলেই মনে হয়। কারণ শ্রীদাসানীর শিল্পের বিষয় হল জৈন ধর্মের প্রবর্তকদের জীবনী। দ্বিতীয়ত কলকাতার জৈন সম্প্রদায়ের অনেকেই এ অঞ্চলে বসবাস করেন। তাছাড়া ছবির প্রদর্শনী যত বিভিন্ন জায়গায় হয় ততই ভাল। এ বিষয়ে বিকেন্দ্রীকরণ খারাপ নয়। শ্রীদাসানীর বয়স মাত্র বাইশ। তিনি ইন্দোরের মানুষ; শিল্পশিক্ষালাভ করেছেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। বর্তমানে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও সুখময় মিত্রের অধীনে জৈন চিত্রকলা নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর চোদ্দখানি ছবির মধ্যে দু-তিনটি বাদে সবগুলিই জৈন ধর্মবিষয়ক। মাধ্যমের দিক থেকে তিনি জল রং টেম্পারা এবং তৈল ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ছবিই জৈন পুঁথিচিত্রণের প্রভাবে আঁকা। এর মধ্যে তাঁর সিল্কের ওপর আঁকা ছবি-গুলির মধ্যে রঙের প্রয়োগ কিছুটা উজ্জ্বল। যেমন মহাবীরের জন্ম, ধর্মপ্রচার ও নির্বাণ প্রভৃতি ছবি। টেম্পারায় আঁকা ছবিগুলির রং এতটা উজ্জ্বল নয়। তবে স্থানে স্থানে কোমলত্বের আভাস আছে। বস্ত্রদান ছবিতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব কিছুটা বেশী। প্রায় সমস্ত ছবিগুলি জৈন পুঁথিচিত্রের অনুসরণে আঁকা হলেও প্রকাশভঙ্গী এবং উপস্থাপনার আধুনিক চিত্রকলার ঢিলেঢালা ভাবের ছাপ বেশ স্পষ্ট। তৈল চিত্রগুলিকে যথেষ্ট প্রশংসা করা গেল না। এই মাধ্যমের যে কটি উদাহরণ উপস্থিত করা হয়েছে তাতে শিল্পীর মাধ্যমের ওপর যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনের কোন নিদর্শন দেখা গেল না। একটা অ্যামেচারিশ ভাব বড় প্রকট। প্রদর্শনী ২১শে আগস্ট পর্যন্ত খোলা ছিল।

শিল্পী : জওয়ারচাঁদ দাসানী

শ্রীযামিনী রায়

শিল্পী যামিনী রায়ের পৌর সম্বর্ধনা

গত ১৬ই আগস্ট কলকাতার পৌর-সভার পক্ষ থেকে শিল্পী শ্রীযামিনী রায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। শিল্পীর এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ না থাকলেও তাঁর অন্তরঙ্গদের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁর স্বগৃহেই সম্বর্ধনাসভার আয়োজন হয়। তাঁর পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে শিল্পী সর্বশ্রী অতুল বসু, চারু রায়, পূর্ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি এবং শ্রীমতী রাণু মুখার্জি শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও আরো অনেক গুণমুগ্ধ বন্ধু ও নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। মেয়র ডাঃ প্রীতিকুমার রায়চৌধুরী শিল্পীকে পৌরসভার তরফ থেকে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি রৌপ্যাধারে মানপত্র, জরির কাপড় এবং চন্দনকাঠের ছড়ি উপহার দেন এবং চন্দন ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শিল্পী বলেন যে, বিষয় বিষ থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান। তাঁর সমগ্র শিল্প তিনি জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে চান। সম্মানের চেয়েও সাধারণ মানুষের ভালবাসাই তাঁর কাছে অধিক কাম্য। আমাদের একমাত্র আনন্দের বিষয় হল শিল্পী যামিনী রায় এখনো আমাদের মধ্যেই আছেন এবং ছবি আঁকা তাঁর আজো বন্ধ হয়নি; এইটুকুই আমাদের পরম লাভ।

অন্য ভুবন ॥৬॥

ইরাবতী প্রজাপতি ধরতে ভালবাসতো।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিলো সুন্দর ফুলের বাগান। বাবার নিজের হাতে গড়া। লাল, গোলাপী, সাদা, কতো রকমের গোলাপ যে ফুটতো বাগানে! বাবা নিজে হাতে বাগানের যত্ন করতেন। কারো ঢোকার অধিকার ছিলো না বাগানে। আমরা ভুল করেও কোনদিন একটা গোলাপ তুলেছি বলে মনে পড়ে না।

কিন্তু আশ্চর্য! ইরাবতীর ক্ষেত্রে বাবা তাঁর নিজের হাতে গড়া নিয়ম লঙ্ঘন করতেন। যখন-তখন খুশিমতো ইরাবতী বাবার সখের বাগানে ঢুকতো, ফুলের বুকে লেগে থাকা রঙ-বেরঙের প্রজাপতি ধরতো আর বাবার

চোখাচোখি হ'লেই একতাড়া সাদা গোলাপের মতো দাঁত বার করে খিলখিল করে হেসে উঠতো। বাবা প্রায়ই ওর রেশমের মতো নরম চুলের মাঝে হাত বুলিয়ে কোলের কাছে টেনে নিতেন। আমি দূর থেকে লক্ষ করতাম রামধনুর মতো বিচিত্র রঙ রঙীন প্রজাপতিকে বাবার চোখের সামনে মেলে ধরতো ইরাবতী, আর বাবা শিশুর চোখে সেই রঙের মাঝে তাকিয়ে থাকতেন। মনে-মনে ইরাবতীর প্রতি ঈর্ষা বোধ করতাম। মনে হতো বাবার সবটুকু আদর সে যেন একাই কুড়িয়ে নিচ্ছে।

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই ইরাবতীরা থাকতো। ইরাবতীর বাবা ছিলেন সার্কেল অফিসার। প্রায়ই বাইরে-বাইরে ঘুরতেন। ছোট্ট সংসার। মা, বাবা, ইরাবতী আর ছোট্ট এক ভাই।

ইরাবতীর তখন আর কতো বয়স হবে! বড়জোর বছর দশেক। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমি সেবার মাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। কলকাতার কলেজে পড়বার তোড়জোড় চলছে। অফুরন্ত অবসর। ফুটবল খেলে আর মাছ ধরে সময় কাটাই।

একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। দুপুরের পড়ার বিকেল হ'তে না হ'তেই আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। মেঘ ভাঙা না মেঘে ঢাকা আকাশ দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগতো। বাইরের বারান্দায় বসে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় অদূরে কোথায় কে যেন সুন্দর মিষ্টি গলায় গান ধরেছে। গানের সুরের মাঝে আমি ক্রমশ যেন ডুবে যেতে লাগলাম। আমার মনটাকে সহসা কেমন যেন উদাসীন করে দিতে লাগলো।

আমি একবারও ভাববার অবসর পেলাম না এমন মিষ্টি গলা কার হতে পারে। আমার মনে হলো কে যেন অত্যন্ত গোপনে হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। ক্রমশ সে-সুর আমার মনের, আমার সমস্ত সত্তার গভীরে ডুবে যাচ্ছে।

তারপর সেদিন আমি প্রথম চোখ খুলে আলো দেখার মতো বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম, যখন দেখলাম হাওয়ায় সুর ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ইরাবতী অন্যমনস্কভাবে আমাদের ফুলের বাগানের দিকে এগিয়ে আসছে। ইরাবতীর মধ্যে সেই কিশোর বয়সে এক নতুন সত্তা যেন আবিষ্কার করেছিলাম। দশ বছরের

মেয়েটি সেদিন আমার মনের কোণে এক নতুন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিলো।

তারপর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। বারান্দা ছেড়ে আমি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। আর জানালার শিক গলিয়ে লক্ষ্য করলাম বৃষ্টিভেজা শরীরে নেচে-নেচে অজস্র প্রজাপতি ধরলো ইরাবতী। বৃষ্টিভেজা ইরাবতীর দিকে তাকিয়ে সেদিন আমার মনে হয়েছিলো প্রজাপতির চেয়ে আরো অনেক বেশি রঙীন যেন ইরাবতী। তার সমস্ত শরীরে যেন অজস্র রঙের ছটা। সেদিন সেই মুহূর্তে আমি একবারের জন্যেও ইরাবতীর প্রতি কোনরকম ঈর্ষাবোধ করিনি।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। মফস্বল শহরের জীবন ছেড়ে মহানগরী কলকাতার জীবনে এসে আশ্রয় নিয়েছি। তারপর ধীরে ধীরে কলকাতার চলমান জীবনের ছন্দের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে গিয়েছি। মন থেকে আস্তে আস্তে মুছে গিয়েছে সেই সুন্দর ফুলের বাগান, রঙ-বেরঙের প্রজাপতি আর শিশিরভেজা সকালের মতো সেই ছোট্ট মেয়ে ইরাবতী।

মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় দু'একবার বাড়ি গিয়েছি। মাঝেমধ্যে ইরাবতীকে দেখেছিও। নেচে-নেচে তখনও সে প্রজাপতি ধরে। তবে, তার সুমিষ্ট কণ্ঠের সুর ছড়ানো সেই গান আর কোনদিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না। স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে ইরাবতীর সেদিনের সেই সুরের রেশ কখন ঝরে পড়েছে খেয়াল করিনি।

কলেজ-জীবনও ক্রমশ শেষ হয়ে গিয়েছে। নিজের অজান্তেই অনেকটা সময় যেন আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। কর্মজীবনে ঢুকবার আগে কয়েকদিনের জন্যে বাড়ি এসেছি। বাঙলা দেশের বাইরে চাকুরী পেয়েছি। বাবা চিঠি লিখেছিলেন, প্রবাসে যাওয়ার আগে কয়েকদিন যেন তাঁর কাছে কাটিয়ে যাই। ছেলেবেলা থেকেই মাকে হারিয়েছি। বাবার মাঝেই মাতৃস্নেহের রূপটি চিরকাল খুঁজে পেয়েছি। বাবা যেন মা-বাবার যৌথ স্নেহের প্রতীক।

রাত্রে বাবার পাশে বসে খেতে বসেছি। হঠাৎ কথায়-কথায় বাবা জানালেন, ইরাবতীর বাবা যতীনবাবু বদলী হয়ে যাচ্ছেন। ইরাবতীকে নিজের মেয়ের চেয়েও বোধহয় বেশি স্নেহ করতেন বাবা। সংবাদটি দেওয়ার সময় বাবার চোখের কোণে কিরকম যেন একটা ব্যথার সন্ধান পেলাম আমি।

আমি মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলাম, কবে যাচ্ছেন?

দু'এক দিনের মধ্যেই। বাবা জবাব দিলেন।

ইরার পড়ার কি হবে? আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম।

বাবা কি বুঝলেন কে জানে! একটু হাসলেন। বাংলাদেশে কি স্কুল একটা? ওখানেই পড়বে।

আমি চুপ করে থাকলাম। আর কোন প্রসঙ্গ তুললাম না। বাবাও আর কথা বললেন না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন।

পরের দিন সকালবেলা। বাবার ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আরও অনেক ফুলের গাছ লাগিয়েছেন বাবা। বাবার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী এই বাগান ক্রমশ যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। কৈশোর ছেড়ে যৌবনের পথে যেন পা দিয়েছে। যে-কোন মানুষকে অন্তত মুহূর্তের জন্যে আশ্রয় দিতে পারে এই বাগান। বিষণ্ণতার মাঝে ঠিক এক ঝলক হাসির মতো।

এইসব কথা ভাবছি আর বাবার নিঃসঙ্গ জীবনের জন্যে মনে মনে দুঃখবোধ করছি। কেন জানি না মাকে জ্ঞান হয়ে আমি না দেখলেও সেদিন, সেই মুহূর্তে বারবার মায়ের কথাই আমার মনে হতে লাগল।

আর তখনই আমি লক্ষ্য করলাম এক-ঝাঁক প্রজাপতি নিমেষের মধ্যে আমার চোখের সামনে এসে তাদের রঙের পাখা মেলে ধরলো। প্রজাপতির রঙের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়লো ইরাবতীর কথা। চিৎকার করে ইরাবতীকে ডাকতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু কেন জানি না আমি ডাকতে পারলাম না। আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বার হলো না। সত্যিই এই কয়েক বছরে আমি অনেকটা পাল্টে গিয়েছি।

একটু বেলা হলে বাবা ইরাবতীকে ডাকলেন। আর ইরাবতীকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার চোখ এড়িয়ে ইরাবতী কখন যে বড়ো হয়ে উঠেছে আমি খেয়ালই করতে পারিনি। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। রেশমের মতো চুলে খোঁপা বেঁধেছে। আর খোঁপায় গুঁজেছে আমাদেরই বাগানের একটি লালগোলাপ। প্রজাপতির সমস্ত রঙ ইরাবতীর চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ কেমন যেন সলজ্জ হয়ে উঠেছে ইরাবতী।

তারপর মনে আছে আমাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার আগের দু'দিনের সবটুকু সময় বোধহয় আমাদের বাড়িতেই কাটিয়েছিল ইরাবতী। বাবার স্নেহের কথা ওর মা-বাবা জানতেন। তাই একবারের জন্যেও ডাকেননি তাকে। আর বাবার স্নেহের আড়ালে লুকিয়ে আমি যে গোপনে মনের পটে ওর সুন্দর মুখের ছবি এঁকে নিয়েছিলাম, সে-সংবাদ ওর বাড়ির লোক রাখেননি, রাখবার কথা ভাবতেও পারেননি।

আমার চোখের সামনে সেদিনও ইরাবতী প্রজাপতি ধরেছিলো। আর সাদা গোলাপের মতো দাঁত বার করে হাসতে-হাসতে হাওয়ায় আবার প্রজাপতি উড়িয়ে দিয়েছিলো। বাড়ির ছাদে বসে সেদিন ইরাবতী আমাকে অনেক গান শুনিয়েছিলো। গান গাওয়ার সময় আমি দুই চোখ মেলে ওর আশ্চর্য কোমল সৌন্দর্য অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলাম। ইরাবতীর কাছাকাছি বসে সেদিন যেন আমি ইরাবতীর অস্তিত্বের সাড়া অনুভব করেছিলাম। গোলাপের গন্ধের চেয়েও তার ডাক বুঝি আরো মাধুর্যময়। প্রথম যৌবনে দাঁড়িয়ে সেদিন মনে হয়েছিলো, দিনগুলো যদি নিজের ইচ্ছেমতো এমনভাবেই ধরে রাখা যেতো!

তারপর ইরাবতীরা চলে গিয়েছে। আমিও প্রবাসে কর্মজীবনে মিশে গিয়েছি। ধীরে ধীরে মনের পটে আঁকা ইরাবতীর মুখখানা কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রথম যৌবনের স্মৃতিটুকুও আস্তে আস্তে মুছে ফেলেছি। মাঝে মাঝে বাবার চিঠিতে ইরাবতীদের খবর পাই। বুঝি, বাবার সঙ্গে এখনও চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে। তারপর বাবা মারা গেলেন। ইরাবতীর শেষ রেশটুকুও আমার কাছ থেকে চিরকালের জন্যে মুছে গেল। কোন অবসর মুহূর্তেও ইরাবতীর মুখ ভেসে ওঠে না। সময় এমনিভাবেই বোধহয় সমস্ত স্মৃতিকে মুছে দেয়।

পদমর্যাদায় আমি তখন এক স্বতন্ত্র মানুষ। অন্য সত্তার অধিকারী। অন্য পরিবেশে, অন্য জীবনে অতীতের আলো-ঝলমল দিনগুলোকে হারিয়ে ফেলেছি। ভুলেই গিয়েছি প্রজাপতির রঙ, আর বাবার শখের ফুলের বাগান।

তারপর নতুন চাকরী নিয়ে কলকাতার বাইরে এক বড় শহরে চলে এসেছি। সংসার পেতেছি। জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু করেছি। আমি আমার আগের আমিকে আস্তে আস্তে ভুলতে বসেছি।

কলেজ-জীবনের শহর-বাসের সঙ্গে এ-শহর-বাসের যেন অনেক পার্থক্য। শহরের কোলাহলে ক্রমশ যেন আমি ক্লান্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। তাই, সময় পেলেই বেরিয়ে যাই, মাঠে ঘুরি, নদীর ধারে বেড়াই, শহরতলির রাস্তা ধরে একা-একা হেঁটে চলি। আর মাঝে মাঝে একা-

বিনা কারণে স্টেশনে আসি। শহরের
াহল মারাত্মক মনে হলেও কেন জানি
উচ্চকিত গতিময় রেল-স্টেশন আমার
ভালো লাগে। স্টেশন আমাকে কেমন
আকর্ষণ করে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমি
চলমান জীবনের স্বাদ অনুভব করি।
রবিবারের বিকেল। সেদিনও স্টেশনের
আমাকে হঠাৎ যেন পেয়ে বসলো।
চলতে তাই স্টেশনে এসে
লাম। গতিময় ছন্দের আকর্ষণ আমার
রক্তকে চঞ্চল করে তুলছিলো। আর
নে এসে দাঁড়াতেই আমার কানে ভেসে
মা মাইকের ঘোষণা :

এক নম্বর লোক্যাল, সাতটা দশ
টে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।
ফপুর, তমুকনগর থামবে না। আপনারা
া করে শুনুন। এক নম্বর লোক্যাল,
নম্বর লোক্যাল...স্টেশনের জেগেওঠা
াহল-এর মাঝে সুমিষ্ট কন্ঠের ঘোষণাকে
হচ্ছিল কেমন যেন আচমকা, বন্ধ জানালা
য়ে ঠিকরে-আসা আলোর মতো।
নের শব্দ, একসঙ্গে লক্ষ মানুষের
বাসের মতো।

প্রৌঢ় দুই ভদ্রলোক আমার পাশ কাটিয়ে
যেতে মন্তব্য করলেন। ভাষার
মা করলে এইরকম দাঁড়ায়—শুনে নাও,
নাও কেষ্ট। আহা, এমন মিষ্টি কথা।
া একেবারে জল করে দেচ্ছে রে।
ত বলতে এক ভদ্রলোক সঙ্গীটিকে
া মারলেন। কেষ্ট শুধু একটু মৃদু
লেন। অন্য কোন মন্তব্য করলেন না।
মাইকে থেকে-থেকে তখনও ঘোষণা
া আসছে : শুনুন, শুনুন আপনারা।
নম্বর লোক্যাল·...। প্রৌঢ় ভদ্র-
ঠিকই বলেছেন, সত্যিই মেয়েটির
স্বর ভারি মিষ্টি, বাচনভঙ্গী সত্যিই
র। প্রতিটি কথাকে যেন মেপে-মেপে
ই করে বলা হচ্ছে।

মনে হলো ঘুরে ঘুরে স্টেশনের
ত্র মানুষের বিচিত্র গতিময়তা
করা যাক। কতোবার তো স্টেশনে
ছি, কতোবার ফিরে গিয়েছি। কিন্তু
ময়তার মধ্যে যে একটা সরস জীবন্ত
লুকিয়ে আছে, তা লক্ষ্য করিনি
দিন। এই নতুন সত্য আবিষ্কারের
ন্দে সত্যিই আমার খুব ভালো লাগ-
। মনে হচ্ছিল, আরও, আরও অনেকক্ষণ
নে থেকে যাই, মানুষের জীবনের
ও যে-জীবন, তাকে খোলা চোখে
রে দেখে যাই। মনে হচ্ছিল, ট্রেন
ও খানিকটা লেট করুক। আরও
ক্ষণ আমি এই ছন্দোময় জীবনের
ডুবে থাকি। ডুবুরির মতো আমি
র সন্ধান করি।

আর এমনি মুক্তোর সন্ধান করতে
ত সেদিন আকস্মিকভাবে আমার ইরা-
র সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমি
চিনতে পারিনি। চেনা সম্ভবও নয়।
পতির সেই রক্ত ঝরে কেমন একটা
তার রঙ লেগে আছে চোখের কোণে।
ছলছলে সেই দৃষ্টি কেমন যেন ফ্যাকাসে,
ফাঁকা-ফাঁকা।

আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম।
ইরাবতীই আমাকে ডাকলো, সন্তুদা না?

আমি বোবা চোখে তাকিয়ে আছি দেখে
তার সাদা গোলাপের মতো দাঁতে হাসি
ঝরিয়ে বললো, চিনতে পারছো না! বাব্বা!
এতো পরিবর্তন! আমি ইরা।

এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন
নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জায় মাটিতে মিশে
যেতে ইচ্ছে করে, আমারও তাই হয়েছিল।
ইরাবতীকে আমি চিনতে পারিনি এ-কথা
ভেবেই আমি লজ্জায় গুটিয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর স্টেশনে চায়ের দোকানে
বসে অনেকক্ষণ কাটিয়েছিলাম ইরাবতীর
সঙ্গে। মুছে যাওয়া দিনগুলোর
স্মৃতি ধীরে ধীরে মনের মাঝে ভেসে
উঠছিল। মনে হচ্ছিল ফ্রক-পরা সেই ছোট্ট
মেয়েটি বৃষ্টিতে শরীর ভিজিয়ে আমার
চোখের সামনে যেন রঙ-বেরঙের প্রজাপতি
ধরছে। কান খাড়া করলেই হাওয়ায় ভেসে-
আসা সেই মিষ্টি গানের সুর যেন এখনও
শোনা যায়। সেই দিনগুলোর সঙ্গে আজকের
দিনের কতো তফাৎ। সময় আমাদের কোথায়
নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে। জীবনে কোন-
দিন কি ভাবতে পেরেছি এমন বিষণ্ণতার
মূর্তি ধরে আমার চোখের সামনে ইরাবতী
এসে দাঁড়াবে।

আমার মনের ভাব বোধহয় ইরাবতী
লক্ষ্য করেছিল। তাই জিগ্যেস করলো, কি
ভাবছো?

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম, কই,
কিছু নয় তো!

ইরাবতী একটু ম্লানভাবে হাসলো।
আমার মতো সেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।
আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।
ইরাবতীর কথা জানবার জন্যে আমার মন
ক্রমশ ব্যগ্র হয়ে উঠছিলো। জিগ্যেস করলাম,
কোথায় থাকো?

শহরতলিতে।

স্বামী ভদ্রলোক কি করেন?

মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী।

ছেলে-মেয়ে?

তিনটি।

তুমি চাকরী করলে ছেলে-মেয়ের অসুবিধা হয় না?

হয়।
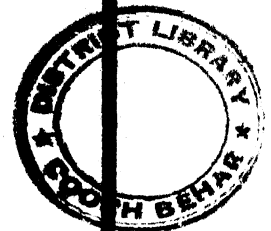
তবে করো কেন?

দরকার। বলে সেই ছেলেবেলার মতো খিলখিল করে হেসে উঠলো ইরাবতী, বাব্বা! তুমি যে একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা শুরু করেছো!

কেন জানি না, আমি ইরাবতীর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। আমার মনে হতে লাগলো তার সেই প্রাণখোলা হাসির মধ্যে দিয়ে ইরাবতী আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, এসব কথা জানবার তোমার কোন অধিকার নেই।

ইরাবতীকে বিদায় দিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরে এলাম। আসার আগে জেনে এলাম, যার সুমিষ্ট কন্ঠস্বরের ঘোষণা, অনেকের মনকেই একটু আগে উৎকর্ণ করে তুলেছিলো, সে-কন্ঠস্বর আর কারোর নয়, স্বয়ং ইরাবতীর।

নেচে-নেচে অজস্র প্রজাপতি ধরলো ইরাবতী

কিসের টানে কেন জানি না, পরের রবিবারের বিকেলেও আমি স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। জীবনের গতিময়তার ছন্দ অনুভব করবার আকর্ষণ সেদিন আমার ছিলো না। আমি সোজা স্টেশনমাস্টারের ঘরে গিয়ে ইরাবতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। স্টেশনমাস্টার ভদ্রলোক উঠে ছোট্ট জানালার কপাট খুলে পাশের ঘরের সঙ্গে কি যেন কথা বললেন, আর তারপর আমাকে সোজা নিয়ে ইরাবতীর কাছে পৌছে দিলেন।

ইরাবতী আমাকে দেখে একটুও অবাক হলো না। এই মুহূর্তে আমার উপস্থিত তার কাছে একান্তভাবেই যেন স্বাভাবিক ছিলো। আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললো, বসো। কথা বলো না। আমি ঘোষণাটা করে নেই।

এয়ারকন্ডিশনড্ ঘর। বাইরের কোলাহলের কোন শব্দ ভেসে আসে না। নিজের নিঃশ্বাস শব্দ নিজেই শোনা যায়।

ইরাবতীর সামনে টেবিল। টেবিলে ছোট্ট রেডিয়োর মতো একটা যন্ত্র। ওখানে সুইচ টিপে মুখ রেখে কথা বললেই বাইরের অজস্র অ্যাম্পিলফায়ারে সেই কথাগুলো ভেসে ওঠে। আমাকে বসিয়ে সুইচ টিপে কথা কেটে কেটে একটি ঘোষণা করলো ইরাবতী। নির্দেশমতো আমি একটিও কথা বললাম না। বুঝলাম, বললেই তা বাইরের মাইকে ভেসে উঠবে। সুইচ বন্ধ করে আমার আরও কাছে চেয়ার টেনে নিলো ইরাবতী, কি মনে করে?

এমনি। দেখতে— আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। ইরাবতী একটু হাসলো, আমার তাহলে ভাগ্য বলতে হবে। আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে থাকলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছে না। একটা নিস্তব্ধ থমথমে পরিবেশ। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেই আমিই প্রথম কথা বললাম, তোমাদের চাকরীটা বেশ মজার তো?

হ্যাঁ, ঐটেই লাভ। কোন ঝামেলা নেই। এক ঘরে নিজের মতো করে কাজ করে যাই। তাছাড়া সহকর্মী নেই বলে আর কোন ঝামেলাও নেই।

আমি হাসলাম, বেশ সপ্রতিভ আর অভিজ্ঞ দেখছি।

দায়ে পড়ে। ইরাবতীও হাসলো।

কিভাবে চাকরীতে ঢুকলে এখানে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিলাম। তারপর পাশ করে গেলাম। কতো শর্ত। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, তিন তিনটে ভাষা জানতে হবে। ভেবেছিলাম হবে না। কিন্তু হয়ে গেল। তারপর মাইক দিয়ে বাচনভঙ্গীর ট্রেনিং দেওয়া হলো। এখন তো অভ্যেস হয়ে গেছে। কথাগুলো প্রায় মুখস্থ পাখীর মতো আওড়ে যাই।

কিরকম মাইনে পাও তোমরা? ইরাবতীর আর্থিক সঙ্গতির কথা আমার জানতে ইচ্ছে করলো।

মাইনে সামান্য। লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের স্কেল। তবে আমাদের একটা এক্সট্রা অ্যালাউন্স আছে।

একাজ ভালো লাগে?

এমনিতে মন্দ লাগে না। তবে মাঝে মাঝে একটু একঘেয়ে তো লাগেই—সব কাজেই ক্লান্তি আছে। বলে ইরাবতী চুপ করলো। তারপর কিছুক্ষণ পর ইরাবতী আবার কথা বললো, দুদিন ধরে আমার কথাই তো খালি জিজ্ঞেস করছো। তোমার কথা তো কিছু বললে না। কোথায় আ... কেমন আছো, বৌদি কেমন হয়েছেন...

ভালো! আমি সব প্রশ্নের ... সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

আমার জবাব শুনে ইরাবতী থাম... বুঝলো নিজের কথা আমি ... বলতে চাইছি না। ইরাবতীর চোখের ... তাকিয়ে যেভাবে লক্ষ্য করে আমি বল... একদিন যাবো তোমাদের ওখানে।

সে আমার সৌভাগ্য। কিছুটা ... করেই বোধহয় বললো ইরাবতী।

ইতিমধ্যে ফোন বেজে উঠলো। ... কথা বলে ইরাবতী চেয়ার টেনে সুইচ ... আবার ঘোষণা করতে লাগলো। আর ... মুহূর্তে বহুকাল আগে একদিন ছাদে ... ইরাবতীর গান গাওয়ার দৃশ্যটা আ... চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

ঘোষণা শেষ হলে আমি উঠে পড়... ইরাবতীও আমাকে আর বসার ... অনুরোধ করলো না।

বাইরে কোলাহল। ইঞ্জিনের একটানা ... হাশ শব্দ। সহস্র মানুষের কন্ঠস্বর। কিছুর মাঝে হারিয়ে যেতে যেতে ... শুনতে পেলাম, মাইকে ঘোষণা হ... দুনম্বর লোক্যাল, আটটা তিরিশ মি... ছয় নম্বর প্লাটফরম্ থেকে ... দুনম্বর লোক্যাল......

মনে হল, একদিন যে প্রাণময়তার ... বতী ফুলের বাগানে প্রজাপতি ধরেছে ... অবাধ আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে, তার ... শক্তির উৎস আজো লুকিয়ে আছে ... জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজো ... তার পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে তুলছে এ... গোটা পরিবারের সুখী ভবিষ্যৎ।

—সত্য...

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রভাতকুমারের জীবন এবং সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(২)

বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে, তাঁর মাতুলালয়ে প্রভাতকুমার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিথি হিসাবে দিনটি ছিল মাঘী সপ্তমী। তাঁর তিরোধানের পর "ভারতবর্ষ" লেখেন, "প্রতিভার উদ্বেল স্ফুরণের পক্ষে দিনক্ষণ যে শুভই ছিল প্রভাতকুমারের সাহিত্য-জীবন তাহার জীবন্ত সাক্ষী।"

এঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার গুরুপ; বর্তমানে ইস্টার্ন রেলের এইচ্-বি কর্ডের একটি স্টেশন।

পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ইস্টার্ন রেলে সিগন্যালারের কাজ করতেন এবং যতটা জানতে পারা যায় বেহারেই ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনে বদলি হয়ে তাঁর চাকরি-জীবন কেটেছিল, ঝা-ঝা, জামালপুর, দিলদার-নগর ইত্যাদি। সেকালে যাঁরা এইভাবে চাকরি-জীবনটা বেহারে কাটাতেন, একদিকে ম্যালেরিয়ার ভয়ে এবং অন্যদিকে দুধ-ঘিয়ের মোহে বাংলায় ফিরে না গিয়ে সেখানেই বাড়িঘর ক'রে থেকে যেতেন। জয়গোপাল তা করেন নি। কথাটা এই জন্যে বললাম, আমি বেহার-প্রবাসী বাঙালী, প্রভাতবাবুকে ঐদিকে টেনে নেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল-মনোরথ হইনি।

পিতার বদলির চাকরি, প্রভাতকুমার মাসতুত ভাই রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বরাবর জামালপুরে থেকেই পড়াশুনা করতেন, নিশ্চয় রেলওয়ে স্কুলে থেকেই। ভাই ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। এখান থেকেই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রেন্স পাস করেন। পরে পাটনা কলেজ থেকে ১৮৯১ সালে ৩য় বিভাগে এফ-এ (তখনকার ফার্স্ট—আর্টস) এবং ঐ কলেজ থেকে ১৮৯৫ সালে বি-এ পাস করেন।

এফ-এ'র দ্বিতীয় বৎসরের শেষ দিকে ও'র বিবাহ হয়ে যায়, ও'র বয়স যখন সতের পূর্ণ হতেও কিছু বাকি ছিল অর্থাৎ এখন একটা কলেজ-ছাত্রীরও যে বয়সে বিবাহ হয়ে গেলে তার বন্ধুমহলে মুখ-টেপাটেপি হয়।

এই ক'টা বছরেই কী বিরাট যুগ পরিবর্তন! বলবেন—ভালোই তো। কিন্তু ছাত্র হোক ছাত্রী হোক কেউ যদি "হায়রে সে যুগ!" বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাহলে সত্যিই কোন যুগটা নিয়ে তার এ দীর্ঘ-শ্বাস তাই বা কি করে বুঝব?

প্রভাতকুমারের স্ত্রীর নাম ব্রজবালা দেবী, হালিশহর নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা। এ বিবাহিত জীবন দীর্ঘ হতে পারেনি। ছয় বৎসর পরেই ১৮৯৭ সালে ব্রজবালা অরুণকুমার ও প্রশান্তকুমার এই দুটি শিশুপুত্র রেখে অকালে পরলোকগমন করেন।

বছর দুই-তিন পরেই, বয়স যখন ছাব্বিশ-সাতাশ আর একবার বিবাহের একটি সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়। এবং লেখক-জনোচিতই, অর্থাৎ তাতে বেশ খানিকটা রোমান্সের গন্ধও ছিল। সরলা দেবী তখন "ভারতী"র সম্পাদিকা, "ভারতী"তে প্রভাতকুমারের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। তখন তিনি গবর্নমেণ্টের ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিমলা স্টেশনে অস্থায়ীভাবে চাকরি করছেন। পরিচয়ের সূত্রপাত এইখানে।

এর পর প্রভাতকুমার ১৮৯৭ সালে কলকাতায় এসে ডিরেক্টর জেনারেল অব টেলিগ্রাফের আপিসে স্থায়ীভাবে চাকরি গ্রহণ করেন এবং এর জন্য উভয়ের পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। এই পরি-স্থিতিতে ঠিক হয় যে প্রভাতকুমার সরলা দেবীর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খরচে বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসবেন, এবং সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহও সম্পাদিত হবে। (মতান্তরে তিনি আই-সি-এস পরীক্ষার জন্য বিলাতে যান এবং কোন কারণবশতঃ মত পরিবর্তন করে ব্যারিস্টারি পড়েন)।

এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলে প্রভাতকুমারের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারত, কিন্তু তা না হয়ে যেন আধাআধি হয়েই গেল থেমে। কেরানি-জীবন থেকে মুক্ত হয়ে একটা উচ্চস্তরে উঠে গেলেন উনি। পারিবারিক জীবন ছাড়া এই বিলাত-প্রবাস তাঁর সাহিত্য-জীবনেরও অনেকখানি দিল পূর্ণতর ক'রে, কিন্তু তবুও পরিকল্পনার উদ্দেশ্যটিকে সম্পূর্ণ-রূপে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারল না। এ বিবাহ হোল না। শোনা যায়, প্রভাতকুমারের জননীর অমতের জন্যই হোল না এ বিবাহ। তাই যদি হয় তো তাঁর জীবনের একটা দিক বিষাদ-ম্লান করে রেখে ঘটনাটি আর একটা দিক সেই অনুপাতে আরও উজ্জ্বল করে রেখেছেই বলতে হয়। তাঁর মাতৃভক্তির সঙ্গে মনের দৃঢ়তা। এই বাংলাতেই অনুরূপ আর একটি ঘটনা মনে পড়েছে। লর্ড কার্জন নাকি স্যার আশুতোষকে বিলাত পাঠাতে নিজের যুক্তি এবং প্রভাব যথাসাধ্য নিয়োগ করেছিলেন ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থার তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি গৌরবময় দৃষ্টান্ত হিসেবে। বিপক্ষে যা ছিল তা দোর্দণ্ড-প্রতাপ বড়লাট লর্ড কার্জনের দৃষ্টিতে একজন হিন্দু রমণীর কুসংস্কার মাত্র। কিন্তু তাঁরই জয় হয়েছিল। মায়ের আদেশ অমান্য করে বিলাত যাওয়া সম্ভব হয়নি স্যার আশুতোষের পক্ষে। শুনেছি কথাটা ঐভাবেই স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দেন লর্ড কার্জনকে; তাতে তাঁকে ক্ষুণ্ণও করেছিলেন। প্রভাতকুমারের বেলায় বাইরের কোন কার্জন-লাটের নির্দেশ না থাকলেও যা ছিল তা নিশ্চয় আরও শক্তিশালী। কিন্তু মায়ের নির্দেশের সামনে এ-শক্তিকেও নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। যাক, ওটা ও'দের মাতা-পুত্রের নিজেদের এলাকার কথা। প্রভাত-কুমার সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু নিয়ে বিষয়—আপশোসই বলতে হয় বৈকি—দুই বিশিষ্ট প্রতিভার সমন্বয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়ের জীবনে প্রতিভা বিকাশের হয়তো যে একটা বিপুলতর প্রত্যাশা ছিল সেটা নষ্টই হয়ে গেল বলে ধরে নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই।

এইখানে প্রভাতকুমারের চেহারার কথাটাও সেরে নেওয়া যায়। ডি-এম লাইব্রেরী কর্তৃক প্রচারিত প্রভাত গ্রন্থাবলীর দুটি খণ্ডে তাঁর ছবি দেওয়া হয়েছে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালীবাবুর বেশে। একটিতে বসে, একটিতে দাঁড়িয়ে। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় সংকলিত সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "সাহিত্য সাধক-চরিতমালার" চুয়ান্ন খণ্ড পুস্তিকায় যে ফটো সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেটি টাই-সুট পরা। এটি যেন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ও হয়তো বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসার অব্যবহিত পরে তোলা। এটিতে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, গোঁফ কস্মেটিক দিয়ে সেকালের ফ্যাশানে সূচ্যগ্র আকারে ওপরের দিকে তোলা। ফটোয় গাত্রবর্ণটা ঠিক বোঝা যায় না, তবে প্রভাত-বাবু যে প্রকৃতই সুপুরুষ ছিলেন এতে সন্দেহ থাকে না। বিশেষ করে তাঁর চোখের দৃষ্টি। প্রতিভা যেন তাতে ফুটে বেরুচ্ছে। সোজা উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত কপাল, মাথায় বাঁকা সিঁথে। দণ্ডায়মান অবস্থার ফটো থেকে মনে হয় দেহও ছিল দীর্ঘচ্ছন্দ। ব্রজেনবাবু যে লিখেছেন স্বভাবের দিক দিয়ে প্রভাতকুমার ছিলেন স্বল্পভাষী, শিষ্টাচার-সম্পন্ন, নিরহংকার ও সুমিষ্ট মেজাজের লোক, এর আকর্ষণ যেন তাঁর চেহারা থেকেই

পাওয়া যায়। অন্তত এই তিনটি গুণে যেন লেখা রয়েছে চেহারায়। তারপর দেখা যায়, এই ধরনের মানুষ প্রায়ই মিতভাষীও হয়ে থাকেন।

জীবন-যাত্রার ধারা, স্বভাব এ-সব জানবার প্রকৃষ্ট উপায় আত্মস্মৃতি কিম্বা অন্যের গবেষণা-প্রসূত জীবনী। প্রভাত-কুমারের এর কোনটিই না থাকায় এ পথ বন্ধ। অভাবে, সম্বল তাঁর রচনাবলী। এর মধ্যে গল্প আর উপন্যাসের ওপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না, কেননা এ দুটিতে লেখকেরা স্বভাবতই নিজের সৃষ্টি থেকে সাধ্যমতো নিজেদের detached বা বিচ্ছিন্ন করে রাখবারই চেষ্টা করেন—তা সত্ত্বেও যেটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে সেইটুকুই ভরসা সমালোচকের। তবে লেখার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ জাতীয় লেখায় মনের গঠনের আভাস অনেকটা স্ফুটতর হয়ে ওঠে। লেখক সবচেয়ে বেশি ধরা দেন ভ্রমণ-কাহিনীতে, কেননা সেটা হয় মূলত আত্মকেন্দ্রিক। এই জন্য শুধু মনের গঠনই নয়, জীবন-যাত্রার ধারাও তাতে অনেকখানি লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। 'প্রদীপ', 'ভারতী', 'মানসী' ইত্যাদিতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ প্রভাতকুমারের আছে, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, কিন্তু সেগুলি সেই জাতীয় নয় যাতে মানুষটির কোন অংশের প্রতিবিম্ব পড়তে পারে। বাকি থাকে একটি প্রবন্ধ 'সিমলাশৈল'। এটি ভ্রমণ-কাহিনী না হলেও প্রবাস-বৃত্তান্ত। ১৩০৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রদীপ'-এ প্রকাশিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করার পর ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দিয়ে চাকরিসূত্রে প্রভাতকুমার বোধ হয় ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় এসে টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ নেওয়ার আগে পর্যন্ত সিমলাতেই ছিলেন। এই লেখাটি হয়তো তাঁর তৎকালীন দৈনন্দিন জীবন-ধারা সম্বন্ধে কিছু আলোক-সম্পাত করতে পারত, কিন্তু এটি সংগ্রহ করতে পারি নি।

তৎসত্ত্বেও উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, প্রভাতকুমারের মতো বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হওয়া উচিত। তাঁর একটি সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থের প্রয়োজন আছে। কোন সুধী যদি এদিকে অগ্রসর হন তো আমার এই সংকেতটুকুও হয়তো কাজে লাগতে পারে। প্রসঙ্গত এটুকুও বলা যায় এটির সংগ্রহে আমার উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কেউ যদি উদ্যোগী হয়ে আমায় সাহায্য করেন তো, আশানুযায়ী তাতে তেমন কিছু থাকলে, আমার বক্তব্যের এই অংশটুকু পূর্ণতর করে নিতে পারি। উপস্থিত আমি নিজে চেষ্টা করে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি এখানে লিপিবদ্ধ করে দিলাম। প্রভাত-কুমারের গয়ায় থাকাকালে তাঁহার পুত্র প্রশান্তকুমারের সঙ্গে আমার এক বন্ধু গয়ার রেলওয়ে কনট্রাকটার শ্রীমোহিনী-মোহন ঘোষের বন্ধুত্ব হয় এবং এই সূত্রে প্রভাতকুমারের বাড়ি তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। তাঁকে পত্র লিখে যে চিঠিখানি পেয়েছি তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করে দিলাম।

ওঁ নাম

গয়া—৩।১২।৬৫

পরম প্রীতিভাজনেষু,—

প্রভাতবাবুর পিতা পুরাতন দানাপুর Rly District -এ কাজ করিতেন। সম্ভবতঃ এ জন্য রেলওয়ের বাবুদের প্রতি তাঁহার একটি সহজ, সরল ও সহানুভূতিশীল ভালবাসা ছিল। এখানে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই Rly Club -এ আসিতেন ও সকলেরই সহিত মিশিতেন।

তাঁহার মা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন। প্রভাতবাবু বাটীর বাহিরেই থাকিতেন। প্রত্যহ সকালে কাপড় ছাড়িয়া (ঢিলা পাজামা ও পাঞ্জাবি) মাকে প্রণাম করিতে বাড়ীর ভিতর যাইতেন। ভিতর বাড়ীর নিরামিষ রান্না তাঁহার জন্য বাহির বাড়ীতেই আসিত। এ-ছাড়া মাছ, মাংস রান্নার ব্যবস্থা বাহির বাড়ীতেই হইত।

সে সময়কার বিলাত ফেরতাদের মতন তিনি ছিলেন না। স্থানীয় বাঙ্গালীদের বাড়ীর সামাজিক কাজে তিনি হিন্দু বাঙ্গালীরই মতন যোগ দিতেন। এ বিষয়ে ছোট-বড়র বিচার বড় একটা ছিল না। আচারে, ব্যবহারে, মেলা-মেশায় তিনি সম্পূর্ণ বাঙ্গালীই ছিলেন।

সামাজিক কাজে ধুতি-চাদর ব্যবহার করিতেন। বাড়িতে সাধারণতঃ ঢিলা পাঞ্জাবি ও পাজামাই সর্বদা ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার গায়ের রং ময়লাই ছিল। বিশেষত্বের মধ্যে মাথার চুল খুব মিহি করিয়া কাটাইতেন—মুখে ফরাসী কায়দায় (French-Cut) ছোট একটু দাড়ি ছিল। বন্ধুমহলে প্রাণখুলিয়া মার্জিতভাবে হাসিতে ও হাসাইতে পারিতেন। অথচ বাহির হইতে দেখিলে, তাঁহাকে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার চরিত্র-গত কোনও স্খলন সম্বন্ধে কোনও কথা কখনও শুনা যায় নি।

শীতকালে গয়া Dry Cold ও 'হাপানী' রুগির জন্য ভাল। এ জন্য ডাঃ নির্দেশে মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় (নাটোরাধিপতি) শীতকালে গয়ায় আসিয়া থাকিতেন।

এই সময়টিতে বেশ একটি সাহিত্যিক বৈঠক প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় মহারাজার বাটীতে বসিত। সে-সময় এখানে Postal Inspector বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন।

এছাড়া বাহির হইতেও সাহিত্যিক সমাগম হইত।

১৯১৬ (সম্ভবত) শেষের দিকে রবি ঠাকুর তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত গয়াতে বরাবর পাহাড় ও বুদ্ধ গয়া দেখিতে আসেন। কবিকে 'প্রভাত'—প্রভাত" বলিয়া প্রভাতবাবুকে আদর করিতে দেখিয়াছি।

ব্যারিষ্টার হিসাবে তাঁহার বিশেষ Busy Practice ছিল না। এ সময় মহা-রাজা "মানসী" মাসিক পত্রিকার ভার লন ও নূতনরূপে "মানসী ও মর্মবাণী" প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই পত্রিকা উপলক্ষ করিয়া মহারাজার ইচ্ছায় ও অনুরোধে (সম্ভবত) প্রভাতবাবু পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার লইয়া Practice ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া যান।

গয়ায় থাকাকালে ছোট গল্প কয়েকটি (ষোড়শীর) লেখেন। তবে উপন্যাসে তাঁর হাতে খড়ি এখানেই। তাঁর প্রথম উপন্যাস "নবীন সন্ন্যাসী" এখানেই লেখা। তিনি তাঁর Office Table —এই লেখার কাজও করিতেন। আমরা (আমি ও তাঁর ছোট ছেলে প্রশান্ত) লুকাইয়া তাঁহার Manuscripts পড়িতাম।

ইহার আদি বাটী নদীয়া জেলার ঘূর্ণী-গ্রামে। মনে হয় যা জানি সবই লিখিলাম।"

চিঠিখানি আমার পূর্বের বিবরণের সঙ্গে কোথাও কোথাও একটু আধটু বৈসাদৃশ্য আছে, তৎসত্ত্বেও আমি যথাযথ উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রভাতকুমারের কর্মজীবনের কথা শুরু করে আমি তাঁর আকৃতি এবং প্রকৃতির দিকটায় চলে এসেছি। আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

কেরানীগিরির দুটি অংশে শেষ ক'র ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তিনি ব্যারিস্টার হয়ে আসবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৯০৩, ডিসেম্বরের শেষের দিকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। পারিবারিক জীবনের দিক দিয়ে তাঁর বিলাতযাত্রা যে ব্যর্থ হয়েছিল একথা বললে বোধহয় ভুল হয় না। প্রথমত, তাঁর যাওয়ার যা মূল প্রেরণা সেটা সার্থক হতে পায়নি। যেমন শোনা যায়, মাতার সম্মতি না থাকায় সরলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হতে পেল না। পরিণামে ভগ্ন-হৃদয় হয়ে তিনি আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করলেন না; নবোদ্যমে জীবনের নূতন যাত্রাপথে নামার যে বিশেষ আর কোন তাগিদ রইল না, এটাও স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারা যায়। অন্তত গোড়ার দিকটায়।

প্রথমটা কিছুদিন দার্জিলিং, তারপর ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে প্রভাতকুমার রংপুরে এসে বসেন। কিরকম প্র্যাকটিস ছিল তার কোন খবর পাওয়া যায় না। এখানে চার বছর কাটিয়ে প্রভাতবাবু গয়ার এসে বসেন। এ সময়-বরাবর মনের ক্ষত নিশ্চয় অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে, অদৃষ্টের সঙ্গে খানিকটা রফা করে নিয়েছেন উনি, মন দিয়েছেন নিজের বৃত্তির দিকে। উনি মারা যাওয়ার পর "ভারতবর্ষ"-এ যে বিবৃতিটুকু বেরোয় তাতে একস্থানে যে বলা হয়েছে, ব্যারিস্টারীতে সাফল্যলাভও করেন, সেটা তাঁর গয়ার প্র্যাকটিসের সম্বন্ধেই মনে হয়, কেননা এখানে তিনি

১৯০৮ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত প্র্যাকটিসে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় জীবনের মোড়টা হঠাৎ গেল ফিরে। একদিন এক ব্যর্থ প্রেরণা তাঁকে এই পথে দিয়েছিল তুলে, আজ অন্যবিধ এক প্রেরণায় তাঁকে এ-পথ থেকে নামিয়ে অন্য দিগন্তে পরিচালিত করল। এবং এই প্রেরণাই শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে সার্থক এবং শাশ্বত হয়ে রইল।

১৯১৬ সাল। গল্পে উপন্যাসে এগার-খানি গ্রন্থ বেরিয়ে গেছে। তার মধ্যে রয়েছে "ষোড়শী", "রমাসুন্দরী", "দেশী ও বিলাতী" "নবীন সন্ন্যাসী", "রত্নদ্বীপ" প্রভৃতির মতো নাম করা গ্রন্থ।

সাহিত্য আকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কদের মধ্যে স্থান প্রভাতকুমারের। এই সময় তিনি তাঁর প্রতিভা এবং মনোবৃত্তির অনুকূল সুযোগটিও পেয়ে গেলেন।

১৯০৪ সালে নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্র-নাথ রায় 'মানসী' নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। এর পূর্বে প্রভাতকুমারের কয়েকটি গল্প মানসীতে প্রকাশিত হয়েছিল—রসময়ীর রসিকতা (১৩১৬), মাতৃহীন (১৩১৭), মাদুলী (১৩১৮), বাল্যবন্ধু (১৩১৯), লেডি ডাক্তার (১৩২১) এবং 'খোকার কাণ্ড' (১৩২১)।

জগদিন্দ্রনাথ সম্পাদনা-পরিচালনা নিয়ে প্রভাতকুমারকে আরও বেশি করে টেনে নিলেন এবং এই সূত্রে তাঁদের লেখার মাধ্যমে গঠিত পূর্ব-পরিচয়টাও ক্রমে আন্তরিকতায় দাঁড়িয়ে গেল। এবং এর পরের রচনা তালিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এখন থেকে তিনি 'মানসী'র নিয়মিত লেখক হয়ে উঠলেন।

এর পর নাটোরাধিপতি অমূল্য বিদ্যা-ভূষণের সহযোগিতায় মর্মবাণী নামে একখানি সাপ্তাহিক ৩রা শ্রাবণ, ১৩২২ (ইং ১৯১০) তারিখে শুরু করেন। এই সূত্রে স্বনামে এবং ছদ্মনামে লেখা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। মর্মবাণী পৃথকভাবে মাত্র মাস ছয় চলেছিল। তারপর ১৯১৬ সালে এক কলেবরে কাগজ-খানি "মানসী ও মর্মবাণী" এই যুগ্মনামে বেরুতে থাকে। অপরপক্ষে ঘটনাটি শুধু পত্রিকা দুটিকেই একাঙ্গীভূত করল না, পরন্তু প্রভাত-জগদিন্দ্রের সম্বন্ধটিও আরও ঘনীভূত করে দিল। মহারাজের আমন্ত্রণে প্রভাতকুমার তাঁর সহযোগীরূপে "মানসী ও মর্মবাণী"র সম্পাদক হয়ে এক সময় প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় স্থায়ী-ভাবে চলে এলেন।

ঘটনাটুকু সময়ের ব্যবধান থেকে যত সামান্য মনে হচ্ছে আসলে সে রকম ছিল না এবং সে সময়ে বাংলা পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে বেশ একটু আলোড়নই তুলেছিল। ব্যাপারটা আমার একটু বেশি করে মনে আছে তার কারণ আমার নিজের প্রায় এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ আস্তে আস্তে জমে আসছে এবং বিশেষ করে মাসিক পত্রিকার নামে যেটা সাময়িক সাহিত্য বলে প্রচারিত তার সম্বন্ধে অধিকাধিক কৌতূহলী হয়ে উঠছি। প্রসঙ্গ. ছেড়ে তাহলে আরও একটু বলি। সামান্য ব্যাপারই, কিন্তু তাতে প্রভাতবাবুর সম্পাদনার অথবা হয়তো সেযুগের সম্পাদনারই রীতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯১৭-১৮'র মধ্যেকার কথা। "দাদা" বলে আমার একটি গল্প "মানসী ও মর্মবাণী"তে প্রকাশিত হওয়ার পর উৎসাহিত হয়ে আমি আর একটি গল্প কিছুদিন পর পাঠালে গল্পটি অমনোনীত হয়ে ফেরৎ আসে। তবে রূঢ়, হ্রস্ব একটি "না"-র লাঞ্ছনা গায়ে নিয়ে নয়। প্রভাত-বাবুর একখানি চিঠি সঙ্গে। লিখেছেন—গল্পটি এমনি ভালোই হয়েছে, তবে যেখানে Love interest ফোটাবার চেষ্টা করেছি সেখানটা একটু অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। মনে পড়ে এই পর্যন্ত প'ড়ে খুবই দমে যেতে হয়েছিল। 'লভ'—বস্তুটি জীবনেও জুটছে না; আবার সাহিত্যেও দাঁড় করাতে পারছি না—এ যে দু'দিক থেকে মারা যাওয়ার লক্ষণ!

দমেই গেছি, তারপর পরের লাইনটির ওপর দৃষ্টি পড়ল। লিখেছেন—"কিন্তু 'দাদা' গল্পের লেখকের আশা আমরা সহজে ছাড়তে পারব না।"

অথচ "দাদা" গল্প আমার তেমন কিছুই নয়। ভাবালুতার বয়স, সেই ধরনেরই একটি দুর্বল গল্প। নিতান্তই কাঁচা হাতের প্রয়াস, বোধহয় কুণ্ঠা কাটিয়ে এখন পর্যন্ত কোন বইয়েও নেওয়া হয়নি।

তাহলেও এই সহৃদয়তা, সামান্যের প্রতিও এই Courtesy, এটুকু আমার গতিপথে তো অনেকখানিই প্রেরণা জুগিয়েছিল। নৈলে, সেদিন, সৌজন্য হিসাবেও 'দাদা'র লেখকের আশা উনি ধরে না রাখলে "দাদা" লেখককেই বোধহয় সাহিত্য-যশের সব আশা জলাঞ্জলি দিতে হোত, কে বলতে পারে?

মণি-কাঞ্চন যোগই বলতে হবে—একদিকে মহারাজের অর্থ, অপরদিকে প্রভাতকুমারের সম্পাদনা, ফলে অচিরেই "মানসী ও মর্মবাণী" একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় পরিণত হল। চৌদ্দ বৎসর, অর্থাৎ মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে পর্যন্ত কাগজটি সম্পাদনা করেন প্রভাতকুমার। তাঁর জীবনে "মানসী ও মর্মবাণী"র স্থান রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'সাধনা'র যে স্থান, অনেকটা সেই রকম। অথবা বঙ্কিমের জীবনে যেমন "বঙ্গদর্শন"। ১৩২২-এর ফাল্গুন, (১৯১৬), গয়ায় থাকাকালেই উনি সহযোগী সম্পাদকের কাজটি নেন। তার পূর্বেই ঐ সালের শ্রাবণ থেকে "মানসী ও মর্মবাণী"তে ও'র "জীবনের মূল্য" উপন্যাসটি শুরু হয়ে গেছে, শেষ হয় ১৩২৩-এর মাঘে। এর পর "সখের ডিটেকটিভ" থেকে শুরু করে ও'র আটখানি গল্পের মধ্যে একুশখানি, এবং চৌদ্দখানি উপন্যাসের মধ্যে পাঁচখানি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। প্রথম কয়েক বছর যেন একচেটিয়া "মানসী ও মর্মবাণী"র সম্পত্তি হয়ে ওঠে ও'র লেখা। পরে দেখছি আশ্বিন, ১৩৩০-এ 'মাসিক বসুমতী'তে "অদৃষ্ট পরীক্ষা" বের হওয়ার পর থেকে উনি এই কাগজটির দিকে যেন একটু বেশি ঢ'লে পড়েন; একেবারে শেষের দিকে তো যেন এই পত্রিকাটিরই একচেটিয়া। অনেক-গুলি গল্প ছাড়া তিনখানি উপন্যাসও যায় ঐ কাগজে। তার মধ্যে শেষেরটি "বিদায়-বাণী" উনি শেষ করে যেতে পারেন নি। এই পক্ষপাতিত্বের মূলে আর কিছু ছিল কিনা বোঝা যায় না। এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিস যা চোখে পড়ে তা এই যে ১৯১৩ সালে "নবীন সন্ন্যাসী" প্রবাসীতে শেষ হওয়ার পর থেকে আর ঐ কাগজে প্রভাতকুমারের কোন লেখাই পাওয়া যাচ্ছে না।

একটু যেন ইংরাজীতে যাকে বলে Ticklish, অর্থাৎ মনে সুড়সুড়ি দিয়ে কৌতূহল উদ্রেক করে। "ভারতবর্ষ" খুব বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এসে দাঁড়ালেও 'প্রবাসী'র তখন জয়জয়কার।

একটা ব্যাপার কৌতূহলকে করে আকর্ষণ। "নবীন সন্ন্যাসী" প্রবাসীতে শেষ হওয়ার পর ঐ পত্রিকাতেই যে তার সমালোচনা বেরোয় সেটা মোটের ওপর বিরূপই। প্লট ঘোরালো নয়—আগাগোড়া একটি সঙ্গতিরক্ষা হয়নি—অবান্তর ও অনাবশ্যক ঘটনার দ্বারা অকারণে ভারাক্রান্ত—এই ধরনের উক্তি ছাড়া একটা বড় ত্রুটি এই দেখান হয় যে "কোন চরিত্রই একটি কেন্দ্রগতভাবে বা ঘটনাকে বেষ্টন করিয়া ফুলের বীজ-কোষের পাশে পাপড়ির মতো বিকশিত হইয়া ওঠে নাই।"

প্রভাতবাবু যে সমালোচনাটিতে আহত হয়েছিলেন এটা বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভালোভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে Unity of actions অর্থাৎ ঐ কেন্দ্রগত ভাব বা ঘটনার কথা নিয়েই তিনি প্রতিবাদটা করেন। উনি Dickens :কে ধরে যা বলেন তা থেকে অল্প একটু উদ্ধৃতি করে দিচ্ছি। বলছেন "আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে তাহা চিত্র-জাতীয় বলা যাইতে পারে। Dickens. এর উপন্যাসগুলি এই জাতীয় উপন্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাতে প্লটও ঘোরালো হয় না, বীজকোষ পাপড়িরও কোন হাঙ্গামা নেই। 'নবীন সন্ন্যাসী' সেইরূপ চিত্রজাতীয় উপন্যাস।......এই বলিয়া মনে করিবেন না Dickens এর সহিত আমি নিজেকে তুলনা করিতেছি। এক-জাতীয়ত্ব দাবি করিতেছি মাত্র যেমন স্যর গুরুদাস বাঁড়ুজ্যে আর আমাদের ঐ রসুয়ে বামন আর কি।"

এই সাক্ষাৎকারে উপরি-পাওনা হিসাবে আমরা যেন আর একটি জিনিস দৈবাৎ পেয়ে যাচ্ছি। পূর্বে বলেছি আত্মজীবনী বা জীবনী হিসাবে কিছু না থাকায় প্রভাত-কুমারের স্বভাবের সেইদিকটার যেমন সন্ধান

পারি না, আলাপ-সংলাপের মধ্যে দিয়ে সেটি আপনিই ওঠে ফুটে। অধ্যাপক বিপিনবিহারীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার তার যেন খানিকটা ইংগিত পাওয়া যায়। বিদ্রূপ হলেও প্রবাসী'র মন্তব্যের মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে একথা যাঁরা "নবীন সন্ন্যাসী" পড়ছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন; পরবর্তী সমালোচকের অনেকেও স্বীকার করছেন। দেখছি, এক ঐ Unity of action ছাড়া অন্য মন্তব্যগুলি নিয়ে তিনি কিছু বলেননি। এতে তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটি যেন সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই আমরা। যদি ধরে নেওয়া যায় পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও প্রতিবাদের কিছু থাকলেও চুপ করে গেছেন, তাহলেও সমালোচনার সমালোচনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার যে একটি অশোভনতা আছে সেটা পরিহার করে গেছেন। এই পরমতসহিষ্ণুতা যে একটা বড় হৃদয়বৃত্তি এটা অস্বীকার করা যায় না।

তারপর ঐ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব —যেন হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়ে শেষের ঐ সরস উক্তি-কণিকা "যেমন সাদা গুরুদাস বাঁড়ুজ্যে আর আমাদের ঐ ...য়ে বামন আর কি।"

—এ যেন একঝলকে মানুষ প্রভাতকুমারের খানিকটা উদ্ভাসিত করে দিয়েছে আমাদের দৃষ্টির সামনে।

প্রভাতকুমারের কর্ম-জীবন তিনটি অংশে ভাগ করা যায়;

কেরানীগিরি, সম্পাদনা এবং আইন কলেজের অধ্যাপনা। গয়া ছাড়বার পর মহারাজার চেষ্টায় তিনি আগষ্ট ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান, এবং শেষ পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

এবার আমি প্রভাতকুমারের রচনার দিকটায় চলে আসতে চাই। তবে তার পূর্বে আর একটি প্রসংগ এইখানেই শেষ করে নিলে তাঁকে বোঝবার একটু বোধহয় সুবিধা হয়। প্রসঙ্গটি নিয়ে যখন কিছু কিছু আলোচনা হয়ে একটু মতভেদের সৃষ্টি করেছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একরকম ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই, বিশেষ করে বঙ্কিমের সময় থেকে তো বটেই, বাংলাভাষায় যে সাহিত্যসৃষ্টি তা পাশ্চাত্যের সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ করে ইংরেজী এবং ফরাসী এবং পরে রুশীয়ও বটে। এই কারণে পাঠক—সমালোচক মহলে একটা প্রবণতাই ছিল—এদিকের কার সঙ্গে ওদিকের কার কোথায় মিল আছে সেটা খুঁজে বের করা। অবশ্য, খুব স্বাভাবিকও, যদিও সবক্ষেত্রে প্রমাদহীনও নয়, আংশিক সত্য হিসাবে ধরে নেওয়াই ভালো। যেমন বঙ্কিমকে বাংলার স্কট বললে তাঁর যে নিজস্ব বঙ্কিমত্ব তার অনেকখানিই বাদ পড়ে যায়। কিন্তু সেকথা থাক।

'বীরবল' অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী বোধ-হয় তাঁর 'সবুজ পত্রে'ই কোনখানে প্রভাতকুমারকে এইভাবে বাংলার Guy-de-maupassant বলে অভিহিত করেন। প্রমথবাবু প্রাবন্ধিক, কাহিনীকার ও সমালোচক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক, ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধেও এদেশের মধ্যে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, সুতরাং তাঁর কথাটায় যে একটা মূল্য আছেই একথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি যদি কোথাও যুক্তি সহযোগে তুলনামূলক সমালোচনা প্রসংগে একথা বলে থাকেন তো সেটা দেখতে পেলে অনেকটা সুবিধা হোত। অভাবে নিতান্তই নিজের বিচারের ওপর নির্ভর করে কিন্তু ঠিক এ ধরনের অভিধার কোন সার্থকতা পাওয়া যায় না।

অন্তত পুরোপুরি নয়। আবার যেন সেই Bankim is the Scot of Bengal -ই এসে পড়ে।

একটা যে সাদৃশ্য সেটা এই যে দুজনেই প্রধানত গল্পকার। বড় উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পই বেশি করে তাঁদের চারণ-ক্ষেত্র করে বেছে নিয়েছেন। প্রভাতকুমার পূর্ণাংগ উপন্যাস মাত্র তেরখানি লেখেন, এর অতিরিক্ত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত একখানি বারোয়ারি উপন্যাসের মাত্র তিন অধ্যায় ও 'বিদায় বাণী' নামে একখানি উপন্যাসের ১৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। মৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ থাকায় পরে শ্রীসৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এটিকে সম্পূর্ণ করেন। তাঁর গল্প সংখ্যাই অনেক বেশি। একশতের কিছু বেশিই। মোপাসাঁরও মাত্র ছয়খানি উপন্যাস, বাকি সবই গল্প।

অবশ্য একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এমন বেশি কিছু মিল নয়, এবং হয়তো 'বীরবল' তাঁর বিচারে এটা ধরেননিও, তবু আর একটা দিকও যে আছে এটাও অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাস এবং ছোটগল্পের আংগিক এবং আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু আকারেই নয় Spirit বা প্রাণধর্মেও ছোটগল্প Lyric সুতরাং Lyric -ধর্মী মনেরই এদিকে বেশি ঝোঁক থাকবে, সে আত্মপ্রকাশের এই আংগিকটি বেশি করে বেছে নেবে এটা স্বাভাবিক, সুতরাং প্রভাত-মোপাসাঁর সাদৃশ্যের মধ্যে এটাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় মিল পাওয়া যায়, অতি তুচ্ছ বিষয়, সাধারণের যা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যা সাধারণে যাতে রসের তেমন কিছু খুঁজে পায় না এমন ঘটনা নিয়েও উভয়েই অনেক সার্থক কাহিনী রচনা করে গেছেন।

তৃতীয় মিল, উভয়ের রচনার মধ্যেই হাস্যরসের বিদ্যমানতায়। তফাৎ এই যে প্রভাতকুমারের এটা যেন প্রায় সমস্ত রচনাকেই অল্প-বিস্তর অভিষিঞ্চিত করে রেখেছে, মোপাসাঁর মধ্যে এটা ক্বচিৎ এবং ক্ষণিকও। বাকি থাকে লেখকের জীবন-দর্শন। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং তাঁর নিজের মনের প্রতিক্রিয়া, জীবন সম্বন্ধে তাঁর Attitude এবং Approach, এইটি লেখকের সৃষ্টির মূল উৎস এবং এইতেই এক লেখককে তাঁর সমকালের থেকে পৃথক করে দেয় বা সম-গোষ্ঠীভুক্ত করে। এ বিষয়ে এই দুই প্রতিভাধরের বিশেষ কোন সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয় না, কেন না দুজনেরই এই জীবন-দর্শন আলাদা। মোপাসাঁ এদিক দিয়ে Realist. ফরাসী বিপ্লব জাতির মানস-জগতে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমাংশে একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা, একটা দুরন্ত আশা; দ্বিতীয় অংশে—বিপ্লবের মূল সত্যটির ব্যর্থতার জন্য সেই পরিমাণেই একটা বিপুল হতাশা—এবং তা থেকে উপজাত এক তীব্র ক্ষোভ এবং তাই থেকে উপজাত বিপুল বিশৃংখলা। এর মধ্যে থেকে যে গ্লানি ফেনিয়ে উপচে এসেছিল—ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে যে লজ্জাহীনতা—তাকে তিনি পূর্ণ নিরাভরণ নগ্নতায় গেছেন দেখিয়ে। দেখিয়ে গেছেন যেন এই নৈরাশ্য, এই Frustration-এর প্রবক্তা হয়েই

এই তাঁর Realism, এই Realism সম্বন্ধে তাঁর সমালোচক Edmond Gosse বলেছেন—

> The great merit of Guy-de-Maupassant as a writer is his frank and masculine directness. He sees life clearly and he undertakes to describe it as he sees it, in concise and vigorous language. He is a realist, yet without the gloominess of Zola, over whom he claims one great advantage, that of possessing a rich sense of humour and a large share of the old Gallic wit. His pessimism, indeed, is inexorable and he pushes the misfortune, more often the degredation, of his character to the extreme logical conclusion.

এই Realism-এর পাশেই কিন্তু তাঁর আর এক সত্তার সন্ধান পাই আমরা। সেখানে তিনি মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে মুক্তপ্রাণ পুরুষরূপে বিরাজিত। এ সম্বন্ধেও Edmand gosse -এর কয়েকটি লাইন তুলে দিই এখানে—

> He travelled widely in the South of Europe, in Africa; wherever he went he took with him a quick sensitive eye for the aspects of nature and his descriptive passages which are never pushed to a tiresome excess of length, are often faultlessly vivid.

বৈষম্যের বিচারে প্রভাতকুমারের দিকে এসে আমরা যেমন না পাচ্ছি রূঢ় Reality তেমনি তাঁর প্রকৃতি-প্রীতিরও বিশেষ কোন উদাহরণ পাচ্ছি না। তাহলে এইখানে Dickens -কেও একটু এনে ফেলা যায়। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য বীরবলের মতো কোন নামকরা সমালোচকের নজীর নেই। কে বলেছে, কবে বলেছে কিছু জানা নেই। তবে, ও'কে মোপাসাঁ কে বলে?—প্রভাতকুমার বাংলার Dickens —এ-ধরনের একটা জনশ্রুতি চলে আসছে।

তা বরং মোপাসাঁর চেয়ে খানিকটা মানা যায়। স্মিত থেকে উচ্চকিত সবরকম হাসির

ন দু'জনেরই রচনা রস-সমৃদ্ধ। য় কথা, দু'জনেরই রচনা চিত্রধর্মী। প্রভাতবাবু 'নবীন সন্ন্যাসী' প্রসঙ্গে ক্ষ সমর্থনে অধ্যাপক বিপিনবিহারী ক বলেছিলেন, ডিকেন্সের সঙ্গে তত্ব দাবি ক'রে। একটু লঘু আলাপে রত হলেও কথাটা যে অনেকখানি এটা অস্বীকার করা যায় না।

দিও, নিজেদের মানুষ হলেও, এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বলেছি, বঙ্কিমকে বাংলার স্কট এক হিসাবে বঙ্কিমের অনেকখানি দয়ে তাঁকে অনেকখানি খর্বই করা হয়। হয় ঠিক তার উল্টো। প্রভাতকুমারের মাথামাথি করে দাঁড় করাতে গেলে সঙ্কেই ছেঁটে-ছুটে অনেকখানি খর্ব আনা হয়। এতে স্বয়ং প্রভাতকুমারই তুষ্ট হতেন না, তা তিনি নিজেই ঐ সন্ন্যাসী' প্রসঙ্গেই একই নিঃশ্বাসে গেছেন।

প্রভাতকুমার অন্য কে নয়, বা কতটা কে নয়—সে-কথা শেষ করে, উনি স্ব- য় কি বা কে সেই বিচারেই নামা যাক স্বমহিমায় বৈকি, কেননা এটা তো ংবাদিত সত্য যে, তিনি বাংলার প্রথম র কথাকারদের মধ্যে অন্যতম। যেখানে হয়তো অন্যদিক দিয়ে পৌঁছেয়ে ন, সেখানে অনাবিল হাস্যরসের পরি- ন সে-ত্রুটি নিয়েছেন পুষিয়ে। আজকে আমাদের নানাদিক দিয়েই উন্নততর সাহিত্য যেমন আরও ব্যাপকতরভাবে ণের স্বীকৃতি পাচ্ছে, শিক্ষার প্রসারে, ন সক্ষম, সার্থক সাহিত্যিককে সমাদর বার অনেক পন্থাও হয়েছে আবিষ্কৃত, প্রতিষ্ঠান উঠেছে গড়ে; আঞ্চলিক, শিক সর্বভারতীয়, ভারতসীমা অতি- ও। প্রভাতকুমারের সময়ে এ-সবের ছিল। তবুও বাংলার তৎকালীন যা সমাদর, তা তিনি পেয়ে গেছেন। ৩ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' সহ-সভাপতি করে নিয়ে সম্বর্ধিত । জন-সমাদরের এর চেয়ে বড় নি,—রবীন্দ্রযুগেও গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জনপ্রিয়তা—যেটা তিক অনেক সমালোচককেও স্বীকার হয়েছে। জীবিতকালেই তাঁর অনেক র একাধিক সংস্করণ সে-যুগেও এটুকু তেই করে।

এই জনপ্রিয়তার মূলে কি আছে এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক; প্রসঙ্গ- পূর্বেও তার কিছু কিছু এসে গেছে নিবন্ধে। আমি গোড়াতেই বলেছি যে, র এ-নিবন্ধে প্রভাতকুমারের হাস্যরসের তেই বেশি পক্ষপাতিত্ব থাকবে এবং ন্য আমার ভূমিকাতেও আদিযুগ থেকে সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা-প্রবাহটিকে ন্য দিয়েছি; যাতে প্রভাতকুমারকে বোঝা তাঁর আবির্ভাব একটা আকস্মিক বলে মনে না হয়।

আমার পক্ষপাতিত্বের একটা কারণ, আমি হাস্যরসই তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যে যেটিকে বলা হয় লেখকের ফ্যরট্ (Forte) ব্যক্তিগতভাবে প্রভাতকুমারের তিরোধান এবং রাজশেখর-কেদারের অভ্যুদয়ের মাঝখানে আমি সাহিত্যে এই রসেরই সবচেয়ে বেশি অভাব বোধ করেছি। অনেকগুলি গল্প যে তাঁর সুষ্ঠু হাসি উদ্রেক করার জন্যেই, সে-কথা পরে দেখাবার প্রয়াস করব; তেমনি, বেশি না হোক, শুদ্ধ করুণ রসেরও কয়েকটি গল্প আছে তাঁর। কিন্তু সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, নিত্য-জীবনের ঘৃণা-প্রেম দ্বন্দ্ব-সখ্য, আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-শোক, পতন-অভ্যুদয়—যে-বিষয় নিয়ে, যে-সুরই তুলুন, হাসির একটি স্বৈত সুর, কখনও ঝঙ্কৃত, কখনও স্তিমিত, সর্বক্ষেত্রেই যেন ওতঃপ্রোত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যেখানে রচনার সমস্ত পট-ভূমি বা পরিবেশ হাস্যরসের প্রতিকূলই, সেখানেও প্রভাতকুমারের চটুল দৃষ্টি হাস্য-রসের সন্ধান পেয়েছে, লেখনি হাস্যরসের সার্থক শিল্পসৃষ্টি করেছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় প্রভাতকুমার প্রসঙ্গে এ-কথা সুন্দর-ভাবে বিবৃত করেছেন। স্বদেশীযুগের পট-ভূমিকায় লেখা কয়েকটি গল্পের উল্লেখ ক'রে। একটু উদ্ধৃত করে দিই এখানে। বলছেন—"ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে-আন্দোলন একদিকে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্রে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রোহ-প্রবণতার বিষ উদ্গার করিয়াছে ও অপরদিকে নানাবিধ দমনমূলক আইনের প্রণয়নে প্রণোদিত করিয়াছে, যাতে শাসক-শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি পরস্পরের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া জর্জরিত হইয়াছে, প্রভাতকুমার সেই হলাহল সমুদ্রের মধ্যে হইতে বিশুদ্ধ হাস্যরস-সুধা আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন উভয় পক্ষই যুদ্ধের উত্তেজনা ও কোলাহলে আত্মবিস্মৃত, তখন এই উগ্র রণোন্মাদনার মধ্যে প্রত্যেকের ব্যবহারে এমন বিসদৃশ অসঙ্গতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহা নিরপেক্ষ, স্থির-মস্তিষ্ক Humarist -এর প্রচুর হাস্যরসের উপাদান জোগাইয়াছে।"

'উকিলের বুদ্ধি', 'হাতে-হাতে ফল', 'খালাস' প্রভৃতি গল্পগুলি এই জাতীয় গল্পের সুন্দর উদাহরণ। এই হাস্যরস, যা তাঁর লেখার মধ্যে একটি প্রসন্ন গতিচ্ছন্দ এনে দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথকেও করেছে মুগ্ধ। দ্বিতীয় সংস্করণ 'নবকথা' আর 'ষোড়শী' উপহার পেয়ে তিনি লিখছেন—"দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের ওপর পাল তুলিয়া একেবারে হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে, তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোট-গল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই—তাহা মাথার ওপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না......"

মাসিক পত্রিকা 'সাহিত্য'-এর সুরেশ সমাজপতি সেকালের একজন অত্যন্ত নিষ্করুণ সমালোচক ছিলেন।

(ক্রমশঃ)
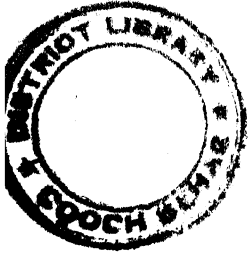
উনি লাবণ্যের রহস্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন

সৌন্দর্যের যত্ন সম্পর্কে অনেকেই ওঁর পরামর্শ নিতে চান। উনি সবসময় একই উত্তর দিয়ে থাকেন—'হেজলীন' স্নো ব্যবহার করুন। কেননা উনি জানেন যে সুন্দর, মসৃণ ত্বকের জন্যে 'হেজলীন' স্নো-র মত জিনিস হয় না। বছরের পর বছর চলে যায়, কিন্তু যৌবনসুলভ লাবণ্য যেন অটুট! ■ নতুন লুসিন-যুক্ত 'হেজলীন' স্নো আদর্শ ভ্যানিশিং ক্রীম, পাউডার বেস্ এবং হ্যাণ্ড ক্রীম। পুরুষদের দাড়ি কামাবার পর ক্রীম হিসেবে ব্যবহার করবার পক্ষেও ভালো।

একমাত্র 'হেজলীন' স্নোতেই লুসিন রয়েছে—এই অপূর্ব উপাদানটি বারোজ ওয়েলকাম এণ্ড কোম্পানীর তৈরী, আপনার ত্বককে আরো লাবণ্যময় ক'রে তোলে।

লুসিন®-যুক্ত
'হেজলীন' স্নো

'হেজলীন'-এর অন্যান্য জিনিস: কোল্ড ক্রীম ও ট্যাল্ক।

HBI-SW-39 BEN.

বারোজ ওয়েলকাম-এর তৈরী

(উপন্যাস)

।। পাঁচ ।।

রাত দশটা। পূর্ণ মুখুজ্জে এসে বাইরের দরজা নাড়ছেন। সবাই ঘুমুচ্ছে। ঘুমোবে বলে পূর্ণিমাও শুয়ে আছে, তড়াক করে উঠে পড়ল। কেমন একটা ধারণা হয়েছিল, আসবেন পূর্ণজেঠা এই রাতের মধ্যেই। খবর চেপে থাকতে পারবেন না। ঠিক তাই। কড়া নেড়ে ডাকাডাকি করছেন : শুয়ে পড়েছ নাকি ভায়া?

দোর খুলে পূর্ণিমা বলল, ঘুমোচ্ছেন বাবা। শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। তা ছাড়া আপনি এলেন না—দাবাখেলা নেই। ডাকব?

পূর্ণ বললেন, শরীর খারাপ হবে, সে আর আশ্চর্য কি? যা ধকলটা গেছে আজ সমস্ত দিন! তাছাড়া মনের উদ্বেগ। শরীর তো আমারও খারাপ, তবু ভাবলাম সুখবরটা না শুনিয়ে ঘুম হবে না। না খাইয়ে কিছুতে ছাড়ল না—এই ফিরলাম, বাড়িও যাইনি। বলে দিও পছন্দ করেছে ওরা, পাকা কথা দিয়েছে। জানতাম, আমার কথা কক্ষণো ফেলবে না—

কিছুতে বসলেন না পূর্ণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলেন, বত্রিশ বছর ওদের স্বার্থে খেটেছি। ঐ যে এসেছিল অসীম অরুণ আর সমীর—এক এক ফোঁটা শিশু ওরা তখন, কোলেপিঠে নাচিয়েছি, লজেন্স কিনে খাইয়েছি, বড় হয়ে আজও সেই কাকাবাবু বলতে অজ্ঞান। না মা, বসতে গেলে দেরি হবে, দেহ ভেঙে আসছে, গিয়েই শুয়ে পড়ব। ভায়াকে এখন ডাকাডাকি কোরো না। সকালবেলা বোলো, জেঠাবাবু এসেছিলেন।

দরজা দিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলা মানুষ তিনজন দেখেছিল, নিশিরাত্রে পাওয়া গেল নাম তিনটি—অসীম অরুণ আর সমীর। তিন নামের ভিতর কোনটি? আসল মানুষ কে?

বাবা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন। ডেকে তুললেই বোধহয় ঠিক হত—শোনা যেত সমস্ত। কৌতূহলে বিনিদ্র শয্যায় ছটফট করতে হত না। একই বাড়ির খুড়তুত জেঠতুত ভাই ওরা সব—কোম্পানির এক একটা সেকসনের কর্তৃত্ব নিয়ে আছে। কোন জন ওদের মধ্যে—অদূরকালে কোন কর্তাটির কড়ে আঙুলে কড়ে আঙুল বন্দী করে পাশে দাঁড়াতে হবে? কোন এক বাড়ির ঘড়ির আওয়াজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাত্রির পরিমাপ দিয়ে যাচ্ছে। দু চোখ এক করতে পারে না পূর্ণিমা—মনে মনে স্বয়ম্বরা হচ্ছে। একবার এ-ছেলেটার পাশে একবার ও-ছেলেটার পাশে সকৌতুকে নিজেকে দাঁড় করায়। বরকে ঠিক মতো না জানায় এই বেশ মজা চলল।

সারারাত পূর্ণিমা লহমার তরে দু'চোখ এক করতে পারেনি। রোদ উঠেছে, পড়ে আছে তখনও। সর্বদেহ এক মধুর আলস্যে এলিয়ে আছে, অর্ধেক তন্দ্রার মধ্যে মন জুড়ে রিমঝিম বাজনা বাজে যেন।

পূর্ণ-জেঠার গলা কানে গিয়ে ধড়মড় করে সে উঠে বসল। এত সকালেই এসে পড়েছেন—ঘুম বুঝি তাঁরও হয় নি। উচ্চকণ্ঠে আত্মকৃতিত্বের ঘোষণা : বত্রিশ বছরের চাকরি—চাট্টিখানি কথা নয়। ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলাম। কর্তাদের জায়গায় ছেলেরা সব বসেছে। তা বলে আমার কথা ফেলবে, এত বড় তাগত নেই। বললও তাই : নেহাৎ আপনি মুখ স্ফুটে বললেন—আপনার হুকুম মতোই চোখের দেখা দেখে আসা। তারিখ অবধি দিয়ে দিয়েছে—পুজো সকাল সকাল এবার, পুজোর ক'টা দিন গিয়ে অক্টোবরের গোড়ায়।

কী রকম গোলমেলে ব্যাপার যেন। অক্টোবরের গোড়ায় তো আশ্বিন মাস—অকাল, বিয়েথাওয়া চলে না তখন। এর পরে পূর্ণিমা আর অন্তরালে থাকতে পারে না। দু-জনে ও'রা বারান্ডায় বসেছেন, একটা ঝাড়ন হাতে পূর্ণিমা সেখানে চলে আসে।

এক-গাল হেসে পূর্ণ মুখুজ্জে বলেন, কেল্লা ফতে মা-জননী। পাকা-কথা বলে দিয়েছে।

পূর্ণিমা শুধায়, পাকা-কথা কিসের?

কী মুশকিল! এত কান্ড হচ্ছে, বলো নি কিছু ভায়া? চাকরি বাগানো গেল তোমার জন্যে। কাল তো এরই জন্যে দেখিয়ে আনলাম।

পায়ের নিচেটা হঠাৎ যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পূর্ণিমা জানলা আঁকড়ে ধরল। ঝাড়ন দিয়ে এক-আধটা বাড়ি দেয়—বারান্ডা ঝাড়পোঁছ করছে, সেই অজুহাত।

বলে, চাকরি তো আছে একটা। চাকরি আর পড়াশুনো এক সঙ্গে চলছে।

পূর্ণ তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, মাস্টারি হল চাকরি আর আরশুলা হল পাখি—ছোঃ! আমি যে অফিসে কাজ করতাম, সেইখানে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছ।

চাকরির জন্যে তো দরখাস্ত করতে হয়, ইন্টারভিউয়ের জন্য অফিসে ডাকে। গড়ের মাঠে গিয়ে এ কী ব্যাপার!

ঠিকই বলেছ মা। ঘাড় নেড়ে পূর্ণ মুখুজ্জে খুব খানিকটা হেসে নিলেন : আইনমাফিক হতে গেলে তো দরখাস্তের পাহাড় জমত, সই-সুপারিশের ঠেলায় পাগল হয়ে যেত ছেলে তিনটে। এ কেমন টিপিটিপি কাজ হয়ে গেল। আগের রিসেপসনিস্ট মেয়েটা চাকরি ছেড়ে দিল। খবর পেয়ে আমি গিয়ে ধরলুম : চাকরিটা আমায় দিতে হবে বাবাজিগণ। এ চাকরিতে চেহারাই সকলের বড় কোয়ালিফিকেশন—তাই বরঞ্চ একটিবার চোখে দেখে খুশি হয়ে এসো। অন্য সব কোয়ালিফিকেশনও আছে—যদি কিছু ঘাটতি থাকে, ধীরে সুস্থে মেরামত করে নেওয়া যাবে। ইন্টারভিউ গড়ের মাঠে—অফিসের ভিতরে হলে হৈ-চৈ পড়ে যেত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার খুব শিগগির এসে যাবে—হপ্তার ভিতরেই।

কাঠ হয়ে সব শুনল পূর্ণিমা। তারপর চা করতে গিয়ে বসে। এত বড় সুখবর নিয়ে এলেন, শুধু-মুখে কেন যেতে দেবে? আবার তারণকৃষ্ণ এক ফাঁকে রান্নাঘরে এসে বললেন, শুধু চা নয় রে, মিষ্টিমুখ করে যাবে পূর্ণ-দা। তাপসের হাতে টাকা দিয়ে বলেন, ছুটে গিয়ে সন্দেশ নিয়ে আয়।

অনেকদিন পরে তিনি আজ প্রাণখোলা হাসি হাসছেন। শয্যাশায়ী তরঙ্গিণীও দেখি উঠে পড়েছেন—দেয়াল ধরে পায়ে পায়ে হাঁটছেন। আনন্দের জোয়ার বইছে বাড়িতে।

আরও খানিক পরে তারণ এসে বলেন, বাজার-থলিটা দে তো মা। ঘুরে আসি।

পূর্ণিমা বলে, বাজারের শখ চাপল কেন বাবা, কবে তুমি যাও বাজারে?

তারণ বলেন, দেহটা কি রকম জখম হয়ে গেছে, ভিড়ের ধকল মোটে সহ্য হয় না। সেইজন্য যাইনে।

আজকে দেহ ঠিক হয়ে গেল বুঝি?

এক-গাল হেসে বলেন, ঠিক তুই তোর মাকেও দেখালিনে উঠে কেমন হাটিতে লেগেছে। আসল ব্যাধি হল দুর্ভাবনা। এই বাজারে পেন্সনের ঐ ক'টি টাকা সম্বল। আর ছিটেফোঁটা তুই যা দিতে পারিস। ভাড়ার দায়ে কোনদিন দূর-দূর করে বের করে দেবে—পথে পড়ে মরবার দশা তখন। পূর্ণ-দা হতে সব সুরাহা হয়ে গেল। ভাবছি, এত বড় সুখের দিনে নিজে গিয়ে কিছু ভাল মাছ-তরকারি নিয়ে আসি।

তারণকৃষ্ণ খাইয়ে মানুষ চিরকাল। জমাতি ফুরিয়ে এসে খাওয়ার বিলাসিতা ইদানীং বন্ধ—কোন রকমে ক্ষুধা-শান্তি করা। ভবিষ্যতের আলো দেখতে পেয়ে পুরানো ক্ষুধা সঙ্গে সঙ্গে চাড়া দিয়ে উঠেছে। বলেন, আজকেও কাজে যাস নে তুই। ছেড়ে দিচ্ছিস যখন, কী দরকার। তাপসের ইস্কুলেও একটা চিঠি দেবে, একটার সময় ওকে যাতে ছেড়ে দেয়। এসে মজা করে খাবে।

বাজারের থলি খুঁজে পেতে নিজেই সংগ্রহ করে নিলেন, পূর্ণিমা ঝংকার দিয়ে ওঠে : তোমায় বাজার করতে হবে না বাবা। আমি যাচ্ছি। সুখের দিন আমায় নিয়েই তো—ভাল মাছ-তরকারি আমিই এনে রেঁধেবেড়ে তোমাদের খাওয়াবো।

প্রতিবাদ করে তারণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, কানে না নিয়ে থলিটা তাঁর হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে পূর্ণিমা বেরিয়ে পড়ল।

উৎকৃষ্ট আহারাদির পর তারণকৃষ্ণ আরাম করে বিড়ি ধরিয়েছেন। রেঁধেছে খুব ভালো। নিষ্ঠা আছে মেয়ের, সবকর্মে দক্ষতা। আহা, ভালো হোক ওর, কাজকর্মে উন্নতি হোক। নতুন কাজে প্রায় তো ডবল মাইনে পাবে। আর অফিসের মাইনে থেমে থাকে না, বেড়ে চলবে বছর বছর। অদৃষ্টে থাকে তো দুটো-চারটে আড়গাড়া লাফিয়ে একেবারে চূড়ায় ওঠাও বিচিত্র নয়। তাই হোক, তাই হোক—ভারি গুণের মেয়ে পূর্নি।

তক্তাপোশের প্রান্তে দেয়ালে ঠেশান দিয়ে চোখ বুজে বিড়ি টানছিলেন। পূর্ণিমা এসে বলে, বসে বসে ঘুমচ্ছ কেন বাবা? ওঠো। চাদর পেতে দিই, শুয়ে পড়ো।

শুইয়ে দিয়ে আকস্মিক বজ্রনিক্ষেপের মতো পূর্ণিমা বলে, অফিসের চাকরি আমি নেবো না বাবা। পূর্ণ-জেঠাকে বলে দিও।

কেন, কেন?

তারণের চোখের ঘুম পলকে উড়ে গেল, তড়াক করে উঠে বসলেন : চাকরি নিবি নে—পাগল না ক্ষ্যাপা তুই?

পূর্ণিমা হাসিমুখে বলে, তাদেরও কিছু উপরে। তালুকদার-বাড়ির মেয়ে আমি—যারা ঘর ছেড়ে বাইরে আসত না, পাছে সূর্যিঠাকুরের নজরে পড়ে যায়।

তারণ বলেন, বড় মুখ করে তো বলছিস—সে জিনিস রাখতে দিয়েছিস তুই? দিনকাল পালটেছে, তবু খানিকটা অন্তত রাখা যেত। ঘর ভেঙে বেরিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কোচিং ইস্কুলের চাকরি নিলি—আমায় জানতেও দিস নি। জাতই দিলি যখন, পেট তবে কেন ভরাবি নে? এমন আরামের চাকরি—গতর নাড়তে হবে না, সেজেগুজে চেয়ারে বসে থাকা শুধু—

চাইনে—চাইনে ঐরকম সেজেগুজে বসতে—

তারণকৃষ্ণ মুহূর্তকাল মেয়ের মুখে চেয়ে বিদ্রূপ কণ্ঠে বলেন, না, বসতে যাবে কেন—গদি পেতে শুইয়ে মাস মাস মাইনেটা দিলে ভাল হত। সংসারের এই অবস্থা—মেয়ে হয়ে সমস্ত চোখের উপর দেখেও তুই ঝগড়া করিস।

পূর্ণিমা বলে, দিদিও তো মেয়ে। সংসারের অবস্থা তখনো কিছু ভাল ছিল না। চেয়েছিলে তার রোজগার?

অণিমা আর তুই। তার কোন বিদ্যে আছে, সে কি রোজগার করবে। তার মতন মুখুসুখু হতিস, কেউ কিছু বলতে যেত না। তখন যে জেদ ধরলি : পড়ব আমি কলেজে। বোঝ—

পূর্ণিমা বলে, কলেজে দিয়েছিলে—আর যাই হোক, চাকরির জন্যে নয়। লেখা-পড়াই করব আমি, বি-এ পাশ করব—তার পরেও পড়ব। মাস্টারি ঠিক চাকরি নয়—বিদ্যাদান, ব্রত বিশেষ। পড়াশুনোর আবহাওয়ায় আছি, অফিসের কাজ আমায় দিয়ে হবে না।

তারণ ও তাপসের খাওয়া সারা, অসুস্থ তরঙ্গিণী বসে গেছেন, ধীরে সুস্থে খান তিনি। ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে এঁটো হাতে টলতে টলতে তিনি উঠে এলেন। রোগে ভুগে চক্ষু কোটরে বসে গেছে, গুহার শ্বাপদের মতো জ্বলছে সেই চোখ দুটো : হাতের লক্ষ্মী দিবি তুই পায়ে ঠেলে?

পূর্ণিমা বলে, তোমার বাপের বাড়ির শ্বশুরবাড়ির কোন মেয়ে এতাবৎ আ[illegible] করেছে বলো দিকি মা? আর অফিসের কী কাজ শুনেছ সেটা? সেজেগুজে চেহারা দেখিয়ে মিষ্টি কথা বলে ওদের খদ্দের পটানো। তোমার শাশুড়ি আমার ঠাকুমা আশি বছর বয়সেও পুরুষের সামনে এক-হাত ঘোমটা টেনে দিতেন। তাঁর নাতনিকে বেশরম বেল্লেবর্ন কাজে দেবে কয়েকটা টাকার জন্যে?

তরঙ্গিণী বুঝি আর জবাব খুঁজে পান না, চুপ হয়ে গেলেন। বাপের গর্জন আরও তুমুল হল : পড়, তবে তুই। বি-এ পাশ কর, এম-এ পাশ কর—পড়ে পড়ে দিগ্‌গজ হ। বিনি চিকিচ্ছেয় ভুগে ভুগে তোর মা মরে যাক, না খেয়ে শুকিয়ে আমি আচমকা একদিন রাস্তায় পড়ে মরি। তাপসের পড়ার খরচ কে দেবে, ইস্কুল ছেড়ে সে বিড়ির দোকান দিক—

তাপস কোনদিকে ছিল, এই সময়টা এসে দাঁড়াল। ছেলেকে দেখে তারণের রাগ উদ্দণ্ড হল। কুলুঙ্গির মধ্যে পড়ার বই পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা। তারণ সেখানে গিয়ে পড়লেন, বই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন মেজেয়।

তাপস ক্ষণকাল হতভম্ব হয়ে দেখে, তারপর কেঁদে পড়ল।

ক্রুদ্ধ পূর্ণিমা ধমক দিয়ে ওঠে : কি করছ বাবা? যাও, শুয়ে পড়োগে আবার।

তখন আর তারণ বই ফেলেন না, মুখেই গর্জাচ্ছেন : যাক, বিদেয় হয়ে যাক। কি হবে গুচ্ছের জঞ্জাল জড়ো করে রেখে?

তাপসকে বলেন, পেন্সনের টাকা তো পেটে খেতেই কুলোয় না। কোথায় পাবি পড়ার খরচ? কে দেবে? ইস্কুল ছেড়ে বিড়ি বাঁধতে শেখ। মোড়ের দোকানে গিয়ে বসবি—আজ থেকেই।

চোখে অগ্নিবর্ষণ করে পূর্ণিমা বই কুড়িয়ে কুড়িয়ে কুলুঙ্গিতে আবার এনে রাখে। তাপসের চোখে ধারা গড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে সে ভাইয়ের চোখের জল আঁচলে মুছিয়ে দেয়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাপস বলে, আমি আর পড়ব না ছোড়দি?

কেন পড়বি নে, কী হয়েছে? বাবা রাগ করে বললেন—ও কিছু না, যত ইচ্ছে পড়ে যাবি। আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোর পড়া কোনদিন বন্ধ হবে না।

দুরদৃষ্টবশে চেহারাটা মোটামুটি ভালো। রিসেপসনিস্টের পক্ষে অনুপযোগী নয়—তদুপরি লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শিখে ফেলেছে। চাকরি অতএব না নিয়ে উপায় কি?

কোচিং-ইস্কুলের মাস্টারি ছেড়ে পূর্ণিমা অতএব অফিসের রিসেপসনিস্ট। হলের প্রবেশদরজার ঠিক পাশটিতে তার টেবিল। টেবিলে কিছু স্লিপ ও কাগজপত্র এবং টেলিফোনের রিসিভার। কাজ হল সেজে গুজে বসে থাকা, হেসে হেসে কথা বলা আগন্তুকের সঙ্গে, এ-চেম্বারে সে-চেম্বারে এ-টেবিলে সে-টেবিলে টেলিফোনে
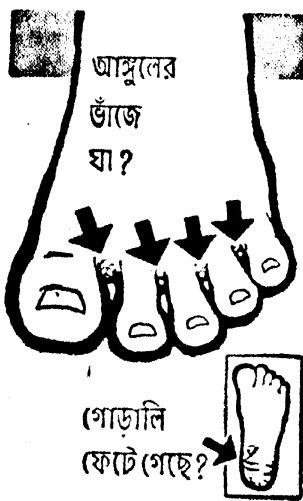
গোযোগ করে দেওয়া। এবং ঘন ঘন পাফ লানো গালে, লিপস্টিক বুলিয়ে ঠোঁটের মেরামত করা, আয়না ধরে ললাটের পরের অবাধ্য চুলের রিং সামলানো। রুস্ত তে পূর্ণিমার তিনটে চারটে দিন মাত্র গেল।

বিস্তর মানুষের আনাগোনা নিত্যি-ন—মিস সরকারের মিষ্টি হাসি থাবার্তা আর তড়িঘড়ি কাজকর্মে মোহিত প্রতিটি জন। সুখ্যাতি উপর-য়ালার কান অবধি গেছে, তারাও খুশি—ই তিন তরুণ উপরওয়ালা, অসীম অরুণ র সমীর, একনজরে যারা পছন্দ করে সেছিল। শান্তা নামে এক অভিজ্ঞ পুরানো য়ে এর আগে এই চেয়ারে ছিল—লাইনে নকেরা নতুন হয়েও মিস সরকার তার নেক উপর দিয়ে যাচ্ছে। খাসা কাজকর্ম।

যতক্ষণ অফিস করছে, এমনি। অফিস রে বাড়িতে পা দেবার সংগে ংগই আবার ঘরের মেয়েটি! কাপড়-পেড় জামা-জুতো ছেড়ে ফেলে লঘরে গিয়ে দরজা দেবে। কালই তো বার এই সমস্ত পরে যাবে—জিনিসগুলো টি করে আলনায় তুলে রাখবে, সেইটুকু র সয় না। সাবান মেখে গায়ের মুখের ঠোঁটের রং ধুয়ে ফেলে সাদামাটা তাঁতের শাড়ি পরে যেন বাঁচে। এবারে ঘরের কাজ। কুসমিকে ঠেলে সরিয়ে : পান-টান সাজো গিয়ে কুসমি-দি, ডাকছেন, ওঘরে যাও। চায়ের জলটা সে তাড়ি উনুনে বসিয়ে দিল।

তরণের বড় শান্তি। এত গুণের মেয়ে না। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি ছোট ভাইয়ের দরদ, যে বোনের বিয়ে হয়ে গেছে তার স্নেহও সতত উদ্বেগ—এ যুগে দেখা যায় একটি। সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি কে একে কাঁধে তুলে নিয়েছে। তরঙ্গিণী ইই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, বাড়ির গিন্নি তে ঐটুকু মেয়েই এখন। সকলের সব তার সংগে। তারণ বলেন, দুধটা যেন মা, মিষ্টি একটু বেশিমাত্রায় পড়ে তাপস বলে, দুটো টাকা দে না ছোড়দি, আজ জব্বর খেলা আছে। কুসমি বলে, কি আনতে হবে বলো দিদিমণি। এক দৌড়ে বাজারটা সেরে আসি, ছিষ্টির কাজ ড়ে রয়েছে। তরঙ্গিণী বলেন, অমাবস্যা লেগেছে—ভাত খাবো না রে পুনি। এক-টো আটা বের করে দিস, কুসমি দুখানা টি করে দেবে। সংসার-খরচা তারই প্রায় নিস্ত। বাপের পেন্সনের টাকা ছুঁতে চায় বলে, তোমার আফিং-দুধে খরচা কোরো বা। ইচ্ছে হল, সন্দেশটা আশটা কিনে আনলে কোনদিন। এসবও আমার দেওয়া উচিত—রোজগার বাড়লে তাই করব। পেন্সনের পুরো টাকা তুমি তখন মা'র হাতে দও।

করুক না করুক, কানে শুনেও তৃপ্তি। একালে কে এমন দেখেছে? দেবী, দেবী, দেবী! পূর্ণিমার মাথায় হাত রেখে তারণ বলেন, মেয়ে হয়ে তুই যা করছিস, ছেলে ড় হয়ে এতদূর কখনো করবে না।

চুপ করে নেই পূর্ণিমা। বি-এর বইটই সব কিনেছে। অবসর পেলেই বই নিয়ে বসে। তার উপরে আর এক ব্যাপার—টাইপ-রাইটিং ইস্কুলে ঢুকে পড়েছে। অফিসে সারাদিন হাজিরা দিয়ে আবার এই নতুন খাটনি। খেটে খেটে এ মেয়ের যেন আশ মেটে না।

তারণ বলেন, টাইপ শেখবার কি হল রে? তোদের কাজে ওসব তো লাগে না।

রোজগার বাড়াতে হবে না? এই টাকায় চলে কখনো? টাইপের স্পীড ভালো হলে বিস্তর উন্নতি। চিরজীবন চাকরি করেছ, তোমায় কি বোঝাব আমি বাবা?

এক গাল হেসে তারণ বলেন, সে হয়ে যাবে, তোর অসাধ্য কিছুই নেই। কিন্তু বলছিলাম, নতুন চাকরিতে সবে তো ঢুকেছিস—এত তাড়া কিসের? সবুর কর, দু-চার মাস জুড়োতে দে। যাচ্ছে কোথায় টাইপ শেখা!

তরঙ্গিণীর কিন্তু ঘোরতর আপত্তি। সোজাসুজি রায় দিলেন: ছেড়ে দে, কোন দরকার নেই—অফিস থেকে সোজা তুই বাড়ি চলে আসবি।

পূর্ণিমা বলে, এ চাকরি গেলে সংগে সংগে যাতে অন্য চাকরি জুটে যায়, তারই উপায় করে রাখছি মা।

চাকরি যাবে কেন?

কদ্দিন আর! চেহারা চটকদার করে স্মার্ট হাসি হেসে মিষ্টি সুরে কথা বলি—ডিউটি আমার তাই। এ জিনিস যদ্দিন পারব, চাকরিটা থাকলেও থাকতে পারে। বয়স হয়ে গিয়ে যখন গাল তুবড়ে যাবে হাসি উৎকট দেখাবে চাকরি সংগে সংগে খতম। একটা দিনও দেরি করবে না। কিন্তু পেটের ক্ষিধে তখনো থাকবে মা। আখের ভেবে টাইপ শিখে রাখছি। শর্টহ্যান্ডটাও শিখে নেবো। রিসেপসনিস্টের থেকে তখন স্টেনোর চেয়ারে।

তরঙ্গিণী পুরো বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু যা ভাবছেন স্পষ্ট করে বলা যায় না মেয়ের কাছে। এই রোজগেরে মেয়ের কাছে। বলেন: তোর চাকরির অন্ন চিরকাল খাবো, তাই বুঝি ভেবেছিস? তাপসের পাশটা হতে যা দেরি, সে-ই খাওয়াবে। ও'র অফিসে গিয়ে পড়লে একটা-কিছু না দিয়ে পারবে না। তুই নিজের সংসারে চলে যাবি তখন।

পূর্ণিমা ঠাট্টা করে বলে, গাছে কাঁঠাল—ঠোঁটে তেল মেখে বসে আছ তুমি মা।

আচমকা তরঙ্গিণী আগুন হয়ে উঠলেন: খেতে দেবে না ছেলে? না দেয়, গলায় দড়ি দিয়ে সকল ভাবনা চুকিয়ে দেবো। তোকে কোন দায় ঠেকাতে হবে না। শুধু এই কটা বছর তুই ঠেকিয়ে দিয়ে যা।

সন্ধ্যা থেকে জোর দাবার আড্ডা। গভীর রাত্রি অবধি চলে। এরই মধ্যে কখন পূর্ণিমা বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে—কেটলি ভরে চা তৈরি করে হাজির। খেলা ভুলে তারণ সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, বুঝলে পূর্ণ-দা, মা দশভুজা নিজে মেয়ে হয়ে আমার ঘরে এসেছেন। কাজ করছে দশখানা হাতে—দুটো হাতে এতদূর হয় না। সকল দিকে নজর, সকলের উপর মমতা। বাড়ি এসেই রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধতে লেগেছে—তার মধ্যেও সকল হুঁশ রয়েছে। এই দেখ, চাইতে হয় নি চা কেমন এসে গেল। মা-জননী যতক্ষণ বাড়ি থাকে, যখন যেটি আবশ্যক আপনা-আপনি সামনে এসে পড়ে।

উল্লাসে বলে যাচ্ছেন। পূর্ণিমার কানে যায় কি না যায়—দুটো কাপে চা ঢেলে দুধ-চিনি মেশাচ্ছে। পূর্ণ মুখুজ্জে সহাস্যে ঘাড় দোলান: শিক্ষার সুফল! মেয়ে কলেজে দিতে চাচ্ছিলে না ভায়া, আমিই তখন জোর-জার করেছিলাম।

তারণ বলেন, তুমি কিন্তু পূর্ণদা অন্য লোভ দেখিয়েছিলে: কলেজে দিলে ঝট করে বিয়ে হয়ে যাবে। ঘটক আরও বলল, পাঠ্য বই কেনার দরকারই হবে না। আজেবাজে যা-হোক কিছু হাতে নিয়ে এক মাস দু মাস ঘোরাঘুরি করতেই কেল্লাফতে। হল কই?

পূর্ণ মুখুজ্জে দমেন না। গর্বভরে বলেন, বোঝ তবে স্ত্রী-শিক্ষার গুণ। শাঁখের করাত—এগোলে কাটবে, পিছোলেও কাটবে। বিয়ে লেগে যেত ভাল, না লাগল তো আরও ভাল। মেয়ে রোজগারে নেমে পড়েছে। মুনাফা সকল দিক। দেশসুদ্ধ তাই বুঝে কোমর বেঁধে লেগেছে—অলিতে-গলিতে মেয়ে-ইস্কুল, মেয়ে-কলেজ।

উনুনে কামাই যাচ্ছে, বুঝি মনে পড়ে গেল। দুই কাপ দুজনের সামনে দিয়ে নিজের ও কুসমির চা নিয়ে পূর্ণিমা ছুটল।

এক রবিবার সকালে অণিমা বাপের বাড়ি এল। বিশেষ করে রবিবার বেছে নিয়েছে—ছুটির দিনে বোনের অফিস নেই ভাইয়ের ইস্কুল নেই, ভাই-বোন, মা-বাপ সকলের সঙ্গে আমোদ করে পুরো দিনমানটা কাটাবে।

গরিব এখন তুলসীদাস, বড়বাজারের দোকান লিকুইডেশনে গেছে। স্বর্গীয় কর্তা বুদ্ধি করে লিমিটেড কোম্পানি করেছিলেন, দোকানের দেনায় তাই কাশীপুরের বাড়ি নিয়ে টানাটানি পড়ল না। নিজেরা উপর-তলায় উঠে গিয়ে নিচেরতলা ভাড়া দিয়েছে। তাই একমাত্র আয়, কষ্টেসৃষ্টে চলছে। এত বাবুগিরি বিলাসিতা ছিল। এখন নিতান্তই ছা-পোষা গৃহস্থ। যতদিন না তুলসীদাস একটা কিছু জোগাড় করছে, চলবে এমনি।

গরিব হয়ে তুলসীদাস ভাল হয়ে গেছে। সেই রুক্ষ মেজাজ নেই, অনুতাপ এসেছে বোধহয় মনে-মনে। হিড়িম্বাঠাকরুন ঘাড় থেকে নেমেছে—সুখের পায়রা ওরা, সুখের অভাব দেখলেই পালাবে। বাইরের কাজকর্মও নেই—বাড়ি থাকে তুলসীদাস প্রায় সর্বক্ষণ। বউকে নিয়ে বউয়ের আঁচল ধরে ঘোরে। বিয়ের পরে গোড়ায় গোড়ায় যেমন করত। এই এসেছে অণিমা বাপের বাড়ি, কথা আছে বিকালবেলা নিজে সে এসে নিয়ে যাবে। অণিমা বলে-ছিল, তুমিও চলো না। একা একা বাড়ি থেকে কি করবে? বাবা-মা বড় খুশি হবেন। তুলসী-

জান পালটা বলল, তার চেয়ে রঞ্জুকে রেখে যাও। একলা না থেকে দুজন হবো।

শেষ অবধি ঠিক হল, এদের মা-ছেলেকে নিয়ে আসবে তুলসীদাস গিয়ে, চা-টা খাবে ওখানে। এই তো অনেকখানি—স্বল্পপরিচিত খুব বেশীক্ষণ কাটাতে সংকোচ বোধ করে, বোঝে সেটা অণিমা। আগে তো ভাল ব্যবহার করেনি অণিমা সম্পর্কিত কারও সঙ্গে। সেই লজ্জা।

এক সময়ে অণিমা নিরিবিলি পূর্ণিমাকে ধরেছে : অফিসের ছুটি পাঁচটায়, বাড়ি ফিরলি তুই কখন?

এই রবিবারের দিনটা বেছে বাপের বাড়ি এসেছে শুধুই কি একসঙ্গে সকলে কাটাবে বলে, না তরঙ্গিণী কোন রকম কল টিপছেন পিছন থেকে? রবিবার বলে ধীরে-সুস্থে অনেকক্ষণ ধরে জেরা চালান যাচ্ছে।

অণিমা বলে, বাড়ি ফিরতে শুনি আটটা-নটা বেজে যায়। কি করিস অতক্ষণ?

পূর্ণিমা বলে, আরও একবার অমনি তো শুনেছিলি—বাড়ি আসতে সন্ধ্যা হয়ে যেত তখন। এবারে রাত্রি—আরো ঝানু হয়ে হয়ে উঠেছি কিনা এদ্দিনে। কান তোর খুব লম্বা কিন্তু দিদি। অতদূরে কাশীপুর থেকে কেমন সব শুনে ফেলিস।

মিথ্যে যখন নয়—আর একদিন-দুদিনের ব্যাপারও নয়, কেন শুনতে পাব না?

পূর্ণিমা বলে, অতক্ষণ ধরে কি করি, সেটাও কেন শুনে নিসনে? জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে কি জন্য?

শুনেছি বই কি। সবাই যেটুকু শুনেছে তার বাইরেও অনেক কিছু। সেই সমস্ত বলবি আজ আমায়। একটা কথাও চেপে রাখবি নে।

উঃ দিদি, কী কড়া নজর তোদের! কত-দিকে কত চর!

দু-হাত ঘুরিয়ে হতাশভাবে পূর্ণিমা বলে, কিছু চাপা রাখবার জো নেই তোদের কাছে। তোর কাছে না,

মায়ের কাছেও নয়। ভালবাসিস কিনা খুড়—বড়শি গেঁথে গুপ্ত খবর তুলে ফেলিস।

সেই চপল কণ্ঠ পূর্ণিমার, সেই রকম চৌটাপা হাসি। এমনি ধারা প্রশ্নের জবাবে আর একবার যেমনটি করেছিল। বলে, টাইপরাইটিং ক্লাস কতক্ষণেরই বা! তার পরেই মজা চলল। রাত করে ফিরি বলছিস—ছাড়েই না মোটে, কি করব। আমারও ইচ্ছে করে না ছেড়ে আসতে। নায়িকা হয়ে সেখানে কত মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনি—বাড়ি এলেই তো, পুনি এটার কি হবে, ওটা না হলে চলছে না তার—এই সমস্ত। নায়িকা তখন রান্নাঘরে ঢুকে জিরা-মরিচ বাটতে বসে গেলেন।

চোখ-মুখ নাচিয়ে পূর্ণিমা বলে যায়। অণিমা যাঃ যাঃ—করে, আর অপলক মুগ্ধ চোখ মেলে যেন অমৃতধারা শুষছে। বলে, যাঃ, বানিয়ে বলছিস তুই। অতসব বিশ্বাস হয় না।

পূর্ণিমা বলে, মরীয়া হয়ে লেগেছি দিদি। বিয়ে হয়ে তোর মতন ঘর-সংসার হবে। মা-মা করে বাচ্চা ঘুরঘুর করবে—কত লোভ আমার! বুড়িয়ে যাচ্ছি—তা বাবা বর না জুটিয়ে চাকরি জোটালেন একটা। তুই নিজে মজা করে কখনও ঝগড়া করিস বরের সঙ্গে কখনও গদগদ হস, আমার বেলাতেই যত বাগড়া। আমি তাই কারো ভরসায় না থেকে নিজে লেগে গেছি। এক-আধটা নয়, আধডজন বর এরই মধ্যে পিছন নিয়েছে।

যাঃ—

পূর্ণিমা নিরীহভাবে বলে, কেন, মা-ও তো জানেন।

মা জানবেন কেমন করে?

পূর্ণিমা জোর দিয়ে বলে, জানেন। সত্যি কথা বল্ দিকি, নইলে ছোট বোনের মরা-মুখ দেখবি, বলে নি তোকে, অত রাত অবধি পুনিটা কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে—টাইপ শেখে কতক্ষণই বা! মা বলে নি এমনি সব?

অণিমা হঠাৎ জবাব দিতে পারে না।

পূর্ণিমা বলছে, আমি জানি, আমি জানি। চাকরি-করা, বাইরে-ঘোরা মেয়েদের ব্যাপার যারা ঘরগৃহস্থালী ছেড়ে এক-পা বাইরে যায় না, তারাই বেশী করে জেনে বসে আছে। কী তারা বলাবলি করে, শোনা আছে আমার। মা যা বলেছেন হুবহু এই না হলেও মোটামুটি এই জিনিষ। বাড়ি ফিরে কড়া নাড়ি, মুখ কালো করে মা দরজা খুলে তক্ষুনি আবার গিয়ে শুয়ে পড়েন। বুঝতে কিছু বাকী থাকে না এর পর। দিন-রাত্রির মধ্যে মায়ের সঙ্গে সাকুল্যে পাঁচ-সাতটা কথা—নিতান্ত যা নইলে নয়। দোষ দিই নে—তালুকদার-বাড়ির বউ, ওঁর আমলে সর্বপ্রথম শহরে এলেন। শাশুড়ি দিদিশাশুড়ির মুখে বাড়ির মেয়েদের হালচাল অন্য রকম শুনেছেন। তোর মধ্যেও সেই জিনিষ দেখেছেন। সোমত্ত মেয়ে নিত্যিদিন রাত করে ফিরি, যত কৈফিয়তই দিই সন্দেহ তবু যায় না। সন্দেহের সঙ্গে মিশে রয়েছে আবার ভয়।

কৌতুক স্বরে শুরু করেছিল, বলতে-বলতে কণ্ঠ কটু হয়ে উঠল। বলে, ভয় হল সংসার চলবে কি করে। বাবার-মায়ের এই বয়সে যা-যা দরকার, উঁচু খরচ হয়। পেন্সেনের টাকা কটা তাতেই ফুঁকে যায়। প্রেম-ট্রেম করে বেড়াই—সেটা অপছন্দের বটে, কিন্তু প্রেম করতে করতে বিয়ে করে ঝুলে না পড়ি কারও গলায়! তা হলে তো ডাহা সর্বনাশ। দিদি, তুই অভয় দিয়ে দিস মাকে। ওঁদের ইচ্ছাই শিরোধার্য, বিয়ে করে বিপাকে ফেলব না। রাত করে ফিরি ওঁদের সংসারের ভবিষ্যৎ ভেবেই—এই চাকরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চাকরি যাতে পেতে পারি।

অণিমা ঝিম হয়ে শুনছিল। বলে, চাকরি যাবার এখন তো কিছু নয়, বড়ো তুই আজই হয়ে যাচ্ছিস নে। এ-ও সত্যি, সেদিনের অনেক আগেই তাপস মানুষ হয়ে দায়ভার কাঁধে নিয়ে নেবে। মায়ের কথা হল তাই—টাইপরাইটিং নিয়ে লেগে পড়বার এক্ষুনি কোন গরজ নেই। যাক না দু-চার বছর। তখন আর দরকারই থাকবে না একেবারে। ওঁদের সকলের সেই প্রত্যাশা।

পূর্ণিমা বলে, দু-চার বছর কি, দু-চার দিনও সবুর সইছে না আমার। টাইপ খানিকটাও যদি রপ্ত থাকত, ডিরেক্টরদের গিয়ে বলতাম, স্টেনোর কাজ দিন, স্টেনোর আমার ভিতরে চলে যাক।

বলে, মেয়েদের একালে শুধু গৃহস্থালী সামলেই চলবে না, পুরুষের একলা রোজগারে চলার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতা আছে যখন, কেনই বা পরাশ্রয়ী হয়ে থাকব? বাবা মোটামুটি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। পূর্ণজেঠাকে ধরে তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চাকরিটা তিনিই জুটিয়ে আনলেন। মায়ের অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মত, স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝামাঝি—চাকরি-বাকরি করবে মেয়ে, কিন্তু পুরুষ-ছেলের দিকে না তাকায়। অফিস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে বাড়ি এসে সদর-দরজায় খিল এঁটে দেবে। আর আমি হলাম—

থেমে গেল পূর্ণিমা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, বাইরে যেমনই দেখিস, মনে-মনে আমি হলাম পুরোদস্তুর সেকেলে। সেকালের তালুকদার-বাড়ির মেয়ে। কাজ-কারবারে কত লোকের অফিসে আনা-গোনা—মুখপাতে সকলে আমার কাছে আসবে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে, হাসবে, তাকিয়ে থাকবে, অকারণে দাঁড়াবে কিছুক্ষণ, ছল করে কথাবার্তা বাড়াবে। বুঝি আমি সমস্ত। ইচ্ছে করে, গায়ের উপর কালি-গোলা জলের বালতি ঢেলে দিতে পারতাম—সর্বাঙ্গ লোক-গুলোর কালি-কালি হয়ে যেত! কালীঘাটের পথে দেখেছিস দরজায় দরজায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে। আমি যেন তাদেরই একটি। বাঁধা মাস-মাইনেয় হাসি কথাবার্তা রূপ বয়স ঠিক-ঠাক ওদের খদ্দেরের কাছে বেচতে হয় নিত্যিদিন। পারছিনে আর দিদি, বড্ড ঘেন্না ঘিনঘিন করে।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

খাদ্যমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার এক কোণে সংবাদটি লুকিয়ে ছিল। হয়ত অনেকেরই নজরে পড়েনি। কিন্তু সংবাদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। সংবাদটি এই যে, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সফর করে ফিরে আসার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম্ মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। সংবাদে আরও বলা হয়েছে যে, সংসদের পাব্লিক একাউন্টস কমিটি সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং সংসদে এই নিয়ে যে সব আলোচনা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে দুজনের মধ্যে আলাপ হয়েছে।

ইতিমধ্যে রটে গেছে যে, শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—যদিও তিনি নিজে সেকথা স্বীকার করেননি। যদি সংবাদ সত্য হয় তাহলে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ দুই বৎসরের মধ্যে এই দ্বিতীয় বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়ে যেতে চাইছেন। এর আগে তিনি সরকারী ভাষা সংক্রান্ত নীতির প্রতিবাদে তখনকার প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন। সেদিন যদি তিনি ইস্তফা দিয়ে যেতেন তাহলে তিনি তাঁর পিছনে অনেক সমর্থক পেতেন; অন্ততঃ দক্ষিণ ভারতে তিনি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করতেন। কিন্তু আজ অবস্থার বদল হয়েছে এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীচিদম্বরম্ সুব্রহ্মণ্যম্ আজ সত্যি সত্যি দুঃসময়ে পড়েছেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দুর্বলতা হল মাদ্রাজের রাজনীতিতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ তাঁকে প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করেন। একজন ব্রাহ্মণ, অন্যজন অব্রাহ্মণ—এই দুই তামিল নেতার মধ্যে যে বিশেষ সদ্ভাব নেই, এটা গোপন কথা কিছু নয়। প্রকাশ্যে খাদ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করতে কংগ্রেস সভাপতি দ্বিধা করেন না। সারের কারখানা স্থাপনের জন্য বিদেশী শিল্পপতিদের বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত দেওয়ার প্রস্তাব উঠলে শ্রীকামরাজ সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিলেন সেটাই বড় দৃষ্টান্ত।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের আর একটা দোষ এই যে, তিনি ওজন করে কথা বলতে জানেন না। অনেক সময়ই তিনি অনাবশ্যকভাবে আঘাত দিয়ে কথা বলেন অথবা অকারণে বিতর্ক ডেকে আনেন। গত বৎসর তিনিই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন, "যদি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়েও পি-এল ৪৮০-র খাদ্য আনতে হয় আমরা তা আনব।" কয়েক বৎসর আগে এই শ্রীসুব্রহ্মণ্যমই মাদ্রাজের বিধান সভায় বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমাগমের যে-কথা বলা হয় সেটা গল্পকথা এবং "আমি এসব গল্পকথা জানি।" এই ধরনের হঠকারিতার দরুণ কংগ্রেস দলের মধ্যে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের বন্ধু-সংখ্যা সামান্যই। দলের মধ্যে তিনি প্রায় শ্রীকৃষ্ণ মেননের মতই নিঃসঙ্গ।

কিন্তু এইসব সত্ত্বেও শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম সম্প্রতি দিল্লীতে বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করছিলেন। তার প্রধান কারণ, তাঁর অন্য অনেক সহকর্মীর চেয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনেক বেশী আস্থাভাজন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর অল্প সংখ্যক ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাদের অন্যতম বলে খ্যাতি লাভ করেছেন।

শ্রী সি, সুব্রহ্মণাম

এই খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে—অথবা এই খ্যাতির কারণেই—শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ বেশ কতকটা অখ্যাতিও অর্জন করেছেন। পার্লামেন্টের বিরোধী পক্ষের ধারণা, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে ভারতবর্ষ যে ক্রমেই বেশী করে আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে তার একটা কারণ হচ্ছে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ ও তাঁর মত আরও কয়েকজনের পরামর্শ। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে শ্রীহীরেন মুখার্জি যাঁদের "থ্রি মাস্কেটিয়ার্স" বলে অভিহিত করেছিলেন তাঁদের একজন হচ্ছেন এই শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ (অন্য দুজন—শ্রীঅশোক মেহ্তা ও শ্রীশচীন চৌধুরী)। অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে কমিউনিস্টদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই ছিলেন এই তিনজন মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের এই রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা শুধু দলের বাইরেই নয়, দলের ভিতরেও তাঁর কিছু শত্রু সৃষ্টি করে থাকবে।

রাজনৈতিক জীবনের এই সন্ধিক্ষণেই শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের উপর এল নতুন আক্রমণ। সে-আক্রমণ সম্পূর্ণ অভাবিত মহল থেকে। সংসদের যে পাব্লিক একাউন্টস কমিটি এক সময়ে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলিতে এসপ্রেসো কফি মেশিন, ক্যামেরা এনলার্জার প্রভৃতি বানাবার সংবাদ ফাঁস করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মেননের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন করে তুলেছিলেন সেই পাব্লিক একাউন্টস কমিটিই এবার শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের দোষ ধরেছেন।

যে-ঘটনার জন্য পাব্লিক একাউন্টস কমিটি শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের সমালোচনা করেছেন সেই ঘটনা অবশ্য কয়েক বৎসরের পুরনো। সেটা ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসের কথা। শ্রীসুব্রহ্মণ্যম তখন ছিলেন ভারত সরকারের ইস্পাত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি ১৬ই নভেম্বর তারিখে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে আদেশ দিলেন, আমিনচাঁদ প্যারেলাল নামক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারী হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডের সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে। আমিনচাঁদ প্যারেলালের বিরুদ্ধে কতকগুলি নিয়মবিরুদ্ধ কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল। ১৯৬৩ সালের ২৮শে জুন তারিখে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ আর একটি আদেশ জারী করে জানিয়ে দিলেন যে, শুধু তাঁর দপ্তরই আমিনচাঁদ প্যারেলালের সঙ্গে কাজ-কারবার করবেন না। এক মাসের মধ্যেই ১৯৬৩ সালের ২৩শে জুলাই শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ তাঁর পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করে আমিনচাঁদ প্যারেলালের শাস্তির মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাঁর নতুন আদেশের তাৎপর্য এই যে, শুধুমাত্র ইস্পাত দপ্তরই আমিনচাঁদ প্যারেলালের সঙ্গে ব্যবসায়ের সম্পর্ক রাখবে না; কিন্তু ভারত সরকারের অন্যান্য দপ্তরের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

পাব্লিক একাউন্টস কমিটি তাঁদের ৫৫তম রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন—ঠিক কি কারণে শ্রীসুব্রহ্মণাম দাগ-মারা প্রতিষ্ঠান আমিনচাঁদ প্যারেলালের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস করেছিলেন সেটা স্পষ্ট হয়নি।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ প্রধানত দুটি কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এক, তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রীর (শ্রীরাজবাহাদুর) পরামর্শে তিনি আদেশ সংশোধন করেছিলেন। দুই, ১৯৬৩ সালের ২৮শে জুন তারিখের যে নোটটিকে তাঁর আদেশ বলে অভিহিত করা হচ্ছে সেটা ঠিক তাঁর আদেশ ছিল না, আদেশের "খসড়া" মাত্র ছিল। পাব্লিক একাউন্টস কমিটিতে ও

লোকসভায় জেরার সামনে তাঁর এই দুইটি কৈফিয়তের কোনটিই টেঁকে নি এবং ভুল তথ্য পেশ করার জন্য লোকসভায় দাঁড়িয়ে তাঁকে ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছে।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের শুনানী গ্রহণ করার পরও পাবলিক একাউন্টস কমিটি তাঁর একথা মেনে নিতে রাজী হননি যে, আমিনচাঁদ প্যারেলালের প্রতিনিধি ভবিষ্যতে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে আর একবার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন।

উপরন্তু, কমিটি বলেছেন, ১৯৬৩ সালের ২৮শে জুন থেকে ২৩শে জুলাইয়ের মধ্যে কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল যেগুলি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনাগুলি হচ্ছে এই যে, আমিনচাঁদ প্যারেলালের প্রতিনিধি শ্রী জিৎলাল ১৯৬৩ সালের ২০শে জুলাই তারিখে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে দেখা করেন এবং এই সাক্ষাৎকারের পর তাঁকে একটা চিঠি লেখেন।

কমিটি মনে করেন যে, মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম্ ও ব্যবসায়ী জিৎলালের মধ্যে এই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সরকারী আদেশ সংশোধনের সম্পর্ক থাকতে পারে।

এই ব্যাপারে লোকসভায় উত্তেজনা ও লোকসভার বাইরে যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে শুধু মুন্দ্রা সংক্রান্ত ঘটনা ও উড়িষ্যার সিরাজুদ্দিনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমারই তুলনা চলে। যদি গত কয়েকদিনে আমিনচাঁদ প্যারেলাল সম্পর্কে একটার পর একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ বা অভিযোগ না বেরোত তাহলে হয়ত ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না। কিন্তু ব্যাপারটা এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এর সব জট ছাড়াতে সময় লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যেসব খবর বেরিয়েছে সেগুলি হচ্ছে (১) পাবলিক একাউন্টস কমিটির ৫০তম রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৬০ সালে এই আমিনচাঁদ প্যারেলালের সঙ্গেই জড়িত একটি প্রতিষ্ঠানকে বিদেশ থেকে এক কোটি টাকার উপর স্টেনলেস স্টীল আমদানী করার জন্য "ভুল করে" আমদানী লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ভুল ধরা পড়ার পর দোষী ব্যক্তিদের সন্ধান না করে ইস্পাত দপ্তরের এখনকার সেক্রেটারী শ্রী এস ভূতলিঙ্গম সেই ভুল চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। (২) পাবলিক একাউণ্টস কমিটির ৫৫তম রিপোর্টে আছে যে, ১৯৬৩ সালের ২৮শে জুন শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ আমিনচাঁদ প্যারেলালের বিরুদ্ধে যে দণ্ডাদেশ দেন সেটা সরকারী দপ্তর থেকে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। (৩) লোকসভায় শ্রীহেম বড়ুয়া অভিযোগ করেছেন যে, আমিনচাঁদ প্যারেলালের কাছ থেকে শ্রীস্বরণ সিং টাকা নিয়েছেন। (শ্রীস্বরণ সিং ১৯৬০ সালে ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শ্রীবড়ুয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।) (৪) শ্রীমধুলিমায়ের মারফৎ কর্ণেল অমৃত সিং নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন যে, লোকসভার স্পীকার সর্দার হুকুম সিং যে আমিনচাঁদ প্যারেলালের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তার একটি নথি আদালতে আছে—যে-নথি আমিনচাঁদ প্যারেলালের অংশীদার শ্রীজিৎলাল একটি মামলা সম্পর্কে আদালতে পেশ করেছেন। (স্পীকার এই অভিযোগ লোকসভার অধিকার রক্ষা কমিটিতে পাঠিয়েছেন।) (৫) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের উপর নজর রাখার জন্য সংসদের যে কমিটি আছে সেই কমিটি তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশ করেছেন যে আমিনচাঁদ প্যারেলাল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনকে ইস্পাতের পাইপ সরবরাহ করেছিলেন; এই ধরনের পাইপ একমাত্র রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানাতেই তৈরী হয়। এই কারখানা থেকেই কেনা পাইপ আমিনচাঁদ প্যারেলাল প্রতিষ্ঠান অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনকে বিক্রী করেছিলেন, এবং বিক্রী করেছিলেন কারখানা কর্তৃপক্ষের নিজেদের দরের চেয়ে কমে। কমিটি তাঁদের রিপোর্টে আরও চাঞ্চল্যকর এই তথ্য দিয়েছেন যে, আমিনচাঁদ প্যারেলাল এবং অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের এই লেনদেনের সঙ্গে জড়িত হিন্দুস্থান স্টীলের একজন সেলস্ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তদন্তের পর তাঁর চাকরি গেলে তিনি আমিনচাঁদ প্যারেলালে চাকরি পান।

যদি এইসব সংবাদের অভিযোগের মধ্যে আংশিক সত্যতাও থাকে তাহলে এ বিষয়ে ভুল নেই যে, সরকারী মহলে আমিনচাঁদ প্যারেলালের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এই প্রভাব-প্রতিপত্তির

রহস্য যাই হোক না কেন, শ্রীসুব্রহ্মণ্যমই তার জন্য একমাত্র দায়ী একথা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু তাঁর নামই এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী করে উঠছে।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম অবশ্য একটা ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন। ভুল বিবৃতি দিয়ে সংসদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ থেকে লোকসভার স্পীকার ও রাজ্য সভার চেয়ারম্যান তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কিন্তু স্পীকার একথাও বলেছেন যে, এই ভুল বিবৃতি দেওয়ার দরুণ লোকসভার সদস্যরা যদি তাঁর পদত্যাগ দাবী করেন তাহলে তাঁর কিছু বলার নেই।

সুতরাং শ্রীসুব্রহ্মণ্যম একটা ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেও সহজে নিস্তার পাবেন বলে মনে হচ্ছে না। টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করার পর থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেস দলের ভিতরে-বাইরে যে-সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছে তার থেকে সামলে উঠতে হলে মন্ত্রিসভার কোন একজন সদস্যের উপর কোপ বসানর প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমান মুহূর্তে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমই সবচেয়ে সম্ভাব্য বলি বলে বোধ হচ্ছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

নতুন রপ্তানী নীতি

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াবার জন্যে সরকার এক নতুন পরিকল্পনা চালু করেছেন।

গত ১৬ আগস্ট সংসদে বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শা এক ঘোষণায় বলেছেন যে, ডি-ভ্যালুয়েশনের আগে রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ দেবার জন্যে আমদানীর অধিকার দান, ট্যাক্স ক্রেডিট প্রভৃতি যেসব ব্যবস্থা চালু ছিল, সেগুলি বাতিল করা হচ্ছে। তার জায়গায় কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বেলায়—যেগুলির রপ্তানীর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে—রপ্তানীকারককে সরাসরি অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হবে। সরকার মনে করেন, আগেকার ব্যবস্থার চাইতে নতুন ব্যবস্থা অনেক সহজ এবং রপ্তানীকারকদের অনেক বেশী উৎসাহ দেবে।

সাহায্যের পরিমাণ হবে ক্ষেত্র বিশেষে জাহাজে তোলার সময়ের রপ্তানী মূল্যের শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ। আপাততঃ ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদি, ইস্পাতের স্ক্র্যাপ, বিভিন্ন ধরনের ইস্পাত দ্রব্য, পশমের কার্পেট ও চিনির ক্ষেত্রেই এই পরিকল্পনা চালু করা হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শিল্পদ্রব্যকেও এর আওতায় আনা হবে।

এই সাহায্য ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যের দাম ও আন্তর্জাতিক দামের মধ্যে পার্থক্য কতখানি কমাবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে ব্যবসায়ী মহল এই নতুন পরিকল্পনাকে স্বাগতই জানিয়েছে।

ডি-ভ্যালুয়েশনের সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে রপ্তানী শিল্পগুলিকে অবাধে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর সুযোগ দিয়ে সরকার যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, নতুন সাহায্য পরিকল্পনা তাকে আরও অনুকূল করতে সাহায্য করবে। এই দুটি ব্যবস্থা মিলে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের দেহে নতুন রক্ত সঞ্চার করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাকে চালু রাখতে গিয়ে সরকারের যদিও ৩০ কোটি টাকা লোকসান হবে, তবু এই পরিকল্পনাটি তাঁরা হাতে নিয়েছেন, কেননা আশা আছে এর দ্বারা রপ্তানীর আয় অন্ততঃ আরো ২০০ কোটি টাকা বাড়ানো যাবে।

রপ্তানী বাড়ানোর জন্যে সরকারের উদ্বেগ অস্বাভাবিক কিছু নয়। রপ্তানী আশানুরূপ বাড়ছিল না বলেই টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য হ্রাস করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রপ্তানী বাণিজ্য আশানুযায়ী চাঙ্গা হয়নি। বস্তুত, এখন যে অর্থসাহায্য দিয়ে রপ্তানীকে সমর্থন দিতে হচ্ছে তা থেকেই এই কথা প্রমাণ হচ্ছে। গত জুনের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেব থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় (স্মরণযোগ্য যে, ডি-ভ্যালুয়েশন ঘোষিত হয়েছিল ৫ জুন)। ঐ মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। সে তুলনায় ১৯৬৫ সালের জুন মাসে ভারত ৬৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকার জিনিস রপ্তানী করেছিল। কিন্তু যেটা আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ তা এই যে, গত জুনের ঠিক আগের মাসগুলিতেও রপ্তানীর পরিমাণ কখনো এত কম ছিল না। অপর পক্ষে জুনের আমদানীর হিসেব ছিল ১২০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, এবং ঠিক আগের মাসগুলিতে আর কখনো এত বেশী টাকার আমদানী করা হয়নি।

খুবই সম্ভব যে, ডি-ভ্যালুয়েশনের আগেকার কনট্রাক্ট এবং টাকায় লেনদেনকারী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের কি হবে সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তার দরুণই জুনের রপ্তানীর পরিমাণ আশানুরূপ বাড়েনি। কিন্তু এ কথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রপ্তানী যে হারে বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল সেই হারে না-ও বাড়তে পারে। নতুন রপ্তানী নীতির ভেতর দিয়েই সেকথার স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে।

অথচ সরকার চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানীর লক্ষ্য স্থির করেছেন ৮,০০০ কোটি টাকা (ডি-ভ্যালুয়েশনের আগেকার দামে ৫,০০০ কোটি টাকা)। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে বছরে ১,৬০০ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানী করতে হবে। সেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালে আমাদের রপ্তানীর মূল্য ছিল মাত্র ৮০৫ কোটি টাকা। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের জন্যে যদি রপ্তানীর পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়ানো না যায় তাহলে পরিকল্পনার কাজ গুরুতররূপে ব্যাহত হবে। হবে।

এরই সঙ্গে যদি লক্ষ্য করা যায় যে, ডি-ভ্যালুয়েশনের পর ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ৮৪ কোটি টাকা কমে গেছে, অথচ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায় ১৯৬৫-৬৬ সালের ১৮৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ৩২৬ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে, তাহলেই আমরা রপ্তানীবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব।

সরকারের নতুন রপ্তানী নীতি সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে এই নীতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। রপ্তানীর যতটুকু ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ সাহায্যের নীতি প্রয়োগ করা হবে তা মোট রপ্তানীর মাত্র ২৫ শতাংশ। সরকার মনে করেন যে, এই ২৫ শতাংশ রপ্তানীরই বিশেষ সমর্থন প্রয়োজন। বাকী ৭৫ শতাংশ রপ্তানীর মধ্যে ২৫ শতাংশ ডি-ভ্যালুয়েশনের সুযোগ প্রয়োজন অনুযায়ীই গ্রহণ করতে পেরেছে, কাজেই সাহায্যের কোন দরকার নেই; আর ৫০ শতাংশ রপ্তানীর ওপর (এর মধ্যে ঐতিহ্যগত রপ্তানী দ্রব্যাদি রয়েছে) ডি-ভ্যালুয়েশনের সুফল এত বেশী পড়েছে যে, সেক্ষেত্রে ইউনিট-পিছু আয়কে রক্ষা করার জন্যে রপ্তানী কর বসাতে হয়েছে, সুতরাং সাহায্যের প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু সরকারের এই যুক্তি আসলে কতখানি টিকবে তা বলা মুস্কিল। কারণ সরকার রপ্তানী কর বসিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এমনকি ঐতিহ্যগত রপ্তানীও ডি-ভ্যালুয়েশনের পর আশানুরূপ বেড়েছে বা বাড়তে পারে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। রপ্তানী কর এর একটা প্রধান কারণ হলেও আরো অনেক কারণ আছে যে জন্যে ভারত ঐতিহ্যগত রপ্তানীর ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারছে না। সরকার অবশ্য পরোক্ষ অনেকভাবে ঐতিহ্যগত রপ্তানী-শিল্পগুলিকে সাহায্যের চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু তার বাইরেও হয়ত প্রত্যক্ষ রপ্তানী সাহায্যের দরকার হতে পারে। ভারত সরকার তাঁদের নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় এই কথাটাও মনে রাখবেন বলে আমরা আশা করি।

(২৯)

আগেই বলেছি যে, বম্বের সাগর মুভিটোনের সঙ্গে একটা মোটামুটি চুক্তি হয়েছিল একখানি দোভাষী ছবি (হিন্দী ও বাংলা) করবার জন্যে। চুক্তিটি অবশ্য কার্যকরী হবে গল্প মনোনয়নের পর।

সুতরাং ঠিক করেছিলাম যে, জানুয়ারী মাসে আর কোন 'শো' নয়—মন্মথর সঙ্গে বসে গল্পটি ঠিক করব এবং পুরোপুরি বিশ্রাম নেব।

কিন্তু বিশ্রাম চাইলেই কি বিশ্রাম পাওয়া যায়?

একদিন আমাদের এক পুরোন বন্ধু কিশ্ নৌরজী এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তার ডাকনাম ছিল 'কিশ' এবং সকলের কাছে সে কিশ নৌরজী নামেই পরিচিত। 'কিশ' ছিল বিখ্যাত দেশনেতা দাদাভাই নৌরজীর পৌত্র এবং জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর একজন খুব উচ্চপদস্থ

চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাট; পাশেই ফার্স্ট এম্পায়ার।

কর্মচারী। 'কিশ'-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় কলকাতায় মাণেক ও তার স্ত্রী জেরু পাওয়ালার মাধ্যমে। মাণেক ও জেরু আমাদের সি এ পি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। জেরু ও তার বোন সুনু সি এ পি'র ব্যালেতে অংশগ্রহণ করত। মাণেক পাওয়ালাও টাটা কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, 'কিশ' নৌরজী এসে জামসেদপুরে আমাদের 'শো' করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে বসল। 'কিশ' প্রায়ই কলকাতায় আসত এবং সি এ পি'র বেশীর ভাগ শো-ই সে দেখেছে। তার একান্ত ইচ্ছে যে, জামসেদপুরে আমরা "ওমরের স্বপ্নকথা" ও "বিদ্যুৎপর্ণা" মঞ্চস্থ করি। সে আমাদের এও জানাল যে, আমাদের কোন কিছু ভাবতে হবে না। হাউস বুক করা, আমাদের দলের থাকা, খাওয়া—সমস্ত বন্দোবস্ত সে করে দেবে। এমনকি টিকিট বিক্রির বিষয়ও আমাদের ভাবতে হবে না—কারণ শোর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদেরই। আমরা শুধু যাব, অভিনয় করব এবং একটা মোটারকম থোক টাকা পাব।

প্রস্তাবটি লোভনীয় সন্দেহ নেই। তবু আমি 'কিশ'কে বললাম যে, গত দু' মাস ক্রমাগত 'শো' করে করে, ঘোরাঘুরি এবং পরিশ্রমে আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সেইজন্যে আমরা জানুয়ারী মাসটা পুরো বিশ্রাম চাই।

সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার যুক্তি হল: কলকাতায় থেকে কি কখনও বিশ্রাম করা যায়? কোন 'শো' বা অন্য কোন কাজ-

মধু বসু
১৯৩৮ সালে গৃহীত একটি আলোকচিত্র

কর্ম না করলেও ফারপো, লেক ক্লাব এবং রাত্রে ৩০০ ক্লাব—এসবের আকর্ষণ কাটিয়ে কি কখনও বিশ্রাম হয়? তারচেয়ে জামসেদপুরে চল, সেখানে বিশ্রামকে বিশ্রামও হবে আর তার থেকে বড় কথা তোমাদের একটা চেঞ্জও হবে—যেটা তোমাদের খুব দরকার। আর সেই সঙ্গে কিছু ভাল অর্থাগমও হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত 'কিশ'-এর অনুরোধ এড়ান গেল না। ঠিক হল জানুয়ারীর মাঝামাঝি আমরা জামসেদপুরে যাব। ইতিমধ্যে মিঃ হেমাদ ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে লাহোর ও দিল্লীতে 'সাধনা ও তার ব্যালে'র 'শো'র বন্দোবস্ত পাকাপাকি করে ফেলেছে।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি সদলবলে জামসেদপুরে গেলাম, সেখানে 'মিলনী হাউসে' আমরা শো করলাম, "ওমরের স্বপ্নকথা" ও "বিদ্যুৎপর্ণা"। স্যার আর্দেশীর দালাল এবং তাঁর পরিবার, টাটার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কীনান ও তাঁর পরিবার, মিঃ জাহাঙ্গীর গান্ধী, মিঃ কে এম ম্যাডান প্রভৃতি টাটা কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

অভিনয় করার কথা ছিল দু দিন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন টিকিট না পেয়ে এত লোক ফিরে গিয়েছিল যে, আর একদিন শো বাড়াতে হল।

মিঃ জাহাঙ্গীর গান্ধী তাঁর বাড়ীতে আমাদের এক ভোজ দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন।

আসবার সময় 'কিশ'কে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম: তুমি ঠিকই বলেছিলে 'কিশ'—ভাল চেঞ্জও হল আর সেই সঙ্গে কিছু রোজগারও হল।

কলকাতায় ফিরে এসে উত্তরভারত সফরের ব্যবস্থা শুরু হল। জানুয়ারীর শেষদিকেই হেমন্তকে পাঠিয়ে দিলাম লাহোর—পার্বলিসিটির জিনিসপত্র নিয়ে।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা সদলবলে লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। প্রায় ২৬ জন লোক নিয়ে এই দল। আমি ও সাধনা ছাড়া দলে ছিল তিমিরবরণ ও তার যন্ত্রীরা, মাধব মেনন ও অন্যান্য ছেলে ও মেয়ে নৃত্যশিল্পীরা, প্রোডাকশন ম্যানেজার, সহকারী, মঞ্চ-ব্যবস্থাপক প্রভৃতি।

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ থেকে লাহোরের প্লাজা সিনেমায় সি এ পি'র শো শুরু হল "সাধনা বসু ও তার ব্যালে" নাম দিয়ে। অর্থাৎ এ প্রোগ্রামে শুধু নৃত্যই থাকবে—কোন নাটকাভিনয় থাকবে না। প্লাজা সিনেমায় চার দিন শো হল। প্রত্যেকদিন অতিরিক্ত সীটের বন্দোবস্ত করেও অনেক লোক ফিরে গেল টিকিট না পেয়ে। আমাদের চার দিন শো-র পর প্লাজা সিনেমায় ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা আগের থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল—সুতরাং লাহোরের রিগ্যাল সিনেমায় আরও তিন দিন এই প্রোগ্রাম চলল। এর পর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে হল দিল্লীতে, এখানে রিগ্যাল সিনেমায় আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হল ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে চার দিনের জন্য।

লাহোর এবং দিল্লী দু জায়গাতেই হল যথারীতি অভাবিত সাফল্য।

ক-একটি নামকরা পত্রিকা যা বলেছিলেন তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি :—

"......The repeated applause which greeted the outstanding items in the programme testified to Lahore's appreciation of the art of Sadhona Bose and the Calcutta Art Players...... It is really a work of art......"

"The Tribune"
Lahore. 9.2.39.

"......numbers in Sadhona Bose's Ballet are provided momemnts of escape from reality into the world of poetry......"

"Civil and Military Gazette,"
Lahore. 10.2.37.

"....Sadhona Bose's ballet now at the Regal Theatre, is the most lovely that has been seen in Delhi since Pavlova visited us; in colour, composition and movement it is the equal of Russian ballet at its best........ Sadhona's dancing is a dream of beauty........"

"Statesman"
Delhi, 16.2.1939.

"......Of the dancers who had come to Delhi in recent years, Sadhona Bose is perhaps the greatest and the most beautiful exponent of the art....The visiting company, Calcutta Art Players, under the leadership of Mr. Modhu Bose, the wellknown stage and film director and sponsor of the C.A.P., have earned a distinctive name for themselves as the most advanced and unique stage organisation in India today."

"Hindusthan Times",
Delhi, 15.2.1939.

আমাদের এই অভাবিত সাফল্যে সকলেরই মন আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু এই এত আনন্দের মাঝেও শেষদিন দিল্লীতে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যেটাতে সকলের মনে একটা নিরানন্দের ছায়াপাত হল এবং এর জন্যে বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতি আমায় মুখ বুজে সয়ে যেতে হল। ব্যাপারটা এই রকম।

দিল্লীতে প্রত্যেক দিন 'শো'-র পরে সেদিনের টিকিট বিক্রির আমাদের অংশ আমি নিয়ে নিতাম। শেষদিন 'শো'-র পরেই আমাদের ট্রেন ধরতে হবে—শো-র সমাপ্তির পর ট্রেন ছাড়ার মধ্যে সময় থাকবে অল্প। কিন্তু সে-রাত্রেই আমাদের রওনা হতে হবে বলে হোটেলেও জানিয়ে দিলাম। আমি ও সাধনা থাকতাম ইম্পিরিয়াল হোটেলে আর দলের অন্য সকলে থাকতো কনোট প্লেসের ইন্ডিয়া হোটেলে। ইন্টারভ্যালের সময় রিগ্যালের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে আমাদের শেয়ারের টাকাটা মিটিয়ে নিয়ে হেমন্তকে লাগেজ এবং অন্যান্য খরচের জন্য কিছু টাকা দিলাম। বাকি টাকাগুলো ওয়েস্টকোটের বুক পকেটে রেখেছিলাম। সাধারণত টাকা-পয়সা আমি ট্রাউজারের পকেটেই রেখে থাকি, কিন্তু সেদিন কেন জানি, অন্যমনস্কভাবে ওয়েস্ট-কোটের বুকপকেটে রেখেছিলাম।

এদিকে শো যত শেষ হয়ে আসছে, আমিও আমাদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার বিষয়ে লোকজনদের নির্দেশ দিচ্ছি। শেষে 'শো' শেষ হবার পর হোটেলে ফিরবার সময় বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেট শূন্য, অর্থাৎ টাকাটি কারুর দয়ায় উধাও হয়ে হয়ে গেছে। আমি তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ—টাকা বলে জিনিস, ওকি আর খুঁজলে পাওয়া যায়। তার ওপর মোটা টাকা অর্থাৎ শেষদিন বলে সেদিনের টিকিট বিক্রিও হয়েছিল আশাতীত, তার সম্পূর্ণ শেয়ার। শুধু হেমন্তকে যে-কটা টাকা দিয়েছিলাম সেটা ছাড়া।

মহামুস্কিলে পড়ে গেলাম। টিকিট কেনা এবং ট্রেনে রিজারভেশনও হয়ে গেছে—হোটেলে বলে দিয়েছি আজ রাত্রেই আমরা চলে যাব, এখন সব প্রোগ্রাম বদলাই কি করে!

যাই হোক অর্থশোকের ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় গেল। কিন্তু দমবার ছেলে আমি নই। আমি ইণ্ডিয়া হোটেলের ম্যানেজারকে জানতাম, তাঁকে ফোন করে বললাম : আমি এখুনি টাকাকড়ি নিয়ে গিয়ে সমস্ত বিল মিটিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমার লোকজনদের ছেড়ে দাও।

ম্যানেজার লোক ভাল, সে আমার কথায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল।

ইম্পিরিয়াল হোটেলে আমি আমার ভৃত্য চামানকে পাঠিয়ে বললাম যে, আমার সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধেছেঁদে অফিসঘরের কাছে লাউঞ্জে ঠিক করে রাখতে। আমি যেন গিয়েই বেরুতে পারি। দলের সমস্ত লোকজনদের বলে দিলাম তারা যেন ইণ্ডিয়া হোটেলে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে স্টেশনে চলে যায়। সেখানে হেমন্ত থাকবে এবং সে সব ব্যবস্থা করবে। তিমির ও টুকুলকে বলে দিলাম তারা যেন সাধনাকে নিয়ে ট্রেনে গিয়ে অপেক্ষা করে—সঙ্গে সাধনার আয়া এবং অন্য চাকরটি চামানের ভাই আসগারও যেন যায়। আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হবো।

লোকজনদের তো সব পাঠিয়ে দিলাম—আমি গিয়ে রিগ্যালের ম্যানেজারকে বললাম এই দুঃসংবাদ। ম্যানেজার তো বললেন : এক্ষুণি পুলিশে খবর দিচ্ছি—এ যে আমার হাউসের দারুণ বদনাম মিঃ বোস। আমি এখুনি হাউস বন্ধ করে লোকজনদের আটকে রেখে সার্চ করাচ্ছি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম : না না, ওসব হাঙ্গামার দরকার নেই। পুলিশে খবর দিলে আর আমার আজ যাওয়া হয় না। কলকাতায় আমায় আজ ফিরতেই হবে। আমার বোকামির জন্যেই টাকাটা গেছে—তা নিয়ে ভেবে আর এখন কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে আমাকে কিছু টাকা দিন, হোটেলের বিলগুলো মিটিয়ে দিই, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়েই আপনার টাকা পাঠিয়ে দেব।

—কিন্তু অনেকগুলো টাকা যে! একবার ফিরে পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করবেন না মিঃ বোস? বললেন ম্যানেজার খুব দুঃখিতভাবে।

আমি বললাম : তার আর সময় নেই। আপনি আর দেরী করলে হয়ত ট্রেনটাই ফেল করবো।

ম্যানেজার আর কিছু না বলে টাকাটা দিয়ে দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে

একটি বিশেষ নৃত্যভঙ্গিমায় সাধনা বসু

ইণ্ডিয়া হোটেল এবং ইম্পিরিয়াল হোটেলের বিল মিটিয়ে যখন স্টেশনে পেঁছিলাম, তখন ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট-দুয়েক বাকি আছে।

সাধনা তো ব্যস্ত হয়ে জিনিসপত্র কামরা থেকে নামাবার যোগাড় করছে। আমায় দেখে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। হেমন্ত হেসে বললে : মিসেস বোস এতো নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে, জিনিস-পত্র সব আর একটু হলেই নামিয়ে ফেলতেন আর কি। আমি যত বলি টিকিট কাটা হয়েছে—মিঃ বোস না হয় পরেই আসবেন। যাক, আপনি এসে পড়েছেন এবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আমিও জিনিসপত্র নিয়ে যেই 'কুপে'তে উঠলাম, অমনি ট্রেন ছেড়ে দিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। আমাদের এই সাফল্যে মা খুবই খুশি হলেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব যে-কথা বলেছিলেন, তিনিও সেই কথাই বললেন অর্থাৎ যদি আমাদের নিজস্ব একটা স্টেজ থাকত!

এখনও পর্যন্ত বোম্বাই যাবার খবরটা মার কাছে ভাঙতে পারিনি। যখনই বলব-বলব মনে করেছি, তখনই মার মুখের দিকে চেয়ে আর বলতে পারিনি। ভেবেছি যে, পরে বলব। এইভাবে ক্রমশ দিন চলে যেতে লাগল এবং বম্বে যাবার সময়ও ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। এদিকে মন্মথও একটি গল্পের কাঠামো তৈরি করে ফেলল।

সুতরাং আর তো না বললে চলে না—একদিন বোম্বাই-এর নতুন কণ্ট্রাক্টের বিষয় মাকে বলতেই হল। আর এও তাঁকে বললাম যে, বোম্বাই যাবার আমাদের প্রধান আকর্ষণ সেখানে একখানি দোভাষী ছবি (বাংলা ও হিন্দী) করবার প্রস্তাব পেয়েছি। বাংলা-দেশে 'আলিবাবা' ও 'অভিনয়' করে আমরা যথেষ্ট সুনাম পেয়েছি, এখন যদি একটা হিন্দী ছবি আমাদের 'হিট' হয়, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে সুনাম ত' পাবই এবং টাকার দিক থেকেও অনেক বেশি রোজগার করতে পারব।

আমাকে ও সাধনাকে তিনি আশীর্বাদ করে বললেন : ভগবান করুন তোমাদের আরও নাম হোক, জীবনে আরও উন্নতি হোক তোমাদের। কিন্তু মুখে তিনি আনন্দ প্রকাশ এবং আশীর্বাদ করলেও আমি বেশ আন্দাজ করতে পারলুম, মার মনের অবস্থা। আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তাঁর মনটি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে আমি মন্মথকে সংগে করে নিয়ে বোম্বাই রওনা হলুম গল্পটিকে মনোনয়ন করবার জন্যে।

বোম্বেতে আমি আর মন্মথ গিয়ে উঠলাম ম্যাজেস্টিক হোটেলে। হোটেলে উঠেই আমি সুরেন্দ্র দেশাই-এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। সুরেন্দ্র বোম্বাই-এ বুলবুল নামে পরিচিত। টেলিফোনে আমার খবর পেয়েই বুলবুল তার বাড়িতে আমাকে ও মন্মথকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করল।

যথাসময়ে বুলবুলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেই সেখানে তার বাবা শ্রীচিমনলাল দেশাই-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। চিমনভাই তখন সাগর মুভিটোনের মালিক। শ্রীচিমনভাই-এর ছোট ভাই শ্রীঈশ্বরভাই দেশাই-এর সঙ্গেও আলাপ হল। শ্রীচিমনভাই আমাদের বোম্বের শো দেখেছিলেন এবং তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সেই সম্বন্ধে অনেক কথা হল। খুব চমৎকার মানুষ এই চিমনভাই—অতবড় সাগর মুভিটোন কোম্পানীর মালিক কিন্তু অত্যন্ত নিরহংকারী। তাঁর এই সহজ সরল ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগল।

যাক, খাওয়া-দাওয়া হল—একেবারে পুরোপুরি নিরামিষ গুজরাটি স্টাইলে। চিমনভাই ঠাট্টা করে বললেন ঃ তোমরা বাঙালী, মাছ না হলে তো তোমাদের খাওয়াই হয় না। আমার তো মনে হয় তোমাদের পেটই ভরল না।

আমি কিন্তু এই প্রথম গুজরাটি খানা খাচ্ছি—আর বলতে বাধা নেই—খেতে ভালই লাগল এবং বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। খাওয়ার পর সেদিন চলে গেলাম, পরদিন একটা সময় ঠিক করে—যখন গল্পটির কাঠামো পড়ে শোনানো হবে। গল্পটির নাম হল 'কুমকুম দি ড্যান্সার'।

পরদিন গল্পের কাঠামো শোনানো হল —সঙ্গে সঙ্গেই ওঁদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। চিমনভাই তাঁর সলিসিটরদের নির্দেশ দিলেন চুক্তিপত্র তৈরি করতে। সবই বেশ সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ রৌদ্র-ঝলমল আকাশে একখন্ড কালো মেঘ দেখা দিল।

যেদিন চুক্তিপত্রে সই হবে তার ঠিক একদিন আগে বুলবুল আমাকে টেলিফোন করে বলল—বাবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বিশেষ দরকার আছে।

আমি যেতেই চিমনভাই বললেন ঃ শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স থেকে আমরা একটা চিঠি পেয়েছি যে, আপনি ও মিসেস বোস নাকি পরের ছবির জন্যে তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ! এক্ষেত্রে আপনারা যদি অন্য কোন কণ্ট্রাক্ট সই করেন, তবে তো সেটা বে-আইনী হবে।

শুনে আমি তো বেশ বিব্রত বোধ করলাম। যদিও কলকাতা থেকে যখন রওনা হই, তখন এইরকম যে একটা কিছু ঘটতে পারে—এই ধরনের একটা সন্দেহ মনে হয়েছিল। তাই 'অভিনয়'র সময়ে ভারতলক্ষ্মীর সঙ্গে যে-কণ্ট্রাক্ট হয়েছিল, সেটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

যাই হোক, বেশ একটু বিপদেই পড়লাম। বোম্বেতে তো কাউকেই চিনি না যার কাছে গিয়ে কোন পরামর্শ করা যেতে পারে। আর এ-সব ক্ষেত্রে একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াটাই বিধেয়। কি করা যায় এখন—! এ-বিষয়ে ভেবে যখন কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না, তখন হঠাৎ মনে পড়ল সিসিলির কথা। সিসিলি হল বোম্বায়ে রয়টারের প্রতিনিধি এ সি চ্যাটার্জির মেয়ে। আসল নাম তার সুশীলা —কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রগতির জৌলুস মেখে দাঁড়িয়েছে সিসিলি। অনেক বছর আগে সিসিলির সঙ্গে কলকাতায় আমার আলাপ হয়েছিল। সিসিলির স্বামী হচ্ছেন বর্তমান এটর্নী জেনারেল মিঃ সি কে দাফতারী, তখন ব্যারিস্টার হিসেবে বোম্বেতে বেশ নাম করেছেন। সিসিলিকেই তখন অকূলের কূল বলে মনে হল—ফোন করলাম তাকে। টেলিফোনে আমার গলার আওয়াজ শুনে সিসিলি আমাকে সেইদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করল।

গেলাম ডিনারে। সিসিলি তার স্বামী মিঃ দাফতারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। চমৎকার লোক এই মিঃ দাফতারী, অদ্ভুত ভালো ব্যবহার। সত্যিই আমার খুব ভালো লাগল ভদ্রলোককে। ডিনারের পর আমি ওঁকে বললাম আমার এই বিপদের কথা।

তিনি বললেন ঃ আপনি কাল সকালে আমার চেম্বারে আসুন ভারতলক্ষ্মীর কণ্ট্রাক্টটা নিয়ে। আমি কণ্ট্রাক্টটা পড়ে দেখি —তারপর এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

পরদিন চেম্বারে যেতে মিঃ দাফতারী কণ্ট্রাক্টটি পড়ে বললেন ঃ আমার মতে এই কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী আপনার বা মিসেস বোসের সঙ্গে ভারতলক্ষ্মীর কোন আইনগত বাধা-বাধকতা নেই। যাতে সাগর মুভিটোনের সঙ্গে আপনাদের কণ্ট্রাক্ট সই না হয় সেই জন্যে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে এই চিঠি দিয়েছে। তবুও আমি একবার এই কণ্ট্রাক্টটি স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে দেখিয়ে তাঁর মতামত আপনাকে জানাব।

স্যার চিমনলাল শীতলবাদ তখন বোম্বায়ের অ্যাডভোকেট জেনারেল। তাঁর মতামত পাওয়া তো খুব সৌভাগ্যের কথা। তাঁর পরামর্শ ও মতামতের থেকে নির্ভরযোগ্য আর কি হতে পারে? আমি মিঃ দাফতারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

মিঃ দাফতারীর সঙ্গে যা আলোচনা হয়েছিল, সব এসে বললাম চিমনভাই দেশাইকে। তিনিও সব শুনে বললেন ঃ মিঃ দাফতারী এখন বোম্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। মিঃ দাফতারীর সঙ্গে আমিও একমত। আমারও ঠিক ঐ কথাই মনে হচ্ছে, যাতে এই কণ্ট্রাক্টটা সই না হয়, সেইজন্যই ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স এইরকম একটা অ্যাটর্নীর চিঠি দিয়েছে। আচ্ছা, স্যার শীতলবাদ কি বলেন শোনা যাক।

মিঃ দাফতারী বলেছিলেন দুদিন পরে ফোন করে খবর নিতে। দুদিন পরে তাঁকে ফোন করতেই তিনি বললেন ঃ আজ চিমনলাল শীতলবাদের চেম্বারে সন্ধ্যার সময় আসুন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। আমি আপনাকে যা বলেছি, তিনিও আমার সঙ্গে একমত। আপনি আপনার প্রোডিউসার মিঃ দেশাইকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। স্যার শীতলবাদের মতামতটা তিনি নিজের কানে শুনে আশ্বস্ত হতে পারবেন।

সেইমত আমি চিমনভাইকে সঙ্গে করে স্যার চিমনলাল শীতলবাদের চেম্বারে গেলাম সন্ধ্যার সময়। স্যার শীতলবাদ স্পষ্টই বললেন যে, ভারতলক্ষ্মীর যে কণ্ট্রাক্ট আছে, তাতে অন্য প্রোডিউসারের সঙ্গে কোন ছবির কণ্ট্রাক্ট করলে ভারত-লক্ষ্মী কিছুই করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে আমার ও সাধনার যে পরবর্তী ছবি করতেই হবে এমন কোন আইনগত বাধা-বাধকতা নেই।

এইবার চিমনভাই আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার ও মন্মথের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হয়ে গেল। আমরা কলকাতা চলে এলাম—কথা হয়ে গেল যে, আমরা সকলে মার্চের মাঝামাঝি সময়ে বোম্বাই চলে আসব।

* * *

কলকাতা ফিরে এসেই বোম্বে যাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। কি জানি কেন ঠিক করে বসলাম যে, আমাদের যতকিছু আসবাবপত্র আছে, সবই বোম্বে নিয়ে যাব। এতে জ্ঞানাংকুর, জর্জ এরা সবাই বলতে লাগল ঃ সব জিনিসপত্র নিয়ে যেও না। অন্তত চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটটা ছেড়ো না। বোম্বেতে তো আর চিরদিনের জন্য যাচ্ছ না। আবার যখন ফিরে আসবে তখন আর ও-রকম ফ্ল্যাট পাওয়া মুস্কিল হবে। ফার্স্ট এম্পায়ারের পাশে এমন কলকাতার মাঝখানে সবচেয়ে সেরা জায়গায় চারখানা ঘরের ফ্ল্যাট পাওয়া সোজা কথা নয়। আর তখন তার ভাড়া ছিল মাত্র মাসিক ১৫০, টাকা— যেটা এখনকার দিনে রূপকথা বলেই মনে হবে। আর তার চেয়েও বড় কথা ছিল যে, সে-ফ্ল্যাটটি আমাদের খুব পয়মন্ত ছিল। পরপর এতগুলো সাফল্যজনক সি এ পি-র নাট্য-প্রচেষ্টা, তার ওপর দুটো 'হিট' ছবি —'আলিবাবা' ও 'অভিনয়' সবই এই ফ্ল্যাটে থাকতেই হয়েছে, সুতরাং একে 'লাকি' বলতেই হবে।

অহীনবাবু তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতার আলোয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, এইসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে। তাই তিনি আমাদের বোম্বে যাত্রার ঠিক আগে দেখা করতে এসে যা বলেছিলেন, তা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে।

তিনি তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন ঃ বোম্বেতে ডাবল-ভার্সন ছবি করতে যাচ্ছেন, এটা খুবই আনন্দের

থা। এতে নামও হবে, পয়সাও হবে—
ন্তু—

আমি বললাম ঃ কিন্তু কি অহীনবাবু?

তিনি ম্লান হেসে বললেন ঃ নিজের
তে গড়া এতদিনের একটা প্রতিষ্ঠান
এ পি এইভাবে ভেঙে দিলেন!

তাতে আমি বলেছিলাম ঃ সি এ পি
ঙে যাবে কেন? যাচ্ছি তো শুধু ৭।৮
সের জন্য, ফিরে এসে আবার সি এ পি-কে
গিয়ে তুলব। আপনি হয়ত জানেন না
হীনবাবু, স্টেজই হল আমার প্রাণ—
আমি কখনও ছাড়তে পারি?

অহীনবাবু মুখে কিছু বললেন না—
ধু একটু হাসলেন। অহীনবাবু সত্যিই
এ পি-কে ভালবেসেছিলেন, তা না হলে
এ পি-র কাছ থেকে তিনি আর এমন
টাকা পেতেন? অন্য থিয়েটরের সঙ্গে
না করলে এটা কিছুই নয়। তার ওপর
র খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তখন একেবারে
যে, তখন তাঁর একার নামেই যে-কোন
জে 'হাউস ফুল' হয়ে যেত—এইরকম
প্রিয়তা ছিল তাঁর।

সি এ পি-র জন্য কেন তাঁর এই সম-
না ও সহানুভূতি? কারণ, তিনি তাঁর
ভজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে
রেছিলেন যে, ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের
ভবিষ্যৎ আছে এবং হয়ত এমন দিন
সবে যখন সি এ পি-র নিজস্ব একটা
য়েটার হবে। তাই অহীনবাবু, তিমির-
ণ ও অন্যান্য শিল্পীরা সি এ পি-কে
দের নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে
তেন।

আস্তে আস্তে যাবার দিন এসে গেল।
নবাবপত্র যা ছিল, সব একে একে রেলে
গাড়ীতে বুক করে দিলাম। আমার
সমান' গাড়ীখানিও বোম্বে নিয়ে
াম, সেটিও 'গুডস্'-এ বুক করে
াম। এই গাড়ীখানা কিনেছিলাম
লবাবা' করার সময়।

যত যাবার দিন এগিয়ে আসত লাগল,
ই যেন মনে হতে লাগল যে, একটা
থর সংসার ভেঙে চলে যাচ্ছি। তখন
এ পি ছিল যেন সত্যি একটা সুখী
বার। সি এ পি-র সকল সদস্য এবং
াকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমাদের চলে
য়ার আঘাতটা খুব বেশি করে বেজে-
জানতাম, কিন্তু যেটা আমি জানতে
নি বা বুঝতে পারিনি, আর না-
নার জন্যে আমি আজও নিজেকে ক্ষমা
তে পারি না যে, কত বড় আঘাত আমি
দিয়েছিলাম।

আশ্চর্য, আজ আমি কাননানী
টের যে-ফ্ল্যাটটিতে থাকি, তার বারান্দা

ব্যালের মেয়েরা মেক-আপ করছেন।

থেকে গণেশ ম্যানশনে মা যে-ঘরটিতে থাকতেন, সেটি স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের দিকে তাকালেই মনে পড়ে মার করুণ শান্ত মুখখানি।

যাবার আগের দিন আমি আর সাধনা গেলাম মা-র সঙ্গে দেখা করতে, সেদিন তিনি আমাদের দুপুরে খেতে বলেছিলেন। যে-সমস্ত জিনিসগুলি আমি খেতে ভালবাসি সেইগুলি, সুশীলামাসীমার কাছে শুনলাম যে, নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও, মা তদারক করে রাঁধবার লোককে দিয়ে রান্না করিয়েছিলেন।

তারপর এল বিদায়ের পালা। সাধনা মায়ের পায়ের ধুলো নিল। সাধনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু-সিক্তকণ্ঠে বললেন ঃ ভাল থেকো বাবা, সুখে থেকো—তোমার আর সাধনার উন্নতি হোক, প্রচুর নাম হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বোম্বেতে আমাদের সঙ্গে গেল আমার সহকারী হেমন্ত গুপ্ত ও টুকলু। এরা ছাড়া তিনজন চাকর, সাধনার আয়া ও ড্রাইভার। সাধনার বাবা ও মন্মথ কিছুদিন পরেই বোম্বে গেলেন।

যাবার দিন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সি এ পি-র যত অনুরাগী, বন্ধু, আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীর দল এসে হাজির। সকলেই নিয়ে এল ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া। ফুলে ফুলে আমাদের কামরা বোঝাই হয়ে গেল।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর ট্রেন ছাড়বার সংকেত-ধ্বনি হল। আস্তে আস্তে ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগল, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলকে পিছনে ফেলে। সকলকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হতে লাগল।

চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। একে একে সব মিলিয়ে যেতে লাগল—কিন্তু ভেসে উঠল মার সেই করুণ শান্ত মুখখানি।

(ক্রমশঃ)

অশ্রু দিয়ে লেখা চিত্রে অনিল চ্যাটার্জী এবং জ্যোৎস্না বিশ্বাস

এ, কে, বি, ফিল্মসের দ্বিতীয় প্রয়াস বিপ্লবী অরবিন্দের কলাকুশলীবৃন্দ অরবিন্দের জন্মতিথি পালন করেন। চিত্রে শিল্প নির্দেশক সুনীতি মিত্র, ক্যামেরাম্যান দীপক দাশ, পরিচালক দীপক গুপ্ত, প্রযোজক এ, কে, ব্যানার্জী ও শিল্পী দিলীপ রায়কে দেখা যাচ্ছে।

ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

মেরে লাল (হিন্দী) : এস, এস, চিত্র-মন্দির-এর নিবেদন; ৪,২৫২·৮৭ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : জ্যোৎস্না সেন; পরিচালনা : সত্যেন বসু; কাহিনী : নীহাররঞ্জন গুপ্ত; সঙ্গীত-পরিচালনা : লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল; চিত্র-গ্রহণ : রাজ রাগাজ্ঞা; সম্পাদনা : মুকতার আমেদ; শিল্পনির্দেশনা : জি, এল, যাদব; গীতরচনা : মজরুহ সুলতানপুরী; নেপথ্য কন্ঠদান : লতা মঙ্গেশকর, মুকেশ, উষা মঙ্গেশকর ও হেমন্তকুমার; রূপায়ণ : মালা সিনহা, দেবকুমার, ইন্দ্রাণী মুখার্জি, জগদেব, শেখর পুরোহিত, ললিত কাপুর, প্রকাশ মিশ্র, মহেশ রতন, অভি ভট্টাচার্য প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায় গত ১৯ আগস্ট থেকে ওরিয়েন্ট, দর্পণা, কৃষ্ণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

আজকের হিন্দী চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক ট্র্যাজেডী কিংবা কমেডীর প্রচলিত ধারানুযায়ী চিত্র-কাহিনীর জীবন দেখে দেখে দর্শকরা যখন

প্রায় ক্লান্ত, তখন ডাকাত-বাদশার জীবনারোহণের বৈচিত্র্যময় কাহিনী 'মেরে লাল' নতুনত্বের আস্বাদন নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। সেদিক থেকে জন-মনোরঞ্জনের জন্য এস. এস, চিত্রমন্দিরের এ প্রয়াস সার্থক বলা চলে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'বাদশা'র কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য বিধৃত। এ কাহিনীর প্রথম বাংলা ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর সত্যেন বসু পরিচালিত হিন্দী সংস্করণ 'মেরে লাল' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হল। ছবিতে দুর্জয়-দুঃসহ এক প্রবল পরাক্রমশালী ডাকাতের দুর্নিবার জীবনের কাহিনী বর্ণিত। এই নির্দয় পুরুষের পরাক্রমকে পরাজিত করতে পুলিশ যখন অসমর্থ, তখন সাধারণ মেয়ের কাছে প্রথম ভালবাসার প্রেম-বন্ধনে কঠিন মানুষটি কখন যেন কোমল হয়ে আসে। তারপর সাগরসঙ্গমে হারিয়ে যাওয়া এক শিশুসন্তানকে কুড়িয়ে পেয়ে ডাকাত-বাদশার জীবনের পট পরিবর্তন হল। সরল শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে দস্যুজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মানবতার উত্তরণে এই আরোহী পুরুষ যখন পৌঁছে যায়, যখন হারানো শিশুপুত্রটি তার জনক-জননীকে ফিরে পায়, তখন ভয়ঙ্কর মানুষটির মৃত্যু ঘটে। তার আত্মার আরোহণে কাহিনীর মহৎ জীবনের সমাপ্ত হয়।

পরিচালক সত্যেন বসু করুণ রসের মাধ্যমে চিত্রনাট্যের মূল সুরটুকু নানান ঘটনায় মালা গেঁথেছেন। হারিয়ে যাওয়া শিশু-মায়ের মর্মবেদনা, দস্যুর বিরহী প্রেমিকার নিঃসঙ্গ জীবন আর ডাকাত-বাদশার মহৎ জীবনের আত্মত্যাগে ছবির বিষয়-বক্তব্য হৃদয়কে স্পর্শ করে। সেই সঙ্গে সহনায়কের বিরহী প্রেমিকার করুণ উপকাহিনী না-পাওয়া জীবনের ব্যর্থতা হৃদয়-গভীরে দোলা দেয়। তবে শেষ মুহূর্তে প্রেমিকার মৃত্যু ঘটিয়ে পরিচালক করুণ রসের যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তা সম্পূর্ণ সার্থক কিনা সে বিষয়ে মত-বিরোধের অবকাশ আছে। সাধারণ দর্শকের কাছে দস্যু নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হতে পারে। শেষ পর্বে বর্ণিত দৃশ্যাগুলি আরও সংক্ষিপ্ত হলে কাহিনীর মূল রস আরও নিবিড় হতে পারতো।

অভিনয়ে ডাকাত-বাদশার ভূমিকায় অশোককুমার সহজ স্বাভাবিক হলেও চরিত্রগত অভিনয়-সৌকর্যে তেমন উজ্জ্বল নয়। শুধু চেহারায় বলিষ্ঠতার চিহ্ন প্রকাশ পায়। হারানো শিশুপুত্রের মায়ের চরিত্রে মালা সিনহার অভিনয়-অভিব্যক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক আত্মভোলা বদমেজাজী ডাক্তারের চরিত্রে অভি ভট্টাচার্যের ভূমিকা, বেশ নতুনত্বের আমেজ থাকলেও চরিত্রটি অতি নাটকীয়তায় দুষ্ট। প্রেমিকার চরিত্রে ইন্দ্রাণী মুখার্জির স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় বেদন। হারানো কিশোরপুত্রের চরিত্রে বয়োগত শিশুশিল্পীর ভাব-ভঙ্গী এবং লাবণ্যময় মুখের চাহনি অভিনীত চরিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে।

অন্যান্য চরিত্রে জগদেব, শেখর পুরোহিত, ললিত কাপুর, প্রকাশ মিশ্র প্রভৃতি উল্লেখ্য।

সঙ্গীতে লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল প্রায় অনেকগুলি গানের (সাতটি) সুরসৃষ্টি করেও তেমন কোন জনপ্রিয় গান এ ছবিতে যুক্ত করতে পারলেন না। তবু কাহিনীর নাটকীয় জীবনারোহণের বলিষ্ঠ বক্তব্যে সত্যেন বসু পরিচালিত 'মেরে লাল' সাধারণ দর্শকের ভাল লাগবে। উপভোগ্য ছবি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

'শেষ তিন দিন' চিত্রের শুভমুক্তি

একটি ভিন্ন রসের নতুনতম কাহিনী 'শেষ তিন দিন' এ সপ্তাহে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরিচালিত ও মিহির সেন রচিত এ কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী, বিপিন গুপ্ত ও গীতালি রায়। অতীন চট্টোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবিটি পরিবেশনা করছেন সুরঞ্জনা।

'অশ্রু দিয়ে লেখা'র শুভমুক্তি

ফাল্গুনী চিত্রমের 'অশ্রু দিয়ে লেখা' চলতি সপ্তাহের শুক্রবার থেকে রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। অমল দত্ত পরিচালিত এ ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপদান করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সুমিতা সান্যাল, গীতালি রায়, অসিতবরণ, জহর রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায় ও নীলিমা দাস। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরারোপিত এ ছবির পরিবেশনাভার গ্রহণ করেছেন ইম্পি ফিল্মস।

'সম্রাটা' চিত্রের শুভমুক্তি

জি সি ফিল্মসের রোমাঞ্চকর হিন্দী চিত্র 'সম্রাটা' এ সপ্তাহে অপেরা, বসুশ্রী, বীণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। মহীন্দ্র সভেরওয়াল পরিচালিত এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, ডেভিড, বীণা, রাজ মেহরা, নীনা, পূর্ণিমা ও অসিত সেন। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছায়ালোক ছবিটির পরিবেশক।

সুচিত্রা সেনের আগামী হিন্দী ছবি 'দেবীচৌধুরাণী'

'মমতা' সাফল্যের পর বাংলাদেশের চায়ুচিত্র সংস্থা যে দ্বিতীয় হিন্দী ছবিটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার নাম 'দেবীচৌধুরাণী।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই জনপ্রিয় কাহিনীর নামভূমিকায় অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন। নায়ক চরিত্রে বম্বের কোন জনপ্রিয় শিল্পীকে শ্রীমতী সেনের বিপরীতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে।
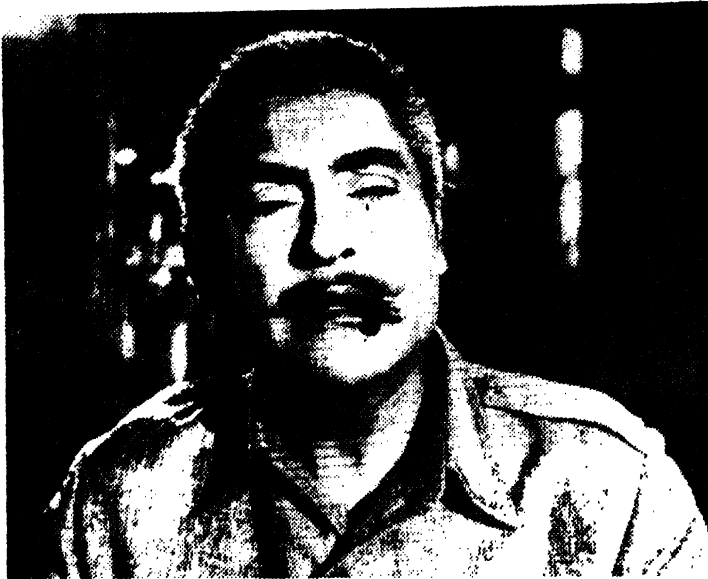
উ'চে লোগ চিত্রে অশোককুমার

বর্তমানে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করছেন হিন্দী সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক কৃষাণ চন্দ্র। ছবিটি পরিচালনা করবেন তরুণ মজুমদার। আগামী মাস থেকে ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে বলে জানা গেল।

বোম্বাই

টি, প্রকাশ রাও পরিচালিত 'ইজ্জৎ'

পরিচালক টি, প্রকাশ রাও বর্তমানে শ্রী সাউণ্ড স্টুডিওয় পুষ্প পিকচার্সের 'ইজ্জৎ'র চিত্রগ্রহণ সুসম্পন্ন করছেন।

কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, জয়ললিতা, তনুজা, বলরাজ সাহনি, মেহমুদ, ডেভিড, ললিতা পাওয়ার এবং মনমোহন কৃষ্ণ। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'ঝুক গয়া আসমান'

প্রযোজক আর, ডি, বনশালের প্রথম হিন্দী ছবি 'ঝুক গয়া আসমান'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। লেখ ট্যানডন পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেন্দ্রকুমার, শায়রাবানু, রাজেন্দ্রনাথ, পরভীন চৌধুরী, দুর্গা খোটে, জাগিরদার ও প্রেম চোপরা। ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

দিলীপকুমার-ওয়াহিদা অভিনীত 'আদমী'

ফিল্মালয় স্টুডিওয় পি, এস, ছি, ফিল্মসের রঙিন চিত্র 'আদমী'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক এ, ভীম সিং। নৌশাদ সুরকৃত এ ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন দিলীপকুমার, ওয়াহিদা রেহমান, মনোজকুমার ও সিমি। অভিনেতা-প্রযোজক পি, এস, ভিরাপ্পা এ ছবির প্রযোজক।

মঞ্চাভিনয়

প্রতিযোগিতার ফলাফল

'আনন্দম্' আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক আন্তঃ অফিস নাট্য-প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। নাট্য-প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন ন্যাশনাল এণ্ড

সম্রাট চিত্রে তনুজা, অনিল চ্যাটার্জি এবং প্রতিমা

গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (প্রধান কার্যালয়), নাটক : 'ইঙ্গিত' — কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় : 'ইস্পাত ক্লাব': নাটক — 'তমসার তীরে' — রমেন লাহিড়ী; তৃতীয় : ডানকান ব্রাদার্স স্পোর্টস এসোসিয়েশন — 'বিকল্প'—লোকনাথ দেবশর্মা।

অন্যান্য পুরস্কার :

শ্রেষ্ঠ নাটক : 'তমসার তীরে' — রমেন লাহিড়ী।

" নির্দেশনা : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ('ইঙ্গিত' নাটক)।

" টিমওয়ার্ক : 'ইস্পাত ক্লাব'।

" অভিনেতা : লোকনাথ চক্রবর্তী ('মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে 'বঙ্কিমে'র ভূমিকায়)—প্রযোজনা : ইন্সপেক্টরেট অফ আরমামেণ্টস্, কাশীপুর রিক্রিয়েশন সাব-কমিটি।

" পার্শ্ব অভিনেতা : মনীশ সেনগুপ্ত ('ইঙ্গিত' নাটকে মিঃ ক্লার্কের ভূমিকায়)।

" টাইপ চরিত্র : ফণী মজুমদার ('কলসী উৎসর্গ' নাটকে 'হাবা'র ভূমিকায়) — প্রযোজনা : ক্ল্যারিয়ন ম্যাকান রিক্রিয়েশন ক্লাব।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : শিপ্রা সাহা (ইঙ্গিত নাটকে মিসেস কিলার চরিত্রে)।

দ্বিতীয় : হিমানী গাঙ্গুলী ('কবুণো কোরনা' নাটকে 'পদ্ম'র ভূমিকায়) : প্রযোজনা : ন্যাশনাল গ্রীনলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (লয়েডস্ ব্রাঞ্চ)।

" পার্শ্ব অভিনেত্রী : চিত্রিতা মণ্ডল 'হে ভৈরব' নাটকে লীলার ভূমিকায়) : প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাব।

বিশেষ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছে :

শ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক নাট্যনিবেদন : নিউ ইণ্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'দ্বিতীয় বিশ্ব'। শ্রেষ্ঠ আঙ্গিক : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া স্টাফ এসোসিয়েশনের 'নব স্বয়ম্বর'। হিমানী বসু (বরানগর মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব) হয়েছে শ্রেষ্ঠ শিশু-শিল্পী।

'সাহানা'র "বায়েন"

শ্রীরামপুরের 'সাহানা' গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ শ্রীজ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনরস-সমৃদ্ধ 'বায়েন' নাটকের অভিনয় করেছেন সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এ'দের প্রথম আবির্ভাব এই নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে। প্রথমেই বলি এ'দের প্রথম নাট্য-প্রযোজনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। নাট্য-নির্দেশনায় অমল গুপ্ত অনেক জায়গায় উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল দেখাতে পেরেছেন। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যের কম্পোজিশান অপূর্ব, সমস্ত নাটকের এমন একটি মর্মস্পর্শী পরিণতি সৃষ্টি করে তিনি নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছেন।

অভিনয়ের দিক থেকে সুবল বায়েনের ভূমিকায় তমাল গুপ্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। মানসিক যন্ত্রণার মুহূর্তগুলো অবশ্য আরো সূক্ষ্মভাবে পরিস্ফুট করে তোলা উচিত ছিল। তবে শেষ দৃশ্যে তার আর্তি চরিত্র উপলব্ধির আন্তরিকতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

নিতাই ঘোষ পাঁচুর চরিত্রে প্রাণোচ্ছল অভিনয় করেছেন, এমন স্বাভাবিক অভিনয় সচরাচর চোখে পড়ে না। একটি ছোট্ট চরিত্র কবিরাজের ভূমিকায় সুখেন্দু চ্যাটার্জি'র অভিনয়-দক্ষতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সৌরভীর ভূমিকায় জয়ন্তী কর তাঁর অন্তর্বেদনাকে সব সময়ে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে না পারলেও, তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা চরিত্রটির সুষ্ঠু অগ্রগতিতে সাহায্যই করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শুভেন্দু চৌধুরী, বুদ্ধদেব ঘোষ, গণেশ দে, বিশু চ্যাটার্জি, শক্তিপদ দাস, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক রায়, ভারতী চক্রবর্তী।

সাহিত্যিকদের নাট্যাভিনয়

নিখিল বঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশনের শেষ দিনে সাহিত্যিক ও শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক পরিবেশন করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন : নরেন্দ্র দেব, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ননীগোপাল মজুমদার, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গৌর আদক, শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য, দ্বীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুকার-এর তিনটি একাঙ্কিকা

গত ৩১শে জুলাই রঙমহল মঞ্চে অনুকার তিনটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিদেশী কাহিনীর ছায়াবলম্বে রচিত 'নিহত নিয়তি' নাটকে শান্তজিৎ সেনগুপ্ত, মায়া ঘোষ ও বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি'র অভিনয়

ভালো। পূর্ণেন্দু মজুমদার ও নিশীথ মণ্ডল সপ্রতিভ নন। ধূর্ত এবং স্বার্থান্ধ কুশাসনকে কটাক্ষ করে রচিত 'দাও ফিরে সে অরণ্য' নাটকে তরুণশংকর দাশগুপ্ত যেমন স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন, দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের অভিনয় তেমন অতিরেকদোষে দুষ্ট। চেখভের কাহিনী নিয়ে রচিত "পূরবী" এক অভিনেতার পূর্বস্মৃতি ও বর্তমান অসামর্থ্যের করুণ আলেখ্য। তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাচনিক ও আঙ্গিক অভিনয়ে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর চরিত্র-রূপায়ণে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হৃদয়গ্রাহী।

মঞ্চে 'বারো ঘর এক উঠোন'

নিয়মিত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রী সংস্থা শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী রচিত 'বারো ঘর এক উঠোন"-এর প্রথম অভিনয় করবেন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে আগামী সোমবার, ২৯শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায়। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন শ্রী বিধায়ক ভট্টাচার্য।

নৃত্যনাট্য শ্যামা

ঝাড়গ্রাম "সুরশ্রী"র ছাত্রছাত্রী কর্তৃক স্থানীয় "দেবেন্দ্রমোহন হলে" রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামা অভিনীত হয় ২১শে আগস্ট। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীসুভাষ

সেনগুপ্ত, নৃত্য পরিকল্পনা—শ্রীকল্যাণ বকসী। আলোকসম্পাতে ছিলেন কনিষ্ক সেন।

মঞ্চবিদ গর্ডন ক্রেগ স্মরণে

বিশ্বের নাট্যলোক সম্পর্কে যাঁদের প্রকৃত অনুরাগ আছে তাঁদের কাছে ইংরেজ মঞ্চকলাবিদ এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগের নাম অপরিচিত নয়। কিছুদিন আগে মঞ্চশিল্পের এই অতন্দ্র সাধকের জীবনদীপ হঠাৎ নিভে গেছে। বিশ্বের নাট্যানুরাগীর মন তাই বেদনাহত। কিন্তু তাঁর মঞ্চকলা সম্পর্কে অমূল্য রচনাসম্ভারের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব বিঘোষিত হবে অনন্তকাল ধরে।

অনুকৃতিবাদী দৃশ্যপট ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গর্ডন ক্রেগ বিদ্রোহী শিল্পীর ভূমিকা নিয়েছেন এবং মঞ্চের জগতে সেই সূত্র ধরে তিনি এনেছেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তিনি বলতেন নাটকে মূর্ত হয়ে উঠবে জীবনের আত্মা, শুধু বহিরঙ্গ রূপ নয়। তিনি এমনও বলেছেন মানুষকে দিয়ে অভিনয় করালে যে ফল পাওয়া যাবে, তার চেয়ে অনেক বেশী ফল পাওয়া যাবে যদি পুতুল দিয়ে অভিনয় করানো যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন নিষ্প্রাণ উপাদানের দ্বারা শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। মঞ্চে থ্রি-ডাইমেনসন প্রক্রিয়া সৃষ্টি, ক্রেগের অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর।

মঞ্চকলায় নব্যরীতির প্রবর্তক বিদ্রোহী শিল্পী গর্ডন ক্রেগের জন্ম হয় ১৮৭২-এর ১৬ই জানুয়ারী। বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরী হোলেন তাঁর মা। সুতরাং জন্ম থেকেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচিতি ঘটে। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি স্যার হেনরি আরভিং-এর দলে যোগদান করেন এবং প্রায় আটবছর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। এই সময়ে তিনি হ্যামলেট, রোমিও, মারকুসিও, পেত্রাচিও, ম্যাকবেথ, রিচমন্ড, বিওনডেলো, মাস্টার ফোর্ড, ক্লডিও, গ্রাসিয়ানো, ক্যাসিও প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সবার স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮৯৬ অভিনয় ছেড়ে তিনি স্টেজম্যানেজমেন্টের কাজে ব্রতী হন। হ্যামলেট, মাচ এডো অ্যাবাউট নাথিং প্রভৃতি নাটক প্রযোজনায় স্বকীয় মঞ্চরীতির প্রয়োগ করেন। ১৯০৮ সালে ফ্লোরেন্স থেকে অভিনয়কলা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মাসিক পত্র 'দি মাস্ক' প্রকাশিত হোতে থাকে। ১৯০৯ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারে হ্যামলেট প্রযোজনা করেন। ফ্লোরেন্সে তাঁর বিখ্যাত স্কুল ফর দি আর্ট অফ থিয়েটার স্থাপিত হয় ১৯১১ সালে।

মঞ্চকলা সম্পর্কে তিনি যে সব স্মরণীয় গ্রন্থ রচনা করেন তা হোল : অন দি আর্ট অফ থিয়েটার, টুওয়ার্ডস এ নিউ থিয়েটার, দি থিয়েটার এ্যাডভান্সিং, হেনরি আরভিং ও এ্যালান টেরী, দি এ্যাকট্রেস এ্যান্ড দি মাদার।।

গানের জলসা

"কহ্লার" শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

আগামী ২৯ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে কল্যাণীর বাৎসরিক উৎসবে মধ্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত নতুন রবীন্দ্র-সংগীত সংস্থা "কহ্লার" শিল্পীগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করবেন সর্বশ্রী অনীতা চট্টোপাধ্যায়, এনা দাসগুপ্ত, সন্ধ্যা দত্ত, ইন্দিরা রায়, দীপ্তি মজুমদার, আরতি পণ্ডিত, কল্যাণ ঘোষ, সৌম্যেন্দু গুহ এবং আরো অনেকে।

রঙ্গবল্লরীর অনুষ্ঠান

নিউ এম্পায়ারে ১৪ ও ১৫ আগস্ট রবিশঙ্করের যন্ত্র-সঙ্গীত পরিবেশনের আর একটি মনোরম অনুষ্ঠান হয়। ইউরোপে সম্প্রতি বেহালা-বাদক ইহুদী মেনুহুইনের সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত যন্ত্র-সঙ্গীত পরিবেশনের পর রবিশঙ্কর ভারতীয় শ্রোতাদের সামনে আবার যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। তাঁর এবারের বাজনায় যে বিশেষত্ব শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হ'লো সুরের শুদ্ধতা, সাবলীল স্ট্রোকের কাজ, যার ফলে একেকটি স্বরকে আলাদাভাবে পরিষ্কার চেনা যায়, এবং তাঁর অনায়াস রাগ-রূপায়ণ। ধ্রুপদী মীড় ও গমকে তিনি রাগের অন্তর্নিহিত ভাবমূর্তিটিকে রঙ-রেখায় উজ্জ্বল করে তোলেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে তিনি প্রথমে মারোয়ায় আলাপ পরিবেশন করেন। ষড়জ-বর্জিত এই রাগকে তিনি যে মুন্সীয়ানার সঙ্গে উপস্থাপিত করেন, তা তাঁর মতো শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। বিশেষতঃ এই রাগের কোমল রেখাব তাঁর অঙ্গুলির স্পর্শে শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। সব মিলিয়ে তারের ঝংকারে একটি ধ্রুপদী মেজাজে তিনি শ্রোতাদের আবিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন।

এরপর তিনি 'মালগুঞ্জ' গৎ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করেন। তিনি মাঝ-খাম্বাজে একটি ঠুমরী বাজিয়ে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন। ঠুমরীতেও তিনি যে লিরিক্যাল 'মুড' ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলেন তা শ্রোতাদের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করে। রবিশঙ্করের সেতারের সঙ্গে কানাই দত্তের তবলা-সংগতও উচ্চাঙ্গের হয়।

এইদিনে প্রথম দিকে লক্ষ্মীশঙ্কর মধুবন্তী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। মীড়-প্রধান সুর বিস্তারে, তানালাপে ও সর্বোপরি রাগ-রূপায়ণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ তারা-র স্বরকে স্পর্শ করলেও কখনো মাধুর্যের হানি হয় না। এই কণ্ঠের মাধুর্য ঠুমরী পরিবেশনে আরো সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবিশঙ্কর মিঞামল্লার রাগের আলাপে একটি মেঘমেদুর পরিবেশ রচনা করেন। তারপর দক্ষিণ ভারতীয় 'বাচস্পতি' রাগে তিনি যে গৎটি পরিবেশন করেন তা অনেক শ্রোতার কাছে নতুন হলেও তাঁদের মনে রেখাপাত করেছে। একটি পিলু অঙ্গের মধুর ঠুমরী বাজিয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

শেষ তিনদিন চিত্রে অনুপকুমার ও সুমিতা সান্যাল

এদিনেও প্রথম দিকে লক্ষ্মীশঙ্কর ইমন রাগের রূপায়ণে স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর পাহাড়ী ঠুংরীটিও শ্রোতাদের তৃপ্তি সাধন করে। দুদিনের অনুষ্ঠানেই তবলাসংগত করেন কানাই দত্ত। 'রঙ্গ-বল্লরীর' প্রযোজনায় এই অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়।

অনিল ভট্টাচার্য জন্মোৎসব

অনিল স্মৃতি বাসরের সভ্যবৃন্দ গত ১৪ই আগস্ট সকাল দশটায় পার্ক ইনস্টিটিউশন ভবনে গীতিকার অনিল ভট্টাচার্যের ৫৮তম জন্মোৎসব পালন করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। অনুষ্ঠানের প্রথমে অনিল ভট্টাচার্য রচিত ৩০০ গানের সদ্য প্রকাশিত সংকলন 'মাধবী রাতে' সভাপতি মহাশয় উপস্থিত শিল্পিবৃন্দকে উপহার দেন। অনুষ্ঠানে অনিল ভট্টাচার্য রচিত সংগীত পরিবেশন করেন : বীথি দাস, শীলা দত্ত (সরকার), রেবা বসু (সোম), পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায় (গাঙ্গুলী), সুপ্রভা সরকার ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। সভার অনুষ্ঠান-সভাপতি, বাসরের সভাপতি [illegible]

[illegible]শিল্পীবৃন্দের ত্রৈমাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলা সংগত করছেন শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনিল স্মৃতি-বাসরে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ পার্শ্বে উপবিষ্ট ডেপুটি মেয়র শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

ভদ্র, সম্পাদক ডেপুটি মেয়র শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীহেমচন্দ্র সোম বক্তৃতা করেন।

নিখিল ভারত শিশু-সঙ্গীত সম্মেলন

গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই আগস্ট নিঃ ভাঃ শিশু-সঙ্গীত সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানের প্রথমে সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্ল সাহা বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। বিচারপতি শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ মিত্র শিশু-সঙ্গীত সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার দিকে বিশেষ আলোকপাত করেন। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে শিশুদের সংগীতচর্চা, অনুশীলন প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় দিনে নাট্যকার শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনদিনের অনুষ্ঠানে বাংলা, বিহার, আসাম, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত বিভিন্ন শিশুশিল্পীরা অংশ গ্রহণ করে। ধ্রুপদে মঞ্জরী বসাক ও শান্তনু ঘোষ, খেয়ালে শুভ্রা গুহ, মায়া মিত্র ও স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তা ও আসামের টফি দে, নৃত্যে মাদ্রাজ থেকে আগত বেবী আলামেলু রাণী ভারতনাট্যমে, মেধাবতী সিং ও শ্যামলী দাস মণিপুরীতে, কথকে লক্ষ্ণৌর ব্রিজ মহারাজ শর্মিষ্ঠা চৌধুরী ও উদয় সাহা, সীমা ভট্টাচার্য, সেতারে সোমনাথ ব্যানার্জি, সরোদে শাশ্বতী ভট্টাচার্য, বেহালায় মমতা সামন্ত গীটারে এবং উত্তর প্রদেশের অভিজিৎ মজুমদার তবলায় সকলকে মুগ্ধ করে। সবশেষে লিটল-বিটলের গ্রুপ গীটার বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বীণকার মহম্মদ দবীর খাঁ-র জন্মোৎসব

মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট তানসেন বংশধর বীণকার মহম্মদ দবীর খাঁ-র জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। খ্যাতনামা ও বিশেষ করে নবীন শিল্পপ্রতিভা এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সাহায্য করেন। প্রথম-দিনের অনুষ্ঠানে কুমারী বুলবুলের পিলু ঠুমরী মনোগ্রাহী হয় এবং মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় সুরদাসী মল্লার রাগের অন্তর্নিহিত রূপটি প্রকাশ করতে সক্ষম হন। অপর্ণা রায়ের সুরবাহার বাজনা কার্তিক সামালের পাখোয়াজ সহযোগিতায় প্রীতিকর হয়। এইদিন

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলাবতী রাগে খেয়াল শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে গভীর রেখাপাত করে। ইনি ধীরে ধীরে রাগ রূপায়ণ এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন যা যথার্থ প্রশংসার যোগ্য। রাগের আঙ্গিক রচনায়, দুরূহ পর্দা সংযোজনায় এবং তানের বিভিন্ন ছন্দরচনায় তিনি যে পারদর্শিতা দেখান তাতে সংগীতরসিকেরা প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। তবলায় চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সারেঙ্গীতে ইকবাল হোসেন খাঁ তাঁর গানের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে বিশেষ সাহায্য করেন। এইদিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিমলকুমার ও দিলীপকুমারের কৌশিক কানাড়ার বিশ্লেষণে মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। আশীষকুমারের সরোদের সঙ্গে কাশীনাথ মিশ্রের তবলা সহযোগিতা উপভোগ্য হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে কালিদাস সান্যালের ছায়া-রাগের বিশ্লেষণে নৈপুণ্য ও লয়কারীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে শওকত আলি খাঁর সঙ্গত গানের গতিকে কিছু ব্যাহত করে। মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক-নৃত্য খুবই মনোগ্রাহী হয়। ইনি তৎকার, গৎ, টুক্‌রা এবং দুরূহ তেহাই ও ভাঁও পরিবেশনে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন। কল্যাণী রায়ের সেতার বাজনা আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—যা শ্রোতাদের বিশেষ তৃপ্তি দেয়। ইনি অল্পসময়ে 'বেহাগ' রাগের অন্তর্নিহিত বিষাদ-করুণ ভাবমূর্তিকে রঙে-রেখায় সুস্পষ্ট করে তোলেন। বিশেষ করে রাগের মেজাজ সৃষ্টিতে তাঁর সুরেলো মীড়গুলি খুবই কার্যকরী হয়েছিল।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৌড়মল্লার রাগের খেয়াল ও ঠুমরী 'আবকে শাওন ঘর আ...' শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চপ্রশংসা লাভ করে। বিস্তারে রাগ-রূপায়ণ ও দুরূহ সরগমে এবং বিভিন্ন বোলবাণীর সাহায্যে ঠুমরীর অনবদ্য পরিবেশনে তিনি নিজস্ব সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে প্রমাণিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এইদিনের শেষ অনুষ্ঠানে পণ্ডিত ভি. জি. যোগের বেহালা ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের হারমোনিয়মের যুগলবন্দী শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। এই দুই গুণী ও প্রবীণ শিল্পীর বাজনায় অনেক নতুন জিনিস পাওয়া যায়। এঁরা রাগ 'শঙ্করা' ও খাম্বাজ ঠুমরী পরিবেশন করেন। নানা ছন্দের কাজে ও লয়কারীতে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হয়েছিল।

ম্যাক্সমুলার ভবনে সংগীতানুষ্ঠান

বালিগঞ্জের 'ম্যাকস্‌মুলার' ভবনে ১৬ই আগস্ট একটি প্রীতিকর যন্ত্রসংগীতানুষ্ঠান হয়। এই আসরের একক শিল্পী ছিলেন জয়া বসু। তিনি সেতারে 'ইমন' রাগ বাজিয়ে শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দেন। রাগ বিশ্লেষণে ও নতুনতর ছন্দের কাজে তিনি শ্রোতাদের উচ্চ-প্রশংসা লাভ করেন। শেষে তিনি 'কিরোয়ানী' রাগে একটি মনোজ্ঞ গৎ পরিবেশন করেন। জয়া বসুর মীড়ের কাজ, সাবলীল স্ট্রোক ও লয়কারী যথার্থ প্রশংসাযোগ্য।

বেতারশ্রুতি

দিনের পর দিন অভিযোগ জানাবার পর এবারে যেন মনে হচ্ছে আকাশবাণী কর্মকর্তাদের শ্রোতাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি জেগেছে। বাংলা ছায়াছবি গানের অনুষ্ঠানে এখন হিন্দী ফিল্মের গান শোনান বন্ধ হয়েছে। তবে এ পরিবর্তন সাময়িক না স্থায়ী এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।

'বিবিধ-ভারতী' নামে যে অনুষ্ঠানটি সর্বভারতীয় পর্যায়ে পরিবেশিত হয় তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গীত পরিবেশন করা। আশ্চর্যের বিষয়, এই অনুষ্ঠানে প্রায় সব প্রদেশের গানই শোনা যায় শুধু বাংলা গান ছাড়া। এর কারণ জানবার অধিকার নিশ্চয়ই বাংলার শ্রোতাদের আছে।

বেতার জগতে প্রকাশিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে আকাশবাণী প্রচারিত অনুষ্ঠানের কোন মিল থাকছে না এ সংবাদ আগেই আমরা আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছিলাম। গত কয়েকদিন ধরে এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও এখনও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আর একটু সজাগ হবেন।

বিচিত্রা শ্রোতাদের প্রতিযোগিতা

লণ্ডন বি. বি. সি'র ভারতীয় বিভাগ বিচিত্রার কর্মকর্তা শ্রীকমল বসু ভারত সফরান্তে পুনরায় লণ্ডন ফিরে গেছেন এ খবর আপনাদের আগেই জানিয়েছিলাম। বিচিত্রার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে ভারতীয় শ্রোতাদের সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ তিনি স্থাপন করেছিলেন—সেটুকু যে তাঁর বিলেতে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যথারীতি শেষ হয়ে যায়নি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সম্প্রতি তাঁর লেখা একখানা চিঠি। ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে যে অংশটুকু বিশেষ আকর্ষণীয় সেটুকু এখানে পেশ করছি।

"দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরে মাতৃভূমি সম্পর্কে যে বহুবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি তার তুলনা নেই। দুঃখ যতটা না পেয়েছি তার চাইতে আনন্দ পেয়েছি অনেক বেশী। এবং এই আনন্দের একটি হল, দেশের জনগণের কাছে সুস্থ সবল সাহিত্যরস পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের উন্নতিসাধনে আপনাদের পত্রিকার প্রচেষ্টা।

বিচিত্রার জন্ম বিদেশে হলেও বিচিত্রা অনেকদিন থেকে ভারতের সেবা করে আসছে, আর চেষ্টা করছে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের ভাব দৃঢ় করতে। এই দুইটি দেশের জনসাধারণকে পরস্পরের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। ভারতীয় শ্রোতাদের মনোভাব জানবার জন্যে বিচিত্রা একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। আশা করবো ভারতীয় শ্রোতারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকবেন না।"

প্রতিযোগিতার মূল বিষয় এবং নিয়ম-কানুন ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে মোটেই কঠিন নয়। শ্রোতারা বিচিত্রা শুনে কল্পনা করবেন বিচিত্রা পরিচালনা করবার ভার

লাভ ইন টোকিও চিত্রে জয় মুখার্জি, আশা পারেখ এবং একজন জাপানী শিল্পী।

...রা পেলে কি ধরনের নতুন অনুষ্ঠান তাঁরা ...য়োজনা করবেন যাতে ভারত এবং ...লেণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভাব ...ড়ে। প্রতিযোগীকে নতুন অনুষ্ঠানের নাম, ... ধরনের অনুষ্ঠান সে সম্বন্ধে সাধারণ-...বে কিছু বিবরণ আর দু'শ কথার ভেতর ...খতে হবে কেন তাঁর এই নতুন অনুষ্ঠান ...ই দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার ...ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একটি সুরম্য, ...শ্রেণী ও বিশেষ শক্তিশালী ট্রানজিস্টর ...ডিও সেট উপহার দেওয়া হবে, যাতে ...বিষ্যতে তিনি বিনা যান্ত্রিক গোলযোগে ...রাসরি বিচিত্রা প্রোগ্রাম শুনতে পান।

প্রতিযোগিতার যোগ দেবার শেষ ...রিখ এ বছরে ভারতের ঠিকানায় ১লা ...প্টেম্বর আর বিলেতের ঠিকানায় ৬ই ...প্টেম্বর। যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ-...হণ করতে চান তাঁরা এই দুই ঠিকানার ... কোন একটিতে রচনা লিখে পাঠাতে ...রেন—

বিচিত্রা শ্রোতাদের প্রতিযোগিতা—
বি, বি, সি, ইণ্ডিয়ান সেকসন,
পোঃ বক্স—১০৯, নিউদিল্লী।
অথবা
বি, বি, সি, ইণ্ডিয়ান সেকসন,
বুশ হাউস,
লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড।

ভারতীয় আকাশবাণী কি এর ভেতরে ...ন নতুন পথের সন্ধান পাবেন?

বিবিধ সংবাদ

পৃথ্বীরাজ কাপুর সম্মানিত

পৃথ্বীরাজ কাপুর "আসমান মহল" ...ম চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্যে প্রাগ্‌ ...গীত-কলা অ্যাকাডেমির রেকটর তাঁকে ...রস্কৃত করেন। আধুনিক ভারতীয় ...চ্চিত্র আর থিয়েটারের বিকাশের ক্ষেত্রে ...জনশীল অবদানের জন্যে তাঁকে সম্মানিত ...া হয়। কারলোভি ভারি আন্তর্জাতিক ...চ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে এশিয়া, আফ্রিকা ...র ল্যাটিন আমেরিকার চলচ্চিত্রকর্মী ...কাডেমি থেকে বরাবর এই পুরস্কার ...ওয়া হয়।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের বার্ষিক প্রতিযোগিতা

পরিষদের ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ...লক্ষে আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, রজনী-...ন্তের গান, খেয়াল, লোকনৃত্য, চিত্রাঙ্কন ...ং প্রবন্ধ বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন ...া হয়েছে। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-...য়েরা এই সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান ...তে পারবে। ৩১ আগস্টের মধ্যে পরি-...দের মূলকেন্দ্র ২২, টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট, ...কাতা-৬-এ নাম পাঠাতে হবে ও ...স্তারিত বিবরণ জানা যাবে।

নিউইয়র্কে ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে যুক্ত-...ষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে 'ফিলহারমোনিক হলে' ভারতীয় সংস্কৃতির যে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত রঙীন চিত্র "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র প্রদর্শনী। 'লিংকন সেন্টার' সংগীত-নৃত্য-নাট্য ভবনে এই ছবির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের কূটনীতিক কর্মচারিবৃন্দ, সরকারী পদস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং বহু বিশিষ্ট শিল্প ও চলচ্চিত্র সমালোচক। উৎসব-সপ্তাহের প্রতি সন্ধ্যাতেই ছবিখানি প্রদর্শিত হয়। স্বনামধন্য যন্ত্রশিল্পী আলি আকবর খাঁয়ের সরোদ বাজনা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

প্রীতি-সম্মেলন

গত ১৩ই আগস্ট বেলেঘাটা দেশবন্ধু বহুমুখী উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জাতীয় সমরশিক্ষার্থী (স্থল) বাহিনীর তৃতীয় বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল 'আলোছায়া' সিনেমায়। এই অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, নাটকের আয়োজন করা হয়। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ও বিশিষ্ট বেতার-শিল্পিবৃন্দ।

শ্রীবিরু সাহা রচিত 'ভেঙেও না ভাঙেনি' নাটকের অভিনয় এই অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীবীরেশ্বর সাহা। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন বরুণ ব্যানার্জি, ভূদেব মুখার্জি, অজয় রায়, বিজয় দাস, মাঃ ছটু, সমীর ব্যানার্জি, রণেন ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু রায়, বিরু সাহা।

সিনে ক্লাব অব নৈহাটি

সিনে ক্লাব অব্ নৈহাটী তাঁদের পূর্ব-ঘোষিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী কল্যাণী সিনেমা হলে ফরাসী ছবির প্রদর্শন করে চলেছেন। আগস্ট মাসের ১, ১৪ ও ২১ তারিখে সকাল ৯টায় যথাক্রমে 'বিউটিজ অব দি নাইট' (রেনে ক্লেয়ার), 'গ্রেট ডিস্ট্রাম' (মার্সেল কার্নে) ও 'ফ্রেঞ্চ ক্যান ক্যান' (জাঁ রেনোয়া) ছবিগুলো দেখানো হয়; সংগে কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, কার্টুন ছবি ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

নাট্যলোকের পুরনো পাতা (৮)

রাজকৃষ্ণ রায়

দিলীপ মৌলিক

"ভগবান, আমার অদৃষ্টে কি মৃত্যু নেই?' সীমাহীন যন্ত্রণায় আর্ত হয়ে উঠছে একটি কণ্ঠ। সারাদিন পথচলায় তপ্ত রোদের অসহ্য ক্লান্তি, আর রাতের নীরবতায় সমস্ত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা। এর মধ্যে সেতু-বন্ধন করে এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হোচ্ছে না। অতল মনের বাসনার কথা আর তার রূপায়ণের জন্য যে প্রয়াস তাকে কেউই এতটুকু স্বীকৃতি জানাতে চাইছে না। অন্তরের অন্দরমহলে তাই প্রচণ্ড অভিমান, পৃথিবীকে তাই ভালো না লাগা খুব স্বাভাবিক।

এই হৃদয়হীন অভিজ্ঞতা আর বিষণ্ণ অনুভব বহু জীবনকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে, কোনদিনই তাকে প্রদীপ্ত আলোর তীর্থে উন্নীত করেনি। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনে এই করুণ অধ্যায়টি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিয়তি ছিল তাঁর বিপক্ষে। তাই গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়কের পরিণতি হয়েছে তাঁর। বুকভরে সমুদ্রসাধ নিয়ে এগিয়েছেন, কিন্তু চলে পেয়েছেন কি কিছু?

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে" হয়তো এই ব্রতই ছিল রাজকৃষ্ণ রায়ের। তাই তাঁর পক্ষে সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়েছিল। মাঝে মাঝে প্রচণ্ডভাবে ক্লান্ত হোলেও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেননি বৈশাখী প্রমত্ততার কাছে। ভাগ্য-বিপর্যয়ের সূত্রে কবি মধুসূদনের সঙ্গে কোথায় যেন রাজকৃষ্ণ রায়ের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নিষ্ঠা আর অনুশীলনের ফলে তিনি নিজেকে খ্যাতিমান নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা যে কজন বিশিষ্ট নাট্যকারকে পেয়েছিলাম রাজকৃষ্ণ রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রহ্লাদ চরিত্র, চন্দ্রহাস, ভীষ্মের শরশয্যা, সিন্ধুবধ, বামন ভিক্ষা, হরিদাসঠাকুর, মীরাবাই, চন্দ্রাবলী, নরমেধ যজ্ঞ, লায়না মজনু ও বনবীর প্রভৃতি নাটক তাঁর নাট্যপ্রতিভার স্মরণীয় স্বাক্ষর।

কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনের শুরু মধুসূদনের চেয়ে অনেক করুণ। প্রথমেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার। পৃথিবীর নতুন সূর্যকে বন্দনা জানাবার সোনালী মুহূর্তেই মা'র মৃত্যু হয়। একজন প্রৌঢ়া মহিলা তখন তাঁর দেখাশোনা করতে থাকেন। তাঁরই সেবাযত্নে কৈশোরের চপল মুহূর্তগুলো কাটতে থাকে। এই মহিলাটি কে তা নিয়ে অবশ্য অনেক তর্কের অবকাশ আছে। সেই তর্কে প্রবেশ না করে বলা যেতে পারে যে পিতার মৃত্যুর পর রাজকৃষ্ণ রায় এই মহিলাটিকে মা'র মতো শ্রদ্ধা করেছেন আজীবন। শ্রদ্ধানিবেদনটুকুই এখানে বড়ো কথা, পরিচয় জানার স্পৃহাটা এখানে গৌণ।

খুব ছোটবেলা থেকেই একটি কবিমন রাজকৃষ্ণ রায়ের ভিতর উঁকি দিয়েছে। যে কোন সাধারণ বিষয়ের ওপরই তাঁর কবিতা লেখার অধিকার ছিল। এই কাব্যপ্রেরণার উৎস তাঁর নিজের মনের নিঃসঙ্গতা। শুরুতেই তাঁর মানসিকতা একথা স্পষ্ট করেছিল যে তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতের একজন যথার্থ শিল্পী লুকিয়ে আছে। উত্তরজীবনে সে কথার সত্যতা ধরা পড়ে।

নাট্যশালার সংস্পর্শে আসার পূর্বে কাব্যপ্রেমিক রাজকৃষ্ণ রায়কে অজস্র পরিশ্রম করতে হয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্য। ছাপাখানার সামান্য কর্মচারী থেকে তাঁর জীবন শুরু হয়। নিজের চেষ্টায় আর অসাধারণ নিষ্ঠায় ঐ কাজ থেকেই তিনি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। এই প্রেসে কাজ করতে করতেই তাঁর কিছু কাব্যগ্রন্থ আর নাটক প্রকাশিত হয়। 'অবসর সরোজিনী' কাব্যগ্রন্থ প্রথম দিকে আত্মপ্রকাশ করে। 'অনলে বিজলী' নাটকও এই সময়ের সৃষ্টি।

তিনি এই সময়ে অনেক সাময়িকপত্র পরিচালনা করেছেন। যেমন সমাজদর্পণ, বীণা, গল্পকল্পতরু। 'বীণা' নানাদিক থেকে, বিশেষ করে কাব্যচেতনা পরিস্ফুটনের দিক থেকে একটা উল্লেখযোগ্য নজীর সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

ছাপাখানার কাজে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যই এসেছিল তাঁর, কিন্তু তাঁর মন গেল নাট্য-শালার সমৃদ্ধির দিকে। যে মন সৃষ্টি করতে চায়, সে চলে ঝর্ণার গতিতে, তাকে বাধা দেবে কে? বিভিন্ন প্রান্তরে নিজেকে মেলে দেওয়াতেই তার চরম আনন্দ। রাজকৃষ্ণ রায় নিজেই একটা নাট্যশালা খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর এই নিষ্ঠা আর অনুভব যে কোন নাট্যানুরাগীরই অনুকরণযোগ্য।

সত্যিকারের আন্তরিকতাই তাঁর নাট্যানুরাগের উৎস ছিল বলেই তাঁর নাট্যসৃষ্টি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। সংগীত রচনাতেও তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। যে গানগুলো তিনি নাটকের জন্য রচনা করতেন, সঙ্গে সঙ্গে লোকের মুখে মুখে তা শোনা যেতো। তাঁর গান আজও বহু বৈরাগীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাঁর অধিকাংশ নাটকের মধ্যেই এই গীতিধর্মিতা আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। এই গানের সুর তাঁর নাটকের গতিকে ব্যাহত করেনি, বরঞ্চ নতুন পথের সন্ধান দিতে পেরেছে।

অনেক গুণেই গুণান্বিত ছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়। প্রকৃত শিল্পীর যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার অধিকারী তিনি ছিলেন। তিনি সেতার বাজাতেন খুব ভালো, আর তাঁর অভিনয়-দক্ষতার কথা তো সর্বজনবিদিত। তিনি তাঁর মঞ্চের জীবন শুরু করেন পাণ্ডুয়া স্টেশনের কাছে সরাই গ্রামে। সেখানে নিজের চেষ্টায় একটি নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত ক'রে অনেকগুলো নাটক সেখানে অভিনয় করেছেন। সেখান থেকে এসে কোলকাতায় আর্য-নাট্যসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং 'প্রহ্লাদচরিত্রের' অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন। একটি অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে দু-রাত্রি প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয় ক'রে কোল-কাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের দেখানো হোল। হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। যোগীন্দ্র ঘটকের পর তিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করেন।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ ক'রে নিজে একটি থিয়েটার খোলবার বাসনা অনুভব করলেন মনে। অবশ্য ইচ্ছেটা অনেকদিন আগেই ছিল তাঁর মনের কোণে। এবার সেটা দুরন্ত গতিতে প্রকাশের পথ খুঁজতে চাইলো। ভাবলেন এমন থিয়েটার করতে হবে, যেখানে কোন কুরুচি বা নীতিহীন কাজের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। পরিশুদ্ধ রুচি আর বিশুদ্ধ চেতনার কেন্দ্র হবে থিয়েটার। এই আদর্শকে সামনে রেখে কাজে লেগে গেলেন রাজকৃষ্ণ। সে কি সীমাহীন উদ্যম' কোনদিকে ফিরে তাকাবার সময় পর্যন্ত নেই। রাতদিন এক চিন্তা, থিয়েটার খোলা যায় কি করে। থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় সারাক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকার জন্য তাঁর প্রখ্যাত 'বীণা' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলো। কি করবেন, সময় দেবেন কি ক'রে। থিয়েটার খোলার প্রয়োজন যে আর অন্য সব প্রয়োজন থেকে অনেক বড়ো।

রাজকৃষ্ণের অক্লান্ত পরিশ্রম একদিন আকস্মিক সার্থকতা খুঁজে পেলো। ১৮৮৭ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হোল 'বীণা' থিয়েটার। এই থিয়েটারের নাম-করণেও সুক্ষ্ম কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দিকে এই থিয়েটার সম্পর্কে একটি সাময়িক পত্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'অন্যান্য রঙ্গালয়ে যেরূপ স্ত্রীলোকের অভিনয় বারাঙ্গনা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে সেরূপ হয় না। এই পার্থক্যই বীণা রঙ্গালয়ের বিশেষ চিহ্ন ও এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। বাবু রাজকৃষ্ণ রায় বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।'

যাই হোক, বীণা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হোল চন্দ্রহাস, তারপর প্রহ্লাদ চরিত্র, হরধনুর্ভঙ্গ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি। এই সময় কেউ কেউ রাজকৃষ্ণকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। অন্যান্য থিয়েটার অপেক্ষা 'বীণা' থিয়েটারের প্রবেশমূল্য কম করা হয়; উদ্দেশ্য থিয়েটারের প্রতি সাধারণ লোক যাতে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রবেশমূল্য যা পাওয়া যায়, তাতে থিয়েটারের অন্যান্য খরচ মেটে না। তাই রাজকৃষ্ণকে ঋণ করতে হোল।

চিন্তাশীল কবি মানুষ রাজকৃষ্ণ। ব্যবসা-বুদ্ধি একেবারেই কম। দিনের পর দিন তাই ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। কাজেই রাজকৃষ্ণ সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য 'বীণা' রঙ্গালয় তুলে দিলেন আর্য-নাট্য-সমাজের কাছে। ইচ্ছে এইরকম, যদিএভাবে ঋণ কিছু শোধ করা যায়। কিন্তু ফল ভালো হোল না, লোকের

মন ভীড় হোল না থিয়েটারে। সবশেষে র্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর যোগদানে সত্ত্বেও ার্যনাট্যসমাজ 'বীণা' রঙ্গালয় ছেড়ে লেন। রাজকৃষ্ণ তখন ভাড়া দিলেন উপেন্দ্রনাথ দাসকে ঋণের ভার অসহ্য নেই তাঁকে বিবেকের বিরুদ্ধেই কাজ রতে হোল। তিনি জানতেন যে, উপেন্দ্রনাথ রাঙ্গনা অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করাবেন। করবেন, ঋণ তো শোধ করতে হবে।

কিন্তু কাজ হোল না খুব বেশী। এই র কিছু কিছু সাময়িকপত্র বিদ্রূপবাণে র্জরিত করলো রাজকৃষ্ণকে। মনে তখন মছে অনেক গ্লানি, সেই গ্লানি নিয়ে রূপের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন। ঝতে চেষ্টা করলেন কি ভাবে, কি দৃশ্য নিয়ে তিনি থিয়েটার খোলবার থ এগিয়েছেন। কাজে এসে তিনি কি য়েছেন? তাঁর নিজের কথায়—'আমার প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকত তাহা লেও আমার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতাম। ার গন্তব্যপথে কাঁটা পড়িয়াছে। আমার আছে, মান নাই; ভক্তি আছে, শক্তি ।' আবার লিখছেন, 'আমি এক বীণা য়েটার করিয়া মানবচরিত্রের কতোরকম জবাজী, ভেল্কিবাজী দেখিলাম তাহার য নাই। বীণা থিয়েটার না হইলে বোধ সংসার থিয়েটারের এই সকল সংরং খতে পাইতাম না।'

সত্যি ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে তখন রাজকৃষ্ণ রায়কে দেখেছেন, তাঁরা এক- তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর অনুভূতি প্রয়াসকে স্বীকৃতি জানান নি কেন? কিছু অর্থসাহায্য করে এই বিপন্ন নাট্যানুরাগীর চলার পথকে আশার আলোয় ভরিয়ে তোলেন নি?

'বীণা' থিয়েটার উপেন্দ্রনাথের হাতে ছিল মাত্র ছ'মাস। তারপর আবার রাজকৃষ্ণ নিজের হাতে সব দায়িত্ব নিলেন। 'মীরাবাঈ' নাটক অভিনীত। মনে করলেন অভিনেত্রী দিয়েই থিয়েটার আবার ভালো করে আরম্ভ করবেন। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার কথা চতুর্দিকে সঞ্চারিত হবার পর 'নববিভাকর-সাধারণী', 'অনুসন্ধান', 'সুলভ সমাচার', 'কুশদহ' প্রভৃতি সাময়িকপত্র বহু অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে রাজকৃষ্ণের এই আকাঙ্ক্ষাকে আঘাত দিলো। সেকালের সাময়িকপত্রের সম্পাদকদের এই ভূমিকার নেপথ্যে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তার অর্থ হোল চরম হৃদয়হীনতা। সাময়িকপত্রের এই সব হৃদয়হীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে অনেক কথা হয়তো তাঁর বলার ছিল। কিন্তু কি করে বলবেন, সাধ্যও নেই, আর সামর্থ্যও নেই!

আকাশে মেঘ ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠলো। এবার বুঝি সবটুকুই অন্ধকার। ঋণের দায়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন রাজকৃষ্ণ। বীণা থিয়েটার উঠে যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে সিটি থিয়েটার। যাই হোক কয়েকদিন পর স্টার থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার হরি বসু রাজকৃষ্ণ রায়কে নিয়ে আসেন নাট্যকাররূপে। 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটক সেখানে তিনি রচনা করেন। জনপ্রিয়তাও অর্জন করে সেই নাটক। কিন্তু ঋণের বোঝা কমে না। তারপর আবার সেই চিরাচরিত অন্ধকার। আয়ের সমস্ত পথ রুদ্ধ। ছাপাখানাও ইতিমধ্যে বিক্রী হয়ে গেছে। চরম দুর্দিন। পাওনাদারদের কাছে করুণ মিনতি করে বলতে হয়—'থিয়েটারের দারোয়ান, চাকরের সামনে আর অপমান করবেন না। আমি খুব সচেষ্ট আছি। যতো শীঘ্র পারি, টাকা জোগাড় করে আপনার দেনা শোধ করবো।' উত্তরে পাওনাদার বলে—'থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি যা টাকা জোগাড় করবেন জানা আছে। আমারই ভুল হয়েছিল, আপনার মতো লোককে টাকা ধার দেওয়া।' অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখে ক্লান্ত রাজকৃষ্ণ শুধু চেয়ে থেকেছেন।

কিন্তু তবুও আশা ছাড়েন নি। অসহ্য দুঃখ আর যন্ত্রণার আঘাতে জর্জরিত হয়েও তিনি মনে মনে ভেবেছেন নাট্যশালার একদিন সমৃদ্ধি হবেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্তও বোধ হয় তাঁর অনুভব যন্ত্রণামুক্ত হয়নি।

আজকের নাট্যপ্রগতির যুগে দাঁড়িয়ে একবার পিছনে ফিরে রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনের দিকে আন্তরিক দৃষ্টিতে তাকানো উচিত। জানা উচিত কেমন করে বুকভরে আঘাত আর যন্ত্রণা নিয়ে তিনি বাংলার নাট্যশালার উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন। জানি এ জীবন করুণ, জানি এ জীবনের পথচলার ইতিহাস প্রতি মুহূর্তে বিষাদের অধ্যায়কেই মুখর করে তুলবে। তবুও রাজকৃষ্ণ রায়ের করুণতম জীবনের সঙ্গে আমাদের আন্তর পরিচিতি থাকা দরকার, শুধু নাট্যানুশীলনে তাঁর নিবিড় নিষ্ঠার কথা স্মরণ করে নয়, জীবনের আরো গভীরতম প্রয়োজনে। কেননা সেই জীবনই আমাদের চিরন্তন সম্পদ যা দুঃখকে বরণ করে নিয়ে দুঃখের সীমা অতিক্রম করে যাবার আকুলতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।
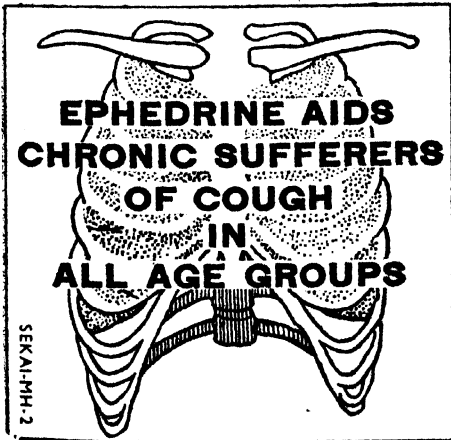
দশ পদকী ভারত

অজয় বসু

কমনওয়েলথ ক্রীড়াভূমি কিংসটন থেকে ঘরে ফেরার পথে ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা দশটি পদক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এক অনুষ্ঠানে দশটি পদক, ভারতের পক্ষে সংগ্রহ হিসাবে এ দৃষ্টান্ত আশ্বাসজনক।

কিংসটন কমনওয়েলথ ক্রীড়ার অষ্টম অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভারত মাত্র চারটি বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল— অ্যাথলেটিকস, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন ও কুস্তি। তার মধ্যে একমাত্র মুষ্টিযুদ্ধ ছাড়া বাকী তিন বিভাগেরই কোনো না কোনো পদক ভারতীয়দের সংগ্রহশালায় জমা পড়েছে। মল্লক্রীড়ায় সঞ্চয় সবচেয়ে চকচকে। সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ, মূল্যবান সব ধাতুতেই সাজানো এই সঞ্চয়ের আঙ্গিক।

গোলাম, রহিম, কাল্লু, কিক্কর সিং, গামা, গোবর পালোয়ানদের দেশ ভারতবর্ষ। কুস্তিতে ভারতীয় ঐতিহ্য যেমন প্রাচীন, তেমনি গৌরবময়। এক সময় পেশাদারী কুস্তিতে ভারতের জোড় ছিল না। সেই ভারতবর্ষের অপেশাদার মল্লরা কিংসটনের মল্লভূমিতে আত্মসচেতনারই পরিচয় রেখেছেন, ঐতিহ্যধারণে ও বহনে বৃষস্কন্ধের ভূমিকা নিয়েছেন, দেখে ভারতীয় ক্রীড়ার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমরা সবাই আজ উৎফুল্ল। আনন্দিত।

মোট আটজন ভারতীয় কুস্তিগীর হাজির ছিলেন কিংসটনে। তার মধ্যে সাতজন বিভাগীয় পদক সংগ্রহে সফল হয়েছেন। স্বর্ণপদক পেয়েছেন হেভিওয়েটে ভীম সিং, ব্যান্টামে বিশ্বম্ভর সিং ও লাইটওয়েটে মুক্তিয়ার সিং। রৌপ্যপদক পেয়েছেন ফ্লাইওয়েটে শাবলে ও ফেদারওয়েটে রণধাওয়া সিং এবং ব্রোঞ্জপদক সংগৃহীত হয়েছে ওয়েল্টারওয়েটে হুকুম সিং ও লাইটহেভিতে বিশ্বনাথ সিংয়ের নৈপুণ্যে।

কমনওয়েলথ ক্রীড়ার কুস্তি প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় অনুষ্ঠান হয়েছে আটটি এবং সেই আটটি বিভাগের নানান পদক ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন ভারতীয় ও পাকিস্থানী মল্লরা। অবিভক্ত ভারতের পাশে। ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত— পাক সাফল্যের এই নজীর নজর কাড়া দৃষ্টান্তটিকে পুরোপুরির মানানসই বলে

পারভিন কুমার

মনে হবে। কারণ ভারতীয় কুস্তির স্বর্ণযুগে যাঁরা ছিলেন যুগধারক তাঁরা এই উপমহাদেশের মাটি মেখে অবিভক্ত ভারতের আখড়ায় ও দঙ্গলে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সেই স্বর্ণযুগ আর কোনোদিন ফিরে আসবে কিনা জানি না, কিন্তু একথা মানি যে একালের ভারতীয় কুস্তিরা নিজেদের জীবনে সেই যুগকে নতুন করে আহ্বান জানাবার জন্যে কিংসটনে সমস্বরে সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করেছেন।

কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সঙ্গে ওলিম্পিক ক্রীড়া বা বিশ্বকুস্তি প্রতিযোগিতার মানের তফাৎ আছে। তবুও বিশ্বাস করা যায় যে উপরে ওঠার চেষ্টায় একটি সিঁড়ি ভাঙা যখন সম্ভবপর হয়েছে তখন পরের সিঁড়ির বাধা জয় করা হয়তো অসাধ্য হবে না।

মোহন ঘোষ

কিংসটনের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষে একমাত্র পদকটি পেয়েছেন উঠতি জোয়ান পারভিনকুমার। পারভিন ১৯৭ ফুট ৩ ইঞ্চি দূরে হ্যামার ছুঁড়ে এই বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পান। বাড়ন্ত তরুণ পারভিন একালে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের সবচেয়ে বড় ভরসা। মিলখা সিংয়ের পরের যুগে একমাত্র গুরবচন সিংকে ঘিরেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় ভারতীয় অ্যাথলিটের সাফল্যের সম্ভাবনা কিছুদিন দৃঢ়মূল হয়েছিল। সেই প্রত্যাশা শিথিল হয়ে ওঠার মুখে পারভিনকুমার নিজের কাঁধে বড়তী দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। বিশ্বাস করি, এই দায়িত্ব বহন করার মতো চওড়া কাঁধ তাঁর আছে। পারভিনকুমার এখনও তাঁর ব্যক্তিগত ক্রীড়ামানের তুঙ্গে উঠতে পারেন নি। ওঠার পালা সবে সুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই এইখানে যতি নয়।

হার্ডলার গুরবচন কি ফুরিয়ে গিয়েছেন? কিংসটনের ট্র্যাকের দিকে তাকিয়ে এ সংশয় প্রকাশ করা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। গুরবচন কিংসটনের হিটে প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু ফাইনালে তাঁকে সবশেষ আসনটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বছর দুয়েক আগে টোকিওর ওলিম্পিক আসরে এ তরুণ স্বল্পপাল্লার হার্ডল দৌড়ের ফাইনালে চতুর্থ স্থান দখল করতে পেরেছিলেন, কমনওয়েলথের সীমাবদ্ধ প্রতিযোগিতায় তাঁর পক্ষে সবার শেষে পিছিয়ে পড়ার দৃষ্টান্তটি নিশ্চয়ই হতাশাব্যঞ্জক। সামনেই এশীয় ক্রীড়া। তার আগে গুরবচন

ং যদি তাঁর পুরনো দিনকে ফিরিয়ে নতে না পারেন তাহলে গুরুবচনের পশ্চিম গতে ঢলে পড়ার কাজটি আর বাকী থাকবে ; তখন আশা জাগাতে থাকবেন সবে নীলমণি ওই পারভিনকুমারই। একা ভিনকুমারই কিংসটনে মিন মিনে তব মতো টিম টিম করে জ্বলেছেন। বাকী ন অ্যাথলিটের মধ্যে গুরুবচন সিং ছাড়া ঃ কেউই প্রাথমিক হিটের গণ্ডী ডিঙিয়ে ঃ এক ধাপও এগোতে পারেন নি।

তিনজন ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ও তিন-ভারোত্তোলক এদেশ থেকে গিয়েছিলেন। দের মধ্যে ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় দীনেশ কিংসটনে তৃতীয় শ্রেষ্ঠের এবং ভারো-লক মোহন ঘোষ ব্যাণ্টাম ওয়েটে দ্বিতীয় ঠের সম্মান পেয়েছেন। মোহন ঘোষ র বিভাগে রেকর্ডও করেছেন।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনে আজ এশীয় ধান তুঙ্গে। আমাদের দীনেশ খান্না য় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন। কিংসটনে তাঁর এশীয় শ্রেষ্ঠের সম্মান হারালেও যাঁরা অতিক্রম করতে পেরেছেন তাঁরাও র প্রতিনিধি। কাজেই দীনেশ খান্নার পদক পাওয়া সত্ত্বেও কমনওয়েলথ ণ্টনে এশিয়ার শীর্ষস্থানই অক্ষুন্ন গিয়েছে। মালয়েশিয়ার ছাত্র তান হয়ে কমনওয়েলথ ব্যাডমিণ্টনে স্বর্ণ স দেশের ইউ চেং হো রৌপ্যপদক ছেন।

সংসটনের নানান ক্রীড়াকেন্দ্র থেকে মুঠো পদক তুলে ব্যাগ ভর্তি করেছে (৩৩+২৪+২৩), অস্ট্রেলিয়া (৮+২২), কানাডা (১৪+২২+৩৪), ল্যান্ড (৮+৫+১৩)। কিন্তু সুইমিং সবচেয়ে বড় আলোড়নের সৃষ্টি করে-স্ট্রেলীয় সাঁতারুরা এবং অ্যাথলেটিক নতুন আফ্রিকার কিপচো কিনো, তেমু প্রমুখ অশ্বেতকায় প্রতি-অ্যাথলেটিকে একমাত্র বিশ্বরেকর্ড হয়েছে স্বল্পপাল্লার রিলে দৌড়ে টোবাগোর অশ্বেতকায় দৌড়বীর-দের।

লেটিকে আর কোনো বিশ্বরেকর্ড না হলেও কেনিয়ার কিপচো কিনো তালি তেমু ব্যক্তিগত সাফল্যের যে ড়েছেন তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। চ কিনো এক মাইল ও তিন মাইল র্ষস্থান পেয়েছেন। কমনওয়েলথ গের সাত সাতটি অনুষ্ঠান উপ-র কোনো অ্যাথলিট দ্বৈত সাফল্যের মাল্যটি নিজের গলায় ঝোলাতে ।

তিন মাইল দৌড় সবার আগে শেষ করতে কিপচো কিনো বিশ্ববিশ্রুত ও বিশ্বের বিবিধ রেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রে-লিয়ার রণ ক্লার্ককে হারিয়েছেন। এক মাইল ও তিন মাইলের স্বর্ণপদক পাবার পথে কিপচো কিনো দুটি বিভাগেই কমনওয়েলথ ক্রীড়ার পুরানো রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েছেন।

মাইল দৌড়ে কমনওয়েলথের রেকর্ড ছিল ডাঃ রোজার ব্যানিস্টারের ৩ মিনিট ৫৮·৮ সেকেন্ড। মাইল দৌড়ে চার মিনিটের বাধা ভাঙায় পথিকৃৎ এই রোজার ব্যানিস্টার আর এক বিশ্ববিশ্রুত অ্যাথলিট অস্ট্রেলিয়ার জন ল্যান্ডিকে হারিয়ে ভ্যাংকোভারে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। উত্তরপর্বে অস্ট্রেলিয়ার হার্ব ইলিয়ট, নিউজিল্যান্ডের পিটার স্নেলের মতো 'সুপার অ্যাথলিটরা' কমন-ওয়েলথ ক্রীড়ার আসরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ব্যানিস্টারের রেকর্ডটি অস্পর্শিত ছিল। কিনো এসেই ওই রেকর্ডটি হাতিয়ে নিয়েছেন।

কিপচো কিনো দ্বিতীয় রেকর্ডটি ছিনিয়ে নিয়েছেন আর এক দিকপাল অ্যাথলিটের নাগাল থেকে। ইনি হলেন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মারে হলবার্জ। নিউ-জিল্যান্ডের মারে হলবার্জ ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে তিন মাইল দৌড়েছিলেন। আর কিপচো কিনো নির্ধারিত পথ উৎরে গেলেন ১২ মিনিট ৫৭·৪ সেকেন্ডে। তবে আন্ত-র্জাতিক অ্যাথলেটিকসের সমকালীন ইতি-হাসে কিপচো কিনোর খ্যাতি দূরবিস্তৃত। সঠিক হিসাবে বলা যেতে পারে যে মাইল থেকে তিন মাইল দৌড়ে তাঁর সমকক্ষ প্রতি-দ্বন্দ্বী দু একজনের বেশী নেই। কাজেই কিংসটনে কিপচো কিনোর সাফল্য ছিল অনেকটা প্রত্যাশিত। কিন্তু নাফতালি তেমুর সাফল্য যেন অভাবনীয়।

নাফতালি তেমু টোকিও ওলিম্পিকে স্বদেশ কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বটে, কিন্তু টোকিওর ম্যারাথন দৌড়ে কমকরে আটচল্লিশজন প্রতিযোগী তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান। অগ্রবর্তী সেই দলে অনগ্রসর অনেক দেশেরই অ্যাথলিট ছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনার ক'মাস পর কিংসটনে এসে এই নাফতালি তেমু দু-মাইল দৌড়ে কমনওয়েলথ রেকর্ড করেছেন এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী রণ ক্লার্ককে হারিয়ে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক আসরে দস্তুরমতো সাড়া জাগিয়েছেন। কিসিমাই উপজাতীয় তরুণ বাইশ বছরের তরুণ নাফতালি তেমুকে আবিষ্কার করার সূত্রে এই ধারণাই আজ বিশেষজ্ঞমহলে গভীরতর হতে চলেছে যে সুবিস্তৃত আফ্রিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে আরও কতো অখ্যাত তরুণ আগামী-কালের জন্যে তৈরী হচ্ছেন। তাঁদের আচরণে জাগরণের লক্ষণ স্পষ্ট। হয়তো মেকসিকোর শৈলশিখরে বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়াপ্রাঙ্গণেই তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

একটি কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার নিজেদের সামর্থ্যের প্রতি সুবিচারের তাগিদে যে কেনিয়ার কিপচো কিনো আর নাফতালি তেমু, ত্রিনিদাদ-টোবাগোর রিলে রানাররা বা অ্যাথলেটিক আসর, ঘানার তরুণেরা মুষ্টিযুদ্ধের রিং মাতিয়ে দিলেও আফ্রিকার কোনো অঞ্চল বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের অশ্বেত ক্রীড়া-বিদেরা এবার কিংসটনে ভারতীয়দের মতো দশটি পদক সংগ্রহ করতে পারেন নি। কেনিয়া, ঘানা, ত্রিনিদাদ-টোবাগো ও পাকিস্থানের স্বর্ণসঞ্চয় বাড়তী হলেও সামগ্রিক খতিয়ানে ভারত প্রাপ্ত পদকসংখ্যা বেশী। বেশী পদকের হিসেবে ভারতকে ডিঙিয়ে যেতে পেরেছে নিউজিল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ড।

কিংসটনে সামগ্রিক মানের নিরিখে সব-চেয়ে উঁচু দরের অনুষ্ঠান হয়েছে সুইমিং পুলে। নয় নয় করে ১৪ বার বিশ্বরেকর্ড অতিক্রান্ত হয়েছে সাঁতারের বিভিন্ন বিভাগে। পুলের জলের তাপ যাচাইয়ের পর এই সব রেকর্ড আনুষ্ঠানিক মর্যাদার স্বীকৃতি পাবে কিনা তা স্বতন্ত্র কথা। কমনওয়েলথের বিশেষ করে অস্ট্রেলীয় সাঁতারুরা যে এই উপলক্ষে মুখ্য ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন তাতে কোনা সন্দেহ নেই। তাঁদের দলে পুরোবর্তী অস্ট্রেলীয় চৌকশ পিটার রেনল্ডস এবং কানাডার পঞ্চদশী এলেন টানার। এলেন সাতটি বিভাগে যোগ দিয়ে চারটি স্বর্ণ ও তিনটি রৌপ্যপদক পেয়েছেন এবং রেনল্ডস অর্জন করেছেন টানারের মতোই চার চারটি স্বর্ণ-পদক।

খেলাধূলা

দর্শক

বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস

জামাইকার কিংস্টনে আয়োজিত অষ্টম বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস গত ১৩ই আগস্ট শেষ হয়েছে। দশদিনব্যাপী (৪ঠা থেকে ১৩ই আগস্ট) এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে যেসব নতুন গেমস রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্তরণের ১৪টি বিশ্বরেকর্ড। সেই তুলনায় এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানটি নিষ্প্রভ। এ্যাথলেটিকসের মাত্র একটি অনুষ্ঠানে (পুরুষদের ৪×৪৪০ গজ রীলে) বিশ্ব-রেকর্ড হয়েছে। সুতরাং সদ্য সমাপ্ত অষ্টম কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানটিকে নিঃসন্দেহে সাঁতারুদের বিরাট সাফল্যের আসর বলা যায়। পদক লাভের চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে ইংল্যান্ড—মোট পদক ৮০ (স্বর্ণ ৩৩, রৌপ্য ২৪ ও ব্রোঞ্জ ২৩), দ্বিতীয় স্থান অস্ট্রেলিয়া (মোট পদক ৭৩) এবং তৃতীয় স্থান কানাডা (মোট পদক ৫৭)। স্বর্ণপদক পেয়েছে ইংল্যান্ড ৩৩, অস্ট্রেলিয়া ২৩ এবং কানাডা ১৪। এই তিনটি দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের পক্ষে ১০টি স্বর্ণপদক জয় সম্ভব
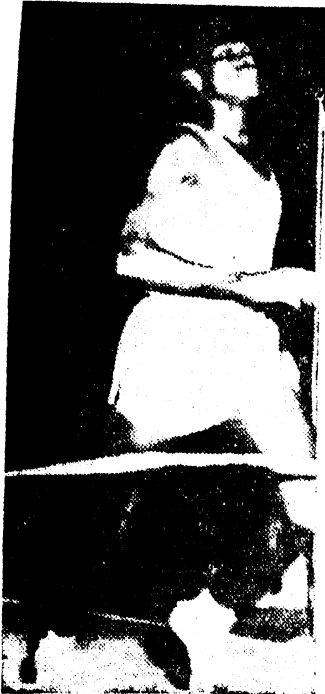
১ ও ৩ মাইল দৌড়ে স্বর্ণপদক বিজয়ী কিপচো কিনো (কেনিয়া)

হয়নি। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় বৃটিশ কমনওয়েলথের ৩৫টি দেশের ১,০০০ হাজার প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী নবম বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে ১৯৭০ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে।

১৯৬৪ সালের অলিম্পিক লং-জাম্প চ্যাম্পিয়ান শ্রীমতী মেরী র‍্যান্ড (ইংল্যান্ড) এবং লিন ডেভিস (ওয়েলস) আলোচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের লং-জাম্পেও স্বর্ণপদক জয় করে নিজেদের অলিম্পিক সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছেন। ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করেছেন স্কটল্যান্ডের জিম অল্ডার। কমনওয়েলথ গেমসে নিউ জিল্যান্ডের শ্রীমতী ভ্যালেরী স্লোপার-ইয়ংয়ের সাফল্য বিশেষ

১১০ মিটার ডিং সাঁতারে স্বর্ণপদক বিজয়িনী কুমারী লিন্ডা লডগ্রেভ (ইংল্যান্ড)

উল্লেখযোগ্য। এইবার নিয়ে তিনি পাঁচটি স্বর্ণপদক পেলেন—১৯৫৮ সালে সটপুটে, ১৯৬২ সালে সটপুট ও ডিসকাসে এবং পুনরায় ১৯৬৬ সালে সটপুট ও ডিসকাসে। তাঁর এই সাফল্যের দ্বিতীয় নজির নেই।

এ্যাথলেটিক্সের ১ মাইল, ৩ মাইল এবং ৬ মাইল দৌড় অনুষ্ঠানে কেনিয়ার স্বর্ণপদক জয় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেনিয়ার পুলিশম্যান কিপচো কিনো ১ মাইল ও ৩ মাইল এবং নাফতালি তেমু ৬ মাইল দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করেন। কিনো ১ মাইল এবং ৩ মাইল দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করে 'ডাবল' খেতাব লাভ করেছেন। কমনওয়েলথ গেমসের একই বছরের অনুষ্ঠানে একজন এ্যাথলীটের পক্ষে ১ মাইল ও ৩ মাইল দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের নজির

লংজাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী লিন ডেভিস (ওয়েলস)

এই প্রথম। ১ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে কিনোর ৩ মিনিট ৫৫-৩ সেকেন্ড (নতুন গেমস রেকর্ড) লেগেছিল। ৩ মাইল দৌড়ে কিনো বিশ্ব-বিশ্রুত দৌড়বীর অস্ট্রেলিয়ার রণ ক্লার্ককে পরাজিত করেন। এই ৩ মাইল দৌড় শেষ করতে কিনোর সময় লেগেছিল ১২ মিনিট ৫৭-৪ সেকেন্ড (নতুন গেমস রেকর্ড) এবং ক্লার্কের ১২ মিনিট ৫৯-২ সেকেন্ড। ৩ মাইল দৌড়ে রন ক্লার্ক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড থেকে কিনো ৭ সেকেন্ড বেশী সময় নিয়েছিলেন। ১ মাইল দৌড় শেষ করতে কিনোর সময় লাগে ৩ মিনিট ৫৫-৩ সেকেন্ড (নতুন গেমস রেকর্ড)। ১ মাইল দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড আছে আমেরিকার জিম রিউনের—সময় ৩ মিনিট ৫১-৩ সেকেন্ড।

কেনিয়ার অখ্যাতনামা দৌড়বীর নফতালি তেমু (বয়স ২৩) ৬ মাইল দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড স্রষ্টা অস্ট্রেলিয়ার রন ক্লার্ককে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয় করেন। অ্যাথলেটিক্সের আন্তর্জাতিক আসরে এরকম অপ্রত্যাশিত ফলাফলের নজির লোকের স্মরণ হয় না। তেমুর ৬ মাইল দৌড় শেষ করতে ২৭ মিঃ ১৪-৬ সেঃ (নতুন গেমস রেকর্ড) সময় লাগে—বিশ্ব-রেকর্ড সময় থেকে মাত্র ৩ সেকেন্ড বেশী। তেমুর সঙ্গে রন ক্লার্ক কোন সময়েই পাল্লা দিতে পারেননি, অসহায়ভাবে তিনি পরাজয়

স্বীকার করেন। তেমু যখন দৌড় শেষ করেন, তখন ক্লার্ক তাঁর থেকে ১৫০ গজ পিছনে পড়ে ছিলেন।

তেমুর এই বিরাট সাফল্যে হাজার হাজার দর্শক আনন্দধ্বনিতে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামটি মুখরিত করে তুলেছিলেন। এইদিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সাফল্য তেমুর সাফল্যের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের সাফল্য

অষ্টম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতবর্ষের ২৩জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে মোট ১০টি পদক জয় করেন (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ৩)। এই দশটি পদকের মধ্যে কুস্তিতেই আছে ৭টি পদক। সুতরাং ভারতীয় মল্লবীরগণই স্বদেশের মুখ যথেষ্ট রক্ষা করেছেন। বাকি ৩টি পদক হল—ভারোত্তোলন (রৌপ্য ১), হাতুড়ি নিক্ষেপ (রৌপ্য ১) এবং ব্যাডমিন্টনে (ব্রোঞ্জ ১)।

স্বর্ণপদক (৩) :

হেভিওয়েটে ভীম সিং, ব্যান্টামওয়েটে বিশ্বম্ভর সিং এবং লাইটওয়েটে মুখতিয়ার সিং।

রৌপ্য পদক (৪) :

কুস্তির ফ্লাইওয়েটে এস সাবলে এবং ফেদারওয়েটে রণধাওয়া সিং; ভারোত্তোলনে মোহন ঘোষ এবং হাতুড়ি নিক্ষেপে প্রবীণ কুমার।

ব্রোঞ্জ পদক (৩) :

কুস্তির ওয়েল্টার ওয়েটে ডি সিং এবং লাইট-হেভী ওয়েটে বিশ্বনাথ সিং; ব্যাডমিন্টনে দীনেশ খান্না

সন্তরণ : এই বিভাগে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড—এই পাঁচটি দেশ পদক জয় করেছে। স্কটল্যান্ড পেয়েছে মাত্র একটি পদক (রৌপ্য)। সন্তরণে মোট ১৪টি বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে এবং দুটি অনুষ্ঠানে পূর্বের বিশ্ব-রেকর্ড সমান হয়েছে। সন্তরণে ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন পুরুষ বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার পিটার রেনোল্ডস এবং মহিলা বিভাগে কানাডার পনের বছর বয়সের কুমারী ইলাইন ট্যানার। রেনোল্ডস জয় করেছেন ৪টি স্বর্ণ পদক এবং কুমারী ট্যানার সাতটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে মোট ৭টি পদক (স্বর্ণ ৪ এবং রৌপ্য ৩) জয়ী হয়েছেন।

ফেন্সিং : এই বিভাগের মোট ৮টি স্বর্ণপদকই জয় করেছে ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড দলে ছিলেন ৮জন পুরুষ এবং ৩জন মহিলা।

কমনওয়েলথ গেমস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কোন একটি দেশের পক্ষে এই বিভাগের সমস্ত স্বর্ণপদক জয়ের নজির এই প্রথম।

স্যুটিং : প্রতিযোগিতার এই নতুন অনুষ্ঠানের মোট ১৫টি স্বর্ণপদকের মধ্যে কানাডা ৫টি স্বর্ণপদক জয় করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে ক্যাসিয়াস ক্লে (ডানদিকে) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রায়ান লন্ডনকে প্রচন্ড ঘুষিতে ঘায়েল করেছেন। ক্লে তৃতীয় রাউন্ডে জয়ী হন।

ম্যারাথনে স্বর্ণপদক বিজয়ী জিম অল্ডার (স্কটল্যান্ড)

ব্যাডমিন্টন : প্রতিযোগিতার এই নতুন বিভাগে প্রাধান্য লাভ করে ইংল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া। ইংল্যান্ড ৬টি পদক (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ১) জয় করে; অপরদিকে মালয়েশিয়া পায় ৫টি পদক (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ১)।

পদকলাভের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ইংলন্ড	৩৩	২৪	২৩
অস্ট্রেলিয়া	২৩	২৮	২২
কানাডা	১৪	২০	২৩
নিউজিল্যান্ড	৮	৫	১৩
ঘানা	৫	২	২
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	৫	২	২
পাকিস্থান	৪	১	৪
কেনিয়া	৪	১	৩
ভারতবর্ষ	৩	৪	৩
নাইজেরিয়া	৩	৪	৩
ওয়েলস	৩	২	২
মালয়েশিয়া	২	২	১
স্কটল্যান্ড	১	৪	৪
উত্তর আয়ারল্যান্ড	১	০	০
জামাইকা	০	৪	৮
বাহামাস	০	১	০
বারমুডা	০	১	০
গায়না	০	১	০
পাপুয়া ও নিউগিনি	০	১	০
উগান্ডা	০	০	৩
বারবাডোজ	০	০	১

সন্তরণ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
অস্ট্রেলিয়া	১০	১০	৯
ইংল্যান্ড	৯	৪	৯
কানাডা	৭	১১	৬
নিউজিল্যান্ড	১	১	৩
স্কটল্যান্ড	০	১	০

অন্ধ অভিনেতা ॥

আনন্দ বাগচী

মনে হয় অলৌকিক স্টেজের উপরে অন্ধ হয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছি, চোখেমুখে তীব্র আলো এসে লাগে
দু-চোখ ধাঁধায়, কিছু দেখতে পাই না জ্যোৎস্নায় প্লাবিত
নক্ষত্র আলোকে প্লুত, ধূলিজলে, মাতাল পবনে
আমার সম্মুখে নারী ডাইনে-বাঁয়ে পশ্চাতে রমণী,
কি করে ফেরাতে হয়, কাছে ডাকতে, ভুলে যাচ্ছি সব
উইংসের দিকে চেয়ে; অন্ধকার বিশাল গহ্বরে
প্রম্পটার মিলিয়ে আছে ঈশ্বরের মত অনায়াসে
নিষ্ঠুর নৈঃশব্দ্যে, সামনে স্তব্ধ করতালি বসে আছে;
কিছুই পাচ্ছি না দেখতে শুধুই মুখস্ত কথাগুলি
নিজের বুকের মধ্যে নিদারুণ ভীত পিপাসায়
খুঁজি, চোখে তীব্র আলো, সংসারের যবনিকা দোলে।

অত্যন্ত নিকটে কোনো মৃত্যু আছে, বিশাল ডাকঘর
বজ্রের মতন তার শীলমোহর অদৃশ্য আখরে
নেমে আসে অনিবার্য, অতিনাটকীয় দক্ষতায়।
মর্গে গিয়ে দাঁড়ালাম, পৃথিবীর ধূসর টিকেট
পায়ে বাঁধা, নির্জন ভোল্টের মধ্যে শান্ত শুয়ে আছে
পিতৃলোক, অন্ধকারে শীতল ড্রয়ারে মৃতদেহ
নিরুদ্দেশ নগ্নতায়, য়্যুক্যালিপটাসের শিশি কেউ
আমার আচ্ছন্ন চেতনার মধ্যে খোলে, ছোঁড়ে ফুলের স্তবক।
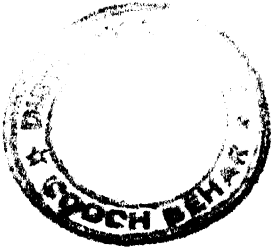
নদীর ওপার ॥

বিজয়কুমার দত্ত

এ জন্মের ইতিহাসে কিছু ক্ষোভ রেখে যাব' চলে—
সময়ের মুগ্ধ পটে, তুলির বাঁকানো রেখা, রঙে
গাঢ় তমসার ছায়া এ'কে রাখবো। যদি কোনদিন
আরেক জন্মের ভোরে জেগে উঠি সুনীল চমকে,
রৌদ্রের উত্তাপে যদি স্বর্ণপ্রভ ক্ষমা জেগে ওঠে—
জাতিস্মর চেতনায় সেদিন তোমায় ডাকবো প্রিয়তমা বলে।'

হয়তো বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠবো, 'আমি বিগত জন্মের সাধে
ফিরে পেতে চাই, সেই বিষণ্ণ মায়ের স্মৃতি বুক ভরে নিয়ে
অস্থির স্বপ্নের মতো অপমান, লজ্জা ভয়, আবদ্ধ ঘরের
রৌদ্রময় অনুভবে—প্রিয়চারী রমণীর মুখে
জ্বলে উঠতে চাই, তীব্র রক্তের আস্বাদে।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

...বিত্রী থিয়েটরে কথনো প্লে করে, কখনো বা করে সত্যনারায়ণ থিয়েটরে। তার উপর আবার আছে এখানে-ওখানে যাওয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক এলে সেখানেও যায় দল বেঁধে, আবার যায় বাংলার বাইরেও।

...খের কোনো পরিশ্রমকে এতটুকু ...ঝাট বলে মনে করে না। অভিনয় ছেড়ে ...লেও টাকার অভাব তার হবে না—এ কথা ...স জানে। কিন্তু অভিনয় ছাড়তে সে রাজি ...। এই লাইনে এসেছিল ব'লেই আজ তার ...ত নামডাক, এত কদর, এত খাতির আর ...মন খ্যাতি।

বিনোদিনীতে আর তাতে তফাত এই-...নে।

অনেকদিন হল ছেড়ে এসেছে চোর-...বাগান। সেখানে যাওয়া আর ঘটে উঠে না ...। কিন্তু ঐ এলাকাটা জড়িয়ে আছে তার ...ক্ত আর মজ্জায়। ওখানকার অনেক কথাই ...খন স্মৃতি হয়ে গিয়েছে; ওখানকার ...নো কোনো ঘটনার কথা ভাবলে এখনো ...ত্যে গায়ে কাঁটা দেয়।

মনে হয় মেনকার কথা। তার মায়ের ...থা, তার ভাই নীলুর কথা, আর তার ...বা পীতাম্বরের কথা। কী ভাবে এখন ...ছে তারা তা ভগবানই জানেন। তাদের ...ই ছোট্ট সংসারটির কথা তার মনে হয়। ...ন হওয়া মাত্র নিজের ঐশ্বর্যের দিকে ...কায় বনবিহারিণী, নিজের গলার পাঁচ-...নী হারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

থিয়েটর হয় সপ্তাহে মাত্র তিন দিন। ...র সব দিনই তার ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনেও পুরো ছুটি তার নেই। আছে রিয়ার্সেল। এই সব নিয়েই কেটে চলেছে তার দিন।

কিন্তু রাত্রি কাটে অন্যভাবে। সে কথা থাক্।

পোস্তার মদনমোহনবাবু জুড়িগাড়ি চেপে এলেন। গোঁফটা চুমড়ে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, কে তুমি?

লোকটা থতমত খেয়ে গেল, একটু থেমে তারপর বলল, আমি থিয়েটরের লোক। আমার নাম উমানাথ।

পোস্তার মদনমোহনবাবু একটু আশ্চর্য হলেন। সিঁড়ির মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানেটা কি। লোকটাকে তো ভদ্র-লোকের মতই মনে হয়, কিন্তু ছোটলোকের মত এখানে ঘুর-ঘুর করার অর্থটা কি।

খুব বিরক্তির সঙ্গে মদনমোহনবাবু আর কয়েক ধাপ উঠে গিয়ে বনবিহারিণীর দরজায় দাঁড়ালেন।

পায়ের শব্দ শুনে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বনবিহারিণী বলল, আসুন। আজ একটু দেরি হয়ে গেল মনে হচ্ছে যেন।

কাঁধের চাদরটা নামিয়ে রাখতে-রাখতে মদনমোহনবাবু বললেন, তা হবে না কেন। কাঁটা ডিঙিয়ে আসতে হল-যে!

—কাঁটা? কাঁটা কিসের? কাঁটা কোথায়?

মদনবাবু খুলে বললেন কথাটি।

ভুনী বলল, ঠিক। কাঁটাই বটে। আমার সর্বাঙ্গে সব সময় খচখচ ক'রে বিঁধছে। সে কি আজকের কথা? পাঁচ-ছয় বছর হয়ে গেল। যেদিন থেকে এসেছি নাটক করতে; সেইদিন থেকে ঐ মানুষটা আছে সঙ্গে সঙ্গে।

তাকিয়াতে শরীরটা ঢেলে দিতে-দিতে মদনমোহনবাবু বললেন, বিদায় দিয়ে দিতে পার না?

—বিদায় দেব কী ক'রে? ও কি আমার লোক. না, আমার মানুষ। ও আমার কেউ না, আমার নোকরও না, আমার নফরও না।

কথাটা ব'লে বনবিহারিণী একটা হাত মদনবাবুর বুকের উপর রাখল। হাতটা রাখা মাত্র তাঁর বুকের জ্বালা যেন জল হয়ে গেল। তিনি বললেন, সত্যি, পৃথিবীতে কত রকম আজব মানুষই না আছে!

উমানাথ সত্যিই একটা আজব মানুষ। বিনোদিনী নাট্যসমাজের সঙ্গে তার যোগ অনেক দিনের। অভিনয় সে করে না, অভি-নয় করার ইচ্ছেও তার নেই। মেক-আপম্যান আছে, সে কাজেও তার টান নেই। সিন টানা তার দ্বারা হয় না। কিন্তু একটা কাজে সে বেশ রপ্ত—ফরমাশ খাটতে সে বেশ পটু।

এই নাট্যসমাজের সঙ্গে নিজেকে সে একেবারে জড়িয়ে ফেলেছে। এবং এই নাটকের দলটিও দেখেছে যে, এমন-একজন লোক দলে থাকা খুবই দরকার। কখন কোন্ সাজটা চাই, কখন কোন্ পরচুলা—অল্পসময়ের মধ্যে বাজার ঘুরে তা জোগাড় ক'রে আনতে হবে। বিনোদিনীর তাই এর উপরে খুব বিশ্বাস। এইজন্যে উমানাথ একেবারে আঠা হয়ে লেগে আছে এই দলটির সঙ্গে।

কিন্তু কখন কাকে কার চোখে লেগে যায়, বলা বড় শক্ত। কত মেয়ে এল-গেল এই দলে, কত মেয়ে উঠল-পড়ল, কতজনের সঙ্গে কত আলাপ হল, কত ভাব হল উমানাথের। কিন্তু হঠাৎ যেদিন এল কচি মেয়ে ভুনী, সেইদিন উমানাথ কেমন-যেন

আলাদা মানুষ হয়ে গেল। কেমন-যেন অন্য-রকম হয়ে গেল।

কিন্তু ভুনীর তখন মনের অবস্থাটাও অন্যরকম। সেই মনের অবস্থার মধ্যে উমানাথের এই আগ্রহটা তার কাছে বড় বিস্বাদ ঠেকল। প্রথম-দর্শনেই যে বিরূপভাব তার এল, সে ভাব ক্রমশঃ তিল থেকে তাল হয়ে গেল। ভুনী আর বদল করে নিতে পারল না সেই ভাবটা।

এখনো সেই বিতৃষ্ণার ভাবই চলেছে।

মদনমোহনকে একে-একে সব কথা বলল বনবিহারিণী। বলল, লোকটার উপর মায়া হয়, কিন্তু টান হয় না। ওকে দেখলেই গা জ্বালা করে।

—করবেই। মদনমোহন ভুনীর কথায় সায় দিয়ে বলল, করারই কথা। ওর আদব-কায়দাই কি-রকম যেন। আমি তো কিছু জানিনে, ওকে চিনিও নে। কিন্তু সিঁড়ির ওপর ওকে দেখামাত্র জ্বলে উঠল আমার সারা শরীর।

শব্দ করে হেসে উঠে মদনমোহনের গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল বনবিহারিণী। বলল, জ্বালা এখন কমেছে তো?

এইভাবে কত মানুষের কত জ্বালা জুড়িয়ে দিয়েছে ও দিচ্ছে সে। কিন্তু উমানাথই এখনো একা।

সে উমানাথ বটে; কিন্তু ভুনীর কাছে সে কিন্তু উমানাথ নয়, সে উমিচাঁদ।

ভুনী যখন প্রথম নায়িকা হল, তখন তার সঙ্গে যে নায়ক সাজত তার নাম ছিল ঐ—উমানাথ। মঞ্চেও সে ছিল তার নায়ক, মঞ্চের বাইরেও ছিল নায়ক। অর্থাৎ, প্রকাশ্য-নায়ক ও নেপথ্য-নায়ক—দুই-ই ছিল সেই উমানাথ। যেমন ছিল তার তেজ, তেমনি গলা, আর তেমনি বিক্রম। সারাটা জীবন একসঙ্গে কাটিয়ে দেবার মত মানুষই ছিল বটে সে। ভুনীর জীবনটা উমানাথ তখন গ্রাস করে ফেলেছে। উমানাথকে নিয়ে সে দূরে কোথাও চলে যাবে, এমন কথাও সে বলেছে উমানাথকে।

দলে তখন দুই উমানাথ। একজন নায়ক উমানাথ, একজন নফর উমানাথ। একজন ছিল সম্মানের, একজন ছিল খোরাব। একই নামে দুজনকে ডাকলে দুজন পাছে প্রায় সমান-সমান হয়ে যায়—এরকম তখন মনে হয়েছিল ভুনীর।

তাই, একদিন হঠাৎ ভুনী তাকে ডাকল, বলল, এই এই!

বেণীতে জড়াবার জরির লম্বা ফিতে গুটিয়ে রাখছিল উমানাথ, এরকম ডাক শুনে হাতের জরি ফেলে রেখে ছুটে এল সে।

ভুরুটা একটু উঁচুতে তুলে ভুনী বলল, তোমাকে এই-এই করে ডাকতে পারব না। তোমাকে উমিচাঁদ বলে ডাকব।

—কেন?

—কেন আবার কি! আমার ইচ্ছে।

চমকে গেল উমানাথ, কিছু উত্তর দিতে পারল না।

ভুনী বলল, আমাদের নায়কের নাম উমানাথ। তুমি তো আর নায়ক না। তুমি হলে গিয়ে ইয়ে—

উমানাথ একটু ভাবল, বলল, আচ্ছা।

তার এই নাম-বদলে সে দুঃখিত হল, না, খুশি হল তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু এটুকু বোঝা গেল যে, সে মেনে নিল এই বদলটা।

ভুনী বলল, আর, শোনো, অমন করে আমার দিকে তাকাবে না।

উত্তর না দিয়ে উমিচাঁদ চলে গেল নিজের কাজে।

সেইদিন থেকে সে আর উমানাথ নয়। দলের সব লোকই তাকে তার এই নতুন নামে ডাকা আরম্ভ করল।

যার জন্যে তার এই বদল হল এই নাম, সেই নায়কটিও বেশিদিন টিকল না। এখানকার ফুলবনের মধু লুণ্ঠন করে সে অন্য বনে চলে গেল। সে এখন শেফালিকার সঙ্গে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে নায়ক সাজে।

সব রকম উপেক্ষা অনাদর অবহেলা অবজ্ঞা সহ্য করে চলেছে উমিচাঁদ। কোনো কথা বলে না, কোনো কথা শুনতেও চায় না, কেবল দূরে থেকে চেয়ে থাকে বনবিহারিণীর দিকে। কী রূপ, কী শরীর, কী স্বাস্থ্য! উমিচাঁদকে চুম্বকের মত সে টেনে ধরে আছে, অথচ ঐ চুম্বকে একটু ছোঁয়া সে পাচ্ছে না। উমিচাঁদের মনে হয়, তার জীবনের সবকয়টা তন্ত্রী যেন জড়িয়ে আছে বনবিহারিণীকে।

তার নাম বদল করে দিয়েছে ভুনী। এর জন্যে দুঃখ তার নেই। সে এটাকে বদল বলে মনে করে না। সে মনে করে যে, ভুনী তার একটা নতুন নাম রেখেছে।

ভুনীর কাছাকাছি আসার সুযোগ খোঁজে কেবল উমিচাঁদ। রিয়াসেলের সময় যদি জলতেষ্টা পায় ভুনীর অমনি উমিচাঁদ চট করে উঠে গিয়ে এক গেলাস জল এনে দেয়। রিয়াসেল দিতে-দিতে শরীরের ঝাঁকুনিতে যদি বেণী আলগা হয়ে মাথার কাঁটা পড়ে যায়, অমনি তা কুড়িয়ে ভুনীর হাতে দিয়ে দেয় উমিচাঁদ।

বছরের পর বছর চলেছে এই তপস্যা। অথচ, এ-তপস্যায় তুষ্ট করা গেল না কাউকে। এক-এক সময় আক্ষেপ হয় উমিচাঁদের। কত মানুষ তো আসছে-যাচ্ছে তার কাছে, একদিন সেই শোভাযাত্রার মধ্যে কি উমিচাঁদকে সে ডেকে নিতে পারে না?

এক-এক সময় ইচ্ছে হয় যে, সে ছেড়ে যাবে এই বিনোদিনী নাট্যসমাজ। ইচ্ছেটা হওয়ামাত্র তার মন হাহাকার করে ওঠে। তার মনে হয়, তাহলে তার ফুরিয়ে যাবে বুঝি জীবনের সব সাধ, আর সাধনা। ইচ্ছেটাকে সরিয়ে রেখে সে দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ করে কাজ। যে যা ফরমাশ করে, তা তালিম করার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

দুনিয়ায় তার কেউ নেই, সে একা ও সে একক। অন্য কোথাও কোনো দায়ও তার নেই, কোনো দায়িত্বও নেই। অন্য কারও উপর কোনো মায়াও নেই, কোনো মমতাও নেই। তাই, সে নিজেকে সমর্পণ করেছে এখানে—এই নাট্যসমাজে। এখানে সামান্য যা পায়, তাই দিয়ে হেসে-খেলে চলে যাচ্ছে তার।

হেসে-খেলে কথাটা অবশ্য কথার কথা। বিশেষ হাসি পায় না উমিচাঁদের। হাসি প্রায় সে ভুলেই গিয়েছে।

কিন্তু তবু আছে। না থেকে উপায় নেই বলেই আছে। চলে যাওয়ার সাধ্য নেই বলেই আছে।

বনবিহারিণী একেবারে পাথর দিয়ে তৈরি নয়। তার শরীরটা পাথর কেটে গড়ে তোলা একটি অপরূপ নারীমূর্তির মতই অবশ্য, তবু সত্যি সে পাথর নয়। উমিচাঁদের কথা সে ভাবে। লোকটার উপর সত্যি তার ভীষণ বিতৃষ্ণা, ও কাছে এলেই ভীষণ ঘেন্না লাগে। কিন্তু, তার জন্যে দায়ী যে উমিচাঁদ নয়—তাও বোঝে বনবিহারিণী। হঠাৎ এমন-এক সময়ে সে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল দু' চোখে প্রচুর লালসা নিয়ে, যখন জীবনের একটা দুর্ঘটনার জন্যে পুরুষ-জাতটার উপরেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। ঐ সময়ে সে না এসে যদি কিছুকাল পরে আসত, তাহলে হয়তো এমন হত না। যাকে একবার ঘৃণা করে ফেলেছে, যাকে কৃমিকীট বলে একবার মনে করে ফেলেছে, তাকে অন্য চোখে দেখা আর সম্ভবই না। একটু দেরিতে এলেই সে পারত। দেরিতে অন্য যারা এসেছে বা আসছে, তারা কি তার কাছে অমন কঠিন ব্যবহার কখনো পেয়েছে?

কিন্তু থাক। ওসব বাজে-চিন্তা দিয়ে সময় বাজে-খরচ করতে ভুনী রাজি নয়।

তিনটে নাটকের রিয়াসেল চলেছে একসঙ্গে। এখন ভুনীর অনেক কাজ। বিষবৃক্ষ, সধবার একাদশী ও কিঞ্চিৎ জলযোগ।

লম্বা পাড়ি দেবে এবার বিনোদিনী নাট্যসমাজ। প্রথমে দিল্লিতে যাবে, তারপর লাহোরে। ভুনীর একটা বাচ্চা হয়েছে। তবু, তার উৎসাহ খুব। বাচ্চার জন্যে বাধা কি। ভুনীর মাও তো যাচ্ছে সঙ্গে। বাচ্চা সামাল দেবে ভুনীর মা।

কয়েকদিন ধরে খুব জোর রিয়াসেল চলল। দলে প্রায় চল্লিশজন লোক—মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে। সেই দল চলল দিল্লিতে।

দিল্লিতে খুব ঘটা করে অভিনয় হল। অভিনয় দেখে লোকে মুগ্ধই হল বলতে হবে। অনেক টাকাও সংগ্রহ হল। কিন্তু এই নাট্যসমাজ যতই নাম করুক, সবার মুখেই এক নাম—বনবিহারিণী। এক মস্ত ধনী লোক তো তাকে বিয়ে করে রেখে দেবার জন্যে পাগলো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোলে নতুন বাচ্চা আছে শুনে পিছিয়ে গেল।

দিল্লি থেকে লাহোরে গেল সেই দল। সেখানেও সেই একই উপদ্রব। একদিন তারা রাবি নদীতে গিয়ে মনের আনন্দে স্নান করছে, এমন সময়ে এক পালোয়ান এসে

হাজির। তার আর-কোনো বায়না নেই, সে চায় ঐ মেয়েটিকে বিবি করে নিতে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল উমিচাঁদ। পালোয়ানকে তার যেন পরোয়া নেই, সে এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়াল তার সামনে। তাকে যে এক-হাত দিয়ে ধরে টেনে তুলে ঐ নদীর জলে ছুড়ে দিতে পারে, সেই পালোয়ানটি —এ-খেয়ালই যেন তার নেই।

ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে যেত, অনেক হৈ-হাঙ্গামা বেধে যেতে পারত, উমিচাঁদের অবস্থাও বিশেষ সংকটজনক হয়ে যেতে পারত। কিন্তু দলের যাঁরা মুরুব্বি ছিলেন, তাঁরা ছুটে এলেন, স্থানীয় লোকেরা এসে জুটল—তারপর অবস্থা একটু ঠান্ডা হল।

ওদিকে জল থেকে উঠে আসতে ভরসা করছে না ভুনীরা। তাদের ধারণা হয়েছে যে, তারা উঠে এলেই তাদের নিয়ে চম্পট দেবে ঐ পালোয়ানটি।

উমিচাঁদকে সকলে ধমক দিল, বলল, বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে অমন মেজাজ দেখানোর দরকার কি? বিয়ে করে-গা সাদি করে-গা বললেই কি বিয়ে-সাদি হয়ে গেল?

উমিচাঁদ কোনো কথা বলল না। সে মেনে নিল সব তিরস্কার।

কিন্তু উমিচাঁদের সত্যিই মনে হয়েছিল যে, ঐ পালোয়ানটি সত্যিই বুঝি ঐ জল থেকে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। তাদের দল তাহলে কানা হয়ে যাবে একেবারে। যে-দলে ভুনী থাকবে না, সে-দল কি দল?

কিন্তু অত কথা সে বলল না। এমন-ভাবে দাঁড়াল, যেন খুবই অন্যায় করে ফেলেছে সে।

জল থেকে উঠে এসে ভিজে কাপড়ে উমিচাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ভুনী বলল, মস্ত বীর! ঐ তো চেহারা, এদিকে বিক্রম দেখাবার বেলায় খুব।

ভুনীর দিকে তাকাতে পারল না উমি-চাঁদ। তার শরীর ভীষণ অস্থির-অস্থির করতে লাগল।

লাহোর থেকে তারা গেল মীরাটে, তারপর লক্ষ্ণৌ। দু-তিন দিন করে এখানে অভিনয় হল। অভিনয় হল বটে, কিন্তু অভিনয়ে সকলের তেমন আর মন নেই। সকলের মনেই একটা আতঙ্কের ভাব—কখন কি বিপদ হয়। সকলের মনেই বাড়তি একটা আতঙ্ক—হঠাৎ উমিচাঁদ কখন কি করে বসে। হিতাহিতজ্ঞান নেই লোকটার একে-বারেই।

যেন রাজ্য জয় করে দু'মাস বাদে তারা দেশে ফিরে এল। দেশে ফিরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বিনোদিনী বলল, প্রথম থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল না। ভুনীর জন্যেই রাজি হতে হল। দেশ দেখার শখ ওকে পেয়ে বসেছিল। কেউ-বে কোনো হারেমে ওকে আটক করে রাখেনি, এই ঢের।

ভুনী বলল, বেশ হত কিন্তু তাহলে। একেবারে বাদশাজাদী হয়ে যেতাম। আয়েষা সেজেছি, তাহলে হয়ে যেতাম সত্যিকারের একজন আয়েষা। আর-একজন বঙ্কিমচন্দ্র এসে তবে লিখতেন আর-একটা—

সস্নেহে ধমক দিল বিনোদিনী, বলল, থাম বাপু। নাটক ক'রে করে বড্ড কথা শিখেছিস।

কিন্তু ঠিক হয়ে গেল একেবারে পাকা-পাকি।—নাকে খৎ, কানে খৎ, আর কিছুতে অত দূরে-দূরে যাওয়া না। যতই ডাক আসুক, যতই টাকার বাজনা শোনাক। এখানেও অঢেল টাকা ছড়ান আছে, কুড়িয়ে তুলতে পারলেই হল।

বিনোদিনী বলল, আমি দৃশ্যটা বেশ কল্পনা করতে পারছি। নীলদর্পণের রোগ্ সায়েব ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যেমন ব্যবহার করেছে, সেই পালোয়ানটির তেমনি সাধ জেগেছিল আমাদের ভুনীকে নিয়ে—

বলেই বিনোদিনী প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল ভুনীর গায়ে।

ভুনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তোমার এ কী রোগ ধরল দিদি, তুমিও যে দেখছি রোগ্ সায়েব হয়ে উঠলে। আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাও নাকি?

দুজনের অনেক হাসি-তামাশা হল। অনেক রসের কথা হল দুজনের। অনেক রসিকের কথা নিয়ে অনেক রূপকথা হল দুজনের।

দেয়ালে ডিমের আকারের মস্ত আয়না-টায় তাদের দুজনের ছায়া পড়েছে। ঐ ছায়া দেখে মনে হয়, তারা দুটি যেন যমজ সন্তান। চেহারায়, স্বাস্থ্যে, রূপে, সাজে, অলংকারে দুজনে প্রায় সমান।

ভুনী বলল, আবার এসো বিন্দি।

—কোথায়?

—নাটকে। এসো, আবার অভিনয় করবে।

হঠাৎ ভুনীর এই প্রস্তাব শুনে একটু চমকই লাগল বিনোদিনীর। ভুনীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন রে?

এ কেনর উত্তর দেওয়া খুবে সোজা না। ভুনীর কেমন যেন মনে হচ্ছে কিছুদিন থেকে যে, সে বড় একা। মঞ্চে উঠে যখন দাঁড়ায়, সহস্র চোখ যখন তার দিকে চেয়ে থাকে, তখন সে তৃপ্তিবোধ অবশ্যই করে, কিন্তু তবু মনে হয় সে একা। এই মঞ্চে যদি সঙ্গীর মত একজন সঙ্গী পেত, তাহলে ঐ তৃপ্তি আর আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যেত। মনে একটু ভরসা যেন হত। অতটা সৌভাগ্যের বোঝা একা বয়ে বেড়ানোতে যেন তেমন খুশি আর লাগে না।

বিদেশে সফর করে এসে এই ভাবটা তার একটু প্রবল হয়েছে। মনের উপর পীড়ন তো গিয়েছে সত্যিই। তাদের দলে তো আরও অনেক মেয়ে ছিল, তারা তো ছিল বেশ আনন্দেই। কিন্তু যত আতঙ্ক সবই একা ভুনীর।

মনের কথাগুলো স্পষ্ট করে না বললেও মনের ভাবটা অস্পষ্ট রাখল না ভুনী।

বিনোদিনী বলল, অভিনয় ভুলে গিয়েছি বললে ভুল হবে। অভিনয় নিয়েই আছি। এটা ঠিক। রোজই করে চলেছি অভিনয়। কিন্তু সে অভিনয়ের কথা আমার নিজের কথা, আমার নিজের বানানো কথা। মঞ্চে উঠে পরের কথা আর নিজের করে বলতে ভালো লাগে না।

—তাহলে আমাদের এমন করে ভালো লাগাচ্ছ কেন। আমরাও তাহলে ছেড়ে দিই মঞ্চের অভিনয়।

বিনোদিনী হেসে উঠল, বলল, কোন্ বইয়ের পার্ট বলছিস রে ভুনী! নাটকের মত শোনাচ্ছে যে তোর কথা!

অভিমান করে ভুনী বলল, মজাটা তো হয়েছে ওইখানেই। আমরা এখন কথা বললেই নাটক মনে হয়। আমার নিজের বলতে আর বুঝি কথা থাকতে পারে না?

ভুনীর থুৎনিতে একটু আদর জানিয়ে বিনোদিনী বলল, রাগ করিস নে। অনেক দুঃখে আমি ছেড়েছি থিয়েটার।

একটু থেমে বলল, থিয়েটার আমার প্রাণের সমান জিনিস। কিন্তু টিঁকতে পারলাম না। দলচক্রে ভগবান ভূত হয়। দশ-জনের টানাটানিতে আমার প্রাণান্ত হবার দশা হয়েছিল। সবাই চায় আমাকে, আমাকে না হলে নাকি কারোই চলবে না। কত রেষারেষি, কত মারামারি, কত হানাহানি। সে সব কথা যদি লিখি তাহলে সেও একটা মস্ত উপন্যাস হয়ে যাবে। অনেক দুঃখে ছাড়লাম তাই থিয়েটার।

কিন্তু থিয়েটার বিনোদিনী ছাড়ে নি, ছেড়েছে মাত্র অভিনয়, ছেড়েছে মঞ্চে আবির্ভাব। এখন সে নেপথ্য-নায়িকা। সে-ই চালাচ্ছে এখন সব কটি থিয়েটার। তার নাট্যসমাজের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই এখন সব থিয়েটারের নটনটী।

বিনোদিনী বলল, আমাদের কোন সমাজ নেই। আমরা মধ্যবিত্তও নই, নিম্নবিত্তও নই, উচ্চবিত্তও নই। কোন সমাজেই জায়গা নেই আমাদের। এই জন্যে গড়ে তুললাম এই নতুন সমাজ। এর নাম দিলাম নিজের নামে। একদিন আমার অভিনয় দেখে লোকে ভুলে-ছিল, আমার নাম ছিল তাদের মুখে-মুখে। একেবারে ভুলে না যায় আমার নামটা, তাই নিজের নামটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে নতুন সমাজটির সঙ্গে জুড়ে দিলাম নামটা।

বিনোদিনীর কথাগুলো যেন শুনছে না, কথাগুলো যেন গিলছে বনবিহারিণী। শুনতে ভালোই লাগছে তার।

বিনোদিনী বলতে লাগল, অনেক মেহনৎ করেছি। এক-একটা নাটকে অনেক-গুলি ভূমিকা নিয়েছি। মেঘনাদবধ কাব্য-নাটকে সাতটি পার্ট একসঙ্গে অভিনয় করেছিলাম।—চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বারুণী, রতি, মায়া, মহামায়া, সীতা। কিন্তু এত করে কী ফল হল। লোকের রেষারেষির শিকার হতে হল। তাই ছেড়ে দিলাম মঞ্চ। এই তো আমার জীবন।

নিজের জীবনের অনেক বৃত্তান্ত বলে গেল বিনোদিনী। অবাক হয়ে শুনতে লাগল ভুনী। এতদিন হল বিনোদিনীর সঙ্গে তার পরিচয়, কিন্তু বিনোদিনীর বিষয় তার এমনভাবে জানাই ছিল না। তার ধারণা ছিল, জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিল সে, কিন্তু নাম যেই কমে গেল, অমনি বুঝি মানে-মানে সরে এল সে।

—তা নয়। বিনোদিনী বলল, নামের মোহ কার নেই। প্রেমের চেয়েও হয়ত বড় মোহ এটা। নাম চাও, না, প্রেম চাও—একথা এসে যদি কেউ বলে, তখন ভাবতে হবে, ভেবেচিন্তে হয়ত আঁকড়ে ধরতে হবে নামটাই। তখনই আমি থিয়েটার ছাড়ি যখন আমার নাম আগুনের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একেবারে নিভে না গিয়ে টিমটিম করে একটু জ্বলুক, এইজন্যেই এই বিনোদিনী নাট্যসমাজ।

ভুনীদের এখন কেউ টানাটানি-ছেঁড়া-ছিঁড়ি করতে পারে না। কেননা ভুনীরা এখন কেউ একা নয়। ভুনীরা বিনোদিনীর সমাজের লোক। এদের সঙ্গে সরাসরি কোন থিয়েটারের যোগ নয়, কে কোথায় যাবে না যা না-যাবে তা ঠিক করে বিনোদিনী। যে দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে বিনোদিনীকে, সে দুর্ভোগ ভুনীদের এখন নেই।

—তা বটে! ভুনী বলল, ওসব ঝঞ্ঝাট নেই। নেই তাই রক্ষে। তা না হলে প্রাণ বোধহয় ত্রাহি-ত্রাহি করে উঠত।

—কি রকম দশা যে হত, তার কিছুটা আঁচ করে এলি দিল্লি-লাহোর গিয়ে। দু-চার দিনের জন্যে গিয়েছিলি, তারই মধ্যে তো টানাটানির বহর দেখে এলি। ঐ রকম যদি রোজ হয় তাহলে আর নাটক করার সাধ থাকে?

কিজন্যে বিনোদিনী নাটক করা ছেড়েছে তা এবার স্পষ্ট জানা হয়ে গেল ভুনীর। তাই, বিনোদিনীকে আবার এসে নাটক করার যে অনুরোধ জানিয়েছে একটু আগে, তার জন্যে সে লজ্জিতই হল। বলল, তবে ও কথা থাক। তোমাকে আর মঞ্চে আমরা চাই নে। কিন্তু তুমি তাই থাক আমাদের সঙ্গে।

সে কথা কি আর বলতে? বিনোদিনী তো সঙ্গে আছেই, সঙ্গী হয়েই আছে সে। এবং থাকবেও। যতদিন সে বাঁচবে ততদিন তার এই সমাজটিকে সে বাঁচিয়ে রাখবে। অর্থের কোনো অভাব তার নেই, দরকার হলে আরও অনেক অর্থ আমদানি করার সামর্থ্য তার আছে।

শুধু চাই ভালো নাটক, ভালো নটনটী, আর ভালো ভালো কাজের লোক। মঞ্চের নেপথ্যে থাকে সাজঘর, সেই ঘরের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্যেও তো চাই উপযুক্ত লোক।

বিনোদিনী বলল, ভাগ্য আমার খুবই ভালো। তেমন লোকও আমার আছে। কোনো জিনিসের কোনো অভাব কখনো দেখিনি, পায়ের নুপুর থেকে চুলের ফিতে—সব জিনিস সব সময় পাচ্ছি হাতের কাছে। নতুন নাটক নিয়ে কাজ আরম্ভ করামাত্র দরকারী জিনিসের তালিকা তৈরী করে করে নেয় উমানাথ। সব জোগাড় করে নিয়ে আসে। খাটতেও পারে যেমন, বাধ্যও তেমনি।

বিনোদিনীর মুখের দিকে চেয়ে কথা-গুলো শুনতে লাগল ভুনী। কিন্তু মন্তব্য করল না।

কিন্তু বিনোদিনী বলল, কিন্তু এখন তো আর সে উমানাথ নয়। তুই নাম পাল্টে দিয়েছিস তার। কিন্তু যার জন্যে এত কাণ্ড করলি, সে এখন কোথায়। শুনেছি, শেফালিকে ছেড়ে অন্য কোথায় যেন চলে গিয়েছে।

পুরনো কথাগুলো এভাবে তোলার দরকার কি। অযথাই মানুষকে কষ্ট দেওয়া। কেবল অভিনয় করে মঞ্চে ও নেপথ্যলোকে, তাই বলে মন বলে কি কোনো বস্তু নেই তার? তার প্রথমজীবনের নায়ককে সে ভুলে আছে বটে, কিন্তু একেবারেই কি তাকে ভুলে গিয়েছে? তার কথা এখন না তুললেই পারত বিনোদিনী।

অল্প-একটু সময়ের জন্যে ভুনীর মনটা একটু গুমোট হয়ে গেল। কিন্তু সেটা সে তখনই কাটিয়ে নিল। মনের একটা ভাব বেশিক্ষণ রাখা অভিনেত্রীদের কাজ নয়। পর-পর দৃশ্য বদল হতে থাকে, পর-পর মুখের ভাব ও মনের ভাব বদল করতে করতে মঞ্চে এসে হাজির হওয়াই যে তাদের কাজ।

পুরনো কথার সঙ্গে অনেক পুরনো স্মৃতি এসে উপস্থিত হল। চোখের সামনে এসে উপস্থিত হল পুরো চোরবাগানটা। একদিন গিয়ে সবাইকে দেখে আসতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ইচ্ছেটা শেষ হয়ে যায় ইচ্ছেতেই। নামের কথা বলছিল বিনোদিনী। নাম জিনিসটা কামনার জিনিস বটেই। কিন্তু তাতে অসুবিধেও যে অনেক। যখন খুশি আর যেখানে খুশি যাওয়া যে এখন বড় শক্ত। লোকের ভিড় জমে যাবে। যা দেখতে আসা তা দেখা হবে না, কেবল নিজেকেই দেখান হবে, আর দেখে ফিরতে হবে ভিড়টাই।

গঙ্গাবাঈ-এর কাছে গান শিখতে যেত যখন ভুনী, তখন কত সহজ ছিল জীবনটা।

...ড়া হোক, ময়লা হোক—কোনো বাধা ছিল না। গায়ে একটা ফ্রক দিয়ে নিলেই সব হয়ে যেত। যখন খুশি এক দৌড়ে চলে যেত মমতাদের বাড়িতে। আর, যেত আরও কত কোথাও।

সেসব একবার গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে। সব দেখে আসতে ইচ্ছে করে। এমনকি, ...বাগানের সেই মেসবাড়িটাও—সেই ...নী ও গুণী ব্যক্তিটি এখনো কি আছেন সেখানে?

বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল ...। কি রকম যেন একটা ব্যথা, কি যেন একটা অস্বস্তি। একটা শিশুর ... সে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। অনেক ... থেকে যেন ভেসে আসছে সেই কান্না—...বাগানের গলির ভিতরে যেন পাক খেয়ে ...র বেড়াচ্ছে সেই কান্নার শব্দ।

কিন্তু এখন ভুনীর মায়ের কোলে তার ... শিশুটি কাঁদছে কিনা, সে কথা ভাবছে ভুনী।

ভুনীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বিনোদিনী ...ল, ও কি রে। হঠাৎ অমন গুম হয়ে ...ল কেন। ও আবার কি ঢং।

খিলখিল করে হেসে উঠল ভুনী, বলল, ...টা মজার কথা ভাবছিলাম।

বিনোদিনী হেসে বলল, আবার নতুন ...কে মজালি নাকি?

—না, না, না। ভুনী বলল, এর উপর ...র নতুন? পুরনো নিয়েই ভীষণ মজে ...ছু।

আজ দুপুরটা এদের মন্দ কাটল না। ...টা দিন বসে বসে অনেক প্রাণের কথা, ...ক মনের কথা বলে গেল তারা। বিনো-...কে অনেকটা ভালোভাবে চিনতে পারল ...। এবং, বলা যায় না, ভুনীকেও হয়ত ...দিনী চিনল অনেকটা স্পষ্ট করেই।

ওরা কথা বলে চলেছে। হঠাৎ থেমে ... দুজন।

কান পেতে একটু শুনল বিনোদিনী, ...পর ডাকল, ওরে, মঙ্গলা, মঙ্গলা রে।

মঙ্গলা-দাসী এসে দাঁড়াল দরজার ...। বিনোদিনী বলল, ঐ বাজনা বাজছে ...দর রে।

মঙ্গলা নাকি জানে না। কিন্তু সে বলল, ... এসে সে খবর দিচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল মঙ্গলা। সিঁড়ির ... দেখা হয়ে গেল উমিচাঁদের সঙ্গে।

মঙ্গলা বলল, এই-যে উমাবাবু। রাস্তায় ...া বাজছে কিসের গো?

—সার্কাস, সার্কাস। সার্কাস হবে ...গাছায়।

বিনোদিনীর কাছেই একটা বার্তা নিয়ে ...ল উমিচাঁদ। কিন্তু মঙ্গলা তাকে বাধা ... বলল, যাও-না, ভালো করে খবর নিয়ে ...

—কেন, কি হবে ও দিয়ে?

মঙ্গলা বলল, দিদিমণি জানতে চাইছে।

উমিচাঁদ জিজ্ঞাসা করল, দিদিমণি কি ...া আছে?

—একলা কেন? মঙ্গলা বলল, ভুনীদি আছে। সারাদিন তো দুজনে বহুৎ মজার-মজার গল্প করছে। খুব হাসছে ভি।

উমিচাঁদ একটু ভাবল, বলল, আচ্ছা।

নেমে গেল উমিচাঁদ। কিন্তু ইতিমধ্যে বাজনার শব্দটা চলে গিয়েছে অনেক দূরে।

একটা পালকি-গাড়ির ছাদে বসেছে বাজনদারেরা। ড্রাম, বাঁশি, ক্ল্যারিয়োনেট। বাচ্চা এক জোড়া ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে গাড়িটা। ধীরে-ধীরে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে চলেছে গাড়ি। গাড়ির ভিতরে যারা বসে আছে তারা বিলি করছে হ্যাণ্ডবিল।

উমিচাঁদ হাঁটা দিল। ঐ শব্দটায় কান পেতে সে এগিয়ে চলল। একটু আগেই সে বড় রাস্তায় দেখে এসেছে গাড়িটা, তখন বুদ্ধি করে একটা হ্যাণ্ডবিল নিয়ে নিলেই হত। কিন্তু এসব জিনিসেরও যে দরকার পড়ে যেতে পারে, তা সে আদপে ভাবেই নি।

সাবিত্রী থিয়েটার কিছুদিন বন্ধ ছিল। মেরামতের কাজ হচ্ছিল। কবে নাগাদ তা তৈরি হয়ে যাবে, কবে নাগাদ নাটক নামান যাবে, সেই খবর তাকে আনতে বলেছিল বিনোদিনী। খবরটা সে সংগ্রহ করেছে। খবরটা সে জানাতেই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলা তাকে বাধা দিল।

বিডন স্ট্রীট পার হয়ে চিৎপুরের রাস্তা ধরে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে গাড়িটা। সদর রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গলি-পথ ধরে জোর-কদমে হেঁটে চলল উমিচাঁদ। একটু পরেই সে গিয়ে পড়ল চিৎপুরে। ঐ তো গাড়িটা।

একটা দৌড় দিয়ে উমিচাঁদ ধরে ফেলল গাড়িটা। গাড়িটাও চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে ভিড়ও চলেছে। মৌমাছির মত গাড়িটাকে ছেঁকে ধরেছে বাচ্চারা।

উমিচাঁদ তাদের ভেদ করে একটা হ্যাণ্ডবিল নিয়ে চলে আসতে গিয়ে আবার এগিয়ে গিয়ে নিল আর-একটা হ্যাণ্ডবিল।

যাক। পাওয়া গিয়েছে। পরিশ্রম তার সার্থক। হ্যাণ্ডবিল পড়তে-পড়তে সে ধীরে-ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করল বিনোদিনীর ডেরার দিকে। বিনোদিনীর ডেরা আর ভুনীর ডেরা অবশ্য কাছাকাছিই। ভুনী যদি এর মধ্যেই নিজের ঘরে চলে গিয়ে থাকে তাহলে বেশ হয়। উমিচাঁদ তাহলে তার কাছে নিজে গিয়ে দিয়ে আসবে।

রামমূর্তি সার্কাস। প্রফেসর রামমূর্তি। সঙ্গে আবার নতুন আকর্ষণ—ম্যাজিক।

ভুনী কিন্তু চলে যায় নি। বিনোদিনীর সঙ্গে বসেই আছে। কথা বলে চলেছে তারা। সাবিত্রী থিয়েটারের খবর নিয়ে আসছে উমিচাঁদ, এইজন্যে বিনোদিনী ভুনীকে ধরে রেখেছে। খবরটা জেনেই যাক ভুনী।

দুটো হ্যাণ্ডবিল হাতে নিয়ে উমিচাঁদ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি উমিচাঁদ।

বিনোদিনী বলল, ভিতরে এসো ভাই উমা।

ভুনী এরই মধ্যে একটু শক্ত হয়ে বসেছে। মুখটা যথেষ্ট গম্ভীর করে নিয়েছে ভুনী।

উমিচাঁদ ভিতরে গিয়ে হ্যাণ্ডবিল দুটো বিনোদিনীর হাতে দিতেই সে বলল, এ আবার কি? সাবিত্রী থিয়েটার বুঝি হ্যাণ্ডবিল ছেপেছে? মেরামতের কাজ হয়ে গেছে বুঝি?

হাত বাড়িয়ে একটা হ্যাণ্ডবিল নিয়ে নিল ভুনী।

উমিচাঁদ বলল, না। এটা সার্কাসের। ওদের থিয়েটার মেরামত হতে দেরি আছে।

বিনোদিনী বলল, ঠিক আছে। তাহলে কৃষ্ণনগরের ওদেরকে কথা দেওয়া যাক। ওখানেই যাবে আমার পার্টি।

উমিচাঁদ সংক্ষেপে বলল, আচ্ছা।

ভুনী বিনোদিনীর দিকে চেয়ে বলল, কি হল?

—কিছু না। বলছিলাম, সাবিত্রী থিয়েটার যদি রেডী না হয়ে থাকে তবে অযথা আমাদের দলটা বসে থাকবে কেন। কৃষ্ণনগর থেকে ডেকে পাঠাচ্ছে বার-বার, বার-বার লোক পাঠাচ্ছে তারা। এর মধ্যে তবে সেইটেই সেরে আয় তোরা।

হ্যাণ্ডবিলের ভাজই খোলে নি এখনো কেউ। যার জন্যে উমিচাঁদকে এতটা হাঁটালে আর খাটালে, সেদিকে দেখি দুজনের কারোই মন নেই।

ভুনীর দিকে চোখ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দুজনে।

ভুনী বলল, এই রোদ, এই গরম। এর মধ্যে কেষ্টনগর।

বিনোদিনী বলল, লাহোর-দিল্লি মেরে এলে, তখন তো গরমের কথা মনে হয় নি। চোত-বোশেখে লাহোর-দিল্লি পারলে, তার উপর কোলে নতুন বাচ্চা। তাতেও অত দূর-পাল্লায় পাড়ি দিতে আপত্তি হল না। আর, কেষ্টনগর তো তিন ঘণ্টার পথ মাত্র। যা ভাই ভুনী, আর দর বাড়াস নে।

ভুনী বলল, তোমার সঙ্গে আর দরাদরি কি। তুমি যা হুকুম করবে, তাই হবে। যাব।

বিনোদিনী মাথা তুলে উমিচাঁদের দিকে তাকাল। বলল, শুনলে তো? মনোহর-বাবুকে বলে দাও, কৃষ্ণনগরে তিনি যেন চিঠি লিখে দেন আজই। দিন ঠিক করে তাঁরা যেন জানান।

হাতের কাগজের দিকে চেয়ে বিনোদিনী বলল, এ কাগজ কিসের?

—ঐ-যে বাজনা বাজছিল। সার্কাস হবে। প্রফেসর রামমূর্তির সার্কাস।

—আচ্ছা। তুমি যাও।

বিনোদিনীর আদেশ পেয়ে উমিচাঁদ চলে গেল।

কাগজের ভাঁজ খুলে ওরা পড়ল—

সার্কাস! সার্কাস!! সার্কাস!!!

প্রফেসর রামমূর্তির অপূর্ব সার্কাস!

বুকে হাতী উত্তোলন!

তারপর লেখা আছে—

এই সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণ

ম্যাজিক! ম্যাজিক!! ম্যাজিক!!!

প্রফেসর পীতাম্বরের অপূর্ব যাদুবিদ্যা

জীবন্ত বালিকা করাতে কর্তন!

ভুনী যেন একটু চমকে উঠল। প্রফেসর পীতাম্বর তাহলে এতদিনেও বেঁচে আছে? বেঁচে থাকার একটা ভীষণ শক্তি আছে

মানুষের। যে দশা সে দেখে এসেছে তাদের, তাতে তো তার মনে হয়েছিল যে, টিকে থাকা ওদের বরাতে আর নেই।

যাক। ছাপার অক্ষরে তার নাম দেখে একটু আশ্বস্ত যেন হল অনেক ঐশ্বর্যের অধিকারিণী বনবিহারিণী।

বার-কয়েক সে পড়ল হ্যাণ্ডবিলটা। তারপর বলল, চলো, বিনুদি। যাওয়া যাক। চলো দেখে আসি সার্কাস। বুকে হাতী নেবে, একটা মেয়েকে কেটে দুখান করবে। দেখতে মজাই লাগবে।

কিন্তু বিনোদিনীর যেন তেমন গরজ নেই। কি হবে ঐ সব ছাইপাঁশ দেখে—এই রকম যেন তার মনের ভাব।

কিন্তু ভুনী তাকে চেপে ধরল, বলল, তোমার কথায় রাজি হলাম কেষ্টনগরে যেতে; আর, আমার একটা কথা তুমি রাখবে না?

বিনোদিনীকে রাজি করল ভুনী। বিনোদিনী বলল, তবে চল্। কাউকে কাটতে বলে দে টিকিট।

এটা আর কঠিন কথা কি। পোস্তার মদনবাবু এখন নেই। এখন আছেন ভবানীপুরের বনেদি বংশের ছেলে বিনোদ। আজ রাত্রেই তাকে বলে দেবে ভুনী।

তারা সার্কাসে যাবে। সে এক সমারোহ। আলাদা আসনের টিকিট কাটা হয়েছে মাত্র দুটি। শুধু যাবে বিনোদিনী আর ভুনী। যেন দুই রাজমহিষী চলেছে তীর্থদর্শনে, এমনি একটা জাঁক করে তুলল তারা।

দুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় জুড়িগাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। ভুনীকে তুলে নিয়ে তারপর তুলে নিল বিনোদিনীকে।

এখন যেখানে মহাজাতি-সদন তৈরি হয়েছে, সেই জায়গাটা তখন ছিল খালি। ঐখানে তাবু পড়েছে মস্ত। বাঘ ডাকছে, সিংহ গর্জন করছে খাঁচায়। প্রফেসর রামমূর্তির দল এইখানে দেখাবে খেলা।

রামমূর্তির তখন একটু পড়তি সময়। পীতাম্বর এসে তাঁকে প্রস্তাব দিল, রামমূর্তি রাজি হলে সেও এখানে দেখাতে পারে ম্যাজিক। দুজনের নাম একসঙ্গে করলে হয়ত লোক কিছু হবে। এর জন্যে পীতাম্বরের মোটা চাহিদা কিছু নেই। প্রত্যেক খেলার জন্যে থোক টাকা ধরে দিলেই সে রাজি। নতুন খেলা আবিষ্কার করেছে সে। করাত দিয়ে একটা মেয়েকে কেটে দু ভাগ করে দেবে।

হ্যাণ্ডবিলে কাজ হয়েছে। সত্যি, আসছে লোকজন। ভিড় সত্যিই হচ্ছে। তার উপর উঁচুমহলের মানুষরাও আসছে। জুড়িগাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে গেটে। অপ্সরীর মত দেখতে মহিলারা নামছে সেই গাড়ি থেকে।

বিনোদিনী আর ভুনী ভিড় ভেদ করে গেল ভিতরে। ভারী পর্দা ফাঁক করে তাদের নিয়ে যাওয়া হল বিশেষ আসনের দিকে।

আলো জ্বলছে চারদিকে ঝলমল করে। মাঝখানটায় গোলাকার চত্বর। ঐখানে হবে খেলা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেজে উঠল ব্যাণ্ড। শুরু হয়ে গেল খেলা।

উঃ, কী সাংঘাতিক ঝুঁকিই নিচ্ছে ওরা। ট্রাপেজের খেলা খেলছে দুটো ছেলে-মেয়ে। ঐ উঁচু থেকে পড়ে গেলেই হল আর-কি।

অনেক রকম খেলা দেখছে আর ভাবছে অনেক রকম কথা। এতগুলো মানুষ আর এতগুলো পশু এই দলে। এত মাল, এত লটবহর। কি করে খরচ পোষায় ভগবান জানেন।

—বাঁচার জন্যে মানুষ কী কাণ্ডই-না করে, তাই না বিনুদি? বিনোদিনীর দিকে একটু ঝুঁকে বলল ভুনী।

প্রফেসর রামমূর্তি হাতি বুকে নেবে নাকি একেবারে শেষের দিকে। তার আগে সাইকেলের খেলা, ঘোড়ার খেলা, ব্যালান্সের খেলা দেখানো হচ্ছে।

সবই দেখছে ওরা একে-একে। দেখতে ভালোই লাগছে।

কিন্তু ম্যাজিক কই, ম্যাজিক? হ্যাণ্ডবিলে তো বেশ ঘটা করে লেখা হয়েছে তার সম্বন্ধে।

অনেক রকমের খেলা দেখাবার পর খেলোয়াড়েরা ক্লান্ত হয়ে থাকবে। তাদের বিশ্রাম নেওয়াও হবে, সেই অবসরে এবার আরম্ভ হবে ম্যাজিক। প্রফেসর পীতাম্বরের ম্যাজিক।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভুনী একটু শক্ত হয়ে বসল। ঐ-ঐ-ঐ। ঐ আসছে পীতাম্বর। যাদুকরের সাজ পরেছে অঙ্গে। কালো প্যাণ্ট, কালো কোর্তা। ভালো করে দেখল ভুনী। এই কয় বছরে অনেক কাবু হয়ে গিয়েছে, অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে পীতাম্বর। কিন্তু চাল-চলন রেখেছে বেশ তাজা। হয়তো মনের উপর অনেক জুলুম করে ঐ রকম তাজা রেখেছে নিজেকে।

সঙ্গে ওটা কে? নীলু না ওটা? বাবা, এর মধ্যেই এমন লায়েক হয়ে উঠেছে? বাপ-কা ব্যাটাই বটে। বাপের সঙ্গে সমান

তাল রেখে সেও এসে দাঁড়াল বা[...]
পাশে। সে এখন কেবল পীতাম্বরের [...]
নয়, সে এখন হচ্ছে পীতাম্[...]
অ্যাসিস্টাণ্ট।

প্রথমদিকে যেসব খেলা দেখাল [...] ব্যাটায় মিলে, তার সবই ভুনীর [...] তারপর নিয়ে আসা হল মস্ত একটা ক[...] বাক্স। ঐ বাক্সটা এনে রাখার প[...] আঁটো গেঞ্জি ও খাটো জাঙিয়া পরে এল একটি মেয়ে। ভুনী চমকে উঠ[...] কে কে এটা?

চিনতে দেরি হল না। মমতা। [...] শরীরটা তো বাগিয়ে নিয়েছে, দিব্যি করে নিয়েছে ফিগার। এও শিখে নি[...] নাকি যাদু?

বাঁচবার জন্যে সপরিবারে ঝাঁপ দি[...] প্রফেসর পীতাম্বর। বাঁচার জন্যে হা[...] করেছে মরণ-পণ। সব বাধা-নিষেধ [...] দিয়েছে দূরে। চক্ষুলজ্জা লোকলজ্জা কিছুর বালাই আর নেই।

কত রকম ভঙ্গি করে ঘুরে-[...] দাঁড়াল মমতা। সকলকে কেমন অভিব[...] করল। হাততালি দিয়ে উঠল দর্শকেরা।

ঐ কাঠের বাক্সে বন্দী করা [...] মমতাকে। বন্দী করা হল তাকে। [...] মস্ত তালা লাগানো হল। কাছির [...] মোটা দড়ি দিয়ে বাক্সটাকে বাঁধা হল।

দম আটকে আসছিল ভুনীর। অত[...] ওভাবে আছে মমতা, মেয়েটা মরে য[...] না তো?

পাশ থেকে বিনোদিনী বলল, অ[...] ছটফট করছিস কেন। স্থির হয়ে ব[...] দ্যাখ।

ভুনী আস্তে করে বলল, ঐ মেয়েটা[...] চিনি। আমাদের পাড়ার।

—নতুন পাড়ার, না, পুরনো পাড়া[...]

—পুরনো পাড়ার, চোরবাগানের।

বিনোদিনী বলল, এখন ওই হয়ে[...] হয়েছে মনোচোর।

বাক্সটার উপরে মশারির মত ক[...] কাপড় টাঙিয়ে দিল নীলু।

বক্তৃতা দিতে লাগল প্রফেসর পীতাম্ব[...] হাতে তার ম্যাজিক-কাঠি। এত ল[...] বক্তৃতার দরকার কি? মেয়েটার দম [...] ফুরিয়ে যায় এর মধ্যে? নিজের মেয়ে[...] উপরেও এতটুকু মায়া নেই পীতাম্বরের[...]

কিন্তু দম ওর ফুরাবে কেন। ওরা [...] সব যাদু জানে।

সত্যি, অদ্ভুত যাদু, অদ্ভুত ম্যাজি[...] ঐ বন্ধ বাক্সটা থেকে বেরিয়ে, মশারির [...] ঢাকনার মাঝখান দিয়ে উঠে দাঁড়াল মম[...] তাকে দেখে মনে হল, ঐ বাক্সতেই [...] যাদু নেই সর্বাঙ্গেই তার যাদু। সেই [...] চারদিকে ছিটিয়ে দিয়ে দর্শকদের [...] উল্লাস ছড়িয়ে দিয়ে, দুই হাত দুই[...] পাখার মত ছড়িয়ে দিয়ে এক-ছুটে [...] চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

বাক্সটা নিয়ে গেল কয়েকজনে ঠেলে[...]

নীলু তাসের খেলা দেখাতে লাগ[...] রাহামতী তাস ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার সে[...] চলে আসছে তার হাতে।

একটা টেবিল এনে রাখা হল। [...]

কাটা হবে একটি মেয়েকে দু-খানা করে।

করাত হাতে নিয়ে দাঁড়াল প্রফেসর ম্বর।

সবুজ ঘাগরা ও খাটো লাল জামা এবার এল মমতা। দ্বিখণ্ডিত হবার সে এল, কিন্তু তাকে ঐ রূপে অনেকের দিল্ খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেল হয়।

টেবিলের উপরে শোয়ানো হল কে। এক হাতে করাত অন্য হাতে ক-কাঠি—পীতাম্বর দর্শকদের অনু-করছে, কেউ যেন না হাসেন, কেউ না শব্দ করেন, কেউ যেন না কাসেন। বড় কঠিন খেলা, সামান্য ভুলচুকে মেয়ের জীবন—

বিনোদিনীর দিকে ঝুঁকে ভুনী বলল, মানে?

—ওসব কথার মানে নেই। চুপ করে ।

মমতার পেটের উপর করাত চালাতে পীতাম্বর। অনেকটা ডুবে গেল আঁৎকে উঠল ভুনী। ইচ্ছে হল র করে উঠে—মমতা।

শব্দও প্রায় করে উঠেছিল, বিনোদিনী মুখ চেপে ধরল, ফিসফিস করে সর্বনাশ। শব্দ করিস নে।

কন্তু সত্যি, সবই ম্যাজিক। দুভাগ গেল মমতা। আবার জোড়া লেগে গেল উঠে, হেসে, অঙ্গ-ভঙ্গি করে, র করে বিদায় নিল সে।

অবাক কাণ্ডই বটে। কিছুতেই মার দমও আটকায় না, দু-আধখানা কাবু করা যায় না। আবার উঠে আবার জুড়ে আসে। আশ্চর্য জীবন মানুষের।

আবার হল সার্কাসের খেলা। তারপর য এলেন রামমূর্তি। বিরাট ানের মত চেহারা। লাহোরের সেই নদীর ধারের সেই লোকটার মতন যেন। মমূর্তিকে শুইয়ে তার বুকের উপর দেওয়া হল পাটাতন। হাতী এল গমনে। আন্দোলন করল শুঁড়। রামমূর্তির বুকে উঠে দাঁড়াল। ণ পর নেমে এল হাতী। কটা পিষে গেল না। গুঁড়ো হয়ে া। উঠে দাঁড়াল রামমূর্তি।

তা, আশ্চর্য জীবন বটে মানুষের। ই তার মার নেই। মানুষের াই যেন ম্যাজিক, জীবনটাই যেন ।

ীর রকম-সকম দেখে বিরক্ত হচ্ছিল নী। বলল, অত ফিসফাস করে কি? দম তোর আটকায় না? বুকে পাথর ওঠে না! তবু, বেঁচে তো । চল, ওঠ, খেলা শেষ হয়েছে।

ছু লোক বেরিয়ে যাবার পরে, ভিড় পাৎলা হলে ওরা উঠল। দুজনে জেন্দ্রগমনে।

টের সামনে অপেক্ষা করছে উমিচাঁদ। ড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটু তফাতে। ড়তে বসে বিনোদিনী হাঁফ ছাড়ল। ত করুণা কিসের রে? কে কাকে করুণা করে! ওদের জিজ্ঞেস করে আয়, জিজ্ঞেস কর গিয়ে তোর পাড়ার মেয়ে মমতাকে; ওরাও করুণা করছে আমাদের।

উমিচাঁদ এদের কথার কোনো মানে ধরতে পারল না।

সেদিন রাত্রে ভবানীপুরের বিনোদবাবুকে ফিরে যেতে হল। ভুনীর শরীর ভালো নেই। সে শুয়ে পড়েছে। ভুনীর মা বাচ্চাটিকে রেখে গেল ভুনীর পাশে। অনেক-ক্ষণ মাকে পায়নি। বাচ্চাটা আকুপাকু করে মায়ের স্নেহ পান করতে লাগল। বুকের কাছে একটু চেপে ধরে ভুনী যেন ভীষণ তৃপ্তি পাচ্ছে।

বিনোদিনীর কথাটা তার মনে হতে লাগল—ওরাও করুণা করছে আমাদের।

কিন্তু করুণা তাদের যতই করুক মমতারা, মমতার কথা খুবই মনে হতে লাগল ভুনীর। একদিন মমতার সঙ্গে বসে অনেক গল্প করতে ইচ্ছে হল তার। পাশা-পাশি বসে অনেক গল্প করতে ইচ্ছে করল।—অনেক গল্প। কি করে চলছে তাদের জীবন তা জেনে নেবার খুব ইচ্ছে হল, কি করেই বা চলছে ভুনীর জীবন, সে কথাটাও একেবারে খোলাখুলিভাবে মমতাকে বলার বড় লোভ হতে লাগল তার। কোনো কথা তো মমতাকে বলতে তার বাধা নেই; তার জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাটা একদিন তো সে বলেছিল ঐ মমতাকেই!

বাচ্চাটাকে কোলের মধ্যে আর একটু চেপে ধরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথাটা আবার ভাবল ভুনী। সেই চোর-বাগানে কি করে চুরি গিয়েছিল তার কচি-বয়সের ইজ্জত, সে কথা তো বলতে পেরেছিল কেবল মমতাকেই।

বহুদিন বাদে আজ তাকে নতুন চেহারায় দেখে এসে কেবলই মনে হচ্ছে তার কথা। তার যাওয়া তো সম্ভব না, সে যে বিখ্যাত নটী। সে গেলে একটা হটুগোল বেধে যাবে।

ঐ বাড়িতেই মমতারা আছে কিনা, তাই-বা কে জানে। যাই হোক, খোঁজ-খবর করলেই নিশ্চয় জানা যাবে সব।

অমন বিখ্যাত যার বাপ, তার হদিশই বের করা যাবে না—এমন হতে পারে না।

উমিচাঁদ তো খুব কাজের লোক, ফরমাশ খাটার রাজা। ভুনী নিজে তাকে নাই-ই বলল, বিনুদিকে দিয়ে বলিয়ে উমিচাঁদকে পাঠাবে ওদের খোঁজ নিতে। খোঁজ তাহলে নিশ্চয়ই পাবে।

সংকল্পটা সে পাকা করে নিল। এবং ঐ ফাঁকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

এর মধ্যে পড়ে গেল কৃষ্ণনগরে যাবার ঝঞ্ঝাট। তার জন্যে রিয়ার্সেল। সেইজন্যে মমতার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা স্থগিত রাখতে হল, কেষ্টনগর থেকে ফিরে এসে তার ব্যবস্থা করা যাবে বলে ঠিক করে নিল ভুনী।

দিন-কয়েক ধরে চেপে রিয়ার্সেল চলল। তিনটি নাটক তৈরি করে নেওয়া হল—দক্ষযজ্ঞ, মৃণালিনী, ও বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

দক্ষযজ্ঞই বটে। সে যেন একটা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির অতিথি হয়ে চলে বিনোদিনী নাট্যসমাজ। কোনো রকম ত্রুটি না হয়, সাজসজ্জা সব যাতে হাতের কাছে পাওয়া যায়—তার জন্যে সাজ-সাজ রবই যেন পড়ে গিয়েছে।

উমিচাঁদের বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। খেটে-খেটে কাহিল হয়ে গেল লোকটা। তবু, ক্লান্তিও যেন নেই তার। যখন যে জিনিসের দরকার হচ্ছে, ছুটে গিয়ে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে উমিচাঁদ।

ভুনী সব লক্ষ করছে আর ভাবছে, একেই একদিন পাঠাতে হবে মমতার খোঁজে, নিশ্চয়ই এ খুঁজে বার করতে পারবে তার ঠিকানা।

কিন্তু কৃষ্ণনগরের পথে যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল, তা অনেকদিন মনে রেখেছিল ভুনী। সেটাও তার জীবনের একটা মস্ত ঘটনা। ঐ ঘটনা ঘটে যাবার পর বহুদিন জীবিত ছিল সে, জীবনভোর সে ভেবেছে সে কথাটা।

কৃষ্ণনগরে রওনা হল তারা। দলে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক। রিজার্ভ করা গাড়ি। এক-গাড়িতেই উঠেছে সকলে।

শিয়ালদহ থেকে গাড়ি ছাড়ল বেলা ভর-দুপুরে। যেমন রোদ তেমনি গরম। সকলের হাতেই হাতপাখা। কিন্তু যতই হাওয়া দেওয়া যাক, ঘামই শুকোয় না। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে আগুনের মত গরম।

গাড়ি চলেছে, গাড়ি চলেছে, গাড়ি চলেছে।

মেয়ে-পুরুষ সকলে বসেছে একাকার হয়ে।

ভুনীর কোলে ভুনীর শিশুসন্তানটি, ভুনীর পাশেই ভুনীর মা। তার পর প্রমীলা, মেনকা, যজ্ঞেশ্বরী ও অন্যান্য মেয়েরা। পুরুষদের মধ্যে হরিধনবাবু, বিহারীবাবু, মথুরবাবু ইত্যাদি, এবং দলের ম্যানেজার ধর্মদাসবাবু।

সকলেই গলদঘর্ম হচ্ছেন। কিন্তু এই গরম ও ঘাম নিয়ে তাঁদের যেন তেমন কোনো চিন্তাই নেই। তাঁদের মনের মধ্যে বেশ উত্তেজনা—কৃষ্ণনগরে গিয়ে অভিনয় দেখাতে হবে তাদের।

গাড়ি চলেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে ছড়িয়ে দিতে দিতে।

হঠাৎ ধর্মদাসবাবু উঠে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, 'ওহে উমি, উমিচাঁদ হে।'

একটু ওপাশ থেকে সাড়া দিল উমিচাঁদ।

ধর্মদাসবাবু বললেন, 'একটা ভুল হয়ে গেছে হে। খাবার নেওয়া হয়নি। একটা বড় স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে তার ব্যবস্থা করতে হবে যে।'

উমিচাঁদ বলল, 'আচ্ছা।'

কয়েকটা ছোট স্টেশনে অল্পসময়ের জন্যে থেমে-থেমে গাড়ি এসে দাঁড়াল কাঁচড়াপাড়ায়।

ধর্মদাসবাবু বলল, 'উমি, এবার জল-খাবারটা নিয়ে এস।'

গাড়ি থেকে নেমে গেল উমিচাঁদ। দ ঠোঙা ভরতি খাবার নিয়ে ফিরে এল সে কিছুক্ষণ বাদে। কিন্তু বরাত তার মন্দ। কি-একটা ভুল হওয়ায় আবার সে ছুটল দোকানের দিকে।

ইতিমধ্যে গাড়ি দিল ছেড়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে ধর্মদাসবাবু ডাকতে লাগলেন, "উমিচাঁদ, উমিচাঁদ!'

কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দরজায় দাঁড়িয়ে গলা বার করে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন ধর্মদাসবাবু।

ঐ দেখা গিয়েছে উমিচাঁদকে। সে ছুটতে ছুটতে আসছে। তার মুখে রোদ পড়ে চকচক করছে মুখটা।

অনেকটা ছুটতে হয়েছে উমিচাঁদকে। অবশেষে সে লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। ধর্মদাসবাবু তার হাত ধরে টেনে তুললেন।

হাঁফাতে-হাঁফাতে উমিচাঁদ বেঞ্চে বসে পড়ল। কিন্তু বসে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। শুয়ে পড়ল সে বেঞ্চে। তার মুখে কথা নেই।

'উমিচাঁদ, উমিচাঁদ।' ডাকলেন ধর্মদাসবাবু। কোনো সাড়া দিল না উমিচাঁদ।

সকলে উঠে এল। কি হল কেউ বুঝতে পারল না।

পুরুষদের ভিড় ঠেলে প্রমীলা আর মেনকা উঁকি দিয়ে গেল। বুকের মধ্যে বাচ্চাটিকে নিয়ে বসে রইল ভুনী।

ব্যাপারটা হল কি? সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সকলে চ্যাঁচামেচি আরম্ভ করল।

ধর্মদাসবাবু বললেন, 'জল, জল। জল আনো। রোদ লেগে সর্দিগর্মি হয়েছে।'

সকলেই 'জল-জল' বলে চ্যাঁচামেচি করতে লাগল। কিন্তু গাড়িতে কারও কাছে জল নেই।

একটা মরুভূমি পার হয়ে চলেছে যেন গাড়িটা। প্রবল উত্তাপ, প্রবল পিপাসা,— কিন্তু জলের চিহ্ন নাই।

মেয়েরা হায়-হায় করতে লাগল। কিন্তু কারও কিছু করার নেই। পুরুষরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভুনী কোল থেকে তার বাচ্চাটিকে তার মায়ের কোলে প্রায় যেন ফেলে দিল। প্রচুর স্বাস্থ্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল ভুনী। একটু এগিয়ে এসে সে আদেশ করার মত করে সকলকে বলল, 'সরে দাঁড়াও সক ওদিকে সরে যাও।'

উমিচাঁদের কপালে একবার হাত দি ভুনী। উমিচাঁদের মুখের কাছে একে নীচু করে নামিয়ে আনল তার শরী একবার চোখ মেলেছিল উমিচাঁদ। তারপর সে চোখ বুজল।

ভুনীর চোখে জল এসে গেল। উমি চাঁদের পিপাসার্ত মুখে সে তার স্ত ঢেলে দিল। কয়েক ঢোক খেয়ে উমিচাঁদ। অথচ, এতে কোনো কাজ হল না

সকলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল এ কাণ্ড। সকলে যেন আকাশ থেকে পড় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হাহাকার করে উ দাঁড়াল ভুনী। গায়ের কাপড় ঠিক ক নেওয়ারও খেয়াল হল না তার। বলল 'পারা গেল না, পারা গেল না, রে : বাঁচাে গেল না লোকটাকে।'

ভুনীর মা এই কাণ্ড দেখে অবাক হ গিয়েছে। তার মেয়ে যে লাজলজ্জা এমন ভাবে বিসর্জন দিতে পারে, তা কখনে ভাবা যায়নি। ত্রিসংসারে এমন কাণ্ড কখনে ঘটতে পারে, তাও তার ধারণার বাইরে ছিল

বাচ্চাটিকে প্রমীলার হাতে দিয়ে তাড়া- তাড়ি উঠে এল ভুনীর মা। মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসাল

ইতিমধ্যে কেঁদে উঠল সমস্ত গাড়িটা।

ট্রেন একটা হুইসল দিয়ে বাঁক নিল। ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে পার হয়ে চলল ট্রেনটা যেন একটা মরুপ্রান্তর।

এরপর গত হয়ে গিয়েছে অনেক বছর।

সে বিনোদিনী নাট্যসমাজ আর নেই। কি ঘটনা সেদিন ঘটেছিল তা বলারও কেউ নেই। সে নট-নটীরাও নেই। নেই সেই বনবিহারিণীও, যাকে বেশির ভাগ লোক সে আমলে ভুনী বলেই জানত। কোনো স্মৃতি- চিহ্নই তারা কেউ রেখে যায়নি।

চোরবাগানের চেহারাও এখন নতুন। নতুন ডিজাইনের কোঠাবাড়ি উঠেছে অনেক— নতুন বাসিন্দারা নতুন মেজাজ নিয়ে সেখানে বাস করে। সেই সার-সার খোলার ঘর উহ্য হয়ে গিয়েছে অনেকদিন হল। প্রফেসর পীতাম্বর নামে কোনো যাদুকর এখানে থাকত কিনা, কেউ তা জানে না। তারা কেউ নেই, নেই সেই মমতা।

সবাই হারিয়ে গিয়েছে তাদেরই সঙ্গে।

যে খোলা জায়গায় সার্কাস দেখিয়েছিল প্রফেসর রামমূর্তি, সেখানে এখন মস্ত বাড়ি উঠেছে, জাতির নেতার নামে চিহ্নিত হয়েছে সেই বাড়িটা।

কিন্তু এত বদলের মধ্যেও চোরবাগানে একটা পুরনো সেকেলে ছোট বাড়ি এখনো সেকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দেয়ালের গায়ে শ্বেতপাথরের ছোট একটা ট্যাবলেট লাগানো, তার উপর সিসার কালো অক্ষরে লেখা— Here lived Jnanendra-mohan Bose

সবই মুছে গিয়েছে, তারই মধ্যে একটু-খানি জায়গা জুড়ে যাঁর স্মৃতিটা আটকে আছে তিনি হলেন সেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন।

— সমাপ্ত —
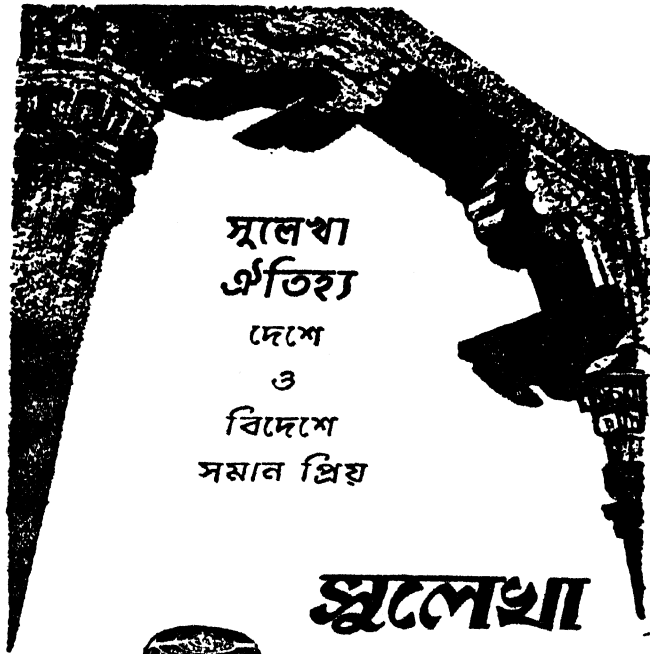
কালীঘাটের কালীমন্দির

কালীঘাট একটি পবিত্র তীর্থস্থান। সতীদেহের দক্ষিণ পায়ের আঙুল বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে এখানে এসে পড়েছিল। এখানকার দেবতা কালী এবং পীঠরক্ষক হলেন নকুলেশ্বর। সতীর প্রতি স্নেহবশত শিব লিঙ্গরূপ ধারণ করে নকুলেশ্বর হলেন। ব্রহ্মা কালীদেবীর মুখমণ্ডল স্থাপনা করলেন। এই মহাতীর্থে, সন্ন্যাসী, সাধু, যোগী, সাধারণ মানুষ মনস্কামনা পূরণের জন্য যুগ-যুগ ধরে সমবেত হয়ে আসছে।

এই কালীঘাট এক সময়ে ছিল বাঘ-ভালুক শ্বাপদসংকুল অরণ্য। তখন গঙ্গার গতিধারা ছিল বেগবান। বাণিজ্যের সুবৃহৎ নৌকা সভয়ে এই অরণ্য অঞ্চল অতিক্রম করত। কালীমূর্তি প্রকাশের পর স্থানটির কালীঘাট নাম হয়; পূর্বেকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাভারতে দক্ষিণ বাঙলার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু কালীঘাট নামে কোন স্থানের উল্লেখ মহাভারতে নেই। অধিকাংশ পুরাণে দক্ষিণ বাঙলার সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্যময় অঞ্চলকে 'সমতট' বলত। মনে হয় কালীঘাট ছিল এই সমতটের অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পালবংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরা তান্ত্রিক উপাসনা প্রচার শুরু করেন। পালরাজারা ব্রাহ্মণদের জমি দান করেছিলেন। তান্ত্রিক কাপালিকরা অরণ্য মধ্যে উপাসনা করতেন। তন্ত্রে যে কালীপীঠ বা কালীক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে তা এই কালীঘাটেরই নামান্তর। এর থেকে মনে হয় বুদ্ধের পরবর্তী কোন সময়ে কালীপীঠের অভ্যুদয় ঘটে। এ দেশীয় বণিকেরা পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য যাত্রা করে পথে অরণ্য মধ্যস্থ কালীক্ষেত্রে পূজাদান করতেন। যেখানে এসে নৌকা থেকে তীরে উঠত সকলে, ঐ স্থানটিকে 'কালীদেবীর ঘাট' থেকে 'কালীর ঘাট', কালীর ঘাট থেকে কালীঘাট নামে চিহ্নিত করা হয়। বল্লালসেনের সময়ে কালীঘাটে তীর্থযাত্রা করতে শুরু করে অনেকে। কালীক্ষেত্রের প্রশস্তি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ষোড়শ শতাব্দীতে কালীঘাটে জনবসতি বেশ ঘন হয়ে উঠতে থাকে। এর আগে দু-এক ঘর লোক দেখা যেত মাত্র।

মার্কণ্ডের পুরাণ, তন্ত্রসার, অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রে কালীঘাটের উল্লেখ আছে। বৃহন্নীলতন্ত্রে কালীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। আকবরের রাজত্বকালে, বাঙলায় সেন আমলে কালীঘাট বর্তমান ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে এ তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' কালীদেবীর কথা আছে। সে ১৪৯৫ খৃঃ ঘটনা। বলরাম কবি শেখরের 'কালিকামঙ্গল', রামলাল দাসকের 'অনাদিমঙ্গল'-এ কালীঘাটের উল্লেখ আছে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন (১৫৭৭ খৃঃ)। চণ্ডীমঙ্গলে আছে—

ত্বরায় বাহিছে তরি তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালুঘাটা এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥
তীরের প্রমাণ যেন চলে তরীবর।
তাহার মেলানি বাহে মাইন নগর॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার পরবর্তী অল্পকালের মধ্যে রচিত ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসানে' উল্লেখ আছে—

কালীঘাটে কালীবধ বড়াতে বেতাই।

এই সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আকবরের রাজত্বকালে কালীঘাট মহাতীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে যে 'কালীকোটা'র উল্লেখ আছে, অনেকে তাকে কালীঘাট বলেই মনে করেন।

কালীঘাটের কালী মন্দির

কালীঘাট এবং পাশের জমি মিলে ছয়শত বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি। এর মধ্যে কালীর পুরী হল এক বিঘা এগার কাঠা তিন ছটাক ভূমির ওপর। পুরীর পূর্ব দিকে কালীকুণ্ড হ্রদ। পশ্চিমে তোরণ দ্বারের সামনে গঙ্গার ঘাট। তোরণের ওপরে নহবৎখানা। পুরীর উত্তরপূর্ব কোণে নকুলেশ্বরের মন্দির। নকুলেশ্বর ও শ্যামরায়ের বিগ্রহ থাকায় এখানে সর্বশ্রেণীর মানুষের সমাবেশ ঘটে থাকে। কালীদেবীর প্রাত্যহিক পূজা ব্যতীত স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, শারদীয় মহোৎসব, শ্যামাপূজা প্রভৃতি পূজা অনুষ্ঠান ও উৎসব হয়ে থাকে। 'দুর্গাপূজার তিন দিন এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। বিশেষ করে মহাষ্টমীর দিন এরূপ লোকারণ্য হয় যে, পুলিশ হইতে ২০।২৫ জন কনস্টেবল ও ২।৩ জন ইন্সপেক্টরকে ভিড় থামাইবার জন্য দিবা-রাত্র উপস্থিত থাকিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ২।৩টা পর্যন্ত কালীঘাট রোডে গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ থাকে। দুর্গোৎসবের কয়েক দিন প্রত্যহ ১৫।১৬ শতের অধিক ছাগ, মহিষাদি বলি হইয়া থাকে। অন্যান্য দিনও অন্যূন শতাধিক ছাগ-মহিষাদি বলি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য পর্ব দিনে বলির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ সকল একত্র করিলে বৎসরে অন্যূন ৫০ হাজার বলি অর্থাৎ প্রতি দ্বিতীয় বৎসরের শেষে লক্ষ বলির অধিক হইয়া থাকে।" এই গ্রন্থখানির প্রকাশের তারিখ ১৮৯১ খৃঃ।

পাদ্রী ওয়ার্ডের বিবরণ থেকে জানা যায় :

"The daily offerings to this Goddess are astonishingly numerous, on days when the weather is very unfavourable not less than 320 pounds of rice, twenty-four of sugar, forty of sweetmeats, forty of clarified butter, ten of flour, ten quarters of milk, a peck of peas, eight hundred plantains and other things are offered, and eight or ten goats sacrificed. On common days of all these things multiply three times in quantity, and at great festivals or when a rich man comes to worship, ten, twenty or forty times this quantity and as many as forty or fifty buffaloes and a thousand goats are slain."

ওয়ার্ডের বিবরণ থেকে সংক্ষেপে আরো উল্লেখ করছি : একবার রাজা নবকৃষ্ণ কালীঘাট দর্শনে এসে এক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছিলেন পূজা দিতে। তার পূজার অর্ঘ্যের মধ্যে ছিল দশ হাজার টাকা মূল্যের একছড়া সোনার হার, বহু মূল্য শয্যা, রূপোর থালা,

পরবর্তী সংখ্যায়
নিউ মার্কেট, ইডেন গার্ডেন্স
শেঠ সুখলাল কারনানী
হসপিটাল

রেকাব, বাটি, এক হাজার লোকের উপযুক্ত সন্দেশ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। তাছাড়া দু হাজার কাঙালীকে নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছিল। খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করে পূজা দিয়েছিলেন। তাঁর পূজার অর্ঘ্য ছিল : দেবীর চারটি রূপোর হাত, দুটি সোনার চোখ, সোনা ও রূপোর বিবিধ অলংকার, পঁচিশটি মহিষ, দশটি ছাগল। পূর্ব বাঙলার একজন ব্যবসায়ী পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে কালীর পূজা দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি এক হাজার ছাগল কিনে বলিও দেন। ১৮১০ খৃঃ পূর্ববঙ্গের একজন ব্রাহ্মণ চার হাজার টাকা পূজার জন্য ব্যয় করেছিলেন। তিনি যে সোনার কণ্ঠমালা দিয়েছিলেন, তার মালাগুলি ছিল অসুরের মাথার মত। ১৮১১ খৃঃ কলকাতার ব্রাহ্মণ গোপীমোহন দেবীপূজায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলে বলি প্রদান করেন নি। ওয়ার্ড সাহেব আরও বলেছেন যে : "কেবল হিন্দুরাই যে এই কাল পাথরের পূজা করে, তাই নয়; আমি অনেকবার শুনেছি যে, ইউরোপীয়রা অথবা তাদের এদেশীয় উপপত্নীরা এই মন্দির দর্শনে গমন করে এবং পূজায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে। আমি যে ব্রাহ্মণের নিকট বসে এই বিবরণ লিখছিলাম, তিনি বলেছেন যে, তিনি যখন কালীঘাটের নিকট বড়িষায় থেকে পড়তেন, সেই সময়ে তিনি অনেকবার দেখেছিলেন যে, ইউরোপীয়দের ভার্যারা পাল্কি করে এসে পূজা দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমার বোধহয়, এই সকল রমণী ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ

কালীপীঠে আর একটি শিব মন্দির — ফটো : অমৃত

করেছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ বললেন, মন্দিরাধিকারীরা তাঁকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চয় করে বলেছেন যে, সাহেবেরা সর্বদাই দেবীর পূজা দিয়ে তাঁর নিকট বর প্রার্থনা করেন, এবং সম্প্রতি কোম্পানির একজন সাহেব কর্মচারী একটি মোকদ্দমায় জয়লাভ করে দুই-তিন হাজার টাকা ব্যয় করে কালীর পূজা দিয়েছিলেন। তাছাড়া এও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয় যে, প্রতি মাসে প্রায় চার-পাঁচশত মুসলমান কালীর পূজা দিয়ে থাকে।" তাছাড়া মার্শম্যানের একটি বিবরণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালীঘাটে পূজা প্রদান সম্পর্কে আছে :

> "Last week a deputation from the Government went in procession to Kalighat and made a thanks giving offering to this Goddess of the Hindus, in the name of the company, for the success which the English have lately obtained in this country. Five thousand rupees were offered. Several thousand natives witnessed the English presenting their offerings to this idol."

কালীর মন্দিরের চারপাশে যে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে তা দান করা সম্পর্কে নানা মত শোনা যায়। বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী কেশব রায় বা সন্তোষ রায়ের দান যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অবশ্য এই মতটি সব থেকে বেশী প্রচলিত। বহু পূর্বে হিন্দু রাজারা এই জমি দান করেছিলেন বলে যে মতটি প্রচলিত তারও কোন ভিত্তি নেই। কারণ ক্ষত্রিয় রাজাদের এই দান সংক্রান্ত কোন অনুশাসন পত্র পাওয়া যায় না।

কালীপীঠে দুটি শিব মন্দির — ফটো : অমৃত

১৭১৬ খৃঃ জমিদার কেশব রায় ...রী নিমতা বিরাটী থেকে বড়িষায় গিয়ে ... স্থাপন করেন। এই সময় কলকাতার ...ংশ স্থান ছিল জঙ্গলময়। বাঘ এবং ...ন্য হিংস্র প্রাণী ঘুরে বেড়াত। ১৭০০ ...ইংরেজরা গোবিন্দপুর কিনে নেওয়ার ...সেখানকার অনেক অধিবাসী ভবানী-...ও কালীঘাটে গিয়ে বাস করতে থাকে। ...সময়ে কালী সেবাইতদের যে পরিচয় ...যায় তার থেকে প্রমাণ হয় যে, ...ঘাট গ্রামটি সেবাইতদের অধিকারে এর ...ক আগে থেকেই ছিল। তবে কোন সূত্রে ...ই দান তাঁরা লাভ করেছিলেন, তার ...সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। অবশ্য সাবর্ণ ...রৌরা কালীর সেবার জন্য কালীঘাটের ...র বহু স্থানে ভূমিদান করেছিলেন। ...রাঁদের দান সংক্রান্ত তায়দাদে কালীঘাট ...র উল্লেখ নেই। সন্তোষ রায় জমিদারীর ...টি স্থান কালী সেবার জন্য দান ...। কিন্তু কালীঘাট নয়। সম্ভবত ...ঘাট গ্রাম তাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ...না।

১৩৩১ খৃঃ দক্ষিণ ও পূর্ব বাঙলা ...সেনের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ...ছিলেন শৈব সাধক এবং ব্রাহ্মণদের ...মি দান করেন দেবসেবার জন্য। কিন্তু ...ঘাট সম্পর্কে তাঁদের কোন দানপত্র পাওয়া যায় না। ১৫৮২ খৃঃ মোগল আমলে বাঙলা দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে কালীঘাটের উল্লেখ নেই। ১৭২২ খৃঃ কেশব রায় এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ এই সময়ে যে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন, সেখানে কালীঘাট রাজস্বভুক্ত অঞ্চল ছিল না। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময় কালীঘাট গ্রাম ইংরেজ বা সাবর্ণ চৌধুরী কারও এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না।

১৭৬৯ খৃঃ কোম্পানী কালীঘাটে দেবোত্তর ভূমির বার বিঘা জমি হুজুরি-মলকে পুরস্কার দেন। হুজুরিমল ঐ জায়গায় ঘাট এবং শিব মন্দির নির্মাণ করান। অবশ্য মুদিসাহানগরে বার বিঘা জমি হালদারদের নিষ্করর‍ূপে দান করা হয়েছিল এর পরিবর্তে। ১৭৭২ খৃঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি জরীপ ও নক্সা প্রস্তুত হয়। কালীঘাট সম্ভবত দেবোত্তর সম্পত্তি বলে ঐ রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। ১৭৮৯ খৃঃ কর্নওয়ালিশের দশসালা এবং ১৭৯৩ খৃঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কালীঘাটের জমির জন্য খাজনা দিতে হত না। ১৮৫৫ খৃঃ মেজর স্মাইক কালীঘাট ইংরেজদের পঞ্চান্ন গ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলে কালীঘাট ক্রোক করেন। একটি জটিল অবস্থা সৃষ্টি হলেও সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। ১৮৬৯ খৃঃ গভর্নমেন্ট কালীঘাট মৌজা করমুক্ত বলে ঘোষণা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী যখন কালীর সেবাইত ছিলেন তখন কালীদেবীর একটি ছোট মন্দির ছিল। এর আগে দেবী ছিলেন ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে। পাথর সাজিয়ে তার ওপর দেবীর মুখমণ্ডল, হাত, অস্ত্র এবং হাতে ধরা মুখ-গুলি রাখা হয়েছে। অনেকে মনে করেন ঐ পাথরের নীচেই সতী-অঙ্গ সযত্নে রক্ষিত। দেবীমূর্তির নীচে একটি কূপ কালী-কুণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। ঐ পথে দেবী-চরণামৃত কুণ্ডে গিয়ে পড়ে।

কালীর পুরীর তোরণদ্বার পশ্চিমে গঙ্গার দিকে। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের পরিসর পঞ্চাশ হাত। ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে আট বৎসরে নির্মিত হয়। তখন সন্তোষ রায় ছিলেন কলকাতার একজন হিন্দু সমাজপতি। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর প্রতাপ ছিল অখণ্ড। সে সময় হাটখোলার ধনী কালিপ্রসাদ দত্ত দক্ষিণ কলকাতার ব্রাহ্মণ-দের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। সন্তোষ রায় বড়িষা, সুরসুনা, কালীঘাট এবং ঐ অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের ব্রাহ্মণদের অনুষ্ঠানে যোগদানে অনুমতি দেন। ব্রাহ্মণদের সম্মান এবং বিদায়দানস্বরূপ কালীপ্রসাদ সমাজপতির নিকট পঁচিশ হাজার টাকা পাঠান। সমাজের ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে সন্তোষ রায় ঐ টাকায় কালীমন্দির নির্মাণ শুরু করেন। তখন পুরোন মন্দিরের জীর্ণ অবস্থা। সন্তোষ রায় মন্দির নির্মাণ শেষ দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর পুত্র রামনাথ রায় ভ্রাতুষ্পুত্র রাজিবলোচন রায় ১৮০৯ খৃঃ মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করেন।

পুরাণে উল্লেখ আছে কালীঘাটের কালীর মুখমণ্ডল ব্রহ্মার সৃষ্টি। কালীর ঐ মুখমণ্ডল বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির দানে নানাবিধ অলংকারে শোভিত। প্রথমে কালীর চারটি রূপার হাত তৈরী করিয়ে দেন খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। পরে কালীচরণ মল্লিক চারটি সোনার হাত নির্মাণ করেন। চড়ক-ডাঙার রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় চারগাছা সোনার কঙ্কন দেন। বেলেঘাটার রামনারায়ণ সরকার দেন স্বর্ণখোচিত সোনার মুকুট। পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ কালীর সোনার জিহ্বা প্রদান করেন। নেপালের প্রধান সেনাধ্যক্ষ জঙ্গবাহাদুর তৈরী করে দেন কালীর মাথার ওপরকার রৌপ্যনির্মিত ছাতাটি। কালীদেবীর সোনার ভ্রূ, অন্যান্য সোনার অলঙ্কার, হাতের অসুরের মুণ্ড

...ঘের মন্দির ফটো : অমৃত

ধনী ব্যক্তিরা প্রদান করেছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ দেবীর অলঙ্কার চুরি হয়ে গেলে বহু ধনী হিন্দু সে সমস্ত আবার নির্মাণ করিয়ে দেন।

কালীপীঠ এক সময় কাপালিক এবং তান্ত্রিকদের হাতে ছিল। তখন পূজা পদ্ধতি ছিল তামসিক। পশু ও নরবলি হত। বর্তমান সেবাইত হালদারদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ভবানীদাস ব্রহ্মচারী। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ভবানীদাস নিরামিষ ভোগসহকারে দেবী অর্চনা করতেন। পশুবলি ছিল না। কেবল দুর্গাপূজার নবমী দিনে একটি পশু বলি হত। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত। অবশ্য যাত্রীরা প্রতি দিন কালী মন্দিরে পশু বলি দেন। প্রথম প্রদত্ত বলি কালীর ভোগের জন্য গ্রহণ করা হয়। হালদাররা পশুবলি দেন না।

ভবানীদাসের সময় পর্যন্ত সেবাইতরাই দেবী পূজা করতেন। ভবানীদাসের পর থেকে পুরোহিতদের দ্বারা দেবী পূজা হয়। যেদিন যে সেবাইতের পালা সেদিন তিনি পূজার ব্যয় বহন করেন। কালীর মিশ্ররা দেবীর বেশভূষা সজ্জা করেন। মিশ্ররা বংশানুক্রমিক এই কাজ করে আস- ছেন। মন্দিরের দ্বার উন্মোচন ও বন্ধ করেন এই মিশ্ররাই। অধিকারীরা সব কিছু তদারক করেন।

মন্দিরের আয়ের পথ ঃ যাত্রীরা কালী, নকুলেশ্বর, শ্যামরায় ও মনসায় প্রণামী দিয়ে থাকেন; অনেক পূজার দ্রব্য যাত্রীরা প্রদান করেন; পশুবলির দক্ষিণা; উৎসর্গীকৃত ছাগমুণ্ড বিক্রয়; পূজা প্রণামী অন্যান্য উপহার এবং দেবোত্তর ভূমির উপসত্ত্ব।

মন্দিরের ব্যয় ঃ প্রতি দিনের পূজার নৈবেদ্য; পুরোহিতের দক্ষিণা, মিশ্রদের দৈনিক প্রাপ্য, বাদ্যকর, ঘণ্টাবাদক, কর্মকার- দের দৈনিক বেতন, মন্দির রক্ষীদের প্রাত্যহিক বেতন, পাচক এবং জমাদারদের বেতন, কালীর ও শ্যামরায়ের ভোগ।

নিত্যপূজার শেষে দুপুরে অতিথি ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভোগ বিতরণের পর মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। সন্ধ্যায় সময় আবার দ্বার উন্মোচন করে বৈকালী নিবেদিত হয়। পালাদার, যাত্রিরা এবং বহু ধনী ব্যক্তি নিত্যপূজা দিয়ে থাকেন। অভিলাষ অনুযায়ী প্রথম পূজা ও বলিদান করা যায়। সাবর্ণ চৌধুরীরা এক সময় প্রতিদিন কালীপীঠে পূজা পাঠাতেন। এই পূজা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হত। পাইকপাড়ার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহও দেবীর পূজা পাঠাতেন এবং আমিষ ভোগের ব্যয় তিনি বহন করতেন। অধিকারীরা পালাক্রমে দেবীর প্রাত্যহিক পূজা করেন। কয়েকটি সাময়িক উৎসবের ব্যয় অধিকারীরা সকলে মিলে বহন করেন।

কালীঘাটের সীমানার মধ্যে অন্য কোন দেবীপ্রতিমা গঠন করে পূজা করার বিধান নেই। কালীঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে স্বতন্ত্র দেশজ শিল্পরীতির উদ্ভব ঘটে তা কালীঘাটের পটশিল্প নামে দেশে ও বিদেশে পরিচিত।

কালীপীঠ সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

কালীর সম্মুখীন গঙ্গার ঘাট ১৭৭০ খৃঃ-৭১ খৃঃ হুজুরিমল কর্তৃক নির্মিত কালীর বর্তমান মন্দির ১৮০৯ খৃঃ বড়িষার প্রসিদ্ধ জমিদার সন্তোষ রায়চৌধুরী ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা নির্মিত; দুটি ভোগঘর এবং পুরীর তোরণদ্বার ও নহবৎখানা ১৮১২ খৃঃ গোরক্ষপুরের টীকা রায় নির্মিত; নাটমন্দির ১৮৩৫ খৃঃ আন্দুলের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা কালীনাথ রায় নির্মিত; শ্যামরায়ের মন্দির ১৮৪৩ খৃঃ বাওয়ালীর বৈষ্ণব-প্রধান জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল; তৃতীয় ভোগঘর ১৮৪৩ খৃঃ শ্রীপুরের জমিদার রায় তারকচন্দ্র চৌধুরী নির্মিত; চতুর্থ ভোগঘর ১৮৪৪ খৃঃ তেলেনীপাড়ার জমিদার কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মিত; নকুলে- শ্বরের মঠ-মন্দির ১৮৫৪ খৃঃ পাঞ্জাব- প্রদেশীয় ব্যবসায়ী তারা সিং নির্মিত; পুরীর চারদিকের গমনাগমনের পথ ... খৃঃ গড়িয়ার গোবিন্দ সাধুখাঁ এবং ... খৃঃ কলকাতা জোড়াসাঁকোর রামচন্দ্র ... পরে হাপরানিবাসী গোবর্ধনদাস ... ওয়ালা নির্মিত; শ্যামরায়ের ... ১৮৫৮ খৃঃ শাহানগরের মদন ... নির্মিত; অবশিষ্ট ভোগঘর ১৮৭... হাপরার গোবর্ধনদাস আগরওয়ালা নি... গঙ্গার ঘাট থেকে কালীর মন্দির ... গমনাগমনের পথ ১৮৭৮ খৃঃ জোড়া... নিবাসী রামচন্দ্র পাল ও ... আগরওয়ালা নির্মিত; শ্মশানের বিশ্রামের ঘর ও যাতায়াতের পথ ১৮৭... কালীর সেবাইত গঙ্গানারায়ণ হাল... স্ত্রী ও প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জননী ... ময়ী দেবী কর্তৃক নির্মিত; শ্মশানে... বিশ্রামঘর ও শিবমন্দির ১৮৮০ খৃঃ কোর্টের বেঞ্চ-ক্লার্ক বরিশালের ... বসু নির্মিত; কালীর মন্দিরের ... পশ্চিম কোণে মনসাতলা প্রস্তর ... নির্মাণ করান বেহালা নস্করপুরের গো... চন্দ্র দাসমণ্ডল ১৮৮০ খৃঃ।

শ্যামরায়ের বিগ্রহ

কালী মন্দিরের পশ্চিমে শ্যামরা... বিগ্রহ ও দোলমঞ্চ। কালী মন্দিরের সে... হালদারদের পূর্বপুরুষ ভবানীদাস এ... ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি এই শ্যাম... বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তখন ... রায়ের অধিষ্ঠান ছিল কালী মন্দি... ভিতরে। ১৭২৩ খৃঃ মুর্শিদাবাদের ... কানুনগো কালী মন্দিরে শ্যামরায়কে দে... পান। তিনি নিজ ব্যয়ে শ্যামরায়ের ... ছোট ঘর তৈরী করে দেন। ১৮৪৩ ... বাওয়ালীর জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল ... ঘরটি ভেঙে বর্তমান স্থানে এই মন্দি... তৈরী করে দিয়েছেন।

শ্যামরায়ের প্রাত্যহিক পূজা হয় ক... সেবাইত হালদারদের তত্ত্বাবধানে। পূজার ... একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। শ্যামরা... প্রধান উৎসব দোলযাত্রা। রাসনবমীর ... মহাউৎসাহে উদযাপিত হয়। প্রথমে দো... মঞ্চ ছিল না। ১৮৫৮ খৃঃ সাহানগ... মদন কোলে এই দোলমঞ্চ তৈরী করে দে... পরে মেরামতের কাজ করেছেন অনেকে...

শ্যামরায় বিগ্রহ মন্দিরের কাছেই ... একটি শ্যামরায় বিগ্রহের অধিষ্ঠান ... গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকদের ... পূজিত হতেন। এর গোবিন্দরায় ... থেকেই গোবিন্দপুর গ্রামের নাম। ১৭... খৃঃ ইংরেজরা গোবিন্দপুর কিনে ... বিগ্রহটি কালীঘাটে নিয়ে আসা হ... এখানে নিত্য সেবা ও দোলযাত্রা হয়। এ... জন ব্রাহ্মণ সমস্ত পূজা ও অনুষ্ঠান প... চালনা করেন। এই মন্দিরে হালদারদে... কোন অধিকার নেই।

কালীর মন্দিরের চারদিকে যে-সক... মন্দির আছে, তাতে হালদারদের কো... সংস্রব নেই।

জানাতে পারেন

প্রশ্ন

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ১৯৪৯ সালে গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় কে প্রথম হয়েছেন? ঐ বৎসর পাশকোর্সে ইংরেজী ও ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন কে বা কাহারা?

(খ) ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-টি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীর নাম কি কি?

বিনীত
এস চক্রবর্তী
খেলাঘর, ত্রিপুরা

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

ষষ্ঠ বর্ষ ১ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত শ্রীতীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ক) প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দিচ্ছি। নামগুলো "ভারতের বীরসেনানী" বই থেকে সংগৃহীত হল :—

১। পদ্মবিভূষণ — জেনারেল জে এন চৌধুরী, এয়ার মার্শাল অর্জন সিং।

২। পদ্মভূষণ—লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল যোগীন্দর সিং ধীলন, লেঃ জেঃ কাশ্মীর সিংহ কাটোচ, লেঃ জেঃ প্যাট্রিক ওসওয়াণ্ড ডুন, লেঃ জেঃ হরবকশ সিং, এয়ার ভাইস মার্শাল প্রতাপচন্দ্র লাল, এয়ার ভাইস মার্শাল রামস্বামী রাজারাম।

৩। বিশিষ্ট সেবাদক—মেজর জেনারেল যোগীন্দর সিং, গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডাব্লিউ ডি এ লয়েড।

৪। পরম বীরচক্র—কোম্পানী কোয়ার্টার মাস্টার আবদুল হামিদ, লেঃ কর্ণেল এ বি তারাপোরে। (উভয়েই মরণোত্তর)।

৫। মহাবীরচক্র—(১) মরণোত্তর—লেঃ কঃ এইচ এল মেটা, লেঃ কঃ এন এন খান্না, মেজর ভূপিন্দর সিং, মেজর এ আর ত্যাগী, ক্যাপ্টেন চন্দ্রনারায়ণ সিং, সুবেদার অজিত সিং। (২) জীবিত — মেজর জেনারেল রাজিন্দর সিং, মেঃ জেঃ গুরুবকশ সিং, মেঃ জেঃ এস এস কালান, মেঃ জেঃ এইচ কে শিবলাল, লেঃ কঃ গুরুবংশ সিং সংধ, লেঃ কঃ সালিব কালেব, লেঃ কঃ হাইড, মেজর ভাস্কর রায়, মেজর রণজিৎ সিং দয়াল, উইং কমাণ্ডার ডাব্লিউ এস গুড-ম্যান, উইং কমাণ্ডার পি পি সিং, কোয়াড্রেন লীডার পি গোতম, বিগ্রেডিয়ার আর ডি হীরা।

৬। বীরচক্র—(১) মরণোত্তর—মেজর এস এম শর্মা, নায়েক দেবীবাহাদুর গুরুং, ল্যান্সহাবিলদার উমরাও সিং। (২) জীবিত—লেঃ কঃ সম্পুরণ সিং, লেঃ কঃ চাজুরাম, মেজর এম এ আর শেখ, মেজর মেঘ সিং, মেজর যতীন্দর কুমার, মেজর এস সি ভাদেরা, মেজর মস্তোর সিং থয়রা, মেজর এম এ জাকি, মেজর এস এস রাগ্রা, মেজর সোমেশ কাপুর, ক্যাপ্টেন আর সি বক্সী, লেঃ সুরীন্দর পাল শেখন, লেঃ তেজা সিং, লেঃ ভিকব সিং, সেঃ লেঃ আই এস থানি-ওয়াল, সুবেদার মানবাহাদুর গুরুং, সেঃ লেঃ ভি কে বৈদ্য, সুবেদার ভি মাধবন, সেঃ লেঃ আর এস বেদী, রিসলদার অচর সিং, নায়েক সুবেদার জগদীশ সিং, নায়েক চাঁদ সিং, নায়েক সুবেদার মহম্মদ আয়ুব খাঁ, নায়েক গনেশী দত্ত, হাবিলদার সি পেরুমল, নায়েক প্রেম সিং, হাবিলদার পোখারাজ ল্যান্সনায়েক রাজবাহাদুর গুরুং, হাবিলদার আজমীর সিং, ল্যান্সনায়েক প্রীতম হাবিলদার যেশুরাম, ল্যান্সহাবি গুরুদেব সিং রাইফেলম্যান মাতন মতীলাল সিং, ল্যান্সহাবিলদার বে জর্জ, রাইফেলম্যান ধনবাহাদুর গু সিপাহী বালমরাম উঃ কঃ ভারত স্কোঃ লীঃ ট্রিভর কীলার, ফ্লাইট লেঃ এস পাঠানিয়া, স্কোঃ লীঃ এম এস বা ফ্লাইট লেঃ ত্রিলোচন সিং, স্কোঃ লীঃ হান্দা, ফ্লাইট লেঃ ভি এল রাঠোর, স্কোঃ এ জে এস সান্ধু, ফ্লাইট লেঃ এ টি স্কোঃ লীঃ ডেনজিল কীলার, ফ্লাইট লে কে মজুমদার, ফ্লাইং অফিসার এস মামগেন, ফ্লাইট লেঃ ভি কপিল, অফিসার এ আর গান্ধী, ফ্লাইট লেঃ এস মাংগাত, ফ্লাইং অফিসার ভি কে ফ্লাইং অফিসার পি পিংলে।

বিনীত
শ্রীমোহান্ত গুরুসদয় বিদ্যাবি
হাইলাকান্দি, আ
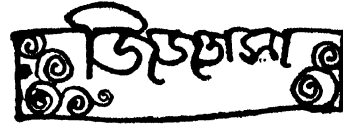
সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মঞ্জরী অপেরা' তাঁর অতি সম্প্রতিকালে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। বর্তমান সংখ্যায় এ উপন্যাসটির সংলাপ তুলে দেওয়া হল। বামদিকে সংলাপস্তম্ভ। ডানদিকে চরিত্রগুলি। বলাবাহুল্য ডানদিকের নামস্তম্ভটি ওলটপালটভাবে সাজানো রয়েছে। এখন বামদিকের স্তম্ভ ঠিক রেখে সেই অনুসারে নামগুলি সাজাতে হবে। উত্তর আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তরঃ (১) সাহিত্যের সত্য, (২) সঙ্গ : নিঃসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, (৩) বঙ্কিমচন্দ্রঃ জীবন ও সাহিত্য, (৪) লেখকের কথা, (৫) সাম্প্রতিক, (৬) কবিতার কথা, (৭) দেখা, (৮) বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, (৯) কুলায় ও কালপুরুষ, (১০) মনন, (১১) আমরা ও তাঁহারা, (১২) সাহিত্যের ভবিষ্যত।

সংলাপ	চরিত্র
(১) গোপালবাবু কি একটি জিরাফ? গোরাবাবু পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উঁচু—খাঁটি উচ্চৈঃশ্রবা হর্স। এই ঘোড়া ডিঙিয়ে আপনি মঞ্জরী দেবীর চরণতলের ঘাস খাবেন তাই জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কি জিরাফ, গলদেশটি কি অষ্টফুট লম্বা?	(১) মঞ্জরী
(২) আমাদের দেখে লোকে ভোলে—ঘরদোর ভুলে ছুটে এসে বলে—ভালবাসি। ভালবাসা না ছাই মঞ্জরী, আমাদের মধ্যেই ভুলো রোগের ছোঁয়াচ আছে—সেই রোগের ঝোঁকেই আমাকে ভুলে ওর কাছে—ওকে ভুলে তার কাছে—এই ভুলে ভুলেই সারা জীবন ছুটে বেড়ায়।	(২) গোরাবাবু
(৩) একদিন বাড়ী-ঘর স্ত্রী—তাদের অনেক সম্পদ ছেড়ে এসেছিলাম। তারপর মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হল। চিরকাল তাকে ভালবাসব বলে জাত খুইয়ে বোষ্টম হয়ে বিয়ে করলাম। আজ মনে হচ্ছে অলকা সব। অলকাকেই ভালবাসি। অলকা মনে করেই মঞ্জরীকে ভুল করে ভালবেসেছি।	(৩) বাবুল বোস
(৪) দল তুলে দিচ্ছি মাস্টারমশাই। নইলে তো আমি বাঁচতে পারব না। বাঁচতে আমাকে হবেই। তাকে যে আমি ভালবাসি।	(৪) তুলসী

অজানা

প্রমীলা

পুতুলের কথা

[illegible] ও লুইসিয়ানার সীমানা [illegible] প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর [illegible] জীবনে একটি মজার অভিজ্ঞতা [illegible] একদিন তিনি গেছেন ভালুক [illegible] প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন এক-[illegible] সংবাদিক। সবাই উৎসুক হয়ে রয়েছেন [illegible] প্রতীক্ষায়। শিকার মিলেও গেল, [illegible] সুযোগে। সকলকে চমকে দিয়ে [illegible] কটি নামিয়ে নিলেন। সহজ [illegible] হয়ে গেল। সাংবাদিক-[illegible] 'ওয়াশিংটন স্টার'-এর [illegible] তিনি প্রেসিডেন্টের মহানু-[illegible] এই দৃশ্যটি অমর করে রাখতে [illegible] কার্টুনিস্টের তুলিতে ধরা [illegible] বিখ্যাত 'টেডি' ভালুক—ভীত [illegible] করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

[illegible] সর্বত্রই কার্টুনটির ব্যাপক [illegible] ছিল। খেলনা-প্রস্তুতকারকরা [illegible] উৎসাহিত হয়েছিলেন। [illegible] কল্পনার নতুন দিগন্ত প্রসারে [illegible] অবদান অসামান্য। একজন এই [illegible] নিয়ে গেলেন মার্গারেট স্টেইফের [illegible] মার্গারেট স্টেইফে ছিলেন জার্মানীর [illegible] খেলনা-প্রস্তুতকারক। [illegible] খেলনা-প্রস্তুতকারক-[illegible] মার্গারেটের বেশ নামডাক। [illegible] তার খেলনা দ্রব্যের যথেষ্ট [illegible] ফ্রাউ স্টেইফে এই প্রতিষ্ঠান শুরু [illegible] শারীরিক ক্ষেত্রে তিনি মার খেয়েছেন [illegible] প্রতিভায় অতুলনীয়। [illegible] বয়সের সময় পোলিও রোগে [illegible] শারীরিক দিক থেকে অকর্মন্য পড়েন। আঘাত প্রচণ্ড হলেও তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। অক্ষমতাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তিনি হুইল চেয়ারে বসে সেলাই-এর কাজ শিখতে থাকেন। অবসর সময়ে রং-বেরং-এর কাপড় দিয়ে মজার মজার খেলনা তৈরী করা ছিল তার একটা নেশা। তার প্রত্যেকটি খেলনাই উৎসাহীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তিনিও ক্রমে বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েন। শুধু ছোটরাই নয়, বড়রাও তার খেলনা বেশ পছন্দ করত। ফলে অচিরেই ব্যবসাটি বেশ চালু হয়ে গেল। ১৯০৯ সালে ফ্রাউ স্টেইফে মারা যান। শূন্য স্থান পূরণ করেন মার্গারেট। ব্যবসার দিনে দিনে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে মার্গারেট 'টেডি' ভালুক আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'টেডি' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, আজও তা অক্ষুন্ন আছে। বেস্ট সেলার লিস্টে 'টেডি'র আধিপত্য দ্বিতীয়-রহিত। পাশাপাশি আর যে খেলনাগুলি শিশুচিত্ত জুড়ে রয়েছে তারা হল জাম্বো দি এলিফ্যান্ট, স্নবি দি পোডল, স্নো দি ট্রটল এবং নোজি দি রিনোসারোজ। এ ছাড়াও রয়েছে ডজন-খানেক অন্যান্য খেলনা-পুতুল। বিশ্বজোড়া যাদের বিরাট জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

জার্মানীর খেলনা কেনার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের। মোট উৎপাদনের শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ রপ্তানী করা হয়। ১৯৬৪ সালে খেলনা সামগ্রী রপ্তানী করে আয় হয়েছিল ৫১ মিলিয়ন ডলার। আগামী ছয় বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলেই আশা করা যায়। এ ছাড়া ৯০০টি অন্যান্য খেলনা উৎপাদক সংস্থা ১৯৫৯ সালে ৯৮ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৬২ সালে ১৩০ মিলিয়ন ডলার ব্যবসা করেছে। তাদের ধারণা খেলনা রপ্তানীতে তারা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবেন।

শুধু আমেরিকা নয়, সারা পৃথিবীতেই এই খেলনা পুতুলের চাহিদা ব্যাপক। আর এক্ষেত্রে জার্মানীর মধ্যে নুরেমবার্গ শহরেরই খ্যাতি সর্বাধিক। এ সম্বন্ধে নুরেমবার্গের ঐতিহাসিক খ্যাতিও আছে। চতুর্দশ লুই তাঁর বার বছরের ছেলেকে পুতুলের সেনাবাহিনী দিয়ে চমকে দিতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি তাঁর যুদ্ধমন্ত্রীকে প্রথমে নুরেমবার্গেই পাঠান। যুদ্ধমন্ত্রী যে পুতুলের সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেন তারা সকলেই ছিল 'অটোমেটিক' কায়দায় সুসজ্জিত। শতাব্দী পরেও নুরেমবার্গের এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে এবং বর্তমানে সেখানকার 'টিন সোলজার্স' ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে জানা গেছে যে, বড়রা আর মূল্যবান খেলনা কেনার তেমন আগ্রহী নয়। তবু ছেলেমেয়ের চাপে বাধ্য হয়ে বাবা-মাকে অনেক খেলনা কিনতে হয়। আজকাল ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই খেলনা-পুতুল তৈরী করার জন্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। কারণ বাচ্চাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে এরকম খেলনার দরকার আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী।

খেলনা-পুতুল সম্পর্কে শিশুদের মনোভাব এখন অনেক বদলেছে। কাঠের পুতুল সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েছে। আবার শিক্ষাগত খেলনা যেমন 'কেমিস্ট্রি সেট' তাদের বেশ প্রিয়। 'টয় সোলজার' অপেক্ষা কাউবয় এবং ভারতীয় পুতুলের জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। টেলিভিশন মানুষের রুচি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করলেও ফ্যান্সী পুতুল শুধু শৌখিন লোকেরাই কেনেন ঘর সাজানোর জন্য।

পুরনো ধরনের গাড়ী যেমন আজ অচল তেমনি সেকেলে খেলনা-পুতুলও অচল। একটি খেলনা গাড়ী বিক্রি করতে হলে তার লাইট, হর্ন এবং মেকানিজমের দিক থেকে আধুনিক হতে হবে। আমেরিকা অনুপ্রাণিত এবং জাপানে প্রস্তুত 'বার্বী' ডল' এখন বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। তবে রুচির পরিবর্তনের ফলে কিছু পুতুল আবার জনপ্রিয়তাও হারিয়েছে। শিশুদের জন্য খেলনা পুতুল সাধারণত মায়েরাই কেনে। আর তারা এজন্য বেশী পয়সা খরচ করতে নারাজ। তাছাড়া মেয়ের মাথায় বেশী বুদ্ধির ভার চাপাতেও তার অনিচ্ছা।

জার্মান পুতুল শিল্পের 'ক্রাফটসম্যানশিপ' কিন্তু অনবদ্য। বিশ শতকে পুতুল সম্পর্কে জটিলতার ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আর বড়দের কাছে পুতুলের অর্থও পাল্টে গেছে। তবে পুতুলের সংগী অর্থাৎ শিশুরা এ সম্পর্কে মাথা ঘামায় না বলেই বাঁচোয়া। এ জন্যই আজকাল জার্মান পুতুল শিল্পে অনেক সাইকোলজিস্টের সমাবেশ ঘটেছে। নির্মাতারা এই সব সাইকোলজিস্টদের পরামর্শ অনুযায়ী পুতুল তৈরী করেন। এক ধরনের লুডোর জনপ্রিয়তা কিন্তু আজও অক্ষুণ্ন আছে। আর এই লুডো নির্মাতারাও এ সম্বন্ধে খুব একটা ভাবছেন। কারণ এই খেলার যদি পরিবর্তন হয় তবে নতুন একটা উদ্ভাবনের ব্যাপারে খুব একটা অসুবিধা হবে না। পুরনো জার্মান দুর্গগুলি ঘুরে নতুন খেলা চালু করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি ঘুরতে বেরোন। ব্যাভেরিয়াতে তিনি একটি দুর্গে একটি চিত্র দেখে থমকে দাঁড়ান। একটি টেবিলে কয়েকজন লোক বসে খেলছে। এটা হচ্ছে সেকালের 'টেবিল গেম'. ভদ্রলোক ফিরে এসে 'কনফারেন্স' নাম দিয়ে খেলনাটি চালু করলেন। সংগে সংগে দোকানে ভিড় আর ধরে না। অবশেষে এই খেলনার রেশন করতে হয়।

জার্মানী শুধু পুতুল রপ্তানী করে না, আমদানীও করে। আমেরিকা ও জাপান থেকেই বেশী পুতুল জার্মানীতে আসে এবং পুতুলের ক্ষেত্রে এদেরই শীর্ষস্থান। বৃটেন এবং জার্মানী একত্রে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। জার্মানীর বাজারে জাপানী পুতুলের জনপ্রিয়তা খুব। কিন্তু সাইকোলজিস্টরা এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। একজন বলেছেন যে, কথা বলা পুতুল মেয়েদের তুলনায় মায়েদেরই আকর্ষণ করে বেশী। বাচ্চা মেয়ে শিগগিরই পুতুলটি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। সাত বছর পর্যন্ত মেয়েরাই এটা পছন্দ করে। কারণ পুতুলের জবাব দেওয়ার রহস্যটা তারা তখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারে না। অবশ্য নির্মাতারা একথায় কান দিতে খুব একটা রাজী নয়। মোদ্দা কথা প্রতি সিজনে নতুনের আগ্রহকে নস্যাৎ করে অসম্ভব। আবার শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে কুড়িটি ভাল পুতুল তেরো বছর পর্যন্ত মেয়ের সন্তুষ্টিবিধানে সমর্থ। পুতুলের প্রাচুর্য তাদের ক্লান্ত করে ফেলে।

খেলনার দোকানে কাজ করাটাও লাভজনক। কারণ কর্মীদের মধ্যে কোন রকম 'র‍্যাঙ্ক' নেই। এযাবৎ ২৫০টা দোকান এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত হয়েছে। ফলে চাকরীর নিরাপত্তা অনেক বে[...] এসোসিয়েশনের নিজস্ব একটা শো[...] আছে। এই শো-রুমে প্রায় পঁয়ত্রিশ হা[...] খেলনা দ্রব্য স্থান পেয়েছে এবং এখান [...] সরাসরি পছন্দমত খেলনা কেনাও [...] পারে।

'টয় স্টীম ইঞ্জিন' আজও উৎসাহী[...] সমানভাবে আকর্ষণ করে। তবে পুতু[...] আকর্ষণও অব্যাহত। পুতুলের ম[...] জগৎ থেকে বাস্তবের সত্যে ফিরে আ[...] অনেকেরই মন চায় না। আর সে[...] পুতুলের জনপ্রিয়তা নতুন বি[...] পথিকৃৎ।

সমবায় আন্দোলন ও বাঙালী মেয়ের

[এ-প্রবন্ধে সমবায় সম্পর্কে আম[...] উদাসীনতাকে নতুন করে ধাক্কা [...] হয়েছে ও সংক্ষেপে সমবায় জগতে মে[...] সমস্যার কিছু ইংগিত রয়েছে। এ-সম[...] আগ্রহশীল পাঠিকাদের যে-কোন প্রশ্ন [...] আহ্বান করা হচ্ছে ও ঠিকানা [...] ব্যক্তিগতভাবে তার উত্তর দেওয়া হবে।

সমবায় সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্নাব[...] অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সম্ভব [...] ভবিষ্যতে কিভাবে সমবায় সমিতি গঠন [...] যায় ও কি কি ধরনের সমবায় শিক্ষা [...] মেয়েদের উপযোগী, তা আলোচন[...] হবে।]

বাংলাদেশের মাটিতে কি আছে জানি না, তবে এখানে সবই যেন কেমন ভিজে-ভিজে—এখানকার মাটিরই মত। বিশেষ করে অতিসাম্প্রতিক অবস্থার দিকে তাকিয়েও এ-কথাই মনে হয়।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন আজ আর বয়সের দিক দিয়ে শিশু নয়, কোন কোন বিশেষ শাখায় সমবায়মূলক কাজকর্মের অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমবায়ের ভিত্তি আজও এখানকার মাটিতে দানা বেঁধেছে বলে মনে হয় না। বাঙালী সমবায় চিন্তার তাৎপর্য বোঝেন না—এমন নয়, সমবায়ের ভিত্তিতে সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং সমবায়দর্শনই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বীজ—এসব কথা বাঙালীরা ভালোই জানেন। তবু সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী কেন একটি যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার চেয়ে একটি সত্তর-আশী টাকার মাস্টারি বা কেরানীগিরি পছন্দ করেন—এ এক রহস্য। জীবনে কোন রিস্ক (Risk), কোন ঝামেলা যেন আমাদের পছন্দ নয়। চোখ বুজে নির্বিরোধী দিনগুলি কেটে গেলেই হোল।

দুঃখের বিষয়, আমরা চাইলেও নির্বিরোধী জীবনযাত্রা এ-যুগে আর কোনমতেই সম্ভব নয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই শুধু প্রতিযোগিতা। এটা প্রাণস্পন্দনের লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু সুস্থ প্রতিযোগি-তার ক্ষেত্র কোথায়? জীবনধারায় পা[...] সামঞ্জস্য কোথায়?

এদিক থেকে চিন্তা করলে সম[...] ধারায় অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলা [...] কোন পথ স্বল্পবিত্ত, ক্ষীণজীবী বাঙা[...] সামনে খোলা নেই।

এ-ব্যাপারে মেয়েদের সুযোগ সু[...] বেশী। কারণ, জীবিকার তাগিদে স[...] মেয়ের পক্ষে উচ্চশিক্ষা নেওয়া সম্ভব ন[...] অনেকের পক্ষে দীর্ঘ সময়ের জন্য বা[...] কাজ করার সুযোগও সীমিত। এ-স[...] ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠা[...] মাধ্যমে নিজেকে অর্থনৈতিক দিক [...] স্বাবলম্বী করার সুযোগ রয়েছে। [...]

বেহালার একটি সমবায় কেন্দ্রে মেয়েরা

...জন্য চাই মানসিক একরকম বিশেষ প্রবৃত্তি। শুধু নিজেকে নিয়ে নয়—একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে, অন্য দশজনের সুখ-দুঃখের সমব্যথী, সহযোগী হিসাবে নিজেকে ভাবতে হবে। আর প্রয়োজন বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধি। মনে রাখতে হবে, সমবায় সংগঠিত কোন কাজও অর্থনৈতিক উন্নতিরই প্রয়াস। সুতরাং সমবায় ভিত্তিতে যদি ক্ষুদ্রশিল্প গঠন করতে গেলে এই শিল্পের ব্যবসাগত দিক সম্পর্কে মোটামুটি পূর্ব ধারণা থাকা উচিত। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রইলো ভবিষ্যতে এই বিষয়ে। সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন, তা হোল, নতুন কিছু গড়তে এগিয়ে আসার উৎসাহ। সব বাধার মধ্যেও এই উৎসাহই সাফল্যের হেতু। মাদ্রাজে, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যায়, বিহারে পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে সমবায়মূলক কাজে। সে তুলনায় আমাদের দেশে শতকরা পঞ্চাশজন মেয়ে শিক্ষিতা হলেও আজ পর্যন্ত শীর্ষস্তরে কোন শিল্প-সমবায় গড়তে মেয়েরা এগিয়ে আসেননি বা এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেননি। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ঘুরে দেখেছি, ছোট ছোট প্রাথমিক শিল্প-সমবায়গুলির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে উদ্যোগে কাঁচামাল সংগ্রহ করা ও তৈরী জিনিস বিক্রয় করা। এ-কাজটি বিশেষভাবে... স্তরের একটি শিল্প-সমবায়ের কাজ। ... মেয়েদের শিল্প-সমবায়ের প্রধান ... সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত ... সমবায় গঠন করেছেন ও এদের ... নিয়ে কার্যকরী পন্থায় ভেবে ... এমন মেয়েদের কাছেই এ বিষয়ে ... আবেদন রইলো আমার। ক্ষুদ্র ও ... ভাবে যে সমবায় উদ্যোগ রয়েছে ... দের মধ্যে, তাকে শক্তিশালী করবার ... আমাদের প্রয়োজন বিভিন্ন ছোট ছোট ... সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ... করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ... যোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সেজন্য চাই ... পরিপ্রেক্ষিতেও এগিয়ে আসার ...।

—দীপশ্রী

সেলাইয়ের কথা

(৪)

বেবী ফ্রক

আগেরবার আমি আপনাদের সাধারণ ব্লাউজের নিয়ম, ফরমুলা ও তৈরীর পদ্ধতির

বিষয় জানিয়েছি। আরও দু-চার রকম ব্লাউজের বিষয় আমি পরে লিখব, এখন আমি বেবী ফ্রক তৈরীর নিয়ম ও ফরমুলা জানাচ্ছি।

মাপ :—

ছাতি— ২২"

ঝুল— ২২"

পুট— ৫⅙"

হাতা— ৬½"

মুহুরী— ৫⅚"

ফরমুলা :—

ছাতি—২২"

ঝুল—২২"

পুট—ছাতির—১/৬+১½=৫⅙"

হাতা—ছাতির—¼—১"=৬½"

মুহুরী—ছাতির—১/৩—১½"=৫⅚"

বডি :—

১— ৪=ছাতির ¼—⅞"=৪⅝"

১— ৭=পুট ৫⅙+⅛"=৫¼"

১— ৮=ছাতির ১/১২ গলা=১⅚"

৭— ৯=১" (কাঁধের সেপ)

১— ৫=১" (পেছন গলা)

১— ৬=ছাতির ১/১২" অর্থাৎ

১⅚+১"=২⅚" (সামনা গলা)

১০—১২=½" ছাতি থেকে ওপরে

১১—১২=½" বাইরে

১০— ৪=পুট+½"=৫½"

৪—১০=½ ছাতি =১১"+২"=১৩"

ঘের :—

৪— ২=ঝুল ২২"—৪⅝"

(বডি)+½"=১৭⅞"

২— ৩=১½" নীচের মোড়ার জন্যে।

২—১৭=½ ছাতি=১১"+২"=১৩"

৩—১৮=½ ছাতি=১১"+২"=১৩"

সেপ করবার জন্যে ১৩—১৪=১" ভেতরে নিয়ে সোজা লাইন টেনে ১৭ ও ১৮-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে ১৪ থেকে।

১৪—১৫=১½"
১৪—১৬=১" (বগলের সেপ)
১৭—২০=½" ওপরের সেপ
১৭—১৯=½" ওপরের সেপ
২১=১০ ও ৪-এর ½।

হাতা ঃ—
১—২=ছাতির ¼—১"=৬½"+½"
সেলাই-এর জন্যে=৬¾"
১—৪=ছাতির ⅛—১"=৪½"
২—৩=½"
৫=১ ও ৪-এর ½
৬—২=½ মুহুরী+½"=৩½"
৭—৮=¾"
৬—৮ ও ৫ সেপ হবে।
সেলাই-এর নিয়ম ঃ—

প্রথমে কাঁধ জোড়া দিয়ে নিয়ে বোতাম পটী করতে হবে, তারপর গলায় ½" মাপে ওরেয়া পটী লাগিয়ে উল্টে হাতে হেম করে দিতে হবে। তারপর বডির সঙ্গে কুঁচি টেনে ঘের জুড়তে হবে। তারপর দুই পাশ জুড়ে নিয়ে বডির সঙ্গে হাতা বসাতে হবে, আগে হাতে ঠিক মাপ মত ধরে টেঁকে নিয়ে তারপর মেসিন সেলাই দিতে হবে। সবশেষে তলার ১½" কাপড় মুড়ে হাতে হেম করে দিতে হবে। তারপর বোতাম বসালেই ফ্রক সেলাই সম্পূর্ণ হবে।

সংবাদ

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দাস লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে এ বৎসর প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় (আর্টস) পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

* * *

আসানসোল গার্লস কলেজ থেকে শ্রীমতী কল্পনা সেনরায় এবং শ্রীমতী রত্নাবলী গুপ্ত এবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলা বিভাগে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও দশম স্থান অধিকার করেছেন। এঁরা দুজনেই বার্ণপুর গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন।

* * *

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত লাল বাংলা প্রবন্ধ পুরস্কার ১৯৬৬ সাল 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধের জন্য মিরাণ্ডা হাউস কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় লাভ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধটি পরীক্ষা করেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং ডঃ শিশিরকুমার দাস। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে পুরস্কারটি দেওয়া হবে।

শ্রীমতী জয়ন্তী স্নাতকোত্তর বাংলা শ্রেণীর ছাত্রী।

* * *

সিস্টার সিলিবি জন বিহারীলাল কলেজ অফ হোম অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্স থেকে এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় আর্টস বিভাগে দশম স্থান অধিকার করেছেন।

* * *

শ্রীমতী মীরা গুপ্তার উদ্যোগে কলকাতাস্থ পশ্চিম জার্মানীর কন্সাল জেনারেলের পত্নী শ্রীমতী ভন র‍্যানডো আলিপুরে সম্প্রতি একটি পুষ্পসজ্জা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পুষ্পসজ্জা করেন শ্রীমতী নমিতা বসু। তিনি জাপান থেকে এ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন। 'ইকেবানা' পদ্ধতিতে তিনি কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করে চারটি পদ্ম-কুঁড়ির বিন্যাস ও দল মেলে ধরার ভঙ্গী দিয়ে মানব জীবনের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য এই চারটি পর্যায়কে রূপদান করেন।

পুষ্পসজ্জা সম্পর্কে তিনি একটি স্কুল করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

* * *

শ্রীমতী শ্যামলী মুখোপাধ্যায় এ বছর ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ অনার্স পরীক্ষায় মনস্তত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী শ্যামলী ভাগলপুরে জে, এন, জুবিলী কলেজের বটানীর অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

॥ আটাশ ॥
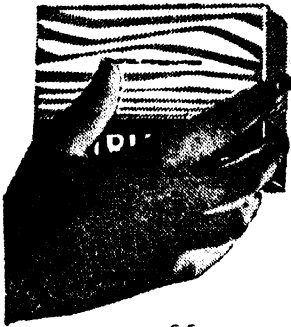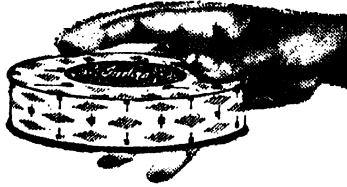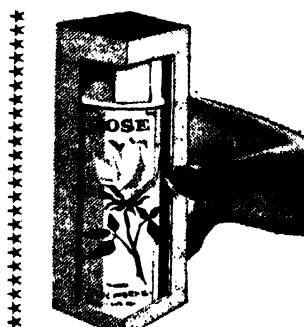
পরের দিনটা কাটল দুর্যোগ-শেষের
নি-শিথিল একটা ছুটি-পাওয়া দিনের
। আগের দিনগুলোর ক্লান্তির ছাপ
ছে, আগামী দিনের প্রস্তুতির উদ্বেগও
ছে—তবু এই দিনটা ওই দুইয়ের
নটারই ভার বইতে রাজি নয় যেন।

তার পরদিন সকাল ন'টা নাগাত রাস্তার
কর বারান্দা থেকে জ্যোতিরাণী রিক্সায়
ট বিছানা আর স্যুটকেস চাপিয়ে যে-
য়েটিকে আসতে দেখলেন, গত কয়দিনে
র কথা একবারও মনে পড়েনি। চিঠি যে
খা হয়েছিল, তাও ভুলে গেছলেন।
াড়া ভদ্রলোক এরই মধ্যে চিঠি পাবেন
চলে আসবেন ভাবেননি।

মামাশ্বশুর গৌরবিমল।

রেলিংয়ের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েই
মনস্কের মত নিজের চুলের বোঝায়
নর হাত চালিয়ে নিচ্ছিলেন জ্যোতি-
। রিক্সাটা ঢুকতে দেখে হাত থেমে
। সংকল্পে কোনো দ্বিধার জায়গা নেই,
গোছের একটা অনুভূতি বড় করে
ার তাড়নায় চিঠিটা লিখতে দেরি
নি। আর তখন লিখে ফেলার পিছনে
নর প্রতি অভিমানও একটা কারণ।
তখন ওভাবে সরে না দাঁড়ালে দু'-
দিন সবুর করা চলত। কিন্তু মাঝের
দিন ঠিক এই পর্যায়ের ধকল যাবে কে
। জানলে তাড়াহুড়ো করে লিখতেন

াকে দেখে মনে হল, বাড়ির এই
টা কেটে যাওয়ায় কিছুদিন বাদে উনি
ভালো হত।

সিঁড়িতে বাড়ির মালিকের সঙ্গেই দেখা
প্রথম। শিবেশ্বর তাঁর নীচের ঘরে গিয়ে
বসার উদ্দেশে সবে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে-
ছিলেন, মামুকে উঠে আসতে দেখে
সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। এই মামুটি
কোন সময় নোটিস দিয়ে আসেন না বা
নোটিস দিয়ে বাড়ি ছেড়ে যান না, তবু
ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে শিবেশ্বর জিজ্ঞাসা
করলেন, তুমি হঠাৎ কোথা থেকে?

—এলাম। বাড়ির খবর সব ভালো
তো?

ভিতরে ভিতরে গৌরবিমল উতলা
ছিলেন একটু। জ্যোতিরাণীর অপ্রত্যাশিত
সাদামাটা চিঠিটা তাঁর দুশ্চিন্তার কারণই
হয়েছিল। চিঠি পেয়ে পরদিনই হরিদ্বার
থেকে রওনা হয়েছেন। ভাগ্নে চিঠির খবর
রাখে না, সেটা প্রথম সাক্ষাৎ আর প্রশ্ন
থেকেই বোঝা গেল। বাড়ির ধারা ভালই
জানেন। অতএব কিছু না বলে তিনি ফিরে
শুধু কুশল প্রশ্নই করলেন।

গম্ভীর মুখে শিবেশ্বর বললেন, খুব
ভালো। সুসময়ে এসেছ।

পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী এসে
দাঁড়ালেন। শিবেশ্বর ফিরে একবার
তাকালেন শুধু। কি সুসময় গৌরবিমল
জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করলেন না।
জ্যোতিরাণী প্রণাম সারলেন। এই অবকাশ-
টুকুতে চিন্তা করে নিয়েছেন কিছু। সহজ
সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, এত তাড়াতাড়ি
আসতে পারবেন ভাবিনি, চিঠি পেয়েই
রওনা হয়েছেন বুঝি?

ফলে ভদ্রলোককে যে বিড়ম্বনার মধ্যে
ফেলা হল একটু জ্যোতিরাণী খেয়াল
করলেন না। শিবেশ্বরের দিকে ফিরে
জানালেন, মামাবাবুকে আসার জন্যে আমি
চিঠি লিখেছিলাম।

কয়েক নিমেষের প্রতিক্রিয়াটুকু সুস্পষ্ট।
সাফল্যের যে-চূড়ায় শিবেশ্বরের বিচরণ তাতে
মনের ভাব গোপন করার মত পরোয়া কাউকে
করেন না আজকাল। গম্ভীর মুখে ঠাণ্ডা
একটু হাসির আভাস ফোটাতে চেষ্টা
করলেন।—চিঠি লিখেছ সেটা চেপে যাওয়া
দরকার কিনা না জানার ফলে মামু বলল,
এলাম। মামুর মুখখানাই চড়াও করলেন
তারপর, এরোপ্লেনে চেপে এলেও ভাড়া
পেতে, বুঝলে? সময় নষ্ট করার সময় নেই
এখন—

গৌরবিমল ফাপরেই পড়লেন, কি
ব্যাপার?

পরিস্থিতি তরল হল কালীদার
কল্যাণে। তাঁর ঘর থেকে উঁকি দিয়েই লঘু
বিস্ময়ে চেঁচামেচি করতে করতে এগিয়ে
এলেন, রাত্রি হতে ভোর এ-কি অবাক কাণ্ড
ঘোর! তাড়াতাড়ি সামনে তাঁর গায়ে-পিঠে
মুখে হাত বুলিয়ে মন্তব্য করলেন, ঠিকই
তো দেখছি—

একজন ভাশুর একজন শ্বশুর, তবু
স্বস্তিবোধ করলেন জ্যোতিরাণী। গৌর-
বিমল মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি
ঠিক আছে?

—সূক্ষ্ম দেহে আবির্ভাব কি স্থূল
দেহে দেখে নিলাম।

দ্রষ্টার মতই শিবেশ্বর আনন্দের আতি-
শয্য লক্ষ্য করলেন কালীদার। ঠোঁটের ফাঁকে
হাসির আভাস ফোটার উপক্রম আবার।
নির্লিপ্ত হালকা প্রশ্নটা সোজা তাঁর মুখের
ওপর নিক্ষেপ করলেন।—অর্থাৎ তুমি

বলতে চাও মামুকে আসতে লেখা হয়েছে তুমিও জানতে না?

জ্যোতিরাণী নির্বাক। এই-ই রীতি মানুষটার। কালীদার মুখে বিস্ময়ের পলকা কারুকার্য। তারপর জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরে চোখ পাকালেন, ওর কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছ বুঝি?

অর্থাৎ দুজনে পরামর্শ করেই মামাশ্বশুরকে আসতে লেখা হয়েছে সেই স্বীকৃতি। কালীদার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই জ্যোতিরাণীর, তবু চিঠি লেখার একলার দায় থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টাটা একটুও ভালো লাগল না। এদিকে দুদিনের পথ ভেঙে এসে ভদ্রলোক এখনো ঘরে ঢুকতে পাননি, এসেই হকচকিয়ে গেছেন বোঝা যায়।

ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করার কথাই বলতে যাচ্ছিলেন, দরকার হল না। ছোট দাদুর আগমন-বার্তা কানে আসতে লাফাতে লাফাতে সিতু এসে হাজির। এত লোকের মধ্যে বুড়োছেলেকে ছোটদাদু যে দুষ্টুমি করে টুক করে কোলে তুলে ফেলতে পারে সেজন্যে প্রস্তুত ছিল না। লজ্জায় লাল, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নামার চেষ্টা। কালীনাথের সরস গম্ভীর টিপ্পনীতে পরিস্থিতি তরল আবার। তিনি মন্তব্য করলেন, শত্রুপুরীতে বিপদতারণ মধুসূদনের কোল পেল বাছা।

কোন্ কাজে নীচে যাচ্ছিলেন শিবেশ্বর ভুলে গেছেন। নিজের ঘরেই ফিরে এসেছেন আবার। তাঁর ইচ্ছা আর শাসানীর বিরুদ্ধেই কিছু গড়ে উঠতে যাচ্ছে সেই ক্ষোভ আছেই। কিন্তু মামুকে আসতে লেখা হয়েছে জেনে তিনি রুষ্ট একটুও হননি। বরং তুষ্ট হয়েছেন। ঠান্ডা মাথায় ভাবার অবকাশ পেলে মামুকে ডাকার পরামর্শটা হয়ত বা তিনি নিজেই দিতেন। কালীদা আর মামু পিছনে থাকে যদি ছোট ব্যাপার না হোক অপচয়ের ব্যাপার কিছু হবে না। কিন্তু টাকা এত আছে যে, সত্যিই অপচয়ের পরোয়া খুব করেন না তিনি। আসলে নিশ্চিন্ত অন্য কারণে। স্ত্রীর আদর্শ নিয়ে মেতে ওঠার ঝোঁকটার কানাকড়িও দাম দেননি। কোত্থাকার কে একটা উদ্বাস্তু মেয়েকে কুড়িয়েছে স্টেশনে বিভাস দত্তকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে। আদর্শের পরিকল্পনার খবর কানে আসা মাত্র তাঁর মগজ সক্রিয় হয়েছিল তাই। এই জটিলতার যেমন রীতি। ঘোরালো ছায়া পড়েছিল। আর স্ত্রীর অনমিত মনোভাবে সেটা দ্বিগুণ পুষ্ট হয়ে তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। পরশু রাতে কালীদার বেপরোয়া ফয়েসালার পরে ক্ষোভ যায়নি বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁরও গোঁ দেখে সেই কালো ছায়াটা আগের মত ভিতর বিষোয়নি অত। আজ আবার ওই একই উপলক্ষে মামুর পদার্পণের ফলে ওটা ফিকেই হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, শিবেশ্বর চাটুজ্জের উর্বর মস্তিষ্কে এক অভিনব বুদ্ধির খেলা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। এই খেলার নেশে পড়ার মত হঠাৎ এমন বিপরীত জোরটা কোথা থেকে পেলেন জানেন না। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর হাসছেন মৃদু মৃদু। আর কল্পনায় দেখছেন কিছু।

ও-ঘরে কালীদা আর এক দফা ফাঁপরে ফেলেছেন মামুকে। সিতু বেচারা মুখখানা বেজার করে স্কুলের জন্য তৈরি হতে গেছে। স্কুলের কি একটা বিগত অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগামীকাল তার ছুটি এটুকুই যা সান্ত্বনা। শুধু তারই ছুটি, জেঠু আর বাবার অফিস আছে, অতএব ছোটদাদুর ওপর অনেকক্ষণের কায়েমী দখল পাবে সে। জ্যোতিরাণী শুধু দু পেয়ালা কফি নিয়ে ঘরে ঢুকেছেন, মামাশ্বশুরকে বলেছেন, একেবারে স্নান সেরে নিন, তারপর খাবার দিই।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কালীদা সায় দিয়েছেন, সেই ভালো...। পরক্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত, জ্যোতিরাণীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু শুধু চানে হবে না আমি একটা আইস-ব্যাগের খোঁজে যাব?

পরশু সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত এই বিদ্রূপ কানে এলে রাগে জ্বলতেন জ্যোতিরাণী। আজ হেসেই ফেললেন।

গৌরবিমলের বিস্ময়ভরা বিড়ম্বিত মুখ।—সকলে মিলে তোরা যে ঘাবড়েই দিলি আমাকে! জ্যোতিরাণীর দিকে তাকালেন, কি ব্যাপার বলো তো?

হাসিমুখে জ্যোতিরাণী মৃদু জবাব দিলেন, আপনার ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়—।

বিপুল উৎসাহে কালীদা তক্ষুনি সায় দিলেন আবার, নাহি ভয় হবে জয়—জ্যোতিরাণী তোমার মাথায় একটি মর্যাদার মুকুট আর কাঁধে একটি দায়িত্বের পাহাড় বসাবে স্থির করেছে। এর বেশি কিছু নয়—

মামাশ্বশুর আসাতে ভদ্রলোক যে যথার্থ খুশি জ্যোতিরাণী সেটা ভালই লক্ষ্য করেছেন। অনুযোগের সুরে বললেন, জ্যোতিরাণী আপনাকেও বাদ দিতে চায়নি।

—এক মুখে দুই নাম করে গুরুচন্ডালি দোষ ঘটিও না। কালীদার ধমকের সুর।

—কেবল ফাজলামিই করছিস, কি ব্যাপার বলবি তো? গৌরবিমল তাগিদই দিলেন এবার, কিছু যেন একটা হতে যাচ্ছে?

—হুঁ। খোঁয়াড়। কালীনাথের ফাজলামি বর্জনের মুখ।—হাঁ করে চেয়ে আছ কি, খোঁয়াড় দেখোনি?

—তা তো দেখেছি। তোদের জন্যে?

—না। আমাদের জন্যে জ্যোতিরাণীর অত দরদ নেই। প্রমীলাদের জন্যে।

জ্যোতিরাণী হাসছেন মুখ টিপে। যে চাপের মধ্যে ছিলেন ক'টা দিন, এই লঘু আলাপ বন্ধ ঘরের দুই-একটা জানলা খুলে দেওয়ার মত। কালীদা যে-ভাবেই বলুন বিদ্রূপের ছায়া আর পড়ুবে না।

কি হতে যাচ্ছে বা কেন তাঁকে চিঠি লিখে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে গৌরবিমল এই থেকেই মোটামুটি একটু আঁচ পেলেন। অল্প হেসে জ্যোতিরাণীর দি[ke] ফিরলেন তিনি, হঠাৎ এ-খেয়াল কেন?

—সর্বনাশ, সর্বনাশ করেছে! আ[র্ত]প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন কালীনাথ হোলড্ ইওর টাং মামু! খেয়াল বলছ, [ভ]য়-ডর নেই তোমার?

গৌরবিমল ঈষৎ অপ্রস্তুত। জ্যোতির ঘর ছেড়ে পালানো শ্রেয় ভাবলেন আপাত[ত] কিন্তু বাধা পড়ল। কালীদার গম্ভ[ীর] আশ্বাস, জ্যোতিরাণী! অজ্ঞজনের [কথা] কান থেকেই বিদায় করো, মরমে নিও [না]। মামুকে আমি বেশ করে সমঝে দি[ব]... সমঝে দেবার জন্য আসামীর দিকেই ফির[লেন] যেন, এটাকে খেয়াল ভাবা হয়েছিল [?] বাড়ির টেম্পারেচার একটানা চারদিন এ[ক] একুশ ডিগ্রীতে উঠে বসেছিল সে[টা] রাখো? তারপর মাত্র দশ বিঘে জমির ও ছোট্ট একটা প্রাসাদ আর মাত্র লাখ-দু[ই] টাকার দখল নিতে পেরে সেই থরতাপ [এখন] ঠান্ডা হয়েছে। আমার আর [শি] গন্ডারের চামড়া বলে বেঁচে গেছি, তোমা[য়] কে রক্ষা করবে?

জ্যোতিরাণী পালিয়েই এলেন। কা[লী]দার সামনে দরকারী কথা হবার জো [নে]ই হাসলেন। খানিক আগে রিকশয় মা[মা]শ্বশুরকে দেখে মনে হয়েছিল এই হাঙ্গা[মায়] না এলেই ভালো ছিল। এখন ভাবে[ন] এসেছেন ভালো হয়েছে। একটা অস[্বস্তির] গুমোট কেটেছে।

পরক্ষণে হাসি মিলিয়ে যেতে লা[গল]। তাঁকে হাসতে দেখলে আঁচড় পড়ে এ[মন] লোকও বাড়িতে আছে। এবং সেই লো[ক] দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দিকে চোখ। কিন্তু জ্যোতিরাণীর মনে হ[ল] ক'দিনের সেই ঘোরালো ধারালো চাউনি বদলেছে। গম্ভীরই বটে, তবে অনেক[টা] আত্মস্থ গাম্ভীর্য। নিজের সম্বন্ধে সর্ব[দা] সকলকে সচেতন রাখার জন্যে যেমন থাকে।

—শোনো।

নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলে[ন]... দাঁড়ালেন।

একটা কথা ভাবছিলাম, সহজ সু[রে]... একটা মানসিক চিন্তাই ব্যস্ত করছেন যে... মামু এসে গেল, কালীদা আছে, মেয়েরা আছে বলছ, তুমি কি চাও বলে দিলে... করার তারাই তো করতে পারে। তো[মার] নিজের এর মধ্যে থাকার খুব দরকার আছে...

নিজে কোনো বক্তব্য প্যাঁচালো ক[রে] প্রকাশ করেন না জ্যোতিরাণী। কিন্তু [সহজ] বলে প্যাঁচের কথা ধরতে পারেন না এ[মন] নয়। ক্ষোভ বা উষ্মা প্রকাশ না ক[রে] খুব সহজভাবেই জবাব দিলেন, গো[ড়ায়] দরকার আছে, শুরুর আগে সরে দাঁড়া[লে] কেউ গা করবে না। পরে দরকার বুঝলে চলে আসব।

—ও, আচ্ছা...।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির অস্পষ্ট রেখা দেখলেন কিনা জ্যোতিরাণী ঠিক ঠা[হর] করতে পারলেন না।—ভাবছিলেন কেন?

—আমার নিজের কাজেও তো তোমাকে
র হতে পারে।

—তোমাদের সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট
শনের কাজে?

শ্বেব অন্যমনস্ক যেন একটু, শুধু
কেন দেখলে কত দিকই তো দেখার
।

মুখের ওপর চোখ রেখে আবারও
ন সুরে জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন,
সেরকম দরকার পড়ে যদি, বোলো—
ই ছেড়ে আসব।

রে এসে জ্যোতিরাণী স্নানের জন্যে
হলেন। মাথায় সেই কখন তেল মেখে
আছেন ঠিক নেই। ব্যস্ততার ফাঁকে
অবাঞ্ছিত অনুভূতি ঠেলে সরানোর
। ডেকে কোনরকম কটু কথাও বলা
তাকে তিক্ত কথাও না। তবু স্নায়ুতে
টান ধরে কেন? টান ধরার উপক্রম
ছিল সেটা অস্বীকারের তাড়নায়
তিরাণীর স্নানের তাড়া।

সিতুরই ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে।
তার ছুটির দিনের সকালের কাগজে
বেরবে কেন?
চায়ের ব্যবস্থা করছিল। খাবার
দেওয়া হয়েছে। জেঠু কাগজ পড়-
তার সিতু সকলের অলক্ষ্যে ছোট-
ঠেলছিল একটা গল্প শুরু করার
রাতেই সে বায়না পেশ করে রেখে-
সকালে চায়ের টেবিলে সেবারের মত
একটা গল্প বলতে হবে।
মত মাকে স্বাধীনতার দিনের সেই
বায়না করার সঙ্গে সঙ্গে
জেঠুকে জোগাতে চেষ্টা করেছে সে,
তোমার গল্প আমি একা শুনি
মা আর জেঠুও খুব মন দিয়ে
আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য
বুঝলে?

শোনে বটে কিন্তু তার উল্লেখ
আসলে মায়ের আগ্রহের দিকটা
করেই সিতুর রাতের লোভ ছেড়ে
গল্প শোনার বায়না। স্বাধীনতার
সেই রাণী আর নাটি ফাঁসির
গল্প শুনতে শুনতে মায়ের
যা হয়েছিল সিতু ভোলেনি। মা
করে শুনছিল, মুখ কি-রকম
ছিল, আর চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে
ঠিকরে পড়ছিল। কি ভালো
ছিল মা-কে সেদিন শুধু সিতুই
গল্প শোনার ঝোঁক তো আছেই,
ভিতরে সিতুর আবারও মায়ের
দেখার বাসনা।

চায়ের টেবিলে বসে সিতু সরবে
পারছিল না ছোটদাদুকে।
র প্রথম বারের তাগিদ কানে যেতে
চাপা ধমকের সুরে বলেছে,
বিরক্ত করতে হবে না, খেয়ে-দেয়ে
বোস্‌গে যা।

সিতুর ভয়টা মায়ের জন্যে
, জেঠুর জন্যে বড়। ঝাড়ে হাত
দিয়ে তার ঘরের দিকে রওনা হলেই হল। তাকে কাগজ পড়ায় নিবিষ্ট দেখে পাছে তন্ময়তা ভাঙে, সেই আশঙ্কায় আজ যে স্কুল ছুটি সেই প্রতিবাদ করতেও ভরসা পেল না। তাই হাবভাবে আর এক-একবার বাকি দুজনের অলক্ষ্যে ছোটদাদুকে ঠেলা মেরে গল্পের দিকে টানতে চেষ্টা করছিল। আর ছোটদাদুও দুষ্টুমি করে চোখ পাকিয়ে ইশারায় একবার মা-কে দেখাচ্ছে, একবার জেঠুকে—অর্থাৎ আবার ঠেলা-ঠেলি করলে তাদের বলে দেবে।

মুখের কাছ থেকে কাগজ সরিয়ে কালীনাথ হঠাৎ হেসে উঠলেন একটু, তার-পর বললেন, রাস্তার কুকুরদের সব ডেকে সভা করে তাদের গলায় মালা দেওয়া উচিত।

কোন্ খবর প্রসঙ্গে এই মন্তব্য, পর-ক্ষণেই সেটা স্পষ্ট হল। খবর বেরিয়েছে, গতকাল বেশি রাতে কোন্ রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথা থেকে দুটো ভদ্র-চেহারার গুন্ডা এসে ভদ্রলোকের ঘড়ি, টাকা আর মহিলার গায়ের গয়না ছিনিয়ে নেবার শুভেচ্ছায় ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ বাধা দিতে চেষ্টা করলে বা টুঁ-টা শব্দ করলে রক্ষা নেই। কিন্তু সব পন্ড রাস্তার দুটো কুকুরের জন্য। পরোপকারের আশায় কোথায় যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দ করে তীরের মত ছুটে এসে গুন্ডাদুটোর পা কামড়ে ধরল তারা। আর তারপর আঁচড়ে কামড়ে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ল—সঙ্গে বিকট ঘেউ ঘেউ। প্রাণ ফিরে পেয়ে ভদ্রলোক আর মহিলাও চিৎকার চেঁচামেচি করে সাহায্য করল তাদের। কুকুরদুটোর কবল থেকে গুন্ডাদুটো পালাবার অবকাশ পেল না—কুকুরের চিৎকারের সঙ্গে মানুষের চিৎকার যুক্ত হতেই আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে গুন্ডাদুটোকে ধরে ফেলল।

ভালো লাগার মতই খবর বটে। গৌর-বিমল শুনলেন, পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জ্যোতিরাণীও শুনলেন। আর সিতু হাঁ করে গিলল। জেঠু বলল বলেই খাঁটি খবর কি বানানো, বুঝছে না। একটু বাদে ছোটদাদুর উক্তি কানে আসতে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল সে।

গৌরবিমল বললেন, আমি এক ভদ্র-লোকের গল্প জানি একটানা চল্লিশ বছর ধরে যে কম করে চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে আর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি জলের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

পথের কুকুরের সঙ্গে ভদ্রলোকের গল্প যুক্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়। কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কুকুর গোছের ভদ্রলোক?

—না, ডল্‌ফিন্ গোছের বলতে প্যারিস।

সকালবেলায় গল্প শোনার বাসনা জ্যোতিরাণীর খুব ছিল না। এরপর সিতু বই নিয়ে আর কালীদা কাজ নিয়ে বসলে মামাশ্বশুরকে চিঠি লেখার কারণটা সবিস্তারে ব্যক্ত করবেন ভাবছিলেন। আর এক-একবার ভাবছিলেন, মিত্রাদিকে টেলি-ফোন করে বীথিকে নিয়ে আসতে বলবেন কিনা। স্বচক্ষে ওই পম্মার শোক দেখলে আর সব শুনলে জ্যোতিরাণীর এই খেয়াল কেন সেটা বুক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন। গতকাল মামাশ্বশুর খেয়ালই বলে-ছিলেন মনে আছে। কিন্তু কুকুর থেকে

হঠাৎ ডল্‌ফিন্‌ গোছের ভদ্রলোকের কম করে চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণ বাঁচানো আর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষার কথায় কৌতুককর বা চমকপ্রদ কিছু শুনবেন মনে হল তাঁরও। কারণ মামা-শ্বশুরের গল্পের রীতি ভালই জানেন, বানিয়ে কিছু বলেন না তিনি।

কিন্তু ডল্‌ফিন্‌ জাতীয় ভদ্রলোক কি ব্যাপার বোঝা গেল না। ডল্‌ফিন্‌ শুশুকে জাতীয় সমুদ্রের জীব। নদীতেও দুই একটা ছটকে আসে।

কালীনাথের মুখেও কৌতূহল দেখা গেল। ডল্‌ফিন্‌ কি সিতু বোঝেনি, কিন্তু সেটা প্রকাশের ইচ্ছে নেই, ছোটদাদুকে গল্পে টানার আগ্রহটাই প্রবল।—বলো না, ভদ্রলোক কি করেছেন?

—দাঁড়া ভদ্রলোকের নামটা মনে করি আগে। চিন্তা করার আগেই মনে পড়ে গেল। —নাম হল পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌—পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌, দি পেলেস্‌ পাইলট। বুঝলি কিছু? ভদ্রলোকের নাম পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌, একটি পয়সাও না নিয়ে একটানা চল্লিশ বছর বিনা বেতনে যে সমুদ্রের ঝড়ে দুর্যোগে জল সাঁতরে কাণ্ডারীর কাজ করে গেছে, শ'য়ে শ'য়ে জাহাজ রক্ষা করেছে আর হাজার হাজার প্রাণ বাঁচিয়েছে—ওই রাস্তার কুকুর দুটোর মতই অবস্থা, কেউ তার মনিব নয়, কেউ তাকে কাজের ভার দেয়নি,—নিজেই নিজেকে পাইলটের কাজে বসিয়েছে। টানা চল্লিশ বছরের মধ্যে মাত্র দু সপ্তাহ সে কামাই করেছিল, কেউ তাকে একদিনের জন্যেও বেতন নিয়ে সাধেনি, পেলোরাস্‌ জ্যাকও কোনদিন কারো কাছ থেকে কিছু আশা করেনি। বিলেতের ওয়েলিংটনে নাবিকেরা ঘটা করে তার স্মৃতি-স্তম্ভ বানিয়েছে, গেলে দেখবি।

—ধেৎ! কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সিতু অসহিষ্ণু, জাহাজের পাইলট জলে সাঁতরাবে কেন? আর কেউ চাকরি না দিলে সে চাকরি করবে কি করে? মাইনে না পেলে চল্লিশ বছর ধরে খাবে কি?

বুঝতে জ্যোতিরাণী বা কালীনাথও পারেন নি। কাহিনীর ভনিতাটুকুই শুধু অদ্ভুত লাগছে তাঁদের।

মুখ টিপে হাসছেন গৌরবিমল। —তুই একটা গাধা, পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌ হল একটা পরপয়েজ্‌ যাকে বলে শুশুক—শুশুক দেখেছিস? সেখানকার নাবিকেরা ওই নাম দিয়েছিল।

সিতু ভেবাচাকা। শুশুক গঙ্গায় দুই একটা দেখেছে বই কি। —ওই গোল হয়ে যেগুলো ডিগবাজী খায়?

—তোর মত ফূর্তি হলে ডিগবাজী খায়, নইলে গোল নয় একটুও, দীর্ঘ মোটা-সোটা আর বিরাট লম্বা।

...মামাশ্বশুরের মুখে শোনা এমন অবিশ্বাস্য বিচিত্র গল্পটাও জ্যোতিরাণী জীবনে কখনো ভুলবেন না, কারণ, গল্পের শেষে স্তব্ধ বিস্ময়ে নিজের অগোচরে হঠাৎ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কি-যে আশ্বাসের সম্বল পেয়েছিলেন, সে-শুধু তিনিই জানেন। বুকের ভিতরটা উথলে ওঠার মতই গল্প বটে, শুধু তিনি বা সিতু নয়, কালীদাও হাঁ করে শুনেছেন পেলেস্‌ পাইলট পেলোরাস্‌ জ্যাকের গল্প।

...১৮৭১ সালের এক সকাল সেটা। বোস্টন থেকে সিড্‌নি যাচ্ছে মাল আর যন্ত্রপাতি বোঝাই এক জাহাজ—নাম ব্রিন্ডল্‌। সকাল থেকেই ঝড়ের লক্ষণ। সকলেরই শুকনো মুখ। জাহাজ ঢুকেছে সেই ভয়াবহ ফ্রেঞ্চ-পাস্‌এ। এই ফ্রেঞ্চ-পাসের নামেই ভয়ে বুকের ভিতরটা গুড়্‌গুড়্‌ করে না এমন নাবিক নেই। শান্ত আকাশ আর শান্ত সমুদ্রেও এই ফ্রেঞ্চপাসে যে কত জাহাজ ডুবেছে আর কতশত প্রাণ গেছে ঠিক নেই। এই বিশাল ফ্রেঞ্চ-পাস্‌ শুরু হয়েছে পেলোরাস সাউন্ড থেকে, শেষ হয়েছে টাস্‌মান বে-তে এসে। এই লম্বা রাস্তা পাড়ি না দেওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ সংকট সর্বক্ষণ জীবন সংশয়। সেখানকার বিশ্বাস-ঘাতক জলের স্রোত কোন্‌ জাহাজ কোথায় নিয়ে গিয়ে ডোবাবে ঠিক নেই, সেখানকার জলের তলার কোন্‌ লুকনো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে কোন্‌ জাহাজটা যে খানখান হয়ে যাবে তারও ঠিক নেই। তার ওপর এই ফ্রেঞ্চপাসএ ঢুকে পড়ার পর দুর্যোগ এলে জাহাজ বাঁচানো বা প্রাণ বাঁচানো তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

জাহাজ চলেছে। দিনের আর সমুদ্রের অবস্থা দেখে নাবিকেরা বিষণ্ণ, ক্যাপ্টেন চিন্তিত। হঠাৎ নাবিকেরা দেখে জাহাজের সামনেই বিশাল একটা শুশুক লাফিয়ে উঠল। ঝকঝকে তকতকে গাঢ় নীল রঙ। এত বড় যে নাবিকেরা প্রথম ভাবল তিমির বাচ্চা হবে। জাহাজের ঠিক আগে আগে তরতর করে সাঁতরে চলল সে, ফূর্তিতে ডিগবাজী খাচ্ছে এক-একবার। এমনভাবে চলেছে যেন জাহাজটা তার বন্ধু, অনেকদিন বাদে বন্ধুর দেখা পেয়েই আনন্দ যেন ধরে না তার।

নাবিকেরা কেউ কেউ ধারালো হারপুনে দিয়ে ওটাকে খতম করে জাহাজে তুলতে চাইলে। তিমি শিকারের জন্য হারপুন জাহাজে থাকেই। কিন্তু ক্যাপ্টেনের বউ ভয়ানক আপত্তি করলে, আ-হা, মেরো না বাপু, ওটাকে কেউ মেরো না তোমরা।

আশ্চর্য, ওটা সঙ্গে চলল তো চললই। এদিকে কুয়াশা, দুর্যোগ—দূরের কিছুই দেখা যায় না। নিরুপায় ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজ তখন ওই জলের জীবটাকেই অনুসরণ করে চলেছে। সে যেখান দিয়ে যাচ্ছে আশা করা যায় সেখানকার অজ্ঞাত স্রোত বিপদের কারণ হবে না, আর আশা করা যায় সে-পথে জলের নীচে লুকনো পাহাড়ও থাকবে না। জাহাজ চলেছে—সামনের ওই প্রাণীটা তার কাণ্ডারী।

ফ্রেঞ্চ-পাস নির্বিঘ্নে পার! নাবিকেরা সব আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু তাদের বন্ধু? বন্ধু গেল কোথায়? দেখা গেল বন্ধু ফিরে চলেছে।

সেই শুরু। এরপর পেলোরাস সাউন্ড-এর কাছে কোনো জাহাজ এলেই অব্যর্থ সাক্ষাৎ মিলবে তার। জলের ওপর থেকে ঝকঝকে লাফিয়ে উঠে জাহাজটাকে অভ্যর্থনা জানাবে সে। তারপর হেসে [illegible] নির্বিঘ্নে পার করে দেবে সেই জা[illegible] ফ্রেঞ্চপাস। কোনো একটা জাহাজকে অবহেলায় ছেড়ে দেবে না, সঙ্গশূন্য ক[illegible] না। একেবারে ফ্রেঞ্চপাসের শেষে এসে [illegible] ফিরবে।

বিপদের শুরু পেলোরাস সাউ[illegible] মুখেই বাস করে প্রাণীটা, তাই নাবি[illegible] তার নাম দিল পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌। দে[illegible] দেখতে তামাম দুনিয়ার নাবি[illegible] কাছে ছড়িয়ে পড়ল পেলোরাস জ্যা[illegible] নাম। ফ্রেঞ্চপাস-এর ভয় কেটে গেল, স[illegible] কেটে গেল। জাহাজের মালিকেরা ফ্রে[illegible] পাসের যাত্রাকে অনিশ্চিত যাত্রা ভাবতে [illegible] গেল। রোজ জাহাজ চলাতে লা[illegible] পেলোরাস্‌ সাউন্ডের মুখেই প্রতিদিন প্র[illegible] জাহাজের জন্য অপেক্ষা করছে [illegible] পেলোরাস্‌ জ্যাক্‌—ভাবনা কি। জা[illegible] পেলোরাস সাউন্ডের মুখে এলেই প্র[illegible] নাবিক, ক্যাপ্টেন, সকলে সমুদ্রের [illegible] ঝুঁকবে, রেলিংএ হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

—পেলোরাস জ্যাক্‌! পেলোরাস জ্যা[illegible] পেলোরাস জ্যাক!

—ওই যে! ওই যে—পেলো[illegible] জ্যাক!

জলের ওপর বার কয়েক মস্ত [illegible] ডিগবাজী খেয়ে দেখা দেবে সাড়া [illegible] অভ্যর্থনা জানাবে পেলোরাস জ্যাক। মানুষের চিৎকারে আর উল্লাসে [illegible] যেন ফেটে যাবে। তারপর নিশ্চিন্ত। দায়িত্ব এখন পেলোরাস জ্যাকের। সে [illegible] পথে যায় সেই পথে চলো। [illegible] চলো। বিপদ গোটাগুটি পার [illegible] তবে ফিরবে পেলোরাস জ্যা[illegible] নাবিকেরা, ক্যাপ্টেন সকলে সমস্বরে [illegible] বিদায় সম্ভাষণ জানাবে তাকে, পেলো[illegible] জ্যাক! পেলোরাস জ্যাক!

পেলোরাস জ্যাক্‌ ফিরে তাকাবে [illegible] সম্ভাষণের জবাবে বার কয়েক [illegible] ডিগবাজী খেয়ে মনের আনন্দে ফিরে [illegible] যেখান থেকে তার ডিউটি শুরু সেইখা[illegible]

১৮৭১ থেকে ১৯০২ অবধি [illegible] একটানা প্রথম একত্রিশ বছরের মধ্যে প্র[illegible] ঝড়ে দুর্যোগেও একটি জাহাজ ফ্রেঞ্চপা[illegible] মধ্যে তলিয়ে গেল না, একটি প্রাণও [illegible] হল না। কারণ ভালো সময় হোক আর [illegible] সময় হোক, ওই একত্রিশ বছরে এক[illegible] জাহাজকেও পেলোরাস জ্যাকের সঙ্গ [illegible] নিশানা বঞ্চিত হয়ে পার হতে হয়নি।

তারপর এলো ১৯০৩ সাল [illegible] ১৯০৩ সালের সেই দুর্ভাগা পেঙ্গু[illegible] জাহাজ। সকলে নিশ্চিন্ত। পেলোরা[illegible] জ্যাক্‌ পাইলট, সে-ই জাহাজ নিয়ে চলে[illegible] ফ্রেঞ্চপাসের ভিতর দিয়ে।

জাহাজে ছিল এক মাতাল যাত্রী[illegible] সকালেই আচ্ছা করে মদ খেয়েছে। তারপ[illegible] দেখেছে জীবটা চলেছে জাহাজের পা[illegible] পাশে। কি দুর্মতি হল তার। পিস্তল [illegible] করে দিলে গুলী চালিয়ে।

জাহাজের নাবিকেরা চমকে লাফি[illegible] উঠল। চমকে লাফিয়ে উঠল পেলোরা[illegible] জ্যাকও। কিন্তু এটা তার আনন্দে লাফি[illegible]

...া নয়, মর্মান্তিক যাতনায়। তারপরেই ডুব ...ল পেলোরাস জ্যাক।

...আর্তনাদ করতে করতে নাবিকেরা ...পিয়ে পড়ল সেই মাতাল নাবিকের ...র। তাকে খুন করবে, খুন তাকে করবেই ...রা। তাদের সেই জিঘাংসু রোষ থেকে ...কে রক্ষা করা যাত্রীদের আর ক্যাপ্টেনের ...হে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। লোকটা ...গে বাঁচল কোনরকমে।

...একত্রিশ বছর বাদে পর পর দু' ...তয়ের জন্য দেখা গেল না পেলোরাস ...ক্যাকে।

...জাহাজ পেলোরাস সাউণ্ডের কাছে ...লেই নাবিকেরা ঝুঁকে পড়ে, ক্যাপ্টেন ...কে পড়ে—যাত্রীরাও।

—পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস ...াক্!

দু'সপ্তাহ পর্যন্ত কেবল ডাকাডাকি ...। পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে জাহাজ ...রে না ডাক শুনে জলের তলা থেকে কেউ ...ফিরে উঠল না, কেউ অভ্যর্থনা জানালো ...। সকলে ধরে নিল পেলোরাস জ্যাক্ ...তাল নাবিকের গুলী খেয়ে মরে গেছে। ...উজিল্যাণ্ডের সমুদ্রে শোকের ছায়া নামল।

...গল্পের এই জায়গায় এসে অপ্রত্যাশিত ...র পড়ল একটু। দোরগোড়ায় শিবেশ্বর ...স দাঁড়িয়েছেন। তিন জোড়া উদ্‌গ্রীব ...র সামনে মুখখানা ছেঁকে ধরে আছে ...ব হঠাৎ অবাকই হয়েছেন তিনি। ...ইমেজেই প্রথম দেখেছেন তাঁকে। হেসে ...ছেন, হয়ত সিতু গল্প শুনছে।

...পায়ে পায়ে শিবেশ্বর চায়ের টেবিলে ...বসলেন। এ-রকম সচরাচর হয় না। ...কে কখন ঘুম ভাঙল, মুখ-হাত ধোয়া ...হল, সে-সম্বন্ধে সদাই আগে সজাগ ...। ঠিক সময়ে নিজের হাতে সে চায়ের ...আর সকালের খাবার ঘরে পেঁছে দিত। ...নিয়মটা এখন ভোম্বার। কিন্তু মুখ-হাত ...হতে মনিবকে ধীরেসুস্থে খাবার ...দিকে এগোতে দেখে সে কি করবে ...। পায়নি।

...এই ব্যতিক্রমটুকু একেবারে লক্ষ্য না ...মত নয়। কিন্তু গল্প যে পর্যায়ে ...ছে, লক্ষ্য করার বিশেষ মন খুব সচেতন ...হবা। জ্যোতিরাণীর না, এমন কি ...দেরও না। সিতুর তো নয়ই। শোনার ...য় সে ধৈর্য রাখতে পারছে না। ...তিরাণী ধরে নিলেন, মামাশ্বশুর আর ...দের সামনে কিছু আলোচনার উদ্দেশ্য; ...আর খুব সম্ভব সেটা যে-প্রতিষ্ঠান ...ওটার ব্যাপারে বাধা দেওয়া গেল না, ...প্রসঙ্গে। কারণ, কি হতে যাচ্ছে না ...দেখে শুনে বুঝে নেবার সংকল্প ...হে কালীদার সামনেই শুনিয়ে রাখা ...ন। জ্যোতিরাণী নিজেই এগিয়ে এসে খাবার রাখলেন, চা দিলেন।

...বার পড়ে থাকল। সকালের খাবার ...তে পড়েই থাকে। চায়ের পেয়ালা ...নিয়ে শিবেশ্বর বললেন, তোমার গল্প ...। পাহাড়ের ডগার বরফের মত জমেছে, ...রে ফেল।

গল্প বলার বা গল্প শোনার নিবিষ্টতা হোঁচট খেয়ে আবার সেখানেই ফিরবে সে আশা কম। কিন্তু প্রাণের স্পর্শের রীতি ভিন্ন। ওটা হিসেব করে তাপ জোগায় না। কান সজাগ রেখে কাগজে চোখ রেখেছেন কালীনাথ, আর কয়েক নিমেষের মধ্যে জ্যোতিরাণীও প্রায় আগের মতই তন্ময় হয়েছেন।

পেলোরাস্ জ্যাক্ মরেনি।

টানা একত্রিশ বছরের মধ্যে ঠিক দু'টি সপ্তাহ ছুটি নিয়েছিল। গুলীর ঘা সারাবার জন্য হয়ত ছুটির দরকার হয়েছিল। আর হয়ত সেই সঙ্গে কিছু অভিমানও জমা হয়েছিল।

পেলোরাস্ জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে ওই যে লাফিয়ে লাফিয়ে ডিগবাজী খাচ্ছে পেলোরাস জ্যাক, ক'দিন আসতে পারেনি বলে দ্বিগুণ উৎসাহে জাহাজকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে! আনন্দে দিশেহারা নাবিকেরা পারলে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। সমুদ্রের আকাশে দু' সপ্তাহ ধরে যে অনাগত দুর্যোগ আর সংকট জমাট বেঁধে উঠেছিল সেটা নিমেষে সরে গেল। নিঃশঙ্ক নীল আকাশ হেসে উঠল, নীল সমুদ্র হেসে উঠল। বেতনশূন্য পাইলট পেলোরাস্ জ্যাক্ জাহাজ নিয়ে চলল আবার।

আবার সাড়া পড়ে গেল। ভয় নেই, একত্রিশ বছরের উপোসী ফ্রেঞ্চ-পাস্ আবার হাঁ করবে না, জাহাজ গিলবে না, মানুষ গিলবে না। তার যম এসে গেছে। পেলোরাস জ্যাক্ আবার এসে কাজে লেগেছে।

ওয়েলিংটন কাউন্সিল থেকে অর্ডিনান্স জারি হয়ে গেল, পেলোরাস জ্যাকের যে এতটুকু ক্ষতি করবে তার কঠিন শাস্তি হবে। কিন্তু আইন মান্য করা হচ্ছে কিনা সেটা কে দেখবে? জাহাজের নাবিকরাই দেখবে, কারো অসৎ উদ্দেশ্য দেখলে তারাই প্রতিকার করবে। তারা সানন্দে রাজি। এ-রকম বন্ধু তাদের আর কে আছে?

কিন্তু আশ্চর্য! কিছুদিনের মধ্যে আবার এলো সেই পেঙ্গুইন জাহাজ। যে জাহাজের মাতাল যাত্রী গুলী করেছিল পেলোরাস জ্যাককে। পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে নাবিকেরা সব ঝুঁকে পড়ল, তারস্বরে ডাকতে লাগল, পেলোরাস জ্যাক! পেলোরাস জ্যাক!

পেলোরাস জ্যাক্ অদৃশ্য। নিপাত্তা। ওই জাহাজটাকে সে ভোলেনি, ওই জাহাজ থেকে মারাত্মক যন্ত্রণার মত যে পুরস্কার তার দেহে বিঁধেছে, তাকে সে ক্ষমা করেনি। পেঙ্গুইন ফ্রেঞ্চপাস পাড়ি দিয়েছে—নিঃসঙ্গ, কাণ্ডারীশূন্য।

একবার নয়, প্রতিবার। ভয়াবহ ফ্রেঞ্চ-পাস পাড়ি দেবার সময় শুধু ওই একটি জাহাজকেই পরিত্যাগ করেছে পেলোরাস্ জ্যাক্। আর সমস্ত জাহাজের সে বন্ধু, কাণ্ডারী।

পেঙ্গুইনের আকাল পড়ল। নাবিক পাওয়া ভার। তারা ওই জাহাজে চাকরি করতে চায় না, পেঙ্গুইনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় না। বলে ওটা অপয়া, অভিশপ্ত।

অভিশপ্তই বটে। ১৯০৯ সালে অর্থাৎ দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের মধ্যে ফ্রেঞ্চপাসের ক্ষুধা মাত্র একবারের জন্য মিটল। কাণ্ডারী-শূন্য পেঙ্গুইনকে নিঃশেষে গ্রাস করল সে। কত জীবন গেল আর সম্পত্তি গেল ঠিক নেই।

কিন্তু ওই একটিই। বাকি সব জাহাজের সঙ্গে পেলোরাস জ্যাক আছে।

এমনি কেটে গেল আরো তিন বছর। এলো ১৯১২ সালের এপ্রিল মাস। পেলোরাস জ্যাকের দিবা-রাত্র চাকরির চল্লিশ বছর পুরিয়েছে।

হঠাৎ পেলোরাস জ্যাক্ অদৃশ্য একদিন। চল্লিশ বছর আগে যেমন হঠাৎ একদিন তার দেখা মিলেছিল তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য।

—পেলোরাস জ্যাক! পেলোরাস জ্যাক! পেলোরাস জ্যাক!

বুক-ফাটা যাতনায় আর্ত হাহাকার করে অবিশ্রান্ত ডাকতে থাকে নাবিকেরা তাদের বন্ধুকে, পেলোরাস জ্যাক! পেলোরাস জ্যাক!

কেউ আর লাফিয়ে ওঠে না, কেউ আর ডিগবাজী খেয়ে অভ্যর্থনা জানায় না। তবু ডাকের বিরাম নেই তাদের। সব জাহাজের সব নাবিক ঝুঁকে পড়ে পেলোরাস সাউণ্ডের মুখে। কাণ্ডারীশূন্য হয়েছে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তাই ডাকে, বন্ধু পেলোরাস জ্যাক্! পেলোরাস জ্যাক্!

সব শূন্য। বিরাট সমুদ্রটা শূন্য। সামনে ভয়াল কুটিল ফ্রেঞ্চপাস।

গল্প যে শেষ হয়েছে জ্যোতিরাণীর হুঁস নেই। নিজের অজ্ঞাতে মামাশ্বশুরের দিকেই চেয়েছিলেন তিনি। কালীদার কথায় সচেতন হলেন। ছেলের উদ্দেশে কালীদা হঠাৎ বলে উঠেছেন, ও কি রে?

জ্যোতিরাণী দেখলেন, সিতু উসখুস করছে কেমন আর বোকার মত হেসে মুখটা সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। কালীজেঠুর কথায় ছোটদাদু এমন কি তার বাবার দৃষ্টিও তার দিকেই। ফলে বোকার মত আরো বেশি হাসতে চেষ্টা করলে সে। দু'চোখে জল ঠেলে বেরিয়ে আসছেই তবু। এক ঝটকা মেরে উঠে ছুটে পালিয়েই গেল।

কালীদা আর মামাশ্বশুর হাসছেন মৃদু মৃদু। শিবেশ্বরের গম্ভীর মুখেও কৌতুকের আভাস। কিন্তু ছেলের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য জ্যোতিরাণী কি-যে দেখলেন আর বুকের তলায় কোন্ আশ্বাসের স্পর্শ পেলেন—তিনিই জানেন।

ছেলের মুখের এই হাসিতে নিখাদ খানিকটা সোনা গলতে দেখলেন তিনি। আর তার জল-ভরা দু'চোখে দুর্লভ দুটো মুক্তো দেখলেন।

(ক্রমশঃ)

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

জিলিপি খেতে গিয়ে ভুরু কুঁচকেছেন মাখনবাবু। তাঁর নাকে একটা গন্ধ আসতেই তাঁর মনে হল জিলিপিটা টাটকা নয়। একটু পচা-ই মনে হল যেন। তিনি হঠাৎ একটা বিরাট হুঙ্কার ছাড়লেন। বললেন, চালাকির আর জায়গা পাওনি হরিদাস?

হরিদাস ময়রা একটু কেঁপে উঠল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আজ্ঞে চালাকি? মাখনবাবু বললেন, হ্যাঁ চালাকি, চালাকির আর জায়গা পাওনি? হরিদাস বলল, আজ্ঞে ব্যাপারটা কি হয়েছে? জিলিপিটা খারাপ?

মাখনবাবু বললেন, জিলিপিটা খারাপ মানে, খারাপ বললে একে প্রশংসাই করা হয়। পচা, পচা—বুঝলে? একদম পচা।

মিষ্টির দোকানের সামনে গোলমাল দেখে যাদের প্রচুর সময় আছে এমন শ'দুয়েক লোক দর্শক হয়ে নিশ্চলপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকজনের সময় তেমন ছিল না, কিন্তু তারাও কেউ দু মিনিট কেউ আট মিনিট ধরে ভীড় বাড়ালো। ধর্মবাবুর অফিসে যাবার সেদিন তেমন ইচ্ছে ছিল না, তিনি বাজার করতে এসে ভাবছিলেন কোন ছুতোয় আজ অফিসে যাওয়া বন্ধ করা যায়—তিনি খুব খুসি হয়ে উঠলেন গোলমাল দেখে। তিনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেখানে এসে দেখলেন তাঁরই পরিচিত মাখনবাবুই গোলমাল বেশি করছেন। মাখনবাবু অবশ্য অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতেই তাঁর বক্তব্য সুরু করেছিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর চতুর্দিকে জনতার সমাগমে তিনি উত্তেজিত হতে উত্তেজিততর হচ্ছিলেন। তাঁর ভাষারও উন্নতি পুরোমাত্রায় চলছিল। তিনি প্রথমে বলছিলেন, দেশে আইনের অস্তিত্ব আছে। খাদ্য নিয়ে এহেন যথেচ্ছাচার চলবে না। তারপর তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, এদেশ বলেই লোকেরা হরিদাস ময়রার মত খুনেকে সহ্য করছে। আরো বললেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে জিলিপি যে কেবল পচা তাই নয়, তাতে ভেজালও যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

ধর্মবাবু ভীড় ঠেলে মাখনবাবুর কাছে গিয়ে বললেন, কই দেখি কোথায় জিলিপি? মাখনবাবু তখন ধর্মবাবুর হাতে জিলিপির ঠোঙা তুলে দিলেন। ধর্মবাবু ঠোঙার জিলিপি শুঁকে দেখলেন। বললেন, পচা—একদম পচা। এই দোকানের সমস্ত জিলিপি রাস্তায় নিকাল দেও। এই হুকুম শুনে বেশ কিছু যুবক দোকানে ঢুকতে চেষ্টা করল। কিন্তু এই সময় একজন বেশ দীর্ঘকায় এবং সবল লোকের আবির্ভাব ঘটল। তিনি এসে বললেন, দেখি কোন জিলিপি নিয়ে গোলমাল হচ্ছে? মাখনবাবুর জিলিপির ঠোঙাটি সেই আগন্তুকের হাতে দিলেন। আগন্তুক একটি জিলিপির ঠোঙা শুঁকে বললেন, কই, আমার তো জিলিপিগুলোকে একটুও পচা বলে মনে হচ্ছে না!

এইবার জনতা, যে জনতা এতক্ষণ নানা কথা বলছিল, যাকে সাধুভাষায় কল্লোল বা কলরোল বা কলকোলাহল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না, সেই জনতা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ যেন প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছিল এমন একটা রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। যুবকেরা, যারা দোকান থেকে সমস্ত জিলিপি ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য ঢুকতে যাচ্ছিল, তারা থমকে দাঁড়াল। একটু দুঃখিতও হল। ধর্মবাবু বাজারের থলিটা রাস্তায় রেখে হঠাৎ জামার আস্তিন গুটিয়ে আগন্তুকের সামনে গিয়ে বললেন, আপনার পচা মনে হচ্ছে না, বললেই হল? আগন্তুক সংক্ষেপে বললেন,

হল। একথা শুনে ধর্মবাবু আস্তে আস্তিন খুলে এসে বাজারের থলে এসে দেখেন থলিটি নেই, কে যে উধাও হয়েছে। এ ব্যাপারে ওখানে আঞ্চলিক চাঞ্চল্য হল। তবে কয়েক জন্য, কেননা জিনিস নিয়ে উধাও হও সাধারণ ঘটনা যে তা নিয়ে বিরাট কে ঘটল না। কেউ এমনকি ধর্মবাবুকে জন্য দায়ী করে বসল! একজন বলল বাজারের থলি রাস্তায় ফেলে রাখে দোষ তো আপনারই।

দুঃখিত মনে ধর্মবাবু আবার করতে গেলেন। এদিকে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়নি। মাখনবাবুও তাঁর সমর্থক চলে যাওয়াতে চটপট ব সমর্থক সংগ্রহ করে ফেললেন। আ সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু আগন্তুকেরও সমর্থক কয়েকজন হ অকস্মাৎ। মাখনবাবু একটু চেঁচিয়ে এই পচা জিলিপি খাওয়া মানে কলেরা! আগন্তুক বললেন, পচা খেলেই কলেরা হয় না। কলেরা হ কলেরার জীবাণু শরীরে যাওয়া পচা জিনিস খেলে অবশ্য অন্যান্য শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ম পারে।

লোকেরা দুদলে বিভক্ত হওয়াতে ময়রার গলা উচ্চতর ছিল। এ আপন মনে বিড় বিড় করছিল। সে এসব ব্যাপারের জন্য আইন আছে আছে পুলিস আছে আদাল আপনারা বিচার করবেন সে কিরকম তবে, যদি ঐ লম্বা শক্তিশালী ভদ্রলোক করেন তাহলে কোনো আপত্তি নেই।

যাই হক, অবশেষে একজন খা দর্শক ঐ দিক দিয়েই যাচ্ছিলেন তাঁকে মিলে টেনে আনল। খাদ্য পরিদর্শক বাবুর হাত থেকে জিলিপির ঠোঙা পরীক্ষা করে দেখলেন। শুঁকে দে তারপর বললেন, কি হয়েছে ব্যাপার

সমস্ত ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শ খাদ্য পরিদর্শক মশাই। শুনে ব জিলিপি পচা নয়। টাটকাই।

একথা শুনে মাখনবাবু বললেন, মশাই টাটকা? তা আপনি যখন তখন আমি তা মেনে নিতে বাধ্য।

যাই হক, আমি পরাজয় মানলুম। দিন দিকি জিলিপির ঠোঙাটা—বাড়িতে যাই।

খাদ্য পরিদর্শক মশাই বললেন, নিয়ে যাবেন কি মশাই—কতজনে শুঁকেছে খেয়াল করেছেন? অতজন বার পর জিলিপি কি আর জীবাণুমুক্ত বলে মনে করেন?

বলে সেটাকে ফেলে দিলেন কোথায় ছিল জানা যায় না, ডজন কুকুর ছুটে এল সেখানে।

"বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ"

লা সাহিত্যের অনুবাদ'—(অমৃত, সংখ্যা, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৩) 'অভয়ংকর'-এর মতের সঙ্গে আমিও এবং লেখককে এ নিবন্ধটির জন্যে সাধুবাদ জানাই।

য়ংকর লিখেছেন—'বিদেশের যে সব াংলা ভাষার সমাদর আছে সেটুকু মাত্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভিন্ন থাও বাংলা বিষয়ে তেমন আগ্রহের না যায় না। দু-একজন মার্কিন অবশ্য ব্যতিক্রম।' প্রসঙ্গত বলতে , বিদেশের যে সব রাষ্ট্রে বাংলা- াদর লাভ করেছে তা 'অনুগ্রহ'- নয়; কাজের তাগিদে দীর্ঘ দশ কয়েক শ' বিদেশী গবেষক বিদেশী পাঠকের সান্নিধ্য পাবার আমার হয়েছে—(এ সমস্ত পাঠক মধ্যে ইংরেজ, আমেরিকান, জার্মান, চেকোশ্লোভাক ও দেশী) তাঁদের সঙ্গে বাংলা- সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কখনও 'অনুগ্রহ' মনে হয়নি, বরঞ্চ বাংলা- প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা দেখে বিস্মিত জার্মানীর বাইরে ও সাহিত্য আজ পশ্চিম- ও আমেরিকায় বিশেষভাবে সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের প্রচেষ্টায় জার্মান ভাষার ত্রৈমাসিক পত্রিকা এ বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য হচ্ছে। এ পত্রিকাটি ইতি- জার্মানীর সরকারী কর্তৃপক্ষের করতে সক্ষম হয়েছে।

এই কলকাতাতেই এমন জার্মান ছাত্র আছেন যাঁরা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে হয়ত গবেষণা কিন্তু তাঁরা অনর্গল বাংলা এ অনেক বাঙালী পাঠকের বাংলা সাহিত্যের গতি- খবর রাখেন। এ'দের মধ্যে ফিল্ডসাইপার-এর নাম তিনি বর্তমানে কয়েকজন রচনা বিশেষ মনো পড়েছেন—ইচ্ছে এ'দের রচনা অনুবাদ করা।

আমেরিকার কথা ধরা যাক। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাহিত্যের প্রতি সমান আগ্রহ- আমেরিকার 'ওকল্যান্ড মিচিগান', 'শিকাগো ইউ- মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি', অব পেনসিলভেনিয়া', অব মিশৌরী', 'ইউনিভা- এন্ড এম' প্রভৃতি পাঠক্রমের মধ্যে বাংলা- হয়েছে। প্রতি বছরই প্রায় ছাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে গ্রহণ করেন।

অভয়ংকর লিখেছেন— 'দু-একজন মার্কিন গবেষক অবশ্য ব্যতিক্রম'। যদি মেনেই নিই যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়- গুলিতে বাংলাভাষার পঠন-পাঠন একান্তই আকস্মিক ব্যাপার তাহলেও ব্যতিক্রমের তালিকায় মাত্র দু-একজন মার্কিন গবেষক নন, সেই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। আমার ব্যক্তিগত পরিচিতির গণ্ডীর মধ্যে আমি অন্তত পক্ষে দশজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ, গবেষক ও অধ্যাপককে জানি যাঁরা বাংলা- সাহিত্য ও ভাষার প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট। এ'রা বাংলা বলেন, লেখেন ও পড়েন। অভয়-করের অবগতির জন্য আমি এ'দের নামও উল্লেখ করছি।

১। অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডিমক (ছোট) ইনি 'বাইশ কবির মনসা মঙ্গল কাব্যে'র অনুবাদক এবং সম্প্রতি যুগ্ম অনুবাদক ও সম্পাদক হিসেবে স্বনামধন্য বাঙালী ঐতিহাসিক ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' গ্রন্থটির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন। (২) মিস মেরী লেগো—ইনি রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা ইংরেজীতে অনুবাদ করে- ছেন, অতি সম্প্রতিকালে 'মহফিল' পত্রিকায় এ'র দ্বারা অনূদিত শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ইনি জীবনানন্দ দাসের কবিতার অনুবাদ- কাজে ব্যাপৃত আছেন। (৩) ডাঃ (মিস) রেচেল ভ্যানমিটার—ইনি বঙ্কিম-সাহিত্যে ডক্টরেট, রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত- এর অনুবাদিকা, বর্তমানে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে গবেষণা করছেন। (৩) ডঃ ডেভিড কফ, (৫) অধ্যাপক রালফ নিকোলাস, (৬) অধ্যাপক ওয়াবেস গুন্ডেরসন, (৭) অধ্যাপক জন ম্যাকলীন, (৮) অধ্যাপক (ডঃ) স্টিভেন হে, (৯) মিঃ ওয়েন কিলপ্যাট্রিক, (১০) মিস ক্লারা স্মিথ। আমেরিকাতে এ'রা একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন, নাম তার 'কনফারেন্স অব বেঙ্গলী স্টাডিজ— ১৯৬৪'। যেখানে এ'রা সকলে মিলিত হয়ে মাঝে মাঝে বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করেন।

> এই আলোচনা সম্পর্কে কোনো পাঠক যদি সুচিন্তিত এবং সংক্ষিপ্ত মতামত পাঠান তা প্রকাশের জন্যে অবশ্যই বিবেচিত হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি যে নিউ- ইয়র্কের বিখ্যাত প্রকাশক 'ব্যান্টাম বুকস আই-এন-সি' ১৯৬৪ সালে **The Language of Love : an anthology, edited by Michael Rheta Martin (An unforgettable collection of the literature of Love — in all conditions, in all times, in every part of the earth)** প্রকাশ করেছেন। এই সংকলনে পৃথিবীর প্রায় উল্লেখযোগ্য সব কয়টি ভাষা থেকে বাছাই করে গল্প সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের চৌদ্দটি ভাষার মধ্যে যে সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে তিনি বাঙালী। এই সংকলনে বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'... 'লজ্জাহর' গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ 'শাই-কীলার' সংকলিত করে সম্পাদিকা বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাগুলি জ্ঞাপন করেছেন। এতে সরকারী অনুকূল্য বা বিদেশী রাষ্ট্রের অনুগ্রহের ছাপ নেই।

'অভয়ংকর' আলোচ্য নিবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর ইংরেজী-অনুবাদের প্রয়োজন আছে। আমিও বলি নিশ্চয়ই আছে। তাঁর দেওয়া তালিকাতে অনেক লেখকেরই নাম আছে কিন্তু শ্রীবিমল মিত্রের ও 'শংকর' নামের অনুল্লেখ আমার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নামও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

অভয়ংকরের সাংবাদিক বন্ধুর চিঠিতে পড়লাম—'বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের হিন্দী অনুবাদ যথেষ্ট হচ্ছে, গুজরাটীতেও। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা- গুলিতে এবং দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য- পত্রিকা 'কলাইমগল'-এ প্রতি বৎসর দীপাবলী সংখ্যায় একজন বাঙালী লেখকের গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়। গত বৎসরের দীপাবলী সংখ্যায় বিমল মিত্রের একটি গল্প ছিল। তাছাড়া উক্ত লেখকেরই 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটি মালয়ালাম ভাষার সাপ্তাহিক 'জনযুগম' পত্রিকায় গত দু বছর ধরে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই উপন্যাসটিরই আবার পশ্চিম পাকিস্থানের 'নুকুশ'—লাহোর, পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ধারা- বাহিক উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

ভারতীয় ভাষায় অনূদিত এ লেখকের রচনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আনন্দের সঙ্গে আমি জানতে পেরেছি যে এ লেখকের 'সাহেব বিবি গোলাম' দক্ষিণ ভারতের কানাড়া ভাষায় ছাপা হচ্ছে এবং মালয়ালাম ভাষায় 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড ছাপা হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডও যন্ত্রস্থ। কাজেই দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের অনুবাদ হয়নি বা হচ্ছে না একথা বলা ঠিক হবে না। পাঠকের দাবীতে ও ব্যবসায়িক গরজেই এই গ্রন্থগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে—সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নয়।

এযাবৎ যে সমস্ত বাঙলা বই (স্বাধী- নোত্তর যুগে) ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে তার অনেকগুলিই ইউনেস্কো, সাহিত্য আকাদমী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের দাবী বা প্রকাশকের তাগিদে খুব কমসংখ্যক বাঙলা বই-ই ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে (বঙ্কিম রবীন্দ্র- নাথ ও শরৎচন্দ্র ছাড়া)। কেন তা হয়নি?

বাঙলা ভাষা ভারতের চৌদ্দটি ভাষার অন্যতম একটি আঞ্চলিক ভাষা। বাংলা-

সাহিত্যের অনেক উল্লেখযোগ্য রচনাই আজও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়নি। প্রথমে বাঙলা-সাহিত্য অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হোক, পরে আন্তর্জাতিক ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করা যাবে।

অভয়ঙ্কর লিখেছেন—"রাইটার্স গিল্ড" বা 'রাইটার্স ক্লাব' প্রভৃতির পক্ষে এই দায়িত্বভার (অনুবাদ) গ্রহণ করা উচিত, পি ই এনেরও দায়িত্ব কম নয়।" আমি বলি রাইটার্স গিল্ড, পি ই এন, এমনকি সাহিত্য আকাদমী যদি এই অনুবাদের ব্যবস্থা করে (যা তারা করছে) তাহলেও তার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাহিত্য অকাদমী থেকে তো গত কয়েক বছরে কয়েক লক্ষ টাকা অনুবাদের জন্যে ব্যয় করা হয়েছে, তাতে কার কতটুকু লাভ-ক্ষতি হয়েছে তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। যেদেশে খ্যাতি বা অখ্যাতি পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতা বা কুৎসা-কলহের ওপর নির্ভরশীল, সেই দেশে যতক্ষণ না নিরপেক্ষ অনুবাদযোগ্য গ্রন্থ নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ এ প্রস্তাবের সাফল্য সম্বন্ধে কোনও ভরসাই করা যায় না। একমাত্র ভরসা বিদেশী ভাষার পাঠকদের দাবী ও সেই ভাষার প্রকাশকদের ব্যবসায়িক গরজ কথা, সেইরকম কিছু বিদেশী বাঙলা প্রেমিক পাঠক ও গবেষক সৃষ্টি হচ্ছে কালক্রমে তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁ দিন বিদেশী ভাষায় প্রকাশের জন্যে যোগ্য গ্রন্থ নির্বাচন করবেন। এব নির্বাচনই হবে প্রকৃত নিরপেক্ষ। যতদিন পর্যন্ত তা না হয় "অভয়ঙ্কর"কে প্রতীক্ষা করতেই এ-ছাড়া আপাততঃ গত্যন্তর নেই।

নকুল চ
কলিকা

আর এস ভি

একটি অদ্ভুত ক্যান্সার জীবাণু

ক্যান্সার রোগের মূলে আছে কয়েক রকমের জীবাণু। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটি মারাত্মক, তার নাম রাউস সারকোমা ভাইরাস—মার্কিন জীবাণু-বিজ্ঞানী পেটন রাউস প্লাইমাউথ অঞ্চলের একটি পাহাড়ী মুরগীর টিউমার থেকে ১৯১০ সালে এটি সনাক্ত করেছিলেন। (সারকোমা বলতে সন্নিবদ্ধ টিস্যুর টিউমার বোঝায়) ১/২৫০,০০০ ইঞ্চি পরিধির এই জীবাণু আকারে-প্রকারে যেমন বিশিষ্ট, তেমনি ক্যান্সার জন্মাতে এর জুড়ি নেই। অন্যান্য ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টি নিতান্ত পরোক্ষ বা ঘটনাচক্রে। বিলম্বিত গতিতে কাজ করে তারা; কয়েক মাস, কয়েকটি বছর এমন কি পঞ্চাশতম পুরুষও লাগিয়ে দেয়। তাছাড়া জীবদেহের কোন টিস্যুতে এদের অনুপ্রবেশ ঘটলে, সেখানেই টিউমার সৃষ্টি করে ক্যান্সার জন্মানোর প্রাথমিক ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হবে—তার মানে নেই। জানতে ঢুকে গলায় কীর্তিস্তম্ভ গড়ে তুলতেও পারে। কিন্তু আর এস ভি একেবারে প্রত্যক্ষ ও সোজাসুজি কাজ করে। যেখানে ঢোকে সেখানেই বিস্ফোরণ ঘাঁটি বানায়। এর দ্রুততাও অসাধারণ। জীবকোষে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে এই জীবাণু ত্বরিতে কোষটির রূপান্তর ঘটায় এবং অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় পার্শ্ববর্তী কোষগুলিতে বংশবৃদ্ধি দ্বারা সংক্রামিত হতে থাকে। তারপর গুচ্ছে-গুচ্ছে দলাবাঁধা অসংখ্য টিউমার স্তূপ সৃষ্টি করে ফেলে; পরিণামে ক্যান্সাররূপ বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা—তার এরূপ অত্যদ্ভুত ক্যান্সার সৃষ্টি ক্ষমতার মূলে আসলে তারই নিজস্ব একটি দুর্বলতা। সে আরেক জাতের জীবাণু ছাড়া নিতান্ত অসহায়। একটা থালায় যদি স্বাভাবিক জীবকোষগুলিকে বাড়তে দেওয়া হয়—দেখা যাবে থালার সম্পূর্ণ বিস্তারটা তারা একটিমাত্র স্তরে অর্থাৎ একের পর অন্যে না চেপে, ঢেকে ফেলে। এরূপ একটি স্তরে বিন্যাসের কারণকে বলা হয়: contact inhibition বা সোজা কথায় স্পর্শদুষ্টতা। এখন, এই কোষগুলিতে আর এস ভি অনুপ্রবিষ্ট হলে ওই স্পর্শ-দুষ্টতার অবসান ঘটে। তার ফলে কোষ-গুলি বাড়বার সময় একের পর অন্যে চেপে ঠাসাঠাসি স্তূপীকৃত হতে থাকে—যাদের বলা চলে আণবিক টিউমার গুচ্ছ; যে ক্ষমতা অন্য জীবাণুর নেই।

আর এস ভি-র মধ্যে রয়েছে কিছু নিউক্লিক এ্যাসিড (বা রিবোনিউক্লিক এ্যাসিড—যা সব জীবাণুতেই থাকে) এবং প্রোটিন ও লিপিড নামক রাসায়নিক আবরণ। অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বংশ-বৃদ্ধি দ্বারা আর এস ভি কোষে-কোষে সংক্রামিত হতে থাকে। একবার দেখা গেল—যে পরিমাণ আর এস ভি অনুপ্রবিষ্ট হয়, ঠিক সেই পরিমাণ কোষ রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং স্তূপীকৃত রূপান্তরিত কোষ গোনাও সম্ভব হয়। আর একবার মুরগীর ভ্রূণের দশ লক্ষ কোষবিশিষ্ট একটি অংশে প্রচুর আর এস ভি ইঞ্জেকশান করে ঢুকিয়ে দেওয়া হলে এক আশ্চর্য কান্ড দেখা গেল।

সচরাচর ক্ষেত্রে জীবাণুরা যে কোষটিতে ঢোকে, তাকে ধ্বংস করে ও নিজের বংশ-বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল—অতিথি আর এস ভি গৃহস্থ কোষটিকে ধ্বংস না করে বাইরে বসে বংশবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে মাত্র। তার মানে কোষের কোন রূপান্তর দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ কী? নিশ্চয় কোষে কোন প্রতিরোধক অবস্থা রয়েছে। এর নাম দেওয়া হল রাউস ইনডিউসিং ফ্যাক্টর বা সংক্ষেপে আর আই এফ—রাউস বিরোধী ব্যবস্থা। তাছাড়া লক্ষ্য করা গেল যে এই আর এস ভি অধ্যুষিত কোষগুলি আর পরবর্তী কোন আর এস ভি-কে ঢুকতে দিচ্ছে না। ধাঁধা আরও জটিল হল। বিস্তর গবেষণার পর দেখা গেল আরেক রকম জীবাণু ওই কোষে বিরাজ করছিল—যা আর এস ভির তুলনায় সংখ্যায় দশগুণ বেশী। এর নাম দেওয়া হল আর এ ভি বা রাউস সংসর্গিত জীবাণু। আর এস ভি-র সঙ্গেই এরা থাকে মাথাপিছু দশ। গবেষণাগারে এ্যান্টিসিরাম প্রয়োগে সংসর্গিত জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে আর এস ভি বাছাই করা সম্ভব বর্তমানে। এবং দেখা গেছে আর বংশবৃদ্ধির জন্য আর এ ভি দায়ী আর এস ভি কোষে ঢুকলে কোষ ওঠে এন-পি বা অনুৎপাদক কোষ কোষে আর এ ভি ঢুকিয়ে দিলে আর এস ভি জন্মাতে থাকে ও ব করে। অবশ্য আর এস ভি তাদের ছাড়া যদি বা কোষটিকে ক্যান্সার রূপান্তরিত করতে পারে, নিজের ব ঘটাতে সক্ষম হয় না। এখানেই মারাত্মক দুর্বলতা।

আরও দেখা গেছে, জীবকোষ আগে থেকে এই জীবাণু মজুত পরে আর এস ভি জীনগুলি দ্বারা কোষ এবং জীন দ্বারা গঠিত হয়) সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা বংশ সক্ষম হয় না। আবার, অপরপক্ষে থেকে মজুত আর এস ভির স দ্বিতীয় প্রকার জীবাণু যুক্ত হলে ভি জীবাণুগুলির বিকাশ ঘটিয়ে পূর্ণ গঠনের জীবাণু সৃষ্টি ও তার বংশবৃদ্ধি সম্ভব হয়। এরা আর এ গায়ে যে আবরণ থাকে, তারই যোগা অত্যন্ত সম্প্রতি নতুন প্রমাণ পাওয় যে এদের ওই আবরণ যোগানোর সঙ্গে আর এস ভিকে প্রতিরোধের যুক্ত রয়েছে। ইতিমধ্যে আর এক আর এস ভির খোঁজ পাওয়া আর এস ভি দ্বিতীয় শ্রেণীর আর কাছে আবরণের সাহায্য পেলে সে ভাবে আক্রমণেও পটু।

ক্যান্সারের জীবাণুতত্ত্বে এই গুলি বিস্ময়কর। আর এস ভি আর সহায়ক—অথচ একটি অন্যটির প্র দর্পণবিম্ব বললে ভুল হয় না। এও বিস্ময়কর? তবে সবচেয়ে আশার শত্রুর বিনাশসাধনে তার দুর্বলতার সন্ধান একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ক জীবাণু সংক্রান্ত এই নতুন গবেষণ মারাত্মক দুর্বল ঘাঁটিটির ওপরই আ পাত করছে।

সুমন্ত সেন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ ২য় খণ্ড

১৮শ সংখ্যা
মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 2nd. September, 1966 শুক্রবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

অবহেলিত প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তি প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬ সংখ্যায় শ্রীকালীপদ লাহিড়ী 'অবহেলিত প্রাচীন শিল্পকীর্তি' বিষয়ে একটি মূল্যবান চিঠি লিখেছেন। এই সম্পর্কে আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তি অবহেলায় ও অনাদরে ধ্বংস হতে চলেছে। আমরা আজ উনিশ বৎসর স্বাধীন হয়েছি, আমাদের জাতীয় সরকারের অধীনে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আছে, তবুও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন এই জাতীয় সম্পদগুলি সংরক্ষণ করা হয়নি। অবশ্য আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের সাধ থাকলেও এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যুগে সাধ্য নেই। ফলে অতীত যুগের নীরব সাক্ষী এই স্থাপত্য-কীর্তিগুলি আজ অবলুপ্তির পথে।

এইরূপ বেশকিছু প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি ২৪ পরগণার সারা সুন্দরবন জুড়ে আছে। বাংলাদেশে যে কয়টি প্রাচীন মন্দির সেগুলির মধ্যে দক্ষিণ সুন্দরবনের জটার প্রাচীন মন্দির অন্যতম। গদামথুরার শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর পাথরে খোদাই বিরাট মূর্তি, রাজবল্লভপুরের বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, দাশপুর সীতারামপুরের দেব-দেবীমূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি, নামখানা থানায় চন্দনপীড়ির মন্দিরের ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, ফেজারগঞ্জে বঙ্গোপসাগরের তীরে বকখালির প্রাচীন মন্দিরগুলির স্থাপত্যশিল্পে বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলীর ও শিল্পসৌকর্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, সুন্দরবনের এই মন্দির ও দেবদেবী মূর্তিগুলি প্রাচীন হিন্দুযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের বুকে লুপ্তিয়মান দ্বীপে (তেমলুকের চড়া) বৌদ্ধমূর্তি, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, পুষ্করিণী ও পাকা পথের ধ্বংসাবশেষ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

ডায়মন্ডহারবারের অদূরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত দেউলপোতায় বিচ্ছিন্ন বালুকাস্তরে অসংখ্য ফ্লীট অথবা চার্ট পাথরে তৈরী আয়ুধ পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন প্রস্তরযুগেই একমাত্র এই ধরণের অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। এইগুলি প্রমাণ করে যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এমনকি অর্ধলক্ষ বৎসর পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের সমুদ্রকূলে উপলাকীর্ণ প্রান্তরে এক অজ্ঞাত মানবগোষ্ঠী বাস করত। এই দেউলপোতা এবং নিকটবর্তী হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন থেকে মনে হয়, দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা একদিন বাংলার হারানো সভ্যতার বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল।

আমরা উক্ত মন্দিরগুলি সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন কীর্তিগুলি কোন সংগ্রহশালায় স্থাপন করবার জন্য আমাদের জাতীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই প্রসঙ্গে সরকারের নিকট প্রস্তাব এই যে, দীঘার ন্যায় একটি দর্শনীয় ও স্বাস্থ্যকরস্থান ফেজারগঞ্জে একটি সংগ্রহশালা তৈরি করলে স্থানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।—

বিনীত—
শ্রীবিনোদবিহারী দাস
প্রধান শিক্ষক, পাথরপ্রতিমা
উচ্চ বিদ্যালয়, ২৪ পরগণা

অনুবাদ প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত "২০ শ্রাবণ ১৩৭৩" সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে শ্রীঅভয়ঙ্করের রচনা ও গত ৯ ভাদ্রের সংখ্যায় শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় লিখিত আলোচনাটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত তথ্যের অবতারণা করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোকপাত করবে। আর অভয়ঙ্কর-এর রচনাটি পড়ে আমি যেমন হতাশ হয়েছিলাম তেমনি 'নকুল চট্টোপাধ্যায়ে'র আলোচনাটি পড়ে উৎসাহবোধ করছি। এবং আলোচনাটি পড়বার পর দ্বিতীয়বার 'অভয়ঙ্করের' রচনাটি পড়লাম। এবার মনটা আরও দমে গেল। কারণটা বলছি—অভয়ঙ্কর বলেছেন—"অনেক অযোগ্য এবং কদর্য রুচির সাময়িক পত্রের প্রচারাধিক্য আছে। এবং সেই সব পত্রিকাতেও কোন কোন লেখক প্রকাশের জন্য রচনা দান করে থাকেন। মোটকথা, সাহিত্যিকদের বিশেষতঃ বাঙালী সাহিত্যিকদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই।" অভয়ঙ্করের মতে "অযোগ্য এবং কদর্য রুচির সাময়িকপত্র" বাংলাদেশে কো[illegible] জানতে পারলে ভালো হতো। যদি লেখক কোন পত্রিকাতে প্রকাশের রচনা দান করেন তাতে বাংলা সাহি[illegible] কতটা ক্ষতিসাধন সেই লেখক করেন তিনি জানাবেন কি? অভয়ঙ্কর ব[illegible] সাহিত্যিকদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ম[illegible] মনে একটি প্রশ্ন জাগছে যে সাহি[illegible] কি ট্রাম, রেল বা ফ্যাক্টরীর মত ইউনিয়নের প্রয়োজন আছে?

শ্রীচট্টোপাধ্যায় অভয়ঙ্করের সাংব[illegible] বন্ধুর চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত কর[illegible] কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে মু[illegible] প্রমাদের ফলে উদ্ধৃতিটি সম্পূর্ণ পড়তে না পেরে মূল প্রবন্ধটি থেকে সেই অং[illegible] পড়েছি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ভার[illegible] ভাষায় বাংলা সাহিত্যের অনু[illegible] সম্পর্কে যা বলেছেন আমিও তাঁর স[illegible] একমত। তামিল, মালয়ালাম, কান[illegible] তেলেগু ভাষায় যথেষ্ট অনুবাদ হয়েছে হচ্ছে।

অতি সম্প্রতিকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহি[illegible] সমালোচক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহা[illegible] "স্বাধীন ভারতের সাহিত্য" প্রব[illegible] লিখেছেন "স্বাধীন ভারতের উ[illegible] বছরে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃ[illegible] তেমন কিছুই হয়নি। .. একমাত্র ব্যত[illegible] বিমল মিত্র; যিনি ক বছরের মধ্যেই বাংল[illegible] এবং বাংলার বাইরে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জ[illegible] করেছেন।"

অভয়ঙ্করের নিবন্ধে সেই বিমল মিত্রে[illegible] নামের অনুল্লেখ শুধু শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে বিস্মিত করেনি আমাকেও করেছে।

অভয়ঙ্কর লিখেছেন "অনুবাদ ক[illegible] মিশনারী কর্ম। অনুবাদকের কোন খ্যা[illegible] নেই", একথা মেনে নিতে পারলাম না একাজটি একান্তভাবে মিশনারী নয়— অনুবাদকের কিছু প্রাপ্তি ও খ্যাতি এতে আছে অভয়ঙ্করের কাছে একান্ত অনুরোধ যে তিনি যেন এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করে দেখেন। অভয়ঙ্কর রাইটার্স গিল্ড ও ইন্ডিয়ান পি-ই-এন-কে অনুবাদের ভার গ্রহণ করবার কথা বলেছেন। রাইটার্স গিল্ড প্রভৃতি সংস্থা যদি এ কর্মে কৃতকার্য হয় তবে খুশী হব।

বিনীত—
উষারাণী চৌধুরী (দেব)
কলিকাতা—৪৯

কাশ্মীর নিয়ে নানাকথা

কিছুদিন আগে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ কোদাইকানালে গিয়ে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কোদাইকানাল একটি স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। সেখানে কাশ্মীরী আবদুল্লার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে রাখা হয়েছে। কাশ্মীর সম্পর্কে আবদুল্লার মতামত সরকারের জানা আছে। তিনি দেশের বাইরে গিয়ে, হজযাত্রার নাম করে, কাশ্মীর ও কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী বিশ্বসমক্ষে জোর গলায় প্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি আলজিয়ার্সে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে মোলাকাৎ করে ভারতের কবল থেকে কাশ্মীরকে "মুক্ত" করার বিষয়ও আলোচনা করেছিলেন। তার ফলে ভারত সরকার আবদুল্লাকে দেশে ফিরে আসার জন্য তলব করেন। অন্য কেউ হলে এই অপরাধে বিচার হত। ভারত সরকার ততদূর পর্যন্ত যান নি। আবদুল্লাকে কোদাইকানালের শীতল আবহাওয়ায় রেখেই নিশ্চিন্ত আছেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লা বা তাঁর অনুচরদের মতিগতি পরিবর্তনের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। কিন্তু অকস্মাৎ জয়প্রকাশ-আবদুল্লা সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়ে ভারত সরকার এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছেন যে, কাশ্মীর রাজনীতি ও তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আবদুল্লার ভূমিকা এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

স্বভাবতই এর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোলাম মহম্মদ সাদিক। শ্রীসাদিক একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। আবদুল্লাকে তিনি ভালভাবেই জানেন। আবদুল্লাকে বর্তমান অবস্থায় রাখা হবে কি অবাধ চলাফেরার সুযোগ দেওয়া হবে, এ নিয়ে তিনি কিছু বলেন নি। তিনি বলেছেন যে, কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ভারত-বিরোধী শক্তিগুলি ম্রিয়মাণ ও আবদুল্লাপন্থীরা হতাশাগ্রস্ত, ঠিক এমন সময়ে জয়প্রকাশকে আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেবার ফলে কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী শক্তিগুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার পথ খুঁজছে এই ভেবে যে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্ভবত ভারত সরকার এখনো নিশ্চিত নন। যার ফলে আবার আবদুল্লার সঙ্গে কথাবার্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অবশ্য ভারত সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলছেন যে, জয়প্রকাশ নারায়ণ ব্যক্তিগতভাবে আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাৎকারের ওপর সরকার কোনো গুরুত্ব দেন না। কিন্তু এতে সাদিকের সংশয় দূর হবে না। কারণ, আবদুল্লাকে সরকার যদি পলিটিক্যাল ফোর্স মনে না করেন তাহলে জয়প্রকাশজীর ন্যায় একজন রাজনৈতিক দূত, তা তিনি শান্তিবাদীই হোন কিংবা সর্বোদয়ীই হোন, কোদাইকানাল গিয়ে তাঁর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করবেন কেন? এই ধরনের দ্বিধা রয়েছে বলেই ভারত সরকারের পক্ষে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। বলা বাহুল্য, এই দুর্বলতার সুযোগ পাকিস্থান গ্রহণ করবে এবং তার পশ্চিমী মিত্ররাও এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না।

কাশ্মীরে একটি আইনানুগ সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। তার নির্বাচিত মন্ত্রিসভা ও মুখ্যমন্ত্রীকে ডিঙিয়ে সরকারের পক্ষে এমন কোনো রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় যাতে সেই রাজ্য সরকার বিড়ম্বিত বোধ করতে পারেন। অন্তত আগে থেকেই তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত। নতুবা এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, কাশ্মীর শাসন করে নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষ, শ্রীনগরের মন্ত্রিসভা নয়। এই ধারণা, বলা বাহুল্য, কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী শক্তিগুলিকেই আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। গত ১৯ বছরে কাশ্মীর নিয়ে এত অশান্তির পরও একথা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, তাই আশ্চর্য। শুধু জয়প্রকাশ ন'ন, কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডাঃ করণ সিং মহোদয়ও জম্মু ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রকাশ্যে জল্পনাকল্পনার সুযোগ দিয়েছেন। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতার কাছে এক বিবৃতিতে ডাঃ করণ সিং বলেছিলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার একটি সমাধান হতে পারে যদি জম্মুকে আলাদা করে হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই নীতির সঙ্গে ভারত সরকারের এতদিনের অনুসৃত নীতির কোনো সামঞ্জস্য নেই। কাশ্মীরের বিরোধী দল প্রজা পরিষদের কোনো কোনো নেতা হিন্দুপ্রধান জম্মুকে কাশ্মীর থেকে আলাদা করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং রাজ্যপালের মুখে এই অভিমত শুনে মনে হতে পারে যে, কাশ্মীর নিয়ে ছেলেখেলার সুযোগ এখনো আছে। এবং যাঁরা কাশ্মীরকে টুকরো করে এই সমস্যার সমাধান খুঁজছেন তাঁরা কোনো বিরোধী দলের লোক ন'ন, শেখ আবদুল্লার লোক ন'ন, ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মহামান্য রাজ্যপাল।

এইভাবে যদি আবোলতাবোল বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে তাহলে শ্রীনগরের মন্ত্রিসভার পক্ষে আইনের শাসন বজায় রাখা কি কঠিন হয়ে পড়ে না? কারণ, এতে কাশ্মীরের নির্বাচিত মন্ত্রিসভাই লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার এই ধরনের ঘটনার দিকে যথেষ্ট সচেতন হচ্ছেন না। শ্রীসাদিক যদি এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে কাশ্মীরে ভারতীয় জাতীয়তার স্বপক্ষে আইনানুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের দুরূহ দায়িত্ব পালন করছেন। এখন যদি দেখা যায় যে, একজন মনোনীত রাজ্যপাল কিংবা দেশদ্রোহী একজন আটক রাজনীতিকের মতিগতিতে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের দূরতম সম্ভাবনাও আছে তাহলে কাশ্মীর মন্ত্রিসভা কি তবে পুতুল মন্ত্রিসভা বলে প্রমাণিত হবে না?

নিশ্চয়ই ভারত সরকার তা চান না?

বিচিত্র চরিত্র

অভিনেতা রতনবাবু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যাত্রার দলের মানুষেরা তাঁদের পেশার কারণেই বোধহয় বিচিত্র অভ্যাসের মানুষ হয়ে ওঠেন—তার ভিতরের ভিতরে দেহের কোটোয় প্রাণভ্রমরের মত থাকে তার জন্মগত স্ব-ভাব বা চরিত্র। কতটা বা কোনটা তাঁর স্ব-ভাব অথবা কোনটা তাঁর অভ্যাস ভাব—তা বলা খুব কঠিন।

কেন্দুয়ার রতন বাঁড়ুজ্জে মশায়কে দেখে আশ্চর্য হতাম; তাঁকে দেখে—তাঁর কাজ কর্ম বিচার ক'রে বুঝতে পারতাম না—আসল মানুষটার স্বরূপ কি বা কেমন?

কেন্দুয়ার বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান। খানিকটা জমিদারী ছিল—ভাল জোতজমা ছিল—পুকুর বাগান ছিল; সেকালে যাকে বলত খামারে ধান, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু ছিল। ঘরে ঠাকুরদেবতা ছিল। সমাজে নামডাক ছিল। চেহারা তাঁর ভাল ছিল। লেখাপড়া তা মন্দ জানতেন না, সে আমলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি; তখনই শখের যাত্রার দলে—অর্থাৎ গ্রামের এ্যামেচার যাত্রার দলে—অভিমন্যু বধ পালায় অভিমন্যুর পার্ট করে প্রথমে নিজের গ্রাম তারপর আশপাশের গ্রাম মাতিয়ে তুলেছিলেন। বিয়ে হয়েছিল তার আগেই; ভালঘরের মেয়ে, সেই বউ হঠাৎ তার বাপের কাছে গিয়ে কলেরা হয়ে মারা গেল। রতন বাবু ছুটে গেলেন, ফিরে এলেন এবং সেই পড়া ছাড়লেন। অতঃপর গ্রামের এ্যামেচার যাত্রার দল ছেড়ে গেলেন একটা মফস্বলের প্রফেশনাল থিয়েট্রিক্যাল পার্টিতে; এবং বেশ নাম করলেন সেখানে। তার পর বৎসরই চলে গেলেন কলকাতায়। বাড়ী প্রায় ছাড়লেন—মধ্যে মধ্যে আসতেন কেন্দুয়াতে, দু-চারদিন থাকতেন তারপর চলে যেতেন। আরও দুই-ভাই ছিল তাদের কাছ থেকে এজমালি বিষয়ের আয় বাবদ যা পারতেন নিয়ে যেতেন—আসতেন ওইজন্যেই তাতে কোন সন্দেহ তিনি নিজেই রাখতে দিতেন না।

আসতেন দেশে—সঙ্গে থাকত একজন চাকর। তাঁর খাস চাকর। ওই তাঁর সব। তিনি এলে পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা দলবেঁধে তাঁকে দেখতে যেত সকাল বেলা থেকে। কিন্তু তিনি সাড়ে ন'টা দশটার কম উঠতেন না; উঠেই প্রচণ্ড হ্যা—খ্যা—খ্যা শব্দে গলা ঝেড়ে নিয়ে—সিগারেট ধরিয়ে বসতেন—বালিশের উপর পা-রেখে। তারপরই আরম্ভ হত বিচিত্র জীবন, চা, সিগারেট, সিগারেট চা—আর তার মধ্যে মধ্যে মদের শিশিতে চুমুক। এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতা। যা অত্যন্ত সাধারণ। সাধারণ জীবন থেকে পৃথক হলেও যার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নেই। আর একটা কাজ তিনি করতেন—; যে টাকা তিনি এখান থেকে পেতেন—তাঁর অংশ বাবদ তার থেকে দুটাকা চারটাকা একটাকা দিয়ে যেতেন গ্রামের এবং আশপাশ গ্রামের কতকগুলো স্বৈরিণী মেয়েকে। একালে না হোক একালে সমাজ বদলেছে—কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব-পর্যন্ত গ্রামে এই শ্রেণীর বা স্বভাবের কিছু ব্রাত্য মেয়ে থাকত। যাদের কিছু অবশেষ এখনও আছে। তারা বৃদ্ধা হয়েছে—ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে—কেউ পঙ্গু, কেউ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কারও নাক বসে গেছে, কারও চোখ গেছে, কারও কিছু কারও কিছু। যার কিছু হয়নি—তারও বয়স গেছে—সে বৃদ্ধা—এরা এখন ভিক্ষা করে খায়। এরা আজও রতনবাবুর নাম করে।

নাম ছিল তাঁর—সোনার বাবু।

রঙই ছিল তাঁর সোনার মত, মেজাজও ছিল সোনার মত। কথা ছিল ফুলঝুরির মত।

ওরা সব দল বেঁধে আসত—তখন তারা বৃদ্ধা নয় প্রৌঢ়া নয়—তারা লাস্যময়ী হাস্যময়ী ভরা যৌবনে যুবতী। বাবু মশায়!

—এসেছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ক'জন আছিস?

—আমরা তিন জন এসেছি।

—এসেছিস এবার ফিরে যা।

—ফিরে যাব?

—যাবি নে? তবে কি করবি? কই আমাকে তো মজাতে পারলি নে!

মেয়েগুলো গা টেপাটেপি করে হেসে বলত—আপনি না-মজলে—কি ক'রে মজাব বলুন। আমরা তো মজেছি।

বলা বাহুল্য, এ সব কথার সময় ছেলেপিলেদের সরিয়ে দেওয়া হ'ত। অন্য যারা বয়স্ক তাদের তিনি যেতে বলতেন না—কিন্তু তাঁরা, জানতেন বলে, নিজেরাই চ'লে যেতেন। দু একজন থাকলে তাঁদের গ্রাহ্য করতেন না। লজ্জা তাঁর ছিল না। কেউ এ নিয়ে দোষারোপ করলে তিনি হা-হা করে হাসতেন। বলতেন—'ক'রে থাকি অপরাধো—আষ্টে পৃষ্ঠে ক'ষে বাঁধো, দাও বেত্র যাহে ইচ্ছা—মুণ্ড ভাঙো চামড়া কেটে মারো। অথবা চালান দাও কোর্টে কোর্টে যেথা চাও—যারা যদি খুঁজে পাও ফৌজদারী সোপরদ্দ করো।"

তারপরই বলতেন—"এ সংসারে গতন কোথায় মূর্খ? কোথা খোঁজো—খনি অন্ধ-

করে—সমুদ্রের [illegible]? হায় হায় রতনের [illegible]র সে যে [illegible]—কুসুমপেলব অঙ্গ। [illegible]পর্শ মাত্র মোহ আনে। ভুলায় মৃত্যুর ভয়।

কিন্তু কোথায়—তা তোদের কোথায় রে? রূপ কোথায়? নেশা কোথায়? মদের নেশা মাথায় চনচন করছে—চোখের সামনে দুনিয়া যেন নাচছে—তবু তোরা তো সেই তোরাই আছিস। ওরে গদা—দে এদের একটা করে টাকা দিয়ে দে।

—আজ্ঞে না। একটাকা এবার নেব না।

—কেন? বর্ষার সময় ঘরে জল পড়ছে—

—বেশ দুটাকা হিসেবে দিয়ে দে। ওই মেয়েটা নতুন এসেছে—ওকে একটাকা বেশী দে।

তারা টাকা নিয়ে প্রণাম করে চলে যেত।

পাঁচদিন সাত দিন থেকে তিনিও চলে যেতেন।

তাঁর চাকর গদাধরের কাছে শুনেছিলাম—তিনি যাত্রাদলে ভাল মাইনে পান। তিনি হিরো সাজেন। যা রোজকার করেন—সবই এতেই যায়। ওই বস্তীতে বস্তীতে ঘুরে বেড়ান।

এই রতনবাবু। জীবনে লোকটিকে কোনদিন শ্রদ্ধা করতে পারিনি। রতনবাবু আমাদের থেকে বেশ ক'বছরের মানে পাঁচ সাত বছরের বড়। জমিদারী উচ্ছেদের কয়েক বছর আগেই একবার এসে যা ছিল সব বিক্রী করে চলে গেলেন এখান থেকে। জানতাম এরপর যদি কোন দিন দেখা হয় তবে তাঁকে ভিক্ষে করতে দেখব!

তাই-ই দেখলাম। তবে ঠিক ভিক্ষুক নন—তাঁকে সন্ন্যাসী বেশে দেখলাম। বিস্মিত হই নি। তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম—তিনি চুপ ক'রে চোখ বুঁজে বসেছিলেন গঙ্গার ঘাটে একটা গাছে ঠেস দিয়ে। হঠাৎ চোখ মেললেন। আমার দিকে চোখ পড়ল। এবং চিনলেনও সঙ্গে সঙ্গে। বললেন—বসো। ভাল আছ!

যখন ফিরলাম তখন দুনিয়ার রঙ পাল্টে গেছে।

সেদিন তিনি বললেন—দেখ গঙ্গার ধারে ব'সে আর এই গৈরিক গায়ে আজ মিথ্যে কথা বলতে পারব না। তুমি বলছ—জীবনটা এমনভাবে বরবাদ করলাম কেন? সত্য বলি—আমার স্ত্রী মরে গেছিল বলে শুনেছিলে তোমরা। কিন্তু তা নয়। সে চলে গিয়েছিল একজনের সঙ্গে। শ্বশুরে স্টেশনমাস্টার ছিলেন। সেই স্টেশন থেকেই তাকে নিয়ে পালিয়েছিল একটা ফেরিওলা। জামা ছিট বেচত। আমি তাকে বড় ভালবাসতাম হে। তাকে আমি খুঁজেই বেড়ালাম সারাটা জীবন। বস্তীতে বস্তীতে খুঁজেছি। কিন্তু—। নাঃ ও অপরাধ করিনি আমি। তবে মদ খেয়েছি। মুখে ওই সব বাক্য বলেছি; আর ওই শ্রেণীর মেয়েদের দিয়েছি—দু চার টাকা। আমি তো জানি হে—মেয়েরা আমাদের দেশে নিজে থেকে খারাপ হয় না। ওদের আমরাই খারাপ করি। খারাপ করলে, কলসীর জল গড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিলে—মাটি-গোলা হবেই। জলের কি দোষ বল? দেখনা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখনা। ঘোলা! কিন্তু ওতেই শরীর জুড়িয়ে যাবে।

আচ্ছা—জয় গঙ্গা। বলে নেমে গেলেন জলের দিকে।

আমি ফিরলাম তখন দুনিয়ার রঙ পাল্টাচ্ছে। গঙ্গাস্নান করিনে আমি। আমি পুজো করি জপতপও করি কিন্তু গঙ্গাস্নান করিনে। কাল গঙ্গা স্নান করব।

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

আনন্দকুমার স্বামী

প্রায় উনিশ বছর আগে বোস্টন শহরে এই সেপ্টেম্বর মাসে আনন্দকুমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আনন্দকুমার স্বামীকে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্তব্য। ভারতীয় শিল্পকে মর্যাদামণ্ডিত করে সারা বিশ্বের মানচিত্রে একটি বিশেষ স্থান তিনিই দান করেছেন এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আনন্দকুমার স্বামীর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলম্বোতে জন্ম হয়। স্যার মুথুকুমার স্বামী ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, আনন্দ-কুমার স্বামীর মা ছিলেন ব্রিটিশ রমণী। আনন্দ কেনটিস্ কুমার স্বামীর যখন মাত্র দু' বছর বয়স, তখন মুথু কুমারস্বামীর মৃত্যু ঘটে।

আনন্দকুমার স্বামীর মা তাঁকে ইংলণ্ডে নিয়ে এসে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। উইক্লিফ কলেজ ও পরে লণ্ডন ইউনি-ভার্সিটিতে পড়াশোনা করে আনন্দকুমার স্বামী অতি অল্পবয়সেই জিওলজিতে ডক্টরেট লাভ করেন, এর পর তাঁকে সিংহলে ডাইরেক্টর অব মিনারোলজী পদে নিযুক্ত করা হয়, এই পদে তিনি প্রায় তিন বছর কাজ করেছেন ১৯০৩ থেকে ১৯০৬। ভূতত্ত্ববিদ আনন্দকুমার স্বামীকে সরকারী চাকরীর স্বর্ণসূত্র কিন্তু বেশী দিন বেঁধে রাখতে পারেনি, কারণ তিনি ভূতাত্ত্বিক গবেষণাসূত্রে আবিষ্কার করলেন যে আধুনিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। পুরাতনকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে। ভারত-বর্ষের মানুষ একদিন যে-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী ছিল, সেই অধিকারে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আনন্দকুমার স্বামী সরকারী চাকরী ছেড়ে দিলেন। যে-কালে আনন্দকুমার স্বামী চাকরী ছেড়ে দিলেন, সেই কাল স্বদেশীর যুগ বলে চিহ্নিত। স্বাদেশিকতার প্লাবন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রবাহিত। পুরাতনকে আবিষ্কার করতে হবে। জাতীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, যা ভারতীয় তা স্বর্গীয়। স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু। আনন্দকুমার স্বামী তাঁর 'আর্ট অ্যাণ্ড স্বদেশী' নামক গ্রন্থে এক সাহসিক উক্তি করলেন, তাঁর নিজস্ব ধারণাকে তিনি সমা-লোচনার সামনে দাঁড়িয়েও আঁকড়ে থাকতেন। তিনি সেদিন লিখেছিলেন—

'I do not believe in any regeneration of the Indian people which can not find expression in art; any reawakening worth the name must so express itself. There can be no true realization of political unity until Indian life is again inspired by the unity of the national culture".

জাতীয় সংস্কৃতিতেই যে জাতীয় সংহতি সম্ভব এই বিশ্বাস ছিল কুমার-স্বামীর। তাই তিনি স্বদেশী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পেরেছিলেন—রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেয়ে জাতীয় সংহতির ভিত্তিমূলে গভীরতর হওয়া প্রয়োজন। সেই কঠিন ভিত্তি কেউ কোনোদিন ধ্বংস করতে পারবে না।

আনন্দকুমার স্বামী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার যাঁরা অধিকারী, তাঁদের মধ্যে বোধ করি একমাত্র প্রবীণ শিল্প-সমালোচক ও রূপদক্ষ অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গো-পাধ্যায় জীবিত আছেন। যতদূর স্মরণে আছে, তাঁর সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'রূপম' পত্রিকায় কুমারস্বামীর অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও কিছু রচনা ছড়ানো আছে।

অবনীন্দ্রনাথ, ই বি হ্যাভেল প্রভৃতির নেতৃত্বে যে প্রাচ্যকলা সমিতি গঠিত হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর অঙ্কন-রীতিকে পরিচিত করার ব্যাপারেও আনন্দ-কুমার স্বামীর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

প্রাচীন চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের উৎস-সন্ধানে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন কুমার-স্বামী। ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিল্প ও স্বাভাবিক শিল্পের মধ্যে পার্থক্য ও সমন্বয় সন্ধান করেছেন। সভ্যতার বিস্তার ও ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতার অবক্ষয়ের কারণানুসন্ধানেও তিনি অনেক সময় ব্যয় করেছেন। 'ফিলজফি অব মিডিভ্যাল অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল আর্ট' নামক গ্রন্থটিতে তিনি বলেছেন—

If we mean to go far we must begin by asking what was the meaning of life for those, whose works of art we are proposing to 'understand' and 'appreciate'. We can not go far to-day. I shall be content if you realize that the way is a long one. And I ought perhaps to warn you that if you ever really enter into this other world, you may not wish to return; you may never again be contented with what you have been accustomed to think as 'progress' and 'civilization'. If in fact you should ever come to this, if will be the final proof that you have 'understood' appreciated medieval and Oriental Art'.

এ-কালের সমালোচকের দৃষ্টিতে কুমারস্বামী নিন্দিত হয়েছেন দৃষ্টিভঙ্গীর সীমিত গণ্ডীর জন্য। তাছাড়া তাঁর মানসিক প্রবণতা প্রাচীনত্বের প্রতিই প্রবল-তর। আনন্দকুমার স্বামীর মধ্যে একাধারে বহুবিধ শক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। বহুবিধ গুণসমন্বয়ে তাঁর রূপদক্ষের দৃষ্টি গড়ে উঠেছিল। অপরে যেখানে লক্ষ্যবস্তুকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচারে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, আনন্দকুমার স্বামী সেই ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে এক অখণ্ড বিচারে অনন্যসাধারণ কুশলতা প্রদর্শন করেছেন।

ভারতীয় ভাবনার এক বিশিষ্ট অধিকারী ছিলেন কুমারস্বামী। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বে-সরকারী প্রচারক হিসাবে আনন্দকুমার স্বামী যে-কাজ করেছেন, তা তুলনাবিহীন। রবীন্দ্র-নাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এই দুই প্রাচ্যাভিমানী মনীষীর সঙ্গে যোগাযোগ কুমারস্বামীর জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। জাতীয়তা-বাদ সম্পর্কে কুমারস্বামীর যা বক্তব্য, তা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে বেশী দূরে নয়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ যে পরোক্ষভাবে দেশের অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর, মানসিক-তার বিকাশে অন্তরায় বার বার এ-কথা দৃঢ় গলায় বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কুমারস্বামীও তাঁর 'দি ড্যান্স অব শিব' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে যে সহজ-ভঙ্গীতে কয়েকটি কথা বলেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে :

"Nationlism does not suffice for the great idealists of young India. Patriotism is but a local interest —Great Souls have greater destinies to fulfil. Life not merely the life of India, demands our great devotion. The happiness of the human race is of more import to us than any party triumph. The chosen people of the future can be no nation, no race, but an aristrocracy of the whole world, in whom the vigour of European action will be united to the serenity of Asiatic thought".

এই চিন্তাধারার মধ্যে যে প্রগতিশীল-তার পরিচয় পাওয়া যায়, তা বর্তমান কালেও দুর্লভ।

আনন্দকুমার স্বামী বোস্টনের ফাইন আর্টস ম্যুজিয়মের সংরক্ষক ছিলেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শিল্পের ক্ষেত্রে আনন্দকুমার স্বামীর দান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

পরলোকে আই সি চাক্কো ॥

কেরলবাসীদের কাছে আই সি চাক্কো একটি পরিচিত নাম। তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়েছিল একজন ভূতত্ত্ববিদ্ হিসেবে, তৎকালীন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তিনি প্রধান ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে প্রায় ২০ বৎসর কাজ করেন। কিন্তু তাঁর পরিচয়ের ক্ষেত্র অন্যত্র। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অপরিসীম পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। মালয়ালম ভাষায় রচিত "পাণিনীয়প্রদ্যোতম" নামক ব্যাকরণ গ্রন্থটি তাঁর অসাধারণ সাহিত্যকীর্তি। কেরলের সমাজজীবনের উপরও তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ৯১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেছেন।

ব্যাস জয়ন্তী ॥

ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্যোগে গত ২রা জুলাই "ব্যাস জয়ন্তী" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কুলপতি মুন্সী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অভেদানন্দজী। কুলপতি মুন্সী তাঁর ভাষণে এই মহাঋষি এবং স্রষ্টার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গত একালের তরুণেরা রামায়ণ বা মহাভারতের মত সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সভায় আচার্য টি, এ, ভি দীক্ষিত ও আচার্য ভাইশঙ্কর পুরোহিতও ভাষণ প্রদান করেন।

ঐ একই দিনে কোচিনের "সংস্কৃত ব্যাস পরিষদ" কর্তৃকও ব্যাস জয়ন্তী পালিত হয়। এতে হাতীরাম রতনজী, শর্মা শাস্ত্রী, কে, পুরুষোত্তম পাই, কিশোর-কুমার চুনীলাল, কে, অনন্ত ভাট প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন এবং কবির রচনা থেকে বিভিন্ন অংশ পাঠ করে শোনান।

নিসিম ইজাকিয়েলের কবিতা ॥

নিসিম ইজাকিয়েলের নাম আজ সমস্ত ভারতের সাহিত্যরসিকদের কাছেই পরিচিত। যে সমস্ত তরুণ ভারতীয় কবি ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র ডোম মোরেসকে বাদ দিলে তাঁর খ্যাতিই সর্বাধিক। সম্প্রতি বোম্বের পরিচয় ট্রাস্টের উদ্যোগে যে "পোয়েট্রি ইণ্ডিয়া" বলে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তাঁর সম্পাদক। উক্ত পত্রিকায় বাঙালি কবিদের কবিতা এবং বাংলা কাব্য আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন বাঙালি কবি এবং সমালোচকদের সঙ্গে তিনি এর মধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় খুব সীমিত।

এ পর্যন্ত তাঁর পাঁচটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লণ্ডন থেকে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছে, 'এ টাইম টু চেঞ্জ', বোম্বে থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে, "সিক্সটি পোয়েমস" এবং ১৯৫৯ সালে "দি থার্ড"; কলকাতা থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়েছে "দি আনফিনিশড ম্যান" এবং ১৯৬৫ সালে "দি এক্সাক্ট নেম"।

তাঁর কবিতার বাক্-প্রতিমা খুবই উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ের জটিলতর অনুভূতিগুলি তাঁর কবিতায় বাণীলাভ করেছে। লিণ্ডা হেস তাঁর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন, তা এখানে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> "He is a poet at the city Bombay; a poet of the body; and an endless explorer of the labyrinths of the mind, the devious delvings and twistings of the ego, and the ceaseless attempt of man and poet to define himself, to find through all 'the myth and maze' a way to honesty and love."

তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় এই বিষয়টি তেমন পরিণতি লাভ করতে পারেনি। যতই তিনি রচনা করে চলেছেন, ততই তাঁর কবিতায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণতা অর্জন করছে। ইজাকিয়েলের কবিতায় তাঁর কর্মভূমি বোম্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দুটি কবিতাগ্রন্থ অবশ্য বিদেশে রচিত। তৃতীয় গ্রন্থটি ভারতে রচিত হলেও, তখনও পর্যন্ত তাঁর কবিতায় বোম্বের প্রাণসম্পদ ধ্বনিত হয়নি। কিন্তু "দি আনফিনিশড ম্যান" এবং "দি এক্সাক্ট নেম" কাব্যগ্রন্থে বোম্বে শহর এক উল্লেখ্য ভূমিকায় উদ্ভাসিত। তাঁর "মর্নিং ওয়াক" কবিতায় তিনি সকালবেলায় বোম্বে শহর সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তা তাঁর সমগ্র কবিতাগুলির মধ্যেও অভিনন্দিত সংযোজন।

স্বল্পপরিসরে তাঁর কবিতার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ইংরেজি-ভাষী ভারতীয় তরুণতর কবিদের মধ্যে তিনি যে স্বতন্ত্র অভিধায় চিহ্নিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অ্যানি বেশান্তের গ্রন্থ ॥

ভারতের শিক্ষা এবং জাতীয় আন্দোলনে অ্যানি বেশান্তের নাম চিরস্মরণীয়। সম্প্রতি মাদ্রাজের 'থিওসফিক্যাল পাবলিশিং হাউস' থেকে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "সেভেন গ্রেট রিলিজিয়ন"। ১৮৯৬-৯৭ সালে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, গ্রন্থটি তারই নির্বাচিত সংকলন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত এতে প্রকাশিত। সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও এই বক্তৃতামালার প্রয়োজনীয়তা এখনও সমান। বিশেষ করে যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অপরিসীম মূল্যবান বলে স্বীকৃত হবে।

বিদেশী সাহিত্য

॥ আধুনিক জার্মান সাহিত্যের সংকলন ॥

সম্প্রতি হামবুর্গ শহর থেকে আধুনিক জার্মান গদ্যসাহিত্যের দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বই দুটি হচ্ছে হান্স সংকলিত ও ক্রিস্টিয়ান ভেগনার প্রকাশিত ডুকশাকেন—যুগেগ ডায়েশ্চে আন্টোরেন (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৭), এবং পেটের য়োকোস্তা সংকলিত ও হফমান উন্ট কাম্পে প্রকাশিত টুশফুলেণ্ড—নেভে ডয়েশে প্রোসা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৬)। ডুকশাকেন-এ সাতাশজন লেখকের তেত্রিশটি রচনা স্থান পেয়েছে। বলা-বাহুল্য, এই গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। এখানের সব লেখকই ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। এক হিসেবে বলা যায়, গত তিরিশ বছরের আধুনিক জার্মান সাহিত্যের রূপ এতে ধরা পড়েছে। শুধু বিষয়বস্তুর বিভিন্নতায় নয়, রচনারীতির স্বাতন্ত্র্যেও গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। পেটের য়োকোস্তা সংকলনটি একটু আলাদা জাতের। এখানে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সবাই প্রতিষ্ঠিত লেখক। প্রথম গ্রন্থের মতো অনামী বা তরুণতর সাহিত্যিকের স্থান দ্বিতীয় বইটিতে মিলবে না। হাইনরিশ বোল, রলফ হোকুথ মার্রি লুইজ কাশিনৎস এবং জিগফ্রিড লেনৎস প্রভৃতির রচনা এখানে প্রকাশিত।

॥ লা মিজ আ মর : ফরাসী উপন্যাস ॥

'সবচেয়ে বড়ো কথা, আমার উপন্যাস হল ভাষার তরবারি খেলা।' এই ধরনের উক্তি মেনে নিয়ে যদি আরাগ'র সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'লা মিজ আ মর' আলোচনা করতে কেউ বলেন, তাহলে নিঃসন্দেহেই বলা চলে এখানে প্লট খোঁজা কিংবা আদি-মধ্য-অন্তের যোগসূত্র অনুসন্ধান করা বৃথা। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রথমদিকে লেখক তাঁর নিজের কাহিনীই বেশ কিছুটা বর্ণনা করে শেষকালে ইচ্ছাকৃতভাবে কৌশল অবলম্বন করলেন এবং পাঠকদের বার-বার বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হলেন।

গ্রন্থটির বিষয়ে একবাক্যে বলা চলে—'পাঠক টাকা-পয়সা দিলেন এবং তাঁর রুচি যাচাই করলেন' ধরনের। লেখক নিজেকে

জিজ্ঞাসা করেছেন, এটা কি তাহলে সম্পূর্ণ ঈর্ষাপ্রসূত, না সংগীতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা, কিংবা সাহিত্যে বাস্তবতা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা? গ্রন্থটি সত্যিই বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং রহস্যময়।

॥ ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে সোভিয়েত গ্রন্থ ॥

শিল্পবিদ আনতোনিয়া করোতস্কাইয়া সম্প্রতি 'ভারতীয় শিল্পমঞ্জুষা' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এই গ্রন্থে লেখক প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন এবং বিভিন্ন যুগে ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে দক্ষিণ ভারতের গুহা-চিত্র থেকে প্রাচীন প্রস্তর ও নতুন প্রস্তর যুগের শিল্প-নিদর্শনের বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন, স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রাণময়তা, খুঁটিয়ে দেখবার ক্ষমতা—ইত্যাদি গুণগুলি এই যুগের চিত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভারতে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেন এবং এখানকার ভাস্কর্য ও শিল্প নিদর্শনগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করার পর লেখক এ যুগের শুরু থেকে কিভাবে ভাস্কর্য ও শিল্পের বিকাশ ঘটল তার এক আকর্ষণীয় বর্ণনা উপস্থিত করেছেন। যে পুরাকাহিনী ও ধর্মীয় উপদেশ অবলম্বন করে মধ্যযুগের গোড়ায় দিকে অপূর্ব মন্দিরভাস্কর্য ও মন্দিরচিত্র সৃষ্টি হয় তারও বর্ণনা গ্রন্থে করা হয়েছে। অজন্তার অসাধারণ রত্ন-সম্ভার, মোগল যুগের 'ক্ষুদ্রচিত্রে' বিকাশ—এ সম্পর্কে লেখক বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি মোগল যুগের এই ক্ষুদ্র-চিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন, স্থানীয় 'ঘরানা'র প্রভাবে এই চিত্রগুলিতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এসেছিল যাতে পারস্য, তুরস্ক বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির ক্ষুদ্রচিত্র থেকে এ চিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের 'আধুনিক যুগের চিত্র' প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পবিদ হাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে যে শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বৎসরে যে ভারতীয় শিল্পীরা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে অমৃত সেরগিল ও যামিনী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ভারতের প্রায় ছ হাজার বছরের শিল্প-ইতিহাস বিশ্লেষণ করে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিল্প-ঐতিহ্যের এক অনন্যসাধারণ ধারাবাহিকতা ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য। কি বিষয়নির্বাচনে, কি প্রকাশভঙ্গিতে—প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ভারতীয় শিল্পে পরিস্ফুট।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় শিল্পই বিশেষভাবে মানুষের সমগ্র জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতীয় শিল্প মানুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই শিল্প মানুষের জীবনে, কর্মে নিত্যসহচর।

পরলোকে মিস অ্যালিংহাম ॥

প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক মিস মার্জারি অ্যালিংহাম গত ৩০ জুন ক্যান্সার রোগে দীর্ঘদিন ভুগে ইংলন্ডের কোল-চেস্টারে পরলোকগমন করেন। রহস্য উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দি ক্রাইম অ্যাট ব্ল্যাক ডাডলি' 'ডেথ অব এ ঘোস্ট' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

নতুন বই

নন্দিকেশ্বর বিরচিত অভিনয় দর্পণ

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী দুই শতকের মধ্যে নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণ' রচিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে অভিনয়কলা ছিল সংস্কৃতির অঙ্গ। শিক্ষাধারা এই বিদ্যায় জ্ঞানার্জনের সঙ্গে গভীর সম্পৃক্ত ছিল। অভিনয়কলার চিন্তাধারা ছিল যাবতীয় শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গ। এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতে গবেষণার অন্ত ছিল না। শিল্প-ভাবনার এক অসামান্য ও অনন্যসাধারণ চর্চা তখন ছিল সমগ্র ভারতের বুকে পরিব্যাপ্ত। শ্রীনন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ পাঠ করলে তা সহজেই বোঝা যায়। অভিনয় যে একটি সহজসাধ্য বিষয় নয়, তা যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের শিল্প একথা আজকের মত প্রাচীন ভারতেও স্বীকৃতি পেয়েছিল বলেই এই ধরনের গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর ছিল।

অভিনয়দর্পণে নন্দিকেশ্বর আঙ্গিক অভিনয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আঙ্গিক অভিনয় হল নৃত্যের উপযোগী। অভিনয়-দর্পণের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গেছে এপর্যন্ত তার অধিকাংশই তেলেগু ভাষায় রচিত। এর থেকে অনুমান করা সহজ যে শ্রীনন্দিকেশ্বর ছিল দক্ষিণ ভারতের অধি-বাসী। তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে তাঁর এই অসামান্য গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল বলে গবেষকরা অনুমান করে থাকেন। কিন্তু যে শতাব্দীতেই রচিত হোক না কেন তার বহু পূর্বে যে ভারতে অভিনয়কলার বিকাশ ঘটেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। কারণ আজো বর্তমান শিল্পের মূর্তি। তারপর এসেছে তত্ত্ব বহুদিনের সাধনার পর। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন: "জীবনের হাজার হাজার বছর পরে এসেছে জীবনদর্শন, পদার্থের হাজার হাজার বছর পরে এসেছে পদার্থবিদ্যা। তেমনি নাট্যশাস্ত্রের অনেক আগেই জন্মেছে নাটক, অভিনয়-শাস্ত্রের অনেক আগে থেকেই চলে এসেছে অভিনয়।" সুতরাং নাট্যশাস্ত্র বা অভিনয়-দর্পণ রচনার বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বেই ভারতবর্ষে অভিনয়ের জন্ম হয়েছে।

বাংলা ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে। ভূমিকায় তিনি বলে-ছিলেন: "আলোচ্য অভিনয়দর্পণ গ্রন্থ-খানিতে নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রচলিত অঙ্গাভিনয়-পদ্ধতির কিয়দংশমাত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।" তারপর বহুদিন কেটে গেছে এতদিন পর্যন্ত আর কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্যবিনোদ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণ-তীর্থ অনূদিত অভিনয়দর্পণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সটীক সংস্করণ অতি-সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই শ্রমসাধ্য কাজটা সম্পাদন করেছেন। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সুবোধ্য ভাষান্তরে শ্রীভট্টাচার্যের কৃতিত্বের পরিচয় অপরিসীম তিনি বহু ক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত করে নতুন মত ও তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাবে। অভিনয়ের ৬৯টি মুদ্রাচিত্র মুদ্রিত হওয়ায় অভিনয়শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন। বাঙলা ভাষায় সুদীর্ঘকালের একটি অভাব পূরণ করে শ্রীভট্টাচার্য বাঙলাভাষী প্রতিটি মানুষের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

গ্রন্থখানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও নাট্য বিভাগের অধ্যক্ষ ও কলা বিভাগের ডীন ডঃ শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য লিখিত ভূমিকা। প্রাচ্য ও পাশ্চত্য নাট্য সাহিত্যে ডঃ ভট্টাচার্যের মনীষা সুবিদিত। তাঁর লিখিত এই সুদীর্ঘ ভূমিকাটিতে অভিনয়দর্পণ এবং প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা চর্চা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাবে। অভিনয় প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে নাট্য-বিদ্যা চর্চা, অভিনয় দর্পণের পুঁথি ও অনুবাদ, অভিনয়দর্পণ রচয়িতা ও রচনা-কাল, অভিনয়দর্পণের মূল্য—এই কয়টি পর্যায়ে তাঁর আলোচনা বিভক্ত। বিশেষ করে অভিনয়দর্পণের মুখ্য পর্যায়টি সবথেকে মূল্যবান।

গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদপটে আছে নৃত্যের আদিগুরু শিবের একটি মূর্তি (নটরাজ)।

অভিনয় দর্পণ—শ্রীনন্দিকেশ্বর বিরচিত।
অনুবাদ : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। ভূমিকা : ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। সংস্কৃত বুক ডিপো। ২৮ বিধান সরণী। কলকাতা—৬। মূল্য দশ টাকা।

প্রতিবর্গীকরণের একটি মূল্যবান গ্রন্থ

ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী বাংলা ভাষায় আরবী, ফারসী ও উর্দু অক্ষরের কোন নির্দিষ্ট প্রতিবর্গীকরণের পদ্ধতি ছিল না। এই কারণে আরবী, ফারসী বা উর্দু ভাষা শুদ্ধভাবে বাংলায় লিখতে বা পড়তে অসুবিধা হত। সম্প্রতি সৈয়দ আনিমুল আলম এই বিষয়ে সহজ ভাবের একটি প্রতিবর্গীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত বাংলা হরফের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে সেই নিয়মাবলীই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানে প্রতিবর্গীকরণ খুবই জটিল ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—"In transliteration, SL (source language) graphical limits are replaced by TL (target language); [Catford] মোটামুটিভাবে এর তিনটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সব সময় প্রতিবর্গীকরণের কাজ সম্ভব হয় না। যেমন সংস্কৃতকে রোমানে প্রতিবর্গীকরণ করতে হলে অনেক নতুন চিহ্ন সংযোজন করতে হয়। আরবী, ফারসী বা উর্দুর বাংলায় প্রতিবর্গীকরণও খুব জটিল ব্যাপার এবং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এর জন্য, "বাঙ্গালায় অনেকগুলি বর্ণ নূতন উচ্চারণে পাঠ করিতে হইবে।" যেমন বাংলায় তিনটি শ, ষ, স; দুটি জ, য; একটি ত; একটি হ; একটি গ আছে। অথচ আরবী, ফরাসী বর্ণমালায় এইরূপে অনেক বর্ণ রয়েছে। সেইসব বর্ণের উচ্চারণ বাংলায় প্রচলিত বর্ণের সাহায্যে করা খুবই কঠিন। কিন্তু আনিমুল সাহেব এই বিষয়ে সত্যই দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি এর জন্য বাংলায় কোন নতুন বর্ণ প্রবর্তন করেন নি। কেবল কমা, ড্যাশ এবং ডট-এর সাহায্যে এই কাজ সম্পন্ন করেছেন। অবশ্য অনেকাংশে তিনি রোমান প্রতিবর্গীকরণের নীতিই অনুসরণ করেছেন, তবু যেখানে যেখানে এই পদ্ধতিকে প্রতিবর্গীকরণে অসুবিধা হয়েছে, সেখানেই বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজস্ব মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

লেখক দীর্ঘদিন পরিশ্রমের পর এই পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। যখন ভাষাবিজ্ঞানের উপর গবেষণা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, তখন ভাষাবিজ্ঞানের উপর এমন একটি পরিশ্রমসাধ্য কাজ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

প্রতিবর্গীকরণে নূতন পদ্ধতি ঃ (আলোচনা) সৈয়দ আনিমুল আলম॥ ১, মার্কুইস লেন, কলিকাতা—১৬ থেকে প্রকাশিত। দাম ঃ ০-৬২ পয়সা॥

একটি উল্লেখ্য কবিতাগ্রন্থ

সমকালীন বাংলা কাব্যজগতে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একটি পরিচিত নাম। বোধহয়, এই গ্রন্থটি তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থ। প্রথম কবিতাগ্রন্থের প্রায় এক দশক পরে প্রকাশিত এই দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থটি বিভিন্ন কারণেই কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি দু' অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয়াংশের রচনাকাল ১৯৫৪—১৯৫৯। প্রথমাংশের কবিতাগুলি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের বলে কবি জানিয়েছেন। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার প্রস্থানভূমি মূলতঃ প্রেম, প্রকৃতি এবং নিঃসঙ্গতায় সমাহিত। অনেক সময়েই মনে হয়, তিনি যেন রূপ-সম্ভোগের কবি। এই কাব্যানুভূতি কিন্তু প্রধানতঃ প্রতীকী উচ্চারণেই তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছে। এই কারণেই তাঁর কবিতাকে সাম্প্রতিক কাব্য আন্দোলনে স্বতন্ত্র অভিধায় চিহ্নিত করে আমার মনে হয়েছে। বর্তমান সময়ের নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা তাঁর কণ্ঠকে কোথাও কোথাও ক্লান্ত করে তুলেছে।

ছোট ছোট চিত্রকল্প রচনাতেও কবি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এইসব চিত্রকল্প রচনায় তাঁর মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কাব্যআন্দোলনে "সদর স্ট্রীটের বারান্দা" একটি মূল্যবান সংযোজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্যামল দত্তরায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ সুন্দর।

সদর স্ট্রীটের বারান্দা ঃ (কাব্যগ্রন্থ) প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ৩২।২ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা—২৮। দাম ঃ আড়াই টাকা।

॥ মধ্যবিত্তের সংসার ॥

অচ্যুত গোস্বামী একজন চিন্তাশীল লেখক। গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি সম্প্রতি বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন তাঁর 'অভিষেক' নামক উপন্যাসে। অচ্যুত গোস্বামী জানেন যে, সমাজ-জীবনের ওপর রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির ফলে একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে, বাঁধাধরা ছকে সমাজের পক্ষে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। অচ্যুত গোস্বামী অসামান্য লিপিকুশলতায় সমাজের প্রকৃত রোগ-নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সামাজিক মর্যাদা-লাভের স্পৃহা, অর্থলিপ্সা ইত্যাদি প্রবণতা এ-দিনের মানুষের মনে প্রবল, তাই এ-যুগের যন্ত্রণাও বিচিত্র। বাস্তবানুগ চরিত্র ঊর্মিলা ও লতিকা পাঠকের অন্তর স্পর্শ করবে।

অভিষেক—(উপন্যাস)—অচ্যুত গোস্বামী। প্রকাশক ঃ বাক-সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো। কলিকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

॥ পল্লীবৈচিত্র্য ॥

দীনেন্দ্রকুমার রায় গোয়েন্দা উপন্যাসের অনুবাদক হিসাবেই খ্যাত হয়ে আছেন কিন্তু পল্লীবাংলার যে-ছবি তিনি তাঁর পল্লীগ্রামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন তা এ-দিনের পাঠক বিস্মৃত হয়েছে। দীনেন্দ্রকুমারের সেই রচনার স্বাদ পাওয়া গেল শক্তিপদ রাজগুরুর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'বাসাংসি জীর্ণানি'তে। শক্তিপদ রাজগুরু এ-যুগের একজন শক্তিমান ঔপন্যাসিক। তিনি শহরের কাহিনী অনেক লিখেছেন, কিন্তু পল্লীগ্রামের কাহিনী তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার এক বিশিষ্ট পরিচয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রামবাংলার পরিবর্তন ঘটেছে, অতীত আজ বিস্মৃত, বর্তমানের কল-কারখানার জড়দানবের আবির্ভাবে পল্লীগ্রামের সেই স্নিগ্ধ মধুর শান্ত পরিবেশ আজ আর নেই। শান্ত গ্রামগুলি রাতারাতি রূপান্তরিত হয়েছে শহরতলীতে। সেই নতুন জগতের ছবি এঁকেছেন শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর নতুন উপন্যাসে। শক্তিপদ রাজগুরু এক বিশেষ ধরনের চরিত্রসৃষ্টিতে পারদর্শী, এই সব মানুষ এমনই স্পষ্ট এবং জীবন্ত যে মনে হয় তাদের সামনে রেখে লেখক তাদের রেখাচিত্র এঁকেছেন। ভুবন, কদমবৌ, প্রীতি, জীবন প্রভৃতি চরিত্রগুলি সুপরিচিত ভঙ্গীতে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। গতানুগতিকতামুক্ত এই উপন্যাসটি জনসমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই।

বাসাংসি জীর্ণানি (উপন্যাস)—শক্তিপদ রাজগুরু। প্রকাশক ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য চোদ্দ টাকা মাত্র।

করুণ মধুর গল্প সংগ্রহ

'বোর্ডিং ইস্কুল' বইটিতে আমরা পাই একটি বিদ্যার্থী বালকের কাহিনী। রূপনকী নদীর তীরে তার স্কুল ছিল। তার থাকবার জায়গা ছিল বোর্ডিং-এর এক কোণের ঘরে যার পশ্চিমদিকের জানলাটা খুললেই সে দেখতে পেয়েছিল 'রূপকী নদীর কাঁচের মত জল ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তুলে

চতে নাচতে ছুটে চলেছে।' ঐ নদীর লেই তার প্রথম বন্ধু কমলকে সে হারিয়ে-স। তারপর তার বন্ধুত্ব হয়েছিল র্ডিং-এর অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে। সের ছেলে নারাণদাকে যেন কিছুতেই ভালা যায় না। বাগানের মালী ও তার ছেলের সংখনের সঙ্গেও তার মধুর সম্পর্ক ড়ে উঠেছিল। ফুল কুড়োতে গিয়ে সীতা-জতী ফুলের মতই মিষ্টি মেয়ে গাঙ্গীর ঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল আবার তার রের খবরে তার বালকমন খেলার থীর অভাবে ব্যথায় ভরে উঠেছিল।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বইটির তিটি গল্প সুন্দর, মধুর এবং করুণও টে। এই অপরূপ গল্পগুলি একদা কিশোর নকে আনন্দ দিয়েছিল এখন নবরূপে ধুনিক কিশোরদেরও সমভাবে আনন্দ দবে বলে আশা করি।

বোর্ডিং ইস্কুল : (গল্প) মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক : ডি মেহরা, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

ভারতে জাতীয়বাদ বনাম সাম্যবাদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টার-ন্যাশনাল রিলেশান্স-এর রীডার জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম ভার্সাস ইণ্টারন্যাশনাল কম্যুনিজম' গ্রন্থে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে কম্যুনিজমের ভাব সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিজম কখনও উৎসাহ সঞ্চার করেনি, বিরোধিতাই করে এসেছে, যুক্তিসহ তিনি তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। নবজাগ্রত ভারতীয় চিন্তাধারা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ার ফলে এই বিশেষ আন্তর্জাতিক মতবাদ এ দেশে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন ভারতে জাতীয়তাবাদ এবং কমিউনিস্ট মতবাদ সহাবস্থান না করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। গান্ধীজী এবং তাঁর অহিংস আন্দোলন ভারতীয় ভাবনার সার্থক সংগ্রামের পথ, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের তার মধ্যে কোন স্থান নেই। বরং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ভারতীয় কমিউনিস্টরা কোন কোন সময় বিরোধিতাই করেছে। কমিউনিজম যেখানে একমন্ত্রে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছে, ভারত সেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে সাম্যবাদী আন্দোলনে রূপায়িত না করবার নিখেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থকার নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ব্যক্তি। গ্রন্থখানি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা হলেও লেখকের যুক্তি ও তথ্য-নির্ভরতাও যথেষ্ট বলিষ্ঠ। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেমন গভীর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারণাও তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

Indian Nationalism versus International Communism, by J. Bandyopadhyaya, published by firma K. L. Mukhopadhyay, 6/A Banchharam Akrur Lane Calcutta-12, Price Rs. 25/-

দুটি কাব্যগ্রন্থ

বিজয়কুমার দত্ত কবি হিসেবে এরই মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পরিচিত হয়ে উঠেছেন। 'মুখশ্রী উন্মোচনে' তাঁর প্রথম কাবিতাগ্রন্থ। মোট ৫৩টি কবিতা এতে আছে। প্রেম, বিষাদ ও নৈরাশ্য নিয়েই কবিতাগুলির পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। অত্যন্ত সাবলীল ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা করেছেন কবি। ছন্দ বিষয়েও তিনি যত্নবান। কবি এখনও কাব্য রচনায় তরুণ বলে পরবর্তীকালে আমরা তাঁর কাছে আরো গভীরতা আশা করবো। অজয় গুপ্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদ সুন্দর।

তুলনায় বঙ্কিম গুহ কাব্য-পাঠকের কাছে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। বিক্ষত সংলাপ তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ। প্রতিটি কবিতার সঙ্গেই রয়েছে নারীর সংযোগ—যে নারীর জন্য তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত। পরি-মিতির অভাব থাকলেও কবিতাগুলির মধ্যে সততার পরিচয় বর্তমান। যোগেন চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদ চিত্রের পরিকল্পনা অভিনব।

মুখশ্রী উন্মোচনে (কাব্যগ্রন্থ)—বিজয়কুমার দত্ত। মঙ্গল প্রকাশনী : ৩৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : দু টাকা।

বিক্ষত সংলাপ (কাব্যগ্রন্থ)—বঙ্কিম গুহ। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী ; ৪-এ, আফতাব মস্ক লেন, কলিকাতা—২৭। দাম : দু টাকা।

রামকৃষ্ণ জীবন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীবন অবলম্বনে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর লীলাকাহিনী আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথায় এবং নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে কণ্টকিত হয়ে পড়েছে। শ্রীকরালী-কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও উমা দেবী রচিত 'নরলীলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি ব্যতিক্রম বিশেষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম থেকে তিরোধান পর্যন্ত নরলীলার ঘটনাবহুল জীবনবৃত্তান্ত ভক্তমনের আবেগমথিত করে রচিত।

নরলীলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ (জীবনী) শ্রীকরালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও উমা দেবী। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

মাসিক সাহিত্যপত্র **'চতুষ্কোণ'-এর** আষাঢ় সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন মনোরঞ্জন রায় (বৈদিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা), শিবদাস চৌধুরী (রোডেশিয়া), রবি সামন্ত (বাংলা দেশ : মেঘনাদবধ কাব্য), সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রবাসে বাংলা সাহিত্যপত্র ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'প্রাচীন হিন্দুদের প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান'। অনুবাদ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত। জগদীশ চক্রবর্তীর উপন্যাস; মৃণাল চৌধুরী ও মিহির পালের গল্প; নবেন্দু চক্রবর্তী, শিশির সামন্ত, মৃণাল করগুপ্ত, শেখ আবদুল জব্বার, কৃষ্ণগোপাল মল্লিক, প্রদীপকুমার চৌধুরীর কয়েকটি কবিতা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া আছে আরো কয়েকটি আলোচনা। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির দাম এক টাকা।

●

একমাত্র গল্পের ত্রৈমাসিক **'শুকসারী'** বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই ধরণের পত্রিকা বাঙলা ভাষায় খুব কমই প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বর্ষ বর্ষা সংখ্যাটিতে আছে কয়েকটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ। ইতালী, আফ্রিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার গল্প, মার্কিন নিগ্রো গল্প, চীনা ও জার্মান গল্প আছে বর্তমান সংখ্যায়। ছটি গল্পের দুটি অনুবাদ করেছেন শ্রীরণেন নাগ এবং শ্রীচন্দ্রকান্ত চৌধুরী। বাকি চারটি গল্পেরই অনুবাদক শ্রীউৎপল মুখোপাধ্যায়। টমাস মানের গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীবার্ণিক রায় এবং জার্মান ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন সাংবাদিক। সংখ্যাটি সুসম্পাদনার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। ১৭২।৩৫, লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম এক টাকা। পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীমিহির আচার্য।

●

শ্রীসত্যেন সাহা সম্পাদিত **'সংলাপে'র** জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় আছে মেরিও ফ্রাট্টি, শ্রীনীহার গুণ্ডী, গিরিশংকর, শ্রীসোমেন নন্দীর নাটক এবং শ্রীবার্ণিক রায়, শ্রীরঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাসবিহারী সরকারের আলোচনা। মেরিও ফ্রাট্টির নাটক অনুবাদ করেছেন শ্রীচন্দ্রশে[খর] মুখোপাধ্যায়। ১৬২, বিপিনবিহা[রী] গাঙ্গুলী স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত পত্রিকা[টির] দাম এক টাকা।

●

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকার 'শ্রাব[ণ]-আশ্বিন' সংখ্যায় লিখেছেন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীসুধাকা[ন্ত] রায়চৌধুরী, ডঃ শীতাংশু মৈত্র, ড[ঃ] অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীসমর ভৌমিক, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার এবং আরো কয়েক জন। এর মধ্যে শ্রীসরকারের বেঙ্গল কন্ট্রিবিউশন টু ইংলিশ পোয়েট্রিক্যাল লিটারেচা[র] এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'চিত্র শিল্পে বাংলা ঘরাণা' আলোচনা দু[টি] মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এব[ং] সুখরঞ্জন রায়ের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এডওয়ার্ড হ্যান্সলিকের 'সংগীতে সুন্দর' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে অনুবাদ করছেন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ সম্পাদিত এবং ৬।৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির দাম এক টাকা।

প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে চিত্র-প্রদর্শনী

১৮ থেকে ৩১শে আগস্ট অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে সেখানকার স্টুডিওর শিশু-সভ্যদের একটি সুন্দর চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীটি খুব সুনির্বাচিত এবং সুসজ্জিত হয়েছিল।

১৭ থেকে ২৩শে আগস্ট আর্জেন্টাইন মহিলা শিল্পী সুসান ডি মুরোর একক প্রদর্শনী অ্যাকাডেমির মধ্যের হলে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী সুসানা ডি মুরো ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ভারতে ভিত্তিচিত্র অংকনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্যে এদেশে এসেছেন এবং দিল্লীর শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এখানে তিনি চারটি মুরালও এঁকেছেন। এছাড়া আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে তাঁর অনেকগুলি প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। বর্তমান প্রদর্শনীতে সাতাশখানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিগুলি টেম্পারা এবং তৈল মাধ্যমে আঁকা। বিদেশী শিল্পীর চোখে ভারতবর্ষের রূপ কেমনভাবে ধরা পড়ে, তার নিদর্শন হিসেবে শ্রীমতী ডি মুরোর ছবিগুলি দর্শকের কৌতূহলের খোরাক হতে পারে। ছবিগুলির মাপ বেশী বড় নয়। ছবি হিসেবে তিনি কাঠের ব্যবহার করেছেন। কাঠের গ্রেনগুলি অনেক সময় নক্শার থেকে ফুটে বেরিয়ে একটা প্যাটার্ন তৈরী করেছে। শ্রীমতী ডি মুরোর ছবিগুলি ভিত্তিচিত্রধর্মী—ফ্ল্যাট এবং স্টাইলাইজড। কয়েকটি মৌল রঙের প্যাটার্নের মধ্যে কালো রেখা দিয়ে ফিগারগুলি সুস্পষ্ট করে একটি নক্শা তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটি ছবিই এই একই ধাঁচের রঙের মধ্যে লাল, সবুজ, হলদে, নীল, গেরুয়া প্রভৃতি রঙের ব্যবহারই বেশী। ভারতের লোকশিল্পের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যে বাধাহীন উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার দেখা যায়, তার কিছুটা আমেজ এই ছবিগুলির মধ্যে মেলে। ছবিগুলির ফিনিশও এক ধরনের। ফলে কিছুটা সিল্কস্ক্রীনে ছাপা ফ্ল্যাট, ডেকরেটিভ ভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে যে-সব দৃশ্য শিল্পীকে আকৃষ্ট করেছে, তার থেকেই তিনি ছবির বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন। এর মধ্যে 'অ্যাওয়েটিং' (২), 'ওয়ার্কিং ডে' (৪), 'মেডিটেশন' (১২), 'ওয়াশার উইমেন' (১৩), 'দি হাট' (১৫), 'সানসেট' (১৯), 'বিকানীর উইমেন' (২৭) প্রভৃতি কতকগুলি ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২২শে আগস্ট অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে জাপানী শিল্পের ওপর তিনটি সুন্দর ছোট ছোট তথ্যচিত্র দেখানো হয়ে গেল; 'লিভিং আর্টস অব জাপানে' জাপানের বিভিন্ন রকমের কারুশিল্পের নির্মাণরীতি দেখানো হয়। জাপানের মত শিল্পসচেতন দেশে চারু ও কারুশিল্পের কৃত্রিম বিচ্ছেদ বোধহয় করা সম্ভব নয়। সামান্য একটি ল্যাকারের বাক্স করতেও শিল্পী সৃজন-শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকেন। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত দক্ষতা পুরুষানুক্রমে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছে, তা জাপানী শিল্পীদের কাজ করা দেখলে কিছুটা বোঝা যায়। এক-বর্ণের প্রিন্ট তোলার জন্যে কাঠের ওপর ছবি আঁকা, খোদাই ও তার ছাপ নেওয়ার দৃশ্যগুলি দেখবার মত। জাপানী বাগান তৈরীর পেছনেও কত চিন্তা ও পরিকল্পনা থাকে, তারও কিছু আভাস পাওয়া গেল। 'দি বিউটি অব জাপানীজ সেরামিকস' ছবিতে প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জাপানের মৃৎশিল্পের একটি সুন্দর ধারাবাহিক ছবি দেখান হয়। জাপানের মৃৎশিল্প কোরিয়া ও চীনের কাছে কতখানি অনুপ্রেরণা লাভ করেছে, তারও কিছু হদিশ মেলে। এই নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলিকে যান্ত্রিক প্রথায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের জন্যে যেসব সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে, তাও কিছু কিছু জানা যায়। সবশেষে দেখানো হয় জাপানী কাগজ ভাঁজ করার শিল্প 'ওরিগামি'। ইস্কুলের শিশু থেকে বড়রা পর্যন্ত রঙীন কাগজ ভাঁজ করে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করার এই সুন্দর শিল্পটি শিখে থাকেন। এঁদের কুশলতা দেখলে মনে হয় বোধহয় এমন কোন জিনিস নেই যা এঁরা কাগজ ভাঁজ করে তৈরী করতে পারেন না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের করা কতকগুলি জন্তু-জানোয়ারের মূর্তিশোভিত নিসর্গ দৃশ্য অপূর্ব হয়েছিল।

সবে বেরোতে যাচ্ছি, মা পিছন থেকে ডাকলেন। দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, বলো।

মা বললেন, কাল রাত্তে কমল এসেছিলো। তোর খোঁজ করছিলো। তোর সংগে ওর খুব দরকার।

কিছু বলে গেছে? আমি জিগেস করলাম।

না, সেরকম কিছু তো বলে গেল না। তবে, তোর সংগে এক্ষুনি দেখা করা দরকার বলছিলো। মা চুপ করলেন।

আচ্ছা দেখা করবো। বলতে বলতে আমি বেরিয়ে গেলাম।

রবিবারের সকাল। ভেবেছিলাম চায়ের দোকানে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ঢেকে বিষয়-সমস্যা আলোচনা করে কয়েকঘন্টা সময় সমস্তটাকে একটু হাল্কা করে নেব। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি আর একঘেয়েমিকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার এর চেয়ে সহজ উপায় আমার অন্ততঃ জানা নেই। তাছাড়া চায়ের দোকানের আড্ডায় নিজেকে অকস্মাৎ কেমন ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ মনে হয়। একবারের জন্যও মনে হয় না বয়স তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছে, কালো চুলের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ শাদা চুল আবিষ্কৃত হচ্ছে। মনে হয় বয়সের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে বেশ কয়েকটা ধাপ পিছিয়ে গিয়েছি।

কিন্তু কি জানি মা যেন সমস্ত গোলমাল করে দিলেন। কমলের এক্ষুনি কেন আমার সংগে দেখা করা দরকার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকলো না।

কমলের সংগে আমার প্রায় মাস তিনেক দেখা নেই। সেই যে সেবার আড্ডা মেরে সমস্ত রাত্তিরকে শাদা করে দিয়ে চলে গেল তারপর ট্রামে-বাসেও তার আমি মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কমলের ধরণ-ধারণই এইরকম। ভুঁইফোঁড় গাছের মতো হঠাৎ গজাবে, সারাদিন, সারারাত আমার মনের আকাশে সন্ধ্যাতারার মতো জ্বলজ্বল করবে, তারপর রোদ ওঠার সংগে সংগে আকস্মিকভাবে কোথায় মিলিয়ে যাবে যে তাকালেও দেখা যাবে না। কমলকে তো আমি আজ থেকে দেখছি না। সেই ছেলেবেলার স্কুল-জীবন থেকে। যে-জীবনের স্মৃতি শ্লেটের দাগ মোছার মতো মন থেকে মুছে ফেলা যায় না, কমল আমার সেই-জীবনের বন্ধু।

আমি নিজেও খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখতে পেলাম নিজের অজান্তেই চায়ের দোকানের আড্ডার আসরের উল্টো-পথে আমি কসবায় এসে পড়েছি। বুঝলাম, কমল আমাকে ভিতর থেকে আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু সে-আকর্ষণ থেকে দূরে সরে আসার ক্ষমতা আমার নেই।

কড়া নাড়তে কমল কিন্তু দরজা খুলে দিলো না। যে দরজা খুলে আমার চোখের সামনে দাঁড়ালো তাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। একমুহূর্ত। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে জিগেস করলাম, কি ব্যাপার? তুমি কবে এলে? চেরা ধানের মতো দুটি

চোখ তুলে সরমা আমার দিকে তাকালো। কোন কথা বললো না। এমন কি দরজা ছেড়েও দাঁড়ালো না, যাতে আমি ভিতরে ঢুকতে পারি।

বাধ্য হয়েই আমাকে মুখ ফুটে বলতে হলো, দরজাটা ছাড়ো, না হলে ঢুকি কি করে।

সরমা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালো।

কমলের বাড়ি। আমার অবাধ অধিকার। আমি সোজা কমলের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথাটায় কেমন যেন জোট পাকিয়ে গেল। সরমাকে এই বেশে এখানে দেখতে পাবো ভাবিনি কোনোদিন। যতোদূর মনে পড়ছে বছর তিনেক আগে সরমাকে দেখেছি। আর আগের বছরই সরমার বিয়ে হয়েছিল। সরমা কমলের আদরের বোন। কমলের এমনকিছু রোজগার না থাকলেও সরমার বিয়েতে সে অনেক খরচ করেছিলো। আমি জানি সেই ঋণের বোঝা কমলের ঘাড় থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে নামেনি। এখনও মাসে-মাসে কমল তার জের টেনে যাচ্ছে।

বছর তিনেক আগে সরমা এসেছিল। আর সেদিন ভোরবেলায় হামলা করে কমল আমাকে সত্যি বলতে কি জোর করেই ধরে এনেছিলো। সরমার প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতার কথা কমল জানতো। বিয়ের আগে এ-নিয়ে সরমাকে নাকি সে জিগ্যেসও করেছিলো।

সরমা নাকি সেদিন শুধু অবাকই হয়নি, চমকেও উঠেছিলো, তোমার মাথা খারাপ?

কেন?

সতুদাকে আমি দাদার মতো শ্রদ্ধা করি। সতুদা ভাবলে কি বিশ্রী হবে।

সতুদা তো অন্যকিছুও ভাবতে পারে। কমল বলেছিলো।

আমি বিশ্বাস করি না। সতুদাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। এরকমের ভাবনা তার মনের মাঝে আসতেই পারে না।

ঠিকই বলেছিস। আমি তোকে শুধু একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। বলে কমল প্রসঙ্গ ঘুরিয়েছিলো। আর সরমা সেদিন নাকি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

আমার বিছানায় আমার পাশে আধ-শোওয়া হয়ে কমলই আমাকে এই গল্প করেছে। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুধু ভেবেছি, ঈশ্বর যদি শ্রদ্ধার পর্দাটা আমার সামনে থেকে একবার খুলে ফেলতেন!

তারপর যথারীতি আমাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে নিজের পছন্দমতো সরমা বিয়ে করেছে। একবছর পর দেখে তাকে সেদিন মনে হয়েছে, জীবনকে দুই করতলে রেখে সে যেন খেলা করছে। তার চোখে-মুখে, সারা শরীরে নেচে-নেচে যেন স্বপ্ন খেলা করছে। হাস্নাহানার তীব্র গন্ধের মতো তার শরীর থেকে সবসময় যেন একটা মাধুর্যের সাড়া বেরিয়ে আসে।

সেদিন সরমার দিকে তাকিয়ে আমি মনে-মনে কিরকম তৃপ্তিবোধ করেছিলাম। সরমার পরিপূর্ণতায় আমার নিজের কেমন ভালো লাগছিলো। চলায়ফেরায়, কথায়-বার্তায় সরমার জীবনের ছন্দ আমারও মনের মাঝে কেমন আন্দোলন আনছিলো। ঠিক বোঝানোর নয়, বোঝার। ঠিক বলার নয়, অনুভবের।

সরমার স্বামীকে আমি দেখিনি। শুনেছিলাম খুব পুরুষালী চেহারা, সদা হাস্যময়। সরমার জীবনের বিকাশের পথে সেই ভদ্রলোকের কৃতিত্বই সবটুকু বুঝে দূরে থেকে তাকে আমি শ্রদ্ধাই করতাম।

সরমা সেদিন আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলো, তোমার ঐ গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বেড়ালে তোমার কপালে কিছুই জুটবে না সতুদা। একটু ভালো করে হাসো। মেয়েরা হাসি পছন্দ করে।

আমি সরমার দিকে বিস্মিতচোখে তাকিয়েছিলাম। কোনো জবাব দিতে পারিনি। সরমার কথাগুলোর মধ্যে একটা গভীর সত্য লুকিয়ে আছে বলে আমার সেদিন মনে হয়েছিলো।

সরমা সেবার দিন তিনেক ছিলো। আমি সেদিন ফিরে এসে আর যাইনি। কমলও আমাকে আর বিরক্ত করেনি। কমল আমাকে ভালবাসে, আমাকে বোঝে। কমল বুঝেছিলো, আমি চট্ করে সহজ হয়ে উঠতে পারবো না।

সরমাকে সত্যিই আমি ভুলতে পারিনি। আজও না। কমলও বোধহয় টের পেয়েছে, আর পেয়েছে বলেই কোনো প্রসঙ্গেই সে সরমার কথা আমার কাছে তুলতে চায় না। মাঝেমধ্যে বড়জোর সরমার খবরাখবর দেয়। কমল জানে সরমার শুভসংবাদ আমাকে তৃপ্তি দেয়। সেই তৃপ্তি দেওয়াটুকু বন্ধু হিসাবে তার পবিত্র কর্তব্য বলে সে মনে করে।

কিন্তু আজ? আজ কমল আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে? তৃপ্তিবোধের মূল্য শোধ করতে কি আজ আমি এখানে এসেছি। সরমার স্পন্দনহীন নীরব ছন্দ অনুভবের কঠিন দায়িত্ব পালন করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুকনো রজনীগন্ধার মতো সরমার এ-রূপ আমি সহ্য করতে পারছি না। কমলের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আমার বারবার মনে হতে লাগলো, আমি যেন আস্তে-আস্তে কোথায়, কোন গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি। অস্তিত্বহীনতার অনুভূতি আমাকে প্রতি-মুহূর্তে আঘাত করতে লাগলো। আমার চিৎকার করতে বলতে ইচ্ছে করলো, সরমা, তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও। না, না, তোমার বর্তমান রূপ আমি দেখিনি। আমি অতীত নিয়ে বাঁচতে চাই। তুমি, তোমার অতীতের মাঝে ফিরে যাও সরমা।

কমল এসে আমাকে বাঁচালো। চেয়ারটা আমার কাছে টেনে এনে বসলো, কতক্ষণ এসেছিস?

আমি কমলের দিকে তাকালাম। কমলেরও যেন অনেকটা বয়স বেড়ে বলে মনে হলো। আয়নায় আমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করলো। মনে আমারও নিশ্চয় বয়স বেড়ে গেছে। ব মতোই।

কমল একটা সিগারেট ধরালো। এ আনমনে কয়েকটা টান দিয়ে আবার দিকে তাকালো।

আমি উঠে বসলাম।

কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস বললো, কি করা যায়?

কতোদিন? আমি সংক্ষেপে করলাম।

মাসখানেক।

খবর দিসনি কেন?

হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গে তোকে খবর দেওয়ার সময় পাইনি।

কিভাবে মারা গেলেন? আমি প্রশ্নে এসে পড়লাম।

জিপ্ য়্যাকসিডেন্ট। স্পটেই ইন্টারন্যাল হেমারেজ। বলে মনের উত্তে চাপবার জন্যে বারবার সিগারেটের ঝাড়তে লাগল কমল।

সরমার মনের অবস্থা কিরকম? জেনেও আমি জিগ্যেস করলাম।

বুঝতেই পারছিস্। ওর দিকে ত তাকাতে পারছি না।

আমি চুপ করে থাকলাম। কমল কমলের চেয়ে কোন অংশে কম খারাপ আ মনের অবস্থা নয়।

কমল তার ঠাসা চুলের মাঝে হাত দি বললো, সবচেয়ে সমস্যা দাঁড়িয়েছে জানিস। একটা পয়সাও রেখে যায় এমনকি একটা লাইফ-ইনসিওরেন্স করে

কি করে বুঝবে বল। আমি সান দিলাম।

তা অবশ্য ঠিক।

তাছাড়া তুই তো আছিস।

সেকথাও ঠিক। কিন্তু সরমাকে বোঝানে যাচ্ছে না। আসার আগে থাকতেই শু করেছে, আমাকে একটা কাজের মধ্যে ঢুকি দাও দাদা।

আর কিছুদিন যাক্। এখুনি কি?

আমি তো তাই বলছি। কিন্তু ও বোঝানো কঠিন। নাছোড়বান্দা। তুই এক বলে দেখ্না।

আমি বুঝলাম অসম্ভব। কমল পারেনি, আমার পক্ষে তা কোনমতেই সম্ভ নয়। তাছাড়া আমার যা মনের অবস্থা তা আমি সবকিছু বোধহয় ঠিকমতো গুছিয়ে বলতেও পারবো না।

হঠাৎ আমার মাথায় উপায় এসে গেল বললাম, মাকে বলেছিস্।

না। কমল জবাব দিলো।

কেন?

কি [illegible] আমি [illegible]

সতে পারিনি। কেমন যেন একটা বিশ্রী
ান্না ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিলো।

কমলের মা নেই। আমার মাকেই কমল
জের মায়ের মতো শ্রদ্ধা করেন বুঝলাম
জ কথা সহজ করে কমলের পক্ষে বলা
ম্ভব নয়।

শেষকালে সেদিন বাড়ি ফিরে মাকে সব-
ছু বললাম। সব শুনে মা কিছুক্ষণ
থরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে
কলেন। এবং শুধু বললেন, আমি সকালে
বো।

পরদিন মা গেলেন। এবং সরমাকে
মাদের বাড়িতেই নিয়ে এলেন। পাশের
র বসে আমি আর কমল চাপা কান্না
নলাম আর পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি
লাম।

আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকলো
মা। এবং মাই শেষপর্যন্ত সব ব্যবস্থা
রলেন। আমি আর কমল দুজনে গিয়ে
মাকে রেখে এলাম। নারী উন্নতি সংঘে।
বং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই কয়েকদিন
মার সঙ্গে একবারের জন্যও কোন কথা
লনি সরমা। একবারের জন্যও তার চেরা-
দের মতো চোখ তুলে আমার দিকে
কায়নি। কিন্তু নারী উন্নতি সংঘ থেকে
রবার আগে সরমা কথা বললো, মাঝে-
ঝে খবর নিয়ো সতুদা।

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না।
মল আমার দিকে তাকালো। তারপর
চাপ নিঃশব্দে দুজনে বেরিয়ে এলাম। এবং
সেই মুহূর্তে পৃথিবীকে মনে হলো, বড়ো
বেশি বিষাদময়। বাতাসকে মনে হলো,
বড়ো বেশি ভারি। আকাশের দিকে তাকিয়ে
মনে হলো, আকাশ বড়ো বেশি ছোট, বড়ো
বেশি নীরব। ফিরবার আগে সরমার চোখের
গভীরে আমি যেন সেই বিষাদের ছবি
দেখেছিলাম। আমার অনুভূতির পাগলা
ঘোড়াটাকে হঠাৎ যেন লাগাম ধরে বশ
মানিয়ে দিয়েছিল সরমা।

এক বছর কেটে গেছে। সময় ধীরে
ধীরে সরমার মনের বিষণ্ণতাকে মুছে
ফেলেছে। সাবলম্বী চেতনা সরমাকে শক্তি
দিয়েছে। অস্তিত্বের সংগ্রামে আস্তে আস্তে
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সরমা। সরমা হাতের
কাজ শিখেছে। টেলারিং-এর কাজে সমানে
বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে সে।
নারী উন্নতি সংঘের সম্পাদিকা মাকে ডেকে
বলেছেন, সরমা এতো তাড়াতাড়ি এতো
ভালো কাজ শিখেছে যে আমাকে পর্যন্ত
অবাক করে দিয়েছে।

মা এসে আমার কাছে গল্প করেছেন।
আমি ঠিক আগের মতোই তৃপ্তিবোধ
করেছি। সরমা যেন নতুন মূর্তি ধরে
আমার চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

কমলও যেন আবার বয়স ফিরে
পেয়েছে। আগের মতোই হঠাৎ উপস্থিত
হয়ে রাত শাদা করে ফিরে যায়। অতীত-
টাকে খুব তাড়াতাড়ি যেন আমরা সবাই
ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি।

আরও কিছুদিন পরের ঘটনা। সরমা
নিজে টেলারিং শুরু করেছে। কমল আর
আমি অনেক কষ্টে টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছি,
মেসিন কিনেছি। কমলের সংগে সংগে সরমার
জন্য আমিও যেন মেতে উঠেছি। সরমার
সার্থকতার মধ্য দিয়ে আমি যেন জীবনে
সার্থকতা লাভ করতে চলেছি।

সরমা আরও দু'জন দর্জি রেখেছে।
নিজের হাতে কাটে। নিজে কাজের তদারকী
করে। আমি গেলে ভালো করে কথা বলার
সময় হয় না। বলে, একটু বসো সতুদা,
এবারই ফ্রি হয়ে যাবো।

কিন্তু ফ্রি সত্যিই সরমা হতে পারে না।
আমার দূরে থেকেই দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে
ইচ্ছে করে সরমার কর্মব্যস্ত জীবনের ছন্দ।
এক নতুন জীবন-ছন্দে স্পন্দিত সরমা।

'না, আগে প্রমিস করো'

তারপর একদিন সরমার কাছে গেলে
সরমা বললো, বসো সতুদা, তোমার সংগে
দরকার আছে। সেদিন দোকানে খুব ভিড়
ছিলো না। আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে
বসলাম। হঠাৎ সরমা ভিতর থেকে একটা
খাম এনে আমার হাতে দিলো, প্রমিজ করো,
এটা খুলবে না এখন। বাড়ি গিয়ে খুলবে।

কি আছে বলো। আমি সরমার দিকে
তাকালাম।

না, আগে প্রমিস করো। ছেলেবেলার
সেই বিনুনিদোলানো মেয়ের মতো সরমা
আব্দার ধরলো।

আচ্ছা, প্রমিস! আমি অগত্যা বললাম।
কিন্তু ভিতরে-ভিতরে কেমন একটা চাঞ্চল্য,
কেমন উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম।
আমার বারবার মনে হতে লাগলো সরমা
বোধহয় প্রেমে পড়েছে কারো, নতুন করে
জীবন আরম্ভ করতে চায়। সেই কথাই সে
জানাতে চেয়েছে চিঠির ভেতর।

চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরে
সোজা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে
খাম ছিঁড়ে ফেললাম। খাম খুলে আমি
অবাক—ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। খামের
ভিতরে পাঁচশো টাকার নোট, আর একটুকরো
চিঠি : সতুদা, তোমার ঋণ আমার জীবনে
শোধ করবার নয়। তোমাকে আমি দাদার
মতোনই শ্রদ্ধা করি। তুমি গোপনে দাদাকে
অনেক টাকা আমার জন্যে দিয়েছ আমি
জানি। এ-ঠিক ঋণ শোধের স্পর্ধা নয়।
ছোটবোনের প্রণামী ব'লে ধরে নিয়ো।

চুপচাপ চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে
থাকলাম আমি। সরমার মুখখানা বারবার
আমার চোখের সামনে জেগে উঠতে লাগলো।
সরমাকে সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো,
আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অন্য জগতের,
অন্য জগতের মানুষ—আমি যেন তাকে ঠিক
চিনতে পারছিলাম না।

আনন্দে আর গৌরবে হঠাৎ দু-চোখ
আমার ঝাপসা হ'য়ে গেল।

—সত্যকাম

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হাস্যকৌতুক রসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাত-কুমারের রচনার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

(৩)

একটু বে-লাইন হয়ে গেলে এই ধাঁর সমালোচনার নমুনা, তাঁকেও "বলবান জামাতা" সম্বন্ধে বলতে হয়েছে—"বলবান জামাতা" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি অতি সুন্দর। আখ্যানবস্তু মনোহর এবং হাস্যরসের কিরণে সমুজ্জ্বল। বহুদিন আমরা এমন মনোহর গল্প পড়ি নাই।" দুর্মুখ ঐ লেখনী-মুখে এই সাধুবাদের মূল্য কতখানি নিশ্চয় কাউকে হিসাব করে বোঝাতে হবে না। ও'র লেখার এই দিকটা কোথাও হাসির ঊর্মি-উচ্ছ্বাস, কোথাও শান্ত বীচিভঙ্গ মাত্র—আধুনিক সব সমালোচকদের দ্বারাই স্বীকৃত এবং সমাদৃত হয়েছে। তবে, তাঁরা সকলেই সর্ব রসের সমন্বয়ে যে প্রভাতকুমার তাঁকেই পাঠকের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন—কোথায় তাঁর ত্রুটি, কোথায় উৎকর্ষ, কোথায় তিনি জীবনের একেবারে গভীরে প্রবেশ করতে গিয়ে অসমর্থ হয়েছেন, কোথায় সহজ সুরে সহজ কথা বলায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিশেষ বিশেষ গল্প-উপন্যাসের নাম ধরে তাদের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সবাই যে সর্বক্ষেত্রে এক-মত হবেন, আমারও যে কোন কোন ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকবে না এটা সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়; তবে সমালোচনার যে এইটেই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি এটা তো স্বীকার করতেই হবে। আমি শুধু এতে আমার যে একটা সুবিধা হয়েছে তার কথাই বলব। তাঁদের এই ব্যাপক এবং সর্বাত্মক সমা-লোচনার একটা সুবিধা এই হয়েছে যে, স্থানাভাবেই হোক বা যে জন্যেই হোক, তাঁরা হাসির দিকটায় ঝোঁক বেশি না দেওয়ায় আমি বেশ খানিকটা ফাঁক পেয়ে গেছি। এইজন্যেই সমালোচনার অন্য সব দিক নিয়ে মতামতের রাশি না বাড়িয়ে আমি কিছু কিছু রচনা ধরেই প্রধানত হাস্যরসের দিকটা নিয়ে, নিজে যেটুকু বুঝেছি দেখিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই বেশি সিদ্ধকাম বলে, উপন্যাসের দিকটা শেষ করেই পরে গল্পের ক্ষেত্রে নামব। বলা বাহুল্য মাত্র কয়েকটি টাইপ হিসাবে বেছে নিয়ে। সবগুলির প্রয়োজনও নেই, এই নিবন্ধের পরিধির মধ্যে সংকুলানও হওয়ার নয়।

প্রথমেই "জীবনের মূল্য" উপন্যাসটি ধরা যায়। এটি প্রভাতকুমারের তৃতীয় উপন্যাস। প্রথম 'রমাসুন্দরী' ১৯০৮ সালে 'ভারতী'তে বেরুবার পর নয় বৎসর পরে এটি ১৯১৭ সালে 'মানসী'তে প্রকাশিত হয়। সুতরাং তখন উপন্যাস রচনায় তাঁর হাত অনেকটা পেকেছে বলে টাইপ হিসাবে ধরে নিতে পারা যায়।

এর মূল বক্তব্যটি করুণ। গ্রন্থকার ভূমিকায় জানিয়ে দেন এর মূল ঘটনাটি সত্য। শেষের দিকে, সময়ের ব্যবধানে সব-কথা মনে না থাকায়, তাঁরই ভাষায় "সত্য-মিথ্যা একাকার, মেঘ আর গিরির মতন হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে অনেকখানি নিজের কল্পনাও অঙ্গীভূত করতে হয়েছে। সমালোচকের দৃষ্টিতে ভালোই হয়েছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

গ্রামের কুশীদজীবী সম্পন্ন গৃহস্থ বিপত্নীক গিরিশ মুখোপাধ্যায় এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর প্রথম স্ত্রী যেন বলছেন তিনি পনের বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গ্রামের জগদীশ বাঁড়ুজ্জ্যের মেয়ে প্রভাবতী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এখন সে বিবাহযোগ্যা, সুতরাং তিনি যেন তাকে বিবাহ করেন। স্বামীর মায়া কাটাতে না পারার জন্যই স্ত্রীর এই পুনর্জন্ম গ্রহণ। সকালে উঠেই গিরিশ গ্রামের পুরোহিত ভট্টাচার্যমশায়ের কাছে এসে স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলে তাঁকে ঘটকালি করতে অনুরোধ করলেন।

গিরিশের দুবার সংসার পাতা হয়ে গেছে। বয়স পঁয়তাল্লিশ, মাথায় টাক। দুই পরিবারে চারটি সন্তান। প্রথমা হতে দুটি ছেলে, এখন বড় হয়েছে। দ্বিতীয়ার দুটি ছোট মেয়ে।

এমন অবস্থায় কোন বাপমাই মেয়ে দিতে চাইবে না, প্রভাবতীর এঁরাও প্রথমটা চাইলেনই না। কিন্তু জগদীশ বাঁড়ুজ্জ্যে খাতক, বাড়িখানি পর্যন্ত গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাঁধা, শেষ পর্যন্ত না রাজি হয়ে উপায় রইল না।

আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়ে গেল।

বিবাহ কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ জগদীশের ছেলে হরিপদ কলকাতায় মেসে থেকে প্রাইভেট টুইশানি ক পড়ছে। সে ফিরে এসে জানতে কলকাতায় গিয়ে তার মেসের ও বন্ধু রাজকুমারকে বিবাহের জন্য রাজকুমার নিজে ছেলে হিসাবে তবে অত্যন্ত গরীব। তা ভিন্ন মা-বা নেই, সংসারে একাই। বাড়িঘরও কুড়ি টাকার একটি চাকরি সম্বল ক'রে থেকেই কালাতিপাত করে। এমন অনিচ্ছাই ছিল রাজকুমারের, তবে অনুরোধ, একদিন বাড়িতে গিয়ে এসেছে তার বোনকে, আকৃষ্টই হয়েছে পর্যন্ত রাজি হোল। ঠিক হোল বন্ধুতে টুইশন ক'রে একসঙ্গে বি-এ ক'রে ওকালতি করবে, ইত্যাদি ইত্যা গিরিশের ভয়ে সমস্ত ব্যবস্থা গোপনে করে বিবাহেরও দিন স্থির হয়ে তারপর বিবাহ শুরু হয়েছে, গিরিশ জানতে পেরে অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে ছিঁড়ে অভিসম্পাত দিল—পিতার তঞ্চ জন্যে প্রভাবতী এক বৎসরের মধ্যে হয়ে যাবে।

অভিসম্পাতটি ফলেও গেল করার পর বিহারের চন্দ্রগড়ে এক জমিদা বাড়ি একটা মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে চল মতো চাকরি পেয়ে রাজকুমার স্ত্রী শাশুড়িকে সঙ্গে করে সেখানে চলে গে

এরপর এক বৎসরের মধ্যে সম পরিবারটি মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে নিঃশে প্রায় হয়ে গিয়ে বাকি রইল শু হতভাগিনী প্রভাবতী আর তার এক শিশুপুত্র। গিরিশ বাড়িখানি ক্রোক কার নিলামী ইস্তাহার ঝুলিয়ে দিল একদি জগদীশ বাঁড়ুজ্জ্যে চাকরির সন্ধানে বেরি এক জমিদারের অতিথিশালায় রাত্রে অ নিয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে বিঘোরে মা গেলেন। ওদিকে একদিন কলেরায় আক্রা হয়ে হঠাৎ রাজকুমার গেল মারা। হরিপ কলকাতা থেকে এসে ঐ চাকরি নিয়ে মা বোনের ভরণপোষণ করছিল, বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মা এবং ছেলে উভয়েই মার যেতে শিশুপুত্র নিয়ে প্রভাবতী অকূলে পড়ল।

এরপর অনেকগুলি দ্রুত ঘটনা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষে প্রভাবতী কলকাতায় যদুবাবু নামে এক সদয় এবং অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি তাদের রাঁধুনি-গিরির কাজ নিয়ে একটা আশ্রয় পেল। সং পরিবার। গৃহকর্তা, গৃহিণী, সবারই সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে এই নিদারুণ দৈব-বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রভাবতী খানিকটা শান্তি পেল।

বছর ছয় অতিবাহিত হয়ে গেল। এর মধ্যে এদিকে গিরিশের জীবনেও একটা পরিবর্তন এসে গেছে। ধীরে ধীরে সমস্ত সংবাদই তার কানে গেছে এবং তারই লালসার অতৃপ্তি-সঞ্জাত ক্রোধই প্রভাবতীর

কথা—সমস্ত পরিবারটির এই বিপর্যয়ের কারণ এই বিশ্বাসে তার অনুতাপের অন্ত নেই। বাড়িটি দখল করে নিলেও অনুতাপের জন্য সে আর ওদিক মাড়াল না। জীর্ণ হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে বাড়িটা, অনুতাপের যন্ত্রণায় ও ঠিক করল বাড়িটা ভালো করে মেরামত করে দানপত্রের সঙ্গে হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে ও প্রভাবতী আর তার ছেলেকে গ্রামে আবার পুনর্বসতি করবে। প্রস্তুত হয়ে তাদের খোঁজ করতে লাগল এবং কিছুকাল পরে পেয়েও গেল সন্ধান। এরপর একদিন যদুবাবুর বাড়ি গিয়ে অনুতপ্তচিত্তে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বাসনা প্রকাশ করল। যদুবাবু প্রভাবতীর কাহিনীটা সবই জানতেন, এই ব্যক্তিই তার এ দুর্দশার মূলে জেনে প্রথমটা বিরক্তই হলেন, তারপর গিরিশের মুখে প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ দেখে করুণাপরবশ হয়ে তাকে ওপরের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রভাবতীকে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রভাবতী চিনতে পারল না প্রথমটা। গিরিশ কম্পিতহস্তে বালাপোশের ভেতর থেকে একটি কাগজের পুলিন্দা বের ক'রে তার হাতে দিতে খুলে তার মধ্যে নোটের তাড়া দেখে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল—আপনি কে? এ টাকা আমায় দিচ্ছেন কেন?"

পরিচয় পেয়ে ঘৃণাভরে দৃপ্তকণ্ঠে তার স্বামীর জীবনের এই মূল্য প্রত্যাখ্যান করল প্রভাবতী। তারপর পূর্বাপর সব মনে পড়ে গিয়ে প্রায় চৈতন্য হারাবার মতো হয়ে কোনরকমে দেওয়াল ধরে ধরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কাহিনীটি খুবই করুণ। গোড়ার দিকটায় গিরিশের পাষণ্ডতার পরিণাম এবং শেষের দিকে তার অনুতাপ—দুদিক দিয়েই করুণ। যদিও শেষের দিকের এই অনুতাপ-দীপনা এমনভাবে ফোটেনি যাতে পাঠকের মনে ক্ষমার ভাবটা আসতে পারে। কিন্তু সে-বিশ্লেষণের দিকে আমি যাচ্ছি না। আমি শুধু এই বলব—প্রভাবতীকে কেন্দ্র ক'রে এক বছরের মধ্যে তার শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-ভাই,—এই এক মৃত্যুর মিছিল চালিয়ে কাহিনীটিকে লেখক যতটা সম্ভব বিষাদময় করবার চেষ্টা করেছেন। আর্টের দিক দিয়ে এটাও ঠিক হয়েছে কি হয়নি সে বিচারেও প্রবৃত্ত হব না আমি; আমার বলবার উদ্দেশ্য, এই কারুণ্যের টানা-পোড়েনের গায়ে সূক্ষ্মতার সঙ্গে মাঝে মাঝে হাস্য-কৌতুকের এমন এক একটা ক'রে রেশমী ডোর টেনে গেছেন যে করুণ কোনখানেই একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে, করুণ রসটা যদি কোন কোনখানে না তেমন ফুটে থাকে তো এই হাস্যরসের Relief এর জন্যেও নয়। অর্থাৎ, এ দিকটা কান্নার দিকটাকে আঘাত দিয়ে ব্যাহত করে নি, সেটাকে বরাবর সহনীয় করে গেছে মাত্র।

এর জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে মাঝে মাঝে humour situation দিয়ে হাসি এনে ফেলা ছাড়া দু'টি চরিত্র টেনে নিয়ে গেছেন লেখক; এক সতীশ, আগাগোড়াই একরকম; দ্বিতীয় পুরোহিত ভট্টাচার্যমশাই।

ভট্টাচার্যমশাইয়ের সাক্ষাৎ গোড়াতেই পাই আমরা, গিরিশের স্বপ্নকাহিনী বলার উপলক্ষ্যে। বেশ চতুর লোক, শুনেই তিনি বাড়ির ভেতর চলে গিয়ে একটু পরে বেশ গম্ভীরভাবেই একখানি মোটা বই হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে বইখানি ওলটাতে ওলটাতে এক স্থানে থেমে গিয়ে জানালেন—ব্যাপার খুব গুরুতর, এ-বিবাহ যদি তিনি দেওয়াতে পারেন তো—কমলা যদি সদয় হয়ে বর্তমানের চেয়ে দশগুণ, বিশগুণ, পঞ্চাশগুণ সমৃদ্ধি দেন তো ভট্টাচার্য-মশাইকে ভুলবেন না বলে কথা দিতে হবে গিরিশকে। খুবই একটা উৎকটরকমের পরিস্থিতি হয়ে পড়ে—গিরিশ রাজি হলে জানালেন বইখানি শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, এতে বলছে—

দিব্যা স্ত্রী যং প্রবদাত্তি মম
স্বামী ভবান ভব।
স্বপ্নে দৃষ্টা চ জাগর্তি স চ রাজা
ভবেদ্ধ্রুবম।

গিরিশ বইখানি হাতে নিয়ে আগ্রহভাবে বারতিনেক পড়বার চেষ্টা ক'রে শ্লোকটার অর্থটা কি জিজ্ঞাসা করতে ভট্টাচার্যমশাই সজোরে নস্য নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন—'দিবু বলতে স্বর্গ বোঝায়। তার উত্তর ষ্ণিয় প্রত্যয় ক'রে হল দিব্য, স্ত্রীলিঙ্গে দিব্যা। দিব্যা স্ত্রী—কিনা স্বর্গে গেছে এমন যে স্ত্রী, যং প্রবদাত্তি যাকে বলে—মম স্বামী ভবান ভব—তুমি আমার স্বামী হও, অর্থাৎ কিনা আমায় বিয়ে কর—এইরকম স্বপ্নে দৃষ্টা, কিনা স্বপ্ন দেখে, জাগর্তি—জেগে ওঠে, তাহলে ধ্রুবং কিনা নিশ্চিতং স রাজা ভবেৎ —সে রাজা হবে। ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সুখস্বপ্ন দর্শনাধ্যায়।

কিছু সংস্কৃত গিরিশের জানা আছে। বইখানি হাতে করে শ্লোকটি আবার পড়লেন, একটু ভেবে বললেন—"হ্যাঁ ভট্‌চায দাদা, দিব্যা স্ত্রী মানে দেব-কন্যা নয় তো?"

হেসে উঠলেন ভট্টাচার্যমশাই। বললেন—"স্ত্রী মানে কন্যা! কোথাকার টোলে পড়েছ হে? পাপাত্মা!"

—দিব্যা স্ত্রীর অর্থ দেব-কন্যা হলেই তো অনর্থ, সব আশা ধূলিসাৎ হয় ভট্টাচার্য মশাইয়ের। বেশ ভালোভাবেই সামলে নিলেন—যার ওপর আর কথা চলে না। মূর্খ বা স্বল্পপঠিতের ওপর চতুর পণ্ডিতের সেই চিরন্তন চাতুরালির কথা। সেই চলতি গল্পময় কথাটা মনে পড়ে যায়—

রামধন গিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে গুরুঠাকুরকে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা ঠাকুর-মশায়, একই গাঙ্, অথচ শুনি না কি আমাদের এপারে চান করলে বৈকুণ্ঠ-লাভ আর ওপারে চান করলেই গাধা-জন্ম—এ কেমনটা বুঝিনি তো?"

হয়তো ঐরকম সজোরে নস্য নিয়েই গুরুঠাকুর বললেন—"এই দ্যাখো, এত বুদ্ধিমান হয়েও আমাদের রামধনের বোকার মতন কথা! আরে এটা যে এপার আর ওটা যে ওপার, এ সাদা কথাটা বুঝলে না?

আহ্লাদে গদগদ হয়ে গুরুঠাকুরের জন্যে যা পুজো এনেছিল, পুঁটলি খুলে বের করে দিল রামধন।

ভট্টাচার্যমশাইও বাজিমাৎ করলেন।

কথাটা হচ্ছে, না মানলেই যখন 'বোকা' বা 'পাপাত্মা' (অবশ্য পরিহাসচ্ছলেই বলা), তখন কে-ই বা তা চায় হ'তে যদি মেনে নিলেই ফাঁড়া কেটে যায়? তার চেয়েও যা বড় কথা—where ignorance is bliss it is folly to be wise. স্বর্গই যখন কাম্য আর একটু অজ্ঞ সাজলেই যখন তা করতলগত, তখন বুদ্ধিমান সাজার মূর্খামি কে করে?

গিরিশও গদগদ হয়েই নিল মেনে।

এরপর একবার আশীর্বাদের মজলিশে দেখি, উদ্ভটের একটা সরস শ্লোক এনে ফেলে মজলিস জমিয়েছেন ভট্টাচার্য মশাই, তারপর একরকম শেষ হয়েই গেলেন, কেননা খাজিমাৎ করলেও বিয়েটা তো হোল না। কিন্তু সতীশ দত্ত প্রায় শেষ পর্যন্ত এই প্রজেক্টীর মধ্যে কৌতুকের হাল্কা সুরটি টেনে নিয়ে গেছে।

লোকটি স্কুলের "সেকেন্ড পন্ডিত"—এবং একজন ধূর্ত মোসাহেব। কতকটা বিদূষক গোছের বলা যায়। লোকটার তাল বুঝে ঠিক প্রয়োজনমতো সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে দেওয়ার একটা বেশ ক্ষমতা আছে; বিশেষ করে "উদ্ভট" থেকে। সকলেই জানেন "উদ্ভট" গ্রন্থখানি (একাধিক আছে কিনা জানি না) সংস্কৃতে কৌতুকরসের আকর। সর্বদাই যে হাসির অঙ্গের এমনও নয়। কখনও কৌতুকের কখনও আবার অন্য-রসেরও, বিশেষ করে কোমল আদি-রসাশ্রিত। অবশ্য, 'উদ্ভট' হ'লে যে-রসেরই হোক তাতে তির্যক কিছু একটা থেকে কিছু না কিছু কৌতুকের অবতারণা করবেই।

এসব তো আছেই, তাছাড়া পাঠকের মনে সর্বকিছুর মধ্যে একটা কৌতুকের সুড়সুড়ানি লেগে থাকে অনাদিক দিয়েও যে, লোকটা গিরিশকে, চলতি কথায় যাকে বলে, আমড়াগাছি ক'রে কেমন নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে।

দু' একটা উদাহরণ দেওয়ার লোভ সংবরণ করা যায় না।

প্রৌঢ় গিরিশের সঙ্গে প্রভাবতীর বিবাহ নিয়ে ঘোট করবারও লোক আছে গ্রামে। সেই ধরণেরই এক মজলিসের রিপোর্ট দিচ্ছে সতীশ দত্ত জগদীশের কাছে—

ঘোট প্রসঙ্গে কে এক মাধব চক্রবর্তী টিপ্পনী করেছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে আবার বিয়ে করা কেন গিরিশের? এবার বনে যাওয়াই ভালো, শাস্ত্রেও বলে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেত। তার উত্তরে সতীশ সেখানে যে শ্লোকটি আওড়েছিল সেটি শোনাল গিরিশকে, বলল—"আমি বলি, আপনারা বিচার করুন মুখুজ্জেমশাই বনেই যাচ্ছেন কিনা—

> পুষ্পবাণ ভয়তো মনমৃগঃ,
> সংবিবেশ নবযৌবনে বনে।
> তত্র দৃষ্টি-বিশিখেন হনতে
> কাতরে তব কৃপা ন যায়তে।

মনে হচ্ছে,—নায়ক নায়িকাকে বলছেন, কন্দর্পবাণের ভয়ে আমার মনমৃগ তোমার নব-যৌবনরূপ বনের মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সখি, তুমি এমন নিষ্ঠুর যে, সে-বেচারিকে নয়ন-বাণের দ্বারাই বিদ্ধ করছ।

এ-ছাড়া আশীর্বাদের দিন গিরিশের বৈঠকখানায়, লেখকের ভাষাতেই "সতীশ দত্ত তো আজ কথায় কথায় উদ্ভট আওড়াইতেছে। হাস্য ও গল্প-গুজবে বৈঠকখানা ঘরটি যেন জমজম্‌ করিতেছে।"

গ্রামে একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে, পটলী অর্থাৎ প্রভাবতী নাকি কোট ক'রে বসেছে গিরিশ ছাড়া অন্য কাউকে করবেই না বিবাহ। গ্রামে যাদব ভট্টাচার্য নাকি একটু স্পষ্ট বক্তা, সে ওটাকে ঘোর কলির লক্ষণ বলে জানিয়েছে কাকে। কথাটা বৈঠকখানাতেও উঠতে সতীশ বলল, আমাকেও বলেছিল, তা আমার যা রোগ, একটা উদ্ভট শ্লোক বলে তার উত্তর দিলাম। বললাম, কাকে কার মিষ্টি লাগে তা-কি বলা যায় দাদু? জানই তো—

> দধি মধুরং মধু মধুরং
> দ্রাক্ষা মধুরা, সুধাপি মধুরৈব।
> তস্য তদেব হি মধুরং
> যস্য মনো যত্র সংলগ্নম্‌।

ব্যাখ্যাও করল ছড়াতেই—

> দধি মিষ্টি, মধু মিষ্টি
> আঙুর মিষ্টি, সুধাও মিষ্টি বটে।
> তার কাছেতে সেই মিষ্টি
> মনখানি তার বাঁধা যার নিকটে।

এরপর নিমন্ত্রণের বৈঠকে একটু ভাঁড়ামি অঙ্গের হলেও সবচেয়ে যে রসটা জমে—

> হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
> গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে,
> যজ্ঞেশ নারায়ণ সৌরভমুখেন্দ্র চিত্তম্‌
> বুভুক্ষিতং মাং জগদীশ রক্ষ।

শুধু উদ্ভটই নয়। বানিয়ে বানিয়ে মুখ-রোচক গল্প তোয়ের করেও নিজের কাজ হাসিল করবার চমৎকার একটা ক্ষমতা আছে সতীশের। গিরিশের জন্য প্রভাবতীর কোট করে থাকা ওরই চটুল রসনার রটনা। তারপর গল্প বানিয়ে বানিয়ে মেজাজ মতো গিরিশেরও মনোরঞ্জন ক'রে গেছে। কয়েক জায়গাতেই। একটার খানিকটা তুলে দিই এখানে।

ট্রেনে যেতে যেতে গল্প শুরু করেছে পটলী অর্থাৎ প্রভাবতীর গিন্নিপনা নিয়ে—

সতীশ বলছে—"হুঁ! হুঁ! ছেলে-মানুষ চেহারায় বটে! বুদ্ধিতে অনেক বুড়োমানুষের কান কেটে দেয়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রীতভাবে বললেন—"তাই নাকি?"

"ভেবেছেন কি? আর দু'দিন পরেই জানতে পারবেন। ভারি কড়া হাকিম!"

"কি রকম?"

সতীশ বেঞ্চির ওপর দুই পা গুটাইয়া চাপিয়া বসিয়া কল্পনার সাহায্যে আরম্ভ করিল—"এই কালকেরই ঘটনা মশাই, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। কাল বিকেলে পটলী আমাদের বাড়ি এসেছিল। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম আমার মাকে বলছে—'ঠাকুমা, উনি নাকি কাল কলকাতায় যাচ্ছেন?' মা বললেন—'হ্যাঁ, সতীশ বলছিল বটে, সতীশও সঙ্গে যাবে কিনা।'

পটলী বললে—'কেন ঠাকুমা, হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছেন কেন? ক'দিন সেখানে থাকবেন?' ...মা হেসে বললেন—'তা যদ্দিনই থাকুক না, বিয়ের আগে এলেই তো হোল। এ ক'টা দিন সে বাড়িতেই থাকুক বা বিদেশেই থাকুক, তোর তাতে লাভ লোকসান কি বল?' পটলী বললে—'না ঠাকুমা, তা বলছিলে, তা নয়। কলকাতায় শুনলাম নাকি বসন্ত হচ্ছে?' মা বললেন—'কি জানি ভাই, বসন্ত হচ্ছে কি কোকিল ডাকছে সে সব খবর রাখি নে।' পটলী বললে—'যাও ঠাকুমা, তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা, পাঁজিখানা কৈ?' —মা বললেন 'কেন লা? কি দেখবি পাঁজিতে? ৫ই জষ্টির আর ক'দিন আছে?'

পটলী বললে—'না, কালকের দিনটে কেমন তাই দেখব, অশ্লেষা মঘাটঘা কিনা'—মা বললেন—'যদি দিন ভালো নাই হয়, যেতে দিবি নে? এখনও তো হাতে পাসনি, কি করে মানা করবি?'

পটলী বললে—"যদি অদিন হয়, যেতে দোব বুঝি? ইস্‌, ঠাকুরপোকে দিয়ে বারণ করে দোব না?' মা বললেন—"

গিরিশ, 'ঠাকুরপোটা'কে প্রশ্ন করায় সতীশ জানাল—ঠাকুরপো এখন সে নিজে। পটলী আগে গ্রামসম্পর্কে কাকাই বলত। এখন হুকুম-হাকাম করবার জন্য ঠাকুরপোই করে নিয়েছে। বলল—"দেখুন একবার বুদ্ধি!"

এর আগে কুমারসম্ভব থেকে একটা শ্লোক আউড়ে প্রভাবতীকে প্রৌঢ় স্বামীর জন্য তপস্যায় রতা "গৌরী" করে দিয়ে ভালো করে জমি তোয়ের করে নিয়েছে।

এদিকে "গৌরী" "পাকা গিন্নি" পটলীর কথা? ...সেটা লেখকের ভাষাতেই বলি—

"ওদিকে 'গৌরী' কিন্তু 'হরের' উদ্দেশে এমন সকল প্রণয়োক্তি করিতেছিল যাহা কুমারসম্ভবে নাই, শিবপুরাণেও নাই। প্রভাবতী ওরফে পটলী তাহার প্রবীণ হস্তাকাঙ্ক্ষীর প্রতি "হুতুম হুমো", "ঘাড়ে-গর্দানে", "হতভাগা মিন্সে" প্রভৃতি কর্ণরসায়ন উপনামগুলি সর্বদা প্রয়োগ করিতে লাগিল।"

মোট কথা, সতীশ একটি মৌলিক চরিত্র। বজ্জাত তো বটেই। কিন্তু তার বজ্জাতিতে কণামাত্র ক্রোধ আসে না পাঠকের মনে। আমরা চোরকেও ঘৃণা করি বাটপাড়কেও ঘৃণা করি: কিন্তু বাটপাড় যদি আপনার বিদ্যাটা ফলিয়ে চোরের ওপর বাটপাড়ি করে তো সেটা হয় পরম উপভোগ্য। তাকে শুধু ক্ষমাই করি না, তার বেঁচে থাকা পরম অবাঞ্ছনীয় জেনেও তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করি—"জীতা-রও বেটা।"

সতীশ দত্ত এই।

বইয়ের মধ্যে আর এক উপায়ে কৌতুক-রসের অবতারণা করেছেন লেখক, ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানানন্দ স্বামীকে এনে। উপরের কাহিনীটি তাঁরই সাক্ষাৎকারে যাওয়ার জন্য ট্রেনের কামরায় বর্ণিত করেছে সতীশ দত্ত। এই জীবগুলি, এই বিরিঞ্চি-বাবার দলও লোকের কোন একটি বা একাধিক মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের রক্ত চুষে লাল হয়ে দিব্যি কাটিয়ে যাচ্ছে। এদের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। এরাও বাটপাড়ই। পরশুরামের "বিরিঞ্চিবাবা" শেষে ধরা পড়ে

[অ]নগৃহীত হয়েই পাঠকের মনে কৌতুক [স]ঞ্চার করল। জ্ঞানানন্দ স্বামীর কৃতিত্ব, সে [ভ]চোরের ওপর বাটপাড়। পাঠকের কাছে, [গি]রিশের ওপর আক্রোশেই তার সাত খুন মাপ।

হিউমার উদার, কে ভালো কে মন্দ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যে যখন মনের প্রসন্নতাটুকু এনে দিতে পারল, সেই তখন তার আত্মীয়।

এ ছাড়া, সারা বৎসর সর্দিতে-ভোগা, বন্ধনাশা মাধব চক্রবর্তীও। লোকটি স্পষ্ট-বক্তা বলে এই বিবাহে তার মন্তব্যগুলি বেশ উপভোগ্য। তাছাড়া সর্দিতে নাক বন্ধ বলে তার লকার-বহুল কথাগুলোও একধরনের হাসির উদ্রেক করে—যেমন সে যখন "দধি মধুরং—" শ্লোকটির পদ্যে অনুবাদ শুনে বলছে—"বাহবা, বাহবা, এ অলুবাদটি তুমি নিজে করেছ লাকি সতীশ?"

বা, অন্যত্র প্রণামের জায়গায় "প্রলাপ" ইত্যাদি।

অবশ্য এ নিম্নস্তরের কৌতুকরস, তা হলেও বাতাবরণটুকু হালকা ক'রে রাখতে সাহায্য করে বৈকি।

ও ছাড়া দু' এক আঁচড়ে হঠাৎ একটা কিছু এনে ফেলে হাসির ক্ষণিক একটু ঝিলিক তোলাও আছে।

রাজকুমারের অফিসের বড়বাবুর কথা ধরা যাক। রাজকুমারের নূতন বিবাহ, ছুটি চাই একটু সকাল সকাল, ট্রেন ধরতে হবে। বড়বাবু টের পেয়েছেন, তবে ছোটদের এই সব নিয়ে একটু হাসি-মস্করা করার অভ্যাস একটু যাকে বলে ল্যাজে খেলাতে চাইলেন—এত সকাল সকাল ছুটি কেন? ইত্যাদি।

অন্য একটি যুবা বলল—"কি বলছেন বড়বাবু! বেচারি এখন বাসায় যাবে, মুখে সাবান ঘষবে পনের মিনিট, চুল ফিরাবে দশ মিনিট, কাপড় ছাড়বে, তবে তো যাবে। সেই কোন মান্ধাতার আমলে আপনারা বিয়ে করেছিলেন, এসবের কি বুঝবেন বলুন?"

বড়বাবু বললেন—"কেন, মান্ধাতার আমলে...শক ছিল না? আমরাও শনিবারে শ্বশুরবাড়ি যেতাম। ...তখন যে গানই ছিল ঐ নিয়ে।

"কি গান বড়বাবু?"

বড়বাবু সহাস্যে গুণগুণ করিয়া ধরিলেন—

"কবে হবে নানা নানার সুখ-শনিবার,
বহুদিনে নানা নানা আসিবেন আবার।"

বাবুটি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নানা নানা কি বড়বাবু?"

বড়বাবু বলিলেন—"পয়ে রফলা আকার মূর্ধন্য-ণ, দন্তন্যয়ে আকার থ। সেকালে ঐ বলত কিনা, আজকালই ওটা অশ্লীল হয়ে গেছে।"

একটু হাসির ঝলক উঠল আফিসের গুরুগম্ভীর পরিবেশে। এইরকম এখানে-ওখানে আরও।

শ্রেষ্ঠ বা খুব উৎকৃষ্ট নয়, অথচ অপকৃষ্টও নয় এই রকম একটি উপন্যাস ধরে আমি প্রভাতকুমারের উপন্যাসে হাস্য-

রসের একটা ধারণা দেওয়ার একটু সবিস্তারে চেষ্টা করলাম।

এখানে আর একটিমাত্র উপন্যাস সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলে আমি উপন্যাস-পর্ব শেষই করব। অর্থাৎ বস্তুত আমি 'সাহিত্যে'র সম্পাদকের সমালোচনার ভাষায় হাঁড়ির একটি ভাতই টিপে দেখলাম বা দেখালাম।

এই দ্বিতীয় উপন্যাস "নবীন সন্ন্যাসী"।

"নবীন সন্ন্যাসী" শ্রেষ্ঠ উপন্যাস না হলেও (শ্রেষ্ঠ 'রমাসুন্দরী'ই) প্রভাতবাবুর বৃহত্তম উপন্যাস এবং দু' বছর ধরে প্রবাসীতে ধারাবাহিকরূপে বের হওয়ায়, অনেকটা হাতের মুন্সিয়ানা, আবার অনেকটা প্রবাসীর তৎকালীন জনপ্রিয়তার জন্য বেশ একটা আলোড়ন তুলেছিল পাঠকমহলে। বেশ মনে আছে, কেননা আমিও তখন প্রভাতবাবুর লেখার আস্বাদ পেয়ে ওঁর অনুরক্ত পাঠক হয়ে উঠেছি। অবশ্য তখনকার দৃষ্টিতে এখনকার দৃষ্টিতে প্রভেদ হয়ে পড়ে। প্রবাসীতেই সমালোচনায় যে দোষত্রুটি ধরে দেওয়া হয়েছে—যার কথা পূর্বেই বলেছি—তা মোটামুটি মেনে নিতে হয়। তবু কৌতুকরসের দিকটা যে ঐ সমালোচনাতেই মেনে নেওয়া হয়েছিল এও একটা বড় কথা। খানিকটা তুলে দিই—

"...হরিদাসী ও দারোগা, মালী ও রামদাসোরা অস্ফুট অপপস্থাতেও কৌতুককর বলিয়া জীবন্ত। ...গদাই পালের চরিত্র-চিত্রণ অসাধারণ নৈপুণ্যে জীবন্ত করিয়া তোলা হয়েছে...গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাও অবান্তর ও অনাবশ্যক ঘটনার দ্বারা অকারণে ভারাক্রান্ত হইয়াছে—আগা ও গোড়ায় একটি সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই—তথাপি, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্রভাবে হাস্য-বৈচিত্র্যে ঝলমল করিতেছে......সর্বোপরি মুগ্ধ করে রচনার সহজ সরল অনাড়ম্বর হাস্যরস-অনসৃত ভাষা।" ভাষার প্রবাহে, চিত্রের মোহে হাস্যের প্রলোভনে পাঠকের মন বরাবর অগ্রসর হইয়াই চলে, এত বড় গ্রন্থের কোথাও ক্লান্তি অনুভব করে না—ইহা লেখকের অসাধারণ শক্তির পরিচয়।"

সমালোচকের মত যদি সর্বাংশে মেনে নিতে হয়, তাহলেও মোটামুটি একটা ত্রুটিবহুল দীর্ঘ গ্রন্থ কৌতুক-রসের জনাই মনকে বরাবর অক্লান্ত কৌতূহলে টেনে নিয়ে চলে, হাস্যরস নিয়ে এর চেয়ে বড় শিরোপা প্রভাতকুমারকে আর কেউ দিয়েছেন কি না জানি না। যাঁরাই "নবীন সন্ন্যাসী" পড়েছেন, আমায় সমর্থন করবেন।

এখানে একটু প্রসঙ্গ ছেড়ে একটা কথা বলি। কেন্দ্রানুগ, বেশ সুসংবদ্ধ উপন্যাস, অথচ আগাগোড়াই হাস্য-কৌতুকরসে নিটোল আমি কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না। হাসির রচনা ছোটগল্পেই জমে ভালো।

কিম্বা বড় হলেও তা চিত্রধর্মী হওয়া চাই। কিম্বা ভ্রমণ-কাহিনী, যাতে কথায় কথায় পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনে থেকে থেকে নূতন নূতন চিত্র ফুটে ওঠবারই সুযোগ এসে যায়। ডিকেন্সের দুটি শ্রেষ্ঠ বই তাই—পিকউইক পেপার্স এবং ডেভিড কপারফিল্ড, যদিও শেষেরটি অনেকটা কেন্দ্রগ উপন্যাসের কাছাকাছি। ওডহাউস ছোটগল্পকার, জ্যাকবও তাই, মার্কটোয়েন পরিব্রাজক, তাঁর— Innocents, Abroad সত্যই ভবঘুরে ক্যাবলাকান্তদের দল। সারভেনটিসের 'ডন-কুইক্‌সো' হাস্যকর টুকরো-টুকরো এ্যাডভেঞ্চারের জোড়া-তালি।

হাস্যে ছোটগল্পেরই জয়জয়কার। একটি আঙুরের মতো রসে টুলটুল হোক, কিম্বা চিত্রধর্মী নভেল বা ভ্রমণ-কাহিনীই হোক, যা বস্তুত কতকগুলি ছোট-গল্পেরই সমাহার।

পূর্বেই বলেছি প্রভাতকুমারের গল্প-সংখ্যা একশতের কিছু অধিক। এর মধ্যে গুটি-তিনেক প্রথম দিকের গল্প—'ভূত না-চোর', 'বেনামী চিঠি', 'স্ত্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' ছদ্মনামে বাহির হয়। একটি ছদ্মনাম—'রাধারাণী দেবী' ছিলেন প্রভাত-কুমারের শ্যালকপত্নী। তিনটি গল্প 'ভূত না চোর', 'কাটামুণ্ড', 'শাহাজাদা ও ফকির-কন্যার প্রণয়-কাহিনী'—লেখকের নিজের কথায়—"ভাষান্তর হইতে গৃহীত; অনুবাদ নহে, স্বেচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি।"

'দেবী' গল্পের প্লট রবীন্দ্রনাথ প্রভাত-কুমারকে দেন। এই ভূমিকাটুকু দিয়ে এবার আমি তাঁর ছোটগল্পের মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। একটা শ্রেণীবিভাগ করে নিলে সুবিধা হবে—

১) এমন কয়েকটি গল্প যা সম্পূর্ণ হাস্যরসবর্জিত। পূর্বেই বলেছি, সাধারণত ওঁর গল্প-উপন্যাসে কম-বেশী করে হাস্য-রসের অবতারণা থাকলেও, এমন কয়েকটি গল্পও আছে যার মধ্যে এ-রসের নামগন্ধ নেই। বিশেষ করে কয়েকটি করুণরসের গল্প।

২) জীবনের লঘুগুরু নানারকম অসঙ্গত ঘটনা নিয়ে wit, humour সংযোগে রচিত গল্প। এগুলিতে উচ্চকিত হাসির চেয়ে একটি শান্ত কৌতুকরসের প্রবাহ মননাকে দুলিয়ে দুলিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে।

৩) স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গরসের গল্প;

৪) Fun বা অদ্ভুত অদ্ভুত Situation বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে wit, humour সহযোগে উচ্চকিত হাসির গল্প।

(১) প্রথম শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'গল্প-বীথি'র 'কুমুদের বন্ধু' গল্পটি নেওয়া যাক।

কলকাতার বিখ্যাত ওষুধ-বিক্রেতা রজনীকান্ত সোমের পুত্র কুমুদনাথ লণ্ডনে আজ বিপন্ন। বড়লোকের ছেলে, সচ্ছল-ভাবেই লণ্ডনের এক ভালো পল্লীতে রুমস্ (Rooms) নিয়ে পড়াশুনা করছিল, আজ আড়াই মাস যাবৎ বাড়ি থেকে টাকা না পেয়ে ঋণে ডুবে এবং শেষ অবধি ঋণ করবার মতো অবস্থা না থাকায় একেবারে অকূলে পড়েছে। এই সময় বন্ধু হরিপদর একখানি চিঠি পেল যে, কোম্পানীর ম্যানেজার কুমুদের পিসেমশাইয়ের সঙ্গে যোগসাজস করে ভুয়ো ঋণের দায়ে বসতবাটি পর্যন্ত নিলামে তুলে ইনসলভেন্সি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তারিখ পড়েছে ১লা জুন, তার মধ্যে এসে না পড়লে ভরাডুবি।

১৩ই মে চিঠি পেল। মার্সেলিস থেকে যে-জাহাজ ১৭ই খুলছে তাতে বেরুলেও বোম্বাই পৌঁছিতে ৯ই জুন। নিষ্ফল।

ছুটোছুটি করে জানতে পারল যদি একেবারেই পরের দিন যাত্রা করতে পারে তো মার্সেলিসে একখানি ফরাসী জাহাজ ধরে সময়ে পৌঁছতে পারে। তাতে থার্ড ক্লাসও আছে।

কুমুদের হাতে গোটা পাঁচ-ছয় পেনিমাত্র অবশিষ্ট। বিস্তর ছুটোছুটি করে সাত পাউণ্ডের বেশি সংগ্রহ করতেই পারল না, তখনও আঠার পাউণ্ড আরও দরকার। হতাশায় একটি বারে ঢুকে কুমুদ সুরা পান করছে, হঠাৎ একটি খবরের কাগজে মোটা হেডলাইনে একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ চোখে পড়ল—লিভারপুলের কোন এক বণিক ব্যবসায়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মুক্তির একটা পথ দেখতে পেল কুমুদ।

বার থেকে বেরিয়ে সে একটি বন্দুকের দোকানে গিয়ে একটি রিভলবার কিনল। তারপর কলেজের কমনরুমে গিয়ে কতকগুলি চিঠি লিখে পকেটে নিয়ে হাইড পার্কের দিকে চলল। তখন রিভলবার আর জাহাজ-টিকিটের খরচ বাদে তার হাতে মাত্র চারটি পেনি। অমনিবাসের এক পেনি এবং হাইড পার্কে বেঞ্চের ভাড়া এক পেনি রেখে সে বাকি দুটি পেনি একটি ভিখারীকে দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে একটু অন্ধকার এবং নিরিবিলির জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে কার স্পর্শ পেয়ে ঘুরে দেখে বলে উঠল—"এথেল? How Lucky (এথেল নাকি, কী সৌভাগ্য)!"

এথেল লেডি নয়, কিছু নয়, একটি কোন হোটেলের যুবতী পরিচারিকা। প্রণয়িনী বলা মোটেই চলে না। কোন দুর্বল মুহূর্তের পরিচয়, তারপর কিছু অন্তরঙ্গতা। বিলাতপ্রবাসী ধনীসন্তানদের একটা গ্লানির দিক।

আজও অন্য এক দুর্বল মুহূর্ত। কুমুদ তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে এথেলের কাছে।

একরাশ প্রশ্ন এথেলের, চেহারা কেন এরকম—আর আসে না কেন?

কুমুদ জানালে টাকা ছিল না হাতে।

'কেন?'

জানালে কুমুদ সব কথা—কারবার ফেল করেছে।

'বল কি!'

কথা কইতে কইতে ওরা হাইড পার্কের সার্পেন্টাইন নামক দীঘিটার কাছে এসে পড়েছে। কুমুদেরই কথায় ওরা আলো থেকে একটু দূরে একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসে গল্প করছে—দুজনের স্বর

বিষাদ-ঘন হয়ে আসছে, এই সময় খেলাচ্ছলে কুমুদের কোটের একটা বোতাম খোয়াতে ঘোরাতে পকেটে পিস্তলটার ওপর হাত পড়ল এথেলের।

কিছু বলে সামলাবার আগেই এথেল সেটা বের করে নিয়ে ছুটে গিয়ে ছুদের মাঝামাঝি লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। আত্ম-হত্যার রোখ চেপেছে, খানিকটা বচসা। হাতটাও চেপে ধরেছে কুমুদ, হঠাৎ 'ব্রুট' (জানোয়ার) বলে চেঁচিয়ে উঠল এথেল।

তার রিস্টলেট ভেঙে কব্জির মাংসের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কলহ-পর্বটা এইতেই শেষ হোল। কুমুদ খানিকটা ঘাস চিবিয়ে ক্ষতস্থানে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল, তারপর ওরা আবার পূর্বস্থানে ফিরে গিয়ে বসল।

এরপর কথাপ্রসঙ্গেই ও সমস্ত দিন কিছু খায়নি টের পেয়ে—"Poor Dear!" বলে এথেল তাকে একটা ভোজনশালায় নিয়ে গিয়ে একটা প্রাইভেট সেলুনে বসে সব কথা শুনল।

এরপর একেবারে বিদায়ের দৃশ্যটিতে আসা যায়। হাত কেটে যাওয়াটা একটা আশীর্বাদেই দাঁড়িয়েছে এথেলের কাছে; অন্তত তাই করে নিয়েছে সে। ঐ অজু-হাতেই ছুটি পেয়ে ঘুরে ঘুরে বন্ধুদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, নিজের যা সম্বল ছিল তার সঙ্গে যোগ করে ভাড়াটা জোগাড় করে দিয়েছে। শপথ করিয়ে নিয়েছে আর আত্ম-হত্যার কু-মতলব কখনও মাথায় আসবে না—Honour bright

শেষ দৃশ্য ভিকটোরিয়া স্টেশন—

"এথেল, দুমাস পরেই তোমার টাকা আমি পাঠাইয়া দিব।"

এথেল কোন উত্তর করিতে পারিল না; অশ্রুবাষ্পে তাদের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল।

ক্রমে গাড়ি ছাড়িবার সময় হইল।

এথেল বলিল—"গুড বাই কুমি—এই বোধহয় আমাদের শেষ দেখা।"

"গুড বাই নয়—ও রিভোয়া, যতদিন না আবার দেখা হয়। আবার দেখা হইবে"—বলিয়া কুমুদ এথেলের হাতখানির ওপর নিজের ওষ্ঠযুগল স্পর্শ করিল।

একটানা একটি করুণ কাহিনী। তবু মনে হয় ঐ "ও রিভোয়া, আবার হবে দেখা" ওটুকুর মধ্যে আবার যেন আমরা হাসির যাদুকর সেই প্রভাতকুমারকেই ফিরে পাচ্ছি।

উচ্চকিত হাসি নিশ্চয় নয়, স্পষ্টও নয়, সমস্যাও নয়। কোন সুদূর ভবিষ্যতের আবার দেখা হওয়ার স্মিতহাসি—যা সম্ভাবনার মণিকোঠায় আপাতত লুকানো রইল।

কথাটা হচ্ছে, একটা কিছু অবলম্বন নও যা অন্তত সুখের দিনের, হাসির দিনের স্মারক হয়ে থাকবে, অন্তত সে-হাসি ফিরে আসবে বলে একটু আশা। তা নাহলে সে-কাহিনী Sad বা করুণ হবে না, হবে Cruel বা নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরতাও রস, কিন্তু তার জন্য প্রভাতকুমারের লেখনীর সৃষ্টি হয়নি।

(২) এবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে থেকে একটি গল্প বেছে নেওয়া যাক। এখানে এসে বাছাইয়ের কাজে একটু ভাবতে হয়, কেননা এই ধরনের গল্পেই প্রভাতকুমারের প্রতিভা সবচেয়ে বেশি at home অর্থাৎ নিজের সহজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত।

সংখ্যাতেও এত বেশি যে, কোনটে ছেড়ে কোনটে ধরব যেন একটা সমস্যাই হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত আকর্ষণে আমি নিজে হয়তো ঘুরে-ফিরে সবচেয়ে বেশি যেটি পড়েছি তার কথাই বলি—

গল্পটির নাম—'প্রণয় পরিণাম'।

হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর (অর্থাৎ বর্তমান স্কুল-ফাইনালের পূর্ববর্তী শ্রেণীর ছাত্র চতুর্দশবর্ষীয় মানিকলাল প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার প্রেমে পড়েছে। কুসুমের বয়স এগারো, নিত্যই দেখাশোনা, কথাবার্তাও, তৎসত্ত্বেও এতদিন কোন দিন কিছু হয়নি, আজ ওদের বাগানে গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছিল, স্নান করে মার সঙ্গে সিক্ত বসনে ফিরে আসতে দেখে মন হারিয়ে বসল মানিক। ওরা চলে গেলে নেমে এসে কোন্তে পেয়ারাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে একটা ওয়েবেস্টার ডিক্‌শনারি মাথায় দিয়ে প্রণয়-চিন্তায় ডুবে রইল। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রভৃতি এবং বটতলারও কিছু কিছু নভেল আগেই পড়ে ফেলেছে—তারা চিন্তার ভাষা জুগিয়ে যেতে লাগল।

"কেন দেখিলাম! হরি হরি, কি দেখিলাম, দেখিলাম তো মরিলাম না কেন!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। খেলাধুলো সব ছেড়ে দিয়েছে, এই সময় একদিন ওর পিসতুতো ভাই প্রভাস এসে উপস্থিত। মানিকের চেয়ে তিন বছরের বড়, কলেজে পড়ে এবং মনটা রোমান্সে ঠাসা। কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোন রকমে প্রেমে পড়া থেকে বিরত আছে।

মানিকলালের ভাবগতিক দেখে আশঙ্কা করল কিছু হয়েছে। কিন্তু মানিক কিছু ভাঙতে চায় না। শেষে তার একটা কবিতার খাতা হাতে পড়ল।

প্রভাস এলে বড় ভাই হিসাবে মানিককে অসৎ সঙ্গের দোষ, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি সদুপদেশই দিত, এক্ষণে কবিতার প্রেমে পড়ার শুভ লক্ষণের সন্ধান পেয়ে তার সঙ্গে একটা সখ্যের ভাব দাঁড়িয়ে গেল। সে অনেকগুলি প্রশ্ন করে যখন জানল, আকর্ষণ উভয় দিকেই কিন্তু স্পষ্টাস্পষ্টি কোন কথা হয়নি, তখন প্রচুর সাহস দিয়ে মানিককে একবার কুসুমের মন জানবার জন্য প্রশ্ন করতে বলল। তারপর অগ্রসর হতে হবে।

তা বেশ কৌশলের সঙ্গে মনটা জেনে নিল কুসুমের মানিকলাল।

একদিন কাঁচা আম পেড়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে বলল—"আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

"খবরদার, খবরদার ফুল তুল না।" বলে শাসিয়ে উঠল কুসুম।

না, তুলবে না ফুল। শুধু ভালোবাসে সেই কথাই বলছে মানিক। ফুলের আর একটা কি নাম জানে কি কুসুম?

"আহা, কে না জানে?—পুষ্প..."—উত্তর করল কুসুম।
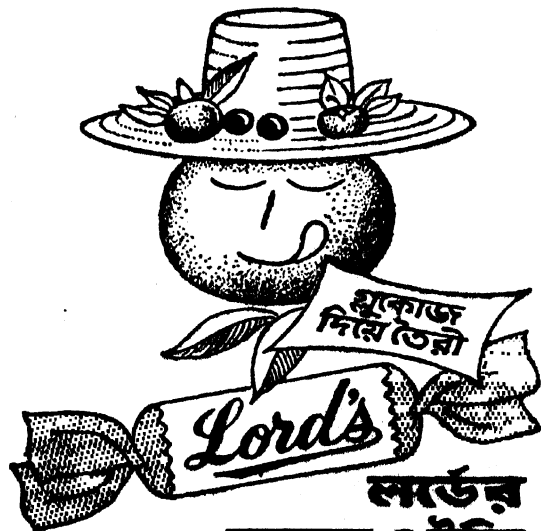
তারপর একটা পদ্যও শুনিয়ে দিল—

পাখী শাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর।
পাখী ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর।।

এরপর 'পুষ্প' থেকে 'কুসুমে' আসতে অসুবিধা হোল না। প্রভাসের শিক্ষামত যথারীতি হাতটা ধরে প্রণয় নিবেদনও করে দিল মানিক—

"তোমায় ভালবাসি কুসুম। তুমি আমার জলোচ্ছ্বাস?"

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

মানিক বলল—"দেখ, কুসুম। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

তাতেও খুব রাজী কুসুম। একটু ভেবে দেখবার জন্যেও সময় দরকার হোল না।

এরপর একদিন মানিক কুসুমের নামে একটা মস্ত কবিতা লিখল এবং প্রভাস পড়ে ধন্য ধন্য করল।

এইভাবে এ-দিকটা পাকা হয়ে গেলে প্রভাস মানিককে জানাল পদ্যটা কুসুমকে উপহার দিয়ে বিয়ের কথাটা তার বাবা ডাক্তার নন্দলালকে জানান দরকার। কিছু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হোল প্রভাসই পাড়বে কথাটা।

উৎসাহ পেয়ে মানিক কাউকে দেখাতে মানা করে পদ্যটি কুসুমের হাতে দিল এবং কুসুম সেটি প্রথম সুযোগেই—"মেজদি, একটা মজা দেখবি" বলে তার ভগ্নী নলিনীকে দেখাল। চুগলি নয় অবশ্য, সে-বেচারিও নিজে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। চুগলি নয়, শুধু এগার বৎসরের একটি মেয়ের স্বাভাবিক কৌতুক-কুণ্ডয়ন। নলিনীর বয়স ষোল বৎসর, নূতন বিবাহ। পদ্যে নাম না দেখে কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে জিজ্ঞাসা করতে কুসুম ভীত হয়ে বলল—"মানিক-দাদা দিয়েছে। আমায় একদিন বলছিল যে, আমি তোকে ভালোবাসি।"

ষোল বছরের নব-বিবাহিতা, সে এগারো বছরের কাঁচা প্রেমকে চেনে, সুতরাং আশঙ্কায় নয়, কৌতুকবশেই সমস্ত কবিতাটা পড়ে হেসে উঠেছে, মা উপস্থিত হলেন। "এই নাও মা, তোমার ছোটজামাই

তোমার ছোট মেয়েকে কি লিখেছে দেখ"—বলে সমস্ত কবিতাটি শুনিয়েও দিল—

কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি
দিবস রজনী
মনে লই
শয়নে স্বপনে
কিম্বা জাগরণে
সদাসর্বদা।
চিন্তা করি তোমা
রূপ নিরুপমা
ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া
নিদ্রা তেয়াগিয়া
ফেলি অশ্রুজল,
যথা শুষ্ক তরু
হনু এবে সরু
দেহ টলমল।

মায়ের জেরায় পড়ে এবার কুসুম আরও অ-প্রণয়িনীসুলভ কাজ করে বসল। বলল—"একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যানকা আমায় বললে কি—তোকে আমি আম পেড়ে দোব, তুই আমায় বিয়ে করবি? 'দূর পোড়ারমুখো।' বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এদিকে এই পর্যন্ত। অবশ্য এখনও নেপথ্যেই। ওদিকে পূর্ব ব্যবস্থা-মতো প্রভাস, তার মামা, মানিকের পিতা নন্দলালকে গিয়ে জানাল। তিনি দিবা-নিদ্রা সেরে গড়গড়া নিয়ে চৌকিতে বসেছেন, অত্যন্ত রাশভারি লোক, প্রভাস কম্পিত চরণে গিয়ে প্রবেশ করে ও'র প্রশ্নের উত্তরে জানাল—

"আমাদের মানিকের জন্যে চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন, ব্যাপার কি, কোন ব্যারাম-স্যারাম হয়েছে নাকি?"

"আজ্ঞে শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

"কি রকম?"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে লভে পড়েছে।"

"কি রকম করে লবে পড়ল?" তামাক টানতে টানতে গম্ভীর প্রশ্ন।

"আজ্ঞে, কিরকম করে পড়ল বলা বড় কঠিন। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, আকর্ষণটা উভয়ত প্রবল ...মানিক বলছে, যদি বিয়ে না হয় তো ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

আরও কিছু কথা হাল্কাভাবে বের করে নিয়ে নন্দলাল মানিককে ডেকে দিতে বললেন।

বাইরে গিয়ে প্রভাস মানিককে বলতে সে প্রশ্ন করল—"কি রকম বুঝলে?"

প্রভাস বলল—এখন পর্যন্ত তো খুব আশাপ্রদ।"

নন্দলাল আরসির সামনে দাঁড়িয়ে একটা পাকা গোঁফ তোলবার চেষ্টা করছিলেন। আরসিতে ছায়া পড়তে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—"তোর এগজামিন কবে?"

মানিক বলল—"আর বারো দিন আছে।"

"কি রকম তৈরি হোল?"

"আজ্ঞে হয়েছে একরকম।"

"পড়াশোনা করছিস মন দিয়ে, না খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?"

"আজ্ঞে খেলা বেশি করিনে।"

"তবে কি করিস? 'লবে' পড়েছিস নাকি শুনলাম?"

এর পরেই পরিণাম অনিবার্য; কান ধরে ঠাস ঠাস করে গণ্ডদেশে কয়েকটি চপেটাঘাত।

—"দিবে-রাত্তির প্রভাসের সঙ্গে গুজ-গুজ ফুসফুস হচ্ছেই—আমি ভাবি ব্যাপারটা কি—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মতলব করছে, না, কি করছে...।"

এর পরের দৃশ্য অনেক পরে। ডাক্তার পিতার চিকিৎসায় সুফল হয়েছে। দেখা গেল কুসুমের বিবাহে মানিক অকাতরে লুচি সাঁটিয়ে যাচ্ছে।

অদ্ভুত মিষ্ট গল্প। প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠতমের মধ্যে একটি। উচ্চকিত হাসি খুব বেশি নেই, তেমনি Wit পরিবেশ-জনিত হিউমার, বয়সের সঙ্গে আচরণের অসঙ্গতি সর্বোপরি কৌতুক-সরস ভাষার জন্য এমন একটি লাইন নেই যা পাঠকের ঠোঁটের হাসিটি একটুখানির জন্য লুপ্ত হতে দিচ্ছে।

(৩) এরপর আমি ও'র তৃতীয় পর্যায়ের একটি গল্প নিচ্ছি। ও'র বোধহয় সবচেয়ে প্রখ্যাত এবং জনপ্রিয় গল্প 'বলবান জামাতা'।

আলিপুরের পোস্টমাস্টার নলিনী মুখোপাধ্যায় আফিসে বসে টেলিফোনের সামনে ছটফট করছেন। শ্বশুরবাড়ি যাবেন এলাহাবাদে, ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছেন, এখনও মঞ্জুরি আসেনি। পকেটে স্ত্রী সরোজিনীর চিঠি, বহুবারই পড়া হয়ে গেছে, আবার বের করে পড়লেন। বিবাহের পর বছর-দুই যাননি, আকুল আহ্বান, তাছাড়া যাওয়ার একটা যে বড় তাগিদ, সরোজিনী লিখেছে দিনাজপুর থেকে তার মেজদিদি কুঞ্জবালা এসেছে।

এই মেজদিদি নিয়েই যত কাণ্ড। বিয়ের সময় নলিনীর শরীরটাও ছিল ঢলঢলে, নরম, মেদবহুল। কুঞ্জবালা ডেপুটির বৌ, আধুনিকা, রসিকা। বাসরঘরে নলিনীর এই স্ত্রীজনোচিত লালিত্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্র-নাথের পদ্য অবলম্বনে একটি প্যারডি রচনা করে বিদ্রূপ করে—

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম

ইত্যাদি।

একটি শ্লেষ মানুষকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশ-বচনেও সেরকম হয় না। কলকাতায় ফিরে কিছুদিন পরে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেল কিনে নিয়মিত ব্যায়াম করে রীতিমতো ভোল ফিরিয়ে নিলেন। সব লালিত্য ঝরে গিয়ে রীতিমত পালোয়ানি চেহারা, তার ওপর দাড়ি

[সা]জিয়ে, শ্যালিকার বিদ্রুপের একখানি [ম]ৌকিক প্রত্যুত্তর করে দাঁড় করালেন নিজেকে নলিনী। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার [তা]গিদটা তাই আরও বেশি। পৌরুষ-[প]ীড়া হিসাবে বন্দুক কিনে শিকারেও অভ্যাস করেছেন।

টেলিফোনে ছুটির খবর এল।

যথাসময়ে যাত্রা করে পরদিন বেলা দুটোর সময় এলাহাবাদ স্টেশনে নমে তাঁর শ্বশুর মহেন্দ্রবাবুর নাম ক'রে একটা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে নামলেন টাঙ্গা থেকে। গায়ে একটা লম্বা পাঞ্জাবী কোট, পরনে পায়জামা, মাথায় পাগড়ি। হাতে একটা সুপুষ্ট যষ্ঠী। সঙ্গে কুঞ্জবালাকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য বন্দুকের বাক্সটিও এনেছেন সঙ্গে।

রামশরণ নামে এক ভৃত্য কড়া নাড়ছিল। প্রশ্নের উত্তরে বাড়টা যে মহেন্দ্রবাবুরই এটা জানিয়ে বলল, বাবু কেদারবাবুর বাড়ি পাশা খেলতে গেছেন। নলিনী ভেতরে খবর দিতে বললেন, জামাইবাবু এসেছেন।

একটি বছর দশেকের মেয়ে খেলা করছিল. সেই ছুটে গিয়ে খবরটা দিল। এরপরই হল বিড়ম্বনার সূত্রপাত।

রামশরণ স্নানাদি পরিচর্যার ব্যবস্থা করছে, একটি বাঙালী ঝি বাইরে এল, কোলে একটি শিশুপুত্র। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে ছেলের মুখ-দেখানি বকশিষ চাইল। দুটি টাকা বের করে হাতে দিতে ঝি বলল—"ওমা, ওকি রুপা দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা!...ছেলের বাপ হলেই হয় না!"

নলিনীর তো কালঘাম ছুটে গেল। মাত্র দু'বছর শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখা নাই. একেবারে ছেলের মুখ।"

এই সময় ভেতর থেকে একটি ছোট মেয়ে একটি সরবতের গ্লাস নিয়ে এসে দিতে সমস্যাটা একরকম মিটে গেল। চিনির নয়, নুনের সরবৎ; তাহলে ছেলেও নিশ্চয় নুনের সরবৎ, অর্থাৎ ঠাট্টাই।

এই সময় বৈটকখানার কবাট খুলে রামশরণ জানাল খাবার দেওয়া হয়েছে। নলিনী তারই সংলগ্ন একটি সুসজ্জিত ঘরে গিয়ে রেকাবিতে সাজানো নানাবিধ আহারের সামনে একটি আসনে ব'সে আরম্ভ করেছে, একটি ছোট মেয়ে এসে জানাল—"মেজদি আসছে।"

কুঞ্জবালাই নিশ্চয়, নলিনী নড়েচড়ে দেহের সুপুষ্ট শিরা পেশিগুলি সাধ্যমতো জাগিয়ে প্রস্তুত হোল তাকে দেখাবার জন্য। "কি ভাই, মনে পড়ল?"—ব'লে প্রবেশ করল একটি যুবতী। তারপর চারি-চক্ষে মিলন হতেই একগলা ঘোমটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন। বাড়িতে হৈ হৈ—জামাই সেজে বাড়িতে ডাকাত ঢুকেছে——সঙ্গে বন্দুক!...রামশরণ! বাবুকে খবর দে!...

এদিকে নলিনীর হঠাৎ আলমারির আইনের বাঁধানো বইগুলির ওপর নজর পড়ে যাওয়ায় দেখল সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে—এম, এন, ঘোষ। সমস্যা মিটে সে নিশ্চিন্ত মনে খাবারগুলি সব শেষ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল এবং মহেন্দ্র-বাবু এলে এ পর্ব শেষ হোল।

দ্বিতীয় পর্ব নলিনীর আসল শ্বশুর মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।

রামশরণের বিবরণ শোনার পর কেদার-বাবুর বাড়ির আড্ডা ভেঙে যে যার বাড়ি চলে এসেছেন। মহেন্দ্রবাবুও এসে বৈঠক-খানায় বসে আলবোলার নলটি মুখে দিয়েছেন, বাইরে একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল এবং তারপরেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর —"এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি?"

উত্তর হোল—"আজ্ঞে হাঁ।"

"খবর দাও, বল বাবুর জামাই এসেছেন।"

কেদারা ছেড়ে উঠে মহেন্দ্রবাবু দেখেন সেই রামশরণ বর্ণিত চেহারা, সঙ্গে বন্দুকের বাক্স পর্যন্ত।

বেরিয়ে এসেই—"কোই হ্যায় রে?... ঘরে ফিরে আবার আমার বাড়িতে এসেছে! মারকে নিকাল দেও!"

চাকর-দারোয়ান জুটে গেছে। নলিনীকে আক্রমণ করবার উদ্যোগ করতে নলিনী মাথার ওপর লাঠি ঘুরিয়ে হুংকার ছাড়ল —"খবরদার! হাম চলা যাতা হ্যায়, লেকিন যো হামকো ছুয়েগা উসকো হাম চুর চুর কর ডালেঙ্গে।"

এরপরও একটু শেষ চেষ্টা—"আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন মহেন্দ্রবাবু—"বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন, আমি জামাই চিনি না? আমার জামাইয়ের ওরকম গুন্ডার মতন চেহারা? ভাগো হিঁয়াসে। নিকালো হিয়াসে—নয়ত অভি পুলিসমে ভেজেঙ্গে...?"

নলিনী গাড়োয়ানকে বলল—"চলো স্টেশন।"

বাড়িতে বচসা হচ্ছে। গিন্নি বললেন, জামাই হওয়াই সম্ভব—তাড়ানো ঠিক হয়নি—মহেন্দ্রবাবুর নামের গোলমালে এরকম নিত্য কত হচ্ছে—জামাইয়ের পুজো উপলক্ষে আসার কথা আছে, সে হওয়াই সম্ভব—কুঞ্জবালা বলছে, তার অমন গুন্ডার মতো চেহারা হতেই পারে না—এই সময় চাকর এসে জানাল টেলিগ্রাম এসেছে।

নলিনীরই বিলম্বিত টেলিগ্রাম।

মহেন্দ্রবাবু স্বয়ং গিয়ে জামাইয়ের মান ভাঙিয়ে নিয়ে এলেন।

নলিনী আর এ নিয়ে কিছু আলোচনা করে কাউকে লজ্জায় ফেলেনি। শুধু একদিন মহেন্দ্র ঘোষ উকিলের কথা উঠলে বলেছিল—"যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠে যে আদরযত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সেরকম নিজের শ্বশুরবাড়িতে পায় না।"

পড়েছি বহুবার, তারপর একদিন আমার ছাত্রজীবনে পাটনায় তৎকালীন বিখ্যাত কৌতুক-অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর মুখে 'বলবান জামাতা'র কৌতুক-অভিনয়ও দেখি। অনবদ্য, জীবন্ত! এখনও মনে পড়লে হাসি গড়িয়ে ওঠে বুকে-পেটে। আর একবার মণি-কাঞ্চন যোগ! অত আর কখনও হেসেছি জীবনে বলে মনে পড়ে না। সামলাতে না পেরে পেট চেপে আসর ছেড়ে উঠে যেতে হয়েছিল।

তাই যে-দুঃখ দিয়ে শুরু করেছি, সেই দুঃখ দিয়ে শেষও করতে হয়,—কোথায় যেতে বসেছে বাংলার সে সাহিত্যের হাসি, সাহিত্যের হাত ধরে মজলিস-আসরের হাসি? তাকে ফিরিয়ে না আনলে বাংলার প্রাণ-পুষ্প আবার বর্ণে-সৌরভে স্বমহিমায় বিকশিত হয়ে উঠবে কি করে?

(সমাপ্ত)

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

মোহনবাবু কোলকাতা থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন দিল্লি। তারপর সেখান থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন শিলং এ, সেখানে দু' বছর থাকবার পর বোম্বাইতে ন' মাস ছিলেন বদলি হয়ে, তারপর আন্দামানএ সাড়ে তিন বছর থাকবার পর প্রায় অবসর নেবার সময়ে ফিরে এলেন কোলকাতায়। এসেই তাঁর প্রথমে মনে পড়ল তাঁর আবাল্যবন্ধু হরিহরের কথা। মোহনবাবুর মতে হরিহর এখনো মানুষ হয়নি। অতএব ওকে মানুষ করার কাজে তিনি লেগেছিলেন। হরিহরের অমানুষ হবার মধ্যে অনেকগুলি কারণ ছিল, তার প্রধানতম হল হরিহরের পিতৃদেব নরহরিবাবু তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন তার পরিমাণ এতই অসামান্য যে তাঁর যদি দশটি পুত্র থাকত তাহলেও প্রত্যেকে কোলকাতায় আলাদা আলাদা বাড়ি করে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত। ফলে হরিহর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে পা বাড়ায়নি। কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে পা বাড়াতেই হয়, অতএব হরিহর এমন দিকে পা বাড়াল যে দিকটা হল হিসেবী ব্যবসার দিক নয়, লেখাপড়ার দিকও নয়, বেহিসেবী মজা এবং ফুর্তির দিক। কুড়ি কি একুশ বছর বয়স থেকেই সে হয়ে ওঠে বিশেষ তরল-পদার্থের রীতিমত সাধক, এবং তার বাড়ি হয়ে ওঠে নাচ-গান ফুর্তির একটা ডিপো।

যে সমস্ত বন্ধু এবং পরিচিতেরা তার এই খেয়ালের বিরোধিতা করেছিল হরিহর তাদের প্রত্যেককে তার বন্ধুর তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল। যারা তাকে সমর্থন করেছিল তাদের সে দু-হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছিল। মোহনবাবুই ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে হরিহরের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু তিনি হরিহরের দলেও ভিড়ে যাননি। মদ তিনি হয়ত কখনো পান করেছেন, কিন্তু হরিহরের সঙ্গে কখনো নয়, নাচ-গানও তিনি অপছন্দ করেন না, কিন্তু তাঁকে কখনো হরিহরের বাড়ির নাচের আসরে দেখা যায়নি। তিনিই হরিহরের একমাত্র বাল্যবন্ধু, অন্য সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে হরিহরের কোনো দুঃখ ছিল না। হরিহর বলতেন, যারা আমাকে পছন্দ করবে আমি যা তার বেশি সে আমার কাছ থেকে আশা না করেই করবে। আমি গোল্লায় গেছি বলে যাদের ধারণা আমি তাদের ধার ধারি না।

মোহনবাবু হরিহরের সঙ্গে মিশেছেন। মদ পান সম্পর্কে বলেছেন, ওটাতে যদি তোমার উপকার হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ছাড়বে না। যদি ক্ষতিও হয় সেটাও তোমারই ক্ষতি হবে, অন্য কারও নয়, অতএব আমি তা নিয়ে কিছু বলব না। তবে একথা বলব যে, পৃথিবীতে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে আর বহু সংসার এবং লিভার নষ্ট হয়েছে। অবশ্য তাও নিশ্চয় তোমার জানা। এভাবে তিনি কৌশলে বন্ধুকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এমন সব বই পড়তে দিয়েছেন যাতে বন্ধুর উপকার হয়। কিন্তু কিছু হয়নি।

আশা ছাড়েননি মোহনবাবু কিন্তু। বরাবরই তিনি আশা করেছেন একদিন হরিহরের নেশা চলে যাবে। একদিন সে অমানুষ থেকে সামাজিক জীবন ... করবে। হয়ত বিয়েও করবে।

তিনি তাই কোলকাতায় ফিরে ... খোঁজ করলেন হরিহরের। হরিহরের বাড়িতে ঢুকতে যেতেই দেখলেন সেই বাড়ির ... একটা নাম-ফলক। পেতলের উপর ... রাম মল্লিক। রাম মল্লিক? সে আবার ... কলিং বেল টিপতেই একটি বছর-... বয়সের ছেলে দরজা খুলে দিল, ... কাকে চাই?

মোহনবাবু বললেন, আমি হরিহরকে চাই। হরিহরবাবু।

ছেলেটি বলল, তিনি কে? এখানে তো তিনি থাকেন না।

মোহনবাবু অবাক হলেন। এমন ... একজন প্রৌঢ়ব্যক্তির আগমন ঘটল। ... শুনে তিনি বললেন, ও হরিহরবাবু, ... তো বছর চারেক হল কাশীতে রয়েছেন। এ-বাড়ি তিনি আমাকে ভাড়া দিয়ে গেছেন। প্রত্যেক মাসে তাঁকে আমি ভাড়া পাঠাই।

দারুণ খুসি হলেন মোহনবাবু। হরিহরের ঠিকানা লিখে নিয়ে এলেন ... সবাইকে বললেন, আমার আশা ... পরে হলেও ফলেছে ঠিক। হরিহর ... নিচে নেমেছিল, চরমে গিয়েছিল, ... প্রায়শ্চিত্তও তেমনি কঠোর হবে ... আশ্চর্য কি?

ঠিক করলেন একবার গিয়ে ... তাঁর বাল্যবন্ধুর নতুন পরিবেশ ... আসবেন।

কাশীতে পেঁছিলেন ... সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। ... থাকায় পেঁছুলেন বহু রাত্রে। ... হরের বাড়িতে পেঁছুতে তাঁর ... অসুবিধে হল না। প্রথমে ভেবেছিলেন ... রাত্রে বন্ধুকে জাগানো বোধহয় ঠিক ... না, কিন্তু তারপরই ভাবলেন, ... বন্ধু তো। সে বোধহয় খুসিই হবে।

দরজায় কড়া নাড়তে হল না। দরজার বাইরেই বন্ধুকে পাওয়া গেল। হাতে ... বন্ধু সিঁড়িতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রচণ্ড তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে। কোনো ... নেই।

মোহনবাবু ডাকলেন, হরিহর, ... হরিহর বলল, কে কোৎরাম নাকি? ... বাবু বললেন, আমি মোহন। হরিহর বলল, তা তুমি বাওয়া মোহনই হও ... হও এই দরজার তালাটা একটু খুলে দেবে? বলে টলতে টলতে উঠে এসে ... মুখ দিয়ে ভক করে একটা ... বেরুল, আর তীব্র একটা গন্ধে জায়গা ভরে গেল। তারপর বলল, কে তুমি ... মোহন? সেই কোলকাতায় এক ... থাকত—আর এই তুমি এক ... কোলকাতা! ছোঃ কোলকাতার কথা ... পড়লে বমি হয়—বলে সত্যি সত্যিই ... করল হরিহর।

মোহনবাবু অতঃপর ঐ বৃষ্টিতে আবার স্টেশনের দিকে চললেন।

ভাগাভাগির পালা

পাঞ্জাবকে ভেঙে পাঞ্জাবী সুবা ও হরিয়ানা এই দু'টি নতুন রাজ্য গঠনের আয়োজন সন্তোষজনকভাবেই এগোচ্ছে। পাঞ্জাব পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিলটি সংসদের দু'টি সভাতেই গৃহীত হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২৫ আগস্ট এক সিদ্ধান্তে স্থির করেছেন যে, ঐ রাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন আগামী ১ নভেম্বর তুলে নেওয়া হবে। ঐ তারিখেই নতুন রাজ্য দু'টির নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবেন বলে কথা আছে।

আগে কথা হয়েছিল অন্তত আগামী নির্বাচন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন বজায় রাখতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় এই ব্যবস্থার কতকগুলি সাংবিধানিক অসুবিধা আছে। যেমন রাষ্ট্রপতির শাসন অব্যাহত রাখা হলে নতুন রাজ্য দু'টির জন্ম হয়েছে একথা বলা যাবে না। কেননা, নিয়ম অনুসারে নতুন রাজ্য গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। যদি দেখা যায় নবগঠিত রাজ্য দু'টি শাসনযন্ত্রকে ঠিকমত চালাতে পারছে না, কেবল তখনই আবার রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কিন্তু সেটা করতে হবে নতুন করে।

সুতরাং এই খবর যখন ছড়ালো যে, নির্বাচন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন বজায় রাখার কথা ভাবা হচ্ছে, তখন অনেকেই ভাবলেন সরকার বুঝি পাঞ্জাব পুনর্গঠনের ব্যাপারটা আগামী মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে চান (ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২ অক্টোবরের মধ্যেই পুনর্গঠনের কাজ সমাধা করার কথা)। এই নিয়ে বিশেষ করে অকালী মহলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, এবং সন্ত ফতে সিং কলকাতায় এক বিবৃতিতে সরকারকে স্পষ্টই হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, নতুন রাজ্য গঠন যদি মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, তাহলে আবার অশান্তি দেখা দেবে।

সেদিক থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অকালীদের আশ্বস্ত করবে। যদিও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্য গঠনে এক মাস দেরী হয়ে যাবে, তবু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, যে-বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক ভাগাভাগির দায়িত্ব সরকারকে নিতে হয়েছে সে তুলনায় এই এক মাস দেরী কিছুই নয়।

এই ভাগাভাগির মধ্যে সবচেয়ে জটিল সমস্যা ছিল সম্পদ ও দায়-দায়িত্বের ভাগ। যেহেতু ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর ভিত্তিতে নতুন রাজ্য দু'টি গঠিত হচ্ছে, সেই কারণে তারই ভিত্তিতে সম্পদ ও দায়-দায়িত্বের ভাগ হবার কথা। কিন্তু হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের প্রতিনিধিরা দাবী করছেন যে, কেবল জনসংখ্যার ভিত্তিতেই এই ভাগাভাগি হওয়া উচিত নয়, ভৌগোলিক এলাকার ওপরেও জোর দেওয়া উচিত। তাছাড়া এটাও তাঁরা মনে রাখতে বলছেন যে, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ

সন্ত ফতে সিং

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশী অনগ্রসর। যদিও এসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হবে সেটা জানা যায়নি, তবে দাহেনিয়া কমিটি এ সম্পর্কে যে সাধারণ নীতি বেঁধে দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট তিনটি পক্ষ তা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন।

কমিটির সিদ্ধান্ত মোটামুটি এই রকম : জমি ও মালপত্র যে জায়গায় আছে সেই অনুসারে পাঞ্জাব বা হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে ভারত সরকার প্রয়োজন বোধ করলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারবেন।

বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যের সমস্ত ট্রেজারীতে যে ক্যাশ ব্যালান্স আছে এবং রিজার্ভ ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংকে যে ক্রেডিট ব্যালান্স আছে, সেগুলি ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের মধ্যে ভাগ করা হবে।

ভূমি রাজস্বের বকেয়াসহ সম্পত্তির বকেয়া করের বেলায় সম্পত্তি যে-রাজ্যে থাকবে সেই রাজ্যের ওপরেই আদায়ের ক্ষমতা থাকবে। অন্য সমস্ত করের বকেয়ার বেলায় অ্যাসেসমেন্টের জায়গা যে-রাজ্যে থাকবে সেই রাজ্যই তা আদায় করবে।

বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যের তরফ থেকে স্থানীয় সংস্থা, সমিতি, কৃষক বা ব্যক্তিকে প্রদত্ত ঋণ বা দাদনের টাকা সেই রাজ্যই আদায় করবে যে রাজ্যে ঐ সংস্থা, সমিতি, কৃষক বা ব্যক্তি অবস্থিত।

যদি বর্তমান রাজ্যের সীমানার বাইরের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বা দাদন দেওয়া হয়ে থাকলে সেই বাবদ আদায় করা টাকা জনসংখ্যার অনুপাতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

বর্তমান রাজ্য সরকার যদি কোন ব্যবসায়িক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন এবং সেই বিনিয়োগ যদি ক্যাশ ব্যালান্স বিনিয়োগ খাত থেকে করা না হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিনিয়োগ ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রটি যে রাজ্যে সেই রাজ্যের ওপরেই বর্তাবে।

কিন্তু এছাড়াও এমন কয়েকটি সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলির বিভাগ এতটা সহজ হবে না এবং যেগুলি ভাগ না করলেই সর্বাধিক সুফল পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে আছে ভাকরা বাঁধ, পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ, বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ গবেষণা ইনস্টিট্যুট, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব ফিনান্স কর্পোরেশন ও পাঞ্জাব ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন। এগুলি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি এখনও গ্রহণ করা হয়নি। মনে হয় এগুলির পরিচালনায় যৌথ দায়িত্ব থাকবে, তবে এগুলি থেকে যে রাজ্য সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে তার ওপরেই দেওয়া হবে প্রত্যক্ষ পরিচালনার দায়িত্ব।

একটা ছোটখাটো বিরোধ বেধেছে সরকারী সম্পত্তির বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ে। পাঞ্জাব দাবী করছে যে সিমলায় তার যত বাড়ী আছে তার অধিকাংশ এবং ডালহৌসীর কয়েকটি বাড়ী তারই থাকবে। হিমাচল প্রদেশ স্বভাবতই এতে রাজী নয়।

বর্তমান পাঞ্জাব সরকারের মোট সম্পদের পরিমাণ ১৫৬ কোটি টাকা। মূলধনী খাতে সরকারের বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৮৬ কোটি টাকা। মোট দায়-দায়িত্বের পরিমাণ ৪১৯ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেছেন যে, আপাতত দু'টি রাজ্যের জন্যে একই

রাজ্যপাল এবং এক হাইকোর্ট থাকবে। পরে তারা এই ব্যবস্থাগুলি আলাদা করে নিতে পারে।

মাও'র বিপ্লব

ইয়াংসির জলে ন' মাইল সাঁতার কেটে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং নিজের গতরে কতখানি তাগত সঞ্চার করেছেন জানি না, তবে চীনের নতুন 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে' বেশ একটা নতুন প্রাণ এনে দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই বিপ্লব ইতিমধ্যেই কয়েকজন বাঘা বাঘা 'প্রতিবিপ্লবী' নেতাকে গ্রাস করেছে (অভিযোগ এ'রা নাকি মাও সে-তুংয়ের চীনে শোধনবাদের প্রবর্তনা করতে যাচ্ছিলেন)। এখন নাকি নজর পড়েছে রাস্তার নামের ওপর। সম্প্রতি পিকিংয়ে উল্লসিত ছাত্রদের দেখা যায় তারা ঘুরে ঘুরে রাস্তার বর্তমান নামগুলি খুলে ফেলে তার জায়গায় নতুন নাম লাগাচ্ছে। নামগুলি জানতে চান? কোনটা 'শোধনবাদ নিপাত যাক সড়ক', কোনটা 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই সড়ক', আবার কোনটা 'সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব সড়ক'!

শোনা যাচ্ছে এই বিপ্লবী উল্লাসকে ব্যক্তিগত গৃহের অভ্যন্তরেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন নাকি বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে মাও-বিরোধী 'চক্রান্তকারীদের' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অতি সম্প্রতি পিকিংয়ের রেড গার্ড বিক্ষোভকারীরা একটি রোমান ক্যাথলিক কনভেণ্ট দখল করে নেয় ও শহরের বৃহত্তম মসজিদে হানা দেয়। পোস্টারে পোস্টারে চারদিক ছেয়ে ফেলে তারা বলে ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং বিদেশীরা হচ্ছে শয়তান।

এই বিপ্লবীরা প্রতিদিন তাদের শুদ্ধিকরণ অভিযানে নামবার আগে চেয়ারম্যান মাও'র রচনাবলী পাঠ করে নেয়। এই রচনাবলীর গুণ নাকি অব্যর্থ। সম্প্রতি চীনের খেলোয়াড়েরা মাও'র বই পড়েই নাকি টেবিল-টেনিসে জিতেছে। দোকানীরা তাঁর লেখা পড়েই নাকি বিক্রি বাড়াচ্ছে। চাষী নাকি মাঠে নামবার আগে ঐ রচনাবলী একবার পড়ে নেয়, আর তাতে নাকি আজকাল ফসল ফলছে ভালো।

আর ফলবেই বা না কেন। চেয়ারম্যান মাও বলে কথা। তাঁর সবকিছুই মাহাত্ম্য। তাঁর অঙ্গস্পর্শে ইয়াংসির ঘোলা জল নাকি মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল!

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পরিকল্পনার সঙ্গতি

পরিকল্পনা কমিশন ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা প্রস্তুত করেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ইতিমধ্যে সেটি অনুমোদন করেছেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই খসড়া রূপরেখাটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তথাপি এমন কথা বলা যায় না যে, পরিকল্পনার আয়তন সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসা হয়েছে।

যেমন, ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শ্রীমোরারজী দেশাই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাবমত এত বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করলে টাকার বাট্টা আর একবার কমাবার প্রয়োজন হবে।

আসল কথা হল পরিকল্পনার সঙ্গতি। পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী পাঁচ বৎসরে ২৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করার মত টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে যে সব দলিল উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলিতে প্রকাশিত তথ্য এই আলোচনায় নতুন ইন্ধন যুগিয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের খসড়ায় প্রধান সিদ্ধান্তই এই যে, নোট ছাপিয়ে সরকারী আয়-ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করে পরিকল্পনা চালান হবে না। অর্থাৎ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট যে ১৬০০০ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব হয়েছে তার সবটাই আসবে চলতি সরকারী আয়, ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্য থেকে। যদি আমরা এক...

মনে রাখি যে, প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় একুনে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয়েছে একমাত্র চতুর্থ পরিকল্পনাতেই তার চেয়ে বেশী অর্থব্যয় করার প্রস্তাব হয়েছে—এবং সেই অর্থও ব্যয় করা হবে সম্পূর্ণরূপে সরকারী সঙ্গতির মধ্যে — তাহলে আমরা বুঝতে পারব, পরিকল্পনা কমিশন কত দুঃসাধ্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য ১০২৩ কোটি টাকার নোট ছাপান হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের খসড়ায় এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি সরকারী ব্যয়ে "কঠোর শৃংখলা' আনা যায় এবং যদি কমিশনের প্রস্তাবমত অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা যায় তাহলে ঘাটতি পূরণের জন্য আদৌ নোট না ছাপিয়েও পরিকল্পনার ব্যয়-সংকুলান করা যাবে।

কমিশনের এই আশা অত্যন্ত উচ্চ আশা তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যা হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমানের অংকগুলিকে অসম্ভব বলেই মনে হবে। সরকারী খাতে যে ১৬০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে সেই টাকাটা বিভিন্ন সূত্র থেকে এভাবে তুলবার প্রস্তাব করা হয়েছে—

সূত্র	কেন্দ্র	রাজ্য	মোট
	(কোটি	টাকার	হিসাবে)
চলতি রাজস্ব থেকে উদ্বৃত্ত	২০৯০	৯২০	৩০১০
রেলওয়ে থেকে আয়	২৬০	—	২৬০
সরকারী শিল্পোদ্যোগ	৭৬০	৩২৫	১০৮৫
ঋণ	৭০০	৮০০	১৫০০
ক্ষুদ্র সঞ্চয়	৩৬০	৬৪০	১০০০
অপরিশোধিত ঋণ	৪০০	১৬৫	৫৬৫
কমপালসারি ডিপোজিট ও অ্যান্যুয়িটি ডিপোজিট	১৫০	—	১৫০
মূলধনী ব্যয়	১৩৩০	—৬৬৫	৬৬৫
পি-এল ৪৮০ বাদে অন্য সূত্রে বৈদেশিক ঋণ	৪৩৪০	—	৪৩৪০
পি-এল ৪৮০ তহবিল	৩৬০	—	৩৬০
পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের সংকোচ	৮৫	২৫০	৩৩৫
অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ	১৭৪৫	৯৮৮	২৭৩০
মোট	১২৫৮০	৩৪২০	১৬০০০

এই অংকগুলি পরীক্ষায় দেখা যাক—

(১) চলতি রাজস্ব থেকে উদ্বৃত্ত — পরিকল্পনা কমিশনের অনুমান, বর্তমানে যে সব ট্যাক্স আছে সেগুলি থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে মিলিয়ে ৩০১০ কোটি টাকা আদায় হবে। এই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, কর আদায় ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে, কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করা হবে এবং জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমান সূত্রগুলি থেকেই আরও বেশী আদায় করা যাবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় এই অনুমানের পাশাপাশি তৃতীয় পরিকল্পনার বাস্তব কৃতিত্ব কি? তৃতীয় পরিকল্পনায় কথা ছিল চলতি রাজস্ব থেকে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে ৫৫০ কোটি টাকা। আর এখন জানা যাচ্ছে, উদ্বৃত্ত ত দূরস্থান, ঘাটতি হয়েছে ৪৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ একুনে ঘাটতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াল ১০২০ কোটি টাকা।

(২) অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়—নতুন ট্যাক্স বসিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি মিলে মোট ২৭৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করবেন। নতুন ট্যাক্স-গুলি চাপান হবে প্রধানত কৃষির ক্ষেত্রে—জমির খাজনার হার সংশোধন করে, সেচের জলের দরুন ট্যাক্সে হার অদল-বদল করে অথবা অর্থকর ফসলের উপর বিশেষ "সারচার্জ" বসিয়ে।

(৩) সরকারী উদ্যোগ থেকে মুনাফা—তৃতীয় পরিকল্পনায় এই বাবদ পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ৩৯৫ কোটি টাকা আর সে-জায়গায় চতুর্থ পরিকল্পনার আশা হচ্ছে ১০৮৫ কোটি টাকা অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের প্রায় তিন গুণ।

(৪) ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়—তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করেছিলেন ৯১৫ কোটি টাকা আর এবার সে জায়গায় এই বাবদ তোলার আশা করা হচ্ছে ১৫০০ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মারফৎ গতবার পাওয়া গিয়েছিল ৫৮৫ কোটি টাকা আর এবারের প্রত্যাশা হচ্ছে, ১০০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

(৫) অনুরূপভাবে রেলওয়ের উদ্বৃত্ত আয় থেকেও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশী টাকা তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমদানী হ্রাস করার জন্য, রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য অথবা অন্যান্য কারণে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে সরকার দেশের ভিতরে যোগান সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন এবং তার ফলে বাজার দর বাড়তে পারে। কমিশনের খসড়া পরিকল্পনায় বলা হয়েছে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মত বাঁধা মজুরী ও বেতনের শ্রমিক ও কর্মচারীদের এই মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ, আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, ন্যায়বিচারের জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে ছাড়া অন্য ঢালাওভাবে মজুরী বা বেতন বৃদ্ধি করা হবে না। কেননা, এতে "মুদ্রাস্ফীতির চাপ আরও বাড়বে।"

কমিশনের এই সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট তাৎপর্য হচ্ছে, চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ-ভাবে বাঁধা আয়ের কর্মচারীদের প্রকৃত আয় হ্রাস পাবে এবং এর প্রতিকার করার জন্য সরকার কিছু করবেন না।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরি-স্থিতিতে এইরকম একটা নীতি কার্যে পরিণত করার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব কি? জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিনব্যাপী বৈঠকে খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল, পরিষদ সেই পরিকল্পনা অনুমোদনও করলেন; কিন্তু পরিষদের আলোচনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, পরিষদ প্রশ্নটি আদৌ বিবেচনা করেছেন। অথচ সন্দেহ নেই যে, পরিষদে বিষয়টি সতর্ক-ভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। ভারত-বর্ষের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা পরিষদের সদস্য। তাঁরা পরিকল্পনার খসড়া অনু-মোদন করার আগে তার সমস্ত তাৎপর্য তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবেন, এ-প্রত্যাশা স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের আলোচনার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয়, মুখ্যমন্ত্রীরা পরিষদের সভায় বসে শুধু নিজ নিজ রাজ্যের জন্য আরও বেশী কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবী তুলে ও মামুলীভাবে পরিকল্পনার খসড়া অনু-মোদন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

যদি তাঁরা তা না করতেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই পরিকল্পনার সঙ্গতির প্রশ্নটি মনোযোগসহকারে পর্যালোচনা করতেন। পরিকল্পনা কমিশন যে-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করার প্রস্তাব করেছেন সে-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা, তা করতে হলে প্রশাসনিক কোন পরি-বর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা, এই সব প্রশ্ন ভালভাবে আলোচনা না করেই যদি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পরিকল্পনার খসড়া অনু-মোদন করে থাকেন তাহলে সে অনু-মোদনের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

(৩০)

মার্চ ১৯৩৯ সাল।

বোম্বাই পৌঁছে আমি আর সাধনা গিয়ে উঠলুম প্রথমে তাজমহল হোটেলে। টুকল, হেমন্ত এবং অন্যান্যরা ফোর্ট এলাকার অন্য একটি হোটেলে গিয়ে উঠল। তখনকার বোম্বায়ের সঙ্গে এখনকার বোম্বাই-এর আকাশ-পাতাল তফাৎ। তখন পশ্চিমদিগন্তে যুদ্ধের আগুন জ্বলেনি, আর সে সময় 'পাগড়ি' বা 'সেলামির' কথা কেউ চিন্তাও করেনি, সুতরাং গৃহ-সমস্যা এত নিদারুণভাবে দেখা দেয়নি। অর্থাৎ ফ্ল্যাট ভাড়া যথেষ্টই পাওয়া যেত।

ঠিক সমুদ্রের ধারে মেরিন ড্রাইভ হল সবথেকে অভিজাত পল্লী। তখন সবে নতুন নতুন বাড়ীগুলি উঠতে সুরু করেছে। মেরিন ড্রাইভের একটি বাড়ীতে সুন্দর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গেল। বাড়ীটির নাম ছিল 'স্যাটো মেরিন'—পাঁচখানা ঘর, তার মধ্যে দুখানা শোবারঘর, একখানা অফিসঘর, একখানা খাবারঘর, একখানা ড্রয়িংরুম। এছাড়া রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর এবং ভৃত্যদের থাকবার ঘর। সামনেই দিগন্তবিস্তারী সমুদ্র—ভাড়া মাত্র মাসে ৩৫০ টাকা। এখন ঐ রকম একটা ফ্ল্যাট তিরিশ হাজার টাকা সেলামি দিলেও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

দিন পনের 'তাজ'-এ থাকবার পর আমি আর সাধনা এই ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। সাধনার বাবা এলেন এবং কিছুদিন পরে মন্মথ এসে আমাদের ওখানেই উঠল।

মা
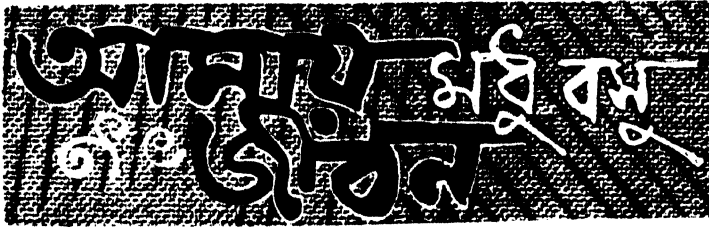
আগেই বলেছি মন্মথবাবুর গল্প—"কুমকুম দি ড্যান্সার" নিয়ে সাগর মুভীটোনের সঙ্গে আমাদের চুক্তিপত্রে সই হয়েছিল।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আমাদের আসবাবপত্রগুলি সব এসে পৌঁছে গেল—আর তার সঙ্গে এল আমার সেই প্রিয় 'হিলম্যান' গাড়ীখানি।

বোম্বায়ে তখন ঘরে ঘরে সব আধুনিক ফার্নিচার—আর আমাদের যত পুরনো সাবেকী ধরনের আসবাবপত্র নিয়ে কি ঘর সাজানো চলে? আমাদের মনের ভাবটা তখন এই যে এখানকার 'তারকা' পরিচালক ও অভিজাত সমাজের সঙ্গে যখন মিশতেই হবে তখন আসবাবপত্র সব আধুনিক না হলে লোকে বলবে কি? সেইজন্যে আধুনিক ফার্নিচার কিনে খাবার ঘর এবং ড্রয়িংরুম সাজালাম—এবং সেই সঙ্গে কিনলাম একটা এচ, এম, ভি রেডিওগ্রাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বেশ গুছিয়ে সংসার পাতলাম।

চিত্রনাট্য রচনার কাজ সুরু হয়ে গেল। মন্মথ ও হেমন্তের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা করতে করতে চিত্রনাট্যের কাজ এগুতে লাগল।

১৯৩৮ সালে যখন আমরা 'স্টেজ শো' করি বোম্বাইতে তখন বহু নামকরা মঞ্চ ও চিত্র-সাংবাদিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তার মধ্যে খাজা আহমেদ আব্বাস (কে, এ, আব্বাস) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তখন "বম্বে ক্রনিকল" পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনিই "কুমকুমে"র হিন্দি সংলাপ লেখবার জন্য ডবলু, জেড, আহমেদের নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং তাঁকেই আমি নির্বাচন করেছিলাম। আহমেদ ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান, তাকে কোন জিনিসই বেশী বার বলতে হোত না। খুব অল্প-সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষাও মোটা-মুটি শিখে ফেললেন।

প্রথমে চিত্রনাট্যের সংলাপগুলি লেখা হোত বাংলায়, তারপর সেগুলি আহমেদ হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করতেন। এইভাবে মাসখানেকের মধ্যেই চিত্রনাট্য রচনা সম্পূর্ণ হল। বাংলার গানগুলি অবশ্য হেমন্তই লিখেছিল।

সাগর মুভীটোনের স্বত্বাধিকারী শ্রীচিমনলাল দেশাই আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন শিল্পী, কলাকুশলী ও সঙ্গীতপরিচালক নির্বাচনে। তার ফলে আমি আমার মনোমত ব্যক্তিদের নির্বাচন করলাম। সঙ্গীতপরিচালকরূপে নির্বাচন করলাম তিমিরবরণকে। ক্যামেরা-ম্যান নির্বাচিত হলেন জয়গোপাল পিলাই। ইনি পাঞ্জাব ফিল্ম কোম্পানীর টেকনিক্যাল ডিরেক্টার ছিলেন—যাঁদের হয়ে আমি "খাইবার ফ্যালকন" ছবি করেছিলাম লাহোরে ১৯৩০ সালে—একথা আপনাদের আগেই জানিয়েছি। উভয় সংস্করণেই নায়কের ভূমিকায় আমি নির্বাচন করলাম ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। তারপর বাংলা সংস্করণের জন্য আমি নির্বাচন করলাম রবি রায়, নবদ্বীপ হালদার, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, লাবণ্য দেবীকে বাংলা দেশ থেকে। তখন বোম্বাই-এ অনেক বাঙালী শিল্পী কাজ করতেন হিন্দি ছবিতে—তাঁদের মধ্যে থেকে ঠিক করলাম পদ্মা দেবী, মণি চট্টোপাধ্যায়, ভুজঙ্গ রায়-চৌধুরী (কামতাপ্রসাদ নামে খ্যাত)

অবনী মিত্র প্রভৃতিকে। 'ব্যালে'র মেয়েরা বোম্বাই থেকে নির্বাচিত হল। সাধনাই তাদের শেখাবার এবং নৃত্যপরিকল্পনার ভার নিল।

সাগর মুভিটোনে তখন সুবিখ্যাত পরিচালক মেহবুব খাঁ নিয়মিত ছবি করছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ফাদুন ইরাণী। অনিল বিশ্বাস ছিলেন সাগরের বাঁধা মাইনে-করা সঙ্গীতপরিচালক। কোম্পানীর নিজস্ব অর্কেস্ট্রাও ছিল। তিমির অবশ্য কলকাতা থেকে কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রশিল্পীকে নিয়েছিল।

কলকাতা থেকে বোম্বায়ের চিত্রজীবন তখন খুবই জমকালো ছিল। সুতরাং আমার ঐ ছোট্ট 'হিলম্যান' গাড়ীতে করে স্টুডিও যাওয়াটা অনেকেই বিশেষ সুনজরে দেখত না। তারা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকত—ভাবটা এই যে—এ আবার একটা গাড়ী নাকি? আমারও কি রকম একটা সঙ্কোচ লাগত—তখনকার অন্যান্য ডিরেক্টার এবং তারকাদের বড় বড় গাড়ীর বাহার দেখে। সুতরাং তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে আমাকেও বাধ্য হয়ে একটা বড় গাড়ী কিনতে হোল।

কিনলাম একখানা পনটিয়াক, শুধু তাই নয়, মেম্বার হলাম ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার এবং উইলিংডন ক্লাবের। ওখানকার চিত্রজগতে 'জাতে' উঠতে হলে এই সব জৌলুষ দরকার, নইলে কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। 'ককটেল পার্টি' তো লেগেই থাকত—আমিও যেমনি নিমন্ত্রিত হতাম—তেমনি আমাকেও মাঝে মাঝে পার্টি দিতে হোত মাসে অন্তত একবার।

গ্রীষ্মকালে 'স্যাটো মেরিন'-এর ছাতের ওপর ব্যবস্থা করতাম। সমস্ত ছাতটা চাইনীজ লন্ঠন দিয়ে সাজানো হোত। একদিকে লম্বা খাবারের টেবিল—তার পাশেই পানীয়ের টেবিল (একটা ছোট-খাটো বার বললেও চলে) অন্যদিকে অতিথিদের বসবার জন্যে ছোট ছোট টেবিল।

সামনেই মেরিন ড্রাইভের শান্ত সমুদ্র—তার মৃদু-মন্দ বাতাস, জ্যোৎস্নালোকিত উন্মুক্ত আকাশের নীচে রেডিওগ্রাম থেকে ভেসে আসছে দেশী ও বিলাতী সংগীত—সমস্ত পরিবেশটাকে মনে হত স্বপ্নময়। তার ওপর অতি উপাদেয় খাদ্য ও পানীয়। অতিথিরা সকলেই বলত—এ যেন একটা ফেয়ারিল্যান্ড অর্থাৎ রূপকথার রাজ্য।

এক একটা পার্টিতে অতিথি অভ্যাগতদের সংখ্যা ৫০।৬০-এর কম হোত না। এঁদের মধ্যে যাঁরা খুব নামকরা তাঁদের ছাড়া বিশেষ আর কারো নাম আমার এখন মনে পড়ছে না। কিন্তু আমি যখন এই অধ্যায়টি লিখছিলাম তখন সাধনা এসে আমায় পুরো নামের তালিকা দিয়েছিল। তাদের সকলের নাম লিখতে গেলে অনেকখানি জায়গা চলে যাবে বলে বিশিষ্ট অতিথির নামগুলিই নীচে দিলাম :

লেডী রমা রাও এবং তাঁর দুই মেয়ে প্রেমা এবং শান্তা (শান্তা এখন সুলেখিকা হিসেবে খুব নাম করেছে) সাধনার বড়-মামা বিচারপতি এস. এন. সেন এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুজাতা সেন ও পরিবারের অন্যান্য সকলে, স্যার রিচার্ড ও লেডী টেম্পল, সিসিলি ও তাঁর স্বামী মিঃ সি. কে. দাফতারী (বর্তমান ভারতের এটর্ণী-জেনারেল—এঁদের কথা আগে বলেছি) সিসিলির বোন পামিলি (ভাল নাম প্রমীলা) এবং তাঁর স্বামী শ্রীনলিন সেন (উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্মচারী), মিঃ রসিদ (ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী) ও তারা বেগ, মিঃ ও মিসেস ডি. সি. গুপ্ত এবং তাঁদের পরিবার (কলকাতায় যখন ছিলেন এঁরা, তখন এঁদের মেয়েরা বিনীতা ও অনীতা সি. এ. পি ব্যালেতে বহুবার অংশগ্রহণ করেছিল), শ্রীমতী কৃষ্ণা ও রাজা হাতীসিং, মিঃ জেপসন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস জেপসন, ডাঃ এবং মিসেস সালধানা প্রভৃতি।

এ ছাড়া তো সাধনার বাবা থাকতেনই ওখানে। তারপর তিমিরবরণ, জয়গোপাল পিলাই, টুকলু, বুলবুল দেশাই এবং কয়েকজন নামকরা শিল্পী ও সাংবাদিক তো থাকতেনই।

খুব আনন্দকলরবের মধ্যে দিয়ে এই সব পার্টিগুলি হোত। কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে খরচের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। মাসের শেষে আর একটি পয়সাও উদ্বৃত্ত থাকে না—অর্থাৎ প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত!

আমাদের 'স্যাটো মেরিনে'র নীচের ফ্ল্যাটে থাকতেন বিখ্যাত গায়িকা বাঈ জদ্দন বাঈ। ইনি হলেন স্বনামধন্যা শিল্পী নারগিসের মাতা। নারগিস তখন খুব ছোট,
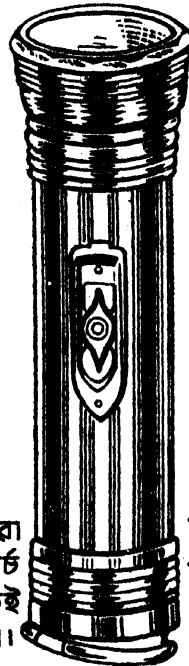
চিত্রজগতে প্রবেশ করেনি তখনও। সে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই আসত—সাধনা তাকে খুব ভালবাসত।

মাঝে মাঝে জদ্দন বাঈ-এর সংগে দেখা হোত। সত্যিকারের মহীয়সী মহিলা ছিলেন জদ্দন বাঈ—তাঁর অন্তঃকরণটি ছিল যেমন কোমল তেমনি বিরাট। দেখা হলেই আমি বলতাম : বাঈ জদ্দন বাঈ, কবে আমাদের মোগলাই খানা খাওয়াচ্ছেন বলুন? আর কবে গান শোনাচ্ছেন আমাদের?

—যেদিন খুশী বেটা তোমার সেদিনই চলে এসো। সস্নেহে বলতেন জদ্দন বাঈ।

একদিন সত্যিই তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন—খাওয়ার এবং গান শোনবার।

খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর গান সুরু হল—এবং একের পর এক অনেকগুলি গান তিনি গেয়ে চললেন। সমস্ত মনটা ভরে উঠেছিল তাঁর অপূর্ব কন্ঠের গান শুনে। বেশ মনে আছে—কি করে যে সময়টা কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। শেষে অনেক রাত্রে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেছিলাম।

এই 'স্যাটো মেরিনে'র দোতলায় থাকতেন চিত্রজগতের আর একজন মহারথী মিঃ এ, আর, কার্দার। কার্দারের সঙ্গে অবশ্য আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল —অর্থাৎ যখন ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোং 'সেলিমা' ছবি করি, তখন থেকেই। পরিচালক মেহবুব প্রায়ই আসতেন মিয়া কারদারের কাছে। মেহবুব ছিলেন কারদারের ভায়রাভাই অর্থাৎ কারদার স্ত্রী হলেন সর্দার আখতারের ভগিনী। মেহবুবও মানুষ হিসাবে খুব ভাল ছিলেন—এবং একজন খাঁটি মুসলমান। প্রতিদিন নমাজ পড়া তাঁর চাই-ই।

গোলাপদা (হিমাংশু রায়) তখন বম্বে টকীজের কর্ণধার—তাঁর স্টুডিও হল ম্যালাডে—বোম্বাই থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে। বম্বে টকীজের তখন দারুণ প্রসার প্রতিপত্তি—প্রায় প্রত্যেকখানি ছবিই 'হিট' বললেই চলে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী অকৃপণ-হস্তে যশ এবং অর্থ দুইই ঢেলে দিচ্ছেন। পালসাহেবও (নিরঞ্জন পাল) তখন বম্বে টকীজে—আমি অবসর পেলেই চলে যেতাম ম্যালাডে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ পুরোন দিনের মতো গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়া করে চলে আসতাম।

এই সময় যে সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে খুব অন্তরংগতা জন্মেছিল তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণা এবং রাজা হাতিসিং-এর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাই-এ এলেই উঠতেন গিয়ে তাঁর ছোট বোন কৃষ্ণার ওখানে।

আমার বেশ মনে আছে, যেদিন আমি প্রথম পন্ডিতজীকে দেখি, এবং তাঁর সংগে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়, সেও ছিল একটা নৈশভোজে'র পার্টি'—দিয়েছিলেন মিঃ ভাবা তাঁর মালাবার হিলের বাড়ীতে। এই মিঃ ভাবাই ছিলেন আমাদের সদ্য পরলোকগত বৈজ্ঞানিক হোমী জামসেদজী ভাবার পিতা।

মিঃ ভাবা এবং সাধনার বড়মামা বিচারপতি এস এন সেন একসঙ্গে বিলেতে ছিলেন এবং তাঁরা দুজনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রেই আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল এই নৈশভোজে। এই ডিনার-পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, তাঁর মেয়ে ডিনা ও জামাই নেভাল ওয়াদিয়া, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু, কৃষ্ণা ও তাঁর স্বামী রাজা হাতিসিং এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁদের নাম আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না।

মিঃ জিন্নার মত সুসজ্জিত মানুষ খুব কম দেখা যেত। দামী ইয়োরোপীয় পোশাক, চমৎকার ইংরাজী উচ্চারণ—সহজেই লোককে আকৃষ্ট করতে পারত। পন্ডিত নেহরুর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চিত্তজয়ী হাসি মনে একটা অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে।

ডিনারের পর আমরা সকলে ছাদের ওপরে গেলাম। নানাজাতীয় ফুলের টব এবং ছোট ছোট টেবিল দিয়ে ছাদটি সাজানো রয়েছে—ইংরাজীতে যাকে বলে 'রুফ-গার্ডেন'। একদিকে বসল বড়দের দল—আর একদিকে বসল আমাদের বয়সী যারা ছিল তারা। আমাদের টেবিলে ছিল কৃষ্ণা ও রাজা হাতি-সিং, ডিনা ও নেভাল ওয়াদিয়া, হোমি জামসেদজী ভাবা ও তার ছোটভাই, ও আরও দুই-একজন।

এই সময় একটা অভূতপূর্ব কান্ড ঘটেছিল—সে ব্যাপারটার কোন মূল্যই থাকত না, যদি না মিঃ ভাবার হঠাৎ বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হোত। ব্যাপারটা তাহলে বলি—

জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর আমার এবং সাধনার ঝোঁক অনেকদিন থেকেই। সে সময় সাধনা কিরো ও অন্যান্য জ্যোতিষীদের হস্ত-রেখার বইপত্র খুব পড়াশোনা করত আর অনেকেরই হাত দেখে ঠিক ঠিক বলে দিত। মিঃ হোমি ভাবার হাতও সে সেই টেবিলে বসে দেখেছিল।

মিঃ ভাবা জিজ্ঞেস করেছিল : কি দেখছেন মিসেস বোস?

সাধনা বলেছিল : আপনি আপনার ক্যারিয়ার-এর খুব উঁচুতে উঠবেন। যশঃ-রেখা আপনার খুব প্রবল—কিন্তু—

—কিন্তু কি—মিসেস বোস?

—না-না—ও কিছু নয়—প্রেমের ব্যাপার—এখন থেকে না জানাই ভাল—বলে হেসে সাধনা কথাটা উড়িয়ে দিল। কথাটা ওইখানেই চাপা পড়ে গেল।

বাড়ীতে এসে সাধনা আমায় বললে : জানো, হোমি ভাবার হাতে এমন একটা রেখা দেখেছি যার মানে হল—ওর মৃত্যু হবে কোন দুর্ঘটনায়। কিরো এবং অন্যান্য জ্যোতিষীরা ঐ একই কথা বলেন যে হাতে ঐ রেখাটা থাকলেই নাকি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

সাধনা বলল, আমিও শুনে গেলুম। তারপর একসময় ভুলেও গেলুম এ ঘটনার কথা.

তাই যেদিন মিঃ হোমি ভাবার মৃত্যু-সংবাদ দেখলাম কাগজে, যে কি দারুণ বিমান দুর্ঘটনায় ও'র জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়েছে সেইদিন সাধনার সেই ভবিষ্যদ্-বাণীটি মনে পড়ল।

* * *

ইতিমধ্যে "কুমকুমে"র বাংলা ও হিন্দি উভয় সংস্করণেরই চিত্রনাট্য তৈরী হয়ে গেল এবং শুটিং সুরু হল। সেটা হবে জুন মাস। শুটিং বেশ সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল। নতুন নতুন বহু বন্ধু-বান্ধবের সংগেও আলাপ পরিচয় হতে লাগল।

সবই সুন্দরভাবে এগুতে লাগল, কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অশান্তি মাঝে মাঝে উঁকি দেয়—মাঝে মাঝে মনটা উতলা হয়ে পড়ে যখনই মার কথা মনে পড়ে। মনে হোত, মা নিশ্চয় আমার কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করছেন। আমাকে ছেড়ে তিনি খুব শান্তিতে নেই। প্রায়ই মনে পড়ত মার কোমল অথচ করুণ মুখখানি। আসবার দিনে তাঁর সেই অশ্রুসজল দৃষ্টি আমাকে যেন সবসময় আনমনা করে তুলতে লাগল।

এইসময় স্টুডিওতে এক মহা গন্ডগোল দেখা দিল ক্যামেরাম্যান জয়গোপাল পিল্লেকে নিয়ে। জয়গোপাল যদিও কাজ খুব ভালই করত—যাকে বলে একেবারে প্রথম শ্রেণীর—কিন্তু সে ছিল একটু মন্থরগতি অর্থাৎ স্লো। সাগরের মালিক মিঃ দেশাই আমাকে ডেকে বললেন যে এত মন্থরগতি ক্যামেরা-ম্যান নিয়ে কাজ করলে ছবি শেষ হতে অনেক দেরী হবে আর চিত্রের নির্মাণ-ব্যয়ও অনেক বেড়ে যাবে। তাঁর স্টুডিওর নিজস্ব ক্যামেরাম্যান ফার্দুন ইরাণী ক্যামেরা-ম্যান হিসাবেও যেমন ভাল, কাজও তেমনি দ্রুত করেন। জয়গোপালের বদলে তাকে দিয়ে কাজ করাতে। জয়গোপালও থাকবে যতদিন না শুটিং শেষ হয় এবং তার চুক্তির টাকাও অবশ্য তাঁরা পুরোপুরিই দিয়ে দেবেন। কিন্তু ফার্দুন ইরাণীই ক্যামেরার কাজ করবে।

আমি বললাম : তা কি করে হয়? ওকে আমি নিজে থেকে ডেকে এনেছি—আর মাঝপথে তাকে বাদ দিয়ে আর একজন ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে কাজ করালে শুধু অভদ্রতাই করা হবে না, তার ভবিষ্যতটাও নষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি কিছুতেই শ্রীদেশাই-এর প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না।

এই নিয়ে বেশ মন-কষাকষি চলতে লাগল। শেষে শ্রীদেশাই ছবির কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখলেন। অর্থাৎ যতদিন না এই ব্যাপারের একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হয়, ততদিন শুটিং বন্ধ।

মন-মেজাজ দুই-ই খারাপ হয়ে গেল। শেষকালে কি ছবি শেষ হবে না? আমিও জিদ ধরে রইলাম যে, জয়গোপালকে বাদ

দিয়ে আমি ছবি করব না। আর এখানে শুধু জিদের কথা নয় একটা আদর্শের কথা, আর একজন কলা-কুশলীর ভবিষ্যৎ আমার হাতে।

এইরকম যখন আমার মানসিক অবস্থা ঠিক সেই সময় একদিন হঠাৎ রাত্রিবেলায় একটা 'ট্রাঙ্ক কল' পেলাম জ্ঞানাঙ্কুরের কাছ থেকে। সে জানাল যে মা'র হার্টের অবস্থা খুব খারাপ—স্যার নীলরতন সরকার মাকে দেখছেন এবং আমাকে খবর দিতে বলেছেন।

জ্ঞানাঙ্কুরকে টেলিফোনেই জানালুম যে আগামী কাল সন্ধ্যার ট্রেনে আমি রওনা হচ্ছি। এখানে অবশ্য বলে রাখা ভাল যে বোম্বাই থেকে কলকাতা তখন পর্যন্ত প্লেন সার্ভিস চালু হয়নি।

পরদিন সকালে গিয়ে আমি চিমনলাল দেশাইকে জানালুম আমার মার অসুখের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এও জানালুম যে আমাকে আজই যেতে হবে। শ্রীদেশাই আমার মানসিক অবস্থা বুঝলেন এবং অনুমতিও দিলেন। আমার অনুপস্থিতিতে ছবির কাজ বন্ধ থাকবে জেনেও অনুমতি দেওয়া ছাড়া এ-অবস্থায় তাঁর অন্য কোনো উপায় ছিল না।

সাধনার বাবা তখন বোম্বাইতে আমার ওখানেই ছিলেন—তাঁর ওপরেই সাধনার দেখাশোনার ভার দিয়ে আমি সন্ধ্যার ট্রেনেই কলকাতা রওনা হলুম। সেটা হবে জুলাই মাসের গোড়ায়।

হাওড়া পৌঁছে একেবারে সোজা গণেশ ম্যানসনে মার কাছে গিয়ে হাজির হলুম। আমাকে দেখে মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে ও উত্তেজনায় তাঁর চোখের জলে আমার জামা ভিজে গেল। দেখলাম যে এই চার মাসের মধ্যে মা খুব রোগা হয়ে গেছেন, আর খুব দুর্বল হয়ে গেছেন।

আমি সপ্তাহখানেক রইলাম। এই ক'দিনে মা অনেকটা সামলে উঠলেন। প্রথমে মাকে দেখছিলেন ডাঃ দেবেন ব্যানার্জি। তারপর যখন হার্টের অসুখটা একটু বাড়াবাড়ি হোলো তখন স্যার নীলরতন সরকারও রোজ আসতেন মাকে দেখতে। স্যার নীলরতনের সঙ্গে যে আমাদের পরিবারের একটা গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল সে কথা আগেই বলেছি। মাকে কিছুটা ভাল হয়ে উঠতে দেখে স্যার নীলরতন বললেন : এখন বিপদ কেটে গেছে, এখন তুমি বোম্বাই ফিরে যেতে পার। ওখানে তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে—কতদিন আর বসে থাকবে? বর্তমানে ভয়ের কোনো কারণ নেই—তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

স্যার নীলরতনের কাছে এই আশ্বাস পেয়ে আমি আবার বোম্বাই যাবার জন্য তৈরি হলাম। মার কাছে বিদায় নেবার সময় মা বেশী কিছু বলতে পারলেন না। শুধু অঝোর ধারায় চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। শুধু বললেন : "নিজের শরীরের যত্ন করিস বাবা। ভগবানে বিশ্বাস রাখিস।" এই তাঁর শেষ কথা।

কি জানি কেন আমারও তখন মনে হয়েছিল—যে আর হয়ত মার সঙ্গে দেখা হবে না। এই দেখাই শেষ দেখা। চলে আসতে একেবারেই মন চাইছিল না—কিন্তু যে বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি, তাতে এখানে বেশীদিন থাকলে কর্তৃপক্ষের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে। এবং আমার ইউনিটের লোকেরাও টাকা পয়সা না পেয়ে বিপদে পড়বে। এইসব ভেবে আবার আমাকে বোম্বাই রওনা হতেই হল।

আমার বড়দি এবং সেজদি তখন বিলেতে, আর মেজদি এবং ন'দিও তখন কলকাতার বাইরে—একমাত্র ছোড়দি (অর্থাৎ উমাদি) ও জ্ঞানাঙ্কুরবাবু তখন কলকাতায় ছিলো। ছোড়দি, জ্ঞানাঙ্কুর এবং আমার মামা (অজয় দত্ত)—প্রায় রোজই আসতেন এবং দেখাশোনা করতেন। মামা তো মার দেখাশোনা করবেনই, কারণ বড়দি-অন্তপ্রাণ ছিলো তাঁর—আর ছোড়দি যে মার যথাসাধ্য সেবা যত্ন করবে, সে ত খুবই স্বাভাবিক কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুর জামাই হয়ে যেরকম সেবা-যত্ন এবং দেখাশোনা করেছিল, সেরকম আমি কলকাতায় থাকলেও, তার বেশী কিছু করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

বোম্বাই ফিরে গিয়ে দেখি শ্রীচিমনভাই দেশাই তখনও তাঁর মত পরিবর্তন করেননি। অর্থাৎ জয়গোপাল পিলেকে না সরালে 'কুমকুম'র কাজও আর সুরু হবে না। এজন্যে এ ইউনিটের কর্মীদের মাস-কাবার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনো টাকা-পয়সা দেওয়া হয়নি। আমি বোম্বাই যেতেই কর্মীরা সব আমার কাছে তাদের দুরবস্থার কথা জানাল। আমি দেখলাম মহা মুস্কিল। দেখা করলাম চিমনভাই-এর ভাই ঈশ্বরভাই দেশাইর সঙ্গে। তিনি মধ্যস্থতা করায় ব্যাপারটা মোটামুটি একটা নিষ্পত্তি হল। আমি অনেক করে বললাম—একটা লোকের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নষ্ট করাটা কোনোমতেই উচিত নয় মানবিকতার দিক থেকে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম জয়গোপাল যাতে আরো দ্রুত কাজ করে তারজন্যে দায়ী রইলাম আমি। এই প্রতিশ্রুতিতে কাজ হলো—চিমনভাই নরম হলেন। এবং আবার কাজ আরম্ভ হলো পূর্ণোদ্যমে। অবশ্য আমার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা জয়গোপাল রেখেছিল—সেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ফাস্ট হবার।

যাক, শুটিং আবার আরম্ভ হল। ইউনিটের লোকজনেরা টাকা-পয়সা পেল তাদের মুখে আবার হাসি ফুটল। আমার কিন্তু কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর থেকে মনটা বড় অস্থির হয়ে ছিল—কোন কাজে মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম না। সবসময় মার কথা মনে পড়ত। আসবার সময় যদিও জ্ঞানাঙ্কুরকে বলে এসেছিলাম একদিন অন্তর যেন সে 'ট্রাঙ্ক-কলে' মার সমস্ত খবরাখবর দেয়—সেও একদিন অন্তর আমাকে টেলিফোন করত। শুনতাম মার শরীর কখনও ভাল আবার কখনও খারাপের দিকে।

এইভাবে কিছুদিন চলল। তখন জুলাই মাসের শেষাশেষি—শুটিং চলছে পুরোদমে। একদিন আমি সকালবেলা একাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছি স্টুডিওতে—সাধনার সেদিন শুটিং ছিল না—অন্য শিল্পীদের ছিল। দুপুরবেলায় লাঞ্চের সময় যখন আমি খেতে বসেছি, তখন দেখি আমার পুরাতন ভৃত্য চামান শুকনো ম্লান মুখে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : চামান, তোমার চেহারা এরকম শুকনো-শুকনো দেখছি কেন? তবিয়ৎ ঠিক আছে তো?

সে ছোট্ট করে জবাব দিল, হ্যাঁ সাহেব, ঠিক আছে।

দেখলাম তার গলাটা যেন ধরা-ধরা। আমি তাকে ফের জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে কি হয়েছে কি?

সে কিছু না বলে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমারও মনের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা কাঁটার মত খচ-খচ করতে লাগল। শুটিং শেষ করার পর সোজা একেবারে বাড়ী চলে এলাম। বাড়ী ফিরতেই সাধনার বাবা প্রথম আমায় খবরটা দিলেন। আমি সকালে স্টুডিও চলে যাবার পরই জ্ঞানাঙ্কুরের কাছ থেকে একখানি টেলিগ্রাম এসেছে। তাতে লেখা আছে মাত্র ক'টি কথা :

Mother Passed Away Last Night.

মাত্র এই ক'টি কথা—কিন্তু এরই মধ্যে যেন দুনিয়ার সমস্ত বেদনা একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে আমার মনের ওপর আঘাত করতে লাগল। রাত্রে জ্ঞানাঙ্কুরকে 'ট্রাঙ্ক-কল' করলুম। জ্ঞানাঙ্কুর বললে : টেলিফোনে আমি তোমায় কি বলব? এ দুঃসংবাদ তোমায় আমি মুখে বলি কেমন করে? তাই টেলিগ্রাম করেছি।

এ শোকের পরিমাপ নেই, কাউকে বলে বোঝান যায় না—যে সন্তানের কাছে মার মূল্য কতখানি, বিশেষ করে আমার কাছে। ছোটবেলা থেকে মা-ই আমার একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র বন্ধু। কত অন্যায় আবদার করেছি—কত জিদ ধরেছি—তাঁর মনে ব্যথাও দিয়েছি। আবার বিপদের সময় ছুটে গেছি তাঁর কাছে। তিনি দুহাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছেন বুকে। তাঁর স্নেহের স্পর্শে আমার সব বিপদ কেটে গেছে।

আজ তিনি নেই। একথা ভাবতেই আমার মন চাইছিল না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি আমায় পথ দেখিয়েছেন। তার স্নেহের আলোতে আমার চলার পথ হতো উজ্জ্বল—আজ সেই আলোকশিখা চিরতরে নিভে গেল।

(ক্রমশঃ)

আজকের কথা :

চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে
তথ্য ও বেতারমন্ত্রী রাজ বাহাদুর :

পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার চতুর্থ সমাবর্তন উৎসবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী রাজ বাহাদুর তাঁর সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে সমাজকল্যাণে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে যে মূল্যবান উক্তি করেছেন, তা চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। শ্রীরাজ বাহাদুর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেন: বেন জনসনের মতে যে কোনও শিল্পের শত্রু হচ্ছে অজ্ঞতা। তাই আপনাদের মধ্যে যাঁরাই চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজে ব্রতী হবেন, তাঁদেরই কাছে আমার অনুরোধ, আপনাদের শিল্পকে আপনারা সর্বদিক দিয়ে এই অজ্ঞতা-দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার কাজে নিযুক্ত করুন। আমাদের মতো নিরক্ষরতায় পরিপূর্ণ দেশে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা ও তথ্য পরিবেশন করার জন্যে আপনাদের শিল্পমাধ্যমকে ব্যবহার করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সমাজসেবায়, শিল্পকে নিয়োজিত করার মধ্যে আমি কোনও অন্যায় দেখতে পাই না। কিন্তু এই কাজ এমন সুকৌশলে সম্পন্ন করতে হবে যে, তা যেন একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক ও শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে। মানুষকে আকৃষ্ট করবার জন্যে ছবির মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রমোদোপকরণ থাকা দরকার। ...কাজেই চলচ্চিত্র নির্মাণকালে চিত্তবিনোদনকারিতার সঙ্গে শিল্প সৃষ্টির উদ্বাহবন্ধনের প্রয়োজন আছে।... আজকের কঠিন প্রতিযোগিতাপূর্ণ চলচ্চিত্র জগতে সুনাম অর্জন করতে হলে জীবন সম্পর্কে উচ্চ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই চিত্র নির্মাণ করলে সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক।

মূলত ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও ভারতের যে কোনও চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীরাজ বাহাদুরের কথাগুলি মনে রাখলে উপকৃত হবেন। জনসাধারণের ওপর চলচ্চিত্রের ব্যাপক এবং অমোঘ প্রভাবের কথা স্মরণে রেখে একথা বলা বোধকরি অসঙ্গত নয় যে, একটি ছবি তৈরীর সময়ে তাকে মাত্র চিত্তবিনোদনের বাহন করে না তুলে জনগণের সামনে একটি উচ্চ আদর্শ স্থাপনের মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। সমাজকল্যাণে শিল্পের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

আগামী বহু ছবির শিল্পী গীতাঞ্জলি রায় — ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

(১) **শেষ তিন দিন** (বাংলা): এম বি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন, ৩,৭২৩·৪৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা: জয়দেব বাসু; পরিচালনা: প্রফুল্ল চক্রবর্তী; কাহিনী: মিহির সেন; চিত্রনাট্য: মিহির সেন ও প্রফুল্ল চক্রবর্তী; সঙ্গীত পরিচালনা: অতীন চট্টোপাধ্যায়; গীত রচনা: মিণ্টু ঘোষ; চিত্রগ্রহণ: দীনেন গুপ্ত; শব্দানুলেখন: অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা: শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা: রামচন্দ্র সিন্ধে; সম্পাদনা: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; নেপথ্যকণ্ঠসঙ্গীত: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য; রূপায়ণ: অনুপকুমার, তরুণকুমার, জহর গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, প্রেমাংশু বসু, দ্বিজু ভাওয়াল, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, গৌর শী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতাঞ্জলি রায়, অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী (বড়), গীতা দে, আরতি দাস প্রভৃতি। সুরঞ্জনার পরিবেশনায় গেল ২৬-এ আগস্ট, শুক্রবার

থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সারা বিশ্বের লোক যখন আণবিক মারণাস্ত্রের বিধ্বংসী শক্তি সম্পর্কে রীতিমত আতঙ্কের মধ্যে অহর্নিশ যাপন করছে, তখন নবীন কাহিনীকার মিহির সেন পাঠকবৃন্দকে চমৎকৃত করলেন ঐ আণবিক মারণাস্ত্র ক্ষেপনকে সুনিশ্চিত জেনে পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে উপজীব্য করে লিখিত তাঁর রম্য রচনা 'শেষ তিন দিন' উপহার দিয়ে।

বাংলা চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে নবাগত জয়দেব বসুকে সাধুবাদ জানাব এই জন্যে যে, তিনি এই নূতনত্বপূর্ণ সময়োপযোগী কাহিনীটির চিত্রসম্ভাবনাকে সুনিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং বাংলাদেশে এই ধরণের কাহিনীর চিত্রপ্রদানে সুযোগ-সুবিধার সমূহে সংকীর্ণতা সত্ত্বেও আমাদের একটি সুষ্ঠু অভিনব ও প্রচুর উপভোগ্য ছবি উপহার দিতে সমর্থ হয়েছেন।

বাস্তবিকই 'প্রতিনিধি' পত্রিকার বার্তা-সাংবাদিক গোপাল সেন যে মুহূর্তে

সুবোধ মিত্র পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-র একটি মুহূর্তে অচলার রূপসজ্জায় সুচিত্রা সেন ও মৃণালের রূপসজ্জায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে 'প্রচন্ড শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ করে সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করা সম্বন্ধে দুই পাইলটের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার' বিবরণ তাঁদের পত্রিকার বিশেষ সংস্করণে প্রকাশ করলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই শহরে তথা বিশ্বের সর্বত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে প্রতিক্রিয়াসূচক আলোড়ন শুরু হল, সেই আলোড়নের পর্যায়ক্রমিক রূপটি অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে, এই 'শেষ তিন দিন' ছবিটির মাধ্যমে। প্রথম দিনে পাইলটদের সদম্ভ উক্তি সম্পর্কে বহু মানুষের মনের অবিশ্বাস, পরে আসন্ন ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা, বেঁচে থাকবার জন্যে মানুষের আপ্রাণ প্রচেষ্টা, অপর পক্ষে সরকারের তরফ থেকে আতঙ্কিত জনতাকে মনোবল না হারাবার জন্যে বারংবার অনুরোধ; দ্বিতীয় দিনে ধ্বংস অনিবার্য জেনে পৃথিবীর মানুষের শেষবারের মতো উন্মত্তভাবে জীবন সম্ভোগের স্পৃহা, সাধারণ সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চূড়ান্ত অবসরপ্রাপ্ত জনগণের সভ্যতার আড়ালে চাপা দেওয়া আদিম মূর্তি প্রকট

লাভ ইন টোকিও চিত্রে জয় মুখার্জি ও আশা পারেখ

হয়ে ওঠা লুটেপাট, রাহাজানি, মত্ততা, যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার মাধ্যমে অপর পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মিলিতভাবে ঐ দুর্দৈব এড়ানোর চেষ্টায় বারংবার অসাফল্য। সব শেষে তৃতীয় এবং চরম দিন; মারণাস্ত্র ক্ষেপনের নির্ধারিত সময় বেলা বারোটার দিকে ঘড়ির কাঁটা যতই এগিয়ে চলেছে, ততই আতঙ্কগ্রস্ত জনসমুদ্র আছড়ে পড়তে চাইছে তাদের বাঁচবার অধিকারের আবেদন নিয়ে সেই মৃত্যুরই মতো করাল পাইলটদের বিবেকের পায়ে; যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রপ্রধানদের সরিয়ে দিয়ে তারা নিজেরাই রেডিও মারফত করুণ আবেদন জানায় পাইলটদের কাছে তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে। এই চরম আবেদনের ফল কি হল, তাই নিয়েই ছবিটির চরম উত্তেজনাপূর্ণ শেষ দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।

দর্শকমনে ক্রমবর্ধমান কৌতূহল জাগ্রত করবার এবং ঘটনাবলীকে শেষ পর্যন্ত একটি চরম ক্লাইম্যাক্সের মুখোমুখী দাঁড় করাবার জন্যে যে সুকৌশলে দৃশ্যের পর দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তা চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচায়ক। মাত্র ধনীকন্যা মিলির সঙ্গে রিপোর্টার-হিরো গোপালের প্রেম এবং তার মাঝখানে কৃষ্ণা বড়ুয়ার অনিবার্য উপস্থিতির ফলে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটাকে আরও সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সম্ভাব্যভাবে চিত্রিত করা হত, তাহলে 'শেষ তিন দিন'-এর চিত্রনাট্যটি পুরোপুরির নিখুঁত হয়ে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিটিও কিছু কিছু জায়গায় থমকে না দাঁড়িয়ে তার দ্রুত গতিশীলতাকে অটুট রাখতে পারত।

অভিনয়ের দিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বার্তাজীবী গোপাল সেন রূপী অনুপকুমার কাহিনীটির নায়ক বেশে দর্শকদৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছেন বেশী। সাধারণত তিনি হাল্কা হাসির চরিত্রে অবতীর্ণ হন; কিন্তু এই বিশেষ ভূমিকাটিকে হাল্কা বা গুরু-গম্ভীর বলে বিশেষ করে চিহ্নিত করা উচিত হবে না। গোপাল সেন হচ্ছে সাধারণ রক্ত-মাংসে গড়া একটি জীবন্ত মানুষ এবং এই মানুষটিকেই শ্রীমান অনুপকুমার অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। ছায়াছবির জীবনে এটি তাঁর বিশেষভাবে স্মরণীয় ভূমিকা। গোপাল সেনের বিমান সহযাত্রিণী কৃষ্ণা বড়ুয়ার স্নিগ্ধ সুমিষ্ট চরিত্রে অত্যন্ত সংযত ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন সুমিতা সান্যাল। গোপালের প্রতি কৃষ্ণার ক্ষণিক দুর্বলতা প্রকাশের মুহূর্তটি এবং পরে এই দুর্বলতা প্রকাশের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার দৃশ্যটিও অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়েছে তাঁর দ্বারা। গোপালের পড়াশুনো-ভক্ত ও কুনো বোন ইতির আবনর্মাল চরিত্রটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। আগেই বলেছি, ধনীকন্যা মিলির চরিত্রটি বেশ স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যভাবে কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়নি, কাজেই শক্তিশালিনী অভিনেত্রী গীতালি রায়কেও এই চরিত্রটির রূপ দিতে গিয়ে যে যথেষ্টই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা বেশ অনুভব করা যায়। আপাতঃ স্থিরবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ বিশ্বদার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন কৃতী অভিনেতা তরুণকুমার। পৃথিবীকে নিশ্চিত-ভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখী জেনে বিশ্বের চরিত্রবিপর্যয় ঘটা—তার আকস্মিকভাবে সন্ত্রাসগ্রস্ত হয়ে পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করেছেন তিনি। ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ দুই হাল্কা হাসির চরিত্র—লাল-মোহন ও গোবর্ধন রূপে উপভোগ্য অভিনয় করেছেন যথাক্রমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। এছাড়া অপরাপর চরিত্রে প্রেমাংশু বসু (খেপে শিল্পী সোমেন), বিপিন গুপ্ত (মিলির ধনী ব্যবসায়ী পিতা), রেণুকা রায় (প্লেনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের স্ত্রী), হরিধন মুখোপাধ্যায় (রেস্তোরাঁর মালিক), মন্মথ মুখোপাধ্যায় (বৃদ্ধ ভিখারী), গীতা দে (সন্তানের আর্ত জননী)। অপর্ণা দেবী (গোপালের মা), গৌর শী (ভোটের দালাল) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে মোটামুটি একটা উচ্চমান রক্ষা করবার প্রয়াস দেখা যায়। ছবিতে বহু জনতার দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণও পরিচালনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো জায়গায় দীনেন গুপ্তের ম্যুভ ফোটোগ্রাফী' প্রশংসনীয়। ছবির শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচায়ক। আবহ-সঙ্গীত কাহিনীর আতঙ্ক প্রকাশে সাহায্য করেছে।

কাহিনীর সময়োপযোগিতা এবং অভিনবত্বে, সুষ্ঠু চরিত্র-চিত্রণে এবং সামগ্রিক গতিশীলতায় 'শেষ তিন দিন' বাংলা চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

(২) **সম্রাট** (হিন্দী): জি সি ফিল্মস-এর নিবেদন; ৩,৮৪৫-০৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা: ও পি গধোক ও বি এস চৌধুরী; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: মহীন্দ্র সভেরওয়াল; কাহিনী: রাজ কাটিয়াল; সঙ্গীত পরিচালনা: হেমন্তকুমার; গীতরচনা: গুলজার; চিত্রগ্রহণ: মার্শাল বাগাঞ্জা; শব্দানুলেখন: প্র থ্যাকারসে; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ পুনর্যোজনা: রবীন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প নির্দেশনা: টি কে দেশাই; সম্পাদনা: বাবুলাভাণ্ডে; নৃত্য পরিচালনা: সত্য-নারায়ণ; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত: লতা মঙ্গেশকর ও হেমন্তকুমার; রূপায়ণে: তনুজা, বীণা, পূর্ণিমা, প্রতিমা দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড, রাজ মেহরা, অসিত সেন, জগদীপ, দুর্গা সিং, রবিকান্ত, ভোলা প্রভৃতি। ছায়ালোক (প্রা) লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৬-এ আগস্ট থেকে অপেরা, বসুশ্রী, বীণা, ক্রাউন এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

গীতাঞ্জলী পিকচার্স প্রযোজিত এবং পরলোকগত বীরেন নাগ পরিচালিত 'বিশ সাল বাদ' ('জিঘাংসা'র হিন্দী সংস্করণ) থেকে হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে যে রহস্য-রোমাঞ্চভরা সঙ্গীতবহুল চিত্রের আমদানি হয়েছে, তার সমাপ্তি কোনো দিন ঘটবে কিনা কে জানে? 'গুমনাম', 'উও কোন থী?', 'ইয়ে রাত ফির না আয়েগী', 'মেরা সায়া' প্রভৃতি বহু সাদা-কালো ও রঙীন ছবিই একজন রহস্যময়ী নারী ও মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। জি সি ফিল্মস-এর সাদা-কালো চিত্র 'সম্রাট' এই বহু ব্যবহৃত ছকে তৈরী চিত্রগোষ্ঠীতে আর একটি সংযোজন।

কুমার বিজয় সিংয়ের প্রিয়তমা পত্নী যখন আবিষ্কার করল যে, তার স্বামী বেশী সরোজিনীও কুমারকেই ভালোবাসে, তখন সে নিজে সরে দাঁড়িয়ে সরোজিনীকে নিজের ছদ্মবেশে কুমারের সঙ্গে মিলিত হবার

পরলোকে অভিনেত্রী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮শে আগস্ট বিলাতের এডিনবরা হাসপাতালে একটি অস্ত্রোপচারের পর পরলোকগমন করেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত ২৬ তারিখে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। চিত্রপ্রযোজক শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর স্বামী। একটি পুত্র এবং একটি কন্যা তিনি রেখে গেছেন।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন 'নিদ্রিত ভগবান' নির্বাক চিত্রে। নায়িকা চরিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন 'কাশীনাথ' চিত্রে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির নাম হলঃ 'দুই পুরুষ', 'বিরাজ বৌ', 'দৃষ্টিদান', 'সমাপিকা', 'নার্স সিসি', 'অঞ্জনগড়', 'দত্তা', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লী-সমাজ', 'শুভদা', 'প্রাতভোর', 'ছবি', 'উল্কা', 'মায়ামৃগ' প্রভৃতি। তাঁর শেষ অভিনীত ছবি 'অশ্রু দিয়ে লেখা'। অভিনেত্রী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক আত্মার শান্তি কামনা করি।

াগ করে দিল। কিন্তু কুমার বিজয় সিং নবীবোশনী সরোজিনীর সঙ্গে প্রতারণা র যখন নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ র সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন, ন সরোজিনী এই প্রতারণার জন্যে রকে সমুচিত শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর এবং বহু বছর অপেক্ষা করবার পরে উৎসবমুখর রাত্রে তাঁকে হত্যা করে মিয়ে অন্তর্হিত হল। কুমারের দেওয়ান ল তাঁর স্ত্রীর অনুগৃহীত। তিনি বলেন, দেওয়ানই তাঁকে হত্যা করেছে। চ খোলাখুলিভাবে এ ব্যাপারে আলোচনা ওয়া অসম্ভব। অপর দিকে আবার মারের হত্যার অব্যবহিত পরেই পদ্মিনী-পিণী সরোজিনীও নিহত হয়েছিল। ফলেই কুমার বিজয় সিংয়ের হত্যার কিনারা া পুলিশ এবং বিজয় সিংয়ের পত্র জয়ের পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। দেওয়ানের মেয়ে লতা তার ঠাকুমার সঙ্গে বজয় সিংয়ের পরিত্যক্ত প্রাসাদ-দুর্গে বাস রে। অজয়ের কাছে এই প্রাসাদ-দুর্গটিই কেমন অত্যন্ত রহস্যজনক ঠেকতে লাগল। ক করে বহু অনুসন্ধানের পরে অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে অজয় শেষপর্যন্ত এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছিল, তাই নিয়েই চিত্র-কাহিনীটি রচিত।

'সন্নাটা' ছবি রহস্যঘন সাসপেন্সধর্মী চিত্রের শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। যে হত্যাকান্ড নিমিষে সংঘটিত হয়ে গেল, এর প্রকৃত অপরাধী কে তা ছবির প্রায় শেষ পর্যন্ত কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি, একমাত্র সন্ধানকারী অজয় ছাড়া ছবির অন্যান্য প্রত্যেকটি চরিত্রকেই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করবার ব্যবস্থা আছে, অকুস্থলের কাছাকাছি বিজনবনে গান গেয়ে ফেরে কোন রহস্যময়ী রমণী, সে সম্পর্কেও কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে; এছাড়া অহেতুক পদশব্দ, রহস্যঘন আওয়াজ ইত্যাদিরও সমাবেশ আছে। এর ওপর এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটা রহস্যময় 'চুপ-চুপ' ভাব বা অর্থবহ নৈঃশব্দ্য, যার হিন্দী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সন্নাটা'—তাও ছবিটির যত্রতত্র বিরাজ করছে। এই নৈঃশব্দ্য আবার কোথাও কোথাও আবহ-সঙ্গীতকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়েও আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই চেষ্টা যে সর্বত্র সার্থক হয়েছে, তা মনে করতে পারছি না।

এ ধরনের রহস্যমূলক চিত্রে শিল্পীদের কাছ থেকে খুব বেশী রকম নাট-নৈপুণ্য আশাই করা যায় না; কারণ এর কাহিনীর দৃষ্টি এমন যে, গুরু-গম্ভীর নাটকীয় পরিস্থিতি এতে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। এ অবস্থায় নায়ক অজয়ের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় সতর্ক দৃষ্টি ও সজাগ মন নিয়ে রহস্য উদ্ঘাটনের পথে এগিয়ে গেছেন বেশ সপ্রতিভ ও স্বাভাবিকভাবে। নায়িকা লতার চরিত্রে তনুজাও রহস্যময়ী সংগীতনিপুণা নারীর চরিত্রটিকে যথা-সম্ভব জীবন্ত করবার চেষ্টা করেছেন। দেওয়ানের ভূমিকায় রাজ মেহরা, গোপীচাঁদ বেশে ডেভিড, সরোজিনী ও পদ্মিনীর

অনন্ত-ভূমিকার বাণী, কুমারশঙ্কররূপে পূর্ণিমা এবং লতার বন্ধ্যা ঠাকুমার চরিত্রে প্রতিমা দেবী স্ব-স্ব নাটনৈপুণ্যের যথাসম্ভব পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিটির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসা পাবার যোগ্য শিল্পনির্দেশনা। কাহিনীর যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে টি কে দেশাইয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি। সম্পাদক বাবুলাভাণ্ডে ছবির সাসপেন্সটিকে বজায় রাখবার জন্যে যথেষ্ট গতিশীলতার দিকে নজর রেখেছেন সার্থক-ভাবে। ছবির গানগুলিতে সুরযোজনায় তেমন কোনো নূতনত্ব না থাকলও আবহ-সঙ্গীত রচনায় কাহিনীর প্রয়োজনের দিকে অনেকখানি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

জি সি ফিল্মস প্রযোজিত এবং নবাগত মহীন্দ্র সভেরওয়াল পরিচালিত 'সন্নাটা' সাসপেন্সধর্মী রহস্যচিত্র হিসেবে সার্থকতা দাবি করতে পারে।

—নান্দীকর

কলকাতা

'বিসর্জন' নাটকের চলচ্চিত্রায়ন

রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় নাটক 'বিসর্জন' বর্তমানে চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন পরিচালক বীরেশ্বর বসু। সম্প্রতি সঙ্গীত পরিচালক কালীপদ সেন এ ছবির পাঁচটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গ্রহণ করেছেন। কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন চৌধুরী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও সুমিত্রা সেন। মহালক্ষ্মী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের এ চিত্রে নায়কের ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন নবাগত অভিনেতা আনন্দ। দুটি প্রধান চরিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সুমিতা সান্যাল ও শমিতা বিশ্বাস।

একটি ভোজপুরী চিত্রের শুভমহরৎ

গত ২১শে আগস্ট ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় ভোজপুরী চিত্র 'ভর দে ফুলুয়াসে আঁচারায়া'র শুভমহরৎ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ছবিটির পরিচালনা করছেন কাত্যায়ন। কাহিনী, সংলাপ ও সঙ্গীত রচনা করেছেন রামচন্দ্র আসি। এ ছবির বিশেষ সম্পদ হল সঙ্গীত। প্রাকৃতিক পরিবেশে লোকগীতির বিভিন্ন সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করবেন নবাগত সঙ্গীত পরিচালকদ্বয় রবীন্দ্র-প্রশান্ত। প্রধান চরিত্রে নবাগত শিল্পীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে। আলোকচিত্র গ্রহণ এবং সম্পাদনায় রয়েছেন মুরারী ঘোষ ও রমেশ যোশী।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'শঙ্খবেলা'

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত অনুরাধা ফিল্মসের 'শঙ্খবেলা' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। অগ্রগামী পরিচালিত এ চিত্রের প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, শোভা সেন, তরুণকুমার ও নবাগত মৃণাল মুখোপাধ্যায়। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। ছায়াবাণী ছবিটির পরিবেশক।

তপন সিংহ পরিচালিত 'গল্প হলেও সত্যি'

নিউ থিয়েটার্স এক্জিবিটার্স প্রযোজিত 'গল্প হলেও সত্যি' চিত্রের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবার পর ছবিটি বর্তমানে শুভমুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। এ ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন তপন সিংহ। প্রধান চরিত্রাবলীতে অংশগ্রহণ করেছেন যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ বসু ও রমা দাস। পরিবেশনায় রয়েছেন ছায়াবাণী।

বোম্বাই

কে, এ, আব্বাসের পরবর্তী ছবি 'বোম্বাই রাত কী বাহু মেঁ'

প্রযোজক-পরিচালক খাজা আহমদ আব্বাসের পরবর্তী ছবিটির নাম 'বোম্বাই রাত কী বাহু মেঁ'। স্বরচিত কাহিনীর নায়ক-নায়িকা চরিত্রে দুই নবাগত শিল্পী এ ছবির জন্য মনোনীত হয়েছেন। এই দুই নবাগত শিল্পী হলেন পার্সিস খাম্বাটা এবং বিমল আহুজা। ছবির সুরযোজনা করবেন সঙ্গীত পরিচালক জে. পি কৌশিক।

কে, পি, কে, মুভিজের নতুন ছবি 'পূর্ব পশ্চিম'

কেওল কাশ্যপ প্রযোজিত কে. পি. কে মুভিজের নতুন রঙিন ছবিটির নাম 'পূর্ব পশ্চিম'। নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মনোজকুমার। ছবিটির দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে এ মাসের পনেরো তারিখ থেকে। ছবির পরিচালক রাম শর্মা। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

'তামান্না' চিত্রে মালা-বিশ্বজিৎ

সুরজ প্রকাশ শেঠ প্রযোজিত কে. এস পিকচার্সের নতুন ছবি 'তামান্না'র চিত্রগ্রহণ এ মাস থেকেই শুরু হচ্ছে। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ ও মালা সিনহা। পার্শ্ব চরিত্রে থাকবেন ওমপ্রকাশ, সুলচনা এবং কৃষ্ণকুমারী। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবির সুরকার। ছবিটি পরিচালনা করছেন কে, পি, আত্মা।

আর, ডি, প্রোডাকসন্সের 'হামরাহ'

আর, ডি, প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'হামরাহ'র তিনটি প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মীনাকুমারী, নন্দা এবং সঞ্জয়। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন রেহমান, সুলচনা, আগা, নতুন, মোহন চোটী, জুনি হুইস্কী ও হারিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন রাহুল দেব বর্মণ। অমিত বসু ছবিটির পরিচালক।

[illegible] গুহঠাকুরতা পরিচালিত **পঞ্চশর** চিত্রের একটি দৃশ্যে রুমা গুহঠাকুরতা, [illegible] সান্যাল ও কণিকা মজুমদার। —ফটো : অমৃত

স্টুডিও থেকে বলছি

বিশেষ করে এ বয়সটা বড় একা একা মনে হয়। কি ছেলে, কি মেয়ে, সবাই মন কেবল আর একজনকে কাছে পেতে চায়। এটাই বুঝি বয়সের ধর্ম। যৌবনের প্রবেশে সাজ্গহীন হতে মন চায় না। কিন্তু মুখ ফুটে মনের কথাটা বলি বলি করে যেন বলা হয় না। শুধু চোখের ভাষায় সে ছায়া ধরা পড়ে। কিংবা প্রথম প্রেমের লজ্জা জড়ানো ছন্দ চোখে পড়ে। [illegible] এরই নাম ভালবাসা।

বিহারের ছোট্ট শহর রাজপুর। এ কাহিনীর পটভূমি। গল্পের চরিত্র [illegible] পরেশ। আর অভিলাষ। অতসী কিন্তু একেবারে আলাদা। আর সব [illegible] মত নয়। ছেলেদের মত কথা বলে। ঘোরে-ফেরে। বড় দুরন্ত। ওর যত [illegible] পাড়ার ছেলেদের সংগে। মেয়ে [illegible] অতসীর নেই বললেই চলে। [illegible] আর সিনেমায় বসে ছেলেদের [illegible] সে সমান তালে কথার সাগরে গা [illegible] চলে। কথার দাপটে অতসীর [illegible] পেরে ওঠা ভার। তাই চট করে [illegible] কেউ ঘাঁটাতে চায় না।

পরেশ কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে বড় [illegible] সবে কলেজের পাঠ শেষ করে ইলেকট্রিক্যাল রিপেয়ারিংয়ের ব্যবসা খুলে [illegible] অবশ্য তার বাবার একটা মনো-হারীর দোকান আছে। কিন্তু পরেশ বাবার [illegible] উৎসাহী নয়। তাই মনের মত [illegible] এ ব্যবসাকে সে বেছে নিয়েছে। [illegible] জীবিকা ভিন্ন হলেও মনটা কিন্তু সাহিত্যচর্চা নিয়েই ডুবে রয়েছে। মাঝে মাঝে কবিতা লেখে। ভালবাসার তেমন সুযোগ আসেনি। তবে অতসীকে তার ভাল লাগে। কিন্তু মুখ ফুটে পরেশ একথা কোনদিনই বলতে পারেনি।

অভিলাষ এই শহরেরই ছেলে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে পাটনায় সরকারী চাকরী করছে। মাঝে মাঝে ছুটিতে দাদা-বৌদি ও বোনের কাছে বেড়াতে আসে। দাদা এখানকার এক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিক। অভিলাষের ছোট বোন প্রতিমা। দুদিনের জন্য এসে অভিলাষ সবাইকে মাতিয়ে রাখে। অতসীর সংগে পাল্লা দিয়ে চলে। এদের ঘনিষ্ঠতায় ভালবাসার কোন অসতর্ক মুহূর্ত ধরা পড়ে না। তবে স্বভাবের জন্যই হয়তো অভিলাষদাকে অতসীর ভাল লাগে। সেটুকু অতসীর নিজস্ব। অভিলাষের কোন দুর্বলতা নেই।

পরেশের প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু অভিলাষ নয়। একথা পরেশ জানলেও তার বন্ধু পল্টু মোটেও বিশ্বাস করে না। বরং সে অতসী-অভিলাষের সব গতিবিধির কথা পরেশকে জানিয়ে দিয়ে যায়। পরেশ কিন্তু সব জেনেশুনেও অতসীকে তার মনের কথাটা জানাতে পারে না। বড় ভীরু তার প্রেম। মনের পিঞ্জরে তার ভালবাসা-পাখী যেন বন্দী হয়ে রয়েছে।

অভিলাষের সংগে অতসীর মেলামেশা চলে। দাদা-বৌদি এবং প্রতিমার কাছে অতসী প্রায়ই আসে। বৌদি অভিলাষের জন্য পাত্রী দেখছেন। দুয়েকটা সম্বন্ধও এসেছে। কিন্তু ছবি অতসীর মন উঠছে না। অভিলাষ এবং বৌদির সামনেই পাত্রীর ছবি দেখতে দেখতে অতসী একনাগাড়ে বোঝাতে চেষ্টা করে, এ মেয়ে ঠিক মানাবে না অভিলাষদার সংগে। তা ছাড়া এত ফর্সা হলেও চলবে না। একটু শ্যামলবরণ হবে অভিলাষদার বউ। তার কপালে ছোট একটা খয়েরের টিপ থাকবে। পাট-ভাঙা তাঁতের শাড়ি পরে জ্যোৎস্না রাতে অভিলাষদা যখন চাঁদের দিকে চেয়ে থাকবে তখন সে অভিমানে গম্ভীর হয়ে বলবে, 'চাঁদ বুঝি আমার চেয়েও সুন্দর?'

অতসীর কল্পনা-পাত্রীর বর্ণনা শুনে বৌদি হেসে ফেলেন। অভিলাষও বেশ মজা পায়। কিন্তু অতসী? সে কি মনে-প্রাণে তাই চেয়েছিল। সে তো অভিনয়-ছলেই তার মনের কথাগুলো বলে গেছে। শুধু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। কিন্তু মনে মনে সে তো অভিলাষকেই ভাল বেসেছে।

এদিকে পল্টুর মাধ্যমে অতসীর ব্যাপারে পরেশ বেশ খানিকটা এগিয়ে আসে। এর মধ্যে একদিন রাতে অতসীকে একা

সুনীল ব্যানার্জি পরিচালিত **অ্যান্টান ফিরিংগী** চিত্রের সেটে উত্তমকুমার ও তনুজা।
ফটো ঃ অমৃত

পৌঁছেও দিয়েছে। চলার পথে একা পেয়েও ভীরু পরেশ না-বলা কথাটি **জানাতে** পারেনি।

দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে যায়। **অভিলাষ** আবার পাটনায় চলে আসে। অতসীর চোখে বুঝি নীড় বাঁধার স্বপ্ন। **তাই** অভিলাষকে মনের কথাটি জানিয়ে অতসী চিঠি লেখে। অভিলাষ কিন্তু অতসীকে এমনভাবে ভাবে নি। চিঠিতে অভিলাষ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সে তাকে মোটেও ভালবাসেনি।

অতসীর স্বপ্নময় জগৎটা হঠাৎ ভেঙে **যায়**। হারানো প্রেমের ব্যথায় ভেঙে পড়ে। **অতসীর** দিদি মিনতিকে বোঝায়। কিন্তু অতসী। আজ অভিলাষ-বিরহে বৈরাগী। এ সংসার থেকে সে মুক্তি চায় চিরদিনের **জন্য**। তাই শেষ চিঠিতে অতসী লেখে— **'তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাব বলে আশা করিনি। তুমি আমাকে ভালবাস না, এই দুঃখ সহ্য করার চেয়ে আমার মৃত্যুবরণ করাই ভাল। আজ সন্ধ্যায় যখন ঘরে ঘরে দেয়ালীর আলো জ্বলবে, তখন আমি সোনালীঝোরার ঝর্ণার কোলে চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়বো।'**

আজই সেই সন্ধ্যা। অতসীর জীবনে দেয়ালীর শেষ উৎসব। দেয়ালীর রাতে সবাই যখন মগ্ন একা অতসী সোনালী-**ঝোরার অন্ধকারে** দাঁড়িয়ে। আকাশে বাতাসে **উৎসবের চিহ্ন**। একাকী অতসী অভিমানের পালা সাঙ্গ করবে। অনেক **কিছুই ভাবছে অতসী**। আর কয়েক **মুহূর্তের পর তার** স্মৃতি মাখানো দিনগুলোর অবসান ঘটবে। হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি তার পাশেই কেঁপে উঠতে দেখে অতসী শিউরে উঠলো। আতস বাজীর আলোয় এক পলকে অতসী থমকে গেল। কে সেই প্রেমিক? অভিলাষ না পরেশ? অতসী তাই জানতে চেয়েছিল। আত্মহত্যাটা তার শেষ অভিনয়!

শ্রীসুবোধ ঘোষের জনপ্রিয় প্রেম কাহিনী 'আবিষ্কার' গল্প অবলম্বনে এটি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীঅরু গুহঠাকুরতা। ছবির নাম 'পঞ্চশর' টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে এ ছবির চিত্রগ্রহণ সুসম্পন্ন হচ্ছে। ছবির দুই নায়ক চরিত্রে অভিলাষ এবং পরেশের ভূমিকা অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অতসীর চ রয়েছেন রুমা গুহঠাকুরতা। পলু, মিনতি এবং দাদা-বৌদি ও প্রতিমার ভূমিকায় ঘোষ, অনুভা দেবী, পিসু মজুমদার কণিকা মজুমদার ও সমিতা সান্যাল দান করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন রায়, সীতাদেবী এবং রতীন ঠাকুর। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মঞ্চাভিনয়

।। লোকরঞ্জন শাখার নাট্যোৎসব ।।

শিল্পের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম চিন্তা প্রয়োগনৈপুণ্যের মাধ্যমে পশ্চিমব লোকরঞ্জন শাখা ইতিমধ্যে বাংলা তথা ভারতের জাতীয় মানসিকতাকে গভীর আন্দোলিত করেছে। বাংলা দেশের লো সংস্কৃতির গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যকে শাখার শিল্পীবৃন্দ আশ্চর্য দক্ষতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মূর্ত

জীবন-মৃত্যু চিত্রে উত্তমকুমার ও অপর্ণা দেবী।

তুলেছেন। দীর্ঘ বারো বছরের সীমা পেরিয়ে এসে আজো তাদের অগ্রগতির ছন্দ ব্যাহত হয়নি। এ'দের দায়িত্ব শুধু সাময়িকভাবে আনন্দ বিতরণ করে লোকের মনোরঞ্জন করা নয়, স্বদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতির সংগে মানুষকে পরিচিত করিয়ে দেওয়াতেই তাদের প্রয়াসের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এই ধরণের একটি সুগভীর সার্থকতার স্বাক্ষর গত ১৫ই আগস্ট থেকে ২২শে আগস্ট পর্যন্ত 'রবীন্দ্র সদনে' আয়োজিত তাঁদের নাট্যোৎসবে চিহ্নিত হয়েছে।

আটদিনব্যাপী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবংগ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়। ডাঃ গুহরায় তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে বলেন যে দেশের সংস্কৃতির মানোন্নয়নের জন্য এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন অপরিহার্য। তিনি পরিশেষে এই আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠবে এই লোকরঞ্জন শাখা। পশ্চিমবংগের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল মুখার্জী বলেন যে দেশের গ্রাম্য জীবনের স্পন্দনকে সংগীত আর নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে তুলতে আরো ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তিনি লোকরঞ্জনের শিল্পীদের এই বিষয়ে প্রয়াসের উচ্চ প্রশংসা করেন। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীনরেশ মিত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শংকর। প্রখ্যাত সুরস্রষ্ঠা শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।

উদ্বোধনী দিনে শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহা-উদ্বোধন' নাটক মঞ্চস্থ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দিককার জীবনকাহিনী এতে রূপ লাভ করেছে। বলা যেতে পারে নরেন্দ্রনাথ দত্তের বিবেকানন্দ রূপে উত্তরণই এই নাটকের মূল বিষয়। নাটকটির সুগভীর বক্তব্য শিল্পীদের অভিনয় গুণেই সবার কাছে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রথম দিনের সাফল্যকে পাথেয় করে দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ভারতের সাধক কবি' নৃত্যনাট্য। ভারতের মাটিতে যুগে যুগে বহু সাধক কবি এসেছেন যাঁরা এক অখন্ড ভাবসংহতির সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন সমগ্র জাতিকে। এদের মধ্যে এগারো জন সাধক কবির গৌরবদীপ্ত জীবনী ও মর্মবাণীকে নৃত্যের ললিত ছন্দে রূপ দেওয়া হয়েছে। নৃত্য-পরিকল্পনায় অতীনলাল গংগোপাধ্যায় সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধের নজীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন। প্রতিটি শিল্পীর অপূর্ব ভাবতন্ময়তার মধ্যে সাধক কবিদের পবিত্র জীবন রূপলাভ করেছে সুষ্ঠুভাবে।

শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়ের 'জাগরী' নাটকের মধ্য দিয়ে একটি সমস্যাপূর্ণ সংকটের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের নীতি এবং আদর্শবোধ যা আজ বিপর্যস্ত হোচ্ছে প্রতিমুহূর্তে তার পরিণাম কি? কোন পথে গেলে চৈতন্যের নবজাগরণ সম্ভব? এইসব প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর মিলবে এই নাটকে। অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পী

রাধা নাটকে গোবিন্দমোহিনীর ভূমিকায় জয়শ্রী সেন

সমানতালে চলতে না পারলেও মূল বক্তব্যের পরিণতিতে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'চন্ডালিকা' নৃত্য-নাট্যের মাধুর্য ও ভাবগভীরতা নৃত্যের মৃদু ছন্দে মোটামুটি মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। নরেশ চক্রবর্তীর 'কুরুক্ষেত্র' নাটকে পৌরাণিক যুগের একটি সত্যাদর্শকে রূপ দেওয়া হয়েছে। নাটকটির সামগ্রিক অভিনয় খুব প্রাণবন্ত হয়নি। মাঝে মাঝে নাটকের গতি থেমে গেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার একটি আশ্চর্য প্রেমগাথা 'মহুয়া'। এই নৃত্যনাট্য পরিবেশনে লোকরঞ্জনের শিল্পীরা অনেক আগেই শিল্পানুরাগীদের অজস্র স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। সত্যি প্রতিটি শিল্পীর নিখুঁত চরিত্রায়ণ এই নৃত্যনাট্যের একটি অমূল্য সম্পদ। নৃত্য আর সংগীতের ছন্দ যেন একটি অখন্ড সুরমূর্ছনায় রূপলাভ করেছে, আর তাতেই দুর্বার গতিতে এগিয়েছে নাটকীয় সংঘাতসমৃদ্ধ কাহিনীর ধারা।

দার্জিলিংয়ের লোকনৃত্য ও সংগীত, তরজা গানের মধ্যে আমাদের দেশের কোন এক সময়ের সংস্কৃতির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শতাব্দীর সাধনা' নৃত্যনাট্যের মধ্যে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতের মুক্তিসংগ্রাম যাদের জীবন অবলম্বন করে এগিয়েছে তা কেন্দ্র করেই এই নৃত্যনাট্যের পটভূমি রচিত হয়েছে। এই

অনুষ্ঠানে আলোছায়ার সম্মিলন এক অভূতপূর্ব আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। সংগীত রবীন্দ্রসংগীত এর গীতিমাধুর্যকে সুন্দরতর করে তুলেছে।

শেষদিনে অভিনীত হয় রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট'। আশী বছর আগেকার সমাজচিত্রের একটি নকসা পরিবেশিত হয়েছে এই নাটকে। শিল্পীদের প্রাণোচ্ছল অভিনয়ে নাটকটির রসধারা প্রত্যেকটি দর্শকের মনে সঞ্চারিত হয়েছে। আটদিনব্যাপী প্রতিটি অনুষ্ঠানে সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে পালন করেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।

।। নতুন নাট্যমঞ্চ ।।

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'আনন্দমে'র উৎসাহী শিল্পীবৃন্দ একটি ছোট ল্যাবরেটরী স্টেজ তৈরী করেছেন। স্টেজটির নাম হয়েছে 'আনন্দ-অঙ্গন'। এতে একশ জন দর্শকের জন্য আসন সাজানো থাকবে। আশা করা যায়, বিভিন্ন অপেশাদারী নাট্য-সংস্থার নিয়মিত অভিনয়ে মুখর হয়ে উঠবে বিডন স্ট্রীটের এই ছোট্ট নিরীক্ষা-মূলক মঞ্চটি।

'আনন্দ অঙ্গনে'র শুভ উদ্বোধন হবে আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর নতুন নাটক দিয়ে। প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'রৌদ্ররেখা' নামক এই নতুন নাটকটি সপ্তাহের শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় অভিনীত হবে। একই ব্যক্তির বয়স ও মানসিকতা পৃথকীকরণে দুটি স্বতন্ত্র সত্তার নিরন্তর সংগ্রাম এই নাটকের মুখ্য পটভূমি। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্বে আছেন দীপক রায়।

।। "সারথী"র নাটকাভিনয় ।।

-দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা "সারথী" গত ১৫ আগস্ট অহিন্দ্র মঞ্চে "কৃপণের ধন" ও "বোবা বৌ" নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

"কৃপণের ধন" জনপ্রিয়তায় যে আজও অম্লান, "সারথী" গোষ্ঠীর নিখুঁত অভিনয়ে প্রমাণিত হল। অদূর ভবিষ্যতে এই গোষ্ঠী প্রথম শ্রেণীর নাট্যগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

অভিনয়ে কার্তিক চন্দ্র (হাবা) একটি অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি। অজয় কয়ালের (কৃপণ) অভিব্যক্তি, বাচনভঙ্গী ও বলিষ্ঠ অভিনয়ে কৃপণের চরিত্রটি জীবন্ত। সমীর ঘোষ (মধু খুড়ো), তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন

গঞ্জিকাসেবী আপনভোলা মধু খুড়োর রূপায়ণে প্রাণবন্ত। মৃণাল ভট্টাচার্য (মন্মথ) ও দিলীপ বিশ্বাস (পুরোহিত) এক কথায় অপূর্ব। স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় নিম্নমানের। তবে ইলা বিশ্বাস (কুন্তলা) মন্দ নয়।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে এঁরা সবিশেষ সাফল্যের সঙ্গে 'বোবা বৌ' নাটকটি অভিনয় করেন। এ নাটকের ক্ষেত্রেও এদের দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। সমীর ঘোষ (ললিত বড়াল), কার্তিক চন্দ্র (ডাঃ চৌংদার) ও অজয় কয়াল (ডাঃ পাকড়াশী), ইলা বিশ্বাস (কাত্যায়নী) উল্লেখযোগ্য। নাটক দুটির সাফল্যের পথে কার্তিক চন্দ্রের দক্ষ পরিচালনা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গোপাল হালদার ও চিত্ত ভাদুড়ীর রূপ-সজ্জা ও মঞ্চপরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

'আঙ্গিক গোষ্ঠীর' আগামী নাটক

আঙ্গিক গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ 'ক্যারাবিয়ানের স্বপ্ন' নামে একটি নতুন নাটকের মহড়া চালাচ্ছেন। নাটকটি এ-মাসের শেষের দিকে অভিনীত হবে। কিউবা বিপ্লবের একটি বিশেষ পটভূমিকায় নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীরণজিৎ রায়।

প্রতিযোগিতা

স্বামী অভেদানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ছোট নাটক 'যুগাচার্য অভেদানন্দ' নাটকটির অভিনয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যে-কোন সাংস্কৃতিক সংস্থাই এই নাট্য-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কর্তৃপক্ষ নাটকটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীদের দেবেন। আবেদন করার শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর।

'কাঠের পুতুল'

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রনিবাস মঞ্চে তরুণ যুবক সংঘের শিল্পীরা শচীন ভট্টাচার্যের 'কাঠের পুতুল' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে। নাটকটি বক্তব্যের গম্ভীরতা ও অভিনয়-রীতির সূক্ষ্মতার জন্য সবার স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন সনৎ মিত্র, রঞ্জিত ঘোষ, অনিত চক্রবর্তী, তপন রায়, মলি মুখার্জি, সবিতা সমাদ্দার, নমিতা ঘোষ, শ্রীমন্ত দত্ত, গোবিন্দ সাহা, পার্থ রুদ্র, গোপাল দাস, জয়ন্ত দে। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন কমলেন্দু বোস।

'রবিরূপ'র আগামী নাটক 'জীবন যৌবন' ও 'বেকার বিদ্যালঙ্কার'

আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে নাট্য সম্মেলনের প্রযোজনায় রবিরূপ নাট্য-সংস্থা অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'জীবন যৌবন' ও মনোজ মিত্র রচিত 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তমাল লাহিড়ী। এ দুটি নাটকে অভিনয় করবেন অচিন্ত দত্ত, স্বপন দাস, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, মিলন বোস, দিলীপ চৌধুরী, প্রদীপ মিত্র, সমীরন দত্ত, সন্তোষ দাস, গুরুপ্রসাদ ভড়, বিশ্বদেব দত্ত এবং সন্দীপ গোস্বামী। সংগীত পরিচালনা এবং আলোক সম্পাতে রয়েছেন মুরারী ভড় ও বসন্ত সিং। ব্যবস্থাপনায় অনুপম গোস্বামী।

গানের জলসা

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

মহাজাতি সদনে ১৭ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট অবধি প্রায় সপ্তাহকাল সুরদাস সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে প্রথম দুদিন আধুনিক সংগীত ও নৃত্যের জন্য ধার্য ছিল এবং ১৯ তারিখে ছিল পূর্ণ বিরতি। শেষের তিনদিন এই সংগীত সম্মেলন তাঁদের রীতি অনুযায়ী মার্গ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের আয়োজন করেছিল।

হয়তো সংগীত সম্মেলনের মরশুম এখনো শুরু হয় নি। সেজন্যেই কিনা জানি না সম্মেলনে শ্রোতার সমাগম আশানুরূপ হয়নি। এমনকি বিভিন্ন ধরনের শ্রোতার রুচি অনুযায়ী আধুনিক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেও শ্রোতাসমাগমের সুরাহা করা যায়নি। তাই এক্ষেত্রে আমাদের মতামতের পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় যে আধুনিক সংগীতের জন্য বোধহয় কোনো সম্মেলনের প্রয়োজন নেই। কেননা, রেডিও, রেকর্ড মারফৎ তো পথে ঘাটে বিবাহ ইত্যাদি বাসরে এত বেশি প্রচারিত যে এ সংগীত শোনানোর জন্য কষ্ট করে কোনো সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজন নাই। অপরপক্ষে মার্গ-সংগীত তার স্বভাববশেই এত অবসর ও মেজাজের দাবী করে যে সম্মেলনে শিল্পীর মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ হয়ে না বসলে তার পূর্ণরসগ্রহণ করা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া সম্মেলন শোনাও এক ধরনের আগ্রহ বা শখ। যার ফলে একই শ্রোতৃমণ্ডলীকে একাধিক মার্গসংগীত সম্মেলনে দেখা যায়।

২০ তারিখের সারারাত্রিব্যাপী মার্গ-সংগীত সম্মেলনে একাধিক নবীন ও প্রবীণ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতশিল্পী সুষ্ঠু অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন।

মিয়াঁ কি টোড়ী রাগে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার বাজনা শ্রোতাদের রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিকে দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগালাপ, তাঁর মীড়টানার কৌশল, রাগের সুরেলা বিশ্লেষণ সুষ্ঠুভাবে রাগরূপকে মূর্ত করে তোলে। সবচেয়ে বড়ো কথা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝালার অংশও শ্রোতাদের শ্রবণকে তৃপ্ত করে (অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক সময় তা পীড়াদায়ক হয়)। কানাই দত্তের সাথসংগত এই সেতার বাজনার সঙ্গে সুষ্ঠু হয়েছিল।

এঁর আগে সরোদ বাজিয়েছিলেন বাহাদুর খাঁ বসন্তমুখারী রাগে। গৎ-এর অংশ এঁর বাজনায় উজ্জ্বল হয়েছিল। অনিল ভট্টাচার্যের তবলার সোওয়ালী জবাব এঁর বাজনার সঙ্গে মনোগ্রাহী হয়। তবে সোওয়ালী জবাব পরিবেশনে আরেকটু সংযমের পরিচয় দিলে ভালো হতো।

কণ্ঠসংগীতের আসরে সুনন্দা পট্টনায়ক জৌনপুরী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন।

রাতশেষের আসরে তারায় ষড়জ থেকে গানের মুখ ধরে তিনি সমস্ত শ্রোতার চিত্তকে মুহূর্তে একাগ্র করে তোলেন। গানের বিলম্বিত অংশে জোনপুরীর করুণ মাধুর্য খুব বেশি পরিস্ফুট না হলেও দ্রুত অংশে তিনি সহজেই আসর জমিয়ে তোলেন। সবচেয়ে সুখশ্রাব্য হয়েছিল তাঁর তারাণাটি। সঙ্গে শ্যামল বসুর তবলা ও সাগিরুদ্দিনের সারেঙ্গী সঙ্গত অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করেছিল। কণ্ঠসঙ্গীতে এ. কাননের রামকেলি রাগের খেয়াল এবং ভৈরবী ঠুমরী আরেকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান যা তৃপ্তিদায়ক হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত সময়ে অল্প বিস্তার ও সুষ্ঠু তানালঙ্কার প্রয়োগে তিনি খেয়াল গানটিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে পরিবেশন করেছেন। এঁর সঙ্গে তবলা ও সারেঙ্গীতে সঙ্গত করেন শ্যামল বসু ও সাগিরুদ্দিন।

নবীন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে এই দিনে কল্যাণী রায়ের সেতার ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদ বাজনা শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছে।

কল্যাণী রায় সেতারে জলধারিণী রাগ পরিবেশন করেন। রাগটিকে ঠাকুর-পরিবারের ধ্রুপদের সংগ্রহ থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হল। কল্যাণী রায়ের সঙ্গে তবলা-সঙ্গতে দিল্লীর নবীন শিল্পী লতিফ আহমেদ খাঁ শ্রোতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পান। তার ফলে দুজনের বাজনাই সহজে জমে ওঠে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সরোদে নায়েকী কানাড়ার রাগরূপ পরিবেশন করেন। তাঁর বিশ্লেষণ সুচারু, ছন্দের কাজ প্রশংসনীয়। সাবলীল স্ট্রোকে তিনি রাগটিকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আসরের প্রথমদিকে নবীন কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে প্রগতি বর্মণের নন্দকল্যাণ শ্রোতাদের উচ্চপ্রশংসা লাভ করে। নন্দকল্যাণ বা আনন্দী কল্যাণ নানা রাগের মিশ্রণে গঠিত হলেও কল্যাণ ঠাটের এই রাগটির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি রাগটিকে মধ্যমে ন্যাস করে চারসপ্তকে সুন্দর সুরেলা বিস্তার করেন। গমকী তান, সাপাট তান প্রয়োগে সর্বত্র তাঁর কণ্ঠমাধুর্য অবিকৃত ছিল এটাই বড়ো কথা। নতুনদের মধ্যে শিপ্রা বসু রামদাসী মল্লারের খেয়াল পরিবেশনে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আসরের একমাত্র ধ্রুপদশিল্পী। তিনি উদাত্তকণ্ঠে রাগেশ্রীতে আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। তাঁর সঙ্গে জিতেন সাঁতরার পাখোয়াজ সঙ্গত মনোগ্রাহী হয়েছিল। নৃত্য অনুষ্ঠানে যথারীতি নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখেন ভরতনাট্যমের শিল্পী লিপিকা গুপ্ত ও কথকের শিল্পী বন্দনা সেন। বন্দনা সেনের ভাও সুচারু। সুষ্ঠু নৃত্তছন্দের সঙ্গে তাঁর উর্ধ্ব শায়েরগুলি একটি মনোরম পরিবেশ রচনা করে।

এছাড়াও এদিনে মঞ্জু মুখোপাধ্যায় মিঞামল্লারে খেয়াল ও মানিক দাস তবলা-লহরা পরিবেশন করেন।

তরুণ মজুমদার পরিচালিত **বালিকা বধূ** চিত্রে পার্থ মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

২১ তারিখের অনুষ্ঠানে রবি কিচ্‌লু ও কুমার মুখোপাধ্যায়—আগ্রাঘরানার এই শিল্পীযুগল মিঞামল্লার, গৌড়মল্লার ও সবশেষে দ্রুত একতালে 'দেশ' পরিবেশন করে আসর জমিয়ে দেন। এই শিল্পীযুগলের গান প্রাণবন্ত এবং নানা দুরূহ কৌশল-সমন্বিত হয়েও যথেষ্ট সরস এই কথা প্রথমেই মনে আসে। আগ্রাঘরানার গান এঁদের মেজাজে সহজেই আসে। আলাপ, কূটতান, বোলতানে রাগ-রূপায়ণের দিকে স্থিরলক্ষ্য হয়েও এঁরা রাগের অন্তর্নিহিত বিষাদ ও কারুণ্যকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। কুমার মুখোপাধ্যায়ের দুরূহ আ-কারান্ত তানেও কণ্ঠের সাবলীলতা ও কোমলতা যেমন রক্ষিত হয়েছিল তেমনি রবিকুমারের মেজাজ ছিল রাগের সেন্টিমেন্টকে ফুটিয়ে তোলার দিকে। এই নবীন শিল্পীযুগলের গানকে শ্যামল বসুর তবলা ও সাগিরুদ্দিনের সারেঙ্গী উপভোগ্য করেছিল।

প্রবীণ ও প্রথিতযশা শিল্পী তারাপদ চক্রবর্তী আভোগী রাগে নিজস্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। সঙ্গে মানস চক্রবর্তী কণ্ঠসহযোগিতায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যতীন ভট্টাচার্যের সম্পূর্ণ কানাড়া রাগের সরোদ বাজনাও এদিনের একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান। এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন আশুতোষ ভট্টাচার্য।

এছাড়াও এদিনের আসরে আরতি বাগচী কণ্ঠসঙ্গীত, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সেতার ও চৌবে মহারাজ কথকনৃত্য পরিবেশন করেন।

২২ তারিখের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল রবিশঙ্করের সেতার বাজনা। তিনি বেহাগে আলাপ, মারু-বেহাগে গৎ পরিবেশন করে সমগ্র শ্রোতৃ-মন্ডলীর চিত্ত জয় করে নেন। এইদিনের অনুষ্ঠানটি প্রকৃতভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। সঙ্গে কানাই দত্তের তবলাসঙ্গতও আমাদের ভালো লেগেছে।

কালিদাস সান্ন্যাল মালকোষ রাগে যে খেয়াল পরিবেশন করেন তা শ্রোতাদের ভালো লেগেছে। তাঁর কণ্ঠটি দরাজ, তানালঙ্কার প্রয়োগেরও বৈশিষ্ট্য আছে। ঝুমরা তালে বিলম্বিত ও দ্রুতে তিনি খেয়ালটিকে পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে তবলাসঙ্গতকারী আরেকটু নৈপুণ্যের পরিচয় দিলে গান আরো জমতো। এইদিন কথক নৃত্য পরিবেশন করেন মায়া চট্টোপাধ্যায় ও বোম্বাইয়ের চিত্রতারকা কুমুদ চোগানী। এই দুজনের নৃত্য থেকে বোঝা যায় যে সাধনা ও সাধের মধ্যে প্রভেদ দুস্তর। মায়া চট্টোপাধ্যায় গৎকারী ও লয়কারীর নৈপুণ্যে উচ্চপ্রশংসা লাভ করে। কুমুদ চোগানীর দু'এক ভাও পরিবেশনে নৈপুণ্যের আভাস এলেও সাধনার অভাব চোখে পড়ে।

বেঞ্জামিন গোমেসের সেতার বাজনা মোটামুটি মন্দ হয়নি। তিনি তিলক-কামোদ পরিবেশন করে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন উচ্চগ্রামে ঝালার প্রয়োগে তার রসহানি ঘটে।

এছাড়াও গৌতম রায় পুরিয়া কল্যাণে

খেয়াল পরিবেশন করেন। মনোয়ার আলি খাঁ আসরে অনুপস্থিত ছিলেন।

আগের দুদিনের আধুনিক সঙ্গীতের আসরে মহেন্দ্র কাপুর, উষা খান্না, রুমা গুহঠাকুরতা, ললিতা ঘোষ, মীরা সীরাজ ও মান্না বসুর গান শ্রোতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে টপ্পার আসর

কয়েকটি মুহূর্তের জন্য আমরা অতীতের আনন্দবেদনা রোমাঞ্চিত রঙিন পরিবেশে তীব্রভাবে বেঁচে উঠেছিলাম বর্তমানের সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবনের তিক্ততা ভুলে। সম্প্রতি শ্রীতপন সিংহ আয়োজিত ২নং নিউ থিয়েটার্সের সেই মনোরম টপ্পার সান্ধ্য আসর ভোলবার নয়। প্রায় ৭৭ বছরের শিল্পী কালিপদ পাঠক, বর্তমান যুগে নিধুবাবুর টপ্পার সুযোগ্য প্রতিনিধি, সেদিনের রসগ্রাহী শ্রোতা, বর্ষণমুখরিত কাব্যমধুর পট-ভূমিকার সঙ্গতে যেন বয়সের বাধা ও প্রাত্যহিক সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করে কয়েকটি রসোজ্জ্বল মুহূর্তের মালা গেঁথে উপহার দিতে পেরেছিলেন। শান্ত লগনের এমন পরিবেশ জীবনে খুব বেশীবার আসে না।

টপ্পা'—উচ্চাঙ্গ লঘু সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হলেও ভাবগত ঐক্যে বাংলার লোক-সঙ্গীতের ধারার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। নিধুবাবুর টপ্পা একান্তভাবে বাংলার সম্পদ নিশ্চয়,—কিন্তু টপ্পার মূল উৎস পঞ্চ নদীর তীরে। পাঞ্জাবের গোলাম নবীর প্রেমিক মনের রঙিন উচ্ছ্বসে এর জন্ম। প্রেয়সী সারীকে সম্বোধিত প্রণয়-কলোচ্ছ্বাসে মুখর বিচিত্র ভাবের দুর্বার, উদ্দাম প্রকাশ। তাই এই টপ্পা 'সারীর টপ্পা' নামেই প্রসিদ্ধ।

ক্রমশঃ ওস্তাদকুল বাহিত হয়ে এই টপ্পা বাংলাদেশেও পেঁছালো এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিধুবাবুর রসিক-চিত্তে দোলা দিল। সেই রসগ্রাহী মনের ঐশ্বর্যে বাংলার জল, মাটি, প্রণয়-রঙ্গ ও আবেগের বিদ্যুৎ স্পর্শে এই টপ্পায় রসাশ্রিত এই টপ্পায় নর-নারীর হৃদয়ের চিরন্তন আকুতি, বেদনা মীড়, জমজমা, রাগ ও ভাবে এক অপূর্ব রসমূর্তি গ্রহণ করেছিল সেদিন শ্রীপাঠক পরিবেশিত টপ্পায়। সুরু করলেন 'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ দিয়ে।' দ্বিতীয় গানটি বর্ষাসজল সন্ধ্যার স্নিগ্ধ রসাবেশের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই যেন 'দেশ' রাগে পরিবেশিত। মাঝে মাঝে জয়-জয়ন্তী ও মল্লারের আলগা ছোঁয়া একটা কোমল মাধুর্য বিছিয়ে দিয়েছে রসিক শ্রোতৃচিত্তে। কথার মাধুর্যও চুম্বকের মত মনকে টানে—'কে তোমারে শিখায়েছে প্রেমছলনা?' তারপরই খাম্বাজে—

'সে কেন রে করে অপ্রণয়
ও তার উচিত নয়।' ...
'আঁখিতে যে যত হেরে
সকলি কি মনে ধরে?
এই পোড়ামন যাকে মনে ধরে
সেই ত মনোরঞ্জন।'

আর শেষের ভৈরবী-ঠুংরি? সে মাধুর্য বুঝি অনুভবে লোকের সম্পদ।

নাগর হে আমি আর প্রেম করব না।
ফিরে যাও
ছি, ছি, ছি!
আমায় লোকে বলবে কি?
আমি আপনার প্রাণ পরকে দিয়ে
আপনি ঠকেছি।'

শ্লথগতি তানের হঠাৎ থেমে যাওয়া চকিত, চমকের বিদ্যুৎ শিহরন গমকের অতৃপ্ত হাহাকার, উন্মাদনা, প্রণয় ধিক্কার ভৈরবীর কোমল পর্দায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এই রসোত্তীর্ণ আসরের স্মৃতি অবিস্মরণীয়।

ভাবতে দুঃখ হয় এমন সম্পদের না রইল কোনো স্মারক, না রইল উত্তরসূরী। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গীতসম্ভারের ডালিতে কি 'নিধুবাবুর টপ্পা' স্থান পেতে পারে না?

বেতারশ্রুতি

পনেরোই আগস্ট শুধু ভারতের স্বাধীনতা দিবসই নয়—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবসও বটে। রুটিনমাফিক সকালবেলায় শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে পাঠ ছাড়া বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হয়নি। 'বিপ্লবী অরবিন্দ' নামে লোক-দেখান গোছের একটা কথিকা প্রচার করে নিজেদের কর্তব্য সমাধান করেছেন।

রাত ৯-৩০টায় নরেন্দ্র শর্মা নামক জনৈক লেখকের হিন্দী রচনা 'স্বদেশী' নামে একটি রূপক, বাংলায় অনুদিত হয়ে প্রচারিত হ'ল। যাঁরা শুনেছেন তাঁদের অবস্থাটা আমি চোখে না দেখলেও কল্পনা করতে পারছি। কল্পনাশক্তির কত বড় অপচয়ে এই ধরনের হাস্যকর রচনা সম্ভব হয় সেটা যাঁরা শোনেননি তাঁদের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। প্রচারধর্মীরূপক রচনায় বালসুলভ চপলতা এবং অজ্ঞতা কতটা যে ভয়াবহ এবং ক্ষতিকারক হতে পারে এই ধারণা লেখকেরও নেই, আকাশবাণীর কর্মকর্তাদেরও সকলের বোধকরি নেই।

নির্বাচন ও বিতার

নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেতারের ব্যবহার আমেরিকায় এবং ইংল্যাণ্ডে বহুদিন ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। আমেরিকায় বেতার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত বলে যে কোন দল বা ব্যক্তি উপযুক্ত মাশুল দিয়ে যে কোন দিন, যে কোন সময়ে এবং যতক্ষণ ইচ্ছা সময়ের সুযোগ নিতে পারেন। তিন তিনটি বিরাট বেতার প্রতিষ্ঠান থাকার দরুণ এরকম সুযোগ থেকে কারো বঞ্চিত হবার সম্ভাবনাও কম।

বিলেতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান লণ্ডন বি, বি, সি পুরোপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান না হলেও পরোক্ষভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই একে খানিকটা বাঁধা নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। তা সত্ত্বেও বেতারের সুযোগ দলগতভাবে প্রত্যেক দলকেই দিতে হয়। এবং এই ব্যাপারে সময় বন্টনের বিশেষ অসুবিধা বি, বি, সি'কে বিব্রত করতে পারে না, কারণ রাজনৈতিক দলের সংখ্যা মাত্র চারটিতে সীমাবদ্ধ।

আমেরিকা এবং বিলেতের তুলনায় ভারতের অবস্থা অত্যন্ত জটিল। এখানে ছোটখাট দলের কথা বাদ দিলেও বড় বড় দলের সংখ্যা খুব কম হলেও বার থেকে চোদ্দটি। এ চোদ্দটি দলের আবার বিভিন্ন ধরনের আদর্শ। রাজনৈতিক আদর্শ বিপদ বা ভয়ের কারণ নয়। বিপজ্জনক হচ্ছে সাম্প্রদায়িক আদর্শ। বেতারের মত শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র যদি সাম্প্রদায়িক দলের হাতে পড়ে তাহলে তার ফলাফল জাতি এবং দেশের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হতে পারে। এই ধরনের সম্ভাবনা এবং বড় বড় দলগুলির মধ্যে সময়-বন্টনের মতানৈক্যের দরুণ নির্বাচনের সময়ে ভারতীয় বেতার ব্যবহার করার সুযোগ এতদিন বন্ধ ছিল।

গতবারের নির্বাচনের আগে সব দলগুলিকে ডেকে নিয়ে একটা উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সব দলই নিজেদের অন্য দলের চাইতে বড় মনে করে বেশী সময় দাবী করার দরুণ সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকদিন ধরে দলগুলির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বেতার-দপ্তর। সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলি এবং বেতার দপ্তরের ভেতর একটা বোঝাপড়া হয়েছে।

কোন দলকেই ছোট-বড় শ্রেণীভুক্ত করা হবে না। সব দলই সমান সময়ের অধিকারী হবেন। মোট পনেরো মিনিট করে প্রথমবার সব দল নিজেদের নির্বাচনী আদর্শকে জনগণের কাছে উপস্থিত করার সুযোগ পাবেন। তারপর দ্বিতীয়বার আবার পনেরো মিনিট করে পাবেন শেষবারের মত ভোটারদের কাছে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবার জন্যে। সবাই এই পন্থা মেনে নেওয়াতে এবারের নির্বাচনে বেতারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ভারতীয় জনগণের কাছে নতুনত্বের স্বাদ আনবে। বিভিন্ন মতাবলম্বী দলগুলিকে একত্রিত করে নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করার মূলে বেতার দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী এ, কে, মিত্রের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেল

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেল আগামী ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল ভবনে দুটি জার্মাণ ছবি 'লাষ্ট লাফ' এবং 'ক্যাবিনেট অব ডাঃ ক্যালিগরি' সন্ধ্যে ৬-১৫ মিঃ সংস্থার সভ্যদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।

মহুয়া-র 'নৃত্য-গীত বিচিত্রা'

মহুয়া সংস্থা প্রযোজিত কবিগুরুর 'নৃত্য-গীত বিচিত্রা' গত ২১ আগষ্ট প্রতাপ মেমোরিয়াল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র

চন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসহদেব মন্ত্র। সংগীতানুষ্ঠানে 'হে নিরুপমা' গানটির সঙ্গে সুনৃত্য পরিবেশন করেন কেয়া গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীতে মানসী বাগচী ও ইরা গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

'লাভ ইন টোকিও' প্রসঙ্গে পরিচালকের বক্তব্য

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক সাংবাদিক সভায় পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী তাঁর 'লাভ ইন টোকিও' প্রসঙ্গে বলেন, তিনি দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যই ছবি নির্মাণ করে থাকেন। 'জিদ্দি'র অসাধারণ সাফল্যের পর বর্তমানে পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী এটি পরিচালনা করেন। সম্পূর্ণ জাপান বহির্দৃশ্যে গৃহীত এটি প্রথম হিন্দী ছবি। জাপানের বহু দর্শনীয় অঞ্চলে জয় মুখার্জি ও আশা পারেখ অভিনীত রোমাঞ্চকর দৃশ্যগুলি দর্শকদের ভাল লাগবে বলে পরিচালক শ্রীচক্রবর্তীর বিশ্বাস। এ ছবির কৌতুক দৃশ্যে মেহমুদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেবে।

সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয়

গত রবিবার ১৪ই আগষ্ট বরানগর বরেমহল এর শিল্পীবৃন্দ তাদের নিজস্ব মঞ্চে শচীন ভট্টাচার্যের নাটক "সম্রাটের মৃত্যু" অভিনয় করেন। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্র কশাঘাত করে গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ নাটক "সম্রাটের মৃত্যু"। এই সংস্থার শিল্পীদের সাবলীল ও প্রাণবন্ত অভিনয় নাটকটিকে রসসমৃদ্ধ করে তুলেছে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন সর্বশ্রী সুশীল দে, তুষার শীল, সুশান্ত দে, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎপতি দে, প্রশান্ত দাশ, অমর শেঠ, তপন শীল, সবিতা দাশ ও মণিকা ব্যানার্জী। সু-অভিনীত এই নাটকটির মঞ্চসজ্জা মনোরম রুচিসম্মত। আবহ-সংগীত উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

এই সঙ্গে এরা সংঘসদস্য সুশীল দের পাণ্ডুলিপি একাঙ্ক "রক্ত দিয়ে লেখা" মঞ্চস্থ করেন। রক্ত দিয়ে লেখায় সুশীল দে, সুশান্ত দে, তুষার শীল, মোহিত ভড়, সুব্রত দে অভিনয়ে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটি দর্শকমন জয়ে সক্ষম হয়েছে।

হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১৫ই আগষ্ট নিউ এম্পায়ারে হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। হিমাংশু দত্তের সুর সংযোজিত "আকাশে চাঁদ" গানটি দিয়ে সুচিত্রা মিত্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরে তিনি কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য। সংগীত পরিচালনা করেন সুচিত্রা মিত্র ও [illegible] চৌধুরী। নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন রামগোপাল ভট্টাচার্য। বাল্মীকির ভূমিকায় অমর রায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দস্যুর চরিত্রে যথাক্রমে রামগোপাল ভট্টাচার্য ও তুষার ভঞ্জ উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। অমর রায়ের কণ্ঠে বাল্মীকির গানগুলি সংগীত এবং তাহার রূপসজ্জাও মনোরম হয়েছিল। বালিকা, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর ভূমিকায় যথাক্রমে মানসী বসু, অলীনা মৌলিক ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় সুঅভিনয় করেন। বনদেবীদের নৃত্যও বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন—রীতা সেনগুপ্ত, চন্দনা বসু, শান্তা বসুরায়, পলি রায়, রুণা মতিলাল, নন্দা পুরী, সংযুক্তা রায়চৌধুরী ও বাণীবন্দনা ঘোষ। আলোসম্পাত ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন তাপস সেন।

"পপ" সঙ্গীতের উপর ভারতীয় সুরের প্রভাব

বিশ্ববিখ্যাত বীটলস্ দলের গীটার-বাদক ও গায়ক ২৩ বছরের জর্জ হ্যারিসনের মতে 'পপ' সংগীতের ক্ষেত্রে "ভারতীয় সংগীতের একটা ভবিষ্যৎ আছে।"

যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হবার আগে গত সপ্তাহে লণ্ডনে এশিয়ান মিউজিক সার্কল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জর্জ এই মতটি প্রকাশ করেন।

এশিয়ান মিউজিক সার্কল কৃষ্ণ রাও ও তাঁর স্ত্রী চন্দ্রভাগা দেবীকে নিয়ে নতুন এক নৃত্য প্রবর্তন সম্পর্কে এই সাংবাদিক সম্মেলনটি আহ্বান করেছিলেন। তাঁদের এই নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানটির নাম হয়েছে "বুদ্ধের প্রলোভন"। এটি ২০ আগষ্ট ও ২৭ আগষ্ট লণ্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে পরিবেশিত হয়।

কিন্তু জর্জ হ্যারিসন ভারতীয় সংগীত সম্পর্কেই বিশেষভাবে দু-চারটি কথা বলেন —এর কারণও আছে, এর কারণ হল সম্প্রতি তিনি ভারতীয় সংগীতের প্রেমে পড়েছেন।

সেতারে আগ্রহ

"আমি ঠিক নৃত্য সম্পর্কে আগ্রহী নই", তিনি বলেন, "আমি আগ্রহী সমগ্র সংস্কৃতি সম্পর্কে, এবং বিশেষভাবে সংগীত সম্পর্কে। এইজন্য আমি এশিয়ান মিউজিক সার্কল-এ যোগ দিয়েছি। আমি কয়েকমাস ধরে সেতার বাজানো শিখছি, এবং আমি মনে করি ভারতীয় সুর আমাদের এখানকার যে কোন সুরের চেয়ে অনেক উন্নত। সংগীত এক মহান জিনিস। আমরা নতুন কিছু গ্রহণের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত—এবং আমি মনে করি "পপ" সংগীতের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংগীতের একটা ভবিষ্যৎ আছে।"

জর্জ হ্যারিসন, যিনি পিয়ানোও বাজান এবং সংগীতও রচনা করেন, বলেন তিনি আশা করেন ভারতীয় সুর ও বাদ্যযন্ত্রগুলি পশ্চিমী গানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে।

বীটলস সম্প্রদায় ইতিমধ্যে জর্জের সেতার বাজনার কতকগুলি রেকর্ড করেছেন।

জর্জ বলেন, "একথা ঠিক পশ্চিমী কানকে তৈরি করে নিতে হবে ভারতীয় সুর ও সুর-মূর্ছনা উপভোগের উপযোগী করে, কিন্তু দুই সুরের—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলন ঘটিয়ে আমরা তৈরি করে নিতে পারি নতুন ধ্বনি, যা আমাদের সংগীতের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিতে পারবে।"

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগঃ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা আসর

বিচিত্রিতা সংস্থা তাঁদের প্রতিষ্ঠানগৃহে ২৪এ, রায়বাগান স্ট্রীটে সম্প্রতি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ সম্পর্কে তৎকালীন প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের দ্বারা একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। প্রায় চারশত সংস্কৃতি অনুরাগী শ্রোতার উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করেন অনুষ্ঠান পরিচালক শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।

শ্রীধীরেন গাঙ্গুলি (ডি, জি,) নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগের প্রথম দিক পর্যন্ত চিত্র পরিচালনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক তথ্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

পরিচালক ও শিল্প নির্দেশকরূপে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন আউট ডোরের নির্মিত সেটে স্টুডিওর ভিতরে চিত্র গ্রহণ পদ্ধতির পথিকৃৎ শ্রীচারু রায়।

সার্থক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা সম্বন্ধে শ্রীদেবকীকুমার বসু বলেন যে, মানুষকে প্রকৃত আনন্দ দেওয়া এবং মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি ও নৈকট্য-বোধকে জাগিয়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে চলচ্চিত্র বা নাটকের সার্থকতা। তার অভাবে নিছক আঙ্গিকের প্রাধান্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয়।

যুদ্ধ-পূর্ব যুগের অভিনয় প্রসঙ্গে শ্রীপাহাড়ী সান্যাল বলেন যে, সে সময়ে শিল্পীরা যেভাবে সাধনার পথে পদে পদে অগ্রসর হবার অবকাশ পেতেন, বর্তমানে তা আর সম্ভব নয়। বর্তমান কালের শিল্পীরা সেই অভিনয় সাধনার সুযোগ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত এবং সে কারণেই অভিনয়ে প্রাণের স্পর্শ সৃষ্টিতেও তারতম্য ঘটতে দেখা যায়।

চণ্ডীদাস চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী উমাশশী দেবীও তৎকালীন পরিচালকদের নিপুণ অভিনয় শিক্ষণের কথা উল্লেখ করেন ও বলেন যে, তাঁরই অভিনীত 'ভাগ্যচক্র' চিত্রে প্লেব্যাক পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তিত হয়।

'দেশের মাটি' চিত্রের পরে এই প্রথম শ্রীমতী উমাশশী দেবী চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেন।

প্রথম যুগের চিত্র পরিচালনার বিভিন্ন অসুবিধার কথা বিবৃত করেন শ্রীপ্রফুল্ল রায় এবং গীতিকার শ্রীহীরেন বসু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাষণ দেন। চিত্রনাট্য রচনায় তৎকালীন ও বর্তমান অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

সর্বশ্রী জহর গাঙ্গুলী, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী, ইন্দিরা রায় ও রেণুকা রায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র (ছোটাই বাবু)।

কিংস্টনে কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে স্কটল্যান্ডের জিম এলডার ম্যারাথন দৌড় শেষ করছেন। ইনি এই অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয় করেন।

উলটোপথে ভাগ্যের দৌড়!

অজয় বসু

উলটো মুখে দৌড়! সে আবার কি? হঠাৎ শুনে মনে হতে পারে যে, বাক্যটি ব্যবহার করছি বোঝাবুঝির অসুবিধে ঘটিয়ে পাঠকমনকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তেমন কোনো দুষ্ট অভিসন্ধি সত্যিই আমার নেই। কারণ, সোজা পথ ছেড়ে উলটো পথে দৌড় দেবার সংবাদ আমার হাতেই রয়েছে। সোজা পথে ছুটতে ছুটতে কেউ যখন হঠাৎ উলটো পথে বাঁক ফেরে, তখনই সেই ঘটনা সংবাদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

কুকুর মানুষকে কামড়ে তার স্বভাবের প্রতি সুবিচার করলে তা খবর হয় না। খবরের সৃষ্টি তখনই যখনই মানুষ তার স্বভাব ভুলে কুকুরের গায়ে দাঁত বসিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি খবর হয় অ্যাথলিটরা সোজা পথ ভুলে ভুলের ফাঁদে জড়াতে যখন ভুল পথে পা বাড়িয়ে বসেন।

এমনি এক ভুলের ফাঁদে পা বাড়িয়ে ছাব্বিশ বছরের স্কটিশ তরুণ জিম এলডার এবার বড়সড় খবরের মুখরোচক উপকরণ জুগিয়েছেন। তবে পা বাড়াবার পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পেরে আবার তিনি নিজেকে শুধরে নেওয়ায় খবরটি আরও দানা বাঁধতে পারেনি। নইলে বেচারীর ভাগ্যে ভোগান্তির আর শেষ থাকতো না।

জিম এলডার হলেন দূরপাল্লার দৌড়-বীর। কিংসটনে কমনওয়েলথ ক্রীড়ার ম্যারাথন রেসে তিনি পেয়েছেন শীর্ষস্থান। কিন্তু শীর্ষাসন দখলে আনার আগে উলটো মুখে দৌড়াবার চেষ্টায় এলডার কি যে করে বসছিলেন, তা ভাবতেও আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ছাব্বিশ মাইল তিনশ পঁচাশী গজের প্রায় সবটুকু উৎরে সবার আগে স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়েন জিম এলডার। তখন আর কতোটুকু পথই বা বাকি! বড়জোর গজ ছ'শো হবে। প্রায় ছাব্বিশ মাইল যিনি ছুটেছেন, তার কাছে বাকি ছ'শো গজের চ্যালেঞ্জের চাপ কিছুই নয়। দর্শকেরা ভাবেন, এলডার বাকি পথটুকু নির্বিঘ্নে উৎরে যাবেন।

এমন সময় ভুল হলো। স্টেডিয়ামে ঢুকে ডাইনে ফিরে এগোবার কথা। কিন্তু জিম এলডার বাঁক ফিরলেন বাঁয়ে। ফিরেই ছুট। দর্শকেরা যতোই হায়, হায় করেন কর্মকর্তারা যতো বলেন, ওদিকে নয়, এদিক ততোই এলডারের স্ফূর্তি চড়ে। গতি বাড়ে। ভাবেন তিনি, পথের মোহনায় সবার আগে এসে পড়েছেন দেখে সবাই বুঝি তাঁকে উৎসাহ জোগাচ্ছেন।

ভাবুন দিকিনি কি কান্ড!

দীর্ঘ পথ সফল পরিক্রমণের আনন্দে জিম এলডার কি করতে চলেছেন, তা হায় তিনি নিজে কি বুঝতে পারছেন! বুঝিয়ে দিলেন দ্বিতীয় প্রতিযোগী ইংলন্ডের বিল এডকক্স এসে। এডকক্সের দিকভুল ঘটেনি। স্টেডিয়ামে ঢুকে তিনি চললেন ঠিক পথে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামের ট্র্যাক জুড়ে দুটি বিপরীতমুখী ঘড়ির কাঁটার মতো দু' পথে চলতে লাগলেন জিম এলডার ও বিল এডকক্স।

কেমন যেন বিসদৃশ দৃশ্য। দেখে থমকে গেলেন জিম এলডার। তারপর কর্মকর্তাদের কথায় ও নির্দেশে সম্বিৎ ফিরে উলটো প

ছেড়ে সোজা পথে মুখ ঘুরিয়ে পিছু ধাওয়া করলেন বিল এডককসের। স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে এডককস অনেক পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু পরে এলডারের ভুলে তিনি নির্দিষ্ট পথে গজ-আঠারো এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে একটানা প্রায় ছাব্বিশ মাইল ছোটার পরিশ্রমে এডককস তখন অবসন্ন-প্রায়। গতি-মন্থরতায় তাঁর পদক্ষেপ নাবরাবর। তাঁকে ধরে ফেলতে, ডিঙিয়ে যেতে এলডারের অসুবিধে হয়নি। শেষ-পর্যন্ত জিতলেন তিনি। হয় হয় করেও বড় খবর হলো না।

হলো না, ভালই হলো। খবর হলে, উলটো পথে মোড় ফেরার জন্যে এলডারকে হয়তো শেষপর্যন্ত হারতে হোতো, তাহলে তাঁর দুঃখ সেটুই, উপরন্তু আমাদেরও বুঝি দুঃখশোকের সীমা-পরিসীমা থাকতো না। তবু এলডার দুনিয়ার অ্যাথলেটিক অনুরাগীদের আক্ষেপ করার সুযোগ দেননি। এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তবে এমন বিয়োগান্ত ঘটনা এড়িয়ে গেলেও ম্যারাথন দৌড়বীরদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই রীতিমতো ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে ক্রীড়ানুরাগীদের চোখের জল ফেলতে বাধ্য করেছেন।

বলতে বলতে একটি কাহিনী আমার এখনই মনে পড়ছে। কাহিনীটি আর এক কমনওয়েলথ ক্রীড়ার। ভারী করুণ কাহিনী। এক জেদী অ্যাথলিটের ভাগ্যবিপর্যয়ের এক মর্মান্তিক বিবরণ।

কাহিনীর নায়ক ইংল্যণ্ডের দৌড়বীর জিম পিটার্স। বহুযুদ্ধের বীর। ম্যারাথন দৌড়ে এক সফল চরিত্র। দেশ-বিদেশের অনেক আসর মাতিয়ে দেওয়ার পর ১৯৫৪ সালে ভ্যাঙ্কুভারে এসেছিলেন কমনওয়েলথ ক্রীড়ার ম্যারাথন জিততে। পারেননি। এগিয়ে থেকে যেতে শেষপর্যন্ত তিনি তলিয়ে যান। কিন্তু তলিয়ে যেতে যেতেও জিম পিটার্স সাহসের ও পরিশ্রমের যে অবিমিশ্র পরিচয় রেখে যান, সেইটুকু আঁকড়ে ধরেই আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ইতিহাসের এক অধ্যায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকের সফল চরিত্রের কথাই সবাই মনে রাখে। কিন্তু ব্যর্থতা বরণ করেও যাঁরা ক্রীড়ানুরাগীদের মনের গভীরে স্থায়ী চিহ্ন এঁকে রাখতে পারেন, তাঁরাও স্মরণীয়। অবিস্মরণীয়। হ্যাঁ, উলটো পথে ছুটে, বাঁকা পথে পা বাড়িয়েই জিম পিটার্স অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখেছেন। জিতে নয়, ম্যারাথন দৌড় না জিততে পেরেই। সেই অবিস্মরণীয় ব্যর্থতার বিবরণ আর একবার জেনে নেওয়া যাক।

১৯৫৪ সালের ৮ই আগস্ট ভ্যাঙ্কোভার কমনওয়েলথ ক্রীড়ার শেষদিন অনুষ্ঠিত ম্যারাথন দৌড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরু স্টেডিয়ামে। সমাপ্তিও সেখানে। মাঝপথে ভ্যাংকোভার শহরের রাজপথ, শহরতলীর রাস্তা, চড়াই-উৎরাই, নালা-নদী, পার্ক-বাগিচা, হাইওয়ে-এক্সপ্রেসওয়ে ঘুরতে হবে। বাইরের পথ পঁচিশ মাইলের বেশী। সঠিক হিসেবে পঁচিশ মাইল ১৩৬০ গজ ঘুরে জিম পিটার্স যখন সবার আগে স্টেডিয়ামে ফিরে এলেন, তখন দর্শকমন প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়েছে।

প্রায় ছাব্বিশ মাইল পথ রীতিমত তড়াতাড়ি ছুটে জিম পিটার্স ম্যারাথন দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়তে যেন হাত বাড়িয়েছেন। সবাই ভাবে, রেকর্ড বুঝি হবে। হবে নাই বা কেন? সাগর যিনি ডিঙিয়েছেন সামান্য গোষ্পদটুকু অতিক্রম করতে তিনি হিমসিম খাবেন কেন!

কিন্তু ও কি!

স্টেডিয়ামে ঢুকেই জিম পিটার্স প্রথমে উলটো পথে বাঁক ফিরলেন। কর্মকর্তারা হৈ-হৈ করে উঠতে সোজা পথে আবার ফিরে গেলেন বটে তবে পরিশ্রান্ত শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার সামর্থ বুঝি তাঁর আর নেই। পা কাঁপছে, শরীর দুলছে, দেহের ওপর মাথাটা নড়বড় করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। কি করছেন তিনি জিম পিটার্স তা নিজেও জানেন না। ছোটার নামে হেলে-দুলে জিম পিটার্স একবার ট্র্যাকের এধারে যান। পরক্ষণেই ওধারে। ছুটতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। গুটি-গুটি পায়ে হাঁটাই সার। হাঁটতে-হাঁটতে মূলচ্যুত কাটা কলাগাছের মত কতোবার এলিয়ে পড়লেন মাটিতে।

পড়লেন। উঠলেন। আবার দাঁড়ালেন, হাঁটলেন। পরক্ষণেই গড়িয়ে পড়লেন ধুলোয়। শেষ চারশ গজ পথ অতিক্রমের চেষ্টায় জিম পিটার্স কম করে বার কুড়ি মাটি নিলেন। ট্র্যাকের নির্মম স্পর্শে পিটার্সের গায়ের পায়ের কত জায়গার চামড়া ছিঁড়ে গেল। ঘামে-ভেজা সাদা পোষাক তাঁর রক্তে-রক্তে লাল হয়ে গেল। দৌড় দেখার মজা লুটতে এসেছিলেন যাঁরা, স্টেডিয়ামের আসনে বসে তাঁরা সভয়ে চোখ বুজে ফেললেন। কি জানি কি হয়! এই নাটকের শেষ কোথায়?

শেষের লগনটি আরও পরে দেখা দিল। পেছনে পড়ে ছিলেন যাঁরা এগিয়ে এসে জিম পিটার্সকে তাঁরা একে-একে অনেকেই ধরে ফেললেন। তারপর পায়ের নীচে চক-খড়ির সাদা রেখা এবং পথের ধারে একটি পোস্ট দেখে পিটার্স পথ শেষ হয়েছে ভেবে যেই চোখ বুজে মাটিতে গড়িয়ে নিতে কাৎ হলেন অমনি বৃটিশ দলের ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে পিটার্সের পড়ন্ত অসহায় দেহটিকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনেকের মত ম্যানেজারের স্নায়ুও এই করুণ দৃশ্যের চাপ সইতে পারছিল না।

কিন্তু চক-খড়ির সাদা রেখা আর পথিপার্শ্বের ওই পোস্ট সবই মরীচিকা। ওগুলো ফিনিশিং লাইনের নির্দেশ নয়। সমাপ্তি রেখা সেখান থেকে আরও ২২০ গজ দূরে। কাজেই প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে জিম পিটার্স এত করেও ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গেলেন। কিন্তু বিচারের বাণী, সংগঠকদের ঘোষণা, কোন কিছুই তখনকার মত জিম পিটার্সের কানে ওঠে নি। বিচারক-ঘোষক যখন ভ্যাঙ্কোভার ম্যারাথন দৌড়ের চূড়ান্ত রায় দেন তখন জিম পিটার্স হাসপাতালের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অচেতন। প্রাণান্তকর মেহনত করেও জিম পিটার্স জয়লক্ষ্মীর প্রসন্নতা পেলেন না, এমন কি শেষ ধাপে পৌঁছতেও পারলেন না। একেই বলে কপালের দৌড় উলটো পথে! শরীরের মূলধন যদি আর কয়েক মিনিটের জন্যে কার্যক্ষম থাকত তাহলে কি তীরে এসে জিম পিটার্সের তরীখানি ডুবে যেত?

জিম পিটার্সের এই কাহিনীর সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে ডোরাণ্ডো পিয়েট্রির। তিনিও ম্যারাথন দৌড়বীর। বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার চতুর্থ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ডোরাণ্ডো এসেছিলেন লণ্ডনে। জিম পিটার্সের মত ডোরাণ্ডো পিয়েট্রিও ছিলেন তাঁর কালের অন্যতম শীর্ষপর্যায়ের দূরপাল্লার দৌড়বীর। লণ্ডনে তিনিও সমাপ্তি রেখায় পৌঁছেছিলেন সব প্রতিযোগীর আগে। কিন্তু মুহূর্তকাল পূর্বে ডোরাণ্ডোর পতন ও প্রায় মূর্চ্ছায় অস্থির হয়ে কর্মকর্তাদের কেউ কেউ তাঁকে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন, এই অপরাধে তাঁকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে বেলজিয়ামের ইটিনি গেইলিও আর একটু হলে ডোরাণ্ডো পিয়েট্রি ও জিম পিটার্সের মত অসহায় অবস্থায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন। তাঁর ভাগ্য ভাল যে, শেষমুহূর্তে শারীরিক সামর্থের কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটা রয়ে গিয়েছিল তারই জোরে অপরের সাহায্য ছাড়াই গেইলি নির্দিষ্ট পথ শেষ করতে পেরেছিলেন। তবে দু-দুজনের (আর্জেন্টিনার ক্যাবেরা ও ইংলণ্ডের রিচার্ডস) কাছে হেরে যাওয়ার আগে নয়। অথচ প্রায় ছাব্বিশ মাইল পথ শেষ করে ইটিনি গেইলি লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে এসে হাজির হয়েছিলেন ক্যাবেরা, রিচার্ডস এবং আরও অগুন্তি প্রতিযোগীর আগে।

ইটিনি গেইলির অভিজ্ঞতা তিক্ত। তবে জিম পিটার্স বা ডোরাণ্ডো পিয়েট্রির মত একেবারে বিস্বাদ নয়। গেইলি তবু তো রোঞ্জপদক পেয়েছিলেন। কিন্তু পিটার্স ও পিয়েট্রির ধাতব সঞ্চয় শূন্য। প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট পথ শেষ করতে পারার সান্ত্বনাও তাঁদের ফাঁকি দিয়েছে, ওঁদের ভাগ্যে কারুরই ঈর্ষার বস্তু নয়। ভাগ্য উলটো পথের গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়ে ওঁদের সঙ্গে নিদারুণ রসিকতা করেছে। ছাব্বিশ মাইল তিনশো পঁচাশী গজ দৌড়বার মেহনত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা যাঁদের, তাঁদের প্রার্থনা, জিম পিটার্স আর ডোরাণ্ডো পিয়েট্রির মত যেন আর কারুর না হয়।

'উইসডেন' ট্রফি হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স। ১৯৬৬ সালের সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ৩-১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে এই 'উইসডেন' ট্রফি জয় করেছে।

দর্শক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ড

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৬৮ রান (রোহন কানহাই ১০৪ এবং গারফিল্ড সোবার্স ৮১ রান। বারবার ৪৯ রানে ৩, ইলিংওয়ার্থ ৪০ রানে ২ এবং স্নো ৬৬ রানে ২ উইকেট)

ও ২২৫ রান (নার্স ৭০ এবং বুচার ৬০ রান। স্নো ৪০ রানে ৩, ইলিংওয়ার্থ ২২ রানে ২ এবং বারবার ৭৮ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৫২৭ রান (টম গ্রেভনী ১৬৫, জন মারে ১১২, কেন হিগস ৬৩ এবং জন স্নো ৫৯ রান। হল ৮৫ রানে ৩ এবং সোবার্স ১০৪ রানে ৩ উইকেট)

প্রথম দিন (আগস্ট ১৮) :

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ১টা উইকেট খুইয়ে ২০ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিন (আগস্ট ১৯) :

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৩০ রান দাঁড়ায় (৭ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত থাকেন টম গ্রেভনী (১২৯ রান) এবং জন মারে (৮১ রান)।

তৃতীয় দিন (আগস্ট ২০) :

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৫২৭ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৫৯ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪ উইকেট খুইয়ে ১৩৫ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিন (আগস্ট ২২) :

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস লাঞ্চের পরবর্তী ১০ মিনিটে ২২৫ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড এক ইনিংস এবং ৩৪ রানে জয়ী হয়।

ওভাল মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস এবং ৩৪ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে কোন রকমে মুখ রক্ষা করেছে। ১৯৬৩ সালের মতই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে ৩—১ খেলায় (ড্র-১) 'রাবার' পেয়ে 'উইসডেন' ট্রফী জয়ী হয়েছে। এই শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দল পরিচালনা করেন নবাগত অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ। আলোচ্য পঞ্চম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দলের জয়লাভের মূলে ছিলেন এই চারজন খেলোয়াড়—টম গ্রেভনী, জন মারে, কেন হিগস এবং জন স্নো। অষ্টম উইকেটের জুটিতে গ্রেভনী এবং মারে ২১৭ রান এবং দশম উইকেটের জুটিতে কেন হিগস এবং জন স্নো ১২৮ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫২৭ রান তুলতে সাহায্য করেছিলেন। ফলে প্রথম ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৬৮ রানের থেকে ইংল্যান্ড ২৫৯ রানে অগ্রগামী হতে সক্ষম হয়েছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের মাত্র ১৬৬ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু শেষ তিন উইকেটে ইংল্যান্ড ৩৬১ রান সংগ্রহ করে খেলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স পঞ্চম টেস্টেও টসে জয়ী হলে একই টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই টসে জয়লাভের গৌরব লাভ করেন। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট সিরিজে অনুরূপ সৌভাগ্যের পরিচয় দিয়েছেন আরও এই চারজন অধিনায়ক : ১৯০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার এম এ নোবল,

১৯২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার এইচ জি ডিন, ১৯৫৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার লিন্ডসে হ্যাসেট এবং ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষের পতৌদির নবাব।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হয়ে ব্যাট করার প্রথম সুযোগ পেয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। দলের ৭৪ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে কানহাই এবং সোবার্স গড়ে প্রতি মিনিটে এক রান করে সংগ্রহ করে ১২২ রান যোগ করেছিলেন। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ৮৩ (৪ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন কানহাই (৫৩ রান) এবং সোবার্স (২ রান)। কানহাই ২১০ মিনিট খেলে তাঁর ১০৪ রানে ১৪টা বাউণ্ডারী করেছিলেন—১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে কানহাইয়ের এই প্রথম সেঞ্চুরী। সোবার্সের ৮১ রান তুলতে ১৪৫ মিনিট সময় লেগেছিল। তিনি ১২টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের শেষ উইকেট জুটি দলের মূল্যবান ৪৫ রান সংগ্রহ করেন। প্রথম দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড একটা উইকেট খুইয়ে ২০ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড আরও ৬টা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ২০ রানের (১ উইকেটে) সঙ্গে ৩১০ রান যোগ করে। লঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ১৩৫ (৫ উইকেটে)। লাঞ্চের বিরতির পাঁচ মিনিট আগে হলের বলে এ্যামিস এবং ডি'ওলিভিরা আউট হন। চা-পানের বিরতির সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২১২ (৭ উইকেটে)। খেলায় এই সময় অপরাজিত ছিলেন গ্রেভনী (৭২ রান) এবং মারে (২৬ রান)। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ৩৩০ (৭ উইকেটে); ফলে ইংল্যাণ্ড ৬২ রানে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন গ্রেভনী (১৩২ রান) এবং মারে (৮১ রান)। ১৯৬৬ সালের এই টেস্ট সিরিজে গ্রেভনীর এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। তিনি ২৫২ মিনিট খেলে ১৩টা বাউণ্ডারী করেছিলেন।

তৃতীয় দিনে চা-পানের ঠিক আগে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৫২৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৫৯ রানে অগ্রগামী হয়। ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে এই ৫২৭ রানই এক ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক রানের রেকর্ড। অষ্টম উইকেটের জুটি গ্রেভনী এবং মারে দলের ২১৭ রান সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের পথ পরিষ্কার করেন। ইংল্যাণ্ডের ৩৮৩ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়।

টম গ্রেভনী (ইংল্যাণ্ড)

গ্রেভনী এবং মারের এই ২১৭ রানই ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৮ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। গ্রেভনী প্রায় ৬ ঘণ্টা খেলে তাঁর ১৬৫ রানে ১৯টা বাউণ্ডারী করেন। ৫৯টি সরকারী টেস্টে গ্রেভনীর এই ৮ম সেঞ্চুরী এবং বর্তমান টেস্ট সিরিজে ২য়। অপরদিকে মারে ২৬৫ মিনিটের খেলায় তাঁর ১১২ রানে ১৩টা বাউণ্ডারী করেন। দশম উইকেটের জুটিতে কেন হিগস এবং জন স্নো আড়াইঘণ্টা খেলে দলের মূল্যবান ১২৮ রান সংগ্রহ করেন—ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সরকারী টেস্টে ১০ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। মাত্র ৩ রানের জন্যে তাঁরা বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি। দশম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড হল ১৩০ রান (ডব্লু রোডস এবং আর ফস্টার (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনি, ১৯০৩-৪)।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৫২৭ রানের থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৫৯ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৩৫ রান সংগ্রহ করে।

খেলার চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস লাঞ্চের পর মাত্র ১০ মিনিট স্থায়ী ছিল। ২২৫ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় ওভারে ১৩৭ রানের মাথায় দুটো উইকেট পেয়ে ইংল্যাণ্ড দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। হলফোর্ড বোকার মত রান আউট হন এবং স্নোর বল খেলে ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজের নায়ক গারফিল্ড সোবার্স শূন্য হাতে ইংল্যাণ্ডের নতুন অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজের হাতে ধরা পড়েন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের শেষ আউট হন গিবস—তিনি বারবারের বল খেলে তাঁরই হাতে ধরা দেন।

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এ পর্যন্ত তিনবার 'রাবার' জয় করেছে: ১৯৫০ সালে জন গডার্ডের নেতৃত্বে (খেলা ৪, জয় ৩ এবং হার ১), ১৯৬৩ সালে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে (খেলা ৫, জয় ৩, হার ১ ও ড্র ১) এবং ১৯৬৬ সালে গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে (খেলা ৫, জয় ৩, হার ১ ও ড্র ১)। শেষের দুজন—ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এবং গারফিল্ড সোবার্স হলেন খাঁটি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়।

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

টেস্ট খেলার ফলাফল

স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যাণ্ড	১২	৯	৭
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫	৭	১০
	১৭	১৬	১৭

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	সিরিজ ড্র
ইংল্যাণ্ড	৪	৩	০
ওঃ ইণ্ডিজ	১	২	২
	৫	৫	২

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

১৯৬৬ সালের ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথমস্থান লাভ করেছেন বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকশ খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স—খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১, মোট রান ৭২২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭৪, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০৩-১৪। উভয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের টম গ্রেভনী—খেলা ৪, ইনিংস ৭, নট আউট ১ বার, মোট রান ৪৫৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৬৫, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৭৬-৫০। উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ল্যান্স গিবস—ওভার ২৭৩-৪, মেডেন ১০৩, রান ৫২০, উইকেট ২১ এবং গড় ২৪-৭৬। উভয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন কেন হিগস—ওভার ২৩৬-৪, মেডেন ৪৯, রান ৬১১, উইকেট ২৪ এবং গড় ২৫-৪৫।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) মুদ্রার প্রচলন কবে শুরু হয় এবং কোন দেশে? মুদ্রার আবিষ্কারক কে?

(খ) ধাতু-নির্মিত মুদ্রার কতদিন পরে কাগজের নোট চালু হয়?

বিনীত
কালীপ্রসন্ন ঘোষ,
শিলিগুড়ি।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) কে-এল-এম সম্পূর্ণ কথাটি কি?

(খ) ভারতে সর্বপ্রথম কোন বছর আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল শুরু হয়?

বিনীত
পার্থসারথী দাশগুপ্ত,
মুর্শিদাবাদ।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বি-ও-এ-সি পুরো কথাটি কি?

(খ) ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত কত ডাক-টিকিট প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রথম ডাকটিকিটের নক্সা কি ছিল?

বিনীত
দীপেন্দু পট্টনায়ক,
কলকাতা ৩২।

●

সবিনয় নিবেদন,

ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর জন্ম তারিখ কত এবং জন্মস্থান কোথায়?

বিনীত
গোবিন্দ দাশ
২৪ পরগণা।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ভারত আজ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে এবং ফলাফল কি?

(খ) ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতের কোন খেলোয়াড় উভয়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করেন?

বিনীত
রঞ্জিতকুমার গুহ
রাঁচী।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোলকীপার কে?

(খ) সাইকেল আবিষ্কার করেন কে?

(গ) এইচ-এম-টি পুরো কথাটি কি?

বিনীত
কেকা রায়, নির্মল রায়চৌধুরী,
প্রবোধ ও সুলেখা সান্যাল
বর্ধমান।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত সুশান্ত ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, 'দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিকস' দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। 'ইউনিভার্সিটি এনক্লেভ'-এ এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এখানে 'ইকনমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে' স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এছাড়া ইকনমিকস, সোসিওলজী ও হিউম্যান জিওগ্রাফীতে এম-এ, এম-কম ও পি-এচ-ডি উপাধির ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হলেন ডঃ এম, এন, শ্রীনিবাস।

বিনীত
প্রতীক রায়
নিউদিল্লী—৩

●

সবিনয় নিবেদন,

৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবোধ, সত্যব্রত ও সুলেখা সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,

(ক) প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির অধিকারী প্রথম মহিলা হলেন বিভা মজুমদার।

(খ) অতীত যুগের আশ্চর্য জিনিস: ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, মিশরের পিরামিড, রোডস ও সাইপ্রাস দ্বীপের পিতল মূর্তি, আমনার মন্দির, ওলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্তি, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইট হাউস, রাজা মৎসলাসের সমাধিস্তম্ভ।

বর্তমান যুগের আশ্চর্য জিনিস: এম্পায়ার স্টেটস বিল্ডিং (নিউইয়র্ক), পানামা খাল, গোল্ডেন গেট ব্রীজ (সানফ্রান্সিসকো), টেমস নদীর নিম্নস্থ সুড়ঙ্গ পথ, নীপার বাঁধ (রাশিয়া), ওয়াশিংটনের স্মৃতিমন্দির, ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ (ভারত), স্পুটনিক।

(ঙ) বিছুটি গাছের পাতায় খুব সরু সরু রোঁয়া আছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঐ রোঁয়াগুলোর ডগায় একরকম কাঁচের মত গোল। আমাদের গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গোল ডগাটা ভেঙে গিয়ে আমাদের চামড়ার ভিতরে রোঁয়ার ছুঁচালো ডগাটা ঢুকে যায়। আর ঐ রোঁয়ার ভিতরে ফাঁপা নলের মধ্যে যে বিষাক্ত রস থাকে সেই রস তখন রক্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং আক্রান্ত জায়গা ফুলে ওঠে ও জ্বালা করে।

বিনীত
ইন্দ্রানীবিষ্ণু চৌধুরী
কলকাতা—১১

●

সবিনয় নিবেদন,

১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত সুলেখা, প্রবোধ ও সত্যব্রত সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, কর্ণেল ফর্বস সর্বপ্রথম ডাকটিকিট আবিষ্কার করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডবাসী জেমস টমাস আঠাযুক্ত ডাকটিকিট আবিষ্কার করেন। তারপর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে স্যার রোনাল্ড হিল এক পেনী মূল্যের সস্তা ডাকটিকিট প্রচলন করেন। প্রথম ডাকটিকিটের নকসা ছিল।

বিনীত
তাপস দত্ত
উলুবেড়িয়া

●

সবিনয় নিবেদন,

৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে সর্বপ্রথম ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারক হচ্ছে ক্যাকস্টেন।

বিনীত
প্রদীপকুমার ব্যানার্জী
হুগলী
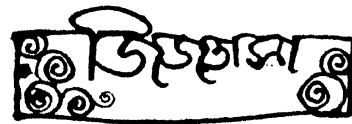
বর্তমান সংখ্যায় বাংলা-সাহিত্যের কয়েকজন খ্যাতনামা গল্পকারের কয়েকটি সাড়া-জাগানো গল্পের নাম দেওয়া হল। বামদিকে লেখকের নাম। ডানদিকে তাদের গল্পের নাম। ডান স্তম্ভটি ওলট-পালটভাবে রাখা হয়েছে। লেখকদের নামানুসারে গল্পগুলি সাজাতে হবে। উত্তর আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর: (১) বাবলু বোস, (২) তুলসী, (৩) গোরাবাবু, (৪) মঞ্জরী

লেখক	গল্প
(১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	(১) বনমর্মর
(২) প্রেমেন্দ্র মিত্র	(২) টোপ
(৩) বুদ্ধদেব বসু	(৩) পালঙ্ক
(৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,	(৪) অযান্ত্রিক
(৫) প্রবোধকুমার সান্যাল	(৫) আদাব
(৬) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	(৬) কেদার রাজা
(৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	(৭) বেদে
(৮) সমরেশ বসু	(৮) যাযাবর
(৯) সুবোধ ঘোষ	(৯) প্রাগৈতিহাসিক
(১০) নরেন্দ্রনাথ মিত্র	(১০) আমরা তিনজন
(১১) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	(১১) স্টোভ
(১২) মনোজ বসু	(১২) অগ্রদানী

(উপন্যাস)

।। ছয় ।।
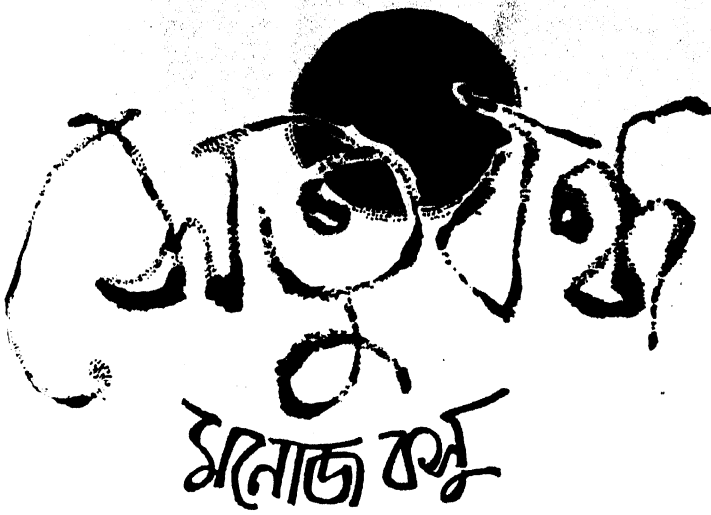
তারপরে ছ'টা মাসও যায় নি—দরজার পাশ থেকে পূর্ণিমার চেয়ার অনেক ভিতরে চলে গেছে। ডিরেক্টরদের চেম্বারের কাছাকাছি। স্টেনো সে এখন।

মেজো মনিব অরুণের কাছে কথা পাড়তেই সে সায় দিয়ে বলেছিল, ঠিক ঠিক! কিছুদিন থেকে আমরাও ভাবছি তাই নিয়ে। দু-জন টাইপিস্ট আছেন—ওঁরা পেরে ওঠেন না। কাজ বেড়ে গেছে, বিস্তর বাকী পড়ে থাকে। বসুন, আর দু-ভায়ের সঙ্গে কথা বলে নিই। স্পীড কম্দূর উঠছে? তার জন্য ঘাবড়াবেন না, কাজ করতে করতে চড়বড় করে উঠে যাবে।

ক'দিনের মধ্যেই চেয়ার পড়ল অপর দুই টাইপিস্টের পাশে। একজন বৃদ্ধ—রিটায়ার করলেই হয়, অন্যটি মেয়ে। বৃদ্ধ বলেন, কতকাল ধরে বাড়তি একজন লোকের জন্য বলছি, কর্তারা গ্যাঁট হয়ে ছিলেন: এস্টাবলিশমেণ্ট অর সিকিখানাও বাড়ান হবে না। তুমি মা একবার বলতেই হয়ে গেল। ভাল হল, আমাদের কাঁধ হাল্কা হল খানিকটা। কিন্তু তোমার দিক দিয়ে বলি—এত যখন নেক-নজর, পে-ক্লার্কের কাজটা চাইলে না কেন তুমি? এক বছরের উপর খালি পড়ে আছে, একে-ওকে দিয়ে চালাচ্ছে।

উপমা দিয়ে একটা গল্প বললেন। উপবাসী ব্রাহ্মণ তপস্যা করছেন, শিবঠাকুর বর দিতে আবির্ভূত হলেন: কি প্রার্থনা? ব্রাহ্মণ বলেন, এক ধামা মুড়ি দাও ঠাকুর, পেট ভরে খাই। খাদ্যের মধ্যে ক্ষীর-সন্দেশের নামও মনে পড়ল না। তোমার বেলাতেও মা সেই দৃষ্টান্ত। পে-ক্লার্কের কাজে উপরি আয় নিদেনপক্ষে দৈনিক দশটি টাকা। আর এ যা নিয়েছ—মেশিনের চাবি টিপতে-টিপতে আঙুল ভোঁতা হয়ে যাবে। মাইনে বলে খাতায় লিখে যেকটি টাকা দেবে তার উপরে একটি আধলাও আর নয়।

তাপস পাশ করেছে। যেমন-তেমন পাশ নয়—ফার্স্ট ডিভিসন, তদুপরি চারটে লেটার। আশা করা যায়, ছোটখাট একটা স্কলারশিপও পেয়ে যাবে। এত ভাল করবে, বাড়ির কেউ ভাবতে পারে নি—তাপস নিজেও না। কিন্তু হলে হবে কি—পরীক্ষা শেষ হবার পরের দিন থেকেই ঘোরাঘুরি করছে, তারণ নিজে সঙ্গে করে তাঁর পুরানো অফিস-সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে নিয়ে দরবার করেছেন। চাকরি দেওয়া পড়ে মরুক—কেউ এতটুকু মিথ্যে ভরসাও দিল না, রাতারাতি সব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব তো হেসেই খুন: ধরে নিলাম পাশই করবে, কিন্তু হায়ার-সেকেণ্ডারি পাশে কি চাকরি পাবে ছোকরা? আপনিই বা সরকারমশায় জেনে-শুনে কি জন্য হন্ত-হন্ত করে ঘুরছেন? পিওনের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—এক ঝাড়ি দরখাস্ত, তার ভিতরে ডজনখানেক অন্তত গ্রাজুয়েট—

উচিত জবাব তারণের মুখে এসেও আটকে রইল: তুমি নিজে ক'টা পাশ, চাকরি করে একসঙ্গে জনম কাটালাম, অত হামবড়া ভাব আমার কাছে নাই দেখালে!

মুখে এসেছিল কথাগুলো। কিন্তু উমেদার হয়ে এসেছেন, আরও হয়তো আসতে হবে—অসহ্য কথা কানে শুনেও চুপচাপ বেরিয়ে আসতে হয়। আরও এমনি কত জায়গায় তারণ সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, পূর্ণ মুখুজ্জের সঙ্গে পাঠালেন, কত রকম সুলুকসন্ধান দিলেন—তাপস সারা দিনের পর বিষন্ন মুখে বাড়ি ফিরে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ে। রাত্রে আর উঠতে চায় না, ধরে তুললেও ক্ষিধে নেই বলে আবার চোখ বোঁজে।

এমনি সময় পরীক্ষার ফল বেরুল। বাহাদুর ছেলে। কত অসুবিধার মধ্যে পড়া-শুনো করে—বাইরের লোক না-ও যদি বোঝে, পূর্ণিমা অহরহ চোখের উপর দেখে এসেছে। আরও কিছুদিন পর দৈবাৎ একটা চিঠি।

পূর্ণিমার হাতে এসে পড়ল। তাপসের নামের চিঠি, কিন্তু খাম খুলে পূর্ণিমা আগে পড়ে নিল।

তরঙ্গিণীর কাছে গিয়ে পূর্ণিমা বলে, নেকলেশটা দাও মা—

তরঙ্গিণী বুঝে উঠতে পারেন না: কোন্ নেকলেশ?

ক'টা নেকলেশ আছে আমার? সেই যেটা গড়ালে তোমার হেলেহার ভেঙে?

মা বলেন, কি করবি?

পরব আমি, শখ হয়েছে। বাঃ রে, অবাক হবার কি? আমার নাম করে গড়িয়েছ, গয়না তো পরবার জন্যই লোকে গড়ায়।

তরঙ্গিণী বলেন, বিয়ের সময় পরবি সেই জন্যে গড়ানো হয়েছে। এখন পরে পুরনো করবি কেন?

পূর্ণিমা হেসে বলে, বিয়ে বিশবাঁও জলের নিচে।

সে কী কথা! পাশ করে গেছে তাপস। যা হোক একটা চাকরি হলেই তোর দায় খালাস হয়ে গেল। বিয়ের তখন বাধা কিসের?

দৃঢ়কণ্ঠে আবার বলেন, চাকরি হোক ভাল না হোক ভাল, বিয়ে তোর আমি দেবই, এই বছরের মধ্যে।

চাকরি কেমন হবে শোন নি মা? বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য কোথাও নয়—নিজের পুরানো অফিসে। গিয়েছিলেন সেই লোকের কাছে পাশাপাশি চেয়ারে বিশ বছর ধরে যে কাজ করেছে। বলে দিয়েছে পিওনের চাকরি পেতে পারে বড়জোর। তার জন্য কলেজে পড়ে গ্রাজুয়েট হতে হবে কিনা, সেটা তেমন স্পষ্ট করে বলে নি।

তরঙ্গিণী বলেন, ও একটা কথার কথা। অন্য কিছু নাই যদি হয়, নেবে তাপস ঐ পিওনের চাকরি। তাই বলে তুই যে চিরকাল ছন্নছাড়া যোগিনী হয়ে ঘুরবি, সেটা আমি হতে দিচ্ছিনে।

পূর্ণিমা চোখ বড় বড় করে বলে, সর্বনাশ! যোগিনী কোথায় দেখলে মা? আমি যে হলাম দেবী—দশভুজা। অন্তর্যামীর মতো সকল দিকে নজর রেখে দশখানা হাতে খেটে যাই। বিশ্বাস না হয় তো বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। তিনি বলবেন।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে, যোগিনী বলেই যদি ঠেকে—গয়না দাও না, গয়না পরে সাজ-পোশাক করে রাজরাণী হয়ে বেড়াই। শখ হয়েছে, দেখিই না পরে কেমন মানায়। তুমি মা অমন করছ কেন?

বেশী বলাবলিতে উল্টো ফল হল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তরঙ্গিণী বলেন, শখ করবার মেয়ে তুই নেস। অন্য কোন মতলব আছে। গয়না দেব না, স্পষ্ট কথা। বিয়ের নাম করে গড়ানো — কনে-পিঁড়িতে বসিয়ে তবে ঐ নেকলেশ পরাব।

তখন পূর্ণিমা নিজমূর্তি ধরে: ঠিক ধরেছ তুমি মা। শখ বলে কিছু নেই আমার। মেয়েমানুষের শখ থাকে, দেবীর

কোন শখ থাকতে নেই। পিওন হবার জন্য আমার ভাই আসে নি। চাকরিই করবে না সে। ডাক্তার হবে মেডিকেল কলেজে পড়ে। ভর্তি হতে গুচ্ছের টাকা লাগে। সে টাকা নেই আমার। থাকলে তোমাদের জানতেও দিতাম না।

মায়ে মেয়ের বচসার মধ্যে তারণ এসে দাঁড়িয়েছেন। নিঃশব্দ ছিলেন — এইবার কৌতুককণ্ঠে বলে উঠলেন, আম্বা তোর কম নয় পুনি। ডাক্তারি পড়াবি ভাইকে—তা আবার মেডিকেল কলেজে? ভর্তি হওয়া সহজ নয় রে, টাকার আণ্ডিল থাকলেও ভর্তি হওয়া যায় না। তদ্বির লাগে, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। তা বড় লোকের ছেলেও কত সময় ঢুকতে পায় না। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, মনে আছে, পাঁচ হাজার অবধি খরচ-খরচ করতে রাজি ছিলেন, তবু ঢোকাতে পারেন নি।

পূর্ণিমা বলে, সেই অসাধ্যসাধন তাপস করেছে—সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। কাউকে কিছু বলে নি—চিঠিটা দৈবাৎ আমার হাতে পড়ে গেল।

চিঠিখানা পূর্ণিমা বাপের হাতে দিল : তাপস সরকার মনোনীত হয়েছে, যে কোন দিন এগারোটা থেকে দুটোর মধ্যে সে ভর্তি হতে পারে। অমুক তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে ধরে নেওয়া হবে সে অনিচ্ছুক। তার জায়গায় তখন অন্য ছেলে নিয়ে নেবে। মাত্র পাঁচটা দিন মাঝে আছে সেই শেষ তারিখের।

তারণ বলেন, গয়না বেচে হোক যেমন করে হোক ভর্তি না হয় হল। তার পরে? পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে পড়ার খরচ কে চালাবে?

পূর্ণিমা বলে, আবার তাপসের দিকটাও ভেবে দেখ বাবা। একলা নিজের ক্ষমতায় এতদূর করেছে, আমরা অপদার্থ বলে যদি সব পণ্ড হয়ে যায়, মনে মনে মস্ত ঘা খবে সে। আমরাই বা মুখ তুলে তার সামনে তাকাব কি করে?

তরঙ্গিণী ধমক দিয়ে উঠলেন : আরও পাঁচ বছর ভূতের খাটুনি খাটবি, সেই চক্রান্ত করছিস তুই। হবে না পুনি, বিয়ে তোর আমি দেবই। এই দু-চার মাসের মধ্যে। চাকরি-বাকরি না করে ছেলে যদি লাট-সাহেব হবার মতলব এঁটে থাকে, করুক তাই। না হয় আমরা গলায় দড়ি দেব—তখন তো আর খাওয়া-পরার ঝঞ্ঝাট থাকবে না!

এই পর্যন্ত তখন। খানিক পরে তাপস বাড়ি ফিরলে তরঙ্গিণী কাছে ডাকলেন : চাকরি হয় না শুনি—হবে কি করে, চাকরি জোটানোর মন আছে তোর? ডাক্তারি পড়া হবে, বিয়ের গহনা বেচে ছোড়দি ভর্তির টাকা দেবে, খেটে খেটে মুখের রক্ত তুলে পড়ার খরচ জোগাবে। তার নিজের সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকতে নেই, পুণ্যিসুদ্ধের জন্য চিরজন্ম খেটে যাবে শুধু। নিজের বাপ পর্যন্ত দাবা নিয়ে দায়দায়িত্ব বিস্মরণ হয়ে থাকে, আমি মেয়েমানুষ আঁকুপাকু করে কি করব?

গজরগজর করে চলেছেন। কী যেন সাংঘাতিক অপকর্ম করে বসেছে—সেই লজ্জায় তাপস ঘাড় নিচু করে আছে। মুখে জবাব নেই। কানে শুনে পূর্ণিমা ছুটে এসে পড়ে। তরঙ্গিণীকে বলে, ওকে কেন বকছ মা? চিঠি এসেছে, এখন অবধি ও জানেই না। যা বলতে হয় আমায় বলো।

তাপসের মুখ তুলে ধরে হেসে উঠল। হেসে যেন তার মনের ভার উড়িয়ে দিতে চায়। বলে, ভাই আমার কত বড় হবে দেখো মা। বিয়ে না হয় ক'টা বছর পিছিয়ে গেল। সব গয়না তাপস সেই সময় পূরণ করে দেবে। বাড়তি নতুন নতুন গয়নাও দেবে কত। কী বলিস রে, মায়ের সামনে কথা-বার্তা হয়ে যাচ্ছে, দিতে হবে কিন্তু।

দু হাত মেলে জড়িয়ে ধরে ছোটমেয়েকে যেমন সান্ত্বনা দেয় পূর্ণিমা তেমনি ভঙ্গিতে বলে, মুখ গোমড়া করো কেন মা, লাভেরই ব্যাপার তো! এক গয়না দিয়ে পাঁচ-সাতখানা পেয়ে যাচ্ছ। এই একবার বলে নয়—কত দেবে, কত নেবো চিরকাল ধরে। এক ছেলে তোমাদের, আমার আর দিদির একটিমাত্র ভাই। ক'টা বছর সবুর করো—ডাক্তার-ভাইকে নিয়ে কত জাঁক করব আমরা দেখো।

মায়ের আঁচলে চাবির গোছা—পুণ্য ঠিকই আছে, চাবির থোলো মুঠির মধ্যে এঁটে ধরল। লড়ালড়ি করে মেয়ের সঙ্গে পারা যাবে না, সে চেষ্টায় তরঙ্গিণী গেলেন না। ওঘরে গিয়ে পূর্ণিমা আলমারি খুলে ফেলল, টাকাকড়ি ও দামি জিনিষপত্র মা কোন খোপে রাখেন জানা আছে—

তাপস কোন দিক দিয়ে এসে পায়ের উপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

ভুল করেছিলাম ছোড়দি। এতদূর হবে আমি ভাবতে পারিনি।

হাসিমুখে পূর্ণিমা বলে, কত দূর কি হল রে?

গয়না কেন বেচবি ছোড়দি? সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না—

বলতে বলতে তাপস কেঁদে ফেলে: বন্ধুরা বলল পরীক্ষা যত ভালোই হোক, এখনকার দিনে বিনা তদ্বিরে কিছু হয় না। তারই পরখ করবার জন্য ভর্তির ফরম এনে পূরণ করে দিলাম। ইন্টারভিউয়ে ডাকল, যা মুখে এলো জবাব দিয়ে এলাম। সত্যি সত্যি নেবে চাইবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ছোড়দি। এমন গেরো, চিঠিটাও পড়ল তোর হাতে। আমি পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলতাম, কাক-পক্ষীও টের পেত না। ডাক্তারি পড়ার আমার একটুও সাধ নেই।

পূর্ণিমা ধমক দিয়ে ওঠে : সাধ হোক না হোক, আমার। অফিসের কেরানী না হয়ে ডাক্তার হবি তুই। মাথার উপরে গুরুজনরা সব আছি—আমাদের নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি, তুই তার ভিতরে পড়ে জেঠামি করিস কি জন্যে? আমাদের বিবেচনায় যা আসে সেই ব্যবস্থা করব—তোকে যেমন যেমন বলা হবে তেমনি শুধু করে যাবি।

মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় পূর্ণিমার। সুর নরম করে মৃদু কণ্ঠে আবার বলে, ভাই আমার মস্তবড় ডাক্তার হবে, নামযশ ছড়াবে চতুর্দিকে, কত লোকের জীবন দেবে, মানুষ কত উপকার পাবে—আমার এমন সাধে কেন তুই বাদ সাধবি? গয়না তো একখানা যাচ্ছে—ঐ একখানার জায়গায় গা ভরে তুই গয়না দিয়ে দিস। ক'দিন আর—চারটে পাঁচটা বছর। তার মধ্যে বুড়ো হয়ে গয়না পরার দিন ফুরিয়ে যাবে,—তাই ভেবেছিস নাকি?

তরঙ্গিণীর কাছে গিয়ে তাঁকে শান্ত করছে : সমস্ত জীবন বাবা খেটে গেছেন—একটা দিন কখনো আরাম করে কাটাননি। বুড়ো হয়ে আজ তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। তবু পূর্ণ-জেঠা আছেন—তাঁর সঙ্গে দাবা নিয়ে দুর্ভাবনা একটুখানি ভুলে থাকেন। তাপসেরও ঐ পরিণাম চাও? বাবা ভুক্তভোগী, হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন তিনি—সেই জন্যে চুপ করে গেলেন। কেন রাগ করছ মা, এ ক'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। গয়না তুমি আবার দিও, টাকার ব্যবস্থা আমি করব। তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আপাদমস্তক গয়নায় সাজিয়ে বিয়ে দিও আমার—টুঁ শব্দটি করব না।

স্টেনো এখন পূর্ণিমা। চেয়ার বাইরে থেকে ভিতরে গিয়ে পড়েছে। বেশভূষা নিয়ে হাঙ্গামা করতে হয় না, চলনসই রকমের হলেই হল। হাঙ্গামা যত কিছু আনাড়ি আঙুল দশটা সম্পর্কে—অবাধ্যপনা না করে যেন তারা। টাইপ-রাইটারের চাবির উপর দিয়ে যেখানে যেমনটি প্রয়োজন, দ্রুতবেগে ঘুরে বেড়াবে। সুপারসোনিক বিমানের গতিতে—কোন আঙুল তর্জনী কোনটি অনামিকা

আলাদা করে চেনা যাবে না। আর চোখ বুজে বলবে তখন পূর্ণিমা। এমনি হলে বলা যেতে পারে, হাঁ, শেখা হয়েছে কিছু বটে।

কিন্তু বিস্তর দেরি তার। পূর্ণিমার খাটুনির অবধি নেই। অফিসের কাজ সারা হলে, পূর্ণিমার মেশিন তারপরেও সমানে চলছে। যথেচ্ছ টাইপ করে হাত রপ্ত করছে। সকাল হাজিরার পর ছুটি না হওয়া অবধি আঙুল তিলেক বিশ্রাম পায় না। বুড়ো-মানুষটি সেই যে আঙুলে ভোঁতা হবার কথা বলেছিলেন, তাই না অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

অরুণ ক্ষমাশীল মনিব—টাইপের ভুল-ত্রুটি নিজ হাতে কেটেকুটে ঠিক করে নেয়। কাটাকুটো অত্যধিক হলে নতুন করে টাইপ করার প্রয়োজন পড়ে। পূর্ণিমার লজ্জা ঢাকবার জন্য একটা দুটো বাড়তি লাইন জুড়ে দেয়—যেন এই নতুন লাইনের জন্যই পুনরায় ছাপতে হচ্ছে, পূর্ণিমার দোষ কিছু নেই। আমারই ডিকটেশনের দোষ মিস সরকার, অর্ধেক কথা ছেড়ে যাই, সই করতে গিয়ে মনে আসে। করুন আবার, উপায় কি।

অনাদি ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজে বসে এই শোনা গিয়ে।

এর উপরে তিরিশ টাকা দমকা মাইনে-বৃদ্ধি নতুন টাইপিস্টের কর্মদক্ষতার জন্য। মাইনে বৃদ্ধি হয়েছে, খবরটায় তারণকৃষ্ণ বাড়িসুদ্ধ রোমাঞ্চ বোধ করছেন। চিরকাল চাকরি করে এসেছেন। মাইনে তাঁরও বেড়েছে কালেকালে। কিন্তু একলা একজনের আলাদা করে নয়, সকলের সঙ্গে সাধারণ ইনক্রিমেন্ট। মেয়ে দেখিয়ে দিয়ে এই সামান্য দিনের মধ্যে নিজের বিশেষ সমাদর আদায় করল।

আহ্লাদে গদ গদ হয়ে পূর্ণ মুখুজ্জেকে বললেন: পুনিকে তুমিই ঢুকিয়েছ পূর্ণ-দা। তোমার কাছে তোমার মুখ কত বড় হয়ে গেল।

পূর্ণ কিন্তু উৎসাহ দেখান না। মুহূর্ত-কাল চুপ করে থেকে বললেন, রোসো, খবরটা ভাল করে নিই। লোক ওরা খারাপ নয়, কিন্তু টাকাপয়সার ব্যাপারে বড় কঞ্জুষ। ছেঁড়া-কাগজ কুড়োয়, দেখেছ ওদের ঠাকুরদা সেই জিনিষের ব্যবসা করে টাকা করেন। টাকা হয়েছে, কিন্তু ছেঁড়া-মন বংশধারায় চলছে। না চাইতে আপসে মাইনে-বৃদ্ধি হয়ে গেল এরকম হবার কথা নয়। ভাল করে খবর নিয়ে তারপর বলব।

তরঙ্গিণী মেয়েকে বলেন, ঐ তিরিশ টাকা আমার কিন্তু। মনে কর, আগের মাইনেই পাচ্ছিস তুই। আমি ঐ টাকা মাসে মাসে পোস্টাপিসে জমা দিয়ে যাবো।

পূর্ণিমা বলে, তিরিশ কেন, পুরো টাকাটাই তোমার মা। জমাও, খরচ করো—যেমন তোমার খুশি।

মিষ্টি মিষ্টি বলে আমাকে ভোলাতে পারবিনে। ডাকাতি করে গয়না ছিনিয়ে নিয়েছিস—মাসে মাসে দিয়ে যাবি, টাকা জমিয়ে আমি গয়না গড়িয়ে যাব। একটা গয়না নিয়েছিস, তার খেসারত দিবি পাঁচখানায়।

পূর্ণিমা বলে, ভালোই তো— আমার জন্যে হবে, লাভ তো আমারই। খরচপত্র মিটিয়ে যত খুশি গয়না গড়িও। আমার তো ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। হাত-খরচা বলে গেল মাসে যে ক'টা টাকা রেখেছিলাম, দিদি এসে থাবা মেরে তা নিয়ে গেল। চালাতে পারে না, কি করবে। আট-দশটা দিন হেঁটে হেঁটে অফিস করেছি। ক্যান্টিনে না ঢুকে কলের জলে টিফিন। এ মাসে পুরো মাইনে তোমায় দিয়ে দেবো মা। বাসভাড়া আর টিফিন বাবদ যা ন্যায্য মনে কর, তুমিই আমায় দেবে। কেমন?

তুলসীদাস বাধ্য স্বামী এখন। বাড়ি বসে বসে রঞ্জুকে কোলে তুলে নাচানো এবং সংসারের ফাইফরমাস খাটা ছাড়া অন্য কাজ নেই।

অনিমা বলে, এই বেশ ভালো—

মুখে বলে এই, মনের কথা ক্রমশ বিপরীত হয়ে উঠছে। বারবার দরাজ হাতে খরচ-

পার করে এসেছে, ভাড়া বাবদ এখন যে ক'টি টাকা পায় তাতে কুলিয়ে ওঠে না। কষ্ট হয় দস্তুরমতো, পূর্ণিমার কাছে গিয়ে পড়তে হয়। তারাও সচ্ছল নয়. লজ্জায় মাথা কাটা যায় ছোট বোনের কাছে বলতে। নিরুপায় হয়ে বলতে হয় তবু।

তুলসীদাসেরও বিষম খারাপ লাগছে! বলে, পাড়ার সবাই জনে আমায়, শহরের বিস্তর লোক জানে। চিরকাল রাজার হালে কাটিয়েছি—এখন এই অবস্থায় এইরকম পোশাকআশাকে কেমন করে বেরুব। ঘরের মধ্যেই জ্যান্ত-কবর আমার

চিঠিপত্র লেখালেখি চলছিল। কলকাতায় এতবেশি চেনাজানা—কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে কোন একখানে থাকতে পারলে হয়। হলে তো ভালোই, অণিমার কী আপত্তি! বছর খানেক লেখালেখির পর এলো কাজের খবর লুধিয়ানার এক মিল থেকে। এই মিলের বিস্তর হোসিয়ারি জিনিস এক সময়ে এরা চালিয়েছে—খেলনার দোকানের লাগোয়া একটা হোসিয়ারি দোকানও নিয়েছিল তখন। বাবা বর্তমান ছিলেন—তুলসীদাস নিজেই কয়েক-বার সেখানে মাল পছন্দ করতে লুধিয়ানা গিয়েছে। গিয়ে মালিকের বাড়ি উঠত। জানাশোনা ভাবসাব সেই থেকে। মিলের জনৈক সেলসম্যান হিসাবে মালিক তুলসী-দাসকে নিতে চেয়েছেন। মালিকের নিজ হাতে লেখা চিঠি : এইখানে থাকো এসে। বাংলা মুলুকের যাবতীয় পাইকারের ভার তোমার উপর থাকবে। ঐ অঞ্চলের ফ্যাশান মাফিক মাল তৈরির পরামর্শ মিলকে দেবে। নতুন নতুন খদ্দের ধরবার চেষ্টা করবে। যদি কখনো নিজস্ব কাজকারবারের বন্দোবস্ত করতে পার, সর্বপ্রকার সাহায্য পাবে মিল থেকে।

চিঠি দেখে অণিমা লাফিয়ে ওঠে : আমি যাব রঞ্জু যাবে—সবশুদ্ধ চলে যাব আমরা। বাসা করে একসঙ্গে মজা করে থাকব। ওসব জায়গার জলহাওয়া খুব ভালো, পাঞ্জাবীদের চেহারা দেখে বুঝি। তুমি একলা দূরদেশে পড়ে থাকবে, আমরাই বা একা এখানে থাকতে যাব কেন? আর ঐটুকু বাচ্চা নিয়ে থাকবই বা কোন ভরসায়?

তুলসীদাসকে একলা ছাড়তে ভরসা হয় না। সে দেশে কি আর হিড়িম্বা-চামুণ্ডারা নেই, দিলদরিয়া মানুষটার ঘাড়ে চেপে বসা কিছুমাত্র শক্ত নয়। আরও আছে—পরিচিতের মধ্যে থাকতে অণিমারও বড় লজ্জা। দোকান গিয়ে একেবারে নিঃস্ব—তদুপরি তুলসীদাসের বেলেল্লাপনা জানতে কারো বাকি নেই। অণিমার একটা রোগের মতো দাঁড়িয়েছে—যার দিকে তাকায়, মনে হয়, হাসছে সে টিপে টিপে। হেনকালে পালানোর এত বড় সুযোগ এসে গেল। নাছোড়বান্দা অণিমা, উপরতলাটাও ভাড়া দিয়ে কলকাতার মুখে লাথি মেরে সবশুদ্ধ আমরা চলে যাই—

তুলসীদাস গররাজি নয় : ভালই তো! একা একা আমারও কি ভাল লাগবে সেখানে? মিলের ভাল ভাল কোয়ার্টার দেখে এসেছিলাম তখন—একটা কি তার মধ্যে জোগাড় হবে না? কিন্তু মুশকিল হল—

তুলসীদাস চুপ করে যায়, অণিমা একাগ্র হয়ে চেয়ে আছে। একটু থেমে গলা-খাঁকারি দিয়ে আবার বলে, গিয়ে একবার পৌঁছতে পারলে আর অসুবিধা নেই। সেই অবধি যাওয়াই তো মুশকিল, আড়াইখানা টিকিট—অতদূরের পথ, থার্ডক্লাসে গেলে কষ্টের একশেষ হবে—সেকেণ্ডক্লাস নেহাৎপক্ষে। তার উপরে জামা-কাপড় আমাদের সকলেরই কিনতে হবে। আগে গিয়েছি, তখন কত বাহার দেখেছে। সেই তাদের সামনে একেবারে ভিখারি বেশ নিয়ে কেমন করে দাঁড়াই?

কথা শেষ হতে দেয় না অণিমা। হাতের চুড়ি খুলে দিয়ে বলে, বিক্রি করো এই চার গাছা—

তুলসীদাস স্ত্রীর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখে চুড়ি নিয়ে নিল। বলে, বিক্রি নয়, বন্ধক দেবো। দুর্দিন কেটে যাবে। চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই শ্বশুর-মশায়ের কাছে টাকা পাঠাব, গয়না খালাস করে ওঁরা পাঠিয়ে দেবেন।

বন্ধক না বিক্রি—তুলসীদাস কোনটা করল অণিমা জানে না। যেমন ইচ্ছে করুক গে. চলে যাওয়াটা মোটের উপর ভণ্ডুল না হলে হয়। কলকাতা শহর শ্বাপদসংকুল অরণ্য—কোন কালসাপিনী কখন ফের দংশন করে বসে ঠিকঠিকানা নেই। ভাল আছে, আবার মন্দ হতে কতক্ষণ!

যাওয়ার তোড়জোড় চলেছে. তারিখ পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে। দোকান ঘুরে ঘুরে ছেলের এবং নিজেদের কাপড়চোপড় কেনা হল। এবং বিদেশে যেতে কতকগুলো জিনিস হাতের কাছে থাকা অত্যাবশ্যক, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা-ও কিনল। রবিবারের দিন অণিমা ছেলে কোলে বাপের বাড়ি এসেছে—যেমন সে আসছে ইদানীং। এই শেষ রবিবার—সামনের শুক্রবারে রওনা হয়ে যাচ্ছে, আর কোন রবিবার পাওয়া যাবে না। মা-বাপ ভাই-বোনের সঙ্গে সমস্তটা দিন কাটিয়ে যাবে। কতদিন আর দেখা হবে না, এ জীবনে দেখা আর না-ও হতে পারে।

তাপস পূর্ণিমা তরঙ্গিণী সবাই তুলসীদাসের কথা বললেন, বড় বেশি করে বলছেন আজ : তাকে কেন নিয়ে এলিনে? এখন আর এত সংকোচের কি আছে। পা পিছলেছিল, সে তো সামলে নিয়েছে অনেকদিন। অতীতের বৃত্তান্ত. মন থেকে মুছে ফেলা উচিত। আমাদের বলে নয়, তুলসীদাসের নিজের মন থেকেও।

তা ছাড়ত না আজ অণিমা, নিয়ে আসত ঠিক টেনেটুনে। রঞ্জুকে এগিয়ে দিত রঞ্জু বাপের হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু সত্যি সত্যি জরুরি কাজ আজ বাড়িতে উপরতলাটা ভাড়া নিতে চায় এমনি দুটো পার্টি ঘর দেখতে আসবে, পছন্দ হলে ভাড়া অগ্রিম দিয়ে পাকাপাকি করে যাবে। ঘর দেখাবার কাজে তুলসীদাসকে বাড়ি থাকতে হল। তবে অন্যদিনের মতো নয়—বিকাল বেলা আজ সে এসে পড়বে। রাত্রে এখানে খাওয়াদাওয়া সেরে সবাইকে বলেকয়ে প্রণাম আশীর্বাদ সেরে ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, তুলসীদাসের দেখা নেই। অণিমা ছটফট করছে। তরঙ্গিণী প্রবোধ দেন : চিরকালের বাস তুলে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কোন কাজে আটকে পড়েছে। ব্যস্ত হোস নে, এইবারে এসে যাবে।

পূর্ণিমা ঠাট্টা করে : পথ তাকিয়ে তাকাতে সারা হলি যে দিদি। ঝগড়া হত চোখের বালি, ভাব হল তো চোখের মণি। না আসে ভালই—দু-বোনে পাশাপাশি শোব মাঝখানে রঞ্জু। ঘুমোব না, গল্পে গল্পে রাত কেটে যাবে। কতকাল আর তোকে দেখব না বল্ তো।

তাপস বলে রেখেছে, পরীক্ষাটা দিয়ে তোদের ওখানে চলে যাবো বড়দি।

থার্ড-ইয়ারের পরীক্ষা সামনের মাসে বড় কঠিন পরীক্ষা। বলে, কলকাতার বাইরে কখনো যাইনি—বন্ধুরা হাসে. ধানগাছ চিরে কেমন তক্তা হয় জিজ্ঞাসা করে। এবারে লম্বা পাড়ি—পাক্কা দেড়টি মাস দেখেশুনে বেড়াব।

রাত্রি দশটা বাজল, বাড়িশুদ্ধ লোক এইবারে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কোন রকম বিপদ ঘটল কিনা কে জানে। আর দেরি করা চলে না—গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে লণ্ঠন নিয়ে তারণকৃষ্ণ ওদের পৌঁছে দিতে চললেন। বুড়ো বাপ যাচ্ছেন, তাপসও গেল ঐ সঙ্গে।

তুলসীদাস সরেছে।

(ক্রমশ

আদিবাসী শিল্প ও শিল্পী

কার্তিকচন্দ্র শাসমল

নিবিড় শ্যামল বনের মাঝে ঝকঝকে করে নিকানো মাটির দেওয়াল ও খড় বা পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কুটিরগুলো, গ্রামের রূপ এনে দেয় এক অপূর্ব শ্রী, ঘরগুলো কোথাও রাস্তার দুপাশে সাজান আবার কোথাও বনের মাঝে এলোমেলোভাবে ছড়ানো। ঝোপ-ঝাড় ও বাঁশবনের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে পায়ে-চলা পথ এক একটা কুটিরকে নিয়ে যেন মালা গেঁথেছে। সে এক রূপময় স্বপ্নময় জগৎ। এইসব কুটিরেই বাস করে লোকশিল্পীরা। সাঁওতালদের ঘর-বাড়ির দেওয়াল কত রঙ-এ রঞ্জিত, কত রকমের আলপনা। কালো, সাদা, লাল মাটি যেখানে দেখে, সেখান থেকেই নিয়ে এসে আলপনার কাজে লাগায় তারা। জ্যামিতিক রেখার প্রাধান্য থাকলেও অন্য নক্সা যেমন গাছপালা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষীর অভাব নেই। বিভিন্ন মনের বিভিন্ন রসবোধ। এই-সব নক্সার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারী। নানান ঋতুর প্রভাবে তাদের রঙিন মনের বহি-প্রকাশ হয় এইসব শিল্পকর্মে। পুরুষরাও হাত মেলায় তাদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে। এই শিল্প শুধু সাঁওতালদের মধ্যেই নয়, গণ্ড কুট্টিয়াখণ্ড, সাওরা প্রভৃতি আদিবাসী-দের মধ্যে দেওয়াল অলঙ্কৃত করার রীতি খুব সমাদরের। বিশেষ করে সাওরাদের দেওয়ালের রঙ ও নক্সা খুবই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। কি না আঁকা হয়েছে দেওয়ালে! কত রকমের, কত ধরনের বিষয়বস্তু! কোনটা ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত আঁকা, কোনটা তাদের আশেপাশের গাছপালা, জীবজন্তুর মূর্তি আঁকা। প্রতিটি জন্তুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শিল্পী বাসস্থান অলংকৃত করেছে। কোথাও একটা গাছের ডালে হনুমান, পাখী ও মৌচাকের নক্সা এঁকে শিল্পী তার পরিবেশের এক মনোরম নিদর্শন রেখে দিয়েছে। কত রকমের জন্তু— হাতী, ঘোড়া, হরিণ, জিরাফ, কুকুর, শিয়াল, শূয়োর, কচ্ছপ কোনটা বাদ যায় নি। শুধু কি এই? কোনটা আবার হাতীর পিঠে বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার করার ছবি। কোথাও দেখান হয়েছে বাঘ মানুষ মেরে খাচ্ছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগের সংস্পর্শে যারা এসেছে বা যন্ত্রযুগের কিছু নিদর্শন দেখেছে তাও দেওয়ালে এঁকে রেখেছে। উড়োজাহাজ, ধাবমান মোটরগাড়ী এ থেকে বাদ যায় নি। এসবই আঁকা হয়েছে কালো রঙ-এর দেওয়ালে সাদা রঙ দিয়ে, প্রতি ছবি কিন্তু নিখুঁতভাবে আঁকা।
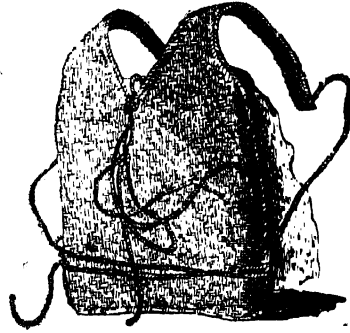
একটি বেতের ব্যাগ

এছাড়া তাদের রসবোধ ও রুচিবোধের পরিচয় অবাক হয়ে দেখতে হয় খোদাই-করা কাঠের শিল্পে। আধুনিক এনগ্রেভিং এর চেয়ে কোন অংশে কম? কি নেই তাতে? আরোহীসমেত হাতী-ঘোড়া আছে, আছে মাছ, পাখী, গরু, কুকুরের মূর্তি। ফুল ও সূর্যাস্ত বাদ যায় নি এইসব খোদাই থেকে। একটি বাছুর তার মায়ের দুধ খাচ্ছে এই দৃশ্যও নিখুঁতভাবে খোদাই করা হয়েছে। সুন্দর জিনিসের প্রতি কি প্রবল অনুরাগ, কি আসক্তি! এইসব মনমাতান জিনিস কেবল দু-একটি আদিবাসীদের মাঝে সীমিত নয়, ছড়িয়ে আছে সাঁওতাল, গন্ড, বাইগা, কুট্টিয়াখন্ড প্রভৃতিদের মধ্যে।

পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যে আসামের আদিবাসীরা অনেক বেশী অগ্রসর। বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গসজ্জায় এরা রত। আব-হাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই বেশবাসের জন্য অনেকখানি দায়ী সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বিহার থেকে আরম্ভ করে মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হলে এই বেশভূষার স্বল্পতা বেশ চোখে পড়ে। গন্ড, খন্ডরা লজ্জানিবারণের জন্য কোথাও গাছের পাতা বা কোথাও সরু এক-ফালি কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করছে। এই অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসী যেমন বণ্ডো, সাওরা, গাদাবা কিন্তু কাপড় তৈরী ও পোশাক-আশাকে কিছুটা যত্নবান। আসামের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে পোশাক-পরিচ্ছদই এক শিল্পের জগৎ। আদি আবোর, পাদম, প্যাসি, নাগা, মিকির, মিশমি, দাফলা প্রভৃতির বেশবাস দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। যেমন রঙ তেমনি তার ডিজাইন। রঙ-এর কি সমাবেশ! হলদে-কালোয়, সাদায়-লালে, লাল-সবুজে, লাল-নীলে তৈরী স্কার্ট মনকে আপনি টানে। ডিজাইন কত রকমের। লম্বাকৃতির চৌকো ঘরের মধ্যে এক রঙ, আবার সেই ঘরের চারপাশ তৈরী হয়েছে অন্য রঙ-এর সুতোয়। তার উপর ছুঁচ সুতো দিয়ে বসান হয়েছে রেঙ-বেরঙ-এর পুঁথি বা অভ্রের টুকরো। কেবল রঙ আর রেখায় আলপনা। যেন রামধনু। যদিও মধ্যভারতের আদিবাসী সমাজে বেশবাসের প্রতি আগ্রহ কম, তবুও অলংকারের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও স্বল্প কাপড়ের টুকরোতে তাদের শিল্পমনের পরিচয় রেখে দেয়, বন্ডোদের লাল রঙ-এর কাপড়ের উপর সাদা-কালোর আড়াআড়ি সমান্তরাল রেখা কম লোভনীয় নয়। উড়িষ্যার গাদাবাদের কাপড় আরো সুন্দর। রঙ-বেরঙ-এর সরু ও চওড়া স্ট্রাইপ কাপড়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে গেছে। আর ধারের বা পাড়ের সরু স্ট্রাইপগুলোর
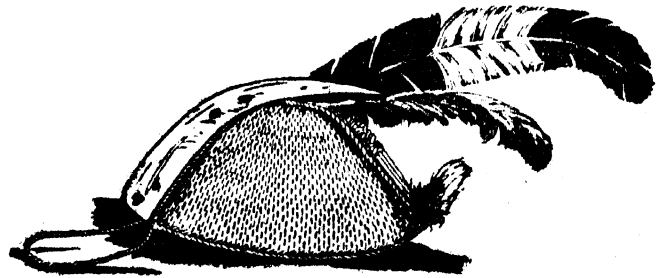
বেতের টুপি
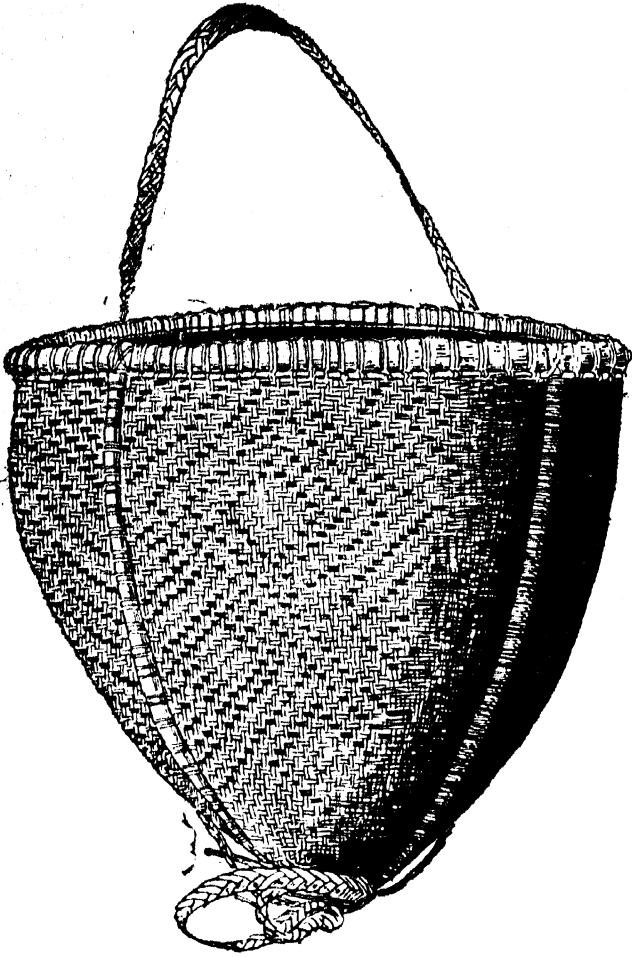
একটি বেতের কাজ

মাঝে আছে কারুকার্য। তাদের সৌন্দর্য-প্রীতিতে সত্যই অবাক হতে হয়।

প্রাত্যাহিক জীবনের ছোট-বড় জিনিস-গুলিও শিল্পসম্ভারে ভরপুর। আসামের আদিবাসীদের বেতের বিভিন্ন কাজ সত্যই চিত্তাকর্ষক। কি দক্ষতা, কি নিপুণতা! দাফলা, পাদম প্রভৃতি আদিবাসীদের তৈরী বেতের ঝুড়ির বুনোন ও ডিজাইন দেখার মত। দাফলাদের চামড়ার ব্যাগ—'চুথ' কত সুন্দর। সেই ব্যাগ আবার অলংকৃত করা হয়েছে জীব-জন্তুর দাঁতের ছাপ দিয়ে। লামানাদের ব্যাগ, আধুনিকাদের ভ্যানিটি ব্যাগের অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর, অনেক বেশী লোভনীয়। কি কারুকার্য, কি নক্সার বাহার। এতেও মন ভরে নি। সেই ব্যাগে আবার ছোট-বড় কড়ি লাগিয়ে শুধু চিত্তাকর্ষক করা হয় নি, মিলেছে চলার পথে কড়ির সুরেলা আওয়াজ। সামান্য চিরুনীকেও কেন্দ্র করে এরা গড়ে তুলেছে এক অপরূপ জগৎ।

তামাক খাওয়ার প্রচলন সভ্য সমাজে ও আদিবাসী সমাজে ব্যাপক। কেউ খায় বিড়ি, সিগারেট আবার কেউ খায় খৈনী। বিড়ি বা চটাই ও খৈনীর চলন আদিবাসীদের মাঝেই বেশী। সিগারেট রাখার জন্য যে সিগারেট-কেস বা বাক্স আধুনিক সমাজে দেখা যায়, সেগুলি কোথায় লাগে আদিবাসীদের তামাক রাখার পাত্রের কাছে! সরু বাঁশের টুকরো দিয়ে তৈরী কুট্টিয়াখন্ডদের তামাক-কেস এক-একটি শিল্পস্তম্ভ। কত রকমের নক্সা, রেখার তৈরী আলপনা কম লোভনীয় নয়। সুরিয়া গন্ডদের কাঠের তামাক রাখার বাক্সগুলিও দর্শনীয়। কোনটা আম, কোনটা মাছের আকারে তৈরী। তাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করা হয়েছে রেখার টানে। মিষ্টি সুরের আশায় আবার কোনটার সঙ্গে ছোট-ছোট ঘুমুর বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাথার টুপীকেও কত সুন্দর করে পরে এইসব আদিবাসীরা। কত রকমের জিনিস দিয়ে তৈরী, দাফলাদের মনমুগ্ধকর টুপী বেতের বোনা। হর্নবিলের লম্বা ঠোঁটকে লাল রঙে রাঙিয়ে বসান হয়েছে সেই টুপীর উপর, আর রক্তিম ঠোঁটের পাশে শোভা পাচ্ছে সাদা-কালো-লাল পালক। কি অপূর্ব না দেখতে! হর্নবিলের ঠোঁটের ব্যবহার খন্ডদের মাঝে দেখা গেলেও এরা টুপীর বদলে কাপড়ের পাগড়ীর মধ্যে বেঁধে নেয়। তবে মারিয়া ও ডোরলা-মারিয়াদের কাছে অন্যরা লাগে না। বাইসনের দুটি শিঙ দিয়ে তৈরী মারিয়াদের টুপী সত্যই দেখার মত। বাঁশের টুপীর সঙ্গে শিঙ দুটির প্রথমে বেঁধে নেয়। ময়ূরের পুচ্ছ ও বন-মোরগের পালকে শোভিত একটি বাখারীও বাঁধা হয় এর সঙ্গে। এটা পিছনের দিকে উঁচু হয়ে থাকে। বাঁশের টুপীটিকে তারপর আচ্ছাদিত করা হয় রঙ-বেরঙ-এর কাপড়ে আর ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কড়ির তৈরী পর্দা সামনের দিকে। বাইসনের শিঙ-এর পরিবর্তে ডোরলা-মারিয়ারা চিতল হরিণের শিঙ দিয়ে বানায় লোভনীয় শিরস্ত্রাণ। ভাতরা, খন্ডদের আবার ধাতুর তৈরী শি[illegible] ব্যবহার করতে দেখা যায়। সৌন্দর্যে কোনটা কম যায় না। বিভিন্ন উৎসবে যখন নানা আদিবাসী সম্প্রদায় এসে যোগ দেয় না[illegible] আর গানে, তখন মনে হয় সুন্দর টুপী যেন প্রতিযোগিতা চলছে। সে এক সুন্দর মেলা।

আদিবাসীদের রসিকমনের ও শিল্প-বোধের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে আরও ক[illegible] শত জিনিসে। তাদের মুখোশ কত সামা[illegible] জিনিস দিয়ে তৈরী। কোথাও কাঠ খোদাই করে আবার কোথাও লাউ-এর খোলা রূপান্তরিত করা হয়েছে মুখোশে, ন[illegible] বনান হয়েছে মোম দিয়ে, দাঁত বান[illegible] হয়েছে লাউয়েরই বীচি দিয়ে। কোথা[illegible] আবার সাদা ও লাল পুঁথি বসান হয়ে[illegible] এর উপর। প্রত্যেকটি মুখোশ যেন জীবন্ত। এইসব মুখোশের ছবি দেখে ছোট ছে[illegible] ছেলে-মেয়েদের মায়ের কোলে মুখ লুকো[illegible] দেখেছি। এমনই সার্থক সৃষ্টি।

এছাড়া বিয়ের বিভিন্ন উপকরণে জাতশিল্পীর ছোঁয়াচ ছড়িয়ে রয়েছে। পাল্কীর গায়ে খোদাই-এর কাজ, বিয়ে[illegible] স্তম্ভ কম সুন্দর নয়। প্রদীপদানী [illegible] পিলসুজও কত মনোরম। একটা লোহা[illegible] প্রদীপদানীর মাথায় বানানো তিনটে হরিণে[illegible] মূর্তি যেন প্রাণবন্ত। কোথাও নৌ[illegible] পালাচ্ছে হরিণ, তাও দেখান হয়েছে। টোপ[illegible] বিয়ের এক অপরিহার্য দ্রব্য। আমাদে[illegible] শোলা দিয়ে তৈরী টোপর কি পাল্লা দে[illegible] মারিয়াদের খেজুর পাতার তৈরী টোপরে[illegible] সঙ্গে। খেজুর পাতায় তৈরী হয়েছে ফি[illegible] ও ফুল, আর হয়েছে সূর্যরশ্মি। কত স্ব[illegible] কল্পনা, কি নিপুণ হাতের কাজ।

চিঠিটা হাতে পেয়ে সবিতা ঢিপ ক'রে মাকে একটা প্রণাম করে ফেললো।

মেয়ের কাণ্ড দেখে আশালতা হতভম্ব হয়ে যান। বুঝতে পারেন চিঠির ভিতর এমন কিছু আছে যা তাঁদের নিস্তেজ জীবনে আনন্দের ঢেউ তুলেছে।

—মা! সবিতার চোখমুখ আনন্দে চিক-চিক করে ওঠে, কাল থেকে কাজে জয়েন করছি।

আশালতা খবর শুনে বাইরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। মনে মনে মৃত স্বামীকে এই মুহূর্তে স্মরণ করলেন।

বললেন, বিনয়কে খবরটা দে। ও কি এখনো ঘুমুচ্ছে?

সবিতা মাথা নেড়ে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। দাদা এখনো বেকার। মনে হলো তার চাকরী পাওয়ার ফলে আনন্দের যে আমেজে সারা মনটা ভরে তুলেছিল তা বুঝি দাদার কথা মনে হতে— ।

খবরটা তুমিই দাদাকে দাও। আমার কেমন— ।

আশালতা মেয়ের মনোভাবটা বুঝতে পারলেন। দিনকাল বড় খারাপ। ভাবলেন এই চাকরীটা তো বিনয়েরও হতে পারতো। তা না হয়ে হলো গিয়ে মেয়ের। অবশ্য আজকাল ছেলেমেয়েতে রোজগারের ক্ষেত্রে কোন তফাৎ নেই।

তিনি মেয়েকে ডাক দিলেন, আয় আমার সঙ্গে।

এই ছোট্ট দোতলা বাড়ীটা না থাকলে কি হ'ত সেকথা অনেকদিন ভেবেছেন আশালতা। ভেবে শিউরে উঠেছেন। দোতলার তিনখানা ঘর তাঁরা ব্যবহার করেন। নীচের তলায় ভাড়াটে বসিয়েছেন। সংসার চলে ভাড়ার টাকায়। শেষ জীবনে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা দিয়ে স্বামী এই বাড়ী তৈরী ক'রে গেছেন। শোভাবাজারের ভাড়াটে ফ্ল্যাট ছেড়ে এই ঢাকুরিয়ায় প্রথম আসাতে আশলতা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন আশেপাশে এত বাড়ীঘর ওঠেনি। প্রায় ফাঁকা জায়গায় এসে প্রথম প্রথম অস্বস্তি লাগতো। তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে। যেমন গেছে স্বামীর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা।

দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে বিনয় খিল খুলে দেয়। মুখচোখ তার কুঁচকে ছিল তীব্র বিরক্তিতে। সবিতার চেয়ে বিনয় একটু কালো, সবিতা শ্যামবর্ণা। সুশ্রী চেহারা। বয়স বাইশ তেইশ। বিনয়ের চেয়ে বছরের তিনেকের ছোট।

কি ব্যাপার? বিনয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে থাকে।

মস্ত সুখবর। আন্দাজ করতে পারিস? আশালতার মুখে মৃদু হাসি।

সবিতা বিনয়ের বিছানা গুটোয়, জানালা খুলে দেয়। ঘরে সোনা রংয়ের রোদ দামাল ছেলের মত ঢুকে পড়ে। তাদের চোখমুখ এখন উজ্জ্বল দেখায়।

বিনয় হালকা সুরে বলে, মনে হচ্ছে সবিতার জন্যে কোন ভাল পাত্র পেয়েছো।

আশালতা স্থিরগলায় জবাব দেন, সবিতার চাকরী ঠিক হয়েছে। মেয়েরা চাকরী পেয়ে যাচ্ছে আর তুই শিক্ষিত ছেলে হয়ে—

সকালবেলায় মেজাজটা খারাপ করে দিচ্ছ। তোমাদের জ্বালায় ঠিক পালাতে হবে। গ্রামে মাস্টারী নিয়ে চলে যাব।

চটিস কেন বিনু। তুই ভালভাবে থাকবি তাই তো আমি চাই।

তুমি থাম তো মা! সবিতা বিনয়কে উদ্দেশ্য ক'রে বলে, কি খাবে বলো দাদা?

বিনয় হাসে, মা এবার তোমার গ্রাজুয়েট কর্মক্ষমা মেয়ের জন্যে পাত্রের বাবারা সব লাইন দিয়ে দাঁড়াবে দেখবে।

সবিতা চোখ পাকিয়ে বলে, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি দাদা।

আশালতা বলেন, থাক। সাত সকালে দুভাইবোনের ঝগড়া করতে হবে না। চল সবিতা, বিনয়ের জলখাবার তৈরি করবি।

সবিতা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আশালতার কথার জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু তার মনটা স্থির ছিল না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। ভাবছিল চাকরী পাওয়ার জন্য কম তপস্যা সে করেনি। টাইপ শেখা, শর্টহ্যাণ্ড ক্লাসে ভর্তি হওয়া, বুক কিপিং শেখা। যদিও এর কোনটাই সে ভালভাবে শিখতে পারলো না। বেশীদিন ধৈর্য থাকেনি তার। অথচ তার সঙ্গে যেসব মেয়েরা টাইপ শিখতে সুরু করেছিল, তারা আজও নিয়মিতভাবে ক্লাস করে। বলিহারি ধৈর্য ওদের। এছাড়া উপায়ই বা কি! সবার কথা সে জানে। আশেপাশে কলোনীতে থাকে কয়েকটা মেয়ে। কোনরকমে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে টাইপ শিখতে সুরু করেছে। কলেজে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য নেই। ওদের তুলনায় সে অনেক সুখে আছে। চাকরীটা পাওয়াতে সবদিক থেকে ভাল হলো। বাবার

মৃত্যুর পর কিছুটা অভাবের ছায়া তাদের সংসারে পড়েছে। যদিও মা প্রাণপণে চেষ্টা করেন তারা যেন এসব টের না পায়। কিন্তু সে আর কাঁচ খুকী নয়, সে সব বোঝে। কলেজের পড়া চালিয়েছে টিউশানী ক'রে। বাড়ীভাড়া আর দাদার টিউশানীর টাকাতে তাদের সংসারে যা রোজগার তা এমন আহামরি কিছু নয়। সব মিলিয়ে শ-দেড়েক। যদিও তারা তিনটি প্রাণী তবু খরচ কম কি! সে চাকরী পেলো অবশেষে। কাল থেকে ফিটফাট হয়ে একতলার ভাড়াটে বউয়ের মত চাকরী করতে বেরোবে। কথাটা ভাবতেই তার মন পাখীর মত ডানা মেলে নীল আকাশে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতে থাকে। তার নতুন জীবন শুরু হবে। এতদিন যেন রুটিনমাফিক কাজ ক'রে গেছে। কোন উত্তেজনা ছিল না সেই জীবনে। শাসন ছিল প্রতিপদে। সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ী ফেরা, দাদার বন্ধুদের সামনে না বেরুনো, সিনেমা দেখা নিষেধ, নীচের ভাড়াটে বউ অর্থাৎ সুনন্দার সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করা—এসবই সে এতদিন ইচ্ছের হোক বা অনিচ্ছেয় হোক পালন ক'রে এসেছে। কেননা মাকে সে আঘাত দিতে চায়নি।

কোথায় মন পড়ে থাকে শুনি? আশা-লতা অপ্রসন্ন কন্ঠে বল্লেন, এই পোড়া চপ খাবে কে?

সবিতা ভীষণ লজ্জা পায়। আড়চোখে আশালতাকে দেখে পোড়া চপটা ফেলে দেয়। ভারী তো একটা চপ নষ্ট হয়েছে, তার জন্যে কি ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে?

একটু পরে বিনয় একটা বেতের মোড়া নিয়ে রান্না ঘরে উবু হয়ে বসে।

চপ খেতে খেতে বলে, মা আমি যদি বাইরে কাজ পাই, যেতে দেবে?

পেয়েছো নাকি? কোথায়? সবিতার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অনেক দূরে। আন্দামান। ইচ্ছে করলে যেতে পারি।

আশালতা যেন আঁৎকে উঠে বল্লেন, ক্ষেপেছিস বিনু। এখানেই চেষ্টা কর, একটা কিছু হবেই।

সবিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ খুনসুটি করে বিনয় চলে যায়। আশালতা গিয়ে ঢোকেন পুজোর ঘরে। ঘণ্টাখানেকের আগে বেরো-বেন না।

সবিতা নিজের ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। সারামুখ আগুনের তাপে ঈষৎ রক্তাভ, বিন্দু বিন্দু ঘাম নাকের ডগায় কপালে জমেছে। আঁচল দিয়ে মুখ মোছে, চাবুকের মত শরীরটা আয়নার মধ্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ঈষৎ কোঁকড়ান চুলে চিরুনি চালায়। এখন অঢেল সময়। সুনন্দার কথা মনে পড়ল। সুনন্দার বেশ চেহারা, তাকেও বেশ ছিমছাম। ওকে খবরটা জানানো দরকার।

একতলায় এসে দেখল সুনন্দা খেতে বসেছে। সুনন্দা সবিতার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। সুন্দর চেহারা। মাথার চুল স্কাইস্ক্রাপার করে বাঁধা। অলঙ্কারের বদলে বাঁ হাতে ছোট্ট একটা সুদৃশ্য রিস্টওয়াচ। ম্যাচ ক'রে শাড়ী ব্লাউজ পরেছে। সুনন্দার ঠোঁটে লিপস্টিক। এই প্রথম সবিতা লক্ষ্য করলো।

সুখবর দিতে এলাম সুনন্দা।

বিয়ে বুঝি? কবে ঠিক হলো?

দূর ছাই! বিয়ে না হাতী। চাকরী পেয়েছি। এল ডি ক্লার্ক, কাল জয়েন করছি। পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্টে।

মুখ ধুয়ে সুনন্দা ফিরে এসে বলে, বি, এ, পাশ ক'রে শেষে এল ডি ক্লার্কের চাকরী! অনার্সটা দিয়ে দে, মাস্টারী করলে এর চেয়ে অনেক বেশী মাইনে পাবি।

ইতিমধ্যে সুনন্দার স্বামী অবিনাশ এসে দাঁড়িয়েছে। এক সদাগরী অফিসে কাজ করে। স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায় পুরুষোচিত চেহারা।

অবিনাশ এসে সবিতাকে হেসে বল্লে, চাকরী তো পেলেন এবার আমাদের একদিন খাইয়ে দিন।

সবিতা হাসিমুখে জবাব দেয়, মাইনে পাই নিশ্চয়ই খাওয়াবো। সুনন্দা চলি, তোর দেরী হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ অবিনাশ হো হো করে হেসে ওঠে। সুনন্দার ভ্রূ কুঁচকে যায়। কি হয়েছে সবিতা বুঝতে না পেরে অবিনাশের দিকে অবাক হয়ে তাকায়।

সুনন্দার কাণ্ডটা লক্ষ্য করুন। ওর ঠোঁটের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন।

সবিতা লক্ষ্য করলো জলে সুনন্দার লিপস্টিক ধুয়ে গেছে। কি আনাড়ী সুনন্দা! সেও হাসি চাপতে না পেরে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

সুনন্দা লজ্জিত কণ্ঠে বলে, মনের ভুল খাওয়ার আগে লিপস্টিক মুছতে পারিনি।

অবিনাশ যেতে যেতে বলে, এই ... সবে ভুলের সুরু।

সুনন্দার মর্মভেদী দৃষ্টিতে অবিনাশের অপসৃয়মাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি হল আবার তোদের? সবিতা ঠাট্টা করে, ভদ্রলোক তোর প্রতি খুব প্রসন্ন নয় দেখতে পাচ্ছি।

আমার তাতে ভারী বয়েই গেল।

চলি সুনন্দা।

আচ্ছা। কাল থেকে একসঙ্গে অফিস যাব।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সবিতা ভাবলো সুনন্দা আর অবিনাশবাবুর ভালবাসাবাসির মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে।

দুই

জানলা ঘেঁষে তার টেবিল চেয়ার। এক জন হেড ক্লার্ক, জনা দুই ইউ ডি ... জনা সাতেক লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক। ... ছাড়া আরও দুজন মেয়ে আছে। ... টাইপিস্ট। একজন বিবাহিতা। অন্যজন ... চেহারার একটি মেয়ে। গোতম ইউ ... ক্লার্ক। বয়স তিরিশের নীচে। চেহারা মন্দ নয়। ফর্সা রং। গোতম মিত্র। জীবনে কোন পুরুষের নিকটসান্নিধ্যে এখন পর্যন্ত সবিতা আসেনি। হেডক্লার্ক বলেছে গোতমের হেলপার হিসেবে তাকে কাজ করতে হবে।

টিফিনের সময় ওদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ হলো। যে বিবাহিতা তার নাম কে... সান্যাল। অন্য মেয়েটির নাম কৃষ্ণা রায়। ওদের সঙ্গে ক্যানটিনে ঢুকলো সবিতা। অল্প দুচার কথার পর ও কেয়াদি বলে ডাকতে সুরু করলো। বয়সে তার চেয়ে কেয়াদি অনেক বড়। আর কৃষ্ণাকে নাম ধ'রে 'তুমি' ক'রে ডাকতে একটুও বাধলো না।

কেয়াদি বললে, কি ভাই, কেমন লাগছে? ও কি মুখ শুকনো ক'রে বসে আছ কেন?

সবিতা ম্লান হাসে, কই না তো।

—মন খারাপ করছে বুঝি। কৃষ্ণা হেসে বলে, আমাদের দল বাড়লো। কিন্তু সাবধান ওই লোকটাকে বেশী আস্কারা দিয়ো না। তুমি নতুন এসেছো তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

কেয়াদি ধমক দিয়ে উঠলো, তুই থাম কৃষ্ণা! সবে ঢুকেছে মেয়েটা। অমনি ওর কানে মন্তর দেওয়া শুরু করলি।

—কি ব্যাপার? সবিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়। কার কথা বলছে কৃষ্ণা? কারু সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপই হ'ল না, প্রশ্রয় দেওয়ার কথাই উঠতে পারে না।

—কিস্‌সু না। কি খাবে বলো সবিতা? কেয়াদি প্রসঙ্গ পালটাতে চায়। সবিতাও ঐ মুহূর্তে আর কথা বাড়াতে চাইল না।

—সে কি! আমিই বরং আপনাদের খাওয়াব।

—কেন?

—বাঃ চাকরী পেলাম এই কি যথেষ্ট কারণ নয়? প্লীজ কেয়াদি, না করবেন না।

চায়ে চুমুক দেওয়ার সময় মনে পড়লো টিফিনে সুনন্দার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল। ইস্ সে একদম ভুলে গেছে। ওদিকে সুনন্দা হয়তো তার সেকশান ঘুরে তাকে না পেয়ে চলে গেছে। কি ভাববে সুনন্দা?

—কি ভাবছো সবিতা?

কেয়াদির প্রশ্নে সবিতা চমকে উঠলো। সুনন্দার কথা ওদের কাছে বললো। তারপর দাম মিটিয়ে ওরা সেকশানে ফিরে আসে। কৃষ্ণা কি একটা ঠাট্টা করতেই কেয়াদি হেসে উঠলো। সবিতা অন্যকথা ভাবছিল। কি হয়েছে সুনন্দার? ভীষণ গম্ভীর লাগছিল আজ ওকে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে ভীষণ মন কষাকষি চলছে নিশ্চয়ই। অনেকসময় ভাবে, ওদের ভালবাসার বিয়ে, তার মধ্যে এত ফারাক থাকবে কেন!

সীটে বসতেই গৌতম বললে, এক ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজ ক'রে গেছেন।

—কিছু বলে গেছেন?

—হ্যাঁ। ছুটির পর আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

—আচ্ছা।

অফিস ছুটির পর সবিতা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছিল। মাঝপথে কেয়াদি ওকে বললে, এত তাড়া কিসের?

—কিছু মনে করবেন না কেয়াদি। আমার একটু কাজ আছে।

—আচ্ছা ভাই; তবে আর তোমাকে আটকাব না।

মৃদু হেসে সবিতা এগিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি হেঁটে লিফ্‌ট ধরে।

জনস্রোত ঠেলে দুজনে হাঁটছিল। একথা সেকথার পর ফিক্ ক'রে হেসে সুনন্দা হঠাৎ বললে, ছেলেটা তো বেশ দেখতে! একেবারে আকাশ থেকে পড়লি মনে হচ্ছে! তোর পাশের সীটে যে-বসে ওর কথা বলছি।

—কি বাজে বকছিস্! সবিতা বিরক্ত হয়। সুনন্দার ইয়ারকি সব সময় ভাল লাগে না। একটু রেখে ঢেকে কথা বলতে শেখেনি।

—রাগ করিস কেন। কি নাম রে ছেলেটার?

—গৌতম। ইউ ডি ক্লার্ক। ওর হেল্পার হিসেবে কাজ করতে হ'বে।

—দেখিস, শেষে একটা ইয়ে ক'রে না বসিস। আমার এখন থেকেই ভাবনা হ'চ্ছে।

কথা বলতে বলতে ওরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। টাইগার সিনেমার কাছাকাছি আসতেই সবিতা বললে, আর কত হাঁটবি? বাসে উঠবি না।

—কি ভীড়। যাবি কি ক'রে? চল একটু চা খেয়ে নি।

—দেরী হয়ে যাবে। মা ভাববেন।

সুনন্দা ঠোঁট উলটে বললে, তুই ভীষণ ভীতু।

—যা বলিস। বলে একটু হেসে সবিতা আবার বলল, সুনন্দা, একটা কথার জবাব দিবি?

—কি।

—তোদের কি হয়েছে রে?

—জানিস সবিতা, সুনন্দা কোনদিকে না তাকিয়ে বলতে থাকে, অবিনাশ আজকাল আমাকে সহ্য করতে পারে না। বাইরে যা দেখিস তা আমাদের ভান, অভিনয়।

সবিতা ভাবলো ওদের মধ্যে সাময়িক বিরোধ, দু'দিন গেলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সুনন্দার অনেক দোষ আছে। অবিনাশ ওর তুলনায় অনেক ভাল।

—চলি। সুনন্দা একটা ট্যাক্‌সী ডাক দেয়।

—বাড়ী যাবি না। কোথায় চললি?

ট্যাক্‌সীর ভিতর থেকে মুখ বের ক'রে সুনন্দা জবাব দেয়, জাহান্নামে!

সবিতা একপলক তাকিয়ে ট্রাম স্টপেজের দিকে এগোয়।

গড়িয়াহাটার মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রায় ছ'টা বাজতে চলেছে। যা ভীড় বাসে উঠবে কি ক'রে ভাবতে লাগলো। অফিসপাড়া থেকে সোজা বাসে চাপবে—মাঝপথে গাড়ী বদল করা মহা ঝামেলা। সুনন্দাকে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। বাইরে সুনন্দা হাসি-খুশী হ'লে কি হ'বে, আসলে ও ভীষণ জেদী আর একগুঁয়ে। বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সবিতা অধৈর্য হ'য়ে উঠলো।

চারিদিকে মানুষের ভীড়। কাপড়ের দোকানে ক্রেতাদের ভীড়ে জমজমাট। খুব নামকরা দোকান। বাইরে দাঁড়িয়ে শো-কেসের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একটা শাড়ী তার খুব পছন্দ হলো। দামও লেখা আছে। একটু হতাশ হলো সে। এত দামী শাড়ী কেনা এই মুহূর্তে তো নয়ই, সামনের মাসে মাইনে পেয়েও সম্ভব কিনা সন্দেহ। যা চমৎকার মানাত তাকে শাড়ীটায়, ঘুরেফিরে বাড়ী পৌঁছনো পর্যন্ত এই কথাই সে ভাবলো।

বাড়ী ফিরতেই প্রথমে বিনয়ের সঙ্গে দেখা। বেশ সেজেগুজে কোথায় যেন বেরুবার তোড়জোড় করছিল।

—মা, সবি এসেছে। তোমার চাকুরে কন্যা ভীষণ টায়ার্ড হ'য়ে ফিরছে—শিগ্গির চা ক'রো।

বিনয় হাসতে থাকে। সবিতা কপট ক্রোধে হেঁকে বলে, দাদা কি হচ্ছে! তারপর নিরীহ গলায় প্রশ্ন করলো, কোথায় যাচ্ছ? সিনেমায়।

—ভাগ। ফাজিল কোথাকার! বিনয় গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, টুশানীতে যাই, জানিস না? তারপর কেমন লাগলো চাকরী।

—মন্দ কি।

—শেষ পর্যন্ত কেরানীর চাকরী! বিনয় যেন মর্মাহত হয়েছে এমন মুখচোখ ক'রে বলে, দু'দিনে তোর পিঠ কুঁজো হয়ে যাবে! অন্তত একটা মাস্টারী তো জোটাতে পারতিস।

—ভীষণ টায়ার্ড। তোমার উপদেশ মনে থাকবে।

এরপর সবিতা আর দাঁড়ায় না। বিনয় দিন দিন উন্নাসিক হ'য়ে উঠছে। মুরোদ কত সব জানা আছে। কলকাতায় প্রফেসারী চাই! যেন ওর জন্যে সব কলেজ হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছে!

হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরোবার পর আশালতা তাকে ডাকলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন। সবিতা সব কথার জবাব দেয়। অবশ্য গৌতম প্রসঙ্গ যথাসম্ভব নিরুত্তাপ গলায় বললো।

অবশ্য মা সন্দেহ করুক তা সে চায় না। সেকেলে লোক, কি কথায় কি মনে ক'রে বসবেন কে জানে।

রাত্রে খাওয়ার পর সবিতা শোয়ার আগে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। মা শুয়ে পড়েছেন। দাদা এখনো ফেরেনি। ও ঝুঁকে নীচের দিকে তাকায়। কোন সাড়াশব্দ নেই। কিছুদিন আগেও এমনি সময় ঘরে শুয়ে ভাড়াটেদের হাসির শব্দ শুনেছে। সুনন্দা কি এখনো ফেরেনি? অবিনাশবাবু? কি হয়েছে ওদের মধ্যে? সাময়িক বিরোধ। হ্যাঁ, তাই যেন হয়। চারিদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা। আকাশে দু' একটা তারা সবে উঠতে শুরু করেছে। সবিতা অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো। কাল আবার অফিস। নতুন জীবন শুরু হ'ল। নতুন অধ্যায়। ঠান্ডার আমেজ অনুভব করতেই শাড়ীর আঁচল দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘরে ফিরে এ'ল। ঘুমে দু'চোখ তখন জড়িয়ে আসছে। হঠাৎ কি ভেবে সে হাসলো। নিঃশব্দে। কৃষ্ণার কথা মনে হ'লো। কি যেন বলছিল তাকে? কি যেন, কি যেন......।

।তিন।

অবিনাশদের অফিস একটা কারখানারই অংগ। তাই রাতেও কাজ চলে। সেদিন নাইট ডিউটি সেরে ফিরছিল অবিনাশ। সুন্দর সকাল। শহরতলী অঞ্চল, তাই শীতের প্রকোপ এখানে একটু বেশী। এখন বাসায় পৌঁছে চান, তারপর জেলি-মাখানো রুটি আর এক কাপ গরম চা খেয়ে একটানা ঘন্টা চারেক ঘুম। সুনন্দা দিনের পর দিন পাল্টে যাচ্ছে, তার কাছে থেকেও দূরে স'রে যাচ্ছে। তাকে সে আজকাল বুঝতে পারে না। ফলে তার শুধু ক্রোধ হয়; সেই ক্রোধ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আদিমতা নেমে আসে।

অবিনাশ এই সব ভাবতে ভাবতে সম্পূর্ণ অন্যমনস্কের মত বাড়ী এ'ল। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরে চোখ মেলে দেখলো, দোতলার বারান্দায় সবিতা দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়তেই ও দ্রুতপদে এগিয়ে যায়।

মেয়েটাকে তার ভাল লাগে। আশ্চর্য! সুনন্দা এখনো দোর বন্ধ ক'রে ঘুমুচ্ছে। প্রবল উত্তেজনায় সে দরোজার উপর করাঘাত করলো।

খিল খোলার শব্দ। সুনন্দা ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে। অবিনাশের দিকে একপলক তাকিয়ে তার পাশ কাটিয়ে বেরোবার চেষ্টা করে।

অবিনাশ চাপা গলায় গর্জন ক'রে উঠলো, এত বেলা অব্দি ঘুমুতে লজ্জা ক'রে না। সারারাত কি করছিলে?

সুনন্দা শান্তস্বরে জবাব দেয়, সরে দাঁড়াও।

অবিনাশ কিছু বলার আগেই সুনন্দা দ্রুতপদে তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ও বেশ-বাস বদল ক'রে ফিরে আসে। ফিকে গোলাপী রংয়ের একটা শাড়ী পড়েছে। সামান্য প্রসাধন করতেও ভোলেনি।

অবিনাশ এক পলক স্ত্রীকে দেখে জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করে। তারপর গিয়ে বাথরুমে ঢোকে। মাথায় জল ঢালতে ঢালতে শুনলো শোঁ শোঁ শব্দে স্টোভের আওয়াজ। কি বিরাট প্রহসন তার আর সুনন্দার সম্পর্কের মধ্যে!

রোদে ঘর আলোকিত। ওরা মুখোমুখি ব'সে রোদ গায়েমুখে মেখে চা খেতে থাকে। কাছেই জানালা। অল্প হাওয়ায় পর্দা দুলছিল। কেউ কারুর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তারা আকাশ দেখছিল। পাখীদের দেখছিল। কেমন স্বচ্ছন্দে ওরা উড়ে বেড়াচ্ছে।

অবিনাশ ভাবলো চারিদিকে একটা চরম মিথ্যার জালে সে আর সুনন্দা নিজেদের ঢেকে রেখেছে। এভাবে কাছে থেকেও তারা দিন দিন পরস্পরের কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে। ভালবাসা জীবনে কি ছিল কোনদিন? এক সময় সুনন্দার জন্যে কি তীব্র আসক্তি সে অনুভব করতো!...ন্যাশনাল লাইব্রেরী, আউটরাম ঘাট, মেট্রো সিনেমা, ইউনিভার্সিটি থেকে বিকেলে ঘামেভেজা হাতে হাত জড়িয়ে গোলদীঘির বেঞ্চে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসা...এক সময় একদিন...কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবন, ত্যাগ, তিতিক্ষা...প্রেম না হ'লে জীবনের কি তাৎপর্য...! একটা সিগারেট ধরালো, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুনন্দার দিকে তাকালো। সুনন্দা কি তবে কোনদিন তাকে ভালবাসেনি? সিগারেটের ধোঁয়া সরু তারের মত এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে ভেবেছিল সুনন্দাই প্রথমে কথা বলবে। কিন্তু সুনন্দা নির্বাক, বোবা। এই নীরবতা ইচ্ছাকৃত। যেন এই নীরবতার মধ্য দিয়ে সুনন্দার অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছে।

—সুনন্দা।

—কি!

সুনন্দা এবার সোজাসুজি অবিনাশের চোখের দিকে তাকায়।

—তুমি কি চাও, সুনন্দা? তোমার অভাব, আমাকে বল'।

—আমি শান্তি চাই। নিরুদ্বেগ জী[বন] চাই। অবিনাশ, তোমার কাছ থেকে আমি পাব না। তোমার জেদ, অ[হং-] আব্দার, তোমার ছোটমন দিন[...] আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে।

—শাট্ আপ! অবিনাশ রুক্ষ গ[লায়] চিৎকার ক'রে ওঠে।

—চিৎকার করো না। সুনন্দা[...] বারুদের মত জ্বলে ওঠে, কি অ[...] অপরাধ? তুমি যদি মনগড়া সমস্যার স[ৃষ্টি] ক'রো তার জন্যে আমি দায়ী নই।

—মনগড়া!

—তা নয়তো কি!

—আমি প্রমাণ করাতে পারি।

—কি?

—তোমার ঘরে মন নেই। স্বা[মীর] প্রতি সাধারণ কর্তব্য করা পর্যন্ত[...] গেছে। অপরিচিত পুরুষের সংগে তো[মাকে] রেস্তোরাঁয়, সিনেমায় বহুবার দেখা গে[ছে।] অস্বীকার করতে পা'র?

—এ'সব তোমার ভুল ধারণা[...] জন্মেছে, অবিনাশ।

—বিশ্বাস করি না। আর কি[...] গোজের বাহার তোমার! কি জঘন্য[...]

—তোমার মধ্যে তো এ'ধরনের[...] ভাব কোনদিন ছিল না। কি হ'চ্ছে দিন[...] আসলে আমাকে আর সহ্য করতে পা[র] না। তাই সবিতার দিকে আজকাল তো[মার] মনোযোগ লক্ষ্য করতে পারছি।

—লায়ার! চিৎকার ক'রে উ[ঠে] অবিনাশ এবং শক্ত মুঠোতে সুনন্দার[...] চেপে ধরলো।

—হাত ছেড়ে দাও। আমার লাগ[ছে।] সুনন্দার কন্ঠস্বর কান্নাবিকৃত শোনা[লো।]

—ছাড়বো না। তোমার মত মে[য়েকে] কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় তা অ[...] জানা আছে।

—বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।[...] দাও বলছি।

বলতে বলতে সুনন্দা হঠাৎ[...] কান্নায় ভেঙে পড়লো। অবিনাশ[...] ছেড়ে দিলে সে দ্রুতপদে চোখে অ[াঁচল] চেপে পাশের ঘরে ছুটে যায়।

অবিনাশ প্রবল উত্তেজনায় এ[কটা] সিগারেট ধরায়। সমস্ত দেহে সে[...] জ্বালা অনুভব করছিল। চোখের মা[...] ব্যাপারটা যা ঘটে গেল তা এক[...] ভালই হয়েছে বলা চলে। মে[য়েদের] চোখের জল দেখলেই যে গলে যেতে[...] এমন কোন কথা নেই। পাশের[ঘরে] যাবার কথা একবার ভাবলো। সুনন্দা এখনো কাঁদছে?

—সুনন্দা কোথায়?

অবিনাশ চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দে[খে] সবিতা এসে ঘরে ঢুকেছে। কি ব[...] সে ভেবে পেল না। বলবে কি, সু[নন্দা] নেই, বাথরুমে গেছে। অথবা বলবে অফিসে জরুরী কাজ থাকায় আজ সু[নন্দা] একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে। মে[...]

...শ স্নিগ্ধ চেহারা। বেশ খানিকটা সময় ...বিতার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

সবিতা লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি অন্য-...কে তাকিয়ে আবার সুনন্দার কথা ...জ্ঞেস করলো।

অবিনাশ কি বলতে যাচ্ছিলো, থেমে ...য় সে, কেননা দেখলো সুনন্দা এসে ...ড়িয়েছে।

সুনন্দা হাসিমুখে সবিতাকে বলে, ...তে সকাল সকাল কোথায় চললি?

—সকাল কোথায়। ন'টা বেজে গেছে। ...মুচ্ছিলি বুঝি? চোখ দুটো বেশ ...লা দেখাচ্ছে।

সুনন্দা একপলক স্বামীর দিকে ...কিয়ে বলে, কাল রাতে ভাল ঘুম ...নি। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। ...জ আর অফিস যাচ্ছিনে।

—তাহলে আমি চলি। অবিনাশের ...কে তাকিয়ে সবিতা মৃদু হেসে বলে, ...মশাই, বউ-এর দিকে একটু নজর দিন।

অবিনাশ সুনন্দার দিকে তাকিয়ে ...বার দেয় শোন, তোমার বান্ধবী ... বলছে।

সুনন্দা কৃত্রিম ক্রোধে সবিতাকে বলে, ... কবে কি দেখছিস? পরপুরুষের দিকে ...ভাবে তাকাতে নেই!

—কি অসভ্য! ব'লে সবিতা অপরূপ ... ভ্রূভঙ্গী ক'রে অবিনাশের দিকে ...কিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ...নন্দাও তার পিছন পিছন এসে ...পস্থিত হয়।

—সবিতা শোন।

সদর দরোজা পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ...কমুহূর্ত অপেক্ষা করে সবিতা। সুনন্দা ...সতেই তারা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

—রাগ করেছিস? সুনন্দা হাসিমুখে ...কায়।

—তোর স্বামীর সামনে ও'কথা বলতে ...রলি?

—এত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন? ...কাগে আসল কথা ব'ল। কেমন ...ঝেছিস?

—কিসের? সবিতা বুঝতে পেরেছে ...নন্দা কি বলতে চায়। তবু বাইরে সে ...জ্ঞতার ভান করলো।

...ন্যাকামো করিস না। আমরাও তো ...ক সময় প্রেম করেছি, আমি সব শুনেছি। ...স দু'য়েক হ'ল অফিসে ঢুকেছিস। এরই ...ধ্যে টোপ ফেলতে শুরু করলি। কতদূর ...গিয়েছিস?

—কি আশ্চর্য! সবিতা অপ্রস্তুত হ'য়ে ...ড়ে। কি বলবে ভেবে পায় না। সুনন্দা কি ...নেছে কে জানে। ছিঃ কথাটা ভাবতেই ...র অন্তঃস্থল পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

...কথাটা যে মিথ্যে তা কি সে জোর ...রে অস্বীকার করতে পারে? গৌতম ...ম থেকেই তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার ...টা করে আসছে। সে প্রশ্রয় দেয়নি। ...তো সহকর্মী হিসেবে অন্তরঙ্গ হওয়া চলে তার এক পাও বেশী সে নিজে অগ্রসর হয়নি বা ওকে অগ্রসর হতে দেয়নি। প্রথম থেকেই গৌতম তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কত কি করলো! ভেবে তার হাসি পায়। কাজকর্মে তার যাতে কোনরকম অসুবিধে না হয়, তাই বুঝে যতটা সম্ভব হাল্কা কাজ দেয়। হেডক্লার্ক বোধহয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন। তিনি কিছু বলেন না শুধু মুচকি হাসেন। গৌতমকে তিনি ভাল চোখে দেখেন। তাই সব দেখেও না দেখার ভান করেন। বেশ তো অফিসের একটি ছেলে মেয়ে যদি পরস্পরকে ভালবাসে, যদি তারা সুখী হয়, তবে এর চেয়ে আনন্দের আর কি হ'তে পারে। কিন্তু এসব কি ভাবছে সে। ছিঃ এসব দুর্বলতা। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই গৌতমের। অফিসে সে কাজ করতে যায়, প্রেম করতে নয়। এরই মধ্যে কৃষ্ণার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে গেছে। ভীষণ বাজে মেয়ে কৃষ্ণা! কেয়াদির মনটা ভাল। ব্যবহারও ভাল। ওর মুখে শুনেছে কৃষ্ণা গৌতমকে পাওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু গৌতম পাত্তা দেয়নি।

একসঙ্গে ক'দিন রেস্টুরেন্টে বসে চা খাওয়া, সিনেমা দেখা, কৃষ্ণা ভেবেছিল গৌতম বুঝি ওর অনুরক্ত। কিন্তু কৃষ্ণার হাবভাব দেখে গৌতম পিছিয়ে গেছে। এসব অবশ্য সবিতার জয়েন করার আগের ইতিহাস। কেয়াদির মুখে সে এসব শুনেছে। কৃষ্ণা এখন জ্বলেপুড়ে মরছে। কিন্তু সবিতার কি দোষ! সে তো আর সেধে গৌতমের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'বার চেষ্টা করছে না। বরং গৌতমকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে চায়। অবশ্য ছুটির পর মাঝে মধ্যে গৌতম অনুরোধ করলে ওর সঙ্গে গিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে চা খেয়েছে। এ' অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। পারা যায় না। সাধারণ সৌজন্যবোধ তো ভুলতে পারে না। হয়তো তাকে আর গৌতমকে রাস্তায় একসঙ্গে হেঁটে বেড়াতে কি রেস্টুরেন্টে পাশাপাশি ব'সে চা খেতে অনেকেই দেখেছে। ফলে তারা রংচং মাখিয়ে অনেক কিছু রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ছি কি অন্যায়!

চমক ভাঙলো তার সুনন্দার কথায়।

সুনন্দা বলছিল, কার ধ্যান করছিস্? ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি। তোর মত কেউ না। সবিতা হেসে বলে, আমি বুঝি সৃষ্টি-ছাড়া। কি রে কথা বলতে বলতে দেখি অনেক দূর চলে এলি।

—চল বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাচ্ছি।

—এই না বললি তো শরীর খারাপ।

—সারাটা দিন তো পড়ে রয়েছে। বিশ্রাম করবো।

—হ্যাঁ। আর অবিনাশবাবুর যখন এ'বেলা অফ ডিউটি। বেশ আছিস তোরা।

—হিংসে হ'চ্ছে মুখপুড়ি!

—হচ্ছে বৈকি। তাড়াতাড়ি পা চালা। আজ লেট্ হয়ে যাবে।

—সে তো আছে, সব ম্যানেজ ক'রে দেবে।

—ওই জন্যেই তো ভয়।

—কেন?

—তুই জানিস না। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে মাঝে মাঝে রাগ হয়। ভুলে যায় অফিসে আরও লোক আছে। না, আমাকে দেখছি চাকরী ছাড়তেই হ'বে।

—কোন দুঃখে। সুনন্দা ফিক্ করে হাসে, ছেলেটা তো বেশ ভাল। গেঁথে ফ্যাল!

—যাঃ কি হ'চ্ছে। তুই ভারী অসভ্য!

—শোন, সুনন্দা সবিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, প্রেমের ব্যাপারে তোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। পুরুষের কথায় সহজে বিশ্বাস করিস না। তাহ'লে ঠকবি। বেশ ভাল ক'রে বাজিয়ে নিস্।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে ওরা দাঁড়ায়।

ভিড় ঠেলে সবিতা ভিতরে কোনরকমে বাসে দাঁড়াবার জায়গা পায়। সুনন্দার কথার জবাব দেওয়া হ'ল না। কেননা তার কাছে এই মুহূর্তে কোন জবাব তৈরী নেই।

(ক্রমশঃ)

এখন সমস্ত কিছু ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এখন সমস্ত কিছু
জড়ো ক'রে রেখে দেয়া ভালো
যদি কাজে লাগে
পরবর্তী কারুকার্যকালে।
জড়ো ক'রে রেখে দেয়া ভালো
দুচোখের নীল, মুগ্ধতার স্বপ্নলীন
স্নিগ্ধ চিহ্নগুলো
যদি অন্য জীবন বাঁচায়।
ফুলগুলো, অমন সুন্দর পাপড়িগুলো
রেখে দেয়া ভালো,
যদি লাগে প্রয়োজনে দৃশ্যান্তরে হঠাৎ কখনো।

এখন যা-কিছু সব ঝরে' ঝরে' যায়
কালান্তক হাওয়ার নিশ্বাসে।
এখন সমস্ত দৃশ্য বারুদের স্তূপে
আকণ্ঠ প্রোথিত;
হৃদয়ে স্থিরতা অনুভবে
অবিশ্বাস, ঘৃণার অঙ্কুর।
বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মতো ভীষণ বিশ্বাসে
পেট্রোল নিক্ষেপে সারা পরিবেশ
প্রজ্বলিত বিক্ষোভে অংগার

প্রেম ভালোবাসা সম্মোহন
যাবতীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি
এখন কোথাও ধুলোময়
চৌকাটের বুকে শুয়ে তুহিন কঙ্কাল।
জড়ো ক'রে রেখে দেয়া ভালো
যদি কাজে লাগে
পরবর্তী কারুকার্যকালে।।

কাছে সমুদ্দুর ॥

সজল বন্দ্যোপা[ধ্যায়]

কারই বা ঘরে ফেরা, গাহনে রোদ্দুর
ঝাউয়ের হাওয়া মেখে কেই বা তন্ময়
কণ্ঠে কার গান অপার বিস্ময়
দুহাত বাড়ালেই কাছে সমুদ্দুর

স্তব্ধ উপকূলে কে নয় অস্থির
মুঠোয় নির্জন বিষাদ তৃষাতুর
শীতল শয্যায় ক্লান্ত রাত্তির
অথচ দাহ ছিল, কাছে সমুদ্দুর।

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন

বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষত অনুন্নত দেশগুলিতে দুটি জটিল সমস্যা সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে। একটি হলো দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে খাদ্যাভাব। যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে সে অনুপাতে খাদ্যোৎপাদন বাড়ছে না। তার ফলে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে বহু সহস্র লোক আজ অর্ধাহারে দিন কাটায় বা অপুষ্ট থেকে যায়। খাদ্যাভাবজনিত এই সমস্যা স্বভাবতই বিজ্ঞানীদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তাঁরা বহুদিন থেকে চিন্তা করে আসছেন, কি উপায়ে এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করা যায়। তাঁরা দেখেছেন, প্রকৃতির অকৃপণ দানে খাদ্যোৎপাদন হলেও ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা মেটানো যাবে না। এজন্যে খাদ্যের নতুন নতুন উৎসের সন্ধান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই উৎস-সন্ধানে বিজ্ঞানীরা আজ তাই বিশেষভাবে তৎপর হয়েছেন।

আমরা জানি, আমাদের দেহপুষ্টির একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। প্রাণীজ দেহ অর্থাৎ মাছ-মাংস থেকেই এই প্রোটিন আমরা প্রধানত পেয়ে থাকি আর কিছু পরিমাণে পাই উদ্ভিদ থেকে। বর্তমানে পৃথিবীর সমুদ্রগুলি থেকে বছরে প্রায় ৪ কোটি টন খাদ্যোপযোগী সামুদ্রিক মাছ ধরা হয়ে থাকে, কিন্তু তা থেকে খাঁটি প্রোটিন পাওয়া যায় মাত্র ৬০ লক্ষ টন। বিশেষ চেষ্টা করে সামুদ্রিক মাছ ধরার পরিমাণ বছরে ১০ কোটি টন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে এবং তা থেকে দেড় কোটি টন পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার বেশি মাছ ধরতে গেলে বিপদ দেখা দিতে পারে অর্থাৎ যে পরিমাণ মাছ ধরা হবে তা পূরণ করার মতো বাচ্চা জন্মাবে না। আর গরু, ছাগল, ভেড়া যাদের কাছ থেকে আমরা প্রাণীজ প্রোটিন পেয়ে থাকি, তারা উপযুক্ত খাদ্য না পেলে প্রোটিনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না। গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব থাকায় তাদের কাছ থেকে মানুষের পুষ্টি-সাধনের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন সত্যই পাওয়া যাচ্ছে না।

এ সমস্ত কারণে বিজ্ঞানীদের আজ প্রোটিনের নতুন উৎসসন্ধানে মনোনিবেশ করতে হয়েছে। সম্প্রতি তাঁরা এমন একটি নতুন উৎসের সন্ধান পেয়েছেন, যা বিশ্ব-বাসীর প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা অনেকখানি মেটাতে পারবে বলে তাঁরা মনে করেন। এই নতুন উৎসটি হচ্ছে তেল অর্থাৎ পেট্রো-লিয়াম। এতদিন আমরা জেনে এসেছি, যানবাহনের পরিবহনের কাজেই পেট্রোলিয়াম মুখ্যত ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, পেট্রোলিয়াম থেকে প্লাস্টিকস, কাপড়, রাবার ইত্যাদি নানারকম শিল্পজাত পণ্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু পেট্রোলিয়াম থেকে মানুষের খাদ্যও উৎপন্ন হতে পারে—শুনলে আমরা প্রথমে একটু হকচকিয়েই যাব! তৈল-বিজ্ঞানীরা এই আপাত অবিশ্বাস্য কাজটি সত্যই সাধন করেছেন! তাঁরা এই প্রচেষ্টায় আজ পরীক্ষার স্তর পার হয়ে মানুষের খাদ্যোপযোগী বিশুদ্ধ প্রোটিন বহুল পরিমাণে উৎপাদন করতে কৃতকার্য হয়েছেন।

তবে পেট্রোলিয়াম থেকে এই প্রোটিন উৎপাদন দ্বারা পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহের স্থায়ী সমাধান করা যাবে না। কারণ পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের উৎস সীমিত এবং তা একবার নিঃশেষিত হলে পুনরায় কখনই পূরণ হবে না। তবুও এই নতুন উৎস থেকে প্রোটিন উৎপাদনের গুরুত্ব আছে নানাদিক থেকে। প্রথমত গবেষক-বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, ৪ কোটি টন কাঁচা পেট্রোলিয়াম থেকে বছরে প্রায় ২ কোটি টন বিশুদ্ধ প্রোটিন উৎপাদন করা সম্ভব এবং তার ফলে বিশ্বের প্রোটিন উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, পেট্রোলিয়ামকে ইন্ধন হিসাবে বা প্লাস্টিকস ইত্যাদি শিল্পজাত পণ্যের কাজে সম্পূর্ণ ব্যবহার না করে তার অংশ বিশেষও যদি খাদ্যোৎপাদনে সদ্ব্যবহার করা হয় তার ফল হবে মানুষের পক্ষে যথার্থই উপকারক।

২০০৮ শতকে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ৩০০ কোটি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রোটিনের অভাবজনিত সমস্যায় ইতিমধ্যেই পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেক প্রপীড়িত। কাজেই তখন সমগ্র জন-সংখ্যার মধ্যে এই সমস্যা দেখা দেবে। তখন সবাইকে পর্যাপ্ত পরিমাণে না হোক, শুধুমাত্র স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ন্যূনতম পরিমাণ প্রোটিন সরবরাহের জন্যে বছরে কমপক্ষে ৬ কোটি টন প্রোটিনের দরকার হবে। পৃথিবীর সামগ্রিক পেট্রোলিয়াম পরিমাণের শতকরা ৩ ভাগ যদি প্রোটিন উৎপাদনে সদ্ব্যবহার করা যায়, তা হলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

এ-কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আত্মনিয়োগ করেছেন। এই বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী হচ্ছেন বৃটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী। কোম্পানীটি স্কটল্যাণ্ডের গ্রেঞ্জমাউথ শহরে, ফ্রান্সের লাভেরা ও প্যারিস শহরে তিন সংস্থাকে এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় সাহায্য করছেন। এছাড়া, নাইজিরিয়ার একটি গবেষণা-খামারে গৃহপালিত পশুকে পেট্রোলিয়ামজাত প্রোটিন খাইয়ে তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছেন। আরও কয়েকটি দেশে অন্যান্য তৈল-কোম্পানী এ বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ করছেন। আমাদের দেশেও আসামের জোড়হাটে আঞ্চলিক গবেষণা মন্দিরে পেট্রোলিয়াম হাইড্রো কার্বন থেকে একপ্রকার প্রোটিন উৎপাদনের
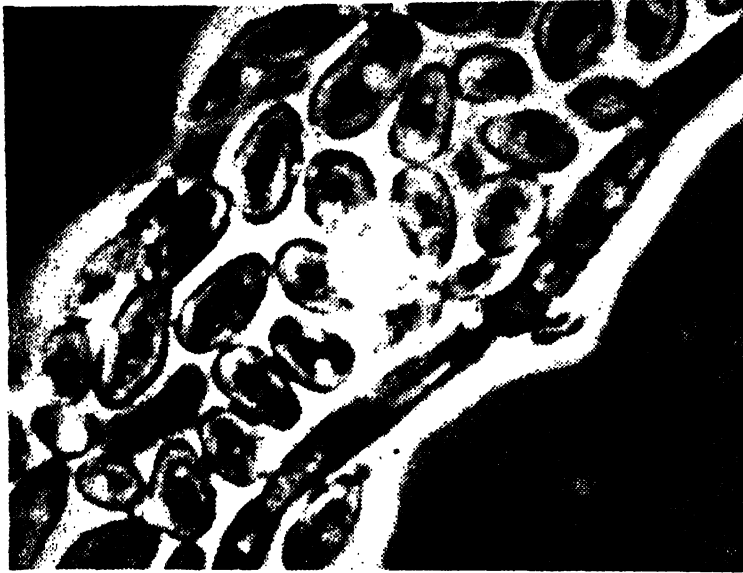
ঈস্টের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন উৎপাদন

পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে বলে সম্প্রতি জানা গেছে।

পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন উৎপাদনের মূলে আছে 'ঈস্ট' নামে এককোষী আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ। এই ঈস্টের সাহায্যেই আটা-ময়দা থেকে পাউরুটি তৈরী হয়। ঈস্টকে পেট্রোলিয়াম খাইয়ে প্রোটিন উৎপাদন করা হয়। পেট্রোলিয়াম-খাওয়ানো ঈস্টকে শুকিয়ে ও বিশুদ্ধ করে তা থেকে পাওয়া যায় শাদা প্রোটিন চূর্ণ। এই চূর্ণের নিজস্ব কোনো স্বাদ বা গন্ধ নেই। এই প্রোটিনচূর্ণের প্রথম ব্যবসাগত ব্যবহার হয়েছে গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই মানুষের খাদ্যোপযোগী পেট্রোলিয়াম-প্রোটিনও প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছেন। মাছ-মাংস বা অন্যান্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে এই প্রোটিন-চূর্ণ মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এই প্রোটিন খুব সহজেই হজম হয় এবং 'লাইসিন' (এক রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড) নামে একটি অতি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই লাইসিন মানুষের খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং সাধারণত প্রাণীজ প্রোটিনেই পাওয়া যায়। সাধারণ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে লাইসিন নেই বললেই চলে।

শিল্পগত দিক থেকে ঈস্ট আমাদের আর একটি উপকার করে। অপরিশ্রুত পেট্রোলিয়ামের মধ্যে কয়েকরকম তেল মিশ্রিত থাকে। তার মধ্যে কতকগুলি শিল্পের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। যে তেলে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি তা গাঢ় আঠার মতো হয়। তৈল পরিশোধনকালে ইঞ্জিনীয়াররা এই গাঢ় আঠার মতো অংশটি বার করে নিতে চান। ঈস্ট তাঁদের এই কাজটি করে দেয় অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামের এই অংশটি তারা খেতে ভালবাসে এবং এইভাবে প্রোটিন উৎপাদনকালে তারা পেট্রোলিয়ামের পরিশোধনের কাজও খানিকটা করে দেয়।

ঈস্টের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন প্রস্তুতের কাজ কঠিন বা ব্যয়সাধ্য নয়। ঈস্ট সহজেই যে কোনো পুকুরে বা জলাধারে চাষ করা যায়। তার জন্যে মাটি, সূর্যের আলো, বৃষ্টি বা মানুষের পরিশ্রম কোনো কিছুরই দরকার হয় না। আর পেট্রোলিয়ামের দামও খুব বেশি নয়। এছাড়া, ঈস্ট মূলত উদ্ভিজ্জ বলে বিশ্বের কোনো ধর্মাবলম্বীর পক্ষে ঈস্টজাত প্রোটিন খাদ্য গ্রহণে আপত্তি হবে না। কৃত্রিম কৌশলে বিভিন্ন ভালো জাতের ঈস্টের চাষ করে তার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন উৎপাদন করতে পারবেন বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। আর এইভাবে মানুষের দেহের পুষ্টিসাধনে প্রোটিনের এই নতুন উৎস অনেকখানি সহায়তা করবে।

অভিনব 'মনের ওষুধ'

পৌরাণিক যুগে অমৃত পান ক… অমরত্ব লাভ করা যেত বলে শোনা যা… কিন্তু আজকের যুগে এমন দ্রব্যের সন্ধা… আমরা এখনও পাইনি যা পান করে মৃ… উত্তীর্ণ হতে পারি। তবে সম্প্রতি এমন এক… রাসায়নিক দ্রব্যের কথা শোনা যাচ্ছে… খেলে দুঃখময় এই পৃথিবীকে নাকি স্বগে… অমরাবতী বলে মনে হয়! এই অভি… 'মনের ওষুধটি' 'এল-এস-ডি' এই সংক্ষি… নামে পরিচিত এবং মার্কিন যুক্তরা… আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে এই ওষু… বর্তমানে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এ… এস-ডি আসলে হচ্ছে একটি রাসায়… যৌগিক পদার্থ ডি-লাইসারজিক অ্যা… ডাই-ঈথাইল-অ্যামইড। এটি একটি স্ব… হীন বর্ণহীন গন্ধহীন দ্রব্য। অতি সাম… পরিমাণ এল-এস-ডি খেলে মনে অদ… অনুভূতি জন্মায়। মনে হয়—বুঝি… বসন্তের সৌন্দর্যরাজ্যে উপনীত হয়… কখনও মনে জাগে অদ্ভুত আতঙ্ক… ভয়। এক গ্রাম মাত্র এল-এস-ডি… হাজার লোকের ওপর কাজ করতে পা… মনের ওপর এই দ্রব্যটির প্রতিক্রিয়া… অপরিসীম, কিন্তু দেহের উপর… প্রতিক্রিয়া বিস্ময়করভাবে সামান্য।

বিজ্ঞানীরা মনুষ্যেতর প্রাণীর… পরীক্ষা করে দেখেছেন, মস্তিষ্কের বি… অংশে অসমভাবে এল-এস-ডি ছড়িয়ে প… পিটুইটারি এবং পিনিয়াল গ্রন্থিতে… সবচেয়ে বেশি জমা হয়। এছাড়া লিম্… তন্ত্রে ও হাইপোথালামাস অংশেও… বেশি সঞ্চিত হয়। এল-এস-ডি অনুভূ… তন্ত্রে বিশেষভাবে বিকৃতি ঘটায় এবং… ফলে নানা অস্বাভাবিক অনুভূতি জন্মা…

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এল-… ডি'র ব্যবহার যেরকম ভীতিজনক… বেড়ে চলেছে তা প্রতিরোধের জন্যে… প্রয়াস শুরু হয়েছে। এর বিরূপ প্র… ক্রিয়ার কথা টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রি… মারফৎ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। … এল-এস-ডি খেলে যে রোমাঞ্চকর অভি… হয় এ তথ্য যত দ্রুত প্রচারিত হ… তার ফলাফলের ভয়াবহতা সম্পর্কে… সাধারণ ততটা সচেতন নন। এল-এস-… বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিতর্ক … আছে, তবে একথা তর্কাতীত সত… এল-এস-ডি যে আনন্দময় অমরাবত… নিছক মায়া আর মুহূর্তের মরীচিকা মাত্র।

॥ উনত্রিশ ॥

হঠাৎ ধাক্কা খেলে যে-ভাবে সুখ-তন্দ্রা ছোটে, শামু এসে খবরটা দেওয়া মাত্র জ্যোতিরাণীর কয়েক মুহূর্তের আবেশ সেই গোছের একটা ধাক্কা খেল।

কালীনাথ আবার কাগজ টেনে নিয়েছিলেন, শিবেশ্বর দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ে মন দিয়েছিলেন। গৌরবিমল কালীনাথের হাতে-ধরা কাগজটার পিছন দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। শিবেশ্বরের পেয়ালা খালি হলে চায়ের আসর ভাঙবে।

জ্যোতিরাণী ভাবছিলেন শুধু তাঁর পরিকল্পনার রূপ দেবার জন্য মামাশ্বশুরকে প্রয়োজন না, সিতুর রূপ বদলাবার জন্যও এই একজনকেই দরকার। তাঁকে ধরে রাখতে পারলে অনেক ভাবনা ঘোচে।

শামু এসে সংবাদ দিল, নীচে বিভাসবাবু এসেছেন। ঘরের চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণীর দিকে চেয়ে তাঁকেই খবরটা দিয়ে গেল।

কালীদা কাগজের থেকে মুখ সরালেন না, কেউ কিছু বলে গেল মনে হতে গৌরবিমল শুধু ফিরে তাকালেন। পর পর গোটা কয়েক চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা আধা-আধি খালি করে শিবেশ্বর মুখ তুললেন।

স্ত্রীর মুখের চকিত বিড়ম্বনা আর বিরক্তি উপভোগ্য। কিন্তু মুখে প্রকাশ পেল না। মোলায়েম করে বললেন, তুমি যাও, আমার আর দরকার নেই। অদূরে প্রতীক্ষারত ভোলার দিকে ফিরলেন, নীচে চা-টা কি দিবি দিয়ে আয়—।

ঠাণ্ডা মুখে জ্যোতিরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ওই অমায়িক উক্তি বা [illegible] প্রতি নির্দেশ [illegible] কানে এসে লেগেছে। মামাশ্বশুর ভব্যতাই ভেবেছেন হয়ত কিন্তু কালীদার তা ভাবার কথা নয়।

হঠাৎ এ-সময়ে এসে হাজির হলেন কেন জানেন না। সকালে ক্বচিৎ কখনো আসেন। হয়ত দরকারী কাজেই এসেছেন। টেলিফোনে সেদিন দেখা হওয়া দরকার বলেও ছিলেন। পিছনে পাশের ঘরের মালিককে সেই মূর্তিতে এসে দাঁড়াতে দেখে আর কিছু শোনা হয়নি বা বলা হয়নি। পরে কথা বলবেন জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন তিনি। এ-ক'দিনে ফোন করার কথা মনেও ছিল না। মনে থাকলেও করতেন না। কিন্তু যে-দরকারই থাক, জ্যোতিরাণী ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। সম্ভব হলে ওপরে চায়ের পাট চুকিয়ে ঘর থেকে সব বেরিয়ে আসার আগেই দু'কথায় ভদ্রলোককে বিদায় করে ফেরার ইচ্ছে তাঁর। শুধু ইচ্ছে নয়, এই গোছের একটা সংকল্প নিয়েই নীচে নেমে এলেন তিনি।

বিভাস দত্ত বসেননি তখনো। সোফা-সেটির মাঝের ফাঁকে দাঁড়িয়ে সিগারেট হাতে পিছন ফিরে রাস্তা দেখছেন।

—কি আশ্চর্য, আপনি হঠাৎ এ-সময়ে?

বিভাস দত্ত ফিরলেন। দুই-এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন চুপচাপ। তারপর হাতের সিগারেট রাস্তার দিকেই ছুঁড়ে ফেলে সামনের সোফাটায় পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। দাঁড়িয়ে থেকে জ্যোতিরাণী একটা প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করবেন, অসময়ে এসে বিরক্ত করা হল কিনা বা তিনি ব্যস্ত ছিলেন কিনা। ব্যস্ততার জরুরী দায়টা মামাশ্বশুরের ওপর চাপিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত বলেই সাক্ষাৎমাত্রে জ্যোতিরাণী শমীর কথাও জিজ্ঞাসা করেননি।

—বসুন। বিভাস দত্তর মুখে পাল্টা চাপা বিস্ময় একটু।—এ সময়ে আমি কেন ভেবে না পেয়ে নিজেই তো ঘাবড়ে আছি। ...আপনার উঁচু মহলের ভদ্রলোকটির হঠাৎ এই অধমকে দরকার হয়ে পড়ল কেন, জোর তলব একেবারে?

জ্যোতিরাণীর সংকল্প ওলট-পালট হয়ে গেল। কি শুনলেন বোধগম্য নয় যেন। বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইলেন খানিক।—আপনাকে তলব...কে?

অবাক জ্যোতিরাণী যেমন বিভাস দত্তও তেমনি। তবু মুখের সহজ অভিব্যক্তিটুকুই বজায় রাখতে চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।—আজ এ-সময়ে আসার জন্য শিবেশ্বর কাল টেলিফোনে বিশেষ করে বলে রেখেছিল, দরকারি কি পরামর্শ আছে নাকি, আপনি জানেন না?

আচমকা প্রতিক্রিয়া এত দ্রুত সামলে নিতে শেখেননি জ্যোতিরাণী যাতে করে বিভাস দত্তর চোখে কিছু পড়বে না। বাইরের কারো উপস্থিতিতে এর পরেও হয়ত এতটা স্তব্ধ হতে চাননি। কিন্তু তিনি চান আর না চান, সমস্ত মুখ ছেড়ে দুই কানে পর্যন্ত লালের আভা ছড়িয়েছে। বসলেন। মাথাও নাড়লেন, জানেন না। অস্ফুটস্বরে বললেন, আপনি এসেছেন খবর পেয়েছেন, এক্ষুনি নামবেন তাহলে।

সামলে নিতে পারলে এই কথা কটাই অন্য সুরে বলা যেতে পারত। এর থেকেও হালকা জবাব কিছু দেওয়া যেতে পারত। বলতে পারতেন, উঁচু মহলের ভদ্রলোকদের তেমনি উঁচু দরের লোকের সঙ্গেই পরামর্শের দরকার হয়, তিনি অতশত খবর রাখেন না। কিন্তু

জ্যোতিরানী কিছুই পারেননি। পারেননি অন্য কারণে। তাঁর অগোচরে টেলিফোনে আসতে বলা হয়েছে বা দরকারী পরামর্শের তাগিদে ডাকা হয়েছে সেই কারণে নয়।... শামু খবরটা দেবার পরেও চুপ করে থেকে শুধু মজাই দেখা হয়েছে। ভদ্রলোককে আসতে বলা হয়েছে সেটা তখনো চাপা। সকলের সামনে আর এই ভদ্রলোকের সামনেও এভাবে জব্দ করা আর মজা দেখার অকরুণ প্রবৃত্তিটাই জ্যোতিরাণীকে এত স্তব্ধ করেছে।

আর কিছু বলা বা ভাবার আগে ভোলা চা-প্রাতরাশ নিয়ে হাজির। বিভাস দত্ত চায়ের পেয়ালাটাই তুলে নিলেন শুধু। চা অথবা সিগারেট কিছু একটা দরকার। শিবেশ্বর চাটুজ্জের টেলিফোন পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। এখন আরো অবাক। ভোলা খাবারের ট্রে হাতে চলে যাচ্ছিল, শিবেশ্বর ঘরে ঢুকলেন। পরিতুষ্ট গাম্ভীর্য।—খেলে না কিছু?

বিভাস দত্ত হাল্কা জবাব দিলেন, তোমার টেলিফোন পেয়ে আপাতত খাবি খাচ্ছি।

তাঁর মুখোমুখি বসলেন তিনি। নির্লিপ্ত মন্তব্য কিছু করতেন হয়ত। ঘরে কালীনাথ আর গৌরবিমলের পদার্পণ ঘটল। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি বুঝলেন তাঁদেরও ডাকা হয়েছে। নইলে এভাবে আসার কথা নয়, বিনা আহ্বানে এসে বসার কথা নয়। মামাশ্বশুরের স্বাভাবিক মুখ, কালীদার অতিরিক্ত গাম্ভীর্যে কৌতুক গোপনের প্রয়াস।

স্ত্রীর মূর্তিটি একবার দেখে নিয়ে খুব সাদাসিধেভাবে শিবেশ্বর বললেন, তোমার ওই ব্যাপারে পরামর্শের জন্য বিভাসকে আমিই আসতে বলেছিলাম। মামু আছে কালীদা আছে, সকলে মিলে ঠিক করে ফেলা যাক—

জ্যোতিরানীর ঠোঁটের ডগায় একটাই প্রশ্ন এঁটে বসতে চেয়েছিল। ডাকা যে হয়েছে ভদ্রলোক আসার পরেও তাঁকে জানানো হল না কেন। কিন্তু থাক। মামাশ্বশুর আর এই ভদ্রলোকের সামনে কিছু বলতে বা শুনতেও রুচিতে বাধছে।

পেয়ালা রেখে সিগারেটের খোঁজে বিভাস দত্ত পকেটে হাত ঢোকালেন।—ঘাবড়ে যাচ্ছি, কি ব্যাপার?

—ব্যাপার গুরুচরণ। চতুষ্পর্শ যোগ। কালীদার গাম্ভীর্যে অনুশাসনের সুর, আরামের শয্যায় শুয়ে শুধু বইয়েতেই আদর্শ ছড়াবে, কেমন? এবারে বাস্তব ফসল ফলাও, দেখি মুরোদ কত!

রসিকতা বিরক্তিকর, তবু জ্যোতিরাণী যতটা সম্ভব স্থির, নির্লিপ্ত। তাঁর মনে হয়েছে শুধু কালীদা মামাশ্বশুর আর বিভাস দত্ত নয়, সম্ভব হলে এই আসরে শোভাদারও ডাক পড়ত। রোগ একে একে এঁদের সকলকে নিয়ে বাসা বেঁধেছিল সে-কথা সেদিন মুখের ওপরই বলেছিলেন তিনি। তারই জবাব এটা।

শিবেশ্বর গৌরবিমলের দিকে ফিরলেন, জ্যোতি কি করতে চায় শুনেছ তো?

—ভালো করে শুনিনি, কালী বলছিল কি-সব।

—তুমি জানো তো? প্রশ্ন বিভাস দত্তকে।

তিনি মাথা নাড়লেন, জানেন না।

অবিশ্বাসী বিদ্রূপের দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর স্থির হবার আগেই জ্যোতিরাণী বললেন, উনি জানবেন কি করে, এক মিত্রাদির সঙ্গে ছাড়া এ-ব্যাপারে আর কারো সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। আলোচনা করবে ঠিক করেছ যখন, সকলের আগে তাঁকে ডাকা উচিত ছিল। টেলিফোনে খবর পেলে এখনো চলে আসতে পারেন।

কুশনের কাঁধে মাথা রেখে কালীদা ঘরের ছাদে চোখ রাখলেন। মিত্রাদিকে ডাকার প্রস্তাবে শিবেশ্বরেরও কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। বললেন, অতক্ষণ সময় দিতে পারব না, তোমার কাছ থেকেই শুনে নেবো'খন।...ভালো করে কেউ কিছু জানে না, এদের বলে দাও কি করতে চাও, আমি নিজেও ঠিক জানি না।

খুব ঠাণ্ডা মুখে দু'কথায় বক্তব্য শেষ করলেন জ্যোতিরানী। সারমর্ম, ঠাঁই নেই এমন গৃহস্থ মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া হবে একটা, আর নিজের পায়ে তারা যাতে দাঁড়াতে পারে সেই চেষ্টা আর সব-কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

সবথেকে বেশি মন দিয়ে শিবেশ্বরই শুনলেন যেন। আর একটু বিস্তারিত করে জানাবার সুরে গৌরবিমলের দিকে চেয়ে যোগ করলেন, এ জন্যে আমার দশ বিঘে জমির ওপর বড় একটা বাড়ি আর লাখ-তিনেক টাকা দরকার হয়েছে—তিন লক্ষই বলেছিলে না?

শেষেরটুকু কালীনাথের উদ্দেশে, এদিক থেকে জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, এখন এতেই হবে, পরে আরো দু'তিন লক্ষ লাগতে পারে।

শোনার পর ভিতরে ভিতরে শুধু বিভাস দত্তই একটু অস্বস্তি বোধ করলেন হয়ত। দশ বিঘে জমির বড় বাড়ি আর তিন লক্ষেরও ওপর দু'-তিন লক্ষ টাকার অংকের বাস্তব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। কিন্তু বললেন যিনি, শ'তিনেক টাকার ওপর আরো দু'তিনশ বেশি লাগার মত করেই বললেন যেন।

—বেশ। লাগলেও টাকা তো তোমার কালীদা দান করেই রেখেছে। শিবেশ্বরের নিশ্চিন্ত মুখ।

—আপত্তিকর! কালীনাথ সোজা হয়ে বসলেন, যেখানে হুকুম করা হয়েছে চিনির বলদ সেখানেই চিনির বস্তা পৌঁছে দিয়েছে।

গৌরবিমলই শুধু হাসছেন একটু একটু। শিবেশ্বর আলোচনায় এগোতে চান।—প্রতিষ্ঠানের তো আর নিজের হাত-পা নেই, ব্যবস্থা কি হচ্ছে?

এবারের প্রশ্ন স্ত্রীর দিকে ফিরে, কিন্তু ও-ধার থেকে জবাব দিলেন কালীদা, আগে একটা ট্রাস্ট করে নিলে ভালো হয়, টাকা ট্রাস্ট ফাণ্ডে জমা করা যেতে পারে।

উত্তর কালীদা দিলেন বলেই শিবেশ্বর তুষ্ট নন খুব।—ট্রাস্ট-এ কে-কে থাকছে? চেক-এ কার সইয়ে টাকা উঠবে?

বিভাস দত্ত নীরব শ্রোতা। গৌরবিমল পরামর্শ দিলেন, তোর আর জ্যোতির সইয়ে তোলার ব্যবস্থা করাই তো ভালো।

—আমার সময় নেই। নেহাত উপার্জনের টাকা বলেই কি ব্যবস্থা হবে জেনে নিচ্ছি। কাজের কথা বলো—

গৌরবিমল চুপ। কাজের কথা কিছু মাথায় এলো না। মাথা কালীদাই বেশি ঘামাচ্ছেন ধরে নিয়ে শিবেশ্বর তাঁর দিকে ফিরলেন।—ট্রাস্ট-বোর্ড-এ কারা থাকবে, তুমি, মামু, বিভাস আর জ্যোতি?

—তিনজন বা পাঁচজন হলে ভালো হয়, [..]কে বাদ দিলে তিনজন হবে। আমি [আ]গেই জ্যোতিরাণীর কাছ থেকে ছাড়পত্র [নি]য়ে নিয়েছি।

এবারে শিবেশ্বর বিস্মিত একটু, তার [মা]নে?

—তার মানে আমি বাদ।

আর একজনও যদি নিজে থেকেই [নিজে]কে বাদ দিত জ্যোতিরাণী খুশি হতেন। [সেই]রকমই আশা করেছিলেন তিনি। বিভাস [দত্ত], কিন্তু নীরব শ্রোতা আর দ্রষ্টার মতই [ব]সে আছেন। বিরক্তি চেপে জ্যোতিরাণী [ব]ললেন, প্রতিষ্ঠানের আসল মানুষ মিত্রাদি, [তি]নি থাকবেন।

গম্ভীর দৃষ্টিটা এবারে তাঁর মুখের [ও]পর রাখলেন শিবেশ্বর। —চেক্এ টাকা [তো]লার ক্ষমতাও থাকবে তার?

জ্যোতিরাণী এদিক ভেবে বলেননি। [উত্ত]র দিয়ে উঠতে পারলেন না।

আবার কালীনাথের দিকে ফিরলেন শিবেশ্বর। —তুমি বাদ কেন?

—অযোগ্য বলে।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি বুঝতে [চেষ্টা] করলেন তিনিই জানেন। পরে একটু [জো]রে মাথা নাড়লেন। —তুমি না থাকলে [চল]বে না, আমার মনে হয় চেক্ সই করার [ভা]র তোমার আর মামুর ওপর থাকা উচিত।

কালীনাথ মাথাও নাড়লেন, স্পষ্ট করে জবাবও দিলেন, আমি না। ও ভার তাহলে জ্যোতি আর মামুর ওপরে থাক।

শিবেশ্বরের চোখে কিছু একটা [..] জিজ্ঞাসার ছায়া উঁকি দিয়ে গেল। [কি]ন্তু তাঁর প্রথম প্রস্তাবে গৌরবিমল মনে [মনে] আঁতকে উঠেছিলেন প্রায়, কালীনাথের কথায় বিড়ম্বনার একশেষ যেন। দ্বিধা [কা]টিয়ে বললেন, এ-সবের মধ্যে আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

অসহিষ্ণুতা চাপতে চেষ্টা করেও [..]টুকুটি পারা গেল না, জ্যোতিরাণী বললেন, সে-ভার তাহলে আমারই থাকুক, [চে]ক্ আমিই কাটতে পারব।

সঙ্গে সঙ্গে গৌরবিমলের উদ্দেশে কালীনাথের চোখ গরম। —হল তো? দিলে [তো] মেজাজখানা ঠিক করে!

মামাশ্বশুরের বিড়ম্বিত হাসিমুখ এক-পলক দেখে নিয়ে জ্যোতিরাণী সোজা কালীদার দিকে তাকালেন। তিনি [স]হায় বলে উল্টে তাঁরই ওপর বেশি [..] ওঠার দাবি যেন। বললেন, কোনো [কি]ছুতে একেবারে থাকাই চলবে না [আ]পনারই বা এ-রকম প্রতিজ্ঞা কেন?

বিভাস দত্তর নির্বাক দৃষ্টি একজন [ছে]ড়ে আর একজনের মুখের ওপর ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে শুধু। কালীনাথ আকাশ [থে]কেই পড়লেন প্রায়, এ-রকম পাল্টা আক্রমণের অবিচার আশা করা যায় না যেন। আমাকে বলছ! সকলকেই সালিশ মানার [অ]ভিব্যক্তি, দেখলে কাণ্ড, আমি উপকার করতে গেলাম, আর উল্টে আমাকেই কিনা...

কাণ্ডর সমর্থনে এবারে গৌরবিমলও হাসিমুখে অনুযোগ করলেন, ঠিকই বলেছে। আমি তো ঠায় এখানেই থেকে যেতে পারব না, মাসের মধ্যে বড় জোর দশ-পনের দিন থাকতে পারি, তাই টাকা-পয়সার হাঙ্গামার মধ্যে যেতে চাই না। তুই এখানেই বসে আছিস, তোর আপত্তি কেন?

কালীনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ফিরে দু'হাত জোড় করলেন, অর্থাৎ পিছনে লাগার ফল হাতে-নাতে পেয়েছেন, ক্ষমা-ঘেন্না করে এবারের মত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

এ আসরে বিভাস দত্তকে ডেকে আনার মানসিক তুষ্টি যতটা উপভোগ্য হবে আশা করা গেছল তা যেন হল না। স্টেশনে তাঁকে তুলে দিতে গিয়ে কে এক বীথি ঘোষকে কুড়নোর ফলেই স্ত্রীটি আদর্শ নিয়ে মেতেছে আর বিভাস দত্ত তাতে উদ্দীপনার খোরাক জুগিয়েছে শিবেশ্বরের এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু লেখক বলেছে পরি-কল্পনার খবর কিছুই রাখে না আর স্ত্রী জানিয়েছে এক মৈত্রেয়ী ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারো সঙ্গে তার কথা হয়নি। দু'জনার কারো উক্তিই এখনো নির্জলা সত্যি ভাবতে পারছেন না, তবু তাঁর বদ্ধ ধারণা কিছুটা ঢিলে হয়ে গেছে। বিভাস দত্তকে অনেকবারই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর নির্বাক নির্লিপ্ততায় চাপা উৎসাহেরও আঁচ পাচ্ছেন না। ফলে মাথাওয়ালা লোকের মতই উদ্দীপনার খোরাক জোগাবার ঝুঁকি তিনিই নিয়ে বসলেন।

মন্তব্যের সুরে বললেন, বাইরের ডোনারদের থেকেও চাঁদা-টাঁদা তোলার প্ল্যান আছে শুনেছি, পাঁচজনের টাকা নাড়াচাড়া করতে গেলেই অনেক হিসেব-নিকেশের ঝামেলা—চেক্ সইয়ের ব্যাপারটা একজনের হাতে থাকা ঠিক নয়। ...জ্যোতির সঙ্গে এ দায়িত্বটা তাহলে বিভাসকেই দিতে হয়।

বেঁধে গঞ্জনা দেওয়ার থেকেও উদারতার চাবুক বরদাস্ত করা আরো কঠিন কি? সামনে মামাশ্বশুর, কালীদা, বিভাসবাবু— কিন্তু জ্যোতিরাণীর দু' চোখ স্থির ওই মানুষটার মুখের ওপর। যে উক্তি মুখে এসেছিল, সামলে নিলেন। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, বাঁচা গেল, সেই ভালো।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার খুব অবকাশ কারো মেলেনি। কারণ, বিভাস দত্ত এতক্ষণে একটা বড়গোছের নাড়াচাড়া খেয়ে সচেতন হয়েছেন যেন। তিনি সভয়ে বলে উঠলেন, মাথা খারাপ নাকি! আমি সামান্য মানুষ, লিখে খাই, ও-সব লাখ্-বেলাখের মধ্যে আমি নেই—তোমাদের ওই ট্রাস্ট কমিটির থেকেও আমার নাম কেটে দাও, আমার দ্বারা যদি কিছু হয়, এমনিই হবে।

এতক্ষণে জ্যোতিরাণীর ভালো লাগল। খুব ভালো লাগল। বিকৃত তুষ্টির লোভে এই আসরে তাঁকে ডাকার সমুচিত জবাব হয়েছে তা শুধু জ্যোতিরাণীই অনুভব করতে পারেন। আর কেউ না, জবাব যিনি দিলেন তিনিও না। বিভাস দত্তকে ছেড়ে জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটা আবার শিবেশ্বরের মুখের ওপরেই নিবিষ্ট হল। শুধু মামা-শ্বশুর সামনে বসে না থাকলেই হয়ত উষ্মা চেপে এবারে তিনি রসিকতাই করতেন, চেক সইয়ের দায়িত্ব তাহলে তুমি আর আমিই নিই।

একটু পরে সমস্যা নিষ্পত্তি করার মত করেই বললেন, মামাবাবু মাসে দশ-পনের দিন এখানে থাকেন যদি তাতেই হবে। তাছাড়া সে-রকম দরকার পড়লে ডাকেও চেক সই করিয়ে আনা যেতে পারে।

খানিক আগের বিড়ম্বনা ভুলে কালীনাথ তক্ষুনি সায় দিলেন, আমারও তাই মত।

আর আপত্তি করা সম্ভব নয় বলেই গৌরবিমল আপত্তি করলেন না। সমস্যার দো-টানা ভাবটা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারলেন না তবু। একটু ভেবে শেষে চূড়ান্ত ফারসালাই করলেন যেন। —ঠিক আছে। চেক সইয়ের ব্যাপারে আমার কালীর আর জ্যোতির নিতজনেরই অর্থারিটি থাক—যে-কোনো দুজনের সইয়ে টাকা উঠবে। এ ব্যবস্থা হলে হঠাৎ কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না, ডাকে চেক সই করে আমার জন্যেও বসে থাকতে হবে না। হাসিমুখে কালীনাথকে শাসালেন তারপর, তোতে আমাতে একত্র হয়ে কিছু গুছিয়ে নেবার এ-সুযোগ ছাড়িস যদি ভালো হবে না বলে দিলাম।

নিরুপায় কালীনাথ বললেন, তথাস্তু। সামনে এসে ধরলেই আমি সই করে দেব, কেন টাকার দরকার, কি জন্যে টাকার দরকার, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না বলে দিলাম।

মামাশ্বশুরের প্রস্তাব জ্যোতিরাণীর পছন্দ হয়েছে, কিন্তু সব থেকে বেশি মনঃপূত হয়েছে শিবেশ্বরের। বললেন, সে-রকম ঠেকে না পড়লে তোমার তো সই করার দরকারই নেই—এই ব্যবস্থাই ভালো।

তাড়া আছে বলে মিত্রাদিকে ডাকতে দেওয়া হল না, তাই জ্যোতিরাণী আশা করেছিলেন আলোচনা এখানেই শেষ হতে পারে। একটু বাদেই বোঝা গেল তা হবে না। অন্যান্য ব্যবস্থার কথা তুললেন শিবেশ্বর। কত মেয়ে নেওয়া হবে, কি-ভাবে নেওয়া হবে, তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা আর ব্যবস্থাটা কি—ইত্যাদি।

জ্যোতিরাণী সংক্ষেপে জবাব সারলেন, সে-সব কিছুই এখনো ভাবা হয়নি, সময়ে হলে মামাবাবু মিত্রাদি আর তিনি বসে ঠিক করবেন। তার আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গল পরিষ্কার করা, বাড়িটা মেরামত করা আর জল-লাইট-ফোন আনার ব্যবস্থা করা দরকার।

শিবেশ্বরের তবু বড়-গোছের দায় সুসম্পন্ন করে তোলার মত চিন্তিত মুখ।—তোমার প্রতিষ্ঠান চালাবে কে? খরচা-পত্রের ভার নেওয়া, সেখানে থেকে সব-দিক দেখা-শোনা করা—এ-সব কে করবে?

বিরক্তি বাড়ছে জ্যোতিরাণীর। প্রকাশ পেল না। —মিত্রাদি। আমিও সাহায্য করব।

—সে সেখানে থাকতে রাজি হয়েছে?

প্রচ্ছন্ন বিস্ময় কি প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস জ্যোতিরাণী ঠিক ধরতে পারলেন না। মিত্রাদি মিটিং পার্টি আর ফাংশান নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়ায় বলেই হয়ত এই প্রশ্ন। জবাব দিলেন, দরকার হলে মাসের মধ্যে ত্রিশ দিনও থাকবে। আরো একটু যোগ করার ইচ্ছে ছিল, বলার ইচ্ছে ছিল, দরকার হলে তিনিও গিয়ে থাকবেন। বললেন না। এ নিয়ে আবার কোনো বিকারের সূত্রপাত হোক, চান না। মন্তব্য করলেন, তা ছাড়া দূরের রাস্তা কিছু নয়, গাড়ি থাকলে দিনের মধ্যে যতবার খুশি যাতায়াত করা যেতে পারে। কালীদার দিকে চোখ ছিল না জ্যোতিরাণীর। থাকলে দেখতেন কুশনে মাথা রেখে আবার তিনি ঘরের ছাদ দর্শনে মগ্ন।

—বেশ। সমস্যা নিষ্পত্তির হৃষ্ট অভিব্যক্তি শিবেশ্বরের মুখে। সামান্য আড়মোড়া ভাঙার ফাঁকে লঘু দৃষ্টিটা বিভাস দত্তর মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন একপ্রস্থ। তারপর স্ত্রীর দিকেই ফিরলেন আবার। হালকা গাম্ভীর্যে বললেন, কিন্তু বিভাস এত বড় বড় সব আদর্শের কথা লেখে, ওর কি কাজ বুঝলাম না—ও এর মধ্যে কি করবে তাহলে?

এবারে আর মামাশ্বশুর আছে বলে ঢোক চেপে চুপ করে বসে থাকলেন না জ্যোতিরাণী। বিভাস দত্ত উসখুস করে উঠেছিলেন, কিন্তু তার আগেই খুব সহজ হালকা সুরে জবাব ছুঁড়লেন তিনি। চাউনিটাও হাসি-মাখা করে তুলতে পেরেছেন। —তুমি যা করবে তাই করবেন। সমালোচনা করবেন, টিকা-টিপ্পনী কাটবেন—উনি বড়-বড় আদর্শের কথা লেখেন, তুমিও বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও—ও'রই বা এর থেকে আর বেশি কিছু করার সময় কোথায়?

কালীদা আর মামাশ্বশুর জোরেই হেসে উঠেছেন। সঙ্গে বিভাস দত্তও। তাঁর হাসির আড়ালে প্রয়াস কতটুকু জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করেন নি। হাসির চেষ্টায় মুখ শুধু একজনেরই বিকৃত হতে দেখলেন। জবাবটা যাঁর মুখের ওপর ছোঁড়া হয়েছে, তাঁর। লক্ষ লক্ষ টাকা আর বিষয়সম্পত্তির মানী মহাজনের সমপর্যায়ে তোলা হয়েছে দু চোখের বিষ প্রায় অস্তিত্বশূন্য একটা লেখককে—এ-রকম ঠাট্টাও বরদাস্ত করা কঠিন বইকি। বিশেষ করে, আলোচনার আসর বসানোর তুষ্টি ষোল-কলায় পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই শুধু যাঁকে ডাকা।

ও-ধার থেকে কালীদা বলে উঠলেন, মধুরেণ সমাপয়েৎ! কিন্তু গদ্য ব্যাপারটার একটুখানি বাকি থেকে গেল যে! উক্তি জ্যোতিরাণীকে লক্ষ্য করে, রেজিস্ট্রেশন টেজিস্ট্রেশন যা দরকার আগে করে নেবে তো, নাকি এমনিতেই ঝাঁপ দেবে?

কি দরকার জ্যোতিরাণীর ধারনাও নেই, মাথাও ঘামাননি। —যা দরকার করুন, আমি তার কি জানি!

—তাহলে সর্বাগ্রে তোমার আদর্শ কেন্দ্রটির একটি নাম দরকার, কালীনাথ আশ্রম তো আর নাম দিচ্ছ না।

হাসিমুখে গৌরবিমল এবারে বিভাস দত্তর দিকে ফিরলেন, নাম দেওয়ার ভারটা অন্তত লেখকের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। উচিত কাজ তক্ষুনি সম্পন্ন করতে চাইলেন বিভাস দত্ত। হাসিমুখে সঠিক নাম বাতলে ফেললেন। —নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে, আদর্শ কেন্দ্রের প্রাণ-সঞ্চার হবে শিবেশ্বরের টাকায়, আর সেই প্রাণধারণ করবেন দুই প্রধানা—জ্যোতিরাণী আর তাঁর মিত্রাদি—নাম দেওয়া যেতে পারে শিবজ্যোতির্মিত্রালয়।

—বা-বা-বা-বা! খুশি আর বিস্ময়ের অমিত ধারা কালীনাথের মুখে, শিবু ঠিক স্যাংশন করলে তোমার মাথাখানা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে রাজি।

গৌরবিমলের পছন্দ হয়েছে, হাসি-মাখা দৃষ্টিটা শিবেশ্বরের দিকে ঘুরল, নামটা মন্দ বলেনি কিন্তু বিভাস...

কাজের লোকের বাজে কথায় অরুচি গোছের বিরক্তি শিবেশ্বরের মুখে, আমি কিছুতে নেই আগেই তো বলেছি, ও নামেই যদি মধু ঝরে তাহলে আমার নামটা বাদ দিয়ে তোমাদের যে-কারো নাম জুড়ে দাও—কালীজ্যোতির্মিত্রালয় করতে পারো, গৌরজ্যোতির্মিত্রালয় করতে পারো—জ্যোতি বিভাসমিত্রালয়ও খারাপ শোনাবে না।

এই কথাগুলোই সুরে বললে আর একদফা হাসির খোরাক হতে পারত। উল্টে প্রচ্ছন্ন অস্বস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল যেন। নামবিন্যাস সব থেকে বেশি বিরক্তিকর লেগেছে জ্যোতিরাণীর। ঠান্ডা মুখে বললেন, নামের জন্যে ভাবতে হবে না, নাম ঠিক করাই আছে।

চার জোড়া জিজ্ঞাসু চোখ তাঁর দিকে ফিরল। একটু অপেক্ষা করে শিবেশ্বরই জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম?

—প্রভুজীধাম।

চার জোড়ার মধ্যে তিন জোড়া চোখ নিঃশব্দে তাঁর মুখের ওপর হোঁচট খেয়ে উঠল একদফা। এ নামের তাৎপর্য শুধু বিভাস দত্তর জানা নেই। মুগ্ধ হবার মত বা হতভম্ব হবার মত নাম কিছু নয়। তবু তাৎপর্য কিছু আছে সেটা বাকি তিন মুখের দিকে চেয়ে একটু বেশিই স্পষ্ট মনে হল তাঁর।

হতচকিত ভাবটা সব থেকে বেশি স্পষ্ট শিবেশ্বরের চোখেমুখে। বাকি দুজনও নির্বাক বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত নয় একটুও। অপ্রত্যাশিত নামটা যেন ঘরের বাতাসের ওপরেও একধরনের স্থির-শান্ত প্রভাব বিস্তার করেছে।

আসন ছেড়ে জ্যোতিরাণী উঠে দাঁড়ালেন। খুব সহজ সুরেই বিভাস দত্তর উদ্দেশে বললেন, আমি আর বসতে পারছি না কিন্তু, সকালের কাজ একটাও সারা হয়নি, আপনারা কথা বলুন, আমি চলি—

সহজ পদক্ষেপে সুচারু প্রস্থান। ভিতরের ছোট বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠছেন। গতি ঈষৎ মন্থর। এই মুখে প্রসন্নতা যেন নিঃশব্দে কাড়াকাড়ি করে জায়গা দখলের খেলায় মেতেছে।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

আগের কথা

দেশ-বিদেশের কথা আমাদের প্রায়ই আলোড়িত করে। সকলের দুঃখে সকলের বেদনা মানবত্বের মহৎ ধর্ম। আবার সুখে আনন্দ প্রকাশও স্বাভাবিক ঘটনা। এর দ্বারা সেই সনাতন সত্যই প্রমাণিত হয় 'সকলের তরে সকলে আমরা'। সকলের জন্য সকলের সমবেদনা এবং সহমর্মিতা একান্তই বাঞ্ছনীয়। না হলে আজকের পৃথিবীতে টিঁকে থাকাই দুষ্কর। কারণ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আমরা বর্তমানে আর আবদ্ধ হয়ে নেই। সকল গন্ডী এবং সীমারেখা অতিক্রম করে আমাদের ছড়িয়ে পড়েছি সর্বত্র। দূরকে নিকট এবং পরকে আপন করেছি। আর যতদিন যাচ্ছে ততই এই চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নির্দিষ্ট কোন দেশ নয়, দেশে দেশে আজ আমাদের ঘর। আর সেই ঘর খোঁজার কাজে আমাদের তৎপরতার অন্ত নেই। এই নৈকট্য একদিন ছিল পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে। পাড়া-প্রতিবেশী ছাড়িয়ে সকলের সঙ্গে এই নৈকট্যের সূত্রে আমরা বাঁধা পড়েছি। তাই কোথাও দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা জল-প্লাবন হলে দুর্গতদের জন্য চিন্তা-ভাবনার ভাগ আমাদের সমান। সাহায্যের হস্ত আমরা সমানে প্রসারিত করে দিই তাই তাদের উদ্দেশ্যে। কামনা করি আশু বিপদ ত্রাণ।

আবার আনন্দেও আমরা সমান অংশ নিই। বিদেশিনী তেরেস্কোভার মহাকাশ বিজয়ের সাফল্যে আমরা একইরকম আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি। বৌটি মিলারের বিমানে আটলান্টিক অতিক্রমণে আমরা কারো তুলনায় কম গর্বিত নই। আবার শীলা স্কটের বিমানে বিশ্ব প্রদক্ষিণের ঘটনায়ও আমরা সমান উল্লসিত। বৃহত্তর মানবজাতির অংশীদার হিসেবেই আমাদের এই আনন্দ ও বেদনাবোধ।

এতে কোনরকম বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা বা সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা শুধু অশোভন নয়,—অন্যায়ও বটে। কিন্তু বিদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের কথাও চিন্তা করা উচিত। কারণ আমরা শুধু অপরের ব্যাপার নিয়ে মত্ত থাকতে চাই না। নিজেদের নিয়েও সমান গর্ব অনুভব করতে চাই। অপরেও আমাদের নিয়ে গর্ব অনুভব করুক এটাও অন্তরের গোপন কামনা। সেজন্য প্রয়োজন যোগ্য প্রস্তুতি। যোগ্য প্রস্তুতি ছাড়া কোন ব্যাপারেই সাফল্য বা কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব নয়। তাই আরো সুষ্ঠুভাবে আমাদের তৈরী হতে হবে। তৈরী আমরা অনেকটা হয়েছি—সাফল্যও অনেকটা অর্জন করেছি। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় তা নিতান্তই কম। সাফল্যের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকলের সঙ্গে চলতে পারে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরো তীব্র করার জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে হবে সুনিপুণভাবে। আর এজন্য অপেক্ষা করা চলবে না। লগ্ন সমুপস্থিত—পরীক্ষা সন্নিকট।

শ্রীমতী সুন্দরী শ্রীধরণী

শ্রীমতী কাটিনকা হফম্যান

দেশে দেশে

নাচ-গান-অভিনয়ে মেয়েদের স্বাভাবিক দক্ষতা অনস্বীকার্য। এর প্রমাণ উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নাচ-গান-অভিনয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশে এবং বিদেশেও খুব স্বল্প মহিলার নামই মনে পড়ে। আবার এধরণের ললিতকলা কেন্দ্রের পরিচালক মহিলার সংখ্যা আরও কম। এর কারণ অবশ্য মহিলাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব নয়,—সুযোগের অভাব। সামর্থ্য এবং সুযোগের অভাবে অনেকের অনেক পরিকল্পনাই নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার নজীর বিরল নয়। সমস্ত প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে নিজের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে পারেন মাত্র কয়েকজন। আর সেজন্যই আমাদের মধ্যে তাঁরা বিশেষত্বের মর্যাদায় চিহ্নিত হন। শ্রীমতী সুন্দরী শ্রীধরণী হচ্ছেন এই শেষোক্ত পর্যায়ের প্রতিনিধি। নয়াদিল্লী, ত্রিবেণী কলা সঙ্গম-এর তিনি একাধারে প্রতিষ্ঠাত্রী, পরিচালিকা এবং সাধারণ সম্পাদিকা। অথচ আজকের বাস্তবায়িত স্বপ্নের সম্ভাবনা সেদিনও ক্ষীণ ছিল। কিন্তু কর্মে নিষ্ঠা থাকলে, লক্ষ্যে অবিচল হলে স্বপ্নও সত্যি হয়—কল্পনাও বাস্তব রূপ পায়। শ্রীমতী শ্রীধরণীর কলা-সঙ্গম তারই প্রমাণ।

স্বপ্নালু দৃষ্টি আর কল্পনা-রঞ্জিত মন নিয়ে আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগে কলা সঙ্গম-এর কাজ শুরু করেন শ্রীমতী শ্রীধরণী। ভারতীয় মহিলাদের বৃহৎ প্রচেষ্টার সূচনায় এক্ষেত্রে তিনি এবং তার প্রতিষ্ঠানই ছিল পথিকৃৎ। কনোট প্লেসের একটি ফ্ল্যাটে মাত্র দুটি ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সূচনা। সম্বলমাত্র বন্ধুর দেওয়া একশটি টাকা। শ্রীমতী শ্রীধরণীর পরিকল্পনার উৎসাহী সমর্থক এক বন্ধু এই টাকা কটি দিয়েছিলেন। তাই তাঁর লজ্জাজড়িত পায়েই যাত্রা শুরু করেছিল শ্রীমতীর অনেক আকাঙ্ক্ষার ধন কলা সঙ্গম। সবাই ভেবেছিল এ পাগলামি ছাড়া

কিছুই না—নিছকই স্বপ্নবিলাস। কিন্তু তাঁরা শ্রীমতীকে চিনতে ভুল করেছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বার পাত্রী তিনি নন। শক্ত হাতে হাল ধরে রইলেন।

শক্ত হাতে হাল ধরতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীমতীর স্বপ্ন দেখা সার্থক হয়েছে। ত্রিবেণী কলা সংগমে এখন নাচ-গান-চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে দুশো ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করেন পনেরজন সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে। কলা সংগমের নিজস্ব একটি মণিপুরী নৃত্যের দলও আছে। ইতিমধ্যেই এই দল দেশে-বিদেশে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে।

কনোট প্লেসের ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সম্প্রতি কলা সংগম। আমেরিকান স্থপতি জোসেফ আলেন স্টেইন পরিকল্পিত এই ভবনটি স্থাপত্যশিল্পেরও একটি চমৎকার নিদর্শন। এই ভবনটি শুধু কলা সংগমের ক্রিয়াকাণ্ডে গন্ডীবদ্ধ না থেকে দিল্লীবাসীর প্রয়োজনের দিকেও নজর দিয়েছে। এই ভবনের আর্ট গ্যালারী এবং মুক্ত অংগন শিল্প প্রদর্শনী এবং থিয়েটারের অন্যতম কেন্দ্র। এই ভবনটি নির্মাণের জন্য শ্রীমতী শ্রীধরণী যখন জোসেফ স্টেইনের কাছে আসেন এবং নিজ পরিকল্পনা ও সামর্থ্যের কথা তাঁকে জানান তখন স্টেইন মৃদু হেসেছিলেন তাঁর পরিকল্পনার বিরাটতা এবং আর্থিক অসংগতির কথা শুনে। কিন্তু তারিফও করেছিলেন শ্রীমতীর উৎসাহের এবং আগ্রহের। তাই প্রায় সংগে সংগেই রাজী হয়ে গেলেন উদ্দিষ্ট ভবনের ডিজাইন প্রণয়নে। ভবন নির্মিত হলো আর সাফল্যমণ্ডিত হলো তাঁর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা। কলাসংগমের স্বীকৃতি আজ সর্বত্র। শিল্প-শিক্ষায় এর উচ্চমান এবং মণিপুরী নৃত্যে কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। আর সবকিছুর পেছনে আছে একজন নিষ্ঠাবতী মহিলার আন্তরিক প্রয়াস, শ্রীমতী সুন্দরী শ্রীধরণী যার নাম।

পাশাপাশি আর একজন মহিলার নাম করা যায় যিনি শিল্পক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ এবং একটি থিয়েটারের পরিচালিকা। এক্ষেত্রে অবশ্য মহিলাটি ভিনদেশী। নাম তাঁর কাটিনকা হফম্যান। তিনি একজন অভিনেত্রী। কোনট্রা ক্রেইজ থিয়েটারটি ছিল তাঁর বাবার। বাবা মারা যাওয়ার পর থিয়েটারটির দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর উপর। দায়িত্ব পালনে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অকৃত্রিম। তাই সফলতাও এলো অচিরে। সবসময়ই প্রেক্ষাগৃহ দর্শক পরিপূর্ণ। একটি আসনও ফাঁকা থাকে না। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের বসার পদ্ধতিটিও অভিনব। মোট আসন সংখ্যা ১২০। মঞ্চের চারদিকে দর্শকদের আসন। অভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের মাঝখান দিয়েই মঞ্চে যাবার রাস্তা করে নেয়। অভিনয় আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে সমবেত দর্শকমণ্ডলী হর্ষধ্বনি করে কোনট্রা ক্রেইজের নতুন অভিনয়কে স্বাগত জানায়। বনের দর্শকরা কোনট্রা ক্রেইজকে নিয়ে রীতিমত গর্ব করে।

এদেশের প্রায় অধিকাংশ শহরেই এরকম ছোটখাট থিয়েটার আছে। এবং এ সকল থিয়েটারে উৎসাহী দর্শকের সমাবেশও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোনট্রা ক্রেইজের গৌরব যে এর সর্বাধিনায়িকা হলেন একজন নারী। জার্মানীর পক্ষেও এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ সমস্ত দেশে ১৭২ জন মঞ্চ পরিচালকের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ১২ জন এবং কাটিনকা হফম্যান এঁদের অন্যতম ও নেতৃস্থানীয়া। শ্রীমতী হফম্যানের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিনেত্রী হওয়ার। তাই অভিনয়েই মন-প্রাণ সমর্পণ করে দিয়েছিলেন তিনি। বাবার নিজস্ব থিয়েটার থাকায় তাঁর বিশেষ কোন অসুবিধাও হয়নি। কোনট্রা ক্রেইজই তাঁর জীবনে সাফল্য বহন করে আনে। এইভাবে একেবারে গোড়া থেকে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেন। অভিনয়ের সংগে সংগে তিনি স্টেজ-ক্রাফট সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করতে থাকেন। আবার বিরতির সময় তিনি দর্শকদের স্বহস্তে সুপ পরিবেশন করে আপ্যায়িত করেন।

পারিবারিক জীবনেও শ্রীমতী হফম্যান সুখী। বাবা মারা যাওয়ার পর থিয়েটারের দায়িত্ব যখন তাঁর কাঁধে এসে পড়ল তখন তিনি বিয়ে করলেন তাঁরই এক সহযোগীকে। স্বামী এবং কন্যা নিয়ে সংসার ও থিয়েটারের হাল তিনি শক্তভাবেই ধরে আছেন।
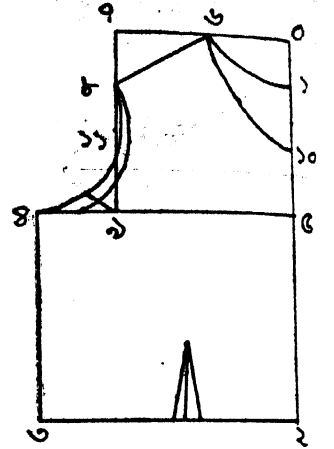
সেলাইয়ের কথা

(৫)

বডি ফ্রক

আগের সংখ্যায় আপনাদের ব... ফ্রকের বিষয় জানিয়েছি। এবার ব... ফ্রকের বিষয় জানাচ্ছি।

বডি ফ্রক

মাপ :— কাপড় জানিবার নিয়ম:
ঝুল—২২" ৩২" বহরের কা...
ছাতি—২৪" ২ ঝুল+২ ই...
পুট—৯½"
সেস্ত—১০"
কোমর—২২"
হাতা লম্বা—৫"
মুহুরী—৭"
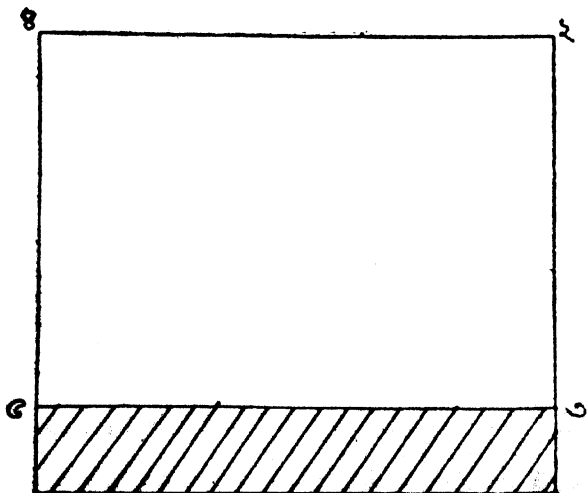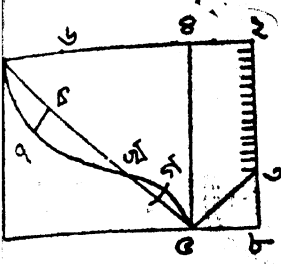
-২=সেন্ত+½″=১০½″

-১=১½″

-৬=ছাতির ১/১২+½″=২½″

পিছন গলার জন্যে ৬ ও ১ মিলিয়ে দিতে হবে।

-৭=½ পুট+½″=৫″

-৯=ছাতির ½—½″

-৮=১″½ কাঁধের সেপ্ ৮ থেকে ৬ মিলিয়ে দিতে হবে।

-৫=ছাতির ½+১½″=৭½″

আর ৯ এর মধ্যে চিহ্ন দিয়ে ১১, ৪, ১১, ৮ মিলাতে হবে।

-২=কোমরের ½+১½″=৭″

২ থেকে ২½″ পিছনে নিয়ে প্লিটের চওড়া

ও লম্বা হবে ২½″

-১০=ছাতির ½+½″ =৩½″

থেকে ১০ যোগ করে দিতে হবে এবং এর মধ্যে চিহ্ন দিতে হবে Ai

থেকে B=½″

৬, B, ১০ সামনা গলার জন্য।

৮ আর ৯ এর মধ্যে চিহ্ন দিতে হবে ১১, ১২ পিছনে সেপের জন্য মিলাতে হবে।

৪, ১১, ৮ পিছন সেপের জন্য মিলাতে হবে।

০—২ পিছন খোলার জন্য কেটে দিতে হবে এবং চিহ্ন A থেকে ১″ কাপড় বেশী রাখতে হবে বোতামপটীর জন্য।

স্কার্ট

০—৩=সেন্ত বাদ দিয়ে পুরো ঝুল +½″ সেলাইয়ের জন্য।

২—৪=ছাতির ½+২½=১৪½″

তলায় মোড়ার জন্য ২½″ বেশী নিতে হবে। ৩ হইতে ৫, ২ হইতে ৪ এর সমান আছে। ৪ হইতে ২ কে কুচি বা প্লিট দিয়ে কোমরের সমান করতে হবে, ২ ও ৪ কে সোজা টেনে ৫, ৪, ২ কে মিলাতে হবে।

সাধারণ হাতা

১—২=হাতার লম্বা +½″ সেলাইয়ের জন্য =৫½″

১—৪=ছাতির ১/১২+½″ =২½″

৪—৫=ছাতির ½—½″=৫½″ (পৌনে ৬″)

৫ হইতে ১ মিলিয়ে দিয়ে ৩ সমান ভাগ করে নং দিতে হবে AB। পয়েণ্ট A থেকে ½″ বাইরে নিয়ে নং দিতে হবে ৬।

নং B আর ৫ আর মধ্যে পয়েণ্ট করতে হবে C।

নং C হইতে ½″ ভিতরে নিয়ে সেপ্ করতে হবে।

২—৩=মুহুরীর ½+½″ =৩½ (পৌনে ৪)

৩ আর ৫ মিলাতে হবে।

পাপহাতা

সাধারণ হাতার সঙ্গে উপর দিকে ২½″ কাপড় বেশী নিতে হবে।

৬—২=হাতা লম্বা +২½″=৭½″

৬—১=কাপড় বেশী আছে ২½″

৪—২=ছাতির ১/১২=২″

৪—৫=ছাতির ½—½″=৫½″

১ হইতে ৫ কে মিলিয়ে দিয়ে ৩ সমান ভাগ করে নং দিতে হবে A, B

A থেকে ৭ পয়েণ্ট বাইরে নিয়ে চিহ্ন দিতে হবে ৭।

A আর ৫ এর মধ্যে চিহ্ন দিতে হবে C। C হইতে ½″ ভিতরে নিয়ে সেপ দিতে হবে। ৩ আর ৫ মিলাতে হবে।

২—৮=৪—৫

এখানে মুহুরী ২ থেকে ৮, ৪ ও ৫ এর সমান। তারপর কুচি দিয়ে ২—৮ কে ২—৩=মুহুরীর ½+½″=৩½″ করতে হবে।

—বসুধা

সংবাদ

শ্রীমতী অঞ্জলি ঘোষ দস্তিদার এবার পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পরীক্ষার পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

• • •

শ্রীমতী ছন্দা ব্যানার্জী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রিতে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করে সম্প্রতি আমেরিকা গিয়েছেন গবেষণা ও শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি রিষড়ায় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনার প্রচারক নেত্রী শ্রীমতী সুশীলা সিংহী বলেন যে, প্রতি মিনিটে বাইশটি সন্তান অর্থাৎ বছরে এক লক্ষ দশ হাজার সন্তান জন্ম গ্রহণ করছে এবং খাদ্যের দাবী জানাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনার পথেই এই ভয়াবহ সমস্যার সমাধান হতে পারে। তিনি মহিলাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা ও ভবিষ্যৎ সন্তানদের মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক নির্দেশে সমস্ত প্রকাশ্য স্থান থেকে 'লুপ' সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

• • •

সম্প্রতি আমঘাটা (নদীয়া) সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের নব-নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী।

প্যারিস থেকে

দিলীপ মালাকার

সবার মুখে এক কথা, প্রকৃতি দেবী অপ্রসন্ন তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতি দেবীর খাম-খেয়ালি মনোভাবে সব দেশের জনসাধারণই মর্মাহত। [illegible] বৃষ্টিহীন-উত্তপ্ত বাতাস আর ইউরোপময় চলেছে প্রতিদিন বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সেখানে যা প্রয়োজন ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে এ বছরে। ভারতে দরকার বৃষ্টিপাত। নইলে শস্য জন্মাবে না। আবার ইউরোপে দরকার এই ভরা গ্রীষ্মে রৌদ্র। নইলে শস্য ও ফল ভাল ফলবে না। এখানে সারা বছরই ঠাণ্ডায় সবাই কাবু। তাই তাদের একান্ত কামনা এই গ্রীষ্মে এক ঝলক্ রোদ। সে দিক দিয়ে আমাদের দরকার একটু শীতল বাতাস। ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে। সূর্যদেবের দেখা নেই খালি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তার উপর কনকনে ঠাণ্ডা। আমি যত বছর ইউরোপে আছি তার মধ্যে এই আগস্ট মাসে কখনো এত ঠাণ্ডা দেখিনি। আবহাওয়া অফিসের ঘোষণায় জানা গেল যে, গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে এত ঠাণ্ডা কখনো হয়নি। গ্রীষ্মকালের ছুটি মাঠে মারা গেল। সারা বছর এখানকার লোকেরা সঞ্চয় করে রাখে এই গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করবার জন্যে। তাদের আশা হতাশ করেছে সূর্যদেব। ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিকরা। দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্টরা এই ঠাণ্ডায় কষ্ট করে ভ্রমণ করতে চায় না। তাই সমুদ্রোপকূলের হোটেল-রেস্তোরাঁয় হাহাকার রব উঠেছে। তবে একটি মাত্র ব্যবসা এ বছরে ফেঁপে উঠেছে, সে হল ছাতা ও বর্ষাতির ব্যবসা। সবার হাতে হয় ছাতা নয় বর্ষাতি ঝুলছে। এই ভরা গ্রীষ্মে আমি কখনো গরম জামা কাপড় ও ওভারকোট পরতে দেখিনি। এই প্রথম দেখছি ভরা গ্রীষ্মকালে আগস্ট মাসে শীতকালের পোশাকে প্যারিসিয়ানরা মুখটা বাংলা পাঁচের মতন করে অফিস-আদালত করছে। যারই সঙ্গে দেখা হয় তারই মুখে একমাত্র আলোচনা।

কী বিচ্ছিরি আবহাওয়া। এদের রাগ রকেট-বিজ্ঞানী ও এ্যাটম বোমা নির্মাতাদের ওপর। তাদের চক্রান্তেই নাকি আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। তাই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যাঁরা ছুটিতে গেছেন তাঁরা বৃষ্টির দাপটে ঘরে বসে থাকতেও বাধ্য। তাই তাঁদের মনোরঞ্জনে টেলিভিশন কোম্পানী রোজ দুপুরে সিনেমা-থিয়েটার দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। রোজই শুনি টেলিভিশনে আজ আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ বলে আপনা-

বর্ষার দুটি কার্টুন
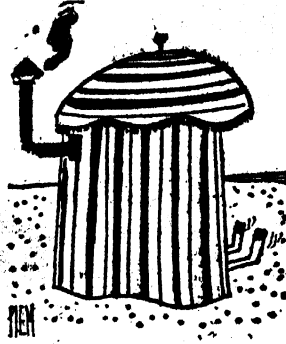
দের মনোরঞ্জনার্থে সিনেমা দেখান হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশী মার খেয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন পোশাক ব্যবসায়ীরা। গ্রীষ্ম-পোশাকের বাজার গরম হয় জুন-জুলাই মাসে। গ্রীষ্মের ছুটির সাথেই তার বিক্রি। পোশাক বেশী বিক্রি না হলে আগস্ট মাসের শেষে কিম্বা সেপ্টেম্বরের গোড়ায় সুতীর পোশাকের 'সেল্' শুরু হয়। এবার দেখলাম তার ব্যতিক্রম। গ্রীষ্মকালীন পোশাকের 'সেল্' শুরু হয় জুলাই মাসে। অর্থাৎ বাজার কতখানি খারাপ এর থেকেই প্রমাণিত হবে।

উত্তর ফ্রান্সের আবহাওয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের চেয়ে আর্দ্র ও ঠাণ্ডা। তবে গ্রীষ্মকালে সেখানে যখন রোদ ওঠে বা গরম পড়ে তখন সমুদ্রোপকূল হয়ে ওঠে উপভোগ্য। দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে সবসময়েই ঝলকান রোদ পাওয়া যায়। এবার সেখানেও কালো আকাশের ভিড়। আর উত্তর ফ্রান্সের কথা না বলাই ভাল। যেন খাস লণ্ডন শহর। স্যাঁতসেঁতে-ঠান্ডা আর বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বিদেশ থেকে যেসব ট্যুরিস্ট উত্তর ও পশ্চিম ফ্রান্সে বেড়াতে যাবার জন্যে ট্রেন ও বিমানের টিকিট অগ্রিম কিনেছিল তারা যাত্রা বাতিল করেছে। শুধু ফ্রান্সেই এই দুরবস্থা নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপময় চলেছে আবহাওয়া দুর্যোগ। উত্তর ইতালির ইতিহাসে জুলাই ও আগস্ট মাসে অমন বৃষ্টিপাত হয়নি। একমাত্র ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে ছাতা ও বর্ষাতিওয়ালাদের। ভেনিস শহরে এই সময়ে অন্য বছরে ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে। সেণ্টমার্ক স্কোয়ারে হাজার হাজার পায়রার ঝাঁক বসে থাকে। এবার তার ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। পায়রার ঝাঁক বৃষ্টি ও উত্তুরে হাওয়ায় কাবু হয়ে বাড়ীর কার্নিসে আশ্রয় নিয়েছে। আর ট্যুরিস্টরা ভেনিসের মায়া ত্যাগ করেছে।

পশ্চিম ইউরোপে ইতালি ও স্পেনের সুনাম তার রোদের জন্য। ইতালির অবস্থা যখন কাহিল তখন স্পেনেরও খুব সুবিধার নয়। বার্সেলোনার উত্তাপ কমে গেছে। সেখানেও ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে নিয়মিত। [illegible] এই গ্রীষ্মকালে হয় না। ব্রাসেলস্, বার্[illegible] লণ্ডন ও বার্লিনের কথা না বলাই ভাল[illegible] ব্রাসেলস শহরে প্রতিদিন বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা[illegible] প্রকোপ বেড়েছে বলে, একঘেয়ে বৃষ্টির হা[illegible] থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বহু ট্যুরি[illegible] আজকাল সিনেমা হলে আশ্রয় নিতে বা[illegible] হয়েছে। সিনেমাঘর গরম করায় সেখা[illegible] অনেকে ঢুকছে। সুইৎজারল্যাণ্ডের অনে[illegible] পাহাড়ী শহরে হচ্ছে নিয়মিত তুষারপাত[illegible] এর সঙ্গে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়ে নর[illegible] গুলজার করে তুলেছে। গ্রীষ্মকালে চলে[illegible] শীতকালের ঠান্ডা। আর দক্ষিণ ইংলণ্ডে[illegible] প্রবল বারিপাতে কয়েকটা শহরে বন্যার ম[illegible] অবস্থা হয়েছে। জার্মানীতেও [illegible] জুলাইয়ের শেষে হামবুর্গ ও ডুশেলডর্[illegible] দেখেছি প্রতিদিন বৃষ্টিপাত। তার ওপ[illegible] কনকনে ঠাণ্ডা। জার্মানরা এখন আবহাও[illegible] অফিসের দিকে মুখ করে বসে আছে[illegible] কবে সূর্যদেব একটু দয়াপরবশ হয়ে [illegible] ঢালবেন। নইলে এ বছরের ছুটি পা[illegible] মারা যাবে।

ফরাসী সরকারের ট্যুরিস্ট দপ্তর এ[illegible] বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, জুলাই মা[illegible] যেমন ফরাসী হোটেল-রেস্তোরাঁ ও দোকা[illegible] দাররা হাহাকার রব তুলেছে তার তুলনা হ[illegible] না। আগস্টও ভাল যাবে না। গত বছরে[illegible] তুলনায় এ বছরে পঁচিশ ভাগ কম বিদে[illegible] ট্যুরিস্ট এসেছে। তার ওপর আমেরিক[illegible] ট্যুরিস্টরা জিনিসপত্র কিনছে না। বরং তা[illegible] রাতের প্যারিসে নাইট ক্লাব কাবেরেতে ভি[illegible] জমাচ্ছে। ফ্রান্সে বিদেশী ট্যুরিস্ট সংখ্[illegible] কমে যাচ্ছে বলে আজকাল ফরাসী সরকা[illegible] ব্যবসায়ী সংঘ ও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠ[illegible] অনেক নতুন ফাঁদ খুলেছে। ফরাসী [illegible] অতিথিপরায়ণ নয় বলে ফরাসীদের কুখ্যাতি[illegible] আছে। তাই, সে কলঙ্ক ঘোচাবার জন্যে[illegible] তারা বিদেশী ট্যুরিস্টদের খুব আদর যত্ন [illegible] খোসামোদ শুরু করে দিয়েছে। ফরাসী [illegible] পরিবার যাতে বিদেশী ট্যুরিস্টদের বাড়ীতে[illegible] [illegible] এক কাপ চা খাওয়া[illegible]

জন্যে অনুরোধ জানান হয়েছে এবং এই খবর ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। অনেক য় দেয়ালচিত্রে দেখা যাচ্ছে "হেসে বলুন" ইত্যাদি। বিদেশীদের প্রতি রা ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে না বরং প ব্যবহার করে থাকে। একথা পুরো । তাই আজ ফ্রান্সে বিদেশী টুরিস্ট-সংখ্যা কমে গেছে। তার ওপর আবহাওয়া প হলে অবস্থা আরও খারাপ হতে ।

পশ্চিম জার্মানীর কাসেল্ শহরের এক স্ট কোম্পানী গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবার ব্যবস্থা করেছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে ই চায় সমুদ্রের তীরে কিম্বা পাহাড়ে তে। গ্রামাঞ্চলে অনেক সুন্দর সুন্দর গা পড়ে রয়েছে যা টুরিস্টদের অজানা। ওপর জার্মান গ্রামাঞ্চলে চাষী ও খামার সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ ও সেখানে আরামে ট উপভোগ করার জন্যে উপরোক্ত পানী আড়াইশ খামার বাড়ীর সংগে যোগ স্থাপন করে অল্প টাকায় ছুটি বার ব্যবস্থা করেছে। তরুণ-তরুণী ও ছুটির সময়ে খামার বাড়ীতে কাজে করে টাকাকে টাকা রোজগার ও কাটান দুয়ের ব্যবস্থা করেছে। আর পরিবার তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ছুটি কাটাতে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব খামার তে প্রশস্ত ঘর, স্নানাগার, গরম জলের থাকায় হোটেলের আরাম পাওয়া ।

তার ওপর গ্রামাঞ্চলের টাটকা মাছ-মাংস তরিতরকারি পরিবেশিত রেস্তোরাঁয় বিলাসও এর বড় আকর্ষণ।

পিকাসো সংবাদ

জীবিত অবস্থায় আর্টিস্টরা সম্মান না। পিকাশো তাদের ব্যতিক্রম। শুধু শায় সম্মান নয় ধনলাভ যত করেছেন শো তত নয় অন্যকোনো আর্টিস্ট। তাই শো সংবাদ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২ সালে সোভিয়েট সরকার পিকাশোকে লেনিন শান্তি পুরস্কার। লেনিন রের আর্থিক মূল্য প্রায় দশ লাখ লেনিন পুরস্কার পাওয়ার পর শো বলেছিলেন যে, তিনি কোনো প্রদর্শন পছন্দ করেন না। ১৯৬৩ প্রধানমন্ত্রী কুশ্চভের জামাতা সাংবাদিক বেই দক্ষিণ ফ্রান্সে গিয়েছিলেন র সংগে দেখা করতে। পিকাশো সংগে দেখা তো করেইনি এবং রও গ্রহণ করেনি। এ বছর ফেব্রুয়ারী গোড়ায় প্যারিসস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত রিন গিয়েছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে র সংগে দেখা করতে এবং তাঁকে
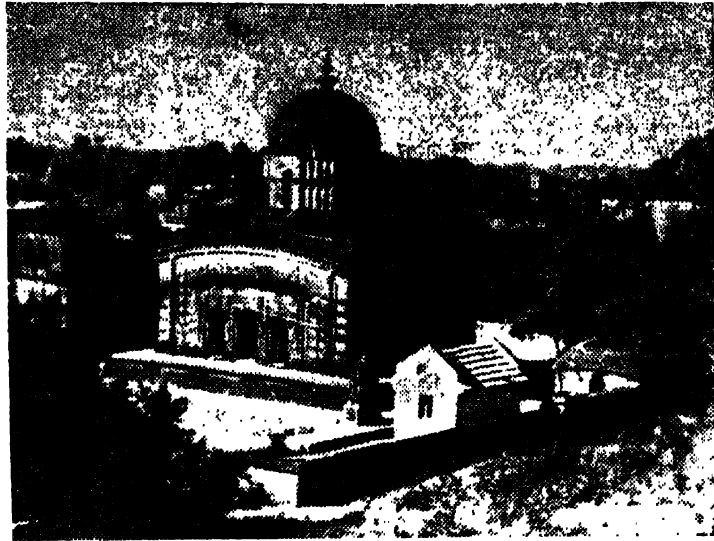
রাধেশ্যাম মন্দির : বিষ্ণুপুর ফটো : নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

লেনিন পুরস্কার হাতে দেবার জন্যে। পিকাশো রাষ্ট্রদূতের সংগে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন। ফলে রুশ রাষ্ট্রদূত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তারপর এপ্রিল মাসের শেষে পিকাশোর পুরোনো বন্ধু বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গ সোজা চলে যান দক্ষিণ ফ্রান্সে পিকাশো যে গ্রামে বাস করেন। তাঁর পুরোনো সাহিত্যিক বন্ধুর জন্যে দ্বার খোলা। সাহিত্যিক এরেনবুর্গের হাতে সবশেষে পিকাশো লেনিন পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ইউরোপীয় আর্টিস্ট ও আর্ট গ্যালারির ব্যবসাকেন্দ্র প্যারিস। খাস প্যারিসেই চলেছে আর্ট বাজারের দুর্দিন। আজকাল চিত্রপট কম বিক্রি হচ্ছে। তাই এক সাংবাদিক ও এক শিল্পী মিলে নতুন দুটো আর্ট গ্যালারি খুলেছে। সে দোকানের কাজ হবে ধারে চিত্রপট বিক্রি করা। অথবা মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা শোধ করা হবে। কোনো ছবি ছ'শ টাকার বেশী হবে না। মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিলে এক বছরে টাকা শোধ হয়ে যাবে। যে কোনো পরিবার পিকাশোর আঁকা আসল একটি ছবি রাখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে। তাই পিকাশোর আঁকা কয়েকটি লিথোগ্রাফ বেচারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর্ট গ্যালারিতে চিত্রকরদের আঁকা চিত্রপট বিক্রি হয় বলে জানতাম। এখন থেকে বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেও নামকরা শিল্পীদের ছবি বিক্রী হবে। বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সে চাল-ডাল, জামা-কাপড়ের সংগে গৃহিণীরা যাতে সস্তায় চিত্রপট কিনতে পারে তার জন্যে এই সব চিত্রপটের দাম একশত থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে রাখা হয়েছে। তবে নামকরা শিল্পীদের ছবি অনেক দাম বলে তাঁদের আঁকা ছোটখাট লিথো, এনগ্রেভিং ইত্যাদি কম দামে বেচার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকে বলছে যে, উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতিকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রিশিলা চ্যাপমানের 'হিন্দু ফিমেল এডুকেশন' (১৮৩৯ খৃঃ) গ্রন্থে মা... পাঠশালার একটি চিত্র

ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল বা মাধ্যমিক পাঠশালা

ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে এখন কেবলমাত্র তিনটি ক্লাস বসে। আগে এই অবস্থা ছিল না। প্রায় দেড়শ বৎসর অতিক্রম করেছে স্কুলটি। বহুজনের পরিশ্রম ও বদান্যতায় আজও টিকে আছে এটি। কলকাতার অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভের মত হারিয়ে যায়নি ইতিহাসের পাতায়।

আজাদ হিন্দ বাগের দক্ষিণ পূর্ব কোণের এই সুপ্রাচীন গৃহটি দেখে কেউই ভাবতে পারবে না এই বাড়ীটার একটা ইতিহাস আছে। ফ্রি চার্চের সম্পত্তি এই বাড়িটি একদিন কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দানে গড়ে উঠেছিল। মিসেস উইলসনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙলা দেশে মেয়েদের শিক্ষার নতুন দ্বার উন্মোচন ঘটেছিল। যদিও এখন এখানে কেবলমাত্র তিনটি ক্লাস বসে, একদিন এখানে শিশু থেকে বয়স্ক নারী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারত।

মধ্য কলকাতায় 'সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল' 'আধুনিক পাঠশালা', 'সেন্ট্রাল স্কুল'টির ইতিহাস অনেক দিনের। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতির জন্যই স্কুলটির নামের সঙ্গে সেন্ট্রাল শব্দটি যুক্ত হয়েছিল।

সেযুগে ব্রিটেনে 'ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি ছিল। ১৮২১ খৃঃ এই সমিতির প্রতিনিধি মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

কলকাতায় তখন নারী শিক্ষা প্রবর্তন হলেও, মেয়েদের বাইরে স্কুলে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না সেকালের কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি যদিও সাহায্য দিতে চেয়েছিল মিস কুককে, কিন্তু সেকালের কলকাতার হিন্দু নেতা রাধাকান্ত দেব মিস কুককে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। কুক ক্যালকাটা চার্চ মিশনারী সোসাইটি পরিচালিত মেয়েদের স্কুলগুলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেন।

ক্রমশঃ শিক্ষার বিস্তার ঘটছিল। মেয়েদের স্কুলের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মিস কুকের পক্ষে সমস্ত স্কুলে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ক্যালকাটা চার্চ মিশনারী সোসাইটির আকাঙ্ক্ষন করী ১৮২৩ খৃঃ ৬ মার্চ জনসাধারণের মধ্যে একটি আবেদন প্রচার করেন। উদ্দেশ্য মধ্য কলকাতায় একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা। জনসাধারণের কাছে অর্থও চাওয়া হয়। ১৮২৪ খৃঃ ২৫ মার্চ ইউরোপীয় মহিলাদের লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির দায়িত্ব নেয়। এই সোসাইটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মিস কুক। অবশ্য পাদ্রী আইজাক উইলসনকে বিবাহ করে তিনি তখন হয়েছেন মিসেস মেরী অ্যান উইলসন।

মধ্য কলকাতায় মেয়েদের স্কুল ... তার জোর চেষ্টা সুরু হয়ে যায়। ধনী হিন্দুরা মেয়েদের শিক্ষা... পক্ষপাতী ছিলেন, এদের মধ্যে ... দেব, বৈদ্যনাথ রায়ের নাম ... তারা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরী... স্থিত থাকতেন। রাজা বৈদ্যনাথ ... খৃঃ সেন্ট্রাল স্কুলের ... কুড়ি হাজার টাকা দান করেন।

সেন্ট্রাল স্কুলের অর্থ সংগ্রহে ... ১৮২৫ খৃঃ লেডিজ অ্যাসোসিয়ে... আর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ... এক হাজার টাকা সংগ্রহ করে... গৃহ নির্মাণের কাজ সুরু হয়... ১৮মে হেদুয়ার পূর্ব দক্ষিণ... ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন... হার্স্ট। সেখানে কলকাতার ... বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন... আমহার্স্টকে ধন্যবাদ জানান ... রায়। শহরের বহু ... শিক্ষ ...

> "এই
> মাধ্যমিক পাঠশালা
> এতদ্দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার্থে
> সম্ভ্রান্ত খ্রীস্টান স্ত্রী-সমূহের এক অমাত্র কর্তৃক
> স্থাপিত হইল
> তন্নিমিত্তে
> শ্রীমান্ রাজা বৈদ্যনাথ রায়বাহাদুর
> অতিস্বচ্ছন্দরূপে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান দ্বারা
> বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং ইহার প্রয়োজন
> সকলের তদতিরিক্ত সাধন ও অর্থের আহরণ
> শ্রীল শ্রীযুক্ত চার্লস নোলস রবিনসন সাহেব কর্তৃক হ...
> যিনি এই গৃহের পাণ্ডুলিপি, পরে তদনুসারে গৃহনির্মাণ
> ১৮২৮"

দিয়েছিল। বাড়ীটির নক্সা করেন মিঃ স নৌলস্ রবিনসন।

১৮২৮ খৃঃ ১ এপ্রিল নতুন বাড়ীতে খোলা হয়। যত দিন বাড়ীটি তৈরি হয় ততদিন নতুনবাড়ীর কাছেই আর একটি তে মিস কুক উ'চু ক্লাসের মেয়েদের তেন। অধিকাংশ ছাত্রীই ছিল বেশ কা। এখানে মিস কুক একটি শিশু লয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মিশনারীরা স্কুলটিকে একটি ধর্ম-র স্থানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। পৃষ্ঠপোষক হিন্দু দলপতিদের সঙ্গে নতর ঘটে। তারা এর সাহায্য থেকে দূরে যান।

মেল স্কুলের কাছেই ছিল রামমোহন র 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল'। পরে এর হয় 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি' (১৮৩৪)। স্কুলের ছাত্র ছিলেন ভূদেব মুখো-ায়। মিস কুকের তিনি ছিলেন ইং-জর ছাত্র।

মিশনারী সোসাইটি আগরপাড়ায় টি অনাথ আশ্রম খোলে ১৮৩৩ খৃঃ অক্টোবর। এর দায়িত্ব নিয়ে চলে যান স উইলসন। তখন ফিমেল স্কুলের নেন মিস টমসন ও মিসেস হেবোয়-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মেয়েরা এখানে পড়ার সুযোগ পেত। বোর্ডিং স্কুলে হয় এক সময়।

১৮৫২ খৃঃ এখানে ছিল দুটি বিভাগ। টি বিভাগে ছিল শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষা-র ব্যবস্থা, অন্য বিভাগটি সাধারণ।

'নর্ম্যাল স্কুল ফর দি ট্রেনিং অফ টিভ ফিমেল টিচার্স' ১৮৫১ খৃঃ কল-য় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ এটি র স্কুলের সঙ্গে মিলে যায়। পরে র নাম হয় 'ফ্রি চার্চ নর্ম্যাল স্কুল।'

নিউ মার্কেট

ভারতবর্ষের সবথেকে সুন্দর বিপণিকেন্দ্র মার্কেট। কলকাতায় যারা আসেন র কাছে এর আকর্ষণ কম নয়। প্রথমে মার্কেটটির নাম ছিল হগ মার্কেট। স্টুয়ার্ট হগের নামানুসারে। ১৯০৩ এর নাম হয় নিউমার্কেট। পৃথিবীর থেকে বড় ডিপার্টমেন্ট মার্কেটগুলির হল একটি।

১৮৭১ নিউমার্কেট নির্মাণ আরম্ভ এবং ১৮৭৪ খৃঃ নির্মাণ কাজ শেষ ছিল। ঐ বৎসরের ১ জানুয়ারী সর্ব-ণের জন্য মুক্ত হয়। ১৯০৯ খৃঃ টির আকার বৃদ্ধি হয়েছিল।

নিউ মার্কেট ফটো : অমৃত

প্রায় দু হাজার স্টল আছে এখানে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই জিনিস এখানে পাওয়া যায়। স্টলগুলির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা। দুপাশের স্টলগুলির জিনিষপত্র আকর্ষণীয়ভাবে সাজান। ফল, শুকনো ফল, তরকারি, মুরগী, আলু, পেঁয়াজ, মসলা, প্রস্তুত করা খাবার, মাংস, মিষ্টি দ্রব্য, খেলা, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, অলংকার, লৌহ দ্রব্য, মাটির দ্রব্য, অভিনব দ্রব্যাদি, দুর্লভ দ্রব্য, কাপড় ও শয্যাদ্রব্য, তামাক, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খাবার দোকান। সমস্ত জিনিসগুলিই শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন বিভাগে সাজান।

স্টলগুলির ১,৫০০টি হল স্থায়ী এবং ৫০০ অস্থায়ী। তাছাড়া ফেরিওয়ালা আছে।

অসংখ্য লোক প্রতিদিন এখানে কেনা-কাটা করে তা সে তুলনায় মার্কেটটি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন।

ইডেন গার্ডেন

ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কোণে ইডেন গার্ডেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের দুইবোন মিস এমলি ইডেন এবং মিস ফ্যানি ইডেন ১৮৪০ খৃঃ বাগানটি প্রতিষ্ঠিত করেন। দুই ভগিনীর শিল্পমন ও প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় ইডেন গার্ডেন। সবুজ গাছপালায় ভরা স্থানটি ছিল ভ্রমণের পক্ষে একটি মনোরম স্থান। অপরূপ ফুলের শোভা শহরবাসীকে আকৃষ্ট করত। আবার মাঝে মাঝে আলো দিয়ে সাজান হোত। ১৮৭৫ খৃঃ হাওড়া ব্রীজ থেকে ইডেন গার্ডেন পর্যন্ত রাস্তাটির দুপাশে ছিল নোংরা বস্তী। আজকের দিনে সেদৃশ্য কল্পনা করাও অসম্ভব।

ইডেন গার্ডেনের প্রবেশ পথে ছিল স্যর উইলিঅম পীলের মূর্তি। ভাস্কর উইকিশের নির্মিত লর্ড অকল্যান্ডের যে মূর্তিটি ছিল এখানে, সেটি হাইকোর্টের উত্তরদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পশ্চিম দিকে যে ব্যান্ড স্ট্যান্ডটি ছিল, সেখানে প্রতিদিন বিকালে ফোর্ট উইলিঅমের ব্যান্ডপার্টির আসর বসত। ইডেন গার্ডেনের একটি আকর্ষণ ছিল একটি প্যাগোডা।

লর্ড ডালহৌসিকে মুগ্ধ করেছিল বার্মার শিল্পকলা। তিনি একটি প্যাগোডা তুলে নিয়ে আসেন কলকাতায়। প্যাগোডাটি রাখা হয় ইডেন গার্ডেনে। এর মধ্যে ছিল সোনা খোচিত বুদ্ধ মূর্তি। ইডেন গার্ডে-

নকুলেশ্বর মন্দির ফটো : অমৃত
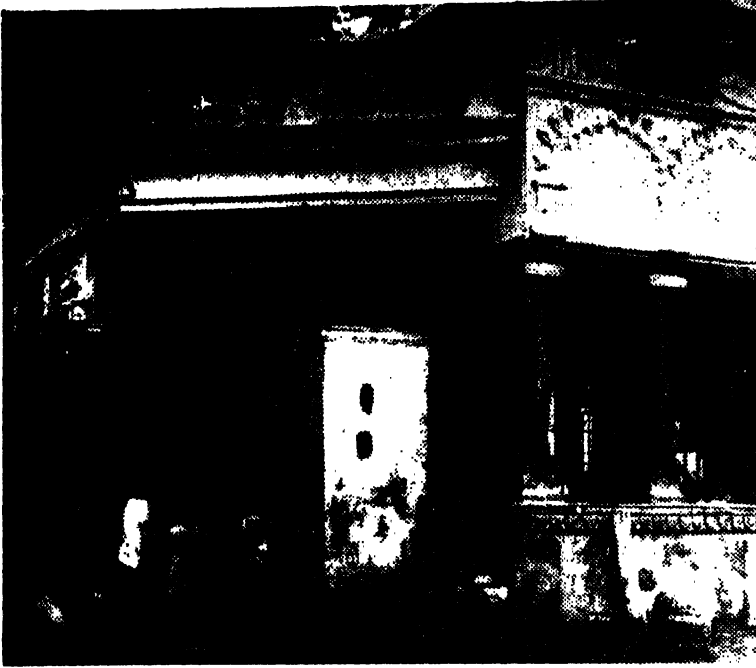
লের সবথেকে বড় আকর্ষণ। প্যাগোডার গায়ে লেখা ছিল :

"The above specimen of Burmese ornamental architecture was removed from the city of Prome in the months of August and September, 1854, and reconstructed on this site in the months of October, November and December, 1854."

১৮৫২ খৃঃ এটি নির্মাণের ব্যয় পড়েছিল প্রায় ১৫০০ টাকা। ১০৯ বৎসর পরে এই বর্মী প্যাগোডাটি ৪৫৫১ টাকায় বিক্রি হয়ে যায় ১৯৬৫ খৃঃ ১১ সেপ্টেম্বর। প্যাগোডাটি পুরোন হয়ে পড়ায় সংস্কারের খরচ বেড়ে গিয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত। পুরোন প্যাগোডার জায়গায় ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকায় নতুন প্যাগোডা নির্মাণ করবেন রাজ্য সরকার।

ইডেন গার্ডেনে ছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। এখন তার নাম পরিবর্তিত হয়েছে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব—এন সি সি। এখানে আছে মনোরম রঞ্জি স্টেডিয়াম। শীতের মরশুমে বসে ক্রিকেট খেলার আসর। দেশী ও বিদেশী বহু বিখ্যাত খেলোয়াড় এখানে খেলে গেছেন।

তাছাড়া এখানে তৈরি হয়েছে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের নতুন ভবনটি।

নকুলেশ্বর মন্দির

শিব ও শক্তির পূজা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভক্তির পথ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং প্রাচীন রাজাদের মুদ্রায় শিবসাধনার উল্লেখ আছে। ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিবমন্দির।

শিবের উপাসনায় লিঙ্গপূজোই প্রধান। কালীঘাটে একটি মঠ হোল ত্রিকোণেশ্বর। বহু উদাসীন সন্ন্যাসী এখানে সমবেত হন নির্গুণ উপাসনার জন্য। ঘাটের কাছে শৈব সম্প্রদায়ের দাক্ষিণাত্যের শেঠীদের একটি মঠ প্রতিষ্ঠা হয় গত শতাব্দীর শেষদিকে। নির্গুণ উপাসনা লক্ষ্য হলেও অধিকাংশ শিবমন্দিরে লিঙ্গপূজা হয়।

শিবের প্রতিমূর্তি পূজা দেখা যায় না। সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যে-যে স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, শিব সেখানে লিঙ্গরূপে অবস্থান করছেন। শিব সংহারকর্তা মাত্র নন, তিনি সৃজনকর্তাও। শিবের লিঙ্গমূর্তি সৃজনশক্তিরই পরিচায়ক।

লিঙ্গ-পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে :

জগদ্যোনি মহাভূতং স্থূলং সূক্ষ্মং
অজং বিভুং।
বিগ্রহং জগতাং লিঙ্গং অলিঙ্গাদ
ভবৎ স্বয়ং।।

সুতরাং শিব দুই প্রকার—
শিব ও লিঙ্গ-শিব। লিঙ্গশিব অকৃ
কৃত্রিম লিঙ্গ। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ ও বা
হোল অকৃত্রিম লিঙ্গ। বিভিন্ন
মানুষের তৈরি লিঙ্গ হোল কৃত্রিম।
যে-সমস্ত লিঙ্গের উদ্ভব জানা যায়
স্বয়ম্ভূ বা অনাদি লিঙ্গ। নর্মদা নদী
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ খণ্ড বাণলিঙ্গ
পরিচিত। বাণ-রাজার পূজিত
বলেই এই নাম।

কালীর মন্দিরের উত্তর-পূর্ব
নকুলেশ্বর ভৈরবের স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অ
সতীঅঙ্গ পতনেই এর উদ্ভব। কা
প্রকাশের সময়েই এই লিঙ্গের প্রকা

কালী-মন্দির নির্মাণের বহু
নকুলেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়।
পাতায় ছাওয়া ঘরে ছিলেন নকু
১৮৫৪ খৃঃ পাঞ্জাবের ব্যবসায়ী
নকুলেশ্বর মন্দির নির্মাণ করান। এ
তিনি নিজের দেশ থেকে প্রস্তর
ছিলেন। সম্পূর্ণ প্রস্তর-নির্মি
মঠ-মন্দিরটি মূল্যবান।

তারা সিংহের এই মন্দির
সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে।
লাভ হওয়ায় তারা সিং ঐ অ
ণসীতে সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ
ব্যয় করবেন স্থির করেন। প্রস্তর
অন্যান্য জিনিস কিনে নৌকা করে
যাত্রা করেন। বারাণসীতে কোনক্রমেই
অবতরণ করতে পারেননি।
ভেসে কালীঘাটে এসে উপস্থি
এখানে নকুলেশ্বরের দুরবস্থা দে
সিং প্রস্তর দ্বারা মন্দির তৈরি কর

নকুলেশ্বর উৎসব হোল শিবরা
নীলষষ্ঠী। বৈশাখ সংক্রান্তির
বিস্তর লোক সমাগম হয়। চড়ক
সমারোহ বহুদিন পূর্বে ছিল
কালীঘাটের উত্তর-পূর্বে চড়কডাঙা
পর্বে বিশাল মেলা বসত। নকু
চড়কপর্ব ঐখানে সমাধা হোত ব
নাম।

'শিবশক্তিপ্রদায়িণী' সভা প্রতিষ্ঠা
ক্ষেত্রমোহন হালদার। সাবিত্রী চ
দিনে নকুলেশ্বরের মন্দির-এর সম
সেদিন কাঙালীভোজন হয়।

নকুলেশ্বর ছাড়া কালীঘাটে
অনেকগুলি প্রাচীন শিবমন্দির

কয়েকটি হালদারের প্রতিষ্ঠিত
কয়েকটি স্থানীয় ধনবান ব্যক্তির
করেছিলেন। কালী-মন্দিরের
দুটো শিব-মন্দির আছে। গঙ্গা
মন্দিরের সম্মুখে যে শিব-মন্দির
যায়, তা তৈরি করান হুজুরিমল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।
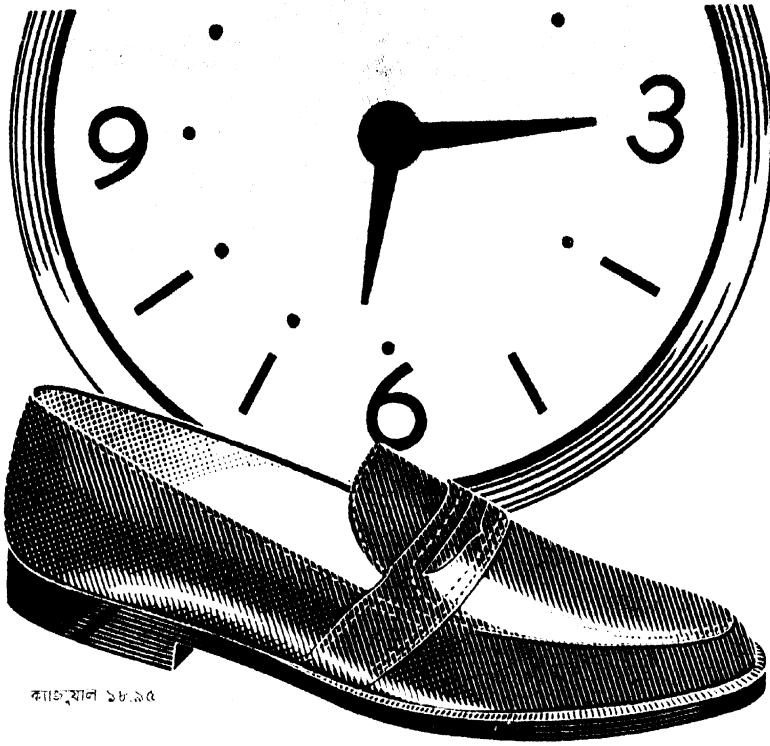
ক্যাজুয়াল ১৮.৯৫

ঘড়ি-ঘড়ি আরাম

শুধু আরামই নয়, তার সঙ্গে রুচিসম্মত নকশা যে কেতাদুরস্ত পুরুষের কাম্য, তাঁর কাছে বাটার এই জুতো এক অভিনব আবিষ্কার। কারণ, দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে এই জুতোয় : নির্মাণের নতুনতম পদ্ধতি, আর তার সঙ্গে আধুনিক নিয়মনিষ্ঠ নকশা। তার উপর এমন সুঠাম চামড়ায় এর গঠন যে পুরুষের পায়ে টিকে থাকবার ক্ষমতা এর অসীম, অথচ এমনই নমনীয় যে চলতেফিরতে পরম আরাম অনেক ঘড়ি পেরিয়ে। আজই কিনে দেখুন একজোড়া।

লঙলাইফ
মাডগার্ড ২০.৯৫

Bata

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 9th September, 1966 শুক্রবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

অনুবাদ প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

অনুবাদ নিয়ে গত কয়েক সংখ্যা ধরে যে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলছে তা যেন ঈষৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 'অভয়ঙ্করে'র আলোচনায় এমন কিছু ছিল বলে তো মনে পড়ে না যাতে শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় বিরক্ত হতে পারেন বা শ্রীউষারাণী চৌধুরী (দেব)-এর 'মনটা আরও দমে' যেতে পারে। 'অভয়ঙ্কর' খুবই সুবিবেচক লেখক এবং তাঁর পড়া-শোনার সীমান্ত দূর-ব্যাপ্ত। 'অমৃতে' প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি অনূদিত বাংলাগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করতে বসেননি। কাজেই তাঁর আলোচনায় কার কতো বই কোন কোন ভাষায় অনূদিত হয়েছে সে প্রসঙ্গ চুলচেরাভাবে বিচার করা হয়নি—শুধু সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদে দৈন্য রয়ে গেছে সে-বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় খুশী না হয়ে একটি বড় আলোচনা ফেঁদেছেন; এবং তাতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক নতুন তথ্য স্থান পেয়েছে, এতে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু কারো বই বেশি অনূদিত হলেই যে তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষও প্রমাণিত হয়ে যায় এমন কথা নিশ্চয়ই তিনি বলতে চান না। এই বাংলা ভাষাতেই সমারসেট মম যতো অনুকৃত এবং অনূদিত হয়েছেন, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ বা গ্রাহাম গ্রীনের কি সে সৌভাগ্য হয়েছে? অন্যদিকে, শ্রীউষারাণী চৌধুরী (দেব) শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। জানি না, কী প্রসঙ্গে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'স্বাধীন ভারতের ঊনিশ বছরে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি তেমন কিছুই হয়নি।' ...এই উক্তির পর শ্রীবিমল মিত্রের নাম শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই করেছেন এবং তাঁর বিপক্ষে কিছুই বলার নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ প্রবীণ এবং পরবর্তী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ ঘোষ, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসমরেশ বসু, শ্রীনবেন্দু ঘোষ, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ সাহিত্যিক 'উল্লেখযোগ্য' 'কিছুই' লেখেননি এমন অদ্ভুত কথা মানতে আমি অন্তত একেবারেই অক্ষম।

নমস্কারান্তে,—

শৈবালকান্তি দত্ত,
কলকাতা-৩২।

অথ বায়স-কথা

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতে'র ১৬ সংখ্যায় (১৯শে আগস্ট) প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর 'অথ বায়স-কথা' একটি মনোজ্ঞ রচনা। অনেক সময়—মানুষকে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেপিয়েও কাক যে আনন্দ উপভোগ করে তার এক প্রত্যক্ষ বিবরণ উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

গত ১ জুন বিকেলবেলা দিল্লীর দক্ষিণ প্রান্তে আই-এন-এ কলোনীর ভিতর দিয়ে চলার পথে হঠাৎ নজরে এল সবেমাত্র হাঁটতে শেখা একটি শিশু একটি কাককে অনুসরণ করে চলেছে হাতের নাগালে পাবার জন্য। কাকও রস-রসিকতাবোধে হেঁটে-হেঁটে শিশুর নাগালের বাইরে বারে বারে চলে যাচ্ছে। প্রায় মিনিট দশেক বিফল চেষ্টার পর শিশু এই খেলায় হার স্বীকার করে ঘরের দিকে যেতে শুরু করল। এবার কাক তাকে অনুসরণ করতে থাকে। শিশু পেছনে ফিরে মাঝে মাঝে কাকের দূরত্ব নিরীক্ষণ করছে আর যথাসাধ্য দ্রুত চলছে। অবশেষে ঘরের সিঁড়ির নিকট পৌঁছানর পর কাকের ভয়ে—তার পক্ষে অনতিক্রম্য সিঁড়ি বেয়ে ওঠার অযথা চেষ্টার দৃশ্যে কাক আনন্দে ডানা ঝাঁপটা দিয়ে তিনবার কা-কা রব করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শিশু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। অদূরে কাক-নিদ্রায় নিমগ্ন শিশুর মাতা ধড়ফড় করে উঠে পড়ে এবং শিশুর সাহায্যে অকুস্থলে পৌঁছান। কাক তখন নিকটবর্তী এক বৃক্ষ-শাখায় গিয়ে বসে। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে আমিও সেদিন অবাক হয়েছিলাম।

বিনীত—
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়,
নেতাজীনগর, নিউ দিল্লী।

আকাশবাণীর দুঃখবোধ

সবিনয় নিবেদন,

"...একটি ঘোষণা...এত মিনিট থেকে এত মিনিট এই সাত মিনিটকাল যান্ত্রিক গোলযোগ/বৈদ্যুতিক গোলযোগ/অনিবার্য কারণবশতঃ আমাদের অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখিত..."। গত কয়েক মাস যাবৎ রেডিও খুললেই কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে এই রকম প্রত্যাশিত ঘোষণা দিনে একাধিকবার শোনা যাচ্ছে। কোন জনপ্রিয় শিল্পীর গান বা অন্য যে কোন অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মাঝপথে হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে গেলে কি যে বিরক্তি লাগে—তা ঠিক লিখে বোঝানো যায় না।

নাটক প্রচারে সময় কিছু বেশী লাগে, তাই নাটক প্রচারের সময় রেডিও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া এক প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সেই সময় বিরক্তি ও অস্বস্তিতে মন ভরে ওঠা স্বাভাবিক। বেতার কর্মকর্তারা এই ব্যাপারে কতটা সচেতন আছেন জানি না, তবে শ্রোতাদের অভি-যোগের প্রতি তাঁরা যে সজাগ নন, একথা সর্বজনবিদিত। কারণ, বেতার জগতে প্রকাশিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মিল থাকছে না, এই রকম অভিযোগ অনেকবার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন সুফল প্রসব করেনি। অর্থাৎ ওয়েজে যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তা নিয়মিত ঘোষণা করা হয় না। কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি দিকে লক্ষ্য রাখলে শ্রোতাদের ঐ অনুষ্ঠান শোনার জন্য হয়ত দুর্ভোগ স করতে হবে না।

বিনীত— অধীপকুমার র
মিনুরাণী বস
হাওড়

সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' ১৯ আগস্ট ১৯৬৬ তারি প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধটি সম্প লেখকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একটু সংবাদ দিতেছি।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে "বাঙ্গা মেয়ে" নামক রচনায় বঙ্গমহিলাদের বাঙ্গ কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। শীঘ্রই মোক্ষদায়িনী দেবী হেমচন্দ্র পদ্যাকারে 'বাঙ্গালীর বাবু' লিখে প্রদান করেন। মোক্ষদায়িনী দেবীর প্রসূন' (কাব্য)-এ তা ছাপা হয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনায় বঙ্গমহিলা সম্পর্কে কোন সংবাদ দেননি।

মোক্ষদায়িনী দেবী ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে (W. Bonerjee)-র ভগিনী। বহুবাজারের কুবের খ্যাত বিশ্বনাথ মতিলালের শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মো দায়িনী দেবীর বিবাহ হয়। মোক্ষদা দেবী দীর্ঘজীবিনী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, তিনি তিনটে রচনা করেন। যথা :

১। বন-প্রসূন (কাব্য) ১৮৮২

২। সফল স্বপ্ন (ঐতিহা উপন্যাস) ১৮৮৪

৩। কল্যাণ-প্রদীপ (জীবনী) ১৯২

'বন-প্রসূন' কাব্য সঞ্জীবচন্দ্র চ পাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ১২৮৯ সংখ্যায় সমালোচিত হয়ে এর অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি দিলাম :

'হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে মো দায়িনী "বাঙ্গালির বাবু" শিরো একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি রঙ্গদার—লেখিকার লিপিশক্তি পরিচায় আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য।'

এই দুষ্প্রাপ্য কবিতাটির কয়েক পং নিম্নে দেওয়া হল :

"হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু
দশটা হ'তে চারটাবধি দাস্য বৃত্তি
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পসরা।
উকীল, ডেপুটি কেহ, কেহ বা মা
সবজজ কেরানী কেহ, ওভারি
বড় কর্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারাদিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।'

সনৎকুমার
কলকাতা

শিক্ষার বাহন কী হবে?

শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়েছে কম। এর একটি প্রধান কারণ আমাদের বহুভাষা সমস্যা এবং শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার কথা যখন আমরা বলি তখন সরকারী কাজকর্ম চালানোর উপযোগী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাবুশ্রেণীর লোকের কথা বলি না। এখনকার সমস্যা হল জনশিক্ষা তথা গণশিক্ষার প্রসার। শিক্ষিতের হার এখনও আমাদের দেশে নিতান্ত নগণ্য। দেশকে ব্যাপক অশিক্ষার মধ্যে রেখে ঔপনিবেশিক শাসন চালানো যায়, গণতান্ত্রিক শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ব্যাপকতর সর্বজনীন শিক্ষার ওপর। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই বলেছিলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের দশ বৎসরের মধ্যে চোদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য সর্বজনীন, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা কোনো আকাশকুসুম কল্পনা ছিল না। আমরা জানি, আফ্রিকার বহু নতুন-স্বাধীন দেশ সবচেয়ে বেশি ব্যয় করছে শিক্ষার জন্য। কেনিয়া, উগাণ্ডা, ঘানা প্রভৃতি বহু দেশে উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত কার্যত অবৈতনিক। অতি সামান্য ব্যয়ে ছাত্ররা সেখানে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সরকার থেকে বুক-এলাউন্স দেওয়া হয়, এ-খবর ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালী অধ্যাপকের কাছে সেদিন শুনেছি। সে তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যয়সাধ্য। স্কুল-কলেজের মাইনের কথাই শুধু বিবেচ্য নয়, পাঠ্যবইয়ের দামের ওপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই দরিদ্র দেশের বহু ছাত্রের পক্ষে বই কেনাও যে সম্ভব নয় তা আশা করি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় জানেন।

শিক্ষা প্রসারের সমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশে আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে শিক্ষার বাহন বা মিডিয়ম অব এডুকেশন নিয়ে। ইংরেজরা আমাদের মুখে জোর করে ইংরেজি বুলি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষিত বাবুশ্রেণী তৈরী না হলে আমাদের গোরা-প্রভুদের পক্ষে এই দেশ শাসন করা সম্ভব হত না। যে কারণেই হোক ইংরেজি ভাষা দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর আয়ত্তে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশ আফ্রিকার মতো কেবলমাত্র উপজাতি-অধ্যুষিত দুর্বল মাতৃভাষার দেশ নয়। এদেশে অনেকগুলি সমৃদ্ধ ও সুসংগঠিত ভাষা আছে। তাই আজ প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার সর্বস্তরে কী ভাষা ব্যবহার হবে? ইংরেজি থাকবে অথবা ইংরেজির স্থান ধীরে ধীরে দখল করবে তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা হিন্দী? ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা কমিশন এই বহুদিনের প্রশ্নের উত্তর একটি দিয়েছেন। ও'রা বলেছেন যে, ইংরেজি যতই সমৃদ্ধ ও প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক ভাষা হোক না কেন, চিরকাল এই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে উচ্চতম স্তরে শিক্ষাকার্য চলা বাঞ্ছনীয় নয়। এমনিতেই ইংরেজি শিক্ষার মান নেমে এসেছে। আগামী দশ-পনেরো বছরে তার আরও অধোগতি হবার সম্ভাবনা। তাহলে বিকল্প ভাষা কি হবে? হিন্দী? কমিশন বলছেন, ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম রাখার যে-অসুবিধা, হিন্দী হলেও সে-অসুবিধা দূর হবে না। অহিন্দীভাষী অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বরং ইংরেজি গ্রহণযোগ্য হবে হিন্দীর প্রতি বিরোধিতা হবে আরও তীব্র। এছাড়া, কমিশন ঠিকই বলেছেন যে, শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা না হলে শিক্ষার প্রসার হবে না এবং চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের পক্ষে কোনো মৌলিক উৎকর্ষ দেখানো কোনোদিনই সম্ভব হবে না। ইংরেজির দাপটের যুগেও ভারতবর্ষে চিন্তার মৌলিকত্ব প্রকাশিত হয়েছে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে — বাংলা, হিন্দী, মারাঠী কিংবা তামিল, তেলুগুতে। দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন ইংরেজি ভাষায় তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু সংস্কৃত, তেলুগু কিংবা ভারতীয় ভাষায় রচিত আকর গ্রন্থাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকলে শুধু ইংরেজির জ্ঞানে তাঁর পক্ষেও মৌলিকত্ব অর্জন সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথ, সুব্রহ্মণ্যম ভারতী কিংবা রাহুল সংকৃত্যায়নের দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলেও মাতৃভাষার গুরুত্ব আশা করি ইংরেজিনবীশদের হৃদয়ঙ্গম হবে।

সুতরাং শিক্ষা কমিশনের মতে নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত মাতৃভাষা। অসুবিধা হয়তো এর আছে। মাতৃভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানের গ্রন্থ একমাত্র ইংরেজিতেই লিখিত নয়। রুশ, জাপানী, জর্মন, ফরাসী ইত্যাদি জাতির উন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের দান মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই হয়েছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি নির্ভরতা এতটা অনড় না হলে গত কুড়ি বছরেই কাজ অনেকখানি এগোন যেত। বিলম্ব হলেও মাতৃভাষায় মৌলিক জ্ঞানের গ্রন্থ রচনার কাজে এখনি হাত দেওয়া উচিত। অনেকে সংশয় প্রকাশ করছেন যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা আঁকড়ে থাকলে সর্বভারতীয় চিন্তার আদান-প্রদান ব্যাহত হবে। এর উত্তরে বলা যায় যে, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলেও ইংরেজি অথবা সর্বভারতীয় কোনো একটি ভাষার চর্চা তো বন্ধ করা হবে না। চিন্তার আদান-প্রদান সেই ভাষাতেই চলবে। আমরা সবাই নিজের ভাষায় বন্দী হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো এমন আশংকার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজনের তাগিদে আজ পশ্চিমীরা রুশ শিখছে, রুশরা শিখছে ইংরেজি বা জর্মন। তেমনি প্রয়োজনে বাঙালীরা শিখবে তামিল বা মারাঠী। কিন্তু শিক্ষার ভিত্তিমূলে অপরিচিত ভাষার আসন দিলে শিক্ষার প্রসার ঘটবে না আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকত্ব প্রকাশের সুযোগও হবে সীমাবদ্ধ।

বিচিত্র চরিত্র

বিপিন চাটুজ্জে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

• • • • •

হঠাৎ কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বিপিন চাটুজ্জেকে। বিপিন চাটুজ্জে আমাকে খুড়ো বলত। বয়সে কিন্তু বিপিন আমার থেকে সাত-আট বছরের বড় ছিল; সম্পর্কটাও এমন কিছু নয়, রক্তের যোগ তো ছিল না, কারণ ওরা এক মেল, আমরা এক মেল; বিবাহ কোনকালে হতে পারত না সে কালে। গ্রাম সম্পর্কই বলা ঠিক। তার থেকে আরও ঠিক হয় যদি বলি সম্পর্কটা; কি বলব? অর্থনৈতিক বলা কি ঠিক হবে? অন্ততঃ খুড়ো-ভাইপো সম্পর্কটা হয় না। তবে অর্থনৈতিক সূত্রেই প্রথম বন্ধনটা হয়, খুড়ো-ভাইপো সম্পর্কটা সেই খুঁজে-পেতে বের করেছিল। নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের মত।

খুলে বলি। বিপিনের ব্যবসা ছিল মহাজনী অর্থাৎ আজকাল যাকে বলে ব্যাঙ্কিং। সামান্য পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসা আরম্ভ করেছিল তার বাপ এবং বিপিনের আমল পর্যন্ত সে পুঁজি নগদে-লগ্নীতে এবং কেনা সম্পত্তির মূল্যে লাখ দেড়েকে দাঁড় করিয়েছিল। এই বিপিনের কাছে এক সময় আমি আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজনে একবার একশো টাকা হ্যান্ডনোটে ধার করেছিলাম। বছর দুয়েক পর আবার একশো টাকার দরকার হলে বিপিন চাটুজ্জে নিজে এসে আমার সঙ্গে খুড়ো সম্পর্ক আবিষ্কার ক'রে টাকাটা দিলে এবং পুরনো হ্যান্ডনোটটার টাকা সুদে আসলে কষে, এক ক'রে দুশো পঞ্চাশ টাকার হ্যান্ডনোট লিখে নিয়ে গেল। সুদে-আসলে হয়েছিল একশো তিরিশ, নতুন একশো তার সঙ্গে আরও কুড়ি টাকা নগদ দিয়ে দুশো পঞ্চাশের হ্যান্ডনোট সই করিয়ে বললে—বাপজান, দরকার হলে পাঁচকান না করে কাকের মুখে একটা বাত্তা পাঠিও, আমি এসে তোমার দরকার মত টাকা দেব; তবে বাবা এক নেবে, এক দেবে। বুঝলে। নাহলে তিলে-তিলে তাল হলে তখন দোষী দাঁড়াতে হয় পাওনাদারকে। কাল ভয়ানক পড়েছে গো, ঘরের কড়ি বের ক'রে দিয়ে আজ চাইতে গেলে চোর বদমাস সাজতে হচ্ছে। লোকে বলছে—রাঘব বোয়াল।

এইভাবেই তার পৈত্রিক কয়েক শো টাকা দুলক্ষের কাছে এসে পৌঁচেছে এবং আমাদের গোটা থানাটার মধ্যে প্রায় দু হাজার বিঘা জমি বড়শীতে গাঁথা মাছের মত বাঁধা পড়েছে। কিছু তার দখলে চলে গেছে এবং কিছু সে কালে বন্ধকী-তমসুদে বাঁধা আছে।

আমার কোন জমি বা সম্পত্তি যায় নি; কিন্তু দিয়েছি পাঁচশো টাকা। তাও স্বর্গত ফজলুল হক সাহেবের ডেট সেটেলমেন্ট বোর্ডের কল্যাণে। না হলে আড়াই শো টাকার হ্যান্ডনোট সুদে-আসলে হাজারের উপরেই বোধহয় গিছল। ভাইপো তখন খুড়োকে ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে—"খুড়ো-ভাইপোর খেয়াটা ঘর ঢুকিয়ে দাও বাবা।" খেয়া ঘর ঢুকিয়ে দাও কথাটা কোড-ওয়ার্ডের মত। অর্থাৎ নালিশ মকদ্দমা ইত্যাদি অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে না গিয়ে, 'ঢেউ, ঘূর্ণি ঝড়' এড়িয়ে খেয়া নৌকার ঘাটে এসে পৌঁছুনোর মত হয়ে যাক ব্যাপারটা।

সাধারণ চাষীভূষিকে বিপিন এই কথাটাই বলত, প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে ধমক দিয়ে। চেহারা পাল্টে যেত। মনে হত বাঘ-টাঘের সঙ্গে তুলনীয় ব্যক্তিত্ব। মধ্যে মধ্যে নিজের চুল ছিঁড়ত রাগের বশে। বলত—এই পরের উপকার মানুষে করে। যে করে সে গাধা-গাধা-গাধা। সে গাধা, তার বাবা দাদা চৌদ্দপুরুষ গাধা।

কখনও কখনও খাতকদের সামনেই নাক এবং কানে হাত দিয়ে বলত—নাকে-কানে খত দিলাম। বুঝলি, নাকে-কানে খত দিলাম। এ কাজ আর কখনও যদি করি, তখন বলিস, হ্যাঁ।

সবিস্ময়ে মানুষটিকে দেখতাম। সে তা বুঝত' না তা নয়, সে বুঝত'। সকলে চলে গেলে বলত'—খুড়ো এ না করলে হয় না, বুঝলে না-করলে হয় না। বুঝেছ! খেয়া ঘর ঢোকে না। রাগ করলেই মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি। বুঝেছ। কারবারটার নাম মহাজনী কিন্তু কাজটা হল দারোয়ানীর, ইতরামির। এবং নিজের অভিজ্ঞতা মত বলছি, ও অপর সকল জনের কথা বলছি যে, কখনও মানুষটাকে হিসেবে ভুল করতে দেখি নি। কখনও না।

যা ভুল সে করত, তা সে নিজেই বলত, অকপটে স্বীকার করত। মনে আছে, একবার তার এই দেনা-পাওনার কারবার সূত্রে গিয়ে ছিল একখানা গ্রামে, গিয়ে আসর পেতেছিল তার এক আত্মীয়া বিধবা পিসিমার বাড়ী। বিধবা পিসিমা সত্যই আপন জন। নিতান্ত মধ্যবিত্ত অবস্থা, তাই বা কেন, অবস্থা নিম্ন-বিত্তই ছিল। বর্তমানে একটু উন্নতি হয়েছে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন; কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না, কাজেই অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণবাড়ীতে রান্নার কাজ করে ছেলে-মেয়ে মানুষ করে ছিলেন। মেয়েটার বিবাহ দিলেন, সে বিধবা হল। ছেলেকে পড়তে দিলেন, ছেলের পড়াশুনো হল না। তবুও ছেলেটা বেরিয়ে পড়েছিল, কয়লাকুঠীতে কাজ ক'রে কিছু কিছু আনছে তখন। এই এ'র বাড়ীতে প্রতি বৎসরই আসত বিপিন তার টাকা আদায়ের খেয়া ঘর ঢোকাবার জন্য। কিছু টাকা আদায় করে দলিলে উসুল পাড়িয়ে না-হয় সুদে-আসলে দলিল এক করে বদলে নিয়ে নৌকো ঘাটে ভিড়িয়ে নৌকার মালপত্র খালাস করে নিয়ে পিসিকে কিছু দিয়ে প্রণাম সেরে চলে যেত। এবং আদায়ের মালের মধ্য থেকে কিছু ধান পিসিকে দিত ও মধ্যে মধ্যে হাটে-বাজারে গিয়ে এটা-ওটা কিনে আনত'।

মাছটা সে খেত না, বলত—না-না। মা মেয়ে দুজনে বিধবা। নিরিমিষ্যি হেঁসেল আমার জন্যে আমিষের হাঙ্গামা। না-না।

মাছ সে ইচ্ছে করলে বিনা পয়সায় পেতে পারত। কিন্তু তা খেত না। সেবার হঠাৎ এই পিসী মারা গেলেন। গেলেন গেলেন, বিপিন বাড়ীতে থাকতে থাকতেই গেলেন। বিপিন হঠাৎ যেন পাল্টে গেল শ্মশান থেকে ফিরে এসে—"এই জীবন রে বাবা! এর জন্যে এত! দূর দূর দূর!" বলে মাথায় হাত দিয়ে বসল।

দিন দশেকের মধ্যে বেশ কয়েক শো টাকা সে লোকসান করলে, লোকজনকে সুদ ছেড়ে দিয়ে এবং প্রায় সাত-আটশো টাকা খরচ করে পিসীর বেশ ভালভাবে শ্রাদ্ধ করে লোকজনকে বিস্মিত ক'রে দিলে।

খাতকদের এবং আরও বহুজনের ধারণা হ'ল চাটুজ্জের এমন মতি যখন

হয়েছে. তখন সে আর ছ'মাসের বেশী বাঁচবে না। কিন্তু ঠিক পরের বছর ওই ফাল্গুনেই এসে সেই ওদের বাড়ীতেই বাসা গেড়ে আমাকে খবর পাঠালে, খেয়া ঘর চুকিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ হ্যান্ডনোটটা সুদে-আসলে পাল্টে নিতে হবে। আমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হ'ল, বললাম—উশুল দিয়ে তামাদি বাঁচাব কিন্তু সুদে-আসলে এক করে নতুন হ্যান্ডনোট করব না।

বিপিন বললে—খুড়ো মরে যাব। মরে যাব। ঈশ্বরের দিব্যি বলছি, মরে যাব। দেখ বলে একখানা ফর্দ দেখালে, পনেরো-শো কত টাকার যেন হিসেব, উপরে লেখা "লোকসান"।

বিপিন বললে—গতবারের লোকসান হবে। কি যে দুর্মতি হ'ল—পিসীমা মরে আমার ঘাড়ে চাপল। তারপর এই দেখ। এই টাকা সুদে ছেড়েছি। এই টাকা শ্রাদ্ধে গিয়েছে। বল—তুমি লোকসান বটে কিনা। বল।

বুঝলাম সেবার সে তার আগেরবারের লোকসান সুদে-আসলে উশুল ক'রে তবে উঠবে।

এই বিপিন চাটুজ্জে।

বিপিন চাটুজ্জে মরেছে বেশী দিন না। এই দিন আগে। বুড়ো হয়েছিল। মাথার ঠিক ছিল না বলতে লোকে। কিন্তু আমার চোখে পড়ে নি। অক্ষম হয়েছিল। ছেলেরা বড় হয়েছে।

আমাকে সে ডেকেছিল। গেলাম, বিপিন আমাকে দেখে চোখ বড় বড় করে বলল—খুড়ো দেখি দাঁড়াও ভাল করে দেখি। তুমি যে এখন মস্ত লোক। তারপরে একটি পরামর্শের জন্যে ডেকেছি বাবা। একটি পরামর্শ দাও দেখি!

বললাম—কি বল?

—দেখ, বিষয়-সম্পত্তি যা আছে তার সব বিলি-ব্যবস্থা করে দলিলপত্র করাই ভাল নয়?

বললাম—নিশ্চয়। অন্তত উইল করে ফেল।

—তোমাকে একজন সাক্ষী হতে হবে। উইল একটা করেছি। উইলে সাক্ষী হ'লাম।

মাস কয় পর আবার সে খবর দিলে, খুড়ো তুমি এসেছ, একবার আসবে। বিশেষ দরকার।

গেলাম। বললে—বাঁচলাম বাবা। দেখ উইলখানা বদলাচ্ছি। নতুন করলাম। তাছাড়া, আর একটা পরামর্শ আছে। দেখ নগদ টাকা। টাকা যা খাটছে, তা খাটছে। বাকী কিছু ক্যাশ সার্টিফিকেট আছে। কিছু পোস্টাপিসে আছে। আর দেখ, কিছু টাকা আমার লুকোন আছে, পোতা আছে। তা কি করি বল তো!

বললাম—ছেলেদের বল পাঁচজনের সামনে, এই এই আছে এইখানে। তার ভাগ এই রকম হবে।

—ঠিক বলেছ। তাই বলব। তবে নতুন উইলে সই ক'রে দাও! করে দিয়ে এলাম।

এইভাবে আরও দুবার গিয়েছিলাম, এবং আরও দুখানা উইলে সই করেছিলাম। এবং ওই টাকার কথায় বলেছে, হ্যাঁ পাঁচজনের সামনে বলব।

১৯৬০ সালে মারা গেল বিপিন। দেশেই ছিলাম। মৃত্যুর পূর্বে ছেলেরাই খবর দিয়েছিল, খবর দিয়েছিল ওই পোতা টাকার জন্যে। কিছুতেই বিপিন বলে নি। তাই ওরা আমাকে ডেকেছিল।

সে আমাকে দেখে বললে, এসেছ। চললাম এবার। এখন খেয়াটা ঘর ঢুকলে বাঁচি।

বললাম, কিন্তু টাকার খবর তুমি কিছু বল নি বলছে ছেলেরা। বলনি কেন?

হেসে বললে, এইবার তুমি এসেছ, বলব। ঠিক বলব। কাল বলব। কাল তুমি এস। বুঝলে। নিজের নাড়ী দেখে বললে, কাল বোধহয় পার হবে না। কাল একবার নিশ্চয় এস। খেয়া ঘর ঢুকবে না মাঝনদীতে ডুববে, তা' ওই জানে। বুঝলে। এস, কাল এস।

বিপিন যে নৌকার সম্পদ বা যাত্রী সে নৌকা মাঝদরিয়ায় ডোবে না, নিরাপদে ঘাটে পেঁছোয় দেখতে কৌতূহল ছিল। তাছাড়া ওর ছেলেদের জন্যে গেলাম। ওই টাকাটা যাতে সকলে পায় তার জন্য।

গেলাম। তখন বিপিন স্তিমিত হয়ে এসেছে। আমাদের ও অঞ্চলের ভাষায় বলে 'সেজেছে'। অর্থাৎ যাত্রী সাজে সেজে পা বাড়িয়ে লগ্নক্ষণের অপেক্ষায় আছে!

একটু অস্থির।

বললাম—কেমন আছ?

বললে—দেখছ না। যাব। দেরী নেই।

বললাম—কি কষ্ট হচ্ছে?

—কিছু না।

আর কথা আমি খুঁজে পেলাম না। টাকার প্রশ্ন কি ক'রে করব ভেবে পেলাম না। কিন্তু সে নিজেই বললে, দেখ সেই কথাটা বলব, বুঝেছ।

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছেলেরা ব্যগ্র হল।

সে বললে, দেখ, অনেক কষ্টে টাকা করেছিলাম। বুকে ক'রে রেখেছিলাম। এদের হাতে পড়লে এরা—।

কষ্ট হচ্ছিল তার। জল তার মুখে দিয়ে বললাম, যাক ওসব কথা। এখন—।

—হ্যাঁ। বলছি।

আবার মিনিটখানেক অপেক্ষা ক'রে বললাম, বল—ছেলেরা—।

—ছেলেরা? হুঁ। তাইতো! ওটার খবরই তো দরকার! হুঁ। বলে শুয়ে শুলো। তারপর বললে, একটু জল দাও।

জল খেয়ে বললে, একটু ঘুমুবো। পরে বলব।

ঘুমুলো বিপিন। এবং আর জাগলো না। সে ঘুম ভাঙল না। ঘুমের মধ্যেই বার দুই হেঁচকি তুলে শেষ হয়ে গেল।

টাকাটার কথা বলে গেল না। বলে যেতে পারলে না। শুধু তাই নয়, বাক্স থেকে সব উইলগুলো বের করা হল। প্রথম থেকে শেষখানা পর্যন্ত পাঁচখানা। সব ক'খানাকেই লালকালীর বড় ঢেরা দাগ দিয়ে কেটে নাকচ ক'রে দিয়ে গেছে।

বাড়ীটার উপর নিচ ঘরের মেঝে খুঁড়ে, সিন্দুক প্যাঁটরা খুলে মাথার বালিশ ছিঁড়ে, তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হল, শুধু একটা দেওয়ালে একটা বুজিয়ে দেওয়া কুলুঙ্গী খুঁড়ে আড়াইশো টাকা পাওয়া গেল। আর কিছু না। তবে খাতায়-পত্রে, হিসেবে মজুত যে অংক লেখা আছে, সে তো পাঁচ অংকের পরিমাণ মত টাকা!

বুঝলাম বিপিনবাহী নৌকাখানা মাঝদরিয়ায় ডুবে গেছে। ওপারে পেঁছুতে সে পারে নি।

সেই বিপিনকে কাল স্বপ্ন দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলে—ভুলে গিয়েছ খুড়ো?

বললাম, না। না। তোমাকে ভোলা যায় না বিপিন।

ক্ষণিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চিরকালের কবিতা
যারা লিখতে চায় লিখুক,
আমায় লিখতে দাও
হারিয়ে যাবার, ভুলে যাবার, মুছে যাবার,
মুহূর্তের পরমায়ু নিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার কবিতা।

সজ্ঞানে আমার সে কবিতা
সেতু হতে চায় না
কাল থেকে কালান্তরে,
স্মৃতির যাদুঘরে অক্ষয় হ'তে
শ্রদ্ধার মোড়কে।
সময়ের ক্ষীণায়ু বুদ্বুদ হওয়াই তার সাধ,
এই ক্ষণকালের হৃদ্‌স্পন্দন,
আর এই মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ,
বিক্ষুব্ধ হুঙ্কার আর উৎক্ষিপ্ত বজ্রমুষ্টি
প্রতিফলিত প্রতিধ্বনিত করেই
সে যাক্ ফুরিয়ে।

ইতিহাস যা ভুলে যায়,
সাহিত্যের রাজকোষে যা জমা পড়ে না,
সেই অগণনের একটি কণার কবিতা আমার
আজকের মিছিলের পতাকা বয়েই
বিস্মৃতির পাথারে বিলীন হোক।

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

প্রেমের বিচিত্র প্রকৃতি

মানব সমাজ যেসব স্বর্গীয় পদার্থের অধিকারী হয়েছেন তার মধ্যে প্রেম তার বহু-বর্ণ এবং বহু-বৈচিত্র্য নিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য সম্পদ বলে গণ্য। প্রেমের অনেক ভঙ্গী, অনেক বিচিত্র প্রকৃতি। প্রেমের অভিব্যক্তি মনস্তত্ত্ব বিশারদের বিশ্লেষণের বস্তু।

সম্প্রতি জে ক্রিসটোফার হেরাল্ড রচিত "লাভ ইন ফাইভ টেম্প্যারামেন্টস" নামক একটি বিচিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'লাভ ইন ফাইভ টেম্প্যারামেন্টস' গ্রন্থে ক্রিসটোফার হেরাল্ড পাঁচটি বিভিন্ন রীতির প্রেমাভিব্যক্তির বিশ্লেষণ করছেন।

প্রেম এক নামহীন ভাবাবেগ, যেসব হতভাগ্য প্রাণী এই আকুলতা বা জ্বালা জীবনে অনুভব করেনি সে নিতান্ত হতভাগ্য। সেই জাতীয় মানুষের মনে এক ভয়ঙ্কর রৌরব সদৃশ নরক সৃষ্টি হয় আর সেই নরকের আগুনে অহর্নিশ সে জ্বলে পুড়ে মরে। মনস্তাত্ত্বিক অভিধায় বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের জটিল ব্যাধির সে শিকারে পরিণত হয়।

কিভাবে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেমের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পরস্পর বিরোধী ভঙ্গী বিরাজ করে সেই অবস্থা চিন্তা করতে মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে। প্রেমের প্রয়োজনে কোথাও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কোথাও বা কর্তামির কঠোর চাপ। কোথাও বা আত্মবলিদান আবার কোনো স্থলে চরম স্বার্থপরতা কিংবা হোমার বর্ণিত "সুইট-লাস্ট।"

মিঃ হেরাল্ড সম্ভবতঃ মধ্য-ইয়োরোপের বাসিন্দা। তাঁর রচনার স্বচ্ছ ভঙ্গীর জন্য তাঁকে ইংরাজ লেখক বলে মনে করা যায়। হেরাল্ডের গদ্য-রীতির বৈশিষ্ট্য আছে, তা স্বচ্ছ এবং মনোরম। তবে তিনি যে ইংরাজ নন সে তাঁর রচনার মেজাজেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি হৃদয়হীনের মত বলেছেন:

> "Under her sentimentally romantic loveliness one senses the hardness and the ruthless determination which, it seems, a life-long association with horses tends to breed into so many members of the English upper class."

অবশ্য শৈশবে আস্তাবল-বাস মানুষকে সংনশীল এবং যৌনবিকার মুক্ত করে এই ধরনের একটা বিশ্বাস অনেকের আছে।

যে নিরাসক্ত নিস্পৃহতায় শল্য-চিকিৎসক এক্স-রে ফটোগ্রাফ আলোয় ধরে দেখে, হেরাল্ডও সেই ভঙ্গীতে প্রেমের পাঁচটি নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ফরাসী দেশের সলোঁর জাঁক-জমকপূর্ণ গ্ল্যামার তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি, নৈশ ভোজের টেবলের আলাপচারকে কেন্দ্র করে যে গৌরবময় স্তরে ওঠার জন্য তরুণ সম্প্রদায় সদা জাগ্রত তিনি সেই দিক একেবারে উপেক্ষা করে গেছেন। পরস্পরকে পথে বসানোর প্রচেষ্টায় এই সব সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে কতখানি নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে সেই বিষয়ে তিনি আগেভাগেই মন স্থির করে ফেলেছেন। তাঁর পাঁচটি চরিত্র সম্পূর্ণ সাধারণ মানবিক চরিত্র হিসাবে পরিবেশিত হয়েছে, তারা উচ্চাশা বা উদগ্র কামনার দ্বারা শাসিত।

কর্তৃত্ব-পরায়না মাদাম জিওফ্রিন, কিংবা চতুরা জুলি দ্য লেসপিনাশ মাদাম দেফাঁর তমসাচ্ছন্ন আকাশ থেকে কিভাবে এতগুলি তারকাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে এল সেই বর্ণনা সবিস্তারে হেরাল্ড তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি প্রয়োগে পরিবেশন করেছেন।

হেরাল্ড বলেছেন তিনি রমণীর মন সম্পর্কেই সবিশেষ আগ্রহী, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসের সঁলো সম্পর্কিত সামাজিক অভিশাপ বিশ্লেষণে তাঁর রুচি নেই। হেরাল্ডের তিনজন নায়িকা প্রেমের চেয়ে জীবন উপভোগ এবং শক্তির অধিকারিণী হওয়ার প্রতি একটু বেশী মাত্রায় আগ্রহান্বিত। আর বাকী দুজন প্রেমানুভূতির দহনে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে।

প্রথম তিনজন যুক্তির যুগের প্রতিনিধি। আর শেষের দুজন ভাবাবেগের কালের প্রতীক।

মাদাম দ্য তেনসা বলছেন—

> "I regard self-lore which is the origin of all motion, as the celestial fluid in which we swim.'

এই কান্ডাকান্ড-জ্ঞানহীনা 'নান' কনভেন্ট থেকে পলাতক হয়, নিজের বে-জন্মা শিশু-সন্তানটিকে প্যারিসের সাঁ-জাঁ-লে-রঁ মন্দিরের সোপানে ফেলে দিয়ে আসে রাত্রির অন্ধকারে। দুজন কার্ডিন্যালের রক্ষিতা হয়, একজন আবার তার নিকট-সম্পর্কের মানুষ। মঁসিয়ে দ্য ফ্রেসনের আত্মহত্যার জন্য সেই দায়ী আর পরিশেষে তার যা কিছু সম্পদ সবই জুয়ায় নষ্ট হয়।

অন্যদিকে মামজেল আইসে আবার শেষ পর্যন্ত মারা গেল, শুধু— "a conscience too nice for her circumstances. এতখানি বিবেকবতী হওয়া তার সইলো না।

চার বছর বয়স থেকে তাকে শার্ল দ্য ফেরিওল মানুষ করেন। কনস্তানতিনোপলের এক বাঁদীর বাজার থেকে তাকে কিনে আনা মাত্র ১,৫০০ লাইভারের বিনিময়ে। শার্ল দ্য ফেরিওল ছিলেন ফরাসী দেশের তুরস্কস্থ রাষ্ট্রদূত, তিনি ছিলেন বদমেজাজী এবং ক্ষেপা স্বভাবের। তিনি এই চার বছরের মেয়েটিকে কিনেছিলেন পরিণত বয়সের একজন উপযুক্ত সঙ্গিনী হিসাবে গোড়া থেকে তালিম দিয়ে তৈরী করার বাসনায়।

খুব যত্ন সহকারে তাকে লেখাপড়া শেখানো হল এবং বেশ সুকৌশলে তাকে জানানো হল যে একটু বড়ো-সড়ো হলেই তাকে তার মনিবের রক্ষিতা হিসাবে বাস করতে হবে। এই চিন্তায় কিন্তু মামসেল আইকের মন অহর্নিশ জ্বলতে থাকে বিবেকদংশনে—

"unworthiness and degradation"—

এই চিন্তায় সে আকুল হয়। এর ফলে সে ক্রমশঃই ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, ভক্তিমতী হয়ে ক্রমে ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে পড়ে। সে এক সময় তরুণ স্যেভালিয়ে দেদাই-এর সঙ্গে গভীর প্রেমে মগ্ন হয়, চোদ্দ বছর তার সঙ্গে সে সংযুক্ত ছিল। অপরাধবোধের এক মনোভঙ্গীতে মামজেল তীব্র যন্ত্রণানুভব করে, কিন্তু দেদাইকে সে এমনই গভীরভাবে ভালোবাসত যে স্বয়ং রাজকুমারের প্রেম সে প্রত্যাখ্যান করে। এই কর্ম সেইকালে দেশদ্রোহীতার সমতুল, প্রায় রাজদ্রোহের মত। দেদাই-এর সূত্রে যে কন্যাটি জন্মেছিল তাকে রেখে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হল মামজেলকে। দেদাই অবশ্য মানুষটি ভালো।

ইস্তামবুলের বাজার থেকে কিনে আনা চার বছরের দাসীর জীবনের বিচিত্র পরিণতি সন্দেহ নেই।

মাদাম দেলাউনিকে একজন সমাজচ্যুতা রমণী বলা যায়, নিজস্ব আদর্শ থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না। কপর্দকহীনা এই রমণী যখন একটা গভর্ণেসের চাকরী গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন তখন তাঁর মনে হল:—

> "To arm myself with a set of unshakeable principles by which the entire conduct of my life could be tested. I resolved to suffer indigence or to seek servile employment rather than to deny my character, convinced as I was that nothing can degrade us except our own actions."

শেষ জীবনে তার মনে সংশয় জেগেছিল যে আদর্শবাদ যতই সুদৃঢ় হোক, সে কি জীবনের সুখ ও শান্তিকে অব্যাহত রাখতে পারে, সংরক্ষণ করতে পারে! তার মনে হয়েছে যে যুক্তিশীলা হওয়ার প্রচেষ্টা তার জীবনে সর্বদাই এক মহা ত্রুটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাস্তিল কারাগারে সে বন্দিনী হয়, সেখানে একজন কয়েদীর সঙ্গে তার প্রেম হয়। শেষকালে ডাচেস দ্য মেইন এক রকম জোর করে তার বিবাহ দেন ব্যারন দ্য স্তালের সঙ্গে। এই বৃদ্ধ ব্যারনটি ছিলেন ডিউক দ্য মেইনের বাহিনীর একজন মাতব্বর সৈনিক। বুদ্ধিমতী, বুদ্ধিশালিনী, শিক্ষিতা ও নম্র এই মাদমজেল দেলাউনি মুক্তির বেদীতে তার আত্মসুখ বিসর্জন করেছিল।

জুলি দ্য লেসপিনাস আফিম এবং প্রেমের জন্য মারা যায়। তার ধারণা ছিল সে এক বিশিষ্ট প্রাণী, সহনশক্তি তার অসীম এবং এই কারণেই সে বিশিষ্ট। অপরের সঙ্গে সে এক সারিতে থাকার নয়। সে বেচারী মাদাম দ্য দেফাঁকেও যেমন ঠকিয়েছে তেমনই প্রতারিত করেছে তার প্রেমিক দ্য' লেমবারকে। এক স্প্যানিয়ার্ডের প্রেমে সে আকুল হয়, তার নাম মোরা, আবার ঠিক সেইকালে চলছে কাউন্ট দ্য গিলবারের সঙ্গে প্রেমলীলা। মিঃ হেরাল্ড লিখেছেন।—

"Her duplicity was bottomless.

শেষের কাহিনীটি অপূর্ব। মাদমজেল ক্লারিওন নামক অভিনেত্রীর কাহিনী, চল্লিশ বছর অভিনয় করার পর সে মারগ্রেভ অফ আনবাসের রক্ষিতা হয় এবং মারগ্রেভ তাকে ছাড়ার পর প্রায় আশী বছর বয়স পর্যন্ত প্যারিসে এক চটুল জীবনযাপন করে গেছেন।

মিঃ হেরাল্ড তাঁর দৃষ্টান্তগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁর বিশ্লেষণ যুক্তিনিষ্ঠ। তবে প্রেমের প্রকৃতি যত বিভিন্ন রকমেরই হোক পরিনামে মনে হয় সবই একই প্রকারের,—সব প্রেমই প্রেম এবং তার রঙ এক। *

—অভয়ঙ্কর

* **LOVE IN FIVE TEMPERAMENTS: By J. Christopher Herald. Publishers: Hamish Hamilton. Price 25 shillings.**

ভারতীয় সাহিত্য

কেশবসুতের জন্ম শতবর্ষ ॥

মারাঠি সাহিত্যে কেশবসুত একটি পরিচিত নাম। কিন্তু বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁর পরিচয় অতি সামান্য। বাংলায় তাঁর কবিতার কোন উল্লেখযোগ্য অনুবাদ অথবা তাঁর সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে বলে জানা নেই। অথচ আধুনিক মারাঠি কাব্য আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একজন সমালোচক বলেছেন—

> "As a poet, keshavasuta reigned supreme, and was looked upon as the father of modern Marathi poetry".

এবৎসর তাঁর প্রথম জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক কৃতিত্বের উপর নতুনভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সাহিত্য আকাদেমী থেকেও তাঁর একটি সুনির্বাচিত কাব্য-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ চলছে।

কেশবসুত আসলে কৃষ্ণজী কেশব দামলের ছদ্মনাম। বিভিন্ন ছদ্মনামেই তিনি কাব্যরচনা করেছেন। কিন্তু কেশবসুত নামেই মারাঠি সাহিত্যে শেষপর্যন্ত তাঁর স্বীকৃতি ঘটেছে। তাঁর জন্ম হয় ১৮৬৬ সালের ১৫ মার্চ। জন্মস্থান মহারাষ্ট্রের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি গ্রাম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র বিদ্যালয়শিক্ষক। কেশবসুত হলেন পিতার পঞ্চমপুত্র। তাঁর মোট বার ভাইয়ের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষায়দীক্ষায় উত্তরকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য কেশবসুতকে বার বার লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়। যাই হোক, এইসব অসুবিধার মধ্য দিয়েও তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং কখনও কেরানী আবার কখনও শিক্ষক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন। ১৯০৫ সালে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে দারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

কেশবসুতের অনেক রচনা এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এর কারণ এই যে, নানা অর্থনৈতিক অনটনের মধ্যে তাঁকে জীবিকানির্বাহ করতে হয়েছিল বলে, তিনি তাঁর রচনার প্রকাশের বা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর ১২ বৎসর পর তাঁরই সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীহরিনারায়ণ আপ্তে তাঁর ৩১২টি কবিতা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে কেশবসুত কর্তৃক মারাঠি ভাষায় অনূদিত কিছু সংস্কৃত ও ইংরেজি কবিতাও স্থান পায়। তাঁর রচনার সমস্ত নিদর্শন না পাওয়া সত্ত্বেও আধুনিক মারাঠি কবিতার জনকরূপে তিনি কিভাবে অভিনন্দিত হলেন, তার পরিচয় লাভ করতে হলে তৎকালীন মারাঠি সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করতে হবে।

আধুনিক মারাঠি সাহিত্যের সূত্রপাত মোটামুটিভাবে বর্তমান শতকের প্রারম্ভ থেকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্যের মত আধুনিক মারাঠি সাহিত্যেরও যাত্রারম্ভ মূলতঃ পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে। এই সময়ে সাংবাদিকতা খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনেক সাহিত্যিকই সংবাদ-সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই সময়েই হরিনারায়ণ আপ্তে মারাঠি সাহিত্যের চিরাচরিত ধারাকে অস্বীকার করে নতুন রীতি এবং চিন্তায় উপন্যাস রচনা করতে আরম্ভ করেন। নাটকে নতুন রীতি প্রবর্তন করলেন দেবল। ঐতিহাসিক গবেষণায় এবং সাহিত্যে অভিনবত্ব আনলেন রাজওয়াদে। প্রবন্ধ-সাহিত্যকে শিল্পসম্মত রূপদান করলেন এস এম পরাঞ্জপে। 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক মহামান্য তিলকের রাজনৈতিক রচনাগুলিও সেকালের মারাঠি সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। যখন এইভাবে যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে মারাঠি সাহিত্যের তৎকালীন আবহাওয়া ভয়ানক মাত্রায় চঞ্চল, তখনই কবিতায় নতুন বাণীবন্ধন এবং চেতনাকে পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন কেশবসুত। মৃতপ্রায় মারাঠি সাহিত্যধারায় তিনিই সঞ্চার করলেন প্রাণাবেগ। উন্মুক্ত করে দিলেন সমস্ত বন্ধ দুয়ার। নতুন জীবন লাভ করলো আধুনিক মারাঠি কবিতা। মারাঠি সাহিত্যে তিনিই প্রথম সনেট প্রবর্তন করেন। তাঁর কাব্যে যেমন একদিকে পরিবেশিত হয়েছে আধুনিক যুক্তিবাদ, তেমনি আছে সুগভীর মানবপ্রেম। একারণেই তাঁকে অনেকে সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'বিপ্লবী' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে এম ডি আলটেকার লিখেছেন—

> "Keshavasuta produced some excellent lyrics, and brought out in poetic form, the thoughts and philosophy of Agarkar".

জীবিতকালে তিনি খুব সম্মান পাননি। কিন্তু শতবর্ষ পরে আজ নতুন করে মারাঠি সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ধারিত হচ্ছে।

রামানন্দ প্রদর্শনী ॥

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার ভবনে সম্প্রতি রামানন্দ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই প্রদর্শনীতে ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিউ'র ৪০ হাজার সম্পাদকীয় টীকা এবং প্রবন্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা রচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

বিদেশী সাহিত্য

মাইনর মাস্টারপিস ॥

আজ থেকে প্রায় আঠারো বছর আগের কথা। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন ব্রিটেনের ডেন্টন ওয়েলথ। ক্ষীণকায় প্রতিভাসম্পন্ন এই আর্টের ছাত্রটি সবে যখন ২০ বছরে পা দিয়েছেন সেসময় হলেন গুরুতর আহত। এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। বাধ্য হয়েই ছাড়তে হল আঁকার কাজ। হাঁটা-চলাও একরকম বন্ধ হল। ফাঁকা সময় কাটাবার জন্যে তাঁকে পেয়ে বসল নতুন নেশায়, ধরলেন কলম। লিখলেন পরপর দুটি গল্পের বই। ছেলেবেলার স্মৃতিকথাকে কাহিনীর আকার দিলেন দুটি গ্রন্থে। তবে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অথচ ভয়ংকর রচনা হল আলোচ্য উপন্যাস 'এ ভয়েস থ্রু এ ক্লাউড'। ২৫৪ পৃষ্ঠার এই বইটি সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস প্রকাশনালয় থেকে বেরিয়েছে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইংলন্ডে, ১৯৫০ সালে। তখন কিন্তু বইটি তেমন কারো নজরে পড়েনি। তবে ইদানীং সমালোচকদের কা

মাইনর মাস্টারপিস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হল।

ডেন্টন ওয়েলথ তাঁর মৃত্যুর মাত্র কিছু-দিন আগেই বইটি লিখেছিলেন। বলাবাহুল্য, সেসময়েই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন বিদায়-বেলার শেষরাগিণীর সুর। পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্যে চলে যাবার বেদনায় তাই ছিলেন ভারাক্রান্ত। পুরনো দিনের কথা ছায়াছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে। যেদিন তাঁর অ্যাকসিডেন্ট হয় তার-পর থেকেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। একসময় মৃত্যুর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরও ভেসে এল মেঘের অন্ত-রাল থেকে।

বইটিতে হাসপাতালের যে-ছবি আঁকা হয়েছে তা যেমন নিখুঁত, তেমনি মর্মান্তিক। অন্যান্য রোগীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে হাসপাতালের বিভীষিকাপূর্ণ যে দৃশ্যের তিনি অবতারণা করেছেন, তা আমাদের কল-কাতার কোন কোন হাসপাতালের কথাও মনে করিয়ে দেয়। লেখকের কাছে এ জায়গাটি অনেকসময় তাই কসাইখানা বলে মনে হয়েছে। তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন ভয়ংকর অভিজ্ঞতাকে এখানে তুলে ধরেছেন মনোজ্ঞ-ভংগীতে. তবে মানুষের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসে কখনো চিড় খায়নি।

পোলিশ সাহিত্যের জনপ্রিয়তা ॥

যতই দিন যাচ্ছে, পোলিশ সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সারা পৃথিবীতে ততই বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় যে, গত দুই দশকের মধ্যে ৩,১৩৭টি পোলিশ গ্রন্থ বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১০০০টি ক্লাসিক বই এবং বাকি গ্রন্থ সাম্প্রতিককালের।

পোলিশ সাহিত্যের বিস্তৃতি শুধু অনুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যকর্ম ছাড়াও নানাধরনের অ্যালবাম এবং শিল্প-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা নিয়মিত বেরুচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রেডিও এবং টেলিভিশনেও পোলিশ সাহিত্যের গতি-প্রগতি সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা শুনতে পাওয়া যায়।

হিরোশিমার স্মৃতি ॥

এযুগের অধিবাসীর কাছে, বিশেষ করে যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী মানুষের কাছে হিরোশিমার স্মৃতি বড়ো ভয়ংকর। পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট তারিখটি তাই সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন হিসেবেই চিহ্নিত। কেননা এইদিনেই মানুষের সভ্যতার গর্ব চূর্ণ করে হিরোশিমার বুকের উপর আমেরিকা ফাটিয়েছিল অ্যাটোম বোমা। সেখানে সৃষ্টি করেছিল একালের মহাশ্মশান। আজ কিন্তু সেই হিরোশিমা আর নেই। মোটামুটি সমস্ত ক্ষতচিহ্ন ধুয়ে মুছে সেখানে গড়ে উঠেছে নূতন নগরী। 'শান্তির শহর' বলে পরিচিতিও সে লাভ করেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন সাংবাদিক র‍্যাফেল স্টেইনবার্গের 'পোস্টস্ক্রিপ্ট ফ্রম হিরোশিমা' বইটি আলোচনাকালে উপরের কথাগুলি মনে পড়ল। স্টেইনবার্গ বর্তমানে জাপানে বসবাস করেন। তিনি জাপানের অধিবাসীদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে পেরেছেন। তাঁদের কাছে বসে শুনেছেন 'হিরোশিমা'কে নিয়ে সব অজস্র বীভৎস কাহিনী। চোখেও দেখেছেন তার কিছু কিছু ভয়ঙ্কর চিহ্ন। সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততায় ভরে গিয়েছে তাঁর মন। মার্কিনী বলে নিজেকেও কখনো অপরাধী হিসেবে মনে হয়েছে।

তিনি বিভিন্ন তথ্য ও সংখ্যা তত্ত্ব সহকারে সেকালের সঙ্গে একালের হিরো-শিমারও মোটামুটি তুলনা করেছেন।

নতুন বই

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান

মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্যেই বিজ্ঞানের জন্ম। এই জিজ্ঞাসার শেষ নেই তাই বিজ্ঞানকে হতে হয়েছে অশ্রান্ত। বিজ্ঞানের গতি সেইদিনই রুদ্ধ হবে যেদিন মানব সভ্যতার বিলোপ ঘটবে। অতন্দ্র বিজ্ঞান সাধক জলেস্থলে মহাশূন্যে তার জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফিরছেন। সৃষ্টি হয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আরো নানান শাখা। একটা কিছু সৃষ্টির সঙ্গে সংগেই মানুষের মন জেগে উঠেছে নতুন কিছু সৃষ্টির চিন্তায় অদৃশ্য দৃশ্য হওয়ার পর, অজানাকে জানবার অসীম আকাঙ্ক্ষায়।

বিশ শতকের এই বিজ্ঞানের যুগে বাংলা দেশে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছে গভীর-ভাবে। আজ আমাদের স্কুলের শিক্ষার সংগে বিজ্ঞানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারের এক আন্তরিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। অসংখ্য সহজবোধ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ রচিত হচ্ছে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী পালের সম্পাদনায় 'বিজ্ঞান চেতনা' পর্যায়ে যে চারখানি গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির আমরা যথাযোগ্য আলোচনা করেছিলাম। সম্প্রতি 'বিজ্ঞান চেতনা'র পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে আছে 'মানবদেহের কথা' ও 'রোগ জয়ের কথা' এবং ষষ্ঠ খণ্ডে আছে 'মানুষের কথা' ও 'প্রত্নতত্ত্বের কথা'।

হাড়, মাংস, চামড়া, রক্তের এই মানব দেহের গঠনবৈচিত্র্য এবং তার বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ যেমন বিস্ময়কর তেমনি আকর্ষণীয়। দেহযন্ত্র, রক্ত ও তার কাজ, হৃদযন্ত্র ও তার কাজ, ফুসফুস, পাচন যন্ত্র, বৃক্ক, অন্তঃক্ষরণ তন্ত্র, নার্ভতন্ত্র, পঞ্চইন্দ্রিয়, শরীরের কাঠামো, মাংসপেশী প্রজনন তন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায় 'মানব-দেহের কথা' অংশ থেকে। দেহের সংগে সম্পর্ক রয়েছে রোগের। মানব-শরীর যতদিন থাকবে রোগ-ব্যাধি তার অনুষংগ হয়ে থাকবেই। রোগের মূলে যে সব জীবাণু, তাদের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের কাহিনী যুদ্ধজয়ের থেকেও রোমাঞ্চকর। 'রোগ জয়ের কথা' অংশে আছে সেই সমস্ত বিস্ময়কর আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের কথা।

'মানুষের কথা' অংশে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব থেকে সভ্যতার আলোক লাভ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। ডারউইন, আদি মানুষের রূপ ও স্বরূপ, নানাজাতের মানুষ, বিভিন্ন ধরণের মানুষ আদিমকালে মানুষের দিনচর্চা, আদিম মানুষের শিল্প-চর্চা, খাদ্য উৎপাদনের যুগ, বর্বরতা থেকে সভ্যতা, কৃষি ও জাদু, জাদু ও বিজ্ঞান, ভারতে নৃতত্ত্ব চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'প্রত্নতত্ত্বের কথা' অংশে আছে প্রত্নতত্ত্ব কি, কিভাবে প্রাচীন দ্রব্যাদির আবিষ্কার হয়, সময় নির্ণয় হয় কিভাবে, মাটির পাত্রের কথা, সমাধির কথা বাস-স্থানের কথা, খননের কথা, ভারতে পুরা-তত্ত্বের অনুশীলন। 'মানুষের কথা ও প্রত্নতত্ত্বের কথা' অংশ দুটি মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক নিপুণ আলেখ্য।

'মানবদেহের কথা' ও রোগ জয়ের কথা লিখেছেন শ্রীননীগোপাল মজুমদার। মানুষের কথা লিখেছেন শ্রীবিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রত্নতত্ত্বের কথা লিখেছেন শ্রীসন্তোষ বসু। প্রতিটি গ্রন্থের আলোচনা সহজবোধ্য এবং মনোরম। অসংখ্য চিত্রে শোভিত এই খণ্ড দুটিও পূর্ব প্রকাশিত খণ্ডগুলির ন্যায় জনপ্রিয় হবে আশা করি। সম্পাদকের এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য সকল বাংলা ভাষীর ধন্যবাদার্হ।

বিজ্ঞান চেতনা– (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)– কুঞ্জবিহারী পাল সম্পাদিত। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম প্রতি খণ্ড চার টাকা।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পূর্বরাগ—সুমন্ত সোম। হৃদয় প্রকাশনা। ৩০, বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা—৯।

ভূমিকায় লেখক যে উচ্চ আদর্শের কথা বলেছেন, কাহিনীবিস্তারে তিনি তাতে বিন্দু-মাত্রও সফল হননি। প্রচ্ছদ পুরোন রুচির পরিচয়সম্বলিত।

অগ্নিকণা—ভাস্কর ভট্টাচার্য। ২, হরচন্দ্র মল্লিক লেন, কলকাতা—৫ থেকে প্রকাশিত।

'অগ্নিকণা' হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনার সংকলন। অনেকটা উপদেশমূলক।

●

মহাজীবনের প্রাঙ্গণে—রাখাল রায়চৌধুরী। ২সি, নবীন কুন্ডু লেন। কলকাতা—৯। নৃত্য সঙ্গীত আবৃত্তি সহযোগে রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গীতালেখ্য।

●

অ্যালফাবেট ক্লাব—সমর চট্টোপাধ্যায়। নির্ঝরিণী। ৪৫, মহারাজা ঠাকুর রোড। কলকাতা—৩১।

নাটকের মাধ্যমে এ বি সি শেখবার একটি নতুন পথ দেখিয়েছেন লেখক। গ্রন্থের সুন্দর ছবিগুলি এঁকেছেন শ্রীশৈল চক্রবর্তী।

●

নীলাঞ্জি মজুমদার—পঙ্কজ মৈত্র। মৈত্র সন্দর্শন। শ্রীরামপুর, হুগলী।

ভাষা অত্যন্ত সাধারণ। কাহিনী-সৃষ্টিতে ভাষাও যে অন্যতম অনুষঙ্গ এই শ্রেণীর লেখকরা সম্ভবত তা ভেবে দেখেন না। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সমগ্র কাহিনীটি দানা বাঁধতে পারেনি।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

বাংলা দেশে সিনেমা সম্পর্কে যে সচেতনতা এবং উৎসাহ দেখা যায় তার তুলনীয় উদাহরণ ভারতের আর কোথাও মিলবে না। বাংলা সিনেমার এই জাগরণের একটি ফসল সম্প্রতি প্রকাশিত 'সিনেমা সমালোচনা' পত্রিকাটি। এতে যাঁদের লেখা বা বক্তৃতা আছে তাঁদের মধ্যে আছেন সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, ঋত্বিক ঘটক, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি) ইত্যাদি। এছাড়া আছে বাংলা সিনেমার ওপর মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া বা বাংলায় হিন্দী সিনেমা তৈরীর ঔচিত্য সম্পর্কে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ। বিদেশী সিনেমার গানের অনুবাদ একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা। পত্রিকাটি সিনেমা রসিকদের মধ্যে বহুল প্রচারিত হবে আশা করা যায়। ৪এ, রাণী শংকরী লেন কলকাতা—২৬ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

●

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'ক্রান্তি' পত্রিকার প্রথম সংকলনে লিখেছেন অরবিন্দ পোদ্দার (শিল্পকথা : মার্কসীয় মনোভঙ্গি), স্টেফান শেবার্ড্‌কে (লেনিনের সাহিত্যতত্ত্ব), অবিনাশ দাশগুপ্ত (ভারতে মার্কিনী ডলারের নাগপাশ), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (কোসাম্বির ধর্মানন্দ কোশাম্বীর স্মরণে), সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট), এবং আরো অনেকে। শিল্প সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান-বিষয়ক এই পত্রিকাটি জনপ্রিয় হবে আশা করি। ৮বি কলেজ রো, কলকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

●

'থিয়েটার' নাট্যবিষয়ক একটি পাক্ষিক পত্রিকা। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 'থিয়েটার' যে বিষয়গুলোর উপর আলোকসম্পাত করেছে তার মধ্যে মোটামুটি বাংলা নাটকের গতি-শীলতা ও প্রাণবন্ত সত্তার পরিচয় ধরা পড়েছে। তবে নাট্যসংবাদের সীমাকে আরো ব্যাপক করা দরকার। আমাদের দেশের অপেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলোর বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে আরো বিস্তৃত করে আলোকসম্পাত করা প্রয়োজন। পত্রিকার কোনো কোনো আলোচনা মতবাদের চাপে কিঞ্চিৎ একপেশে মনে হল। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সচেতন থাকলে পত্রিকাটি সর্বজনীন নাট্য-আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

পত্রিকাটির প্রথম চারটি সংখ্যায় আছে বিদেশের কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের এক একটি মুহূর্তের আলোচনা, বিভিন্ন দলের নাট্যসংবাদ, নাট্যবিচার ও 'সর্বতোভদ্র' নামে একটি আলোচনা চক্র। কয়েকটি বিশেষ নিবন্ধও স্থান পেয়েছে। শম্ভু মিত্র, কালের চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কয়েকটি আলোচনা এই পত্রিকাটির গভীরতা বৃদ্ধি করেছে।

থিয়েটার : সম্পাদক—পবিত্র সরকার ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৯।১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিঃ ৯

●

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রদের মুখপত্র হল 'কুরান্ট'। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন: দক্ষিণারঞ্জন বসু, চঞ্চল সরকার, সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, ডি গুরুগেনভ, অলোক গুহ, নীরোদকুমার ভট্টাচার্য, অজিত দাস, মোহিতকুমার মৈত্র, পরিমল ভট্টাচার্য, জয়ন্তী সেন, প্রাণতোষ ঘটক, শান্তিকুমার মিত্র, চন্ডী লাহিড়ী, ইরা পাইন। পত্রিকাটির দাম এক টাকা।

প্রদর্শনী

ভারতীয় শিল্পকলার ২৫০০ বছরের ইতিহাস

সম্প্রতি হামবুর্গে 'ভারতীয় শিল্প-কলা' প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পকলার তিন হাজার বছরের গতি ও প্রকৃতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে।

মোট শিল্পবস্তুর সংখ্যা ৩৩৪। এর বেশিরভাগই ব্রোঞ্জ ও প্রস্তরের খোদাই মূর্তি ও মিনিয়েচার পেন্টিং, অবশ্য কিছু কিছু হাতীর দাঁতের কাজ, বস্ত্র ও অন্যান্য হস্তশিল্পও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। বিশেষ কারণে সিন্ধু সভ্যতার কোন শিল্প নিদর্শন এখানে রাখা হয়নি। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্যগুলি প্রথম থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় বলা যায়। মুসলিম যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছে মুঘল শাসনকালে মিনিয়েচার, বস্ত্রসম্ভার ও চমৎকার হাতের কাজ।

কলকাতার ভারতীয় মিউজিয়াম ছাড়াও য়ুরোপের খ্যাতনামা সংগ্রহশালা থেকে যাবতীয় শিল্পবস্তু এই প্রদর্শনীর জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেগুলি বিস্ময়কর সেগুলি হল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভারতীয় মিনিয়েচারের একটি অ্যালবাম, সপ্তদশ শতাব্দীর ৩৮৩ পাতার একখন্ড "আথতারি" ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রূপকথার একটি সুন্দর পান্ডুলিপি।

'মুজিয়াম ফুইর কুনস্ত উন্ট গেভেরবে' (অর্থাৎ 'চারু ও কারুকলা মিউজিয়াম') যেখানে প্রদর্শনী চলেছে, সেখানেও কিছু কিছু ভাস্কর্য, বস্ত্র ও মুসলিম যুগের হাতের কাজের সংগ্রহ আছে। এই সংগ্রহের মধ্যে 'তুরস্কের লাঞ্ছিত কম্বল' একটি প্রধান আকর্ষণ। কম্বলটি তুরস্ক থেকে উদ্ধার করা হলেও আসলে সেটি নিঃসন্দেহে ভারতীয়।

যোগী বুদ্ধের প্রতিকৃতি গান্ধার যুগ। দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী

ভাবগম্ভীর দীর্ঘ মূর্তিটি পশ্চিম বার্লিনের সরকারী মুজিঅমের ভারতীয় বিভাগের একটি সংগ্রহ

একটা গোটা দেশের শিল্প-সত্তা একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা যায় না; সেজন্য ভারতীয় স্থাপত্যরীতি চলচ্চিত্রের সাহায্যে দর্শকদের দেখানো হচ্ছে।

কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌

ত্রিপুরাশংকর সেন

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ধ্যানকালে এই শ্লোকটি আমাদের উচ্চারণ করতে হয়—

'বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্‌।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং
বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌'।।

যিনি বসুদেবের পুত্র, যিনি কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করেছেন, যিনি জননী দেবকীকে পরম আনন্দ দান করেছেন, সেই জগদ্‌গুরু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি।

এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত কয়েকটি তত্ত্ব আছে। সে তত্ত্বগুলি এই—

(১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নররূপে লীলা করার জন্যেই বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর জন্ম ও কর্ম উভয়ই দিব্য (অলৌকিক বা অপ্রাকৃত)।

(২) তাঁর অবতরণের একটি প্রয়োজন হচ্ছে ভূভারহরণ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি অত্যাচারী বা দুষ্কৃতকারী অসুরগণকে সংহার করেছেন।

(৩) যাঁরা কোনো রস আশ্রয় করে তাঁর বন্দনা করেন, তিনি তাঁদের পরম আনন্দ দান করেন।

(৪) ধর্মসংস্থাপনের জন্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। যে ধর্ম শাশ্বত, যে ধর্ম সর্বদেশের সর্বমানবের কল্যাণকর, সেই ধর্মই তিনি স্থাপন করেছেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে 'জগদ্‌গুরু' এই বিশেষণে বিশেষিত করা হোলো কেন? পরবর্তী একটি শ্লোকে তার কারণের ইঙ্গিত করা হয়েছে—

'প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ'।।

শরণাগতের যিনি কল্পতরু, অশ্ব-চালনার সময় যিনি এক হস্তে লাগাম ও অপর হস্তে চাবুক ধারণ করেন, যিনি জ্ঞানরূপ মুদ্রাযুক্ত ও গীতারূপ অমৃতকে যিনি দোহন করেছেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে,—এই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অধিকারী বলেই তিনি প্রপন্ন জনের বাঞ্ছাকল্পতরু।

শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে, শ্রীভগবান পার্থসারথি। পার্থসারথিরূপে তিনি নিজের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও সমর-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তদুপরি—তিনি জ্ঞানবলেও শ্রেষ্ঠ। শুধু অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে প্রেরণা দেবার জন্যেই নয়, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যেই তিনি গীতারূপ অমৃত দোহন করেছেন।

অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ, এ কথাটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকপোল-কল্পিত নয়। আর্ষ মহাভারতে বলা হয়েছে, রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করচেন—'কোন্‌ পূজনীয় ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম অর্ঘ্য দান কোরবো'? ভীষ্মদেব উত্তর করলেন—'সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণই অর্চনীয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য।'

'এষ হ্যেষাং সমস্তানাং
তেজোবলপরাক্রমৈঃ।
মধ্যে তপন্নিবাভাতি জ্যোতিষামিব
ভাস্করঃ'।।

সকল নৃপতির মধ্যে ইনি তেজের দ্বারা, বলের দ্বারা ও পরাক্রমের দ্বারা সাতিশয় দীপ্যমান, যেমন সকল জ্যোতিঃ-পদার্থ মধ্যে ভাস্কর সর্বাপেক্ষা দীপ্তি-শালী।

তখন সহদেব বৃষ্ণিকুলজাত শ্রীকৃষ্ণকে পরম ভক্তিভরে অর্ঘ্য প্রদান করলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরব কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর ক্রোধের সঞ্চার হোলো। তিনি তিরস্কার করলেন যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মকে। যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিশুপালের ক্রোধ শান্ত হোলো না। তখন ভীষ্ম বল্লেন, সমগ্র নরলোকে এমন কেউ নেই, যিনি গুণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারেন।

'দানং দাক্ষ্যং শ্রুতং শৌর্যং হ্রীঃ
কীর্তির্বুদ্ধিরুত্তমা।
সন্ততিশ্রীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ
নিয়তাচ্যুতে'।।

দান, দক্ষতা, বিদ্যা, শৌর্য, হ্রী অর্থাৎ লজ্জা, কীর্তি, উত্তমা বুদ্ধি, বিনয়, শ্রী, ধৃতি, পুষ্টি ও তুষ্টি এই সকল গুণ গোবিন্দে নিত্য বিরাজিত।

তারপর ভীষ্মদেব রাজগণকে সম্বোধন করে বল্লেন—আপনারা আমাদের এই অর্ঘ্যদান অনুমোদন করুন।

শরতল্পশায়ী ভীষ্মকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবও আদ্যোপান্ত ভক্তিরসে অভিষিক্ত ও ভাব-গাম্ভীর্যে তুলনারহিত। শ্রীকৃষ্ণ যে ভীষ্মদেবের নিকট পরিপূর্ণ ভগবত্তা ও পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ, এই সুদীর্ঘ

ভক্তবাটি পাঠ করলে তা' সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একদিকে পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ, অপর দিকে মহাভারত বা অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যে 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য পাশে বেঁধে দিয়েছিলেন', এটা উনবিংশ শতকের কবির কল্পনা নয়, মূল মহাভারত থেকে এ কথা প্রতিপন্ন করা চলে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের দুটি বিখ্যাত শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন, কখন কি উদ্দেশ্যে তিনি অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। শ্লোক দুটির ভেতর তিনটি কথা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান ও ধর্মসংস্থাপন।

'যখন যখন ঘটে ধর্মের গ্লানি হে ভারত!
অধর্মের অভ্যুত্থান,
আপনারে আমি করিহে সৃজন,
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ'।
(নবীন সেনের অনুবাদ)

মনস্বী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'অবতারবাদ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'কোন ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের, জাতিবিশেষের ব্যবহারে যদি মানবসমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তাহা হইলেই ধর্মের গ্লানি ঘটিয়া থাকে। যাহা ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম; শক্তির সামঞ্জস্য—অবস্থাতেই ধারণার উদ্ভব হয়। * এই সামঞ্জস্যের অভাবের নামই ধর্মের গ্লানি। রোগসকল দেহধর্মের গ্লানি।* পাপ সমাজ-ধর্মের গ্লানি। সাম্যাবস্থার নাশ যাহা হইতে হয়, তাহাই ধর্মের গ্লানি। ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে সাধুর হৃদয় কাতর হইয়া উঠে, সেই কাতর আহ্বানে ভগবান স্থির থাকিতে পারেন না, দুষ্কৃতের নাশ ও সাধুর পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে অবতার-গ্রহণ করিতেই হয়'।

কেউ কেউ বলতে পারেন, এখন তো আমাদের দেশে চতুর্দিকেই দুর্নীতি ও অনাচার, অত্যাচার ও অবিচারের প্রাবল্য, এখনও কি আমাদের দেশে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় নি? পুরাণকার হয়তো উত্তরে বলবেন—হয়েছে কিন্তু কোথায় সেই ভক্তবৃন্দ যাঁদের আকুল ক্রন্দনে শ্রীভগবান ভূভার-হরণের জন্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন? সেদিনও শ্রীমদদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কার, তর্জন ও কাতর ক্রন্দনে শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি,
আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটীরে দেখেছি
মানুষের ঠাকুরালি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া'।

দ্বাপর যুগের শেষে স্বৈরাচারী কংসের অত্যাচারে জননী বসুন্ধরা যখন ক্রন্দনরতা, যখন বহু স্বার্থান্ধ, বলদৃপ্ত ও মদগর্বিত নরপতি ধর্মের আদর্শ থেকে প্রমত্ত, যখন দুর্বৃত্তের পীড়নে সাধুগণ ভীত সন্ত্রস্ত, যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে ভক্তহৃদয় বেদনাবিহ্বল, সেই সময়ে ভূভার-হরণের জন্যে 'অজন্মা সমজনি', যিনি জন্মরহিত, তিনি আবির্ভূত হলেন। দৈববাণী-শ্রবণে ভীত কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, নিরপরাধ ছয়টি শিশুর শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করেছেন। বসুদেব-পত্নী রোহিণীর গর্ভে বলরামের আবির্ভাব হলেও কংসের অত্যাচারের নিবৃত্তি হয় নি, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তারপর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের শুভ অষ্টমী তিথিতে কংসের কারাগারে এক দিব্য শিশুর আবির্ভাব হোলো। তিমিরাবৃতা দুর্যোগ-ময়ী রজনীতে, মথুরাবাসীরা যখন যোগনিদ্রার প্রভাবে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন সেই সময়ে, নন্দ-যশোদার সদ্যোজাতা কন্যা কংসের কারাগারে ও বসুদেব-দেবকীর সদ্যোজাত পুত্র নন্দগৃহে আনীত হোলো। কংস যখন প্রাণভয়ে আবার শিশুহত্যায় প্রবৃত্ত, তখন শুনতে পেলেন নিয়তির মতো অমোঘ সেই দৈববাণী—

'তোমারে বধিবে যে
কোথাও বাড়িছে সে'।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে কোনো স্থানের উল্লেখ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের জনশ্রুতি অনুসারে দৈববাণী হচ্ছে এইরূপ—

'তোমারে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে'।

ভীত কংস মথুরার সকল শিশু-নিধনে প্রবৃত্ত হলেন। কৃষ্ণ-বলরামকে নিধন করার জন্যে তিনি যে সকল কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সকলই ব্যর্থ হোলো। পরে কংসকে নিধন করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জন্ম ও কর্মের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও হরিবংশে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ব্রত ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভীমসেনের দ্বারা দ্বৈরথ যুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করান, শিশুপালকে বহুবার ক্ষমা করেও পরিশেষে ভূভার-হরণের জন্যে তাকে নিধন করেন।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে অদ্বিতীয়, বুদ্ধিনৈপুণ্যে অতুলনীয়, সমরকৌশলে অপরাজেয়, তিনি নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্মসংস্থাপক। যে সূত্রে সমগ্র মহাভারতের ঘটনাপুঞ্জ গ্রথিত, সে সূত্র হচ্ছে—'যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। মহাভারতের উপদেশ হচ্ছে—

'অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি'।।

অধর্মের দ্বারা মানুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অধর্মের দ্বারাই জাগতিক মঙ্গল দর্শন করে, অধর্মের দ্বারাই শত্রু বিনাশ করে, পরিণামে অধর্মের দ্বারাই সে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

নরদেহধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নিয়তির অধীন। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের সভায় গমন করেছিলেন কিন্তু দুর্যোধনের 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' এই মনোভাবের জন্যে তাঁর দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত এই ব্যর্থতার মূলে ছিল দ্রৌপদীর দীর্ঘশ্বাস। আবার কুরুক্ষেত্রের মহাধ্বংস লীলার পরে পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে যে অভিশাপ দেন, তার ফ… যদুবংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। অব… শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, গান্ধারীর অভিশা… একটা উপলক্ষ্যমাত্র,—সুরাপান, ব্যভি… প্রভৃতি অধর্মের ফলে যদুবংশের ধ্ব… একদিন অনিবার্য। শ্রীকৃষ্ণ শুধু নির্লিপ্ত ভাবে নিজের বংশের ধ্বংসলীলা প্রত্য… করেন নি, নিজেও ধ্বংসকার্যে লি… হয়েছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ-এও হয়তো দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরই লীলা। অ… শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংবরণের পর অর্জুন এ… শক্তিহীন হয়ে পড়লেন যে দস্যুদের হ… থেকে যদুবংশীয় নারীদের রক্ষা কর… পারলেন না।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বঙ্কিম… চন্দ্র বলেছেন, আমরা মহাভারতের … মহামানবের ভেতর এমন একটি আদ… দেখতে পাই যাঁর সামনে অপর স… আদর্শ ম্লান হয়ে যায়। একমাত্র শ্রীকৃ… মধ্যেই সকল বৃত্তি সম্যক স্ফূর্তিপ্রাপ্ত … সমঞ্জসীভূত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্বাঙ্গ… স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দ… ও অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসি… বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ… সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য … জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনু… পরিণতিতে সর্বলোকের হিতে রত। … বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বু… বলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, … বলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করি… ছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। … কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া, সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়া…

* আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—ধাতুবৈষম্যই রোগ, ধাতুসাম্যই (বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতাই) আরোগ্যতা। এইজন্যেই

Health is something more than freedom from disease.

যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণের প্রচার করিয়া, তারপর কেবল দণ্ডপণেতৃত্ব-বশতই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, বেদে ধর্ম নহে — ধর্ম লোকহিতে — তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি'।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ শুধু পূর্ণ মানব নহেন, তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ একীভূত করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতার আদর্শ হলেও তাঁর জীবনের ব্রত ছিল মহাভারতের প্রতিষ্ঠা। আমরা বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত পূর্ণতার আদর্শ (ideal of perfection), আর নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতিষ্ঠাতা (nation-builder). রৈবতক কাব্যে গোষ্ঠ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গর্গের ভবিষ্যদ্বাণী :

'তব গোচারণ-ক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা,
সমগ্র মানব জাতি গোপাল তোমার;
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিকহারা
খুঁজি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝংকার'।

তারপর তন্দ্রাগত শ্রীকৃষ্ণের দিব্যানুভূতি :

'শুনিলাম — এক জাতি মানব সকল;
এক বেদ — মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম;
একই ব্রাহ্মণ তার — মানব-হৃদয়;
একমাত্র মহাযজ্ঞ — স্বধর্ম সাধন,
যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ'।

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমরা সকলেই সমস্বরে উচ্চারণ করতে পারি— 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্'।

একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্কারক নয়, ধর্মসংস্থাপক। যিনি ধর্মসংস্কারক, তিনি প্রচলিত ধর্মের ওপর, আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির ওপর আঘাত হানেন, তাঁকে এক হাতে ভাঙতে হয়, আর এক হাতে গড়তে হয়। যিনি ধর্মসংস্থাপক, তিনি প্রচলিত ধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করেও উহাকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেন। খৃষ্ট ছিলেন এক-জন ধর্মসংস্থাপক, তাই তিনি বলেছেন—

'I have not come to destroy, but to fulfil the prophets.

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রাচুর্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বেদের নিন্দা করলেন না, তিনি বললেন — বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মানুষের ভোগবহুল স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কিন্তু মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না। সেই সঙ্গে মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়ও তিনি প্রদর্শন করলেন। বৈদিক যাগযজ্ঞের চেয়ে উচ্চতর ও মহত্তর আদর্শ তিনি স্থাপন করলেন। সেটা হচ্ছে ঈশ্বরার্থে (ভগবানের প্রীতির জন্যে) অথবা লোকসংগ্রহের (লোককল্যাণের) জন্যে নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ব্যক্তিগত কামনা বিসর্জন দিয়ে কর্ম করা। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে অনেকের ধারণা ছিল নারী জাতি, বৈশ্য ও শূদ্র পরাগতি লাভ করতে পারে না। শ্রীভগবান প্রচলিত মতের বিরোধিতা না করেও বললেন,—'আমি সর্ব দেহে বিরাজমান, আমার নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কিছু নেই। যিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, যিনি আমাকে আশ্রয় করবেন, তিনিই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করবেন।

মহাভারতের কর্ণপর্বে দেখি, যুধিষ্ঠির অর্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করলে অর্জুন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিরচ্ছেদনে উদ্যত হন। তখন অর্জুনকে এই মহাপাতক থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে সব উপদেশ দেন, তা এ যুগের মানুষেরও বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেছিলেন—বেদে ধর্ম আছে এ কথা কোন কোন পণ্ডিত বলে থাকেন। আমি এই মতের নিন্দা করি না, কিন্তু বেদে যা নির্দিষ্ট হয়েছে, তাই যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় পালনীয়, এ কথা সত্য নয়। যা প্রজাসমূহকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম; যা অহিংসা সংযুক্ত, তাই ধর্ম। সত্যের স্বরূপও অনেক ক্ষেত্রে দুর্জ্ঞেয়। যার দ্বারা লোক-কল্যাণ সাধিত হয়, তাই সত্য। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যও মিথ্যা আবার মিথ্যাও সত্য হয়।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন, লোকশ্রেয়ই ধর্ম। অতএব 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়' যা করা যায়, তা' ধর্ম। জন স্টুয়ার্ট মিলের অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখবিধান (greatest good of the greatest number) উৎকৃষ্ট চরিত্রনীতি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' শ্রীকৃষ্ণকথিত ধর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন— 'আদর্শ পুরুষ কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, কিন্তু যেখানে মিথ্যাই সত্য, সেখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা বলেন'।

সকলেই জানেন, এই মন্তব্যকে উপলক্ষ্য করে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের অসিযুদ্ধ নয়, তথাকথিত মসীযুদ্ধ ঘটেছিল।

পার্থসারথির উপাসনা ও ধ্যানের ভেতর দিয়ে একটা বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন জাতি গড়ে উঠতে পারে।

ভারতবর্ষের বৈষ্ণবরা কিন্তু প্রধানত গীতার শ্রীকৃষ্ণকে নয়, গীতের শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতের আলোয়াড় সম্প্রদায় মধুরভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করেছেন। লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে লিখেছেন—
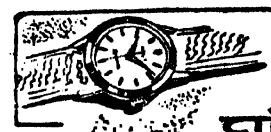
'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

মধুর রসের উপাসক বল্লভাচার্য 'মধুরাষ্টক' রচনা করেছেন। শ্রীমদ্-ভাগবতেও বলা হয়েছে — রম্য তিনি, রুচির তিনি, ভক্তের নিকট নব-নবায়মান তিনি, মনের নিত্য মহোৎসব তিনি, শোকার্ণবশোষণ (যিনি শোকসমুদ্রকে শুষ্ক করেন) তিনি। অন্যত্র বলা হয়েছে—তাঁর কথা হৃদয় ও কর্ণের পক্ষে রসায়নস্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমদ্-ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতির অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য ও লীলা-মাধুর্যের বর্ণনা করেছেন।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদন মোহন।
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লৈয়া গোপীগণ॥

* * *

নিজ সম সখা সঙ্গে গোগণ-চারণ-রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
অশ্রু বহে, পুলক কম্পধার' ইত্যাদি।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে আমরা ভক্তি-নম্রচিত্তে প্রণাম করি ধর্মসংস্থাপনকারী পার্থসারথিকে, প্রণাম করি বৃন্দাবনবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে। যাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, মাধুর্যও অনন্ত, যিনি দুর্বৃত্তের দমনকারী হয়েও অখিলরসামৃতসিন্ধু ও সকল কল্যাণ-গুণের আকর, তাঁর শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করে বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

'হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে'॥

অন্য ভুবন ॥ ৮ ॥

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

কাগজ আর কালির গভীরে একটা মুখ বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম. শরতের সকালের মতো স্বচ্ছ, শিশিরবিন্দুর মতো কোমল, বর্ষাভেজা ঘাসের মতো সবুজ দুটি চোখ মেলে মনীষা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেতারের তারের মতো তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠছে। কি যেন বলতে চাইছে সে। অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি না। নিস্তব্ধতার গভীরে কান পেতেও আমি শুনতে পাচ্ছি না। কেবল যেন একটা ভাসা-ভাসা শব্দ। শব্দের গভীরে যেন আরও, আরও অনেক শব্দ।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। না। কোন শব্দই আমার কাছে স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট অতীত। ঘসা কাঁচে চোখ রেখে দেখার মতো কিছু ছবি। কপোতাক্ষ তীর... বেলা গাছ. একজোড়া টিয়া পাখী...সবই আমার কাছে কেমন কেমন যেন হারিয়ে যাওয়া, ডুবে যাওয়া দৃশ্য। চোখ বন্ধ করলে অস্পষ্ট, চোখ খুললে শূন্যতা।

এই দুটি চোখ; মনীষার চোখ। আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ভাবলাম, ভাবলাম, আর ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি ধরে ধরে অনেকটা পিছনে নেমে এলাম।

মনীষা আব্দার ধরলো তাকে নিয়ে যেতে হবে।

আমি প্রতিবাদ করলাম, তোর কি মাথাখারাপ?

কেন? ছোট্ট প্রশ্ন

আমরা সব ছেলেরা যাচ্ছি। তাছাড়া ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তোকে নিয়ে যাবো কি করে? আমি বোঝাতে চাইলাম।

ভারি তো সব ছেলে! তোমাদের চেয়ে আমার অনেক সাহস আছে। না, আমাকে নিতেই হবে। মনীষা নাছোড়বান্দা।

অগত্যা মনীষার মাকে বলতে হলো।

মনীষার মা অর্থাৎ অনুমাসী প্রথমটা আমতা-আমতা করলেন। কিন্তু মনীষা মার গলা জড়িয়ে ধরে আব্দার সুরু করলো, সতুদা তো আছে। কিছু হবে না।

অনুমাসী আমার দিকে তাকালেন।

আমার কি হলো বলতে পারবো না। আমি ফস করে বলে ফেললাম, হ্যাঁ, আমি তো আছি।

মনীষা তার কৈশোরের চোখদুটি তুলে আমার দিকে তাকালো। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

অনুমাসী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সাবধানে যেয়ো। তোমাদের সব বিশ্বাস নেই। নিজেরা নৌকো বেয়ে যাওয়ার কি দরকার বুঝতে পারি না। মদনকে সঙ্গে নিলে পারতে।

মদনদা? বলে হো-হো করে হেসে উঠলো মনীষা।

কেন? মদনের নাম শুনে হাসবার কি আছে? বলে অনুমাসী মনীষার দিকে তাকালেন। মনীষার চোখে-মুখে তখনও হাসির ঢেউ ভেসে ভেসে উঠছে।

আমি জানি মুখে একথা বললেও অনু-মাসীও মনে মনে হাসছিলেন। অনুমাসীর চোখের কোণে সেই হাসির চিহ্ন যেন ফুটে উঠছিল।

আমি মুখ টিপে-টিপে হাসছিলাম।

মদনদা আমাদের বাড়িতে কাজ করে। জাতে ওড়িয়া। কিন্তু এখন পুরোমাত্রায় বাঙালী আমরা জ্ঞান হয়ে অবধি মদনদাকে কোনদিন দেশে যেতে দেখিনি।

মদনদার চোখ দুটি ট্যারা। সামনে তাকালে মনে হয় পিছনে তাকাচ্ছে। পিছনে তাকালে মনে হয় পাশে তাকাচ্ছে। সামনের দুটি দাঁত উঁচু কোদালের মতো।

মনীষা উঠতে-বসতে মদনদার পিছনে লাগে। কিন্তু আশ্চর্য! মদনদা একবারের জন্যেও রাগ করে না। বড়জোর উঁচু দাঁতের ফাঁকে মিষ্টি হেসে বলে, মেয়েটাকে যে ঘরে নেবে, তার কপালে অশেষ দুঃখু।

মনীষা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, তুমি নেবে মদনদা?

এরপর মদনদার পিছু-হটা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

যাহোক, মদনদার প্রসঙ্গ চাপা পড়লো।

মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দশ মাইল পথ। নদীতে ভাঁটা। আমাদের উজান বেয়ে যেতে হবে। আমরা তিন বন্ধু। আমি, শিবু, পলা। নিজেরা নদীতে ভেসে আসা নৌকো ধরেছি। এখন তার মালিক আমরাই। দশ দিন হয়ে গেছে। কেউ কোন খোঁজ করেনি। অন্য গাঁয়ে বন্ধুর বাড়ী যাবো। শখ, নিজেদের নৌকোয় নিজেরা যাবো। তার মধ্যে মনীষার আব্দার। মনীষা সঙ্গে জুটেছে।

আমি বৈঠায় বসলাম। ওরা দাঁড়ে বসলো। আর আশ্চর্য, মনীষা সমান তালে ওদের সঙ্গে দাঁড় বেয়ে চললো। শিবু, পলা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে দাঁড় ছাড়লো। কিন্তু মনীষা একবারের জন্যও নয়। উজানে সমান তালে দাঁড় ফেলতে লাগলো।

আমি হেসে বললাম, ধন্যি মেয়ে বাবা!

মনীষা হাত দিয়ে আমার দিকে খানিকটা জল ছুঁড়ে দিয়ে বললো, কে মেয়ে? আমি না ওরা?

শিবু আর পলা লজ্জা পেয়ে আবার দাঁড়ে হাত লাগালো।

একটু পরে আমরা জোয়ার পেলাম। ওরা দাঁড় ছাড়লো। আমি চুপচাপ হাল ধরে বসে থাকলাম। নদীর স্রোতে আপন মনে ভেসে চললো আমাদের নৌকো।

মনীষা নৌকোর অন্যমুখে শরীর এলিয়ে দিয়ে দুই হাত মাথার নিচে রেখে আকাশের দিকে তাকালো। আকাশে তখন ভাসা-ভাসা কালো মেঘ। আমার মনে হলো, বৃষ্টি হতে পারে।

মনীষা গান ধরলো, সুরের গুরু, দাও হে সুরের......

বাতাসে-বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো মনীষার গানের সুর। আর আমরা তিনজন নীল চোখের মতো নদীর দিকে তাকিয়ে মনীষার গানের মাঝে ডুবে গেলাম।

ফিরতে সত্যিই আমাদের রাত হয়ে গেল। আর ফিরবার সময় বন্ধুদের বাড়ি থেকে একজোড়া টিয়াপাখি নিয়ে এলো মনীষা। দুটি টিয়াপাখীকে বুকের মাঝে ধরে নৌকোর মাঝে চুপচাপ বসে থাকলো মনীষা। আমি লক্ষ্য করলাম, গভীর ভালবাসায় ছোট্ট হাতে টিয়াপাখীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মনীষা।

নদীতে ভাঁটা। আমরা স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছি।

আকাশে ঘন কালো মেঘ। নদীতে মিশমিশে কালো অন্ধকার। চারিদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা। শিবু, পলা চুপচাপ বসে আছে। ঝড়-বৃষ্টির আশংকা করছে সবাই। অনেকটা পথ আমাদের যেতে হবে। পথের মাঝে বৃষ্টি নামলে বিপদের সম্ভাবনা। আমার চিন্তা হচ্ছিল মনীষার জন্য। অনুমাসী আমার কথায় ছেড়ে দিয়েছে। ভালোয়-ভালোয় কোলে ফিরিয়ে দিতে পারলে হয়।

আশঙ্কা সত্যি হলো। ঝড় নয়। একটু পরে মুসলধারে বৃষ্টি নামলো। আমি গায়ের জামা খুলে মনীষার দিকে ছুঁড়ে দিলাম, ভালো করে মাথা ঢেকে নে।

কিন্তু নিজের দিকে মনীষার বিন্দুমাত্র নজর নেই। টিয়াপাখীকে নিয়ে সে ব্যস্ত। আমার জামা দিয়ে সে ভাল করে টিয়াপাখী দুটোকে ঢেকে কোলের মাঝে চেপে ধরলো।

আমি আবার বললাম, মনীষা, মাথাটা ঢেকে নাও। তোমার অসুখ হবে।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো তার কানে কথাকটি ঢুকলো বলে আদৌ মনে

'মনীষার দিকে ছুঁড়ে দিলাম'

হলো না। নিজের শরীরটাকে বেঁকিয়ে, সমস্ত পিঠের মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা সহ্য করে সে টিয়াপাখী দুটিকে আরও নিরাপদ করতে চাইলো।

আমি আর কথা বললাম না। ওর ভালবাসার ক্ষমতায় শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হতে লাগলাম।

মনীষার সত্যিই অসুখ হলো। প্রচণ্ড জ্বর। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার রায় দিলেন, নিউমোনিয়া।

আমি নিজেকে অপরাধী মনে করলাম। আমার বার-বার মনে হতে লাগলো, মনীষার অসুখের জন্যে আমিই দায়ী।

মনীষার শয্যার পাশে আমি বসে থাকতাম। কতো রাত জাগতাম! অনুমাসী আমার মাথায় হাত দিয়ে বলতেন, সতু, তোমার সামনে পরীক্ষা। তুমি বাড়ি যাও।

কি জানি আমি কিছুতেই বাড়ি যেতে পারতাম না। পিছন থেকে কে যেন আমাকে টানতো। আমি কিছুতেই যেতে পারতাম না। মনীষার দুজন একজোড়া চোখ যেন পিছন থেকে আমাকে টেনে রাখতো।

মনীষার আদরের টিয়াপাখীর দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। মনীষাকে কথা দিয়েছিলাম। মনীষা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতো, সতুদা, আমার টিয়াপাখী ভালো আছে তো?

আমি মনীষাকে আশ্বস্ত করতাম।

আস্তে আস্তে মনীষা ভালো হয়ে উঠলো। একজোড়া টিয়াপাখীর দায়িত্বভার তার উপর অর্পণ করে আমি পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

পড়ার সময় মনীষা আমাকে খুব বিরক্ত করতো না। শুধু মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটতো, যা পড়ার ধুম। তুমি একবার একটা কেলেঙ্কারী না করে শুনবে না সতুদা!

আমি শুধু হাসতাম। কোন কথা বলতাম না।

তারপর পরীক্ষা হয়ে গেল। আমার অফুরন্ত অবসর। কপোতাক্ষ তীরের সেই বাবলাগাছের নীচে বসে বসে আমি নদীর কলতান শুনতাম। কি জানি নদী যেন কেন আমাকে ডাকতো। নদীর দিকে তাকিয়ে আমার নিজেকে কেমন যেন বিরাট, বিরাট মনে হতো।

মনীষা আমার পাশে এসে বসতো। আর আমাকে কতোরকমের প্রশ্ন করতো। মনীষার সব প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিলো না।

মনীষা একদিন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সতুদা, তুমি বড়ো হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে এসো। কতো রকমের দেশ, কতো রকমের মানুষ। আমার বইতে পড়তে খুব ভাল লাগে।

তুমিও তো যেতে পারো: আমি মনীষার চোখে চোখ রেখে বলতাম।

ধ্যেৎ, তোমার মাথাখারাপ! বলে মনীষা অন্যদিকে মুখ ফেরাতো।

আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি কপোতাক্ষ তীরে, বাবলাগাছের নিচে ব

মনীষাকে একদিন বলেছিলাম, আমি তোমাকে সারা পৃথিবী দেখাবো মনীষা!

দুজনেই তখন আমরা ছেলেমানুষ। যে কথা বলতাম তার পুরো অর্থ বুঝতাম না। সব কিছুর অর্থ বোঝার বয়স তখনও হয়নি।

আজ যখন অর্থ বোঝার বয়স হয়েছে, অর্থ বুঝে যখন কথা বলি, অর্থ বুঝে যখন কথা শুনি, তখন আমি কোথায়, মনীষা কোথায়। কোথায় সেই কপোতাক্ষ তীর, কোথায় সেই বাবলাগাছ, কোথায় সেই একজোড়া টিয়াপাখী।

অতীতের মাঝে ডুব দিয়ে আবার আমি বর্তমানে এসে উঠলাম। হাতে একটুকরো চিঠি। মনীষা লিখেছে: ইচ্ছে করলে একবার দেখা করতে পারো। খুশি হবো।

কিন্তু, কি করে মনীষা আমার ঠিকানা জানলো। কতো বছর কেটে গেছে। মনীষার কোন খবর তো আমি রাখি না। পুরো পৃথিবী না হলেও অনেক দেশে আমি ঘুরে এসেছি। মনীষাকে যে-কথা দিয়েছিলাম, তাতো একবারের জন্যও মনে পড়েনি। পৃথিবীতে মনীষার অস্তিত্বও তো একবারের জন্যও অনুভব করিনি। জনপদের পথে পথে শুধু অনুভব করেছি নিজের অস্তিত্ব, নিজের ভবিষ্যৎ।

নিজেকে হঠাৎ কেমন যেন খাটো মনে হলো। বৃহৎ পৃথিবীর মাঝে নিজেকে মনে হলো ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। মনে হলো, তুচ্ছতা আমার সমস্ত দেহে-মনে গোপনে-গোপনে আশ্রয় করেছে। আমি কোনদিন তা বুঝিনি। বোঝবার চেষ্টা করিনি।

জীবনকে নিক্তিতে মেপে মেপে ওজন করেছি। অর্থ, যশ, খ্যাতি, সম্ভাবনায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি। সময়ের মতো প্রচন্ড গতিতে শুধু চলেছি আর চলেছি। বিয়ে করেছি। সংসার করেছি। কলকাতা শহরের কোলাহলে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কোলাহলের পেছনেও যে অন্য কিছু আছে তা ভাববার কোন অবসর হয়নি কোনদিন।

মনীষার এই ছোট্ট চিঠি আজ যেন আমার আমাকে আঙুল উঁচিয়ে চিনিয়ে দিলো। অতীতকে চোখের সামনে বর্তমানের মতো স্পষ্ট করে দিলো। অতীত-বর্তমান সব মিশে একাকার হয়ে গেল।

আর সত্যিই, তখনই আমি চমকে উঠলাম।

স্টেশনে নেমে মনীষার বাড়ি চিনতে আমার অসুবিধা হয়নি। চিঠিতে ঠিকানা দেওয়া ছিলো। রিক্সাওয়ালাকে বলতেই সে সোজা মনীষার বাড়ির সামনে নিয়ে আমাকে নামিয়ে দিলো।

ছোট্ট একতলা বাড়ি। সামনে এক ফালি বারান্দা। দরজায় পর্দা ঝুলছে। গাঢ় সবুজ রঙের পর্দা। টিয়াপাখীর রঙের মতো। মনীষার নাম ধরে ডাকতে কি জানি কেন আমার খুব খারাপ লাগছিল। রিক্সাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। গভীর নিস্তব্ধতা। বাড়ীতে কোন মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

আমি কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা চেনা কণ্ঠস্বর সুদূর অতীত থেকে যেন আমাকে ডাকলো, আরে, সতুদা, দাঁড়িয়ে আছো কেন? উঠে এসো।

আমার চিনতে একটুও অসুবিধা হলো না। মনীষা আমাকে ডাকছে। অনেকগুলো বছর যেন চোখের সামনে থেকে ভেসে গেল। আমার মনে হলো, কপোতাক্ষ তীরের সেই বাবলাগাছের নিচে দাঁড়িয়ে মনীষা যেন আমাকে ডাকছে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম।

মনীষা আমার সামনা-সামনি বসলো। আমি কোন কথা বলতে পারছিলাম না। দুই চোখ মেলে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মনীষা হাসলো, কি দেখছো অমন করে?

আমি ফস করে বলে ফেললাম তোমাকে!

আর মনীষা তখনই তার চোখের পাতা দুটি নিচের দিকে নামিয়ে নিলো।

তারপর সারাদিন মনীষার বাড়িতে থাকলাম। আর দুজনে মুখোমুখি বসে অতীতের দিনগুলোকে সামনে ধরে-ধরে খেলা করলাম। অতীত সত্যিই মধুর। অতীতকে কাছে টানতে সত্যিই ভালো লাগে। অন্তত সেই মুহূর্তে এই কথাটুকু আমি অনুভব করেছিলাম।

মনীষা বিয়ে করেনি। কেন, আমি জানি না। মনীষাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। কেন, তাও বলতে পারবো না। নিজের মাঝেই জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মনীষা। অন্তর্মুখীনতায় সে এখন আত্মস্থ।

কলকাতা মনীষার ভালো লাগে না। কলকাতার কোলাহলে সে নাকি বড়ো ক্লান্ত। কলকাতা থেকে দূরে শহরাঞ্চলের এক কারখানায় তাই সে চাকরী নিয়েছে। টেলিফোন অপারেটরের চাকরি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ চাকরি তোমার ভালো লাগে মনীষা?

চাকরি, চাকরি। এতে ভাল লাগার কি আছে! তবে খারাপ লাগে বলে তো মনে হয় না। মনীষা জবাব দিলো।

ব্যবহার?

খারাপ তো দেখি না।

বড্ড বোরিং, তাই না?

জীবনটাই তো বোরিং। বলে মনীষা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললো।

আমি চুপ করলাম। বুঝলাম, আর প্রশ্ন করা সমীচীন নয়। না জেনে, না বুঝে, মনীষার মনের গভীরে কোথাও হয়তো আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মনীষা হাসলো, কেন চিঠি লিখলাম, জিগ্যেস করলে না তো।

কি জিগ্যেস করবো বলো!

হঠাৎ এতো বছর পরে তোমাকে চিঠি লিখলাম কেন?

এমনি! মনে পড়েছে তাই। আমি বললাম। এছাড়া আর কিছু আমার জানা ছিল না।

এমনও তো হতে পারে কোন কাজ আছে! মনীষা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। যেন আমার সমস্ত ভিতরটা সে দেখতে চাইছে।

আমি ওর তীক্ষ্ম চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, হতে পারে।

আর সংগে সংগে মনীষা হো-হো করে হেসে উঠলো, যতোই তোমার যশ-খ্যাতি হোক না কেন সতুদা, তুমি এখনও ঠিক আগের মতো ছেলেমানুষ আছো।

মনীষার কথার কোন অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আচ্ছা, পরে জানাবো। বলে মনীষা আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, রাত হয়েছে, এবার আমি উঠি। আটটায় বোধহয় ট্রেন।

মনীষা বাধা দিলো না।

আমি উঠে এলাম।

তারপর অনেকদিন আমি মনীষার কাছে গিয়েছি। কেন সে আমাকে চিঠি দিয়েছিল জানায়নি। আমিও জানতে চাইনি।

কেন, ঠিক আমি নিজেও জানি না। হয়তো সে নিঃসঙ্গ, তাই। হয়তো আমিও!

—সত্যকাম

(উপন্যাস)

।। সাত ।।

তুলসীদাস নেই। একা অণিমা কার ভরসায় থাকে, তারণ তাই কাশীপুরে থেকে গেলেন। অনেক রাত্রে তাপস ফিরল, তার কাছে কিছু কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। শুক্রবার অবধি দেরি না করে ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র তুলে নিয়ে তুলসীদাস আজ দুপুরেই রওনা হয়ে পড়েছে। দরজায় তালা দিয়ে চাবি নিচের ভাড়াটেদের কাছে দিয়ে গেছে। বলে গিয়েছে, মালগুলো বুক করে আসি। ফিরতে যদি কিছু দেরি হয়—বাচ্চা নিয়ে বাইরে বসে থাকবে কেন, চাবিটা দিয়ে দেবেন ওদের। বিবেচক ব্যক্তি, সন্দেহ কি।

পরের দিন তারণকৃষ্ণ ফিরলেন। রঞ্জু সহ অণিমাও এসেছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। শঠ নৃশংস নরাধম যত কিছু বলো, কোন বিশেষণে তুলসীদাসের পরিচয় হয় না। লোকটা ঝানু অভিনেতা। ইদানীং বাইরে দেখাচ্ছিল স্ত্রীর ভালবাসায় গদগদ, কিন্তু সেই হিড়িম্বার সঙ্গে সম্পর্ক একটা দিনের তরেও ছাড়ে নি। কোন ফাঁকে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করে আসত। অণিমার চুড়ি বিক্রির টাকা বেশ কিছু হাতে রয়েছে, এ মাসের বাড়িভাড়াটাও পরশু আদায় হয়ে গেছে—আপাতত ভাবনা কিছু নেই। আগে থেকে ভেবেচিন্তে প্লান করা ছিল—ভেগে পড়েছে অণিমার বাপের বাড়ি যাবার সুযোগ নিয়ে। কত দোকান ঘুরে ঘুরে পছন্দের শাড়িজামা কিনেছিল, নতুন জায়গায় নতুন সমাজে বাহার করে বেড়াবে—একটিও তার রেখে যায় নি। শাড়ি পরিয়ে বিধবাকে বউ পরিচয়ে নিয়ে রাখবে। একটা মহৎ দয়া করেছে—রঞ্জুর জামাগুলো নিয়ে যায় নি। ছেলে কেঁদে কেঁদে খুন হবে, এ জিনিস ভেবে নিশ্চয়ই নয়—নিতান্ত অনাবশ্যক বলেই।

চিঠিও রেখে গেছে খাটের উপর কাপ চাপা দিয়ে : আমার খোঁজ করিও না, করিলেও লাভ হইবে না, সময় হইলে সংবাদ পাইবে।

লুধিয়ানার চাকরি খুব সম্ভব ধাপ্পা। সরল বিশ্বাসে ভাল করে তাকিয়েও দেখলাম না তখন, গেছে কোন চুলোয় ঈশ্বর জানেন—

হঠাৎ অণিমা ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠে : না, এতবড় শয়তানি ঈশ্বরের জানিত নয় কখনো। তাহলে ওদের মাথায় বাজ পড়ত।

তরঙ্গিণীর সঙ্গে হচ্ছিল। রঞ্জু অবোধ চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে, মায়ের চিৎকারে ভয় পেয়ে সে কেঁদে ওঠে। কোন দিকে ছিল পূর্ণিমা—আজ সে অফিসে যায় নি—ঝাঁপিয়ে পড়ে রঞ্জুকে কোলে তুলে নিল।

অণিমা মাথার চুল ছিঁড়ে চেঁচিয়ে শাপশাপান্ত করছে : মাথার উপর যদি ঈশ্বর থাকো, রেল-কলিশন হয়ে দুটোয় যেন পিণ্ডি চটকে থাকে। খবরের কাগজে কাল মজা করে পড়ব।

থাম্ দিদি, কী হচ্ছে!

কণ্ঠস্বর ভয়ংকর, অণিমা থতমত খেয়ে গেল। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে পূর্ণিমা মুখোমুখি দাঁড়াল। সে মুখে তাকিয়ে অণিমা ভয় পেয়ে যায়। ভিন্ন এক চেহারা—ত্বকই নেই যেন, ভাবলেশহীন মুখোশে মুখ ঢেকে আছে। বলে, রেল-কলিশন কেন চাস, এমনিই সে লোক মরেছে। মনে আনবিনে তার কথা। রঞ্জুকেও এমন করে তুলবি, বড় হয়ে ঘৃণায় বাপের নামটা পর্যন্ত মুখে আনবে না। পুরুষের অত্যাচারে মেয়েমানুষের কান্নাকাটি—সে এক যুগ ছিল, তোর দুঃখে আরও অনেকে ঘিরে এসে ফোঁত-ফোঁত করত। এখন হবি তামাসার পাত্র। তোর যখন কোন দোষ নেই, প্রাণপণে স্ত্রীর কর্তব্য করে গেছিস, কাঁদতে যাবি কিসের জন্য শুনি, কোন অনুতাপের যন্ত্রণায়? তুই এমনি ভাবে সরে পড়লে পুরুষটা যা করত, ঠিক সেই জিনিস করতে হবে তোকে।

কিন্তু পেট চলবে কিসে, বাচ্চা মানুষ করব কেমন করে?

ঘৃণা উপছে পড়ে পূর্ণিমার কণ্ঠে : বলিস নে, বলিস নে—কত রোজগেরে ছিল যেন সে মানুষ! আগে যেমন চলত, তাই চলবে। নিচের তলার ভাড়াটে রয়েছে—আর আচমকা আমার তো তিরিশ টাকা মাইনে বৃদ্ধি হল, ঐ টাকাটা সম্পূর্ণ আমাদের রঞ্জুর। চলে গেছে আপদ গেছে, একটা মুখের তিন-চার বারের খাওয়া কমেছে। আরও ভাল চলবে দেখিস তোর সংসার।

ঠাণ্ডা মাথায় তারপর শলাপরামর্শ হল। একলা অণিমা থাকতে পারে না, সর্বক্ষণের মানুষ তরঙ্গিণী আপাতত গিয়ে থাকুন। গাউটের ব্যথায় প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, কিন্তু সংসারে নজর রাখতে পারবেন, রঞ্জুকে ধরতে পারবেন দায়ে-দরকারে। তরঙ্গিণী রইলেন, আর এরাও সব যাওয়া-আসা করবে।

আর খুব কড়া সুরে পূর্ণিমা ধমকে দেয় : কান্নাকাটি করবিনে দিদি, খবরদার। কেউ জিজ্ঞাসা করলে ভাঁওতা দিতে পারিস : চাকরিস্থলে একলা চলে গেছে—বাসা পেলে নিয়ে যাবে। আর মনে মনে জানবি বিধবা হয়েছিস তুই। তা-ও নয়—কুমারী মেয়ে—আমারই মতন, ঐ লম্পটের সঙ্গে কোনদিন তোর বিয়ে হয় নি।

হস্টেলে গিয়ে উঠল তাপস। বাড়ি থেকে কলেজ করা এতদিন যা হোক করে চলেছে, আর এখন উপায় নেই। ক্লাসের লেকচার দিনমানে—ঘড়ির কাঁটার হিসাবে, কিন্তু ডিসেকসন ও হাসপাতালের ডিউটিতে দিনরাত্রি সময়-অসময়ের বিচার নেই। বেওয়ারিশ মানুষ মরে গিয়ে লাস হয়ে কখন যে টেবিলে উঠবেন আর ছাত্রেরা বিশেষ রকমের পক্ষীপালের মতো চতুর্দিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিড় করে আসবে—আগে থাকতে প্রায়ই হদিস পাওয়া যায় না। কলেজের কাছাকাছি হস্টেল করেছে সেই জন্য। একাধিক আছে। নিচের ক্লাসে যা-হোক করে চলে যায়, কিন্তু খানিকটা উঁচুতে উঠে হস্টেলে আস্তানা না নিয়ে গত্যন্তর নেই। কর্তৃপক্ষের আইনও তাই।

তাপস অতএব হস্টেলে চলে গেল। মাসে মাসে এই ভারী-ওজনের খরচা।

কথাটা পূর্ণিমা মুখাগ্রে আনে নি, তারণ তবু গায়ে পড়ে ঝগড়া করেন : গরীবের ঘোড়া-রোগ। ভাইকে ডাক্তার বানাবার শখ। ঠেলা বোঝ্ এবারে। মাসে মাসে নিদেনপক্ষে ষাট-সত্তর টাকা, বই-মাইনে তার উপরে। এখন নাক কাঁদলে হবে না, যেখান থেকে পারিস এনে জোটাবি।

পূর্ণিমা বলে, নাক কাঁদতে তোমার কাছে কবে গেলাম বাবা?

আরও চটে তারণ বললেন, কাঁদলেই বা পাচ্ছি কোথা আমি? রিটায়ার করে বসে আছি, অক্ষম মানুষ, গায়ে এতটুকু তাগত

নেই যে দোকানে একটা খাতা-লেখার কাজ জুটিয়ে পাঁচশটে টাকা এনে দিই। ঠুকঠুক করে চলে বেড়াই সে কেবল আধসের দুধ আর তিন গুলি কালাচাঁদের জোরে। ইচ্ছে হয়, বন্ধ করে দে—তাতে লোকসান বই লাভ হবে না। আফিং বিনে একটা দিনও বাঁচব না—ঐ খরচা বাদ দিয়ে পেন্সনের ক'টা টাকা তবু এখনো হাতে পাস, সেই পাওনাটুকুও বন্ধ হবে কিন্তু।

পূর্ণিমা বলে, তুমি বড় কুঁদুলে হচ্ছ বাবা। আফিং কেন বন্ধ হবে? আর পেন্সন থেকে একটি টাকাও তোমায় দিতে হবে না, আগে থেকে তো বলাই আছে।

কোন তালুক-মুলুক আছে তোর শুনি। মচ্ছবের খরচ কোথা থেকে চালাবি?

বাবা তুমি থামবে কিনা বলো। নয়তো আমি একমুখো বেরিয়ে পড়ব—

তাড়া দিয়ে উঠল পূর্ণিমা : তাপস আজ টাকা নিতে আসবে, এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে। শুনতে পেলে রক্ষে থাকবে না। মাথা খুঁড়বে পায়ের উপর পড়ে, হস্টেলে আর যেতে চাইবে না। এদ্দিন ধরে এত টাকা খরচ হল, সবশুদ্ধ বরবাদ।

এ তাড়ায় সবাই জব্দ। চুপ করে গিয়ে তারণও সরে পড়লেন। এবার কথাবার্তা কুসুমকে ডেকে। ঝি হলেও কুসুম বাড়িরই লোক। পূর্ণিমার সবে কথা ফুটেছে সেই সময় সে এবাড়ি এসেছে, তাপসকে সে-ই একরকম মানুষ করেছে। তারণ বললেন, তুই চলে যা কুসমি, আর তোকে রাখতে পারছি নে।

কুসমি ভ্রূক্ষেপ করে না : এদ্দিনের পর কোথায় এখন কাজ খুঁজে বেড়াব? মাইনে যবে সুবিধা হয় দিও। না হয় দিও না একেবারে।

কিন্তু মাইনে বাদ দিয়েও এ বাজারে একটা মানুষ পোষায় অঢেল খরচা—বেটি একবারও সেটা ভাবছে না। আর বিনি-মাইনের খাটানো—কুসমি বললেই তো হবে না—পূর্ণিমার সে জিনিস সইবে না কিছুতেই।

তারণ এবারে অন্যদিক দিয়ে যান : রিটায়ার করে অবধি কাজ খুঁজে পাইনে, দাবা-পাশা খেলে খেলে দেহ জখম হয়ে গেল। ডাক্তার পইপই করে বলছে, খাটাখাটনি না হলে ছ'টা মাসও আর বাঁচব না। সংসার তো এই—এর মধ্যে কাজ আমি করব, পুনি করবে, আবার তুইও থেকে যেতে চাস—এত কাজ কোথায় আছে বল্। মাইনে নিস আর না-ই নিস, হাত-পা কোলে করে ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে দিনরাত চব্বিশঘণ্টা বিনি কাজে বসে থাকতে হবে। পারবি সে জিনিস?

কুসুম অগত্যা বিদায় নিল। পাড়ার মধ্যেই রয়ে গেল। পুরানো বিশ্বাসী মানুষটাকে পূর্ণ মুখুজ্জে ছাড়লেন না, নিজের বাড়ি বহাল করে নিলেন। তবু ভাল, যাওয়া-আসায় ওদের সঙ্গে শতেকবার চোখের দেখা হবে।

ইতিমধ্যে আর এক বিপদ।

মাসের গোড়ার দিকে তারণ অফিসে গিয়ে পেন্সন নিয়ে আসেন। এদিনও গেছেন। টাকা পকেটে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। অণিমার পরিণামে মনে দাগা লেগেছে, সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক থাকেন—এমন প্রিয় দাবা খেলাতেও মন বসে না, প্রায় ছেড়ে দেবার মতো। তার উপরে আজ আসবার সময় ট্রামের ভিড় দেখে খররৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে এত পথ চলে এসেছেন। কারণ যা-ই হোক, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল, পড়ে গেলেন তিনি সিঁড়ির উপর। খাড়া সিঁড়ি—এ-ধাপ থেকে ও-ধাপ কখনো চিত কখনো কাত, গড়াতে গড়াতে একেবারে ভূঁয়ের উপর। সদর দরজায় ঠিক সামনেটায়। সম্বিত হারিয়েছেন, থেঁতলে কেটেকুটে গেছে সর্বাঙ্গ।

হৈ-চৈ পড়ে গেল। মস্তবড় বিল্ডিং, দশ-বারোটা কোম্পানির অফিস এক বাড়িতে, অগুন্তি লোকের আসা-যাওয়া। রাস্তা থেকে পথ-চলতি লোকও উঠে আসছে। লোকে লোকারণ্য।

চেতনা পেলেন ক্ষণপরেই। ইতিমধ্যে বালতি বালতি জল এনে মাথায় ঢেলেছে, মুখে ছিটিয়েছে। জলে জলময় চতুর্দিক, জামা-কাপড় ভিজে জবজবে। খাতা-বই রুমাল-তোয়ালে যে যা হাতের মাথায় পেয়েছে তাই দিয়ে বাতাস করছে। ভিড়ের মধ্যে দৈবাৎ ডাক্তারও একটি জুটে গিয়েছেন, তাঁর নির্দেশ মতো সেবাকর্ম হচ্ছে। চোখ খুলতেই সেই ডাক্তার হাঁ-হাঁ করে ওঠেন : উঠতে যাবেন না—খবরদার! হাড়গোড় ভেঙেচুরে কদ্দুর কি হল যতক্ষণ না সঠিক বোঝা যাচ্ছে, যেমন আছেন পড়ে থাকুন।

কিন্তু অবস্থা যেমনই হোক, ভিড়ের মধ্যে এমনিভাবে কতক্ষণ পড়ে থাকা যায়? তারণ মিনমিন করে বলেন, দয়া করে কেউ আপনারা ট্যাক্সি ডেকে দিন—বাড়ি চলে যাই।

তা ছাড়া করবারও কিছু নেই। এমন তো আকছার হচ্ছে—মরে তো বাড়ি গিয়েই মরুক, বাঁচে তো বাঁচুক গিয়ে সেখানে।

ট্যাক্সিতে কাত হয়ে বসে তারণের মনে হচ্ছে, কই এমন-কিছু আঘাত লেগেছে বলে তো ঠেকে না। ডাক্তারটা খামোকা ভয় দেখিয়ে দিল। ট্যাক্সি-ভাড়ার অপব্যয়টা নিশ্চয় রোধ করা যেত, বাসে চেপে বাড়ি চলে যেতেন। বাস-স্টান্ড অবধি পায়ে হেঁটে গিয়েই বাসে ওঠা চলত।

গলির মুখে নেমে করলেনও ঠিক তাই। গলিতে গাড়ি ঢোকে না— হেঁটে হেঁটে চললেন। হরি হরি, কয়েক পা যেতেই যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। গোড়ায় খাড়া হয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, তার পরে পাশের বাড়িটার দেয়াল ধরে ধরে। তা-ও হল কই, বসে পড়লেন রাস্তার উপর। যন্ত্রণা সর্বদেহ জুড়ে। বসতে পারেন না, শুয়েই পড়েন বুঝি বা—

কুসুম এই সময়টা দোকানে কি কিনতে যাচ্ছিল, তারণের অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে : কি হয়েছে, বসে কেন অমনধারা?

পূর্ণ-দাকে শিগগির ডেকে নিয়ে আয়। আমার আর বেশিক্ষণ বোধহয় নেই।

কুসুম ছুটে গিয়ে পূর্ণ মুখুজ্জেকে ডেকে আনল। দুজনে ধরাধরি করে কোন রকমে তাঁকে বাড়ি নিয়ে তুলল। বাড়িতে কেউ নেই, পূর্ণিমা অফিসে গেছে। এক-সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজায় তালা এঁটে বাপে মেয়েয় বেরিয়েছিলেন। তালা খুলে তারণকে খাটে শুইয়ে দেওয়া হল। পূর্ণ মুখুজ্জে বড় রাস্তার এক দোকান থেকে পূর্ণিমার অফিসে ফোন করে এলেন : ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো। তাপসের হস্টেলে একটা খবর পাঠিয়ে দাও, পুরো-পুরি না হলেও আধা-ডাক্তার তো বটে—যা করতে হয় দেখেশুনে করুক।

সন্ধ্যার দিকে অণিমা আর তরঙ্গিণী এসে পড়লেন। তাপস ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে তারণকে হাসপাতাল ঘুরিয়ে এনেছে। বাইরের কাটা-ছেঁড়াগুলোয় ব্যান্ডেজ হয়েছে। এক্সরে নিয়ে নিয়েছে—ভিতরের কি অবস্থা, এক্সরে-প্লেট না পাওয়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে পাওয়া যাবে। ব্যথা সাংঘাতিক—হাতখানা পাখানা উঁচু করে তোলবার শক্তি নেই, এপাশ-ওপাশ করা যাচ্ছে না। বুড়ো বয়সে কী দুর্দৈব রে বাবা—খোঁড়া হয়ে নুলো হয়ে পঙ্গু শয্যাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনে আমি। তেমন চিকিৎসে করতে হবে না তোদের। বরঞ্চ খানিকটা বিষ দে, খেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

রাত্রিটা এইভাবে গেল। সকালবেলা তাপস এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে আসে। হাসি-মুখ—খবর খুব ভাল। হাড় ভাঙেনি—হাড়ের উপর কিছুমাত্র আঘাত-চিহ্ন নেই। সবকিছু আঘাত উপরে উপরে। কিছুকাল ভোগান্তি আছে এই মাত্র। এ বয়সে হাড় ভাঙলে কিছুতে আর জোড়া লাগত না—খুব রক্ষে হয়ে গেছে।

পূর্ণিমার অফিস কামাই হল না। ভালই হল, পারতপক্ষে সে কামাই করে না। কাজের নিষ্ঠা দেখেই মনিবের সুনজর—না চাইতে মাইনে বৃদ্ধি হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সে ভাইয়ের উপর হুমকি দিয়ে পড়ে : তুই যে এখনো যাসনি চলে?

অণিমা কানে শুনে বলে, ও মা, তাড়িয়ে দিলিস কেন? বাবার এই অবস্থা—এখনই যাবে কী!

সামনে ওর এগজামিন—

অণিমা অবহেলাভরে বলে, এগজামিন ডরাবে তেমন ছেলে নয় আমাদের তাপস। মুড়ি মেরে পাশ করবে। ক'টা দিনে বাবাকে একটু খাড়া করে তুলে তারপরে হস্টেলে যাবে।

পূর্ণিমা বলে, বড্ড কড়া এগজামিন। ফেল করলে সর্বনাশ—একটা বছরের খরচা বেড়ে যাবে, পাব কোথায়? তাপস চলে যাক—তেমন কিছু যখন নয়, আমরাই বাবাকে খাড়া করে তুলব।

অণিমা বলে, যেমনধারা আজ সমস্তটা দিন করলি।

ধরেছিস ঠিক দিদি। সমস্তটা দিন মেসের আড্ডা দিয়ে এলাম—

ফিক হাসি হাসে পূর্ণিমা : বিশ্বাস করিস বা না করিস, বাবার জন্যে তোদেরই সমান উদ্বেগ। তার উপরে আরও সব উদ্বেগ আছে, যা তোদের নেই। বাবা এই পড়ে গেলেন—আমি দেখছি, বাড়তি খরচা এসে ঘাড়ে পড়ল। কোচিং-ইস্কুলে যা মাইনে ছিল, তার তিনগুণ এখন পাই। ডাইনে আনতে তবু বাঁয়ে কুলোয় না।

খোঁটা দিচ্ছে, মনে হল। অণিমা ফোঁস করে ওঠে : রোজগার করে তুই সকলকে দিয়ে দিচ্ছিস, সবাই সেটা জানে। বারবার শুনিয়ে কি মজাটা পাস?

প্রতি মাসের গোড়ায় অণিমা এসে পড়ে, নিয়মিত তিরিশ টাকা তো আছেই, তার উপর থাবা দিয়ে দশ টাকার নোট একটা হয়তো ধরল। পূর্ণিমা হাঁ-হাঁ করে ওঠে : পারব না দিদি, এদিককার এত খরচা চলবে কিসে? ফি মাসে ধারদেনা হচ্ছে—

নোট ফিরিয়ে নিয়ে ইতস্তত করে খুচরো তিন-চার টাকার মতো দিতে গেল। টাকা ছুঁড়ে ফেলে অণিমা হাউ-হাউ করে কাঁদে : কপাল-দোষে ভিখারির বেহদ্দ হয়ে ছোট-বোনের কাছে মুখনাড়া খাই। বলি নিজের বেলা তো খরচের অভাব হয় না, সাজসজ্জায় রাজার কন্যা হার মেনে যায়।

পূর্ণিমা বলে, অফিসে ছেঁড়া ময়লা সেজে যাওয়া যায় না। অফিসের ইজ্জতহানি—চাকরি তারপরে দুটো দিনও আর থাকবে না। তাই একটু সাফসাফাই হয়ে যাই। এর মধ্যে খরচ দেখিস তুই কোথায়?

ঝগড়া কান্নাকাটি এমনি লেগেই আছে। একদিন অণিমার কত ছিল, কত খরচপত্র করেছে—দুঃখ-যাতনা হল সেই। ভাইয়ের প্রসঙ্গে সেই ঝগড়া আবার উঠে পড়ে বুঝি—সভয়ে তাপস তাড়াতাড়ি বলে, যাবই তো কাল—পরীক্ষার ভয় নেই বুঝি আমার! ছোড়দি না বললেও যেতাম। ফেল হলে সত্যি সত্যি সর্বনাশ।

হেসে জিনিসটা লঘু করে নিয়ে পূর্ণিমাকে বলে, বয়সে ছোড়দি তুই তো মোটে তিন বছরের বড়। কথাবার্তা শুনে কে তা বলবে? কত বড় মুরুব্বি যেন তুই—বড়দি'র চেয়েও বড়। আদ্যিকালের বাদ্যি-বুড়ি। কালই চলে যাব হস্টেলে, রাত হয়ে গেছে, আগে থেকে জানানো নেই। আজ যেতে পারলেই ভাল হত, ভোর থেকে পড়াশুনোয় লাগতে পারতাম। এক একটা ঘণ্টা এখন পুরোদিনের সমান।

অণিমা ঠাণ্ডা হল তো তারপরে তরঙ্গিণী। আহ্নিকে বসেছিলেন, কোন রকমে সমাধা করে রে-রে করে পড়লেন : আমি ছিলাম না, কী কাণ্ড করেছিস তুই?

পূর্ণিমা নির্বিকারভাবে বলে, সকলের কাছেই তো আমার অপরাধ। বলো তুমি, কি করেছি। গালিগালাজ করো—ধরে মারো তাতে যদি শান্তি হয়।

তরঙ্গিণী বলেন, আমার আলমারি খুলেছিলি তুই—

না খুলে উপায় ছিল না। চাবি নিয়ে চলে গেছ তুমি, চাবিওয়ালাকে ডেকে খুলিয়ে নিলাম। তা দেখ, একটা জিনিসও তোমার খোয়া যায় নি। মিলিয়ে দেখে নাও।

তরঙ্গিণী গর্জন করে উঠলেন : আলবৎ গেছে। কানের ফুল আর হাতের ব্রেসলেট গড়িয়েছিলাম—কোথায় সে জিনিস?

সে জিনিস তোমার হল কি করে মা? আমার জন্যে গড়িয়েছিলে, আমি নিয়ে নিয়েছি।

তোর বিয়েয় দেবো বলে গড়িয়েছি, কেন তুই নিয়ে নিবি?

নইলে যে তাপসের হস্টেল খরচা দিতে পারি নে, পড়াশুনো বরবাদ হয়ে যায়। বাবা যাচ্ছেতাই করে বলতে লাগলেন, তখন আমার মাথার ঠিক রইল না। ভেবেছিলাম কিছু কিছু জমিয়ে ওগুলো গড়িয়ে রাখব। তুমি টেরও পেতে না মা। বউবাজারে এক দোকানে কথাবার্তাও বলা ছিল। ভেবেছিলাম কি জানো—

ফিক ফিক করে হাসে পূর্ণিমা এরই মধ্যে। বলে, সোনার গয়নার অত টাকা কোথায়, ভেবেছিলাম গিল্টির গয়না গড়াব। বউবাজারের দোকানদার গ্যারান্টি দিল তিন-চার বছর অবিকল সোনার রং থাকবে। তবে আর কি—গয়না তো পরতে হবে না—আলমারিতে ঠিক মতো রেখে দেওয়া। তোমার মনের তৃপ্তি।

তরঙ্গিণী ভ্রূকুটি করলেন : পরতে হবে না মানে? বিয়ে করবি নে, সেই কথা বলতে চাস?

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি বলে, আজকেই তো নয়—তিনটে বছর পরে অন্তত। ভাই ডাক্তার হয়ে বেরুবে, তখন আর পায় কে আমাদের? গিল্টির গয়না নর্দামায় ছুঁড়ে দিয়ে ডাক্তার ভাই সোনাও নয়—হীরে-মুক্তোয় জড়োয়া গড়িয়ে দিত। ঘুণাক্ষরে তুমি জানতে পেতে না। মতলব ঠিকই ছিল, মাঝখানে তুমি এসে পড়ে ভণ্ডুল ঘটে গেল। বাবার জন্যে হঠাৎ এমন আসতে হবে, কে জানত। আর এসেছ বাবার খেদমত করতে, তার মধ্যেও তুমি কিনা আলমারি খুলে বসলে!

পরীক্ষায় তাপস আশাতীত রকম ভাল করল। বিশেষ করে মেডিসিনে। একটা পেপার ডাক্তার অপূর্ব রায় দেখেছেন। ক্লাসও নেন তিনি হপ্তায় দুটো তিনটে দিন। পরীক্ষার পর থেকে তাপস খুব নজরে পড়ে গেল। কলেজ থেকে একদিন বাড়ি ফিরছেন, গেটের কাছে তাপসকে পেয়ে গাড়িতে তুলে তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। আলাপ করে চমৎকৃত হলেন—জানার আগ্রহ বটে ছেলেটির, আর দশটা ছাত্রের তুলনায় জানেও অনেক বেশি। চা খাওয়ালেন তাপসকে, স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মেয়ে স্বাতী—কলেজের দু-একটা পার্টিতে তাপস আগেও তাকে দেখেছে। ভাল গান গায়, অনুরোধে পড়ে ডাক্তার রায় কোন কোন কলেজ-পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। চোখের দেখা ছিল, এইবারে আলাপ হল।

অপূর্ব রায় উৎসাহ দিয়ে বলেন, তোমার ভিতর প্রতিভা রয়েছে। জীবনে বিস্তর ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছি, ভাল ছাত্রও তার মধ্যে অনেক। কিন্তু শেষ অবধি তারা সব কি করল—খবর নিয়ে দেখেছি, রোগি দেখে প্রেসক্রিপসন লিখে ভিজিট কুড়িয়ে ঘোরে দিবারাত্রি, টাকার বাইরে অন্য কিছু জানে না। তুমিও ঐরকম নষ্ট হবে না, এই আমার ইচ্ছা। বড় কিছু করবে, সঙ্কল্প নিয়ে নাও।

ছুটির দিনে বাড়ি এসে তাপস ছোড়দি'র কাছে এইসব গল্প করে। পূর্ণিমার খুশির অন্ত নেই। তাপসের মাথায় হাত রেখে বলে, বেশ তো, বেশ তো—

হাত সরিয়ে দিয়ে তাপস বলে, যা বলবি এমনি এমনি বল্ ছোড়দি। মাথায় হাত কি জন্যে?

পূর্ণিমা হেসে বলে, দোষটা কি হল?

না, মনে হচ্ছে ভারিক্কি চালে আশীর্বাদ করছিস যেন তুই—

পূর্ণিমা বলে, আশীর্বাদেরই তো সম্পর্ক। গুরুজন হইনে তোর?

ভারি তো গুরুজন! তিন বছরের বড়—তা ভাবখানা দেখাস তিন হাজার বছর বড় যেন আমার চেয়ে—

অপূর্ব রায়ের কথা নিয়ে তাপস উৎসাহে ডগমগ : ডাক্তার রায় বলেছেন, এখানে পাশ করেই শেষ হবে না। লণ্ডনের এম, আর, সি, পি, হয়েও নয়। রিসার্চ করে দুনিয়ার সেরা হতে হবে।

পূর্ণিমা বলে, তোর মধ্যে গুণ দেখতে পেয়েছেন—এত বড় অধ্যাপক নয়তো বলতে যাবেন কেন?

আমি কিন্তু সাফ জবাব দিয়েছি : তেমন অবস্থা আমাদের নয়, উঁচু

ভাবনা আমরা ভাবিনে। আর দুটো বছর পার করে ঐ প্রেস্‌ক্রুপসন-লেখা ভিজিট-কুড়ানো অবধি ভালোয় ভালোয় পৌঁছুতে পারলে বাঁচি। এত কথাবার্তার পরেও ডাক্তার রায় কিন্তু তেমনি নাছোড়বান্দা—

নিঃশব্দে পূর্ণিমা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তার রায় বললেন, চেষ্টা করে দেখব কোন স্কলারশিপের জোগাড় হয় কিনা। তার উপর যা লাগে, ধার দেবো আমি। ফিরে এসে রোজগার করে শোধ দিও।

হাসতে হাসতে পূর্ণিমা বলে উঠল, টান যেন বড্ড বেশি—বলি, মেয়ে গছানোর মতলব নেই তো?

তাপস বলে, মেয়ে বাড়ির আবর্জনা নয় যে, আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে। ভাইকে তোরা কী ভাবিস বলতো ছোড়দি?

তাই বলে মানুষে অহেতুকী কৃপা করে, এই আমায় বিশ্বাস করতে বলিস?

পূর্ণিমার কথার মধ্যে অগ্নিজ্বালা। কী যেন বিষম কাণ্ড ঘটেছে। ক্ষণে-ক্ষণে ক্ষেপে ওঠে। আগে সে এমন ছিল না।

ঘটেছে সত্যিই এই ক'দিন আগে। পূর্ণিমা কাউকে বলে নি। বলবার কথাও নয়। রিসেপসনিস্টের টেবিল বাইরের দিকে, তার জন্যে একদা অনুযোগের অন্ত ছিল না। এখন ভাবছে দিব্যি ছিল সেই জায়গা। বাইরের লোকের আনাগোনা—মনিবরা আসা এবং যাওয়ার সময়টা হাসিমুখে তাকাতেন পূর্ণিমার দিকে, তাড়াতাড়ি সে নমস্কার করত। তাঁরা প্রতিনমস্কার করে উপরে উঠে যেতেন অথবা রাস্তায় নেমে গাড়িতে ঢুকতেন। দিনের মধ্যে প্রতি জনের দু-বার—তিন ডিরেক্টরের একুনে ছ'বার মাত্র। ছয়ের বেশি সাত নয়। এখন স্টেনো হওয়ার দরুণ ডিকটেশন নিতে ডাক পড়ে। ক্ষণে-ক্ষণে কামরার ভিতরে ঢুকে খাতা-পেন্সিল নিয়ে সামনের চেয়ারে বসে পড়তে হয়।

কৃপা-বৃষ্টির মুখপাতটা এই রকম। মেজ ভাই অরুণ একটা জরুরী চিঠির বয়ান বলে যাচ্ছে। বলতে বলতে পূর্ণিমার মুখের উপর তাকিয়ে পড়ে। তারণ সিঁড়িতে পড়ে গেলেন, তার ঠিক পরের দিনটা। দুশ্চিন্তায় বাড়ির কেউ ঘুমোয় নি, পূর্ণিমার চোখে-মুখেও সেই ক্লান্তি লেগে রয়েছে।

অরুণ বলে, কি হয়েছে মিস সরকার?

কি হবে, কিছুই তো নয়। এড়িয়ে গিয়ে পূর্ণিমা পেন্সিল ঠোঁটের কাছে নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। অর্থাৎ ডিকটেশনে পরের বাক্যের অপেক্ষায় আছে।

অরুণ ভ্রুক্ষেপ না করে বলে, অসুস্থ দেখাচ্ছে আপনাকে। কি হয়েছে বলুন।

অগত্যা দুর্ঘটনার কিছু বলতে হয়। বলে, রাত্রিটা কাল বড় উদ্বেগে কেটেছে।

অরুণ বলে, অফিসে এলেন কেন তবে? ছুটি তো এক দম নেন না, অঢেল ছুটি জমে আছে। আর না থাকলেই বা কি। এমন ব্যাপারেও ছুটি না নেবেন তো ছুটির নিয়ম আছে কি জন্যে?

সকালে এক্স-রে রিপোর্ট পেয়ে এখন অনেকখানি নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া বছরের শেষে এখন কাজ-কর্মের চাপ। গাদা-গাদা বিল ছাড়তে হচ্ছে। পোদ্দার এজেন্সীর এই চিঠি ছাড়া আরও তো চারটে ডিকটেশন দেবেন বললেন।

অরুণ হাসিমুখে নির্বাক হয়ে আছে।

পূর্ণিমা বলে, শেষ সেন্টেন্সটা পড়ে শোনাই?

অরুণ বলে, না—। জোর দিয়ে আবার বলে, না, একটি লাইনও আর বলছি নে। আগে যা ডিকটেশন দিয়েছি, বাতিল। কিছুই টাইপ করতে হবে না।

পূর্ণিমা ইতস্তত করে বলে, খুব জরুরী চিঠি বলছিলেন আপনি।

আপনার সুস্থ থাকা আরও বেশি জরুরী। ইয়ার-এনডিং বলে অন্য সবাই বহাল তবিয়তে পাওনা ছুটি শোধ করে নিচ্ছে—পুরনো কর্মচারী তারা, বিস্তর কাল নিমক খেয়েছে। আর নতুন হলেও সত্যি সত্যি অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি অফিস করতে এসেছেন।

হঠাৎ প্রশ্ন করে, থাকেন কোথা আপনি?

পূর্ণিমা ঠিকানা বলল।

অরুণ বলে, আমি এখনই বেরুচ্ছি। এই ডিকটেশনটা সেরেই বেরুতাম—দরকার নেই, কাল হবে। আপনাদের ঐ পথেই আমায় যেতে হবে—চলুন নামিয়ে দিয়ে যাব।

বড় সহৃদয় মনিব। বাপের জন্য পূর্ণিমারও চিন্তা রয়েছে—অণিমা সেবা-শুশ্রূষা তেমন পেরে উঠে না, কি করছে কে জানে? অরুণের বেয়ারা এসে তাগিদ দিল : সাহেব বেরিয়ে পড়েছেন, আপনাকে যেতে বললেন।

লাল রঙের টু-সীটার গাড়িতে অরুণের পাশে সে উঠে পড়ল। অফিসের লোক জুল-জুল করে দেখছে। অসম্ভব নিচু গাড়ি, একটা সাপ যেন মাটির গা বেয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে।

গলির মোড়ে এসে পূর্ণিমা দেখিয়ে দিল : এইখানে। এত ছোট গাড়ি তবু গলির ভিতর ঢুকবে না। মৃদু হেসে সহজ কণ্ঠে বলে, তার জন্যে অসুবিধা কিছু নেই—যত লোক এই গলিতে থাকি, মোটর চড়ে বেড়ানোর কথা ভাবিনে কেউ।

মানুষটি অতিশয় ভদ্র ও নিরহংকার। নেমে গিয়ে ও-দিককার দরজা খুলে দাঁড়াল। পূর্ণিমা নেমে গলির মধ্যে ঢুকে গেলে তবে স্টার্ট দিল।

এদিন শরীর খারাপ ছিল, মনে উদ্বেগ ছিল, সকাল সকাল বাড়ি ফিরবার প্রয়োজন ছিল, কৃপাই করেছিল অরুণ, বড় উপকার হয়েছিল। কৃপার এই শুরু। তিনটে কি চারটে দিন পরে অফিস থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। অফিস-পাড়ার দুরন্ত ভিড় এড়িয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে বাস বা ট্রাম ধরে—এই তার নিয়ম। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে—লাল টুরিস্টকার কোন দিক দিয়ে ছুটে এসে সশব্দে ব্রেক কষে ফুটপাথের পাশে থেমে পড়ল। দেখেনি দেখেনি করে চলছে পূর্ণিমা—গাড়ির ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হাসি।

দরজা খুলে অরুণ নেমে পড়ল : আসুন, নামিয়ে দেবো।

বেশ তো যাচ্ছি—

গাড়িতেও খারাপ যাবেন না।

সহসা গম্ভীর হল যেন অরুণ। বলে, আপত্তি থাকে তো কাজ নেই—

ভয়ে ভয়ে অতএব গাড়িতে উঠতে হয়, দু-একটা কথা বলতে হয়, হাসতেও হয়। হেসে পূর্ণিমা বলে, আপনি বুঝি প্রায়ই এদিকে আসেন?

অবসর পেলেই আসি। ক্লাবে এসে টেনিস খেলি।

কিন্তু মুশকিল হল বড়। পথের উপর ইদানীং হামেশাই দেখা হয়ে যাচ্ছে—গাড়িতে তুলে অরুণ গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যায়। সাত-আট দিন এমনি হয়ে গেছে। বলবার কিছু নেই—নিখুঁত সৌজন্য, গাড়ির মধ্যে সামান্য একটি-দুটি কথা।

কিন্তু তাদের মধ্যে কথাবার্তা না হলেও অফিসে কথা চলছে সুনিশ্চিত। পাশে বসেন সেই বৃদ্ধ টাইপিস্ট নলিনাক্ষ সেন, একদিন পূর্ণিমাকে ধরে পড়লেন : রিটায়ার করিয়ে দিচ্ছে আমায়। বিস্তর কাচ্চাবাচ্চা — না খেয়ে মরব। বয়স হয়েছে তা মানি, তা বলে কাজের শক্তি একরত্তি কমে নি মা, নিত্যিদিন তুমি তো নিজে চোখে দেখছ। মেজো সাহেবকে আমার জন্যে বল একবার, তুমি বললেই শুনবে।

হাত জোড় করা ঠিক নয়—বুড়ো মানুষ হাত দুটো একত্র করলেন।

কী লজ্জা! কী লজ্জা! তালুকদার বাড়ির কর্তারা মেয়েদের তো অসূর্যম্পশ্যা করে অন্দরে রাখতেন—স্বর্গলোকে তাঁরাও নিশ্চয় অধোবদন হয়েছেন লজ্জায়।

অফিস থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে পূর্ণিমা ট্রাম-বাস ধরে। একদিন উল্টো পথ ধরল—পশ্চিমে গঙ্গার দিকে। হনহন করে চলেছে, ছুটে পালানোর মতো। কিন্তু দুটি মাত্র পায়ের সাধ্য কতটুকুই বা! লাল গাড়ি পিছন ধরে ঠিক এসে হাজির। এবং হাসি।

আজ যে ভিন্ন দিকে?

পূর্ণিমা থতমত খেয়ে বলে, এক আত্মীয় হাওড়া স্টেশনে নামবেন—

এত পথ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন? উঠে পড়ুন।

গাড়ি হাওড়ায় ছুটল। হঠাৎ বুঝি পূর্ণিমার সময়ের খেয়াল হল। হাতঘড়ি দেখে হতাশভাবে বলে, এই যাঃ, গাড়ি তো অনেক আগে এসে গেছে। এখন কি আর স্টেশনে বসে আছেন?

মুখ ফেরাল পূর্ণিমার দিকে—কি দেখল, কে জানে। জবাবের অপেক্ষা না করে গাড়ি ঘোরাল। বাড়ির গলির মুখে নামিয়ে দিয়ে দে ছুট।

তা বলে শেষ নয়—চলল এই ব্যাপার। উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম—যেদিকে খুশি ইচ্ছা মতন বেরিয়ে দেখেছে। লাল গাড়ির

চোখে ফাঁকি চলে না। বাজপাখির মত গাড়ি কোন অলক্ষ্যে ওত পেতে থাকে, ঠিক সময়টিতে উদয় হয়ে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। ছুটির আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে দেখেছে, আবার ছুটির পর কাজের অছিলায় গড়িমসি করে দেখেছে। ফলের ইতরবিশেষ নেই—গাড়ি এসে পথের মাঝে দুয়োর খুলে দাঁড়াবে। এবং হাস্য। এবং প্রশ্ন ঃ কোথা যাবেন? পূর্ণিমারও সেই এক জবাব ঃ বাড়ি। গল্পের সেই বিধাতাপুরুষের মত—জেলের কপালে লেখা আছে, জাল পাতলে একটা মাছ সে পাবেই। জেলে কেমন করে লিখনটা জেনে গেছে—জাল পাতে সে জলে নয়, কোন দিন ঘরের চালে, কোনদিন গাছের মাথায়, কোনদিন কাঁটাবনে। বিধাতাপুরুষকে খুঁজে-পেতে সেই সেই স্থানে জালের মধ্যে মাছ দিয়ে আসতে হয়। গাড়ি ঢোকে না এমন গলিঘুঁজি নেই এই হতভাগা অঞ্চলে—তাহলে পূর্ণিমা একদিন সেই পরখটা করে দেখত।

আরও আছে। ইদানীং নতুন উপসর্গ হয়েছে, আলতোভাবে হাত এসে পড়ে পূর্ণিমায় গায়ের উপর। পূর্ণিমা পাথর হয়ে বসে থাকে। মুহূর্তমাত্র—পরক্ষণেই হাত উঠে গিয়ে স্টিয়ারিং-চাকার যথাপূর্ব সংলগ্ন হয়। নিতান্ত দৈবঘটনা, ভাব দেখে তাই মনে হয়—হাতের চলাচল কিছুই যেন টের পায় নি অন্যমনস্ক হাতের মালিকটি।

(ক্রমশ)

দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান
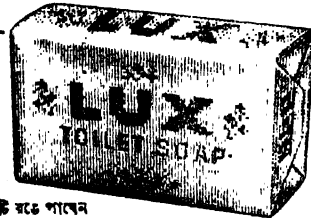
নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন

শ্রেণীগত ধর্মের গোঁড়ামির নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব সৌভ্রাত্র্য স্থাপনের জন্য মানব জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ৩১শে আগস্ট কলকাতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন।

ভগ্নী নিবেদিতার জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটি কর্তৃক মহাজাতি সদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন পৌরোহিত্য করেন।

এই রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে-ছিলেন। আর শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সকলের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার মধ্যেই প্রকৃত ধর্মের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে রাষ্ট্র-পতি শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোক্তাদের স্মরণ করিয়ে দেন।

তিনি আরো বলেন, যে ধর্মের উদ্দেশ্য গোঁড়ামী ও শ্রেণীগত, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সে ধর্ম সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশে জাগরণের ওপর ভিত্তি করে যে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, তার গতি বিজ্ঞানের অগ্রগতি বা ইতিহাস কোনদিনই স্তব্ধ করতে পারবে না।

রাষ্ট্রপতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, গোঁড়ামি ও শ্রেণীগত ধর্মের আওতা থেকে মানব জাতিকে বেরিয়ে এসে যে ধর্ম সকলকে একতার পাশে আবদ্ধ করে, সেই ধর্মের কথা চিন্তা করতে হবে। মহা মিলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব সৌভ্রাত্র্য স্থাপন করতে পারলেই সমগ্র মানবজাতি যে এক, তার যথার্থ আদর্শ প্রস্ফুটিত হবে বলে তিনি মনে করেন।

ভগ্নী নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দকে যেদিন তিনি গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেই দিনই তাঁর মহান্ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল। স্বামীজী এই মহীয়সী নারীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ধর্মের যথার্থ বিষয়বস্তুকে রক্ষা করে মানুষ ধর্মের বিকাশ কিভাবে করতে পারে, সে সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা তখনই তাতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

তিনি বলেন যে, ভগবৎ দর্শনই ধর্মের সবচেয়ে বড় কথা। সাধনার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব। তাছাড়া মূর্তির পূজা, তীর্থযাত্রা ও বলিদানের মধ্য দিয়ে ধর্মের আরাধনা সম্ভব হয়। ভগবৎ দর্শন ব্যতীত মানুষ পরি-পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

সভাপতির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মহীয়সী নারীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, ভগ্নী নিবেদিতা অন্য দেশের মেয়ে হলেও ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির তিনি ছিলেন যথার্থ ধারক ও বাহক। কলকাতার মেয়েদের জীবনে সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নানা ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

জন্মোৎসব সমিতির সভাপতি বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র বলেন যে, ভগ্নী নিবেদিতা যে জাতীয়তাবাদের পূজারী ছিলেন, সকল ভারতবাসী তা মনেপ্রাণে গ্রহণের জন্য যেন আজ শপথ গ্রহণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতা

অনুষ্ঠানে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী মহাজাতি সদনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির হাতে দেশ-সেবকদের জীবনী সম্বলিত একটি পুস্তক 'মৃত্যুঞ্জয়ী' ও সদনের কার্যাবলীর একটি বিবরণী প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী ভগ্নী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এর পর জন্মোৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসু শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এই কমিটি কি কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন, তা বিবৃত করেন।

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ভগ্নী নিবেদিতার আলোচনা-বৈঠকের একটি আলোকচিত্র শ্রীবসু রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করেন। এই সংস্থার একটি সংকলনও মাননীয় অতিথির হাতে শ্রীসত্যেন বসু তুলে দেন।

সর্বশেষে কলকাতার মেয়র ডাঃ প্রীতি-কুমার রায়চৌধুরী অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্ল্যাটিনাম জুবিলী

কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসবের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন ৩১ আগস্ট। তিনি একটি বোতাম টিপে ইনস্টিটিউটের ৭৫ বছর পূর্তির প্রতীক হিসাবে ৭৫টি বাতি জ্বালান।

ইনস্টিটিউটের এই অনুষ্ঠানে হলে তিল ধারনের স্থান ছিল না এবং এখানে আসার ও এখান থেকে যাবার পথে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে কয়েক হাজার লোক হর্ষধ্বনি করে রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনা জানায়। রাষ্ট্রপতি শোভাযাত্রা সহকারে মঞ্চে এসে দাঁড়ালে সারা হলের লোক তাঁকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানায় এবং তিনিও কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে প্রীতিসিক্ত অভিনন্দন গ্রহণ করেন।

ঊনিশ শতক ও বিশ শতকের বাংলার প্রথম যুগের যে সকল মনীষা ও প্রতিভা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের জাতীয় আন্দোলনে অবদানের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, তাঁরা ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনা করেছেন ও গণতন্ত্রের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রেখে গেছেন। সুতরাং যে কোন মূল্যে হিংসার পথ পরিহার করে ঐ ঐতিহ্য ও গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শগুলিকে তুলে ধরতে হবে। অবস্থার উন্নতি করার জন্য হিংসার পরিস্থিতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই।

হিংসাত্মক কাজে ও হাঙ্গামায় বালক ও নবীনদের অংশ গ্রহণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, বালক ও নবীনদের রাজনৈতিক আন্দোলনে ও বিশৃঙ্খলায় টেনে নামিয়ে কেবল তাদেরই হীন চরিত্র করা হচ্ছে না, দেশের সম্মান ও সুনামকেও হীন মূল্য করা হচ্ছে। অবশ্য জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগ নিশ্চয়ই রয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, "অসন্তোষ সমাজের সকল অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির মূল কারণ। যখনই সন্তোষ এসে যাবে ও স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, তখনই অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং স্থিতা-বস্থাকে চূর্ণ করার জন্য আমাদের দৃঢ়তাকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে জন-সাধারণের ভাগ্যের প্রকৃত উন্নতি হয়। আমা-দের ভুললে চলবে না যে হিংসা, বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন লাভ হয় না। দেশের শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে অবহেলিত ও দুর্ভাগ্যপীড়িত জনসাধারণের অদৃষ্টের উন্নতি করতে হবে।"

জুবিলী উৎসবের সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ইনস্টিটিউটের গৌরবময় অতীতের উল্লেখ করেন। ইনস্ট-টিটিউটের সভাপতি অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানান। জুবিলী কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু সকলকে ধন্যবাদ দেন। —সাংবাদিক

দেশে বিদেশে

পাকিস্তানের অস্ত্রসজ্জা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি আবার পাকিস্তানকে সমরোপকরণ সরবরাহ করতে আরম্ভ করেছে?

গত বৎসরের ভারত-পাকিস্থান সংঘর্ষের পরই মার্কিন সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা উভয় দেশকেই সামরিক রসদ যোগান দেওয়া আপাততঃ বন্ধ রাখছেন। সেই নীতি অনুযায়ী ভারত সরকার ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন করে আর কোন সমরসম্ভার চানও নি, পানও নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকেও ভারত সরকারকে এমন কোন কথা জানান হয়নি যে, তাঁরা তাঁদের নীতির বদল করেছেন।

ইতিমধ্যে, তাসখন্দ চুক্তি সত্ত্বেও, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে এবং পাকিস্তান নতুন করে যুদ্ধায়োজন করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা হল, পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে জঙ্গী বিমান ও ট্যাংক সংগ্রহ করছে এবং চীনের সাহায্যে নিজের গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলছে। পাকিস্তান শুধু যে যুদ্ধের অস্ত্রই সংগ্রহ করছে তা নয়, ভারতের সীমান্তে নিজের সৈন্য-বাহিনীরও সমাবেশ করছে।

এই সব সংবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অজানা নয়। গত ১লা আগস্ট ও ৮ই আগস্ট লোকসভায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যাবন পাকিস্তানের এই যুদ্ধায়োজনের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবি কে নেহরু গত ২০শে আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব মিঃ রেমন্ড হেয়াবের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানের এই অস্ত্রসজ্জার সংবাদ জানিয়ে এসেছেন।

এরই মধ্যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল যে, মার্কিন সরকার আবার পাকিস্তানকে ট্যাংক ও জেট বিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে আরম্ভ করেছেন। গত ৯ই আগস্ট রাজ্যসভায় এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং বলেন, "আমরা মার্কিন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি যে, পাকিস্তান যে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব অবলম্বন করে রয়েছে, যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর তার সৈন্য সমাবেশ করছে এবং চীন থেকে প্রচুর পরিমাণে মিগ বিমান, বোমারু, ট্যাংক ও অর্ডিন্যান্স কারখানা সংগ্রহ করছে, এই তথ্য যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অজানা নেই সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানকে ট্যাংক ও জেট বিমানের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি সমরসম্ভার পুনরায় সরবরাহ করার সংবাদ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মারমুখী ও শত্রুতামূলক অভিসন্ধিতে উৎসাহ যোগাবে।"
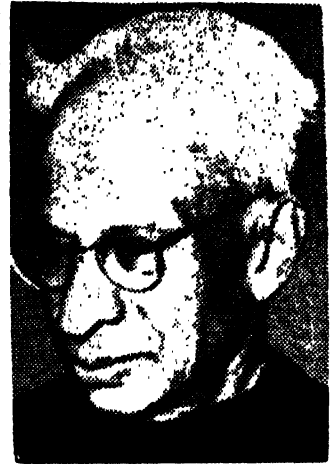
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিবৃতিতে মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানকে সমরোপকরণ বিক্রী করছে। অথচ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যাবন যে দুটি বিবৃতি দিয়েছেন তাতে কিন্তু তিনি এমন কথা বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও" পাকিস্তান অন্য দেশের মারফৎ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে। শুধু কয়েকজন বে-সরকারী সদস্য সংসদের সভায় এই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, আসলে পাশ্চাত্য দেশগুলিই "পিছনের দরজা দিয়ে" পাকিস্তানকে সমরোপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

এই সব পরস্পরবিরোধী বিবৃতি ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, পাকিস্তানের এই নতুন যুদ্ধায়োজনের পিছনে মার্কিন সহায়তা আছে কিনা এবং থাকলে কতখানি আছে। প্রথমে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তান তুরস্কের মারফৎ কিছু মার্কিন অস্ত্র পেয়েছে। পরে জানা গেছে, পাকিস্তান তুরস্কের কাছ থেকে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছে বটে; কিন্তু সেগুলি মার্কিন অস্ত্র নয়। ইরাণ থেকে পাকিস্তান যে প্রায় ৯০টি এফ-৮৬ জেট বিমান পেয়েছে সেগুলিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী নয়, কানাডায় তৈরী।

এই অবস্থায় সম্ভবতঃ সরকারও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে, পাকিস্তানের এই নতুন রণসজ্জার জন্য প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন সরকারকে দায়ী করা এবং এই ব্যাপার নিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে নতুন তিক্ততার সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে।

অবশ্য একথা অনুমান করা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভিতরে পাকিস্তানের প্রতি একটা প্রবল অনুকূল মনোভাব আছে, একথা নয়াদিল্লীতে অজানা নেই। মার্কিন সামরিক মহলে এই রকম একটা অভিমত আছে যে, পাকিস্তানে আমেরিকার যে সব বিমান, ট্যাংক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র আছে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বিশেষ ধরনের তেল প্রভৃতির অভাবে অকেজো পড়ে থাকতে দেওয়ার কোন মানে হয় না। কেন না, এতে শেষ পর্যন্ত কোটি কোটি ডলার মূল্যের মার্কিন অস্ত্রই বরবাদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আর একটি যুক্তি এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি পাকিস্তানকে সমরোপকরণ না দেয় তাহলে সে সম্পূর্ণরূপে চীনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। একথা বলা হচ্ছে যে, বর্তমান নিষেধাজ্ঞা যদি তুলে নেওয়া হয় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ত তার বিনিময়ে পাকিস্তানকে তার অস্ত্রসজ্জার পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী করতে পারবে। এই সংবাদও প্রকাশ পেয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরেই কোন কোন মহল থেকে মার্কিন সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার আগে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যে সব সমরসম্ভারের ফরমায়েস দিয়েছিলেন (এই ফরমায়েস অনুযায়ী সমরোপকরণগুলি বাক্সবন্দী করে ফেলা হয়েছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ায় বাক্সগুলি আর পাঠান হয়নি) অন্ততঃ সেই ফরমায়েস এবার রক্ষা করা হোক।

এই সব খবর যখন নয়াদিল্লীতে এসে পৌঁছচ্ছিল তারই মধ্যে গত ২৬শে আগস্ট তারিখে ইসলামাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরিফুদ্দীন পীরজাদা ঘোষণা করেছেন যে, নগদ দাম দিয়ে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে সব অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করেছে মার্কিন সরকার তার কিছু অংশ ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন।

জয়তু রাষ্ট্রপতি

আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ৭৮ বৎসরে পদার্পণ করেছেন গত ৫ সেপ্টেম্বর। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থজীবন আমরা কামনা করি। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন। ঐদিন সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষক-দিবস পালিত হয়।

এক সপ্তাহের উপর হয়ে গেল পাকিস্তানের এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। এখনও মার্কিন কর্তৃপক্ষ না করেছেন এই সংবাদের সমর্থন, না করেছেন তার প্রতিবাদ। ইতিমধ্যে ভারতীয় দূত শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব মিঃ রেমণ্ড হেয়ারের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিবৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস" পত্রিকার ওয়াশিংটন সংবাদদাতা শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, মিঃ হেয়ার জানিয়েছেন, মার্কিন সরকারের নীতির কোন বদল হয়নি; তাঁরা গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানকে শুধু সেই সব সামরিক রসদ দিচ্ছেন যেগুলি মারণাস্ত্রের মধ্যে পড়ে না।

শ্রীভট্টাচার্য আরও লিখেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগেকার কথাগুলিই এখন যেভাবে পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে তাতে এর মধ্যে কতকটা তিক্ততার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। ঘরোয়াভাবে মার্কিন সরকারী কর্মচারীরা বলছেন, নয়াদিল্লীকে ইতিপূর্বেই যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তারপর এই বিষয়ে ভারতবর্ষের এমন কূটনৈতিক অভিযান চালানর যুক্তি নেই।"

মুস্কিল হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের অস্ত্রসজ্জা যে ভারতবর্ষের পক্ষে একটা বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠছে, এই উপলব্ধি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বড় বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এমন কি পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সামরিক আঁতাতে ভারতবর্ষের চেয়েও যে সব দেশের বেশী উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা তারা এই ব্যাপারে, যে কোন কারণেই হোক, বড় বেশী মাথা ঘামাচ্ছে না। পাকিস্তান চীন থেকে যে সামরিক সাহায্য পাবেই তার সংবাদ পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলিতে খুব বেশী ফলাও করে প্রকাশ করা হয়নি। ইকনমিষ্ট পত্রিকায় সম্প্রতি একটি সংবাদের শিরোনামায় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ "পালে বাঘ পড়েছে" মিথ্যাই চেঁচামিচি করছে। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচাবন অবশ্য বলেছেন যে, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক মতিগতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া উদ্বেগ বোধ করছে। গত ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাশিয়ার প্রাভদা পত্রিকায় যে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাসখন্দ চুক্তি অমান্য করার জন্য পাকিস্তানকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানের এই আচরণের পিছনে ভিন্ন রাষ্ট্রের উস্কানি আছে। কিন্তু, শুধু, আটের উপর বলতে পারা যায় যে, পাকিস্তানের সমরায়োজনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি সহায়তা না করলেও চোখ বুজে আছে। ভিয়েৎনামের সমস্যা, নিজেদের ভিতরকার অর্থনীতির সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি বিব্রত; হয়ত সে কারণেই তারা ভারত-পাকিস্তান সমস্যার সঙ্গে নিজেদের বেশী করে জড়াতে চায় না। আর সেই ফাঁকে পাশ্চাত্য জগতে পাকিস্তানের যে সব দরদী বন্ধু আছেন তাঁরা তার হাতে যথাসম্ভব বেশী অস্ত্র-সম্ভার তুলে দেওয়ার ফিকিরে আছেন।

ভারতবর্ষকে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকতেই হবে এবং সামান্যতম সন্দেহ হলেই প্রতিবাদ জানাতে হবে—তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতই বিরক্তি প্রকাশ করুক না কেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া

অর্থনীতিবিদেরা বলে থাকেন, তিনটি শর্ত পূরণ হলে বলা চলে অর্থনীতি 'টেক-অফ' পর্যায়ে পৌঁছেছে, অর্থাৎ স্বয়ংনির্ভর অগ্রগতির ক্ষমতা অর্জন করেছে:

এক, জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ থেকে ১০ ভাগ উৎপাদনী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ:

দুই, বিকাশের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক বড় রকমের উৎপাদনী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা;

তিন, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে মূলধন যোগাড় করার উপযুক্ত রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংগঠনিক পরিবেশ সৃষ্টি।

এই তিনটি শর্তে পৌঁছবার আগে আরো দুটি শর্ত পালনের কথা তাঁরা বলে থাকেন: এক, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত সামাজিক মূলধন গড়ে তোলা। তার মধ্যে কৃষির ক্ষেত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশী; অর্থাৎ 'টেক-অফ' পর্যায়ে পৌঁছবার আগে অন্তর্বর্তীকালে কৃষি ব্যবস্থাকে এমন একটা স্তরে উঠতে হবে যেখানে জন-সাধারণের জন্যে ক্রমশ বেশী পরিমাণে খাদ্য পাওয়া যাবে, কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের

প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার বনিয়াদ গড়ে উঠবে, এবং অগ্রগতির জন্যে আরো বেশী পরিমাণে রাজস্ব পাওয়া যাবে।

স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতির এই শর্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অর্থনীতি এবং সদ্য ঘোষিত (২৯ আগস্ট) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?

১৯৫০-৫১ সালেই ভারত 'টেক-অফের' একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পেরেছিল একথা ঠিক। ঐ বছর জাতীয় আয়ের শতকরা ৫½ ভাগ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এই বিনিয়োগের অর্থ সংস্থানও করা হয়েছিল আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে, এবং ঐ সঞ্চয়ও ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫½ ভাগ।

পরবর্তী বছরগুলিতে এই দুটি হারই যদিও বেড়েছে, কিন্তু এমন অস্বাভাবিকভাবে যা সুস্থ অর্থনীতি গড়ে তোলার অনুকূল নয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের তুলনায় বিনিয়োগের হার ছিল ১৪ শতাংশ, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০·৫ শতাংশের বেশী ছিল না।

এই সংগে আরো একটি তুলনামূলক হিসাব মনে রাখা যেতে পারে। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ভারতের জনসংখ্যা বছরে ২·৫ শতাংশ হারে বেড়ে এসেছে। সেই তুলনায় প্রকৃত অর্থে মাথাপিছু আয় বেড়েছে মাত্র ১·৮ শতাংশ হারে। অর্থাৎ পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রসাদে আমাদের আয় যেটুকুই বাড়ছে, প্রতি বছর নতুন ভাগীদার জুটে তার সবটাই ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

স্বভাবতই এই অবস্থায় অর্থনীতির পক্ষে তালে তালে পা ফেলে চলা সম্ভব নয়। আজকের ভারতীয় অর্থনীতির যা কিছু সমস্যা, এই মৌলিক বৈষম্য থেকেই তার সৃষ্টি। এরই ফলে পরিকল্পনার জন্যে অর্থ-সংস্থানের সমস্যা বাড়ছে। এরই জন্যে ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় বিদেশী সহায্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এরই জন্যে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে করের বোঝা বাড়াতে হয়েছে, অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা সকলেই জানি। এরই জন্যে নোট ছাপিয়ে আমাদের ঘাটতি মেটাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে; আর এর থেকেই এসে জুটেছে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি নানান উপসর্গ।

পরিকল্পনা কমিশন নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যদিও 'প্রভূত সাফল্য' অর্জন করেছিল এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফলও যদিও "অসন্তোষজনক ছিল না", তৃতীয় পরিকল্পনা আমাদের সাধারণভাবে নিরাশ করেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এসে আমরা দেখলাম, জাতীয় আয় যেখানে বছরে পাঁচ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল (এবং যেখানে এই আশার ওপর ভিত্তি করেই বর্ধিত অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল), সেখানে বৃদ্ধির হার ছিল ২·৫ শতাংশেরও কম। অথচ, মনে রাখা দরকার, আমাদের জনসংখ্যা বছরে ২·৫ শতাংশ হারে বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির সুযোগ একেবারেই অনুপস্থিত।

আরও দেখছি, কেবল ১৯৬৫-৬৬ সালে ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন একদম বাড়েনি এবং বিপুল পরিমাণ খাদ্য বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনও আশার তুলনায় কম ছিল। সাধারণ মূল্য-সূচক শতকরা ৩৬ ভাগ বেড়ে যায়। আগের দুটি পরিকল্পনায় এই সূচক কখনো এতটা বাড়েনি।

তৃতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার; কেননা তৃতীয় পরিকল্পনাতেই আমরা আমাদের নির্ধারিত ২৫ বছরের পরিকল্পিত অগ্রগতির অর্ধেক পথ পার হয়ে গেলাম, এবং তৃতীয় পরিকল্পনাতেই আমরা স্বয়ংনির্ভরতার ভিত্তি রচনা করতে পারব বলে আশা করেছিলাম।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করা হলো। এই পরিকল্পনায় মোট ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা খরচা করা হবে (সরকারী ক্ষেত্রে ১৬ হাজার কোটি টাকা ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা)। গত তিনটি পরিকল্পনায় যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, এই অঙ্ক তার চাইতেও বেশী। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের বোঝা বহনের ক্ষমতা অর্থনীতির আছে কি?

এই সংশয় আরো দানা বেঁধেছে এই জন্যে যে, সম্পদের সূত্রগুলি এখনও অনিশ্চিত। পরিকল্পনা কমিশন যদি এবার নোট ছাপিয়ে ব্যয় সংকুলান না করার নীতিতে টিঁকে থাকেন, তাহলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগাড় করার জন্যে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সাহায্য ও দেশীয় সম্পদের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের কোন সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি (আমরা ৪,৭০০ কোটি টাকা পাবো ধরে বসে আছি)। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়ায় বর্তমান কর থেকেই নির্দিষ্ট রাজস্ব পাওয়া যাবে কিনা তারই নিশ্চয়তা নেই, তার ওপর কমসে কম ১,৮০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত সম্পদ যোগাড়ের কথা বলা হয়েছে। সরকারী শিল্প প্রকল্পগুলির অবস্থা এমন নয় যে তার লভ্যাংশ থেকে এই সম্পদ যোগাড় করা যেতে পারে।

সুতরাং একথা অনেকেই বলেছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনায় আরো ছোট, অর্থাৎ সাধ্য অনুযায়ী, পরিকল্পনা রচনা করা উচিত ছিল। পরিকল্পনা কমিশন এই যুক্তি অস্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পরিকল্পনাকে ছোট করার অর্থ জনসাধারণের দারিদ্র্যকে কায়েম রাখা।

প্রধানমন্ত্রী হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন। কেননা ভারতের মত একটা বিরাট দেশে একটা অনগ্রসর অর্থনীতিকে গতিশীল করে তুলতে গেলে বিকাশের হার (growth-rate) বছরে অন্তত ছয় শতাংশ হওয়া উচিত, এবং ছয় শতাংশ হার অর্জন করতে হলে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার আমরা তার কাছাকাছি এখনো পৌঁছতে পারিনি। আমরা আশা করছি চতুর্থ পরিকল্পনায় আমরা ৫·৫ শতাংশ বিকাশের হার অর্জন করতে পারব। কিন্তু তার পরেও, ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা খরচ করার পরেও, জনসাধারণকে (চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে জনসংখ্যা সাড়ে ৫৫ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে) আমরা দৈনিক মাত্র তিন আউন্স বেশী খাদ্যশস্য এবং বছরে মাত্র দু মিটার বেশী কাপড় দিতে পারব। চাহিদার তুলনায় তা তখনও অনেক কম থেকে যাবে।

তবু একথাও হয়ত ঠিক যে, অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে চতুর্থ পরিকল্পনা সাধ্যানুযায়ী রচনা করলেই বোধহয় ঠিক হতো। কেন না তৃতীয় পরিকল্পনার Projection-এ যদিও চতুর্থ পরিকল্পনায় এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে, তবু তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা এই দায়কে আরো বেশী অসহনীয় করে তুলেছে।

এই ব্যর্থতা পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যর্থতা। তৃতীয় পরিকল্পনা যদি ঠিক ঠিক রূপায়িত হতো, অর্থাৎ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হতো তাহলে চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের একটা নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, অর্থাৎ সম্পদের সূত্রগুলি ঠিক ঠিক গড়ে ওঠেনি, অথচ আমরা চতুর্থ পরিকল্পনায় বিপুলতর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি নিচ্ছি। তার চাইতে চতুর্থ পরকল্পনাকে কঠোরভাবে সাধ্যায়ত্ত রেখে, লক্ষ্যগুলি যথাযথ রূপায়ণের ওপরেই বেশী জোর দিয়ে এবং এইভাবে অতীতের ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে বনিয়াদ শক্ত করে তারপর পঞ্চম পরিকল্পনায় ব্যাপকতর প্রয়াসে অবতীর্ণ হওয়াই কি উচিত ছিল না?

তবু পরিকল্পনা কমিশন তাঁদের আশাবাদকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা বলেছেন চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যেই তাঁরা অর্থনীতিকে স্বয়ংনির্ভর করে তুলতে চান যাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি পঞ্চম পরিকল্পনায় দূর হতে পারে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনা থেকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আর একেবারেই নির্ভর করতে না হয়।

এই উদ্দেশ্য, আমরা আগেও বলেছি, ভালো এবং স্বয়ংনির্ভরতা অর্জনের পক্ষে আবশ্যক। এই জন্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় সংগতভাবেই কৃষি ব্যবস্থার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, আমরা একথাও বলেছি, স্বয়ংনির্ভরতা কেবল বড় পরিকল্পনা বা বড় উদ্দেশ্য থেকে আসবে না। ঐ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করতে হবে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া তা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নেতৃত্ব কেন্দ্রের আছে স্বীকার করে নিলেও সম্পদের অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি কি পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভবপর হবে?

মার মৃত্যুতে মনের এই আঘাতকে সামলাবার জন্যে আমি বেশী করে কাজে মন দিলাম। সময়ে সবই সয়ে যায়—কথায় বলে Time is the best healer — সময়ের সংগে সংগে মনের ক্ষতটাও ধীরে ধীরে শুকোতে লাগল। 'কুমকুমে'র শুটিংও (হিন্দি ও বাংলা) বেশ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়ে এল নভেম্বর নাগাৎ এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ছবির উভয় সংস্করণেরই সম্পাদনা শেষ হয়ে রিলিজের জন্য তৈরী হয়ে গেল।

এর মধ্যে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আগষ্ট মাসে যখন 'কুমকুমে'র শুটিং বেশ পুরোদমে চলছে তখন আমি কয়েকজন মার্কিন ইম্প্রেসারিওর সংগে পত্রালাপ করেছিলাম—এবং তার মধ্যে জগদ্বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও মিঃ হুরকও ছিলেন। এই মিঃ হুরকই উদয়-শংকরের আমেরিকা সফরের সব বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর সংগে আমাদের কথাবার্তা একরকম পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে আমি জানিয়েছিলাম যে আমাদের শুটিং-এর জন্য আমরা ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যস্ত থাকব এবং 'কুমকুমে'র মুক্তিলাভের পর মার্চ-এপ্রিল মাসে আমরা আমেরিকা সফরে যেতে পারি।

এই উপলক্ষ্যে প্রচুর অর্থব্যয়ে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' প্রেস থেকে সাধনা ও তার ব্যালের নানারকম বিশেষ বিশেষ ছবি তুলে সুন্দর একটি পুস্তিকা ছাপানো হল। কোন কোন শিল্পী সঙ্গে যাবে—কোন কোন বাদ্যযন্ত্রীকে নেওয়া হবে—সমস্তই একরকম ঠিক হয়ে গেল। যখন সকলেই আমরা আসন্ন সফরের আনন্দে মশগুল তখন পশ্চিম দিগন্তে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই শুরু হয়ে গেল জার্মানীর সংগে ব্রিটেনের যুদ্ধ। তার কয়েকদিন পরেই অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কিংবা অক্টোবরের গোড়ায় মিঃ হুরক জানালেন যে, এই প্রস্তাবিত সফরটি বর্তমানে স্থগিত রাখতে। আমরাও দেখলাম যে এইরকম অনিশ্চিত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দেশ ছেড়ে এত লোকজন নিয়ে বিদেশে যাওয়াটাও সমীচীন নয়। অতএব বাধ্য হয়েই এই সফর বাতিল করে দিতে হল। এই উদ্দেশ্যে পুস্তিকা ছাপানো, ছবি তোলা এবং প্রচারের দরুণ প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল আমার—সেকথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু আমাদের সকলেরই মনটা নৈরাশ্যে ভরে গেল—বিশেষ করে আমার ও সাধনার। কিন্তু উপায় কি? এতদিনের আশা, আকাঙ্ক্ষা সব বাস্তবের একটি আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

কুমকুমের ভূমিকায় সাধনা বসু

যাই হোক, 'কুমকুম' শেষ হয়ে যাওয়ার পরে চিমনভাই দেশাই কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং চিত্রনির্মাতাকে ছবিখানি দেখবার জন্য একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমার আজও মনে আছে—সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখবার পর বম্বের চিত্র-জগতের এক বিশিষ্ট দিকপাল আমায় অভি-নন্দন জানিয়ে বললেন : মিঃ বোস, 'কুমকুম' আমার খুব ভাল লেগেছে—কিন্তু আমার মনে

হয় এ ছবির নির্মাণকাল অন্ততঃ ১৫ বছর এগিয়ে এসেছে—অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন যে "The picture is 15 years ahead of its time". তাঁর এই কথা বলার কারণ হল যে 'কুমকুমে'র কাহিনী হল সোস্যালিস্ট প্যাটার্নের—অর্থাৎ কিভাবে ধনীরা দরিদ্রদের শোষণ করছে তারই একটি আলেখ্য।

এই 'সোস্যালিজম' তখনও ভারতবর্ষের বুকে জন্মলাভ করেনি এবং এ বিষয়ে তখন পর্যন্ত খুব বেশী আন্দোলনও হয়নি। পরে আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এই সোস্যালিস্ট প্যাটার্নেই ভারতকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আর সেই চেষ্টাই তিনি করে গেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

'কুমকুম'-এর সংগঠনকারিগণ

প্রযোজক—সাগর মুভিটোন
পরিচালক—মধু বসু
কাহিনী—মন্মথ রায়
সুরশিল্পী—তিমিরবরণ

আলোকচিত্র : জয়গোপাল পিলাই, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ : শান্তিসু প্যাটেল, দৃশ্য-পরি-কল্পনা : সুধাংশু চৌধুরী, নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা : সাধনা বসু, গীতিকার : হেমন্ত গুপ্ত (বাংলা) ও পণ্ডিত সুদর্শন (হিন্দি), সম্পাদনা : গোবিন্দ বনভালী, সংলাপ (হিন্দি) : ভবলু জেড আহমেদ, কারুশিল্পী—গোড়া মিস্ত্রী, পরিস্ফুটন : গঙ্গাধর নার্ভেকর ও প্রাণজীবন সুকলা, ধারারক্ষী : অবনী মিত্র, রূপ-সজ্জাকর : কানাই মিত্র, স্থির-চিত্রশিল্পী : ঈশ্বরলাল।

সহকারী : পরিচালনায় : হেমন্ত গুপ্ত, আলোকচিত্র : মিনু বিলমোরিয়া, শব্দ-নিয়ন্ত্রণে : সুবিন।

রূপায়ণে

কুমকুম—সাধনা বসু (বাংলা ও হিন্দি)
চন্দন—ধীরাজ ভট্টাচার্য ,,
সূর্যশঙ্কর—ভুজঙ্গ রায় ,,
প্রদীপ—প্রীতি মজুমদার ,,
শিপ্রা—পদ্মা দেবী ,,
শুক্লা—বিনীতা গুপ্তা ,,
তিলোত্তমা—লাবণ্য দেবী ,,
রিপোর্টার—নবদ্বীপ হালদার ,,
প্রাইভেট সেক্রেটারী—অবনী মিত্র ,,
'পঞ্চপাণ্ডব' :
মণি চ্যাটার্জি ,,
যশবন্ত আগাসী
শশধর চ্যাটার্জি ,,
ললিত রায় ,,
সুশান্ত মজুমদার ,,
জগদীশপ্রসাদ :
রবি রায় (বাংলা)
মহম্মদ ঈশাক (হিন্দি)
স্টেজ ডিরেক্টার :
বেচু সিংহ (বাংলা)
কারামাল্লী (হিন্দি)
থিয়েটার ম্যানেজার :
হেমন্ত গুপ্ত (বাংলা)
বুড়ো আতজানি (হিন্দি)

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ বাংলা সংস্করণটি কলিকাতার 'রূপবাণী'-তে মুক্তিলাভ করল। বাংলা সংস্করণটির পরিবেশক ছিলেন অধুনালুপ্ত প্রাইমা ফিল্মস্। ছবির মুক্তিলাভের সময় আমি আর সাধনা কলকাতায় এলাম কয়েকদিনের জন্যে।

হিন্দি সংস্করণটি বোম্বাইয়ে মার্চ মাসে ইম্পীরিয়াল সিনেমায় মুক্তিলাভ করল।

কলকাতা ও বোম্বায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব সমালোচনা বেরিয়েছিল, তারই কিছু কিছু নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"'কুমকুম্'। 'কুমকুম্'। সারা শহরে ঘরে ঘরে, পথে পথে জনতার মুখে মুখে 'কুমকুম্'!...চিত্রাখ্যান, পরিচালনা, অভিনয়, দৃশ্যপট, শব্দগ্রহণ ও আলোকচিত্রের কাজ, সর্বদিক থেকেই 'কুম্‌কুম্' যে বাংলা চিত্র-জগতে নবঅধ্যায়ের সূচনা করবে, একথা বললে অতিশয়োক্তির অপরাধ হবে না।"

...বাতায়ন (৯-২-১৯৪০)

"সাহিত্যের মত রঙ্গালয় ও ছায়াচিত্রও জাতির জীবনের মুকুর...ছায়াচিত্রেরও জন-সেবার একটা দিক আছে। সাগর মুভিটোনের প্রথম বাংলা ছবি 'কুম্‌কুম্' জনসেবার সেই মহৎ কর্তব্যে আত্মনিবেদন করিয়াছে।...আধুনিক যুগে ক্যাপিটালিজম্ ও লেবারে যে সংঘাত বাধিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত গণ-স্বার্থের যে বিরোধ শুরু হইয়াছে...শ্রমিক-ভারতের বর্তমান সমস্যা আজ সমগ্র জাতির সম্মুখে যে মর্মান্তিক প্রশ্ন তুলিয়াছে, 'কুমকুম' যেন সেই প্রশ্নের প্রতীক।...মায়াময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী সাধনা বসু এই [illegible] চরিত্রটিকে যে অপরূপ রূপ দিয়েছেন, তাহাতে বাঙ্গলার ছায়াচিত্রাভিনয়ের ইতিহাস তাহাকে চিরদিন স্মরণ করিবে।...শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবি রায় ও ভুজঙ্গ রায় প্রমুখ উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জের অভিনয়-দীপ্তিতে 'কুম্‌কুমের' চিত্রাকাশ ঝলমল।"

...দীপালি (অভিমন্যু) (৮-২-১৯৪০)

"...পরিচালনা ত্রুটিহীন হইয়াছে বলিয়াই ছবিখানি এত সুন্দর হইতে পারিয়াছে..."

...ভগ্নদূত (১৭-২-৪০)

"...দেশ ও জাতির কল্যাণের দিক হইতে 'কুমকুমে'র মত ছবির সার্থকতা আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

...দেশ (১৭-২-৪০)

". . . In her very first Hindustani film Sadhona Bose takes a place in the first rank of our screen artistes . . ."

K. Ahmad Abbas,
(Bombay Chronicle), 15-3-1940.

". . . When one realises the first rate talent, latest technique, superb music and excellent direction that distinguished 'KUMKUM', one is not so much surprised at its tremendous success . . . The direction of 'KUMKUM' could not have been placed in more capable hands . . . 'KUMKUM' bears the unmistakable stamp and polish of Mr. Modhu Bose's genius as a director and places him high in the direction field of national production . . ."

THE ILLUSTED WEEKLY
OF INDIA (17-3-1940).

". . . DEFINITELY the best of Sagar and one of India's best. That is my rating of 'Kumkum the Dancer' . . ."

D. C. Shah (The Sunday
Standard), 10-3-1940.

". . .As one of the outstanding productions of the Indian screen "Kumkum the Dancer" will find an important place in our film history . . ."

THE MORNING STANDARD,
BOMBAY (14.3.1940)

". . . 'Kumkum the Dancer' is one of the best and certainly the most polish picture that has ever graced the Indian screen . . . Sadhona Bose presents the exquisite art of the Indian dance in a manner never known on the Indian screen before . . . the photography displays remarkaole inspiration . . ."

THE TIMES OF INDIA,
BOMBAY (15-3-1940).

". . . Modhu Bose's direction contrived to make 'Kumkum' an outstanding production . . . the treatment of the picture is very modern . . . Sadhona Bose as KumKum, is as versatile in dramatics, singing and dancing . . . she acquits herself magnificently in her many sided role . . Robi Roy gives a fine impersonation of a polished villain . . ."

THE STATESMAN,
CALCUTTA (13-2-[illegible]).

"কুমকুম' বাংলা ও হিন্দি উভয় সংস্করণই প্রচুর সাফল্যলাভ করল। প্রথমে ঠিক করেছিলাম যে 'কুমকুম' শেষ হলেই কলকাতা ফিরে আসব। 'কুম্‌কুম্ রিলিজের সময় এলামও কলকাতায়—কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর কলকাতায় একদম মন টিকলো না। মার স্মৃতি সবসময় মনে ভেসে উঠত—সেজন্য বাধ্য হয়ে আবার চলে গেলাম বোম্বাই—এখানে অন্ততঃ কিছু ভুলে থাকতে পারব।

ওখানে গিয়ে দোভাষী ছবির কোনো কন্ট্রাক্টের চেষ্টা করতে লাগলাম। ভাবলাম 'কুমকুম' যখন সকলের ভালো লেগেছে তখন নতুন কন্ট্রাক্ট হতেও দেরী হবে না। এখন হাতে অফুরন্ত সময়।

এইসময় একদিন খেয়াল হল—হাতে যখন প্রচুর সময় আছে তখন অজন্তা ও ইলোরা গুহাগুলি দেখে এলে কেমন হয়! সাধনাকে বলতে সেও খুব উৎসুক হয়ে উঠল যাবার জন্য।

লেগে গেলাম যাবার বন্দোবস্ত করতে। শ্রীচিমনলাল দেশাই-এর ছেলে বুলবুল দেশাই আমাদের জানাল যে জলগাঁওতে তার এক বিশিষ্ট বন্ধু আছে, তার নাম সতীশ হোসালি। সে ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার। সে জানিয়েছে তার ওখানে একটি সুন্দর বিরাট বাংলো আছে—সেখানে সে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবে। শুধু তাই নয়, জলগাঁও থেকে মোটরে করে অজন্তা ও ইলোরাতে নিয়ে যাওয়ার সব

কুমকুম-এর একটি দৃশ্যে সাধনা বসু (কুমকুম) এবং ধীরাজ ভ্যাচার্য (চন্দন)

বন্দোবস্ত করে দেবে। তার ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করলে সে কৃতার্থ হবে।

আমরা দেখলাম, ভালই হল। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একদিন আমি, সাধনা, সাধনার বাবা ও বুলবুল জলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সঙ্গে রইল আমার দুই চাকর—চামান ও তার ভাই আসগর। সত্যিই সতীশ হোসালি আমাদের যেরকম আদর-আপ্যায়ন এবং অভ্যর্থনা করেছিল তা চিরদিন মনে রাখবার মত। সমস্ত আয়োজন এত সুন্দর ও পরিপাটি করে করেছিল যে আমরা কোনরকম অসুবিধাই বোধ করিনি।

জলগাঁও থেকে দুখানি বিরাট মোটরে করে আমরা অজন্তা ও ইলোরা গুহার দিকে রওনা হলুম। সঙ্গে চামান ও আসগব প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদি সব নিয়ে চলল।

এতদিন শুধু আমরা অজন্তা ও ইলোরার ছবিই দেখে এসেছি—অতীতের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শুধু এতদিন ফটোগ্রাফের মাধ্যমে — কিন্তু আমরা যখন স্বচক্ষে সেগুলি দেখলাম—তার সৌন্দর্য, তার কারুকার্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত অন্তর দিয়ে তা অনুভব করতে হয়। দু দিন ধরে এই অজন্তা ও ইলোরার গুহা ও ভেতরের ফ্রেস্কোগুলি দেখলাম সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রাত্রে আমরা আওরঙ্গাবাদের এক হোটেলে গিয়ে থাকতাম।

অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হল। পরিপূর্ণ মন নিয়ে আমরা জলগাঁও-এ ফিরে এলাম—এবং সেখান থেকে বোম্বাই।

আমি আগেই বলেছি যে, আমাদের অত্যধিক খরচের জন্য আমরা কিছুই জমাতে পারি নি। যত্র আয়, তত্র ব্যয়। ক্রমশ আমা-দের আর্থিক অবস্থা খুবই সংগীন হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে ২।১ জন প্রোডিউসারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়, কিন্তু ঠিক কার্যকরী হয় না—এদিকে সময় চলে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, যখন একটি কন্ট্রাক্ট সত্যিই হল—তার কথাবার্তা শুরু থেকে মায় চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা পর্যন্ত ৪।৫ দিনের বেশী সময় লাগে নি।

ওয়াদিয়া মুভিটোনের সর্বময় কর্তা মিঃ জে বি এচ ওয়াদিয়ার সঙ্গে কোথায় যেন একদিন বুলবুলের দেখা হয়। কথায় কথায় মিঃ ওয়াদিয়া আমার ও সাধনার বিষয় জিজ্ঞেস করেন। তিনি বুলবুলকে এও জানান যে, 'কুমকুম' তিনি দেখেছেন। ছবি তাঁর খুবই ভাল লেগেছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের তিনি একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল চিত্রনির্মাতা—সত্যি কথা বলতে কি, আমার এই সুদীর্ঘ চিত্রজীবনে তাঁর মত শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল চিত্র-নির্মাতা আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি বুলবুলকে জানালেন যে, আমার সঙ্গে তিনি একবার দেখা করে একটি ভবিষ্যৎ ছবির বিষয় কথাবার্তা বলতে চান।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করলুম। আলাপ হল—চমৎকার লোক। প্রথম আলাপের সময় কি জানি কিভাবে দুজনের দুজনকে খুব ভাল লেগে গেল। তাঁর কথায় বুঝলুম যে, তিনি এমন একখানি ছবি করতে চান যা ভারতের বাইরেও চলবে।

—অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য ছবি এবং তা হবে ইংরাজীতে। আমি "রাজনর্তকী"র গল্পটি বললাম। রাজ-নর্তকীকে রাজনটী নাম দিয়ে ইতিমধ্যেই আমি মণ্ডস্থ করেছিলাম। রাজনর্তকীর গল্প শুনে তাঁর খুব ভাল লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কথাবার্তা পাকা হয়ে কন্ট্রাক্ট

হয়ে গেল। যেদিন কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করলাম সে তারিখটি আমার আজও মনে আছে—সেটি হল ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল। ১৩ নম্বরকে ইংরেজরা বলে Unlucky 13' - অনেকে আমাকে বলল যে, এদিনে কন্ট্রাক্টটা সই না করতে, কারণ দিনটা অশুভ। অন্য কোন কারণে নয় যেহেতু ১৩ তারিখ বলে, কিন্তু আমি কারও কথা শুনলুম না। সই করলুম ১৩ তারিখে। 'রাজনর্তকী'র বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী—তিন সংস্করণের জন্য এবং আজ আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, আমার চিত্র-জীবনে যতগুলি কন্ট্রাক্ট সই করেছি, তার মধ্যে 'রাজনর্তকী'র কন্ট্রাক্ট সব দিক থেকে সার্থক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কন্ট্রাক্ট।

চিত্রনাট্যের কাজ শুরু হল।

মন্মথ, আমি, হেমন্ত ও ডবলু জেড আহমেদ একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে পরের পর দৃশ্য সাজিয়ে যেতে লাগলাম; সঙ্গে সঙ্গে সংলাপও লেখা হতে থাকল। "কুমকুমে"র মত সংলাপ প্রথমে বাংলাতেই লেখা হতে লাগল, তারপর আহমেদ সেগুলি হিন্দিতে অনুবাদ করে যেত। আহমেদ এতদিনে বাংলা বেশ ভালই শিখে নিয়েছিল, এমনকি সে এখন বাংলাতেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

একদিন চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখা শেষ হল। বাংলা সংলাপ মন্মথই লিখল, হেমন্ত তাকে সাহায্য করেছিল, হিন্দি সংলাপ লিখল আহমেদ এবং ডি এফ কারাকা লিখলেন ইংরাজী সংলাপ।

এর পর এল ভূমিকা নির্বাচনের পালা। প্রযোজক মিঃ জে এচ ওয়াদিয়া আমায় কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন আমার পছন্দমত শিল্পী নির্বাচন করে একেবারে কন্ট্রাক্ট করে ফেলবার জন্য। টাকা-কড়ি কাকে কি রকম দেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন : মিঃ বোস, আপনি আমার হয়ে কন্ট্রাক্ট সই করবেন। যাকে যা দেওয়া উচিত সেটা আপনিই ঠিক করবেন।

এতখানি বিশ্বাস ছিল তাঁর আমার ওপর। শুধু তাই নয়, কতখানি বিরাট অন্তঃকরণ ছিল তাঁর, যা খুব কম দেখা যায়।

ঠিক আসবার সময় খবর পেলাম গোলাপদা খুব অসুস্থ। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কত দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব তাঁর সঙ্গে আমার। বন্ধুভাবে তাঁকে ভালবেসেছি এবং দাদার মত তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি। সেই গোলাপদা অসুস্থ শুনেই ছুটলাম ম্যালাড-এ। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে পৌঁছেও এত কাছে গিয়েও এ সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। দেবিকা বললে : খুব দুঃখিত মধু—কি করব বল, ডাক্তারের নির্দেশ কারুর সঙ্গেই দেখা করা চলবে না।

মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম—এই শেষ সময়ে একবার চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম। সেটা হবে মে মাসের মাঝামাঝি।

কুমকুম-এর একটি দৃশ্যে ভুজঙ্গ রায় (সূর্যশঙ্কর) এবং রবি রায় (জগদীশ প্রসাদ)

তারপর আমি চলে এসেছি কলকাতায়। এখানে এসে সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলী-দের নির্বাচন করে কন্ট্রাক্ট সই করছি। এমন সময় হঠাৎ বম্বে থেকে একটা ট্রাঙ্ককল এল যে, গোলাপদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমার আফশোষের আর সীমা রইল না—একবার শেষ দেখাও হল না তাঁর সঙ্গে।

কুমকুম-এর জগদীশ প্রসাদের ভূমিকায় রবি রায়

এদিকে যেসমস্ত শিল্পীদের নির্বাচন করলাম তাঁরা হলেন : অহীন্দ্র চৌধুরী, *জ্যোতিপ্রকাশ, *প্রভাত সিংহ, *বিভূতি গাঙ্গুলী, *মৃণাল ঘোষ, প্রতিমা দাশগুপ্ত ও মাধব মেনন। জ্যোতিপ্রকাশ ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই বাংলা ও হিন্দি উভয় সংস্করণের জন্য চুক্তি হয়েছিল। সুধাংশু চৌধুরীকে ঠিক করলাম শিল্প-নির্দেশক হিসেবে, সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে ঠিক হল তিমিরবরণ, তার সহকারী হল প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। ওয়াদিয়া মুভিটোন আগে বেশীর ভাগই Stunt ছবি করত, আর সেগুলি পরিচালনা করতেন মিঃ জে বি এচ ওয়াদিয়ার ভাই হোমি ওয়াদিয়া। তাঁদের নিজস্ব অর্কেস্ট্রা বলতে কিছু ছিল না। সেইজন্য তিমির এইখান থেকেই বেশীর-ভাগ যন্ত্রীদের নিয়ে গিয়েছিল। ক্যামেরা-ম্যান নিলাম যতীন দাস ও তার ভাই প্রবোধ দাসকে এবং শ্যাম দাসকে নিলাম সম্পাদক হিসেবে।

কলকাতায় নির্বাচিত শিল্পী ও কলা-কুশলীদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই করে জুন মাসের গোড়ায় বম্বে ফিরে গেলাম।

(ক্রমশ)

আজকের কথা ঃ

ছবির প্রযোজকদের প্রতি ঃ

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রজগতে নিত্য নূতন প্রযোজকের আবির্ভাব দেখতে আমরা বহুদিন ধ'রেই অভ্যস্ত। কিন্তু যতখানি ঢক্কানিনাদের দ্বারা এ'দের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, এ'দের নিষ্ক্রমণের সময়ে ঠিক ততখানিই নীরবতা অবলম্বিত হয়ে থাকে: প্রতিমা বিসর্জনের মতো বাদ্যভান্ড বাজিয়ে এ'দের বিদায় দেওয়া হয় না।

কিন্তু যে ভদ্রলোক নিজের পয়সা খরচ ক'রে বাঙলা ছবির প্রযোজনায় ব্রতী হন, যিনি মোটরবাহিত হয়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করা মাত্র সেখানকার হাওয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে, যাঁর আচারে ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় এবং সর্বোপরি অর্থ সম্বন্ধে অকৃপণতায় মুগ্ধ হয়ে স্টুডিওমহলে সাড়া প'ড়ে যায়—'একজন নাম করবার মতো প্রোডিউসার এসেছে বটে!' তাঁকে আমরা সবিনয়ে গুটিকয়েক কথা নিবেদন করব ঃ

প্রথমেই বলব, আপনি হয়ত একজন খুব পাকা ব্যবসায়ী, তবু আপনাকে সতর্ক করবার জন্যেই বলব, চলচ্চিত্র ব্যবসায় অপর সকল ব্যবসায় থেকে একেবারে আলাদা জাতের। এখানে এক ইঞ্চিও ছবি তৈরী হবার আগেই আপনার পকেট থেকে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে কাহিনীর চিত্রস্বত্ব, চিত্রনাট্য, গীতরচনা, শিল্পী ও কলা-কুশলী (পরিচালক, সহকারী পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও সহকারী, শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক ও সহকারী, সংগীত-পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও সহকারী, বেশকার প্রভৃতি) নিয়োগ, স্টুডিও ভাড়া ইত্যাদি বাবদ। কাঁচা ফিল্মের আমদানী ভারত সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই ওটা কেনবার অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্যে ওরই মধ্যে আপনাকে দরবার করতে হবে জয়েন্ট চীফ কন্ট্রোলারের কাছে। এর পরে যখন শুটিং শুরু হবে, তখন দেখবেন, অধিকাংশ আর্টিস্টই কাজ করছেন তাঁদের নিজেদের মর্জি মতো, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত ঠোঁটের পাশে একটু হাসি ফুটিয়ে আপনার নমস্কারের পাল্টা জবাব দেন, আবার কোনো জন হয়ত তাও নয়। কারুর আচরণ বা অভিনয় আপনার মনোমত না হলেও আপনাকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে চুপ ক'রেই থাকতে হবে; কারণ তাঁকে খারিজ করতে হ'লে তিনি যে-সব দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই দৃশ্যগুলিকেই বাদ দিতে হয় অর্থাৎ আবার নতুন ক'রে সেই দৃশ্য-গুলি তোলবার ব্যবস্থা করতে হয়। এবং এর জন্যে শুধু যে খরচেরই সমস্যা, তা নয়; অপর আর্টিস্ট ও ক্যামেরাম্যান প্রভৃতির 'ডেট' পাওয়া রীতিমত দুষ্কর ব্যাপার। মনে রাখবেন, আর্টিস্ট ও

ভুপেন সান্যাল পরিচালিত **ছায়াপথ** চিত্রে সুস্মিতা সান্যাল। ফটো ঃ অমৃত

টেক্নিসিয়ানরা মাত্র আপনারই ছবিতে কাজ করেন না। যতদিন শ্যুটিং চলবে, ততদিন আপনার কাজ এবং একমাত্র কাজ হবে—প্রয়োজন মতো অর্থ যুগিয়ে যাওয়া।

আপনি পাকা ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধি-মান। কাজেই আপনি নিশ্চয়ই আপনার ছবির চিত্রনাট্যের একটি কপি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং ছবিতে সবসমেত কটি 'সেট'-এর (কৃত্রিম গৃহাদি) কাজ আছে ও কতগুলি বহির্দৃশ্য আছে, তারও একটা হিসাব রেখেছেন। কারণ এই থেকেই বুঝতে পারবেন, আপনার ছবির কতগুলি 'সেট'-এর কাজ ও চিত্রনাট্যের কতখানি অংশ গৃহীত হয়েছে এবং কতখানিই বা বাকী আছে। জানবেন, ছবির শ্যুটিং নির্বিঘ্নে যথাসময়ে শেষ হ'তে পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের কথা। আর্টিস্ট বা কলা-কুশলীদের সুখ-অসুখ তো আছেই, তার ওপর আছে ক্যামেরা বা শব্দযন্ত্রের হঠাৎ অকেজো হয়ে পড়া, বিজলী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি বহুবিধ বাধাবিপত্তি। কাজেই এ-সব কাটিয়ে শুটিং শেষ হ'লে আপনাকে চব্বিশ ঘন্টা খবরদারি করতে হবে সম্পা-দকের ঘরে—কতদিনে সট ও দৃশ্যগুলিকে পর পর সাজিয়ে ছবির সংলাপ ও গানের সঙ্গে একাত্ম ক'রে চিত্রনাট্য অনুযায়ী একটি সম্পূর্ণ কাহিনীচিত্রে পরিণত করেন তিনি পরিচালকের সহায়তায়, তারই জন্যে। অবশ্য ঠিক সম্পূর্ণ একে বলতে পারবেন না। কারণ সর্বসম্মতভাবে চূড়ান্ত রূপ পাবার পরে ছবির আবহসঙ্গীত গ্রহণ ও রি-রেকর্ডিং বা শব্দপুনর্যোজনার কাজ আছে ছবির টাইটেল প্রভৃতি জোড়বার

পরে। যখন ফাইন্যাল কপি তৈরী হল, তখন আপনাকে করতে হবে ছবির সেন্সারিং-এর ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার ছবির পরিবেশক করবেন ছবির মুক্তির আয়োজন। জানবেন, আজকাল একটি ছবির মুক্তির আয়োজন করা রীতিমত দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার; কত যে ছুটোছুটি, কত যে শলাপরামর্শ, কত যে গোপন চুক্তি ও লেনদেনের সমস্যা, তা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানেন। অথচ ছবি সেন্সারের ছাড়পত্র পাবার পরে যতদিন না সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করছে, ততদিন আপনার আহারে ক্ষুধা নেই, শয়নে নিদ্রা নেই। ক্রমাগত আপনি ভাবছেন, এই যে আড়াই তিন লক্ষ টাকা গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে ছবি তৈরী করলুম এবং বিজ্ঞাপন ও প্রিন্ট বাবদ আরও বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এর শেষ ফলাফলটি দেখব কবে? আপনার অর্থব্যয়েরও শেষ নেই, মানসিক উৎকণ্ঠারও অবধি নেই।

বি কে প্রোডাকসন্সের নায়িকা সংবাদ চিত্রে **অঞ্জনা ভৌমিক**

খুব কম ক'রে বছর খানেক ধ'রে দস্তুরমত হিমসিম খাবার পরে যেদিন আপনার ছবিখানি শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে মারফত মুক্তি পাবে, সেই মোক্ষম দিনটিতে তিনটের ম্যাটিনী শো' ভাঙবার সংগে সংগেই আপনি অবধারিতভাবে বুঝতে পারবেন, আপনার ছবির দৌড় কতদূর পর্যন্ত। এমনকি, কোনো কোনো চিত্রগৃহের অভিজ্ঞ ম্যানেজার খোলাখুলিভাবে আপনাকে ব'লে দিতে পারবেন, আপনার ছবির পরমায়ু ক' হপ্তা স্থায়ী এবং ছবিটি শহর থেকেই বা কত আয় করবে ও মফস্বল থেকেই বা কত। এইখানে একটা মোটামুটি হিসেব আপনাকে জানিয়ে রাখি। টিকিট বিক্রীর প্রতি একশো টাকার মধ্যে আপনার ভাগে জমা হবে মাত্র আঠারো কি উনিশ টাকা। কাজেই সর্বসমেত কত টিকিট বিক্রী হ'লে আপনার খরচটি উঠে আসতে পারে, সেটি আপনি নিজেই হিসেব ক'রে নিতে পারবেন বলে আশা করি।

অপরাপর ক্ষেত্রে একজন পাকা ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত হয়েও এই বাঙলা চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে ব্রতী হয়ে প্রথমেই যাতে বোকা বনে না যান, প্রয়োজন মতো অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও আপনার ছবিখানি যাতে দর্শকবৃন্দ দ্বারা জলছবি বলে উপেক্ষিত না হয়, তারই জন্যে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব, প্রযোজকরূপে আত্মপ্রকাশের আগেই বাঙলা ছবির জগৎটার সংগে কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার জন্যে। প্রথমেই আপনার জেনে নেওয়া উচিত, বর্তমানে বাঙলা ছবির আয় সাধারণভাবে কি হয়ে থাকে। কারণ, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন একখানি সাধারণ ছবিতে কতটা খরচ করা উচিত।

এর পরে আপনি জানতে চেষ্টা করবেন, টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় যে-সব ছবির শ্যুটিং চলছে, তার মধ্যে কোনো নামকরা প্রযোজকের ছবি আছে কিনা। যদি থাকে, তা হ'লে তেমন দু'একজন প্রযোজকের সংগে চেষ্টাচরিত্র করে পরিচিত হবেন এবং তাঁদের ছবির শ্যুটিং ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করবার বন্দোবস্ত করবেন। এমনকি, অভিজ্ঞতালাভের সুযোগের জন্যে তাঁদের কারুর ছবিতে আপনি কিছু—ধরুন, হাজার দশেক টাকা—অর্থবিনিয়োগও করতে পারেন। ছমাস বা বছরখানেক ধরে এইভাবে স্টুডিওপাড়ায় যাতায়াত করতে করতে এবং বিভিন্ন ছবির শ্যুটিং দেখতে দেখতে ছবির প্রযোজনা সম্পর্কে আপনার একটা অভিজ্ঞতা জন্মে যাবে; ঐ সঙ্গে যদি আপনি পরিচিত প্রযোজকদের কাছ থেকে ছবি তৈরী সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত

বি কে প্রোডাকসন্সের **নায়িকা সংবাদ** চিত্রে অঞ্জনা ভৌমিক

অভিজ্ঞতার কথা গল্পচ্ছলেও জেনে নিতে পারেন, তা'হ'লে চিত্রপ্রযোজনা সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান বাড়বে বৈ কমবে না। এবং এর ফলে আপনি জানতে পারবেন, কি ধরনের বলিষ্ঠ কাহিনী আপনার গ্রহণ করা উচিত, সেই কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করবার জন্যে কে সব চেয়ে বেশী উপযুক্ত, ঐ কাহিনীর প্রতি সুবিচার করতে পারেন সবচেয়ে বেশী কোন্ কোন্ পরিচালক, চিত্রনির্মাণের জন্যে তিনি যে অর্থব্যয় করতে চাইছেন, তার অনুপাতে কোন্ কোন্ শিল্পী ও কলাকুশলী নিয়োগ করা সম্ভব ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের স্থির বিশ্বাস, হঠাৎ চিত্র-প্রযোজনার কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে হবু প্রযোজকেরা যদি বাঙলার চলচ্চিত্রজগৎ সম্পর্কে আগে থেকে বেশ কিছুটা ওয়াকিবহাল হবার সুযোগ করে নিতে পারেন, তাহলে একদিকে তাঁরাও যেমন কম ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, অপরদিকে বাঙলা চলচ্চিত্রজগৎও তেমনই "ছবি-নামের-অযোগ্য" ছবির জন্ম দেবার হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে।

চিত্র-সমালোচনা

(১) অশ্রু দিয়ে লেখা (বাংলা) : ফাল্গুনী চিত্রম-এর নিবেদন ; ৩,৫৩১-৩৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ ; প্রযোজনা : দীনেশ দে এবং অমা ঘোষ ; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : অমল দত্ত ; কাহিনী : মেঘনাদ ; সঙ্গীত-পরিচালনা : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ; গীতরচনা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দত্ত এবং অভিজিৎ ; চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে ; শব্দানুলেখন : জে ডি ইরাণী এবং অনিল তালুকদার ; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ; শিল্প-নির্দেশনা : গৌর পোদ্দার ; সম্পাদনা : রমেশ যোশী ; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র ; রূপায়ণ : অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, নিরঞ্জন রায়, জহর রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার (অতিথি), সুখেন দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ রায়, মাঃ চঞ্চল, মাঃ জয়দীপ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সুমিতা সান্যাল, সুনন্দা দেবী, গীতালি রায়, গীতা দে, নীলিমা দাস (অতিথি), চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি। ইপ্সি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২রা সেপ্টেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ, আলোছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

হিমাদ্রি সেন আজ যে কোলিয়ারীর ম্যানেজার, একদিন সেটি তার বাবারই সম্পত্তি ছিল। তাঁর বন্ধু চন্দ্রনাথ চৌধুরী দেনার দায়ে সেটিকে আত্মসাৎ করে নেন। এই কারণে মৃত চন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র প্রতাপ চৌধুরী সম্পর্কে সে মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করে। সহকারী তারিণী সান্যালের সহযোগিতায় সে অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে সুরা ও নারী-সম্ভোগ করে চলেছিল এতদিন। কিন্তু যখন প্রতাপ চৌধুরী নিজে কোলিয়ারী পরিদর্শন করতে এসে উপস্থিত হলেন, তখন সে মনে মনে প্রমাদ গুনল। এর ওপর যখন প্রতাপ স্থানীয় মানবদরদী জন বিশ্বাসের একমাত্র কন্যা সীমার প্রেমে পড়ে ওখানেই বসবাস করবার উদ্যোগ করতে লাগল, তখন প্রতাপের মাকে খৃষ্টান মেয়ে সীমা সংক্রান্ত সব কথা গোপনে জানিয়ে সে প্রতাপকে কলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করল। অপর দিকে সে মিথ্যা বলে সকলের জন বিশ্বাসকেও ওখান থেকে সরিয়ে ফেলল এবং প্রতাপ যখন সীমার সন্ধানে এল তখন জন বিশ্বাসের স্কন্ধে অর্থ-আত্মসাতের মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাঁর ওপর প্রতাপের মনকে বিষিয়ে দিল। প্রতাপ সীমাকে ভোলবার চেষ্টায় তার মায়ের কথামত আধুনিকা গোপাকে বিবাহ করে শেষ পর্যন্ত সুখী হতে পারল না। ওদিকে সীমা কুমারী অবস্থায় প্রতাপের সন্তানের জননী হল এবং পিতার মৃত্যুর পরে যখন সে সহায়হীনা, তখন পাছে সীমা তার সন্তানকে নিয়ে প্রতাপের কাছে হাজির হয় এই ভয়ে ভীত হিমাদ্রির চক্রান্তে তার সন্তানকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল হিমাদ্রিরই আদেশে কুলি-সর্দার কুন্দন সিং। কিন্তু হিমাদ্রির কথামত ফুলের মতো শিশুকে জীবন্ত কবরস্থ না করে সে তাকে দিয়ে এল এক অনাথ আশ্রমে। অর্থগৃধ্নু হিমাদ্রি তারই অনুগৃহীতা একটি মেয়েকে সন্তানবতী সীমা বলে খাড়া করে প্রতাপের মায়ের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে। সীমা সন্তানের শোকে যখন পাগল হয়ে গেল, তখন নিশ্চিন্ত হিমাদ্রি তার পাপের সাক্ষী ও হাতিয়ার কুন্দনকে পর্যন্ত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে মনস্থ করল। কিন্তু সেকথা জানতে পেরে কুন্দন হিমাদ্রিকে করল আক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে জেলে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে সে কেমন করে প্রতাপ ও সীমার মিলনের উপলক্ষ্য হল, সেই আনন্দ-বেদনায় মিশ্রিত ঘটনাবলী নিয়ে ছবির শেষের দৃশ্য-গুলি গড়ে উঠেছে।

পাঠকের নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে, কাহিনীটি অতিমাত্রায় ঘটনা-প্রধান। এত বেশী ঘটনার ভীড়ে যে চরিত্র হারিয়ে যেতে পারে, একথা বোধকরি কাহিনীকার বা চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের আদৌ খেয়াল ছিল না। 'মানুষ পাপ নিয়ে জন্মায়, না পরিবেশের দোষে জন্মে পাপী হয়?" —পরিচয়পুস্তিকা থেকে জানা যায়, এই প্রশ্নের সমাধান ছিল কাহিনী-কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, তাহলে ঘটনাকে এমনভাবে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, যাতে কুন্দন সিং হয় কাহিনীর আসল নায়ক। কিন্তু তা না হয়ে প্রতাপ চৌধুরীর প্রেম এবং তার প্রতি হিমাদ্রি সেনের বিদ্বেষের পরিণতিই ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে, কাহিনীগত কোনো ঘটনাই দানা বাঁধতে পারেনি এবং কোথাও ছিটে-ফোঁটাও রসসৃষ্টি হয়নি। হিমাদ্রি সেনের চক্রান্তে পড়ে প্রতাপ, প্রতাপের মা, জন বিশ্বাস প্রভৃতি সবাই কি করে অত বোকা বনে গেল, তা ভেবে পাওয়াই দুষ্কর। ছবির প্রাণ হচ্ছে কাহিনী এবং একটি বলিষ্ঠ কাহিনী ছবির বহু ত্রুটিকেই উপেক্ষা করতে বাধ্য করে, এই তথ্যটি সব সময়েই স্মরণ রাখা উচিত।

কাহিনীগত দুর্বলতা সত্ত্বেও নায়িকা সীমার চরিত্রে জ্যোৎস্না বিশ্বাস তাঁর নাট্য-নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস, সুযোগ্য পরিচালকের অধীনে তিনি একজন কৃতী শিল্পীরূপে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। নায়ক প্রতাপ চৌধুরীর ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় যে একজন টাইপ চরিত্রের সার্থক অভিনেতা, এ প্রমাণ তিনি কুন্দন সিংয়ের ভূমিকায় দিতে পেরেছেন। জন বিশ্বাসের মানবদরদী রূপটিকে অতি সহজেই ফুটিয়ে তুলেছেন অসিতবরণ। দুই ক্রুর চরিত্রে মন্মথ মুখোপাধ্যায় (তারিণী) ও নিরঞ্জন রায় (হিমাদ্রি) অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।। কুন্দনের প্রণয়িনীর চরিত্রটিকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন

অতিথি-শিল্পী নীলিমা দাস। অতি আধুনিকা গোপার ভূমিকায় সুস্মিতা সান্যালকে নামানো উচিত হয়নি; উগ্র, রুক্ষ চরিত্রে তিনি বেমানান। অপরাপর ভূমিকায় জহর রায় (কবিরাজ), সুখেন দাস (মল্টুদা), গীতালি রায় (জাল সীমা), সুনন্দা দেবী (প্রতাপের মা), প্রবীরকুমার (ডাঃ আশীষ সেন) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের ওপর প্রশংসনীয়। অন্তর্দৃশ্য ও বহির্দৃশ্যের অধিকাংশ স্থলে—বিশেষ করে বিভিন্ন চরিত্রের 'ক্লোজ-আপ' গ্রহণে চিত্রশিল্পী বিজয় দে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত-পরিচালক অভিনবত্বের নিদর্শন রেখেছেন পরিচয়-লিপির যন্ত্র-সঙ্গীত-রচনায় বা টাইটেল-মিউজিকে; অবশ্য এই অংশে শব্দানুলেখন কিছুটা মৃদু হলে ভালো হত। ছবির অনেকাংশে আবহসঙ্গীতও উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনা যথাযথ।

ফাল্গুনী চিত্রম-এর "অশ্রু দিয়ে লেখা" কাহিনীগতভাবে দুর্বলতা সত্ত্বেও সুঅভিনয় ও দ্রষ্টব্য কলাকৌশল গুণ-বিশিষ্ট।

(২) লাভ ইন টোকিও (হিন্দী): প্রমোদ ফিল্মস-এর নিবেদন; ১৫,৫০০ ফিট দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা: প্রমোদ চক্রবর্তী; কাহিনী ও চিত্রনাট্যঃ শচীন ভৌমিক; সংলাপঃ আগা জানি কাশ্মীরী; সঙ্গীত-পরিচালনাঃ শঙ্কর জয়কিষণ; গীত-রচনাঃ হসরৎ জয়পুরী ও শৈলেন্দ্র; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা: ভি কে মূর্তি; চিত্রগ্রহণঃ এম সম্পৎ; সঙ্গীতানুলেখনঃ মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা: শান্তি দাস; সম্পাদনা: ধরমবীর; নৃত্য-পরিচালনা: সুরেশ ভাট; নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতঃ লতা মঙ্গেশকার, মোহাম্মদ রফী ও মান্না দে; রূপায়ণঃ জয় মুখোপাধ্যায়, প্রাণ, মেহমুদ, ধুমল, উল্লাস, অসিত সেন, মদনপুরী, মাস্টার শহীদ, আশা পারেখ, ললিতা পাওয়ার, শুভা খোটে প্রভৃতি। বিলিমোরিয়া লালজীর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২রা সেপ্টেম্বর থেকে রক্সী, প্যারাডাইস, ম্যাজেস্টিক, প্রিয়া, মেনকা, রূপালী, গণেশ, নাজ, মিত্রা, ছায়া, ইন্টালী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

চলচ্চিত্রের প্রধান শর্ত যদি প্রমোদ বিতরণ হয়, তাহলে প্রমোদ চক্রবর্তী পরিচালিত ও প্রযোজিত, প্রমোদ ফিল্মস-এর ইস্টম্যান কালারে তোলা সুদীর্ঘচিত্র "লাভ ইন টোকিও" সেই শর্ত পালন করেছে শতকরা পুরোপুরি একশো ভাগই। আমরা ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বহির্দৃশ্যসংবলিত 'সঙ্গম' ছবি দেখেছি। 'লাভ ইন টোকিও'তে এবার আমরা দেখলুম, বহু-বিচিত্র টোকিও শহরের পটভূমিকায় বিধৃত একটি কাহিনীর বর্ণসুষমামণ্ডিত চিত্ররূপ। অবশ্য টোকিও শহরের গিনজা, অধুনা-নির্মিত অলিম্পিক সিটি, মজাজিনিয়া ভাসমান মন্দির, টোকিও টাওয়ার (যা প্যারিসের ইফেল টাওয়ার থেকেও চল্লিশ ফুট উঁচু), হিবিয়া পার্ক, মেনোবাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (যেখানে বালু-স্নানের আয়োজন আছে), পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাষ্ঠসেতু কিন্টাইবাশি প্রভৃতি বহু বৈচিত্র্যময় স্থানই 'লাভ ইন টোকিও'র একমাত্র আকর্ষণ নয়; এর মধ্যে দর্শকের নয়ন ও শ্রবণকে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করবার জন্যে আছে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রেম-নিবেদন, ক্রূরের শঠতামূলক রোমহর্ষক কার্যাবলী, বালক-অভিনেতার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়পূর্ণ দৃশ্য, সুন্দরী নায়িকার তরুণ শিখ যুবকবেশে বহু ছলাকলার অবতারণা (নায়ককে বৃদ্ধ অধ্যাপকের বেশে দেখেছেন, 'প্রোফেসর' ছবিতে) এবং তার ওপর যা সাধারণ কোনো ভারতীয় ছবিতে নেই, সেই রকম দুটি চমকপ্রদ দৃশ্যঃ এক, মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে মেহমুদ-এর টোকিও শহরের ওপর দিকে বেলুনের মতো বারংবার উঠে যাওয়া ও নেমে আসা এবং একটি শিশুকে চলন্ত ট্রেনের সামনে থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং দুই, নায়িকাকে নিয়ে পলায়মান দুর্বৃত্তের পশ্চাদ্ধাবন করে উড়ন্ত হেলিকপ্টারের নীচের রজ্জু ধরে নায়কের বিপজ্জনকভাবে শূন্যে ঝুলতে থাকা, সেই অবস্থায় হাতের মুঠোর ওপর দুর্বৃত্তের পুনঃপুন আঘাত সত্ত্বেও অমিতবিক্রমে নায়কের হেলিকপ্টারের ওপরে উঠে যাওয়া এবং মল্লপণ সংগ্রামের পর উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে দুর্বৃত্তের পতন। মেহমুদের ওড়া ও পড়ার দৃশ্য যেমন অভাবনীয়ভাবে উপভোগ্য, উড়ন্ত হেলিকপ্টারেনায়ক-দুর্বৃত্তের জীবন-মরণ সংগ্রামের দৃশ্য তেমনই শ্বাসরোধকর ও রোমহর্ষক। —তাই বলছিলুম, 'লাভ ইন টোকিও'-তে দর্শকের প্রমোদোপকরণ আছে শতকরা পুরোপুরি একশো ভাগই এবং সেই কারণে ছবিটি অসামান্যভাবে জনপ্রিয় হতে বাধ্য।

'লাভ ইন টোকিও'র মধ্যে একটি কাহিনী নিশ্চয়ই আছে এবং সেটি হচ্ছে সংক্ষেপে এইঃ ভারতীয় বাপ ও জাপানী মায়ের সন্তান বালক চিকু যখন হঠাৎ তার বাপ-মা দুজনকেই হারাল, তখন সংবাদ

পেয়ে তার কাকা অশোক এল তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে। কিন্তু চিকু জাপান ছেড়ে ভারতে যেতে চায় না বলে পালিয়ে গেল। এদিকে বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, নৃত্য-গীত পটিয়সী আশা নিজের অমতে প্রাণ নামে এক দুর্বৃত্তকে বিবাহ করতে গররাজী হয়ে তার কাকার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। এই অবস্থায় চিকুর সংগে আশার দেখা ও ভাব হয়ে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে টেলিভিসনের প্রসিদ্ধা তারকা আশার পলায়নের সংবাদ জানিয়ে তাকে ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করা হয়ে গেছে। তাই চিকু আশাকে সহজেই চিনতে পারল এবং তার আসল চেহারা গোপন করে ছদ্মবেশ ধারণের বন্দোবস্ত করল। চিকু নিজেও ছদ্মবেশ ধারণ করতে ভুলল না। দুজনে দুজনকে কোনো অবস্থাতেই ছেড়ে যাবে না প্রতিজ্ঞা করল। অপরদিকে চিকুর জন্যে অশোক এবং আশার পেছনে প্রাণের অনুসন্ধানের অন্ত নেই। নানা পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে অশোক চিকুর সন্ধান পায় এবং খুব শিগগীরই চিকুর সংগিনী আশাকে ভালোবেসে ফেলে। এরপরে প্রাণ যখন আশার নাগাল পায়, তখন অশোক-আশা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত। প্রাণ আপ্রাণ চেষ্টা করে আশাকে অশোকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন তা পারে না, তা আগেই বলা হয়েছে।

নায়িকা আশার ভূমিকায় আশা পারেখ অভিনয়ে, গানে, নাচে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন দর্শকের চোখের সামনে; চরিত্রটির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অভিব্যক্তির মাধ্যমে। নায়ক অশোকরূপে জয় মুখোপাধ্যায় প্রেমিকের অংশে যতটা সহজ স্বাভাবিক, গভীরতর ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ততটা নয়। মহেশরূপে মেহমুদ দর্শকদের প্রচুর আনন্দের খোরাক যুগিয়েছেন। এবং তাঁর সংগে তাঁর প্রণয়িনীর পিতার ভূমিকায় ধুমলও অল্প উপভোগ্য নন। দুর্বৃত্ত প্রাণ-প্রাণ তাঁর চিরাচরিত খলতার প্রকাশ করেছেন সিদ্ধহস্তে। মাস্টার শহীদের চিকো অপরূপ এবং ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এছাড়া ললিতা পাওয়ার, উল্লাস, অসিত সেন, শুভা খোটে, মদনপুরী প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় শান্তি দাসের শিল্প-নির্দেশনা এবং তারপরেই বাবুভাই মিস্ত্রীর চোখধাঁধানো ইন্দ্রজাল (স্পেশ্যাল এফেক্ট)। শংকরজয়কিষণ সৃষ্ট সুর 'জাপান-লাভ ইন টোকিও', 'সায়োনারা সায়োনারা' প্রভৃতি গানকে অবশ্যই জনপ্রিয় করে তুলবে। আবহ-সংগীত ছবির দৃশ্যগুলিকে বেশী করে উপভোগ্য করে তুলেছে।

প্রমোদ চক্রবর্তী পরিচালিত ও প্রযোজিত 'লাভ ইন টোকিও' হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় প্রমোদ-সম্ভারপূর্ণ অবদান।

—নান্দীকর

কলকাতা

আগামী সপ্তাহে 'গল্প হলেও সত্যি'

তপন সিংহের কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা সমৃদ্ধ 'গল্প হলেও সত্যি' আগামী সপ্তাহে ১৬ই সেপ্টেম্বর রূপবাণী, ভারতী, অরুণা ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। নিউ থিয়েটার্স এক্‌জিবিটার্স নিবেদিত এ চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ছায়াদেবী, ভারতী দেবী, কৃষ্ণা বসু, জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। ছায়াবাণী ছবিটির পরিবেশক।

বি কে প্রোডাকসন্সের 'নায়িকা সংবাদ'

ট্রেন বিভ্রাটে হারিয়ে যাওয়া এক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র-নায়িকার কয়েকদিনের কিছু বিচিত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন পরিবেশে বিবৃত হয়েছে 'নায়িকা সংবাদ'র কাহিনী। প্রশান্ত দেব রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী। সুর-সৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রধান চরিত্রে রয়েছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্তা, সর্বেশ্বর ও জহর রায়। মুক্তি প্রতীক্ষিত এ ছবিটির পরিবেশক হলেন চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

'হঠাৎ দেখা' সম্পূর্ণপ্রায়

শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'হঠাৎ দেখা'র চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণপ্রায়। তীর্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত হাল্কা রসের প্রণয়মধুর কাহিনীচিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সুস্মিতা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, রেণুকা রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতালি রায়। শ্যামল মিত্র সুরকৃত এ ছবির পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত।

'কাল তুমি আলেয়া'র সংগীতগ্রহণ

শ্রীলোকনাথ চিত্রম প্রযোজিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল তুমি আলেয়া'র
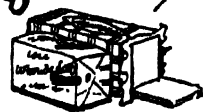
সংগীতগ্রহণ সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হল। সঙ্গীত পরিচালনা করেন ছবির নায়ক উত্তমকুমার। কণ্ঠদান করলেন লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আশা ভোঁসলে। শচীন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণপ্রায়। মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, শিখা ভট্টাচার্য, দীপ্তি রায় ও রবি ঘোষ। চণ্ডীমাতা ছবিটির পরিবেশক।

'হাটে বাজারে'র চিত্রগ্রহণ শুরু

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবি 'হাটে-বাজারে'র প্রথম চিত্রগ্রহণ শুরু করলেন গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে। ইতিপূর্বে শ্রীসিংহ এ ছবির সঙ্গীতগ্রহণ করেছেন। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দুনম্বরে অনুষ্ঠিত এ ছবির দৃশ্য গ্রহণে অভিনয় করেন বৈজয়ন্তীমালা। মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অশোককুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বনফুল রচিত এ কাহিনীর আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন দীনেন গুপ্ত।

সলিল দত্ত পরিচালিত 'প্রস্তর স্বাক্ষর'

পরিচালক-প্রযোজক সলিল দত্ত ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের 'প্রস্তর স্বাক্ষর' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, বনানী চৌধুরী, তরুণকুমার, গীতালি রায় প্রভৃতি।

'দেবতীর্থ কামরূপ কামাক্ষা' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

দেবী কামাক্ষার পুণ্য কাহিনী ভিত্তিতে গৃহীত পৌরাণিক চিত্র 'দেবতীর্থ কামরূপ কামাক্ষা' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত চিত্রনাট্যের প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, যমুনা সিংহ ও অসিতবরণ। অনিল বাগচীর এ ছবির সংগীত পরিচালক। মানু সেন ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

ট্রায়ো ফিল্মসের 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'

রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত ট্রায়ো ফিল্মসের 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণপ্রায়। গৌরীপ্রসন্ন রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান প্রসেনজিৎ, বিশ্বজিৎ, অনুপকুমার, হারাধন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও গীতা দে। নচিকেতা ঘোষ ছবির সুরকার।

সরকার প্রোডাকসন্স-এর নবতম উদ্যম:

'নির্জন সৈকত'-এর প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান সরকার প্রোডাকসন্স এবার যে-নতুন ছবিটি দর্শকদের জন্যে প্রস্তুত করছেন, সেটি সলিল সেন রচিত জনপ্রিয় নাটক 'সন্ন্যাসী' অবলম্বনে গঠিত হচ্ছে। সলিল সেন নিজেই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ছবিটির সুর-সংযোজনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দানুলেখন, শিল্পনির্দেশ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিমল মুখোপাধ্যায়, অতুল চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক বসু ও সুবোধ রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে মাধবী মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, রেবা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি যশস্বী শিল্পীর সঙ্গে সৌম্যেন চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন নবাগত ও নবাগতাকে। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির আনওয়ার শা' রোডস্থ স্টুডিওতে 'অজানা শপথ' নামে ছবিটির চিত্রগ্রহণ কার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'ছুটি'

অভিনেত্রী পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় 'ছুটি'র চিত্রগ্রহণে রত হয়েছেন। বিমল কর রচিত 'খড়কুটো' অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য গৃহীত। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও নন্দিনী মালিয়া। এছাড়া প্রধান কয়েকটি চরিত্রে

গল্প হলেও সত্যি চিত্রে রবি ঘোষ ও সাধন সেনগুপ্ত। ফটো ঃ অমৃত

রয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবারতি সেন, কাবেরী চৌধুরী, দীপালি চক্রবর্তী ও নির্মল চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং অরুন্ধতী দেবী।

বোম্বাই

চেতন আনন্দ পরিচালিত 'আখরী খাত'

চেতন আনন্দ পরিচালিত হিমালয় ফিল্মসের 'আখরী খাত' হিন্দী চলচ্চিত্র একটি পরীক্ষামূলক প্রয়াস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় এ ছবির শেষ দুটি সংগীত গ্রহণ করেন সংগীত পরিচালক খাজাম। এছাড়া দুটি প্রধান চরিত্রে রয়েছেন রমেশ খান্না ও ইন্দ্রাণী মুখার্জী।

মণি ভট্টাচার্য পরিচালিত 'জবাল'

গুরু দত্ত স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত নিউ ওয়ার্লড পিকচার্সের 'জবাল'র একটানা তিন সপ্তাহ ধরে দৃশ্যগ্রহণ শেষ করলেন পরিচালক মণি ভট্টাচার্য। ধ্রুব চ্যাটার্জী রচিত এ কাহিনীর প্রধান অংশে রূপদান করছেন বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা, সুজিত-কুমার, নিরূপা রায় ও তরুণ বোস।

এল বি ফিল্মসের 'অনুপমা'

সম্প্রতি মোহন স্টুডিওয় এল বি ফিল্মসের 'অনুপমা' ছবির দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জী। হেমন্ত মুখার্জী সুরসৃষ্ট এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা, শশিকলা, দুর্গা খোটে, ডেভিড, তরুণ বোস ও দেবেন বর্মা।

মেহমুদ প্রযোজিত 'পড়শান'

মেহমুদ প্রোডাকসন্সের রঙীন ছবি 'পড়শান'-এর চিত্রগ্রহণ রঞ্জিৎ স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। জ্যোতিস্বরূপ পরিচালিত এ চিত্রের প্রধান অংশে রূপদান করছেন সুনীল মুখোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন মেহমুদ, জনি ওয়াকর, মুকরি ও কেষ্ট দত্ত, সায়রাবানু, কিশোরকুমার, রাজকিশোর, রাহুল দেববর্মন।

মঞ্চাভিনয়

সৌভিকের নাট্যোপহার

সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নবগঠিত 'সৌভিক' সম্প্রদায় তিনটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করেন। নাটক তিনটি ঃ 'প্রস্তাবনা', 'অনির্বাণ' ও 'জীবন-মৃত্যু'।

অভিনয়ের উৎকর্ষে ও প্রয়োগকলার নৈপুণ্যে 'অনির্বাণ' নাটকটি সর্বোত্তম হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কাহিনীগত দুর্বলতা ও শিল্পীদের একনিষ্ঠতার অভাবে প্রস্তাবনা ও 'জীবন-মৃত্যু' দর্শক-দের মনে রেখাপাত করতে পারে না। অবশ্য 'প্রস্তাবনা' নাটকে শিল্পীদের অভিনয় নৈপুণ্য কিয়দাংশ দেখা গিয়েছে। এই নাটকে অভিনয়ের দিক থেকে রমণ চট্টোপাধ্যায় ও

'সৌভিক' প্রযোজিত 'প্রস্তাবনা' নাটকের একটি দৃশ্যে রমন চট্টোপাধ্যায় ও জয়শ্রী কর

জয়শ্রী করের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অভিনয়ে পারদর্শিতার শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন 'অনির্বাণ' নাটকে শ্রীশ্যামল ব্যানার্জী। নাটকগুলির কাহিনীকার শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক শ্রীশম্ভু ব্যানার্জী।

অন্বেষার "সত্য মারা গেছে" :

গেল ৩০শে আগস্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় "অন্বেষা" শিল্পীগোষ্ঠী দক্ষিণ কলিকাতার

বধূবরণ চিত্রে প্রদীপকুমার ও গীতা দত্ত

মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে গঙ্গাপদ বসু রচিত "সত্য মারা গেছে" নাটকটি অভিনয় করে ছিলেন। আজ মানুষের জীবনের প্রতি স্তরেই মিথ্যার বেসাতি—'যে যা নয়, সে তাই ব'লে নিজেকে জাহির করবার জন্যে' লালায়িত। জীবনের এই ট্র্যাজিক রূপটিই শ্রীবসু প্রধানত হাসির মাধ্যমে তাঁর এই নাটকটিতে প্রকাশ ক'রতে চেয়েছেন। নাটকটির ভিতর মিঃ জি ডি মিটার, মিসেস মিলি মিটার, মিস ডলি মিটার প্রভৃতি চরিত্রকে আজকের সমাজের প্রতিবিম্ব বলা যেতে পারে। তবু বলব, নাটকের নায়ক 'ক্যাবলা' তথা 'সত্যজীবন'-এর জীবনে আকস্মিক পরিবর্তন দেখানোর জন্যে তিনি যে কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা 'কাঞ্চনরঙ্গ'-কে মনে পড়িয়ে দেয় ; এমনকি 'ক্যাবলা' চরিত্রটিও ঐ ' 'কাঞ্চনরঙ্গ''-এর নায়ককে অনুসরণ ক'রে সৃষ্ট বলতে পারা যায়।

'অন্বেষা' সম্প্রদায়ের অভিনয় এক কথায় চমৎকার। ''ক্যাবলা' চরিত্রে স্বদেশ বসু অসামান্য নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ডলির ভূমিকায় কল্পনা ভট্টাচার্যও অতি সুন্দর। জি ডি মিটার ও মিসেস মিটার চরিত্রে গঙ্গাপদ বসু ও মঞ্জুলা মুখো-পাধ্যায়ের অভিনয় উপভোগ্য। জ্ঞানেশ মুখো-পাধ্যায়ের 'সুশোভন' চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়ে বিশ্বাস্য। অপরাপর ভূমিকার অভি-নয়ও উল্লেখযোগ্য।

নাটকটি মোটের উপর সুপ্রযোজিত।

বিবিধ সংবাদ

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 'অতিথি'

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত ভারতীয় ছবি 'অতিথি' ৯ই সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হচ্ছে। এই চিত্রের প্রযোজক সংস্থা নিউ থিয়েটার্স এক-জিবিটার্সের তরফ থেকে শ্রীমতী মীরা সরকার উৎসবে যোগদান করছেন। ছবির

পরিচালক তপন [illegible] যাত্রা করেছেন।

আর ডি বনশলের 'সেক্সপীয়ারওয়ালা'

সম্প্রতি প্রযোজক আর ডি বনশল মার্চেন্ট আইভরি প্রোডাক্সন্সের ইংরেজী 'সেক্সপীয়ারওয়ালা' চিত্রের সর্বভারতীয় পরিবেশনার ভার নিয়েছেন। জেমস আইভরি পরিচালিত এ ছবিটি গত বছর বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে 'শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী'র পুরস্কার লাভ করে। এই পুরস্কারে ধন্য হন এ ছবির নায়িকা মধুর জাফরি। নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন শশিকাপুর।

'অংগারে' চিত্রের শুভমহরৎ

কাশী আলোক চিত্রমের পক্ষ থেকে 'অংগারে' হিন্দী ছবিটির শুভমহরৎ গত ৬ই সেপ্টেম্বর রাধা ফিল্ম স্টুডিওয় পালিত হয়। ছবিটির কাহিনীকার ও পরিচালক হলেন ইন্দুমাধব।

'কার বউ' চিত্রের শুভ মহরৎ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাধা ফিল্ম স্টুডিওর 'কার বউ' চিত্রের শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। অশোককুমার দত্ত প্রযোজিত এ চিত্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীকুমার সরকার। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত চিত্রনাট্যের দুটি প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করবেন শ্যামল মিত্র।

গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক অভিনীত 'দ্বিতীয় পানিপথ' নাটকে অংশগ্রহণকারী শশাংক চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত রায়, ধীরেন চক্রবর্তী, বনফুল, প্রদ্যোৎ বসাক ও অজিত ঘোষ।

'ইউরেকা'র পুরস্কার বিতরণী উৎসব

গত ২৮শে আগস্ট আলমবাজার নারায়ণী প্রেক্ষাগৃহে 'ইউরেকা' পরিচালিত আবৃত্তি ও রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসব সুসম্পন্ন হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন অভিনেতা সবিতাব্রত দত্ত। অনুষ্ঠানে 'ইউরেকা' শিল্পীগোষ্ঠীর দুটি নাট্যাভিনয় 'অভিনয়' এবং 'শিল্পী চাই' অভিনীত হয়। বিমল রায় রচিত প্রথম নাটকে সুঅভিনয় করেন সুখেন্দু সরকার, দেবু মুখোপাধ্যায়, তরুণ ঘোষ ও পূর্ণেন্দু সরকার। রবিদাস সাহা রচিত দ্বিতীয় নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন অরুণ ঘোষ, কমল গাঙ্গুলী, গৌর মুখোপাধ্যায়, পূর্ণবিকাশ পাত্র, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও প্রিয়ব্রত দাস। সবশেষে সুখেন্দু সরকারের সম্পাদনায় 'বর্ষামঙ্গল' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশিত হয়।

[illegible] পুরনো পাতা (৯)

অভিনেত্রী তারাসুন্দরী

দিলীপ মৌলিক

বাংলার নাট্যলোকে যে ক'জন অভিনেত্রীর অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে তার মধ্যে তারাসুন্দরীর নাম প্রথম সারিতেই স্মরণযোগ্য। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তাঁর নাট্যানুরাগের মধ্যে যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে হৃদয়ের যে নিবিড় সমর্থন ছিল তা তাঁর জীবনকে তারার আলোয় বিভূষিত করেছে এবং আগামীকালের মানুষের জন্য তুলে ধরেছে স্বর্ণাভ আলোর দীপবর্তিকা। নাম তার সার্থক, দীপ্তিময়ী তারার আসরে তিনি শুধু সুন্দরী নন, শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। তাঁর নাট্যসাধনায় নামের সুগভীর তাৎপর্য নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে। কবি সত্যেন দত্ত এই চিরস্মরণীয়া অভিনেত্রী সম্পর্কে বলেছেন, 'তারাসুন্দরীর মৃত্যুর পর, আমি যদি বেঁচে থাকি তো ওর ওপর খুব ভালো একটি কবিতা লিখবো।' সত্যি তারাসুন্দরীর অভিনয় জীবনের কীর্তি সাহিত্যের পাতায় অনন্তকালের অনুভূতি-লোকে ছন্দোবন্ধ হবার মতো।

বাংলা নাট্যজগতে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অন্তরমথিত শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবন সীমা স্পর্শ করেছে তাঁদেরই প্রয়াস পেয়েছে সফল পরিণতি। তারাসুন্দরীর প্রকৃত অভিনেত্রী জীবনের পরিণতি এসেছে গিরিশচন্দ্রের শুভেচ্ছা পেয়ে। অন্তরের কোণে ছিল খুব বড়ো অভিনেত্রী হবার বাসনা, গিরিশচন্দ্রের আশীর্বাদের ছোঁয়া পেয়ে তা বন্যাধারার মতো এগিয়ে গিয়েছে।

একটা দিন তারাসুন্দরীর জীবনে খুব স্মরণীয়। এই দিনটিকে তিনি জীবনের প্রতিটি প্রহরেই স্মরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্র যখন এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে কাজ নিয়েছেন স্টার থিয়েটারে। সামনের দিকে রামকৃষ্ণদেবের ছবিকে প্রণাম করেই তিনি দেখতে পেলেন একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সে দৃশ্য। তার মুখমণ্ডলে কি যেন একটা বাসনা প্রকাশের ভাষা খুঁজছে। চোখের পাতা কাঁপছে। মুগ্ধ হোলেন গিরিশচন্দ্র। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে রে তুই।' স্তব্ধ মেয়েটির মনে যেবার ঝর্ণার চাঞ্চল্য জাগলো। অসীম আনন্দে বলে উঠলো, 'আমি তারা।' গিরিশচন্দ্র চিনতে পারলেন। একটা স্মৃতি তাঁর মনে দোলা দিলো। মনে পড়লো 'সরলা' নাটকে 'গোপালে'র কথা। বলেছেন 'ও তুই বুঝি গোপাল সাজিস্।' উত্তর এলো 'হ্যাঁ।' সেই শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠ শুনে আকৃষ্ট হোলেন গিরিশচন্দ্র। মাথায় হাত রেখে করলেন আশীর্বাদ। অমৃতলালকে ডেকে বললেন, 'অমৃত, মেয়েটাকে যত্ন করিস। ওর কিছু হবে।' সত্যি উত্তরজীবনে তারাসুন্দরী গিরিশচন্দ্রের উপলব্ধিকে সফলতার রূপ দিতে পেরেছেন।

তারাসুন্দরীকে নাটকের ব্যাপারে হাতে খড়ি দিয়েছেন অমৃতলাল মিত্র। তাঁর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছেন নাট্যানুশীলনের উদ্যম। একথা তিনি স্বীকার করেছেন অনেকবার। কিন্তু মঞ্চের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচিতির সেতু-বন্ধন করে দেন বিনোদিনী। ছোট্ট তারার সঙ্গে বিনোদিনীর পরিচয় ছিল। তারার মা'র সঙ্গে বিনোদিনীর মা'র ছিল অন্তরঙ্গতা। বয়সে তারাসুন্দরী ছিল বিনোদিনীর চেয়ে প্রায় সতেরো-আঠারো বছরের ছোট। বিনোদিনী দেখেছিলেন ছোট্ট তারার চোখের গভীরে বড় অভিনেত্রী হবার বাসনা। তাই ওকে সঙ্গে করে থিয়েটারে অনেকদিন এনেছেন, পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মঞ্চের প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে। অনেক দিন পর তার মঞ্চ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা পরিণতি পেয়েছে। প্রথমেই তিনি 'সরলা'য় গোপালের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পাননি। তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। নেহাৎ বালিকা যখন, তখন চৈতন্যলীলার কয়েকবার বালক সেজেছে। প্রাথমিক অবস্থায় বিনোদিনীর সহযোগিতা না পেলে তারাসুন্দরীর অভিনেত্রী জীবনের সফল আবির্ভাব যে অনেক বিলম্বিত হোত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী আর একজনের মনের আকাঙ্ক্ষা বুঝে তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে যে আন্তরিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, তার নজীর সাম্প্রতিক অভিনয় জগতে সত্যি বিরল।

দৈনন্দিন কাজে একদিন ছেদ পড়লো। বিনোদিনী নানা মানসিক গ্লানিতে জর্জরিত হয়ে থিয়েটারে আসা বন্ধ করলেন। তারাসুন্দরীর মন ব্যথায় ভরে উঠলো। কি করবে, বিনোদিনী না গেলে সে যাবে কি করে? মহা চিন্তায় পড়লো। রাতদিন মুখটা গোমড়া করে বসে থাকেন বাড়ীর ভিতরে। এলোমেলো চিন্তার পাথারে বার-বার মনটা ডুব দেয়। কি করবে সে, কেমন

শ্রীমতী তারাসুন্দরী

করে আবার থিয়েটারে যাবে! কিশোরী তারার কাঁচ মনে সে কি দুশ্চিন্তার মেঘ!

একদিন অবশ্য মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যালোক স্পষ্ট হোল। থিয়েটারে যাবার আর অংশ গ্রহণ করবার ভালো সুযোগ মিলে গেলো। ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অসীম আগ্রহ থাকলেই প্রাপ্তির মুহূর্ত আসবেই। প্রথমেই 'স্টার' থিয়েটার। এখানে তাকে আনার ব্যাপারে সবচেয়ে প্রথম ধন্যবাদ জানাতে হয় নীলমাধব চক্রবর্তীকে। তাঁরই আন্তরিক আগ্রহ আর উদ্দীপনায় তারাসুন্দরী আসতে পেরেছে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরশধন্য 'স্টার' থিয়েটারে। জীবনে নতুন পথে যাত্রার সুযোগ পেয়েছে সে এখান থেকেই। তারার মা অবশ্য প্রথমে একটু আপত্তির সুর তুলেছিলেন, কিন্তু তা মুহূর্তকালের জনাই। বিনোদিনীর বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আপত্তি স্বীকৃতি আর সম্মতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই ন'বছর বয়সের তারা এলো 'স্টার' থিয়েটারের মঞ্চে। আনন্দ আর উচ্ছলতার কল্লোলে সে তখন উদ্বেল। ছোট্ট তারা 'নসীরাম' নাটকে পেলো ভীল-বালকের চরিত্র, 'সরলা'য় সে সাজলো গোপাল। কৈশোরের চপলতায় তাকে সুন্দর মানালো।

এটা তারাসুন্দরীর প্রদীপ্ত অভিনেত্রী জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে। অনুশীলন চলছে পূর্ণোদ্যমে। 'হারানিধি' নাটকে তারাসুন্দরীকে দেওয়া হোল

'হেমাঙ্গিনী'র ভূমিকা। আবার উদ্যম আর আকাঙ্ক্ষা পেলো সার্থকতম প্রকাশের পথ। কিন্তু সাময়িকভাবে একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হোল। হেমাঙ্গিনীর চরিত্রে যে অভিনয় করবে তাকে গান গাইতে হবে। তারাসুন্দরী একটু দমে গেলেন। কিন্তু মনে তার প্রবল বাসনা, গান শিখে এই চরিত্রেই অভিনয় করবেন। অমৃতলাল বসু সেটা বুঝতে পেরে ব্যবস্থা করে দিলেন। রামতারণ সান্যালকে ভার দেওয়া হোল তারাসুন্দরীকে গান শেখাবার। গানের সঙ্গে আবার নাচও। শেখাবার দায়িত্ব নিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। সব দিক দিয়ে পূর্ণ হয়ে তারাসুন্দরী অভিনয় করলেন হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায়। সুন্দর অভিনয়ের একটি সার্থক স্বাক্ষর হয়ে রইলো তা। মনের কোণে গভীর কিছু পাবার তীব্র অনুভূতি থাকলে তার অগ্রগতির বন্যাকে কেউ রোধ করতে পারে না। এটা চিরন্তন সত্য। 'হারানিধি'র পর 'দেবী চৌধুরাণী'র দেবীর ভূমিকায় তারাসুন্দরী অপূর্ব অভিনয় করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে অভিনয় দীর্ঘস্থায়ী হোতে পারলো না। তারপর 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে কল্যাণীর ভূমিকায় অভিনয়। 'স্টারে' অনেক নাটকেই পর পর অংশগ্রহণ করতে লাগলেন তারাসুন্দরী।

'চন্দ্রশেখর' নাটকের অভিনয় থেকেই তারাসুন্দরীর সুখ্যাতি সর্বব্যাপী হয় এবং সেই নাট্যাভিনয়ের সূত্র ধরে আর একটি ঘটনা তাঁর জীবনে এসে পড়ে, যা কিছুকাল তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তারাসুন্দরীকে নায়িকা শৈবলিনীর ভূমিকাই দেওয়া হোল। অমৃতলাল বসু তাকে বললেন—'এই ভূমিকাটি অভিনয়ের ওপর তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই ভূমিকায় যদি তুমি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করতে পারো তা হোলে তোমার আর মার নেই।' অমৃতলালের এই আন্তরিকতা সমৃদ্ধ কথা স্মরণে রেখে শৈবলিনীর চরিত্রকে তিনি যেভাবে মঞ্চে উপস্থিত করেছিলেন তা তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার এক উজ্জ্বলতম সম্পদ হয়ে আছে। অমৃতলালের কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কিন্তু তারপর একটু ঘটনা ঘটে গেলো। মাত্র তিন রাত্রি শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে ছেড়ে দিলেন। অনেকদিন তারাসুন্দরীর মঞ্চে অনুপস্থিতি বাংলার নাট্যানুরাগীদের ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

সেই অনুপস্থিতির কালটা তারাসুন্দরীর দিনগুলো যেভাবে কেটেছে, তা কতোটা তাঁর অভিনেত্রী জীবনের পক্ষে শুভ হয়েছিল তা হয়তো ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। তবে বাংলার নাট্যরসিকরা তাঁর অনুপস্থিতিতে যে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এই সময় তাঁর পরিচয় হয় অমরেন্দ্র দত্তের সঙ্গে। স্টারে 'চন্দ্রশেখর' নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় তারাসুন্দরীর অপূর্ব অভিনয় অমরেন্দ্রনাথকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করেছে এবং সেই বিস্ময়ের ফলে তাঁদের পরিচয় গভীরতর হয়।

এর পর একটা ঘটনা তারাসুন্দরীর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে, যার মধ্য দিয়ে তিনি লাভ করেছেন নতুন করে গিরিশচন্দ্রের নিবিড় আশীর্বাদ। গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ। 'করমেতিবাঈ' হচ্ছে মিনার্ভায়। তিনকড়ি অভিনয় করতেন নাম-ভূমিকায়। কিন্তু হঠাৎ তাঁর চলে যাওয়ায় জন্য খুব অসুবিধায় পড়তে হল গিরিশচন্দ্রকে। কিন্তু নাটক তো বন্ধ করা যায় না, কি করা যায়? ডাকা হল তারাসুন্দরীকে। গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে আবার নতুন উদ্যম নিয়ে ছুটে এলেন তিনি। অপূর্ব অভিনয়ে মুগ্ধ করলেন সবাইকে। গিরিশচন্দ্র বিমুগ্ধ হয়ে বললেন, 'বেটি, তুই আমার মুখ রক্ষা করেছিস। আমার আশীর্বাদে কালে তুই একজন বড় শিল্পী হবি'। সারা জীবনের অমূল্য পাথেয় হিসাবে তারাসুন্দরী তুলে নিয়েছেন গিরিশচন্দ্রের এই আশীর্বাদকে।

তারাসুন্দরীর অপূর্ব অভিনয়দীপ্ত জীবনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের উক্তির সুগভীর সত্যতা নিহিত রয়েছে। প্রায় প্রতিটি ভূমিকাতেই তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। 'মায়াবসান' নাটকে অন্নপূর্ণার ভূমিকায় তিনি উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের নজীর রাখেন। হরিশ্চন্দ্রের 'শৈব্যা' তাঁর সূক্ষ্ম অভিনয়দক্ষতার এক উজ্জ্বলতম প্রতীক। শৈব্যার কোমলতা এবং মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি অপূর্ব সুন্দরভাবে তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠত। এই ভূমিকায় তাঁর মত সার্থকতা কেউ অর্জন করতে পারে নি। দুর্গেশনন্দিনী, আয়েষা ও রিজিয়ার রিজিয়া তাঁর বিজয়বৈজয়ন্তী। বিপিন পাল বলেছেন : 'ইউরোপ ও আমেরিকায় কোন রংগমঞ্চে তারার রিজিয়ার মত অভিনয় আর দেখি নি'। উত্তরকালে অপরেশ মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'তখন এবং এখনও রিজিয়া বলতে তারাসুন্দরীকেই বোঝায়। এই ভূমিকায় এ পর্যন্ত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সাহস কেহ করে নাই'। অনেকের মতে 'সিরাজদ্দোলা' নাটকে 'জহরা' চরিত্রে তারাসুন্দরীর অভিনয় প্রতিভা রিজিয়াকেও নাকি অতিক্রম করে গিয়েছিল। বলিদানের সরস্বতীর ভূমিকায় তিনি ফুটিয়ে তুলতেন খাঁটি গৃহকর্ত্রীর ভাবগাম্ভীর্য। 'ছত্রপতি শিবাজী'র লক্ষ্মীবাঈ চরিত্রে তাঁর অভিনয় দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি করত।

অল্পদিন পরের একটি ঘটনা তারাসুন্দরীর জীবনে চিরস্মরণীয়। বাংলা নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের দিক দিয়েও এই ঘটনার মূল্য অনস্বীকার্য। শিশির ভাদুড়ীর যুগ তখন এসে গেছে। নাট্যমন্দিরকে ঘিরে তখন নাট্যাভিনয়ের নতুন কল্লোল নতুনতর ছন্দ নিয়ে মুখর হতে চলেছে। শিশির ভাদুড়ী ঠিক করলেন গিরিশ প্রতিভার অন্যতম সৃষ্টি 'জনা' নাটকের পুনরাভিনয় করবেন। কেননা তখনো লোকের মনে এই নাটক সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ জমে ছিল। এই ভূমিকায় তারাসুন্দরীর খ্যাতির কথা জানা ছিল তাঁর। জনার চরিত্রে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি তাঁকে আহ্বান করলেন। থিয়েটার থেকে তখন প্রায় অবসরগ্রহণ করে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজা-অর্চনা করছিলেন তারাসুন্দরী। শিশিরকুমারের আহ্বানে নাট্যমন্দিরে এলেন তিনি। তখন বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। বার্ধক্যের গ্লানি জমেছে সারা অঙ্গে। কিন্তু থিয়েটারকে মনে-প্রাণে ভালবাসেন বলেই এলেন, দাঁড়ালেন শিশিরকুমারের পাশে। প্রবীণ ও নবীনের এই মিলন এক নতুন যুগের তোরণদ্বার উন্মোচন করে দিল।

নাট্যমন্দিরের এই 'জনা' নাটকে জনা চরিত্রে উচ্চাঙ্গের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল দেখিয়েছিলেন তারাসুন্দরী, সেই বয়সে তাঁর কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য লীলায় ও ভাবভঙ্গীর অপরূপ বিকাশে তিনি যে সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখাতে পেরেছেন, পৃথিবীর স্টেজে তার তুলনা নেই, একথা বেশ জোর করেই বলেছেন শিশিরকুমার। 'জনা'র পর 'পাষাণী'র উন্মাদিনী সাকীর ভূমিকায়ও তারাসুন্দরীর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়।

তারাসুন্দরীর শেষ দিকের জীবন হয়ত তাঁরই সেই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের মধ্যে এক শুচিস্নাত শুভ্রতাকে খুঁজে পেয়েছে। দেবতার সামনে হয়ত নিঃসীম মিনতির সুরে আকুল হয়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ—'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার এই দেবালয়ের প্রদীপ করো'।

নাটকের ক্ষেত্রেঃ সাফল্যই সফলতার মাপকাঠি

এলমার রাইস

এখানে আমাদের ঠিক করতে হবে, **বহু দিনের পোড়খাওয়া** বিশেষজ্ঞদের নাটক **বিচারের ক্ষেত্রে,** নাটকীয় উৎকর্ষ তো বটেই, **এমন কি ব্যবসায়িক** সাফল্য স্থির করার **দিক থেকেও এই** যে আপাত-অক্ষমতা দেখা **যায়,** এর কারণ কি? প্রযোজকদের **নির্বুদ্ধিতা,** ভীরুতা, অব্যবস্থা সম্বন্ধে **অবশ্য** অভিযোগ তোলা কঠিন নয় এবং সে **বিষয়ে** উদাহরণ জোগানোও সহজ।

কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে পুরোপুরি **অবিচার** হবে যদি নাট্য-প্রযোজনার **অনিশ্চয়তা** কিম্বা স্থায়িত্বহীনতার গোটা **দায়িত্বটাই** ব্যবস্থাপনার বিচ্যুতির ঘাড়ে **চাপিয়ে দিই।**

সব প্রযোজক এক ধরনের নয়। তাছাড়া **রঙ্গালয়ের ব্যবসাতে** ছকবাঁধা কোন নীতিও **নেই — যেমনটি** একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রিত, **বিপুল উৎপাদনশীল** বেতার প্রতিষ্ঠান **কিম্বা ছায়াচিত্র**-শিল্পে দেখা যায়। অন্য **দিকে বেশীর ভাগ** রঙ্গালয়ের প্রযোজকই **হলেন কিছুটা** উদ্রগ্রভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এবং **তাঁদের এই রুচির** ভিন্নমুখিতা ও মান **সম্বন্ধে বিষম** চিন্তাধারা একদিকে যেমন **রঙ্গালয়ে** আনে নিদারুণ বিরক্তিকর **বিশৃংখলা,** অন্যদিকে এরই ফলে আসে **অত্যন্ত সজীব** বৈচিত্র্য। এর এক প্রান্তে **রয়েছে স্থূল,** প্রায়-অশিক্ষিত ফাটকাবাজ, **যাদের কাছে নাটক** প্রযোজনা হল একটা **জুয়া খেলার** সামিল, যাতে মাঝে মাঝে কেউ **দাঁও মারে।** আবার অন্যপ্রান্তে রয়েছে **আদর্শে অনুপ্রাণিত** মানুষ, যারা একটু **অর্থনৈতিক সুবিধা** পেলেই এমন নাটক **প্রযোজনা করতে** সাহস পায় যার আর্থিক **সাফল্যের সম্ভাবনা** খুবই সামান্য, আর এর **মাঝখানে আছে** আরো কত স্তর। সবচেয়ে **যেটা জটিল করে** তোলে ব্যাপারটিকে, সেটি **হল সব ধরনের মানুষকেই** খুঁজে পাওয়া **যাবে ব্যর্থ ও সাফল্যমণ্ডিত** নাটক-**প্রযোজনার** দুটি ক্ষেত্রেই। এর মধ্যে যে **ব্যাপারটা অযৌক্তিক** অথচ সুনিশ্চিত তাহল **'প্রদর্শন-ক্ষমতা'**(showmanship)। কিন্তু **এই** গুণটা বিচার-বিশ্লেষণের বাইরে এবং **প্রতিভার মতই** এর কোন সংজ্ঞা নেই। **তাছাড়া এই প্রদর্শন ক্ষমতারও** রকমফের **আছে, যেমন** Demi Virgin এবং **Long Days** Journey into Night **এ দুটির প্রদর্শন-ক্ষমতা এক** জাতের নয়।

এমন অনেক উপাদান আছে যেগুলির **উপর প্রযোজকদের** কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, **অথচ** সেগুলি নাটকের সাফল্য বা ব্যর্থতার **কারণ হয়ে উঠতে** পারে। এদের মধ্যে কতক-গুলির কথা আগে বলা হয়েছে। যেমন, প্রথম রজনীর দুর্ঘটনা। এর মধ্যে আছে মোক্ষম কলাকৌশলগত ভুল, কিম্বা হয়ত প্রধান অভিনেতা তাঁর কথাটাই গেলেন ভুলে; তারপর, কোন বড় বিপদের সংবাদ, অকস্মাৎ যুদ্ধের আশংকা, স্টক মার্কেটের মন্দা, এসবও প্রথম রজনীর দর্শকবৃন্দের মনকে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে এবং সেই অনুপাতে তাঁরা নাটকটিকে গ্রহণ করেন অন্য মনে। যদি একটা ভাল নাটকের অব্যবহিত কাল পরেই একটা নগণ্য বই খোলা হয় তাহলেও তুলনামূলক বিচারে পরের বইটি মার খেতে পারে। সেই রকম একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকও উৎরে যেতে পারে, যদি পঞ্চম শ্রেণীর বাজে নাটকের পর সেটা মুক্তি পায়।

এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, একটি প্রতি-শ্রুতিময় নাটকও কেবল ভূমিকালিপি বন্টন ও পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেই ব্যর্থতা বরণ করল। আবার প্রযোজকরাও ভুল করেন তাঁদের বিচারে, কিন্তু সেটা সব সময় নয়। অনেক সময় ত্রুটিটা বেশী ঘটে প্রযোজকদের চেয়ে নাট্যকারের নিজের দিক দিয়ে। তাছাড়া সেরা পরিচালকও সব সময় ঠিক তাঁর মেজাজে থাকেন না, এবং সুঅভিনেতারা মাঝে মাঝে খারাপ অভিনয় করে ফেলেন। আবার কখনো বা প্রযোজকরা বড় বড় মাইনাওলা অভিনেতা দিয়ে ভূমিকা-লিপি ভরিয়ে তোলেন, কিম্বা কখনো কেবল নিকৃষ্ট অভিনেতাদেরই নিয়োগ করেন তিনি কৃপণতাবশত। প্রথমটির ক্ষেত্রে বইটি বন্ধ হয়ে যায়, কারণ খরচের তুলনায় আয় হয় না, আর দ্বিতীয়টির বেলায় অভিনয় হয়ে পড়ে নিকৃষ্ট ধরনের। এখানেও বলা যায় প্রযোজক ভুল বিচার করেছেন। তবুও অনেক মাঝারি জাতের নাটক যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সে কেবল 'তারকা' অভিনেতাদের অভিনয়ের জন্যেই; এবং অনেক যে গোড়ার টলমলে দশা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত টিঁকে থেকে দর্শকদের মনোহরণ করতে পেরেছে, তাও কেবল সম্ভব হয়েছে তার খরচ কম ছিল বলেই।

কিন্তু দুটি বিশেষ ধরনের অবস্থা আছে, যা নাটকের জনপ্রিয়তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সে সম্বন্ধে প্রযোজক কিম্বা রঙ্গালয়ের অন্য কেউই কিছু করে উঠতে পারেন না। প্রথম হল, উদ্বোধন রজনীর গুরুত্ব। সেই প্রদর্শনীটি দর্শকেরা কিভাবে নেয় তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নিউইয়র্ক শহরের চৌহদ্দির মধ্যে নাটকটির প্রথম যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, তাও অনেক সময় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। শহরের বাইরের প্রদর্শনী এবং পূর্ণ-মহড়া প্রদর্শনী **কোনটাই এই নিউইয়র্কের প্রথম রজনীর প্রদর্শনীর মত ভাগ্যনিয়ন্তা নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এটা হল সর্বস্বপণ করে পাশায় দান দেওয়ার মত।**

উদ্বোধন রজনীর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তার মধ্যে দর্শকদের শ্রেণীবিচারও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এঁদের মধ্যে থাকেন নানা ধরনের লোক, যেমন (ক) সংবাদপত্রের কর্মচারী, অনেক সময় এঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৫০ জন, এঁরা রঙ্গালয়ের দর্শক হিসাবে আসেন না, আসেন তাঁদের পেশাদারী কর্তব্য পালন করার জন্যেই। (খ) রচয়িতা, পরিচালক, অভিনেতাদের ব্যক্তিগত বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়স্বজন যাঁরা নানা ব্যক্তিগত কারণে নাটকখানির সাফল্য কামনা করেন। (গ) কিছু সংখ্যক অর্থলগ্নীকারক, যাঁরা সমস্ত ব্যাপারটাই অর্থকরী সম্ভাবনার দিকে বিচার করে দেখেন, (ঘ) আরো অনেকে আসেন খানিকটা নিজেদেরই দেখাতে, নাটক দেখতে নয়; অনেক সময় বেকার অভিনেতারা এই সুযোগে প্রচার করে যান যে, তাঁদের হাত খালি আছে, এখন তাঁদের পাওয়া যেতে পারে। (ঙ) রঙ্গালয়ের এজেন্ট, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজনার বিষয়ে এঁরা উৎসাহিত হন নিজেদের পেশাদারী সুবিধার স্বার্থেই। (চ) অনির্দিষ্ট সংখ্যার রঙ্গালয়প্রেমিকরা, যাঁরা আসেন নিছক আনন্দ উপভোগ বা রসানুভূতির তাগিদে।

বলাই বাহুল্য, এঁদের সকলের সংমিশ্রণে যে প্রথম রজনীর দর্শকমণ্ডলী গঠিত হয় তাঁরা ঠিক সাধারণ দর্শকশ্রেণীর প্রতিনিধি নন। সাধারণ দর্শকশ্রেণীতে পূর্বোক্ত শেষ ধরনের ব্যক্তিই থাকেন বেশী সংখ্যায়। ঐ যে প্রথম রজনীর দর্শক ওঁরা স্বাভাবিক দর্শকশ্রেণীর চেয়ে ভাল না খারাপ সেটা হল তর্কের বিষয়। ওঁরা খারাপ এই অর্থে যে, অনেকে এর মধ্যে আসেন ব্যক্তিগত স্বার্থে, কেউ কেউ অমিত্রোচিত, কারুর বা রঙ্গালয়ে যাওয়া বহু দিনের ক্লান্তিকর অভ্যাস এবং সহজে তাঁদের পরিতৃপ্ত করা কঠিন। আবার ভাল এই জন্যে যে, যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁরা রঙ্গালয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তার মূল্যায়ন করতে সক্ষম, অর্থাৎ যেসব শিল্পকৃতি মঞ্চপ্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। হামেশাই এরকম বলা হয় যে, নিউইয়র্কের উদ্বোধন রজনীতে যেমন সচেতন দর্শক সমাবেশ ঘটে এমনটি আর কখনো হয় না। কিন্তু প্রশ্নটা হল, এ ব্যাপারটা ভাল 'কিম্বা' মন্দ, অথবা বলা যায় ভাল 'এবং' খারাপ, যাই হোক না কেন নাটকটির ভাগ্যলিপি যাঁদের হাতে নির্দিষ্ট হয় তাঁরা হলেন সাধারণ দর্শকদের অপ্রতিনিধিস্থানীয় প্রথম রাত্রির এই দর্শকবৃন্দ।

একটি নাটকের ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে সংবাদপত্রের সমালোচনা। চিত্রশিল্পে এবং ভাস্কর্য **সম্বন্ধে সমালোচনা বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত**

হয় এবং যাঁরা আর্ট গ্যালারিতে যান তাঁদের উপর এই সব সমালোচনার প্রভাবও তত সুদূরপ্রসারী হয় না, কারণ বেশীর ভাগ শিল্প-দর্শক সংবাদপত্রের অভিমত বা সমালোচনা পড়ে প্রদর্শনী দেখতে যান না। এর প্রধান কারণ হল, এসব জায়গায় প্রবেশ-মূল্য কিছু থাকে না এবং স্বচক্ষে দেখে নিজেদের মতামত স্থির করা সম্ভব। তাছাড়া দর্শক যাই হোক না কেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এগুলি খোলা থাকে। পুস্তক বিক্রয় অবশ্য সমালোচনার ফলে বাড়ে-কমে বটে, কিন্তু সেখানেও স্থানকাল অনুসারে রকমফের আছে। পুস্তকটি প্রকাশের দিনই সাধারণত তার সমালোচনা প্রকাশিত হয় না; বহু পুস্তকের আদপেই কোন সমালোচনা হয় না; এবং সমালোচনাগুলি কেবল একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সারা দেশে শত শত সমালোচনা বেরোয় বই-এর এবং একটি অপরের চেয়ে প্রভাবশালী হতে পারে বটে, কিন্তু কোনটিকেই ঠিক শেষ-কথা বলে মনে করা হয় না। আরো কথা হল, প্রকাশের দিনই বইটি অনেক সংখ্যায় পুস্তকবিক্রেতা এবং পাঠাগারগুলির কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, আর এই পাঠাগার থেকেই অনেক সময় ক্রেতারা কোন্ বই কিনবেন তার পরামর্শ চান। এমনকি প্রতিকূলে সমালোচনার ক্ষেত্রে বইটিকে তাকে তুলে রেখে যতক্ষণ না জনসাধারণের রুচি সেই-দিকে ফেরে তার জন্যে অপেক্ষা করতেও কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু রঙ্গালয়ে ঠিক তা হবার উপায় নেই। বায়ভারকে বেশী দিন মেটান যাবে না যদি বক্স-অফিসের চাহিদার ঘাটতি পড়ে। অবশ্য বিপুল পরিমাণে অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়ে গেলে সেকথা স্বতন্ত্র। কাজেই জনসাধারণের আগ্রহের উত্তাপটা যেহেতু পত্রিকা সমালোচনার (যেটি উদ্বোধনের পরের দিনই প্রকাশিত হয়) উপর নির্ভর করে, তাই কাগজের সমালোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আরো আশ্চর্যের কথা, খারাপ অভিমত ব্যর্থতা যেভাবে ডেকে আনে ভাল অভিমত কিন্তু প্রায়ই সেভাবে সাফল্য ডেকে আনতে পারে না। রঙ্গালয়ের সকলেই জানে স্থায়ী সাফল্য নির্ভর করছে 'মুখের কথায়', অর্থাৎ যাঁরা দেখেছেন তাঁদের বেশীর ভাগের মুখে-মুখে ছড়ান প্রশংসার উপর। ভাল প্রচার হলে প্রথমে টিকিটঘরে ভিড় জম-জমাট হবে বটে, কিন্তু দর্শকরা যদি নিরাশ হয় তাহলে চাহিদা ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকবে। অন্যপক্ষে খারাপ অভিমত প্রচারিত হলে, দর্শক আসবে না কিছুতেই; ফলে কেবল ক্ষতির মাত্রাই যে তখন বাড়বে তা নয় মুখে মুখে সুনাম ছড়ানর দর্শকও যোগাড় করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, রঙ্গালয়ের সংগে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদের প্রত্যেকের কাছে নাটকের ইতিহাসে সব থেকে স্নায়ুপীড়নকারী সময়টুকু হল প্রথম রজনীর যবনিকা পতনের পর থেকে সমালোচনাটি পত্রিকায় প্রকাশ হবার অন্তর্বর্তী ব্যবধানটি।

একথা অনস্বীকার্য যে, নাট্যসমালোচনা একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধ করে। যদি তা নাও করত, তবু এতে সন্দেহ থাকত না যে, মুক্ত সমাজে প্রত্যেকেরই কোন একটি নাটক সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ করার অধিকার আছে; তা সে অভিমত যতই অসুবিধাজনক বা ক্ষতিকারক হোক না কেন। যখন প্রযোজক, নাট্যকার এবং অভিনেতারা সমালোচকদের সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠেন, যা তাঁরা প্রায়ই হন, তখন তার প্রধান কারণ হল, তীব্র সমালোচনার প্রতিকূল ফলাফল সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা। সমালোচকদের খুচরো মন্তব্য বা তা প্রকাশ করার যোগ্যতা যাই হোক না কেন, তাঁদের মোট অভিমতের ওজন কিন্তু খুবই বেশী। যোগ্যতার দিক দিয়ে ভাল-মন্দ-মাঝারি নানা জাতের সমালোচকই আছেন, যেমন আছেন ভাল-মন্দ-মাঝারি প্রযোজক, নাট্যকার এবং অভিনেতা। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। একজন অযোগ্য প্রযোজক শীঘ্রই ব্যবসা থেকে খসে পড়বেন। একজন অক্ষম নাট্যকারের রচনা বেশী দিন টিঁকে থাকবে না এবং অপটু অভিনেতাও বেশী দিন কাজ পাবে না। কিন্তু অযোগ্য সমালোচকের যে তাড়াতাড়ি চাকরি চলে যাবে এমন কোন কথা নেই। হয়ত নিয়োগ-কর্তা এ ব্যাপারে উদাসীন কিম্বা নিয়োগ-কর্তার সংগে তাঁর দোস্তি আছে, কিম্বা হয়ত সংবাদপত্র লেখা তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর চটকদার বা মজাদার বৈশিষ্ট্য আছে, কিম্বা এমন কোন কারণ যার সংগে সমালোচক হবার কোন সম্পর্ক নাই। সেই জন্যে বছরের পর বছর ধরে তিনি সমালোচকের পদে থেকে রঙ্গালয়জীবীদের কর্মজীবনের পক্ষে অবর্ণনীয় ক্ষতি করতে পারেন। এটা শুধু পুঁথিগত তত্ত্বকথা নয়, এটা ঘটতে দেখা গেছে।

যদি একটি নাটকের সমালোচনাকে কেবল ব্যক্তিগত অভিমত বলেই মনে করা হত তাহলে তা নিয়ে এত বিচলিত না হলেও চলত। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। কারণ সমালোচককে আসলে একটি পত্রিকার সংগে একাত্ম করে দেখা হয়, ফলে তাঁর অভিমতটির একটি ব্যাপক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কতবার যে আমি কাউকে কোনো নাটক দেখতে বলার পর যা উত্তর শুনেছি, কাগজে তো বলেছে যাচ্ছে-তাই 'তার ইয়ত্তা নেই।' প্রায়ই দেখেছি কাগজ বলতে ওরা অনেক কাগজ বোঝালেও খারাপ লিখেছে হয়তো একটি কাগজেই। এবং প্রতিকূল অভিমতটি হয়তো একটি মাত্র লোকেরই। হয়তো সেই লোকটি গুণী, হয়তো বা নয়। যদি আমার বন্ধুটি অন্য কোনো কাগজ পড়তেন, হয়ত তিনি টিকিট কাটার তাগিদ অনুভব করতেন। এমনকি তিন কি চারটি বিরূপ মন্তব্যও হয়ত কেবল তিনজন কি চারজনেরই প্রতিক্রিয়া। তবু মুশকিল এই যে, এই তিন-চারজনই সম্ভাব্য দর্শক সমাগমের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারেন।

এই অবস্থাটির কারণ হল, রঙ্গালয়ে নাটক দেখার মূল্যটা কম নয়, তাছাড়া অন্যান্য ধরনের প্রমোদও রয়েছে, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই কোনো মানুষ একটু আগেভাগে ওয়াকিবহাল না হয়ে পয়সা খরচ করতে ছোটে না। নাট্যসমালোচনা সব সময়েই প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। কিন্তু তিরিশ চল্লিশ বছর আগে অনেকের কাছে রঙ্গালয়ে যাওয়া ছিল একটি নিয়মিত অভ্যাসের ব্যাপার এবং টিকিটের দাম, কি অন্যান্য ধরনের প্রমোদ বিনোদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেমন ছায়াছবি, টেলিভিশান, বা নাইট ক্লাবের প্রদর্শনী, এসব কোনো কিছুই নাটক দেখার অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারত না। আরো কথা হল, জনসংখ্যা বেড়ে গেছে বহু পরিমাণে, অথচ সংবাদপত্রের সংখ্যা গেছে কমে। আমার প্রথম নাটক যখন মঞ্চস্থ

হয় তখন নিউইয়র্কে ছিল পনেরো কি ষোলোটি দৈনিক কাগজ। আজকে তার চেয়ে অর্ধেক সংখ্যক কাগজ আগেকার সেই জনসংখ্যার দ্বিগুণ লোককে খবর যোগাচ্ছে। আবার এদের মধ্যে তিনটি কি চারটি পত্রিকা রঙ্গালয়-দর্শকরা বেশি পড়েন, সুতরাং এটা স্পষ্ট যে একটি নাটকের ভাগ্য এই তিন চারটি সংবাদপত্রের সমালোচকেরাই স্থির করতে পারেন। যাঁরা বুদ্ধিমান সমালোচক তাঁরা অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচলিত বোধ করেন, কারণ নিজেদের অভিমতে ভুল ঘটতে পারে এ বোধ তাঁদের আছে, সেইজন্যে তাঁরা উপলব্ধি করেন তাঁদের উপর যে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেটি কত গুরুভার। এটা বিশেষ করে আরো জটিল মনে হয় এই কারণে যে, সমালোচকের আসল কাজ কী সে সম্পর্কে কোনো সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত নেই।

বাস্তবিক সমালোচকের অভিমতের গুরুত্ব হিসেব করে দেখলে বলা সত্যি শক্ত হয়ে ওঠে যে, সমালোচকের আসল কাজ কী? নাটক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তিনি কি তাঁর ব্যক্তিগত ভালো লাগা বা মন্দ লাগার দ্বারাই একমাত্র চালিত হবেন? কিন্তু ধরা যাক তাঁর Naturalistic play কিংবা verse-play-র প্রতি একটি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, কিংবা সঙ্গীতালেখ্য অথবা যুদ্ধ, কিংবা হয়তো রঙ্গালয়ের প্রতিই রয়েছে বিরূপতা। তিনি কি রঙ্গালয়কে কেবলমাত্র প্রমোদনের মাধ্যম হিসেবেই দেখবেন, এবং সেই দিক থেকেই নাটকটির বিচার করবেন? কিংবা তিনি কি শিল্পকৃতির উৎকর্ষকেই তাঁর একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবেন? কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে সেই উৎকর্ষের নিরিখ কি চিরায়ত নাটক অথবা সমসাময়িক? নাটকের ভিত্তি কবে নির্ধারিত হবে? সমালোচনা কি তাহলে আনাতোল ফ্রাঁস যা বলেছিলেন : "শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জগতে অন্তরের অভিযান" তাই হবে? নাটক-সমালোচক নিজেকে সাধারণ দর্শকদের একজন মনে করে তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিচার করবেন? (কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়-দর্শক বলে কোনো কিছুর কি অস্তিত্ব আছে? এবং যদিও বা থাকে, সমালোচক কি নাট্যকার প্রযোজক এবং পৃষ্ঠপোষকদের চেয়ে তাদের মনোভাব ভালো বুঝতে পারবেন?) কিংবা তাঁর উদ্দেশ্য হবে নাট্যকারের অভিপ্রায়কে অনুধাবন করার চেষ্টা করা, এবং সেই অভিপ্রায় কতখানি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে সেটি বিচার করা? হয়তো দেখা যাবে নাট্যকার তুচ্ছ জিনিস চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করেছেন, কিংবা কোনো সত্যিকারের মহৎ মনোভাবকে রূপায়িত করতে গিয়ে পথ হাতড়ে বেড়িয়েছেন। যেহেতু প্রত্যেক সমালোচকেরই নিজস্ব রীতি রয়েছে সেই জন্যে দেখা যায় নাট্যসমালোচনাও মোটের উপর রঙ্গালয়ের অন্যান্য ব্যাপারের মতই কখনো হয়তো লাগসই হয়ে যায়, আবার কখনো যায় ফসকে। আর এইসব সমালোচনার ফলাফল যাঁরা ভোগ করেন তাঁরাও ভেবে হদিশ পান না ঠিক কি হলে ভালো হত।

একালের চলতি সমালোচনা রীতির একটি বিভ্রান্তিকর দিক হচ্ছে, সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গেই সমালোচনাটি জুড়ে দেওয়া হয়। কী এক দুর্বোধ্য কারণে দেখা যায়, নাটকের উদ্বোধন একটা নতুন ঘটনা হিসাবে ধরা হয় এবং মহৎ নাট্যকারের মহান নাটকের ক্ষেত্রেও যতটা নজর ও জায়গা দেওয়া হয় ঠিক ততোটুকুই নির্দিষ্ট হয় একটি খেলো জাতের নাটকের জন্যেও। এটা যেন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতাও যে পরিমাণ উচ্ছল শিরোনামা পায় কাগজে, তেমনি একজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার স্থানীয় মন্তব্যও ততোটা জায়গা পাবার মতো ব্যাপার। ফলে সমালোচক রঙ্গালয় থেকে বেরিয়েই সোজা এসে হাজির হন টাইপ-রাইটার মেসিনের কাছে এবং পরদিন সকালেই যাতে সমালোচনাটি ঠিক সময়ে কাগজে বেরোতে পারে তার জন্যে কাজে লেগে যান। এমনকি কাগজগুলি যদি প্রত্যেক উদ্বোধনকে একটি উপযুক্ত ঘটনা হিসেবে গণ্য করেও, তাহলেও তাদের পক্ষে সোজা কাজ হচ্ছে, একজন পারদর্শী রিপোর্টারকে দিয়ে প্রযোজক নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা থেকে মঞ্চের বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি এবং সহকারী মঞ্চপরিচালক পর্যন্ত সকলের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর পাঠকের সামনে হাজির করা। সেই রিপোর্টে আরো থাকতে পারে নামজাদা লোকের উপস্থিতির তালিকা, মহিলারা কে কি পরিধান করেছিলেন তার বিবরণ এবং বিনা সমালোচনায় ছোট করে নাটকের কাহিনীটুকু দেওয়া। আর সেই সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া, যা খুব কমই উল্লেখ করা হয়। এর ফলে সমালোচক সময় নিয়ে মাথা ঘামানোর হাত থেকে নিস্তার পাবেন এবং অবান্তর ঘটনার বিবরণের দায়ও তাঁর থাকবে না; ধীরেসুস্থে তিনি পরদিন বা দুদিন পরে ভেবেচিন্তে নাটকটি সমালোচনা করার সুযোগ পাবেন। এটা কিন্তু নিছক তত্ত্বকথা নয়, বহু ইউরোপীয় দেশেই প্রচলিত আছে এই ব্যবস্থা। যাইহোক বর্তমানে এই যে নাটকের ভাগ্য মূলত নির্ভর করছে সমালোচকের অনিশ্চিত বিচারের উপর, এটি কিন্তু রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের পক্ষেই ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে, এবং এর ফলে এমন একটি স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যাতে অভিনেতারা তাঁদের প্রতিভা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন না। আর প্রযোজকদের দশা হয় বুকে হাত দিয়ে বসে থাকার সামিল।

দ্বিতীয় যে বস্তুটি অচিন্তানীয় ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেটি হল, জনসাধারণ কিভাবে গ্রহণ করবে নাটকটি তা নির্ভর করে মার্কিন মনস্তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ার উপরে যুক্তরাষ্ট্রের এই একটা অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব যে (আর তা হয়ত কেবল যুক্তরাষ্ট্রের নয় পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে) প্রযোজনার বা নাটকের গুণের চেয়ে নাটকটির আপাত সাফল্যের উপরই নির্ভর করে তার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ। বিজয়ীকে প্রত্যেকেই ভালোবাসে; কি করে সে জয়লাভ করেছে কিংবা সেই জয়ের অর্থই বা কি, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করে না কেউ।

সাফল্যের প্রতি এই অদ্ভুত মানসিকতার দৃষ্টান্ত খেলার জগতে স্বতঃপ্রকাশ। বেস্-বলকে সাধারণত জাতীয় ক্রীড়া হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং লোকেরা কোনো না কোনো পক্ষকে মনেপ্রাণে সমর্থন করে। যেসব শহরে বড় লীগ দল নেই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে সব দলই কারো না কারো সমর্থন পায়। কিন্তু কেউ যদি লীগের খেলায় বিজয়ী হয় তবে তার প্রতি উৎসাহ হয়ে ওঠে বিপুল এবং নানা উৎসব ও সমারোহের মধ্য দিয়ে সেটি আত্মপ্রকাশ করে; লীগ বিজয় করে খেলোয়াড়েরা শহরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম সম্মান বর্ষিত হয় তাদের উপর। খেলার মাঠে কাতারে কাতারে লোক এসে উপচে পড়ে এবং খবরের কাগজ স্থানীয় দলের প্রত্যেকটি বিজয়কে এমনভাবে অভিনন্দিত করে যেন ইতিহাসে এমনটি আর কখনো দেখা যায় নি। ব্যাপারটা এইভাবে চলতে থাকে ততোদিনই যতোদিন দলটি জয়লাভ করতে থাকে; কিন্তু দলটি যখন জয়ের চেয়ে হারের দিকে বেশি যেতে আরম্ভ করে তখন আস্তে আস্তে কমতে থাকে আগ্রহ, লোকজনের ভিড়ও পাতলা হতে থাকে, আর গুণের চেয়ে দোষের দিকটায় বেশি নজরে পড়ে। এমনকি যেসব শহরে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত দল আছে সেখানেও দলের কৃতিত্বের অনুপাতেই দর্শক-সংখ্যা কমে বা বাড়ে। অর্থাৎ দলের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় দর্শকসংখ্যা, এবং পরাজয়ের হার যত বাড়তে থাকে তত কমে যায় সমর্থকের দল। স্পষ্টই বোঝা যায়, বেশির ভাগ বেস্-বল সমর্থকরা নিজের দলের একতরফা শ্লথগতি খেলাও বরং তারিফ করবে, যদি সেখানে নিজেদের ঘরোয়া দল জয়লাভ করে, কিন্তু খেলাটি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উত্তেজনাপ্রদ হয়েও

যারোরা দলের পরাজয় বরণ করতে হয় তা তারা পছন্দ করবে না। গোটা ছ' মাসের মরশুমে যদি শেষ দিনের খেলায় দুটি দলই প্রথম স্থানের জন্যে প্রতিযোগিতা করে এবং কোনো দলের চূড়ান্ত জয় হয় মাত্র এক রানের জন্যে, বিজয়ী দলকে 'চ্যাম্পিয়ান' বলে ঘোষণা করা হয় এবং দলের লোকদের অতিমানব বলে স্তুতি করা হয়। অন্যদিকে যারা 'রানার্স-আপ' হয় তাদের অতি-বাজে দ্বিতীয় স্তরের দল বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। আর যারা হেরে যায় তারা চেঁচিয়ে বলে, 'দেখ না পরের বছর কী হয়!' কিন্তু সে ঘোষণা খুবই করুণ এবং আবেদনের মতো শোনায়। অর্থাৎ তারা নিজেরাও যেন বেশ সচেতন যে এসব ব্যাপারে যেটা আসল কথা তা হল নিছক কোনোক্রমে জিতে যাওয়া, আর সবই এখানে অসার।

বছর কয়েক আগে পশ্চিমাঞ্চলের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পুনর্মিলন উৎসবে উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে পুরনো ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হন মস্ত বড় একটা ফুটবল খেলা দেখতে। জনৈক অধ্যাপক-বন্ধুর আমন্ত্রণে আমি সেই ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। খেলা হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামে, যেখানে আসনসংখ্যা হল এক লক্ষ। স্থানীয় দলটি হেরে গেল। তারপর অত্যন্ত বিমর্ষ সেই গৃহ-প্রত্যাগত দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে যখন আমরা পথ করে ফিরে আসছি, আমার বন্ধু বললেন, "ভয় হচ্ছে, এর ফলে আমাদের গ্রন্থালয় তৈরির অর্থভাণ্ডারে জমার অংকে এবার টান পড়বে রীতিমত।" শিল্পের ক্ষেত্রেও সাফল্যের উপর এইভাবে জন-সাধারণের উৎসাহ ও সাড়া নির্ভর করে। লোকেরা বই আসলে কেনে না, কেনে যে বই 'বেস্ট সেলার' সেই বই। যদি পুস্তক বিক্রেতার কাছে জমা বইগুলি সব আগেই সাময়িকভাবে কাটতি হয়ে গিয়ে থাকে এবং পাঠাগারে বইটির জন্যে অপেক্ষমান গ্রাহকের লম্বা তালিকা থাকে, বইটির চাহিদা তাহলে ক্রমাগত চড়তে থাকে। কেননা সকলেই চান চলতি হাওয়ার পন্থী হতে। কোনো বই যখন বিক্রি হতে থাকে তখন প্রকাশকরা এই ব্যাপারটাই বিজ্ঞাপনে যুৎসই করে কাজে লাগান যে, পাঁচটি সংস্করণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে এবং ষষ্ঠ সংস্করণটি এখন যন্ত্রস্থ। তাঁরা একথা বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার মনে করেন না যে, কোনো প্রখ্যাত সমালোচক বইটির বিষয়ে কী প্রশংসা করেছেন। আমেরিকার দুটি সেরা এবং বহুলপঠিত সাহিত্য বিভাগ হল নিউইয়র্ক টাইমস (New York Times) ও নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন-এর, New York Herald Tribune); এদের প্রত্যেকটিতে নিয়মিতভাবে বেস্ট সেলার বইয়ের তালিকা থাকে, যাতে বইগুলি জনসাধারণের চাহিদার ক্রমপর্যায় অনুযায়ী ছাপা হয়। আর এতে বিষয়বস্তু কিংবা গুণগত মান সম্বন্ধে কোনো কিছুই বলা হয় না। লোকে বলে যে, এগুলি বড় বড় পুস্তক-বিক্রেতাদের রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত করে ছাপানো হয়, আর এগুলি নাকি সব সময় সত্যিও হয় না। কারণ পুস্তক-বিক্রেতাদের কাছে কোনো বই বেশি জমে গেলে তারা তাকে বেস্ট সেলার তালিকায় দিয়ে দ্রুত কাটতির চেষ্টা করতে পারে। সাফল্যের উপর বেশি ঝোঁক দেওয়ার আর কী বড় উদাহরণ থাকতে পারে জানি না।

সংগীতের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহুল প্রচারিত সোপ্রানো (Soprano) কিংবা সিম্ফনির (Symphonic) পরিচালক অনেক বেশি ভিড় জমিয়ে তুলতে পারেন, কিন্তু একালের চলতি সংগীত-প্রদর্শনীর বরাতে তেমন লোক জোটে না। এটা না বললেও চলে যে খ্যাতি এবং উৎকর্ষ সব সময় সমার্থক নয়। কাজেই বহুবার শোনা একঘেয়ে সংগীতের খুব পারদর্শী অনু-ষ্ঠানের চেয়ে অনেক সময়ই নতুন বা অল্প-প্রচলিত সংগীতের মাঝারি অনুষ্ঠান বেশি হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। আমার একজন পিয়ানো-কলাবিদ, যিনি দেশের বাইরে সম্মান লাভ করে ফিরেছেন, তাঁর বাজনা শোনার জন্যে কাতারে কাতারে লোক জমবে এবং হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা করবে তাঁকে; যদিও তাঁর বাজনা এর আগে কোনোদিন তারা শোনে নি, এবং শুনলে হয়তো তাদের হাই উঠত। কিন্তু যে সব পিয়ানোবাদক দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে খ্যাতির জন্যে সংগ্রাম

চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের চেয়ে। তিনি কি সত্যিই খুব বেশি বড়? কে তা জানে, আর কেউ যা গ্রাহ্য করে ওসব। আমাদের এই আলোচ্য গায়কটি বিদেশে হৈ-চৈ জাগানো সাফল্য অর্জন করেছেন, কাজেই যে কোনো মূল্যেই হোক তাঁর বাজনা শোনা চাই।

কিছুদিন আগে ভ্যানগগের চিত্র-প্রদর্শনীতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল, যাদের ছবি সম্বন্ধে সামান্যতম বোধও ছিল না। কিন্তু এটা তারা পড়েছে যে একদা এই অবহেলিত শিল্পীর চিত্র আজ নাকি অমূল্য। আর এটাও তারা জেনেছে এই শিল্পীটি তাঁর একটি কান কেটে বারবনিতাকে উপহার দিয়েছিলেন। যদিও একে ঠিক সাফল্যের নিরিখ বলে ধরা যায় না, তবু এইসব সংবাদের মধ্যে এমন চটকদার উত্তেজনা আছে, যা সাফল্যের সঙ্গেই একতালে চলে। একদা আমি রোমের বোর্গেস গ্যালারীতে (Borghese Gallery) গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম তিসিয়ান (Titian)-এর সেক্রেড এ্যান্ড প্রোফেন লাভ (Sacred and Profane Love), এমন সময় গাইড একজন মার্কিনী ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির হল সেখানে। ভ্রমণকারী ভদ্রলোকটি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তা সহজেই বোঝা যায়, ছবির উৎকর্ষ ও শিল্পকৃতির বিষয়ে গাইডের শব্দ-আড়ম্বরবহুল বর্ণনা শোনবার সময় তাঁর ছিল না; কিন্তু যখন গাইড বলে উঠল, "এবং এই ছবিখানি গ্যালারি এক হাজার পাউন্ড দামেও ছাড়তে অস্বীকার করেছে" তখন দেখা গেল ভদ্রলোকটির উৎসাহ উদ্দীপিত হয়ে উঠল। "বলছেন কি এত পাউন্ড?" ভদ্রলোক এই প্রথম বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "নিশ্চয় ইনি তাহলে একজন নামজাদা শিল্পী।" অন্য আর এক সময়ে লন্ডন-এর গ্র্যান্ড গ্যালারিতে র‍্যাফেলের ছোটোখাটো একটা ছবি দেখছি, জামার হাতায় একটি ছোট আকর্ষণ অনুভব করলাম, তাকিয়ে দেখি জনৈকা প্রসন্নবদনা বৃদ্ধা উল্টো দিকের দেয়ালে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করছেন, "ওদিকে দেখুন মোনালিসা!"

রঙ্গালয়েও ঠিক তাই ঘটে। লোকেরা রঙ্গালয়ে ঠিক নাটক দেখতেই যায় তা নয়, তারা যায় 'সাফল্য'কে দেখতে। তারা অভিনয় দেখতে যায় না, যায় তারকা-অভিনেতাদের দেখতে। কোনোরকমে খবরটা ছড়িয়ে দিন যে কোনো নাটকের টিকিট আর পাওয়া যাচ্ছে না, দেখবেন তার চাহিদা কেমন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। লোকেরা ছ' মাস আগে ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে আসন সংগ্রহ করে রাখবে। ঠিক সেই সময়েই হয়তো পাশেই আর একটি ভালো নাটক, যা এক মরশুমে হয়তো নাম কিনতে পারেনি, সেটা দর্শকাভাবে ধুঁকছে। প্রায়ই যখন কোনো রঙ্গালয়-দর্শককে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি কি উপভোগ করেছেন নাটকটি, উত্তর শোনা যায়, "নিশ্চয় চমৎকার আনন্দ পেয়েছি।" কিন্তু তারপরেই যেন প্রমাদের শিকারে পরিণত হয়েছেন এমনভাবে বলেন, "কিন্তু মশাই প্রেক্ষাগৃহ অর্ধেকটাই ছিল খালি পড়ে।" এক ডিনার পার্টিতে জনৈক বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী, যিনি কালেভদ্রে একটু আধটু নাটক লিখতে চেষ্টা করতেন, তিনি বলেছিলেন, "থিয়েটারে আমি হামেশাই যাই। অবশ্য সব নাটকই যে আমি দেখি তা নয়, কিন্তু যেগুলি বাজার জমায় সেগুলি অবশ্যই দেখি।"

প্রমোদ-শিল্পের পত্রিকা হিসেবে ভ্যারাইটি (Variety) হল নাম-ডাকওলা কাগজ। এতে সফল নাটক ইত্যাদির উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে একটি তালিকা প্রকাশ করে এরা দেখায় যে, ব্রডওয়েতে কতগুলো নাটক চলছে, কতগুলো প্রদর্শনী হয়েছে, এবং টিকিট বিক্রির ফলে কতো টাকা উঠেছে। নতুন নাটকের সমালোচনা চাতুর্যের সঙ্গে এমনভাবে গুছিয়ে লেখা হয় যাতে করে টিকিট ঘরের সাফল্যটা কিরকম দাঁড়াবে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। বছরের পর বছর ধরে ভ্যারাইটি (Variety) একটা ফিচার ছাপত যার নাম 'ক্রিটিকস বক্স-স্কোর' (Critics box-score) এতে নিউইয়র্কের সমালোচকমহল তাঁরা যেভাবে নাটকটির মূল্যায়ন করেছেন এবং দর্শকসমাজ টিকিটঘরে যেমনভাবে ভিড় জমিয়েছে তার মধ্যে তুলনা করে বুঝে দেখেন তাঁদের অনুমান যথার্থ ছিল কি না। এ ব্যাপারে শতকরা ভাগ কষা হয় বেস-বল খেলোয়াড়দের ব্যাটিং-এর অ্যাভারেজ বার করার মতো করেই। রঙ্গালয়েও এই ব্যাপারে যদি কোনো সমালোচক যথার্থই আগে-ভাগে বলে দিতে পারেন যে, নাটকটি ব্যর্থ হবে কিংবা সাফল্য লাভ করবে, তাহলে তাঁর জয়জয়কার পড়ে যায়। অর্থাৎ পরীক্ষাটা হল, সমালোচক কি ঠিক অনুমান করতে পেরেছিলেন? বছরের শেষে অর্থনৈতিক সাফল্য বিষয়ে তাঁদের এই অনুমান করার শক্তির ভিত্তিতেই ক্রমিক তালিকায় তাঁদের নাম ওঠে। এই অসাধারণ তালিকা তৈরির ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, কারণ যতোদূর মনে হয় কয়েকজন দায়িত্বশীল সমালোচক এ পদ্ধতির বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। যাই হোক না কেন একজন সমালোচকের মতামতের মূল্য কতটুকু তা বাজিয়ে নেবার এইরকম একটা ঝোঁক দর্শকদের মধ্যে চালু আছে। যেসব শহরে নাটকগুলি প্রথম অভিনয় করে ঠিকঠাক করে নেওয়া হয়, সেখানকার অভিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী নাট্যসমালোচকেরাও সচেতন থাকেন যে, তাঁদের বিচারবিবেচনাগুলি নিউইয়র্কের সমালোচনার আলোকে আবার স্পষ্ট করা হবে। সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা একরোখা তাঁরা অবশ্য এ বিবেচনায় বিচলিত হন না; কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা একটা না একটা ফাঁক রেখে যান এই বলে যে, নাটকটি সাফল্যলাভ করতে পারে যদি নিউইয়র্কে এটি প্রদর্শন করবার পূর্বে প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি করে নেওয়া হয়।' এর তাৎপর্য হচ্ছে, যদি নাটকটি সাফল্যলাভ করে তাহলে ধরে নিতে হবে সমালোচকের কথামতো প্রয়োজনীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো শুধরে নেওয়া হয়েছিল; আর যদি ব্যর্থ হয় নাটকটি, তাহলে বুঝতে হবে বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে নেওয়া হয়নি।

কেবল ভ্যারাইটি-ই (Variety) যে সাফল্যের এই দিকটায় জোর দেয় তা নয়। সংবাদপত্র-কাহিনী এবং রঙ্গালয় সম্পর্কিত ফিচারগুলিতে যেদিকে বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়, তা হল সাম্প্রতিক সাফল্যমণ্ডিত নাটক, এবং ঐসব নাটকের সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত থাকেন তাঁদের সম্পর্কে নানা গাল-গল্প। কখনো কখনো ঐসব ব্যক্তিরা কে কত রোজগার করেন সে খবরও এর অন্তর্গত করা হয়, যদিও নাটকটি হয়তো মাঝারি দরের, আর যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও হয়তো সকলেই ম্যাটমেটে ধরনের মানুষ। যদি সম্পাদক মহাশয় এসব কাজের সাফাই হিসাবে বলেন, যে জিনিসটি তিনি প্রকাশ করছেন সেটিতে তাঁর পাঠকরা বেশি আগ্রহান্বিত, আমি তাহলে তার উত্তর বলতে পারি, তাতে এইটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর পাঠকদের যাতে আগ্রহ তা হল সাফল্যের কাহিনী।

সাফল্যকে এইভাবে গ্রহণ করার ঝোঁককে মনস্তাত্ত্বিকেরা হয়তো নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; কিন্তু ব্যাখ্যা তাঁদের যাই হোক না কেন, রঙ্গালয়ের উপর এর প্রভাব হয় মারাত্মক। এটা ক্রমশ যেন নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে যে, হয় কোনো নাটক সোজাসুজি সার্থক হবে নয়তো হবে ব্যর্থ। যে নাটকের সীমিত অথচ প্রকৃত আবেদন রয়েছে, সেটিও শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না: কারণ এর যাঁরা সম্ভাব্য দর্শক, তাঁরা তাঁদের অর্থ ও সময় কেবল সাফল্যমণ্ডিত নাটকের জন্য ব্যয় করতে ব্যস্ত।

রঙ্গালয়ের কর্মে যাঁরা নিযুক্ত তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, এটি একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অর্থমূল্যকে বড় করে দেখেন না এমন প্রত্যেক নাট্যকার প্রযোজক এবং অভিনেতাই বুঝতে পারেন যে (এবং বেশির ভাগ সেরা শিল্পীরাই অর্থমূল্য বড় মনে করেন না) শিল্পমানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সাফল্যের কোনো সাযুজ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রত্যেকেই মনে মনে যে নাটক যোগ্য স্বীকৃতি পায়নি, তাকে মহৎ ব্যর্থতা বলে লালন করেন। অলডাস হাক্সলি যেমনটি বলেছেন: "সাফল্য—যাকে উইলিয়ম জেমস বলেছেন কুক্কুরী-দেবী—বড় আজগুবি আত্মত্যাগ দাবি করে তার পূজারীদের কাছ থেকে।"

Elmur Rice-এর Living Theatre থেকে অনূদিত।

বহুদিন থেকে ডাক্তারেরা

কাশি ও সর্দি
এবং গলাব্যথা

প্রতিরোধ করতে

অ্যাঙ্গিয়ার্স

ইমালশন

অনুমোদন করছেন
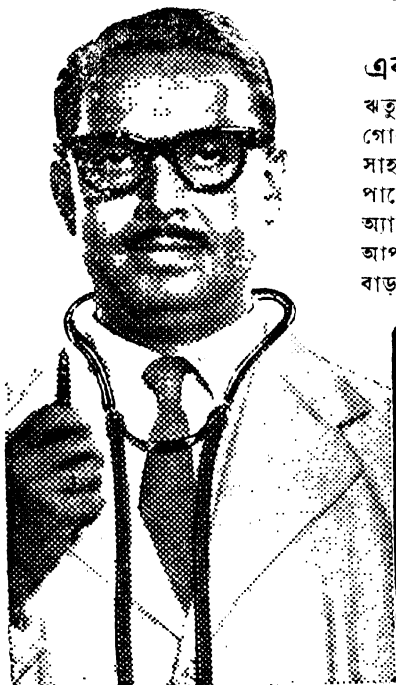
একটি চমৎকার প্রতিষেধক ও টনিক

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাশি সর্দি, গলাব্যথা ও হজমের গোলযোগ দেখা দেয়; খেতে সুস্বাদু অ্যাঙ্গিয়ার্স ইমালশনের সাহায্যে আপনি এসবের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পেতে পারেন। তাছাড়া অ্যাঙ্গিয়ার্স তাড়াতাড়ি শরীর সারিয়ে তোলে। অ্যাঙ্গিয়ার্স ছোট-বড় সকলের পক্ষেই একটি আদর্শ টনিক। এটি আপনাকে চাঙ্গা করে তুলবে এবং আপনার শক্তি ও জীবনীশক্তি বাড়াবে। নিয়মিত অ্যাঙ্গিয়ার্স খান।

অ্যাঙ্গিয়ার্স ইমালশন শ্লেষ্মা তরল করে ও বুকের ভার লাঘব করে। এসব ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা দেখা দেয়, এই চমৎকার টনিকটি তা সারাতে সাহায্য করে।
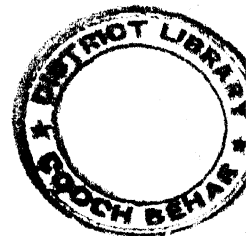
অ্যাঙ্গিয়ার্স আপনাকে সুস্থ রাখার জন্য একটি প্রতিষেধক

সন্তরণগুরু শান্তি পাল

অজয় বসু

আমাদের দেশে আর কেউ সাঁতার সম্পর্কে শান্তি পালের চেয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন কিনা এবং মনপ্রাণ ঢেলে জলক্রীড়াকে তাঁর মতো ভালবাসতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। যেদিন তিনি হেদোর পাড়ে এসেছিলেন সেইদিন থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের (শনিবার, ২৭শে আগস্ট,১৯৬৬) আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সাঁতারই ছিল শান্তি পালের চেতনায় ও সমগ্র সত্তায় মিশে।

দেহে সুস্থতা আনতে, মনে স্ফূর্তির যোগান দিতে সাঁতারের জুড়ি নেই, পরম প্রত্যয়ে এই কথাগুলি উচ্চারণ করে, যুক্তির জোরে তা বুঝিয়ে দিয়ে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, বয়স্ক-বয়স্কাদের জলের ধারে টেনে আনার এবং হাতেনাতে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁদের সত্যিকারের সাঁতারু রূপে গড়ে তোলায় শান্তি পাল অগ্রগণ্য। সাঁতারের মানোন্নয়নে নিত্য নব পরীক্ষা নিরীক্ষায়ও তিনি এদেশে পথিকৃৎ। তাই তিনি শুধু সাঁতারুই নন, সন্তরণগুরু।

সত্তরের চৌকাট পেরিয়ে যাবার পরও তাঁকে হাসিমুখে হেদোর পাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে দেখেছি। মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্যের অগ্নিবর্ষণ বা নির্দয় পর্জন্যদেবের অঝোর আপ্যায়ন, যেমন বিরক্তিদায়ক তেমনি অস্বস্তিকর। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পালের ভ্রূক্ষেপ নেই। সামনে জলের বুকে ভাসছে যে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিণী তার হাতপাড়ি আর পদসঞ্চালন নিখুঁত হচ্ছে কিনা পুরু কাঁচের চশমা দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন গুরু। গরমিলের সন্ধান পেলেই স্বচ্ছ নির্দেশে মনমতো কাজটুকু আবার করিয়ে নিচ্ছেন। এ অনুরাগের কি তুলনা আছে? না, এই সাধনার মূল্য ধরে দিতে পেরেছে শান্তি পালের স্বদেশ!

সাঁতারু হিসেবে তিনি বড়। কিন্তু আরও বড় প্রশিক্ষকরূপে। যেকালে শিক্ষণ-পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়ার কথা কেউই চিন্তা করতে পারেন নি সেইকালেই আরম্ভ হয়েছিল শান্তি পালের গুরুগিরি। উত্তরপর্বে একদিনের জন্যেও তাতে ছেদ পড়েনি। যতোদিন পেরেছেন ততোদিন নিজের হাতে গড়া সাঁতারের পাঠশালার দরজা অবারিত রেখে দিয়েছেন সমকাল ও উত্তরকালের উদ্দেশ্যে।

সাঁতার সম্পর্কে তাঁর পড়াশুনার গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী। বইয়ের কথা তিনি প্রচার করেছেন। এবং তিনি লিখেছেন নতুন কথা। অধ্যয়নে পাওয়া জ্ঞানের মূল্যে উপলব্ধি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অব্যবহারিক তত্ত্বকে বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাঁতারের ওপর কয়েকখানি পুস্তক (সন্তরণ পরিচয়, সন্তরণ বিজ্ঞান, সাঁতারের গল্প) প্রণয়ন করে সাঁতারের প্রসার ও প্রচার এবং মানোন্নয়নে গঠনমূলক কাজের এক সুনিশ্চিত ধারা তিনি রেখে দিয়েছেন।

একটা সময় ছিল যখন নদীমাতৃকা বাংলা দেশে ছেলেমেয়েরা খাল, বিল, নদী, পুকুরে গা ভাসাতে ভাসাতে আপনা থেকেই সাঁতার শিখতো। শিখতো দেহে মনে স্ফূর্তি আনতে, খেলার আনন্দ উপভোগ করতে বা জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে। এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমের সঙ্গে সবাকার জীবন ছিল অসম্পৃক্ত। সে শিক্ষায় হয়তো গুরুর প্রয়োজন ঘটতো

সন্তরণগুরু শান্তি পাল

না। কিন্তু কালে শহুরে জীবনে সাঁতার শেখার এবং প্রতিযোগিতা জয়ের তাগিদ অনুভূত হওয়া মাত্রই গুরুদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। দুটি কারণেই উচ্চতর শিক্ষার চাহিদা মেটাতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, শান্তি পাল ছিলেন তাঁদেরই অগ্রপথিক।

তাঁর আগে দু-একজন প্রখ্যাত সাঁতারু আধুনিক পদ্ধতিতে সাঁতার কেটেছিলেন। হয়তো আরও কেউ আধুনিক কায়দায় শিষ্যদের রপ্ত করে তোলায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে সেই সব নজীর ছিল নিতান্তই বিক্ষিপ্ত। ব্যাপকভাবে, বৈজ্ঞানিক রীতিতে এবং সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সাঁতার শিখিয়েছেন শান্তি পালই। চিন্তায় ও কর্মে তিনি আদর্শ শিক্ষক। আম পুহকে যেমন আমরা মল্লগুরু, দুঃখীর মজুমদারকে ফুটবলের 'স্যার', সারদারঞ্জ রায়কে যেমন ক্রিকেটের জনক বলে জা তেমনি জানি শান্তি পালকে বাংলার সন্তরণ গুরু হিসেবে। এই জানাজানির পথ অ কোনো ধারণায় অস্পষ্ট হয়ে ওঠার আশঙ্ক নেই। তাঁরা সবাই নিজের নিজের ক্ষে পথিকৃৎ।

শান্তি পালের শিষ্যভাগ্য যে কেমন জানতে একবার আমাদের প্রফুল্ল ঘোষে নামটি স্মরণ করতে হয়। বীরেন পাল প্রভাস মিত্র, কালী রক্ষিত, শ্যামাপদ গোঁসাই নরেন ঘোষ, রাজারাম সাহু, মদন সিং, বিমল চন্দ্র এবং আরও কতোজনকে তিনি তালিম দিয়েছেন। কিন্তু প্রশিক্ষণে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রফুল্ল ঘোষ। স্বল্পপাল্লার ফ্রি স্টাইলে ভারত শ্রেষ্ঠের এবং অবিরাম সাঁতারে বিশ্বের নজর-কাড়া নজীর গড়ে প্রফুল্ল ঘোষ গুর শান্তি পালের শিক্ষকতার উপযুক্ত মূল্য ধরে দিয়েছেন। ওই একজন প্রফুল্ল ঘোষের মধ্যেই শান্তি পাল কালজয়ী সান্ত্বনা পেয়েছেন। তাঁর হাতে গড়া প্রফুল্ল ঘোষ নিজেও গুরুর ভূমিকাটিকে চেনেন। তাই গুরু-বিয়োগের সংবাদে চোখের জল মুছতে মুছতে ছেষট্টি বছরের প্রফুল্ল ঘোষ বলে উঠেছিলেন, আজই আমার পিতৃবিয়োগ ঘটলো!

উত্তর কলকাতার হেদোর (একালের আজাদ হিন্দ বাগ) জলই ছিল শান্তি পালের শিক্ষাভূমি। আস্তানা দক্ষিণ পূব পাড়ের সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব। হেদোর জলের অতলে যখন 'জটাবুড়ি' লুকিয়ে থাকতো আর তারই কীর্তিকাহিনীর কথা শুনিয়ে মায়েরা যেদিন দুষ্টু ছেলেদের ঘুম পাড়াতো, যখন হেদোর জলে গা ভাসাতে কেউই ভয়ে এগোয় না শান্তি পাল জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিন।

সে কি আজকের কথা! সেই থেকে যুগযুগান্তরের মুখোমুখিতে হেদোর জলের সঙ্গে শান্তি পালের অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে উঠেছে। পুকুর পাড়ে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ১৯১৭ এবং মনীষীদের সংসর্গের কল্যাণে হেদো শান্তি পালের জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

সামনে বাঁধানো পুকুরের জল, চারপাশে শ্যামলিমা, বসবার জায়গা সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব। আড্ডা দিতে সেখানে সেদিন অনেকেই আসতেন। কবি সত্যেন দত্ত, নরেন দেব,

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী, প্রভাত গাঙ্গুলী, চারু রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান, শিশির ভাদুড়ী-রা ছিলেন নিত্যকার আড্ডাধারী। মাঝে মাঝে আসর জমাতে আবির্ভাব ঘটতো শরৎচন্দ্রেরও। রীতিমতো বিদগ্ধ সমাবেশ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই আড্ডার নাম দিয়েছিলেন 'পিঁজরাপোল'। 'পিঁজরাপোল' ভেঙে গিয়েছে কবে। কিন্তু শান্তি পাল কোনোদিনই ভাঙা বাসার মোহ কাটাতে পারেননি। সকাল সন্ধ্যে হাজির দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথের 'রঙ বেরঙের সঙের বাসা'য়।

জলের নেশা শান্তি পালকে এমন করে পেয়ে বসেছিল কি করে? শুনেছিলাম সে প্রেরণার উৎস ও'র জনকই। ও'র মুখেই শোনা,

'বাবা, হিন্দু-হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ডাঃ সুরেশচন্দ্র পাল পড়তে গিয়েছিলেন বিলেতে। সেখানেই সাঁতারু হিসেবে তাঁর নামডাক হয়। বাবার দৃষ্টান্তেই আমরা ভায়েরা জলের দিকে ঝুঁকি। দাদা সত্যপ্রিয়, সুধাপ্রিয়, ছোট ভাই হরিপ্রিয়, জ্ঞানপ্রিয়, দেবপ্রিয়, সবাই ভাল সাঁতার কাটতো। তবে বাবা কাউকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন এমন কথা বলতে পারি না। আমার নিজেরও কারুর কাছে হাতেখড়ি হয়নি।'

তাহলে শিখলেন কি করে? কথায় কথায় জানলাম,

শান্তিবাবুর বয়স যখন ছ-সাত বছর হবে তখন সমবয়সী দু-চারজনের সঙ্গে পাড়ার (সিমলা কাঁসারিপাড়া অঞ্চলে) হৌস বা সর্বজনীন স্নানাগারে নেমে হাত পা ছোঁড়ার চেষ্টাই তাঁর সাঁতার শেখার প্রথম প্রয়াস। তখন কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামের যুগ। হৌসে যাঁরা স্নান করতে আসতেন তাঁরা আপত্তি করায় হৌস ছেড়ে আর কজন দস্যি ছেলের সঙ্গে স্কুল পালিয়ে ট্যাংরার বাগানবাড়ীর পুকুরে বা বাগমারির ঝিলে ঝাঁপাই জুড়তে জুড়তে সাঁতারে তাঁর হাত পাকে।

তারপর ওয়াই এম সি এর হয়ে গোলদীঘিতে এবং আহিরীটোলার ঘাটে মহা উৎসাহে সাঁতার দেওয়ার পর আহিরীটোলা, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও ফ্রেন্ডস পোলো ক্লাবের পক্ষে ওয়াটারপোলো বা জল-বল খেলার সুযোগ মিলে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের সেই কালে জল-বল খেলায় শান্তি পালের সঙ্গী ছিলেন শ্যামচাঁদ দত্ত, জিতেন, উপেন, শচীন মুখার্জি, নিবারণ দে, যুগল সাধু খাঁ, হিমাংশু গুপ্ত, রবীন রক্ষিতেরা। এরপরই

সাঁতারুর সাজে কবি সত্যেন্দ্রনাথ, পাশে প্রফুল্ল ঘোষ

সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা এবং সেখানেই শান্তি পালের স্থায়ী অধিষ্ঠান।

১৯১২ সালের ১৯শে নভেম্বর ওয়াই এম সির বার্ষিক উৎসব অন্তে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফেরার পথে নৌকাডুবিতে জনকয়েক প্রাণ হারাবার পর কলকাতায় সাঁতার শেখার হিড়িক পড়ে যাওয়ার পরই (১৯১৩) সালে ক্যালকাটা সুইমিং স্পোর্টস এসোঃর গোলদীঘিতে এক সন্তরণ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। কলকাতায় এইটিই প্রথম জলক্রীড়ানুষ্ঠান। শান্তি পাল সন্তরণ প্রতিযোগিতার সেই প্রথম অনুষ্ঠানে যোগ দেননি বটে কিন্তু পরের যুগে আশপাশের সমস্ত প্রতিযোগিতায় তিনি নিয়মিত যোগ দিয়েছিলেন।

এইকালে নিবারণ দে, প্রবোধ ভড়, মোনা শীল, পোকা মুখার্জি, সুরেন সাধুখাঁ, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল ঘোষ বা শান্তি পাল, এ'দেরই কেউ না কেউ যে কোনো প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি আসন দখল করে নিতেন। শান্তি পাল নিজে অবশ্য কোনোদিনই সেরা প্রতিযোগীর অবিসম্বাদী সম্মান পাননি। কিন্তু প্রফুল্ল ঘোষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ের মধ্যে তাঁর প্রশিক্ষণের মাহাত্ম্য সর্বসম্মত রায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। শিষ্যের সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্যে সাঁতার উপলক্ষ্যে তিনি একদিন বর্মাতেও পাড়ি জমিয়েছিলেন।

শান্তি পাল সাঁতার কাটা ছাড়া যৌবনে আরও অনেক রকম খেলাধুলোয় হাত পাকিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে লাঠিখেলা ছোরাখেলা শিখেছেন। কুস্তির আখড়ায় মাটিও গায়ে মেখেছেন ; ওয়াই এম সি-এতে থাকার সময় গানবোট জ্যাক ও নিগ্রো শিক্ষক সারকির কাছে মুষ্টিযুদ্ধের তালিমও নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবনে এসব খেলাধুলোর প্রভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী, স্থায়ী প্রভাব রেখেছে ওই সাঁতার আর সাহিত্য-চর্চা।

সাঁতারু শান্তি পালের আর এক পরিচয়, তিনি কবি।

খেলাধুলোর চর্চা ও সাহিত্য সাধনায় সমন্বয়ে শান্তি পালের জীবন-দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে এক ব্যতিক্রমের নজীর। সাঁতার অথবা কাব্যচর্চা, কোনটিকে তিনি বেশী ভালবেসেছেন তা বলা কঠিন। দুই দিকেই তিনি তাঁর সাধনা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছেন।

শান্তি পাল রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ছায়া (১৯৩৫), পথচারী (১৯৩৬), ছন্দোবীণা (১৯৩৭), খেয়াপারে (১৯৩৮) অসি ও বাঁশী (১৯৪৪) এবং সাম্প্রতিককালের গাঁয়ের গান, পল্লী-পাঁচালীর সঙ্গে কাব্যরসিকদের নিবিড় পরিচয় রয়েছে। খ্যাতকীর্তি সাঁতারু যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিও তারই প্রমাণ আর এক কবি ও সমালোচকের স্বীকৃতি।

কবি, সমালোচক সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠিতে (১৯৬২-র শ্রাবণে) লিখেছেন,

'শান্তি পালের কবিতার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার মাটির খাঁটি গন্ধ তাহাতে পাওয়া যায়। তিনি চিরকাল শহরে বাস করিয়াও প্রধানত পল্লী প্রকৃতির কবি। প্রেরণা, অভিজ্ঞতা ও শব্দ-সম্পদ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রায়শঃই দুরূহ দুর্গম পল্লীপথে উধাও হইয়া যান। প্রাচীন বাংলার বীরত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও তাঁহার অন্যতম সাধনা। এই অশিক্ষিতপটু কবি মানুষটি নিজের অদম্যচেষ্টায় কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার চিত্তের মৌলিক কাব্য-প্রেরণা যে বল্গাহীন 'দস্যিপনাতেই' বিনষ্ট হয় নাই তাহার প্রধান কারণ হেদুয়া পুষ্করিণীতে খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপের মধ্যেই কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহসংস্পর্শ।'

সেই স্পর্শে উজ্জীবিত জীবন ছুটি নিয়েছে। বাহাত্তর বছরের আয়ু (জন্ম ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৫) কম নয়। কিন্তু তারচেয়ে বেশী সেই জীবনের স্থায়ী পরিচয়। যে পরিচয় আজ আমরা স্মরণ করছি। উত্তরকালেও করবো।

দর্শক

ভাগীরথীবক্ষে দূরপাল্লার সাঁতার

মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ভাগীরথী বক্ষে আয়োজিত দূরপাল্লার দুই বিভাগের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় (জঙ্গীপুর সদর ঘাট থেকে গোরাবাজার এবং জিয়াগঞ্জ সদর ঘাট থেকে গোরাবাজার সদর ঘাট) এ বছর কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বসিরহাট, বনগাঁ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁতারুরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ভাগীরথীর দুই পাড়ে হাজার হাজার দর্শক সমাগম হয়েছিল।

এ বছরের ৭২ কিলোমিটার (৪৫ মাইল) সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন তরুণ সাঁতারু বৈদ্যনাথ নাথ (কলকাতা স্পোর্টস এসোসিয়েশন)। এই বিভাগে গত দু' বছরের বিজয়ী দেবীপ্রসাদ দত্ত দ্বিতীয় স্থান পান। যোগদানকারী ১৫ জন সাঁতারুর মধ্যে ৮ জন নির্দিষ্ট দূরত্ব পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভাগীরথীর জলে আয়োজিত ৭২ কিলোমিটার (৪৫ মাইল) সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের বৈদ্যনাথ নাথ (বাঁ দিকে) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেবীপ্রসাদ দত্ত (স্টেট ট্রান্সপোর্ট, কলকাতা)।

১৯ কিলোমিটার (১৩ মাইল) সাঁতারে গত দু' বছরের বিজয়ী বি এন রেলদলের লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক প্রথম স্থান লাভের কোনরকম সম্ভাবনা না দেখে প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করেন। এই বিভাগে প্রথম স্থান পান ইস্টার্ণ রেলদলের কালীকিঙ্কর মণ্ডল। আলোচ্য অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ৩১ জন সাঁতারুর মধ্যে যে ২৮ জন নির্দিষ্ট দূরত্ব পথ অতিক্রম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মহিলা সাঁতারু ছিলেন—কলকাতার কুমারী কাজল ঘোষ তিনি সাফল্যলাভের তালিকায় নবম স্থান পান। ১৯ কিলোমিটার (১৩ মাইল) জলপথ অতিক্রম করতে তাঁর ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লাগে—প্রথম স্থান অধিকারীর থেকে ২০ মিনিট বেশী।

ভাগীরথীর জলে আয়োজিত ১৯ কিলোমিটার (১৩ মাইল) সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী ইস্টার্ণ রেল দলের কালীকিঙ্কর মণ্ডল (বাঁ দিকে) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বাগবাজার ইউনাইটেড দলের দুলালচন্দ্র মণ্ডল।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

৭২ কিলোমিটার : ১ম বৈদ্যনাথ নাথ (কলকাতা স্পোর্টস এসোসিয়েশন)—সময় ৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট; ২য় দেবীপ্রসাদ দত্ত (স্টেট ট্রান্সপোর্ট, কলকাতা)—সময় ৯ ঘণ্টা ৫১ মিনিট এবং ৩য় হরেকৃষ্ণ ব্যানার্জি (কোন দলের নন)—সময় ১০ ঘণ্টা ৬ মিনিট।

১৯ কিলোমিটার : ১ম কালীকিঙ্কর মণ্ডল (ইস্টার্ণ রেলওয়ে)—সময় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট; ২য় দুলালচন্দ্র মণ্ডল (বাগবাজার ইউনাইটেড)—সময় ২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট এবং ৩য় সাধন বৈদ্য (আগরতলা, ত্রিপুরা)—সময় ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট।

ডেভিস কাপ

১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। আমেরিকান জোন-

ফাইনালে আমেরিকা ৫-০ খেলায় মেক্সিকোকে পরাজিত করে ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপ বিজয়ী ব্রেজিলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এ বছর এই প্রথম ইউরোপীয়ান জোনকে দু'ভাগ করা হয়েছে ('এ' এবং 'বি' গ্রুপ)। 'এ' গ্রুপের ফাইনালে ব্রেজিল ৪-১ খেলায় ফ্রান্সকে পরাজিত করে। অপর দিকে ইউরোপীয়ান জোনের 'বি' গ্রুপের ফাইনাল খেলায় পশ্চিম জার্মাণী ৩-২ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে। গত বছরের প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ স্পেন ইউরোপীয়ান জোন ফাইনালে উঠতে পারেনি। ১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত তিন বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে এই পাঁচটি দেশের যে-কোন একটি দেশ—আমেরিকা, ব্রেজিল, পশ্চিম জার্মাণী, ভারতবর্ষ এবং জাপান। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর টোকিওতে ভারতবর্ষ বনাম জাপানের এশিয়ান জোনের ফাইনাল খেলাটি সুরু হবে। এশিয়ান জোন বিজয়ী দেশ ভারতবর্ষ অথবা জাপান খেলবে পশ্চিম জার্মাণীর সঙ্গে।

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা

ব্রুক্লিনে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের আমেরিকান জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলসে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন এবং ফ্রেড স্টোলে এবং মহিলাদের ডাবলসে মারিয়া বুইনো (ব্রেজিল) এবং নান্সি রিচে (আমেরিকা) খেতাব জয় করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর কুমারী রিচে স্বদেশেরই কুমারী ক্যারোল গ্রেইবনারের সহযোগিতায় মহিলাদের ডাবলস খেতাব জয় করেছিলেন। আর মারিয়া বুইনো ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সালে আমেরিকার ডার্লিন হার্ডের জুটিতে মহিলাদের ডাবলস খেতাব পেয়েছিলেন। মারিয়া বুইনো এবং নান্সি রিচে ১৯৬৬ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতাতেও মহিলাদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন।

আলোচ্য প্রতিযোগিতার বাকি তিনটি অনুষ্ঠানের (পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস) আসর বসেছে ফরেস্ট হিলসে।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের ডাবলস : রয় এমার্সন এবং ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ডেনিস রলস্টোন এবং ক্লার্ক গ্রাবনারকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : ১নং বাছাই জুটি মারিয়া বুইনো (ব্রেজিল) এবং নান্সি রিচে (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ২নং বাছাই জুটি বিলি জিন মোফিট কিং এবং রোজমেরী ক্যাসলাসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।
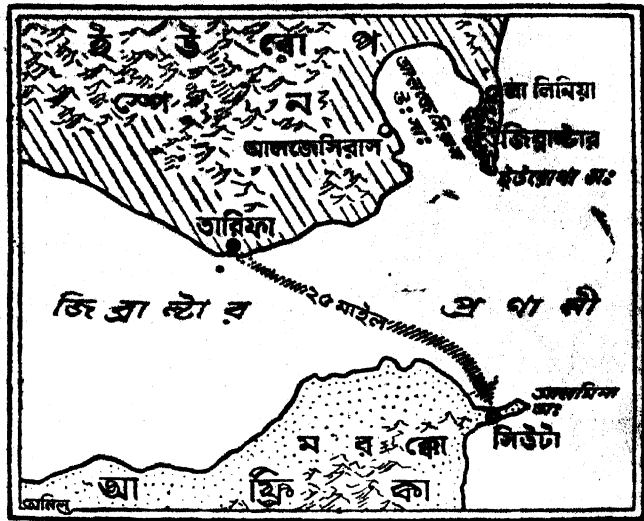
প্রখ্যাত সাঁতারু মিহির সেন ৮ ঘন্টা ১ মিনিট সময়ে জিব্রাল্টার প্রণালীর যে দীর্ঘ ২৫ মাইল জলপথ অতিক্রম করেন তার পথ-পরিক্রমা। তিনি স্পেনের তারিফা থেকে যাত্রা করে মরক্কোর সিউটাতে পৌঁছান।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা উৎসব দিবস উপলক্ষে রাজধানী কুয়ালালামপুরে আয়োজিত নবম বার্ষিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ১-০ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে। দঃ ভিয়েৎনামের পক্ষে এই প্রথম টুংকু আব্দুল রহমান ট্রফি জয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আট মিনিট আগে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দলের ইনসাইড-লেফট এন ভি চিউ দলের জয়সূচক গোলটি দেন। ফাইনাল খেলা উপলক্ষে মাঠে ৩৫,০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এই সাফল্যের মূলে আছে জার্মান কোচ কার্ল হেংজ উইগ্যাংগের অবদান। মাত্র তিন মাস সময়ে তিনি দুর্বল জাতীয় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ফুটবল দলকে ঢেলে সাজিয়ে শক্তিশালী করে তুলেছেন।

১৯৬৬ সালের নবম বার্ষিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল দশটি। এই দশটি দেশ সমান দুই ভাগে লীগের খেলায় যোগদান করেছিল। মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছিল 'ক' বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ এবং 'খ' বিভাগের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। 'খ' বিভাগের লীগের খেলায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং ভারতবর্ষের সমান ৬ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় প্রচলিত নিয়মে যদি গোলের গড়পড়তার উপর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা হত, তাহলে ভারতবর্ষই ফাইনালে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে এক নতুন নিয়মে—স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ গোলের বিয়োগ ফলের শ্রেষ্ঠত্বের উপর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা হয় এবং তাতেই দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

ভারতবর্ষের আর এক দুর্ভাগ্য—রেফারী সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভারতবর্ষের একটি ন্যায়সঙ্গত গোল বাতিল করেন এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের চার মিনিট আগে খেলা শেষের নির্দেশ দেন। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করেও কোন প্রতিকার হয়নি।

লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকা

'ক' বিভাগ

	খেঃ	জঃ	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ব্রহ্মদেশ	৪	৩	১	০	৭	০	৭
দঃ কোরিয়া	৪	৩	০	১	৫	৪	৬
মালয়েশিয়া	৪	১	২	১	২	২	৪
থাইল্যান্ড	৪	০	২	২	৩	৭	২
হংকং	৪	০	১	৩	২	৬	১

'খ' বিভাগ

	খেঃ	জঃ	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
দঃ ভিয়েৎনাম	৪	৩	০	১	৯	২	৬
ভারতবর্ষ	৪	৩	০	১	৫	১	৬
সিঙ্গাপুর	৪	২	০	২	৬	৪	৪
জাপান	৪	২	০	২	৬	৯	৪
তাইওয়ান	৪	০	০	৪	৩	১৩	০

ভারতবর্ষের লীগ খেলা

ভারতবর্ষ ১-০ গোলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ৩-০ গোলে জাপান এবং ১-০ গোলে তাইওয়ানকে পরাজিত করে; ভারতবর্ষের একমাত্র পরাজয় সিঙ্গাপুরের কাছে ০-১ গোলে। ভারতবর্ষের ৫টি গোলের মধ্যে অরুময় দেন ৩টি এবং অশোক চ্যাটার্জি ২টি। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় ভারতবর্ষ ১-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান পায়। ভারতবর্ষের পক্ষে জয়সূচক গোলটি সুনে গাঙ্গুলী দেন।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

"আমি আজ একটা হাসির গল্প বলব।" বলল প্রিয়গোপাল।

হাসির গল্প? আমি শঙ্কিত হয়ে পালাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেলাম। নতুন জামার কলার ধরে এমনভাবে রইল প্রিয়গোপাল যে আমার পক্ষে আর বিশেষ ছটফটানি করা সম্ভব হল না। আমি শঙ্কিত ছিলামই, এখন বিমর্ষ হলাম। অথচ গৌরীপদ আর বংকা দুজনে প্রিয়গোপালের আসবার সামান্যমাত্র আভাস পেয়েই, জানালার শিক যেভাবে বাঁকিয়ে তর-তর করে পাইপ বেয়ে নেমে গেল সেটা আমিও করতে পারতাম। কিন্তু প্রিয়-গোপালের আসবার আভাস আমি পাইনি। সত্যি কথা বলতে কি, গৌরীপদ আর বংকা যে কেমন করে সে আভাস পেল তা আমি তখন বুঝিনি। পরে অবশ্য শুনেছি স্মৃতি-ধরের ছোটভাই ঘনধর একটা রেফারীর বাঁশি বাজিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল রাস্তা থেকে। রেফারীর বাঁশির আওয়াজ আমার কানেও এসেছিল, কিন্তু সে যে প্রিয়গোপালের আগমন উপলক্ষে তা আমার জানা ছিল না।

এর মধ্যে দেখলাম অবিচলিত রয়েছে গঙ্গাদাস আর নীতিশ। তারা দিব্যি বসে বসে দাবা খেলছিল, দাবাই খেলতে লাগল। এদিকে তারা একদম তাকাল না পর্যন্ত।

প্রিয়গোপালের কিন্তু তা সহ্য হল না। সে একটানে ঘুঁটিগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, আমি আজ একটা হাসির গল্প বলব। গঙ্গাদাস আর নীতিশ দেখি তা শুনে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। কেমন যেন নির্জীবের মত তাকাল। তারা যে প্রিয়-গোপালের ঘোষণা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল না তা দেখে আমি চিন্তিত হলাম, কেন না এর আগে যখনি প্রিয়গোপাল হাসির গল্পের সূচনা করেছে তার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গাদাস আর নীতিশ ক্ষেপে উঠেছে। ভেবেছিলাম, ওরাও যদি ক্ষেপে অন্তত উঠত তাহলেও বাঁচতাম। ঐ সুযোগে পালানোর একটা চেষ্টা করা যেত, কিন্তু তাও হল না।

আমি তখন বললাম, গল্পটা বড় না ছোট? প্রিয়গোপাল বলল, আগে থেকে তা বলে তোদের সারপ্রাইজ নষ্ট করতে চাই না। হাসির গল্পের মজাই হচ্ছে সারপ্রাইজে।

যাই হক, গল্পটা ওর নিজের জীবনে ঘটেনি। তা শুনে আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। গল্পটা বিলিতি শুনে একটু আশাও হল যে গল্পটা হাসিরও হতে পারে। কিন্তু সে আশা বেশিক্ষণ টিঁকল না। এর আগে বলা হয়নি, কিন্তু এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে প্রিয়গোপাল লোক যে খুব খারাপ তা নয়। কিন্তু গল্প বলতে গিয়ে সে যে সমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করে সেগুলোর সঙ্গে গল্পের সম্পর্ক তেমন থাকে না।

"যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি", প্রিয়গোপাল বলতে সুরু করল, "সেটা ভীষণ হাসির—বুঝলে, ভীষণ হাসির।" বলে খানিকক্ষণ খিক-খিক করে হাসল। তারপর বলল, "যাকে শুনিয়েছি সেই শুনে হেসেছে। এইবার গল্পটা বলি। যা বর্ষা পড়েছে ভাই, একটা গল্পও যে ঠিকমত বলতে পারব নিশ্চিন্তে তার উপায় নেই। ভাল কথা, গৌরীপদ আর বংকাকে তো দেখছিনে? ওরা এখানেই এসেছে খবর পেলাম যে। ওরা যায় যে কোথায় আজকাল বোঝা মুস্কিল। হ্যাঁ গল্পটা বলি—অ্যামেরিকার একজন কোটি-পতি, তার নাম...তার নাম...এ যাঃ নামটাই ভুলে গেলাম যে।" বলে খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "নামটা খুব প্রয়োজনীয় যে তা নয়। তার নাম ধরা যাক পীটার। এখন ওই পীটার খুব বুড়ো...এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছ তোমরা, কোটিপতি মাত্রেই বুড়ো হয়। বোধহয় কমবয়সে কোটিপতি হওয়া যায় না। তারপর সেই কোটিপতির একদম বৌ-টৌ ছেলে-পিলে কিছু ছিল না। তার দুই ভাইপো ছিল। একজনের নাম প্যাট্রিক, আর একজনের নাম জুলিয়াস। এখন এই দুজন বিয়ে করতে পারছে না, কেননা খুড়ো বেজায় কিপটে আর ওরা দুজনেই তেমন ভাল চাকরী করে না।"

বলে প্রিয়গোপাল হাসতে লাগল। বলল, "কি রকম সিচুয়েশনটা বলো দেখি! খুড়ো যাতে মারা পড়ে সেজন্য দুই ভাইপো নানাবিধ চেষ্টা করছে। ওষুধে বিষ মিশিয়েছে, টাইম বোমা এনে বসিয়েছে খুড়োর বাড়িতে। কিন্তু দুই ভাই এসবই দল বেঁধে করছে না, করছে আলাদা আলাদা। অথচ খুড়ো মরছে না।" বলে প্রিয়গোপাল খুব হাসল আবার একচোট। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "হাসছ না তোমরা?" আমি একটু হেসে বললাম, "তারপর?" প্রিয়গোপাল বলল, "তারপর আবার কি, এই তো শেষ?" শেষ শুনে আমি খুব খুসি হলাম। বললাম, "শেষ?" তারপর বেজায় হাসলাম। আমার হাসি দেখে (তাই মনে হল) গঙ্গাদাস আর নীতিশ দুজনে খুব হেসে উঠল। প্রিয়গোপাল তাতে খুসি হল। কিন্তু কেবলি আক্ষেপ করতে লাগল, গল্পটা আরো ভাল লাগত যদি কিনা কোটিপতি বুড়োর নামটা ঠিক বলতে পারতাম। ওর নাম পীটার কিছুতেই নয়।

আমি বললাম, "প্রিয়গোপাল, তুমি এক কাজ করো। যে বই থেকে গল্পটা বললে সে বইটা তো তোমার বাড়িতে আছে।" প্রিয়গোপাল বলল, "দি আইডিয়া! এক্ষুনি নামটা দেখে এসে বলছি তোমাদের।" বলে বেরিয়ে গেল।

আমিও তখনি পালিয়ে যাব ভাবছি, কিন্তু গঙ্গাদাস আর নীতিশ বলল, "সামান্য প্রিয়গোপালের ভয়ে পালানোটা কাজের কথা নয়। আসুক না ব্যাটা। আমাদের কাছে তুলো নেই? আমরা তা কানে দিতে পারি না?

বলে ছোট গোল গোল তুলোর দুটো বল আমাকে দিয়ে বলল, যখনি ঘনস্মৃতির হুইসল শুনবে তক্ষুনি কানে লাগিয়ে দেবে। আর বিশেষ কোন গোলমাল হবে না তাহলে।

তুলোর বল দুটো নিয়ে বসে রইলাম। গঙ্গাপদ আর নীতিশ আইডিয়াটা ভালই বার করেছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিজেকে পেতে চাও যদি, সাহসে বুক বেঁধে দামী কিছু দাও—

কারো মুখে শুনেছিলেন কি কোথাও পড়েছিলেন জ্যোতিরাণীর মনে নেই। কথাগুলো অন্তর্মুখি কোন্ গহনে ঘুমিয়েছিল কে জানে। সময়ে জেগে উঠেছে। জ্যোতিরাণী সাহসে বুক বেঁধেছেন। দামী কিছু দিতেও চলেছেন। সেটা দশ বিঘে জমির একটা বাড়ি নয়। কয়েক লক্ষ টাকাও নয়। ওর থেকে অনেক দামী বুকের তলার সম্পদ কিছু। ঠিক যে কি, সেটা জ্যোতিরাণী জানেন না। শুধু অনুভব করছেন। আর আশ্চর্য, নিজেকে যেন এরই মধ্যে চারগুণ করে ফিরে পাচ্ছেন তিনি। পাওয়ার অনুভূতিটা এমন যে নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে না।

বাড়ির খোদ কর্তা আর কালীদা বেরিয়ে গেলেই এ-বাড়িতে দুপুর নামে আজকাল। সিতু তাঁদের অনেক আগে স্কুলে রওনা হয়। তবে আজ তার স্কুল নেই, সকাল থেকে টিকির দেখাও নেই। থাকত যদি ছোট দাদুর সঙ্গ পেত। তিনিও কালীদার সঙ্গেই বেরিয়েছেন। সকালে জলের জীবের ওই অদ্ভুত গল্পটা শোনার পর কান্না চাপার তাড়নায় ছেলের ওই মেকী হাসির মূর্তিটা জ্যোতিরাণীর চোখে লেগে আছে। মনে পড়তে নিজের মনেই হাসছেন মুখ টিপে।

বেলা এগারোটার পর থেকেই দুপুর। জ্যোতিরাণী অকারণে লঘু পায়ে ওপর-নীচ করলেন বার কয়েক। শাশুড়ীর ঘরেও উঁকি দিলেন। খানিক আগে তাঁর খাওয়ার সময় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সকাল-সকালই খেয়ে নেন। দ্বিতীয় দফায় এসে দেখলেন তাঁর খাওয়া সারা। গালে হরতকী পুরে বসে আছেন। ফিরে এসে আবার এ-ঘর ও-ঘর করলেন খানিক। বারান্দার ও-ধারের কোণে হাত-পা ছড়িয়ে মেঘনা পান সাজছে নিজের জন্য। এই ক'দিন ওর গজর-গজর কানে আসছে না তেমন। ওকে দেখলেই সদার কথা মনে পড়ে জ্যোতিরাণীর। আজ মন ভালো, আরো বেশি মনে পড়ল। অকারণে পরদা ঠেলে পায়ে পায়ে একবার পাশের ঘরেও ঢুকলেন জ্যোতিরাণী। শূন্য ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিক। চারদিকে তাকালেন একবার। কিছুই দেখলেন না। কি যেন অনুভব করতে চেষ্টা করলেন শুধু। কী? ...সব-কিছুর মধ্যে কোথাও বুঝি সব-ভালোর একটা মূল রয়েছে, শিকড় রয়েছে।

সর্বাঙ্গে শিহরন একপ্রস্থ। বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়ালেন। লজ্জা পেলেন একটু, কারণ, আয়নায় নিজেকে দেখতেও ভালো লাগছে। টেবিলের ওপর বাবার সেই স্তোত্র লেখা বাঁধানো গানের খাতাটা পড়ে আছে। ঘণ্টা-খানেক আগে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে বার করেছিলেন ওটা। বসে ওটাই টেনে নিলেন আবার। সামনে কলমটাও আছে। জ্যোতিরাণী হাসছেন আপন মনে। ...একটু আগে তিনি কিছু পেয়েছেন। আবার কখন কোন্ আঘাতে এই পাওয়াটুকু হারিয়ে যাবে কে জানে। কলম খুলে বাবার ওই স্তোত্রের মাঝে অনেকটা ফাঁক দিয়ে একটু আগের সঞ্চয়টুকু লিখে রাখলেন। —সব-কিছুর মধ্যে কোথাও সব-ভালোর একটা মূল রয়েছে, শিকড় রয়েছে। নীচে তারিখ বসালেন। অনেক সময় তো খোলেন খাতাটা, দেখলে দুর্দিনেও মনে পড়বে।

কিন্তু লেখার পর লজ্জা পেলেন। একটু বেশিই আবেগে ভাসছেন বোধ হয়। খাতাটা দেরাজে ঢুকিয়ে টেলিফোনের দিকে এগোলেন। মিত্রাদিকে আসতে বলবেন। এতক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছে নিশ্চয়। আগে তার দুশ্চিন্তা ঘোচানো দরকার। কিন্তু রিসিভার তুলেও টেলিফোন করলেন না। বাড়িতে ভালো লাগছে না, তিনিই যাবেন। তাছাড়া কথায় কথায় ডেকে না পাঠিয়ে নিজেরই যাওয়া উচিত।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি। মেঘনাকে ডেকে বলে দিলেন ঘণ্টা-খানেক ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ঘুরে আসছেন। পা বাড়াতে গিয়ে সিতুর কথা মনে পড়ল। ...গেল কোথায় ছেলেটা। নীচের বারান্দায় দেখা পেলেন তার। বন্ধু-বান্ধবরা স্কুলে, তাই ছুটি নীরস লাগছে। তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেই ও-যে টো-টো করে ঘুরবে সন্দেহ নেই। জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করে দেখলেন, পরনের জামা প্যান্ট ফর্সাই। বললেন, চল্ আমার সঙ্গে, জুতোটা পরে আয়।

কোথায় যাওয়া হবে না জেনেই সিতু সানন্দে জুতো পরতে ছুটল।

মিত্রাদির বাড়ি গড়িয়াহাট ছাড়িয়ে আরো খানিক দূরে। সিতু গাড়িতে বসে শুনেছে কোথায় যাওয়া হচ্ছে। শোনার পর আর তেমন উৎসাহ বোধ করছে না।

বাড়ি থেকে বেরুতে পেরে জ্যোতিরাণীর সত্যিই ভালো লাগছে। মেঘলা আকাশ। শরতের ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। আর দিন-কয়েক বাদে পুজো। এ-পাশ ও-পাশের

[illegible] ভেতরকারও [illegible] [illegible]

মিত্রাদির বাড়ির ভিতরে আগে আর কখনো আসেননি জ্যোতিরাণী। প্রতিষ্ঠানের বাড়ি দেখার জন্য যেদিন তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিনও তাড়া ছিল বলে ভিতরে ঢোকেননি। মিত্রাদিই নেমে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফেরার সময় তাঁকেই নিজের ওখানে নিয়ে গেছলেন।

ড্রাইভার হর্ন বাজাতে ওপরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মৈত্রেয়ী চন্দ। তার-পরেই শশব্যস্তে নেমে এলেন।—কি ভাগ্যি, অ্যাঁ? এসো এসো—সিতু আয়। খুশি ধরে না, একটা টেলিফোনও তো করোনি, আর আধঘন্টা পরে এলেই তো বেরিয়ে যেতাম—কি হত বলো তো?

জ্যোতিরাণী হাসছেন।—কি আর হত। যাওনি তো।

দোতলায় এলেন। সিতু তক্ষুনি তাদের ছেড়ে দোতলা বারান্দার রেলিংএ গিয়ে দাঁড়াল। জ্যোতিরাণীকে সাদরে বসতে দিয়ে মৈত্রেয়ী বললেন, গরিবের এ-ই স্বর্গবাস—নীচের তিন-ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছি, ওপরটা আমার।

জ্যোতিরাণী অবাক। ছেচল্লিশ বা সাতচল্লিশের গোড়ায় এ-সব জায়গার বাড়ির দাম বেশি ছিল না অবশ্য। বিলেত থেকে ফিরে মিত্রাদির বাড়ি বদলানোর কথাই শুনেছিলেন, কিনেছে ধারণা ছিল না। বললেন, এ-বাড়ি তোমার জানতুম না তো।

মৈত্রেয়ী চন্দ হেসে উঠলেন, কিনিনি, পরের জিনিস কিছুকালের জন্য নিজের করে নিয়েছি।

সানন্দে রহস্য ব্যক্ত করলেন তারপর। কেনা হয়নি, খুব সুবিধের দরে পঁচিশ বছরের মিয়াদে লীজ্ নেওয়া হয়েছে। মুসলমানের বাড়ি, বড় দাঙ্গার সময় ভদ্রলোক সেই যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল, আর এখানে বাস করতে আসেনি। বিলেত থেকে ফেরার পর এক পরিচিতজনের মারফৎ বরাতজোরে যোগাযোগ। সেই পরিচিত লোকটির [illegible] তখন এই বাড়ি [illegible] তার [illegible]। মিত্রাদি হেসে সারা হঠাৎ, বিলেত-ফেরতার চটকে সেজেগুজে কম করে চারদিন মাঝ-কলকাতার বড় হোটেলে বাড়ির মালিকের সঙ্গে ফয়সালায় বসতে হয়েছে, তবে তার মুণ্ডু ঘুরেছে। এত শস্তায় লীজ্ দিয়ে লোকটা বোধহয় এখন হাত কামড়াচ্ছে। তিন মাস অন্তর যা দিতে হয় নীচের তলার ভাড়াটের কাছ থেকে তার বেশি আসে।

উৎফুল্ল মুখে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেছেন মৈত্রেয়ী চন্দ।—সাহস করে আর একটু খাতির জমাতে পারলে জলের দরে বাড়িটা হয়ত কিনেই ফেলতে পারতাম ভাই। এখন আফশোস হচ্ছে।

জ্যোতিরাণীও হেসে ফেললেন।

ছোটর ওপর ছিমছাম বাড়িটা। লীজ্ নেওয়ার পর মিত্রাদির কিছু খরচ হয়েছে শুনলেন। তার ফলে একেবারে নি-খরচায় থাকা যাচ্ছে এখন। নীচের তলার মাঝ-বয়সী সিন্ধী ভাড়াটে মাসের তিন তারিখে ভাড়া গুণে দিয়ে যায়—লীজ্-নেওয়া বাড়ি, পাকা রিসিট দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার নেই। তাছাড়া লোকও ভালো, ঘরের দরজা বন্ধ করে রাত ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত মদ খায়, কিন্তু হৈ-হল্লা করে না।

জ্যোতিরাণী শুনছেন আর ভাবছেন চৌকস বটে মিত্রাদি। ঠাট্টা করলেন, অবাঙালী নিয়ে ঘর করছ তাহলে?

—কি করব, অবাঙালী বলে রক্ষে, বাঙালী হলে দুদিন বাদে আমাকেই বাড়ি-ছাড়া করার ফিকির খুঁজত।

এসেছেন মিনিট-পনের হল, এতক্ষণের মধ্যে বীথির সাড়া না পেয়ে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, বীথি কোথায়?

—ও-মা, বীথিকে তো ওই ও-দিকের এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সিনেমায় পাঠালাম। সারাক্ষণ গোমড়া মুখ করে ঘরে বসে থেকে কি করবে, তাই দিলাম পাঠিয়ে।

[illegible] সিনেমার [illegible] এখনো।

—তুমি না এলে আমি তো শুয়ে পড়তাম, তখন যেত কিনা ঠিক কি। তাই আগেই এই বাড়ির মেয়েদের কাছে জিম্মা করে দিয়ে এলাম।

মিত্রাদি ভালো কাজই করেছে, তবু এই ভালোটা কেন-যে হঠাৎ মনে ধরল না জ্যোতিরাণী ভেবে পেলেন না। স্টেশনে পম্মার যে-শোক স্বচক্ষে দেখেছেন তিনি তার তুলনায় সিনেমা জিনিসটা বড় বেশি বে-খাপ্পা লেগেছে হয়ত। তক্ষুনি আবার কি মনে পড়তে উৎসুক একটু, তোমার মেয়েকেও তো দেখলাম না, মামাবাড়িতে থাকে বুঝি?

মেয়ের প্রসঙ্গ খুব যেন আশা করেনি মিত্রাদি। তবু লঘু জবাবই পেলেন।—তুমি সব খবরই রাখো দেখছি, মেয়ে তো সেই কবে থেকেই দার্জিলিংএ, সেখানে বোর্ডিংএ থেকে পড়ে।

মুখের দিকে চেয়ে মিত্রাদির জোরের দিকটাই যেন অনুভব করছেন জ্যোতিরাণী। এমন নির্লিপ্ত অথচ সহজ হাসিখুশির মধ্যে জীবনটাকে বাঁধতে পারল কি করে সেই বিস্ময়। স্বামীর তো ওই ব্যাপার, একটা মাত্র মেয়ে সেও দার্জিলিংএ। মেয়েকে মনের মত বড় করে তোলার আকাঙ্ক্ষাতেই সেখানে রাখা হয়েছে সন্দেহ নেই। তবু এই মুখে নিঃসঙ্গতার পরিতাপ কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

বারান্দার রেলিংএ দাঁড়িয়ে শ্রীমান সাত্যকির বিরক্তি ধরেছে। ঘরে পদার্পণ করে গম্ভীর মুখে বলল, আমি নীচে গাড়িতে গিয়ে বসছি।

—গাড়িতে কেন রে! মৈত্রেয়ী ব্যস্ত হলেন, মাসির বাড়ি বুঝি ভালো লাগছে না? দাঁড়া, কি খাবি বল্?

সিতু বলতে পারলে বলত, ঘোড়ার ডিম। এখানে আসার পরে বুঝেছে মা তাকে আটকে রাখার জন্যেই সঙ্গে ধরে এনেছে।—আসার আগে ঠাকুমার ঘরে খেয়ে এসেছি, এক ফোটাও খিদে নেই। তুমি মায়ের সঙ্গে প্রাণভরে গল্প করো, আমি গাড়িতে গিয়ে বসি।

মায়ের ভ্রূকুটি এড়িয়ে প্রস্থান। মিত্রাদির খিলখিল হাসি। জ্যোতিরাণীও হেসে ফেললেন।

—বাপের মতই ভারিক্কি চাল হচ্ছে দেখি, অ্যাঁ?

মিত্রাদির লঘু উপমা কানে সুধাবর্ষী ঠেকল না খুব। হেসেই জবাব দিলেন, আর বোলো না, দিনকে দিন যা হয়ে উঠছে—। যাক, কাজের কথা শোনো, এ-দিকের সব ব্যবস্থা তো রেডি, এবারে তোমার কেরামতি দেখাও।

তাকে দেখা মাত্র এই সুখবরেরই প্রত্যাশায় ছিলেন মৈত্রেয়ী চন্দ। সুখবর ধরেই নিয়েছিলেন, নয়তো নিজে আসত না। আর এই কারণেই মুখ ফুটে নিজে কিছু জিজ্ঞাসা না করে সাগ্রহে প্রতীক্ষায়

ছিলেন [illegible] ব্যস্ত [illegible] পড়লেন। [illegible] মৈত্রেয়ী চন্দ। জ্যোতিরাণীকে কাছে টেনে নিয়ে [illegible] বসার মতলব প্রায়। হাসিমুখেই নিজেকে ছাড়িয়ে বাঁচলেন তিনি।

—আসল কেরামতি তো তুমিই দেখালে, এতবড় একটা ব্যাপারে তোমার ভদ্রলোক এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন? মৈত্রেয়ী চন্দর বিশ্বাস হয় না যেন।

—না হলে আর এগোলাম কি করে।

—সত্যি, [illegible] দিল্লী থেকে ফেরার [illegible] বলে আর পড়লেও আমার [illegible] না। এখন দেখছি আঁচলের জোর বটে তোমার। কি করে কি হল শুনি না, দিল্লী থেকে ফিরে আঁচল বিছানো দেখেই মজে গেলেন ভদ্রলোক?

—অনেকটা। মুখটিপে হাসছেন জ্যোতিরাণী।

—আর তুমি আলটিমেটাম দিলে, হয় কথা রাখো, নয় আঁচল ছাড়ো?

ভিতরে ভিতরে [illegible] পড়ল জ্যোতিরাণীর। মিত্রাদির এত কৌতূহল কেন, অনুমান করতে পারেন। অনেক লোকের মধ্যে তাঁর সম্পর্কের [illegible] করতে পারেননি এমন [illegible] মিত্রাদি [illegible]। এই জন্যেই তার ভাবনা ছিল, আর এ-জন্যেই এখন কৌতূহল। তাই সাদা-সাপটা রসের জবাবটাই দিলেন তিনি।—ত্য আঁচল ছাড়া না ছাড়ার ধকল তো কিছু গেলই।

[illegible] কথার মূলে না পৌঁছে ছাড়ত সেই মিত্রাদির।—কথা রেখে আচ্ছন্ন ধরলেন ভদ্রলোক, সেই ধকল?

ছদ্ম কোপে এবার ভ্রূকুটি করলেন জ্যোতিরাণী।—তুমি একটি অসভ্য, রস ছেড়ে ভালো করে কাজে মন দাও এখন।

প্রতিষ্ঠানের নামটা মৈত্রেয়ীর মনে ধরেনি। সরাসরি সেটা প্রকাশ না করে ঘুরিয়ে বললেন, প্রভুজীধাম নামটা বড় সেকেলে হয়ে গেল না?

নাম-প্রসঙ্গে একটুও দ্বিধার আমল দিতে রাজি নন জ্যোতিরাণী।—হল তাতে কি। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী হয়ে তুমি যাজ্ঞবল্ক্যের ঘর করেছিলে সেই মহাভারতের যুগে, এখনো তো দিব্বি সেই সেকেলে নাম ধরে বসে আছ।

অতএব মৈত্রেয়ীরও দ্বিধা বিসর্জন।

গাড়ি গরিয়াহাট ধরে ফিরছে। জ্যোতিরাণী সকৌতুকে ছেলের গোমড়া মুখ দেখছেন। ওর যেন অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট করা হয়েছে। সকালের সেই গল্প শোনার মুখও মনে পড়ল। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যেই জিজ্ঞাসা করলেন, ছোটদাদু সকালে সেই সমুদ্রের শত্রুকটার কি নাম বলেছিলেন যেন?

—পেলোরাস্ জ্যাক। ছেলেরই বয়োজ্যেষ্ঠের ভূমিকা।

লঘু কৌতুকে জ্যোতিরাণী পেলোরাস্ জ্যাকের ফূর্তির সঙ্গে ছেলের গোমড়া মুখের কিছু একটা তুলনামূলক মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ বিষম আতঙ্কে উঠলেন তিনি। সিতু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। সিমেন্ট-সুরে [illegible] বুকে বুঝি আকস্মিক বজ্রপাত হয়ে গেল একটা। পথের মানুষও নিস্পন্দ বিমূঢ়।

সামনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা-ভবন। স্টেট ব্যাঙ্ক নাম হয়নি তখনো। জ্যোতিরাণীর গাড়ি অতিক্রম করার আগেই আচমকা গুলীর শব্দ। ব্যাঙ্কের সামনে একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে। ভ্যান থেকে একটি বাঙালী ভদ্রলোক সবে পিছনের দরজাটা খুলেছে—সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলী। ভদ্রলোক রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। আর বন্দুকধারী একজন পশ্চিমী রক্ষী গাড়ির ভিতরে—আচমকা গুলীতে তারও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। ভ্যানের লাগোয়া আর একটা মোটর দাঁড়িয়ে। তারই আরোহীরা গুলী চালিয়েছে, তাদের হাতে স্টেন-গান, পিস্তল।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চালিয়েছে তারা। তাদের গাড়িটা সামনে পড়ায় আর লোকজনের ছুটোছুটির ত্রাসে জ্যোতিরাণীর গাড়ি বাধা পেয়ে নিশ্চল হঠাৎ—ব্যাপারটা বুঝে চোখের নিমেষে আত্মস্থ হয়ে ড্রাইভার চেষ্টা করছে ও-ধার দিয়ে পাশ কাটাতে। কিন্তু পায়ে-হাঁটা গতি গাড়ির। ঘুরে ঘুরে গুলী ছুঁড়ছে লোকগুলো—জীবিত কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। হ্যাঁচকা টানে জানালার দিক থেকে সিতুকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ কাঠ। একটা লোকের পিস্তল এদিকেও ঘুরেছে। লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে জ্যোতিরাণীর। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখেমুখে অটল জিঘাংসার বীভৎস নরক দেখেছেন তিনি। এক মুহূর্ত থমকে লোকটা ড্রাইভারের দিকে পিস্তল বাগিয়ে দূরে সরে গেছে। ইতিমধ্যে [illegible] জ্যোতিরাণীর ড্রাইভার নিজেকেও সামলে গাড়ি ও-ধারের ফুটপাথের দিকে ঘুরিয়েছে।

চোখের পলকে আরেকটা লোক ভ্যান থেকে বড় একটা ক্যাশ বাক্স নামিয়ে নিজেদের গাড়িতে তুলেছে। আর একজন মৃত রক্ষীর বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপর গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে চোখের পলকে তারা গাড়ি নিয়ে উধাও।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে যেতে কতক্ষণ লেগেছে? সম্ভবত কয়েক মিনিট মাত্র। তারপরেই লোকে লোকারণ্য। জনতা আর গাড়ির ভিড়ে এগোবার উপায় নেই। উপায় থাকলেও যেন হুঁস নেই কারো। জ্যোতিরাণীর বুকের ভিতরটা এখনো কাঁপছে থর-থর করে।

আবার চমকে উঠলেন তিনি। হঠাৎ দরজা খুলে সিতু ভিড়ের দিকে ছুটেছে। জ্যোতিরাণী ব্যাকুল ক্ষোভে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, শিগগীর ধরে নিয়ে এসো ওকে!

ড্রাইভারও দরজা খুলে ছুটল। সিতুকে ধরে নিয়ে ফিরল মিনিট পাঁচ-সাত বাদে। সরোষে জ্যোতিরাণী তাকে কাছে টেনে নিয়ে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, কেন গেছলি? কেন গেছলি?

সিতু জবাব দিল, ওরা তো পালিয়েছে, এখনো ভয় পাচ্ছ কেন?

ধীর গতিতে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেল ড্রাইভার। মা-কে যাই বলুক, নিজে উত্তেজনায় ফুটছে সিতু। বলছে, ভদ্রলোকের নাম গণেশ মিত্র—ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, আর ওই যে মরে কাঠ বন্দুকধারী সিপাইটা—ওর নাম লোক বাহাদুর। লোকগুলো সাতানব্বুই হাজার টাকার ক্যাশবাক্স নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে!

জ্যোতিরাণী শুনলেন। কিন্তু তখনো হুঁস নেই যেন।

...মিত্রাদির কাছে কেন এসেছিলেন? কি নিয়ে যেন ভাবছিলেন তাঁরা। বাঁচার সম্বল নেই যদের, তাদের কেমন করে বাঁচানো যেতে পারে তাই নিয়ে। শোকে যারা হাসতে ভুলেছে তাদের মুখে কেমন করে হাসি ফোটানো যেতে পারে, তাই নিয়ে।

...আর সকালে একটা গল্প শুনেছিলেন মামাশ্বশুরের মুখে। একটা সমুদ্রের জীব চল্লিশ বছর ধরে চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। আর তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে আর তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করেছে।

কিন্তু চোখের সামনে এ-কি দেখলেন তিনি? ক্ষুদ্র লোভে মানুষের হাতে মানুষের এ-কি নিষ্ঠুর হত্যা দেখলেন, চিরদিনের মত মুখের হাসি নেভানোর এ-কি ভয়াল করাল অন্ধকারের মুখব্যাদান দেখে উঠলেন তিনি? সত্যি দেখলেন না দুঃস্বপ্ন?

বাড়ির সিঁড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামল। জ্যোতিরাণী তখনো নিস্পন্দের মত বসে।

(ক্রমশঃ)

প্রমীলা

সুখ-শান্তি

সুখের সংসার গড়তে চায় সবাই। বিশেষভাবে বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তির প্রত্যাশা সকলের। সংসার করার আর এক উদ্দেশ্যই হলো শান্তির নীড় রচনা করা। সংসার সমরাঙ্গনে প্রাণপণে যুদ্ধ করার পেছনে এই শান্তির প্রতিশ্রুতিটুকু না থাকলে সবটাই বুঝি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে যেত। মানুষ লড়াই করতে পারতো না, লড়াই করার উৎসাহও হারিয়ে ফেলত। বাইরে যতই অশান্তি থাক ঘরে ফিরে প্রত্যাশিত শান্তির সন্ধান পেলে সেটা অনেক পরিমাণে লাঘব হয়ে যায়। নতুন উদ্যমে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। ঘরে-বাইরে সমান অশান্তি নিয়ে বেঁচে থাকা দুষ্কর। আর্থিক সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যায়। ক্রমাগত প্রচেষ্টায় এর বিহিত করাও হয়তো সম্ভব। কিন্তু পারিবারিক শান্তির জন্য লড়াই চালানো সহজ নয় এবং সম্ভবও নয়। সেটা সম্পূর্ণভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে। পারস্পরিক বোঝাপড়া যত সহজ হবে পারিবারিক শান্তিও ততই দৃঢ়মূল এবং স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন হবে।

কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে অনেক ক্ষেত্রেই আজ এই প্রত্যাশিত শান্তির স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যে বিরাট প্রত্যাশা এবং সোনালী স্বপ্নের তন্দ্রালু পরিবেশে মগ্ন থেকে নীড় রচনা করা হলো তা কোন অসতর্ক মুহূর্তে ভেঙেচুরে খান-খান হয়ে যায়। পরিবর্তে থাকে কতকগুলি ছুঁচালো কাঁচের টুকরো যা কিনা প্রতি মুহূর্তে পরস্পরকে বিদ্ধ করে। তীব্র যন্ত্রণায় উভয়েই বিদ্ধ হয় কিন্তু নিষ্কৃতির পথ খুঁজে পায় না। এর মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরতার অভাব। সুখ ও শান্তির নীড় গড়ে তোলার জন্য আমাদের শুধু ইচ্ছাই আছে—আগ্রহ নেই। আন্তরিকতার অভাবের ফলেই এই ছন্নছাড়া দশায় আমাদের ভুগতে হয়। এটা বোধহয় সভ্যতার অগ্রগতির দীর্ঘশ্বাস। না হলে এরকম কেন হয়? দুজন দুজনকে একান্ত-ভাবে ভালোবেসে পাচ্ছি। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করতে পারছি না, ভালবেসে সুখ ও শান্তির পরিপূর্ণতায় বেঁচে থাকতে চাইছি—সব কিভাবে যে ভেস্তে যাচ্ছে তার সঠিক ব্যাখ্যা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু পারস্পরিক নির্ভরতা নয় পরস্পরকে সহ্য করার দিনও বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন আর একে অপরকে সহ্য করতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছা এবং অভিরুচির বৈপরীত্য নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ছে। কেউ কারো সঙ্গে মানিয়ে চলার যেন চেষ্টা করছে না। যে যার খুশি-মত চলতে চায়। যুগের অগ্রগতির ফলে স্ত্রীকেও আর কোন ব্যাপারে স্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। তাই সুখ এবং শান্তির চেয়ে সংঘাতটাই অনিবার্য হয়ে উঠছে।

কিন্তু সংসারে শান্তি বজায় রাখায় স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর দায়িত্ব অনেক বেশি। দিনের যত পরিবর্তনই হোক না কেন একথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। সংসার করে যদি সুখ-শান্তি না পাওয়া যায়, পরস্পরকে না বোঝা যায় তবে সে সংসার নিরর্থক।

ধ্বংসের মধ্যেই সৌন্দর্যের প্রকাশ

১৯৪৫-৪৬ সালে বার্লিনের বুক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ অপসারণে যারা নিযুক্ত করেছিলেন সেদিন তারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। সমস্ত জার্মাণী এক বিশাল ধ্বংস-স্তূপে পরিণত। আর এরই মধ্যে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে অস্থি-কঙ্কালসার মানুষের দল। জীবনধারণের দুঃসহ গ্লানি সেদিন তাদের কাছে অকপটে নিজের সকল দুয়ার খুলে দিয়েছিল। এরই মধ্য থেকে যে আবার নতুন জীবনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় তা তাদের কাছে ছিল একান্তই কল্পনা-বিলাস। কোন রকমে জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করে তারা সেদিন শেষদিনের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু ধ্বংসের বুক থেকেই নতুন সৃষ্টির সূচনা হয় এবং একই সঙ্গে নবজীবনের। একথাটা আজকের প্রাণবন্ত জার্মাণীর রূপ দেখলে বেশ উপলব্ধি করা যায়।

আজকের জার্মাণ তরুণীদের দেখলে মনে হয় 'বিউটি রাইজেস ফ্রম দি রুইনস'। ধ্বংসস্তূপ থেকে এই সৌন্দর্যের সৃষ্টি সকলকে চমকে দিচ্ছে। যুদ্ধপূর্ব জার্মাণ তরুণীদের সঙ্গে তাদের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। আজকের তরুণীরা বেশ ছিমছাম এবং সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিতা। সেদিনের মত মেদবাহুল্য ও অস্বাভাবিক কাঠিন্যমণ্ডিত নয়। আর তখনকার হাস্যকর পোষাক এখন তো আর একদম নেই।

কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের জার্মাণ তরুণীরা আজ পৃথিবীর 'ডিয়ারেস্ট গার্লস' আখ্যায় বিভূষিত। মডেলের ক্ষেত্রে তো আজকে তাদের জুড়ি মেলা ভার। প্রতি বছর গোটা জার্মাণীতে যে বিরাট ফ্যাশানের মেলা বসে তাতে প্রায় হাজার খানেক তরুণীর প্রয়োজন হয় মডেল হবার জন্য। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই পেশাধারী, অধিকাংশই শৌখিন—কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অফিস থেকেই এরা আসে। কিন্তু পেশাধারীর সঙ্গে শৌখিনের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে তাদের এই প্রতিষ্ঠার কারণ হিসেবে বলা যায় যে অতীতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক এক নিঃশ্বাসে চুকিয়ে দিয়ে বর্তমানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এতে তাদের কোন ইতস্তত ছিল না বা কোন রকম 'যদি' এবং 'কিন্তু'র আশ্রয়ও তারা নেয়নি। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাদের ঠিকই আছে কিন্তু ফ্যাশানের ব্যাপারে ঐতিহ্যকে তারা আমল দেয়নি।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও আজ তাদের জগৎ-জোড়া নাম। যুদ্ধের পর ক্রমশই তারা অধিক সংখ্যায় ফিল্মের দিকে ঝুঁকছে এবং নামও কিনছে বেশ। এক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি

বন পার্লামেন্টে সদ্য নির্বাচিত উরসুলা ক্রিপস

ত্রয়ী অভিনেত্রী : এলকে সোমের, নাদজা টিলার এবং রোমি সেইণ্ডার

যে কোন দেশের মেয়েদের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। নাৎসী জার্মাণীতে মেয়েদের প্রধান কর্তব্য ছিল দেশের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সন্তান ধারণ করা। কিন্তু আজ মেয়েদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কোন পরিসরে আবদ্ধ হয়ে নেই। আর তারাও সেটা হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাই সব ব্যাপারেই তাদের সমান আগ্রহ। বিদেশী আদবকায়দা এবং ভাষা শেখার জন্য তাদের আগ্রহের অন্ত নেই। আবার জার্মাণ তরুণীদের এসব ব্যাপারে বেশ খ্যাতিও আছে। যে কোন জিনিষ তারা সহজে আয়ত্ত করে নিতে পারে। সেজন্য দেশ-দেশান্তরে তারা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য লণ্ডন, প্যারিস, জেনেভা, মাদ্রিদ এবং নিউইয়র্কেও তারা পাড়ি জমায়। এসব দেশে তারা কোন পরিবারে গৃহকর্ত্রীর সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে দিনেরবেলা এবং সন্ধ্যেবেলায় বিভিন্ন ক্লাশে যোগদান করে। অনেকে সে-দেশেই বিয়ে-থা করে থেকে যায়। তবে অনেকেই শিক্ষাশেষে দেশে ফিরে আসে।

নারীর অধিকার বিস্তৃতির ব্যাপারেও এরা বেশ সজাগ। সেজন্য ইদানীং রাজনীতিতেও তাদের প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে এবং বেশ বৃহৎ সংখ্যায়। গত ষোল বছরে একজন মাত্র মহিলা মন্ত্রী ছিলেন। এবার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কয়েকটি উচ্চপদে মহিলাদের নিয়োগ ঘটেছে। যদিও এবারকার নির্বাচনে পার্লামেণ্ট মহিলা সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা বেশ উল্লেখযোগ্য। সর্বাপেক্ষা উল্লেখের দাবী রাখে বন-পার্লামেন্টে শ্রীমতী উরশুলা ক্রিপসের নির্বাচন। বত্রিশ বৎসর বয়স্কা এই ভদ্রমহিলা একজন অর্থনীতিবিদ এবং তার নির্বাচনে পার্লামেন্ট একজন শক্তিশালী সদস্য পেল। অবশ্য সরকারী উচ্চপদে মহিলা একান্ত দুর্লভ। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই অবস্থা আরো নৈরাশ্যজনক। সেখানে মহিলার সংখ্যা শতকরা একভাগেরও কম। এজন্য অবশ্য প্রস্তুতি চলছে। এতকাল

জার্মাণীর একমাত্র নারী মন্ত্রী

জার্মাণ তরুণীরা এ সম্বন্ধে বেশ উদাসীন ছিল। কিন্তু সে ঔদাসীন্য এখন কেটে গেছে।

জার্মাণীতে মেয়েদের পছন্দই এখন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি বিপণিতে মজাদার রঙের জামা-কাপড়ের এক প্রদর্শনী হয়। ফলে বিপণির মালিক ভদ্রলোককে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ভদ্রলোক এক কথায় দায়মুক্ত হলেন, মেয়েরা এসব রঙ পছন্দ করে। জামা-কাপড় থেকে শুরু করে মোটর গাড়ি পর্যন্ত সবাই মেয়েদের পছন্দের দিকে নজর রাখে বেশি। পুরুষরা কেবল টাকা দিয়েই খালাস। এর ফলে জিনিসপত্রের কেনাবেচাও অনেক বেড়ে গেছে। আবার তাদের পছন্দেরও বেশ রকমফের আছে। একই জিনিষের দিকে বরাবর তারা ঝোঁকে না। এতে দাম সম্পর্কেও তাদের বেশ একটা অবজ্ঞা এসে গেছে। জিনিষ পছন্দ হয়ে গেলে দাম নিয়ে তারা খুব একটা মাথা ঘামায় না।

মেয়েদের প্রধান কর্মস্থল রান্নাঘরেও আজ এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কাঠের উনুন বা পুরনো স্টোভের দিন আর নেই। সে জায়গায় এসেছে গ্যাস বা ইলেকট্রিক চুল্লী। সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে নতুন নানা বাসনপত্র। যার ফলে রান্নাঘরের কাজ-

চলার ছন্দে জার্মাণ নারী

কর্ম অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। পড়ার প্রতি তাদের আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় এই রান্নাঘরেও। সচিত্র সাপ্তাহিক ও মাসিকে প্রত্যেক গৃহিণী ডুবে থাকে। শিল্পোদ্যোগে জার্মাণ রমণীদের এখন উল্লেখযোগ্য অংশ নিতে দেখা যায়। কিছু-দিন আগেও এ ব্যাপারে তারা বেশ নিস্পৃহ ছিল এবং উৎসাহীরা ছিল সহায়কমাত্র। প্রত্যক্ষভাবে শিল্পোদ্যোগে অংশগ্রহণ এই তাদের প্রথম। শিল্পে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাক্ষেত্রেও তাদের ছায়াপাত ঘটেছে এবং সে ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লান্টস, এক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট, শিপিং লাইনস, রোড ট্রান্সপোর্ট এবং অন্যান্য ব্যবসায় মেয়েদের মুখ জার্মাণীতে আর অপরিচিত নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শতকরা ষাটটির মালিক হলো মেয়েরা। এর মধ্যে আবার নিজেদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার সংখ্যা শতকরা ত্রিশটি এবং যুক্ত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শতকরা দশটি। এছাড়া ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কনসার্ন পরিচালনায়ও মেয়েরা উৎসাহী হয়ে উঠেছে এবং এধরণের ব্যবসা সাফল্যলাভও করেছে।

সৌন্দর্যের সাধনা, শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে জার্মাণ তরুণীদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ আশার কথা। অপূর্ণতা অনেক রয়েছে। কিন্তু অবস্থার সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে সচেতনতাও আছে। এটা বেশ আশার কথা। এরকম উপলব্ধির ফলেই জাতীয়জীবনে নতুনের জোয়ার আসে। জার্মাণ তরুণীরা আজ সেই জোয়ারে ভাসছে।

সেলাইয়ের কথা

(৬)

কুর্তা

এই জমাটি ছোট ছেলেদের গরমকালের পক্ষে বেশ উপযোগী—বিশেষ গ্রীষ্মের দুপুরে ও গুমোট করা রাতে।

কুর্তা

মাপ :—

ছাতি—২০"

ঝুল—১২"

সেন্ত— ৮"

কোমর—১৮"

পুট— ৪½"

গলা— ৯"

ফরমুলা :—

১"=½ স্কেলে অংকন।

ছাতি—২০"

ছাতি—২০=কোমর—১৮"

½ ছাতি—২"=৮" সেন্ত

½ „ —½"=৪½" পুট

সেন্ত+৪"=১২" ঝুল

½ ছাতি+১/১২ ছাতি=৯"

পিছন পার্ট :—

ক—খ=ঝুল ১২"+½"=১২½"
(½" সেলাইয়ের জন্য)

ক—গ=সেন্ত=৮"

ক—ঘ=ছাতির ¼=৫"

ঘ—চ=ছাতির ¼+১¼"=৬¼
=এলাউন্স সহ ছাতি

গ—ছ=কোমরের ¼+১¼"=৫¾"

ঘ—জ=ছাতির ¼+১¼"=৬¼"

ক—ঝ=পুট ৪½"+½"=৪¾"

ক—ট=গলার ১/৬=১½"

ঝ—ঠ=½" কাঁধের সেপ্

ক—ড=১" পিছন গলা

ঘ—ট, জ—ত | =১½" বর্ডারের জন্য

সামনা পার্ট :—

১—২ =লম্বা=১২+½"

১—৩ =সেন্ত=৮"

১—৪ =ছাতির ¼=৫"

৪—৫ =ছাতির ¼+১¼"=৬¼
(এলাউন্স সহ ছাতি)

৩—৬ =কোমরের ¼+১¼"=৫¾"

২—১১=ছাতির ¼+১¼"=৬¼"

১— ৭=পুট+½"=৪¾"

৭— ৯=কাঁধের সেপ্ ½"

৮— ১=গলার ১/৬

১—১০=১/৬+½"

২—১২, ১১—১৫ | =১½" বর্ডার

১০—১৩=ল্যাপেল=½"

এখন চিত্রানুযায়ী সকল বিন্দু যোগ করে সেপ্ করা হলো।

সেলাইয়ের নিয়ম

প্রথম বুকের পট্টি সোজা দিকে রেখে বখেয়া দিয়ে পরে উল্টো করে হেম সেলাই করতে হবে। দু' পাটের কাঁধ এক সঙ্গে ধরে সামনের পার্ট বাড়তি রেখে সেলাই দিয়ে মুড়ে হেম সেলাই হবে।

এর কাঁধ পাঞ্জাবির কাঁধের মতো সেলাই করতে হবে, তারপর দু' পাশ উল্টো দিকে ধরে সামনের পার্টে কিছু বাড়তি কাপড় রেখে বখেয়া সেলাই দেওয়ার পরে ঐ কাপড় মুড়ে হেম করতে হবে।

গলার সোজা পিঠে ওরেয়া কাপড় বখেয়া দিয়ে মুড়ে উল্টো করে হেম সেলাই করা হবে।

কুর্তার উল্টো পিঠে কোমরের চারদিকে মুড়ে ১" চওড়া পট্টি সেলাই করতে হবে। পট্টিটির দু'দিকে টেঁকে নিয়ে হেম সেলাই দিতে হবে। পকেটের মুখের বর্ডার বখেয়া সেলাই করে সোজা পিঠে পকেট বসিয়ে বখেয়া সেলাই দিতে হবে। দু' পাশে খানিকটা খোলা থাকে সেই খোলা জায়গা এবং নীচের বর্ডারের ভেতর দিকে মুড়ে হেম সেলাই করতে হয়। এই করলেই কুর্তা শেষ হবে।

অনুশ্রী।
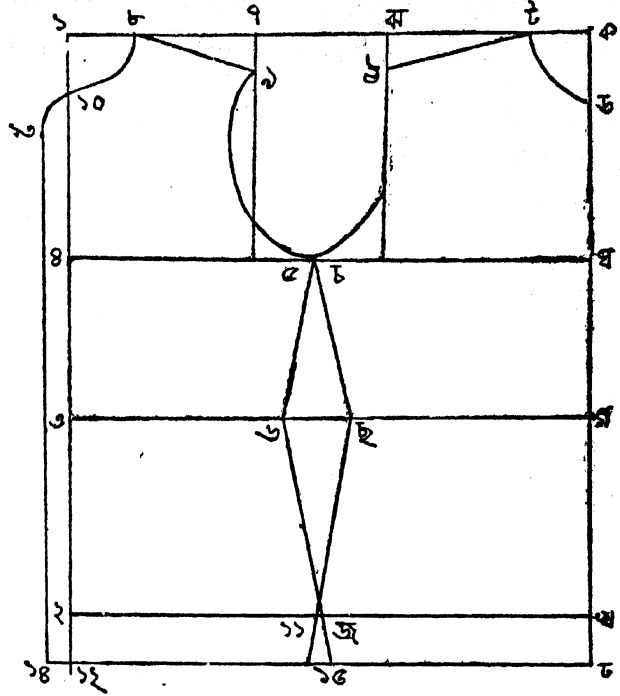
(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন এবং কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজি এম সাদিকের জন্মদিন কবে?

বিনীত
পুষ্পব্রত রায়চোধুরী
কটক, ওড়িষ্যা।

●

সবিনয় নিবেদন,

মুর্শিদাবাদের 'হাজারদুয়ারী' কার নক্সা অনুযায়ী তৈরী হয়?

বিনীত
অমরকুমার দাশ
মুর্শিদাবাদ।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বিশ্ব ফুটবলের আসরে ভারতের স্থান কিরূপ?

(খ) কোন কোন দেশে কয়েদীদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়?

বিনীত
অমল দেব
আসাম।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) etc-এর পুরো বানান কি এবং 'that is' এই অর্থে i, e কেন ব্যবহার করা হয়?

(খ) এ এম আই সি ই, এস ইউ এন এফ ই ডি, ইউ এন ই এস সি ও এবং ইউ এন আই সি ই এফ-এর পুরো কথা চারটি কি?

(গ) ন্যাটো ও সিয়াটো চুক্তি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

বিনীত
মৃণালচন্দ্র দত্ত
মুরারই, বীরভূম।

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

১০ম সংখ্যায় (৮-৭-৬৬) প্রকাশিত শীলা রায়ের দুইটি প্রশ্নের উত্তর নীচে দেওয়া হইল:—

প্রশ্ন (ক) একটি টেপকে যদি নিম্নলিখিত ভাবে (১) ১০৪ ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রার নীচে এবং স্বাভাবিক আর্দ্রতায়, (২) এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড-এর বাইরে, (৩) ধুলো, ময়লা থেকে বাঁচিয়ে অতিরিক্ত গরম এবং সূর্যালোক থেকে বাঁচিয়ে সংরক্ষিত করা যায় তবে একটি টেপে বহুবার রেকর্ড করা সম্ভব এবং বহুদিন টেপটিকে রেকর্ড করা অবস্থায় রাখা সম্ভব। উপরিউক্ত চারটি বিষয় থেকে টেপকে বাঁচানোর কোন অসুবিধা নেই। বাড়ীর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় এবং বাক্সের মধ্যে টেপটিকে যদি বন্ধ রাখা যায় তবেই টেপ বহুদিন থাকবে। কতদিন টেপটি ভাল থাকবে বলা সম্ভব নয় এবং তা সংরক্ষণের উপরই নির্ভরশীল।

প্রশ্ন (খ) বাড়ীতে সাধারণতঃ গানবাজনা ৩¾ ips বা ৯.৯-৫ cps-এ রেকর্ড করা হয় এবং কোন কারণবশতঃ যদি এই স্পীড বাজাবার সময় না থাকে তবে কণ্ঠস্বর ভারি হওয়া সম্ভব। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই এইরূপ হওয়া সম্ভব। প্রায় প্রত্যেক রেটেপরেকর্ডারেই এই স্পীড বরাবর বেল্ট-এর দ্বারাই কিছুদিন রাখা হয়। একটি টেপরেকর্ডার বেশ কিছুদিন চলার পর বেল্টগুলি হয় ছিঁড়ে যায় বা ঢিলে হয়ে যায় এবং ঢিলে অবস্থায় বেল্ট ৩¾ ips স্পীড বজায় রাখতে পারে না যার দরুণ আমরা যখন পূর্বে রেকর্ড করা টেপ বাজাই তখন তাহার কণ্ঠস্বর মোটা বা অস্বাভাবিক শুনি। এর একমাত্র প্রতিকার বেল্ট বদলানো।

বিনীত
আশীষকুমার নন্দী
পাটনা

●

সবিনয় নিবেদন,

পঞ্চম বর্ষ ৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে দুর্গাপুরের শ্রীহর্ষবর্ধন ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত এবং ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত জাতীয় অধ্যাপকের তালিকাটি অসম্পূর্ণ। ভারতে বর্তমানে দশজন জাতীয় অধ্যাপক আছেন। দশম ব্যক্তির নাম শ্রীশিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন। ইনি ১৯৬৫ হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক।

বিনীত
শ্রীনারায়ণ সাহা
কলিকাতা—২০

●

সবিনয় নিবেদন,

পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যার জানাতে পারেন বিভাগে প্রকাশিত অপুকুমার ও সুকান্ত পালের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানালাম : ভারতের সর্বোচ্চ মিনারের (দিল্লীর কুতুব মিনার) উচ্চতা ২৩৮' ফুট। এবং মীনখা করের (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, খৃষ্টীয় ১২০ অব্দে গ্রীক পণ্ডিত টলেমীই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার ম্যাপ আঁকেন। মনে হয় এটিই পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র এবং টলেমিই এর প্রথম প্রস্তুতকারক। তবে অন্যান্যদের মতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে 'অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার' নামক গ্রীক দার্শনিক মাটিতে খোদাই করে যে ম্যাপ তৈরী করেন তাই পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র। এটি লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

বিনীত
যজ্ঞেশ্বর শেঠ ও সুখময় চ্যাটার্জি
কদমতলা, হাওড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

১২ সংখ্যায় প্রকাশিত অশোককুমার সরকারের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, জাপানে টিউব রেলওয়ে আছে।

বিনীত নিখিল ভট্টাচার্য
গোহাটি-১।
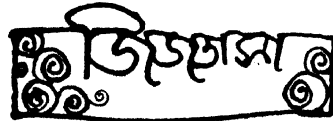
বর্তমান সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাম দেওয়া হ'ল। বাম দিকে লেখকের নাম। ডান দিকে তাঁদের গ্রন্থ। গ্রন্থনামগুলি বিশৃংখলভাবে রাখা হয়েছে। বামদিকের স্তম্ভ ঠিক রেখে ডানদিকের গ্রন্থনামগুলি সাজাতে হবে। উত্তর আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর : (১) অগ্রদানী (২) স্টোভ (৩) আমরা তিনজন (৪) প্রাগৈতিহাসিক (৫) যাযাবর (৬) বেদে (৭) কেদার রাজা (৮) আদাব (৯) অযান্ত্রিক (১০) পালংক (১১) টোপ (১২) বনমর্মর

(১) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	(১) শিলালিপি
(২) প্রেমেন্দ্র মিত্র	(২) বরযাত্রী
(৩) অন্নদাশংকর রায়	(৩) রাত্রির তপস্যা
(৪) বুদ্ধদেব বসু	(৪) কাক-জ্যোৎস্না
(৫) প্রবোধকুমার সান্যাল	(৫) চলাচল
(৬) মনোজ বসু	(৬) প্রথম প্রতিশ্রুতি
(৭) আশাপূর্ণা দেবী	(৭) বন কেটে বসত
(৮) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	(৮) আঁকাবাঁকা
(৯) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	(৯) তিথিডোর
(১০) গজেন্দ্রকুমার মিত্র	(১০) দুখ
(১১) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	(১১) পঞ্চশর
(১২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	(১২) চৈতালী ঘূর্ণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। চার ।।

অবাধ্য চোখদুটোকে কিছুতেই বাগে আনাতে পারে না সবিতা। ঘুরেফিরে গৌতমের দিকে যাওয়া চাই। কৃষ্ণা এখনো আসেনি। বোধহয় আজ আর আসবে না। কেয়াদি তিন-মাসের ছুটি নিয়েছে। মেটার্নিটি লিভ। প্রথম মা হ'তে চলেছে কেয়াদি। কতদিন কেয়াদি তাদের বাড়ী যেতে বলেছে, সে একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। এবারে সে যাবে, কেয়াদির বাচ্চা হ'লে নিশ্চয়ই দেখতে যাবে। গৌতমের দিকে আবার তার চোখ দুটো আপনা থেকেই চলে যায়। পুরো বিলিতি পোশাক পরে এসেছে। বাড়ীর অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল, টাকাপয়সা খরচের ব্যাপারে দিলদরিয়া ভাব। দায়দায়িত্ব না থাকলে মানুষ অমনি হয়। গৌতম সবার ছোট। বড় ভাইরা ভাল চাকরী করেন। বাবা সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। তিনিও রেলের বড় অফিসার ছিলেন। গড়িয়ার দিকে বাড়ী করেছেন। দোতলা বাড়ী। গৌতমের মা নেই। বড় বৌদি নাকি মায়েরই মতন গৌতমকে স্নেহ, আদর করেন। এসব শুনেছে সবিতা কেয়াদির কাছে।

কৃষ্ণা এলো। সবিতা ঘড়ির দিকে তাকায়। প্রায় বারটা বাজতে চলেছে। হাজিরা খাতা অফিসারের ঘরে। কি বিশ্রী সেজে এসেছে কৃষ্ণা! পাতলা ফিনফিনে জামা। গালে-মুখে-গলায় পাউডারের মাত্রাধিক্যে সং-এর মত দেখাচ্ছে। একে কালো রং, তারপর স্বাস্থ্য তো ঐ প্যাকাটির মত। চেহারাও অতি সাধারণ। এরই মধ্যে অতি তুচ্ছ কারণে কৃষ্ণার সঙ্গে কয়েকবার ঝগড়া হয়ে গেছে। আজকাল সে আর নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া ওর সঙ্গে কথা বলে না। কি ধারণা কৃষ্ণার! ভেবে তার হাসি পায়। কারু সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে চা খেলে সিনেমা গেলেই কি ধরে নিতে হ'বে প্রেম বা ঐ জাতীয় কিছু।

কৃষ্ণা কাছে এসে দাঁড়ালো। গৌতম এক-বার তাকিয়ে মাথানীচু ক'রে কাজ করতে থাকে। কৃষ্ণা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর গৌতমকে বললে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে আজ। কি করবো বলুন, একটা জরুরী কাজে আটকে গেলাম। এখন কি করি বলুন তো গৌতমবাবু?

—অফিসারের ঘরে চলে যান না। এখনো তো একটা বাজেনি, সই করতে পারবেন।

—প্লীজ খাতাটা একবার নিয়ে আসুন না। মিঃ চাকলাদারকে দেখলেই আমার ভয় করে। এখন সই করতে গেলে......না না, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ট্রাবল্ থেকে বাঁচাতে পারেন।

—হেডক্লার্ককে বলুন কৃষ্ণা দেবী। আমাকে মাফ করুন।

—আবার হেডক্লার্ক! কৃষ্ণা যেন একটু ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আমি কি রোজ লেট্ করে আসি? একটু ফেবার কি আশা করতে পারি না আপনার কাছে?

—আমি খুব দুঃখিত। মিঃ চাকলাদারের সঙ্গে আমার আজকাল আর ভাল টার্মস নেই।

মুহূর্তেই কৃষ্ণার মুখচোখ কদাকার হয়ে উঠলো এবং খুব চাপা গলায় বললো, আপনি মিথ্যেবাদী!

—কি বললেন? গৌতম খুব অবাক হয়ে কৃষ্ণাকে দেখতে থাকে। মেয়েটা কি একদিন একটা সীন্ ক'রে বসবে না কি?

—বললাম আপনি মিথ্যেকথা বলছেন।

—উত্তেজিত হবেন না কৃষ্ণাদেবী। সীটে গিয়ে বসুন।

—পাত্রীভেদে আপনার দাক্ষিণ্য উপচে পড়ে আমি সব জানি।

—কি বকছেন আবোলতাবোল! চলুন হেডক্লার্কের কাছে।

হেডক্লার্ক জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে?

গৌতম কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলে, এঁকেই জিজ্ঞেস করুন। লেট্ করে এসে আমার উপর তম্বি করছেন।

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে উঠলো, মিথ্যেকথা বলবেন না। আপনাকে অনুরোধ করেছি। তম্বি করা কাকে বলছেন? এই তো কদিন আগে এমনিসময় সবিতাও এসেছিল। তখন কি করে সায়েবের ঘর থেকে খাতা আনতে পারলেন? আমার বেলায় বুঝি যত ঝামেলা এসে উপস্থিত হয়। এ'ধরনের একচোখামি ভাল নয়।

—আপনি সীটে গিয়ে বসুন। হেড-ক্লার্কের গম্ভীর গলা শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে যায় কৃষ্ণা। পরক্ষণেই সবেগে বলে ওঠে, আমার বেলায় বুঝি অবিচার হবে!

—আপনি বসুন না। খাতা আনার ব্যবস্থা করছি।

কৃষ্ণা বিজয়িনীর দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে তাকিয়ে নিজের সীটে গিয়ে বসে।

হেডক্লার্ক গৌতমের দিকে তাকান। গৌতম মনে মনে ভীষণ চটে গেছে। কি ছিলেটে মেয়ে। ছিঃ! সহকর্মীরা কি ভাবলো কে জানে। সবাই কথাটা শুনেছে। কৃষ্ণা যা বলেছে তা মিথ্যে নয়। সবিতার প্রতি তার যে কিছুটা দুর্বলতা আছে তা সে অস্বীকার করে না।

—দেখলেন তো ব্যাপারটা। কিরকম ছিংসুটে মেয়েটা! অনুচ্চকণ্ঠে সবিতার উদ্দেশ্যে বললে গৌতম। তারপর গিয়ে নিজের সীটে বসে পড়লো।

সবিতা খুব রাগ আর বিরক্তি নিয়ে তাকালো। ক্ষনকাল তাকিয়ে কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়লো। কি নির্লজ্জ লোকটা!

কৃষ্ণার কথায় তার মেজাজটা বিগড়ে গেছে। একঘর লোকের সামনে কি জঘন্য ইঙ্গিত করলো! গৌতম একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলো না। কি মতলব ওর? যেচে তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হ'তে কেন চায়? সুনন্দা ঠিক বলেছে; পুরুষকে সহজে কাছে ঘেঁষতে দিতে নেই। মনে মনে স্থির করলো গৌতমের সঙ্গে আর কোনদিন রেস্তোরাঁয় যাবে না, সিনেমা দেখবে না। ভদ্রতার খাতিরেও যাবে না। কথায় পটু লোকটা। মেয়েদের মন রেখে কথা সাজিয়ে বলতে জানে। এ'ধরনের পুরুষেরা সাংঘাতিক!

অফিস ছুটির পর সোজা সুনন্দার অফিসে গেল। সেকশনে সুনন্দাকে দেখতে পেল না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো সুনন্দা অনেক আগে ছুটি নিয়ে চলে গেছে।

লিফ্‌ট বেয়ে নীচে নামল। রাস্তায় এসে দাঁড়ালো যখন তখন অস্তগামী সূর্যের আলোতে ট্রাম-বাস, মানুষজনের মুখচোখ, চতুর্দিকের প্রতিটি বস্তু কেমন যেন বিষাদময় হয়ে উঠলো তার কাছে। ভীড়ের মধ্যে মিশে সে হাঁটতে থাকে। ক'পা এগিয়েছে কি শুনলো তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে। গলার আওয়াজ তার অতিপরিচিত। পিছনে তাকাতে তার ভয় করছিল। যেন পিছনে এক অবাঞ্ছিত উৎপাত তাকে অনুসরণ করছে।

পারলো না সে গৌতমকে এড়াতে। একটু পরে সে দেখলো গৌতম সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে তার পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

—খুব রেগে গেছেন দেখছি।

সবিতা রাগে ফেটে পড়লো, আপনি কি চান? কেন আমাকে জ্বালাতন করছেন? অফিসে আজ যা হ'ল এরপরেও কি আপনার শিক্ষা হয়নি। আমাকে একটা বিশ্রী অবস্থায় ফেলে আপনি হাসছেন?

গৌতম হাসল, আপনি দেখছি অল্পতেই মুষড়ে পড়েন। এত সেন্টিমেন্টাল কেন?

সবিতা কোন জবাব দিল না। অধীর আগ্রহে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কি নাছোড়বান্দা লোক। লজ্জা বলে কিছু নেই না কি! অবজ্ঞাও কি বুঝতে পারে না? গৌতমকে আড়চোখে একবার দেখলো। কি যেন ভাবছে গৌতম। আশ্চর্য! মুখে কোন ক্লান্তির চিহ্ন নেই। বুঝতে পেরেছে কি তার ঔদাসীন্য? সবিতা ভেবেছিল সে অনমনীয় থাকবে, গৌতমের কথায় কোন জবাব দেবে না। কিন্তু তা হ'ল কই? কেন যে এমন হয় কে জানে। ধীরে ধীরে তার মনটা শান্ত হ'য়ে আসলো। এতটা রূঢ় হওয়া তার ঠিক হয়নি। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে গৌতমের কোন দোষ নেই। মেয়েদের প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্য থেকেই হয়তো ও যা কিছু করার করেছে। কিন্তু তাই কি? তা'হলে কৃষ্ণার অনুরোধ রাখলো না কেন? শুধু তার নিজের ক্ষেত্রেই এতটা উদার কেন হয়? তার কোন উপকার করতে পারলে যেন কৃতার্থ হ'য়ে যায়। এসব কি নিছক ভদ্রতা? কিন্তু এই ভদ্রতাই যদি একদিন গৌতমকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে যায়, সে কি নিজেকে শেষপর্যন্ত ঠিক রাখতে পারবে? কোথায় গেল তার রাগ। কেন ঘুরেফিরে তার চোখ-দুটো সর্বদাই ওর দিকে যাচ্ছে। এসব ভেবে যেন সবিতার দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চায়। গত কয়েকমাসের টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি তার মনে পড়ে। রেস্তোরাঁয় বসে চা খাওয়ার সময় গৌতমের চোখমুখের উজ্জ্বলতা তার চোখ এড়ায়নি। তার নিজেরও কি সেইসব মুহূর্ত-গুলি স্বপ্নময় ব'লে মনে হয়নি? সে কি একটা অজানা চাপা আনন্দ মনে মনে অনুভব করেনি? এসব সে অস্বীকার করতে পারে না। গৌতমকে তার ভাল লাগে। তার সঙ্গ ভাল লাগে। তার হাসি ভাল লাগে। এক ধরনের চাপা বেদনা সে অনুভব করলো। গৌতমের কোন দোষ নেই, সে যা করেছে সব সবিতার জন্যে।

একটা লেডিস বাস এসে দাঁড়াল। ভীড় ছিল। ও উঠবে কিনা ভাবছিল।

—আপনার বাস এসে গেছে। গৌতম হেসে ওর দিকে তাকালো।

সবিতা অপাঙ্গে তাকিয়ে বললে, আসুক।

—উঠে পড়ুন। ঐ যা ছেড়ে দিল।

—যাক।

—হ্যাঁ চলে যাক। আবার বাস আসবে, কি বলেন, আমি চললাম। বুঝতে পেরেছি আপনি আর আমাকে সহ্য করতে পারছেন না।

গোঁত্তা খেয়ে হেসে এগিয়ে গেল। একটু এগিয়ে পিছন ফিরে তাকাল, মুখে তখনও হাসি লেগে আছে। আস্তে আস্তে সে ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়।

সবিতার ঠোঁটদুটি থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। সে কিছু বলতে পারলো না। তার কান্না পাচ্ছিলো। ভীষণ অসহায় বোধ করলো সে। চারিদিকে কোলাহল, টুকরো টুকরো কথা, বিচিত্র সাজে নরনারীর আনাগোনা, সবিতা এসব দেখেও যেন কিছুই দেখলো না। নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল।

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস?

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ক্লান্ত চেহারায় বিনয় এসে কখন ওর পাশে দাঁড়িয়েছে।

—অনেকক্ষণ। যা ভীড় উঠতে পারছি না। তুমি কোত্থেকে আসছো, দাদা?

—টুশানী থেকে ফিরছি। ছাত্রের জ্বর হয়েছে তাই চলে এলাম। ভাবছিলাম প্রফেসর সেনের কাছে একবার যাব। থাক, কাল গেলেও চলবে।

—বাড়ী যাবে তো?

—হ্যাঁ। এই যাঃ, আসল কথাটা বলা হল না। সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। বাড়ী ফিরে দেখবি কে এসেছেন।

—ভনিতা রেখে দাও। কে আবার এসেছেন?

—সবি, আমাদের আবার মাসীমা কবে ছিল? দুপুরে খাওয়ার পর সবে একটু চোখ বুজেছি, ঠিক তক্ষুনি শুনলাম মার ঘরে কারা যেন কথা বলছেন। একটু পরে মা এলেন, সঙ্গে বিধবা এক মহিলা আর একটা সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে। পরে জানলাম মার কেমন সম্পর্কিতা বোন আর তার মেয়ে। ওদের কথা আগে মা কখনো বলেননি। তুই জানতিস?

—না। বেড়াতে এসেছেন বোধহয়।

—হাবভাব দেখে কিন্তু তা মনে হল না। মেয়েটা এরই মধ্যে 'দাদা' ডাকতে ডাকতে পাগল করে তুলেছে। সবি, ওরা যদি বরাবরের জন্যে থেকে যায়, কি হবে?

—কি আবার হবে। সবিতা হাসতে হাসতে বলে, আমার তো ভাল হল। একটা ছোট বোন পাওয়া গেল।

—হাসি বেরিয়ে যাবে। জানিস, একটু আগে তোকে মিথ্যে কথা বলেছি। ছাত্রের জ্বর না ছাই। টুশনীটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

—সে কি! সবিতা লক্ষ্য করলো বিনয়ের সারা মুখে হতাশার চিহ্ন।

—হ্যাঁ। বোগাস ছাত্র! পারলাম না আর পড়াতে।

—খামখেয়ালীপনা ছাড় দাদা।

—উপদেশ দিস না।

সবিতা চুপ করে রইল। কি ভাবে বিনয় সেই জানে। মনটা তার বিরক্তিতে ভরে উঠলো। বিনয়ের চিন্তাধারা সে বুঝতে পারে না। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব কি সে একলা বহন করে বেড়াবে? বিনয়ের কমপ্লেক্স বিনয়কে স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। তাই সে মনে মনে আকাশ-কুসুম কল্পনা করে দিনের পর দিন নির্বিবাদে কাটিয়ে দিচ্ছে।

—সবি উঠে পড়। একদম খালি বাস।

বাড়ী ফেরা পর্যন্ত সবিতা মুখবুজে কাটালো। বিনয় একমনে অনেকক্ষণ বকবক করলো। ও দু-একটা কথায় সামান্য জবাব দিয়েছে। ভাল লাগছিল না বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে। শুধু গৌতমের কথা মনে পড়তে লাগলো। এই কি প্রেম? তবে তার মনটা এত ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে কেন? বেদনা-মিশ্রিত এক ধরনের আনন্দ সে অনুভব করতে পারছে। কে জানতো একজনের কথা শুধু ভাবতেই তার এত ভাল লাগবে!

।। পাঁচ ।।

পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে লীলা। ঘুমোতেও পারে মেয়েটা। মাসীমা আর তাঁর মেয়ে এখন তাদের আশ্রিতা। মাসখানেক হয়ে গেল ওরা এসেছে। মার সাক্ষাৎ আপন বোন না হলেও খুব নিকট আপনজন। অতএব আশ্রয় না দিয়ে উপায় কি? এ' বছর সেসন শুরু হলে লীলা কলেজে ভর্তি হবে। কুঁকড়ে শুয়ে আছে লীলা। রংটা সামান্য চাপা, কিন্তু চেহারা সুশ্রী। বিশেষ করে চোখ দুটো খুব সুন্দর।

সারারাত ঘুমোতে পারেনি সবিতা। গরম লাগছিল খুব। অন্ধকার ভাবটা ক্রমশ কমে আসছিল। ও উঠে বসলো। বসা অবস্থায় ব্লাউজ পরলো।......কাল রাতে গৌতমকে স্বপ্নে দেখেছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গ ভেদ করে সে আর গৌতম হাত ধরাধরি করে ছুটে চলছিল। কিন্তু তারা বাইরে বেরোবার পথ খুঁজে পায়নি। একসময় তারা পরিশ্রান্ত হয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ও শুনেছে কে যেন তার নাম ধরে আর্ত-কণ্ঠে ডাকছে। সে চিৎকার করে জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। তার গলা দিয়ে রক্ত উঠেছে।...

কি বিশ্রী স্বপ্ন! সবিতা মশারী তুলে বাইরে চলে আসে।

জানালার কাছে এসে পর্দা তুলে দেয়। এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তীব্র সিটি বাজিয়ে বারুইপুর লোকাল চলে যাচ্ছে। ঘরটা যেন কেঁপে উঠলো। এত ভোরে জাগার কোন দরকার ছিল না। ছুটির দিন, একটু আয়েস করে ঘুমোতে পারলো না। চাকরী পাওয়ার পর দেখতে দেখতে কটা মাস কেটে গেল। মা জানতে পেরেছেন গৌতমের সঙ্গে তার মেলামেশার কথা। স্পষ্টত না হলেও প্রকারান্তরে তাঁর হাবভাবে মনে হয়েছে মেয়ের ঐ ধরনের স্বাধীনতায় তিনি লজ্জিত, ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। ফলে সবিতা যেন আজকাল মার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশতে পারে না। বাধ্য হয়ে সে মাকে এড়িয়ে চলে। এখন তার অসাক্ষাতে তাকে কেন্দ্র করে মা আর মাসীমার মধ্যে প্রায়ই বৈঠক হয়। লীলা তাকে সব কিছু জানায়। দাদার কথা মনে পড়লো। শেষ পর্যন্ত বিনয় মাস্টারী নিয়ে বাইরে চলে গেল। ফলে সংসারের সব ঝক্কি ঝামেলা এখন তাকে সামলাতে হচ্ছে।

প্রথমটা সবিতা লক্ষ্য করেনি। ভাল করে তাকাল—হ্যাঁ অবিনাশই নাইট ডিউটী সেরে ফিরছে। যতটা সে জেনেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, অবিনাশ আর সুনন্দার মধ্যে বিচ্ছেদ অবধারিত। আজ না হক কাল তাদের ছাড়াছাড়ি হবেই। এই কি ভালবাসার পরিণাম, এর জন্যেই কি এত ত্যাগ, এত দুঃখ বরণ করা? সুনন্দাকে আজকাল আর আগের মত আপন মনে হয় না। আগের মত কথাবার্তাও হয় না তাদের মধ্যে। সুনন্দা এখন দূরের মানুষ।

সবিতা প্রাণভরে ভোরের তাজা হাওয়া টেনে নেয়। একটা চাপা আনন্দে মনটা ভরে ওঠে। গুন-গুন করে গানের এক কলি যেন চুপি-চুপি গেয়ে উঠলো। চোখ পড়লো টেবিলের উপর ফ্লাওয়ার ভাসটার দিকে। যেন দুঃসহ আনন্দের ভারে এলিয়ে আছে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ও শুকনো ফুল বুকের কাছে জড়ো করে খানিকক্ষণ শুঁকলো। ভাবলো অন্যের কথা ভেবে বৃথাই সে মন খারাপ করছিল। এই ভোর, আকাশে কমলালেবুর মত রাঙা সূর্য, তাজা হাওয়া—এই সব যতদিন পৃথিবীতে আছে ততদিন জীবনের তাৎপর্য তার কাছে হারাবে না। তাছাড়া আছে গৌতম। ওই তো তার জীবনের সূর্য! ও যুক্তকরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়: 'আমাকে ভালবাসার মত হৃদয় দাও!'

—আমার জন্যেও একটু প্রার্থনা কর দিদি।

লীলা ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। সবিতা ওকে কাছে টেনে নেয়।

—কি প্রার্থনা করছিলাম বল তো?

সত্যি কথা বললে তুমি আমায় বকবে না তো?

—কিচ্ছু বলব না লক্ষ্মী মেয়ে, এবার বল।

লীলা হেসে বলে, তুমি প্রার্থনা করছিলে গৌতমদাকে যেন চিরকালের জন্য পাও!

—লীলা! সবিতা চাপা হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

—কি?

—বিকেলে আমরা সিনেমায় যাচ্ছি। যাবি?

—ধেৎ! লীলা মাথা নেড়ে বলে, তোমাদের আনন্দ আমি মাটি করতে চাইনে।

—বাঃ বলছিলি না গৌতমকে দেখবি।

—বেশ তো, একদিন বাড়ী নিয়ে এসো গৌতমদাকে। চায়ের নিমন্ত্রণ কর।

সবিতা কিছু বলার আগেই দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। লীলা একরকম ছুটে গিয়ে খিল খুলে দেয়। আশালতা ঘরে ঢোকেন। লীলা পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে যায়।

—সবি, নীচের ভাড়াটেদের তো নোটিশ দিতে হয়। রাতদুপুর পর্যন্ত ঝগড়া চিৎকার, কাপ-ডিস ভাঙা—এসব আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়। ঐ বউটা যত নষ্টের গোড়া!

—চুপ কর মা! সুনন্দাকে তুমি দেখতে পার না তা আমি জানি। ওর কোন দোষ নেই।

—তুই আমাকে মানুষ চেনাতে আসিস না। কি অভদ্র ছোটলোক ভাড়াটে আমি বসিয়েছি! অবিনাশের কি দোষ—বউটা তো অনেক দিন রাতে বাড়ীই ফেরে না। ওদের আমি ঝেঁটিয়ে তুলে দেব। এমন ভাড়াটে আমার দরকার নেই।

—কি বিশ্রী স্বভাব তোমার আজকাল হয়েছে মা! সবিতা প্রতিবাদ না করে পারে না। ভেবেছিল এই সকালের মাধুর্যকে সে নষ্ট হতে দেবে না। এমন একটি ভোর মানুষের জীবনে রোজ আসে না। একটু আগেও আকাশটাকে তার মনে হয়েছে প্রার্থনার মত শুভ্র আর পবিত্র!

মুহূর্তে আশালতার চেহারা পাল্টে যায়। কদর্য হয়ে উঠল তাঁর চোখ-মুখের ভঙ্গী। মুখে যা আসে তাই বললেন সবিতাকে।

সবিতা কাঠের পুতুলের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চপলামাসী এসে আশালতাকে একরকম জোর করে টেনে ঘর থেকে নিয়ে যান।

বিকেল পর্যন্ত সবিতা গুম হয়ে চুপচাপ কাটিয়ে দেয়। স্নান খাওয়া যান্ত্রিকভাবে করেছে। তার দেহ-মন নিপীড়নে ক্লান্ত।

ভীড়ের মধ্যেও গৌতমকে দেখতে পেল। পিছন ফিরে একমনে সিগারেট টানছিল।

সবিতা এগিয়ে যায়, গৌতমের জামার হাতায় মৃদু টান দেয়। ঘুরে দাঁড়ায় গৌতম। সবিতাকে দেখতে পেয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে, এতক্ষণে আসবার সময় হল। চল, শো বোধহয় শুরু হয়ে গেছে।

—আজ সিনেমা দেখার মুড নেই গৌতম। ভাল লাগছে না। উঃ কি ভীড়! অন্য কোথাও চল।

গৌতম ওর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। তারপর সবিতার একটা হাত নিজের মুঠিতে চেপে হাঁটতে শুরু করে। বলে—

—কি হল তোমার?

—কিছু না হাত ছাড়।

গৌতম সবিতার হাত ছেড়ে বলে, কি ব্যাপার? আমাকে খুলে বল।

সবিতা ম্লান হাসে, বলার মত কিছু নেই। তোমার সন্ধ্যেটা আজ মাটি করে দিলাম।

গৌতম কিছুটা হতাশার সুরে বলে, তোমার মনটাকে আজও আমি স্পষ্ট করে জানতে পারলাম না।

—সত্যি? সবিতা গম্ভীর হয়ে বলে, জান না স্ত্রীলোকের মন জানার চেষ্টা করে দেবতারা পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আর তুমি তো ক্ষুদ্র মনুষ্য!

—হ্যাঁ, এই ক্ষুদ্র মনুষ্য এত সহজে হাল ছাড়বে না।

—একটা সামান্য মেয়ের জন্যে কেন এত ভাবছ।

—আমার মুখ থেকে কি প্রশংসা শুনতে চাও? কিন্তু আর কত হাঁটা যায়? একটা রেস্তোরাঁয় ঢোকা যাক।

—সিনেমা-রেস্তোরাঁ সব পুরনো হয়ে গেছে। তোমার বাড়ীর লোকে জানে আমাদের কথা? তোমার বড় বৌদি?

—কি জানি, বলতে পারবো না।

বাড়ীর কোন খবরই রাখ না দেখছি। বেশ আছ।

—বেশ তো ছিলাম এতদিন। হঠাৎ তুমি এসে ঝড়ের মত সব তচনচ করে দিলে।

—আমি? সবিতা অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, আমার উপর কোন ভরসা কর না। আমার হাত-পা বাঁধা।

—তুমি যেন দিন-দিন সিনিক হয়ে পড়ছ। খুব ভাল লক্ষণ নয়।

কোন কথা না বলে সবিতা হাঁটতে থাকে। গৌতম যেন প্রসঙ্গ পাল্টাবার উদ্দেশ্যে বললে, তোমার দাদা শেষ পর্যন্ত গ্রামে চলে গেল। ভেরি স্যাড!

হাঁটতে-হাঁটতে ওরা একটা রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল। কেবিনে ঢুকতেই বয় এসে উপস্থিত হয়।

—কি খাবে? গৌতম সহাস্যে প্রশ্ন করে।

—তুমি বল। বিলটা কিন্তু আমিই পে করব।

—না, না, তুমি দেবে কেন! আজকের সব খরচ আমার।

সবিতা পীড়াপিড়ি করল না। বয় অর্ডার নিয়ে চলে যেতেই ও কৃত্রিম ক্রোধে বলে, খুব পয়সা হয়েছে, না? এত সিগারেট খাও কেন!

সবিতা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়। এক ধরনের চাপা আনন্দ বেদনায় তার বুক কাঁপতে থাকে।

গৌতম বোধকরি সবিতার চিবুক স্পর্শ করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখুনি দু' কাপ কফি, টোস্ট নিয়ে বয় ঢোকে। টেবিলের উপর আহার্যগুলো রেখে ভাল করে পর্দা টেনে বয় বেরিয়ে যায়।

সবিতা ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। এক কাপ কফি গৌতমের দিকে এগিয়ে মৃদুস্বরে বলে, চিনি ঠিক আছে কিনা দ্যাখ।

কফিতে চুমুক দিয়ে গৌতম হাসলো, বড্ড শাই তুমি।

—ওটা মেয়েদের ধর্ম।

—রাবিশ! তুমি একটা শিক্ষিতা মেয়ে—এসব গ্রাম্যতা তোমার কাছ থেকে আশা করি না।

—তোমার বিচার অনুযায়ী আমি হয়তো ততটা মডার্ন নই।

—কেন পিছিয়ে থাকবে? ভেঙে দাও পুরানো যা কিছু।

—প্লীজ গৌতম, চুপ করো।

—দুঃখিত। ক্ষমা করো।

দুজনে নিঃশব্দে কফি খেতে থাকে। কেবিনের ছোট্ট পরিধি তাদের দুজনের শ্বাস-প্রশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে। সবিতা মাথা নীচু করে ছিল। সে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। কিছুতেই ভুলতে পারছে না মার অপ্রসন্ন মুখের ছবি। চোখ তুলে দেখলো গৌতম মিটমিট করে হাসছে। চোখাচোখি হয় দুজনের। অনেকটা সময় এভাবে কেটে যায়।

গৌতম মুখ এগিয়ে নিয়ে আসে। সবিতার বুকের ভিতর যেন ঝড় বয়ে যায়। কান গরম, মুখ লাল হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হয়।

পায়ের শব্দ বাইরে শোনা যায়। ক্ষিপ্র-ভঙ্গীতে গোতম সোজা হয়ে বসে। বিরক্তি-বোধ ক'রে এবং অনতিবিলম্বে বয় ঢুকতেই তার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। বয় কাপ-প্লেট তুলে টেবিলের উপর বিল রেখে ওদের দিকে চোরা চাহনী দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গোতমের গুম্ হ'য়ে যাওয়া ভাব দেখে সবিতা মৃদু হাসে। বলে, এবার ওঠা যাক। মা আবার ওদিকে ভাববে। কিছু তো বলে আসিনি।

—তুমি আজ না এলেই ভাল করতে। গোতম ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলে, তুমি যদি আরেকটু স্বাভাবিক হ'তে, তোমার মনটাকে যদি ছুঁতে পারতাম...।

কোন কথা না ব'লে সবিতা উঠে দাঁড়ায়। গোতমও। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। গোতম এবার দুঃসাহসিক কাজ ক'রে বসলো। সবিতা বাধা দেওয়ার আগেই তাকে সবেগে নিজের কাছে টেনে নেয়।

একটু প'রে ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সবিতার মুখ গম্ভীর। গোতম ভাবলো, সবিতার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস অজস্র আদরে বেলুনের মত শূন্যে উড়িয়ে দিতে হ'বে। নইলে সবিতা ক্রমশ কেন্নোর মত নিজেকে গুটিয়ে নেবে।

—সবিতা!

—গোতম, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেয়ো না। দয়া করো আমাকে!

সবিতার কান্না পেল। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল, সহায়সম্বলহীন মনে হচ্ছে।

—চলি।

দৈত্যের মত একটা বাস এসে গোতমকে যেন বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে নিয়ে উধাও হ'য়ে যায়।

বাকী পথটা বাড়ী ফেরা পর্যন্ত সবিতা মাতালের মত ঘোর আচ্ছন্নাবস্থায় ছিল। সেই দৃশ্যটা মনে পড়তেই তার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ শিহরনের মত এক ধরনের উত্তেজনা বয়ে যায়। সে ভাবতেই পারেনি গোতম ওই ধরনের একটা কাজ ক'রে বসবে। শরীরটা তার গুলিয়ে ওঠে। গোতম একটু একটু করে পাকা ওস্তাদের মত এগুচ্ছে। এখন থেকে শক্ত না হ'লে সে আর তাকে রুখতে পারবে না, জোয়ারের জলে পল্কা কাঠের মত তাহ'লে ভেসে যাবে।

বাড়ী ফিরে বাথরুম থেকে সবে বেরিয়েছে অমনি মুখোমুখি হ'ল আশালতার সঙ্গে। সবিতা সহজ হ'বার চেষ্টা করলো, যদিও বুকটা ভয়ে ঢিবঢিব করছিল।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আশালতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সবিতা অস্বস্তি বোধ ক'রে। মা যেন তার অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখতে পান। কি বলবে সে? মিথ্যে বানিয়ে কিছু বলতে তার বাধছিল। আবার সত্যকথা বললে তাতে হ'বে আরও বিপদ। কিছু বলতে না পে'রে সবিতা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—সবিতা, আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। চেয়ে দেখ আমার বয়স হয়ে গেছে। তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। তুই আমাকে ছেড়ে চ'লে যাসনে।

বলতে বলতে আশালতা কেঁদে ফেলেন। সবিতা স্তম্ভিত হ'য়ে মার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক রোগা হ'য়ে গেছেন মা। অনেক বয়স হয়েছে মার। সমস্ত মুখে জরার চিহ্ন। আত্মগ্লানিতে ওর মন ভ'রে যায়। মার প্রতি সে অবিচার ক'রেছে। মাকে দুঃখ কিছুতেই সে দিতে পারবে না। সে ছাড়া কেউ নেই মার।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, মা। কেঁদ না। তুমি যা বলবে তাই আমি শুনবো। তোমাকে ছেড়ে কোথায়ও আমি যাব না। চল তুমি শোবে।

আশালতাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সবিতা নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। লীলা ওৎ পেতে ছিল। সে কিছু প্রশ্ন করার আগেই শুনলো, বড় ক্লান্ত। আজ আমাকে বিরক্ত করিস না। লাইট নিভিয়ে দে।

অন্ধকারে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে সবিতা হু হু করে কেঁদে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

বৃহত্তর কলকাতার জলসমস্যা ও তার প্রতিকার

নিরঞ্জন শিকদার

কলকাতার জলের সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে একটা দুঃস্বপ্নের মত, প্রত্যেক বছরই শোধিত জলসরবরাহের অভাবে কলকাতা ও শহতলীর জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি জলবাহী রোগের শিকার হয়ে পড়ে। পূর্ব-ভারতের অর্থনীতিক প্রাণকেন্দ্র কলকাতাকে বাঁচাতে হলে এই সমস্যাটির আশু সমাধান প্রয়োজন।

জব চার্নকের শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠা ১৬৯০ সালে। কিন্তু ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত কোনরকম কলের জল কলকাতায় ছিল না। গত একশ বছরে কলকাতার লোকসংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে। ১৮৫০ সালে শহর কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল ৪১৩,১৮২ জন, ১৯৬১ আদমসুমারীতে সেটি দাঁড়িয়েছে ২,৯২৭,২৮৯ জনে। জলের চাহিদা যে হারে বেড়েছে সরবরাহ তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি। তাই ঘাটতির পরিমাণটাও ক্রমবর্ধমান।

কলকাতার মত বড় শহরে দৈনিক মাথাপিছু ৫০ থেকে ৬০ গ্যালন জল দেওয়া দরকার। এর মধ্যে পানীয় জল ছাড়াও গৃহস্থবাড়ীর কাজে ব্যবহারের জল, ফ্যাক্টরী, হাসপাতাল, ফায়ারব্রিগেড, কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত জল সমস্তই বিবেচনা করা হয়েছে।

আজকের বৃহত্তর কলকাতা বা কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলা প্রায় ৪০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৫০ মাইল আর পূবে পশ্চিমে প্রায় ৩ থেকে ৫ মাইল। এর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে হুগলী নদী। ১৯৬১ সালে লোকসংখ্যা ৬৫০ লক্ষ বা ৬.৫ মিলিয়ন। দুটি কর্পোরেশন (কলকাতা ও চন্দননগর), ৩৫টি মিউনিসিপ্যালিটি, ৩৪টি মিউনিসিপ্যালিটি-বহির্ভূত ছোট শহর আর ৩৯৬টি গ্রাম নিয়ে গঠিত কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা।

১৯৬১ সালের চাহিদা ও সরবরাহের চিত্রটা একবার দেখা যাক্।

চাহিদা

মাথাপিছু দৈনিক ৫০ গ্যালন জল
লোকসংখ্যা ৬.৫ মিলিয়ন
মোট চাহিদা দৈনিক
৬.৫×৫০=৩২৫ মিলিয়ন গ্যালন

সরবরাহ

পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে	৮০ মিঃ গ্যাঃ
বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে	৪০ মিঃ গ্যাঃ
কলকাতার গভীর নলকূপ থেকে	১০ মিঃ গ্যাঃ
মোট	১৩০ মিঃ গ্যাঃ

সুতরাং দৈনিক ঘাটতি—৩২৫-১৯৫=১৯৫ মিলিয়ন গ্যালন।

বর্তমানে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের অনুরোধে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা একটি বিশেষজ্ঞদল পাঠালেন কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলার সমস্যাগুলির সর্বাঙ্গীণ পর্যালোচনার জন্য। উপদেষ্টাদল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে কলকাতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট রচনা করলেন। এটি "প্রোজেক্ট ইন্ডিয়া—১৭০" নামে খ্যাত।

কলকাতার সমস্যাগুলি সংখ্যায় এত বেশী এবং সেগুলি পরস্পর এত অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত যে কলকাতার কোন সমস্যার সমাধানে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার উপদেষ্টা-দল সবকটি সমস্যার একযোগে বিবেচনা করে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার প্রয়োজন সম্পর্কে জোর দিলেন। এই ধরনের প্রকল্পকেই 'মাস্টার প্ল্যান' বলা হয়।

মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্য বহুমুখী—এটির জন্য বহু সময় ও অর্থ প্রয়োজন। কিন্তু কলকাতার বর্তমানে যে অবস্থা তাতে এখনই কিছু করা দরকার যাতে জলের সমস্যাটা কিছুটা লাঘব হয়। হুগলী নদীর জল যা পলতায় পরিশোধন করে কলকাতার পানীয়

হিসেবে পাঠানো হয় তাতে নুনের ভাগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। পলতার 'থিতানোর পুকুর' বা 'সেটলিং ট্যাঙ্ক' পলি জমে জমে অকেজো হওয়ার মত অবস্থায় পৌঁছেছে। যে সমস্ত পাইপ পলতা থেকে টালায় জল নিয়ে আসে সেগুলির অবস্থাও ভাল নয়। তার উপর যে সমস্ত বিতরণ পাইপ সেগুলির উপর পাড়ায় পাড়ায় জল বিতরণ নির্ভরশীল সেগুলিও বিশেষ ভালো অবস্থায় নেই। মাস্টার প্ল্যানের কাজ শেষ হতে যত-দিন লাগবে সে সময় দেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তাই সি-এম-পি-ও তৈরী করেছেন জরুরী জল সরবরাহ প্রকল্প। যে যে এলাকা এই প্রকল্পের অন্তর্গত সেগুলি ম্যাপে দেখানো হল। ১৯৮১ সালে এইসব এলাকার মোট লোকসংখ্যা হবে প্রায় ২ মিলিয়ন এটা ধরে নিয়ে এই প্রকল্প রচিত। হুগলী নদীর জলের উপর নির্ভর না করে মাটির তলায় যে জল আছে নলকূপের সাহায্যে সে জলকে ব্যবহার করার ব্যবস্থা হয়েছে এতে। দেখা গেছে কলকাতার নীচে মাটির তলায় সুপেয় জলের স্তর কোথাও ৪৫০ ফিট কোথাও বা ৬৫০ ফিট। সেই অনুযায়ী এই প্রকল্প শেষ হলে মোট নলকূপের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৪২।

কলকাতা ও হাওড়ার যে যে এলাকা এই জরুরী প্রকল্পের অন্তর্গত সেগুলি পাবে মাথাপিছু দৈনিক ৬০ গ্যালন ও অন্যান্য এলাকা দৈনিক ২০ গ্যালন। এর চেয়ে বেশী দেবার মত আর্থিক সঙ্গতি এখন নেই তো বটে আর বেশী জল দিলে যে ভাল ড্রেনেজ বা নিষ্কাষণের উপায় থাকা প্রয়োজন তাও এখন নেই। জরুরী পরিকল্পনাটি মাস্টার প্ল্যানের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে কালক্রমে।

এখন মাস্টার প্ল্যানটা সম্পর্কে দুচার কথা বলা যাক্। যে কোন জলসরবরাহ ব্যবস্থারই সর্বপ্রথম দেখতে হবে জলটা পাওয়া যাবে কোথা থেকে। প্রধানত দুটি উপায়ে জল পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে মাটির উপরকার জল যেমন নদী, হ্রদ, বৃষ্টি ইত্যাদি। অপরটি মাটির অভ্যন্তরস্থ জল। কলকাতা মেট্রো-পলিটান জেলার বুক চিরে চলেছে হুগলী নদী। এই নদীর প্রচুর জল যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে খুব ভালো হয়, কিন্তু নদীর এখনকার অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। জলের নুনের ভাগ বেশী। নদীতে পলি পড়ে চড়া পড়ে জলবহনক্ষমতা যাচ্ছে কমে। এইসব অসুবিধা দূর হলে ভাগীরথীই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

ফরাক্কা বাঁধ হয়ে গেলে হুগলী নদীতে জল নিশ্চয়ই বেশী আসবে। ফলে নুনের ভাগ কমবে। তাই মাস্টার প্ল্যানে হুগলী নদীর উপরই নির্ভর করা হয়েছে। কিন্তু আপাতত যে জরুরী জলসরবরাহ প্রকল্প রচিত হয়েছে তাতে কিন্তু নদীর জল ব্যবহার না করে মাটির তলার জলকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এ প্রকল্পটাই মাস্টার প্ল্যানের প্রথম ভাগ বলতে গেলে।

জলের প্রাপ্তিস্থান বা সোর্স তো ঠিক হল। এবার অন্যান্য ব্যবস্থা। আমরা আগেই জেনে নিয়েছি নদীর জল পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে শোধন করে বা ফিলটার করে পাঠান হয় টালার জলের রিজারভারে। এই ওয়াটার ওয়ার্কসের "থিতানো পুকুরের" পলি পড়ে মজে যাওয়ার কথাও রোজই কাগজে আমরা পড়ি। এই পলির সমস্যা দূর করবার একটি আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হবে—যন্ত্রটির নাম ক্ল্যারি-ফ্লকুলেটর। তাছাড়া পলতার যে ৫৯টি পুরোন স্লোস্যান্ড ফিল্টার ইউনিট আছে সেগুলির সংস্কারও মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্য।

পলতা থেকে চারটি মোটা ব্যাসের পাইপ জল বয়ে নিয়ে আসে টালায়। (১) একটি ৪২" ব্যাসের কাস্ট আয়রণ পাইপ, (২) ৪৮" ব্যাসের কাস্ট আয়রণ পাইপ, (৩) ৬০" ব্যাসের স্টীল পাইপ ও (৪) নব-স্থাপিত ৭২" ব্যাসের স্টীল পাইপ। ৬০" ব্যাসের স্টীল পাইপটা ১৯২১—২৪ সালে পাতা হয়েছিল। মাস্টার প্ল্যানে ওটির আমূল সংস্কারসাধন করা হবে। কোন কোন অংশ নতুন লাগানো হবে। বিভিন্ন বিতরণ পাইপের মাধ্যমে কলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে জল সরবরাহ করা হয়। এখন এগুলি অত্যন্ত পুরোন ও ছিদ্রযুক্ত। তার উপর পলতার ওয়াটার ওয়ার্কসের সংস্কারসাধনের পর জলের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে বর্ধিত জলের চাপ সহ্য করতে হলে এগুলির সংস্কার করা দরকার। মাস্টার প্ল্যানে এগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে কলকাতায় দুটি পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে গঙ্গার অপরিশোধিত জল সরবরাহ করা হয়। এই কর্দমাক্ত জল রাস্তা ধোওয়া, আগুন নেভান, স্নান করা ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই জলে কলেরা ইত্যাদি রোগের বীজাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। ইদানীং এই জলে ক্লোরিন দেওয়া হচ্ছে কিছু দিন যাবৎ। যাই হোক মাস্টার প্ল্যানে এই জলকে পরিশোধন করার ব্যবস্থা আছে। গার্ডেনরীচে হবে এই পরিশোধনাগার। ফরাক্কা বাঁধ তৈরী হবার পর জলের গুণের উন্নতি হলে এই শোধিত জলও সব রকম ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হবে।

কলকাতার জলসমস্যার মোটামুটি একটা চিত্র আর তা দূর করবার যে প্রচেষ্টা চলেছে তার পরিচয় এখানে উপস্থাপন করা হল। আমরা আগেই বলেছি কলকাতার সমস্যাগুলির এককভাবে সমাধান সম্ভব নয়। জলের সঙ্গে সঙ্গেই আসে স্যুয়ারেজ-এর কথা। সি এম পি ও বাস্তবিকপক্ষে জল ও স্যুয়ারেজ একই সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

আরও একটা বিশেষ সমস্যার কথা বলা দরকার। এই বৃহত্তর কলকাতায় জল সরবরাহ এত দিন বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসন

প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। এখন মাস্টার প্ল্যানের রূপ দেবার সময় একটি একক নীতি বা পলিসি, পরিচালন ব্যবস্থা ও অর্থবিনিয়োগ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা মেট্রোপলিটান ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন অথরিটি গঠন করেছেন। এরাই মাস্টার প্ল্যানকে কাজে পরিণত করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত দপ্তরের জনস্বাস্থ্য ও জল সরবরাহ ইঞ্জিনীয়াররাই তাঁদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন কলকাতার সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে। জরুরী জল সরবরাহ প্রকল্পের তো ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর শুরু করেছেন।

নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কাজ এ চলেছে। মানুষের বুদ্ধি আর কর্মদক্ষতার জয় হবেই।

আজকের অঘটন

অজয় হোম
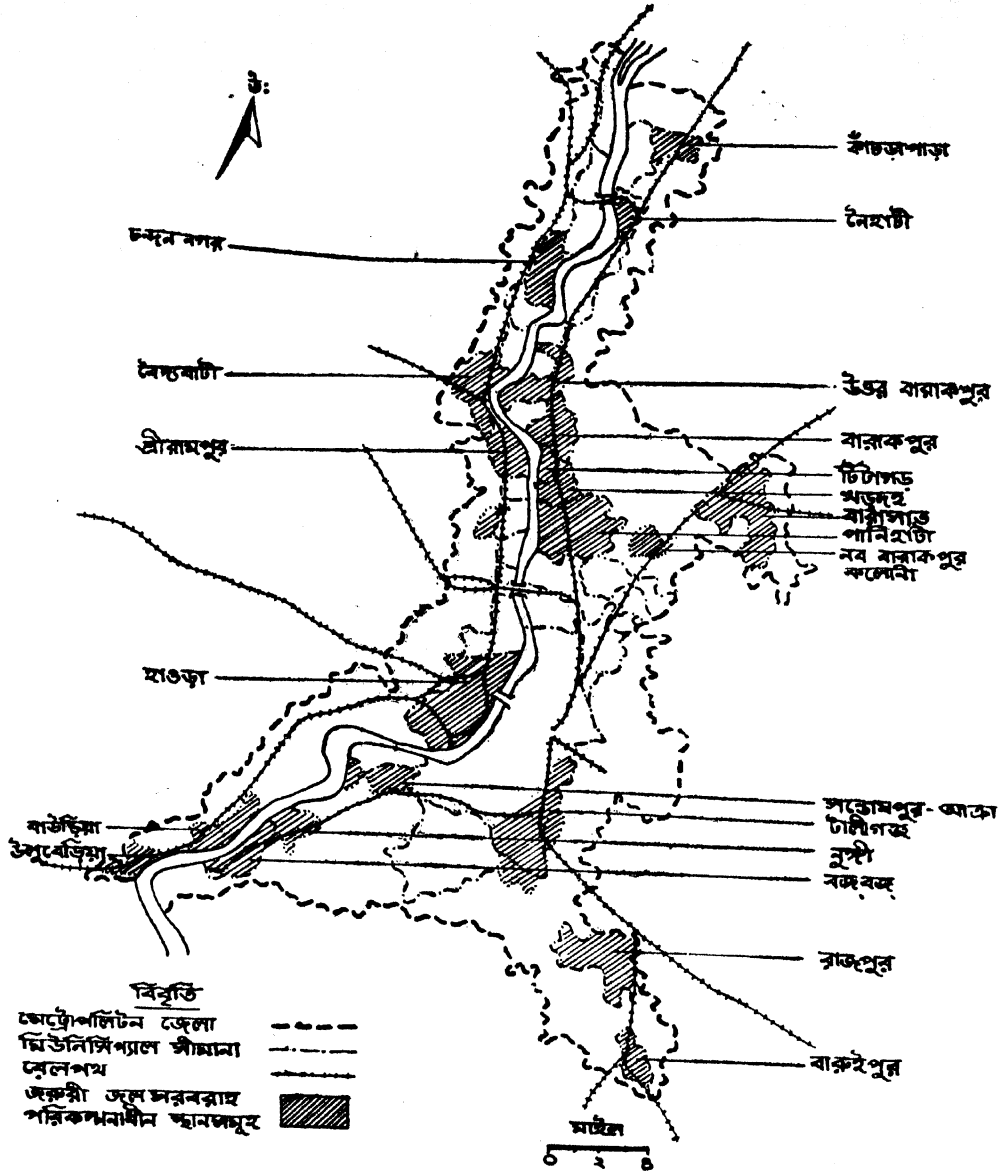
বাসেল-এ অনৈসর্গিক ঘটনা : ৭ আগস্ট ১৫৬৬। কালো গোল বস্তুগুলি মনে হচ্ছে নিজেদের মধ্যে লড়াই বা খেলা করছে। ভিকিয়ানা সংগ্রহ ; ৎস্যুরিক সেন্ট্রাল লাইব্রেরী।

যদি বলি উড়ন্ত চাকি বা ফ্লাইং সসার দেখেছি, তবে সেটাই হবে আজকের অর্থাৎ বর্তমানের অঘটন। কিন্তু আপনারা সকলেই একবাক্যে আমাকে রাঁচীতে বসবাসের রায় দেবেন, না হয় ভাববেন বাগবাজারে পুরো একটি ইঁটের অধিকারী আমি—আধখানা বা সিকিখানার নয়। আমি বলব আপনারা যে কেউ যে কোন একদিন উড়ন্ত চাকি দেখতে পারেন। অর্থাৎ আপনার ভাগ্যে আজকের অঘটন ঘটতে পারে। বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু একদিন যে হবেই সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ধরুন, কলকাতা থেকে অনেকদূরে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণে গোদাবরীর কাছে সিরোঞ্চা নামে এক অরণ্যাকীর্ণ জায়গায় কোনও কাজে আপনি ক্যাম্পে বসবাস করছেন। সেদিন শুক্লপক্ষের কোন এক রাত্রি। তাঁবুর বাইরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে রাত্রির নিঃসঙ্গতায় প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছেন। হঠাৎ দেখলেন চাঁদটাকে পেছনে রেখে বড় চুরুটের মত কি একটা বস্তু শূন্যে ভেসে আপনার দিকে আসছে। কোন আওয়াজ নেই। কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দে আসছে। প্রথমে ভাববেন মেঘ বুঝি! পরে দেখলেন তা নয়। তবে জেপলিন? সেইরকমের বিমানযান লাগছে বটে কিন্তু তাও নয়। তবে ভৌতিক কোন বস্তু? নানারূপ প্রশ্নে আপনার মন অস্থির হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বস্তুটি সোজা হল। সেই খাড়া অবস্থায় এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। বেশ দেখতে পাচ্ছেন চুরুটের মত, উপর দিকটা সরু, তলাটা গোল বেশ বড়। হঠাৎ তলাটা উজ্জ্বল হলদে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপরেই আগুন-রাঙা লাল আলো। তলা থেকে যেন আলো ছিটকে বেরুচ্ছে। আলো—আগুন নয় কারণ কোন ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। আপনার লোম খাড়া! স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলেন তলার সেই অতিউজ্জ্বল আলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা প্লেটের উপর আর-একটা প্লেট উপুড় করে রাখলে যেমন দেখতে হয় ঠিক তেমনি। একটা...দুটো...তিনটে। পর-পর দশটা গুনলেন। এখন শুনতে পাচ্ছেন ভ্রমরের মত মৃদু গুঞ্জন। সেই গোল গর্ত-মুখ দিয়ে বেরিয়ে দশটা লাল আলোয় প্রজ্জ্বলিত চাকতি পরস্পরের সঙ্গে খেলা শুরু করে দিলে। এরকম কসরত কোন এয়ারোপ্লেনও করতে পারে না। ফেল মারবে আজকের এয়ারো ডাইনামিকস এদের দেখলে।

এক-একটার উপরের ঠিক মাঝখান থেকে আলোর শিখা বিকিরণ করছে—সরু সার্চলাইটের মত। কোনটার রঙ লাল, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ। দেখলেন কতকগুলো চোখের পলকে উড়ে আপনার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। গতিবেগ দেখে আপনি বিস্মিত। কোনটা গাছের শুকনো পাতা যেমন ভাসতে ভাসতে খসে পড়ে তেমনি করে পড়ে মাটির কাছে এসে সাঁ করে উড়ে চলে গেল। কোনটা বা লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে নীচে নেমেই মুহূর্ত-মধ্যে উড়ে যাচ্ছে। আবার বেশ খানিকটা বাদে সব চাকতি ফিরে এসে একে একে সেই আলো-প্রজ্জ্বলিত গর্তের মধ্যে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

প্রায় আড়াইশ'-তিনশ' ফিট লম্বা চুরুটের মত বস্তুটি এবার সোজাভাবে খানিকটা চলে বেঁকে বা কাত হয়ে সমান্ত-রালে নিজেকে রেখে অতি দ্রুতবেগে আপনার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।... আপনি কি করবেন? চোখ কচলাবেন, নিজেকে চিমটি কাটবেন। পরখ করবেন প্রকৃতিস্থ কিনা, জেগে স্বপ্ন দেখছেন কিনা! সবটাই দৃষ্টিবিভ্রম না অন্যকিছু? কোথা থেকে এল এ বস্তু? কোন বিজ্ঞানের খেলা এ? আকাশের বুকে এ কোন দেশীয় 'এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার'? মৃদু গুঞ্জন ছাড়া শব্দহীন, ধোঁয়াহীন। কোন জ্বালানীতে চলছে বলে আপনার মনে হল না! কি অবিশ্বাস্য গতিবেগ! ভয়ে বিস্ময়ে আপনার শরীর দিয়ে কালঘাম ঝরছে। আপনার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাইরে এমন এক ঘটনা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। লোকের কাছে আপনার অভিজ্ঞতা বলতে যান, হয় বলবে পাগল না হয় গাঁজাখোর।...

যুক্তরাষ্ট্রে টেকসাসের অন্তর্গত ডেনি-সনের দক্ষিণে কিছু দূরে এক গাঁয়ের চাষী জন মার্টিন ২৪ জানুয়ারী ১৮৭৮ খৃঃ চাকির আকারে একটি কালো জিনিসকে অনেক উঁচুতে আকাশের গায়ে খুব দ্রুত-গতিতে উড়তে দেখে। পাঁচজনের কাছে বস্তুটি কি বুঝিয়ে বলতে গিয়ে প্রথম 'সসার' এই শব্দটি ব্যবহার করে এবং পর-দিন ২৫ 'ডেনিসন ডেইলি নিউজ'-এ সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার ৭০ বছর পরে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে কেনেথ আর্নল্ড ওয়াশিংটন স্টেটে মাউন্ট রেনিয়েরের উপর ব্যক্তিগত বিমানে উড়ে যেতে দেখেন সারিবদ্ধভাবে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক রুপোলি চাকতি। তিনিই প্রথম 'ফ্লাইং সসার' এই উক্তিটি করেন এবং সেটাই পরে বাজারে চালু হয়। সেই থেকে ওই নামই আজ পর্যন্ত বহাল আছে।

উড়ন্ত চাকি বা চাকতি এবং পৃথিবীর বুকে অন্যগ্রহের মানুষ নিয়ে কিম্বদন্তী, গল্প-কাহিনী, ভাস্কর্য-নিদর্শন, শিল্পকলা বহু যুগ ধরেই চলে আসছে। হয়ত মানুষের প্রথম পদক্ষেপ থেকেই। এমনও গল্প শোনা যায়, এই পৃথিবীতে বর্তমান মানুষের পূর্বে এমন এক অজ্ঞাত সভ্যতা ছিল যারা উড়ন্ত চাকিতে করে গ্রহ-গ্রহান্তরে যখন খুশী যাওয়া-আসা করত, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তৎকালীন পৃথিবীতে বাস করা সম্ভবপর না হওয়াতে তারা স্থান ত্যাগ করে অন্য গ্রহে চলে যায়। (১)

হুনান পর্বতের গায়ে এবং তুংতিং হ্রদের মধ্যস্থিত দ্বীপে পাথরের গায়ে যে সব ছবি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৎসুচি পেন লাও আবিষ্কার করেন তার বয়েস খৃষ্টপূর্ব

1. Kasantsev, A. **Did Ancients meet Spacemen?** Australian Flying Saucer Review, **Vol 1**, No. 3, Sept. 1960.

৪৫ হাজার বছর। ছবিগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে লম্বা-চওড়া সব লোক আকাশের গোলাকার কোন বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে। উড়ন্ত চাকিতে করে গ্রহান্তরের মানুষ পৃথিবীতে আসতে পারে কিনা এই সম্পর্কে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে রুশ জ্যোতির্বেত্তা আলেকজান্ডার কাজানৎসেভ সোভিয়েট পত্রিকা 'স্মেনা'র পাঠকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান সাহারার তাসিলি উপত্যকায় হেনরী লাবোতের আবিষ্কৃত কতকগুলি পাথরের মূর্তির প্রতি। অদ্ভুত ধরনের সব গোল-মাথা মূর্তি উড়ন্ত চাকির উপর। এদের নিয়ে নানা ভাস্কর্য। মূর্তিগুলির বয়েস খৃষ্টপূর্ব ৬ হাজার।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে ধর্মগুরু ইজেকিয়েলের অপরিচিত বা অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তু (UFO—Unidentified Flying Object) দেখার। তিনি বলেছেন (Ezekiel, Chapter I), উত্তর দিক থেকে ঘূর্ণিবায়ুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের বুকে জ্বলন্ত গোলকপিন্ড কাছে এলে বুঝতে পারেন সেটা একটা অদ্ভুত যান। চারটে পা যেন চারটে থাম। প্রতিটি থাম থেকে দুটো করে ডানা, মোট আটটি। সেগুলি নাড়িয়ে উড়ে আসছে। ডানা ছাড়া আর কিছু নড়ছে না। সেই ডানা নাড়া থেকে জল আলোড়নের মত শব্দ উঠছে। চার পায়া থামের উপর এক গম্বুজ। গম্বুজের উপরে পীতাভ তৈলস্ফটিক, ফিরোজা, নীলকান্তমণি ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত এক সিংহাসন। যানটি এসে নামে তাঁর কাছে। তিনি তখন চ্যালডিয়ায় (বর্তমানে ইরাকের অংশবিশেষ) চেবার নদীর ধারে। যানটি নামার সময় খুব শব্দ করে। ইজেকিয়েলকে তার উপর চাপিয়ে উড়িয়ে নিয়ে তেল আবিবের পর্বতের উপর ছেড়ে দেয়। এই ঘটনার পর তিনি সাত দিন বাক্যহারা হয়ে ছিলেন। ইজেকিয়েল এই উড়ন্ত যানটি দেখেন খৃষ্টপূর্ব ৫৯৩ সালে। (২)

ইজেকিয়েলের নিজ বর্ণনায় যত আবছা-ভাবই থাকুক না কেন, একটা সত্য এই যে, সেযুগে যুদ্ধরথ আর লাঙলই ছিল প্রযুক্তিবিদ্যার শেষ কথা। তাছাড়া ইজেকিয়েলের যুগে ধাতব বস্তু ছিল অল্পই, যন্ত্র বলে কোন বস্তুই ছিল না। সুতরাং তাঁর পক্ষে সেই দৃষ্ট বস্তুর যথাযথ বর্ণনার ভাষাজ্ঞান থাকা অসম্ভবেরই পর্যায়ে। সিংহাসনের ও গম্বুজের যা বর্ণনা তাতে মনে হয় ওই বিমানের কিছু অংশ প্লাস্টিকের তৈরী। ডানার এবং অন্যান্য যা শব্দ তা কোন ইঞ্জিনের এগজস্ট ইত্যাদির বলে মনে হয়। ইজেকিয়েলের নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা এত বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলা, তাতে মনে হয় না যে, তিনি অশিক্ষিত শ্রোতাদের উপর এ ধরনের গল্প বানিয়ে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছেন।

2. Domenica del Corriere, May 27, 1962; **Australian F.S. Review**, No. 7, Nov. 62; Menzel, Dr. D. and Boyd, L. **The World of Flying Saucers**, New York, 1963

শেকসপীয়রের জন্মের তিন বছর আগে ১৪ই এপ্রিল ১৫৬১ ন্যুরেমবার্গে এবং জন্মের দু বছর পরে ৭ই আগস্ট ১৫৬৬ বাসেলে উড়ন্ত চাকি দেখা গিয়েছিল। তার ছবি তৎকালীন চিত্রকররা এঁকেছিলেন এবং তা ৎসুরিখের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে আছে। ইজেকিয়েলের বর্ণনার পর থেকে শেকসপীয়রের যুগ পর্যন্ত এবং তার পরেও বহু ঘটনা, বহু বিবরণ বা রিপোর্ট পাওয়া যায় জাপান, মিশর, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, পোলান্ড, জর্মনী, বেলজিয়ম, হলান্ড, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন ইত্যাদির পুরাতন প্রাসাদ ও বিভিন্ন ধর্মমন্দিরের গ্রন্থাগারে।

উড়ন্ত চাকির অস্তিত্বকে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ও ফ্যানটাসি বলে মনে হয়। ফ্যানটাসি অর্থাৎ আজ যা বিজ্ঞানাভিত্তিক গল্প বলে চালু তারই একটা উদাহরণ দিয়ে গল্প বললে সেই পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত বা উড়ন্ত চাকি সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান উপলব্ধি হতে পারে।

ধরা যাক, যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড-এর এক ঝাঁক অ্যাটমিক বোমারু বিমান উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখে তারা অজান্তে উৎক্ষেপিত হয়েছে বহু আগে ফেলে আসা এক যুগে। তারা চলেছে ভারতের বুকের উপর দিয়ে। তখন রাজা বিক্রমাদিত্যের যুগ। তিনি নবরত্ন নিয়ে রাজসভা আলো করে রাজকার্য পরিচালনা করছেন। এমন সময় বোমারু বিমানের আওয়াজ! যে আওয়াজ সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই নেই। বজ্রপাত, সিংহনাদ, ব্যাঘ্র-গর্জন, বৃংহতি ইত্যাদির আওয়াজে অভ্যস্ত তাঁরা অ্যাটমিক বোমারু বিমান ও তাদের নিকটতম আওয়াজ এযাবৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাইরে। কল্পনাতেও নেই।

পণ্ডিতদের নস্যাধার হারিয়ে গেল। মুক্তকচ্ছ হয়ে বা তা সামলাতে সামলাতে ছুটলেন বাইরের অলিন্দে। অভুতপূর্ব দৃশ্য! দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু!... নগরবাসীরা অমঙ্গলের আশঙ্কায় অস্থির! রাজপুরীর অভিমুখে প্রজাকুল ব্যাকুল হয়ে ধাবমান। বিক্রমাদিত্য অস্থির হয়ে নবরত্নের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকান।

অদ্ভুত গর্জনকারী পাখিরা রাজপ্রাসাদের উপর কয়েকবার পাক খেয়ে নিমেষের মধ্যে কোথায় চলে গেল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহস্র সহস্র লোক এই অদ্ভুত উড়ন্ত প্রাণীদের দেখল। কেউ দেখেছে রাতে, কেউ দিনে। কারুরই দেখার সঙ্গে কারুর মিল নেই। বক্তব্যের মিল হচ্ছে না। কারণ, কেউই এর আগে এ ধরনের প্রাণীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করে নি। সুতরাং সঠিকভাবে ব্যক্ত করায় হচ্ছে মুশকিল। রাতে-দেখা লোকেরা বলে এই পাখীদের একটা চোখ লাল, আর একটা সবুজ। সে চোখ জ্বলে আর নেভে। চোখ দুটো কাছাকাছি নেই, আছে ডানার দু পাশে। কেউ বললে পিছনেও একটা চোখ আছে। দিনে-দেখা লোকেরা একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলে।

অভিধানপ্রণেতা সভাপণ্ডিত অ
সিংহ রাজগ্রন্থাগারের অনেক পুঁথি
ঘেঁটে কোথাও এর উল্লেখ দেখতে পে
না। বললেন, মানব আত্মা মাঝে মাঝে
ধরনের অদ্ভুত স্বপ্ন ও দৃষ্টিবি
ফলে ভোগে। আমি আরও শাস্ত্র
দেখি। পুরাণটা এখনও ভাল করে
হয় নি, ওটাই বাকি। তিনি গিয়ে গ্র
গারের মধ্যে ডুব মারলেন, আর তাঁর
দেখা গেল না।

রাজবৈদ্য ধন্বন্তরি হাজার-খা
লোকের বিবরণ সংগ্রহ করে বুঝে
অতিকায় পাখির এক ঝাঁক অদ্ভুত আও
ও হাওয়া কেটে উড়ে গেছে। তিনি
নাকে বেশ বড় দুই টিপ নস্যি গুঁজে সশ
নাক ঝেড়ে হেঁচে বললেন, অশিক্ষিত,
অর্বাচীনরা বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা
আসলে ওরা এক জাতের গরুড়প
অসময়ে দেশান্তরী হবার জন্যে হিমাল
উপর দিয়ে না গিয়ে এখান দিয়ে উড়ে গে

কবি কালিদাস নব মেঘদূ
প্রস্তাবনার কয়েকটি সুন্দর শে
শোনালেন।

রাজজ্যোতিষ বরাহমিহির বলল
দেবগণ রুষ্ট হয়েছেন। মহামারী, র
বিপ্লব ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। তাই দেব
বজ্র পাঠিয়ে সংকেত করেছেন। সাব
মহারাজ! ইতিমধ্যে আড়ালে রাজপুরোহিত
ইঙ্গিত করাতে তিনি এগিয়ে এসে বলল
জ্যোতিষশ্রেষ্ঠ আচার্য বরাহমিহিরের
সত্য। প্রতি দেব-মন্দিরে যোড়শোপচ
পূজা, বলি ও ব্রাহ্মণকে দান এই শ
শাস্ত্রের এমত বিধান।

ঠিক এমন সময় রাজসভায় সব লোক
ভিড় ঠেলে ঢোকে তিনজন পথক্লান্ত চাষ
রাজার কাছে নিবেদন জানায় রাজধা
থেকে তিন দিনের পথ তাদের গাঁ, সেখ
দৈত্যের মত গর্জন করে অতিকায় আকা
পাখিরা খেতের উপর নামে। তখন তারা
করছিল। আকাশ-পাখিদের পেটের ভিত
থেকে বেরিয়ে আসে সব টকটক করছে ল
রঙের পুরুষ। অদ্ভুত পোশাক। রং সবু
পোশাকের হাতায় রাজপাখির ডানা আঁক
প্রত্যেকের হাতে ছোট কালো নল। যে ভাষ
কথা বলল তা সংস্কৃত নয়, প্রাকৃতও না
কিছুই বুঝলাম না। খালি নিজেদের বু
হাত দিয়ে 'মারিকান, মারিকা' বারব
বলেছে। মাটিতে পা ঠুকে মুখ তুলে ইঙ্গি
করাতে আমরা বলি, এ ভারতবর্ষ। মহ
রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব। আম
তাঁর দাসানুদাস প্রজা। তাতে সকল
'ননসেনস...ইন্ডিয়া...' ইত্যাদি কিসব ব
তা আমরা বুঝলাম না। শেষে বিরক্ত হ
আকাশ-পাখির পেটের মধ্যে সবাই ঢু
পড়ল। তারপর কি আওয়াজ! ঝড়! মা
ধুলো উড়িয়ে খেত পিষে দিয়ে উড়ে চ
গেল।...রাজসভা থেকে অনেক প্রশ্ন ক
হল কিন্তু তারা বারবার একই জবাব দিল
শেষে এদের পাগল সাব্যস্ত করা হল। পাগ
রোগ সংক্রামিত হয় এই আশঙ্কায় তৎক্ষণা
ফাঁসির হুকুম হল।

বিদূষক ব্যঙ্গ করে গান লিখলেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল দেশের মাটির উপর এত সুন্দরী থাকতে আকাশে কুৎসিত পাখির দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট ও ঘাড়ে ব্যথা করে কি লাভ? এই গান হিন্দি ফিল্ম সঙ্গীতের মত রাস্তায় ঘাটে শোনা যেতে লাগল।

এমন অবস্থার মধ্যে অন্য এক দেশের শক্তিশালী রাজা তার একমাত্র সুযোগ্য পুত্রের জন্যে বিক্রমাদিত্যের অনূঢ়া কন্যার পাণি প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। লোভনীয় ও অভাবনীয় প্রস্তাব!

রাজজ্যোতিষ বরাহমিহির বললেন, বক্রীগ্রহের জন্যে গণনায় ত্রুটি হয়েছিল। আসলে শুভসূচক ইঙ্গিত। রাজা হুকুম দিলেন, তিন দিনের জন্যে দেশব্যাপী উৎসব। সকল শৌণ্ডিকালয় জনগণের জন্যে উন্মুক্ত, ব্যয়ভার সম্পূর্ণ রাজসরকারের।

বছরের শেষে দেখা গেল জনসংখ্যা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেছে।

উড়ন্ত চাকি নিয়ে আমাদের অবস্থাটা বিক্রমাদিত্যের আধুনিক বোমারু বিমান দেখার মতই। আমাদের ধারণার বাইরে বলেই অবিশ্বাস্য বলছি। গল্পটি বলেছি এই কারণে যে, আমাদের বর্তমান ধারণার সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনামূলক বিচার নয় এর মধ্যে অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তুর সম্বন্ধে যে সব গবেষণা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে চলছে তাতে অনেক বিজ্ঞানী মন্তব্য করছেন বটে কিন্তু সঠিক পথ বা ব্যাখ্যা কেউ দেখাতে বা করতে পারেন নি বলেই অবিশ্বাসের পর্যায়ে থেকে গেছে।

বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন এটা উল্কা ইত্যাদির ন্যায় নৈসর্গিক ঘটনা নয়। সন্দেহ করেছিলেন, কোন রাষ্ট্রের গুপ্তভাবে পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা বলে। ১৯৪৭ সালে আর্নল্ডের দেখার পর ইউরোপ, আমেরিকার লোক সন্দেহ করেছিল এর পেছনে মস্কোর হাত আছে, হয়ত বা তাদেরই কোন রহস্যময় বিমান। কিন্তু সেসময়ে রুশ ইঞ্জিনীয়ারদের পক্ষে এমন দ্রুতগতি বিমান (প্রায় ঘন্টায় পাঁচ হাজার মাইল) তৈরি করা অসম্ভবের পর্যায়ে, এই ভেবে অনেকে মনে করলেন আমেরিকারই কোন গুপ্ত পরীক্ষামূলক বিমানযান। যখন জানা গেল তাও নয় তখন থেকে বিজ্ঞানীরা কোন যুক্তি খুঁজে পান নি। গ্রহান্তরের মানুষ এও স্বীকার করতে তাঁরা এখনও রাজী নন। বলেন, ওটা খবরের কাগজ বিক্রি করার একটা উপায়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়, মঙ্গলগ্রহ যখনই পৃথিবীর কাছাকাছি এসেছে তখনই উড়ন্ত চাকি বেশি মাত্রায় দেখা গেছে। আর দেখা গেছে পাঁচটি অ্যাটম বোমা ফাটার পর — আলামোগোর্দো (১৬ জুলাই ১৯৪৫), হিরোশিমা (৬ আগস্ট ১৯৪৫), নাগাসাকি, ক্রসরোডস-এ এবং ক্রসরোডস-বি। জে ই লিপ বলেন, (৩) প্রথম দুটির বোমা-ফাটা মঙ্গলগ্রহ থেকে দেখা সম্ভব, কারণ মঙ্গলগ্রহ তখন পৃথিবী থেকে যথাক্রমে ১৬৫ লক্ষ এবং ১৫৩ লক্ষ মাইল মাত্র দূরে ছিল, তৃতীয়ের সময় মঙ্গলের অবস্থান পৃথিবী থেকে সন্দেহজনক অবস্থায়, আর শেষের দুটির সময় পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে ছিল। তিনি তাঁর রিপোর্টে আরও বলেছেন, গ্রহান্তরে আমাদের অজ্ঞাত অধিবাসীরা বহুদিন ধরে নিয়মিতভাবে পৃথিবীর উপর নজর রেখেছে। অ্যাটম বোমার অস্তিত্বে ও ব্যবহারে আমরা যুদ্ধমান জাতি বলে তারা শঙ্কিত হয়েছে। চিন্তিত হয়েছে আমরাও তাদের মত মহাশূন্যে যথেচ্ছ বিচরণের দ্বারে পোঁছেছি বলে।

সহস্রাধিক অঘটনের মধ্যে চারটি এমন উদাহরণ এখানে উল্লেখ করব যা কোন বিজ্ঞানীই অসত্য ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি, কারণ তাদের সাক্ষী-সাবুদ এত বেশি যে, অস্বীকারের কোন উপায় নেই। এটা ঠিক, এত লোক কখনও বানিয়ে গল্প বলতে বা ভুল বস্তু দেখতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজও পারেন নি ঘটনাগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ করতে। এই সেদিন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ মধ্যরাত্রির পর নিউ হ্যামশায়ারের একসিটার, কেনসিংটন, এপিং প্রভৃতি স্থানে উড়ন্ত চাকি দেখা গেছে। সাধারণ লোক ছাড়াও পুলিশ এবং মিলিটারীর পদস্থ কর্মচারীরা দেখেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আজ প্রয়োজন একজন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকারীর যিনি এই সব তথ্য ও রিপোর্ট থেকে খুঁজে বের করতে পারবেন সঠিক ব্যাখ্যা।

প্রথম উদাহরণ যা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যেহেতু ২১ এপ্রিল ১৮৯৮ প্রতিজ্ঞাসহ সাক্ষীপত্রে সহি করেন—স্টেট অয়েল ইন্সপেক্টর ই ডবলিউ হোয়ার্টন, শেরিফ এম ই হান্ট, ডেপুটি শেরিফ ডবলু লাবার, ব্যাঙ্কার এচ এচ উইন্টার, ঔষধবিক্রেতা এচ এস জনসন, অ্যাটর্নি জে এচ স্টিচার, জাস্টিস অফ পীস আলেকজাণ্ডার স্টুয়ার্ট, ঔষধবিক্রেতা এফ ডবলিউ বাটলার, রেজিস্টার অফ ডীডস জেমস ডবলু মার্টিন এবং পোস্টমাস্টার এচ সি রলিনস।

হ্যামিলটন কানসাসের বহুদিনের অধিবাসী। উডসন, অ্যালেন, কফে ও অ্যাণ্ডারসন কাউন্টির সকলেই তাঁকে চেনে ও শ্রদ্ধা করে। তিনি বাইবেল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন ওঁর উক্তির মধ্যে কোথাও অতিরঞ্জন বা কল্পনার আভাস নেই।

ঘটনাস্থল ল্য রয়, কানসাস। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের খোঁয়াড়। তারিখ ১৯ এপ্রিল ১৮৯৮। সময় রাত সাড়ে দশটা। হ্যামিলটনের নিজের কথায় শুনুন—"গরু-বাছুরের আওয়াজে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ভাবলাম আমার বুলডগটা বজ্জাতি করে ওদের বুঝি দেখাচ্ছে। কিন্তু দরজা খুলতেই ভ[য়ে] আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখি একটা উ[ড়ো] জাহাজ আমার খোঁয়াড়ের উপর না[মছে]। আমার থেকে তার দূরত্ব সওয়া দুশ আড়াইশ' গজের বেশি হবে না।

"আমার ভাড়াটে গিড হেসলি[ং], ছেলে ওয়ালকে হাঁক দিয়ে বিছানা [থেকে] তুলে সবাই মিলে হাতের কাছে খ[ুন্তি] কুড়ুল যা পেলাম নিয়ে খোঁয়াড়ের [দিকে] ছুটলাম। ইতিমধ্যে উড়োজাহাজটা আ[স্তে] আস্তে নেমে মাটি থেকে ৩০ ফিট উ[পরে] আর আমরা তার থেকে মাত্র ৫০ গজ দ[ূরে]।

"জাহাজটা দেখতে খুব বড় চুর[ুটের] মত। বোধহয় লম্বায় তিনশ ফিট [...] তলায় একটা কামরা। কামরটা কাচ বা [...] কোন স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে তৈরি। কাচ [...] অন্য কোন ধাতব বস্তু পটির মত প[...] সুজান। ভিতরটা উজ্জ্বল আলোয় আলো[কিত]। আমরা স্পষ্ট দেখলাম তার মধ্যে ছ[...] অদ্ভুত আকৃতির মানুষ। এ ধরনের ম[ানুষ] কখনও চোখে দেখি নি, কল্পনাও করি [নি]। দেখলাম, তারা নিজেদের মধ্যে উত্তে[জিত] হয়ে কিসব কথাবার্তা যেন চালাচ্ছে।

"জাহাজের যে সব অংশ স্বচ্ছ নয় [...] রঙ সবই গাঢ় লালচে। আমরা ভয়ে বি[...] হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। সম্ভবত [...] আওয়াজে হঠাৎ তাদের দৃষ্টি আমাদের [...] পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাদের [...] আলো ফেলল। ওই আলোতে আমাদের ভাল করে দেখার পরই মনে হল তারা কোন যন্ত্র চালাল। তার ফলে একটা চাকা ব্যাসে প্রায় ৩০ ফিট হবে জাহা[জের] তলায় গুন-গুন আওয়াজ করে অ[াস্তে] আস্তে ঘুরতে লাগল। দেখলাম, জাহা[জটা] পাখির মত ধীরগতিতে উপরে উঠ[ছে]। আমাদের মাথা থেকে তিনশ' ফিট উ[পরে] ওঠার পর মনে হল জাহাজটা যেন কি[ছু]ক্ষণের জন্যে স্থির হয়ে রইল, ত[...] খোঁয়াড়ের দু বছরের একটা বাছুরের [...] চক্কর দিতে লাগল। বাছুরটা ভয় [...] লাফাতে ও ডাকতে শুরু করে দিলে। [...] হল, বাছুরটাকে কে যেন দড়ি দিয়ে [...] গায়ে বেঁধেছে। কাছে গিয়ে দেখি আধ [...] চওড়া লাল রঙের অদ্ভুত এক দড়ি জা[হাজ] থেকে নামিয়ে বাছুরটার গলায় কে যেন [...] পরিয়েছে। বাছুরটা সেটাকে ছাড়াতে [...] তারের বেড়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে[...] ওটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করলাম [...] কিছুতেই পারলাম না। শেষে ত[...] বেড়া কেটে দিলাম। অবাক হয়ে তা[কিয়ে] দেখলাম সেই উড়োজাহাজটা বাছুরা[টাকে] নিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। খানিকটা উপরে উঠে বাছুরশুদ্ধ ধ[ীরে] ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে মিলিয়ে গেল[।]

"আমরা সবাই বাড়ি ফিরে এল[াম] কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার এত ভয় ক[রতে] লাগল যে, আমি আর মোটেই ঘু[মোতে] পারলাম না। পরদিন মঙ্গলবার সকাল [...] না হতেই ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়[লাম]

3. Lipp, J. E. **Appendix D to Report Project Sign: Unidentified Flying Objects, US Air Force, February 1949.**

আমার বাছুরের কোন খোঁজ পাই কিনা দেখতে। সন্ধ্যের সময় যখন ফিরছি পথে দেখা হল লিঙ্ক টমাসের সঙ্গে। সে ল্যু রয় থেকে তিন-চার মাইল পশ্চিমে থাকে। সে বলল, সেদিনই তার মাঠে একটা বাছুরের চামড়া চারটে পা আর মাথা পেয়েছে। তার মনে হয়েছে কেউ বাছুর চুরি করে এনে ওখানে কেটেছে। তাই সে এগুলোকে বয়ে শহরে এসেছে কার বাছুর সনাক্ত করাতে। সে আরও আশ্চর্য হয়েছে তার মাঠের নরম জমির উপর কোথাও বাছুরের পায়ের ছাপ পড়ে নি। চামড়ার উপর আমার মার্কা ছাপ দেখে তাকে বললাম, এটা আমার খোঁয়াড়েরই বাছুর।...অবাক হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

"এরপর থেকে যখনই ঘুমের চেষ্টায় বিছানায় শুই, চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই অভিশপ্ত জাহাজ, তার প্রচন্ডশক্তির আলোকরশ্মি এবং অদ্ভুত আকৃতির লোক। জানি নে তারা শয়তানের বাচ্চা, না দেবদূত, না অন্য কিছু। কিন্তু আমরা সকলেই তাদের দেখেছি। ওই অদ্ভুত আকৃতির লোক যা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত, তাদের কোনো সংস্পর্শে আমি আসি এও আমি আর চাই নে।"

দ্বিতীয় উদাহরণ—ফাতিমায় অলৌকিক দর্শন। ফাতিমা পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের প্রায় ৬২ মাইল উত্তরে লীরা প্রদেশের অন্তর্গত একটা ছোট্ট গ্রাম। এই অলৌকিক দর্শন প্রায় ৭০ হাজার লোকের সামনে ঘটে ১৩ অক্টোবর, ১৯১৭। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে রিবেরা একটি প্রবন্ধে (৪) বলেছেন, "৫০ বছর আগে পর্তুগাল ছিল খুবই এক অনুন্নত দেশ। রাজধানী থেকে বেশ দূরে অখ্যাত এক পল্লীর অশিক্ষিত চাষীদের কাছে ১৯১৭ সালে এর ব্যাখ্যা একমাত্র ধর্মের কুসংস্কারের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই ১৯১৭ সালে 'হোলি ভার্জিন' অর্থাৎ কুমারী মেরী মাতার আবির্ভাব ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারেনি। কোনোরকম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের পক্ষে কিছু ভাবা সম্ভবও নয়। হাজারখানেক বছর আগে হলে তারা নিশ্চয়ই বলতো পৃথিবীর উপর কোনো দেবীর আবির্ভাব।"

ইংলেফিল্ড বলেছেন (৫)—"ফাতিমাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, একটা কিছু সেখানে ঘটেছিল। বলা যেতে পারে শুধু বিংশ শতাব্দীর নয়, যে-কোনো শতাব্দীর একমাত্র প্রমাণযোগ্য অলৌকিক দর্শন এবং কম করে ৭০ হাজার তার সাক্ষী। আপনাদের ইচ্ছে হলে জি রেণল্টের **Fatima, Esperance du Monde** পুস্তকের আলোক-চিত্রগুলি দেখতে পারেন। দেখবেন, দর্শকরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে, সেই সঙ্গে তাদের অলৌকিক দর্শনে বিস্মিত মুখের অভিব্যক্তি। সে-সময়ের বহু খবরের কাগজে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। আজও অনেক লোক বেঁচে আছে, যারা প্রত্যক্ষ করেছে। এমনকি স্বয়ং লুসিয়া, যে এখন স্পেনের এক কনভেন্টে বাস করে, সেও জীবিত আছে।"

১৩ অক্টোবর ফাতিমার মাঠে অগণিত জনতা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল অলৌকিক দর্শনের জন্যে, কারণ, তিনটি শিশু তাদের আশ্বাস দিয়েছে, আজকেই দর্শনলাভ হবে। এক দেবী যিনি আলোর এক গোলকে চেপে আকাশ থেকে নেমে এসে তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করেছেন। তিনি তারিখ দিয়েছেন আজ সকলের সামনে অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করাবেন। তিনটি বালক-বালিকা হল তিনটি মেষপালক। দশ বছরের লুসিয়া ও তার দুই খুড়তুতো ভাই ন' বছরের ফ্রানসিসকো মার্টো আর সাত বছরের জ্যাকিনটো মার্টো। বর্তমানে এই ফাতিমা সমস্ত পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিকদের তীর্থভূমি। ক্যাথলিক চার্চ স্বীকৃতি দিয়েছেন এই অলৌকিক দর্শনের। প্রতি বছর ওই তারিখে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয় ওখানে 'হোলি ভার্জিন'কে শ্রদ্ধা জানাতে।

রিবেরার রিপোর্টে আছে যে, এই তিন ছেলে-মেয়েরা জনসাধারণের অলৌকিক দর্শনের আগে পাঁচবার ১৩ মে থেকে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বর্গীয় দেবীর সঙ্গে ফাতিমা থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে কভা দা ইরিয়ার পাহাড়ের খাঁড়ির ভিতর তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওই জায়গায় ওরা যখন দুপুরের দিকে ভেড়াগুলোকে এক জায়গায় করছিল, সেই সময় আকাশে আলোর এক উজ্জ্বল রেখা তারা প্রথমে দেখে। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ছোট ওক গাছের কাছ থেকে বেরিয়ে আসে ধবধবে সাদা সুন্দর এক নারীমূর্তি।

উপরের এই বর্ণনা থেকে এখন আমাদের মনে রাখতে হবে, গ্রহান্তরে জীব ৫০ বছর আগে ক্যাথলিক দেশের অশিক্ষিত অজ্ঞ তিন শিশুর কাছে কি মনে হবে? নিশ্চয়ই মেরী মাতা—'হোলি ভার্জিন'। শিশুরা প্রথম দেখার পর বলেছিল, সেই সুন্দরী মহিলাটির বয়েস খুবই অল্প। তার দেহে তুষারশুভ্র পোশাক। গলায় একটা সোনার বালার সঙ্গে তা আটকানো। গলা থেকে সমস্ত শরীরকে ঢেকে নেমে এসেছে সেই পোশাক। সোনালি পাড়বসানো সাদা একটা ওড়নায় মাথাটা ঢাকা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দেখা ও কথা হয় ১৩ জুন আর ১৩ জুলাই। ওদের কাছে বিবৃতি শুনে নিজেদের গাঁ ছাড়াও আশেপাশের ধর্মযাজকরা খুব শংকিত হয়ে ওঠেন, শিশুরা নিশ্চয়ই অপদেবতা বা শয়তানের পাল্লায় পড়েছে। এসব কথার জন্যে গাঁয়ে আন্দোলন এমন হল যে, সেই তিনটি ছেলে-মেয়েকে কয়েকদিনের জন্যে শ্রীঘরও বাস করতে হয়। তারপর চতুর্থ দর্শনে বাচ্চাদের দেখা সেই 'হোলি ভার্জিন' বলে যান ১৩ অক্টোবর তিনি এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটাবেন যে, লোকেদের বিশ্বাস না করার কোন কারণ আর থাকবে না। ১৩ সেপ্টেম্বর পঞ্চম সাক্ষাৎকারে বেশ কয়েকজন লোক সাক্ষী হিসেবে একটু আড়াল থেকে দেখে আলোর এক গোলক চেপে এক দেবীমূর্তির শিশুদের কাছে অবতরণ! সেই সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন লীরার রেভারেন্ড জেনারেল ভাইকার। তিনি বলেন, সেই দেবীমূর্তি আলোর উড়ো-জাহাজ চেপে আসেন। মস্ত বড় গোলক, মধ্যগতিতে খুব উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমদিকে উড়ে চলে যান। অন্য সাক্ষীরা দেখে সেই গোলক থেকে ধবধবে সাদা এক মহিলা বার হয়ে আসেন এবং কিছুক্ষণ পরে সেই গোলকের মধ্যে ঢুকে সূর্যের দিকে চলে যান।

শেষ ১৩ অক্টোবর অলৌকিক ঘটনার দিন। ৭০ হাজার লোকের মধ্যে ছিলেন বহু ধর্মভীরু, নাস্তিক, ধর্মযাজক এবং এক সোস্যালিস্ট খবরের কাগজের কয়েকজন রিপোর্টার। একজন ছিলেন বৈজ্ঞানিক। তিনি কয়মব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলমীডা গ্যারেট। তিনি ঘটনাকে বিবৃত করেন এইভাবে—

"বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছিল। প্রত্যেকের পোশাক-পরিচ্ছদ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। হঠাৎ ঘন মেঘের ভিতর থেকে মনে হল সূর্য বেরিয়ে এল। প্রত্যেকে সেই নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে। দেখতে একটা চাকতির মত কিন্তু আকৃতিতে একটা বিশিষ্টতা আছে। আলো বিকিরণেও। ফাতিমার অনেকে পরে তুলনা করেছেন নিষ্প্রভ রুপোলি বলে, আমি কিন্তু তা মোটেই মনে করি না। চাকতিটার উজ্জ্বলতার বাড়া কমা ছিল, বরং খুব বড় মুক্তোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। খুব পালিশ করা চাকা বললেই ঠিক বলা হবে। না, না, এ-কবিতা নয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ক্রমে ক্রমে সেই চাকতির ঘোরার গতি বাড়তে লাগল। হঠাৎ সমস্ত জনতা ভয়ে বিস্ময়ে অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ওই সূর্যসম বস্তুটি সবসময়ে ঘুরে চলছে, উঠছে নামছে, কখনো ভাব করছে এমন যেন মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। রঙ তখন লালচে রক্তাভ। ভয় দেখতে লাগল অগ্নিসম অবয়বে এবং তার ওজনের ভারে সকলকে যেন পিষে মেরে ফেলবে।"

তৃতীয় উদাহরণ—কেলিতে অবতরণ। ১৯৫৫ সাল। কেলি হল যুক্তরাষ্ট্রের হপকিনসভিলের উত্তরে একটি ছোট শহর। সরকারীভাবে এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হয়েছিল। পদস্থ সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও বিমান-বিভাগের লোকেরা ছিল সেই তদন্তে। রেডিও রিপোর্টার অ্যানড্রু বি লেডউইথ ওই রাত্রে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ স্থানীয়

---

4. Ribera, A. **What Happened at Fatima?** Flying Saucer Review, Vol. X, No. 3 (May 1964), Pp. 12-14
5. Inglefied, G. **Fatima: The Three Alternatives,** F.S.R., Vol. X, No. 3 (May '64), p 5
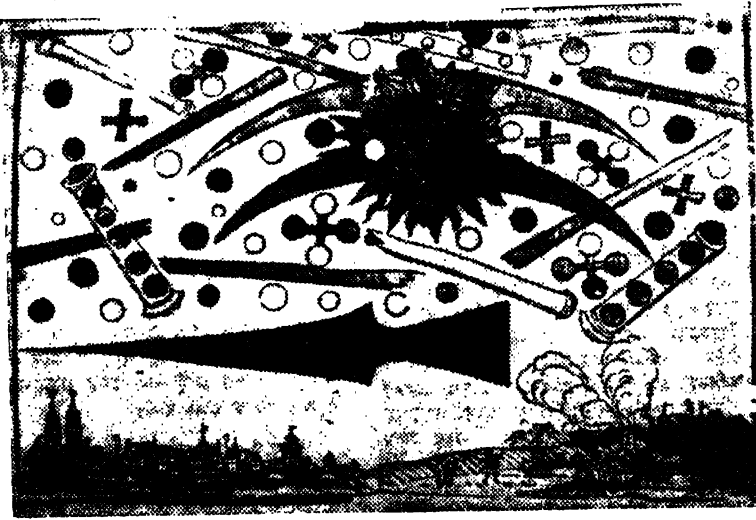
নুরেমবার্গে অনৈসর্গিক ঘটনা : ১৪ এপ্রিল ১৫৬১। নলের ভিতরে গোল গোল বস্তু। তারই কতকগুলি মনে হচ্ছে ডানদিকের কোনে নামছে এবং তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভিকিয়ানা সংগ্রহ ; ৎস্যুরিক সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী।

খবরের কাগজ, ডঃ এম কে জেসাপের The UFO Annual ও জ্যাকেলাইন স্যাণ্ডার্সের রিপোর্টে (৬) আছে।

রবিবার ২১ আগস্ট ১৯৫৫ রাত্রে তিনটি বালক ও আটটি বয়স্কের উপস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটে। এই রকম বানিয়ে গল্প বলার মতো কল্পনাশক্তি, মজা করা বা পাবলিসিটির জন্যেও মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা তাদের কারুর ছিল না।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ সাটন-পরিবারের ১৪-১৫ বছরের ছেলে বিলি রে সাটন বাড়ির বাইরে আসে কুয়ো থেকে খাবার জল নেবার জন্যে। জল নিয়ে ফিরে বাড়ির সকলকে বলে তাদের খামারবাড়ির পেছনে একটা উড়ন্ত বস্তু নামতে সে দেখেছে! ওর কথায় বাড়ির কেউই কান দেয়নি। সকলেই ভেবেছে হয়ত একটা উল্কা বাড়ির পিছন দিয়ে চলে গেছে, আর বিলি তাই দেখেছে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে একটি জীবকে প্রথম দেখা গেল বেশ দূরে জানালার বাইরে। প্রথমে সকলের মনে হয়েছিল, অদ্ভুত একটা আলো এগিয়ে আসছে। বাড়ির খুব কাছে আসতে বোঝা গেল সেটি আলো নয়, একটি 'ছোট্ট মানুষ'।

এই অদ্ভুত দৃশ্যে সকলে বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে ছোট্ট মানুষটি দুই হাত তুলে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যখন প্রায় ফিট-কুড়ি দূরে, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের মানুষ না অন্য কোন জীব ঠিক ধরতে না পেরে বাড়ির দুজন লোক উত্তেজিত হয়ে গুলি করে। গুলি লাগতেই সেই অদ্ভুত জীবটি ডিগবাজি খেতে খেতে অন্ধকারে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল। মরল কিনা বোঝা গেল না। ভয় পেয়ে সকলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রথমটার মত আর একটা জীব জানালার পাশে এসে ঘরের মধ্যে তাকাচ্ছে। জানালার মধ্যে দিয়েই আবার গুলি চালাতে থাকে। এবারেও মনে হল গায়ে লেগেছে। দৌড়ে জানালার ধারে গিয়ে দেখে, এটাও আগের মতো ডিগবাজি খেতে খেতে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল বা মিলিয়ে গেল।

এই পরিস্থিতিতে ওরা বেশিক্ষণ ঘরে বসে থাকতে পারল না। ঠিক করল, সবাই মিলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এই অদ্ভুত আধা-মানুষ আধা-জন্তুকে ভালো করে দেখবে সত্যিই সেটা কী। বাইরে আসতেই দেখল ছাদের ওপর একটা। সেটাকে গুলি করতে গড়াতে গড়াতে ছাদের উল্টো দিকে গিয়ে মাটিতে কিরকমভাবে যেন পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর একটাকে দেখা গেল একটু দূরে এক গাছের উপরেই তাকে গুলি করতে স্পষ্ট দেখা গেল জীবটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মাটিতে পড়েই কোথায় যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। গুলি খাচ্ছে কিন্তু কেউই মরছে না বা কোনরকম জখম হচ্ছে না দেখে সকলেই আশ্চর্যান্বিত যেমন, তেমনি ভীতও।

ঘড়িতে দেখে রাত এগারোটা বেজেছে। বাড়িরই একজন যার নাম টেলর, সে উত্তেজিত হয়ে তার পয়েণ্ট টু-টু রাইফেল দিয়ে প্রায় চার বাক্স গুলি খরচ করে ফেলেছে। বাচ্চারা আর মেয়েরা অসম্ভব ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করাতে ওরা সকলে বাড়ি ছেড়ে নিজেদের গাড়ি করে হপকিনসভিল পুলিশ স্টেশনে আসে।

পুলিশ প্রথমে শুনতেই চায় : নেশার ঘোরে এসব আবোলতাবোল ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীলোকদের ভয় এ দেখে পরীক্ষা করে বোঝে এরা বে ফোঁটাও মদ স্পর্শ করেনি। তখন র বারোটা নাগাদ পুলিশের গ্রীনওয়েল ও অন্যান্য পদস্থ ক আসে সরজমিনে তদন্ত করতে। আশেপাশের প্রায় ডজনখানেক রেডিওতে এই খবর জানানো হয় জীপ হাঁকিয়ে একে একে আসতে

প্রতিবেশীদের কাছে জানা যায়, কেউই মদ্যপ নয়। বসবার ঘরে, রা বাড়ির কোথাও একটা খালি পাওয়া গেল না। প্রত্যেককে আ জিজ্ঞেস করে পুলিশ বুঝল মোটাম এক কথাই বলছে। পুলিশ ত অঞ্চলের মিলিটারির সাহায্য করাতে সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি গাঁ চষে ফেলল। মিলিটারির এক ঘটনাস্থলে এসে বলে, জীপে কে সময় সে কতকগুলো 'উল্কা'র মত তার গাড়ির মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে উড়ে যেতে দেখেছে।

পুলিশ বাড়ির চারপাশ ঘু সূত্র পেল বটে কিন্তু কোনরকম জাতীয় যানের নামার চিহ্ন জীবগুলির বর্ণনায় সাটন-প সকলের কাছ থেকে তদন্তে যা জা তা হচ্ছে—জীবগুলির চোখ খ ড্যাবা-ড্যাবা গোল। আলো এক করতে পারে না। সবসময়ে বাড়ির দিক থেকেই তারা এসেছে, গু অন্ধকারেই গেছে। চোখের পা চোখের মণিও নেই। লম্বায় সাড়ে তি চার ফিট হবে। কান বড়ো ও স হাত লম্বায় প্রায় মাটিতে ঠেকে। দিকে এগিয়ে এসেছে দুই হাত শূন্যে ছড়িয়ে টলতে টলতে। গুলি পর তারা কেউই পড়ে যায়নি, ভেসেছে। মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থা খেয়ে ছিটকিয়েছে তাও শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে গেছে। বা ও গাছের উপর থেকে পড়েছে ভাসতে। পোশাকের কথা জিজ্ঞেস জানা গেল সেই ছোট্ট অদ্ভুত মন জীবের পোশাক যেন নিকেল দিয়ে

চতুর্থ উদাহরণ—নিউগিনিতে সালের জুন মাসে। অসনাক্ত উড় পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে এটি একটি ঘটনা। প্রধান সাক্ষী বা দর্শক যে উইলিয়ম বুথ গিল হলেন ব্রিসবেন বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং চা

6. Sanders, J. Panic in Kentucky, Saucerian Review, January 1956; ATIC. Report on the Kelly-Hopkinsville Case, 1955

ইংলণ্ডের একজন কট্টর পাদরি। তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে আরও সাঁয়ত্রিশজন সাক্ষী ছিল।

রেভারেণ্ড গিল ঘটনাস্থলে অর্থাৎ পাপুয়াতে তের বছর ধরে অ্যাংগলিকান মিশনের কর্মী। তাঁর কর্মস্থল সামারাই থেকে প্রায় ৯০ মাইল দূরে গুড এনাফ বে অঞ্চলে পাপুয়ার উত্তর-পূব অংশে। প্রধান কাজ তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে।

ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়া থেকে রিপোর্টাররা যখন তাঁর কাছে যান, তখন সাক্ষাৎকারের সময় স্পষ্টই বলেন, "অসনাক্ত উড়ন্ত চাকি সম্বন্ধে এর আগে ভাবতাম ওটা বুঝি সম্পূর্ণ মানুষের কল্পনাপ্রসূত কিংবা কোনো বৈদ্যুতিক কারণে সংঘটিত যার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। প্রথম খবর পাই আমাদের কাছ থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ট্যাগোরার কাছে ওয়াইমেরায় ডাঃ কেন হৌসটন নাকি দেখেছেন গত নভেম্বরে। ২১শে জুন রবিবার রাত্রে বোইয়ানাইতে যেখানে আমি কাজ করি, সেখানে নাকি কেউ কেউ দেখেছে। আমি দেখতে শুরু করি ২৬ জুন থেকে।

"২৬ জুন ডিনার সেরে বাড়ির বাইরে আসি সন্ধ্যে পৌনে সাতটা নাগাদ। একটু অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকালাম। শুকতারা বা ভিনাস দেখা আমার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। ভিনাস আমি দেখলাম কিন্তু সেই সঙ্গে দেখলাম দপ্-দপ্ করে জ্বলছে আর একটি বস্তু। আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লেগেছিল দপ্‌দপ্ করে জ্বলাটা আর তার আলোটা অসম্ভব উজ্জ্বল—কল্পনাতীত। সমস্ত ব্যাপারটাই অসাধারণ এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। আমার সঙ্গী যারা ছিল, তারাও সকলে দেখল ওই বস্তুটির উপর মানুষের মতো কয়েকজনকে। সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লুম এই অপ্রত্যাশিত দর্শনে। প্রথমেই লোকগুলোকে দেখতে পাইনি। যখন জিনিসটা নেমে এল, কি বলব ৪০০ কি ৪৫০ ফিট বা ৩০০ ফিটের মধ্যে। সে-সময় অন্ধকারে ঠিক বোঝা খুবই শক্ত। তাছাড়া শূন্যে অবস্থিত কোন বস্তুর মাটি থেকে তার উচ্চতা অনুমান করার শিক্ষাও আমার নেই। কিন্তু আমরা সবাই দেখলাম একটা খুব বড় চাকতির উপরে ডেক, তার উপরে মানুষগুলো চাকতির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সবশুদ্ধ চারজন লোক। কখনও দুজনে, তারপরেই একজন। সেও চলে গেল, ফিরে এল তিনজন, তারপর চারজন। আমরা লক্ষ্য করলাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাদের আসা-যাওয়া। এক দুই হল, তারপর তিন; দুজন চলে গেল হল এক, আবার দুই, আবার এক, তিন, চার আবার দুই। ঠিক এমনিভাবে আসা-যাওয়া করছিল। ওদের এই আসা-যাওয়ার সময় আমরা ঘড়ি ধরে লিখে রাখছিলাম। এই দেখুন সকলের সাক্ষী হিসেবে সহি করা রিপোর্ট—অদ্ভুত ধরনের চাকতির উপর মানুষ বা ওই ধরনের কোন জীবের চাকতির ভিতরে ঢোকা আর বাইরে বেরিয়ে আসার সময় নির্ঘণ্ট।

"আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার সেটা হল একটা নীল আলো ঠিক ডেকের মাঝখান থেকে সোজা শিখার মতো শূন্যে উঠছিল। যেন অকাশের গায়ে কোন সার্চলাইটের নীল আলো ফেলছে। লোকগুলো নিচু হয়ে ডেকের উপর কিছু একটা নাড়াচাড়াও করছিল। কখনওবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। তারা ডেকের উপর কিছু নিয়ে যে কাজ করছিল, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সরু নীল সার্চ-লাইটের আলো আকাশে সেকেণ্ডখানেক বা সেকেণ্ড-দুই স্থির হয়ে থেকেই নিভে যাচ্ছিল বা নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই নীল আলোর খোলা ও বন্ধর সময়ের হিসেব রেখেছি সারারাত ধরে।

"যানটি দেখতে একটি প্লেটের উপর আর-একটি প্লেট উপুড় করে রাখলে যেমন দেখায় তেমনি। সেই ওপরের উপুড়-করা প্লেটের উপর আর-একটি গোল বাটি উপুড় করা। যানটির তলায় দুজোড়া করে চারটে পা আছে। সেই পাগুলোকে নড়াচড়া করা যায় না, একেবারে স্থায়ী। অন্য বিমানযানের চাকা যেমন খোলের ভিতর ঢুকিয়ে নেওয়া যায় এর তেমন নয়। পর পর দুরাত্রি আমরা এই দেখেছি। তবে দ্বিতীয় রাত্রে নীল আলোর শিখা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দেখা গিয়েছিল পরপর দুবার।"

রেভাঃ গিলের অনুমান যানটির তলার দিক পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফিট, মাথাটা কুড়ি ফিটের মতন। রিপোর্টারদের প্রশ্ন—"আপনারা কি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন?" তিনি জবাবে বলেন—

"হ্যাঁ, আমরা তা করি। ওদের মধ্যে একটা লোক মনে হল কোন রেলিং ধরে ঝুঁকে আমাদের দেখছিল। আমি মাথার উপর একটা হাত তুলে নাড়ালাম। সেই আকৃতিটাও নাড়াল। যেমন জাহাজের কাপ্তেন পাড়ের লোকেদের হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানায়। রেলিং আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু কোন কিছু দুই হাতে ধরে ঝুঁকেছিল, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। কারণ, কোমরের নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের একজন শিক্ষক অ্যানানিয়াস মাথার উপর দুহাত তুলে নাড়াতে, প্রথম লোকটির পাশের দুজন ঠিক দুহাত তুলে নাড়াল। এরপর আমি আর অ্যানানিয়াস দুজনেই দুহাত তুলে নাড়াই। তক্ষুণি ওদের চারজনই প্রত্যেকে দুহাত তুলে নাড়ায়।"

প্রশ্ন—"এইসব হাত নাড়ানাড়ির সংকেতে স্থানীয় লোকেদের মনে কি ধরনের ভাব হয়?"

"তারা খুবই আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত দুই-ই হয়। মিশনের ছোট ছেলেরা চিৎকার করে তাদের মাটিতে নামার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু তাদের দিক থেকে সে-ধরনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ওদের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই।"

প্রশ্ন—"আমরা শুনেছি আপনারা নাকি টর্চ জ্বালিয়ে তাদের সংকেত করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমরা টর্চ জ্বেলে নাড়াতে সমস্ত যানটি ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলেছিল। আমাদের টর্চ নাড়ার স্বীকৃতি বলেই মনে হয়। যখন আমরা যানটির দিকে টর্চ ফেললাম, ওটা তখন শূন্যে ঘুরে মাটির খুব কাছে নেমে এল। আমরা প্রত্যেকেই আশা করেছিলাম এবার নিশ্চয়ই মাটিতে নামবে কিন্তু তারা তা করল না। এতে আমরা হতাশ হই।"

পাঠকদের শুধু কয়েকটি রোমহর্ষক সংবাদ দিলাম না, চিন্তার খোরাকও দিলাম। এইসব সত্য ঘটনা থেকে অনেক বিজ্ঞানীও চিন্তা করছেন, বহু থিয়োরীও সৃষ্টি হচ্ছে বটে, কিন্তু কেউই কোন কূলকিনারা পাচ্ছেন না।

উড়ন্ত চাকি আছে। অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। গ্রহান্তরে মনুষ্যসদৃশ বুদ্ধিমান জীব যারা প্রযুক্তিবিদ্যায় অসম্ভব অগ্রসর তারা আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর বহুদিন ধরে আসা-যাওয়াও করছে। তবে আমাদের আকাশে ও মাটিতে কোন উদ্দেশ্যে আগমন ও বিচরণ তা বর্তমানে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

উপসংহার টানবো ম্যাকডোনাল্ড অবজারভেটোরির রিসার্চ অ্যাসিস্টান্ট ও নাশার অর্থাৎ ন্যাশনাল এয়ারোনটিকস্ এণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মঙ্গলগ্রহের ম্যাপ আঁকার উপদেষ্টা জ্যাকুইস ভ্যালীর (৭) উক্তি দিয়ে। তিনি বলেছেন, "আমাদের ধারণা, মহাশূন্যে বিচরণ একমাত্র রকেট পরিচালিত যানের দ্বারাই সম্ভব। প্রযুক্তি-বিদ্যার জগতে প্রবেশ করার সম্ভবত তা প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে, কিন্তু শেষ কথা নয়। সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় কেবলমাত্র যন্ত্রচালিত যানের দ্বারাই পৃথিবীর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্য কোন সৌরজগতের কিংবা আমাদের সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহদের মধ্যে যে ব্যবধান, তা দূর করা যাবে এবং যেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এ-জ্ঞান, এ-ধারণা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে, যেমন আজ হয়েছে আমাদের বাপপিতামহের ইথারের ধারণা। অধুনা প্রযুক্তিবিদ্যার কয়েকটি চমকপ্রদ সাফল্যের প্রচারের ফলে আমাদের ভুলিয়ে দিচ্ছে একমাত্র পদার্থবিদ্যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মহাশূন্যে বিচরণের সঠিক চাবিকাঠি, প্রযুক্তিবিদ্যায় নয়। আজকের এই গূঢ় প্রশ্নের সমাধান পদার্থবিদ্যাবিদরা যেদিন খুঁজে পাবেন, সেদিনই বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হবে সহজে গ্রহান্তরে যাওয়া, বিচরণ এবং যোগাযোগ স্থাপন করা।"

---

7. Vallee, Jacques. Anatomy of a Phenomenon, Neville Spearman, London, 1966
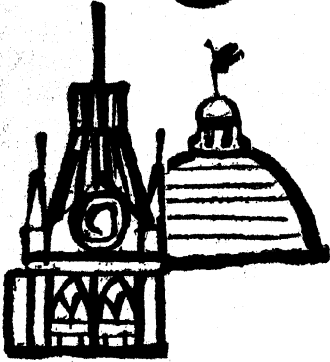
এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকাল-চারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া

প্রথমে নাম ছিল 'এগ্রিকালচারাল সোসাইটি'। পরে 'হর্টিকালচারাল' যুক্ত হয়। ডঃ উইলিঅম কেরী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> "I hope it will ultimately be of great benefit to the country and contribute to prepare its inhabitants for the time when they shall beat their swords into plough shears and spears into pruning hooks".

আলিপুরে পঁচিশ একর জমির ওপর সোসাইটির বাগানটি দেশীবিদেশী প্রতিটি মানুষেরই আকর্ষণের বস্তু। বহু দুষ্প্রাপ্য সুদৃশ্য গাছের সংগ্রহ আছে এখানে। আপেল, কমলালেবু, নেশপাতি, কিশমিশ, পীচফল, আঙুর বিদেশ থেকে এনে উপযুক্ত আবহাওয়ায় চাষ শুরু হয়েছিল। সোসাইটি ভারতে কৃষি উন্নতি ও উদ্যান রচনায় এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। একদিকে যেমন ভারতের খাদ্য সমস্যা সমাধানে দেশীবিদেশী শস্যবীজ এনে গবেষণা চলেছে, অপরদিকে চলেছে ভারতকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলবার সাধনা। অবশ্য সেসব এখন হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস মাত্র।

'এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির' আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের ডঃ উইলিঅম কেরীর নামই সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। কেরী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদ্ভিদ প্রেম। শ্রীরামপুরে ছিল দেশবিদেশী গাছপালায় ভর্তি তার একটি বাগান। ১৮১৪ খৃঃ বন্যার জল এসে এই বাগানটি নষ্ট করে দেয়। বাঙলাদেশের গাছপালা, বাঙলাদেশে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি এবং কৃষি গবেষণায় কেরীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। বোটানিক গার্ডেনের রক্সবারো এবং নাথানিয়েল ওয়ালিচ দুজনই ছিলেন তার বন্ধুস্থানীয়। এই বাগানে কেরী অনেকগুলি দেশী ও বিদেশী গাছপালা দান করেছিলেন। রক্সবারোর উদ্ভিদ সংক্রান্ত তিনখণ্ডের মূল্যবান গ্রন্থও কেরী প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। এই উদ্দেশ্যে ১৮২০ খৃঃ ১৪ সেপ্টেম্বর কেরী টাউনহলে একটি সভা ডেকেছিলেন। বত্রিশজন ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে সভা ডাকা হলেও উপস্থিত ছিলেন মাত্র সাতজন। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং রামকমল সেন উপস্থিত ছিলেন সেদিনের সভায়। কেরী অস্থায়ী সম্পাদক হলেও, রামকমলও সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। লর্ড ও লেডী হেস্টিংস ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। শ্রীরামপুর মিশনের জোসুয়া মার্শম্যান সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৮২০ খৃঃ ২ অক্টোবর তেরজন সদস্য নিয়ে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় তার মধ্যে ছিলেন : রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, জন পামার, জেমস কীড; জোসুয়া মার্শম্যান এবং আরো কয়েকজন। ১৮২২ খৃঃ ২২শে নাথানিয়েল ওয়ালিচ সোসাইটির স্থায়ী সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাধাকান্ত দেব প্রথমদিকে মাত্র এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেরী সম্পাদকপদ ত্যাগ করলেও পরে সভাপতি-হয়েছিলেন।

টিটাগড়ে জমি কিনে সোসাইটি সেখানে উঠে যায়। এই জমিতে নানারকম চাষ-আবাদ সুরু হয়। এদেশের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষি দ্রব্যাদি সম্পর্কে গভীর গবেষণামূলক কাজের সৃষ্টি হয়। ১৮৩৮ খৃঃ থেকে পুস্তক প্রকাশ হতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি হল : "এগ্রিকলচুরেল সোসাইটি হইতে এদেশের কৃষি বৃদ্ধির নানা উপায় বাঙ্গলা ভাষায় সংকলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিতানন্তর প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তক পাঠে কৃষিকারিদিগের ও তদ্বিষয়ে উৎসাহ যুক্ত লোক সকলের বিবিধ উপদেশ প্রাপ্তি হইতে পারিবে। সর্বসাধারণের উপকারার্থে ঐ পুস্তক অল্পমূল্যে এগ্রিকলচুরেল সোসাইটির কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহারা প্রয়োজন হয় উক্তস্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। তৃতীয় খণ্ড অবধি প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য দুই আনা মাত্র ই, এফ, ক্রোইস্ট। আসিস্টান্ট সেক্রেটারি।"

সাময়িকপত্রে এখানকার সভায় কৃষি-বিষয়ক আলোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি মুদ্রিত হোত। ১৮৪২ খৃঃ সোসাইটির মুখপত্র 'মন্থলি জার্নাল' প্রকাশিত হয়। কৃষিদ্রব্যের বাৎসরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল।

টিটাগড়ে সাত বৎসর থাকবার পর সোসাইটির বাগান উঠে আসে আলিপুরে। এই জমি এবং আক্রায় পরীক্ষা কাজের জমি সরকার থেকে পাওয়া। কৃষিদ্রব্যের বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হোত। এর থেকে উৎপন্ন ফসল প্রদর্শনীতে নিয়ে আসা হোত এবং শ্রেষ্ঠ চাষীকে পুরস্কৃত করা হোত। সোসাইটির উপযুক্ত ও সার্থক কার্যক্রম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকার বাৎসরিক দশ হাজার টাকা সাহায্য দিতে রাজী হন।

১৯০০ খৃঃ মধ্যে সোসাইটির নাম বহুদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙলাদেশের মধ্যে কয়েকটি স্থানে শাখা স্থাপিত হয়। তাছাড়া মীরাট, লক্ষ্নৌ, মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর, দানাপুর, বাঙ্গালোরেও শাখা স্থাপিত হয়েছিল। বাঙলা ও ভারতের বাইরের কৃষি-দ্রব্য এখানে নিয়ে আসা হয়। সোসাইটি যখন বোটানিক গার্ডেনে তখন দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৮৫২ খৃঃ সিনকোনা গাছ চাষের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। এদেশে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য কুইনাইন অত্যাবশ্যক। এই সিনকোনা গাছ থেকেই কুইনাইন পাওয়া যাবে। বোটানিক গার্ডেনে সিনকোনার চাষ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৬১ খৃঃ থেকে। তাছাড়া সোসাইটির চেষ্টায় আমেরিকা থেকে তুলা ও শস্যবীজ, পশ্চিম আফ্রিকা চীন ও ম্যানিলা থেকে শস্যবীজ, মরিসাস থেকে ইক্ষু, উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ফুলকফির বীজ এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে তুলারবীজ, যব, নানা-রকমের ধানের বীজ এনে চাষাবাদ সুরু হয়। পাটনায় ফুলকফির চাষ সফল হয়। এই সমস্ত শস্যের বীজ চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হোত।

সোসাইটির সমস্ত টাকা পয়সা ছিল 'আলেকজাণ্ডার কোম্পানী'-তে। এই এজেন্সী হাউসই ছিল সেকালের ব্যাংক। ১৮৩৩ খৃঃ হাউসটি ফেল পড়ায় সোসাইটির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। আলিপুর ও আক্রার জমি সরকার নিয়ে নেন। কিন্তু সোসাইটির উদ্যোগীরা নীরব হয়ে গেলেন না। ১৮৩৬ খৃঃ শিবপুরে বোটানিকগার্ডেনে দু'একর জমিতে তারা আবার কৃষি কাজ সুরু করেন। পরে

গার্ডেনের কর্তৃপক্ষ সোসাইটির কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আরো তেইশ একর জমি দেন। এখানে চল্লিশ বৎসর ছিল সোসাইটি। তারপর উঠে আসে বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাশের জমিতে। ১৮৭২ খৃঃ সরকার এই জমি সোসাটিকে দেন। সর্ত ছিল যতদিন সোসাইটি থাকবে ততদিন জমি তারা ভোগ করতে পারবে।

সোসাইটির ছিল বিরাট লাইব্রেরী মিউজিঅম অফিস। স্ট্রান্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রীটের সংযোগস্থলে মেটকাফ হলে ছিল এই তিনটি বিভাগ। এই ভবনটি ভারত হিতৈষী মেটকাফের স্মৃতিতে নির্মিত হয়। ভবন নির্মাণের তিনভাগের একভাগ টাকা দিয়েছিল সোসাইটি ১৮৪৪ খৃঃ। ১৯০০ খৃঃ একতলাটি সোসাইটির অধিকারে ছিল। ইতিমধ্যে সরকারী কৃষিবিভাগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। ফলে সোসাইটি সরকারী আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। নিজস্ব আয়ে সোসাইটির বিস্তৃত কার্যক্রম অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর ১৯০০ খৃঃ পাবলিক লাইব্রেরী (পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী)-র জন্য সমগ্র মেটকাফ হলটি নিয়ে নেওয়া হয়। সোসাইটিকে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হয় এর জন্য। সোসাইটি আলিপুরের জমিতে উঠে আসে এবং ঠিক হয় সরকার বৎসরে ছয় হাজার টাকা সাহায্য দেবেন। এতদিন সোসাইটি নিজের কর্মধারা অনেকটা বিস্তৃত রেখেছিল। এবার তার সংক্ষেপকরণ ঘটতে থাকে। ফুল উৎপাদন এবং উদ্যান-রচনা পুষ্পসজ্জা ও বিতরণ কাজটিই মুখ্য হয়ে পড়ে। একসময় যে সোসাইটির উদ্যানে উন্নত ধরনের চাষ নিয়ে গবেষণা চলেছে, সিনকোনা, তামাক, গোল আলুর উন্নত ধরনের চাষাবাদ পরীক্ষিত হয়েছে কালক্রমে তার রূপও পরিবর্তিত হয়েছে।

বর্তমান উদ্যানে বিড়লা ব্রাদার্স এর দানে একটি ল্যাবরেটরী ও চারটি গ্লাস হাউস তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত গ্লাস হাউসে আবহাওয়া সংরক্ষণ করে উদ্ভিদ গবেষণা সম্ভব। তাছাড়া চারাগাছ, বীজ সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য কয়েকটি গ্লাস হাউসও আছে।

শেঠ সুখলাল কারনানী হসপিটাল

কলকাতার তখন পত্তন হচ্ছে। দলে দলে সাহেবেরা আসছে বিলেত থেকে বিদেশের জল হাওয়ায় বিশেষ করে বাংলাদেশের স্যাঁতস্যাঁতে জলবাতাস সাহেবদের সহ্য হোতনা একেবারে।

ম্যালেরিয়া আমাশয় প্রভৃতি রোগে সাহেবেরা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে মারা যাচ্ছে, তখন কলকাতায় একটি হাসপাতালের প্রয়োজন পড়ল। কলকাতার ইংরেজরা কোম্পানীর কাছে আবেদন জানাল একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য। কোম্পানী পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পাশে হাসপাতাল তৈরীর জন্য দু'হাজার টাকা মঞ্জুর করে। কলকাতা বন্দরে আগত বাণিজ্যকামী সকল শ্রেণীর জাহাজ বা নৌকা হাসপাতাল নির্মাণে চাঁদা দেবে। কলকাতার অধিবাসীদের চাঁদা দান করতে হবে। এই মর্মে কোম্পানী যে নির্দেশ জারী করে তা কার্যকরী করবার দায়িত্ব পড়ে কোম্পানীর কর্মী মিঃ আডামের ওপর। কলকাতাবাসীদের দেয় চাঁদার পরিমাণ কম ছিল না। দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের অর্থদান কম না হলেও দেশীয়দের চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে হয়নি।

জব চার্নক বা বেগম জনসনের সমাধির ওপর দিকে ১৭৫ ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট প্রস্থ হাসপাতালটি নির্মিত হয়েছিল ১৭০৭ খৃঃ। এখানে সি-এম-পিও-র অফিস হয়েছে। গার্স্টিন প্লেস নামে জায়গাটি এখন পরিচিত। ইউরোপীয়দের জন্য নির্মিত এই হাসপাতালটি ছিল একটি
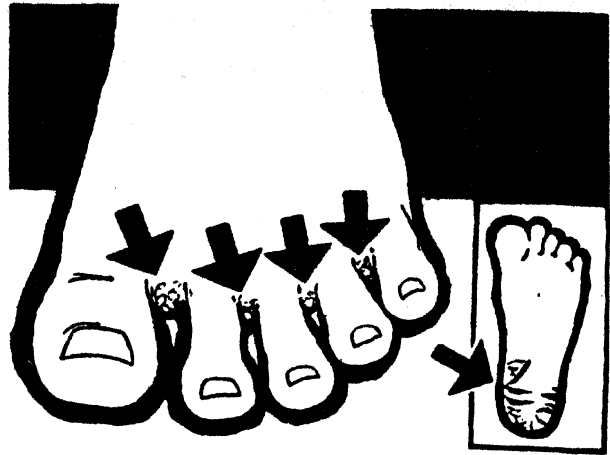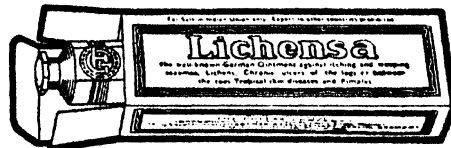
এস এস কে হাসপাতালের প্রবেশপথে সার রোনাল্ড রসের প্রতি সম্মানসূচক উৎকীর্ণ বাক্য

একতলা বাড়ীতে। ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের বিবরণে পাওয়া যায় :

> The company has a pretty good hospital at Calcutta, where many, go into undergo the penance of physic, but few came out again to give account of its operation.

হাসপাতালে এই ছিল চিকিৎসার অবস্থা। ডাঃ উইলিয়ম হ্যামিলটন, ডাঃ রিচার্ড হার্ভে হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ১৭১৩ খৃঃ ২০ অগাস্ট কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করেন। নিয়মগুলি ছিল :

১। তিরিশটি তক্তপোশ—বিছানা, কুড়িজন রোগীর উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ কোম্পানী দেবে;

২। যে সকল সৈনিক অসুস্থ এবং অবিবাহিত তারা হাসপাতালে থাকবে;

৩। হাসপাতালে প্রত্যেক সৈনিক চার আনা, করপোরাল ছয় আনা, সারজেন্ট আট আনা দেবে প্রতিদিনের পথ্যের খরচ বাবদ ;

৪। একজন সৈনিক থাকবে, রোগীদের বাইরে যাতায়াত বন্ধ করবার জন্য;

৫। ঐ সৈনিক হাসপাতালে যাতে মদ প্রবেশ করতে না পারে তাও দেখবে;

৬। একজন স্টুয়ার্ট নিযুক্ত করা হোল তিরিশ টাকা বেতনে। সে রোগীদের বিছানা ও জামাকাপড় সরবরাহ করবে।

অসুস্থ সৈনিক আর নাবিকেরা শহরে গিয়ে সেখানকার সুস্থ মানুষদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলত। তাদের শহরে প্রবেশ বন্ধ করবার জন্য ১৭১০ খৃঃ হাসপাতালটিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।

১৭৩০ খৃঃ হাসপাতাল সংস্কার করতে ১০২০ টাকা ৭ আনা ৬ পাই খরচ হয়। রোগীদের জন্য তক্তপোশের ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৭৫২ খৃঃ এর পর। আগে ব্যবহার করা হোত কিছুটা উঁচু এক ধরনের বিছানা (অনেকটা রেলের বাঙ্কের মত)।

১৭৩৬ খৃঃ হাসপাতালটি দুতলা নির্মিত হলে ডিসপেন্সারী ও ডাক্তারদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা হয়। এর আগে ডাক্তাররা সবসময় হাসপাতালে থাকতেন না। ডাঃ উইলিঅম জেমস, ডাঃ উইলিঅম হ্যামিলটন, ডাঃ রিচার্ড হার্ভে, ডাঃ উইলিঅম ফ্লাটন, ডাঃ জর্জ গ্রে ছিলেন হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত।

কোম্পানীর সাহায্য ও রোগীদের প্রদত্ত অর্থের থেকেও অনেক বেশী খরচ হওয়ায় কোম্পানী কাউন্সিলের একজন সভ্যকে হাসপাতালের খরচের ওপর নজর রাখবার দায়িত্ব দেয়। কোম্পানী ডাক্তারের বেতন, ওষুধের দাম দিত আর রোগীরা দিত প্রাত্যহিক পথ্যের খরচ। ১৭৫৬ খৃঃ সিরাজদৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। সে সময় হাসপাতালটি ধ্বংস হয়।

কলকাতায় লোকসংখ্যা অসম্ভব বেড়ে উঠেছে। রোগের ও রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে, ফাঁকা জায়গায় আরও বড় আকারে হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা হোল।

১৭৬৮ খৃঃ লোয়ার সার্কুলার রোডে দুটো বাড়ী কেনা হয়। একটি বাড়ী ছিল সুইডিস মিশনারী রেভারেন্ড জন জ্যাকেরিয়াসের। নতুন হাসপাতালের ছিল প্রেসিডেন্সী জেল। হাসপাত নাম হল প্রেসিডেন্সী জে হসপিটাল। ১৭৭০ খৃঃ নবা হাসপাতালে রোগী ভর্তি শুরু হয়। একমাত্র ইউরোপীয়দের প্রবেশাধিকার ১৭৯৫ খৃঃ এর সংস্কার করে পা করা হয়। এখন যে বৃহৎ বাড়ীটি ব তা নির্মিত হয়েছিল ১৮৯৮ খৃঃ বৎসরই পুরোনো বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে বাড়ী তৈরী করা হয়। ইউরোপ চিকিৎসকদের জন্য নির্মিত হাসপাতালটির খ্যাতি বিশ শতকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

লোয়ার সার্কুলার রোড ঢোকবার মুখে লেখা

> In the small laboratory tov to the south-east of this Surgeon-Major Ronald I.M.S., in 1898 discovered manner in which malaria is veyed by mosquitoes".

ম্যালেরিয়া যেকি সাংঘাতিক ব্যাধি এখনকার মানুষের কাছে তা অকল্প লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেত এই রোগে।

আর একটি গেটে রোনাল্ড নিজের লেখা

> This day relenting God
> Hath placed within my hand
> A wonderous thing and God
> Be praised at His Command.
> Seeking His secret deeds
> With tears and toiling breath
> I find thy cunning seeds
> O million murdering death.
> I know this little thing
> A myriad men will save.
> O death where is thy sting
> Thy victory! O grave?

আর একজন চিকিৎসকের নাম স্ম যোগ্য। ১৮৪৯ খৃঃ তিনি ছিলেন বা ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ হসপিট এডওয়ার্ড হেয়ার। জ্বর এবং আম রোগ সম্পর্কে তিনি একটি পু প্রকাশ করেন, সেটি লর্ড ডালহৌ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেসিডেন্সী জেনা হাসপাতালে একটি ওয়ার্ডে হেয়ারের গ ষণার ব্যবস্থা করে দেন ডালহৌসি। কুইন আবিষ্কার করে তিনি জ্বর ও আমা নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন। তখন ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরস লর্ড ডালহৌসি ভারতে সিনকোনা চা জন্য ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ জা পত্র লেখেন।

এখানে আছে চৌদ্দটি ওয়ার্ড বাহা কেবিন। শিশুদের জন্য আছে একটি বি বিভাগ। খাওয়াদাওয়া ও খেলার সু ব্যবস্থা আছে এখানে।

উনত্রিশটি বড় বাড়ী উদ্যান রাস্তা সমেত হাসপাতালটি প্রায় ৮২ একর জ ওপর অবস্থিত। নার্স, হাউসসার্জে ভিজিটিং ডকটর, আর্দালি, আয়া সমেত দেড় হাজার লোক এখানে কাজ করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

খোটে খাই—ষোল আনা তৃপ্তি চাই!
নির্বাচনী গরমে
১ নির্বাচনী গরম বলছেন? আমার তো এদিকে রোদে ঘুরে সর্দিগর্মী হবার যোগাড়। তবে সাংবাদিকদের হালই এই।
আরে বসুন মশায়—দুদণ্ড জিরিয়ে নিন। এক কাপ চা? আর এই নিন, একটা সিজার্স ধরান। আমার আবার সিজার্স ছাড়া চলে না। খাসা সিগারেট!
২ আমিও তো সিজার্সেরই মক্কেল। সত্যি, সিজার্স ধরার আগে সিগারেটে যে এত তৃপ্তি তাই জানতাম না।
হবেই তো—সিজার্সের স্বাদই আলাদা—অন্য কোনো সিগারেটেই এমন স্বাদ পাবেন না। সেইজন্যেই সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়।
W.D. & H.O. WILLS
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
৩৮ পয়সায় ১০টি
সিজার্স-এর
স্বাদই আলাদা—
সব সময় তৃপ্তি দেয়
JWTS 2050

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

২০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 16th September, 1966 শুক্রবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

খৃষ্টবাণীর বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

যিশু খৃষ্টের একটি বিখ্যাত বাণী অনেকেই জানেন এদেশে এবং দীর্ঘকাল ধরে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এই উক্তিটিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনায়। উক্তিটি হচ্ছে—

It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a Rich man to enter into tne Kingdom of God !

এর মানে বাংলা ভাষায় এই দাঁড়িয়েছে—একটি উটের পক্ষে সূচের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে গলে যাওয়া যদিও বা সম্ভব একজন ধনী ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ সম্ভব নয়। এই অর্থেই বাণীটিকে ব্যবহার করা চলেছে—ব্যবহার করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। (রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খন্ড। জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৩২০)। দুই পুরুষ নাটকে নুটু মোক্তারের জীবনেও বাণীটির তাৎপর্য এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন শ্রদ্ধেয় তারাশংকরবাবু। প্রথমেই খটকা লাগে হঠাৎ উটের উপমা এলো কেন একটা সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে? এর বদলে দাঁড় কিংবা কাছির উপমা অধিকতর শোভন ও সঙ্গত হত না কি? যিশু খৃষ্টের বাণী প্রধানত নিরক্ষর অশিক্ষিত জনসাধারণের উদ্দেশেই প্রচারিত। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই এমন উপমা ব্যবহার করেছেন যা সাধারণ মানুষেরই ধারণাযোগ্য। শোনা যায় পূর্ব জীবনে যিশু খৃষ্ট নাকি ছুতোরের কাজ-কর্ম করেছিলেন। তাই মনে হয় সূত্রধরের জীবনের সঙ্গে জড়ানো নানা ব্যাপারই তো উপমা হিসেবে চলতে পারতো, তার বদলে সীবনশিল্পীর যোগ্য উপমা এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল কেন? কিন্তু সব চাইতে মুস্কিল হয়েছে এই সুন্দর নীতি ব্যাখ্যায় কিম্ভূতকিমাকার উষ্ট্র নামীয় জীবটির অস্বস্তিকর উপস্থিতিতে। সামান্য রজ্জুতেই যেখানে কাজ চলতো সেখানে উষ্ট্রের আমদানী কেন?

আমার মনে হয় বঙ্গানুবাদে এই উক্তিটির প্রথমাংশের বরাবরই ভুল অর্থ করা হয়েছে এবং এর যে অন্যতর মানেও থাকতে পারে সে বিষয়ে নজর হয়তো অনবধানতাবশতই এড়িয়ে গেছে এতকাল। অভিধানে দেখা যাচ্ছে Needle এর একটি অর্থ Mountain Peak অর্থাৎ পর্বতশিখর। eye শব্দটারও আভিধানিক অর্থ পাওয়া যাচ্ছে entrance of a mine, a round hole ইত্যাদি। তাই মনে করা যেতে পারে eye of a needle আসলে পর্বতশিখরে অবস্থিত গুহা—যেখানে ধার্মিকদের উপাসনাস্থল অথবা পথক্লান্ত মুসাফিরদের বিশ্রামস্থল থাকাটা যিশু খৃষ্টের মরুময় পর্বতসংকুল দেশে মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পর্বতশিখরের গুহা নিশ্চয়ই আকারে ছোট হওয়াতে পথচারীদের বাহন উটগুলিকে বাইরেই অবস্থান করতে হত যদিও ভেতরে পরিশ্রান্ত মানুষগুলোর পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার উপকরণের অভাব ছিল না। এরই পরি-প্রেক্ষিতে উক্ত বাণীটিকে বিচার করলে মনে হয় যিশুখৃষ্ট খুব সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ উপমা দ্বারাই তাঁর উপদেশটি দিয়েছেন। তিনি হয়তো বলছেন ওই পর্বত শিখরের সংকীর্ণ গুহায় উটের প্রবেশ লাভ যদিও বা ঘটে একজন ধনী ব্যক্তি কখনোই ভগবানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। পরিশ্রান্ত পথিকদের আশ্রয়স্থল পর্বত-গুহার সঙ্গে ভগবানের রাজ্যের তুলনা এখানে করা হতে পারে। আমার মনে হয় এই অর্থেই কেবল উটের উপমার যথার্থ্য রয়েছে। আশা করি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে মূল বাণীটির অনু-মোদিত ব্যাখ্যা সহযোগে এই বহু প্রচলিত অথচ সম্ভবত ভ্রান্ত বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ইতি—

সত্যবন্ধু ঘোষ দস্তিদার,
জলপাইগুড়ি।

অভিনেত্রী তারাসুন্দরী প্রসঙ্গে

শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন "জনা" নাটক মঞ্চস্থ করেন মনোমোহন নাট্যমন্দিরে, তখন দেখা গিয়েছিল নাম-ভূমিকায় নাট্য-সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী পূর্বপ্রচলিত ধারায় সুরেলা অভিনয় করছেন, কিন্তু শিশির-কুমার সমেত অপর সকলেই জনার গৈরিশ ছন্দকে শিশিরকুমার প্রবর্তিত কাটা কাটা ভঙ্গীতেই আবৃত্তি করছেন। শোনা যায়, মহলা চলার সময়ে শিশিরকুমার বার কয়েক চেষ্টা করেছিলেন তারাসুন্দরী যাতে নতুন বাচনভঙ্গী গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত ভঙ্গীকেই আঁকড়ে ছিলেন শেষ পর্যন্ত।

'জনা'র পরে তারাসুন্দরী যে নাটকে 'সাকী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, সেটি হচ্ছে ব্যারিস্টার শ্রীশ বসু রচিত "পুন্ডরীক"; নাটকখানি 'হাঞ্চ ব্যাক অব নোতরদেম' অবলম্বনে লিখিত। 'পাষাণী' হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিত পৌরাণিক নাটক—অহল্যা, গৌতম, ইন্দ্র প্রভৃতির কাহিনী।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৪৫

বেতারশ্রুতি

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত'র 'বেতারশ্রুতি' বিভাগে 'আকাশ-বাণীর' অনুষ্ঠান এবং তার পরিচালনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনুষ্ঠানের সামগ্রিক মান উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা পড়ে আশান্বিত হয়েছি। কয়েক ক্ষেত্রে এই সমস্ত আলোচনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। তাই আমিও উৎসাহিত হয়ে আমার কিছু বক্তব্য রাখছি।

আকাশবাণীর নির্ধারিত অনুষ্ঠান-গুলির হঠাৎ সময় পরিবর্তনের কোনও সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাই না। 'অনুরোধের আসর' শনিবারের পরিবর্তে হঠাৎ বুধবার রাত্রে নিয়ে যাওয়া হল কেন? আর একটা কথা আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ, 'অনুরোধের আসরে' শ্রোতাদের পছন্দ-মাফিক গান বাজিয়ে শোনাচ্ছেন এটা আমাদের কথা এবং এজন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ-কারী 'দশজনের' নাম বলার কি প্রয়োজন? আমরা নিজেদের নাম শোনার চেয়ে আমাদের প্রিয় শিল্পীর নাম শুনতে, আরও দু-চারটি গান বেশী শুনতে ভালবাসি।

আমার মনে হয়, 'অনুরোধের আসর'-এর সময় অনুরোধকারীদের নাম ঘোষণা করার চেয়ে, শিল্পী, গীতিকার এবং সুরকারের নাম ঘোষণা করা উচিত। এতে তাঁদের প্রত্যেককেই তাঁদের কৃতিত্বের জন্য যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। আর এতে সময়েরও খুব ইতরবিশেষ হবে বলে মনে হয় না।

আশা করব, কর্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যাপারটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন।

নমস্কারান্তে—

চুনীলাল রায়।
কলকাতা।

'অন্যভুবন' প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ 'অন্য-ভুবন' নামে যে সমস্ত ছোট ছোট নক্সা প্রকাশিত হচ্ছে তা যেমন বাস্তবধর্মী তেমনি হৃদয়-গ্রাহী। জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কঠোর পরীক্ষাই যে পার হতে হয় তার সুন্দর অভিজ্ঞতা লেখক প্রতি সপ্তাহে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা এক এক সময় জানতেও পারি না যে, আমাদের হাতের কাছেই একটা গোটা বই রয়েছে, সেটার নাম জীবন। সবিতা, লোরা, মধুমিতা, মণিমালা এরা যেন লেখকের লেখনীমুখে স্ব-স্ব মহিমায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের জীবিকানির্বাহের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত যে সংগ্রামের মুখোমুখী হতে হচ্ছে 'অন্য-ভুবন'-এর রচনাগুলির মধ্যে তা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতিফলিত। যারা আমাদের চোখের সামনে ছায়া-ছবির মতো চলে যায়, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-অশ্রু বিজড়িত তাদের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন। এই স্কেচগুলি প্রকাশের জন্যে লেখককে এবং আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

বিনীত—
মঞ্জুলা চক্রবর্তী
হাফলং, আসাম।

বাইরের উদ্বেগ

বিষয়টি নিয়ে আগে আমাদের ভাবতে হয়নি। ইংরেজের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে ছিল দিগ্বিদিকে। তাদের প্রয়োজনেই ভারতবর্ষ থেকে অনেক মানুষ নিয়ে যাওয়া হত বাইরে। এইভাবে গড়ে উঠেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ফিজি, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমাজ। এছাড়াও সিংহল, বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি এশিয়ার প্রতিবেশী দেশে অনেক ভারতীয় গিয়েছিলেন জীবিকার সন্ধানে। তাঁদের অনেকেই আর দেশে ফেরেন নি। সেই দেশকেই আপন ভেবে রয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজের রাজত্ব গেছে, বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ভারতের বাইরে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নিয়ে সুরু হল নতুন সমস্যা। অনেক বৎসর অপেক্ষার পর, সিংহল ও বর্মার সঙ্গে সম্প্রতি একটা বোঝাপড়া হয়েছে। বর্মী সরকার ভারতীয়দের বিতাড়ন করেছেন। আমরা ভাল মানুষের মতো বিনা প্রতিবাদে তাঁদের গ্রহণ করেছি। তবু রক্ষা, সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিল না। কোনোরকমে তাদের জন্য জায়গা করা গেছে।

সিংহলের সঙ্গেও একটা চুক্তি হয়েছে যার ফলে দফায় দফায় সেখানকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের আমরা নিয়ে আসতে বাধ্য থাকব। তাদের আগমন এখনও সুরু হয়নি। হলেই বোঝা যাবে আমাদের অর্থনীতিতে তারা কতখানি বোঝা নিয়ে আসবেন। ভাগ্য ভাল আমাদের মালয়ের ভারতীয়রা সেই সমাজের সঙ্গে কার্যত মালয়ী হয়ে গেছে। তামিলকে মালয়েশিয়া সরকার অন্যতম সরকারী-ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই আমরা আশা করতে পারি যে, আপাতত এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে বাড়তি ও সে-দেশে অবাঞ্ছিত জনসংখ্যার বোঝা আমাদের দেশে এসে পড়বে না।

কিন্তু বিপদের আশংকা আসছে অন্য দিক থেকে, যে বিষয়ে আমরা এতদিন মোটেই চিন্তা করিনি। সেই দেশের নাম কেনিয়া। কেনিয়াতে প্রায় দু'লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বাস। আফ্রিকানদের ভাষায় এরা এশীয়। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর সূত্র ধরে বহুদিন আগে পূর্ব আফ্রিকায় গিয়েছিল। এদের অধিকাংশই বৃটিশ পাশপোর্টধারী। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ এদের সামান্য। কেনিয়া স্বাধীন হবার পর এদের কিছু সংখ্যক কেনিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। অনেকেই তা করে নি। কিন্তু এদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্বও অনেকের নেই। অথচ দায় এসে পড়ছে ভারতের ওপর। কারণ, ভারতীয় রক্ত আছে এদের গায়ে।

কেনিয়া তথা আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের ভূমিকা ছিল সংগ্রামী সমর্থকের। বর্ণ-বিদ্বেষ ও জাতি-বিদ্বেষের শিকার হয়ে আফ্রিকানদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কাছে। তাই এ আশা সকলেই করেছিলেন যে, নতুন স্বাধীন আফ্রিকায় আর যাই হোক জাতিত্বের ভিত্তিতে কোনোরূপে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। সম্প্রতি কেনিয়া সরকারের আচরণে কিন্তু ভারতের পক্ষে নতুন উদ্বেগ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে। গত কয়েক বৎসর ধরেই তারা বলছিলেন যে, এশীয়রা রাষ্ট্রের প্রতি যথেষ্ট অনুগত নয়; তারা আফ্রিকানদের সমান মর্যাদার চোখে দেখে না এবং আফ্রিকান সরকারের প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ নেই। ভারত সরকার যথাসময়েই পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে আফ্রিকান সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বসবাস করার। এদের অনেকেই দেখা গেছে, সে নির্দেশ পালন করে নি। বৃটিশ পাশপোর্টের ওপর ভরসা করে কমনওয়েলথের নাগরিকরূপে তারা সেখানে আছে। কিন্তু মূলত যে তারা কেনিয়ান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আইনের সূক্ষ্ম তর্ক তুলে এদের সম্পর্কে যে রায়ই দেওয়া হোক না কেন, কেনিয়ার আইনকানুন মানতে তারা বাধ্য। এবং যেহেতু এরা ভারতের নাগরিক নয়, আইনত তাদের দায়িত্বও ভারতের নয়।

কিন্তু কেনিয়া সরকার এদের দায়-দায়িত্ব ভারতের ওপরেই অর্পণ করতে চাইছেন। সম্প্রতি কেনিয়া সরকার ছয়জন এশীয়কে বিনা বিচারে কেনিয়া থেকে বহিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে চারজন বৃটিশ পাশপোর্টধারী অর্থাৎ আইনত বৃটিশ নাগরিক। বাকী দু'জন কেনিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেনিয়া সরকার এদের ভারতে পাঠিয়ে দিলেন যেহেতু এরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এ নিয়ে কেনিয়ায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাতে কোনো ফল হয়নি। উপরন্তু কেনিয়ার সংবাদপত্র ও সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতারে গোটা ভারতীয় সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক। কারণ, ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটা অসম্ভব নয়। এবং এমন একদিন আসতে পারে যখন গোটা ভারতীয় বংশোদ্ভূত সমাজকেই কেনিয়া সরকার অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারেন অথবা তাদের ওপর এমন বাধানিষেধ আরোপ করবেন যাতে তাদের পক্ষে সম্মান নিয়ে সে দেশে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কেনিয়ার দেখাদেখি আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রও যদি অনুরূপ মনোভাব দেখাতে সুরু করে তাহলে ভারতের উদ্বেগ যে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, তা বলাই বাহুল্য।

বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই মনোভাবের কারণ যতটা রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী থেকে ভারতীয়দের বিতাড়ন আফ্রিকানদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠছে। কিন্তু এই নীতি জাতিবৈষম্যমূলক। যে আদর্শ ও সত্যের জন্য আফ্রিকানরা সংগ্রাম করেছেন এবং ভারতবর্ষ জানিয়েছে তাদের সমর্থন আজ নিজেদের স্বার্থের জন্য সেই আদর্শ জলাঞ্জলি দিলে নতুন আফ্রিকার পক্ষে তা হবে গর্হিত। তাই আফ্রো-এশিয়ার সামগ্রিক সংহতির স্বার্থেই এই বৈষম্য-নীতির অবসান বাঞ্ছনীয়। আশা করি ভারত সরকার বিপদের প্রথম সংকেত থেকেই ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হবেন এবং কেনিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্যা অচিরে স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য অগ্রণী হবেন।

বিচিত্র চিত্র

জটিল ডাক্তার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূম জেলায় লাভপুর থানার উত্তরসীমা বরাবর বেয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী নদী। নদীর ওপারটা হল ময়ূরেশ্বর থানার এলাকা কিন্তু খানিকটা ফালি অংশ আছে সেটা লাভপুর থানার অন্তর্গত। গনুটিয়া গ্রামখানা নদীর এপারেও আছে ওপারেও আছে।

গনুটিয়া গ্রামখানার পুরনো কালে নামডাক ছিল। বললেই চিনতে পারত। গনুটিয়ার রেশমকুঠী বাংলাদেশের সবথেকে বড় রেশমকুঠী না হোক, সবথেকে বড়গুলির অন্যতম ছিল। এক হাজার ঘাই—অর্থাৎ গরম জলের ডাবা ছিল—যাতে ডুবিয়ে রেশনগুটিগুলোর ভিতরের পোকা মেরে ফেলত এবং ফুলে-ওঠা গুটি থেকে রেশম-সুতোর প্রান্ত বের করে লাটাইয়ে গুটিয়ে নিত।

এসব বাহ্য কথা। কুঠী অনেক কাল উঠে গেছে। অনেক কাল। সে বোধ হয় দশ-এগার সালে। তারপর কিনেছিল জমিদারেরা যজান পাঁচথুপীর সিংগীবাবুরা। কুঠীর কোম্পানীর সাত-আটখানা গ্রাম জমিদারী ছিল। জমিদার কুঠীবাড়ীর ভিতরটায় নারকেলের গাছ লাগিয়েছিলেন। এক হাজার নারকেল গাছ। যার থেকে বছরে নির্ঘাৎ পাঁচ হাজার টাকা আয় হবে। তারপর জমিদারের হাত থেকে কুঠীবাড়ীটা কিনেছে জটিল ঘোষ ডাক্তার।

জটিল ঘোষ বীরভূমের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের ধন্বন্তরী। শুধু বীরভূম কেন মুর্শিদাবাদের একটা অংশ—ওদিকে কাটোয়া অঞ্চল থেকে কঠিন রোগী নিয়ে লোকেরা দেখাতে আসে। এবং ভালও হয়ে যায়। মেডিকেল কলেজ থেকে পালিয়ে গিয়ে রোগী জটিল ডাক্তারের কাছে গেছে এমন অনেক ক'জনকে পাওয়া যাবে।

মেডিকেল কলেজে জটিলের কেরিয়ার অসাধারণ। একই সময় এক বছর অন্তর দুটি বীরভূমের ছেলে মেডিকেল কলেজে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। জটিল ঘোষ আর কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেদিন বেলা তখন দশটার কাছে—একখানা গরুর গাড়ী এসে নামল ময়ূরাক্ষীর ঘাটে। গ্রীষ্মকাল, রোদ চড়ে গেছে। বালি খুবই তেতে উঠেছে। এবং প্রখর রোদের সময় অনাবৃষ্টিতে বালির রাশ জলের অভাবে বেশী ঝুরঝুরে হয়েছে, চাকা বসে যাচ্ছে—গরুদুটোর মুখে ফেনা ভাঙছে। চাকা চলছে অত্যন্ত মন্থর পাকে-পাকে। হঠাৎ গরুদুটো বেশ যেন ব্যগ্র হয়ে টান দিলে এবং ময়ূরাক্ষীর ক্ষীণ জলধারায় এসে দাঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট করে জল খেতে শুরু করলে। গাড়ীর ভিতরে একটি রোগিণী, সংগে একটি বাচ্চা এবং অভিভাবক তাঁর স্বামী।

মেয়েটি বললে—আমিও জল খাব একটু, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

—এই জল? গ্রীষ্মকালে নদীর জল কম—এ সময় কলেরা-টলেরা হয় (সময়টা ১৯৩০ সালের কাছের সময়)।

—কিন্তু বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। জল ফুরিয়ে গেছে কখন—

সত্যই পিছনে গ্রাম গনুটিয়া কুঠীবাড়ীর ওপারে। এদিকে গ্রাম নদীর ওপারে গনুটিয়ায় বা ভোগপুরে। গনুটিয়ার এক অংশ এবং ভোগপুর পাশাপাশি গ্রাম—ভোগপুরেই ডাক্তার জটিল ঘোষের বাড়ী। ঘন বাঁশবন আর গাছপালার জঙ্গলের মধ্যে ডাক্তারের বাড়ী, টিনের চাল, মাটির দেওয়াল। বাইরে পাকা পাঁচিল।

এমন সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। কুঠীবাড়ীর ঘাটে নেমে একটি লোককে এক কাঁদি ডাব কাঁধে নিয়ে আসতে দেখা গেল। পুরুষটি বললে—ওই হয়েছে। ওই লোকটি ডাব আনছে, ওর কাছ থেকে একটা ডাব কিনে নি।

বেশ শক্ত চেহারা, একটু মাথায় খাটো, চাষী মানুষ, মালকোঁচা করে কাপড় পরে মাথায় গামছা বেঁধে এক কাঁদি ডাব নিয়ে আসছিল। খালি গা, খালি পা; পেশী-বহুল চেহারা। আমাদের দেশে বলে আঁটির মত চেহারা।

লোকটি কাছে আসতেই এরা বললে—আমাদের একটি ডাব দাও বাবা, যা দাম হয় নাও। বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। পুরানো রোগী, বড় কাতর হয়েছে। কিন্তু কেটে দিতে হবে বাবা।

লোকটির কাছে কাটারী ছিল। ডাব কেটে দিয়ে বললে—কোথায় যাবে?

—জটিল ডাক্তারের বাড়ী। দেখাতে এসেছি অনেক দূর থেকে। বেঁচে থাক বাবা, কত দাম দেব বল।

—এ-ডাব ডাক্তারেরই। ওর কাছেই দামটা দিয়ো। এখানে দাম নিলে ডাক্তার বকবে।

—তুমি বুঝি তারই লোক?

—হ্যাঁ। তবে তোমরা এস—আমি চলি! ওখানে দেখা হবে। চলে গেল সে।

গল্প লিখলে একটা সারপ্রাইজ দিয়ে কথাটা প্রকাশ করতাম। কিন্তু এ-গল্প নয়, তাই বলেই দিচ্ছি—এই খালি-গা খালি-পা লোকটিই জটিল ডাক্তার। বাড়ীতে রোগী এসে সেই ডাব-কাঁধে-বওয়া লোকটিকে গায়ে একটা ফতুয়া পরে ডাক্তারের চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

না—ডাক্তার হাসে না। এর মধ্যে তার নাটক করার কৌতুকও নেই, অভ্যাস অভিপ্রায়ও নেই। এই হল ডাক্তারের জীবন।

জটিল ডাক্তার আমার সহপাঠী। খুব উজ্জ্বল ছেলে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিশ্রমী উচ্চাকাঙ্ক্ষী অসাধারণ ছেলে। নেহাত গরীব চাষী সদ্গোপ ঘরের ছেলে। বাপ-জ্যাঠা নিজে হাতে লাঙল ধরে চাষ করত। জটিল পাঠশালা থেকে পড়ায় দীপ্তি দেখিয়ে মাইনরে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক পড়তে এল। পাশ যখন করলে, তখন বোর্ডিংয়ের দেওয়ালে লিখে গেল—আমি যদি ১০ বৃত্তি পাই, তবে এতগুলি ছেলে পাশ করবে, এত ফার্স্ট ডিভিশন, এত সেকেণ্ড ডিভিশন, এত থার্ড। যদি কম্পিট করি তবে এই ফল হবে। যদি বৃত্তি না পাই, তবে এতগুলো ফেল হবে। জটিল বৃত্তি পায়নি কিন্তু তার লেখা ফলের সঙ্গে গেজেটে প্রকাশিত ফলের কোন তফাৎ হয়নি, অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছল।

সদ্গোপ সমিতির সাহায্য নিয়ে জটিল পড়েছিল, মেডিকেল স্কুল থেকে এমন ভালভাবে পাশ করেও কলকাতায় সে থাকেনি। সুযোগ সে পেয়েছিল। কলকাতায় বড়লোক সদ্গোপ বাড়ী থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু জটিল শহরে থাকতে চায়নি, শহরের মেয়েও বিয়ে করেনি। দেশে ওই সামান্য একখানা গ্রামে গিয়ে প্র্যাকটিশ করতে বসেছিল এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তিনটে জেলার ডাকের ডাক্তার অর্থাৎ কনসাল্টিং ফিজিসিয়ান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মস্ত বড় সাদা ঘোড়া কিনে রমরমে প্র্যাকটিশ জমিয়ে তুলেছিল। পাকা দালান করেনি; জমিদারী কেনেনি; জমি কিনেছিল—তাও বেশী জমি কেনেনি; উৎকৃষ্ট ১০০ বিঘে জমি। ভাল বলদ, ভাল ভাল গাইগরু কিনে সেই পুরনো কালের গোলায় ধান, পুকুরে মাছ, বাগানে ফল, গোয়ালে গাই, কেঁড়ে-ভরা দুধের ব্যবস্থা সত্য করে তুলেছিল। আজও তার সে-সত্য অটুট আছে।

আগে জটিলের অর্থপিশাচ বলে দুর্নাম ছিল, ঘোড়ায় চড়ে বসেছে এমন সময় দ্বিতীয় লোক এসে যদি বলত—আর যেতে হবে না, তাহলেও সে ফি চাইত এমনি অপবাদ দিত।

এখন জটিল অন্য মানুষ। এখনও জটিল ডাক্তার নতুন কালের ডাক্তারদের মধ্যেও জায়েণ্ট। এখনও ডাক্তারের বাড়ীতে রোগীরা আসে সকালে। বসে থাকে। বর্ষার সময় ডাক্তার মাঠে চাষ দেখতে গেছে। এমন সর্বাঙ্গে কাদা মেখে ডাক্তারই এসে বাড়ী ঢুকল। ডাক্তার ভোরে মাঠে গিয়ে খানিকটা হাল ধরেছে, খানিকটা কোদাল চালিয়েছে, খানিকটা ধান রোয়ার কাজ করেছে, তাতে কাদা লেগেছে হাতে পায়ে গায়ে। ডাক্তার ঘরে ঢুকেই রোগীদের বলবে—আসছে আসছে ডাক্তার আসছে।

মিনিট-দশের মধ্যেই ফর্সা একখানা কাপড় পরে একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে জটিল এসে বসবে চেয়ারে, বলবে—বল, কার কি? একটু জোরে বলো—কানে কালা।

দেখতে দেখতে বেলা দুপুর হল। এমন সময় ডাক এল—তিন ক্রোশ পথ। ডাক্তার বেরিয়ে পড়ল। এখন আর ঘোড়ায় চড়ে না, হেঁটে যায়। সঙ্গে একটা লোক থাকে। একজনকে দেখতে এসে আরও দু-চারজনকে দেখে যায়। হাফ-ফি দিলে তাই নেয়; আবার কেউ যদি বলে—গরীব, তবে ফি নেয় না।

জটিলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত গাঢ়। তাকে একবার ডেকেছিলাম লাভপুরের বাড়ীতে আমার বড়জামাইকে দেখাবার জন্য। ফি দিইনি, দিয়েছিলাম একটা পেলিক্যান কলম।

সে বলেছিল—ফিয়ের বদল?

বলেছিলাম—না। আমার স্মৃতিচিহ্ন।

—না। পুরস্কার হিসেবে নিলাম। আর বলে যাচ্ছি—এ-অঞ্চলে এর পরে যে ডাক্তার সবথেকে বড় হবে, তাকেই দিয়ে যাব এ-কলম, বুঝেছ।

জটিলের ছেলের নাম রেখেছে তারাশঙ্কর। কলকাতায় সে ডাক্তারী পাশ করে রিসার্চ করছে। তারাশঙ্কর ঘোষ, এম-বি, মধ্যে মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী আসে। রিসার্চ করছে ডাক্তারী। সে আসে গোপধারায় কোমর বেঁধে কাপড় পরে। গায়ে একটা টুইল সার্ট। খালি পায়েও আসে সময়ে সময়ে।

কিন্তু আজও তার পকেটে পেলিক্যান কলমটা দেখিনি। তার পকেটে একটা পার্কার থাকে।

জটিল বলে—শরতের ছেলেটা ভেরী সাইনিং, বুঝেছ। ভেরী সাইনিং। হয়তো—। বুঝেছ।

ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ডাক্তার বলে—উঠলাম, রাত্রি হয়ে গেল। তিন ক্রোশ পথ। জঙ্গলে ঘেরা ছোট গ্রাম। বুঝেছ—ডাকাত-ফাকাত নিয়ে ফ্যাসাদ একটা। যাই।

হ্যারিকেন জ্বালিয়ে লোকটা আগে চলে, ডাক্তার পিছনে পিছনে। একবার ডাক্তারের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল। ডাক্তার দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে পাশের গ্রামে গ্রামে চিৎকার করে লোক ডেকে ফিরেছিল।

ডাক্তারের ঘোড়াটা ডাক্তারের একটা আঙুল কামড়ে চিরদিনের মত জখম করে দিয়েছে। ডাক্তার সেদিন বন্দুকে টোটা পুরে তাকে গুলী করবার জন্যে বন্দুক তুলেছিল। কিন্তু শেষে নিরস্ত হয়ে বলেছিল—নাঃ, বেচে দেব।

কিন্তু বেচেও দেয়নি। সেটা আছে। তার খাবার বরাদ্দও কমায়নি।

অত্যন্ত কঠিন বস্তুতববাদী হিসেবী মানুষ। কিন্তু ওই ঘোড়াটাকে যে বেচতে গিয়েও বেচেনি, মারতে গিয়েও মারেনি, সে একজন আছে ওই বাস্তববাদীর আড়ালে। আর একজন আছে সত্যবাদী, যে এখনও পেলিক্যান পেনটা তার ছেলেকে দেয়নি। তার সঙ্গে আমি গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ।

ভিক্ষুক ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধ মন্দিরের চূড়া
যেন স্বর্গ করেছে চুম্বন;
তোরণের সামনে আমি নতজানু
ছুঁয়েছি তোমাকে।

এত শুভ্র তোমার বুকের মধ্যে
রক্তের তোলপাড়, এত পবিত্র আমার
আনন্দ!

আমি আরো কাছে যেতে চাই
মন্দিরের ভিতরে, যেখানে স্বর্গের দিকে সিঁড়ি
উঠে গেছে।
কিন্তু আমি নতজানু হওয়া ছাড়া আর কোনো
অভ্যাস শিখি নি;
আমার প্রার্থনা ছাড়া আর কোনো ভাষা নেই
ভিতর মন্দিরে চলে যেতে।

তাই রাত শেষে আমার সকল
অসহ্য আনন্দ অসহায়
শিশুর কান্নার মতো, যখন আয়নায় মুখ দেখি।

অতনুর প্রতি ॥

মানস রায়চৌধুরী

ঝরে যায় সমস্ত শরীর থেকে ইচ্ছার গোপন ক্ষতগুলি
বাগানে আমার কিছু চাষবাস ছিল, রৌদ্রে শেষ বুলবুলি
শস্য নিয়ে উড়ে গেল, বুঝি এ নিষ্পত্র মাঠে আমার যাওয়ার
ব্যথা মঞ্জরিত হয়
অথচ ভিতরে পাখা দুর্নিবার ভয়
ঘনিয়ে এনেছে সন্ধ্যা—কতদূরে বসন্তের মাস্তুল আবার দেখা
যাবে জন্মান্তরে?

অতনু তোমার কথা বড় মনে পড়ে
ইস্কুলে আমাকে তুমি বলেছিলে শেখাবে গ্রীষ্মের ছুটি ধরে
কী করে শরীর ছেড়ে চলে যেতে হয়
জ্যোৎস্নার গভীরে নীল রেশমী চাদর মুড়ি দিয়ে
কী করে উচ্ছেদ করা যায় সব মমতা, মায়ের মুখ, দুধের বাটির
মৃদু তাপ
আমাকে শেখাবে বলেছিলে এই অহংকৃত, অলীক প্রস্তাব...
অতনু, তুমিই আগে চলে গেলে মেল ট্রেনের লাইনে
মাথা রেখে ঘুমের আলস্য আর রক্তের চন্দনে
মাখামাখি, চলে গেলে—ছিল শূন্যে কোন অভিযান?

সন্ধ্যার গোলাপ মেঘ দেখে বড় মনে পড়ে তোমার প্রস্থান
এখনো পূর্ণিমা রাতে হাওয়া যদি শিস্ দেয়, দেখি
অতনু তোমার স্মৃতি রক্তে আছড়ায়—
চিরুনি দুভাগ করি, লণ্ঠন দুভাগ করি, তোমার স্মৃতি কি টানে
আমাকে গহ্বরে অতিকায়
চলে যায় শরীরে প্রত্যাশাগুলি সাবানের ফেনা যায়
গ্রীষ্মের আড়ালে
যতো ফুল ফুটিয়েছি তারা যেন ঝরে গিয়ে দূরে শূন্যতায়
ফুটে ওঠে, অতনু তোমার সেই প্রতিশ্রুত অহঙ্কারী ডালে।

'তুই পারবি। খুব পারবি।'

'তবু কী রকম যেন লাগছে।'

'মনে কর তোর ভাই। তোর কোনো আত্মীয়। তোর আপন জন—'

'কোনোদিন এসব করিনি তো। এসব লাইন ঠিক জানা নেই।'

'কে আর করে! বিপদে পড়লেই করে। ঘরে আগুন লাগলেই মানুষে ঘর থেকে ছুটে বেরোয়।'

তবু কল্যাণীর আড়ষ্টতা যায় না। কিন্তু বন্ধুর এই আকুলতাকে ঠেলে ফেলতেও মন সরে না।

'তুই ছাড়া আমার কেউ নেই যার উপর নির্ভর করতে পারি। তুই-ই আমার একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু।' কল্পনা আবার মিনতি করল।

'আমার ভয় হয় কোনো ভুলটুল না করি।'

'এতে ভুল করবার কী আছে? তুই শুধু যাবি, বলবি, টাকাটা ঠিক করবি। তারপর যা করবার তিনি করবেন।'

'কিন্তু যদি দেখা যায় আগেই অন্য কাউকে এনগেজ করা হয়েছে!'

'কোত্থেকে করবে?' কল্পনা দীর্ঘশ্বাস চাপল: 'তার সে অবস্থা নেই। না, কেউ নেই কিছু নেই। তাছাড়া উনি বলছিলেন আনডিফেণ্ডেড যাচ্ছে নাকি।'

'আনডিফেণ্ডেড?' কল্যাণী চমকে উঠল: 'যার অবস্থা নেই তার হয়ে লড়বার কেউ থাকবে না?'

'স্টেট থেকে কাউকে দাঁড় করাবে নিশ্চয়—মার্ডার-কেসে সেইটেই নিয়ম, কিন্তু, বুঝতে পাচ্ছিস তো, সে তেমন ভালো হবে না। শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরে যাকে-তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দেবে।' কল্পনা আশ্বস্ত করতে চাইল: 'বেশ তো, যদি দেখা যায় অন্য কাউকে এনগেজ করা হয়ে গেছে তবে তিনি বুঝবেন তিনি থাকবেন কিনা। এমন ভাব করবি, তুই আনাড়ি, কিছু জানিস না, বলবি সমস্ত আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি যেমন বলবেন তেমনি হবে।'

কল্পনার বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কল্যাণী। কিছুক্ষণ পরে বললে, 'টাকা দিতে হবে তো?'

'তা তো দিতেই হবে। মোটা টাকা।'

'কত?'

'তার জন্যে তুই ভাবিসনে। তুই অবশ্য বলবি তুই দুঃস্থ—মানে প্লিড করে যতটা কম করতে পারিস করবি। তারপর একটা সেটলমেণ্ট করে নিবি, ডেইলি ফি বা থোক টাকা, যা বলে। উপায় নেই, দিয়ে দেব।'

'টাকাটা কিসে দিবি? চেকে?'

'পাগল! উকিল-ডাক্তার পারতপক্ষে কখনো চেকে ফি নেয়? তাছাড়া আমার নিজের স্বার্থেই নগদ দিতে হবে।'

'ঠিকই তো।' বুঝে নিল কল্যাণী: 'নইলে যে ব্যাঙ্কের হিসেবে ধরা পড়ে যাবি।'

ম্লান মুখে কল্পনা হাসল। গলা নামিয়ে বললে, 'শুধু, তুই বন্ধু, তোর কাছেই ধরা পড়লাম।' তারপর কী মনে হল, কথাটা সংশোধন করল: 'না, আরো একজনের কাছে ধরা পড়েছি।'

'বলিস কী?' কল্যাণী শিউরে উঠল: 'সে কে?'

'সে অন্তর্যামী। রাত্রিদিন যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি', সোফাতে ছড়িয়ে বসল কল্যাণী: 'একটা খুনেকে বাঁচাবার জন্যে তোর কেন এত আগ্রহ? তাকে বাঁচিয়ে লাভ?'

'লাভ? তাই বলে একটা জলজ্যান্ত মানুষের বাঁচবার অধিকার সমাজ কেড়ে নেবে বলতে চাস?'

'লোকটা যে জলজ্যান্ত খুন করেছে!'

'তাই তাকে উলটে খুন করতে হবে? যে লোকটা চুরি করেছে তার থেকে ফের চুরি করতে হবে?' কল্পনা ধরা গলায় বললে, 'মৃত্যু থেকে কাউকে বাঁচানো যদি পুণ্যকর্ম হয় তবে এও পুণ্যকর্ম।'

'কিন্তু কাকে খুন করেছে তা দেখতে হবে তো?'

চোখ বুজল কল্পনা। মুখে হাসি নয় হাসির ছায়া ফেলে কল্পনা বললে, 'তাহলে কেন খুন করেছে তাও দেখতে হবে।'

'নিশ্চয় তা বলা হবে বৈকি। ঝগড়া মারামারি সন্দেহ বিশ্বাসঘাতকতা—এমনি কোনো একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই—'

'সে তো নিকট-কারণ। কিন্তু দূরে, গভীরে যে কারণ আছে তা কে দেখছে?'

'তাই বলে যে একটা বেশ্যাকে খুন করেছে তার জন্যে এত মমতার কোনো মানে হয় না।'

'মমতা! মমতা বৈকি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কল্পনা: 'সমস্ত কথা তো এই মামলায় মধ্যে আসবে না, তা হলে হয়তো বোঝানো যেত এ মমতা না আরো কিছু? কিন্তু হীনতম যে অপরাধী তার পক্ষেও কিছু বলবার থাকে। অন্তত সে কথাটুকু যাতে পুরোপুরি বলা যায় ভালো করে বলা যায় তারই জন্যে বড়ো উকিল দিচ্ছি।'

'কিন্তু ও ছাড়া পেলেই তো সমাজের বিপদ।'

'যতক্ষণ নিশ্বাস আছে ততক্ষণই তো আশা করা চলে। হয়তো এই মুক্তিটা তার জীবনে একটা বড় সুযোগ হয়ে আসবে, তার গ্লানিকর পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।' কল্পনার চোখ ছাপিয়ে জল এল: 'একটা চান্স পেলে বিপদ সম্পদ হয়ে উঠতে কতক্ষণ!' তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দেরাজ টানল কল্পনা: 'না, না, তাকে বাঁচাতে হবে। চতুর উকিল ছিদ্রপথ খুঁজে নিয়ে ওকে ঠিক বার করে আনবে। নে, তোকে টাকা দিচ্ছি, পাঁচশো এখন নিয়ে যা, পরে আবার যা লাগে দেব। আশা করি টাকার জন্যে আটকাবে না।'

টাকাটা ব্যাগে পুরল কল্যাণী। বললে, 'আগে মিস্টার ঘোষালকে ফোন করি। ফোন করে সময় ঠিক করে দেখা করি। তারপর—'

'হ্যাঁ, সময় নেই, খুব তাড়াতাড়ি—। মোটকথা, তোকে উদ্ধার করে দেওয়া চাই। তোর নিজের কেস এমনি ইন্টারেস্ট দেখাবি। তোর নিজের ভাই যদি হত তুই কি প্রাণপণ চেষ্টা করতিস না?'

কল্যাণী সহানুভূতিতে হাসল। উঠতে-উঠতে বললে, 'দেখি চেষ্টা করে—'

'আর শোন।' কল্পনাও উঠল: 'খুন খুন। সে বেশ্যা না সে সতীসাধ্বী সেটা অবান্তর।' অজিতেশেরও কম অস্বস্তি হচ্ছে না। এতদিন সে যত 'সেনসেশন' কেস করেছে তা হয় ডাকাতি নয় জালিয়াতি, নয় বা বলাৎকার। মার্ডার কেস এই প্রথম। নিজের হাতে খুন করেছে, আসামীর কাঠগড়ায় এমন লোক সে এখনো দেখেনি।

খুনের মামলা তার বিচারের প্রতীক্ষায়—জীবনে এ একটা ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চ। স্ত্রীকে একথা না বলে সে থাকতে পারল কই?

'দেখ খবরের কাগজে বেরিয়েছে তোমার কোর্টের সেই খুনের মামলাটা—'

'কই দেখি—' হাত বাড়িয়ে সাত-সকালের খবরের কাগজটা টেনে নিল অজিতেশ। চোখ বুলাতে-বুলাতে বললে, 'প্রথমে জেনেছিলাম আনডিফেণ্ডেড যাবে, এখন দেখছি অতুল ঘোষালকে দিয়েছে।'

'অতুল ঘোষাল বুঝি বড় উকিল?'

'ফৌজদারিতে বেস্ট। মোটা ফি। আসামী তো একটা ব্রোক, ছন্নছাড়া, এত টাকা—'

'কেউ তার আছে হয়তো।'

'নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কোর্টে তো কাউকে দেখলাম না উকিলের পাশে বসে ইনস্ট্রাকশান দিতে। তা ঝানু উকিল, ইনস্ট্রাকশানের ধার ধারে না, নিজের লাইন ধরে চলে।'

কল্পনাও ও-লাইনে থাকল না। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বুঝছ?'

'এখনো ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। সব জুরির উপর নির্ভর করছে।'

জজের সঙ্গে ঘর করে-করে আইন-আদালতের কিছু কিছু বুঝে নিয়েছে কল্পনা। বললে, 'তা তুমি যেমন জুরিকে বোঝাবে তেমনি তো ওরা বুঝবে।'

'আমি বোঝাব?' অজিতেশ নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'আমাকে তো নথির উপরে, সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপরেই বোঝাতে হবে।'

'তবু সূক্ষ্মভাবে জজ তার নিজের মতটা এগিয়ে দিতে পারে না?' সূক্ষ্মভাবেই হাসল কল্পনা।

'তা পারে বৈকি। ফুটবল খেলায় শুধু পাশ দেবার মত। আর তাইতেই গোল। খালাস।' নিজের উপমায় নিজেই হাসল অজিতেশ।

আরো কিছু যেন বলতে চাচ্ছিল কল্পনা—না, আর দরকার নেই। অন্তরের নিভৃতে কল্যাণীর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কল্যাণী এসে আরো টাকা চাইল। বললে, 'তুই টাকা দিচ্ছিস বটে কিন্তু লোকটার বিরুদ্ধে যা কেস শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। আর, বিশ্বাস কর, তাই শুনতে কোর্টে কী অসম্ভব ভিড়!'

'তুই গিয়েছিলি নাকি কোর্টে?' আঁতকে উঠল কল্পনা।

'কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে ভারি কৌতূহল হচ্ছিল। আফিস থেকে দু ঘণ্টার ছুটি নিয়ে উঁকি মারতে গিয়েছিলাম।'

'কী সর্বনাশ, তোকে তো উনি চেনেন, যদি দেখে ফেলেন?'

'না, না, তোর ভয় নেই। আমি দূরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখেছি। আসামী বা তার উকিলের কাছাকাছিও হইনি। তা আমাকে যদি জজসাহেব দেখেও ফেলেন, আমি আসামীর লোক বা আমার হাতে তার তদবির এমন সন্দেহ করতে পারবেন না। কত পুরুষ-মেয়েই তো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছে।'

'মেয়েরাও গিয়েছে?'

'বাধা কী! হাতে বই-খাতা, কলেজ-পালানো মেয়েও কটা আছে। রূপোলে ঘটনা তো, তাই মেয়ে-সাক্ষীও যথেষ্ট। কটা প্রোবেশনার মেয়ে-উকিলকেও বসে-বসে নোট করতে দেখলাম। কেন, তুই যাবি?'

'আমি যাব? ওরে বাবা!' কল্পনার বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল।

'কেউ বুঝতে পারবে না, দূরে করি-ডোরে দাঁড়িয়ে দেখবি।'

'ওরে বাবা! ফেণ্ট হয়ে পড়ে যাব।'

'আহা, যা না আসামীর চেহারা হয়েছে তা দেখে কেউ মূর্ছা যায় না।'

'চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে, তাই না?' ভয়ের থেকে হঠাৎ করুণায় নেমে এল কল্পনা।

'কদাকার হয়ে গিয়েছে। দেখলেই মনে হয় খুনে। যেন পাগলাগারদ থেকে দরজা ভেঙে পালিয়েছে।'

'কিন্তু আমার কাছে যখন প্রথম এসে-ছিল তখন কী সুন্দর দেখতে ছিল! কী রঙ, কী রূপ! উজ্জ্বল, সজীব—'

'থাক, আর কাব্য করতে হবে না। কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার গোনা-গুনতি নেই। হেন নেশা নেই যা নাকি করেনি—'

'কী করবে! তার জীবনের প্রথম যে নেশা, পবিত্র নেশা, তাই তো আমি ভেঙে দিলাম।' কল্পনা আবার বাস্তবে এসে দাঁড়াল: 'কী রকম বুঝছিস? মিস্টার ঘোষাল কেমন চালাচ্ছেন?'

'খুব ভালো। গত জীবনের এভিডেন্স কিছুই আনতে দিচ্ছেন না। বলছেন, মামলা সংক্রান্ত যেটুকু দরকার তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হবে। বাইরের ব্যাপার আমদানি করে জুরিকে প্রেজুডিস করা চলবে না।'

'ঠিকই তো,' কল্পনা শিউরে উঠল: 'বাইরের ব্যাপার আনতে গেলে কতদূর পর্যন্ত টানতে হবে তা কে বলবে?'

'তা মিস্টার ঘোষাল যেমন এফিসিয়েন্ট, খালাস করে আনবে মনে হয়। কিন্তু আমার মতে খালাস পাওয়া উচিত নয়। শাস্তি হওয়া উচিত।'

'শাস্তি আর কী কম হয়েছে! কম হচ্ছে!'

'প্রত্যক্ষ এ মামলায় হওয়া উচিত।' কল্যাণী নির্দ্বিধায় বললে।

'তার মানে তো চরম শাস্তি।'

'তাই হওয়া উচিত।' কল্যাণীর মুখে রাগ আর ঘৃণা একসঙ্গে ফুটে উঠল: 'লোকটা যা নৃশংস, নির্লজ্জ, পশু—

'তুই তা বলছিস? একটা মুহূর্তের সুইচ মেরামত করে নিতে পারলে নৃশংস কোমল হতে পারে না? নির্লজ্জ ভদ্র হতে পারে না? আর পশু? কোন মানুষটা পশু নয় শুনি? মানুষ যদি পশু হয় তবে পশু কেন না মানুষ হতে পারবে!'

'তা আমার বলায় তো কিছু হবে না।' কল্যাণী কাষ্ঠহাসি হাসল: 'মামলা এখন অতুল ঘোষালের হাতে। অতুল ঘোষালের আসামী মানেই নাকি খালাস। দে টাকা দে।'

তৃপ্ত মুখে কল্পনা আরো একগাদা টাকা দিল।

'যাই বলো, ক্যাপিট্যাল পানিশমেন্টটা উঠে যাওয়া উচিত।' অজিতেশ কোর্টের কাপড় থেকে বন্ধনমুক্ত হতে-হতে বললে।

'একশোবার উচিত।' দৃপ্ত কণ্ঠে সায় দিল কল্পনা।

'আসামীর জন্যে না হোক, হাকিমের জন্যে। একটা লোককে ফাঁসির হুকুম দেওয়া কি কম মৃত্যুযন্ত্রণা! হাকিমকে এই মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ করবার জন্যেই ক্যাপিট্যাল পানিশমেন্ট রদ করা দরকার।'

'কেন, এই মামলা কী রকম বুঝছ?' কল্পনা কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য নিরাসক্ত করলে।

'অতুল ঘোষাল দুঁদে উকিল, সহজে হারবে না। তবে জুরির এটিটিউড ভালো নয়।'

'ভালো নয় মানে?'

'যেন কনভিকটিং এটিটিউড—'

'ওরা যদি নিতান্তই কনভিকট করে তুমি কিন্তু ফাঁস দিয়ে বোসো না।'

'পারত পক্ষে কে ফাঁসি দেয়!' অজিতেশ নির্ভাবনায় হাসল: হাকিমদের বাঁচিয়ে দেবার জন্যেই দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা। তেমন হলে এদিক-সেদিক করে বেটাকে সেইখানেই পাঠিয়ে দেব।'

'তাও ভালো। তবু তো বাঁচবে। এক মুহূর্তের জীবনেও মানুষ কত কী করে ফেলতে পারে। কত পরিবর্তন ঘটাতে পারে।'

'নিশ্চয়।' অজিতেশের স্বরে বুঝি সহানুভূতির স্পর্শ: 'শুধু চান্স।'

সাহস পেয়ে কল্পনা জিজ্ঞেস করল, 'ছাড়াও তো পেয়ে যেতে পারে।'

'তা পারে বৈকি, খুব পারে। আসামী পক্ষের টাকার জোর আছে মনে হচ্ছে। জুরিকে ঘুষ দিতে পারলেই তো হয়ে গেল।'

কল্যাণী আবার এসেছে টাকার জন্যে। কল্পনা বললে, 'আমার যদি অনেক টাকা থাকত তবে জুরির হাতে দিয়ে আসতাম।'

'ছি-ছি, ওকথা কল্পনায়ও আনিস নে, মারা পড়বি।' কল্যাণী আতঙ্কে কালো হয়ে উঠল: 'সেই ঘুষ তোর হয়ে আমি পৌঁছুতে যাব? রক্ষে কর। তাহলে আমি যাব, তুই যাবি, তোর জজসাহেবের চাকরি যাবে।'

'না, না, ওকথাটা আমি অমনি বলছিলাম।' কল্পনা মাটির দিকে চোখ নামাল: 'যেমন করে হোক রাজীবকে ফাঁসির থেকে বাঁচাবার কথাটাই কেবল মনে হচ্ছে।'

'সবকিছুরই একটা সীমা আছে।' কল্যাণী ঝলসে উঠল: 'তুই নিয়তির সঙ্গে পারবি? রাজীবই পেরেছে? নিয়তির হাত থেকে তোকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল? ন্যায্য ডিফেন্ড করাচ্ছিস—সেটাও তোর কথা নয়—তারপর যা হবার তা হবে।'

'নে, নে, উকিলের টাকাটাই নে।' কল্পনা শান্তমুখে বললে, 'ঘুষ দেবার মত অত টাকা কই? ঘুষ দিলেই যে উলটোটা হবে না তা কে বলতে পারে?'

'মামলার এটমশফিয়র এমনিতেই বেশ ভালো।' কল্যাণী সন্তোষের সুরে বললে, 'খালাস হবারই বেশি সম্ভাবনা।'

'ঘোষাল বেশ একটা রোমান্টিক এটমশ-ফিয়র গড়ে তুলেছে।' কোর্ট-ফেরত বাড়ি এসে চা খেতে-খেতে বললে অজিতেশ, 'আর কিছু নয়, বুঝতে পারছি, জুরির সহানুভূতির জন্যে।'

'কেন, কী বলছে?'

'বলতে চাচ্ছে আসামী নাকি কোন এক কল্পনা নামে মেয়েকে ভালোবাসত। তাকে বিয়ে করতে না পেরেই নাকি—'

কল্পনা হাসতে চাইল, হাসতে পারল না। বললে, 'মেয়ের আর নাম পেল না।—কল্পনা!' বিরক্তি প্রকাশ করতে গেল, কিন্তু পিছনে বুঝি আতঙ্ক মুখ বাড়াল।

'সংসারে কত কল্পনা আছে তার ঠিক কী।' অজিতেশই পারল উড়িয়ে দিতে: 'সবই কল্পনা তো তাই উপন্যাসের জালিকাও কল্পনা।'

কল্পনা ধীরে নিশ্বাস ফেলল। বললে, 'তা বিয়ে করতে পারেনি কেন?'

'বেশ মজার গল্প দাঁড় করিয়েছে ঘোষাল। বলছে, কল্পনা আসামীকে কথা দিয়ে শেষমুহূর্তে এক ব্যারিস্টারকে বিয়ে করেছে আর তারই ফলে আসামীর এই দুর্দশা।'

বলার দরকার নেই, তবু কল্পনা বলে উঠল, 'আমার স্বামী তো জজ।'

'গোড়ায় ব্যারিস্টার তো ছিলাম, মানে ব্রিফলেস ব্যারিস্টার, তাই না এই চাকরিটা নিই।' হাসল অজিতেশ: 'মক্কেলের জন্যে উকিল কী না গল্প ফাঁদে! বলছে, একটা মেয়েকে আসামী খুন করেছে দেখছেন কিন্তু একটা মেয়ে যে এই আসামীকে খুন করেছে তা কে দেখছে!'

'কোনো কিছুই দেখি মুখে বাধে না উকিলের।' কল্পনা আবার অজান্তে স্বরে অভিমান আনল।

'হ্যাঁ, সত্য মিথ্যা কল্পনা, কিছুই বাধে না।' অজিতেশ সায় দিল: 'যে-কোনো উপায়ে জুরির মন ভেজানো।'

'তা ভিজুক ওদের মন। ছেড়ে দিলেই সব শান্তি।'

কিন্তু বলতে কী, কল্পনার একবিন্দু শান্তি নেই। অজিতেশ কি কিছু অনুমান করতে পেরেছে?

কল্যাণী আসতেই কল্পনা মুখিয়ে উঠল: 'তুই ঘোষালকে কিছু বলেছিস আমার কথা?'

'আমি বলতে যাব কেন?' কল্যাণীও তড়পে উঠল: 'আসামী নিজে বলতে পারে না? ঘোষাল কি আসামীর সঙ্গে ইন্টারভিয়ু নেয়নি? জানতে চায়নি তার গোপন কথা?'

'তাই উকিল বলবে কোর্টে?'

'কেন বলবে না? ঢাক পিটিয়ে বলবে। তখনই বলেছিলাম দরকার নেই ওসবে। না, সবচেয়ে বড় উকিল ঘোষালকে দিতে হবে। এখন বোঝো—'

'কিন্তু তাই বলে মামলার যা বিষয় নয় তা, আমদানি করবে?'

'কেন করবে না? আসামীকে খালাস করে নিতে সে সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করবে।'

'তাই করুক। তবু সে যেন বেঁচে যায়।' কল্পনা ভরপুর গলায় বললে, 'আমার এত চেষ্টা যেন সার্থক হয়।'

সওয়াল-জবাব শেষ হতে প্রায় দেড়টা। কাটায়-কাটায় দুটো, অজিতেশ চার্জ বোঝাতে সুরু করল।

কী না জানি হবে আজ দিনের শেষে, উদগ্রীব হয়ে বসে আছে কল্পনা। অজিতেশ বাড়ি ফিরলে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না। মুখের দিকে তাকাবে মনে করে অন্যদিকে তাকাল।

অজিতেশ বললে, 'আজ শেষ হল না, কালকেও কিছু বকতে হবে।'

নিভৃতে কল্যাণী এল দেখা করতে। বললে, 'আশা নেই বলে মনে হচ্ছে। জজ-সাহেব ভীষণ কনভিকটিং চার্জ দিয়েছে। বেনিফিট অফ ডাউটের লেশমাত্র পথ রাখেনি। তোর এত চেষ্টা এত প্রার্থনা বুঝি বিফলে যায়।'

'না, যাবে না।' উঠে পড়ল কল্পনা।

সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমুতে পারল না, মনে মনে শুধু প্রার্থনা করতে লাগল।

পরদিন দুপুরে খবর পৌঁছুতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল কল্যাণী।

'কী, এতটুকু চঞ্চল হল না কল্পনা, স্বচ্ছ কণ্ঠে বললে, 'ফাঁসি—ফাঁসির হুকুম হল তো?'

'উঃ, জজসাহেব কী নিষ্ঠুর, দ্বীপান্তরটা দিলে না—'

'তা আইনের যা বিধান তাই করবেন তো।' পরিষ্কার শান্তস্বরে কল্পনা বললে, 'যে বর্বরের মতো খুন করে তার ফাঁসি হবে না তো কার হবে? বিচারালয়ে মায়া-মমতার স্থান নেই। বিচারক বিচারক। আমি আমার স্বামীকে অভিনন্দন করছি তিনি যে প্রথম মার্ডার কেসেই নির্বিচল হয়ে ফাঁসির হুকুম দিতে পেরেছেন। তুই বাড়ি যা, আসামীর জন্যে অনেক খেটেছিস, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে। জজসাহেবের ফিরতে দেরি আছে। ততক্ষণ আমি ঘুমুব। উঃ কতদিন ঘুমুইনি।'

কল্যাণী চলে গেলে কল্পনা ধীরে ধীরে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল। দরজা-জানলা খোলা, তা থাক, গ্রীষ্মের রোদ ঘরে এসে পড়েছে, তা পড়ুক—এত নির্বাক নিশ্চিন্ত আরামে আর কোনোদিন ঘুমোয়নি কল্পনা।
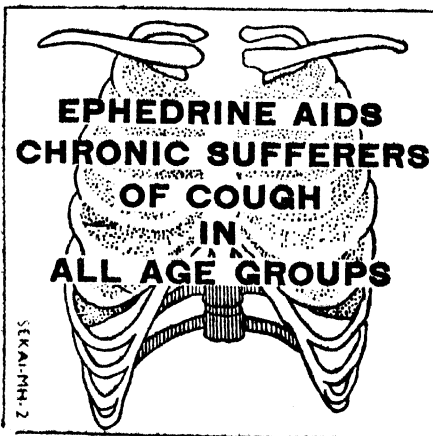
পাঠকের বৈঠক

সবার উপরে মানুষ

কারিগরি শিল্পের বৈপ্লবিক আবির্ভাব যা অসন্দিগ্ধ জন-জীবনে ঘটেছে, তার ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে মানবজাতি কিভাবে প্রকৃতির পরাভব ঘটিয়েছে তা বিস্মৃত হয়েছে।

চার প্রকার মানবিক উদ্ভাবনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগুন, যন্ত্র-শিল্পে চক্র, বাণী-বিনিময়ের সহজ পন্থা এবং ভোট।

আগুনের আবিষ্কার প্রাগৈতিহাসিক কালের ঘটনা, কিন্তু অবশিষ্ট আবিষ্কার-গুলি সমকালীন ইতিহাসের অন্তর্ভূত। চিন্তার ক্ষেত্রে যে-বিপ্লব ঘটেছে বা যে-সব যুগান্তকারী আবিষ্কার সাফল্যলাভ করেছে, তা অবশ্য রেণেসাঁসের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

গত তিনশ' বছরে মানুষ শুধু যে প্রকৃতির শক্তিকে অনেকখানি পোষ মানিয়েছে তা নয়, তার মনের মত একটা জগৎ সৃষ্টির কাছাকাছি পৌঁছেচে। মানবিক সিদ্ধিলাভে প্রকৃতির পরাজয় ঘটেছে পদে পদে। তবে বিশ্ব-মানবের কল্যাণের পরিমাণ কতটুকু, তা অবশ্য এখনও পরিমাপ করা হয়ে ওঠেনি।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে বিখ্যাত কবি এ, ই, হাউসম্যান লিখেছিলেন ঃ "Whatever brute and blackguard made this World"? বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস লেখকদের পূর্বসূরী জুলভার্ন কল্পনানেত্রে চন্দ্রালোকে যাত্রার স্বপ্ন দেখেছেন। সেই চন্দ্রালোক কিংবা মেঘলোক বা মহাকাশের অন্যান্য গ্রহপুঞ্জে শ্যামবাজার-কালীঘাট যাত্রার মত আজ আর অসম্ভব ফ্যানটাসি মাত্র নয়। আজ আর এই নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয় নেই। কেউই কোনো কিছু অসম্ভব মনে করেন না।

জড়বিজ্ঞানে এবং সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে মানুষ আশ্চর্য উন্নতিলাভ করেছে। স্যামুয়েল বাটলারকে কেউ আজ আর উদ্ভট কল্পনা-বিলাসী মনে করবেন না, স্যর টমাস মোরকেও নয়। যা ঘটেছে তাকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বলা যায়। সংগঠন শক্তির পূর্ণতা, আর মানুষ এবং বস্তুকে উপযুক্ত-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিলাভ।

মানুষকে সংঘবদ্ধ করা, তাকে বিরাট প্রকল্পের উপযোগী করে তোলা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুদক্ষ, রণ-নিপুণ সৈনিকের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ করা মানুষের এক আশ্চর্য কৃতিত্ব।

এইসব প্রগতিমূলক আবিষ্কারের মধ্যে যে ভুলত্রুটি ছিল না তা নয়, বিনা ত্রুটি এবং কারচুপিতে কোনো কিছু লাভ করাও সম্ভব নয়। বারবার পরাজয় ঘটেছে মানুষের হাতে মানুষের। মানুষের লাঞ্ছনায় মানুষ যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে, তার কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

তাই মুর, এট্টিলাস এবং হিটলারের কথা স্মরণ করুন। এরা মানুষের প্রতি অতিশয় বর্বর অত্যাচার করেছে, মানবিক দুর্দশার চরম স্তরে মানুষকে নামিয়ে নিয়ে গেছে এবং মানুষের মনে হয়েছে এই জীবনের জ্বালা ও গ্লানির চেয়ে মৃত্যু অনেক বরণীয়। দুর্গতির অবসান ঘটেছে শেষপর্যন্ত।

কিন্তু পরিণামে জয় হয়েছে সেই মানুষের। যে-মানুষ ক্ষুদ্র হলেও বৃহৎ। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্প্রতি প্রকাশিত এক কবিতায় লিখেছেন—

"পরমাণু পোষ মানিয়ে
ধরা সরা দেখছে কে?
আরো প্রলয় - ঠাসা কিছু
নেই কি আদ্যিকাল থেকে?"

তারপর কবি বলেছেন—সৃষ্টি ধসায়, সূর্য খসায়—সে কে, কি সে? সে এই মানুষ। ছোট্ট মানুষ যে অসুরের প্রাণেও ত্রাস সঞ্চার করে—

"সব অসুরের ত্রাস জাগানো
কি সে? কে সে?
এই মানুষ?"

বিশেষ করে ভিয়েতনামে যে ত্রাস-জাগানো বিমান আক্রমণ শুরু হয়েছে, তা আজ সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে একটা পরম সমস্যার আকার নিয়ে উপস্থিত।

মানুষের বিপদ আজো কাটেনি। যে বীভৎস বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে মানুষ আজ দাঁড়িয়েছে তা তুলনাহীন। বিপদ আছে, বিশেষ করে মারণাস্ত্রের উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং আদান-প্রদানের মধ্যেই এই দুঃখকর অবস্থা বিজড়িত। হিরোশিমার দুঃস্বপ্ন আজো দূর হয়নি। মানবিক দুর্দশা দূর করার শক্তিও মানুষের হাতে এ-কথা ভাবতে মনে বিস্ময় জাগে। যে-হাত ধ্বংসের অস্ত্র বানায়, সেই ত' আবার মৃত-সঞ্জীবনী সর্বরোগহর ওষুধ তৈরি করে। ফসল ফলায়, তপ্ত মরুতে প্রাণ সঞ্চার করে সবুজ সুধায় ভরে দেয়।

শীতল যুদ্ধের আঘাত এবং অন্যান্য কলা-কৌশল ছাড়াও মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকার কৌশলটাও অনেকখানি আয়ত্ত করেছে। ধ্বংসের ক্ষমতা ত' অতি সহজ, বাঁচানোর শক্তিলাভ করা কঠিন।

আশ্চর্য কাণ্ড, বিজ্ঞানের জটিলতম সমস্যার সমাধানে যে-বুদ্ধি কাজে লাগে, সেই বুদ্ধি কিন্তু কলহ, সংঘর্ষ, শত্রুতা এবং বৈরী মনোভাব নিবারণে প্রয়োগ করা হয়নি কোনোদিন, সেই চেষ্টাও নেই। মুক্ত বিবেকের ধিক্কার কই বর্বরতার বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথের কথা স্বাভাবিক কারণে মনে জাগে, তিনি জাপানী কবি নোগুচিকে লিখেছিলেন—

> Humanity, inspite of its many failure, has believed in a fundamental structure of society. When you speak, therefore, of the inevitable means, terrible it is though for establishing a new great world in the Asiatic continent — signifying, I suppose, the bombing of Chinese women and children and the desecration of ancient temples and Universities as a means of saving China for Asia — you are ascribing to humanity a way of life which is not even inevitable among the animals and would certainly not apply to the East, inspite of her occasional aberrations."

কিন্তু আজ এই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অভাব ঘটেছে। কে বলবে যে, বর্বর নিষ্ঠুরতা প্রাচ্যদেশের পক্ষে ত' নয়ই, সাময়িক উৎক্রান্তি সত্ত্বেও পশুদের প্রতিও প্রযোজ্য নয়।

জড়বস্তুর সন্ধানেই আমরা আজ সমধিক আগ্রহী, নৈতিক প্রয়োজনের দাবী জড়বস্তুর ভারে চাপা পড়েছে।

আত্মসম্মান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে পাশা-পাশি বাস করতে পারে, তেমন কোনো উপকরণ কি আজ আবিষ্কার করা যায় না?

উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং অচলিত আদর্শবাদের বাধ্যতামূলক চাপের কাছে আত্মবিক্রয়, ধর্মান্ধতা, বর্ণ-বিদ্বেষ প্রভৃতি অরণ্যচর শ্বাপদের ধর্ম যে কি বস্তুতে গঠিত, কে তার বিশ্লেষণ করবে।

উৎকট জাতীয়তাবাদের যূপকাষ্ঠে যেমন মানুষকে অবলীলাক্রমে বলি দেওয়া যায়, তেমনই আবার অচলিত আদর্শবাদে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য বাধ্যও করা হয়। বিশ্বাস না থাকলে সে রাষ্ট্র ও সমাজের শত্রু বিবেচিত হয়। ধর্মের গোঁড়ামিতে পাশের বাড়ির প্রতিবেশীকেও অবলীলা-ক্রমে হত্যা করা যায়। শাদা কিংবা কালো রঙের গাত্রচর্ম নিয়েও নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে যে-সব রাষ্ট্র বা সমাজ

উন্নত এবং সুসভ্য বলে চিহ্নিত, তারাও লজ্জা পায় না।

এইসব কারণে মানুষে মানুষে বৈরিতা বেড়ে চলেছে, সদাই শঙ্কিত হয়ে থাকতে বৈরী স্বদেশবাসী কখন গায়ের রঙ দেখে ক্ষেপে যাবে কে জানে, কিংবা ধর্মের উৎকট গোঁড়ামি কোন অশুভ লগ্ন বুঝে মাথাচাড়া দেবে!

শুধু যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা রাষ্ট্রবিপ্লব নয়। আমি তোমার সর্বনাশ করতে চাই, এইটাই সবচেয়ে বড়ো যুক্তি।

সমাজ-জীবনের অভিশাপ অসংখ্য। এইসব অশুভবুদ্ধির যাঁরা অগ্রনায়ক, তাঁরা হাউসম্যানের সেই ইয়ং ম্যানের মত একটি মাত্র নীতিতেই বিশ্বাসী—

"And I will die to-morrow
But you will die to-day —"

শেষপর্যন্ত জয় হবে কিন্তু সেই ছোট্ট মানুষের, সেই ক্ষুদে মানুষ একদিন চরম আদর্শ, উৎকট জাতীয়তাবাদ, জঙ্গী প্রতিশোধ নেবে। মানব সম্প্রদায় ভাবগত ধর্মান্ধতা, সাদা-কালোর বিদ্বেষ প্রভৃতির নাগপাশ কাটিয়ে হয়ত একদিন ত্রাসের জগৎ থেকে ত্রাণলাভ করবে। কিন্তু সেদিন এখনো সুদূরে, এখনও সে-পথ দুর্গম এবং কণ্টকর কঠিন।

সেই শুভবুদ্ধিকে আজ জাগ্রত করার জন্য মুক্ত বিবেকের বলিষ্ঠ কণ্ঠ ধ্বনিত হোক। বাঙালী কবির বাণী সবার ওপরে মানুষ সত্য এই পরম সত্য যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

ওড়িয়া কবির জন্মোৎসব ॥

উড়িষ্যার সাহিত্যে গঙ্গাধর মেহের একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আধুনিক কাব্য আন্দোলনে যদিও তাঁর নাম রাধানাথ বা মধুসূদনের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না, তবু তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গত ৩০শে আগস্ট তাঁর ১০৩তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়। বাংলাদেশেও কুলটিতে 'কুলটি উৎকল সমাজ' এবং 'গঙ্গাধর মেহের বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের যুগ্ম উদ্যোগে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রভাকর নায়ক। কবির রচনা থেকে আবৃত্তি পাঠে অংশ গ্রহণ করেন বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা।

ওড়িয়া সাহিত্যে গঙ্গাধর মেহেরের অবদান নির্ণয় করতে গেলে উড়িষ্যার আধুনিক কাব্য সাহিত্যের পট-ভূমিতে প্রবেশ করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের মত উড়িষ্যারও আধুনিক যুগের আরম্ভ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষ থেকে। ১৮০৩ খৃঃ উড়িষ্যা প্রথম ইংরেজ অধীনে আসে। সেই সময়েই অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একটা ব্যাপক পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়েই রাধানাথ রাই, ফকিরমোহন সেনাপতি, মধুসূদন রাও প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। বস্তুতপক্ষে তাঁদের প্রচেষ্টাতেই নতুন যুগের ওড়িয়া সাহিত্যের সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

রাধানাথ রাই প্রবর্তিত কাব্যধারায় পরবর্তীকালে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, গঙ্গাধর মেহের এবং চিন্তামণি মহান্তি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য কাব্য-প্রতিভার দিক থেকে এঁদের কেউ-ই তেমন বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন নন। তবু উড়িষ্যার সাহিত্যে তাঁদের অনুসারী এক বৃহৎ কবিসমাজ পরবর্তী-কালে গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে নন্দ-কিশোর বল, গোপবন্ধু দাস, পদ্মচরণ পট্টনায়ক, নারায়ণমোহন দে, গোদাবরী মিশ্র প্রমুখ প্রধান।

গঙ্গাধর মেহের অনেকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত আধুনিক কাব্যধারায় এক যুগ-সন্ধি-ক্ষণের কবি বলে মনে হয়। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাঁর কাব্যকৃতির পরিচয় হিসেবে এখানে তা উল্লেখ করা যাচ্ছে—

"Gangadhar was a born poet with very little schooling. His 'Tapasvini', a characterisation of Sita during her incarceration by Ravana, is regarded as a masterpiece. But at times he fails to maintain the required gravity and force of style and expression.'

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করলে বোধহয় অন্যায় হবে না। কলকাতা থেকে অনেক চেষ্টা করেও গঙ্গাধর মেহের বা আধুনিক ওড়িয়া কাব্যের কোন সংকলন-গ্রন্থ সংগ্রহ করা গেল না। অথচ সাগর-পারের দেশের বইয়ের কত ছড়াছড়ি। যাঁরা প্রবাসী উৎকলবাসী এখানে আছেন, তাঁরা মাঝে মধ্যে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। কিন্তু সেটা কেবল তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন ভাব-বিনিময়ের প্রশস্ত পথ এখনও পর্যন্ত নির্ণীত হয়নি। অথচ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাজ্য হল উড়িষ্যা।

তুলসীদাস জয়ন্তী ॥

গত মঙ্গলবার 'কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দী পরিষদ' কর্তৃক তুলসী-দাস জয়ন্তী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এন ডি বাজপেয়ী। প্রখ্যাত সমালোচক—পণ্ডিত রামকিঙ্কর উপাধ্যায় তুলসীদাসের রচনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় তুলসীদাসের রচনা থেকে বিভিন্ন অংশ পাঠ করে শোনান হয়।

তামিল সাপ্তাহিকের রজত-জয়ন্তী ॥

গত ৩ আগস্ট, প্রখ্যাত তামিল সাপ্তাহিক 'কল্কি'র রজত-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। মাদ্রাজের রাজ্যপাল সর্দার উজ্জ্বল সিং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং তামিল সাহিত্য বিকাশে 'কল্কি' পত্রিকার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীভক্তবৎসলম, প্রধান বিচারপতি শ্রীএম অনন্তনারায়ণম এবং সমবেত লেখক ও সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীআর কৃষ্ণমূর্তির অসাধারণ-আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেন। এই পত্রিকার প্রথম থেকেই শ্রীরাজাগোপালাচারী যুক্ত ছিলেন। তিনিও পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করে ভাষণ দেন। এই পত্রিকার রজত-জয়ন্তী উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি রচনা প্রতি-যোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে উপন্যাস রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন শ্রীউমাচরণ পান ১০,০০০ টাকা পুরস্কার, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন শ্রীআর এস নল্লাপেরুমল পান ৭,৫০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন শ্রীআর ভি রামকৃষ্ণন পান ৫,০০০ টাকা। ছোটগল্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন শ্রীমতী এন পদ্মা এবং ১,০০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। দ্বিতীয় হন শ্রীকে ভেঙ্কটরমণী। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীরাজাগোপালা-চারী। পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক শ্রীটি সদাশিবম সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানান।

বিদেশী সাহিত্য

জার্মানীর জাতীয় সংগীতের ইতিহাস ॥

জার্মানীর জাতীয় সংগীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই কিছু জানা নেই। জার্মানদের মধ্যেও অনেকে এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন না। সম্প্রতি গুডরুন হেরমান-এর ইতিহাস অর্থাৎ কে তার রচয়িতা এবং কবে থেকে সেটি জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেল—এ সম্বন্ধে নতুন-ভাবে আলোকপাত করেন।

জার্মানীর জাতীয় সংগীত "ডয়েট-শল্যান্ট, ডয়েটশল্যান্ট উইবের আলেস,...ইন-ডের ভেল্ট" (জার্মানী, জার্মানী সবার উপরে, পৃথিবীর সবকিছুর উপরে") লেখা হয়েছিল ১২৫ বছর আগে। জার্মান কবি

ও ভাষাবিদ্ হাইনরিখ হফমান ফন ফালেরস্‌লেবেন এর রচয়িতা। এটি হিটার ভিয়েনার কবি জোসেফ হেডেন-এর "গড সেফ দি এম্পারার ফ্রাঞ্জ"-এর অনুকরণে তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরে হেডেনেরই সুরে রচনা করেন। গানটির সমাদর হয়েছিল মদের আখড়ায় মাতালদের বৈঠকে। প্রথম মহাযুদ্ধ সমাপ্তির চার বছর পর জার্মানীর সে সময়কার প্রেসিডেন্ট এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে মনোনীত করলেন। নাৎসীরা ক্ষমতা লাভের পর আসল গানটির সঙ্গে আরো কিছু জুড়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একে জাতীয় সংগীত হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। ফলে এর পরিবর্তে অরেকটি জাতীয় সঙ্গীতও লেখা হল। তখন জার্মানীর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক থিওডোর হয়েস হফমানের সংগীতের সঙ্গে হেডনের রচনার তৃতীয় পদটি জুড়ে দিয়ে বর্তমান জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীতকে স্থায়ী স্বীকৃতি দিলেন।

আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থ ॥

আয়তনের দিক থেকে, বোধকরি, এ মুহূর্তে শ্রীমতী মার্গারেট্‌ ইয়ং-ই পৃথিবীর বৃহত্তম উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব রাখেন। পিটার ওয়েন প্রকাশিত তাঁর এই বিপুলকায় উপন্যাসটির নাম 'মিস্‌ ম্যাকিনটোস্‌, মাই ডার্লিং'। এতে ১০ লক্ষ শব্দ আছে। দাম প্রায় ৬৩ টাকা। এই উপন্যাসটি শেষ করতে তাঁর প্রায় ১৮ বছর লেগেছিল।

গ্রন্থটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র অসম্ভব চাহিদা দেখা দেয়। কেবলমাত্র আমেরিকাতেই এক সপ্তাহে ৪০ হাজার কপি বিক্রী হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য আধুনিক জীবন। আত্মহত্যা, খুন, জুয়া, গুণ্ডাবাজী থেকে শুরু হোমোসেক্সুয়ালিজ ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসই এই গ্রন্থটির বিপুল আয়তন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

পরলোকে ডঃ আর্থার ওয়ালে ॥

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ডঃ আর্থার ওয়ালে গত ২৭ মে তারিখে গত হয়েছেন, এ খবর অনেকেই শুনে থাকবেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে অনেকেই হয়তো তেমন খবর রাখেন না। তিনি যে একজন বিশিষ্ট কবি তাই বা ক'জনের জানা আছে? ভাষাবিদ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সর্বত্র। পৃথিবীর বহু জ্ঞানী পণ্ডিতের ভাষায় তিনি ছিলেন 'ইন্টেলেকচুয়াল জায়েন্ট'। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাণ্ড সেভেনটি চাইনিজ পোয়েমস্‌,' 'টেল্‌ অ গাঞ্জি', 'দি সেক্রেট হিস্ট্রি অব্‌ দি মোঙ্গল্‌স' উল্লেখযোগ্য।

নতুন বই

রাঢ়ভূমির পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত

'দেখি পুরী বর্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ-দেশ!

রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ।'

—অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের এই চিত্র এঁকেছিলেন ভারতচন্দ্র। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরের দেশ বর্ধমান। প্রাচীন কাল থেকে এর ঐশ্বর্যের তুলনা নেই। মহাভারতে, আচারাঙ্গ সূত্রে, মহাবংশে, রঘুবংশে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, দশকুমার চরিতে বর্ধমানের উল্লেখ আছে। প্রধান শহর বর্ধমান থেকেই সমগ্র অঞ্চলটির বর্ধমান নামকরণ। এক সময় এই অঞ্চলকে বলা হত রাঢ়ভূমি। বাঙলাদেশের ইতিহাসে এই রাঢ়ভূমির অবদান উল্লেখযোগ্য। জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমানস্বামী খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। বর্ধমানস্বামীর নামানুসারেই বর্ধমান নাম হয়েছিল, অনেকের অনুমান। মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বর্ধমান অঞ্চলে যে সুসভ্য ও পরাক্রান্ত জাতি বাস করত, তারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার ঘটেছিল এই অঞ্চলে। পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধধর্ম এবং সেন রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। বর্ধমানভুক্তি (ভুক্তি অর্থ প্রদেশ) কথাটা খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। পাল রাজাদের সময় রাঢ়দেশ উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় দুটি অংশে বিভক্ত হয়। মাঝখানে অজয় নদী। বর্ধমানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বাঙলাদেশের সমতল ও পার্বত্যভূমির সংগমস্থল হল বর্ধমান। বর্ধমানে 'রাঙ্গামাটি'র পাহাড় অঞ্চলের উত্তরে সমতলভূমি চলে গেছে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত। এই পার্বত্যভূমিতেই আর্য-অনার্য সভ্যতার সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ ঘটে বাঙলাদেশের সংস্কৃতিকে এক বিচিত্র দিকে প্রবাহিত করেছিল। ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে বর্ধমানের ইতিহাসে অনেক নতুন তথ্যের আলোকপাত ঘটবে। অজয়-তীরবর্তী অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্ধমানের তিন প্রধান নদী—ভাগীরথী, অজয় ও দামোদর। দামোদর এই অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে গঙ্গার মতই পবিত্র। আর্য-পূর্বকালীন সংস্কৃতির নিদর্শন এখনও বর্ধমানের বুকে সুস্পষ্ট। এখানকার আদিবাসী বাউড়ি, হাড়ি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি। এদের প্রধান উপাস্য ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলশ্রুতি। বর্ধমানের দুর্গাপুর অঞ্চলের এক সময় নাম ছিল গোপভূমি। গোপ ও সদ্গোপদের প্রাধান্য সমগ্র জেলায়। এরাও ধর্মপূজা করে থাকে। মনসা, চণ্ডী, বাশুলী, ষষ্ঠী, বিশালাক্ষী, রুক্মিণীদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত দেবদেবীকে ঘিরে বর্ধমানের নিজস্ব লোক-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মমত এই জেলার সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। শিব-কালী-কৃষ্ণ পূজার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে জেলার সর্বত্র। তারপর পাঠান আমলে মুসলমানদের আগমন ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানের সংস্কৃতি জগতে আরও পরিবর্তন ঘটল। মসজিদ নির্মিত হল। হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংস্কৃতির রূপ পীরের দরগা গড়ে উঠল রাঢ়ভূমির সর্বত্র। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ পূজা তার নিদর্শন।

এই প্রাচীন ভূভাগটির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও পর্যন্ত রচিত হয়নি। ১৯১০ খৃঃ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রকাশের পর এদিকে কারো বিশেষ লক্ষ্য পড়েনি। যা-কিছু কাজ হয়েছে, [illegible] যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি বিচ্ছিন্ন। ১৯৫[illegible] খৃঃ 'রাঢ় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি' গঠিত হয়েছিল সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের তথ্যে বর্ধমানের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য রচনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু উদ্দেশ্য কার্যকরী হয়নি। ১৯৫৪ খৃঃ ও ১৯৫৯ খৃঃ বর্ধমানের দুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী রচিত 'বর্ধমান পরিচিতি'। এই গ্রন্থে বর্ধমানের প্রাচীন নিদর্শন থেকে পাঠান, মোগল, ইংরেজ শাসনযুগ অতিক্রম করে স্বাধীনতা উত্তরকালের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে চৈতন্যোত্তর যুগের বর্ধমান সংস্কৃতি (আর্য, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে কিভাবে, চণ্ডী, মনসা যোগাদ্যা, কালী, শিবঠাকুর, ধর্মঠাকুর, মুসলমান সংস্কৃতির বিকাশ, চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, মঙ্গলকাব্যের বিবরণ) লেখকদ্বয় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে আছে বর্ধমানের ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, অরণ্য, সংযোগ-ব্যবস্থার কথা। বর্ধমান জেলার লোকসংখ্যা, বিভিন্ন ভাষাভাষী, নগরী ও উপনগরী, জীবিকা, আদিবাসী, ধর্ম, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মান, কৃষি উৎপাদন, জলসেচ ব্যবস্থা, কৃষক-সম্প্রদায়ের জীবনধারা, বাজার, ব্যবসা, মেলা, শিল্প ও শিল্পাঞ্চল, ক্ষুদ্রশিল্প, বৃহৎশিল্প, শিল্পাঞ্চলে সমাজজীবন বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। পরিশিষ্ট দশটি অধ্যায়ে বর্ধমানের পাঁচালী ও যাত্রাগান, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, পল্লীনগরী ও উপনগরী, খৃষ্টান মিশনারীদের বর্ধমানে আগমন, মেলার পরিচয়, পুরাতাত্ত্বিক স্থান, তীর্থস্থান, চাউলের কল, পাকা রাস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলের

কয়েকটি মন্দিরের আলোকচিত্র এবং একটি সুবৃহৎ মানচিত্র গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। গ্রন্থকার দুজন যে অপরিসীম পরিশ্রমে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন, তা নিশ্চয়ই যোগ্য সমাদর পাবে। এখনও বর্ধমান অঞ্চলে যে অজস্র পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তার ফলে বর্ধমানের ইতিহাসে আরো নতুন আলোকপাত ঘটবে। বর্ধমানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে এ প্রাথমিক পদক্ষেপ: সে-হিসাবে গ্রন্থকার দুজনকেই তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদ জানান উচিত। গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখেছেন শিক্ষাব্রতী শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য।

বর্ধমান পরিচিতি (ইতিহাস) — অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী। বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। ২, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

বঙ্গ প্রসঙ্গ : অসামান্য আলেখ্য

বাঙলাভাষী মানুষেরা নিজের দেশকে যতখানি চেনেন, তার থেকেও বেশী পরিচিত বাইরের সঙ্গে; নিজের সংস্কৃতি অপেক্ষা অপরের সংস্কৃতিকে বেশী জানেন। এ কখনই সুলক্ষণ হতে পারে না। বাঙলা-দেশের জল-আবহাওয়ায় প্রকৃতিতে যে-চিত্রকল্প ভেসে বেড়ায়, বাইরের থেকে আমদানি করে তার স্থান পূরণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় হৃদয়ের খোরাক জোগান। আমাদের স্বাজাত্যবোধ স্বল্প, কিন্তু আমাদের হৃদয় বিশ্বপ্রেমে উদ্বেল। হয়ত অনেকে বলতে পারেন, এর দ্বারা সংকীর্ণতা দূর হয়। কিন্তু এই সংকীর্ণতা দূর করতে গিয়ে নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শ্রীসুশীল রায় সম্পাদিত 'বঙ্গ প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানি বাঙালী সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক অসামান্য আলেখ্য। বাঙালীর সামগ্রিক জীবনে উনিশ শতক এক পরিবর্তনের বাড় নিয়ে আসে। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সেই যুগকে জানতে হলে সে-সময়ের চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচয় সাধন বিশেষ প্রয়োজন। সংকলনের আটত্রিশটি রচনা বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। ভূমিকায় অতুল গুপ্ত বলেছেন : "সাহিত্যের ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কাছেই নয়, তারা শিক্ষিত সাধারণ পাঠকের চিন্তাকে সচল করে সাহিত্য-পাঠের আনন্দ দেয়। বর্তমান কালের বাঙালী পাঠক, বিশেষ বাংলার লেখকদের সঙ্গে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের নিকট-পরিচয় আজ একটা বড় প্রয়োজন।...সংগ্রহ কোনও বিশেষ কালে আবদ্ধ নয়। রামমোহন রায়ের ১৮২১ সালে লেখা প্রবন্ধ থেকে বিনয়কুমার সরকারের লেখা প্রবন্ধ পর্যন্ত বহু লেখকের লেখা এতে সংগ্রহ হয়েছে। যে-সকল পাঠক এই সংগ্রহ-গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধ প্রথম পড়বেন, তাঁরা সম্ভব চমৎকৃত ও বিস্মিত হবেন। যে-সব ভাব ও চিন্তাকে আমরা মনে করি আধুনিক, অনাধুনিক কালে তাদের গভীর মর্মস্পর্শী আলোচনায়, বাংলা গদ্যের যে লঘু ছন্দকে আমরা মনে করি সৌন্দর্যের সৃষ্টি, বহুদিন পূর্বে তার আবির্ভাব ও সৌকর্য দেখে।" বাঙলাভাষার উৎপত্তিকাল থেকে প্রবন্ধ-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অবলম্বী। বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে প্রবন্ধ। গল্প-উপন্যাসের মত বাঙলা প্রবন্ধের পাঠক-সংখ্যা নিতান্ত কম নয়! মনোরম রচনাভঙ্গী এর অন্যতম গুণবৈশিষ্ট্য। বর্তমান সংকলনের প্রবন্ধগুলি বিগত শত-বর্ষব্যাপী বাঙলাদেশ ও সংস্কৃতির পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

রামমোহন রায়ের 'আদি বঙ্গ' থেকে বিনয়কুমার সরকারের 'হাজার-ভূজা বাঙালী' পর্যন্ত বাঙালী জীবনের সামগ্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। রামসুন্দরী দেবীর সেকালের গৃহবধূ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নদীবক্ষে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুরাতন লোকাচার, অক্ষয়কুমার দত্তের প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কুনীতি ও সুনীতি, রাজনারায়ণ বসুর বাংলাভাষা, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইংরাজী-প্রভাব, রামগতি ন্যায়রত্নের বঙ্গের ভূগোল, কেশবচন্দ্র সেনের বাংলাভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক স্মৃতি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার সাহিত্য, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাংলার কথা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রায়শ্চিত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রাচীন ও নবীন, রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গবিজেতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মারাঠী ও বাঙলা, মীর মশররফ হোসেনের পল্লীচিত্র : একটি কথোপকথন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলার গৌরব, বিপিনচন্দ্র পালের বাংলার বৈশিষ্ট্য, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাংলাভাষার প্রসারচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ

ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস

পত্নী এমিলির প্রেমে ভরপুর ডাঃ মাইকেল জন নতুন পরিবেশে সংসার পাতার স্বপ্ন নিয়ে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি জানলেন প্রিয়াকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে অক্ষম তিনি, সেদিন থেকে জীবন হ'ল জটিল। অপরাধ-বোধ আর আত্মগ্লানিতে জর্জর জন এমিলির কাছে আর সহজ হতে পারলেন না। নিঃসঙ্গ এমিলি তরুণ অফিসার রবার্টসকে গ্রহণ করল একাকীত্বের সঙ্গী হিসাবে। জন দুঃখ পেলেও আপত্তি করার যুক্তি খুঁজে পান নি। কিন্তু এমিলির শরীরে যখন সন্তানসম্ভাবনার লক্ষণ প্রকাশ পেল, জন তা সহ্য করতে পারলেন না। স্ত্রীকে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করলেন তিনি। ডাঃ জনের বিবাহিত জীবনের এখানেই ইতি। এরপরে যবনিকা উঠছে সুদূর বাঁকুড়ার নাচনহাটি গ্রামে, যেখানে জনসায়েব স্থানীয় হাসপাতালে মিশনারী ডাক্তার। গ্রামেরই এক পঙ্গু দরিদ্র অধিবাসী ভগীরথ। ন্যায় অন্যায় বিচারের শিক্ষা তার নেই। কিন্তু শারীরিক খর্বতা তাকে হীনমন্য করে তোলে নি। জীবনের দাবী মেনে নিতে সে দ্বিধা করেছে হয়ত, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে তার দেরী হয়নি। লছমীর সন্তানের পিতৃত্ব সে মেনে নিয়েছে, যা জনসায়েবের শিক্ষিত, মার্জিত মন পারেনি এবং সেই অপারগতার মূল্য দিতে হয়েছে বাকী জীবন দিয়ে। জীবনের সত্য যখন উপলব্ধি হোল, জীবন তখন দূরে সরে গিয়েছে।

অনুরূপ দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক নায়কচরিত্রের ট্র্যাজেডি মূর্ত করে তুলেছেন। ভগীরথ চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাহেবের জীবনের ব্যর্থতা প্রতিফলিত। বর্তমান জীবনের ঘটনার মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতিতে অতীতকাহিনী কথন অধিক মনোজ্ঞ হয়েছে। গ্রামজীবনের পরিবেশ ও গ্রামীন চরিত্রঅংকনে লেখক নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের ভাষা সাবলীল, তবে বিষয় অনুযায়ী রচনাশৈলী আরো সুসংবদ্ধ হলে ক্ষতি ছিল না।

ধ্রুব রায়ের প্রচ্ছদ চোখে পড়ার মত।

নাচনহাটির জনসায়েব— অজিত চট্টোপাধ্যায়। সম্বোধি পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২২, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা—৬। দাম—ছয় টাকা।

সঙ্গীত সংকলন

গায়ক-সুরকার-গীতিকার অনিল ভট্টাচার্য বাংলাদেশের সঙ্গীতপিপাসু মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অতি অল্পবয়সে এই প্রতিভার অবসান দুঃখ ও বেদনাদায়ক। স্বল্প পরিসর জীবনে অসংখ্য গান তিনি রচনা করেছেন এবং সুরসংযোজনাও করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি নিজের গান নিজের পরিচালনায় বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ড করিয়েছেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর এই জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং খ্যাতিমান সুরকারদের পরিচালনায় তাঁর গান রেকর্ড হয়েছে। আজও তাঁর গান রেডিওতে শোনা যায়।

অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গীতপ্রীতিকে জাগ্রত রাখার জন্যই 'অনিল স্মৃতি বাসর'-এর প্রতিষ্ঠা। এ'দেরই উদ্যোগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরেকটি সঙ্গীত-সঙ্কলন 'আলো ঝলমল'। এবার প্রকাশিত হলো তিনশ গানের এই সঙ্কলনটি। সঙ্কলনের প্রতিটি গানই ভাব ও ভাষায় অনবদ্য। আমরা আশা করব এই গানগুলি সুর সংযোজিত হয়ে গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হবে।

মাধবী রাতে : অনিল ভট্টাচার্য। প্রকাশক— অনিল স্মৃতি বাসর, ১৪নং মোহনলাল স্ট্রীট, কলকাতা—৪, দাম—৪ টাকা।

ঠাকুরের নূতন পদ্ধতি, [illegible] বাঙালী, [illegible] উ[illegible], প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাঙালীর উন্নতি-চিন্তা, স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা ভাষা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী বাঙালী, মুন্সী আব্দুল করিমের প্রাচীন সাহিত্য. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালীর বিশিষ্টতা, দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গলিপির আদিকথা, প্রমথ চৌধুরীর বাঙালী-পেট্রিয়টিজম্, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিবসুন্দর, চিত্তরঞ্জন দাশের বাঙলার কথা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার বেখাপ বর্ণমালা, শ্রীঅরবিন্দের বাংলার দুর্বলতা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৌড়রাজমালা, বিনয়কুমার সরকারের হাজার ভুজা বাঙালী আলোচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। বাংলাভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বহুবৈচিত্র্য ধরা পড়েছে এর মধ্যে।

এই ধরনের সংকলন-গ্রন্থ খুব কমই দেখা যায়। সম্পাদক পূর্বসূরী বাঙালী মনীষীদের রচনার সঙ্গে একালের মানুষের পরিচয়সাধন করে এক মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন। নির্বাচন বিষয়ে শ্রীরায় বাঙালী চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। পূর্বসূরী সংকলনের মত এই সংকলনটি সমাদৃত হবে।

বঙ্গ প্রসঙ্গ (সংকলন) — শ্রী[illegible] সম্পাদিত। ভূমিকা : অতুল গুপ্ত। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম আট টাকা ও দশ টাকা।

একটি অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের গৌরব যখন আমরা গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করি, সর্বস্তরে মাতৃভাষার শিক্ষামাধ্যমের জন্য যত দাবীই জানাই, এ কথা মনে রাখতেই হবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভাবনার সনিষ্ঠ প্রকাশ এখনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। শুধু তাই নয়, বাংলা দেশে সাহিত্যের ভাষায় যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তার পাশাপাশি একটি সামান্য ভাষা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তেমন প্রয়াস দেখি না। এবং বিজ্ঞান যে দর্শন-চিন্তার প্রাথমিক উপকরণ, এবং পুনরায় দর্শন যে বিজ্ঞানের নবনব প্রতিভাশালিনী দিগন্তের বিস্তার ঘটায়, উন্মেষ আনে, একথাও স্কুলকলেজের বিজ্ঞানপাঠের প্রতিযোগিতায় আমরা ভুলতে বসেছি। কিন্তু বিজ্ঞান কি? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র এক প্রবন্ধে [illegible] (বৈশাখ ১৩১২) বলেছিলেন : "বিজ্ঞান—বিজ্ঞান—আমরা বিজ্ঞান চর্চা করিব। কেবল পদার্থ বিদ্যা, আর রসায়ন শাস্ত্র আর [illegible] তত্ত্ব লইয়াই বিজ্ঞান। যেন কলের গাড়ীতে আর টিনের ক্যানিস্তারেই বিজ্ঞান [illegible]বদ্ধ। মানবতত্ত্ব যেমন বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে—ইতিহাসালোচনা যেন বিজ্ঞানের সীমার বহির্গত!

বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়, তাহা বিজ্ঞানের বিষয়—আত্মতত্ত্ব পর্যন্ত।" সুতরাং এককথায় বিজ্ঞানচিন্তার পথিকৃৎ হিসাবে জ্ঞানকোষস্বরূপ প্রতিভাশালী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকে বাংলাদেশ পেয়ে ধন্য হয়েছে। একধারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পুরাণতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয় যেন তাঁর নখাগ্রে ছিল। জনপ্রিয় জ্ঞানের ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সামান্য নয়। তথ্য ও তত্ত্বনিষ্ঠ যুক্তির ভাষারূপে গদ্য চিন্তাপ্রকাশের যে একনিষ্ঠ বাহন, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার দাক্ষিণ্যে আমরা জানতে পেরেছি।

ডক্টর বন্ধদেব ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করে একটি বিশেষ দিকের পথানুসন্ধান করেছিলেন। 'পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর' তাঁর গবে-

অন্যান্য খ্যাতির পরিধির আজও বিস্তার ঘটাবে। ২৩৫ পৃষ্ঠার এই বইখানিতে তিনটি ভাগ রয়েছে—সাহিত্য কথা, জীবন কাহিনী ও নির্দেশিকা। প্রথমাংশে রামেন্দ্রসুন্দরের বাংলা সাহিত্য ও চিন্তা জগতে লেখক স্থান নির্দেশ করে বলেছেন "বৈজ্ঞানিক সত্যকে পাথেয় করে তিনি বেরিয়েছেন জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধানে। বিজ্ঞান-বিদ্যা, তাঁর কাছে শেষ কথা নয়, অশেষকে জানার উপকরণ মাত্র।" ১৯৬৫ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। ডক্টর ভট্টাচার্যের বইখানি যথেষ্ট সময়োপযোগ্যও বটে।

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর— ডঃ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—৯।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

চাষের পাঁজি (কৃষি) — দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। মেরিট পাবলিশার্স। ৫১, বিধান সরণী। কলকাতা ৬। দাম এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

'চাষের পাঁজি' কৃষি-বিষয়ক পঞ্জিকা। শস্যের বিষয়ে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। কোন্ সময়ে কোন্ বীজ বপন করতে হয়, উপযোগী মাটি ও বপনের প্রণালী, সঠিক বপনে সার্থক ফলনের পরিমাণ, জমিতে সার প্রয়োগ, ফসলের পোকামাকড়, ফসলের রোগ, বীজ উৎপাদন-রক্ষা ও পরীক্ষা প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র কৃষি-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

●

মধ্যদিনের গান (উপন্যাস) — বিমলেন্দু চক্রবর্তী। ৭, অশ্বিনী দত্ত রোড। কলকাতা-২৮। দাম তিন টাকা।

যুগযন্ত্রণা আর অবক্ষয়ে বিভ্রান্ত এক-দল সংগ্রামী মানুষকে নিয়ে কালক্ষয়ী সাহিত্য সৃষ্টির এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখক দৈহিক বিকৃতিকে একমাত্র মূলধন করে যে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছেন, তা বিপরীতমুখী আকর্ষণে কাহিনীকে পাঠোত্তীর্ণ করতে সক্ষম হলেও, রসোত্তীর্ণ করতে পারেনি। লেখককে শিল্প-কুশলতার দিক থেকে আরও পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

●

জ্যোতির্ময়ের রচনা সংগ্রহ—সম্পাদক : দেবীদাস বসুঠাকুর। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিপ্লবী জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়েছিল বাল্যকাল থেকেই। পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন ও বন্দী-জীবনযাপনকালে তাঁর সাহিত্যসেবা নীরব হয়ে যায়নি। জ্যোতির্ময়ের রাজনৈতিক জীবনের মত সাহিত্যজীবনও ছিল সমৃদ্ধ। জ্যোতির্ময়ের গান, কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কয়েকটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ আছে বর্তমান সংকলনে। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে।

প্রদর্শনী

শিল্পী কুমুদ শর্মা—বিহারের প্রথম মহিলা চিত্রকর শ্রীমতী কুমুদ শর্মা তাঁর আটত্রিশটি তেলরঙের প্রতিভাদীপ্ত চিত্রসম্ভার নিউদিল্লীর শ্রীধরনী আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শন করেন গত ১১ সেপ্টেম্বর। বিহারের প্রখ্যাত হিন্দী কবি ও সমালোচক স্বর্গত অধ্যাপক নলীন বিলোচন শর্মার তিনি সহধর্মিণী।

● ● ●

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

● ● ●

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'র (বৈশাখ-আষাঢ়) বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন: অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সুকুমার রায়, অনন্তকুমার গোস্বামী, দেবকুমার চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভৈরবপ্রসাদ হালদার, বিনোদবিহারী দত্ত, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, শৈলোকেন্দু ঘোষ, নিখিল রায়। ১০, হেস্টিংস স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

'মধ্যাহ্ন' ত্রৈমাসিক দেয়াল পত্রিকার পরিবর্তিত নাম। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন অশোক দাস, অচ্যুৎ গোস্বামী, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, রত্নেশ্বর হাজরা, বিষ্ণু ভৌমিক, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য, এবং আরো কয়েকজন। ৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম পঁচাত্তর পয়সা।

●

মনোবিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা **"মানব মনে"র** বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন বি জেডেন্কো (সাইবারনেটিক্স ও চিন্তা-প্রক্রিয়া), ভি পেট্লেংকো (চিকিৎসা বিজ্ঞানের কয়েকটি তত্ত্বগত সমস্যা), শ্রীবন্ধু (বার্ধক্য বিজ্ঞান প্রসঙ্গে), অচিন্ত্যেশ ঘোষ (কাজে ফাঁকির সামাজিক পশ্চাৎপট), গুরুদেব দের (আধুনিক ভারতবর্ষে মনরোগের চিকিৎসা), এ এফ পলিস (ব্যক্তি ও পরিবেশ), অসীম মুখোপাধ্যায় (উনিশ শতকের গ্রাম্য সমাজ), ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (শিল্পী-মানসে সমকালীন বিরোধের প্রতিফলন), জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় (কোয়ান্টাম মেকানিকসের পরিপ্রেক্ষিতে জীববিদ্যা) এবং আরো কয়েকজন। ১৩২।১এ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম এক টাকা।

●

দ্বিমাসিক বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা **'বিজ্ঞানবার্তা'র** প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় জেমিনি পরিকল্পনার সাফল্য, চাঁদে প্রথম মানুষ, মনীষী আইনস্টাইন, গ্রহান্তরের বাণী, সময় ও ঘড়ি, ঘুম, হিস্টিরিয়া, তর্কশাস্ত্রীয় গণিত, শুক্রগ্রহে প্রাণ, ফিউজ, অর্থ প্রভৃতি আলোচনাগুলি বেশ সহজবোধ্য। বিজ্ঞানকে সাধারণের উপযোগী করে যে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন বিজ্ঞানবার্তার কর্তৃপক্ষ তার জন্য ধন্যবাদার্হ। ২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম এক টাকা।

●

'স্বাস্থ্য-দীপিকা' : স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকা। এই ধরনের পত্রিকা আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। চতুর্থ ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় লিখেছেন ডাঃ আরতি রায় (বিপদ), সুকুমার চ্যাটার্জি (যক্ষা-চরিত), ডঃ জলধিকুমার সরকার (রোগের ভাইরাস ও তাহার বিস্তার), ডঃ কে কে রায় (ডিপ্থেরিয়া), ডঃ অমিয়কুমার হাটি (মশা ও জনস্বাস্থ্য), মাধব পাল (চিবিয়ে খান), ডঃ সন্দীপকুমার চক্রবর্তী (নতুন রোগের আমদানি), ডঃ কে কে রায় (টনসিল) এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটিতে পড়বার বিষয়, বিজ্ঞাপনের তুলনায় অনেক কম। ২, ফরডাইস লেন, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির দাম ৫০ পয়সা।

●

নানা বিষয়ের রচনার মাসিক পত্র **'আলোক সরণি'**। গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গচিত্র, রম্যরচনা, ধারাবাহিক উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছাত্র ও শিক্ষাজগৎ, শিল্প ও সংস্কৃতি মেয়েদের আসর, ছোটদের পাতা সমস্ত প্রকার রচনাই আছে এতে। পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করতে হলে সম্পাদককে আরো দায়িত্বশীল ও রুচির পরিচয় দিতে হবে। ৪১এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত এবং সজীব সরকার সম্পাদিত এই পত্রিকাটির দাম পঞ্চাশ পয়সা।
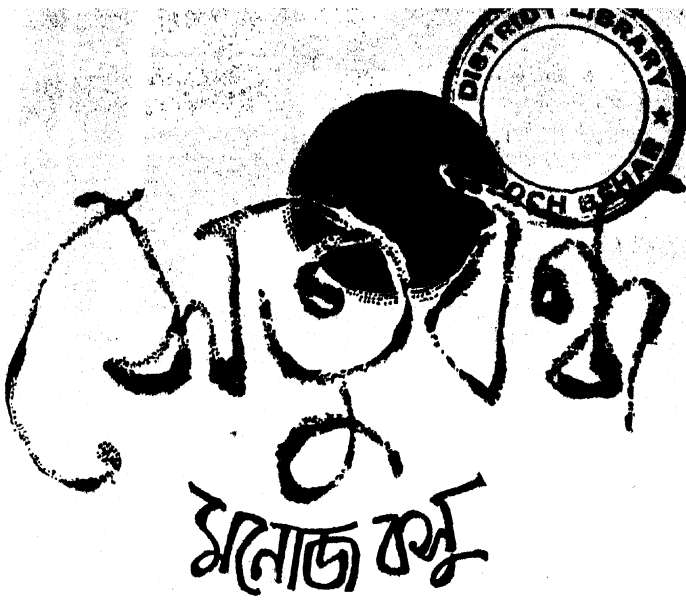
[উপন্যাস]

(আট)

একদিন ঠিক ঐ রকমের হাসি। তারপরের প্রশ্নটা একটু ভিন্ন : অফিস আর বাড়ি এর বাইরে কোনখানে কখনও যান না বুঝি?

পূর্ণিমা বলে, আজকে যাব।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে অরুণ বলে, কোথা যাবেন?

হাওড়া স্টেশনে—না, তারও ওদিকে। শিবপুরে চলুন যাই।

কোন আত্মীয় আছেন বুঝি?

পূর্ণিমা বলে, না, বেড়াব। বটানিক্যাল বাগানে চলুন যাই।

আর কথাটি নয়, গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিল। হাত বটে অরুণের! গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়—তার ভিতর দিয়ে সুকৌশলে এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি যেন এক নেংটি ইঁদুর। ঘিঞ্জি অঞ্চল ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে গেল, তখন তো আর কথাই নেই—গাড়ি বাতাসের বেগে ছুটেছে। আর কী আশ্চর্য—এমনি অবস্থার মধ্যেও একটা হাত মুক্ত হয়ে পূর্ণিমার উপর।

অন্যমনস্ক মানুষটার নজর ধরিয়ে দেয় পূর্ণিমা : গাড়ি যে এক হাতে চালাচ্ছেন—

অরুণ সগর্বে বলে, দুটো হাত তুলে নিয়েও পারি।

পূর্ণিমার বুক ঢিব ঢিব করে। একটা হাতে তার ডানহাত চেপে ধরেছে—অপর হাত মুক্ত হলে সেই হাতখানার কাজ কি হবে তখন?

না, তেমন কিছু হবার জো নেই। স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নিলেও অতিশয় কড়া নজর রাখতে হয়—বেয়াড়া কিছু না ঘটে। দু-এক মিনিটের বাহাদুরি দেখানো, এই মাত্র। এরই মধ্যে গাড়ি হুশ করে বাগানে ঢুকে পড়ল।

অরুণ বলে, এবার?

পূর্ণিমা বলে, বসি গিয়ে একটা ভাল জায়গা দেখে।

ভাল জায়গা, অর্থাৎ নিরিবিলি জায়গা। গঙ্গার একেবারে কিনারায় ঘাটের উপর বসেছে। মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে, দিনমানের মতন জ্যোৎস্না। হাওয়া দিয়েছে—ভারি মনোরম। নড়ে-চড়ে অরুণ নিবিড় হয়ে এলো।

পূর্ণিমা ভালমানুষের মতো বলে, এই সব বুঝি আপনাদের উপরি?

চমক লাগে অরুণের। কথার সুর কেমন যেন।

পূর্ণিমা বলে যাচ্ছে, আমি যে-বাড়ির মেয়ে, সেখানে চাকরি-বাকরি দূরের কথা, মেয়েদের বাইরে বেরুনোই মানা ছিল চিরকাল। এ লাইন অজানা বলেই জিজ্ঞাসা করছি। মনিবের উপরি-পাওনা বুঝি এইগুলো?

খোয়ার স্তূপ একটা অদূরে। কথা নয়, মনে হয় পূর্ণিমা খোয়া ছুঁড়ে মারছে। লোলুপ হাতদুটো অরুণ তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল।

শান্ত কণ্ঠে পূর্ণিমা নিজেই জিনিসটা ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে : আপনার অফিসের কর্মচারীরা ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায় কিসে দু পয়সা উপরি-আয় হয়। অফিসের মনিবরাও তাই। মাইনে দেন, তার জন্য ডিকটেশন নিই, টাইপ করি, ষোলআনা কাজ আদায় দিই। অফিসের বাইরে তারপর গাড়িতে তুলে ঘোরাঘুরি, গায়ের উপর হাত চেপে ধরা—আচ্ছা, এই অবস্থায় আমায় তখন কি করতে হয় বলুন তো। জানি নে বলেই জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবেন না।

অরুণের মুখে কথা নেই, কানেই যাচ্ছে না যেন। একটা নৌকো ঘুরে-ঘুরে আনন্দবিহার করছে, ছইয়ের ছাদে যুবক আর যুবতী, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে একদৃষ্টে।

একটুখানি চুপ করে পূর্ণিমা বুঝি জবাবের প্রত্যাশায় ছিল। বলে, আনাড়ি বুদ্ধিতে আমি বুঝি—দুটো জিনিস করা চলে। হাত ধরেছেন তো সেই হাতে গালের উপর ঠাস করে চাপড় মারা। অথবা হাতে বেড় দিয়ে ধরে আপনার গায়ের উপর ঢলে পড়া, নৌকোরি উপর ঐ ওরা যেমন করছে। দুটো জিনিসই নির্ভয়ে করা চলে, নিজে আপনি কোনটাই প্রকাশ হতে দেবেন না। তা হলেও চড়-চাপড়ের পর সেই মনিবের চাকরি কোন মতে আর করা চলে না। কি বলেন?

সমস্যায় পড়ে বহুদর্শী হিতৈষী সুহৃদের কাছে সদুপদেশ চাইছে, ভাবখানা এমনি। বল, চড় দিলে চাকরিও সঙ্গে সঙ্গে ছাড়তে হয়। সে তো পেরে উঠব না। ভাইয়ের জন্য খরচ, সিঁড়ি থেকে পড়ে বাবা অচল হয়েছেন—চাকরি ছাড়লে এঁদের কি উপায় হবে? আবার চড়ের বদলে গায়ে গড়িয়ে পড়েও মুনাফা নেই। শান্তা হতভাগী তাই তো করেছিল।

সচকিত হয়ে অরুণ প্রশ্ন করে, শান্তা কে?

আমার আগে যিনি রিসেপশনিস্ট ছিলেন। আপনার কিছু নয়, সেটা আপনাদের কনিষ্ঠ সমীরবাবুর ব্যাপার, সেইজন্যে বোধহয় সঠিক মনে পড়ছে না। সমীরবাবুর তখনও বিয়ে হয় নি, শান্তা অনেক রকম প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন শুনেছি। টের পেয়ে আপনারা সমারোহে বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনলেন। কাঁদতে কাঁদতে শান্তা বাড়ি গিয়ে ঘরের দরজা দিলেন। তারপরে আর অফিসে আসেন নি। শান্তার তবু যা-হোক আশা করবার ছিল—আপনার বেলা শুধু স্ত্রী নয়, দু-দুটো বাচ্চা ছেলে। আমি কোন লোভে তবে শান্তার মত হতে যাই বলুন।

হেসে উঠল পূর্ণিমা। অরুণ বলে, আপনি অন্যায় দোষারোপ করছেন। ফিরে যাবেন তো চলুন।

পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তা দেখুন দুয়ের কোনটাই আমি করলাম না। ঠিক সেই জন্যেই আপনি আমার কিছু করে দিন। কোন ভাল অফিসে একটা চাকরি। ব্যবসা সূত্রে আপনাদের বিস্তর জানাশোনা—ইচ্ছে করলেই পারেন। এত সব কাণ্ডের পর আপনার চাকরি না ছেড়ে দিয়ে উপায় নেই।

গাড়ির ভিতরে একটি কথাও নয়। যেন দুই বোবা চলেছে—দুই পাথরের মূর্তি পাশাপাশি। বাড়ির গলির কাছে থামতে পূর্ণিমা দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। গাড়িও তারপরে মুহূর্তকাল দাঁড়ায় না।

অফিসেও তেমনি। ডাক পড়লে পূর্ণিমা অরুণের চেম্বারে গিয়ে ডিকটেশন নিয়ে আসে, টাইপ করে জিনিসটা বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দেয়। ছুটির পরে ধীরে-সুস্থে গিয়ে ট্রাম ধরে, লাল-গাড়ি ত্রিসীমানার মধ্যে দেখা যায় না।

কেউ কিছু জানে না, পাশের সেই নলিনাক্ষ সেনকে সে কেবল বলেছিল, আমি একজন বাড়তি এসে পড়েছিলাম, আপনাকে তাই রিটায়ার করতে বলল। আর বলবে না, আমি চলে যাচ্ছি।

সাগ্রহে নলিনাক্ষ বলেন, চাকরির অন্য কোথাও ঠিক হল বুঝি?

ভাসা-ভাসা রকমে পূর্ণিমা জবাব দেয় : হয়ে যাবে বই কি!

উল্লাস চেপে রাখতে পারেন নি ভদ্রলোক। বড়সাহেব অসীমের ঘরে তাঁর বেশি কাজকর্ম। সুখবর সরাসরি বোধকরি সেই অবধি তুলে দিয়ে এসেছেন। পূর্ণিমার ডাক পড়ল।

পূর্ণিমা প্রমাদ গণে। কাজের রীতিমত দুনাম হয়েছে ইতিমধ্যে। অসীম যদি মানা করে কি জবাব দেবো? আগে-ভাগে চাউর হতে দেওয়া ঠিক হয় নি।

অসীম বলে, চাকরি ছাড়ছেন নাকি?

আমতা-আমতা করে পূর্ণিমা বলে, ঠিক করিনি এখনো কিছু। মানে, দুবার করে বাস-বদল, ভিড়ের মধ্যে কষ্ট হয় বড্ড—

অসীম উপদেশ দেয় : ঠিক করে ফেলুন, দ্বিধা করবেন না। এখানে ভবিষ্যৎ কি? কত আর আমরা দিতে পারব? ভাল জায়গায় পান তো এক্ষুনি চলে যান।

একটু থেমে আবার বলে, সত্যি বলতে কি—সব জায়গাই ভাল আমাদের এখান থেকে, এ হল নরককুণ্ড।

কী লজ্জা, কী লজ্জা! অরুণের আচরণ কানে গিয়েছে নিশ্চয় কিছু। সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে নিরীহভাবে পূর্ণিমা বলে, ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে যদি কিছু জোটানো যেত, যাতায়াতের সুবিধা হত আমার পক্ষে।

আলবৎ জুটবে। আমিও খোঁজে রইলাম।

যা ভেবেছিল একেবারে তার উল্টো। সহানুভূতিতে অসীম যেন গলে গলে পড়ছে। বলে, কাজে যা নিষ্ঠা—লুফে নেবে আপনাকে। ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি। দরখাস্ত করেছেন? কোথায় কোথায় করলেন, আমায় বলবেন। চেনা বেরুতে পারে তার মধ্যে—আমি বলে দেব।

এই শেষ নয়। ঘণ্টাখানেক পরে ছোটসাহেব সমীরের ঘর থেকে তলব।

হার্মান প্লাম্বিং সাপ্লায়ার্স-এর নাম শুনেছেন?

পূর্ণিমা মৃদু হাসল। মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করছে, অত বড় কোম্পানির নাম জানবে না?

সেখানে কাজ খালি আছে, দরখাস্ত করুন। দরখাস্তের ড্রাফট তৈরি করে রেখেছি, টাইপ করে নাম সই দিয়ে ছেড়ে দিন। আমাদের কোম্পানির একটা সার্টিফিকেট দরখাস্তের সঙ্গে জুড়ে দেবেন। তারও ড্রাফট আছে—টাইপ করে বড়দাদাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবেন।

স্বহস্তে সমীর ড্রাফট বানিয়ে রেখেছে, পূর্ণিমার হাতে দিল। বলে, আপনার মতন কাজের মানুষের উন্নতি হোক, একান্ত ভাবে চাই আমরা।

অর্থাৎ মধ্যমের লাল-গাড়িতে উঠে ঘোরাঘুরির জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ উভয়েরই কানে গেছে, নজরেও পড়ে যেতে পারে। দুই ভাই অতএব কোমর বেঁধে লেগেছে পূর্ণিমার উন্নতি না করিয়ে ছাড়বে না। শান্তার মতন অত দূরে যেন গড়াতে না পারে।

আরও হল—সার্টিফিকেটে অসীমের সই নিতে গেছে যখন। অসীম বলে, দরখাস্ত এমনি দিয়ে লাভ নেই। এক কাজ করুন, কাটায় কাটায় দশটার সময় কাল চলে আসুন। আমি সঙ্গে করে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসব।

পূর্ণ মুখুজ্জের পুরানো অফিস। চিরজন্ম কাটিয়ে এসেছেন—চাকরি ছাড়লেও মায়া ছাড়ে নি। তাঁর আমলের কর্মচারীও আছেন দু-পাঁচজন। পথে-ঘাটে দেখা হয়ে গেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবরাখবর নেন। বুড়ো টাইপিস্ট নলিনাক্ষ সেনের সঙ্গে দেখা একদিন।

কাজকর্ম চলছে কেমন?

নলিনাক্ষ সেনের নিজের কথাই এক কাহন। বলেন, আপনার মতন আমিও রিটায়ার করছিলাম মুখুজ্জেবাবু, করাচ্ছিল জোর করে। কিন্তু আপনার অবস্থা আমার অবস্থা তো এক নয়। আপনার একটি মাত্র বন্ধন—এক মেয়ে। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেললে দুনিয়ায় আর দায় থাকল না। আর সে দায় মোচনের জন্য ঈশ্বরের দয়ায় তিলেকের তরে ভাবতে হবে না। আমার হল পঙ্গপালের সংসার। চোখে সর্ষেফুল দেখছিলাম—তা খুব রক্ষে হয়েছে, তীর কানের পাশ দিয়ে সরে গেছে। যে ছুঁড়িটাকে আপনি দিয়েছিলেন, ভারি তুখোড় কিন্তু। ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি—

পূর্ণ শুনে খুব খুশি হলেন। দেমাক করে বলেন, পাড়ার মেয়ে—ওর বাপের সঙ্গে আমার বড় সম্প্রীতি। ভারি ঘনিষ্ঠতা। ও মেয়ে উন্নতি করবে আমি জানতাম।

ক্রমশ আসল বক্তব্যে এসে পড়লেন নলিনাক্ষ। বেরিয়ে আসবার জন্য যা সব ফুটছিল পেটের ভিতর। বললেন, উন্নতি এত দূরে যে, আমাদের কোম্পানিতে কুলাগো না। শেষটা অসীমবাবু নিজে গাড়ি করে হার্মান প্লাম্বার্সে তুলে দিয়ে এলেন। দিয়ে এসে তবে সোয়াস্তি। টাল খেয়ে আমার চাকরিও তাই টিঁকে গেল।

কথার ধরন বাঁকা। পূর্ণ মুখুজ্জে নলিনাক্ষর মুখে তাকিয়ে পড়লেন : বৃত্তান্ত কি, খুলে বলুন।

নানান রকম রটনা। অফিসে কান পাতা যায় না। বাড়িতে মেজোকর্ত্রী শোনা গেল বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছেন। অসীমবাবু আর সমীরবাবু মিলে শেষটা কলে-কৌশলে সরিয়ে দিলেন। তা শাপে বর হয়েছে ছুঁড়িটার। এখানে যা পেত, তার দেড়া মাইনে। অত বড় কোম্পানি—আরও কত দূরে উঠবে, লেখাজোখা নেই।

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনলেন পূর্ণ। খানিকটা বিশ্বাস হল, খানিকটা নয়। আরও ভাল করে শুনবেন বলে পুরানো অফিসে চলে গেলেন। সোজা অসীমের ঘরে।

কাকাবাবু, মনে পড়ল বুঝি এতদিনে?

সেই যে পূর্ণিমা সরকার—কাজকর্মে কেমন হয়েছে মেয়েটা?

ভাল কাকাবাবু, ভালোই রকমের ভাল। এত ভাল যে রাখতে পারলাম না—মস্ত জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম—

মিথ্যে বলে নি তবে নলিনাক্ষ সেন। তেমন কিছু বাড়িয়েও বলে নি। পূর্ণকে এরা খুব মান্য করে। ঢোক গিলে অসীম আবার বলে, একটা নিবেদন কাকাবাবু, না বললে নয়, তাই বলছি। নেশা সহজে যেতে চায় না, দৃষ্টি পড়লেই টেনে ধরে। আপনি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেবেন, মিস সরকার এদিককার ছায়া না মাড়ায়। আমাদের পক্ষে বলাটা ঠিক হবে না। আরও ভয়, মেজোবাবু চটতে পারে। সমান শরিক তো বটে। দাদা বলে মান্য করে, কিন্তু চক্ষুলজ্জা কাটতে কতক্ষণ। আপনি যখন এনে দিয়েছিলেন, আপনিই আগে মানা করবেন। কথা না শুনলে আমরা তো আছিই। তখন কি আর ন্যায়-অন্যায় বাছব?

সেদিন সন্ধ্যায় যথারীতি দাবা পাতিয়ে বসেছেন, কিন্তু পূর্ণ মুখুজ্জে কেমন অন্যমনস্ক। মনের মধ্যে আনাগোনা করছেন : নোংরা কথাটা তোলা যায় কেমন ভাবে। সে সুযোগ তারণকৃষ্ণই করে দিলেন। গদ-গদ হয়ে সুখবর দিচ্ছেন : পুনির খুব ভাল হয়ে গেল। হার্মান প্লাম্বিং-এ ঢুকেছে। জান তো কত বড় কোম্পানি—পুনি তো পুনি, তার বাপ পেলে বর্তে যেত। কিন্তু তুমি পূর্ণদা সকলের মূলে—সেটা ভুললে চলবে না। পুনিকে কিছুতে কলেজে দেবো না—নাছোড়বান্দা হয়ে তুমি ঘাড়ে চাপালে। কনে দেখানোর কায়দায় পছন্দ করিয়ে চাকরিতে ঢোকানো — সম্পূর্ণ তোমার ব্যবস্থায়। ভাবতেও ভয় করে, পুনির চাকরি না হলে কোথায় আমার সংসার ভেসে যেত!

পূর্ণ মুখুজ্জে গম্ভীর হয়ে থাকেন। মনে মনে লজ্জা এবং অনুতাপও। এদের বনেদি নির্মল কুলের মেয়েটাকে ঘরের বার করেছি বুদ্ধি দিয়ে। কুবুদ্ধি বললেই ঠিক কথা বলা হয়।

তারণ অবাক হয়ে যান। আহত কণ্ঠে বলেন, কি হল পূর্ণদা, পুনির ভাল খবরে এমন চুপ করে গেলে কেন?

টাকাই রোজগার করছে, ভাল আর কিসে হল?

বলতে বলতে পূর্ণ মুখুজ্জে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : ভুল করেছিলাম ভায়া, মুক্তকণ্ঠে মেনে নিচ্ছি। পোষা বিড়াল বনে গিয়ে বনবিড়াল হয়ে যাবে ভাবতে পারি নি। পুরানো মনিববাড়িতে আমার এত খাতির-ইজ্জত—গিন্নি খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা মুখ দেখাবার লজ্জায় যেতে পারি নে।

শোনা অবধি তারণ আপন মনে গর্জাচ্ছেন, কিন্তু পূর্ণিমাকে মুখোমুখি বলতে পারেন না। টাকা রোজগার করে দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সে এখন সর্বময়ী—তাকে কথা শোনাতে সাহস হয় না।

যে পারে সে হল অণিমা। রবিবার অবধি চেপেচুপে রইলেন কোন রকমে। প্রতি রবিবার সকালবেলা সবশুদ্ধ ওরা চলে

আসে—ভরাপেটী, অণিমা, বুদ্ধু। এসে সমস্তটা দিন হৈ হৈ করে সন্ধ্যাবেলা কাশীপুরে ফিরে যায়। এরই মধ্যে এক-সময় অণিমাকে আলাদা ঘরে ডেকে তারণ সব কথা বললেন। বলে সামাল করে দেন : নোংরা কথা নিয়ে চেঁচামেচি না হয়—শেষ-কালে দুর্গন্ধ পাড়াময় ছড়িয়ে পড়বে। আড়ালে গিয়ে চুপি-চুপি বলবি ওকে, এই যেমন তোকে বলছি। তোর মা'কেও বলবি নে—খামোকা মনোকষ্ট পাবে, কী দরকার! অল্পবুদ্ধির সেকেলে মেয়েমানুষ, একটা সিন করেও বসতে পারে। তবে পুনিকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—কেলেঙ্কারি বিস্তর দূর গড়িয়েছে, আমাদের কান অবধি পৌঁছে গেছে। নতুন জায়গায় গেছে, ওখানে বদনাম শুনতে যেন না হয়।

পূর্ণিমাকে নিয়ে অণিমা ঘরের দরজা দিল। মুখ কালো করে বলে, তুই যে এমন হবি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবি নি।

পূর্ণিমা যেন কিছুই বোঝে না। এক-মুখ হাসি নিয়ে বলে, কি হয়েছে রে?

বলতে মাথা কাটা যায়—

তাচ্ছিল্যের সুরে পূর্ণিমা বলে, অফিসের কানাঘুষো বাড়িতেও হাজির। ভেবে দেখ দিদি, কী কপাল-জোর আমার! একলা আমার বা বলি কেন, তোদের সকলের। ভাগ্যিস ঐ কথাটা অমনভাবে ছড়াল।

অণিমা বলে, কলঙ্কে কান পাতা যায় না, তাকে তুই ভাগ্য বলছিস?

নইলে কি হার্মান প্লাম্বার্সে এত টাকার চাকরিতে ঢুকতে পারতাম? কত রকম তদ্বির, কত সই-সুপারিশ নিয়ে কতজনে মুকিয়ে ছিল—আমার তদ্বির সকলের সেরা। চিঠি নয়, টেলিফোন নয়, অসীম-বাবু গাড়ি করে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দিলেন। মূলে তো ঐ কলঙ্ক।

অণিমা বলে, তালুকদার-বাড়ির মেয়ে-গলায় দড়ি তোর, কলঙ্ক নিয়ে দেমাক করছিস।

তালুকদার-বাড়ির মেয়েদের যেমনভাবে জীবন কেটেছে, নেহাৎ পক্ষে তুই যেমন কাটাচ্ছিস, আমার তেমন হতে দিলি কই? টাকা রোজগারে আমায় যে হাটে-বাজারে পাঠান হল। মাইনে বেড়েছে আমার, সংগে সংগে সংসারের বরাদ্দ বেড়েছে, তোর টাকাও বাড়িয়ে দিয়েছি। তবে আর বলবার কি আছে শুনি।

হঠাৎ হাসি মুছে গিয়ে কণ্ঠে যেন তার আগুন ধরে গেল : আমি কি চেয়েছিলাম এই জীবন? কত কেঁদেছি, খবর রাখিস? তালুকদারের মেয়েরা চিরকাল ধরে যা পেয়ে এসেছে, তাই ছাড়া এককোঁটাও বাইরের প্রত্যাশা করি নি। ঘর চেয়েছিলাম, তোর রঞ্জুর মতন একটা সন্তান চেয়েছিলাম। লেখাপড়া একটু-আধটু শিখেছি, সে আমার নিজের ঘরে নিজের ছেলেমেয়ের কাজে লাগত। আবর্জনা-আস্তাকুঁড় ঘেঁটে টাকা কুড়োতে গিয়ে ময়লার ছিটেফোঁটা তো লাগবেই। অন্যে যাই বলুক, তোরা বলতে আছিস কোন লজ্জায়। দেবী বানিয়ে আমারে—পুরোপুরি পাথরের দেবী চাস বুঝি? সে দেবীকে কিন্তু পুজো দিতে হয় নৈবেদ্য সাজিয়ে। পাল্টা তিনি দেন—কী দেন তা চোখে দেখা যায় না—নিরাকার কল্যাণ। আছিস রাজি এমনি ব্যবস্থায়?

দড়াম করে দরজা খুলে পূর্ণিমা বেরিয়ে গেল। রঞ্জুকে সামনে পেয়ে কোলে তুলে দুম-দুম করে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে গিয়ে উঠল।

গেঁথে আছে পূরবীর মনে—বেরুবোই। শহরবাসী হব। শিশিরের উপর সম্প্রতি বড় বেশী তাগিদ : দেখ, পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমাদের অভ্যাস আছে, আমরা খুব কষ্ট করতে পারি। কিন্তু অন্য একজন যদি না পেরে ওঠে—

শিশির বলে, মানুষ তো আমরা দুজন। আর মা। এর বাইরে অন্য কে আছে—তিনি কোন হুজুর শুনি?

আছেন বই কি!

শিশির তাকিয়ে থাকে পূরবীর দিকে। পূরবী মিটিমিটি হাসে। শিশিরও হেসে বলে, বুঝেছি। কিন্তু ফাইফরমাস, ইচ্ছে-অনিচ্ছে এখন থেকেই তিনি বলতে লেগে-ছেন?

বলবে না! তুমি বেরিয়ে যাও। মা টিক-টিক করেন, ভারী কোন কাজে হাত ছোঁয়ানোর জো নেই। বড়জোর বিছানার উপর চাদরখানা পাতা, কি বসে-বসে চন্দন-পাটায় একটু চন্দন ঘষা। ষোড়শী-দি এরই মধ্যে বহাল হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না? সারাটা দিন তবে আমার কাটে কি করে? হুজুরের জামা-জাঙিয়া বানাই, আর কি কি তিনি বলতে চান, শুনি কান পেতে।

শিশির সকৌতুকে বলে, একটু-আধটু আমিও না হয় শুনলাম—

তুমি আগাগোড়া সমস্ত শুনবে। হুকুম নইলে তামিল করবে কে? বর্ষা আসছে, প্যাচ-পেচে সেই কাদার মধ্যে থাকতে উনি নারাজ। পাকা ঘর-উঠোন চাই, পাকা পথঘাট—আর?

অন্ধকারে ভয় করবে। কলমলে আলো জ্বলবে সারা রাত্তির—ঘরে পথে চতুর্দিকে।

মানে, শহর—

ঘাড় দুলিয়ে দুটো চোখ কুঁচকে পূরবী সায় দেয় : শহর কলকাতা। পার্কে বেড়ান হবে, তার জন্যে পেরাম্বুলেটার চাই। জামা ডজনখানেক আমিই বানিয়ে দিচ্ছি—মাথার টুপি, পায়ের জুতো-মোজা এই সমস্ত চাই। মেমপুতুল চাই, বাজনা চাই, হাতী চাই, এরোপ্লেন চাই—

বাপ যে গরীব ইস্কুলমাস্টার—সেটার বিবেচনা হবে না?

পূরবী সগর্বে বলে, কিন্তু মা?

রানী!

সোহাগ-ভরা কণ্ঠে শিশির বলে, তাই বটে! রানীর কোলে যে আসছে সে তো রাজপুত্তুর। মাটিতে পা না ছোঁয়াতেই তার হুকুম-হাকাম।

পূরবী চিঠি লেখার বৃত্তান্ত বলল। বলে, মামাকে আমি তো এই এই লিখলাম। মায়ের জবানি—তাঁরই সামনে বসে। মা পড়ে শোনাতে বললেন তো গড়গড় করে তাঁর কথাগুলোই বলে গেলাম। অন্য কাউকে পড়তে দিলে ধরা পড়ে যেতাম। পারবে তুমি—সে আর পারতে হয় না! দাম সাহেবকে তুমি লেখো এবার। গড়িমসি আর নয়, একটা-কিছু করে দিন। জল-জঙ্গল সাপ-খোপের রাজ্যে—নড়বড়ে এই খোড়ো চালের নিচে—মাগো মা, আমরা থাকি বলে, ছেলে কেন থাকতে যাবে?

ভাগ্যক্রমে কলকাতায় এক বিশেষ মুরুব্বি আছেন—দামসাহেব। পুনর্বাসন দপ্তরের কেষ্টবিষ্টু একজন—শিশিরের জন্য তিনি সত্যিই কিছু করতে চান। সতীশ দাম ছাত্র-জীবনে শিশিরের বাপের আশ্রিত ছিলেন, পিতৃহীন গরীব ছেলেটার পড়া-শুনোর ব্যবস্থা তিনি তখন করে দেন। জীবনে কৃতী হয়ে পিছনের কথা বিলকুল ভুলে যাওয়াই রীতি। কিন্তু দামসাহেব

আলাদা ধাঁচের মানুষ—এক বয়সে যে উপকার পেয়েছিলেন, তার কিছু প্রতিদান দেবার জন্য আকুপাকু করেন।

দামসাহেবের সঙ্গে শিশির চিঠি-পত্র চালায়, যথারীতি উত্তরও আসে। এবারে পূরবী আচ্ছা রকম ঘাড়ে লাগল : চিঠি দাও, আর এখানে থাকা যাচ্ছে না। এ-দুঃখ, সে-দুঃখ বানিয়ে বানিয়ে লেখো। তিনি মন করলে চাকরি পেতে একটা মাসও লাগবে না।

দামসাহেব লিখলেন, ও রকম চিঠি ছুঁড়ে চাকরি হয় না। বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। গরজ যখন এত বেশী, একবার সরেজমিনে চলে এসো। বর্ডারে এখনো রিফিউজি-স্লিপ দিচ্ছে, বনগাঁ থেকে জোগাড় করে নিয়ে এসো। দশ-বিশ টাকা বাজে খরচ হতে পারে, তবু এনো। ঐ জিনিষ থাকলে চাকরির সুবিধা হয়। পূব-বাংলা কোন জন্মে চোখে দেখে নি তারাও সব জোগাড় করে আনে। স্লিপ নিয়ে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

তবে আর কি! যাও চলে। এমন চিঠির পরেও দেরী করবার মানে হয় না—

তাগিদে তাগিদে পূরবী অস্থির করে। ঠোঁট ফুলায় ছোট্ট খুকিটির মতো : গা করছ না। জানি জানি, গাঁ ছেড়ে নড়বার ইচ্ছে নেই। স্পষ্ট করে বললেই তো হয়। নইলে দামের মতন সহায় থাকতে চাকরি হয় না, এ কেউ বিশ্বাস করবে!

শিশির ইতস্তত করছে : তোমায় এই রকম অবস্থায় রেখে যাওয়া—

অবস্থা আবার কি! ঢের ঢের দেরি এখনো—। আঙুলের কর গুনে পূরবী দ্রুত হিসাব করে ফেলে : মাসের উপরে আরও অন্তত বাইশ-চব্বিশ দিন। মা রইলেন। ষোড়শী-দি তো চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে মোতায়েন, পাড়ার সকলে আছেন। আর তোমারও তো সেখানে পড়ে থাকতে হবে না। একটা হপ্তা বড়জোর।

মুখ শুকনো করে পূরবী শাশুড়ির কাছে চলে যায় : বিপদ শুনেছ মাগো? তোমায় কিছু বলে নি? পুরানো হেড-মাস্টার চলে গিয়ে নতুন এক ছোকরা এসেছে—বি-টি পাশ নয় বলে সে ওকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-হেডমাস্টার থাকতে দেবে না। ডি-পি-আইকে লিখেছে মাইনে কমিয়ে জুনিয়ার টিচারে নামিয়ে দিতে। এর পরে ইস্কুলে থাকা কি করে সম্ভব?

ধরগিন্নি এক কথায় বলে দিলেন, থাকবে না। লেগে-পড়ে জমি-জমা দেখুক, ইস্কুলের ঐ ক'টা টাকা চাষবাস থেকে উঠে আসবে।

পূরবী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে ওঠে : আমিও তাই বলছি মা। মাস্টারি না থাকল তো বয়ে গেল—

শাশুড়ির দিকে চোখ পিটপিট করে চেয়ে খুব সতর্কভাবে এগোয় : না-ই হল বি-টি—অনার্সে ফার্স্টক্লাস, তার উপর সুনামের সঙ্গে এদ্দিন ধরে কাজ করে আসছে, তার একটা বিচার হবে না। বলছে কি, ঢাকায় গিয়ে চীফ-ইন্সপেক্টরের কাছে বুঝিয়ে বলে আসবে। সেই ইন্সপেক্টরের ভাইয়ের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছে, দুজনে বড় বন্ধুত্ব।

এবারও ধরগিন্নি বলেন, যাবে তাহলে ঢাকায়। এদিককার হাঙ্গামাটুকু মিটসেই চলে যাবে।

পূরবী ঘাড় নেড়ে বলে, আমিও তাই বলি। ক'টা মাস বাদ দিয়ে পুজোর ছুটির মধ্যে যাওয়াই ভাল। এখন কামাই হলে তাই নিয়ে হয়ত আবার লেখালেখি করবে। কিন্তু সে নাকি হবার জো নেই। দেখুন দিক মা!

কেন? বলছে কি শিশির?

বলে পাঁচটা-সাতটা দিনের তো ব্যাপার। যা করবার এখনই। অর্ডার একবার বেরিয়ে গেলে রদ করান ভারি শক্ত।

ধরগিন্নি শেষ-রায় দিয়ে দিলেন : চলে যাক তবে। কী হয়েছে—আমরা সব আছি। ষোড়শী রয়েছে—

ষোড়শীকে দেখতে পেয়ে তাকে শুনিয়ে বলছেন, আঁতুড়ঘরের কাজই শুধু নয়, বড় বড় ডাক্তারের কান কেটে দেয় ও বেটি। ওকে পেয়ে নিশ্চিন্ত। তুই কি বলিস রে ষোড়শী—জরুরী কাজে শিশিরের একবার বাইরে যাওয়া দরকার। যাবে?

বরের কাছে গিয়ে পূরবী দেমাক করে : সমস্ত আমি করেছি, মার কাছ থেকে ছুটি করে নিয়ে এলাম দেখ। তুমি পারতে? এখন কোন আপত্তি তুলবে তো—ভেবে ভেবে বের করো একটা-কিছু। সময় দিয়ে যাচ্ছি।

কথা ছুঁড়ে দিয়ে পূরবী ফরফর করে চলে গেল।

শিশির ঢাকায় গেল, মা তাই জানেন। গেছে কলকাতায়। ওদের ষড়যন্ত্র তাই। দামসাহেবের কাছে। বর্ডার-স্টেশন থেকে রিফিউজি-স্লিপ নিয়ে নিয়েছে। পরিবারের ক'জন সঙ্গে আছে, তা-ও স্লিপে লেখা। ঝামেলা নেই, বাঁধা রেট হয়ে আছে—মিষ্টি অধিক আবশ্যক হলে গুড় বেশি পরিমাণে লাগবে, এই হল কথা—পরিবার বাড়ালে তো খরচাও তদনুসারে।

দামসাহেব স্লিপখানা ফিরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে সহাস্যে বললেন, ঠিক আছে।

বিস্তর করলেন তিনি। খান-দশেক দরখাস্ত লেখালেন বিভিন্ন অফিসের নামে। বলেন, ঘুরে ঘুরে নিজের হাতে এগুলো ছেড়ে এসো, অন্যের উপর নির্ভর কোরো না। আর ফোন করে দিচ্ছি গোটা কয়েক জায়গায়—সেই সেই অফিস-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে যাও। গাড়িতে করে নিজেও কয়েক জনের কাছে নিয়ে গেলেন। সবাই আশা দিচ্ছে। এই সব করতে করতে দুটো হপ্তা যেন উড়ে চলে গেল কোন দিক দিয়ে। দু-হপ্তা কেটে আরও ক'দিন হয়েছে।

বাড়ির জন্যে মন চঞ্চল। এক সস্তা হোটেলে আছে। পূরবী ঠিকানা জানে না, নিজেও চিঠি লেখে নি জিনিষটা চাউর হয়ে যাওয়ার শঙ্কায়। পাকা আড়াই হপ্তা কাটিয়ে শিশির দামসাহেবকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

সতীশ দাম আরও এক ব্যবস্থা করে-ছেন। দরখাস্তে শিশিরের কলকাতার ঠিকানা দেওয়া হল দামেরই এক আত্মীয়-বাড়ি। শিশিরের নামের যাবতীয় চিঠিপত্র তাঁরা দামসাহেবের কাছে পৌঁছে দেবেন, পড়ে দেখে দাম যথাব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজন হলে টেলিগ্রাম করবেন শিশিরের মহকুমা ইস্কুলে।

প্রণাম করে শিশির বলে, আসি এবারে দাদা—

সতীশ দাম বলেন, তা যাও। কাঁহাতক পড়ে পড়ে হোটেল খরচা করবে। বড় শক্ত ঠাঁই—ভাল হল, নিজে এসে দেখে-শুনে গেলে। নইলে ভাবতে, ইচ্ছে করেই দাদা কিছু করছে না। তক্কে তক্কে রইলাম, হবেই একটা-কিছু। (ক্রমশ)

কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র

প্রবোধচন্দ্র সেন

অনেকেরই ধারণা আছে যে, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—৫৯) ছিলেন অনেকাংশেই ভারতচন্দ্রের (১৭০৬—৬০) অনুবর্তী। সম্ভবত তার মূল কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতা সংগ্রহ' পুস্তকের (১২৯২, আশ্বিন ১৫) ভূমিকায় তাঁর জীবন-চরিত ও কবিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে,—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে।"

—কবিতা সংগ্রহ : ভূমিকা, পৃ ২৫

অতঃপর বসুমতী সংস্করণ ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর (১৩০৬ আশ্বিন ১৫) 'মুখবন্ধে' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন লেখেন—

"ঈশ্বর গুপ্তের রচনা-ভঙ্গিমায়, শব্দ-প্রয়োগে, অলংকারবিন্যাসে অনেকটা ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভঙ্গী পাওয়া যায়। তেমনি পদলালিত্য, তেমনি রসপ্রাচুর্য, তেমনি শব্দাড়ম্বর। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের আদিগুরু বলিলেও দোষ হয় না।"

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী, ১৩০৬) মুখবন্ধ।

তার অনেক কাল পরে 'কাব্যবিতান' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী 'নবযুগের প্রথম কবি' ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বলেন—

"তাঁহার কাব্যশিল্পের আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তখন না ছিল ভারতের যুগ, তাঁহার না ছিল ভারতের প্রতিভা।"

—'কাব্যবিতান' (১৩৬৩ চৈত্র) মুখবন্ধ

ঈশ্বরচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে এবং কি পরিমাণে ভারতচন্দ্রের শিল্পাদর্শের অনুসরণ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ ও বিচার সাপেক্ষ। এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোচনার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে তা আবশ্যক নয়।

ব্যাপক আলোচনার অভাব থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্রের শিল্পাদর্শে ভারতচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতা আছে। কিন্তু তাঁর রচনায় রামপ্রসাদের (১৭২০—৮১) প্রভাব সম্বন্ধে সে চেতনারও পরিচয় পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে কোন আলোচনা আমার চোখে পড়ে নি। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র যে অনেক ক্ষেত্রেই রামপ্রসাদের অনুবর্তী ছিলেন তার সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বর্তমান আলোচনার অভিপ্রায়।

এই আলোচনায় প্রধানতঃ যেসব গ্রন্থের উপরে নির্ভর করেছি, মূল বিষয় অবতারণার পূর্বে সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।—

রামপ্রসাদ

১। মাসিক সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত (১২৬০ পৌষ, মাঘ ও চৈত্র) ঈশ্বরচন্দ্রকৃত রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত ও রচনা-সংকলন। ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জীবনী' গ্রন্থে (১৯৫৮) পুনঃ প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। ২। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), ষষ্ঠ সংস্করণ।। তারিখ নেই। ৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' (সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী-সম্বলিত), পৃ ১৯৫৪।

ঈশ্বরচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'কবিতা সংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী।' —পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৮। এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধটির (৮০ পৃষ্ঠা) মূল্যবত্তা সর্ববিদিত। এই গ্রন্থে ধৃত পাঠ ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য রচনা সংকলনের পাঠ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ বাঞ্ছনীয়। ২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত 'বোধেন্দুবিকাশ নাটক'। প্রথম ভাগ (প্রথম তিন অঙ্ক)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। ১২৭০ সাল। —কবির অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়নি। ৩। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮। তারিখ...

এই গ্রন্থের ষড়ঙ্ক 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটকটি সমগ্র ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে (পৃঃ ১—২৭৪)। তা ছাড়া অনেকগুলি কবিতাও এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। (পৃঃ ২৭৫—৩৬৮)।

৪। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত 'কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' (বসুমতী)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০। প্রকাশ ১৩০৬। 'মুখবন্ধে'র তারিখ '১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬ সাল'।

এই গ্রন্থাবলীর অন্য একটি সংস্করণও আমি দেখেছি। এটিতে মুখবন্ধের তারিখ আছে '১৫ই আশ্বিন, ১৩০৮'। ১৩১৪ সালে পুনর্মুদ্রিত। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন-কৃত মুখবন্ধের বক্তব্য একই আছে, তবে তাঁর ভাষায় কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬২। এই সংস্করণের 'বিবিধ' বিভাগে পূর্ববর্তী সংস্করণের কতকগুলি কবিতা বর্জিত ও তার স্থলে কতকগুলি নূতন কবিতা সংকলিত হয়েছে। মুখবন্ধে এই গ্রহণ-বর্জনের কোনো হেতু নির্দেশ করা হয়নি। ▪

৫। বসুমতী সাহিত্য মন্দির-প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)। সম্পাদকের নাম ও তারিখ নেই। এটিতে সংকলিত রচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, এই উভয়ের রচনাসংগ্রহগুলিতেই কিছু কিছু পাঠভেদ দেখা যায়। রামপ্রসাদের রচনার পাঠভেদ অনেক বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতা সংগ্রহে'র পাঠ নিঃসন্দেহে পরবর্তী সংগ্রহের পাঠের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র-ধৃত ও সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত রামপ্রসাদের রচনার পাঠ নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। সে পাঠে অনেক স্থলেই অর্থ হয় না। তা ছাড়া এমন ছন্দোদোষও আছে যা রামপ্রসাদের রচনার পক্ষে স্বভাবিক বলে মনে করা যায় না। তা ছাড়া রামপ্রসাদী রচনার অন্যান্য সংকলনেও অনেক পাঠভেদ দেখা যায়। সব পাঠ মিলিয়ে যথার্থ পাঠ নির্ণয় করা প্রচুর শ্রমসাধ্য ও গবেষণাসাপেক্ষ হলেও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তা একটি অবশ্য করণীয় কাজ। যা হক, বর্তমান প্রবন্ধে আমাকে নিজের বিচারবুদ্ধির উপরে নির্ভর করে যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে পাঠ নির্বাচন করে নিতে হয়েছে। যেসব পাঠ বিতর্কের বিষয় বলে বোধ হয়েছে সেগুলি বর্জন করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশই উদ্ধৃত করেছি।

২

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের কোনো কোনো রচনার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন—

এক। কুপুত্র অনেকে হয়,
কুমাতা তো কেহ নয়, মা গো।

—"কবিতা সংগ্রহ", নীলকর (পঞ্চম গীত), পৃঃ ১১৫। এই ছত্র দুটি অনিবার্যরূপেই রামপ্রসাদী গানের নিম্নোক্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

কুপুত্র অনেক হয় মা,
কুমাতা নয় কখনো ত।
—মা আমায় ঘুরাবে কত

দুই। ভিটে গেল যথা তথা,
'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা',
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ
কাঁদতে হবে বসে ঘাটে।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৌষড়ার গীত,[1] পৃ ১৬৩।

স্মরণীয় রামপ্রসাদের গান—

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শংকরি হেথা॥

আর একটি গানেরও প্রথম দুই পংক্তি ঠিক এ রকম। কেবল 'তারা'র স্থলে আছে 'আমি'। দ্রষ্টব্য যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থে (১৯৫৪) সংকলিত পদাবলী, ১৫১×৫২। বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে দুটি গানেই (১২৯—

---

১ ১৩০৮ সালের সংস্করণে এই রচনাটির নাম ছিল 'পৌষপার্বণ গীত'। ১৩০৬ সালের সংস্করণে এটি ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'কবিতা সংগ্রহে'ও না।

৩০) আছে 'অসি' অথচ সূচীপত্রে দুই স্থলেই আছে 'তারা'।

তিন। মহামায়া কেন তুমি, এত মায়া ধর?
বাজীকরের মেয়ের মত,
বাজী কেন কর?॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), ৩য় অঙ্ক, পৃ ১২২।

স্মরণীয় রামপ্রসাদের গান—
মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥
—মন গরিবের কি দোষ আছে

চার। সর্বঘটে বিরাজ করে,
যাবে বলে সর্বগত।
মন শুদ্ধ মনে শুদ্ধ রে তার
হোয়ে থাকো অনুগত॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৫ম অঙ্ক, পৃ ২৩২।

এই উক্তিটি রামপ্রসাদী বাণীরই প্রতিধ্বনি মাত্র। রামপ্রসাদের বাণী এই—
শ্রীরামপ্রসাদে রটে
মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ কাকে
তিমিরে তিমির হরা।
—এমন দিন কি হবে তারা

উদ্ধৃত চারটি গানের একটিও সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত রামপ্রসাদের রচনা সংকলনে ধরা হয়নি। এবার এমন একটি গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যা ঈশ্বরচন্দ্রের সংকলনেও পাওয়া যায়।

পাঁচ। যতন করে রতন পেলেম,
মতন মতন বাছের বাছে।
আমি কাঁচা-সোনার মুখ দেখেছি,
আর কি ভুলি ঝুঁটো কাঁচে।।

—'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ ২৭১।

এটিতে স্পষ্টতঃই রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত কথাগুলির ছায়াপাত ঘটেছে।—
প্রসাদের মন হও যদি মন,
কর্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মতন মতন কর যতন
রতন পাবে অতি খাসা॥

—মন করো না সুখের আশা, 'কবিজীবনী', পৃ ৫৩।

এখানে ভাষাগত সাদৃশ্যই বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। উল্লেখ করা উচিত যে, 'মতন মতন' পাঠ ঈশ্বরচন্দ্রেরই। অন্যান্য সংকলনে আছে 'মনের মতন'।

এই দৃষ্টান্তগুলি সবই রামপ্রসাদের সাধন-সংগীত থেকে সংকলিত। ভালো করে সন্ধান করলে এ রকম আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে আশা করি। রামপ্রসাদের সমর-সংগীত থেকেও এ রকম ছায়াপাতের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'বোধেন্দু-বিকাস' নাটক তৃতীয় অঙ্কের 'কে রে বামা বারিদবরণী' এবং 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' ইত্যাদি দুটি গানেই অনেকগুলি রামপ্রসাদী গানের ভাব ও ভাষার যুগপৎ সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ছন্দ-আলোচনার প্রসঙ্গে তা দেখানো যাবে। তবু নমুনা হিসাবে এখানে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

'কে রে বামা বারিদবরণী' ইত্যাদি প্রথম গানটিতে আছে—
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপম রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ
চরণ শরণ লয়।

এটিতে স্পষ্টতঃই রামপ্রসাদী গানের নিম্নোদ্ধৃত দুটি উক্তির আভাস পাওয়া যায়।

১। মরি কিবা অপরূপ,
নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
—কে মোহিনী ভালে কালশশী, 'কবিজীবনী' পৃ ৭২।

২। মরি হেরি এ কি রূপ,
দেখ দেখ ভূপ,
রসসুধাকূপ
বদনখানি।
—ও কে রে মনোমোহিনী, 'কবিজীবনী', পৃ ৯৩।

বোধেন্দুবিকাসের পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গানটির প্রথমেই আছে—
কে রে বামা ষোড়শী রূপসী,
সুকেশী এ যে, নহে মানুষী,
'ভালে শিশুশশী', করে শোভে অসি,
'রূপ মসী', চারু ভাস।

এটিতে রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত দুটি গানের ছায়াপাত লক্ষণীয়।

১। নীল কমলদলাজিতাস্যা,
তড়িতজড়িত মধুর হাস্যা,
লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্যা,
'ভালে শিশুশশী'।
—শ্যামা বামা গুণধামা, 'কবিজীবনী', পৃ ৭০।

২। শবশিশু ইষু শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা 'রূপ মসী'॥
—এলো চিকুর নিকর, নরকর কটিতটে

এই শেষ গানটি ঈশ্বরচন্দ্রের সংকলনে নেই।

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষার এ রকম বা এতখানি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বা ছায়াপাত ঘটেছে কিনা তা বিচার করে দেখিনি। দেখার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

শুধু ভাব ও ভাষা নয়, রামপ্রসাদী সুরের বিশিষ্টতাও ঈশ্বরচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রমাণ এই যে, তিনি অন্ততঃ পাঁচটি গান রামপ্রসাদী গানের ভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি যে রামপ্রসাদী সুরে গেয় এমন স্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছিলেন ওই গানগুলির উপরে। যথা—

১। সেথা, ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে
—'কবিতা সংগ্রহ', নীলকর (পঞ্চম গীত), পৃ ১১৪।

২। অহংকারে অন্ধ হয়ে
'অহং' গীতটি গেও না রে

৩। মন ভাব তারে মনে মনে

৪। মহামোহের মোহ ছেড়ে
মন যদি হও মনের মত

'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৫ম অঙ্ক, পৃঃ ২৩০—৩১।

৫। এ জগতে কি আর আছে
—পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃঃ ২৭০।

ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে রামপ্রসাদের ভাব, ভাষা ও শিল্পাদর্শের প্রভাব যে উপেক্ষণীয় নয়, আশা করি প্রাথমিক সত্য হিসাবে তা নিঃসন্দেহেই প্রতিপন্ন হয়েছে। অতঃপর সে প্রভাবের যথার্থ স্বরূপ কি তার বিশদতর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হব।

(৩)

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদের প্রতিই ঈশ্বরচন্দ্র অধিকতর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। উক্ত প্রকার অভিমত সংকলনের পূর্বে দুটি বিশেষ তথ্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গতঃ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রায় আরম্ভকালেই রামপ্রসাদের 'কালী কীর্তন' গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন (১৮৩৩)। এখানিই তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন—

"ঐ অপূর্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্যরূপে ২ বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তন পুস্তক মুদ্রিতকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে...গ্রন্থকর্তার মহাকীর্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সফল-সিদ্ধি হয়।"

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'সাধক-কবি, রামপ্রসাদ' (১৯৫৪), পৃ ৩৬৯—৭০।

এই উক্তির মধ্যেই রামপ্রসাদের এই গীতগ্রন্থটি সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের সনিষ্ঠ ও সতর্ক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। কালী-কীর্তনে তিনি শুধু 'অপূর্ব গীতগ্রন্থ' বলেই নিরস্ত হননি। তাকে তিনি রামপ্রসাদের 'মহাকীর্তি' বলেও বর্ণনা করেছেন এবং সেই মহাকীর্তিকে 'চিরস্থায়িনী' করবার অভিলাষও ব্যক্ত করেছেন। মনে রাখতে হবে তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স একুশ বৎসর মাত্র।

দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র যখন মাসিক 'সংবাদ প্রভাকরে' অতীত কবিদের জীবনী-প্রকাশে ব্রতী হন তখন সর্বাগ্রেই প্রকাশ করেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত।

---

২ 'ও প্রাচুর্যরূপে' কথা দুটি আছে সাহিত্যসাধক চরিতমালার দশম পুস্তক 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' গ্রন্থে। যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থে এই দুটি কথা বোধ করি অসাবধানতা-বশতঃই বাদ গিয়েছে।

[illegible]

[illegible] অন্যান্যদের [illegible] পারে। [illegible] অল্প বয়স থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত রামপ্রসাদের মহিমা তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল। বাসভূমি এবং জীবন-কালের দিক থেকে ভারতচন্দ্রের চেয়ে রাম-প্রসাদ যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের নিকটতর ছিলেন, হৃদয় ভাবের দিক থেকেও তেমনি তিনি তাঁর অন্তরের বেশি কাছাকাছি ছিলেন।

এবার ঈশ্বরচন্দ্রের এই মনোভাবের প্রমাণ হিসাবে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদধৃত করা প্রয়োজন। উক্তিগুলি প্রায় সবই মাসিক সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত এবং শ্রীমান্ ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিজীবনী' গ্রন্থে (১৯৫৮) সংকলিত। বিষয়বস্তুর কালক্রম এবং পাঠকের পক্ষে সহজলভ্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটি উক্তির সঙ্গে সেটির উভয়বিধ বৎসরেই নির্দেশ দেওয়া গেল।

১। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবি-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন, ...ইহার পদ একটিও অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতন ভাবে পরিচিত হইতেছে, যখনি যাহা শুনা যায় তখনি তাহা নূতন বোধ হয়, গায়কেরা যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে কর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে।"

—সংবাদ প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১, 'কবিজীবনী', প. ৪৭।

২। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভায় যদিও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই অবস্থান করিতেন, যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব স্ব প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্ট নিবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্তন এবং বিদ্যা-সুন্দরের কবিতা সকল লোকমুখে শ্রবণ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন।"

—সংবাদ প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১; 'কবিজীবনী', পৃ. ৫৭-৫৮।

৩। "দশ বৎসর পর্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্যের [পুরাতন কবিদের জীবনচরিত সংগ্রহ ও প্রকাশ] পথপ্রদর্শক হইয়াছি অর্থাৎ সর্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন রাম-প্রসাদ সেনের 'জীবন-বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত...পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।"

—'ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত', ভূমিকা ১৩৬২ আষাঢ় ১, 'কবিজীবনী', পৃ. ২২৯-৩০।

প্রথম দুটি উদধৃতিতেই রামপ্রসাদকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, [illegible] ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অপেক্ষাও উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'জীবন-বৃত্তান্ত' গ্রন্থের ভূমিকাতেই যে রামপ্রসাদকে 'অদ্বিতীয় মহাকবি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাতেও নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের মতে রামপ্রসাদের স্থান ভারতচন্দ্রেরও উপরে এবং সে জন্যেই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত কবি-চরিতমালায় রামপ্রসাদের জীবন-বৃত্তান্ত 'সর্বাগ্রে' প্রকটন করা হয়েছিল।

পূর্বে বলেছি, ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়স থেকেই রামপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করতেন। তাঁর এক প্রমাণ 'কালী-কীর্তন' প্রকাশ (১৮৩৩)। তা ছাড়া, তার আরও দু একটি প্রমাণ আছে। সংবাদ প্রভাকরে (১২৬০ পৌষ ১। ১৮৫৩ ডিসেম্বর ১৫) প্রকাশিত 'কবিরঞ্জন রাম-প্রসাদ সেন'এর জীবন-বৃত্তান্তে ঈশ্বরচন্দ্র জানান—

পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতীত হইল আমরা [illegible] হইয়াছি।"

—'কবিজীবনী', পৃ. ৬৪।

তার প্রায় দুই বৎসর পরে সংবাদ প্রভাকরে (১৮৫৪ অক্টোবর ১৭) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র এই 'মহাত্মা'র [রামপ্রসাদের] 'জীবনচরিত' গ্রন্থাকারে প্রকাশেরও অভিলাষ করেছিলেন।৩

এই বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয়—

"এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি।"

—সাহিত্য সাধকচরিতমালা—১০, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', পৃঃ ৫০।

এর থেকেই বোঝা যায়, কি গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে ঈশ্বরচন্দ্র রাম-প্রসাদের জীবন-বৃত্তান্ত ও রচনা সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন। (ক্রমশঃ)

৩ কিন্তু তাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ হয় নি। রামপ্রসাদের জীবনচরিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।
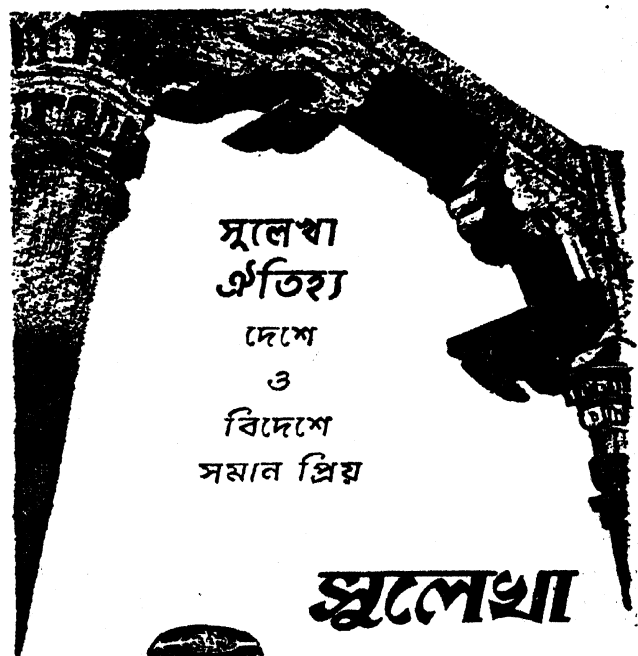
অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

এক এক জন লোকের এক এক রকমের আতঙ্ক থাকে। সেটা অধিকাংশ সময়েই মনের ভেতরে থাকে, সহজে বার করেন না। এর ফলে কার কি ধরনের আতঙ্ক হয় সেটা জানা যায় না। এর ফলে সুবিধে এবং অসুবিধে দুইই হয়। যেমন, আমি যদি আগে জানতাম যে শান্তিবাবুর ল্যাম্পপোস্ট এবং ট্রামের তার আতঙ্ক আছে তাহলে তার সঙ্গে কখনো রাস্তায় চলতাম না। একদিন অফিস থেকে বেরিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। বাগনান না কোথায় থাকতেন তিনি, আমার চাইতে অনেক বেশি বয়স এবং অন্য সেকশনে কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে কালে-ভদ্রে দেখা হয়। দেখা হলে দুজনে দুজনকে নমস্কার করি এই পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গে বেরুনোর কথা নয়। কিন্তু অফিস থেকে এক সঙ্গেই যখন রাস্তায় এসে পড়লাম, তখন তিনি বললেন, কোন দিকে যাচ্ছেন? আমি একটু হেসে বললাম, বাড়ির দিকেই যাব, তবে তার আগে একটা কম্বল কিনতে হবে। শান্তিবাবু বললেন, কম্বল যদি কিনতে চান তো ইসমতুল্লার দোকান থেকে কিনবেন, খাসা কম্বল আনায় কোত্থেকে, আর দামও দু-পাঁচ টাকা কমেই পাওয়া যায়। আমি বললাম, ইসমতুল্লার দোকান চিনি না। শান্তিবাবু বললেন, এই কাছেই, চলুন আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

রাস্তায় চলতে চলতেই বুঝলাম শান্তিবাবু ল্যাম্পপোস্টগুলিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। একটা ল্যাম্পপোস্ট আসে, আর তিনি বলেন, এটাকে তেমন সুবিধের ঠেকছে না, যে কোনো মুহূর্তে পায়ে এসে পড়তে পারে। চলুন ঐ ফুটপাথ দিয়ে হাঁটি। অন্য ফুটপাথ দিয়ে চলবার সময়েও অন্য সব ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে দেখা হতে থাকল, আর শান্তিবাবু সেগুলোকে এড়ানোর জন্য ফুটপাথ বদল করতে লাগলেন। অবশেষে আমরা ধর্মতলা স্ট্রীটে এসে পড়লাম।

এইবার বুঝতে পারলাম শান্তিবাবুর যে কেবল ল্যাম্পপোস্ট দেখেই ভয় হয় তা নয়। ট্রামের তারগুলির দিকে তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি আমার দৃষ্টি অতিক্রম করল না। করা সম্ভব নয়, কেননা তিনি কেবল দেখেই যে ক্ষান্ত হচ্ছিলেন তা নয়। তিনি বলছিলেনও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতামত। তাঁর বক্তব্য অবশ্য খুব কঠিন কিছু যে তা নয়। ট্রামের তার ছিঁড়ে যদি যায় হঠাৎ তাহলে ঝাঁপিয়ে মাথায় পড়ার দারুণ সম্ভাবনা। একটা দেখে দেখে চলা ভাল। যেখানেই দেখা যাবে তার বাঁধা রয়েছে, সেখানে একটু সাবধানে যেতে হবে। আমি তাঁর দুটি আতঙ্ককেই হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করাতে তিনি হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি জানেন পৃথিবীতে নানা-বিধ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে? আমি বললাম, দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তাই বলে...। তিনি বললেন, অবশ্য ল্যাম্পপোস্ট হঠাৎ পড়ে যাওয়াটা খুবই কম ঘটে, কিন্তু ঘটতে পারে না তা তো নয়। ল্যাম্পপোস্টগুলোর গোড়াগুলো মরচে পড়ে পড়ে এমন হয়ে থাকতে পারে যে, যে কোনো মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়তে পারে। এখন দেখে শুনে চললেই তো সেটা এড়ানো যায়। তারপর ধরুন ট্রামের তার। ট্রামের তার খুলে যায় আমি দেখেছি নিজে।

একথায় আমি আর কি বলব। আমার মনে হল শান্তিবাবু মাত্র দুটি ব্যাপারে আতঙ্কিত। কিন্তু আতঙ্কিত হবার তো আরো কয়েক হাজার জিনিস রয়েছে। সব ব্যাপারে আতঙ্কিত হতে হলেই তো
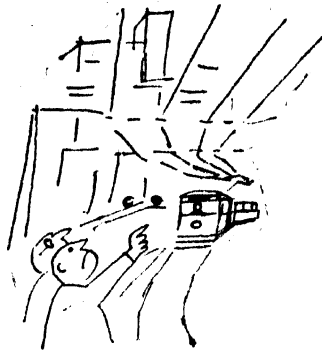
গিয়েছি! আমি তখন দেখলাম পৃথিবী... এই যে হাজার হাজার বিমান উড়ছে তা... একখানা যদি এসে ভেঙ্গে পড়ে আম... উপর? কেবল বিমান কেন, একখা... উল্কাও তো আমাকে শেষ করে দিতে পারে... তা ছাড়া কোলকাতা শহরে এতগুলো গা... রয়েছে তাদের ডাল ভেঙ্গে পড়তে পা... মাথায়, বারান্দা ভেঙ্গে পড়তে পারে। মো... কথা, হঠাৎ যেকোন সময়ে বহু রক... দুর্ঘটনার যেকোন একটা ঘটতে পারে!

শান্তিবাবুর কথায় অবশ্য তব... করলাম না। এসব ধারণা তর্ক করে দূ... করা যায় না। সেদিন ইসমতুল্লার দোকা... থেকে কম্বল কিনে বাড়িতে চলে গেলা... আর স্থির করলাম ও'র সঙ্গে আর বেরু... না কোথাও।

কিন্তু, জগতে শান্তিবাবুর মত লোকে... অভাব আছে কি? কথাটা মনে হ... সুবীরের বাড়িতে একদিন বিকেলে বেড়াতে গিয়ে। সুবীরেরা থাকে তেতলার ফ্ল্যাটে। সুবীর তখনো আসে নি। ফ্ল্যাটে দুটি ঘ... আর তাদের একটা ছোট্ট বারান্দা রয়েছে। বারান্দার রেলিং-এর বদলে বেশ পু... ইঁটের আলসে। তার উপর বেশ বসা চলে। আমি আর প্রিয়তোষ সেখানে গিয়ে বসলাম। সেখান থেকে দেখা যায় কলকাতা শহরের একটা অংশ। আমরা সেই অংশটাকে দেখছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম নিচের থেকে একটা বাজখাই আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ। তিনি বলছেন, ওখানে বসো না, ধপাস করে পড়ে যেতে কতক্ষণ। আমি আর প্রিয়তোষ বললাম, মশাই আমরা পড়ব না। ভদ্রলোক দেখলাম হাতে একটা জলের ঝারি নিয়ে ফুলের গাছে জল দিচ্ছেন। ভদ্রলোক বললেন, বলছ তো পড়বে না, কিন্তু পড়লে কি সর্বনাশ হবে ভেবেছ? আমরা হাসলাম। একটু জোরে জোরেই হাসলাম। হয়ত সে হাসি তাঁর কানেও গেল।

ভদ্রলোক আর কোনো কথা বললেন না। সুবীর একটু পরেই এল। সুবীরকে বললাম নিচের ভদ্রলোক পড়ে যাব এই ভয় করছিলেন, আর আমাদের সাবধান করছিলেন। ভদ্রলোকের আতঙ্কের সঙ্গে শান্তিবাবুর আতঙ্কের তুলনামূলক একটা গল্প ফাঁদব ঠিক করেছি কিন্তু সুবীরের কথায় সেটা আর করা গেল না। সুবীর বলল, নিচের ভদ্রলোক তোদের জন্য মোটেই চিন্তা করছিলেন না।

আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তবে?

সুবীর বলল, ও'র ফুলের বাগানের খুব শখ। ঐ নিয়েই থাকেন। তাঁর ধারণা দোতলা তেতলা আর চার-তলার ছাত থেকে লোকেরা হুড়মুড় করে পড়ে তাঁর ফুলের গাছগুলোকে শেষ করে দেবে!

দেশে বিদেশে

লিন পিয়াও'র নির্ঘোষ

চীনের বর্তমান আদর্শগত বিপ্লব সম্পর্কে যদিও অনেকখানিই এখনো অনিশ্চিত, এবং যদিও ভাঙা-গড়ার পালা এখনো শেষ হয়নি, তবু একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি : চীনের ভাগ্যাকাশে মহিমান্বিত মাও সে-তুং এখন আর একক জ্যোতিষ্ক নন; তাঁকে অনেকখানি বিবর্ণ করে সেখানে একটি নতুন ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে।

ঐ ধূমকেতুর নাম লিন পিয়াও। চীন-বিশারদ পর্যবেক্ষকদের মতে লিন পিয়াও শুধু বর্তমান প্রতিবিপ্লব-বিরোধী বিপ্লবের প্রধান নেতাই নন, তিনিই মাও সে-তুংয়ের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী, ৭০ কোটি মানুষের চিন্তা ও কর্মের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক। খবরের কাগজে কিংবা প্রাচীর-পত্রে তাঁকে এখন থেকেই মাও'র পাশে পাশে দেখা যাচ্ছে। এমনকি পিকিং রেডিও একদিন মাও সে-তুংয়ের রচনা থেকে পাঠের দৈনন্দিন রুটিন থেকে বিচ্যুত হয়ে তার বদলে লিন পিয়াও'র উক্তি উদ্ধৃত করেছিল। অনেক প্রবীণতর নেতাকে অতিক্রম করে চীনা নেতৃত্বের সিঁড়িতে তিনি এখন দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

কে এই লিন পিয়াও তা আমরা জানি। কম্যুনিস্ট চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নামটি এক'দিনে আমাদের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি তাঁর মতবাদ, তাঁর চিন্তাধারা? আমরা এটুকু জানি মাও-লিন চক্রের জয় চীনা রাজনীতিতে উগ্রপন্থীদেরই জয় সূচিত করছে। কিন্তু এই মতবাদ কতখানি উগ্র এবং এর জন্যে এই চক্র কতখানি যেতে প্রস্তুত? এটা আজ খুব ভালোভাবে জানা দরকার, কেননা অন্তত কিছুকাল এই চক্রই চীনে প্রভুত্ব করবে।

*

১৯৬৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর পিকিং থেকে যে ২০ হাজার শব্দের দলিলটি প্রচারিত হয়েছিল, চীনা-বিশারদদের কাছে সেটি আজো চীনা মতবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থিসিস হয়ে রয়েছে। "গণযুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক!" এই শিরোনামায় প্রকাশিত এই দলিলকে বলা হয় চীনা কম্যুনিষ্টদের 'মাইন কামফ'। এতে চীনের বিশ্বনীতির একটি অত্যন্ত জোরদার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, এই দলিলের রচয়িতা হিসেবে যাঁর নাম প্রচারিত হয়েছিল তিনি —লিন পিয়াও। যদি সেই সময় থেকেই লিন পিয়াওর বর্তমান অভ্যুত্থানের সূচনা

বলে ধরি, তাহলে এই দলিলটি তাঁর নিজস্ব মতবাদের দর্পণ।

লিন পিয়াও মার্কিন 'সাম্রাজ্যবাদ'কে চীনের পয়লা নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন, এবং বলেছেন আমেরিকার তথা পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবকে খর্ব করাই চীনের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য কিভাবে অর্জিত হ'তে পারে? লিন পিয়াও'র মতে কেবল মাও'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তিনি চীনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলেছেন, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিকে ঘেরাও করার যে কৌশলের কথা মাও বলেছেন, সেই কৌশল অনুসরণ করেই চীনে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন সমগ্র পৃথিবীতে এই কৌশল প্রয়োগ করবার সময় এসেছে।

লিন পিয়াও'র ভাষায়ঃ "সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপকে যদি পৃথিবীর শহরাঞ্চল বলা যায়, তাহলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল।...চূড়ান্ত বিচারে বিশ্ব বিপ্লবের গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ওপর।"

লিন পিয়াও তাঁর থিসিসে এই লক্ষ্যই উপস্থাপিত করেছেন। এক কথায়, পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তিকে পরাজিত করার জন্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার গণ বিপ্লব ঘটানো দরকার, এবং চীন তার আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসেবে ঐ বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করবে।

এবং, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এই বিপ্লব আনতে হবে বল-প্রয়োগের দ্বারা। "চূড়ান্ত বিচারে", তিনি বলেছেন, "সর্বহারার বিপ্লবের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী থিয়োরী হচ্ছে বৈপ্লবিক বল-প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের থিয়োরী, গণযুদ্ধের দ্বারা গণ-বিরোধী যুদ্ধের মোকাবিলা করার থিয়োরী।"

লিন পিয়াও এই প্রসঙ্গে ভিয়েৎনামকে গণযুদ্ধের দ্বারা মার্কিন 'সাম্রাজ্যবাদ'কে পরাভূত করার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চলার পক্ষপাতী। তিনি বলেন, "ইতিহাস প্রমাণ করেছে এবং ভবিষ্যতে করে যাবে যে, যুদ্ধই হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র।"

এই মনোভাবকে যাঁরা জংগীবাদী বলেন (লিন পিয়াও 'ক্রুশ্চেভ-শোধন-বাদীদের' এ'দের মধ্যে ধরেছেন), তাঁদের প্রতি তাঁর উত্তর লেনিনের একটি উক্তিঃ "যুদ্ধ জনতাকে জাগিয়ে দিয়েছে; এর ভয়াবহতা ও দুঃখকষ্টই তাদের জাগিয়ে তুলেছে। যুদ্ধ ইতিহাসকে এনে দিয়েছে গতিবেগ, এবং ইতিহাস এখন রেল ইঞ্জিনের গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।"

এই কথারই জের টেনে প্রবন্ধের উপসংহারে লিন পিয়াও বলছেনঃ "মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তির জন্যে ভিয়েৎনামী জনগণের সংগ্রাম এখন মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বের মানুষের সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিয়েৎনামী জনগণের এই সংগ্রামকে সমর্থন ও সাহায্য করার জন্যে চীনের প্রতিজ্ঞাকে কিছুতেই টলানো যাবে না।"

•

শক্ত ভাষা, এবং নিঃসন্দেহে কঠিন সংকল্পও। মার্শাল লিন এই প্রবন্ধে বস্তুত যা বলেছেন, তা এইঃ

- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতেই হবে;
- তার জন্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় গণযুদ্ধের সূত্রপাত করতে হবে;
- যেহেতু ভিয়েৎনাম এই বিশ্বব্যাপী মার্কিন-বিরোধী গণযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু, সেইজন্যে ভিয়েৎনামকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করে যেতে হবে।

যেহেতু আমরা জানি চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্প্রতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, রাশিয়ার সঙ্গে এক-জোটে কাজ করা আর সম্ভব নয়, আর যেহেতু চীনা সশস্ত্র বাহিনীর যে-সব নেতারা সামরিক প্রয়োজনে রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলবার প্রস্তাব করেছিলেন তারা সাম্প্রতিক বিপ্লবে ছাঁটাই হয়েছেন সেজন্যে অনেকেই এই ধারণা করেছেন যে চীন (অর্থাৎ মাও-লিন চক্র) আমেরিকার সঙ্গে মোকাবিলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, এবং এই মোকাবিলা হবে বল-প্রয়োগের মাধ্যমে এবং রাশিয়ার সাহায্য ছাড়াই।

খুব দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ধারণার মধ্যে কতগুলি শূন্য স্থান রয়ে গেছে, যার ভিত্তিতে বলা চলে যে, লিন পিয়াও'র বজ্রনির্ঘোষ শেষ পর্যন্ত ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

যেমন, মার্শাল লিন চাইলেও বিভিন্ন দেশ তাঁর যুদ্ধ করার জন্যে হয়ত তৈরী নেই। এশিয়া ও আফ্রিকায় এখন পর্যন্ত যে ক'টি জায়গায় চীন গণযুদ্ধ ঘটাবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল, সে সবখানে তাকে নাকে খৎ দিয়ে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আর লাতিন আমেরিকায় কিউবাও তাকে হতাশ করেছে।

এ তো গেল দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তারের কথা। স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রে এই মোকাবিলা চীন কোথায় করতে পারে? ভিয়েৎনামে। কিন্তু সেখানেও চীনের পক্ষে এর সুযোগ কতটুকু?

উত্তর ভিয়েৎনামের অনুমতি ছাড়া চীন সৈন্য পাঠিয়ে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করতে পারবে না, আর উত্তর ভিয়েৎ-নামও চীনের সৈন্য সাহায্য চেয়ে একটা দ্বিতীয় কোরীয় যুদ্ধের সৃষ্টি করতে চাইবে না, কেননা তখন যুদ্ধের পটভূমিই
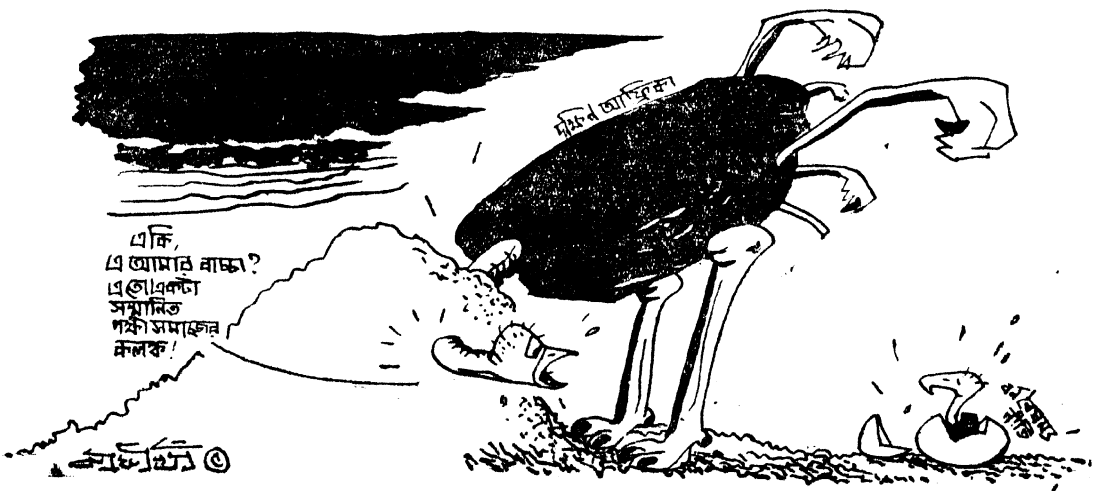
যাবে পাল্টে এবং চীনের আক্রমণের বিরোধিতা করার প্রশ্নটাই তখন বড় হয়ে দেখা দেবে। এতখানি ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা এখনও চীনের নেই।

এক্ষেত্রে হ্যানয় চীনের সক্রিয় সমর্থন চাইবে না, কেননা, দুনিয়ার নৈতিক সমর্থন এইভাবে সে হারাতে এখনো রাজী নয়। বরং তার এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম। সেখানে চীনের চাইতে রাশিয়াই তার উপকারে আসবে বেশী।

সুতরাং সঙ্কল্প নিলেও সংকল্প সিদ্ধি চীনের পক্ষে কতখানি সম্ভব তা বলা মুস্কিল। এদিক দিয়ে চীনের নতুন দৃঢ় নীতি আপাতত যতটা গর্জাবে ততটা বর্ষাবে না বলেই মনে হয়।

তাহলে লিন পিয়াও'র এই বজ্র ঘোষণা এবং সাম্প্রতিক [illegible] উদ্দেশ্য কি?

এর একটাই [illegible] উত্তর আছে। দেশে এমন একটি [illegible] মানসিকতা সৃষ্টি করা যাতে আভ্যন্তরীণ সবরকম প্রতি- বন্ধতাকে দূরে রাখা যায়। কেননা একথা ঠিক যে, [illegible] সে-তুংয়ের [illegible] গোঁড়ামির বিরু[illegible] মতবাদ চীনে গড়ে উ[illegible]

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পরিকল্পনার ফলশ্রুতি

পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনাগুলির কতটুকু সুফল পাওয়া গেছে সেবিষয়ে রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি সমীক্ষা করেছেন। সরকারী যেসব তথ্য আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করেই তাঁরা এই পর্যালোচনা করেছেন। তাঁদের রিপোর্টের প্রথম অংশ প্রস্তুত হয়ে গেছে। এই অংশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সড়ক উন্নয়ন সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনার সূচনা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি পর্যন্ত এইসব বিষয়ে কতটুকু উন্নতি হয়েছে বা হয়নি তার একটা প্রামাণ্য বিবরণ এই রিপোর্টের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

এই সমীক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গকে সাতটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অঞ্চল হল দার্জিলিং জেলা, দ্বিতীয় অঞ্চলে আছে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, তৃতীয় অঞ্চলের মধ্যে ফেলা হয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাকে, চতুর্থ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলা, পঞ্চম অঞ্চলে ধরা হয়েছে বর্ধমান ও বীরভূম জেলা দুটিকে, ষষ্ঠ অঞ্চলে আছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা এবং কলকাতাকে রাখা হয়েছে সপ্তম অঞ্চলে।

এই অঞ্চলগুলির মধ্যে অগ্রগতির হারের বৈষম্য আছে; কিন্তু রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর সিদ্ধান্ত হল, সাধারণভাবে এই বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে।

যে চারটি খাতে পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্টে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলিতে সমগ্র রাজ্যের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান ব্যুরোর রায় হলঃ—

(১) কৃষি—সমগ্রভাবে পরিকল্পনাকালের মধ্যে কৃষিতে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি।

(২) শিক্ষা—শিক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি খুব লক্ষণীয় নয়।

(৩) স্বাস্থ্য—১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে।

(৪) সড়ক—নূতন রাস্তা তৈরী ও পুরানো রাস্তার উন্নয়নে বেশ কিছুটা কাজ হয়েছে।

কৃষির দিক থেকে উন্নতির দিকগুলি হচ্ছে ঃ—

পূর্বের তুলনায় বেশী জমি চাষের আওতায় এসেছে। ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা ৮৮ ভাগ চাষ করা হচ্ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে এই হার বেড়ে শতকরা ৯০ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে এই হার শতকরা ৯৫ ভাগেও এসে পেণীছেছে।

আগের চেয়ে বেশী জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। পরিকল্পনার আগে শতকরা ২০·৯ ভাগ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে সেটা ২২·৫ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২৬·২ শতাংশ হয়েছে।

প্রাক্-পরিকল্পনার কালের তুলনায় বিঘাকরা ধানের ফলন বেড়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ১৪·৬।

১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যমান অনুযায়ী প্রতি হেক্টেয়ার পিছু ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে হেক্টেয়ার পিছু গড়ে ৬০০ টাকার ফসল ফলেছিল, প্রথম পরিকল্পনার শেষে সেই অংকটা ৬২৯ টাকায় এসে দাঁড়ায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অংকটা কমে ৬১৯ টাকায় পরিণত হয়, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথমার্ধে আবার সেটা বেড়ে ৬৫৪ টাকা হয়েছে।

কৃষির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার দিকগুলি হচ্ছে ঃ—

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ প্রাক্-পরিকল্পনা কালের তুলনায় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী (২৮ শতাংশ) পঞ্চম অঞ্চলে (বর্ধমান-বীরভূম) ও ষষ্ঠ অঞ্চলে (বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর)।

১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যমান অনুযায়ী মাথাপিছু উৎপন্ন ফসলের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

রিপোর্টের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঃ—

(ক) কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। এবং (খ) পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ।

শিক্ষার খাতে এই কয় বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় করা হয়েছে মোট ৪২ কোটি টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয়, দুই পরিকল্পনাতেই বরাদ্দের তুলনায় এই খাতে অধিকতর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ২৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯·৩ শতাংশ হয়েছে অর্থাৎ অগ্রগতির হার ৫.৩ শতাংশ। কিন্তু রাজ্যের সকল অঞ্চলে এই অগ্রগতির হার সমান হয়। অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে সাক্ষরতার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী অগ্রগতি হয়েছে। ফলে এই বিষয়ে অগ্রসর ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মধ্যে বৈষম্য কতকটা কমেছে। ১৯৫১ সালে রাজ্যের অঞ্চলভেদে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অধিবাসীদের শতকরা হার ৫৩'১ থেকে ১৪·২-এর মধ্যে ছিল। ১৯৬১ সালে সেই পার্থক্যটা ৫৯'৩ ও ১৮·৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই কয় বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। "কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক হয় নি। কি ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রতি হাজার পিছু বিদ্যালয়ের সংখ্যার দিক দিয়ে, কি এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কতজন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে সেই হারের দিক দিয়ে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে কোন লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যায়নি। টাকার অভাবই সম্ভবতঃ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের পথে বৃহত্তম অন্তরায় হয়েছিল।"

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৬১-৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সের ছেলেমেয়েদের অর্ধেকের বেশী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলে ও বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর অঞ্চলে পরিকল্পনার আগে শতকরা যতগুলি ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল পরিকল্পনার কয় বৎসরে সেই অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা আরও কমে গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে ভর্তির হার বেশী শোচনীয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। মিড্ল হাই ও জুনিয়ার হাই স্কুলের সংখ্যা ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনার ১২ বৎসরের মধ্যে ১১ থেকে ১৪ বৎসর ও ১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে

ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৩·৪ জন স্কুলে যেত, ১৯৬১-৬২ সালে গেছে শতকরা ২৮·৮ জন ঐ বয় বৎসরের মধ্যেই ১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা মাত্র ৫·৩ থেকে বেড়ে ১২·৪ হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়েছে ৪০ কোটি টাকা (বরাদ্দের চেয়ে বেশী)।

পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি এক শত বর্গ কিলোমিটার এলাকাপিছু চিকিৎসা সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রতি একলক্ষ অধিবাসী পিছু চিকিৎসাসংস্থার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। পরিকল্পনাকালের শেষে প্রতি লক্ষ অধিবাসী-পিছু স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী রয়েছে দার্জিলিং জেলায়—৩·১টি আর সবচেয়ে কম ২৪ পরগণা-হাওড়া-হুগলী অঞ্চলে —১·৩টি।

পরিবারপরিকল্পনা ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৯৬৩ সালের শেষে লাখ মানুষ পিছু একটি ক্লিনিকও ছিল না।

ম্যালেরিয়া রোগ প্রায় নির্মূল হয়েছে, কলেরা ও বসন্তও অনেকটা আয়ত্তে এসেছে। কিন্তু যক্ষ্মা, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে।

পথের খাতে দুইটি পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় হয়েছে ২৮ কোটি টাকা। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি একশত বর্গ কিলোমিটার পিছু ও প্রতি এক লক্ষ অধিবাসী পিছু রাস্তার দৈর্ঘ্য কোচবিহার জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর-মালদহ-মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুরে অঞ্চলে সন্তোষজনক। অবশ্য প্রতি একলক্ষ অধিবাসী পিছু রাস্তার দৈর্ঘ্য বিবেচনা করলে দার্জিলিং জেলায় ও ২৪ পরগণা-হাওড়া-হুগলী এলাকায় অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ভারতীয় সিগারেট

চা, পাট, কাপড় ইত্যাদি গতানুগতিক পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী ছাড়াও ভারতবর্ষ যে এ দেশে তৈরী-সিগারেট রপ্তানী করতে সক্ষম হচ্ছে এ কথাটা বোধকরি অনেকেরই জানা নেই। বৈদেশিক মুদ্রার এই সংকটের সময়ে সিগারেটের অবদান খুব বেশী না হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

কলকাতার ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানীর সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার কুসেপল্ কোম্পানীর একটি চুক্তি হয়েছে। ঐ চুক্তি অনুসারে ন্যাশানাল কোম্পানী ২ কোটি ৫০ লক্ষ সিগারেট চেকোশ্লোভাকিয়ায় রপ্তানী করবে। এর ফলে ভারতবর্ষ প্রায় চার লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানীর আগড়পাড়াস্থিত কারখানায় ঐ রপ্তানীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কলকাতার চেক্-কনসাল জেনারেল মিঃ সিমা এবং ট্রেড কমিশনার মিঃ বেচেক্ অনুষ্ঠানে মাননীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানীর ডিরেক্টার মিঃ মায়ার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সিগারেট রপ্তানী এই তাঁদের প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও তাঁরা করেছেন তবে এবারে সেটা পরিমাণে অনেক বেশী। ভবিষ্যতে পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় রপ্তানী সম্ভাবনার দিকেও কোম্পানী বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

চেক্-কনসাল মিঃ সিমা তাঁর ভাষণে বলেন যে, চেক-ভারত মৈত্রী আজ রাজনৈতিক মতামত আদান-প্রদানের সীমানা ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক জগতেও প্রবেশ করেছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হবে একথা নিশ্চিত।

চেক্-বাণিজ্য প্রতিনিধি মিঃ বেচেক্ মিঃ সিমাকে সমর্থন করে বলেন যে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেন-দেনের হার যেভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে তা বিস্ময়ের বিষয়। গত চার বছরের ভেতরই মাত্র তিরিশ কোটি থেকে বেড়ে আজ পঞ্চাশ কোটির বেশী দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরোও যে বাড়বে তার সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গতানুগতিক রপ্তানী দ্রব্য ছাড়াও ভারতবর্ষ শিল্পজাত দ্রব্য বিশেষ করে চামড়ার জুতো, কাপড়, সিগারেট ইত্যাদি রপ্তানী করছে। এই থেকেই ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য আভাষ পাওয়া যায়। তিনি আশা এবং আনন্দ প্রকাশ করে আরো জানান যে, ন্যাশানাল টোবাকো কোম্পানী যে মেসিনে সিগারেট তৈরী করছেন তার একটা বৃহৎ অংশ চেকোশ্লোভাকিয়া সরবরাহ করেছেন।

(৩২)

কলকাতা থেকে বম্বে ফিরে এসে আমি ইংরিজি সংস্করণের জন্য শিল্পী নির্বাচন করতে সুরু করলাম। ইংরিজি সংস্করণের নাম দেওয়া হল 'দি কোর্ট ডান্সার'। পৃথ্বিরাজ কাপুরকে আমি নির্বাচন করলাম হিন্দী ও ইংরাজি উভয় সংস্করণের নায়কের ভূমিকায়। আগেই বলেছি যে বাংলা সংস্করণের নায়ক নির্বাচিত হয়েছিল জ্যোতিপ্রকাশ। 'রাজনর্তকী'র অপর একটি প্রধান ভূমিকায় (কাশীশ্বর গোস্বামী) হিন্দী ও বাংলার জন্য আমি নির্বাচন করেছিলাম অহীন্দ্র চৌধুরীকে, আর ইংরিজি সংস্করণের জন্য ঠিক করলাম জাল খাম্বাটাকে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে বাংলা হিন্দী ও ইংরাজি তিনটি সংস্করণের চরিত্রই নির্বাচিত হয়ে গেল শুধু একটি ছাড়া। সেটি হল 'জেনারেল টায়া' ইংরিজি সংস্করণে। বাংলা ও হিন্দীতে আমি এ চরিত্রটির জন্য নির্বাচন করেছিলাম মণি চ্যাটার্জিকে। মণি আমার সঙ্গে আগে 'কুমকুম'-এ কাজ করেছিল। এই চরিত্রটির জন্য আমি অনেকগুলি শিল্পীকে দেখলাম, কিন্তু কাউকেই আমার ঠিক মনঃপুত হচ্ছিল না। কারু হয়ত চেহারা ঠিক 'জেনারেল টায়া'র মত নয়, কারু হয়ত ইংরাজী উচ্চারণ ঠিক মত হয় না—এই রকম একটা-না-একটা খুঁত থেকেই যাচ্ছিল।

জুন মাস এসে গেল—মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হবার জন্য সব তোড়জোড় চলছে। কিন্তু তখনও 'জেনারেল টায়া' ঠিক হল না। খোঁজ-খবর যথেষ্ট চলছে।

একদিন জুনের মাঝামাঝি প্রায়—আমি আমার বাড়ীরেই অফিসঘরে বসে আছি। এমন সময় আমার 'পুরাতন ভৃত্য' চামান একটি ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এল। কার্ডে নাম লেখা আছে ক্যাপ্টেন কে এল থাপ্পান। প্রথমটা আমি বুঝতে পারলুম না যে একজন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন? কি এমন কারণ থাকতে পারে? যাই হোক আমি চামানকে বললাম, তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন লম্বা সুগঠিত দেহী যুবক আমার ঘরে প্রবেশ করল। লম্বায় প্রায় ৬ ফুট হবে। তাকে আমার সামনের চেয়ারে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম তার এখানে আসার কারণ।

কোনরকম ইতস্তত বা ভনিতা না করে সে সোজাসুজি বলল যে, সে কাগজে দেখেছে এবং লোকের মুখেও শুনেছে যে আমি এটি ত্রিভাষী ছবি করছি—তাতে সে একটা পার্ট চায়।

এই কথা শুনে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সে এর আগে কোথাও অভিনয় করেছে কিনা—তা সে স্টেজেই হোক আর ফিল্মেই হোক।

সে কিন্তু কোনরকম ইতস্তত না করে বলল: না, অভিনয় আমি কখনও করিনি। তবে আমার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে যে অভিনেতা হিসাবে আপনাকে নিরাশ করব না। যদিও আপনি আমার কার্ডে নাম দেখে বুঝতে পারছেন যে আমি একজন সেনাবাহিনীর লোক। অবশ্য আগে আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম। এখন আর নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এখন আর নেই কেন?

—মানে, আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। বললেন তিনি।

—তার মানে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মিঃ থাপ্পান মৃদু হেসে বললেন: সে অনেক কথা স্যার। এখন আমি একটা কাজ চাই—এবং সেটা আমার তাড়াতাড়ি চাই।

আমি বললাম: কিন্তু আপনি ত এর আগে কখনও অভিনয় করেননি। আপনি কি পারবেন?

মিঃ থাপ্পান বললেন: বেশ ত আপনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন—দেখুন আমি পারি কিনা।

তাকে এরকম সহজভাবে এবং আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখে আমার কিরকম ভাল লেগে গেল মিঃ থাপ্পানকে। তার পার্সোন্যালিটি আমাকে আকৃষ্ট করল, আর বিশেষ করে আকৃষ্ট করল তার ইংরাজী উচ্চারণ। চমৎকার উচ্চারণ—কোথাও কোন জড়তা নেই—স্পষ্ট ও পরিস্কার।

আমার মনের ভাব আর আমি চেপে রাখতে পারলাম না, বলেই ফেললাম: আপনি তো চমৎকার ইংরাজী বলেন! আপনি বুঝি অনেকদিন বিলেতে ছিলেন?

মিঃ থাপ্পান বললেন: খুব ছোটবেলা থেকেই আমি বিলেতের এক স্কুলে লেখা-পড়া শিখেছি।

আমার মনে হল এতদিন 'জেনারেল টায়া' চরিত্রটির (ইংরাজী সংস্করণ) জন্য যে আপ্রাণ সন্ধান চারিদিকে করছিলাম—ক্যাপ্টেন থাপ্পান যেন ঈশ্বর-প্রেরিত সেই ব্যক্তি। আমার মনে হল ক্যাপ্টেন থাপ্পান হলেন 'জেনারেল টায়া'র উপযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁর ইংরাজী বাচনও নির্ভুল এবং নিখুঁত। যদিও তিনি চিত্রজগতে একেবারে নবাগত, তবু আমি তাঁকেই ঐ চরিত্রটির জন্য ঠিক করে ফেললাম। এবং আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে আমার নির্বাচন ঠিকই হয়েছিল, থাপ্পান তাঁর ভূমিকাটির উপর পূর্ণ সুবিচার করেছিলেন।

জুন মাস নাগাদ আমাদের শুটিং সুরু হোল। এমন সুষ্ঠু পরিবেশে এবং সুশৃংখলার সঙ্গে কাজ আমি ইতিপূর্বে আর করিনি। প্রোডিউসার মিঃ ওয়াদিয়া কখনও শুটিং-এর সময় 'ফ্লোরে' আসেননি, কিন্তু সমস্ত বিভাগের কাজ-কর্ম তিনি এমন সুন্দরভাবে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন যে মনে হোত যেন মেসিনে কাজ হচ্ছে। এক-একটি 'সেটে'র শুটিং শেষ হলেই আমরা সকল বসে 'রাস প্রিন্ট' দেখতাম। কোনো কিছু আমাদের ভাল না লাগলে সেই সব দৃশ্যগুলি আবার তোলার আয়োজন করতাম অবশ্য সে রকম রিটেক আমাদের খুব কমই হোত।

লোকে শুনলে অবাক হবে যে 'রাজ-নর্তকী'র মত ওরকম একটি বিরাট ছবি, যার মধ্যে অতগুলো বড় বড় 'সেট', অত নাচ, গান এবং তাও আবার তিনটি সংস্করণে (বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী)—তুলতে সময় লেগেছিল মাত্র ছ'মাস।

এই অত্যাশ্চর্য জিনিস সম্ভব হয়েছিল সেদিন যেটা আজ একেবারে অসম্ভব। তার কারণ হলো—প্রত্যেকটি শিল্পীই এখান ছাড়া আর কোথাও অভিনয় করতে পারবেন না ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর নিজের স্টুডিও, নিজের টেকনিসিয়ান, টাকা-পয়সার অভাব নেই এবং সর্বোপরি প্রোডিউসার পরিচালকের ওপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। কোনো বিষয়েই অনাবশ্যক প্রশ্ন করে সবজান্তা সেজে কাজে ব্যাঘাত ঘটাতেন না। প্রডিউসারের এই অকুণ্ঠ সহ-যোগিতা এবং তাঁর প্লানিং ও স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনের ফলে সমস্ত কর্মীরা যেন প্রাণ দিয়ে কাজ করত—মনে হোত যেন একটি বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। সকলেরই লক্ষ্য এক—ছবিটিকে ভাল করা। যার যতটুকু ক্ষমতা সে তাই দিয়েই ছবিখানিকে সার্থকতার পথে টেনে নিয়ে যেত।

এই প্রসঙ্গে সেকাল ও একালের চিত্র-নির্মাণপদ্ধতির একটা তুলনামূলক সমালোচনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমি এই শিল্পের প্রথম যুগের মানুষ— আজকে যে শিল্পকে আমরা এত বিরাট দেখছি—প্রদর্শন, পরিবেশন, নির্মাণ—তৎসহ যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও আনুসঙ্গিক বহু বিভাগ নিয়ে এক সুবিশাল মহীরূহ—একদিন তাকে আমি দেখেছি অঙ্কুর রূপে—সবে মাত্র জন্ম নিয়েছে। বহু লোকের পরিশ্রম, চিন্তা ও সৃষ্টির প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তখনকার কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে আজকের কর্ম-পদ্ধতির কত তফাৎ! সেই সম্বন্ধেই কিছু বলছি।

তখনকার দিনে যাঁরা চিত্রনির্মাণ করতেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল একটা ভাল জিনিস তৈরী করা—একটা বড় জিনিস

তৈরী করা, এবং এই সৃষ্টির প্রেরণাতেই তাঁরা অনেক কিছু ত্যাগস্বীকার করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এ ধরনের কাজ যা অনেক লোকের বহু পরিশ্রমের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় তাতে প্রয়োজন সমস্ত কর্মীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা। সমস্ত কর্মীর মন বাঁধা থাকবে একটি সূত্রে—লক্ষ্য হবে যাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী ছবি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে। সেইজন্যে কলাকুশলীরা এবং শিল্পীরা একখানি ছবি হিসেবে চুক্তি করতেন না—তাঁরা পাকাপাকিভাবে মাসিক মাহিনায় কাজ করতেন। ফলে কর্তৃপক্ষ সবসময়ের জন্যেই শিল্পী এবং কলাকুশলীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেতেন এবং একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে, যাকে বলে প্ল্যানিং, কাজ করবার সুযোগ পেতেন।

এখন যেমন, শিল্পীরা তো বটেই, নামকরা কলাকুশলীরা পর্যন্ত একসঙ্গে বহু ছবিতে কাজ করেন এবং চিত্র-নির্মাতাদের নিজস্ব স্টুডিও পর্যন্ত নেই। সুতরাং প্রডিউসারদের খেয়াল-খুশী এবং মর্জি অনুসারে ছবির কাজ এগিয়ে চলে। প্ল্যানিং এবং ডিসিপ্লিন-এর কোন বালাই নেই—এর ফলে একখানি ছবি শেষ হতেও যেমন দেরী হয়, অর্থব্যয়ও হয় পরিকল্পনার অতীত।

নির্বাক যুগে এবং পরে সবাক যুগেও—বিশ্বমহাযুদ্ধের আগে, এমনকি দু-এক বছর পরেও আমি যেসব চিত্রনির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছি ভাল প্লানিং অ্যান্ড স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনের ফলে ছবি শেষ করতে বেশী সময় লাগত না।

কিন্তু কেন সেই পরিবেশের অস্তিত্ব আজ অবলুপ্ত? এর কারণ খুঁজতে বেশী দূরে যেতে হবে না। যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধোত্তরকালের চিত্রশিল্পের সমালোচনা করলেই দেখা যাবে যে সর্বগ্রাসী যুদ্ধই আমাদের চিত্রশিল্পের সেই সুন্দর পরিবেশে বিরাট ফাটল ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

যুদ্ধের সময় হল বিরাট মুদ্রাস্ফীতি। লোকের হাতে তখন প্রচুর টাকা। সদুপায়ে অর্জিত থেকে অসদুপায়ের অর্জনই বেশী। এলো ফিল্ম কোটা—তৎসংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রথা। যারা লাইসেন্স পেল, তাদের মধ্যে অনেকেই বিরাট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে লাইসেন্স বিক্রি করে দিতে লাগল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ছবির নির্মাণসংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। শিল্পীদের চাহিদাও বেড়ে গেল—তখন আর তাঁরা বাঁধা মাহিনায় কাজ করতে চাইলেন না। তাঁরা শুরু করলেন ছবিতে কন্টাক্টের ভিত্তিতে কাজ করতে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা—মানে 'স্টার'-রা—যাঁরা কেউ আগে হাজার টাকার বেশী মাহিনা পেতেন না—তাঁরা তাদের পারিশ্রমিকের হার বাড়াতে বাড়াতে বম্বেতে এখন একজন 'স্টার' ছবি প্রতি পারিশ্রমিক নেয় ছয় থেকে দশ লাখ টাকা আর বাংলাদেশের স্টার'রা নেয় ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা। অবশ্য দুই-একজন 'স্টার' এখানেও **আছেন যাঁরা বাংলা ছবিতে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে থাকেন।**

বড় বড় স্টার'রা যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন এর জন্যে আমার বিন্দুমাত্র হিংসা বা গাত্রদাহ নেই কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হল একজন শিল্পীর সঙ্গে একজন শীর্ষস্থানীয় কলাকুশলীর অর্থাগমের দিক থেকে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ—সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো। পরিচালক 'স্টার' তৈরী করেন, কিন্তু একজন ভাল পরিচালকের ছবি যদি আয় হল দশ থেকে পনেরো হাজার—অবশ্য বাংলাদেশে কয়েকজন মুষ্টিমেয় শীর্ষস্থানীয় পরিচালক আছেন যাঁরা ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ হাজার টাকাও পেয়ে থাকেন।

একজন শিল্পী একসঙ্গে দুই কি তিন কি কোন কোন সময় চারখানা ছবিতে কাজ করে থাকেন, কিন্তু একজন পরিচালক, যাঁর ওপর সমস্ত ছবির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তিনি একসঙ্গে একাধিক ছবি করতে পারেন না। আর একখানি ছবি শেষ করতে প্রায় ৮ থেকে ১০ মাস সময় লাগে। তাহলে 'স্টার'দের তুলনায় তাঁর মাসিক আয় কত দাঁড়াল? অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কলাকুশলীদের (যেমন ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী, সম্পাদক) আয়ও মাসে ৬০০ টাকার বেশী হয় না। বেশীর ভাগ বড় বড় কলাকুশলীরা (শব্দযন্ত্রী ছাড়া) এবং তাদের সহকারীরা ছবি-পিছু চুক্তিতে কাজ করে থাকেন—অর্থাৎ ফ্রি ল্যান্সার—সেইজন্যে একটা ছবি হয়ে যাবার পর অনেক সময় বহুদিন বসে থাকতে হয় নতুন ছবির আশায় বা নতুন কোন কন্ট্রাক্টের আশায়। এইখানেই হল আসল **ট্র্যাজেডী যে একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর সঙ্গে একজন শীর্ষস্থানীয় টেকনিসিয়ানের কি বিরাট ব্যবধান—অথচ এই টেকনিসিয়ানরা না হলে বড় বড় শিল্পীদের আবির্ভাবই ঘটত না।**

আজকাল অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় যে, অন্ততঃ বাংলাদেশে কয়েকজন প্রগতিশীল তরুণ পরিচালক এই স্টার প্রথা'র উচ্ছেদসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে বেশীভাগ পরিবেশকরা যাঁরাই এখন বলতে গেলে ছবির আসল নির্মাতা, তাঁরা সেই পুরোন স্টার প্রথা'টিকে এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 'স্টার-দের' পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা সত্ত্বেও তাদের ছবি দেখে দর্শকরা তৃপ্ত হয়নি, অর্থাৎ সে ছবিগুলি ব্যর্থ হয়েছে।

আগেকার দিনে প্রোডিউসার এবং ডিরেক্টরই ছিলেন সর্বেসর্বা। স্টার বা ডিস্ট্রিবিউটাররা এবং চিত্রগৃহের মালিকরা সবসময়ই তাঁদের সমীহ করে কথা বলতেন। আর এখন সব উল্টো। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিচালক এবং প্রোডিউসারের কোনো ব্যক্তিত্বই নেই, নিই কিছু জোর করে বলার ক্ষমতা। এখন যা কিছু করবেন সব, নয় স্টার'রা নয় ডিস্ট্রিবিউটার কিংবা এক্সিবিটার।

এতক্ষণ একজন শীর্ষস্থানীয় টেকনিসিয়ানের আয়ের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিলাম কিন্তু উপরোক্ত টেকনিসিয়ানরা ছাড়াও আরও অনেক ছোট-বড় কর্মীরা আছে যারা একটি চিত্রনির্মাণে তাদের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করে। এই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে তিল-তিল করে একটি ছবির সম্পূর্ণ রূপ। কিন্তু একজন সহকারী পরিচালক, সহকারী ক্যামেরাম্যান, ব্যবস্থাপক ও তার সহকারী, সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের গড়পড়তা আয় কত? খুব যদি বেশী হয় তবে মাসে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা। উপরন্তু এই কাজগুলির দায়িত্ব কিছু নেই। এ তো সব ছবি-পিছু চুক্তির ব্যাপার—ছবিও শেষ হল তারাও আবার বেকার হল বেশ কিছুদিনের জন্যে।

আমি আগেই বলেছি যে আগেকার দিনে স্টুডিওর মালিকরাই ছিলেন সত্যিকার প্রোডিউসার এবং সেখানে এই সব কলাকুশলীরা স্থায়ীভাবে মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত থাকতেন। আজকাল স্টুডিওগুলির একমাত্র আয় হল ভাড়া দেওয়া—সুতরাং শব্দযন্ত্রী ও তার সহকারী ইলেকট্রিসিয়ান, সেটিংস কুলী এবং ছুতাররা ছাড়া স্থায়ীভাবে কেউই নিযুক্ত নয়। আর এই সব স্থায়ী কর্মীদের আয় কত জানেন?

একজন শব্দযন্ত্রী যাঁর অভিজ্ঞতা মনে করুন ২৫।৩০ বছরের, তিনি মাসে ৬০০। ৭০০ টাকার বেশী পান না। অন্যান্য কর্মীরা যেমন ছুতার ইলেকট্রিসিয়ান বা চিত্রকর—এঁরা যে কি পান তা আর না বলাই ভাল। এই সব কর্মীদের বলা হয় সুদক্ষ কর্মী—এঁরা পান মাসে ১৩০-১৫০ টাকা আর যারা সুদক্ষ কর্মী নয়, যেমন সেটিংস কুলী প্রভৃতি—তারা পায় মাসে ৮৫ টাকা করে। আমি আমার পাঠক-পাঠিকাদের জিজ্ঞাসা করছি—আপনারা বলুন এটা কি কোনোরকমে বেঁচে থাকার মত মাহিনা আজকালকার দিনে? সুতরাং শুনে অবাক হবার কিছু নেই, যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কলাকুশলী ছাড়া বেশী স্টুডিওকর্মীরাই দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পায় না—তাহলে তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ দুরবস্থার কথাটা একবার ভেবে দেখুন তো!

আগেকার দিনে চিত্রশালাগুলি ছিল যেন শিল্পমন্দির। আর আজ সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফিল্ম কারখানা। বেশীভাগ কর্মী কলাকুশলী এবং শিল্পীদের জীবনে আজ আর কোনো লক্ষ্য নেই—নেই কোনো আদর্শ। এঁদের গতি আছে, কিন্তু স্থিতি নেই। থাকবেই বা কি করে?

অনিশ্চয়তার দুর্নিবার স্রোতে, ভাগ্য আজ এঁদের বানচাল হয়ে গেছে। আজকের চিত্রশিল্প দুলছে অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চয়তার দোলায়—আর সেই সঙ্গে দুলছে যাঁরা ছবি করেন তাঁদের ভাগ্য—অর্থাৎ কর্মী এবং কলাকুশলীরা।

এ অবস্থায় অনাহারে এবং অর্ধাহারে যে সব কর্মীদের দিন কাটে তারা কি করে সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করবে? শীর্ষ-স্থানীয় শিল্পী এবং কলাকুশলীরা যাদের কোনো অভাব নেই, অভিযোগ নেই—তাদের সঙ্গে কি করে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সব কর্মীরা সহযোগিতা করবে?

কয়েকজন মুষ্টিমেয় শীর্ষস্থানীয় 'স্টার'দের প্রভাব প্রতিপত্তিই আমাদের চিত্র-জগতে আজকাল সমধিক, বিশেষ করে বম্বেতে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে বম্বের মতো অতটা 'তারকা-প্রীতি' নেই—এখানে একটা বাংলা ছবি ছ'মাসের মধ্যে শেষ করা যায়। কিন্তু বম্বেতে প্রোডিউসারদের 'তারকা-প্রীতি' এত বেশী যে এক-একজন 'স্টার'কে একসঙ্গে ৩।৪ খানি—কিংবা কোনো সময় তারও বেশী ছবিতে কাজ করতে হয়। কিন্তু গোলমাল বাঁধে যখন প্রোডিউসারকে শুটিং-এর দিন দিতে হয়। সেজন্য তারা প্রোডিউসারদের মাসে ৪।৫ দিন, কোন মাসে তারও কম দিন দিতে বাধ্য হয়। সেরকম ব্যস্ত শিল্পী হলে কোন কোন প্রডিউসার হয়ত ২।৩ মাস ধরেই কোনো দিন পেলেন না। ফলে একখানি হিন্দী ছবির শুটিং চলে মাসের পর মাস ধরে, কোন কোন ক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে।

সেজন্যে আজকের কোন প্রোডিউসার বা ডিস্ট্রিবিউটার কল্পনাও করতে পারেন না যে কি করে 'রাজনর্তকী'র মত একখানি ত্রিভাষী ছবি (ইংরাজী সংস্করণসহ)—যার অত জাঁক-জমকপূর্ণ বিরাট বিরাট সেটিংস বড় বড় নৃত্য-সমাবেশ এবং গান নিয়ে—ছ'মাসের মধ্যে শেষ হয়! এইখানেই স্টুডিওর সর্ববিভাগের কর্মীদের সঙ্গে প্রডিউসার, ডিরেক্টার, শিল্পী ও কলাকুশলী-দের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা আজ স্বপ্ন বলে মনে হবে!

এবার আবার 'রাজনর্তকী'র কথায় ফিরে আসি।

'রাজনর্তকী'র তিনটি সংস্করণেরই শুটিং শেষ হয়ে গেল ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ। আমার এখনও মনে আছে মিঃ জে বি ওয়াদিয়া একদিন বলেছিলেন : মিঃ বোস, আপনার মনে আছে কি, যে আমরা কন্ট্রাক্ট সই করেছিলাম এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখে। আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই বলেছিলেন যে ১৩ তারিখে কন্ট্রাক্ট সই করছেন, দেখবেন ছবি শেষ করতে কত বেগ পেতে হয়। এত বড় ছবি—এত টাকা খরচ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মধ্যে তো কোনরকমই গণ্ডগোল হয়নি, এমনকি রি-টেক (যা প্রায় সব ছবিতেই কিছু না কিছু হয়ে থাকে)—তাও সামান্য একটু-আধটু ছাড়া কিছুই হয়নি।'

আমি মিঃ ওয়াদিয়ার সঙ্গে একমত হয়ে বললুম যে, এরকম একটা বিরাট কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্যে।

তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন : 'না-না মিঃ বোস, শুধু আমার একার সহ-যোগিতা নয়—এই ছবির সঙ্গে সংযুক্ত প্রত্যেকটি কর্মী, শিল্পী ও কলাকুশলী—সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, যে রকম প্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করেছে—তার ফলেই সম্ভব হয়েছে এই অসাধ্যসাধন।'

যাই হোক, এই 'অশুভ ১৩' আমাদের জীবনে সবথেকে শুভদিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আজ লিখতে লিখতে 'আনলাকি থার্টিন' বা অশুভ ১৩ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কথাটা তাহলে বলি—

আমার ও সাধনার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছিল ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩০। সেই তারিখ অনুসারে সাধনার বাবা ও মা প্রেসে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপতে দিলেন এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

আমি তখন পাঞ্জাবে নির্বাক ছবি 'খাইবার ফ্যালকন' তুলছিলাম। বিয়ের ৮।১০ দিন আগে কলকাতা এসে পৌঁছলাম। আমার বন্ধু-বান্ধব সব বলতে লাগল : ১৩ তারিখে বিয়ে করছিস? —দিনটা বদলে ফেল এখনো। এদিনে বিয়ে করলে জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পাবি।

সকলেই বলতে লাগল এই কথা—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই—শুনে শুনে আমারও মনে কেমন একটা খটকা লাগল। আমি সাধনার বাবা ও মাকে গিয়ে বললাম যে তারিখটা ১৩-র বদলে যদি ১৫ হয়, তো খুব ভাল হয়।

তাঁরা বললেন : এখন কি করে সম্ভব? নিমন্ত্রণ চিঠি ছাপতে গেছে—সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—লোকজনদের বলা হয়েছে এখন শেষমুহূর্তে তারিখ কি করে বদলানো যায়?

কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম যে ১৩ তারিখ বদল ১৫ তারিখ করতেই হবে।

যাই হোক, শেষ মুহূর্তে আমার মনস্তুষ্টির জন্যে তাঁরা ১৩ তারিখ বদলে ১৫ তারিখেই বিয়ের দিন ধার্য করলেন। যদিও ১৩ তারিখ দিনটি ১৫ তারিখের চেয়ে অনেক বেশী শুভদিন ছিল। এই তারিখ বদলের জন্যে অবশ্য আমার শ্বশুর-বাড়ীর লোকদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল।

জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এবং বহু-রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা দুজনেই গেছি—তাই আজ আমাদের মনে হয় যে বিয়েটা হয়ত ১৩ তারিখ হলেই ভাল হত। অবশ্য জানি যে এটা একটা মানসিক প্রতি-ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আর আজ আমার পরিণত বয়েসে এও জানি যে, 'ললাটের লিখন কভু না যায় খণ্ডন'—What is ordained must happen. কিন্তু আমি তো সাধারণ মানুষ—সংস্কার এবং কুসংস্কার দুই-ই বর্তমান আমার মধ্যে—তাই পরবর্তী জীবনে যখনই কোন শুভ-কর্মের সূচনা হয়েছে ১৩ তারিখে, তখনই মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করেছে। কারণ জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় দিন হল বিবাহের দিন—সেটা জিদের বসে ১৩ তারিখ বদলে ১৫ তারিখ করে কি সুফল হল? এই নিয়ে সাধনার সঙ্গে কথাও হয় আমার মাঝে মাঝে।।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জি। ফটো : অমৃত

আজকের কথা :

পরিচালক, নায়ক ও দর্শক-কথা :

আর, ডি, বনশল নিবেদিত এবং সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "নায়ক" ছবির উদ্বোধন হয় গত ৬ই মে তারিখে। ঐ উদ্বোধন রজনীর সন্ধ্যা ছটার প্রদর্শনীতে যে-সব দর্শক ইন্দিরা চিত্রগৃহে উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা ছিলেন না, তাঁদের সকলকেই নীচের এই সুখপাঠ্য বিবরণটি উপহার দিচ্ছি :

উদ্বোধন রজনীর ছ'টার প্রদর্শনী আগত! 'নায়ক' সম্পর্কে রীতিমত কল্পনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে সুদৃঢ় মতামত ব্যক্ত করার অন্ত ছিল না। প্রাচীনকালে রোমান এরিনাতে যে উত্তেজনা দেখা যেত, তারই যেন পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। রক্তের উন্মাদনা শান্তিবারি সেচনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। সাধারণত শ্রীরায় প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন অন্ধকারের মধ্যে। আগের যে তিনখানি ছবির উদ্বোধনে আমি উপস্থিত ছিলুম (কাঞ্চনজঙ্ঘা, চারুলতা, কাপুরুষ-ও-মহাপুরুষ), তাতে তিনি ছবির পরিচয়লিপি (ক্রেডিট টাইটেল) দেখানোর সময়ে চট্ ক'রে ঢুকে প'ড়ে সামনের ব্যাল্‌কনির সহজে-নজরে-পড়েনা-এমন একটি কোণে কিছুটা হতবুদ্ধি ও নার্ভাসভাবে বসেছিলেন; কিন্তু ঐ অন্ধকারের ভিতরেই অনেকগুলি শ্রদ্ধাভরা চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখত। কিন্তু 'নায়ক'-এর বেলা তাঁর প্রবেশের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করলুম। তথ্যচিত্রাদি দেখাবার পরে বিশ্রামের সময়ে যখন আলো জ্বলতে থাকে, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেশ যেন সাড়ম্বরেই প্রেক্ষাগারে ঢুকলেন; তাঁর দু'পাশে ছিলেন পরিচালক মৃণাল সেন ও খ্যাতিমান নট সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফোটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ-বাল্‌ব জ্বলে উঠল, সৌজন্যসূচক হাসিরও অভাব হ'ল না। কল্‌কাতার চিত্র-জগতের যিনি খবর রাখেন, তাঁর কাছে শ্রীরায়ের দু'পাশে ঐ দু'জনকে দেখতে পাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বোধ হয়েছিল। কেননা কিছুদিন আগেই শ্রীরায় মৃণাল সেনকে "আকাশ-কুসুম"-এর মতো একটি 'ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক'-তুল্য সাধারণ ছবির পরিচালক ব'লে একখানি দৈনিকে পত্র লেখায় বহু বাদানুবাদ, তিক্ততা ও ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কেউ কেউ 'নায়ক'-এর নায়কের ভূমিকায় উঠ্‌তি-নট সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে না নিয়ে জনপ্রিয়তার শিখরে আসীন উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচন করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু "নায়ক"-এর এই প্রদর্শনীতে যখন কেশতৈল এবং আয়ুর্বেদিক হজমী বটিকার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত 'স্লাইড' দেখানো চলছিল, সেই প্রায়ান্ধকারের আবরণের আশ্রয়ে যিনি প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে-ছিলেন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং উত্তমকুমার। তাঁর ডাইনে ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর—বোম্বাই ঢঙের চুমকিবসানো সাদা নাইলন জাতীয় জিনিস ছিল তাঁর অঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে জনতার গর্জন শোনা গিয়েছিল। শ্রীউত্তমকুমার অবশ্য ভিন্ন দিকে তাকিয়েছিলেন—যেন তিনি কিছুই শুনতে পাননি। আবার সেই গর্জন, এবার যেন তার সঙ্গে কিছুটা ভয় দেখানোর ভাব। শ্রীউত্তমকুমার তখন শ্রীমতী ঠাকুরের সঙ্গে যেন খোসগল্প করতে ব্যস্ত। তৃতীয় বারের মতো একেবারে উন্মত্ত চীৎকার শুরু হয়ে গেল—তার সঙ্গে তীব্র শিশ্ ও অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি। এবারে শ্রীউত্তমকুমার ওপরের ব্যালকনির প্রথম সারির আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং গ্রীক-দেবতাদের প্রশান্ত ভাবের সঙ্গে মৃদু হেসে জনতাকে নমস্কার করলেন।...শ্রীরায়

এবং সামনের সারির দেবলোকের বাসিন্দাগণ এই পোষ-মানানো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে লক্ষ্য করলেন, "ঠিক দেবতাদেরই মতো মনুষ্যলোক সম্পর্কে নির্বিকার।"

[উপরে উদ্ধৃত বিবরণটি একটি সিনেমা সংক্রান্ত ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক সমালোচকের রচনার মর্মানুবাদ—নান্দীকর।]

—নান্দীকর

কলকাতা

বীরেশ্বর বসু পরিচালিত 'বিসর্জন'

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটককে চলচ্চিত্র রূপ দিচ্ছেন পরিচালক বীরেশ্বর বসু। বর্তমানে এটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন কমল মিত্র (রঘুপতি) অভি ভট্টাচার্য (গোবিন্দমাণিক্য), দীপ্তি রায় (গুণবতী), শর্মিতা বিশ্বাস (অপর্ণা) ও নবাগত আনন্দ মুখোপাধ্যায় (জয়সিংহ)। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভোলানাথ। সঙ্গীত পরিচালনা ও আবহ সংগীতে রয়েছেন দ্বিজেন চৌধুরী এবং কালীপদ সেন।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'বালিকা বধূ'

তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'বালিকা বধূ' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। সম্প্রতি এ ছবির সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় সন্ধিক্ষণে কৈশোর বিবাহের যে কাহিনী পরিচালক চিত্রিত করেছেন তা চলচ্চিত্রের দৃশ্যকাব্যে এক অনন্য সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। বিমল কর রচিত এ কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহুই বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী ও অনুভ গুপ্তা। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রদীপ প্রযোজিত এ ছবিটির পরিবেশক মানসাটা ফিল্মস।

বলাই সেন পরিচালিত 'কেদার রাজা'

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কেদার রাজা'র চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ করেছেন পরিচালক বলাই সেন। তপন সিংহ কৃত এ ছবির চিত্রনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন, পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ রায়, লিলি চক্রবর্তী, তমাল লাহিড়ী, মমতাজ আমেদ, অসিতবরণ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, দীপিকা দাস, জিন্দল ফিল্মস নিবেদিত এ ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন কালীপদ সেন।

'মিস প্রিয়ংবদা' মুক্তি আসন্ন

দুষ্মন্ত চৌধুরী ও রবি বসু পরিচালিত হাসির ছবি 'মিস প্রিয়ংবদা' মুক্তি আসন্ন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, দ্বিজু

কাল তুমি আলেয়া চিত্রের সংগীতপরিচালক উত্তমকুমার নির্দেশ দিচ্ছেন আশা ভোঁসলেকে

মহালক্ষ্মী চিত্র প্রতিষ্ঠানের বিসর্জন চিত্রে অপর্ণার ভূমিকায় শর্মিতা বিশ্বাস

শাশ্বতী চিত্রের মহরৎ দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে পরিচালক শ্রীখগেন রায় নায়ক শ্রীঅনিল চ্যাটার্জীকে নির্দেশ দিচ্ছেন।
—ফটো ঃ অমৃত

স্তাওয়াল, শিখা ভট্টাচার্য, প্রেমাংশু বসু, মণি শ্রীমানী, শ্যাম লাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অমর বিশ্বাস, তরুণকুমার ও দিলীপ চক্রবর্তী। ছবিটির পরিবেশক সুরঞ্জনা।

বোম্বাই

গুরু দত্ত ফিল্মসের নতুন ছবি 'শিকার'

সম্প্রতি গুরু দত্ত ফিল্মসের নতুন ছবি 'শিকার'র চিত্রগ্রহণ শুরু করলেন পরিচালক আত্মা রাম। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন, ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, জনি ওয়াকার, হেলেন, সঞ্জীবকুমার ও রেহমান, শংকর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

দেব আনন্দ-র নতুন ছবি

শঙ্কর মুক্তি প্রোডাকসন্সের নবম রঙিন চিত্রের শুভমহরৎ সম্প্রতি সংগীত-গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সুরকৃত এ ছবিতে কণ্ঠদান করেন মহম্মদ রফি। নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন দেব আনন্দ। এছাড়া মেহমুদ এবং নিশি রয়েছেন প্রধান দুটি চরিত্রে, ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক রাজা নাওয়াদি। ছবির নামকরণ এখনো ঠিক হয়নি।

'দিল সে পুকারা' বহির্দৃশ্য গ্রহণ

কাহিনীকার, প্রযোজক ও পরিচালক মোহন তাঁর রঙিন ছবি 'দিল সে পুকারা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ এ সপ্তাহের শেষে শ্রীনগরে শুরু করছেন। এ ছবির প্রধান চরিত্রে রয়েছেন শশি কাপুর, রাজশ্রী, সজ্জন, মেহমুদ, হেলেন, অচলা সচদেব ও টুনটুন। এ ছবির সুরকার কল্যাণজী-আনন্দজী।

উত্তম চিত্রের পরবর্তী ছবি

উত্তম চিত্রের পরবর্তী ছবিটি পরিচালনা করবেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। এন, সি, শিল্পপ প্রযোজিত এই রঙিন ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীহারঞ্জন গুপ্ত। অন্ধ নায়িকা চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন মালা সিনহা। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সংগীত পরিচালনা করবেন। ছবির নাম এখনো জানা যায়নি।

স্টুডিও থেকে বলছি

আসুন, আপনার-আমার দেখা কয়েকটা ছড়ানো জীবন নিয়ে একটা গল্প শুরু করি। ঠিক গল্প না বলে চরিত্র-চিত্রণ বলতে পারেন। যদি শহরে থাকেন, তাহলে আনাচে-কানাচে এমন অনেক চরিত্র আপনার চোখে পড়বে যা সহজে ভোলা যায় না। একটা ছাপ রেখে যায়। কাজের মধ্যেই মানুষের বড় পরিচয়। কর্মজীবনের ছায়াপথ ধরে এগিয়ে এলে ছায়া-ছায়া সে মুখ মনের আয়নার ছাপ পড়বে। সাধারণ অসাধারণের কথা নয়। একটু চোখ রাখলে সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

এ গল্পের চরিত্রের জন্য আপনাকে বেশী দূরে যেতে হবে না। এই শহরেই সেসব চরিত্র এধার-ওধার ছড়িয়ে আছে। শুধু খুঁজে নিতে হবে। আজকের ভগ্নাংশ মানুষের প্রাত্যহিকতার মাঝে বিচিত্র চরিত্রের বাসা বেঁধে আছে। বৃহত্তর সমাজ আর কতটুকু খোঁজ রাখে। অথচ সবটাই সত্য। ভয়ংকর। ভগ্নাংশ মানুষে খুঁটিয়ে তার বিচার করে না। মূল্য দেয় না। অথচ মূল্যায়নের সময় এসে গেছে।

বিশেষ করে শহর জীবনে শূন্যতার ছবি আগে চোখে পড়ে। হৃদয় বলতে কিছু নেই। ভালবাসার কোন দাম নেই। সবটাই অভিনয়। মেকী। আন্তরিকতার অভাবে কাছে থেকেও আজ আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। মাঝখানের দূরত্বটা বেশী বলেই মাঝে মাঝে বড় একা মনে হয়। শান্তি পেতে চাই। জীবনকে পেতে চাই। কিন্তু সবটাই যে ফাঁকা। শক্ত মাটিতে পা ফেলবার এতটুকু জায়গা মাত্র নেই।

তবুও তো সবার ওপরে মানুষ সত্য। বিশ্বর মতে। আজও সৎমানুষ আছে। ইউনিভার্সিটির তরুণ ছাত্র। স্বভাবে কবি, কিন্তু দার্শনিক। জমিদারের ছেলে হয়েও আভিজাত্য তাকে বিনষ্ট করেনি। তার ব্যক্তিত্ব বলে জিনিস আছে। আদর্শ আছে। সবার মধ্যে সে একটু আলাদা।

নিশ্চয়ই বিশ্বকে আপনার চোখে পড়বে। এই শহরের এক মেসবাড়িতে থেকে সে পড়ে। বিশ্বর চোখ দিয়ে আজকের আধুনিক মানুষদের জীবনটা দেখি আসুন। এই মেসবাড়ি থেকে শুরু করে পাশের পাইস হোটেল 'ঘোষাল কেবিন'র প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিশ্বকে অবাক করে। ছোট ছোট মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা আর আনন্দ-বেদনার মাঝে আরও বাস্তব কিছু দৃশ্য রাতের অন্ধকারে বড় অশালীন বলে মনে হয়। লাটুবাবু, গোকুল আর সরলা ঝি

ছায়াপথ চিত্রে অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিতা সান্যাল

এই চরিত্র হাটের মেলায় যেন বেসামাল। ধারকরা পয়সায় মদমত্ত হয়ে গভীর রাতে পাড়া কাঁপিয়ে গোকুল ফেরে। সরলাও বাদ যায় না। বৃদ্ধ সাধুবাবুর সঙ্গে তার মেলামেশাটা কেমন যেন চোখে ঠেকে। কোন কোন দিন, কখনো কখনো উত্তেজিত লাটুবাবুর কণ্ঠ ভেসে আসে। কথার সংলাপে বোঝা যায়, তিনি একদার জমিদার। লোকে বলতো 'লাটসাহেব'। আজ আর লাটুবাবুর কিছুই প্রতিপত্তি নেই। তবুও নেশার ঘোরে বনেদী মেজাজটুকু নীরব সাক্ষী হয়ে বাজে।

মেসবাড়ির পেছনে খোলা বস্তির আর এক জীবন। চোখের পর্দা পর্যন্ত নেই। তিনকুলের বৃদ্ধ খুড়ো তার তৃতীয় পক্ষের যুবতী বউ সাবিত্রীকে আজও সন্দেহ করে চলেছে। কালো মেকানিকসকে সে নাকি ভালবাসে। এই তার অপরাধ। সাবিত্রী বড় অসহায়। যৌবনের কোন সোহাগ সে পেল না ঐ বুড়ো মিনসেটার কাছে। তাই তো অঢেল যৌবনের কালোকে তার ভাল লাগে।

ঘর ছেড়ে বাইরে আর এক জীবনের মিছিল বিশ্বর চোখে পড়ে। এটা আভিজাত্যের জগৎ। এখানে বড়মানুষের মেলা। চরিত্র নিয়ে খেলা। কোন তফাৎ নেই ঐ গোকুল, সরলা আর লাটুবাবুর সঙ্গে। গাড়ি-বাড়ি আর অর্থের প্রাচুর্যে অসৎ কামনার প্রবৃত্তিগুলো সব নীচে চাপা পড়ে আছে। ঠেলে বার করলে সব দেখা যায়।

অজানা শপথ-এর সেটে পরিচালক সলিল সেন, বীরেন মুখার্জী, বিমল চক্রবর্তী, মাধবী মুখার্জী ও সৌমিত্র চ্যাটার্জি। ফটো : অমৃত

বিশ্বর পরিচিত দেবাশীষ, দীপঙ্কর আর মণিদি এই প্রাচুর্য-পাড়ার কয়েকটি বিশেষ চরিত্র।

মণিদির অতীত-প্রেমিক প্রকাশ কথা দিয়েও কথা রাখে নি। আজ সে লীলাকে বিয়ে করে বিদেশে রয়েছে। মণিদি আজও একা, তার জীবনে কেউ স্থায়ী হল না। সবাই একদিন জোয়ারের টানে এসেছিল আবার ভাঁটায় চলে গেছে। এই তো হয়। তবে মণিদির কোন দুঃখ নেই। জীবনটাকে তিনি অন্যভাবে দেখেছেন। আজও তরুণদের সঙ্গে সমানভাবে মজলিসি-আড্ডায় বয়সটাকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে দিব্যি নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন। কেউ কেউ আজও মণিদির পড়ন্ত যৌবনে হোঁচট খায়। কিন্তু মণিদি কি সত্যি সুখী? বিশ্ব ভাবে।

বিশ্ব হাঁপিয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর সত্যকে সে আর সহ্য করতে পারে না। সর্বত্র একই জীবন-দর্শন। তাই মনের পরিবর্তনের জন্য সে নতুন পরিবেশের আহ্বানে কথা দেয়। বন্ধু দেবাশীষের যোগাযোগে মেস ছেড়ে ধনী ব্যবসায়ী মিঃ মজুমদারের একমাত্র সন্তান অমিতের গৃহ-শিক্ষক এবং অভিভাবক রূপে বিশ্ব নিযুক্ত হয়। একই পরিবারভুক্ত বিশ্ব এই নতুন পরিবেশে উঁচুতলার মানুষকে প্রথম দেখলো।

বধূবরণ চিত্রের সেটে গীতা দত্ত, পরিচালক দিলীপ নাগ, অজয় বিশ্বাস ও ভারতী দেবী —ফটো ঃ অমৃত

এ পৃথিবীর সংসার আছে। কিন্তু সব কিছুই সাজানো। অনেকটা কাগজের ফুলের মতো। প্রাণ নেই। সাজানো স্বামী। সাজানো সংসার। ঘর থেকে বাইরের টান বেশী। এ বাড়ির গৃহিণী রত্না। তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। সেও বন্ধু-পুরুষ আর বান্ধবী নিয়ে নাচে-গানে ডুবে যায়। সংসার পড়ে থাকে পেছনে। মাঝে মাঝে বিশ্বকে ওরা টেনে নিতে চায়। কিন্তু বিশ্ব সাড়া দেয় না। তাই নিকে রত্নার বান্ধবী এনাক্ষী আর শকুন্তলা ঠাট্টা করে। এনাক্ষী কটাক্ষ হানে। ওদের বন্ধু-পুরুষ জিৎ-এরই জয় হয়। হেরে যায় বিশ্ব ওদের চোখে।

কিন্তু বিশ্ব সত্যের বিশ্বাসী। সে ভেবে পায় না এমন কেন হয়! কেন এমন বিশৃঙ্খলাময় জীবন! ওরা তো কেউ মনের জগতে সুখী নয়! ওদের বাইরেই যেটুকু উৎসব। ভিতরের আলো নিভে গেছে বহুদিন। তাই তো ওরা আলোর মিথ্যে মরীচিকার পেছনে ছুটে মরে। মনের ভিতরটা চির অন্ধকার। বিসর্জনের সানাই বাজছে। সেই সুর বিশ্বকে ব্যথিত করে।

তাই তো বিশ্ব এনাক্ষীকে শূন্যতার জগৎ থেকে পূর্ণতার মাঝে ফিরিয়ে আনতে চায়। নিয়ে যেতে চায় অন্ধকার থেকে আলোয়। কিন্তু অন্ধ এনাক্ষীর সে দৃষ্টি কবে বন্ধ হয়ে গেছে। বারবার সে ভুল করে বিশ্বকে দূরে ফেলে দেয়। বোধহয় বিশ্বর ভালবাসাকে সে দাম দিতে পারবে না। সে মূল্যবোধ তার নেই। তার পবিত্র প্রেমকে এনাক্ষী ছোট করতে চায় না। তাই একদিন ইন্দর সিংকে বিয়ে করেও এনাক্ষী সবকিছু পেছনে ফেলে বিশ্বর প্রতি নীরব ভালবাসা রেখে এ শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায়।

ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের কি যন্ত্রণা! আজকের মানুষের মূল্য কোথায়? বিশ্ব

অবাক বিস্ময়ে ভাবে। এর চেয়ে উমার ভালবাসা অনেক বড়। সে তো কোনদিন মুখ ফুটে তার ভালবাসাকে জানায়নি। বরং হৃদয়ের ব্যবধানে পাথর-চাপা দিয়ে রেখেছে। সে প্রেম নীরব। কোমল। ধূপ হয়ে জ্বলে। রং নেই। গন্ধ আছে। অস্থির নয়। স্থিতি আছে।

বিশ্ব যেন ঠিক তার মনের মত আর-একজনকে খুঁজে পায়। সে উমা। তার চোখ দুটি বড় শান্ত। ঠিক ছায়াপথের মতো। আমাদের গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু এটা ঠিক গল্প নয়। বিশ্বর চোখ দিয়ে আপনার-আমার দেখা আজকের আধুনিক সমাজের কয়েকটি চরিত্র-চিত্রণ মাত্র।

এই চিত্র-কাহিনীর নাম 'ছায়াপথ'। সিনে প্রোডাকসন্সের ছবি। এ ছবিটি সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে নির্মিত হচ্ছে। বর্তমান জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার দৃশ্যগুলি ক্যামেরার তুলি দিয়ে জীবন্ত-ছবি আঁকছেন আলোকচিত্র শিল্পী ও পরিচালক ভূপেন্দ্র-কুমার সান্যাল। এ ছবিতে আমাদের জীবনকে আমরা দেখতে পাব। এর আগে শ্রী সান্যালের প্রথম বলিষ্ঠ ছবি 'ঢেউয়ের পরে ঢেউ'-এ আমরা তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে খুঁজে পেয়েছি। আবার তাঁকে 'ছায়াপথ'-এ নতুন করে পাব। সে বিশ্বাস আমাদের আছে। বিশেষ করে শিল্পী ও কলাকুশলীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ ছবির কাজ সফল হতে চলেছে। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে বাস্তব চরিত্রগুলি রূপদান করছেন বিশ্ব—অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা—মাধবী মুখোপাধ্যায়, মণিদি—মঞ্জু দে, প্রকাশ-বিকাশ রায়, এনক্ষী—সুস্মিতা সান্যাল, মিঃ মজুমদার—এন বিশ্বনাথন, রত্না—কণিকা মজুমদার, দেবাশীষ—তরুণকুমার, দীপঙ্কর—শিব-শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, জিৎ—দিলীপ রায়, কালা মেক্যানিকস—শেখর চট্টোপাধ্যায়, লাটুবাবু—নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সরলা—আরতি দাস, খুড়ো—সুহৃদ রায়, ইন্দর সিং—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত—শ্রীমান শেখর রাও, শকুন্তলা—অলকা গাঙ্গুলী, তনুশ্রী—দীপা চট্টোপাধ্যায় ও লীলা কৃষ্ণা রায়। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক রবিশঙ্কর। সুরঞ্জনা ছবিটির পরিবেশক। কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল।

প্রহ্লাদ শর্মা পরিচালিত দেশহারারা চিত্রে সর্বেন্দ্র

ভিনদেশী ছবি

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার

ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চূড়ান্ত ফলাফল গত ১০ই সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয়েছে। এবারের উৎসবে 'ব্যাটল অব আলজেরিয়া' ছবিটি শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে গোল্ডেন লায়ন পুরস্কারটি লাভ করে। সিলভার লায়ন পুরস্কার পেয়েছে আমেরিকার 'ছাপ্পাকুয়া' এবং জারমানির 'গুডবাই টু ইয়েসটারডে' ছবি দুটি।

ইটালীর 'হাফ এ ম্যান' এবং স্পেনের 'লা বুসকান্না' ছবি দুটিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছেন জ্যাকস পেরি। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন রুশ অভিনেত্রী নাতালিয়া আরিনবেকারোভা। তিনি 'টি ফার্স্ট টিচার' ছবিতে অভিনয় করেন।

চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কারটি লাভ করেছে 'কুল ডি স্যাক' বৃটিশ ছবিটি। উৎসবের শেষ প্রতিযোগী চিত্র ছিল ভারতের 'অতিথি'। এটি দর্শক এবং সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। স্থানীয় পত্রিকা—দি রোম মেসাগেরো 'অতিথি'কে উৎসবের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি কাহিনী চিত্রের অন্যতম বলে মনে করেন। তাছাড়া এ ছবিটিতে কাব্যভাব অনুভব করা গেছে বলে স্বীকার করেন। কমিউনিস্ট পত্রিকা লুনিতা-র সমালোচক অতিথি-র মানবিক আবেদনের কথা সবিশেষ উল্লেখ করেন। এ ছবির সঙ্গীত সম্পর্কে দ্বৈতমত প্রকাশ পেয়েছে।

আলফ্রেড হিচককের নতুন ছবি 'টন কার্টেন'

ইউনিভার্সাল প্রোডাকসন্সের তরফ থেকে আলফ্রেড হিচকক যে নতুন ছবিটি পরিচালনা করছেন তার নাম 'টন কার্টেন'। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন পল নিউম্যান এবং জুলি এন্ড্রুজ।

বিবিধ সংবাদ

সুনন্দা দেবীর স্মরণসভা

প্রখ্যাতা অভিনেত্রী ও সমাজসেবিকা সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর শোক প্রকাশের জন্য গত ১২ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর সভাগৃহে একটি স্মৃতি-সভা আয়োজন করেন শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ। চলচ্চিত্রজগতের বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীরা পরলোকগত সুনন্দা দেবীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

সেনী সঙ্গীত সম্মেলন

২০শে ও ২১শে আগস্ট সেনী সঙ্গীত সমাজের সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্মেলনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে এতে খেয়াল, সেতার, সরোদ ছাড়াও ধ্রুপদ, বীণা, সুরবাহার প্রভৃতিকেও যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে প্রাচীন সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল।

সৌকত আলি খাঁ সুরশৃঙ্গারে নাগধ্বনি কানাড়া রাগ ও বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বীণায় লঙ্কেশ্বরী রাগ বাজিয়ে শ্রোতাদের তৃপ্তি দেন।

অপর্ণা চক্রবর্তী, বাগেশ্রী রাগে খেয়াল গান করেন। রসসমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল সঙ্গীত পরিবেশন তাঁর কাছে প্রত্যাশিত উচ্চমান অনুযায়ীই হয়েছিল।

অন্যান্য শিল্পী যাঁদের গান ও বাজনা শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর খাঁ, সুকৃতি ভট্টাচার্য, অনিল

উত্তর পুরুষ চিত্রে রবি ঘোষ এবং শিখা ভট্টাচার্য

নন্দী, বেগম জব্বর, পূর্ণিমা সেন, নাসের খাঁ, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, জগন্নাথ মুখার্জি ইত্যাদি।

নির্মলেন্দু চৌধুরী ও সম্প্রদায় পরিবেশিত 'মলুয়া'

বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচার প্রতিষ্ঠান "লোক-ভারতী"র দ্বিতীয় বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে গোখলে গার্লস কলেজস্থিত সরলা স্মৃতি মন্দিরে ময়মনসিংহগীতিকার অন্তর্ভুক্ত এক সঙ্গীতময় কাব্যনাট্য মঞ্চস্থ করেছিলেন শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী ও সম্প্রদায়।

"মলুয়া"র অশ্রুস্নাত প্রেমোপাখ্যান এই লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের বিষয়বস্তু। সাধারণ মানুষের "ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোটো সুখদুঃখগাথা নিতান্তই সহজসরলই"—লোকসঙ্গীতের আধারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শ্রীচৌধুরীর নাট্যপরিকল্পনা সার্থক। বিনোদকে প্রথম দর্শনেই মলুয়ার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার, উভয়ের মিলনের রোমাঞ্চ ও বিরহের অশ্রুজলে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ সমাজ পটভূমিকার এক জীবন্ত চিত্র আড়ম্বরহীন নৃত্যগীতের মাধ্যমে সহজপ্রাপ্য। তখনকার সমাজের স্বাচ্ছল্য, উৎসব, নির্মম নিয়তির মত কাজীর অত্যাচার, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে নিপীড়িত মানবাত্মার বেদনার মর্মন্তুদ কাহিনী গ্রামীণ পরিবেশ ও সুরে মর্মস্পর্শী হয়েছে। কাহারবা, তিলাড়া ও দাদরা ছন্দে লোকসঙ্গীতের ভাবটিও সুপরিবেশিত।

তবে বাসরঘরে বিনোদকে মনের কথা বলবার জন্য মলুয়ার মাইকের সামনে ছুটে যাওয়া, অস্বাভাবিক, পীড়াদায়ক, অনেক-সময় হাস্যকরও। পশ্চাৎপটে গ্রামীণদৃশ্যের অতিরঞ্জন বর্জিত করে, শুধু নীল পর্দার ব্যাকগ্রাউন্ড আরও ব্যঞ্জনাদ্যোতক হতে পারত। শ্রীচৌধুরীর দলগত দক্ষতা সম্বন্ধে নতুন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মঞ্চাভিনয়

"মঞ্জরী অপেরা" নাট্যাভিনয়

সার্থক উপন্যাসের মধ্যে যথার্থ নাটকের গতিবেগও লুকিয়ে আছে। নাট্যরূপায়িত হোলে তা বিচিত্র সংঘাতের মধ্য দিয়ে আরো দুর্বার, আরো মুখর হয়ে ওঠে। সম্প্রতি অনেক প্রগতিশীল নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ ভালো ভালো কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করছেন। কিছুদিন আগে 'কিশলয়ে'র শিল্পীগোষ্ঠী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মঞ্জরী অপেরা'র নাট্যরূপ পরিবেশন করেছেন 'রঙমহলে'র মঞ্চে।

তারাশঙ্করের 'মঞ্জরী অপেরা'র পটভূমি বিরাট। এই বিরাট পটভূমিকাকে ঠিক রেখে নাটকের গতিকে অব্যাহত রাখা খুব দুরূহ। কিন্তু অভিনীত নাট্যরূপে দুর্বার গতিবেগ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। নাট্যরূপে কিছু চরিত্র, কিছু ঘটনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তাতে মূল উপন্যাসের বক্তব্য ও পরিণতি ব্যাহত হয়নি মোটেই। 'মঞ্জরী অপেরা'র সফল নাট্যরূপায়ণের জন্য শ্রীপ্রভাত হাজরা নাট্যানুরাগীর অজস্র অভিনন্দন লাভ করবেন।

'কিশলয়ে'র শিল্পীবৃন্দ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আন্তরিক নিষ্ঠা দেখাতে পেরেছেন। বিশেষ করে শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব নাট্যনির্দেশনায় এই অভিনয় একটি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। প্রতিটি চরিত্রাভিনেতা মঞ্চে তার স্বকীয় বক্তব্য সুন্দর করে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। 'মঞ্জরী' চরিত্রে রাণু রায় আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম থেকে শেষ [illegible] অভিব্যক্তি [illegible] [illegible]। [illegible] মুহূর্ত [illegible] যেভাবে তাঁ মানসিক অনুভূতিকে মূর্ত করে তুলেছে তাতে একথা বলা যায় যে, 'মঞ্জরী' চরিত্রে অভিনয় তার জীবনের একটি স্মরণী সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বাবলু বোসে চরিত্রে বাসুদেব পাল প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। গোমাবাবুর ভূমিকায় অমরেন্দ্র দত্ত মনে দাগ কাটতে পারেননি। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের অভাব বার বার তাঁর অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন ধীমান চক্রবর্তী, অজিত মৈত্র, নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী দেবী। দীপালি ঘোষ। আলোকসম্পাত আবহসংগীত রচনা নাটকের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ মুহূর্তকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

'ছাত্র সমিতি'র নাট্যাভিনয়

গত ২৭শে আগস্ট মহাজাতি সদন মঞ্চে 'ছাত্র সমিতি'র সভাবৃন্দ বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দর' নাটকটি অভিনয় করেন। 'বন্দর' নাটকটি বহুবার বহু সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। 'ছাত্রসমিতি'র নাট্যাভিনয়ে সাফল্যের সংকেত ছিল। দলগত অভিনয়ে এঁরা প্রশংসার দাবী করতে পারেন। অঘোর চৌধুরী চরিত্রে অশোক ঘোষ দক্ষতা দেখিয়েছেন, প্রলয়ের ভূমিকায় মানিক বড়ালের অভিনয় অপূর্ব। দিলীপ দাস, রজতশুভ্র বসু, প্রসাদ পালিত ও অলকের ভূমিকায় প্রাণের সঞ্চার করতে পারেননি।

অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেন কল্পনা ভট্টাচার্য, প্রতিমা চক্রবর্তী, দিপালী ঘোষ, শান্তি দত্ত, পান্না নন্দী, অরুণাভ শীল। প্রবীর মুখোপাধ্যায় ও হিমাংশু বিশ্বাস নাট্যনির্দেশনা ও আবহসংগীত সৃষ্টিতে তাঁদের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

চন্দননগর ইউথ সেন্টার

সম্প্রতি চন্দননগর 'ইউথ সেন্টারে'র শিল্পীবৃন্দ শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বিদিশ' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন স্থানীয় রবীন্দ্র-স্মৃতি কাননে। নাট্যাভিনয়ে সৌমেন ঘোষ, রণসিন্ধু মিত্র, রমেন ঘোষ, অতুল বসু, দিলীপ দাঁ, অমিয় বসু, পাঁচুগোপাল মল্লিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। নাট্য-নির্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় দেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামপুরহাটে নাটক

সম্প্রতি রামপুরহাট রেলওয়ে জেনারেল ইনস্টিটিউটের শিল্পীবৃন্দ স্থানীয় রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'পাহাড়ী ময়ূর' নাটকটি পরিবেশন করেন।

শাড়ী
রুমাল
ক্যালিকুথের দোকানে পাওয়া যাবে
প্রাপ্তিস্থান : ক্যালিকুথ রিটেল শপ্স
১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা
২৯, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা
৯৬ এ, বিধান সরণী (শ্যামবাজার), কলিকাতা।

সামগ্রিকভাবে অভিনয় সবার প্রশংসা পেয়েছে। শ্রীমূর্তিবন্দ্ দাস, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, মলয় চট্টোপাধ্যায়, বেলা রায়, ইরা মিত্রের অভিনয়ে উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল লক্ষ্য করা গেছে।

প্রতিযোগিতা

ছোট নাটক রচনার একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন 'সপ্তসিন্ধু' পত্রিকার পরিচালকগোষ্ঠী। যে কোন বিষয়ের ওপর নাট্যরচনাই এই প্রতিযোগিতায় গৃহীত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—১০।১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা—৩।

●

শিশুশিল্পীদের উৎসাহ দেবার জন্য 'সাউথ পাপেট থিয়েটার' নাচ, গান ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৪শে ও ২৫শে সেপ্টেম্বর সাউথ সুবারবন ব্রাঞ্চ স্কুলে। যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৭ই সেপ্টেম্বর। ২, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিঃ-২৯।

মৌতিকের নাট্যাভিনয়

'মৌতিক' সম্প্রদায়ের শিল্পীবৃন্দ আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে দুটি একাংক নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটি হোল নীরদ চৌধুরীর 'একটি চিঠি' ও লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাক প্রহরী'।

রোকিট এ্যান্ড কলম্যান রিক্রিয়েশন ক্লাব

আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর রোকিট এ্যান্ড কলম্যান রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ স্বপন সেনগুপ্তের 'কবে আসবে বসন্ত' নাটকটি অভিনয় করবেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হবে চেতলায় কোম্পানীর নিজস্ব মঞ্চে।

'পূর্বাপর'

১৬ই সেপ্টেম্বর 'রঙমহল' মঞ্চে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গার্ডেনরীচ মেকানিক্যাল রিক্রিয়েশন ক্লাব হরিপদ বসুর 'পূর্বাপর' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নাট্যনির্দেশনা ও সংগীত-পরিচালনায় আছেন শম্ভু রায় ও হরিসাধন দলুই।

'কালিন্দী' নাট্যাভিনয়

কলিকাতা পৌরসভার কলেজ স্ট্রীট মার্কেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে গত ৩০শে আগস্ট সন্ধ্যায় 'রঙমহলে' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পৌরসভা কর্মীদের এই প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে বিভিন্ন বক্তা ভূয়সী প্রশংসা করেন। নাট্যাভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের না হোলেও মোটামুটি তা সবার স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের নাট্যোৎসব ঃ

গেল ৩রা, ৪ঠা, ৬ই, ৭ই এবং ৮ই সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ রবীন্দ্র-নাট্যোৎসবের আসর বসিয়েছিলেন রবীন্দ্র স্মরণীতে (সম্প্রতি এর নতুন নামকরণ হয়েছে রবীন্দ্র সদন)। প্রথম দু'দিন এ'রা মঞ্চস্থ করেছিলেন 'মায়ার খেলা' এবং শেষের তিনদিন যথাক্রমে 'তাসের দেশ', 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'বাল্মীকি প্রতিভা'।

বলা বাহুল্য, একমাত্র 'তাসের দেশ' ছাড়া অপর তিনটিই গীতিনাট্য এবং কবির অল্পবয়সের রচনা। এগুলির মধ্যে কাহিনী ও নাট্যপরিস্থিতি সামান্যই; এরা আসলে হচ্ছে ভাবপ্রধান এবং নৃত্য-গীতই এদের মুখ্য বাহন। 'তাসের দেশ' কিন্তু এদের থেকে স্বতন্ত্র। এতে আছে নাচগানের সঙ্গে কথা—গদ্যাশ্রিত সংলাপ, এর কাহিনী শুধু ভাবলোকেই ঘুরে বেড়ায় না, 'রীতিনীতি আর জীর্ণ সংস্কারের গণ্ডী দিয়ে' আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা নির্জীব সমাজের মানুষগুলোকে রীতিমত নাড়া দেয়। 'তাসের দেশ'-এর কাহিনীর অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য এর পাত্র-পাত্রীদের দিয়েছে অসাধারণ সাজ ও ভঙ্গীর সুযোগ, প্রয়োগকর্তাকে দিয়েছে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার বিস্তৃত অবসর। ছোট গল্পের আকারে প্রথমে লেখা হলেও কবি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত এর নাট্যরূপকেই দিয়েছেন একক প্রাধান্য।

কবির এই চারটি পালাই বহুবার বহু সম্প্রদায় কর্তৃক বারংবার বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হতে দেখা গেছে। এমন কি, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘও বছরখানেক আগে এদের মধ্যে তিনটিকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন। কাজেই এগুলিকে ফিরে ফিরে দেখার ভিতরে শিল্পীদের কণ্ঠমাধুর্য ও নৃত্যসুষমা এবং প্রযোজনায় কিছু অভিনবত্ব উপভোগের আশাটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এবারে আশ্রমিক সংঘ নিবেদিত পালাগুলির মধ্যে একমাত্র "তাসের দেশ"ই সমগ্রভাবে একটি সার্থক রূপায়ণ। অভিনয়, নৃত্য, গীত, বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের রূপসজ্জা এবং মঞ্চোপস্থাপনা পরস্পরের সঙ্গে এমনই সুষ্ঠু ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল যে, একটি অখণ্ড, অব্যাহত রসাস্বাদন সহজ হয়ে উঠেছিল এই "তাসের দেশ" নাট্যাভিনয়ে।

কিন্তু অন্য পালাগুলি সম্পর্কে সমান কথা বলা যায় না। ওগুলি গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তার ওপর রবীন্দ্র সদনের মতো বিস্তৃত মঞ্চে পাঁচ ছ'টি শিল্পী নিয়ে গঠিত মায়াকুমারী বা বনদেবীর দলকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে, এবং ঐ বিশাল প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশন করতে গেলে যে-বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রয়োজন, তারও অভাব অনুভূত হয়েছে প্রতিক্ষণে। মঞ্চের ওপর দোদুল্যমান মাইক্রোফোনগুলি রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে কেমন যেন দৃষ্টিকটু ব'লেই বোধহয়। রবীন্দ্র সরোবর ইনডোর স্টেডিয়ামে যে আসরকে জমাট ও জমজমাট ব'লে মেনে নিতে পারা যেত, রবীন্দ্র সদনে তাকেই কেমন আশ্চর্য ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল!

শিল্পীদল-এর 'জীবন ও জীবিকা' ঃ

গেল শনিবার, ১০ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর ইনডোর স্টেডিয়াম মঞ্চে শিল্পীদল সুনীল চক্রবর্তী রচিত নতুন নাটক "জীবন ও জীবিকা" অভিনয় করলেন। বহু নাটক, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির সার্থক লেখক হিসেবে শ্রীচক্রবর্তীর সুনাম আছে। তাঁর রচিত "টাকার রং কালো" রঙমহলে বহুদিন সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তীর "জীবন ও জীবিকা" বর্তমান নৈরাশ্যোত্তর যুগে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়জাত বাঙালী যুবকদের মিথ্যা চাকুরীর সন্ধানে ঘুরে না বেড়িয়ে ছোটখাট ব্যবসায় ফেরিওয়ালা হয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের পথ নির্দেশ করেছে। ঠনঠনমল, ঢুনঢুলওয়ালাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছে ঃ লোটাকম্বল সম্বল ক'রে এখানে এসে ওরা ছাতুলঙ্কা দিয়ে পেট ভরিয়ে বছর কয়েক যেতে না যেতে গদীয়ান হয়ে বসেছে। অসৎভাবে ব্যবসা ক'রে রাতারাতি বড়লোক বনবার চেষ্টা না ক'রে সমবায় প্রথায় সৎ-ব্যবসায়ী হবার কথাও এই নাটকের মারফত বলা হয়েছে। প্রধানত একটি দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে নাটকটি গড়ে উঠলেও ঐ পরিবারের একটি ছেলের বন্ধু হিসেবে কর্তব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ-কারী জনকয়েক বেকার যুবককেও যেমন এনে ফেলা হয়েছে, তেমনই আনা হয়েছে প্রাচুর্যের ভিতর জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত এক ব্যবসায়ী যুবককে ডুয়ার্সের বনভূমি থেকে এই অভিশপ্ত কলকাতায় বসবাসকারী ঐ পরিবারের অতিথিরূপে। মাত্র দারিদ্র্য-পীড়িত দাদু ও তার নাতি হচ্ছে নাটক-খানিতে অবান্তর সংযোজন।

অভিনয়ে চমৎকার নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়েছেন গৌর বন্দ্যোপাধ্যায় (তীর্থপতি), স্বপ্না মিত্র (মহামায়া) ও শীলা পাল (ঊর্মিলা)। এ ছাড়া বিলাস মুখোপাধ্যায় (পি, বাসু), শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (নির্মল), অপূর্ব মৈত্র (শক্তি), চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সুখহরি), মণ্টু দাশগুপ্ত (অঞ্জন), পরিমল ধর (অরূপ) অনাদি চৌধুরী (সমর), সুধীর দত্ত (অজয়), নুনীল রায় (মলয়) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। নাটকখানিতে আবহসংগীতের প্রয়োগ বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা নাটকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

গানের জলসা

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলন

শ্রীমতী শশী রাও-এর কথকনৃত্যে দিয়ে উত্তর কলিকাতার সংগীত সম্মেলনের ১০৭তম অধিবেশন সুরু হ'লো। ইনি চৌবে মহারাজের ছাত্রী। গুরুও অনুষ্ঠান উপভোগ করবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। উপরি পাওনা হিসাবে তাঁরও একটি প্রোগ্রাম জুড়ে দেওয়া হলো। ইনি সুদর্শনা, এছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না, যেটুকু ছিল বাংলাদেশের উদীয়মানা তরুণ শিল্পীদের মধ্যেও তা বিরল নয়।

কণ্ঠসংগীতে এক নতুন প্রতিভার অবতারণা করেছিলেন সম্মেলনের উদ্যোক্তা-বৃন্দ। শ্রীসত্যেন ঘোষালের শিষ্যা শ্রীমতী ভারতী ভট্টাচার্য। ইনি পরিবেশন করলেন "পূরিয়া ধানেশ্রী"। সুরেলা কণ্ঠ, রাগের চলন, আরোহী, অবরোহীর শুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্বও সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। বিশেষ কড়ি মধ্যমের শ্রুতিমাধুর্য সহজলভ্য নয়। তানের অংগও পরিচ্ছন্ন, পরিমিত। কিন্তু শেষের 'ঠুংরী'তে 'ঠুংরীর' পেলব-কোমল মাধুর্যের একান্ত অভাব ছিল। 'ঠুংরী' না বলে একে খেয়ালেরই এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়। ইনি তানের ওপর জোর না নিয়ে কথার ছোট্ট মীড়ে, জমজমার রেশে ও সূক্ষ্ম কাজে মনোনিবেশ করে ঠুংরীর যথাযথ রসসঞ্চার করতে পারতেন। সংগত ভাল হলে এঁর গান আরও জমত।

কথকনৃত্যশিল্পী চৌবে মহারাজ সম্বন্ধে অনেক আশা মনে জেগেছিল, যখন ঘোষণা করা হ'লো তিনি শম্ভু মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নটরাজ গোপীকিষণের মাতুল (না কি গোপীকিষণ এঁর মাতুল?)। পণ্ডিতজীর আঙ্গিকদক্ষতা, চক্রধার, তৎকার ও লয়কারীতে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু অভিব্যক্তির দীনতা এবং নৃত্য-সুষমার অভাব তাঁর নৃত্যকে রসোত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়নি।

রবীন্দ্রসংগীত-পরিষদ

রবীন্দ্রসংগীত পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হ'লো রবীন্দ্র সরোবর হলে। শ্রী দ্বিজেন চৌধুরীর নজরুলগীতি ও শ্রীসুচিত্রা মিত্রের কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত ছিল প্রথম অনুষ্ঠান। শ্রীমতী মিত্র তাঁর অনুরাগীদের খুশী করতে পেরেছিলেন।

প্রধান অনুষ্ঠান ছিল "শেষবর্ষণ" গীতিনাট্য। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ পরিবেশিত রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে বর্ষাবিদায়ের আনন্দ ও বেদনার রূপায়ণ ছিল এই নৃত্যনাট্যের উপজীব্য। এই পালাগানের বিষয়বস্তু ছিল বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। নিছক 'যাওয়া'টাই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ কথা নয়, বিদায় রক্তিমা আসন্ন এক পরম প্রাপ্তির আগমনঐশ্বর্যও ঘোষণা করে। ফুল-ফোটার সংগে ফুল-ঝরের মালাবদল"—কবির ভাষায়।

কিন্তু এতবড় এক ভাবসম্পদকে, যাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁরা সেই গুরুদায়িত্ব পালনের উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল।

রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান সম্পদ গান। সুরের সংগে কথার মহামিলন। কথাকে বাদ দিয়ে বাংলা গান "চিরকুমার ব্রত" গ্রহণ করবে না কোনদিন—কবি বলেছিলেন।

কিন্তু অসংস্কৃত, শিক্ষাহীন কিছু কণ্ঠের সমন্বয়ে উচ্চারণ বিকৃতিতে প্রতিটি গানের সৌন্দর্য যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে যে কোনো সংগীতরসিকের পক্ষেই তা ক্ষোভের বিষয়। রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয়গুলির ক্রম-বর্ধমান সংখ্যা রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি বাঙালীর অনুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মহাজাতি সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির পরিবেশিত শ্যামা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য।

নিশ্চয়ই। কিন্তু ক্ষোভ জাগে তখনই যখন দেখা যায় শিক্ষার এমন বিস্তৃত ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও এমন একজনও তরুণ শিল্পীর অভ্যুদয় ঘটল না যিনি, রবীন্দ্রসংগীতের মর্মগত মাধুর্য শিল্পসম্মতভাবে পরিবেশন করতে পারছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী ছাড়া শ্রবণযোগ্য কোনো শিল্পীর দেখা মেলে না এটা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলব। এর কারণ কি? শিক্ষার্থীবৃন্দের উপযুক্ত নিষ্ঠার অভাব না উপযুক্ত শিক্ষার?

নৃত্যের প্রসংগ না তোলাই ভাল। 'রাজা' নটরাজ ও রাজকবির ভূমিকায় অরুণ-কুমার পাল, শ্যামল ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সংলাপ সুপরিবেশিত। কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত শুভ্র মালাভূষিত এবং মেক-আপ-চর্চিত মুখে স্টেজের এককোণে উপবিষ্ট হয়ে কথা বলাবলি দৃষ্টিকে বড় পীড়া দিয়েছে। এঁদের নেপথ্যভাষণ আরও মর্যাদামণ্ডিত হতো।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

গত ২৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মহাজাতি সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা-মন্দিরের ১৯তম বাৎসরিক উৎসব মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। নৃত্যবিদ—নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় শিক্ষা-কেন্দ্রের ছাত্রীদের দ্বারা উচ্চাংগ-নৃত্য, গ্রাম্যনৃত্য ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। নৃত্যে সহকারীরূপে ছিলেন অনুপশংকর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা। আলো বাগচি, শুক্লা সেনগুপ্তা, পাপড়ি বোস, কৃষ্ণা রায়, মহুয়া ভৌমিক, শুভ্রা গাঙ্গুলী, শেলী দাস, সংঘমিত্রা রায়চৌধুরী, কৃষ্ণা নন্দী, মানসী ঘোষ, সুচরিতা ঘোষ, রুনু সেন, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা, স্বপ্না দে, কৃষ্ণা ঘোষ, মায়া ভট্টাচার্য, তন্দ্রা রায় ও অনুপ-শংকর প্রভৃতি নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন। কণ্ঠসংগীতে ও যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে বিপুল ঘোষ, কৃষ্ণা ঘোষ, স্বপ্না সেনগুপ্তা, কৃষ্ণা সেনগুপ্তা, কমলা নন্দী, গীতা মল্লিক, বিন্দু চৌধুরী, লীনা মজুমদার, বিপ্লব বক্সী, শিখা বক্সী, অরবিন্দ মিত্র, সুনীল গাঙ্গুলী, বিষ্ণু মিত্র, নেপাল ঘোষ, ফেলু চন্দ প্রভৃতি। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু মহাশয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রগীতিচক্র

গত ১১ই ভাদ্র ১৩৭৩ (২৮ অগস্ট ১৯৬৬) তারিখ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ৮৪, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা-৭ ঠিকানায় মিত্রভবনে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সংগীত এবং পাঠ ও আবৃত্তি সহযোগে রবীন্দ্রগীতিচক্রের দশম অধিবেশন উদযাপিত হয়। সূচনায় সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান কর্মাধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন সভাপতি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

'অচ্ছাবদ' (ঋগ্বেদ) পর্জন মন্ত্র ও তার বাংলা অনুবাদ, কালিদাসের মেঘদূতের সুনির্বাচিত অংশবিশেষ ও তার বাংলা অনুবাদ, রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র-রচনা থেকে উপযোগী পাঠ ও আবৃত্তি সহযোগে বর্ষানুষ্ঠানটি উদযাপিত হয়। একক সংগীতে যোগ দেন ইন্দুলেখা ঘোষ, নীলিমা সেন ও ঊর্মিলা ঘোষ। পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ, ইন্দুলেখা ঘোষ, রমা চক্রবর্তী, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব গুপ্ত প্রভৃতি। সম্মেলক সংগীতেও বহু বিশিষ্ট শিল্পী যোগদান করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বহু শ্রোতৃ-সমাবেশ হয়েছিল এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল।

চিরজীবী রঙ্গালয়

এলমার রাইস

প্রত্যেক সপ্তাহে কোন একজন জেরেমিয়া (Jeremiah) কিম্বা ক্যাসান্ড্রা (Cassandra) **ভবিষ্যদ্বাণী করতে উঠেন** যে, রঙ্গালয়ের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। প্রতি মাসে কোন না কোন সমালোচক মহোদয় ধর্মযাজকের ভঙ্গিতে রঙ্গালয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করেন। তবুও কাউফম্যান এবং হার্ট (Kaufman and Hart) যেমনটি তাঁদের ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় নাটকে বর্ণনা করেছিলেন, সেই "উপকথা-বর্ণিত অচল প্রতিষ্ঠানটি" আজও বেঁচে আছে এবং বেঁচেই থাকবে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, রঙ্গালয়ের সবকিছুই ভালভাবে চলছে। বাস্তবিক এই যে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে "রঙ্গালয়ের হলটা কি?" এর সঙ্গে জোড়া থাকে লম্বা অভিযোগের ফিরিস্তি এবং তার পরিপূরক হিসাবে সেই সঙ্কটগুলি কাটিয়ে ওঠার দাওয়াইও। এরকমই কিন্তু কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, "মানবতার হাল কি হল?" বা "সমাজের হাল কি হল?" কেননা, রঙ্গালয় তো আসলে মানবিক সৃষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানই। আর আমরা এটাও দেখেছি যে, এই রঙ্গালয়ের গড়ন আর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, যে-সমাজের মধ্যে রঙ্গালয়কে কাজ করতে হয় তার প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক ছাঁচের দ্বারাই। রঙ্গালয় এমন একটি বস্তু যা সৃষ্ট হয়েছে মানুষেরই বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাপ্রবণতা, কলাকৌশল, নির্বুদ্ধিতা, স্থূলতা ও অর্থলোলুপতা দিয়ে। এর সঙ্গে আরও জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক সংগঠন, উদ্যম, অযোগ্যতা এবং অপচয়বৃত্তি। সেইজন্য বিস্ময়ের কিছু নেই যে, রঙ্গালয়ের উৎসাহী শুভার্থীরাও মাঝে মাঝে রঙ্গালয়ের অবস্থাকে হতাশাজনক ও জঘন্য বলে মনে করেন।

আগের অধ্যায়গুলিতে রঙ্গালয়ের অনেকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচিত হয়েছে বা ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি বোধহয় দুশ্চিকিৎস্য; কিন্তু বেশ কিছু আছে যেগুলির আরোগ্যের উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কাজেই সমসাময়িক রঙ্গালয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কালে এর ব্যাধির স্বরূপ নির্দেশ ও রোগমুক্তির হদিশ দেওয়া এবং ভবিষ্যৎটাই বা কি রকম সে বিষয়ে কিছু বলা বোধহয় উপযুক্ত হবে। বইটিতে প্রধানত মার্কিন রঙ্গালয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, কাজেই এই পূর্বানুসৃতিতেও আমি আগেকার প্রধান বক্তব্যগুলিই আবার বলব। কিন্তু এর উপসংহারের অনেকগুলি বক্তব্যই মনে হয় অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে শিল্প-সমৃদ্ধ দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হবে বলে আমার ধারণা।

ব্রডওয়ে রঙ্গালয় যে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কারণ হল সেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহরে ও সাংস্কৃতিক রাজধানীতে অবস্থিত, এবং সমস্ত পেশাদার রঙ্গালয়কর্মী, অর্থাৎ নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, পরিকল্পনাবিদ ইত্যাদি সকলেরই কর্মক্ষেত্র। সুতরাং এইখানেই কম-বেশী সারা দেশের সুরটা বাঁধা হয়ে যায়—এবং পৃথিবীর চোখে মার্কিন রঙ্গালয়ের বৈশিষ্ট্য বলতে যা কিছু বোঝায় তা এইখানেই প্রতিফলিত হয়।

ব্রডওয়ে রঙ্গালয়ের অনস্বীকার্য প্রাণশক্তির পিছনে দুটি কারণ আছে। প্রথমত, এটি মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ-পরিবেষ্টনীর মধ্যে কাজ করতে পারছে, এবং এখানে কোন সেন্সরশিপের বাধা বা সরকারী তরফ থেকে নিয়ন্ত্রণ নেই। নাট্যকারের স্বাধীনতা আছে, তাঁর যা খুশি লেখার এবং প্রযোজকদেরও রয়েছে তাদের খুশিমত নাটক মঞ্চস্থ করতে পারার অবাধ স্বাধীনতা। দ্বিতীয়ত, রঙ্গালয় বড় ব্যবসা নয়, ছোট ব্যবসা। এর যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁরা তাঁদের যে রুচি থেকে একটি নাটক পছন্দ করেন এবং বিশেষ প্রযোজনার উপর মনঃসংযোগ করেন সেগুলির সঙ্গে বিস্তর ফারাক রয়েছে বড় ব্যবসায়ীদের যান্ত্রিক পদ্ধতির রুচি ও মানের সঙ্গে। ফলে জনসাধারণের সামনে যে-সব নাটক উপস্থাপিত করা হয় সেগুলি রুচি ও গুণের দিক দিয়ে হয় বহুবিচিত্র। তার মধ্যে গায়ে-কাঁটা দেওয়ার মত বিশ্রী থেকে মহৎ পর্যন্ত সব রকম নাটকই থাকে। অবশ্য সব সময় খেয়াল ও লক্ষ্য থাকে টিকিটঘরের দিকে। কিন্তু এর শেষ কথা ব্যক্তিক বিচার-বুদ্ধি; বাইরের কোন 'এজেন্সী'র খোশামুদি করে বেড়াতে হয় না। যেমন, উদ্যোক্তাবৃন্দ, কিংবা চাপ-সৃষ্টিকারী দল অথবা কোন না কোন আনুমানিক দর্শকদল, যাদের মধ্যে থাকে ছোট ছেলেমেয়ে এবং অপরিণত বুদ্ধির মানুষেরা। তাছাড়া এটাও সগৌরবে বলা যায় যে, রঙ্গালয়ে কারও রাজনৈতিক বিশ্বাস বা ব্যক্তিগত আচরণের জন্যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয় না। একটি ছোট গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারের অধীনে আসার মত জঘন্য ও অশুভকর ব্যাপার আর কিছুই রঙ্গালয়ের পক্ষে হতে পারত না। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বা উচ্চমান ইত্যাদি সমস্ত কিছু সত্ত্বেও এমন ব্যাপার ঘটলে তা হত বিপদস্বরূপ।

কিন্তু ব্যক্তিক উদ্যোগেরও কিছুটা অসুবিধা আছে এবং রঙ্গালয়ের জগতে এটা যেমন প্রকট হয়ে পড়ে এমন আর কোথাও হয় না বোধহয়। রস-বিচারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়ত ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা চলতে পারে না, আবার উল্টোটাও এখানে ঘটে। কোন কোন প্রযোজকের দুটি গুণই আছে। কারুর আবার কোনটাই নেই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত খুব কর্মতৎপর, কিন্তু প্রচণ্ডরকম আত্মকেন্দ্রিক, তাঁরা কোন রকমের প্রতিষ্ঠানগত নিয়ন্ত্রণের অধীনেই কাজ করতে নারাজ। কেউ কেউ পারস্পরিক মঙ্গলের প্রতি স্বার্থপরের মত উদাসীন। কেউ কেউ জাঁহাবাজ ঠগও আছেন। সেইজন্য প্রযোজকদের পক্ষে এমন একটি সমিতি স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি যার ফলে তাঁরা সদস্যদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে পারেন, এবং এমন কোন উপায় অবলম্বন করাও সম্ভব হয়নি যার দ্বারা রঙ্গালয়-শিল্প সম্বন্ধে সাধারণের অভিযোগগুলি দূর করা যেতে পারে।

সম্মিলিত এবং সমবায়মূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রযোজকরা খরচ কমাতে পারেন, রঙ্গালয়ের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন, এবং যে হাজার হাজার দর্শক চড়া দামের টিকিট এবং রঙ্গালয়ে যাওয়ার অসুবিধার জন্য রঙ্গালয়বিমুখ হয়েছে তাদেরও ফিরিয়ে আনতে পারেন। একটি কেন্দ্রীয় টিকিট-বিক্রি অফিস খুলে কাউন্টারে বা ডাকে যেভাবেই হোক, টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করা; টিকিটের চোরা-কারবার বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা করা; বর্তমান বিজ্ঞাপন-ধারার সাহায্য গ্রহণ; ছাত্রদের জন্য অপরাহ্নে সুলভ মূল্যের টিকিট—এই সমস্ত মিলিয়ে-মিশিয়ে চেষ্টা করলে জনসাধারণ আবার রঙ্গালয়ে আসতে প্রলুব্ধ হবে এবং রঙ্গালয়ে আসাটাকে এমন একটি খরচের

সীমার মধ্যে রাখা যাবে যাতে এখন যাদের আরে কুলাচ্ছে না তারাও তখন দেখতে পারবে এবং যারা পারছে তারা আরও বেশি-বার রঙ্গালয়ে আসবে। কারণ তখন টিকিটের জন্য ফাটকাবাজদের হাতে দ্বিগুণ দাম তুলে দিতে হবে না। একটি সমবেত ভাণ্ডার রাখা যেতে পারে যেখানে সকলেই তাঁদের দৃশ্য-পট ও সাজ-সরঞ্জাম রাখতে পারবেন, যেখানে সকল প্রযোজকেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। এতে প্রতিটি নতুন প্রযোজনার জন্য নতুনভাবে জিনিসপত্র কেনাকাটার, অপচয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারবে।

যদি সাহস করে প্রাথমিক খরচের টাকাটা একটু বেশি ব্যয় করা যায় তাহলে আরও কাজ দিতে পারে। যদি রঙ্গালয়গুলি যথাযথভাবে তাপনিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহলে সারা গ্রীষ্মকালই সেগুলি খোলা রাখা সম্ভব হবে। এর ফলে মোট খরচ কম পড়বে, আবার চাকরীও অনেক বেশি জুটবে। যেখানে সুবিধা সেখানে "বার" কিম্বা খানাপিনার বন্দোবস্ত করতে পারলে আরও একটা মোটা আয়ের পথ খুলবে। আর একটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হল রঙ্গালয়ের যন্ত্রপাতিগুলির উন্নতিসাধন করা এবং যথেষ্ট পরিমাণে সুইচ-বোর্ড আর মঞ্চ-আলোকের ব্যবস্থা করা। এর ফলে সেই প্রাচীন কাল থেকে চালু ব্যয়বহুল পদ্ধতিটি — অর্থাৎ প্রতিবার নাটক শেষ হবার সঙ্গে আলোক-বর্তিকাগুলি খুলে নিয়ে ঠিক সেই ধরনের আলোই আবার লাগানোর ঝামেলা ও খরচও বন্ধ হবে। এগুলি সমস্তই বর্তমান রঙ্গালয়ের কাঠামোর মধ্যে থেকে কী কী করা যায় তারই উদাহরণ। এর জন্যে দরকার শুধু উদ্দেশ্যের ঐক্য, দূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ বিনিয়োগ।

অবশ্য আধুনিক আরামপ্রদ রঙ্গালয়ের চাহিদাও খুব প্রবল। রঙ্গালয়ের গড়নে নতুনত্ব আনার ফলে শোনবার ও দেখবার বহু সুবিধা হতে পারে। ফলে একই সময়ে অনেক দর্শকের সামনে নাটকটি উপস্থাপিত করা যাবে এবং আয়বৃদ্ধিও ঘটবে সেই সঙ্গে। কিন্তু প্রশ্ন হল : আধুনিক রঙ্গালয় তৈরির জন্যে এই টাকাটা দেবে কে? দুর্ভাগ্যক্রমে, খুব কড়া ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, ঝুঁকিটা খুব উৎসাহজনক নয়।

কার্যক্রমের দিক দিয়েও রঙ্গালয়ের ইউনিয়নগুলি তাদের অর্থনৈতিক ঝুঁকিকে অনেকটা হাল্কা করতে পারে, তাদের কর্মী-দের নিরাপদে রাখার (Feather bedding) বাজে খরচটাকে বাদ দিয়ে। প্রায়ই দেখা যায়, যে নাটকটির অবস্থা শূন্যে দোদুল্যমান, সেটি টিঁকে যেতে পারে যদি, অপ্রয়োজনীয় কর্মচারীদের মাইনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেত। যদি নাটকটি দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়, তাহলে কর্মচারীদের সংখ্যা যতটা বৃদ্ধি পায়, তা অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের ছাঁটাইয়ের চেয়ে বেশী। তাছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর রঙ্গালয়-কর্মীদের মধ্যে যে অস্বস্তিকর এবং বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক রয়েছে তারও অনেক উন্নতি ঘটতে পারে। আরও খানিকটা এগিয়ে বলা যেতে পারে, প্রথম সপ্তাহের অভিনয় রজনীতে নাট্যকার এবং উচ্চমাইনেওলা অভিনেতারা যদি খানিকটা অর্থের দিক থেকে ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহলে প্রযোজক নাটকটি এমন একটি ব্যয়ের মধ্যে রাখতে পারবেন যা নাটক চালু রাখার পক্ষে প্রতিবন্ধকতামূলক হবে না। যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের মধ্যে এটাও দেখা যেতে পারে যে, নাট্যকার আর অভিনেতাদের তরফ থেকে এই প্রথম সপ্তাহের প্রাপ্য আয়ের কিছুটা ত্যাগ করার ক্ষতিটা নাটকের পরবর্তী লভ্যাংশকে ভাগ করে নিয়ে পূরণ করে দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু, এরকম কোন পরিকল্পনা যে প্রযোজকরা গ্রহণ করবেন এমন সম্ভাবনা খুব বিরল। কারণ, তাঁরা প্রধানত চান চট-পট দাঁও মারতে, আর রঙ্গালয়কর্মীদের নজর থাকে হাতে হাতে লাভের দিকে।

বড়জোর এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি পেশাদার নাটক প্রযোজনার অর্থনৈতিক দিককে প্রভাবিত করে, কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা মূল শিল্পগত চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে বা যার ফলে রঙ্গালয়কে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতি-ষ্ঠানরূপে উন্নত করা সম্ভব হতে পারে। রঙ্গালয়কে যদি জাতীয় সংস্কৃতির একটি প্রতিশ্রুতিময় মাধ্যম হিসাবে সার্থক হতে হয়, তাহলে মাত্র পূর্ব উপকূলের একটিমাত্র শহরে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক কর্মধারার মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিশেষত এটা আবার এমন একটি কর্মধারা যে, নাটকটি যদি সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তার সাফল্য লাভ না করে, তাহলে তার বেঁচে থাকবার উপায় নেই এবং এই কর্মধারায় রঙ্গালয়কর্মচারী-দেরও শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, কিম্বা চাকরীরও কোন স্থায়িত্ব নেই।

এই সব ত্রুটি দূর করবার একটিমাত্র পথ আছে, তা হল রঙ্গ-জগতে বিকেন্দ্রী-করণ, কতকগুলি রেপারটরী (Repertory) রঙ্গালয় স্থাপন করা, ঠিক যেমন অনেক ইউরোপীয় দেশে আছে। এই ধরনের রঙ্গালয় অনেক জরুরী উদ্দেশ্য সাধন করে। এগুলি সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গী-ভূত হয়ে ওঠে, এবং জনসাধারণের গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যে সব প্রতিশ্রুতিময় নাটকের আবেদন সীমিত, সেগুলিও এর ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে এবং এরই সাহায্যে বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অভিনয় প্রদর্শিত হয়ে জনসাধারণের রুচির মান উন্নত হয়। এ ছাড়া এগুলি অভিনেতা, পরিচালক ও পরিকল্পনাবিদদের পক্ষে শিক্ষায়তনেরও কাজ করে।

যারা রঙ্গালয়ের উন্নতি কামনা করে তারা এই ধরনের রঙ্গালয়ের প্রয়োজন স্বীকার করে বলেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রকম রঙ্গালয় গড়ে ওঠে না কেন? উত্তরটি সরল। একটি ভাল ধরনের রেপারটরি রঙ্গালয়, যেখানে নানা ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক অভিনীত হতে পারে, সুলভ মূল্যে সে রকম প্রতিষ্ঠান কখনই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারে না। আর আর্থিক আনুকূল্য পাবারও কোন সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

দুটি সম্ভাব্য সূত্র আছে, আর্থিক আনুকূল্য পাবার। সরকারী খয়রাতি ও ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্য। ইউরোপে রঙ্গালয়গুলি সাধারণত জাতীয় এবং মিউনিসিপাল সরকারী সমর্থনে তাদের চিরাচরিত দরবারী ঐতিহ্যকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য চালু রাখা হয়। কিম্বা সোভিয়েট ইউনিয়নের মত এক-নায়কতন্ত্রী দেশে রঙ্গালয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা কর্মসূচীর একটি যন্ত্রে পরিণত হয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের ঐতিহ্যও নেই, সরকারী কর্মসূচীও নেই। এখানে করদাতাদের প্রবল বাধা এবং শিল্প সম্বন্ধে বিধানসভার সদস্যদের অজ্ঞতা এমন বাধা সৃষ্টি করে যা প্রায় অনতিক্রম্য। মাঝে মাঝে কথা উঠেছে ওয়াশিংটনে একটি জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করবার। কিন্তু সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আমি এমন কোন শহরের কথা জানি না, যেখানে রঙ্গালয়কে পোষণ করা হয়, বা পোষণ করার মত পরিকল্পনা কারও আছে। মেয়র ল গার্ডিয়া (Mayor La Guardia) -এর সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল, একটি বড় কলাকেন্দ্র স্থাপন করবার। তাতে থাকবে একটি অপেরা হাউস, একটি কনসার্ট হল, একটি রঙ্গালয় এবং একটি শিল্পশালা। কিন্তু সে স্বপ্ন কখনো বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে নি। যখন একটি ম্যাসোনিক হল (Masonic Hall) যেটি মক্কা টেম্পল (Macca Temple) নামে পরিচিত—কর দিতে না পারার ফলে শহর কর্তৃপক্ষের
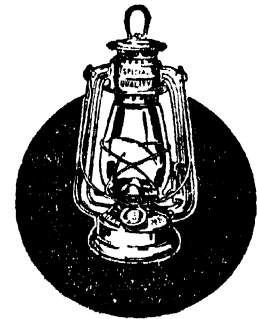
হাতে এসে পড়ল, তখন লা গার্ডিয়া (La Guardia) সুযোগটি গ্রহণ করলেন এবং সেখানে নিউইয়র্ক সংগীতকেন্দ্র (New York Music Centre) এবং নাট্য কেন্দ্র (Drama Centre) স্থাপন করলেন। কয়েক বছর এই প্রতিষ্ঠানটি ভাল জাতের অপেরা, ব্যালে এবং নাটক অনুষ্ঠান করেছে। কিন্তু রঙ্গালয়টি ভালভাবে গোছান নয়, আর কোন অর্থবরাদ্দ শহর থেকে পাওয়া গেল না। তাছাড়া কোন স্থায়ী কোম্পানী বা কোন স্থায়ী নীতির অস্তিত্ব ছিল না, কেবল উদ্যোগটি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল যেন-তেন প্রকারের শৈল্পিক নৈপুণ্যের মাধ্যমেই। তারপর লা গার্ডিয়া নির্বাচিত স্থলেই তাঁর মৃত্যুর পর যখন (Coliseum) অট্টালিকা তৈরী করার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হল, আমি কমিশনার মোজেস কে চিঠি লিখে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম মেয়রের কল্পনার কথা, এবং এই অট্টালিকার মধ্যে একটি রঙ্গালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি অবশ্য আমাকে উত্তর দিয়ে জানিয়েছিলেন ও ধরনের ব্যাপারে কোনো অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে না। সুতরাং La Guardia-র শিল্পমন্দিরের স্বপ্নের পরিবর্তে গড়ে উঠল এক দৈত্যাকার বিরাট সৌধ। সেখানে ডিস-ধোওয়া যন্ত্র আর মটরবোটের প্রদর্শনী খুলে রাখা হয়।

কিন্তু রঙ্গালয়ের জন্যে জনসাধারণের কাছ থেকে তহবিল জোগাড় করলেও সর্বদা ভয় থাকে যে ব্যবস্থাপনার ভার পড়বে হয়ত কোনো অযোগ্য রাষ্ট্রনীতিবিদের হাতে, এবং শিল্প কর্মসূচীগুলির উপর রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এসে পড়বে। আমরা দেখেছি ফেডারেল থিয়েটার প্রোজেক্ট সম্ভব হয়েছিল নিছক বেকারদের অসুবিধা দূরীকরণের উপায় হিসেবেই, এবং ঐটিও সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেই রাজনীতির শিকারে পরিণত হল। তাছাড়া সেন্সরশিপের বিপদও থেকে যাবে। কারণ, অনেক আইনপ্রণেতা রঙ্গালয়কে পাপের আকর, অধর্মের ডিপো এবং সাম্যবাদীদের আড্ডা বলে মনে করেন। আর আইনপ্রণেতাদের পরিভাষায় ঐ তিনটি ব্যাপারই আসলে এক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এইসব খরচ সামলাতে হলে রঙ্গালয়কে বিত্তশালী ব্যক্তির অর্থদাক্ষিণ্য এবং বড় বড় সম্পদশালী প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এখন এইসব প্রতিষ্ঠানই বাড়তির দিকে, মানুষের সত্তা ক্ষীয়মাণ। রঙ্গালয়গুলির পক্ষে এখন তাই ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগত অর্থসাহায্য পাওয়া খুবই দরকার। অপেরা কোম্পানি, সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা, সাধারণ গ্রন্থাগার, শিল্পশাখা ইত্যাদি সবকিছুই বরাবর আনুকূল্য পেয়ে এসেছে, প্রকৃতপক্ষে তা না হলে এরা অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারত না। কিন্তু শিল্পের মধ্যে রঙ্গালয়কে সবসময় দেখা হয়েছে সতীনপো রূপে। যদিও এটা বোঝা শক্ত, যে রেপারটরি-তে সুন্দর নাটক অভিনয় হয় সেটা কেন নিজের ব্যয় নিজে বহন করবে, আর যেসব রেপরটরিতে অপেরা অর্কেস্ট্রা, সিমফনি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাদের বেলায় খরচটা হবে পরস্মৈপদী? সেটা কি এইজন্যে যে এতদিন ধরে অভিনেতাদের লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে বলে মনে করা হত? কিংবা এইজন্যে যে যুক্তরাষ্ট্রে রঙ্গালয় সবসময়ই ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত আছে? কারণটা যাই হোক না কেন, কতকগুলি আশার চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গীর হয়তো পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। সম্প্রতি কতকগুলি ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে কয়েকটি সংগ্রামশীল মুমূর্ষু কমিউনিটি রঙ্গালয়কে অর্থসাহায্য দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। তাছাড়া রঙ্গালয়ে প্রতিভাসম্পন্ন নতুন লোক যাঁরা আসছেন তাঁদেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কনেকটিকাট-এর স্ট্র্যাটফোর্ড-এ শেক্সপীয়ার রঙ্গালয় হল অগ্রণী বৃটিশ ও কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠানের উত্তরসাধক। এঁরা অর্থানুকূল্যের ফলে চমৎকার একটি রঙ্গালয় নির্মাণ করতে পেরেছেন এবং চমৎকার একটি প্রতিশ্রুতিময় শেক্সপীয়ার রেপারটরি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সারা দেশের এখানে সেখানে অনেকগুলি স্থানীয় কোম্পানী বিত্তবান রঙ্গালয় প্রেমিকদের সাহায্যলাভ করছে। নিউইয়র্কে মিসেস ভি বি এ্যালেন তিন লক্ষ ডলার দান করেছেন, নিউ লিঙ্কন শিল্পকেন্দ্রে একটি রেপারটরি রঙ্গালয় নির্মাণ করবার জন্য।

এ ঘটনাটি ঘটল তারপরই, যখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাঁচটি অপরূপ রঙ্গালয় নির্মাণের নক্সা বাতিল করে না দিলে এক পয়সাও এই প্রকল্পে সাহায্য করবেন না বলে ঘোষণা করলেন। এইসব ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে, রঙ্গালয়ের যে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন আছে সেটা ক্রমশ লোকের কাছে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আর পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলি যত জনসংখ্যায় এবং সম্পদে স্ফীত হয়ে উঠছে, ততই সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে যে একটি সুন্দর সাধারণ রঙ্গালয় বড়রকমের লীগ বেসবল ক্লাবের মতই (League baseball club) শহরের অলংকারস্বরূপ, এ সত্যটা তারা আবিষ্কার করতে পারবে।

পেশাদার রঙ্গালয়ের ত্রুটিগুলির মতোই অপেশাদার রঙ্গালয় বিশেষকরে বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গালয়ের ত্রুটিগুলিও রীতিমত প্রকট। প্রত্যেক উচ্চ শিক্ষায়তনে হয়তো নাট্যশিক্ষা পাঠক্রম চালু আছে এবং নাটক যোজনার কাজেও তাঁদের উদ্যোগ আয়োজন আছে, কিন্তু তার সাংগঠনিক গড়ন, সাজসরঞ্জাম, শিক্ষকতার মান অন্য যে কোন বিভাগের শিক্ষা বা যে কোনো শিল্পশিক্ষার চেয়ে অনেক নীচু স্তরের। অনেক কলেজে অনেক বিভাগ আছে যেখানে চিত্রশিল্প সংগীত ভাস্কর্য শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু নাটকের পাঠক্রমটি অসংবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে ইংরিজী বক্তৃতা (স্পীচ) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে; কিংবা কোথাও হয়তো এর মর্যাদা নেমে এসেছে অতিরিক্ত পাঠক্রমের তালিকায়। আর এজন্য ছাত্রেরা কোনোরকম স্বীকৃতিও লাভ করে না। মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিক্ষায়তনেরই পূর্ণাঙ্গ নাট্যবিভাগ আছে। হার্ভার্ডে চমৎকার একটি School of Business Administration চালু আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের জন্য কোনো বিভাগ নেই। কলম্বিয়াতে চমৎকার একটি School of Journalism -এর বিভাগ আছে, কিন্তু রঙ্গালয় বিভাগ নেই।

মিচিগানে একটি সুন্দর School of Medicine (এবং প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল) আছে, কিন্তু নাটকের শিক্ষাব্যবস্থায়

রয়েছে চরম দুরবস্থা; কারণ হচ্ছে, সুসংগঠিত পাঠক্রম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভাব। সারাদেশে প্রায় একই হাল। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই উপযুক্ত রঙ্গালয় আছে, যদিও সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশ ভাল গবেষণাগার, ব্যায়ামাগার এবং ফুটবল স্টেডিয়াম আছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ই হল রঙ্গালয় স্থাপনের একটি আদর্শ স্থান। অনেক শিক্ষায়তনের ছাত্রসংখ্যা পনেরো হাজার বা তারো বেশী। এই সংখ্যা যেকোন বড় শহরের রঙ্গালয় কয়েক সপ্তাহ ধরে দর্শক দিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারে, আর এসব ছাত্রদের সকলেই রঙ্গালয়ের সম্ভাব্য দর্শক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের রঙ্গালয় একবার তৈরী হয়ে গেলে তাকে চালু রাখতে কমই খরচ পড়ে। আর এগুলি কেবল যে ছাত্রদের আনন্দ উপভোগের কেন্দ্র হিসাবেই পরিগণিত হতে পারে তা নয় এসব জায়গায় রঙ্গালয়ের বিভিন্ন শিল্প ও পেশায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হয়তো এর ফলে তরুণ নাট্যকারদের কিম্বা প্রবীণদেরও পরীক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে এইসব রঙ্গালয়। দুর্ভাগ্যক্রমে খুব অল্প বিশ্ববিদ্যালয়েই এইসব কার্যকলাপগুলির সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা সম্ভব হয়েছে। আর এটার কারণ হল সেই প্রাচীন কুসংস্কার যে, রঙ্গালয় হল একটি লঘু আনন্দবিনোদনের ক্ষেত্র, দুর্নীতির আকর, উচ্চশিক্ষায় রঙ্গালয়ের কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে অবশ্য গৃহস্থালীর অর্থনীতি বা বিক্রয় বাণিজ্য এসবের ঠাঁই আছে উচ্চশিক্ষায়। প্রযোজনাও যে সমস্ত নাটকের হয় সেগুলি অপ্রচলিত কোনো ঐতিহ্যপন্থী নাটকের দায়সারা অভিনয় কিংবা ব্রডওয়েতে যেসব নাটক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সেগুলির নিকৃষ্ট পুনরাভিনয়। কদাচিৎ এখানে সুপরিকল্পিত উৎকর্ষব্যঞ্জক প্রাণবান রঙ্গালয়ের সাক্ষাৎ মেলে যা নাটক রচনা থেকে শুরু করে নাট্যপ্রযোজনার সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে সংবেদনশীল দর্শকমহলের সামনে উপস্থাপিত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন শিখতে হবে যে, পেশাদারী রঙ্গালয় বাণিজ্যপ্রবণতার সম্পর্কে তাঁদের যে অভিযোগ ও বীতরাগ তাকে কাটিয়ে তুলতে হলে দরকার ভবিষ্যৎ দর্শকমহলের মনে উচ্চ রুচির ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া। সুখের বিষয় যে এখন অসংখ্য কলেজ প্রেসিডেন্ট এবং শিক্ষকরা এই নাট্যকার্যকলাপ আরো বিস্তারিত করবার চেষ্টা করছেন।

কেননা, শেষপর্যন্ত দর্শকরাই সবকিছুর সুর বেঁধে দেয়। সরকারের মতোই রঙ্গালয়ও জনসাধারণ তাই শুধু পায়, যা পাওয়ার যোগ্য তারা। যদি তারা কেউ ভোটদান থেকে বিরত হয় বা অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয় তাহলে সরকারের অযোগ্যতা বা অসাধুতো নিয়ে অভিযোগ করার কিছু তাদের থাকবে না। তেমনি যদি তারা রঙ্গালয়ে নাটক দেখা থেকে বিরত থাকে, কিংবা দুর্বল নাটকগুলি সমর্থন করে চলে, তাহলে এই যে মাঝারি এবং অশ্লীল নাটকের প্রচলন অব্যাহত রয়েছে, এ সম্বন্ধে তাদের নিজেদেরই কেবল অপরাধী বলে গণ্য করতে হবে। রঙ্গালয়কে বুদ্ধিজীবীর স্তরে রাখবার জন্যে যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে না। সত্যি বলতে কি যেসব পণ্ডিতম্মন্য উন্নাসিক ব্যক্তি এটিকে মন্দির করে তোলেন, সেখানে রসবেত্তা ছাড়া আর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ তাঁরা সেইসব ব্যক্তির মতোই রঙ্গালয়ের ক্ষতি করেন, যাঁরা রঙ্গালয়কে করে তুলতে চান মস্তিষ্কহীন উপভোগের পীঠস্থান। রঙ্গালয়ের পরিসর হবে এত প্রশস্ত যাতে সর্বপ্রকার রুচিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, কিন্তু যে স্তরেই রঙ্গালয়ের কার্যকলাপ চলুক প্রধানত দর্শকমহলের সক্রিয় ও সচেতন সহযোগিতার উপরই নির্ভর করবে তার প্রাণময়তা ও সাফল্য।

'রঙ্গালয়ের ব্যাপারটায় গোলমাল কোথায়?' এই প্রশ্নটির চেয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আরো ঘনঘন লোকের মুখে ফেরে সেটি হোলো, 'রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ কী?" আন্দাজী উত্তর ছাড়া আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। একশ বছর আগেও হয়তো এর খুব বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেওয়া চলত। কেননা সেদিন ভবিষ্যদ্বক্তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেনি যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব। সমগ্রতাবাদের জন্ম কী চেহারা নেবে; মার্ক্স, ডারউইন এবং ফ্রয়েডের চিন্তাধারার ফল সমাজ ও জীবনের উপর কি পরিমাণে পড়বে; সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে নাটকের পুনর্জন্ম, বিশেষতঃ বাস্তববাদের উন্নয়ন কী অবস্থা আনবে; এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের ক্ষিপ্র উন্নতি, যার ফলে ছায়াছবি টেলিভিশনের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে কী পরিস্থিতি দেখা দেবে, এসবও জানা ছিল না। আবার আমাদের মতো সে যুগ রাজনৈতিক উত্থান-পতনে অস্থির, অর্থনৈতিক সংকটে বিক্ষুব্ধ, এবং উপর্যুপরি কতকগুলি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বিহ্বল, আর যে জগত একই সময়ে মহাশূন্যে বিজয় ও সামগ্রিক ধ্বংসের সম্ভাবনায় আচ্ছন্ন, সেখানে যে-কোনোরকম ভবিষ্যদ্বাণীই কম টেকসই বলে মনে হবে। রঙ্গালয়ের ধর্ম হল তরলতা, যে সমাজের মধ্যে তার স্থিতি, রঙ্গালয় ঠিক তারই আকার গ্রহণ করে।

কিন্তু একটি ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভয়ে করা চলে। সমাজের গঠন যাই হোক রঙ্গালয়ের মৃত্যু নেই। যতদিন টিকে থাকবে এই পৃথিবী এবং যতদিন পৃথিবীর বুকে মানুষ স্বপ্ন দেখে বিভোর হবে, ততদিনই থেকে যাবে রঙ্গালয়। কারণ রঙ্গালয় হল স্বপ্নপুরী, মন-গড়া এক অলীক দুনিয়া। শেক্সপীয়রীয় ধারণার চেয়ে আরো ব্যাপকতর অর্থে বলা চলে, সারা পৃথিবীটাই হল এক নাট্যশালা, এবং একজন মানুষ তার জীবনকালে অনেকগুলি ভূমিকাতেই অভিনয় করে। আর তা কেবল বাস্তবতার মধ্যেই নয়, কল্পনার প্রসারে, নিজের ভীতি, আশা, কামনা, অনুরাগ, ঘৃণা, উচ্চাভিলাষ এবং অপরাধ-বোধের ভিত্তিতে নিজেকেই অজস্র চরিত্রের নাট্যরূপে দেখতে থাকে। বাস্তবতার বেড়াকে সে অতিক্রম করে উড়ে চলে কল্পনার রথে। নিজেকেই বোকা বানিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে কাল্পনিকতার সঙ্গে একাত্মবোধের আনন্দে। রঙ্গালয়ে তাই সে আসনে হেলান দিয়ে বসে সুদক্ষ বিশেষজ্ঞের তৈরী মায়াজালে দর্শক হিসাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকেই বোকা বানানোর বিলাসে খুশী হয়। রঙ্গালয়ের মতো এমনটি আর কিছুই নেই, এবং মানুষের আত্মার ডাকে সাড়া দিতে রঙ্গালয়ের স্থান আর কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।

(Elmer Rice এর Living Theatre থেকে অনুবাদ)

জ্বলজ্বলে জুটি ইরিনা ও ইয়া

অজয় বসু

ফিলচো কিনো, মাইকেল জাজি, জিম রিয়ান, জন পেনেল, লিন ডেভিস—নামকটি অ্যাথলেটিক অনুরাগীদের চেনা। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকে নিয়মিত সাফল্যের সূত্রে ও'রা নিজেদের চিনিয়ে রেখেছেন। ও'দের নামের ছটায় অন্যদের পরিচয় যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে সেই অন্ধকার ছি'ড়ে ফেলে আর একটি নামের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সময় বুঝি আসন্ন।

এই নাম ইরিনা কিজেনস্টিন।

পোলিশ তরুণী কিজেনস্টিন এখনও ছাত্রী। বয়স কুড়ি। গড়ন ছিপছিপে। হাল্কা। মাথায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। ইরিনা বনের হরিণের মতো দ্রুতগামিনী। এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি আছে তাঁর মধ্যে। যেকালে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকে নায়কদের প্রভাবই বেশী, সেই যুগেই ইরিনা সর্বসম্মত রায়ে নায়িকা।

ওলিম্পিক ক্রীড়ার বিগত অনুষ্ঠান-কেন্দ্রে, টোকিওতে রুশ তরুণী তামারা ও ইরিনা প্রেস, নিগ্রো উইওমা টিয়াস ও এডিথ ম্যাকগুয়ার, রুমানিয়ার ইওলান্ডা ব্যালাস, বৃটেনের মেরি র‍্যান্ড ও অ্যান প্যাকারকে দেখেছি খ্যাতির তুঙ্গে। কিন্তু টোকিও উত্তরকালে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকের মহিলামহল যে নামের জয়ধ্বনিতে সোচ্চার সে নাম হলো ইরিনা কিজেনস্টিনের।

ইরিনা টোকিওর অ্যাথলেটিক আসরেও হাজির ছিলেন। প্রাক্ ওলিম্পিককালে স্বল্পপাল্লার দৌড়ে তাঁর নিয়মিত সাফল্যের নজীরে উৎসাহিত হয়ে স্বদেশীয় অনুরাগীরা আশা করেছিলেন যে ইরিনা টোকিও থেকে স্বর্ণ সঞ্চয় করে ফিরবেন। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি।

সেই হার ইরিনার জীবনে মস্তো শিক্ষা। নতুন উদ্যমে অনুশীলনে মনপ্রাণ ঢেলে দেবার প্রেরণা যোগাতে তাই যথেষ্ট। ইরিনা তাই টোকিও থেকে ঘরে ফিরেই আবার শিক্ষাভূমির দিকে ঝুঁকেছেন। আগের চেয়ে আরও বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন অনুশীলন ও সাধনায়। এবং সেই নিরলস সাধনার সুফলও তিনি পেয়েছেন হাতেনাতে।

টোকিও ওলিম্পিকের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে স্বদেশে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক আসরে স্বল্পপাল্লার দু' দুটি বিভাগে পাশে পেলেন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন উইওমা টিয়াস ও এডিথ ম্যাকগুয়ারকে টোকিওর অভিজ্ঞতা মনে ছিল তাঁর। সেই অভিজ্ঞতাই হলো বর্ধিত গতির উৎস। প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প ইরিনা: মিলেনও। একই আসরে তাঁর কাছে যুগল ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানের হার হলো।

পোল্যান্ডের সিলিজয়া স্টেডিয়ামে গত বছরে পোল্যান্ড বনাম আমেরিকার দ্বৈত অ্যাথলেটিকসে টিয়াস ও ম্যাকগুয়ার বনাম ইরিনা কিজেনস্টিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসংখ্য পোলিশ ক্রীড়ানুরাগী হাজির ছিলেন। ইরিনা এবার তাঁদের নিরাশ করেন নি। একশো ও দুশো মিটার দৌড়ে দ্বৈত সাফল্যের নজীর গড়ে তিনি তাঁদের কৃতজ্ঞ করে তুলেছেন। টোকিও ওলিম্পিকের স্বল্পপাল্লার দৌড়ের দু' বিভাগে অর্জিত রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকের 'ব্যর্থতার' কথা সিলিজিয়ার স্বর্ণ সংগ্রহের স্বাক্ষরে মুছে দিয়েছেন।

সিলিজিয়ার স্বর্ণ-স্বপ্ন পোলিশ ক্রীড়ানুরাগীদের মনে নতুন আশা জাগিয়েছে। সামনে মেকসিকো ওলিম্পিক। এবার নিশ্চয়ই ইরিনা তামাম দুনিয়াকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবেন। এ আশা অযৌক্তিক নয়। দৌড়ে এবং ব্রডজাম্পে, অ্যাথলেটিকের এ দু বিভাগেই ইরিনা কিজেনস্টিন বিশ্বশ্রেষ্ঠের সংজ্ঞায় অভিনন্দিত

ইরিনা কিজেনস্টিন

হওয়ার দাবী রেখেছেন টোকিও ওলিম্পিক উত্তরকালে।

শত মিটার দৌড়ে তিনি উইওমা টিয়াসকে, দুশো মিটারে এডিথ ম্যাকগুয়ারকে এবং ব্রডজাম্পে একবার নয়, দু দুবার হারিয়েছেন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মেরি বিগন্যাল র‍্যান্ডকে। মেরি বিগন্যাল র‍্যান্ডও একালের অ্যাথলেটিকে মস্তো এক নাম। ইরিনা তাকে প্রথম হারান গত বছরে। তারপর তিনি ক'দিন আগে বুদাপেস্তে সদ্যসমাপ্ত ইওরোপীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ উপলক্ষ্যে। এই ফাঁকে স্বল্পপাল্লার দু একটি [illegible] বিশ্ব-রেকর্ড ভেঙেছেন ইরিনা [illegible] নতুন করে বিশ্ব-রেকর্ড গড়েছেন। আজ যাঁরা তাঁকে বিশ্বের 'ফাস্টেস্ট ওম্যান' বলে অভিহিত করছেন তাঁদের অভিমত অলৌকিক নয়। এবং সেই দলে শুধু পোলিশ অনুরাগীরাই নেই, আছেন অ্যাথলেটিকে ওয়াকেফহাল অন্য মুলুকের মানুষেরাও।

বুদাপেস্তের ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকের আসর ইরিনা কিজেনস্টিনকে নতুন মহিমায় প্রতিভাত হওয়ার যে সুযোগ উপহার দিয়েছিল ইরিনা কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণে সদ্ব্যবহার করেছেন। এক লাফে ৬'৫৫ মিটার পথ ডিঙিয়ে তিনি ব্রডজাম্পে প্রখ্যাতা মেরি বিগন্যাল র‍্যান্ডকে পরাজিত করেছেন এবং দুশো মিটার দৌড়ের ফাইনালে অন্যদের পেছনে ফেলে রাখতে তাঁর এতোটুকু অসুবিধে হয়নি।

দু-দুটি স্বর্ণপদক হাতিয়ে নেওয়া ছাড়াও ইরিনা বুদাপেস্তে শতমিটার দৌড়ের স্বর্ণপদকটির দিকেও হাত বাড়িয়েছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সম্পদ ছোঁ মেরে সরিয়ে নেন ইরিনারই স্বদেশীয়া ইয়া ক্লোবুকাউস্কি। ইয়া ও ইরিনা, দুজনেই একই সময়ে বুদাপেস্তে শতমিটার দৌড়-পথের প্রান্তে এসে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু ক্যামেরার শ্যেনদৃষ্টিতে তফাৎটি ধরা পড়ে। কাজেই ইরিনাকে এবার রুপার পদকেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সোনা ছেড়ে রুপা নিয়ে থাকায় ইরিনার অবশ্য ক্ষোভ নেই। কারণ ইয়া ও ইরিনা, দুজনেই পুরানো বান্ধবী। একই গুরু আন্দ্রেজ পিত্রোস্কির হাতে গড়া শিষ্যা। দুজনেই সমবয়সী। শিক্ষাভূমিতে, ট্র্যাকে এবং ক্রীড়াজীবনের বাইরে ইয়া আর ইরিনার অন্তরঙ্গতা দেখে লোকে বলে, এতো মাখামাখি বলেই রিলেতে ব্যাটন বদলে ও'দের এমন বোঝাবুঝি!

ইরিনায় ও ইয়ায় আকৃতিগত দুস্তর ব্যবধান। দীর্ঘাঙ্গী ইরিনাকে দেখে বোঝাই যায় না যে ঝড়ের বেগে দৌড়াবার বা এক-লাফে অনেকখানি ডিঙিয়ে যাবার সামর্থ্য ওই ফিনফিনে কাঠামোর কোন গোপন মহলে লুকিয়ে আছে। ইয়া কিন্তু একেবারেই ব্যতিক্রম। মাথায় খাটো। শরীরের বাঁধন আরও আটোসাঁটো। সব মিলিয়ে ইয়ার ধাত শক্ত, মজবুত। দৃশ্যতঃ তিনি যেন মাঝারি বা দূরপাল্লার দৌড়েরই উপযুক্ত। কিন্তু কাজের বেলায় স্বল্পপাল্লাতেও ইয়ার জুড়ি মেলা ভার।

ইয়া ক্লোবুকাউস্কি ও ইরিনা কিজেনস্টিন জুটিতে আজ জ্বলজ্বল করছেন। দ্বৈত প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকসে তাঁরা পরীক্ষিত ও সফল। বাকী আছে আগামী ওলিম্পিকের কষ্টি-পাথরে তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাইয়ের অবকাশ। আসন্ন সেই পরীক্ষার ফল কি হবে তা পরের কথা। তবে একথা বলার সময় আজ এসেছে যে ইরিনা ও ইয়া ব্যক্তিগত ক্রীড়ানিপুণতার পরিচয়ে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক আসরে স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

দর্শক

রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা

আজাদ হিন্দ বাগে আয়োজিত চার-দিনের রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে ৯টি রাজ্য রেকর্ড ভংগ হয়েছে তার মধ্যে জাতীয় রেকর্ড ভংগেরও একটি নজির আছে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় বালী স‍ুইমিং ক্লাবের স‍ুশীল ঘোষের সাফল্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প‍ুর‍ুষদের জ‍ুনিয়র এবং বালক বিভাগের (১৬ বছরের কম) ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক অন‍ুষ্ঠানে কেবল প্রথম স্থানই অধিকার করেন নি, সেই সংগে রাজ্য এবং জাতীয় রেকর্ডও ভংগ করেন।

প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সাফল্যের উপর ভিত্তি ক'রে প্রথম স্থান পেয়েছে : প‍ুর‍ুষ-দের সিনিয়র বিভাগে ইস্টার্ন রেলওয়ে (৫৫ পয়েণ্ট), প‍ুর‍ুষদের ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগে শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব (৪৩ পয়েণ্ট), প‍ুর‍ুষদের জ‍ুনিয়র বিভাগে বালী স‍ুইমিং ক্লাব (৩৪ পয়েণ্ট), বালক (১৬ বছরের কম) বিভাগে ন্যাশনাল স‍ুইমিং এসোসিয়েশন (১৯ পয়েণ্ট), মহিলাদের সিনিয়র বিভাগে ন্যাশনাল স‍ুইমিং ক্লাব (১৪ পয়েণ্ট) এবং মহিলাদের জ‍ুনিয়র বিভাগে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিংস সোসাইটি (১৮ পয়েণ্ট)।

প‍ুর‍ুষ বিভাগ—সিনিয়র

দলগত ফলাফল : ১ম ইস্টার্ন রেলওয়ে (৫৫ পয়েণ্ট); ২য় ন্যাশনাল এস এ (২৮); ৩য় হাটখোলা (১৫); ৪র্থ বি এন রেলওয়ে (১৪); ৫ম ওয়াই এম সি এ (১৩); ৬ষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ প‍ুলিশ (১১); ৭ম ভবানীপ‍ুর এস এ (৬); ৮ম সেণ্ট্রাল এস সি (৩); ৯ম ছাত্র এস সি (২); ১০ম বৌবাজার বি এস (২) এবং ১১শ আই এল এস এস (১)।

পশ্চিমবংগ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প‍ুর‍ুষদের (জ‍ুনিয়র) ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের প‍ুরস্কার বিতরণ অন‍ুষ্ঠান। ফটো : অম‍ৃত

প‍ুর‍ুষ বিভাগ—ইণ্টারমিডিয়েট

দলগত ফলাফল : ১ম শৈলেন্দ্র এম সি (৪৩); ২য় ন্যাশনাল এস এ (১৩); ৩য় বৌবাজার বি এস (৯); ৪র্থ আই এল এস এস (৫); ৫ম সেণ্ট্রাল এস সি (৪); ৬ষ্ঠ খিদিরপ‍ুর এস এ (৩) এবং ৭ম জগজ্জননী (৩)।

প‍ুর‍ুষ বিভাগ—জ‍ুনিয়র

দলগত ফলাফল : ১ম বালী এস সি (৩৪); ২য় ন্যাশনাল এস এ (৩০); ৩য় পঃ বংগ প‍ুলিশ (৬); ৪র্থ শ্মশানেশ্বর স্পোর্টিং (৩); ৫ম আই এল এস এস (৩); ৬ষ্ঠ হাটখোলা (২); ৭ম কলেজ স্কোয়ার (১) এবং ৮ম মেদিনীপ‍ুর জেলা (১)।

বালক বিভাগ—(১৬ বছরের নীচে)

দলগত ফলাফল : ১ম ন্যাশনাল এস এ (১৯); ২য় বালী এস সি (৮); ৩য় জগজ্জননী (৬); ৪র্থ আই এল এস এস (৫); ৫ম ভবানীপ‍ুর এস এ (৩); ৬ষ্ঠ হাটখোলা (৩); ৭ম কলেজ স্কোয়ার (১)।

মহিলা বিভাগ—সিনিয়র

দলগত ফলাফল : ১ম ন্যাশনাল এস এ (১৪); ২য় সেণ্ট্রাল এস সি (১২); ৩য় বৌবাজার বি এস (৯); ৪র্থ আই এল এস এস (৬); ৫ম শৈলেন্দ্র এম সি (৪)।

মহিলা বিভাগ—জ‍ুনিয়র

দলগত ফলাফল : ১ম আই এল এস এস (১৮); ২য় ন্যাশনাল এস এ (৪); ৩য় ভবানীপ‍ুর এস এ (৩); ৪র্থ বৌবাজার বি এস (১); ৫ম সেল‍ুফ কালচার ইনঃ (১)।

পশ্চিমবংগ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের প‍ুরস্কার বিতরণ অন‍ুষ্ঠান। ফটো : অম‍ৃত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের (ইণ্টার-মিডিয়েট) পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ফটো : অমৃত

নতুন রাজ্য রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ—সিনিয়র

২০০ মিটার বাটারফ্লাই : মধুসূদন সাহা (ইস্টার্ন রেলওয়ে)

রেকর্ড সময় : ২ মিঃ ৪৯·২ সেঃ

৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে : ইস্টার্ন রেলওয়ে

রেকর্ড সময় : ৪ মিঃ ২৮ সেঃ

২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : নিমাই দাস (হাটখোলা)

রেকর্ড সময় : ২ মিঃ ২৪·৭ সেঃ

পুরুষ বিভাগ—জুনিয়র

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক : সুশীল ঘোষ (বালী এস সি)

রেকর্ড সময় : ১ মিঃ ১৮·৭ সে (হিট)

৪×১০০ মিটার মেডলে রিলে : —বালী এস সি

রেকর্ড সময় : ৫ মিঃ ২৬·১ সেঃ

বালক বিভাগ (১৬ বছরের নীচে)

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : রাজীব সাহা (জগজ্জননী)

রেকর্ড সময় : ১ মিঃ ১৯·৭ সেঃ

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক : সুশীল ঘোষ (বালী এস সি)

রেকর্ড সময় : ১ মিঃ ১৭·২ সেঃ

১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক :

প্রীতিপদ সমাদ্দার (আই এল এস এস)

রেকর্ড সময় : ১ মিঃ ২৫·৫ সেঃ (হিট)

পুরুষ বিভাগ—ইণ্টারমিডিয়েট

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : অপূর্ব মজুমদার (শৈলেন্দ্র এম সি)

রেকর্ড সময় : ১ মিঃ ১৮·২ সেঃ

ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ

১৯৬৬ সালের ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় ইয়র্কসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ফলে তারা ২৯ বার ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের রেকর্ড করেছে। ইয়র্কসায়ার দল প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় ১৮৯৩ সালে এবং শেষ লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পায় ১৯৬৩ সালে। ১৯৪৯ সালে তারা মিডলসেক্স দলের সঙ্গে যুগ্ম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত তালিকায় ১ম স্থান পেয়েছে ইয়র্কসায়ার (১৮৪ পয়েণ্ট), ২য় স্থান গত দু' বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান উরস্টারসায়ার (১৬৬ পয়েণ্ট) এবং ৩য় স্থান সমারসেট (১৫৬ পয়েণ্ট)। ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় ইয়র্কসায়ার ৪র্থ, উরস্টারসায়ার ১ম এবং সমারসেট ৭ম স্থান পেয়েছিল। এবছরের লীগ প্রতিযোগিতার শেষের দিকে উরস্টারসায়ার এবং ইয়র্কসায়ার দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। সমান ২৬টা ম্যাচ খেলে উরস্টারসায়ার দলের থেকে ইয়র্কসায়ার দল ৬ পয়েণ্টে এগিয়েছিল। বৃষ্টির ফলে ইয়র্কসায়ার এবং উরস্টারসায়ার দল তাদের ২৭তম লীগের খেলায় কোন পয়েণ্টই সংগ্রহ করতে পারেনি, খেলা দুটি পরিত্যক্ত হয়। এই অবস্থায় লীগের ২৮তম অর্থাৎ শেষ খেলায় ইয়র্কসায়ার দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পেতে আর মাত্র ৬ পয়েণ্টের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইয়র্কসায়ার দল তাদের শেষ খেলায় কেণ্ট দলকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে ১০ পয়েণ্ট পায় এবং উরস্টারসায়ার দলের উপর্যুপরি তৃতীয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের আশা নির্মূল করে দেয়। অপরদিকে উরস্টারসায়ার দল তাদের শেষ খেলায় সাসেক্স দলের কাছে ৩১ রানে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত রানার্স-আপ হয়।

ইয়র্কসায়ার দলের রেকর্ড

(পক্ষে এবং বিপক্ষে)

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান :

পক্ষে : ৮৮৭ (বিপক্ষে ওয়ারউইকসায়ার), ১৮৯৬

বিপক্ষে : ৬৩০—সমারসেট, ১৯০১

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান :

পক্ষে : ২৬ (বিপক্ষে সারে), ১৯০

বিপক্ষে : ১৩—নটিংহামসায়ার, ১৯০

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান :

পক্ষে : ৩৪১ জি এইচ হার্স্ট (বিপক্ষে লিস্টারসায়ার), ১৯০৫

বিপক্ষে : ৩১৮*—ডবলউ জি গ্রে (গ্লস্টারসায়ার), ১৮৭৬

গিলেট ক্রিকেট কাপ

লর্ডস মাঠে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের গিলেট কাপ নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়ারউইকসায়ার ৫ উইকেটে উরস্টারসায়ার দলকে পরাজিত করে গিলেট কাপ জয় করেছে। ওয়ারউইকসায়ার দলের পক্ষে এই প্রথম গিলেট কাপ জয়।

পূর্ববর্তী বিজয়ী : ১৯৬৩ সাসেক্স, ১৯৬৪ সাসেক্স, ১৯৬৫ ইয়র্কসায়ার

পূর্ববর্তী রানার্স আপ : ১৯৬৩ উরস্টারসায়ার, ১৯৬৪ ওয়ারউইকসায়ার, ১৯৬৫ সারে।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। একদিকের সেমি-ফাইনালে ১৯৬৩ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী বি এন রেলওয়ে দল ২—১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে (বোম্বাই) পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। বি এন রেল দলের পক্ষে এই দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলা। অপরদিকের এক কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টার্ন রেল দল ৩—১ গোলে মধ্যপ্রদেশ দলকে পরাজিত করে সেমি ফাইনালে উঠে বসে আছে। ইস্টার্ন রেল দলের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার বিজয়ী দল। এই কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাটি (ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং) তিনদিন ড্র গেছে—প্রথম দিনের খেলাটি গোলশূন্য ছিল, দ্বিতীয় দিনের খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায় এবং তৃতীয় দিনের খেলাটিও গোলশূন্য অবস্থায় ড্র গেছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(ছয়)

একতলার ভাড়াটেরা চলে গেছে।

চারিদিকে ধূসর শূন্যতা বিরাজ করছিল। সারাদিন ধরে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। সবিতা কয়েকদিন ধরে অফিস যাচ্ছে না। শরীর খারাপ। তিনচারদিন ধরে ভুগেছে—আজ অনেকটা ভাল বোধ করছে। কালকের দিনটা দেখে পরশু জয়েন করবে।

এখন সন্ধ্যা। ঘরে আলো জ্বালিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। মাথাটা অল্প ভারভার লাগছিল। শুয়ে শুয়ে ও বাইরের বৃষ্টিপাত দেখতে থাকে। মৌমাছির মত ঝাঁক বেঁধে চতুর্দিক থেকে চিন্তারাশি যেন তাকে ঘিরে ধরে, কামড়ায়। সমস্ত দেহমন তার অবসন্ন।

সে কয়েকদিন হল অসুখে পড়ার পর থেকে অনেক কিছু ভেবেছে। পর পর দুটো বড় ঘটনা ঘটে গেল। অবিনাশ আর সুনন্দার মধ্যে শেষপর্যন্ত বনিবনাও হল না। ফলে সেপারেশান। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। রোজ রোজ কলহ চিৎকার, কাপডিস ভাঙার চেয়ে, পরস্পরকে তীব্র ঘৃণা করার থেকে, দুজনের সরে যাওয়া অনেক ভাল। আশ্চর্য হয়েছে সে সুনন্দার কাণ্ড দেখে। চাকরী ছেড়ে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। ওর ব্যবহারে সে প্রথমে আঘাত পেয়েছিল। প'রে ভেবে দেখেছে এই স্বাভাবিক। কেননা সুনন্দা শেষ-পর্যন্ত আলাদা মানুষ হ'য়ে গিয়েছিল। অনেক অসঙ্গতি দেখতে পেয়েছিল ওর চলা-ফেরায়। স্বাধীনতা ভাল, কিন্তু স্বেচ্ছা-চারিতা কখনও কাম্য নয়।

বিনয়ের বিবাহের সংবাদ শুনে আশালতা তিনদিন কিছু খাননি। শেষে চপলামাসীর পীড়াপীড়িতে যা হোক দুটি মুখে দিয়েছেন। গ্রাম থেকে বিনয়ের বন্ধু চিঠিতে সব জানিয়েছে। যে ছাত্রীকে পড়াতো ঘটনাক্রমে তার প্রেমে পড়াতে বিনয়ের বিবাহ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

দাদার কথা ভেবে তার মনটা বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো। দাদার কি উচিত ছিল না সংসারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। তা না ক'রে এখান থেকে পালিয়ে দূরে স'রে গিয়ে দিব্যি বিয়ে-থা ক'রে আরামে আছে। তার বিয়ের খবর জানতে হয় তারই এক বন্ধুর চিঠির মারফৎ! এতদিন হয়ে গেল নিজে একখানা চিঠি পর্যন্ত দিল না! সব স্বার্থপর! মা, দাদা, চপলামাসী সবাই যে-যার নিজের সুখসুবিধে দেখতে ব্যস্ত, কেউ সবিতার কথা ভাবে না। সবিতার মনে হ'লো সে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেবে এভাবে দিনের পরে দিন নিছক কর্তব্য পালন ক'রে একঘেয়েমির মধ্যে সে জীবন কাটাতে পারবে না! তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে কেউ তা লক্ষ্য করছে না। এই ঘর, সাদা ধবধবে দেয়াল, যাবতীয় আসবাব, সব যেন মৃত ইচ্ছার মত চোখ উলটে তাকে দেখছে। ওরা আর কেউ এই মুহূর্তে নির্জীব বস্তু নয়। সবাই যেন পৈশাচিক চোখমুখ ক'রে ওর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। দেয়ালে অসংখ্য কাল কাল ছায়া। ছায়ামূর্তিরা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওর দিকে তীক্ষ্ন নখ উঁচিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। সবিতা আর পারলো না, চিৎকার করতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে শুধু অস্ফুট ধ্বনি বেরোল। ও দুহাতে মুখ ঢাকলো।

সদরে কেউ কড়া নাড়ছে। বেশ অসহিষ্ণুভাবে। কে এল? চপলামাসীদের তো এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয়। ঘড়ির দিকে তাকালো—সাড়ে সাতটা। কে আসতে পারে? তবে কি দাদা নতুন বিয়েকরা বউ নিয়ে বেড়াতে এল? কেমন দেখতে সেই মেয়েটা যে দাদার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, ওর মনটা উদগ্র কৌতূহলে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

খুব দুর্বলবোধ করাতে বিছানা ছেড়ে উঠলো না। ভাবল, লীলা তো বাড়িতেই আছে, সে দেখুক। ততক্ষণে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পায়। অস্পষ্ট পুরুষ কন্ঠস্বর। অকারণে বুকটা ঢিবঢিব করে ওঠে। ডানহাত দিয়ে সে হৃৎপিণ্ডের উত্তাল তরঙ্গ থামাতে চেষ্টা করে। থরথর করে হাত কাঁপে।

—দিদি।

লীলা সামনে এসে দাঁড়ায়। সারামুখ হাসিতে উজ্জ্বল। যেন সে উত্তেজনায় কিছু বলতে পারছিল না। অথচ কিছু বলবার জন্যে ঠোঁটদুটি কাঁপছিল।

—কে এসেছে? সবিতা প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে। যেন সে অনেকটা আঁচ করতে পেরেছে। এমনটি যে হবে তা সে জানতো। তবে এত তাড়াতাড়ি তা সে ভাবেনি।

—গৌতমবাবু। বড়দার ঘরে বসিয়েছি। এ'ঘরে ডেকে আনবো?

—না। সবিতা বিরক্ত হয়ে ব'লে, মাসীরা কতক্ষণ হ'ল ভাগবত শুনতে গেছেন?

—ঘন্টাখানেক। আজ রান্না করছি—খেয়ে দেখো কেমন লাগে। তোমার জ্বর তো নেই। ও কি শুয়ে আছ যে, ওদিকে উনি একলা বসে আছেন। কি চমৎকার সময়ে এসেছেন, লক্ষ্য করেছো? ঘন্টাখানেক দিব্যি তোমরা গল্প করতে পারবে। যাও, দেরী ক'র না।

লীলা খিলখিল্‌ ক'রে হেসে ওঠে।

—চুপ। সবিতা চাপাকণ্ঠে বললো, চা করো। বাইরের লোক এসেছে, এত হাসি কিসের?

—বাইরের লোক যখন, একটা ধন্যবাদ দিয়েই বিদায় ক'রে দাও। আবার ঘটা করে চা করতে বলছো কেন!

—পাকামো হচ্ছে। তুই দিনদিন ভারী অবাধ্য মেয়ে হচ্ছিস!

লীলা যেতে যেতে বলে, মাসীমা আসুক সব ফাঁস ক'রে দেব।

সবিতা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। পাউডারের পাফটা আলতো ক'রে মুখে বুলোয়। মাথায় চিরুনি চালায়। কাপড় বদলাবে কিনা একবার ভাবলো। না, কি প্রয়োজন। সে তো আর বরপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না। চাদর দিয়ে গা ঢাকে। বেশ রুগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে। তিনদিনের জ্বরে তাকে কাহিল ক'রে ফেলেছে।

বিনয়ের ঘরে এল সে। তাকে দেখে গৌতম উঠে দাঁড়ালো।

দাঁড়ালে কেন, বস। এ'দিকে কোথায় এসেছিলে? সবিতা ছলনার আশ্রয় নেয়।

—অন্য কোথাও নয়, তোমাদের এখানে আসবো বলেই বেরিয়েছিলাম। গৌতম চেয়ারে বসে সবিতাকে দেখতে দেখতে বলে, তোমার দরখাস্ত আমরা পেয়েছি। ইস্‌ ভীষণ দুর্বল দেখাচ্ছে তোমাকে।

সবিতা মাথানীচু ক'রে বসে রইল। মনে মনে শক্তি সঞ্চার করতে থাকে সে। চপলা-মাসীরা ফেরার আগে গৌতম যদি চলে যায়। যুগপৎ ভয় ও আনন্দে তার মন আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে। মাকে সে কথা দিয়েছে। মার প্রতি নিষ্ঠুর সে কিছুতেই হ'তে পারবে না।

—সবিতা!

—কি।

—আমি আসাতে তুমি কি অস্বস্তিবোধ করছো?

—ছিঃ! সবিতা কাতরকণ্ঠে বলে, আমি বড় অসুস্থ, বড় দুর্বল। কি সৌভাগ্য তুমি এসেছো!

ও গৌতমের দিকে তাকায়। জোর করে মুখে হাসি ফোটায়।

—তোমার মা কোথায় সবিতা?

—মা! পলকে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একটু পরে নিজেকে সামলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, ভাগবত শুনতে গেছেন। সেই দশটার আগে ফিরছেন না।

—দশটা পর্যন্ত দরকার হ'লে অপেক্ষা করবো। তোমার মার সঙ্গে আলাপ না ক'রে যাচ্ছিনে।

মুহূর্তে সবিতার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। গৌতমের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেক-ক্ষণ। কি যেন ভাবে।

—সত্যি ক'রে বল তো কিজন্য এসেছো।

গৌতম হাসে, খুব সমস্যায় পড়ে গেছ মনে হ'চ্ছে!

সবিতা কি বলতে যাচ্ছিলো সেই সময়ে লীলা ট্রের উপর তিন কাপ চা সাজিয়ে ঘরে ঢুকলো। শুধু চা নয় সেইসঙ্গে কাঁচকলার চপও তৈরী ক'রেছে। সবিতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। দুর্বল দেহমন নিয়ে সে বিপর্যস্ত। গৌতম তাকে রেহাই দিক চিরকালের মত।

লীলাকে দেখিয়ে সবিতা বলে, আমার বোন। এ'বছর আশুতোষে ভর্তি হয়েছে।

পরিচয়ের পালা শেষ হয়। তিনজনে চা খেতে খেতে গল্প করে। মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা চলে। আসলে বেশী কথা বলছিল গৌতম আর লীলা। সবিতা মাঝে মাঝে ওদের আলাপে সায় দিচ্ছিলো। লীলা বেশ সপ্রতিভ। গৌতম গল্প জমাতে ওস্তাদ। ওর কথায় লীলা না হেসে পারে না। কিন্তু সবিতার ভ্রূকুটি দেখে সে আবার গম্ভীর হয়ে যায়।

একটু পরে লীলা উঠে দাঁড়ায়, গৌতমকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে, চলি। কিছু মনে করবেন না। আবার আসবেন। খুব আনন্দ পেলাম আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে।

—এক্ষুনি চলে যাবেন। অবশ্য আপনার পড়াশুনার ডিসটার্ব হ'লে—

—শুধু পড়াশুনা নিয়েই বুঝি থাকি আমরা। ঘরের কাজও তো করতে হয়। তাছাড়া আমি থাকাতে বোধহয় আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে।

—ভুল ধারণা আপনার। গৌতম সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসে, আপনি থাকাতে যেন মনে হ'চ্ছিলো আমরা বেঁচে আছি।

লীলা লক্ষ্য করলো সবিতার মুখের চেহারা ক্রমশ অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠছে। ও গৌতমের দিকে একপলক তাকিয়ে ট্রেতে চায়ের কাপ তুলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সবিতা গম্ভীরস্বরে বলে, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এখন বাড়ী ফেরার কথা যদি ভাব বাধিত হ'ব। মার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না।

—অসুখে তোমার মেজাজটা দেখছি বিশ্রী হ'য়ে গেছে। সাধারণ ভদ্রতাবোধও ভুলে গেছ।

—অযথা দোষ দিয়ো না গৌতম। আমি আর বসতে পারছি না। মাথা ঘুরছে।

—তার মানে, চলে যাই। তোমার এ'ধরনের ব্যবহারের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে।

সবিতা চুপ করে রইল। সে বড় ক্লান্ত-বোধ করছিল। গৌতম কি চায়? কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে? মার সঙ্গে দেখা করবে। কেন? সে তো অনেক দিন জানিয়েছে তাদের মেলামেশা মা পছন্দ করেন না। তবু কোন্ ভরসায় গৌতম মার সঙ্গে দেখা করতে চায়! গৌতমকে মা হাসিমুখে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবেন না। কি বিশ্রী অবস্থায় সে পড়ল। কি কুক্ষণেই না দেখা হয়েছিল গৌতমের সঙ্গে! মাথা নীচু করে বসে রইল সে।

—স্পষ্ট একটা কথা জানাবে সবিতা।

—বল'।

—আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

—কটা বাজে গৌতম?

—ও।

গৌতম উঠে দাঁড়াল। অপমানে তার মুখ-চোখ বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। চললাম।

সবিতাও উঠে দাঁড়ায়। গৌতম ঘর ছেড়ে বেরোয়, সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করে।

সদর দরজায় চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সে রাস্তায় দণ্ডায়মান গৌতমকে মৃদুকণ্ঠে বলে, রাগ কর না। আমাদের ধৈর্য ধরা দরকার।

গৌতম অতিকষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করল। কিন্তু কোন কথা না বলে লম্বা লম্বা পদ-ক্ষেপে এগিয়ে চলল। অপমানে তার সারা শরীর জ্বলছিল। সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা দূরে নিক্ষেপ করে অস্ফুট স্বরে অশ্লীল একটা উক্তি করে হাঁটতে থাকে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে গৌতম এগিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ দেখা যায় দেখল সবিতা। তারপর সদরে খিল এ'টে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে।

ঘরে এসে ও শুয়ে পড়ল। লাইট নেভাল। চোখ বুজে নির্জীব বস্তুর মত পড়ে রইল।

—দিদি!

—বিরক্ত করিস না। চলে যা।

সবিতার রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনে লীলা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

পরের দিন সকালে আশালতা তাকে জেরা করতে শুরু করলেন। সবিতা চুপচাপ সব কটূক্তি সহ্য করল। শেষ পর্যন্ত লীলা গৌতমের আসার কথা বলে দিল।

আশালতা মুখ বিকৃত করে বলেন, এত দূর এগিয়েছিস? বাড়ীতে ডেকে এনে ঢলাঢলি করা—তুই কি চাস আমি গলায় দাড়ি দিয়ে মরি!

সবিতা দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করল। মনে মনে ভাবল গলায় যদি দড়ি দিতে হয় সেই দেবে। সব জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু সে সাহস তার নেই। সে শুধু তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। অত্যন্ত দুর্বল সে, অত্যন্ত ভীতু!

বাথরুমে গিয়ে ছিটকিনি এ'টে নিঃশব্দে কাঁদল অনেকক্ষণ। চৌবাচ্চার দিকে তাকিয়ে দেখল একটা আরশুলো দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। পারছে না। বারবার জলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। ও দেখল আরশোলাটা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে!

।। সাত ।।

সন্ধ্যার পর অফুরন্ত সময় তার হাতে। সময় কাটতে চায় না। লীলা তার পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মা-মাসী রান্নাঘরে কাটান। আজকাল কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু না, ভুল হল। সেই কথা বন্ধ করে দিয়েছে। ভাল লাগে না তার। মা-মাসীর কথা মনে হলে এক ধরনের বিরক্তি আর অভিমানে তার মন ভরে যায়। লীলাকেও সে আজকাল সহ্য করতে পারে না। বস্তুত যেদিন ও গৌতমের আসার খবর মার কানে তুলে দিয়েছে সেদিন থেকে লীলার প্রতি তার বিরূপ ধারণা জন্মে গেছে। দেয়ালের দিকে তাকালো। কোনা-কুনিভাবে একটা ছায়া যেন দেয়ালের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ছায়াটা একটু পরে জীবন্ত হয়ে উঠবে।...তারপর ধারালো নখ বার করে ওর দিকে ছুটে আসবে।

মাঝে মাঝে তাকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসে।...

বারান্দায় এল লঘুপায়ে। পরিচিত মুখের ছবি, তাদের মামুলী জীবনধারা, তাদের চাহিদা, ব্যর্থতা, হতাশা—সব যেন পিঁপড়ের সারির মত কলকাতার অলি-গলি পেরিয়ে সারিবদ্ধভাবে তার শ্বাসরোধ করবার জন্যে ছুটে আসছে!

সদরে কড়া নাড়ার শব্দ। বুকটা কেঁপে উঠলো। দেহের রক্ত চলাচল বুঝি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। শ্বাসরোধ হবার উপক্রম।

ওর পাশ দিয়ে লীলা নীচে নেমে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলে, এক ভদ্রলোক সুনন্দা দেবীর খোঁজ করছিলেন। বিরাট গাড়ী চেপে এসেছেন। বড়লোক।

সবিতা নিস্পৃহ গলায় বলে, ঠিক আছে। এবার দয়া করে পড়তে বসগে। যা পড়ার নমুনা দেখছি পাশ আর করতে হবে না।

লীলা মুখ নীচু করে চলে যায়।

চপলামাসী সবিতাকে ডাকলেন। সবিতাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন। আশা-লতা চুপচাপ বসেছিলেন। আজকাল রান্নার ভার চপলামাসীর উপর। মাঝে মধ্যে লীলা তার মাকে সাহায্য করে। সবিতাকে কেউ রান্না করতে বলেন না, সেও যেচে আসে না। মা ডেকেছেন, কৌতূহল বোধ করলো সে। আবার তাকে ডাকা কেন? নতুন করে কোন অপরাধ তো সে করেনি। তবে মিছিমিছি তাকে নির্জনতার মধ্য থেকে ছিনিয়ে আনার কি দরকার ছিল! বোধহয় অভাবের ফিরিস্তি তাকে শোনাবে। তার আর করবার কিছু নেই। সে অবসন্ন পীড়িত চোখে মার দিকে তাকালো।

আশালতা চপলামাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মেয়েটাকে বসবার জন্যে একটা মোড়া এনে দে।

—থাক। আমি বসবো না। কিছু বলবে?

চপলামাসী একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বলেন, আমাদের সঙ্গে বসে দু'দণ্ড গল্প করতেও কি তোর মন চায় না? আমার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, তোর মার কথা ভাব। বিনয় তো অনাছিষ্টি এক কাণ্ড করে বসেছে! এমন স্বার্থপর ছেলে তো দেখিনি কোথায়ও। এখন তুই আমাদের একমাত্র ভরসা।

আশালতা বলেন, ওই আমার ছেলে! বুঝলি চপলা, বিনয়ের কথা আর আমি ভাবি না এখন!

—মা! সবিতার সমস্ত কেমন বিষিয়ে উঠল। ও আর দাঁড়াতে পারলো না। বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপায়ে শোবার ঘরে চলে আসে।

লীলা পড়া থামিয়ে ওর মুখ-চোখের পাণ্ডুরতা দেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখাচোখি হতেই সবিতা চোখ ফিরিয়ে নেয়।

—দিদি, একটা কথা বলবো? তুমি আমার উপর বিরক্ত হয়েছো কেন? আমাকে আর আজকাল ভালবাস না।

অভিমানে লীলার চোখ ছল-ছল করে ওঠে। কি সুন্দর দুটি চোখ!

সবিতা থরথর করে কেঁপে ওঠে। এরপরও কি, লীলার উপর রাগ করে থাকা যায়? চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে আসে। না, দুর্বলতা প্রকাশ সে কিছুতেই করতে পারবে না। লজ্জা আর বেদনায় সে মুহ্যমান হয়ে ওঠে। কোন কথা না বলে বাইরে চলে আসে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। নির্জনতায় ডুবে যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এল না। পাশে শুয়ে লীলা ঘুমে অসাড়। সে দুবার লাইট জ্বেলে বাথরুমে গেছে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে এসেছে। ঘুম কিছুতেই আসছে না। আজকাল স্বাভাবিক ঘুমও তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। ফলে সে লক্ষ্য করেছে শরীরের লাবণ্য দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুকিয়েও যাচ্ছে একটু একটু করে। কাল রাতের মত আজও কি বিনিদ্র কাটিয়ে দেবে? অথচ ছ মাস আগেও সে কিশোরী বালিকার মত হেসে বেড়াতো। ছ'মাস এমন কি দীর্ঘ সময় যে, তাকে তিল-তিল করে শুষে নিচ্ছে! জোঁকের মত সময় তার দেহের সব রক্ত একদিন টেনে নেবে, তারপর তাকে উচ্ছিষ্ট বস্তুর মত পথের ধুলোয় ফেলে দেবে! উঃ এভাবে দিনের পর দিন...সবিতা পাগলের মত লীলাকে জড়িয়ে অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়লো!

ওরা তিনজনে ক্যানটিনে বসে চা খাচ্ছিলো। মেয়েদের আলাদা ঘর। একটু পরে আরও অনেকে টিফিন করতে এলো। হাসিগল্পে ঘর মুখর হয়ে ওঠে। কৃষ্ণার সিঁথিতে সামান্য সিঁদুরের আভাস। অপ্রত্যাশিতভাবে সবাই জানলো একদিন কৃষ্ণার বিয়ে হয়ে গেছে। ব্যস এই পর্যন্ত। কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে একথা কেউ জানে না। কেননা কৃষ্ণা সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছে।

সবিতা আড়চোখে একবার কৃষ্ণাকে দেখলো। শেষে কৃষ্ণাও—?

নিজেকে সে সংযত করতে চেষ্টা করে—এধরনের ঈর্ষাবোধ নীচ মনের পরিচয়। উঠে দাঁড়াল। কেয়াদি আর কৃষ্ণা ওর দিকে তাকায়, ওরা তাকে বসতে বলে না। কেয়াদি তার ব্যবহারে আহত। সে ওদের সঙ্গে আজকাল আর ভালভাবে মিশতে পারছে না। খুঁটিয়ে দেখলে এর কোন সংগত কারণ নেই। ওরা তো কোন অপরাধ করেনি। কৃষ্ণা বিয়ের পর থেকে ওর সঙ্গে ভারী সুন্দর ব্যবহার করতে সুরু করেছে। আশ্চর্য হয়ে গেছে সবিতা। সে কৃষ্ণার আগেকার আচরণ কিছুই ভোলেনি। মানুষগুলো দ্রুত তার চারপাশে বদলে যাচ্ছে। সুনন্দার সেকশনে পর পর বেশ কিছুদিন গিয়ে খোঁজ করে এসেছে। না, এখনও তার কোন সন্ধান নেই। একমাস ছুটি নিয়েছিল। একমাস কবে পার হয়ে গেছে। সুনন্দা বোধহয় কলকাতায় নেই। অবিনাশকে একদিন রাস্তায় ও আবিষ্কার করেছে—ওকে দেখতে পায়নি, ও লক্ষ্য করেছে অবিনাশ যেন অনেক বয়স্ক হয়ে গেছে, যেন যুদ্ধফেরত আহত কোন সৈনিক ক্লান্ত পায়ে মাথা নীচু করে রাস্তা পার হচ্ছে। সবিতা ভেবেছিল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে সুনন্দার কোন খবর আছে কি না। সে যায়নি। একরাশ

লজ্জা তাকে ভীড়ের মধ্যে পুতুল বানিয়ে রেখেছিল।

সবিতা অফিসে ফিরে কাজ করতে চেষ্টা করে। গৌতম ওকে দেখে এগিয়ে আসে। একটা ফাইল ওর সামনে রেখে ফিরে যায় নিজের জায়গায়। বেশ কিছু দিন ধরে এ রকম চলছে। কাজ দেয় তাকে, আলাদা স্লিপে লিখিত নির্দেশ থাকে কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। অবশ্য সামান্য বাক্যালাপ বন্ধ থাকে না। বাইরের পাঁচ-জনের কাছে স্বাভাবিক হতে গেলে যেটুকু কথা, অবশ্য কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারেই, এর বাইরে একটা কথা বা সামান্য হাসিও বন্ধ। সবিতা ফাইল খুলে এক টুকরো কাগজ দেখলো। "ছুটির পর অপেক্ষা করবে। কথা আছে।" ও গৌতমের দিকে তাকাল। গৌতম মাথানীচু করে চিঠি ড্রাফট করছে। এখন সে তাকাবে না। সব অভিনয়, সব ভান। দাম বাড়াচ্ছে। যেন সে অপেক্ষা করে আছে সবিতা গিয়ে ওর কাছে চোখের জল ফেলে ক্ষমা চাইবে! কি কথা থাকতে পারে তার সংগে? তার কিছু করার নেই, হুট করে কিছু করার মত সাহস তার নেই। সত্যি প্রতিপদে তার ভয়, তার দ্বিধা। গৌতমের চাহিদা অফুরন্ত। এবং খুব স্বাভাবিক। সব সে স্বীকার করে, তবু সে এগিয়ে যেতে পারছে না।...স্বপ্নে গৌতম আর তার মধ্যে একটা খরস্রোতা নদী থাকে। নদীর উপর একটা ভাঙা সেতু। সেতু পার হয়ে সে কোনদিন নদীর অন্যপারে যেতে পারবে না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সবিতা ভাবছিল কি বলবে গৌতম? নতুন কি বলবার আছে? শেষ পর্যন্ত অভিমান, জেদ, রাগ কিছুই বজায় রইল না। হার মানলো গৌতম। মনে মনে কিছুটা আত্মতৃপ্তির আমেজ অনুভব করে সে।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলো ওরা। সাদা ধবধবে পাথরের টেবিল, টেবিলের মাঝখানে একটি ফুলদানীতে কাগজের ফুল; লাল নীল সবুজ রংয়ে ছোপানো ফুলগুলি আশ্চর্য রকম তাজা জীবন্ত বলে মনে হয়।

সবিতা চপের এক টুকরো মুখে ভেঙে গালের মধ্যে পুরে খুব আলতোভাবে চিবোয়। একমনে গৌতমের দিকে চোখ রেখে তাকিয়ে ছিল সে—অথচ গৌতমের চুল ভুরু কপাল চোখ কিছুই দেখছিল না, তার দৃষ্টি অসংলগ্ন চিন্তার সংগে তাল মিলিয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। তাকে ভীষণ চিন্তান্বিত, কিছুটা বেদনাহত বন্যাপীড়িত শস্যক্ষেত্রের মত দেখাল। যেন সে একা একা অফিস থেকে বেরিয়ে জনমানবশূন্য একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসে আত্মার মুখোমুখি হয়ে নানাবিধ দ্বিধা সন্দেহের দোলায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল।

মাঝে মাঝে তার এমনি মনের অবস্থা হয়। যেন কোলাহলের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বুকের মধ্যে নিরাশ্রয়ের, নিঃসঙ্গতার ঢেউ ছলকে ছলকে ওঠে। ইদানীং এই বোধ অহর্নিশ সজারুর কাঁটার মত জ্বালা ধরায়। গোপন রোগের মত এই যন্ত্রণার দায়-দায়িত্ব তার সম্পূর্ণ নিজের!

সবিতার আনমনা ভাব দেখে গৌতম ঠাট্টার সুরে বলে, কার ধ্যান করছো? ওদিকে চা যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সবিতা মৃদু হেসে চায়ে চুমুক দেয়। কার ধ্যান করছিল সে? গৌতমকে খুশী করতে হলে বলতে হয়, তোমার ধ্যান করছি! কিন্তু তা কি সত্য?

একটু পরে ও জিজ্ঞেস করল, কৃষ্ণার স্বামীকে দেখেছ? কি করেন ভদ্রলোক?

—জানি না। হঠাৎ এ প্রশ্ন আমাকে করছ কেন?

—বাঃ এমনি। মেয়েটা ঝপ করে বিয়ে করে বসল।

—হিংসে হচ্ছে! ভেবেছিলে ওর কোন-দিন বিয়ে হবে না।

সবিতার চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। চোখ কাঁপিয়ে ঝাঁঝালো কন্ঠে বলে, আমাকে ডেকে এনেছ কি অপমান করবার জন্য?

—ডোন্ট বি সিলি সবিতা! ঠাট্টাও বোঝ না। দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ।

—কিছু ভাল লাগে না গৌতম! চল ওঠা যাক। রাত হয়ে যাচ্ছে।

—বাঃ আসল কথাই তো বলা হল না। তোমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত হতাশ। তোমার মধ্যে কি কোন প্রাণ নেই?

—প্রাণ! সবিতা অবাক হয়ে তাকায়। আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

—যদি পণ করে থাক কিছু বুঝবে না, আমি তোমাকে কিছু বোঝাতে পারব না। সবিতা, আমাদের কিছু একটা করা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি।

—রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।

সবিতা উঠে দাঁড়ায় এবং গৌতমকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পর্দা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। কাউন্টারের সামনে গিয়ে পার্স খুলে দাম মিটিয়ে দেয়। তার-পর দ্রুত হেঁটে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। একটু বাদে গৌতম আসে।

গৌতমের মুখ অপমানে কাল বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। মেয়েটা ভেবেছে কি? ইচ্ছে করছিল এই ভীষণ ভীড়ের মধ্যে দারুণ কিছু একটা করে ফেলে। ইচ্ছে করছিল—; না থাক। আজ সব শেষ হল। ভালবাসা একটা প্রকান্ড ধাপ্পা! দিনের পর দিন একটা জোয়ানমর্দ পুরুষ হয়ে সে এই নির্জীব মেয়েটার মন পাবার জন্যে সব কিছু করল, কি লাভ হল তাতে, অন্তহীন প্রত্যাশায় ধৈর্য ধরার মত মেজাজ তার নেই। কোন বাধা ছিল না তাদের মিলনের পথে। শুধু দুর্বল মেয়েটা প্রতিমুহূর্তে একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে গেছে!

হাঁটতে হাঁটতে বাঁ-দিকে যে গলি পড়লো সেই পথে সবিতাকে সম্পূর্ণ হতচকিত করে গৌতম পা বাড়ালো। এবং কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর সে অস্পষ্ট স্বরে শুনলো তার নাম ধরে যেন ডাকছে। সে ঘাড় ফেরালো না। ভালবাসাকে যেন সে সিগারেটের ধোঁয়ার মত শূন্যে উড়িয়ে হেঁটে চললো।

সবিতা স্থাণুবৎ একস্থানে দাঁড়িয়ে গৌতমের অপসৃয়মান মূর্তিকে যতদূর দেখা যায় দেখলো। অতিদূরে আলোরেখার মত একটি বিবর্ণ মুখ তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

।। আট ।।

দিনগুলি রাতগুলি দ্রুত পার হতে লাগলো। সবিতা খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে লীলাকে ডেকে তুলে দেয়। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে কিছুটা সময় ছাদে বেড়ায়। একটু বেলা হলে নীচে নেমে আসে। তখন রোদ ধীরে ধীরে ভীরু বালকের মত তার ঘরে এসে উঁকি মারে। ও খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খায়। লীলার সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলে। এরপর লীলা পড়তে বসলে ওর বড্ড নিজেকে অসহায়, দুর্বল মনে হয়। সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। সময়ের সাঁড়াশী যেন প্রতি পলে ওর কন্ঠনালীতে দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসেছে! সে সুনিশ্চিত জেনেছে কর্কট রোগের মত তার অস্তিত্বে মৃত্যু ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে। তখন একাকী ঘরের মধ্যে থাকতে তার ভীষণ ভয় করে। মনে হয় সে যেন পাহাড়ের চূড়ো থেকে অতর্কিতে পা পিছলে পড়ে অতল অন্ধকার খাদের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে! বস্তুত সে তখন পালাতে চায়। পালিয়ে যেতে চায় জনারণ্যের মাঝখানে, উৎফুল্ল নর-নারীর একজন হিসেবে নিজেকে ভাবতে চায়; চারিদিকে আলোকশোভিত পথে উদ্দাম-গতিতে দ্রুতগামী যানবাহনের সংগে পাল্লা দিয়ে অজস্র স্ত্রীলোক, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা হেঁটে চলেছে; সে ওদের মুখে-চোখে হাঁটাচলায় সর্বত্র গতির চিহ্ন দেখেছে; তার মত গতিহীন... চোখে ক্লান্তি। অক্ষম দুর্বল হাড় বের করা বুড়ো ঘোড়ার মত সে কি চিরদিন...!

অফিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে সবিতা ভাবছিল এখন কিছুটা সময় সে

[illegible] থাকতো। [illegible] দুখ আয়নায় দিয়ে [illegible] দেয়। ভাবে আয়নায় কি মনের [illegible] মুছে ফেলতে পারে!

আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে যেন সে নিজেকে চিনতে পারে না। এ কোন সবিতাকে সে লক্ষ্য করছে? মাত্র এক বছর—এরই মধ্যে সে কি বুড়িয়ে গেল? তার কান্না পায়। কোথায় গেল তার লাবণ্য? চোখের দুপাশে কাল দাগ, সমস্ত মুখে বিষাদ; অনেক রোগা হয়ে গেছে সে. বুকে হাত দিয়ে ও শিউরে উঠলো! আয়নার মধ্যে এ কার মূর্তি ফুটে উঠেছে?

ঝাপসা হয়ে ওঠে তার দুটো চোখ। ও পাউডারের পাফ মুখে বুলোয়। চোখে কাজল টানে যত্ন করে। মাথায় চিরুনি চালায়। চুল উঠে আসছে একটা একটা করে। খোঁপায় টাসেল জড়ালো। আবার তাকায় আয়নার দিকে। অল্প হাসলো। কদাকার হয়ে ওঠে তার মুখ। খুব বিশ্রী লাগে নিজের চেহারা দেখতে। হাত নিস-পিস করে ওঠে। মনে হয় একটা বই ছুড়ে মারে ঝকঝকে আয়না লক্ষ্য করে। সেই কিশোরী যে ঝরনার মত ছুটে বেড়াতো, কবে যেন ধীরে ধীরে কলকাতা তাকে গ্রাস করেছে!

—সবিতা! আশালতার হাতে একটা চিঠি। তিনি চিঠিটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, বিনয় ওর বউকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসতে চায়। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলে দিলাম ওর আমি মুখদর্শন করবো না। এ বাড়ী ওর জন্যে চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেছে!

আশালতা নিজের মনে গজগজ করতে থাকেন। তাতে ইন্ধন জোগান চপলামাসী। ইদানীং তাঁর ভূমিকা হচ্ছে সর্বপ্রকারে আশালতার প্রতিটি কথা, আচরণ, ব্যবহারকে অন্ধের মত সমর্থন করে যাওয়া।

সবিতা খুব অনুনয় করে বললো, দাদা তো চিরকালের জন্যে আসবে না। ক'দিন এসে বউ নিয়ে থেকে যাবে, তুমি অমত ক'র না। দাদাকে দেখতে কি একদম ইচ্ছে করে না?

আশালতা স্থিরচোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, আমার কথামত সবাইকে চলতে হবে। আমি চোখ বুজলে তখন তোমরা যা ইচ্ছে করো, কেউ দেখতে আসবে না।

—আমাদের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই না কি তোমার কাছে? সবিতা রাগে ফেটে পড়ে বলে, তোমার জেদ সবচেয়ে বড় হলো। আমি চিঠি লিখে দাদাকে আসতে বলবো। কোন কথা শুনবো না।

চপলামাসী আশালতাকে লক্ষ্য করে বলেন, থাম দিদি। রোজগেরে মেয়ে নিজের মত ফলাতে চায়, বুঝেছো? ঘেন্নায় মরে যাই। লেখাপড়া শেখা মেয়েদের নমুনা দেখে তাজ্জব বনতে হয়।

লীলা ফুঁসে ওঠে, মা! তুমি সব ব্যাপারে নাক গলাতে যাও কেন?

—থাম তুই। আশালতা [illegible] বললেন, হাওয়া লেগেছে বুঝি গায়ে! [illegible] পড়া তুই পড়। বাঁদর মেয়ে হচ্ছে দিন-দিন।

লীলা মাথা গুঁজে বই-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আশালতা ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, বিনয় আসলে আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। এখন তুই যা ভাল বুঝিস করবি।

তিনি যেন জবাবের প্রত্যাশা করলেন না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে চপলামাসীও।

লীলা কাঁদছিল। সবিতা দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলো কিন্তু তেমন কোনো উত্তর না পেয়ে যেন হতাশ হলো। আজকাল লীলার আনমনাভাব তার নজর এড়ায়নি। কি ব্যাপার বুঝতে পারে না সবিতা।

বারান্দায় এল সে। পরিচিত বারান্দায় ও এই মুহূর্তে তাকে নির্জনতার প্রলোভনে আটকে রাখতে পারলো না। সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলো। মা জানতে পারলে আবার এক প্রস্থ কলহ শুরু হয়ে যাবে। অতি দ্রুত মার মন ছোট হয়ে গেল। ভাবতে তার আশ্চর্য লাগে। বাবা বেঁচে থাকলে তার জীবনের ধারা বদলে যেত। এবারেও মার জেদ বজায় থাকবে। দাদা আসলে তিনি নাকি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। চারিদিকে জোঁকের মত থিক-থিক করছে অন্ধকার। সে চমকে উঠলো, চারিদিকে তাকালো—না কেউ নেই, শুধু তাকে ময়লের মত অন্ধকার পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। মার জেদ বজায় থাকবে। সে মুখে বলেছে বটে, কিন্তু বিনয়কে কোন চিঠি লিখতে যাচ্ছে না। কেন লিখবে? স্বার্থপর দাদার জন্যে তার বিন্দুমাত্র অনুকম্পা নেই।

কোত্থেকে এক ঝলক বুনো হাওয়া ভেসে আসে। সবিতা উদ্গত অশ্রু অতি কষ্টে চেপে নীচে নেমে আসে।

আর এক সন্ধ্যা।

সবিতা অফিস থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চা খাওয়ার পর অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করেছে। চপলামাসী রান্নাঘরে। আশালতা লীলাকে সঙ্গে করে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে গেছেন গীতাপাঠ শুনতে।

বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বসলো লীলার টেবিলে। একটা বই টেনে নাড়া-চাড়া করলো। বিনয়কে চিঠি না লিখে পারেনি। মার অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়েছে। না জানিয়ে সে স্বস্তি পেত না। এখন বিনয় ভেবে দেখুক তার আসা উচিত হবে কি না।

বই-এর পাতা অন্যমনস্কভাবে উল্টাচ্ছিলো সে। হঠাৎ টুপ্ করে পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো টেবিলের উপর লুটিয়ে পড়লো। ও অবাক হ'য়ে ফটোর দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটি সুদর্শন [illegible]বার ছবি। কে ছেলেটি? লীলার বই-এর মধ্যে...! কৌতূহলে চোখের [illegible] বিস্ফারিত ক'রে [illegible]অনেকক্ষণ কি [illegible] ভাবলো। তারপর [illegible] অসংলগ্ন কাগজের স্তূপ [illegible] থাকে। হতাশ হ'ল সে। আবার ফটোর দিকে তাকালো। লীলা প্রেম করতে শিখেছে। প্রণয়ীর ফটো বই-এর মধ্যে রাখছে আজকাল। ভাল লাগলো না সবিতার। ও ফটো আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। এত বোকা নয় লীলা যে, প্রেমপত্র বাইরে রেখে দেবে। কি লিখেছে ছেলেটা? কি উত্তর দিয়েছে লীলা? যদি সে জানতে পারতো! পরক্ষণেই ভাবলো এ ভারী অন্যায়, এ' ধরনের চিন্তা কেনই বা সে করছে! তবু তার মনটা ভারী খালি খালি লাগে। তার কর্তব্য লীলাকে প্রথম থেকেই সাবধান ক'রে দেওয়া। লীলার কাছে প্রেম এখন চোখের নেশা!

তারপর রাত বাড়লো ধীরে ধীরে।

আশালতা ফিরলেন, লীলাকে সবিতা যেন নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। এই একরত্তি মেয়েটাও প্রেম করতে শিখেছে!

বিছানায় শুয়ে ও লীলাকে দেখছিল। টেবিল ল্যাম্প জেলে লীলা পড়ছে। পড়ছে না হাতি! ভাবছে ছেলেটাকে। কিছু হ'বে না লীলার। ওকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। লীলার সঙ্গে এ ধরনের আলাপ সে কিছুতেই করতে পারবে না। শুধু সঙ্কোচ-লজ্জা নয়, তার সম্মানবোধও আছে।

তবু ওর সমস্ত হৃদয় অপরিমিত কৌতূহলে ছটফট করতে থাকে।

ওরা দুটিতে নিশ্চয়ই জোড় বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায় ওরা? সিনেমায়, পার্কে, রেস্তোরায়? না কি গঙ্গার ধারে?...গৌতম আর সে যতবার একসঙ্গে মিলিত হয়েছে, ওরা রেস্তোরাঁ ছাড়া যেন আর কোন জায়গায়ই খুঁজে পায়নি। তাদের প্রেম কৌবনের ছোট্ট পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে রইলো। তাদের প্রেম যেন এই গঙ্গার তীরবর্তী শহরের অসংখ্য ধূম্রজালের মধ্যে মিলিয়ে গেল!...

অনেক রাত্রে সবিতার আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। গুম্‌গুম্ শব্দ। ট্রেনের। পাশে লীলা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। টিক্‌টিক্ শব্দ, বুকে হাত দিয়ে থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো। এই ঘর, জমাট অন্ধকার, ট্রেনের শব্দ, সব তার কাছে অবাস্তব মনে হ'ল। মনে পড়লো কাল তার অফিস আছে। কাল তার চাকরীর এক বছর পূর্ণ হ'বে।।

—শেষ—

প্রমীলা

সবার কাজ

সমাজের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সকলেরই কমবেশী পরিচয় আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না অবস্থা। বিত্তবানদের কথা স্বতন্ত্র। আর তাদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। আমাদের বেশির ভাগই এই আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে টাকার চিন্তা করতে গিয়ে চাকরী নিতে হয় এবং পরিণতিতে একটা অহেতুক ঝামেলার সৃষ্টি হয়। ছেলেমেয়েও ঠিকভাবে মানুষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও থাকে না। দুজনের আয় ছাড়া একার আয়ে নির্ভর করে থাকা এখন আর সম্ভব নয়। এর মূল কারণ সমগ্র অর্থনৈতিক চিত্রে পরিবর্তন। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আয় বাড়ানোর। এদিকে দিনে দিনে খরচ বাড়ছে কিন্তু আয় কমছে। আয় এবং খরচের মধ্যে সমঝোতার জন্য আরো আয়ের দিকে আমাদের নজর দিতে হচ্ছে। এজন্য মেয়েদেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরী নিতে হচ্ছে।

কিন্তু চাকরী করতে গিয়ে সবসময় আটকে না থেকে অন্য কিভাবে এই আর্থিক সমস্যার সমাধান করা যায়, সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আজকাল একটা বেশ আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনেক মহিলাই সমাজসেবায় বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। শুধুমাত্র মুখে নয় অনেকে কাজেও নেমে পড়েছেন। শহরের বুকে এবং মফস্বলেও ইদানীং মেয়েদের হাতের কাজের অনেক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এসব কেন্দ্রে মেয়েরা যে কাজ শিখতে পায় তাই নয়, প্রয়োজনমত হাতের কাজ করে বেশ কিছু রোজগারও করতে পারে। নিম্ন আয়-সম্পন্ন পরিবারগুলির পক্ষে এটা বেশ আশার কথা। অনেকেই এখানে কাজ করে বেশ দু' পয়সা আয় করেন এবং এর ফলে পরিবারের সাহায্যও হয় অনেকটা। এইসব শিল্প-কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় অনেক মহিলাই যে আর্থিক অনটনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছেন সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সমাজসেবার এই মহান আদর্শ নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। সেইসঙ্গে আমাদেরও লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন যাতে আমরা এই সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন সামগ্রী কেনার ব্যাপারে সাধারণকে উৎসাহী করে তুলতে পারি। শিল্প-কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, অনেকের মধ্যেই উচ্চ শিল্পবোধ বর্তমান এবং কাজকর্মও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অবশ্য ভুলত্রুটির কথা ছেড়ে দিয়েই একথা বলছি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এর দ্বারা আমাদের মা-ভাই-বোন প্রতিপালিত হচ্ছে। হাসি-ঠাট্টা না করে এক্ষেত্রে উৎসাহীরূপে আমাদের আবির্ভাবই কাম্য। আর যাঁরা পারেন এরকম সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁদেরও আত্মপ্রকাশ বাঞ্ছনীয়। একার পক্ষে যা সম্ভব নয় অনেকের পক্ষে তা সম্ভব। তাই অনেকের জন্য আমরা উন্মুখ।

নতুন শাড়ী

বয়নশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাজপোশাকের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে। কৃত্রিম কাপড়ে আজ বাজার ছেয়ে গেছে। সেই সঙ্গে শাড়ীর ক্ষেত্রেও কৃত্রিমতা বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এ পর্যন্ত অনেক শাড়ী সুন্দরীদের অঙ্গে নতুনের মোহজাল

বিস্তার করেছে এবং নীরবে বিদায়ও নিয়েছে। শাড়ীর ক্ষেত্রে নতুন অবদানে ভারতীয় বস্ত্র মিলগুলির প্রচেষ্টা সর্ব-সময়ের। সম্প্রতি আমেদাবাদের 'কেলিকো মিল' এক নতুন ধরনের শাড়ী বের করেছেন। প্রথম দর্শনেই বোঝা যাচ্ছে শাড়ীটি বেশ জনপ্রিয় হবে। নতুন এই শাড়ীর নাম 'ক্যালি-কার্ট'। এই শাড়ীর গবেষণা সম্পর্কে বলতে হয় যে 'আনকাশেবল স্লিঙ্ক-প্রুফ, ক্লিন-ড্রাই'। উন্নত ধরনে প্রস্তুত এই ক্যালি-কার্ট শাড়ী বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির নিদর্শন। এর সীমা আবার শুধু শাড়ীতে শেষ নয়। ছাপানো কাপড় এবং রুমাল প্রভৃতিও এর অবদানে সমুজ্জ্বল হবে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত এই শাড়ীতে কিন্তু সুতীবস্ত্রের স্বাদ তাই অনুভবে কোন অসুবিধাই হবে না। আর এটাই এর বিশেষত্ব।

শিল্পশ্রী

রক্তের মধ্যেই ছিল সমাজসেবার আগ্রহ। বাবা ডক্টর ডি এন মৈত্র ছিলেন বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগের প্রতিষ্ঠাতা। তাই মীরা চৌধুরী যে সমাজসেবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন সেটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার মধ্যে কোথাও ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুযোগ যখন পেয়েছেন তখনই তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তবে সেটা সুপরিস্ফুট হয় ১৯৪৩ সালে—বিখ্যাত পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষ। সেদিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আজও আতঙ্কে শিউরে ওঠেন তিনি। মানুষের এরকম মর্মান্তিক দুর্দশার চিত্র বুঝি কল্পনাও করা যায় না। দুর্ভিক্ষপীড়িত সেদিনের বাংলাদেশে তিনি নিরন্ন মানুষদের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের। প্রচণ্ড উদ্যমে এই নিদারুণ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। আর এইভাবেই সমাজসেবার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের রেশ তখনও কাটেনি। সবেমাত্র বছরখানেক হয়েছে। সমাজসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আরও বৃহৎ রূপ নিয়েছে। মনের মধ্যে অজস্র চিন্তার প্রতিনিয়ত আনাগোনা। ১৯৪৪ সালেই আজকের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান 'শিল্পশ্রী'র সূচনা। সঙ্গীসাথী অবশ্য আরো কয়েকজন ছিলেন। তাঁদের কথাও তিনি প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে একই সঙ্গে স্মরণ করেন। মাত্র দশজন নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে প্রতিষ্ঠানের সূচনা। প্রতিষ্ঠানের তখন ছিল দ্বিবিধ রূপ—ট্রেনিং এবং এমপ্লয়মেণ্ট সেণ্টার। শিগগীরই শিক্ষার্থী-কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। পুরোপুরি অর্ডারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে প্রতিষ্ঠান চলতে থাকে। সরকারী বা বে-সরকারী সাহায্যের কোন প্রশ্নই তখন ওঠেনি।

তখনকার তথ্য বলতে গিয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন শ্রীমতী মীরা চৌধুরী। নিজের বিরাট বাড়ীতে মেয়েরা এসে কাজ শিখতো এবং করতো। তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে ডিজাইন করতেন আর মেয়েরা তার শিল্পরূপ দিত। সকলের তখন অপার আনন্দ। আজ অবশ্য আর তা সম্ভব হচ্ছে

পাটের তৈরি কয়েক প্রকার জিনিস

না। মেয়েরা এখন 'পিস-ওয়ার্ক' হিসেবে বাড়ীতে নিয়ে কাজ করে। নিজের বাড়ীটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার জন্যই এমনটি হলো। এখনকার বাড়ীতে জায়গা কম। তাই বিক্রয়-কেন্দ্রটি চালু রেখে মেয়েদের কাজ করার মত জায়গা থাকে না। আগে চারটে ঘর জুড়ে ছিল বিরাট বিক্রয়-কেন্দ্র। স্থানাভাবে এখন একটিমাত্র ঘরে বিক্রয়-কেন্দ্রটি আশ্রয় পেয়েছে। ঘরটি বেশ বড়সড়। একটি নিখুঁত শিল্পীমনের ছাপ ছড়ানো রয়েছে ঘরটির সর্বত্র। জিনিসপত্র এমন সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো যে, ক্রেতার মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। কোনটার পর কোনটা রাখলে জিনিসপত্রের বাহার খোলে এবং আকর্ষণ বাড়ে, সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সচেতন। জিনিসপত্রের বিন্যাসে যে ক্রেতার মন জয় করা সহজ এটা তিনি যেমন জানেন তেমনি মানেনও।

শুধু সাজানো-গোছানো নয়, আহরিত বস্তুর মধ্যে সেই শিল্পীমন সমান সক্রিয়: এমন সব জিনিস এখানে স্থান পেয়েছে, যা রূপে ও গুণে অতুলনীয়। এসব ব্যাপারে আবার তিনি মেয়েদের হাতের কাজের উপরই নির্ভর করেন না। বাইরে থেকেও নানা জিনিস কিনে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে পছন্দটা তিনি নিজেই করেন। তাছাড়া তিনি নিজে ডিজাইন করে শিল্পীদের দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করিয়ে নেন। নানারকম সুচের কাজ, চামড়ার, ব্রাসমেটাল ওয়ার্ক প্রভৃতির মধ্যে 'শিল্পশ্রী' নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। আবার বাটিকের কাজে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম যথেষ্ট। ইদানীং বাটিকের কাজটা কম হয়। কারণ এতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া বাজারে বাটিক প্রিন্টের প্রাদুর্ভাব।

এপর্যন্ত অনেকগুলি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীরাজাগোপালাচারী। আজ প্রতিষ্ঠানের জীবনে বাইশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীমতী চৌধুরীর কর্মোদ্যমে কোথাও ভাঁটা পড়েনি। আজও তিনি অক্লান্ত কর্মী। এবার তিনি কাজ শুরু করেছেন পাটজাত দ্রব্যাদি নিয়ে। এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে পাটজাত দ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিদেশাগত বহু ব্যক্তির অভিনন্দনও এর ভাগ্যে জুটেছে। আর এজন্য সব কৃতিত্বই পাওনা শ্রীমতী চৌধুরীর। পাটজাত দ্রব্যাদি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে, ব্যাগ, পর্দা, টেবিল প্রভৃতি কত সুন্দর হতে পারে।

এই বয়সেও তিনি নিজে ডিজাইন করেন এবং কাজ করতে এখনও তিনি পেছপা নন। সেদিন তিনি 'ডেফ এ্যান্ড ডাম্ব' স্কুলের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ব্লাইন্ড স্কুলের ছেলেদের সম্বন্ধেও তিনি উৎসাহী। এদের দিয়ে এবার কাজ করাতে চাইছেন। এজন্য কথাবার্তাও চালাচ্ছেন। তিনি সেদিন ঐ সমস্ত ছেলেদের কাছ থেকে ওদের হাতের কাজ নিজ বিক্রয়-কেন্দ্রের জন্য রাখছিলেন। ওদের নিয়ে একটি ক্লাব গড়তে চান তিনি। আর এই ছেলেরা তাঁর ডিজাইনে কাজ করবে।

দেশী-বিদেশী অনেকেরই আগমন ঘটেছে এই প্রতিষ্ঠানে। আবার শিল্পশ্রীর জিনিসপত্র বাইরেও পাঠান হয়েছে। ঘরে-বাইরে এইসব জিনিসের সমান কদর। এখন তিনি খোঁজ করছেন কাঁচের কাজ জানা মেয়ে। হয়তো নতুন কোন চিন্তা মাথায় ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু চিন্তার অন্ত নেই। চিন্তা করেন আর ডিজাইন তোলেন। এইভাবেই তিনি আজও শিল্পশ্রীর শিল্প-শোভা বৃদ্ধি করে চলেছেন।
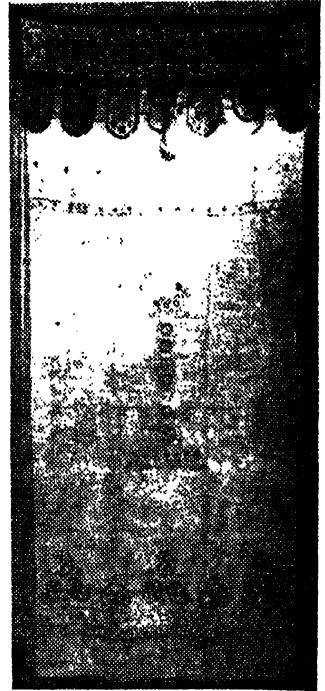
পর্দা

শিল্পশ্রীর সুসজ্জিত বিক্রয়কেন্দ্র

গণিতবিদ্ সম্মেলন

গণিতের দ্রুত উন্নতি ব্যতীত বিশ শতকের যান্ত্রিক প্রগতি কোনক্রমেই সম্ভব হোত না। জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কলাবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে গণিতের ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। এমনকি জনপ্রিয় আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এবিষয়ে একমত যে, পাইথাগোরাস উপপাদ্যে ঐতিহ্যগত প্রতীক আদিম সভ্যতার পক্ষেও ছিল সহজবোধ্য।

অতীত কাল থেকে গণিত দুটি শাখায় বিভক্ত : অ্যাপ্লায়েড এবং থিয়োরেটিক্যাল। জটিল প্রযুক্তিবিদ্যা বর্ণনাকারী সমীকরণের ধারাগত সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য এবং স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ও নতুন বস্তুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার গাণিতিক বিশ্লেষণের জন্য এর প্রয়োজন। অতীতে গাণিতিক যুক্তি ছিল পুরোপুরি নিয়মমাফিক কিন্তু আজ তা একান্ত অপরিহার্য। বিশেষভাবে 'থিংকিং' মেসিন সৃষ্টির জন্য। যার ফলে কিনা সম্ভাব্য মীমাংসার বিশ্লেষণ এবং শ্রেষ্ঠটি বেছে নেওয়া সুবিধে হয়।

এই ফলশ্রুতি পাওয়া গেছে গণিতের সর্বাপেক্ষা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' শাখায় এবং এর দ্বারা বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা প্রভাবিত হচ্ছে ও নতুন উদ্ভাবনের ব্যাপারে সাহায্য হচ্ছে।

এবার বিশ্বের গণিতবিদদের সম্মেলন বসেছে মস্কোতে। পৃথিবীর ষাটটি দেশ থেকে পাঁচ হাজার গণিতবিদ্ এই সম্মেলনে যোগদান করছেন। প্রতি চার বছর অন্তর এই সম্মেলন বসে। প্রথম অধিবেশন বসেছিল ১৮৯৭ সালে জুরিখ শহরে। গণিতবিদদের এটা পঞ্চদশ মিলন আসর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গঠিত এই সম্মেলন প্রথমে ৪১টি দেশের গণিতবিদ্দের ঐক্যবদ্ধ করে। এবার দশদিন ধরে সম্মেলন চলে। সম্মেলনে যোগদানকারীদের পনেরটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা ও গণিতের অবদান সম্পর্কেই আলোচনা মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। এছাড়া দু' হাজার রিপোর্ট সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

সকল দেশ থেকেই প্রথিতযশা গণিতবিদ্রা এতে যোগদান করেছেন। ভারত থেকে যোগদানকারীদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রীমতী কে সাবিত্রী।

মস্কো সম্মেলনে শ্রীমতী কে সাবিত্রী

যখন শিশুকে 'না' বলি

একটা গল্প পড়ছিলুম, তাতে বোঝানো হয়েছে, মায়ের কথা না মানার ফলে একটি ছেলেকে কত দুঃখ পেতে হয়েছিল। বাবা-মায়ের কথা না শুনলে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, সেকথা ছোটদের বোঝানোর জন্যে এমন কত গল্প আছে।

টুলটুলের শখ হলো সে নিজের হাতে বাজী পোড়াবে। মা বললেন, না, বাচ্চা ছেলেদের হাতে ওসব ভারী বিপজ্জনক। টুলটুল অনেক আবদার করলো, কাকুতিমিনতি করলো—অন্ততঃ কয়েকটা ফুলঝুরিও সে নিজের হাতে পোড়াবে। কিন্তু মায়ের হুকুম নড়লো না। 'না' বলে দিয়েছেন এক কথা। ফুলঝুরি থেকেও বিপদ আসতে পারে, কে বলতে পারে? বাড়ীতে শেষে একটা আগুন লাগিয়ে লঙ্কাকান্ড বাঁধতে দিতে চান না তিনি।

ফল? টুলটুল কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে আনলো কিনে ফুলঝুরি রংমশাল আর সেগুলো সোজা পাচার হয়ে গেলো একেবারে শোবার ঘরে। গোপনীয়তা সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বাজীগুলো নিয়ে সে স্নানের ঘরে ঢুকে মনের আনন্দে নিভৃত নিশ্চিন্তে সাধের দেওয়ালী সুরু করলো।

কী মজা! মা যে কেন এইসব বাজী দেখলে ভয় পায়!

হঠাৎ দৈবক্রমে একটা জ্বলন্ত ফুলঝুরি থেকে কেমন করে যেন আগুন ধরে গেল টুলটুলের জামায়। জামা থেকে প্যান্টে। কি যে হলো বোঝবার আগেই ওর সর্বাঙ্গে আগুন গেলো ছড়িয়ে।

আকুল চিৎকারে বাবা ছুটে এলেন। টুলটুল ততক্ষণে প্রায় অর্ধদগ্ধ।

এ কাহিনীর উপদেশ : সব সময়ে মায়ের কথা শুনতে হয়; মা সবকিছু খুব ভালভাবে জানেন।

কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এই ঘটনাটির প্রথমে মা কেন 'না' বলে টুলটুলকে সরিয়ে দিলেন!

মা বললেন, ও তো বাচ্চা ছেলে। ওদের সাবধানে রাখতে হয়।

কিংবা হয়তো আর একটা কারণ হতে পারে। কেমন করে টুলটুল বাজী পোড়ালে বিপদ হবে না, সেটা হাতে ধরে শিখিয়ে-দেখিয়ে দেবার ঝঞ্ঝাটটুকু তিনি কি নিতে চাননি?

এই ধরনের সমস্যাকে আর একভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে,—বাবা-মা তাঁদের বাচ্চাদের কেন 'না' বলে নানা কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে চান?

প্রশ্নটির জবাবে বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই বাবা-মায়েরা বলতে পারেন, ছোটরা যা চায়,

তার সবকিছু দেওয়ার মত অর্থসংগতি তাঁদের নেই।

কিংবা কিনে দেওয়ার অর্থসংগতি থাকলেও, শিশুকে সব জিনিস দেওয়া অনুচিত। বড় না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত করে রাখলে, তার বড় হয়ে ওঠার উদ্দীপনা জ্বলন্ত থাকে। আজকাল ছেলেমেয়েদের রকমারী খেলনা কিনে দিয়ে তাদের খেলার ঘর প্রায় বোঝাই করে ফেলেন অনেক অভিভাবক; এসব খেলনা উপভোগ করার মতো বয়সই অনেক ছেলেমেয়ের হয় না। একটু বড় হলে বয়সের উপযোগী খেলনা দিলে তার সদ্ব্যবহার হয় —এ হলো একটা অভিমত।

এসব অভিমত আর যুক্তির মূল্য আছে ঠিকই, কিন্তু অবাক হতে হয় যখন দেখা যায়, অসহায় শিশুর মন বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের যে চেষ্টা করছে, তার আকুলতা বোঝবার চেষ্টা না করেই বাবা-মা 'না' বলে মুখ ঘুরিয়ে নেন, ওসব ছেলেমানুষী ব্যাপারে ঝামেলা করতে, সময় নষ্ট করতে তাঁরা রাজী নন।

দৃষ্টান্ত হিসাবে টুলটুল ছেলেটির ঘটনাটিই ধরা যাক্। কি করে সাবধানে বাজী পোড়াতে হয়, কেমন করে ফুলঝুরি ধরতে হয় জামাকাপড় বাঁচিয়ে, এসব শেখানোর জন্যে টুলটুলের মা এতটুকু সময় খরচ করতে রাজী হননি। কিন্তু তিনি যদি ছোট্ট ছেলেটির সঙ্গে বাজী পোড়ানোর আনন্দে একটুখানি সময় মেতে যাওয়ার অবসর করতে পারতেন, তাহলে ছেলেটির বিপজ্জনক দেওয়ালী খেলাটি গোপনে সম্পন্ন হওয়া বন্ধ হতো, তাহলে শিশুটিকে মারাত্মকভাবে জখম হওয়ার হাত থেকে নিশ্চয়ই বাঁচানো যেতো, আর তার ফলে তাকে মানুষ করে তোলার মস্ত বড় একটা কাজও হয়ে যেতো—একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বিকাশ অব্যাহত থাকতো।

তবে এর জন্যে দিতে হবে খানিকটা সময়; —গৃহকর্মে ব্যতিব্যস্ত মায়েরা সন্তানদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করার জন্যে সেসময় দিতে পারবেন বলে মনে করেন না। কিন্তু একাজে সময় দিতে পারলে সময়ের সদ্ব্যবহারই হবে।

তারপর ধরুন ঝুনুর কথা। ওর অনেক দিনের সাধ ছিল, একটা কাঠের পাটায় চাকা লাগিয়ে একটা গাড়ী তৈরী করে তাতে চড়ে গড়গড়িয়ে চলবে। কিন্তু পারবে কেন? কাজটা তো ওর মতো বাচ্চা ছেলের পক্ষে সহজ নয়। ও তখন আর পাঁচটা ছেলের মতোই বাবার মুখাপেক্ষী হলো, 'কি করে চাকা লাগাবো?'

কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত।

তিনি ভাবলেন, বড় ত ছেলেমেয়েদের নিজের কাজ নিজে করতে দেওয়াই ভালো। নিজের সমস্যাকে নিজের চেষ্টাতেই জয় করতে শিখুক।

ফল?

তাঁর সাহায্য ছাড়াই চাকা-লাগানো গাড়ী তৈরী হ'লো। হাঁ মোটামুটি হলো। কিন্তু প্রথম যাত্রাতেই এমন একটা ঢালু জায়গা দিয়ে গাড়ী নামলো তীরবেগে যে, দুটো চাকা ছিটকে খুলে গেল এবং গাড়ী উল্টেপাল্টে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে ঝুনুকে যেতে হলো হাসপাতালে, কপালে দুচারটে সেলাই করতেও হলো।

এটা হতো না, বাবা যদি ঝুনুর গাড়ীটা মজবুত করে তৈরী করার কাজে খানিকটা হাত লাগাতে পারতেন। দুর্ঘটনার পরে ক'-সপ্তাহ তাঁকে যে পরিমাণ মনোযোগ দিতে হয়েছে ঝুনুর দিকে, তার চেয়ে কম সময়ই লাগতো আগে। প্রথমে তিনি 'না' বলে দিয়েছিলেন ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যেই। সে ঝঞ্ঝাট দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিল দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে। তাই নয় কি?

একটি ছোট্ট খুকীর কথা মনে পড়ছে, তার আবদার ছিলো রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের সঙ্গে কাজ করবে। মা জানতেন, খুকীর দ্বারা সত্যিকারের কাজ মাথামুণ্ডু কিছুই হবে না। তবুও, তিনি খুকীকে নিয়ে একটু কাজ-কাজ খেলা করতে আপত্তি করলেন না। সময় একটু নষ্ট হলো বৈকি, মেয়েকে শেখাতে হলো কি করে কড়া ধরতে হয়, কেমন করে উনুনে কয়লা দিতে হয়, আর কিভাবে মাছ ভাজতে হয়।

হাঁ, এতে তাঁর সময় নষ্ট হয়েছিল ঠিকই, একটু-আধটু ভুলচুকের বিরক্তিও যে ঘটেনি, তা নয়। কিন্তু বছরখানেক পরে তাঁকে যখন হঠাৎ হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, তখন তাঁর অবর্তমানে বাড়ীতে ক্ষুদে গিন্নীর মতোই ঐ মেয়েটি অনেক কাজ চালিয়ে নিতে পেরেছিল। সবাই তার সুন্দর কাজ দেখে খুশি না হয়ে পারেনি।

ছোটদের কাজ শেখানো, বাধ্য হতে শেখানো, সত্য কথা বলতে শেখানোর জন্যে কত দৃষ্টান্তমূলক গল্পই না আছে। কিন্তু মনে হয়, এ বিষয়ে অভিভাবকদেরও কিছু শেখার সময় থাকা দরকার—কেমন করে শিশুর সত্যিকারের বন্ধু হয়ে, তার সাথী হয়ে, তার বিকাশের সহায়তার জন্যে কিছুটা সময় দিয়ে, এই বিপজ্জনক জটিল জগতের জীবনধারার মধ্যে নিরাপদে বেঁচে থাকার প্রত্যক্ষ শিক্ষা তাকে দেওয়া যায়, এসব বিষয়ে বাবা-মায়ের অনেক কিছু করার আছে। ব্যস্ত বলে দায়িত্ব এড়াতে গেলে ঘরে এবং বাইরে নানা রকম দুঃখ আর অশান্তির সৃষ্টি হয়।

শিশুকে সাহায্য করতে পারার জন্যে যে সময়টুকু দেওয়া দরকার, তা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না, কেবলমাত্র এই যুক্তিতেই ছোটদের আবদারের জবাবে কঠোরভাবে 'না' বলে দেওয়া কোনো অভিভাবকের পক্ষেই উচিত নয়।

শিশুমনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যখন শিশুরা কোন নটখট কাজে নামতে যাচ্ছে দেখবেন, হয়তো তার মধ্যে শিশুসুলভ দুষ্টুবুদ্ধিও লুকোনো রয়েছে, তখন 'না' বলে বাধা না দিয়ে কেমন করে সেটা করতে হয় শিখিয়ে দিন তাদের।

কথাটা শুনতে অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু এই নীতিটা কাজে লাগিয়ে দেখবেন, সুস্থ দেহমনের শিশুকে গড়ে তুলতে হ'লে এর মূল্য কতখানি। —অশীম বর্ধন

(৭)

ঝাবাসুট

বেড়াতে যাবার পক্ষে শিশুদের এই পোশাকটি সুবিধাজনক এবং দেখতেও বেশ সুন্দর।

ঝাবাসুট

মাপ:—

ছাতি=২২"+৬"=২৮"÷৪=৭"
পুট=৫"
সেন্ত=৮½"
হাতা=৫"
প্যাণ্ট লম্বা=৮½"
হিপ্=২১"÷৩=৭" ২১÷১৬=১¼"

বডি:—

১— ২=সেন্ত+½"
২— ৩=৩½"
১— ৮=পুট+¼"
১—১০=ছাতির ১/১২
১—১২=১/১২+¼"
১—১১=¼"
৮— ৯=¼"
৯—১৩=৯—১৭ এর অর্ধেক
১৩—১৫=½"
১৭—১৪=১"
৪— ৫=ছাতির ¼+১½"
২— ৬=৪—৫ এর ¼" কম
১— ৪= ছাতির ¼"

প্যাণ্ট:—

১— ২=বডির ৪—৫ এর সমান
১— ৫=হিপের ½+½"
২— ৩=হিপের ১/৬+½"
২— ৪=প্যাণ্ট লম্বা +½"
৪— ৬=১½" মুড়িবার জন্য
৬—১৪=½" বাইরে ৩ পর্যন্ত তারপর সেপ্ হবে
৫— ৭=হিপের ১/১৬
৭— ৮=১"
৪— ৯=৫ এর ২" নীচে ও ½" বাইরে
৯—১০=১"
৬—১১=৯ এর ১½" নীচে ও ½" বাইরে
১১—১২=১"

কলার:—

১—২=গলার ½+১"
১—৩=২½"
৩—৪=গলার ½+¼"
৫—৩=৩—৪ এর অর্ধেক
৪—৬=¼" নীচে সেপ্
৬—২=মিলাতে হবে।

হাতা:—

১— ৫=হাত লম্বা +½"
১— ২=ছাতির ¼
৫— ৬=১—২ এর ½" কম।
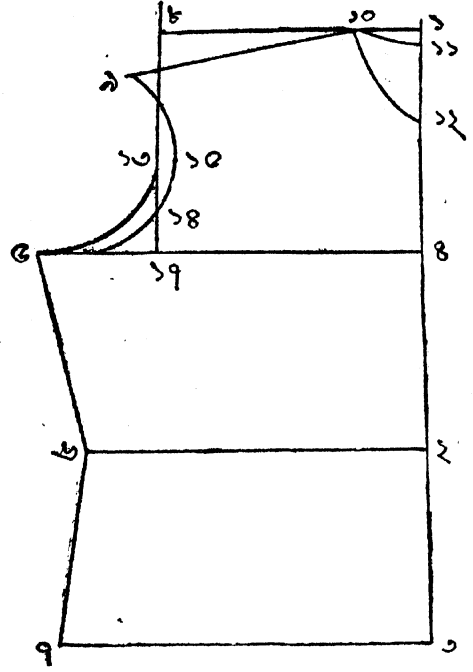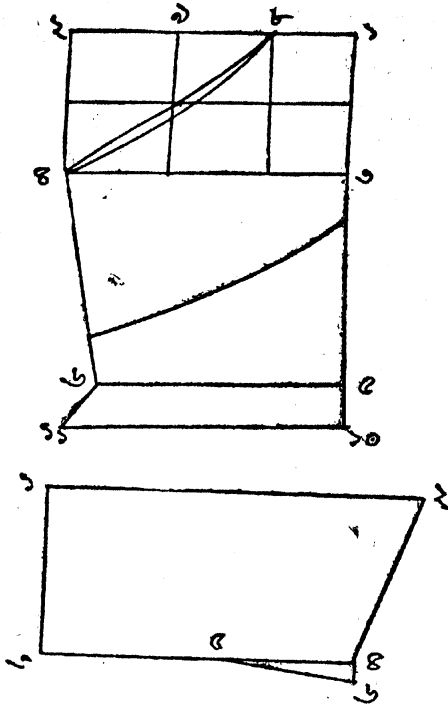
৩— ৪=ছাতির ⅙
১— ৩=১—২ এর অর্ধেক।
১— ৭=১—৩ এর অর্ধেক।
১— ৮=৮—৯
২— ৯=১—২ এর ⅙ করে
৫—১০=১" মুড়িবার জন্য।
১১—১১=৫—৬ এর ½" বেশী।

বসুধা।

সংবাদ

সমাজসেবার কাজে নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি দশ হাজার ডলার মূল্যের ম্যাগসাসে পুরস্কার গ্রহণ করেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস-এর হাত থেকে।

ভারতীয় সমবায় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সভানেত্রী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে বলেন যে, একজন সংবাদিক যখন তাঁকে এই পুরস্কারলাভের সংবাদ দেন, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বিস্ময়সূচক ধ্বনি বেরিয়ে যায়। তিনি বলেন যে, এ হতে পারে না, নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে। কারণ 'মহৎ ব্যক্তিরাই' এই পুরস্কার পেয়ে থাকেন। তবে তিনি একটি কারণে আনন্দিত হয়েছেন। নীরব এবং অনাড়ম্বর সমাজসেবা সাধারণতঃ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাও যে পুরস্কৃত হয় সেটা জেনে আনন্দিত **হয়েছি।**
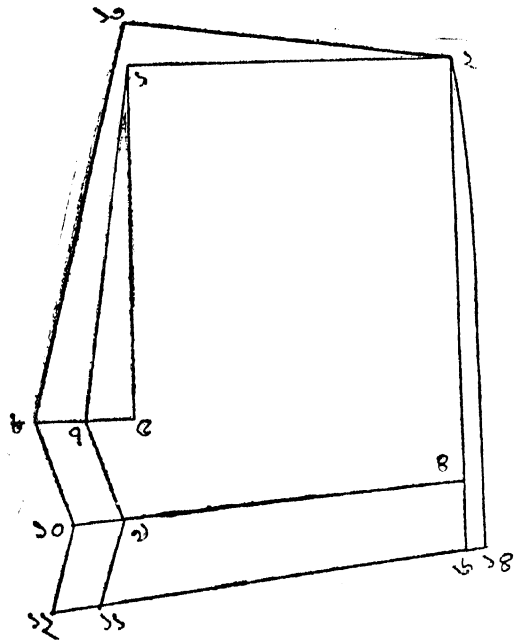
সংযুক্ত বিশ্বগ্রামীণ মহিলা সংঘের আন্তর্জাতিক সভানেত্রী শ্রীমতী আরতি দত্ত ও সহঃ সভানেত্রী শ্রীমতী বারবারা কালেন লণ্ডনে উক্ত সংঘের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য যাত্রা করেছেন। পথে গ্রীসের গ্রামাঞ্চলগুলিতে মহিলা সমিতির কাজ দেখবার জন্য তাঁরা এথেন্সে হয়ে যাবেন। শ্রীমতী দত্ত পরে স্কটল্যাণ্ড, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও লেবাননে উক্ত সংঘের অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলিও পরিদর্শন করবেন।

॥ তিরিশ ॥

পেলে.রাস্ জ্যাকের মানুষ বাঁচানোর গল্প ছেলের চোখে জল এনেছিল। জ্যোতিরাণী জল দেখেননি, আশার মতো দেখেছিলেন। কিন্তু লোভের বশে চোখের ওপর মানুষ মারতে দেখার প্রতিক্রিয়াটা ছেলের দিকে চেয়ে তিনি লক্ষ্য করেননি। কটা দিন নিজেই তিনি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। ছেলের বিপরীত উত্তেজনা প্রায় উদ্দীপনার মতই। গুলীবিদ্ধ দু-দুটো লোকের বরাত মন্দ অস্বীকার করে না সিতু, কিন্তু অন্যদিকে রোমাঞ্চকর সাহসিকতার এক অনন্য নজির দেখেছে সে। ছোটদের ডাকাতির বই কিছু পড়া আছে—এর কাছে সবই জলো। লোক-দুটোকে না মেরে শুধু গুলী ছুঁড়ে ওই রকম ধাঁধা-লাগানো তৎপরতায় গাড়ি-হাঁকানো ভদ্র-ডাকাতগুলো টাকার বাক্স নিয়ে হাওয়া হতে পারলে সিতু এর দ্বিগুণ অভিভূত হত। আর তারপর যদি শোনা যেত রবিনহুডের মত ওই টাকা গরিব-দুঃখীদের বিলনো হয়েছে, সিতুর তাদের ভক্ত হতেও আপত্তি ছিল না।

মাত্র এগারো বছরে পা দেবে যে ছেলে, বিপদ আর ভয়ের ঝুঁকি নেবার তড়িৎগতি রোমাঞ্চ আর আনন্দের প্রতি তার এই টান লক্ষ্য করলে জ্যোতিরাণীর শঙ্কাই হত হয়ত।

বন্ধু-মহলে কটা দিন প্রায় নায়কের সম্মান পেয়েছে সিতু। পরদিন সমস্ত কাগজে যে গায়ে-কাঁটা-দেওয়া খবর পড়ে স্তম্ভিত সকলে, ও সেটা স্বচক্ষে দেখেছে। শুধু দেখা নয়, কাগজে তার আর মায়েরও মৃত্যুর খবর বেরুতে পারত। একটা ডাকাত তো সোজা মুখের ওপর রিভলবার বাগিয়েই ধরেছিল—আর তার ধরালো চোখ দিয়ে যেন আলো ঠিকরোচ্ছিল। সিতুকে ঘিরে শ্বাসরুদ্ধ বন্ধুরা কবার করে আদ্যোপান্ত শুনেছে ঠিক নেই। স্কুলে ক্লাসের ছেলেরাও দম-বন্ধ করে শুনেছে, মাস্টারমশাইরাও। পাড়ার বড় ছেলেরা ওকে ডেকে চাক্ষুষ ঘটনা শুনেছে. ঘোড়-মুখো সমরের দাদা আর সজারু-মাথা সুবীরের দাদা তো তাকে আদর করে পার্কে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিবিষ্ট বিস্ময়ে শুনেছে সব এটা কম সম্মান ভাবে না সিতু। তারপর চালবাজ দুলুর দিদি নীলিদি—যে-নীলিদি একদিন সিতুকে হনুমান বলেছিল আর রোগা-পটকা অতুলের দিদি রঞ্জুদি—যে-রঞ্জুদি ভাইকে মারা হয়েছিল সেই রাগে একদিন ওকে মায়ের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—স্তব্ধ মুগ্ধ বিস্মিত কণ্টকিত তারাও। নীলিদি, রঞ্জুদি, তাদের মায়েরা, আর, পাড়ার আরো অনেকের মা মাসি-পিসিরা গোল হয়ে বসে জোড়া-জোড়া চোখ টান করে ওর বর্ণনা গিলেছে, আর শিউরে উঠে গলা দিয়ে নানা রকমের শব্দ বার করেছে।

বলার ঝোঁকে সিতু একটু-আধটু বাড়িয়েই যদি বলে থাকে, তাও নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য নয় খুব। যেমন, তাদের গাড়ি ডাকাতগুলোর গাড়ির রাস্তা আগলে ফেলেছিল বলেই রিভলবারের তাড়া খেতে হয়েছিল, একটা ডাকাত পাঁচ হাতের মধ্যে এসে তাকে আর মাকে দেখেছে আর ভেবেছে গুলী করবে কি করবে না, ইত্যাদি।

ঘটনাটা ছেলের অপরিণত মনে কত বড় ছাপ ফেলে গেল, তা নিয়ে জ্যোতিরাণী মাথা ঘামাননি বা চোখ তাকিয়ে দেখেননি। কিন্তু ছেলে যে তাঁকে মাঝে-সাজে ঈষৎ কৌতূহলে চুপচাপ লক্ষ্য করে, মুখের দিকে চেয়ে থাকে—এটা খেয়াল করলেন। তৃতীয় দিনে স্কুল-ফেরত জলখাবার খেতে খেতে খাওয়া ভুলে ওমনি চেয়েছিল।

—কি দেখছিস?

—না তো। সিতু তাড়াতাড়ি খাবারের দিকে মন দিয়েছে।

পরদিন একটা ধাক্কা খেয়েই জ্যোতি-রাণীর চোখ আর চিন্তা ছেলের দিকে ঘুরল। সকালে শমী ফোন করেছিল আজ সে মাসির কাছে আসবেই। তার মনে হয়েছে মাসির ওপর নিজের দাবি পেশ না করে অভিমান নিয়ে বসে থাকলে মাসি হয়ত তাকে ভুলেই যাবে। কড়া নোটিস পেয়ে জ্যোতিরাণী শামুকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে বিকেলের আগেই ওকে আনিয়ে নিয়েছেন।

বিকেল পর্যন্ত শমী মাসির কাছেই ছিল। সিতুদা স্কুল থেকে ফেরার পর সজ্জা বদলেছে। ঘণ্টা-দুই বাদে ঘরে এসে হঠাৎ দু'হাতে মাসিকে জড়িয়ে ধরল সে।

জ্যোতিরাণী প্রথমে ভাবলেন, রাতটা এখানে থেকে যাবার ইচ্ছে সেই বায়না বোধহয়। কিন্তু সে-রকমও লাগল না। মেয়েটার চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ—ভয়েরও।—কি হল?

কি হল বার করতে সময় লাগল একটু। শমীর কাঁদ-কাঁদ মুখ। সিতুদার মুখে ডাকাতদের কথা সব শুনেছে। তার এখনো ভয় করছে।

জ্যোতিরাণী হাল্কা অভয়ই দিলেন, এখনো ভয় করছে কেন, মেরে তো ফেলেনি।

ঠোঁট ফুলিয়ে শমী বলল, তোমাকে মারবে কেন, আর একটু সময় থাকলে সিতুদাকে মারত, তোমাকে তো ধরে নিয়ে যেত—

কথাগুলো জ্যোতিরাণীর কানে খট করে লাগল কেমন। শমীর মুখের ভয়ের

ছাপটা ভালো করে লক্ষ্য করলেন এবার।—সিতু তোকে কি বলেছে শুনি?

শুনলেন কি বলেছে। ডাকাতদের গুলী-গোলার মধ্যে পড়ার ব্যাপারটা ফেনিয়ে বলে যতখানি সম্ভব ত্রাস সঞ্চার করেছে মেয়েটা মনে। রিভলবার হাতে ডাকাতটা ওদের গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল একেবারে। আর ওর মাকে দেখেই ভেবেছে ছেলেটাকে খতম করে দেবে কি না' বলেছে, ডাকাতটা একা না থাকলে বা হাতে আর একটু সময় থাকলে বোকার মত শুধু টাকা নিয়ে পালাতো না, নির্ঘাত ওকে মেরে মা-কে নিজেদের গাড়িতে টেনে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত।

জ্যোতিরাণীর দু'চোখ শমীর কচি-মুখের ওপর ঘুরস এক চক্কর।—ওকে মেরে আমাকে নিয়ে যেত কেন?

যেত যে তাতে শমীরও খুব সংশয় নেই; কারণ সিতুদা যা বলেছে সেটা ও নিজেও অবিশ্বাস করতে পারেনি। 'সিতুদা বলেছে, ডাকাতরা তার মায়ের মত এমন আর কাউকে দেখেছে নাকি! মায়ের মত এত সুন্দর আর ক'জন আছে? যে-মেয়েরা সিনেমা করে তাদের থেকেও তার মা ঢের ঢের সুন্দর। তাই ফাঁক পেলে মা-কে তারা নিয়ে যেতই। একজনের বেশি ডাকাত তার মা-কে দেখলে টাকা ফেলেই নিয়ে যেত হয়ত। টাকা তো যে-কোনো ব্যাংকে এসে ডাকাতি করলেই পাওয়া যায়, কিন্তু ওর মায়ের মত ক'জনকে পাবে?

দু'দিন ধরে তাঁর দিকে চেয়ে কি দেখে সিতু তা যেন অনুমান করা গেল। দশ-পনের মিনিটের মধ্যে শামুকে সঙ্গে দিয়ে গাড়ি করে শমীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন জ্যোতিরাণী। তারপর নিঃশব্দে ছেলেকে খুঁজলেন। বাড়িতে নেই। রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক ঝুঁকে দেখলেন, অন্য দুই-একটা ছেলের সঙ্গে অদূরের একটা বাড়ির রকে বসে আছে। ভোলাকে পাঠালেন ডেকে আনতে।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই সিতু এলো। একটু আশা নিয়েই এসেছিল, আদুরে মেয়ে এসেছে, মা হয়ত তাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুবে। কিন্তু ঘরে এসে শমীকে না দেখে সে অবাক একটু। তারপরেই হকচকিয়ে গেল। মুখে ভয়ের ছায়া নামল। ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মা নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করল, ছিটকিনি আটকে দিল। আর সেই দু'-চার মুহূর্তের মধ্যেই সিতু বিকেলটুকুর মধ্যে মারাত্মক অপরাধ কি করেছে হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

দরজা বন্ধ করে জ্যোতিরাণী ঘুরে দাঁড়ালেন। ছেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। আঙুল দিয়ে শয্যা দেখিয়ে দিলেন। —বোস্ ওখানে।

বিমূঢ় সিতু আদেশ পালন করল।

—শমীকে কি বলেছিস?

সিতুর মুখে নির্বাক বিস্ময়ের ছাপ পড়তে লাগল এবার। ওই মেয়ে মায়ের কাছে সাংঘাতিক কিছু নালিশ করে গেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মায়ের এই মূর্তি দেখার মত কি-সে বলে থাকতে পারে হঠাৎ ভেবে পেল না। পরের মুহূর্তে কি মনে পড়তে পাংশু মুখ।...বড় হয়ে ওকে যে বিয়ে করবে বলেছিল বজ্জাত মেয়ে আজ সেটাই মায়ের কাছে ফাঁস করেছে নিশ্চয়।

জ্যোতিরাণী ছেলের দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন।—একটা মিথ্যে কথা বলবি যদি আজ তোকে আমি মেরে ফেলব, সত্যি বললে কিছু করব না। ডাকাতেরা ফাঁক পেলে আমাকে তুলে নিয়ে যেত তোকে কে বলেছে?

বিপদ কেটেছে কিনা জানে না, কিন্তু এ-কথা শোনার পর হঠাৎ বুঝি আশার আলো দেখল সিতু। ওই সম্ভাবনার চিত্রটি চুপি চুপি রোগা অতুল তার কাছে পেশ করেছিল। তারপর সিতু ও'তে রঙ চড়িয়েছে। রঙ চড়াবার আগে দুটো দিন মা-কে কিছুটা নতুন চোখে নিরীক্ষণও করেছিল সে। সত্যি জবাব দিল। রঞ্জুদির ভাই অতুল বলেছে। নীলিদিদের কথা ও শুনে ফেলে তাকে বলেছে।

—তাদের কি কথা?

সিতুর কলে-পড়া মুখ। অতু নির্জলা রিপোর্টটুকুই ব্যক্ত করল। ডাকা ব্যাপারটা সব শোনার পর নীলিদি বঙ্ আর গলির অন্য মেয়েরা নিজেদের মধ্যে সব বলাবলি করছিল আর হাসাহাসি ছিল। অতুল তখন চুপি চুপি উল্টো সামনেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের শুনেছে। সার কথা, নীলিদি হাসছিল বলছিল, ডাকাতটা এক-নম্বরের বে বলেই সিতুর মা বেঁচে গেছে, নইলে ট ফেলে তাকেই নিয়ে পালাতো। আর এক হেসেছে আর বলছে, এখন হয়ত ডাকাতটা টাকা ভুলে নিজের হাত কামড়া তারপর আরো একটা মেয়ে বলেছে, ডাক করতে এসে সময় পায়নি বলেই ছেড়ে দি গেছে, ফাঁক পেলে কি আর ছেড়ে দি নাকের ডগায় রিভলভার উঁচিয়ে নিজেদের গাড়িতে টেনে নিয়ে যেত—ত আগে ছেলেটার কি দুর্দশা করত জানে। ওদের মধ্যে শুধু মঞ্জুদিই চুপ ক শুনছিল, কিছু বলেনি।

জ্যোতিরাণী অবিশ্বাস করলেন ন দু'চোখ ছেলের মুখের ওপর আটা রেখেছেন।—আর সিনেমার মেয়েদের ক কে বলেছে?

সিতু দ্বিতীয় দফা ফাঁপড়ে পড়ল পাজী মেয়েটা কোনো কথাই আর বলা বাকি রাখেনি। কিন্তু সে বার নাম করবে মায়ের চেহারা সম্পর্কে তো কতসময় ও নীলিদিরা আর তাদের মা-মাসির ক রকম প্রশংসা করে। শিস্পনীও কাে সেদিনও নীলিদি এক-গাদা মেয়ের সামা ওকে বলেছিল তুই মেয়ে হলে তোর মায়ে নাম ডোবাতিস, কেউ তোকে ওই মায়ে মেয়ে বলত না। জবাবে আর একটা মেয়ে- নীলিদির কোনো বে-পাড়ার বন্ধু হবে- বলেছিল, কেন ওর চেহারা তো বে সুন্দর। তাতে নীলিদি বলেছিল ওর মা-ে তো দেখিসনি, চোখ ফেরানো যায় বিকেলের দিক বারান্দায় এলে দেখাব'খন মায়ের চেহারা নিয়ে বন্ধুদের দাদাদে মধ্যেও যে একটু আধটু আলোচনা হয় সি তাও জানে। তাছাড়া সেদিন সুধীরের দা প্রবীর আর সমরের দাদা অমর তাকে পাবে ডেকে নিয়ে ডাকাতের ব্যাপারটা শোনা পর মায়ের সম্পর্কে তাদের একটা মন্তব সিতুর কানে লেগেছিল। ও যাতে বুঝতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সুধীরের দাদ ইংরেজীতে সমরের দাদার কাছে তার মায়ে সম্পর্কে যা বলেছিল, তা মধ্যে 'বিউটি স্টার' শব্দটা ছিল। কি বলা হল সিতু মোটমাট ঠিকই বুঝেছে ওরা তা জানে না ফুটবল খেলায় একটা ভালো গোল হলে সকলে 'বিউটি বিউটি' বলে চেঁচিয়ে ওঠে পাড়া থেকে একটু এগোলেই বিরাট সাইন বোর্ডে সুন্দর একটা মেয়ের ছবি আঁক দোকানের নাম 'বিউটি স্টোরস' পাড়া বড় ছেলেদের উচ্ছ্বাসেও অনেক সময় 'বিউটি-সাভার্জ' শব্দগুলো কানে আসে অতএব বিউটি শব্দটার অর্থ সম্বন্ধে প্রায় স্পষ্টই ধারণা আছে। আর স্টার বলতে দু রকমের স্টার জানে সে। এক, আকাশের স্টার, আর এক ফিল্ম স্টার। তা মা-কে আ

আকাশের স্টার বলবে কেন ওরা। মায়ের চেহারা সম্পর্কে এই সব আলোচনা কোন সময়ে খারাপ লাগে না শতুর, বরং আনন্দ হয় গর্ব হয়। কিন্তু এ আবার কি ফ্যাসাদ হল তার!

—কে বলেছে? জবাব না পেয়ে মায়ের গলায় অনুচ্চ স্বর আর স্থির চাউনি দুই-ই আরো কঠিন।

সেদিকে চেয়ে সিতুর কেমন মনে হল মিথ্যে বললেই ধরা পড়বে। কপাল ঠুকেই বরং জবাব দিল, আমি--

ছেলের মুখ আবার কয়েক নিমেষ দু'চোখের আওতায় আটকে রাখলেন জ্যোতিরাণী।—তুই সিনেমার মেয়ে দেখেছিস?

কি জবাব দেবে সিতু হঠাৎ ভেবে পেল না। কিছুকাল আগে মায়ের সঙ্গেই তো বিষ্ণুপ্রিয়া আর টারজানের ছবি দেখেছে। কিন্তু মা সিনেমায় দেখার কথা জিজ্ঞাসা করছে না নিশ্চয়। মাথা নাড়ল, দেখেনি।

—তবে শমীকে বললি কি করে?

—তুমি দেখতে কত সুন্দর ওকে বোঝাবার জন্যে।

জ্যোতিরাণীর হেসে ফেলাও বিচিত্র ছিল না। কিন্তু এই মেজাজে হাসির বদলে ভিতরটা রাগে রি-রি করে উঠল। ইচ্ছে করল এক থাপ্পড়ে খাট থেকে ওকে মাটিতে ফেলে দিতে। সংযত করলেন নিজেকে। সত্যি বললে কিছু করবেন না কথা দিয়েছিলেন, কথা রাখলেন। বাড়ির আর বাইরের যে বাতাসে ও বড় হচ্ছে সেই বাতাসটাই বদলানো দরকার। তাছাড়া মারধর করে কিছু হবে না। আর দেরি না করে সেই ব্যবস্থাই করলেন তিনি।

দরজা খুলে দিয়ে বললেন, যাও। ফের যদি কারো বাড়ির রক বসে আড্ডা দিতে দেখি তো আস্ত রাখব না বলে দিলাম।

সুবোধ বালকের মত সিতু প্রস্থান করল। মায়ের শেষের অনুশাসন নতুন কিছু নয়। দুই-একটা দিন সামলেসুমলে থাকতে হবে এই যা। আসলে মায়ের আজকের এই আচরণ তার কৌতূহলের কারণ; ওই মুখ করে ঘরে আটকে দরজা বন্ধ করতে দেখে প্রথমে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল।

ব্যবস্থার কথা জ্যোতিরাণী কিছুদিন আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন। আদুড় গায়ে মেঘনা এসে যেদিন হেসে গড়িয়েছিল, আর ছোট মনিবের শাসনের কথা বলেছিল—সেদিন থেকেই। নিয়মের কড়াকড়ি আর সংযমের মধ্যে ছেলে মানুষ করা হয় সে-রকম কয়েকটা ভালো সংস্থার নাম-ঠিকানাও সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই রাতেই যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার কাগজপত্র পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে কাছে দূরের চার-পাঁচ জায়গায় চিঠি লিখলেন তিনি। খরচ যত লাগুক আপত্তি নেই, সব থেকে ভালো ব্যবস্থা কাদের তাই জেনে নিতে চান। জবাব এলে নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।

গৌরবিমলের অনাড়ম্বর তত্ত্বাবধানে, জ্যোতিরাণীর একাগ্র উদ্দীপনায় আর মৈত্রেয়ী চন্দের উচ্ছ্বসিত তৎপরতায় প্রভুজী-ধাম রূপ নিচ্ছে, আকার নিচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশনের কাজ চুকে গেছে। ব্যাংকে দু'রকমের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ছোট অ্যাকাউন্টের লেন-দেন জ্যোতিরাণী একাই করতে পারবেন। বড় অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে আগের ব্যবস্থাই বহাল আছে। গৌরবিমল, কালীনাথ আর জ্যোতিরাণী—যে-কোনো দুজনের সইয়ে টাকা উঠবে। এই তিনজনের বাইরে ট্রাস্ট কমিটিতে শুধু মৈত্রেয়ী চন্দ আছেন। গৌরবিমল বিভাস দত্তর নামটা রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জ্যোতিরাণী এক কথায় সে-প্রস্তাব ছেঁটে দিয়েছেন। বলেছেন, দরকার নেই, ওঁকে এ-সবের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

কালীনাথের সামনেই মৈত্রেয়ী চন্দ আর একটা নাম দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বলেছেন, এই নামটাতেও আমার আপত্তি—এও বাতিল করলে ভালো হয়।

নামটা কালীনাথের। মামাশ্বশুরের সামনে বসে বলেই জ্যোতিরাণী একটু বিরক্ত হয়েছেন। আবার বিব্রতও বোধ করেছেন। কিন্তু গৌরবিমল অবাক, কালী থাকলে আপনার আপত্তি...?

আরো গম্ভীর হয়ে মৈত্রেয়ী মাথা নেড়েছেন।—হ্যাঁ, এ-বয়সে মাস্টারমশায় সহ্য হয় না।

রসিকতা ধরে নিয়ে গৌরবিমল হেসেছেন। আর হেসে ফেলেছিলেন জ্যোতিরাণীও। কালীনাথ ঘরের ছাদে চোখ রেখে মন্তব্য করেছেন, এই আপত্তিতে আমার সমর্থন আছে, কারণ মাস্টার থাকলেই তার হাতে ছড়ি থাকবে।

যাই হোক, আপত্তি এবং সমর্থন দুই-ই নাকচ করা হয়েছে। ট্রাস্ট কমিটির প্রধানা জ্যোতিরাণী এবং সংস্থার সর্বময়ী কর্মাধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী চন্দ। গৌরবিমল প্রভুজী-ধাম সংস্কারে মন দিয়েছেন। জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে, পুকুর সাফ করা হচ্ছে, বাড়িটারও ভোল ফেরবার জন্য অনেক লোক লেগে গেছে। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে জ্যোতিরাণী প্রায়ই দেখতে যান। এক-একদিন বীথিকেও সঙ্গে নেন। আর তখন ধমকেই তাকে একটু-আধটু সাজ-পোশাক করিয়ে ছাড়েন মৈত্রেয়ী। তার প্রতি মিত্রাদির প্রচ্ছন্ন টানটুকু জ্যোতিরাণী অনুভব করতে পারেন।

কাগজে সেদিন ছোট খবর বেরুলো একটা। জ্যোতিরাণীর চোখে পড়েনি। তাঁকে খবরটা দেখালো সিতু। ইদানীং তাকে খুব মনোযোগসহকারে কাগজ পড়তে দেখা যাচ্ছে। জ্যোতিরাণীর ধারণা খেলার খবর পড়ে, ক্রিকেট মৌসুম আসছে। ছেলের ওপর সেই থেকেই যতটুকু সম্ভব নজর রেখে চলেছেন তিনি। কাগজ এনে যা দেখালো সেটা প্রভুজীধামের খবর। অল্প দু'-চার কথায় জ্যোতিরাণী আর মৈত্রেয়ীর প্রশস্তি। যে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সরকার হিমসিম
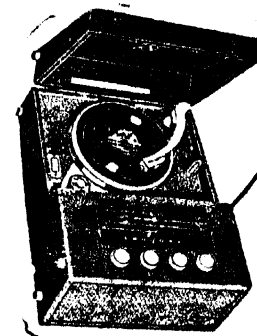
থাকে, তারই এক অংশকে সুস্থ নির্বিঘ্ন জীবনে ফিরিয়ে আনার আদর্শ পরিকল্পনায় দুটি অভিজাত মহিলার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। প্রশংসা জ্যোতিরাণীরই বেশি—নগর পারে তার বিরাট সৌধ আর চার-পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে এগিয়ে আসার খবরটাও বাদ পড়েনি।

কাগজে খবরটা কে পাঠালো জ্যোতিরাণী ভেবে পেলেন না। মিত্রাদি রোজই আসছে। আলোচনা করে এখন কাগজে লেখা হয় কি হবে না হবে, সাজ-সরঞ্জাম কি থাকবে না থাকবে। তাকে জিজ্ঞাসা করে বোঝা গেল খবরের কাগজে তার মারফৎ কোনো রিপোর্ট যায়নি। খবর পড়ে খুশিতে আটখানা হয়ে ফিরে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছে, খবরটা কে ছাপতে দিলে। আর তাহলে বাকি থাকল কালীদা আর বিভাস দত্ত। মামাশ্বশুর এ-সবের মধ্যে যাবেন না জানা কথা, তিনি প্রচারের ধার ধারেন না। কালীদার কাজ তাও মনে হয় না, জ্যোতিরাণীর ধারণা কাগজের আপিসে খবরটা বিভাস দত্তই পাঠিয়েছেন। কাগজের আপিসের সঙ্গে একটু-আধটু যোগাযোগ ওই ভদ্রলোকেরই আছে। তাছাড়া রিপোর্টের প্রশংসার মধ্যে জ্যোতিরাণীর নাম আর মহৎদয় দানের বিশেষ উল্লেখ দেখেও তাঁর কথাই মনে হয়েছে।

দু'দিন বাদে বিকেলের দিকে বাড়িতে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ মিলল। বয়েস তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে। হাতে ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ বাল্ব-এর ছোট চামড়ার থলে। নীচের বসার ঘরে জ্যোতিরাণী ছিলেন আর মৈত্রেয়ী ছিলেন। গোড়ায় ক'টি মেয়ে নেওয়া হবে, কিভাবে নেওয়া হবে, কোন্ গোছের মেয়ে নেওয়া হবে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে কিনা—সেই ফয়সালাই হয়ে ওঠেনি এখনো।

এরই মধ্যে ওই ভদ্রলোকের আবির্ভাব। নামী কাগজের রিপোর্টার। সপ্রতিভ হাবভাব। ভুল জায়গায় আসার পাত্র নন। বারান্দা থেকে রমণী দুটিকে দেখামাত্র দৃষ্টি প্রসন্ন। অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর একে-একে দুজনের দিকে চেয়েই নির্ভুল অনুমানের কৃতিত্ব দেখালেন।—আপনি মিসেস জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জি আর আপনি মিসেস মৈত্রেয়ী চন্দ তো?

জ্যোতিরাণী বিস্মিত একটু। মৈত্রেয়ীর চোখে-মুখে চাপা খুশির ছটা।

পকেট নোট-বই বার করে রিপোর্টার অসময়ে বিরক্ত করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। প্রভুজীধাম সম্পর্কে তাঁদের কাগজে যে ছোট রিপোর্টটা বেরিয়েছে, তারই বিশদ বিবরণ সংগ্রহের তাগিদে আসা। বলা বাহুল্য, এখানে আসার পর আর বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান-প্রধানাকে দেখার পর তাঁর বিবরণ সংগ্রহের তাগিদ আগ্রহের আকার নিয়েছে।

কিন্তু জ্যোতিরাণী বেশির ভাগ সময় চুপচাপ। সকৌতুকে মিত্রাদিকে লক্ষ্য করছেন। পারেও। রিপোর্টার এক কথা জিজ্ঞাসা করলে মৈত্রেয়ী সাত কথা বলছেন। শেষে জিজ্ঞাসা করারও দরকার হল না। কি হতে যাচ্ছে, কি হবে আর দেশের মানুষ সাড়া দিলে কি হতে পারে—এ নিয়ে ছোট-খাট একটা লেকচার দিয়ে বসলেন তিনি। এত বড় আদর্শ পরিকল্পনার মধ্যে বারবার করে জ্যোতিরাণীর দাক্ষিণ্যের প্রচারটা যখন স্পষ্ট করে তুলছিলেন তিনি, তখনই শুধু অস্বস্তি। প্রভুজীধাম সম্পর্কে এক বিস্তৃত চিত্র সংগ্রহ করে রিপোর্টার জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন।—এরকম একটা সংকল্প আপনার মনে এলো কি করে?

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি মৈত্রেয়ীকে দেখিয়ে দিলেন।—ওঁর জন্যে।

মৈত্রেয়ী চন্দ খুশি মুখে চোখ পাকালেন। কাগজের মানুষটি এ-রকম সংক্ষিপ্ত জবাবে তুষ্ট নন। প্রতিষ্ঠানের টাকা-পয়সা আর ঘর-বাড়ির প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু ওই-রকম এক কথা দু'কথার বেশি জবাব জোগালো না জ্যোতিরাণীর মুখে। অগত্যা নোট-বই বন্ধ করে ভদ্রলোক ক্যামেরার দিকে মন দিলেন। নরম চামড়ার ব্যাগ থেকে ফ্ল্যাশ বাল্ব বার করতে করতে বললেন, আপনাদের আর একটু কষ্ট দেব, আলাদা দু'টি ছবি তুলব আর একসঙ্গে একটা—

জ্যোতিরাণীর মুখে বিড়ম্বনার চকিত ছায়া। কি ভেবে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।—একটু বসুন, আসচি—

দোতলার সিঁড়িতে পা দেবার আগেই বাধা পেলেন, তাঁর পিছনে মৈত্রেয়ীও উঠে এসেছেন। চাপা গলায় ডেকে থামলেন। তাঁর অনুমান, ফোটো তোলা হবে বলে একটু প্রসাধন সেরে আসতে যাচ্ছেন। ডাকলে তিনিও সঙ্গ নিতে পারেন। কিন্তু একটা কর্তব্য-কর্ম স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই উঠে এসেছেন তিনি। বললেন, শোনো, কাগজের লোকদের সর্বদা পায়া ভারী, এলে একটু চা-টা দিয়ে খাতির-যত্ন করতে হয় কিন্তু...।

—ও, মিত্রাদির উদ্দীপনা দেখে জ্যোতিরাণীর হাসি পেল—কাগজের লোকেরা যে তোমার গুরুঠাকুর বোঝা গেছে, করছি খাতির-যত্ন, তুমি বোসোগে যাও।

ওপরে উঠে গেলেন। মুখের কি ছিরি হয়ে আছে কে জানে—বলার আর অবকাশ পেলেন না মৈত্রেয়ী। অগত্যা ঘরেই ফিরলেন।

দু'-চার জনের জলযোগের ব্যবস্থা মজুতই থাকে। ভোলার চা তৈরিও সারা। কর্ত্রীর নির্দেশে তক্ষুনি চা জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে ছুটল সে।

জ্যোতিরাণী নেমে এলেন মিনিট আট-দশ বাদে। দেখলেন, মিত্রাদি সাধাসাধি করে খাওয়াচ্ছে ভদ্রলোককে। নিজের খাবারটা তেমনি পড়ে আছে।

পরিতুষ্ট সাংবাদিক জলযোগ সেরে আবার ক্যামেরা হাতে নিলেন। আর তক্ষুনি একবার ওপর থেকে ঘুরে আসার বাসনা ব্যক্ত করতে গিয়ে থমকালেন মৈত্রেয়ী চন্দ। জ্যোতিরাণীর দিকে চেয়ে কোনরকম প্রসাধন বিন্যাসের আভাসও পেলেন না।

ও দিকে রিপোর্টার ভদ্রলোকও ক্যামেরায় মন দেবার অবকাশ পেলেন না। জ্যোতিরাণী বললেন, আমাদের ছবি তোলার দরকার নেই, আপনি এটা নিয়ে যান। একটা পাসপোর্ট সাইজের ফোটো তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।

অপ্রস্তুত মুখে ভদ্রলোক সেটা হাতে নিয়ে দেখলেন।—ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি বোধহয়?

—হ্যাঁ। ছবি যদি ছাপতেই হয় এইটে ছাপুন। আমরা যা-কিছু করতে যাচ্ছি, এঁর জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

মৈত্রেয়ীর দু'চোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর বিচরণ করে ফিরল একপ্রস্থ। কাজ সহজ হয়ে গেল বলে রিপোর্টারটি গাত্রোত্থান করলেন না তক্ষুনি। বললেন, বেশ তো, কিন্তু এই সঙ্গে আপনাদেরও একখানা করে ছবি নেব, আসল কাজ তো আপনারাই করবেন।

জ্যোতিরাণী মিষ্টি করেই বাধা দিলেন, আসল কাজ বলে কিছু নেই, এর পিছনে আরো অনেকে আছেন—ছবি যদি ছাপতেই হয়, দয়া করে ওইটেই ছাপুন।

এবারে মৈত্রেয়ীও সায় দিলেন, আসল মানুষকেই যদি খোঁজেন, তাহলে ওই ছবিখানা ছাপলেই হবে, এই ভদ্রলোকের টাকা আর সহানুভূতি না থাকলে এতবড় এক ব্যাপারে হাত দেবার কথা ভাবাও যেত না।

অগত্যা আসল মানুষের ছবি নিয়েই বিদায় নিতে হল ভদ্রলোককে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে মৈত্রেয়ী বললেন, এভাবে হতাশ করলে বেচারাকে?

জ্যোতিরাণী হাসিমুখে পাল্টা ঠেস দিলেন, হতাশ একটু তুমিও হয়েছ মনে হচ্ছে।

—তা যা বলেছ ভাই, সানন্দে স্বীকারই করলেন মৈত্রেয়ী চন্দ, ছবি তোলার জন্য আমি আরো আঁট-সাঁট হয়ে বসতে যাচ্ছিলাম—ভাগ্যি বলে ফেলিনি কিছু! হেসেই অনুযোগ করলেন, তোমার যদি কিছু সখ থাকত, পাশাপাশি দিব্বি তিনজনের ছবি বেরুতো, হাজার হাজার লোক দেখত, আর সত্যি কিছু করতে যাচ্ছি বলে নিজেদেরও আনন্দ হত, তুমি দিলে পণ্ড করে।

—আগে বললে না কেন, তিনজন ছেড়ে পাশাপাশি না হয় দুজনেরই বেরুতো।

—থাক্, অত ভাগ্যে কাজ নেই। ছবি তুলতে পারলে কাগজে যা বেরুবার বেরুতো। কিন্তু বউকে লুকিয়ে রিপোর্টার ভদ্রলোকের নিজস্ব ফাইলে শুধু একখানি ছবিরই জায়গা হত, বুঝলে?

জ্যোতিরাণী হেসে ফেললেন।—না তুলতে দিয়ে তাহলে ভালো করেছি বলো।

খবরের কাগজের রিপোর্টারকে দেখে ভিতরে ভিতরে একটাই খবর জানার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। প্রভুজীধাম সম্পর্কে যে-রিপোর্ট গোড়ায় ছাপা হয়েছে, সেটা তারা পেল কোথায়। কিন্তু মিত্রাদি ছিল বলেই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেননি। কারণ তখনো ধারণা জিজ্ঞাসা করলে বিভাস দত্তর নামটাই শুনবেন। সেই রিপোর্টে জ্যোতিরাণীর প্রশংসার বিশেষ

উল্লেখের দরুন মিত্রাদিকে রসের খোরাক জোগাতে রাজি নন তিনি।

ইতিমধ্যে রোজই কাগজ উল্টে মৈত্রেয়ী সত্যিই হতাশ হয়েছেন। অনুযোগ করেছেন, ছবি তুলতে দাওনি সেই আক্কেল দিচ্ছে ভদ্রলোক, রাগ করে কোনো খবরই বার করলে না।

খবর চার দিনের দিন বেরুলো। বেশ বিস্তৃত খবর। ওপরে শিবেশ্বর চাটুজ্জের ছবি। বড় বড় হরপে তাঁর অবদানের শিরোনামা।

প্রথমেই কাগজ দেখেছেন কালীদা, তিনি মামাশ্বশুরকে দেখিয়েছেন। তাঁরা যেমন অবাক তেমনি খুশি। সিতুও সাগ্রহে বাবার ছবি দেখেছে, খবর পড়েছে। আনন্দে মিত্রাদি পনের মিনিট ধরে টেলিফোনে বক-বক করেছে। বলেছে, কাগজের ওই ছবির পাশে তুমিও থাকলে ভালো হত—বেশ ভরাট দেখাতো—এখন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। জিজ্ঞেস করেছে, শিবেশ্বরবাবু কি বলেন?

দুই-একটা হাল্কা জবাব দিয়ে জ্যোতিরাণী তাকে আরো খুশি করেছেন।

গত রাতে বাড়ির মালিক কখন বাড়ি ফিরেছেন জ্যোতিরাণী টের পাননি। বেশি রাতেই ফিরেছেন মনে হয়। যতক্ষণ জেগে ছিলেন পাশের ঘরে আলোর আভাস দেখেননি।

সকালের কাগজে ছবি আর খবর বেরুবার পর এই একটি মুখের প্রতিক্রিয়া দেখার বাসনা জ্যোতিরাণীরও মনে মনে ছিল। বেশ বেলা পর্যন্ত ঘরের বাইরে তাঁর সাক্ষাৎ মেলেনি বলে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিও একটু। এই সামান্য ব্যাপারেও মাথা গরম হল কিনা কে জানে। মানের পরদা তো বাতাসে নড়ে এখন।

শামু খবর দিল একজন শিল্পী দেখা করতে এসেছেন। ব্যস্ত হয়ে জ্যোতিরাণী নেমে এলেন। ভালো আঁকতে পারে মিত্রাদির কাছে এমন একজন শিল্পীর সন্ধান চেয়েছিলেন তিনি। একই ব্যাপারে মামাশ্বশুরের সামনে কালীদাকেও অনুরোধ করেছিলেন। উদ্দেশ্য, প্রভুজীধামে প্রভুজীর একখানা প্রমাণ আয়তনের রঙিন ছবি থাকবে। কালীদা অবাক হয়েছিলেন, পরে ঠাট্টা করেছিলেন, মানিকরাম নাম শুনেই ছবি এঁকে দেবে এমন শিল্পী তো দেখিনে—তবে আমাকে আর মামুকে দেখে কমবাইন্ করে আঁকলে কাছাকাছি কিছু একটা হতে পারে বটে। শুনেছি ভদ্রলোক ধার্মিকও ছিলেন আবার ঝানু বাস্তববাদীও ছিলেন। আর মিত্রাদি এক মস্ত শিল্পীর নাম করেছিল, বলেছিল, একটু-আধটু পরিচয় আছে, ভয়ানক খেয়ালী মানুষ, কাজ হবে কিনা বলা শক্ত—তবে আলাপ করে দেখা যেতে পারে।

সেই নাম-করা শিল্পীই বাড়িতে হাজির।

এদিকে নীচে আপাতদৃষ্টিতে ছোট্ট একটা যোগাযোগের খবর জ্যোতিরাণী রাখেন না। ঘরে ঢুকেই অবাক তিনি। শিল্পীর সামনে গম্ভীর মুখে সিতু বসে আছে, আর তার দিকে চোখ [illegible] ভদ্রলোক

একটা সাদা কাগজে খস-খস আঁচড় ফেলছেন।

আধ মিনিটের মধ্যে সাদা কাগজে সিতুর মুখের আদল ভেসে উঠল। ভদ্রলোক সেটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন—পাশ, না ফেল?

বিস্ফারিত সিতু সাদা কাগজ দেখছে কি ম্যাজিক দেখছে জানে না। জ্যোতিরাণীও সাগ্রহে লক্ষ্য করলেন কাগজটা। হুবহু সিতুর মুখই বটে। ভিতরে ভিতরে কি অনুভূতির ফলে হঠাৎ যেন নির্বাক তিনি। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কি আনন্দের স্পর্শ যেন। কিসের আনন্দ, কেন আনন্দ জানেন না।

শিল্পীর বয়েস খুব বেশি নয়, বছর পঞ্চাশের মধ্যে। ঝাঁকড়া এক-মাথা কাঁচা-পাকা চুল, খোঁচা-খোঁচা এক-গাল কাঁচা-পাকা দাড়ি। পরনের মোটা জামা-কাপড়ও ফরসা নয় তেমন। পান-খাওয়া ঠোঁট। হাসিমুখে জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন। কিন্তু দৃষ্টিটা মুখের ওপর থেকে যেন নড়তে চাইল না তারপর। দু'হাত জোড় করে জ্যোতিরাণী নমস্কার জানালেন, কিন্তু তারও উত্তর মিলল না।

জ্যোতিরাণী অস্বস্তি বোধ করেও করলেন না। পুরুষের নিবিষ্ট চোখ নয়। সরল চাউনি। ভালো লেগেছে তাই চেয়ে আছেন যেন। অবশ্য কয়েক মিনিট মাত্র, আত্মস্থ হয়ে শিল্পী হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন।—আপনার ছেলে?

এ-ধরনের আলাপে অভ্যস্ত নন, জ্যোতিরাণী কৌতুক বোধ করছেন। মাথা নাড়তে একগাল হেসে ভদ্রলোক তাঁর পরীক্ষার ফিরিস্তি দিলেন। অর্থাৎ, একজন শিল্পী দেখা করতে এসেছেন খবর পাঠাতে শুনে ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছিল, তার মা কোনো পাগলের পাল্লায় পড়বে কিনা ভাবছিল বোধহয়। তিনি ইশারায় ডাকতে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কিসের শিল্পী—ছবি আঁক, না গান করো, না সিনেমা করো? ছবি আঁকেন শুনে ছেলে তক্ষুনি একটা কাগজ-পেন্সিল এনে দিয়ে হুকুম করেছে, এঁকে দেখাও।

জ্যোতিরাণীর ভালো লাগছে। কেন যে এত ভালো লাগছে জানেন না। হেসে বললেন, ও ভয়ানক দুষ্টু। আপনি নিজে এসেছেন, আমার খুব ভাগ্য।

সাদাসিধেভাবেই শিল্পী জানালেন, মিসেস চন্দ তাঁকে আসতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে ছিল না। সকালের কাগজে প্রভুজীধামের খবর দেখে মনে পড়েছে। এই নামের কি এক প্রতিষ্ঠানের কথাই বলেছিলেন তিনি। কাগজ পড়েই চলে এসেছেন।

কাজের কথায় আসার জন্য ছেলেকে যেতে বলতে গিয়েও কেন যে বললেন না, তাও নিজের কাছে স্পষ্ট নয় খুব। শুধু মনে হল, আছে থাক। সবিনয়ে আরজি পেশ করলেন। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। শিল্পী যদি দয়া করে একবার সাগরে যান আর সেখানকার বিগ্রহ কপিলদেবের একখানা বড় অয়েল পেণ্টিং করে দেন...প্রভুজীধামের জন্য বিশেষ দরকার।

ভদ্রলোক হাঁ না কিছুই বললেন না। তাঁর দিকে চেয়ে ছেলের মাথার চুলগুলো নিয়ে খেলা করছেন। জ্যোতিরাণীর আরো একটু অভিলাষ ব্যক্ত করার ইচ্ছে। সংকোচ কাটিয়ে বলেই ফেললেন, সাগরের কপিলদেবের বিগ্রহ আমি দেখিনি...কিন্তু হুবহু বিগ্রহই আমি চাইনে—তাঁর মধ্যে মানুষের আদল এনে দিতে পারলে ভালো হয়।

সিতুর মাথার ওপর শিল্পীর আঙুল থেমে গেল, সরল চাউনিটা জিজ্ঞাসু হয়ে উঠতে লাগল। লজ্জা পেয়ে জ্যোতিরাণী একটু হেসে বললেন, এ-রকম সম্ভব কিনা জানি না, মন ও-রকম কিছু চাইছিল তাই বলে ফেললাম।

শিল্পীর চোখে কৌতূহলের আভাস, ঠিক বোঝা গেল না, আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

ভরসা পেয়ে জ্যোতিরাণী এবারে বিশদ করেই বললেন। এ-বংশের পূর্বপুরুষদের যিনি প্রধান, তাঁর অর্থাৎ মানিকরামের উপাস্য ওই কপিলদেব। তিনি তাঁকে প্রভুজী ডাকতেন। পরের বংশধরদের চিন্তায় আর কল্পনায় মানিকরাম আর প্রভুজী এক হয়ে গেছেন। মানিকরামই প্রভুজী। কিন্তু মানিকরামের কোনো ছবি নেই। তাই জ্যোতিরাণীর এই গোছের একটা কল্পনা মাথায় এসেছে। বিগ্রহের মধ্যে মানুষের আদল ফুটিয়ে তুললে যা দাঁড়াবে, প্রভুজীর আলেখ্য হিসেবে সেটাই প্রভুজীধামে স্থাপন করবেন।

সিতু হাঁ করে মায়ের কথা গিলছে। মা আবার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামায় তার ধারণা ছিল না। ও বরং ঠাকুমার মুখে তাদের আগের কালের কত গল্প শুনেছে। এদিকে শিল্পীকে লক্ষ্য করছেন জ্যোতিরাণী, তাঁর উদ্ভট প্রস্তাব শুনেও হেসে উঠলেন না। উল্টে একটু তন্ময়তা দেখলেন যেন। ভাবছেন কিছু।

—পূর্বপুরুষদের কার কার ছবি আছে আনুন তো। আর হালের কারো ছবি থাকলেও আনবেন।

সাগ্রহে জ্যোতিরাণী ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন। পূর্বপুরুষ বলতে আদিত্যরামের ছোট একখানা রঙ-চটা হাতে আঁকা ছবি আছে। আর শ্বশুরের তো আছেই। সে-দুটো নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে জ্যোতিরাণী থমকালেন একটু। তারপর কি ভেবে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে অ্যালবাম থেকে শিবেশ্বরেরও একটা ফোটো বেছে নিলেন।

গভীর মনোযোগে শিল্পী ছবি তিনখানা উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তারপর হঠাৎ দু'হাতে দু'গাল ধরে সিতুর মুখখানা নিজের দিকে ফেরালেন তিনি। কি দেখলেন তিনি জানেন। ওর হাত থেকে একটু আগে পেন্সিল-এ আঁকা কাগজটা টেনে নিয়ে বাকি তিনখানা ছবিসহ উঠে দাঁড়ালেন।—আচ্ছা যদি কিছু করতে পারি তো আসব, নয়তো এগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেব।

কোনরকম সম্ভাষণ না জানিয়ে ভদ্রলোক চলে যাবার খানিক বাদে জ্যোতিরাণীর হুঁস ফিরল যেন। ছেলে সকৌতুকে মাকে নিরীক্ষণ করছে।

হ্যাঁ, মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য জ্যোতিরাণীর কি যেন হয়েছিল। হঠাৎ বুকের ভিতরে কাঁপুনি ধরেছিল।...ভদ্রলোক সিতুর মুখটা নিজের দিকে ঘোরানো মাত্র, পেন্সিলে ওর মুখ-আঁকা কাগজটা টেনে নেওয়ার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত। কাঁপুনিটা ভয়ের নয় আদৌ, উত্তেজনারও নয়। কিসের যে, জ্যোতিরাণী জানেন না। শুধু বড় আশ্চর্য অনুভূতি একটা।

জ্যোতিরাণী বি-এ পাস করেছেন, এম-এও পড়েছেন কিছুদিন। ক'দিন আগেও বিলিতি নভেল পড়ে আর বিলিতি ছবি দেখে বেশির ভাগ সময় কেটেছে। শাশুড়ীর মুখে পূর্বপুরুষদের অনেক অলৌকিক আখ্যান শুনেছেন। বলতে বলতে শাশুড়ীর গায়ে কাঁটা দিয়েছে, কিন্তু জ্যোতিরাণীর বুদ্ধির দরবারে ও-সব কিছু পৌঁছয়নি। শাশুড়ী নাতির মাথায় পাকা চুল দেখে অনেক বিচিত্র কল্পনায় গা ভাসিয়েছেন আগে—জ্যোতিরাণী কখনো হেসেছেন, কখনো বিরক্ত হয়েছেন। স্বাধীনতার রাতে ওর বাবা যেদিন চাবুকের ঘায়ে ছেলের পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছিল, আর তারপর ঘুম-ভাঙা জ্বরের ঘোরে ছেলের চোখের গলানো বিদ্বেষের ঝাপটা খেয়ে জ্যোতিরাণী যখন নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন—হতাশার সেই এক রাত্রে শুধু এই গোছের একটা দুর্বোধ্য শিহরন তিনি অনুভব করেছিলেন, মনে পড়ে। কিন্তু তাও ঠিক এই রকমই নয় বোধহয়।

শিল্পী চলে যাবার পর খেয়াল হল টাকা-পয়সার কথা বা সাগরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা কিছুই বলা হল না। অবশ্য ভদ্রলোককে যে-রকম দেখলেন, খেয়াল থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ছেলেকে স্কুলের তাড়া দিয়ে গভীর একটা পরিতৃপ্তি নিয়ে তিনি ওপরে উঠে এলেন। অনেক—অনেক কালের গ্লানি অনেক তাপ অনেক ক্ষোভে ক্লিষ্ট স্নায়ুগুলোর ওপর ভারী আশ্চর্যরকমের একটা ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়েছে। কি, সেটা এখনো ঠাওর করতে পারছেন না। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছেন আর আস্বাদন করছেন শুধু। এখন গোটাগুটি বাস্তবে ফিরেছেন, কিন্তু অনুভূতিটুকু ছাড়িয়ে আছে। বাস্তবে ফিরেছেন, তবু ভাবছেন, বাড়িতে কত লোকই তো আসে যায়, শিল্পীর সঙ্গে ছেলেটার এমন একটা কৌতুককর যোগাযোগ হল কি করে...।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুরাবস্তু সংরক্ষণ

জগতের কোনো বস্তুই বোধহয় চিরদিন 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে থাকতে পারে না। মানুষের সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পস্থাপত্যের কত মহামূল্য নিদর্শন কালক্রমে জীর্ণ বা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মিউজিয়মে এইসব ঐতিহাসিক পুরাবস্তুর নিদর্শন আজও কিছু কিছু আছে। কিন্তু এগুলিকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে সেগুলি ক্রমেক্রমে বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মূল্যবান নিদর্শনগুলিকে সংরক্ষণের জন্যে নানা উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। গত দুই দশকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পুরাবস্তুগুলিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিশেষ প্রসার লাভ করেছে এবং এই ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রসূ বলেও প্রমাণিত হয়েছে।

কয়েকটি কারণে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে। প্রথমত, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যে সব পুরাবস্তু খুঁড়ে বার করেন, তার অনেকগুলি মিউজিয়মের প্রচলিত অবস্থায় দ্রুত ক্ষয় পাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতার ফলে শুধু যে পুরাবস্তুর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে উপকরণের বৈচিত্র্যও অনেক বেড়ে গেছে। এছাড়া, ক্ষতিকারক গ্যাসের দ্বারা, বিশেষত সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসের দ্বারা আবহাওয়া দূষিত হওয়ার ফলে কোনো কোনো শ্রেণীর ঐতিহাসিক নিদর্শন ভয়াবহভাবে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উন্মুক্ত আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনগুলিকে কালের কবল থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করছেন। সমগ্র পৃথিবী থেকে তাঁরা এক সমীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খোলা জায়গায় পাথরের যেসব শিল্পনিদর্শন রয়েছে, সেগুলি রোদ বৃষ্টি ও দূষিত আবহাওয়ায় দ্রুত ক্ষয় পাচ্ছে। প্রাচ্য অঞ্চলে অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও ছত্রাক জন্মাবার দরুন পাথরের বহু শিল্পনিদর্শন বিনষ্ট হয়ে গেছে। প্রচণ্ড শীতের দরুন রোমান ফোরাম ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে, ফ্লোরেন্সের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভেনিস খালের তীরে যেসব অমূল্য পাথরের মূর্তি আছে, মোটরবোটের ধোঁয়ায় সেগুলির বিনাশ প্রায় হতে চলেছে।

সমীক্ষার ফলে আরও জানা গেছে, এথেন্সের ২৪ শত বছরের প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন, যেমন পারথেনন, রক্ষার ব্যাপারে রীতিমত দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। কারণ এক শীতের রাত্রিতে প্রবল বৃষ্টি হয় এবং পরদিন বেদীর কাছে কয়েক টুকরো ভাঙা পাথর পাওয়া যায়।

সমগ্র বিশ্বের শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শন-গুলিকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষার জন্যে গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কেবল পাথরের মূর্তিই নয়, প্রাচীর চিত্র, তৈল চিত্র, ধাতু, চামড়া এবং সুতোর তৈরী পুরাবস্তুগুলিকে সংরক্ষণের জন্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

উদাহরণস্বরূপ এখানে পাথরের জিনিস সংরক্ষণের পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে। আমরা জানি, পদ্ধতি যাই হোক না কেন, তাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং এই পদ্ধতি এমন হওয়া দরকার যাতে অদক্ষ শ্রমিকেরা সহজে তা প্রয়োগ করতে পারে। তা ছাড়া, শিল্পনিদর্শনগুলিকে রক্ষা করতে গিয়ে সেগুলির যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। এমন একটি বস্তু চাই যা চুনা পাথরকে কালের নিষ্ঠুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। এজন্যে বিজ্ঞানীরা প্রথমে পাথরের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তারপর পাথর কিভাবে ধীরে ধীরে শক্ত হয় অথবা কালের কবলে পড়ে নরম হয় এবং কিভাবে তার রং বদলায় সেই সব নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হন।

একটি পুরাকালের অস্ত্র রেডিওগ্রাফের সাহায্যে প্রাথমিক পরীক্ষা

তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার পর এক ইঞ্চি লম্বা কয়েকটা চুনা পাথরের টুকরো নিয়ে তাতে সিকি ইঞ্চি গর্ত করলেন এবং খড়িমাটি ও কাঠ-কয়লার গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে সেই গর্তে পুরে দিলেন। পরে সে-গুলিকে বেরিয়াম, জল এবং ইউরিয়া মিশ্রিত দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলেন।

এক মাস পাথরগুলিকে দ্রবণ থেকে তুলে দেখা গেল, সেগুলি আসল পাথরের মতো হয়ে গেছে। ক্যালসিয়ামের দানাগুলি এই তরল মিশ্রণে রাখার ফলে জমে যে পাথরের মতো হয়—বিজ্ঞানীদের এই তত্ত্ব এর দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এই তরল পদার্থ প্রয়োগের ফলে পাথর আরও শক্ত হয় এবং ক্ষয় পাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। এতে পাথরের রং বা আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা শ্বেতপাথর (যেমন আগ্রার তাজ-মহল) ও চুনা পাথরের শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনগুলিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ধাতু, চামড়া ও সুতোর তৈরী পুরা-বস্তুগুলিকেও সংরক্ষণের জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন ও করছেন। এই সংরক্ষণকাজে যেমন প্রয়োজন রাসায়নিক ও পদার্থিক পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান তেমনি প্রয়োজন শ্রমসাধ্য সুপরিকল্পিত গবেষণা।

অবৈজ্ঞানিকভাবে প্যালেস্টাইনের পুরাকালের পাত্রটি পরিষ্কার করতে যাওয়ার পরিণতি

ভারতীয় বিজ্ঞানীর অভিনব আবিষ্কার

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৬ সালে খ্যাতনামা বাঙালী জীববিজ্ঞানী ডঃ

হরেন্দ্রনাথ রায় ম্যালেরিয়া উৎপাদক এক নতুন ধরনের কীটাণু যে আবিষ্কার করেছিলেন তা দীর্ঘদিন ব্যবধানের পর আর একজন বাঙালী বিজ্ঞানীর নিরলস গবেষণার ফলে সত্য বলে বর্তমানে স্বীকৃত হয়েছে।

ডঃ রায় কলকাতায় সুখ্যাতির সঙ্গে জীবাণু ও কীটাণু সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কারের পর ১৯৪৬ সালে উত্তরপ্রদেশের কুমায়নের মুক্তেশ্বরস্থিত কেন্দ্রীয় পশু-চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণাগারে কীটাণুতত্ত্বের গবেষণা পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত হন। সেই সময় এক জাতীয় উড়ন্ত কাঠবেড়ালীর দেহে তিনি ম্যালেরিয়া উৎপাদক এক নতুন ধরনের কীটাণু আবিষ্কারে সমর্থ হন। জীবদেহে এই কীটাণু বৃদ্ধির দ্বারা ম্যালেরিয়া উৎপাদক অন্যান্য কীটাণুর সঙ্গে এর এত বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করেন যে একে সম্পূর্ণ এক নতুন শ্রেণীর কীটাণু বলে তিনি নির্ধারণ করেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ম্যালেরিয়া তত্ত্ববিদদের অন্যতম প্রখ্যাত ডঃ গারমান একে অবিশ্বাস্য বলে মন্তব্য করেন এবং তার ফলে ম্যালে-

ভূ-প্রদক্ষিণশীল উপগ্রহের সাহায্যে বিশ্ব-ব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার কাল্পনিক চিত্র
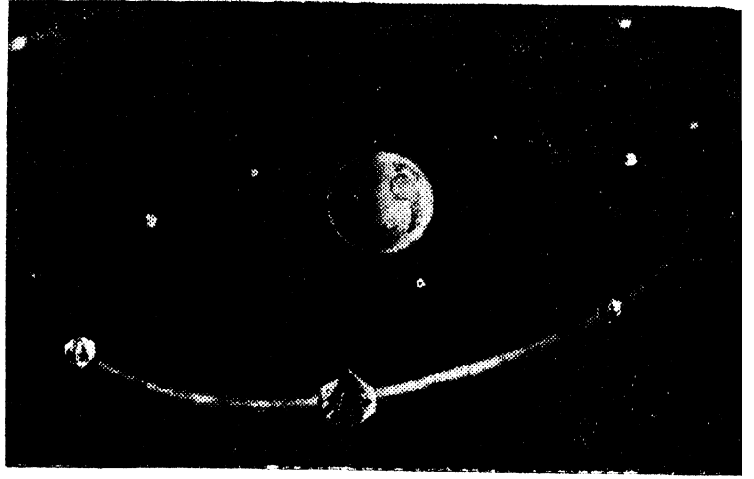
রিয়াসংক্রান্ত কোনও পুস্তকে ডঃ রায়ের আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

কিন্তু ডঃ গারমানের প্রাক্তন শিষ্য ডাঃ বি দাশগুপ্ত এই আবিষ্কারের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্যে প্রায় কুড়ি বছর ধরে নিরলস গবেষণা করেন এবং ডঃ রায়ের আবিষ্কার যে সত্য সেই তথ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছেন। ডঃ গারমানও এখন ডঃ রায়ের আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দান করেছেন।

এই উড়ন্ত কাঠবিড়াল হিমালয়ের পাদদেশে কুমায়ন গাড়ওয়াল থেকে দার্জিলিঙের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে পাওয়া যায়। ডঃ দাশগুপ্ত দার্জিলিঙের সরকারী কলেজের জীবতত্ত্ব বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হয়ে এই গবেষণা পরিচালনে সুবিধা লাভ করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে দীর্ঘ ৭ বছরব্যাপী অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর ১৯৬৪ সালে তিনি ডঃ রায়ের আবিষ্কারের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ পান। এ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ বিচারের জন্যে তিনি জাতিসংঘের অন্তর্গত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাছে প্রেরণ করেন। এই নিবন্ধ পরীক্ষা করে জাতিসঙ্ঘের ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত বিভাগের প্রধানসহ ডঃ গারমান এর প্রমাণাদি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভুল বলে স্বীকার করেছেন। তার ফলে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকায় এই নিবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। ডঃ গারমান নিজে উদ্যোগী হয়ে আগামী নভেম্বর মাসে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড হাইজিন নামক গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক বিজ্ঞানসংস্থার অধিবেশনে ডাঃ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ সম্পর্কে এক আলোচনায় চিত্রাদি দ্বারা এর প্রমাণ দাখিল করবেন। এ ছাড়া বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছেন, এই নতুন আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়া উৎপাদাক কীটাণু অন্য প্রাণীদেহে এবং মানুষের দেহে সঞ্চারিত হয় কিনা সে সম্পর্কে গবেষণা চালাবার জন্যে ডঃ দাশগুপ্তকে তাঁরা অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন।

ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর গুরু ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্মানার্থে এই নতুন আবিষ্কৃত কীটাণুর নাম দিয়েছেন 'রয়েলা রায়ি'।
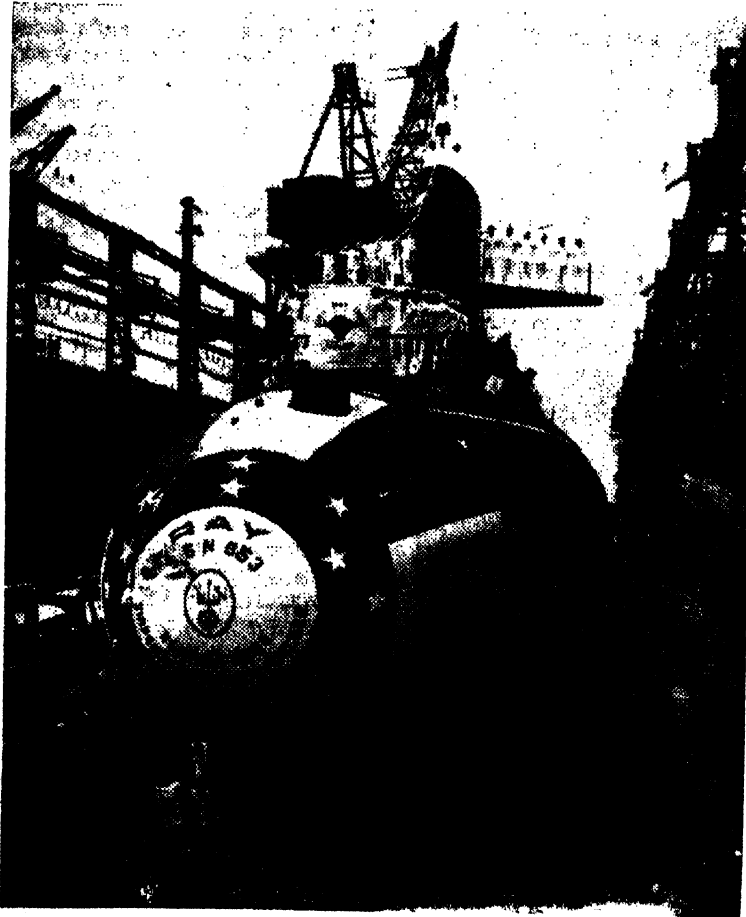
ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী পরমাণুশক্তি চালিত মার্কিন অর্ণবপোত 'রে'।

গোবিন্দপুর সিনে ক্লাব

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
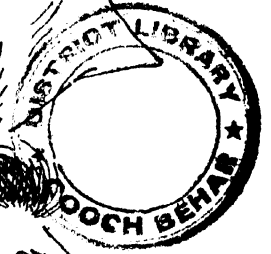
অনেকদিন বেকার থাকার পর পাঁচুগোপাল একটা দিশী কলেজে চাকরি পেয়ে গেল। আজকাল কোনো কোনো ছাত্রদের পড়া জিগ্যেস করা বিপজ্জনক, সুতরাং কলেজের অনেক মাস্টারমশাই তা করেনও না। তবে মাঝে-মধ্যে ছাত্রদেরই কেউ কেউ অনুগ্রহ করে মাস্টারমশাইদের অনুমতি দেয়, আজ পড়া ধরুন। তখন ভয়ে ভয়ে ছাত্রদের যার যা তৈরী আছে তাই বলে যেতে বলেন মাস্টারমশাইরা। তাতে উভয় পক্ষেরই সম্মান বজায় থাকে। পাঁচুগোপাল এত সব জানতো না, সুতরাং প্রথমদিনকার ক্লাশেই ছাত্রদের বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় নিতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। কোন্ ছাত্রের খাতায় যেন কী একটা মন্তব্য লিখে অধ্যাপক পাঁচু-গোপাল দাশ নামের আদ্যক্ষর দিয়ে সই করেছিল পা-গো-দা। ঐ নামই শেষে ছাত্রদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র হয়ে রইলো।

ছাত্র পড়িয়ে পাঁচুগোপাল জনপ্রিয় হতে পারেনি। একালে মানুষ নামকে বড় করে না, নামই মানুষকে জাঁকিয়ে তোলে। এফিডেভিট করে নাম বদলাবার কথাও ভেবেছে পাঁচু-গোপাল, তাতে হয়তো ঝামেলা আরো বাড়বে, এই ভয়ে নিরস্ত হয়েছে। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, বিদ্যেসাগরী চটি ইত্যাদি নিয়মিত পরেও দেখেছে নামের অপকর্ষে ব্যক্তিত্ব খাটো হয়ে যায়। সভাসমিতিতে শ্রুতিসুখকর নামসম্বলিত অধ্যাপকদেরই ডাক পড়ে।

পাঁচুগোপাল বুঝলো এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে তার নামের বাধা তুচ্ছ করেও দলে দলে ছেলেরা তার দিকে আকৃষ্ট হবে। যাত্রা-থিয়েটারের দল করা ভালো দেখাবে না, সিনেমার ডিরেক্টর হলে না হয় —সিনেমা! দি আইডিয়া।

কলেজে এক্‌স্‌কারশনের ব্যবস্থা হয়— কত পয়সা খরচ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপুরে, রৌরকেল্লা, হিউম্যানি-টিজের ছাত্রদের নিয়ে রাজগীর, নালন্দা বেড়াতে যান অধ্যাপকরা। বাছাই করা সিনেমার ছবিইবা তাদের দেখানো হবে না কেন?

এই সূত্রেই চিন্তাটা দেখা দিয়েছিল, মাথা থেকে সেটা মুখে আসতেই স্থানীয় তরুণদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেল; কলেজের কয়েকজন বৈরী ছাত্রও সবিনয়ে বললো, আমরাও মেম্বর হবো, স্যার। আড়ালে বললো, পা-গো-দা একটা জিনিয়াস!

পাঁচুগোপালের বাড়িতেই বৈঠক বসলো। ঠিক যাদের ওপর তার কর্তৃত্ব চলবে এমন কয়েকজনকে সংবাদ দিয়েছিল পাঁচুগোপাল। কলেজের পান্ডাস্থানীয় ছাত্র এসেছে তিনজন।

পাঁচুগোপাল আগে-ভাগেই সব ঠিক করে রেখেছিল—কী করবে, কী বলবে, কাকে কাকে নিয়ে কমিটি করবে।

কলেজের ছাত্ররা ঠিক এতখানি আশা করতে পারেনি, অধ্যাপক পাঁচুগোপাল দাশ নিজের হাতে তাদের সিগারেট দিলেন! পাঁচুগোপাল জানে, এর চেয়ে মোক্ষম দাওয়াই আর নেই, কাল থেকে এরা তার জয়ধ্বনিতে কলেজের দেওয়াল ফাটাবে। ওরা ইতস্তত করছে দেখে পাঁচুগোপাল বললো, ও সব সস্তা ছুঁৎমার্গে আমি বিশ্বাস করি না। এক সঙ্গে বসে ছবি দেখতে পারবো, আর সিগারেট খেলেই দোষ! ইউ আর রিজিনেবলি গ্রোন্ আপ।

সলজ্জভাবে সিগারেট টানতে টানতে ছাত্ররা বললো, আমরা প্রেসে গিয়ে ফর্ম ছেপে আনবো, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মারবো।

কম করে অন্তত জনা কুড়ি মেম্বর তোমাদের করতে হবে ভাই। পাঁচুগোপাল সস্নেহে বললো।

যে ক'জন উপস্থিত ছিল সবাই স্থান পেল কমিটিতে। সভাপতি পাঁচুগোপাল স্বয়ং। বিপ্রপদ সম্পাদক। কলেজের ছাত্র তিনজন বিপ্রপদের দিকে একবার তাকালো, একে পছন্দ হয়নি তাদের। বার তিনেক স্কুল-ফাইনাল ফেল করে পড়াশুনো ছেড়েছে বিপ্রপদ, এখন একটা সাইকেল নিয়ে টো টো করে বেড়ায়। মুখে বলে, সমাজসেবা করছে।

পরের দিন কলেজে একজন ছাত্র বললো, বিপ্রপদকে সম্পাদক করলেন, স্যার? জীবনে ও বিদেশী ছবি দেখল না আর এখন দেখলে কিছু বুঝতে পারবে?

মৃদু হেসে পাঁচুগোপাল বললো, ছবি দেখাও শিখতে হয়। সেজন্যে পড়াশুনো করতে হবে, নিয়মিত কোচিং ক্লাশ করতে হবে। এক একদিন তোমাদের এক একজনকে পাশে নিয়ে বসবো, ছবির ভালোমন্দ বুঝিয়ে দেব। এমনি করতে করতেই তো সবাই শেখে। বিপ্রপদও শিখে নেবে।

না শিখেই সম্পাদক! ছাত্রটি অসন্তোষ প্রকাশ করলো।

এখন আমাদের . সিনে ক্লাবের অনেক কাজ। টাকা তুলতে হবে, মেম্বর করতে হবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ছবির জন্যে কলকাতা যেতে হবে। তাতে খাটুনি অনেক, বিপ্রপদ পারবে। বুদ্ধিমান ছেলে ও। —পাঁচুগোপাল থামলো।

যার যত দম, তার তত বুদ্ধি! ছাত্রটি স্বগতোক্তি করলো যেন। সর্বক্ষণ সাইকেল চড়ে, তাতে হয়েছে কী! মাথার ঘিলু কি থাকে পায়ের গুলিতে?

উৎসাহের অন্ত নেই বিপ্রপদর। সংবাদপত্রের সিনেমার পৃষ্ঠা মন দিয়ে পড়ে প্রতি শুক্রবার। মুখস্থ করে নতুন নতুন ছবির নাম। সকাল-বিকেল দেখা করে পাঁচুগোপালের সঙ্গে। পাঁচুগোপালও কলেজের বইখাতা ত্যাগ করে সিনেমা-জার্নাল নিয়ে মেতেছে। বিপ্রপদকে বাড়িতে পেয়েই অর্জিত বিদ্যেবুদ্ধি একবার ঝালিয়ে নেয় পাঁচুগোপাল। কোনদিন বলে, জানো বিপ্রপদ, এদেশে ভালো ছবি হতে এখনও

ইউ আর রিজনেবল গ্রোন আপ

অনেক দেরী। ছবির ভাষাই এখনও আয়ত্ত হয়নি ডিরেক্টরদের।

কেন, বিপ্রপদ বলে, ভাষা তো বাংলা, তা আবার আয়ত্ত না হবার কী আছে!

সে ভাষার কথা বলছি না। বিজ্ঞতা-মূলক মৃদু হেসে বলে পাঁচুগোপাল, সিনেমার ভাষা হচ্ছে সিম্বল্। মানে, যা দেখাচ্ছে তার আসল বক্তব্য আছে আরো গভীরে। এই যেমন ধরো, চেক্ ছবি 'এ্যানাদার ওয়ে অব্ লাইফ'। এই তো পড়ছিলাম; যা সব সীন আছে না, দেখলে চট করে মনে হবে খাপছাড়া। দুটি যুবককে নিয়ে গল্প—তারা কখনও দেখছে কোন বাড়ির জানলায় এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, জানালায় এক গাদা বালিশ; কখনও আবার ছেলে দুটির একজন বার বার একই বাড়িতে এসে বেল্ টিপছে, সাড়া নেই; একটা পেরাম্বুলেটরের চাকা কেবলই খুলে খুলে যাচ্ছে।

এর মানে কী হলো?

ওগুলোই সিম্বল। মানে খুঁজে বের করতে হবে।

বিপ্রপদ আর প্রশ্ন করতে পারে না, ভাবে এসব সিম্বলের মানে কী হতে পারে।

কোনদিন আবার কলেজের যে সব ছাত্ররা সিনে ক্লাবের সদস্য হয়েছে তারা এসে উপস্থিত হয়। অধ্যাপক পাঁচুগোপাল দাশের মনে ছবি সম্পর্কে কোচিং ক্লাশের পরি-কল্পনা চাড়া দিয়ে ওঠে। সবাইকে সিগারেট অফার করে পাঁচুগোপাল। এখন আর ইতস্তত করে না ওরা, নিঃসঙ্কোচে সিগারেট টানে।

এই ছাত্ররাই সিনে ক্লাবের চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য স্থানীয় চিত্রগৃহ রূপালয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে। রূপালয়ের মালিকের ছেলে গগন সিনে ক্লাব সম্পর্কে উৎসাহী, এ ব্যাপারে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি পয়সায় হল্ পাওয়া যাবে শনিবার; শনিবার রাত্রে ও রবিবার সকালে ইংরেজি ছবি চলে, তাই শনিবার ছাড়া উপায় নেই।

ছাত্রদের সঙ্গে গগনও এসেছে। ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে যে কোন শনিবার সিনে ক্লাবের করা যায়।

কী ছবি আনা যায় বলো দিকি

এক একজন এক একটা ছবি করে। পাঁচুগোপালের কোনটাই পছ না। বলে, জাক দেমির 'লোলা'-ভাগ্-এর উল্লেখযোগ্য ছবি, ওটা দেখ দেখা যায়। নুয়েল ভাগ্ মানে হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ছবির বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ। সিম্বলে ভর্তি।

জার্নাল থেকে টুকে-রাখা ছবি গুলো এক নিশ্বাসে বলে যায় পাঁচু —'সুইডিশ ছবি 'স্মাইলস্ অব এ নাইট', পোলিশ ছবি 'দেয়ার ও লাইফ',-এর পরিচালকের নামটা মনে আলেকজান্দর স্কিবর-রিলস্কি; রবার্তো রসেলিনির 'ওপন সিটি', লা ভিতা, সাড়ে আট, এসব ছবিগুলোর খবর নিতে হবে।

ছাত্ররা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে গোপালের দিকে। সম্মোহিত ছাত্রদের জ্ঞানদান করে অধ্যাপক, এখন আর রিয়ালিজমে হবে না, চাই নিও রিয়া মিকেলানজেলো আন্তোনিওনি, ফে ফেলিনি, এদের শিল্পকর্ম ত বুঝতে হবে।

আমরা বুঝতে পারবো, স্যার?

আমি বুঝিয়ে দেব। অভয় দেয় গোপাল। এক একদিন এক একজন পাশে বসবে, দেখবে সিম্বল কী ছবির ভাষা তো ঐ সিম্বল, দেখতে চোখ তৈরী হবে।

সিনে ক্লাব না হলে ছাত্ররা জ পারতো না ছবির মধ্যে এত জিনিস তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

করিৎকর্মা ছেলে বিপ্রপদ। কাগজপত্তর দেখিয়ে কলকাতার সোসাইটির সহযোগিতায় 'লা দলচে ছবি জোগাড় করে এনেছে। কলকাতায় আগে ওকে উপদেশ ও পরামর্শ দি পাঁচুগোপাল: বলেছিল, ওদের সম্প ঠিকানা তো দিলাম, স্ট্রেট্ গিয়ে করবে। আমার নাম-টাম করো না চিনতে পারবে না, হয়তো রেগে-টেগে

মনে মনে বিপ্রপদর কর্মদক্ষতার করে পাঁচুগোপাল। সব তো ও-ই ব ভাগিস বেশি লেখাপড়া শেখেনি! তা কি আর হ্যান্ডবিল বিলুনো থেকে মঞ্চ পর্যন্ত সব কাজ করতে রাজী হতো

আজ শনিবার। কাল ফিল্ম এসে সকাল নটায় শো। অনেক উদ্যোগ আ করতে হয়েছে, সুতরাং অনিবার্য বিলম্ব

...। গগন এসে তাড়া দিল, এমন জানলে আমি এসব ঝক্কি-ঝামেলা ঘাড়ে নিতাম না। ওদিকে শো আরম্ভ করতে দেরী হলে, ম্যানেজারবাবু বলছেন, আমাদের ম্যাটিনি শো দেরী হয়ে যাবে। বাবা জানতে পারলে আর হল পাবেন ভেবেছেন?

পাঁচুগোপাল বললো, তাই তো। বলেই বিপ্রপদর দিকে তাকালো।

বিপ্রপদ বললো, আমি কী করবো! আপনার কলেজের ছাত্ররাই তো এখনো আসেনি।

এ কি আপনার খেয়া-ঘাট নাকি যে কে একজন এলো না বলে নৌকো ছাড়বে না! স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করলো গগন।

ছাত্রদের দেরী হবার কারণ আছে। গত পুজোয় তারা সবাই একপ্রস্থ করে টেরি-লিনের পোশাক কিনেছে। মফঃস্বল শহর, ওগুলো পরার মতো উপলক্ষ্য কম। ওদের মধ্যে কথা হয়েছে, সিনে ক্লাবের মেম্বর হলে তবু প্রতি শনিবার সকালে সবাই মিলে সেজেগুজে যাওয়া যাবে। আর ঐ জেল্লার আকর্ষণে অদূর ভবিষ্যতে দু'একজন ছাত্রীও সিনে ক্লাবের সদস্য হতে পারে। তখন আবার তাদের আকর্ষণে আসবে নতুন নতুন টেরিলিনশোভিত তরুণ সদস্য। আজ প্রথম দিন, ফিটফাট হতেই দেরী করে ফেলেছে ওরা।

ছাত্ররা সদলে এসে পড়েছে দেখেই আক্রোশে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল বিপ্রপদ, পাঁচুগোপাল থামালো তাকে। গগনকে বললো, তুমি গিয়ে অপারেটরকে বলো ছবির ক্রেডিট্ টাইটেল্ বাদ দিয়ে যেন ছবি দেখায়, তাতে খানিকটা সময় বাঁচবে।

সর্বসাকুল্যে জনা পঁচিশেক সদস্য হলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলো। ছাত্ররা বসলো অধ্যাপকের থেকে অনেক দূরে। কী রকম ছবি বলা তো যায় না, আগে দেখাও নেই। এক একটা ছবিতে যা সব কান্ড-কারখানা থাকে! বিপ্রপদকে পাশে নিয়ে বসেছে পাঁচুগোপাল। শেখার আগ্রহ আছে ছেলেটার, সিম্বলের অর্থভেদ করতে বেশি-দিন লাগবে না ওর।

পাঁচুগোপাল দেখলো হলটার দেওয়ালে বেশ কয়েকখানা পোস্টার টাঙিয়েছে বিপ্রপদ। ভাষাটা পাঁচুগোপালের, লিখিয়েছে বিপ্রপদ : ছবির ক্ষেত্রে স্বভাষা ও স্বজাতি-প্রীতি বর্জন করুন; ছবি দেখা শিখুন ইত্যাদি। পর্দার মঞ্চের গায়ে লাল শালুতে লেখা 'গোবিন্দপুর সিনে ক্লাব'।

ক্রিং—ক্রিং! ঘন্টা পড়ে ছবি আরম্ভ হয়ে গেল।

প্রথম খানিকটা বেশ চলছিল, তারপরই শুরু হয়ে গেল অর্ধনগ্ন নায়িকার প্রচন্ড নাচ। নাচতে নাচতে নায়ক কোত্থেকে এসে জাপটে ধরলো নায়িকাকে; তারপর বন্ বন্ করে দুজনে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো।

বিপ্রপদ চাপা গলায় বললো, নাচটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

পাঁচুগোপাল বললো, ধাৎ, কিস্যু বোঝ নি! এ নাচও সিম্বল, জীবনের ছন্দ বোঝাবার জন্যে দিয়েছে। নাচ থেকেই জাম্প করে দেখলে না একেবারে অন্য সট্, ডিফারেন্ট মুড। একে বলে জাম্প কাট্, এডিটিং-এর কায়দা।

নাচ দেখে ছাত্র-সদস্যরাও ঘাবড়ে গেছে, একজন সাহস করে উঠে এসে জিগ্যেস করলো, ছবিটার কী যেন নাম স্যার?

লা দলচে ভিতা। গম্ভীর হয়ে বললো পাঁচুগোপাল।

মানে কী, স্যার?

পরে বলবো। এখন বসে দেখগে যাও, নইলে অনেক কিছু মিস্ করবে।

ছাত্রটি চলে গেল। বাংলা ছবির সমা-লোচনা পড়ে কয়েকটা শব্দ শিখেছে বিপ্রপদ, তাই জিগ্যেস করলো, কই, ফ্রিজ শট্ তো এলো না?

আঃ, চুপ করে বস তো। পাঁচুগোপালের সজাগ দৃষ্টি পর্দার ওপরে, কোন সিম্বল না ফাঁকি পড়ে। ছবি দেখছে আর মাঝে মাঝে যেন স্বগতোক্তি করছে, কী মন্তাজ! কী কম্পোজিশন!

বিপ্রপদ বললো, ফ্রিজ শট্?

পাঁচুগোপালের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, ফ্রিজ শটের মানে জানো?

ছবির শেষের দৃশ্যে একটা মোটরগাড়ী আসছে, হেড লাইট দুটো মাত্র জ্বলছে, তীব্র আলোর দুটি বিন্দু ক্রমশ বড় হচ্ছে। বাংলা ছবিতে এরকম হামেশাই দেখেছে বিপ্রপদ। কিন্তু পাঁচুগোপাল সিম্বল ব্যাখ্যা করলো, দেখেছ কী মারাত্মক সাজেশন্! নায়ক-নায়িকা ক্রমশ বড় হলো, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য, কিন্তু মিলতে পারলো না; দুটি সমান্তরাল আলোক-রেখার মত শুধু এগিয়ে গেল!

ছবি শেষ হলো। ছাত্রদের খুব ভাল লেগেছে, এমন উত্তেজক দৃশ্যাবলী তারা দিশী ছবিতে কম দেখেছে।

বিকেলে পাঁচুগোপাল নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ছবির ব্যাখ্যা করছিল। ছবির ভাষা বুঝতে হবে, ছবি দেখা শিখতে হবে, তাই সবাইকেই সে আমন্ত্রণ করেছিল বাড়িতে। আলোচনা যখন জমে উঠেছে ঠিক সেই সময় রূপালয়ের ম্যানেজারের চিঠি নিয়ে এসে দাঁড়ালো সিনেমার দারোয়ান। চিঠি সই করে নিল পাঁচুগোপাল। কী লিখলো আবার! সকালে শো আরম্ভ করতে একটু দেরী হয়েছিল, তবে কী সেই জন্যেই ভবিষ্যতে আর হল না দেবার কথা জানিয়েছে সিনেমা-কর্তৃপক্ষ! নাকি ভাড়া চাইছে!

এ নাচও সিম্বল, জীবনের ছন্দ......

চিঠি খুললো পাঁচুগোপাল ভয়ে ভয়ে, সিনে ক্লাব করতে গিয়ে আবার আক্কেল সেলামি না দিতে হয়। ভাঁজ করা ছোট্ট চিঠি, লিখেছে সিনেমার ম্যানেজার :

মাননীয় মহাশয়, আপনি জানেন আজ রাত্রে আমাদের নাইট শোতে একটি হলিউড চিত্র চালাবার কথা। আপনারা সকালে শো আরম্ভ করতে দেরী করলেন; ফলে, তাড়া-হুড়োতে আমাদের অপারেটর আপনাদের ছবির বদলে সেই ছবির রিল্ চালিয়ে দিয়েছে। ত্রুটি মার্জনা করবেন। আপনাদের ছবির রিল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা কত সালে শুরু হয়? (খ) কোন দল প্রথম 'জুলে রিমে কাপ' লাভ করে? (গ) ভারতে কয়টি দোতলা ব্রীজ আছে? প্রথমটি কোন নদীর উপর এবং কবে তৈরী হয়?

বিনীত
দীপা সরকার
ও
অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়
আসাম

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন? (খ) পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষ কোনটি? (গ) কোন কোন দেশের মেয়েরা লম্বা চুল রাখতে অভ্যস্ত? (ঘ) সময় সময় আমরা চোখে স্পন্দন অনুভব করি—কেন এমন হয়?

বিনীত
কমল সেনরায় (চন্দ)
কৃষ্ণনগর

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত অমল সরকারের (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ভারতে মোট রেল স্টেশনের সংখ্যা ৬,৮৭৬।

বিনীত
নির্মলকুমার ঘোষ
জলপাইগুড়ি

●

সবিনয় নিবেদন,

১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত কমল সেন রায়ের (চন্দ) (চ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে 'পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রোম দেশে ক্যালেণ্ডার চালু হয়' এবং জুলিয়াস সীজার এই ক্যালেণ্ডার প্রচলন করেন। তিনি নিজের নাম অমর রাখার জন্য ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের সপ্তম মাসের নাম রাখেন (July) জুলাই।

বিনীত
পীযূষকুমার গুহ
কিষনগঞ্জ।

●

সবিনয় নিবেদন,

গত ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত এলা বসুর (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে ক্রিকেট টেস্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন অস্ট্রেলিয়ার এফ আর স্পোফোর্থ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮৭৮-১৮৭৯ সনে মেলবোর্ণ মাঠে। (খ) ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত অরূপ দাশগুপ্তের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই পৃথিবীর মধ্য সবচেয়ে বড় জাহাজের নাম গ্রেট বৃটেনের 'কুইন এলিজাবেথ' (৮৫০০০ টন)।

বিনীত
হেনা ও জয়শ্রী সরকার
কলকাতা-৪।

●

সবিনয় নিবেদন,

১২শ সংখ্যায় (২২-৭-৬৬) প্রকাশিত শ্রীকমল সেন রায় (চন্দ)-এর (ক, খ ও ঘ) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি :

(ক) গঙ্গাসাগরের পৌষ সংক্রান্তির মেলাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মেলা।

(খ) ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় জেলা—ভিজাগাপট্টম।

(ঘ) কালিফোর্ণিয়ায় একটি গাছ আছে মোট ৩২০ ফুট উচ্চ এবং তার পরিধি ৯০ ফুট, গাছটির বয়স প্রায় ৪ হাজার বৎসর। এইটাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গাছ।

বিনীত
সুনীলচন্দ্র নাথ
ত্রিবেণী, হুগলী।

●

সবিনয় নিবেদন,

১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসলিলকুমার ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,এম-বি ই,—এই সম্পূর্ণ কথাটি হলো মেম্বার অব দি অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার।

বিনীত
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
নাগপুর—২

●

সবিনয় নিবেদন,

১২ সংখ্যায় প্রকাশিত নির্মলকুমার ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নাম যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, ডঃ সূর্যকুমার ভুঞা, ডঃ হিরণ্যচন্দ্র ভুঞা, ডঃ এইচ জে টেলর, ডঃ পবন মহন্ত, শ্রীফণী দত্ত, ডঃ মথুরা গোস্বামী (বর্তমান উপাচার্য)।

বিনীত
মঞ্জুলা চক্রবর্তী
আসাম।

●

সবিনয় নিবেদন,

১২শ সংখ্যায় জানাতে পারেন বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমতী স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়ের দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

যতদূর জানা যায়, ভারতের প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী জেমস অগাস্টাস হিকি সাহেব কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় উক্ত পত্র প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত পত্রের নাম 'দিগ-দর্শন' (মার্চ ১৮১৮)। শেষোক্ত পত্রটি প্রকাশের দেড় মাসের মধ্যেই ঐতিহাসিক কাগজে ... 'সমাচার-দর্পণ' আত্মপ্রকাশ ঘটে। শ্রীরামপুর মিশ... ছিলেন বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্র কর্ণধার।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উত্তরে জানাই, সুরেন্দ্রনাথ মজু... (১৮৩৮-১৮৭৮) 'মহিলা' কাব্য ... হয়েছিল কবির মৃত্যুর পরে। মাতা ও জায়া এই দুই অংশ ছাপ ছিল যথাক্রমে ২৮ মে, ১৮৮০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩। কবির এই ... কাব্যের নাম পরিকল্পনা কবির নিজে প্রসঙ্গত একথাও স্মর্তব্য।

বিনী...
রেবন্তকুমার চট্টো...
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরে...

●

সবিনয় নিবেদন,

৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত সন্তে... গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবীর স... আয়ুষ্মান তিন ব্যক্তির নাম জানাচ্ছি।

(ক) সৈয়দ আবু তালেব ... ১৯২ বছর, তেহেরাণের অধিবাসী।

(খ) সিরালী ফরজালী মুসলি... ১৫৯ বছর। সোভিয়েট রাশিয়ার অধিব...

(গ) লক্ষ্মণচন্দ্র গুপ্ত, ১৫০ বিহার প্রদেশের টিকর গ্রামের অধিবাস...

বিনীত
সান্ত্বনাকুমারী গ...
র...

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত অ... সরকারের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ... কাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮... সালে। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠাতা।

(খ) ভারতে সর্বপ্রথম তিনটি বি... বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতা, বোম্ব... মাদ্রাজ—১৮৫৭ সালে। ৪র্থ সং... প্রকাশিত বিকাশ বিশ্বাসের (খ) প্র... উত্তরে জানাই যে, জাপান কোনবার সাহি... নোবেল পুরস্কার পায়নি।

বিনীত
প্রতীশ চক্রবর্তী
ভদ্রকালী, হুগলী

●

সবিনয় নিবেদন,

সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত দীপক দা... প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, আমেরিক... পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জন ফিটজারে... কেনেডী ১৯১৭ সালের ২৯শে ... বোস্টনের শহরতলী ব্রুকলিনে জন্মগ্র... করেন। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে তি... প্রথম সেনেট পদপ্রার্থী হন ম্যাসাচুসে... কেন্দ্র থেকে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হেন... ক্যাবট লজ জুনিয়র। এই সময় কেনেডি... বয়স ছিল ৩৫ বছর ৫।৬ মাস।

বিনীত
বল্টু চট্টোপাধ্...
কলকাতা-৬
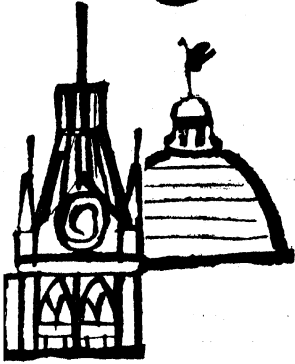
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন —বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বর্তমান সাহিত্য পরিষৎ যে-উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোন অনৈক্য ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৮২ খৃঃ জুলাই মাসে। অধিবেশনে সহযোগী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভার নাম প্রস্তাব করেছিলেন 'অ্যাকাডেমি অফ বেঙ্গল লিটারেচার'। কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসংখ্য প্রচেষ্টার মত সারস্বত সমাজও অল্পকালের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (১৮৯৩ খৃঃ) গ্রে স্ট্রীটের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার'। কিন্তু এই বিদেশী নাম অনেকেরই মনঃপূত হল না। তাই ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ ইংরাজি নাম রূপান্তরিত হল বাংলায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'। প্রথম সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত। নবীনচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত হন সহ-সভাপতি। সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত 'কলকাতার ইতিহাস'-এ এই সম্পর্কে আছে : "রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের যত্নে তাঁহারই ভবনে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। এল লিয়টার্ড সাহেব, পরলোকগত বাবু ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্তী এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব এই তিনজনেই ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালে প্রতীচ্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট বাংলাভাষাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া এবং তৎপ্রতি তাঁহাদের অনুরাগ উদ্রিক্ত করা ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মাননীয় অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলার ও জন বিম্‌স ইহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অধিকাংশ খ্যাতনামা বাংলা লেখক-গণের মতানুসারে ইহার কার্য-বিবরণীতে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলাভাষার ব্যবহারই স্থিরীকৃত হইল। রাজা বাহাদুরের অনুরোধে পরলোকগত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল ইহার নাম 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' রাখেন। এই সভার বেশ আয় দাঁড়াইয়াছে। নিজের আয়েই ইহার ব্যয়নির্বাহ হইয়া থাকে।" রমেশচন্দ্র সভাপতি ছিলেন দু' বৎসর। লিওটার্ডের পদত্যাগের পর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর স্থানে সম্পাদক পদে বৃত হন।
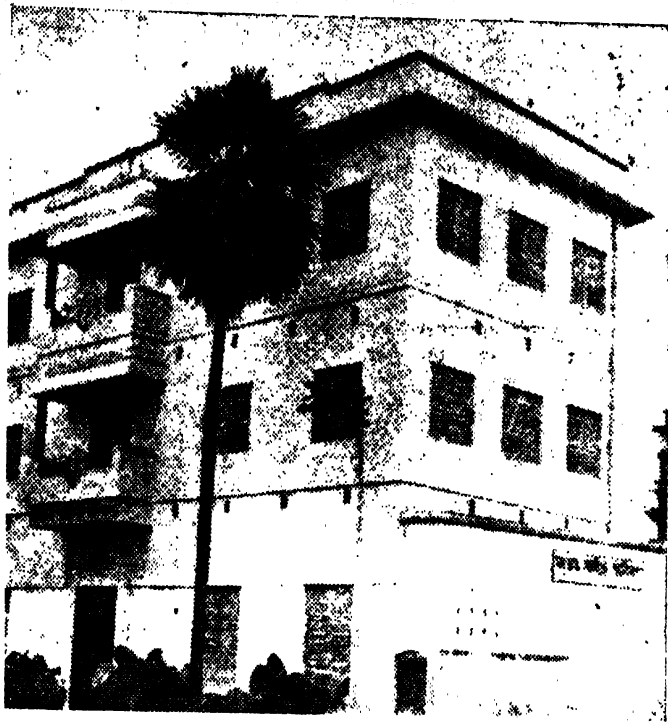
সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ
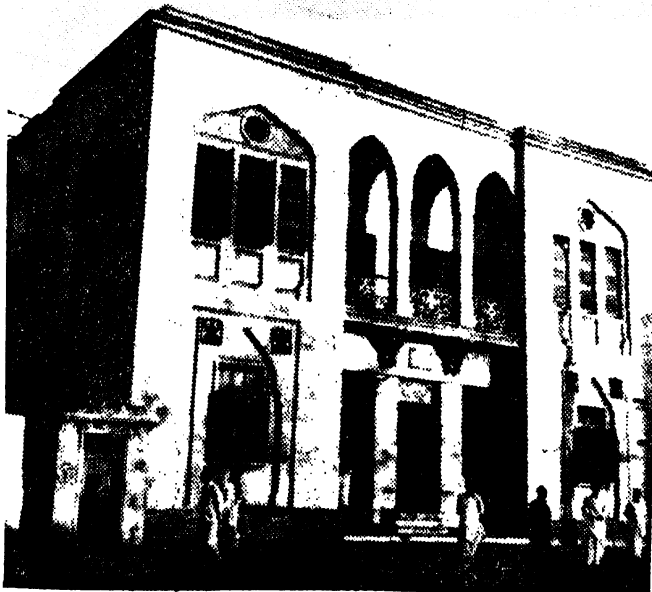
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য পরিষৎ প্রথম থেকেই চেষ্টা শুরু করে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতিদানের জন্য পরিষদের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-

ভাষা যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে। ১৮৯৯ খৃঃ পরিষৎ আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রীকৃত হয়। ১৯০০ খৃঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী পরিষদের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু পরিষদের কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে পরিষদের কাজের অসুবিধা ঘটবার জন্য রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি সকলেই স্থান-পরিবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। পরিষদের অফিস উঠে এল ১৩৭।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও কার্যবৃদ্ধি ঘটায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতেও স্থান সংকুলান হল না। রামেন্দ্রসুন্দর এবং কয়েকজন উৎসাহী কর্মী পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কথা চিন্তা করতে থাকলেন। রামেন্দ্রসুন্দর, সুরেশচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির অনুরোধে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আপার সার্কুলার রোডে যে সাত কাঠা জমি দান করেন, তার ওপরেই পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণ শুরু হয়। পরিষদের পঞ্চদশ বৎসরের কার্য-বিবরণীতে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ "সাহিত্য পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণের সম্মিলন কেন্দ্রস্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানু-সন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতি-মার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীত কালের মহাপুরুষগণের স্মরণ নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থস্বরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষদ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন।......"

পরিষদ প্রথম বৎসর থেকেই পুঁথি সংগ্রহ শুরু করে। কালক্রমে এই সংগ্রহ এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটতে থাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হয়। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের উপকরণ পুঁথি সংগ্রহ হত এই সমস্ত শাখা-কেন্দ্রের মাধ্যমে। রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের সূচনা হয়।

১৩১১ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পরিষৎ স্টার থিয়েটারে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করে এবং সরকারের নিকট প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানায়। ১৩১৪ সালে ১৭ কার্তিক কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য-সেবকদের একত্রিত করে পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধি-বেশনেই পরিষদের ঈপ্সিত কার্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস সংকলন ও কীর্তিকলাপ সংরক্ষণের জন্য 'সারস্বত-ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতায় ১৩১৩ সালে আয়োজিত শিল্প-প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের প্রাচীন ও বর্তমান সংস্কৃতির যে রূপ ফুটে উঠেছিল, মনে হয় তা থেকেই এই প্রস্তাবের জন্ম। ১৩১৬ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য কাশিমবাজারের মহা-রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সাত কাঠা জমি দান করেন। ১৯০৮ খৃঃ গৃহনির্মাণ শেষ হয়। দোতলা নির্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করে-ছিলেন লালগোলার মহারাজা রাও যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায়। ডিসেম্বর মাসে নব-নির্মিত ভবনে মহাসমারোহে পরিষদ স্থানান্তরিত হয়। তারপর থেকে কবি, সাহিত্যসেবী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। ১৯১২ খৃঃ পরিষদ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ সম্বর্ধিত হন এক-পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে। রমেশ-ভবন নির্মাণের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আরও সাত কাঠা জমি এবং বরোদার মহারাজা পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৩৩১ সালে এটি নির্মাণ শেষ হয়। এখানে ঐতিহাসিক দ্রব্যাদির সংগ্রহ আছে।

পরিষদে পুস্তকসংগ্রহ, প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহৎ লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির গ্রন্থ সংগ্রহ দান হিসাবে দেওয়া হয়েছে। বিনয়কৃষ্ণ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থসংগ্রহ এখানে স্থান পেয়েছে। পরি-ষদের লাইব্রেরী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য লালগোলার মহারাজা তের হাজার টাকা দান করেছিলেন। পরে বাংলা সরকার বৎসরে বারশত টাকা সাহায্য দান করতে থাকেন। ঝাড়গ্রামের রাজাও দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। 'বৌদ্ধ-গান ও দোহা', 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ এখান থেকে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রাম-মোহন, রামেন্দ্রসুন্দর, দীনবন্ধু, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্কলিত শব্দকোষ পরিষৎ থেকেই প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দুটি খণ্ড প্রকাশ করেন পরিষৎ। পরিষদের মূল্যবান প্রকাশনা হল 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র তুলনাহীন গ্রন্থগুলি। সম্প্রতি 'ভারতকোষে'র দুটি খণ্ড পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

লাইব্রেরীর মত পরিষদের চিত্র ও পুঁথি সংগ্রহ অমূল্য। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির দানে ও প্রচেষ্টায় এই সংগ্রহ এমন মূল্যবান হতে পেরেছে। গান্ধার, কুষাণ, মগধ, বাংলা-দেশের অপূর্ব শিল্প-নিদর্শন সং হয়েছে। ধাতুনির্মিত এই সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আছে প্রাচীন মুদ্রার বি সমাবেশ।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠি ১৯১৬ খৃঃ সংস্কৃত ভাষা ও স প্রচারের উদ্দেশ্যে। সংস্কৃত ভাষা অন এবং পণ্ডিতরাই ছিলেন উদ্যোক্তা। এ আছে গ্রন্থাগার ও চতুষ্পাঠী। গ্রন্থা হাতে-লেখা ও ছাপা পুঁথির সংগ্রহ থেকে মূল্যবান। কলকাতার কয়েকজন ব্যক্তির দানে এবং সমগ্র অবিভক্ত ব থেকে সংগ্রহ করার ফলেই, এখান পুঁথি সংগ্রহ এমন মূল্যবান হতে পেরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশী বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাও এখানে সংগৃহীত হয়ে থা বার হাজারের অধিক গ্রন্থ আছে এখানে

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে পরিষদের নিজ ভবন। বাংলাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রথম থেকেই এর স যুক্ত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্র ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় প্রমথন তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দু চরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এক সময় পরি ষদের সভাপতি ছিলেন।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা পণ্ডিতে চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদান করে থাকেন। ম মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচ এক সময় এখানকার অধ্যক্ষ ছিলে জানকীনাথ শাস্ত্রী এবং রামধন ভট্টাচা শাস্ত্রী এখানে অধ্যাপনা করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ থেকে দুষ্প্রা অপ্রকাশিত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়ে থাকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশে পর দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভাষারত্নম, দুগ পুজোতত্ত্বম, কালীতন্ত্রম, পবনদূতম, মনে দূতম, দেবীশতকম, প্রভাকরবিজয় ছন্দোগামন্ত্রভাষ্যম প্রভৃতি গ্রন্থ এখান থে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৭ খৃঃ পরিষদে সংস্কৃত ভাষায় মুখপত্র প্রকাশিত হয় সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিতদের রচন সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষে এই ধরনের মূল্যবা রচনাসমৃদ্ধ সংস্কৃতভাষী পত্রিকা আর এব খানিও আছে কিনা সন্দেহ।

পরিষদ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত প্রসারের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত নাটকের অভিন করে থাকে। বাংলা ও বাংলার বাইরে এ অভিনয় চলে আসছে পরিষদ প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকাল থেকে। কালিদাস, ভবভূতি ভাস, ভট্টনারায়ণ শূদ্রক, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি এবং আধুনিক কালে রচিত নাটকের অভিন এঁরা করে থাকেন।

সাড়ম্বরে পরিষদের বাৎসরিক উৎস অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বৎসর।

কোম্পানীর রেশম কুঠি

হেমচন্দ্র ঘোষ

ভাগরথী, গঙ্গা ও জলাঙ্গী—তিনটি বিরাট নদীর সংগমস্থলে কাশিমবাজার—সেকালের দিনের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র—বাংলার প্রাণ-প্রদীপ। সুদূর ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোলুপ দৃষ্টি এই 'সোনায় মোড়া' নগরটির বুকে আকৃষ্ট করেছিল তার বিরাট সম্ভাব্য বাণিজ্যের সম্ভার। বাণিজ্য-পোত, অসংখ্য নৌকার মালা শান্ত সন্ধ্যার বুকে মিট-মিটে আলো নিয়ে ঝিকমিক করত ভেঙে পড়া তরঙ্গের কোলে। সুন্দর কাশিমবাজার অগণিত মানুষের কর্ম-ব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠত। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাংশে। মোগল আমলের প্রধান বন্দর ছিল—সপ্তগ্রাম—সরস্বতীর তীরে। এখন সরস্বতীর শীর্ণকায়া অস্তিত্ব বিলুপ্তের পথে। সপ্তগ্রাম ছিল অন্তঃদেশীয় পণ্যের লেনদেনের প্রধান ঘাঁটি। এই কালে পর্তুগীজ-দের ব্যবসা চলত হুগলীতে কিন্তু বাংলার সকল কেন্দ্রের মধ্যমণি ছিল কাশিমবাজার। তিন-তিনটে বড় বড় নদীর বুকে কাশিম-বাজার বড় হয়ে উঠেছিল তার অতুল সম্পদ নিয়ে। জনবহুল নগরীর বিভিন্ন সড়কে বিভিন্ন পণ্যসম্ভার বিদেশী বণিকদের চকচকিয়ে দিত। ইংরেজ, ফরাসী, আর-মেনিয়ান ব্যবসাদাররা নগরীর বিভিন্ন স্থানে প্রচুর কুঠী তৈরী করে ব্যবসা সুরু করেছিল। আগেকার যুগে যাঁরা রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন তাঁদের ভবিষ্যতের কোন চিন্তাই ছিল না—চিন্তা করার অবকাশও ছিল না। নিত্য নতুন আমোদ-প্রমোদ, সুরা আর নর্তকীর জাঁকালো মজলিস, আহার ও বিহারে মজগুল হয়ে থাকতেন। দেশে অনেক 'রাজার দল' গড়ে উঠল। মুর্শিদকুলি খাঁ অসংখ্য জমিদার সৃষ্টি করলেন—তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু, উদ্দেশ্য মোগল দরবারে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁরা সাহস পাবেন না উপরন্তু ভয়াবহ পীড়নের আশঙ্কায় রাজস্ব আদায়ের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। এই সব জমিদারদের পীড়ন চলত দুর্বল জনসাধারণের ওপর। নবাব আর তাঁর স্তাবকদের মনোরঞ্জন করাই ছিল এই সব খুদে রাজাদের একমাত্র করণীয় কর্তব্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক নিপীড়নের মূলে বাংলায় দাস-প্রথার সৃষ্টি। সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকদের কোন রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা ছিল না—ভেড়ার পালের মত জমিদারদের অতুল ঐশ্বর্যের দিকে নিরীক্ষণ করে তারা আত্মতুষ্টি লাভ করত, এছাড়া তাদের আর কোন উপায়ও ছিল না।

বিচার-ব্যবস্থা তো ছিলই না—বিচারের নামে চলত অবিচার, পীড়ন আর জনগণের ওপর দুঃসহ অত্যাচার। কাজীর খেয়াল-খুশি ছিল শাস্তির মাপকাঠি—বেগুন চুরির জন্যে ফাঁসির হুকুম, কথাটা এদেশে এখনও চলে আসছে। অশিক্ষিত জনগণকে অর্ধ-শিক্ষিত গোঁড়া পারসী-নবীশদের ইঙ্গিতে চলতে হত। সুফলা বাংলার প্রচুর ফসলের কোন মূল্যই ছিল না। খুন-জখম, দস্যুদের কাছে একটা ইঙ্গিতের সাপেক্ষ, একটা কথার ওয়াস্তা। এ হেন দেশের অবস্থায় সংঘবদ্ধ বিদেশী বণিকদের অর্থোপার্জনের প্রচুর সুযোগ ঘটল। পলাশী-যুদ্ধের আগে ইংরেজ ভাবতেই পারেনি যে এত বড় একটা দেশের তারা এত সহজে মালিক হয়ে পড়বে। পূর্বে তারা নবাব দরবারে খুব সমীহ করে চলত—তাদের ব্যবসা ছিল খুব সীমিত। দরবারে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পলাশীর আম্রবনে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলার সমাপ্তি অঙ্ক। ইংরেজ-দের চাল-চলন বদলে গেল। ক্লাইভ-গর্দভ জাফর আলি বাংলার মসনদে। এর জন্যে তাঁকে মূল্য দিতে হল প্রচুর। জাফর খাঁ চুক্তি করলেন, ইংরেজদের গোমস্তারা বাংলায়
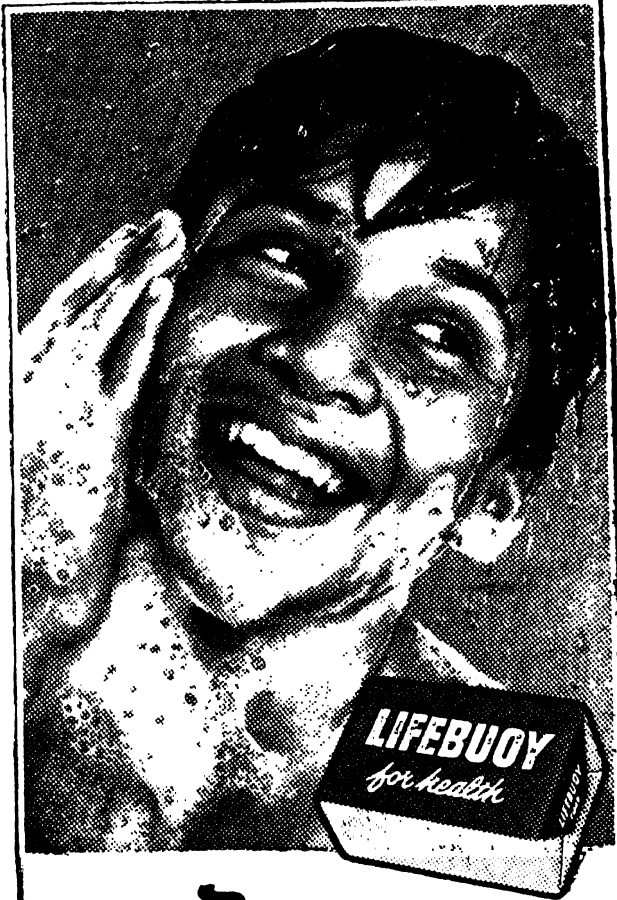
বিনা-শুল্কে অবাধে ব্যবসা করতে পারবে। নবাবের কর্মচারীরা তাদের কোন কাজে কোন রকম বাধা দিতে পারবে না। এর ফলে দেশীয় কর্মচারীরা যেন মেতে উঠল। পায়ের কুকুর মাথায় উঠে বসল। পাবনা, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি রাজন্য-প্রধান জেলাগুলোতে কোম্পানীর দেশী কর্মচারী-দের প্রাধান্য রাজাদের চেয়েও বেড়ে গেল। গোমাস্তাগুলোর ভয়ে রাজন্যবর্গ অস্থির হয়ে পড়তেন। এই সব নিম্নস্তরের লোক-গুলোর মন জুগিয়ে রাজাদেরও চলতে হত। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে একদিন গোমস্তা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে লিখতে হয়েছিল—

'নিজের নাই কোন সাধ্য ছেলেরা সব অবাধ্য,
এবে যা কিছু ভরসা তুমি যে
গঙ্গা-গোবিন্দ।'

সেন্ট পল গীর্জার ডীন ডাবলু আর ইনজী তখনকার ইংরেজদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করে গেছেন—

"The first impetus was given by the plunder of Bengal, which after the victories of Clive, flowed into the country in a broad stream for about thirty years".

এই লুঠপাটের মূল উৎস ছিল কাশিম-বাজারের রেশম-কুঠি। আলিবর্দীর আমলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও আরও বিভিন্ন স্থানে অতি উৎকৃষ্ট রেশম তৈরী হত। কাশিম-বাজারে সংগৃহীত সিল্ক ইউরোপে মুর্শিদা-বাদী সিল্ক বলে সমাদৃত ছিল। সিরাজের পতনের আগে ইংরেজদের ব্যবসা চলত এক মাটির ঘরে। জাফর খাঁর মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজারের বুকে গড়ে উঠল তাদের বিরাট অট্টালিকা, চিত্ত-বিনোদনের জন্যে তৈরী হল নাচঘর। খানা-পিনায় সুরার ফোয়ারায়, সুন্দরীর নৃত্যবৈচিত্র্যে ইংরেজের রেশম-কুঠি সন্ধ্যায় সরগরম হয়ে উঠল। পলাশী-যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতি-ক্রিয়ায় ডুবে গেল ফরাসী ও ওলন্দাজ। তাদের ব্যবসা রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণতর হয়ে পড়ল। ইংরেজ-দের গোমস্তারা নবাবের স্বীকৃত অধিকার বলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির রেশমের ব্যবসা প্রায় নির্মূল করে দিল—কোন প্রতিযোগিতাই আর রইল না। তাঁতিরা ফরাসী ওলন্দাজদের লুকিয়ে কিছু কাপড় বিক্রী করত, এটা ছিল গোমস্তাদের গুরুতর অভিযোগ। এই অভিযোগের কোন ভিত্তি ছিল কি ছিল না তা খোঁজ নেবার কোন প্রয়োজন কুঠিওয়ালা সাহেবদের ছিল না, গোমস্তাদের রিপোর্টই যথেষ্ট। ইংরেজ একেবারে ক্ষেপে উঠল। টাকা লোটার এই ছিল উপযুক্ত সময়—উপযুক্ত ক্ষেত্র। উইলিয়ম বোলটস তখন কাশিমবাজারের কুঠিওয়ালা। মাত্র তিন বছর তাঁর ওপর কুঠি পরিচালনার ভার ছিল। এই তিন বছরে বোলটস ন'লক্ষ টাকা রোজগার করে দেশে নিয়ে গেল। ডঃ হান্টার বলেছেন—

"Bolts amassed nine lacs of rupees during his three years stay at Kasimbazar. He was shipped off for his swindling habit".

গোমস্তাদের ওপর কাশিমবাজার আড়ৎ-এর (বাজার) সব কাপড় কেনার নির্দেশ ছিল কিন্তু এ আদেশ কার্যকরী হল না। গোমস্তারা অভিযোগ করল—লুকিয়ে তাঁতিরা বেশী দামে ফরাসী, ওলন্দাজদের কাপড় বেচছে। তাদের কাছে ইংরেজরাই একমাত্র সাহেব। ইংরেজের ব্যবসা চালু থাকলে তাদের উপার্জনের অসুবিধা হবে না। তারা পরামর্শ দিল—তাঁতিদের দাদন দিতে। বোলটস দেখলেন, পরামর্শটা মন্দ নয়—কোম্পানীর ব্যবসা ভাল চলবে আর সেই সঙ্গে নিজের বেশ দু-পয়সা রোজগার হবে। গোমস্তারা ঘুরে ঘুরে মুচলেকা নিতে লাগল। রেশমের আড়তগুলোতে কাছারি বসল। পেয়াদা-পাইকরা তাঁতিদের কাছারিতে এনে মোচলেকায় টিপ নিতে আরম্ভ করল—আপত্তি করলে পাঁচ হাত লম্বা 'শ্যামচাঁদের' পেটন। মুর্খ তাঁতিদের মোচলেকার কোন সর্তই জানান হত না। শতকরা পনের আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা চল্লিশ টাকার কম মূল্যে তাঁতিদের কাপড়ের দাম দেওয়া হত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাপড় সরবরাহের এক অসম্ভব সর্ত এই মোচলেকায় থাকত। লিখিত সময়ের মধ্যে কাপড় না দিতে পারলে তাঁতিদের হত চরম দুর্দশা। তাঁত-যন্ত্র ধ্বংস, বাড়ী-ঘর লুঠ কাশিমবাজারে এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। যার দুখানা কাপড় বোনার ক্ষমতা তাকে দশখানা কাপড় সরবরাহের মোচলেকা দিতে হত। এই অসম্ভব অবস্থার স্রষ্টা ইংরেজদের শয়তান গোমস্তারা নারীনিগ্রহের দায়িত্ব নিতে কখন কুণ্ঠিত হত না।

"By the company's agents been frequently seized and imprisoned confined in irons, fined considerable sums of money, flogged and deprived in the most ignominious manner, of what they esteem most valuable, their caste. Their goods seized and sold on the spot to make good the deficiency".

কাশিমবাজারে গোমস্তাদের পদোন্নতি নির্ভর করত ছোট-সাহেবদের খুশির ওপর যারা সবাই ছিল অবিবাহিত যুবক। তারা ছিল লুণ্ঠিত অর্থের অংশীদার। গরম দেশের শান্ত সন্ধ্যায় "পাঞ্চে" নিমজ্জিত এইসব যুবকদের সকল রকম প্রয়োজন মেটাতে গোমস্তারা সুন্দরী সংগ্রহে সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। অকৃতকার্যের শাস্তি ছিল বরখাস্তের হুমকি। ঐ সময়ে কাশিমবাজারে গোমস্তাদের মধ্যে ছিদাম বিশ্বাস প্রাধান্য লাভ করে। সাহেবদের মন যোগান ছিদামের পদোন্নতির মূলে কারণ। অল্পদিনের মধ্যে ছিদাম ফ্যাক্টরীর কার্যতঃ দেওয়ান হয়ে পড়ল। সাহেবরা তাকে বলত Bis-ass লোকে বলত ছিদম বাহাদুর। তার মুখ দিয়ে যা বেরুবে সেইটাই হবে হুকুমনামা—পেয়াদা পাইকের দল তা পালন করতে ছুটে চলত। যেসব তাঁতিরা আসতে অনিচ্ছুক তাদের বেঁধে আনা হত। তাদের অসন্তোষে ভরা আপত্তির ঝড় ছিদামের রুদ্ধ ইঙ্গিতে নিস্তব্ধ হয়ে যেত। অসম্ভব সর্তে রাজী হয়ে তারা ঘরে ফিরত। ছিদাম

ছিল অতি হিসেবী ও কুচক্রী। তার শোভারামই এই সব উত্তেজনা সৃষ্টি তার আকাশছোঁয়া আস্পর্দা পায়ের গুঁড়িয়ে না দিতে পারলে কো ব্যবসার অসীম ক্ষতি হবে, তাকে সা কাছ থেকে ম্লান মুখে বিদেয় নিতে শোভারাম তখনকার দিনে একজন না তাঁতশিল্পী—তার গায়ে খুব সহজে দেওয়া যাবে না। আলিবর্দীর আমল বয়নশিল্পে শোভারাম প্রাধান্য লাভ নবাব খুশিমনে শোভারামকে পাঁচিশ জমি দান করে তাকে সম্মানিত ক শেঠরাও শোভারামকে স্নেহের দেখতেন। শেঠবাড়ীর পুজোপ শোভারামের কাপড় ছাড়া চলত কোম্পানীর কুঠিতে ছিদামের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—রামহরি। অমানু বর্বরতায় রামহরি ছিল ছিদামের সম কুঠির অ্যাসিস্টেন্ট ছিল ডবসন, রা ছিল তার স্নেহধন্য। ডবসনের জন্য সংগ্রহ করাটা রামহরি সরকারী কাজ মনে করত। পরবর্তীকালে এই শয়ত ভয়াবহ মৃত্যু তার সঞ্চিত পাপের যৎস মূল্য বলে লোকে মনে করত। ন মুন্সীর পাচকপুত্র রামহরি এক জমিদারীর পত্তন করে যায়। ডবসনের পরামর্শ চলল—শোভারামের প্রচুর সম হস্তগত করতে হবে আর তার সু কন্যাকে ডবসনের কুঠিতে আনতে শোভারাম অতি বৃদ্ধ—ডাকা হল তার পুত্র ও জামাই নবীনকে। রামহরি মেজাজে হুকুম করল—মোচলেকায় দিতে হবে।

তারা অস্বীকার করল—আপত্তির তুলল। পেয়াদা-প্রধান এগিয়ে এল, মা লাঠি ঠুকে বলল—দেখছো!

উপায় নেই—টিপ দিতে হল—কাগজে!

রামহরি বিকৃত মুখে বলল—এই একশ টাকা।

জ্যেষ্ঠ কালাচাঁদ উপায় না দেখে নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরল।

গোরাচাঁদ ও রায়চাঁদ অনুযোগ কর দাদা, টাকাটা না নিলেই হত।

—যা পেয়েছ, পরে তাও পেতে না

শোভারাম সবই শুনল।

—কতগুলো কাপড় দিতে হবে?

—তা তো জানি না।

শোভারামের মনটা শঙ্কায় ভরে উ শয়তান রামহরির অত্যাচারের কথা অজ্ঞাত ছিল না।

বৃদ্ধের অর্ধোচ্চারিত উক্তি—জীবনে একি করলে নারায়ণ!

তার সর্বশরীর কাঁপিয়ে দিল।

দুমাস পার হবার সঙ্গে সঙ্গে রা লোকজন নিয়ে শোভারামের বাড়ী ফেলল।

—কাপড় দেও—দু হাজার। মোচল চুক্তি!

কালাচাঁদ এগিয়ে এল

—কৈ এরকম তো কোন চুক্তি করিনি আর!

—আর টার শুনবো না!

কালাচাঁদ হাতজোড় করে বলল—

—দুমাসে কি দু হাজার কাপড় বোনা যায়—কেউ পারে না।

রামহরি গর্জ্জন করে উঠল।

—এক্ষুনি চাই!

কালাচাঁদ ধীর কণ্ঠে বলল—

—অসম্ভব!

—অসম্ভব এখুনি সম্ভব হবে!

ইঙ্গিতে পেয়াদাদের লাঠি চলল।

গোরাচাঁদ ভাইকে রক্ষা করতে এসে গুরুতর আঘাত খেয়ে অচৈতন্য হয়ে গেল। রাইচাঁদ আর নবীনকে কয়েদ করে কলকাতার কোম্পানীর কারাগারে পাঠান হল। কালাচাঁদ আর গোরাচাঁদ দুজনেই জীবন হারাল। গুপ্তধনের সন্ধানে তাদের বাড়ী খুঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করা হল। প্রতিবেশীরা সন্ত্রস্ত—কেউ এগিয়ে এল না। পাইকরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে শোভারামের মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। হতচৈতন্য মেয়েটিকে ডবসনের বাংলোর খোলা বারান্দায় রেখে রামহরি ছুটল তাকে খবর দিতে—এমন সময় মিঃ সাইক এসে পড়লেন। মিঃ সাইক তখনকার দিনের একজন চরিত্রবান ইংরেজ। মেয়েটি না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়েছিল—মানবতার খাতিরে রামহরি তাকে তুলে নিয়ে এসেছে মিঃ সাইক একথা আদৌ বিশ্বাস করলেন না। মিঃ সাইক তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। রামহরির প্ল্যান ভেস্তে গেল, ডবসনের কাছে পুরস্কার হল তার সবুট লাথি। সন্ত্রস্ত তাঁতিকুল রামহরির অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সুতোর কাজে "নগদা"দের খাটিয়ে মজুরী না দেওয়া কোম্পানীর কুঠীতে একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। এতে রামহরির বেশ দু' পয়সা হ'ত আর তার মনিবের আয়টা মোটা অঙ্কে দাঁড়াল।

"The winders of raw silk, called 'Nagaads' have been treated also with such injustice, that instances have been known of their cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk".

এহেন দুর্দশাগ্রস্ত জনগণকে রক্ষা করার মত কোন ব্যক্তি তখন বাংলায় ছিল না। সুবেদারী অস্তাচলগামী। কোম্পানীর বিজয় পতাকা নিষ্ঠুর পরিহাস করে তার পীড়নচক্রে সমগ্র দেশটাকে ধ্বংস করে দিল। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরাও লুণ্ঠনে যোগ দিল—

"The chaplain was a second class sharer in the profits of the oppressive monopoly trade".

পাচকপুত্র রামহরির দ্রুত পদোন্নতি ছিদাম বিশ্বাসকে যেন পাগল করে তুলল। রামহরি হবে বাংলার দেওয়ান, লোকমুখে হল প্রচার। ছিদাম তাকে কিছুতেই দেওয়ান হতে দেবে না, এই সংকল্পে সে তৎপর হয়ে উঠল কিন্তু তাকে হঠান এত সহজ নয়। কাশিমবাজার কুঠির ছোট বড় সব সাহেবরা তাকে খুব স্নেহ করত। সকল রকম কুকর্মে রামহরির সমতুল্য কোন গোমস্তা ইংরেজ কুঠিতে ছিল না। ছিদাম খুব ফাঁপরে পড়ল। ডবসনের স্মরণাপন্ন হয়ে ছিদাম তাকে সুন্দরী নারীর প্রলোভন দেখাল। সে সময় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ঘোর দুর্দিন। ঢাকায় বারওয়েল অত্যাচারের তান্ডবলীলায় উন্মত্ত। এডমন্ড বার্ক পার্লামেণ্টে হেস্টিংসের বিচারের সময় বল্লেন—পয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাঁতীদের কাছ থেকে বারওয়েল ভয় দেখিয়ে আদায় করেছে—তাদের একটা ছোট্ট ঘরে আটক করে পীড়ন করা হয়েছে—তাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। এহেন অত্যাচারের কাহিনী কাশিমবাজারের হাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই ভিটমাটি ছেড়ে দেশত্যাগ করতে আরম্ভ করল। বাস্তুহারার দল বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। যারা একদিন রেশমশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বে দেশের মর্যাদা অর্জ্জন করেছিল তারা নিঃস্ব হয়ে দেশের নিভৃত স্থানে আশ্রয় নিল। নিঃবীর্য দেশে তার এতটুকু প্রতিক্রিয়া হল না—মুর্শিদাবাদের মসনদ রইল অটল। ইংরেজদের লুঠপাটের মাত্রা শতগুণ বেড়ে গেল—জনসাধারণ দুঃখদৈন্যের মধ্যে মৃত্যুমুখী হয়ে পড়ল। এই হল সুবর্ণ-সুযোগ। এগিয়ে এল গোমস্তা ছিদাম। পেয়াদা-পাইক পাঠিয়ে তাঁতিদের ডাকা হল—হুকুম অমান্যের শাস্তি, বাড়ীঘর লুঠ, মেয়েদের ধর্ষণ আর সবার সামনে নগ্নদেহের উপর বেত্রাঘাত। প্রতিবাদে ফল নেই, প্রায় অধিকাংশ তাঁতিরা দেশ ছেড়ে চলে গেল। প্রথম প্রতিবাদ এল একমাত্র হলধর তাঁতির নিকট থেকে। শক্তিমান হলধর লাঠি উঁচিয়ে বলল—জীবন থাকতে ছিদামের কথা মানব না। রং ফলিয়ে কথাগুলো ছিদামের কানে পৌঁছে দিল তার প্রধান পাইক রহমত।

—হুজুর, হলধরটা বড্ড বেড়ে উঠেছে!

হলধরকে জব্দ করতে পেয়াদা-পাইকের দল তার বাড়ী ঘিরে ফেলল। সে এটাই আশা করেছিল। এর আগেই সে তার স্ত্রী ও মেয়েটিকে সরিয়ে দিল—গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল লাঠি হাতে।

হলধর, তার স্ত্রী ও কন্যার কোন সন্ধান মিলল না।

রহমত বলল—ঘরে আগুন দে—যেখানেই থাক ছুটে আসবে।

তখন সন্ধ্যা হয়নি। অস্তগামী সূর্যের ছোঁয়া লেগে পশ্চিম গগনটা রক্তাভ হয়ে উঠেছে, গাছের ডগা থেকে ঝিলিমিলি রংটা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। হলধর ওপর-দিকে তাকাল, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে তার বুকটা দুলে উঠল। বাল্যের স্মৃতিবিজড়িত এই আমগাছের তলায় তার সুখের দিন-গুলো কেটেছে কত দৌড় ঝাঁপ, কত ঠেলা-ঠেলি, কত মারাপিটে বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরেছে—পুরস্কার পেয়েছে মায়ের তীব্র তিরস্কার। তার চোখদুটো সজল হয়ে উঠল—হাতের লাঠিটা শিথিল হয়ে পড়ল। সংকল্পচ্যুত সে জীবনে কোনদিন হয়নি—আজও না। বাঘের মত তার চোখদুটো জ্বলে উঠল। জীবনের সকল আশা যখন নির্মূল হয়ে গেছে, সাতপুরুষের পবিত্র ভিটাটুকু ছাই হয়ে বাতাসের সঙ্গে কুন্ডলী পাকিয়ে যখন দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে, চোখের সামনের এই নিদারুণ দৃশ্য তাকে উন্মাদ করে তুলল। বিষিয়ে যাওয়া জীবনটার ওপর তার আর এতটুকু মায়া নেই। প্রতিশোধ চাই, অত্যাচারীর শাস্তি চাই। হলধর ভাল করে লাঠিটা একবার দেখে নিল। পিয়াদা-পাইকের অসাফল্যের সংবাদে ছিদাম ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়ল। সামান্য কয়েকখানা কুঁড়ে ঘর পুড়িয়ে পিয়াদার দল ভেবেছিল, ছিদাম তাদের কাজের খুব তারিফ করবে কিন্তু তার [illegible] তারা পেল নাককান মলা। [illegible] অভিযানের চিন্তা ছিদামের মনটাকে বিষম তোলপাড় করে দিল, কিন্তু [illegible] ঘনিয়ে এসেছে, বাড়ী ফেরার তাড়া দিচ্ছে বেহারারা পাল্কী নিয়ে উপস্থিত। হলধরের বাড়ীর কাছ দিয়েই পথ। ছিদাম দেখলো, [illegible] বাড়ী তখনও পুড়ছে।

দাঁত চেপে ছিদাম বলল—ব্যাটা, কাল তোকে দেখে নেবো!

হঠাৎ গাছের আড়াল হতে হলধর বেরুলো। লাঠির আস্ফালনে বেহারার দল ছুট দিল।

ছিদাম পাল্কীর বাইরে এল। হলধরের রুদ্রমূর্তি দেখে ছিদামের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

ছিদামের কথা বলার আগেই হলধর মহানন্দে তাকে লাঠির পর লাঠি মেরে শেষ করে দিল।

পৈশাচিক উল্লাসে উৎফুল্ল হলধর ছুটল স্ত্রী-কন্যার কাছে।

—আর দেরী নয়—চল আশ্রয় নেই!

কোথায় বাবা! মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল। তার ভীতিসন্ত্রস্ত চোখের পাতা জলে ভরে উঠেছে।

—ঐ

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—গঙ্গা!

হত্যাকারীর সন্ধান চলতে লাগল। সব তাঁতিবাড়ী অনুসন্ধান করা হল কিন্তু হলধরের কোন হদিস্‌ মিলল না। ফ্যাক্টর বোল্‌টস্‌ বিশেষ উদ্বিগ্ন—কলকাতায় খবর পাঠান হল। ১৭৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী মিঃ ভ্যান্সিটার্টের সভাপতিত্বে ফোর্ট উইলিয়মে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হল।

বোল্‌টস্‌ লিখলেন—

"A great misfortune has befallen us. I have to communicate to you the death of Babu Sidam Bis-ass who was assacinated yesterday at 8 p.m. while returning home from factory. One Haladhar Tanti was very justly punished (though the punishment by no means excessive) by Sidam Babu. It seems that Haladhar has drowned himself to avoid punishment with his wife and daughter".

কাশিমবাজারের রেশমকুঠি—অত্যাচারের পাদপীঠ—সারা বাংলার রেশমশিল্পের ধ্বংসের মুখ্য কারণ হয়ে আজ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে। তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ওপর যে আঘাত হেনে গেছে, যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ কি কখনও সম্ভব হবে।

বিগত দিনের একটি বিস্মৃত পত্রিকা

বরুণকুমার চক্রবর্তী

সাহিত্যের দেশ বাংলা দেশ। একে পত্র-পত্রিকার দেশ বলেও অভিহিত করা চলে। যদিও এতে সেই পূর্বোক্ত পরিচয়টিকেই প্রকাশ করা হয় মাত্র। কারণ সাহিত্যচর্চা প্রধানত পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করেই হয়ে থাকে। তবু সাহিত্যচর্চা আর তার প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যে উদ্যম বাংলাদেশে দেখা গেছে বা আজও যায় তা ভারতবর্ষের অন্যত্র বিরলই কেবল নয়, তুলনারহিতও বটে! অন্যসব কাজের মতই পত্রিকা প্রকাশের সময় যে উদ্যোগ-আয়োজন লক্ষিত হয়, একাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর নানাবিধ কারণেই উদ্যোক্তাদের সে উদ্যম আর থাকে না। অবশেষে একদিন বহু সাধের বহু স্মৃতি-বিজড়িত পত্রিকার প্রকাশ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এইভাবে কত পত্র-পত্রিকারই যে আত্মপ্রকাশ আর অকালমৃত্যু ঘটেছে, তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। বর্তমান রচনাটিতে আমরা বিগত দিনের এমনই একটি পত্রিকার কথা বলব, যেটি সম্বন্ধে আজ আমরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। স্বল্পকালীন স্থায়ী এই পত্রিকাটির নাম "বেপরোয়া"।

'বেপরোয়া' তার চাল-চলন, বিষয়বস্তু সবকিছুতেই বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৩২৯ সালে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত আশ্বিন মাসে। পত্রিকাটি ছিল ত্রৈ-মাসিক। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। ইনি কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ডাক্তার তুলসীচরণ ভট্টাচার্য। এঁদের মধ্যে একমাত্র অশীতিপর বৃদ্ধ প্রখ্যাত ডাক্তার তুলসীচরণ ভট্টাচার্যই এখনো জীবিত আছেন। তবে লেখকগোষ্ঠী কিংবা সম্পাদনায় যাঁদেরই নাম থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গরচনা ও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী সদ্য পরলোকগত ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইনি ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক। সুসাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে এঁর কথার উল্লেখ করেছেন। 'বনফুলে'র প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'অগ্নীশ্বরে'র ডাক্তার পিতাও ইনিই। পত্রিকাটি পরিকল্পনা তো বটেই, এমনকি এতে প্রকাশিত রচনার অধিকাংশই ছিল তাঁর। আর 'বেপরোয়া'র প্রতিটি ব্যঙ্গচিত্রও ছিল তাঁরই অঙ্কিত।

পত্রিকাটির প্রচ্ছদ তথা 'টাইটেল পেজ' তথাকথিত যতসব অমঙ্গলকর ও অশুভ বস্তুর চিত্রাবলীতে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হত। এইসবের মধ্যে ছিল ফণি মনসার গাছ, সাপ, ব্যাঙ, শূন্য নৌকা, শূন্য কলসী, ঝাঁটা আর শূন্য ডালে উপবিষ্ট কাক।

'বেপরোয়া' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল অন্যায় তথা সর্বপ্রকারের কুসংস্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও ব্যঙ্গের কশাঘাত করা; আর সেই সঙ্গে গতানুগতিকতার বিরোধিতা। আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রায় সকলপ্রকার পত্র-পত্রিকার পূজা-সংখ্যা প্রকাশ একপ্রকার রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে বলা চলে। কিন্তু 'বেপরোয়া' এক্ষেত্রেও তা বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় বজায় রেখেছিল। এর পূজা-সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছিল চৈত্র মাসে এবং তাও আবার শ্রীশ্রীঘেঁটুরাজের পূজো উপলক্ষে'। পূজাসংখ্যায় যে 'আবাহন' প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

হে দেবাদিদেব, হে ঘেঁটো, একবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও, আমরা তোমার আবাহন করি। তুমি মহান্, তুমি শক্তিমান, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণস্পর্শে বঙ্গদেশ আজ নবশোভা ধারণ করিয়াছে। আজ বসন্ত তাহার শাখা পল্লবে, বসন্ত তাহার ঘরে ঘরে।

* * *

তুমি বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমরা তোমাকে বন্দনা করি। এমন অন্তঃসারশূন্য! এমন মাথায় গোবর! আর সেই গোবরে জাগিতেছে শুধু কাড়ি। তাও ভাল করিয়া জাগে নাই, জাগিলে গোবরটা চাপা পড়িত। তোমার পা থাকিলে একটু চরণামৃত খাইয়া ধন্য হইতাম। কিন্তু ও হাত, পা, কি আর রাখিয়াছ? ওগুলোর যে disease atrophy হইয়াছে!

তুমি বেপরোয়ার অন্তর্যামী, আমরা তোমাকে ভজনা করি। এই বাংলাদেশে অনশন আছে, অর্ধাশন আছে, কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আরও কত কি আছে। সে দিকে তোমার দৃক্‌পাত নাই। তোমার নজর শুধু খোসপাঁচড়ার উপর। তুমি শুধু চুলকনা সারাও।

সুপ্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আধুনিক সভ্যতার যা কিছু গর্বের তার সবই নাকি বর্তমান ছিল—এই ধরণের একপ্রকার মানসিকতাকে কটাক্ষ করে লিখিত হয়েছিল 'ইলেকট্রিসিটি' নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনাটি।

টেলিগ্রাফি প্রভৃতি লইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গর্বের আর অবধি নাই। তাঁহারা মনে করেন তড়িৎকে তাঁহারাই বশে আনিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি অনাদিকাল হইতে এই ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফির প্রচলন ছিল না? এই সেদিন যশোহর জেলার এক স্থান খনন করিতে করিতে এক পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকায় খানিকটা ছিন্ন তার পাওয়া গেল। ইহা হইতেই ত' বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রাচীন যুগেও আর্যগণ Telegraphy জানিতেন।

এমনকি শিখা রাখার সার্থকতা বিষয়ে অনেকের মনে যে সংস্কার ছিল তাকে
করে লেখক বলেছেন—

আমরা জানি দেহ তড়িতে পূর্ণ
দেহস্থিত তড়িৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া
law of repulsion অনুসারে মস্তক
শরীরের এই দুই প্রান্তে চালিত হয়।
সংলগ্ন তড়িৎ ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া
অবশিষ্ট থাকে মস্তকস্থ তড়িৎ। এই ত
যদি খুব অল্পপরিসর স্থানে নিবদ্ধ
পারা যায় তো ঐ তড়িতের Pote
খুব বেশী হওয়ায় উহার কার্যকরী
অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তড়িৎ
ব্যুৎপন্ন আর্যগণ একথা জানিতেন তাই
রাখিলেন টিকি। সমস্ত তড়িৎ টিকিতে
হইল। কিন্তু এই টিকির ডগা যদি
ফর্‌ফর্ করিয়া উড়িতে থাকে তো তড়িৎ
দিয়া আকাশে leak করিয়া যাইবে
তাঁহারা টিকিতে ফাঁস দিয়া তাহার
মস্তকের দিকে ফিরাইয়া দিলেন; ফলে
নিবদ্ধ সমস্ত তড়িৎ প্রাণন শক্তি
medulla oblongata, Spinal
এর উপরিভাগ চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পরি
স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর নিঃশেষে
হইল—সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠিল।
পদদেশে চালিত তড়িৎ তো ভূপৃষ্ঠে সঞ্চ
হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই তাঁহারা বা
আসন করিলেন সব non-conducto
—মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম প্রভৃতি। কিছুই নষ্ট হ
পারিল না।

ধর্মরক্ষার নামে সমাজের পক্ষে ক্ষতি
কতকগুলো কুসংস্কারের অযথা প্র
পালনকেও নানাভাবে ব্যঙ্গ করতে
গেছে একাধিক রচনায়—গদ্যে ও প
বলাবাহুল্য এখন থেকে প্রায় ৪২।৪৩ ব
পূর্বেকার সমাজ ও সেই সমাজে ধর্মরক্ষ
নামে বাড়াবাড়ি যে কিরকম ছিল
আজকের দিনে অনুমান করা যথেষ্ট কষ্ট
সে সময়ে নিতান্ত অল্পবয়সের কন
বিবাহদানের কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছি
এবং সেই নিয়মের অন্যথা করার অধি
কারোর ছিল না। তাহলেই সমাজচ্যু
ভয়। সুতরাং কন্যার একটু বয়স হ
পিতামাতাকে নিতান্ত দুশ্চিন্তায় কালা
পাত করতে হত তার বিয়ের চিন্তায়।
অবশেষে কোনক্রমে একজন পাত্র খাড়া ব
তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে কন্
পিতামাতা সামাজিক কর্তব্য পালনের
থেকে উদ্ধার হতেন। বলাবাহুল্য এক্ষে
অধিকাংশ সময়েই উপযুক্ত পাত্ররে পরিব
বয়োবৃদ্ধ রুগ্ন প্রভৃতির হাতেই কন্যা
সম্প্রদান করতে হত। 'কালের ফের' শীর্ষ
একটি কবিতায় তৎকালীন প্রচলিত
সামাজিক প্রথাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ ব
হয়েছে। সমসাময়িক সমাজজীবনে
প্রতিচ্ছবি হিসাবেও কবিতাটির গুরু
অনস্বীকার্য।

বয়স হ'ল বছর বারো, এখনো আইবুড়ো!
পিতৃপিতামহের বিপদ ঠাউরে, জ্যাঠা, খুড়ো
ছেড়ে দিলেন রাত্রে আহার, দিনের বেলা ঘুম,
দাবার ছকে দৃষ্টি রেখে সবাই নিজঝুম!
মেসো পিসে পড়লেন ব'সে হুকোতে মুখ জুবে
বিশুর মুখত কুঁচকে গেল, এবং গেল তুবে
বেগুনপোড়ার মত, মহা দুর্ভাবনার আঁচে
সবাই বল্লে 'এবার বিশু আর বুঝি না বাঁচে।
পাড়ার লোকে ডুকরে উঠে বল্লে সবাই হায়
ধর্ম গেল! ধর্ম গেল! জাত বুঝি ঐ যায়

চারদিকে ঘটকচূড়ামণিরা খোঁজ-খবরে লেগে গেলেন। পাত্রের সন্ধানও নেহাৎ কম হলো না। তাদের মধ্যে কারো বয়স দশ, কারো বা নয়ের পিঠে আট, কারো নেই স্ত্রী, কারো বা চরস খেয়েই দিন কাটে। কিন্তু এরকম সবগুণের পাত্র সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়! কারণ বরপণের পরিমাণ বেশ কিছু। সুতরাং কন্যার পিতা ত—

পড়লেন শুয়ে দাওয়ার উপর, দিলেন হাল ছেড়ে।
এমন সময় নীলু ঘটক এলেন টিকি নেড়ে,
বললেন সাথে, সাত গাঁ খুঁজে, সস্তা দরে বর,
ধবল জোড়ে অঙ্গ ঢাকা, অনঙ্গ সুন্দর,
...কো জুতোয় ঢুকিয়ে চরণ, নেংচে চলা রোগ,
...হীন দুই হাতে লাঠি বাগিয়ে, কর্ম-ভোগ!
...কের স্থানে গর্ত,—
কারণ, বলতে দোষ কি আর?
...ছিল কুষ্ঠ। তা রোগ নেই বা বল কার?

*　　　*　　　*

...সম্প্রদানের কার্য হ'ল ফতে!
...বাঁধন নিবিড় হ'ল স্মৃতির বিধান মতে,
...নাম ঘুচলো কনের,
মাথায় উঠলো সিঁদুর,
...আজ জয় জয়কার, মুখ উজ্জ্বল হিঁদুর

'বঙ্গভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে গদ্য ও পদ্য রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হতে দেখা যায়। প্রথমেই গদ্য রচনার কয়েকটি উদ্দেশ্য ...হয়েছে। যেমন—

...পুষ্টিসাধন। এই পুষ্টি সাধনের উপায় ...দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি। পদের ...সংস্কৃত সমাসের সাহায্যেই হইয়া ...। গ্রন্থের কলেবর বাড়িবার উপায় পর্যাপ্ত ..., কলম ও কাগজ। এই জাতীয় গ্রন্থ ... বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে ...হইয়া থাকে।

অর্থোপার্জন। — অর্থোপার্জনের উপায় ...সাধন। শিক্ষিতা মহিলা, বিদ্যালয়ের ছাত্র, ...জমিদার, প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি তুষ্ট ...গ্রন্থকারের অর্থাগম হইয়া থাকে। ...অন্য উপন্যাস ও স্কুলপাঠ্য ...কের শতকরা ৯৯·৯৭৩২ খানি এই ...। ইত্যাদি। পদ্য রচনার একাধিক ...মধ্যে আছে 'যশোলাভ'।

যশোলাভ। — যশোলাভের একটি উপায় ...। সর্বদেশে ও সর্বকালে একথা সত্য। ...গণ মৃত্যুর পরই যশের মুকুট পরিধান ...থাকেন। জীবদ্দশায় ইঁহাদের অনেকের ...শিরোভূষণ যদি কিছু জুটিয়া থাকে ত ...টুপি।

... ... আর একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, ... পয়ারবাহুল্য। ইহা না থাকিলে কোন ... অক্ষয় যশঃ অর্জন করিতে পারিবেন না। ... প্রয়াণে' পয়ার নাই বলিলেই হয়, পরন্তু তাহার রচয়িতা জীবিত, এই কারণে তিনি একেবারে অখ্যাতনামা (পাঠকবর্গের ...হল নিবারণার্থে বলা প্রয়োজন যে, ...প্রয়াণ' বঙ্গ ভাষায় লিখিত একখানি ...গ্রন্থ। 'Struggle for Existence' এবং Survival of the fittest' এই নিয়মের ...এখানি কিছুকাল হইল লোপ পাইয়াছে ...বং সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া উঠিতেছে।)

গদ্য ও পদ্যের সাধারণ গুণ বিষয়ে ...লা হয়েছে—

গদ্য ও পদ্যের একটি সাধারণ গুণ, অপঠিত মনোহারিত্ব। বিলাতী কবি সেক্‌সপীয়রে এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কালেজের অধ্যাপক হইতে ভবানন্দবাবুর বাজার সরকার পর্যন্ত, সকলেই বলিবে 'আহা! সেক্‌সপীয়রের মানবচরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্য কি চমৎকার!' সেক্‌সপীয়রের কবিত্বে ইঁহারা সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু এরূপ মুগ্ধ হইবার জন্য সেক্‌সপীয়র পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ... ... যাহা হউক এ পরচর্চায় আমাদের প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশেই কয়েকজন ক্ষণজন্মা লেখকের যথেষ্ট অপঠিত মনোহারিত্ব আছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের লেখনীর অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়-মনোরঞ্জন করিয়া থাকে।

গদ্য ও পদ্যের ক্ষেত্রে বর্জনীয় যে সকল দোষের উল্লেখ করেছেন লেখক, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অশ্লীলতা।'

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক আলোচনাটিতে তৎকালীন পাঠকের রুচি-বোধ এবং বিচারবোধকেই তীব্রভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমসাময়িককালে প্রচলিত রুচি ও বিচারবোধের সুষ্ঠু পরিচয় দানের জন্য এ রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

'বেপরোয়া'র প্রতিটি সংখ্যাতেই 'ধাঁধা' বা 'ফার্ড' নামে কয়েকটি করে প্রশ্নোত্তর-মূলক রচনা প্রকাশিত হত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ রচনাগুলিও ছিল কটাক্ষপূর্ণ ও শ্লেষাত্মক। দু'একটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নারিকেল-জল খাইলে লক্ষ্মী ঘরে অচলা হইয়া থাকেন; অথচ দেখা যাইতেছে ধর্মপ্রাণ ভারত দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। ইহার কারণ কি?

উত্তর। — ভারতবর্ষে নারিকেল গাছ কমিয়া যাইতেছে।

(খ) স্বর্গে যাইবার মনু, রঘুনন্দন, পদ্মীপিসী প্রদর্শিত কতকগুলি পথ আছে।— যথা, গ্রীষ্ম-কালে লিমনেড বরফ খাইও না; আট বৎসরের বিধবা কন্যাকে নির্জলা একাদশী করাও; স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে আর একবার টোপর মাথায় দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবে ঝঞ্ঝাট অনেক। কোনও সহজ পথ আছে কি না?

উত্তর। — মহাজননির্দিষ্ট এক অতি সহজ পথ আছে। সংসারে যতকিছু দুষ্কর্ম আছে করিয়া বেড়াও, মৃত্যুকালে পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতেও মর, কোন চিন্তা নাই, তবুও ড্যাং ড্যাং করিয়া স্বর্গে যাইবে যদি মৃত্যুর পর তোমার পুত্রে বা পৃথিবীর আর যে কেহ গয়ায় ক্রোশব্যাপী গদাধরের পাদপদ্মে তোমার নাম করিয়া একটি পিণ্ড ফেলিয়া দেয়।

পরিশেষে 'বেপরোয়া' পত্রিকার যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হল এতে প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্রাবলী। 'বেপরোয়া'র রচনা ও চিত্র-উভয়ই শ্লেষাত্মক ও কটাক্ষপূর্ণ। বাস্তবিক এর প্রতিটি চিত্রই এত অপূর্ব ও উপভোগ্য যে, সেই রেখাঙ্কিত চিত্রগুলিকে ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মদের বোতল, গাঁজার কলকে ও আফিসসহ উপবিষ্ট রুদ্রাক্ষের মালা ও আলখাল্লা পরিহিত 'সিদ্ধপুরুষের চিত্র,' কিংবা 'সমাজ সংরক্ষণের' নামে দু'পায়ে সমাজদলনরত সমাজের নেতার চিত্র, অথবা 'কাব্যসমালোচনা' শীর্ষক চিত্রগুলি কার্টুন চিত্র হিসাবে সত্যই অপূর্ব। এই প্রসঙ্গে 'কাব্যসমালোচনা' শীর্ষক চিত্রটির বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সে সময়ে রবীন্দ্র-কাব্যের সমালোচকরা কাব্যসমালোচনার নামে কবির ব্যক্তিজীবনের সমালোচনাতেই অধিক লিপ্ত থাকতেন। বিশেষত এমন সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করতেন, যা নাকি কবির কাব্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত। 'কাব্যসমালোচনা' চিত্রটির শেষে মন্তব্য সংযোজিত হয়েছে : 'কাব্য উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট বুঝিতে হইলে প্রথমে analyse করিয়া দেখা উচিত—কবি কখনও চালতার অম্বল খাইয়াছিলেন কিনা। যদি না খাইয়া থাকেন বুঝিতে হইবে তিনি অপদার্থ। অতএব তাঁহার লেখাও অপদার্থ।'

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ চিত্রটি দেখে মুগ্ধ হয়ে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে নাকি পত্র দিয়েছিলেন। 'বাস্তবিক', 'বেপরোয়ার' কার্টুন চিত্রগুলি ছিল পত্রিকার সম্পদস্বরূপ।

এই 'বেপরোয়া' বেপরোয়ার মত এসে অনুরূপভাবেই স্বল্পকাল পরে অন্ত-র্হিত হল। তবে স্বল্পকালীন স্থায়ী হলেও বাংলার সাময়িক পত্রের ইতি হাসে যেদিও 'বেপরোয়াকে' অসাময়িক পত্র বলে পত্রিকার টাইটেল পেজে ছাপা হত) এর যে একটা বিশেষ স্থান আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা হিসাবে 'বেপরোয়া' সেকালে ছিল অনন্য ও অদ্বিতীয়। বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না—আজও এর জুড়ি মেলা ভার।

সাত-পাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

।। বার্ধক্যে আমরা ।।

বার্ধক্যকে আমরা সকলেই মনে-প্রাণে অপছন্দ করি। এর মাত্রই একটা কারণ নয় যে বার্ধক্য মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে বলেই আমাদের বার্ধক্যের প্রতি এই বীতরাগ। বার্ধক্যে আমাদের কালো চুল সাদা হয়, মুখে পড়ে বয়সের নানা আঁকিবুকি, সতেজ টানটান দেহের ত্বক যায় শিথিল হয়ে। শুধু এরই জন্যে আমরা গুমরে মরি না, আমাদের ক্লেশ সেখানেই যে আমরা কর্মমুখর এই পৃথিবীর মধ্যে থেকেও ক্রমশ রবাহুত অতিথির মত অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হই। বৃদ্ধ বনস্পতি যে তার যৌবনে ফুল দিয়েছে ফল দিয়েছে সে শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, বনস্পতির এই দুঃখই বার্ধক্যের প্রধান দুঃখ।

অনভিপ্রেত এই বার্ধক্যকে পরাস্ত করতে মানুষ তাই সর্বদাই সচেষ্ট। শুধু পরমায়ু বৃদ্ধি নয়, কিভাবে বার্ধক্যজনিত এই মানসিক ক্লেশের ঊর্ধ্বে থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে অবগাহন করা যায় তার জন্যে বহু সক্রিয় প্রচেষ্টা আমরা করে থাকি। পরের বোঝা হয়ে থাকা অপেক্ষা অর্থনৈতিক বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হয়ে সমাচিন্তার ভাগীদার বৃদ্ধদের বিশেষ আবাসে জীবনটাকে স্বচ্ছন্দ করে তোলার ব্যবস্থায় বহু দেশের বৃদ্ধরা স্বস্তি ও শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের কথা তুলে, কতটা সুবিচার করব বার্ধক্যপীড়িত মানুষদের ওপর সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে দেশে শিশুরা জন্মগ্রহণ করেই বুড়ো হয়ে যায়, সে দেশে বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করলেই যে আমাদের বার্ধক্য ভীতি ঘুচে যাবে এমন সরল সিদ্ধান্তে নিশ্চয় কেউ আসতে চাইবেন না। আমাদের আকৈশোর জীবনযাত্রার মধ্যে এমনই শ্বাসরোধকারী সমস্যার ভিড় যে সেই সমস্যাগুলোই আমাদের মন বলে যে বস্তুটি আছে তাকে প্রতিনিয়ত অসাড় করে তুলছে। তাই যদি দার্শনিক এমার্সনকে উদ্ধৃত করে বলি, 'মানুষের বয়স আমরা গুনতে চাই না, যতক্ষণ না তার দেবার মত সব কিছু ফুরিয়ে যায়।' তাহলে নিশ্চিত আমরা বলব, এই রুগ্ন সমাজটাকে কিছু দেবার মত সুযোগ থেকে প্রতিনিয়ত যখন বঞ্চিত হচ্ছি আমরা, তখন তাড়াতাড়ি ফিরতি টিকিট কাটবার জন্যে ব্যস্ত আমরা, বয়স কত হল ছাড়া ভাববই বা কি?

তবু আমরা নিরাশ হতে চাই না। কানের পাশে রুপোলী রেখা দেখলে হাত-পা ছড়িয়ে না দিয়ে ছুটি দোকানে। ভালো কলপ দিয়ে ঢেকে দিই বয়সের এই অশুভ পদপাতকে। হয়ত ঢাকা দেওয়া যায় না আমাদের বয়সকে, তবু আমরা সচেষ্টই থাকি

গ্রামের পথে ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজেদের তারুণ্যকে বার্ধক্যচিহ্নিত নয় বলে প্রকাশ করতে।

প্রচেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়ই শেষ পর্যন্ত। দেহের বয়সজনিত পরিবর্তন সত্যই ঠেকিয়ে রাখা যায় না কিন্তু মনের সজীবতা কি বজায় রাখা যায় না—এ ধরনের চিন্তাও আমাদের আসে। আর বার্ধক্যকে সত্যিই যদি ঠেকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে বার্ধক্যব্যাধির এই মূল্যবান প্রতিষেধকটির দিকে আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন এও বুঝি।

অভিজ্ঞদের মত হল, শরীরটাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো যেমন দরকার, তেমনি দরকার আমাদের মনটার চালচলনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বার্ধক্যের শিকার হয়ে যাঁরা প্রতিদিন ভাবতে চান না কবে যে মানে মানে সরে পড়বেন, তাঁদের পরিত্রাণের এই একটা রাস্তাই খোলা।

"বার্ধক্যে বারানসী"তে না গিয়েও যে আমাদের অবসরের জীবনটা আনন্দে আঁকড়ে ধরা যায়, এটা সম্ভব যদি মনের দিক থেকে সজীব থাকা যায়।

প্রশ্ন উঠবে মন নামক বেয়াড়া বস্তুটা কি আমাদের শরীরের চেয়েও আমাদের বেশী বিপদে ফেলে না। চারধারে এত যে মানুষ ভেবে ভেবেই করোনারী হয়ে মারা যাচ্ছে, তারা যদি পারত তাহলে কি প্রফুল্ল থাকতে চাইত না? কিন্তু যাঁরা পারলেন না, পারলেন না; আমরা এই বেয়াড়া মনটিকে সায়েস্তা করে রাখতে চেষ্টাই বা করব না কেন যখন জানি, আমাদের প্রফুল্ল মনই হ'ল আমাদের সুস্থ থাকার পক্ষে খুবই কার্যকরী একটা ভালো ওষুধ, এই মন ভেঙ্গে গেলে আমাদের অস্থি-মজ্জাকেই শুকনো করে দেয়। এটা মাত্র প্রবাদই যে নয়, তা আমরা ভালো করেই জানি। তাই বার্ধক্যে ভীত হবার আগেই মনে করে রাখি আসুন—

'তারুণ্যকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে দেহের বয়সের সঙ্গে মনটাকেও পরিণত করতে হবে। আমরা যদি মনটাকে পিছিয়ে রাখি, তখনই দেহের বয়স চেপে বসে সেই অপরিণত মনটার ওপর।'

—স্বপ্ন দেখার দিন আমাদের জ কোনদিন ফুরোবার নয়। আশা-কুহ মাত্র নয়, আশা মৃতসঞ্জীবনী। মনে আমরা দার্শনিকের কথা, যে মানুষটার স্বপ্নেরও মৃত্যু হয়েছে, তাকে নিয়ে পৃথিবীর সত্যি আর কিছু করবার নেই

—'জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষরা জরা-বার্ধক্যকে পরাস্ত করে স মন নিয়ে সৃষ্টির ফসল ফলিয়ে গে তাঁদের কথা মনে করে হতাশ মনটাকে ত উৎসাহিত করব। আমাদের রবী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর অ লেখনী দিয়ে বার্ধক্যকে উপে গেছেন, মহান গ্যেটে তাঁর 'ফাউস্ট' শেষ করেছেন বিরাশী বছর বয়সে, এ তিরাশী বছর বয়সেও তাঁর ল্যাবরেটা কাজ করে গেছেন। এমনি বহু প্র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁদের তারু খর্ব না করতে দিয়ে নিজেদের কর্ম রেখেছেন। নিজেরা আমরা কোন প্র না হলেও নিজেদের সব কাজ থেকে স না নিলে, আমরাও পারব জীবন উদ্দীপিত রাখতে।

—'লজ্জা নেই যদি কেউ আমাদের তুমি ছেলেমানুষ। কার্ল স্যান্ডবার্গ বলে 'যদি ছেলেমানুষ থাকা সম্ভব হয়, ত এই ছেলেমানুষ বুড়োটির জন্যে গর্বই বোধ করব।' যে গর্ব আমরা বো আমাদের শিশু ভোলানাথ রবীন্দ্রন নিয়ে এবং আরও অনেককে নিয়ে।

—'আর যে কথা আমাদের কানে অন বাজতে থাকুক পথ দীর্ঘ; ক্ষমতা ত স্বল্প, তবু হে ভৈরব পথ চলার শক্তি যেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বলতে চরৈবেতি চরৈবেতি। পথ চলবই আমি দেখে মূর্চ্ছা যাব না আমি।

দেহের বার্ধক্যকে পরাস্ত করতে না আমরা, কিন্তু জীবনটাকে মৃত্যুর প্রান্তে যখন নিয়ে যাব, তখন জীবন সম আমাদের আক্ষেপের কোন কিছু থাকবে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

২১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 23rd September, 1966 শুক্রবার, ৬ই আশ্বিন, ১৩৭৩ **40 Paise**

সূচীপত্র

আমার জীবন প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

"অমৃত" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীমধু বসুর আত্মজীবনী খুবই উপভোগ্য হচ্ছে।

এখনকার যুগে চিত্রজগতে উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তনের [illegible]। কিন্তু বাংলার চলচ্চিত্রকে বর্তমান গৌরবোজ্জ্বল পরিণতিতে পৌঁছে দেবার মূলে যাঁদের অবদান সশ্রদ্ধ স্মরণীয় শ্রীমধু বসু ও সাধনা বসু তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত।

উভয়েই বাংলার দুই অভিজাত পরিবারের সন্তান। শিল্পকলা এঁদের কাছে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ছিল না — ছিল আত্মবিকাশের ক্ষেত্র।

উদয়শংকর, শ্রীমতী সাধনা বসু, এঁরা যখন নৃত্যজীবনকে গ্রহণ করেন, নৃত্য তখন উচ্চকলাশিল্পরূপে সাধারণ্যে স্বীকৃত হয়নি।

সাধনা বসু ও মধু বসুর মিলন বাংলার শিল্পজগতে এক সাংস্কৃতিক মহামিলন। এই মিলনের ফলশ্রুতি হলো তখনকার চিত্রজগতের উল্লেখযোগ্য মোড় ফেরা। বাংলার ছায়ালোকের উন্মেষযুগের ইতিহাস হিসেবেও এই আত্মজীবনীর বিশেষ মূল্য আছে। এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশক হিসাবে এঁরা একাধারে [illegible] ও [illegible] উভয়েরই কাজই করেছেন। সেই নিরলস সাধনার এক মর্মগ্রাহী চিত্র সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক করে তুলে ধরা হয়েছে।

[illegible] শিল্পী ও [illegible] শিল্পীদের সম্মান [illegible] সম্বন্ধে [illegible] শুধু [illegible] না তখনকার সাংবাদিকমহলের [illegible] ও সমালোচনার [illegible] পাওয়া যায়। "দীপালী" নামে এক বাংলা চিত্রপত্রিকা ছিল [illegible]। কিন্তু এর [illegible] সংস্করণও ছিল এ [illegible] এসব [illegible] ব্যাপারের [illegible]।

[illegible] ছায়ালোকের এক কর্ণধারের লেখনীর মাধ্যমে এক বিশেষ যুগের চিত্র উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত

[illegible] সেন কলকাতা—৬

লোকসংস্কৃতির পাতায় পুরুলিয়া

সবিনয় নিবেদন,

[illegible] আমাদের সংখ্যার 'অমৃতে' [illegible] রায়চৌধুরীর লেখা 'লোকসংস্কৃতির পাতায় পুরুলিয়া' পড়ে মনে হোলো পুরুলিয়া জেলার আদি সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে তিনি নিজেও যেন খুব সঠিক নন। তাই সকলের অবগতির জন্যই লিখছি যে পুরুলিয়া জেলার আদি লোকসংস্কৃতির মধ্যে কেবল টুসু, ভাদু, ঝুমুর ও ছো নাচই পড়ে। বাকী যেগুলোর কথা তিনি লিখেছেন সেগুলো 'আদি' নয়। বাইরের থেকে আমদানি ও বর্তমান লোক-সংস্কৃতির মধ্যে আসে। তেমনি পুরুলিয়া জেলার বাইরে যে সব টুসু, ভাদু, ঝুমুর ও ছো নাচের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলো এখানের রপ্তানি।

টুসু, ভাদু, ঝুমুর ও ছো ইত্যাদির কোন লিখিত জন্মবৃত্তান্ত নেই। কারণ এগুলোর জন্মই হচ্ছে শিক্ষাহীন পল্লী-অঞ্চলের মধ্যেই। এদের সঠিক আদি রূপ জানতে হলে যেতে হবে সেই সব অঞ্চলের মানুষদের কাছে।

এবারে সংক্ষেপে এদের আদি রূপ দিচ্ছি।

টুসু—কুমারী মেয়েদের পুজো। পৌষ মাসে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের কোন একজনের বাড়ীতে দলবেঁধে সব কুমারী মেয়ে এক কল্পিত দেবীর সামনে বসে নিজে-দের ভাষায় নিজেদেরই রচিত গানের মাধ্যমে নিজেদের মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই আরাধনা করে। দেবীর কোন মূর্তি নেই। মাটির পাত্রে এক গোবরের তালকে ধান, কড়ি ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে তারই সামনে বসে গান করে। পুরোহিত নেই, বাজনাও নেই, নাচও নেই। পুরো পৌষ মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় গানের সুরে এই পুজো চলে। পৌষ সংক্রান্তিতে সেই মাটির পাত্রের হয় বিসর্জন আর এই পুজোর সমাপ্তি।

ভাদু—বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতী মেয়েদের পুজো। এই দেবীর মূর্তি থাকে। মূর্তিকে ও মণ্ডপকে সাজানো হয় মেয়েদেরই নিজেদের শাড়ী দিয়ে। গ্রামেরই কোন একজনের বাড়ীতেই এই মণ্ডপ তৈরী করা হয় এবং গ্রামের সব মেয়েরা দলবেঁধে সারারাত ধরে নিজে-দেরই রচিত গানের মাধ্যমে দেবীকে আরাধনা করে। গানের বিষয়বস্তু প্রেম ও ভালবাসা। নাচ নেই, বাজনা নেই, পুরোহিতও নেই।

ঝুমুর—নাচও নয়, গানও নয়। এ হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের সুর। অশিক্ষিত সরল মনের আবেগময় কণ্ঠের স্বতঃস্ফূর্ত সুর। সুর নির্ভর করে গানের বিষয়-বস্তুর উপর। আর বিষয়বস্তু নির্ভর করে মনের অবস্থার উপর। গানের ভাষা গায়কের নিজস্ব। এ গানের সুরে নাচ যেমন নেই, তেমনি বাজনাও নেই। বাজনার মধ্যে কেবল গ্রাম্য বাঁশীই চলতে পারে। এ সুরের কোন গণ্ডীঘেরা তাল-লয়-মান নেই, কোন একটা বিশেষ রূপ নেই। এতে থাকে শুধু ভাব, ছন্দ, আর প্রাণস্পর্শী মন-মাতানো আবেগ।

ছো—এটা নাচ। মেয়েদের স্থান নেই। রামায়ণ বা মহাভারতের কোন অংশ বিশেষকে পালা স্বরূপে ব্যবহার করে মুখোশ পরে এই নাচ নাচতে হয়। ঢোল, নাগড়া, আর টামসা-ই-ই এর বাজনা। এতে গানও নেই, ভাষাও নেই। ভা ভঙ্গি ও প্রকাশের মধ্য দিয়েই দর্শ দিগকে সব কিছু বুঝে নিতে হবে।

লেখিকা এ গুলোর সম্বন্ধে, উপরো আদিরূপ ছাড়া আরও যা যা লিখেছে সেগুলো পরে এসে ঢুকেছে শহুরে সভ্যত ভাগিদে। তবে আদিরূপ এখনও বেঁচে আ পুরুলিয়া জেলারই নিভৃত পল্লী অঞ্চ সমূহে। ইতি—

বিনীত

তারাপদ রায়

চকবাজার,

পুরুলিয়া।

॥ বেতারশ্রুতি ॥

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিক 'বেতার অনুষ্ঠান' সম্পর্কে শ্রোতাদের না প্রকার মতামত প্রচার করে থাকেন দে আনন্দিত হলাম। সেই কারণে আশান্বি হয়ে আপনার পত্রিকা মারফত 'আকাশ বাণী' কলকাতার একটি উল্লেখযো অনুষ্ঠানের প্রতি বেতার কর্তৃপক্ষের অ হেলার বিষয় আপনার ও আর সক শ্রোতাদের দৃষ্টিগোচরে আনছি।

'ছায়াছবির' গান উক্ত বেতার কেন্দ্ একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান কিন্তু বেত কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানটিকে সময়ের দিক থে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করে রেখেছেন। প্র সপ্তাহে মাত্র আধ ঘন্টা এই অনুষ্ঠ আমরা শুনতে পাই। সময় বাড়ানোর জ এর বহু পূর্বে অনেক শ্রোতা তাঁদে অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিষয় কোন যুক্তি শুনতে নারাজ। অথচ একই বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন হিন্দ ছায়াছবির গান (অধিকাংশ পুরানো) প্রচ করার সময় তাঁদের আছে। তাছাড়া একই কেন্দ্রের মারফত বিবিধ ভারতী কলকাতায় হিন্দী ছায়াছবির গানের প্রচ তো আছেই। বাংলা ছায়াছবির যে প্রচুর ভা ভাল গান আছে তা আমরা প্রবা শ্রোতারা প্রায় ভুলতে বসেছি। ছায়াছবি গানের প্রতি ইচ্ছাকৃত এই উদাসীনতা কেন কেন এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার? বল বাহুল্য এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের নিব খুব জনপ্রিয়। কর্তৃপক্ষের জনসংযোগকা কোন ব্যক্তি একবার শুধু, কলকাতায় বাড় বাড়ী কষ্ট করে খোঁজ নিলেই জান পারবেন আমার উক্তি ঠিক কি না? বাংল দেশের বাইরে যে প্রচুর প্রবাসী শ্রোতা আছেন তাঁদের কথা না হয় ছেড়েই দিলা এই বাংলাদেশেই যেখানে শতকরা নব্বই শ্রোতা বাঙালী সেখানে হিন্দী ছায়াছবি গান শোনান হয় রবিবার ছাড়া প্রতি দেড় ঘন্টা ধরে। আর বাংলা ছায়াছবি গান? কর্তৃপক্ষের দয়ায় সপ্তাহে মাত্র অ ঘন্টা। অথচ 'সবিনয় নিবেদন' অনুষ্ঠ শুনলে মনে হয় শ্রোতাদের প্রতি বেত কর্তৃপক্ষের মনোযোগ যেন প্রগাঢ়, তাঁরা শ্রোতাদের খুশি করতে সব সময় প্রস্তুত

বিনীত—

শঙ্কর সিং

বারাউনি

আমরা কা'দের মুখ চেয়ে থাকবো ?

ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছাত্রদের বিক্ষোভ আন্দোলন ও আচরণ দেখে আমরা খুবই বেদনা বোধ করছি। তারুণ্যের ধর্মই প্রাণচাঞ্চল্য। সেজন্য তাদের অনেক কিছুই ক্ষমার্হ। কিন্তু দেশের সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে ছাত্রদের অস্থিরতার মাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে বলে আমাদের উদ্বেগ বোধ হচ্ছে। কারণ, দেশে এমন কোনো নেতা নেই, শিক্ষক নেই বা উপদেষ্টা নেই যাঁর কাছে গেলে এর নিশ্চিত প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। আজ সবাই নিজেদের দাবীতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আপসের কথা, যুক্তির কথা, শৃংখলার কথাগুলো নীতিসুধার বইয়ে আপাতত তোলা থাক। এখন শুধু ক্রোধ, শুধু শ্লোগান এবং শিক্ষায়তনের দরজা বন্ধ করার জন্যই যেন সবাই উঠেপড়ে লেগেছে।

আমরা তো মনে করি দেশের অন্যান্য সমস্যার চেয়ে ছাত্রসমাজের এই অস্থিরতা আরও বেশি মারাত্মক। কারণ, যে-নতুন প্রজন্ম স্কুল কলেজে তৈরী হচ্ছে তাদের হাতেই তো একদিন সমাজের দায়-দায়িত্ব পড়বে। এরা সবাই যদি এই বয়সেই এত ক্রুদ্ধ, এত বেপরোয়া ও এত শৃংখলাবিরোধী হয়ে ওঠে তাহলে ভবিষ্যতে আমরা কা'দের মুখ চেয়ে থাকবো? আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, ভারতের বড় বড় নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই ছাত্র-বিক্ষোভের ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আলীগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলেঙ্কারী গত কয়েক বৎসর ধরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেচে যে, কোনো শিক্ষাবিদই সেখানে নিশ্চিন্তে উপাচার্যের দায়িত্ব নিতে ভরসা পান না। এই সেদিন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির গুণী উপাচার্য ডঃ চিন্তামন দেশমুখকে একদল ছাত্র ঘেরাও করে নাস্তানাবুদ করেছে। গোয়ালিয়রে ছাত্রহাঙ্গামা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সেখানে পুলিশকে গুলী চালাতে হয়েছে। রাজস্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী ভি, ভি, মাথুর ছাত্রবিক্ষোভকারীদের হাতে আহত হয়েছেন। গত বৎসর আলীগড়েও উপাচার্য আলী ইয়ার জঙ্গকে প্রহার করা হয়।

আমাদের বাংলাদেশেও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে। যাতে আশঙ্কা হচ্ছে, নির্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে পড়াশোনা করার ও শিক্ষা চালাবার পথ কতদিন খোলা থাকবে! আমরা একথা বলছি না যে, সমস্ত দোষই ছাত্রদের। তাদের অভিযোগ থাকতে পারে, সেই অভিযোগ প্রতিকারের জন্য ন্যায্য পন্থায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাবার অধিকারও তাদের আছে। কিন্তু ছাত্রসমাজের কাছ থেকে আরও সংযম ও শালীনতা আমরা আশা করি। কারণ, তারা উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ননিযুক্ত, তাদের আচরণ হবে অনুকরণীয়। এরাই তো একদিন হবে সমাজের মাথা, কেউ শিল্পী, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ প্রশাসক। তাদের মধ্যে যদি সংযম না থাকে তাহলে সমাজের ভবিষ্যৎ চেহারা কী রকম হবে?

এই প্রশ্নগুলি আমরা করছি হতাশা ও বেদনা থেকে। কারণ, এই ছাত্ররা আমাদেরই ঘরের ছেলে। বহুকষ্টে অভিভাবকগণ আজকাল উচ্চশিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করে ছেলেমেয়েদের কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। কথায় কথায় যদি কলেজ বন্ধ হয়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা পড়ে, তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হবে কীভাবে? আসল ক্ষতি হবে তো ছাত্রদেরই। এই কথাগুলি আমরা ছাত্রসমাজকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। এর সঙ্গে শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও সরকারেরও কিছু করণীয় আছে। আজকাল এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, হাঙ্গামা-বিক্ষোভ না হলে কিছুতেই যেন কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে না। রাজনৈতিক, অর্থনীতিক কি শিক্ষানৈতিক যে কোনো দাবীর প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে দলবদ্ধভাবে রাস্তায় বেরোতে হবে—এই ধারণা যদি বদ্ধমূল হয়ে যায় মানুষের মনে তাহলে তো বিপদ বাড়বেই। এই ধারণা সৃষ্টির জন্য কর্তৃপক্ষও অনেকখানি দায়ী। চাপ না দিলে তাঁরা কোনো সমস্যার দিকে নজর দিতে চান না—এই নজীর হামেশাই দেখা যাচ্ছে। আমাদের মনে হয় অন্যান্য নজীর দেখেই ছাত্ররা এই বিশৃঙ্খলার পথে পা বাড়াতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। তার ফলে গোটা ছাত্রসমাজেরই হচ্ছে ক্ষতি এবং শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের ঘটছে তীব্র অবনতি। দেশের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে এবং ছাত্রসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের স্বার্থে অবিলম্বে শিক্ষাজগতে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ কাজে কর্তৃপক্ষের যেমন গুরুদায়িত্ব আছে, তেমনি ছাত্রসমাজেরও রয়েছে অনেকখানি দায়িত্ব। কারণ, তাদের শিক্ষাজীবন নিরুদ্বিগ্ন হলেই আগামীদিনের সমাজ তাদের কাছ থেকে মহৎ কিছু প্রত্যাশা করতে পারে। এই দায়িত্ববোধ যেন তারা বিস্মৃত না হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

• • • • •

হটাৎ কেন এবং কেমন করে কালো বউকে মনে পড়ল বলতে পারি না। কিন্তু পড়ল। যে-মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল যোগাযোগ নেই, দেখাশুনো নেই, যার সঙ্গে জীবনের কোন স্বার্থের বা কোনক্রমে কোন কাজকর্মের কোনরকম বাঁধন নেই—বা যে-মানুষ কতদিন আগে মরে গিয়ে বিস্মৃতির দহে তলিয়ে গেছে—সে-মানুষ হঠাৎ অকারণে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে কেন—এ-প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। হয়তো পণ্ডিতেরা মনঃসমীক্ষা করে বলতে পারেন, অন্তত একটা উত্তর খাড়া করে দিতে পারেন—সে পছন্দ হোক বা নাই হোক। কিন্তু এত বিতর্কে না-গিয়ে এ-কথা সংশয় এবং দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে লোকটি বাইরে থেকে আসেনি, মনের ভেতর থেকেই হঠাৎ জেগে উঠে বেরিয়ে এসে উঁকি মেরেছে। আমার মনের ঘরে তার একটা দখলী ঠাঁই আছে; তার নিজের স্বত্বর বলে—সাক্ষী সংসারের চরম-আদালতে পাওয়া ডিক্রী থেকে কায়েমী স্বত্বে সে সেটার উপর দখলীকার হয়ে আছে।

মানুষের জীবনের অদেখা রাজ্যে একটা এলাকা আছে যে-এলাকায় বিচিত্র মানুষেরা নিষ্কর-স্বত্বে বসবাস করে; তাদের উপরে আমার কোন হাত নেই—না পারি তাদের এলাকা বাড়িয়ে দিতে, না পারি কমিয়ে দিতে বা উচ্ছেদ করতে।

যে কালো বউকে হঠাৎ মনে পড়ল, সেই কালো বউই এর সবথেকে সেরা দৃষ্টান্ত। কালো বউকে দেখেছি ছেলেবেলা থেকে। কালো বউ মারা গেছে সেও হল প্রায় কুড়ি বছর। আমার বয়স তখন আট-চল্লিশ উনপঞ্চাশ। একটা দূরসম্পর্ক ছিল—সে বউদি, আমি দেওর। আমার থেকে প্রায় দশ বছরের বড়।

কালো বউ নামে কালো-বউ কিন্তু একরাশ কালো চুলের পটভূমিতে সোনার মত গায়ের রঙ, বড় বড় দুটো চোখ, নাকটি খানিকটা খোঁদা-খোঁদা, ঠোঁটদুটি একটু মোটা, পুরুষ্ট—টুকটুকে ফলের মত পানে রাঙা। গোটা দুটিন দোক্তা-মেশানো পান, পরনে ফিকেপেড়ে কাপড়, খালি গা; সব নিয়ে সে যা ছিল, তাতে সে কালো বউ ছিল না। আসলে তার স্বামীর ডাকনাম ছিল 'কালো'—কালোবরণ, তাই লোকে বলত—কালোর বউ। তা থেকে কালো বউয়ে পরিণত হয়েছিল। কালো বউয়ের অপর নাম ছিল; আড়ালে লোকে বলত—কলঙ্কিনী কালামুখী; সামনে বলত 'আমের শাখা' অর্থাৎ সর্বঘটে আমের শাখা; সখীরা সমবয়সীরা বলত—দেখনহাসি।

কলঙ্ক তার সত্য কিনা বলতে পারব না। সুতরাং কালামুখী নামটা নিয়েও কিছু বলব না, তবে বাকী সবকটা নামই সত্য—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গ্রামে যে-আসরই বসুক না, সে যাত্রাগানের হোক, খেমটা নাচের হোক—এমনকি সে আমলে কংগ্রেসের মিটিং হোক—কালো বউ সবথেকে আগে সামনে আসর জাঁকিয়ে বসতেন। এছাড়া মেয়ের বিয়ের বাসরে, ছেলের বিয়ের ফুলশয্যার আসরে, সেখানেও কালো বউ সর্বাগ্রে থাকতেন, বরের কোলে সে আমলে কনেকে বসাতেন, কনের ঘোমটা খোলাতেন, তাদের গান গাওয়াতেন, তিনি নিজে গাইতেন, দরকার হলে নাচতেনও। এছাড়া কার বাড়ীতে মেয়ের পাকা দেখা, কার বাড়ীতে শখের খাওনদাওন, কার বাড়ীতে

নতুন জামাই ফিস্টি দিচ্ছে, কার বাড়ীতে মেয়ের বা বউ সাধের খাওয়া হচ্ছে, সেখানে রান্নাশালে কালো বউ আছেই। সে একেবারে ময়দায় জল দেওয়া থেকে মাছের ধুনো করানো থেকে, রান্না সেরে খাইয়ে-দাইয়ে, হাত না ধুয়ে—খুব একচোট হেসে ভেঙে পড়ে ফিরতেন কিছু খাবার হাতে নিয়ে।

গঙ্গাস্নানে যাবে যাত্রীরা দশহরায় সর্বাগ্রে থাকতেন কালো বউ। মেলা দেখতে যাবে—সে সদর শহরে—কৃষি প্রদর্শনীর মেলা পর্যন্ত, সেখানেও তিনি সর্বাগ্রে। এবং সামান্য যে-কোন কথায় হাসি আরম্ভ হত—খিল-খিল-খিল, সে যেন নিঃশব্দ কাঁপত তার দেহের কাঁপনের সঙ্গে।

আমার বিয়ের বাসরেও কালো বউ ছিলেন, ফুলশয্যার রাত্রেও ফুলশয্যায় কালো বউ ছিলেন। আমার বিয়ে হ[illegible] গ্রামে। প্রায় পাশাপাশি বাড়ী। বউয়ের সম্পর্কে তিনি খুড়তুতো [illegible] কিন্তু বাসরে ঢুকেই বললেন—এই ভাই, কেউ যেন পেতে খুলে বসো না। ভাই কারুর কিছু হই না। কারুর কোন সম্পর্ক নেই। আমি কালো বউ, কালো বউ; নাচতে জানি, গাইতে [illegible] হাসতে জানি, ভাসতে জানি—কাঁদতে [illegible] না। থিয়েটারে বিরহশালায় গান শুনে গোলাপীর? "হেসে নাও দু'দিন বই নয়, কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়।" [illegible] যে রাধা ভটচাজ গোলাপী সেজে কোমরে কলসী নিয়ে নেচে নেচে গাইত—। না দেখ তো দেখ,—দাও না হে একটা কলসী [illegible] না।—

কলসী কালো বউ নিয়ে এসেছিলেন, বাইরে রাখা ছিল। ভেবেচিন্তে বন্দোবস্ত করেই বাসরে ঢুকেছিলেন।

বলেই গান শুরু করেছিলেন। কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গী করেছিলেন।

আবার আমার ফুলশয্যার দিন আ[illegible] ঘরে একমুখ হাসি নিয়ে ঢুকে বলেছিলেন—এটা কি হল? বলি হ্যাঁ হে, এটা কি হল? কাজটা ঠিক হল? কই বল, [illegible] আমাকে বিয়ে করব বল নাই? বল? [illegible] তাই এত আশা করে রয়েছি—তারা মনে দরবীর মত—দেওর আমার বড় হলে তো বিয়ে করব। শেষ এই!

কথাটা পরিষ্কার করে বলি। কালো বউ বিধবা হয়েছিলেন অল্পবয়সে। [illegible] আমার বিয়ে হচ্ছে, তখনই তাঁর [illegible] ছাব্বিশ-সাতাশ; অর্থাৎ পূর্ণযুবতী, [illegible] উপর সন্তানহীনা বন্ধ্যা; তাঁর রূপ-যৌবন তখন ঝলমলে গৌরবে সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত। এর আগে যখন আমার বয়স পাঁচ-[illegible] এবং যখন বউদির বয়স ষোল-সতের, [illegible] তিনি সধবা, কালোদা তখন জীবিত, তখনই বউদি আমার সঙ্গে বর-কনে সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন। আমি নিতবর ছিলাম [illegible] বিয়েতে।

কালো বউয়ের এই বর-কনে সম্পর্ক একলা আমার সঙ্গে পাতানো ছিল না। যত পাঁচ-ছ' বছরের দেওর ছিল, তা[illegible] সঙ্গে পাতিয়েছিলেন। এবং পরে যত দিন তিনি বেঁচেছিলেন, ততদিনই যত পাঁচ-[illegible] বছরের নাতি পেয়েছেন সম্পর্কে, [illegible] সঙ্গে বর-কনে সম্পর্ক পাতিয়েছেন। [illegible] হলেই ওই পাঁচ বছরের নাতি-বরকে [illegible] করেছেন; এবং খুনসুটি ধরে গান [illegible] ছেন।

কালো বউয়ের আর একটি গুণ ছিল, তাঁর যেমন মিষ্টি গলা ছিল, তেমনি তিনি গান বাঁধতে পারতেন নিজে। নাতি-বরকে কোলে নিয়ে থুতনী ধরে গান গাইতে গিয়ে কত যে দু' কলি তিন কলি গান বেঁধেছেন, তার হিসেব কেউ রাখেনি। কয়েকটা গানের দু' কলি-তিন কলি এখনও মনে আছে আমার। আমাকে কোলে নিয়ে একবার গেয়েছিলেন—ও আমার সোনার নাগর "কোথা তোমায় বসাই বলো—বুকের মাঝে তুফান উঠে টলোমলো হৃদকমলো; কোথা হায় বসাই বলো!" আর একটা গান মনে আছে —"বঁধু হে করলে একি? চোখে যে ঘুম আসে না, স্বপনে তোমায় দেখি ছি-ছি বঁধু করলে একি?"

এছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে গান বাঁধতেন তিনি। বজনী নামে একটি ছেলে একটি মেয়েকে লোকজন নিয়ে বাড়ী থেকে তুলে এনে জোর করে বিয়ে করেছিল, ফলে তাই নিয়ে মামলা-মকদ্দমা হয়েছিল। তাতে গান বেঁধেছিলেন—"কি নিয়ে করলি বজনী! শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বাসব হবে জেলখানাতে ঘোরে হায় টানবি ঘানি।" এমনিতরো অনেক গান কালো বউ বেঁধে-ছিলেন, সে-সব তাঁর স্মৃতিতেই ছিল সে সব তাঁর সঙ্গেই সমাধিস্থ বা ভস্মের কালো স্রোতে ভেসে চলে গেছে।

এমন শুনি আমার বয়সী প্রবীণারা বলেন—কালো বউ তাঁদের কাছে এমন অনেক গান গাইতেন এবং এমন ভঙ্গিতে নাচতেন যার কথা বলতে এই বাটের উপর বয়সেও তাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে-কালে তার আভাস যে পাইনি, তা নয়। পেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিয়ে কিছু বলতে পারা সহজ ছিল না। তবু আমার সুযোগ হয়েছিল। আমি একবার বলেছিলাম, বলেছিলাম ঠিক নয়, এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

তখন তিনি প্রবীণা হয়েছেন বয়স তখন পঞ্চান্ন বছরের কাছে, তবু তখনও এই বন্ধ্যা বিধবাটির রূপ দেহ বয়সের মত ম্লান বা বিষন্ন হয়নি। কষকষে কালো চুলের মধ্যে কিছু কিছু রূপালী চুল ঝিক-মিক করছে, কপালে গালে একটু-আধটু কালছে ছোপ যেন ধরছে-ধরছে। আমার বয়স তখন ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ। সাহিত্যের আসরে আমার খ্যাতি হয়েছে। এবং সাহিত্য থেকে আমি উপার্জন করি। অনেক বই বেরিয়েছে। থাকি কলকাতায়। একবার বাড়ী গিয়েছি, খবর পেয়ে তিনি এসে-ছিলেন। দেখতে এসেছিলেন।

আমি হেসে উঠে তাঁকে প্রণাম করেছিলাম, বলেছিলাম—ভাল আছ?

কালো বউদি গান গেয়েছিলেন—সেই পুরনো দিনের মত থুতনী ধরে—মুখপানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গেয়েছিলেন—

তোমার কুশলে কুশল মানি—বল বল তোমার কুশল শুনি। 'তোমার ভালোয় আমার ভালো'—তোমার কুশল বল হে শুনি।"

তারপর হেসে থুতনী ছেড়ে বললেন —বুড়ো বলে মনে পড়ল? তারপর বলে-ছিলেন—বলি হ্যাঁ হে, তোমার এখন খুব নাম তো শুনি, খুব নাকি ভাল লেখ। বই লেখ, গল্প লেখ। বলি গানটান লিখেছ? —গান! শোনাতে পার?

বলেছিলাম—পারি বউদি, রেকর্ড হয়েছে, শোনাতে পারি।

—শোনাও দেখি।

আমি 'কবি' ফিল্মের গানগুলির রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম।

—ও আমার মনের মানুষ গো,

তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর।

রোদের ছটায় ঝিকিমিকি তোমার ইসারা

আমায় হেথা টানে নিরন্তর।

গানখানা শুনতে শুনতে চোখদুটো দপ্-দপ্ করে উঠল তাঁর। আমার হাতখানা চেপে ধরলেন।

গান শেষ হলে বললেন—ভাল গান। খুব ভাল।

শেষ গান "এই খেদ আমার মনে মনে—ভালবেসে মিটল না আশ—পুরিল না এ জীবনে—হায় জীবন এত ছোট ক্যানে এ-ভুবনে।"

শুনে ফট করে যেন কেঁদে ফেললেন। কবি বইখানা পড়তে নিয়েছিলেন। ফিরে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভেবে ভেবে লিখেছ? না—। হেসে ইসারা করে বলেছিলেন—ভালবেসেছ এমনি করে?

বলেছিলাম—লোক পাইনি বউদি।

—তাহলে আমারই মত। দূর। দূর। দূর।

তারপর হঠাৎ সেই কাল হাসি হেসে হাসিতে ভেঙে পড়ে বললেন—আঃ হায় হায় হায় দেওর—আমার জন্মটাও তাই তো ভালবাসার লোক পেলাম না।—বলে বললেন —আমি একটা গান বেঁধেছিলাম, শোন—

এমন যৌবন রূপ আমি তুলে দিতে

মানুষ পেলাম না।

মাটিতে সব ঢেলে দিলাম বাকী ফেললাম

দাম নিলাম না।

ওই বউদির সঙ্গে শেষ দেখা। তারপরই তিনি মারা গিছলেন। আজ হঠাৎ ঝপ করে তাঁকে মনে পড়ে গেল। কবি বইখানা ওল্টাচ্ছিলাম মনের ভিতর থেকে কালো বউদি তাঁর কালো স্বপ্নের এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।
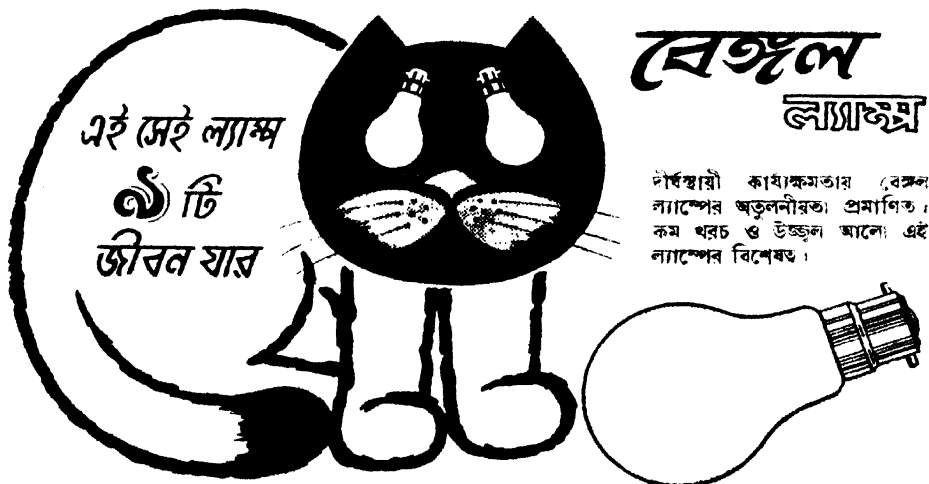
জীবন সীতা ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু

এ জীবন মর্ত্যে সীতা পরীক্ষা কেবল,
রাবণের কুক্ষিগত দুর্গতি অসীম:
পরিত্রাণে নিরন্তর জটায়ু সংগ্রাম,
তবুও নিস্তার নেই মুক্তি বহুদূরে।
গৃহদাহ রক্তস্রোত মৃত্যুর মিছিল,
রাবণেরই পাপে তার লঙ্কা ছারখার:
তারপরে যদিও বা লাঞ্ছনার ঘটে
অবসান, সম্মুখীন আরো বিচারের।
'অগ্নিশুদ্ধি চাই' দাবী: শুধি সব ঋণ
তাই তার মহাযাত্রা সে মায়ের কোলে,
যে মাটিতে আবির্ভাব রাজর্ষি আশ্রয়ে।
স্তব্ধ সব কোলাহল চূড়ান্ত শিক্ষায়,
সহসা এ জীবনের পাতাল-প্রবেশ!

নিষিদ্ধ ॥ মৃণাল দত্ত

কথা ছিল সব দিকে যাবার,
কিন্তু যেতে গিয়ে অকস্মাৎ
সন্ধ্যা নামে, উত্তরের পথ
ঘুরে যায় দক্ষিণে দৈবাৎ।

নাকি রে দক্ষিণ দিকে ছিল
নিষেধের চিহ্নিত সীমানা,
বুড়ো সন্ন্যাসীর কথা মতো
কয়েক শ' প্রেতের আস্তানা।

তবে কোন্ সম্মুখে দিশারী
নিজস্ব প্রভাবে সব মানা
ব্যর্থ করে উত্তর পশ্চিম
নির্ধারিত পূবের ঠিকানা?

যেন কী জেনেই সন্ন্যাসী
আঙুলে নাড়িয়ে সঙ্কেতে,
বলেছে, হাজার আত্মারা
শুয়ে আছে মৃত উপবাসী।

আমি তা জেনেও সর্বনাশ
আদিম পিতার সন্ধানে
মৃত্যুর শাসনে নিসন্ত্রাস
ছুটে গেছি দক্ষিণ বাগানে।

"নাঃ, প্রাণরক্ষা আর বুঝি চলল না, দেখছ তো ডিভ্যালুয়েশনে যেসব জিনিসের দর বাড়া উচিত নয়, তার প্রত্যেকটার দর কেমন বেড়ে গেছে? সরকার চাপ দিলে জিনিস গর্তে ঢোকে, খদ্দের চাপ দিলে জিনিস গর্তে ঢোকে, আমরা কি করব মাঝে পড়ে? যে গর্তে জিনিস ঢোকে, সে গর্তে পুলিস ঢুকতে পারে না?"

কানাইদা এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করলেন। প্রতিবেশী, বন্ধুস্থানীয়, কিন্তু একটিমাত্র অসুস্থ স্ত্রী নিয়ে কিছু বিপন্ন। কিছু দুঃখ জমলেই চলে আসেন আমার কাছে, তারপর খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে হাল্কা হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

"জীবনধারণের জন্য যা দরকার তা সব চোরের হাতে!"

"কোনো জিনিসের দরবৃদ্ধি ঠেকাবার ক্ষমতা নেই অথচ দর বৃদ্ধির সুযোগ চোরেরা নিয়মিত পায়। মানুষ বাঁচে কেমন করে? দেশে খুনোখুনি বাড়ছে, অরাজকতা বাড়ছে, ঠেকাবার উপায় কি?"

এই ধরনের কয়েকটি দৈনন্দিন দুঃখের [illegible] নিয়ে কানাইদার উত্তেজনা, এবং যেদিন যে বিষয়টিতে তিনি ঠেকেছেন ভাবেন, সেদিন সেই বিষয়ে তাঁর অভিযোগ [illegible] হয়ে [illegible] পাড়ার সবাই জানতে পারে সে কথা, কারণ বিধাতা কানাইদার [illegible] পরিকল্পনা করেছিলেন [illegible] উপযুক্ত করে, অথচ তাঁকে কোনো দিন ঘর ছেড়ে দশ গজের বেশি গিয়েছেন এমন কেউ জানে না।

[illegible] প্রতিদিনের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে তাঁর উত্তেজনার মাত্রা বৃদ্ধি হয়ে চলেছে, এবং তাঁর চিৎকারের যে কোনো প্রতিকারই হবে না, তা জেনেই তিনি চিৎকার করেন। কিন্তু আমার কাছে এসে বোধহয় ভালই করেন, কারণ এতে আমারও মন কিছু হাল্কা হয়। তাঁর দৈনন্দিন দুঃখের অংশীদার তো আমিও।

কিন্তু আমার এই প্রতিদিনের দরদী বন্ধু কানাইদা আমার কাছে আসা বিনা নোটিসে একদিন বন্ধ করে দিলেন। পর পর তিন দিনও যখন তিনি এলেন না, তখন আমি কিছু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মনে ভয় হল বৌদির অসুখ বোধহয় বেড়ে গেছে। চতুর্থ দিন আমিই তাঁর কাছে যাব আয়োজন করছি, এমন সময় কানাইদা এসে হাজির। তাঁর চেহারা উস্কোখুস্কো যেন মস্ত বড় একটা ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে।

কি হতে পারে অনুমান করতে শিউরে উঠলাম। কিন্তু আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, এবারে ষোলকলা পূর্ণ হল।

এ কথার একমাত্র অর্থ যা আমার মনে জেগে উঠল, তা প্রাণপণে চেপে রেখে, তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। কানাইদা ধপ করে বসে পড়লেন একখানা টুলের উপর।

[illegible] কিছু?—

ভয়ানক মানে? আমার সর্বনাশ হয়েছে। তোকে একবার যেতে হবে, তোকে নিতে এসেছি।

কানাইদা সব দুঃখই কিছু বাড়িয়ে দেখেন, এবং বাড়িয়ে বলেন। কিন্তু এবারে যা বললেন, তা যেমন তাঁর প্রতিদিনের কথা থেকে অন্য জাতের, তেমনি তা ভয়ঙ্কর।

এবং 'নিতে এসেছি' কথাটার আর কি অর্থ থাকতে পারে?

কানাইদা বললেন, চল, আর দেরি করিস না।

আমি ঘুরিয়ে আসল কথাটা জানবার চেষ্টা করলাম। বললাম, দাঁড়াও গামছা নিয়ে আসি।

কানাইদা চেঁচিয়ে উঠলেন, তুই ভেবেছিস কি? ভেবেছিস, আমার বৌ মরে গেছে? ওরে, তা হলে তো বেঁচে যেতাম—সংসার ছেড়ে সোজা হিমালয়ে। না রে, গামছা-টামছা নয়, সমস্যাটা বৌকে নিয়ে নয়, ঝিকে নিয়ে। পদ্মঝিকে তো তোর অজানা নেই?

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, পদ্মঝি তো তোমাদের বাড়িতে অনেকদিন ধরেই আছে—বোধহয় পনেরো ষোল বছর হল?

পনেরো ষোল বছর কি রে? ত্রিশ বছর ধরে আছে। কিন্তু এখন সে এক হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলেছে। কি সব ইংরেজী কথাটথা বলছে। পদ্মঝি! [illegible] পদ্মঝি! —তার মুখে এসব কথা শুনে আমার মাথা খারাপ হবার উপক্রম। [illegible] যদি সে ছেড়ে যায়, তা হলে তোর বৌদিকে আর বাঁচানো যাবে না। নতুন ঝি এখন [illegible] দেখছি, চব্বিশঘণ্টা থাকে না, [illegible] মতো কাজ করে, অথচ কিন্তু [illegible] আমাদের বাড়িতে।

[illegible] পদ্মঝির চেহারা আর এক রকম হয়ে গেছে। [illegible] মুখ দেখেছি আগে, এখন [illegible] একটা [illegible] ফুটে উঠেছে [illegible] সব [illegible]। আমার [illegible] একটু সংশয় হল।

পদ্মকে অনেকদিন দেখেছি এ বাড়িতে। রং বেশ ফরসা ছিল, এখনও সে রং আছে, কিন্তু মাথার চাঁদিতে কিছু টাক পড়েছে, সেখানকার চুলগুলো শাদা হয়ে গেছে। মুখে নাকের দুপাশে ভাঁজ পড়ে গেছে। দুহাতে বালা ও অনন্ত এখনও ঠিক আছে, কিন্তু কনুইয়ের উপরে অনন্তের স্থানটি বেশ গোল ছিল, এখন কিছু শিথিল। অনেকদিন পরে দেখছি তাকে, কিছু মোটা হয়েছে মনে হল।

যখন ওকে প্রথম দেখি সেই পনেরো ষোল বছর আগে তখন নীরবে কাজ করতে দেখেছি। শুনেছিলাম প্রথমে আড়াই টাকায় কাজ করত, ক্রমে মাইনে বেড়ে বর্তমানে পঁচিশ হয়েছে। এখন দাবি করছে চল্লিশ টাকা। এর কমে সে আর কাজ করতে পারবে না, এবং পুরনো বাড়ি বলেই চল্লিশ চাইছে, নতুন কাজ সে এখন যে-কোনো বাড়িতে পঞ্চাশ টাকায় পেতে পারে।

আমি এ কথা শুনে প্রথমেই কি বলব ভেবে পেলাম না, তারপর পদ্মঝির মুখে এর পুনরাবৃত্তি ভাল করে শুনে বললাম কানাইদা তোমার দাবি নিশ্চয় স্বীকার করেন, তুমি ঠিকই চেয়েছ। কিন্তু তার পক্ষে চল্লিশ টাকা দেওয়া তো এখন সম্ভব নয়। তুমি একটুখানি বিবেচনা কর। এতদিনের সম্পর্কটাও তো ধরতে হবে?

পদ্ম আমার কথার জবাবে বললে আমার দিকটা কেন ভাবছ না? —এবং এর পর যা বলল, তা শুনে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হল। সে এক অসম্ভব ব্যাপার এবং এমন অসম্ভব যে তা শুনলে কেউ বিশ্বাসই করবেন না, ভাববেন আমি একটা রূপকথা বানিয়ে বলছি। অথচ তা ঘটেছে আমারই চোখের সামনে।

পদ্ম ইতিমধ্যে দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে এতখানি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তা আমার কল্পনারও অগোচর ছিল। আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেন সম্পর্কের কথাটা ভাবছ না? তোমার সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক তো একদিনের নয়? শুধু কি টাকা দিয়েই তার বিচার হবে? —তার উত্তরে সে বলল, এখন তো ওসব বিচার উঠেই গেছে, দাদাবাবু। এখন আপনাদের বিজ্ঞানের যুগ, সবই অঙ্কের হিসাবে চলে, আমার বেলাতেই বা তা খাটবে না কেন?

পদ্মঝির মুখে বিজ্ঞানের কথা শুনে আমার মনের অবস্থা কি হল, আগেই তার আভাস দিয়েছি। কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না। আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু এ পর্যন্ত এসেও যদি পদ্মঝি থেমে যেত, তা হলেও মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু যখন বললাম, পদ্ম, তুমি তো জান কানাইদা এককালে তোমাকে আড়াই টাকা দিয়েছেন আর আজ দিচ্ছেন পঁচিশ টাকা। জিনিসের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাইনেও সব সময়েই বিবেচনা করা হয়েছে তখন পদ্মঝি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, ব্যাপারটা তা নয়। আগে আমিও তাই ভেবে খুশি ছিলাম, কিন্তু ডিভ্যালুয়েশন হওয়ার পর থেকে আর তেমন ভাবছি না, দাদাবাবু।

কানাইদা ধপ্ করে বসে পড়লেন...

পদ্মঝির মুখে ডিভ্যালুয়েশন! প্রথমে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম এতে অবাক হচ্ছি কেন? গত মহাযুদ্ধের সময় কত ইংরেজী শব্দ ঝিদেরও শিখতে হয়েছে। যুদ্ধ আর যুদ্ধজনিত অভাবের দরুন কত ইংরেজী শব্দ! সাইরেন বাজা, ট্রেঞ্চে ঢোকা, এ-আর-পি, কনট্রোল, র‍্যাশন। তারপর হালের ওজন, সবই তো বিদেশী। অতএব ঝি ডিভ্যালুয়েশন কেন শিখবে না? কেজি, কুইনটাল মিটার-কিলোমিটার জানে যখন? লিটার-মিলিমিটার শিখেছে যখন?

ওর যুক্তি অকাট্য। বলল, তুমি একটা কথা ভেবে দেখ দাদাবাবু। যুদ্ধের আগে যে, মাসে আড়াই টাকা পেতাম, তা যে কেবল জিনিসপত্তর শস্তা ছিল বলেই, তা নয়।

আমি বললাম, আমি তো তাই মনে করি, পদ্ম। ডিভ্যালুয়েশনের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তোমার সম্পর্ক জিনিসের দরের সঙ্গে। তুমি বিদেশী জিনিস কিছুই কিনছ না।

তুমি ভুল করছ, দাদাবাবু। আমি সব দিক ভেবে বলছি কথা। দেখ, এই যে পর পর সবার মাইনে বেড়ে চলেছে, এর সঙ্গে আমাদের মতো ঝি চাকরেরও সম্পর্ক আছে।

কেমন করে?

তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? একটি ঝির শরীরে যেসব পদার্থ আছে, যুদ্ধের আগে তা আলাদা করে বাজারে বিক্রি করলে মোট কত দাম হত?

বল কি পদ্ম! তুমি কি দেহের উপাদানের কথা বলছ?

বলছি বৈ কি।

সর্বনাশ! এত শিখেছ?

দায়ে পড়ে শিখেছি দাদাবাবু, নইলে আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমাকে কে আর কষ্ট করে শেখাতে যাচ্ছে? যাই হোক তুমি আমার কথার জবাব দাও।

আমি কিঞ্চিৎ নড়েচড়ে বসে বহুকষ্টে মনে করতে চেষ্টা করলাম একটি মানুষের দেহের উপাদানের মোট দাম কত ছিল যুদ্ধের আগে। তারপর ক্ষীণ স্মৃতি থেকে বললাম পঁচিশ টাকা হবে।

পদ্ম বললে গড় মানুষের দেহের উপাদানের মোট দাম ছিল তেইশ টাকা পাঁচ আনা।

আমি বিস্ময়ের ধাক্কাটা কিছু সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাকে অবাক করেছ পদ্ম, কিন্তু এসব কথা তুমি কবে শিখেছ?

শিখে নিয়েছি অল্পদিন হল। কিন্তু কথা যখন উঠলই তখন তোমাকে আরও কিছু বলি। সেটাই আসল কথা। এসব শেখা তো বড় কথা নয়, একটা তোতাপাখীও শেখালে শিখতে পারে। কিন্তু যখন একটা দেহের পদার্থগুলোর মোট দাম ছিল তেইশ টাকা পাঁচ আনা তখন মাইনে পেতাম আড়াই টাকা। আড়াই টাকার কতগুণ তেইশ টাকা পাঁচ আনা?

এখন অত সূক্ষ্ম হিসাব করতে পারব না, পদ্ম মোটামুটি ন'গুণ ধরে নাও।

তাহলে উল্টোদিকের হিসেবে আড়াই টাকা ওর ন'গুণ ছোট—বা বলতে পার ন'ভাগ

এদেশে বসে জন্ম থেকে পেয়েছো

ছোট। এই হিসেবে ধরে নাও, আমার দেহ-পদার্থের দাম যখন দশ পঁচিশ টাকা, তখন আমাকে কানাই দালালবাবু মাইনে দিয়েছেন পঁচিশ টাকা। ঠিকই দিয়েছেন। কিন্তু তারপর ডিভ্যালুয়েশন হল। তাতে আমার দেহের দাম পঁচিশ টাকা এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে চারশ টাকা। সে হিসেবে এখন আমার মাইনে হওয়া উচিত পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু আমি চেয়েছি চল্লিশ টাকা। অন্যায় করেছি কিছু? সত্যি করে বল।

অন্যায় কিছুই করনি, পদ্ম। তুমি যত সব কথা বলছ, তবু আমার সব ধাঁধা মনে হচ্ছে। দেহপদার্থের কথা যে বলছ সত্যিই জান সে কি?

তা আর জানি না? এই দুমাস ধরে তাহলে কি মুখস্থ করলাম! কি কি আছে দেহে শুনবে?

বল তো?

এই ধর গিয়ে কার্বন আছে, অক্সিজেন আছে, হাইড্রোজেন আছে, তারপর গিয়ে কি নাম ওর—নাইট্রোজেন আছে, ক্যালসিয়াম আছে—

আমি চিৎকার করে পদ্মকে থামিয়ে দিলাম। বললাম, দাঁড়াও—দাঁড়াও, একটুখানি অপেক্ষা কর, মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠেছে, কানাইদা, একটুখানি জল—

মাথায় জল ঢেলে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে পদ্মকে বললাম, এইবার বল বাকিটা।

পদ্মঝি বলতে লাগল, তারপর ধর ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, সালফার, [illegible]

ম্যাঙ্গানিজ, আইওডিন, কোবাল্ট, কোবাল্ট, সিলিকন, ফ্লোরিন, আলুমিনিয়াম।

থাক, থাক পদ্ম আর নয়—কানাইদা, আরো একটুখানি জল। এবারে আর মাথায় নয়, গলায়। গলা শুকিয়ে উঠেছে।

জল খেয়ে পদ্মকে বললাম, আর বলতে হবে না। কারণ এরপর কি বলবে জানি। তুমি বলবে ডিভ্যালুয়েশনে এ সবের দাম বেড়ে গেছে। আমি সেকথা যথার্থ বলে এখনই তোমায় মেনে নিচ্ছি। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করব না।

এদিকে কানাইদা আমাকে ক্রমাগত চোখের ইঙ্গিতে কর্ম্মীর কথায় সায় দিতে নিষেধ করছেন, কিন্তু আমি যে পদ্মঝির যুক্তিতে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছি, সেকথা তাঁকে এখন কি করে বোঝাই। ও যে এত জানে সেকি আমার দোষ?

পদ্মঝির দিকে চেয়ে দেখি সে বিজয়-গর্বে মৃদুমৃদু হাসছে। সে হাসিমুখেই বলতে লাগল, এসবের দাম বেড়েছে, সে তো আর এমনি-এমনি নয়, এর প্রায় সবই বিদেশী জিনিস। তোমরা বড়লোক, হিসেবের ধার ধার না, আমাদের কত হিসেব করে চলতে হয়!

কানাইদা আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে এতক্ষণ পরে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন, পদ্ম, বাজে কথা বলো না। তোমার দেহের কোনো উপাদানই বিদেশ থেকে কিনতে হয়নি, এদেশে বসে জন্ম থেকে পেয়েছ।

কি বলছ দাদাবাবু! পদ্ম ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। বিদেশী চাল আর গম খেয়ে ওগুলো রক্ষা করতে হচ্ছে না? বিদেশী সার দিয়ে এদেশে খাদ্য ফলাতে হচ্ছে না? ডিভ্যালুয়েশনের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক তা জান না? আমার দেহপদার্থ এখন এদেশে বেচলে ঐ সাড়ে চারশ টাকাই দাম উঠবে।

আমি কানাইদাকে কাতরভাবে বললাম, আমি হেরে গিয়েছি, তুমিও হার স্বীকার কর কানাইদা। অবিলম্বে হার স্বীকার কর, ওর এই বিদ্যার জন্যও অন্ততঃ ওর দাবিটা মেনে নাও। ও চলে গেলে এমন কি আর পাবে না।

কানাইদা গজগজ করতে করতে বললেন, তোকে তাহলে এনেছিলাম কেন!

আমি বললাম, এতো বোধহয় ভালই করেছ। আমি এখন চললাম।

সিঁড়িতে পা রেখে বুঝলাম, পদ্মঝি ওদের ছেড়ে যাবে না জানি না, শেষপর্যন্ত মানবিক সম্পর্কটাই হয়তো তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এবং সে নিজে থেকেই মাত্র পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছে, চল্লিশ টাকার দাবি আর তোলেনি।

কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র

প্রবোধচন্দ্র সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের এত গভীর অনুরাগের কারণ কি, স্বভাবতই তা জানতে ইচ্ছা হয়। রামপ্রসাদ ছিলেন 'কুমারহট্টনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব', আর ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন কুমারহট্টের অদূরবর্তী কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ানিবাসী, তিনিও বৈদ্যকুলোদ্ভব। এই নৈকট্য এবং সাজাত্যবোধই ঈশ্বরচন্দ্রের এমন শ্রদ্ধা ও আগ্রহের একমাত্র কারণ বলে মনে করা সমীচীন নয়। দুইজনই কবি, দুইজনের জীবনবোধেও সাদৃশ্য আছে। ধর্মবোধ জীবনবোধের ভিত্তি। তাঁদের এই ধর্মবোধের সাদৃশ্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। রামপ্রসাদের ধর্মবোধ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বারবার যে-সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের সুগভীর শ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়। এইজন্যই ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদকে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ বা অদ্বিতীয় 'মহাকবি' বলেই নিরস্ত হননি, তাঁকে একাধিকবার 'মহাত্মা' বলেও অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে ব্যাপক ও গভীরভাবে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। যথাস্থানে এ-বিষয়ে আরও একটু পরিচয় দেওয়া যাবে। ঈশ্বরচন্দ্রের আন্তরিক সংগীতপ্রীতিও যদি এই অনুরাগের অন্যতম কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ বোধ করি তাঁর সহজাত কাব্যভাব ও রসগ্রাহিতা। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের যে-উক্তিটি সর্বপ্রথমে উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যেই তাঁর এই কাব্য ও রসগ্রাহিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এস্থলে আরও দু-একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই ঈশ্বরচন্দ্রের গুণগ্রাহিতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।—

১। "রামপ্রসাদী পদসকল রত্নাকরবৎ, যত্নপূর্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায়, ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে।"

—সংবাদপ্রভাকর, ১২৬০ আশ্বিন ১; 'কবিজীবনী' পৃ ৩৩৮।

২। "ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের [রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের] এক এক স্থলে এমত সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থপ্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।...

এই মহাশয় আগমনী সপ্তমী বিজয়া রাসলীলা কৃষ্ণলীলা শিবলীলা যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহাই অতিসুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীর রসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণবর্ণনা-ঘটিত পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না।"

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ পৌষ ১, 'কবিজীবনী' পৃ ৫৮-৫৯ এবং ৬৬-৬৭।

আশা করি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও এই অনুমান করা অসংগত হবে না যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদের প্রভাব গভীরতর হওয়াই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। বস্তুতঃ রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার পারস্পরিক তুলনা করলে এই অনুমানের সত্যতাই প্রতিপন্ন হবে। অন্ততঃ ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের গভীর প্রভাব সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন হবে। এ-প্রভাব ভাবে, ভাষায়, অলংকার ও ছন্দে। অতঃপর একে একে এসব প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাবে।

৫

কিন্তু তৎপূর্বে এসব প্রভাবের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীন কবিদের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনা-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র এক স্থানে এই মন্তব্য করেন।—

"কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি শিক্ষা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্বক কেবল বিলাতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন? কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই।"

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১ অগ্রহায়ণ ১; কবিজীবনী, পৃঃ ৩৪৪-৪৫।

এর থেকে বোঝা যায়, খাঁটি বাংলা সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরের মূল প্রেরণা। আর, এই প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তিনি রামপ্রসাদের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। কারণ, বিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল রামপ্রসাদের মধ্যেই। ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি, তাঁর রচনায় আছে একটা সাহিত্যিক আভিজাত্য ও শৈল্পিক কৃত্রিমতা সাধারণের পক্ষে তা দুরধিগম্য। আর রামপ্রসাদ ছিলেন বাঙালির জাতীয় কবি, তাঁর রচনায়, বিশেষতঃ তাঁর পদগুলিতে কোনো কৃত্রিমতা বা ভেজাল নেই, তাতে সর্বসাধারণের সমান অধিকার। তাঁর ভাষা সকলের মুখের ভাষা, তাঁর ছন্দও সকলের ভাষারই ছন্দ, তাঁর অলংকার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাজাত এবং তাঁর ভাব সর্বসাধারণের উপলব্ধিগম্য। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য বিশেষভাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত সংগীতগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সব রচনা সম্বন্ধে নয়। এই গানগুলিই তাঁকে অমরতা দান করেছে, তাঁকে জাতীয় কবির আসনে বসিয়েছে। তিনি সাধারণের কবি, অথচ অনন্যসাধারণ। এই বিশিষ্টতাই ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করি, তাতে রামপ্রসাদের এই বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাবে।—

"কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেন অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ধারণ করিতেন। ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, কস্মিন্ কালে কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত, তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাহার বর্ণনা করিতেন।"

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ পৌষ ১; কবিজীবনী, পৃ, ৬৮।

রামপ্রসাদের অনুগামী ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক পরিমাণে এই গুণগুলির অধিকারী হয়েছিলেন। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"আধুনিকার দিনের বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়—এটি সুন্দর, কিন্তু এ যেন পরের, আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালা কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা।"

—'কবিতা সংগ্রহ' : ভূমিকা, পৃ, ৩।

অর্থাৎ রামপ্রসাদের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রও 'খাঁটি বাঙ্গালা' কবি, বিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির প্রতিভূ।

৬

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তর্গত সাদৃশ্যের প্রধান সূত্র ধর্ম। রামপ্রসাদকে ঈশ্বরচন্দ্র বারবার 'মহাত্মা' বলে আখ্যাত করেছেন এবং তাঁকে 'পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক' বলে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন 'ধর্মাত্মা', ধর্মভাবই তাঁর চরিত্রের মূলকথা। এসম্বন্ধে তিনি বলেন—

"পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে-পদ্যে যত লিখিয়াছেন এত আর কোন বিষয়েই বোধহয় লিখেন নাই।...এইসকল গদ্যপদ্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। বলিতে কি, তাঁহার গাঢ় সরল অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না।"

—'কবিতা সংগ্রহ' : ভূমিকা (কবিত্ব) পৃ, ৬৬-৬৭।

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের এই ধর্মপ্রাণতা ও ভাব-সাদৃশ্যের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এই।—

"বাঙ্গালার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর-এক ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।"

—'কবিতা সংগ্রহ' : ভূমিকা (কবিত), পৃ ৬৮-৬৯।

এই দুইজনের ধর্মভাবগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃভাব সম্বন্ধে অধিকতর বিশ্লেষণ ও আলোচনার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। উভয়ের ধর্মভাবের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সাধারণ মন্তব্য এই।—

"যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।"

—পূর্ববৎ পৃঃ ৭৬

এই অগ্রবর্তিতার অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন—

"ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্যহেতু সেসকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এজন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।"

—পূর্ববৎ, পৃঃ ৭৮-৭৯

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলী পাঠেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত সমর্থিত হয়। তিনি কোনো উপধর্মে বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর স্বীকৃত ধর্ম ছিল বিশ্বজনীন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর উপাস্য। সাকার ঈশ্বরকল্পনায়, মূর্তি পূজায় ও ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানাদিতে তাঁর আস্থা ছিল না। শুধু তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ নয়, তাঁর 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটক থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে সময়ের অগ্রবর্তী বলা যায় কিনা সন্দেহ। তৎকালীন সাধারণ হিন্দুর তুলনায় অগ্রবর্তী হলেও তখনকার যশস্বী ব্যক্তিদের তুলনায় তাঁকে অগ্রবর্তী বলা যায় না। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যে হিসাবে আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সে হিসাবে আপন কালের অগ্রবর্তী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁদের অনুবর্তীই ছিলেন। ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দেখা বোধহয় এই অনুবর্তনেরই ফল।

কিন্তু রামপ্রসাদকে নিঃসন্দেহেই আপন সময়ের অগ্রবর্তী বলা যায়। রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের বহু পূর্বেই তিনি যে ধর্মাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, বাংলার ইতিহাসে তা একটি বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর কোনো সহায়সম্বল ছিল না। শুধু সহজাত হৃদয়প্রবৃত্তি ও কণ্ঠনিঃসৃত গানের সম্বল নিয়ে তিনি বাংলাদেশের মনোজগতে যে নিঃশব্দ ধর্মবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। পরবর্তী শতাধিক বৎসরে বাংলাদেশে ধর্মের যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তার সুনিশ্চিত ভূমিকা রচিত হয়েছিল রামপ্রসাদের গানের দ্বারা। তার মধ্যে সুগভীর অনুভূতি আছে, সংশয়হীন সত্য আছে, হৃদয়জয়ের দুর্নিবার শক্তি আছে—অথচ তার কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই, আড়ম্বর নেই। রামপ্রসাদের ধর্মভূমিকার স্বরূপ ও গুরুত্ব প্রথম অনুভব করেন ঈশ্বরচন্দ্র। বস্তুতঃ ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে তিনি রামপ্রসাদেরই যথার্থ অনুবর্তী। এই অনুবর্তিতাই তাঁকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তন করতে সহায়তা করেছিল। ছেলেবেলা থেকে রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে তাঁর হৃদয়ে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হতে বেশি সময় লাগেনি।

এবার রামপ্রসাদের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। আশা করি তার থেকে পূর্বোক্ত অভিমতের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।

১। নিরাকারবাদিরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার জ্ঞান ও উপাসনা করেন, ইনি 'কালী' নাম উচ্চারণপূর্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক। যথার্থভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয়পক্ষেরি তুল্য হইতেছে। তাঁহারা যেমন তীর্থপর্যটনাদি ক্রিয়াকর্ম গ্রহণ করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন।

...সেন সদাভাবে স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন—যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যাপূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না।

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, আশ্বিন, ১; 'কবিজীবনী', পৃঃ ৩৩৭-৩৮

২। তিনি পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য বিষয়সকল লইয়া ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্যচিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিল না, বিষয়বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন।... তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করে, অতি কুৎসিৎ সামান্য রূপোসোনার উপাসনা তাহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে?

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, পৌষ, ১; 'কবিজীবনী', পৃঃ ৬৮

৩। ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপে প্রমাণ হইয়াছে।

ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগ-বিরাগী হইয়া প্রীতিচিত্তে গীতছলে পরম-পূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তিরসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞান-গত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থপক্ষে উভয়েরি কর্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।

—পূর্ববৎ; 'কবিজীবনী', পৃঃ ৬২

৪। যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশকালপাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্মানুযায়ি প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন তিনি জগদীশ্বরের নিকটে দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক, সর্কভিই তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত কর্মের হানি হয় না। যথা গোলাব পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেনকবির কালীনামাদি উচ্চারণ যে মৌখিক মাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।

প্রসাদ বলে আমি মাতৃরিভাবে
তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি
বুঝরে মন ঠারেঠোরে।।

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, মাঘ, ১; 'কবিজীবনী', পৃঃ ৬২

রামপ্রসাদের গানগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র যে উদার বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সে আদর্শের প্রতি তাঁর নিজেরও যে আন্তরিক অনুমোদন ছিল, তা এই উদ্ধৃতিগুলির ভাষাতে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শ যে মূলতঃ অভিন্ন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত অভিমত যে সত্য তাতে সন্দেহ থাকে না।

প্রশ্ন হতে পারে রামপ্রসাদী ধর্মের ঈশ্বরচন্দ্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য কিনা। অর্থাৎ তা ঈশ্বরচন্দ্রের আরোপিত স্বীয় মতের প্রতিরূপমাত্র কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় সর্বত্রই প্রশংসনীয় তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিপরায়ণতা ও ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কেননা প্রতি পদেই তিনি রামপ্রসাদের গান উদ্ধৃত করে নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। রামপ্রসাদের পদাবলীর সামগ্রিক পর্যালোচনা করলেও ঈশ্বরচন্দ্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। এ স্থলে উক্ত পদাবলী থেকে কয়েকটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।—

আর কায কি আমার কাশী।
ওরে কালীপদ কোকনদ
তীর্থ রাশি রাশি।।
গয়ায় করে পিণ্ডদান
পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান
তার গয়া শুনে হাসি।।
কাশীতে গেলেই মুক্তি—
বটে সে শিবের উক্তি;
সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি তার দাসী।।...

কৌতুকে প্রসাদ বলে—
করুণানিধির বলে
চতুর্বর্গ করতলে
ভাবলে এলোকেশী।।
—'কবিজীবনী'। পৃঃ ৩৩৬

মা আমার অন্তরে আছ।...
প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হোয়ে
মনোময়ী হোয়ে নাচ।।
—পূর্ববৎ, পৃঃ ৭৮

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা
দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে,
পদে গঙ্গা গয়া কাশী।।
—পূর্ববৎ, পৃঃ ৭৫

এমন দিন কি হবে তারা।
(যবে) ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা।।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে
মা বিরাজে সর্বঘটে—
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে
তিমিরে তিমিরহরা।।
—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী—৭১

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।...
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই—জান না।।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস উপাসনা।।
পূর্ববৎ, পদাবলী—৭৮

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও অনুরূপ [illegible] ভাবের অভাব নেই। এখানে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হল।—

লোকাচারে দেশাচারে
জাতিপ্রথা ব্যবহারে নাহি হয় সত্যের প্র[illegible]
সত্যের হইলে দাস
এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহা[illegible]
সমাজেতে যদি রই
সত্যসভা ছাড়া হই,
তোমা-ছাড়া হতে ভবে [illegible]
সত্য আর লোকাচার
আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে [illegible]
যদ্যপি তোমায় স্মরি,
সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে ক[illegible]
অনাচারী নিজে যারা
অনাচারী বলে তারা,
হরি হরে ভেবে জ্ঞান হ[illegible]
—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), তত্ত্ব, পৃঃ [illegible]

এক ভিন্ন নাহি আর,
তিনি সংসারের সার,
আত্মরূপে সবাকার
হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয়বিত্ত,
নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তিভরে ভজ চিত্ত,
নিত্য নিরাময়।
—পূর্ববৎ, শরীর অনিত্য, পৃঃ [illegible]

বিবেক কাজল প'রে দৃষ্টি অভিনব,
বোধহয় ব্রহ্মময় সমুদয় ভব।।
—পূর্ববৎ, মনের প্রতি উপদেশ, পৃঃ ৬

তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
একের পূজাই ধর।
সদা এক-জ্ঞানে থেকে এক-ধ্যানে
জীবন সফল কর।।
—পূর্ববৎ, তত্ত্বজ্ঞান, পৃঃ ৬[illegible]

কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাতা।
কেহ কহে ব্রহ্মময়ী জগতের মাতা।।
মাতা হও পিতা হও সে হও সে হও।
হলে তুমি একমাত্র তুমি ছাড়া নও।।
—পূর্ববৎ, নিবেদন, পৃঃ ৪[illegible]

একেতেই সব হয়,
একেতেই সব লয়,
একেতেই একময় সব একাকার।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর।।
—পূর্ববৎ, তত্ত্ববোধ, পৃঃ ৪১

পেয়েছি পরম নিধি,
না মানি নিষেধ-বিধি,
উপরোধ অনুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি,
আর নাহি ভেদ গণি,
এ জগতে সমান সবাই।।
এই আমি আমি নই,
এই আমি আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।
ব্রহ্মময় সমুদয়,
ব্রহ্মছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার।
—পূর্ববৎ, ব্রহ্মময়, পৃঃ ৯৩

(ক্রমশ)

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

আচার্য দীনেশচন্দ্র

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন, তাঁর সম্পর্কে একটি প্রচলিত উক্তি প্রায় প্রবাদে পরিণত যে, মৃত্যুকালেও তাঁর আঙুলে কালির ছাপ ছিল। সধবা নারীর কাছে সিঁদুরের চিহ্ন যেমন সৌভাগ্যের পরিচায়ক, লেখকমাত্রেই কালি চিহ্নিত হয়ে মৃত্যুবরণও তেমনই এক আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা।

"প্রাচীন বাংলা সাহিত্যসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী পূর্তির শুভলগ্ন আসন্ন"—সেই উপলক্ষে বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে আচার্য দেবের অনুরাগীবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি বিরাট সভায় একটি সুদৃঢ় কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন, এই সংবাদ নিঃসন্দেহে সুসংবাদ।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য আমাদের জীবনে ঘটেছে, বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ কয়টি বছর আমরা প্রায় তাঁর নিত্য-সঙ্গী ছিলাম, এই মহাপ্রাণ সাহিত্যসেবী মানুষটির প্রকৃত পরিচয় দেশবাসী এখনও পরিপূর্ণভাবে অবগত নন, আশা করি তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ঢাকার সুয়াপুর গ্রামে দীনেশচন্দ্রের জন্ম। বি-এ পাশ করার পর তিনি কুমিল্লার শম্ভুনাথ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সাহিত্য-প্রীতির জন্যই তিনি কলিকাতার নাগরিক জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দীনেশচন্দ্রের সৌভাগ্য যে সেই কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যর আশুতোষের মত মানুষ ছিলেন সর্বাধিনায়ক আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অধিনায়কত্ব ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির। এই দুটি মহৎ আশ্রয়েই তরুণ দীনেশচন্দ্র অনায়াসে লাভ করেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রাচীন পটভূমি, বঙ্গ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং বাংলার পুঁথি ও পট প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা তাঁকে কলকাতার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"যেমন ভূস্তর পর্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, জল-প্লাবন, তুষার সংহতি কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন, তেমনি যে সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে জানিতে পারি।"

দীনেশচন্দ্র সেই দুরূহকর্তব্য সাধন করেছিলেন। তাঁর তরুণ বয়সের লেখা 'পরাগলী মহাভারত' 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ও ঘনরাম' 'মুসলমান কবির বাংলা ভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। দীনেশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে, খৃষ্টজন্মের তিনশত বছর আগে মগধীলিপি, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের লিপিপ্রথার প্রচলন ছিল। সেই সময় পর্যন্ত নাগরী অক্ষরের উদ্ভব ঘটে নি। মহারাজ চন্দ্রবর্মার লিপি প্রাচীন বঙ্গলিপির নিদর্শন। মহারাজ চন্দ্রবর্মার লিপি নিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাসে' বিস্তারিত আলোচনা আছে।

দীনেশচন্দ্র অতিকষ্টে প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করতেন। তিনি লিখেছেন : "পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া পুঁথি সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে রক্ষিত। আমাদের সাধুর যুক্তি ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর বিচলিত করিতে পারে নাই, কিন্তু পুস্তক খানা পড়িলে কেহ কেহ উৎফুল্ল হইয়া নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন দশ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই দশ মাইল পুনঃ প্রত্যাবর্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে।"

এইভাবে কাজ করার জন্য দীনেশচন্দ্র পীড়িত হয়ে পড়লে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। দীনেশচন্দ্র একজন অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লী-গবেষক, সামান্য একটি বিদ্যালয়ের বি-এ পাশ করা শিক্ষকমাত্র তাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন দান করায় সেই সময় সাময়িক পত্রাদিতে নানা রকম বক্রোক্তি এবং বিদ্রূপ করা হয়। এমনই একটি সুদীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা অমৃত সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের আজও মুখস্থ আছে।

দীনেশচন্দ্রের গবেষণায় হয়ত অপূর্ণতা আছে, থাকা কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু তখনকার কালে এই সব কাজ করা যে কি কঠিন ও বায়সাধ্য ছিল সেকথাও স্মরণ করা কর্তব্য। দীনেশচন্দ্র পথিকৃৎ তাই নমস্য। তাই তিনি স্মরণীয়।

তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র মত আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ "বৃহৎবঙ্গ" (১৯৪৩)—এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত এবং এর একটি ইংরাজী সংস্করণও আছে। কামরূপ-বিহার-উৎকল এবং বঙ্গ এই বৃহৎ অংশ নিয়ে বৃহৎবঙ্গ। বাঙালীর জাতি, বর্ণ, কৌলীন্য প্রথা এবং পূজো-পার্বনের নানাবিধ সংস্কার, প্রভৃতি এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

দীনেশচন্দ্র অতিসুন্দর গল্পরচনা করতে পারতেন, তাঁর 'রামায়নী কথা' (১৯০৪), ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য (১৯২২), পদাবলী মাধুর্য (১৯৩৭), প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান (১৯৪০), উপন্যাস শ্যামল ও কজ্জল (১৯৩৬) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ। ছোটদের জন্যে তিনি [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] রচনা করেন তার [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] লিখেছিলেন— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] সাধন করিয়াছেন। এইরূপে পূজার [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের [illegible] দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলেই এক কালে দীনেশচন্দ্রের [illegible] বা [illegible] পাঠ করেছেন।

দীনেশচন্দ্র অনেকসময় কোনো কিছু গ্রন্থাদি না দেখেই বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করতে পারতেন, তথ্য এবং সন তারিখে [illegible] নির্ভুল। এমন স্মৃতিশক্তি আর দেখা যায় না। অতিশয় জীর্ণ শরীরেও রোগশয্যায় বসে বৃহৎ একটি কাঠের জাপানী কলমে দীনেশচন্দ্র দিনের পর দিন লিখে যেতেন, আশে-পাশে নাতি-নাতনীরা খেলা করত, পাশের ঘরে রান্নার কলরব, দীনেশচন্দ্রের কিন্তু কোনো দিকে দ্রূক্ষেপ নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় স্নেহ-পরায়ণ মানুষ ছিলেন, কত ছাত্র এবং অনাথ যে তাঁর কাছে প্রতিপালিত হয়েছে তার হিসাব পাওয়া দুষ্কর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আজ দু-তিন হাজার টাকা

মাসিক আয় করে থাকেন। দীনেশচন্দ্র একরকম আত্মভোলা উদাসীন মানুষ ছিলেন। তাঁর চাদর পড়ে যেত, পথ চলতে অনেক সময় ভুল হত, সর্বদাই তিনি চিন্তামগ্ন থাকতেন।

'শ্যামল ও কজ্জল' বাংলা সাহিত্যের একটি আশ্চর্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাস মোগল-পাঠানের কাহিনী নয়। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ যুগের কাহিনী অতিশয় মনোরমভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ।

তিনি তরুণ সাহিত্যপ্রতিভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। কল্লোলের লেখকবৃন্দ সম্পর্কে বিশ্বকোষ লেনে থাকার সময় লিখেছিলেন : 'এই সকল বলদর্পিত মর্মবান লেখকদের পদভরে প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের অস্থিপঞ্জর কেঁপে উঠবে। কিন্তু আমি এঁদের লেখা পড়ে যে কত খুসী হয়েছি তা বলতে পারি না। আমাদের মনে হয় ডোবা ছেড়ে পদ্মার স্রোতে এসে পড়েছি—যেন কাগজ ও সোলার ফুল—লতার কৃত্রিম বাগান ছেড়ে নন্দনকাননে এসেছি—'

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে তরুণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগুন' উপন্যাসটি পাঠ করে দীনেশচন্দ্র নীল পেন্সিলে বইটির পোস্তানিতে ইংরাজী ভাষাতে লিখেছিলেন অকুণ্ঠিত প্রশস্তি, তার মধ্যে সমালোচনা ছিল, কিন্তু আচার্য দীনেশচন্দ্র তারাশঙ্কর যে একদা আপন গৌরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উচ্চসম্মানের আসন ও মর্যাদা লাভ করবেন এই ভবিষ্যৎ-বাণী তিনি করেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র ছোট বড়ো সবাইকে সমান চক্ষে দেখতেন। কলহদুষ্ট সাহিত্যের কোলাহলের বাইরে থাকতেই তিনি অতিমাত্রায় আগ্রহশীল ছিলেন। করুণা ও মমতায় দীনেশচন্দ্র ছিলেন তুলনাহীন। তাঁর কথা সংক্ষেপে সারা যায় না। দীনেশচন্দ্রের শতবর্ষপূর্তি উৎসব সার্থক হোক।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

সুব্রাহ্মানিয়া ভারতীর মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠান ॥

প্রতি বছরের মত এবারও কলকাতায় তামিলনাদের জাতীয় কবি সুব্রাহ্মানিয়া ভারতীর ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর তামিল লেখক সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহেমচন্দ্র গুহ। তিনি বলেন, দেশের সংহতির জন্য আজ ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যের অনুবাদ প্রয়োজন। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতীকে বিশ্বকবি বলে উল্লেখ করেন। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির অধ্যক্ষ মনসুখলাল জাভেরী জাতীয় আন্দোলনে তাঁর স্মরণীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সংঘের সভাপতি শ্রী পি এন রঙ্গরাজন এবং সম্পাদক শ্রী এস কৃপুস্বামী সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানান।

বাংলা সাহিত্যে যেমন 'রবীন্দ্রযুগ' একটি বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত, তামিল আধুনিক সাহিত্যেও তেমনি 'ভারতী যুগ'। শ্রী এম আর জম্বুনাথন তামিল সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন,

> "Modern Tamil literature can be divided into three sections—the era of origin, the era of Bharati, and the era of Gandhiji."

প্রথম যুগের তামিল সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যের মতই ছিল ধর্ম-নির্ভর। ভারতী যুগে প্রবেশ করেই এই সাহিত্যের একটা ব্যাপক পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সন্দেহ নেই যে, তামিল সাহিত্যে এই পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট করেছিলেন ভারতী। অবশ্য এই পরিবর্তনের অনেকটা পেক্ষাপট রচনা করেছিল বাংলার জাতীয় আন্দোলন এবং বাংলা সাহিত্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশ ভারতীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বন্দেমাতরম তাঁর মনে জাগিয়েছিল স্বদেশপ্রেমের সুতীব্র আবেগ। তিনি জীবনের অনেকটা সময়ই কলকাতায় কাটিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, মতিলাল ঘোষ প্রমুখের সাহচর্যও তাঁর সাহিত্য-চেতনাকে নির্ধারিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তাঁকে দিয়েছিল প্রেরণা। তাঁর রচিত সাহিত্যে বাংলার জাতীয় চেতনা, বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব তাই স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাও তিনি তামিলে অনুবাদ করেছেন। জগদীশচন্দ্র বসু কিভাবে তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল, তা তাঁর একটি উক্তি থেকেই প্রমাণিত হবে। তিনি বলেছেন—

> "His very words resound with the universal life current and in turn strengthen the life current of his readers".

তামিল সাহিত্যে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি মনে করতেন, যতক্ষণ মনে ভয় থাকবে ততক্ষণ মুক্তির কোন পথ নেই। 'ভয় নাই' নামক কবিতায় তাই তিনি ভয়কে মন থেকে মুছে ফেলে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সিস্টার নিবেদিতার বাণীও তাঁর জীবনে কার্যকরী হয়েছিল। তিনি জেনেছিলেন, পাখি যেমন একটি ডানায় উড়তে পারে না, মানুষও তেমনি শক্তি ছাড়া সমাজের বিবর্তন আনতে পারে না। যে-মন দ্বিধাখন্ডিত, স্বাধীনতার জন্য তা অক্ষম। 'পাঁচালী শপথম' কবিতায় তিনি এই কথারই প্রতিধ্বনি জাগিয়েছেন। দুর্যোধনের রাজসভায় দ্রৌপদী লাঞ্ছিত। সে ভিক্ষা চাইল, সে কেঁদে উঠল। কিন্তু কিছুই হল না। তারপর, সমালোচকের ভাষায়—

> "Weak as she was, loosening her hair she took a public vow that she would not bind it up till she had saturated it with the

পূর্ব জার্মানি ভারততত্ত্ববিদ ডঃ জে মেহলিগ (বামে) তাঁর 'সতীদাহ প্রথা' সম্পর্কিত গবেষণার পাণ্ডুলিপি অধ্যাপক ডঃ হাইনশ মোদের হাতে পেশ করছেন। ডঃ মোদে বাঙলা ভাষায় বহু প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

blood of the tyrant and his men".

ভারতীয় কবিতায় এই বীরধর্ম সর্বত্র প্রকাশিত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। 'ভারতী'র সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক এত নিবিড় হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাংলায় ভারতীর কোন গ্রন্থ অনূদিত হয়নি। 'তামিল লেখক সংঘ' এ-ব্যাপারে কিছুটা উদ্যোগী হলে ভালো হত, যদিও তাঁরা প্রতিবারই 'ভারতী দিবস' পালন করেন। এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার লেখক সমাজের সঙ্গে তামিল লেখক সমাজের যে খুব একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন মনে করা যায় না। 'তামিল লেখক সংঘ' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী-দের যেমন উৎসাহের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানান, তেমন আগ্রহ খ্যাতিমান লেখকদের ক্ষেত্রেও দেখা গেলে ভালো হয়।

হিন্দি সমালোচকের সম্মান ॥

বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যের সমালোচক আচার্য নন্দদুলারে বাজপেয়ীকে গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সম্বর্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন 'ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রধান শ্রীকল্যাণমল লোধা পৌরোহিত্য করেন। শ্রীনন্দদুলারে বাজপেয়ী বর্তমান হিন্দি কবিতা সম্পর্কে উল্লেখ্য ভাষণ দেন।

বিদেশী সাহিত্য

লিও তলস্তয় ও ভারতবর্ষ ॥

গত ৯ সেপ্টেম্বর দিনটি মহান রুশ লেখক লিও তলস্তয়ের ১৩৮তম জন্ম-বার্ষিকী। ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, ভারতের জননেতাদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ, ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনে তাঁর অধ্যয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সম্প্রতি অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা গেছে।

তলস্তয়ের বিখ্যাত সরকার-বিরোধী 'আমি নীরব থাকতে পারি না' প্রকাশ হবার পর ভারত থেকে ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায় পত্রপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

১৯০৮ সালের জুন মাসে তলস্তয় ভারত সম্পর্কে একটি বিশদ প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। রচনাটি শেষ হয় সে-বছরেই ডিসেম্বর মাসে। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বেদ, উপনিষদ ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকেও উদ্ধৃতি ছিল। 'একজন হিন্দুর কাছে পত্র'-এ তলস্তয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে মর্মান্তিক বিবরণ লিখেছিলেন তা-ই মহাত্মা গান্ধীকে প্রথম তলস্তয়ের কাছে পত্র লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯২৫ সালে 'তলস্তয় ও প্রাচ্য' নামক পুস্তকে তলস্তয় ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে পত্রালাপ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। গান্ধীজীর

প্রথম চিঠির জবাবে তলস্তয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সংগ্রামে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

জার্মান অ্যাকাডেমি ॥

জার্মান ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা গবেষণামূলক কাজ করেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য প্রতি বছরই জার্মান অ্যাকাডেমি পুরস্কার দিয়ে থাকেন। শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-কর্মের জন্যও অ্যাকাডেমির একটি পুরস্কার আছে। অন্যান্যবারের মতো এবারেও, মাত্র কিছুদিন আগে, কোলোন শহরে তাঁদের একটি অধিবেশন হয়ে গেল। তাতে এ-বছরের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত নামগুলি ঘোষণা করা হয়। জার্মান সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য এবারে আমেরিকার প্রিন্সটন শহরনিবাসী অধ্যাপক ভিক্টর ল্যাঞ্জকে এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে—তাঁরা দু'জন হলেন যথাক্রমে ফ্র এভা রেচেল-মের্টেন্স ও ফিলিপ জ্যাকেটে। এঁরা দুজনেই ৬,০০০ মার্ক করে পুরস্কার পেয়েছেন। প্রথমজন মূল থেকে অবিকৃত-ভাবে জার্মান ভাষায় 'প্রাউস্ত্'-এর অনুবাদ করেন। দ্বিতীয়জন ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেছেন রবার্ট মুশিল্-এর যাবতীয় রচনা।

লুই ম্যাকনিসের আত্মজীবনী ॥

ম্যাক্‌নিসের কবিতার ভক্তদের কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর—সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'দি স্ট্রিংস্ আর ফলস্'। প্রকাশ করেছেন তাঁর পান্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী অধ্যাপক ই আর ডডস্। ১৯৪০ সালেই ম্যাকনিস্ এই আত্ম-জীবনীটি রচনায় হাত দিয়েছিলেন। অথচ ১৯৬৩-র মৃত্যু সময় পর্যন্তও বইটি বেরুতে পারেনি। এই দীর্ঘ সময় লাগার কারণ—প্রথমতঃ, পান্ডুলিপিটি মুদ্রণের জন্য তৈরী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তা ছিল অসমাপ্ত। অবশ্য তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কবিতার অনুরাগীরা তাঁর বিষয়ে গ্রন্থটি থেকে নানা মূল্যবান সূত্র খুঁজে পাবেন।

কবিমাত্রেরই আত্মজীবনী হচ্ছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও মনোজগতের উদ্ঘাটন। এবং নিজের বিষয়ে সত্যভাষণের দায়িত্ব। পরিবেশ, ব্যক্তিমানুষের প্রভাব ও চিত্তবৃত্তিই এর প্রধান লক্ষ্য। ম্যাক্‌নিসের জীবনস্মৃতি থেকে যেমন সমকালীন ও পূর্ববর্তী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত জানতে পারা যায়, তেমনি নিজের সাহিত্য-সাধনার পক্ষেও কিছু তথ্য পাঠক বা গবেষকের কাছে মূল্যবান উপরিপাওনা।

মানবসেবায় গ্রন্থস্বত্ব দান

খবরে প্রকাশ, জে বি প্রিস্টলে মানব-সেবার তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থটির সবরকম স্বত্ব দান করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। গ্রন্থটির নাম 'মোমেন্টস্ অ্যান্ড আদার পীসেস্'। বইটি অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

মানুষের ক্ষুধা ও দুঃখ মোচনের কাজে [illegible] সেবা প্রতিষ্ঠান 'অক্স্‌ফ্যাম'-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই তাঁর এই মহৎ কাজের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থটি কয়েকটি প্রবন্ধ, কিছু বক্তৃতা ও আলোচনার একটি সংকলন। 'মিউজিক হলস', 'টোব্যাকো' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লেখকের চিন্তা এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আরো দুটি গ্রন্থের নাম এ-প্রসঙ্গে করা চলে। একটি হোল 'চেফস্ গ্যালরে'—বইটি রন্ধন-তত্ত্বের। স্যার লরেন্স অলিভিয়ের ও মিসেস্ জনসনের মত খ্যাতনামাদের রন্ধন-প্রণালী এতে জানা যাবে। অন্য গ্রন্থটি এ্যালান বার্টিমের 'দি ওয়ার্ল্ড অব দি চাইল্ড'।

১৯৬৬-র পুলিৎজার পুরস্কার

সাহিত্যকর্মের জন্য এ-বছর 'পুলিৎজার পুরস্কার' পেয়েছেন চারজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। আমেরিকার স্বনামধন্যা গল্পকার ক্যাথরিন অ্যানি পোরটারকে পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁর উপন্যাসের জন্য। কবিতার জন্য এই সম্মান পেয়েছেন রিচার্ড এবারহার্ট। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও আমেরিকার স্বর্গত প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিশেষ সহকারী আর্থার এম শেলসিংগার (ছোট) পেয়েছেন 'আত্মজীবনী' রচনার জন্য। স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৪৬ সালেও ইনি ইতিহাসের জন্য একবার পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবারে ইতিহাসের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় স্বর্গত পেরি মিলারের নামে। ইনি ১৯৬৩ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদবর্গের অন্যতম ছিলেন।

ক্যাথরিন্ অ্যানি পোরটার

নতুন বই

বাঙলার পল্লীগীতিঃ নিঃসীম আনন্দলোক

বিচিত্রতায় ভরা এই বাঙলা দেশ। তার রঙরূপ রসের তুলনা মেলা ভার। এর সংস্কৃতি বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। অপূর্ব রসের খনি বাঙলার পল্লীগীতি। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ বাঙলার গীতধারায় রয়েছে এক আপাতলক্ষ্য ভেদ রেখা। কিন্তু অন্তরালে ধরা পড়ে যে আদর্শগত মিল, তাই হল বাঙলা পল্লীসঙ্গীতের এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতজনরচিত এই সঙ্গীত-জগৎ আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ করে। লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে একালের শিক্ষিত মানুষের পরিচয় ঘটে বর্তমান শতাব্দীতেই। এর আকর্ষণে বহু গবেষক ও সঙ্গীত-রসপিপাসু বাঙলার বুকে ছুটে বেড়িয়েছেন। তার অপরিসীম সৌন্দর্যের রসোপভোগে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। লোকসঙ্গীতের রচয়িতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এ হল পল্লীজীবনের সামগ্রিক সৃষ্টি; বাঙলায় সামাজিক ইতিহাসের এক নিপুণ আলেখ্য।

লোকগীতির স্রষ্টারা সচেতন শিল্পী নন। আঙ্গিক বা শব্দ নির্বাচনে তাদের বৈদগ্ধ্যের পরিচয় খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু অন্তরের অকৃত্রিম অনুভূতি ও আত্ম-সমর্পণে এই সাহিত্য চিরকালের জীবন্ত-রূপ পেয়েছে। লোকগীতির বিশাল ভান্ডারের সৌন্দর্য আজ অনেকখানি উদ্ঘাটিত। কিন্তু তা আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। অফুরন্ত গানের ভান্ডার সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে বাঙলা সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য। তবুও দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে সম্প্রতিকালের বহুজনের চেষ্টায় এই সুরলোকের অভিজ্ঞান অনেকখানি পরিজ্ঞাত।

পল্লীগীতির মধ্যে দেবদেবীর বন্দনা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই সব গীতির মধ্যে মানুষের অভাব-অভিযোগ সুখ-দুঃখের কাহিনীও ব্যক্ত হয়েছে। ফুটে উঠেছে এক নিঃসীম আকূতি। কিন্তু দেবতা এদের হাতে হয়েছেন মর্তের মানুষ। লৌকিক দেব-দেবী তো তাদের ঘরেরই আপনজন। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে মানুষ ও দেবতা একাত্ম হয়ে গেছে।

বাঙলা দেশে লোকগীতি সংগ্রহ করে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব তাদেরই একজন। বাঙলা দেশের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে তিনি ঘুরেছেন। অসম্ভব কষ্ট স্বীকার করে তিনি এইসব কাজ করেছেন। বেশ দীর্ঘকাল পূর্বে তাঁর "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর সুধীজনের আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেছেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাংলার পল্লীগীতি' পূর্ব সুনামকে অক্ষুন্ন রেখেছে।

বিভিন্ন ঋতুতে সারা বাংলায় ব্রত পাল-পার্বণ উপলক্ষে যে সঙ্গীত অনুষ্ঠান হয় তার মনোরম বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের আলোচনা পাঁচটি খন্ডে বিভক্ত : লৌকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠান, বহিঃ-প্রাকৃতিক, অন্তরধর্ম, সাময়িকগীতি, ছড়া ও প্রবচন।

গম্ভীরা, মেছেনীর গান, হুদুমা, মেঘারাণীর ব্রত ও গান, ঝুমুর, জারি, ঝাপান ও ভাসান, ভাদুগান ও পরব, করম পুজা উৎসব, আগমনী ও বিজয়া, আহিরা উৎসব, টুসুগান ও পরব, পৌষ পার্বন, গারমেঠাকুরের গান, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, মানিকপীরের পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, বিয়ের গান, ব্রত অনুষ্ঠান, ভাওয়াইয়া, সারি, ভাটিয়ালী, বারমাস্যা, বিচ্ছেদের গান, ধানকাটার গান, আদিবাসীদের গান, বিভিন্ন বিষয়ক পালা গান, ভাসান গান, কবিগান তরজা ও টপ, বাউল, বৈরাগী ও বৈষ্ণবের গান, কীর্তন ও সংকীর্তন, দেশাত্মবোধক ও স্বদেশী গান, গাজীর গান, বয়াবতীর গান, হোলির গান, রাখালিয়া গান, উদাসীর গান, জাগের গান, বাইদ্যানীর গান, মেঠো গান, ঘুম পাড়ানী ছড়া ও গান বহু বিচিত্র গান সংকলিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গানের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার।

ব্রত অনুষ্ঠানে আছে কুমারীব্রত বা শিবপুজা, অশ্বত্থ নারায়ণের ব্রত, হরির চরণ, পুণ্যিপুকুর, অলক্ষ্মীপুজা, ইতু পুজা, তুষ-তুষলী, মাঘমন্ডল, গো-ক্ষুর ব্রত, বনদুর্গার পুজা, ভাই-ফোঁটা, ঘেঁটু-তারার ব্রত, পাঁচড়া পুজা, মঙ্গলচন্ডী-র আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা প্রবচন ধাঁধা ও ঠারের সংগ্রহ আছে। বাঙলার ছাব্বিশ প্রকার লোকবাদ্যের বিবরণ, তিন প্রকার লোকনৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থকার। এই সঙ্গে আছে লোকবাদ্যের চিত্র।

সংগৃহীত উপাদানের আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল। গ্রন্থকারের বক্তব্য কয়েকটি স্থানে পরিস্ফুট হয়নি—ফলে বক্তব্য বিষয়ে লেখকের চিন্তাধারা অনেক অপরিচ্ছন্ন থেকে গেছে। ভাষা সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

তবুও নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে উপাদান শ্রীদেব সংগ্রহ করেছেন ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে তার মূল্য অপরিসীম। শহরবাসী মৌখিক বিদগ্ধ লোকগীতি বিশেষজ্ঞের শ্রেণীভুক্ত যে বর্তমান গ্রন্থকার নন, তা পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থখানি পাঠ করলেই।

বাংলার পল্লীগীতি (আলোচনা)—চিত্তরঞ্জন দেব। পুরবী দেব প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—আট টাকা।

সাধক জীবন

মহাসাধক শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের জীবনী গ্রন্থ 'মহাসাধক নিগমানন্দ' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নিগমানন্দের জীবনের আলোকসামান্য ঘটনাবলীর আকর্ষণ বিস্ময়কর। শ্রীতারক হালদার তাঁর রচিত এই গ্রন্থে মহাসাধকের জীবন কথা উপন্যাসের ন্যায় আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করেছেন। ভূমিকায় প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী বলেছেন : "আজীবন সাধনায় অমৃত সন্ধানের পথচারী স্বামী নিগমানন্দের লোকহিতকারী সুপবিত্র কর্মাবলীর সঙ্গে তাঁহার জীবন কথার মধুমিলনে এই গ্রন্থ অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।" বর্তমান গ্রন্থখানি সাধারণ্যে সমাদৃত হবে। প্রচ্ছদ-পটটি নিগমানন্দের চিত্রে সুশোভিত।

মহাসাধক নিগমানন্দ (জীবনী)—তারক হালদার। বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস। ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম ২-৫০ পয়সা।

●

রোমাঞ্চ কাহিনীর বিস্ময়কর জগৎ

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের "অপরাধ দেশে দেশে" মোট তেরটি রোমাঞ্চকারী গোয়েন্দা-কাহিনীর সংকলন। কাহিনীজাল এক-একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত এবং কিছুকাল পূর্বে এগুলি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বিচিত্র স্বাদের এতগুলি গোয়েন্দাগল্প রোমাঞ্চরসপিপাসু পাঠকদের আনন্দ দেবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এর মধ্যে 'বেপরোয়া ফিলিপ অ্যাং', 'বিভৎস শিল্পকর্ম', আর 'আগা খাঁর অলঙ্কার অপহরণের শেষ অধ্যায়' কাহিনী-গুলিতে গোয়েন্দাগল্পের পুরোপুরি লক্ষণ, যেমন উত্তেজনা, বিস্ময় ও ভয়, বর্তমান। বাকিগুলিকে নিছক 'ক্রাইম-স্টোরি' বলা যায়।

অপরাধ দেশে দেশে : বীরু চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম ৪·৫০ পঃ।

স্বাধীনতাসংগ্রামে বাঙলা রঙ্গালয়ের ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মূলে বাঙলা দেশের অফুরন্ত অবদানের কথা অনস্বীকার্য। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর যেদিন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হ'ল, সেদিন থেকেই আইনজীবী সাহিত্যিক, শিক্ষক, ছাত্র, অর্থনীতিবিদ-নির্বিশেষে সকলেই মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই মুক্তিসংগ্রামের একটি বিশিষ্ট অংশীদার হয়ে পড়েছিলেন বাঙলার সৌখীন ও সাধারণ নাট্যশালার নায়কগণ। একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা মানুষকে যতখানি না উজ্জীবিত করতে পারে, একটি অভিনয়ে যে তার থেকে শতগুণে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ, এ-কথা সকলেরই জানা আছে। এবং তাই দেখা যায় যে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু ক'রে স্বাধীনতালাভের প্রায় অব্যবহিত পূর্ব ১৯৪৩ পর্যন্ত বাঙলা রঙ্গালয় এবং ঐ সঙ্গে নাট্যকারগণ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাঙ্কেতিক, রূপক নাটক ও প্রহসনের মাধ্যমে বাঙালী জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধক ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে জাগ্রত করতে প্রয়াস পেয়েছেন প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। বাঙলা রঙ্গালয় ও বাঙালী নাট্যকারদের অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে এই মহতী প্রয়াসের কাহিনী সুষ্ঠু-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা" গ্রন্থে। মাত্র আটত্রিশ পৃষ্ঠার ভিতর তিনি যেভাবে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হওয়ার জন্যে কবিবর নবীন সেনের আক্ষেপ থেকে শুরু ক'রে নীলকরদের অত্যাচারপীড়িত চাষীদের অবস্থায় ক্ষুব্ধ হয়ে দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" রচনা ও তাঁর আদর্শে সমসাময়িক ও পরবর্তী নাট্যকারদের জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিবরণ ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন, তাতে তিনি গন্ডুষে সমুদ্রপানের মতোই অসাধ্য-সাধন করেছেন। বহু নাটক থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার ক'রে রঙ্গালয়ের স্বাধীনতাসংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকে তিনি প্রামাণিকত্ব দান করেছেন। মূল প্রবন্ধটি ছাড়াও রঙ্গালয় সংক্রান্ত আরও তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ বইটির কলেবর-বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। বইখানির প্রচ্ছদপট যেমন পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিপূর্ণ, ভিতরের ছাপা সেই অনুযায়ী নয়। কিছু কিছু মুদ্রাকরপ্রমাদও দৃষ্টিগোচর হ'ল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা— (আলোচনা) মন্মথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম—৩·৫০ প।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

বাংলা সাহিত্যকে অবাঙালী পাঠকদের হাতে অনুবাদের মাধ্যমে পেণছে দেবার প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরে অনুভূত হলেও, এ দুরূহ কাজে তেমন কেউ-ই এগিয়ে আসেন নি। অবশেষে যখন কলকাতার কয়েকজন তরুণ কবি ও সাহিত্যানুরাগী দুঃসাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে এলেন এবং 'বেঙ্গলি লিটারেচর' প্রকাশ করলেন, তখন তাদের এই গঠনমূলক প্রচেষ্টাকে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এর দ্বিতীয় সংখ্যা। বলা বাহুল্য প্রথম সংখ্যায় যে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, হালের সংখ্যাটিতে তা একেবারেই অনুপস্থিত। পরিচালকমণ্ডলী এই সযত্ন প্রয়াসের জন্য নিঃসন্দেহেই ধন্যবাদার্হ। রচনা নির্বাচনের দিকেও তাঁরা অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। ফলে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রগতি এই পত্রিকাটিতে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর তার ফলে কাগজটির মর্যাদাও অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। ভাষান্তরকরণে এবার আশ্চর্য দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। কবিতা লিখেছেন ১৭ জন খ্যাতনামা প্রবীণ ও তরুণ কবি। তাছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, সিনেমা ও শিল্পসম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে দুটি করে।

বেঙ্গলি লিটারেচার (২য় সংখ্যা) প্রধান সম্পাদক : আশিস সান্যাল, ৫৩, বিধান পল্লী; কলকাতা-৩২। দাম : ২ টাকা।

●

কবিতা-বিষয়ক কাগজ 'সীমান্ত' পত্রিকা যখন দীর্ঘকাল বাদে আবার প্রকাশিত হয়, তখন কাব্যানুরাগীমাত্রেই পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীতরুণ সান্যাল ও শ্রীপ্রসূন বসুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এর ভাদ্র-সংখ্যা। এ-সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, মৃগাঙ্ক রায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, তরুণ সান্যাল, প্রসূন বসু, আশিস সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত এবং আরো অনেকে। তাছাড়া রয়েছে ফরাসী, রুশ ও অস্ট্রেলীয় কবিতার অনুবাদ। তবে এ-সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ১৯৬০ সালে এলিয়টের সঙ্গে ডোনাল্ড হলের স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের অনুবাদ এবং রাম বসুর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'বিশ্বাস : কী ও কেন'। এইসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ হল 'ধ্বনি-প্রতিধ্বনি'। এতে দুজন কবির কবিতা সম্পর্কে তিনজন করে কবি আলোচনা করেছেন এবং আলোচ্য কবি তার জবাব দিয়েছেন। তাছাড়া এ-সংখ্যায় আছে কাব্য-সমালোচনা ও পত্রিকা সমালোচনা।

সীমান্ত (ভাদ্র সংখ্যা)—সম্পাদক : তরুণ সান্যাল ও প্রসূন বসু, ৫৯, পটুয়াটোলা লেন। দাম : এক টাকা।

'নতুন পরিবেশ'-এর বর্তমান সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন, কৃষ্ণ ধর, মণীন্দ্র রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, ধনঞ্জয় দাশ, প্রসূন বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, শান্তি দত্ত, চিত্ত ঘোষাল, শোভনা গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার মি[illegible], রবীন্দ্র বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যা[illegible] এবং আরো অনেকে।

নতুন পরিবেশ (আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা) সম্পাদক : প্রশান্ত গায়েন, ১৪-[illegible] ডি, এল, রায় রোড।

বিখ্যাত লোকদের ছেলেবেলার কথা

'বিখ্যাত লোকদের ছেলেবেলার কথা' নামে শিশুদের জন্যে সম্প্রতি যে বইটি বেরিয়েছে, বড়দের কাছেও সেটি সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতে আছে জার্মানী ও বিদেশের একশো তিরিশ জনেরও বেশি রাজনীতিবিদ, মনীষী ও শিল্পীর ছেলেবেলার দুষ্টুমির কথা, বাড়িতে ও স্কুলে তাদের গঞ্জনা-নির্যাতনের কথা, ও বড় হয়ে তাঁরা কে কি হবেন সে সম্বন্ধে ছেলেবেলার মনের কথা। এই বইটি থেকে জানা যায় যে পশ্চিম জার্মানীর ধুরন্ধর প্রথম চ্যান্সেলার কনরাড আডেনাউয়ের ছেলেবেলায় অত্যন্ত বিনয়ী ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন; বর্তমান চ্যান্সেলার লুডভিক এরহার্টের কিছুতেই স্কুলের পড়াশোনায় মন বসত না। আরও অনেক বড় বড় লোকের কথা এতে আছে যেমন এরিখ মেন্ডে, হিলি ব্রান্ট ইত্যাদি। এই বই থেকেই জানা যায় জার্মানজাত মার্কিন মহাকাশ বিশেষজ্ঞ হেরনের ফন ব্রাউন ছেলেবেলাতেই বাড়িতে তৈরী রকেট-গাড়িতে বাগানময় ঘুরপাক মারতেন এবং বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র ডিরেক্টর ইটালীর ফেডেরিকো ফেলিনের ছেলেবেলায় ভীষণ ভূতের ভয় ছিল।

বইটির ভূমিকা লিখেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। এই বইটির বিক্রিলব্ধ অর্থ পঙ্গু শিশুদের সাহায্যে দান করা হবে।
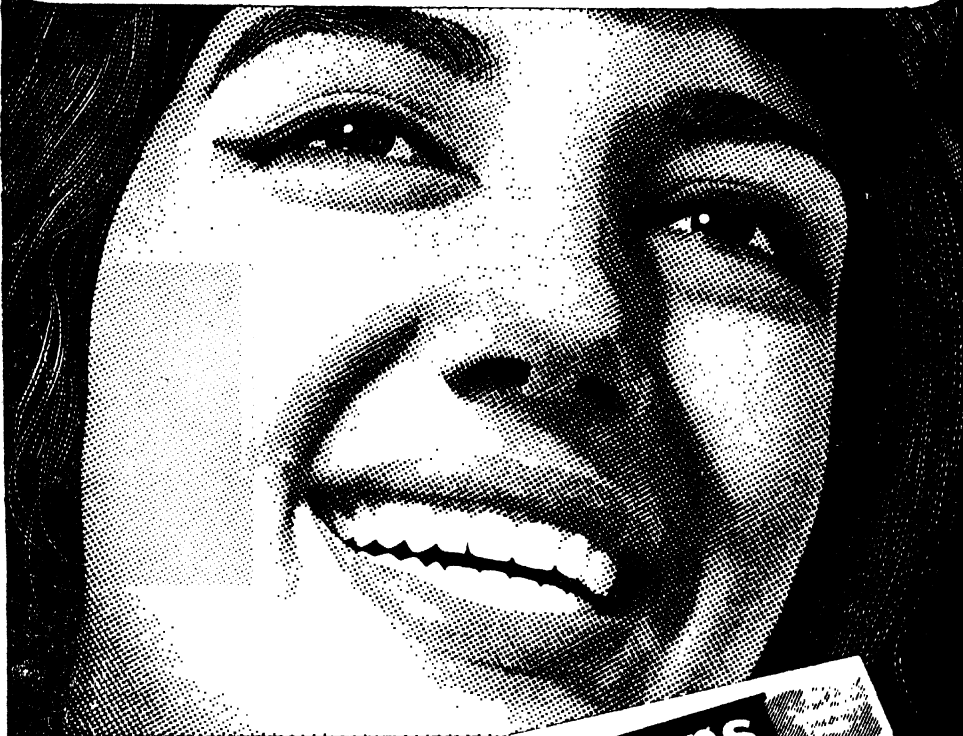
প্রদর্শনী পরিক্রমা

আগস্টের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতায় যে-ক'টি প্রদর্শনী হয়ে গেল, তার মধ্যে নতুনত্বের আভাস বিশেষ পাওয়া গেল না। এই প্রদর্শনীগুলির মধ্যে তিনটি হল চিত্র-প্রদর্শনী এবং একটি কারুশিল্পের প্রদর্শনী। এর ভেতর সবচেয়ে বেশী আর্থিক সাফল্য লাভ করেছে কারুশিল্পের প্রদর্শনীটি। নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলির সৌন্দর্যবিধানের দিকে শিল্পীদের প্রচেষ্টা এবং এ-সম্বন্ধে গ্রাহকদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। সম্ভবত সেইটিই কারুশিল্প প্রদর্শনীটির সাফল্যের কারণ।

আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টসের অন্যতম পরিচালক নৃপেন মজুমদারের ইয়োরোপ যাত্রার প্রাক্কালে এখানে শিল্পী জেরাম প্যাটেলের একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রীপ্যাটেল বোম্বাইয়ের জে জে স্কুলের ছাত্র, ইয়োরোপ প্রত্যাগত, বহু গ্যালারীতে প্রদর্শিত এবং সাম্প্রতিক কমনওয়েলথ শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখান হয়েছে। তবে কলকাতায় এই প্রথম। আলোচ্য প্রদর্শনীতে তিনি আঠারোটি ছবি দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সাতখানি ক্যানভাসে আঁকা তৈলচিত্র এবং বাকিগুলি কাঠের ওপর এনামেল পেন্ট এবং ব্লো-টর্চ-এর সাহায্যে আঁকা। ছবিগুলি সবই ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬-র মধ্যে আঁকা, সুতরাং একেবারে আধুনিক।—দৃশ্য কোন রূপের সঙ্গে যে সাদৃশ্য পরিহার করে চলা হয়েছে তা অবশ্য বলাই বাহুল্য। তাঁর ক্যানভাসে আঁকা বিমূর্ত ডিজাইনগুলি অন্যান্য বিমূর্ত চিত্র থেকে খুব একটা মৌলিক কিছু পরিবর্তন বলে মনে হয় না। কাঠের ওপর আঁকা ছবিগুলিও অবশ্য নয়, তবে ব্লো-টর্চ-এর ব্যবহার করে কিছুটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সে-বৈচিত্র্যটা বৈচিত্র্যের জন্যেই করা, কোন বক্তব্য উপস্থাপিত করবার জন্যে নয়। কারণ শিল্পীর বক্তব্য ক্যাটালগের ভেতর নিজের জবানীতে উপস্থিত করা হয়েছে, ছবির ভেতরে নয়। এখানে দেখা যায় তাঁর কাঠের ওপর আঁকা ছবিগুলিতে কাঠকে ব্লো-টর্চ দিয়ে পুড়িয়ে, কখনো বা গর্ত করে কিছু ধূসর বর্ণের ডিজাইন সৃষ্টি করে তার ওপর এনামেল পেন্ট দিয়ে কখনো কয়েকটি পেরেক ঠুকে বাকি ডিজাইনটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এর ভেতর রঙের প্রয়োগ হিসেবে তাঁর 'গার্ডিয়ানস অব দি গেট' (১), 'গেস্টাল্ট ৫' (৫) 'জেরাম নং ১' (৭), 'জেরাম ১১' (১৭) ইত্যাদি কয়েকটি ছবি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি ছবিতে কালো এনামেল পেন্টের আধিক্য প্রকৃতপক্ষে কাঠের ওপর আলকাতরা লেপনের ভ্রম সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার কালো, ধূসর, লাল, কমলা ইত্যাদি বর্ণের সামঞ্জস্য কিছুটা চক্ষুতৃপ্তিকরও হয়েছে।

এখন শিল্পী নিজে তাঁর শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলেছেন দেখা যাক। এ-ধরনের ধরাছোঁয়ার বাইরে বক্তব্য কিছু কিছু আধুনিক কবিতা ছাড়া সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রথমে তিনি বলছেন যে, তিনি কিছু বলতে, কিছু দেখাতে এবং কিছু বর্ণনা করতে চান, যেমন নাকি আর সব শিল্পী বা লেখক বা যে-কেউ চেয়ে থাকে। তিনি কি করতে পারেন, তাই তিনি দেখাতে চান। সেটা হল তাঁর মতে, তিনি যে অস্তিত্বের মধ্যে চিন্তা করছেন, খেলছেন বা কথা বলছেন, তারই প্রসারণ। ধরা যাক, সেটা হল ছবি আঁকা। ধরা যাক তিনি ছবি আঁকছেন। তিনি তখন তারই মধ্যে, তাই নিয়ে কথা বলছেন, খেলছেন কিম্বা তাঁর মনে যা খুশি হচ্ছে তাই করছেন। পরে তিনি বলছেন যে, তাঁর মনের মধ্যে কি হয় তা তিনি জানেন না। কিন্তু কি তিনি করছেন, তা তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বুঝতে পারেন। কাঠ করবার সময় যখন কাঠে আগুন দেন, তখন তিনি যে কাঠ পোড়াচ্ছেন, সেই অনুভূতিটুকু পান। কারণ, দহনকর্মটি দ্বারাই তিনি নাকি কিছু বলতে চান।...কাঠ পোড়ানোর মধ্যে কাঠের ওপর একটা আক্রমণ চালানো হয়। এতে তিনি কোনকিছুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত করেন এবং সংযোগ স্থাপনের পর তিনি কিছু কিছু জিনিস ভুলে যান। তবে কি ভুলে যান তা তিনি জানেন না। এবং এ-সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা বিভ্রান্তি জাগে। তিনি কোন জিনিস সৃষ্টি করায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে কোনকিছু সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করা যায়। এই ধ্বংসকর্মের ভেতরেই তিনি পূর্বোল্লিখিত কোনকিছুকে ভুলতে চান। এইভাবে আরো অনেক কথা তিনি বলে গিয়েছেন কিন্তু কোথাও নিজেকে স্পষ্ট করেননি। সবশেষে বলছেন, তাঁর কাজ সম্বন্ধে আর কিছু বলার দরকার নেই। আমাদেরও তাই মনে হয়। প্রদর্শনী ৩১শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল।

●

চারুকলা ভবনে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শিল্পী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর যে একক প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল, সেটি একটি শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলে অকালে বন্ধ হয়ে যায়। প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের দু' দিনের মধ্যেই শ্রীমতী রায়চৌধুরীর স্বামী ডঃ দিলীপকুমার রায়চৌধুরী অল্পকাল রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। শ্রীরায়চৌধুরীর মৃত্যুতে তরুণ শিল্পীরা সকলেই মর্মাহত হয়েছেন। কারণ, তিনি নিজে শিল্পী না হলেও, শিল্পপ্রেমিক এবং শিল্পীদের বন্ধু ছিলেন।

শ্রীমতী রায়চৌধুরী যে পনেরোটি তৈলচিত্র উপস্থিত করেছিলেন, তার মধ্যে দু-একটি বাদে সবগুলিই নতুন। তাঁর অধিকাংশ ছবির মধ্যেই একটা সবুজ-নীল আলোকোজ্জ্বল পটভূমিকার ওপর কৃষ্ণাভ-নীল ডেকরেটিভ দেহাকৃতির কতকগুলি সিলহুয়েৎ সাজাবার প্রচেষ্টা বেশী করে চোখে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকোজ্জ্বল পটভূমিকা সামনের ফিগারগুলিকে ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। ছবির বাঁধুনির দিক থেকে সেটি সর্বত্র সুখকর হয়েছে তা বলা চলে না। তাঁর 'অ্যাবান্ডান্স' (১) বা 'দি সঙ অব

'করবী' অনুষ্ঠিত শাড়ির ডিজাইন

সোল অ্যান্ড বডি শিল্পী : অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

থাগুার' (১১) কতকটা এই জাতের ছবি। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি স্বপ্নালু বা মিস্টিক ভাব আনবার চেষ্টায় আংশিক সাফল্যলাভ করেছেন—যেমন, 'টাইম অ্যান্ড ল্যান্ড' (১), 'মেডিটেশান' (৪) প্রভৃতি ছবি। তাঁর বিমূর্ত ছবি 'ফল অব হিফায়েস্টোস' (১৫) কতকটা গগনেন্দ্রনাথের উত্তরসূরীর কাজ বলে মনে হতে পারে। তবে রং এবং ডিজাইনের দিক থেকে তাঁর ফিগারেটিভ এবং ডেকরেটিভ কাজ 'সোল অ্যান্ড বার্ড' (৫) আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। ছবিটি মুরালের উপযোগী করে আঁকা।

শ্রীমতী রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্যে আমাদের গভীর সমবেদনা রইলো। তবে আশা করব তিনি যেন তাঁর শিল্পসাধনা অব্যাহত রেখে যেতে পারেন।

●

দক্ষিণ কলকাতার আধুনিক কেশ-প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান 'কবরী'র এক বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে ৬৪নং লেক প্লেসে শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরীর বাড়িতে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। ৩১ আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে মহিলাদের সাজ-সজ্জার উপকরণ হিসেবে কতকগুলি শাড়ি কাপড় ও গহনার সুন্দর নক্‌শা প্রদর্শিত হয়েছিল। শাড়িগুলি অধিকাংশই সুতীর এবং নক্‌শা ছাপার দিক থেকে আমাদের দেশের চিরাচরিত নক্‌শাগুলিই একটু নতুনভাবে আধুনিক মনের চাহিদা অনুযায়ী ছাপান হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুটির বেশী রং ব্যবহার করা হয়নি। আর কোন ক্ষেত্রেই বোধহয় তিনটির অধিক রঙে ছাপান হয়নি। পাড় এবং জমির রঙের বৈপরীত্যের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ঘোর রঙের জমির ধারে অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও উজ্জ্বল রঙের পাড় ব্যবহার করে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। একটি আনারস তন্তুর সিল্ক এবং একটি পশমের বস্ত্রের ওপরের ছাপার কাজের নৈপুণ্যও দেখবার মত হয়েছিল। কতকগুলি ঢোকরাদের রীতিতে তৈরী গহনা প্রদর্শনীতে নতুনত্ব এনেছিল। আর প্রদর্শনীর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হয়েছিল শিল্পী গোষ্ঠ-কুমারের করা ভারতের বিভিন্ন দেশের নারীমূর্তির কাপড়ের তৈরী পুতুল। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পী ভারতীয় মিনিয়েচার থেকেও পুতুল তৈরীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিষণগড় শৈলীর অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল মূর্তিদুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

●

৯ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর ক্যাথিড্রাল রোডের চারুকলা ভবনে অ্যাকাডেমির স্টুডিয়োর তরুণ সভ্যদের (সিনিয়র গ্রুপ) আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। গত কয়েক বছর ধরেই অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ শিশুদের ছবি আঁকার ক্লাস নিয়মিত নিয়ে আসছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন। এই প্রদর্শনীতে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছাত্র ছাত্রীদের ৪১খানি ছবি স্থান পেয়েছিল। বেশীর ভাগ ছবিই জল-রঙে আঁকা। অল্প কিছু প্যাস্টেল, পেন্সিল ও কালির ড্রয়িং দেখা গেল। এর মধ্যে কিছু কিছু ছবিতে একেবারে শিশুসুলভ সরল কাজ থাকলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের কাজে) খানিকটা বড়দের অনুকরণের ছাপ এসে পড়েছে। কিন্তু তার মধ্যে দু'-একটি ক্ষেত্রে কম্পোজিশন এবং আবহাওয়া সৃষ্টির কাজের দিকে কেউ কেউ অনেকখানি পরিণতির আভাস দিতে সক্ষম হয়েছেন। এ'দের মধ্যে প্রদীপ চ্যাটার্জির 'শূন্য স্টুডিও' (১৫) কম্পোজিশনের দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এই শিল্পীর ১২ এবং ১৩ নম্বরের ছবিদুটিও উল্লেখ-যোগ্য। রমা ব্যানার্জির শাদা-কালোয় বাড়ীর ড্রয়িং (১), মৃন্ময় মুখার্জির দুটি জল-রঙের কাজ এবং অমিত সাহার একটি প্যাস্টেল (৩৭) ও একটি জলরঙের কাজে সম্ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়।
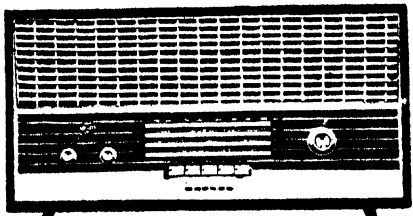
চিত্ররসিক

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

এ এক অন্য দিল্লী—ভারতের প্রশাসনিক রাজধানী নয়, ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী দিল্লী।

এক সময় কলকাতা ছিল এ গৌরবের অধিকারী। সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ উঠলে কলকাতার নাম আগে উঠতো, তারপর উঠতো বোম্বাই, মাদ্রাজ লক্ষ্ণৌর নাম। দিল্লীর নাম কখনও উঠতো না। দিল্লীর সংস্কৃতি মুঘল রাজত্বের সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ছিটে-ফোঁটা যা ছিল বৃটিশ আমলের শেষ পনেরটা বছরে খুঁজে খুঁজে তার কিছু কিছু আবিষ্কার করতে পারতাম। অবিজ্ঞাপিত গানের আসরে গজল-ঠুংরি, কোথাও কাওয়ালি, কোন গলিতে বাইজীর নাচ। কিংবা কোথাও মুসয়রা—কবি দরবার।

দেশ স্বাধীন হ'বার পনের বছরের মধ্যে এই ছিটে-ফোঁটাগুলিও একে একে মুছে গেছে।

দিল্লী থেকে উর্দু গিয়েছে, তার স্থান নিয়েছে পাঞ্জাবী। বাইজী বিদায় নিয়েছে, তার স্থান নিয়েছে ভাঙরা। ভাঙরার সঙ্গে টুইস্ট মিশেছে, এখন তারই আকর্ষণ বেশী!

মুসয়রা অবশ্য একেবারে উঠে যায় নি। কালে-ভদ্রে সামিয়ানার নিচে, মাইকের সামনে ভি আই পি'দের মনোরঞ্জনের জন্যে কবিদের হাজির হতে দেখা যায়।

দিল্লীর নিজস্ব কিছু নেই, তবুও আজ সে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী!

দিল্লী ভারতের প্রশাসনিক রাজধানী বলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকে এসে বসবাস করছে। তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি। এ হোল টবে সাজানো বাগান। এ বাগান দেশের মাটি, জল, বাতাস, রৌদ্র থেকে প্রাণ ধারণের উপকরণ সংগ্রহ করে না, তাকে বেঁচে থাকতে হয় কৃত্রিম উপকরণের, রাসায়নিক সারের সাহায্যে। জুঁই-জবার টব, কিন্তু ল্যাটিন নামের তকমা আঁটা। এবং সবটার মধ্যেই ড্রইংরুম সাজাবার প্রয়াস।

কিন্তু সে যাই হোক, এই প্রয়াসে বাঙালীদের অবদান কম নয়, যদিও তার তেমন স্বীকৃতি নেই।

দিল্লী রামলীলা দেখতে অভ্যস্ত ছিল, থিয়েটার দেখলো বাঙালীরা আসার পর। বাঙালী চিত্রশিল্পী পট-তুলী নিয়ে এল, দিল্লীতে প্রথম সে করলো আঁকা ছবির প্রদর্শনী। দিল্লীর অনুর্বর মাটিতে চারুকলা ও কারুশিল্পের বীজ প্রথম পুঁতলো বাঙালীরা।

কিন্তু এসব হোল অতীতের কথা।

গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি বাঙালী সাংস্কৃতিক অভিযাত্রী দল দিল্লী জয়ের চেষ্টা করছেন।

নাট্য জগতের দিকপালরা একে একে এবং একাধিকবার যাঁরা দিল্লী ঘুরে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, তরুণ রায় প্রভৃতি। সাহিত্যিক দলের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এঁরা কেউ আঁচড় কেটেছেন, কেউ পারেন নি। শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র, তাপস সেন, সুনীল জানা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র—সবাই শিল্পী, সবাই স্রষ্টা। এবং সরকারী দিল্লীর বাইরে সকলেরই আদর আছে, গুণের উপযুক্ত কদর আছে।

সুচিত্রা মিত্র এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দিল্লী এসেছেন একাধিকবার এবং দিল্লীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যেটুকু সম্মান, সেটুকু বলতে গেলে ওঁদের জন্যেই। অন্য সঙ্গীত-শিল্পীরা দিল্লী এসে বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীতের সঙ্গে দিল্লীবাসীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সতীনাথ মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখার্জি, দ্বিজেন মুখার্জি, ভূপেন হাজারিকা, মিন্টু দাশগুপ্ত, তরুণ ব্যানার্জি, নির্মলেন্দু চৌধুরী, উৎপলা সেন, ছবি ব্যানার্জি, ইলা বসু এবং নির্মলা মিশ্র। প্রভৃতি।

এঁদের অনেকে এবং সঙ্গে পংকজ মল্লিক গত বছর অনুরূপ একটি সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লী এসেছিলেন।

পর পর দুবছর বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন স্থানীয় বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীদের মনে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে, এবং তাঁরা নিজেদের জন্যেও কিছুটা সরকারী স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছেন।
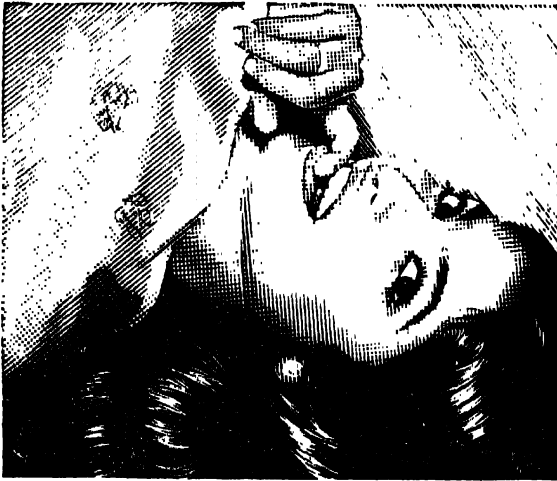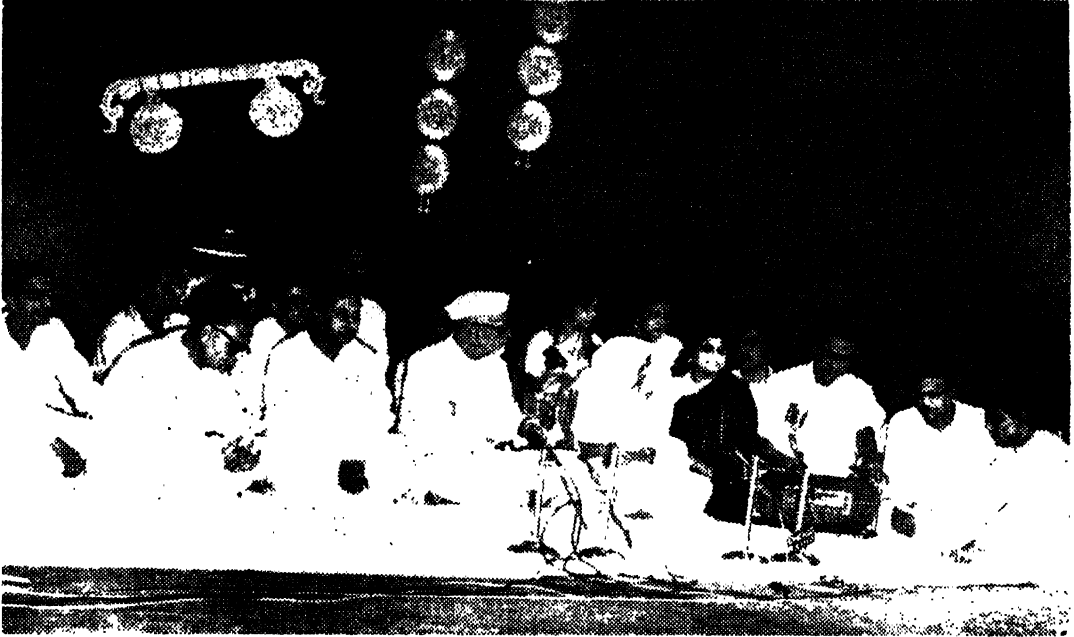
রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনসহ শিল্পিবৃন্দ

উদয়শঙ্কর তাঁর দলবল নিয়ে একাধিকবার দিল্লী ঘুরে গেছেন. তাঁর রামলীলা নৃত্য-নাট্য একটি অপূর্ব সৃষ্টি হিসাবে আজও অনেকের মনে আছে।

কিন্তু দিল্লীতে উদয়শঙ্করের স্বীকৃতি ঠিক বাঙ্গালী শিল্পী হিসাবে নয়, যেমন নয় সত্যজিত রায়ের। এঁদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এঁদের বাঙ্গালীত্বকে ঢেকে দিয়েছে. এঁরা বিশেষ করে ভারতীয়। সত্যজিত রায় তবু কিছুটা বাঙ্গালী, তার কারণ এখনও তাঁর আর্ট অনেকটা বাঙ্গালী পরিবেশের মধ্যে আটকে রয়েছে। কিন্তু উদয়শঙ্কর হাজো বাঙ্গালা দেশে তাঁর কলাকেন্দ্র স্থাপন করলেও তাঁর বাঙ্গালীত্ব বিশেষ প্রকাশ পায় নি।

দিল্লী সত্যজিত রায়কে স্বীকৃতি দিলেও তাঁর শিল্প-সৃষ্টি সাধারণ নাগরিকের সহজ নাগালের পথে যে সব বাধা সেগুলি দূর করার কোন চেষ্টা করে নি। মার্কিন মুল্লুক থেকে আমদানি যৌন আবেদন-মূলক ছায়াছবির ব্যাপক প্রদর্শনী রাজধানীতে সম্ভব, কিন্তু এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্র প্রযোজকের সৃষ্টির প্রদর্শনী নয়।

বাংলা দেশ থেকে দিল্লী জয়ে আসেন মধ্যে মধ্যে চিত্রকলা শিল্পীরাও। এঁদের প্রতি ভাগ্যদেবী নিতান্ত অপ্রসন্ন, তাই এঁরা পান সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার। শিল্পীরা রাজধানীতে এসে দেখেন ওঁদের তুলীর চেয়ে এখানকার কলা-সমালোচকদের কলমের জোর বেশী। ব্যর্থতায়, এবং ক্ষোভে ওঁরা ফিরে যান মনের দুঃখ মনে চেপে।

বাঙ্গালার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দিল্লীতে জীইয়ে রাখার নানাভাবে চেষ্টা হয়েছে, সাহিত্যচর্চা, নাট্যাভিনয়, নৃত্য-গীতের জলসা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান অঙ্গ।

এ নিবন্ধ যে সময় লিখছি, সে সময় রাজধানী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে দুটি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা, একটি ত্রৈমাসিক 'ইন্দ্রপ্রস্থ' এবং অন্যটি সাপ্তাহিক 'রাজধানীতে'।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বছর ত্রিশ আগে এক চেষ্টা হয় 'রাজপথ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ থেকে। তারপর আজ পর্যন্ত বহু সাময়িক পত্রিকার উদয়-অস্ত হয়েছে। রাজধানীতে সাহিত্যচর্চার ইতিহাস আরও পুরনো।

সম্প্রতি স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লাব পর পর কয়েকটি সাহিত্য আসরের আয়োজন করেছিলেন তাতে বঙ্কিম সাহিত্য, শরৎ সাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। সুরুতে কিন্তু বাঙ্গালীদের সাহিত্যচর্চার রূপ ছিল অন্য। প্রতি পূর্ণিমায় কোন না কোন স্কোয়ারে সাহিত্য বাসর বসতো। তাতে পাঠ হোত স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। নৃত্য-গীতের জলসা অনুষ্ঠিত হোত ১লা কি ২৫শে বৈশাখ বা অন্য কোন উপলক্ষ্যে।

এখন রাজধানীতে নাট্যাভিনয় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—আইফ্যাকস্ হলে মাসে একটা-দুটো নাট্যাভিনয় লেগেই আছে। তারপর রাজধানীতে বিভিন্ন নাট্য-প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হয়, পুজো উৎসবের অঙ্গ হিসাবেও।

দিল্লীতে বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় পুজো উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই।

রাজধানীর পাশ্চিমশেলী সাংস্কৃতিক জীবনে বঙ্গ সংস্কৃতির দীপকে উজ্জ্বলতর করার যে চেষ্টা দেখা দিয়েছে তা হয়ত রাজনৈতিক জীবনে আঘাতের প্রত্যাঘাত হিসাবে। এখানকার রাজপথে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙ্গালী সঙ্কোচের সঙ্গে নয়, গর্বের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতে সুরু করেছে।

—বি-চ

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

আমার কানে কানে কে যেন বলল, 'লাফাও!" আর আমি বোকার মত চলতি বাস থেকে লাফিয়ে পড়লাম। আমার কানে কে ফিস ফিস করে আইডিয়া দেয় জানি না। প্রায়ই দেখেছি, দেয়। সবসময়েই দেখেছি আমার বহু অধঃপতনের জন্য এবং নানাবিধ গোলযোগের ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে পড়ার মূলে রয়েছে এই বাণী। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এই আমার বোধহয় বিবেক। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয়েছে তা ঠিক নয়—অন্তত আমার নিজের বিবেক বাস থেকে লাফাতে বলবে কেন?

লাফাতেই প্রায় কুড়ি ফুট গড়াতে গড়াতে সামনে গেলাম, তারপর বারো ফুট বেঁকে একেবারে একটা থামা মোটর গাড়ির সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলাম। তাতে আমার কপাল কেটে গেল, আর সারা গা তো নানারকম আঁচড়ে ভর্তি হয়ে গেল। কোথায় যে ব্যথা বুঝতে পারছিলাম না—কোথাকার ব্যথা বেশী, আমি বেঁচে আছি কিনা, থাকলে আমার কি অবস্থা, আমার অজ্ঞান হওয়া উচিত কিনা এসব বিদ্যুৎ-বেগে ভাবছি, এমন সময় হেঁড়ে গলায় গাড়ির ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এল, "মশাই দেখতে পান না কোথা দিয়ে চলেছেন?" আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকাতে তিনি বললেন, "দেখছেন না আপনি গাড়িটার কি ক্ষতি করলেন। খামোকা আপনি আমার গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মারলেন কেন?"

আমি কিছু বলতে পারলাম না। প্রচণ্ড ব্যথা, বিহ্বলতা ইত্যাদিতে ওখানেই শুয়ে পড়লাম, যদিও কথাবার্তা কিছু কানে আসতে লাগল। হঠাৎ একটা বাজখাঁই আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে এসে বলছে, "একটা লোককে চাপা দিয়ে চুপচাপ বসে বসে সিগারেট টানা হচ্ছে, বটে? দেব একটা ঘুষিতে মাথা ফাটিয়ে।" গাড়ির ভেতরকার লোকটি বলল, "ঐ লোকটাই আমার গাড়িকে চাপা দিতে এসেছিল!" "বটে! আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে—এই ভুতো এদিকে আয়, লোকটাকে একটা শিক্ষা দিই।" লোকটা বলল, "কি শিক্ষা আমাকে দেবেন? আমার অপরাধ আমি গাড়িটাকে থামিয়ে রেখেছি। লোকটা বাস থেকে লাফিয়ে টাল সামলাতে না পেরে এসে আমার গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। এক্ষুনি দেখুন ও উঠে বাড়ি চলে যাবে।"

আমি তখন বোধহয় একটু চিঁ-চিঁ করে উঠেছিলাম। তা শুনে বাজখাঁই আওয়াজের লোকটা বলল, "লোকটা বাস থেকে লাফাবে কেন—ওর বাস থেকে লাফানোর কি দরকার? তা ছাড়া বাস থেকে যারা লাফায় তারা কি চিঁ-চিঁ করে—আমর, মশাই বহু বছর কোলকাতায় আছি, বাস থেকে হাজার হাজার লোককে দৈনিক লাফাতে দেখেছি—তারা কেউ গিয়ে থেমে থাকা মোটর গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় না।" এমন সময় মনে হল আরো কেউ এসে জুটল। কেউ বলল, "লোকটার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।" আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে প্রথমে ভেবেছিলাম, তাতে আমি জোরে চিঁ-চিঁ করে ওঠাতে কে যেন বলল, "ইস, কি জোরে ধাক্কা মেরেছে লোকটাকে! গাড়িওলাকে ধোলাই দিয়ে দেওয়া দরকার। ব্যাটার গাড়ি হয়েছে বলে যেন আমাদের মাথা কিনেছে! আবার দেখ না কি রকম টেরি কেটেছে—দেব এক ঘুষিতে দাঁত ভেঙে!"

আর একজন বলল, "দেখ না আবার কি রকম সিগারেট টানছে! আর চশমারই বা বাহার কি রকম!" এতগুলি অভিযোগ

লোকটির বিরুদ্ধে। লোকটি বোধহয় তখন হঠাৎ গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। আর যায় কোথায়, কোত্থেকে আরো লোক এসে লোকটিকে গাড়ি থেকে বার করে তার জামা ছিঁড়ে দিল (এই সময় থেকে আমি একটু একটু করে তাকিয়ে দেখছিলাম।) একজন তার সিগারেট কেড়ে নিয়ে কপালে দুটো ছেঁকা দিয়ে দিল। লোকটি প্রথমে খুব একচোট লড়বে ভেবেছিল। ঘুসিও পাকিয়ে-ছিল, কিন্তু জনতা ক্রমশ ভারি হওয়াতে চুপ করে গেল। একটা বছর দশেকের ছোকরা কোথায় যাচ্ছিল সে এসে লোকটির জামা ছিঁড়ে দিল। দুজন ভদ্রলোক বোধহয় সিনেমায় যাচ্ছিলেন তাঁরা এসে লোকটির দুই গালে দুটি চড় দিয়ে লোকদের বললেন, "হাঁ করে দেখছেন কি সব, গাড়িতে আগুন লাগান!" বলতে না বলতেই দেখলাম গাড়িতে আগুন লেগে গেল, আর আমাকে জনতা ধরাধরি করে একটা বাড়ির বারান্দায় শুইয়ে দিল। তখন আমার কানে কে যেন বলল, "চুপ করে আছ কেন এখন, একটা কিছু করো?" সেই অদৃশ্য রহস্যময় শব্দ যাকে বলে "ভয়েস" নাকি তাকে বিবেকই বলে? আমি তখন প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও লাফিয়ে উঠে বললাম, "বন্ধুগণ আপনারা অন্যায় করেছেন। গাড়িওলার কোন দোষ নেই। আমিই লাফিয়ে ছিলাম বাস থেকে। দোষ আমারই।"

"ওরে আমার মহাপুরুষ রে!" একজন ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, "মহাপুরুষটা মহত্ত্ব দেখাচ্ছে, শালা! ওটাকেও লাগাও দু-ঘা!"

তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হল হাসপাতালে। জ্ঞান হতে দেখি আমার পাশের খাটে সেই গাড়িওলা ভদ্রলোকটি। তাঁর তখনো জ্ঞান হয়নি।

[উপন্যাস]

।। নয় ।।

গায়ে পা দিয়েই শিশির দুঃসংবাদ শুনল। পা পিছলে পূরবী পুকুরঘাটে পড়ে যায়। আঘাত গুরুতর, রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। সময়ের আগেই প্রসব হয়ে গেছে। মেয়ে। রাজপুত্তুর নিয়ে হাসি-তামসা হত—কিন্তু ছেলে নয়, মেয়ে হয়েছে।

তা বিধাতাপুরুষ যা দিলেন, হাসিমুখে করে নিতে হয়। ভালই দিয়েছেন। কেননা মা-মেয়ে দুজনেই যাবার দাখিল হয়েছিল। অবস্থা রীতিমত সাংঘাতিক। মহকুমা শহরে দু-দুজন প্রবীণ বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন। উভয়েই পাততাড়ি গুটিয়েছেন। সেই দুয়ের জায়গায় নতুন জন পাঁচ-সাত চেয়ার-আলমারি সাজিয়ে এসে বসেছেন। সাক্ষাৎ শমনদূত—হাত ফসকে রোগী কদাচিৎ প্রাণ পায়। ঐ ডাক্তারবাবুরা বাচ্চাটাকে তো নয়, পূরবীকে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন, তখন ষোড়শী উঠেপড়ে ধরে ডাক্তারী ওষুধপত্র অস্তাকুঁড়ে ফেলে নিজস্ব শিকড়বাকড় ও ঝাড়ফুঁক নিয়ে লাগল। এবং সেই ঝাড়ফুঁক সামালও দিয়েছে সত্যি।

বাড়ির পথে এইসব খবর শুনল শিশির। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, হনহন করে বাড়ি এসে উঠল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মা এ-সময়টা ঠাকুরঘরে থাকেন। শিশির নেই, সেজন্যে হয়তো মাহিন্দারেরাও সরেছে। ষোড়শীও গেছে কোনদিকে।

শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। পূরবী নিঃসাড়, এই সন্ধ্যারাত্রেও ঘুমুচ্ছে। জুতো খুলে রেখে পথের কাপড়চোপড় ছেড়ে সাবানে হাত-পা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে শিশির নিঃশব্দে খাটের কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘুমুচ্ছেই বটে—দুজনে পাশাপাশি। মা আর মেয়ে। নতুন মা আর হপ্তা-দুই বয়সের মেয়ে। শিশির এত টিপিটিপি এসেছে, পূরবী তবু জেগে পড়ল। চোখ মেলে তাকাল।

এক লহমা তাকিয়ে রইল, বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। শিয়রের দিকে জোর-কমানো হেরিকেন—জোর বাড়িয়ে দিল। কালো বর্ণের পূরবী হেরিকেনের আলোয় দস্তুরমতো ফর্সা দেখাচ্ছে। ফর্সা নয়, ফ্যাকাশে—রক্তের কণিকামাত্র নেই বোধহয় চামড়ার নিচে। শিশিরের বুকের ভিতরটা হায়-হায় করে ওঠে—কাকে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে কোন ভিন্ন নারীকে দেখছে।

শীর্ণ হাতদুটো শিশির মুঠোয় তুলে নিল। উষ্ণ, জ্বর রয়েছে বোধহয়। পূরবী হাসে : ভেবেছিলাম আর দেখা হল না।

যাও, অমনি করে বলে বুঝি! স্নেহ-কণ্ঠে শিশির তাড়া দিয়ে ওঠে, ঠোঁটের ওপর তর্জনী চেপে ধরে দুয়োরে কুলুপ আঁটার ভঙ্গিতে।

পূরবী তবু বলে, তোমার মেয়ে, ভেবেছিলাম, তোমার কাছে সঁপে দিতে পারলাম না। বড্ড কষ্ট হচ্ছিল। তা দেখ, সাধ পূরণ হল, আর আমার কোন দুঃখ নেই।

অমন বলতে লাগলে আমি কিন্তু পালাব। যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটে বেরুব। কত ছুটোছুটি করে চাকরি আর বাসা বাঁধার যোগাড়যন্তর করলাম, সে সব খবর শুনবে না তো?

এই মন্ত্রে কাজ হল। শিশিরের হাত-দুটো পূরবী শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। সত্যি সত্যি বুঝি পালিয়ে যাবে, হাত বেঁধে তাই ঠেকাল।

শিশির কলকাতার খবর বলে যায়। দস্তুরমতো বাড়িয়ে এবং বানিয়ে বলছে। চাকরি তো একরকম মুঠোয় ধরে নিয়ে এসেছে। একটা উৎকৃষ্ট বাসা—সে-ও কি আর আটকে থাকবে দামসাহেব যখন পিছনে রয়েছেন! রানী, খুব তাড়াতাড়ি তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

শুনতে শুনতে পূরবীর দু-চোখে নির্ঝরের মতন জল গড়ায়। মুছে দেবে, কিন্তু হাত সে কিছুতে ছাড়ে না। অশ্রু-ভোলা চোখদুটো এঁটেসেঁটে বন্ধ করল। অশ্রুজল শিয়রের আলোয় ঝিকমিক করে—কোন স্বপ্নে বুকের ভিতরটা বুঝি আলো-আলোময়, ঝলক পড়েছে মুখের উপরেও। চোখ-মুখ প্রাণপণে বন্ধ করে আছে, স্বপ্ন যাতে অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখা যায়।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে খাট থেকে পূরবী নেমে পড়ল। পরক্ষণেই বিকৃতমুখে আবার বসে পড়ে। বলে, না পারিনে। পেটের মধ্যে এমন মোচড় দিয়ে উঠল—

শিশির বলে, উঠবার কি হল! কি দরকার, বলো আমায়।

ষোড়শী-দিদিকে ডাকো না একবার। সর্বক্ষণই তো আমাদের নিয়ে আছে—দুজনেই এখন শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছি দেখে একটু হয়তো বেরিয়েছে। কাছেপিঠে আছে কোথাও, বাড়ি ছেড়ে যাবে না।

শিশির একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে এলো। ফিরে এসে বলে, কী দরকার বলো না আমায়। আমি করে দিচ্ছি।

তুমি পারবে না।

দেখই না বলে।

বলাই যাবে না তোমায়—

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দুষ্টামির হাসি। যে-হাসির জন্য কালো মেয়ের পোশাকী নাম রানী। রানী ছাড়া এমন হাসি কেউ কখনো হাসে না। হাসতেই জানে না।

বলো, বলো, বলো—

পূরবী বলে, যখনই তুমি বাড়ি ফেরো, আমি কত সাজ করে থাকি। বরাবরই তো করে আসছি। কলকাতা থেকে ফিরবে—মনে মনে কত ভেবে রেখেছিলাম। আরো আরো অনেক করে সেজে থাকব। আমি সাজব, মেয়ে সাজবে। চমকে দেবো কোলের উপর আচমকা মেয়ে দিয়ে। তা চমকে দিয়েছি ঠিকই।

বলতে বলতে চুপ করে যায়। চুপ করে একটুখানি দম নিল। ম্লান হেসে বলে, চমকে উঠেছিলে—নয়? এই ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরনে, একমাথা রুক্ষ চুল, খড়ি-ওঠা আদুল গা—উঠে বসতে গিয়ে আমারও সেই সময় খেয়াল হল। আমি যে রানী তোমার। মরে যাবে রানী, তখনো সে রানী হয়ে মরবে। ষোড়শী-দিকে ডাকছি, একটা শাড়ি বের করে দিক, চুলগুলো ঠিকঠাক করে দিয়ে যাক।

শিশির আবদারের সুরে বলে, ষোড়শী-দি নয়, এসে গিয়েছি তো আমি, তোমার সমস্ত কিছু করে দিই। নিত্যিদিন তুমি আমার সব করো, একটা-দুটো দিন আমায় তোমার কাজ করতে দাও।

জবরদস্ত করতল দুটি কুসুমগাছের মতো মুঠোয় ধরে শিশির ঠোঁটে তুলে ঠেকায়। ঠোঁট-মুখ মিঠা-মিঠা হয়ে গেছে। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে তারপর বলে, শাড়ি কোথায় বলো।

চোখে-মুখে এক অপরূপ ভঙ্গি করে পূরবী : জানিনে তো—

জানিনে-জানিনে করছে দুষ্টামির সুরে, আর আড়চোখে তাকায়। এক একবার আলমারির দিকে। বলার তবে বাকি কি রইল!

শিশিরই বা কম কিসে, সে-ও আর জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। বালিশের তলে হাত ঢুকিয়ে চাবির গোছা পাওয়া গেল। গোটা সংসারের চাবিকাঠি—অধিকর্ত্রী সগর্বে আঁচলে বেঁধে এঘর-ওঘর করত। এ-চাবি ও-চাবি পরখ করতে করতে আলমারি খুলে গেল। একটা শাড়ি হাতে নিয়ে শিশির বলে, চলবে?

দেখার মানুষ তো তুমি। একমাত্র তুমি। তোমার যা পছন্দ—যে-শাড়ি পরে তোমার চোখে আমি ভাল দেখাব!

আবার বলে, শাড়ি তো শুয়ে শুয়ে পরা যায় না। ওঘরের দেয়ালে আয়না—সেইখানে যেতে হবে।

পারবে?

তুমি থাকতে কেন পারব না? তোমায় ধরে ধরে যাবো। মাথা ঘুরে পড়ি তো তুমি ধরে ফেলবে। মরি তো তোমার বুকেই মাথা থাকবে আমার।

শিশির চুপ করে গেল। কথা বাড়ালে এমনি তো সব আবোল-তাবোল বকবে। খাটের তলে চটিজোড়া। গাঁগ্রামে জুতোর তেমন চল নেই—পুরুষেরাও খালি পায়ে বেড়ায়, তা মেয়ে। শিশির শখ করে সদর থেকে এই জরি-দেওয়া শৌখিন চটি এনে দিয়েছিল। বাড়ির একলা বউয়ের ঘরের মধ্যে পরবে বাধা নেই। তবু অবহেলায় পড়ে থাকে খাটের তলে—অবরে-সবরে বেরোয়। এই যেমন শিশির বের করল—মাটির মেঝেয় খালি পায়ে অসুখ অবস্থায় চলাচল নিষেধ। ফস করে পূরবীর একটা পা আলগা করে নিয়েছে—

ওকি, ওকি, পায়ে কেন হাত?

শিশির কানেও নিল না। শক্ত করে ধরেছে, ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। ঠাকুর-প্রতিমার অঙ্গে কুমোরে যেমন ধরে ধরে ডাকের সাজ পরায়, শিশিরের জুতো পরানোর ধরনটা তাই। যেন প্রতিমা-সজ্জা হচ্ছে। একটা পা হয়ে গেল তো আর এক পা।

কী পাগলামি তোমার—

ফিক করে পূরবী হেসে পড়ল : আমি যদি না থাকি, মেয়ে তবু জুতো পরেই বেড়াবে। কাজটা তুমি দিব্যি পারো, আজকে পরখ হয়ে গেল।

মেয়ে কাপড়ও পরবে। জুতো-কাপড় দুটোই খুব ভালো পরাই—মেয়ের মায়ের উপর সে-পরীক্ষাও দিয়ে দিই—

ছিঃ!

স্বামীজনোচিত আদেশের ভঙ্গিতে শিশির বলে, আয়না অবধি যাওয়া চলবে না, ওঠাউঠির কোনই দরকার নেই। দেখবার লোক একলা আমি—যেমনভাবে পরলে চোখে আমার ভাল লাগবে, সে-জিনিস তোমার চেয়ে আমারই বেশি জানা।

অসহায়ের মতো হাত-পা ছেড়ে পূরবী বলে, লজ্জা করে—

চোখ বোজ তবে। দেখতে না পাও—

বুজল চোখ সত্যি সত্যি। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ষোড়শী-দি কি অন্য কেউ হঠাৎ ঢুকে না পড়ে। চোখ বুজে বড় মধুর এক উপভোগ। শিশির সব পারে, ঘরকন্নার সব ব্যবস্থায় নিপুণ তাঁর হাত।

চোখ খুলে হঠাৎ পুরবী বলে, রোগা হয়ে আমায় খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে—না?

কোন্ আয়নায় দেখলে শুনি।

তোমার চোখে যে-দুটো আয়না রয়েছে। ঘাড় নাড়লে শুনিনে, মন-রাখা কথা আমি ধরতে পারি।

পুরবী আবার কেঁদে পড়ে। ব্যাকুল হয়ে শিশিরকে জড়িয়ে ধরল। সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে, যেন ভেলার কাঠ আঁকড়ে ধরেছে। বলে, যত ভরসাই দাও, আমি বাঁচব না। সে আমি জানি, জানি। মেয়ে নেড়েচেড়ে বড় করে তুলব—সে আমার হল না। বুলি ফুটবে ওর মুখে, 'মা' বলে ফালুক-ফুলুক চাইবে—কোথায় আমি তখন, জানিনে।

দৈববাণীর মতো ফলে গেল। দিন-দশেক কেটেছে তারপর, পুরবী ভালোর দিকে। ভালো দেখে শিশির আবার ইস্কুলে যাওয়া ধরেছে। খেয়েদেয়ে সাইকেল নিয়ে খানিক আগে সে রওনা হয়ে গেছে। ধর-গিন্নিও ঠাকুরঘরে গিয়ে যথারীতি নিত্য-পূজার নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন, দরজার সামনে ষোড়শী হন্তদন্ত হয়ে এলো : খাতিক ভালো নয় গিন্নিঠাকরুন। আমার ভয় করছে।

ধর্মভক্ত নারী, দৃষ্টিতে ভুল হবার কথা নয়। মুখ পাংশু, কথা বেরুচ্ছে না গলা দিয়ে। বলে, তাড়াতাড়ি আসুন। আর দাদাবাবুর কাছে কেউ ছুটে চলে যাক— এক্ষুনি।

বাড়ির উঠানের একদিকে ঠাকুরঘর অন্যদিকে এসেছে এই তো কয়েক-পা পথ—খবর পেয়ে সে ছুটে গেছেন, পাড়ার ভিতরেও চলে গেছে। নবীনা-প্রবীণা জনকয়েক এসে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছেন। ধরগিন্নি ছুটে এসে পড়লেন : কি হয়েছে বউমা।

শ্বাস টানছে পুরবী। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে পড়ল। গলার ঘড়ঘড়ানির মধ্যে ভিন্ন ধরনের একটা আওয়াজ, 'মা' বলে ডাকতে চাইছে সে যেন। বাচ্চাটি পাশে— আহা, ফুটফুটে সোনার পদ্ম মেয়ে। হাতের মুঠো সঞ্চালিত করে ওঁয়া-ওঁয়া করে মেয়ে কেঁদে উঠল। জ্ঞান আছে পুরবীর, দুপাশ চোখ-ভরা জল, আঁকুপাঁকু করছে মেয়ের দিকে ফেরবার জন্য। সাধ্যে কুলোচ্ছে না।

হঠাৎ কী হয়ে গেল! শুচিবেয়ে মানুষ ধরগিন্নি স্নান করে লক্ষ্মী-জনার্দনের কাছে ছিলেন, পরনে শুচি তসরের কাপড়। ফুলে-অশৌচ চলছে, ছোঁয়াছুঁয়ি এমনিতেই মানা, সে-সব মানলেন না তিনি, বাচ্চা মেয়ে কোলে তুলে নিলেন। পুরবীর চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, কাঁদিস কেন মা, ভয় নেই, সেরে যাবে।

(ক্রমশ)

দেশে বিদেশে

কমনওয়েলথের সংকটত্রাণ

কথা বলতে বলতে সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন সব মতভেদ মিটে যাবে—যেকোন রাজনৈতিক আলোচনার এই নিয়ম। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সেকথা জানেন এবং প্রয়োজনমত কৌশল হিসাবে এই নিয়মের প্রয়োগ করেন।

এইবারকার কমনওয়েলথ সম্মেলনে কমনওয়েলথের যে-নাভিশ্বাস উঠেছিল তারও পরে যদি পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে সাদা-কালো-বাদামী মানুষে মেশান ২২টি জাতির এই বিচিত্র সমন্বয় টিকে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা সম্ভব হয়েছে তার নিজের জীবনীশক্তির জন্য যত না তার চেয়ে বেশী এই কথা-ফুরিয়ে-যাওয়া ক্লান্তির জন্য। এই প্রথম কমনওয়েলথের মাননীয় প্রতিনিধিরা লণ্ডনে রাণী মেরীর পুরাতন বাসভবন "মার্লবরো ভবনে" মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সভা করে গেছেন এবং আরও পরে ঘরোয়া বৈঠক করেছেন। অনেকেই চার ঘণ্টারও কম সময় ঘুমোতে পেরেছেন, স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন মধ্যাহ্নভোজ খেতে মার্লবরো হাউস থেকে বাইরে যাওয়ার অবসর পাননি।

এই সব প্রলম্বিত আলোচনার ফলে এবারকার মত শেষরক্ষা হল বটে; কিন্তু আসলে যে-সমস্যাটি কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রীদের এই ষোড়শ সম্মেলনের মাথার উপর সংকটের কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলেছিল সে-সমস্যার কতদূর সুরাহা হল সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ রয়েছে।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে এবার প্রধান—অথবা, বলা যায়, একমাত্র-আলোচ্য বিষয় ছিল রোডেশিয়া। গত নভেম্বর মাসে লাগোসে যে কমনওয়েলথ সম্মেলন হয়ে গেছে তারই জের হিসাবে এবার লণ্ডনে সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। লাগোসে যেমন, লণ্ডনে তেমনি, কমনওয়েলথের নেতাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল, রোডেশিয়ার বিদ্রোহী ইয়ান স্মিথের সরকারের পতন ঘটান যায় কিভাবে। ইয়ান স্মিথের গভর্নমেণ্ট রোডেশিয়ার প্রায় ৩৭ লক্ষ কালা আদমীকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের উপর দুই লক্ষ শ্বেতাঙ্গের শাসন চাপিয়ে দিয়েছে এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সম্মতির অপেক্ষা না করেই একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কমনওয়েলথ দেশগুলি লাগোসে জানতে চেয়েছিল, মহারাণীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রজাদের একাংশের বিদ্রোহ দমনের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কি করবেন? কমনওয়েলথের অস্তিত্বের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর জরুরী ছিল। কেননা, একটি বৃটিশ উপনিবেশের প্রজাদের একাংশই যদি অন্ধ বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয় ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যদি তার কোন প্রতিকার না করতে পারেন তাহলে সাদা ও কালো মানুষ কি করে এক কমনওয়েলথ রাষ্ট্রজোটের শরিক থাকবে? লাগোস সম্মেলনে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বললেন, ইয়ান স্মিথের বিদ্রোহী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁরা বলপ্রয়োগ করবেন না, তার পরিবর্তে তাঁরা সে-গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। অর্থাৎ ইয়ান স্মিথের সরকারকে তাঁরা হাতে না মেরে ভাতে মারবেন। লাগোসের সেই সিদ্ধান্তের পর আট মাস কেটে গেছে। "অর্থনৈতিক ব্যবস্থা"র ফল কি হয়েছে। মার্কিন সংবাদ সাপ্তাহিক "টাইম"-এর চলতি সংখ্যায় লেখা হয়েছে:—

"স্মিথ স্বাধীনতা ঘোষণা করার দশ মাস পর রোডেশিয়া বরাবরকার মতই অবিচলিত ও প্রায় তেমনি সচ্ছল। সলসবেরির রাস্তাগুলি গাড়ীতে ভর্তি। আর এই সব গাড়ীর ট্যাঙ্কগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা ও

ভারতের প্রতিনিধি সর্দার স্বরণ সিং

মোজাম্বিক থেকে সীমান্ত পার করে নিয়ে আসা পেট্রোলে ভর্তি। কারখানাগুলি এখনও প্রায় পুরোদমেই কাজ চালাচ্ছে এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে জীবিকাহীনতা নেই বললেই চলে। রোডেশিয়া যা চায় তার সব কিছুই দক্ষিণ আফ্রিকার মারফৎ আনাতে পারে। গলফ্ বলের দারুণ অভাব রয়েছে এবং রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের স্থানীয় মিষ্টান্ন, কাপড় ও কৃত্রিম দাঁত দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে; কিন্তু কারও ভাঁড়ারে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন জিনিসের ঘাটতি নেই।"

অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যা করা হয়েছে তাতে ইয়ান স্মিথের গভর্নমেণ্টের ভাতে মরার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং, অন্যদিকে, রোডেশিয়ার প্রতিবেশী কমনওয়েলথ রাষ্ট্র জাম্বিয়া বিপদে পড়েছে। জাম্বিয়ার রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান পথ ছিল রোডেশিয়ার মধ্য দিয়ে। সেই পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন জাম্বিয়ার তামা ও

হ্যারল্ড উইলসন

অন্যান্য রপ্তানী পণ্য বাইরে পাঠাতে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন জানতেন যে, লণ্ডন সম্মেলনে তাঁকে অন্যান্য কমনওয়েলথ সদস্যদের যে-প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সেটা হচ্ছে, এর পর কি? বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কি এবার বিদ্রোহী ইয়ান স্মিথের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে অথবা ইয়ান স্মিথের রোডেশিয়াকে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ঘেরাও করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হবে? বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা ঘোষণা করবেন যে "প্রত্যেকের জন্য এক ভোট," এই ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত রোডেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে না?

প্রধানমন্ত্রী উইলসন একথাও জানতেন যে, এইসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে কমনওয়েলথ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জাম্বিয়া আগেই কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিল, আফ্রিকার আর একটা দেশ তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়েরেরে নিজেও সম্মেলনে যোগ দেন নি, কোন প্রতিনিধিও পাঠান নি। তানজানিয়া যদিও বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তথাপি সে এখনও কমনওয়েলথে আছে।

সম্মেলনের প্রথম দিনেই প্রধানমন্ত্রী উইলসন যে-বক্তৃতা দিলেন তার থেকে বোঝা গেল যে, (১) তাঁর গভর্নমেণ্ট এখনও ইয়ান স্মিথের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক। (২) এখনও তিনি রোডেশিয়ার সমস্যাকে বৃটেন ও রোডেশিয়ার ভিতরকার সমস্যা বলে মনে করেন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হতে ইচ্ছুক নন। (৩) ইয়ান স্মিথের রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে এখনই কোন ব্যাপক অর্থনৈতিক অবরোধের ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তি আছে।

মিঃ উইলসনের দ্বিধার কারণ ছিল। রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে গেলে তাঁকে দেশের ভিতরেই প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হবে এবং তিনি তাঁর নিজের গভর্নমেণ্টই টিকিয়ে রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কারণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ বসতিকারীদের

মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ এবং ইংল্যাণ্ডের শাসকমহলে তাঁদের অনেক বন্ধু আছে। স্মিথের এই হিতৈষীরা অনবরত বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে "ভ্রাতৃরক্তে" হাত কলুষিত না করার জন্য মন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছেন। (মিঃ উইলসন অবশ্য লণ্ডন সম্মেলনে বলেছেন, রোডেশিয়ার বসতিকারীরা শুধু নন, সারা মনুষ্যজাতিই তাঁর "আপন জন"।) দ্বিতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রী উইলসন জানেন, ইয়ান স্মিথের রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে কোন অবরোধকে কার্যকর করতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও সেই অবরোধ প্রয়োগ করতে হবে। বৃটিশ স্টার্লিং-এর বর্তমান পড়তি দশায় বৃটেনের পক্ষে সেটা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কেননা, দক্ষিণ আফ্রিকার সোনা স্টার্লিং-এর পতন ঠেকিয়ে রাখতে অনেকখানি সাহায্য করছে। (মিঃ উইলসন কমনওয়েলথের নেতাদের বলেছেন, পর্তুগীজ মোজাম্বিক দক্ষিণ আফ্রিকা সহ এত বিরাট উপকূলকে কোন সামুদ্রিক অবরোধের দ্বারা ঘেরাও করা রাষ্ট্রসংঘের অসাধ্য।)

প্রধানমন্ত্রী উইলসনের কুণ্ঠার আরও একটি অব্যক্ত কারণ ছিল। সেটি হচ্ছে, বৃটেনে এই জনমত গড়ে উঠছে যে, বৃটেনকে একদিন না একদিন (এবং যত শীঘ্র ততই ভাল।) ইয়োরোপের কমন মার্কেটে যোগ দিতেই হবে। এদিকে কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ইয়ান স্মিথকে মদৎ দিয়ে যাচ্ছে। কমনওয়েলথের স্বার্থ দেখতে গিয়ে ইয়োরোপের সঙ্গে বিরোধ করতে নেমে বৃটেন কি তার আখের খোয়াবে? উইলসনের নিজের শ্রমিক দলের মধ্যেও এই মতের লোকের অভাব নেই।

লণ্ডন সম্মেলনে কালা আদমীদের প্রতিনিধিদের সমবেত বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটেন রোডেশিয়া সম্পর্কে তার মূলনীতি থেকে সরে নি। উইলসনের সবচেয়ে বড় জয় হয়েছে এখানে যে, তিনি ইয়ান স্মিথের গভর্নমেণ্টকে "আর একবার সুযোগ" দিতে কমনওয়েলথের দেশগুলিকে রাজী করাতে পেরেছেন। বিনিময়ে অবশ্য তাঁকেও কিছুটা ছাড়তে হয়েছে। সেটা হচ্ছে :—(১) শুধু মাত্র কয়েকটা কঠোর সর্তেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে রোডেশিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া যাবে। (২) যদি ইয়ান স্মিথ তাঁর বিদ্রোহের অবসান করতে রাজী না হন তাহলে তাঁর গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পণ্যের (যেমন তামাক, অ্যাসবেস্টস, কাঁচা লোহা, ক্রোম ইত্যাদি) ব্যাপারে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ প্রয়োগ করা হবে।

কিন্তু যে ইয়ান স্মিথ এতদিন বাগ মানেন নি তিনি কি আর একবার হুমকি দিলেই শায়েস্তা হবেন? যদি না হন তাহলে বৃটেন কতদূর এগোবে? বা এগোতে পারবে?

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পরিকল্পনা চিন্তা

চতুর্থ পরিকল্পনায় ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা খরচা করবার সরকারী সিদ্ধান্তটি বিভিন্ন মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই অঙ্ক বিগত তিনটি পরিকল্পনার মিলিত বরাদ্দের চাইতেও বেশী। অর্থনীতিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে না ফেলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগাড় করার সাধ্য দেশের আছে কি? এই প্রশ্ন অনেকেই করছেন। অনেকে এই কথাও বলছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব কাজ হাতে ইতিমধ্যেই রয়েছে চতুর্থ পরিকল্পনায় সেইসব কাজ সম্পূর্ণ করার দিকেই প্রধানতঃ নজর দেওয়া উচিত। আবার কারো কারো মত পরিকল্পনাকে ছাটকাট করার অর্থ হচ্ছে দারিদ্র্যকে কায়েম করা; সেটা যখন করা উচিত নয় তখন টাকাটা যোগাড় করতেই হবে, তা সে যেভাবেই হোক।

নিরাশাবাদী এবং অতিআশাবাদী এই দুটি মতের মাঝখানে পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারী চিন্তা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে সেটা জানা দরকার। যদিও এখনো চূড়ান্ত কিছু ঠিক হয়নি, তবু একটা দ্বিতীয় চিন্তার ইঙ্গিত মাঝে মাঝেই পাওয়া যাচ্ছে। সেই চিন্তা কি, সেটা বোঝাবার জন্যেই এখন চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামতের একটা সংকলন এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

পরিকল্পনা সম্পর্কে বে-সরকারী মনোভাব সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি প্রচারিত একটি পুস্তিকায়। পুস্তিকাটির নাম "অ্যাপ্রোচ অ্যাণ্ড প্রি-কণ্ডিশনস"। তাতে বলা হয়েছে যে, উৎপাদনের চাইতে আর্থিক বরাদ্দের ওপর যদি বেশী জোর দেওয়া হয় এবং যদি সাধ্যের বাইরে পরিকল্পনা রচিত হয় তাহলে অর্থনীতিতে এমন চাপের সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে দাম আরও বাড়তে বাধ্য।

ফেডারেশনের মতে "কেবল প্রয়োজনের বিচারেই বড় পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, সফল হওয়া দূরের কথা।" পরিকল্পনার দ্বারা জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনাগুলিকে সফল করে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে জনসাধারণ নিদারুণ অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন।
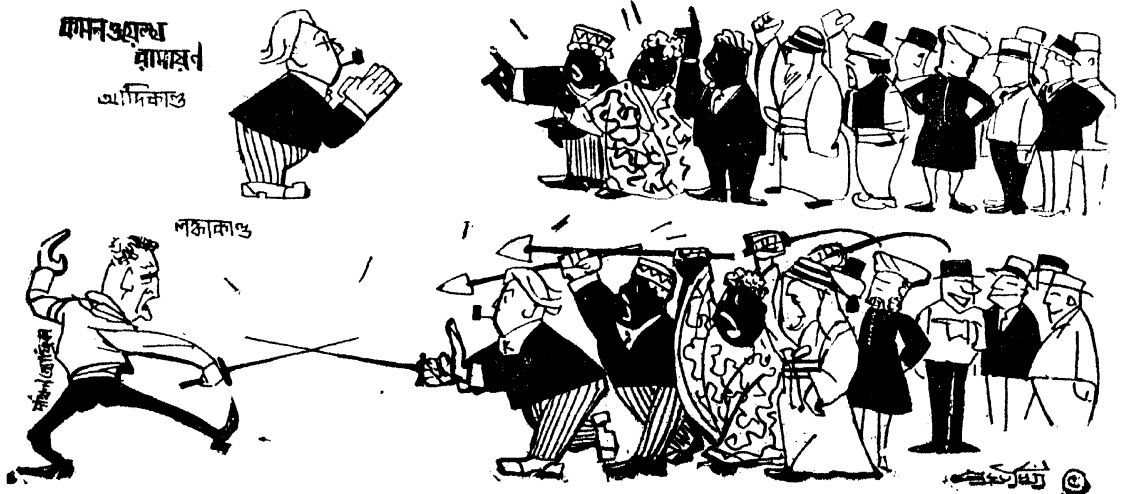
পুস্তিকায় বলা হয়েছে, চতুর্থ পরিকল্পনা মূল্যকে স্থিতিশীল রাখার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হওয়া উচিত এবং এজন্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ঠিক করে নেওয়া উচিত। যেহেতু খাদ্য ঘাটতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিই বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কথা, সেজন্যে চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ অগ্রাধিকারের বিচারে এইভাবে করা উচিত : (১) কৃষি, (২) ভোগ্য পণ্যশিল্প, (৩) বিদ্যুৎশক্তি, (৪) পরিবহন এবং (৫) ভারী শিল্প।

ফেডারেশনের মতে বরাদ্দের মোট পরিমাণ ১৮ হাজার কোটি টাকা (১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রে ও ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বে-সরকারী ক্ষেত্রে) হলেই ভালো হত।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ **শ্রী পি, জে, স্রফ** মনে করেন, "খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনাটি একদল গোঁড়া আদর্শবাদীর মস্তিষ্ক-প্রসূত সন্তান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বীকৃত রীতি-নীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার বেদনাদায়ক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে পরিকল্পনাকারীরা বছরে ৫·৫ শতাংশ হারে বিকাশের একটা আজগুবী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।"

শ্রীস্রফ আরও বলেন : "নোট ছাপিয়ে ব্যয়সঙ্কুলান না করার সংকল্প কাগজে-কলমেই থাকবে। সেক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের

সঙ্গে করভার বৃদ্ধির ব্যবস্থাটি মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যাতে মূল্য আরো বৃদ্ধি পাবে এবং অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা দেবে।"

বেসরকারী মতবাদের আরেকটি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন শ্রী এল. এন. বিড়লা। গত ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় স্টাডি গ্রুপের এক আলোচনাচক্রে তিনি বলেন, কতগুলি ধারণার ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। যেমন : (১) কৃষি উৎপাদন আশানুযায়ী বৃদ্ধি পাবে; (২) বৈদেশিক সাহায্য আশানুরূপে পাওয়া যাবে; (৩) রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে; (৪) প্রতিরক্ষা ব্যয় পরিকল্পনাকালে ৫,৫০০ কোটি টাকার বেশী হবে না (এই অংক ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার বরাদ্দের বাইরে)।

শ্রীবিড়লার মতে সবগুলি ধারণাই পরিকল্পনা-রচয়িতাদের সাধ্যের বাইরে। "সরকার হয়ত ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে তাঁদের সর্বময় নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। কিন্তু আবহাওয়ার ওপর, বৈদেশিক সরকারের ওপর, বৈদেশিক ক্রেতাদের ওপর এবং অ-মিত্র রাষ্ট্রের ওপর যোজনা ভবনের কোন হাত নেই।

"যদি এর কোন একটি ধারণা গোলমাল হয়ে যায়—সেটা অসম্ভব নয়—তাহলে রূপায়ণের পর্যায়েই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। ঐ রকম কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে খসড়ায় কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যদি হঠাৎ সীমান্তে গণ্ডগোল দেখা দেয় তাহলে কি হবে?"

সেইজন্যে শ্রীবিড়লার মতে, পরিকল্পনা সংশোধন করতেই হবে। তাঁর ফরমুলা : ব্যুরোক্রেসী নয়, জনসাধারণকেই কাজ করতে দিতে হবে। আশু-ফলপ্রদ কাজের ওপর জোর দিতে হবে। সরকার কেবল বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি ইনফ্রা-স্ট্রাকচার তৈরীর দিকেই নজর দেবেন।"

এই বেসরকারী মতের বিরুদ্ধে সরকারী তরফ থেকে যে পাল্টা অভিমত দাঁড় করানো হয়, তা হলো : বড় পরিকল্পনা দরকার কেননা গত তিনটি পরিকল্পনায় যে আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে এখন সেই অনুপাতে ব্যবস্থা করতে না পারলেই বরং অশান্তির মাত্রা বেড়ে যাবে।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই মতের প্রবক্তা। ছোট পরিকল্পনার অর্থ দারিদ্র্যকে কায়েম করা—এই কথার উদ্ভাবক তিনিই। গত ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর 'জনে জনে' বেতার বক্তৃতায় তিনি বলেন, চতুর্থ পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সমালোচনার তিনি সব সময় পক্ষপাতী, তবে সেই সমালোচনা গোটা পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে; অর্থাৎ পরিকল্পনার আকার নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে না।

তিনি বলেন : "জনসাধারণকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করতে ও কাজে লাগাতে পারব তার ওপরেই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে একথা বলা হয়ে থাকে, আরও বলা হয় যে, এ সম্পর্কে অতীতের শিক্ষা খুব আশাপ্রদ নয়। আমি এ নিয়ে কোন বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না, কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, আমাদের জনগণ তাদের ক্ষমতার যথেষ্ট নিশ্চিত প্রমাণ দিয়েছে।"

পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা চতুর্থ পরিকল্পনাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেন এবং বলেন, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস-কর্মীদের এক সভায় বোম্বাইয়ে তিনি বলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনায় অগ্রগতির দ্রুততর হবে বলেই তাঁর ধারণা। চতুর্থ পরিকল্পনাকে সফল করার জন্যে তিনি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর জোর দেন। যদি স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের অভাব দেখা যায় তবে সরকারই সম্পদ আহরণের কাজে এগিয়ে আসবেন। অর্থাৎ পরিকল্পনার টাকা যোগাড়ের জন্যে কর আরও বাড়াতে প্রস্তুত থাকবেন।

তবু সম্পদের সংস্থান সম্পর্কে যে সংশয় নানা মহলে দেখা দিয়েছে সেই সংশয় থেকে সরকারও একেবারে মুক্ত হতে পারেননি। তাঁদের দ্বিতীয় চিন্তার উৎপত্তি এইখানেই। পরিকল্পনাকারীরা এখন এটা স্বীকার করছেন যে, ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা যদি যোগাড় করা যায় তো ভালোই; কিন্তু যদি না যায় তাহলে যাতে বিপদে পড়তে না হয় সেইজন্যে একটা বিকল্প ব্যবস্থা রাখা দরকার।

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া ঘোষণার দুদিন পরেই, অর্থাৎ ৩১ আগস্ট, দিল্লীতে মিলিত হয়ে জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ পরিকল্পনাকে "মূল" ও "বহিরঙ্গ" এই দুভাগে ভাগ করার প্রস্তাব করেন। "মূল" অংশটিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়িত করা হবে। তারপর যে রকম টাকা পাওয়া যাবে সেই ভাবে "বহিরঙ্গের" কাজে হাত দেওয়া হবে।

১৫ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও এই দ্বিতীয় চিন্তাকে আরেকটু স্পষ্ট করে বলেন, আভ্যন্তরীণ সম্পদ বা বৈদেশিক সাহায্য যদি আশানুরূপ না পাওয়া যায়, তাহলে পরিকল্পনা সংশোধন করা হবে।

তিনি এটা স্পষ্ট করে দেন যে, নোট ছাপিয়ে ব্যয়সঙ্কুলান করার কোন ইচ্ছা সরকারের নেই; আর বৈদেশিক সাহায্যও "যে কোন শর্তে" চাওয়া হবে না। তিনি বলেন, খসড়ায় যে সব লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারের কোন অনমনীয় মনোভাব থাকবে না।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আমি কলকাতার মন্মথর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম যে নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার তার কাছে একটি প্রস্তাব করেছেন যে আমি ও সাধনা নিউ থিয়েটার্সের হয়ে একখানি দোভাষী ছবি করতে রাজী আছি কিনা। হ্যাঁ, আমি বলতে ভুলে গেছি যে গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪০) রাজনর্তকীর শুটিং শেষ হবার পর মিঃ জে বি এন ওয়াদিয়ার সঙ্গে আর একখানি দোভাষী ছবি শেষ করার কন্ট্রাক্ট সই করেছিলাম।

বোম্বাইতে আমি আছি প্রায় দুবছর হল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এখানকার জীবনধারার সঙ্গে কেন জানি না, এখনও খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি। যদিও বম্বে কলকাতার চেয়ে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর আধুনিক প্ল্যান রয়েছে—বোম্বায়ের কাছাকাছি কয়েক মাইলের মধ্যে চমৎকার চমৎকার বেড়াবার জায়গা রয়েছে যেগুলো পিকনিকের পক্ষে অপূর্ব—বম্বে থেকে পুণা মোটরে যাবার সুন্দর রাস্তা—সবার উপরে মেরিন ড্রাইভে আমাদের ফ্ল্যাট......এত সব আকর্ষণ সত্ত্বেও কলকাতার দিকে আমার মন পড়ে থাকত। আমার সেই চৌরঙ্গী প্লেসের ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে যে পরিবেশ ও প্রাণের স্পর্শ পেতাম, এখানে তার অভাবটাই সব থেকে বেশী অনুভব করতাম। বম্বেকে আমার মনে হোত যেন দেহ আছে প্রাণ নেই। রূপের দীপ্তি আছে কিন্তু স্নিগ্ধতা নেই। ওখানেও আমার বহু বন্ধুবান্ধব ছিল—কয়েকজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যথেষ্ট, কিন্তু যেন সেই প্রাণের স্পর্শটুকু ছিল না, যেখানে মানুষ পায় সান্ত্বনা এবং নির্ভরতা। কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যেমন প্রাণখুলে মিশতে কোনো সংকোচ হত না এখানে বন্ধুত্ব যতই গাঢ় হোক না কেন, কোথায় যেন একটা ব্যবধান রয়েই যেত।

সেজন্যে কলকাতায় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও নিজের লোকজনের মধ্যে নিজের সেই অতি-পরিচিত পরিবেশের মধ্যে ফিরে আসবার জন্যে আমার মনটা ছটফট করছিল। তাই আমি নিউ থিয়েটার্সের এই প্রস্তাবের কথাটি মিঃ ওয়াদিয়াকে বললাম। আমি আগেই বলেছি যে, মিঃ ওয়াদিয়া যে আমার একজন বিশেষ বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাই নয়, তিনি লোকের মনের আসল খবরটি ঠিক বুঝতে পারতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিলেন—কেন আমি কলকাতা ফিরে যেতে চাই—শুধু যে নিউ থিয়েটার্সের কন্ট্রাক্ট তা নয়—কারণ, তাঁর সঙ্গে তো আমার আগেই আর একখানি ছবির জন্যে কন্ট্রাক্ট হয়েই ছিল, আমি চাই আমার সেই পুরোনো পরিবেশে ফিরে যেতে। তিনি ঠিক আমার মনের গোপন কথাটিই বলে দিলেন : আমি বুঝেছি মিঃ বোস আপনি কেন যেতে চান। নিউ থিয়েটার্সের হয়ে একখানি ছবি করবেন—এটাই একমাত্র কারণ নয় কারণ আমার সঙ্গে তো আপনার আর একখানা ছবির কন্ট্রাক্ট আছে। এছাড়াও অন্য কারণ আছে, যেটা আমি বুঝতে পারছি। আমি আপনার সঙ্গে মিশে যেটুকু বুঝতে পারছি তা হল আপনি এমন একটি ঘরোয়া পরিবেশ খুঁজছেন, যা বম্বে আপনাকে দিতে পারছে না। এখানে চারিদিকে সম্পদের সমারোহ, চারিদিকে আধুনিক সভ্যতার উগ্র প্রকাশ কিন্তু কোনো প্রাণের স্পর্শ নেই, নেই কোনো আন্তরিক সহানুভূতি। আপনার সঙ্গে মন্মথ ও সুধাংশু চৌধুরীর সঙ্গে বাঙালীদের সেণ্টিমেণ্টাল স্বভাব ও ভাবধারা নিয়ে অনেক সময় হাসা-পরিহাস করেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—আপনার সঙ্গে আমার আলাপ ৬।৭ মাসের বেশী নয়—আপনাকে আমি যতখানি আপনার বলে মনে করতে পেরেছি, যারা আমার সঙ্গে বহু বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাদেরও আমি এতখানি আপনার বলে ভাবতে পারি না।

মিঃ ওয়াদিয়ার মনের এই অদ্ভুত কোমল দিকটি আমার অন্তর স্পর্শ করল, তাঁর আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হলাম। আমি বললাম : আমিও ঠিক এই কথাই ভাবি মিঃ ওয়াদিয়া। আপনার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম দেখা হয়, সেইদিন থেকেই মনে হয়েছে আপনি যেন আমার কত কালের চেনা—সেইদিন থেকেই পেয়েছি আপনাকে একান্ত বন্ধুভাবে—আমাদের সম্পর্ক প্রযোজক ও পরিচালকের মধ্যে যা হয় তা নয়।—আমরা দু'জনেই দু'জনকে স্পষ্ট ভাবে চিনতে পেরেছি, সেইজন্যেই আমাদের কাজও হয়েছে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ভাবে—একদিনের জন্যেও আমাদের মধ্যে কোনরকম মনান্তর বা মতান্তর হয়নি।

সমুদ্রের ধারে (WORLI SEA FACE) মিঃ ওয়াদিয়ার সুন্দর আধুনিক বাড়ী বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল; সঙ্গে অবশ্য পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। হুইস্কি সোডার সঙ্গে রেডিয়োগ্রাম থেকে ভেসে আসা হাল্কা সংগীতের সুর—সামনে সমুদ্রের মৃদু কল্লোল—এরই মধ্যে আমাদের দু'জনের প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। মিঃ ওয়াদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে করমর্দন করবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমাদের এ-বন্ধুত্ব চিরদিন অটুট থাকবে। আজও আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের সে-বন্ধুত্ব এখনও তেমনি অম্লান আছে। ৪।৫ বছর আগে তিনি যখন কলকাতা এসেছিলেন [illegible] ওয়াদিয়া মুভিটোনের ছবির রিলিজের ব্যাপারে তখন আমাকে ও সাধনাকে একটা ককটেল পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু সাধনা যেতে পারেনি বলে [illegible] নয়, কাজের ভিড়ের মধ্যেও, [illegible] বার [illegible] আমাদের [illegible] ফ্ল্যাটে [illegible] মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—নিউ থিয়েটার্সের কন্ট্রাক্টের কথা। মিঃ ওয়াদিয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেল যে, নিউ থিয়েটার্সে দোভাষী ছবিখানি শেষ করবার পরই আমি আর সাধনা বোম্বাই ফিরে এসে ওয়াদিয়া মুভিটোনের হয়ে একটি দোভাষী ছবি করব।

আমি মন্মথকে লিখে দিলাম—নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে আমার আর সাধনার কন্ট্রাক্টের খসড়া পাঠিয়ে দিতে।

তখন ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি। সাধনা তার আসন্ন সফরের নাচের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত আর আমি ব্যস্ত রয়েছি 'রাজ-নর্তকী'-র বাংলা সংস্করণের সম্পাদনা নিয়ে।

বাংলা সংস্করণের সম্পাদনা করে ফেব্রুয়ারীর শেষদিকেই আমি আমার সহকারী হেমন্তকে নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়—সঙ্গে নিয়ে এলাম পাবলিসিটির সমস্ত মালমশলা; আগেই বলেছি যে, মিঃ ওয়াদিয়ার আমার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল, তিনি বলে দিয়েছিলেন আমি যেরকম ভাল মনে করব সেইভাবেই যেন পাবলিসিটি হয়। আমি তাঁকে অনেক করে বলেছিলাম 'রাজ-নর্তকী' (বাংলা)-র রিলিজের সময় কলকাতায় উপস্থিত থাকতে কিন্তু তিনি বললেন যে, বম্বেতে 'রাজনর্তকী' 'হিট' করেছে, সুতরাং তিনি এখন পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের রিলিজের জন্য খুব ব্যস্ত। এই কারণে তাঁর পক্ষে এখন কলকাতায় যাওয়া সম্ভব হবে না।

যাই হোক, 'রাজনর্তকী' মুক্তিলাভ করল উত্তরা সিনেমায় ৮ই মার্চ ১৯৪১ সালে এবং আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই বলছি যে, হিন্দীর মতই বাংলা সংস্করণটিও সর্বশ্রেণীর দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

রাজনর্তকীর সংগঠনকারিগণ

প্রযোজনা ... ... ওয়াদিয়া মুভিটোন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ... ... মধু বসু
কাহিনী ... ... মন্মথ রায়
সুরসংযোজনা ... ... তিমিরবরণ
প্রধান ব্যবস্থাপক ... সুরেন্দ্র দেশাই

আলোকচিত্র : যতীন দাস ও প্রবোধ দাস, শব্দনিয়ন্ত্রণ : বেহরাম ভারুচা, দৃশ্যপরিকল্পনা : সুধাংশু চৌধুরী, নৃত্যপরিকল্পনা ও পরিচালনা : সাধনা বসু, গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য (বাংলা) ও পণ্ডিত ইন্দ্র (হিন্দি), সম্পাদনা : শ্যাম দাস, সংলাপ (হিন্দি) : ডবলু. জেড. আহমেদ।

রূপায়ণে :

রাজনর্তকী মধুছন্দা ...... সাধনা বসু (বাংলা ও হিন্দি)
কাশীশ্বর গোস্বামী ... অহীন্দ্র চৌধুরী "
প্রিয়া .... প্রতিমা দাশগুপ্তা "
বিরা .... বিনীতা গুপ্তা "
মহাকাল .... বিভূতি গাঙ্গুলী "
অনঙ্গ .... প্রীতি মজুমদার "
মন্দা .... মৃণাল ঘোষ "
জেনারেল টাম্বা .... মণি চ্যাটার্জি "
পুরোহিত রাজদূত ...... প্রভাত সিংহ "

যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি :
জ্যোতিপ্রকাশ (বাংলা)
পৃথ্বীরাজ কাপুর (হিন্দি)

মহারাজ জয়সিংহ :
মন্মথ রায় (বাংলা)
নারায়ণদাস (হিন্দি)

কলকাতা ও বোম্বায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব সমালোচনা বেরিয়েছিল, তারই কিছু কিছু নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"রাজনর্তকী ...একসঙ্গে এই ছায়াছবির তিনটি সংস্করণ বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী তোলা হইয়াছে। এতবড় প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম। ভারতীয় ছায়াচিত্রের ইতিহাসে ওয়াদিয়া মুভিটোন ও শ্রীযুক্ত মধু বোসের এই বিরাট প্রচেষ্টা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল।...রাজনর্তকীরূপে সাধনা বোস তাঁহার অপরূপ নাট্যনৈপুণ্যে তাঁহার পূর্ব গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। তিনি যে ভারতের শ্রেষ্ঠতম অভিনেত্রী তাহা প্রমাণিত হইল...প্রভুপাদের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী... এই নাটকীয় চরিত্রটি শ্রীযুক্ত চৌধুরী যথাযোগ্য রূপ দিয়াছেন। নায়ক চন্দ্রকীর্তিরূপে তরুণ প্রিয়দর্শন নট জ্যোতিপ্রকাশের অভিনয় সুন্দর।...পরিচালক শ্রীযুক্ত বোস যে-চিত্র রচনা করিয়াছেন, রূপে, রসে ও বর্ণচ্ছটায় তাহাকে অনন্যসাধারণ বলা চলে ...চিত্রনাট্য রচনা ও Short division-এ তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা অকুণ্ঠ কণ্ঠে অভিনন্দন জানাই।...তিমিরবরণ রচিত তিনটি নৃত্যের আবহসংগীত আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়।"

...আনন্দবাজার পত্রিকা (২২-৩-৪১)

"...."Raj-Nartaki" is a beautiful picture—"a thing of beauty" in truth that may well be "a joy for ever".... bouquets are to be handed to Director Modhu Bose for grand work....the picture is well dressed, well photographed and eminently well presented throughout"

TIMES OF INDIA. Bombay (15.2.41.)

"...Sadhona Bose in the title role is a dream of grace and beauty come to life, exquisite in the sinuous grace and bewitching rhythm of her dancing.... she reveals a flawless histrionic genius....Prithviraj puts over an attractive performance...."

THE EVENING NEWS OF INDIA. Bombay (20.2.41.)

"...Director Modhu Bose has given us one of the most remarkable of Indian productions .... Ahindra Choudhury in the role of the high Priest gives a performance which will be remembered as about the best of its kind we have had for a long time ...."

THE HINDU, Madras. (28.2.41)

"..."Raj-Nartaki" is definitely a remarkable production in the annals of the Indian movies"

HINDUSTHAN STANDARD. Calcutta. (21.3.41).

"...Sadhona Bose, in the title role, rises to dizzy heights on accounts of her magnificient exposition of histrionic talents and dancing....Music direction by Timir Baran is another highlight of the picture .... I take my hat off in sincere admiration to the Producer Mr. J. B. H. Wadia and Director Modhu Bose for their memorable contribution to the Indian film-world".

DAPALI (Avimanyu). Cal.cutta. 14.3.41.

কলকাতায় থাকাকালীন আমি নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে একখানি দোভাষী ছবির জন্যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম। এটা হল ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। ছবির শুটিং আরম্ভ হবে জুন মাস নাগাদ। আমি মন্মথকে বললাম, এমন গল্প ঠিক করতে যাতে অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) এবং নিউ থিয়েটার্সের অন্যান্য নামকরা শিল্পীদের ভাল চরিত্র থাকে। অবশ্য নায়িকার ভূমিকায় সাধনা তো থাকবেই। 'কুমকুম' এবং 'রাজনর্তকী' ছিল নৃত্যগীতবহুল কাহিনী কিন্তু এবারে আমি ঠিক করলাম পুরোপুরি একটি নাটকীয় কাহিনী করব।

মার্চ এবং এপ্রিল মাসে আমি ইংরাজী সংস্করণটি (the Court Dancer)-র সম্পাদনায় ব্যস্ত রইলাম। সাধনা এর মধ্যে সুরাট, বরোদা, আহমেদাবাদ এবং বম্বেতে 'শো' দিয়ে বন্ধুবর হরেন ঘোষের সঙ্গে সদলবলে দক্ষিণ ভারতে চলে গেল। নাগপুর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদে হরেন ঘোষ বন্দোবস্ত করেছিল।

মার্চ মাসের শেষাশেষি সাধনার বড়-মামা বিচারপতি এস এন সেন বম্বেতে মারা গেলেন। দুঃখের বিষয় সাধনা তখন বম্বেতে ছিল না। আমি আগেই বলেছি যে, জাস্টিস সেনের পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় সাধনার সঙ্গে বিবাহসূত্রেই নয়, ১৯২৫ সালে যখন আমি রেঙ্গুনে একটি

রাজনটী মধুছন্দারূপে সাধনা বসু

বর্মী চিত্রে ক্যামেরাম্যানের কাজ করছিলাম, তখনই জাস্টিস সেনের পরিবারের সংগে আমার হৃদ্যতা খুব বেশী হয়েছিল। তাছাড়া জাস্টিস সেনের পিতা মিঃ পি সি সেনের পরিবারের সংগে আমাদের পরিবারের অনেক আগে থেকেই অন্তরঙ্গতা ছিল। এ-কথা আগেই বলেছি। জাস্টিস এস এন সেন তখন রেঙ্গুন হাইকোর্টের একজন বিচারক ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুজাতা দেবী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ছোট মেয়ে (অর্থাৎ সাধনার ছোট পিসি) তাঁদের বাড়ীতে আমায় এত আদর-যত্ন করতেন যে, আমি যে বিদেশে রয়েছি এ-কথা মনেই পড়ত না। আমি থাকতাম ওয়াই এম সি এ-তে, কিন্তু তাঁরা প্রায় সন্ধ্যাতেই গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন আমার যাবার জন্যে। তাঁরা আমায় ঠিক বাড়ীর ছেলের মতই মনে করতেন—সারা সন্ধ্যাটা হৈ-চৈ-গান-গল্প করে তারপর প্রায় প্রত্যেকদিন রাত্রেই বাড়ী ফিরতাম বিরাট ভুরিভোজন করে।

সেজন্য বম্বেতে তাঁর অসুখের সময় আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি করলাম, কিন্তু সকলের চেষ্টার কোন ফলই হল না—একদিন তিনি সকলের মায়া কাটিয়ে অনন্তধামে চলে গেলেন।

এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ 'কোর্ট ড্যান্সার'-এর সম্পাদনা শেষ হল।

বোম্বাই-এর পাট তুলে আবার কলকাতায় আসার তোড়জোড় শুরু হল। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু হল, আসবাবপত্র সব ভালোভাবে প্যাকিং করে ট্রেনে 'বুক' করা হলো—সেইসঙ্গে আমার Pontiac গাড়ীটাও।

একটা বিরাট সংসারকে একবার কলকাতা থেকে বম্বে, আবার বম্বে থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার খরচের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু টানা-পোড়েন কি কম! প্রথমে ভেবেছিলাম, বম্বেতেই স্থায়ীভাবে থাকব, সেখানে সব পেলাম, নাম পেলাম, অর্থ পেলাম, নতুন কন্ট্রাক্টও পেলাম, কিন্তু মন ভরল না—মন পড়ে রইল কলকাতায়। সেই পরিচিত মুখের মেলা—প্রাণখোলা হাসি-হল্লা, পান-ভোজন! মেরিন ড্রাইভের সমুদ্রের ধারে অমন সুন্দর সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট যেন এর কাছে কিছু নয়। কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ছিল চিত্তের বিনিময়—বম্বেতে চিত্ত নেই, আছে চটক; এখানে আছে প্রাণের স্পর্শ, ওখানে আছে দুরন্ত এটিকেট; সামাজিকতা ও সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য প্রকাশ। সেইজন্যেই আমার প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছিল কৃত্রিম আবহাওয়ার মাঝে। তাই কলকাতা আসবার এই সুযোগ পেয়ে প্রাণটা নেচে উঠেছিল। নইলে নিউ থিয়েটার্সের কন্ট্রাক্ট এমন কিছু একটা লোভনীয় ছিল না যাতে ওয়াদিয়ার ছবি না করে কলকাতায় ছবি করব।

যাই হোক, আসবার আগে মিঃ ওয়াদিয়া ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া-তে একটি বিরাট নৈশভোজের আয়োজন করে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। সত্যিই তাঁকে ছেড়ে আসতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল কারণ আজ অবধি তাঁর মত সত্যিকার বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী আমি খুব কমই পেয়েছি।

(ক্রমশ)

দিলীপজিৎ রসূলপুরী পরিচালিত ভোজপুরী চিত্র **চলজাগরা-য়** বেলা বোস ও নারেন্দর

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানে ভারত :

ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্বাধীনোত্তর যুগে আজ **পর্যন্ত** ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র **উৎসব** অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনবার— **১৯৫২, ১৯৬১** এবং ১৯৬৫-তে। প্রথম দুবারের উৎসব থেকে গেল বছরের **জানুয়ারী** মাসে অনুষ্ঠিত উৎসবের পার্থক্য **ছিল** এই যে, এই উৎসবটি হয়েছিল **প্রতিযোগিতামূলক**। কোনোও দেশে প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত **করতে** গেলে **ছাড়পত্র** নিতে হয় প্যারিসে **অবস্থিত** ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব **ফিল্ম** প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর **কাছ** থেকে। ভারতে **বৈদেশিক চলচ্চিত্রের** কোনো খোলা বাজার নেই, এই কারণে তাঁরা **গেল বছরে** ভারতকে **এই** অনুষ্ঠান করতে দিতে প্রথমটা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার যখন ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে বছরে অন্ততঃ তিরিশখানি ছবি আমদানি করতে স্বীকৃত হন, তখন এবং মাত্র তখনই আই-এফ-এফ-পি-এ ভারতের প্রচেষ্টাকে অনুমোদন **করেন**। ভারত সরকার আরও ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান চলচ্চিত্র **উৎসবগুলিতে** উৎকর্ষের গুণে পুরস্কারপ্রাপ্ত **ছবিগুলিকেও** বিনাবাধায় ভারতে প্রবেশ **করতে দেওয়া হবে সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্যে। এই সঙ্গে** এমন কথাও শোনা যায় যে, অতঃপর চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান **ভারতবর্ষে** নিয়মিতভাবে একটি বাৎসরিক **ব্যাপারে পরিণত হবে।**

গত বৎসরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক **চলচ্চিত্র** উৎসবের অব্যবহিত পরেই **ঘোষিত হয়েছিল** যে, পর বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই উৎসব অক্টোবর মাসে **অনুষ্ঠিত** হবে বলে স্থির করা **হয়েছে**। এবং **এই** মর্মেও সংবাদ পাওয়া **গিয়েছিল** যে, পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্যে **প্রারম্ভিক কাজকর্ম** ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তর। এ-রকম অশ্রুতপূর্ব তৎপরতার **কথা** শুনে **আমরা** অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করেছিলুম।

এর পরে দেড় বৎসরেরও অধিক **সময়** অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং সেই বিঘোষিত অক্টোবর মাস প্রায় এসে পড়ল বলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় **সরকারের** সাম্প্রতিক ঘোষণা থেকে জানতে পারা গেছে যে, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তর **যখন** চতুর্থ ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে **প্রস্তুতি** হিসেবে নানাবিধ ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, এমন কি বৈদেশিক মুদ্রার জটিল প্রশ্নটিও অর্থমন্ত্রকের সহায়তায় মীমাংসিত হতে চলেছিল, ঠিক এমনই সময়ে ইন্টারন্যাশনাল **ফেডারেশন অব ফিল্ম প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন** (আই-এফ-এফ-পি-এ)-র কাছ থেকে ভারতকে এ-বছর-আন্তর্জাতিক-চলচ্চিত্র-উৎসব-করতে-দিতে অক্ষমতাজ্ঞাপক পত্র আসায় এই উৎসব অনুষ্ঠান এ-বছরের মতো পরিত্যক্ত হ'ল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের রূপরস, গতিপ্রকৃতি ও মান দেখবার জন্যে যে-সকল চলচ্চিত্রানুরাগী এতদিন উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা এই সংবাদে নিশ্চয়ই নিরাশ হয়ে পড়বেন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, আই-এফ-এফ-পি-এ ভারতকে এ-বছর প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান করতে দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন কেন? আমরা জানি যে, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে ভারত সরকার প্রতি বছর অন্ততঃ তিরিশখানি ছবি আমদানি করবেন, মাত্র এই শর্তে আই-এফ-এফ-পি-এ গেল বছর ভারতকে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গেল বছরের উৎসব অনুষ্ঠানের পরে এক অবধি দেড় বছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে খোলা বাজারের জন্যে ঐ প্রতিশ্রুত তিরিশখানার মধ্যে ভারত সরকার একখানি ছবিও আমদানি করতে পেরেছেন কি? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, না, পারেন নি। অথচ শোনা যায়, বিভিন্ন দেশ থেকে **তিরিশখানির** মতো **ছবি** আমদানি করবার **জন্যে** আনুমানিক যে-পরিমাণ বৈদেশিক **মুদ্রার প্রয়োজন**, তা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক **আগে থাকতেই মঞ্জুর** ক'রে রেখেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের শ্রম-**মন্ত্রকের ডেপুটি লেবার কমিশনর মিঃ এইচ, এম, ঘোষের মধ্যস্থতা ব্যর্থ হ'ল। গেল রবিবার,** ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে **বেংগল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন-এর নির্দেশে** সিনেমাকর্মীরা **ধর্মঘট** শুরু করেছেন। **এবং এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে** সিনেমাগৃহের মালিকেরা ১৯-এ **তারিখ থেকে লক্-আউট ঘোষণা করেছেন। এই মালিক-শ্রমিক বিরোধ যতশীঘ্র সম্ভব মিটে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহগুলি আবার দীপোজ্জ্বল হয়ে উঠুক, এই কামনাই আমরা করি।**

জীবন-মৃত্যু চিত্রে উত্তমকুমার ও জনৈক শিল্পী।

তাহ'লে কার বা কাদের গাফিলতিতে আমাদের সরকারের পক্ষে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্ভব হয়নি? আমাদের ভারত এই যে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত করবার সুযোগ ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হ'ল, এর জন্যে দায়ী কে বা কারা?

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ আগস্ট ইয়োরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অবশ্য স্মরণীয় দিন। ঐ দিনটিতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরকে মিত্রপক্ষীয় সেনারা নাৎসীকবলমুক্ত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটিকে একটি বিরাট যুদ্ধজয়ের নিদর্শন বললেই যথেষ্ট হবে না; বরং বলতে হবে, এই ঘটনার ফলে পশ্চিমী সভ্যতা নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছিল। যখন জার্মানদের কানে গিয়েছিল যে, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ক'রে দ্রুতগতিতে প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, তখন শহরটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে ফেলার উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। নাৎসী সৈন্য যদি মিত্রপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে অসমর্থ হয়, তাহ'লে ফুয়েরার (হিটলার) ইয়োরোপের এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবেন ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। লুভার মিউজিয়াম, নোতর্দাম্ গির্জা, ইফেল টাওয়ার, আর্ক দ্য ট্রাওম্ফে এবং সেইন নদীর ওপরের অপূর্ব সেতুগুলি——প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থানকে ভূমিসাৎ করবার জন্যে ডিনামাইট পর্যন্ত পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও হিটলারের এই উন্মাদ পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরিত হ'তে পারনি একটি কারণে—যে-জার্মান সেনাপতিকে এই ধ্বংসলীলার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে স্বাক্ষরিত কোনো আদেশ যথাসময়ে এসে পোঁছোতে পারেনি।

—কেন? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে প্যারামাউণ্ট পিকচার্স-এর মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি "ইজ প্যারিস বার্নিং?"-এ। ল্যারি কোলিন্স ও ডোমিনিক লেপিয়ের রচিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুস্তক "ইজ প্যারিস বার্নিং" ডি-ডেতে জার্মান অবরোধ ভেদ ক'রে মিত্রশক্তির ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ থেকে শুরু ক'রে প্যারিস শহরকে নাৎসী কবল হ'তে উদ্ধার পর্যন্ত শ্বাসরোধকারী ঘটনাকে যে-জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেছে, তারই ওপর নির্ভর ক'রে এই চিত্ররূপটি গ'ড়ে উঠেছে। ফরাসী সরকারের সহৃদয় সহযোগিতায় গেল দু'বছর ধ'রে প্যারিস শহরের বুকের ওপর প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থানে ও পথেঘাটে এই দুরন্ত সংগ্রামের দৃশ্যাগুলি বাস্তবের সমস্ত খুঁটিনাটিসহ অভিনীত হয়েছে।

প্যারামাউণ্ট-সেভেন আর্টস-রে স্টার্ক নিবেদিত এই ছবিখানির প্রযোজক, চিত্র-নাট্যকার, পরিচালক ও সঙ্গীতপরিচালক হচ্ছেন যথাক্রমে পল গ্রিয়াজ, গোরে ভিডাল ও ফ্রান্সিস কোপোলা, রেণে ক্লেমেণ্ট ও 'ডক্টর জিভাগো'র জন্যে অ্যাকাডেমী-পুরস্কারপ্রাপ্ত মরিস জারে। এবং অভিনয় করেছেন জাঁ-পল বেলমোণ্ডো, চার্লস বয়ার, লেসলি ক্যারণ, জাঁ-পিয়ারে কাসেল, জর্জ চাকিরিস, অ্যালেন ডেলন, কার্ক ডগলাস, গ্লেন ফোর্ড, অ্যান্থনি পার্কিন্স, সিমোনে সিনোরেট, অর্সন ওয়েলস্ প্রভৃতি যশস্বী শিল্পী।

১৯৪৪-এর ২৫-এ আগস্ট তারিখের স্মরণীয় ঘটনাসংবলিত চিত্র "ইজ প্যারিস বার্নিং" দেখবার জন্যে আমাদের আগ্রহের সীমা নেই।

—নান্দীকর

কলকাতা

"হাটে-বাজারে"তে বৈজয়ন্তীমালার গান :

তপন সিংহ পরিচালিত বাঙলা ছবি "হাটে-বাজারে"তে বৈজয়ন্তীমালা অভিনয় করছেন, বাঙলা ছবির দর্শকদের কাছে এইটাই একটি প্রকাণ্ড সংবাদ। কিন্তু তাঁদের জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি চিত্রে তনুজা।

উত্তরপুরুষ চিত্রে বসন্ত চৌধুরী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও বিকাশ রায়

করছিল। তিনি এই ছবির জন্যে নিজেই অর্থাৎ স্বকণ্ঠে একখানি বাঙলা গান গেয়েছেন। যাঁরা এই গান রেকর্ডের সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এবং পরিচালক-সংগীতপরিচালক তপন সিংহ নিজে অভিমত প্রকাশ করেছেন, এই গান শ্রোতৃবৃন্দকে খুশী করবেই করবে।

'দুরন্ত চড়াই'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু

সমরেশ বসু রচিত ক্যাপিটাল ফিল্মসের 'দুরন্ত চড়াই'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, বিকাশ রায়, সৌমেন চক্রবর্তী ও সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বম্বে)। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন শ্যামল মিত্র।

'আকাশ-ছোঁয়া' সমাপ্তপ্রায়

রাজেন তরফদার পরিচালিত চলচ্চিত্রগুণের 'আকাশ-ছোঁয়া'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। মহাশ্বেতা দেবী রচিত এ কাহিনীর বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া দেবী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, পারিজাত বসু, ছায়া দেবী, বিনতা রায় ও শিখা ভট্টাচার্য। সুধীন দাশগুপ্ত ছবিটির সুরকার। অভিনেতা দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত এ চিত্রের পরিবেশনায় রয়েছেন চণ্ডমাতা ফিল্মস।

'জীবন-মৃত্যু'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ রায় রচিত বি এম ডি মুভিজের 'জীবন-মৃত্যু'র সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শেষ করেছেন পরিচালক হীরেন নাগ। বর্তমানে সম্পাদনার কাজ শেষ হচ্ছে। এ চিত্রের প্রধান অংশে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, তরুণকুমার, এন বিশ্বনাথন, কমল মিত্র, প্রশান্তকুমার, বুবু গাঙ্গুলী ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

দিলীপ নাগ পরিচালিত 'বধূবরণ'

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় পরিচালক দিলীপ নাগ তাঁর 'বধূবরণ' ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ করে এনেছেন। গীতিকার শ্যামল গুপ্ত রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার, গীতা দত্ত (বম্বে), বিকাশ রায়, অভি ভট্টাচার্য, অজয় বিশ্বাস, রাখী বিশ্বাস, জহর রায়, জীবেন বসু, ভারতী দেবী ও গীতালি রায়। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন প্রবীণ সুরকার কমল দাশগুপ্ত। চণ্ডীমাতা ছবিটির পরিবেশক।

কৃষ্ণ পিকচার্সের 'মুক্ত বলাকা'

কৃষ্ণ পিকচার্সের 'মুক্ত বলাকা' ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। পরিমল ঘোষ ছবিটির পরিচালক। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন ললিতা চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, সীতা মুখোপাধ্যায় ও নবাগত মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজেন সরকার এ ছবির সুরকার।

বোম্বাই

'ঝুক গয়া আসমান' সমাপ্তপ্রায়

আর ডি বনশল ও রমেশ লাম্বা প্রযোজিত 'ঝুক গয়া আসমান'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে মেহেবুব স্টুডিওয় গ্রহণ করছেন পরিচালক লেখ ট্যান্ডন। ওংকার সাহিব রচিত চিত্রনাট্যের মূল চরিত্রে রূপদান করছেন রাজেন্দ্রকুমার, সায়রাবাণু, রাজেন্দ্রনাথ, জাগীরদার, দুর্গা খোটে, শিবদসানী ও প্রেম চোপরা। শংকর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার। আগামী মাসে দার্জিলিং অঞ্চলে এ ছবির একটি স্বপ্নদৃশ্য গৃহীত হবে।

অর্চনা ফিল্মসের আগামী ছবি 'দিয়া জালে সারি রাত'

অর্চনা ফিল্মসের নতুন রঙিন ছবি 'দিয়া জালে সারি রাত'র নায়ক-নায়িকা চরিত্রে এই প্রথম একসঙ্গে অভিনয়ের জন্য মনোনীত হলেন জীতেন্দ্র এবং নন্দা। মধুসূদন কালেলকার রচিত বিখ্যাত মারাঠি নাটকের কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রটি বিধৃত। ছবিটি পরিচালনা করছেন নরেন্দ্র সুরী। সুরসৃষ্টি করবেন রবি।

আর ভট্টাচার্য পরিচালিত রঙিন ছবি 'সুহাগ রাত'

প্রযোজক-পরিচালক আর ভট্টাচার্য তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'সুহাগ রাত'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান পালন করে সম্প্রতি একটানা আট দিন ধরে ছবির অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করলেন রাজকমল স্টুডিওয়। অনুপ শর্মা প্রযোজিত

প্রস্তর স্বাক্ষর চিত্রে বনানী চৌধুরী, সন্ধ্যা রায় ও অনুপকুমার।

এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন জীতেন্দ্র, রাজশ্রী, সুলচনা, নীলাম, মাধবী, অভি ভট্টাচার্য, মণি চ্যাটার্জি ও মেহমুদ। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

'মেরী কাহানী' চিত্রের সংগীত-পরিচালক গীতা দত্ত

কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্ত 'মেরী কাহানী' চিত্রের সংগীত-পরিচালক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। সম্প্রতি বাংলা 'বধূবরণ' চিত্রে শ্রীমতী দত্ত অভিনয় করছেন। সম্প্রতি এ ছবির দুটি গান গ্রহণ করে গীতা দত্ত এক মাসের জন্য সংগীত পরিবেশনে দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেছেন।

স্টুডিও থেকে বলছি

মেয়ে তো নয়, যেন বাঘিনী। বাগদিপাড়ার মেয়ে দুর্গা। বাপের নাম বাঁকা বাগদি। বাঘের মতই সাহস করে। লোকে বলত যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। ডাকাত বাপের ডাকাত মেয়ে। এমনটি না হয়ে দুর্গার কোন উপায় ছিল না। বাপ বেহুঁস, তাই নিজেকে হুঁসিয়ার হতে হয়েছে। সবার চোখে বাঘিনী হলেও তার একটা তোলা-নাম আছে। তবে বড় একটা সে নামে কেউ ডাকে না। সেই পোশাকী নামটা 'পারুলবালা'। কঙ্গালেশ্বরের মেয়ের আবার নাম! বাপ ডাকে ছুঁড়ি বলে। লোকে বলত বাঁকার মেয়ে।

বাঁকা ছিল দুর্ধর্ষ চোরাই-চালানদার। বেআইনী মদের চোলাইকর। যেদিন বাঁকা মারা গেল সেদিন কেউ এতটুকু চোখের জল পর্যন্ত ফেলেনি। বরং সেদিন পাড়ার লোকের পিঠ জুড়ল। সবাই জানত বাঁকা পাপী। কেউ তাকে ক্ষমা করেনি। ঈশ্বরও কোন করুণা করেননি। এমনকি পাড়ার

৮০-তেও আসিওনা চিত্রে রবি ঘোষ ও গঙ্গাপদ বসু

মোরগটা পর্যন্ত যেমন ডাকত, সেদিনও তেমনি ডেকেছিল, কোথাও একফোঁটা পরিবর্তন চোখে পড়েনি।

শুধু কেঁদেছিল দুর্গা। অসহায় হয়ে। আপন বলতে আর যে কেউ রইল না তার কাছে। বাবা-মা অবশ্য চিরদিন কারও থাকে না। কিন্তু দুর্গার জন্য অন্ততঃ বাঁকার বেঁচে থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যে মেয়ের আঠারোতেও বিয়ে হয়নি, তার দেহের দরিয়ার প্লাবন কে সামলাবে? এ প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্ব কেউ নেবে না। বরং তার একূল-ওকূল দুকূল ভরা যৌবনের জল ঘোলা করতে অনেকেই ছুটে আসবে।

তাই দুর্গা সেদিন কেঁদেছিল। আকুল হয়ে। কেঁদেছিল ভয়ে আর ঘৃণায়। শুনেছি, কপাল মন্দ না হলে কেউ নাকি এ সংসারে মেয়ে হয়ে জন্মায় না। মেয়ের ধর্ম নাকি সে যেচে করে না। কেঁদে করে। তাই সেদিন বাপের জন্য কাঁদতে গিয়ে, দুর্গা বারবার নিজের জনাই কেঁদেছিল।

কিন্তু আজ। দুর্গার চোখে আগুন। মনে আগুন। কাউকে সে বিশ্বাস করে না। শুধু একজনকে ছাড়া। সে চিরোঠাকুর। চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বামুনপাড়ার ছেলে। শিক্ষিত। বছর তিনেক আগে চিরো ঠাকুর স্বদেশী করে জেল খেটে এসেছে। সত্যের জন্য সে লড়েছে। কিন্তু [illegible] হেরে গেছে। তাই বেপরোয়া চিরঞ্জীব জীবিকার জন্য সবচেয়ে নোংরা পথকেই বেছে নিয়েছে। সে এখন বাঁকা বাগদির মতই চোরাই-চালানদার।

শেষে দুর্গাও জীবিকার জন্য এই সহজ পথটা বেছে নিল। চিরোঠাকুরের কারবারে যোগ দিল। সেও চোলাই-এর পথ ধরল। কিন্তু এ পথে বড় সজাগ থেকে কাজ করতে হয়। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নানা পাত্রে বে-আইনী মদ চালান দিতে হয়। একবার ধরা পড়লেই এ কারবার একেবারে বন্ধ। তাই গোপনে গোপনে এ-রসের জোগান চলে।

বেশ চলছিল চিরঞ্জীবের। দুর্গাকে পেয়ে তার এ করবার দিনদিন বেড়ে উঠছিল। হঠাৎ একসাইজ ডিপার্টমেন্টের নতুন অফিসার হয়ে এলেন বলাই সান্যাল। আবগারি বিভাগের নতুন দারোগা। চোলাইকরদের হাতে-নাতে ধরতে তাঁর নাকি জুড়ি নেই। এরমধ্যেই চাকরীতে বেশ নাম-ডাক করে ফেলেছেন বলাই সান্যাল। ঘুষের ব্যাপারে তিনি নেই। কাজেই তার

ব্রেক চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়

নেশা। বিবাহিত। স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছেন। মলিনাদেবী তাঁর আবগারির স্বামীকে চোখে চোখে রাখেন।"

চিরঞ্জীব কিন্তু মোটেই ভয় পায়নি। দুর্গাও তেমনি। রাত-বিরেতে দিব্যি মাল পাচার হচ্ছে। ওদের ডেরা গ্রামের পথে। গরুরগাড়ির খড়ের গাদার নিচে সারিসারি চোলাই মদের ব্লাডার কিংবা টিউব সাজিয়ে ব্যবসার লেনদেন চলেছে। আজ এখানে কাল সেখানে। বেশ দু'পয়সার মুখ দেখছে চিরঞ্জীব।

দুর্গা অনেক পাল্টে গেছে। আইবুড়ো নামটা অবশ্য ঘোচেনি। কিন্তু লোকে আর তাকে অরক্ষণীয়া বলে না। বরং তার যাদুর প্রশংসা করে। তা নাহলে চোলাই স্মাগলার দুরন্ত ও দুর্ধর্ষ চিরঞ্জীবকে ও কি করে এমন বেঁধে রেখেছে। যা বটে, তার কিছুটা বটে দুর্গা যেন একেবারে থিতিয়ে গেছে। দুচোখ মেলে চিরঞ্জীবকে সে দেখে। চিরঞ্জীবও দুর্গাকে কাজের মাঝে দেখে। কখন যেন ওরা একজন আর একজনকে চুপিসাড়ে ভালবেসে ফেলেছে তা নিজেরাই জানে না। প্রেম-পিরীতির ফাঁদে ওরা ধরা পড়েছে। চিরঞ্জীবের দেওয়া সোনার হারটা দুর্গার গলায় চিকচিক করে। যেন এক চিলতে রোদ ওর গলায় এসে পড়েছে। ওর কাজল-কাজল চোখে সলজ্জ হাসি। পান পাতার মত খোঁপা। হরনামাসীর মেয়ে সোহাগ করে বলত, 'হরতনের টেক্কা হয়ে গেল ভাই দুর্গো। দাঁড়া, পাতাসুদ্ধ গন্ধরাজ ফুল গুঁজে দিই। ইসকাবনের টেক্কা হয়ে যাবে।'

আজকের এ-দুর্গা বাইরের নয়। ভেতরের। পুকুরের গায়ে নিঃশব্দে ফোটা একটি পদ্মফুল। রং আছে। তবে ঢং নেই। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে এ-রূপ দেখার সময় পর্যন্ত পায়নি দুর্গা। হঠাৎ খবর এল আবগারির দারোগা নাকি চিরঞ্জীবকে অফিসে নিয়ে গিয়ে জেরা করছে। খবর রটে গিয়েছিল এতদিনে ধরা পড়ল চিরো বাঁড়ুজ্জে।

সেই বেশে বাঁশঝাড় মাড়িয়ে চুপিচুপি অফিসের সামনে চলে এসেছে দুর্গা। ভেতরে ঢুকতে তার লজ্জা। দূরে থেকে সব দেখছে। বলাইবাবুর সঙ্গে চিরঞ্জীর কথা বলছে। হয়তো কোন মিটমাট, ঘুষ দেওয়া-নেওয়া চুক্তির কথা। এতদিনে তাহলে নতুন দারোগার মন বুঝি টলল। দুর্গা ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে।
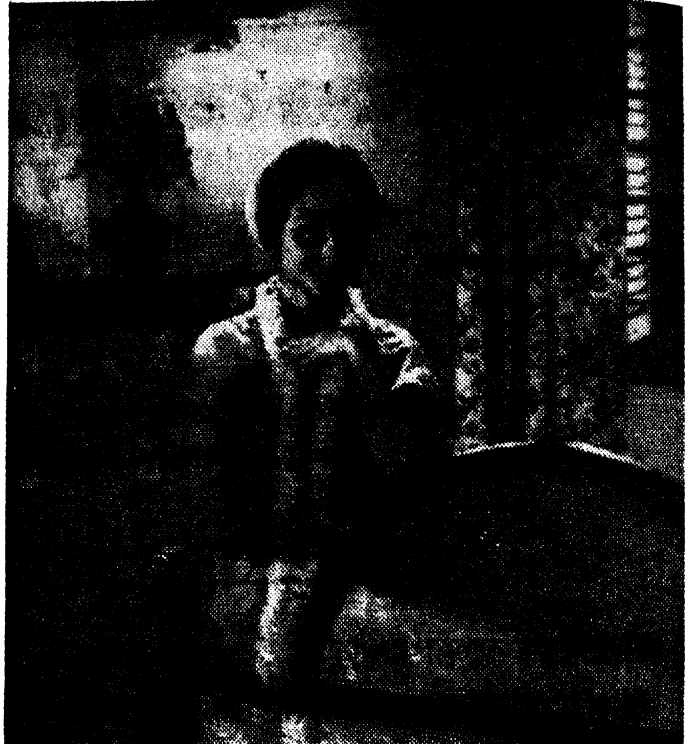
শেষপর্যন্ত চিরঞ্জীবকে জব্দ করতে না পেরে বলাইবাবু তাকে ছেড়ে দিলেন। তাই দেখে লাফাতে লাফাতে দুর্গা অনেক আগেই একাএকা বাড়ি ফিরে এসেছে। চিরঞ্জীবও একসময় পায়ে পায়ে দুর্গার বাড়িতে চলে আসে। পাড়ার লোকেরা চিরঞ্জীবকে দেখে একএক করে অনেক-চোখে চলে গেছে। দুর্গা তখনও দরজার একপাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে। আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। চিরঞ্জীবও যেন আজ মনে-প্রাণে দুর্গাকেই কাছে পেতে চাইছে। দুজনের মাঝখানে কেরোসিনের যেন লজ্জায় মৃদু হয়ে জ্বলছে। এই আলো আঁধারে দুটি মন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আজ দুর্গার বুক কাঁপছে। আজকের এই মুহূর্তে চিরঞ্জীবকে তার যেন কেমন কেমন লাগছে। কেমন যেন বেসামাল। সহসা চিরঞ্জীব দুর্গাকে দু' হাতে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তার এতদিনের তৃষ্ণার্ত দুটি ঠোঁট দুর্গার লবণাক্ত অধরের স্বাদ গ্রহণ করল। কঠিন আলিঙ্গনে চিরঞ্জীব আরো জোরে আঁকড়ে ধরল দুর্গাকে। তার মুঠো-মুঠো যৌবন চিরঞ্জীবকে ঢেকে দিল। ছোঁয়ায়-ছোঁয়ায় ফুলে ফুলে উঠল। দোলা লাগল। আকাশের ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দূরের প্রদীপ-তারারা দক্ষিণ হাওয়ায় থর থর কাঁপছে। যেন টিপ টিপ জোনাকীরা নিঃশব্দে জ্বলে ওদের দেহের আলো নিভিয়ে দিয়েছে যাতে ওরা লজ্জা পায়। হাওয়ায় হাওয়ায় অন্ধকার রাত্রি দুলে দুলে উঠছে। ফিসফিস করে এই প্রথম দুর্গাকে চিরঞ্জীব ডাকল পারুলবালা বলে। ভুলে যাওয়া কবে বলা ভুলে যাওয়া সেই নামের প্রথম ডাক শুনে দুর্গা খুশির জোয়ারে উথলে উঠল। চিরঞ্জীবের বুকের মাঝে তার খুশি খুশি চোখগুলো বারবার আছাড় খেয়ে পড়ল। উঠতে গিয়ে যেন উঠতে পারল না। আজ যেন প্রতিটি কথা, প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি ভঙ্গী অন্যরকম। অন্যদিকে চিরঞ্জীবের দলের ভুটো আর বাঁশার একই অবস্থা। তবে এদের ভালবাসায় যেন খাদ মেশানো আছে। ততটা পবিত্র নয়।

দুর্গার সোহাগ কপালে আর সইল না। আবগারির দারোগার কড়া পাহারায় বাগদি-পাড়া নজরবন্দী হল। এক এক করে চিরঞ্জীবের দলের লোকেরা ধরা পড়তে লাগল। শুধু চিরঞ্জীব আর দুর্গা ছাড়া। প্রতিশোধের আগুনে এরা দুটিতে জ্বলতে থাকে। শেষবারের লড়াইয়ের আগে দুর্গা নতুন সাজে সাজল। সিঁথিতে লাল টকটকে সিঁদুর। কপালে কালো টিপ। চোখে কাজল। ঠোঁটে রং। পায়ে আলতা। গলায় হার। হাত-ভরতি কাঁচের চুড়ি। চোখে বাঘিনীর দৃষ্টি। সঙ্গে গুপ্ত ছোরা।

পথে বেরিয়ে পড়ে দুর্গা। পেছনে পেছনে আবগারির টহলদার। মাতাল ভোলা

তার পিছু নিয়েছে। গরুর গাড়িতে বসে দুর্গা। চিরঞ্জীবকে আগলে মরার বড় সাধ ছিল। কিন্তু তা পূর্ণ হল না। তার আগেই আবগারির মাতাল ভোলা দুর্গাকে কোল-চাপা করে খালপাড়েরর ঢালু জঙ্গলে দৌড় দিল। চলতে চলতে দুর্গার বুকের জামাটা ফ্যাঁস করে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। আছাড়ে ফেলল দুর্গাকে কালকাসুন্দরের জঙ্গলে। কিন্তু সতীত্ব হারবার আগেই বাঘিনী দুর্গা তার গুপ্তি ছোরা দিয়ে ভোলাকে খুন করল। কিন্তু বাঘিনী পালাল না। সে নিজে থেকেই ধরা দিল। সেপাইয়ের দল তাকে আবগারি-অফিসে নিয়ে গেল। দারোগার জেরায় দুর্গা স্পষ্ট জনায়, 'ও তো চোরা-চালানদারণীকে ধরে নি। আমাকে ধরে ছিল। বে-ইজ্জত করবে বলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে। তাই নিজের ইজ্জত বাঁচাতে খুন করেছি।'

চিরঞ্জীব ছুটে আসে। বলে, 'এ কি করলে দুর্গা? কোন পথ রাখলি নে?' আইনের চোখে অপরাধী দুর্গাকে আবগারির লোকেরা বন্দী করল। বেআইনী মদ চোলাই আর খুনের অপরাধে ফাঁসির বদলে দুর্গার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। কিন্তু দুর্গা মরতে চেয়েছিল। তা হল না। তাই যাবার সময় চিরঞ্জীবকে দুর্গা বলে যায়, 'একেবারে যেতে পারলুম না। বছরের একটা দিন আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেই ... ভালোবাসার। যেদিন হারটা আমাকে পরিয়েছিলে। আর একটা কথা, তুমি এ পথ ছেড়ে দিয়ে একটা বিয়ে কর। সংসারী হও। তাতেই আমি সুখী হব।'

চিরঞ্জীব নির্বাক। নিঃস্তব্ধ। ভালবাসা কি নিষ্ঠুর! কি নির্মম!

সমরেশ বসু রচিত এ কাহিনীর নাম 'বাঘিনী।' বর্তমানে এটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক বিজয় বসু। ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ সুসম্পন্ন হচ্ছে। এস এম ফিল্মসের এ চিত্রের প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন দুর্গা—সন্ধ্যা রায়, চিরঞ্জীব—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আবগারি-দারোগা বলাইবাবু—বিকাশ রায়, মলিনা—রুমা গুহঠাকুরতা, জটা—অজয় গাঙ্গুলী, বীণা—শমিতা বিশ্বাস এবং চিরঞ্জীবের মা—ছায়া দেবী। অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রে রয়েছেন জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, বুদ্ধ গাঙ্গুলী প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবির সুরকার। পরিবেশনায় চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

ভিনদেশী ছবি

সোভিয়েত অভিনেতা নিকোলাই চেরকাশোফের জীবনাবসান

বিশ্বের জনপ্রিয় সোভিয়েত অভিনেতা নিকোলাই চেরকাশোফ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। জগদ্বিখ্যাত পরিচালক আইজেনস্টাইনের 'ইভান দি টেরিবল' চিত্রে চেরকাশোফের চরিত্রাভিনয় অভিনয় আজও সপ্রতিভায় উজ্জ্বল।

১৯৪৬ সালে এ ছবিটি মুক্তি পায়। ক্ষমতাপ্রিয় জার ইভানের চরিত্রের জটিলতা তার অসাধারণ অভিনয়ে ছবিটি অনন্য। চেরকাশোফ ছিলেন একজন দক্ষ চরিত্রাভিনেতা। 'এভরিথিং রিমেইনস ফর দি পিপল' চিত্রে চেরকাশোফের আর এক অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি। অভিনয়-প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পাঁচবার সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক পুদোভকিনের সঙ্গে তিনি ভারতভ্রমণে আসেন। নিকোলাই চেরকাশোফের পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

বিবিধ সংবাদ

ভূপালে মূকাভিনয়

ভূপালে হেভী ইলেকট্রিক্যালস গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতবর্ষের মূকাভিনয়ের পথিকৃত শ্রীযোগেশ দত্তের মোট দশটি বিষয়ের মূকাভিনয় পরিবেশিত হয়। ভূপাল থেকে জনৈক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বিদেশী ও ভারতীয় মিলিয়ে বহু ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভূপালের সব চাইতে বড় ও সুন্দর হলে শ্রীদত্ত মূকাভিনয় করেন। এখানে মূকাভিনয় এই প্রথম।

ভূপালের জন্য রচিত "হাই সোসাইটি এন্ড হোয়াট ইট ইজ"-এর সময় ঘন ঘন করতালি শোনা যায়। কবিগুরুর "দুষ্টু ছেলে" এত ভাল হয় যে, কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে কাঁদতে দেখা যায়। "জন্ম থেকে মৃত্যু" অতুলনীয়। সব কয়টি অনুষ্ঠানই চমৎকার হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে শ্রীদত্তের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। একটি সংবাদপত্রের দুই কলম হেড লাইন ছিল, "যোগেশ ক্যাপটিভেটস অডিয়ান্স।"
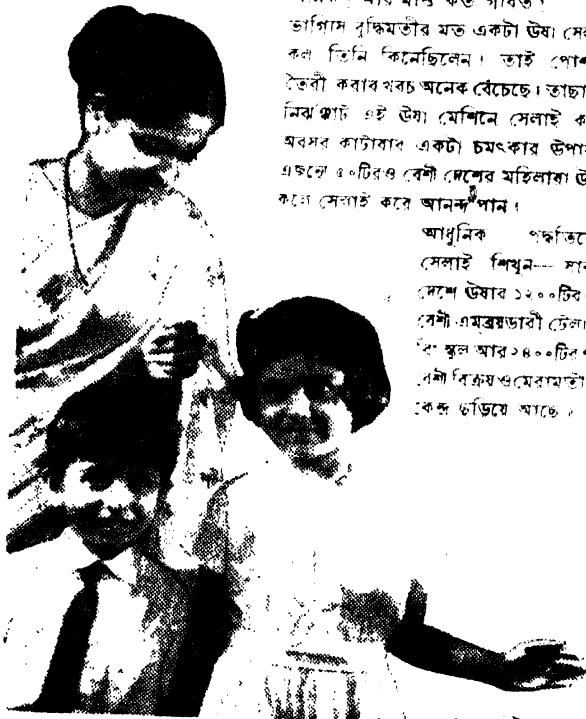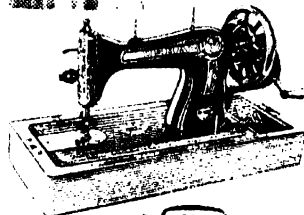
মানবাজারে রবিচক্রের অনুষ্ঠান

গত ১১ই সেপ্টেম্বর মানবাজারে (জেলা পুরুলিয়া) রবিচক্রের প্রযোজনায় সুনির্বাচিত রবীন্দ্রগীতি ও কবিতার সহায়তায় রচিত "ঋতুবিচিত্রা" অনুষ্ঠানটি এবং কবিগুরুর "ডাকঘর" নাটকটি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়। ঋতুবিচিত্রার গ্রন্থনায় ছিলেন সোমেন দাশগুপ্ত। সংগীতে রবীন্দ্র অনুষ্ঠানের রসলোক সৃষ্টি করেন গীতাঞ্জলি দাশগুপ্ত ছবি চক্রবর্তী, অজিত ভট্টাচার্য, গোরাচাঁদ নারায়ণ দেব, মণি মিত্র এবং শান্তি দত্ত। সেতার ও তবলা-সংগতে যথাক্রমে গঙ্গাপ্রসাদ ভাণ্ডারী ও গৌরচন্দ্র নিজ নিজ কৌশলের পরিচয় দেন। নির্বাচিত রবীন্দ্র-সংগীতের নৃত্যরূপ দান করে শুভ্রা চক্রবর্তী, বনানী নাগ ও নিবেদিতা আচার্য দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমেন দাশগুপ্তের উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি পরিবেশকে ঘনীভূত করে তোলে।

"ঋতুবিচিত্রা" অনুষ্ঠানের পরে কবিগুরুর "ডাকঘর" নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। রবীন্দ্র-নাট্যধারার এই বিশিষ্ট নাটকটি দলগত অভিনয়ের গুণে দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে, বিশেষ করে অমল, সুধা ও মাধবদত্তের ভূমিকায় যথাক্রমে সঞ্জনা চক্রবর্তী, শুভ্রা চক্রবর্তী এবং প্রশান্ত দাস নাট্যগতি অব্যাহত রাখেন। এ ছাড়া এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন মনোজ মুখার্জি, সরোজ মুখার্জি, বিনয় মণ্ডল, সুরেন্দ্রবালা, অরবিন্দ কুণ্ডু এবং অনিল দাস। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন অজিত ভট্টাচার্য (গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ) এবং গীতাঞ্জলি দাশগুপ্ত। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল দাস।

নাট্যলোকের পুরনো পাতা (১০)

মহেন্দ্রলাল বসু ও অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)

দিলীপ মৌলিক

"তাঁহার বিয়োগে বঙ্গরঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ হবার নহে"......

"ভগবান তাঁহাকে যেন অভিনেতা করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন"...

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অনুরাগস্নিগ্ধ হৃদয় আর উচ্ছলকন্ঠ যে দুজন অভিনেতা সম্পর্কে এমন অপূর্ব স্বীকৃতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাঁরা হোলেন মহেন্দ্রলাল বসু ও অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। বাংলার নাট্যলোককে রূপে ও রসে সমৃদ্ধতর করবার যে বাসনা গিরিশচন্দ্রের মনে দোলা দিয়েছিল তাকে বাস্তবে সার্থক রূপায়নের প্রচেষ্টায় এই দুজন শিল্পীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরোনো পাতা ওল্টালে এঁদের জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত করে কোন তথ্য আমরা খুঁজে পাবো না, কিন্তু যেটুকু পাই তা হল তাঁদের অভিনয়-দীপ্ত জীবন ও মঞ্চের প্রতি সীমাহীন অনুরাগ। এরই আলোকে এই অভিনেতাদের পরিচিতি নিবিড় হয়েছে আমাদের কাছে।

মহেন্দ্রলাল বসু ও বেলবাবু একসঙ্গেই অনেক নাটকেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। অভিনয়ের ব্যাপারে দুজনারই দক্ষতার কথা গিরিশচন্দ্র সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করেছেন। দুই অভিনেতারই প্রয়াসে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বাক্ষর নিহিত আছে।

'সধবার একাদশী' নিয়েই বাংলার জননাট্যশালার উদ্বোধন হয় আর সেই সূচনাতে দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। নিয়মিত 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকের মনে অভিনয় সম্পর্কে একটা আগ্রহ জেগে উঠেছিল। অনেকেই একটা দুর্বার শক্তি মনে মনে অনুভব করতো 'চেষ্টা করলে আমিও বড়ো অভিনেতা হোতে পারবো'। মহেন্দ্রলাল বসু ঠিক এইরকম অনুভবেরই অংশীদার ছিলেন প্রাথমিক স্তরে। প্রায়ই তিনি 'সধবার একাদশী' অভিনয় দেখতে আসতেন। ইচ্ছেটা ছিল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুযোগ মিললো না। 'সধবার একাদশী'র পরবর্তী নাটক 'লীলাবতী'র মহড়া যখন চলছে তখনই গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হোল। সেই থেকেই যাত্রা শুরু হোল অভিনেতা মহেন্দ্রলালের জীবনের। সেই স্মরণীয় পরিচিতি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে বলেছেন "কৈশোরকাল অতীত, যৌবনে পদার্পিত, গৌরবর্ণ, সুঠাম কলেবর মহেন্দ্রলালকে আমি এখনও চক্ষের উপর দেখিতেছি"।

'লীলাবতী' নাটকে তাঁকে দেওয়া হোল জমিদার ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকা। কি করা যাবে, অনেক আগেই সব চরিত্র নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। এই ভূমিকাতে অভিনয়ের সম্মতি জানালেন মহেন্দ্রলাল। পরচুলের গোঁফ দিয়ে তার চেহারার গাম্ভীর্য আনা হোল। অপূর্ব হোল সেই অভিনয়। গিরিশচন্দ্র সে অভিনয় রজনীতে মহেন্দ্রলালের কৃতিত্বের কথা বহুবার বলেছেন। এবং স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র

মহেন্দ্রলাল বসু

তাঁকে 'ভোলানাথ চৌধুরী' বলে ডাকতে আরম্ভ করেন। তারপর ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে 'নীলদর্পণ' নাটকের যে অভিনয় হয়, তাতে তিনি পদী ময়রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'লীলাবতী'র মতো এই চরিত্রাভিনয়েও নাট্যকারের স্বীকৃতি তিনি পান।

গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছেন 'যে ভূমিকায় তিনি দর্শকের সম্মুখীন হইতেন, সেই ভূমিকাই উত্তম হইত'। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে রাণীর চরিত্র অভিনয়ে তিনি এমন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারতেন যাতে সমস্ত দর্শকের চোখ ছলছল করে উঠতো। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের পরই 'ভারতমাতা'। এই নাট্যাভিনয়ে অনেক উত্তেজনা দেখা দিতো। ভারতমাতা সেজেছেন তিনি এই ভূমিকায় এতো সূক্ষ্ম অভিনয়

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন যে, সবাই তাঁকে 'মা' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারের পর প্রতিষ্ঠিত হোল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, এখানে অভিনীত উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী'তে শরতের ভূমিকায় মহেন্দ্র বসুর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের কথা কিছুতেই ভোলা যায় না। গিরিশচন্দ্রের কথায় "বিচ্ছেদ অন্তে শরৎ-সরোজিনীর যখন মিলন হয়, সে স্থানের অভিনয়ের আর তুলনা হয় না। অদ্যাবধি সে ভূমিকার অভিনয় অন্য কাহারো দ্বারা সেরূপ চোখে ঠেকে না।"

'পলাশীর যুদ্ধে' তাঁর সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে প্রথম অভিনয় দেখে 'সাধারণী' পত্রিকা মন্তব্য করে "যিনি সিরাজদ্দৌলা সাজিয়াছিলেন, তিনি কেবল সং সাজিতে পারেন।" এই উক্তিতে অভিনেতা মহেন্দ্রলাল স্বভাবতঃই একটু আঘাত পান এবং তিনিও মন্তব্য করেন 'আর আমার সিরাজদ্দৌলা সাজিয়া কাজ নাই'। তবে একটা কথা। 'সাধারণী'র সমালোচনা কঠোর হোলেও নিরপেক্ষ, রঙ্গভূমির সংস্কার সাধনই এর লক্ষ্য ছিল। বস্তুতঃ এর পরেই সিরাজের ভূমিকায় মহেন্দ্রলালের অভিনয় অসাধারণ হয়ে ওঠে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কৃষ্ণকান্ত ও পাণ্ডব গৌরবে 'ভীষ্মে'র চরিত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভায় উজ্জ্বল মূর্ত হয়ে ওঠে। পরে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'তে মহেন্দ্রলালের কুমার সেন মর্মস্পর্শী হয়। 'ইলা ইলা ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া।' এই কথা মহেন্দ্রলালের মতো এতো করুণ করে কেউ বলতে পারতো না। এই বিষাদমূলক প্রেমের অভিব্যক্তিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই তাঁকে ট্র্যাজেডিয়ান বলা হত।

উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে তাঁর অভিনয়-জীবনের

সংকটের কথা সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে দু একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা প্রয়োজন। এ থেকে মহেন্দ্রলালের অভিনেতা হিসাবে দক্ষতার আলোই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অভিনীত হচ্ছে 'রাবণ বধ নাটক। মহেন্দ্রলাল সেজেছেন লক্ষ্মণ। একটি স্বগতোক্তি 'কেন মাগো সুমিত্রা জননী, ধরেছিলে গর্ভে মোরে' এমন দরদ আর আন্তরিকতা দিয়ে বললেন যে তা শুনে সমস্ত দর্শকবৃন্দ একেবারে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। গিরিশচন্দ্র রাম সেজেছিলেন, তাঁর চোখেও এলো জল। রঙ্গমঞ্চের যে দৃশ্য পরিবর্তনের সহায্য করে সেও হোল বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। সীতার বনবাস নাটকেও লক্ষ্মণের ভূমিকায় অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখেন মহেন্দ্রলাল। সীতাকে বনে রেখে সন্তপ্ত হৃদয়ভাব এমন নিখুঁত করে তিনি মূর্ত করে তুলতেন যে তাতে সবাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো। গিরিশচন্দ্র নিজের কথা : 'এ অভিনয়ে আমি রাম ছিলাম, অদ্ভুত অভিনয় দর্শনে আমি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকাল বিস্মৃত হই।' 'বিষাদ' নাটকে অলকের ভূমিকায় আবার নতুন করে মহেন্দ্রলালের অসাধারণ অভিনয়প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। গিরিশচন্দ্র বলেছেন 'অদ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাঁহার অনুকরণেই চলিতেছে, কেহই তাঁহার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় করিতে সক্ষম হন নাই।

অভিনেতা মহেন্দ্রলালের জীবনে একটি সৌন্দর্যপিপাসু হৃদয় লুকিয়ে ছিল। প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর করে সাজিয়ে প্রকাশ করা বা পরিবেশন করার দিকেই তার আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। তিনি অনেক চেষ্টা করে তখনকার রঙ্গমঞ্চকে নানা চিত্রপটে বিভূষিত করেছেন। তাঁর এই সৌন্দর্যসাধনার আকাঙ্ক্ষা একেবারে জীবনের প্রথম থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল। ছেটবেলায় পিতৃবিয়োগের জন্য নানা দুর্ঘটনা নেমে আসে তার জীবনে এবং সেই সূত্র ধরে তার বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে এবং সৌন্দর্যঅনুশীলনেও হয়তো খানিকটা ছন্দোপতন হয়, কিন্তু নটজীবনে সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণতার আলোয় ভরিয়ে তোলেন মহেন্দ্রলাল।

উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন মহেন্দ্রলাল বসু। জীবনে নিজের অনেক ক্ষতি স্বীকার করে অপরের উপকার করেছেন তিনি। সামাজিকতা সম্পর্কে বোধও ছিল তার গভীর। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সার্থক একটি মানুষ, মানবতার প্রতিটি স্পন্দন দিয়ে যাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল, গিরিশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন :—'মহেন্দ্রলালের জন্মগ্রহণ সময় সাপেক্ষ'। সত্যি বাংলা রঙ্গমঞ্চে এখন এমন একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র পাওয়া খুব সহজ নয়।

• • • •

বাংলা রঙ্গমঞ্চের আর একজন অসাধারণ অভিনেতা হলেন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। ইনি বাংলা দেশে বেলবাবু বা ক্যাপ্তেন বেল নামেই পরিচিত। মহেন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বরের নীলদর্পণে তিনি ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং নাট্যানুরাগীদের সামনে নিজের অভিনয়প্রতিভার নজীর তুলে ধরেন। গিরিশচন্দ্র বেলবাবুর অভিনয়বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই থেকে আমরা অভিনেতা হিসাবে কোন দিক তাঁর দক্ষতা মূর্ত হয়ে উঠতো বেশী তা জানতে পারি।

সম্প্রতি যে প্যান্টোমাইমের প্রসার ও জনপ্রিয়তা দেখা দিয়েছে তা বহু আগেই বেলবাবুর শিল্পীমনে উৎকর্ষ লাভ করে। প্যান্টোমাইমে শিল্পীর নিখুঁত সংযম ও আন্তরিক নিষ্ঠা তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যে সব প্যান্টোমাইমের অনুষ্ঠান হোত তাতে বেলবাবুই অংশগ্রহণ করতেন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন—

যেরা হাস্কে বলো, ও মুয়াজান,
জান গিয়ারে।
তোমার নাম ফুলকুমারী,
তোমায় না দেখলে মরি।
তবে কেন রাধা পিয়ারী,
নজরা মার রে।।

এই গানখানি যখন নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গির সহিত গাহিতেন, দর্শকগণ যেন একটি ছবি দেখিতেন।'

ক্রাউন সাজার ব্যাপারে বেলবাবু অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। Reis & Rayyat তাঁকে Prince of Actors & Great Comedian বলে সম্মান করতেন। বেণিকবাজার 'কুঞ্জ ও দর্জি' ও 'ধীবর ও দৈত্য' অভিনয়ে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা স্মরণে রেখেই বোধ হয় এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর নামের আগে। নিজে তিনি পেণ্ট করে মনোমত সাজতেন। হয়তো প্রসাধনকলার দিকে তাঁর একটি বিশেষ বাসনা ছিল।

বেলবাবুর আর একটি দারুণ ক্ষমতা ছিল। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অবস্থার চাপে পড়ে একই চরিত্রের অভিনয় তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে করতে পারতেন। এটা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর গুণ। 'হারানিধি'তে অঘোরের ও 'প্রফুল্লে' ভজহরির ভূমিকার অভিনয়ে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য অনেকবার প্রকাশের পথ পায়। 'সরলা' নাটকে গদাধর চন্দ্রের অভিনয়ে বেলবাবু সবাইকে বিস্মিত করেন এবং এই অভিনয় তাঁর নবজীবনের একটি স্মরণীয় কীর্তি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চরিত্রের মর্মস্থলে প্রবেশ করে সেখান থেকে তুলে আনেন তার নিটোল সম্পদ। চরিত্র উপলব্ধিই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার প্রাথমিক কর্তব্য। অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, কেননা তারই অতল গভীরে লুকিয়ে আছে সার্থক অভিনয়শৈলীর প্রাণবন্ত রূপ। বেলবাবুর অভিনয়ে এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল, ছিল চরিত্রকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা। বহুদিন আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখতেন তিনি কি করে মঞ্চে চরিত্রের রূপ দেবেন এবং এই ধরনের অনুভব ছিল বলেই গড়ে অভিনেতার আসন পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য যে বেলবাবুর একাধিপত্য ছিল হাস্যরসাভিনয়ে। এই সব ভূমিকার অভিনয়ে যেন তিনি প্রাণের স্পর্শ পেতেন। কিন্তু তাই বলে একথা ঠিক নয় যে গুরুগম্ভীর চরিত্রের মঞ্চরূপায়ণে তিনি কোন বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রাখতে পারেন নি। গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়েও তাঁর অন্তর্নিহিত শিল্পীসত্তার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ অব্যাহত থেকেছে। 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজদ্দৌলা, 'সীতাহরণ' ও 'রামবনবাস' নাটকে লক্ষ্মণ, 'আনন্দ রহো' নাটকে সেলিম 'অভিমন্যু বধ' নাটকে অভিমন্যু, রূপসনাতনে চৈতন্য প্রভৃতি ভূমিকায় বেলবাবু তাঁর স্বকীয় অভিনয়প্রতিভার দীপ্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন—বেলবাবু দেখিতে যেরূপ সুপুরুষ, সেইরূপ অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন'। তাঁর শেষজীবন সম্পর্কে বিস্তৃত করে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে 'হারানিধি' নাটকে অঘোরের ভূমিকায় অভিনয় তাঁর শেষকীর্তি, এর কিছুদিন পরেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু 'যেরা হাসকে বলো ও মুয়াজান, জান গিয়ারে-র রূপকার বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুহীন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

দলবল নিয়ে সোবার্স আসছেন!

অজয় বসু

খবরের মতো খবর, দলবল নিয়ে ভারত-সফরে আসছেন গ্যারি সোবার্সই!

এই শীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারত পরিভ্রমণে আসার কথা আগেই পাকা হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দলের পক্ষে কারা কারা আসবেন সে কথাটি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হলো সবে। ঘোষণা শুনে আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলতে পারছি, যাক, ফাঁকিতে পড়ার আশংকা নেই তাহলে!

ভারত সফরকামী দলের খেলোয়াড় বাছাইয়ের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের নির্বাচকমন্ডলী বৈঠকে বসার আগে পর্যন্ত কিঞ্চিৎ সংশয় আমাদের মনে ছিল বৈকি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুপাতে ভারতীয় দল তেমন শক্তিধর নয়। এই বিবেচনায় পরিণতদের বাদ দিয়ে যদি শুধু উঠতি, অখ্যাত ও অল্পখ্যাতদেরই ভারতে পাঠানো হয়? যদি তাও করা হোতো, তাহলেও আমাদের অভিযোগ করার কিছু থাকতো না। শুধু কিছুটা ফাঁকিতে পড়ার আফশোসে গুমরে গুমরে কেঁদে মরতাম।

মাগ্‌গীগন্ডার বাজারে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের পথ প্রশস্ত করে তোলা হয়েছে। সফরের প্রয়োজনে আঠারো হাজার পাউন্ড মঞ্জুরের জন্যে দিল্লী-দিল্লী ঘুরে কতো নেতা এবং কতো মন্ত্রীর কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে কতো তদ্বির করতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত চিঁড়ে ভিজেছে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহৃদয়তায়। এতো কান্ডের পর নামী খেলোয়াড়দের ঘরে রেখে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড যদি একটি সাধাসিধে দল ভারতে পাঠাতেন তাহলে ওই আঠারো হাজার পাউন্ডের শোক কি আমরা ভুলতে পারতাম?

কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড তা করেন নি। ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীদের অনুচ্চারিত চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থেকেই তাঁরা ছেঁকে ছেঁকে বাছা বাছা খেলোয়াড়দেরই এদেশে পাঠাচ্ছেন। তাঁরা গ্যারি সোবার্সকেই নেতৃপদে বসিয়েছেন। সঙ্গে দিচ্ছেন কানহাই, হান্ট, বুচার, নার্স, গিবস্, হল, গ্রিফিথের মতো কৃতি খেলোয়াড়দের। মানতেই হবে, আমাদের প্রতি তাঁদের অশেষ অনুগ্রহ।

দলবল নিয়ে সোবার্স আসছেন শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছি কেন? উঠছি, নানান কারণে।

অতীতের অভিজ্ঞতার মতো আমাদের ভবিষ্যত প্রত্যাশাও রঙিন। যে ক্রিকেট মজাদার, রংদার প্রাণের উষ্ণ পরশে প্রাণবন্ত সেই ক্রিকেট খেলতেই সোবার্সের দল অভ্যস্ত। পরিসংখ্যানের পথ মাড়িয়ে প্রতিনিয়তই সমঝে বুঝে চলতে গিয়ে যে ক্রিকেট খেলার আগেই ফুরিয়ে যায়, বেনিয়া বুদ্ধির অক্টোপাশে যার সামগ্রিক অস্তিত্ব আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সেই নিরর্থক ক্রিকেটের সঙ্গে ওঁদের চিরকালের আড়ি। তাই যা দেবো তার বিনিময়ে বেশি পাবো এই আশাতেই আমরা সামনের দিকে চেয়ে রয়েছি। সামনে সুদিন। আমাদের। এবং ক্রিকেটেরও।

এককালে আমাদের ক্রিকেটেও ওঁদেরি মতো সুস্থ, সবল জীবনের আশীর্বাদ জড়িয়ে ছিল। খেলার জন্যেই তখন আমরা খেলতাম। খেলে আনন্দ পেতে, ও দর্শকদের আনন্দ দিতে। এবং সেই আনন্দ আহরণ ও বিতরণের মাধ্যমে আমরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতাম। পারতামও। তখন জিততে পারতাম না সত্যি। কিন্তু ক্রিকেটের অর্থ খুঁজে পেতাম নিজেদের আচরণের মধ্যে। ক্রিকেট যে একটা জীবনবোধ, বোধ ও বোধির কল্যাণে সে জীবনবোধকে আমরা আবিষ্কার করে নিতে পারতাম। তাই নাইডু, মুস্তাক, অমরনাথ, নিসার, অমর সিং, সুঁটে ব্যানার্জিরা চোখের সামনে থেকে অনেকদিন আগেই সরে দাঁড়ালেও মনের মুকুরে ওঁরা আজও তেমনি জীবন্ত হয়ে আছেন।

কাল থেকে কালান্তরে এসে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্থান এবং অস্ট্রেলীয় রীতি দেখে আমরা যেদিন চালাক হতে চাইলাম সেদিনেই স্বাতন্ত্র্য গেল হারিয়ে। বৈশিষ্ট্য হলো বিসর্জিত। আমরা পরিসংখ্যানের দাম দিতে চাইলাম দরাজ মেজাজে। হারজিতকেই ইহকাল পরকাল জ্ঞান করতে এগোলাম। আর ফন্দী আঁটলাম ঘাস ছাঁটাই করে পিচের জীবন নিংড়ে একএকটি খেলাকে পাঁচদিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে। এর পরিণামে হারজিতের এবং টাকাকড়ির হিসেবে আমাদের কপাল ফিরে গিয়েছে বটে। কিন্তু ক্রিকেটারদের সনাতন ও মহনীয় চরিত্রে আমরা নিজেদের আর প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারিনি।

সব খেলারই লক্ষ্য জয়। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। ক্রিকেটে লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনায় কেউ হিসেব করে বেশি। কেউ বুক চিতিয়ে হেঁটে দুর্জয় সাহসে জয়লক্ষ্মীকে বেঁধে ফেলে। জয়ই যদি একমাত্র বিবেচ্য হয় তাহলে পথ যাই হোক্ না যে দল জেতে সেই দলের স্বীকৃতিই সবার চেয়ে বড় হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু সে কথা কি শুধু কথারই কথা নয়? কেন আমরা মস্তো মর্যাদা দিই ব্রিজবেনের সেই টেস্ট ম্যাচটির যে টেস্টে হারজিতের ফয়সালা হয়নি, দু দলের রাণসংখ্যা একটি বিন্দুতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল? কেনই বা মনে রেখেছি সেদিনের ভারতীয় ক্রিকেটারদের? কেনই বা চিরদিন ভালবেসে এসেছি লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন জর্জ হেডলিকে এবং তাঁদের উত্তরসাধকদের?

কনস্ট্যানটাইন আর নাইডুর আমলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা ভারত, কোনো দলই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বড় একটা সুবিধে করতে পারে নি, মানে জিততে পারে নি। তবু তাঁরা ক্রিকেটের স্বধর্ম ছাড়তে চান নি। তাই তাঁরা যতোই হেরেছেন ততোই ক্রিকেটের মর্মার্থের ব্যাখ্যাকে সরল করে দিয়েছেন। ক্রিকেটে হার মানেই পরাজয় নয়। জীবনযুদ্ধে ক্ষণিক পশ্চাদপসরণ যেমন একেবারে ফুরিয়ে যাওয়া নয়। হারতে হারতে যাঁরা লড়াই বাধান, অপরপক্ষের মনে কাঁপন ধরিয়ে দেন, ব্যাটের ঘায়ে হুংকার তোলেন, বলের ধারে বুদ্ধির খেলা দেখান তাঁরাই ক্রিকেটার। আসলে সব খেলার মতো ক্রিকেটের আয়োজন সকলের মনোরঞ্জন করা। মনই যদি মাতাতে না পারলো তাহলে ক্রিকেট ক্রিকেটই হলো না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে ক্রিকেটের এই সাদামাটা অর্থটা অনেক দেশই ভুলে বসেছিল। ভারতও ভুলেছে। শুধু ভোলেনি দ্বীপময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারকুল। তাই তাঁদের ক্রীড়ারীতিতে, জীবনবোধে দৃশ্যতঃ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। হারতে হারতেই তাঁরা জিততে শিখেছেন। জিততে জিততেই তাঁরা চারপাশকে মাতিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে হারে জিতে কিবা আসে যায়। তাঁরা হারতে জানেন যেমন, জিততেও তেমনি। সবতেই ওস্তাদ এবং আসল খেলাতেও তাই। তাঁদের মধ্যে আমরা নিজেদের সাবেকী পরিচয়ের ঐশ্বর্য খুঁজে পাবো বলেই আমাদের প্রত্যাশা এতো গভীর।

গভীর থেকে গভীরতর করে তুলেছে যে একটি খেলোয়াড়ের সামর্থ তিনিই আসছেন দলপতি হয়ে। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে সমান দক্ষ সোবার্স এক আশ্চর্য প্রতিভা। ঝড়তুফানের মুখে একাই তিনি তাঁর দলটিকে ইংলন্ডে আগলে রেখেছিলেন। যেদিন পারেননি সেইদিন অমন ধুরন্ধর দলটিকেও 'নবীন' ইংলন্ডের কাছে হারতে হয়েছে। ইংলন্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে সহস্রকণ্ঠে একথা প্রচারিত হওয়ার পরও মূল কথাটি আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, দলকে জিতিয়েছেন এই সোবার্সই। জেতার আসরে সর্বক্ষণই তিনি নায়ক, অন্যেরা পার্শ্বচরিত্র। সোবার্স না থাকলে কানহাই, বুচার, নার্স, হান্ট, গিবস, গ্রিফিথ, হলের সম্মিলিত চেষ্টা একালের শক্তিহীন ইংলন্ডের সামর্থ্যকে বাগে আনতে পারতো কিনা তা ভাববার বিষয়।

যে দলটি ভারতে আসছে সেই দলের আদ্যাশক্তি ওই সোবার্সই। পাশে থাকবেন ব্যাটসম্যান হিসেবে কানহাই, নার্স, বুচার, হান্টেরা। এঁদের মধ্যে একমাত্র নার্স ছাড়া আর কেউ ইংলন্ডে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। শেষ টেস্টে তিন অংকের একটি ইনিংস উপহার দিয়েও কানাহাইও নন। তবে মরশুমী বাজার মন্দা গেলেও ভারতে এসে তাঁরা আশা করা যায় নিজেদের সুদিন ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কারণ ভারতের মাটিতে তো আর ব্যাটসম্যানদের কবর খোঁড়া নেই। এই মাটিতে কানহাই যদি ১৯৫৮ সালের কানহাই হয়ে উঠতে পারেন তাহলে কানু ছাড়া অন্য সুর কানে ওঠাও কঠিন।

ওয়েসলে হল আসছেন। সঙ্গে দোসর চার্লি গ্রিফিথ। কাকে দেখবো! আর কাকেই বা দূরে রাখবো! ব্যাটসম্যানেরা বলবেন, ওঁরা দূর থেকেই ভাল। কাছে এলেই ভয়ংকর। কিন্তু সে কথায় আমরা দর্শকেরা সায় দেবো কেন? আমরা তো নেপোর দল। পরের অস্বস্তিতেই তো আমাদের আনন্দ। যতো জোর বল ততোই মজা। সাধে কি আর বলে, ক্রিকেট হলো মজার খেলা!

মজাটা জমবে ভাল যদি আমাদের বোরদে, হনুমন্ত, সারদেশাই, পাতৌদিরা গ্রিফিথের গরম মেজাজ আর হলের হলাহলের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেন। না পারলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাদ পানসে হয়ে যাবে। দলপতি পাতৌদির প্রত্যয় অশেষ। ইংলন্ডে থাকতে থাকতেই বলেছেন, আমাদের ভয় ফাস্ট বোলিং নয়। শঙ্কার কারণ স্পিন বোলিং। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি স্বতন্ত্র।

আমার ধারণা, আমাদের মাঠে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতার সুযোগ লান্স গিবস যতোটা সদ্ব্যবহার করতে পারবেন তারচেয়ে বেশি পারবেন ফাস্ট জুটি হল-গ্রিফিথ এবং সোবার্স। জানি, ভারতের পিচ 'নির্জীব'। এই পিচে জুৎসই বল করা সকলের পক্ষেই, ফাস্ট এবং স্পিন দু ধরনের বোলারদের পক্ষেই শক্ত। তবু হল—গ্রিফিথের বলে যে বাড়তি জোর এবং বাম্পারে যে বাড়তি চ্যালেঞ্জ আছে তার মোকাবিলা করা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের পক্ষে সহজ নয়। কারণ এ ধরনের বিপদের সামনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বড় একটা পড়তে হয় না।

এই বিপদকে এড়াবার চেষ্টায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অনুশীলন করানো হলে প্রস্তুতিপর্বে কিছু মূলধন জোগাড় হতে পারে। দেশে ফাস্ট বোলার নেই বটে, তবে যাঁরা অপেক্ষাকৃত জোরে বল করেন তাঁদের হ্রস্বদীর্ঘ উইকেটে বল করতে বলা হোক, নির্বিচারে বাম্পার ছাড়ার অধিকার দেওয়া হোক্। এবং সেই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দলের সম্ভাব্য ব্যাটসম্যানদের অনুশীলনে রপ্ত করে তোলা গেলে ভবিষ্যতে কাজ হতে পারে।

কিন্তু কাজের কথা কেই বা ভাবছে? যাঁদের ভাববার কথা তাঁরা হয় হিসাব নিয়ে ব্যস্ত, আর না হয় টেস্ট খেলার মাঠে কি করে বাড়তি লোক জড়ো করা যায় তা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন। যতো লোক, ততোই টাকা।

হিসাবের প্রশ্ন ঘিরে বোম্বাইয়ে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের মালিক ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়ার বিরোধ বেধেছে। রাজ্য সংস্থা বলছে, আমরা টেস্ট খেলার সংগঠক। আমাদের আরও বেশি টিকিট চাই। সি সি আই বলছে, আমরা স্টেডিয়ামের মালিক, কাজেই আমাদের লাভের পরিমাণ কম হলে চলবে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ—ভারতের আসন্ন টেস্ট খেলার টিকিট যেন লুটের মাল। যাদের হাতে গিয়ে পড়বে আগেভাগেই তাঁরাই সিংহভাগ বসাবার অনুমতি কমেছেন।

এই অঙ্কেতে বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থাও মশগুল। তাঁরাও তাই ইডেনে যতো পারছেন ততোই আসন বাড়াবার চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টাতে সারি সারি গাছ কেটে ইডেনকে ন্যাড়া বানাতেও তাঁদের আপত্তি নেই। গাছগুলি মূলোচ্ছেদ হবার পর কতো আসন বাড়বে তা জানি না, তবে একথা জানি যে বৃক্ষহননে ইডেনের চরিত্র ও ঐতিহ্য দুই নষ্ট হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষে টেস্ট ক্রিকেট আজ মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসা বিশেষ। তাই যে উদ্যম ও আন্তরিকতা ব্যবসা বাড়াবার দিকে নিয়োগ করা হয় সেই উদ্যমের ছিটেফোঁটা আসল খেলাটির ওপর গিয়ে পড়ে না। খেলাটির প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ থাকতো যদি তাহলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফর পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ওপর জোর দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোতো। কিন্তু কোথায় সেই পরিকল্পনা? যা কিছু তোড়জোড় সবই আসন বাড়িয়ে বাড়তি পয়সা তোলার মতলবই ঘিরে।

অর্থই অনর্থ, জ্ঞানীগুণীরা অনেক দুঃখেই কথাটা বলে ফেলেছেন। আমাদের ক্রিকেটের কপালে দুঃখ তোলা থাকবে না তো কি! খেলা ভুলে ব্যবসা নিয়ে মেতেছি আমরা কাজেই ভাগ্যলিপিও লেখা হয়ে গিয়েছে।

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় বি এন রেলওয়ে বনাম হায়দরাবাদ একাদশ দলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য। রেলদল ২—১ গোলে জয়ী হয়।
ফটো : অমৃত

দর্শক

আই এফ এ শীল্ড

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একদিকের সেমি-ফাইনালে বি এন রেলওয়ে দল ২-১ গোলে বোম্বাইয়ের [illegible] নেভী দলকে পরাজিত করে [illegible] উঠেছে। আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে বি এন রেলদলের এই দ্বিতীয় পদার্পণ। ১৯৬৩ সালে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে তাদের প্রথম আবির্ভাবের বছরে রেলদল ১-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়। এ বছরের অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দল ২-১ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। ফলে দুই রেলওয়ে দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনার অবসান হল।

আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল দলের ঐতিহ্য বি এন রেলওয়ে দলের থেকে অনেক বেশী উজ্জ্বল। এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৫ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠলো। তারা আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে ৮ বার—১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯-৫১ (উপর্যুপরি তিনবার), ১৯৫৮, ১৯৬১ (মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী) এবং ১৯৬৫ সালে। ইস্টবেঙ্গল দল পূর্বে যে ১৪ বার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠেছে তার মধ্যে এই ২ বারের শীল্ড ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে—১৯৫৯ সালে মোহনবাগানের বিপক্ষে (খেলাটি হয়নি) এবং ১৯৬৪ সালে পুনরায় মোহনবাগানের বিপক্ষে (প্রথম দিনে ১-১ গোলে খেলা ড্র যায়)।

ফাইনালের পথে

ইস্টবেঙ্গল : তৃতীয় রাউণ্ডে ৫-০ গোলে রাজস্থানকে, কোয়ার্টার ফাইনালে ০-০, ১-১, ০-০ ও ১-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে এবং সেমি-ফাইনালে ২-১ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

বি এন রেলওয়ে : দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৬-১ গোলে পোর্ট কমিশনার্সকে, তৃতীয় রাউণ্ডে ১-০ গোলে বর্ডার্স প্রতিভাকে, কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ গোলে হায়দরাবাদ একাদশকে এবং সেমি-ফাইনালে ২-১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে (বোম্বাই) পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

বিশ্ব ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট

লর্ডস মাঠে আয়োজিত প্রথম ত্রিদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে ইংল্যাণ্ড একাদশ দল ৮২ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একাদশ দলকে পরাজিত করে সদ্য সমাপ্ত ১৯৬৬ সালের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের হাতে যে ৩-১ (ড্র ১) খেলায় পরাজয় বরণ করেছিল তার গ্লানি কিছুটা লাঘব করেছে। এই ত্রিদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল—ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং বিশ্ব একাদশ দল। খেলার নির্দিষ্ট সময় ছিল একদিন এবং দল পিছু খেলা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল ৫০ ওভারের মধ্যে; তাছাড়া কোন বোলারকে এক ইনিংসের খেলায় ১১ ওভারের বেশী বল করতে দেওয়া হয়নি। বিশ্ব একাদশ দল গঠন করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের নিয়ে। বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসন, ইংল্যাণ্ড একাদশ দলের টেড ডেক্সটার এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একাদশ দলের গারফিল্ড সোবার্স। বিশ্ব একাদশ দলে ভারতবর্ষ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন দুজন—পাতৌদির নবাব এবং বাপু নাদকার্ণী।

ইংল্যাণ্ড বনাম বিশ্ব একাদশ

ইংল্যাণ্ড : ২০১ রান (৭ উইকেটে। জিম পার্কস ৫২ এবং বেসিল ওলিভিয়া ৪৯ রান। বাপু নাদকার্ণী ৩১ রানে ৩ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ : ১১৯ রান (৩৬.৩ ওভারে। ববি সিম্পসন ৩৮ রান। কেন হিগস ২৯ রানে ৪ এবং বেরী নাইট ১৯ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড একাদশ দল ৮২ রানে বিশ্ব একাদশ দলকে পরাজিত করে। ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেয়। নির্দিষ্ট ৫০ ওভারের খেলায় ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেট খুইয়ে ২০১ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেছিলেন বেসিল ওলিভিয়া। বিশ্ব একাদশের পক্ষে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ভারতবর্ষের বাপু নাদকার্ণী—১১ ওভার বল করে তিনি ৩১ রানে ৩টে উইকেট পান।

ইংল্যাণ্ড দলের ২০১ রানের (৭ উইকেটে) পিছনে ধাওয়া করে বিশ্ব একাদশ দল ১১৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ৫০ মিনিট আগেই ১১৯ [illegible]

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের গোলের সামনের একটি দৃশ্য। ফটো : অমৃত

বিশ্ব একাদশ দলের ইনিংস শেষ হয়। ইংল্যান্ডের ফাস্ট মিডিয়াম বোলার কেন হিগস বিশ্ব একাদশ দলের 'হাঁড়ির হাল' করে ছেড়েছিলেন (৩৪ রানে ৫ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বিশ্ব একাদশ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৮ রানে বিশ্ব একাদশ দলকে পরাজিত করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ২৫৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮৮ রান করেন সেমুর নার্স। তিনি ১৫০ মিনিট খেলে তাঁর ৮৮ রানে ৮টা বাউন্ডারী করেছিলেন। তাঁর পরই কনরাড হান্টের ৫৭ রান উল্লেখযোগ্য। হান্ট ৭টা বাউন্ডারী করেন।

বিশ্ব একাদশ দলের খেলার সূচনা ভাল হয়নি। মাত্র ১৮ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হানিফ মহম্মদ এবং আর জি পোলক তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ৯৬ রান যোগ করেন। দলের ১১৪ রানের মাথায় হানিফ মহম্মদ ব্যক্তিগত ৬৩ রান সংগ্রহ করে আউট হন। আর জি পোলক দলের সর্বোচ্চ রান (৬৫ রান) করেন। ওয়েসলী হল ৪০ রানে ৪টে উইকেট পান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৫৪ রান (৭ উইকেটে। নার্স ৮৮ এবং হান্ট ৫৭ রান)

বিশ্ব একাদশ : ২৩৬ রান (৮ উইকেটে। আর জি পোলক ৬৫ এবং হানিফ মহম্মদ ৬৩ রান। হল ৪০ রানে ৪ এবং সোবার্স ২৫ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ইংল্যান্ড : ২১৭ রান (৭ উইকেটে। এডরিচ ৩৩ এবং পার্কস ৩৩ রান। ন্যার্সলি ৪৬ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৫০ রান (নার্স ৫৩ রান)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল টসে জয়ী হয়েও ইংল্যান্ডকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেয়। একদিনের ক্রিকেট খেলায় যে দল টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেয়, সেই দলকেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খেলায় জয়লাভ করতে দেখা গেছে। এই তথ্য জানা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। ফলে হাতে-নাতে তার কুফল পেয়েছেন। ইংল্যান্ড একাদশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ দলের এই ফাইনাল খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ দলকে ৬৭ রানে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

আমেরিকান লন্ টেনিস

১৯৬৬ সালের ৮৫তম আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় নানা অঘটন এবং অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেছে। পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলায়

●

১৯৬৬ সালে আই এফ এ শীল্ডের তৃতীয় রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গল বনাম রাজস্থানের খেলার একটি দৃশ্য। ইস্টবেঙ্গল ৫—০ গোলে জয়ী হয়। ফটো : অমৃত

জন নিউকম

ফ্রেড স্টোলে

অস্ট্রেলিয়ার যে দু'জন খেলেছিলেন তাঁরা দু'জনেই ছিলেন অবাছাই খেলোয়াড়, অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের গুণানুসারে যে ক্রমিক বাছাই তালিকা তৈরী হয়েছিল সেই তালিকায় এঁরা কোন স্থানই পাননি। আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে একই বছরে পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস ফাইনালে দু'জন অবাছাই খেলোয়াড়ের আবির্ভাব এই প্রথম। শুধু তাই নয়, এই দু'জন অবাছাই খেলোয়াড় হলেন আবার একই দেশের—অস্ট্রেলিয়ার।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য

পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনাল খেলায় চারজন খেলোয়াড়ের তিনজনই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার- ফ্রেড স্টোলে, রয় এমার্সন এবং জন নিউকম। অপরজন গত বছরের আমেরিকান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা। একদিকের সেমি-ফাইনালে ফ্রেড স্টোলে তাঁর স্বদেশবাসী এবং প্রতিযোগিতার ২নং বাছাই এমার্সনকে ৬—৪, ৬—১ ও ৬—১ গেমে পরাজিত করেন। রয় এমার্সন ১৯৬১ ও ১৯৬৪ সালে আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম ৬—৩, ৬—৪, ৬—৮ ও ৮—৬ গেমে এ বছরের ১নং বাছাই খেলোয়াড় ম্যানুয়েল সান্তানাকে (স্পেন) অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করেন।

মহিলা বিভাগের সেমি-ফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমেরিকার ছিল দু'জন (রিচে এবং ক্যাসলস) এবং একজন করে অস্ট্রেলিয়ার (কেরী মেলভিলে) এবং ব্রেজিলের (মারিয়া বুনো)। একদিকের সেমি-ফাইনালে ২নং বাছাই মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) ৬—২, ১০—১২ ও ৬—৩ গেমে রোজমেরী ক্যাসলসকে (আমেরিকা) পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনাল থেকে ফাইনালে উঠেছিলেন ৩নং বাছাই নান্সি রিচে (আমেরিকা); কুমারী রিচে ৬—৩ ও ৬—২ গেমে অবাছাই খেলোয়াড় মেলভিলেকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ফ্রেড স্টোলে তাঁর স্বদেশবাসী জন নিউকমের সঙ্গে ২ ঘন্টা ২০ মিনিট খেলে শেষ পর্যন্ত ৪-৬, ১২-১০, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে জয়ী হন। আন্তর্জাতিক লন টেনিস আসরে প্রধান চারটি প্রতিযোগিতায় (অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) স্টোলের এই দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেতাব জয়। ১৯৬৫ সালে স্টোলে উল্লিখিত চারটি প্রধান খেতাবের অন্যতম ফ্রেঞ্চ খেতাব জয় করেন। এখন তাঁর লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ান এবং উইম্বলেডন খেতাব। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, স্টোলে উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৩—৬৫) উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলে তিনবারই রানার্স-আপ হন। ১৯৬৩ সালের ফাইনালে তিনি আমেরিকার 'চাক' ম্যাকনলের কাছে এবং ১৯৬৪-৬৫ সালের ফাইনালে স্বদেশবাসী রয় এমার্সনের হাতে পরাজয়বরণ করেন। তবে স্টোলে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের জুটিতে কয়েকবার উইম্বলেডন এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ২নং বাছাই খেলোয়াড় মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) ৬-৩ ও ৬-১ গেমে ৩নং বাছাই নান্সি রিচেকে (আমেরিকা) পরাজিত করে চতুর্থবার (১৯৫৯, ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৬) আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং বনাম লিডার্স ক্লাবের (জলন্ধর) তৃতীয় রাউণ্ডের খেলার একটি দৃশ্য। দ্বিতীয় দিনে মহমেডান স্পোর্টিং ২—০ গোলে জয়ী হয়। ফটো : অমৃত
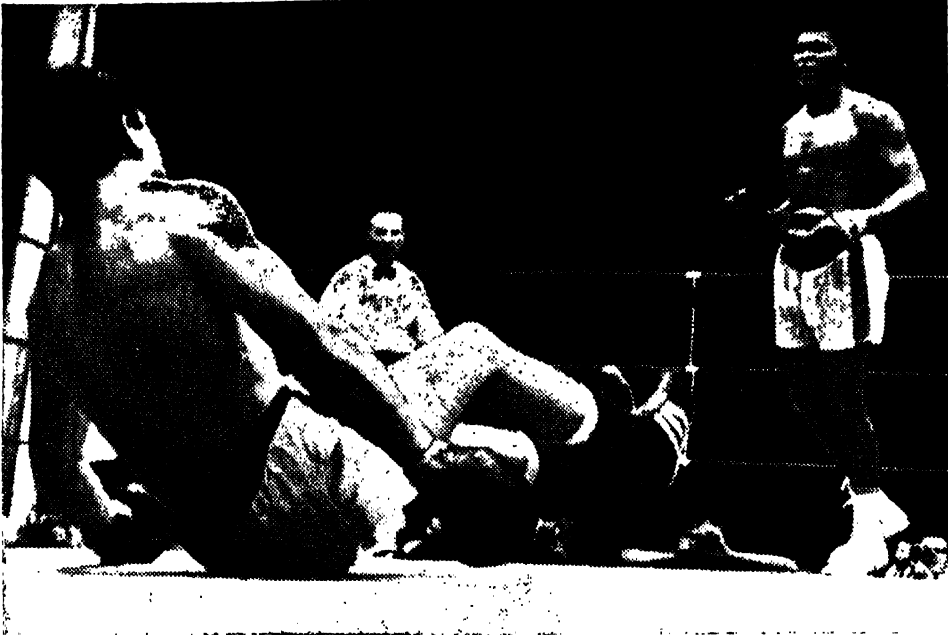
ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের খেতাবী লড়াইয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে দশম রাউণ্ডে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কার্ল মিল্ডেন বাজারকে ধরাশায়ী করার পর আবার লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হয়েছেন। এই লড়াইয়ে ক্লে দ্বাদশ রাউণ্ডে জয়লাভ করেন।

কুমারী বুনো উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনবার (১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) সিংগলস খেতাব পান। বিশ্বের প্রধান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলস খেতাব ছাড়াও কুমারী বুনোর করস্পর্শে একাধিক ডাবলস ট্রফির জীবন ধন্য হয়েছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া) ৪—৬, ১২—১০, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে জন নিউকমকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) ৬—৩ ও ৬—১ গেমে নান্সি রিচেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

বাছাই বনাম অবাছাই খেলোয়াড়

অনেক দিনের প্রচলিত নিয়ম—প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক সাফল্যের উপর ভিত্তি করে গুণানুসারে খেলোয়াড়দের নামের একটি তালিকা প্রকাশ করা। অনেক সময়েই দেখা যায়, যাঁরা এই তালিকায় স্থান পান না তাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকার রচয়িতাদের—টেনিস খেলার পণ্ডিত মহলকে খুবই বেকায়দায় ফেলে দেন। সদ্য-সমাপ্ত আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতার অবাছাই খেলোয়াড়দের সাফল্যের ভূরি-ভূরি নজির এ বছর থেকে গেল। এই নজিরগুলির মধ্যে মহিলাদের সিংগলস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১৯ বছরের কুমারী কেরী মেলভিলের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারী মেলভিল সদ্য-সমাপ্ত আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পান নি; অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রমপর্যায় তালিকায় তাঁর স্থান খুবই নীচের দিকে—৯ম স্থান। সুতরাং আলোচ্য আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁর খেলা সম্পর্কে কারও আগ্রহ ছিল না। কিন্তু একাধিক অপ্রত্যাশিত সাফল্যের মধ্যে দিয়ে কুমারী মেলভিল আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে রাতারাতি খ্যাতি অর্জন করেছেন। মহিলাদের সিংগলস খেলার দ্বিতীয় রাউণ্ডে তাঁর হাতে পরাজয়বরণ করলেন ১নং বাছাই খেলোয়াড় এবং ১৯৬৬ সালের উইম্বলেডন সিংগলস চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন মোফিট কিং। ১৯৬৬ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী মোফিট কিং খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় ৪র্থ স্থান পেয়েছিলেন। গত কয়েক বছরের আন্তর্জাতিক টেনিসে 'অঘটনঘটনপটীয়সী' হিসাবে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আজ অবাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার কেরী মেলভিলের হাতে পরাজয় বরণ করায় সে খ্যাতি যথেষ্ট খর্ব হয়েছে। কুমারী মেলভিল কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশের ৩নং বাছাই জুডি টেগার্টকে পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই জয়যাত্রা প্রতিরোধ করেন প্রতিযোগিতার ৩নং বাছাই খেলোয়াড় আমেরিকার নান্সি রিচে; সেমি-ফাইনালে তাঁরই কাছে কুমারী মেলভিল ৩-৬ ও ২-৬ গেমে পরাজিত হন।

পুরুষ বিভাগের সিংগলসে বাছাই খেলোয়াড়রা সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮ জন খেলোয়াড় উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩ জন বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন; অথ সেমি-ফাইনালে ছিলেন মাত্র ২ জন বাছাই খেলোয়াড়। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে কোন বাছাই খেলোয়াড় উঠতেই পারেন নি। সে দিক থেকে মহিলা বিভাগের বাছাই খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতার বাছাই খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটির মুখ রক্ষা করেছেন; মহিলা বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন ১নং বাছাই খেলোয়াড় মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং ৩নং বাছাই নান্সি রিচে (আমেরিকা)।

আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে অবাছাই খেলোয়াড় হিসাবে শেষ সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই মল এণ্ডারসন, ১৯৫৭ সালে। খেলায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বদেশের এ্যাসলী কুপার।

পেশাদারী টেনিস

লণ্ডন ইণ্টারন্যাশনাল ইনডোর পেশাদারী টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১নং বাছাই রড লাভের (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে ২নং বাছাই কেন্ রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার খেতাব জয়ের সূত্রে ১,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় কেন্ রোজওয়াল পাঁচবার খেতাব জয় করেছেন। লাভের এই নিয়ে ৬ বার ফাইনালে খেললেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দোতলায় পা দিয়েই জ্যোতিরাণী ব্যস্তসমস্ত ভোলাকে মনিবের ঘর থেকে বেরুতে দেখলেন ব্যস্ততা তাঁরই উদ্দেশে। খবর দিল, বাবু ডাকছেন—

কিছু জিজ্ঞাসা না করে পায়ে পায়ে এগোলেন। নটা বেজে গেছে সকাল, ওদের মনিব এখনো ঘরে কেন জানেন না। এই গোছের ডাক শুনলে গোচরে হোক বা অগোচরে হোক প্রস্তুতির দরকার হয় একটু। তাই শিথিল গতি। কোনো বিরাগের কারণ ঘটে থাকতে পারে কিনা চকিতে ভেবে নিলেন। সকালের কাগজে প্রভুজীধামের খবর আর ছবি ছাড়া আর কিছু তো দেখছেন না। কিন্তু যা-ই হোক একটুও উতলা নন তিনি। একটু আগে ওই খেয়ালী শিল্পী কি-যে দিয়ে গেলেন তাঁকে, কে জানে। সেই প্রশান্তি নিয়েই পুরু পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে পারলেন তিনি।

শিবেশ্বর শয্যায় শুয়ে আছেন, বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। পাশে গোটা দুই-তিন খবরের কাগজ পড়ে আছে। নীরব মনোযোগে একটা বিদেশী ইনডাস্ট্রিয়াল জার্নাল পড়ছেন।

মুখখানা শুকনো মনে হল জ্যোতিরাণীর। কাছে এসে দাঁড়ালেন।

জার্নাল থেকে চোখ সরল। আঙুল দিয়ে বিছানার লাগোয়া টেলিফোন স্ট্যান্ডটা দেখিয়ে দিলেন শিবেশ্বর।

জ্যোতিরাণী ওটা লক্ষ্য করেননি আগে। রিসিভারটা নামানো দেখলেন। অর্থাৎ তাঁর টেলিফোন এবং সেইজন্যেই তলব।

সাড়া দিতে ও-ধার থেকে যার প্রগলভ উচ্ছ্বাস ভেসে এলো সে বিক্রম পাঠক।—নমস্তে ভাবীজী, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে তোমার মুখখানা দেখে আসতে ইচ্ছে করছে!

জ্যোতিরাণী হালকা জবাব দিলেন, আমার মুখ দেখে কি হবে, হাসপাতালে যাঁকে পাঠিয়েছিলেন তিনি ফেরেননি এখনো?

ও-দিক থেকে হা-হা হাসির শব্দের তোড়ে কানের পরদা ঝালা-পালা। রিসিভার একটু সরিয়ে জ্যোতিরাণী জানালে নিবিষ্ট সামনের মানুষটাকে দেখে নিলেন এক পলক।

হাসি থামিয়ে বিক্রম জানালো, ফিরেছে —একেবারে মেয়ে নিয়ে ফিরেছে। ভাবীজীকে আর একটু কাছে পাবার লোভে এখন থেকেই ছুঁড়ীটার সঙ্গে দাদার ছেলের বিয়ে দেবার বাসনা। বলেই আর একপ্রস্থ হাসি।

জ্যোতিরাণী পাল্টা ঠাট্টা করলেন, মেয়ের বিয়ের বয়েস পর্যন্ত ওই লোভে ভাটা পড়বে আশা করা যায়।

বিক্রম সবিক্রমে প্রতিবাদ জানালো, নেভার! তার আগে আমি যেন অন্ধ হয়ে যাই। যাক, যে-জন্যে ডেকেছিলাম, তুমি যে আমাদের একেবারে ম্যাজিক দেখিয়ে ছেড়ে দিলে, অ্যাঁ?

—কি করলাম?

—সকালের কাগজ খুলে আমি হাঁ। কি করে কি হল দাদাও কিছু জানে না শুনলাম। ওদিকে দাদার মুখে তোমার প্রতিষ্ঠানের গল্প শুনে প্ল্যান কষে কাগজের আপিসে প্রথমবারের সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে আর তদবির তদারক করে এসে আমি কি আশা নিয়ে বসেছিলাম—তার বদলে এই!

অভিযোগ শুনে জ্যোতিরাণী অবাক। —প্রথমবারের ওই রিপোর্ট আপনি পাঠিয়েছিলেন?

—না তো কি? জানুয়ারীর গোড়ার আমাদের সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইলেকশন না? আমি দাদার প্রচারসচিব, তোমাকে সঙ্গে করে যুদ্ধে নামব বলে সুযোগ পেয়ে কাগজে তোমারও একদফা জাঁকালো প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলাম—রিপোর্টারকে লোভ দেখিয়ে এসেছিলাম, এমন রূপসী মহিলা আর দেখোনি বাছা, চোখ জুড়তে চাও তো বাড়ি গিয়ে দেখা করো, তারপর ঢালা খবর আর ছবি ছাপো। একটু আগে ওদেরও ফোন করেছিলাম, ওরা বললে নিজের ছবি ছাপতে দিতে তুমি কিছুতে রাজি হলে না। দাদার ছবি দিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু পাশে তুমি নেই কেন?

কথা শোনার ফাঁকে জ্যোতিরাণী চকিতে আর একবার সামনের শোয়া-মানুষটার দিকে তাকিয়েছেন। পড়ায় ছেদ পড়েছে, জার্নাল সামনে ধরে এদিকেই চেয়ে ছিলেন। বিক্রম বেফাঁস কিছু বলছে কিনা বোঝার চেষ্টা মনে হল। চোখোচোখি হতে দৃষ্টি আবার জার্নালের দিকে ঘুরেছে।

হাসিমুখেই জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, এত-সব প্ল্যানের কথা কি করে জানব বলুন। তবু পাশে না থাকি, কাগজটা পড়ে দেখুন ভিতরে বেশিই আছে। তাছাড়া ঘরের বউয়ের একটু আড়ালে থাকাই ভালো।

বিক্রমের আর এক-দফা দরাজ হাসি।

জার্নালে মনোযোগ দেখেও রিসিভার রেখে জ্যোতিরাণী তক্ষুনি চলে গেলেন না। খানিক আগের প্রশান্তির প্রলেপে এখনো আঁচড় পড়েনি, পড়তে দেননি

তিনি। দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন একটু।—তোমার শরীর খারাপ নাকি?

জার্নাল রেখে নির্লিপ্তমুখে শিবেশ্বর ফিরলেন তাঁর দিকে। জবাব না দিয়ে সামনের কাগজটা তুলে নিয়ে প্রভুজীধামের খবরের পাতাটা খুললেন।—এটা কি ব্যাপার?

বিক্রমের টেলিফোন ধরার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠাবার আগে ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচন হয়েইছে জানেন। আর, এখন কথা-বার্তা যা হল তাও সব-টুকুই কানে গেছে। জ্যোতিরাণী কি বলবেন? নরম সুরেই ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্যায় করেছি?

—তোমাকে তো সে-দিন বলেছিলাম এর মধ্যে আমি নেই।

—তুমি আছ সে-কথা তো বলা হয়নি, বরং আমার সম্বন্ধেই বেশি-বেশি লেখা হয়েছে। তুমি ভিন্ন এক পা-ও এগনো যেত না সে-কথাই বলেছি, আর সেইজন্যেই তোমার ছবি দিয়েছি।...তাও ভদ্রলোক ছবির জন্যে ঝকাঝকি করল বলে।

কাগজ রেখে শিবেশ্বর আবার জার্নালটা তুলে নিলেন। নিস্পৃহ, ভাবলেশশূন্য। জ্যোতিরাণী তবু অপেক্ষা করলেন একটু। তারপর চলে এলেন। কোন-রকম অপ্রিয় বাদানুবাদের ব্যাপার দাঁড়ালো না তাতেই স্বস্তি। খেয়ালী-শিল্পীর যোগাযোগে খানিক আগের ওই দুর্বোধ্য পরিতৃপ্তির অনুভূতিটুকু কেটে যায়নি।

বিকেলের দিকে মৈত্রেয়ী এলেন। নিয়মতই আসছেন এখন। উৎসাহে ভরপুর। সকালের কাগজে ওই প্রশস্তি দেখার পর উদ্দীপনা আরো বেশি হবার কথা। অথচ আজই তাঁকে কেমন বিমনা দেখালো একটু। সে-রকম হাসি নেই, সে-রকম খুশিও ঠিকরে পড়ছে না।

থেকে থেকে জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছে ভিতরে ভিতরে মিত্রাদির কিছু একটা অস্বস্তির কারণ ঘটেছে।

এ-কথা সে-কথার পর মৈত্রেয়ী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, শিবেশ্বরবাবু আজ আপিসে যাননি বুঝি?

—না। তোমাকে কে বললে?

মৈত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করলেন, দুপুরে টেলিফোন করেছিলেন—

হাসির আড়ালে মিত্রাদির অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু জ্যোতিরাণী ঠিকই লক্ষ্য করলেন। জিজ্ঞাসু চোখে কিছু শোনার অপেক্ষা।

কিছু একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়ে গেছে বলেই মৈত্রেয়ী আরো বিড়ম্বিত যেন। একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম...তুমি আবার কিছু বলে ভদ্রলোককে আরো রাগিয়ে দেবে না তো আমার ওপর?

জ্যোতিরাণী ফিরে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোকের রাগ-বিরাগে তার কি আসে যায়। মিত্রাদির অস্বস্তি লক্ষ্য করেই বললেন না। তাছাড়া, শোনার কৌতূহলও কম নয়। মাথা নাড়লেন, কিছু বলবেন না।

আশ্বস্ত হয়ে মৈত্রেয়ী বললেন, সে-দিন রিপোর্টার এলো, দুজনের সঙ্গেই কথা-বার্তা হল, ভদ্রলোক ছবি তোলার আগ্রহ দেখাতে শিবেশ্বরবাবুর ফোটো তুমিই জোর করে গছিয়ে দিলে—এর মধ্যে আমি কি দোষ করলাম?

সেই এক ব্যাপার। কেবল জট, কেবল জটিলতা। তবু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলেন না জ্যোতিরাণী।—তুমি দোষ করেছ বলেছেন?

—প্রায়। তোমার ভদ্রলোকটির ধারণা তোমাতে আমাতে ষড়যন্ত্র করেই এই ব্যাপারটি করেছি। নইলে এর পরেও এক ফাংশনে দেখা হয়েছিল যখন, তখনো খবরটা আমি চেপে গেলাম কেন? আচ্ছা বলোতো, এ-যে রাগ করার মত কিছু এ-কি আমরা জানি, না ও-কথা মনে করে বসে আছি! মাঝখান থেকে দুপুরে টেলিফোনে আমার ওপর ঝাঁঝ।

জ্যোতিরাণীর মনে পড়ল টেলিফোনে আর একদিনও কড়া কথা শুনতে হয়েছিল মিত্রাদিকে। পুলিসের লোকের মারফৎ স্টেশনে বীথি ঘোষের সমাচার জানতে পেরে মিত্রাদিকেই জেরা করে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিল। মিত্রাদি সেদিনও ঘাবড়েছিল। চাপা রাগে জ্যোতিরাণী বলে উঠলেন, আমি ভেবে পাই না, ঝাঁঝ তুমি বরদাস্ত করো কেন? তোমার কিসের ভয়?

মৈত্রেয়ী থতমত খেলেন।—কি জানি ভাই, এতটা এগোবার পর আবার না গণ্ডগোল হয়ে যায় আমার সর্বদা সেই ভয়।

—তোমাকে কি বলেছেন?

...আমরা সোজা পথে না চললে আদর্শের স্বপ্ন নাকি এখানেই ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু এ-সব যেন তুমি তাঁকে বোলো না কিছু!

মিত্রাদির এই ভয় আরো বিরক্তিকর। —আমরা সোজা পথেই চলেছি। শোনো মিত্রাদি, তোমাকে আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি তোমার কোনো দুর্ভাবনার কারণ নেই। স্বপ্ন হোক আর যা-ই হোক এখন আর কেউ সেটা ভেঙে দিতে পারবে না। আমাদের যা দরকার তার থেকে ঢের বেশি আমি নিজের হাতে নিয়েই নেমেছি। কারো মুখচেয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে না—বুঝলে?

জ্যোতিরাণীর ফর্সা মুখ লাল হয়েছে। মৈত্রেয়ী চেয়ে রইলেন। আপসশূন্য জোরের দিকটাই দেখছেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। জ্যোতিরাণী নিজের ঘরেই বসে ছিলেন। খেয়ালী শিল্পী আসা আর চলে যাওয়ার পর থেকে যে অগোচরের প্রশান্তির গভীরে ডুবে ছিলেন বিকেল পর্যন্ত, মিত্রাদি আসার পর তার সুর কেটেছে। কিন্তু দুর্লভ বস্তুর মত জ্যোতিরাণী ওটুকু ধরে রাখতেই চান। অন্য দিন হলে নিজের ঘরে আসার আগে পরদা ঠেলে ওই পাশের ঘরে ঢুকতেন। মিত্রাদির ওপর রাগারাগি করে তাঁকে অপমান করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করতেন।

নিজেকে সংযত করতে পেরেছেন। পেরেছেন বলেই সমস্ত দিনের প্রশান্তিটুকু আবার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসছে। সামান্য কারণে উত্তপ্ত না হবার মত শক্তি অর্জন করা দরকার। জ্যোতিরাণী সেই চেষ্টাই করবেন।

...সকাল থেকে মানুষটা ঘরের থেকে বেরোয় নি। অসুস্থই হয়ে পড়েছে মনে হয়। এতকালের মধ্যে শরীর খারাপ বড় হতে দেখেন নি। সকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি হয়েছে, জবাব পান নি। দুপুরের খাবারটাও ভোলা সবই ফেরত এনেছে প্রায়, বলেছে, বাবু তো কিছুই খেলেন না। তার খানিক বাদে খবর নেবার জন্য জ্যোতিরাণী পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলেন। ঘুমুচ্ছে মনে হতে ফিরে এসেছেন।

উঠলেন। অনভ্যাসের বাধা ঠেলে পায়ে পায়ে এ-ঘরেই এলেন আবার।

বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, শিবেশ্বর শুয়েই আছেন। শুয়ে শুয়ে কাগজ-পত্র দেখছেন।

শিয়রের দু'তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরানী লক্ষ্য করলেন একটু। মুখ চোখ এখন আরো শুকনো মনে হল। এগিয়ে এসে শয্যার পাশে দাঁড়ালেন।

শিবেশ্বরের তন্ময়তায় ছেদ পড়ল।

—সকাল থেকে সমস্ত দিন শুয়ে আছ, কি হয়েছে?

শিবেশ্বর সামান্য মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না। কিছু হয় নি। হাতের কাগজে গভীরতর মনোযোগ।

—শরীর বেশি খারাপ লাগে তো ডাক্তারকে খবর দিলে হত?

শিবেশ্বর নিরুত্তর।

—খবর দেব?

কাগজ সরিয়ে শিবেশ্বর তাকালেন একবার। নির্লিপ্ত ঠান্ডা মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এত সময় আছে?

—আছে। কাকে ডাকব?

—দরকার হলে এটুকু আমি নিজেই পারব।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ চেয়ে রইলেন খানিক, সমস্ত দিন তো না খেয়েই কাটল একরকম, রাতে কি খাবে?

দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল শিবেশ্বরের, টাইপ-করা কাগজের গোছা পড়ে ওঠাই জরুরী যেন। মাথা নাড়লেন। কিছু খাবেন না।

জ্যোতিরাণীর মনে হল জিজ্ঞাসা করলেন বলেই রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা গোটাগুটি বাতিল। এর পর না-খাওয়াটাই লক্ষ্য হবে। এবারে তাঁর চলে যাবার কথা। গেলেন না। যেতে পারলেন না। চুপচাপ চেয়েই রইলেন খানিক। টান-ধরা মুখ-চোখের চেহারা ভালো ঠেকছে না। শরীর বেতালা না হলে এ-ভাবে শুয়ে থাকার মানুষ নয়। রাগ বিরাগ মান অভিমান তুচ্ছ করার মত

শান্ত প্রসন্ন শক্তি অর্জনের যে সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, তার প্রসাদগুণ বড় বিচিত্র। জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল অহঙ্কার দম্ভ আর বিকৃত চিন্তার মধ্যে ডুবে থেকে এই মানুষও কি শান্তি পেয়েছে কখনো? ভিতরে ভিতরে যে অশান্ত ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে তার জ্বালা-পোড়া থেকে অব্যাহতি কোথায়? আজ এই প্রথম বোধকরি মানুষটাকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল তাঁর। ...সকাল থেকে ঘরে পড়ে আছে, খায় নি—কিন্তু জ্যোতিরাণী ক'বার ঘরে এসেছেন, ক'বার খোঁজ করেছেন, ক'-মিনিট কাটিয়েছেন এখানে? অবশ্য এখানে আসা খোঁজ করা বা সময় কাটানো সহজ নয়। কিন্তু সহজ নয় বলে এড়াতেই বা চেষ্টা করবেন কেন তিনি?

আর একটু এগিয়ে এসে শয্যায় শিয়রের কাছে মাথা ঘেঁসে বসলেন। কপালে একখানা হাত রাখতে রাখতে বললেন, গায় ঢাকা দিয়ে আছ কেন, জ্বরটর আসে নি তো...।

শিবেশ্বরের ঝকঝকে দুচোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়েছে। তিনি ব্যতিক্রম দেখছেন। ব্যতিক্রম দেখে বিশ্লেষণ করছেন। নিজে থেকে এত কাছে এসে, ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে বসাটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম বইকি। বিগলিত হবার বদলে মুখের দিকে চেয়ে কারণ অনুসন্ধান করছেন তিনি।

চোখে চোখ রেখেছেন জ্যোতিরানীও। চোখের ভিতর দিয়ে নিজের ভিতর দেখানোর সুযোগ দিচ্ছেন যেন। দেখুক, কোনো স্বার্থ নিয়ে যে তিনি আসেন নি দেখে একটু অন্তত বিশ্বাস হোক। তেমনি চেয়ে থেকে একটু বাদে আস্তে আস্তে বললেন, মিছিমিছি তুমি আমার ওপর রাগ করে আছ কেন, ওরা ছবি নেবার আগ্রহ দেখাতে যা করা উচিত আমি শুধু তাই করেছি—এ-জন্যে তুমি কিছু ভাবতে পারো আমার মনেও হয় নি। হলে দিতুম না। যার জন্যে সব হল তাকে ছেড়ে নিজের ছবি দেব ভাবতেও আমার খারাপ লেগেছে। মিথ্যে কেন কষ্ট পাও?

শিবেশ্বর দেখছেন না শুধু, কথার এই সুরও নতুন ঠেকছে। জ্যোতিরানীর হাত তখনো তাঁর কপালের ওপর।

মিত্রাদির মুখে যা শুনেছেন তার ধার দিয়েও গেলেন না জ্যোতিরাণী। সনুনয়ে নিষেধ করেছে বলে নয়, খানিক আগের উষ্মার লেশমাত্রও নেই আর। সকাল থেকে যে অজানা আশ্বাসের তরঙ্গ ভিতরে ভিতরে বহুবার ওঠা-নামা করে গেছে, তাই যেন দ্বিগুণ করে আবার ফিরে পাচ্ছেন তিনি। সমস্ত গ্লানি সমস্ত যাতনা ভুলে, একটা বারো বছরের নির্দয় অতীতকে মুছে দিয়েই আবার বুঝি নতুন করে শুরু করা যায় সবকিছু। যে-টুকু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তাতেই যেন নিজের ওপর আশ্চর্যরকমের একটা অধিকার লাভ হয়েছে তাঁর। ভাবী সহজ অথচ ভারী সবল অধিকার। এটুকুর ফলেই অনায়াসে আরো কিছু পারলেন তিনি, যা ভেবে-চিন্তে পারতেন না। কপালের ওপর থেকে হাতখানা মাথার দিকে সরল। বললেন, কপাল তো গরমই লাগছে একটু। আরো ভালো করে বোঝার জন্য প্রথমে কপালের ওপর তারপর তাঁর গালের ওপর নিজের গাল রাখলেন। মাথার হাতখানা চাদর ঠেলে জামার ভিতর দিয়ে তাপ অনুভব করার মত করে বুকের ওপর নড়া চড়া করল তারপর সেখানেই স্থির হল। সে-ভাবেই থাকলেন একটু। আরো নরম করে বললেন, রাতে ভাত না খাওয়াই ভালো. আমি ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি, তুমি না খেয়ে থেকে আমাকে জব্দ কোরো না।

মুখ তুলে নিজের দুই ঠোঁট দিয়ে শুকনো দুটো ঠোঁট আলতো করে স্পর্শ করলেন একবার। তারপর শয্যা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

দু'চোখ টান করে দেখছেন শিবেশ্বর। ঘাড় উঁচিয়ে দরজা পর্যন্ত দেখলেন। বিস্ময়ের অন্ত নেই। সব-কিছুর ওপর দিয়ে নিজের আধিপত্য-বোধ উঁচিয়ে রাখা মজ্জাগত স্বভাব তাঁর। ওই এক জায়গা থেকে পাল্টা আঘাতে সেটা অনেকবার ক্ষুন্ন হয়েছে। তিনি আপস করেন নি, আধিপত্য খোয়ানো বরদাস্ত করা চরিত্রে নেই তাঁর। কিন্তু খাবার আনতে যে গেল, স্বল্পক্ষণের মধ্যে সে তাঁর সমস্ত আধিপত্যের অস্তিত্ব সুদ্ধ মুছে দিয়ে গেল বুঝি। এও তিনি চান না হয়ত। কিন্তু চান না চান আজকের এই আধিপত্য খোয়ানোর স্বাদ যে বিচিত্ররকমের আলাদা, সে-বুঝি তিনি দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব না করে পারলেন না। এখনো করছেন।

যে আশায় ঝলক হতাশার মেঘ ফুঁড়ে আসে তার রঙ সব থেকে চড়া। একটা মাস এই চড়া রঙের মধ্যেই বাস করেছেন জ্যোতিরাণী। সেই রঙে গোটা বাড়ির নিভৃতের রঙ বদলাচ্ছে বললেও বেশি বলা হবে না। সকলেই সেটা অনুভব করছেন। গৌরবিমল কালীনাথ সিতু এমনকি মেঘনা ভোলা শামুও।

সবথেকে বেশি অনুভব করছেন সম্ভবত শিবেশ্বর চাটুজ্জে।

এই এক মাসে গত বারো বছরের চেহারাই বদলে গেল বুঝি। চাপা উদ্বেগ নেই, স্নায়ু-দ্বন্দ্ব নেই, ক্ষোভের তাপ-ছড়ানো নিঃশ্বাস নেই, হিসেব করে পা ফেলা নেই।

জ্যোতিরাণীর দিবারাত্র ফুরসত নেই। ঝরনার অবিরাম ধারায় ক্লান্তি নেই।

প্রভুজীধাম রূপ নিচ্ছে, আকার নিচ্ছে। অজানা অচেনা মেয়েরা বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে, দেখা করে যায়। কেউ কাজ চায়, কেউ আশ্রয়। কেউ বা দুই-ই। জ্যোতিরাণী ধৈর্য ধরে দেখা করেন সকলের সঙ্গে, আবেদন শোনেন, নামঠিকানা লিখে রাখেন। কাউকে বা মিত্রাদির সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দেন। সপ্তাহে দু'-তিন দিন মিত্রাদি আর বীথিকে নিয়ে প্রভুজীধাম দেখতে ছোটেন। বীথির মুখে এখনো হাসি ফোটে নি, তবে ফুটবে যে সে-সম্ভাবনা অস্পষ্ট নয় খুব। মিত্রাদি তার পিছনে লেগেই আছে, তার মনের মত সাজ-গোজ না করলে বকুনি, কোথাও যেতে আসতে না চাইলে বকুনি, মুখ বুজে থাকলেও বকুনি। অতটা আবার জ্যোতিরাণীর কেন যেন ভালো লাগে না। ওই মেয়ের মধ্যে আগুন আছে সে-তো মিত্রাদি খুব ভালো করে জানে। অত ব্যস্ত হবার কি আছে।

প্রভুজীধাম থেকে ঘুরে এসেই মামাশ্বশুরকে অবধারিত তাগিদ দেবেন জ্যোতিরাণী, কিছুই তো যেন এগোচ্ছে না এখনো, আর লোক লাগালে তাড়াতাড়ি হয় কিনা।

পরিকল্পনার একটাই ফাইল হয়েছে এখন পর্যন্ত। সেটা জ্যোতিরাণীর হেপাজতে আছে। দিনের মধ্যে কতবার ওটা নিয়ে বসতে হয় ঠিক নেই। জায়গায় জায়গায় নিজের হাতে সব দরকারী চিঠি লেখেন, জিনিস-পত্রের অর্ডার দেন, চেক কাটেন, হিসেব রাখেন। মিত্রাদির সঙ্গে দেখা প্রায় রোজই হয়, তবু দিনের মধ্যে কম করে চার-পাঁচবার টেলিফোনে কথা বলারও দরকার হয়ই। ফাঁক পেলে এরই মধ্যে ছেলেকে ডেকে পড়াতে বসেন। সিতু গোড়ায় গোড়ায় দু'-চার দিন অবাক হয়েছে, কিন্তু মায়ের কাছে পড়তে খুব যেন মন্দ লাগে না। মায়ের পড়ানোটা কেমন এলোমেলো আনাড়ি ধরনের। সেই কারণেই বেশি পছন্দ হয়ত। ওদিকে শাশুড়ীর দেখাশোনাও আগের থেকে একটু বেশিই করছেন জ্যোতিরাণী। সকলের ক্ষোভ মুছে দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর। এমনকি শমীর অনুযোগের ভয়ে তার জন্যেও গাড়ি পাঠাতে ভোলেন না। যে-সময় বিভাস দত্তর বাড়ি থাকার সম্ভাবনা কম, সে-সময় তুষ্ট করার জন্য টেলিফোনেও ওর সঙ্গে কথা বলেন মাঝে-সাঝে।

...আর, এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কারণে হোক অকারণে হোক দিন আর রাত্রির মধ্যে বার কয়েক পাশের ঘরে এসে দাঁড়ানোর অবকাশ মেলেই।

শিবেশ্বরের কি চোখ নেই? আছে। যে আনুগত্য তিনি চান, সেই গোছেরই কিছু পাচ্ছেন। কিন্তু এ বুঝি কেউ তাঁকে দিয়ে চলেছে, নিজের জোরে কিছু তিনি দখল করেন নি। তিনি শিকলে বিশ্বাস করেন বলেই বিড়ম্বনা। ভীরু সমর্পণের ওপরেও ভ্রূকুটি চলে বোধ হয়, এর ওপর চলে না।

দু'দিন বিক্রম এসেছে। শিবেশ্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমাদের সঙ্গে একটু বেরুতে পারবে, দুই এক জায়গায় যাব...

জ্যোতিরাণী তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে। জানাই আছে অবশ্য। উঁচু-মহলের সেই অনন্য সংস্থার নির্বাচনের তোড়জোড়। এই আনুগত্যও তিনি দিতে চান কি চান না একটুও বুঝতে দেন নি। গেছেন। সমাদর লাভ করেছেন। যে-যে জায়গায় গেছেন, তাঁদের প্রচ্ছন্ন মার্জিত আশ্বাস কানে এসেছে। তাঁরা তো সমর্থন করবেনই, অন্যেরাও যাতে করেন সেই চেষ্টা করবেন। ফেরার পথে বিক্রমের উচ্ছ্বাস প্রায় অশালীন হয়ে উঠতে চেয়েছে, বলেছে, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কোন্ ছার, ভাবীজীকে যদি ভরসা করে আমার হাতে ছেড়ে দাও দাদা তোমাকে আমি প্রাইম মিনিস্টার বানিয়ে দিতে পারি বোধহয়।

জ্যোতিরাণী ভ্রূকুটি করেছেন। হেসেছেন। এই সহজতা কৃত্রিম কিনা ভালো করে লক্ষ্য করেও শিবেশ্বর ঠাওর করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু এর পর সস্ত্রীক নির্বাচনের সংগঠনে বেরুনোর উৎসাহ তাঁর আপনা থেকেই কিছুটা স্তিমিত।

কিন্তু সব-কিছুর তলায় তলায় জ্যোতিরাণীর কি বুঝি একটা প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষাটুকুই প্রেরণার মত। উদ্দীপনার মত।

ঠিক এক মাসের মাথায় খবর পেলেন, শিল্পী এসেছেন। জ্যোতিরাণী প্রায় ছুটেই নীচে নেমে এলেন। বুকের ভিতরে ধপ-ধপ করছে যেন।

রিকশয় চাপিয়ে পূর্ণ আয়তনের অয়েলপেন্টিং এনেছেন শিল্পী। কাগজে মোড়া। জ্যোতিরাণী ঘরে ঢুকতেই আঙুল

তুলে অদূরের দেয়াল দেখালেন শিল্পী। ওইখানে দাঁড়ান।

কিছু না বুঝে ছোটমেয়ের মত হুকুম পালন করলেন জ্যোতিরাণী। শিল্পী ওপরের কাগজ টেনে ছিঁড়লেন। —দেখুন।

জ্যোতিরানী দু' চোখ টান করে দেখছেন। একটু একটু করে তাঁর চোখে রঙ বসছে, রূপ বসছে। নিখুঁত সুন্দর মূর্তিই বটে। বিগ্রহের মুখে মানুষের আদল। একেবারে অচেনা মানুষের নয় যেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে মনে হল, মানুষের ঠিক নয়, কচি ছেলের আদল মিশেছে।

এই প্রতীক্ষায় ছিলেন জ্যোতিরাণী? এই প্রত্যাশায়? জানেন না। তলিয়ে ভাবতে গেলে হাস্যকর। তিনি ভাবতেও চান না হাসতেও চান না। নির্নিমেষে দেখছেন শুধু।

চিত্র সোফায় শুইয়ে দিয়ে শিল্পী বললেন, চলি—

জ্যোতিরাণীর সম্বিত ফিরল যেন। কি আশ্চর্য, বসুন বসুন, কোনো কথাই হল না—

খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি আর পানখাওয়া মুখে একগাল হাসলেন শিল্পী। বললেন, কথা হয়ে গেছে, দামও পেয়েছি, চললাম—

হাসতে হাসতে সত্যিই চলে গেলেন। জ্যোতিরাণী বিমূঢ় খানিকক্ষণ।

প্রভুজীর প্রায়-কল্পিত আলেখ্য মামাশ্বশুর দেখলেন, কালীদা দেখলেন। বেশ নিরীক্ষণ করেই দেখলেন। দু'জনেই তারপর একবাক্যে শিল্পীর প্রশংসা করলেন। কিন্তু এর বেশি আর কিছু বললেন না তাঁরা।

জ্যোতিরাণী কি আর কিছু শুনবেন আশা করেছিলেন?

ছেলেও সকৌতুকে দেখল। তারপর ভারিক্কি মন্তব্য করল, এমন কি ভালো—

ছদ্মকোপে জ্যোতিরাণী চোখ পাকালেন, ভাগ্ এখান থেকে!—

শাশুড়ী দেখলেন। পুলকিত, রোমাঞ্চিত। ছবির উদ্দেশে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠলেন তিনি।

শিবেশ্বরও ভালো করেই দেখলেন। পরে মন্তব্য করলেন, বেশ—

...বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে ওই ছবির মধ্যে বিশেষ কিছু কি শুধু জ্যোতিরাণীই দেখলেন তাহলে? হোক কল্পনা, গোপন সঞ্চয়ের মত গোপনই থাক ওটুকু। শাশুড়ী যখন নাতিকে নিয়ে উদ্ভট কল্পনা করতেন, সকলের সঙ্গে জ্যোতিরাণীও হাসতেন। বিরক্ত হতেন। এখন তাঁরই এ দুর্বলতা প্রকাশ পেলে মাথা-খারাপ ভাববে সকলে।

তবু, প্রকারান্তরে শুধু শিবেশ্বরকেই ভালো করে দেখার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, বিগ্রহের সঙ্গে প্রভুজীকে ধরার জন্য শিল্পী তোমাদের সকলের ছবি নিয়ে গেছলেন, দাদাশ্বশুরের, শ্বশুরের, তোমার, সিতুর...

কিন্তু না। বিশেষ কিছুই চোখে পড়েনি তাঁরও।

শেষে শিল্পীর প্রশংসা করলেন জ্যোতিরাণী। কত পরিশ্রম হয়েছে, কত খরচ হয়েছে—কিন্তু কিছু দেবার কথা বলারও ফুরসত মিলল না, উল্টে এই এই বলে গেলেন তিনি। আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় বলে উঠলেন, এমন ভালো লোকও হয়......

শিবেশ্বর তক্ষুনি টিপ্পনী কাটলেন, এমন হাতেই পড়েছ, দুনিয়ায় দু'চারজন ভালো লোক আছে তাও ভুল হবার দাখিল।

জ্যোতিরাণী থতমত খেলেন। তারপর হাসিমুখেই বললেন, তোমার কেবল প্যাঁচের কথা—

গৌরবিমলের কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, জ্যোতিরাণীর সদ্য বর্তমানের মেজাজই সেদিক থেকে সবচেয়ে অনুকূল মনে হল। সেদিন বিকেলের দিকে তাঁর হাতে লম্বা গোছের একটা খাম দিলেন। ডাকে এসেছে। খামের ওপর বাইরের কোনো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাপ।

খামটা নিয়ে জ্যোতিরাণী উল্টেপাল্টে দেখলেন শুধু একবার। মামাশ্বশুর তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে যেতে পারলেন না।

আমতা আমতা করে গৌরবিমল বললেন, কালী বলছিল, বাইরের নানা জায়গার ইন্‌সটিটিউট্ থেকে তোমার নামে এ-রকম আরো গোটাকতক চিঠি এসেছে—কি ব্যাপার?

—সিতুকে রাখার জন্য একটা ভালো জায়গার খোঁজ করছি।

এই আশঙ্কাই করছিলেন যেন। —ওকে এখানে রাখবে না?

—এখানে থাকলে ও মানুষ হবে না। ...দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বাজে ছেলের সঙ্গে মিশছে।

এর বেশি জ্যোতিরাণী কি আর বলতে পারেন। মামাশ্বশুর বা আর কারো যে এ-ব্যবস্থা মনঃপূত হবে না জানা কথাই। তিনি বললেন। মানুষ না হবার বয়েস একেবারে চলে যায়নি, তা ছাড়া আমি তো এখন প্রায়ই আছি এখানে, আরো কিছুদিন দেখো না—

জ্যোতিরাণী নিজের ঘরে চলে এলেন। আরো কিছুদিন দেখতে গেলে এ-বছরের সময় পার হয়ে যাবে। যে-মন নিয়ে ছেলেকে দূরে সরানোর সংকল্প করেছিলেন, সেই মন অনেক ঠান্ডা, অনেক প্রসন্ন। তবু কিছুই স্থির করে উঠতে পারলেন না। ভিতরটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল। ভবিষ্যতের আশায় মিত্রাদি পর্যন্ত তাঁর ওই একমাত্র মেয়েকে দার্জিলিংএ রেখেছে। তবে মামাশ্বশুর আছেন এখন এ একটা ভরসার কথা বটে। তাঁর পেলোরাস জ্যাকের গল্প শোনার পর ছেলের সেই মূর্তি তিনি ভোলেন নি।

জ্যোতিরাণীর মনে হল, এই শঙ্কট কাটিয়ে তোলার জন্যেই তাহলে ছেলের পড়ার আর কালীদারও পড়ানোর একটু চাড় দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ফাঁক পেলে সন্ধ্যার পর মামাশ্বশুরও ক'দিন হাঁক-ডাক করে নাতিকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। আজ তার কারণ বুঝতে পেরে জ্যোতিরাণী হাসবেন না, রাগ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রভুজীধামের কি একটা অর্ডারের কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য জ্যোতিরাণী কালীদার ঘরে এলেন। মামাশ্বশুরকেও এখানেই পাবেন জানেন। তাঁর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সিতু মাথা গোঁজ করে তারস্বরে পড়তে লাগল, গড্ ইজ্ গুড্ অ্যান্ড্ গড্ ইজ্ কাইন্ড! গড্ ইজ্ গুড্ অ্যান্ড ......

জ্যোতিরাণী থমকালেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন ছেলের দিকে। —তোকে তো এই পড়া দেড় মাস দু'মাস আগে পড়তে শুনেছি আমি!

সিতু হকচকিয়ে গেল। গৌরবিমলও ঈষৎ শঙ্কিত যেন। গম্ভীর মুখে কালীনাথ সিতুর দিকে ঘুরে বসলেন।

কালীনাথের কঠিন হাব-ভাব। —পুরনো পড়াই পড়ছিলাম—

কালীনাথের কঠিন হাব-ভাব। পুরনো পড়া সে-কথা আমাকে আগে বলোনি কেন? দেখি কেমন পুরনো পড়া পড়ছিস তুই। খপ করে বইটা টেনে নিলেন তিনি। —গড্ মানে কি?

—ঈশ্বর।

—আর কাইন্ড মানে?

—দয়ালু।

কালীনাথ আরো গম্ভীর। গড্ মানে ঈশ্বর আর কাইন্ড মানে দয়ালু—উঁ?

সিতু মাথা নাড়ল, তাই।

সঙ্গে সঙ্গে কালীনাথ হাত বাড়িয়ে তার চুলের মুঠি ধরে কোলের কাছে টেনে এনে পিঠের ওপর বেশ জোরেই গুম গুম কিল দুটো।

জ্যোতিরাণী অবাক, গৌরবিমল অবাক। আর সব থেকে বেশি অবাক সিতু নিজে। —ঠিক হয়নি?

—হয়েছে। জেঠুর মুখ নির্দয়, কঠিন। —তবু কেন মারলাম বল্ তো?

সিতু ভেবাচাকা।

তেমনি অটল গাম্ভীর্যে কালীনাথ বললেন, পারলি বলেই এই—না পারলে তোমার গড্ কেমন কাইন্ড ভালো করে জেনে রাখো!

বলতে যা এসেছিলেন বলা আর হল না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে জ্যোতিরাণী সোজা নিজের ঘরে। সেখানে এসেও হেসে বাঁচেন না।

ওদিকের ঘরে গৌরবিমল হা-হা শব্দে হাসছেন। জ্যোতিরাণী চলে যাবার পর কালীনাথও হাসছেন মিটিমিটি। সিতুকে বললেন, যা ছোঁড়া—এ-যাত্রা তোর ফাঁড়া কাটল মনে হচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

কাপড় কাটা হচ্ছে

অঙ্গনা

কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টার

প্রমীলা

'দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'—এই মহৎ আদর্শ সামনে রেখে 'কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টার'-এর সূচনা। মহৎ আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উদ্যোক্তাদের মহৎ উদ্দেশ্য 'হেল্প আদর্স হেল্প দেমসেলভস'। পরিকল্পনা অনেক দিনের কিন্তু বাস্তব রূপায়ণ এইমাত্র সেদিনের কথা। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসের কোন এক হিমেল প্রভাতে মাত্র দু'জন কর্মী নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য বৃহৎ কর্মসূচী সামনে রেখে প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করলো। প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করলেও সংগতি ছিল খুবই সামান্য। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বড় কিছু করে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সূচনা থেকেই শুভার্থীর অকুণ্ঠিত সাহায্য এবং সদিচ্ছায় ওয়েলফেয়ার সেণ্টার-এর শূন্য ঝুলি পূর্ণ হয়েছে। আর এই শুভার্থীরা আজও প্রতিষ্ঠানের জীবনে সবচেয়ে বড় সহায় এবং সম্পদ। তাই সূচনা সামান্য হলেও অচিরেই বৃহত্তের আভাস প্রতিভাত হলো প্রতিষ্ঠানের জীবনদর্পণে। একটি থেকে চারটি ওয়ার্কিং সেন্টারে বিস্তারলাভ করলো এর কর্মসূচী। ইতিমধ্যে কর্মীসংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দু'জন থেকে কর্মীসংখ্যাও দাঁড়িয়েছে ১১০ জনে। চারটি ওয়ার্কিং সেণ্টারের একটিও কিন্তু ভাড়াটে বাড়ীতে নয়—সবকটি সেণ্টারেই প্রতিষ্ঠান সভ্যদের বাড়ীতে। কাজেই সেণ্টারগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আন্তরিকতা যুক্ত হওয়াতে এটা সম্ভব হয়েছে। আর সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের সকলের নিষ্ঠা এবং উদ্যোগী মনোভাব। শুভার্থী জুটলেও কম্পিটিশন মার্কেটে নিজেকে প্রতিষ্ঠার আসনে বসান সহজ নয়। প্রথমদিকে তো খদ্দেরের মন জয় করাটাই ভীষণ কঠিন। কিন্তু সে ভীষণ কঠিন পরীক্ষাকে এঁরা ভয় করেননি। প্রথমদিকে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে জিনিষপত্র বিক্রি করা হতো। অনেকে এতে হেসেছিলেন। কেউ কেউ বাঁকা কথার তীক্ষ্ণতায় এদের প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু সহ্য করবার শক্তি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের ছিল। তাই সব ঠাট্টাবিদ্রূপ হাসিমুখে সহ্য করেছেন। আর দিনরাত প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ রূপকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছেন। তারপর গত আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র খুলতে সমর্থ হলো। বালিগঞ্জ কুইন্স পার্কে নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে নিজেদের জিনিসপত্র পেঁছে দেবার সুযোগ পেয়ে ওয়েলফেয়ার সেণ্টারটি আজ গর্বিত। তার গর্বের আরও কারণ আছে, ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি জায়গা থেকে

ছোটদের জামা

মেয়েদের ব্যাগ

বিক্রয়কেন্দ্র খোলার আমন্ত্রণ এসেছে। হাওড়ার শিবপুরে একটি বিক্রয়কেন্দ্র সেখানকার চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত। আর একটি বিক্রয়-কেন্দ্র খুব শিগগির খোলা হবে পাম এভি-নিউয়ে। শুধুমাত্র আসন্ন পুজোর মরশুমকে সামাল দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা নয়। এই বিক্রয়কেন্দ্রগুলি পাকাপাকিভাবেই চালু থাকবে। এই অল্প সময়ে এতটা সাফল্য প্রতি-ষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিক চিহ্নবিশেষ। বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত এই ওয়েলফেয়ার সেণ্টারের কর্মসূচী। হাতের কাজের সমস্ত কিছুই এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। 'বিভিন্ন ওয়ার্কিং সেণ্টারে বিভিন্ন রকম কাজ হয়। একটি সেণ্টারে হয় সেলাইয়ের কাজ। কাটছাট সব মেয়েরা নিজেরাই করে। নিজেরাই নিজেদের পছন্দমত জামা কাপড়ের উপর সূচের কাজ করে। কোন কাপড়ের সঙ্গে কোন সুতো খোলতাই হবে তা মেয়েরাই পছন্দ করে। এরকম স্বাধীনতা বড় কম কথা নয়। কাজে মাঝে মধ্যে ভুলত্রুটি যে না হয় তা নয় কিন্তু সেজন্য স্বাধীনতায় ছেদ পড়ে না। এরকম স্বাধীনতার জন্যই বোধহয় যে-কোন নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে কাজগুলির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। উলের কাজ এবং কাঁথার কাজ বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উলের কাজ-গুলি অত্যন্ত নিখুঁত এবং পারিপাট্যেও উজ্জ্বল। কাঁথার কাজ করাটাই প্রশংসনীয়। কারণ এদিকে এমনিতেই আগ্রহ কম। কিন্তু নিঃসংকোচে বলা যায় যে, এঁদের কাঁথার কাজ যথেষ্ট সমাদর পাবার যোগ্য। কয়েকটি বাটিকের শাড়ীও উল্টেপাল্টে দেখলাম। অনেকগুলিই অর্ডারী — অন্যান্যগুলিও শিল্পনৈপুণ্যে উজ্জ্বল। অর্ডারের প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠানের জিনিসের সুনামেরই ফলশ্রুতি।

সারা কলকাতা থেকেই এখানে জামা-কাপড়-শাড়ীর জন্য বেশ অর্ডার আসে। প্রতিষ্ঠানের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হলো প্লাস্টিকের কাজ। প্লাস্টিকের রকমারী জিনিসে ঘরটি ঝলমল করছিল। টয়লেট ব্যাগ, অ্যাপ্রন, ফীডার প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আগে আগে আচার, বড়ি তৈরী করা থেকে অর্ডারী খাবারদাবারও সরবরাহ করা হতো। আচার-বড়ি এখনও মাঝে মাঝে তৈরী হয়। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের অনিশ্চয়তার জন্য খাবারদাবারের অর্ডার এখন আর নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এবার আসা যাক 'কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টার'-এর জিনিসপত্রের দামের কথায়। বাজারে আজকাল প্রায় প্রতিটি জিনিসই অগ্নিমূল্য। এমন সময় আমাদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কেউ যদি সহৃদয়তার হস্ত প্রসারিত করেন তবে তাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাতে আপত্তি উঠতে পারে না। কমলচন্দ্র ওয়েলফেয়ার সেণ্টার সেই সহৃদয়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই অভিনন্দন তার পাওনা। প্রতিটি জিনিসের দামই এখানে বেশ কম। অনেকসময় মনে হয় ন্যায্যদামের চেয়েও কম। বাচ্চাদের তোয়ালে সেট, জামা, ফ্রক থেকে শুরু করে উপরে বর্ণিত যে-কোন জিনিসের দাম আমাদের কেনাকাটার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ভাষায় বলতে হয়, 'লাভ আমরা মোটেই রাখছি না। আর লাভ করাটা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। উদ্দেশ্য শুধু, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এই মেয়েদের অর্থাৎ যারা এখানে কাজ করছে, তাদের সাহায্য করা।'

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের কাজের বিনিময়ে আর্থিক সাহায্যই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মোট ১১০ জন কর্মীর মধ্যে ষোল জন কর্মী নিয়মিত মাইনে করা এবং অন্যান্যরা 'পিসরেটে' কাজ করে। প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের মধ্যে পরিবেশ অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। কাজেকর্মে শাসন নেই আছে

পশমের তৈরি জিনিস

এমব্রয়েডারি কাজ করছে

শুধু তত্ত্বাবধান। অনেক প্রতিভার সন্ধানও পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে—যাদের কাজে বেশ সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। এসম্পর্কেও প্রতিষ্ঠান বেশ সচেতন।

সকলকে নিয়ে প্রতিষ্ঠান দিনে দিনে গৌরবের পথে এগিয়ে চলেছে। আর এগৌরব কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় সকলের।' কথাগুলি বলছিলেন প্রতিষ্ঠানের একজন কর্ণধার। কথাটা বেশ লেগেছিল। গৌরব একার নয় সকলের—এরকম চিন্তাধারা যেখানে সে প্রতিষ্ঠান যে সহজেই উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে তা সন্দেহাতীত-ভাবে সত্য।

মাইলো

মাইলো! নামটা অবশ্য বাঙালীর কাছে খুব বেশী পরিচিত নয়। ব্যবহারও বাংলাদেশে বেশী নেই। তবে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে নাকি মাইলোর চাষ হয়। খাদ্য হিসাবে ব্যবহারও হয়। প্রাচুর্যেভরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের ভাতের বিকল্প কোন খাদ্যের কথা এতদিন ভাবতে হয়নি। তাই ধানের বিকল্প কিছু উৎপাদনের প্রয়োজনও বোধ করেনি। কিন্তু বর্তমান খাদ্যসংকটের দিনে বাঙালীকে বিকল্প খাদ্যের জন্য অহরহ চিন্তা করতে হচ্ছে। এমন সময় রেশন এলাকায় মাপা খাদ্যের উপরি বা ফাউ হিসাবে মাইলোর আবির্ভাব। আবির্ভাব হল বটে তবে সাদরে কেউ গ্রহণ করছে না। একেতো অপরিচিত শস্য, তারপর সংকট সময়ে এত অল্পমূল্যে ফাউ হিসাবে পাওনা বলে হয়তো এর খাদ্যগুণ সম্পর্কে মনে সন্দেহ আছে। তাই সঙ্কট সময়েও মাইলোর এত অনাদর।

বিশেষজ্ঞরা কিন্তু মাইলোকে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য তালিকাভুক্ত করে এর গুণাগুণ যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা থেকে সহজেই বুঝা যায় মাইলো কুলীন খাদ্যশস্য না হলেও অচিরেই মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে সাদরে স্থান পাবে। শুধু চিনতে আর বুঝতে যতটুকু দেরী।

মাইলোর খাদ্যগুণে কিন্তু কম নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে গম থেকে বেশী। বিশেষজ্ঞদের মতে মাইলোতে প্রোটিনের ভাগ শতকরা ১২·১১, স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে শতকরা ৩·৬৫ ভাগ আর শ্বেতসার ৫৮ থেকে ৬০ ভাগ। শ্বেতসারের অংশ ছাড়া এই পরিমাণ খাদ্যমূল্য গমের মধ্যেও নেই। তাই ডাক্তাররাও মাইলোকে পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও সহজপাচ্য বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

সুতরাং পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মাইলো থেকে খৈ, ভাত, খিচুড়ি, ছাতু আটা পাওয়া যেতে পারে এবং তা থেকে খাদ্য সমস্যা সমাধানে কিছুটা সুরাহাও হতে পারে।

মাইলোর আটা : গমের মত পেশাই করে মাইলো থেকে যে আটা পাওয়া যায় তা দামে যেমন সস্তা খেতেও খারাপ নয়। তবে গমের আটার সঙ্গে মাইলোর আটা মিশিয়ে রুটি, চাপাটি কচুরি প্রভৃতি তৈরী করলে খেতে বেশ সুস্বাদু হয়।

মাইলোর খৈ : চিড়ে মুড়ির অভাব পূরণে মাইলোর খৈ যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। চল্লিশ পয়সা কে, জি মাইলো। দামে সস্তা, অথচ রেশনের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য থেকে মাইলো বাড়তি। ধানের খৈ ভাজার মতোই মাইলোর খৈ ভাজবার পদ্ধতি। তবে ভাজার আগে জলে ভিজিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে গরম করে নিলে খৈ-এর আকার বড় হয় এবং পরিমাণেও বেশী পাওয়া যায়। ধানের খৈ-এর মতো মাইলোর খৈ-এর রঙও হয় সাদা। তবে ধানের খৈ-এর মত লম্বা আর নরম হয় না, হয় গোল। আর একটু শক্ত। তবে ভুট্টার খৈ-এর মতো শক্ত নয়, আর অতবড়ও নয়। সুবিধে হচ্ছে ধানের খৈ-এর মতো মাইলোর খৈ বাছতে সময়ের অপচয় হয় না। চিনি বা গুড়ের রস তৈরী করে তা দিয়ে মাইলো খৈ-এর মোয়া যেমন বানানো যায় তেমনি হয় মাইলো খৈ-এর মুড়কি। তবে মাইলো খৈ-এর মোয়া ধানের খৈ-এর মোয়ার মত নরম হয় না। অনেকটা চিড়া বা মুড়ির মোয়ার মত শক্ত হয়। মাইলোর মুড়কিও সুস্বাদু।

ছাতু : হিসাবে মাইলো ব্যবহার করতে হলে প্রথমে দানাগুলোকে বেশ করে ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে নিয়ে খৈ ভাজার মতো নিবু নিবু আগুনের তাপে খোলা হাড়িতে বা কড়াতে গরম করে নিন। গরম দানাগুলো যখন পুট পুট করে ফুটতে আরম্ভ করবে তখন নামিয়ে নিন। তারপর শিল-নোড়ার কিম্বা হামালদিস্তায় গুড়ো করলেই সুস্বাদু ছাতু তৈরী হবে। চিনি, গুড়, কলা, নারিকেল দুধ যেমন খুশি মাখিয়ে খান, কোন ক্ষতি হবে না। বরং অন্যান্য ছাতু অপেক্ষা সহজে হজম হবে।

মাইলোর ভাত বা খিচুড়ি : বিশেষজ্ঞরা যখন মাইলোকে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন তখন এ-থেকে ভাতই বা হবে না কেন? হবে, তবে রন্ধনপদ্ধতি অত সহজ হবে না। মাইলোর ভাত বা খিচুড়ি রাঁধতে হলে দানাগুলোকে প্রায় ১৭।১৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ভিজান দানাগুলোকে হাতের চাপে ঘসে ঘসে (চাল ধোয়ার মতো) পরিষ্কার করে ভাত রাঁধার মতোই সিদ্ধ করতে হবে। তবে ভাতের মতো এর মাড় গালা চলবে না। পরিমাণ মতো জল দিতে পারলে অবশ্য ঝরেঝরে ভাতও যে না হয় তা নয়, তবে ফেনা-ভাত করাই সুবিধে। আর ফেনা-ভাত ঘি দিয়ে খেতেও বেশ লাগে।

খিচুড়ি রন্ধনপদ্ধতিও প্রায় একই। তবে খিচুড়ি রাঁধতে মাইলোর দানাগুলোকে ডাল-ভাঙ্গার মত আধ ভাঙ্গা করে ভিজিয়ে নিলে যেমনি সহজে খোলা ছেড়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে তেমনি সিদ্ধ হতে সময়ও নেবে কম। ভিজান দানার সম-পরিমাণ রুচি অনুযায়ী ডাল মিশিয়ে চালের খিচুড়ি রান্নার সাধারণ নিয়মেই মাইলোর খিচুড়ি রান্না করা যায়। মাইলোর খিচুড়িতে মুগ-ডাল ব্যবহার করলে খেতে স্বাদ বেশী পাওয়া যায়। মাইলোর মধ্যে খাদ্যগুণের অভাব নেই। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তো নয়ই বরং উপকারী। তাছাড়া মাইলো দিয়ে তৈরীও করা যায় নানারকমের খাদ্যবস্তু। সুতরাং এই দুর্দিনে মাইলোর সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকেরই উচিত। মাইলোর ব্যবহারও রন্ধনপদ্ধতি যদি ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মধ্যবিত্তঘরের মা-বোনেরা মাইলোকে সাদরে গ্রহণ করবে, উপকৃতও হবে।

—মাধবী মজুমদার

সেলাইয়ের কথা

আগে আপনাদের বেবীফ্রক ও ... ফ্রকের বিষয় জানিয়েছি। এবারে আর ... ধরনের ফ্রকের বিষয় জানাচ্ছি। এই ... অনেক স্কুলে ইউনিফরম হিসাবে ...

করা হয়। এই ফ্রকে সিটের অর্থাৎ পেছন ঘিরে মাপ নেবার প্রয়োজন হয়।

স্কুল ফ্রক

মাপ :—

(অংকন—১" ১¼ স্কেল)

ঝুল—২৬"
সেস্থ—১০"
ছাতি—২৪"
কোমর—২২"
সিট—২৫"
গলা—১১"
পুট— ৫"
পুটহাতা—১২"
মুহুরী— ৭"

বডি :—

১— ২=সেস্থ+১"
১— ৩=¼ ছাতি—½"
৩— ৪=¼ ছাতি+১½" (এ্যালাউন্স)
১— ৫=পুট+¼"
১— ৫=৩—৬
৫— ৬=সোজা লাইন
৫— ৭=১" কাঁধের সেপ
১— ৮=১/৬ গলা
১— ৯=১" পিছন গলা ডিপ
৯— ৮=পিছন গলার সেপ করা হবে
১—১০=গলার ১/৬+½" সামনের গলা ডিপ
১০— ৮=সামনের গলার সেপ করা হবে
২—১১=¼ কোমর+১"
৪—১১=সাইডে সেপ করা হবে
৪—১২=১" দাবাট।

ঘের :—

১—২=ঝুল—সেস্থ+২" নীচের বর্ডার
১—৩=½ সিট+২"
১—৪=½ কোমর+৭½"
প্লিটের জন্য জন্য+১¼" সেলাই
৩—৫=½ সিট+৭½"
প্লিটের জন্য+১¼" সেলাই
৩—৫=২—৬
৬—৭=¼"
৭—৫=সোজা লাইন
৪—৫=সেপ করা হবে
২—৮=২" নীচের বর্ডার।

হাতা :—

১— ২=পুটহাতা—পুট+১" সেলাই
১— ৩=¼ ছাতি+১"
(কুঁচির জন্য)+১ দাবাট।
১— ৩=২—৪
৩— ৫=¼ ছাতি
২— ৬=½ মুহুরী
৬— ৭=¼" সেপ
৭— ৮=১"
২— ৯=২"
২— ৭=সেপ করা হবে
৮— ৯=সেপ করা হবে
৫— ১=হাতার সেপ করা হবে
৬—১০=১" দাবাট।

—বসুধা
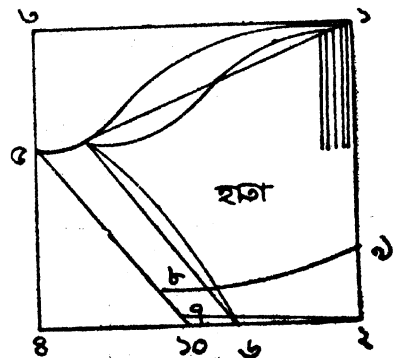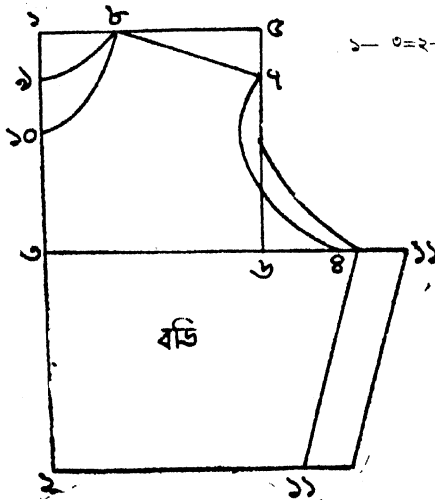
বিবাহবার্তা

পশ্চিম জার্মানীর মত একটা আধুনিক দেশে মান্ধাতা আমলের মত প্রজাপতির অফিস মারফৎ হাজারে হাজারে বিয়ে হচ্ছে, এটা সহজে বিশ্বাস করতে মন ওঠেনা কিন্তু প্রেমের ফাঁদের ঝক্কি এড়িয়ে 'নিরাপদে বিবাহ সেরে ফেলতে' ইদানীং বহু যুবক-যুবতীই প্রজাপতি অফিসের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

তবে দেশটা আধুনিক, তাই প্রজাপতির অফিসেও আধুনিক ব্যবস্থা। হামবুর্গের একটা প্রজাপতি অফিসের কথাই বলি। যুবক-যুবতীরা এখানে গিয়ে তাদের নাম চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, চেহারার বর্ণনা, ধর্ম, পেশা, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং আয় সবকিছু জানিয়ে আসেন। সেইসব খবর একটি কম্পিউটার মেশিনে ঢোকান হয় আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর নির্বাচন হয়ে যায়। তারপর সেই খবর একটি কার্ডে লিপিবদ্ধ কোরে পাত্র বা পাত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই একটি মাত্র প্রজাপতি অফিসের মারফতেই এখন বছরে পাঁচ হাজার বিবাহ হচ্ছে।

জুলাই আগস্ট অর্থাৎ আমাদের আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পশ্চিম জার্মানীতে বিয়ের হিড়িক পড়ে যায়। এই সময়টা বিয়ের পুরুতদের দম ফেলার অবসর থাকে না। এর কারণ বছরের এই সময় কিছুটা রোদের মুখ দেখা যায় আর ৩১শে আগস্টের আগে বিয়ে করলে সারা বছরের জন্যে আয়কর থেকে বেশকিছুটা রেহাই পাওয়া যায়।

আজকাল পশ্চিম জার্মানীতে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের বয়স অনেক কমে গেছে। বছর পাঁচ-ছয় আগেও ছেলেদের ও মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল যথাক্রমে ঊনত্রিশ ও ছাব্বিশ, কিন্তু এখন ছেলেরা তেইশ থেকে পঁচিশ ও মেয়েরা একুশ থেকে তেইশের মধ্যেই বিয়ে সেরে ফেলছে। একটি সমীক্ষার হিসেবে দেখা গেছে বেশীরভাগ মেয়ে আরও কম বয়সে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, অনেক মেয়ে বাইরের কাজকর্ম না নিয়ে সংসার পাততে চায়, অল্প সংখ্যক মেয়ে বিয়ের পর কাজকর্ম করার পক্ষপাতী আর শতকরা নজন মাত্র মেয়ে কুমারী জীবনের স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। অল্প বয়সে এই বিবাহ প্রবণতার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি: এটা কি যৌনপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ না আমাদের এই অনিশ্চিত যুগে পারিবারিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব লাভ করার আন্তরিক আকাঙ্খা কিনা কে জানে!

পশ্চিম জার্মানীর মেয়েরা আজকাল সেকালের মত বিয়ে সম্বন্ধে কোন রঙীন কল্পনা মনে স্থান দেয় না। নিতান্তই জৈবিক ব্যাপার ভেবে নিয়ে ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় বিয়ে করে। পণপ্রথা একেবারে উঠে না গেলেও মেয়ের বাবা সাধারণত পণের চিন্তা না করে মেয়েকে লেখাপড়া বা কোন পেশাগত বিদ্যা শেখান যাতে দরকার হলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

আফগান জানান উৎসবে যোগদানের জন্য সম্প্রতি একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল কাবুল গিয়েছিলেন। গত ২৩ আগস্ট এই উৎসবের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেষে আফগানিস্থানের রাজা ও রাণী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মিলিত হন: চিত্রে ভারতীয় নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে আফগানিস্থানের রাণী শ্রীমতী হুমাইরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। রাণীর ডানদিকে আফগানিস্থানের রাজা এবং প্রধানমন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে।

নতুন বিবাহিত দম্পতিদের সংসারে সন্তানসন্ততিদের সংখ্যাও কম, খুব জোর একটি কি দুটি। এর কারণ জীবনধারণের মানোন্নতি ও গৃহসমস্যা।

সংবাদ

গ্যাংটক হাই স্কুল ফর গার্লস-এর স্কটল্যান্ডদেশীয় প্রধান-শিক্ষিকা পৃথিবীতে প্রথম মহিলা যিনি "পেমা দোরজি" পুরস্কার পেলেন। এটি সিকিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান।

এই মিশনারী শিক্ষিকা হলেন এডিনবরার মিস মার্থা হ্যামিলটন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে 'নিঃস্বার্থ কর্মের' স্বীকৃতিস্বরূপে তাঁকে সিকিমের চোগিয়াল এই পুরস্কার দান করেছেন।

মিস হ্যামিলটন তাঁর বৃদ্ধ পিতার পরিচর্যার জন্য স্কটল্যান্ডে আছেন। তিনি এডিনবরায় জানান যে, তিনি ১৯৫৯ সাল থেকে সিকিমের পালজোর নামগিয়াল গার্লস হাইস্কুলে কাজ করছেন। এর আগে তিনি কালিম্পং-এ তিন বছর ও দার্জিলিং-এ এক বছর শিক্ষকতা করেন।

মিস হ্যামিলটনকে প্রদত্ত পুরস্কারের মধ্যে একটি সুদৃশ্য রৌপ্যপদক ও প্রশংসাপত্র রয়েছে। চোগিয়ালের ব্যক্তিগত মোহরাঙ্কিত এই প্রশংসাপত্রে মিস হ্যামিলটনকে "তরুণ ও প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে স্কুলের নতুন বিজ্ঞান বিভাগ, শিক্ষকাবাস ও ক্যান্টিন, স্কুল হল, শিশু-উদ্যান, ভলিবল কোর্ট, একটি ছোট ডায়ারী ইউনিট সকলই তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য।

* * *

ব্রিটেনে সম্প্রতি পাঁচ দিনব্যাপী যে কমনওয়েলথ কনফারেন্স অব গার্ল গাইড কমিশনারস অনুষ্ঠিত হয় তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন মহীশূরের শ্রীমতী কে এস অঞ্জনাম্মা।

এই সম্মেলনে তেত্রিশটি কমনওয়েলথ দেশ থেকে ষাটজনের বেশী প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রতি তিন বছর অন্তর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবছরের সম্মেলনের বিষয় "ভবিষ্যৎ গঠন—নিজ দেশের কাজে গাইডের অবদান।"

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত ফক্সলিজের ব্রিটিশ গার্ল গাইড সেন্টারে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল: গার্ল গাইডদের প্রশিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি-বিধান ও গাইড আন্দোলনে সাধারণের সমর্থন সংগ্রহ।

লণ্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর স্যার কেনেথ ব্যাডলে এই সম্মেলনে অতিথি বক্তা। ওয়ার্লড চীফ গাইড লেডি ব্যাডেন-পাওয়েল সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যতজন সম্ভব প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভারত ছাড়া অন্যান্য যে সব দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন তাদের মধ্যে রয়েছে নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া এবং মরিশাস।

শকুন তো নয়, যেন এক-একটা বিশাল জেট বিমান নামছে।—একটা নয়, দুটো নয়—দূরে প্রকান্ড মরা অশ্বত্থ গাছটার শুকনো ডালপালা কাঁপিয়ে, চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে খেতে পালে পালে শকুনগুলো নামছে ওদিকের ঝোপের আড়ালে। কোথায় যে নামছে, কী উদ্দেশ্য—অনেকক্ষণ ঠাওর করেও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না রামাশীষ তেওয়ারী। দেখা না গেলেও, এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছে ওদের ক্রুদ্ধ তপ্ত নিঃশ্বাস। ফোঁস ফোঁস শব্দে ভোরের হাল্কা বাতাস ভারি হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। একে অপরকে হটিয়ে নিজের দাবি কায়েম করার প্রচেষ্টায় হুটোপুটি করছে নিজেদের মধ্যে। কেউ বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মল্লভূমি থেকে সখেদে সরে দাঁড়াচ্ছে। কোনটা বা আবার ডানা ঝাপ্‌টিয়ে উড়ে গিয়ে অশ্বত্থ গাছটার মরা ডাল আশ্রয় করে বসে লোভাতুর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঝোপের দিকে।

...একটা শকুন প্রায় রামাশীষের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সন্ত্রস্ত ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই একটা দমকা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল ওর গায়ের ওপর। সর্বাঙ্গে যেন শীত ধরিয়ে দিয়ে গেল। শুধু কী তাই একটার পর পর জেট বিমান অবিরাম উঠছে আর নামছে মাথার ওপর দিয়ে। না, নিশ্চিন্ত হয়ে আর বসে থাকার উপায় নেই। কে জানে, ওরা আবার ভুল করে ওকেই না ভোজ্যবস্তু ভেবে বসে।

রামাশীষ প্রথমটা বুঝে উঠতে পারেনি জিনিসটা কী! সামনেটা পাহাড়ের মত আড়াল করে বসে আছে শকুনগুলো, তায় ভোরের অন্ধকার এখনো ভাল করে কাটেনি হয়ত বা মরা গরু-বাছুর কিছু খাচ্ছে। মরুক গে যাক ভেবে চলেই যাচ্ছিল। কী ভেবে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে দিল ভিড়ের মধ্যে। আচমকা একটা উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল ওদের মধ্যে। আবার একটা ঢিল ছুড়লো। শকুনের দল সন্ত্রস্ত-সচকিত ডানা মেলে উড়ল আকাশে। নিমেষে যেন একটা মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেল এই নির্জন প্রান্তরের বুকে। আগাছায় ভরা জঙ্গলের বুকে তান্ডব জেগে উঠল।

...রামাশীষের চোখ পড়ল কুকুরগুলোর ওপর। ওরা কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। কিন্তু ভিড় অনেকটা সাফ হয়ে গেছে। ওদের ভোজ্যবস্তুটা কিছুটা দেখা যাচ্ছে এখন। প্রথমটা কেমন একটা খট্‌কা লাগল রামাশীষের। মানুষ নাকি? আরো কয়েক পা এগিয়ে এল, কিন্তু হঠাৎ পা-দুটো যেন বিস্ময়াহত যন্ত্রণায় শিউরে উঠল! মানুষই তো বটে, একটা ছোট ছেলে কিম্বা মেয়ে, চেনার কোন উপায় রাখেনি রাক্ষসগুলো।

মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেহটা। কাঁধ থেকে পিঠের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। কোমরের কাছটা এখনো তাজা রক্তে লাল হয়ে রয়েছে। হাতদুটো ছড়ান রয়েছে দুদিকে কিন্তু অক্ষত নয়, দুটোই অর্ধভুক্ত। মুখটা প্রায় কিছুই নেই, সবটাই শেষ হয়ে এসেছে—রক্তমাংসের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার খুলিটা ধবধবে শাদা হয়ে ভোরের নতুন আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। এখনো অক্ষত আছে কেবল পা-দুটো। সেটা চোখে পড়তেই ভীষণ চমকে উঠল রামাশীষ। দুধের মত শাদা কচি দু'খানা পায়ে সেই চিরপরিচিত জুতো জোড়াটা এখনো রয়েছে—একি চিনতে ভুল হয়? অন্তত এই শ্রমিক মহল্লায় এ-চেহারা চিনতে ভুল হবার কথা নয় কারো। এ সেই মেরী। ওর দেহের যে-কোন অংশ এক নজরেই চেনা যায়। এ-চেহারা আর কারো নেই এখানে—নীল চোখ, সোনালী চুল, ধবধবে শাদা গায়ের রং লম্বাটে একহারা সাত বছরের মেয়ে মেরীর জীবনটা সকলের কাছেই প্রচন্ড বিস্ময়!

অপরিসীম বিস্ময় আর বেদনায় চোখের তারাদুটো মুহূর্তের জন্য থেমে গেছে রামাশীষের। কি মর্মান্তিক পরিণতি একটা সুন্দর জীবনের। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারে না সে। এখনও মেরীর জীবন্ত মূর্তিটা ভেসে রয়েছে ওর চোখের সামনে। এই তো সেদিনও ওকে দেখেছে, সেইরকম বক্‌বক্‌ করতে করতে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেরী, আর ওর পেছনে বস্তির একপাল ছেলেমেয়ে সমানে ওকে টিটকারি দিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা ঢিল ছুঁড়ে মারছে, নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু মেরী উদ্‌ভ্রান্তের মত কেবল ঘুরেই চলেছে। ঘোরার কোন বিরাম নেই ওর। নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়ে থাকা বস্তির অলিগলি ধরে ঘুরেই চলে, আর ওর পেছন বস্তির কুকুরগুলো সারারাত অবিরাম ডেকে মরে।

।। দুই ।।

ঠিক সাত বছর আগে এই শ্রমিক বস্তির নিস্তরঙ্গ জীবনে একদিন বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মত ছুটে এসে আছড়ে পড়েছিল মেরীর ফুলের মত জীবন। নিঃসন্দেহে এ-মহল্লার ইতিহাসে ঐ একটা মস্ত অঘটন। এর আগে ঠিক এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও। সকলের বিচলিত হবারই কথা। জনে জনে ক্ষোভ প্রকাশ করে গেল মহল্লার সমাজপতির কাছে—এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। অনেক সহ্য করেছে তারা, কিন্তু তাই বলে আর নয়। আগে হলেও বা একটা কথা ছিল, কিন্তু এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে—সাহেবদের অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না'।

বিচারের জন্যে পঞ্চায়েতের সভা ডাকা হল।। আর ডাকা হল এ মহল্লার কিংবদন্তীর নায়িকার মত সর্বজন-পরিচিতা সুন্দরীকে। একই কারখানার নারী-শ্রমিক সুন্দরী. ওদেরই সঙ্গে সেই হুপরীর মত ধরে থাকে। তবু সুন্দরীর সঙ্গে ওদের অনেক তফাৎ। ওরা দুটো পয়সার জন্যে যে কারখানায় দিবারাত্র হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও অভাবকে ঠেকাতে পারে না, সেখানে সুন্দরী ইচ্ছে করলে অনেককিছু করতে পারে নিজের জন্যে। কারখানার চাকা এক মুহূর্ত নিশ্চল করে দিতে পারে। সে-অভিজ্ঞতা প্রত্যেকেরই আছে। শুধু তাই নয়, বড়-সাহেব মিঃ আর্চারকে বলে কতজনের যে উপকার করেছে সুন্দরী তার হিসেব নেই। কারখানার যে দুর্ধর্ষ বড়সাহেব কাউকে পরোয়া করে না, যার অদম্য জেদ আর উদ্ধত আচরণের জন্যে সকলে সন্ত্রস্ত, সেও কিন্তু সুন্দরীকে সমীহ করে। অতএব এ-হেন সুন্দরীর স্বপক্ষেও যে কিছু লোক থাকবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তারা পাল্টা অভিযোগ করল, এ-সব মিথ্যে, সুন্দরী নির্দোষ।

প্রত্যুত্তরে পাল্টা যুক্তি দেখান হল, যে-সুন্দরীকে নিজের বর ঘরে নেয় না আজ চার বছর, তার সন্তান—এটাও কি মিথ্যে অভিযোগ? তাছাড়া নীল চোখ, সোনালী চুল, ধবধবে শাদা গায়ের রং,—এ-মেয়ে সে পেল কোত্থেকে?

—বটেই তো! সন্দেহ পোষণ করার কারণ যথার্থ! পঞ্চায়েতের সভাপতি প্রবোধী সাউ কৈফিয়ত তলব করল সুন্দরীর কাছে—জবাব কি?

সুন্দরী দশদিনের মেয়ে কোলে বসে-ছিল একদিকে। অভিযোগ শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, তোমাদের মতলবটা কি বল তো? অযথা ঝগড়া আমি পছন্দ করি না। মেয়ে আমার না তো কার?

প্রবোধী বিজ্ঞের মত এবারও কৈফিয়ত তলব করল, তবে ওর পিতৃ-পরিচয় কি? আরও কি বলতে যাচ্ছিল প্রবোধী কিন্তু তাকে বক্তব্য শেষ করার পর্যন্ত সুযোগ দিল না সুন্দরী। এক ঝট্‌কায় মেয়ে কোলে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সকলের দিকে চরম অবজ্ঞা ভরে জোর গলায় বলল,—বড়সাহেব আর্চারিয়াই ওর বাবা।

কথাটি বলেই পেছন ফিরল সুন্দরী। কিন্তু পেছনে পড়ে রইল বিস্ময়হত মানুষের দল। দেমাক বটে সুন্দরীর! বড়-সাহেবের মেয়ে পেটে ধরেই এত বড় স্পর্ধা। ও কি ভেবেছে চিরদিন বড়সাহেবের সোহাগ পেয়ে বাঁচতে পারবে? না, ওর ইচ্ছেমত সমাজে সকলকে বাস করতে হবে?

কিন্তু প্রতিকারের উপায় বার করা আরো কঠিন ব্যাপার! পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে ও, তা না হলে শাস্তির একটা ব্যবস্থা করা যেত বইকি! চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঐ ভাগাড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসত সুন্দরীকে। কিন্তু স্বয়ং কারখানার বড়সাহেব মিঃ আর্চার ওর সহায়, কিছু করতে চাইলেই করে ওটা যায় না। অবশ্য, বড়সাহেব ওদের সামাজিক জীবনধারায় হস্তক্ষেপ করায় দুঃসাহস দেখালে তার প্রতিকারের জন্যে ওরা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করতে পারে—কিন্তু তাতে অনেক জল ঘোলা হবে। একে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে নিত্যি গন্ডগোল লেগে আছে, তার মধ্যে আবার একটা উড়ো ঝঞ্ঝাট আনা—ঠিক হবে না।

তা ছাড়া সুন্দরীর এই দম্ভকে হজম করে নেওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। সুন্দরীর ঐ একটা দোষ ছাড়া গুণও ছিল অনেক। এ মহল্লায় হেন লোক নেই যে ওর কাছে উপকার পায় নি। কারো আত্মীয়ের জন্যে চাকরীর প্রয়োজন—ধর সুন্দরীকে, ওতেই কাজ হবে। কারো নাইট ডিউটি করে শরীর ভেঙে পড়ছে, ডিউটি বদলের নিতান্ত প্রয়োজন। সুন্দরীর এক কথায় ব্যবস্থা হয়ে গেল। শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারই নয়, ইউনিয়নের প্রয়োজনেও সুন্দরী পেছপা নয়। সেখানে সুন্দরী সকলেরই একজন—আলাদা কেউ নয়। বড়সাহেবের প্রিয়জন বলে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না। অথচ নিজের জন্যে কিছু করল না সুন্দরী। চাকরীতে অনেক উন্নতি করতে পারত কিন্তু সে ইচ্ছে ওর নেই। থাকলে, আজ ওকে পঞ্চায়েতের কৈফিয়তের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হত না।

মিঃ আর্চারের মত একটা দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ওর যুক্তির কাছে হয়ত হার স্বীকার করে নি, কিন্তু ওর সততা এবং সকলের মঙ্গলের জন্যে ওর নারীহৃদয়ের সমবেদনা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। কখনো কারো নামে বড়সাহেবের কাছে নালিশ করে নি সুন্দরী, কিন্তু সকলের ভালর জন্যে অনুরোধ করেছে। তাতেও না হলে অনুনয় বিনয় করেছে। শেষে প্রয়োজন হলে মান-অভিমানও করেছে।

মিঃ আর্চার বিব্রত হয়ে এক একদিন না বলে পারতেন না,—সুন্দরী, আমি তোমার জন্যে সব করতে পারি, কিন্তু তুমি বারবার অপরের জন্যে আমায় অনুরোধ কর না। তুমি ভুলে যেও না আমিও কোম্পানীর একজন কর্মচারী। কোম্পানীর স্বার্থ দেখবার জন্যে আমায় তাঁরা এদেশে পাঠিয়েছেন।

বড়সাহেবের বাংলোটা কারখানার পেছনে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানটার এক কোণে। দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্য ইংরেজরা চলে গেছে দেশে। এখন কোম্পানীর গোষ্ঠীভুক্ত একমাত্র ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়ার্কস ম্যানেজার মিঃ থিওডোর হেনরি আর্চার। অতি ধুরন্ধর প্রশাসক, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, শিক্ষিত ও নির্ভর-যোগ্য কর্মচারী মিঃ আর্চার। মাত্র তিন বছরের মেয়াদে এদেশে এসেছেন তিনি। তাই তাঁর কথা ডিরেক্টার্স বোর্ড যথাসম্ভব মেনে নেবার চেষ্টা করেন। তাঁর চালচলনও আগের অন্যান্য বড়সাহেবদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদাই। এদেশী লোকদের সঙ্গে মেলা-মেশা করেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার উদ্দেশ্যে নতুন এই বাংলোটা তৈরী করিয়েছেন সম্প্রতি।

কিন্তু কেউ কেউ বলে আসলে তা নয়, মিঃ আর্চার লোকচক্ষুর আড়ালে একান্ত নিভৃতে সুন্দরীকে কাছে পাবার জন্যে নিজেই দূরে সরে থাকতে চান। সুন্দরী এখন তাই অসংকোচে যাতায়াত করে। অবশ্য আগে ও কখনো লজ্জাবোধ করে নি অন্যান্য বাংলোর মেয়ে বউরা ওর যাতায়াতে পথে মুখ টিপে হাসে, সুন্দরী বোঝে কিন্তু কেউ সামনে দাঁড়িয়ে ওকে ব্যঙ্গ করা মত সাহস যে রাখে না, তাও বোঝে। ভ কাউকেই পায় না সুন্দরী। এমন কী বড় সাহেবের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যত প্রীতির হোক, যেখানে আর পাঁচজনে স্বার্থ জড়িত সেখানে সুন্দরী নির্ভয় এইটেই বোধহয় ওর সাহসের উৎস।

মিঃ আর্চারের যুক্তির প্রত্যুত্তরে তা সুন্দরীও পাল্টা যুক্তি দেখায়—তা তোমরা যেমন নিজেদের ব্যবসা সামলাতে চেষ্টা করছ—আমরাও তো তাই করব। তোমাদে কাছে না বললে, নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা আর কার কাছে বলব আমরা তোমাকেই চিনি—!

মিঃ আর্চার মুখের পাইপে একটা বড় টান দিতে গিয়েও থমকে গেলেন। তাড়াতাড়ি পাইপটা মুখ থেকে টেনে বার করে, একটু হাসলেন। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে ডিভানের ওপ্রান্ত থেকে সুন্দরীকে নিজের দিকে আরো নিবিড় করে টেনে নিতে নিতে বললেন, কেবল তোমরা......তোমরা বোল না সুন্দরী, তোমার বল। আমি কেবল তোমার কথা শুনব। আমি তোমার জন্যে সব করতে পারব। এমন কী তোমার জন্যে হয়ত আরো কয়েক বছর বেশি ইণ্ডিয়াতে থেকে যেতে পারি......।

সুন্দরী নিজেকে এক ঝটকায় মিঃ আর্চারের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে কপট অভিমানের সুরে বলল, না, অমন থাকায় কাজ নেই। যত বেশি দিন থাকবে তত বেশি জ্বলতে হবে আমাদের......।

—আর তুমি? আমি কেবল তোমার কথা শুনতে চাই সুন্দরী, আমি চলে গেলে তুমি দুঃখ পাবে না? মিঃ আর্চার ততক্ষণে আবার নিবিড় করে ওকে টেনে নিয়েছেন বুকের মধ্যে।

এবার আর নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না সুন্দরী। ধরা যে পড়েছে সে কথা কী আজও ওকে মুখে বোঝাতে হবে? তাই কিছুক্ষণ সাহেবের বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থেকে আবার শুরু করে, তবে আমার দুঃখ দিও না, আমার এ কথাটা অন্তত মেনে নাও! আমি যে ওকে কথা দিয়েছি সাহেব......।

চকিতে মিঃ আর্চার ওর মুখটা চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন, এই শেষ কিন্তু? আর কারো জন্যে বলবে না তো? বেশ, তাই হবে...... তুমি ওকে বলতে পার......।

সুন্দরী আবার নিশ্চিন্তে মিঃ আর্চারের বুকের ওপর মাথা হেলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তুমি খুব ভাল সাহেব—তুমি খুব ভাল।

আশ্চর্য! দুজনের ভাষা আলাদা, জাত আলাদা, শিক্ষাদীক্ষা, দেশ, সংস্কৃতি........ সবেতেই আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবু দুজনে দুজনকে পৃথক বলে ভাবতে পারে নি কখনো।

উত্তরপ্রদেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামের অতিসাধারণ একটি মেয়ে সুন্দরী। আর সুদূর ইংলণ্ডের এক প্রৌঢ় উচ্চশিক্ষিত মানুষ মিঃ আর্চার। কত দেশই না পাড়ি দিয়ে শেষে এসে ধরা পড়ল ওর কাছে।

প্রথম প্রথম হয়ত নিছক কামনা নিয়েই সুন্দরীকে জয় করেছিলেন মিঃ আর্চার। কেন সুদূর ইংলন্ডে তাঁর ছেলে বউ পড়ে রয়েছে। কিছুতেই এডিথ এদেশে আসতে রাজি হয় নি। কোথা থেকে ও শুনেছে কে জানে—এ দেশের জল-হাওয়া খারাপ। অতএব একা তাকেই আসতে হয়েছে। প্রথমে এ দেশে চাকরী করতে আসার খুব একটা ইচ্ছা তারও ছিল না কিন্তু এখন মনে হয় এ দেশে আসা বৃথা হয় নি। এখানে না এলে এ জীবনে ওঁর সুন্দরীকে পাওয়াই হত না। মনে হয় একদিকে কেবল সুন্দরী, আর একদিকে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য। তবু ওর তুলনা হয় না। আজ তার জীবনে সুন্দরী শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, অপরিহার্য!

সুন্দরীর অবস্থাও তাই। দিনান্তে অন্তত একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা না হলে কিছুতেই মন বসে না কাজে। কিন্তু তাই বলে কারখানার মধ্যে অসংযত আচরণ করে নি কখনো। দেখা সাক্ষাৎ—যা কিছু, সব লোকচক্ষুর আড়ালে। প্রথম প্রথম মিঃ আর্চার কিছুটা অসংযমের পরিচয় দিয়ে ফেলতেন, কিন্তু সুন্দরীর কড়া হুকুম তাকে সংযত আচরণ করতে অভ্যস্ত করিয়েছিল।

এখনকার দিনগুলো মন্দ কাটছিল না মিঃ আর্চারের। কেবল মাঝে মাঝে দেশে পড়ে থাকা এডিথ আর একমাত্র সন্তান চার্লসের কথা মনে পড়ে গেলে চঞ্চল হয়ে উঠতেন। এডিথের ওপর তীব্র অভিমানে টনটন করে উঠত বুকটা। অদ্ভুত জেদ ওর! মিথ্যে ভয় পেয়ে একা একা পড়ে থাকবে ইংলণ্ডে—তবু স্বামীর দুঃখ বুঝবে না!

এডিথ আর চার্লসের কথা মনে পড়লে মন খারাপ করে বসে থাকেন মিঃ আর্চার। কাজে আর কোন উৎসাহ পান না তখন। একা একা প্রকাণ্ড বাগানটায় কখনো রাত-দুপুরে পায়চারি করে বেড়ান। কখনো বা অবস্থাটা সহ্যের বাইরে চলে গেলে, বেয়ারাকে দিয়ে ডেকে পাঠান সুন্দরীকে। সুন্দরী কাছে এলেই নিমেষে সব ভুলে যান মিঃ আর্চার। সমস্ত দুঃখ যেন চক্ষের পলকে উধাও হয়ে যায়। তখন মনে হয় ভাগ্যিস এখানে সুন্দরীকে খুঁজে পেয়েছিলেন—তা না হলে যে কি হত কে জানে। সেকথা ভাবতেও ভয় হয়।

কিন্তু তাই বলে চিরদিন তো আর এখানে থাকা যায় না। একটার জায়গায় দুটো কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ শেষ হল। প্রথম তিন বছরের পরই চলে যেতে চেয়েছিলেন মিঃ আর্চার। কিন্তু কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনেক অনুরোধ উপরোধের ফলে আরো তিন বছর থেকে যেতে রাজি হন। কোম্পানীর অবস্থা এখন দিন দিন ভালর দিকে চলেছে। অনেক নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। পৃথিবীবিখ্যাত এই বিদেশী কোম্পানীর ইন্ডিয়ান ব্রাঞ্চ এখন আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। এবার মিঃ আর্চারের বিদায় নেবার পালা।

॥ তিন ॥

শুধু কোম্পানীরই নয়, কোম্পানীর কর্মচারীদেরও অনেক কিছু ভাল করে-ছিলেন মিঃ আর্চার। তাই সেই বড়সাহেবের ফেয়ারওয়েলের সভায় সকলেই আন্তরিক বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছিল। সাহেব নিজেও মর্মস্পর্শী ভাষায় তার শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। চোখ দুটো জলভারে টলটল করছে, মুখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারছেন না। বক্তৃতার পরও মাথাটা নিচু করে বসে রইলেন চেয়ারে। তারপর কত লোকই বক্তৃতা করল—তার বিন্দু-বিসর্গও কানে গেল না সাহেবের।

মাঝে মাঝে কেবল মুখ তুলে এদিকে ওদিকে কী যেন খুঁজছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন। না সকলেই এসেছে—কিন্তু যাকে খুঁজে ফিরছে দুটো তৃষিত চোখ—কই সে তো এল না! সকলকে চোখে পড়ছে তবু দৃষ্টি কেন পরিতৃপ্ত হচ্ছে না? কতবার যে চোখ তুলে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, তার শেষ নেই। সে দৃষ্টি সকলেই বুঝতে পারছে সকলেই জানে কি খুঁজছেন সাহেব, কাকে খুঁজছেন। কিন্তু মিঃ আর্চারের নিজেরই সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই......।

সকলে এসেছে, আসে নি একা সুন্দরী। সকলের সমবেত বিদায় সম্ভাষণ, আর তার পক্ষে চিরজীবনের মত সাহেবকে বিদায় জানানর মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য। সেখানে সুললিত ভাষা ও শব্দের বিন্যাস নিরর্থক। এই দীর্ঘ ছটি বছরে এ সবের কখনো কোন প্রয়োজন হয় নি ওদের দুজনের জীবনে। দেশোয়ালী হিন্দি বলে সুন্দরী, আর চোস্ত ইংরিজি বলেন মিঃ থিওডোর আর্চার। তবে সাহেব অনেক পরিশ্রম করে দুজনের এই মেরুপ্রান্তিক ভাষার ভিন্নতাকে একটা সমঝোতার মধ্যে এনেছিলেন—যেটা সুন্দরীর বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে গ্রহণ করেছে একে অপরের হৃদয়ের বারতা। আজও সেই ভাষাবিহীন ভাবাবেগ দিয়েই সে বিদায় জানাবে সাহেবকে।

কিন্তু সে যে কি কঠিন, তা মর্মে মর্মে সেদিন অনুভব করেছিল সুন্দরী। রাত্রে নিজের বাংলোর সামনে খোলা লনে অশান্ত ভাবে পায়চারি করছিলেন সাহেব, ভোর-রাতেই এখান থেকে যাত্রা শুরু করবেন। সকাল ছটায় দমদম থেকে প্লেন ছাড়বে। এখান থেকে মোটরে একঘণ্টার পথ। মাল-পত্তর সব আগেই জাহাজে পাঠান হয়ে গেছে। সঙ্গে যাবে কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস।

সমস্ত বাংলো এলাকাতেই আজ যেন বিদায়ের বিষণ্ণ সুর বাজছে। সকলেই আজ চুপচাপ। বাংলোর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা খুব আশা করে শেষ ডিনারের টেবিলে মিঃ আর্চারকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবেন ঠিক করেছিল। কিন্তু মিঃ আর্চার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন। আজ আর এসব ফর্মালিটি ভাল লাগছে না। মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে রয়েছে। কেন যে এমন হচ্ছে যদিও সেটা দুর্বোধ্য নয় তাঁর কাছে, তবু একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না—আজ এতদিন পর নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন, এতদিনে এডিথ আর চার্লসের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন.....

যাদের জন্যে দূরে থেকে মানসিক যন্ত্রণায় কত বিনিদ্র রাতই না একা বিছানায় ছটফট করে কাটিয়েছেন—আজ তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। এখন তো তার আনন্দিত হবারই কথা!

......হয়ত তাই হতেন, যদি সেই সঙ্গে সুন্দরীকে চিরদিনের মত জীবন থেকে বিদায় দিয়ে যেতে না হত! আর তার চেয়ে বড়, মেরী। সকলের কাছে মুখে স্বীকার না করলেও তিনি কি করে ভুলবেন যে মেরী তাঁরই সন্তান! সে পড়ে থাকবে এই বনপ্রান্তরে, পৃথিবীর শেষতম প্রান্তে। কেমন করে বাঁচবে মেয়েটা? কী তার ভবিষ্যৎ, তাই বা কে জানে! অথচ তিনি আর কোনদিন ওর কথা জানতে পারবেন না, কাল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের মত দুজনে দুজনের কাছ থেকে হারিয়ে যাবেন! ভাবাই যায় না। কিছুতেই চিন্তার শেষ টানতে পাচ্ছেন না। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব।

মাথাটা আপনা থেকেই নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে মিঃ আর্চারের। প্রকাণ্ড লনটার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত অস্থির পায়ে পায়চারি করে করে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তবু পায়চারি করে চলেছেন, আর এক একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ তুলে দূরে গেটের দিকে তাকাচ্ছেন। এখুনি সুন্দরী আসবে মেরীকে নিয়ে। কিন্তু আজও এত দেরী করছে ও? রাতও তো অনেক হল। এইটুকু তো মাত্র রাত, সব কথা কী আজও বলে শেষ করার সময় পাবেন না মিঃ আর্চার!

—মেরী! চার বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে। নীল চোখ, সোনালী চুল...অদ্ভুত ফর্সা গায়ের রং......! এক এক সময় নিজেও বড় কম বিস্মিত হন না মিঃ আর্চার। কেন যে ঠিক নিজের মতই দেখতে হল মেয়েটা! সুন্দরীর মতও তো হতে পারত মেরী! তা হলে হয়ত মনকে কোন রকমে সান্ত্বনা দেওয়া যেত। এখন মনে মনে আক্ষেপই হয়, এভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা উচিত হয় নি!

মিঃ আর্চার নিজেই মেয়ের নাম রেখেছিলেন—মেরী। এ নামটা ভারতীয়রাও নিজের করে নিয়েছে। এমন একটা নাম রাখতে চেয়েছিলেন যে নামটা দুটি দেশেরই গ্রহণযোগ্য হয়। ঠিক একটি বছর মেরী সুন্দরীর হেপাজতে ছিল, কিন্তু সেই একটি বছর রাত্রে ঘুমতে পারতেন না মিঃ আর্চার। কি যে যাতা খাওয়ায় মেয়েটাকে সুন্দরী, চিন্তা করে শঙ্কিত হন। শিশুকে মানুষ করতে জানে না ওরা। কত যত্ন নিতে হয় ওদের, কত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কিন্তু ওদের জীবনধারণ পদ্ধতি দেখে কেবল হতাশই হয়েছেন এতদিন।

অবশ্য দূরে থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। রাজ্যের যত ভাল জিনিস নিজে কলকাতা থেকে কিনে এনে সুন্দরীকে দিয়েছেন, যেন ভাল করে যত্ন করে মেয়েটাকে। তারপর এক বছর বয়েস হতেই মেরীকে শিলং-এ একটা ভাল কনভেন্টে ভর্তি করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হন। এখানের এই জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যে থেকে ওকে উদ্ধার করতে পেরেছেন—এই যথেষ্ট! এমনি করে ওকে মানুষ করে তুলতে পারলে, তখন আর ওর জন্যে চিন্তার কিছু থাকবে না। লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে উঠলে তখন নিজের দায়িত্ব নিজেই বহন করতে পারবে।

বছরে একবার মেরী সুন্দরীর কাছে ফিরে আসত ছুটিতে। রামাশীষ বিশ্বস্ত লোক, প্রায় নিজস্ব ড্রাইভার, সাধারণত এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ড্রাইভার চাপরাশীরাই হয় সাহেবদের কাছের মানুষ, আপনজন। তার অনেক গোপনীয় খবর রাখে। কিন্তু কখনো বাইরে সে কথা প্রকাশ করে না। তাই তাদের প্রতি আলাদা একটা কৃতজ্ঞতা থাকে সাহেবদের। সাহেব রামাশীষকে পাঠাতেন মেরীকে ছুটিতে সুন্দরীর কাছে নিয়ে আসবার জন্যে। মেয়েকে দেখে সুন্দরী নিজেই অবাক হত! অনেকক্ষণ অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত মেরীর মুখের দিকে—এ মেয়ে কার নিজেই চিনে উঠতে পারত না! ঠিক যেন সাহেবদের মেয়ে, বিশেষত মুখের আদল হুবহু মিঃ আর্চারের মত। এ মেয়েকে নিয়ে কী করবে ও? তা ছাড়া আরো একটা মুস্কিল, মেরী হিন্দী কিছু শেখেনি। সাহেবদের স্কুলে থেকে ইংরিজিকেই মাতৃভাষার মত শিখেছে। মেয়ে যা বলে, মা বোঝে না। আবার মা যা বলে মেয়ে বোঝে না।

শুধু তাই নয়, এই বয়সেই আবার নাক উঁচু স্বভাব হয়েছে মেরীর। চাপাটি আর ছাতু যে খেতে চাইবে না এ মেয়ে, প্রথম দৃষ্টিতেই এটুকু বুঝতে পেরেছিল সুন্দরী। তাড়াতাড়ি বাজার থেকে কেক পাঁউরুটি কিনে আনাল, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না যদি এ সবও না খায় তো কী খাইয়ে বাঁচাবে ওকে? খাওয়া, পরা, শোয়া-বসা, সবই যেন সৃষ্টিছাড়া। কিছুতেই আর মনঃপূত হয় না মেয়ের। সাতদিনেই হাঁপিয়ে উঠল সুন্দরী। তার ওপর আরেক উপদ্রব তো আছেই, মহল্লার ছেলেমেয়েরা সারাদিন দল বেঁধে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেরীর দিকে। কেউ বা কৌতূহল চাপতে না পেরে সুন্দরীকে

প্রশ্ন করে বসে, এ কৌন্‌কার বিটিয়া হো সুন্দরীয়া? মালুম হোই...কই মেমসাহবকো বিটিয়া? প্রশ্ন শুনে সুন্দরী বিরক্ত বোধ করে, না শোনার ভান করে।

কিন্তু সে-কথা শুনে হাসেন মিঃ আর্চার। মেয়েকে দেখে ভয়ে বুক কাঁপে সুন্দরীর, আর মেয়েকে দেখে আনন্দে কি যে করবেন ভেবেই পান না মিঃ আর্চার! একা তিনিই কেবল খুশি হয়েছেন। রাতে মেয়েকে সঙ্গে করে সুন্দরী আসে সাহেবের বাংলোতে। এসেই দৌরাত্ম্য শুরু করে মেরী —যেন এতক্ষণে ঠিক জায়গায় ফিরে এসেছে। সুন্দরীর সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারে না মেরী, কিন্তু মিঃ আর্চারের সঙ্গে কেমন অনর্গল কথা বলে চলে। তাই দেখে হতভম্বের মত ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে সুন্দরী।

এক-একদিন মেরীকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে কলকাতা যান মিঃ আর্চার। রামাশীষ গাড়ি চালায় সামনে তাকিয়ে, কিন্তু নজর থাকে পেছনে। সমস্ত পথটা মেরীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকেন সাহেব। সোনালী চুলগুলোকে সস্নেহে পেছনে ঠেলে দিতে দিতে কত যে আদর করেন মেয়েকে, কতবার যে বুকের সমস্ত উত্তাপ উজাড় করে চুমু খান ওর নরম গালে—বলে শেষ করা যায় না।

কিন্তু কলকাতায় পৌঁছেই সাহেব চলে যান হেড অফিসে কোন কাজে। কিন্তু ওঠেন কোন বড় হোটেলে। আর রামাশীষের ওপর দায়িত্ব দিয়ে দেন মেরীকে নিয়ে সারা কলকাতার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো দেখানোর। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এমনকি কোন্ ভাল হোটেলে মেরীকে খাওয়ানো উচিত, সে সম্বন্ধে পর্যন্ত নির্দেশ দিয়ে দেন। কিন্তু সঙ্গে থাকেন না। দেখা হয় আবার ফেরার সময়। কোন একটা বড় পোষাকের দোকানের সামনে অপেক্ষা করেন মিঃ আর্চার। সেখান থেকেই তুলে নেয় রামাশীষ। বড় বড় কয়েকটা পোষাকে ভর্তি প্যাকেট হাতে নিয়ে চকিতে গাড়িতে উঠে পড়েন। তারপর মেরীকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে টেনে নেন বুকের মধ্যে...। গাড়ি তৎক্ষণাৎ ফেরার পথ ধরে।

...হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলেন মিঃ আর্চার। কখন যে সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছে ওর চোখের সামনে এতক্ষণ খেয়ালই করেননি। নিজের চিন্তার বাঁধনগুলো ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। চকিতে ফিরে এলেন বাস্তব পৃথিবীতে—দুচোখে জল সুন্দরীর কাঁধে ঘুমন্ত পাঁচ বছরের মেরী। চেহারাটা ইদানীং খুব খারাপ হয়ে গেছে সুন্দরীর। দেখে মনে হয় যেন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আগের সে-লাবণ্য আর তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই দেহে। চোখদুটো বসে গেছে কোটরে। গায়ের রং যদিও খুব একটা ফর্সা নয় সুন্দরীর, তবু এতটা কাল ছিল না কোনকালে। মনে হয় কে যেন ওর সর্বাঙ্গে কালি ঢেলে দিয়েছে।

কিছুদিন আগে যক্ষ্মারোগ থেকে সেরে উঠেছে সুন্দরী, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি। চন্দ্রকোণা টি-বি স্যানেটোরিয়ামে ওকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন সাহেব। প্রথমটা এই সাহেব-ছাড়া ব্যবস্থায় অস্বস্তি পেয়েছিল সুন্দরী। কিন্তু শেষপর্যন্ত সাহেবের কথা ঠেলতে পারেনি। সেখানে প্রায় সাতমাস থাকতে হয়েছিল ওকে। রোগ সেরে গেছে ঠিকই কিন্তু শরীরটাকে আর আগের মত সারিয়ে তুলতে পারেনি।

মিঃ আর্চার কতদিন বলেছেন, একটু নিজের ওপর নজর দাও সুন্দরী। আর চাকরীটা ছাড়—টাকার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

এ-কথার কোন প্রতিবাদ করেনি সুন্দরী, চুপ করেই থেকেছে। কী হবে মিথ্যে বোঝাবার চেষ্টা করে যে তা সম্ভব নয়। সাহেব চিরদিন ওর কাছে থাকবে না। একদিন-না-একদিন ফিরে যাবে দেশে। সেদিন উপার্জন না থাকলে চলবে কী করে ওর? নিজের অপদার্থ স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, বাড়ি নেই, ঘর নেই, সঞ্চয় অর্থও নেই যে বসে বসে খাবে। তার ওপর আবার মেরী রয়েছে। তাকে প্রথম থেকেই যেভাবে মানুষ করে তোলা হচ্ছে, সেকি গরীবের সংসারে খাপ খাবে! অতএব চাকরী ছাড়া যে একদিনও চলবে না ওর।

অবশ্য সাহেবও অবুঝ নয়। যাবার আগে সুন্দরীর নামে স্থানীয় পোস্ট-অফিসে নগদ পাঁচ হাজার টাকা জমা করে দিয়েছেন। সুন্দরীকে বলেছেন, এছাড়াও যখনই টাকার দরকার হবে, তখুনি যেন বিলেতে সাহেবের ঠিকানায় চিঠি লিখে জানায়। তাছাড়া, আজ মেরী ছোট আছে কিন্তু একদিন ও বড় হবে, বিয়ে দেবার বয়েস হবে। সে-সময় যেন সাহেবকে একটা খবর দেয়। সেদিন যদি বেঁচে থাকেন তবে বিয়ের সমস্ত খরচের দায়-দায়িত্ব তাঁর—তিনি টাকা পাঠিয়ে দেবেন। মেরীর জীবনটা যেন টাকার অভাবে নষ্ট না হয়ে যায়।

দুজনেই মৌন, একসময়। দুজনেই দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কতক্ষণ বোধহয় নিজেদেরই হুঁশ ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সাহেব নিজেই এগিয়ে এলেন ওর দিকে। গভীর আবেগে কি যেন বলতে গিয়েও থমকে গেলেন...কার যেন পায়ের শব্দ হঠাৎ ভেসে এল কানে?

রামাশীষ জিজ্ঞেস করতে এসেছিল—আগামীকাল সকালে ঠিক কখন গাড়ি নিয়ে আসবে?

সাহেব ভদ্রলোকটি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, সকাল না, ভোর। ভোর পাঁচটায় তিনি এখান থেকে যাত্রা করবেন। তারপর রামাশীষকে বিদায় করে সুন্দরীকে সঙ্গে করে চলে গেলেন নিজের বাংলোর মধ্যে।

ভোর পাঁচটার কিছু আগেই সাহেবের বাংলোর সামনে গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল রামাশীষ। প্রকাণ্ড বাংলোর চত্বরটা তখনও যেন গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড সেটাকে ঠিক শ্মশানের মত দেখাচ্ছে। ঝাঁকড়ামাথা কৃষ্ণচূড়া আর দেবদারু গাছের শাখাগুলো ফাগুনের হাল্কা হাওয়ায় থেকে থেকে অল্প অল্প নড়ছে। আর সব নিঝুম নিস্তব্ধ।

একটু পরেই সাহেব তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। এই একটি রাতের মধ্যেই যেন আরো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন মিঃ আর্চার। চোখমুখ শুকনো, চুলগুলো উসকো-খুসকো। টাইটা আলগা হয়ে রয়েছে। কিন্তু সাহেব যে কখনও কাঁদতে পারে এমন কথা ভাবতে পারেনি রামাশীষ। মিঃ আর্চার তখন অবোধ শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কিছুতেই যেন নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

বাংলো থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি ভেবে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। তারপর পেছন ফিরে তাকালেন বারান্দাটার দিকে। এতক্ষণ রামাশীষ দেখতে পায়নি সুন্দরী ঘুমন্ত মেরীকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। সাহেব কী যেন একটা ইসারা করতেই ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সামনে। সুন্দরীর চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে রয়েছে।

সাহেব ওর কোল থেকে ঘুমন্ত মেরীকে তুলে নিলেন—শেষবারের মত আদর জানাতে। দুহাত দুটো বাহু দিয়ে গভীর আবেগে চেপে ধরলেন নিজের বুকের মধ্যে। চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তুললেন। হঠাৎ মেয়েকে আদর থামিয়ে এক হাত বাড়িয়ে দিলেন সুন্দরীর দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রামাশীষের উপস্থিতিটা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল সুন্দরী। সাহেব বোধহয় এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলেন ওর অস্তিত্ব। একটু অপ্রস্তুত হয়ে সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে মেরীকে আবার ওর কোলে ফিরিয়ে দিয়েই আর তাকালেন না পেছনে। এক লাফে উঠে বসলেন গাড়ির মধ্যে, সশব্দে দরজাটাকে টেনে বন্ধ করে দিলেন নিজেই।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই রেখেছিল রামাশীষ। সাহেবের কাছে যাত্রা শুরুর মৌন নির্দেশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। দেখতে দেখতে গাড়ি বাংলো ছাড়িয়ে, বড় গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর গতিবেগ বাড়তে বাড়াতে সামনের বড় বাঁকটার আড়ালে হারিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

পথের দুপাশে
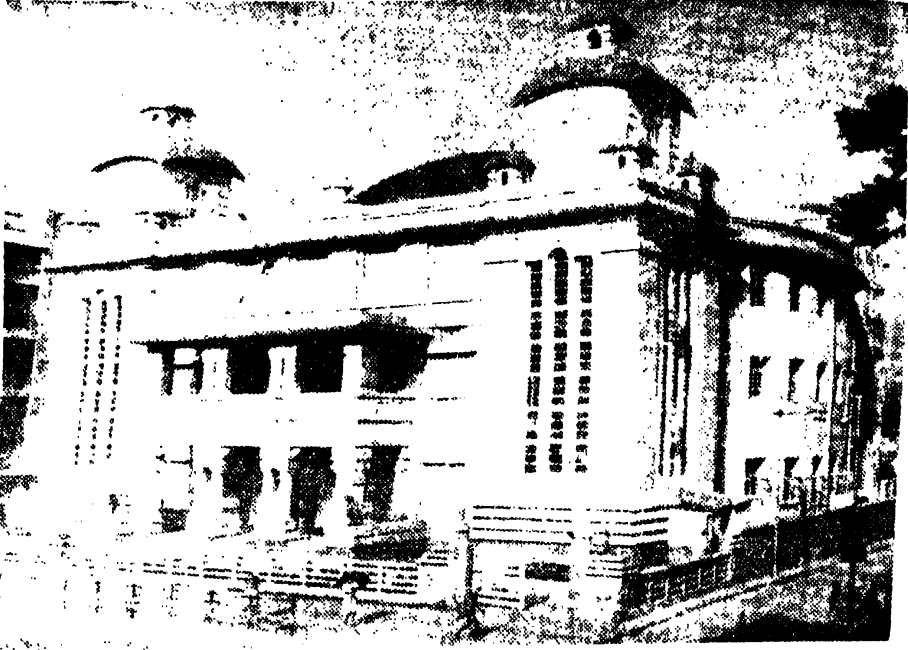
মহাজাতি সদন

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার বুকে যে সমস্ত সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, মহাজাতি সদনের নাম তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নেতাজি সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্ন ও আদর্শের বাস্তব রূপ দেখতে চেয়েছিলেন এই ভবনে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কয়েকজন নেতার আন্তরিকতায় তা সম্ভবপর হয়েছে। সর্বভারতীয় সংস্কৃতির আশ্চর্য মিলনক্ষেত্রে এই ভবনটির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। এর কার্যক্রম বহুধারায় বিভক্ত। বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীজয়নকণ্ঠ নিয়োগীর প্রচেষ্টায় এবং আন্তরিকতায় সমস্ত বিভাগের উন্নতি ঘটছে যেমন ধীরে ধীরে, তেমনি জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।

মহাজাতি সদনের সবথেকে বড় আকর্ষণ শহীদ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতির সংগ্রহ। বর্তমানে ২১৮ খানি শহীদ ও নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি সংগৃহীত হয়েছে। অছিপরিষদ কার্যভার গ্রহণের পর শহীদ, দেশভক্ত ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি সংরক্ষণের এই ব্যবস্থা করেন। সদনে সতীন সেন স্মৃতি সমিতি সংগৃহীত ৯০টি প্রতিকৃতির ১৯৫৮ খৃঃ ২৫ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আবরণ উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন : "ইতিহাসখ্যাত মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে এ দেশবাসীদের ত্রুটি আছে। যাঁহারা দেশের সেবায় জীবনদান করিয়াছেন, দেশবাসী তাঁহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না এবং তাঁহাদের কথা মনে রাখেন না। সুতরাং মহাজাতি সদনে শহীদ ও নেতৃবৃন্দের চিত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা উত্তম হইয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার স্থান হিসাবেও ঐ সদন অপেক্ষা উপযুক্ত কোনও স্থান হইতে পারে না। স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাজাতি সদনের নির্মাতা এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে বিশ্বের লোক ঐ স্থানে আসিয়া ঐ সকল বীর সংগ্রামী ও নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহাদের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন।" সংগৃহীত প্রতিকৃতি সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'মৃত্যুঞ্জয়ী'।

মহাজাতি সদন গ্রন্থাগারে আছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার গ্রন্থ। এর নাম 'বিধানচন্দ্র গ্রন্থাগার'। বহু শিক্ষার্থী এবং গবেষক এখানে নিয়মিত পড়াশুনা করেন। বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রায় ২৭০০ গ্রন্থ এখানে দান করা হয়েছে।

সদনের তিনতলায় উত্তরদিকের সেমিনার কক্ষটিতে বক্তৃতা, আলোচনা সভা, কথিকা, পাঠচক্র নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় এই কক্ষটি মাঝে মধ্যে সরব হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষ যদি এই সমস্ত আলোচনাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহলে একটি মূল্যবান কাজ হবে। বর্তমানে এই সেমিনারে অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী 'মহাভারতে অপধর্ম' বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা করে থাকেন।

মহাজাতি সদনের সবথেকে বড় আকর্ষণ গান্ধীজি ও নেতাজির জীবনের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকচিত্রের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী। নেতাজির ও গান্ধীজির রচিত পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্রও সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতি বৎসর এখানে স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, শহীদ দিবস, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, সদনের প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতি বৎসর বিপুল জনসমাগমের মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। সদনের সামনে নেতাজি ও রবীন্দ্রনাথের মর্মর নির্মিত দুটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হবে। মূল প্রেক্ষাগারটির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রেক্ষাগারের অভ্যন্তরভাগের ব্যবস্থা আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত। বর্তমানে এখানে ১২০৬টি আসন আছে। আসন সংখ্যা আরও ২১৪টি বাড়ান হচ্ছে। রবীন্দ্র সদনের থেকে এখানকার আসনসংখ্যা অনেক বেশি। যদিও মহাজাতি সদন নির্মাণের সামগ্রিক ব্যয় রবীন্দ্র সদনের ব্যয়-পরিমাণ থেকে অনেক কম। প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে উপরে আছে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় চিত্ররূপ। গ্রন্থাগারের ছাত্র, গবেষক এবং বিবিধ অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিদের জন্য একটি সুন্দর ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের বহু স্বপ্নের মধ্যে একটি ছিল দেশবাসীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মননশীল জীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ একটি ভবন। তারই বাস্তব রূপ আজকের মহাজাতি সদন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে

আরও দু'জন বিশিষ্ট বাঙালী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম।

সুভাষচন্দ্র তখন দীর্ঘ কারাবাস ও অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন (১৯৩৭ খৃঃ)। সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। ৩৮।২ এলগিন রোডে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত হল 'সুভাষ কংগ্রেস ফান্ড'। সুভাষচন্দ্রকে লক্ষাধিক টাকার তোড়া উপহার দেওয়ার জন্য সংবাদপত্র মাধ্যমে আবেদন জানান শ্রীমিত্র। সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ডে অর্থ-সাহায্যের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সম্পাদক ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। কোষাধ্যক্ষ কুমার দেবেন্দ্রলাল খান ও বসন্তলাল মুরারকা।

অর্থসংগ্রহের কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। সুভাষচন্দ্র ১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর জমি ইজারা নেওয়ার জন্য কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করেন। ১৯৩৮ খৃঃ ইজারার আবেদন মঞ্জুর হয়। সুভাষচন্দ্র গৃহনির্মাণের নকসা প্রস্তুত করলে কর্পোরেশন অনুমোদন করে ১৯৩৮ খৃঃ ২৪ নভেম্বর।

১৯৩৯ খৃঃ ১৯ আগস্ট মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে বলেন :

আমার বিশ্বাস, য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাঙলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানা দিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল দীর্ঘ যুগের অজগর নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সজীবতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্বমানবের পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাঙলা দেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহামনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল। আচার ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাঙলা দেশেই সর্বপ্রথম উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্প কালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাঙলা ভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবন সঞ্চারে, সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে, নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাঙলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের দীপ্তশুভ্রতা লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণ-চক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হল। গীতকলা আজ এই বাঙলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার করে নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে, তার আশুফলের বিচার করবার সময় হয় নি। কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নব নবোন্মেষের
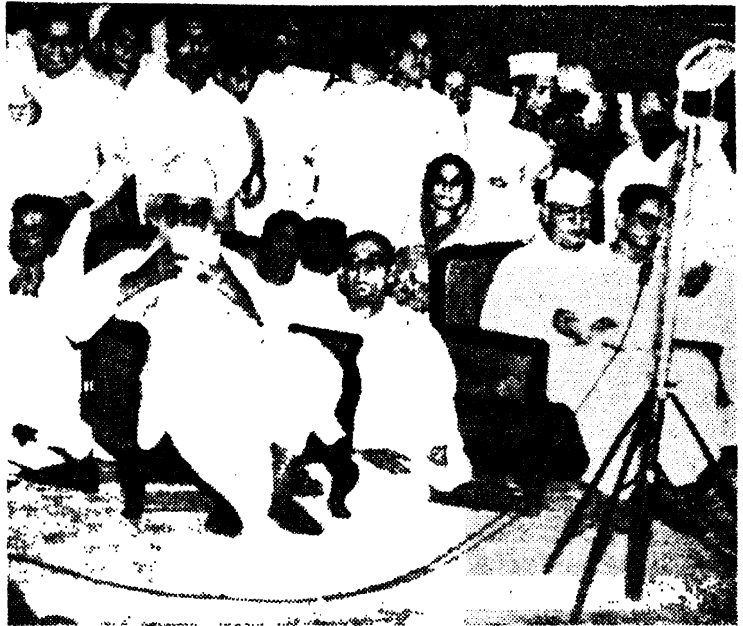
ভিত্তিস্থাপনানুষ্ঠানে অভিভাষণ দানরত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাঙলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হ'তে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না, বহুদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নব যুগের সাড়া দিতে বাঙলাদেশ প্রথম হ'তেই জড়তা দেখায় নি, বাঙলাদেশের এই গৌরব এবং এই সত্য পরিচয়। একথা অগোচর নেই যে, একদা রাষ্ট্রমুক্তিসাধনার সর্বপ্রথম কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাঙলাদেশ, এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারাপ্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন, তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বাধা-বন্ধনের মুখে যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশেই এ রকম ঘটে নি। এ অধ্যবসায়কে ফলের দ্বারা বা শাস্ত্রবুদ্ধির আদর্শে বিচার করব না, বিচার করব মুক্তির জন্যে দুঃসহ বেদনার মূল্য অনুসারে। বাঙলাদেশে সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ সুদীর্ঘকাল কারানির্বাসনে আপন দীপ্তি নির্বাপিত করেছে, জানি সেইজন্যে আজ বাঙলাদেশের আকাশ অনুজ্জ্বল, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, যে-মাটিতে এদের জন্ম, সেই মাটিতে দুঃখজয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে তারা পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সমাহিত হয়ে ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে।

আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাঙালী জাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে-শক্তি শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি

সংশয়কন্টকিত। চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাঙলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তিরূপ গ্রহণ ক'রে বাঙালীকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাঙলায় যে জাগ্রত হৃদয়মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস-বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাঙলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদ-বুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক, এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সঙ্কীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হ'তে থাক—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক
হে ভগবান।

"MAHAJATI SADAN"

Laying of Foundation Stone

by

Viswa-Kavi Rabindranath Tagore

19th August, 1939

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান।।

সেই সঙ্গে এ-কথা যোগ করা হোক—বাঙালীর বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালীর বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালী স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।

২রা ভাদ্র, ১৩৪৬
কলিকাতা

ঐ অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

"বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেক দিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন, সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীকস্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য হয়নি, পরিশেষে, আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ আজ বপন করাতে পারছি, যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব।

আজকার এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা আপনা-আপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, যার দ্বারা আমাদের

ধর্ম ও কৃষ্টি, সংস্কারের ভিতর দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডি মানেনি—এমনকি জাতীয়তার গণ্ডিও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন, রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন, তা কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি? আমরা জানি যে, আমরা তাঁদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

নবজাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্মা যখন 'বহু'-র মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে, একদিকে রাষ্ট্র এবং অপরদিকে সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ভ হল—রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব। সেই বিপ্লবের সূচনাও এই ভূমিতে—যেখানে একদিন ধর্ম-বিপ্লবের ও কৃষ্টি-বিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার) জন্ম হয়। কুড়ি বছর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়—সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, স্বদেশীর ও বিদেশী-বর্জনের যুগ। তারপর একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপরদিকে আমলাতন্ত্রের দমন-নীতি এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করলে যে-দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে আত্মসংযম হারিয়ে ইতিহাসের চিরপরিচিত পন্থা—সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করলে। দশ বছর অতীত হতে না হতে, আমরা পুনরায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম—"অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের" অধ্যায়।

আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরা ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি, যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই, যে-নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্জন করেছিলাম পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা, আমরা কি গণআন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্কবিতর্ক আমি শুরু করব না—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সাফল্য লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা তুচ্ছ আপোস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা—হেলায় ছেড়ে দেবে না।

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়! আমরা চাই, ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক নতুন সমাজ ও এক নতুন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বতকণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ-পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে-সমস্ত কথা, যে-সমস্ত চিন্তা, যে-সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে—তা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তিস্থাপনা করুন। যে-সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে, এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"

১৯৪১ খৃঃ অকস্মাৎ ভারতবর্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ঘটে। সৌধ নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা চলছিল। সুভাষচন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ হলে এই নির্মীয়মান ভবনটিও ক্রোক করা হয়।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই ভবনের কোন স্বার্থ জড়িত নেই—সুতরাং এই আদেশ প্রত্যাহার করা হোক—এই মর্মে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন শরৎচন্দ্র বসু এবং নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য হয়। গৃহনির্মাণের কাজ বন্ধ থাকে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু করা হয়। ১৯৪৮ খৃঃ ৩০ জুন মামলার রায় ঘোষিত হয়। রায়ে বলা হয়, যেহেতু মহাজাতি সদন জনগণের সম্পত্তি সেহেতু এটি ক্রোক করা যায় না।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহাজাতি সদনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকরী করে তোলবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেওয়া উচিত বলে উপলব্ধি করেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেশের মঙ্গল-কাজে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। সুভাষ-চন্দ্রের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তাঁর ইচ্ছা ছিল আন্তরিক। ১৯৪৯ খৃঃ বিধান-সভায় মহাজাতি সদন আইন পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫৮ খৃঃ কাজ শেষ হয়। 'মহাজাতি সদন আইন' অনুসারে অছি পরিষদ গঠিত হয়। প্রথম অছিপরিষদের সদস্য ছিলেন : শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীশংকর-প্রসাদ মিত্র, শ্রীঈশ্বরদাস জালান, শ্রীশৈল-কুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, কলকাতার শেরিফ, বিধানসভার অধ্যক্ষ, কলকাতার মেয়র এঁদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

মহাজাতি সদনে বিধানচন্দ্র গ্রন্থাগারে পাঠকদের একাংশ

১৯৫৮ খৃঃ ১৯ আগস্ট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে মহাজাতি সদনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : "এই মহাজাতি সদন স্থাপনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহা-পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ করতে হলে আমাদের প্রয়োজন হল কঠোর পরিশ্রম করা। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নয়নের ফলেই শুধু জাতীয় উন্নয়ন সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। আমাদিগকে দ্বেষ হিংসা, নীচতা, বিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে হবে। আমাদের এমন এক সমাজ গঠন করতে হবে যেখানে একজন আর একজনকে নিয়ন্ত্রিত করবে না, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের উন্নতির সমান সুযোগ পাবেন, তবে তা' অন্যের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করবে না বরং একে অপরের ব্যক্তিত্বকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেবে,

এই মহাজাতি সদন যাঁরা স্থাপন করেছেন, তাঁরা আমাদের উপর একটি মহান জাতি গঠনের ভার অর্পণ করে গিয়েছেন। আমরা কি সে-ভার গ্রহণে উপযুক্ত? আমাদের সম্বল কেবল আমাদের জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। অতীতের কীর্তিই আমাদের অবলম্বন, কিন্তু সকল মহান কর্মেই চাই নিয়মানুবর্তিতা। বাঙালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ এবং সেই ভাবাবেগের দ্বারা তাঁরা কখনও কখনও অসাধ্য সাধনও করতে পারেন। কিন্তু এই ভাবাবেগ যদি নিয়ন্ত্রিতভাবে কার্যকরী না হয়, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যদি আমরা কাজ করতে না পারি, তবে পাহাড়ী নদী যেমন বাঁধ ভেঙে কূল ছাপিয়ে উঠে চারিদিকের গাছপালা, বাড়ী ঘর, মানুষ সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং মহাজলপ্লাবন সৃষ্টি করে, জাতির মধ্যে অসংযত উত্তেজনা তেমনি আমাদের সহায়-হীন করে দুর্বল করে তুলবে।

এই গৃহ হোক সমগ্র জনসমাজের সকল শুভকর্মের প্রাণকেন্দ্র। তাঁরা যেন এখানে ভারতের মনুষ্যত্ব এবং জাতীয়তার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য জ্ঞান ও আলোক খুঁজে পান। তাহলেই এর মহাজাতি সদন নাম সার্থক হবে।"

আমার বাবাকে আমি আমার নিজের চেয়েও ভালবাসি। মাকেও কিছু কম ভালবাসি না। কিন্তু সেটা বলতে গেলে কিংবা ভাবতে গেলে আমার মাথাটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। বাবাকে কথাটা বলতে পারি স্বচ্ছন্দে, কতবার বলেও ফেলেছি। কিন্তু মার কথাটা যদি খোলা মাঠে চুপি চুপি বাড়ী থেকে পালিয়ে গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করতে পারতাম!

ভেবেছি খাবার টেবিলে আমাদের শুধু তিনখানা চেয়ার থাকবে। বাড়তি চেয়ারখানায় কি হবে? কিচ্ছু হবে না. সেটাকে টান মেরে দূর করে দেব। আর বাড়তি লোক এলে পর মেজেতে আসন পিঁড়ি করে বসব। নেমন্তন্ন খেতে এলে কোথায় বসবে? বসুক না আসন পিঁড়ি করে। তিনটি চেয়ারের বেশি একটি চেয়ার কিছুতেই কিন্তু চাই না আমি।

চারজনের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারটি সত্যি আমায় পাগল করে তুলেছে। কেমন করে যে সেটি সরাব মনে মনে তাই নিয়ে অনেক জল্পনা করেছি, ভেবেছি চেয়ারটি সরালেই সেই মানুষটি, তার আনুষঙ্গিক খাট, বিছানা খুঁটি-নাটি সবই বুঝি ম্যাজিকের মত অদৃশ্য হবে। শোন না সেদিন কি কাণ্ড করেছি! দুপুর বেলা আমি একা বাড়ীতে, যোগেনের মাও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে, জানলার পাশের নিমগাছটায় দুটো চড়ুই খড়কুটো নিয়ে ঘরবাড়ি বানাচ্ছে। সেদিকে চেয়েই বিছানায় চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। জ্বর হয়েছে বলে সেদিন স্কুলে যাওয়া হয়নি হঠাৎ সেই চেয়ারখানার কথা মনে হল।

ভাবলুম অবাঞ্ছিত জিনিসটিকে বিদায় করবার এই ত উপযুক্ত সময় ঠেলতে ঠেলতে চেয়ারটাকে নিয়ে এলাম কোণের ফালি বারন্দায়। তারপর বাবার হাতুড়ি দিয়ে সেটাকে পিটতে লাগলাম। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেয়ারটাকে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছি তবু সেটার একফোঁটা ক্ষতিও করতে পারিনি।

আঙুলগুলো আমার ব্যথায় টনটন করেছে তবু চেয়ারটা যেমন ছিল দেখি তেমনিই রইল।

কল্পনায় দেখি জানলার ধারে পেছন করে চেয়ারটিতে সেই মানুষটি বসেছে। মুখোমুখি চেয়ারে খাবার টেবিলে মা বসে খাচ্ছেন। আমি আর বাবা বসি মুখোমুখি, কিছুক্ষণ খাওয়ার পর ওদের হুঁশ হল আমি তখনও হাত গুটিয়ে বসে আছি।

—বারে বাবাকে ফেলে খাব কি করে?

মাছের কাঁটা চিবুতে চিবুতে মা বল্লেন—তুমি ছেলেমানুষ। তোমার আবার অত খেয়াল কেন? আমি ত খাচ্ছি, আমি কাঁদ কাঁদ গলায় বলি—তুমি ত রোজই খাও। খেতে খেতে মা বিষম খেলেন, আর সেই মানুষটি জল খাইয়ে মাকে পাখার বাতাস দিয়ে কটমটিয়ে আমার দিকে চাইল।

চাইলেই বা কি! আমি তেমনি বসে রইলুম। যোগেনের মাকে বলি—খাওনা ছাতে, বাবা হয়ত মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওরা আবার চুপচাপ খাওয়া সুরু করল, মার মুখটা কেমন লালচে রঙের মনে হল।

লোকটি বল্লে—মেয়ে তোমার চমৎকার মানুষ হচ্ছে অপর্ণা।

মা বল্লেন—ও ত আমার মেয়ে নয়।

বলব কি? আমার বুকটা যেন যন্ত্রণায় দুমড়ে গেল। মা কিন্তু কিছু না বলেই হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন। তাই ত বলছি চেয়ারটার ওপর গায়ের ঝাল মেটাতে গিয়ে আমি সেই লোকটিকেই সরাসরি যেন চোখের সামনে দেখেছি। কিন্তু তার ক্ষতি করবার সাধ্য কই আমার? বরং আমার আঙুলগুলোই থেঁৎলে গেছে। তখন আরও রাগ বেড়েছে; গাটা আরও গরম হয়ে উঠেছে, চোখ জ্বালা করেছে। মনে হয়েছে মজা পেয়ে সেই লোকটা দূর থেকে আমার দিকে কেমন অবজ্ঞার হাসি হাসছে। কিছু করতে না পেরে তখন আমার ভয় হল। সত্যি যদি ওরা টের পেয়ে যায় কিংবা আমার মনের ভাবনার হদিশ পায়।

আমি তখন হাতের কাছে পুরোন ছেঁড়া কাগজ, ময়লা কাপড় যা পেলাম তাই দিয়ে চেয়ারটা ঢেকে রাখলাম।

এর পরের খবর কিছুই জানি না, আমি তখন জ্বরে বেহুঁশ। ভাল হয়ে দেখি চারখানা চেয়ার টেবিলের চারপাশে তেমনি সাজান। বাঁচলুম বাবা ভাগ্যিস কেউ জানতে পারেনি আমার দৌরাত্মের কথা।

শুধু বাবাকে চুপি চুপি বলেছি।

অন্ধকার ছাতে বাবার কোলের কাছটিতে বসেছিলাম। আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বাবা যেন থমকে গেলেন।

মনে হল বাবা রাগ করলেন। ভীরু গলায় বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বলি— এরকম আর করব না কী বল বাবা?

বাবা আমার কপালে চুমু খেয়ে বল্লেন— এসব নোংরামি আমার খুকুমা করে না।

তারপর আকাশের তারার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন—এবার লক্ষ্মী মেয়ের পড়ার বই হবে এই তারাভরা আকাশটা, আচ্ছা এই যে হাতের কাছে জ্বলজ্বল করছে নয়ত ঐ উত্তরে মিট মিট করছে ওটা কি বলত? বলতে পারলে প্রাইজ পাবে। এক ঝাঁক পাখী দক্ষিণ আকাশে উড়ে গেল, বাবা বলেন, জলার খোঁজে চলেছে হাঁসেরা। যতক্ষণ ওরা খুঁজে পাবে না, ততক্ষণ ওদের ডানায় শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

বেশ রাত করে নিচে নেমে এলাম। মা বাবাকে খুব বকলেন—কেন আমার দুর্বল শরীরে শুধু হিম লাগান হয়েছে।

আমি বলি—বাঃরে আমি যে গ্রহ আর তারার তফাৎ বুঝেছিলাম। তুমি থাকলে তুমিও চিনতে পারতে মা, বাবা কী সুন্দর বোঝাতে পারে যে।

মা একটিও কথা আর বল্লেন না, আমার কথা যেন কানেই শুনলে না। বাবা

সেই লোকটিকেই মনে মনে মুণ্ড করি। নিশ্চয়ই সে আমার বিষয়ে কিছু বলেছে। মা আমাকে আদর করেন সেটা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। জোয়ারের মত্ততার মত একএকদিন মা ফেটে পড়েন।

আমি নাকি ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মত নই। বড় বেশী পাকা হয়ে গে কেন আমার দৃষ্টি হবে অমন সন্ধানী

'এ-রকম আর করব না, কি বল বাবা?'

একটু কাশলেন। দু'চারবার পায়চারি করলেন তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ খুব কাঁদলাম। কেন কাঁদি তা ঠিক জানি না। মনে হল মা বলেছেন আমি মার মেয়ে নই। সবাই যদি একবাক্যে সেই কথা মেনে নেয়। কিন্তু যেকথা যেই বলুক একথা ত সত্য— যে আমার মনে একটুও আনন্দ নেই। আমার পড়তেও ভাল লাগে না, খেলতেও ভাল লাগে না, শুধু চুপচাপ নিজের ঘরে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকতে ভালবাসি, সব-চেয়ে আনন্দ হয় যে রাতে বাবা আমায় ওপরের ন্যাড়া ছাতে চুপিচুপি নিয়ে যান তারা দেখাতে। আমার দিনগুলো যেন একটানা নদীর স্রোতের মত। ভাটার পর যেই জোয়ার এল অমনি শুনি নানান সমালোচনা।

চেরা চেরা গলায় মা বাবাকেই সরাস প্রশ্ন করেন। মার তীক্ষ্ণ স্বর রুক্ষ চাহ দেখে একটা জমাট ব্যথা আমার বুকটা দুমড়ে খেঁৎলে ফেলতে চায়।

বাবা একটা হাত আমার কাঁধের ওপ রেখে আর একটা হাতে থুতনিটা তু ধরেন।

বলেন—দেখ দেখ অপর্ণা, ঠিক তোম মেয়ে, তেমনি চিবুক, তেমনি বাঁ গালে তি আর পাতলা চাপা ঠোঁট। আমার এলবা তোমার এই বয়সের যে ছবিটা আছে ত সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম। আমার ম থ্যাবড়া নাক ত মেয়েটা পায়নি, আর এ আলকাতরা কালো রঙ।

নাঃ ভগবানের একচোখামিরও নেই, অবিকল সেই তুমি।
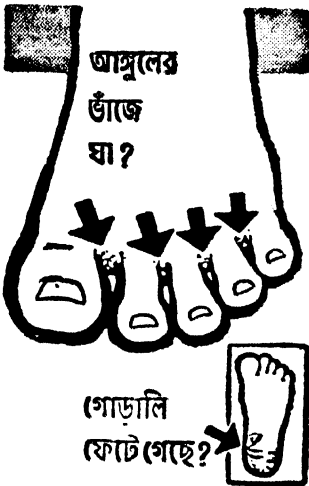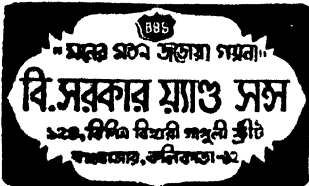
দু হাত দিয়ে মা মুখ ঢাকলেন. আর আমি মুখ ঢাকলাম বাবার বুকে।

শুনলাম বাবা অতি ধীরগলায় বলছেন—খুকুমা আমার বুকে মুখ না ঢেকে, মার খালি বুকটায় একবার মাথা দাও না।

বাবাকে তখন আশ্চর্য সুন্দর, আর বিরাট পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। এই উত্তুঙ্গ পর্বত ছেড়ে আর কোনও সমতলের দিকে আমার দৃষ্টি পড়বে না ; একথা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

কান্নায় আমার সারা মুখ ভিজে গেল বাবা মিথ্যে কথা বলছেন। কালো আর কাতরো না ছাই। বাবা আমার হিমালয় পর্বত, তেমনি মহান তেমনি বিরাট, সাধ্য কি আর কেউ তার নাগাল পায়।

আমার কোঁকড়া চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে হঠাৎ বাবা বললেন—চল না অপর্ণা, এ বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আর কোথাও যাই। তুমি, আমি আর খুকু আর কেউ থাকবে না আমাদের মধ্যে।

একবার পরখ করে দেখ না একটু ভালবাসা, স্নেহ, শান্তির নীড় সত্যি আমরা গড়ে তুলতে পারি কি না।

উত্তেজনায় বাবার গলার স্বর কাঁপছে, ওরা মুখোমুখি দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

আমার বুকে কাঁপে, চোখে জল এসে পড়বে মনে হয়।

আমি স্পষ্ট দেখছি মার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, মুখের রঙ হয়েছে সিঁদুরপানা, নাকের পাটা কাঁপছে। বাবার একটা হাত মার কাঁধের ওপর আলতোভাবে পড়েছে। হঠাৎ মা স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। ঠোঁটের কোনায় বিদ্রুপের হাসি, বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়েছেন জানলার বাইরে।

মা বল্লেন—অসম্ভব হয় না। চারজনকে বাদ দিয়ে শুধু তিনজনের খেলো সংসার। চারজন আছি বলেই ত এত বাড়বাড়ন্ত, মস্ত লোকজন, খুকুর দামি দামি জামা কাপড় আর অত ভাল স্কুল...

আর তিনজনে ?

একতলার এঁদো ঘর বড় জোর দেড় খানা ঘরওয়ালা বিশ্রী পাড়ায় সস্তার ফ্ল্যাট ঠিকে ঝি আর সস্তার বাংলা স্কুলে মেয়েকে পড়ান।

বাবা বল্লেন—তবু ভাল।

জানলার ধারে সরে পেছন ফিরে মা দাঁড়ান, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে মা কাঁদছেন, আড়াল করলে হবে কি ; কান্নার ভারে মার শরীর কাঁপছে।

পরদিন আপিস থেকে সবাই ফিরেছে কেবল বাবাই তখনও বাড়ী ফেরেননি...মা আজ আমায় একটা সুন্দর জামা কিনে পরিয়ে দিয়েছেন, আমার আজ খুব ছুটো-ছুটি করে বেড়াতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ ট্যাক্সির আওয়াজ পেলাম। খুব মশমশিয়ে বাবা ঘরে ঢুকলেন তারপর হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি।

বল্লেন—খুকুমা, শীগগীর তোমার বইখাতা, জামাকাপড় সব গুছিয়ে নাও। কলকাতায় বাড়ি পাওয়া কি চাট্টি কথা ! তবু দেখ দেখি অসাধ্য সাধন করে ফ্ল্যাট জোগাড় করেছি। এক বন্ধু বিদেশ গেছে, বছর খানেক ওখানেই থাকতে পারব। তারপর খুঁজেপেতে দেখব'খন। নাও নাও অপর্ণা। অমন হাঁ হয়ে দেখছ কি ?

কাল স্বপ্নে দেখ আজই পেয়ে গেলে তোমার মনের মত ফ্ল্যাট।

আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছি, ধোওয়া কাপড়ের মত মুখ করে মা একটা মোড়ায় বসে আছেন। এত কথা বাবা এক-সঙ্গে কোনদিন বলেছেন বলে ত শুনিনি।

তারপর যোগেনের মাকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি, নাও দিকি হাত লাগাও। মা একা পারবেন কি করে। দু'চারটে হাঁড়ি-কড়াই যা না হলে চলে না তাই নিয়ে নাও, বিছানা আমি জড়িয়ে নিচ্ছি।

মার সামনে এসে বল্লেন, খাট বিছানা, ড্রেসিংটেবিল ওসব কাল সকালে যোগেনের মা আর চাকরটা ঠেলায় করে পৌঁছে দেবে। তোমার শাড়ির ট্রাঙ্ক, খুকুর বই খেলনা সেসব যাবে সেইসঙ্গে। চটপট একটা শাড়িটা পালটে নাও।

বাবা যেমন ঝড়ের মত এসেছিলেন তেমনি বেরিয়ে গেলেন। তখন সেই মানুষটি এসে মার মুখোমুখি দাঁড়ান। মার কপালে তেমনি ঘাম জমেছে, নাকের পাটা কাঁপছে থরথর করে। নতুন জামা পরে আমি যে মার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি সে কথা মার মনেই পড়ল না।

আমি শুনতে পারছি বাবার গলা, হৈ হৈ করে বাবা মাল তুলছেন। কি চাকরদের ছুটোছুটি বাইরে, পাড়ার লোকেদের টুকরো টুকরো কথা। আমি আর সইতে পারছি না। মা আর সেই লোকটি ওরা কেমন ভীরু, অসহায় দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরের দিকে একভাবে চেয়ে রয়েছে।

ছুটে বেরিয়ে এসে আমি গাড়ীতে উঠে পড়লাম, আমার চোখ জ্বালা করছে। বাবাকে কেমন রূপকথার দস্যুর মত মনে হচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে বাবা যোগেনের মাকে নানান কাজের কথা বলছেন। চাকরটাকে কাল ছুটি দিয়ে দিলেই হবে, শুধু যোগেনের মা থাকবে। মার আপিস বাবার আপিস। যোগেনের মাই আমায় দেখবে'খন।

মাল বোঝাই হবার পর বাবা এসে ড্রাইভারের পাশে বসেন। পেছনে আমি বসেছি স্তূপাকৃত জিনিসের ওপর। পাশে একটুখানি জায়গা রয়েছে মার জন্য।

পেছন থেকে বাবার কাঁধ দেখাচ্ছে যেন একটা পাহাড়ের চূড়ো। কোন ভাবেই আর তা নুয়ে পড়বে না, আমার বুক ধুকধুক করছে। বাবা কী ভাবছেন, কার জন্যেই বা অপেক্ষা করছেন, মা আসবেন, মোটেই না।

ওরা হয়ত এখনও তেমনি করে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা একটু নড়ে চড়ে বসে পেছনে তাকিয়ে বলেন—

—খুকু আমাদের নতুন বাড়ীর ঘরের সামনে ছোট্ট একটি ছাত, সেখানে বসেই রোজ আকাশটা দেখব দুজন মিলে।

আমি সোৎসাহে বলি—তারা আর গ্রহ, এবার খুব ভাল করে দেখব তাই না বাবা ?

বাবা বাধা দিয়ে বলেন—আর গ্রহ নয়, শুধুই তারা।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার এবার অসহিষ্ণু হয়ে হর্ণ দিচ্ছে, গাড়ী স্টার্ট দিল বলে।

তখন আমার কান্না পেয়ে গেল, মাকে ছেড়ে যেতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। নতুন জামা পরে মায়ের গায়ের গন্ধ যেন এখনও মেখে রয়েছি। কান্নার দমকে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, বাবা এতক্ষণ টের পাননি এমন নয়, এখন যেন চমকে উঠে নেমে এসে আমাকে দরজা খুলে নামালেন।

—এই নাও অপর্ণা, তোমার মেয়ে রইল তোমার কাছে। আমি তবে আসি।

দেখি মা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন।

—উঁহু, ও মেয়ে ত আমার নয়, তোমার, কেমন চেরা চেরা গলায় মা বলেন।

কান্না বন্ধ করে আমি দুজনের মুখের দিকেই চেয়ে থাকি।

আমাকে কোলে নিয়ে হঠাৎ গাড়ীতে উঠে বসলেন মা—খুকু তোমারও নয় আমারও নয়, দুজনেরই। কি বলিস খুকু ?

মার চুলের গন্ধ আমার নাকে এসে লেগেছে, অন্ধকারে দেখি মার চোখের তারা মিটমিট করছে দূরে আকাশের তারার মত, তখন মায়ের বুকেই আমি মুখ লুকোই।

উড়ন্ত গবেষণাগার

বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী

রক্ষে এই যে মানুষের মগজ আজ মেতে আছে মহাকাশের রহস্য নিয়ে। নইলে হয়তো যদুবংশের পুনরাবৃত্তি ঘটতো এত-দিনে।

রাশিয়া আর আমেরিকা — মানুষের দুই বিজ্ঞানী শিবির আজ মহাকাশ জয়ের পথে অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে মানুষের সভ্যতার জয়যাত্রায়।

সে ইতিহাস দীর্ঘ, বহু সাধনার বৈজয়ন্তী সে। রাশিয়ার 'ভস্কদ দুই' নিরাপদে নেমে এলো মাটিতে। ভস্কদের মানুষযাত্রী মহাশূন্যের অতলান্ত সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়াল বিশ মিনিট কাল।

ওদিকে আমেরিকার 'জেমিনী'ও মহাশূন্য পরিক্রমা শেষ করে ফিরে এলো তার মর্ত্য-লোকের ঘাঁটিতে।

'রেঞ্জার-নয়' আঘাত হানলো চাঁদের গায়ে।

—সেই থেকেই শুরু হলো আর এক নোতুন অধ্যায়—মহাকাশ জয়ের পরবর্তী কার্যক্রম। সর্বশেষ সংবাদ হলো মহাকাশে দুই মহাযানের মিলন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আর এক ধাপ অগ্রগতি। সম্ভবতঃ এবারের খবর হবে 'এ্যাটলাস এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন'।

মহাকাশ সম্পর্কে স্থায়ীভাবে আরও পাকাপোক্ত গবেষণার জন্যে মহাশূন্যে গবেষণা-গার স্থাপন করা দরকার। তাই মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীদের এই অভিনব পরি-কল্পনা।

পৃথিবী, চাঁদ কিংবা অন্যান্য গ্রহ উপ-গ্রহের গা ঘেঁসে পাক খেয়ে বেড়াবে সৌর পরিবারের একটি শিশু উপগ্রহ। সূর্যদেব হয়তো হাঁ করে তাকিয়ে দেখবেন পৃথিবীর মাটি থেকে উড়ে আসা এই যান্ত্রিক উপ গ্রহটির দিকে। এই ক্ষুদে যন্ত্রযানের ভেতরটা দেখা হয়তো তাঁর ঘটে উঠবে না। নইলে দেখতে পেতেন পৃথিবীর মানুষ সৌর পরিবারের খুঁটিনাটি জ্ঞান সন্ধানেই ব্যস্ত আছে ওখানে।

আসল কথায় আসা যাক এবার। এ্যাট-লাস এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন দেখতে ঠিক যেন এক দৈত্যদেহী সিলিণ্ডার। দৈর্ঘ্যে হবে একশো ছ' ফুট আর ওজন হবে পনেরো হাজার পাউণ্ডের মত। সিলিণ্ডারের সম্মুখ দিকে থাকবে কনট্রোল রুম, ল্যাবরেটরী, শোবার ঘর, রিক্রিয়েশন রুম, রান্নাঘর আর বাথ রুম। আর পেছনের দিকে থাকবে জল আর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি আর জ্বালানির স্টোর রুম।

শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এ্যাটলাস স্টেশনটি তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপিত হবার পরে একে একে সরবরাহকারী জাহাজগুলিকে পাঠানো হবে।

প্রথম সরবরাহ জাহাজখানি নিয়ে যাবে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম।

দ্বিতীয় জাহাজখানি হবে যাত্রীবাহী জাহাজ। যাত্রী হিসেবে থাকবেন চারজন বৈজ্ঞানিক। এ্যাটলাস স্টেশনটি কক্ষপথের কোনখানে থাকবে তাও নিয়মনিয়ন্ত্রিত। যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে যাত্রীরা ঐ এ্যাটলাস স্টেশনে ঢুকবেন। সরবরাহ জাহাজ থেকে মালপত্র তুলে নিয়ে স্টেশনে গোছগাছ করে নেবেন যাত্রীরা। তাছাড়া আপৎকালীন জল-বিদ্যুৎ আর অক্সিজেন ব্যবস্থাও চালু করবেন তাঁরা।

বাকী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাবে দ্বিতীয় মালজাহাজখানি।

আসবে আবার একখানি যাত্রী-জাহাজ রিলিফ নিয়ে। রিলিফ নাবিকের দল ঘর-গুলির গোছগাছ ঠিক করে আহার আর ভাঁড়ারের ব্যবস্থাপত্র বহাল করবেন। বাকী যান্ত্রিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ করবার দায়িত্বও তাঁদের।

এঁদের কাজ হলেই আসবেন আর এক-দল নাবিক, আর একখানি সরবরাহ জাহাজ। গোটা স্টেশনটিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নেবেন ওঁরা। ওঁরা শুধু নাবিক নন, ওঁরা বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগর, এককথায় মহাকাশযান-বিশারদ।

সবাই বিদায় নেবেন তারপর। জাহাজে চেপে মহাশূন্য থেকে যাত্রা করবেন পৃথিবীর কোলে।

এ্যাটলাসে থাকবেন শুধু সবার আগে এসেছিলেন যাঁরা যাত্রী হয়ে — সেই চারজন বৈজ্ঞানিক। কনট্রোল মোটরগুলোকে চালু করতেই পাক খেতে শুরু করলো এ্যাটলাস স্টেশন — প্রতি আড়াই মিনিটে এক পাক। শুরু হলো কক্ষপথে তার চলা।

সকাল সন্ধ্যে পৃথিবীর মানুষের নজরে পড়বে মহাকাশে পাকখেয়ে বেড়ানো এই আশ্চর্য গবেষণাগারটি। পৃথিবীর বিষুব-রেখা বরাবর কোন কক্ষপথে এই স্পেস স্টেশনটিকে স্থাপন করবেন বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে ওর দূরত্ব থাকবে চারশ মাইলের মধ্যে। বিষুবরেখা বরাবর অব-স্থানের ফলে স্টেশনটির গতিবেগ থাকবে অব্যাহত এবং পূর্বনির্দিষ্ট। তাছাড়া চারশ মাইলের মধ্যে অবস্থিতির ফলে যন্ত্রযানটির জীবনের মেয়াদও অটুট থাকবে বলে আশা করেন বিজ্ঞানীরা।

কক্ষপথে স্থাপিত এই সিলিণ্ডার আকৃতি উড়ন্ত ল্যাবোরেটরীর অন্দরমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক এবার। সিলিণ্ডারের নাকের ডগায় বসে একজন হয়তো স্নানে ব্যস্ত। পরের কামরায় চলেছে হয়তো রান্না-বাড়ি। তৃতীয় কামরায় বিছানাপত্র গোছ-গাছ করে পড়াশুনায় মন দিয়েছেন তৃতীয় যাত্রী। চারজনের সংসারের চতুর্থ মানুষটি কিন্তু কনট্রোল রুমে তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

কক্ষ চারখানি ইনসুলেটেড ক্যাপসুলের মধ্যে অবস্থিত। সিলিণ্ডারের বাকীটাতে অর্থাৎ পেছনের অংশে আছে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, রকেটচালিত শক্তি, নিউ-ক্লিয়ার প্লাণ্ট আর যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য সাজসরঞ্জামের কারখানা।

এ্যাটলাস এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশনটি তো মহাকাশে অনেককাল ধরেই থাকবে। ঐ বিজ্ঞানীদের রিলিফ বা বদল ব্যবস্থা চাই তাছাড়া সরবরাহ চাই মাঝে মাঝে।

তারও ব্যবস্থা থাকবে। একপক্ষ কিংবা একমাস অন্তর সরবরাহ জাহাজ পাঠানো হবে। ক্লান্ত বিজ্ঞানী ঐ সরবরাহ জাহাজে চেপেই ফিরে আসবেন পৃথিবীর মাটিতে।

কিন্তু কেন এই এ্যাটলাস স্টেশন? মহাকাশের রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যেই তো। মহাকাশের রহস্য একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছে। চাঁদ আর চাঁদ মামা নেই। মানুষ তাকে দেখতে পাচ্ছে রূঢ় বাস্তবের পটভূমিকায়।

সৌরজগতের গোপন যা কিছু, তাও যেমনি ফাঁস হয়ে যাবে তেমনি করেই পৃথিবীর এই অতি পরিচিত গণ্ডীতে দেবে সে নোতুন বৈচিত্র্য, হয়তো নোতুন এক মহা শক্তি।

তিন পর্যায়ের যে রকেটটি এই উড়ন্ত গবেষণাগারটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করবে তার ছবিটাকেও ব্যাখ্যা করা যাক এই প্রসঙ্গে।

রকেট — যুগটাই তো রকেটের যুগ। তার শক্তির নাকি নিশানা করা যায় না। তিন পর্যায়ের রকেট সম্পর্কে বলা হয়েছে অনেক কথাও। পর্যায়ক্রম শুরু হয়েছে নিচের থেকে। প্রথম পর্যায়ে যে শক্তি আছে তা দিয়ে দশ লক্ষ পাউণ্ডের ওজনকেও পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরে তোলা সম্ভব। দ্বিতীয় পর্যায়ে যোগ হবে আরও তিন লক্ষ পাউণ্ড শক্তি। তৃতীয় পর্যায়ে যে শক্তি সঞ্চিত আছে সেই শক্তির বলেই উড়ন্ত গবেষণা-গারটিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

২২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 30th September, 1966 শুক্রবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

অবলুপ্তির পথে পুরাকীর্তির নিদর্শন

সবিনয় নিবেদন,

কয়েকটি সংখ্যায় পুরাকীর্তির নিদর্শন বিলুপ্তি সম্পর্কে যে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার বিবরণ তুলে ধরছি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকার কারণ হিসাবে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে অনেকাংশে দায়ী করা যায়। ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কাজে সাহায্য ক'রতে পারে এমন বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ আজও নানাস্থানে, বিশেষত মফস্বল গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এরূপ বহু পুরাকীর্তির নিদর্শন আজ অবলুপ্তির পথে। জয়পুর থানার অন্তর্গত "দেউলঘাট" তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গড়জয়পুর থেকে মাইল চার অর্থাৎ পুরুলিয়া থেকে কুড়ি মাইল দূরে কংসাবতী নদীর তীরে এই 'দেউলঘাট' অঞ্চল। নদী এখানে খুব প্রশস্তও নয় বা গভীরও নয়। বর্ষাকাল ছাড়া এই নদীতে কখনও এক হাঁটুর বেশী জল থাকে না। কাজেই হেঁটেই পার হওয়া যায়। নদীর ওপারে বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে আগাছায় পরিপূর্ণ ঢিবির মত উঁচু জমি। তার উপর দাঁড়িয়ে আছে তিনটি অর্ধভগ্ন (চূড়াহীন) ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত প্রকাণ্ড দেবদেউল। নদীর এপার থেকে শান্ত-স্তব্ধ পরিবেশে ধ্বংসস্তূপের উপর ঐ মন্দিরের ভগ্নাংশগুলি দেখে সত্যিই খুবই দুঃখ হয়। সেই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার রুচিরও প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

নদীগর্ভে থেকে কয়েকটি সুপ্রশস্ত পাথরের সিঁড়ির ভগ্নাংশ দেখা যায়। ঐ ঢিবির উপর ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় এখনও যেগুলি ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে ঐ তিনটি অর্ধভগ্ন বিশালাকার মন্দির। এই মন্দির তিনটি খুব মসৃণ পাতলা ইঁটের তৈরী। ঐ ইঁটগুলি লম্বায় ও চওড়ায় সাধারণ ইঁটের দ্বিগুণ। অপরিচ্ছন্ন ঢিবিটির উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কারুকার্যযুক্ত পোড়ামাটির টুকরা দেখে মনে হয় যে ঐগুলি সম্ভবত শিখরের আমলকগুলির ধ্বংসাবশেষ। পোড়ামাটি ও ইঁটের গায়ে যে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য খোদাই করা যেতে পারে তা ঐ মন্দিরগুলি না দেখলে বিশ্বাসই করা কঠিন। মন্দিরগুলির গায়ে পংকচুন জাতীয় একপ্রকার প্রলেপের চিহ্ন বিদ্যমান। মন্দিরগুলির উর্ধ্বাংশের কারুকীর্তি ভুবনেশ্বরের "লিঙ্গরাজ" মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই মন্দির তিনটিতে কোনপ্রকার বিগ্রহ নেই। তবে একটি ঘরে গ্রানাইট পাথরের এক মহিষাসুরমর্দিনী ও তার পাশে এক কেশবমূর্তি আছে। এই ঘরটি স্থানীয় এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তৈরী হ'য়েছে। অপর এক স্থানে অসংরক্ষিত-ভাবে এক বৃক্ষের পাশে আছে চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তি। একটি ছাদহীন ঘরে আছে অর্ধ-ভগ্ন গণপতির বিগ্রহ, আর আছে প্রায় চার ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বেদীর উপর অবস্থিত এক শিবলিঙ্গ। যে স্থানে ঐ শিবলিঙ্গটি আছে তার বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধুমাত্র সেই স্থানের মেঝে ও দেওয়ালের ভগ্নাংশটুকুই পাথরের তৈরী।

স্থানীয় জনসাধারণের নিকট থেকে জানা যায় মন্দিরগুলিতেও নানাস্থানে আগে বহু বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল, কিন্তু একদল চোর ও সংস্কৃতি-প্রেমী সেসবের অধিকাংশই নিয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত "দেউলঘাটের" ঐ ধ্বংসাবশেষগুলির প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অনুরোধ ক'রছি, যেন অবিলম্বে পুরাকীর্তির এই নিদর্শনগুলিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা ক'রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

নমস্কারান্তে।

শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী,
ঝরিয়া, ধানবাদ।

আজকের অঘটন প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅজয় হোম লিখিত 'আজকের অঘটন' আলোচনাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এই ধরনের রচনা সাধারণত আজকালকার পত্রিকায় খুব কমই প্রকাশিত হয়।

আজ বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীতে মানুষের মন মুগ্ধ হয়। কত তার কৌতূহল! বাংলা দেশে কতযুগ আগে কিশোরবয়সে 'সন্দেশ'র পাতায় 'প্রবাসী'র 'পঞ্চশস্য' ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে মুগ্ধ হয়েছে কত জন! বৈজ্ঞানিক আগ্রহ কত প্রেরণা দিয়েছে বিভিন্ন মানুষকে তাই আজ কত আবিষ্কার, প্রকৃতিকে জয় করবার কত অদম্য আগ্রহ, দুর্বার সাধনা।

বর্তমান নিবন্ধে উড়ন্তচাকীর কাহিনী অপূর্ব মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে সেই পুরাতন বাইবেল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল অবধি বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্যের সুপরিকল্পিত সন্নিবেশে সুখপাঠ্য। মনে প্রশ্ন জাগে গ্রহান্তরের "মানুষের মত জীবেরা" আমাদের এই পৃথিবীতে দীর্ঘ যুগ আগে থেকেই যোগাযোগ রেখে আসছে? হয়ত ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকেরা এর সঠিক ব্যাখ্যা একদিন দিতে পারবেন! আজ তাই গ্রহান্তরে যাবার কত সাধনা, কত প্রচেষ্টা মানুষের! অদূর ভবিষ্যতে তা হয়ত সফলও হবে।

লেখক নানা সূত্র থেকে যে ক'টি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা নিবন্ধের বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করেছে। বিশেষ করে উড়ন্ত-চাকীর বোধকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যে কালান্তরের বিক্রমাদিত্যের কাহিনী পরিবেশন করে মধুর রসোত্তীর্ণ করেছেন—পাঠক-পাঠিকার আনন্দ বৃদ্ধি করেছেন।

নমস্কার জানবেন

কুমুদনাথ দত্ত
১৪-সি, কালীকুমার ব্যানার্জি লেন,
টালা, কলিকাতা—২

আমার জীবন প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমধু বসুর রচনা "আমার জীবন" সাহিত্য এবং তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান রচনা। চিত্রপরিচালক হিসাবে মধু বসু সর্বজনবিদিত। শুধু স্বদেশে নয় বিদেশেও তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত কিন্তু এই খ্যাতি অর্জন করতে তাঁকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তার তুলনা নেই। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁর দেহমন পরিশ্রান্ত হয়েছে তবু তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না! চলচ্চিত্রের উন্নতিকল্পে তিনি সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অভিনয়কে আভিজাত্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

শ্রীমধু বসুর সেকাল ও একালের চিত্র নির্মাণ পদ্ধতির তুলনামূলক সমালোচনাটি আমার কাছে অত্যন্ত ভাল লেগেছে।

বর্তমান একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর সঙ্গে একজন শীর্ষস্থানীয় টেকনিসিয়ানের কি বিরাট ব্যবধান অথচ এই টেকনিসিয়ানরা না হলে বড় বড় শিল্পীদের আবির্ভাবই ঘটত না—এটা অত্যন্ত সত্যি কথা। কারণ জগতে শ্রেষ্ঠ যে কোন জিনিসই আত্মপ্রকাশ করে প্রথমে নীচের দিক থেকেই উঠতে আরম্ভ করে।

শ্রীমধু বসু যেভাবে বর্তমান আমাদের দেশের টেকনিসিয়ানদের দৈন্য দুর্দশার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে একটি মজুরেরও ভালভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারে না। হয়তো মজুরের চলা সম্ভব হতে পারে কিন্তু টেকনিসিয়ানেরা শিক্ষিত সমাজে বাস করে, লেখাপড়া শিখেছে, হাতে কলমে কাজ শিখেছে সুতরাং তাদের মান মজুরদের চাইতে অনেক উঁচুতে, তাদেরকে ভদ্রভাবে অবশ্যই বাস করতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে চিত্রনির্মাতাদের অবশ্যই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য একটা শ্রেষ্ঠ স্থানীয় শিল্পীকে যেহারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ঠিক সেরকম একজন শ্রেষ্ঠস্থানীয় টেকনিসিয়ানকে দেওয়া উচিত। অন্তত পক্ষে সে যেন সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে।

টেকনিসিয়ানরা যদি তাদের ছায়াচিত্রের জীবিকা ত্যাগ করে অন্যকোন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে তবে বড় বড় শিল্পীর আত্ম-প্রকাশ কতখানি সম্ভব হবে সন্দেহ। সুতরাং একের প্রতি অন্যের সংযোগ অবশ্যই আছে এবং থাকতে হবে।

নমস্কারান্তে—
পরিমল বিশ্বাস
দাশ কলোনী, গৌহাটী-১১

একুশ বছরের ব্যর্থতা

গত মহাযুদ্ধের পর যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইউনাইটেড নেশনস্ বা রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন রণক্লান্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে তা অনেক আশা নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা কারো অজানা ছিল না। পরমাণু বোমার ধ্বংসক্ষমতার পরিচয়ও তখন সবেমাত্র জানা গিয়েছিল। তাই পরবর্তী কোনো বৃহৎ যুদ্ধ বাধলে পৃথিবীর ধ্বংস যে অনিবার্য এ ধারণা করতেও জাতিপুঞ্জের কোনো অসুবিধা তখন হয়নি। যুদ্ধের আগুনে পৃথিবীই যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে শক্তিশিবিরের ক্ষমতার লড়াই হয়ে পড়বে অর্থহীন। শাদা এবং কালো, সমৃদ্ধ এবং অনুন্নত, পূর্ব এবং পশ্চিম ইত্যাদির স্বার্থের সংঘাতের মীমাংসা পাওয়া যাবে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে, একুশ বছর আগে যদি এ আশা করা হয়ে থাকে তবে তা খুব অযৌক্তিক ছিল না।

গত ২১ বছরে পৃথিবীর রাজনীতির অনেক পটপরিবর্তন হয়েছে। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহল থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক অধিকার প্রত্যাহৃত হয়। তখন থেকেই সাম্রাজ্যবিলোপের সূত্রপাত। ইতিমধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ স্বাধীন হয়েছে। অবশিষ্ট যে-কয়টি দেশে এখনও জবরদস্তিমূলক ঔপনিবেশিক শাসন চলছে তার অবসানও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় না যে, রাষ্ট্রসংঘ যে-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। তাই আজ বিদায়ের আগে সেক্রেটারী জেনারেলের রিপোর্টে ফুটে উঠেছে এক হতাশার সুর। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে তো বটেই, তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং পৃথিবীর সাধারণ মানুষের পক্ষেও এই হতাশার চিত্র উদ্বেগের কারণ হবে।

এর নজীর আছে রাষ্ট্রসংঘের পূর্বসূরী লীগ অব নেশনসের ইতিহাসে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনুরূপ সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই লীগ অব নেশনসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু সে সময়েও আমেরিকার মতো একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশ লীগ অব নেশনসের বাইরে থাকার দরুণ তার ভবিষ্যৎ খুব ভাল হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের ক্ষেত্রেও আজ পর্যন্ত চীনকে সদস্য করা যায়নি। চীনের জঙ্গী রাজনীতির সঙ্গে আমাদের বিরোধ আছে, বহু দেশই আজ তার বিরোধী। কিন্তু চীনকে সদস্য না করলে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্ব যে সর্বজনীন হয় না, এ কথা স্বয়ং সেক্রেটারী জেনারেল বহুবার বলেছেন। অথচ অদূর ভবিষ্যতে তার সদস্যপদলাভের কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং রাষ্ট্রসংঘের সংগঠনে একটা মৌলিক দুর্বলতা গোড়া থেকেই আছে, তা দূর করা সম্ভব হয়নি।

এ ছাড়াও আজ আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো যে, রাষ্ট্রসংঘে এশিয়া ও আফ্রিকার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর বৃহৎ শক্তিগুলি এই বিশ্বসংস্থার ওপর খুব বেশি ভরসা রাখতে পারছে না। রাষ্ট্রসংঘকে সরাসরি অবজ্ঞা না করলেও, এদের হাতে পরোক্ষভাবে এই বিশ্বসংস্থার কর্তৃত্ব অবজ্ঞাত হচ্ছে। সেক্রেটারী-জেনারেল তাঁর রিপোর্টে যে-ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে এটা স্পষ্ট হবে যে, রাষ্ট্রসংঘ যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতা না পাওয়ার জন্যই বহু আন্তর্জাতিক সমস্যা আজ অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

গত দশকে স্নায়ুযুদ্ধ যত তীব্র ছিল আজ তা খানিকটা হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু নতুন আকারে আবার উত্তেজনা দেখা দিয়েছে প্রধানত ভিয়েতনামের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কোনো বৃহৎ শক্তিই আজ ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘকে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক নয়। ফলে ধীরে ধীরে পৃথিবী যেন আরেকটি বৃহৎ ও সর্বনাশা যুদ্ধের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘের নিষ্ক্রিয়তা তার মন্থর মৃত্যুই ত্বরান্বিত করবে। সেক্রেটারী-জেনারেলের হতাশার একটি কারণ হল এই।

আরেকটি বৃহৎ ও জরুরী প্রশ্নেও রাষ্ট্রসংঘ কোনো কার্যকর সাফল্য দেখাতে পারেনি। তা হল পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং পরমাণু বোমা নিষিদ্ধকরণ। মস্কো চুক্তির মারফৎ পরমাণু বোমা পরীক্ষার ওপর আংশিক বাধানিষেধ আরোপিত হলেও তাতে কাজ খুব বেশি হয়নি। ফ্রান্স ও চীন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। তারা একটার পর একটা পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে বায়ুমন্ডলে। অন্যদিকে আমেরিকা ও রাশিয়া ভূগর্ভে তাদের মারণাস্ত্র পরীক্ষা করছে। সুতরাং এই ভয়াবহ অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতারোধে রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পৃথিবীকে যুদ্ধের ভয়মুক্ত করার সংকল্পকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। সেক্রেটারী-জেনারেল তাই দুঃখ করে বলেছেন, "আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। ভিয়েতনামে যুদ্ধের ঘন কৃষ্ণমেঘ আরও বৃহৎ ও আশংকাজনক হয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র ও সাধারণ অস্ত্রের প্রতিযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর যে দুই-তৃতীয়াংশে দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞতা মানুষের প্রতিদিনের জীবনে প্রতিফলিত, সেখানকার জনগণের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার কাজ খুব কমই এগিয়েছে।"

একুশ বছরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পৃথিবীর চেহারা বদলে দেওয়া যেত এবং সে আকাঙ্ক্ষাতেই পৃথিবীর মানুষ গড়ে তুলেছিল আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এই প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রসংঘ। আদর্শের সংঘাত ও ক্ষমতার লড়াইয়ে এই প্রতিষ্ঠান যদি সত্য সত্যই ব্যর্থ হয়ে বিদায় নেয়, তাহলে আমাদের আর আশা করার, ভরসা করার কিছু থাকবে কি?

বিচিত্র সংগ্রহ

মাতু বামনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো বউয়ের পিছন পিছন মাতু পিসী যেন আপনি এল মনের মধ্যে। কালো বউয়েব কথায় লিখেছিলাম, কালোবউ একটা কায়েমী স্বত্বের দখলীকার ছিল, তাই সে হঠাৎ তার খেয়ালমত মনের ভিতরের কোন এক কামরা খুলে সদরে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাতু পিসীর সেই দখলীস্বত্ব ঠিক নেই। কালোবউয়ের পিছন পিছন সে এসে দাঁড়াল। বললে—হ্যাঁরে বাবা, কালোবউ এসেছিল?

বললাম—এসেছিল। তা সে।

—কোথায় বল তো?

—তাই তো পিসী ঠিক তো বলতে পারছি না।

—তাহলে? বড় বিপদে পড়লাম যে বাবা। এখন কি করি আমি?

মাতু পিসী খুব চিন্তিত মুখে দাঁড়াল, যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। মাথায় পাঁচ ফিটের মত লম্বা; গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত; খাঁড়ার মত নাক, চোখ দুটি মুখের তুলনায় ছোট, কপালটি বড়, চুল সামনে বেশ কিন্তু লম্বায় নেহাত খাটো,—কোন রকমে একটি নেবু বা কাশীর পেয়ারার আকারের ঝুঁটি হয়। মুখ থেকে আপাদমস্তক অবয়ব জুড়ে কেমন একটা পুরুষালি ভাব, পরনের কাপড়খানা দশ হাত হলেও বিয়াল্লিশ ইঞ্চি, বহরে কোন রকমে হাঁটুর নিচে নেমেছে, বাকী পা পর্যন্ত অংশ অনাবৃত: পাখানি আকারে তেমনি। গলার কণ্ঠস্বরে নারী মাধুর্য নেই। পিসী কোমরের পিছনে দুই হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। মনে হল, কি করবেন তিনি তার হদিশ খুঁজছেন, আকাশ পানে তাকিয়ে। হয়তো যা লেখা আছে, যা তিনি দেখতে পাচ্ছেন আমি বা আমরা পাচ্ছিনে দেখতে।

আবার বললেন—একটা হিসেব ক'রে দিতে পার বাবা?

—হিসেব?

—হ্যাঁ। ধর টাকায় দু পয়সা সুদ, বছরে নয় বাবা, মাসে; ধার দিয়েছি দু কুড়ি পাঁচ; দিয়েছি তোমার তিরিশ সালের শাওন মাসে, আর এটা হ'ল ধর গিয়ে তেত্রিশ সালের মাঘ, তাহলে হল গিয়ে একোত্রিশ-বত্রিশ পুরো দু বছর, আর তিরিশ সালের শাওন থেকে চোত আর তেত্রিশের বোশেখ থেকে মাঘ—ক' মাস হ'ল দেখ। দেখে হিসেবটা করে দাও দিকিনি। ওই কালোবউ আমার হিসেব করে দেয় বাবা, দেখ মুস্কিল, লোকটা এসেছে ভিনগাঁ থেকে, টাকা দেবে। শোধ করবে। কি করি আমি এখন!

কুলীনের ঘরের মেয়ে মাতু; বাল্যকালে হয়তো দীর্ঘাঙ্গী হিলহিলে ফিরানি-পরা মেয়েটি মা-বোনের কাছে সমাদর পেয়েছিল, তারপর জীবনে এল যৌবন, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মাতু হয়ে উঠল 'মাতঙ্গিনী'। লম্বা-চওড়া মেয়ে, দুরন্ত যৌবন; মাতঙ্গিনীর আহার ছিল নাকি হাতির মত। এই এত অন্ন তার লাগত। বিয়ের সমস্যা কুলীনের মেয়ের খুব ছিল, তা ছিল না। কারণ ওতো কেবলমাত্র সিঁথিতে সিঁদুর চিহ্ন দিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল; এই মাতুনাম্নী কন্যাটি থেকে এই বংশের চতুর্দশ পুরুষের যে নরকস্থ হওয়ার আশঙ্কা ছিল, অতঃপর তা বিদূরিত হল। পাল্টী ঘরের সদাশয় কুলীন সন্তানেরা সারা জীবন এই ব্রত নিয়ে বঙ্গদেশে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন এবং এক-এক গ্রামে আড্ডা গেড়ে কৌলিনী মর্যাদা হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন দক্ষিণা নিয়ে প্রস্থান করতেন। এ কর্মটি ষোল বছর বয়সে শুরু করতেন, শেষ করতেন বৃদ্ধ বয়সে। দু-চারজন মহাপুরুষের কথা শোনা যায়, যিনি নাকি জ্ঞানগঙ্গা যাবার পথে কন্যাদায়ের সংবাদ শুনে ডুলি নামিয়ে দশম বা একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয়া কুলীন কন্যাটির পানিগ্রহণ ক'রে সিঁথীতে সিঁদুর দিয়ে চলে যেতেন গঙ্গাতীরে। কুলীনদের কথা নয়, কুলীন মহাপুরুষের কথা থাক, মাতু পিসীর কথা বলি, মাতু পিসীর কপালেও এমনি একজন বৃদ্ধ সিঁদুর দান করেছিল এবং তিনি কয়েক বছর পরেই মারা গিয়েছিলেন, তখন মাতু আর মাতু নেই, সত্যই মাতঙ্গিনী হয়ে উঠেছে, তার ওই দীর্ঘ দেহে যৌবনের জোয়ার বয়েছে। মাতঙ্গিনীর তখন নাকি রূপ ও যৌবনের মধ্যে একটি আশ্চর্য লাবণ্য ছিল। এবং হাস্যে, উল্লাসে ছিল তরঙ্গময়ী।

স্বামী মারা যাবার সংবাদ আসার পর হাসিতে উল্লাসে কিছু ভাটা পড়ল। তার বছর খানেক পর মারা গেলেন বাবা; মা বিগত হয়েছিলেন অনেক দিন, সংসারে রইল ভাই এবং ভাজ এবং তাদের কটি ছেলে-মেয়ে।

ভাই বোনকে বাড়ীর মধ্যেই একখানি ঘর দিয়ে পৃথক করে দিলেন, মাসে কিছু চাল দিত ভাই, তার বেশী কিছু না। বাকীটা তাকে জোগাড় করে নিতে হবে।

সে জোগাড় করতে মাতু পিসীকে বেগ পেতে হয় নি। পিসী কয়েকটি স্বচ্ছল এবং বর্ধিষ্ণু লোকের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্মে, যাগ-জজ্ঞিতে, ভাগের ঠাকুরের পালায় ঠাকুরের ভোগ রান্নায় জোগাড় করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া বাড়ীর গাছা অর্থাৎ শাকপাত এসব ছিলই।

আর যেতেন গঙ্গাস্নান। হেঁটে বিশ মাইল রাস্তা উদ্ধারণপুরের ঘাট সেখানে যেতো, তার খরচ জোগাতো তার সঙ্গী-সাথীরা। সে তাঁদের রান্না করত ' সেখানে, বাজারে মেলায় জিনিষপত্রের দরদাম করত; তাছাড়া দলে যে সব যুবতী বউ মেয়ে থাকত তাদের রক্ষা করত ইলচে চ্যাংড়াদের হাত থেকে। মাতু নিজেও যুবতী এবং লাবণ্য মাধুর্য না-থাকলেও গৌরাঙ্গী, কিন্তু তার নিজের জন্য ভয় সে করত না; তার ওই দীর্ঘ সমর্থ দেহ এবং কটমটে চাউনি দেখলেই তারা সরে পড়ত। গঙ্গাস্নানে যখন যেতেন, তখন মেলাখেলায়, বাজারে-ঘাটে বেড়াবার সময় একটা বেশ বড় লোহার খন্তা থাকত তার হাতে। নতুন খন্তা, হাত দুই লম্বা, মোটায় তা আধ ইঞ্চি হবে। যজ্ঞির রান্নায়, বড় কড়ায় ব্যবহারের খন্তা। ওটা যেন দোকান থেকে কিনেছে এখুনি, এই ভাবত লোকে। আসলে ওটা ছিল তার অস্ত্র। রাঢ়ের গ্রামেব লোকেরা বলে "হেতের", অর্থাৎ হাতিয়ার। দরকার হলে ওটা নিয়ে মাতু পিসী আস্ফালন করে বলত—"তবে রে হারামজাদা বোকা পাঁঠা, খানকীর বাচ্ছা, এই খন্তার ঘায়ে তোমার মাথা দুচেলা করে দোব! মাতু বামনীর কাছে চালাকী?"

অনেক অশ্লীল বাক্যও বলত। সেকালে এ নিয়ে খুব মাথা ঘামাত না কেউ। এই ধরনের পুরুষদের বলত—এঁড়ে। ধর্মের ষাঁড়। মেয়েদেরও বলত—। কিন্তু সে থাক। এ থেকেও সে কিছু কিছু পুরস্কার পেত। এবং এতেই তার চলে যেত। পুরস্কার বলত না সেকালে, বলত সন্দেশ খাবার জন্যে দিলাম। তখনও মাতুর বয়স কম, পঁচিশের নিচে। এ থেকেই মাতু পিসীর জীবনে একটা মোড় ফিরল। সেবার দশহারায় গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল 'শহরের ঘাট', শহরেব ঘাট মানে মুরশিদাবাদ। দশহরায় মুরশিদাবাদ গঙ্গাস্নান যাওয়া একটা বিলাস ছিল। প্রায় বড়দিনে কলকাতা যাওয়ার মত। মুরশিদাবাদ শহর, তার ওপর আম-কাঁঠালের সময়।

মাতু পিসী বলত—বাবারে, সেকালে লোকে বলত, 'শহর ঘাটে গঙ্গাচানে যাবি, গাঙের ঘাটে আম-কাঁঠাল, চিঁড়ে-দুই গব-গবিয়ে খাবি। সেদিন সন্ধ্যেবেলা হয় হয়, মাতু পিসী সন্ধ্যাতে আর একবার চান করবে বলে ঘাটে গেছে। এদিকে খাগড়া ঘাট, ওদিকে রাধার ঘাট। মাতু পিসী ওই ঘাটে দেখেছিল একটা মোটা-সোটা বিধবা মেয়ে গলায় বিছে হার, গালে পান ঠেসা, চেহারাটা যেন কেমন কেমন, সে একটি ঘোমটা-টানা মেয়ের হাত ধরে, নৌকার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে; লোক কয়েকজন জমেছে; ঘোমটা-টানা মেয়েটি যেন কাঁদছে, আর এই বিধবাটি বকছে, এই এই জন্যে বেটাকে বললাম—বাবা বউ নিয়ে যেতে হবে না, গেলেই মা-বাপকে দেখে বউয়ের আঁত উথলাবে, বাপের বাড়ী যাব বলে কেঁদে ভাসাবে।

ইতিমধ্যে নৌকো এসে ঘাটে লেগেছিল, বিধবা মেয়েটি বউকে প্রায় হিড় হিড় করে টেনে জলে নামিয়েছিল, নৌকোতে তুলবে বলে। ওদিকে নৌকোর ওপরে একজন চোয়াড়ে চেহারার লোক হাত বাড়িয়ে বসে-ছিল, বউয়ের হাত ধরে টেনে তুলবে বলে। বিধবাটির ছেলে সে।

মাতুর কিন্তু কি রকম সন্দেহ হয়েছিল। সে ঘাটে চান করে মুখ ফিরিয়েছে ঘাটের দিকে। হঠাৎ ঘোমটাটা ফাঁক হয়ে গিয়ে বউয়ের মুখ বেরিয়ে পড়েছিল। সে মুখ দেখে মাতুর যে কি করে ধারণা হল যে, এ মেয়ে বামুনের বা কায়েতের বা ভাল বদ্যি ঘরের মেয়ে এবং এই যে মেয়েটা ও একটা খারাপ কসবী খানকী জাতীয় মেয়ে, সে সম্পর্কে মাতু পিসীই বলে,—বাবা মনে হয়ে গেল। এই দেখ মুখে নেকা তো কিছু

থাকে না, তবে ছাপ একটা থাকে। সেই ছাপ। বুঝেছ। সেই ছাপ। বিধবা মেয়েটাকে দেখে গোড়া থেকেই কেমন-কেমন লাগছিল। বউটার মুখ দেখে আর সন্দেহ রইল না—যে এ বউ ওর বেটার বউ হতেই পারে না। যেমন রূপ, তেমনি কি বাবা পেসাদী ফুলের মতন চেহারা, গন্ধ! আহা-হা! দু চোখে জলের ধারা বইছে। আর সে কি ভয়!

মাগী ঘোমটাটা মাথায় টেনে দিয়ে বললে—মরণ! দোব গলা টিপে শেষ করে। চালাকী পেয়েছ।

আমি বাবা হুড়মুড় করে উঠে গিয়ে বউটাকে জড়িয়ে ধরে বললাম—কে তুই, বজ্জাত মাগী সোনার পিতিমে ধরে নিয়ে যাচ্ছিস ?বল তুই কে ?

মাগী হাউমাউ করে উঠল। আচমকা টানে বউয়ের হাতখানা তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে নৌকো থেকে সেই বদমাসটা ঝপ করে লাফিয়ে পড়ে কেড়ে নিতে আসছিল বউটাকে। আমি বাবা ঘাটে পড়ে থাকা ওই খন্তাখানা নিয়ে বললাম—আয় শালারা। চলে আয়। আমি মাতু বামনী। শালা-শুয়রের বাচ্চা! ধর, ধর ওই খানকী কসবীকে। ধর তোমরা। ধর গো!

হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছিল। মাতু পিসীর ভুল হয় নি। সত্যিই ভালঘরের একটি বালিকা বধূ, ভিড়ের মধ্যে দল-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তাকে ওই বাড়ীউলী বেশ্যাটা দলে পেঁাছে দেব বলে আশ্বাস দিয়ে সরিয়ে এনে, এই সন্ধ্যের মুখে নৌকো চড়িয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল। মাতুর জন্যেই তা সম্ভবপর হয় নি। বউটি ভালঘরের অর্থাৎ সম্পদশালী কায়স্থ ঘরের বউ। তারা বউ ফিরে পেয়ে মাতুকে একশো টাকা দিয়েছিল, প্রণামী দিয়েছিল। সেই টাকা নিয়ে মাতু পিসী আরম্ভ করেছিল নতুন জীবন। আরম্ভ করেছিল সুদি কারবার। এক টাকায় দু পয়সা সুদ। মাসে মাসে সুদ আদায়। সেই খন্তাটা নিয়ে ঘুরত মাতু পিসী।

—ওরে অ-হরুশে। দে সুদ দে এ মাসের। ফেল চার পয়সা। গোপশা কোথা গেল, গত মাস থেকে দিস নাই, পালিয়ে বেড়াচ্ছিস। ফেল একসঙ্গে দু মাসের কুড়ি পয়সা, কুড়ি পয়সা, চল্লিশ পয়সা পাঁচ আনা। ফেল। আর আমি শুনব না।

—অ-বাবা—শঙ্কর, আমার টাকা তো আর ফেলে রাখতে পারব না বাবা! আমি রাঁড়ী-ভাঁড়ী মানুষ, এই দু-চার পয়সা নেড়ে-চেড়ে খাই, বাবা ওতে আমার পেট ভরে, আবার বাবা ভাতার-পুত নাই, মন খাঁ-খাঁ করে, সে খাঁ-খাঁ করা মনও ভরে। আমি বাবা একসঙ্গে একশো টাকা কাউকে দিই না। তা তোমার বিপদ অন্টমে, টাকা লাগবে, একশো টাকা খামতি, তাই দিয়েছিলাম। বাবা দু মাস হয়ে গেল। আমার টাকাকটি দাও বাবা।

দিতে পারি নি। মাতু পিসী বকতে বকতে গিয়েছিল, বাবু লোক, জমিদার লোক। আমার টাকা নেবার সময় নিয়ে এখন বলে এখন পারব না দিতে। বেশ। আমি নালিশ করব, আমি অস্থাবর এনে বাবু লোকের বাড়ীর গয়না কোরোক দিয়ে নিয়ে যাব। ছাড়ব, আমার নাম মাতু বামনী।

মাতুর এই সব হিসেব করে দিত কালো-বউ। একশো টাকা ধর, দু পয়সা টাকায় সুদ, মাসে দুশো পয়সা। দুশো পয়সা ছ মাসে বারো শো পয়সা। কত হয় কালো-বউমা? বারোশো পয়সায়? কত আঠারো টাকা বারো আনা!

—কালোবউ হিসেব করত আর হাসত।

মাতু পিসী বলত—এত হাসিস কেন বউ ?

পিসেশ তোমার এই হিসেব দেখো। কি করবে বল তো টাকাগুলো নিয়ে? কি করবে? কি হবে?

—কি করব? কি হবে? দেখ, ঘাটে-ঘাটে পারানী দিয়ে যা থাকবে, নিয়ে গিয়ে যমরাজাকে ঘুস দিয়ে বলব, আমাকে তুমি একদিনের জন্যে যে পুরীতে বিধেতা পুরুষ থাকে, সেই পুরীতে পাঠিয়ে দাও। এই এক-দিনের জন্যে। এক ঘন্টার জন্যে। বুঝলি! বুঝতে পারছিস? কি করব?

খিল খিল করে হেসে ভেঙে পড়ে কালোবউ, বলত বুঝেছি পিসেস (পিস-শাশুড়ী) বুঝেছি, তোমার খন্তা দিয়ে—

—হ্যাঁ। বেটার হাতের আঙুল ছেঁচে দোব। সারা জীবন এই করতে কেন পাঠিয়েছিল আমাকে ?

আমিও জেনো ॥

মণীন্দ্র রায়

আমিও জেনো বইয়ের মতো
দুই মলাটের ভাঁজে অনেক
রাত্রিপোড়া ঘন্টাঘড়ি, ভালোবাসার
বুকে ত্রিশূলে ঘৃণার এবং শিশুমুখের
দুধে-দাঁতের ঝিলিক আশার ঘরে হঠাৎ
নতুন মায়ের হেসে ওঠার সকাল নিয়ে কালো হরফ
পাতার পরে নীরব পাতায় প্রতীক্ষিত।

আমিও জেনো ইতিহাসের
স্তম্ভ-দেউল টেরাকোটার
শিল্পলোকের দীপ্তি এবং বাঁকা ছুরির
দরদালানে মশাল-আলোয় আর্তনাদের শেষে নাচের
নূপুর-তালে ঢের হেসেছি, শতাব্দীপার
অন্ধকারের ধুলোয় জয়ের লুণ্ঠনে নীল তেপান্তরে
অনেক কেঁদে কাঁটাঝোপের ভাঙা-পাথর ঘিরে গাঁয়ের
খড়ো ঘরের চষা মাঠের ঢের দেখেছি মাইল মাইল
স্তব্ধ এবং স্পন্দিত দিন।

আমিও জেনো লোকের মতো—
এই আমাদের দেশের মানুষ গঞ্জে-হাটে মাটির বুকে
যেমন কাটায় জীবন, আমি তাদের মতোই
আধখানা মন অন্ধকারে কাদায় জলে ডিবের আলোয়
হিজিবিজি ছায়ায় রেখে হঠাৎ কখন
দেখি সবার খেতের মাঝে পা নামিয়ে লোহার থামে
ঈশান থেকে নৈঋতে ঐ দিগন্তকে বিঁধে সটান
নিযুত ভোল্ট বিদ্যুতের শক্তি স্বাধীন
হাই-টেনশান তারে—
আমিও সেই অবাক নতুন স্বপ্ন চিনি
বিস্ফোরিত অন্য মনের॥

জন্মদিন ॥

শান্তনু দাস

এই ভালো একা একা দ্বীপ চিনে চিনে
নুড়ি তুলে আনা
বেদনার ক্ষতচিহ্ন কোন জন্মদিনে
রক্তক্ষরণের কালে অসহ্য উল্লাস মনে পড়ে
জন্মের রঙিন ধাপ মেপে মৃত্যুর শিখরে উঠে আসি :

ভালবাসা, ঠিকানা কোথায়?......মেলেনা উত্তর,
হয়তো উঠোনে কোন পবিত্র প্রহর
হাঁটে চলে, কথা বলে
দূরাগত কোন মুসাফির, ক্লান্তদেহে ঘরে ফিরে আসা,
এই ভালোবাসা
রোজনামচায় যার শব্দময় স্মৃতি রাখতে হয় :

তামাম দুনিয়া যেন বিকলাঙ্গ নুব্জ দেহ নিয়ে
খুঁড়িয়ে সীমান্তে যেতে পারে
কারণ শরীর মহাশয় নির্বিরোধ জীব,
কারণ সূর্য লক্ষ বার
ঘষা জানলার কাঁচে বিবর্ণতম হতে পারে :

অথচ এখনো আমি হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে
অন্ধকারে পথ বেয়ে চলি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে
কোন জন্মদিনে
ধূসর দ্বীপের পথ চিনে মৃত্যুর আরেক ধাপে
যন্ত্রণা শিখরে উঠে আসি।

ওরা দুজনে বাল্যবন্ধু। বদ্যিনাথ আর রতন। স্কুলজীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই বেঞ্চে পাশাপাশি ওদের স্থান ছিল। তারপরে হয় ছাড়াছাড়ি। বদ্যিনাথ বড়লোকের ছেলে। উচ্চশিক্ষার জন্য তাকে চলে আসতে হল কলকাতায়। রতন মেদিনীপুরেই রয়ে গেল। না থেকে তার উপায় ছিল না। বদ্যিনাথ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, চলে আয় রতন। ব্যবস্থা একটা হবেই। যদি আমার চলে, তোরও চলবে। ভাগাভাগি করে নেব।

রতন সে হাতে হাত রাখতে পারেনি। বলেছিল, তা হয় না বদ্যিনাথ। তোর নিজের টাকা হলে কথা ছিল না। কিন্তু......

বদ্যিনাথ রাগ করেছিল। দুঃখিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর তাকে অনুরোধ করেনি। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে রতন তার আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। ভালবাসার মধ্যে খানিকটা শ্রদ্ধার সংমিশ্রণ ঘটল।

বদ্যিনাথের মুখের পানে খানিক তাকিয়ে থেকে রতন বলেছিল, তুই আমায় ভুল বুঝিসনে বদ্যিনাথ—

সেদিনে ভুল বোঝেনি বদ্যিনাথ কিন্তু, কর্মজীবনে সেদিনের সে রতন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ইদানিং রতনকে সে ঠিক চিনতে পারছে না। ওর কথা, ব্যবহার এমন কি চেহারাটাও যেন পাল্টে গেছে। এই পরিবর্তনের কারণটাকে বদ্যিনাথ একটা কারণ বলেই ভাবতে পারছে না।

রতন বলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

বদ্যিনাথ বলে, বাজে কৈফিয়ৎ।

রতন তর্ক করে। বলে, যারা রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় তারা একথা বলবে এ জানা কথা।

বদ্যিনাথের সবচেয়ে দুর্বল স্থানে ঘা দিয়েছে রতন। জেনেশুনেই দিয়েছে। নইলে ওকে থামান যাবে না। অর কথা-প্রসঙ্গে এমন সব ঘটনার আবির্ভাব ঘটবে যা [illegible] সযত্নে পরিহার করে চলতে চায়।

বদ্যিনাথের চোখ-মুখ রাগে দুঃখে লাল হয়ে উঠল। রতন অবস্থাটা বুঝে নিয়ে হাসিমুখে বলল, দে ভাই, একটা ভাল সিগারেট দে। তোকে আর রাগ করতে হবে না।

রতন এড়িয়ে যেতে চাইলেও বদ্যিনাথ ছেড়ে দিতে রাজি না। আঘাতটা উপেক্ষা করেই সে পুনরায় প্রশ্ন করে, তুই বিয়ে করছিস কেন রতন?

হা-হা করে হেসে উঠে রতন জবাব দেয়, দেহের তাগিদে বদ্যিনাথ, নইলে আমাদের মত লোকের কি বিয়ে করার কোন অর্থ হয়।

বদ্যিনাথ গম্ভীর গলায় বলে, কিন্তু সে তাগিদ ত অন্য উপায় মেটান যায় রতন। বিয়ের মূলে কথা কি একমাত্র কামনার পরিতৃপ্তি?

একথার জবাব না দিয়ে রতন হাত বাড়িয়ে দিল, সিগারেট—

বদ্যিনাথ একটি সিগারেট এগিয়ে দেয়। রতন তাতে অগ্নি সংযোগ করে বার কয়েক টান দিয়ে একটু নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে বসল। বলল, তুমি কি উপদেশ দেবার জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ বদ্যিনাথ?

একটুখানি হেসে বদ্যিনাথ বলল, এত বড় স্পর্ধা আমার সেই রতন। আমি শুধু আমার বাল্যবন্ধুর খোঁজ করছিলাম। আজ এক মাসের উপর বিদেশ থেকে ফিরেছি অথচ না ডেকে পাঠাতে তুমি একবার এলে না পর্যন্ত।

তাহলে একটা সত্যি কথাই বলতে ইচ্ছে বদ্যিনাথ। রতন বলল, তোমার আমার মধ্যে আজ বিরাট ব্যবধান। আমার বর্তমান জীবিকা ট্যাক্সিচালনা। তুমি একাধারে ধনী তার উপর একজন বিচারক। পদমর্যাদায়, জীবিকায় ভিন্ন জাতের—

বাধা দিয়ে বদ্যিনাথ বলল, তা সত্ত্বেও তুমি আমার সঙ্গে তুই তুকারি করে কথা কইছ। তোমার কথা আর কাজ দু রকম হচ্ছে নাকি রতন?

রতন কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলল, অভ্যাসের দোষে হয়ে গেছে ভাই।

বদ্যিনাথ গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, শ্রেণীভেদের দোহাই আর অভ্যাসের দোষের কথা তুলে তুমি কখনও সত্যকে চাপা দিতে পারবে না রতন।

কাকে তুমি সত্য বলছো বদ্যিনাথ? জবাব দেয় রতন।

বদ্যিনাথ হাসিমুখে বলে, তুমি নিজেও তা জান।

আমি নিজেও তা জানি......

তেমনি হাসিমুখেই বদ্যিনাথ বলতে থাকে, জান বলেই এড়িয়ে যাবার এমন সযত্ন প্রয়াস। তোমার মনের সঠিক সংবাদ হয়ত আমি জানি না কিন্তু তবুও বলব তুমি ভুল পথে চলেছ। তোমার স্ত্রী-পুত্রের উপর অবিচার করেছ। আর একথা তুমি নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জান।

রতন চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে এসে বলল, চম্পা বোধহয় তোমার কাছে দরবার করতে এসেছিল? কি কি বলে গেছে তোমাকে? তার স্বামী একটি পাঁড় মাতাল—স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্তব্যহীন...অত্যাচারী...

থাম......বদ্যিনাথ ধমকের সুরে বলল, তোমার স্ত্রী কোনদিনই আসেননি। আমি গিয়েছিলাম তোমার খোঁজ করতে। দেখলাম—আর সেই থেকেই ভাবছি যে, এতটা কি করে সম্ভব হল। সংবাদ পাঠাতে বলেছিলাম একবার সচক্ষে তোমাকে দেখবার জন্য আর সকর্ণে তোমার মুখ থেকে কিছু শুনবার জন্য। দেখে-শুনে এখন মনে হচ্ছে সম্ভব অসম্ভবের কোন সীমারেখা নেই। এটা নিছক একটা কথার কথা। আমার যুক্তি বিচার এই কথাই বলছে। তবুও ভাবতে কষ্ট পাচ্ছি রতন।

রতন হঠাৎ প্রশ্ন করল, তুমি ভাগ্য মান বদ্যিনাথ?

হাসি ফুটে উঠল বদ্যিনাথের ঠোঁটের [illegible] [illegible], তুমি [illegible] কোণে আশ্রয়

নিতে চাইছ রতন। ভাগ্যকে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু তার কাছে চোখ বুজে আত্মসমর্পণ করতেও আমি রাজী নই।

রতন বলল, আমি, তুমি হলে একই কথা বলতাম।

বদ্যিনাথ ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল, যারে যারে তুমি যে বিষয়ে ইঙ্গিত করছ সেটা স্বর্গে ওঠার সোনার সিঁড়ি নয় রতন—পাতালে নেমে যাবার পিচ্ছিল সোপান।

রতন একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমার দেখছি খুব অহংকার—

বদ্যিনাথ রাগ করে না। হাসিমুখে বলে, তা হয়ত খানিকটা আছে, কিন্তু তোমাকে নিয়েও আমার কম অহঙ্কার ছিল না রতন।

হা-হা করে খানিক হেসে রতন বলল, আজ বোধহয় তা আক্ষেপে পরিণত হয়েছে?

বদ্যিনাথ বলল, তুমি জ্ঞানপাপী। তোমাকে বলবার কিছু নেই। তবে একদিন তোমাকে আক্ষেপ করতে হবে।

সেদিনে তোমাকে ডাকতে হবে না—আমি নিজেই তোমার কাছে ছুটে আসব।

সেই দিনটি যে এতশীঘ্র দেখা দেবে তা দুজনের একজনেও কি ভাবতে পেরেছিল।

রতন নিঃশব্দে এসে বদ্যিনাথের ঘরে প্রবেশ করল। চোখে-মুখে খানিকটা বিব্রত ভাব। বলল, আবার এলাম।

বদ্যিনাথ গম্ভীর। বলল, কথাটা কি বলবার অপেক্ষা রাখে?

খানিক বদ্যিনাথের ভাবলেশহীন মুখের পানে চেয়ে দেখে পুনরায় বলল, কিছু জিজ্ঞেস করছ না যে?

তার কারণ তোমার নিজের প্রয়োজনেই তোমাকে বলতে হবে।

তুমি নিশ্চয়ই আমার বিপদের সুযোগ নেবে না বদ্যিনাথ?

তোমার বক্তব্যটা এখনও আমার শোনা হয়নি রতন।

তোমার ঘরেই আমার মামলা চলছে—

একথা বলবার মত কথা নয়।

তা ঠিক, তোমার ঘরে যখন মামলা তখন একথা নতুন করে বলবার কি আছে। রতন ঝাঁকিয়ে উঠল।

বদ্যিনাথ প্রসঙ্গান্তরে এল। বলল, তুমি কি দাঁড়িয়ে থাকবে? বসবে না?

রতন একটা চেয়ার টেনে বসে পড়তেই বদ্যিনাথ সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, একটা ধরিয়ে ফেল।

পরে নেব।

তা হলে কি জন্যে এসেছ তাই বল। নিশ্চয়ই মামলার তদবির করতে নয়। বদ্যিনাথের কণ্ঠস্বর রস-কষহীন।

রতন জবাব দিতে পারে না, মাথা নীচু করে থাকে।

বদ্যিনাথ বলতে থাকে, আজ কিন্তু তোমার স্ত্রী এসেছিলেন। তোমার জন্যে অনেক কাকুতি-মিনতি করে গেলেন। তাঁকে যখন কোন ভরসা দিতে পারিনি তোমাকেও পারব না একথাটা আগেই বলে দেওয়া ভাল।

রতন এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল। উত্তাপহীন গলায় বলল, বলার আগেই জবাব পেলাম। তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা না বলে পারছি না। বর্তমান দুর্ঘটনার জন্য তুমি দায়ী—

বদ্যিনাথের কণ্ঠে বিস্ময়—আমি!

হ্যাঁ তুমি। রতন বলতে থাকে, রতন বেশ ছিল। তার মত করেই সে দিন কাটাচ্ছিল। তুমি জোর করে তার অতীত জীবনকে বর্তমানে টেনে আনলে—ভাল ভাল কথা শোনালে। আমার বর্তমানের মধ্যে অতীত পাক খেতে লাগল বদ্যিনাথ। আমি ভয় পেলাম। চতুর্দিকে খোলা চোখে তাকাতে গিয়ে হাত কাঁপল......কিন্তু থাক ওসব কথা। তোমার শেষ জবাব যখন পেয়ে গেছি, তখন আর মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে কি হবে—

বদ্যিনাথ আস্তে আস্তে বলল, শুনলাম ইচ্ছে করলে নাকি তুমি অনায়াসে পালাতে পারতে রতন?

রতন জবাব দেয়, পারতাম, কিন্তু পারিনি। বেচারার একখানা পা বোধহয় একেবারেই গেছে। এত বছর গাড়ী চালাচ্ছি কোনদিন এমনটি ঘটেনি।

সাক্ষী সাবুদ আছে? বদ্যিনাথ জিজ্ঞেস করে।

তা নেই বটে কিন্তু থানায় গিয়ে আমি নিজেই সত্য ঘটনা রেকর্ড করিয়ে এসেছি।

রতন। বদ্যিনাথের গলায় নরম সুর।

বল। জবাব দেয় রতন।

জীবনের প্রতি আজও দেখছি তোমার রীতিমত শ্রদ্ধা আছে। বদ্যিনাথ বলে, অথচ নিজের স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে এমন উদাসীন! তাদের সম্বন্ধে......

বাধা দিয়ে রতন বলল, কি সব উক্তি করেছি এই কথা বলবে ত? কিন্তু সেদিনেও আমি তোমাকে মিথ্যে বলিনি আজও তেমনি তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি। যাকগে ওসব কথা—বকে বকে গলাটা শুকিয়ে গেছে একটা সিগারেটই দাও, টানতে টানতে নিজের আস্তানায় চলে যাই।

●

এক বিন্দু দুর্বলতা দেখাতে পারেনি বদ্যিনাথ। বরং লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে রতনকে। এক মাসের জন্য লাইসেন্স বাতিল, দুশ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে একমাস কারাদণ্ড। তবে উপযুক্ত জামিনে এক সপ্তাহ পরে জরিমানার টাকা দেবার সময় মঞ্জুর করা হয়েছে। জামিন দাঁড়াবার লোকের অভাব হয়নি রতনের। কিন্তু টাকাটা নিয়েই ভাবনা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। এক সপ্তাহের মধ্যে এতগুলি টাকা কোথা থেকে আসবে...... লাইসেন্স বাতিল অর্থে রোজগারের পথও রুদ্ধ। ইচ্ছে করলে অল্পের উপর দিয়ে অনায়াসেই তাকে রেহাই দিতে পারত বদ্যিনাথ। তার এতদিনের লাইসেন্সে ইতি-পূর্বে আর দাগ পড়েনি।

কোর্ট থেকে বার হয়ে এসে দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু রতন উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে একবার বাড়ীতে এসে উঁকি দিল। অনেক দিন পরে সে তার স্ত্রী-পুত্রের পানে চোখ চেয়ে দেখল। বুকের কোথায় যেন খোঁচা লাগল। বদ্যিনাথ হয়ত ঠিকই বলেছে। বিয়ে করা তার উচিত হয়নি।

রতন নিঃশব্দে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। স্ত্রীর আহ্বানে থামতে হল। ছেলেটাও মার পিছু পিছু এসে উপস্থিত হয়েছে। কেমন, যেন ভীরু ভীরু চোখে বাপকে দেখছে।

চম্পা ছেলেকে চলে যেতে বলতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রতন বলল, ডাকছিলে কেন?

চম্পার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি দেখা দিয়েই মুহূর্তে তা মিলিয়ে গেল। বলল, দুশ টাকা ফাইন হয়েছে—

না দিতে পারলে এক মাসের হাজত।

জানি! চম্পা আস্তে আস্তে বলে, আমার ত আর কিছু নেই শুধু তোমার মার দেওয়া দুগাছা বালা ছাড়া। শুনেছি এতে অনেকটা সোনা আছে। তোমার প্রয়োজন এতে মিটে যাবে।

রতন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, জবাব দিতে পারে না।

চম্পা বলতে থাকে, খুব বিপদে না পড়লে হাতছাড়া করতে নিষেধ করেছিলেন তিনি।...... বালা দুগাছি রতনের হাতে তুলে দিয়ে চম্পা পিছন ফিরতেই রতন আর্তকণ্ঠে ডাক দিল, চম্পা—

চম্পা ফিরে দাঁড়াতেই বালা দুগাছি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ঝড়ের বেগে সে উধাও হয়ে গেল।

চম্পা তারপরেও বহুক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় মন্থর পদে ঘরে ফিরে এল।

●

রতনকে আবার এসে দাঁড়াতে দেখা গেল বদ্যিনাথের সম্মুখে। একটি বেলার ব্যবধানে তাকে যেন আর চেনা যায় না। চমকে উঠল বদ্যিনাথ। মনে হচ্ছে যেন একটা প্রচন্ড ঝড় ওর উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

কি হয়েছে রতন? বদ্যিনাথের কণ্ঠে উদ্বেগ।

একটুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। একটা চেয়ার টেনে ক্লান্তভাবে বসে পড়ল রতন। বলল, বলছি, কিন্তু তার আগে একটু জল আনতে বলবে?

নিজের ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটি এগিয়ে দিল বদ্যিনাথ।

খাবো? মুখ ফসকে কথাটা বার হয়ে এল।

জল ত তুমিই চাইলে রতন?

তাহলে খেয়েই ফেলি কি বলো?

রতন এক নিঃশ্বাসে জলটুকু পান করে গ্লাসটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে একটু হেসে বলল, তোমার ত অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে বদ্যিনাথ, আমার গাড়ীটা বিক্রি করিয়ে দিতে পার?

হঠাৎ গাড়ী বিক্রি করতে চাইছো কেন রতন? বদ্যিনাথ নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল।

যে রোগের যে ওষুধ। আবার নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করতে চাই।

গাড়ী না হয় বিক্রি করিয়ে দেওয়া গেল কিন্তু তারপরে তোমার চলবে কেমন করে তা ভেবেছ কি?

রতন বলল, ভেবেছি। দু'শ টাকা জরিমানা—দু'শ টাকা নিজে আর বাকী টাকাটা থাকবে চম্পা আর তার ছেলের জন্য।

চম্পা আর তার ছেলের কথা নাইবা ভাবলে। ওরা যখন তোমার কেউ না। বদ্যিনাথের কণ্ঠস্বর একটু যেন রূঢ় মনে হল।

রতন আস্তে আস্তে বলল, কেউ না একথা বলবার জোর আমি হারিয়ে ফেলেছি বদ্যিনাথ। তাই বলে দাবী করতেও লজ্জা পাচ্ছি। চম্পার দেহটা ছিল আমার কাছে মুখ্য। আমার খিদে মিটিয়ে চম্পা পেয়েছে সন্তান। ওর নাকি মাতৃত্বই ছিল একমাত্র কামনা। অহঙ্কারে সে একদিন আমাকে করল অবহেলা। মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়ী না এলে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। চম্পা তার সন্তানকে ওর পিতার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের কথা জানতে দেবে না।

রতন থামল। বলল, একটু চা খাওয়াবে বদ্যিনাথ? তোমার চাকরকে ডাকবে?

ডাকতে হল না। চাকর নিজে থেকেই চা জলখাবার নিয়ে এসেছে।

গলা ভিজিয়ে নিয়ে রতন আবার বলতে শুরু করল, রক্ত মাথায় উঠে গেল। চম্পার এত বড় সাহস! যুক্তি বিচারের চেয়ে ক্রোধ-রিপুর বশবর্তী হলাম। চম্পাকে শিক্ষা দেবার জন্য বাড়ী ছাড়লাম। তোমাকে মিথ্যে বলব না, আজ একটি বছর তাদের কোন খোঁজ রাখিনি। আমার আশে-পাশের বন্ধুরা বাহবা দিয়েছে। এ নইলে আর পুরুষ কি। রতন একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল। এমনি সময়ে তুমি এলে—

●

অনেককাল পরে মেদিনীপুরে এসে বদ্যিনাথের সর্বপ্রথমেই রতনকে মনে পড়ল। উপস্থিত হল তার বাড়ীতে। রতনের পরিবর্তে দেখা হল তার স্ত্রীর সঙ্গে। যে আশা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল তার কিছুই ওর চোখে পড়ল না। বরং অভাব আর অনটনের একটা নগ্ন ছাপ সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করেও ওদের সংসারের প্রকৃত অবস্থা সে জানতে পারল না। সাবধানে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল চম্পা।

ফিরে আসবার আগে নিজের পরিচয় দিয়েছিল বদ্যিনাথ। বলেছিল, আমার কথা রতনের কাছে শোনাই স্বাভাবিক তাই খবর না দিয়েই চলে এসেছি। ওকে আমার কথা বলবেন। আর সম্ভব হলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেন।

এরপরে অনেকখানি সহজভাবে কথা বলেছে চম্পা এবং মাঝে মধ্যে আসবার অনুরোধও জানাল। আর সে অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি বদ্যিনাথ। এবং আসা-যাওয়ার সূত্র ধরে ওর পারিবারিক **জীবনের বহু ঘটনাই সে অবগত হয়েছে।**

আর তার ভদ্র শিক্ষিত মন রতনের এই অকরুণ ব্যবহারে বিরূপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু পিছিয়ে যেতে পারেনি বদ্যিনাথ। বরং অতীতের বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে একেবারে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বদ্যিনাথ অভয় দিয়েছিল চম্পাকে। বলে-ছিল, রতন আমার বাল্যবন্ধু। ওর ভাল-মন্দ নিয়ে আমারও দুশ্চিন্তা কিছু কম নয়।

রতনের কথা বলার বিরতির ফাঁকে গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলি আর একবার নতুন করে বদ্যিনাথের চোখের সম্মুখে ফুটে উঠল। মিথ্যে আশ্বাস চম্পাকে সে দেয়নি। তাই রতন আজ তার মুখোমুখী।

রতন পুনরায় বলতে সুরু করে, তুমি এসেছ খবর পেয়েও তুমি না ডাকতে তোমার কাছে কিছুতেই আসতে পারিনি। আমি যে অনেক নীচে নেমে গেছি তা আরও স্পষ্ট অনুভব করলাম। নইলে আমার মধ্যে দ্বিধা দেখা দিল কেন? তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই আমার আত্ম-জিজ্ঞাসা শুরু হল। কেমন করে এতটা পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। জবাবও আমি পেয়েছি। আসলে বড় দুর্বল-চিত্ত আমি। নিজের উপর না আছে বিশ্বাস না আছে ব্যক্তিত্ব। তাই তোমার পাশে যে রতন ঘুরে বেড়াত সঙ্গদোষে অতি সহজেই সে তলিয়ে গেল। হারিয়ে গেল।

বদ্যিনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তলিয়েও যায়নি হারিয়েও যায়নি রতন। দৃষ্টিভ্রম ঘটেছিল—

রতন মাথা নাড়তে থাকে, ওটা তোমার কথা বদ্যিনাথ। একটুখানি থেমে রতন সহসা অন্য কথায় চলে গেল, আমার একটা কথা রাখবে বদ্যিনাথ?

বল—

ভেবে দেখলাম গাড়ী বিক্রি করে খুব বেশীদিন চলতে পারে না।

তা ঠিক। বদ্যিনাথ বলে, ওটা বরং বিক্রি করো না।

গাড়ী আমি কোন কিছুর বিনিময় আর রাখবে না। রতন বলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু জোগাড় না করলেও নয়।

চাকরী পেলে করবে রতন?

এই কথাটাই ত আমি বলছি তোমায়। রতন জবাব দেয়।

চাকরী তুমি পেতে পার তবে তা সর্ত সাপেক্ষ।

সর্তটা জানাবে কি?

বিলক্ষণ। জবাব দিল বদ্যিনাথ, খাওয়া পরা, থাকবার জন্য একখানি ঘর আর হাত খরচ বাবদ মাসিক দশ টাকা।

চম্পা আর ছেলে খাবে কি?

আপাতত সে ভাবনা থেকে তোমাকে রেহাই দেওয়া হবে।

চাকরীটা তা হলে তোমার কাছে?

আমাকে প্রয়োজন মত তুমি সাহায্য করবে রতন। আমি একলা আর পেরে উঠছি না।

খানিক মাথা নীচু করে কি ভাবল রতন। তারপরে গভীর কণ্ঠে বলল, তোমাকে বোধ-হয় বুঝতে পেরেছি বদ্যিনাথ। আমি রাজী আছি ভাই। মনে হচ্ছে আমার কাছে এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

এরপর থেকে রতনের জীবনের ধারা ভিন্ন পথ ধরে চলতে শুরু করল। কিন্তু এই পরিণতিই কি বদ্যিনাথ চেয়েছিল? ইদানিং সে নিজেকে প্রশ্ন করে। রতনকে বলে, তোমার স্ত্রী-পুত্রের কথা যে ভুলে যেতে বসেছ। এবারে তোমার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে ভাই। আমাকে আর নিমিত্তের ভাগী করে রেখ না রতন।

প্রশান্ত হেসে রতন জবাব দেয়, আমার দায়িত্ব-জ্ঞান যে কতখানি তা তোমার অজানা

দৃষ্টিভ্রম ঘটেছিল

নয় বদ্যিনাথ। এ বরং ভালই হয়েছে। ছেলেটা মানুষ হবে।

বদ্যিনাথ বলে, চোরের উপর রাগ করে তুমি মাটিতে ভাত খাচ্ছ রতন।

রতন তেমনি হাসিমুখেই বলে, যদি খেয়ে থাকি তাহলে মাটি খাঁটি বলে। তাছাড়া নিমিত্ত তুমি আর ভাগ নেবে না এ কখনও হয়?

কি যে হয় আর কি হয় না তা আরও বেশ কিছুকাল একটা প্রশ্ন হয়েই ওদের দুজনের মধ্যে ঝুলে রইল। সময় নিজের নিয়মে স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে চলল। একটা সহজ সমাধানের পথ আজও তারা খুঁজে পায় না। বদ্যিনাথ বলে, অত্যন্ত বেশী হয়ে যাচ্ছে রতন। তুমি কি চাও তা আমি জানি না কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম তা আজও অপূর্ণ রয়ে গেল।

সহাস্যে রতন বলে, তাহলে হুকুম কর বদ্যিনাথ।

বাধা দিয়ে বদ্যিনাথ বলে, জোর করে সব জিনিস পাওয়া যায় না রতন। পেলেও তার পরমায়ু সম্বন্ধে আমি সন্দিহান।

তোমার সঙ্গে আমিও একমত। রতন হাসতে থাকে।

বদ্যিনাথ নিজে বিয়ে করেনি। জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা স্থূল। দৃষ্টির আড়ালেও যে কত সূক্ষ্ম বস্তু লুকিয়ে থাকতে পারে তার সম্যক ধারণা নেই। তাই আরম্ভটা সুষ্ঠু ভাবে হলেও শেষ করা আজও সম্ভব হল না।

ওর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে চেয়ে রতন আবার একটুখানি হাসল। বলল, জীবনটা যে নিছক অঙ্ক না একথা আগে বুঝতে চাইনি। বুঝতে শিখিয়েছ তুমি অথচ......

রতন হোঁচট খেল। কথাটা শেষ করবার সুযোগ পেল না। খানিকটা বিস্ময় আর কিছুটা চাপা আনন্দ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল।

খোলা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করছে চম্পা। সোজা বদ্যিনাথের কাছে এগিয়ে এসে কোন প্রকার ভূমিকা না করে সহজ গলায় বলল, তুমি সমাধান খুঁজে-ছিলে কিন্তু পাওনি। আমি পেয়ে আর এক মিনিটও দেরী করিনি দাদা। আসলে তুমিও ভুল করেছ, আমিও করেছি। আমার কাজ তুমি কেমন করে করবে তাই আমিই চলে এসেছি।

বদ্যিনাথ পলকহীন চেয়ে আছে। আর রতন রীতিমত বিচলিত মনে হল।

এরপরে চম্পার দৃষ্টি বদ্যিনাথের মুখের উপর থেকে সরে গিয়ে রতনের উপর নিবদ্ধ হল। একটুখানি ম্লান হেসে বলল, এতদিন ধরে অনেক মিথ্যে বাচ্চকে বলেছি কিন্তু সে মিথ্যের বোঝা এত ভারী হয়ে উঠেছে যে আমি নিজেই আর বইতে পারছি না। তাই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি। নিজের ছেলের কাছে আমাকে দিয়ে আর মিথ্যে বলতে বাধ্য করিও না।

এর বেশী আর বলতে পারে না চম্পা। এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলে সে হাঁপাতে থাকে।

রতন হয়ত এমনি একটি আহ্বানের প্রতীক্ষাই করছিল নইলে ওর চোখে-মুখে উচ্ছ্বসিত আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে কেন—

আজ কিন্তু বদ্যিনাথের স্থূল দৃষ্টিতেও সবই ধরা পড়ল। প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, তোমরা দুজনেই দেখছি সমান। মনে আর মুখে যদি এতটুকু মিল থাকে...

কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র

প্রবোধচন্দ্র সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। আশা করি এর থেকেই বোঝা যাবে যে, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শ তথা জীবনবোধ মূলতঃ অভিন্ন। উভয়ের ধর্মভাব নাই আসলে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর, উভয়েই সে বিদ্যাকে নিছক তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আগ্রহী। এটাই হল আধুনিক ভারতের ধর্ম-সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ দিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যাবে যে. —রামপ্রসাদকেই আপন কালের অগ্রবর্তী বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তা বলা যায় না। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মভাবনায় যে মূলগত ঐক্য লক্ষিত হয়, তা নিতান্তই একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। অন্ততঃ আংশিকভাবে এটা ঈশ্বরচন্দ্রের আবাল্য মনোবিকাশের উপরে রামপ্রসাদের গীত-ধারার প্রায় অলক্ষিত অথচ সুগভীর প্রভাবের ফল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মভাবনা অনেকাংশে রামপ্রসাদের অনুরূপ হলেও তাঁর কবিভাবনায় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁর কবিভাবনায় রূপকল্পনারও স্থান ছিল। সে ক্ষেত্রে দেখি শিবের ভাবমূর্তি তাঁর কল্পনাকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত করত। যেমন—

জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন।
জগতের অন্তরাত্মা নিজে নারায়ণ।।
উভয়ে অভেদ তাঁরা শাস্ত্রে শুনি তাই।
স্বভাবিক আমাতে সে দেবজ্ঞান নাই।।
তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ যাঁহার।
সেই অচলা ভক্তি তাঁতেই আমার।।
মহাযোগী জ্যোতির্ময় যোগে অনুরত।
সহজেই তাঁহার প্রেমে মন হয় রত।।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), মনের প্রতি উপদেশ, পৃঃ ২৪৭

এ প্রসঙ্গে অধিকতর অগ্রসর হওয়া অনাবশ্যক। তবে এখানে এটুকুমাত্র বলা যেতে পারে যে, কবিকল্পনার ক্ষেত্রে শিবের প্রতি এই যে অন্তরের টান, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বোধ করি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এবং তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে।

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, উভয়েরই প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্ম। তাই অপেক্ষাকৃত বিশদ-ভাবেই এ বিষয়ের আলোচনা করা গেল।

এই দুই কবির রচনাগত সাদৃশ্য শুধু যে ধর্মভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ভাষা, অলংকার, ছন্দ প্রভৃতি সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে আশ্চর্যরকম মিল দেখা যায়। অতঃপর আমরা একে একে এই কাব্যাঙ্গগত সাদৃশ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হব।

সংস্কৃতির প্রধান বাহন ভাষা। তাই রাম-প্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অসংগত হবে না। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে "মান-সিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি"-প্রসঙ্গে বলেন—

'পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা, কাব্য রস লয়ে।।'

রাজসভার অভিজাত কবির এই উক্তিতে জ্ঞানাভিমান ও অনাদরের সুর যেন একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে অনভিজাত ও নিরভিমান রামপ্রসাদের পদ-গুলিতে যে সহজ প্রসাদগুণ ও রসালতা স্বতঃপ্রকাশ, ভারতচন্দ্রের রচনায় তা দুর্লভ। অথচ রামপ্রসাদের রচনাও কম যাবনী-মিশাল নয়। যেমন—

মনরে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-'জমিন' রইল পতিত
'আবাদ' করলে ফলতো সোনা।।
আমায় দেও মা 'তবিলদারী'।
আমি 'নিমকহারাম' নই শঙ্করী।।

রামপ্রসাদের রচনায় 'যাবনী' শব্দের নিঃসংকোচ প্রয়োগ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'মানব-জমিন' শব্দে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও আরবী শব্দের মধ্যে যে অপূর্ব সৌভ্রাত্রবন্ধন ঘটেছে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। গুরুচণ্ডালী পদ্ধতি রামপ্রসাদের রচনায় দোষ নয়, গুণ। রামপ্রসাদের প্রতিভাবলে এটা 'দোষ হয়েও গুণ হৈল'।

রামপ্রসাদের ভাষার যে গুণ ও যে বৈশিষ্ট্য, অনেক পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষারও সেই গুণ, সেই বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনাতেও 'যাবনী' শব্দের অভাব নেই। যেমন—'ইংরাজী নববর্ষ' (১৮৫২) কবিতার এই বিখ্যাত পংক্তিটি—

'বিবিজান চলে যান লবেজান করে।'

এর শুধু অলংকারের ঝংকারটুকু নয়, দেশী কথার সঙ্গে বিদেশী কথার মিশোল-টুকুও রমনীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় চলতি বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে অজস্র পরিমাণে। এই মিশ্রণ অনেক স্থলেই বেমালুম। এই সব মিলেই খাঁটি বাংলা। এই বাংলা তিনি পেয়েছিলেন অংশতঃ ভারতচন্দ্র ও মুখ্যতঃ রামপ্রসাদের উত্তরাধিকার হিসাবে।

'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গলায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই।'

—'কবিতা সংগ্রহ': ভূমিকা পৃঃ ৭৪

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই দুই কবির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

অলংকার প্রয়োগেও ঈশ্বরচন্দ্র যে অনেক পরিমাণেই রামপ্রসাদের অনুবর্তী তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নজরে পড়ে ঈশ্বর-চন্দ্রের রচনায় অর্থালংকারের বিরলতা। এই বিরলতার দ্বারা কল্পনার দীনতাই সূচিত হয়। এই জন্যই তাঁর রচিত কবিতা পড়তে অনেক সময় রসহীন বক্তব্যসার গদ্য প্রবন্ধের মত বোধ হয়। কল্পনা তখন অলংকারের দৈন্যই তার প্রধান কারণ। কেন না অলংকার তো কাব্যের বহিরঙ্গ বা ভূষণমাত্র নয়, কাব্যাত্মার প্রকাশরূপেরই নাম অলংকার। এই হিসাবে রামপ্রসাদের স্থান ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক উপরে। তাঁর হৃদয়ানুভূতি প্রায় সর্বত্রই অলংকারের রূপ নিয়েই প্রকাশ পায়।

কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র অলংকারের আশ্রয় নিয়েছেন, সে সব স্থলে তিনি প্রায় রামপ্রসাদের পথেই চলেছেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি এক স্থানে বলেছেন যে, তিনি 'অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন।' রাম-প্রসাদের পদাবলীর সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই ঈশ্বরচন্দ্রের এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করবেন। তবু পূর্ণতার খাতিরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ওরে মন চড়কী, ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।...
ওরে মায়া-ডোরে বড়শী গাঁথা,
স্নেহ বল যারে।।

কবিজীবনী পৃঃ ৫৫

ধৈর্য খোঁটা ধর্ম বেড়, এ দেহের চৌদিক
ঘেরেছে।
এমন কাল চোরে কি করতে পারে
মহাকাল রক্ষক হয়েছে।

—পূর্ববৎ, পৃঃ ৬২

এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য বসিল পাটে,
নেয়ে লবে গো।
দশের ভরা তোরে লয়ে,
দুঃখিজনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,
কোথা পাবে গো।।

পূর্ববৎ, পৃঃ ৬৫

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী—১২৪

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।।

—পূর্ববৎ, পদাবলী—১২৭

অলংকার রচনায় ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত চিরাগত উপমাস্থলগুলি বর্জন করে নিত্যপরিচিত অথচ অবহেলিত তুচ্ছ বিষয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ কথা কারও অজানা নেই। তবু কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধির সহায়তা

হবে। দৃষ্টান্তগুলি সবই বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী (প্রচলিত) থেকে সংকলিত।—

লোভ নাহি থেকে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটেপুলি পেটে যেন ছিটে-গুলি ফোটে।।
....
কর্তাদের গালগল্প গুড়ুকে টানিয়া।
কাটালের গুঁড়িপ্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া।।
—'কবিতা সংগ্রহ', পৌষপার্বণ, পৃঃ ৮০

ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিতে সামান্য আনারসও দেখা দিয়েছে অসামান্য রূপ নিয়ে।—

ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত-মণিহার চাঁদের গলায়।।
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে।।

নীলকান্তমণির তুলনাটাতে নূতনত্ব নেই। কিন্তু রূপসীর চোখ-ওঠার তুলনাটা অসাধারণ। এ রকম সাদৃশ্য কল্পনায় ঈশ্বরচন্দ্র অদ্বিতীয়।

ফুলকপির বর্ণনাটাও অভিনব নয়।—

মনোহর ফুলকপি, পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়।।
—হেমন্তে বিবিধ খাদ্য, পৃঃ ১৫১

খয়রা মাছও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের তুলনার গুণে।—

নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর।
খয়রার পেট যেন ময়রার ঘর।।
পূর্ববৎ, পৃঃ ১৫৯

মিলন প্রার্থনায় কালিনীর উক্তি।—

পান-খয়েরের প্রায় তোমায় আমায়।
উভয়ে একত্র যোগ, কত ভোগ তায়।।
—মানভঞ্জন, পৃঃ ১৮৬

'ঋতুপতি' বর্ষার বেশবর্ণনাটাও উপভোগ্য। গায়ে তার চিলে-আস্তিন সাটিনের জামা, গলায় সোনার হার, আর পায় জরির লপেটা।—

সবুজ মেঘের দল ঢল ঢল ছল ছল
হত বগ প্রবল অনিলে।
স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার চিলে।।

সোনার দামিনী-হার গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা লতা পায়।।
—বর্ষা, পৃঃ ২১৫

এরকম কল্পনার দৃষ্টি কবি ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্র যে চিরাভ্যস্ত উপমাদি অলংকার প্রয়োগেও অপটু ছিলেন না তা বলা বাহুল্য। পূর্বে যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এবং পরেও যে সব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হবে তার প্রতি একটু মন দিলেই এ কথা বোঝা যাবে। তবু আশু উপলব্ধির জন্য এখানে আরও কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

প্রথমে রামপ্রসাদ—

আসার আশা আশা কেবল আসামাত্র হোলো।
চিত্রের কমলে যেমন ভৃঙ্গ ভুলে গেলো।।
—'কবিজীবনী', পৃঃ ৯৭

তাজমনা, কুঞ্জন-ভুজঙ্গম-সঙ্গ।
কাল মত্তমাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ।।
....
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে,
উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্মিকে কি কর্ম ছাড়ে,
তার কি প্রসঙ্গ।।
—পূর্ববৎ, পৃঃ ৩৪০

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
....
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।।
—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী—১২২

এবার ঈশ্বরচন্দ্র—

হেরে সে বিমল মুখ নয়নে উপজে সুখ
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর সশঙ্কিতা নিরন্তর
গুরুতর পরিবাদ-রাহু ভয়ে।।
—'কবিতা সংগ্রহ', প্রেমনৈরাশ্য, পৃঃ ২৬৮

ভাবের করিয়া সৃষ্টি
প্রতি বাক্যে প্রীতি বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা
নয়নের পলকে পলকে।।
থেকে থেকে আড়ে আড়ে
আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি ভুল,
অর্ধফোটা পদ্মফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে।।
—'কবিতা সংগ্রহ', প্রণয়, পৃঃ ২৭৩-৭৪

কিন্তু এসব চিরপ্রয়োগসিদ্ধ অভিজাত-বর্গীয় অলংকাররচনা রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্রের আসল কৃতিত্বের বিষয় নয়। অনভিজাত ও অতিপরিচিত বস্তুকে অলংকাররূপে প্রয়োগ করে অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব সৃষ্টিতেই তাঁদের আসল কৃতিত্ব। এ সব অনভ্যস্ত অলংকার প্রয়োগের দ্বারা সাহিত্যে যে নূতন রকমের রস উৎপন্ন হয় তার স্বাদবৈচিত্র্য আছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের সৃষ্ট রসেও স্বাদের পার্থক্য যথেষ্টই আছে। তার কারণ তাঁদের রস সৃষ্টির ক্ষেত্র ও লক্ষ্য পৃথক। যেমন, রামপ্রসাদের বিষয় ধর্মগত এবং তার সুর অনেকাংশেই লিরিক ধরনের, আর ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার বিষয় বিচিত্র এবং লিরিক সুরের বিরলতা তাঁর রচনাবলীর একটি প্রধান অভাব। কিন্তু সে আলোচনা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলেও তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ তথা অলংকারগত রসসৃষ্টির পদ্ধতি ছিল অভিন্ন। কবি চিত্তের বিষয়কে শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করবার প্রয়োজনে যে কোন তুচ্ছ আটপৌরে বস্তুকে অলংকার-রূপে মেনে নেওয়াই হল সে পদ্ধতি। শব্দ বাছাই করার বেলায় যেমন, অলংকার রচনার বেলাতেও তেমনি চিরাগত সংস্কার ও প্রথা লঙ্ঘন করে অভিজাত-অনভিজাত-নির্বিবেশে যে-কোন বস্তুকে বিনা দ্বিধায় মর্যাদার আসনে স্থান দেওয়া, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই হল আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। এই সাহিত্যিক ডিমোক্রেসির যুগে অলংকার রচনার বেলাতেও গুরুচণ্ডালী বিধানের আর কোন বালাই নেই। এই হিসাবেও রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রকে আধুনিকতার অগ্রদূত বলে স্বীকার করতে হয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে কালক্রম তথা গুরুত্বের বিচারে অগ্রাধিকারের মর্যাদা রামপ্রসাদেরই প্রাপ্য।

দেখা গেল অর্থালংকার রচনায় রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্ধতি বহুলাংশে এক ধরনের হলেও একে অন্যের অনুবর্তী নন, অর্থাৎ একজনের উপরে অপর জনের কোন লক্ষণীয় প্রভাব নেই। কিন্তু শব্দালংকারের বেলায় একথা বলা চলে না। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে রামপ্রসাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখন তাই দেখাতে চেষ্টা করব।

একথা সুবিদিত যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান দোষ তাঁর শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"শব্দচ্ছটায় অনুপ্রাসযমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়।...ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালী-ওয়ালার পাঁচালীতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাসযমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল... এই অলংকারপ্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাসযমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নি। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।...

ঈশ্বর গুপ্তের সময়-অসময় নাই, বিষয়-অবিষয় নাই — একবার অনুপ্রাসযমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না কেবল শব্দের দিকে।"

—'কবিতা সংগ্রহ' ঃ ভূমিকা পৃঃ ৭১-৭২ ঈশ্বরচন্দ্রের এই শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা ও অনুপ্রাসযমকের প্রতি তাঁর এই আগ্রহাতি-

শব্দের উৎস কোথায়, বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে নীরব। অন্য অনেকের মত তাঁরও হয়ত ধারণা ছিল যে, পূর্বগামী কবিওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদের প্রভাবেই তাঁর মধ্যে এই শব্দাড়ম্বর তথা শব্দানুপ্রাসপ্রিয়তা দেখা দিয়েছিল। এই ধারণার মধ্যে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্রের আদিগুরু ছিলেন রামপ্রসাদ। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার যে দোষ, রামপ্রসাদের রচনারও সেই দোষ। রামপ্রসাদী রচনার যমকানুপ্রাসবাহুল্য কম পীড়াদায়ক নয়।

এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হওয়া যাক। রামপ্রসাদের কালীকীর্তন কাব্যের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ ছিল তাঁর অল্প বয়স থেকেই একথা আগেই বলা হয়েছে। এই কাব্যের এক স্থানে আছে—

গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥

* * *

জগদম্বারে, যব পূরে বেণু।
যব পূরে বেণু, ধায় বৎস ধেনু।
উড়ে পদরেণু, রেণু ডাকে ভানু।
ভাবে ভোর তনু। ইত্যাদি

—'কবি জীবনী' পৃ ৬১

এখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রাস-প্রীতির আদি উৎস। এই উদ্ধৃতির দুই অংশে দু রকম অনুপ্রাস, এটাও লক্ষণীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও এই দু রকম অনুপ্রাস দেখা যায়। রামপ্রসাদের 'কষিতকাঞ্চনকান্তি' কথাটিতে ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন রস-সৃষ্টির প্রয়োজনে যে রকম অদ্ভুত দক্ষতার সংগে ব্যবহার করেছেন তা সত্যই উপভোগ্য।

কষিতকাঞ্চনকান্তি কমনীয় কায়।
গাল-ভরা গোপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), এণ্ডাওয়ালা তপস্যা কাছ পৃ ১২৯

ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে॥

* * *

রামপ্রসাদ কহিছে, শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
এখনি উঠিবে রাঘব ধনাকি,
প্রসাদ মন মা কমল কানকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো॥

—'কবি জীবনী', পৃ ৮৪

এখানে 'তনয়' ও 'জানকী' শব্দে যমক অলংকার প্রয়োগের দ্বারা চমক সৃষ্টির প্রয়াসটুকুই শুধু লক্ষণীয় নয়, অনুপ্রাসের খাতিরে 'কানকী' ও 'ধানকি'র ন্যায় অর্থহীন শব্দ রচনার হাস্যকর কিম্বা বিরক্তিকর প্রয়াসটুকুও লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রেও রামপ্রসাদ দাশরথি রায় তথা ঈশ্বরচন্দ্রের পথপ্রদর্শক। এ রকম প্রয়াস দেখে মনে হয়,—

"অনুপ্রাস-যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাইভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না।"

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও অনেক স্থলেই সমভাবে প্রযোজ্য। ছন্দ-আলোচনা-প্রসংগে এরকম কিছু দৃষ্টান্ত যথাস্থানে উদ্ধৃত করা যাবে।

যা হক, 'তনয়' শব্দ নিয়ে উক্ত প্রকার ছেলেখেলার দৃষ্টান্তটির প্রসংগে ঈশ্বরচন্দ্রের—

'দোষের ত নয় তবে ঘোষের তনয়।'
—গ্রন্থাবলী (বসুমতী)' বড়দিন, পৃ ১৩১

পংক্তিটির কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। রামপ্রসাদের রচনা থেকে এরকম যমক প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

কাহার নারী হে, চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্নবেশে।
—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী—১৯৩

এর সংগে তুলনীয় ঈশ্বরচন্দ্রের এই দুই পংক্তি।—

আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী।
আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারি॥
—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), মেনকার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়, পৃ ২৮৬

ভাল করে খুঁজলে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এরকম সাদৃশ্যের আরও অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

রামপ্রসাদের এই বিখ্যাত পদটিও এ প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে।—

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
—পদাবলী—৭১

এখানে 'তারা বেয়ে' না লিখে 'নয়ন বেয়ে' লিখলে ক্ষতি হত না, হয়ত ভালই হত। কিন্তু কবি যমক রচনার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পূর্বে দেখেছি তাঁর অনুপ্রাসের মোহও কম ছিল না। তার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি।

প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসান দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে
ভবার্ণবে গো।
—'কবি জীবনী', পৃ ৬৫

এ প্রসংগে শেষ কথা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় রামপ্রসাদের যেসব রচনা বিশেষ আগ্রহের সংগে সংকলন করেছিলেন এবং যেগুলির প্রশংসায় তিনি বারবার উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে এরকম যমক-অনুপ্রাস নিয়ে খেলার বহু নিদর্শন আছে। হয়তো এটাও সেগুলির প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার একটা বড় কারণ।

যা হক, রামপ্রসাদের রচনাই যে ঈশ্বরচন্দ্রের শব্দালংকার প্রীতির একটি প্রধান উৎসস্থল, আশা করি এখন সে বিষয়ে সন্দেহের আর বিশেষ অবকাশ নেই।

ছন্দো রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সে আলোচনারও সার্থকতা আছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ও বিষয়টির গুরুত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। তাই ছন্দের ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের আপেক্ষিক কৃতিত্বের বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হল।

।। শেষ ।।

পাঠকের বৈঠক

সমাজসেবিকার মন্তব্য

আরিজোনার টুকসোন অঞ্চলে তিরাশী বছর বয়সে সম্প্রতি মার্গারেট সাঙ্গারের দেহাবসান ঘটেছে। এই মহিয়সী মহিলা বিশেষভাবে ভারতবর্ষে স্মরণীয়। 'বার্থ কণ্ট্রোল' বা জন্মনিয়ন্ত্রণ কথাটি তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন, এবং ১৯২১-এ ন্যুইয়র্কে প্রথম 'বার্থ কণ্ট্রোল কনফারেন্স' সংগঠন করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং সেই সময় ভারতের আঠারোটি শহরে পরিভ্রমণ করে চিকিৎসক-মণ্ডলী, নাগরিক সংস্থা এবং সমাজ-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলনে তাঁর অবদান সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।

গান্ধীজীর সঙ্গে মার্গারেট সাঙ্গারের অনেকদিন ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পত্রালাপ চলেছিল, গান্ধীজী সংযমের পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু কোনোরকম প্রতিষেধক ব্যবহারে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। মার্গারেট সাঙ্গার তখন রবীন্দ্রনাথের মত প্রার্থনা করে তাঁকে একটি পত্র দেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গী জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুকূল ছিল। তিনি দারিদ্র্য এবং বহুসন্তান জন্মের অভিশাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি মার্গারেটকে যে পত্র লিখেছিলেন তা সেপ্টেম্বর মাসে মার্গারেট সাঙ্গার সম্পাদিত "বার্থ কন্ট্রোল রিভিয়ু" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখে-ছিলেন—

"I am of opining that the birth control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger-stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence than could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family"

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা উত্তরকালে নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হয়েছে। আজ আমাদের রাষ্ট্রকে পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরি-কল্পনা সম্পর্কে তাই উদ্যোগী হতে হয়েছে। সমস্যা এখন অতিশয় প্রবলভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত খাদ্য ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে।

সাহিত্য ও শিল্পে সংস্কৃতি

শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক জ্ঞান-বিচারের উপর নির্ভর করে যে জন্ম প্রতিরোধ এ জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল, এবং যতদিন সেই শুভবুদ্ধি জাগ্রত না হয় ততদিন আরো অসংখ্য প্রাণীকে পৃথিবীতে এনে দুঃখ, দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও অপমৃত্যুর হাতে ফেলে দিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল, তাই তিনি লিখেছিলেনঃ—

"Therefore, I believe that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own is a great social injustice which should not be tolerated".

মার্গারেট সাঙ্গার

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে তাঁর নিজস্ব মতবাদ সাহসিকতার সঙ্গে সেদিন প্রচার করেছিলেন। কুসংস্কার, ধর্মগত গোঁড়ামি এবং সামাজিক বিধিনিষেধ কিছুই তাঁকে সেদিন বাধা দিতে পারেনি। তাই মার্গারেট সাঙ্গারের কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি সমর্থন এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে।

মার্গারেট সাঙ্গার অতি অল্পবয়সেই অশেষ কর্মদক্ষতা এবং স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দান করেছিলেন। তাঁর জননীর এগারোটি সন্তানের তিনি অন্যতমা। অনিশ্চিত আয়সম্পন্ন সংসারে অজস্র সন্তান উৎপাদনের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব অতি অল্পবয়স থেকেই গড়ে ওঠে।

যক্ষ্মারোগে সাঙ্গারের জননীর মৃত্যু হয়, সেই কারণে ছোটবেলা থেকেই তিনি সেবাব্রত গ্রহণে মনস্থির করেন এবং নার্সের বৃত্তি গ্রহণ করেন। এই সূত্রে ন্যুইয়র্ক সিটির লোয়ার ইস্ট সাইডের বস্তী অ[...] তাঁকে প্রায় যেতে হত। সেখানে তিনি[...] কাছ থেকে অসংখ্য সন্তানধারণ এবং প্র[...] জ্বালা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর রোগিণ[...] নিরন্তর সন্তানধারণটাই ছিল সর্ব[...] ব্যাধি—

"With whom pregnancy w[...] chronic condition".

তরুণী সাঙ্গার দেখলেন ত্রিশ প[...] বছরেই জননীরা শীর্ণশরীর ব[...] পরিণত হতেন এবং অনেকে স্বকৃত বাব[...] গর্ভপাত করার প্রচেষ্টায় অকালে [...] কবলে পড়ে জীবনপাত করতেন।

এইসব দুর্গত আশাহীন রমণীদের ব্যথা ও বেদনা তাঁকে আকুল তুলল, এ যেন এক দুঃস্বপ্নের জগৎ। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি নার্সের [...] ছেড়ে দিলেন। কোনো সাহায্যেই [...] দুর্গতদের দুঃখহরণ করতে পারছেন[...] তাঁর সব প্রচেষ্টাই কি ব্যর্থ হবে?

তিনি লিখেছেন—

"I came to a sudden realisa[...] that my work as a Nurse [...] my activities. in social scie[...] were entirely palliative [...] consequently futile and useles[...] relieve the misery I saw all a[...] me".

আসল ব্যাধি কোথায় তার সন্ধান [...] তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে এই [...] তাঁর প্রতিজ্ঞা, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক [...] লড়াই করে কিছুই হবে না। যে দারিদ্র্য [...] চিরকাল দরিদ্র থেকে যাবে যদি এই[...] শ্রাবণের ধারার মত সন্তান বর্ষণ ঘটে [...] বছর। এই সব জননীদের প্রয়োজনীয় [...] সরবরাহ করার কোনো আইনসঙ্গত [...] নেই। ডাক্তাররা বললেন—এ একটা সামা[...] সমস্যা, সমাধানও সেইভাবে করতে হবে।

কয়েক বছর গভীর চিন্তার [...] মার্গারেট একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করলে[...] কিন্তু সর্বপ্রথম বাধা হল যুক্ত[...] সরকারের নীতি এবং অন্যান্য বি[...] ধরনের প্রতিবাদ। সন্তানসম্ভাবনা বিষ[...] নিঃশব্দে মার্গারেট তাঁর উপদেশ দি[...] লাগলেন। এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ত[...] গোপন অভিযান একটা প্রকাশ্য পথে চালি[...] হল। 'দি উইম্যান রেবেল' নামক পত্রিক[...] প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হল কর্ম[...] নারীদের নিজেদের অবস্থা বিষয়ে সচেত[...] করা। তাদের মধ্যে একটা প্রতিরোধমূল[...] চেতনা গড়ে তুললেন। শুধুমাত্র নারী[...] অধিকার রক্ষার কথা বলেই তাঁর পত্রিক[...] ক্ষান্ত হল না, সন্তান নিরোধ ব্যবস্থা [...] সম্পর্কেও প্রচার শুরু হল। অবিলম্বে এ[...] পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হল, প্রথম দি[...]

শুধু ডাকে পাঠানো নিষিদ্ধ ছিল, পরে পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণও ঘটল।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঙ্গারকে অভিযুক্ত করা হল, ডাকযোগে সন্তান নিরোধ প্রচার করার দায়ে। অবশ্য পরে প্রেসিডেন্ট উইলসনের বন্ধুদের প্রতিবাদে সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুকলিন শহরে একটি বার্থ কণ্ট্রোল ক্লিনিক পরিচালনার দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, ত্রিশদিনের কারাদণ্ডও দেওয়া হল। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার ফলে "ইউ. এস কোর্ট অব অ্যাপিলস্" ডাক্তারদের জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষেধক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশ আইনসঙ্গত করলেন—এবং তাঁদের অনুমতি দিলেন—

"give contraceptive advice to women for the cure and prevention of disease".

কারান্তরালে বসে মিসেস সাঙ্গার স্থির করলেন যে আন্দোলন, জনমত গঠন প্রভৃতির কাল শেষ হয়েছে এখন প্রয়োজন সংগঠনের এবং তার সমর্থনে আইন গঠন। মানুষের অজ্ঞতা দূরীকরণে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এই জাতীয় কর্মের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁর সম্পাদনায় "বার্থ কণ্ট্রোল রিভিয়ু" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, তখনও তিনি কিন্তু কারান্তরালে। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়, কি করে এত নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন, তার উত্তরে তিনি বলেন—

"You ask me how I could face all the persecution the martyrdom, the opposition, I'll tell you how: I know I was right. It was as simple as that. I know I was right".

রবীন্দ্রনাথের মত, জর্জ বার্নার্ড শ, এইচ, জি, ওয়েলস এবং জুলিয়ান হাক্সলী প্রভৃতি মিসেস সাঙ্গারের সুহৃদ এবং সমর্থক ছিলেন। কে জানত যে এই মহিলার জন্য সারা পৃথিবীতে এমন একটা আন্দোলন গড়ে উঠবে, জুলিয়ান হাক্সলী বলেছেন—

"She created a movement which swept through the world like a flame".

পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির এতই পরিবর্তন ঘটে যে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউ, এস, ফরেন এড্স বিল দ্বারা "Foreign aid funds for population on control". আইনগত করা হল। লিন্ডন জনসন একটি বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিলেন—

"We shall have to seek new ways to use our knowledge to help deal with explosion in world population".

মিসেস স্যাঙ্গার অনেক সম্মান এবং মর্যাদামূলক উপাধি লাভ করেছেন, ১৯৩১-এ তাঁকে "আমেরিক্যান উইমেনস্ অ্যাওয়ার্ড অব অনার" দেওয়া হয়—

"For conspicuous contribution to the enlargement and enrichment of life".

এলবার্ট এবং মেরী ল্যাসকার ফাউণ্ডেস্যানও তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। বিংশ শতাব্দীর যে বিংশতিসংখ্যক মহিয়সী মহিলার নাম 'উইমেনস্ হল অব ফেমে' মর্যাদার আসন লাভ করেছে মিসেস মার্গারেট সাঙ্গার তাঁদের অন্যতমা বিবেচিত হয়েছেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম:— "The Pivot of Civilization" (1922), "Happiness in Marriage" (1926) এবং দুটি আত্মজীবনী—

"My fight for Birth Control" (1931); "Margaret Sangeor — An Autobiography" (1938)

পরিশেষে যে বিচিত্র ঘটনা মিসেস মার্গারেট সাঙ্গারের জীবনে এবং সেই সূত্রে সারা পৃথিবীতেও পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার উল্লেখ করছি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্যাডি স্যাকস্ নামে একটি দরিদ্র মহিলা নিজের চেষ্টায় গর্ভপাতে উদ্যোগী হয়, তার অবস্থা সংকটজনক হয় এবং তরুণী মিসেস সাঙ্গার তাকে বিপদ থেকে ত্রাণ করেন। তিন মাস পরে তার স্বামী এসে আবার অনুরূপ এক সঙ্কটের কথা জানায় —অল্পকালের মধ্যেই মিসেস স্যাকসের অপমৃত্যু ঘটে। সেই রাত্রে মিসেস সাঙ্গার তাঁর কর্তব্য স্থির করেন—

"I went to bed knowing that no matter what it might cost . . .I was resolved to seek out the root of the evil to do something to change the destiny of mothers whose miseries were vast as the sky".

পৃথিবীর অসংখ্য জননীদের জন্য মিসেস সাঙ্গার যে সঙ্কটত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য নিত্য তাঁকে স্মরণ করতে হবে।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ ॥

শিল্পী সংস্থার উদ্যোগে একাদশ বার্ষিক শরৎ সাহিত্য সম্মেলন গত ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে তিনদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উগ্র আধুনিকতার কথা উল্লেখ করে বলেন, অসমসংস্কৃতি জাতীয় উন্নতির অন্তরায়। আধুনিকতার নামে একালের সাহিত্যিকরা আর গ্রামের মানুষের দিকে ফিরে তাকায় না। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই মানুষগুলোকেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই যখন শরৎ সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের দেখা যায়, তখন মনে হয় তারা কত আপন।

শ্রীহুমায়ুন কবীর শরৎ সাহিত্যে মানবপ্রত্যয়ের দিকটি তুলে ধরে বলেন, শরৎচন্দ্র সমাজের অবহেলিত মানুষকে আলিঙ্গন করে সমাজের ঘৃণ্যতার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। যাঁদের ধারণা, বর্তমান সমাজ সংকটের ছবি শরৎ সাহিত্যে না থাকায় তার আবেদন কমে আসছে, তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রীহরিপদ ভারতী বলেন, যে সাহিত্য মানবতার চিরন্তন আদর্শে রচিত, মানুষের শাশ্বত হৃদয়-বৃত্তির কাছে তা কখনও খণ্ডিত হবে না।

অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। তিনি বলেন, শরৎচন্দ্র বাংলার সমাজ জীবনের এক অজানা সত্যকে প্রকাশ করেছেন। বাংলার নারী জীবনের যন্ত্রণাকে তাঁর মত আর কেউ এত জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় ভাষণ দেন।

*

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত রচনাবলী মূলে বাংলা থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে তিনটি সংস্করণে মোট এক লক্ষাধিক কপির উপরে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচারিত হয়েছে, মস্কো থেকে এ সংবাদ জানিয়েছেন 'এ-পি-এন'। নির্বাচিত রচনাবলী ছাড়াও শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার মুদ্রণ-সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষ কপি।

শরৎচন্দ্রের ৯০তম জন্মদিবস উপলক্ষে সোভিয়েত সংবাদ-সংস্থা 'এ-পি-এন' প্রেরিত সংবাদে আরও বলা হয়েছে যে, শরৎ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত পাঠক-সাধারণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙালী জীবনের ব্যাপকতাকে আবিষ্কার করেন। সোভিয়েত সাহিত্যসমালোচকদের মতে সোভিয়েত পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কারণ হল সামাজিক কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেন তাদের প্রতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি এই সাহিত্য-স্রষ্টার অপরিসীম দরদ। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাহী ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী বলে সোভিয়েত মানুষ মনে করেন।

সোভিয়েত দেশের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-গবেষকরা শরৎসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিবন্ধ রচনা প্রভৃতি কাজ করছেন বলে সংবাদে জানা গেছে।

*

গত ১৬ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের পিতৃভূমি দেবানন্দপুরে 'শরৎ-সদনের' ভিত্তিস্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীজরাসন্ধ।

হাইলে সেলাসির চিত্র প্রতিষ্ঠা ॥

বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির আন্তর্জাতিক চিত্রশালায় সমিতির সহায়ক এবং শুভানুধ্যায়ী বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের চিত্র প্রতিষ্ঠা করবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলবার প্রথম পদক্ষেপ হয় গত ১৭ই সেপ্টেম্বর। সেদিন ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির একটি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীকে পি খৈতান। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কলিকাতাস্থ ইথিওপিয়ার কনসাল জেনারেল মিঃ এস এন হাতা। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানান।

ইউরোপে ভারতীয় সাহিত্য ॥

ইউরোপে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে যে তীব্র অনীহা, বোধ হয় এমন আর কোনোখানে নেই। শুধু ভারতীয় সাহিত্য কেন, বাইরের জগৎ সম্বন্ধেই এখন এঁদের 'ইনটেলেকচুয়াল কিউরিওসিটি' ন্যূনতম। যা আছে তা আমেরিকায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং কিছু পরিমাণে জাপানে এবং অস্ট্রেলিয়ায়। আমেরিকা বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভারতীয় ভাষা চর্চা সম্বন্ধে এর আগে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। জাপানেও যে ভারতীয় সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার একটি সংবাদ এই বিভাগেই প্রকাশ করা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয় সাহিত্যের কিছু কিছু চর্চা সম্প্রতি শুরু হয়েছে। 'মেঞ্জিস কোয়ার্টার্লি'তে এর মধ্যেই কিছু কিছু বাংলা কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইউরোপে, বিশেষত ফরাসীদেশ এবং ইংলণ্ডে ভারতীয় সাহিত্যের খুব একটা প্রচার বা প্রসার ঘটেনি।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ফরাসী জনসাধারণের অজ্ঞতা খুবই সুবিদিত। ফ্রান্সের অনেক শিক্ষিত লোকও রবীন্দ্রনাথ কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, জানেন না। তাঁরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব ভারতীয়কে 'hindou' মনে করেন। যাক সে কথা। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে প্রধানতঃ ১৯২০-৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু রচনা ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এরপর বোধ হয় ১৯৩৯ সালে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) অনূদিত হয়েছে। ব্যস, এই পর্যন্তই ভারতীয় সাহিত্য চর্চা। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী প্রচেষ্টায় কিছুটা হিন্দি চর্চা চলছে।

প্যারিসে 'ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশ শতকের শেষের দিকে। এ ছাড়াও কিছু কিছু কেন্দ্র আছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইন্ডিয়ান স্টাডিজ' কেন্দ্রে কোন পাঠ্যতালিকা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যে ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রটি আছে, তাতে হিন্দি উর্দু এবং তামিল ভাষার ডিপ্লোমা কোর্স পর্যন্ত আছে। কিন্তু বাংলা ভাষার কোন স্থান নেই। মাত্র দু বছর হলো সেখানে বাংলাকে 'কমপ্লিমেন্টারি কোর্স' হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য একজন হিন্দির অধ্যাপক এবং পাকিস্থানী অধ্যাপকের সাহায্যে বাংলা পড়ান হয়। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলা পাকিস্থানের সরকারী ভাষা হিসেবেই স্থান পেয়েছে, ভারতীয় ভাষা হিসেবে নয়।

তামিল সাপ্তাহিক 'কল্কি'র রজত-জয়ন্তী সংখ্যা ॥

সম্প্রতি তামিল সাপ্তাহিক 'কল্কি'র রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই উপলক্ষে পত্রিকাটির যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তা তামিল সাহিত্য এবং সংস্কৃতি আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে স্বীকৃতি লাভ করবে। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পরলোকগত আর, কৃষ্ণমূর্তি'র একটি রচনা দিয়ে পত্রিকাটির আরম্ভ। 'কল্কি' পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখেছেন শ্রীরাজাগোপালাচারী। এ ছাড়াও এই সংখ্যার অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শ্রী কে. শান্তনম, শ্রী কে, বালসুব্রাহ্মণিয়া আয়ার প্রমুখ। পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক শ্রীসদাশিবমের রচনাটিও খুব উল্লেখযোগ্য।

তেলুগু ভাষাতত্ত্বের বই ॥

তেলুগু ভাষাতত্ত্বের খুব উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ নেই বললেই চলে। যে সমস্ত তেলুগু ভাষাতত্ত্ববিদ এর আগে তেলুগু ভাষার উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, সংস্কৃ অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার মত তেলু ভাষারও জননীস্থানীয় ভাষা। ভাব বিস্মিত হতে হয় যে, অধিকাংশ তেলুগ ব্যাকরণ কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হয়নি, সংস্কৃত ভাষাতেও রচি হয়েছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে তেলুগু ভাষা তত্ত্ববিদরা সচেতন হয়ে উঠেছেন। তেলুগ যে দ্রাবিড় ভাষা থেকে জাত, এ বিষয়ে এখন আর বিশেষ সংশয় নেই যদিও এই ভাষার উপর সংস্কৃত প্রভাব অপরিসীম। ডঃ কে সূর্যনারায়ণের তেলুগু সমাজের উপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী, গ্রন্থটি তাঁদের কাছে খুবই মূল্যবান বলে গৃহীত হবে।

বুক কর্পোরেশন ॥

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম, সি, চাগলা ভারতীয় গ্রন্থ ব্যবসায়কে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য একটি 'বুক কর্পোরেশন' গঠনের সপক্ষে সম্প্রতি অভিমত প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য যেমন ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন রয়েছে, তেমনি গ্রন্থ ব্যবসার জন্য একটি কর্পোরেশন গঠন করলে, পুস্তক ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

বিদেশী সাহিত্য

সোভিয়েত ভারতবিদের জন্মশতবর্ষ ॥

এ বছর হ'ল প্রখ্যাত সোভিয়েত ভারতবিদ Fyodor Shcherbatsk -এর জন্মশতবর্ষ। বলাবাহুল্য, এই ভারতবিদ ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সুপণ্ডিত ছাত্রজীবনেই ভারতীয় দর্শন বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এমন কি ভারতবর্ষে আসার বহুকাল আগেই তিনি ভারত বিষয়ে গবেষণামূলক কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ক'রে কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিশেষত, 'ভারতীয় তর্কশাস্ত্র', 'ভারতীয় কবিতার ধর্ম' ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য ভারতীয় পণ্ডিতদের বিস্মিত করে তুলেছিল। পাণিনির ব্যাকরণ, 'ধর্মশাস্ত্র' তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের মতন পাঠ করেছিলেন। ভারতীয় লিপি ও সংস্কৃত ভাষার গবেষণা তখন থেকেই তিনি শুরু করেন। 'বৌদ্ধ-দর্শনে'র গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে তিনি সমগ্র ইওরোপে পরিচিত হন। এই গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে তাঁকে ৭০০ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-দার্শনিক ধর্মকীর্তি'র রচনার সাহায্য নিতে হয়েছিল। ধর্মকীর্তিকে এজন্য তিনি 'ভারতবর্ষের কাণ্ট' বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর ভারতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও ভারতীয় সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছাও নেহাৎ কম ছিল না। অথচ তাঁর মতে, "অন্যান্য ইওরোপীয় পণ্ডিতরা এ বিষয়ে ছিলেন একেবারে উদাসীন।"

দীর্ঘকালের সংস্কৃত সাধনার পর তিনি সে ভাষায় পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। ভারতীয় বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদদের সঙ্গে আলোচনা করে, তাঁদের মূল্যবান উপদেশ নিয়ে তিনি 'ন্যায়শাস্ত্র'কে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অতঃপর দীর্ঘ চার মাস পরিশ্রম করে 'মীমাংসা ও ন্যায়-বৈশেষিক' পদ্ধতি তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনেন। ভারতবর্ষ থেকেই তাঁর নাম সর্বপ্রথম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার জন্য তাঁকে "তর্কভূষণ" উপাধি দেওয়া হয়।

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্র' 'দশকুমার চরিত', 'মেঘদূত', 'রঘুবংশে'র অনুবাদ এবং গবেষণার মধ্যে 'বৌদ্ধ-ধর্মে নির্বাণ', 'বৌদ্ধ-শাস্ত্রের' দুইখণ্ড পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বৌদ্ধ-শাস্ত্রে'র প্রতিলিপি থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে গবেষণায় তিনি তিরিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে নিয়োজিত ছিলেন। অধ্যাপক ধর্মেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী তাই বলেছিলেন, "২৫০ বছরের মধ্যে এই 'বৌদ্ধ-

শাস্ত্র' গ্রন্থটিই ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ।"

ম্যাক্স্ নিয়েদেরমেয়ার ও "লাইমস্ ভের্লগ" ॥

সাধারণ লোকেদের কাছে বিশেষ পরিচিত না হলেও ম্যাক্স নিয়েদেরমেয়ারের নাম জার্মান লেখকমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর প্রকাশনা "লাইমস্ ভের্লগ"-কে এক ডাকে সকলেই চেনেন। কেননা সমকালীন জার্মান সাহিত্যের অনেকেই আজ এই প্রকাশসংস্থাটির জন্য লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সম্প্রতি নিয়েদেরমেয়ার তাঁর এই প্রকাশসংস্থাটির বিংশতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি সুপরিকল্পিত, মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। "লাইমস ভের্লগ" থেকে এ পর্যন্ত যেসব লেখকের গ্রন্থ বেরিয়েছে ও যাঁরা আজ খ্যাতির শীর্ষচূড়ায় তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে স্মৃতিকথা জাতীয় এই গ্রন্থটি। বইটির নাম "প্যারাইসার হফ্"। এ প্রসঙ্গে নিয়েদেরমেয়ার বলেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অল্প কিছুকাল পরে আমি পুরোনো ওয়েসব্যাডেন অঞ্চলের "প্যারাইসার হফ্" নামক হোটেলে প্রথম এই ব্যবসা শুরু করি। তখন এখানেই জার্মানীর বিভিন্ন লেখকরা এসে জড়ো হতেন এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ফলে তাদের জীবনের নানারকম বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আমি জানবার সুযোগ পাই। ...'লাইমস্ ভের্লগ' থেকে এঁদের প্রত্যেকেরই বই বেরিয়েছে।"... জার্মান কবি গটফ্রিড্ বেন-এর গদ্য-পদ্য মিলিয়ে মোট চারটি খণ্ড "লাইমস্ ভের্লগ" থেকে বেরিয়েছে। বেন্ ছিলেন নিয়েদেরমেয়ারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর জীবনের বিচিত্র স্মৃতি "প্যারাইসার হফ্" গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। এ ছাড়া ডব্লিন-এর করুণ-বিষাদঘন জীবনের ঘটনাও তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। "জাহ্রগঙ্ ১৯০২"-এর লেখক আর্নেস্ট গ্লেইসরের সঙ্গে তাঁর নাটকীয় সাক্ষাৎকারের ঘটনাও এতে সুন্দর বিবৃত।

"লাইমস্ ভের্লগ" থেকে আর যেসব বিশিষ্ট জার্মান লেখকের বই বেরিয়েছে তাঁদের মধ্যে হ্যান্স্ আর্প, উইলিয়ম বারোস, ট্রুম্যান কপোট, রেনে শার এবং আঁদ্রে ম্যাসন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক লেখকের সঙ্গেই ম্যাক্স নিয়েদেরমেয়ারের সম্পর্ক যে অত্যন্ত আন্তরিক ছিল বইটি থেকে তা প্রমাণিত হয়। প্রকাশক ও লেখকের পারস্পরিক সম্পর্কের এরকম গ্রন্থ সকলের কাছেই আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হবে।

হ্যারল্ড রবিন্সের উপন্যাস

বইটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই হৈ-চৈ পড়ে গেল। হ্যারল্ড রবিনসের ৭৮১ পৃষ্ঠার বিরাট বই 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স' পেয়ে গেল আমেরিকার 'বেস্ট-সেলার'-এর গৌরব। নিউইয়র্ক টাইমস্ লিখলেন, 'বইটি আমাদের কালের সবচেয়ে উদ্দাম এবং বিরল-দৃষ্টান্ত।' বিস্ময়ের কথা এই যে গ্রন্থটি লেখার আগেই, কেবলমাত্র এর কাহিনী বা বিষয়পরিকল্পনার মৌখিক ভাষ্যেই জো লেভিন নামক এক চিত্র-প্রযোজক দশ লক্ষ শিলিং-এর বিনিময়ে বইটির অগ্রিম চিত্রস্বত্ব কিনে ফেলেছেন। এবং এর প্রকাশকও এই শক্ত পেপারব্যাকের স্বত্বের জন্য অগ্রিম দিয়েছেন দশ লক্ষ শিলিং।

হ্যারল্ড রবিনস আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। এ মুহূর্তে তিনি ৯টি উপন্যাসের রচয়িতা। বইগুলি প্রত্যেকটিই প্রায় ২৫ লক্ষ করে কপি বিক্রী হয়েছে। হলিউডের বাঘা-বাঘা প্রযোজক-পরিচালক রবিনসের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাঁর বর্তমান বয়স পঞ্চাশ বছর। 'দি অ্যাড্-ভেঞ্চার্স' সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমার মতে এটি আমার সবচেয়ে পরিণত উপন্যাস। আমার মনে হয় বর্তমান পৃথিবীর প্রাণ-স্পন্দনকে আমি সার্থকভাবে এই গ্রন্থে তুলে ধরতে পেরেছি। আজকের মানুষ নীতিহীন, রূঢ় এবং অত্যন্ত বাস্তব। ...আমার বিশ্বাস আমি একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখক হতে পারব।"

নতুন বই

রবীন্দ্র সাহিত্যে মৃত্যুচেতনা

রবীন্দ্রসাহিত্যে যে সকল ভাব ও ভাবনার সমাবেশ দেখা যায়, তার মধ্যে মৃত্যু-চেতনা একটা বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের মত আর কোন আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকের রচনায় মৃত্যুজিজ্ঞাসা এমন ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। এটা সর্বজনবিদিত যে, কবিগুরু মানুষের এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে কোনদিন বিভীষিকার চোখে দেখেন নি, কিংবা মৃত্যুতেই যে জীবনের পরিসমাপ্তি সেকথাও ঘোষণা করেন নি। আসলে এই চেতনা হল আমাদের অস্তিত্বেরই আর এক রূপ। অর্থাৎ মৃত্যুকে কবি জীবনের চরম প্রকাশ হিসেবে কল্পনা করেছেন। এর মধ্য দিয়েই ঘটে চরমশুদ্ধি, নতুনতর জীবনের উদ্বোধন। তাই কবি বলেছিলেন :—

> আদিম সৃষ্টির যুগে
> প্রকাশের যে আনন্দ
> রূপ নিল আমার সত্তায়
> আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা
> রুগ্ন বুভুক্ষায়
> দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে
> ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
> মৃত্যুস্নান তীর্থতটে সেই
> আদি নির্ঝর তলায়।

আমরা শুধু রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। মৃত্যুই তার ছদ্মবেশ খসিয়ে আসল চেহারাটি দেখিয়ে দেয়। সে এই বিশ্ব-জগৎ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলির প্রাণস্বরূপ মহাজ্যোতির্ময় সত্তার অংশ। তখন সে তার সেই নিত্য ভাস্বর স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে। বলাবাহুল্য, এই বোধ বেশ কিছুটা ঔপনিষদিক ভাবনায় আচ্ছন্ন। তাই দেখা যায় বাইরের রূপের মধ্যে যাঁর প্রকাশ তাঁর স্বরূপ দেখবার জন্যে কবির কী আগ্রহ। ঈশোপনিষদে ঠিক এমনটি দেখা যায়। যেমন,

> হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
> তৎত্বং পূষন্নাপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।
> পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য।
> ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।
> যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
> যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি।

অবশ্য একথা সত্য যে, বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে অনেকসময় আপাতবৈষম্য মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে সাধারণ পাঠকরা কিছু পরিমাণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মৃত্যুরহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে হোঁচট খান।

এর আগে অনেকে শ্রদ্ধেয় সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তবে তার বেশির ভাগই খুব সংক্ষিপ্ত। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। সেই অভাব পূরণ করেছেন শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। এই দুরূহকর্মে ব্রতী হওয়ায় লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁর আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু' গ্রন্থে মোটামুটিভাবে কবিগুরুর মৃত্যু-চিন্তায় প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন কোন প্রভাব বিস্তার করেছে কি না, তার সঙ্গে মৃত্যুবিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ও দর্শনের সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় প্রভৃতি দুরূহ বিষয়কে আলোচনা করেছেন। কবিজীবনে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত

আলোচনা করে কবির খন্ড ও অখন্ড দৃষ্টিতে মৃত্যুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং নিজস্ব মন্তব্য বিস্তৃতাকারে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ কোন্ অনুভূতি পরম্পরায় মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমানস বিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং বিবর্তনের পথে ধীরে ধীরে একটি বিশ্বাসে পেণছেছে আলোচ্য গ্রন্থে এই ধারাবাহিকতাব সূত্রটি গভীর যত্ন-সহকারে লেখক আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য করবার জন্যে তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন তা এক কথায় প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথের এই গবেষণাগ্রন্থটি স্মরণীয় সংযোজন হয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস করি।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু (আলোচনা)—**ধীরেন্দ্র দেবনাথ, রবীন্দ্রভারতী, ৬।৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, দাম ছ টাকা।**

●

কবিতার কাগজ হিসেবে 'একক' বহু পরিচিত নাম। এ বছরে পূর্ণ হল তার পঁচিশ বছর। সেই উপলক্ষে সম্প্রতি বেরিয়েছে রজত জয়ন্তী বর্ষ প্রথম সংখ্যা। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বনফুল, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখের শুভেচ্ছা ছাড়াও কবিতা ও আলোচনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, রাম বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। 'একক' দীর্ঘজীবী হোক।

একক (বিশেষ সংখ্যা) সম্পাদক : **শুদ্ধসত্ত্ব বসু**

প্রদর্শনী

শিল্পী : উলদিস সালাক

গীতিময় কারুকাজ

আসলে কারুকাজ থেকে সঙ্গীত বেজে ওঠে না। কিন্তু ল্যাটভিয়ার কারুশিল্পী উলদিস সালাক বলেন, "যখন আমি আমার কাঠখোদাইয়ের কাজগুলি করি, তখন যেন কানে শুনতে পাই আমার জন্মভূমি ল্যাটভিয়ার গান বেজে উঠছে।" নিপুণ শিল্পী সালাক তাঁর অজস্র কাঠখোদাইয়ের কাজে যেসব ছবি ফুটিয়ে তোলেন, সেগুলি সবই প্রায় ল্যাটভীয় লোকসঙ্গীত আর লোকনৃত্য উৎসবের।

ল্যাটভীয় প্রজাতন্ত্রের পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পী সালাক অনেকগুলি নতুন কাঠখোদাইয়ের কাজ করেন। ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগা শহরের মাক্সালা সালোয় এগুলির প্রদর্শনী হ'লো; সব মহল থেকেই তা অত্যন্ত প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে।

এরকম একটি কারুকাজের নাম.—"চক্রনৃত্য"। এই কাঠখোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নৃত্যপরা তরুণীদের, যারা নাচের ঘূর্ণীতে মেতে উঠেছে। তাদের উড়ে-পড়া কেশদাম ও পোশাকের প্রান্ত থেকে যেন ছবিতে এই নাচের গতি ফুটে উঠছে। ল্যাটভিয়ার বর্ণপ্রফুল্ল জাতীয় পোশাক পরা এই সুন্দরী তরুণীদের নাচ নিপুণ খোদাই-এর কাজে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বার্চ কাঠে খোদাই-করা আর একটি কাজের নামও 'নাচ'। আর এ নাচে ল্যাটভীয় জনগণের সরস কৌতুকপ্রবণতা যেন উপচে পড়েছে।

শিল্পী সালাক তাঁর দক্ষ খোদাইয়ের কাজের মধ্য দিয়ে কাষ্ঠত্বকের নিজস্ব সৌন্দর্যকেও তুলে ধরেন। এরকম একটি কাজ হল 'জল আনিতে',—একটি ল্যাটভীয় বালিকার জল আনতে যাওয়ার চিত্র. এ ছবির বিষয়বস্তু, একটি প্রাচীন ল্যাটভীয় লোকগীতি থেকে নেওয়া।

শিল্পী সালাক-এর সুন্দর শোভন শিল্পকাজগুলি গৃহের আভ্যন্তরসজ্জার পক্ষেও খুব যত্নসই। দেওয়ালে এরকম একটি কাজ রাখলে ঘরের শোভাও অনেক খুলে যায়।

শিল্পী উলদিস সালাক, তাছাড়া কাঠের খুব ছোট ছোট চিত্রিত পুতুলও তৈরি করেন। এবং তৈরি করেন নক্সা-করা নানারকম মুখোস। ল্যাটভিয়ায় আগত বহু বিদেশী এগুলি স্মারক হিসেবে নিয়ে যান। কাঠের ওপর ধাতুর পাতের রঙীন মিনার কাজও শিল্পীর আর এক নেশা।

ল্যাটভীয় শিল্পী উলদিস সালাক-এর অনেকগুলি প্রদর্শনী তাঁর জন্মভূমি ও

নিয়ানডেরথাল মানবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট এই মস্তকটিতে।

শিল্পী : উলদিস সালাক

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে দেখান হয়েছে। বিদেশেও হয়েছে। বর্তমানে শিল্পী উৎসাহভরে আর একটি প্রদর্শনীর জন্য কাজ করছেন। তা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শিত হবে।

উত্তরসাগর অঞ্চলে তুষারযুগের শিল্প

প্রস্তরযুগের শেষের দিকে মানুষের শিল্পবোধের স্ফূরণ হয়, এই ছিল এতকালের প্রচলিত বিশ্বাস। সম্প্রতি হামবুর্গের নিকটবর্তী অঞ্চলের ভূস্তর থেকে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক ওয়ালথের মাটহেস চকমকি পাথরের তৈরী এমন বহু মূর্তি ও অস্ত্র সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আবিস্কার করেছেন যেগুলি নিঃসন্দেহ রূপে নিয়ানডেরথাল মানব বা তার পূর্ব-বর্তী প্রাক-নিয়ানডেরথাল মানবের সৃষ্টি। পশ্চিম য়ুরোপের বিখ্যাত গুহাচিত্রের চেয়ে এগুলি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। পাথর কুঁদে তৈরী এই বস্তুগুলির উচ্চতা পাঁচ থেকে দশ ইঞ্চি। নানা জীবজন্তু ও মানুষের মস্তকাকৃতি এই প্রস্তর মূর্তিগুলি সাধারণত চ্যাপ্টা ধরণের দ্বিমাত্রিক। বর্তমানে এই মূর্তিগুলির একটি প্রদর্শনী হচ্ছে জার্মানীতে।

[উপন্যাস]

।। দশ ।।

সস্ত্রীক অবিনাশ মজুমদার এবং আরো গুটি-ছয়েক গৃহস্থ দেশ-ভুঁই ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এখন এঁরা যাচ্ছেন, ভাল খবর পাওয়ামাত্র আরও বিস্তর গিয়ে পড়বে। বাংলার ঐ পশ্চিম ভাগে—নতুন যার নামকরণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, নতুন গ্রামের পত্তন হবে। সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে সকলে এক-সঙ্গে বরাবর যেমনটি থেকে এসেছেন, নতুন জায়গাতেও তেমনি হবে এই অভিপ্রায়। অবিনাশ দলপতি—মুখে যা বলছেন, নির্ঘাৎ সেই জিনিষ গড়ে তুলবেন। হারেন না তিনি কোন কাজে। চিরকাল ধরে সকলে দেখছে—তাঁর উপরে আস্থা অগাধ।

তাই বটে। স্ত্রীকে বেহালায় এক দূর-আত্মীয়ের বাড়ি রেখে অবিনাশ জায়গা দেখে দেখে বেড়াচ্ছেন। সুবিধা হচ্ছে না—একটু পছন্দসই হলেই আকাশ-ছোঁয়া দাম। সে টাকা কোথায়? তাঁর একলার ব্যাপারও নয়—গোটা বীরপাড়ার ইতর-ভদ্র সব বাসিন্দাই উন্মুখ হয়ে আছে। অতএব কেউ যেদিকে ফিরেও তাকাবে না, তেমনি জায়গার খোঁজ-খবর নাও। দুর্গম পতিত জায়গা।

গড়িয়া স্টেশন ছাড়িয়ে পূব-দক্ষিণে অনেকটা গিয়ে—মনে পড়ে সে আমলের কথা?—বিশাল জলাভূমি, মাঝে মাঝে কসাড় কেয়ার জঙ্গল। ট্রেনে যেতে যেতে বরাবর এই দৃশ্য দেখে এসেছেন। দেশ ভাগ হয়ে ঘর-বসত ছেড়ে মানুষ এসে পড়ল—এই অবিনাশ মজুমদারের মত হাজারে হাজারে, লাখে লাখে—জমি তার পরে আর পড়তে পায় না। পা রেখে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা-জমি, ছেলেপুলে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দেবার মত ভিটে একটুকু।

জমিওয়ালাদের মজা। কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, এইসব জল-জঙ্গল একদা সোনার দরে বিকোবে? জমির কেনা-বেচায় লাখপতি কোটিপতি হল কত জনা! জয়-জয়কার হোক কর্তাদের—মগজ খাটিয়ে যাঁরা দেশ-ভাগের বুদ্ধি বের করেছিলেন, হয়েছেও তাই বটে—চুটিয়ে সেই থেকে রাজত্ব করে যাচ্ছেন। আরো হোক, আরো হোক! উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে আমরাও নিতান্ত মন্দ নেই। কোটি কোটি নমস্কার আমাদের প্রভুগণের উদ্দেশে।

যাকগে, অবান্তরে এসে পড়েছি। ঐ গড়িয়া অঞ্চলে অবিনাশ জায়গা পছন্দ করলেন। স্টেশনের অনেকটা দূরে। রেল-লাইনের ধারে-কাছে তাবৎ লোকের নজর পড়ে, দর সেখানে হু-হু করে চড়ে যাচ্ছে। অবিনাশের ঐ জায়গায় পৌঁছতে কখনো কাদায় পড়বেন, কখনো কাঁটায় পড়বেন, কখনো জলে সাঁতরাবেন, ভূতেও বোধকরি ভয় খেয়ে নিশিবাসে আপত্তি জানাবে।

জায়গা পছন্দ করে অবিনাশ মালিককে গিয়ে ধরলেন।

জমিদার বলতে হবে, নয়তো সম্মানে টান পড়বে। আসলে অনেকগুলো মেছো-ঘেরির মালিক তিনি। পিতামহ এক বয়সে নিজ-হাতে জাল টানতেন। ধন-সম্পত্তি হয়ে এখন ফিশারির কাজকর্ম লোকজন চালায়, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি পড়ছে। এবং কর্তামশায় জমিদার হয়েছেন।

তাহলেও মানুষটি সদাশয়, সুবিবেচক। অবিনাশের প্রস্তাবে এককথায় রাজি, এবং তাঁকে 'ভাই' বলে সম্বোধন : কেয়াবনে সাপের বাতান কিন্তু ভাই। সাপ মেরে শিয়াল তাড়িয়ে খানাখন্দ বুজিয়ে জঙ্গল সাফ-সাফাই করে নিতে পারেন তো আমার আপত্তি হবে কেন? ভালই তো, জন্তু-জানোয়ারের বদলে ভদ্র গৃহস্থেরা আস্তানা গড়বেন। হয়ে যাক, তারপরে আমার সঙ্গে একটা বার্ষিক খাজনার বন্দোবস্ত করে নেবেন। ব্যস।

কৃতজ্ঞতার গদ-গদ হয়ে অবিনাশ বলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। মালিকের মাল-খাজনা মেরে জমি ভোগ করলে ফল কখনো ভাল হয় না। কথা তবে পাকা, আমরা লেগে পড়িগে। যাবেন এক-আধবার আমাদের কাজকর্ম দেখতে। উৎসাহ পাব।

চোখ কপালে তুলে জমিদার বলেন, যাব কি করে ভাই? এ দেহে কুলোবে না। আপনি গিয়েছেন সশরীরে, না দূরে থেকে চোখের দেখা দেখে বলছেন?

অবিনাশ হেসে বলেন, বিস্তর জলকাদা ভেঙে কাঁটার খোঁচা খেয়ে তারপরে আপনার দেউড়িতে এই ঢুকেছি। এখন কেন যেতে যাবেন? পথঘাট হয়ে যাক, যাবেন সেই সময়। আগাম নিমন্ত্রণ জানিয়ে যাচ্ছি।

চিরকেলে কর্মিষ্ঠ মানুষ— বয়স অগ্রাহ্য করে অবিনাশ নতুন উদ্যমে লেগে পড়লেন। ভিটে-মাটি জলের দামে বিক্রি করেও হাজার কয়েক টাকা পেয়েছেন—এই বাবদে সমস্ত খরচ হয়ে যাচ্ছে। স্বামীর সর্বকর্মে স্ত্রী কনকলতার উৎসাহ—এবারে এই প্রথম মৃদু আপত্তি তুললেন তিনি : বিদেশ-বিভুঁয়ে একেবারে নিঃসম্বল হওয়া কি ভাল?

উচ্চ হাস্যে অবিনাশ কনকলতার কথা উড়িয়ে দেন : বিভুঁই বলছ কেন তুমি—নিজেদের ভুঁই এখন, আপন দেশ। এক বীরপাড়া ফেলে এসেছি, এখানে নতুন করে বীরপাড়া গড়ব। হার মানব না, হার মানা আমার কুষ্ঠিতে নেই। দেখই না ক'টা দিন লাগে?

কলোনির নামকরণ হল নব-বীরপাড়া। বীরপাড়া গাঁয়ে যেমন যেমন ছিল, এই নব-বীরপাড়ারও মোটামুটি সেই চেহারা দাঁড়াবে। বিশাল দীঘি ছিল বীরপাড়ার মাঝখানটায়, ততদূর না হোক—মাঝারি গোছের একটা পুকুর কাটালেন এখানে। পুকুরের মাটিতে খানাখন্দ ভরাট হয়ে জমি চৌরস হল। কেয়ার জঙ্গল নিশ্চিহ্ন। চার দিক থেকে চারটে রাস্তা পুকুরপাড়ে এসে পড়েছে, রাস্তার ধারে ধারে চালাঘর—

কাজকর্মের শেষে রাত্রিবেলা অবিনাশ নতুন মাটি-ফেলা রাস্তায় একাকী পায়চারি করেন, আজকের ফেলে-আসা বীরপাড়া নিয়ে একদিন যখন বড্ড মেতেছিলেন, তখনো ঠিক এই করতেন। তাঁর পুরানো অভ্যাস।

বীরপাড়ার বাসিন্দা আরও কিছু কিছু এসেছে। যা গতিক, গ্রাম ঝেঁটিয়ে এসে পড়বে। এমনি অবস্থায় ভাগনে শিশিরকে ভুলে থাকতে পারেন না অবিনাশ। তার একটু জায়গার জন্য দিদি বিশেষ করে লিখেছিলেন। এবং একটা চাকরির জন্য।

অবিনাশ সবিস্তার জানিয়ে ধরগিন্নির নামে চিঠি দিলেন।

বধূর অন্তিম সময়ে ধরগিন্নি সেই যে পঁচিশ দিনের বাচ্চা মেয়ে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, সেই থেকে সর্বক্ষণ প্রায় সে কোলে-কোলেই থাকে। ননীর পুতুলি, টুকটুকে গায়ের রঙ—ঠাকুরমা ডাকেন টুকটুকি বলে। অতিশয় সেকেলে নাম—মেয়ে নিয়ে পুরবীর কত শখ, সে থাকলে মুখ টিপে টিপে হাসত। তবু রক্ষে, খেঁদি-ভূতি নাম দেননি দয়া করে। আর দিলেই বা কি—রুচিরা কি মধু-চ্ছন্দা হয়ে ক'টা মেয়ে পেট থেকে পড়ে, ঐ খেঁদি-বুঁচি নামেই গোটা শৈশব কাটিয়ে ইস্কুলে ভরতির দিন অথবা আরো বিলম্বে

বিয়ের লগ্নপত্রের সময় নাম শুধরে নেয়। টুকটুকিও তাই হবে, তাড়াতাড়ি নেই।

ষোড়শীকে ছাড়ানো হয় নি—বাচ্চার কাজে বহাল আছে সেই থেকে। কিন্তু বাচ্চাকে কতটুকুই বা কাছে পায়! ধরাগিন্নি ছাড়েন না। শিশিরের বাপ গত হবার পর থেকে গিন্নির সর্বপ্রধান কাজ লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা—তারও ইদানীং সময় করে উঠতে পারেন না। পুরুত চক্রবর্তী-মশায়কে প্রায় সমস্ত একলা করে নিতে হয়। এমন কি দুপুরের আহ্নিকটাও এক-একদিন বাদ পড়ে যাচ্ছে—টুকটুকির খেদমতে সময় কাটে। সন্ধ্যার পর তাকে ঘুম পাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দুবেলার আহ্নিক একসঙ্গে সেরে নেন।

চক্রবর্তী অনুযোগ করেন : কী মায়ার ঘোরে পড়লেন গিন্নিঠাকরুন। ইহকাল-পরকাল সবই যে তলিয়ে যাবার যোগাড়।

ধরাগিন্নি বুকের উপর মেয়েকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে বলেন, কিছুই যাবে না ঠাকুরমশায়। মহামায়া নিজে আমার ঘরে এসে উঠেছেন। ঠাকুরঘরে না-ই গেলাম, শোবার ঘরের মধ্যেই সর্বক্ষণ ঠাকরুনের সেবায় আছি। তাতেই আমার মুক্তি।

এরই মধ্যে অবিনাশের চিঠি এসে পড়ল। চেষ্টা এত দিনে সফল হল, সবিস্তারে সেই সব খবর লিখেছেন। চিঠি ধরাগিন্নির নামে : পুণ্যশীলা তুমি দিদি। যাত্রামুখে আশীর্বাদ করেছিলে, তোমার কামনা কখনো নিষ্ফল হবে না জানতাম। শিশিরের জন্যেও একটা প্লট রেখেছি — আমার বাড়ির লাগোয়া। অবিলম্বে সে যেন চলে আসে। দেরি হলে প্লট থাকবে না। শিশিরের চাকরির বিষয়ে লিখেছিলে—এতদিন আমার নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিল না, এইবারে কোমর বেঁধে লাগব। যা-হোক কিছু হবেই—এত লোকের হচ্ছে, তার কেন হবে না? আসল কথা হল, চিঠি দিয়ে চাকরি হয় না, লেগে-পড়ে থাকতে হয়। শিশির এসে নিজের প্লটে ঘরবাড়ি তুলুক, চাকরির চেষ্টা করুক। আমি তো আছিই। তোমরাও সবসুদ্ধ চলে এসো। নিজের ঘরবাড়ি যদ্দিন না হচ্ছে, আমার বাড়ি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। তোমরা ছাড়া আপন আমার কে আছে? চিঠিতে তুমিই সেকথা লিখেছিলে, এখানে এসে মর্মে মর্মে বুঝছি। গোটা জেলাটা জুড়ে খাতির সম্ভ্রম ছিল, এখানে কে চেনে আমায়? তাছাড়া বয়স হয়েছে—আপনজনের কদর এবারে টের পাচ্ছি……

এমনি বিস্তর কথা পুরো চার পৃষ্ঠা জুড়ে। খাম খুলে শিশির পড়ে নিয়ে মায়ের কাছে শিশির আস্তে আস্তে ভাঙছে : মামা চিঠি লিখেছেন—

ধরাগিন্নি টুকটুকিকে কোলের উপর শুইয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন। উঁহু, টুকটুকি নয়—ভারি হাসকুটে মেয়ে, নাম পাল্টে এবার দেখনহাসি হয়েছে। ঠোঁটের দুধ আঁচলে মুছে দিয়ে গিন্নি বললেন, আছে কেমন ওরা?

ভালো—। উৎসাহভরে শিশির বলে, কর্মবীর মানুষ—বিরাট এক কলোনি গড়েছেন, এখানকার বীরপাড়ার নামে তারও নাম। নব-বীরপাড়া কলোনি। কলকাতা থেকে দূরেও নয়, গড়িয়া এলাকায়—

মায়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে ঢোক গিলে বলে, আমাদের জন্যেও প্লট রেখেছেন, যাওয়ার জন্য লিখেছেন—

ধরাগিন্নি গর্জন করে উঠলেন : আবার লেগেছে? অত গালিগালাজ করে লিখে দিলাম—লজ্জাঘেন্না নেই?

থতমত খেয়ে শিশির চুপ করে যায়।

তোর যাবার ইচ্ছে, তা জানি। মাতুলের যোগ্য ভাগনে। বউটাকেও নাচিয়ে তুলেছিলি—গাঢ় বুদ্ধির মেয়ে সে, আখের বুঝে সামলে নিল। সে চলে গিয়ে এবারে উদোম হয়েছিল। যেতে হয় তুই গিয়ে মামার আশ্রয়ে ওঠ। ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে মাঙ গিয়ে। লক্ষ্মী-জনার্দন ছেড়ে এক-পা আমি নড়ব না। মরতে হলে এখানেই মরব। আমার দেখনহাসিও যাবে না, একলা তুই যাবি। কুলের মুশল ঐ ভবঘুরে হতচ্ছাড়া—আমার বাপের ভিটেয় সন্ধ্যে জ্বলে না—আমার শ্বশুরের ভিটেরও সেই হাল করবে, সে জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

চিঠিটা ধরাগিন্নি নিয়ে নিলেন : যা লিখতে হয়, আমি লিখে জবাব পাঠাব। নিজের কাজে যা তুই—

বউ পূরবীকে বিশ্বাস করে জবাব লিখতে দিয়েছিলেন, নিজের ছেলের উপর সন্দেহ। শিশিরের কথার মধ্যে বোধকরি ভিটা ছাড়বার ঝোঁকটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পূরবীর মতন পোক্ত অভিনয় সে পারে না, যতই করুক খুঁত থেকে যায়। সেই অপরাধে শিশিরের দিকে মা আর তাকিয়েও দেখেন না। দুধ খাওয়ানো সারা করে বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তারই সঙ্গে কথাবার্তা : শুনলে তো দেখনহাসি, আমাদের কোন মুলুকে নিয়ে ফেলতে চায়। দাদুকে এমন লেখা লিখব, জন্মের মধ্যে যাতে এমন চিঠি আর না আসে। তুমি কি বল দেখনহাসি, তোমার মতটা কি?

দেখনহাসি সায় দিল : উঁ—।

বাচ্চার বুলি ফুটছে, আঁ-উঁ করে। কথাবার্তাও বোঝে বোধহয়—তাক বুঝে ঝিকঝিকে দাঁত চারটি মেলে হাসে কী রকম।

ধরাগিন্নি লিখতে পারেন না, দেখনহাসিও শেখে নি এখনো। পাড়ার একজনকে দিয়ে লিখিয়ে জবাব চলে গেল। কি লেখা হল, শিশির জানে না, সে তখন ইস্কুলের কাজে বেরিয়ে গেছে—শক্ত শক্ত গালিগালাজ সন্দেহ নেই।

চিঠি লিখিয়ে ধরাগিন্নি সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাক্সে ফেলেছেন, জবাব ডাকযোগে পৌঁছে গেছে অবিনাশের হাতে।

হার্মান কোম্পানিতে পূর্ণিমার চাকরি এখন। বিরাট কোম্পানি, বিস্তর সুনাম। এজেন্সি কাজকর্মই আগে বেশি ছিল—যত নাম-করা প্লাম্বিং মালপত্র বাইরে থেকে আমদানি করে ভারতের বাজারে ছাড়ত। বিলেত থেকে প্রীত মেলে ডিরেক্টরদের হুকুম-হাকাম আসত— হুকুম যারা তামিল করত, তারাও সব লালমুখো সাচ্চা সাহেব। ম্যানেজার, ডেপুটি-ম্যানেজার, সুপারিন-টেন্ডেন্ট নেটিভ একটিও নয়। তাদের মধ্যে—এমন কি ট্যাশ-ফিরিঙ্গিও নয়।

নটবরবাবু হাহাকার করেন : কী সব দিন গিয়েছে। তোমরা আর কতটুকু দেখছ। বড় নদী মজে গিয়ে খালের অবশেষ থাকে, সেই জিনিষ এখন।

স্বাধীনতা হয়ে দেশি লোকে এখন কোম্পানির মালিক। শেয়ার বেচে দিয়ে সাহেবরা পিঠটান দিয়েছে। নটবর হাহাকার করেন, কিন্তু ঠাট এখনো রীতিমত বিলাতি। অফিসও সেই সাবেক বাড়িতেই বর্তমান—রাস্তার নাম যদিচ ক্লাইভ স্ট্রীটের স্থলে নেতাজি সুভাষ রোড। সাহেব ম্যানেজার গিয়ে স্বদেশি কালা ম্যানেজার বটে, তবে চালচলন ও তর্জন-গর্জন অবিকল সাহেবদের মত। জাহাজ বোঝাই বিলাতি মাল এসে এদেশে বিকাত, ফরেন এক্সচেঞ্জের কঞ্জুষপনায় মাল আমদানি এখন প্রায় বন্ধ। শহরতলিতে বিরাট ফ্যাক্টরি হয়েছে,—বিলাতি স্পেসিফিকেসনের মালপত্র সেখানেই তৈরি হচ্ছে। মোটা মাইনের সাহেব ইঞ্জিনিয়ার আছে গুটি-চারেক। যাই-যাই করছে তারা—আর কয়েকটা বছরের মধ্যে দেশি ইঞ্জিনিয়ারে ভাল করে রপ্ত করে নিলে তারাও সাগর পাড়ি দেবে—সাহেব লোকের টিকিটাও মিলবে না কোম্পানিতে।

এই তো গতিক, নটবরবাবু তবু দমেন না। দেশি কর্তা তো কী হয়েছে—সাহেবরা যেসব চেয়ারে বসে গেছে তার গরম কাটতে এখনো পঞ্চাশটি বছর। যে বসবে, সঙ্গে সঙ্গে সে সাহেব হয়ে যাবে। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের মতন। হার্মান কোম্পানির চাকরির আলাদা ইজ্জত।

এক্সপোর্ট সেকসনের হেডক্লার্ক নটবর। সবাই দাদু বলে ডাকে—খোদ জেনারেল ম্যানেজার থেকে বেয়ারা-দারোয়ান অবধি। বিলাতি সাহেবেরা যখন কর্তা ছিল—সেই স্বর্ণযুগে তারা অবধি খাতির করে ডাড়ুবাবু ডাকত। চাকরি পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে — ছেলেরা সব কাজকর্ম করছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এবং ভাল রকম বোনাস নিয়ে যে কোন দিন রিটায়ার করতে পারেন। অফিসসুদ্ধ চাঁদা তুলে বিদায়-সম্বর্ধনা দেবে—গলায় মালা দেবে, তাঁর ভিতরে ভাল ভাল গুণের আবিষ্কার করে যথাবিধি বক্তৃতা দেবে, মিষ্টি খাওয়াবে, বিদায়-উপহার বলে যা দেবে তা-ও যে নিতান্ত হেলাফেলার জিনিষ হবে, মনে হয় না। এত সমস্ত হবে সুনিশ্চিত। কিন্তু নটবর যাবেন না, ওসব অলক্ষুণে কথা মনে ওঠে না তাঁর—

ভবতোষ বলে, পঁয়তাল্লিশ বছর কাটিয়েছেন, আর অন্তত পঁয়তাল্লিশটা বছর কাটুক—সকাল সকাল রিটায়ার কিসে?

নটবর সপ্রতিভভাবে ঘাড় নাড়েন : ঠিক তাই। রাশিয়ায় কি বলছে, কাগজে পড় নি? বাঁচাটাই নিয়ম, মরা হল ব্যতিক্রম। মানুষ কতকাল বাঁচতে পারে, তার কোন

মুড়ো-দাঁড়া নেই — সোয়াশ-দেড়শ বছর বাঁচা তো সেখানে ডাল-ভাতের শামিল। অফিস আমার জীবন-কাঠি—অফিসে বহাল থাকতে মৃত্যু নেই, অফিস ছাড়লে তারপরে কিন্তু একটা দিনও বাঁচব না।

কৌটা থেকে একটা খিলি মুখে পুরে আঙুলের ডগার চুন একটু দাঁতে কেটে নিয়ে পান চিবাতে চিবাতে নটবর স্মৃতিমন্থন করেন : সতের বছর বয়স, সবে গোঁফের রেখ দিয়েছে—সেই সময় কেয়ারটেকার হয়ে ঢুকলাম। এখানে, এই অফিসে। বাড়ির পর্যন্ত বদল হয় নি। হুমদো হুমদো সাহেবরা মাথার উপর, দিশি-সাহেব কিম্বা ফাশি-সাহেব তার মধ্যে সিকিখানাও নেই। দশ হাত দূরে দাঁড়িয়েও বুক ঢিবঢিব করে। ফাইল, প্যাড, কাগজ, কালি-কলম, পেন্সিল, ব্লটিং পেপার যাবতীয় স্টেশনারি জোগান দিয়ে যাওয়া কাজ আমার। সবাই বলে, চাকরির নামটা যা-ই দিক কাজ আসলে পিওন-বেয়ারার। ভদ্রলোকের বেটা হয়ে এই কাজ কেন নিতে গেলেন? আমি হাসি মনে মনে : সবুর কর বাবুমশায়রা। সাহেব-লোকে যাই দিক হাত পেতে নিতে হয়। ও জাতের সেরা গুণ—কাজ দেখালে কদর হতে দেরি হয় না। হল তাই। বড়দিনে এক ঝাঁকা কমলানেবু তিন বোতল হুইস্কি নিয়ে গুটি-গুটি সাহেবের বাড়ি হাজির হলাম, মেমসাহেবের পদতলে বোতল তিনটে নিবেদন করে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছি। সাহেব চেয়ে চেয়ে দেখে কাছে ডাকল : সিট ডাউন বাবু। বাবু বলে ডাক আর চেয়ার দেখিয়ে দেওয়া—দুটোই একসঙ্গে হল গেল। বলব কি ভায়ারা, একটা মাস যেতে না যেতে অফিসের ভিতরেও ঠিক সেই জিনিস। লম্বা টেবিলের এদিকে-ওদিকে দশটা চেয়ার ছিল—সাহেবের হুকুমে দশের পাশে আর একটা বসিয়ে এগারো হল। কালি-কলম, খাতা-ফাইল এতাবৎ আমি সরবরাহ দিয়েছি—আমার জায়গায় নতুন এক ছোকরা বহাল হল। আমার খাতা-ফাইল সে-ই এখন দিয়ে যায়। ছিল ঘোরা-ঘুরির কাজ, এক লহমা বসার জো ছিল না—এবারে কাজ হল পাখার নিচে জাপটে বসে কলম চালানো। সেই কলমই চলছে একনাগাড়ে পঁয়তাল্লিশটা বছর। পাইকারি টেবিলে এগারো জনের একজন ছিলাম, এখন একলা আমার জন্যেই পুরোপুরি টেবিল। কলম জেট প্লেনের বেগে চালিয়েও কূল পেতাম না, এখন কাজে বসে একশ-আটবার দুর্গানাম লেখা আর অন্য লোকের ফাইলের উপর পনের-বিশটা সই — এই হল সারা দিনে কলমের খাটনি। আছে বলেই তবু বেঁচে রয়েছি—কলম যেদিন বন্ধ হবে, বুকের তলের ধুক-ধুকোনিটাও বন্ধ হবে সঙ্গে-সঙ্গে।

সাহেবি আমলের কথায় নটবর শত-মুখ। কাজকর্ম চলত একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত। কাজে ফাঁকি চলবে না, পাওনা-গণ্ডার বেলাতেও ফাঁকি নেই। সেকসনের সাহেব দশটার সময় কাঁটায়-কাঁটায় ঘরে গিয়ে বসত। অ্যাটেন্ড্যান্স-বই ঠিক সোওয়া-দশটায় সেই ঘরে চলে যাবে। সোওয়া-দশটার পর যে আসবে, সাহেবের ঘরে ঢুকে সই করবে। একটি কথা বলবে না সাহেব, চোখ তুলে তাকাবেও না। কার ঘাড়ে তবু ক'টা মাথা, সই করতে বাঘের সামনে যাবে। অমুক বাবু, তমুক মশায় সই করতে গিয়ে খাতা খুঁজছেন : কী সর্বনাশ, গেছে ঢুকে এর মধ্যে? সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন—পিছন ফিরেও আর তাকান না। এরকম হামেশাই ঘটত। সাহেবের মুখোমুখি পড়ার চেয়ে একটা দিন কামাই হওয়া ঢের ঢের ভাল।

তখনকার দিনে এই। আর এখন? যখন খুশি আসে, যখন খুশি চলে যায়। ঘড়িতে যতগুলোই বাজুক সইয়ের বেলা দশটা। কারো কোনদিন সিকি-মিনিটও লেট হয় না। নিজেকে বাদ দিয়ে বলছিনে—আমিও। ভারত স্বাধীন তো আমাদেরই বা অধীনতা কিসের? অফিসের মাঝেও ফুরফুরে হাওয়া—কেউ কারো তোয়াক্কা রাখিনে।

হালফিল এই যে পূর্ণিমা নামে যুবতীটি বহাল হল, নটবর সেজন্য অতিশয় বিরূপ। এর আগে আরও দুটি চারেক এমনি এসেছে। দেদার এই যে রমণী এনে এনে ঢোকাচ্ছে, কাজের বারোটা বাজল আরো এই থেকে। মেয়েলোকে অফিসের কাজের কি বোঝে? আর আসেও না ওরা কাজ করতে—কাজকর্ম করতে আসে না ওরা, পুরুষ গাঁথতে আসে। হাসাহাসি ফষ্টিনষ্টি চোখ-ঠারাঠারি—এই সমস্ত হল কাজ। আর হালফিল কর্তারাও দেখছি দিব্যি এলাকাড়ি দিচ্ছেন। দেশে বেটাছেলের যেন দুর্ভিক্ষ, ঘরের মেয়েলোক ধরে তাই টান পড়েছে।

ভবতোষ বলে, হালফিল কেন হবে দাদু? মেয়েলোক তো সাহেবি আমলেও ছিল!

মেয়েলোক নয় তারা, মেমসাহেব। ফিরিঙ্গি-পাড়ার মাল। রঙে চাপা, বটে, তবু ভারতে যারা রাজত্ব করত তাদেরই রক্ত ধমনীর মাঝে। রতি-মাসার ওজনে হলেও রাজরক্ত—তার গুণ যাবে কোথা? হাসি বস্তু ছিল না মুখে—একটা কাজের কথা বলতে গেলেও ফাশ করে উঠত হুলো বেড়ালের মতো। তারা করবে ফষ্টিনষ্টি রংতামাসা হাসিমস্করা! সে আমাদের এই দেশি দিদিঠাকরুনেরা — লং-সাইটের চশমা দিয়ে পিটপিট করে দেখি, ছোঁড়াগুলোকে যেন বড়শি গেঁথে খেলাচ্ছে।

ভবতোষের দিকে নটবর আচমকা এক প্রশ্ন ছুঁড়লেন : ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসে যায়, দেখেছ?

ভবতোষ বলে, কেন দেখব না? ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি—রেল লাইনের পাশে লম্বালম্বি ঝিল, দুবেলা সেখান দিয়ে যাতায়াত—

রেললাইন চুঁড়তে হবে কেন ভায়া, কাছে-পিঠেই তো সব লাইনবন্দি বসে—

হেসে গড়িয়ে পড়েন নটবর; এই অফিসের ভিতরেই। আগেকার এক গণ্ডা, তার সঙ্গে ইনি জুটে একুনে পাঁচ হলেন।

পাশ করল তাপস—ডক্টর তাপস সরকার এম-বি, বি-এস। যা ভাবা গিয়েছিল, তেমন কিছু নয়—পাশ করল এই স্বস্তি। অপূর্ব রায়ের ধারণা একটুও চিড় খেলো না তবু। বলেন, পরীক্ষা ব্যাপারটা পাশার দানের মতো। ঐ দিয়ে মেধার বিচার হয় না। ফ্যাসাদ হল, ফরেন স্কলারশিপ মিলবে না। আকাশ-ছোঁয়া নম্বর পেয়ে পেয়ে সব বসে আছে, তারা দাবি ছাড়বে কেন?

বলতে বলতে ঘাড় নেড়েই যেন দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেন : কুছ পরোয়া নেই। জুনিয়ার হয়ে আমার সঙ্গে থাক। চেম্বার প্রাকটিশে সাহায্য করবে, পেসেন্টের বাড়িতেও নিয়ে যাব তোমায়। জানাশোনা হবে বহুজনের সঙ্গে, কৃতিত্ব দেখাতে পারলে নামযশ হবে। দুটো চারটে বছর

চাকিরে হাতে কিছু পয়সা করে নাও। বাদ-বাকি ধার নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, কৃতী হয়ে ফিরে এসে শোধ করবে।

হেসে পড়লেন : ধার আমিও দিতে পারি, সুদ লাগবে। বুঝলে হে, অতি-অবশ্য সুদ চাই, সুদের লোভেই টাকা লগ্নি করা।

মাসখানেক পরে, তাপস ক'খানা দশ টাকার নোট এনে. পূর্ণিমার হাতে দিল। পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, কিসের টাকা রে?

প্রথম রোজগার আমার। তোর কাঁধ তবু যেটুকু হালকা করা যায়। একা একা বিস্তর খেটেছিস, এবার থেকে আমি তোর পাশে।

আর কিছু না বলে পূর্ণিমা টাকা রেখে দিল।

আবার একদিন একশ টাকার একটা নোট। এক হপ্তা যেতে না যেতে আরও কিছু। রোজগার দিব্যি জমে আসছে।

টাকা দেয় আর গর্বভরে তাপস বলে, দেখিস কি ছোড়দি। সমস্ত দায়ভার আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে নিয়ে নেবো। মেয়ে-মানুষ নাক উঁচিয়ে কর্তামি করবে—অসহ্য, অসহ্য! আমি হব সংসারের কর্তা—হুকুম-হাকাম চালাব তোর উপর।

হাসিমুখে পূর্ণিমা ছোটভাইয়ের পাগলামি শুনে যাচ্ছে।

তাপস বলে, এইসা দিন নেহি রহেগা, পুজো নাগাত দেখতে পাবি। নোটিশ দিয়ে রাখছি, পুজোর সময় এবারে তোদের বাইরে বেড়ানো। রোজগেরে ভাই আমি—সকল খরচা আমার। মাকে নিয়ে যাবি, দিদি যাবে। বাবার নড়াচড়া চলে না—আমি আর বাবা দুজনে বাড়ি থাকব।

পূর্ণিমা বলে, পুজোর আগে বিয়ে করে বউ নিয়ে আয় তবে। বাবাকে নাওয়ানো-ধোয়ানো রেঁধেবেড়ে হাতে তুলে খাইয়ে দেওয়া—ডাক্তারি ছেড়ে তুই তো এসব করতে যাবি নে, বউ এসে করবে।

বউ আনব, তোকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করি আগে। মা সামনের উপর নেই, তাগিদ-পত্তর হচ্ছে না, ভাবছিস জোর বেঁচে গেছিস। মোটেই নয়, সর্বক্ষণ আমার মনে গাঁথা আছে—কড়া বর দেখছি, ধাতানি দিয়ে তোকে যে জব্দ রাখবে।

কিন্তু বলছে কাকে এতসব? পূর্ণিমা ওঘরে চলে গেছে, ওঘর থেকে সেভিংস-ব্যাঙ্কের বই এনে ধরল : তোর রোজগার যেমন-কে-তেমন জমা রয়েছে, এই দেখ।

জোর দিয়ে বলে, একটি পয়সা খরচ হয়নি—হবেও না। আমার মাইনে থেকেও অল্পস্বল্প রাখছি। নিজের টাকায় বিলেত যাবি। ডক্টর রায় লোক ভাল, ভালবাসেন তোকে—তাহলেও পরের সাহায্য যত কম নেওয়া যায়। না নিতে পারলেই ভাল।

বিলেত পাঠাবি তুই আমায়?

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাপস বলে, বিলেত যাব, তিল তিল করে তার সঞ্চয় করছিস? বড়-ডাক্তার না বানিয়ে ছাড়বি নে আমায়?

ডাক্তার বড় হবি, মানুষ আরও বড় হবি। টাকা রোজগার করবি, কিন্তু তা-ই সব নয়। সে তো ব্লাকমার্কেটিয়াররা সকলের চেয়ে বেশি করে। দেশ-জোড়া নাম। কত রকম উপকার পাচ্ছে কত জনা—ধন্য ধন্য করবে—

বলতে বলতে পূর্ণিমা চোখ বুজল। মধুর হাস্যে মুখ রাঙিয়ে গেছে, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে সে যেন। বলে, সংসারের অভাব ঘুচবে, বাবার মনের অশান্তি যাবে। বড় বাড়ি নেবো ভাল রাস্তার উপর। কাশীপুরের বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিদি এসে থাকবে। মা রজু দিদি একসঙ্গে থাকব সকলে। খোঁজখবর করে জামাইবাবুকেও ধরে আনব। সুখ উছলে পড়বে।

তাপস অভিভূত হয়ে বলে, তোর যত সাধ আমাদের সকলকে নিয়ে। নিজের জন্য কিছুই নয়?

বাঃ রে, আমারই তো সব। তুই মস্ত বড় হবি, মজা তখন আমারই সকলের বেশি। লোকে আমায় আঙুল দিয়ে দেখাবে: কত বড়লোকের বোন যাচ্ছে দেখ ঐ। চাকরিতে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা। চাকরি ছেড়ে ঘরে এসে গদিয়ান হয়েছি, সংসার অঙুলি-হেলনে চলে আমার। ধমকধামক দিই ভাইবউকে, আবার বুকে জড়িয়ে ধরি—

হঠাৎ কণ্ঠস্বর কাতর হয়ে পূর্ণিমা সম্পূর্ণ নিজের কথায় এসে গেল : চাকরির এই উঞ্ছবৃত্তি আমার একটুও ভাল লাগে না। বড্ড সামাল হয়ে চলতে হয় রে ভাই, ডাইনে বাঁয়ে কড়া নজর—কোনখানে পাঁক, কোনদিকে কাঁটা। কোনপুরুষে অভ্যাস নেই তো—তালুকদার-বাড়ির মেয়ে চাকরিতে বসল আমা হতে এই প্রথম। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছুঁড়িগুলো কাজ করে—পুরুষানুক্রমে চাকরি-করা জাত, ওরা বেশ পারে। চাকরিতে ঢোকার সময় মা-খুড়ি পিশি-মাসিরা তাদের তালিম দিয়ে দেয়—অপমান করবার সুযোগ পায় না কেউ।

তাপসের চোখ সজল হয়ে আসে। দিন কয়েক আগে সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল। তিন মেয়ে পূর্ণ মুখুজ্জের—বড় দু'টির বিয়ে হয়ে গেছে অনিমার বিয়ের আগেই। ঘর সংসার করছে তারা। একটি গোরক্ষপুরে থাকে, জামাই রেলে কাজ করে। অন্যটি নদীয়া জেলার এক গ্রামে। তারপর গৃহিণী গত হলেন, পূর্ণ মুখুজ্জেও চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। সমস্ত গিয়ে দুটি মাত্র বন্ধন—ছোট মেয়ে সুজাতা এবং দাবাখেলা। তার ভিতরে প্রধানটি মোচন হয়ে গেল এবার। ভাল সম্বন্ধ—জামাই ইঞ্জিনীয়ার বিহার গভর্নমেণ্টে কাজ করে। বদলির চাকরি, রাজ্যের এ-জায়গায় সে জায়গায় টোল ফেলে বেড়ানো! জীবনের এই শেষ কাজ— দস্তুরমতো ধুমধাম করলেন পূর্ণ মুখুজ্জে। এই গলির মধ্যে তেমন জাঁকজমক হবে না বলে বড়-রাস্তার উপর ঘর ভাড়া হল। আলোয় বাজনাবাদ্যে নিমন্ত্রিত আত্মীয়বন্ধুর ভিড়ে সমারোহের অন্ত ছিল না।

তারণ চলাচল করতে পারেন না, আহত হাঁটু দুটোয় বাতে ধরেছে। বিয়েয় তিনি যান নি, পূর্ণিমা আর তাপস গিয়েছিল। কাশীপুর থেকে অনিমাও এসেছিল তরঙ্গিণী ও [illegible] নিয়ে। মেয়ে-জামাই এখন দ্বিরাগমনে এসেছে। সুজাতা আর নতুন জামাই আজ জোড়ে এসে তারণকে প্রণাম করে গেল। বাড়িতে আর একবার বেশ ভাল করে জামাই দেখা গেল। দৃঢ়দেহ সুদর্শন ছেলে, কথাবার্তাও চমৎকার। সুজাতাও এই ক'দিনে একেবারে যেন বদলে গেছে—ঢলঢল চেহারা, হাসি-ভরা মুখ। চলে গেল দুজনে গুঞ্জন করতে করতে। আর, দেরি হয়ে গেল ছোড়দি'র—চাট্টি নাকে-মুখে গুঁজে তাড়াতাড়ি সে অফিসে ছুটেছিল। আজকেই সকালবেলার ঘটনা।

ছোড়দি তাকে বিলেত না পাঠিয়ে ছাড়বে না। পাখি বাসার জন্য দিনের পর দিন খড়-কুটো সঞ্চয় করে, সকলের অজান্তে ছোড়দি তাই করে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে তাপস চোখের উদ্গত অশ্রু মুছে ঢিব করে পূর্ণিমার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে।

খিল খিল করে পূর্ণিমা হেসে উঠল আঁ, করলি কি তুই তাপস?

অবাক কাণ্ড বটে! অন্য সময় না হোক অন্তত বিজয়াদশমীর দিনে একটা প্রণামের জন্য দুজনে কী হুটোপাটি! জোর ক[রে] ঘাড় নুইয়ে ধরেও প্রণাম বাগানো যায় নি তাপস বলত, একরত্তি একটুখানি ছোড়দি-সে আবার গুরুজন!

সেই ভাই আচমকা আজ পায়ে মাথা ঠেকায়।

পূর্ণিমা হেসে বলে এত ভ[ক্তি] ছোড়দি'র উপর—হল কি হঠাৎ?

ছোড়দি বলে নয়, তুই দেবী—

বাবাও তাই বলতেন। এখন বোধহ[য়] আর বলেন না।

সেকথা কানে না নিয়ে তাপস ব[লে] তবে দেবী হোস যা-ই হোস প্রণাম ঐ [...] পেলি—শোধবোধ। ওর উপরে কান্নাকাটি আর নয়। তুই পড়ে পড়ে কষ্ট করবি আ[র] আমি বিলেত যাবো—একথা তোর শুনব না।

শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না কিন্তু সম্ভাবনাটুকু অকস্মাৎ ধুয়েমুছে গেল। ডক্টর অপূর্ব রায় মারা গেলেন পার্টিতে যাবেন, দরজায় গাড়ি, তার আ[গে] একটা টেলিফোন করে নিচ্ছেন কাকে যেন। হাতের রিসিভার ঠকাস করে মেজেয় পড়[ল] আধখানা কথার মধ্যেই নিস্তব্ধ তিনি।

বাপের সঙ্গে স্বাতীও যাবে। সাজগো[জ] করে করিডরে নেমে দাঁড়িয়েছে। আওয়া[জ] শুনে এসে দেখে এই কাণ্ড। গিন্নি বিজ[য়া] দেবীও ছুটে এলেন, লোকজন সব এ[সে] পড়ল। ধরাধরি করে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। তখন সন্ধ্যাবেলা, তাপস এলে শহরের বড় বড় ডাক্তার এলেন। সারা রা[ত] যমে-মানুষে টানাটানি। রক্ষে হল না। ভো[র] না হতেই সমস্ত শেষ।

(ক্রমশঃ)

গণতন্ত্রের ছেলেখেলা

অবশেষে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বহু-ঘোষিত নির্বাচন নির্দিষ্ট তারিখেই (১১ সেপ্টেম্বর) সম্পন্ন হয়ে গেল। একে ভিয়েৎনামের নির্বাচন না বলে অবশ্য বলা উচিত প্রধানমন্ত্রী এয়ার মার্শাল নুয়েন কাও কি'র নির্বাচন, কেননা এই নির্বাচন গোড়া থেকেই মার্শাল কি'র ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল; দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিবাসীদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিফলিত হবার কোন সুযোগ এখানে ছিল না।

এই নির্বাচনের পেছনে যাঁদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল—যেমন মার্শাল কি'র নিজের এবং হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগণের—তাঁদের মতে এর চাইতে বেশী অবাধ নির্বাচনের সুযোগ ছিল না, কেননা, প্রথমত, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধ চলছে এবং, দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের এর আগে কখনো গণতন্ত্রে হাতেখড়ি হয়নি।

প্রথম কথাটা এই প্রসঙ্গে তোলাটাই অর্থহীন, কারণ নির্বাচন যখন একটা হতে পেরেছে তখন সেটা এতটা নিয়ন্ত্রিত না হলেও কিছু ক্ষতি ছিল না। দ্বিতীয় কথাটির কোন ভিত্তি নেই, কারণ ১৯৫৬ সালে নিয়েম একবার গণভোট গ্রহণ করেছিলেন, আর এই ১৯৫৬ সালেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রাদেশিক নির্বাচন (মার্কিন মুখপাত্রদের মতে সাফল্যের সংগে) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং অবাধতর নির্বাচনের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেওয়া হচ্ছে তার অর্থ একটাই হতে পারে : ফলাফল যাতে মার্শাল কি'র—এবং ওয়াশিংটন—বিপক্ষে না যায় তার ব্যবস্থা করা।

অবশ্য আপাতঃদৃষ্টিতে এই নির্বাচনের তেমন কোন গুরুত্ব থাকার কথা নয়, কেননা এই নির্বাচনের দ্বারা কোন সরকার গঠিত হচ্ছে না, প্রার্থীরা কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি, কোন প্রশ্ন বা মতাদর্শ নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে ছিল না। এইটে ছিল ত্রি কোয়াং বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে মার্শাল কি'র প্রধান চাল! নিজেকে যত বেশী দিন সম্ভব ক্ষমতায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই চাল রচিত হয়েছিল।

কিন্তু তবু এই নির্বাচনের একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল, কেননা এর দ্বারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের একটি সংবিধান রচিত হ'তে যাচ্ছে। সকলেই আশা করেছিলেন যে, এই সংবিধান অন্তত এমন হবে যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে একটা গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এইজন্যেই মার্শাল কি'র ধাপে ধাপে গণতন্ত্রের আদর্শের সংগে একমত হতে না পারলেও আমরা ঐ নির্বাচনের দিকে চেয়েছিলাম। কিন্তু নির্বাচন আমাদের নিরাশ করেছে। সুতরাং এই নির্বাচন থেকে যে সংবিধানের উদ্ভব হবে তার ওপর কতটুকু নির্ভর করা যেতে পারে?

মার্শাল কি এবং তাঁর ওয়াশিংটনের গুণমুগ্ধরা অবশ্য একথাটা জোর গলায় প্রচার করে চলেছেন যে, নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যার (৫২ লক্ষ) শতকরা ৮০ ভাগই, অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ, ভোট দিতে এসেছিল। তাঁদের প্রশ্ন : ভিয়েৎকংদের প্রচারণা ও হুমকি সত্ত্বেও যদি এত বেশী সংখ্যক লোক ভোট দিতে এসে থাকে, তবে কি সেটাকে একটা বিরাট সাফল্য বলে, এবং ভিয়েৎকংদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রায় হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে এই কথাটা বলে নেওয়া দরকার যে, মোট এবং অংশগ্রহণকারী ভোটারের যে সংখ্যা দুটি মার্কিন প্রচারব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে পেঁৗছে দেওয়া হচ্ছে তার নির্ভুলতায় সংশয়ের কারণ আছে। নয়াদিল্লীতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কন্সাল-জেনারেল মি নুয়েন ত্রিউ দান নিজে গত ১৬ সেপ্টেম্বর বলেছেন যে, রেজিস্টার্ড ভোটারের মোট সংখ্যা হল ৪৩ লক্ষ। তাহলে এর ৮০ শতাংশ কত হয়?

কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে আমরা মার্কিন মহল থেকে প্রচারিত ফাঁপানো সংখ্যাটিকে সত্যি বলে ধরেও নেই, তাহলেই বা অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে?

নির্বাচনের দিনে নাগরিকদের ভোট-কেন্দ্রে হাজির করবার জন্যে সৈন্য বাহিনীর ওপর নির্দেশ ছিল, অনেকক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রেশন কার্ডকে ব্যবহার করা হয়েছিল, এসব অনেক সমালোচনাই নানা মহল থেকে শোনা গেছে। আমরা যদি এসবের সত্যাসত্যের মধ্যে না-ও যাই, তাহলেও আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন তারতম্য ঘটবে না। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভোটাধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অন্তত ৯০ লক্ষ। যদি ৪০ লক্ষ লোক ভোট দিয়েও থাকে তাহলেও ১২ লক্ষ লোক থেকে যাচ্ছে যারা মার্শাল কি'র নির্বাচন থেকে দূরে থাকাই সংগত মনে করেছে এবং ৩৮ লক্ষ লোককে এই নির্বাচনের আওতার মধ্যে আনাই হয়নি। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যক ভোটাধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তির মতামত এই নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়নি। সুতরাং একে কিভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন বলা যায়?

স্পষ্টতই এই ৫০ লক্ষ লোকের অধিকাংশই ভিয়েৎকং-সমর্থক মনে করা হয় বলেই নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়েছে, আর না হয় এরা ভিয়েৎকং-প্রভাবিত এলাকাতে থাকে বলে সরকার এদের নির্বাচনের সংগে জড়িত করতে পারেননি। যেটাই সত্য হোক, তার থেকেও এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, জনমতের গরিষ্ঠাংশের ওপর সায়গণের প্রভাব হয় নেই আর না হয় বিস্তৃত হতে পারেনি।

কিন্তু যদি তর্কের খাতিরেই আমরা এটাও ধরে নেই যে, যুদ্ধাবস্থার মধ্যে এর চাইতে ব্যাপক নির্বাচন সম্ভব ছিল না, তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায় : এর মধ্যেই কি নির্বাচনকে আরো ন্যায়সংগত করে তোলা যেত না? দেশব্যাপী বৌদ্ধ আন্দোলনের ফলেই মার্শাল কি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বৌদ্ধদের একটা বড় অংশই এই নির্বাচন বয়কট করেছে। তারা যাতে এতে অংশগ্রহণ করতে

পারে তার উপযুক্ত পরিবেশ কি রচনা করা যেত না?

বৌদ্ধদের নির্বাচন বয়কট করার প্রধান কারণই হল, অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি। একটু অন্য রাজনীতির গন্ধ থাকলেই সেসব প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মার্শাল কি'র বাছাই কমিটি যাদের অনুমোদন করেছিলেন কেবল তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার ছিল। এটা কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা? এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কারা ভোট দিতে পারে সেটা এখানে খুব বড় কথা নয়, কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে সেটাই বড় কথা।

কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির মোট ১১৭টি আসনের মধ্যে ১০৮টি আসনের জন্যে (বাকী ন'টি আসন মধ্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পার্বত্য এলাকা থেকে মনোনয়নের দ্বারা পূরণ করা হবে) ৫৩০জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সত্যি, কিন্তু এই প্রার্থী কারা?

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, ৫৫ জন সামরিক অফিসার এবং ৬৫ জন সরকারী কর্মচারী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যে গণতন্ত্রে কর্তব্যরত মিলিটারীর ও সরকারী চাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার দেওয়া হয় সেটা কি ধরনের গণতন্ত্র সেটা বোধহয় বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এবং ঐ ৫৩০ জন প্রার্থী যে কি ধরনের ব্যক্তি সেটাও বোধ করি এর পর বলা বাহুল্য। এই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, বাকী প্রার্থীদের একটা বড় অংশ ছিল ব্যবসায়ী। এর পরেও কি আর কিছু বলার দরকার আছে? কিছু সংখ্যক শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক ও কৃষকও অবশ্য প্রার্থী ছিলেন কিন্তু ঐ তিন শ্রেণীর লোককে যেখানে প্রার্থী করা হয়েছে সেখানে এদের সম্পর্কেই বা কতখানি ভরসা করা চলে?

নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে যেখানে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নেই, এবং প্রার্থীদের পরিচয়ও যখন এইরকম, তখন নির্বাচনের ফলও অনুমান করা কিছু কষ্ট নয়। আমরা এই ভেবে আশ্বস্ত হচ্ছি যে, মার্শাল কি'র নির্বাচন আমাদের অনুমানকে ব্যর্থ করেনি। মোট ১০৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে রয়েছেন ২০ জন সামরিক অফিসার, ১৮ জন সরকারী চাকুরে, এবং ২২ জন ব্যবসায়ী। অর্থাৎ ১০৮ জনের মধ্যে ৬০ জনই হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা মার্শাল কি'র সরকারকে সমর্থন করার জন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এর সঙ্গে যদি ন'জন মনোনীত পাহাড়ী সদস্যকে যোগ দেই (এঁরা যে সরকারের ধামাধরা হবেন সেটা এখনই বলে দেওয়া যায়) তাহলে এই সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৬৯।

এর অর্থ কাউকে বলে দিতে হবে না যদি নির্বাচিত বাকী প্রতিনিধিরা (২২ জন শিক্ষক, সাতজন চিকিৎসক, পাঁচজন ব্যবহারজীবী, দু'জন ইঞ্জিনীয়ার, তিনজন বিচারপতি, একজন সাংবাদিক ও আটজন কৃষক) সরকারের বিরুদ্ধেও যায়—যা সম্ভব নয়, কেননা রাজনৈতিক রঙ দেখেই তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল—তবু কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির পক্ষে মার্শাল কি এবং তাঁর সামরিক পর্ষদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ সরকারের নির্দেশানুসারে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট ছাড়া সংবিধানের কোনরকম সংশোধন করা চলবে না, এবং অ্যাসেম্বলির দুই তৃতীয়াংশ সদস্য মার্শাল কি'র পকেটস্থ।

এটা কোন ধরনের গণতান্ত্রিক নির্বাচন? দেশের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এই নির্বাচন কতখানি সন্তুষ্ট করবে বা করতে পারে?

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট

তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ। এই দুটি সংঘর্ষের ফলেই একই সঙ্গে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের তাল সামলাতে গিয়ে ভারতের অর্থনীতির উপর অসহনীয় চাপ পড়েছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনায় যে এরকম কোন অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক চাপ পড়বে না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে বাৎসরিক রিপোর্ট গত ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই প্রশ্নটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, অর্থনীতির মধ্যে এমন কিছু বাড়তি সহনক্ষমতা থাকা উচিত যাতে এই আকস্মিক অতিরিক্ত চাপ সামলানো যায়।

এই রিপোর্টে বিশেষ করে বলা হয়েছে, "চতুর্থ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য মুদ্রাস্ফীতির ব্যাধির মূলে একটা বদ্ধপরিকর আঘাত হানার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।"

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই বার্ষিক রিপোর্টে একই সঙ্গে একটি স্বল্পমেয়াদী আর একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল অবলম্বন

করতে বলা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী কৌশল হচ্ছে ফাঁপানো মুদ্রার সাহায্যে ঘাটতির সংকুলান করার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাটা হচ্ছে মূল্য স্থির রাখার জন্য ও স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ে উৎসাহদানের জন্য বেতনভোগীদের প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বাড়ান।

তৃতীয় পরিকল্পনার উল্লেখ করে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যা অনুমান করা হয়েছিল তার তুলনায় এই পরিকল্পনায় অগ্রগতি অসমান ও মন্থরতর হয়েছে। কৃষি ও শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার লক্ষ্যের চেয়ে উৎপাদন কম হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সুবর্ষণের অভাবে কৃষি উৎপাদনের সূচক সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালে যা ছিল ১৯৬৫-৬৬ সালেও তাই আছে। কিন্তু যদি ১৯৬৪-৬৫ সালের অঙ্কও ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, বৎসরে গড়ে ২·৮ শতাংশের বেশী হারে কৃষির অগ্রগতি হয় নি। অথচ পরিকল্পনা ছিল ফলন বৃদ্ধি পাবে ৫ শতাংশ হারে।

অনুরূপভাবে, পরিকল্পনায় যেখানে বলা হয়েছিল, পাঁচ বৎসরে শিল্পের উৎপাদন বাড়বে শতকরা ৭০ ভাগ সেখানে প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধির হার শতকরা [illegible]।

তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল বৎসরে গড়ে ৬ শতাংশ হারে। পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল [illegible] শতাংশ। শেষ বৎসরে অবস্থার অবনতির ফলে পাঁচ বৎসরের গড় দাঁড়িয়েছে ২·৫ শতাংশে এসে।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির এই হারের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের কাটাকাটি হয়ে গেছে। জাতীয় আয় যেমন ২·৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যাও তেমনি পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ২·৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ফল হয়েছে এই যে, গড় মাথাপিছু আয় পরিকল্পনার আগেও যা ছিল পরিকল্পনার শেষেও তাই আছে।

অথচ পরিকল্পনায় সরকারী তরফে যে-পরিমাণ অর্থ লগ্নী করার কথা ছিল বাস্তবে লগ্নী হয়েছে তার চেয়ে বেশী। কিন্তু সে কেবল টাকার অঙ্কে, প্রকৃত মূল্যের দিক দিয়ে লগ্নীর পরিমাণ পরিকল্পনার লক্ষ্যের চেয়ে কমে গেছে। শুধু টাকার অঙ্কটা ফেঁপে গেছে মূল্যবৃদ্ধির ফলে।

জাতীয় আয় যখন এইভাবে প্রায় স্থির ছিল তখন অন্যদিকে টাকার যোগান কিন্তু বেড়ে যাচ্ছিল। পরিকল্পনার কালে টাকার যোগান বৃদ্ধি পেয়েছে মোট ৫৭·৯ শতাংশ।

রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, "আয় বৃদ্ধি ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির হারের মধ্যে এই অসামঞ্জস্য অর্থনীতির উপর চাপ বাড়িয়েছে যার ফলে পাঁচ বৎসরে দাম বেড়েছে ৩২·২ শতাংশ। পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরেই দাম বেড়েছে শতকরা ২২ ভাগ।"

এই সব ব্যর্থতা সত্ত্বেও রিপোর্টে কিছুটা আশা প্রকাশ করা হয়েছে। একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবহণ, বিদ্যুৎ শক্তি এবং মূল শিল্পগুলির ভিত ইতিমধ্যে এমন মজবুত হয়েছে যে, তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে দ্রুততর অগ্রগতি সম্ভব করে তোলা যায়।

অবশ্য বলা হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা এবং অতিক্রমের জন্য [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটি সর্বাগ্রে বিবেচ্য, এই বোধ যদি থাকে এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয় এড়াবার জন্য ও পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য গুলো সিদ্ধ করার জন্য যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে তাহলে অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিকাশের হার লাভ করা অসম্ভব রকমের কঠিন হওয়ার কথা নয়।

রিপোর্টে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলো যেভাবে বাজেট করেন সেটাই মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ। পণ্যের যোগানে যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেখানে টাকার যোগান বৃদ্ধি শুধু মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে বর্তমান অসামঞ্জস্যই বৃদ্ধি করে ও মূল্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়।

১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরে টাকার যোগান বেড়েছে মোট ৪২৯ কোটি অর্থাৎ শতকরা ১০·৩। ১৯৬৪-৬৫ সালে টাকার যোগান বেড়েছিল ৩৫৯ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৯·৪ শতাংশ। এই ব্যাপারেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের ভূমিকাটিকে বড় করে দেখেছেন। বলা হয়েছে, ব্যাঙ্ক থেকে গবর্ণমেন্ট যে বিপুল পরিমাণ কর্জ করেছিলেন প্রধানতঃ তার দরুণই টাকার যোগান বেড়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই কর্জের পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা, তার আগের বৎসর কর্জের পরিমাণ ছিল ৩০৩ কোটি টাকা।

অথচ, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যদিকে বেসরকারী তরফে ব্যাঙ্কের কর্জের পরিমাণ কমে গেছে। গত বৎসর থেকে এটা ব্যতিক্রম, আলোচ্য বৎসরে বেসরকারী তরফ ব্যাঙ্ক থেকে ১৮ কোটি টাকা কম কর্জ পেয়েছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে "একটা বিপজ্জনক অবস্থায়" পৌঁছেছিল। রপ্তানীর আয় বিশেষ বাড়েনি। দেশের মধ্যে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পটভূমিতে আমদানী পণ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ হয় এবং তার ফলে একদিকে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ও শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়, অন্য দিকে চোরাচালানের ছিদ্রপথ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যায়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, "টাকার বাট্টা হ্রাসের সিদ্ধান্ত এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচ্য। টাকার বাট্টা হ্রাসের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানীর বর্তমান হার বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হচ্ছে দেশের ভিতরকার দাম ও দেশের বাইরের দামের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য এনে এবং রপ্তানী বাণিজ্যকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠার শক্তি যুগিয়ে।"

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

কলেজ স্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁয় আমরা মাঝে মাঝে আড্ডা দিই। আড্ডা বহু দিন ধরে দিচ্ছি—দু কাপ চা নিয়ে দু ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেও রেস্তোরাঁর কর্তা কিছু বলেন না, কেননা বলে কিছু করতে পারেন নি। আমরা বহুদিন আড্ডা দিয়েছি, এর মধ্যে কত লোক এল গেল, কিন্তু ধীরেনবাবুর মত আর একটি লোককেও পেলাম না। তিনি যে আজকাল কোথায় গেছেন জানি না। শুনেছি বিহারের মাইকা অঞ্চলে তিনি রয়েছেন—হয়ত রয়েছেন। যদি সেখানে থেকে থাকেন তাহলে সেই অঞ্চলের লোকেরা যে সৌভাগ্যবান তাতে সন্দেহ নেই। ধীরেনবাবুর মত লোককে পাওয়ার মত সৌভাগ্য যাঁর হয় নি তিনি বুঝবেন না ধীরেনবাবুকে হারানোর দুঃখ। এই প্রসঙ্গে দু-একটা ভাল কথা মনে পড়ে যায়—যদিও ঠিক যুতসই নয় কথাগুলো—একটা হল দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা, আর অন্যটি হল, কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। অর্থাৎ কিনা প্রথমটির মানে হল ধীরেনবাবু যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন ততদিন আমরা বুঝিনি তাঁর মূল্য, এখন তিনি চলে যাওয়াতে বুঝতে পারছি আমরা কি হারিয়েছি। আর দ্বিতীয়টারও একটু-আধটু মানে হয় এই প্রসঙ্গে, হয় না একেবারে তা নয়—অর্থাৎ কিনা, ধীরেনবাবু না থাকায় আমাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছে যে আর কহতব্য নয়। অনেকটা সাপের কামড়ের সঙ্গেই তার তুলনা চলে।

ধীরেনবাবুর যাবার পর থেকে আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি খুব বেশী হচ্ছে। ধীরেন-বাবু থাকার সময় এতখানি হত না, কেননা তিনি তর্কাতর্কির মধ্যে কখনো নিজেকে জড়াতেন না। একদিন আমি তর্কে প্রায় হেরে যখন সুরঞ্জনের শার্ট ধরে টানছি ছিঁড়ে ফেলবার জন্য, তখন ধীরেনবাবু হঠাৎ কেবল আমার পিঠে আস্তে আস্তে দুটো টোকা দিলেন, যেন কারুর বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "শার্ট ছিঁড়ে কি তর্কে জেতা যায়?" গম্ভীর গলা। ঠিক তখনি আমি ভেবে দেখলাম সত্যি তো, শার্ট ছিঁড়ে তর্কে জেতা যায় না। ধীরেনবাবু যতক্ষণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন নি ততক্ষণ কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল সুরঞ্জনের শার্ট ছিঁড়লেই আমি তর্কে জিততে পারব। আর এখন! প্রতি সপ্তাহে এই রেস্তোরাঁয় অন্তত একটা শার্ট ফালাফালা হয়ে ছিঁড়ে যায়। গত মাস পর্যন্ত গেঞ্জির কোন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু এই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে গেঞ্জি পর্যন্ত আর অক্ষত থাকছে না।

এই জামা-গেঞ্জি ছেঁড়ার ব্যাপারটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধীরেনবাবু থাকলে কখনই ঘটতে পারত না। তাঁর ঠাণ্ডা মাথা, তাঁর গম্ভীর গলার আওয়াজ, তাঁর গাম্ভীর্য এসব থাকলে কি আর আমাদের প্রতি সপ্তাহে জামার দোকানে ছুটতে হত?

ধীরেনবাবু সম্পর্কে দুটি ঘটনা শুনলে বুঝতে পারবেন তাঁর মাথা কতখানি ঠাণ্ডা ছিল। একদিন আমরা পিকনিকে গিয়ে ছিলাম বারুইপুরে। খাওয়া-দাওয়া হবার পর একটা গাছের ছায়ায় বসে আছি। আমি,
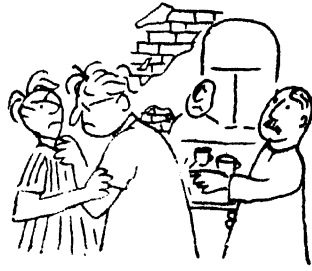
ধীরেনবাবু, সুরঞ্জন, দ্বিজেন সবাই খাওয়ার পর আমাদের সকলেরই এক ঘুমের আমেজ এসেছে, হঠাৎ ধীরেনবা আমাকে বললেন, একটা দড়ি আনতে পার কোথা থেকে? আমি বললাম, দড়ি দ কি হবে? ধীরেনবাবু বললেন, এই এক আগে সাপে কামড়েছে। আমি চম বললাম, কাকে কামড়েছে? ধীরেনবা বললেন, কাকে আবার — আমাকে! আ তৎক্ষণাৎ কি রকম ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচামে শুরু করলাম। ফলে সকলের ঘুমটুম আ এল না, চটপট সব উঠে পড়ল। দ সমস্যার সমাধান হল, ধীরেনবাবুও মা পড়লেন না। কিন্তু তিনি বললেন, সামান্য ব্যাপারে অত কোলাহল কেন?

আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল ট্রেনে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেয়ালদা স্টেশনে যাচ্ছি ধীরেনবাবু আর আমি একই কম্পার্টমেন্টে, পাশাপাশি বসেছি। আমার সঙ্গে ধীরে বাবুর কোন কথা নেই। কেবল দুজনে সিগারেট টানছি। হঠাৎ দেখি ধীরেনবাবু তাঁর পাশের লোকের সঙ্গে ফিসফিস ক কি সব বলছেন। পাশের লোকটিকে ঠি চিনতে পারলাম না। কিন্তু ধীরেনবাবুকে কথা বলতে দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম।

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করলাম, ধীরেনদা ঐ লোকটা কে? ধীরেন বললেন, ওকে আমি চিনি না। আ বললাম, ও আপনাকে কি বলছিল ধীরেনদা বললেন, ও তো কিছু বলে নি আমি কতকগুলো কথা বলেছিলাম। এ আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপ বলছিলেন কথা, কেন? ধীরেনদা বললেন কেন আবার, লোকটা আমার পকেট মেরেছে যে! আমি বললাম, তা আপনি কি বললেন ধীরেনদা বললেন,—বললাম, দাদা আপ যা নিয়েছেন দিয়ে দিন, লোকটি উসখু করছিল, তখন আমি বললাম—আমি দেখেছি আপনি নিয়েছেন, এবারে দিয়ে দিন। এ কথা মন্ত্র বলেছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কাজ হল? ধীরেনদা কেবল বললেন, হল।

তারপর সিগারেট ধরালেন। এমন ধীরেনদা তিনি আমাদের মধ্যে যদি অবিলম্বে ফিরে না আসেন তাহলে আমাদের আ কলেজ স্ট্রীটের চায়ের দোকানে পরে যাবা মত একটা জামাও অবশিষ্ট থাকবে না।

মিঃ জে, বি, এইচ, ওয়াদিয়া

(৩৪)

বম্বে থেকে, আমি আমার বন্ধু জর্জ মিত্রকে লিখেছিলাম যে, মধ্য কলিকাতায় আমাদের জন্যে একটা 'ফ্ল্যাট' ঠিক করতে—সেই অনুসারে সে বিশপ লেফ্রয় রোডে, ক্যালকাটা ম্যানসনে একটি বেশ বড় 'ফ্ল্যাট' ঠিক করেছিল। যদিও তখন যুদ্ধের সময়—ঘৃণ্য 'সেলামী' প্রথা তখন বিশেষ চালু হয়নি কলকাতায়, তাই চার-কামরার একটি 'ফ্ল্যাট' পেলাম মাত্র ২৫০ টাকা মাসিক ভাড়ায়। ইতিমধ্যে আমার সমস্ত আসবাবপত্র এবং Pontiac গাড়ীখানি বোম্বাই থেকে এসে পৌঁছে গেল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি এ ফ্ল্যাটও ছেড়ে দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটাও বদল করলুম; ছিল পণ্টিয়াক,—শুধু বছর দুই আগে কিনেছি, নতুন গাড়ী বদলে হল মাস্টার বুইক্। বন্ধুরা বললেন—তুমি মধু বোস, তোমার এখন কত নাম, কত যশ, চতুর্দিকে তোমার জয়-জয়কার, এই সাধারণ পণ্টিয়াক গাড়ী কি তোমায় সাজে, না এই বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট? আমারও তাদের কথা মনে ধরল। এমনিই হয়, যশ এবং সাফল্য খানিকটা সুরার মত, এর ওপর আছে স্তাবকদের স্তুতি—এ মানুষে যত পারে ততই তাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে। সব সময় মাথা ঠিক রেখে কাজ করা যায় না—আমারও খানিকটা সেই অবস্থা হয়েছিল। 'আলিবাবা' 'অভিনয়', 'কুমকুম', 'রাজনর্তকী'—পর পর চার চারখানি ছবির সাফল্য তখন আমায় 'মাতাল' করে তুলেছে; তখন তো আমি যে-সে লোক নই, আমি সাফল্যের শিখরে দণ্ডায়মান 'সার্থক পুরুষ মধু বোস'। চারদিকে তখন আমায় ঘিরে রয়েছে কত 'শুভকামী' বন্ধুবান্ধব! আমার কাছে আসছে কত রকমের প্রার্থী; আমার সঙ্গে একটু কথা কইতে পেলে কত লোক নিজেকে ধন্য মনে করে; অতএব বদলাও গাড়ী, বদলাও বাড়ী।

পণ্টিয়াকের জায়গায় যেমন এল মাস্টার বুইক, তেমনি বিশপ লেফ্রয় রোডের ক্যালকাটা ম্যানসনের ফ্ল্যাট ছেড়ে এসে উঠলাম স্টিফেন কোর্টের বড় ও দামী ফ্ল্যাটে। মিডলটন রো ও পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এই বড় বাড়ীটি আভিজাত্য ও পরিবেশের দিক দিয়ে অপরূপ। এতে ছিল ছ'খানি ঘর এবং একটা বিরাট বারান্দা। আমার আপিসের জন্যে একটি বড় ঘর এবং স্টেজ প্রোডাকসান, নাচের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি রাখবার জন্যেও আর যে একটি বড় ঘরের প্রয়োজন ছিল, তার সমাধান হয়ে গেল এই স্টিফেন কোর্টে। অথচ আজ শুনলে নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, এই স্টিফেন কোর্টের বিরাট ফ্ল্যাটের ভাড়া ছিল তখন মাত্র ৩৭৫ টাকা।

ইতিমধ্যে খুব সাফল্যজনকভাবে দক্ষিণ ভারত সফর শেষ ক'রে সাধনা ফিরে এল হরেনের সঙ্গে।

এদিকে মন্মথ একটি বেশ নাটকীয় কাহিনী তৈরী করে রেখেছিল—কাহিনীটি এমনই নাটকীয় এবং সংঘাতময় যে কোন-খানেই কোন নাচ দেবার জায়গা ছিল না। কাহিনীটির নাম দেওয়া হল "মীনাক্ষী"। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রনাট্য রচনা এবং শিল্পীনির্বাচনের কাজে লেগে গেলাম। অবশ্য সাধনা হিন্দি ও বাংলা দুই সংস্করণেই নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করবে। অন্য প্রধান ভূমিকাগুলির জন্য নির্বাচিত হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, দেববালা, রাজলক্ষ্মী (বড়), ইন্দু মুখোপাধ্যায় এবং নিউ থিয়েটার্সের অন্যান্য নিয়মিত শিল্পীরা। আর একটি বিশেষ ভূমিকার জন্য আমি নির্বাচন করলাম দুই সংস্করণের জন্যই অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'কে। এই ভূমিকাটিতে অনেকগুলি গান ছিল। পঙ্কজ মল্লিক তখন নিউ থিয়েটার্সের স্থায়ী সঙ্গীতপরিচালক—আমি তাঁকেই ঠিক করলাম সঙ্গীতপরিচালকরূপে। চিত্রনাট্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহকারী হেমন্ত গানগুলি লিখে ফেলল এবং পঙ্কজ সেগুলিতে সুর দিতে লাগল। বাংলা সংস্করণে নায়কের ভূমিকায় ঠিক করলাম জ্যোতিপ্রকাশকে—যে আমার সঙ্গে 'রাজনর্তকী'তে নায়কের ভূমিকায় নেমেছিল এবং ইতিমধ্যে আরও কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। হিন্দি সংস্করণের জন্য ঠিক করলাম তদানীন্তন নিউ থিয়েটার্সের নিয়মিত শিল্পী কে, এল, সায়গলকে।

১৯৪১ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ চিত্রনাট্য রচনা শেষ হল এবং গানগুলি সুর রচনা করা হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যবশত শেষ মুহূর্তে হিন্দি সংস্করণের নায়ক সায়গলকে নিয়ে লাগল গোলমাল। ব্যাপারটা খুবই সামান্য, কিন্তু সেটা এমন একটা রূপ নিল যার জন্যে নায়কের ভূমিকা থেকে সায়গলকে বদলে নাজমুল হোসেনকে নিতে হল তার জায়গায়। ব্যাপারটা হচ্ছে সংক্ষেপে এই।

সাধনার কন্ট্রাক্টের খসড়া আমিই বরাবর করতাম এবং 'রাজনর্তকী' ছবি থেকে ওর কন্ট্রাক্টে থাকত, যে ছবির টাইটেলে ওর নাম একটি আলাদা টাইটেল কার্ড-এ লেখা হবে—ওর সঙ্গে আর কারুর নাম থাকবে না। সুতরাং নিউ থিয়েটারের সঙ্গেও সাধনার কন্ট্রাক্ট সেইভাবেই হল।

সায়গল আমাকে অনুরোধ করেছিল যে সাধনার সঙ্গে ওর নামটাও দেবার জন্যে—সাধনার থেকে ছোট অক্ষরে হোক তাতে তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাধনা তাতে রাজী হল না। সে জিদ ধরে বসল কন্ট্রাক্ট যেভাবে সই হয়েছে তার নড়চড় চলবে না। নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার সব শুনে বললেন যে মিসেস বোস যখন রাজী হচ্ছেন না তখন আমার কিছুই করার নেই; কন্ট্রাক্ট অনুসারেই কাজ হবে। সায়গল যদি এতে রাজী না হয় তাহলে তার বদলে অন্য কাউকে নিতে হবে। এইভাবেই নাজমুল হোসেন নির্বাচিত হল শেষ মুহূর্তে।

গায়ক-অভিনেতা সায়গলের তখন ভারতজোড়া নাম, সেইজন্যই হিন্দি সংস্করণে নায়কের চরিত্রটি সঙ্গীতবহুল করা হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু সায়গলের বদলে যেই নাজমুলকে নেওয়া হল অমনি সমস্ত গান-গুলিকেও বাদ দিতে হল এবং শেষ মুহূর্তে চিত্রনাট্যটি আবার নতুন করে লিখে চরিত্রটিও যথেষ্ট বদলাতে হোলো। এর ফল বিশেষ ভালো হয়েছিল ব'লে মনে হয় না।

যাবার অনুমতি দেওয়াটা আমার সাধারণ সৌজন্যের খাতিরেই অন্যায়।

তাঁর এই উক্তিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। কজন প্রযোজক তার পরিচালককে এ সম্মান দিয়েছেন? আমি আমার ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় মাত্র দুজন প্রযোজককে দেখেছি এতখানি ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের পরিচয় দিতে—একজন মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার অপরজন মিঃ জে, বি, এচ, ওয়াদিয়া।

জুলাই মাসের শেষ—তখন "মীনাক্ষী"র শুটিং চলছে পুরোদমে। আমি খবর পেলাম গুরুদেব খুবই অসুস্থ—শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আনা হয়েছে। একদিন গেলাম জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁকে দেখতে। কিন্তু ডাক্তারের কড়া নির্দেশ ছিলো যে তাঁর শোবার ঘরে কোনো লোককে যেতে দেওয়া হবে না যতদিন না তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম।

•

সেইদিনটির কথা আমি ভুলতে পারব না—৭ই আগস্ট, ১৯৪১। আমি "মীনাক্ষী" শুটিং করছি, হঠাৎ দুপুরবেলায় খবর পেলাম যে রবীন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শুটিং বন্ধ করে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যখন আমি আর সাধনা পেঁছিলাম তখন শুনলাম যে শবযাত্রা ইতিমধ্যে নিমতলা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আমরা কিছুদূর যাবার পর দেখলাম যে আর এগুনো অসম্ভব, সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে শুধু মানুষের মাথা। নীরবে চলেছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে। শেষবারের মত একবার দেখার জন্যে সে কি আকুলি-বিকুলি জনগণের—এই স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাসের সে দৃশ্য জীবনে ভুলবার নয়। কাছে যাবার শক্তিতে কুলোল না, দূরে থেকেই শেষবারের মতো প্রণাম জানালাম বিশ্বকবির চরণে।

"মীনাক্ষী"র শুটিং বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। আগস্টের শেষাশেষি কিংবা সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে তদানীন্তন কলম্বিয়া পিকচার্সের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনীতীশচন্দ্র লাহিড়ী আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন যে "রাজনর্তকী"র ইংরাজী সংস্করণের 'দি কোর্ট ডান্সার' পরিবেশন স্বত্ব তাঁরা নিয়েছেন এবং তাঁরা একই সঙ্গে ২রা অক্টোবর, ১৯৪১ সালে কলিকাতা ও বোম্বাইতে ছবিখানি রিলিজ করতে চান। "রাজনর্তকী"র বাংলা ও হিন্দি সংস্করণ তো লোকে ভালভাবেই গ্রহণ করেছে এখন ইংরাজী সংস্করণটি কিরকম জনাদর লাভ করে এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। বিশেষ করে 'দি কোর্ট ডান্সার' হল প্রথম ভারতে নির্মিত ইংরাজী ছবি যা সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এবং ভারতীয় কলাকুশলী দ্বারা গৃহীত।

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটি (২রা অক্টোবর, ১৯৪১) এল। বোম্বাই এবং কলকাতায় একসঙ্গে 'কোর্ট ড্যান্সার' মুক্তিলাভ করল। মিঃ ওয়াদিয়া বোম্বাই থেকে আমাকে লিখলেন যে উদ্বোধন দিবসে বোম্বায়ের রাজ্যপাল স্যর রজার লাসলে এবং লেডী লাসলে উপস্থিত থাকবেন মেট্রোতে। তারপর তাজমহল হোটেলে অভ্যাগতদের একটি বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনে ছবির নায়িকা এবং পরিচালকের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। আমি মিঃ ওয়াদিয়াকে লিখে জানালাম যে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারলাম না, কারণ আমাদের কলকাতার মেট্রোতে উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর উপস্থিত থাকতেই হবে। প্রথম 'শো'র পরে স্টেজের ওপর সাধনা এবং আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

মিঃ ওয়াদিয়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় আমাকে লিখে জানালেন : আপনি এবং মিসেস বোস দুজনে আপনাদের কাজটা ভাগ করে নিন। মিসেস বোস কলকাতা 'প্রিমিয়ারে' উপস্থিত থাকুন, আর আপনি চলে আসুন বম্বে। কলকাতায় আমার উপস্থিতিটার একান্ত প্রয়োজন ছিল, আমি সেই মতই মিঃ ওয়াদিয়াকে লিখে দিলাম। 'দি কোর্ট ডান্সার'ও যখন 'রাজনর্তকী'র মত সমান সাফল্যলাভ করল তখন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সমালোচকরা তাদের সমালোচনায় আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কারণ ভারতের প্রথম ইংরাজী ছবি ভারতীয়দের দ্বারা নির্মিত এবং অভিনীত বলে।

এর কলাকুশলীদের বিষয় আগেই বলেছি, যখন 'রাজনর্তকী'র কলাকুশলীদের নাম উল্লেখ করেছি; সুতরাং আর দ্বিতীয়বার করে বললাম না।

রূপায়ণে—

রাজনটী মধুচ্ছন্দা	...সাধনা বসু
যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি	...পৃথিরাজ কাপুর
কাশীশ্বর গোস্বামী	...জাল খামবাটা
মহারাজ জয়সিংহ	...নায়ামপাল্লী
প্রিয়া	...প্রতিমা দাসগুপ্ত
রিয়া	...বিনীতা গুপ্ত
মহাকাল	...বিভূতি গাঙ্গুলী
আচংফা	...প্রীতি মজুমদার
ক্ষ্যাপা	...গিরিশ
জেনারেল টায়া	...কে, এল, থাপন
ত্রিপুরার রাজদূত	...প্রভাত সিংহ

কলকাতা ও বোম্বায়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে সব সমালোচনা বেরিয়েছিল, তারই কিছু কিছু নীচে উদ্ধৃত করেছিলাম :

...এইরূপে ভারতে ইংরাজী চিত্র নির্মিত হইলে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্বের দরবারে প্রচারের বিশেষ সুযোগ ঘটিবে এবং এই বিষয়ে ওয়াদিয়া মুভিটোন ও পরিচালক মধু বোস যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা প্রশংসনীয় অভিনন্দনভাজন............ পরিচালক মধু বোস সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন এই চিত্র পরিচালনায়। ...শ্রীমতি সাধনা বোস এই চিত্রে সুন্দর ইংরাজী বাচনভঙ্গী এবং অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা (৩-১০-৪১)

"October 2, 1941; Long long after the present generation has been forgotten, that date will remain in the history of the Indian Motion Picture as a permanent landmark of what great stride forward was taken by Producer Jamshed B. H. Wadia and his Wadia Movietone on that auspicious day by placing at the feet of India's four hundred million people INDIA'S FIRST ALL-INDIAN ENGLISH TALKIES!"

THE MOTION PICTURE MAGAZINE, Bombay, October 1941.

"The release at the Metro of "Court Dancer" ... may well be described as a hstioric event... in its technical excellence, comprised in the mounting, direction, photography, authenticity of detail, "Court Dancer" attains levels comparable with the best anywhere.... In its exquisite embroidery of music, song and dance it is unique . it should accordingly prove a fine ambassador to introduce India's motion picture art to the world abroad . . ."

EVENING NEWS, Bombay. 3.10.1941.

"With the release of "The Court Dancer', a most significant advance in the progress of the Indian film industry has occurred."

THE TIMES OF INDIA (Leader), Bombay. 8.10.1941.

"The Court Dancer" now showing at the Metro, Calcutta, is a pioneer effort . . . Sadhona Bose, who, as the Court Dancer dominates with her personality, as well as her talent, dance and song . . . the excellence and magnitude of the ballet composed by her, lack nothing of the grandeur of foreign pictures . . . the spoken English of the film is extremely good . . . Modhu Bose, as director, has carried out an ambitious project admirably. The speed and tempo are excellent and do not flag during an hour and half performance."

THE SUNDAY STATESMAN Calcutta, 5.10.1941.

"The Court Dancer" is undoubtedly an outstanding attraction . . . it should provide a lesson for our producers . . ."

AMRITA BAZAR PATRIKA. Calcutta, 5.10.1941.

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা ঃ

তথ্যচিত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ

সেদিন নেদারল্যাণ্ডের (পূর্বতন হল্যাণ্ড) একটি দুরীলের সাদা-কালো ছবি দেখছিলুম। 'প্যান' নামক এই ছবিটি ওখানকার জলা অঞ্চলের বাসিন্দা পাখীদের নিয়ে তোলা। তুলেছেন হার্মান ভ্যান দার হোর্স্ট। তিনি নিজের তৈরী চিত্রনাট্য নিয়ে ছবিটি পরিচালনা করেছেন; ওর চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনাও তিনি নিজেই করেছেন। অর্থাৎ ছবিখানি কেবল আনুষঙ্গিক শব্দ ও সঙ্গীতানুলেখনের জন্যে হয়ত অন্যের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত সমগ্রভাবে একক সৃষ্টি। কিন্তু কি অপরূপ সৃষ্টি! জলচর পাখীর রাজ্যে সহসা এক অবাঞ্ছিত অতিথির আবির্ভাব—একটি বছর তেরো চোদ্দ বয়সের কিশোর নৌকা বেয়ে গিয়ে হাজির। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল পাখীর দল; ডানা ঝাপটে, আওয়াজ করে বেশীর ভাগই পালালো, কিছু বা ঝোপের আড়ালে লুকোলো আবার কেউ বা জলের তলায় ডুব মারবার চেষ্টা করল। আবার কোনো কোনো পাখী সাহস সঞ্চয় করে তাদের শত্রুকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিল; অতর্কিতে তার মাথা ঠুকরে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলল। তখন ব্যতিব্যস্ত কিশোরটির মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল; সে বার করল তার সাতনলা বাঁশীটি। যেই ফুঁ পড়ল বাঁশীতে, অমনি পাখীর জগতে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কোনো সময়ে বা বাঁশীর তানকে ওদের কেউ কেউ নিজে-

বধূবরণ চিত্রে গীতা দত্ত ও রাখী বিশ্বাস

দের সঙ্গীত গান ভেবে নিয়ে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল; আবার কখনও বা দেখা গেল কোনো মরাল বাঁশির সুরের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে উতলোল করতে ব্যস্ত। কিন্তু বিপদ হল বাঁশী থামিয়ে। ক্রুদ্ধ মরাল কিশোরের ছোট ডিঙিটিকে বারংবার আক্রমণ করে উল্টে ফেলে দেবার যোগাড় করল। তখন আবার বাঁশীটিকে মুখে তোলা ছাড়া কিশোরের আর কোনো গত্যন্তর রইল না। শান্ত হল মরাল, খুশীতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এবার সে কাছে পেয়েছে তার মরালীকে। বাঁশীর সুরের সঙ্গে তাদের সে কি হিল্লোলিত যুগ্ম নৃত্য, পরস্পরের প্রতি সে কি প্রেম নিবেদন। দুজনে যখন দুজনকে নিয়ে মগ্ন, সেই ফাঁকে কিশোরটি দ্রুত দাঁড় বেয়ে করল এ জলচর পাখীর রাজ্য থেকে পলায়ন। সঙ্গে সঙ্গে ছবিও হল শেষ।

ছবিটির এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে নিশ্চয়ই অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না যে, কি অমানুষিক ধৈর্য ও পরিশ্রম ব্যয় করলে এবং কতখানি কল্পনাশক্তি ও শিল্পদৃষ্টি থাকলে এই ধরনের ছবি নির্মাণ করা সম্ভব। অর্থ ও সময় ব্যয়ের কথা ছেড়েই দিলুম। এমন ছবি সৃষ্টি করতে পারা যে কোনো দেশের পক্ষেই গর্বের কথা।

বছর কয়েক আগে কাঠের ওপর একটি রঙীন তথ্যচিত্র দেখেছিলুম; ছবিটি সুইডেনের তৈরী। বনের ভিতরে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা থেকে শুরু করে গাছের গুঁড়িগুলিকে জলে ভাসিয়ে বন্দরে নিয়ে আসা ও ট্রাক বোঝাই করে কাঠের কারখানায় পৌঁছোনো, ইত্যাদি দেখাবার পর কাঠের অগুনতি রকম ব্যবহার, তার বহুমুখী উপকারিতা প্রধানত আনুষঙ্গিক শব্দ এবং আবহসঙ্গীত সমন্বয়ে যেভাবে দ্রুতলয়ে ও শিল্পচাতুর্যের সঙ্গে দেখানো হয়েছে, উপভোগ্যতার দিক দিয়ে তার তুলনা মেলা ভার। এই ছবিটির সম্পাদনা ও বিচিত্র আবহসঙ্গীতকে শিল্পীমনের এক অবিস্মরণীয় অবদান বললেও অত্যুক্তি হবে না। নেদারল্যাণ্ডের বিখ্যাত পরিচালক বার্ট হানস্ট্রার 'কাঁচ' (গ্লাস) তথ্যচিত্রটিও এই 'কাঠ' (উড)-এর মতোই একটি অসামান্য শিল্পসৃষ্টি।

আমাদের দেশেও তথ্যচিত্র তৈরী হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে এবং তার বেশীর ভাগই কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীন ফিল্মস ডিভিসনের আওতায়। আমাদের কয়েকখানি তথ্যচিত্র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হলেও আজ পর্যন্ত এমন একখানিও ছবি আমাদের চোখে পড়েনি, যাকে কোনো-না কোনো দিক দিয়ে একটি অসামান্য শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন বলে অভিহিত করতে পারি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশে তথ্যচিত্র অন্তরের তাগিদে নির্মিত হয় না, হয় অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে। এবং তা যে হয় না, তার

কারণ হচ্ছে, আমাদের এখানে সৃষ্টিধর্মী তথ্যচিত্র বা স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণের জন্যে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন, তার কোনোই সুযোগ নেই উৎসাহের অভাবে। অপরাপর দেশে হয় রাষ্ট্র, নয় চলচ্চিত্র-জগতের শিল্পপতিরা কিংবা চলচ্চিত্রোৎসাহী কোনো কোনো ধনীর আর্থিক সহযোগিতায় এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রচুর ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

।। 'শিল্পতীর্থে'র নাটক ।।

শ্রীমনোজ মিত্রের 'আরক্ত গোলাপ' নাটকটি সম্প্রতি 'শিল্পতীর্থে'র প্রযোজনায় অভিনীত হয়েছে 'রঙমহলে'র মঞ্চে। শ্রীমিত্রের নাট্যসৃষ্টিতে যে স্বতন্ত্র একটি মেজাজ আছে তার সঙ্গে পূর্বেই অনেক নাট্যানুরাগীর পরিচিতি ঘটেছে, 'আরক্ত গোলাপ' বোধহয় এই দিক দিয়ে নতুন করে আবার পরিচয় ঘটালো। অনেক নাটক আছে যা ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে তার প্রাণ-সম্পদকে খুঁজে পায় না, একটা গভীর অনুভবের আন্দোলনেই সেই মৌল সম্পদ লুকিয়ে থাকে। আলোচ্য নাটকটি হয়তো সমালোচনার বিচারে সেই পর্যায়ে পড়বে। আরক্ত চেতনালোকে যে গোলাপের জন্ম হোল তাকে ঘিরেই নাটকের সংঘাত, তাকে কেন্দ্র করেই তার যতো কিছু ব্যঞ্জনা। তবে একটা কথা, নাট্যকাহিনী গ্রন্থনায় আরো একটু সচেতন দৃষ্টি থাকলে 'আরক্ত গোলাপ' সব কটি পাপড়ি মেলে পূর্ণ বিকশিত হোতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। সে সম্ভাবনা নেপথ্যেই মিলিয়ে গিয়েছে। নাটকের স্পন্দন যে মুহূর্তে এখানে ঘনীভূত হয়েছে তা আরো সুচিন্তিত নাট্য মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠতে পারতো এবং নাটকীয় পরিণতি বোধহয় তাহোলে আর সার্থক ও অর্থবহ হোত।

নাট্যাভিনয়ে 'শিল্পতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দের নিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু সামগ্রিক অভিনয়ের মান খুব একটা উচ্চাঙ্গেরও হোতে পারেনি। অলক সান্যাল শোভনলাল চরিত্রে প্রাণ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়েছেন। সংযমের অভাব তাঁর অভিনয়কে শিথিল করে দিয়েছে, তাই শোভনলালের মানসিকতা তার অভিনয়ে অনুপস্থিত থেকেছে। অধ্যাপক রূপে সত্যেন মুখার্জীও খুব একটা যে সার্থক হয়েছেন, এমন কথা বলা চলে না। প্রণতি আর তৃষ্ণা চরিত্রে দীপা হালদার ও ছন্দা দেবী সুঅভিনয় করেছেন। তাদের প্রয়াসে আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন—বৈদ্যনাথ ঘোষ, শিবনাথ বোস, বিশ্বনাথ গোস্বামী, সৌরেন মুখার্জী, সুবীর গুপ্ত, অজয় চৌধুরী, বিশ্বনাথ পাল, মৃণাল মুখার্জী, হেমন্ত হাজরা। নাট্য নির্দেশনা ও আলোক পরিকল্পনায় [illegible] মুখার্জী ও অজিত মিত্র।

সুশীল বিশ্বাস পরিচালিত ছায়াতীর চিত্রের একটি দৃশ্যে—শ্রাবণী বোস ও গীতালি রায়।
ফটো : অমৃত

।। দাক্ষিণাত্যে অরুণাভ মজুমদারের ।।
মূকাভিনয় ।।

দক্ষিণ ভারতে একটি সফল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে কিছুদিন আগে ফিরে এসেছেন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল। এই দলের অন্যতম শিল্পী ছিলেন মূকাভিনেতা শ্রীঅরুণাভ মজুমদার। সম্প্রতি সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী অরুণাভকে একটি নয়, একাধিক চাহিদায় অনেকগুলো অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল শিল্পীদের সঙ্গে। অ্যাকাডেমি হল, আন্দামালাই প্রভৃতি হলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে শিল্পী দক্ষতার সঙ্গে মূকাভিনয়ের সূক্ষ্ম কলা-কৌশল দেখান এবং উপস্থিত সকল শ্রেণীর দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

বাংলার এই সাংস্কৃতিক দলটি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। একটি সাংবাদিক সম্মেলন ও এ-ভি-এম স্টুডিওতে শ্রীঅরুণাভ তাঁর অভিনয়ের সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করে বিদগ্ধ মহলের স্বীকৃতি অর্জন

... বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পীদের নিয়ে এই সাংস্কৃতিক দলটিকে ... বাংলার প্রায় সব বিশিষ্ট ... অনুষ্ঠানকে উচ্চশ্রেণীর বলে ঘোষণা করেন। এই গৌরবদীপ্ত সাংস্কৃতিক দলের ... করেন বাংলোর প্রখ্যাত সুর-স্রষ্টা শ্রী ... বালসারা।

॥ বান্ধব সম্মেলনী ॥

সম্প্রতি 'রবীন্দ্র-ভারতী'র সহযোগিতায় প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনী' রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য কর্তৃক নাট্য রূপায়িত রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' মঞ্চস্থ করেন। অভিনয় অনুষ্ঠানে বহু শিক্ষাবিদের সমাগম হয়। সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের গতি সুষ্ঠুভাবেই পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন অধ্যাপক দিলীপকুমার ভট্টাচার্য, প্রতিমা পাল, রাধা-গোবিন্দ চক্রবর্তী, সবিতা মুখার্জী, তড়িৎ ভট্টাচার্য, নটবিহারী ধর, লালমোহন মিত্র, রাসবিহারী দাস, বারীন চ্যাটার্জী, গোবিন্দ-লাল ভট্টাচার্য, সব্যসাচী হাজরা, হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মীরা দাস।

॥ 'রাজা সাজা'র নাট্যাভিনয় ॥

আগামী ১২ই অক্টোবর '৬৬ সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গনে 'রাজা সাজা'র শিল্পীবৃন্দ রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'নবযৌবন' নাটকটি মঞ্চস্থ করবে। শ্রীপ্রবীর মুখোপাধ্যায় নাটকটির নির্দেশনায় থাকবেন।

॥ জুনিয়র আর্টিস্ট গোষ্ঠী ॥

জুনিয়র আর্টিস্ট শিল্পীগোষ্ঠী শ্রীকাজল সেনের 'অদ্য ও প্রত্যহ' নাটকটি নিয়মিত মঞ্চস্থ করবেন বলে জানা গেছে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে কেরানী জীবনের সুখ-দুঃখের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা ও হাওড়ার কয়েকটি মঞ্চে এই নাটকটি অভিনীত হবে।

॥ নাট্য-উৎসব ॥

আরামবাগের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অগ্রণী সম্প্রদায়' দুদিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। 'সাজাহান' ও 'ডাউন ট্রেন' এই দুটি নাটক নাট্যোৎসবে অভিনীত হবে। নাটক দুটি পরিচালনা করবেন শ্রীমনু মুখোপাধ্যায়।
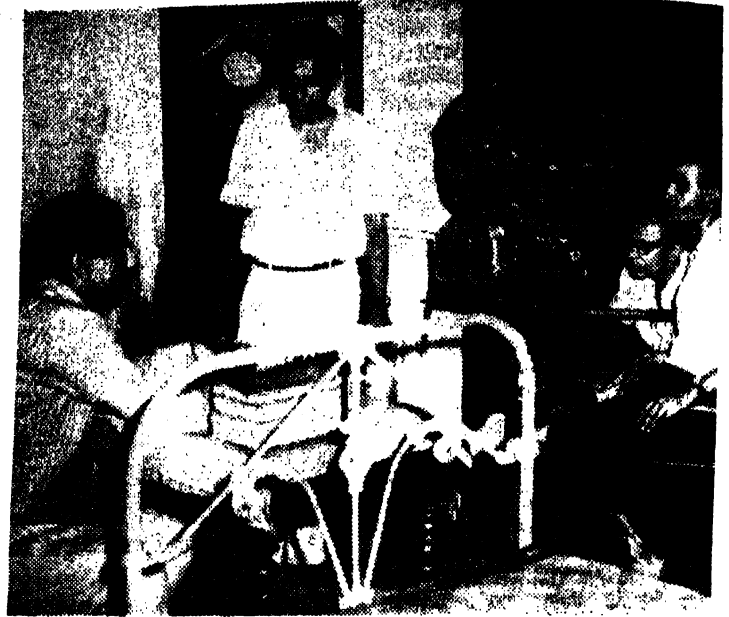
মহাবিপ্লবী অরবিন্দ চিত্রের সেটে—দিলীপ রায়, পরিচালক দীপক গুপ্ত, ক্যামেরাম্যান দীপক দাস ও সহকারী কালী ব্যানার্জী। ফটো : অমৃত

॥ অণ্ডালে নাট্যাভিনয় ॥

চিত্তরঞ্জন ইনস্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি কুষ্ঠরোগীদের সাহায্যকল্পে উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন—গণপতি ভট্টাচার্য, নারায়ণ ঘোষ, শ্যামল ঘোষ, পূর্ণেন্দু মুখার্জী, অসিত সেনগুপ্ত, শীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন মুখার্জী, সুধীর রায় চৌধুরী, সন্তোষ বোস, মনোরঞ্জন লাহিড়ী, উমা প্রামাণিক, বাসুদেব সেনগুপ্ত, মীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

॥ কসবা পোস্ট অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব ॥

কসবা পোস্ট অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'মিশরকুমারী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন স্থানীয় চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে। নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সন্তোষ পাঠক, দত্তা মুখোপাধ্যায়, বিনয় চক্রবর্তী, সত্য দাস, ভবপ্রসাদ মল্লিক, বিদুর ভগৎ। হিমাংশু রায়ের নাট্য-নির্দেশনায় দক্ষতার নজীর ফুটে ওঠে।

॥ নাট্য প্রতিযোগিতার ফল ॥

জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাব দ্বিতীয় বার্ষিক আন্তঃ বিভাগ নাট্য প্রতিযোগিতার যে আয়োজন করেছিলেন তার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা :—নারায়ণী বিল্ডিং-এর 'কালো মাটির কান্না'

দ্বিতীয়—সাতাশ নম্বর চৌরঙ্গী বিল্ডিং-এর 'কালো মাটির কান্না'।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয়—... মজুমদার।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—নমিতা চক্রবর্তী।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক—রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

॥ চেতলা ফ্রেন্ডসের তিনটি একাঙ্ক নাট্যানুষ্ঠান ॥

গত শনিবার ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় চেতলা ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে আশিস সান্যালের একাঙ্ক কাব্য-নাটক 'আজ বসন্ত', অরুণ বিশ্বাসের 'বিনে পয়সার বিয়ে' এবং 'ডিভোর্স' নাটক তিনটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

'আজ বসন্ত' একাঙ্ক কাব্য-নাটকটি পরীক্ষামূলক। বর্তমান জীবনের একটি জটিল সমস্যাকে এতে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। অমলেশের ভূমিকায় অরুণ বিশ্বাস, অশোকার ভূমিকায় লতিকা পাল, বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সৌম্যেন্দুর ভূমিকায় কমল দাসের অভিনয়ও চরিত্রানুগ হয়েছে। নাটকটি সাফল্যের জন্য

চালনায় রয়েছেন সলিল চৌধুরী। আলোক-চিত্রগ্রহণ করবেন দীপক দাস।

পীযূষ বসুর পরবর্তী ছবি 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'

পরিচালক পীযূষ বসুর পরবর্তী ছবি 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'। কালিপদ দত্তগুপ্ত প্রযোজিত সারদা চিত্রমের এ কাহিনী রচনা করেছেন কালকূট। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মালা সিনহা, বিশ্বজিৎ, সুস্মিতা সান্যাল, দীলিপ রায়, গীতালি রায়, রবি ঘোষ, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিম ঘোষ। সঙ্গীত-পরিচালনায় শৈলেন রায়।

বোম্বাই

'কীৎনা নাজুক হ্যায় দিল'র সঙ্গীতগ্রহণ

সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় মমতা মুভিজের 'কীৎনা নাজুক দিল'-র সঙ্গীত-গ্রহণ করেন সঙ্গীত-পরিচালক রাজরতন। দুটি কাওয়ালি গানে কণ্ঠদান করেন মান্না দে ও মহম্মদ রফি। এস ব্যানার্জি পরিচালিত এ চিত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন কিশোরকুমার, কুমিওয়াকর, নূতন, মাধবী, অচলা সচদেব, মদনপুরী, তুনতুন ও মালিকা।

'যব ইয়াদ কিসিকী আতি হ্যায়'

ফিল্মীস্তান স্টুডিওয় এন এস ফিল্মসের রঙিন ছবি 'যব ইয়াদ কিসিকী আতি হ্যায়'-র দৃশ্যগ্রহণ বর্তমানে শেষ করছেন পরিচালক নরেশ সাইগল। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন ধর্মেন্দ্র, মালা সিনহা, অভি ভট্টাচার্য, অচলা সচদেব, অনুপকুমার, বেলা বোস, মধুমতী, ইন্দিরা এবং আগা। মদনমোহন ছবিটির সুরকার।

'যাহা তুম ওহা হাম'

এ সালাম পরিচালিত 'যাহা তুম ওহা হাম'-র দৃশ্যগ্রহণ ফিল্মীস্তান স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। ধ্রুব চ্যাটার্জি রচিত এ কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, নন্দা, মন্টু, মমতাজ বেগম, সুন্দর, মাধবী, ধুমল, তুনতুন ও ধীরেন্দ্র। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন মদনমোহন।

নীতীন বসু পরিচালিত 'উম্মিদ'

সম্প্রতি মডার্ণ স্টুডিওয় নীতীন বসু পরিচালিত 'উম্মিদ'র একটি নাটকীয় দৃশ্য গৃহীত হল। রঞ্জন বসু রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন জয় মুখার্জি, সীলা নাইডু, নন্দা, তরুণ বোস, লীলা মিশ্র, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, সবিতা চ্যাটার্জি, জীবনকলা, তুনতুন ও আগা। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন রবি।

মণি ভট্টাচার্য পরিচালিত 'ধূপ কী সায়ে মেঁ'

মণি ভট্টাচার্য পরিচালিত 'ধূপ কী সায়ে মেঁ'-র সঙ্গীতগ্রহণ সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় পালন করলেন সঙ্গীত-পরিচালক চিত্রগুপ্ত। কণ্ঠদান করেন লতা মুঙ্গেশকর। ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন পৃথ্বিরাজ কাপুর, সুলচনা, অভি ভট্টাচার্য, নানা পালসিকর, বিজয়া চৌধুরী, অসিত সেন, সাপ্রু এবং মৃদুলা।

ছায়াপথ চিত্রে এন বিশ্বনাথন এবং কণিকা মজুমদার।

ভিনদেশী ছবি

ভূতাত্ত্বিক চলচ্চিত্র সংস্থা
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এক অভিনব চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান

সোভিয়েত ভূতাত্ত্বিক চলচ্চিত্র সংস্থা সম্ভবত বিশ্বের মধ্যে এ ধরনের সর্বপ্রথম ও একমাত্র চলচ্চিত্র সংস্থা। লক্ষ লক্ষ দর্শক এই সংস্থার তোলা ছবিগুলি দেখে তাদের স্বদেশ ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও সৌন্দর্য উপভোগ করেন ও ভূপ্রকৃতিগত তথ্যাদি অবহিত হন। বিজ্ঞানমূলক চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় ফিল্ম স্টুডিও ভবনে উল্লিখিত সংস্থাটির দপ্তর, যার পুরো নাম হল "ইউনিয়ন অব জিওগ্রাফিক ফিল্মস, ইউ এস এস আর"।

ভ্রমণ ও ভূতাত্ত্বিক অভিযানমূলক এই সব চলচ্চিত্র তোলা যথেষ্ট পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য। হয়ত ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা-শিল্পীকে তাঁর ক্যামেরাটি নিয়ে দৃশ্যগ্রহণের জন্য এক দুর্গম পর্বতশিখরে উঠতে হল, সেখানে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য তাঁর নিজেরই নিঃশ্বাস নেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে অথবা এক খরস্রোতা নদীর উৎস সন্ধানে তাঁকে ক্যামেরা পিঠে নিয়ে যাত্রা করতে হল। আগ্নেয়গিরির গহ্বরেও অনেক সময় এই চলচ্চিত্রকারদের নামতে হয়। ঘোড়া, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন—যে কোনও যানবাহনেই যাওয়া যাক না কেন এ ছবির ক্যামেরা-শিল্পীকে সবসময়েই সজাগ থাকতে হয়—কখন ঠিক ঠিক দৃশ্য গ্রহণের সময় ও স্থান বেছে নিতে হবে।

এই সংস্থার চলচ্চিত্র পরিচালক ও ক্যামেরা-শিল্পীরা সকলেই হলেন মস্কো সিনেমাটোগ্রাফি ইনস্টিটিউটের স্নাতক। এ'রা বয়সে তরুণ বলেই উৎসাহী, পরিশ্রমী ও নতুনকে জানার জন্য সবরকমভাবে প্রস্তুত ও আগ্রহী।

সোভিয়েত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাদ্যাগারে তাঁরা এ'দের চলচ্চিত্রাভিযানের পরিকল্পনা করেন। এই মানচিত্রের পথরেখা ঘিরে আছে উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু, ইস্টার দ্বীপপুঞ্জ ও নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, হিমালয় পর্বতমালা, আফ্রিকার মধ্যভাগ, য়ুরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান, কিউবা ও পৃথিবীর নানান অঞ্চল। ...

সোভিয়েত দেশের ইউনিয়ন অব জিওলজিক্যাল ফিল্মস প্রতি বছর আটবার এঁদের 'চলচ্চিত্রাভিযানের পঞ্জিকা' প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন না বলে 'পঞ্জিকা'টির চরমুক্তি ঘটে বলাই সঙ্গত। কেননা এটিও চল জনপ্রিয় তথ্যমূলক চলচ্চিত্র: দেখাতে সময় লাগে মাত্র ২০ মিনিট এবং প্রতি পাঁচ মিনিট এক-একটি বিষয়ের সম্পর্কে দৃশ্যাদির অবতারণা থাকে। এ ছাড়া থাকে একটি 'চলচ্চিত্র সম্পাদকীয়' যাতে সোভিয়েত দেশের নয়া গঠনকার্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি যেমন থাকে, তেমনি থাকে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান-প্রগতিরও খোঁজখবর।

এই 'চলচ্চিত্র পঞ্জিকা'টি যে সোভিয়েত জনসাধারণের কাছ থেকে যথেষ্ট সমাদর পায়, তা কিয়েফে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে তার দু' দুবার পুরস্কারপ্রাপ্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

স্বল্প দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রদর্শনী:

গেল মঙ্গলবার, ২০-এ সেপ্টেম্বর গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ সংলগ্ন সরলাবালা রায় মেমোরিয়াল হলে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা'র উদ্যোগে কলকাতাস্থিত রয়্যাল ডাচ এমব্যাসীর সহযোগিতায় নেদারল্যাণ্ডের পরীক্ষামূলক স্বল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চলচ্চিত্রের এক প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে যে পাঁচটি ছোট ছবি দেখানো হয়, সেগুলি হচ্ছেঃ (১) রিদম অব রোটারডাম, (২) বেলস্ অব হল্যাণ্ড, (৩) প্যান, (৪) বিগ্ সিটি ব্লুজ এবং (৫) গ্লাস। এদের মধ্যে প্যান ও গ্লাস নামে ছবি দুখানির উল্লেখ আছে এবারের 'আজকের কথা'য়। অপর তিনখানির মধ্যে চব্বিশ মিনিটকালব্যাপী 'বিগ সিটি ব্লুজ' একটি অসাধারণ কাহিনী চিত্র— যেমন বাস্তব, তেমনই নির্মম। ছবিটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে বারান্তরে।

হল্যাণ্ডে বহুকাল ধরে গির্জার ঘণ্টা নির্মাণের যে পদ্ধতি চলে আসছে, তাই দেখানো হয়েছে 'বেলস অব হল্যাণ্ড' নামক ছবিটিতে। আর রোটারডামের বৃহৎ বন্দরের ক্ষিপ্র কর্মব্যস্ততাকে পটভূমি স্বরূপ ব্যবহার করে একটি সুমধুর প্রেমকাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে 'রিদম অব রোটারডাম'।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে 'সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা'র অবিশ্রান্ত উদ্যম ভূয়সী প্রশংসা লাভের যোগ্য।

বোকারোতে আনন্দানুষ্ঠান

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ডি ভি সি বোকারো ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বোকারো ক্লাবের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে শ্রীচিত্ত ঘোষালের "ঝুমঝুমি" একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সর্বশ্রী সুবিমল রায় (পরিক্ষীৎ), সদানন্দ মাঝি (শৈলেন), সাধন দত্ত (প্রফেসর সান্যাল), সুবীর রায় (অনিমেশ), জ্যোতি মিত্র (নিখিল), সন্তোষ মুখার্জি (বিকাশ), গোপাল দে (রাজ্যেশ্বর), মদন রায় (ধনঞ্জয়) এবং স্ত্রী-চরিত্রে আসানসোলের কুমারী ইলা ঘোষ (অনুরাধা)। এ ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীগোপাল দে'র মূকাভিনয়। শিল্পীর ঘুড়ি উড়ানো এবং পুরুষ ও মহিলাদের প্রসাধন শীর্ষক মূকাভিনয় বিশেষভাবে দর্শকবৃন্দ দ্বারা অভিনন্দিত হয়।

গানের জলসা

অক্ষয় সংগীত-তীর্থ

১১ই সেপ্টেম্বর ৫নং নবীন সরকার লেনে অক্ষয় সঙ্গীততীর্থের ৫ম অধিবেশন শুরু হল শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তবলা-লহরা দিয়ে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান শ্রীপ্রবীর দত্তর তবলা-লহরা।

কণ্ঠসঙ্গীতে ভূপালী রাগ পরিবেশন করলেন কুমারী শুভ্রা গুহ। সঙ্গতে ছিলেন শ্রীগুরুপদ পাল।

সর্বশেষে শ্রীবিশ্বনাথ বসুর তবলাসঙ্গতে শ্রী ভি জি যোগ ও মণিলাল নাগের বেহালা ও সেতারের যুগলবন্দী আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পেরেছে। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত পরিণত শিল্পী, অপরজন উদীয়মান নবীন শিল্পী। একজনের যন্ত্র মেলোডি বা সুরপ্রধান, অপরজনের ঠোকা বা ছন্দপ্রধান। এঁদের পরিবেশিতব্য রাগ ছিল 'মিশ্র দেশ'। শ্রীযোগের বৈচিত্র স্বরসাম্যের জবাবে শ্রীনাগের চাতুর্য ও শিল্পশ্রীমণ্ডিত ছন্দরচনা ও লয়কারীর দক্ষতায় নবীন ও প্রবীণের আনন্দভরা দ্বন্দ্ব ও পরিশেষে প্রবীণের সস্নেহ আত্মসমর্পণে এক বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত পরিবেশ রচনা করেছে। শ্রীবিশ্বনাথ বসু নিজের দক্ষতা প্রদর্শনের প্রলোভনকে সংযত করে যেভাবে শুদ্ধ ও স্পষ্ট ঠেকা রেখে গেছেন তা যে কোন নবীন তবলচির অনুকরণযোগ্য।

জন কুপার পরিচালিত বিদায়ী অর্কেস্ট্রা

মার্কিন শিল্পী ও সুরস্রষ্টা ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকের অধ্যাপকরূপে যুক্ত থেকে শ্রীকুপার মাত্র এক বছরের মধ্যে যে অসাধারণ সৃজনপ্রতিভা ও কর্মক্ষমতার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন যে কোন দেশের সঙ্গীত-রসিক-সমাজের পক্ষে স্মরণীয়।

গত বৃহস্পতিবার রসিকরঞ্জনী সভার উদ্যোগে ত্যাগরাজ হলে শ্রীকুপার বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান তাঁর ভারতীয় শিষ্যদের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন।

অনুষ্ঠানসূচীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঙ্গিক বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় এই দীর্ঘ অনুষ্ঠানে এক আলোকোজ্জ্বল সংবাদ পরিবেশন করেছে। 'পূর্ব এবং পশ্চিমে মিলন অসম্ভব'—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সংকীর্ণ, অনুদার বুলি মিথ্যা হয়ে গেছে বারবার। সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

রঙ্গমঞ্চ

।। নাটক ।।

উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে ব্যাপকভাবে আপন করে তুলতে পেরেছেন, শরৎচন্দ্রের স্থান তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। গ্রাম-বাংলার জনগণের সুখ-দুঃখকে এত নিবিড় করে, এত কাছে থেকে বোধ করি আর কোন সাহিত্যিক দেখেননি। তাই শরৎ-সাহিত্য যেমন করে সর্বস্তরের বাঙ্গালীর হৃদয়-মন অভিভূত করে, আজ পর্যন্ত তার কোন দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মেলেনি।

তাঁর লেখা 'রামের সুমতি' ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি গল্পের অন্যতম বলে স্বীকৃত। এহেন একটি গল্পের উপর যখন অক্ষম কারিগরী তার দম্ভ প্রকাশ করে তখন সে গল্পের পরিণতি কি হতে পারে সেটা কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হবে না যদি না তিনি গত শুক্রবার রাত আটটায় 'রামের সুমতি' নাটকটি শুনে থাকেন।

নাটকটি প্রযোজনা করেছেন শ্রী শ্রীধর ভট্টাচার্য। যে কাহিনী শুধু গড় গড় করে পড়ে গেলেই চোখের জল ধরে রাখা দায়

চতুষ্কোণ হুড়মুড় করে ছুটে আসে ছেদচিহ্ন হয়ে। একটা পেন্ডুলাম দুলতে দুলতে ক্যামেরার লেন্সের গায়ে—ঝাপসা স্পষ্ট ঝাপসা স্পষ্ট ঝাপসা স্পষ্ট। একটা মেয়ে দুলছে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো, খুব কাছে অনেক দূরে, কাছে দূরে, কাছে দূরে; একটা চোখ পিসটনের মতো খুলছে বুজছে খুলছে বুজছে। জনৈকা মোটা মহিলা খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠছে উঠছে উঠছে; শেষ ধাপ, রেলিং—কাট্—আবার গোড়া থেকে" (২৪ বার)।

দেখে তে বটেই, পড়তে পড়তেও মনে হবে : একী বদ্খত পাগলাটে ছবি! পরিচালকরা নিশ্চয়ই রাঁচী কিংবা পাস্তুর ইনস্টিটিউটের স্থায়ী বাসিন্দা। নইলে, আধুনিক কবিতা কি অ্যাবসার্ড নাটকের চেয়েও উদ্ভট ব্যাপার ভাবেন কি করে, তোলেনইবা কেন!

বলা বাহুল্য, এসব ছবি যাঁরা তৈরি করেছেন বা করেন, তাঁরা সত্যিই পাগল নন। তাঁরা শিল্পী, অবশ্যই নতুন রীতির। এবং এই শ্রেণীর সৃষ্টি ইতিহাসে 'আভাঁ গার্দ' বা নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র বলে পরিচিত।

প্রচলিত গতানুগতিক রীতি-পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে নতুন-কিছু করার নামই যদি হয় নিরীক্ষা, তাহলে জীবন্ত শিল্পমাত্রেই প্রতি পদে নিরীক্ষাধর্মী। আর, চলচ্চিত্র তো আজ সবচেয়ে জীবন্ত শিল্প। তাই তার ইতিহাস পদে-পদে নতুন রীতির ও রীতি-বদলেরই ইতিহাস।

প্রথম যুগে, মুভী ক্যামেরার একমাত্র কাজ ছিল নিছক ফটোগ্রাফী—চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে, সামনে যা-কিছু চলছে ঘটছে, তাদের নিশ্চল ছবি তুলে রাখা। তারপর, পর্দার সামনে বসে অবাক মানুষ দেখত : ছবির মানুষ জীবজন্তু প্রাণীর মতোই নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে! স্টেশনে ট্রেন ইন করছে, হোস্‌পাইপে জল দেওয়া হচ্ছে। মানুষ খাচ্ছে খেলছে চলছে—এই সব ছবি তুলতেন লুমিয়ের। মেলিয়ে কিন্তু ছবি তুলতেন কাল্পনিক দৃশ্য সাজিয়ে; যেমন, পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা ট্রেন যাত্রা করেছে মহাশূন্যে। ক্রমে, ক্যামেরা নিজেও নড়তে আরম্ভ করল; কখনও বিষয়ের কাছে, কখনও দূরে, সহজ বা দুরূহ কোণে, ওপরে নীচে, ঢিলে বা দ্রুত দোলানো, বিভিন্ন ফোকাস লেন্সে। আর, একবার যখন নড়ল, তখন ক্যামেরা, সেই সঙ্গে সেট, আলোছায়া, অভিনয়, ধ্বনি ইত্যাদি নিয়ে নানান পরীক্ষা সুরু হয়ে গেল আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী সুইডেন, ইংল্যান্ড, রাশিয়ায়। দেখা গেল : একটা মুঠোর ক্লোজআপ গোটা মনের চেহারা ধরে দিতে পারে; একটা দেয়ালের কাঁপুনি মনের ভয়কে ফোটাতে পারে; একটা সাদা-কালো সিঁড়ি ভয়কে ভয়ংকর করতে তুলতে পারে; ভয়ংকর বীভৎস হতে পারে একটা সামান্য প্রতীকে—মানুষ তখন হয় মুরগি, পেরেক তার হাড়, জুতোর ফিতে স্প্যাগেটি।
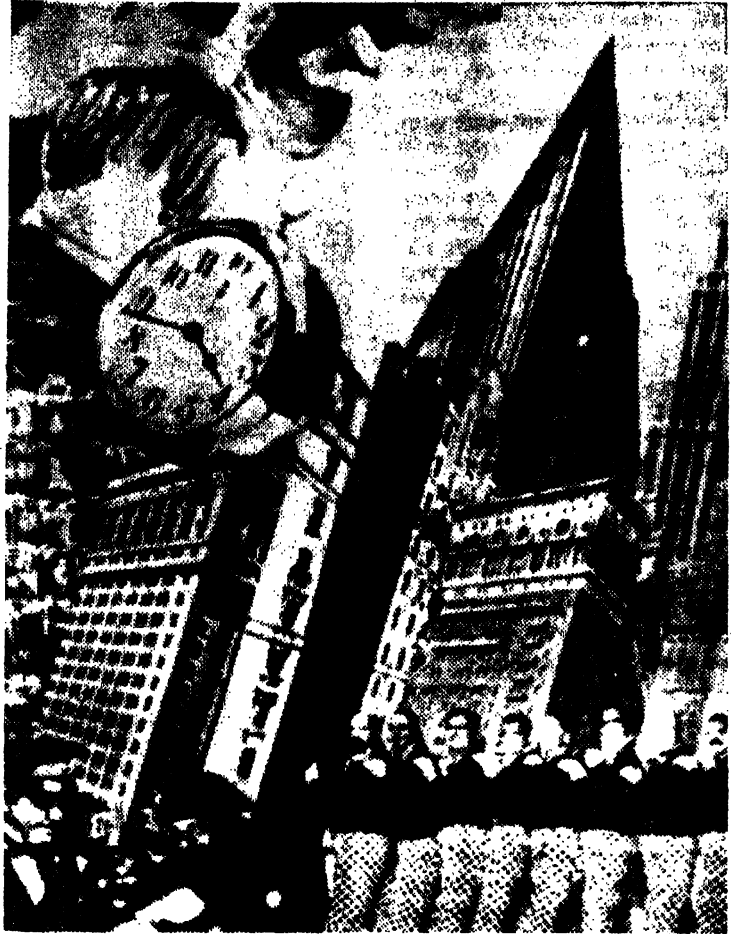
বার্লিন। পরিচালনা : ওয়ালটার রাটম্যান

এসবই চলচ্চিত্রীয় পরীক্ষা। তবু এরা নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্রের সগোত্র নয়। 'আভাঁ গার্দ' চলচ্চিত্রের কুল-শীল আলাদা। যেহেতু, তার দৃষ্টিভঙ্গীটাই আলাদা।

চলচ্চিত্রের যেটি মূল ধারা, তার মেরুদণ্ড গল্প, যাকে বলে 'স্টোরী ফিল্ম'। আভাঁ গার্দ চলচ্চিত্র 'নন্-স্টোরী ফিল্ম', গল্পের পাড়া দিয়ে তার হাঁটা নিষেধ। গল্প বাদ দিয়ে ছবি তোলার একটা সোজা পথ হচ্ছে—ডকুমেন্টারী বা তথ্যচিত্র, যা লুমিয়ের করতেন। আর একটি পথ, নিজের অজ্ঞাতে যার অস্পষ্ট সূচনা করেছিলেন মেলিয়ে এবং যে পথ জটিল ও সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এসে পেঁছেছে যৌবনদৃপ্ত আভাঁ গার্দ আন্দোলনে।

• বিচালক কুলেশভের ছবিতে নায়িকার হাত দেখান হয়েছে অনেকবার, নানাভাবে। ও-হাত কিন্তু নায়িকার ভূমিকা-শিল্পীর নয়, অন্য মহিলার, অন্য অনেক মহিলার! এজাতীয় পরীক্ষাকে আভাঁ গার্দধর্মী বলা যেতে পারে। কিন্তু আন্দোলনের সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানীতে। প্রবক্তা : দুই অস্থির চিত্রকর এগ্‌লিং ও রিখ্‌টার। একদা এঁদের ইচ্ছে হল : আঁকা স্থির ছবিকে গানের মতো গতি ও বিস্তার দেবেন। বসে গেলেন পটুয়াদের মতো স্ক্রলে বা পটে ধারাবাহিক ছবি আঁকতে। কিন্তু ঠিক মনের মতো হল না। এলেন চলচ্চিত্রের কাছে। ক্যামেরাকে তুলির মতো ব্যবহার করে, ট্রিক্‌শটের সাহায্যে তুললেন 'অ্যানিমেটেড ফিল্ম', জড়কে সচল করলেন। এগ্‌লিং সৃষ্টি করলেন 'সিমফনি ডায়াগোনেল'; রিখ্‌টার করলেন 'রিদ্‌মাস ২১'। নাম দিলেন 'অ্যাবস্‌ট্রাক্ট ফিল্ম', গল্প না, স্টুডিওসেট না, অভিনেতা-অভিনেত্রী না, 'গতিশীল বিমূর্ত ছবি'। এক নতুন ধারা, আভাঁ গার্দ চলচ্চিত্রের জন্ম হল।

এগ্‌লিংয়ের ছবিতে বিমূর্ততার চূড়ান্ত। বক্র চতুষ্কোণ ঢেউ-রেখা কেবলই চলছে নড়ছে, বেঁকে যাচ্ছে রূপ বদলাচ্ছে, একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন-যেন অন্য-আকার আকারহীন হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে, কোন অভিনব বস্তুও নয়, শুধু নাচ-ছন্দ, রূপ থেকে রূপে বিমূর্ততার গতি,

'দৃশ্যমান গান'। রিখটার মুদ্রাস্ফীতির মতো কন্‌কাট বিষয়কেও অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট চেহারা দিয়েছেন; গোছা গোছা ব্যাংকনোট, জঞ্জালের স্তূপ, দোকানে দোকানে খালি তাক, ক্ষুধার্ত ভয়পাওয়া মুখ, শেয়ার-বাজারের আতঙ্ক, ভন্ড মাতাল, একটা আত্মহত্যা, গাদাগাদা টাকা এলোমেলো জড়ো করা—যেন রাত্রির এক ভয়াবহ দুঃস্বপন। রাটম্যান তুলেছেন বার্লিনের ছবি : ভোর; একটা ট্রেন স্টেশনে ইন করল, দোকানের ঝাঁপ খোলা হচ্ছে; ট্রাম, জ্যাজ্‌ব্যান্ড, দুধ, জনতা, চাকা, পদচারিণীদের পা— কুয়াশায় সব ঝাপ্‌সা, কাঁপাকাঁপা, মিশে যাওয়া যেন ঘুমজড়ানো চোখে দেখা বার্লিন শহর।

কার্ল গ্রুনে আরও-একটু এগিয়েছেন। একটি ছবিতে শহরকে তিনি দেখিয়েছেন জীবন-পিয়াসী একটি যুবকের চোখ দিয়ে। আর একটি ছবির দ্রষ্টা এক অন্ধ; চোখের দৃষ্টি শেষবারের মতো নিভে যাবার শেষমুহূর্তে সে দেখছে : বস্তু নয়, আকার নয়, বিকৃত এলোমেলো বিক্ষিপ্ত সব পিন্ড; ছিটকে-পড়া রক্তের মতো এক-তাল রঙ; তারপর নিশ্ছিদ্র অনন্ত অন্ধকার। কাভালকান্তির মর্ন্টমোর্টে আরও অগ্রসর : চারপাশের কঠিন জড় দৃশ্যাবলী বেঁকে তুবড়ে গলে ভেসে চলেছে; ভেসে চলেছে। এ যেন চোখ বুজে দেখা গলিত দৃশ্য, ভাবানুষঙ্গের চিত্ররূপ।

কাভালকান্তি ফরাসী। প্যারীতে আভাঁ গার্দ চলচ্চিত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন লুই দেলাক। তাঁকে ঘিরে যেসব নতুন পরিচালক নতুন রীতির ছবি তুলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের তিনজনের তিনটি ছবির দৃশ্য এই প্রবন্ধের আরম্ভেই উদ্ধৃত করেছি। এছাড়াও আরও অনেকে ছিলেন। তার মধ্যে এপস্টাইন বেশি পরিচিত। পো'র ভৌতিক গল্প 'দি ফল অব দি হাউস অব আশার' অবলম্বনে ইনি একটি ছবি তোলেন। গল্প নয়, পরিবেশ : সীমানাহীন বড় বড় হল, শেষহীন সিঁড়ি, এলোমেলো ধাপ, অন্ধকার অনন্ত করিডর, রহস্যময় কালো কালো নির্জন কোণ, বিবর্ণ ছায়ামূর্তিরা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরছে, দরজা খুলে যাচ্ছে, পর্দা পড়ছে, অন্ধকারের বুক চিরে হাত জ্বলে উঠছে, কুয়াশাভরা জলের ওপর কাপড়ের ভেইল ভাসছে। এমনি সব টুকরো টুকরো দৃশ্য স্বপ্নপুঞ্জের মতো।

এসমস্তই কিন্তু বহিদৃশ্য, বাস্তবের বাইরের চেহারা। আভাঁ গার্দ পরিচালক মূর্তিহীন মনোভাবকেও রূপায়িত করতে চান। প্রথমে উদ্ধৃত বুনুএল ও দালির নিরীক্ষা মানবচিত্তের অবদমিত অবচেতন বাসনাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। আবার, সচেতন মনেরও নানান অবস্থা, বিবিধ চিন্তা, বিচিত্র মেজাজ। এই মেজাজী দৃষ্টি নিয়ে কোন-এক বিশেষ মুহূর্তে হাওড়া

নৃত্যের তালে তালে
পরিচালনা : মায়া ডেরেন
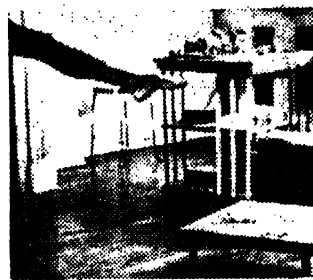
ব্রীজের ওপর চোখ ফেললে মনে হয় : অসংখ্য সুন্দর কস্ত্রী কোণ আর রেখা, ফিগার আর কম্পোজিশনের আশ্চর্য সমষ্টি। কিংবা চোখে পড়ে : বৃষ্টি; নরম বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে পাতার গা বেয়ে; ভিজে ফুটপাতে শহরের তির্যক ছায়া পড়েছে বিগলিত ভঙ্গিতে; বৃষ্টির ছোঁয়ায় পুকুরের জলের রঙ মিশে গেছে হাঁসের পালকের রঙে; সমতল-শার্সির গায়ে একটা নিঃসঙ্গ ফোঁটা একটু করে নামছে, পরক্ষণে থেমে যাচ্ছে অনেক দ্বিধায়-শংকায়, আবার নামছে। চারপাশকে তখন আশ্চর্য ভালো লাগে। মনে পড়ে রাবীন্দ্রিক শ্লোক : 'বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।' বস্তুত, এই মেজাজ, এই দিগন্ত হৃদয় নিয়ে দুটি ছবি তুলেছিলেন হল্যান্ডের ইয়ারিস ইভেনস্—'ব্রীজ' ও 'রেন'।

নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র স্টোরী-ফিল্‌ম্ নয়, যেন তন্বী গান কিংবা লিরিক কবিতা অথবা কয়েক মিনিটের সুদৃশ্য রম্যরচনা। তা বলে পরিপূর্ণ 'অগল্পম্পশ্যা'ও নয়! যেমন শ্রীমতী জারমেন দুলোকের 'দি স্মাইলিং মাদাম বউদে' : মধ্যযৌবনা রোমান্টিক অথচ পতি-অবহেলিত মহিলা; সফ্‌ট্ ফোকাস লেন্সে ধূসর ঘরে বসে পিয়ানোয় তুলছেন দেবুসীর বিষণ্ণ সুর; আর স্বপ্ন দেখছেন : পত্রিকার সচিত্র পাতা থেকে এক-একটি সুন্দর যুবক উঠে এসে ধরা দিচ্ছে ওঁর ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহুডোরে। পরমুহূর্তে অন্য স্বপ্ন, বিকৃত বিরূপ পরিবেশ : স্বামী পিয়ানোর ওপর দমাদ্দম ঘুষি মারছে...সুপ্ খাচ্ছে গপ্‌গপ্ করে ...পিস্তল দিয়ে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছে! যৌবনদৃশ্য খুব ধীরে, স্লো মোশনে; রুক্ষ স্বামীর বীরপণা ত্বরিত দ্রুত মোশনে। একবার এটা, একবার ওটা; একবার এটা—ওটা।

আভাঁ গার্দ চলচ্চিত্র কবিতা-গান-চিত্রকলা-ছন্দ ও যন্ত্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ। গতিশীল দৃশ্যের সমবায়ে এক নতুন শিল্পের স্বাদ দিতে সে চায়। তার কাছে যন্ত্র ও মানুষ, দর্শন ও শ্রবণ স্বজাতি। তার ছবি কখনও পর্দার বুক জুড়ে, কখনও একটি কোণে ছোট্ট আকারে, কখনও ডাইনে, পরক্ষণে বাঁদিকে পরক্ষণে দাক্ষিণে। দৃশ্যের অভিনব সমাবেশে, চিত্রের দুরন্ত স্বভাবে, বিভিন্ন লয়ের গতিতে এক নিজস্ব ছন্দ ও রূপ, একটি বিশিষ্ট চিত্রভাষা সে গড়ে তোলে, যা মন্ময় অথবা বিমূর্ত। পরিচালকের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় এই চিত্রভাষারও আবার নানা ঘরানা, নানা স্টাইল; বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন 'স্কুল'। স্বভাবতই, পূর্ণ দৈর্ঘ্য ফিচার ফিল্‌ম্-এর দেহে এই নিরীক্ষাগুলি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিত্য-নতুন অবরাহিকায় গতিমুখরা প্রাণময়ী ও রূপসী হয়ে ওঠে।

হায়! জীবনহরি জীবন দিলেন!

অজয় বসু

মন্দভাগ্য, জীবনহরি শর্মা! ইস্টার্ন রেল গোল করেছে শুনেই মূর্চ্ছা। শেষ পর্যন্ত সব শেষ! আরও কিছুক্ষণ যদি সবুর সইতো তাহলে হয়তো এতোবড় বিয়োগান্ত ঘটনাটি ঘটতো না। যেহেতু একগোলে পিছিয়ে থাকার পরেও খেলাটিতে ইস্টবেঙ্গলই জিতেছে।

ইস্টবেঙ্গল জীবনহরির শর্মার প্রিয় দল। প্রিয় দলের পিছু হাঁটা। ভাবটি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। না পারারই কথা। তাই বলে জীবন দিতে হবে? জানি না, জীবনহরি শর্মার জীবন নিয়ে আমাদের ফুটবলের কোনো কল্যাণ হবে কিনা! তবে জীবনহরি একটা মর্মান্তিক নজীর হয়ে রইলেন। আর যতো অকর্মের ধাড়ী বলে নিন্দিত হবেন ওই খেলার বেতার ভাষ্যকারেরা। আচ্ছা, জীবনহরিদের মতো দল অনুরাগীদের কথা ভেবে বেতার কর্তৃপক্ষ কি কলকাতার ফুটবলের ধারাবিবরণী প্রচারের ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দিতে পারেন না?

তবে এও জানি না যে ঘোষণার কণ্ঠ থামলেও জীবনহরিরা মানসিক উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তি পাবেন কিনা। ফুটবল থাকলে হারজিত থাকবেই। খেলা খেলা হয়েই থাকবে। তার চেয়ে বেশি কিছুর মর্যাদা খেলাকে দিতে গেলেই বিপদ। এবং সেই বিপদ বরণের করুণ ও চরম পরিণতি হলো জীবনহরির শর্মার জীবনদান। প্রার্থনা করি, এমন দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে। আরও যদি ঘটে তাহলে তার আগে ধারাবিবরণী প্রচারের অনুষ্ঠান, মায় আসল খেলা ফুটবলের পাটও যেন উঠে যায়। খেলার চেয়ে জীবন আরও বড়। তা সে যার জীবনই হোক্ না কেন।

খেলা তো ইস্টবেঙ্গলে আর ইস্টার্ন রেলেতে। কলকাতার মাঠে নতুন কোনো আয়োজন নয়। মানের নিরিখে এ খেলা তুঙ্গেও উঠতে পারে নি। তবু এই খেলা ঘিরেই আমাদের দেশে একটি অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অস্বাভাবিক ও অনন্যসাধারণ ঘটনা। তাই ওই ঘটনার নায়ক, যাকে ভারতবর্ষের ফুটবল খেলার ইতিহাসের এক বিচিত্র করুণ অধ্যায়ের নায়কও বলতে পারা যায়, তাঁরই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমি উপলক্ষ্যটি স্মরণ করছি। নইলে শীল্ড ফাইন্যালের বা ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগানের খেলার মতো অনন্য যে অনুষ্ঠান নয় সেই অনুষ্ঠান অর্থাৎ শীল্ডের সেমিফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল বনাম ইস্টার্ন রেলের খেলার আলোচনায় ঢোকার প্রেরণা পেতাম না।

আকাশে যে বাণী ছড়াতে পারি নি সংক্ষিপ্ত সময় আর দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার চাপে ও টানে তাই আজ উচ্চারণ করছি দলের জন্যে জীবনদাতা জীবনহরির শর্মার ভূমিকা স্মরণে। জীবনহরির জীবনদানে জীবনের পরম শিক্ষা যেন আমরা পাই।

ইস্টার্ন রেল গোল করেছে। শুনেই প্রচণ্ড শকে শিউরে উঠেছিলেন জীবনহরি শর্মা। সত্যিই, গোলই যতো অনিষ্টের মূলে। গোলেই গণ্ডগোল। আবার গোলেই হাসি।

এক গোল হতেই সেদিন মাঠে যতো অপকর্ম জড়ো হতে বসেছিল। মাঠে ইঁট, রেফারীর মুণ্ডপাতের শাসানি, পক্ষবিশেষের উদ্দেশ্যে পক্ষধারীদের চোখা চোখা বিশেষণ প্রয়োগ। সব মিলিয়ে এক অসুস্থ মেজাজ। কিন্তু যেই পরিমল দে গোল করলেন, গোলের পর আবার গোল, অমনি ফুঁসিয়ে ওঠা মেজাজে অট্টহাসির কাঁপন জেগে উঠলো। ফুঁসতে যেমন, হাসতেও তেমনি। এও তো অনুরাগীদের কাণ্ড। জীবনহরি শর্মা এঁদের দলে না ভিড়ে নিজের স্বতন্ত্র পথে হারিয়ে গেলেন কেন।

শেষপর্যন্ত ময়দানের মুখের হাসিটি সাধ্বীর সিঁথির সিঁদুরের মতো অক্ষয় থেকেছে। ভালই হয়েছে। নইলে, কে জানে, আদর্শচ্যুতির নোংরা নজীর দেখে আরও কতো সুস্থ মন মনে মনে শিউরে উঠতো!

খেলা আই এফ এ শীল্ডের সেমিফাইন্যালে। শীল্ড নক আউট প্রতিযোগিতা। ওঠানামা ব্যবস্থাবর্জিত কলকাতা লীগের মতো মেকী প্রতিযোগিতা নয়। শীল্ডে হারজিতের দাম অনেক গুণ বেশি। হারলেই খতম। প্রতিযোগিতা ভূমিতে নিজেদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা যায় না। কাজেই খেলাটির ওপর স্বাভাবিক কারণেই গুরুত্ব এসে পড়েছিল। বলা যায়, খেলাটির গুরুত্ব বেড়েই গিয়েছিল।

বাড়তি গুরুত্বের হেতু, লীগের একটি খেলায় ইস্টার্ন রেলের হাতে লীগ চ্যাম্পিয়নের পরাজয়। একমাত্র পরাজয়। তার ওপর কদিন আগে চার চার দিন লড়াই চালিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইস্টবেঙ্গলকে জিততে হয়েছে। এই ফাঁকে নির্ভরশীল নইম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গুরুকৃপালের পায়ের চোট্ আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দৃশ্যতঃ ইস্টবেঙ্গলের সামনে অবস্থা প্রতিকূল এবং কিছুটা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তাই খেলাটির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু সব সংশয় ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছেন একা পরিমল দে।

পাতলা ফিন্‌ফিনে আকৃতির পরিমল দে'র সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। সূক্ষ্ম কাজে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। বল ধরায় এবং বল ছাড়ায় মোটামুটিভাবে তিনি সিদ্ধকর্ম। ছোট ছোট ড্রিব্লিংয়েও উপযুক্ত। কিন্তু প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহ যখন সুপরিকল্পিত, আটোসাটো, এবং দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ, তখন সেই বাধা ভেদ করে একাই দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো যোগ্যতা পরিমলের আছে, এমন কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা চলে না। ফুটবল যে মুহূর্তে বুদ্ধির খেলা এবং যে খেলায় সূক্ষ্ম কাজের কার্যকারীতা অশেষ সেই লগ্নে পরিমলের গুণপনার শেষ নেই। কিন্তু মস্তিষ্কের ওপর দেহ যখন প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরপক্ষ যখন জেতার আশা ছেড়ে নিজেদের আগলাতে রক্ষণব্যূহকে শক্ত করে সাজিয়ে নেয় অঞ্চল ও মানুষের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, তখন কেন জানি না পরিমলের উপযুক্ততায় কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়। হয়তো দেহগত পুঁজি অপেক্ষাকৃত কম বলেই ব্যক্তিগত ক্রীড়ামানেরও এমন হেরফের ঘটে যায়।

কিন্তু এ হেন পরিমলই সেদিন একাই যেন পুরো দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সেই দায়িত্ব পালনে কতোখানি যোগ্যতার নির্ভেজাল পরিচয়ই না রেখেছিলেন!

একটি সটেই তিনি আসর মাতিয়ে দেন। একটি সটেই একদল জেতার কড়ি সংগ্রহ করে নেয়। একটি সটেই হাজারো মানুষ হারানিধি ফিরে পাওয়ার সান্ত্বনায় আনন্দে ফেটে পড়েন। ইস্টবেঙ্গল খেলেছে পাঁচ মিনিটের বিরাম অন্তে। তবুও যদি বলি ইস্টবেঙ্গলকে জিতিয়েছে পরিমলের ওই ফ্রি কিকটি তাহলেও বোধ করি সত্যের অপলাপ করা হবে না।

দ্বিতীয়ার্ধের সতেরো মিনিটে পরিমল দে'র সেই ফ্রি কিকটি। ফ্রি কিক তো নয়, যেন ইস্টার্ন রেলের মৃত্যুবাণ। গোল লাইন থেকে গজ পঁচিশ-ত্রিশ দূরে বল সাজানোর পর রেলের একদল খেলোয়াড় সারি বেঁধে পাঁচিল তুলে দাঁড়ালেন। তাঁদের অনেক পেছনে রইলেন গোলরক্ষক চিত্ত দাস প্রস্তুত হয়ে। প্রস্তুতিতেই দৃশ্যতঃ ফাঁকি ছিল না। তবু রেলের রক্ষণব্যূহে ফাঁক ছিল কিছু। আর সেই ফাঁকেই লক্ষ্য রেখে বল ছোটালেন পরিমল দে।

বল নয়, যেন ট্রিগার টানার পর ছুটন্ত গুলী। কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখী। সামনের পাঁচিলের মাথা টপকে গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে বলটি যখন জালের বাঁধনে আটকা পড়লো রেল দল যেন তখনই বুঝতে পারলো যে কি ঘটে গেল। তার আগে ছুটন্ত বলের গতিরোধে তাঁদের কেউ নড়ার ফুরসৎ পান নি। যখন নড়ার অবকাশ এলো তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। রেলের কপাল গুঁড়িয়েছে। আর ইস্টবেঙ্গলের কপালে জয়লক্ষ্মীর আশীর্বাদ জ্বলজ্বল করছে।

একটি সটেই পরিমল বাজীমাৎ করে দিলেন। একটি সটেই ইস্টার্ন রেলের বুকে ত্রাসের কাঁপন জাগলো। অনুষ্ঠানকেন্দ্রে জেগে উঠলো আকাশ কাঁপানো সাড়া। সেই সটেই বিপক্ষের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেন পরিমল। তারপর আর খেলা জমেনি। রেল দল যেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার ক্ষমতাটুকু

হারিয়ে ফেলে। প্রতিযোগিতামূলক খেলা উত্তরপর্বে একপেশে অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। তখন যা কিছু খেলেছে ইস্টবেঙ্গলই। খেলা খেলা ভাবের আবেগে ছেলেখেলাও করেছে। আর অনিবার্য পরাজয়কে মেনে নিয়ে ইস্টার্ন রেলও যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষান্তি দেওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করেছে।

একা সঞ্জীব বসু আর কতোদিক সামলাবেন? যতোক্ষণ পেরেছেন একাই ব্যূহরক্ষা করেছেন। রক্ষণভাগের সেরা খেলোয়াড়ের আসনটি সঞ্জীবেরই দিকে বাড়িয়ে দিতে কারুরই আপত্তি হয় নি। কিন্তু একজন স্টপার মানে একটি পুরো দল নয়। তাই আর দশজনের ত্রুটিতে রেলের চাকায় সেদিন শেষপর্যন্ত মরচে ধরেই রইলো। ইঞ্জিন বাষ্পময় হতে পারলো না অনেকের নিষ্ক্রিয়তায়।

অথচ গড়গড়িয়ে চলার কতো না প্রতিশ্রুতিই ছিল। ইস্টার্ন রেল ছকবাঁধা খেলায় অভ্যস্ত। দলগত সংহতির মূল্যে তাঁরা বোঝেন। প্রদীপ ব্যানার্জি, কাজল মুখার্জির মতো খেলোয়াড়ও সেই দলে আছেন। কিন্তু সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা এই যে প্রদীপের চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। আর প্রদীপ শিখাটিও সেদিনে যেন মিনমিনে।

ভাল খেলার হদিশ জাগিয়ে রেল দল ভালভাবেই শুরু করেছিল। প্রথমার্ধে তারাই প্রবলতর পক্ষ। একগোলে অগ্রগামী। মীরকাশেমের আড়াআড়ি সেণ্টারে সময়মতো মাথা দিতে পারলেই এন গাঙ্গুলী রেল দলকে আর এক ধাপ আগে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন। বল দিয়ে নিয়ে তাঁরা খেলছেন। সমঝে বুঝে পথ হাঁটছেন। তখন সত্যিই রেলের চাকা ঢালু পথে নির্বিঘ্নে গড়াচ্ছে। তখন ইস্টবেঙ্গলের সামনে অনেক সমস্যা। শর্মা-সীতেশ-অসীম-পরিমল কেউই সমঝোতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াতে পারছেন না। একেবারে খাপছাড়া অবস্থা। ইস্টবেঙ্গল তখন যেন ভাঙা দল, গোঁজামিলে জোড়াতালি দেওয়া এক ভঙ্গুর কাঠামো।

কিন্তু বিরতির পরই অবস্থা গেল বদলে। সমাজপতি অবসর নিলেন। দলের সমস্যা বাড়ার কথা। কিন্তু রক্ষণভাগের সুনীল ভট্টাচার্যকে সামনে রাখা সত্ত্বেও দলের সঙ্গতি বাড়লো। সমস্যার হলো অবসান! যেন তাঁদের মধ্যে লুকোনো ছিল বর্ধিত মনোবলের পুঁজি। বিশ্রামের পর শুধু সেইটুকু নিয়েই ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা মাঠে ফিরে এলেন। আর সেই মূলধনেই আগের পরাজয়ের শোধ নিলেন, একে একে দু' দু'টি গোল করে। গরেকপাল, নইম ছিলেন না। সমাজপতিও অনুপস্থিত। তবু বাড়তি মনোবলে উজ্জীবিত হতে পেরেছে ইস্টবেঙ্গল, তারা জিতেছে মুক্ততঃ এই প্রেরণাতেই। উঁচু দরের খেলা খেলেছে একথা বলা যায় না, বলতে হয় যে জেতার সংকল্পে জান মান কবুল করতে দলের এগারোজনে একজোট হয়েছেন বিশ্রামান্তে।

এই সংকল্প ও উজ্জীবনই লক্ষ্যে পৌঁছুবার পরম পাথেয়। এমন সংকল্প রেল দলের ছিল না। জিততে হবেই, এই মন্ত্রে ইস্টার্ন রেলের দীক্ষা কোনোদিনই সম্পূর্ণ হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। যতোই খেলুক না কেন, জেতার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত হতে শেখে নি। সে শিক্ষা ইস্টবেঙ্গলের আছে। তাই ইস্টবেঙ্গল সেদিন নানান প্রতিবন্ধকতার বাধা ডিঙিয়ে খেলার মোড় ঘোরাতে পেরেছিল। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে শুধু প্রথাপ্রকরণই সব নয়। মানসিক উজ্জীবনও সাফল্যের চাবিকাঠি। পরিভাষায় যাকে বলে 'Killer instinct' সেটুকু থাকা চাই। সেই সঙ্গতি দিয়ে অনেক ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়া যায়। অনেক সমস্যারও সমাধানও করা চলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেদিনের খেলার দ্বিতীয়পর্বে ইস্টবেঙ্গলের ভূমিকা।

তার মানে এ নয় যে সেদিনের আসরে ক্রীড়া প্রথা প্রকরণের নিরিখে ইস্টবেঙ্গল সত্যিই ভাল খেলেছে। দ্বিতীয়ার্ধে মনোবলের পরিচয় রেখেছে। মেহনতেও ফাঁকি দেয় নি। কিন্তু ভাল খেলা বলতে যা বোঝায়, নিখুঁত নিখাঁজ আক্রমণ গড়ার আর গোল করার সাফল্যেই যার অন্তর্নিহিত অর্থ জড়ানো, সেই খেলা কি ইস্টবেঙ্গল দেখাতে পেরেছে? দল হিসেবে অবশ্যই ইস্টার্ন রেলের চেয়ে উপযুক্ত ছিল। তার বেশি আর কিছুই বলা চলে না।

সত্যি ভাল খেলতে পারলে একটি ফ্রি কিকে জয়ের মূলধন সংগ্রহের জন্যে ইস্টবেঙ্গলকে প্রতীক্ষা করতে হোতো না। ফরোয়ার্ডদের গঠনমূলক চেষ্টার সূত্রেই জয়লক্ষ্মী এগিয়ে আসতেন। কিন্তু সে-পথে বিজয়লক্ষ্মী দলের অনুকূলে আসেন নি! এসেছেন ব্যক্তিবিশেষের অসামান্য নিপুণতার সূত্র ধরে। দ্বিতীয়পর্বের পরিমল ছাড়া ফরোয়ার্ড লাইনের আর কেই বা ভাল খেলেছেন?

অনুপাতে রক্ষণকাজে রামবাহাদুর, শান্ত মিত্র এবং প্রথমার্ধে চন্দন ব্যানার্জির ভূমিকা ছিল অনেক উজ্জ্বল। চন্দন প্রথমার্ধে নইমের অনুপস্থিতি বুঝতে দেন নি। রামবাহাদুর অক্লান্ত পরিশ্রমের জলন্ত প্রতীক। আর শান্ত শুধু জীবন্ত বুদ্ধির পরিচয়েই এক আশ্বাস জাগানো ছবি।

বিশ্বস্ত থঙ্গরাজ অথবা উঠতি গোলরক্ষক রতন ঘোষ, দুজনারই কেউই তাঁদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। গড়ানে মিনমিনে সট থঙ্গরাজের নাগাল গলে গোলে ঢোকার সময় মনে হয়েছে যে এই দীর্ঘকায় খেলোয়াড়টি ঊর্ধ্বাকাশে যতোটা প্রস্তুত, মাটিতে তেমনিই অপ্রস্তুত। তাঁর বেসামাল অবস্থার আরও কারণ খেলার গতিবিধি আন্দাজে দীর্ঘসূত্রতা। আগে বুঝতে পারলে থঙ্গরাজ আরও আগে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে অনায়াসে গড়ানে বলটিকে আঁকড়ে ধরতে পারতেন। কিন্তু পারলেন কই? বোঝার ভুলে তিনি সহজ কাজটি সাধ্যায়ত্ত করতে পারেন নি। যেমন পারেন নি অবিকল একই কারণে রতন ঘোষ প্রথম গোলের পথ রুখতে। দূরে থেকে ধনুকের বাঁকানো পথে বল এসে যদি কোনো গোলরক্ষকের মাথা টপকে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে গলদ কোথায়। গলদ ছিল রতন ঘোষের মানসিক প্রস্তুতিতে এবং সেই ঘাটতি শেষ সময়ে শারীরিক মূলধনেও টান বসিয়েছিল।

থঙ্গরাজ সম্বন্ধে আমার আর একটি কথাঃ তিনি নিজের সামর্থ্যে অধুনা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভরসা রাখতে চাইছেন। আত্মপ্রত্যয় প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই মূলধন। কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা হলে পরের সামর্থ্যকে কি যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়? হয় না। থঙ্গরাজও যেন আজ নিজের কর্মকেই বেশি করে চিনছেন, অন্যদের উপেক্ষা করে। তারই ফলে অকারণে বেশিক্ষণ হাতে বল রাখছেন। আগুয়ান ফরোয়ার্ডদের নাকের ডগায় বল দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই আবার তা টেনে নিয়ে লোক দেখানো তারিফের আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠছেন।

এ কাজে সস্তা হাততালি তিনি পাচ্ছেন বটে কিন্তু পদস্খলন ঘটে গেলে যে মাশুল গুনতে হবে তার ভার কি দলের ঘাড়ে ভূতের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না? আর এই হাততালির মূল্যই বা কতোটুকু? যার হাত নেই শুধু পা দুখানা আছে, নিজের দু পা ও দু' হাত দিয়ে তাকে নাকাল করায় সত্যিকারের বাহাদুরী কিছুই নেই। যুদ্ধ যেখানে সমানে সমানে নয়, সেখানে অন্যপক্ষকে টেক্কা দিতে অনেকেই পারে। যা অনেকে পারে তাই পারাতে ভারতশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক থঙ্গরাজের এতো আগ্রহ কেন?

নজীরটি সুস্থ নয়। শোভন তো নয়ই। কিন্তু ওকথা থাক। মোদ্দা কথা এই যে বিশ্রামান্তে মানসিক উজ্জীবন এবং পরিমল দের ফ্রি কিকের কল্যাণে ওই খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতেছে।

ইস্টবেঙ্গল জিতেছে! ঘোষপাটি জোয়ার যদি ফুরসৎ হোতো জীবনহরির শর্মার!

আগামী নভেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডে মহিলা বিভাগের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতা (১৯৬৬) হবে।

বরদলৈ ফুটবল ট্রফি

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বরদলৈ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতার এরিয়ান্স ক্লাব ২—১ গোলে কলকাতারই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার বরদলৈ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছরের ফাইনালে এরিয়ান্স দল ৩-১ গোলে এই মহমেডান স্পোর্টিং দলকেই পরাজিত করেছিল।

নিখিল ভারত বরদলৈ ফুটবল ট্রফি বিজয়ী এরিয়ান্স ক্লাবের খেলোয়াড়রা

এক দিকের সেমিফাইনালে এরিয়ান্স ২-২ ও ২-১ গোলে দিল্লী সিটি ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল. অপর দিকের সেমিফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং দল ২-২ ও ২-০ গোলে জলন্ধরের লিডার্স ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে এরিয়ান্স দলের সংগে মিলিত হয়।

ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং দল প্রথম গোল দিয়ে বিরতির সময় ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ১৪ মিনিটে এরিয়ান্স দলের বিমান লাহিড়ী গোলটি শোধ দিলে খেলার ফলাফল তখন সমান ১-১ দাঁড়ায়। এর দু মিনিট পর বিমান লাহিড়ীর কাছ থেকে বল পেয়ে অসীম বসু হেড দিয়ে দলের জয়সূচক দ্বিতীয় গোলটি দেন।

প্রফুল্ল সরকার ফুটবল কাপ

পশ্চিম বাংলার ক্রীড়া-সাংবাদিক ক্লাবের পরিচালনায় ১৯৬৬ সালের প্রফুল্ল সরকার স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ এবং আনন্দবাজার পত্রিকা দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুই দলের ফাইনাল খেলাটি অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত থেকে যায়।

ট্রেডস কাপ ফাইনাল

১৯৬৬ সালের ট্রেডস কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১-০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গত বছরের ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে খিদিরপুর স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে ১৪ বার ট্রেডস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছিল। ডালহৌসী (এ সি) ক্লাবের বদান্যতায় ভারতবর্ষের মাটিতে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা— ট্রেডস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় (১৮৮৯)। এই সময়ে এই ট্রেডস কাপই ছিল ভারতবর্ষের বেসরকারী দলের (ইউরোপীয় এবং ভারতীয়) একমাত্র প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ট্রফি। ট্রেডস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরের ফাইনালে জয়ী হয়েছিল ডালহৌসী ক্লাব। ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম ট্রেডস কাপ জয়ী হয় ন্যাশনাল দল ১৯০০ সালে। সর্বপ্রথম উপর্যুপরি তিনবার ট্রেডস কাপ জয়ের রেকর্ড করে মোহনবাগান ক্লাব (১৯০৬—১৯০৮)। এই সাফল্যের দৌলতেই মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদানের ছাড়পত্র পায়। ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শীল্ডের উদ্বোধন বছরে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে যোগদান করেছিল শোভাবাজার দল।

অলিম্পিক ভলিবল

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল ফেডারেশনের এক সভায় স্থির হয়েছে, আগামী ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের মূল ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে ১০টি দেশ এবং মহিলা বিভাগে ৬টি দেশ যোগদান করবে। পুরুষ বিভাগের ১০টি দেশের এই পাঁচটি দেশ ইতিমধ্যেই মেক্সিকো অলিম্পিকের মূল ভলিবল প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে—মেক্সিকো (১৯৬৮ সালের অলিম্পিক গেমসের উদ্যোক্তা হিসাবে), রাশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া (গত টোকিও অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হিসাবে), রুমানিয়া এবং পূর্ব জার্মানী (১৯৬৬ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ ও ৪র্থ স্থান অধিকারী দেশ হিসাবে)। সদ্য-সমাপ্ত ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় চেকোশ্লোভাকিয়া ১ম, রুমানিয়া ২য় রাশিয়া ৩য় এবং পূর্ব জার্মানী ৪র্থ স্থান লাভ করেছিল। গত ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশ হিসাবে রাশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া সরাসরি ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের মূল ভলিবল প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়াতে ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ৪র্থ স্থান অধিকারী দেশ পূর্ব জার্মানী আগামী অলিম্পিকের মূল ভলিবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেছে। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া—এই পাঁচটি অঞ্চলে অয়োজিত প্রাথমিক পর্যায়ের অলিম্পিক ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাঁচটি দেশ প্রতি অঞ্চলের একটি করে) শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোর মূল অলিম্পিক ভলিবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে।

মহিলা বিভাগে ৬টি দেশ এইভাবে যোগদান করবে : মেক্সিকো (উদ্যোক্তা দেশ হিসাবে), রাশিয়া এবং জাপান (টোকিও অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হিসাবে। এবং ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী তিনটি দেশ, আগামী নভেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডে মহিলা বিভাগের ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে।

অল-ইণ্ডিয়া রাগবী ফাইনাল

১৯৬৬ সালের অল-ইণ্ডিয়া এবং সাউথ এশিয়া রাগবী টুর্ণামেন্টের ফাইনালে সিংহল রাগবী ফুটবল ইউনিয়ন ৬-৩ পয়েন্টে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি পাঁচবার ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। গত বছর সিংহল যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। এই নিয়ে সিংহল ১৪ বার ট্রফি পেল।
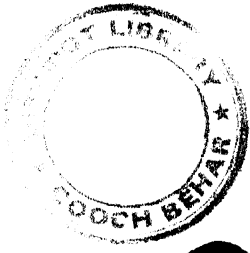
আদুরে গলায় বললাম, 'এখনই এত হায়াই হায়াই ভাব, বিয়ের পর দেখব এরকম টান কত বজায় থাকে।'

'সেই আশংকাতেই বোধহয় লোকটাকে হাতে রাখছ!'

একজন বয়স্ক মান্যব্যক্তিকে কি বিশ্রী-ভাবে উল্লেখ করল। আমি ওকে একটু সচেতন করে দিতে চাইলাম। 'উঁহু, আশংকা নয়, আশা। জানো, ভদ্রলোক সত্যি খুব ভাল আঁকেন। বলেছেন, তোমার আমার একসঙ্গে একটা ছবি এঁকে বিয়েতে প্রেজেন্ট করবেন। তোমায় দেখতে চেয়েছেন। যাবে একদিন আমার সঙ্গে?'

'না।'

প্রত্যাশিত শব্দটা লুফে নিয়েই আমি ফিরিয়ে দিলাম, 'না কেন? দেখবে খুব ভাল লাগবে। জানো, ছোটবেলা থেকে শিল্পীদের সম্বন্ধে কিরকম একটা ধারণা ছিল। যেন, অগোছাল ঘর, এলোমেলো মানুষটা, ঘরভর্তি শুধু ছবি আর ছবি। ওমা, দেখলাম ওসব কিছুই নয়। ঘরটা খুব বড়, প্রায় একটা হলের মত। একদিকে একটা নরম গদীওলা খাট, বসতে বেশ ভাল লাগে। একটা ছোট টেবিল, চেয়ার, একটা বুকশেলফ, তার ওপর সাদা রঙের ফোন। আর একদম ঐদিকে একটা আঁকার বোর্ড, একটা টুল, কিছু রঙ তুলি কাগজ পেন্সিল। দেওয়ালগুলো সাদা ঝকঝক করছে, একটাও ছবি নেই। কিন্তু পাশের ঘরটাতে একবার যেও না। ওরে বাবা! মেঝেতে ছবি, দেওয়ালে ছবি, সিলিঙে ছবি। সত্যি কত ছবি। সত্যি কত ছবিই যে এঁকেছেন ভদ্রলোক। আমি বলেছিলাম ওঁকে, এই ঘরটা দেখলেই মনে হয় আপনি একজন আর্টিস্ট নইলে ওটা তো একটা যে-কোন লোকের ঘর। শুনে উনি হো-হো করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, সর্বনাশ। আপনি কি আমাকে অতিলৌকিক কিছু ভেবেছেন নাকি? আবার হেসেছিলেন। আমি কিন্তু খুব রেগে গিয়েছিলাম। উত্তর দিয়েছিলাম, আমি বলতে চাইছি যে আপনার ঐ ঘরটা দেখলে মনে হয় না—যে আপনার সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য আছে। আমি বা আমার বন্ধুরা যেমন অল্প-বয়সে দু'পাঁচটা কবিতা লিখি, রাত জেগে ফাংশান শুনতে যাই, কিংবা এই আপনার আঁকা ছবি দেখতে এসেছি—তেমনি ছবি আঁকাটা আপনার একটা শখ। কিন্তু এ ঘরে এলে বোঝা যায় ছবি আঁকাটাই আপনার কাজ, আপনার অস্তিত্ব। ...কথাগুলো বেশ ভালই বলেছিলাম কি বল?'

'কী বলছ তুমি, তুমি কী বলছ?' আমার কথাগুলো শরাহত পাখির মত ঝাপটা মেরে উঠল।

আশ্চর্য। পুরন্দরকে অপ্রতিভ দেখাল না, মুখের রেখা একটুও কাঁপল না। বলল, ঠিকই বলছি, আর এও বলছি, ওরা অশোভন কিছু বলেনি। একটা আটচল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের লোক, তার সঙ্গে একটা বাইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে...দিনের পর দিন...অত্যন্ত অত্যন্ত রুচিহীনতা এ সমস্ত।'

মনের গভীরে স্মৃতিরা কলস্বরা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তাদের আস্বাদ চাইলাম না। স্মৃতিরা তো যৌবনকে জ্বালাতে পারে না। আর আমার মধ্যে সেই উত্তাপ কোথায়, যার প্রাখর্যে নিজেকে মেলে ধরা যায়। ওর ব্যক্তিত্বের উষ্ণতাতেই আমি জীবনের সেই কনককুসুম ফোটাতে পেরেছি। স্মৃতির কাঁটায় তাকে ছিঁড়তে দেওয়া যায় কি?

আমার যে হাসি পুরন্দরকে মুগ্ধ করেছিল, সেই হাসি হেসে বললাম, পুরন্দর, তুমি জেলাস।'

ওর জোড়া রোমশ ভ্রু দুটো সামান্য কুঞ্চিত হল। 'আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি শ্রীজাতা, ঐ ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া তুমি ছাড়বে কিনা।'

আমি প্রসঙ্গটাকে এড়াতে চাইলাম।

আমি যেন খুব সহজভাবে গল্প করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ও' কোন উচ্চবাচ্য করল না। আমি আমার বাম বাহু ও কাঁধ দিয়ে ওকে একটু নাড়া দিলাম। বললাম, 'ভদ্রলোক কিন্তু যথেষ্ট মন দিয়েই আমার কথা শুনেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, জানেন আমি কখনোই আমার আগের আঁকা ছবি সামনে রেখে নতুন কিছু আঁকতে চাই না। তাতে সেই একই স্টাইল ঘুরেফিরে আসতে চায়। তবে এটা আর একটা কারণেও হতে পারে। কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আমি খুব বেশী জটিলতার দিকে যাই না। রঙে রেখায় সঙ্গতি রেখে বক্তব্যকে যতটা পারি সরল করেই তুলতে চাই। আর যেখানে সরলতা সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বোধহয় একটা এক-ঘেয়েমির ভাব এসে যায়। ..ভদ্রলোক কেমন অসহায়ের মত মুখ করে কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন। আমার খুব অবাক লেগেছিল। বলেছিলাম, দেখুন ছবি দেখতে আমি খুব ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু বক্তব্য কিছুই বুঝি না। ...আসল ব্যাপার কি জানো, ছবিতেও যে কিছু বলবার থাকে তখন তা জানতামই না। তা সেটা আর ফাঁস করি কি করে! ভদ্রলোক কিন্তু খুব ভাল। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, বেশ তো, আসবেন মাঝে মাঝে। আমার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু সম্ভব বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এভাবেই আলাপ হয়েছিল, তারপর এখন তো প্রায়ই যাই। উনিও আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

স্নেহ শব্দটা স্পষ্টতরভাবে উচ্চারণ করে আমি থামলাম।

প্রতিক্রিয়াটা ঠিক বোধগম্য হল না। হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো করে কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ও বসে আছে। ভ্রূ দুটো আরো সংকুচিত হয়েছে। আরো ওপর দিকে উঠেছে। কয়েকটা লোম যেন চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে। ওর শরীরনিঃসৃত ঘামের একটা গন্ধ আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে চারপাশকে বন্ধ করে ফেলল। আমার ধমনীর মধ্যে থেকে সেই কালো রক্তের পরিচিত স্রোত যেন দুলিয়ে উঠতে লাগল। তার মধ্যে তলিয়ে না যাবার আপ্রাণ চেষ্টায় আমি অস্থির হলাম। পুরন্দর সজোরে আমাকে ঠেলে দিল।

উদভ্রান্তভাবে আমি আবার ওর হাতটা আঁকড়ে ধরলাম, 'পুরন্দর তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়ো না পুরন্দর। আমাকে জানো পুরন্দর আমাকে বোঝো।'

'সব জেনেছি সব বুঝেছি।' দাম্ভিক গলায় প্রায় গর্জন করল পুরন্দর।

'কি জেনেছ, কী বুঝেছ?' আমার সত্তার ভিতর থেকে শব্দগুলো ডুকরে বের হয়ে এল।

'তুমি যা, তোমাকে ঠিক তাই জেনেছি। বুঝেছি সে রক্তের দোষ মানুষ কাটাতে পারে না।'

এক মুহূর্তের জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মূক ও বধির হয়েছিল। পর-মুহূর্তেই সমস্ত শব্দগুলো ছুটে এসে একসঙ্গে আঘাত করল আবেগের আবর্ত-কেন্দ্রে। সেখান থেকে একটা তীব্রতম চেতনা উৎক্ষিপ্ত হল মস্তিষ্কের কোষে কোষে। তার ধাক্কায় আমার সমস্ত শরীর হাঁপাচ্ছিল।

'পুরন্দর!' আমার ডাকটা কঠিন নিঃস্তব্ধতাকে ভেদ করে ঝলসে উঠল। আমি সেটাকে সইয়ে নেবার জন্য আবার ডাকলাম, 'পুরন্দর!'

পুরন্দর আমার দিকে তাকাল।

সূর্যটা দ্রুতগতিতে দিগন্তজোড়া রেল-লাইনের শূন্যতায় নেমে গেল। তরল অন্ধকারে সবুজচোখো একটা শ্বাপদের মুখোমুখি হলাম আমি।

'পুরন্দর, আমি চেয়েছি, আমি যা ঠিক সেইভাবেই তুমি আমাকে জানো।'

ঈষৎ হাওয়া বইছে। কয়েকটা শুকনো পাতা খসখসিয়ে উড়ে পড়ল। আকাশের উত্তর কোণে একটা আয়ত [illegible] তির-তির করে কাঁপছে।

'আমার কর্তব্যবোধ, আমার দায়িত্বজ্ঞান, হৃদয়ধর্ম, রুচি, সংস্কার সবকিছু নিয়ে যে-আমি তাকেই আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলাম। শুধু মাত্র একটা মেয়ে হিসেবেই তুমি আমাকে দেখবে এ আমি ভাবতেও পারি না। সেইজন্যেই আমার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কথা তোমাকে জানিয়েছিলাম, আজ যেমন শোনাচ্ছিলাম সেই মানুষটির কথা যিনি আমাকে বুক-চাপা অশান্তির সংকীর্ণ খাঁচা থেকে খোলা আকাশের আলোয় মুক্তি দিলেন।'

আমার আরো অনেক অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। একটা শাদা মেঘে তাদের রক্তাক্ত করল পুরন্দরঃ 'তাই বুঝি এখন ডালে ডালে গান গেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছ?'

দন্তুর মুখে একটু হাসল ও। তারপরেই একটা জান্তব আর্তনাদে ভেঙে পড়ল, 'কিন্তু আমার সঙ্গে কেন এমন করলে, কেন করলে। তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে বাঁচবো?'

'পুরন্দর শোন, পুরন্দর [illegible]' মায়ের মতন একটা অনুভূতি নিয়ে আমি ওকে ঘিরে ধরতে চাইলাম। [illegible] সঙ্গে বিতৃষ্ণায় জড় হয়ে বসে রইলাম।

[illegible]

রাত আর আমি [illegible] আছি। [illegible] শক্ত হয়ে, [illegible] পাশকে বিক্ষত [illegible] ছিদ্রপথে [illegible] পাখিরা এসে ওকে [illegible]

দ্বিতীয় [illegible] বাড়ী [illegible] আওয়াজ [illegible] আমি একটু সংকুচিত [illegible] কিনা ভাবছিলাম, [illegible] গিয়েছিল। [illegible] নিঃশব্দে হাসছিলেন। ধুতিটা লুঙ্গির মত করে পরা, খালি কাঁধে একটা ডোরাকাটা তোয়ালে ফেলা, চুলের পাশ দিয়ে গলার ভাঁজ দিয়ে [illegible] পড়ছে। বোধহয় স্নান করছিলেন। লজ্জিত হাসি হেসেছিলাম আমিও। বসুন, বলে উনি ভেতরে চলে গিয়েছিলেন।

ঘরটাতে সবুজ ছায়া স্থির হয়েছিল। জানালার ঝিলিমিলি দিয়ে কয়েকটা আলোর রেখা মাছের পিঠের মত চকচক করছিল, ডুবছিল, ভাসছিল। একটা অতল অনুভূতি আমাকে যেন গ্রাস করে ফেলতে চাইছিল। দৌড়ে গিয়ে একটা জানলা হাট করে দিয়ে-ছিলাম আমি।

বাঃ ঘরটাতে অনেক রোদ এনে দিয়েছেন দেখছি।

ওঁর গলা শুনে, ওঁকে দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। ধুতিটা ঠিক করে পরেছেন। একটা সার্ট গায় দিয়েছেন। ভেজা চুলগুলো কপালের ওপর লেপ্টে আছে সেইজন্যেই বোধহয়, কিম্বা কি জানি কেন ওঁর মুখটা কিছুটা বাচ্চাদের মুখের মত লাগছিল।

দেখলেন ছবিটা! চেয়ারটা টেনে বসে-ছিলেন উনি।

এতক্ষণে আমার চোখ পড়েছিল ক্যানভাসটার উপর। শুধু কতকগুলো হলদে আর কাল রঙের ছোপ। উনি তাকিয়ে-ছিলেন আমার দিকে। চোখাচোখি হতে হেসে বলেছিলেন, বুঝতে পারলেন না তো! এদিকে আসুন, এবার দেখুন, কি মনে হচ্ছে?

[illegible] একটা নৌকো। থেমে থেমে বলছিলাম আমি।

আর।

আমি ছবিটার দিকে মনোযোগী হয়েছিলাম।

কি হলো? উনি হেসেছিলেন।

কিছু নেই। আমি অসহায়ের মত ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম।

ঠিকই বলেছেন, কিছু নেই। আমাদের পৃথিবীতে কোথাও কোন সুর নেই, রঙ নেই, রোদ নেই, কিন্তু একটা নৌকা তো আছে।

[illegible] স্বর সমুদ্রের ঢেউ হয়ে আমার চেতনাকে আচ্ছাদিত করেছিল প্লাবিত করে-ছিল। আমার ছোট্ট ঝিনুক বুকে মুক্তোর মত একফোঁটা অনুভূতি জন্ম নিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে আমার বাবা যখন রুটি শক্ত হয়েছে বলে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, আমার মা যখন ফাটা গলায় চেঁচিয়ে বলেছিলেন [illegible] একটু রুটি হলে অত যদি তেজ [illegible] না কর হোটেল-মোটেল [illegible] আমার [illegible] ক্ষুধার্ত চিৎকারে [illegible] কথাগুলো যখন ডুবে গিয়েছিল [illegible] তখনও আমি জানলা বন্ধ করতে ছুটিনি। বরং তারই একটা [illegible] মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। রাস্তার লোক [illegible] ভেতরে চিৎকারের সেই [illegible] শুনে বার বার আমার মুখের দিকে [illegible] পাশের বাড়ীর পর্দাটা নির্লজ্জের [illegible] সরে গিয়েছিল, তবুও আমি সেখান থেকে চলে আসিনি। এক সময় বাবা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, মার বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট ক্ষীণ হয়েছিল, মোড়ের মাথার আড্ডা শেষ করে

দাদা হিন্দী গানের সুরে ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ী ফিরেছিল—একইভাবে জানলার গরাদে মাথা রেখে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হাড়ের মধ্যে একটা যন্ত্রণা আমার জানু থেকে কোমর বেয়ে শিরদাঁড়ায় টনটনিয়ে উঠেছিল। তখনও আমি একাগ্র মনে একটা নৌকো তৈরী করার চেষ্টা করছিলাম।

আর একদিন। আমি ও'র ঘরের আয়নার কাঁচটা মুছতে মুছতে বলেছিলাম, একটা ছবি দেবেন আমাকে?

আয়নার মধ্যে দিয়ে উনি আমাকে দেখেছিলেন। তারপর পাশের ঘর থেকে একটা লম্বা গোল করে মোড়ানো কাগজ এনে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি সেটাকে বিছানার ওপর খুলে ধরেছিলাম। একটা সবুজ উপত্যকা, গাছে গাছে ফুল ধরেছে। গলানো রূপোর মত নদীর জলে সহস্র তারার কুচি এলোমেলো এলোমেলো হাওয়ায় ঝিকিরমিকির। দুধসাদা জ্যোৎস্নার মত পাতলা আলোয় মোড়া নৃত্যরত একজোড়া নারী-পুরুষ। পরস্পরের হাতে হাত রেখে ওরা নাচছে। কয়েকটা রেখার টানে নাচের সেই উদ্দাম গতি, মাটি ছুঁয়ে যাওয়া পায়ের দ্রুত চঞ্চল তাল, আমার মনের গুহায় প্রতিধ্বনি তুলেছিল।

তোমার ভাল লেগেছে।

চকচকে চোখে আমি ও'র দিকে তাকিয়েছিলাম।

উনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ছবিটা আমারও খুব ভাল লাগে। আমি যখন তোমার মত ছোট ছিলাম তখন ওটা এঁকেছিলাম।

আমাকে একেবারে দিয়ে দেবেন? লোভী একটা মেয়ের মত আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

একেবারে। উনি ঠিক আমার অনুকরণে ঘাড় কাৎ করেছিলেন।

আমি হেসেছিলাম।

আচমকা উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নামের মানে জান!

জানি বোধহয়। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম।

কি, যার জন্মে শ্রী আছে, না শ্রীযুক্ত বংশে যে জন্মায়?

হবে ঐ ধরনের একটা কিছু। আমার গলায় কোন ঔৎসুক্য ছিল না।

উনি হেসে বলেছিলেন, এ ছবির নাম দিলাম 'শ্রীজাতার জন্যে।'

আমার মাথাটা কেমন করে উঠেছিল। উনি তো জানেন না আমার জন্মে কোন শ্রী নেই। আমার পরমপূজ্য বংশে আমার অলক্ষ্যে আমার ধমনীতে বাসি কালো রক্ত সঞ্চারিত করেছে—বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অশান্তি আর অসহযোগিতা, হতাশা আর ক্লিষ্টতার অসংখ্য পোকা কিলবিলিয়ে উঠেছে। তারা আমার অস্থি মজ্জা মাংস ফুটোফাটা করে আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতরে, অনেক ভেতরে কি একটা বোধ, ফুল, নদী, তারা, আলো হাওয়া সব মিলিয়ে কি যেন একটা, তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিষাক্ত যন্ত্রণায় আমি ছবিটার কাছ থেকে সরে সরে থেকেছিলাম। ও ছবি শ্রীজাতার জন্যে, ও ছবির কাছে আমি অস্পৃশ্য।

কিন্তু শ্রীজাতা সব মানুষই তো জন্ম নিতে পারে না।

আমি চমকে ওনার দিকে তাকিয়েছিলাম।

উনি বলেছিলেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সেই কার্যকারণে তার কোন ভূমিকা থাকে না। কিন্তু মানুষ যে কোন মুহূর্তে তার পরিবেশের মধ্যে দিয়ে, তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তার বিষাদ বাসনা আহ্লাদের মধ্যে দিয়ে, জন্ম নিতে পারে। আমার শিল্পী-সত্তার জন্মও এভাবে হয়েছিল। আজ আয়নার মধ্যে দিয়ে আমি আমার সেই জন্ম-পূর্ব প্রতিচ্ছবি দেখেছি। তখন তোমার মতই আমার কাঁচ কৌতূহলী একটা মন ছিল। সেই মন আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শ্রীজাতা এখন এ ছবিতে তোমার অধিকার।

একাকার মনে আমি ছবিটাকে গ্রহণ করেছিলাম।

ক্রমশ বাবার চিৎকারে আমার রক্ত আর কুৎসিত ভঙ্গিতে লাফ-ঝাঁপ করত না, মার ফোঁপানিকেও পাত্তা দিত না, আমার রক্তের রং বদলিয়ে গিয়েছিল। তাজা গন্ধওলা গাঢ় লাল রক্ত নদী হয়ে বয়ে যেত, তারা হয়ে ঝলমলাত। হাওয়ায় হাওয়ায় সুরের তরঙ্গ ছড়াত, আলো হয়ে জ্বলত।

একদিন উনি বলেছিলেন, শ্রীজাতা, তুমি প্রেম করেছ!

আমি অবাক হয়েছিলাম, লজ্জা পেয়েছিলাম।

উনি হেসে বলেছিলেন, প্রেম করো, প্রেম করো, প্রেম জীবনকে পূর্ণতা দেয়।

তখন তোমার সঙ্গে আমার মাত্র দেখা হয়েছে পুরন্দর। তবুও কেমন করে যেন তোমার কথাই আমার মনে পড়েছিল।

তারপর। আমি এক ছিলাম, দুই হলাম।

একদিন পুরন্দর, তুমি আর আমি চুপচাপ লাইব্রেরীতে বসেছিলাম। সেবার কলকাতাতে অসময় বৃষ্টি পড়েছিল। প্রচুর বৃষ্টি। লাইব্রেরীতে বিশেষ কেউ ছিল না। বিরাট রিডিং রুমটার মাঝখানে আমরা বসেছিলাম, আমাদের সামনে কয়েকটা বই খোলা ছিল। মাথার ওপর অনেক ওয়াটের একটা বাল্‌ব। জানলায় কাঁচে একঘেয়ে শব্দ ধরেছিল। তোমার ভেতর থেকে একটা উষ্ণতা আমি অনুভব করেছিলাম। আগের দিন তুমি বলেছিলে, শ্রীজাতা, আমিই কি চিরকাল বলে যাব আর তুমি চুপ করে শুনবে। আমি বিষণ্ণ হেসেছিলাম। তুমি বলেছিলে, কিসের যেন একটা সংকোচ ঠিক সংকোচও নয় কমপ্লেক্সে তুমি সর্বকিছু এড়িয়ে যাও। কেন? আমাকে বলতে বাধা আছে? আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। তারপর কখন যেন এক সময় বলে উঠেছিলাম, জানো পুরন্দর, আমার বাবা ভাবেন মাকে বিয়ে করা তাঁর জীবনের একটা ব্লান্ডার, আর মা ভাবেন বাবার হাতে পড়ে তিনি বাঁচার অর্থ হারিয়ে ফেলেছেন।

কেন। সাশ্চর্যে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে।

কে জানে। আমার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে পড়েছিল। আবার আমরা চুপ করে বসেছিলাম।

শেষে আমিই আবার বলেছিলাম, অথচ আমার বাবা একজন পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান, মাও ভদ্রমহিলা। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী কারুর সঙ্গে ব্যবহারে ও'দের এতটুকুও

খ্ুঁত নেই। আমাদের সংসারে কোন আর্থিক অসুবিধে নেই—। আমি আর কথা খ্ুঁজে পাইনি।

তুমি বলতে চাও যে পরস্পরের সম্পর্কটুকু বাদ দিলে ও'রা দুজনেই আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক সুখী মানুষ।

আমি ঘাড় নেড়েছিলাম। বলেছিলাম, কিন্তু ও'দের ঐ সম্পর্কটুকু বাদ দিলে আমাদের অস্তিত্বও যে মিথ্যে হয়ে যায়। আর তাই গেছেও। একথা বলছি না যে ও'রা আমাদের প্রতি কোন কর্তব্য করেননি। আসলে কি জানো, মনের দিক থেকে আমরা কখনো কোনরকম সিকিওরিটি পাইনি। এখন না হয় আমি বড় হয়েছি, বাইরের জগতে নিজের অবলম্বন খ্ুঁজে পেয়েছি। কিন্তু যখন আমি এইটুকুনি একটা মেয়ে ছিলাম, মা-বাবা ছাড়া আর কোন আশ্রয় ছিল না, তখনোও তাঁদের নিয়ে মনে কোন রকম আদর্শ বা কল্পনা গড়ে তোলার অবকাশ পাইনি। মাঝে মাঝে ভাবি, অরফ্যানরাও বোধহয় এরচেয়ে ভাল থাকে, তারা তো জানে যে তাদের কেউ নেই।

তুমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছ শ্রী।

পুরন্দরের কোমল গলার সান্ত্বনা আমার আবেগকে আরো উত্তেজিত করেছিল। বলে উঠেছিলাম, তুমি কি বুঝবে পুরন্দর। তুমি তো সেই চিৎকার, সেই কান্না, সেই কথা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখনি। ছোট ভাই-বোনরা যখন সাদা মুখ করে কাছে এসে দাঁড়ায়—তখন যে কি অসহ্য মনে হয়। আগে-আগে অনেক চেষ্টা করেছি থামাতে, আর থামাতে না পেরে নিজেই এত বিশ্রী চিৎকার করেছি। আজেবাজে কথা বলেছি যে পরে নিজেরই কান্না পেয়েছে। অথচ এসবের কোন একটা নির্দিষ্ট কারণও আমি খ্ুঁজে পাইনি। মাঝে মাঝে এমন সব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ হয় যে তার পরিণতি কী করে ঐ রকম তুলকালাম কাণ্ডে পৌঁছায়—তা এখনও অনেক সময় আঁচ করতে পারি না।

তুমি টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলেছিলে, আমার মনে হয় ও'দের মানসিকতায় কোন বিরোধ আছে। সংঘাত তো আসে তখনই যখন আমরা আমাদের মনের সঙ্গে অপর মনকে মেলাতে পারি না। আর মানুষের মন এত জটিল, এত বিচিত্র যে সবার পক্ষে সব মনকে পুরোপুরি বুঝতে পারা কখনেই সম্ভব নয়। অ্যাণ্ড সো উই অট টু বি মোর টলারেন্ট, মোর ব্রড-মাইণ্ডেড। আদার-ওয়াইজ লাইফ ইজ ইমপসিবল।

ও থেমেছিল। আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ও'ও তাকিয়েছিল।

এক সময় বৃষ্টি থেমেছিল। মাটির গন্ধ নিয়ে ভিজে বাতাস বয়েছিল। কালো আকাশের এক্ফাঁক দিয়ে তামা রঙের খানিকটা চাঁদ। অবশেষে সেই নৌকোটা প্রেমের বন্দরে নোঙর করেছিল।...

রাত নড়েচড়ে উঠল। তারপর ধূসর চাদরে নিজেকে ঢেকে পেছন ফিরল। নিঃসঙ্গ অবসাদে আমি চোখ বুজলাম। বুকের গভীরে সেই সোনার ফুলের পাপড়িগুলো তখনও আমার হৃৎপিণ্ডকে সমানভাবে বিঁধে চলছিল।

কি হয়েছে তোমার। এটাসেটা গল্প করতে করতে হঠাৎ উনি প্রশ্ন করলেন। কী বলব? পুরন্দর আপনাকে অপমান করেছে। যে—আপনি আমাকে একটা নৌকার সন্ধান দিয়েছিলেন, শুনিয়েছিলেন ভূমিষ্ঠ হওয়াটাই সব নয়, মানুষ যে কোন মুহূর্তে তার পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তার বিষাদ-বাসনা আহ্লাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিতে পারে, বলেছিলেন প্রেম জীবনকে পূর্ণতা দেয়, সেই আপনার সম্বন্ধে পুরন্দর অত্যন্ত অরুচিকর, অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছে—বলব কী করে একথা?

কি হল। কথা বলছ না কেন?

কিছু তো হয়নি।

উনি হাসলেন। আমি ও'র হাসির একটা উপমা খ্ুঁজে পেলাম। ও'র হাসিটাকে মনে হল মায়ের হাসি। যে হাসি আমার মাকে আমি কোনদিনও হাসতে দেখিনি, কিন্তু জন্মেরও আগে থেকে তাঁর যে হাসি আমার বোধের ভেতরে কাঙ্ক্ষিত ছিল—সেই হাসি হেসে উনি বললেন, উঁহু কিছু একটা হয়েছে।

কি হয়েছে আমার। ভাবতে চাইলাম আমি। পুরন্দর আমাকে অবিশ্বাস করেছে। আমি ও'র কাছে নিজেকে উন্মোচিত করেছিলাম, ও তার নগ্নতাটুকু নিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করেছে, তার মধ্যে যে সমর্পণের সৌন্দর্য ছিল তাকে বুঝতে চায়নি। পুরন্দর আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। বাক্তিব বিভিন্ন মানসিকতা স্বীকার করে নিয়েই ও বলেছিল পরস্পরকে বোঝার মত ঔদার্য থাকলে এমন কোন সংঘাত বাধে না যাতে পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ওর গলার স্বরে শুধু বিশ্লেষণের চেষ্টাই ছিল না, আরো অনেক কিছু ছিল।

পুরন্দরের সঙ্গে ঝগড়া করেছ।

আমি মাথা নিচু করে রইলাম। উনি ধীর পায় উঠে এসে আমার মাথায় একখানা হাত রাখলেন। চৈতন্যের শিকড়ে বিন্দু বিন্দু রস নিঃসৃত হতে লাগল। আমার ভেতরে সেই সোনার ফুলের পাপড়িগুলো সুকোমল অনুভূতিতে কেঁপে উঠল।

ও চলে গেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় আমি উত্তর দিলাম।

চলে গেছে? কোথায়? ও'কে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। ও'র বিস্মিত স্বর ভেসে এল।

পাড়ার ছেলেরা ওকে কি সব যেন বলেছে। আমি থামলাম। আমি জানি কি বলেছে কিন্তু আমি অবোধ না সেজে পারলাম না। কোনও মতে থেমে-থেমে বলে গেলাম, ও আমাকে আপনার কা আসতে বারণ করেছিল, তারপর রাগ ক চলে গেছে।

এই ব্যাপার। উনি হো-হো ক হাসলেন। বলতে লাগলেন,

There is no fool
like a young fool
with a young heart
with a heart in love.

হাসতে হাসতেই উনি কবিতাটা ব গেলেন। এই ব্যাপার? আচ্ছা কাল সময়, এই সময় নয়, বিকেলের দিকে তু এস। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে, কোম উনি আমার পিঠটা ও'র বিরাট হাত দি বেষ্টন করলেন। আমি শিউরে উঠলাম।

পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমি নিজে ভেতরে কয়েকটা অপরিচিত ইচ্ছেকে অ ভব করলাম। ক্রমশ ইচ্ছেগুলো জোয়া ঢেউ হয়ে আমার প্রতিটি রোমকূপে ক গর্জনে আঘাত হানতে লাগল। ভেঙে পড়া তরঙ্গের কোলাহল শুনে শুনতে আমার দিন কাটল, রাত কাট বিকেল গড়িয়ে এল।

ও'র ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। পদ ফাঁক দিয়ে আমি পুরন্দরের বসব ভঙ্গিটা দেখতে পেলাম। আমার পা দু ওখানেই থেমে পড়ল। ও'র গলা শুনে পেলাম।

ইয়ংম্যান, তোমার কাছ থেকে পেতে পারে আমার কি সাধ্য আছে ওকে দেবার?

ও আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে।

স্বাভাবিক। আমি ওর চেয়ে বয় বড়। আঁকার জন্যে একটু নামটামও হয়েছে বিশেষ ওরও যখন এদিকে ঝোঁক আ শ্রদ্ধাটা তো আমার পাওয়াই উচিত। কি সেটাতেই কি তোমার অপত্তি।

পুরন্দরের কোন কথা শোনা গেল ন

বি ফ্র্যাঙ্ক ইয়ংম্যান। আমি জা তোমাদের বয়সেই সবচেয়ে নিষ্ঠুর হও যায়, আবার সবচেয়ে উদারও এই বয়সে হওয়া সম্ভব। তোমার যা বলার স্বচ্ছন্ বল।

আমার ব্যবহার যদিও অন্য কথা বল তবু সেদিন ঠিক শ্রীজাতার কথা ভে আমি আপত্তিটা তুলিনি।

আমিও তা জানি পুরন্দর। পর্দার পারে দাঁড়িয়ে মনে মনে আমি বলল আসলে সব পুরুষই চায় মেয়েদের দেহ-মন ডিক্টেটর হতে। তুমি তোমার পড়াশোনা ক অতিমার্জিত, সুসংযত বোধ্যা মনে অ আমিত্বটুকু নিয়েই তৃপ্ত ছিলে। অভঙ্গিত অহংকারে সেদিনই প্রথম ফাট ধরেছিল। তাই তুমি তোমার প্রেম অমর্যাদা করেছিলে। এ ভালই হয়ে পুরন্দর। এতদিন তোমার স্বাতন্ত্রে প্রখরতায় চোখ আমার ধাঁধিয়েছিল। বা হয়েছিলাম একটা রঙিন চশমার মধ্যে দি তোমায় দেখতে। এ হীনমন্যতার শিক খোয়া যদি কিছু গিয়ে থাকে তা সে রঙিন চশমাটা। ভালই হয়েছে। প্রেমে একনিষ্ঠতায় যে কোনরকম শাসনে প্রয়োজন নেই, কোন মোহের আড়াল

সেখানে চলে না—তা প্রমাণ হয়ে গেল। নিজের মনে মনেই পুরন্দরের সঙ্গে কথা বলে চলেছিলাম আমি। শিল্পীর ভারী গলার আওয়াজ কানে আসতে চমক ভাঙল।

সেই কথাই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম। তোমার মতো আমিও একদিন যুবক ছিলাম। কিন্তু সে মন তো আমি অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। তুমি আমার মনকে দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পারছো না সে কি চায়। কিন্তু তুমি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছ। রগের দুপাশে ছোপ ধরেছে, চোখের কোন জ্যোতি নেই, চামড়া শিথিল হয়েছে। এই দেহে তোমার মনের উত্তাপ আমি কি করে পাব। শ্রীজাতাকে আমি অভিজ্ঞতা দিতে পারি, স্নেহ করতে পারি, তোমার ধারণা অনুসারে কামনাও করতে পারি, কিন্তু তুমি তো এইমাত্র বলেছ, শ্রীজাতার দিক থেকে তোমার কোন আপত্তি নেই। অর্থাৎ শ্রীজাতাকে তুমি বিশ্বাস কর। আর তুমি নিশ্চয় এও বিশ্বাস কর যে শ্রীজাতা আমার দিক থেকে সে ধরনের কোন কিছু আঁচ পেলে তোমার বলার বহু আগেই আমার বাড়ী আসা বন্ধ করত।... অবশ্য এত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে না গিয়ে তুমি যদি গোঁয়ারের মতন আমাকে রাই-ভালই ভেবে নাও সেটা আমার ডিসক্রেডিট নয়। উনি ঘর ফাটিয়ে হাসলেন। পুরন্দরও বোধহয় যোগ দিল।

কি জান পুরন্দর, আবার বলতে আরম্ভ করলেন উনি, পুরুষের প্রেম কোন-কিছুর সঙ্গেই শেয়ার করতে চায় না। এ বিষয় মেয়েরা যথেষ্ট আধুনিক হতে পেরেছে, কিন্তু পুরুষ সেই আদিম যুগের মতই আজো সমান স্বার্থপর, বর্বর, হিংস্র।

সেদিন কি আমি এতটাই পুরুষোচিত গুণের পরিচয় দিয়ে ফেলেছিলাম। পুরন্দর ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে কৌতুক করল। বলল, শ্রীজাতাও কিন্তু আপনার কাছে নালিশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট আধুনিকা হতে পারেনি, বেশ রং চড়িয়েছে।

উনি হাসলেন। না-না, শ্রীজাতা আমায় এসব কিছু বলেনি। আমি অনুমান করেছি মাত্র।

লোক তো আপনি খুব সুবিধের নন দেখছি, এমন ভয়ংকর রকম অনুমান করে ফেলেন। পুরন্দর বলে উঠল।

একদমই নই। দেখছ না, কথার জাল ফেলে তোমার অভিযোগগুলোকে কেমন গুটিয়ে নিয়ে গন্ডগোল করে দিয়েছি। তুমি তো আসল পয়েন্টেই আসতে পারনি। সব সময়েই কি একজনের নেওয়াটা অপরের দেওয়ার ওপর নির্ভর করে।

না, লুট করেও নেওয়া যায়। পুরন্দর চটপট উত্তর দিল।

উনি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, তোমাদের এই দেওয়া-নেওয়ার দোকানদারীর বাইরেও আরো এক ধরনের পাওয়া আছে। নিজেরও অজান্তে কোন এক বিশেষ আবহাওয়ায়, বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ মানসিকতায় বিশেষ পাত্র বা পাত্রীর কাছ থেকে কখন কেমন করে যে এই পাওয়াটা হয়ে যায় তা কেউই বলতে পারে না। যে পায় সে পাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও জানত না যে এরজন্য তার ভেতরে কতখানি অভাববোধ ছিল। যে পাইয়ে দেয় সেও হয়তো এই 'বিশেষ' অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে না এলে চিরকালই নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে অচেতনই থাকত।

উনি যথেষ্ট হাল্কাভাবেই বলতে চাইছিলেন, কিন্তু কথাগুলো নিজের ভারেই মূর্চ্ছিতের মত একটা পরিবেশ রচনা করল। বারান্দায় দাঁড়িয়েও, আমি পুরন্দরের এই সময়ের মুখটা কল্পনা করতে পারলাম। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে চোখের দৃষ্টি একাগ্র হয়েছে, ভুরুর ওপরে লম্বা-লম্বি ছোট করে দুটো ভাঁজ।

সেই মুখের দিকে চোখ পড়াতেই বোধহয় উনি বললেন, ঠিক পরিষ্কার হোল না, না? তারপর আমাকে যেমন করে বললেন, শোন এদিকে এস। এই ছবিটা দেখ।

আগের দিন আমি বোধহয় এই ছবিটাই দেখেছিলাম, জ্যামিতিক একটা গঠন। অনেকটা এরোপ্লেনের মত।

একটা ত্রিভুজ। পুরন্দরের গলা ভেসে এল।

শ্রীজাতা কাল এটা দেখে বলেছিল একটা এরোপ্লেন। উনি থামলেন। আর আমি বলছি এটা একটা পাখি। উনি আবার থামলেন। তারপর বললেন, তাহলে কি হল? তুমি এই রেখাগুলোর বাইরে আর কিছুই দেখতে পেলে না, আর একজন এটার মধ্যে থেকে একটা গতি-ময়তা আবিষ্কার করেছে। আর আমি সেই গতিময়তাকে সুর দিতে পেরেছি, ছন্দ দিতে পেরেছি। অথচ কারুর দেখাই তো মিথ্যে নয়।

কিন্তু সত্যের মধ্যেও তো কমবেশী আছে।

কী করে বুঝলে? তুমিও ত্রিভুজ বলে একথা ভাবনি যে তোমার আরো কিছু বলার আছে। শ্রীজাতাও এরোপ্লেন বলার সময় মনে করেনি যে এটাকে পাখি বলা যায়। মানে তোমাদের দুজনের অনুভূতিই তোমাদের দুজনের কাছে সমান সত্যি ছিল। আর আমি এটাকে সৃষ্টি করেছি বলেই যে আমার অনুভূতিটা একমাত্র সত্য, তারই বা প্রমাণ কোথায়?

আপনি কি বলতে চান যে দর্শকের সংখ্যানুসারে আপনার ছবির ব্যাখ্যা হবে?

অনেকটা তাই। তবে শেষপর্যন্ত হয়ত একটা ব্যাখ্যাই অধিকাংশ দর্শক মেনে নেবেন। কারণ দেখ। এর পর যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে এটা কী, তুমি নিশ্চয় আর ত্রিভুজ কি এরোপ্লেন বলবে না, পাখি বলবে। কেন বলবে? আমি এটা এঁকেছি এবং এটাকে পাখি বলেছি, তাই। বলবে, কেননা পাখি বলতে তোমার বেশী ভাল লাগবে।

বোধহয়। পুরন্দর দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সমর্থন জানাল।

যাকগে। আমরা তো আর আর্টের আলোচনা করতে বসিনি। আমাদের বক্তব্য ছিল এই যে শিল্প মানুষকে অনেককিছু দিতে পারে। জীবনটাও এক মহান শিল্প-কর্ম। বিভিন্ন মানসিকতা একই মনের ভেতর থেকে বিচিত্র রস গ্রহণ করতে পারে। তুমি আর শ্রীজাতা পারস্পরিক মন দেওয়া নেওয়ায় ভালবেসেছে, ভালবাসায় তোমাদের মুক্তিস্নান হোক। কিন্তু আর কেউ যদি ঐ হাসিখুশী মুখের হিজিবিজি প্রশ্নকরা ছোট্ট মেয়েটার মধ্যে জীবনের কোন শান্তি খুঁজে পায়, তাতে কি তুমি রাগ করবে? যদি আমার সঙ্গে শ্রীজাতার দেখা না হ'ত, তাহলে আমি থেকে যেতাম একটা নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় লোক। রঙ তুলিকেই জীবন ভেবে একদিন অন্য সমস্ত আস্বাদ আঘ্রাণকে উপেক্ষা করেছিলাম। আর এখন যখন সেই জীবন জীবিকা হয়ে অক্টোপাসের মত আমাকে শুষে নিচ্ছে, নির্মম নির্বোধ প্রতিযোগিতায় সৃষ্টির আনন্দ তিলে তিলে মরে যাচ্ছে, ঐ মেয়েটির কাছে যা পাচ্ছি তুমি বা অন্য কেউ কি তা পেতে পারতে?

আমি অভিভূত হয়ে শুনছিলাম। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আর আমি শুনতে পাচ্ছি না। উনি যেন শব্দের তুলি দিয়ে একটা বিমূর্ত ছবিকেই এঁকে যাচ্ছেন।

এক সময় পর্দাটা নড়ে উঠল। পুরন্দর পর্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি দৌড়ে নীচে নেমে এলাম। রাস্তা দিয়ে দ্রুতনিঃশ্বাসে হাঁটতে লাগলাম। পুরন্দর আমাকে ধরে ফেলল। আমার তালে তাল মেলাল। আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে চাইলাম। আর তাকাতে গিয়েই কি একটা মনে হ'ল। নৌকো-নদী-ফুল-আলো-হাওয়া-হাতেহাত নাচ, সেই আশাআশ্বাস—ছলছলতা—ফেনিল সুরভি—উজ্জ্বল ফুল্লতা—বেদনা—আনন্দ রূপ পেল, অবয়ব নিল।

উনি আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন, আমার বুকের ভেতর সেই সোনার ফুলের পাপড়ি প্রাণ পেল। উনি আমার দেহকে বেষ্টন করেছিলেন, আমি আমার রক্তে সমুদ্রের গান শুনলাম। এইমাত্র উনি কি যেন বললেন, বিভিন্ন মন একই মনের কাছ থেকে বিচিত্র আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু একথা তো বলে দিলেন না, এক মন দুই বা ততোধিক মনের কাছে একই রস পরিবেশন করতে পারে কিনা।

শ্রীজাতা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ? পুরন্দর ওর আঙুলগুলো দিয়ে আমার আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরল।

আশ্চর্য, আমার ভেতরে সেই সোনার ফুলের পাপড়িগুলো একটুও সঙ্কুচিত হল না। একটুও বিবর্ণ হল না।

শ্রীজাতা, শ্রী, পুরন্দর ঠিক আগের মত নাম ধরে আমায় আদর করল। আশ্চর্য, আশ্চর্য! ওর ডাকে আজো আমার সমস্ত দেহমন আবেশাতুর হয়ে উঠল। আমার বুকের ভেতর সেই সোনার ফুল কেবলি অজস্র দল মেলে মেলে আমাকে যেন ঢেকে ফেলতে চাইল। অথচ এই রমণীয় অনুভূতির মাঝেও একটা অসহায় ক্ষোভ—এই সোনার অঞ্জলি কেন শুধুমাত্র আমাদের দুজনকে ঘিরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে না—কেন সেখানে অন্য মনেরও সৌরভ? অথচ কে না জানে সোনায় খাদ থাকে।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক কে?

(খ) এশিয়া মহাদেশে কে প্রথম বিজ্ঞানে কলিঙ্গ পুরস্কার পান।

(গ) মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা ও নাগাভূমির রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি?

বিনীত
শিখু ও স্বপ্না দাস
জোরহাট

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) রিসার্চ ডিজাইন ও স্টান্ডার্ড অর্গানাইজেশনের ডিরেকটর জেনারেল এবং মাদ্রাজের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরীর জেনারেল ম্যানেজার ও চীফ মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার কে?

(খ) আফগানিস্থান, মাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন, সুদান, বুটেন, ভেনিজুয়েলা, জাম্বিয়া, ইরান, চন্দ ও গাবোনের রাষ্ট্রপ্রধানের নাম কি?

(গ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সিনেমা হল কোনটি?

বিনীত
বাবলু দাশ ও বাচ্চু
আসাম

●

সবিনয় নিবেদন,

এপর্যন্ত মারডেকা ফুটবলে চ্যাম্পিয়নশীপ সম্মান অর্জন করেছেন কোন কোন দল?

বিনীত
সুশান্ত বসু ও রূপময় রায়
বাঁকুড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার কাদের দেওয়া হয়। পুরস্কারের নগদমূল্য কত এবং কত সালে এর প্রবর্তন ঘটে?

(খ) বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের নাম (বর্তমান) জানতে চাই।

(গ) পৃথিবীর কোন দেশে সর্বপ্রথম সভ্যতার উল্লেখ ঘটে?

বিনীত
শিখা, শুক্লা, পার্থ রায়
দুর্গাপুর

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) অতীত দিনের খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল, সামাদ, সুনীল ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, দুলাল গুহঠাকুরতা, ভেঙ্কটেশ, সত্তার, ধনরাজ ও আমেদ কোন্ ক্লাবে খেলতেন? এঁরা কে কোন্ পজিসনের খেলোয়াড়? গোলদাতা হিসেবে এঁদের মধ্যে কীর্তিমান কে?

(খ) বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ এগারজন খেলোয়াড় কে কে?

(গ) ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সবচেয়ে পুরোন খেলোয়াড় কে কে এবং অলিম্পিকখ্যাত কে কে?

(ঘ) চকোলেট কিভাবে প্রস্তুত হয়?

বিনীত
হিমাদ্রি সেনগুপ্ত
কামরূপ

●

উত্তর

সবিনয় নিবেদন,

১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত পার্থসারথী দাশগুপ্তের খ প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল শুরু হয় ১৯৫৩ সালে—ভারতীয় বিমান পথের জাতীয়করণের পরে।

বিনীত
তপন দাশগুপ্ত
আগড়পাড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

১৪শ সংখ্যার প্রকাশিত শিখা ও রমা দাশগুপ্তের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, সিরিয়া, বেলজিয়াম ও ইয়েমেনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের নাম যথাক্রমে এ-এস মেটা, কে, বি, লাল এবং এস-এন হাকসার। (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, লোকসভার ডেপুটি স্পীকার হলেন এস-ভি কৃষ্ণমূর্তি রাও এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হলেন শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা।

(ঙ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লেবানন, আইভরি কোস্ট, বুরুন্ডি, নাইজেরিয়া, সিংহল এবং নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন যথাক্রমে গুয়েন কাও কি, রসিদ কারামী, আলদো মোয়ো, লিওপোল্ড বিহা, স্যার আবুবকর টি, বালেওয়া, ডাডলে সেনানায়ক এবং ডঃ জোসেফ কালস।

বিনীত
ঝর্ণা ঘোষ
হাওড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত দীপ্তেন্দু পট্টনায়কের 'ক' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বি-ও-এ-সি সম্পূর্ণ কথাটি হল ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন।

বিনীত
অমিতাভ সেনগুপ্ত,
কলকাতা—১৯।

●

সবিনয় নিবেদন,

১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরঞ্জিত গুহের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,—

(ক) ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে, (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে)। এর ফলাফল—ভারতের জয়—০, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়—১০, খেলা অমীমাংসিত—১০।

(খ) রোহন কান্হাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বাধিক রান করেন — ২৫৯ নট আউট এবং ভারতের হয়ে পলি উমরিগড় — ১৭২ নট আউট।

বিনীত
কিশলয় চক্রবর্তী
কলকাতা —[illegible]

●

সবিনয় নিবেদন,

১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত কেকা রায় নির্মল রায়চৌধুরী, প্রবোধ ও সুলেখ স্যান্যালের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,—

(ক) 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক রাশিয়ার লেভ্ ইয়াসিন।

(খ) প্রথম সাইকেল আবিষ্কার করেন স্কটল্যান্ডের ম্যাকমিলন ১৮৪২ সালে, এবং পরে ১৮৫৫ সালে ফ্রান্সের মিশা।

(গ) এইচ-এম-টি পুরো কথাটি হিন্দুস্থান মেসিন টুলস।

বিনীত
কিশোর চক্রবর্তী
কলকাতা —[illegible]

●

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত'র ১৬শ সংখ্যায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শুভেন্দু মজুমদারের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে ১৯০১ সালে ক্যালকাটা এফ, সি, ডালহৌসীকে ৬—০ গোলে পরাজিত করে আই এফ, এ শীল্ড বিজয়ী হয় এবং ১৯৬[illegible] সালে শীল্ডের সেমিফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গৌহাটির মহারাণা ক্লাবকে ৮—০ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে উন্নীত হয়। আই, এফ, এ শীল্ডের ইতিহাসে আর কোন ফাইন্যাল ও সেমিফাইন্যাল খেলা এত অধিক গোলের ব্যবধানে মীমাংসিত হয় নি।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত কমলেন্দু ঘোষালের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, [illegible] বছর মোহনবাগান দল লীগের খেলায় মোট ৮৯টি গোল করে দলগত সর্বাধিক গোল দানের রেকর্ড করে। এ বিষয়ে পূর্বে রেকর্ড ছিল ইস্টবেঙ্গলের। ১৯৪৯ সালে লীগের খেলায় ৭৭টি গোল করে তারা এই রেকর্ড করেছিল।

প্রথম ডিভিশন লীগে ব্যক্তিগত সর্বাধিক গোল-দাতা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড বি, নায়ার। ১৯৪৬ সালে মাত্র ১৭টি খেলায় যোগ দিয়ে ৩৫টি গোল করে তিনি এই রেকর্ড করেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আই-এফ-এ লীগে ১০-১ গোলে ক্যালকাটা গ্যারিসন দলকে পরাজিত করে। এটা দলীয় রেকর্ড সংখ্যক গোল।

বিনীত
জয়ন্ত হালদার
নরেন্দ্রনগর, কলিকাতা-৫[illegible]

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

১৯৬৬ সালের 'শান্তির জন্য পরমাণু' পুরস্কার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণুশক্তি কমিশন ১৯৬৬ সালের এনরিকো ফের্মি 'শান্তির জন্য পরমাণু' (অ্যাটম ফর পিস) পুরস্কার প্রদান করেছেন প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যাপক অটো হান, অধ্যাপক ফ্রিজ স্ট্রাসমান এবং অধ্যাপিকা লিজে মাইটনারকে যৌথভাবে। প্রখ্যাত ইতালীয় পরমাণু-বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির স্মৃতিতে প্রতি বছর বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে অধ্যাপক ফের্মি সেখানকার বিজ্ঞানীদের সহযোগে নিয়ন্ত্রিত পরমাণু-শৃংখলক্রিয়া (চেন রিঅ্যাকশন) সম্পাদনে সর্বপ্রথম সমর্থ হন এবং সেদিন থেকে পরমাণুশক্তির স্বর্ণদ্বার মানুষের কাছে খুলে যায়। এই পুরস্কারের পরিমাণ ৫০ হাজার ডলার এবং একটি স্বর্ণপদক। বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানী নীলস বোরকে এই পুরস্কার সর্বপ্রথম প্রদান করা হয়। এ বছর পুরস্কারের পরিমাণ তিন বিজ্ঞানীকে সমভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। বিশ্বের মধ্যে অধ্যাপিকা মাইটনারই সর্বপ্রথম মহিলা বিজ্ঞানী যিনি এই পুরস্কার লাভ করলেন।

পরমাণুশক্তি বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে হান, স্ট্রাসমান ও মাইটনারের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ইতালীতে ফের্মি, জার্মানীতে হান এবং স্ট্রাসমান, প্যারিসে আইরিন ও ফ্রেডারিক জোলিও-কুরী দম্পতি পরমাণু কণিকার দ্বারা বিভিন্ন মৌল অভিঘাত সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রনের দ্বারা অভিঘাত করে ফের্মি ও তাঁর সহকর্মীরা এমন একটি নতুন মৌলের সন্ধান পান, পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব নেই। কৃত্রিম উপায়ে এই মৌল সৃষ্টির সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। কোন কোন মহল ফের্মির সৃষ্ট মৌলকে '৯৩ সংখ্যক মৌল' অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের পরবর্তী মৌল বলে অভিহিত করলেন।

জার্মানীতে হান ও মাইটনার রোমের গবেষণাগারের ফের্মি সম্পাদিত পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করলেন। তাঁরা ইউরেনিয়াম পরমাণুকে মন্থরগতি নিউট্রন দিয়ে অভিঘাত করেন। অভিঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম থেকে সৃষ্ট পদার্থগুলি তাঁরা পরীক্ষা করলেন। তাঁরাও একটি অজ্ঞাত পদার্থের সন্ধান পেলেন। এর দ্বারা ফের্মির পর্যবেক্ষণ সমর্থিত হলো। কিন্তু অভিঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কি দশা ঘটে সে ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে তখন রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

ইউরেনিয়ামকে অভিঘাত করে ফের্মি তা থেকে যে কটি পদার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন, হান ও মাইটনার তাঁদের পর্যবেক্ষণে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক মৌলের সন্ধান পেলেন। এর রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় তাঁরা কয়েক বছর ধরে ইউরেনিয়াম অভিঘাত সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপৃত রইলেন। এই সময় স্ট্রাসমান এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

অনেক দিন পর্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিল, অভিঘাতের ফলে সৃষ্ট পদার্থগুলি হচ্ছে ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল। তাঁরা বললেন, কেবলমাত্র ৯৩ সংখ্যক মৌলই তাঁরা সৃষ্টি করেন নি, সেই সঙ্গে ৯৪, ৯৫ এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

১৯৩৮ সালে তাঁরা জানতে পারলেন, প্যারিসে আইরিন ও ফ্রেডারিক জোলিও-কুরী ইউরেনিয়াম-উপজাত এমন একটি নতুন মৌলের সন্ধান পেয়েছেন, যার ধর্ম ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মোটেই মেলে না। একইরকম ফল পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্যে তাঁরা জোলিও-কুরীর পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করবেন মনস্থ করলেন। এই সময় নাৎসীদের অত্যাচারের প্রকোপে মাইটনার জার্মানী ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন।

হান এবং স্ট্রাসমান তাঁদের তিনজনের গবেষণা চালিয়ে গেলেন। যখন তাঁরা জোলিও-কুরীর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি

অধ্যাপিকা লিজে মাইটনার

অধ্যাপক অটো হান

করলেন, তখন এমন একটি পদার্থের সন্ধান তাঁরা পেলেন যার রাসায়নিক ধর্ম রেডিয়ামের মত। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন, এটি রেডিয়ামই।

ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলগুলি থেকে তাঁরা এই 'রেডিয়াম'-কে বেরিয়ামের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও তাঁরা সফল হতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা উপসংহারে এলেন, ইউরেনিয়ামকে অভিঘাতের ফলে 'বেরিয়ামই' সৃষ্টি হয়েছে, তাই তাকে পৃথক করা যাচ্ছে না।

ইউরেনিয়াম থেকে বেরিয়াম কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে সেটা অদ্ভুত বলে ঠেকল। কারণ ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ক্রমাংক হচ্ছে ৯২ এবং বেরিয়ামের ক্রমাংক ৫৬। হান এবং স্ট্রাসমান তাঁদের অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা সুইডেনে মাইটনারের কাছে লিখে পাঠালেন। মাইটনার বুঝতে পারলেন আসল ব্যাপার কি ঘটেছে—কিছু সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণু প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তার একটি অংশ হচ্ছে বেরিয়াম এবং অপর অংশটিকে স্বল্পকালের মধ্যে সনাক্ত করা গেল বিরল গ্যাস ক্রিপটন বলে। ক্রিপটনের পারমাণবিক ক্রমাংক ৩৬। তাহলে ৫৬ ও ৩৬ যোগ করলে দাঁড়ায় ৯২, যা হলো ইউরেনিয়ামের ক্রমাংক।

লিজে মাইটনার ও তাঁর ভাইপো অটো ফ্রিশ এই ব্যাপারটি গভীরভাবে অনুধাবন করে জানালেন, নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম পরমাণু অভিঘাতের ফলে প্রকৃতপক্ষে ইউরেনিয়ামের ভাঙন ঘটেছে। তাঁরা এই ঘটনার সংজ্ঞা দিলেন 'ইউরেনিয়ামের বিভাজন'। পরে জানা গেল, এই বিভাজনের ফলে আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে

বিপুল শক্তি মুক্ত হয়। এইভাবে হান মাইটনার ও স্ট্রাসমানের গবেষণায় বিপুল শক্তি-ভাণ্ডার উন্মোচনের একটি নতুন উপায় আবিষ্কৃত হলো—যে শক্তি আজ পরমাণু-শক্তি নামে সুবিদিত। এর কিছুদিন পরে ফের্মি জার্মান পরীক্ষাটির পুনঃ পরীক্ষা করে দেখেন। ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়সের কেন্দ্রীনের প্রত্যাশিত বিভাজন প্রমাণিত হলো।

এর পরবর্তী ইতিহাস আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। ফের্মির দুজন সহকর্মী সিলার্দ ও ভিগনারের এই নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং আইনস্টাইন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে পত্র প্রেরণ, ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার টেনিস-কোর্টে প্রথম ইউরেনিয়াম পাইলে শৃংখলক্রিয়া সম্পাদন, ১৯৪৫-এর এক জুলাই রাত্রিতে নিউ মেক্সিকোর আলমগর্দো বিজন প্রান্তরে প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ এবং আগস্টের প্রথম সপ্তাহে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর মার্কিন বাহিনীর পরমাণু-বোমা নিক্ষেপ এবং তারপর নানা শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণুশক্তির প্রয়োগ।

বিলম্বে হলেও মার্কিন পরমাণুশক্তি কমিশন যে আজ পরমাণুশক্তির পথিকৃৎ হান, মাইটনার ও স্ট্রাসমানকে শান্তির জন্য পরমাণু পুরস্কারে ভূষিত করেছেন তাতে বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগীমাত্রই আনন্দিত হবেন।

মহাকাশ অভিযানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

সম্প্রতি মহাকাশ অভিযানে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী মার্কিন মহাকাশযান 'অরবিটার' সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ইতিপূর্বে চন্দ্রলোক সম্পর্কে এতটা তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। অরবিটার চন্দ্রের আকার, মহাকর্ষ ভর এবং অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্য একেবারে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করেছে।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ধারণা যে চন্দ্রের আকার থালার মতো গোল। কিন্তু অরবিটার যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে তা থেকে জানা যায়, চন্দ্রের আকার গোল নয়, উত্তর দিক ফাঁপা আর দক্ষিণ দিক চাপা।

চন্দ্রলোকের তথাকথিত এপেনাইন অঞ্চলের যে সব ছবি অরবিটার পাঠিয়েছে তার ফলে চন্দ্রলোকে অবতরণের জন্য স্থান নির্বাচনের কাজ আরও সহজ হয়ে উঠবে। এখন থেকে তিন বছরের মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর মানুষ পদার্পণ করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। অন্যান্য যেসব ছবি অরবিটার পাঠিয়েছে তার মধ্যে আছে, চন্দ্রের কাছাকাছি জায়গা থেকে তোলা পৃথিবীর প্রথম ছবি এবং চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের কিছুটা অংশের ছবি যা কোনোদিনই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।

অরবিটারের কাজকর্ম দেখে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা মোটামুটি খুশী হয়েছেন। কিন্তু চন্দ্রলোকের বিষুব রেখা বরাবর অঞ্চলের ছবি দেখে কিছুটা হতাশ হয়েছেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, ছবিতে আরও ছোটখাটো উঁচু-নিচু জায়গাগুলিও ধরা পড়বে। কিন্তু তার পরিবর্তে যেসব বস্তু ছবিতে ধরা পড়েছে সেগুলি সব তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। অরবিটারের একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সামান্য গোলমালের জন্যে ছবিগুলি ঝাপসা হয়ে যায়।

মহাকাশ অভিযানের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মার্কিন মহাকাশযান একাদশ জেমিনির ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮৫০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠে 'রেকর্ড' স্থাপন। তিনদিনব্যাপী মহাকাশ পরিক্রমার এই পরিকল্পনায় মহাকাশযানের আরোহী ছিলেন দুজন মহাকাশচারী চার্লস কনরাড ও রিচার্ড গর্ডন। মহাকাশে যে কৃত্রিম উপায়ে কেন্দ্রাতিগ মহাকর্ষ-শক্তি সৃষ্টি করা যায় একাদশ জেমিনিই তা সর্বপ্রথম প্রমাণ করেছে।

মহাকাশযানটি নাইলন রজ্জুর প্রান্ত ধরে তার লক্ষ্যবস্তু এজেনা রকেটকে কেন্দ্র করে ঘুরেছে ঘুরেছে পৃথিবীর মহাকর্ষের ১৫০০ ভাগের এক ভাগ শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রাতিগ মহাকর্ষ সৃষ্টি করেছে। এই সময়ের মধ্যে মহাকাশচারীরা বুঝতে পারেন তাঁরা আর ভারশূন্য অবস্থায় নেই। এর ফলে মহাকাশচারী চার্লস কনরাড এবং রিচার্ড গর্ডন মহাকাশযানের মেঝের ওপর ধীরে ধীরে অবতরণ করতে সক্ষম হন। এটা মার্কিন মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশিত তত্ত্বকে প্রমাণিত করেছে। তাই মহাকাশচারীরা মহাকাশে চক্রাকারে ঘোরায় তাঁরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন নি।
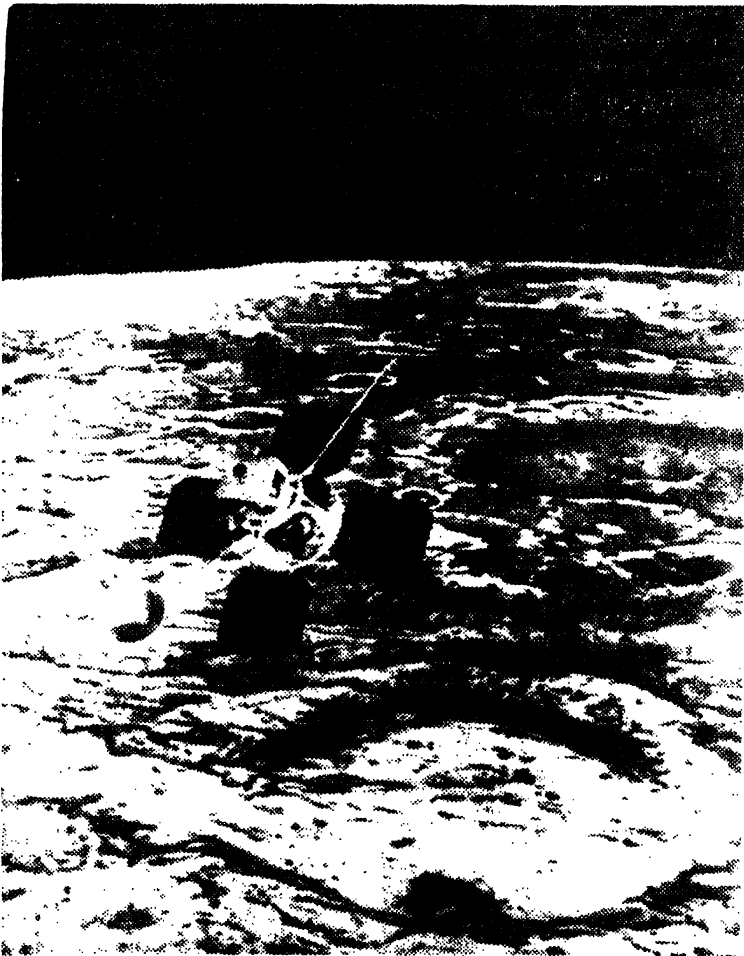
আলোকচিত্র গ্রহণকারী যন্ত্রসমেত চন্দ্রপৃষ্ঠে মার্কিন মহাকাশযান অরবিটার

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

॥ একত্রিশ ॥

মনের খবরদারিরা বলেন শিশুর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরের জগৎ বা চিন্তার জগতটাকেও ছোট করে দেখি বলে ওদের সম্বন্ধে হামেশাই আমাদের মারাত্মক ভুল হয়। সিতু শিশু নয়। এই অশান্ত যুগের বাতাস লেগে সে দশ ছাড়িয়ে এগারোয় পা দিয়েছে। চড়াচড়া বাড়ির বাতাসও তাকে অনেকে এগিয়ে দিয়েছে, অনেক চতুর করেছে। এই সঙ্গে পুরোমাত্রায় বাপের মাথা আর কিছু পরিমাণ মায়ের গোঁ আর হৃদয়ের উপকরণ যোগ হয়েছে।

শ্রীমান সাত্যকির ভিতরের জগতের খবর জানা থাকলে তার ফাঁড়া কাটানোর ব্যাপারে কালীনাথ বা গৌরবিমল এত উৎসাহ বোধ করতেন কিনা সন্দেহ। আর, উতলা হবার মত কিছু কিছু আভাস পেয়েও ছেলের ভিতরটা জ্যোতিরাণী যদি সঠিক দেখে নিতে পারতেন, তিনিও সংকল্প বদলাতেন না হয়ত।

ছোট দাদু আর বিশেষ করে জেঠুর প্রতি সিতু কৃতজ্ঞ। গত কটা দিন জেঠুর হাল্কা শাসনী থেকেই বুঝে নিয়েছিল তার সম্বন্ধে মা কিছু একটা মতলব আঁটছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল। সুযোগ পেলেই সিতুকে মেরে ডাকাতেরা মা-কে ধরে নিয়ে যেত আর তার মা সিনেমার মেয়েদের থেকেও ঢের-ঢের সুন্দর দেখতে—এই দুই নির্দোষ প্রচারের আসামী হয়ে সেদিন মায়ের হাতে পড়ার পর থেকেই তার হাব-ভাব অন্যরকম দেখছে। যত নষ্টের গোড়া ওই শমী। কোনো কথা যদি ওর পেটে থাকত। ওকে বিয়ে করবে না হাতী। আর করেও যদি বিয়ে, ধরে থেতলাবে। ...জেঠু আর ছোট দাদুর এই কদিনের কথাবার্তা থেকে মায়ের মতলবটা সে বুঝেই ফেলেছে। মা তাকে অনেক দূরে বাইরে কোথাও পড়তে পাঠাবার ফন্দী এঁটেছে। যে সব জায়গায় গেলে নির্ঘাৎ হাতে-পায়ে শিকল আর বন্দীদশা। সিতু ঘাবড়েই গেছল।

ফাঁড়া কাটাতে সে ভিতরে ভিতরে মায়ের ওপর রীতিমত চটেছে। মনে মনে মা-কে মুখ ভেঙচেছে। আর একটু বড় হয়ে নিক তখন দেখা যাবে শাসন কোথায় থাকে। বড় হয়েইছে, শুধু বয়সে আর মাথায় ছোট বলেই তেমন জুতে করে উঠতে পারছে না।

সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছু কল্পনায় দেখার ঝোঁক তার। ফাঁড়া কাটার পর বাইরের স্কুলের আর বোর্ডিংয়ের বন্দিদশা কেমন হতে পারত ভাবতে চেষ্টা করেছে। এই বাড়ি-গাড়ি খাওয়া-দাওয়া ঠাকুমা, ছোট দাদু চাল-বাজ দুলু, ভীতু অতুল, সজারু-মাথা সুবীর এমন কি ক্লাসের ঘোড়া-মার্কা সমর, নীলিদি রঞ্জিদি শোফেরসা—এই সব কিছু ছেড়ে যেতে হলে সিতুর দুনিয়া অন্ধকার। ভাবতে গিয়ে আরো কি কারণে যেন ভিতরটা খালি-খালি লেগেছে।

সেটা যে এই অকরুণ মায়েরই অভাব, জানে না।

আপাতত ভিতরে রাগ পুষে বাইরে মায়ের সামনে দিনকতক বেশ শান্ত-শিষ্ট হয়েই থাকতে চেষ্টা করল সে।

এদিকে ব্যাংক লুঠের চকচকে চটপটে ডাকাতেরা তার মনে বেশ পাকাপোক্ত বীরত্বের ছাপ রেখে গেছে একটা। স্কুলের ছেলেদের কাছে গল্পটা পুরনো হয়ে গেছে, কিন্তু তার ভিতরে ওই দিনটা এখনো তাজা। অক্টোবর গিয়ে নভেম্বরের গোড়াতেই সেই তাজা দিনের ব্যাপারটা তরতাজা হয়ে উত্তেজনার খবর জোগালো একপ্রস্থ। জোগাতে থাকল। এইজন্যেই সকালের খবরের কাগজ আসা মাত্র তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে।

খবরটা প্রথম চোখে পড়ামাত্র যেন শক খেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল সে। কাগজ হাতে ছুটে মায়ের কাছে এসেছে। —মা, সেই ব্যাংক ডাকাতির একটা লোক ধরা পড়েছে, পুলিস ভাবছে সে-ই দলের পান্ডা!

শোনামাত্র জ্যোতিরাণীও কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলেন, তারপর সরোষে বলে উঠলেন, বেশ হয়েছে—এবারে ফাঁসি হবে।

...ফাঁসি হবে! সিতুর উত্তেজনা নিষ্প্রভ একটু।

—হবেই তো, লোক মেরেছে ফাঁসি হবে না—বেশ হবে।

সিতু বলল, বিচার হবে, প্রমাণ হবে, তবে তো...

মোট কথা মায়ের রায় তার খুব মনে ধরেনি। লোকটার ছবি বেরিয়েছে কাগজে, ফিট-ফাট সুন্দর চেহারা, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ। চোখের সামনে তাজা লোককে ওভাবে গুলী করে মেরে ফেলাটাই ওই ডাকাতির মধ্যে সবথেকে খারাপ ব্যাপার ঠিকই, আর ফাঁক পেলে তার মা-কে যে ওরা ধরেই নিয়ে যেত এ ধারণাও বদলায়নি—তবু একেবারে ফাঁসি ভাবতে কেমন যেন লাগছে।

দিনে দিনে চমকপ্রদ খবর তারপর। একে একে দলের আরো পাঁচজন ধরা পড়ল। পুলিস যেন মাকড়শার জাল বিছিয়ে ধরছে একে একে। দলের পান্ডার যে ডান হাত সেও ধরা পড়েছে। আর পুলিস অনেককিছু বার করে নিয়েছে সোনা নামে তার এক ভালবাসার মেয়েকে ফাঁদে ফেলে। ওদিকে ডাকাতির ক্যাশবাক্স একটা ডোবার মধ্যে পাওয়া গেছে—টাকা ভাগাভাগি করে নিয়ে বাক্সটা জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ডাকাতদের আড্ডা একটা পুরনো ছাড়া-বাড়ির সন্ধান মিলেছে, সেখানে আরো কিছু হদিস পাওয়া গেছে। শুধু এই নয়, ডাকাতির বাহন সেই গাড়িটাও ধরা পড়েছে—তার রঙ আর ভোল বদলে ফেলা হয়েছিল—তবু। ডিসেম্বরের মধ্যেই ধর-পাকড় আর পরের কয়েক মাসের মধ্যে পুলিসের তদন্ত সারা।

এরপর বিচার। ওই ঘোড়া-মার্কা সময়ের মুখেই সিতু শুনেছে তার দাদা নাকি বলেছে বাইরের লোকও যে খুশি বিচার দেখতে পারে। পরে ঘুরিয়েফিরিয়ে ছোট দাদুর মুখ থেকেই জেনেছে শুধু মিথ্যে নয়। তারপর থেকে সিতু ভিতরে ভিতরে অস্থির উদগ্রীব একেবারে।

তার এই চাঞ্চল্যের খবর জ্যোতিরাণী বা আর কেউ রাখেন না।

বাড়ির বাতাসের গতি একটু একটু করে আবার পুরনো দিকে ফিরছে। জ্যোতিরাণীর ব্যস্ততা বেড়েছে। মিত্রাদিকে সঙ্গে করে ছোটাছুটি আর তদবির-তদারক বেড়েছে। তাই অবকাশ কম। তবু এরই ফাঁকে পাশের ঘরের মানুষকে লক্ষ্য করেন তিনি, চাপা অসন্তোষের কারণ খোঁজেন। প্রভুজীধাম নিয়ে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনাই যদি কারণ হয় তিনি নিরুপায়। অন্যথায় হাতে আপত্তি নেই জ্যোতিরাণীর একটু চাইলে আপত্তি। ওদিকে সে-রকম চাওয়াটাই বহুদিনের স্বভাব। দিন-কতকের বৈচিত্র্যে প্রশ্রয় দিয়ে এখন আবার আত্মস্থ হয়েছে—এই ভাব।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হাই সোসাইটির সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সংবাদ কাগজে বেরুলো। এর দুদিন আগে থেকে জ্যোতিরাণী ভয়ানক গম্ভীর আর অসহিষ্ণু দেখেছেন মানুষটাকে। কেন ধারণা করতে পারেননি। আর মাস দেড়েকের মধ্যে প্রভুজীধামের দ্বারোদ্ঘাটন হবার কথা, এই নির্বাচনের ব্যাপারটা ভুলেই বসেছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারের উদ্দেশে সেই দুদিন ছাড়া তাঁকে আর ডাকাও হয়নি বা কিছু বলাও হয়নি।

কাগজে নতুন প্রেসিডেন্ট-এর ছবি আর সংবাদ দেখে জ্যোতিরাণী সচকিত। নতুন প্রেসিডেন্ট শিবেশ্বর চাটুজ্জে নন।

কাগজ হাতে তক্ষুনি পাশের ঘরে এলেন। শিবেশ্বরও কাগজ পড়ছেন, তবে অন্য পাতা। নির্লিপ্ত গম্ভীর।

—বিক্রম বলেছিল প্রেসিডেন্ট তোমারই হবার সম্ভাবনা, হল না যে?

কাগজ ছেড়ে শিবেশ্বরের দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর উঠে এলো। পরাজয়ের তাপ নিয়ে বসে নেই তিনি, কিন্তু অনুকম্পা সহ্য হবে না। তাই স্ত্রী-পর্যবেক্ষণ সরল বা তরল নয় আদৌ।—হল না বলে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে?

জ্যোতিরাণীর কানে সেই পুরনো সুরটাই লাগল খট করে। তবু হাসতে চেষ্টা করে বললেন, তুমি আশা করেছিলে যখন, খুব না হোক একটু তো হয়েইছে। হল না কেন?

এই হার-জিত স্ত্রীও গায়ে না মাখলে বিরক্ত হতেন না শিবেশ্বর। মুখে হাসি টেনে সশ্লেষে বলে উঠলেন, তোমার স্বামী নির্বাচনের মত এরাও ভুল করল না বলে বোধহয়।

জ্যোতিরাণী হেসেই জবাব দিলেন, সে নির্বাচন আমি করিনি, ভুল যদি হয়ে থাকে তো তোমারই হয়েছে।

শিবেশ্বর কাগজে চোখ ফেরালেন। হাসির ঝাপটা সকলের বরদাস্ত হয় না। কথা না বাড়িয়ে জ্যোতিরাণী বেরিয়ে এলেন। স্নায়ুর টানা-হেঁচড়া আর একটুও চান না তিনি। ত্রুটি তো তাঁরই। হাই সোসাইটির অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা মনে থাকলে আগে থাকতে খোঁজ-খবর নিতে পারতেন। মনেই ছিল না কি আর করবেন।

নিজেরই ভুল। কিন্তু যে কাজে ব্যস্ত তিনি, এইটুকু ভুল একজন ক্ষমার চোখে দেখবে এ আশা এখনো ভিতর থেকে যায় না কেন?

তিরিশে জানুয়ারীর বিকেল। বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জ্যোতিরাণী মাথায় চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছেন একটু, মিত্রাদিকে তুলে নিয়ে ফার্নিচারের আড়তে যাবেন। প্রভুজীধামের আসবাবপত্র প্রায় ডেলিভারি পাবার কথা, কিন্তু এতদিনে নমুনা অর্ডার দেবার জন্য ডাকা হচ্ছে। সব ব্যাপারেই এমনি দেরি হচ্ছে, সামনের ফেব্রুয়ারী ছাড়িয়ে মার্চেও প্রতিষ্ঠান চালু করা যাবে কিনা সন্দেহ।

গোটা দেশের বুকের ঠিক মধ্যখানে হঠাৎ বুঝি কামানের গোলা এসে লাগল একটা। আপাতত জ্যোতিরাণীর বুকে।

—মা-মা-মা! ডাকতে ডাকতে সিতু ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, উত্তেজনায় টকটকে লাল সমস্ত মুখ।—মা! গান্ধীজী বলে প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিল গুলী করে মেরে দিয়েছে!

—কি বললি! মাথার মধ্যে ঝাঁকুনি কি হয়ে গেল, ঠাস করে ছেলের গালে চড় বসিয়ে দিলেন একটা।—কি বলছিস কি বলছিস তুই?

চড়টা খেয়ে সিতু বিমূঢ়। গালের সেদিকটা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু আঘাতের থেকেও বিস্ময় বেশি। পাতেই খেয়ে বলল, নীলিমাদের রেডিওতে এই মাত্র শুনলাম যে!

ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে জ্যোতিরাণী দ্রুত এসে রেডিও খুললেন। সর্বাঙ্গে থর-থর কাঁপুনি। ঘরের বাতাস চলাচল থেমে গেছে বুঝি।

...জওহরলাল বলছেন। বাপুজী নেই। কাঁদছেন আর বলছেন, আমাদের বাপুজী নেই। এক উন্মাদ সব শেষ করে দিল। বাপুজী আর নেই...

অবসন্নের মত জ্যোতিরাণী মেঝেতে বসে পড়লেন।

এক মুহূর্তে দুনিয়ার কত কি যে নেই হয়ে গেল ঠিক নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিতু মায়ের এই প্রতিক্রিয়া দেখল। তার গম্ভীর দৃষ্টি কৌতুক-প্রচ্ছন্ন। চড়টাও ঠিক চড়ের মত লাগছে না। মা একটু-আধটু গান্ধীভক্ত এরকম একটা ধারণা সিতুর ছিল। আর ছোট দাদুর মুখে মায়ের বাবারও কিছু গল্প শোনা ছিল তার। আগে গুলী-গোলা ছুঁড়ে ইংরেজদের কাছ থেকে দেশ কেড়ে নেবার দলে ভিড়ে শেষে মায়ের সেই বাবাটিও নাকি গান্ধীভক্ত হয়ে উঠেছিল। সিতুর মতে মায়ের বাবার এই আগের জীবনটাই রোমাঞ্চকর, শেষেরটা ম্যাড়মেড়ে।

কিন্তু মায়ের গুরুভক্তি মাত্রায় একটু অদ্ভুতই লাগছে তার।

উত্তেজনা চেপে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। আসার সময়ই দেখেছে রাস্তায় সাড়া পড়েছে। ছুটে বেরিয়ে গেল আবার।

দু গজ দশ গজ দূরে দূরে মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে। দুর্ঘটনার আকস্মিকতা বাতাস ছেয়েছে।

...প্রভুজীধামের আদর্শের আলোয় কি জ্যোতিরাণীর চোখে নিষ্প্রভ হয়ে এলো? মনে মনে তাঁর যে একটা সংকল্প ছিল। সম্ভব হোক না হোক চেষ্টা করবেন স্থির করেছিলেন। প্রথম প্রতিষ্ঠান-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর কথা মনে হয়েছিল তাঁর। সেদিন তিনি এই কলকাতাতেই ছিলেন। গত কয়েকদিন... [illegible] ...সংশয় ছিল না। এ কাজে প্রভুজীকে স্মরণ করার মত এমন আর দ্বিতীয় কে আছে?

আকাশে বাতাসে এক মত্ত্য মৃত্যু তার ঘোষণা করে দিল।

আর সেই মৃত্যুর ছায়া বুঝি জ্যোতিরাণীর আদর্শের আলোর ওপর দুলে-দুলে যেতে লাগল। তাঁদের সবথেকে শ্রদ্ধেয় সূচনার মুখে এ কি হয়ে গেল! আদর্শের শিখা আরো বড় করে জ্বালাতে তাগিদ এখন, নইলে এই মৃত্যুর মহিমা সার্থক হবে না। অথচ উদ্দীপনার সলতেটাই নিভে গেছে আপাতত।

এই অসময়ে জ্যোতিরাণী তুচ্ছ ভুলই করে বসলেন আবার একটা। আধিপত্যের বজ্রমুষ্টি অপরের স্বাধীন ইচ্ছের কোনো ফাঁক বরদাস্ত করে না। তাই ভুলের ফসল তুচ্ছ হবার কথা নয়।

প্রভুজীধামের ফাইল নিয়ে বসেছিলেন সেদিন, শিবেশ্বর ঘরে এসে বললেন, আজ বিকেলের দিকে একটু বেরুনো দরকার, সময় হবে?

মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী প্রথমে দরকারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়?

—ক্লাবে। গান্ধীজীর কনডোলেন্স মিটিং।

কিন্তু এই ডাকে সায় দিতে পারলেন না। গত কদিন ধরে রেডিও আর খবরের কাগজ শোকেও ক্লান্তি এনে দিয়েছে। চারদিকে শোকের উৎসব চলেছে যেন। উঁচু-মহলের ওই অতি-অভিজাত পুরুষ-রমণীর শোক সমাবেশের সম্ভাব্যটা দৃশ্যটা মুহূর্তে কল্পনায় দেখে নিলেন জ্যোতিরাণী। সেখানে শোক ঘোষবে কেমন করে তিনি জানেন না। বাড়ির এই এক সভ্যের মুখে অন্তত শোকের ছায়া পড়তে দেখেননি। পড়লে দেখতেন ঠিকই। সেখানকার আনুষ্ঠানিক শোকের আড়ম্বরের মধ্যে সেজে-গুজে গিয়ে বসার কথা ভাবতেই ভিতর বিমুখ। খুব নরম করেই বললেন, আমার ভালো লাগবে না, তুমি একাই যাও না...?

বলে ফেলেই অবশ্য মনে হল, ভালো করলেন না। কিন্তু মুখের কথা খসলে ফেরে না। শিবেশ্বরের ঠান্ডা দু চোখ তাঁর মুখের ওপর থেকে সামনের ফাইলে নামল। ফাইল থেকে আবার মুখে উঠল। তারপর চলে গেলেন।

সভাপতি নির্বাচনের পর এই প্রথম অধিবেশন। তাঁকে যেতে হবে কারণ, এ-যাত্রা নির্বাচনে হেরেছেন তিনি। না গেলে লোকের চোখে হারটা বড় হবে। স্ত্রীকে সঙ্গে নেবার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। নির্বাচনের জাল গোটাবার চেষ্টায় কেন যে কোন পর্যন্ত নিজের সঙ্গে স্ত্রীকে জুড়ে দিতে পারেননি তিনিই জানেন। [illegible] [illegible] হতে পারে, কিংবা [illegible] আগ্রহের ফলে হতে পারে, আবার নিজের জন্য মুহূর্তে কথা দিল যে জ্যোতিরাণী পাশে পেয়েছিলেন সেই [illegible] পারে। কিন্তু কদিনের মধ্যে [illegible] সদস্যদের বাড়িতে ঘরে দাঁড়াতে চেয়েছে আবার। স্ত্রীর ব্যস্ততা দেখে মনে হয়েছে অনুরাগের তিনি উপলক্ষ লক্ষ্য [illegible]। অতএব নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে না নিয়ে ভুল করেছেন। রমণীর রূপের প্রভাব সম্পর্কে শিবেশ্বরের ধারণা অস্পষ্ট নয় একটুও। নিজেকে দিয়েই বিচার করতে পারেন। গোড়াবারে স্ত্রীকে ঘরে আনার ফলে বহুজনের ঈর্ষার পাত্র হয়েছিলেন তিনি। এবারে তাদের দৃষ্টি সেদিকে আরো বেশি ফেরাবার ইচ্ছে। সম্ভব হলে গান্ধীর সম্পর্কে স্ত্রীকে দিয়ে কিছু বলানোর জন্যে বিক্রমকে হয়ত উস্কে দিতেন তিনি।

যে-মাথা জট পাকাতে জানে, সে মাথা জট পাকানোর ইন্ধনও সহজে পায়। শিবেশ্বর পেলেন। পেলেন যে, জ্যোতিরাণী শুধু সেটুকুই অনুভব করলেন।

আরো বেশি অনুভব করলেন সেই সন্ধ্যাতেই।

বিভাস দত্ত এসেছেন।

অনেক দিন পরে এলেন। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার অছিলায় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেও প্রায় তিন মাস আগে। তারপর এই এলেন।

শমী আসার পর থেকে যে-যোগটা পুষ্ট হয়ে উঠছিল তার গতি জ্যোতিরাণীর চোখে সরল ঠেকেনি সর্বদা। তাঁর ঘরে টাঙানো সেই ফোটো আর ওমর-খৈয়ামের মধ্যে যত্নে রাখা ওই ছবিদুটোও চাপা অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। ভদ্রলোকের কথা-বার্তার ধরন-ধারণও বদলাচ্ছিল। বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ঘরের লোকের বিকৃতির দরুন নয়, জ্যোতিরাণী নিজে থেকেই একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছেন।... এ-যাবত অনেক উপকার পেয়েছেন, তাঁর ভালো চান। সহজ অন্তরঙ্গতা সেই ভালোর রাস্তায় গড়াচ্ছে না মনে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ততার ফাঁকে জ্যোতিরাণী নিজেকে কিছুটা সরিয়ে আনতে পেরেছেন।

—একলা যে...শমী কই?

প্রশ্নটা হঠাৎ উপভোগ্য হল কেন সঠিক বুঝলেন না। তাঁর দিকে চেয়ে বিভাস দত্ত হাসছেন আর সিগারেট টানছেন। অ্যাশপটে চাপা দেওয়া দুই ইঞ্চি প্রমাণ এক টুকরো ছোট্ট কাগজ [illegible] নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।

তাতে লেখা, শমীকে আনলেন না?

বিভাস দত্ত জোরেই হেসে উঠলেন, দেখুন খুব বাজে লেখক নই, আপনার আসতে দেরি দেখে এক মিনিট আগে ওটুকু লিখেছি। আর একদিনও প্রথমে একথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

জ্যোতিরাণী অপ্রস্তুত, বিব্রতও। পরিহাস বটে কিন্তু ইঙ্গিত ঠাসা। হাসির আড়ালে কিছু তাপও জমেছে মনে হল। হাসি মুখেই জবাব দিলেন, বাজে লেখক আপনাকে কে বলেছে? জিজ্ঞেস করব না, সঙ্গী-সাথী নই, বেচারী একেবারে একলা—

—তা বটে, আমি বাড়িতে না থাকলে ও হয় আপনার গাড়ি নয়তো আপনার টেলিফোন আশা করে।

অর্থাৎ তাঁর অনুপস্থিতিতে শমী গাড়ি বা টেলিফোন পেয়ে অভ্যস্ত। আগে হলে জ্যোতিরাণী সহজ কৌতুকে আরো কিছু শোনার ইন্ধনও জোগাতে পারতেন। সেদিক না ঘেঁসে লঘু ঠেসের সুরে বললেন, করবেই তো আপনার আশায় থাকার তো এই ফল।
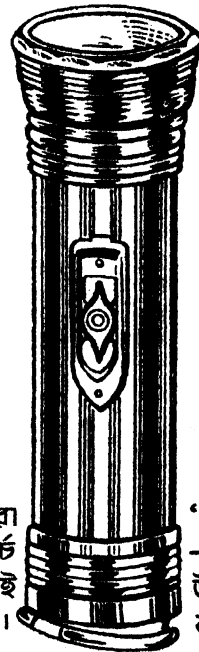
বিভাস দত্ত হাসছেন। নিজের জামার বোতাম ধরে টানাটানি করলেন দ্বই একবার তারপর সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত ঢোকালেন। চাপা অস্থিরতার এই লক্ষণ জ্যোতিরাণীর ভালই জানা আছে।

—ফলটা খ্বব ইচ্ছাকৃত নয়। কাজে বেরিয়েছিলাম, ভালো লাগছিল না, ঘ্বরতে ঘ্বরতে চলে এলাম।

প্রসঙ্গ বদলানোর ফাঁক পেয়ে জ্যোতিরাণী তক্ষ্বনি বললেন, ভালো লাগবে কি করে, যে সর্বনাশ হয়ে গেল—

সিগারেট ধরিয়ে বিভাস দত্ত টান দিলেন গোটা কতক। —বাড়ির কর্তাটি কোথায়? শোকসভায়?

—হ্যাঁ। শোকসভার খবর আপনি জানলেন কি করে?

—হাই সোসাইটির খবর কাগজের প্রথম পাতায় বেরোয়। আপনি গেলেন না?

—না। ...আমি তো ভাবছিলাম আপনি হয়ত দিল্লীতেই চলে যাবেন।

ম্বখ থেকে সিগারেট নামল। দ্ব চোখ তাঁর দিকে ফিরল। পলকা বিস্ময়।—আপনি ভাবছিলেন? কবে?

কানের কাছটা উষ্ণ ঠেকল জ্যোতিরাণীর ভাবেন নি ঠিকই। কথার পিঠে কথা জোগানা ছাড়া এ উক্তির আর কোন তাৎপর্য ছিল না। ভাবেন নি বলেই বিদ্রূপ আরো বেশি স্পষ্ট মনে হলো। তিন মাসের সঞ্চিত ক্ষোভ ক্ষয় করার তাড়নাতেই যেন এসে পড়েছেন ভদ্রলোক।

—আপনাকে হিসেব দেবার জন্যে দিন-ক্ষণ মনে করে বসে আছি নাকি?

—তা নয়, সিগারেট টানার ফাঁকে গলার স্বর মোলায়েম করার চেষ্টা, আমার কথা ভাবতে সময় পেলেন শ্বনে অবাক লাগল। ...আপনার প্রভুজীধাম কতদ্বর এগলো, কাগজে কবে যেন হাঁক-ডাক দেখলাম বেশ।

প্রশ্নটা বড় বেশি নির্লিপ্ত ঠেকল কানে, জবাব দিলেন, এই মাসের শেষে বা সামনের মাসের গোড়ায় কাজ শ্বর্ব হবে আশা করছি। কিন্তু প্রভুজীধাম শ্বধ্ব আমার কেন, সকলেরই তো।

সিগারেট অ্যাশ পটে গ্বঁজে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন বিভাস দত্ত, আবারও কৌতুকের আড়াল নেবার মত রসদ কিছ্ব পেয়েছেন।—শমীর সান্ত্বনা আপনার গাড়ি আর টেলিফোন, আর এটুকু বোধহয় আমার?

জ্যোতিরাণীর দ্বষ্টি এবারে তাঁর ম্বখের ওপর থমকালো একট্ব। কথার ল্বকোচুরির মধ্যে না গিয়ে সোজাই বললেন, ভাব-গতিক স্ববিধের দেখছি না আজ, আপনার আবার সান্ত্বনা দরকার হবার মত কি হল?

বিভাস দত্ত রসিয়েই জবাব দিলেন, এ-ঘরে আপনাদের সেই একদিনের আলোচনার আসর ভারী জমেছিল।...একদিকে আপনার কর্তাটির ঝোঁক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার নামটা যোগ করে দেবেন, অন্যদিকে আপনার সেটা বাতিল করার তাগিদ।

মিথ্যে নয় বলেই জ্যোতিরাণীর সহজতায় টান ধরছে। বলে উঠলেন, শ্বধ্ব আপনাকে কেন, সমান যোগ্য ভেবে আমার কর্তাকেও বাতিল করেছি। তা আক্ষেপ হয়ে থাকে তো বল্বন আবার যোগ করে দিচ্ছি।

বিভাস দত্ত জোরেই হেসে উঠতে পারলেন এবার। বললেন, দিলেও এই যোগে ফল বাড়বে না বোধহয়, তাছাড়া আমারও আক্ষেপ নেই।

সম্ভব হলে জ্যোতিরাণী বলতেন, আক্ষেপ আছে কিনা দেখাই যাচ্ছে, আর, বলতেন যোগের ফল বাড়ার ভয়েই বাতিল করা হয়েছে। কথার মারপ্যাঁচ ছেঁটে দিয়ে বিভাস দত্তই অন্য প্রসঙ্গে ঘ্বরলেন এবার। নিজেকে গ্বটিয়ে নেবার স্বরে বললেন, যাক, আপনার এত ব্যস্ততা শমীরই শ্বধ্ব ব্বঝতে আপত্তি, আমার ব্বঝতে কিছ্ব অস্ববিধে হচ্ছে না।... অনেক দিন আগে টেলিফোনে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে একট্ব দরকারী পরামর্শ ছিল, কথার মাঝেই হঠাৎ টেলিফোন কেটে দিলেন, বললেন পরে কথা হবে—আপনার মনে নেই বোধ হয়।

জবাব না দিয়ে জ্যোতিরাণী চেয়ে রইলেন চুপচাপ। মনে আছে। কথা যখন বলছিলেন, বাড়ির মালিক তখন প্বলিসের লোকের মারফৎ বীথি ঘোষের খবর আর এই একজনকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসার খবর সংগ্রহ করে নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে-দিনটা অন্তত ভোলবার কথা নয় জ্যোতিরাণীর।

বিভাস দত্ত ধীরেস্বস্থে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।—ইচ্ছে ছিল, আপনাকে নিয়ে বীথি ঘোষের সঙ্গে ভালো করে একট্ব আলাপ-পরিচয় করব; কিন্তু আপনার তো সময় নেই, ভাবছিলাম, মিসেস চন্দকে আপনি একবার টেলিফোন করে দিলে তাঁরই শরণাপন্ন হতে পারি।

—বীথিকে নিয়ে লিখবেন?

—যোগাযোগে কি দাঁড়ায় দেখা যাক, আপনার কি মনে হয়, লেখার মত পাব কিছ্ব?

—পেতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় এখন থাক, বীথির ম্বখে যদি হাসি ফোটে কোনদিন তখন লিখবেন, আমরা সকলেই তখন আপনাকে সাহায্য করব।

এ জবাব আশা করেন নি বিভাস দত্ত। তাপ ছিলই, আরো বেশি ক্ষ্বব্ধ। তার ওপর হাসির প্রলেপ।—আপনার আপত্তি হলে থাক। কিন্তু সব বীথি ঘোষের ভাগ্যেই তো জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি। সকলের ম্বখে হাসি নাও ফ্বটতে পারে। তাছাড়া, হাসি ফোটাবার বায়না নিয়েই যে লিখতে বসব তাই বা আপনাকে কে বললে?

হেসে খোঁচা দেবার লোভ দমন করতে পারলেন না জ্যোতিরাণী। বলে ফেললেন, তাই বস্বন না, সাহিত্যের কিছ্ব উপকার হয় তাহলে—

সাহিত্যের আসরে বিভাস দত্তর জায়গা সামনের সারিতে, এ কটাক্ষ বরদাস্ত হবার কথা নয়। হাসির প্রলেপেও টান ধরল। সামাল দেবার জন্য হাসিম্বখে জ্যোতিরাণী নিজেই নিজের অনধিকার চর্চার সমালোচনা করতে যাচ্ছিলেন। বাধা পড়ল।

সিঁড়ির পাশে গাড়ি থামল। শিবেশ্বর ফিরলেন। তাঁর দামী গাড়ি, শব্দ হয় না তেমন। স্টার্ট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে আসতে জ্যোতিরাণী বাইরের দিকে তাকিয়েছেন।...ক্লাব থেকে এত শিগগীর ফেরার কথা নয়।

গাড়িতে বসেই স্ত্রীর হাসি-ম্বখ চোখে পড়েছে শিবেশ্বরের। দেয়ালের আড়ালে উল্টো দিকে কে আছে দেখা না গেলেও ভেবেছিলেন মৈত্রেয়ী হবে। ঘরে পা দিয়ে যাঁকে দেখলেন অনেক দিনের অদর্শনের ফলে তাঁর কথা মনে হয়নি।

বিরাগ নয়, শিবেশ্বর পরিতুষ্ট। রসদের অভাব হলে ভিতরের তাপ নিজেকে দগ্ধায়। রসদ পেলেন। চোখের কোণে খ্বশির আমেজ। স্ত্রীর হাসি-ম্বখের পরিবর্তনট্বকুও কম উপভোগ্য নয়। তাঁর দিকে ফিরলেন, আর যিনি উপস্থিত তাঁকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেন না।—তোমারো শোক-সভা আছে এখানে তখন বললে না কেন, আ... সাধাসাধি করতাম না তাহলে।

ম্বখ লাল হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। অপরের সামনে মর্যাদা রক্ষার তাগিদটুকুই হয়ত স... থেকে বড় দ্বর্বলতা তাঁর। এই এক কারণে গাড়িটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তব্ব হিং... আক্রমণের মত এই উক্তি আশা করেন নি... প্রতিক্রিয়া সামলে কিছ্ব বলার অবকাশ পেলেন না, তার আগেই বিভাস দ... তাড়াতাড়ি হালকা কৈফিয়ত দিলেন, এ... শোক-সভার খবর উনি রাখতেন না, আমার ... রবাহ্বত শোক-সভা বলতে পারো।

দায় ঘাড়ে নেওয়া গোছের এই কথ... গ্বলো জ্যোতিরাণীর ম্বখের ওপর অপমানের দ্বিতীয় প্রস্থ ঝাপটা মেরে গেল। ... নিজেকে সংবরণ করতেই চেষ্টা করছে... তিনি। শিবেশ্বর বিভাস দত্তর দিকে ঘ... দাঁড়াতে তাঁর ম্বখ আড়ালে পড়েছে।

চোখে চোখ রেখে আপ্যায়নের স্বরে শিবেশ্বর বললেন, শোকের ম্বখে দরদী রবাহ্বতই এসে থাকে। তা তুমি কতক্ষণ?

—এই কিছ্বক্ষণ। এরই মধ্যে তোমাদে... শোক করা হয়ে গেল?

শিবেশ্বরের ঠোঁটের হাসি আরো স্পষ্ট —গেল। এ তো আর ঘরের অন্তরঙ্গ শোক নয়, বাইরের অন্বষ্ঠান। শোক চল... তোমাদের, বিঘ্ন ঘটাব না—

যাবার জন্য পা বাড়াবার ফাঁকে দ্ব চোখ স্ত্রীর ম্বখের ওপর আটকালো। জ্যোতিরাণী নিষ্পলক চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। পিছন থেকে বিভাস দত্তর লঘ্ব তাগিদ, বিঘ্ন হবে না, তুমিও বসতে পারো — কোন্ সাহিত্য করলে উপকার হয় তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে আপাতত আমি সেই পাঠ নিচ্ছিলাম—

অতএব আবারও এদিকেই ফিরলেন শিবেশ্বর। স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া দেখার প্রেরণায় এই একজনকে অনায়াসে এখন ঘর থেকে বারও করে দিতে পারেন তিনি। অতটা না করে সশ্লেষে পর্যবেক্ষণ করলেন একট্ব।—সেটা কি রকম পাঠ, অন্ধ-তামিস্র গোছের?

বিভাস দত্ত হকচকিয়ে গেলেন। বাড়ির একচ্ছত্র মালিকের মতই [illegible] ধীরে-সুস্থে প্রস্থান করলেন।

ঘরের বাতাস অস্বস্তিকর নীরবতায় ঠাসা।

অস্ফুট স্বরে বিভাস দত্ত হেসে উঠলেন একটু। সোফার হাতলে চাপ দিয়ে ওঠার ভঙ্গি করে সামনের দিকে তাকালেন। —এবারে আমিও চলি তাহলে?

[illegible] হবার [illegible] এখনো [illegible] [illegible] জ্যোতিরাণী।—আজ্ঞা আছে?

—আজ্ঞা ছিল না, এখন হল। উঠে দাঁড়ালেন। সত্যি কথাটা বলতে পেরে খুশি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, কর্তার এই মেজাজ কেন, শোক-সভায় যান নি বলে?

মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণীর মনে হল ক্ষোভ জুড়িয়েছে ভদ্রলোকের। শেষের প্রশ্নটা করে বিড়ম্বনা আড়াল করার সুযোগ দিলেন একটা, তাও অনুভব করতে পারলেন। [illegible] কর্তার এই [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] জানেন না উনি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটিয়ে ওই হাসিমুখ নিজের দুচোখে আটকে নিতে পারলেন জ্যোতিরাণী, সরস কথারও যোগান দিতে পারলেন। এটুকু পুরুষ ধকল শিরায় শিরায় অনুভব করছেন। বললেন, বোধ হয়...। পুরুষের মেজাজ মেয়েদের গয়নার মত। ছাড়তে কষ্ট—

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

নিবেদিতা স্মরণে

বিদেশিনী এক মহিলার সেবা, নিষ্ঠা এবং মহান আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় জীবনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে কর্মোদ্দীপনার নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল। গৈরিক-সম্বল এক সর্বত্যাগী কিন্তু স্বদেশ-প্রেমে ভরপুর সন্ন্যাসীর আহ্বানে এই মহীয়সী নারী স্বদেশের মায়া কাটিয়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারতবর্ষকেই নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় তাঁর কর্মযজ্ঞের নতুন অধ্যায়। আর সে মহাযজ্ঞের আহুতিতেই তাঁর সমগ্র জীবন নিঃশেষে নিবেদিত হলো। ভারত-বর্ষের কল্যাণে নিবেদিত এই মহীয়সী বিদেশিনীই হলেন নিবেদিতা, বিবেকানন্দের মানস-কন্যা।

বিবেকানন্দের মধ্যে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা। তাই আপন কর্মের সমস্ত দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন তাঁর উপর। আবার বিবেকানন্দও আগামীদিনের স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে আইরিশ দুহিতা মার্গারেট নোবলের বিরাট ভূমিকার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে আহ্বান করেছিলেন কর্মের যজ্ঞভূমি ভারতবর্ষে। চিহ্নিত করেছেন ভারতীয় পরিচয়ে ভগিনী নিবেদিতা নামকরণের মাধ্যমে। নিবেদিতারও দেরী হয়নি নিজের গুরু এবং কর্মভূমি চিনে নিতে। বিবেকা-নন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি এসেছেন এদেশে। আর মুহূর্তের মধ্যে ভারতবাসীর দুঃখবেদনাকে গ্রহণ করেছেন একান্ত আপনার বলে। সেদিন থেকে তাঁর সমস্ত মানসলোক জুড়ে ভারত এবং ভারতবাসী স্থান পেয়েছিল। সে পরিচয় রয়েছে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায়। ভারতবর্ষকেই ধ্যান-জ্ঞান করে নিবেদিতা শুরু করেন তাঁর জীবনসাধনা। তাঁর ভারতপ্রেম অতুলনীয়। দুঃখদুর্দশার তিমিরন্ধতা থেকে ভারত-বাসীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি শুরু করেছিলেন দুর্মদ সাধনা। তাঁর সে সাধনার ছাপ রয়েছে সর্বত্র। ভারতের মুক্তিসাধনায়ও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পরাধীনতার হাত থেকে নিস্তার ব্যতীত যে ভারতবাসীর উন্নতির আশা নেই একথা উপলব্ধি করেই তিনি তরুণদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় বিপ্লবাদেও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং সাফল্যলাভও করেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এবং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে তিনি বিজ্ঞানসাধনা ও শিল্পসাধনায় প্রেরণা জুগিয়েছেন। আর এসবই করেছেন তিনি

ভগিনী নিবেদিতা

ভারতবর্ষের প্রতি কর্তব্যের আহ্বানে এবং অকৃত্রিম ভালবাসায়।

সম্প্রতি দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো এই ভারতদুহিতার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। সারা ভারতব্যাপী এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে কলকাতায় শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষব্যাপী উদযাপিত হবে এই উৎসব। এজন্য 'নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি' এক বিরাট কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। এই কর্মসূচীতে আছে দেশবিদেশের মনীষীদের রচনায় সমৃদ্ধ একটি স্মারকগ্রন্থ, নিবেদিতার রচনাবলীর সংকলন ও শিশুদের জন্য নিবেদিতার সচিত্র জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ। এছাড়া বিভিন্ন আলোচনাসভার মাধ্যমে নিবেদিতার কর্মময় জীবনের আলোচনা এবং নিবেদিতা সম্পর্কে রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিবেদিতার জীবনী ও কর্মকে আজকের যুবক-যুবতী-দের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থাও হয়েছে।

নিবেদিতার কাছে ভারতবাসী পুরুষা-নুক্রমে ঋণী। আর এই ঋণজালে তিনি আমাদের আবদ্ধ করেছেন আপন কর্মের মহিমায়। তাঁকে স্মরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য। জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণে তিনি নতুন মহিমায় আমাদের কাছে আবির্ভূতা হয়েছেন। এই মহিমার মর্যাদা আমাদের দিতেই হবে। আর তা শুধু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়—নিবেদিতা নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে। সেটাই হবে তাঁর প্রতি ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

একটি প্রদর্শনী

ঝাউতলা 'নারী সেবা সংঘের' বার্ষিক হস্তশিল্প প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় সমিতির নিজস্ব প্রাঙ্গণে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আমেরিকান ওমেন্স ক্লাবের সভানেত্রী শ্রীমতী এলান গোল্ডী।

দোতলার স্বল্প পরিসরে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বার থেকেই সংঘের সভ্যাদের সুনিপুণ হাতের আলপনা চোখকে তৃপ্তি দেয়। কাঠের সিঁড়ির পাশে পাশে এবং শিল্পসামগ্রীর সামনে আলপনা, রজনীগন্ধা ফুলের এবং ধূপের গন্ধ মিলিত এক অপূর্ব পরিবেশ রচনা করেছিল। যাঁরা

নারী সেবা সংঘের প্রদর্শনীতে পোষাকের কয়েকটি নমুনা

প্রদর্শনীতে ক্রেতার ভীড়

প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

জায়গার অভাব সত্ত্বেও প্রদর্শনীর দ্রব্যসামগ্রীগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছিল তা সত্যই প্রসংশনীয়। বিশেষ করে বাটিক, ছাপাশাড়ী ও বাচ্চাদের ছোট ছোট জামাগুলো।

'নারী সেবা সংঘে'র হস্তশিল্প সম্পর্কে 'অঙ্গনা'র পাতায় অনেকদিন আগেই সচিত্র আলোচনা হয়েছে। সেই সময়ে আমরা এখানকার সভ্যাদের যে মানের কাজ দেখেছিলাম বর্তমান প্রদর্শনী দেখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় যে বর্তমানে তাঁদের কাজের উৎকর্ষতা আরও বেড়েছে। প্রদর্শনীতে সংঘের তৈরী ছাপা শাড়ী, বাটিক শাড়ী, বাচ্চাদের জামা, পশমের পোশাক লেডিস ব্যাগ, বেড কভার, ন্যাপকিন, টেবিল ক্লথ আরও অনেক জিনিস দেখার এবং কেনার জন্য স্থান পায়। এই প্রদর্শনীটিকে এক কথায় বলা চলে সমিতির সম্পূর্ণ পরিচয়জ্ঞাপক। কথাটি খুব ফেলবার মত নয়, কারণ সমিতির শিক্ষার্থীদের যা যা শেখানো হয় সবই প্রায় প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। আলপনা থেকে শুরু করে বাটিক শাড়ী সবই প্রদর্শনীর অঙ্গে অঙ্গে শোভা এবং সৌরভ বিতরণ করেছে।

এবার সমিতি প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা যাক। সমিতিটিকে এক কথায় বলা যায় বৃহত্তের সম্ভাবনা রূপায়ণের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। নিয়মিত শিল্পশিক্ষা বিভাগ ছাড়াও এই সমিতিতে রয়েছে দুঃস্থা এবং নিরাশ্রয় মহিলাদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা। অবশ্য এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-কল্যাণ **বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন।**

এইসব মহিলাদের আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এদের জন্য অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক: বর্তমানে এরকম মেয়ে সমিতির আশ্রয়ে আছে ৫৩ জন। এখান থেকে শিক্ষালাভ করে এদের মধ্যে অনেকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠালাভও করেছে। সমাজসেবার ক্ষেত্রে সমিতির এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এছাড়া নিয়মিত ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। ঊনষাটজন মেয়ে নিয়মিত এখানে কাজ শেখে। মেয়েদের জন্য নৃত্যগীত শেখানোরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে এবং চিত্তবিনোদনের জন্য নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

নারী সেবা সংঘ আয়োজিত প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দ্রব্য

সেলাইয়ের কথা

(৯)

কোট ফ্রক

মাপ :—
সেস্থ—১২"
ঝুল—২৮"
ছাতি—২৮"
পুট—৬½"
পুটহাতা—১৪"
মুহুরী—৮"
কোমর—২৪"
গলা—১২"

পিছন ভাগ :—
১— ২=সেস্থ+১"
১— ৩=ছাতির ¼—১"
১— ৪=১"
১— ৬=পুট+½"
১— ৫=ছাতির ১/১২
৬— ৭=১" কাঁধের সেপ
৩— ৮=ছাতির ¼+১½"
২— ৯=কোমরের ¼+১½"
১০— ২, ৯ এর ½
১১—১২=½"

সামনা ভাগ :—
১— ২=সেস্থ+১"
১— ৩=ছাতির ¼—১"
১— ৭=পুট+½"
৭— ৮=¼"
১— ৫=ছাতির ১/১২
১— ৬=½"
১— ৪=ছাতির ১/১২+¼"
৯—১০=½"
১১—১৩=১"
৩—১২=ছাতির ¼+১½"

২—১৪=কোমরের ১/৪+১১/২"
৩—২৬=১"
২—২০=লম্বা—সেন্থ+২"
২০—২১=২"
২—১৮=১/২"
২— ৯=কোমরের ১/৪+১"
২০—২২=ছাতির ১/৪+১" বা ২"
২২—২৩=১/২"
২৪—২৫=১/২"
৯—২৭=১/৪" দামট
২২—২৮=১/৪"
কলার :—
১—২=৩"
১—৩=গলার ১/২+১"
২—৫=গলার ১/২+১/৪"
৫—৬=১/২"
হাতা :—
১— ২=পুটহাতা—পুট+১"
২— ৩=১/২"
১— ৪=ছাতির ১/৪—১"
৫, ১—৪ এর ১/২
৭— ৮=১/৪"
৯—১০=১/২"
৩— ২=১/২"
২— ৬=১/২ মুহুরী+১/২"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ চার ॥

মিঃ আর্চার চলে গেলেন সুন্দরীর জন্যে পেছনে রেখে গেলেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত স্মৃতির তীব্র দহন। রাতদিন সে আগুন বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলেই চলেছে। এখনো নিয়মিত কাজে যায় সুন্দরী, ছুটি হলে সকলের সঙ্গে আবার ঘরেও ফেরে। কিন্তু সবটাই যেন জোর করে করতে হয়। নেহাৎ এতদিনের অভ্যেস, তাই যন্ত্রের মত কাজ করে চলে।

তবে আগের মত কোন কাজে আর উৎসাহ বোধ করে না। আগে সকলের প্রয়োজনে লাগত সুন্দরী, সকলে আগে ছুটে আসত ওর কাছে। এখন সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সব দিক থেকেই কাজের বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে সুন্দরীর। এখন অখণ্ড অবসর। গালে হাত রেখে এক মনে বসে কি যেন ভাবে রাতদিন, কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়ে ভাবতে ভাবতে। কখন যে সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় কোন খেয়াল থাকে না। শরীরটা আরো ভেঙে পড়েছে। পরনে ময়লা শাড়ি, মাথায় বোধহয় ইদানীং তেলও দেয় না সুন্দরী। অথচ বরাবরই খুব ফিটফাট থাকতে পছন্দ করত ও। এখন দিন দিন সে উৎসাহও হারিয়ে ফেলছে।

এক একদিন কী ভেবে হঠাৎ কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সন্তর্পণে চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ডিপার্টমেন্টের ছোকরা বাবুর কাছে। বাবু বিস্মিত চোখ তুলে প্রশ্ন করে—কিরে সুন্দরী? কিছু বলবি?

সুন্দরী ক্লান্ত গলায় বলে, আমার মেয়েকে একটা চিঠি লিখে দিন তো বাবু।

মেয়েকে চিঠি লিখতে পারে না সুন্দরী। তার মেয়ে আবার ইংরিজি ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝে না। তাই মেয়ে যখন চিঠি লেখে—পড়াতে নিয়ে আসতে হয় ডিপার্টমেন্টের এই বাবুরই কাছে—কী লিখেছে মেরী, পড়ুন তো বাবু একবার।

নিয়মিত টাকাও পাঠায় মেয়ের কাছে। আর কিছু থাক আর না থাক মেয়েকে কনভেন্টে রেখে লেখাপড়া শেখানর মত টাকা সাহেব রেখে গেছে সুন্দরীর নামে। এখন কেবল ঐ এক চিন্তা. ভালোয় ভালোয় মেয়েটাকে মানুষ করে তুলতে পারলে হয়। যতদিন দূরে থাকে মেয়েটা ততই ভাল। এখানে যেন না আসে। এলে ঐ মেয়েকে কোথায় থাকতে দেবে, কী খাওয়াবে, কী পরাবে...এসব আর ভাল লাগে না চিন্তা করতে। এমন কি ওর ভাষাও বোঝে না সুন্দরী। অবশ্য সে জন্যে দুঃখও হয়, শুধু গর্ভেই ধারণ করেছে মেয়েকে, কিন্তু একদিনও বুক ভরে আদর জানাতে পারল না মেয়েকে। ভাবতে ভাবতে গভীর হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুন্দরী।

এক একদিন আবার বাবুর কাছে এসে বলে, সেদিন সে যে চিঠিটা লিখলেন, সেটা কি মেরী পেয়ে গেছে এতদিনে?

বাবু বিস্মিত চোখ তুলে প্রশ্ন করে তা এখনও যদি না পেয়ে থাকে, দু' একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। কিন্তু কেন একথা জিজ্ঞেস করছিস, বলত?

সুন্দরী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে মনে মনে। তারপর অনুনয়ের স্বরে বলে, দয়া করে আরেকটা চিঠি আজই লিখে দিন বাবু। এবার ছুটিতে মেয়েকে বাড়ি আসবার কথা লিখেছিলাম, খেয়াল হচ্ছে বাবু আপনার? আপনি তো লিখে-ছিলেন চিঠি?

বাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়—খেয়াল আছে।

সুন্দরী আবার বলল—কিন্তু এখন লিখে দিন, যেন ছুটিতে বাড়ি না আসে। টাকা যা লাগে যেন আমায় তাড়াতাড়ি জানায়, আমি পাঠিয়ে দোব!

বাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেন রে? মেয়ে এতদিন পর বাড়ি আসবে, এতে আপত্তি করছিস কেন? অনেকদিন তো আসে নি, মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে করে না তোর?

উত্তরে সুন্দরী শুধু একটু হাসে। সে হাসিতে অজস্র দুঃখ ঝরে পড়ে।

এত দুঃখের মধ্যেও আর এক হুজ্জুতি এসে দেখা দেয় সুন্দরীর জীবনে। যে স্বামী ওকে একদিন ফেলে পালিয়েছিল, আজ আবার সে ওর কাছে ফিরে এসেছে। কিন্তু তাকে দেবার মত সুন্দরীর আজ আর সে কিছুই নেই। শরীর গেছে, মন গেছে, হৃদপিণ্ডটা বুকের মধ্যে থেকে উপড়ে নিয়ে গেছে সাহেব। কিন্তু সে সব কথা গণপতি শুনতে চায় না। সুন্দরী এখন অনেক টাকার মালিক, সে গন্ধ ও ঠিক পেয়ে গেছে এতদিনে। বলে, আমি হলাম ওর স্বামী। স্ত্রীর কাছে আসার আবার সময় অসময় কি? হ্যাঁ, একদিন পালিয়ে গিয়েছিলাম—

সে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করতে অপারগ হয়ে। অবশ্য আজও ওর অবস্থা একই আছে। কিন্তু তার না থাক—স্ত্রীর তো আছে! স্বামী যদি স্ত্রীকে প্রতিপালন করতে পারে, তো স্ত্রী-ই বা করবে না কেন?

অকাট্য যুক্তি! রাগে আর ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে ওঠে সুন্দরীর।

আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক যা হোক! বেহায়া কোথাকার। যে অভিযোগই করা যাক—একটা না একটা উত্তর ওর মুখে লেগেই আছে। বিরক্তির একশেষ। অতএব শেষ পর্যন্ত রণে ক্ষান্ত দিতে হয় সুন্দরীকেই। কেবল মুখের সামনে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

সাহেব চলে যাবার পর এখনো এক বছর পার হয় নি, কিন্তু এর মধ্যেই যেন নিঃশেষ হয়ে পড়েছে সুন্দরী। রোজ রাতে পায়ের উত্তাপ বাড়ে। ক্ষুধামান্দ্য আর অনিদ্রা তো লেগেই আছে। এর ওপর আছে গণপতির চিৎকার ও চেঁচামেচি। এক একদিন আর চুপ করে থাকতে পারে না সুন্দরী। রাগে থরথর করে কাঁপে ওর অশক্ত দেহটা। ঘরের মধ্যে থেকে একাই চ্যালা কাঠ তুলে নিয়ে তেড়ে আসে ওর দিকে! গণপতিও পিছু হটবার লোক নয়! চোখ রাঙিয়ে তেড়ে যায়। নিমেষে যেন কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে যায়।

ইদানীং গণপতির দল ভারি! সমবেত লোককে সাক্ষী মানে। সুন্দরীর ওপর যদিও কেউ অসন্তুষ্ট নয় তবু রোজ এই এক ব্যাপার দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে ওঠে সকলে। একদিন পঞ্চায়েতের সভা ডাকা হল, সভার সিদ্ধান্ত সুন্দরীকে জানান হল—গণপতিকে আগের মত গ্রহণ না করুক, অন্তত আশ্রয়টুকু দিক সুন্দরী। যতই হোক, স্বামী তো ওর।

সুন্দরী পঞ্চায়েতের নির্দেশ মেনে নেয় নি, আবার অমান্যও করে নি। আজকাল আর এসব ভাল লাগে না ওর। থাকে থাক—ঐ পর্যন্ত। স্বামীগিরি না ফলাতে এলেই হল। কিন্তু একটু একটু করে থাবা বাড়িয়েই চলে গণপতি। বুঝেও না বোঝার ভান করত সুন্দরী। তা ছাড়া করার মত সামর্থ্যও ছিল না। শেষের দিকে যেন বড্ড নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। দিন দিন যেন কোথায় তলিয়ে চলেছে। একটুতেই যেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে তেমনি আবার অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়ে। তবু কোনরকমে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু ওর ভাগ্যকে খণ্ডাবে কে? পারের ডাক অনেক আগে থেকেই শুনতে পাচ্ছিল সুন্দরী। অবশ্য সেজন্যে কোন দুঃখ ছিল না ওর মনে, কোন ক্ষোভ ছিল না। কারো প্রতি কোন অভিমানও নয়। চিন্তা শুধু মেরীর জন্যে—সত্যি যদি আর না বাঁচে, তখন কী হবে মেরীর?

ভেবে কোন কূলকিনারা খুঁজে পায় না সুন্দরী। অনেক ভেবেচিন্তে ডিপার্টমেন্টের সেই বাবুকে দিয়ে শেষপর্যন্ত বিলেতে সাহেবের দিয়ে যাওয়া ঠিকানায় চিঠিও লিখিয়েছিল—বোধহয় আর তোমার কথা রাখতে পারলাম না। এবার তুমি দ্যাখ তোমার মেরীকে। আমার যাবার সময় হল। আমি চললাম, ওকে রেখে গেলাম তোমার জিম্মায়।

চিঠি দিতে মন থেকে সাড়া পায় নি সুন্দরী। যে গেছে, চিরদিনের মত সে বিদায় নিয়েছে ওর জীবন থেকে, তাকে আর কেন ডেকে আনা! এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে দয়া, মায়া, প্রেম ভালবাসা—সব মিথ্যে। শুধু পেছন ফিরতে যতক্ষণ! তা না হলে কত কথাই তো বলে গিয়েছিল সাহেব। আর আজ তিনটি সুদীর্ঘ বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে একটা চিঠি লিখেও ওর আর মেরীর খোঁজ নিতে পারল না? তবু নিজে থেকে চিঠি না দিয়েও তো কোন উপায় ছিল না সুন্দরীর। এত বড় পৃথিবীতে মেরীর জন্যে ভাববার তো আর কেউ নেই!

শুধু একটি নয়, উত্তর না পেয়ে সেই বাবুটিকে দিয়ে পর পর আরো দুটো চিঠি লিখেছিল। তবু কোন জবাব এল না সাহেবের কাছ থেকে। এদিকে হাসপাতালে যাবার দিনও এগিয়ে এল। এবার আর চন্দ্রকোণার স্যানেটোরিয়াম নয়—কাঁচরাপাড়ার সরকারী দাতব্য হাসপাতালে স্থান হয়েছে সুন্দরীর। তাও সহজে হয় নি। ইউনিয়ন থেকে অনেক ধরা করার পর।

দেখতে দেখতে শেষেয় সেদিনটাও এসে পড়ল—সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াল সুন্দরী। পেছনে পড়ে রইল বিভীষিকার মত নিষ্ঠুর পৃথিবী, মেয়ের শঙ্কিত ভবিষ্যৎ আর অনিশ্চিত পরিণতি। পড়ে রইল এই বেদনাজর্জরিত হৃদয়ের অনির্বাণ দহন। মৃত্যুর অতল গহ্বরে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল সুন্দরীর নশ্বর দেহ।

॥ পাঁচ ॥

জন্ম এবং মৃত্যু এ মহল্লার জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে অতি সাধারণ ঘটনা। শোক-তাপ, সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার নিরন্তর দোলায় দুলছে এখানকার মানুষের জীবন। পৃথিবীর নতুন আগন্তুককেও যেমন অভিনন্দন জানাবার প্রয়োজন বোধ করে না, মৃত্যুকেও তেমন কেউ বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে না। অবশ্য, মৃত্যু মনের অন্তস্থলে হঠাৎ একটা শোকের তরঙ্গ বইয়ে দেয় ঠিকই, কিন্তু সেটা নিছক সংস্কার। নিস্তরঙ্গ জলাধারে আচমকা ঢিল পড়লে যেমন একটা তরঙ্গ জেগে ওঠে তারপর আবার সব স্থির হয়ে যায় ধীরে ধীরে, তেমনি সুন্দরীও একদিন হারিয়ে যাবে লোকের মন থেকে তাতে আর আশ্চর্য কি!

হয়ত তাই হত, মাত্র পাঁচ ছ' মাসের মধ্যেই সুন্দরীকে এখানের লোকে অনেকটা ভুলেও গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন কোথা থেকে ধূমকেতুর মত এসে হাজির হল মেরী। বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল কনভেন্ট কর্তৃপক্ষ এক পয়সাও পান নি মেরীর অভিভাবকের কাছ থেকে। পর পর অনেকগুলো চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু একটা উত্তরও এ পর্যন্ত পান [illegible] স্বভাবতঃই তাঁরা এবার নিয়মমাফিক [illegible] পথ ধরলেন। এ ছাড়া তাদের কোন গ[illegible] নেই। কোন অবৈতনিক ছেলেমেয়ের এটা কোন অনাথ আশ্রম নয়। [illegible] একদিন প্রতিষ্ঠান থেকে ওর নাম [illegible] করে মেরীকে ফেরৎ পাঠান হল ওর বা[illegible]

আবার এই মহল্লার নিস্তরঙ্গ জ[illegible] আচমকা একটা ঢিল পড়ল। মিঃ [illegible] বিদায় নেবার ঠিক তিন বছর পর এসে পৌঁছল মহল্লায়। ওকে দেখে [illegible] অবাক—সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কথাটাও প্রায় সকলেই ভুলতে বসে ভেবেছিল হয়ত এমন কোন একটা জ[illegible] মেরীকে রেখে গেছে সাহেব যে ওর কখনো এদিকে ফেরার প্রয়োজন হবে তা না হলে, এই দীর্ঘ তিন বছরের একদিনের জন্যেও যেন মেরী আস[illegible] ওর মায়ের কাছে? সুন্দরীই বা কেন [illegible] মেয়ের কথা বলবে না?

নেহাত আগে মেরীকে এখা[illegible] লোকেরা দু'তিনবার দেখেছিল—তা [illegible] কেউ ওকে চিনতেই পারত না। সেই চোখ, সোনালী চুল দুধে আলতার গায়ের রং, দেহের গড়ন, চলন পোশাক-পরিচ্ছদে মনে হয় যেন সাহেবদের মেয়ে পথ ভুলে এসে [illegible] এখানে!

কে একজন গণপতিকে [illegible] জানাতেই ও একটু চমকে উঠল। সু[illegible] মেয়ে মেরীর কথা সে শুনেছে লো[illegible] কিন্তু এ পর্যন্ত তাকে চোখে দেখে সুন্দরী নিজেও কিছু বলে যায় নি[illegible] শুধু তাই নয়, মেরীর অস্তিত্বটা [illegible] অনুভব করার অবকাশ হয় নি ওর।

সুন্দরী মারা যাবার পর ওর পোস্ট-অফিসে গচ্ছিত টাকা, প্রভি[illegible] ফাণ্ডের টাকা প্রভৃতির উত্তরাধিকারী গণপতিই! অবশ্য কোম্পানীর কাছে আদায় করতে অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ [illegible] করতে হয়েছে। পঞ্চায়েতও এই সুন্দরীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির গণপতির দাবি স্বীকার করে [illegible] কোম্পানী ওর হাতে সুন্দরীর প্রাপ্য তুলে দিয়েছিল।

পঞ্চায়েতের কেউ কেউ তবু [illegible] সভার মধ্যে সুন্দরীর মেয়ে মেরীর তুলেছিল, যদিও মেরীর বর্তমানে অ[illegible] ঠিক কী কেউ ভাল করে জানত না। কথাটা যখন উঠলই তখন পঞ্চা[illegible] সভাপতি প্রবোধী সাউ সেই মর্মে শর্ত জুড়ে দিয়েছিল—সুন্দরীর দায়দায়িত্ব এখন থেকে গণপতির, অবশ্য সে কখনো এসে দাবি করে তবেই।

সে শর্ত শুনে গণপতিও এব[illegible] রাজি হয়ে গিয়েছিল। তখন সেটাকে একটা কথার কথা বলেই ধরে নি[illegible] গণপতি। যার কোন অস্তিত্বই আপাতত, তা নিয়ে মাথা ঘামাল

কাজের কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ মেরী যে আজ এমন করে এসে চড়াও হতে পারে, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি ও। তাই অনেকক্ষণ কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সেই লোকটার মুখের দিকে।

ততক্ষণে ছোটখাট একটা ভিড় এসে পৌঁছে গেছে গণপতির ঘরের সামনে। ঘরটা অবশ্য সুন্দরীর সেই আগের ঘর নয়, সেটা ওর মৃত্যুর পরই কোম্পানী দখল নিয়েছে। নেহাত এখনো কিছু সামান্য টাকাকড়ি পাওনা আছে। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত অন্য একজনের ঘরে আপাতত আশ্রয় নিয়েছে। কথা আছে, টাকাগুলো হাতে এলেই দেশে ফিরে যাবে গণপতি।

ভিড় থেকে একজন অপরিচিত লোক এগিয়ে এল ওর ঘরের সামনে,—সুন্দরী কার নাম?

গণপতি কিছু উত্তর দেবার আগেই কে যেন ওর হয়ে পেছন থেকে হঠাৎ বলে উঠল, সুন্দরী তো কবে মারা গেছে। বলেই সংগীদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

পেছন ফিরে ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়েও ওদের ব্যংগ শুনে থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন মনে মনে। তখনো ওর হাত ধরে বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে থাকা মেরীর মুখের দিকে চকিতে একবার বিস্ময় বেদনাহত দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, তা হলে কার সঙ্গে কথা বলব?

সকলে তাড়াতাড়ি গণপতিকে দেখিয়ে দিল।

ভদ্রলোক গণপতির মুখের দিকে কিছুক্ষণ হতভম্বর মত তাকিয়ে থেকে পরে বললেন, যদিও আমি কনভেন্টের কেউ নেই, আমার মেয়েও শিলং কনভেন্টে পড়ে। মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে কলকাতায় ফেরার সময় ওরা আমায় মেরীকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবার কথা বল্ল। আর এই কাগজটাও দিয়ে দিতে বলেছে মেরীর অভিভাবককে মেরীর ছ' মাসের মাইনে আর হোস্টেলের রাহাখরচ অনাদায়ে স্কুল থেকে ওর নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। টাকাটা যেন যথাসম্ভব শিগগির পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উপস্থিত ওর গাড়িভাড়াটা আমায় দিয়ে দিন — আমি চলে যাই। ষাট টাকা দিলেই চলবে—।

টাকা? গণপতির কণ্ঠস্বরে বেদনাহত বিস্ময়ের সুর ফুটে উঠল। অসহায়ের মত করুণ কণ্ঠে বলল, এত টাকা আমি কোথায় পাব বাবুসাহেব?

ভদ্রলোকের মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল। আরেকবার মেরীর মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকালেন। ওর মার মৃত্যুর খবরটা বোধহয় এখনো টের পায় নি। কথাটা ওকে শোনাবেন কিনা ভাবলেন মনে মনে। কিন্তু আবার ভাবলেন, কি দরকার! এমনিতেই মেরীর মত এমন সুন্দর একটা মেয়ের এরকম পরিচয় পেয়ে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। তারপর এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। কিছুতেই যেন নিজের মনের সংগে অবস্থাটার সামঞ্জস্য ঘটাতে পারছিলেন না। কখন নিষ্কৃতি পাবেন এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া থেকে, কেবল তাই ভাবছিলেন। তারপর যা হয় হোক মেরীর, তিনি আর কি করতে পারেন। তাই তাড়াতাড়ি মেরীর হাত ছাড়িয়ে হন্‌হন্‌ করে বস্তির অলিগলি পেরিয়ে অপেক্ষমান রিক্সায় চড়ে বসলেন।

কিন্তু মেরী তখনো হতভম্বের মত ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে চলেছে এ কোথায় এল ও? এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নতুন পৃথিবী, অপরিচিত মানুষজন, দুর্বোধ্য ভাবভঙ্গি আর অবোধ্য ওদের ভাষা! শুনেছে ওর মা আগে এখানে—কিন্তু মা-ই বা কই?

হঠাৎ এতদিন পর মাকে যেন একটু একটু মনে পড়ছে মেরীর। যদিও মার সঙ্গে ওর ভাল করে পরিচয় ঘটেনি। স্তিমিত চেতনার মধ্যে অনেকক্ষণ হাবুডুবু খেল। তারপর হঠাৎ ইংরেজীতে চেঁচিয়ে উঠল, আমার মা কোথায়?

কোন জবাব না পেয়ে বিরক্তিতে ওর গলার স্বর চড়ে উঠল। পেছনে যা চিৎকার করছে নোংরা ছেলেমেয়েগুলো—নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই ভাল করে শুনতে পাচ্ছে না। চুলগুলো ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা পেছনে ঘুরিয়ে ওদের উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল, তোমাদের এখানে কি চাই?

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বিশেষ করে মেরীকে রাগতে দেখে আর মুখ ভেংচে অঙ্গভঙ্গি করতে দেখে ওদের মধ্যে তুমুল হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

সেই সঙ্গে কে যেন পেছন থেকে ওকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, সুন্দরী মরে গেছে।

কথাটা না বুঝলেও ওকেই যে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়েছে, এটা বুঝেছে ও। তাই আবার তেমনি ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল—কি হয়েছে?

নিমেষে ওদের হাসি থেমে গিয়ে সেই একই কথাটা ফিরে এল ওর কানে, তোমার মা মরে গেছে।

ঠিক সেই সময় কি একটা কাজে কারখানার একজন চাপরাশী হরকু ডিউটি থেকে ফিরে এসেছিল নিজের কোয়ার্টারে। এ সময় কারখানা পুরোদমে চলছে, তাই কর্মচারীরা কেউ থাকে না মহল্লায়।

কাজ সেরে আবার কারখানায় ফিরে যাচ্ছিল হরকু, কিন্তু ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে কাছে আসতেই, ভিড়ের লক্ষ্যবস্তু নজরে পড়ল ওর। সুন্দরীর মেয়ে মেরীর কথা ওর খেয়ালই ছিল না। তাই সাহেব বাংলোর একজন মেয়েদের একজনকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হকচকিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে মেরীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন সাহেবের মেয়ে? সিম্পসন সাহেব না জনসন সাহেবের?

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ভিড়ের মধ্যে আবার হাসির হিল্লোল বয়ে গেল—খুব যা হোক আন্দাজ করেছে হরকু?

আবার পেছন থেকে কে একজন বলে উঠল, ও আচারিয়া সাহেবের মেয়ে। সুন্দরী ওর মা। ওকে বুঝিয়ে দাও যে ওর মা মরে গেছে।

হরকু যেন ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ মেরীর দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, নিজেকে সামলে নিল। এতক্ষণে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেছে ওর। কতদিন আগে দেখেছে মেরীকে—তখন কত ছোট ছিল। আজকের মেরীর সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। কিন্তু হরকুর সামনে সমস্যাটা আরো জটিল হয়ে উঠল। —কী করে বোঝায় ওকে ওর মা আর বেঁচে নেই। মেয়েটা যে হিন্দি বোঝে না সে তো বুঝতেই পারছে। অবশ্য সাহেবদের অফিসের চাপরাশী ও। ইংরেজী কিছু কিছু বুঝতে যদিও পারে, বলতে পারে না। মাত্র কয়েকটা শব্দ কোনরকমে শুনে শুনে আয়ত্ত করেছে।

—মেরী এবার হরকুকে সামনে পেয়ে প্রশ্ন করল, ওরা কি বলছে? সুন্দরী কে?

এবার সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুকনো একটা ঢোঁ গিল্ল হরকু। তারপর ইংরাজীতেই বলল, তোমার মা।

এতক্ষণে যেন আশার আলো দেখতে পেল মেরী। নিমেষে ওর মুখখানা খুশীতে ঝলমল করে উঠল, মার নামটা কয়েকবার নিজের মনেই উচ্চারণ করল। তারপর প্রশ্ন করল, কিন্তু আমার মা কোথায়?

কিন্তু ওর কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই হরকুর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মেরীর মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। চোখ দুটো নিমেষে বিস্ফারিত হয়ে উঠল, হোয়াট? বলেই হরকুর দিকে কিছুক্ষণ নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এ এক মহাসমস্যায় পড়ল হরকু! কেন যে মরতে আজ এ সময়ে এসে পড়ল এখানে! কোনরকমে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু মেরী যেভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—উত্তর না দিয়ে নিষ্কৃতি নেই ওর। তাই আবার মুখ খুলতে হল ওকে—হ্যাঁ, সুন্দরী মারা গেছে।

কোনরকমে মেরীকে কথাগুলো বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গণপতির ওপর রাগে ফেটে পড়ল হরকু, এই গণপতি তুই ওকে সব বুঝিয়ে বল না।

...হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। হরকুর কথার জবাব দিতে গণপতি কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেরী। ঘরের সামনের উঁচু বারান্দায়

ওপর বসে পড়ে দুটো হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল মেরী।

একা গণপতিই নয়, সমবেত সকলেই হকচকিয়ে উঠল ওর কান্না শুনে। কী করুণ স্বরে ফুলে ফুলে কাঁদছে মেরী। এতদিন ওর মা মরে গেছে, অথচ তার কিছুই জানে না বেচারা! কী যে হবে মেয়েটার কে জানে! সকলের চোখ জলে ভরে উঠল।

সারাদিনটাই একভাবে বসে কাঁদল মেরী। কে'দে কে'দে চোখ মুখ ফুলে উঠেছে, কেমন একটা বুকফাটা অসহায়, করুণ কান্নায় দমকে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে মেরী। এমন কেউ নেই যে ওর কাছে এগিয়ে এসে সান্ত্বনা দেয়। দুটো সমবেদনার কথা বলে। অথচ সেই সকাল থেকে ওর ঠিক মুখের সামনেই একপাল কৌতূহলী মানুষের ভিড় রয়েছে। বেলা যত বাড়ছে, লোকের ভিড় আরো বাড়ছে। কারখানার ছুটির পর ভিড় আরো বাড়ল। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন, কে মেয়েটা? এমন করে কাঁদছে কেন? সুন্দরীর মেয়ে? আহা...!

সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছে গণপতি। এ অবস্থায় কি যে ওর করা উচিত কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ তাকে সকলের কৌতূহল মেটাতে হচ্ছে, সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। তার ওপর এখানে এসে পৌঁছনর পর থেকে কিছু খায় নি মেয়েটা। নিজের ভাষাতে কয়েকবার, কি খাবে মেরী, জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু কোন উত্তর পায় নি। সকাল থেকে সমানে কে'দেই চলেছে। এমন বিপদ যে মানুষের হয় জানা ছিল না ওর।

ক্রমে ক্রমে বিকেল গড়িয়ে, সন্ধ্যে নামল। কে'দে কে'দে কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল মেরী। কথা বলতে গেলেই ফুঁপিয়ে কে'দে ফেলছে আরো। সন্ধ্যেবেলা বড়সাহেবের গাড়ি গ্যারেজে তুলে রেখে নিজের কোয়ার্টারে ফিরল রামাশীষ তেওয়ারী। সাহেবমেমদের ব্যক্তিগত জীবন-ধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে ওর। চলতি ইংরিজি কিছুটা বুঝতে এবং বলতে পারে। কতদিন আগে, কত ছোটবেলায় দেখেছে মেরীকে। দুবার ওকেই সাহেব পাঠিয়েছিল, কুঠিতে মেরীকে শিলং-এর কনভেণ্ট থেকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে। বিশেষ করে মিঃ আর্চারের চলে যাবার দিনটার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে ওর। সেদিন মেরীর জন্যে সাহেবের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু মাত্র দুটি বছরের মধ্যে যে তার এমন পরিণতি হতে পারে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না তেওয়ারী।

সে রাতটা তেওয়ারী নিজের কাছে এনে রাখল মেরীকে। রাতে যা যা খেতে পারে ও, বাজার থেকে সে সব জিনিস কিনে আনতে পাঠাল গণপতিকে। এ মহল্লায় রামাশীষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিটাই একটু স্বতন্ত্র। এখানে একাই থাকে। বউ ছেলে মেয়ে থাকে দেশে। নিজের সব প্রয়োজন নিজেকেই করে নিতে হয়। তবু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একখানা মাত্র ঘর, সামান্য কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস—কিন্তু বেশ পরিষ্কার করে গোছান। ড্রাই ব্যাটারীর একটা রেডিও সেটও আছে ঘরে। দড়ির খাট মাত্র একটা, মেরীর জন্যে আরেকটা কোথা থেকে যোগাড় করে নিয়ে এল। তার ওপর মেরীর জন্যে বিছানা করে পরিষ্কার একটা চাদর বিছিয়ে দিল। যতটা সম্ভব মেরীর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করল তেওয়ারী।

তবু মেরীর অস্বস্তি কাটতে চায় না! ঘরের মধ্যে ঢুকেই প্রথমটা তো ওর দম বন্ধ হয়ে ওঠার যোগাড়। রামাশীষ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল, আজ রাতটা কোন-রকমে কষ্ট করে থাক। কে'দে আর কী করবে বল! সকাল হোক, সকলকে বলে দেখা যাক্ যদি ভাল বন্দোবস্ত করা যায়।

সকাল থেকেই সেই এক জামা-কাপড়েই রয়েছে মেরী। পায়ে জুতোজোড়াটাও খোলে নি। রামাশীষ ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নিজেই খুলে দিল জুতোটা। একটা পরিষ্কার ডিসে করে মাখন-রুটি, সন্দেশ এনে রাখল ওর সামনে, টেবিলের ওপর। কিন্তু কিছুতেই মুখে তুলবে না মেরী। বরং নতুন করে কান্নার আবেগটা আবার বেড়ে ওঠে, আমি এখানে থাকব না...কিচ্ছু খাব না...আমাকে এক্ষুনি রেখে এস আমার স্কুলে।

বিব্রতবোধ করে রামাশীষ। সারাদিন পরিশ্রমের পর ওসব উড়ো ঝঞ্ঝাট আর ভাল লাগে না। কিন্তু এইটুকু একটা অসহায় অবুঝ মেয়ের ওপর রাগ করাও নিরর্থক। অনভ্যস্ত জায়গায় এসে পড়ে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। অন্তত দিন কয়েক তো থাক ওর কাছে। তারপর যা হবার হবে!

তাই মনের বিরক্তি চেপে আবার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, বেশ ফিরে যেও তোমার স্কুলে। তবে আজকের রাতটা তো থাক এখানে। খেয়ে নাও যা পার। না খেয়ে তো থাকতে পারবে না!

এবার কান্না থামিয়ে রামাশীষের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেরী। বোধহয় মনে মনে তেওয়ারীর দেওয়া আশ্বাসকে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করল। তারপর আব্দারের সুরে প্রশ্ন করল, ঠিক বলছ তুমি? কাল সকালেই আ[মাকে] স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসবে?

কী যেন বলতে যাচ্ছিল রামা[শীষ] কিন্তু কোনক্রমে জিভের ডগা থেকে সা[মলে] নিল কথাটাকে। তারপর বলল, নিশ্চ[য়]। আজ তো তুমি ঘুমোও।

সে রাতটা এমনি করেই কাটল। স[কালে] রামাশীষকে কাজে বেরুতে হবে। গণপ[তিকে] ডেকে কখন খেতে দিতে হবে মের[ীকে] বুঝিয়ে দিল। পঞ্চায়েতের সভা[পতি] প্রবোধীকেও বিষয়টা সব জানাল—এ[কটা] কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বের[োবার] সময় মেরীকে স্তোক দিয়ে গেল, ওকে [স্কুলে] পাঠাবার ব্যবস্থা করতেই বেরুচ্ছে ও। [সারা] দিন যেন ভাল মেয়ের মত চলে, সব [ার] কথা শোনে। আর গণপতি যা খেতে [দেয়] তাই যেন খায়। মহল্লার ছেলে-মে[য়েদের] সঙ্গে যেন খেলা করে...।

ঘুম থেকে উঠে দড়ির খাটে ঝুলিয়ে জুতো-মোজাটা পরে নিচ্ছিল [মেরী।] তেওয়ারীর নির্দেশ শুনে যেন [শিউরে] উঠল, ইস, ঐ নোংরা লোকটার কাছে [আমি] খাব না কিছুতেই। আর ঐ কদাকার [ছেলে-মেয়ে]গুলোর সঙ্গে কিছুতেই খেলব না...।

ছিঃ তুমি খুব ভাল মেয়ে। যা [বলে] গেলাম শুনবে। তা না হলে আমি খুব [রাগ] করব তোমার ওপর।

চলে গেল রামাশীষ। যাবার আ[গে] গণপতির জিম্মায় রেখে গেল মেরীকে।

ক্রমে দিনের উত্তাপ বাড়তে লাগ[ল।] সকাল গড়িয়ে বেশ বেলা হল। কিন্তু এ[কটা] টুলের ওপর সেই থেকে বসেই আছে মে[রী।] আবার সেই ছেলে-মেয়েগুলো দল বে[ঁধে] জমা হয়েছে ওর চারিদিকে। সব বলা[বলি] করছে ওকে দেখিয়ে। আজ কিছু বয়[স্ক] মেয়ে-বউ বাচ্চা কোলে করে এসেছে ও[কে] দেখতে। কৌতূহলী চোখ মেলে দে[খছে] আর নিজেদের মধ্যে ওকে নিয়ে হাসাহ[াসি] করছে। মেরী যেন একটা বিশেষ দ্র[ষ্টব্য] বস্তু ওদের চোখে। সকলের বিস্ময় [ও] কৌতূহলের খোরাক জুগিয়েছে [যেন] মেরী। এক-একবার ভেতরে ভেতরে বো[ধহয় ফুঁসে] উঠছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, তড়াক করে [উঠে] দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশ্য করে কি সব বল[ছে]। তবু ভিড় সরে না, কেউ ওর কথায় গা [করে না,] দিতে চায় না। বরং নিজেদের মধ্যে হা[সির] আরো হুল্লোড় পড়ে যায়।

আবার আরেকজন তারই মধ্যে গে[ল] কানের কাছে বলল, তেওয়ারী চাচা তো[মায়] আমাদের সঙ্গে খেলতে বলে গেছে।

মেরী কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তা[কিয়ে] থাকে ওদের দিকে। এক বর্ণও বো[ধগম্য] হয় না ওদের কথা।

(ক্রমশ

পথের দুপাশে
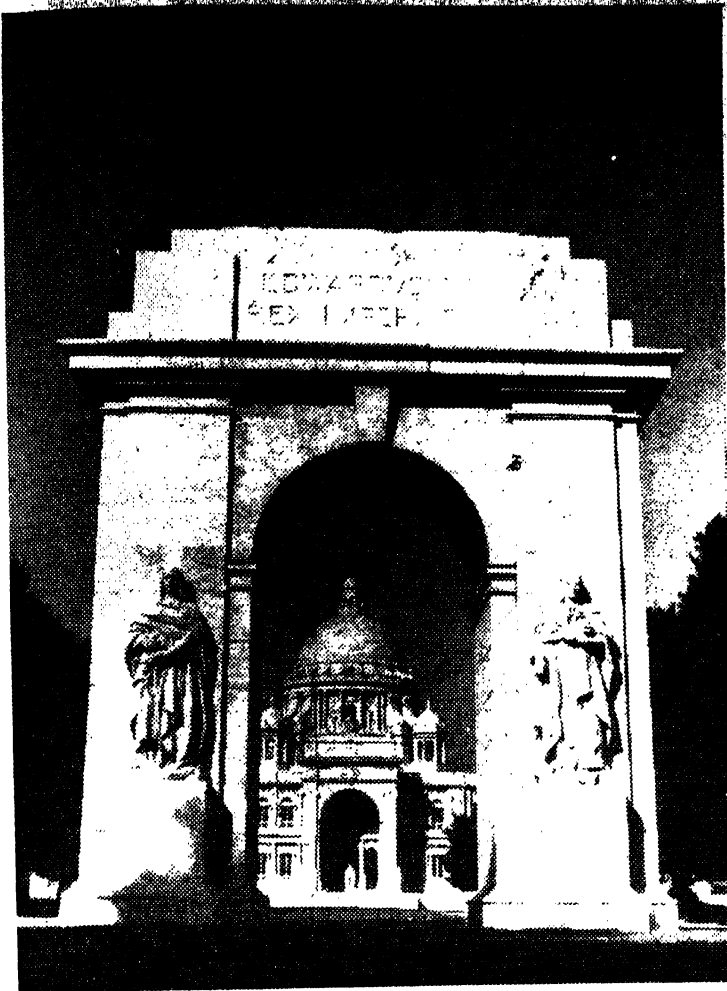
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

ময়দানের এই দিকটাই অনেকটা শান্ত। নীরব যেন সমস্ত পরিবেশটা। সকাল থেকে সন্ধ্যা অশ্রান্ত মানুষের কোলাহল এবং গাড়ীঘোড়ার যাতায়াত যেন এই পরিবেশটাকে এতটুকুও উত্যক্ত করে না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সবুজ ছাওয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সমস্ত ময়দানটাকে কেমন মোহময় লাগে। বিরাট সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন ভিক্টোরিয়া। তার থেকেও বিরাট ছিল তাঁর অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য। শতাব্দীর পথে ফেলে আসা সেই দিনগুলি আজও যেন প্রহর গুনছে এই স্মৃতিসৌধের চতুর্দিক জুড়ে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দেখবার আকর্ষণ বোধ হয় এদেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই রয়েছে। তা নাহলে প্রতিদিন এত মানুষের ভিড় হবে কেন। ভেতরে দেখবার ব্যবস্থাও চমৎকার। সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আছেন ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীসুনীলকুমার কর। যাঁরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দেখতে যাবেন, এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে উপকৃত হবেন।

ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্ট-এর প্রেসিডেন্ট সার উইলসন এমারসন নক্সা প্রস্তুত করেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের। সঙ্গের বাগানের নক্সাও তিনি করেছিলেন। স্যারাসেন্ স্কুল এবং রেনেসাঁ শিল্পকলার এক আশ্চর্য সমন্বয় হল এই স্মৃতিসৌধটি। সমস্ত স্মৃতিমন্দিরটির রাজকীয় শিল্পসুষমা সুন্দরতম মুক্তার মত শুভ্র আবরণ খোদাই করা মূর্তির শিল্পরূপ ব্রিটিশ স্থাপত্যকলার এক সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর সঙ্গে নির্মিত হয়েছে ইটালীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং ভারতীয় কর্মীগরী দক্ষতার চরমোৎকর্ষ।

লর্ড কার্জন মহারাণীর প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে একটি সুগোত্তীর্ণ কীর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। এই স্মৃতিভবনটি কোথায় নির্মিত হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কার্জন দিল্লী অপেক্ষা কলকাতাকেই বেশী পছন্দ করতেন। অনেক চিন্তার পর বর্তমান স্থানটি নির্বাচন করা হয়। তখন এখানে ছিল একটি জেলখানা। জেলখানা ভেঙে ফেলা হয়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের নির্মাণকার্য সুরু হয়েছিল ১৯০৪ খৃঃ। ফাউন্ডেশন স্টোন স্থাপন করেন ১৯০৬ খৃঃ জানুয়ারী মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলস। ১৯২১ খৃঃ নির্মাণ-কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হলেও উপর দিকের কাজ কিছু বাকি থেকে যায়। ১৯৩৫ খৃঃ-এর মধ্যে সে কাজও শেষ হয়েছিল। মাথায় যে মনোরম শিল্প-নিদর্শনগুলি রয়েছে তা হল প্রখ্যাত শিল্পী ড্রুনির তৈরি।

স্মৃতিসৌধ নির্মাণে খরচ পড়েছিল প্রায় এক কোটি দশ হাজার টাকা। সময় লেগেছিল ত্রিশ বৎসর। প্রায় ৩,৫০০ হাজার দর্শনীয় বস্তু আছে এখানে। চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য, পান্ডুলিপি, যুদ্ধাস্ত্র, মেডেল, মুদ্রা আছে প্রায় পঁচিশটি গ্যালারিতে। মোঘল-যুগের প্রারম্ভকাল থেকে ভারত ইতিহাসের বিচিত্র উপাদান এখানে সংগৃহীত হয়েছে। কেবলমাত্র ইতিহাস নয়, চিত্র-শিল্পের সংগ্রহও মূল্যবান। সার জসুয়া রেনল্ড, জন জোফানি টমাস ড্যানিয়েল, উইলিয়ম হজেস, রাজা রবিবর্মা বর্সা এবং আরো অনেকের মূলচিত্র আছে এখানে। তাছাড়া আছে বহু বিখ্যাত শিল্পীর কপিকরা চিত্র।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ ফুট, চওড়া ২২৮ ফুট এবং ২০৫ ফুট উঁচু। প্রতি বৎসর প্রায় ২,৫০,০০০ জন দর্শক আসে এখানে।

এবারে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের আকর্ষণীয় সংগৃহীত দ্রব্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। এসব জিনিসের আকর্ষণ একবারের নয়, বহুদিনের।

উত্তরদিকের হল মনোরম সুপ্রশস্ত প্রবেশপথ। এনট্রান্স হলে আছে সপ্তম এডওয়ার্ড এবং রাণী আলেকজান্ডার ব্রোঞ্জ নির্মিত আবক্ষমূর্তি। জর্জ ফ্রাম্পটন নির্মিত রাণী মেরীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি, সার বার্টরাম ম্যাকেকন্যাল নির্মিত রাজা পঞ্চম জর্জের মূর্তি. রাজা তৃতীয় জর্জ এবং রাণী চার্লোটি সোফিয়ার পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। সার উইলিঅম এমারসনের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মডেলটিও এখানে আছে।

রয়েল গ্যালারীতে ঢোকবার মুখেই আছে ব্রোঞ্জনির্মিত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের আবক্ষমূর্তি, ভিক্টোরিয়ার পিয়ানো, শেষ চিঠি, রাইটিং ডেস্ক, 'দি ম্যারেজ অফ কুইন ভিক্টোরিয়া' এবং তাঁর জীবনের বহু ঘটনার চিত্র আছে। সপ্তম এডওয়ার্ডের একটি সুবৃহৎ রঙীনচিত্র এবং আরো কয়েকটি চিত্র সংগৃহীত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজ দলীপ সিংজী প্রভৃতির আলেখ্য আছে। রুশ-শিল্পী ভেরাশ্চেগিনের আঁকা

এশিয়ার সর্ববৃহৎ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ চিত্র 'স্টেট এনট্রি অফ কিং এডওয়ার্ড, হোয়েন প্রিন্স অফ ওয়েলস ইন টু জয়পুর ১৮৭৬ খৃঃ এখানকার একটি মূল্যবান সংগ্রহ।

সংগৃহীত লেডী কার্জনের ভারতীয় পোষাক, কুইন আলেকজান্ড্রার জন্য নির্মিত ভারতীয় পোষাক -দুটি হোল ভারতীয় এম্ব্রয়েডারির আশ্চর্য-সুন্দর নমুনা।

ত্রিপুরার বর্ম, রাজস্থানের কোটা অঞ্চলের অস্ত্রশস্ত্র আছে এখানে।

জর্জ লয়েলের দেওয়া কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। টভার্নিয়ের এবং বার্নিয়েরের দুটি ছোট ছবি আছে।

পলাশী যুদ্ধের পর যে কামানের গোলাটি পাওয়া গিয়েছিল, সেটি যুদ্ধক্ষেত্রের একটি মডেল তৈরি করে রাখা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথমদিককার জাহাজের একটি মডেল 'আলমগীর' কাচের আবরণের মধ্যে আছে।

পোট্রেট গ্যালারীতে আছে দ্বারকানাথ ঠাকুর, আলেকজান্ডার ডাফ, মধুসূদন দত্ত, চার্লস মিডপেনাল মেটকাফ, লর্ড উইলিঅম বেণ্টিংক, মেজর জেনারেল সার হেনরী রলিনসন, কেশবচন্দ্র সেন, অ্যাডমিরাল, চার্লস ওয়াটসন ও তাঁর পুত্র, আর্কটের নবাব এবং আরো অনেকের সুবৃহৎ তৈলচিত্র।

মেজর জেনারেল স্ট্রিঙ্গার লরেন্সের যে চিত্রটি আছে তা জসুয়া রেনল্ডের আঁকা। লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড ডালহৌসির মূর্তিও আছে এখানে।

তাছাড়া আছে টিপু সুলতানের ডায়েরী, ফারদৌসীর শাহনামার কপি, আবুল ফজলের আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরীর কপি, তুলসীদাসের মহাভারত, চিত্রিত পারসী পাণ্ডুলিপি আছে এখানে।

জাহাঙ্গীরের সময় (১৬১০ খৃঃ) মীর ইমাদের কপিকরা পারস্য সাহিত্যের সংকলনের সাত ভলিউম উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। প্রতি অক্ষর উৎকীর্ণ করণের জন্য এক মোহর ব্যয় হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র-সংগ্রহ, মুর্শিদাবাদের অস্ত্র, হায়দ্রাবাদের অস্ত্র, ভূপালের অস্ত্র এবং আরো কয়েকটি স্থানের অস্ত্র সংগ্রহ আছে। টিপু সুলতানের রকেটটিও রয়েছে।

রয়েল গ্যালারীর বর্ধিতাংশে একটি বড় আকর্ষণ হল মূল্যবান চিত্র কুইন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান সারভেন্ট। ছবিটি নিয়ে গবেষণা চলছে। এই আর্দালীর পরিচয় খুব শীঘ্রই জানা যাবে বলে বর্তমান কিউরেটর মিঃ সেনগুপ্ত আশা করছেন।

মাঝখানে আছে কুইন্স হল। এটি স্থাপত্যকলার সুন্দর নিদর্শন। মাঝখানে রাণী ভিক্টোরিয়ার সুদৃশ্য পূর্ণাবয়ব মূর্তিটি ব্রোঞ্জের তৈরি। ওপরদিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটি ঘটনার ফ্রেস্কো এঁকেছিলেন ফ্রাঙ্ক স্যালিসবেরি।

জাতিতে জার্মান জোহান জোফানি ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত শিল্পী। তিনি এদেশে এসে বহু ছবি এঁকেছিলেন। তার মধ্যে মিসেস হেস্টিংসের সুবৃহৎ চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত ছবির সংখ্যা কম নয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে জোফানির আঁকা ন'খানা ছবি আছে। হেস্টিংসের একটি বড় ছবি এঁকেছিলেন জে টি সিটন। হেস্টিংস সমসাময়িক আরও অনেকের ছবি আছে এখানে। হেস্টিংসের বিভিন্ন বয়সের ছবি এবং নানা শিল্পীর চোখে হেস্টিংসের চিত্রগুলি এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। সমস্ত ছবি একটি স্বতন্ত্র গৃহে রাখা হয়েছে। এখানে হেস্টিংসের সমসাময়িক আরো অনেকের ছবি আছে। মিসেস হেস্টিংসকে মিরজাফরের বেগম মণি বেগম যে হাতির দাঁতের তৈরি চেয়ার এবং টিপয় উপহার দিয়েছিলেন, সেটি এখানে রাখা হয়েছে। হেস্টিংস-এর বেড়াবার কারুকাজ ছড়িটিও সংগৃহীত হয়েছে।

জোফানির আঁকা 'হেস্টিংস ইন লাক্ষ্ণৌ ১৭৮৬', 'দি এমব্যাসি অফ হায়দার বেগ টু ক্যালকাটা,' 'লর্ড কর্নওয়ালিস রিসিভিং দি সন অফ টিপু সুলতান' ছবিগুলি এখানকার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

একটি সুবৃহৎ কক্ষে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সুবৃহৎ আলেখ্য রাখা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাজা রামমোহন, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মোট পনেরখানা চিত্র আছে এখানে। আরো কয়েকখানা চিত্র শীঘ্রই স্থাপন করা হবে। এর বেশীর ভাগ ছবিই শিল্পী অতুল বসুর আঁকা। বিশেষ করে, তাঁর আঁকা রাজা রামমোহনের ছবিখানি তুলনাহীন।

এই ঘরেই আছে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ হেনরী পিটোন ফস্টারের ইংলিশ-বেঙ্গলী (১৭৯৯ খৃঃ প্রকাশিত) ডিকসনারীর একটি সুবৃহৎ খন্ড। এই শ্রেণীর প্রথম কাজ করে ফস্টার বাংলাভাষার মহৎ উপকার করেছিলেন। পারসীর পরিবর্তে বাংলাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাভাষার স্থানদানে তাঁর অবদান অনন্য। তাঁর ডিকসনারী আদালতের কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হোত। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পন্ডিত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিঅম জোন্স সংস্কৃত পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহযোগিতায় মনুসংহিতার যে অনুবাদ করেছিলেন তার পান্ডুলিপি আছে এই ঘরে। তাছাড়া আছে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র দিগদর্শনের এক কপি ১৭৮৪ খৃঃ প্রকাশিত ক্যালকাটা গেজেটের প্রথম খন্ড। মেজর রেনেলের 'জার্নাল অফ সার্ভেস ইন বেঙ্গল'-এর পান্ডুলিপি। অমূল্য সংগ্রহ হোল এটি।

এই ঘরের অপর শোকেসে আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, চিত্তরঞ্জন দাসের কবিতার পান্ডুলিপি, কেশবচন্দ্র সেনের আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা, বিবেকানন্দের হস্তলিপির ফটোচিত্র, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে যে যুক্তি সংগ্রহ করেছিলেন, তার ফটো-চিত্র। তাছাড়া আছে মধুসূদনের 'ক্যাপটেন্ট' কবিতার বাংলা এবং ফরাসী অনুবাদের ফটো-চিত্র।

এই ঘরেই আছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার টেবিলটি।

সরকারী দলিল ও নথীপত্র বিভাগে কোম্পানী আমলের যে মূল্যবান সংগ্রহটি রয়েছে ইতিহাসের গবেষক মাত্রেরই কাছে তা উল্লেখযোগ্য উপাদান। বিভিন্ন সময়ে কোম্পানীর নানাজনের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, সেগুলি কেসের মধ্যে সযত্নে রাখা হয়েছে। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল ফারসী কপি ও তার ইংরেজি অনুবাদ, নন্দকুমারের সম্পত্তির বিবরণ আছে।

এখানে বাংলার নবাবদের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের সংগ্রহ আছে। বিশেষ করে নবাব আলিবর্দীর চিত্রের সংগ্রহটি এখানকার বিশেষ আকর্ষণ।

তাছাড়া এখানে আছে কেরী এবং তার পন্ডিতের একটি ছবি। ভারতবর্ষে প্রথম কাগজ কল প্রতিষ্ঠা, সমাচার দর্পণ এবং ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক এবং শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জন ক্লার্ক মার্শম্যানের আলোকচিত্র। ডেভিড হেয়ারের একটি ছবি আছে এখানে। ১৮৫৮ খৃঃ ২৫ জুন ১ জিগ-জ্যাগ লেন কালীতলা থেকে প্রকাশিত রাজা রামমোহনের একটি ছবি আছে। কলকাতার কয়েকটি মূল্যবান ম্যাপ আছে এখানে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় টেলিগ্রাফে ইংরেজদের সংবাদ প্রেরণের দুটি আলোকচিত্র রাখা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে আরো কয়েকটি মূল্যবান জিনিস ও তথ্যের সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রিন্সেস হল বা স্কাল্পচার গ্যালারীতে আছে সার হেনরি হ্যাভলক, জেমস আউটরাম, জন নিকলসন, লর্ড ক্যানিং, জেমস নীল, সার উইলসন হান্টার, চার্লস জেমস ফক্সের আবক্ষমর্মরমূর্তি। 'ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা' প্রণেতা হেনরী বাস্টীডের একটি আবক্ষমূর্তি আছে। রেনেল নির্মিত ক্লাইভের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি আছে।

পিতলের তৈরি কামান আছে। কিশোরদাস কর্মকার রাজা কৃষ্ণ রায়ের জন্য তৈরি করেছিল। এর ওপর বাঙলা হরফে লেখা আছে।

সংগৃহীত অপর কামান দুটি ছিল ফরাসীদের। পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌলার পক্ষে যারা সী কমান্ডার সিনফ্রে আক্রমণ শুরু করেছিল এই কামান দিয়ে। ইংরেজরা এদুটি দখল করে নিয়ে আসে।

টমাস ড্যানিয়েল এবং উইলিআম ড্যানিয়েলের আঁকা ছবির সংগ্রহটি ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের সব থেকে বড় আকর্ষণ।

লর্ড অকল্যান্ডের বোন এমিলি ইডেনের আঁকা বেশ কয়েকটি ছবি শিল্পীর বিবরণসহ সাজান আছে।

জেমস হান্টারের 'ভিউস অফ মহীশূর (১৮০৫)' অনেকগুলি ছবির সংগ্রহণ এটকিনসনের জলরঙে আঁকা 'ক্যাম্পেইন ইন ইন্ডিয়া ১৮৫৭' সিপাহী বিদ্রোহের একুশ-

খানা ছবি। গঙ্গার ধারের কয়েকটি গ্রাম, ঘাট এবং নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি আছে।

ড্যানিয়েলের একটি সুবৃহৎ বিখ্যাত ছবি হল 'বেনারস'। পুরনো কলকাতার যে বারখানা ছবি এঁকেছিলেন ড্যানিয়েল সেগুলি একত্র রাখা হয়েছে। প্রিন্সেস হলের পাশেই ড্যানিয়েলস রুমে।

'ম্যামালস, বার্ডস অ্যান্ড রেপটাইলস অফ ইণ্ডিয়া' রবার্ট হে'মের আঁকা রঙীন চিত্রের সংগ্রহ। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে এটি দান করেন মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। '১৮৪৭ রিকালেকশনস অফ ইণ্ডিয়া' চার্লস হার্ডিঞ্জের আঁকা ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানের চিত্র। রাজপুত রাজন্যবর্গ এবং প্রধানদের ৬৩ খানি ছবির একটি অ্যালবাম আছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে আঁকা। স্যামুয়েল ডেভিসের তেরখানি ওয়াটার কলার রয়েছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ, চেপেল রয়েল, সেন্ট জেমস্ (১০ ফেব্রুয়ারী ১৮৪০)

মুঘল পেন্টিং, রাজপুত পেন্টিং, মিনিয়েচার পেন্টিং মূল্যবান সংগ্রহ। এর মধ্যে আছে, আকবর, কবীর, নানক, রাণা প্রতাপ সিংহ, বৈরাম খাঁ, দারা-শিকোর ছবি। জাহাংগীর, আকবরের দরবার অর্ধনারীশ্বর হাতির দাঁতের ওপর আঁকা দিল্লীর রাজন্যবর্গের মিনিয়েচার চিত্রটি মূল্যবান। জেনারেল ভন স্কটল্যান্ডকে মহারাজা রণজিৎ সিংহ উপহৃত পান্নাখোচিত তরবারি, টিপু সুলতান এবং হায়দার আলির কারুকার্যময় তরবারি আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীল, টাউন হলের জন্য লটারী কমিটির দুটি টিকিট, কয়েকটি সুদৃশ্য তিব্বতীয় পাণ্ডুলিপি বিশেষ আকর্ষণীয়। ওয়ারেন হেস্টিংস এবং ফিলিপ ফ্যান্সিসের ডুয়েল লড়াইয়ের কাহিনীটি বেশ মনোরম। এই ডুয়েলে তারা যে পিস্তল দুটি ব্যবহার করেছিলেন সেদুটি একটি কেসের মধ্যে আছে। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ অফ রায়পুরের একটি সুবৃহৎ চিত্র এবং পোষাক, লর্ড কার্জনের পোষাক, ১৯১৭ খৃঃ মে মাসে গঠিত ইম্পেরিয়াল ওয়ার ক্যাবিনেটের আলোকচিত্র, তৃতীয় এডওয়ার্ডের পোশাক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের বড় আকর্ষণ প্রাচীন কলকাতার অসংখ্য চিত্র এবং মানচিত্র। এগুলি একত্র করে গ্রন্থাগারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রিন্স অফ ওয়েলস (৭ম এডওয়ার্ড)এর শোভাযাত্রা, জয়পুর	ভেরাশ্চেগিন অংকিত

পাইলট বেলনুন, ঘনুড়ি এবং সাহিত্য

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊর্ধ্বাকাশের বিভিন্ন স্তরে বায়ুর গতি এবং বেগ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আবহাওয়া দপ্তরে একরকম বেলনুন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বেলনুনকে বলা হয় পাইলট বেলনুন। প্রথমে হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ করে বেলনুনটি আকাশে ছেড়ে দেয়া হয়। নীচে থিয়োডলাইট নিয়ে তৈরী থাকেন পর্যবেক্ষক। এই থিয়োডলাইট জিনিসটা আসলে হচ্ছে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র মাত্র, যাকে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব সমতলে (হরাইজণ্ট্যাল অ্যাণ্ড ভার্টিকাল প্লেন) ইচ্ছানুসারে ঘোরানো যায়। আভ্যন্তরিক হাইড্রোজেন গ্যাসের ঠেলা খেয়ে খেয়ে বেলনুনটি যখন ক্রমশঃ উঁচুতে উঠতে থাকে, পর্যবেক্ষক তখন থিয়োডলাইটের স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উড্ডীয়মান বেলনুনটিকে সর্বদা চোখে চোখে রাখেন। থিয়োডলাইটের সঙ্গে অবশ্য একটি অনুভূমিক এবং একটি উল্লম্ব স্কেলও যুক্ত থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (সাধারণতঃ এক মিনিট) এই দুটি স্কেলের পাঠ গ্রহণ করে পর্যবেক্ষক বিভিন্ন উচ্চতায় বেলনুনটির ঊর্ধ্বাকাশের অবস্থান অনায়াসে নির্ণয় করে নিতে পারেন ত্রিকোণমিতির সূত্রের সাহায্যে। এখন, যেহেতু কোনও সুতো বা অন্য কোনও কিছু দিয়ে বেঁধে এই পাইলট বেলনুনটির গতিবিধি নীচে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে না কেউই, বেলনুনটি সম্পূর্ণভাবে বাতাসের স্রোতের অভিমুখেই সর্বক্ষণ চলবে, এবং পূর্ববর্ণিত উপায়ে এর অবস্থান নির্ণীত হয়ে যাবার পর, বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের গতি এবং বেগ নির্ধারণ করা সহজেই সম্ভবপর হয়। সেইজন্যে আবহবিজ্ঞানে এই পাইলট বেলনুনের এত সমাদর।

ঘুড়িও আকাশে ওড়ে, তবে তাত লঘুভার-হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ পাইলট বেলনুনের মতো আর্কিমিডিসের প্লবতার সূত্র অনুযায়ী নয়। ঘুড়ি ওড়ে ওপরে এবং নীচে বাতাসের চাপের তারতম্যের প্রভাবে। তবে, ঘুড়ি এবং পাইলট বেলনুনের আকাশে বিচরণ করবার মূলসূত্রের পার্থক্যের চেয়েও যেটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে এই যে, ঘুড়ি সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে, আর পাইলট বেলনুন বাধাবন্ধহীন। সে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় উন্মুক্ত আকাশে বাতাসের স্রোতে অবাধে গা ভাসিয়ে দিয়ে।

ঘুড়ি এবং পাইলট বেলনুনের আকাশ-ভ্রমণের এই প্রভেদটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ সাহিত্য এবং অবশিষ্ট সাহিত্যের পার্থক্যের মূলে কথা।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর পাইলট বেলনুন যেমন কোনও নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখে নিজের গন্তব্যপথ নিজেই খুঁজে নেয়, প্রকৃত সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রগুলিও তেমনি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের যাত্রাপথে নিজেরাই অনায়াসে অগ্রসর হয় নদীর স্রোতের মতো স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে। পরিমাণ মতো হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে চরিত্রগুলিকে একবার সচল করে দিতে পারলেই সাহিত্যিকের কাজ প্রায় শেষই হয়ে যায়। তখন বাকি থাকে শুধু থিয়োডলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাইলট বেলনুনের মতো তাদের সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা, এবং অনুভূমিক ও উল্লম্ব স্কেলের রিডিংগুলি পর পর নিয়ে যাওয়া। স্কেলের এই রিডিংগুলিই তারপর অমর সাহিত্য সৃষ্টি করে পাতার পর পাতা।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক। ধরুন, ওথেলো। মহাকবির এই নাটকটিতে প্রথম থেকে শেষ অবধি আমরা শুধু দেখতে পাই যে ইয়াগো ক্রমাগত ওথেলোর কান ভারী করে গেল ডেসডিমোনার বিরুদ্ধে এবং ওথেলোও ইয়াগোর কথাগুলি ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করে গেলেন এবং শেষপর্যন্ত শিশুর মতো নিষ্পাপ এবং ফুলের মতো সুন্দর ডেসডিমোনাকে গলা টিপে হত্যা করলেন নিজের বলিষ্ঠ দুটি হাতের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে! বইটা পড়বার পর তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, ওথেলো কেন একবারের জন্যেও খোঁজ নিলেন না—ডেসডিমোনা যথার্থই অপরাধী কি না? এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নটাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—শেক্সপীয়র এটা কি করলেন?

কিন্তু শেক্সপীয়রের এ ছাড়া তো আর উপায়ন্তর ছিল না। তিনি যে থিয়োডলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাইলট বেলনুনের মতো সর্বক্ষণ ওঁদের চোখে চোখে রেখেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্কেলের রিডিংগুলিও নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই স্কেলরিডিংই শেক্সপীয়রকে বলে দিল যে ওথেলো সব সময়ে ইয়াগোর ওপরেই ভরসা করে রয়েছেন, এবং ডেসডিমোনা রয়েছেন দূরে দূরে। এই পরিস্থিতিতে লোকে যেমন নীচে থেকে সুতোয় হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুশি মতো ঘুড়ির দিক পরিবর্তন করে, শেক্সপীয়রও যদি সেই মতো নাটকের মাঝখানে ওথেলোকে জোর করে টেনে নিয়ে এসে ডেসডিমোনার সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন, তাহলে নিষ্পাপ ডেসডিমোনা রক্ষা পেতেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপমৃত্যু হত একটি অমর মহাকাব্যের।

এবার বাংলা সাহিত্যের একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। বিশ্বকবির যে কোনও একটি কবিতা নিলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। ধরুন, শা-জাহান। রবীন্দ্রনাথ শা-জাহানকে দেখেন নি, দেখেছিলেন তাজমহল—সোনালী জ্যোৎস্নালোকে কালো যমুনার তীরে শ্বেতমর্মরের তাজমহল। এই তাজমহলের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাইলট বেলনুনটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন আকাশে, আর সেই জন্যেই স্কেলারিডিং তাঁকে জানিয়েছিল যে শা-জাহান কবি, শা-জাহান প্রেমিক—একনিষ্ঠ প্রেমিক। সঙ্গে সঙ্গে তাজমহলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিশ্বকবির লেখনী থেকে বেরিয়ে এল :

> প্রেমের করুণ কোমলতা,
> ফুটিল তা
> সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

কিন্তু কবিগুরু যদি শ্বেতশুভ্র তাজমহলের পরিবর্তে ইতিহাসের পাতার মধ্যে থেকে তাঁর পাইলট বেলনুনটি উড়িয়ে দিতেন, তাহলে স্কেলরিডিং তাঁকে তক্ষুনি বলে দিত যে ভারতসম্রাট শা-জাহানের হারেমে রয়েছে শত শত সুন্দরী এবং অন্তরে রয়েছে অন্তহীন লালসা কিন্তু প্রেম কোথাও নেই। তাজমহল সৃষ্টির উৎস অন্তরের বেদনা বা প্রেম নয়—জগৎজোড়া চিরন্তন খ্যাতির উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল এই শ্বেতমর্মর মন্দির। কিন্তু সব জেনেশুনেও বিশ্বকবি লিখলেন :

> শুধু তব অন্তরবেদনা
> চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

শ্বেতশুভ্র তাজমহলের গায়ে তিনি কলঙ্কের কালি মাখালেন না। ঘুড়ির সুতোয় হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা স্কেলরিডিং-এর সঙ্গে দ্বিতীয়টি মেশালেন না, যার ফলে জন্ম নিল বিশ্বের বিস্ময়কর ভাস্কর্যের স্বাক্ষর অমূল্য তাজমহলের চেয়েও মূল্যবান—সুন্দর একটি কবিতা!

যেখানেই ঘুড়ির সুতোয় টান পড়েছে সেখানেই সাহিত্যের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গিয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। অবশ্য, উদ্দেশ্যবিহীন কিছুই হয় না এই পৃথিবীতে—পাগলামি ছাড়া। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক কথাটা ব্যবহার করে আমরা এখানে এইটেই বোঝাতে চাইছি যে উদ্দেশ্যটা অন্য কিছু—রাজনৈতিক, প্রচারমূলক, ইত্যাদি—সাহিত্য নয়।

সুতোয় টান দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে যেটা হয় সেটা, আর যাই হোক, সাহিত্য নয়। বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্ট হয় পাইলট বেলনুন যখন মনের আনন্দে উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করে বাধাবন্ধহীন।

ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুর চাপ কমতে থাকে ক্রমশঃ। সেইজন্যে পাঁচ-সাত মাইল উঁচুতে ওঠবার পর, অন্তরে বাইরে চাপের তারতম্যের প্রভাবে বেলনুনটি এক সময় ফেটে যায় আর ঠিক সেই মুহূর্তে উপন্যাস বা গল্পের সমাপ্তি ঘটে। তার আগেই যদি উপন্যাস শেষ করে দেয়া হয় তাহলে পাঠকদের প্রত্যাশার প্রতি অবিচার করা হবে। আবার যদি পাইলট বেলনুনটির মৃত্যুর পরও কাহিনীটিকে অহেতুক টেনে নিয়ে যাওয়া হয় পাতার পর পাতা—যেটা যে কারণেই হোক, আজকাল প্রায়ই হচ্ছে, তাহলে পাঠকদের ধৈর্যের প্রতি অবিচার করা হবে। ঠিক কোথায় পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে, সেটাও আমাদের এই পাইলট বেলনুনের স্কেলরিডিংই দেখিয়ে দেবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পাইলট বেলনুনই হচ্ছে মহৎ সুন্দর এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র উপায় এবং অস

জলে নামবার আগে ব্যাথিস্ক্যাফ 'ত্রিয়েস্ত'
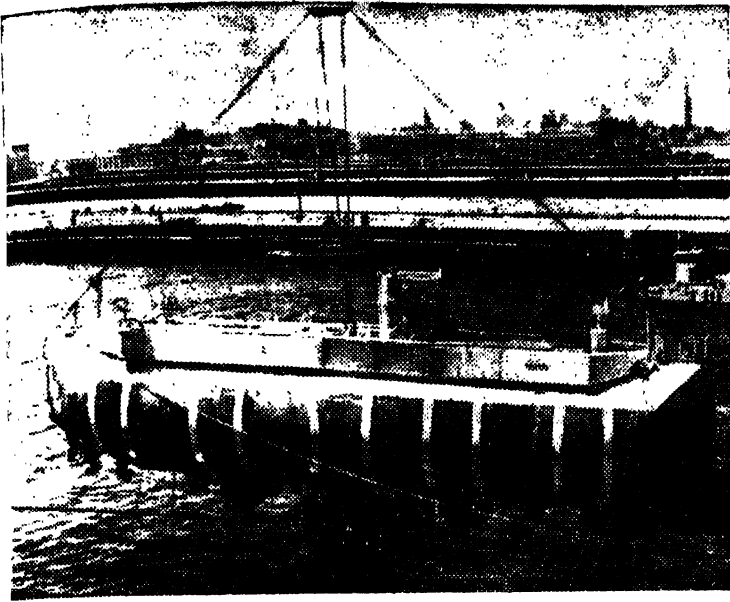
নীলসমুদ্রের নীচে

সঞ্জীবকুমার ঘোষ

সমুদ্র অভিযান ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দিকপাল এক ব্যক্তি বলেছিলেন : মানুষ এসেছে সমুদ্র থেকে, আবার বসবাসের জন্য সে ফিরে যাবে সমুদ্রেই। আগামী দিনে মানুষ যেদিন সমুদ্রের নীচে ক্ষেতখামার, আলোকিত সহর এসব গড়ে তুলবে সেদিন এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু তার আগে সমুদ্র সম্পর্কে বিস্তর তথ্য জানা প্রয়োজন। পৃথিবীজুড়ে আজ সমুদ্রবিজ্ঞানীরা সেই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাই করে চলেছেন নিরন্তর।

ওপরে নীল আকাশ আর নীচে নীল সমুদ্র। এই দুই নীলের জগতের ওপরে-নীচে যে অনন্ত রহস্য লুকানো রয়েছে একে একে তা ভেদ করতে আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বদ্ধপরিকর। তাই একদিকে যেমন তারা একের পর এক মহাকাশযানকে আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশের পথে ঠেলে দিচ্ছেন, অপরদিকে তেমনি সমুদ্রের নাড়ী-নক্ষত্র জানার জন্য নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাপক অনুসন্ধান করছেন। এই দুই ক্ষেত্রে গবেষণা কিন্তু একেবারে পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, কয়েকজাতের সমুদ্রজ শেওলার সন্ধান পাওয়া গেছে যা মহাকাশযাত্রীদের খাদ্য ও অক্সিজেন যোগাবার উপযুক্ত হবে। অর্থাৎ সমুদ্র গবেষণালব্ধ ফল মহাকাশগবেষণার কাজে লাগছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার উপযোগী করে যেসব আকাশযান বা মহাকাশযান নির্মিত হয় তার নক্সা [illegible] জলযান নির্মাণেও কাজে লাগছে।

গভীর সমুদ্র অভিযানের ইতিহাস বহু আগেই আরম্ভ হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, প্রখ্যাত গ্রীক পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, স্বনামখ্যাত অ্যারিস্টটল প্রমুখ ব্যক্তিরা জলে যেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা যায় তার উপযোগী যান তৈরীতে মনোনিবেশ করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, ম্যাসিডন-অধিপতি অ্যারিস্টটল-শিষ্য দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারই প্রথম ব্যক্তি যিনি যান-সদৃশ কোনো কিছুতে আরোহী হয়ে সমুদ্রে নেমেছিলেন। আলেকজান্ডার তাঁর কারিগরদের দিয়ে একটি কাঁচের পিপে
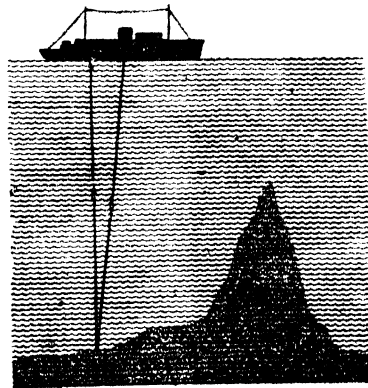
ভূ-পৃষ্ঠে যেমন, সমুদ্রের মেঝেতেও তেমনি উঁচু পাহাড় রয়েছে। এখানে তারই একাংশ দেখা যাচ্ছে।

তৈরী করিয়ে সেই পিপের মধ্যে নিজে বসলেন; পিপের সঙ্গে লাগানো লোহার শেকল রইল ওপরে, নৌকারোহী লোকের হাতে। বেশ কিছুক্ষণ নীচে থাকার পর তিনি ওপরের লোকদের সংকেত জানান তাঁকে টেনে তোলার জন্য। আলেকজান্ডারের এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছিল 'কলিম্‌ফা'।

আলেকজান্ডারের পর গভীর জলে নামার চেষ্টা আরও অনেক হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের যান তৈরীর চেষ্টাও হয়েছে বিভিন্ন সময়। ইটালীর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি নাকি এক সময় সামরিক কাজে ব্যবহারোপযোগী ডুবোজাহাজ তৈরীর পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই সেরকম জাহাজ নির্মাণে হাত দেননি। ব্যাপারটা তিনি সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন, কারণ তাঁর ভয় ছিল, এতে যুদ্ধ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। কিন্তু ভিঞ্চি বিরত থাকলেও অন্যান্য যারা এবিষয়ে মাথা ঘামাতেন তাঁরা কিন্তু সমরকার্যে ব্যবহারোপযোগী ডুবোজাহাজ তৈরীতেই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। এর কারণ সম্ভবতঃ উদ্ভাবনকারীর রাজকোষ থেকে অর্থসাহায্য পেতে দেরী হত না। পক্ষান্তরে শুধু অনুসন্ধান বা গবেষণাকার্যে ব্যবহারের জন্য কোনো ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হলে তা করতে হত খুবই সীমিত আকারে আর তার জন্য যে খরচ হত তা পুরোপুরি উদ্ভাবনকারীকেই বহন করতে হত।

যাই হোক, একবার কর্ণেলিয়াস ড্রেবেল নামে জনৈক হল্যান্ডবাসী এমন এক ডুবোজাহাজ তৈরী করেন যা জলের নীচে পঁচিশ ফুট নামতে পেরেছিল। এটি অবিশ্যি নেমেছিল ইংল্যান্ডের টেমস নদীতে। শোনা যায়, সম্রাট প্রথম জেমস এই জাহাজে করে খানিক দূর পর্যন্ত নেমেছিলেন। ড্রেবেল কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত জাহাজকে সামরিক কাজে ব্যবহারের কথা কখনো ভাবেন নি। যেমন ভাবেন নি সাইমন লেকও। লেক জাতিতে ছিলেন আমেরিকান। নীচ সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী যানের নক্সা রচনায় তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করতেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ঐসব যানে করে সমুদ্রের নীচে গিয়ে অনুসন্ধানকার্য চালানো আর সেখানকার বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করে ওপরে নিয়ে আসা। এই উদ্দেশ্যে লেক এমন এক ধরণের ডুবোজাহাজ তৈরী করেছিলেন যার তলায় চাকা লাগানো ছিল। সমুদ্রের একেবারে নীচের জমিতে যাতে তাঁর ডুবোজাহাজ চলতে পারে তার জন্যই ঐ চাকা লাগানো। আবার আর এক ধরনের ডুবোজাহাজে শুধু চাকাই নয়, সমুদ্রতলে খননকার্য চালাবার জন্য নানা সরঞ্জামও বসানো ছিল। কিন্তু লেকের জাহাজ তাঁর আকাঙ্খিত গভীরে পৌঁছতে পারেনি।

যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা সমুদ্রপৃষ্ঠের কয়েক হাজার ফুট নীচে প্রথম অবতরণ করে সমীক্ষা চালায় তার নাম ব্যাথিস্ক্যাফ।
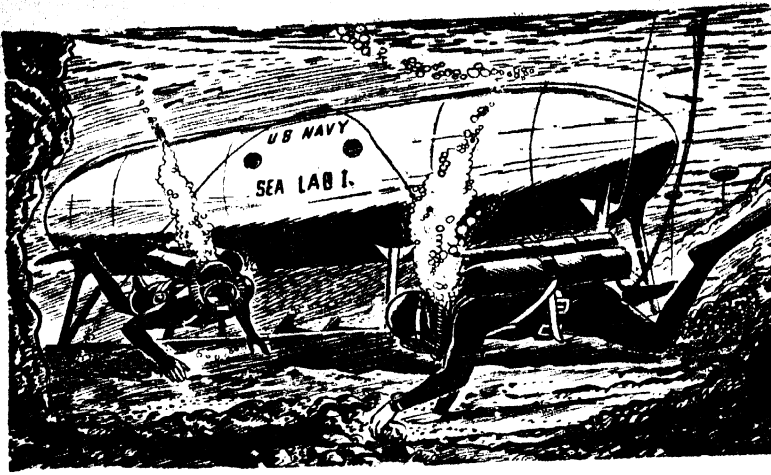
মার্কিন নৌবহরের দুই ব্যক্তি সম্প্রতি বার্মুডার কাছাকাছি আটলান্টিক মহাসমুদ্রে ১৯২ ফুট নীচে দশ দিন অতিবাহিত করেছিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্রতলকে কাছ থেকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা। ঐ ক'দিন বসবাসের জন্য তাঁরা একটি বিশেষভাবে নির্মিত ইস্পাতের ক্যাপসুল ব্যবহার করেছিলেন।

ব্যাথিস্ক্যাফের আগে ব্যাথিস্ফিয়ার অবিশ্যি আধ মাইলের কিছু বেশী নীচে নেমেছিল, কিন্তু ব্যাথিস্ক্যাফের তুলনায় এতে অসুবিধা ছিল বিস্তর। ব্যাথিস্ফিয়ার কোনো যান নয়। উইলিয়াম বীব এবং ওটিস বার্টন উদ্ভাবিত এ বস্তুটি আসলে ইস্পাতনির্মিত একটি গোলক। জলের নীচে এর গতি খুশিমতো নিয়ন্ত্রণ করা যেত না—সেরকম ব্যবস্থাও এতে ছিল না। গোলকে লাগানো রজ্জু ধরে জাহাজ থেকে এটিকে ছেড়ে দেওয়া হত। নানা সরঞ্জামের মধ্যে একটি টেলিফোনও এতে ছিল। বলা হয়নি, ব্যাথিস্ফিয়ার খালি অবস্থায় নামেনি, অবরোহণকালে এর যাত্রী ছিলেন স্বয়ং বীব এবং বার্টন। সমুদ্রের খুব বেশী নীচে চাপ বেশী হয়, কাজেই সমুদ্রের খুব বেশী নীচে সমীক্ষা চালাতে হলে প্রবল চাপ থেকে শরীরকে বাঁচানোর উপায় অবলম্বন করা দরকার। ব্যাথিস্ফিয়ার সমস্যার প্রথম সমাধান করে। প[...] এ বস্তুটির আরো উন্নত সংস্কর[...] করেন। সেটির নাম দেওয়া হয় [...]স্কোপ। বেন্থোস্কোপ ক্যালি[...] কাছাকাছি সমুদ্রের এক মাইল নী[...] ছিল।

ব্যাথিস্ক্যাফের কথায় আসা যা[...] তলার দিকে ইস্পাতের তৈরী [...] একটি প্রকোষ্ঠ থাকে যাকে [...] গণডোল্যা। গণডোল্যার ওপরে থা[...] একটি খোল। এটি হাল্কা গ[...] ভর্তি থাকে। গ্যাসোলিন জলে[...] হাল্কা, তাই গ্যাসোলিন ব্যাথিস্ক্যা[...] ভাসতে সাহায্য করে। ডুববার স[...] খন্ডে ভর্তি করে যানটিকে [...] নেওয়া হয় আবার জলপৃষ্ঠে উঠবা[...] লোহখন্ড মুক্ত করে হাল্কা করা [...] হল ব্যাথিস্ক্যাফের নিমজ্জন ও [...] মোটামুটি মূলকথা।

ব্যাথিস্ক্যাফের উদ্ভাবক সুইস [...] অগাস্ত পিকার্ড। ছাত্রাবস্থায়ই [...] সমুদ্র অভিযানের ব্যাপারে আগ্রহ[...] জুরিখ পলিটেকনিকে যখন [...] করতেন সে সময়েই তিনি [...] নক্সা রচনা করেছিলেন। [...] ঊর্ধাকাশে গবেষণার দিকে তাঁর [...] হয়। ১৯৩২ সালে পিকার্ড [...] বেলুন তৈরী করে তাতে [...] মন্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে [...] উদ্দেশ্য ছিল, মহাজাগতিক র[...] তথ্য সংগ্রহ করা। এই সফল

শিল্পীর কল্পনায় সমুদ্রতলস্থিত আগামী দিনের বাসগৃহ
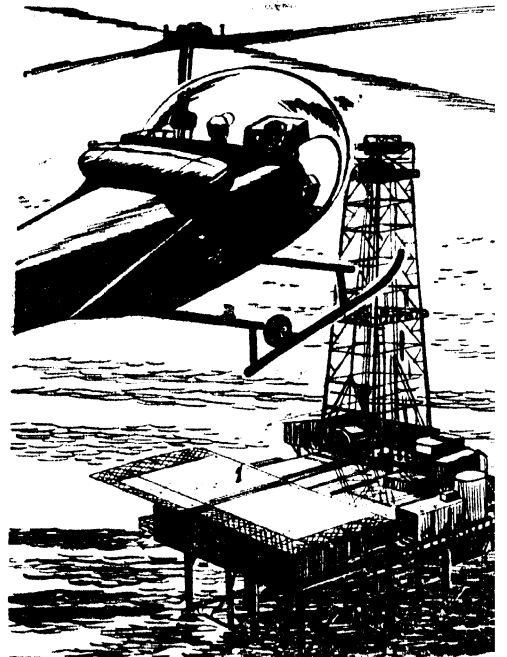
সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরণের আধুনিক ব্যবস্থা

পিকার্ডের খ্যাতি অনেক বেড়ে গিয়ে- কিন্তু এর পরেই আবার তিনি অভিযানের ক্ষেত্রে তাঁর মনোযোগ ভূত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পিকার্ড প্রথম ব্যাথিস্ক্যাফের রচনায় হাত দেন। কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় দ্ধ। যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত নানা প্রতি- তার দরুণ দীর্ঘ পাঁচ বছর সব কিছু রাখতে হল। এই পাঁচ বছরের বিরতি র্ডকে কিন্তু তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত পারেনি, বরং পাঁচ বছর পর তিনি উদ্যমে তাঁর কাজ পুনরারম্ভ করলেন। য় তাঁর ছেলে জ্যাকও তাঁর সঙ্গে দেয়।

থাসময়ে প্রথম ব্যাথিস্ক্যাফ নির্মিত যথারীতি পিকার্ডের এই প্রচেষ্টাকে ার পরিবর্তে অনেকে উপহাস করলেন। সকারীদের মধ্যে অনেক নামী নী বিশেষজ্ঞও ছিলেন। অবিশ্যি কারুর সে দমবার পাত্র পিকার্ড ছিলেন না। াই হোক, নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম শেষ পর্যন্ত প্রথম ব্যাথিস্ক্যাফ কেপ থেকে সমুদ্রে ডুব দিল। প্রথম স্ক্যাফে কোনো মানুষ ছিল না, এটি অবস্থায় জলে নেমেছিল। এতে ছিল অনেক। কিন্তু ত্রুটি সত্ত্বেও সাড়ে তিন হাজার ফুটেরও বেশী পেরেছিল।

থম ব্যাথিস্ক্যাফের পর পিকার্ড আরও ধরনের যান তৈরীতে মনোনিবেশ ন। অল্পকালের মধ্যে তিনি গড়েও ন নতুন এক যান। নতুন যানটির দেওয়া হয় এফ-এন-আর-এস-৩। এটি ল প্রথম ব্যাথিস্ক্যাফেরই উন্নত রণ। এফ-এন-আর-এস বেলজিয়ামের রিসার্চ ফাউন্ডেসনের আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষিপ্ত এক নাম। বায়ুমণ্ডলের টাস্ফিয়ারে উঠবার জন্য যে বেলুন র করা হয়েছিল তা নির্মাণের এবং ব্যাথিস্ক্যাফ নির্মাণে ঐ রিসার্চ ডেসন পিকার্ডকে প্রভূত সহায়তা করে। এন আর-এস-৩ নির্মাণে ঐ ফাউন্ডেসন ফরাসী নৌবহর সহায়তা করে। ফ্রান্সের টুলোঁ বন্দরে নির্মিত। নির্মাণকার্য যখন চলছিল সে সময় ির ত্রিয়েস্ত নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ডকে সেখানে থেকে ঐ ধরনের একটি নির্মাণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ । পিকার্ড সে-অনুরোধে সাড়া দেন। কাজ শুরু করার জন্য তিনি কয়েক- পরেই টুলোঁ ত্যাগ করে ত্রিয়েস্তে চলে ত্রিয়েস্ত থেকে যে যানটি পিকার্ড করেন তার নামও দেওয়া হয় ত'। এটিও একটি ব্যাথিস্ক্যাফ। তে যাতে পূর্ববর্তী যানের চেয়ে র আরও গভীরে যেতে পারে ই পিকার্ড এর নক্সা রচনা করেন। ছিল তাই। কয়েক বছর আগে এ-যাবৎ জানা সমুদ্রের গভীরতম যেতে সমর্থ হয়েছিল। মার্কিণ নৌবহরের অফিসার লেফটেন্যান্ট ডন ওয়ালশ এবং জ্যাক পিকার্ড 'ত্রিয়েস্ত' করে প্রশান্ত মহাসাগরে গুয়াম দ্বীপ থেকে আড়াইশ' মাইল দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় সাত মাইল নীচে নেমেছিলেন। সর্বাধিক গভীরে যেতে তাদের সময় লেগেছিল পৌণে পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশী। আর তলদেশ থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠে উঠতে সময় লেগেছিল সওয়া তিন ঘণ্টার কিছু বেশী। অধোগমনকালে কিছু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলেই অধোগমনে সময় কিছু বেশী লেগেছিল। সমুদ্রতলে যেখানে 'ত্রিয়েস্ত' গিয়ে থেমেছিল সে-জায়গাটা ছিল খুব নরম, কাদায় ভর্তি। 'ত্রিয়েস্ত' সেখানকার মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ কাদা আলোড়িত হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়; ফলে কিছুক্ষণের জন্য কাদা-মেশানো কালো জলে 'ত্রিয়েস্ত' আচ্ছাদিত হয়ে যায়। চতুর্দিকে এক ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল।
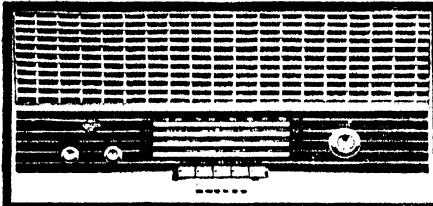
অন্ধকার গর্ভে ঢুকতেই, অর্থাৎ কাদা থিতিয়ে যেতেই আরোহীদ্বজন সবিস্ময়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন : চ্যাপটা লাল রংয়ের একটা মাছ কাতরাতে কাতরাতে এগিয়ে চলেছে। মাছটাকে দেখতে অনেকটা জুতোর তলার মতো। সমুদ্রে মাছ পাওয়া যাবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? আশ্চর্যের কিছু থাকত না যদি মাছটা সমুদ্রের এত নীচে না থাকত। শুধু মাছ কেন, জীবনের অস্তিত্বই এখানে অকল্পনীয়। সমুদ্রের এত গভীরে, যেখানে প্রতি বর্গইঞ্চিতে দশ টন করে চাপ, যেখানে জীবনধারণোপযোগী অক্সিজেন আছে কি-না সন্দেহ, সেখানে জীবন থাকতে পারে না বলেই এতকাল মনে করা হত। কিন্তু লাল রংয়ের মাছটা সেই ধারনার ভ্রান্তি প্রমাণ করেছে। মাছটা প্রমাণ করেছে, উপরিভাগের জল অত নীচেও তাহলে যাতায়াত করে। শুধু তাই নয়, সমুদ্রের অত নীচে যেখানে তাপাঙ্ক দেড় ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মতো সেখানেও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে।

এ-তো গেল মাছটার। দুজন মানুষসহ ব্যাথিস্ক্যাফ 'ত্রিয়েস্তের' রোমাঞ্চকর অধোগমন থেকে যে-জিনিষটা জানা গেল তা-ও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জানা গেল, মানুষ সমুদ্রতলে যে-কোনো জায়গায় নামতে পারে।

ওয়াল্‌শ এবং জ্যাক পিকার্ড গভীরতম জায়গায় গিয়ে আধ ঘন্টা কাটাবেন স্থির করেছিলেন; কিন্তু তা' তার হল না। তাঁদের ব্যাথিস্ক্যাফে সামান্য ত্রুটি দেখা দেওয়ায় আধ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই উঠে পড়তে হয়। ঊর্ধারোহণকালে একটা মজার ব্যাপারে ঘটেছিল। 'ত্রিয়েস্ত' যখন খানিকটা ওপরে উঠেছে তখন এক-সময় ওয়ল্‌শ এবং পিকার্ডের নজরে পড়ল, 'ত্রিয়েস্তের' চার-পাশ দিয়ে দলা পাকানো কাদা উঠছে। এ দেখে তাঁরা বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তাঁদের মনে হল, কাদাগুলো ওপরে উঠছে না; বরং তাঁরাই নীচের দিকে নামছেন; আর সেজনাই কাদাগুলোকে ঊর্ধগামী মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে। অথচ তেমন কোনো যান্ত্রিক ত্রুটিও ত চোখে পড়ছে না। শেষটায় অবিশ্যি তাঁরা আসল ব্যাপার ধরতে পেরেছিলেন। কাদা নড়ছে না। তারাই ওপর দিকে উঠছেন।

এফ-এন-আর-এস ৩ এবং ব্যাথিস্ক্যাফের মধ্যে অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও গ্যাসোলিন ধারণক্ষমতায় দুটি যানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির ধারণক্ষমতা অনেক বেশী।

একটা জিনিষ বলা দরকার। ডুবোজাহাজ জলের নীচে দিয়ে বহু সহস্র মাইল ছুটে যেতে পারে, কিন্তু ব্যাথিস্ক্যাফের মতো সমুদ্রের অত গভীরে তা যেতে পারে না। কাজেই সমুদ্রের নীচে সর্বাত্মক অনুসন্ধানকার্য চালাবার জন্য এই দুই ধরনের যানেরই প্রয়োজন আছে। ডুবোজাহাজের মধ্যে আবার পরমাণুশক্তি-চালিত ডুবোজাহাজই এ-কাজে সুবিধে-জনক বেশী।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকার জুলে ভার্ণের লেখা 'টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস্ আন্ডার দি সী' অনেকেরই পড়া আছে। ঐ বইতে ভার্ণ 'নটিলাস' নামে অত্যাশ্চর্য এক ডুবোজাহাজের সমুদ্র অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ভার্ণ বর্ণিত ডুবোজাহাজের জানালা আছে যার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি মেলে ধরলে সমুদ্রের নীচেকার বিচিত্র গাছ-পালা, পাহাড় পর্বত সব দেখা যায়। বইটির শেষ দিকে দেখা যায়, 'নটিলাস' দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে গিয়ে পৌঁচেছে এবং সেখানে বরফের নীচ দিয়ে চলবার কালে অতিকায় হিমশৈলের পাল্লায় পড়ে আটকে গেছে। হিমশৈলের খপ্পর থেকে 'নটিলাসকে' কীভাবে পরে উদ্ধার করা হয় ভার্ণ তারও এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

এ কাহিনী ভার্ণ লিখেছেন আজ থেকে ছিয়ানব্বই বছর আগে। সেই থেকে পাঠকবর্গ এ কাহিনীকে নিতান্তই আজগুবি মনে করে এসেছেন। সত্যি সত্যিই কোনো জাহাজ মেরু অঞ্চলের বরফ ভেদ করতে পারে বলে তাঁরা কোনোদিনই বিশ্বাস করেন নি।

কিন্তু ভার্ণের কল্পনা সত্যিই একদিন বাস্তবে রূপ নিল। ১৯৫৭ সালে পরমাণুশক্তিচালিত রুশ ডুবোজাহাজ 'লেনিন' জলে ভাসানো হল। এটি কোনো বন্দরে না থেমে বারোমাস বরফের মধ্য দিয়ে চলতে পারে। এর পরের বছর পরমাণুশক্তিচালিত একটি মার্কিণ ডুবোজাহাজ উত্তর মেরু অঞ্চলের নীচ দিয়ে ঘুরে আসে। জুলে ভার্ণের কাল্পনিক ডুবোজাহাজের অনুসরণে এটির নাম দেওয়া হল 'নটিলাস।' বরফের নীচ দিয়ে ঐতিহাসিক যাত্রার পূর্বে 'নটিলাস' সমুদ্রের নীচে বিশ হাজার লীগের বেশী পথ পরিক্রমা করে। উল্লেখ্য যে, এক লীগ প্রায় দেড় ক্রোশের সমান।

'নটিলাস' অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি বদ্ধবর্তনী টেলিভিশন সেটও এতে রয়েছে। টেলিভিশনের ট্রান্সমিটার বা প্রেরকযন্ত্র ওপরদিকে আর পর্দা রয়েছে ডুবোজাহাজের ভেতরে। ফলে, ডুবন্ত অবস্থায় ডুবোজাহাজের ওপরে যদি বরফখন্ড ভাসতে থাকে তাহলে তার ছবি টেলিভিশনের পর্দায় ধরা দেবে। কোন জায়গা ভাসবার পক্ষে নিরাপদ কিনা তা টেলিভিশনের পর্দায় ওপরকার অবস্থা দেখে বোঝা যায়।

সত্যি বলতে কি, বরফের নীচে 'নটিলাসে'র যাওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তর সাগরের গভীরতা সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য আমাদের জানা ছিল না। উত্তর সাগরের তলদেশ সমতল না পর্বতময় তার উত্তর জুগিয়েছে 'নটিলাসে'র গভীরতা পরিমাপক যন্ত্র। এছাড়া, উত্তর সাগরের নীচে এক পর্বতশ্রেণীর আবিষ্কারও 'নটিলাস' করেছে।

আজকাল সাগরতলে অভিযানকার্য চালাবার জন্য অনেক নতুন নতুন যানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। নতুন যে ... নির্মিত হচ্ছে তার মধ্যে একটি আল্যুমিনট। এটি মুখ্যতঃ অ্যালু... দিয়ে তৈরী। নামের মধ্যেই আবি... আভাস রয়েছে। গঠনপ্রণালীর দিক... আল্যুমিনট অনেকটা ব্যাথিস্ক্যাফে... তবে অ্যাল্যুমিনটে আরোহীদের নির্দিষ্ট একটি গণ্ডোলার মধ্যে। কি... স্ক্যাফে সে-ধরনের কোন গণ্ডোল... না, সেখানে আরোহীরা থাকে খোলে...

নীল সমুদ্রের নীচেকার জমি ... দেখতে? এযাবৎকাল ধারণা ছিল, ... একেবারে সমতল ও মসৃণ। কিন্তু ... অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, ... বেশীর ভাগই অমসৃণ, এবড়ো... এখানেও পাহাড় ছড়িয়ে রয়েছে ... পর, মাইল জুড়ে। এমনই এক পর... নাম : মধ্য আটলান্টিক পর্বতশ্রেণ... বিস্তৃতি গ্রীনল্যান্ড থেকে দক্ষিণ অ... উপকূল পর্যন্ত। এছাড়া অন্যান... শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে লোমোনোস... শ্রেণী। রুশ বিজ্ঞানীরা এটি ... করেন। ভূপৃষ্ঠের মানচিত্রের ম... তলেরও মানচিত্র আছে। তা দেখে ... সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা ...

সমুদ্রগর্ভে যে বিপুল পরি... লুকিয়ে রয়েছে তার কথা ভাব... অবাক হতে হয়। হিসেব করে দে... এক ঘন-মাইল সমুদ্র জলকে ম... তা থেকে প্রায় সাড়ে বিয়াল্লিশ ... ক্যালসিয়াম, সাড়ে দশ টন ... পৌনে দুই টনেরও বেশী ... বারো পাউন্ড সোনা, এছাড়া অ... যেমন নিকেল, তামা, কোবাল্ট এস... বিস্তর পাওয়া যেতে পারে। যে ম্যা... ধাতু মহাকাশযানের ক্যাপসুল ... করে বিভিন্ন যানবাহনের অংশাদি... হয়ে থাকে তা প্রচুর পরিমাণে স... সংগে মিশে রয়েছে। রান্নাবান্নায় ... নুন লাগে তাও আসে সমুদ্র থেকে ... তাই রত্নাকর বললে কিছুমাত্র বা... হয় না।

নীল সমুদ্রের নীচে যে খাদ্য-... বিচিত্র প্রাণী আছে তাও আ... বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। সমুদ্র... পর্যন্ত কুড়ি হাজারেরও বেশী ... মাছ ধরা হয়েছে এবং তাদের নাম... হয়েছে। দেখা গেছে, আমাদের ... হিসেবে এক শতাংশ সমুদ্র থে... একজন আমেরিকানবাসীকে মাসে ... পাউন্ড খাদ্য সমুদ্র যোগায়। আব... চীনা বা জাপানী তাঁর খাদ্যের ... জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। ... উপান দ্বীপের অধিবাসীরা সাম... তিমি ইত্যাদি খেয়েই জীবনধ... অর্থাৎ তাদের খাদ্যের সবটাই ... থেকে।

অনেকের কাছে সামুদ্রিক ... উপাদেয় খাদ্য। বহু সহস্র বছর ... রকমের ঝিনুক রান্না করা বা কাঁ... খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আস... জন্মেরও আগে, প্রাচীন রোমের

...কাছে ঝিনুককে এত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় ...যে, তারা সমুদ্র থেকে এ বস্তুকে ...ভাবে সহজে এবং বেশী পরিমাণে ...লন করা যায় তা নিয়ে রীতিমত মাথা ...ত। তারা ঝিনুকের চাষও করত। ...কের দিনেও বহু দেশে সামুদ্রিক ...কের চাষ করা হয়ে থাকে।

১৯৩৮ সালের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার ...দ্রোপকূল থেকে ট্রলারে করে জেলেরা ...ছে মাছ ধরতে। ট্রলার থেকে জলের প্রায় দুশো ফুট নীচে জাল নামান হয়েছে। যথাসময়ে মাছশুদ্ধ জাল টানা হল। কিন্তু জাল উপরে উঠতেই সবাই অবাক। অন্যান্য মাছের সঙ্গে বিকটদর্শন অদ্ভুত একটা মাছও উঠেছে। মাছটার সারা গায়ে নীল রঙয়ের আঁশ। অদৃষ্টপূর্ব এ প্রাণীটিকে কাছ থেকে ভাল করে দেখবার জন্য ট্রলারের ক্যাপ্টেন যেই ঝুঁকেছেন অমনি সেটা ধারাল দাঁত দিয়ে ক্যাপ্টেনের হাতে বসিয়ে দেয় এক কামড়। অন্য কেউ হলে হয়ত সেটাকে তক্ষুনি ফেলে দিত। কিন্তু কৌতূহলী ক্যাপ্টেন তা না করে সনাক্তকরণের জন্য প্রাণীটিকে স্থানীয় যাদুঘরের ডিরেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেন। ডিরেক্টরটি ছিলেন মহিলা। অনেক চিন্তার পরও সনাক্ত করতে না পেরে তিনি প্রাণীটার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী তৈরী করে বিখ্যাত মৎস্যবিশারদ অধ্যাপক স্মিথের কাছে তা পাঠিয়ে দেন। লম্বায় পাঁচ ফুট আর একশো সাতাশ পাউণ্ড ওজনবিশিষ্ট ঐ প্রাণীটির
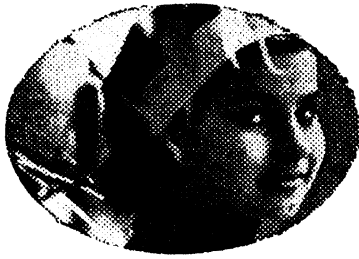
বিবরণী দেখে স্মিথের আর সন্দেহ রইল না যে, প্রাণীটি প্রাগৈতিহাসিক মাছ সীলাকান্থ ছাড়া কিছু নয়। বহু সহস্র বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব যখন হয়নি, সে সময় সমুদ্রে সীলাকান্থের উদ্ভব হয়েছিল। আবার মানুষের আবির্ভাবের আগেই তাদের বিলুপ্তি ঘটেছিল। ১৯৩৮ সালের সেই আশ্চর্যজনক প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত সীলাকান্থকে দেখা গিয়েছে শুধু পুরোন শিলায়, ফসিলাকারে।

ভবিষ্যতে হয়ত সমুদ্রের নীচে গবেষণাগার তৈরী হবে। বিজ্ঞানীরা সে-ধরনের গবেষণাগারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন। বলাবাহুল্য, এই গবেষণাগার নানা যন্ত্রপাতিতে ঠাসা থাকবে। সমুদ্র সম্পর্কে যে সব তথ্য না জানলেই নয়, অথচ যা ওপর থেকে জানায় অসুবিধে অনেক সেসব তথ্য আহরণের জন্যই এর পরিকল্পনা। স্রোতের প্রকৃতি, নীচেকার গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আহরণ করা ছাড়াও সমুদ্র-জলে কী কী পরিবর্তন ঘটে তা ভালভাবে জানার চেষ্টা হবে ঐ গবেষণাগার থেকে। পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আশা করা যায়, এই ধরণের গবেষণাগার থেকে এমন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে যার সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস আরও সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে জীবনহানি ও ক্ষতির পরিমাণ অনেক হ্রাস পা
প্রলয়ঙ্কর ঝটিকাদি সম্পর্কে অ
সম্ভবমত সতর্কতা অবলম্বন
আগামী দিনে শুধু গবেষণা
বিজ্ঞানীদের ধারণা সমুদ্রের নীচে
শহর পর্যন্ত গড়ে তোলা যাবে।
থেকে সম্পদ আহরণের জন্য
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কারখানা
হবে। এসব এখন কল্পকথার মত
বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমন দি
আসবে। তবে সেদিন আসার
বছর কেটে যাবে।

অথ জিপসী সমাচার

তারাপদ পাল

কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়ঃ জিপসীদের চেনেন? দেখেছেন তাদের?

উত্তর আসবে ঃ নিশ্চয়ই। কত জিপসী দেখেছি। দেখলেই তাদের চেনা যায়। জিপসী মেয়েরা আসে কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে—কত কি জিনিস বিক্রি করতে। দোরে দোরে ঘোরে। মলিন পোশাক। ভবিষ্যৎ গণনায় তারা সিদ্ধহস্ত। তাদের কানে শোভা পায় সোনা কিংবা পেতলের তৈরী বড় বড় গহনা।

আপাতদৃষ্টিতে উত্তরগুলি ঠিক। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওদের মধ্যে জিপসীরা থাকলেও, ওরা সকলেই খাঁটি জিপসী নয়। ওদের মধ্যে অনেকের গায়ের রং থাকে বেশ ফর্সা, চুলের রঙ লালচে কিংবা হলদে। এরা কিন্তু আসলে ইংরেজ; তবে সেই জাতীয় ইংরেজ, যারা কখনো কোন নির্দিষ্ট কাজে মন বসাতে পারে না। ওদের মধ্যে যাদের গায়ের আর চুলের রঙ হয় খুব কালো, আকৃতি হয় খাটো—তাদেরই শিরায় বইছে খাঁটি জিপসী রক্ত। এরাই ঠিক জিপসী; এদের বলা হয় 'ডিডিকস্'

অদ্ভুতকর্মা

অদ্ভুত জাত এই জিপসীরা। আর অদ্ভুত এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। আজ এখানে কাল সেখানে—হাতে বয়ে নিয়ে চলেছে তাদের সংসার আর সম্পত্তিকে। গল্প বলার এক সহজাত অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী এরা। তেমনি জানে যাদুবিদ্যা। রোগ নিরাময়ের জন্যে বিচিত্র সব ভৌতিক প্রক্রিয়া আর নানা-বিধ টোটকা ওষুধ। ভবিষ্যৎ গণনা আর হাতদেখায় (হস্তরেখা বিচারে) সিদ্ধহস্ত।

আজও এসবের অভ্যাস ও চর্চা করা বন্ধ করেনি তারা। ভবিষ্যৎ গণনার সময় [illegible] খেলার তাস ব্যবহার করে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, সম্ভবত তারাই ইউরোপে প্রথম তাস আমদানী করে। মেয়েরা হয় অপূর্ব নাচিয়ে। প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে প্রায় নিরাসক্ত—বিশেষ করে মেয়েরা। তারা মনে করে ঃ যে পুরুষের শক্তি আছে, আছে যৌবনের তেজ, তারা শক্তি দিয়ে ভোগ করবে জিপসী নারীর যৌবনকে। এটা তাদের কাছে বিগর্হিত কাজ নয়। মেয়েরা নাচের উল্লসিত উদ্বেলতার মধ্যে দিয়ে আকর্ষণ করে ক্ষমতাশালী জিপসী পুরুষকে। যে পুরুষের প্রতি তাদের আস্থা থাকে না, তার প্রেম নিবেদনকে, মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে ছোট্ট তীক্ষ্ণফলা ছুরির আঘাতে শেষ করে দিতেও পিছপা হয় না জিপসী মেয়েরা।

এরকম খেয়ালী হলেও কয়েকটি বিশেষ ধরনের হাতের কাজে তাদের যে দক্ষতা আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাম্র-শিল্পে তারা বিশেষ পারদর্শী হয়। ইউ-রোপের অনেক গীর্জায় তাদের তাম্রশিল্পের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। ঘোড়া সম্পর্কে এদের অভিজ্ঞতা প্রচুর। অনেক জিপসী পরিবার ঘোড়ার ব্যবসা করে তাদের জীবিকা-নির্বাহ করে। কাঠখোদাই, ঝুড়ি-বোনা, চীনেমাটির কাজ, কাপড়-বোনা প্রভৃতি কাজে এদের যেন একটা সহজাত অধিকার বর্তমান।

জিপসীদের গায়ের চামড়া যেমনি কালো, চোখগুলোও তেমনি কালো আর বড় বড়। মেঘবরন ঘন চুল। আর পোশাক-আশাক কিছুটা অপরিষ্কার। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা ঘোড়ায় টানা এক বিশেষ ধরনের গাড়িতে করে তারা চলে দেশে দেশে। গত শতকের মধ্যভাগ থেকে ঘোড়ায় টানা ওয়াগন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তার মধ্যেই তারা ঘুমোয়। সেই গাড়িই তাদের ঘর-বাড়ি। যখন যেখানে থাকে, সেখানে প্রয়োজনমত তাঁবু খাটিয়ে নেয়। আমরা তাদের দলকে ক্যারাভান বললেও, তারা কখনই তাদের দলকে 'ক্যারাভান
এরা নিজেদের আচার-রীতি
সুখেই থাকে।

সমাজতাত্ত্বিকেরা পর্যবেক্ষ
দেখেছেন ঃ জিপসদের মধ্যে নীতি
নেই বললেই চলে। তাদের কো
ধর্মবোধও নেই। তবে আজকাল
সম্প্রতিই বলা চলে। তারা তা
মেয়ের ধর্মদীক্ষা, বিয়ে-থা, এবং
কবর দেবার সময় কখনো কখ
যায়। যদিও আজও আনুষ্ঠান
(বিয়ে ইত্যাদির সময়) তাদে
বৈশিষ্ট্য এবং রীতিকেই অনুস
মৃতদেহ সৎকারে তাদের নিজস্ব
অদ্ভুত। কোন জিপসী মরে
গাড়িটাকে পুড়িয়ে ফলে, ঘো
ফেলে এবং মৃতের যাবতীয়
নষ্ট করে দেয় (একমাত্র গহনা
ছাড়া)। এমনকি তাদের কোন
আসন্ন হলে বা তাদের মধ্যে খ
দিলে তাদের শিশুপুত্রদের যে
খেয়ে নেয়।

সব দেশে তার ঘর

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই
দেখতে পাওয়া যায়—ইউরো
মাইনর, সাইবেরিয়া, ভারতবর্ষ,
আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরি
বাদ নেই। ইউরোপে প্রায় দশ
আছে; তবে সর্বাধিকসংখ্যক জি
করে রাশিয়া, হাঙ্গেরী,
তুর্কিতে। আর সবচেয়ে কমসং
বাস করে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে—তা
সর্বসাকুল্যে কুড়ি হাজারের বে

'ইজিপসিয়ান' শব্দের
থেকেই সম্ভবতঃ 'জিপসী' না

ইউরোপে যখন জিপসীরা
তখন তাদের সম্বন্ধে সাধারণ
এই রকম ঃ তারা মুসলমান
অনিচ্ছুক হওয়ায়, সারাসেন
মিশর থেকে বিতাড়িত করে
'জিপসী' নাম থেকেই এইরকম
তৈরী হয়েছিল—কিন্তু এই জা

র্ কোন ইতিহাসসিদ্ধ সত্যতার পাওয়া যায়নি। জিপসী ভাষায় পরিচয় 'রোম'।

এরা ভারতীয়!

কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এরা য়। জিপসী ভাষাকে 'রোমানিসিব' য়ে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই নিসিব' ভাষার সঙ্গে ভারতীয় প্রাকৃত ভাষার খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। রোমানি শব্দ আধুনিক যে কোন য় ভাষার থেকে প্রাচীন এবং সংস্কৃত উদ্ভূত। এ-থেকে অনেকে মনে করেন জিপসীরা ভারতবর্ষ থেকেই তে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বাধিক স্বীকৃত থেকে সর্বাধুনিক প্রচলিত সিদ্ধান্ত: রা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, ঃ কাশ্মীর-আফগানিস্থান সীমান্তের শে এলাকা থেকেই প্রথম বহির্যাত্রা করে।

বহির্যাত্রায়

ঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে পশ্চিমাঞ্চল তাদের বহির্যাত্রা শুরু হয়। তারপর য় পারস্য থেকে তারা দুটো দলে ভাগ য়। একটি দল আর্মেনিয়া ও তুর্কী য় ইউরোপে ও গ্রীসে গিয়ে পৌঁছয়; দলটি পৌঁছয় আরবিয়া ও সিরিয়া তারা ইউরোপে প্রথম কবে পৌঁছেছিল র অজানাই থেকে গেছে।

টি জিপসীরা সম্ভবতঃ ১৩২২ সাল ক্রীটে বসবাস করতে থাকে এবং বসবাস করতে থাকে ১৩২৬ সাল ১৫শ শতাব্দীর সুরুতে তারা নে বসবাস শুরু করে এবং পরে ব নদী অতিক্রম করে উত্তরাঞ্চল বহির্যাত্রায় বেরোয়।

পসীদের বসবাস সম্পর্কিত প্রথম দলিল পাওয়া যায় জার্মানীর হেস -১৪১৪ সালে। ১৪১৭ সালে সম্রাট নের কাছ থেকে 'সাত বছরের ধর্ম-নে রত ক্রীশ্চান' এই পরিচয়পত্র এক বিশাল বাহিনী সহ জিপসীরা হিসাবে ধর্ম অভিযানে বেরোয়। একটি দল রোমে যাবার পথে ১৪২২ লিতে প্রবেশ করে এবং অপর একটি ৪২৭ সালে প্যারিসে গিয়ে পৌঁছয়। এই সময় ইউরোপে তুর্কী আক্রমণ হয় এবং তুর্কীরা সেখানে থেকে দের বিতাড়িত করতে থাকে। ফলে, দল পৌঁছবার অনতিবিলম্বেই আর নতুন অভিযাত্রী দলকে পাশ্চাত্যে ভিযানের জন্য পাঠান হয়।

ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে জিপসীরা প্রথম সম্ভবতঃ ১৫০০ সালে। কন্টিনেন্টে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানান ন। তারপর ১৫০৫ সালে স্কট-র রাজা ৪র্থ জেমস তাঁর দেশের

ফটো: শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

জিপসীদের দলপতিকে এক সুপারিশপত্র দিয়ে পাঠান ডেনমার্কের রাজার কাছে। ১৫১৯ সালে ইংল্যান্ডে আর্ল অব্ সারে তাদের একটি দলকে সাফোকে তাঁর বাড়িতে বিশেষভাবে অপ্যায়িত করেন।

বন্ধু থেকে শত্রু

কিন্তু উভয়ের এই সহৃদয় ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্পদিনের মধ্যেই জিপসীদের ব্যবহারে সকলে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনধারণের জন্যে কোন সৎপথে যেতে তারা রাজী নয়। শহরবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে জিপসীদের নামে। ফলে ইউরোপ থেকে জিপসী-উৎখাতের ব্যবস্থা করা হয়। ইউরোপে 'লঙ্ ল' প্রণয়নের আগেই সমগ্র দেশে জারী করা হয়: যেসব জিপসীরা স্বেচ্ছায় অবিলম্বে দেশত্যাগ না করবে তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে।

১৫৯২ সালে ডারহামে পাঁচজনকে এবং ১৬১১ সালে এডিনবার্গে চারজনকে 'ইজিপসীয়ান' বলে ফাঁসি দেওয়া হয়। সেই সময় এবং তার পরবর্তী দুশ বছর ধরে বহু ইজিপসীয়ান বা জিপসীদের ঐভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সভ্যতার আলোর পথে

আধুনিককালে জিপসীদের প্রাচীন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনেক পরিমাণে ক্রমবিলুপ্তির পথে। তাদের নতুন বংশধরেরা ইদানীং স্কুলে যাওয়া অভ্যাস করছে। লেখাপড়া শিখে অপরাপর সভ্যজাতির মত জীবনযাপনের চেষ্টা করছে। অপরপক্ষে কেবল বৃদ্ধ ও প্রাচীন জিপসীদের মধ্যে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ তীব্রভাবে রয়ে গেছে।

জিপসীদের প্রতি সাধারণ মানুষের অবিশ্বাস এবং ঘৃণা (তার সঙ্গে কিছুটা আতঙ্কও) পূর্ণমাত্রায় রয়ে গেছে। ইংরেজরা যেমন জিপসীদের ঘৃণার চোখে দেখে, জিপসীরাও তেমনি ইংরেজকে ঘৃণা করে। জিপসীদের মধ্যে চৌর্যাপরাধ কেউ করে না; আর কখনো যদি কেউ সে অপরাধ করে তবে তাকে তার দলের অন্য জিপসীরা তীব্রভাবে ঘৃণ্য করে রাখে।

আমরা জানি জিপসীরা দায়িত্বশীল হয় না, তাদের বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সমাজতাত্ত্বিকেরা লক্ষ্য করেছেন, তারা সুযোগ পেলে প্রকৃত ও সৎবন্ধু এবং পরম বিশ্বাসভাজন প্রতিবেশী হতে পারে। তাদের মধ্যে আনুগত্যও থাকে প্রবলভাবে। অনেকসময় তাদের আনুগত্য, বন্ধুতা, প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা সভ্যমানুষের বন্ধুপ্রীতিকে ম্লান করে দেয়।

সমাজতাত্ত্বিকেরা আজ বিশ্বাস করেন: বৃদ্ধদের কাল শেষ হলেই জিপসীদের মধ্যে নতুন জীবনধারা পূর্ণ মাত্রায় দেখা দেবে।

ভারতীয় পটভূমিকায় প্রথম ইংরেজি শিশুসাহিত্য

আদিত্য ওহদেদার

রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ তাঁর একটা গল্পের একস্থানে লিখেছেন—'তারপর ওরা রোদে পুড়তে পুড়তে ও ধুঁকতে ধুঁকতে এলো সেই দেশে যার নাম ভারত, তাল-নারকেল খেজুর ও ধানখেতের ভারত, ছবির বইয়ের ভারত, 'লিটল্ হেনরি'র ভারত।"

লিটল্ হেনরির ভারত—এই কথাটি বিনা টীকায় আজকের দিনে কোনো ইংরেজ পাঠকের কাছেও দুর্বোধ্য। আমাদের তো কথাই নেই।

'লিটল্ হেনরি' হল ইংরেজি শিশু-সাহিত্যের একটি বই, যার পুরো নাম, 'লিটল্ হেনরি অ্যান্ড হিজ বিয়ারার'। বাংলা তর্জমায় যার অর্থ ছোট্ট হেনরি ও তার বেয়ারা। বইটি প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের গোড়াতে। লেখা হয় বাংলা দেশে। এবং এটি হল প্রথম ইংরেজি শিশু-সাহিত্য যাতে ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নির্ভর উল্লেখ দেখা যায়। শুধু উল্লেখ নয়, বইটির সম্পূর্ণ অবলম্বনই হল ভারত। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পের ঘটনাবস্তু ভারতীয় পটভূমিকায় বিধৃত। অবশ্য ইংরেজি সাহিত্যে ভারতের উল্লেখ অথবা ভারতীয় বিষয়বস্তুর অবতারণার প্রাচীনত্ব এলিজাবেথীয় যুগ থেকে। কিন্তু ইংরেজি শিশু-সাহিত্যে ভারতের প্রথম পদসঞ্চার ঘটে উনিশ শতকের রচিত এই বইটিতে।

আশ্চর্য হতে হল লিটল্ হেনরির জনপ্রিয়তায়। প্রকাশিত হওয়া মাত্র বইটি খ্যাতির শিখর স্পর্শ করল। তার জনপ্রিয়তা ছড়াল ছেলে বুড়ো সকলের মধ্যেই সমানভাবে। অচিরেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হল ফরাসী, জার্মান, চীন, সিংহলী ভাষায়। এ দেশেও একটা অনুবাদ বার হয় হিন্দিতে। এই বিপুল জনপ্রিয়তার স্থায়িত্বকাল প্রায় একশ বছর একটানা। এবং সেকালে ইংরেজরা নিজের দেশে ব'সে বাস্তব ভারত বলতে বুঝেছেন এই বইটিতে বর্ণিত ভারতকেই।

কিপ্‌লিঙ তাই বলেছেন, 'লিটল্ হেনরি'র ভারত

লিটল্ হেনরি যাঁর লেখা তাঁর নাম, মেরী মার্থা শেরউড। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডের এক গ্রামাঞ্চলে পাদ্রির ঘরে এই মহিলার জন্ম। যখন তাঁর বয়স ছয় তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু হয়। সে সময়ে ইংরেজি শিশু-সাহিত্যে মহিলাদেরই একচ্ছত্র প্রতিপত্তি চলছে। উজ্জ্বল ছিল এই সব নাম—হানা মোর, সারা ফিল্ডিং (ঔপন্যাসিক হেনরি ফিল্‌ডিং-এর বোন), অ্যানা বারবোল্ড সারা ট্রিমার ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে হানা মোর ছিলেন খ্যাতিতে সর্বশ্রেষ্ঠ। বালিকা বয়সে মার্থা শেরউড একটা সুযোগ পান হানা মোরকে দেখার। তখন হানা মোর বৃদ্ধা, এবং পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী। কিন্তু তবু তাঁর দুচোখে কী উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আর কথাবলার কী অদ্ভুত যাদু। উপস্থিত সকলকে যেন বশীভূত ক'রে রেখেছেন। এই দেখে বালিকা মার্থার মনে সাধ জাগে, যদি অমন নামকরা লেখিকা হওয়া যায়! তা মার্থার সাধ পূর্ণ হয়েছিল বৈকি। তাঁর নামও হানা মোরের চেয়ে কিছু কম হয়নি। বরং ছাড়িয়েই গিয়েছিল বলা চলে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে, শ্রীমতী শেরউডের বয়স যখন সাতাশ, তখন তাঁর প্রথম গল্প-গ্রন্থ বার হয়। পরের বছরেই সংঘটিত হয় তাঁর বিবাহ। স্বামী, ভারতীয় সৈন্যবিভাগে ক্যাপ্‌টেন। সেই সূত্রে স্বামীর সঙ্গে তিনি ১৮০৫ সালে ভারতে আসেন। স্বামীর কর্মস্থল হয় প্রথমে দানাপুর, তারপর বহরমপুর এবং পরে কানপুর। বহরমপুরে থাকাকালে তাঁদের একটি ছেলে হয়। তার হেনরি। মাত্র দেড় বছর বয়সে হেনরি মারা যায়। শ্রীমতী শেরউডের ডায়ারির পাতায় আছে এ সম্পর্কে এক সকরুণ বিবরণ।—সূর্যাস্তের রক্তাভ আলোয় তিনি তাঁর বাংলোর বারন্দায় দাঁড়িয়ে। তাঁর ছোট্ট হেনরি তাঁর দুহাতের মধ্যে। তিনি জানতে পারছেন যে, মৃত্যু আর একটু সময়ের মধ্যেই তাঁর শিশুপুত্রকে গ্রাস করতে চলেছে। অনাড়ম্বর সরল ভাষায় লিখিত এই বিবরণ শ্রীমতী শেরউডের সমগ্র রচনার মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল।

নিজের অন্তরের পাথর-চাপা শোককে খানিক মুক্ত করবার জন্যেই যেন শ্রীমতী শেরউড তাঁর লিটল্ হেনরি গল্পটি লেখেন। তাঁর শিশুপুত্র হেনরির মৃত্যুই এই রচনার প্রেরণা। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে গল্পটি লেখা শেষ হয়। লেখিকা লেখাটি পাঠিয়ে দেন দেশে তাঁর বোনকে। বোন এটি ছাপাবার ব্যবস্থা করেন, এবং ১৮১৫ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী শেরউড বিশ্রুতকীর্তি হয়ে পড়লেন।

এরপর শ্রীমতী শেরউড বেশিদিন ভারতে থাকেননি। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে বিলেতে ফিরে যান। সেখানে মেয়েদের একটি স্কুল খোলেন। এই স্কুলে বিশেষ ক'রে সেই সব মেয়েদের স্থান হত যাদের বাবা মা থাকত ভারতে। এই কাজের সঙ্গে শ্রীমতী শেরউডের ছিল আর এক কাজ—অজস্র গল্প লেখা। তাঁর সমগ্র রচনাবলী ষোল খণ্ডে প্রকাশিত। এদের মধ্যে অনেক রচনারই পটভূমি ভারত।

আগেই বলেছি, 'লিটল্ হেনরি'র উৎস হল লেখিকার স্বীয় পুত্রবিয়োগজাত শোক। গল্পের নায়ক ছোট্ট হেনরির মধ্যে তিনি তাঁর শিশুপুত্রেরই যেন একটা বিকাশ রেছেন। গল্পে দেখতে পাই হেনরির মা মারা গেছে তার শৈশবে। তার বাবা সৈনিক, ভারতে কোনো এক যুদ্ধে প্রাণহানি ঘটে। তার মা-ও এরই কিছু পরে মারা যায়। ছেলেটি অনাথ। অনাথালয়ে যায়নি, কারণ এক ধনী · তাকে আশ্রয় দেন। হেনরি তাকে মা জানে। কিন্তু হেনরির জন্যে ভদ্রমা বিশেষ কোনো মাথাব্যাথা নেই, তাকে বেয়ারার হাতে তুলে দিয়েই কর্তব্য। ছেন। বেয়ারার নাম 'বুজি'। জাতিতে হিন্দু। তার কাছে হেনরি হিন্দুর মতোই মানুষ হতে থাকে। বুজি হে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

একদিন হেনরিদের বাড়িতে মেয়ে এল। সে এসেছে বিলেত আসার কারণ—এক মিশনারি যুবক। নারির সহধর্মিণী যে হবে, তার মধ্যে গোঁড়ামি তো থাকবেই। মেয়েটি দেখল খৃস্টান বালক প্রায় হিন্দু হয়ে বসেছে। সে অমনি উঠে পড়ে লেগে তাকে উদ্ধার করতে। হেনরিকে সে খৃস্টান করবে। বহু ধৈর্য ধরে লাগল খৃস্টমতে কা'কে বলে পাপ, পুণ্য, কাকে বলে ভগবান। কিন্তু তা বোঝে না। বরং বিরক্ত হয়ে বলে তুমি কিচ্ছু জানো না। আমার মা'র আলাদা, বুজির ভগবান আলাদা। জানি, ভগবান একটা নয়, অনেক।

ভাবী মিশনারি-জায়া কিন্তু হাল না। হেনরিকে সে লেখাপড়া লাগল। বাইবেল থেকে পড়ে শোনায় বোঝায়, গান গায়। ক্রমে হেনরির মনে ধর্মের প্রভাব পড়ল। গোটা বাইবে কয়েক শেষ করল। সে বুঝল খৃস্টান। অর্থাৎ তার শিক্ষা সম্পূর্ণ তখন বয়স মাত্র আট।

এবার বালক হেনরি নিজেই হ যেন এক মিশনারি। সে চাইল তার বাকে উদ্ধার করতে। অন্ধকার আলোকে আনতে। বুজিকে শেখাতে করল খৃস্টধর্মের তত্ত্ব-মহিমা। বুজি কিন্তু টলে না। হিন্দুধর্ম তাকে ক' রেছে?—যেমন নদী অনেক, ঝর্ণা কিন্তু তারা সকলেই একই মহাসাগ মেশে, তেমনি ধর্ম অনেক, মত কিন্তু তাদের সবারই লক্ষ্য সেই এ বান, একই মুক্তি।

কিন্তু বুজি যে হেনরিকে ভা সেই ভালোবাসার খাতিরে বুজি অনুরোধে পড়াশুনা ধরল ও ক্রমে পড়তে শিখল। ইতিমধ্যে হেনরি শয্যা নিয়েছে এবং সে যে আর সে না, তাও বুঝতে পেরেছে। ম শুয়ে বালক হেনরি বুজিকে সকা বারে বলতে থাকে যে, সে জন্ম অবধি একমাত্র বুজির কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়েছে। বুজিকে সেও ভালোবাসে। সেই বুজি বিধর্মী এতে হেনরি স্বর্গে গিয়েও সুখ তখন বুজি আর কী করে, তার

মেটাতে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল। হেনরির তার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে দেখে পরম সুখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

লিটল্ হেনরির যে কাহিনী-চুম্বক দেওয়া হল তাতে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে যে, এ কাহিনীর মধ্যে কী এমন বস্তু আছে যার ফলে বইটির অতখানি জনপ্রিয়তা ঘটেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে শ্রীমতী শেরউড যেকালে লিখেছেন তখন ইংরেজী শিশু-সাহিত্য নীতিসুধাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাই সে-যুগের আর পাঁচটা শিশু-সাহিত্যের বইয়ের মতো এটিও একটি নীতিসুধামূলক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছে। শিশু-সাহিত্যে তখন 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে'র কল্পনা তো দূরে অস্ত, এমনকি পূর্বগামী লেখক জন নিউবেরি, যার লেখায় শিশু-সাহিত্যগত দক্ষতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তিনিও অবহেলিত। শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে এই চেতনাই তখন ছিল না যে শিশুপাঠ্য কাহিনী হবে বেগবন্ত, আনন্দ-উচ্ছল এবং সহজেই শিশুমনের নির্বাধ কল্পনা ও কৌতূহল জাগ্রত তথা চরিতার্থ করার উপযোগী। সুতরাং সত্যি কথা বলতে, লিটল্ হেনরির খ্যাতি খাঁটি শিশু-সাহিত্যসম্মত কোনো বিশিষ্ট গুণের ওপর নির্ভর নয়। তার খ্যাতির মেরুদন্ড তার কাহিনীর প্রেক্ষাপট, কথাবস্তুর ভৌগোলিক গুরুত্ব।

অবশ্য শ্রীমতী শেরউডের সমকালে ইংরেজী শিশুসাহিত্যে ভৌগোলিক দিগন্ত-বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াটা ছিল কৃত্রিম—থিয়েটারের দৃশ্যপট সাজানোর মতো। নতুন দেশের, বিশেষ ক'রে প্রাচ্য-দেশের অবাস্তব ভৌগোলিক বিবরণ ছাড়াও সেসব দেশের সভ্যতা, সমাজ ও দেশবাসীর সম্বন্ধে লেখকলেখিকাদের কোনো দরদ বা সহৃদয়সংবেদ্য অনুভূতি থাকত না। বরং স্পষ্ট পরিবাদ-সংপৃক্ত উক্তির সন্নিবেশ ঘটত। যেমন এই সময়কার লেখা এক শিশুপাঠ্য গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে সুদূর প্রাচ্যের একটি দেশ। সেই দেশবাসীর সম্পর্কে লেখা হয়েছে এরা স্বভাবে ক্রীতদাস। এদের মুখে এক কাজে আর এক। সত্যি কথা বলতে একেবারেই জানে না।

লিটল্-হেনরি এবম্বিধ দোষ থেকে মুক্ত। এতে খৃস্টধর্ম প্রচারের মনোভাব আছে, কিন্তু তাতে এই দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে পরিবাদের কালিমা লাগে নি। বরং ধর্মান্তরগ্রহণের পালা স্নেহ-ভালোবাসা অবলম্বনে রূপায়িত হয়েছে। তাছাড়া ভারতের যে প্রথম বাস্তব রূপ এই বইতে পাই তার পেছনে আছে লেখিকার সাহিত্য-রস-সম্মত দরদ ও কৌতূহল। অবশ্য শ্রীমতী শেরউড এই দেশকে দেখেছেন তাঁর বাংলোর বারান্দা থেকে; কিন্তু বাইরে থেকে যতটুকু দেখেছেন তার একটা অন্তরঙ্গ, অকৃত্রিম ছবি এঁকেছেন। ফলে এর আবেদন সেদিনকার সাধারণ ইংরেজ পাঠকের কাছে বিপুল হয়ে দেখা দেয়। দূর থেকে অদেখা অজানা ভারতের একটা বাস্তব পরিচয় পাবার মাধ্যম হয়ে ওঠে এই বই।

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে এদেশের ছোটখাট দৃশ্যবর্ণনার মধ্য দিয়েই শ্রীমতী শেরউড ভারতের বাস্তব রূপ কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। অসুস্থ হেনরি, তার পালিকা মা ও বেয়ারা বুজি, সকলে মিলে নৌকো ক'রে কলকাতা যাচ্ছে। পথে রাজমহলেরকাছে বিশ্রামের জন্যে তাদের নৌকো থামল। এই সময়কার বর্ণনা দিচ্ছেন লেখিকা—"তখন সূর্য সবে অস্ত যাচ্ছে। একটা ঝিরঝিরে হাওয়া জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে, যার ঠান্ডা পেলব স্পর্শে হেনরির মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তার সারা দেহও যেন সতেজ হয়ে উঠল। সে বুজির সঙ্গে একটা ছোট টিলার ওপর অনায়াসে হেঁটে চলে গেল। সেখানে একটা বাঁধানো কবর। তারই কাছ ঘেঁসে সে ও বুজি বসল। বাঁদিকে গঙ্গার স্রোত এঁকে বেঁকে তীর ঘেঁষে বয়ে চলেছে এবং অদূরে রাজমহল পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। নিচে চোখ ফেরাতেই হেনরি দেখতে পেল তাদের রঙিন বজরা নৌকো বাঁধা রয়েছে। তার আশেপাশে আরও অনেক নৌকো, হোগলা-পাতার ছাউনি দেওয়া। মাঝি-মল্লা, চাকর-বাকরেরা নিজেদের রান্নার যোগাড় করছে; তবে তাদের জাত-অনুযায়ী আলাদা আলাদা উনুন পাতা হয়েছে। কেউ মশলা পিষছে, কেউ উনুনে আঁচ দিচ্ছে, কেউ বা পেতলের বাসন ধুয়ে পরিষ্কার করছে। আবার অনেকে গোল হয়ে বসে হুঁকো টানছে গল্প করছে। হেনরি এবার তার ডানদিকে চোখ ফেরাল, দেখল সেদিক প্রসারিত রয়েছে স্নিগ্ধ-মধুর প্রান্তরভূমি যেখানে পাকা ফসলে সোনালি রঙ ধরেছে। তারই মাঝে মাঝে রয়েছে নানা গাছপালা ঘেরা মাটির কুটির—বাঁশের খুঁটি পোতা আঙিনা ও তার কোল ঘেঁষে কিছু কলাগাছ ও তাল-গাছ। বহুদূরে দিগন্তকোলে রেখায়িত হয়েছে রাজমহল পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো চূড়া, যা কোথাও বৃক্ষরিক্ত, কোথাও বা বন্য-জন্তুসংকুল জঙ্গলাকীর্ণ।"

এই রকম বাস্তব প্রকৃতি-চিত্রণ ছাড়া আর এক ধরনের বাস্তবতাও লিটল্ হেনরিতে উপভোগ্য। লেখিকা সেসময়কার ভারতে ইংগসমাজের পরিহাসযোগ্য দিকটা তুলে ধরতে কসুর করেননি। হেনরিরা কলকাতায় বেড়াতে এসেছে স্মিথ পরিবারের বাড়িতে। হেনরির মাকে তাঁর পরিচিত লোকদের বাসায় দেখাসাক্ষাৎ করতে যেতে হবে। সেজন্যে চাই যথাযোগ্য পোষাক-পরিচ্ছদ। মফস্বল শহর দানাপুরে যা ছিল নবতম ফ্যাশন, কলকাতায় দেখা গেল তা একেবারে পুরোনো—বাতিলের পর্যায়ে। সুতরাং নতুন সাজ-পোশাক তৈরি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। একদিন তিনি ও শ্রীমতী স্মিথ যখন ঘরে বসে একটা পত্রিকার পাতা উল্টে পাল্টে নতুন নতুন হাল-ফ্যাশনের পোশাকের ছবি দেখতে ব্যস্ত, তখন মিঃ স্মিথ সেই ঘরের এক কোণে মুখ বুজে ব'সে এঁদের কান্ড দেখছিলেন। হঠাৎ পাশের ঘরে মিঃ স্মিথের নজর পড়ল। সেখানে হেনরি মৃদু-স্বরে বুজিকে বাইবেল থেকে পড়ে শোনাচ্ছে আর ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে।

মিঃ স্মিথ প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন। আশ্চর্য! আমি ছাব্বিশ বছর এখানে বাস করছি, কিন্তু এমনটি কোনোদিন দেখিনি। ওই ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে কী করছে, আর এই ঘরে পঞ্চাশ-পেরুনো দুই ভদ্রমহিলা কী করছে!

শ্রীমতী স্মিথ ফোঁস ক'রে উঠলেন, তুমি দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। কখন কী বল, তার ঠিক থাকে না।

হেনরির মা তো প্রায় ক্ষেপে গেলেন। মিঃ স্মিথের দিকে সোজা তাকিয়ে সক্রোধে বললেন, পঞ্চাশ পেরিয়েছে মানে? আপনি কি বলতে চান, আমার বয়স পঞ্চাশ।

মিঃ স্মিথ অপ্রস্তুত হয়ে সবিনয়ে জানালেন, তা হিসেবে হয়ত একটু ভুল হয়েছে।

—কী বললেন? একটু ভুল হয়েছে। পাক্কা বিশ বছরে তফাৎকে বলছেন একটু হিসেবের ভুল!

শ্রীমতী স্মিথ তাঁর বান্ধবীর হাত ধরে অনুনয় করলেন, যেতে দাও ভাই। ওঁকে ক্ষমা করো। উনি রেগে গেলে বয়সের এমন উলটো-পালটা হিসেব কষেন।

ভারতীয় পটভূমিকায় লেখা আরো বেশ কয়েকটি ছোটদের গল্প আছে শ্রীমতী শেরউডের। কিন্তু তারা লিটল্ হেনরির কাছে নিষ্প্রভ। শ্রীমতী শেরউডের ব্যক্তিক সাহিত্যিক সুনাম ও প্রতিষ্ঠা তা লিটল্ হেনরিকেই কেন্দ্র ক'রে।

আজ অবশ্য এরই একটি লুপ্তরত্ন।

সম্প্রতি একটি বিলিতি পত্রিকায় এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিদেশের পটভূমিকায় লেখা পথিকৃৎ শিশুসাহিত্য হিসেবে লিটল হেনরির কদর আজকের দিনের পাঠকের কাছেও হওয়া উচিত। বইটির পুনর্মুদ্রণ সুপারিশ করা হয়েছে।

শিশুসাহিত্যের মূল্যে লিটল্ হেনরির পুনর্মুদ্রণ প্রস্তাবে আমাদের দৃষ্টিতে হয়ত তেমন সমর্থনযোগ্য না ঠেকতে পারে। কিন্তু বিদেশী সাহিত্যে ভারত—এই প্রসঙ্গের গবেষণা ও আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ-যে একটি অত্যাবশ্যক দলিল, একথা মানতেই হবে। এবং সে কারণে আমাদের কাছে লিটল্ হেনরির একটা আবেদন স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে। অতএব তার পুনর্মুদ্রণ কাম্য।

রঙিগলা ২.৭৫
জীবনের যতো সব
দরকারী কাজ
জীবনের বহু দরকারী কাজে জুতো না-হলে ছোটদের চলে না। এমন সব কাজ যথা : ইঁট-পাথরে লাথি মারা, গাছে চড়া, মারবেল সুট করা, স্কুলে যাওয়া, হকি খেলা, ট্রাইসাইকেল চড়া, কিম্বা যেখানে মজা সেখানে উর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া। জুতো পায়ে না-থাকলে এসব কাজ কি জমবে! তাই জুতোর দরকার বড় বেশি। দেখতে ভালো, টিকবে ভালো, আরামে হাঁটতে ভালো—এমন জুতোই ছোটদের দরকার। আর এমন জুতোই তো বাটার জুতো, গত ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতায় উৎকৃষ্ট।
মিণ্টু ৬.৯৫
জলি ৫.৯৫—৬.৯৫
লার্ক ৬.৯৫
জলিগুড ৮.৫০—৯.৫০
Bata
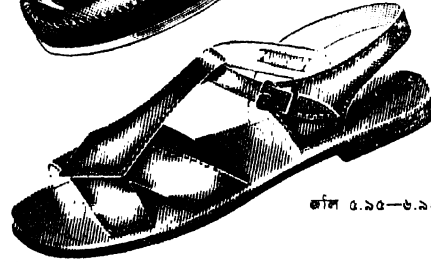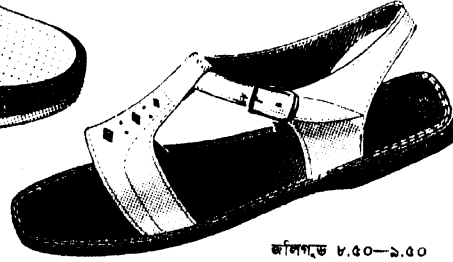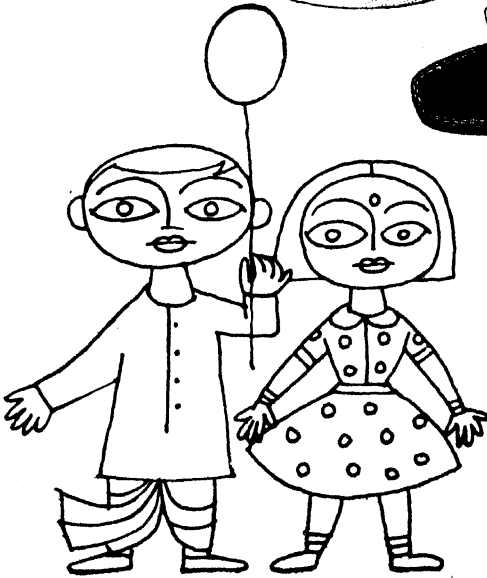
মহাভারতে গীতা-ষোড়শী

সুখময় ভট্টাচার্য

মহাভারতের ভিতরে ষোলখানি গীতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদরূপে ভীষ্মপর্বে যে গীতা প্রচারিত হইয়াছে, সাধারণতঃ এই গীতার সহিতই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অপর গীতাগুলির কথা আমরা বিশেষ কিছু জানি না। এই প্রবন্ধে ষোলখানি গীতারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

১। **শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা** — কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ-রূপে প্রকাশিত। ইহা উপনিষদের সার, ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্র। ভীষ্মপর্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে ৪২শ অধ্যায় পর্যন্ত মোট অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা কীর্তিত। মহাভারত রত্নহারের মধ্যমণি এই মহা-গ্রন্থখানি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অনুপম উপদেশ-রূপে সমগ্র জগতে পূজিত হইয়া থাকে।

২। **উতথ্য-গীতা**—শান্তিপর্বের ৯০তম ও ৯১তম অধ্যায়ে এই গীতাখানি কীর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্ উতথ্য জিজ্ঞাসু নরপতি মান্ধাতাকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইগুলিই উতথ্যগীতা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এই গীতাতে ধর্মের স্বরূপ এবং ধার্মিক রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক অমূল্য তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

৩। **বামদেব-গীতা**—শান্তিপর্বের ৯২-তম অধ্যায় হইতে ৯৪তম অধ্যায় পর্যন্ত তিন অধ্যায়ে এই গীতাখানি প্রকাশিত। জিজ্ঞাসু ধার্মিক নরপতি বসুমনা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বামদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করেন, সেই সকল উপদেশ এই গীতায় বিধৃত। এই গীতাতে ধর্মের মহিমা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কুফল, কল্যাণ-কর্মে আত্মনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অমূল্য উপদেশ রহিয়াছে।

৪। **ঋষভ-গীতা**—শান্তিপর্বের ১২৫-তম অধ্যায় হইতে ১২৮তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট চারি অধ্যায়ে এই গীতাখানি প্রচারিত। হৈহয়-বংশীয় নৃপতি সুমিত্র বিপ্রর্ষি ঋষভ হইতে যে উপদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই ঋষভ-গীতায় বিধৃত হইয়াছে। এই গীতা-খানি গল্পচ্ছলে কীর্তিত। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—আশা পরি-ত্যাগেই জীবের প্রকৃত শান্তি।

৫। **ব্রহ্মগীতা-গাথা**—প্রজাপতি ব্রহ্মা নৃপতিদের ধনসংগ্রহ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। তাহাই শান্তিপর্বের ১৩৬তম অধ্যায়ে রহিয়াছে। এই উক্তি-গুলিকেই ব্রহ্মগীতা-গাথা বলা হয়। প্রজাপতির উপদেশের মর্মার্থ হইতেছে—অসাধুর নিকট হইতে বলপূর্বক ধনসংগ্রহ করিয়া সেই ধন সমাজের কল্যাণার্থে দান করা উচিত।

৬। **ষড়্জ-গীতা**—শান্তিপর্বের ১৬৭-তম অধ্যায়ে এই গীতাখানি বিধৃত। কিভাবে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিলে গৃহস্থের যথার্থ কল্যাণ হয়, ইহাই ষড়্জ-গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য। বিদুর ও পঞ্চপান্ডব এই গীতার বক্তা এবং তাঁহারাই পরস্পর শ্রোতা।

৭। **শম্পাক-গীতা** — শান্তিপর্বের ১৭৬তম অধ্যায়। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শম্পাকের উপদেশের নাম শম্পাক-গীতা। উপদেশের সারার্থ হইতেছে—জগতে ধনীর তুলনায় দরিদ্রই সর্বাধিক সুখী, বিষয়-তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল।

৮। **মঙ্কি-গীতা**—শান্তিপর্বের ১৭৭-তম অধ্যায়। মঙ্কি-নামক একজন গৃহস্থ অনেক চেষ্টা করিয়াও ধনী হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি দুইটি ছোট বলদ কিনিয়া তাহাদিগকে গাড়ীতে যুতিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের কাঁধে একখণ্ড কাঠ যোজনা করিলেন এবং গলার সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। বলদ দুইটি একটি শায়িত বলবান উটকে মাঝখানে রাখিয়া চলিবার সময় হঠাৎ উটটি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলদ দুইটির কাঁধের কাঠখানি উটের পিঠে আটকাইয়া গেল। সেই অবস্থায়ই বলদ দুইটিকে শূন্যে তুলিয়া উট দৌড়াইতে লাগিল। গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়া দুইটি বলদই মারা গেল। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া মঙ্কি বুঝিতে পারিলেন যে, জগতে শুধু নিজের চেষ্টায় কিছুই হয় না, দৈবকেও স্বীকার করিতে হয়। বাসনা পরিত্যাগ-পূর্বক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করাই মানুষের একমাত্র ধর্ম। অতঃপর নির্বিণ্ণ মঙ্কি নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, সেই-গুলিই মঙ্কি-গীতার মূল প্রতিপাদ্য।

৯। **বোধ্য-গীতা**—শান্তিপর্বের ১৭৮-তম অধ্যায়। নৃপতি নহুষের পুত্র ঋষি বোধ্যকে ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ঋষি কহিয়াছেন—'উপদেশ-দানে আমার অধিকার নাই, সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি—পিঙ্গলা, কুরর (উৎক্রোশ, কুরল —চিলজাতীয় পাখী), ভ্রমর, ইষুকার (ব্যাধ) এবং কুমারী—এই ছয়জন হইতেছেন আমার গুরু'। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে এই গুরুদের এবং আরও আঠারজন গুরুর কথা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক গণিকা ছিল। অর্থপ্রাপ্তির আশায় সে সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, কিন্তু সকল রাত্রিতে তাহার বাসনা পূর্ণ হইত না। পরে সে নিজেকে ধিক্কার দিয়া আশা পরিত্যাগপূর্বক সুখে কাল কাটাইয়াছিল।

কুররের মুখে একখণ্ড মাংস থাকায় অন্যান্য বলবান কুররগণ সেই মাংসের টুকরাখানি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত তাহাকে আক্রমণ করে। অবশেষে মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়াই কুরর শান্তি লাভ করিয়াছিল।

গৃহাদি সম্পত্তির অর্জন ও রক্ষণ পরম দুঃখের হেতু। সাপ ইঁদুরের গর্তেই পরম সুখে বাস করে।

ভ্রমর অতি কষ্টে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু সেই মধু তাহার ভোগে লাগে না।

স্থিরলক্ষ্য এক ব্যাধের নিকট দিয়া সদলবলে এক রাজা চলিয়া গেলেন, কিন্তু একনিষ্ঠ ব্যাধ কিছুই জানিতে পারিল না।

একদা এক বরপক্ষ বিবাহের প্রস্তাব করিতে এক ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই সময়ে ভদ্রলোকের কুমারী কন্যা ব্যতীত গৃহস্বামী প্রভৃতি কেহই বাড়ী ছিলেন না। ঘরে চাউল না থাকায় অগত্যা সেই কুমারীই অতিথি সৎকারের নিমিত্ত উদুখলে ধান ভানিতে আরম্ভ করিল। তাহার হাতের শাঁখাগুলি ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিতে থাকায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়াই সে প্রত্যেক হাতে মাত্র এক এক গাছি শাঁখা রাখিয়া অন্যগুলি ভাঙিয়া ফেলায় লজ্জার হাত হইতে রেহাই পাইল। একত্র

ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকের এবং দুই-এর অবস্থিতিও কলহাদির হেতু। অতএব একাকী নির্জনে বাস করাই মনকে স্থির করিবার উপায়।

১০। **বিচখ্নু-গীতা**— শান্তিপর্বের ২৬৫তম অধ্যায়। নৃপতি বিচখ্নু কর্তৃক অহিংসার মাহাত্ম্য কীর্তন।

১১। **হারীত-গীতা**—শান্তিপর্বের ২৭৭ তম অধ্যায়ে মহামুনি হারীতের উপদেশ। ইন্দ্রিয়-সংযম ও সর্বভূতে অভয়-দানই পরম ধর্ম। ইহাই হারীত-গীতার মর্মকথা।

১২। **বৃত্র-গীতা**—শান্তিপর্বের ২৭৮তম ও ২৭৯তম অধ্যায়। বৃত্রাসুর অতিশয় ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। কালে তিনি তাঁহার সমস্তই হারাইয়াছেন। তাঁহার শোচনীয় দারিদ্র্য দেখিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ দশা-বিপর্যয়ে তাঁহার মনে কিরূপ ব্যথা লাগিতেছে। উত্তরে বৃত্র কহিতেছেন—'ভগবন, তপস্যা দ্বারা ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলাম, নিজেরই কৃতকর্মের ফলে তাহা হারাইয়াছি। ধৈর্যে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ, আমার কোন দুঃখ নাই।' ধৈর্য ও সন্তোষ সম্বন্ধে বৃত্র যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেইগুলিই এই গীতায় বিধৃত।

১৩। **পরাশর-গীতা**— শান্তিপর্বের ২৯০তম হইতে ২৯৮তম অধ্যায়। মোট নয় অধ্যায়ে এই গীতা পরিব্যাপ্ত। জিজ্ঞাসু রাজর্ষি জনকের প্রতি মহর্ষি পরাশরের উপদেশরূপে এই গীতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—ত্যাগ-মহিমা ও আশ্রম-ধর্ম।

১৪। **হংস-গীতা**—শান্তিপর্বের ২৯৯তম অধ্যায়। প্রজাপতি ব্রহ্মা হাঁসের রূপ ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসু সাধ্যগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশাবলীই হংস-গীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সংযম, ক্ষমা, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতি বিষয়ে হংস অনেক কিছুই কহিয়াছেন। এই গীতায় হংসের একটি চমৎকার উক্তি রহিয়াছে—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি,
ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।
—তোমাদিগকে একটি মহৎ এবং গুহ্য তত্ত্ব বলিতেছি—মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' মহাকবি চণ্ডীদাসের এই উক্তি যেন হংস-গীতার প্রতিধ্বনি।

১৫। **অনুগীতা**—অশ্বমেধ পর্বের ১৬শ হইতে ১৯শ অধ্যায়। এই গীতাখানি চতুরধ্যায়ী। পরস্পরের ভাষা ভিন্ন হইলেও শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও অনুগীতার প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন। রাজ্যপ্রাপ্তির অনেক দিন পরে একদা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'ভগবন, মহাযুদ্ধের পূর্বে তুমি আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলে, সেইগুলি যেন ভুলিয়া গিয়াছি, কৃপা করিয়া পুনরায় বল'। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যমনস্কতার জন্য অর্জুনকে মৃদু তিরস্কার করিয়া পুনরায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই অনুগীতা, অর্থাৎ পশ্চাৎ উপদিষ্ট শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

১৬। **ব্রাহ্মণ-গীতা**— অশ্বমেধ-পর্বের ২০শ অধ্যায় হইতে ৩৪শ অধ্যায় পর্যন্ত মোট পনের অধ্যায় ব্যাপিয়া এই গীতাখানি কীর্তিত হইয়াছে। মহাজ্ঞানী একজন ব্রাহ্মণকে একদা নির্জনে উপবিষ্ট দেখিয়া তদীয় পত্নী কহিতেছেন—'তোমার ন্যায় বেরসিক স্বামী লাভ করায় আমার ইহকাল বা পরকালের কি কল্যাণ হইতেছে। জ্ঞান-তপস্বী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বচনে রুষ্ট না হইয়া স্মিত মুখেই কহিতে লাগিলেন—'হে সুভগে, স্থূলে সাংসারিক কৃত্যকেই লোক-সমাজে কর্ম বলিয়া মনে করে, কিন্তু এইগুলি যথার্থ কর্ম নহে'।

অতঃপর কর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য এবং আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ পত্নীকে অপূর্ব উপদেশ দেন। এই সকল উপদেশই ব্রাহ্মণ-গীতা। ব্রাহ্মণের উপদেশে ব্রাহ্মণী ধন্য হইয়াছেন। এই গীতাখানি বৃহদারণ্যক-উপনিষদের মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়—ব্রাহ্মণ-গীতা মনোবুদ্ধির রূপকচ্ছলে কীর্তিত। মন হইতেছে—ব্রাহ্মণ, আর বুদ্ধিই ব্রাহ্মণী।

দিব্যদৃষ্টি সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্র শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুনিয়াছিলেন। ষড়্জ-গীতা ব্যতীত শান্তিপর্বের সকল গীতাই শরশয্যাগত পিতামহ ভীষ্মের মুখে প্রকাশিত এবং এইগুলির প্রধান শ্রোতা মহারাজ যুধিষ্ঠির। অনুগীতার প্রকাশক বৈশম্পায়ন, শ্রোতা নৃপতি জনমেজয়। ব্রাহ্মণগীতার শ্রোতা অর্জুন, আর বক্তা শ্রীকৃষ্ণ।

এই প্রবন্ধে বঙ্গবাসী-প্রকাশিত পণ্ডিত-প্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারত হইতে অধ্যায়-সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে 'অবধূত-গীতা', 'ভিক্ষু-গীতা' এবং 'ঐল-গীতা' নামে তিনখানি গীতা দেখা যায়।

'পাণ্ডব-গীতা' বা 'প্রপন্ন-গীতা', 'ভগবতী-গীতা' প্রভৃতির পৌরাণিক সংগ্রহ-গ্রন্থ, ভক্তজনের প্রাণের প্রার্থনা।

বিশ্বসার-তন্ত্রে 'গুরুগীতা' নামে একখানি গীতা দেখা যায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৯ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সবে মাত্র প্রকাশিত হইল
একখানি অনবদ্য ভ্রমণ আলেখ্য

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

• দ্বিতীয় পর্ব •

শ্রীদেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে কত তীর্থ কত জনপদ কত মানুষের মেলা। এই গ্রন্থে ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, মধ্যমেশ্বর, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর, অনসূয়া, লোকপাল, হেমকুণ্ড, ভ্যালী অব ফ্লাওয়ারস, বদরিনাথ প্রভৃতি নানা তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল
এই শ্রাবণ মাসেই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল
উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত

রম্যাণিবীক্ষ্য

কামরূপ পর্ব ৮·৫০

যাব পূর্বে যে সব পর্ব প্রকাশিত হইয়াছে

বিড় পর্ব	(৫ম সং)	৮·০০
ালিন্দী পর্ব	(৭ম সং)	৮·০০
জস্থান পর্ব	(৭ম সং)	৮·৫০
ৌরাষ্ট্র পর্ব	(৫ম সং)	৭·৫০
হারাষ্ট্র পর্ব	(৫ম সং)	৮·০০
ৎকল পর্ব	(৫ম সং)	৮·০০
ত্তর ভারত পর্ব	(৪র্থ সং)	৮·৫০
মাচল পর্ব	(৪র্থ সং)	৮·০০
শ্মীর পর্ব	(৩য় সং)	৮·৫০

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল
একটি অনবদ্য প্রকাশন

বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা ১০·০০

জন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের খানি উপন্যাস ও নাটকের সারাংসার।

শ্রীনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

২৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 7th October 1966. শুক্রবার, ২০শে আশ্বিন, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

সবার উপরে মানুষ সত্য

সবিনয় নিবেদন—

আপনাদের ৩০শে ভাদ্রের 'অমৃত' সংখ্যায় অভয়ঙ্করের "সবার উপরে মানুষ" প্রবন্ধটি একটি অপূর্ব রচনা। বিজ্ঞান আজ বিপ্লব এনেছে মানুষের জীবনে। বিজ্ঞান আজ জয় করেছে প্রকৃতিকে—এগিয়ে চলেছে তার নব নব সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে। আজ আমরা জড়-বস্তুর সন্ধানেই সমধিক অগ্রহী। কিন্তু এদিকে মানুষ ভুলে গেছে তার আসল এবং নিজস্ব সত্তাটিকে। জীবনের সেই শাশ্বতবাণী "সোহম্" সম্বন্ধে আজ আর আমরা আগ্রহশীল নই। অথচ আমরা জড়বস্তুর বিশ্লেষণে আত্মসমাহিত। আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের চরিত্র, কৃষ্টি, মানবতার ধর্ম। মানবজীবনের সুগভীর মর্মবাণীর কথাও আমরা ভুলে যেতে বসেছি। আজ মানুষে মানুষে হানাহানি চলেছে—জাতি-বৈষম্য বিভেদের ধর্ম আজ আমাদের আসল সত্তাকে ঠিক ঠিক মত চিনতে দিচ্ছে না। আমরা ভুলে গেছি মানুষ অমৃতের সন্তান। অভয়ঙ্কর অতি দুঃখের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন "আত্মসম্মান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে পাশাপাশি বাস করতে পারে তেমন কোন উপকরণ কি আজ আবিষ্কার করা যায়"। আমাদের বাঁচতে হলে সেই উপকরণ আবিষ্কার করতে হবে। বিখ্যাত কবি বার্ন্স মানুষের এই দুর্দশার ইতিহাস দেখে বলেছেন— "Man's inhumanity to man makes countless thousand mourn." কবে সব দেশের মানুষই সব দেশের মানুষকে বুকে তুলে ধরে কবির ভাষায় বলতে পারবে—"সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই"। সেদিন নিশ্চয় আসবে—তখনই মানুষ ভুলে যাবে জাতি-বৈষম্য ও উগ্র জাতীয়তা বোধ। সেদিনের আশায় আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করে থাকবো।

নমস্কারান্তে

শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা—৩৭।

।। বেতারশ্রুতি ।।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিবেদন—

মহাশয় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে 'বেতার-শ্রুতি' শিরোনামায় প্রকাশিত পত্রটি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। এই পত্রের এক স্থানে লেখক মহাশয় 'অনুরোধের আসরে' গায়কের নাম ঘোষণার সাথে গীতিকার ও সুরকারের নাম ঘোষণা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নিকট আবেদন করেছেন যাহা সত্য প্রণিধান যোগ্য। আমরা অনুরোধের আসরে যে সমস্ত গান শুনি তা গায়কের একারই সৃষ্টি নয়। প্রত্যেকটি গান সৃষ্টির পিছনে গীতিকার এবং সুরকারের ভূমিকা গায়ক অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। গীতিকার ও সুরকার গানে কথা ও সুর সংযোগ করেন এবং গায়ক সেই কথা সুরে কণ্ঠ দিয়ে গানের সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে অনুরোধের আসরে গায়কের নাম ঘোষণার সময় যদি গীতিকার এবং সুরকারের নামও ঘোষণা করার ব্যবস্থা হয় তাহলে প্রত্যেকেরই প্রতি সুবিচার করা হয়। এছাড়া বর্তমান ব্যবস্থার একদিকে যেমন গায়ক একাই জনপ্রিয় হবার সুযোগ পাচ্ছেন, অপরদিকে তেমনই সুরকার এবং গীতিকার অবহেলিত হচ্ছেন। ঐ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বলা যায় যে, শ্রোতাদের নাম ঘোষণা করার পরিবর্তে গায়ক ও গানের সুরকারের নাম ঘোষণা করাই যুক্তিযুক্ত। শ্রোতাদের নাম ঘোষণা বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষের যদি আপত্তি থাকে, তাহলে এই আসরের সময় অল্প কিছু বাড়িয়ে বিবিধ-ভারতীর (হিন্দী ভারতী?) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, শ্রোতা, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক, প্রত্যেকেরই নাম ঘোষণা করা উচিত।

আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে অনুরোধের আসরে যাঁরা শ্রোতা তাঁদের অনেকেই এই আসরে প্রচারিত গানের রচয়িতা ও সুরকারের নাম জানার জন্যও আগ্রহী। তাঁদের প্রত্যেকের পক্ষে রেকর্ড কিনে অথবা গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত বই সংগ্রহ করে, গীতিকার ও সুরকারের নাম জানা সম্ভব নয়। সুতরাং অনুরোধের আসরে গায়কের নাম ঘোষণার সাথে যদি গীতিকার এবং সুরকারের নামও ঘোষণা করার ব্যবস্থা হয়, তাহলে এই আসরে প্রচারিত বিভিন্ন সুরকার এবং গীতিকারের ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হওয়ার সুযোগও শ্রোতারা পাবেন।

বিনীত

কমলকুমার দাস

কলিকাতা— ৯।

জিপসী প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত-এর বাইশ সংখ্যায় তারাপদ পালের 'অথ জিপসী সমাচার' আলোচনাটি পড়ে এই বিশেষ সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল। প্রকৃতপক্ষে জিপসীদের সম্বন্ধে এত তথ্য নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তা একত্রিত করলে একটি বিরাট গ্রন্থ হয়ে যায়। এদের জীবনধারা বড় বিচিত্র। কোন জায়গায় এরা স্থির হয়ে থাকতে পারে না। ক্রমাগত বাসস্থান পরিবর্তন এদের সর্বাপেক্ষা বড় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে এরা মনস্থির করে কোন কিছু করতেও পারে না। সর্বদিক থেকেই এরা সম্পূর্ণ যাযাবর। শুধু বাসস্থান নয় মনের দিক থেকেও এরা পুরো পুরি যাযাবর। কাজকর্ম এদের একমাত্র ঝাড়ফুঁক এবং জড়িবুটি বিক্রি। এছাড়া কোন মানসিক বা কায়িক পরিশ্রম এরা করে না। আবার কখনও কখনও ম্যাজিক দেখায়, গল্প শোনায়। এদিকেও এদের দক্ষতা অসামান্য।

এদের সম্বন্ধে সব রহস্যের সমাধান হলেও কিন্তু এদের এই ভবঘুরে মনোবৃত্তির কারণ কি তা আজও স্পষ্ট নয়। মানুষের যাযাবরধর্মী মনোভাবই যে এর জন্য দায়ী একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বিস্ময় তাদের এই বিস্তৃতিতে এবং সম্পূর্ণ লুপ্তির কারণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

বিনীত

অনিরুদ্ধ ব[illegible]

কলকাতা [illegible]

।। বিচিত্র চরিত্র ।।

সবিনয় নিবেদন,

আমি অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আশ্বিনের ২৬ সংখ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, কালো বৌ পড়েছি। আগে তাঁর অন্যান্য লেখার সহিত পরিচিত বিশেষ করে 'কবি' পড়েছি দুবার, সিনেমা দেখেছি এবং কবিয়ালের গান শুনে গেয়েও নিজে নিজে। কিন্তু কালো বৌ পড়ে শুধু ভাল লেগেছে বলাটাই যথেষ্ট নয়, খুব ভাল লেগেছে। এ যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে থাকা অনাদৃত লোক, যাদের ব্যাপারী হতে পারি নি কিন্তু বড় কাছে কালো বৌর বেদনা বড় [illegible] সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি। আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিনীত—

গিরিজা চক্র[illegible]

কলিকাতা

(২)

সবিনয় নিবেদন,

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিচিত্র চরিত্র বিভাগের রচনাগুলি আজকের বাংলা সাহিত্য-জগতে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে আমার মনে হয়। বহুদিনযাবৎ আমি তাঁর রচনার পাঠক। কিন্তু এই ধরনের রচনা আমার চোখে পড়েছে খুব কমই। ছোট ছোট চরিত্র যাদের অনেককে আমরা দেখি কিন্তু এমনভাবে চোখে ধরা পড়ে না কখনও। এই বয়সেও তিনি যেভাবে লিখেছেন আমাদের দেশে সাহিত্যকর্মবিশেষ। এবং তাঁর রচনা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। আশা করব তিনি আরও দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে থেকে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে চলুন।

নমস্কার জানবেন

অনুপকুমার

কলিকাতা

বাতাসে পুজোর গন্ধ

আজ থেকে প'চাত্তর বৎসর আগেকার এক আশ্বিনের চিত্র এ'কেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন তিনি শিলাইদায়, পদ্মার বোটে। তিনি লিখেছিলেন ঃ "আজ দিনটি বেশ হয়েছে। ঘাটে দু'টি-একটি ক'রে নৌকো লাগছে, বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁটলাপ'ুটলি, বাক্স-ধামা বোঝাই করে নানা উপহারসামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম, একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধুতি পরলে; জামার উপর সাদা রেশমের একখানি চায়নাকোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে, ছাতা ঘাড়ে ক'রে গ্রামের অভিমুখে চলল।"

আশ্বিন মাস এলেই বাংলাদেশের এই চিরন্তন ছবিটি আমাদের স্মৃতিলোক থেকে উৎসারিত হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এবারের শরতের আকাশ এখনও জললিপ্ত। এখনও বৃষ্টির স্পর্শ লেগে আছে মাটিতে। কিন্তু চারপাশে তাকালে ভুল হয় না, বাতাসে পুজোর গন্ধ লেগেছে। বৎসরের এই সময়টাতে মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার জাগরণ ঘটে। শরৎকালের আকাশে-বাতাসে উৎসবের সুর লেগে থাকে। তাকে কোনো বাঙালী অস্বীকার করতে পারে না।

এবারের শারদীয় উৎসবের প্রস্তুতিতে কেমন জানি একটা বিষণ্ণতার ম্লান ছায়া দেখা যাচ্ছে। প'চাত্তর বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ গৃহপ্রত্যাগমনকারী বাঙালীবাবুর যে-চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আজ সময়ের ও সমাজের অপরিহার্য পরিবর্তনে সে-চিত্রেরও বদল হয়েছে। বাঙালীর প্রবাসীত্বের ভূমিকাও আজ সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ বাঙালীই আজ গৃহবাসী এবং আরও একটি অংশ সীমান্তের ওপার থেকে গৃহচ্যুত হয়ে নতুন ঘর বে'ধেছে। তাই দূর দেশ থেকে সম্বৎসরে একবার ঘরে ফেরার সেই আনন্দ থেকে অনেকেই বঞ্চিত। এখন গৃহবাসী বাঙালীর ঘর-সংসার সামলানোর সমস্যাই তার সারা বৎসরের দুশ্চিন্তার বিষয়।

উৎসবের সময়ে নতুন কাপড়-জামা কেনা, প্রিয়জনকে উপহার দেওয়া, আমন্ত্রিতদের আপ্যায়নকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমেই গৃহস্থের আনন্দ। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় সেই আনন্দের উৎসটুকুও শুকিয়ে যাবার উপক্রম। খাদ্যবস্তু নিয়ন্ত্রণাধীন; সুতরাং গৃহস্থবাড়িতে উৎসবের সময়েও আমন্ত্রিতের আপ্যায়ন একটি বড় সমস্যা। পোশাক-পরিচ্ছদ কেনা উৎসবের অন্যতম প্রধান অংগ। মধ্যবিত্তরা এই সময়ে কিছু বাড়তি টাকা হাতে পান। কেউ পান বোনাস, কেউ পান অগ্রিম। কিন্তু বাজার এবার আগুন। সাধারণ মধ্যবিত্তের ব্যাঙের আধুলি দিয়ে এইবার বাজারে কেনাকাটা করা ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র ছে'চার মতোই হবে। তাছাড়া পুজোর মরশুমে ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে দেয়। বোনাস ঘোষণার সংগে সংগেই শুরু হয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি। এর ফলে বাড়তি টাকা যা সাধারণ মানুষের হাতে আসে, তা চলে যায় ব্যবসায়ীদের মুনাফা মেটাতে। তাই উৎসবের আনন্দ খোলা বাজারের ঢালাও স্রোতে কখন যে নিঃশেষে ভেসে যায়, মূল্যবৃদ্ধির বেড়াজালে বিমূঢ় স্বল্পবিত্ত মানুষ তা টের পান না।

এবারেও পয়লা অক্টোবর থেকে কাপড়ের দাম চড়েছে। সরকার এই মূল্যবৃদ্ধিতে সম্মতি দিয়ে ব্যবসায়ীদের সুবিধে করে দিলেন। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, উৎপন্ন দ্রব্যের নানা উপকরণের দাম বেড়েছে। তাই ন্যায্য মুনাফার জন্যই দাম বাড়ানোর অনুমতি দিতে হল বলে সরকার জানিয়েছেন। কলের কাপড়ের দাম বাড়লে কণ্ট্রোল-বহির্ভূত অন্যান্য কাপড়ের দাম যে স্থিতিশীল থাকবে, তা আশা করা যায় না। তাই সরকারী ঘোষণার সংগে সংগেই সবরকম কাপড়-জামার দামই বাড়বে এবং বাড়ছে। সরকারকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পুজোর মরশুমেই কাপড়ের দাম না বাড়ালে কি চলত না? সাধারণ ক্রেতাদের পকেট কেটে ব্যবসায়ের মুনাফা বাড়ানোর এই নীতিতে সরকার সায় দিয়ে গৃহস্থের দুর্ভাবনা আরও বাড়ালেন।

তবু এই দুশ্চিন্তার মধ্যেই সাধারণ মানুষ উৎসবানন্দের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু দুর্ভাবনা কখনো একা আসে না, তার সংগীসাথী অনেক। শিক্ষকরা ধর্মঘট করে আছেন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। মধ্যবিত্তের ঘরে খাওয়া-পরা ও শিক্ষাই প্রধান সমস্যা। খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তার সংগে এসে জুটল শিক্ষার অনিশ্চয়তা। আর কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলগুলিতে শারদ অবকাশ শুরু হবে। শিক্ষাবর্ষও শেষ হতে চলল। নভেম্বরেই শুরু হবে টেস্ট ও বাৎসরিক পরীক্ষা। অভিভাবকরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, নানা আন্দোলন ও ঝকমারিতে গোটা বছরই প্রায় নষ্ট হল। ছেলেমেয়েদের পড়া হল না, পরীক্ষায় তাদের পাশ করা কি সম্ভব? নেতারা তো আর কিছুদিন পরেই নির্বাচনী ধুমধাড়াক্কায় মেতে উঠবেন। এদিকে সাধারণ মানুষ, ছেলেমেয়ে ও সংসার নিয়ে চড়া দাম, দুষ্প্রাপ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু এবং শিক্ষাহীন একটি ব্যর্থ বৎসরের বোঝা কাঁধে করে শারদোৎসবের মুখোমুখি হলেন। আজকের এই চিত্রের সংগে প'চাত্তর বৎসর আগেকার রবীন্দ্রনাথের চোখে দেখা শারদ-বাংলার সেই শান্ত, স্নিগ্ধ চিত্রটির কি কোনো সাদৃশ্য আছে?

বিচিত্র চরিত্র

সোনার তলোয়ার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতি এবং চরিত্র এ দুটো এক সামগ্রী বা বস্তু নয়, একটা উপাদান—অন্যটাকে গড়ন বলা যায়। একটা মেটাল অন্যটা শেপ। সোনার বাটিও হয় রূপোর বাটিও হয়, পাথরের বাটিও হয়। সোনার বালাও হয়, লোহার বালাও হয়। তলোয়ার বা ছোরা লোহারই হয় সচরাচর, সোনা দিয়ে গড়ালে আর কে কি বলবে বা করবে। তবে সেটাও সোনার সামগ্রীর অপব্যয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনে দেখা যায় আমাদের ভুলে সোনা দিয়ে ছুরি গড়িয়েছি, লোহা দিয়ে বালা নয় হাঁসুলি গড়িয়ে গলায় পরেছি।

সোনার ছুরি বা ছোরা বা তলোয়ার আত্মরক্ষার কোন কাজে লাগে না বরং উল্টে সেইটের জন্যেই মৃত্যু ঘটে। এবং লোহার হাঁসুলি পরে জলে ডুবে আর জল থেকে ওঠা যায় না। ওই ডুবেই মরতে হয়।

নিত্যগোপালবাবুর তাই হয়েছিল।

উপাদানটা খাঁটি সোনা ছিল নিত্যগোপালবাবুর তাতে আর সন্দেহ নেই; বারবার কতবার যে কষ্টিপাথরে কষট হয়েছে তা একজনে জানে না; এবং যাঁকে কষ্ট্য করা হয়েছে তাঁরও হয়তো এ সম্পর্কে ঠিক হিসেব ছিল। বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যেত। একেবারে ঝকমক করত চোখ ধাঁধিয়ে দিত। যেমন মানুষটার রূপ তেমনি ছিল গুণ। ছ' ফিটের কাছাকাছি মাথায়, দেহে এতটুকু মেদ ছিল না, বুকখানা ছিল আটত্রিশ ইঞ্চি, সেটাকে ফোলালে আরও দু' ইঞ্চি তো বাড়তোই অথচ কোমরটি ছিল বত্রিশেরও কম। একেবারে যাকে বলে সিংহের মত পুরুষ। তেমনি ছিল তাঁর সুকণ্ঠ, বাঁশের বাঁশী হার মানত। এবং গানের উপর দখলটা ছিল জন্মগত। একবার শুনলেই গোটা গানখানা গলায় বসিয়ে নিয়ে গেয়ে শুনিয়ে দিতে পারতেন। শুধু তাই নয়, সংগীতযন্ত্রের উপরও তাঁর দখল ছিল। মেধায় স্মৃতিতে বোধে ছিলেন আশ্চর্যশক্তির অধিকারী। একটি ঘটনার কথা বলি—বললেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এন্ট্রান্স পরীক্ষার টেস্ট হচ্ছে জে-এম-এইচ-ই স্কুলে। ১৯০১ সাল। স্কুলের প্রথম বৎসর। ছেলে ছাত্র চার পাঁচটি। তার মধ্যে নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় একজন।

কিন্তু তিনি নিরুদ্দেশ প্রায় মাসখানেকের উপর। কালীপুজোর সময় মেলা দেখতে গিয়ে সেখানে একনাগাড় সাতদিন গানবাজনা নিয়ে পড়ে থেকে সাতদিন পর যখন বাড়ী ফিরলেন তখন তাঁর কাকা, সে কাকা দুর্দান্ত কাকা — বেত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। তিনি ফিরছিলেন হাতীর উপর চেপে। একলা তিনি ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে গ্রামের বহুলক্ষ টাকার অধিকারী বাবুমহাশয়ের (অমুকের বাবুমশায় দ্রষ্টব্য) ছোট ছেলে পরবর্তীকালের নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। বেত্রহস্ত সেজকাকাকে দেখেই নিত্যগোপালের আর ধীরেসুস্থে হাতী থেকে নামবার অবকাশ হল না, তিনি তৎক্ষণাৎ হাতীর পিঠের উপর উঠে দাঁড়িয়ে

লাফ দিয়ে নিচে পড়লেন এবং পিছন দিকে কিছুটা ধুলো উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর আর বাড়ী ঢোকেন নি। বা গ্রামও ঢোকেন নি। টেস্টের দিন ময়লা কাপড় পরে ইস্কুলে ঢুকলেন। হেডমাস্টার মশায় তিরস্কার করেও তাঁকে খাতা কলম দোয়াত সব দিয়ে পরীক্ষায় বসালেন এবং নিত্যগোপালবাবু পাশও করলেন। শুধু টেস্টে নয়। এন্ট্রান্স পরীক্ষাতেও। শুনেছি এক-ঘণ্টার বেশী তিনি হলে থাকতেন না। একঘণ্টা পরই খাতা দিয়ে বেরিয়ে চলে আসতেন।

পরীক্ষা দিয়ে এসেই একটি কাণ্ড করলেন। আমাদের গ্রামের ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইস্কুলের শিক্ষক। তিনি পরবর্তীকালে অন্য গ্রামে বাস করেছিলেন। তাঁর বিবাহযোগ্যা কুমারী কন্যা ছিলেন একটি। ললিতবাবুর মৃত্যুর সময় নিত্যগোপালবাবু কাছে ছিলেন, তিনি তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার কন্যাকে আমি বিনাপণে বিবাহ করব, ভার আমি নিলাম। পরীক্ষা দেওয়ার পর নিত্যগোপালবাবু একদিন বাড়ীতে না-জানিয়ে এই বিবাহ ক'রে বসলেন।

সে সেই ১৯০২-৩ সালের ব্যাপার। আমার আজও মনে আছে, আমাদের বাড়ী-ঘরে এই বিবাহব্যাপারটি নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তার কথা। আজকের দিনে বিস্ময় লাগে, হাসিও পায়, মনে হয় সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত! সামান্য ব্যাপার বইকি। বিবাহ স্বজাতির মধ্যে সেকালের পাল্টীঘরে; কোথাও কোন অনিয়ম, অধর্ম বা ধর্ম-বহির্ভূত কিছু নেই, শুধু বিনাপণে বিবাহ! সে একটা প্রচণ্ড ঝড়। চিৎকার, ঝঙ্কার, শাপ-শাপান্ত! আমার সেকালে ভয় পেয়েছিল।

এই কাণ্ডের পর নিত্যগোপাল আবার বাড়ী থেকে নির্বাসিত হলেন। বাড়ীর বড়-ভাইয়ের একমাত্র সন্তান নিত্যগোপাল। তাঁর সামনে বাড়ীর দরজা বন্ধ হল। পাড়ায় যাঁরা জ্ঞাতি-আত্মীয় তাঁদের ঘরে গিয়ে সেজকাকা বলে এলেন—গোপালকে যে স্থান দেবে, খেতে দেবে, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব আমরা। খাওয়া-দাওয়া, মুখ-দেখাদেখি সব বন্ধ!

নিত্যগোপাল তবু হার মানলেন না। কয়লা ব্যবসায়ীর কলকাতা আপিসে একটি সামান্য চাকরী নিলেন। পড়াশুনা বন্ধ হল। কলেজে পড়া হল না। বালিকা বধূ (তখন তাঁর বয়স সম্ভবত ১২।১৩) রইলেন পিত্রালয়ে। শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ করতেও তিনি পান নি।

নিত্যগোপালবাবুর জীবনের উপাদান এত সমৃদ্ধ ছিল, জন্ম থেকে তিনি এত ঐশ্বর্য নিয়ে জন্মেছিলেন যে, সামান্য চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে তাঁকে ঠিক ধরা যায় না।

সে সম্পর্কে বলতে-বলতে সব বলা শেষ করবার আগেই মেধা ও স্মৃতির কথায় টেস্ট পরীক্ষা এন্ট্রান্স পরীক্ষার কথা বলতে গিয়ে বিয়ের কথায় এসে পড়েছি। নিত্যগোপাল শুধু সুকণ্ঠ গায়ক এবং জন্মগতভাবে সংগীতশাস্ত্রজ্ঞই ছিলেন না, তিনি নিজে গান রচনা করতেন। তিনি কবি ছিলেন, সত্যকারের কবি ছিলেন। কবিতা, নাটক তিনি রচনা করে গেছেন। জীবনে তিনি যদি সাধারণ মানুষ যে সুযোগ, যে সুবিধা পায় তাও যদি পেতেন তবে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে একজন বিখ্যাত গীতিকার কবি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। কিছু, দু-চারখানা গান সেকালে রেকর্ডও হয়েছিল। উপাদানের মহার্ঘতাই সোনার তলোয়ারের ওই স্বর্ণত্বের জন্য তাঁকে দিয়ে কোন কাজ হল না। সেই কথা বলছি।

কিছুদিন, কয়েক বৎসর এইভাবে ঘর সংসার থেকে নির্বাসিত থেকে নিত্যগোপালকে হার মানতে হল। বাড়ী এসে সেজকাকার পায়ে ধরতে হল। একমাত্র সর্তে তিনি ক্ষমা করলেন। নিত্যগোপালকে আবার বিবাহ করতে হবে। তাই তিনি করলেন। জানি না, সম্ভবতঃ তখন আর কোন পথ তাঁর ছিল না, একদিকে তিনি তাঁর মায়ের একমাত্র সন্তান, তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় না। তার উপর আশ্রয় নেই, আশ্রয়হীন। অন্যদিকে স্ত্রী। এবং ১৯০৪। সাল এমন একটা সময় ও কাল, যেকালে একাধিক বিবাহ ঠিক আজকের মত দোষাব

ছিল না। তিনি আবার বিবাহ করলেন। বাড়ীতে স্থান তাঁর হল, কিন্তু হৃদয় সেখানে বসতি বেঁধে ঠিক সুখ পেলে না।

এ সময়ের কথা মনে আছে, তাঁকে দেখেছি—তাঁর এই মনের বেদনার মধ্যেও আমাদের গ্রামের জীবনে একটা ঝলমলানি তুলে ঘুরে বেড়াতেন। সকালে উঠেই শুনতে পেতাম তাঁর গান। আমাদের গ্রামের থিয়েটারের মহলার আসর এবং তাঁদের বয়সীদের আড্ডাঘর থেকে তাঁর গান ভেসে আসত, 'মম মন্দিরে, মন মন্দিরে [illegible] কে হে! সকল প্রদীপ [illegible] জ্বলিল সকল দুয়ার আপনি খুলিল' "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"। বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করতে শুনতাম। ফুটবলের মাঠে রেফ্রি হিসেবে দেখতাম। সন্ধ্যেবেলা সংকীর্তনের দলের মাঝখানে তিনি গ্রামের ভদ্র শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়ে নামকীর্তন করতেন; গলায় থাকত গুলঞ্চ ফুলের মালা, গৌর-কান্তি সবল বুকখানির উপর ঝলমল করত উপবীত এবং উত্তরীয়, তিনিই ছিলেন দলের প্রধান।

এরই মধ্যে গান গেয়ে তাঁর ওই কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গীতজ্ঞানের জন্যই তিনি একটি পথ পেলেন। আমাদের গ্রামে এসেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তখন বোধহয় ১৯১০-১১ সাল। প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের কাল তখন। প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত ছিলেন আমাদের গ্রামের একজন জমিদার-সন্তান। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁদের ইস্কুলেই পুরস্কারবিতরণী সভায় এসেছিলেন রায়বাহাদুর অমৃতবাবু। ওখান থেকে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের বাড়ী চা-খাবার জন্য। ছোট একটি টী-পার্টি ছিল। সেইখানে নিত্যগোপাল গান শোনালেন অমৃতবাবুকে। গেয়ে শোনালেন শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টকম।

সে আসরে আমি ছিলাম। আমার বয়স তখন ১২।১৩ বছর। স্কুলে সেবার 'কিং এ্যান্ড দি মিলার'-এ আমি কিং-এর ভূমিকা করেছি, অমৃতবাবু ডেকেছেন, আমাদের সংকীর্ণ গ্রাম্য রাস্তাটির পরিসর একটু বাড়াবার জন্য খানিকটা করে জায়গা নিচ্ছেন, রাস্তার ধারের বাড়ীর সীমানা কেটে। আমার বৈঠকখানা-বাড়ীও ওই রাস্তার ধারে। আমার বাবা মারা গিছলেন, আমার ন বছর বয়সে; তখন মালিক আমিই, অভিভাবিকা অর্থাৎ গার্জেন আমার। আমি এসেছিলাম ওই আসরে, ওই জমি দেবার জন্যে। অমৃতবাবু আমাকে—যে বালক কিছুক্ষণ আগেই স্কুলে প্রাইজ পেয়েছে, ভাল রেসিটেশন করেছে, দেখে খুশী হয়ে কাছে বসিয়েছিলেন। আমার মনে পড়ছে এবং কানে যেন এখনও বাজছে, নিত্যগোপালবাবুর সেই সতেজ সুন্দর কণ্ঠস্বর, বাঁশের বাঁশী থেকেও উচ্চ তার থেকে অধিক না হোক, তার মতই মধুর, সেই কণ্ঠস্বরের সেই দুটি শব্দ—"শিবোহং। শিবোহং"।

সে যেন আকাশ ছুঁলে উপরে; সামনে শৈবেশবাবুদের নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, তার ওপারে গ্রামরেখা,—সেখান পর্যন্ত চলে গেল ওই 'শিবোহং' ধ্বনি। শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে পড়ছে আমার।

এই গান থেকেই তাঁর চাকরী হল। হল হল পুলিশ বিভাগে হল; সাব-ইন্সপেক্টর হলেন নিত্যগোপালবাবু। সোনা দিয়ে তলোয়ার হল। কিন্তু তখন নিত্যগোপালবাবু খুশী হয়েছিলেন। তিনি দাঁড়াতে পারলেন। বর্ধমানে তাঁর প্রথম চাকরী। প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে বাস করলেন। বাড়ী থেকে মা গেলেন। তখনও কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার হল না। সে অধিকার হল তাঁর পিতার মৃত্যুর পর। তিনি সম্পত্তির, বাড়ীর অংশদার হয়ে তবে আনলেন প্রথম স্ত্রীকে। তবে দুই স্ত্রীর মধ্যে কোন বিবাদ ছিল না। হয়নি। কিন্তু সে থাক।
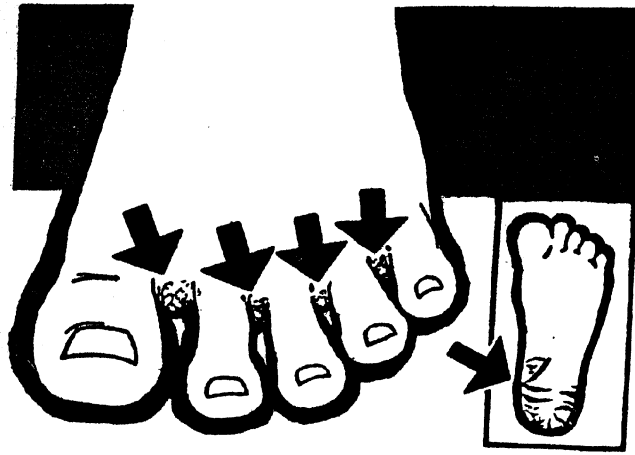
কিছুদিন পর গোপালবাবুর চাকরীর মোহ ছুটল। তখন তিনি ইন্সপেক্টর হয়েছেন। অফিসার হিসেবে খুব সুনাম। ডি-এস-পি হয়ে যাবেন পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই। কিন্তু তা আর ভাল লাগল না। তাঁকে তখন সাহিত্যে টানছে। তিনি নাট্যকার হবেন। নাট্যকার হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রবল। অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। থিয়েটারের দোরে-দোরে ঘুরেছেন। রেডিওতে তাঁর নাটক হয়েছে। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁকে জানতেন। তিনি রেডিওতে গানও গেয়েছেন। কিন্তু তৃপ্তি তাঁর হয় নি।

সরকারী চাকরী ছেড়ে ছিলেন এর জন্য। স্বাস্থ্যের অজুহাতে অসময়ে রিটায়ার করে আবার কয়লার আপিসে ঢুকলেন। কলকাতায় থাকবেন। চাকরী হবে, বই লেখা হবে, থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হবে।

বছর চার-পাঁচ তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই কয়লার আপিসের চাকরীতে তিনি খুসী হতে পারলেন না। মালিকের মনোরঞ্জন করা সম্ভবপর হল না তাঁর পক্ষে। এখানে তাঁর দিক থেকে দোষ ছিল। চাকরী করতেন তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে। এবং চাকরী করতে এসে ঠিক চাকরীর উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারলেন না, আত্মীয়তার দাবী বিসর্জন দিয়ে। সে দিক থেকে তিনি অবুঝ ছিলেন খানিকটা। আবার নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনেরও সাধ তাঁর মিটল না।

তিনি এ চাকরীও ছেড়ে দিলেন। এবং আবার সেই পুরানো পুলিশ বিভাগে তাঁর পরিচিত বড় অফিসারদের ধরলেন। তাঁর কর্মক্ষমতা এবং সততা এমনি উচ্চমানের ছিল যে, ইনভ্যালিড হিসাবে রিটায়ার করার পরও আবার কর্মক্ষম বলে নতুন সার্টিফিকেট দিয়ে সেই পুরনো চাকরীতে ইন্সপেক্টর হিসেবে বহাল হলেন তিনি। কিন্তু সারাজীবন দগ্ধ হলেন অসন্তোষে। সে এক নিদারুণ অসন্তোষ।

তিনি ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষ, তাঁর অসন্তোষও ছিল প্রচণ্ড, এবং তার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত তীব্র ও উত্তপ্ত।

আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। পরে সে সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তাঁর বড়ছেলের সঙ্গে (প্রথমা স্ত্রীর প্রথম সন্তান) আমার বড় মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম—ওই "সোনার তলোয়ারের" কথা। সোনার তলোয়ার হয় না।

তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—ভাল বলেছ, ঠিক বলেছ। আমার হবার সাধ ছিল 'নূপুর'; অভিসারিকা রাধার চরণের নূপুর—সোনার নূপুর।

জীবনের সেই সোনায় গড়তে চাইলাম তলোয়ার সঙ্গীন। কিছুই হল না। কিছুই হল না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন।

সেটা এখনও আমার গায়ে আগুনের হল্কার মত স্পর্শ বুলিয়ে চলে যায়।

চাঁদ ও পৃথিবী

শচীন্দ্রনাথ বসু

চাঁদের জন্ম

আজ পৃথিবীর থেকে মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিতে উদ্যত হয়েছে, তার প্রথম লক্ষ্য চাঁদ। সৌর পরিবারের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে অন্যান্য গ্রহ ও পার্শ্বচর উপগ্রহের মত আমাদের পৃথিবী ও নিকটতম জ্যোতিষ্ক চাঁদ এই দুইয়ে মিলে ক্ষুদ্রতর এক পরিবার। বস্তুত চাঁদকে অনেকে পৃথিবীর কন্যারূপে কল্পনা করেছে; মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো একদা লিখেছিলেন যে মাতা বসুন্ধরার গায়ে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর ক্ষত তার প্রথম ও একমাত্র কন্যার জন্মের স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। এখনও কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে সূর্যের টানে পৃথিবীর বস্তু ছিঁড়ে গিয়ে চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মত আলাদা। আদি বস্তুর মেঘ স্থানে স্থানে দানা বেঁধে সৌরলোক মূর্তি পেয়েছে আজ এই রকমই সাধারণ ধারণা, হয়তো গড়ন্ত প্রাক-পৃথিবীর মধ্যে দুটি কেন্দ্র দেখা দিয়েছিল এবং পাশাপাশি ক্রমশ ঘন হয়ে উঠেছে এই যুগল। অথবা দুই সম্পূর্ণ পৃথক প্রাক-গ্রহও আদি বস্তুর পার্শ্ববর্তী স্তরে গড়ে উঠে থাকতে পারে যারা পরে খুব কাছাকাছি এসে পড়ে পরস্পরের টানে বাঁধা পড়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানী হ্যারল্ড উরে প্রস্তাবিত সাম্প্রতিক এক প্রকল্প অনুসারেও চাঁদ একদা সূর্যপ্রদক্ষিণকারী গ্রহ ছিল।

চাঁদকে প্রাক্তন গ্রহ বলে সন্দেহ করবার আর একটা কারণ তার আয়তন ও ভর। সৌরলোকে যত উপগ্রহ আছে তা সব গ্রহগুলির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় পৃথিবীর ভাগে তার চেয়ে কম পড়েছে বটে, কিন্তু নিজের দেহ অনুপাতে এত বড় উপগ্রহ আর কোনও গ্রহের নেই; বৃহস্পতির চাঁদ গ্যানিমিড আমাদের চাঁদের যেমন তিন গুণ বড় তেমনি বৃহস্পতি নিজেও পৃথিবীর অনেক গুণ ভারী। সুতরাং এই এক বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী আর সব গ্রহকে হার মানায়। চাঁদের বস্তু পৃথিবীর ৮০ ভাগের এক ভাগ, কিন্তু এই বস্তুর ঘনতা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ কম।

গ্রহদের মত চাঁদের কক্ষপথ উপবৃত্তিক. পৃথিবীর থেকে তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দূরত্ব যথাক্রমে ২২১,৪৬২ ও ২৫২,৭১০ মাইল। এই ঘন সান্নিধ্য ও চাঁদের বৃহৎ দেহের ফল প্রত্যক্ষ হয় তার প্রচণ্ড আকর্ষণে। এই টানে দিনে দুবার সাগর ফেঁপে ওঠে জোয়ারে, এমন কি স্থল পর্যন্ত বাদ যায় না; চাঁদ যখন ঠিক মাথার উপরে তখন আমেরিকার মাটি ছ ইঞ্চি ফোলে। কক্ষ প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের লাগে ২৭ দিন আট ঘণ্টা এবং সেই সময়ের মধ্যে সে একবার মাত্র পাক খায় বলে তার একই মুখ সর্বদা পৃথিবীর দিকে ফেরানো। কিন্তু তার অক্ষ কিছুটা হেলে আছে বলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল আমাদের চোখে পড়ে। তা ছাড়া চাঁদের আকৃতি ও গতি সম্পূর্ণ নিয়মানুগ নয় বলে তার অক্ষ অল্প অল্প কাঁপে ও দোলে, ফলে দুই পাশেও তার বিপরীত দিকটা কিছু কিছু উঁকি মারে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর থেকে সব সুদ্ধ তার ৫৯ শতাংশের ছবি তুলেছেন।

চাঁদের অবশ্য স্বকীয় কোনও প্রভা নেই, সূর্যের থেকে ধার করা তার আলো। আকাশ যখন সবচেয়ে পরিষ্কার তখনও মধ্যাহ্ন সূর্যের ৪৫০,০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র চাঁদের উজ্জ্বলতা। আপাত দৃষ্টিতে তার যে বৃদ্ধি ও ক্ষয় আমরা দেখি তা নির্ধারিত হয় চাঁদের যে পরিমাণ অংশ আমাদের দৃষ্টিপথে সূর্যালোক প্রতিফলিত করছে তার দ্বারা। মানুষের দৃষ্টিকোণের কথা ছেড়ে দিলে চাঁদের এক পুরো অর্ধ অবশ্য সর্বদা সম্পূর্ণ অন্ধকার।

চাঁদ যে ক্ষয় হতে হতে মরে যায়, আবার নতুন জন্ম নিয়ে কলায় কলায় বাড়ে এর থেকে প্রাচীন মানুষ সহজেই ভেবেছে যে সে সজীব, এবং পৃথিবীর প্রাণীদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। চাঁদ যখন বর্ধিষ্ণু সেই সময়ে বীজ বুনলে চারা হবে তেজী, যখন ক্ষয়িষ্ণু অর্থাৎ সবচেয়ে দুর্বল তখন গাছ কাটা কম শক্তিসাপেক্ষ। চাঁদ মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটায় এই ধারণার থেকে ইংরেজী লুন্যাটিক শব্দের সৃষ্টি। যাই হক, মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর উপর চাঁদের এই সব প্রভাব আজ আমরা অগ্রাহ্য করলেও পৃথিবীর উপর তার প্রভাব যে একেবারে নেই তা বলা যায় না; জোয়ারের টানের কথা একটু আগে বলা হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও চান্দ্র-শক্তি যে ঐ রকম কাজ করতে পারে তা বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না।

এই প্রসঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণও উল্লেখযোগ্য। যে আলো জল বাতাসের মত স্বাভাবিক, মানুষের এত বড় সহায় তা যে হঠাৎ নিভে গিয়ে চরাচর নিমজ্জিত হল অন্ধকারে, আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড সূর্য বা চন্দ্র গ্রাস করল কোনও কোনও অসুশো দানব, পুরামানবের অভিজ্ঞতায় এর চেয়ে [illegible] ও ভয়াবহ দৃশ্য ছিল কমই। আজ আমরা জানি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে চাঁদ যখন সূর্যকে ঢাকে তখন সূর্য গ্রহণ. এবং পৃথিবী যখন চাঁদ ও সূর্যের মাঝে পড়ে চাঁদের গায়ে ছায়া ফেলে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। মধ্যবর্তী জ্যোতিষ্ক যখন ঠিক একই সরল রেখায় অবস্থিত হয় তখন ঘটে পূর্ণ গ্রহণ, অল্প এদিক ওদিক হলে আংশিক গ্রহণ।

চাঁদের গায়ে যে দাগ দেখা যায় তার থেকেও অনেক আজগুবী কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে; দেশভেদে লক্ষ্মণগত গরু বা খরগোশ অথবা চাঁদের মা বুড়ী কল্পিত হয়েছে। অনেকে সত্যিই বিশ্বাস করেছে যে চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে ঝুলন্ত বস্তুকেই আমরা চাঁদের কলঙ্করূপে দেখি; অথবা চাঁদ এক প্রকাণ্ড দর্পণ, তার মধ্যে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব আমরা দেখছি—উজ্জ্বল অংশগুলি স্থলের ও কালো অংশগুলি জলের ছায়া। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন দিয়ে এই কলঙ্কের রহস্য কিছুটা ভেদ করলেন। তিনি বললেন আমাদের পৃথিবীর মতই চান্দ্র-জগতেও আছে সাগর ও পাহাড়—যা আমরা কলঙ্ক বলি তা সাগর। ল্যাটিন ভাষায় এদের বর্ষণ সাগর, শান্তি সাগর ইত্যাদি কাব্যিক নামও দেওয়া হল। এসব নামের অবশ্য কোনও তাৎপর্য নেই, কিন্তু বিজ্ঞানীর কল্পনা অনেক সময়ে কবিদেরও হার মানায়। আজ এও জানা আছে চাঁদের এই 'সাগর' আসলে জলহীন সমতল ভূমি যার তুলনায় পার্বত্য অঞ্চল

বেশী উজ্জ্বল দেখায়। তা সত্ত্বেও সুবিধা-জনক বলে বিজ্ঞানের ভাষায় সাগর আখ্যাটি টিকে গিয়েছে।

পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের পাহাড় সমান কি বেশী উঁচু হতে পারে এবং তারা অনেক বেশী খাড়া ও প্রখর। তার কারণ চাঁদে পরিবর্তনী প্রভাব খুবই কম। পৃথিবীতে মাটির টানে পাহাড় থেকে সর্বদা পাথর গড়িয়ে পড়ছে নিচে, কিন্তু চাঁদের অভি-কর্ষীয় আকর্ষণ এই গ্রহের মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ। এর চেয়েও বড় কথা হল যে, এখানে বাতাস ও জলের প্রভাবে অবিরাম ভূমির ক্ষয় ঘটছে, চাঁদে তা নগণ্য। চাঁদে যে বায়ুমণ্ডল বলে বিশেষ কিছু নেই তা প্রতীয়মান হয় গ্রহণের সময়ে সূর্য যখন তার পিছন থেকে উঁকি দেয়; পৃথিবীতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে আলোর কিরণ বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে যে অস্পষ্টতা ও বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, সূর্য-গ্রহণের সময়ে সে রকম কিছু দেখা যায় না, সূর্য অকস্মাৎ তার পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের যতখানি ঘনতা, রুশ বিজ্ঞানী লিপস্কি দেখিয়েছেন চাঁদের আবহ তার দশ সহস্রের এক অংশের বেশী নয়। আধুনিক রেডিও পদ্ধতি অনুসারে তা আরও কম।

আবহের আবরণ না থাকায় সূর্যের আলো পড়লে চাঁদের গা দেখতে দেখতে তেতে ওঠে, আর তার অভাবে বেশী জুড়িয়ে যায়। প্রায় দুই সপ্তাহ দীর্ঘ দিনে ও রাত্রে তার তাপ চড়ে যায় ৯৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কি তারও বেশী এবং নেমে যায় শূন্যের ১৫০ থেকে ১৮০ ডিগ্রি নিচে। কিন্তু চাঁদের ত্বক এমন তাপবাধক বস্তু দিয়ে তৈরি যে, কয়েক ফুট নিচে সর্বত্র হয়তো এত ঠাণ্ডা যে, বরফ জমতে পারে। গভীর গর্ভে চাঁদের তাপ আবার বেশী হতে পারে, সৃষ্টির পরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের থেকে পৃথিবীর মত তারও অভ্যন্তরে তাপ বেড়েছিল তা জানা আছে।

কেউ কেউ বলেন যে, চাঁদের ভিতরে হয়তো বরফ রূপে জল আটকে আছে, আমরা তার খোঁজ পাচ্ছি না। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোপাল মনে করেন যে, চাঁদের আভ্যন্তর জল যদি সব বার করে দেওয়া যায় তবে তা সর্বত্র ভূমির ৯৮৪ ফুট উপর পর্যন্ত উঠবে।

এই ঊষর নগ্ন উপগ্রহের উপর মেঘ বৃষ্টি ঝড়-ঝাপটা কিছু নেই, যাতে ভূমি-ক্ষয়ের ফলে প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে একটা কারণে নিশ্চয় চেহারার কিছুটা বদল হয়—তা হল অবিরাম উলকার বৃষ্টি।

এযাবৎ আমরা চাঁদকে বেশ খানিকটা দূর থেকে দেখেছি, এবার আরও এগিয়ে যাওয়া দরকার। আধুনিক দূরবীনে চাঁদের গায়ে মাত্র ৫০০০ ফুট বড় বস্তু ধরা পড়ে, বৃহত্তম ২০০ ইঞ্চি যন্ত্রটি দিয়ে দেখলে দু লক্ষাধিক মাইল দূরের চাঁদ মনে হয় মাত্র ২০০ মাইল দূরে। সুতরাং তার দৃশ্যগোচর দিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তৈরি হয়েছে। এই মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ সনাতন ল্যাটিন আখ্যা পেয়েছে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের সম্মানে, কোথাও বা নামগুলি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত, যেমন আগে উদাহরণ দিয়েছি। ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে রুশ রকেট লুনিক-৩ চাঁদের বিপরীত দিকের ছবি তুলে আরও গোটা-ছয় নাম যোগ করে, তাদের কোনও কোনও-টার রাজনীতিক রং। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে এদেরই মহাকাশ যান জন্ড-৩ আবার এই আঁধার দিকের কতগুলি সুন্দর ছবি তুলে পাঠায়। উজ্জ্বল দিকটার তুলনায় বেশ কিছু ভৌগোলিক পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে এই সব ছবিতে।

দূরবীন দিয়ে দেখলে চাঁদের যে বিশেষত্ব সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা তার গায়ে অসংখ্য গোলাকার খাদ। ৩০,০০০ সংখ্যারও বেশী তালিকাভুক্ত হয়েছে, তাদের ব্যাস এক থেকে ১৮০ মাইল পর্যন্ত। খাদ-গুলিকে ঘিরে আছে দেয়াল, ছবিতে তার উচ্চতা মেপে প্রায়ই দাঁড়িয়েছে হাজার হাজার ফুট। এই সব খাদের কারণ সম্বন্ধে দুটি তত্ত্ব আছে এবং তাদের মধ্যে তর্কের আজও নিষ্পত্তি হয় নি। একদল জ্যোতিষী বলেন যে তাদের অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির মুখ, আর বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বাস করেন যে অধিকাংশের উৎপত্তি উলকার আঘাতে—৪০০ কোটি বছর আগে চাঁদ যখন ক শিশু তখন বিশাল উলকার গোলাবর্ তার দেহ হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। এই দ্বিতী দলে আছেন উরে এবং এঁরা এমন কি দাবি করেন যে চাঁদের প্রকাণ্ড 'সাগর'গ পর্যন্ত (যেমন ৭০০ মাইল দীর্ঘ ব সাগর) উলকার সৃষ্টি। পৃথিবীর বাত ঘষে ঘষে অধিকাংশ উলকা পুড়ে যায়, চ তা হতে পারে না বলে উলকাপাত অ ঘন ঘন ঘটে। এক হিসাব অনুসারে দৈ সংখ্যাটা অন্তত পক্ষে দশ লক্ষেরও বে তাদের দ্রুতি গড়ে সেকেন্ডে ত্রিশ মাই অর্থাৎ রাইফেল বন্দুকের দশ গুণ। ক্ষ কণাও এত দ্রুত আঘাত করলে ফল যথেষ্ট।

এ যুগে অধিকাংশ বিজ্ঞানী উল তত্ত্বে বিশ্বাসী, যদিও রুশ জ্যোতি কজিরেভ সম্প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি করেছে ক্রাইমিয়ার পদার্থ জ্যোতিষ-বৈজ্ঞানিক মা মন্দির থেকে ১৯৫৮ সালে তিনি সুপ্রসি অ্যালফনসাস খাদের কেন্দ্রীয় মুখের কা কিছুটা লাল আভা লক্ষ্য করেন, ধোঁয়া ব হলে যেমন হতে পারে। অ্যারিসটার্ক খাদ থেকেও নাকি হাইড্রোজেন নির্গম ধরা পড়েছে তার বর্ণালী যন্ত্রে।

রেনজার রকেট পাঠিয়ে মার্কি বিজ্ঞানীরা চাঁদের কাছাকাছি অঞ্চল থে অনেক ছবি সংগ্রহ করেছেন, অ্যালফনসা খাদের ছবির থেকে জানা যায় চতুপার্শ্ব দেয়ালের উচ্চতা ৬০০০ ফুট, কিন্ত কেন্দ্রের ছোট মুখটা নাকি পার্থিব আগ্নেয় গিরির মত নয়। সুতরাং এখন পর্যন্ত এ প্রাচীন তর্কের কোনও মীমাংসা হয় নি।

চাঁদের খাদ-খোবলানো চেহারা দে পাশ্চাত্ত্যের লোকে তাকে কল্পনা করে পনীরের পিন্ডরূপে। তা হয়তো রূপকথা কিন্তু চাঁদের উপাদান কি সে সম্বন্ধে খাদের কারণের মত পন্ডিতদের মধ্যে মত বিরোধ আছে। এক তত্ত্ব অনুসারে যুগ যুগ ধরে উলকাণুর আঘাতে চাঁদের গা ধূলি বা ভস্মে পরিণত হয়েছে; আর এক মত এই যে হয়তো 'সাগর'গুলিতে আছে জমে-যাওয়া লাভা, কারণ চাঁদে আগ্নেয় গিরি পৃথিবীর মত সক্রিয়। অন্যদিন

আগেও অভিযাত্রী [illegible] দলে, যদিও ধূলির [illegible] সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। রুশ [illegible] লুনিক-৫ যে চাঁদে নেমেছিল তার থেকেও ঐ রকম ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে আকস্মিকভাবে; এই রকেট খুব ধীরে চাঁদে নামার কথা ছিল, কিন্তু যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় ধাক্কাটা হয় জোর, পূর্ব জার্মেনির এক মানমন্দিরে সেই দৃশ্যের ছবি তোলা হয়েছিল। তাতে নাকি ১৪০ মাইল লম্বা, ৫০ মাইল চওড়া ও ৫০-৬০ মাইল উঁচু এক ধূলির মেঘকে শূন্যে উঠতে দেখা গিয়েছিল, যার থেকে মনে হতে পারে চাঁদে ধূলির পরিমাণ যথেষ্ট।

কিন্তু গত ফেব্রুয়ারীতে রাশিয়ার এক আশ্চর্য কীর্তির ফলে চাঁদের গা সম্বন্ধে যে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে তার ইঙ্গিত অন্য রকম। অনেকগুলি ব্যর্থ চেষ্টার পর তারা এক যন্ত্রবাহী রকেটকে ধীরে ধীরে চাঁদে নামাতে সক্ষম হয়েছে। নামবার ৪৮ সেকেন্ড আগে পৃথিবীতে এক বোতাম টিপে এই লুনা-৯ রকেটযানের (ওজন ৩৫০০ পাউন্ড) দ্রুতি ঘন্টায় ৬০০০ মাইল থেকে প্রায় দশ মাইলে কমিয়ে আনা হয়। ঝটিকা সাগর অঞ্চলে নেমে এই অগ্রদূত টেলিভিসন ক্যামেরায় পরিষ্কার ছবি তুলে পাঠিয়েছে, তা এত স্পষ্ট যে সেখানে একখানা বই খোলা থাকলে তাও পড়া যেত। ছবি দেখে মনে হয় চাঁদের উপরের স্তরে এককালে ছিল ফেনায়িত লাভা (গলিত পাথর), এখন তা জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং প্রথম অভিযাত্রীদের ধূলির সাগরে ডুবে যাওয়ার আশংকা নেই যদি তারা ঠিক জায়গায় নামতে পারে, যদিও তীক্ষ্ণ ভঙ্গুর ঐ ভূমির উপর হাঁটা সহজ হবে না। এর থেকে এমন অনুমানও হয় যে পৃথিবীর মত চাঁদের অভ্যন্তরও একদা গলিত ছিল।

গত জুন মাসে আমেরিকার সার্ভেয়ার যান ঝটিকা সাগরে নেমে ১৪৪ ছবি পাঠায়, তার নির্দেশ এই যে অন্তত ঐ অঞ্চলে চাঁদের গা কঠিন ও মসৃণ সেখানে ইতস্তত পাথর ছড়ানো। মানুষের হেঁটে বেড়াতে কোনও অসুবিধা হবে না। জেট এনজিনের ধাক্কায়ও ধুলো ওড়ে নি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সম্প্রতিক তথ্য উল্লেখযোগ্য। গত বছর এপ্রিল মাসে এক ইংরেজ পদার্থবিদ বলেন যে, চাঁদের গায়ে হয়তো আছে চার-পাঁচ ইঞ্চি গভীর হীরার স্তর, উল্কার আঘাতে তাদের সৃষ্টি।

চাঁদে পাড়ি দেওয়ার পথে দুটি প্রধান সমস্যা ছিল। কাছাকাছি পেৌঁছে প্রধান যান থেকে ক্ষুদ্রতর এক যান ধীরে উপগ্রহটিতে নামবে যাতে মানুষ ও যন্ত্র দুই-ই অক্ষত থাকে; কাজ সেরে তা আবার জননী-যানের কোলে ফিরে আসবে, পৃথিবীর দিকে রওনা হওয়ার আগে। মহাকাশে মিলনের এই দুরূহ কাজটি মার্কিনদের পরীক্ষায় সফল হয়েছে, আর ধীর অবতরণের কৌশলটি রুশ বিজ্ঞানীরা প্রথম আয়ত্ত করলেন।

জীব দেখবে? [illegible] উপন্যাসে পৃথিবীর [illegible] চাঁদে [illegible] নিয়ে সেখানে ভূগর্ভবাসী কীটজাতীয় মানুষের কবলে পড়েছিল। ওয়েলস অবশ্য নিজে বিজ্ঞানী ছিলেন, তেমনি প্রায় ২৫ বছর আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিকারিং বিশ্বাস করেন যে চাঁদের অনুজ্জ্বল অংশগুলিতে গাছপালা এমন কি কীটপতঙ্গও থাকতে পারে। গ্যালভারি প্রস্তাব করেছেন যে চাঁদে কয়েক শো কোটি বছর ধরে সমুদ্র ছিল, সেখানে একদা প্রাণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটেছে। জ্যোতিষী মহারথ কেপলার বিশ্বাস করতেন যে চাঁদে বাতাস, জল ও প্রাণী আছে, যারা আকস্মিক তাপ পরিবর্তন এড়াতে গুহাতে আশ্রয় নিয়ে থাকে।

কিন্তু চাঁদ সম্বন্ধে আজ আমরা যা জানি তাতে কোনও রকম প্রাণীর অস্তিত্ব আশা করা যায় না। তবে হয়তো সেখানে পৃথিবীর বিবর্তন ও প্রাণের সূত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে, তার কারণ চাঁদে সম্ভবত আদিকালের অবস্থা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সেখানে পৃথিবীর মত যুগে যুগে পাহাড় উৎক্ষিপ্ত হয়নি, জল ও বায়ুর প্রভাবে ভূমিক্ষয় ঘটেনি—সুতরাং চাঁদ যেন পৃথিবীর ফসিল। সেই কারণে অনেকের ধারণা সৌরলোকের জন্মকাহিনীর চাবিকাঠি থাকতে পারে চাঁদে।

এক দিকে জন্ম, অন্য দিকে মৃত্যু। চাঁদের সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আগে, তার পরিণতিও কৌতূহলের বিষয়। এক ধারণা অনুসারে সূর্যের তেজ ক্ষয়ে মরণদশা শুরু হলে চাঁদ সম্ভবত ক্রমে পৃথিবীর দিকে সরে আসবে যতদিন সূর্য উষ্ণ থাকে। হয়তো চাঁদ এত কাছে আসবে যে তার দুই পিঠে পৃথিবীর মহাকর্ষীয় টানের পার্থক্যের ফলে সে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যাবে। খণ্ডগুলি নিজেদের মধ্যে ঘা খেতে খেতে আরও ছোট হবে এবং শেষ পর্যন্ত শনির মত কতগুলি পাতলা বলয়ের সৃষ্টি হবে পৃথিবীর কটিদেশ ঘিরে।

কিন্তু আধুনিক তাত্ত্বিকরা এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁদের ধারণা এই পরিণতি ঘটতে সূর্যের যত কাল উষ্ণ থাকা দরকার তা সে নাও থাকতে পারে। হয়তো সে তার অন্তিম অবস্থাগুলি এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে আসবে যে তার তাপ চাঁদকে ফেটে যাওয়ার মত কাছে আনতে পারবে না পৃথিবীর। তার পরিবর্তে চাঁদ আবার পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যাবে। ক্রমে তার আলো কমবে, রাত্রির আঁধার বেড়ে চলবে, অবশেষে তাকে আর দেখা যাবে না। সে যুগের দিনও খুব আনন্দদায়ক হবে না, সূর্য তখন দ্রুত ক্ষীণ হতে থাকবে, ফলে তখনকার ফ্যাকাশে ভুতুড়ে রোদ আজকের পূর্ণিমার তুলনায় বেশী উজ্জ্বল হবে না। তবে এই দুর্ভোগ পোহাতে মানুষ টিঁকে থাকবে কিনা সন্দেহ, কারণ ৫০০ কোটি বছর আগে সূর্যের কোনও পরিবর্তনই হবে না।

(ক্রমশঃ)

তবু ছড়িয়ে পড়ছে, শুধুই ছড়িয়ে পড়ছে ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে, গোয়ালিয়র মনুমেন্ট বুঝি,
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার — ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
তোমায় নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করে আমি
মহান খেলনায় গিয়ে পৌঁছুলাম
এ-বয়স খেলনার নয়, হেলাফেলা সারাবেলার নয়,
রবীন্দ্রনাথের মতন নয় গঙ্গাস্রোতে গা ভাসানো
আমার সুসময় দুঃসময় দুটোই অল্প
রেলগাড়ির ব্রিজ আর কতোটুকু ? আমি সেই ব্রিজের মতন
অল্পস্বল্প হাহাকার — ব্রুকলীন ব্রিজ
নই হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির
মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে
মেলাতে চেয়েছিলাম
অথচ তুমি জানো সবই — আমাদের মিত্র-মিলন হবার নয়
তুমি দূর ছায়ার মধ্যে গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াচ্ছো
আমার স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট,
আষ্টেপৃষ্ঠে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, ইঁটকাঠের স্তূপ
রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার — ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে

প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীর আলুথালু
অলিগলি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তোমার, কবিতার
সিঁড়ি — একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি — যা কোনোদিন
প্রাসাদে পৌঁছায় না
শুধুই সিঁড়ি, একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি আর
অবসোলিট্ ম্যানিফেস্টো—
দূর ছাই ! কি পাগলের মতন আবোলতাবোল--
কবিতা লেখার কথা আমার
সিঁড়ির কথা রাজমিস্তিরির, হলুদবাড়ি — তাও রাজমিস্তিরির,
কবিতা লেখার কথা আমার

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট তুমি,
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার — ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
হাতের পরে মাথা রেখেছিলে, দুই উরু ভরে রেখেছিলে কার্পাস,
শুধু চীনেবাদামের খোসা ছড়ানো আমার কবিতার সঙ্গে
মিশ্ খাচ্ছে না
এয়ারকণ্ডিশানিং-এর ক্ষেত্রেও বাদামের খোসা নিষিদ্ধ ।
চুম্বন নিষিদ্ধ—
তাম্রকূট আইন করে বন্ধ করা, দূর ছাই !
কবিতার কাছে যতো কথা জড়ো করছি ততোই ছড়িয়ে পড়ছে
তোমার-আমার মনের স্বপ্নের সাধের মতন — বাতাস নেই,
গাব-ভেরেণ্ডার পাতা নড়ছে না—জোয়ারের জল
তবু ছড়িয়ে পড়ছে, শুধুই ছড়িয়ে পড়ছে।

ভগ্নাংশ ॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যায় না ভাঙা রোদ। আয়না নিয়ে একা
ঘোরাই যত শুধু মুখের ভুল ভাঙে।
ছড়িয়ে পড়ে মাগো তোমার শেষ জবা
আমার সারা দেহে, ভক্তি যতদূর
স্নেহকে নিতে পারে—মা, দ্যাখো আমি সেই
তোমার ছোট খোকা পাগল হয়ে আজও
ঘুরেই বেড়াচ্ছি, একটু শুধু তুমি
পাখিকে বলে দিও যেন না গাছ থেকে
সবুজ মুছে নেয়, মেঘকে বলে দিও
বৃষ্টি এনে যেন ভেজায় দুটি চোখ;
না হ'লে এখনো যে কাঁদতে পারি আমি
প্রমাণ করা আর যাবে কি শব্দে ? না
রোদের দোষ নেই, জামার মতো ভিজে
বয়স পেলে আর কেই বা ক্ষমা করে;

আয়না ভাঙা মুখ ছায়ায় নড়েচড়ে।

হুঁকোয় শেষ টানটা দিয়েই তারিণী মণ্ডলের দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল যামিনী। জোরে টান দিতে গিয়ে খানিকটা জল মুখে ঢুকে গিয়েছিল। যামিনী ফিচ্ করে সে জল উঠোনটার নীচে ফেললো। তারপর কোঁচার খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে বললো, 'হ, যা কইছিলাম খুড়ো ঠিকচো কি যামিনী সিকদারের কাছে আইসো। যামিনী দিনকে রাইত বানাইয়া ফালব। তীন দিয়া নাও চালাইয়া দিব। আরে থানা পুলিশ? হ্যা সব তো তার কাচার গোঁটে বাধা। নাচাইব তো, তারাও নাচব। যেমুন ঘুরাইব, তেমুনি ঘুরব।'

যামিনীর প্রতিটি কথা যেন গিলছিল তারিণী। তার বড় বড় দুটি চোখের কালো তারা যেন চকচক করে উঠছিল। একটা ভরসার হাসিতে যেন ছড়িয়ে গিয়েছিল নাকের নীচকার গোঁফজোড়া। হুঁকোর ফুটোটা বাঁ-হাতে বার কয়েক মুছতে মুছতে সে বললো, 'তা আর জানি না যামিনী? অরে কইতে গেলে তুমিই তো সব। এ তল্লাটের মাথা। বিপদে-আপদে তুমিই তো সব্বার মুরুব্বি। চর ফুট নগরের নেতাই সর্দার খুনের মামলায় পড়লা। নির্ঘাৎ ফাঁসি। কোহান দিয়া কি জল ঘুরাইয়া তুমিই না তারে ছাড়াইয়া আনলা। আর ঐ যে, বিন্দুবাসিনীর বিধবা মাইয়া চম্পা গলায় দড়ি দিল। লোকে কইল, ইবার আর রেহাই নাই বিন্দুর! ইবার শ্রীঘর। কিন্তু হাত পড়লো তোমার। সব গ্যালো উইলটা। শ্রীঘর দূরে থাকুক বিন্দুকে একদিন থানায়ও যাইতে অইলো না।'

তারিণী মণ্ডলের কথায় খুশী হয়েছে যামিনী। তার প্রশংসায় সে যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তার মুখটা প্রসন্ন হয়েছে। চোখের তারা দুটি করছে চিকচিক। সে একটা মোচড় নিয়ে একেবারে তারিণীর কাছে এসে বসলো। এ-দিক, সে-দিক তাকিয়ে তারিণীর কানে কানে 'ফিস্‌ফিস্' করে যেন কি বললো। তারপর উঠোন থেকে নেমে সে বাড়ীর পথ ধরলো।

তারিণী পেছন ডেকে বললো, 'তাইলে মনে থাকে যান যামিনী। রইত একটার। কথার যান আবার নড়চড় অয়না।'

দূরে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ালো যামিনী। একবার হাসলো। তারপর বললো, 'যামিনীর মাথা ঠিক আছে খুড়ো, কথাও তাই তার ঠিক। পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে। কিন্তু যামিনীর কথার নড়চড় নাই।'

'তা জানি হে, তা জানি। তবু—' বলতে বলতে তারিণী মণ্ডল তার ছড়ানো গোঁফে একবার তা দিলো। একবার হাসলো। তারপর হুঁকোর ফুটোটা বার কয়েক মুছে, হুঁকোতে আবার টান মারলো গুরুক্......গুরুক......গুরুক।

চর গোবিন্দপুরের সবাই চিনে যামিনী সিকদারকে। শুধু চর গোবিন্দপুর কেন, চর ফুট নগর, মাখৈলা, নয়া হাট এমন কি পাঁচ পাঁচ নগরের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যামিনীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। বিপদে-আপদে যামিনী তাদের মুরুব্বী। কেউ থানায় বাঁধা পড়ুক আর কোর্ট-কাছারীতে ঠেকুক, যামিনীর শরণ নিলে হিল্লে তার একটা হবেই।

কারণ যামিনীর অবাধ গতি সর্বত্র।

এ নিয়ে অলক্ষ্যে লোকে রহস্য করে। রহস্য করে বলে, 'থানার বাবুরাও যামিনীর গুণ গায়। আরে নুন খাইলে গুণ গাইব না? যামিনী যে তাগো বস্তায় বস্তায় নুন খাওয়ায়। তাগোর কাছে যামিনীর কদর তাই আলাদা।'

কিন্তু যামিনীকে দেখলে সবাই চুপ। টুঁ শব্দটিও নেই। বরং 'দাদা' 'খুড়ো' 'মামা' ইত্যাদি সম্পর্ক পাতিয়ে যামিনীকে তারা খুশী করতে চায়। কারণ তারা জানে, যামিনীর বিষ নজরে পড়লে কারো আর রক্ষে নেই। আর কিছু না হোক অন্ততঃ সে সিঁধেল চুরির দায়ে ধরা পড়বে। থানার পুলিশ তার কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে থানায় টেনে নেবে। থানা থেকে সদরে চালান।

তারপর কোর্ট কাছারী।

কারো কোমরে জোর থাকলে পয়সা ঢেলে সে বেরিয়ে আসবে। কড়ির জোর যাদের কম, তাদের নির্ঘাত শ্রীঘর বাস।

কাজেই কেউ যামিনীকে ভালো না বাসলেও, ভয় করে। ভয় করে খাতির করে। হাতে রাখে।

জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে কে বিবাদ করবে? তাই যামিনীর সর্বত্র সমান কদর।

তারিণী মণ্ডল বিশেষ প্রয়োজনেই যামিনীকে ডেকেছিল।

নইলে যামিনীকে যে সে খুব ভালো চোখে দেখে তা নয়। বরং যামিনীর উপর নজরটা তার বাঁকা। যামিনীকে সে বরং ঘৃণা করে। আড়ালে বলে, 'শালা বদমাস, মরলে কাউয়ায়ও অর মাংস ছুঁইব না।'

যামিনী বড় কর্তাবাবুদের মুরগীটা-পাঁঠাটা দেয়, লোকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েই দেয়, ভয় দেখিয়ে নেয়, তাতেও তারিণী মণ্ডলের তেমন অভিযোগ নেই। কিন্তু তাদের জন্যে ভোগের বলিও জোগাতে হবে? মা-বোন কার ঘরে না আছে? এ কাজ মানুষে করে না। মানুষে পারে না। কিন্তু যামিনী করে। যামিনী পারে। তারিণী

মণ্ডল তা জানে। বিন্দুবাসিনীর বিধবা মেয়েটা যে গলায় দড়ি দিয়ে মলো, তার জন্যে যামিনীই দায়ী। সে-ই একটা জানোয়ারের ক্ষুধার মুখে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই লজ্জা লুকোতে গিয়েই বিন্দুবাসিনীর মেয়ে মরেছে। মরে বেঁচেছে।

যামিনীর নামে তারিণী মণ্ডল তাই থু থু ফেলে। তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে।

এমন কি দেখা সাক্ষাৎ হলেও একটু হাসি, একটা-দুটো কথা ছাড়া সে সময় নষ্ট করে না।

কিন্তু আজ বড় প্রয়োজনে যামিনীকে ডেকেছিল তারিণী। নিজ হাতে তামাক সেজে যামিনীর হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়েছিল। কারণ সে জানে, যামিনীকে আজ আদর করতে হবে। হাতে আনতে হবে। তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

তারিণীর ভাই নিশিকান্ত। নিশিকান্ত নেই। তার বৌ আছে। পূর্ণশশী। আর আছে একটা ছেলে। দয়ালচাঁদ। দয়ালচাঁদ এখনও ছেলেমানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি হয়নি। খায় দায়, বাঁশী বাজায়। মন হলে হাল ধরে। কখনও বলদের পায় হলের ফাল ঢুকিয়ে হাল ছেড়ে পালায়। সেজন্য তারিণী তাকে কিছু বলে না। আহা, অতটুকু তো ছেলে। সে আবার হাল ধরবে কি? বড় হোক। বুদ্ধিসুদ্ধি হোক তখন সে কাজে লাগবে। চাষীর ব্যাটা, চাষ না করে যাবে কোথ ?

পূর্ণশশী যদ্দিন খাড়া ছিল তারিণী-মণ্ডলের চিন্তা হয়নি। সে আর যা করুক, ভাসুরের বিপক্ষে যাবে না। নিজের সংসারে ভাইকে ডেকে আনবে না।

কিন্তু মাসখানেক হলো পূর্ণশশী বিছানা নিয়েছে। পায়ে-পেটে জল ধরেছে। শরৎ কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। বাঁচবে না পূর্ণশশী। সামনের অমাবস্যা পর্যন্তও টিকলে হয়।

তাই চিন্তায় পড়ছে তারিণী মণ্ডল। পূর্ণশশীর ভাইয়েরা সেয়ান। বোনের সম্পত্তি গেলবার জন্যে তারা হাঁ করে আছে। বার কয়েক ঢুঁ-ও মেরেছিল। পূর্ণশশী আমল দেয়নি। কিন্তু এবার তাদের ঠেকাবে কে? এবার যে ফাঁকা মাঠ।

তারিণী তাই যামিনী সিকদারকে ডেকেছিল। বলেছিল, "বাপ-মা' নাম দিয়া কয় যামিনী, দয়ালকে ঠকামু না। অরে ঠকামু ক্যান্? অর কি রক্ত আলাদা? ঘর আলাদা। শুধু অর মামাগোর ভয়েই—'

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে নাচাতে নাচাতে কথা কেড়ে নিয়েছিল যামিনী।

বলেছিল, 'কাচকলা। বুঝেছ দাদো, এই কাচকলা। নিশার শালাগো যদি এই কাচকলা খাওয়াইয়া না দিচি তো আমার নাম যামিনী সিকদার নয়।' তারপর থেমে একবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলেছিল 'নাও ঠিক রাইখো। গঞ্জে যাওন লাগব। রাইত একটায়।'

'ক্যান্?'

'একেবারে সাফ কবালা। সাফ বিক্রী। ইন্দ্র ব্যাণ্ডারের কাছে তো আর পুরাইনা কাগজের অভাব নাই।'

তারিণী মণ্ডল একটু চিন্তিত হয়ে বলেছিল 'কিন্তু বৌ যে—'

'রোগী? মরকার বইচে? তাতে কি? তাতে কি? ধরাধরি কইরা নাওয়ে তুলবা। নাও গিয়া লাগব ব্যাণ্ডারবাবুর ঘাটে। ব্যস, একটা মাত্তর টিপ। তারপরই সব সাফা।'

যামিনী সিকদার চলে গিয়েছিল।

নাও এর জন্যে চিন্তা নেই। নাও তারিণীর ঘাটেই বাঁধা আছে। নিজের নাও। কারো কাছ থেকে 'করাইয়া' নিতে হবে না।

কিন্তু বিপদ হলো অন্যদিকে। রাতে পূর্ণশশী মারা গেলো।

একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলো তারিণী মণ্ডল। বাইরে অমাবস্যার অন্ধকার। অন্ধকার তারিণী মণ্ডলের বড়ো বড়ো দুটি চোখেও।

খবর পেয়ে যামিনী সিকদার এলো। হাসলো একবার।

বললো, 'মরচে? তা মরুক। মইরা যামিনীরে আটকাইবার পারব না। যামিনীর রাস্তা খোলাই থাকব।' তারপর একটু থেমে তারিণীকে আবার বললো, 'অমন হা কইরা বইসা রইলা ক্যান? চলো?'

'কোহানে?'

'গঞ্জে।'

'কিন্তু—'

'অইব। অইব। এই দিয়াই অইব। খালি তো একটা টিপ সই। তা মরার হাতের অইলেও ক্ষেতি কি?'

অকূলে যেন কূল পেলো তারিণী। উঠে দাঁড়ালো। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে যামিনীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কও কি যামিনী, মরা মানুষ দিয়া—'

'হ, হ। মরা মানুষ দিয়াই অইব। তোমাগোর কিরপায় যামিনীর অসাধ্য কিছু নাই।' বলতে বলতে একটু মুচকি হাসলো যামিনী। তারিণী মণ্ডলের কাছেও সে হাসি বীভৎস বলে মনে হলো।

চর গোবিন্দপুর থেকে গঞ্জ বেশী দূরের পথ নয়। দূরত্ব মাত্র মাইল তিনেকের।

প্রথমে একটা খাল, খালের পরে মাঠ। তার পরই নদী। ধলেশ্বরী। এই ধলেশ্বরী পাড়ি দিলেই গঞ্জ।

পূর্ণশশীর মৃতদেহটা যখন ধরাধরি করে নায়ে তোলা হলো, তখন রাত অনেক। চারপাশে আমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। ও দিককার পাকুড় গাছে কি একটা পাখী যেন একটানা চীৎকার করে চলেছে। ঝোপঝাড়ে

যামিনীর রাস্তা খোলাই থাকব।

মাঝে মাঝে কিসের যেন শব্দ। বোধ হয় মানুষের পায়ের শব্দে সাপখোপগুলি নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটেছে।

যামিনী বললো, 'দেওয়ার ভাবসাব খারাপ গো খুড়ো। তাড়াতাড়ি করে। ঝাড় আইলে ধলেশ্বরী আবার ক্ষেইপা যাইবনে। তখন আর পাড়ি ধরবার পারবা না।'

নায়ের কাছেই থমকে দাঁড়িয়েছিল তারিণী। কি যেন ভাবছিল। যামিনীর কথায় তার ভাবনার সূতোটা ছিঁড়ে গেলো। সে চমকে উঠলো।

বললে, 'হ। ঠিকই কইচো যামিনী। ম্যাঘ য্যান চাইপা আইচে। আবার হাওয়া দিলেই মুসকিল।' নাওয়ের গলুইয়ে তিনবার জল দিয়ে তিনবার হাতটাকে কপালে ঠেকালো তারিণী। 'গুরু' 'গুরু' বললো। তারপর একটু ঠেলা দিয়ে নাওয়াটাকে জলে ভাসিয়ে দিল।

গঞ্জের কাছাকাছি যেতেই বৃষ্টি। প্রথমে মোটা মোটা কটি ফোটা। তারপর অনেক। অনেক। একেবারে বৃষ্টির ঢল। সঙ্গে প্রবল বাতাস।

যামিনী বললো, 'হাইল্ল সই রাইখের খুড়ো। ঐ যে বট গাছ, ঐটেই ইন্দ্র ব্যাণ্ডারের ঘাট। নাও ওখানেই লাগাইবা।'

ইন্দ্র ভেণ্ডারের ঘাটে নাও লাগলো।

তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে বাজ। পূর্ণশশীর মৃতদেহটা নিজের কাঁধেই তুলে নিল যামিনী। তারপর নাও থেকে নেমে গেলো। ইন্দ্র ভেণ্ডারের দরজায় কড়া নাড়লো।

'ব্যাণ্ডার বাবু, ব্যাণ্ডার বাবু।'

'কে?'

'আমি। আমি যামিনী। চর গোবিন্দপুরের যামিনী সিকদার। দরজা খোলেন। ইস্ শালার বৃষ্টিতে যে মাইরা ফ্যালাইলো।'

যামিনীর সঙ্গে ইন্দ্র ভেণ্ডারের পরিচয় বহু দিনের। আজ এই দুর্যোগের রাতে হঠাৎ তার গলা শুনে একটু বিস্মিত হয়েছিল সে।

হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে দিল।

যামিনীর কাঁধে পূর্ণশশীর মৃতদেহটা তা দেখে দু'পা পিছিয়ে গেলো ইন্দ্র ভেণ্ডার।

বললো, 'কে? কে? তুমি কারে নিয়া আইচো যামিনী?'

'মক্কেল, নয়া মক্কেল। দলিল করাতি আইব।' বলতে বলতে যামিনী পূর্ণশশীর দেহটা ধপাস করে ইন্দ্র ভেণ্ডারের পায়ের সামনে ফেললো।

শিউরে উঠলো ইন্দ্র ভেণ্ডার।

যামিনী হাসছে। তার দু'টি চোখের তারা ধক্‌ধক্ করছে।

বীভৎস। বীভৎস।

যামিনীকে যেন সইতে পারছে না ইন্দ্র ভেণ্ডার। সে বার বার যামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। সে মানুষ না আর কিছু।

যামিনী বললো, 'খাড়অইয়া রইলেন ক্যান্? কাগজ আনেন। টিপ লন। দক্ষিণা? দক্ষিণা মোটা রকমই অইবনে। পোষাইয়া দিমু অনে। একেবারে এ্যাক হাত।'

যামিনী ডান হাতের পাঁচটা আঙুল উঁচিয়ে দেখালো।

ইন্দ্র ভেণ্ডারের গা জ্বলছে। দু' কান দিয়ে একটা গরম ভাপ বেরুচ্ছে। কপালের চামড়াটা তার কুঁচকে উঠলো।

সে ধমকে বললো, 'যামিনী।'

হাসলো যামিনী, হাসলো। হেসে হেসেই বললো 'চড়া দর চান? দিমু অনে। আরও দুইখানা দিমু অনে। পুরাপুরি সাত। কাম করেন। পুরাপুরি সাতখানাই দিমু।'

যামিনী একটা হিংস্র দৃষ্টি মেলে ইন্দ্র ভেণ্ডারের মুখের দিকে তাকালো।

আর সইতে পারলো না ইন্দ্র ভেণ্ডার। এবার সে একেবারে চীৎকার করে উঠলো।

বললো, 'তর ট্যাহার মুখে লাথি। তর মুখে লাথি। তুই বাইর অ, তুই বাইর অ শয়তানের বাচ্চা। আমার ঘর থিকা বাইর অ। নইলে—'

আর কথা বাড়াতে হলো না ইন্দ্র ভেণ্ডারকে। যামিনী এবার ঘুরলো। পূর্ণশশীর মৃতদেহটা আবার কাঁধে তুললো। রাস্তায় নামলো।

আবার ধীরে ধীরে নাওএর দিকে চললো।

পূর্ণশশীর দেহের বোঝাটা এখন তার কাছে ভারি বলে মনে হচ্ছে।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

মহিম কাজ পেয়েছে শুনে যতখানি অবাক হয়েছিলাম, তার চাইতে বেশি অবাক হয়েছিলাম তার পদোন্নতির খবর পেয়ে।

এত তাড়াতাড়ি এতখানি উন্নতি আমাদের মধ্যে আর কেউ করতে পারেনি, অতএব ধরে নিয়েছিলাম মহিমের মধ্যে নিশ্চয় পদার্থ ছিল, যেহেতু আমরা তা লক্ষ্য করতে পারিনি সেহেতু আমরাই বোধহয় অপদার্থ ছিলাম। এছাড়া আর তো কোন-রকম সংগত সিদ্ধান্ত করতে পারছিলাম না। আর যত না করতে না পারছিলাম ততই আমাদের নিজেদের কেমন একটা হীন বলে মনে হচ্ছিল।

মহিম অবশ্য কোন পরীক্ষাতে কখনো ফেল করেনি। তবে বোধহয় যত কম মার্ক পেয়ে পাসকরা সম্ভব বোধহয় তার চাইতে বেশি মার্কা কখনো সে পায়নি। অতএব পাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরাও যা, মহিমও তাই। কিন্তু আমরা তো জানি ও হচ্ছে পাসের মধ্যে সবচেয়ে নিচের ধাপে। কিন্তু পরীক্ষার মার্কা থেকে বোধহয় একটা মানুষের পুরো বিচার করা সংগত নয়। আমরাও তা করতাম না—যদি না তার আনু-সঙ্গিক অন্য অন্য অপদর্থতার কথা আমরা না জানতাম।

এই অপদার্থতার মধ্যে একটি হল মহিম কখনো ঘুম থেকে বেলা নটার আগে উঠত না। কোনদিন ইস্কুলে প্রথম পীরিয়ডে গিয়েছে বলে মনে পড়ে না। সর্বসময়েই সে দ্বিতীয় পীরিয়ডে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ইস্কুল থেকে এ নিয়ে আপত্তিও করা হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারের এক সার্টিফিকেট নিয়ে সে দেরিতে আসার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেয়।

ক্লাসের বেঞ্চে বসে বসে সে ঘুমুতে পারত। দৈনিক প্রায় দু ঘন্টা সে ইস্কুলের ক্লাসেই ঘুমুত। পড়াশুনা প্রায়ই কানে যেত না। পরীক্ষার হলে কিন্তু সে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত বসে থাকত, সজাগও থাকত। খাতার পর খাতা লিখে যেত। আমরা যখন একখানা কিংবা দুখানা খাতা নিয়েই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেলতাম তখন তার প্রয়োজন হত অন্তত ছখানা খাতার। আমরা কৌতূহলী হয়ে যদি কখনো জিজ্ঞেস করতাম, মহিম, তুমি অত লেখ কি? মহিম একটু হেসে উত্তর দিত, কেন, উত্তর লিখি! এর বেশি তার কাছ থেকে পাওয়া যেত না। যদি জিজ্ঞেস করা যেত, তুমি দিনে অত ঘুমও রাত্রে ঘুম হয় না বুঝি? মহিম অম্লানবদনে বলত, দিনে তো আমি ঘুমুই না। রাত্রেও তেমন ঘুম হয় না আমার।

মহিম কি লিখত জানা যায় না। কখনো পড়ত না সেটা আমরা অবশ্য বুঝতাম। কিভাবে যে পাস করত সেটাও আমাদের কাছে রহস্য ছিল। প্রত্যেকবারই ভাবতাম এবারে মহিম বুঝি রয়ে গেল, কিন্তু প্রতিবারই সে প্রমোশন পেত। অথচ যাদের পাস করা উচিত, তাদেরই মধ্যে দু একজন আটকে যেত।

মহিমের কোন ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। আমরা কলেজে উঠে সপ্তাহে দু তিনটে সিনেমা অন্তত দেখতে চেষ্টা করতাম—কিন্তু মহিমকে কখনো এক-বারও সিনেমায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সন্ধেবেলা তাকে পাওয়াই যেত না। বাড়ির

লোকে তাকে আটকে রাখত তাও কিন্তু নয়। সন্ধে সাড়ে [illegible] তার রাত্রের খাওয়া শেষ হত, [illegible] সে ঘুমিয়ে পড়ত।

রাজনীতি, [illegible], সমাজনীতি, সংখ্যাতত্ত্ব এ সমস্ত তাকে কখনো আকর্ষণ করেনি। অথচ সে আস্তে আস্তে চেহারায় এবং বয়সে বড় হয়েছে। অবশেষে যা হয় প্রায় সবারই, সমস্ত পরীক্ষা পাস করবার পর একটা চাকরীও তাকে খুঁজতে হয়েছে। কিন্তু আট বছর চেষ্টা করেও সে একটা চাকরী জোটাতে পারেনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে পারবেও না চাকরী জোটাতে।

যখন সে একট বিদেশী বই-এর দোকানের শো-রুম সেলসম্যান হিসেবে একটা চাকরী জোটালো অবশেষে আমরা ধরে নিয়েছিলাম সে চাকরীটি রাখতে পারবে না। আমি একদিন সে দোকানে গিয়ে দেখি মহিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। দু একজন খরিদ্দার দোকানে আছে বটে, কিন্তু তার কিছুমাত্র হুঁস নেই।

চাকরী চলে যাবে তার, এই ভেবে আমি তাকে বললাম, এই মহিম! মহিম কেবল বলল, উঁ! বলে আবার ঝিমোতে লাগল। আমার সঙ্গে প্রায় দু বছর দেখা নেই তার, কিন্তু সে একেবারেই আশ্চর্য হল না, আমাকে অভ্যর্থনা করল না, কেবল ঝিমোতে লাগল।

অতএব ধরে নিয়েছিলাম এ চাকরী আর তার থাকবে না। কিন্তু পদোন্নতি হবার ফলে আমরা সবাই প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেলাম যেন। একি আশ্চর্য ব্যাপার।

অবশ্য ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল কয়েকদিন পরেই। ঐ দোকানেই কাজ করে এমন একজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ট্রেনে।

মহিমের কথা বলাতে বলল, জানেন না কি হয়েছিল? জানুয়ারী মাসে চার লাখ টাকার বই আনা হয়েছিল। মে মাসের শেষে দেখা গেল দশ হাজার টাকার বইও বিক্রী হয়নি। ওকে আর রাখা হবে না সব ঠিক-ঠাক, এমন সময়ে ডিভ্যালুয়েশন হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চার লাখ টাকা দামের বই-এর দাম বেড়ে হয়ে গেল প্রায় ছ'লাখ টাকা। মহিম যদি সমস্ত বই বিক্রী করে দিত তাহলে শতকরা দশ টাকা লাভ থাকলে হত চল্লিশ হাজার টাকা। কিন্তু একদম বিক্রী না করাতে লাভ হল প্রায় পাঁচ গুণ। কোলকাতার আর কোনো দোকান এরকম লাভ করতে পারেনি, অতএব মহিমকে আর পায় কে?

অতএব, প্রচন্ড পরিশ্রম করলেই যে উন্নতি হয়, কিংবা একেবারে পরিশ্রম না করলেই যে লোকে গোল্লায় যায় তা নয়।

পাঠকের বৈঠক

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

জনৈক বড়লাটের কাহিনী

নয়াদিল্লী যখনও ভাল করে গড়ে ওঠে নি সেই ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যিনি নয়াদিল্লীর 'ভাইসরিগ্যাল লজের' অধীশ্বর ছিলেন, তাঁর নাম লর্ড আরউইন।

আরউইন সাহেবের আগের ভাইসরয় লর্ড রিডিং। তিনি তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু লর্ড আরউইন ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গেই এদেশের চিত্তজয় করেছিলেন। তাঁর একটি হাত ছিল না, বোধহয় প্রথম মহাযুদ্ধে নষ্ট হয়েছিল। বেশ লম্বা এবং সুশ্রী দেহসম্পন্ন অভিজাত বংশের সন্তান লর্ড আরউইন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মাউন্টব্যাটেনে যে নাটকের শেষ অঙ্ক, এক হিসাবে সেই নাটকের প্রথম অঙ্কের শুরু হয়েছে আরউইনের আগমনের কাল থেকে। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছাড়া আর কোনও বড়লাট-বাহাদুর এতখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে লাভ করেন নি।

দেশে জাতীয় জাগরণজনিত আন্দোলন কিছু কম ছিল না সেদিন, তথাপি সাধারণ ছাত্র এবং মানুষ হিসাবে আরউইন সাহেবের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর সুযোগ সেইকালে আমাদের মত নেহাৎ অল্পবয়সীদেরও ১৯২৮-২৯-এ ঘটেছে। তখনও হয়ত সিকিউরিটির এমন কড়াকড়ি হয় নি। পুলিশের তরফ থেকে বাঙালী ছাত্রসমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন একজন বাঙালী মুসলমান সি আই ডি ইন্সপেক্টর—সামসুল সাহেব, রাইটার কনষ্টেবল থেকে উঠেছিলেন। এই ভদ্রলোক নির্ভেজাল পূর্ববঙ্গীয় টানে আরউইন সাহেবের পুত্র-কন্যাকে অনেক গাল গল্প বলতেন। আরউইন সাহেব সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে, এ কাহিনী হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তথাপি কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। একদিন প্রথম গ্রীষ্মের রাতে ডিনার শেষে পদচারণাকালে লর্ড আরউইন ইউক্যালিপটাস-কুঞ্জের ফাঁক থেকে লক্ষ্য করলেন "ইম্পিরিয়্যাল সেক্রেটারিয়েটে" (তখন ঐ নামই ছিল) আলো জ্বলছে। সম্ভবতঃ কেউ আছে। হারুণ-অল-রশীদের মত সাধারণ সাহেবের পোষাকে আরউইন সাহেব সেই আলোক-রেখা সন্ধান করে যে কামরায় পেঁৗছলেন সেটি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের একটি সেকস্যান, জনৈক প্রৌঢ় আপনমনে কাজ করছেন। বড়লাট আরউইন অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তাঁর কাজ লক্ষ্য করলেন তারপর এক সময় বললেন—বাবু, বাড়ি যাবে না?
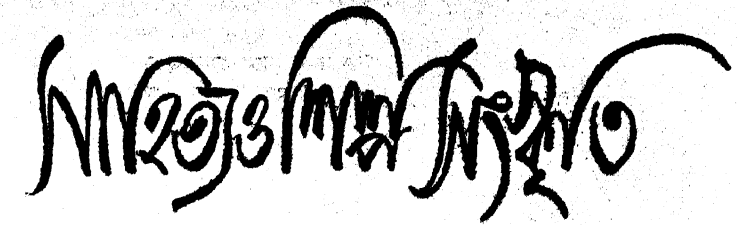
বাবুটি (বলা বাহুল্য তিনি সেকালের ধুতি-কামিজ-পরা জনৈক বঙ্গসন্তান) মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, বললেন — না সাহেব, আমার এই ফিগারটি কাল সকালেই অনারেবল মেম্বর সাহেবের বাড়ি পেঁৗছে দিতে হবে, তিনি বড়লাটের সংগে এই প্রসংগে আলোচনা করবেন।

আরউইন সাহেব বাবুটিকে নিরস্ত করতে না পেরে শুধু তাঁর নামটি জেনে নিলেন। তার পর দিন বড়লাট সাহেব এই প্রৌঢ়কে নিজের খাস দরবারে ডেকে সম্মানিত করেছিলেন। এই ঘটনাটি যে সত্য কাহিনী তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে আমরা জোর করেই বলতে পারি।

দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বড়লাট-বাহাদুর লাটভবনের দরজা ইম্পিরিয়্যাল সেক্রেটারিয়েটের সকল শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁদের প্রচুর পান-ভোজনে আপ্যায়িত করেন। যাঁরা সেদিনকার বৈকালিক চা-পান সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন।

এই সব পুরাতন প্রসংগ উল্লেখ করলাম লর্ড আরউইন এবং পরবর্তীকালে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স হিসাবে খ্যাত মানুষটির ব্যক্তি-জীবনের পরিচয়ের প্রয়োজনে।

আরউইন ছিলেন বৃটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক প্রাচীন পরিবারের উত্তরসাধক। ধর্মপরায়ণ এই খৃশ্চান ভদ্রলোক ভারতের জনগণের আশা এবং অভীপ্সার অন্তরালে যে প্রচণ্ড শক্তি ছিল তা অনুভব করেছিলেন। সেই কারণেই স্মরণীয়।

এই বৃটিশ পরিবারটির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর পিতামহ চার্লস উডের আমল থেকে। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব কন্ট্রোল (ইন্ডিয়া), এবং পরে সেক্রেটারি অব ষ্টেট ফর ইন্ডিয়া। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ইন্ডিয়ান কাউনসিলস এ্যাক্ট পাশ হয়।

এই পরিবারের আরেকজন ছিলেন স্যর চার্লস হ্যালিফ্যাক্স, তাঁকে স্যর জন লরেন্স লিখেছিলেন যে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একজন ভারতীয় জ্যোতিষী তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন যে, আপনার বংশের একজন পুরুষ যিনি আজও ভূমিষ্ট হয় নি, তিনি একদিন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হবেন। লরেন্স সেদিন আরো লিখেছিলেন যে—

> "If ever he comes, however, this descendant of yours he will have a quicker voyage to England than mine was; for, I hear that hare-brained scheme of Mr. Lesseps for digging a canal from Suez to the Mediterranean is actually taking shape."

এই দুই ভবিষ্যৎ উক্তিই পরবর্তীকালে সফল হয়েছে।

লর্ড আরউইনের প্রথমে নাম ছিল এডওয়ার্ড উড। ইটনের ছাত্র সেখান থেকে অক্সফোর্ড এবং অল সোলসের ফেলোশিপও লাভ করেন। রক্ষণশীল দলে যোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তিনি অংশ গ্রহণ করলেন যখন তখন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যে সর্বপ্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :—

> "The time may come and I hope it will come when those races with whose government we are now charged may be in a position to assume control of their own fortunes and may be able to work out their own destiny. When that time is reached, I am sure that all parties in this country will be prepared to assist them when they make the attempt."

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হাউস অব লর্ডসে যখন ভারত ত্যাগ সম্পর্কে বিতর্ক হচ্ছে তখন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (লর্ড আরউইনের পরবর্তী নাম) এটিলিকে সমর্থন করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে ১৯৪৭-এর জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণাটিকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান। লর্ড চ্যান্সেলার জোউইট এই বক্তৃতার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং তাঁর বক্তৃতাটি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। যে আসরে লর্ড টেম্পল উড এবং লর্ড সাইমন বিপক্ষ মতের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করছেন সেই আসরেই একটি-মাত্র বক্তৃতায় সমগ্র পরিষদকে স্বমতে আনা সামান্য কৃতিত্ব নয়।

এডওয়ার্ড উড প্রথম মহাযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক দপ্তরের আন্ডার-সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন, চার্চিল ছিলেন সেক্রেটারী অব ষ্টেট। এর পর তিনি প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব এডুকেশন ও কৃষি-বিষয়ক মন্ত্রীত্ব পদেও কিছুকাল কাজ করেছিলেন। তার পর লর্ড রিডিং-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে একেবারে ভারতের ভাইসরয়।

ভারতের ভাইসরয় হিসাবে আগমনের সংগে সংগেই আরউইন দম্পতি বড়লাট ভবনের অনেক জাঁকজমক কমিয়ে ফেললেন। সেই সময় লর্ড বার্কেনহেড (যাঁর পুত্র আর্ল অব বার্কেনহেড সম্প্রতি "দি লাইফ অব লর্ড হ্যালিফ্যাক্স" রচনা করেছেন) ছিলেন সেক্রেটারি অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া। দুজনের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। বার্কেনহেড

ছিলেন কট্টর রক্ষণশীল মনোবৃত্তির মানুষ, তিনি—

"distrusted and indeed to some extent opposed the Montague Chemsford Report."

শুধু তাই নয় তিনি তাঁর এই মনোভঙ্গীর জন্য গর্ব অনুভব করতেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দেই তিনি বলেছেন—

"To me it is frankly inconceivable that India will ever be fit for Dominion Self-Government."

আশ্চর্য বলা যায় যে, ভারতীয় মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন ভাইসরয় এবং সেক্রেটারি অব স্টেটকেও সেই মতে নিয়ে আসেন। প্রসঙ্গটি ছিল সংস্কার প্রস্তাবসহ ভারতীয় গঠনতন্ত্রকে সংশোধন করার জন্য একটা স্ট্যাটুটারী কমিশন নিযুক্ত করা।

১৯২৬-এর ২৯শে জুলাই বার্কেনহেড ভাইসরয়কে লিখেছিলেন ঃ—

I should be very glad to hear any suggestions you might have in your mind as to the personnel on the Indian side."

ভাইসরয় কিন্তু তার উপদেষ্টা মণ্ডলীর অভিমত অনুসারে উত্তর দিলেন ঃ—

"I have grave doubts about the wisdom of this course."

তাঁর সন্দেহ ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন সম্ভব হবে না। ফলে লর্ড বার্কেনহেড কয়েক মাস ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ের মতই গ্রহণ করলেন। ভারতীয়দের বাদ দেওয়ার ফলে চারদিকে ধিক্কার উঠল—"সাইমন ফিরে যাও"। বৃটিশ শাসকরা এসে বিচার করবেন ভারতীয়রা স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য কিনা এই চিন্তাও অসহনীয়। ভাইসরয় ভেবেছিলেন মুসলমানরা যদি কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে অপর পক্ষ 'বয়কট' প্রত্যাহার করবেন। কিন্তু সে ধারণাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। জিন্না সাহেবও সাইমন কমিশনকে ধিক্কার দিলেন এবং স্যার চিমনলাল শীতলবাদের সহযোগে বোম্বাই শহরে বিক্ষোভের এক সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। কেবল প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীভুক্ত স্যার মহম্মদ সাফী সেই কমিশনের সহযোগিতা করলেন।

কনগ্রেস নিজস্ব ভঙ্গীতে গঠনতন্ত্র রচনা করলেন, তা নেহরু রিপোর্ট নামে প্রকাশিত হল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু ছিলেন সেই কমিশনের সভাপতি। কিন্তু আর এক বিয়োগান্ত কাহিনীর সূচনা হল। এই সময় স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ভাইসরয়ের কাছে একটি সুন্দর প্রস্তাব দিলেন, এক সময় কর্তারা ঘোষণা করলেন তাঁদেরও অন্তিম ইচ্ছা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দান করা। ভাইসরয় অসম্মত। ইতিমধ্যে রক্ষণশীল সরকারের বিদায়, শ্রমিক দল গদীতে আসীন হলেন। ওয়েজউড বেন সাহেব ভারতীয় দপ্তরের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

এত দিনে স্যার চিমনলালের প্রস্তাব ভাইসরয়ের অনুমোদন লাভ করল এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের কাছে ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দানের প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করলেন। ১৯২৯-এর ৩১শে অক্টোবর তারিখের ঘটনা। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের নিমন্ত্রণের পরিসর বিস্তারিত হল।

দিল্লী শহরে এক সমাবেশে উপস্থিত হয়ে গান্ধি মহারাজ, ডাঃ আনসারী, ডাঃ অ্যানী বেসান্ত, দুই নেহরু, মালবীয, সাপ্রু, মুনজে, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সকলেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ইংলণ্ডে এক তুফান উঠল, এইবার বার্কেনহেড আর রিডিং নিলেন সেই আন্দোলনের নেতৃত্বভার। ফলে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর সঙ্গে আরউইনের আলোচনা বেশী দূর গড়াল না।

বর্দোলীর করদানে অসম্মতি আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক দাণ্ডী অভিযান শুরু হল, গান্ধীজী কারারুদ্ধ হলেন, সারা দেশে আইন অমান্য শুরু হল। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। *সাইমন সাহেবের চোখে ঠুলি বাঁধা একথা বলেছিলেন লর্ড আরউইন। ফলে প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স অসফল হল, ভাইসরয় স্থির করলেন—*

"He would make no further progress while Gandhi remained in Prison."

গান্ধীজী জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ছুটলেন লাটদর্শনে। শ্রীমতী সরোজিনীর ভাষায় 'দুই মহাত্মার মিলন'। এই মিলনের বিরুদ্ধে লণ্ডনে ঝড় উঠল, চার্চিলের কুৎসিত উক্তি 'নেকেড ফকীর' আজ সকলের কাছে পরিচিত। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে 'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট' বিশেষ পথচিহ্ন। রাজাগোপালাচারী ব... ছিলেন—

"a historic memorial what ... God-fearing men could achi... though history placed them ... opposite camps."

এর পরবর্তী ঘটনার ফলেও দুজ... মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়... গান্ধী-আরউইন চুক্তির মত দুজনের বন্ধু... অটুট রইল একথা বলা যায়। ভাই... তাঁর কার্যকাল শেষ করে সসম্মানে দে... ফিরেছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে লর্ড হ্যালিফ... চেম্বারলেন সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি কর... পারেন নি। মিউনিক প্যাক্ট এবং অন্য... ঘটনার জন্য তাঁর অপরাধের অংশের ত... পাত কম নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বৃ... রাজদূত হিসাবে তিনি সম্মান ও শ্র... অর্জন করেছেন।

লর্ড বার্কেনহেড রচিত হ্যালিফ্যা... জীবনীতে একটি বিশিষ্ট মানুষের ব্যক্তি... ও চরিত্র সুন্দর ছবির মতই ফুটে উঠেছে।

HALIFAX : The Life of Lord Halifax : By the Earl of Birkenhead : Published by Hamish Hamilton : London : Price — Sixty-three Shillings Only.

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

বিদেশে ভারতীয় সাহিত্য ॥

বিদেশে ভারতীয় সাহিত্য প্রচারের জন্য বে-সরকারীভাবে যে-প্রচেষ্টা চলছে, তার কিছু কিছু তথ্য এর পূর্বে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। এবার আরও দু'টি প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ইংলণ্ডে 'প্রভাসিনি' নামে একটি ত্রৈমাসিক হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই ধরনের পত্রিকা ইংলণ্ডে এই প্রথম। পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের একটি বাণী আছে। তাছাড়া আছে লোকমান্য তিলকের উপর ডঃ থায়েনকার লিখিত একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ। হিন্দী কবিতা, গল্প এবং কয়েকটি প্রবন্ধও এতে স্থান পেয়েছে।

আফ্রিকার উগাণ্ডা থেকে 'ট্রানজিশন' বলে যে মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদক যে একজন বাঙালী, এসংবাদ বোধহয় এখানে খুব প্রচারিত নয়। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শ্রীরজত নিয়োগী। এর সঙ্গে যুক্ত আছেন উগাণ্ডার প্রখ্যাত কবি ডেভিড রুবাদিরি, জন মার্বিত প্রমুখ: এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে এবং প্রধানতঃ বাংলা-সাহিত্যের উপর কিছু কিছু আলোচনা এবং অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

একজন প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক ॥

হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচাঁদ-যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং নাট্যকার হলেন শ্রীসুদর্শনজী। তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হিন্দী মাসিক গল্প-পত্রিকা 'নয়া কাহিনী' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। ঐ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় সুদর্শনজী সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছে।

এপর্যন্ত তাঁর প্রায় ষাটটি গল্প, নাটক এবং উপন্যাসের বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট। এখানে আরও কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন শহীদ হকিকত রায়, স্বামী রামতীর্থ এবং ডঃ ইকবাল। বক্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত।

সুদর্শনজীর সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভও খুব চমকপ্রদ। একটি সাক্ষাতকারে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "তখন আমি ছাত্র। এই সময়ে লাহোর থেকে 'মার্তণ্ড' নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবব্রতলাল বর্মন এম-এ। তাঁর পত্রিকা দেখেই আমারও মনে হল, কিছু লিখি। এই আমার মনে লেখার প্রথম প্রেরণা।" এই সামান্য প্রেরণা থেকেই লিখতে আরম্ভ করে তিনি আজ খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর জীবনী ॥

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কর্মময় জীবনের একটি ইতিহাস সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক খুজা আহম্মদ আব্বাস। গ্রন্থটি প্রকাশ

করেছেন বোম্বের 'পপুলার প্রকাশন' সংস্থা।

গ্রন্থে শ্রীইন্দিরা গান্ধীর ছোটবেলার ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে এই বছরের মে মাস পর্যন্ত তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে। প্রথম জীবনের ইতিহাস প্রায় তাঁর পারিবারিক জীবনের ইতিহাস। এই ইতিহাস রচিত হয়েছে মূলত পিতা জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির রচনাকে ভিত্তি করে। অবশ্য তাঁর জীবনের কিছু ব্যক্তিগত অংশ লেখকের অত্যধিক ভাবালুতার জন্য ব্যাহত হয়েছে।

অবশ্য গ্রন্থটির মধ্যে কিছু তথ্যের ভুলও রয়েছে। এ-বিষয়ে লেখক কিছুটা সচেতন হলে বইটির মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত। যেমন গ্রন্থকার রুশ-বিপ্লবের তারিখ উল্লেখ করেছেন ১৯১৮ সাল বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্বন্ধেও যে দুই-একটি উক্তি করেছেন, যা তা কোন-ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। তবু গ্রন্থটির অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলা ছোটগল্পের হিন্দি সংকলন ॥

কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি হিন্দী ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অনিমা'র বর্তমান সংখ্যাটি আধুনিক বাংলা ছোটগল্প সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আধুনিক বাঙালী ছোটগল্পকারদের গল্পের হিন্দী অনুবাদ সংকলিত। যতদূর মনে হয়, এই ধরনের প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম। পত্রিকার পরিচালক-মণ্ডলী এর জন্য সকলের অভিনন্দন লাভ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। যখন চারদিকে জাতীয় সংহতির সংকট গভীরতর হয়ে উঠছে এবং ভাষার প্রশ্নে বিভিন্নভাষী মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জেগে উঠছে, তখন এই প্রচেষ্টা সময়োপযোগী বলেও অভিনন্দন লাভ করবে বলে আশা করি। এতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকদের গল্প অনূদিত হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্য

তাজিক সাহিত্যের ইতিহাস ॥

মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মতো তাজিক সাহিত্যও রুশ ভাবধারায় প্রবাহিত। এর কারণ হয়তো তাজিকবাসীর উপর জারের অত্যাচার ও 'অক্টোবর বিপ্লব' এর প্রতিক্রিয়া। সাদ্রিদ্দিন আইনি-ই হচ্ছেন তাজিক সাহিত্যের জন্মদাতা। তাঁর ১৯১৮-১৯ সালের কবিতাগুলি হচ্ছে বিপ্লবের জয়গান। 'মুক্তিপণ', 'হোচি সিরাজউদ্দিনের জন্য শোক-সংগীত', 'বিশ্ব-পরিক্রমা' ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতাগুলি ১৯২৩ সালে আইনির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। তাঁর গদ্য গ্রন্থের মধ্যে 'বুখারা জল্লাদ' এবং 'দাসোস্তনী তাজিক মুল্ক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ক্রীতদাস' বের হয় ১৯৩৫ সালে। এতে ঊনবিংশ শতাব্দীর তাজিকদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। এর সমর্থনে সাদ্রিদ্দিন আইনি বলেন, 'অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে এবং আমাকে সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত করেছে।'

এই অক্টোবর বিপ্লব কবি আবুল-কাশেম লাহুতিকেও উদ্দীপিত করে। তাঁর কবিতায় তাই মানুষের দুঃখমোচন ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের কথা এতো প্রকট। লেনিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে 'লেনিনের প্রতি কবিতগুচ্ছ' লিখে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর 'চিরকুট', 'রাজপতাকা' প্রভৃতি কবিতার জন্য তিনি তিরিশের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী।

অতি সম্প্রতি তাজিক লেখকদের পঞ্চম সম্মেলন হয়ে গেল। বর্তমানে গদ্য পদ্য নাটক মিলিয়ে তাজিক লেখকেরা সংখ্যায় মোট ৮৬ জন। প্রথম অধিবেশনের তুলনায় বর্তমান অধিবেশনে তাজিক সাহিত্যের অস্বাভাবিক উন্নতির স্তরটি লক্ষ্য করা গেল।

গত কয়েক বছরেই তাজিক সাহিত্যের এই উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে অনেক ভালো বইও প্রকাশিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস তো একালে রীতিমত জনপ্রিয়। উপন্যাস রচনায় ত পঞ্চাশের শেষ দিকের ও ষাটের গোড়ার দিককার অনেক লেখকই বর্তমানে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে জলোল ইক্রামির 'আমার পাপ' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। 'অবিনশ্বর' বইটির জন্য তিনি তাজিকিস্তানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'রুদাকি পুরস্কার' পেয়েছেন।

কবিতার ক্ষেত্রেও সমসাময়িক লেখকরা সমান তালে চলেছেন। মিরসেইফ মিরশাকর-এর 'সোনার কিশলক', 'পামিরে লেনিন' প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর একেবারে হালের কবিতা 'তিমাদি-দুহিতা' বর্তমান তাজিক কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। আরো পরবর্তী কবিদের মধ্যে মুমিন কানোটভের 'তরঙ্গ' উল্লেখযোগ্য।

নাটকের ক্ষেত্রেও তাজিক সাহিত্য পেছিয়ে নেই। তাজিক নাট্যকারেরা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। ফতে নিয়াজির 'চিরকালের গান' এবং গনি আবদুল্লোর 'পৃথিবীর ছাদ থেকে' ইতি-মধ্যেই জনপ্রিয়তার বুড়ি ছুঁয়েছে। দুটি নাটকেই দেশমাতৃকার জন্য ফ্যাসিস্ত জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামী তাজিক বীর-সন্তানদের আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

১৯৩৪ সালে প্রথম সোভিয়েত লেখক সম্মেলনে ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন যে, সোভিয়েত ভূমির লেখকরা কেবল নিজের নিজের লোকেদের কথা না বলে যেন সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষেরই কথা বলেন। মির্জো বলেন, 'আমাদের সাহিত্য রচনার সময় আমরা সব সময় এই কথাটি স্মরণে রাখি।'

তাজিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি রুশভাষা ছাড়াও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সাদ্রিদ্দিন আইনির উপন্যাস হিন্দী, ফরাসী, জার্মান, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ-কর্মে তাজিকরাও পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যশাখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা তাজিকদের অত্যন্ত জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি 'লাহুতি অ্যাকাডেমিক ড্রামা থিয়েটারে' বছরের পর বছর অভিনীত হয়ে থাকে। হিন্দি লেখক 'প্রেমচাঁদ'-এর রচনার সংগেও তাজিকদের অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটেছে।

সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বিশ্বকোষ

সম্প্রতি মিউনিখ থেকে সাহিত্যের একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বকোষ বেরুচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রকাশ করছেন মিউ-নিখের নামজাদা প্রকাশক সংস্থা 'কিণ্ডলার ভেরলাগ'। ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকা থেকে প্রায় তিনশ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এপর্যন্ত মোট ছয়টি খণ্ডের মধ্যে প্রথমটি বেরিয়েছে। এতে থাকবে ১৩০টি দেশের জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে নানারকমের তথ্য। উপন্যাস, কবিতা, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১৮,০০০টি আলোচনা থাকবে। এছাড়া আধুনিক কাল পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস আত্ম-জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের অল্পবিস্তর আলোচনা রাখা হবে। বিশ্বকোষটির দ্বিতীয় খণ্ড আগামী বসন্তের মধ্যেই বেরুচ্ছে বলে 'কিণ্ডলার ভেরলাগ' সংস্থা জানিয়েছেন।

নতুন বই

উল্লেখ্য অনুবাদ

টমাস মান বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের এক বিরাট লেখক : গল্প উপন্যাস প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার অসামান্যতা যেমন স্পষ্ট তেমনি অভিভূত করে এই মহাশয় শিল্পীর বৃহৎ মানবিকতা, তাঁর বুদ্ধির গভীর নিষ্ঠা, তাঁর সহিষ্ণু জর্মানিক পরিশ্রমের ও জিজ্ঞাসার ক্লান্তিহীনতা এবং তাঁর দীর্ঘ ফলপ্রসূ জীবনের ও কর্মকীর্তির সঙ্গে সামান্য পরিচয়েও একটা দুর্লভ সম্পূর্ণতার বোধ—হিক্‌স্ রয়াল হাইনেস থেকে ব্ল্যাক সোয়ান অবধি। এবং তার মধ্যে পর্বত-গৌরবে বিরাজ করছে জোসেফের মহাদু

কাহিনী, গ্রেগরির জীবনকথা এবং তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য উপন্যাস ডক্টর ফাউস্টস্।

চিরজিজ্ঞাসু মান্-এর সংগে যখন সুইটজারল্যান্ডে ইয়ুং এবং ভারততাত্ত্বিক অসাধারণ মনীষী হাইনরিখ্ ৎজিমর্-এর যোগাযোগ ঘটেছিল, সেই সময়ে একাধারে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের ও আধুনিক ফ্রয়েডোত্তর মনস্তত্ত্বের ঘটকালিতে লেখা হয় বেতালের কাহিনীর গভীর রূপান্তর; দুটি লোকের মাথার প্রত্যাসরণ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় শুধু নানা শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি নন, কি ইংরেজি কি বাংলায় এই রবীন্দ্রবিশারদের অনুবাদ চলে কুড়ুনির সমান স্বাচ্ছন্দ্যে। তাই মানের অনন্য গম্ভীর ও ঈষৎ ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনময় প্রতি-যোজিত মাথার গল্পটি তাঁর কলমে অবলীলায় ভাষা বিনিময় করেছে।

বিষ্ণু দে

টমাস মান : মস্তক বিনিময়
ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনূদিত। মনীষা গ্রন্থালয়, ৪।৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : চার টাকা।

রামেন্দ্রসুন্দর : শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর প্রসংগে : "সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের গংগা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা,—মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সংগমে যুক্ত-বেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত-সাধনার ত্রিবেণী-সংগম বহুদিন বাংগালীর তীর্থ হইয়া থাকিবে। বাংগালা ভাষা, বাংগালীর সাহিত্য তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তিনি সে-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া-ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরস ভাষা, তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাংগালী লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে আমরা ভুল করিব। তিনি শক্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন। দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে, ভবিষ্যতেও তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিলতত্ত্ব তিনি জলের মত বুঝাইয়া দিতেন; নিজে আত্মসাৎ করিয়া তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া, সমগ্রের স্বরূপ দর্শন করিতেন; তাহার পর সমাহারে স্বীয় চিন্তার অভিব্যক্তির ফল দেশবাসীকে দান করিতেন। আলোচ্য বিষয়ের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল পর্যায়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না; তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।"—এই মনীষাদীপ্ত পুরুষের জন্মশতবর্ষ উদ্‌-যাপিত হয়েছে বিগত বৎসরে। সেই উপলক্ষে সমগ্র দেশে রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত হয়। দীর্ঘকাল পর রামেন্দ্রসুন্দরের যে জীবনীগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানি লিখেছেন ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী কেন্দ্রীয় সমিতি একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। রামেন্দ্রসুন্দরকে নতুন করে জানবার পক্ষে এই গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'মনীষী, মনস্বী, যশস্বী রামেন্দ্রসুন্দর', প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক ও বৈদান্তিক', শিশিরকুমার মৈত্রের 'বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রামেন্দ্র-সুন্দর', সত্যেন্দ্রনাথ বোসের 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর', সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের 'বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য ও রামেন্দ্রসুন্দর', প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক', গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের 'মহামনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর', ভূদেব চৌধুরীর 'জিজ্ঞাসু রামেন্দ্রসুন্দর', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর-জিজ্ঞাসা', রথীনাথ রায়ের 'রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরচনা', ভবতোষ দত্তের 'বিচিত্র জগৎ', সুধীন্দ্র দেবনাথের 'সুন্দরের ত্রিবেদী', আশিস সান্যালের 'রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ চেতনা', মুরারিমোহন সেনের 'ভাষা-বিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন ও সাহিত্য-কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের এই আলোচনাগুলি মূল্যবান। রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক রচনায় দর্শন ও সাহিত্যগুণের সমাবেশ, তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকীতে আরও কয়েক-জন সমালোচকের প্রকাশিত কয়েকটি আলোচনা সংকলনে স্থান পেলে গ্রন্থখানির মূল্য আরও বৃদ্ধি পেত।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : শত-বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ— ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সেকাল ও একাল। ৭, টেমার লেন। কলকাতা-৯। দাম ছয় টাকা।

●

নির্বাচন-প্রসংগে

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ ভারতের সাধারণ নির্বাচন আগতপ্রায়। অন্যূন চৌদ্দ পনেরটি দল এখানে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীসুকুমার রায় প্রত্যেকটি দলের নির্বাচনী প্রতীক এবং কিভাবে ভোট দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সন্নি-বেশ করেছেন। একজন সাধারণ নাগরিকের নির্বাচন সম্পর্কে যেসব তথ্য জানা দরকার তার সবকিছুই বিশদভাবে এই বইখানিতে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে কিশোর এবং কিশোরীদের কাছে এই বইর গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতের সাধারণ নির্বাচন—
শ্রীসুকুমার রায়। প্রকাশক—লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস, ৩৩।৪, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—দেড় টাকা।

প্রদর্শনী

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনু-মোদিত কলকাতার ইন্ডিয়ান কলেজ অফ্ আর্টস্ এন্ড ড্রাফটস্‌ম্যানসিপের ছাত্র-ছাত্রীদের এক চিত্র-প্রদর্শনী বহু বিশিষ্ট শিল্পী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে সংগীত নাটক আকাদেমির সহসভাপতি শ্রীএস্. এন্. মজুমদার গত ২০শে সেপ্টে-ম্বর দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস এন্ড ক্রাফ্‌টস্ সোসাইটির গ্যালারীতে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ উদ্বোধন করেন।

শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত, শ্রীসোমনাথ হোড়, শ্রীভবেশ সান্যাল, শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত শ্রীঅবনী সেন, এবং অন্যান্য খ্যাতিমান শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে বলেন যে, "এই প্রদর্শনী শিল্প-জগতে ছাত্র-শিল্পীদের শিল্পকর্মের আদান-প্রদানের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।" বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছাত্র-শিল্পীদের এই প্রদর্শনীকে রাজধানীর এক উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী বলে মনে করেন।

ভাস্কর্য বিভাগে সুবোধ চন্দ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। প্লাস্টারের তৈরী "আমার বন্ধু" এবং সিমেন্টে তৈরী "পাঠিকা" দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চারু-কলা বিভাগে তেলরঙে শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তীর "ওর ক্লান্তি", শ্রীদিলীপ দত্ত "ল্যান্ডস্কেপ্", শ্রীব্রজগোপাল মান্না "ভগিনী অনিতা", শ্রীরবীন ঘোষ "পবন" এবং জল-রঙে শ্রীমতী রাণু দাস কৃতিত্ব দেখান।

বাণিজ্যকলা বিভাগে, শ্রীরথীন দাসের "ট্যুরিস্ট ব্যুরো", শ্রীনির্মল রাহার "লাইফ্ ইন্স্যুওরেন্স" এবং শ্রীমতী দীপ্তি ব্যানার্জির "এল-আই-সি পোস্টারগুলি"র দর্শকরা প্রশংসা করেন।

দিল্লী ও কোলকাতা এই দুই শহরের শিল্পী-ছাত্রদের মধ্যে শিল্পকর্মের আদান-প্রদানের এক সেতু রচনাই ছিল এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য, আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী বছরের প্রথম দিকে দিল্লী আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও কোলকাতার প্রদর্শনীর আয়ো-জন করে অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করবেন।
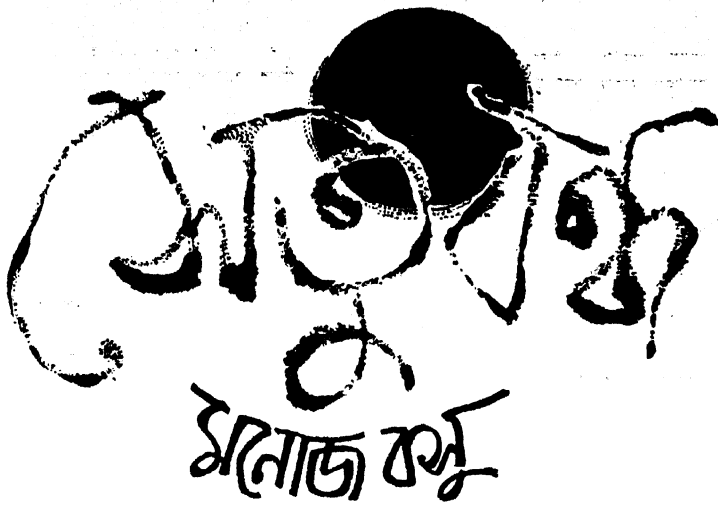
[উপন্যাস]

।। এগার ।।

শিশিরের মা ধর্মগিন্নিরও অমনি আশ্চর্য মৃত্যু। শিবরাত্রির উপোস করে আছেন, বিষম শীত। দেখনহাসি দু-বছরেরটি হয়েছে—লেপের নিচে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। ক্লান্তিতে উপোসের কষ্টে নিজেও কখন ঘুমিয়ে গেছেন।

শেষরাত্রে পুজো দিতে যাবার জন্য পাড়ার এক গিন্নি ডাকতে এসে দেখেন, নেই তিনি—শিবলোকে প্রয়াণ করেছেন। সোরগোল পড়ে গেল। ঘুম ভেঙে দেখনহাসি হাত বাড়াচ্ছে মৃতার দিকে। হায়রে হায়, কাঁচ কাঁচ হাত দুখানায় বুঝি কালকূট মাখানো। — যেটা আঁকড়ে ধরে, তাই অমনি লয় পেয়ে যায়। ভূমিতল ছুঁতে না ছুঁতেই জলজ্যান্ত 'মা'টি গেল। ঠাকুরমা বুকে পেতে নিয়ে নিলেন তো তিনিও।

এবারে? বিচার-বিবেচনা, পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই—একটি নাম শুধু মনে আসে। দুনিয়ার উপর আপন বলতে একজন মাত্র—মাতুল অবিনাশ মজুমদার। নিজে জায়গা সংগ্রহ করেই ভাগনেকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকেছিলেন। বোনের দাবাড়ি খেয়ে তারপর সেই যে নিস্তব্ধ হলেন, এতদিন কেটে গেছে—তার মধ্যে 'আমরা ভাল আছি'—'তোমরা কেমন আছ' গোছের সাধারণ পোস্টকার্ডের চিঠিও নেই একটা। অবিনাশ লেখেন নি, এ তরফ থেকেও যায় নি। মায়ের সেই চিঠিতে পুরবীর মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চয় ছিল। কি-ভাবে লিখেছিলেন জানা নেই। সেদিনের অপমানিত মামার নামে সোজাসুজি চিঠি লিখতে সাহস হয় না—মামী কনকলতাকে লিখল :

তোমার বউমা দু-বছর আগে চলে গেছে, এবারে মা-ও গেলেন তাঁর লক্ষ্মী জনার্দন ও সাধের নাতনি ছেড়ে। বাচ্চাটা না থাকলে আমি একেবারে মুক্তপুরুষ। আত্মীয়বন্ধু পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই সরেছে, যে কয়েকটি আছে তারাও যাই-যাই করছে। বাচ্চা নিয়ে আমি অকূলপাথারে হাবুডুবু খাচ্ছি, কেমন করে বাঁচাব ভেবে দিশা পাই না। মামা হয়তো রাগ করে আছেন, কিন্তু ওঁদের ভাই-বোনের ব্যাপারে আমার কি করণীয় ছিল? আমার জন্যে প্লট রেখেছিলেন, সেটা কি আছে এখনো?

ঝটিতি জবাব এসে গেল। প্রত্যাশার অনেক বেশি। সেই অত দূরে মামী যেন দু হাত বাড়িয়ে আছেন দেখনহাসিকে কোলে তুলে নেবার জন্য। ছিঃ, দেখনহাসি নয়—শহর-বাজারে এ নাম যার কানে যাবে সে হাসবে। পুরবীর চুপি-চুপি-দেওয়া হালফ্যাসানি নাম কুমকুম। আহা, এই নাম ধরে ডেকে যেতে পারল না, মৃত্যুর মুখে শুধু একদিন সে শিশিরকে নামটা বলেছিল। কুমকুমকে নিয়ে এই মুহূর্তে যাবার জন্য লিখেছেন মামী। আর ধমকও দিয়েছেন খুব :

প্লট পড়ে নেই, কী দরকার প্লটের! কত জায়গা লাগবে তোমাদের শুনি? চারখানা ঘর নিয়ে দুটি প্রাণী আমরা পড়ে থাকি, এর মধ্যে কুলোবে না? মেয়ে আমিই মানুষ করে দেবো। কোন চিন্তা নেই, দিনরাতের মধ্যে কাজটা কি আমার? চিঠিপত্তোর লিখে অনুমতি নিতে হচ্ছে, এখনকার ছেলেদের এই বুঝি দস্তুর—ভরসা করে চলে আসতে পারলে না? মায়ের দুধ পায় না বেচারি, ভাল দুধের দরকার, তাই এরই মধ্যে গাইগরু কিনে ফেলেছি। দুসের-আড়াইসের দুধ দেয়—

ইত্যাদি বিস্তর কথা। ঐ খামের ভিতর অবিনাশেরও চিঠি। নব-বীরপাড়া কলোনিতে পেঁছানোর পথ-ঘাট সবিস্তারে বুঝিয়েছেন—নক্সা এঁকে দিয়েছেন চিঠির উল্টোপিঠে। আর দুধাল গরু ছাড়া ভিন্ন রকম সুব্যবস্থারও ইঙ্গিত আছে চিঠিতে—নম্র সুশ্রী সম্বংশীয় ডাগর-ডোগর একটি মেয়ে আছে কলোনিতে, তার মায়ের কাছে কনকলতা ইতিমধ্যে কথা পেড়ে রেখেছেন—বাচ্চা মেয়ের কোন দিক দিকে কষ্ট-অসুবিধা যাতে না হয়।

বিলাতি ডিগ্রি, সম্মান-ইজ্জত দিত নিশ্চয়, কিন্তু নিতান্তই দেশি ডাক্তার এবং জুনিয়ার ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও রোজগারের দিক দিয়ে যা হচ্ছে সেটা খুব নিন্দের নয়। যে কোন ছোকরা-মানুষের মাথা ঘুরে যাবার কথা। হচ্ছে প্রবীণ বিচক্ষণ ডাক্তার অপূর্ব রায়ের বাঁধা পশারের খানিকটা পেয়ে গেছে বলে। এবং চিকিৎসার ধারা দেখে নির্ভয়ে বলা যায়, অভিজ্ঞতা বেড়ে কোন একদিন তাপস ডাক্তার রায়ের কাছাকাছি পৌঁছুবে। বিজয়া দেবী তো এরই মধ্যে বলতে লেগেছেন, এম আর সি পি হয়ে কি শিং গজাবে দুটো? এই পশার ফেলে চলে যাবে—কত ডাক্তার কত দিকে শেয়াল-শকুনের মতন মুকিয়ে আছে, রোগিপত্তর পলকে বাঁটোয়ারা করে নেবে। ডিগ্রি গলায় ঝুলিয়ে ফিরে এসে দেখবে ফাঁকা মাঠ। আমাদের ডিস্পেনসারিও উঠে যাবে তদ্দিনে —নিজের ডাক্তার না বসলে ডিস্পেনসারি থাকে কখনো! তোমাকে উনি হাতে ধরে বসিয়ে গেছেন—ছেড়েছুড়ে সাগর পাড়ি দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝে দেখ?

তাপস কী আর বুঝবে — বোঝবার মালিক আর একজন। তিন বছর, পুরো তিনও নয়—আড়াই বছরের বড় দোর্দণ্ড-প্রতাপ গুরুজনটি। হাঁ-না — কোন রকম জবাবই দিচ্ছে না সে।

মাস কয়েক পরে বিজয়া দেবী হঠাৎ একদিন তারণকৃষ্ণের বাড়ি এসে উপস্থিত। পূর্ণিমা এতক্ষণে অফিস থেকে ফেরে— জেনে-শুনে এসেছেন।

মোটরগাড়ি গলিতে ঢোকে না—বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে আসতে হল। ড্রাইভার আগে আগে এসে কড়া নাড়ছে।

খিল খুলে পূর্ণিমা মুখোমুখি পড়ল। অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু মুহূর্তকাল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, আমাদের এঁদো-বাড়িতে পায়ে হেঁটে এলেন, এ তো ভাবতেই পারা যায় না।

বিজয়া দেবী বলেন, আমায় চেনো তুমি?

চোখে দেখা নেই, কিন্তু তাপসের মুখে অনেক শুনে থাকি। ড্রাইভারকেও দু-একদিন তাপসের সঙ্গে দেখেছি। না হলেই বা কি—ড্রাইভার ছাড়া শুধু যদি একলাও আসতেন চিনতে আমার মোটে একটি সেকেন্ড লাগত।

বাইরের ঘরখানায় তারণ থাকেন। দেয়াল ঘেঁষে দুটো চেয়ার এবং অন্য প্রান্তে তক্তাপোষের উপর তাঁর শয্যা। অর্থাৎ ছেঁড়া তোষক, ময়লা চাদর-বিছানা। প্রায় সর্বক্ষণই তারণ শুয়ে-বসে থাকেন। এই পড়ন্ত বেলায় —পাড়ার মধ্যে ছোট্ট পার্ক মতো আছে, সেইখানে গিয়ে একটু বসেছেন। মোটা মানুষ বিজয়া দেবী। অধিকক্ষণ দাঁড়াতে

পারেন না। তার উপরে সারা গলিটা পায়ে হে'টে এসে হাঁপাচ্ছেন দস্তুরমতো। চেয়ারের দিকে না গিয়ে সামনের মাথার তারণের শয্যা পেয়ে তার উপর এলিয়ে পড়লেন।

পূর্ণিমা বলছে, অন্যায়—কী অন্যায়! দেখুন দিকি, এর মধ্যে এসে বসতে হল। আগে যদি ঘুণাক্ষরে একটু খবর পেতাম—

বিজয়া দেবী বলেন, খবর পেলে কি হত?

আসতে দিতাম না। কী দরকার, আমিই আপনার কাছে গিয়ে শুনে আসতাম।

বিজয়া দেবী হেসে বলেন, তুমি গেলেও দরকার মিটত না মা। আসতেই হবে আমায়—এসে করজোড়ে তোমার বাবার কাছে দায় জানাতে হবে—

দরকার বুঝতে আর বাকি থাকে না। মহিলাকে তাই নিজে আসতে হল, এবং আলাপে-আচরণে এই চূড়ান্ত ভদ্রতা। এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, তিনি কোথায়?

পার্কে যান এই সময়টা। দিন-রাত্রির মধ্যে এই যা একটু চলাচল। এক্ষুনি এসে যাবেন, সন্ধ্যে হবার আগেই—

বিজয়া বলেন, তোমাকেই বলি তবে মা। কর্তামশায় এলে আবার বলব। বড় ভাল মেয়ে তুমি—সমস্ত না হলেও কিছু কিছু আমি শুনতে পাই। এযুগে এমনটি দেখা যায় না। তাপসের যা-কিছু হয়েছে, তোমারই জন্যে—

পূর্ণিমা না-না করে ওঠে: ভাইয়ের হাতে সামান্য দু-দশ টাকার বেশি দিতে পারি নি কখনো। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। কত কষ্ট করে যে পড়াশুনো চালিয়েছে! যদি কিছু হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ তার নিজের গুণে।

বিজয়া লুফে নেন কথাটা: গুণের ছেলে, সে কি আর বলে দিতে হবে? ছেলের গুণ দেখেই তো বাড়ি বয়ে দরবার করতে এলাম—

পূর্ণিমা বলে, আপনি আসবেন টের পেলে অন্ততপক্ষে ছে'ড়া বালিশটা সরিয়ে ফেলতাম, ছে'ড়া তোষক চাদরে ঢেকে দিতাম। ঘরখানা ঝাঁটপাট দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভদ্রস্থ করে রাখতাম একটু।

বিজয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়েন: ছে'ড়া তোষক দেখিয়ে আমায় ভয় দিতে পারবে না মা। বালিশ-তোষক দেখে তো মেয়ে দেবো না।

পূর্ণিমা তেমনি লঘুকণ্ঠে বলে যায়, সেটা ঠিক। মেয়েই যদি দেন তোষক-বালিশ কি আর দেবেন না? অথবা আরও বেশি—আস্ত একটা বাড়িই হয়তো দিয়ে দেবেন। এই বাড়িতে আপনাদের মেয়ে কী করে ঘরকন্না করবে?

ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ বলে, আসছি—

ছিটকে পড়ল যেন গলিতে। মিনিট দুয়ের মধ্যে ফিরে এসে বলে, পান-জর্দা খান আপনি খুব। মোড়ের দোকানে বলে এলাম। ভাল করে পান সেজে এক্ষুনি নিয়ে আসবে।

বলে, একটা মেয়েছেলে কাজ করত, পুরানো ভাল লোক। অসুবিধায় পড়ে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। ছোট্ট সংসার, চলে যাচ্ছে কোন রকমে। তেমনিধারা একটি ভাল লোক পেলে এখন আবার রাখা যায়।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে বিজয়া দেবী বলেন, পান-জর্দার খবরও এসে গেছে—? আমাদের কোন কথা তাপস বুঝি বাদ দেয় না?

আপনাদের স্নেহের কথা সব সময় তার মুখে। আপনার কথা বলে, ডাক্তার রায়ের কথা বলত। আপনার ছেলেমেয়েদের কথা বলে। শুনে শুনে সবাই আপনারা চেনা।

কৌতূহলী বিজয়া বলেন, স্বাতীর কথাও বলে নিশ্চয়। কি বলে তার সম্বন্ধে?

পূর্ণিমা বলে, ভাল মেয়ে সে, বুদ্ধিমতী—

বিজয়া এবার খোলাখুলি বলেন, স্বাতীর জন্য এসেছি মা তোমাদের কাছে। এক মেয়ে ঐ আমার—তাপসের হাতেই দিতে চাই। ও'র বড় ইচ্ছে ছিল, দুজনে আমাদের কথাবার্তা হত প্রায়ই—

নিরুৎসাহ শীতল কণ্ঠে পূর্ণিমা বলে, ওদের ইচ্ছেটাই তো সকলের আগে জানা দরকার।

মুচকি হেসে বিজয়া বলেন, ইচ্ছে না জেনে কি বলতে এসেছি? আজকালকার ছেলেমেয়ের উপর জোর খাটানো যায় না—

দোকানের ছোকরাটা পান-জর্দা নিয়ে এলো। দুটো খিলি একসঙ্গে গালে ফেলে খানিকটা জর্দা ঠেসে দিয়ে বিজয়া বলতে লাগলেন, ওদের মতেই মত দিয়ে যাওয়া উচিত, বুদ্ধিমান অভিভাবক তাই করে। জোর-জবরদস্তি করে তো ঠেকানো যাবে না—ছোট্টটি নেই আর, আইনও ষোল আনা ওদের পক্ষে। তা ছাড়া সবদিক দিয়ে যখন ভাল জুটি, ঠেকাতে যাবোই বা কি জন্যে?

একটুখানি ইতস্তত করে বললেন, বালিশ সরাও আর তোষকে ঢাকা দাও, বড়-লোক তোমরা নও সেটা ভালভাবেই জানা আছে। জেনে-শুনেই মেয়ে দিচ্ছি। মেয়ে অভাব-অনটনে কষ্ট পাবে না, সে ব্যবস্থা আমি করব। সেকথা তুমি নিজেও তো বলে দিলে। কিন্তু তার বোধহয় দরকার হবে না—এখনই তাপস জমিয়ে এনেছে। যা গতিক বছর দুই-তিনের মধ্যে ও'র পশারের অন্তত আধাআধি নিতে পারবে। সেই তো অঢেল।

তারণ এসে পড়লেন এমনি সময়। বিছানা ছেড়ে বিজয়া চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তাঁর সঙ্গেও মোটামুটি ঐ কথা—তাঁর বেলা অনেক সংক্ষেপে। অর্থাৎ আসল মানুষ যেজন তাকে সব ভালভাবে বলা হয়ে গেছে—এটা হল সামাজিক রীতি মেনে কিঞ্চিৎ সময়-ক্ষেপ করা। বলেন, আমার মেয়ে কি বলে সেটাও শুনুন তবে। প্রেসিডেন্সিতে বি-এস-সি পড়ে। বলে, পাশ করে বসে থাকব না—কোন একটা কাজে ঢুকে পড়ব। একজনের উপর কেন সব দায় থাকবে—যার যেমন ক্ষমতা, ভাগাভাগি করে নিলে গায়ে লাগে না।

বলতে বলতে হেসে উঠলেন: পাকা-পাকা কথা শুনুন। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা এই রকম। নিজের পায়ে দাঁড়াবে—অন্যের দেওয়া জিনিস হাতে নিতে যেন ছাঁকা লাগে—বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি যে-ই হোক না কেন। বলে ওর কলেজের মেয়ে-বন্ধু যারা আসে তাদের সঙ্গে, আমার কানে পে'ৗছে যায়। ভাবলাম, এতদূরে যখন, চুপচাপ থাকা কাজের কথা নয়, কথাবার্তা পেড়ে ফেলা ভাল। তা আপনার মতটা শুনি এইবারে—শোনবার জন্য বসে আছি।

তারণ ইদানীং সর্বব্যাপারে যেমন জবাব দিয়ে থাকেন: আমি কি জানি। বলুন পুনিকে— পুনি আমার মা, পুনি জগজ্জননী। সংসার বলতে যা-কিছু সমস্ত ঐ একটা মেয়ে। ও যা করবে তাই হবে, ও বললেই সকলের বলা হয়ে গেল। আমায় আলাদা করে কিছু আর বলতে হবে না।

কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধ করতে এসে এসমস্ত কানে নেওয়া চলে না। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা হল। বললেন, নিজের মান নিজের কাছে—সেটাও বুঝতে হবে বইকি! আমাদের না জানিয়ে ধরুন ওরা রেজেস্ট্রি বিয়ে করে বসল, লোকের কাছে তখন আমরাই তো লজ্জায় পড়ব।

বাপের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, এরই মধ্যে পূর্ণিমা কখন সরে পড়েছিল। ফিরে এসেছে এক রেকাবি মিষ্টি নিয়ে। বিজয়া দেবী আঁতকে ওঠেন, অনেক না-না করে একটা অবশেষে তুলে নিলেন। হেসে বলেন, কন্যাদায় নিয়ে এসেছি, হুকুম অমান্য করি কোন সাহসে?

আলাপে, ব্যবহারে বিজয়া দেবী ভারি চৌকস। এমন কি তারণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করলেন। বলেন, পা সরিয়ে নেন কেন? বয়সে বড়, প্রণম্য আপনি। যে দরবার নিয়ে এসেছি—মঞ্জুর হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক সত্যি সত্যি যদি ঘটে তখনও প্রণাম করব। আগে থেকে দাবি জানিয়ে যাচ্ছি।

কথাবার্তা সেরে বিজয়া উঠলেন। পূর্ণিমা সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলো।

তারণকৃষ্ণ বলে, মানুষটি বড় ভাল রে। মেয়েও ভাল হবে। এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ কোথায় জুটবে? তোর ভাইয়ের বিয়ে এই-খানেই দিয়ে দে পুনি।

দিতেই হবে বাবা, না দিয়ে রক্ষে নেই। শাসানো কথা কত কি বলে গেলেন—

মেয়ের দিকে তারণ অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন।

পূর্ণিমা বলে, শুনলে কি তবে এতক্ষণ? আমরা দিই আর না দিই, এ বিয়ে হবেই—প্রস্তাবটা পাত্র-পাত্রীর কাছ থেকে আসার আগে আমাদের দিক দিয়ে গেলে তবু মান রক্ষে হবে। আরও আছে। ফি বছর গাদা-গাদা ডাক্তারি পাশ করে ফ্যা-ফ্যা করে করে বেড়ায়—ডাক্তার রায়ের বাঁধা রোগি-গুলো পেয়েই তাপস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ও-বাড়ির জামাই হতে দাও তো ভালই—নয় তো যে লোক জামাই হবে, ও'দের ডাক্তার-খানায় বসা তারই একচ্ছত্র অধিকার, ডাক্তার রায়ের পশারও তার উপরে বর্তাবে। কথা অসঙ্গত নয়, তবে বড় বেশি স্পষ্ট। রিভল-ভার উ'চিয়ে ডাকাতি করার মতো: টাকা দাও, নয়তো প্রাণ দাও। এর পরে ভেবে-চিন্তে মতামত দেবার কি আর রইল বলো।

তাপস এলে পূর্ণিমা খবরটা দিল : ডাক্তার রায়ের স্ত্রী এসেছিলেন আমাদের এখানে। কেন বল্ দিকি?

আমি তার কি জানি?

ঠিক আছে। না জানিস তো জেনে কাজ নেই।

প্রসঙ্গের ইতি করে পূর্ণিমা রান্নাঘরে চলল। তাপসও যাচ্ছে।

পিছন ধরলি কেন? আমি বলব না।

তাপস বলে, সেই জন্যে বুঝি? খিদে পেয়ে গেছে, খেতে দিবি নে?

তার জন্যে রান্নাঘর অবধি যেতে হবে না। কোন দিন গিয়ে থাকিস? খাবার এই-খানে আসবে।

খাবার দিয়ে পূর্ণিমা ফিকফিক করে হাসে : তুই পাঠিয়েছিলি তাপস। আগে বলিস নি কেন? ছেঁড়া বিছানা, নোংরা ঘরবাড়ি দেখে গেল।

তাপস বলে, আমি পাঠাই নি কাউকে। আমি কিচ্ছু জানি নে, বিশ্বাস কর ছোড়দি। সাজিয়ে-গুছিয়ে দেখানো হয় নি, সে তো ভালোই। যা আমাদের অবস্থা, ঠিক ঠিক সেই জিনিষ চোখে দেখে গেল।

হঠাৎ পূর্ণিমা গম্ভীর হয়ে গেল : তোদের বিয়ে তোরাই পাকাপাকি করে ফেলেছিস, মিসেস রায় বলে গেলেন। ভালোয়-ভালোয় 'হাঁ' বলে যেতে হবে আমাদের, নইলে ইজ্জত বাঁচে না।

আর আমি যেটা বলছি শোন্। লক্ষ বার 'হাঁ' দিলেও বিয়ে করব না, যদ্দিন না তোর নিজের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

পূর্ণিমা আগের কথার জের হিসাবে বলে যায় : বিয়ে না করলে ও'দের ডাক্তার-খানায় বসা বন্ধ। নতুন ডাক্তার হয়ে যেমন সব হাত-পা কোলে করে বসে থাকে, তোরও সেই গতি হবে তখন।

সকলের আগে তবে সেই পরীক্ষাই হোক ছোড়দি—

ভবিষ্যতের শঙ্কা তাপস যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। বলে, হতেই হবে। বাইরে ঘরটা চাই আমার—আলমারি আর টেবিল-চেয়ার ঢুকিয়ে চেম্বার করব। ডাক্তারখানায় বসা আমিই বন্ধ করে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে বলে, কয়েকটা দিন আরও অবশ্য থাকতে হবে। জরুরি কেস নিয়ে লোকে এসে বাসা খুঁজে খুঁজে বেড়াবে, সেটা হয় না। এ বাড়ির ঠিকানাটা রোগিদের জানিয়ে বুঝিয়ে আসব। খুব বেশি তো এক মাস, তার মধ্যেই হয়ে যাবে সমস্ত।

কথার কথা নয়, পরের দিন থেকেই তাপস নতুন ব্যবস্থায় লাগল। ঘর নিয়ে একটু ভাবতে হচ্ছে। বাড়িতে ঘর বলতে দুখানা। নিচের তলায় একখানা, আর ছাতের উপর সিঁড়ির ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে অ্যাসবেসটোসের ছাউনি দিয়ে আর এক-খানা। এ ছাড়া ভিতরের বারান্দার খানিকটা ঘিরে নিয়ে অতিরিক্ত এক ঘর বানানো হয়েছে—একখানা খাট পড়ে। পূর্ণিমা মায়ের সঙ্গে এখানে থাকত—তরঙ্গিনী কাশীপুর চলে যাওয়ার পর একাই থাকে সে এখন। নিরিবিলি পড়াশোনার জন্য তাপস উপরের ঘরে থাকত, ডাক্তারি পাশের পরেও আবার আস্তানা নিয়েছে ওখানে। আর বাইরের বড় ঘরে তারণ। সে ঘর ডাক্তারের চেম্বার হয়ে যাচ্ছে। আর তারণের পক্ষে উপর-নিচে করা অসম্ভব। বাপে-ছেলেয় অতএব বারান্দার ঘরে না এসে উপায় নেই। এবং পূর্ণিমাকে অগত্যা উপরের ঘরে গিয়ে উঠতে হচ্ছে। গলির মধ্যে বাড়ি—তবে উপকার পেলে রোগিরা সেখানেই খুঁজে খুঁজে চলে আসবে। গলিই বা কোন ছার—ডাক্তার যদি হাওড়ার পুলের চূড়োয় বসে থাকে, সেই-খানে রোগি পিলপিল করে উঠে পড়বে।

একটুকু মেঘ উঠেছিল পূর্ণিমার মনে, মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে আলো ফুটল। বড় শান্তি। তাপস সেই যেমন-কে-তেমন। পড়াশুনো বড় কষ্ট করে চালিয়েছে, ডাক্তারির নামযশও কষ্ট করে খেটে-খুটে নিজে জমিয়ে তুলবে। ডাক্তার রায়ের বাঁধা পশার নিয়ে বড় হতে চায় না।

ডক্টর তাপস সরকার এম-বি, বি-এস—বাইরের ঘরের দরজার পাশে নেমপ্লেট পড়েছে। সকাল ন'টা অবধি বসছে আপাতত। তারপর হাসপাতালের ডিউটি, ফিরতে প্রায় দুটো। বিকালবেলা অপূর্ব রায়ের পুরানো ডাক্তারখানায়—ডাক থাকলে রোগির বাড়ি। সন্ধ্যার পর ঘরে এসে ডাক্তারি বই নিয়ে বসে, অথবা গল্পগুজবে মেতে যায় বাবার সঙ্গে, ছোড়দির সঙ্গে। তখন আর অন্য কিছু নয়—বাবার ছেলে, ছোড়দির ছোট-

ভাইটি। সব দিন অবশ্য ঘটে ওঠে না—রোগির বাড়ির লোক এসে রসভঙ্গ করে। রোগের লক্ষণ বলে পরামর্শ নিয়ে চলে যায়, তেমন-তেমন ক্ষেত্রে নাছোড়বান্দা হয়ে বাড়ি নিয়ে তোলে।

আপাতত এই চলছে। মাসখানেক যেতে দাও—বিকালটাও তখন নিজের বাড়ির বাইরের ঘরে। ও'দের ডাক্তারখানার সংগে কোনরকম সম্পর্ক থাকবে না।

ইতিমধ্যে স্বাতীকে উসকে দিয়েছে তাপস: ঘটকালিতে মা বড় কাঁচা। ছোড়দি বিগড়ে বসে আছে।

স্বাতী বলে, তুমিই বলো তাহলে ছোড়দিকে।

নিজের বিয়ের নিজে ঘটক—সে বিয়ের কন্যা হলে তুমি, বড়লোকের মেয়ে। বলতে হবে আবার ছোড়দির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওরে বাবা!

ভঙ্গি দেখে স্বাতী হেসে পড়ল। বলে, মেয়েলোককে এত ভয়? তার উপরে বোন হলেন তোমার —প্রায় সমবয়সি বোন—

মেয়েলোক কে বলে? তাপসের স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল: মেয়ে নয় ছোড়দি, দেবী। বড় আমার চেয়ে পুরো তিন বছরেরও নয়—তা মনে হয়, তিন হাজার বছর আগে জন্মে বসে আছে।

বিকালবেলা বাড়িতে একা তারণ। ঘুম ভেঙে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কলকের তামাক দিয়ে টিকে ধরাবার তালে আছেন, দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ঠিকে-ঝি বাসন মাজতে এসেছে ঠিক—কিন্তু এত সকাল সকাল? না জানি কোন দরবার আজ আবার মহারাণীর মুখে। সকাল সকাল কাজ সেরে গাঁয়ের বাড়ি মায়ের কাছে চলল হয়তো, তার মানে কাল দু-বেলা কামাই! ও-মাসে যেমনটা হয়েছিল।

দোর খুলে দেখেন, ঝি নয়—ফুটফুটে মেয়ে একটি। অচেনা। মেয়েটা নিঃসংকোচে ঢুকে পড়ে ঢপ করে প্রণাম করল। একালের মেয়েরা এমনভাবে প্রণাম করে না—তারণ হতভম্ব হয়ে গেছেন।

মেয়ের দৃকপাত নেই। সপ্রতিভভাবে সদর দরজায় খিল দিয়ে দিল আবার। তারই যেন বাড়ি—যাক্সে-বাজে লোক ঢুকে পড়তে না পারে সে জন্য সতর্কতা।

খিল দিয়ে তারণের আগে আগে মাঝের ঘরের দিকে চলল। এ বাড়িতে যেন সর্বসময়ের চলাফেরা—তারণকে তেমনিভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছাদের পাইপের জল পড়ে রোয়াকের এই দিকটা পিছল,—এ মেয়ে তা-ও ভাল মতো জানে। তারণকে সতর্ক করে দেয়: সামাল হয়ে আসুন বাবা—

বাবা ডাক শুনে তারণ চকিতে মুখ তুললেন। মেয়েটা বলে ওঠে: উ'হু, দেখে-শুনে, পা টিপে টিপে। হাত ধরব নাকি আমি?

জুতো খুলে ঘরে ঢুকে তারণকে তাঁর খাট দেখিয়ে দিল। দুই খাটের মধ্যে কোনটা কার, তা-ও সে জানে। তারণ বসলেন তো পায়ের কাছটায় মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। তারণ এবারে 'উ'হু' 'উ'হু' করছেন—কেবা শোনে কার কথা, কানেই যেন শুনতে পাচ্ছে না মেয়েটা। টেমি জ্বালা রয়েছে, টিকের মালশা পাশে, সেদিকে তার নজর। বলে, ধরিয়ে দিই—কেমন?

তারণ বলেন, কিন্তু মা, তুমি কে তার এখনো পরিচয় পেলাম না—

আমি স্বাতী—

তারণের তো খাট থেকে ছিটকে পড়ার অবস্থা। বলেন, ডাক্তার রায়ের মেয়ের নামও স্বাতী। তুমি মা তবে কি—

স্বাতী মুখটি মলিন করে বলে, বাবা তো চলে গেছেন, 'বাবা' ডাক বন্ধ হয়ে গেছে। কষ্ট হয় বড্ড আমার। কদ্দিন থেকে তাই ভাবছি—এই পথে কলেজ যেতে হয়, আসতে-যেতে ভাবি, আপনার কাছে বসি এসে খানিক—

একটু ঘেমে আমতা-আমতা করে বলে, তা লজ্জা করে তো, নিন্দের ভয়ও আছে খুব। ভাবলাম, এই সময়টা কেউ বাড়ি নেই। আর আমার যাতে নিন্দে হয়, আপনি কখনো সে কাজ করবেন না। তামাক দেখি সাজাই আছে, টিকে ধরিয়ে দিই বাবা?

না—

তারণ কড়া হয়ে বলেন, পয়লা এসেই তুমি হাত কালি করে দাস করবে, সে হবে না। ভাল হয়ে উঠে ঐ খাটের উপর।

একটু আগে মেজেয় বসবার যেমনটা হয়েছিল, এবারেও ঠিক তারণের ধমক কানেই নেয় না স্বাতী—যেন কাকে বলছে। টিকে ধরে গেছে ই মধ্যে, কলকেটা হুঁকোর মাথায় বসি তারণের হাতে দিয়ে এতক্ষণে জবাব দিল রাগ করছেন কেন, বাবাকেও সেজে দিত তো!

অতএব বিশ্বাস করতে হবে, ডাক্তা অপূর্ব রায় হুঁকোয় তামাক খেতেন আদুরে মেয়ে টিকে ধরিয়ে তামাক সেজে দিত। এবং বই-খাতা-কলম কিছুই নেই—তা সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে হবে, শূন্য হাতে মেয়েটা কলেজ করে ফিরছে।

হুঁকো টানতে টানতে এতক্ষণে তারণ নজর মেলে ভাল করে দেখেন। এক দোষ মিথ্যে কথা বলে—তবু মেয়েটা সত্যি ভাল। বড়লোকের বেটি, কিন্তু বেশভূষা-চালচলতির মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। বিধবা হয়েও এর মায়ের যা ঠাটঠমক, কুমারী মেয়ের তা নেই। ভাল লাগছে মেয়েটাকে। কিন্তু তা-ই তো সব নয়—পুনির কি উপায়ে ভাল লাগানো যায়?

খানিকক্ষণ বকর-বকর করে এবং কথার অন্ধি-সন্ধিতে বারবার 'বাবা' ডাক ডেকে স্বাতী হঠাৎ উঠে পড়ল। বলে, আবার আসব, রাগ করেন নি তো?

শুধু মুখে চলে যাবে কি রকম? সে হবে না। বাড়িতে অন্য দিন কিছু না কিছু থাকে, আজ নেই। বসো তুমি—ঠিকে-ঝি এক্ষুনি এসে যাবে।

কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে তো স্বাতী। পায়ে পায়ে চলল। তারণ ভয় দেখান: দেখ, রাগ এতক্ষণ করিনি—এইবারে করব। সবাইকে বলে দেব যাতে তোমার নিন্দে রটে যায়।

হুঁ, তাই কিনা পারেন! ভ্রূভঙ্গিতে স্বাতী তারণের কথা উড়িয়ে দেয়: কখনো পারবেন না, আমি জানি। বাবাকেও কত জ্বালাতন করেছি। ভয় দেখাতেন তিনি—কিন্তু মা শুনলে বকুনি দেবে তাই মাকে অবধি বলতেন না। কোন বাবা মেয়েকে কিছু বলেন না, সে আমি জানি।

কি ভেবে হঠাৎ ঘুরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। কৌটো হাতে বেরিয়ে আসে। বললেন যে নেই কিছু ঘরে?

মুড়ি তো—

মুড়ি আমি সব চেয়ে ভাল খাই। বাড়িতে দিতে চায় না। বেশ হল, মজা করে আজ মুড়ি খেয়ে যাব—

খবরের-কাগজের উপর ঢেলে নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মতো স্বাতী নিঃসংকোচে মুড়ি খেতে লাগল।

(ক্রমশ)

দেশে বিদেশে

• • • • • জয়তু গান্ধীজি • • • • •

আফ্রিকায় আরও দুটি নবজন্ম

সেরেৎসি খামাকে মনে পড়ে? আজ থেকে ১৮ বৎসর আগে, ১৯৪৮ সালে, এই নামটি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকত। খামা তখন ২৭ বৎসরের যুবক; আফ্রিকা থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন আইনের ডিগ্রী নিতে। লন্ডনের এক তরুণী টাইপিস্ট রুথ উইলিয়ামসের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হল। লন্ডনেই এই কৃষ্ণকায় তরুণের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনী তরুণীর বিয়ে হল। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে হৈ চৈ পড়ে গেল।

এই চাঞ্চল্যের কারণ ছিল। সেরেৎসি খামা একজন সাধারণ আফ্রিকান ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর নিজের দেশের একজন উপজাতীয় প্রধান। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বললেন, খামা যদি শ্বেতকায়া স্ত্রী নিয়ে দেশে ফেরেন তাহলে তাঁর নিজের উপজাতির লোকরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট খামা ও তাঁর স্ত্রীকে খামার দেশে ফিরে না যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাঁরা সে পরামর্শ মানতে রাজী হলেন না। তখন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁদের উপর আইনের নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। সেরেৎসি খামা নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হলেন। তিনি নিজের গোষ্ঠীর প্রধানের পদ থেকে বঞ্চিত হলেন।

সেই সেরেৎসি খামার নাম আবার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হচ্ছে। এখন তাঁর নাম ডাঃ সেরেৎসি খামা সি বি ই। বয়স—৪৫। তিন পুত্র ও এক কন্যার পিতা। পরিচয়—বৎসোয়ানা সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি!

কোথায় এই "বৎসোয়ানা সাধারণতন্ত্র"? মানচিত্রে এই নাম এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা, এই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে মাত্র গত ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে।

রাষ্ট্রটি যদিও নূতন, দেশটি পুরাতন। ঐতিহাসিকরা বলেন, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বান্টু জাতির যেসব মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরই একাংশ এই বাৎসোয়ানো জাতির পত্তন করেন। মকরক্রান্তি রেখা যেখানে কালাহারির মরুভূমির উপর দিয়ে চলে গেছে সেখানে একদিকে জলাভূমি, অন্যদিকে শস্যশ্যামল নদী-উপত্যকা দিয়ে জোড়া এই বিস্তীর্ণ মালভূমির দেশটি মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে বেচুয়ানাল্যান্ড। পোষাকী নাম "প্রোটেক্টোরেট অব বেচুয়ানাল্যান্ড" অর্থাৎ আশ্রিত রাজ্য বেচুয়ানাল্যান্ড। ১৮৮৪ সাল থেকে বেচুয়ানাল্যান্ড বৃটেনের আশ্রিত রাজ্য।

এই বেচুয়ানাল্যান্ডেরই একটি উপজাতির নাম বামাঙ্গোয়াটো এবং এই বামাঙ্গোয়াটো উপজাতিরই প্রধান ছিলেন সেরেৎসি খামা। ১৯৫৬ সালে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যখন তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি নিজের দল গড়লেন। ১৯৬৫ সালে বেচুয়ানাল্যান্ডের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল এবং এই সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন—ডাঃ সেরেৎসি খামা। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ডাঃ খামা আবার লন্ডনে যান—বেচুয়ানাল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ও সেদেশের এক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে। লন্ডনের সেই সম্মেলনে বেচুয়ানাল্যান্ডের স্বাধীনতা সম্পর্কে কথা-বার্তা পাকা হল।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর সেদিনকার বেচুয়ানাল্যান্ড ও আজকের বৎসোয়ানার রাজধানী গাবেরোনস শহরে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতিনিধি প্রিন্সেস মেরিনা ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নেমে যেতে দেখলেন এবং তার জায়গায় রাষ্ট্রপতি স্যার সেরেৎসি খামাকে নূতন বৎসোয়ানা সাধারণতন্ত্রের পতাকা তুলতে দেখলেন। ভগ্নাবশেষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর একটু ক্ষয় হল এবং পুরাতন আফ্রিকার বুকে ৩৮তম নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের এবং কমনওয়েলথের আর একটি নূতন সদস্যরাষ্ট্রের জন্ম হল।

২ লক্ষ ২০ হাজার বর্গমাইল আয়তন ও পাঁচ লক্ষ মানুষ অর্থাৎ কলকাতা শহরের ছয় হাজার গুণ আয়তন ও এই শহরের পাঁচ-ছয়টি বড় ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা নিয়ে বৎসোয়ানার নূতন সাধারণতন্ত্র তার যাত্রা আরম্ভ করল। তার প্রধান সম্পদ গবাদি পশু এবং তার প্রধান শিল্প পশুর মাংস ও গোদুগ্ধজাত দ্রব্যাদি।

বৎসোয়ানার চারদিন পরে জন্ম নিচ্ছে আরও একটি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র—যার বর্তমান নাম বাসুটোল্যান্ড এবং নূতন নাম হবে লেসোথো। বৎসোয়ানার মত লেসোথোও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ এবং কমনওয়েলথের সদস্য হবে। কিন্তু লেসোথো বৎসোয়ানার মত সাধারণতন্ত্র নয়; একজন বংশানুক্রমিক রাজা এই নূতন রাষ্ট্রের প্রধান হবেন। বর্তমান রাজার নাম

দ্বিতীয় মোশেশে। (এ'র পূর্বপুরুষ আর এক মোশেশু বাসোথা বা বাসুটো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন)।

দুই দেশের মধ্যে আর একটি পার্থক্য এই যে, বৎসোয়ানার মত লেসোথো একটা মালভূমি নয়, একটা পার্বত্য ভূমি, যার গড় উচ্চতা ১১ হাজার ফুট।

লেসোথোর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের মধ্যে অন্য দেশ। এটি সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্রের ভূমি দিয়ে ঘেরা। এমন বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান পৃথিবীর অন্য খুব কম দেশেরই আছে। বৎসোয়ানার তুলনায় লেসোথোতে লোকবসতি অনেক ঘন—১২ হাজার বর্গমাইলে নয় লক্ষ অধিবাসী।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের সঙ্গে সহাবস্থানই আগামী দিনগুলিতে এই দুটি নবজাত আফ্রিকান রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা হবে। লেসোথোর বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী লিবুয়া জোনাথন সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন কিছু সরকারী আলোচনার জন্য। তখন সেখানকার বর্ণবিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রী ফেয়ারফুর্ট এই কৃষ্ণাঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর সম্মানের উপযুক্ত রাত্রিবাসের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। গত জুন মাসে এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী জোনাথন বলেছেন যে, তাঁর দেশের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে একথা যেমন সত্য তেমনি লেসোথো যে নবজাগ্রত আফ্রিকারই অংশ একথা ভুলে গেলে চলবে না। তিনি বলেছেন যে, প্রকৃত রাজনৈতিক শরণার্থীদের জন্য লেসোথোর দুয়ার খোলা থাকবে; কিন্তু এইসব শরণার্থীকে স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে অথবা লেসোথোকে ঘাটি করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, "আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় হস্তক্ষেপ করব না এবং দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে তাও আমরা চাইব না।"

• • • • জয়তু শাস্ত্রীজি • • •

রাষ্ট্রসংঘে চীনের আসন

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্ব সংস্থায় কম্যুনিস্ট চীনকে আসন দেওয়ার প্রশ্নটি আবার নূতন করে উঠেছে।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট প্রতিনিধি যখন প্রথম কুওমিনটাং চীনের প্রতিনিধিদের সরিয়ে কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিনিধিদের আসন দেবার দাবী তুলে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেদিনের অবস্থা আজ আর নেই। রাষ্ট্রসংঘে লাল চীনের প্রতিনিধিত্বের দাবীর যারা সমর্থক তাদের সংখ্যা বেড়েছে; যারা সে-দাবীর বিরুদ্ধে তাদের সংখ্যা কমেছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ৪৩টি রাষ্ট্র বিশ্ব সংস্থার নূতন সদস্য হয়েছে। এই ৪৩টির মধ্যে ৩৩টিই হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকার নূতন রাষ্ট্র এবং তিনটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। এইসব নূতন সদস্য রাষ্ট্রের অধিকাংশই পিকিং চীনকে রাষ্ট্রসংঘে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী। ফলে ১৯৫২ সালে যেখানে লাল চীনকে বিশ্বসভায় আসন দেওয়ার প্রস্তাব ৩৫ ভোটের ব্যবধানে বাতিল হয়ে গিয়েছিল সে জায়গায় ১৯৬০ সালে এই ভোটের ব্যবধান কমে মাত্র আটটিতে দাঁড়িয়েছে। যারা অতীতে চীনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের অনেকে ইদানীংকালে ভোট গ্রহণের সময় কোনদিকেই ভোট দেয়নি। অন্যদিকে অবশ্য ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে আফ্রিকার আটটি দেশ—যারা অতীতে এই প্রশ্নে ভোটদানে বিরত ছিল—মত বদল করে চীনের বিপক্ষে গেছে।

কিন্তু এখন একটি বিধিগত কারণে চীনের পক্ষে ভোটের জোরে রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ স্থির করে রেখেছে যে, চীনের প্রতিনিধিত্ব বদলের

ব্যাপারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সেই কারণে এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা চাই।

ভারতবর্ষ প্রথমাবধিই রাষ্ট্রসঙ্ঘে কম্যুনিস্ট চীনকে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী এবং ভারত-চীন সম্পর্কের অবনতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষের এই সমর্থন অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু ১৯৬২ সালের চীনা হামলার পর এবিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে—ভারতবর্ষ এখন নিজে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসে চীনের জন্য ওকালতি করছে না।

কিন্তু একদিক থেকে কম্যুনিস্ট চীনের পক্ষে মামলাটা কতকটা জোরদার হয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির অনেকেই অনুভব করছে যে, পিকিং-এর প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতরে আনলে বিশ্ব-শান্তি যতটা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে তাকে বিশ্বসংস্থার বাইরে রাখা তার চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। সম্প্রতি সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে যে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতেও বলেছেন যে, বিশ্বসংস্থাকে কাযকরী করতে হলে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে তার সদস্য করতে হবে।

এখন প্রধান বাধা দাঁড়িয়েছে ফরমোজাকে নিয়ে কি করা হবে সেই প্রশ্নটি। পিকিংকে স্থান দেওয়ার জন্য ফরমোজাকে বাদ দিতে হবে, এতে অনেক রাষ্ট্রই সম্মত নয়। এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব রাষ্ট্র কম্যুনিস্ট চীনকে বিশ্বসংস্থায় স্থান দেওয়ার জন্য জোর গলায় দাবী জানাচ্ছে তাদেরও অনেকেই ফরমোজাকে বাদ দিতে ইচ্ছুক নয়। আবার এদিকে পিকিং "দুই চীনের তত্ত্ব" কিছুতেই মেনে নেবে না বলে জানিয়েছে। (যেমন পশ্চিম জার্মানী দুই জার্মানী মেনে নিতে রাজী নয়)।

এই অবস্থায় ১৯৬৬ সালের সাধারণ পরিষদে আবার চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি এলে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় সেটা লক্ষ্য করার বিষয়।

জ্যাজ ও ল্যুই আর্মস্ট্রং

রথীন সোম

জ্যাজ সংগীতের জন্ম যে ঠিক কোথায় বা কোন সময়ে হয়েছিল বলা শক্ত। তবে আমেরিকান গৃহযুদ্ধের কিছু পরে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই কোন জায়গায় যে এর উৎসার শুরু হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। জ্যাজের মূলে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু এসেছিল আফ্রিকা থেকে, নিগ্রো সমাজের মারফৎ। আফ্রিকার, বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার সংগীত বেশ কয়েকশ' বছরের প্রাচীন এবং উ'চু দরেরও। জ্যাজ কিন্তু আফ্রিকানও নয়, ইউরোপীয়ানও নয়, পুরোপুরিই আমেরিকান। আমেরিকান নিগ্রোদের সৃষ্টি। জ্যাজের ওপর ফরাসী এবং স্পেনের প্রভাব যে কিছু কিছু নেই তা নয়, কিন্তু তবু ইউরোপের সংগীতধারার সঙ্গে তার অনৈক্যও খুবই স্পষ্ট।

জ্যাজের স্রষ্টাদের মধ্যে অধিকাংশই গানের স্বরলিপি পড়তে জানতেন না, বাদ্য-যন্ত্র বাজাবার শিক্ষাও তাঁরা বিশেষ পাননি। তবে জন্মগত প্রতিভার বলে সব বাধাই অনায়াসে অতিক্রম করে নিয়েছিলেন তাঁরা।

শুরুতে জ্যাজ ছিল কণ্ঠসংগীত; ক্ষেতে-খামারে কাজে উৎসাহ দেবার জন্যেও জ্যাজ গাওয়া হতো। গানের তালে তালে কাজ করত মজুররা। ফলে কাজের একঘেয়েমি দূর হতো, শ্রান্তি লাঘব হতো। তখন ক্ষেত-খামারের জন্য এ ধরনের ভালো গায়কের কদরও ছিল খুব। গায়ক মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গান তৈরি করত আর গাইত। মজুররা ধুয়ো ধরত তার সঙ্গে।

প্রায় একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় জ্যাজের আবির্ভাব হলেও নিউ অরলিন্স তার প্রধান পীঠস্থান হয়ে দাঁড়াল। স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে সৈন্যদলের বাদ্যকাররা। বাদ্যযন্ত্র তখন প্রচুর পাওয়াও যাচ্ছে এবং সস্তাও খুব। ফলে রাস্তাঘাট আস্তানার সংগীত-মুখরিত। অশিক্ষিত হলেও স্বাভাবিক সংগীতপ্রতিভার অধিকারী ছিল তারা। বাদ্যযন্ত্র যেন কথা বলত তাদের হাতে। উপলক্ষ্য একটা হলেই হলো, ব্যাণ্ড পার্টি যেতো বাজনা বাজাতে। সভা-সমিতি, উৎসব, শোভাযাত্রা, অন্তেষ্টি—সব কিছুতেই বাজনা চাই।

১৮৯৩ সালে বাডি বোল্ডেন প্রথম জ্যাজ ব্যাণ্ড পার্টি তৈরি করলেন। 'জ্যাজ' শব্দটি অবশ্য তখনো চালু হয়নি। নিউ অরলিন্সের স্টোরিভিল তখন আমোদ-ফুর্তি এবং সেই সঙ্গে নানা ধরণের পাপাচারের পাদপীঠ। জ্যাজ সংগীতের অনেক রথী-মহারথীর হাতে-খড়ি হয়েছিল এই স্টোরিভিলে।

নিউ অরলিন্সের জ্যাজ গায়কদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, সেই সঙ্গে গায়করাও। কিং অলিভার তাঁর দল নিয়ে প্রথম শিকাগোতে গেলেন। তাঁর সমকালে নানারকম নাম ছিল এই বিশেষ সংগীত-ধারার। পরে উত্তরাঞ্চলের কোন জায়গায় জ্যাজ শব্দটি আবিষ্কৃত হল এবং চিরকালের মতো যুক্ত হয়ে গেল এই সংগীতধারার সঙ্গে।

নিউ অরলিন্সের একটা দল প্রথম জ্যাজ গানের রেকর্ড করল। জ্যাজের জনপ্রিয়তা তখন হু-হু করে বেড়ে চলেছে। রেকর্ডও তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ।

জ্যাজ সংগীতে ল্যুই আর্মস্টং-এর নাম অবিস্মরণীয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই নিউ অরলিন্সে আর্মস্ট্রং-এর জন্ম। মা বাড়িতে বাড়িতে ঝি-র কাজ করতেন, বাবা কাজ করতেন তার্পিন তেলের কার-খানায়। আর্মস্ট্রং যখন খুব ছোট তখন নিউ অরলিন্সে নিগ্রো গায়কদের শখানেক দল ছিল। সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়া ছিল চারদিকে। আর্মস্ট্রং-এর বয়স যখন এগারো তখন তিনিও তিনটি ছেলেকে নিয়ে একটি দল করে ফেললেন। রাস্তায় রাস্তায় জ্যাজ গেয়ে বেড়াতেন তাঁরা। শ্রোতারা যা খুশি কিছু দিলেই হলো। আর্মস্ট্রং গীটার বাজাতেন। চুরুটের বাক্সের সঙ্গে কয়েকটা তামার তার আর গলার সরু দিকে এক টুকরো কাঠ জুড়ে তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন তাঁর গীটার।

আর্মস্ট্রং-এর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা বাঙ্ক জোন্সের কাছে। গীটার বাজান শিখেছিলেন তাঁর কাছে। তারপর জো কিং অলিভারের কাছে শিখলেন ট্রামপেট বাজান। নিউ অরলিন্সে আর্মস্ট্রং-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশঃ। অলিভার আর্মস্ট্রংকে শিকাগোতে নিয়ে এসে নিজের দলে ভর্তি করে দিলেন।

খ্যাতি খুব সহজেই এলো। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সুর সৃষ্টি করেছিলেন আর্মস্ট্রং। অলিভারের প্রথম রেকর্ড যখন তৈরি হল তখনো তিনি অলিভারের দলেই আছেন। শিকাগো তখন জ্যাজের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং বাইরে শিকাগোর জ্যাজ পার্টির কদরও হয়েছে খুব।

১৯২৪ সালে চাকরি নিয়ে নিউ ইয়র্কে এলেন আর্মস্ট্রং। কিন্তু কিছু স্মরণীয় রেকর্ড ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। ১৯২৫ সালে আবার শিকাগোতে ফিরে এলেন আর্মস্ট্রং। এবার তাঁর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। করনেট ছেড়ে ট্রামপেট বাজাতে শুরু করলেন আর্মস্ট্রং এবং একের পর এক রেকর্ড করে যেতে লাগলেন। তাঁর গান এবং বাজনা অসংখ্য সুরকারকে অনু-প্রাণিত করে তুলল।

১৯২৯ সালে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এলেন আর্মস্ট্রং। জ্যাজ সংগীতে তাঁর স্থান তখন সর্বোচ্চে। রেকর্ডের মারফৎ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খ্যাতি। ১৯৩২ এ লণ্ডন গেলেন তিনি। তারপর ১৯৩৩-এ আবার গেলেন ইউরোপ-স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়, হল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে, ফ্রান্সে এবং ইটালিতে। যেখানেই গেছেন সেখানেই অভি-নন্দনে মুখর হয়ে উঠেছে জনতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আবার বেরিয়ে পড়লেন আর্মস্ট্রং। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ালেন। জাপান, আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশ-গুলিতেও গেলেন। পূর্ব বার্লিনে যে অভি-নন্দন পেলেন আমস্ট্রং তার তুলনা নেই।

আর্মস্ট্রং-এর বয়স এখন ৬৫। এই সেদিন তাঁর ৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল। জ্যাজকে একদা কেউ যুবকদের সঙ্গীত বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু আর্মস্ট্রং তার অসারতা প্রমাণ করলেন। ৬৫ বৎসর বয়সেও তিনি জ্যাজের অবিসংবাদিত সম্রাট। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জ্যাজ এবং ল্যুই আর্মস্ট্রং যেন একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছেন, একই সঙ্গে খ্যাত হয়েছেন। জ্যাজের মতই ল্যুই আর্মস্ট্রং-এর খ্যাতিও তাঁর জন্মস্থান নিউ অরলিন্স থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর রেকর্ড পৌঁছেছে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের হাতে। তাঁর একটি রেকর্ডের ১,৫০,০০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল মাত্র আড়াই মাসে।

'দি কোর্ট ড্যান্সারের' সাফল্য আমাদের মনে এনে দিল বিরাট সান্ত্বনা। এই ছবিখানিই হল সম্পূর্ণ ভারতীয় কলাকুশলী এবং শিল্পীদের দ্বারা ভারতে নির্মিত প্রথম ভারতীয় ছবি। রিলিজের আগে আমি এত বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম—এবং সত্যি কথা বলতে কি আমি কোনো কাজেই মন বসাতে পারছিলাম না, এমন কি 'মীনাক্ষী'র শুটিং চলছিল, তাতেও ঠিক পুরোপুরি মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম না। অবশ্য ছবি 'রিলিজে'র আগে সব চিত্রপরিচালকই অল্পবিস্তর নার্ভাস হয়। আমিও এর আগে হয়েছি, কিন্তু এতটা কখনও হইনি। এর কারণ পরে মনে মনে ভেবে দেখেছি যে এ ধরনের ছবি মানে ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে ইংরেজী অভিনয়, তার ওপর মেট্রোর মত সিনেমায় একসঙ্গে কলকাতা ও বোম্বায়ে রিলিজ। এছাড়াও আর একটি কারণ ছিল "Court Dancer"-এর বিশ্বপরিবেশক কলম্বিয়া পিকচার্স তাঁদের বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে লোকের আগ্রহ কৌতূহল এমন একটা জায়গায় এনে দিয়েছিলেন যে লোকে আশা করে আছে একটা বিরাট কিছু এবং অভিনব কিছু দেখবার। এখন ছবি দেখে লোকের আশা মিটবে

নিউ থিয়েটার্সের দোভাষী ছবি 'মীনাক্ষী'র একটি দৃশ্যে শ্রীমতী সাধনা বসু এবং শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী

কিনা—এই উৎকন্ঠাতেই আমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু রিলিজের পরে আমার সে উৎকন্ঠার অবসান হলো—দর্শক এবং সমালোচকদের প্রশংসাধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের জয়মাল্য পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

পূজোর সময়টা বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে খুব আনন্দের মধ্যে দিয়েই কাটালাম। গত দু'বছর পূজোর সময়টা কেটেছিল বম্বেতে—তখনকার দিনে বোম্বায়ের যা দুর্গাপূজো হত তা নামমাত্র, ধুমধাম বা হৈ' চৈ বিশেষ কিছুই ছিল না।

এখন নাম, অর্থ, যশ সবই পেয়েছিলাম প্রচুর ভাবে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সময়টাও কাটছিল খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু একজনের অভাব মাঝে মাঝে বোধ করতাম। সহস্র আনন্দ কলরবের মধ্যে যাঁর কথা মনে পড়লেই মনটা উদাস হয়ে যেতো—তিনি আর কেউ নন, আমার মা। তাঁর শান্ত করুণ মুখখানি আমাকে মাঝে মাঝে উন্মনা করে দিত।

শীতকালে কলকাতার আকর্ষণ খুব বেশী—বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বের সময় কলকাতা শহরের যেন চেহারাই পাল্টে যেত। রূপে রঙে নানা ধরনের উৎসব সমারোহে যেন ঝলমল করে উঠত। এই সময় বড়লাট-সাহেব (ViceRoy) আসতেন কলকাতায় এবং সেই সঙ্গে আসতেন সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলির রাজামহারাজারা। কোন জায়গায় কোন কিছু বিশেষ ধরনের উৎসব বা 'ফাংশান' হলেই 'রোলস রয়েস' 'ডেমলার এবং অন্যান্য বিরাট দামী দামী গাড়ীর ভিড় লেগে যেত। এই সব দেশীয় মহারাজারা দেখাতেন কার কতগুলি বড় গাড়ী আছে—এ ছিল যেন একটা ঐশ্বর্য প্রদর্শনের বিরাট প্রতিযোগিতা। এখন ভাবি তখনকার দিনে সাধারণ মানুষের অর্থ-শোষণ করে কি বিরাট অপচয়ই না তাঁরা করতেন!

আর পার্টি তো লেগেই ছিল প্রচুর—ব্রাঞ্চ ডিনার এবং ককটেল-এর তো কামাই ছিল না একদিনও। অনেকদিন পরে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে পড়ে আমরাও নিজেদের ভাসিয়ে দিলাম এই সব পার্টির মধ্যে। ফলে আমাদেরও প্রায়ই বহু বন্ধু-বান্ধবকে পার্টি দিতে হোত স্টিফেন কোর্টের ফ্ল্যাটে। খরচের দিকে তাকাবার ফুরসৎ ছিল না, সুতরাং যত্র আয় তত্র ব্যয়!

বম্বে থেকে আসবার সময় মনে মনে স্থির করেছিলাম এবার খরচের মাত্রাটা কমাতে হবে। খরচ কমিয়ে কিছু জমাতেই হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সব সাধু সংকল্প কোথায় ভেসে গেল। কথায় বলে না 'স্বভাব যায় না মলে'......। আমারও ঠিক সেই অবস্থা—হাতে টাকা এলে আমার মাথা যায় ঘুরে। কি করে যে সেই টাকাটা খরচ করব তারই চিন্তা সব সময়। টাকা হাতে থাকলে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের দিকে মন যায় বেশী, বন্ধুবান্ধদের ডেকে খাওয়ান, এক-সঙ্গে বসে হৈ-হল্লা করা স্বভাব আমার চিরকালের। আগেও ছিল, এখনও আছে। এ স্বভাব আর আমার গেল না।

যাই হোক, খুব হৈ-চৈর মধ্যে দিয়ে বড়দিন কেটে গেল—এদিকে 'মীনাক্ষী'র শুটিংও বেশ সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল।

ঠিক এই সময় একটা দুঃসংবাদ পেলাম বোম্বায়ের মিঃ ওয়াদিয়ার কাছ থেকে যে তাঁর অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার ফলে একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর অংশীদারেরই ছিল বেশীরভাগ অংশ, সুতরাং মিঃ ওয়াদিয়া একটু অর্থসংকটের মধ্যে পড়েছেন। সম্ভবতঃ ওয়াদিয়া মুভিটোন স্টুডিও হাত-বদল হয়ে অন্যের ব্যবস্থাপনায় চলে যাবে। মিঃ ওয়াদিয়া অবশ্য খুব আশাবাদী, তিনি বহু ঝড়ঝাপটার সম্মুখীন হয়েছেন।

তাঁর স্থির বিশ্বাস যে এটা একটা সাময়িক দুর্ঘটনা মাত্র—এ আর্থিক সঙ্কট থেকে তিনি অচিরেই মুক্তিলাভ করবেন। কিন্তু এখন যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যে আমাদের যে পরবর্তী ছবির জন্য চুক্তি তাঁর সঙ্গে হয়েছিল সেটা ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে।

তিনি যে শুধু একজন আদর্শ প্রোডিউসার ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন আমার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আজ আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন বলে 'কন্ট্রাক্ট' স্থগিত রাখা তো দূরের কথা চুক্তিপত্র বাতিল করে দিতে বললেও আমি কিছুই বলতাম না। এখানে ক্ষতিপূরণের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই মর্মে আমি মিঃ ওয়াদিয়াকে চিঠি লিখে দিলাম। সেই সঙ্গে আরও লিখলাম যে, আমাদের দুজনেরই জীবনে বহু উত্থান-পতন ঘটেছে জীবনে বহু বিচিত্র পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করেছি, সুতরাং এ বিপদে মুষড়ে পড়লে চলবে না। আমার স্থির বিশ্বাস যে শীগগিরই আপনার বিপদের মেঘ কেটে যাবে। ভগবানে বিশ্বাস রাখুন ও মনকে শক্ত রাখুন।

এটা হবে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। আমার কি জানি কেন মনে হয়েছিল যে এবছরটা আমাদের সকলের পক্ষেই অশুভ, যদিও মিঃ ওয়াদিয়ার জন্যে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল তবুও এতখানি নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি। তবে কেন এই অনাগত ভবিষ্যতের অশুভ ইঙ্গিত মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল? এর পরে আমার জীবনাকাশেও যে কালো মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল এ কি তারই ইঙ্গিত মাত্র?

যাই হোক, আমার মনের এ ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না, এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার কাজে মন দিলাম। 'মীনাক্ষী'র শুটিং প্রায় শেষ হয়ে এল।

মার্চের শেষের দিকে।

কলকাতায় তখন গুজবে কান পাতা দায়। চারিদিকে গুজব রটে গেল যে জাপানীরা এবার কলকাতায় বোমা ফেলবে। ইতিমধ্যে তারা রেঙ্গুন অধিকার করে নিয়েছে। এখন যে-কোন মুহূর্তে তারা এসে কলকাতায় হানা দিতে পারে। এই গুজবে লোকের মনে অশান্তির আর আর শেষ নেই। সাধনা তো একেই নার্ভাস, তার ওপর বোমা পড়ার কথা শুনে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল। সে আমাকে বলল যে 'মীনাক্ষী'র শুটিং শেষ হলেই সে আবার একটা নৃত্য-সফরে বেরুতে চায়—তার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিতে। আমি তাকে জানালুম যে তার সফরের বন্দোবস্ত সব করে দিতে পারি, কিন্তু আমার পক্ষে তার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ আমাকে এখন 'মীনাক্ষী'র সম্পাদনা নিয়ে বসতে হবে।

এদিকে সাধনা পীড়াপীড়ি করতে [illegible] সে [illegible] সে [illegible]। ছবির সম্পাদনার তো প্রায় দু' মাস লাগবে—ততদিন সে কলকাতায় শুধু শুধু বসে থেকে কি করবে?

বন্ধুবর হরেনকে খবর দেওয়া হোল। হরেন বলল যে সে অন্য কার একটা শো নিয়ে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খুব ব্যস্ত আছে। তারপর সে সাধনার দলের সঙ্গে যেতে পারে।

যাই হোক, সফরের সূচী তৈরী হল। এই সফরের প্রথম শো হবে মেদিনীপুরে ২৫শে এপ্রিল ১৯৪২। ওখানে কয়েকটি শো'র পরে আসানসোল, পাটনা, বেনারস—তারপর লক্ষ্ণৌতে 'মেফেয়ার হলে' ৯ই মে থেকে শো হবে। ততদিন পর্যন্ত দলের সঙ্গে আমি থাকব, তারপর হরেন গিয়ে সব ভার নেবে।

এদিকে 'মীনাক্ষী'র শুটিং শেষ হল এপ্রিলের মাঝামাঝি। ঠিক করলাম—আমি এই ছবির সম্পাদক হরিদাস মহলানবীশকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যাব। সে সমস্ত ছবির নেগেটিভগুলো বেছে নিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে রাখবে—তারপর মে মাসের মাঝামাঝি ফিরে এসে সম্পাদনা আরম্ভ করব।

এই সফরের প্রথম শো মেদিনীপুরে আরম্ভ করার একটা কারণ ছিল। তখন মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ এন এম খাঁ, আই সি এস। তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় বহুদিন থেকে—তিনি প্রায়ই বলতেন একবার সি এ পি-র সম্প্রদায়কে মেদিনীপুরে নিয়ে গিয়ে শো করা। এত তাড়াতাড়ি সি এ পি-র কোন নাটক নিয়ে ওখানে গিয়ে শো করা সম্ভব ছিল না। তাই "সাধনা ও তার ব্যালে" নিয়ে যখন আমাদের সফর সুরু হচ্ছে তখন পথে ওখানে নেমে কয়েকটা শো করলে মন্দ কি? তিনি আমাদের এ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালেন এবং বিশেষ করে অনুরোধ করলেন যে আমি আর সাধনা যেন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠি এবং তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করি। দলের অন্যান্য সকলের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন অন্য জায়গায়।

মেদিনীপুরে যাওয়ার আর একটা কারণ ছিল—এখানে ছিল আমার সেজমেসোমশায় শ্রী কে বি দত্তের বাড়ী। খুব ছোটবেলায় গিয়েছিলাম একবার—এখন সে বিষয় বিশেষ কিছুই মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে বিরাট দোতলা বাড়ী, চারিদিকে অনেকখানি খোলা জায়গা। যেখান থেকে তিনি তাঁর বিখ্যাত মেদিনীপুর বোমা-মামলা পরিচালনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আমি আগেই বলেছি। আমার আরও দেখার ইচ্ছে ছিল মেদিনীপুরের বিখ্যাত আদালত যেখানে বাদী পক্ষের কৌঁসিলী মিঃ এস পি সিনহা (পরে লর্ড সিনহা)র সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ চলেছিল। এদিকে বাইরে মিঃ সিনহা আর সেজোমেশো ছিলেন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু এই বোমা-মামলায় সেজোমেশো ছিলেন আসামী পক্ষের কৌঁসিলী আর মিঃ সিনহা ছিলেন সরকার পক্ষের কৌঁসিলী।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে গেল—যখন মিঃ এস পি সিনহা মেদিনীপুরে আসতেন তখন সেজোমেশোর খুব ইচ্ছে হতো মিঃ সিনহাকে তাঁর বাড়ীতে রাখবার—কিন্তু যেহেতু মিঃ সিনহা সরকার পক্ষের কৌঁসিলী এবং আদালতে দুজনে দুজনের 'শত্রু'—সেই কারণে সেজোমেশো তাঁকে তার

বাড়ীতে রাখতে পারতেন না—এমন কি তাঁর নিজের ঘোড়াগাড়ীতে করে একসঙ্গে কোর্টে যেতেও পারতেন না। মিঃ সিনহা বাধ্য হয়ে একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী করেই কোর্টে যেতেন কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে রোজ দুবেলা মিঃ সিনহার খাবার যেতো কিন্তু সেজমেশোর বাড়ী থেকে।

এই বিষয়ে দুই-একজন সেজমেশোকে বলাতে তিনি বলেছিলেন ঃ সিংহ (মিঃ সিনহাকে তিনি সিংহ বলতেন—যখন তিনি লর্ড উপাধি পেয়ে বিহারের রাজ্যপাল হলেন তখনও তাঁকে ডাকতেন সেই সিংহ বলে) আমার বন্ধু। আমি জানি যে সার্কিট হাউসে তার খাবার কষ্ট হয়—আর আমি এখানে থাকতে সেটা হতে দেব? হোক না আমার প্রতিবাদী কৌঁসিলী এমন কোন আইন আছে যে আমি তাকে খাবার পাঠাতে পারব না?

সেজমেশোর মধ্যে একটা বড় গুণ ছিল যে তিনি কখনও তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সঙ্গে পেশাকে জড়াতেন না। আদালতে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। জেরা করবার সময় কাউকে ছেড়ে কথা কইতেন না—তা সে যতই নিজের আপনার লোক হোক। একদিকে ছিল তাঁর বিরাট উদার মন, আর একদিকে ছিল কঠোর কর্তব্যজ্ঞান। যা তিনি ন্যায় এবং সত্য বলে মনে করতেন তার জন্যে তিনি প্রাণপণে লড়তেন, এতে তাঁর যত ক্ষতিই হোক। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে তিনি আসামীদের হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরে বোমা মামলা চালিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের বিশেষ কিছুই সঞ্চয় ছিল না—তার ওপর এই ধরণের রাজনৈতিক মামলায় আসামীদের পক্ষে কোন টাকা পয়সা না নেওয়ার তাঁর নিজেরই খুব টানাটানি যাচ্ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও যেসব গরীব ছেলেরা এই মামলায় জড়িয়ে ছিল, তাদের পরিবারবর্গকে মাঝে মাঝে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। সুতরাং এইরকম একজন উদারহৃদয়, মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার জন্যও মেদিনীপুরে তাঁর গৃহটি দেখার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়েছিল।

এপ্রিল ১৯৪২-এর মাঝামাঝি। জাপানীরা যে কোন সময় এসে বোমা ফেলতে পারে এই গুজবে কলকাতা শহরে কান পাতা দায়। সকলের মুখেই ঐ এক কথা। এদিকে আমাদের স্টিফেন কোর্টের নীচে বিমান আক্রমণের সময় 'আশ্রয়' তৈরী হয়েছে। এই সময় মীনাক্ষীর শুটিংও শেষ হয়ে গেল। আমি চিত্র-সম্পাদক হরিদাস মহলানবীশকে সব বুঝিয়ে দিয়ে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে সাধনার নৃত্যসম্প্রদায় নিয়ে সদলবলে সফরে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় হরেনকে বলে গেলুম যে মে মাসের মাঝামাঝি লক্ষ্ণৌতে গিয়ে যেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে।

মেদিনীপুরে ২৫শে এপ্রিল সাধনার নৃত্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। তিন দিন হল এই নাচ। মিঃ এন এম খাঁর আতিথিসৎকারের কোন ত্রুটি ছিল না—তিনি আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত সুচারুরূপে করে দিয়েছিলেন। ওখান থেকে আমরা আসানসোল, পাটনা, বেনারস হয়ে চলে এলাম লক্ষ্ণৌ-এ। সব জায়গাতেই যথারীতি সাধনা ও নৃত্য-সম্প্রদায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলো। লক্ষ্ণৌতে মে ফেয়ার সিনেমায় ৯ই মে সাধনার নৃত্য-প্রদর্শনী সুরু হোল। পূর্ব বন্দোবস্ত মত হরেন গিয়ে ঠিক সময়ে লক্ষ্ণৌতে পৌঁছুল—হরেনের ওপর সমস্ত দলের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এলাম কলকাতায়। তারপর হরেনের সঙ্গে এই দলটি চলে গেল দিল্লী। কলকাতায় পৌঁছেই আমি 'মীনাক্ষী'র দুটি সংস্করণেরই সম্পাদনা নিয়ে মেতে গেলাম।

জুনের গোড়ার দিকে—আমি হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেলাম হরেনের কাছ থেকে। আম্বালা থেকে সে টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছে যে সে কলকাতা ফিরে আসছে একলা—কিন্তু সাধনা এখান থেকে যাচ্ছে লাহোর, তারপর পাঞ্জাবের কয়েক জায়গায় 'শো' করে কাশ্মীর যাবে। এই দলের সমস্ত ভার নিয়ে ইমপ্রেসারিও হিসেবে যাচ্ছেন জনৈক মিঃ এন খান্না।

হরেনের এই টেলিগ্রাম পেয়ে মনে একটা দারুণ খটকা লাগল—কে এই খান্না? লোক কি রকম? টাকা-পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল করবে না তো? সাধনা তো টাকা-পয়সার কোন হিসেবই রাখতে পারে না—সে জানে শুধু খরচ করতে—তাও বেহিসেবী ভাবে। হিসেব-পত্রের ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। সে তার নিজের নাচ-গান-অভিনয় নিয়েই সব সময় মশগুলে—ওসব টাকা-পয়সার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আনাড়ী।

একবার ভাবলুম হরেনকে জরুরী টেলিগ্রাম করে দিই—যে এই সফরটা শেষ করেই যেন সে সদলবলে ফিরে আসে—কিন্তু টেলিগ্রামের ভাব ও ভাষা দেখে বুঝলাম যে সবাই এখন আম্বালা ছেড়েছে—এখন আর টেলিগ্রাম করে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে বরং হরেনের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

হরেন এল।

হরেন আসতে আমি তাকে বললাম যে আমি তাকে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলাম যে সাধনার সমস্ত সফরটা শেষ করে যেন সে ফিরে আসে। তাতে হরেন বললে ঃ আমারও সেই রকম ইচ্ছেই ছিল যে সাধনার সঙ্গে সফরটা শেষ করেই একসঙ্গে ফিরি—কিন্তু আমি আর একটি দলের সঙ্গে চুক্তি করে বসে আছি। তারা শিগ্গির কলকাতায় তাদের 'শো' সুরু করবে—যে জন্যে ইচ্ছে থাকলেও আমাকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হলো। যা হোক, মিঃ এন খান্না হচ্ছেন পৃথিবরাজ কাপুরের কি রকম ভাই হয়। খুব বড়লোক এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ওঁর নিজের সিনেমা হাউস আছে—তাছাড়া পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু সিনেমা মালিকদের সঙ্গে ওঁর বিশেষ হৃদ্যতা আছে। সুতরাং ও সাধনার সফরের ব্যবস্থা বেশ ভালই করবে। তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

আমি শুনে বললাম ঃ সব তো বুঝলাম—বন্দোবস্ত সব না হয় ভালই করবে, কিন্তু টাকা-পয়সার দিকটা কেমন? শেষকালে যা কিছু লাভ হবে সব যেন ও নিজেই না খেয়ে বসে!

হরেন বলল ঃ দেখে এবং কথাবার্তা বলে তো তাকে ভাল এবং সৎ লোক বলেই মনে হয় তবে তার সততার গ্যারান্টি কি করে দেব বল। তবে আমার যতদূর মনে হয় ভদ্রলোক কোন খারাপ ব্যবহার করবে না। এখন আর ও সব ভেবে কোন লাভ নেই, মধু। We can only hope for the best.

(ক্রমশঃ)

অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো : অমৃত

আজকের কথা :

খোলা বাজারে বৈদেশিক চিত্র :

আমরা ভারতবর্ষে সাধারণত যে-সব বৈদেশিক চিত্র দেখতে পাই, তার বেশীর ভাগই—শতকরা প'চানব্বই ছিয়ানব্বইখানি আসে আমেরিকার হলিউড থেকে। এবং এগুলি পরিবেশিত হয় মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার, প্যারামাউন্ট ফিল্মস্, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স, কলাম্বিয়া ফিল্ম এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স—এই কয়টি পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের মারফত। ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ ছবি নিয়মিতভাবে দেখানো হত কলকাতার নিউ এম্পায়ার চিত্রগৃহে। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমরা কালেভদ্রে পুরোপুরি ব্রিটিশ ছবি দেখতে পাই, যদিও আজও এখানে প্রধানত ব্রিটিশ ছবির পরিবেশনার জন্যে র‍্যাঙ্ক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ও লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু হলিউড এবং ইংলন্ডই বিদেশের সবখানি নয়। এ ছাড়াও পৃথিবীতে বহু দেশ রয়েছে, যেখানে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে বছরের পর বছর ধ'রে। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান দেশ হচ্ছে : জাপান, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালী, পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভেকিয়া, পোলান্ড, সুইডেন, মিশর, কানাডা ও ব্রেজিল। আমাদের দেশের চিত্রপ্রিয় জনসাধারণের কাছে তৃপ্তিদায়ক বোধ হবে এমন ছবি কমবেশী সব দেশেই নির্মিত হয়। তবু এ-সব দেশের ছবি আমাদের জনসাধারণ দেখতে পায় না কেন?

আমরা জানি, গেল বছর ভারতে প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান সম্ভব করবার জন্যে ভারত সরকার প্যারিসে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনকে এই সব দেশ থেকে বছরে অন্তত তিরিশখানি ছবি খোলা-বাজারে প্রদর্শনের জন্যে আমদানি করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। এবং শোনা যায়, মাত্র এই কারণেই তাঁরা অনেকখানি উদ্যোগ-আয়োজন সত্ত্বেও এ-বছরে প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রোৎসব করবার অনুমতি লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি, তার কারণ কি?

দেখা যাচ্ছে, হলিউড এবং ইংলন্ড ছাড়া অপরাপর দেশ থেকে খোলা বাজারে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র আমদানি করবার লাইসেন্স তাঁরা দিয়েছিলেন মাত্র সেই সব চলচ্চিত্র পরিবেশককে, যাঁরা বিদেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানি ক'রে থাকেন। সরকারের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন ছাড়াও অন্তত আঠারোটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে একমাত্র বোম্বাই শহরে, যারা নিয়মিতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ছবি রপ্তানি ক'রে থাকে। ভারতীয় ছবি রপ্তানি করবার সময়ে যেমন এই প্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র লক্ষ্য থাকে ছবির অর্থোপার্জন ক্ষমতার উপর, বিদেশী ছবি আমদানি করবার সময়েও তাঁদের লক্ষ্য যে ঐ একই দিকে নিবদ্ধ ছিল, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই তাঁরা কোনোরকম ব্যবসায়িক ঝুঁকি না নিয়ে একদিকে যেমন আমদানি করেছেন সোফিয়া লোরেন অভিনীত 'ইয়েস্টার ডে, টু-ডে অ্যান্ড টোমরো', 'বোক্যাসিয়ো ৭০' বা 'ম্যারেজ ইতালিয়ান স্টাইল', অন্যদিকে তেমনই এনে হাজির করেছেন 'প্যানিক ইন ব্যাংকক', 'এজেন্ট ০৭৭', 'দ্যাট ম্যান ইন ইস্তাম্বুল' প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ও যৌন-উত্তেজনাপূর্ণ আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চিত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার-প্রাপ্ত ছবিগুলিকে আমদানি করার ব্যাপারে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এমন কি, সোভিয়েত

রাশিয়ার 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং', 'ব্যালাডস্ অব এ সোলজার', 'দি লেটার দ্যাট ওয়াজ নেভার সেন্ট', পোল্যাণ্ডের 'দি কানাল', 'অ্যাসেস্ অ্যান্ড ডায়ামন্ডস্', 'দি ইনোসেন্ট সরারার্স', সুইডেনের 'দি ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ', 'দি নাইফ ইন ওয়াটার', চেকোস্লোভাকিয়ার 'দি হাই প্রিন্সিপল্', 'দি ট্র্যাপ', ইতালির 'দি বাইসিকল্ থীফ', 'মিরাকল্স্ অব মিলান', 'এইট অ্যান্ড হাফ', ফ্রান্সের 'হিরোসিমা মন্ আমুর', 'দি ওয়ার ইজ ওভার', 'দি ওয়াচ অন দি রাইন' প্রভৃতি এবং অন্যান্য দেশের আরও অনেক সর্বজনউপভোগ্য ছবিকেও ইংরেজীতে ডাবিং করিয়ে সাধারণ্যে প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে আমদানি করবার জন্যে এ'রা কিছুমাত্র উৎসাহ অনুভব করেন না। এ'দের মধ্যে সম্ভবত এই ধারণাই প্রবল যে, যে-ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের বিচারকদের মতে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পায় সে-ছবি নিশ্চয়ই জনসাধারণের জন্যে নয়। রসিকচিত্তগ্রাহী, শিল্পোৎকর্ষসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রকে 'আর্ট' ফিল্ম' নামে বিশেষ আখ্যায় ভূষিত করা হয় বলেই তাঁদের এই ধারণা পরোক্ষ সমর্থন পায়। অথচ শিল্পের দিক দিয়ে সার্থক সৃষ্টিও যে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারে, তার প্রমাণ আমাদের দেশেই সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু যা হবার নয়, তার জন্যে আপসোস করা বৃথা। ব্যবসায়ী চিত্রপরিবেশক তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পথ চলবেনই। তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারত সরকারের পক্ষে তিরিশখানি ছবি আমদানি করবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি এবং ঐ চিত্রপরিবেশকদের ওপর নির্ভর করলে কোনোদিন সম্ভব হবেও না, অর্থাৎ আমাদের দেশে ভবিষ্যতে কোনোদিনই প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

যদি কোনওদিন কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক চলচ্চিত্রের আমদানি সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করেন এবং নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পোৎকর্ষসমন্বিত চলচ্চিত্র আনিয়ে সাধারণ্যে তা প্রদর্শিত হবার ব্যবস্থাকে গুরুত্ব প্রদান করেন, তবেই আমরা প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রোৎসব থেকে বঞ্চিত হবার গ্লানির হাত হ'তে মুক্ত হব।

—নান্দীকার

কলকাতা

গুরু বাগচীর পরবর্তী ছবি 'তীরভূমি'

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'তীরভূমি' কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক গুরু বাগচী। এ-কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অভিনেতা বিকাশ রায়। প্রধান চরিত্রাবলীতে মনোনীত হয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা ও রবি ঘোষ। চিত্রভারতী প্রোডাকসন্সের এ-চিত্রটির চিত্রগ্রহণ আগামী মাস থেকে শুরু হবে।

প্রযোজক দেবেশ ঘোষের পরবর্তী ছবি 'প্রথম বসন্ত'

সম্প্রতি প্রযোজক দেবেশ ঘোষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কাল তুমি আলেয়া'র চিত্রগ্রহণ শেষ করে পরবর্তী ছবি 'প্রথম বসন্ত'র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে এটি পরিচালনা করবেন তরুণ পরিচালক স্বদেশ সরকার। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী।

শ্রীলেখা মুভিটনের 'পথে হল দেখা'

রক্সি ফিল্মসের দুরন্ত হাসির ছবি 'পথে হল দেখা'র সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শেষ করেছেন পরিচালক শচীন অধিকারী। জ্যোতির্ময় রায় রচিত এ-কাহিনীর চিত্রনাট্যকার হলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। প্রধান ভূমিকায় রূপদান করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সবিতা চ্যাটার্জি (বম্বে), জহর রায়, অমর মল্লিক, বিপিন গুপ্ত, ভারতী দেবী, রেণুকা রায় ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। জে. এন. সিনহা প্রযোজিত এ-ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ভি, বালসারা। ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত।

স্টার প্রোডাকসন্সের 'চিড়িয়াখানা'

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত স্টার প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'চিড়িয়াখানা'র অন্তর্দৃশ্য সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। এ-ছবির চিত্রনাট্য, সংগীত ও তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার। আর, ডি. বনশল ছবিটির পরিবেশক।

বোম্বাই

'মেজদিদি' চিত্রে মীনাকুমারী-ধর্মেন্দ্র

কে, জি, ফিল্মসের নতুন ছবি 'মেজদিদি' চিত্রের দুটি প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মীনাকুমারী ও ধর্মেন্দ্র। ছবিটি পরিচালনা করছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টি করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটি প্রযোজনা করছেন কচি সরকার এবং গোপাল মুখোপাধ্যায়।

'হামদাম' চিত্রে উত্তমকুমার-নূতন

মিত্র প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'হামদাম'-র নায়ক চরিত্রে সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমার। নায়িকা চরিত্রে থাকছেন নূতন। এ-ছাড়া একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন রাজকুমার। নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'শ্রাবণী' কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য বিধৃত। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে রয়েছেন মমতাজ, রাজেন্দ্রনাথ, হেলেন, দুর্গা খোটে ও মধুমতী। ছবিটি পরিচালনা করছেন মিত্র। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

'হামরাজ' চিত্রে সুনীল দত্ত-ভিমি

প্রযোজক-পরিচালক বি, আর, চোপরার নতুন রঙিন 'হামরাজ' ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সুনীল দত্ত, ভিমি, রাজকুমার ও বলরাজ সাহানী।

'দুনিয়া' চিত্রে দেব আনন্দ-বৈজয়ন্তীমালা

টাইম ফিল্মসের রঙিন ছবি 'দুনিয়া'র প্রথম সঙ্গীত সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরাটরীর সংগীত-গ্রহণ স্টুডিওয় গৃহীত হল। শংকর-জয়কিষণ সুরকৃত এ-ছবিতে কণ্ঠদান করেন মহম্মদ রফি। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন দেব আনন্দ ও বৈজয়ন্তীমালা। ছবিটি পরিচালনা করছেন টি, প্রকাশ রাও।

স্টুডিও থেকে বলছি

মেয়েরা আজ অনেক স্বাধীন। স্ত্রী স্বাধীনতার স্বাধিকার সমাজে এখন বেশ চলন হয়েছে। অথচ একদিন মেয়েদের মানবিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু আজ নারী-সমাজের বৈপরীত্য ঘটেছে।

এই নারী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্তের প্রশ্ন তুলছি না, শুধু এটুকু বলতে চাই, সবকিছুর একটা

নায়ক গোষ্ঠী পরিচালিত **চিড়িয়াখানা** চিত্রের সেটে উত্তমকুমার ও শৈলেন মুখার্জি।

সীমা থাকা উচিত। কোন জিনিসের বেশী কিছু ভাল নয়।

তাহলে একটা গল্প বলি শুনুন! অধ্যাপক হিমাংশু গুপ্তর কথাই বলি। তার পারিবারিক জীবনটা কিন্তু সুখেরই ছিল। সহধর্মিণী মলিনা দেবীর সংসারে কোন অভাব ছিল না। হিরু আর সোমা তাদের দুই সন্তান। সুখের সংসারটা দিব্যি হেসে-খেলে চলছিল। হিমাংশুবাবুর শেষ সাধ যেন এইভাবেই বাকী জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সুখের সংসারে কোথায় যেন একটা ফাটল ধরে গিয়েছিল। সেটা প্রথম লক্ষ্য করলেন হিমাংশুবাবু। তখন আর কোন সময় নেই। অনেকটা ফাটল পড়ে গেছে। মনের জগতে তিনি এই প্রথম শূন্যতা অনুভব করলেন। সংসারে সবাই স্বাধীন। কেউ কারও দিকে একবার চেয়েও দেখে না। মন থেকে মন চলে গেছে। শুধু মনের খোলসটা যেন একা পড়ে আছে।

মলিনা দেবী সংসার ফেলে 'শুভানন্দ নিলয়' সাংস্কৃতিক সংস্থায় মনোনিবেশ করেছেন। একমাত্র ছেলে হিরু অফিসের পর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ওয়াই এম সি এ ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলে। আর সোমা পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা জমায় বড় রেস্তোরায় বসে। কর্ম-জীবনের পালা শেষ করে হিমাংশুবাবু যখন পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন তখন এ-সংসার শূন্য। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

শুধু এ বাড়ির চার দেয়ালের মাঝে বন্দী হয়ে থাকেন হিমাংশুবাবু। বারান্দাতে বসে বসে ভাবেন, **এমন কেন হল!** তার মলিনা, হিরু আর সোমা মন থেকে কবে যেন সরে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলোটা তখনো জ্বালানো হয়নি। হিমাংশুবাবু শুধু ভাবছেন। আর ভাবছেন। হঠাৎ সোমার বন্ধু মাধুরী আসে। মাধুরী এখন স্বামীর সঙ্গে কলকাতার বাইরে থাকে। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি বেড়াতে এলে সোমার সঙ্গেও দেখা করে যায়।

কিন্তু বাড়িতে সেদিন কাউকে না দেখে মাধুরী অবাক হয়ে যায়। হিমাংশুবাবু তাকে সস্নেহে বলেন, 'তুমি মা, সোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো, কিন্তু এ সময়ে তো কেউ থাকে না।' কথায় কথায় মাধুরী বুঝতে পারে, হিমাংশুবাবু বড় একা। সবাই তাঁর অর্থ আর প্রতিপত্তিকেই গ্রহণ করেছে, কিন্তু আসল লোকটাকে তারা ভুলে গেছে। একমাত্র এ-বাড়ির ভৃত্য নিশিকান্তর ওপর নির্ভর করে হিমাংশুবাবুকে চলতে হয়।

মলিনা দেবীর সঙ্গে হিমাংশুবাবুর এখন বিরোধ চলেছে। হিরুকে নিয়েই এ দ্বন্দ্বের শুরু। মিঃ গুপ্ত চান, হিরু আত্ম-নির্ভরশীল একজন সচেতন মানুষ হয়ে উঠুক। নিজের পরিচয়ে সে বড় হোক। কিন্তু মলিনা দেবী বলেন, 'কেন ও এর-জন্যে চেষ্টা করবে। ও তো বড় হয়েই জন্মেছে।' মিঃ গুপ্ত বলেন, 'মানুষের পরিচয় তার কাজে, পিতৃ-পরিচয়ে নয়।'

হিরুও ভুল বোঝে বাবাকে। সে বাবার ওপর রাগ করে আর একটা চাকরী নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। হিরুর চলে যাওয়ার ব্যাপারে মলিনা দেবী তাঁর স্বামীকে দায়ী করেন। হিমাংশুবাবু স্তম্ভিত। হত-বাক। মনে মনে নিজেকে একান্ত অপরাধী বলে মনে করেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বুঝতে চায় না।

এবার সোমার পালা। মলিনা দেবী আগে থেকেই 'শুভানন্দ নিলয়'-এর প্রধান স্তম্ভ শোভনের সঙ্গে সোমার বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। একথা শোনামাত্রই সোমা স্পষ্ট জবাব দেয়, 'নেহাৎ তুমি আমার মা। নয়তো কি বলে যে তোমায়...!' সোমা আর দেরী না করে, নিজের মনোনীত ছেলেকে বিয়ে করে জামসেদপুরে চলে যায়।

মলিনা দেবী রাগে, ক্ষোভে জ্বলতে থাকেন। হিমাংশুবাবু আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন, 'মলিনা, তুমি সংযত হও। আমাকে ভুল বুঝ না। নয়তো এরপর আরও আঘাত সইতে হবে।' মলিনা দেবী ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, 'আমাকে সংযত হতে বলছো, তোমরা সব পুরুষেরাই চিরকাল মেয়েদের চার-দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছো। বৃহত্তর জগৎ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছো।' হিমাংশু শেষবারের জন্যে বুঝিয়ে বলেন, 'না মলিনা, না। যা-কিছু করেছি তা সবই তোমাদের জন্য। তোমরা সুখী হবে, সমাজে সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে চলবে, এই জন্যেই।' মলিনাদেবী আর সহ্য করতে না পেরে কিছুদিনের জন্য সব ভুলে থাকতে শুভানন্দ নিলয়ের অনুষ্ঠানে যোগ-দান করতে দিল্লী চলে যান।

শুধু হিমাংশু গুপ্ত একা পড়ে আছেন। সবাই যে যার সংসার থেকে চলে গেছে। হঠাৎ মিঃ গুপ্ত মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে অসুখ বাড়তে থাকে। অফিসের লোকেরা খোঁজ নিতে আসেন। হিমাংশুবাবুর স্টেনো কণিকা

কিন্তু দুবেলা এসে বুঝতে পারে, মিঃ গুপ্ত একান্ত অসহায়। প্রিয়জন বলতে কেউ নেই তাঁর পাশে। কণিকা নিজেই সেবার ভার নেয়। ধীরে ধীরে অনেকটা সেরে ওঠেন হিমাংশুবাবু। কণিকার ঋণ তিনি ভুলতে পারেন না।

হঠাৎ মলিনা দেবী ফিরে এসে কণিকার অযাচিত সেবার প্রতি সন্দেহ করে অযথা তাকে অপমান করেন। অপমান আর লজ্জায় কণিকা কোন প্রতিবাদ না করে মাথা হেঁট করে চলে যায়। হিমাংশুবাবু আর যেন সহ্য করতে পারেন না। সমস্ত সম্পত্তি পুত্র-স্থানীয় ধূর্জটির ওপর ভার দিয়ে তিনি এ সংসার থেকে একদিন চলে যান।

উদ্দেশ্যহীন যাত্রা। কোথায় যাবেন তিনি নিজেও জানেন না। সারাজীবন তপ্ত মরু-ভূমির পথ পেরিয়ে এবার তিনি একটু ছায়াতীরে পৌঁছতে চান। যেখানে জীবনের শেষ কটা দিন পরম শান্তিতে কাটাতে পারেন।

এ-কাহিনীর নাম 'ছায়াতীর'। জরাসন্ধ রচিত কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন তরুণ পরিচালক সুশীল বিশ্বাস। চিত্রনাট্য শ্রীবিশ্বাসের রচনা। বর্তমানে রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন কে রেজা। ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন হিমাংশু গুপ্ত—বিকাশ রায়, মলিনা দেবী—বিনতা রায়, সোমা—গীতালি রায় হিরু—দ্বিজু ভাওয়াল, শোভন—রবি ঘোষ, ধূর্জটি—অজয় গাঙ্গুলী, মাধুরী—শ্রাবণী বসু, জ্যোতির্ময়—দিলীপ রায়, নিশিকান্ত—জহর রায় ও কণিকা—মাধবী মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়। গীত রচনায়—সুনীলবরণ।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে নান্দিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ের পর শিল্পী-দের সঙ্গে সম্পাদক শ্রীকেতকী দত্তকে অভিনন্দন জানান উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন।

বিবিধ সংবাদ

দিলীপকুমারের সঙ্গে সায়রাবাণুর বিবাহ

অবশেষে দিলীপকুমার বিয়ে করলেন সায়রাবাণুকে। গত ২রা অক্টোবর বাগদান অনুষ্ঠান বোম্বাইয়ে সাড়ম্বরে পালিত হল।

দিলীপকুমার এবং সায়রাবাণু শীঘ্রই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। পাত্রী হিসেবে সায়রা যেমন সুন্দরী, তেমনি চিত্রতারকা হিসেবে খ্যাতিময়ী। আর দিলীপকুমার পাত্র হিসেবে সেরা ছেলে। তবে বয়সটা যা একটু বেশী। বহুদিন ধরে বহু নায়িকার সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যাপারে বহু গুজব শোনা গিয়েছে। এবার সত্যি সত্যিই বিয়ের ব্যাপারটা পাকা হল। দিলীপকুমারের আসল নাম কিন্তু ইউসুফ খাঁ। জন্ম পেশোয়ারে।

রঙমহলের নতুন নাটক "অতএব" :

গেল বৃহস্পতিবার, ৬ই অক্টোবর রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠী যে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, সেটি হচ্ছে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত হাল্কা হাসির নাটক "অতএব"। জহর রায় ও হরিধন মুখো-

পাধ্যায়ের সুদক্ষ-পরিচালনাধীনে এই নাটকটিতে অবতীর্ণ হচ্ছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, দীপিকা দাশ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল, জং, মিন্টু, হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, বহুদিন বাদে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে আবার রঙ্গমঞ্চে দেখতে পাওয়া যাবে।

।। গান্ধারের অভিনয় ।।

আগামী ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে 'দশটি বছর' নাটিকাটি গান্ধার নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে অভিনয় করবেন।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী অমর বসু, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, অসিত মুখোপাধ্যায়, তরুণ চৌধুরী, আশুতোষ চক্রবর্তী, রণেন পাল, ভব পাল, সৌরেন বসু ও মুক্তি গোস্বামী।

'রঙ্গম' অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের নবতিতম জন্মোৎসব :

গেল শনিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর (৩১-এ ভাদ্র, ১৩৭৩) কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে 'রঙ্গম'-গোষ্ঠী বিশ্বরূপা মঞ্চে একটি স্মরণসভার আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক মনোজ বসু এবং এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ বসু। সভান্তে 'রঙ্গম'গোষ্ঠী শরৎচন্দ্র রচিত 'বড়দিদি'র নাট্যরূপটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

কীর্তন শিল্পী রথীন ঘোষ

বাঙলার কীর্তন সম্বর্ধিত

কীর্তন রসসাগর রথীন ঘোষ কর্তৃক কীর্তন

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত ত্রিচুর জেলাস্থিত কালহস্তীতে কাঞ্চি কামকোটি পীঠের পরিচালনায় সপ্তাহব্যাপী নিখিল ভারত ধর্মসংগীত সম্মেলনের পঞ্চমবার্ষিক অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পিবৃন্দ প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। অধিবেশনে পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধি সর্ববাদিসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় উপরোক্ত পীঠের পীঠস্বামী শ্রীল শংকরাচার্য স্বামীপাদ মহোদয় পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধি স্বনামখ্যাত কীর্তনশিল্পী কীর্তনরসসাগর শ্রীরথীন ঘোষকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনস্বরূপ স্বর্ণবলয় প্রদান করেন। জনসাধারণের অনুরোধে শ্রীঘোষকে সভামন্ডপে পুনরায় কীর্তন পরিবেশন করতে হয়। ফেরার পথে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে শ্রীঘোষ সাফল্যের সঙ্গে কীর্তন পরিবেশন করে পশ্চিম বাংলার ও বাঙালীর কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। শ্রীঘোষ কীর্তন পরিবেশনে দক্ষিণ ভারতের রসপিপাসু ও গুণীজনের চিত্তজয় করেছেন।

সোভিয়েট নট চেরকাশভ

—দিলীপ মৌলিক

বলিষ্ঠ জীবন-চেতনাসমৃদ্ধ সোভিয়েট নাট্যলোকে যে ক'জন অবিস্মরণীয় অভিনেতার অননুকরণীয় নাট্যপ্রতিভা প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে, নিকোলাই চেরকাশভের নাম ও তাঁর দীর্ঘ নাট্যসাধনার সুবিপুল সিদ্ধি নিঃসন্দেহে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চেরকাশভের সাফল্য শুধু রাশিয়ার অভিনয় ঐতিহ্যকেই নিঃসীম গৌরবের দীপ্তি দেয়নি, বিশ্বের বিচিত্রমুখী নাট্য-আন্দোলনকে আরো গভীরতর জীবনপ্রত্যয়ের তীর্থে উন্নীত করেছে। 'মঞ্চে আমি আমার প্রয়াসকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে আমার দেশের যোগ্য নাগরিক হোতে চেষ্টা করেছি', বলেছেন চেরকাশভ এবং শুধু বলেননি, শুরু থেকে শেষপর্যন্ত এই সত্যকেই তাঁর অভিনয়-জীবনের ধ্রুবতারা করেছেন। বিশ্বের নাট্য-শিল্পীদের ইতিহাস আলোচনা করলে এমন শিল্পীর দেখা খুব কমই মিলবে যাঁর অনুভব ও বাস্তব অভিব্যক্তিতে অভিনয়-প্রীতিটা একটা বাহ্যিক বিলাসসর্বস্ব প্রসাধনকলা হয়ে থাকেনি, অন্তরের নিগূঢ় নিষ্ঠায় তা সাধনবেগে রূপলাভ করেছে। এই বিরল শিল্পীর আসরে চেরকাশভের কীর্তি নিঃসন্দেহে যথার্থ স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যকেই মূর্ত করে তুলেছে। যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি যে শিল্পীর জন্ম দেয়, চেরকাশভের অগ্রগতির প্রতিটি প্রহরে সেই প্রদীপ্ত রূপকারের আবির্ভাবই সূচিত হয়েছে বারবার।

ঐতিহাসৃষ্টিকারী এই শিল্পীর জীবন কিছুদিন আগে মঞ্চের আলো-ঝলমল আসর থেকে সরে গেছে এক অদৃশ্য লোকে। এই চলে যাওয়ার বেদনা যেমন রাশিয়ার প্রতিটি মানুষের বুকে সকরুণ সুরে বেজেছে, নাট্যশিল্পানুরাগী ভারতবাসী হিসেবে আমাদের মনেও কম বেদনা জাগায়নি। কেননা চেরকাশভের উপস্থিতির একটা মুহূর্ত আমাদের এই দেশের মৃত্তিকা ধরে রেখেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক ভি পুদভকিনের সঙ্গে তিনি ১৯৫১ সালে ভারতে এসেছিলেন, প্রতিটি ভারতবাসী সেদিন তাঁকে আন্তর অভিনন্দনে ভূষিতে করেছিল। তাছাড়া প্রকৃত শিল্পের উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে বিশ্বের সবারই তো একটা আত্মিক যোগসূত্র রয়েছে।

চেরকাশভের যাত্রা শুরুর অধ্যায়টা অদ্ভুত। জন্ম হোল ১৯০৩-এ সেণ্ট পিটার্সবার্গ বুর্গ বাল্টিক স্টেশনের স্টেশনমাস্টারের পরিবারে। সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল এই শান্ত শিশুটির প্রশান্ত চোখে উত্তরকালের মঞ্চ ও চিত্রজগতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। হয়তো বাড়ীর কয়েকজনের ইচ্ছে ছিল চেরকাশভ ডাক্তারীকেই জীবনের পেশা হিসাবে বেছে নিক। কিন্তু তা হোল না, শিল্পের প্রতি নিঃসীম অনুরাগ তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পথের গতিকে অন্যদিকে রূপান্তরিত করে দিল। হোতে চাইলেন অভিনেতা, প্রাণের ছন্দ খুঁজে পেতে
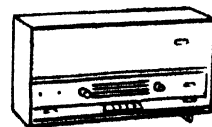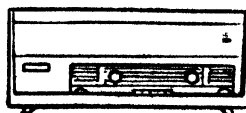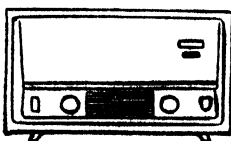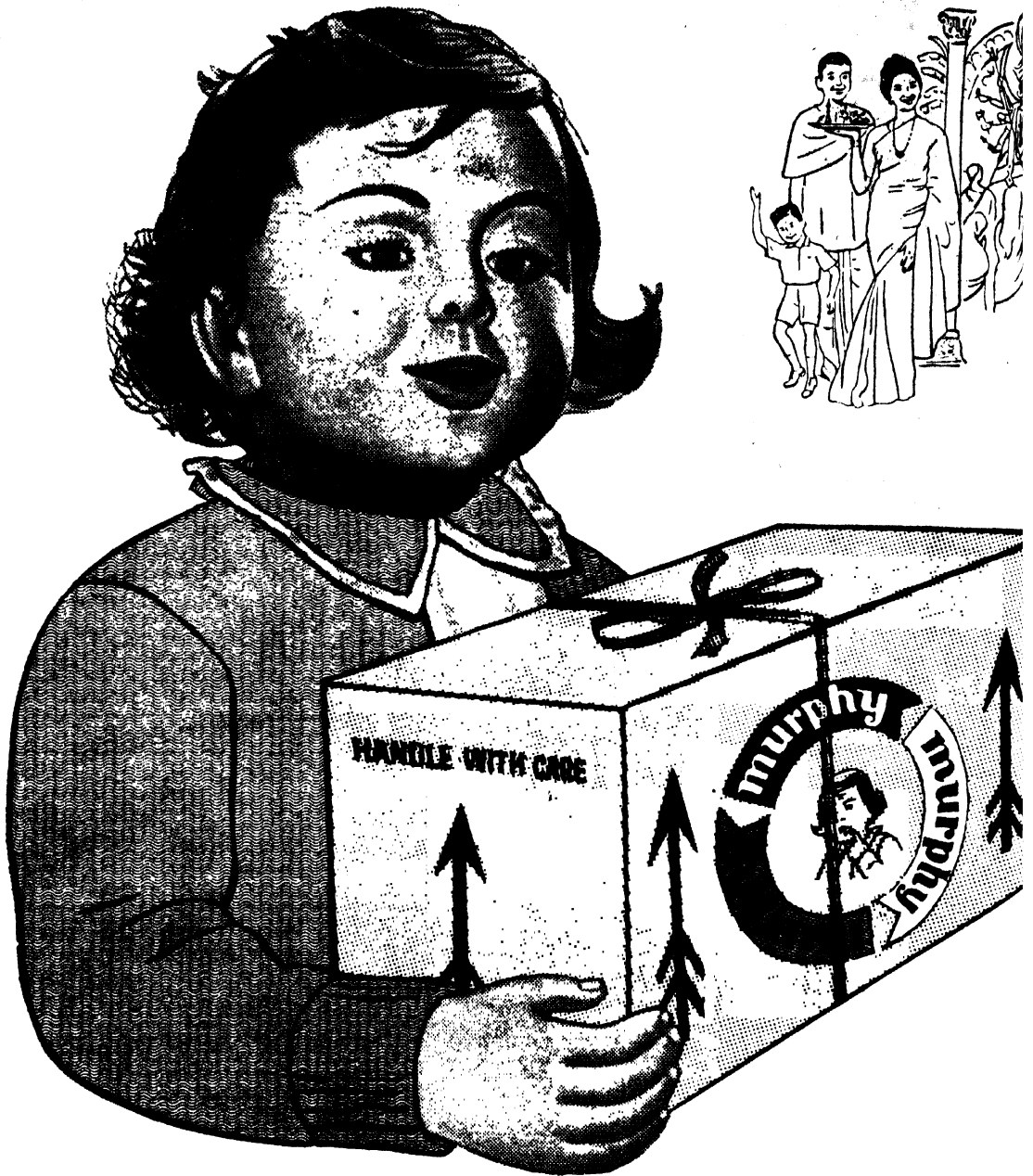
HANDLE WITH CARE
murphy
murphy

NAS b369c A
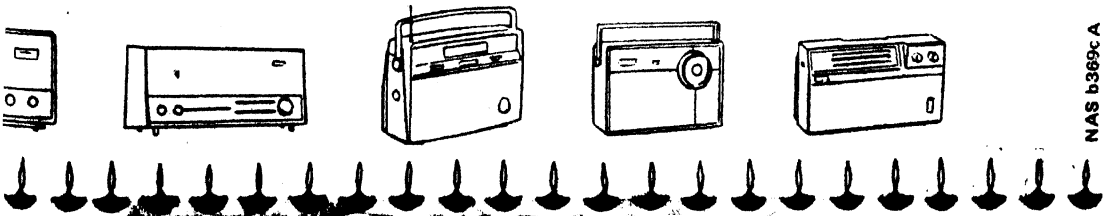
ট্রেজার আইল্যান্ড চিত্রে বিলি বোনসরূপী চেরকাশভ।

চাইলেন মঞ্চের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণের **মধ্য দিয়ে।** চেরকাশভ তাঁর 'নোটস্ অফ এ সোভিয়েট অ্যাক্টর' গ্রন্থে তাঁর শিল্পী-**জীবনের সূত্রপাত** কি করে হোল, তার **ওপর সুন্দরভাবে** আলোকসম্পাত **করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক অভিনেতারই** নাট্যজগতে **প্রবেশের একটা নিজস্ব পথ আছে।** তিনি **বলেছেন,** সোভিয়েট শাসনের গোড়ার দিকে **যখন অকটোবরের** আলোড়নসৃষ্টিকারী **আন্দোলন সাধারণ লোকের** সামনে নাট্য-**শালার প্রতিটি দরজা উন্মুক্ত** করে দিলো, **তখনই তাঁর** অভিনয়-জীবনের যাত্রা শুরু **হয়েছে।**

ছোটবেলা থেকেই চেরকাশভের মন **নেচে উঠতো** গানের সুরে। **হবে না কেন, রেল-কর্তৃপক্ষের** সেই ছোট্ট বাড়ীতে তাঁর মা **রোজ সন্ধ্যেবেলা,** বিশেষ করে রোববার **মিষ্টি সুরে** পিয়ানো বাজাতেন। তাঁর বাবাও **সংগীতানুরাগী ছিলেন,** ছেলের মনের এই **সুরতৃষ্ণাকে** পরিতৃপ্ত করতে তিনি এতটুকু **দ্বিধাবোধ করতেন না কখনো। একটু** বড়ো **হোলে** তাকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন অপেরায় **আর** গানের **জলসায়** যেতেন। **এবং তাঁর বাবার সংগে** গিয়েছেন নারাদিনী অপেরা হাউস, পাভলস্কি রেলওয়ে স্টেশনের গ্রীষ্ম-কালীন **সিম্ফনী** অর্কেস্ট্রা, ফিলহারমোনিক সংগীতের আসর প্রভৃতিতে। সংগীতে চেরকাশভের যেন একটা সহজাত অধিকার **ছিল** এবং **প্রথমে** তাঁর মনে হয়েছিল, শিল্পের **নিটোল প্রাণস্পন্দন** বুঝি লুকিয়ে আছে **সুরের জলতরংগে।** স্মৃতিশক্তিও ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রখর, কোন গান শুনে ভালো **লাগলেই** পিয়ানো নিয়ে বসে যেতেন, তাকে সেটা **তুলতেই হবে।** তিনি **বলেছেন,** 'সেই সুর যেন আমাকে ভিতর থেকে ধাক্কা মারতো'। **এই সুরের** আঘাতে তিনি খুঁজে পেয়েছেন **নতুন উন্মাদনা। কিন্তু মঞ্চ** আর চিত্রজগতেই **তাঁর প্রতিভা** আরো গভীরতর আলোর দীপ্তি **ছড়িয়েছে।**

সংগীতের প্রতি **আকর্ষণ থাকার ফলে চেরকাশভ প্রথম অপেরায় অংশগ্রহণ করেন** এবং সেই অপেরা থিয়েটারেই চালিপিয়ানের গীতাভিনয় তাঁকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। চালিপিয়ানের অভিনয় দেখে তিনি অনু-প্রাণিত হোলেন, যেভাবে হোক্, নিজেকে একজন সার্থক চরিত্রাভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই সময় থেকে মঞ্চাভিনয়কেই জীবনের একমাত্র সাধনা হিসাবে গ্রহণ করলেন। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ অভি-নেতার মতো তাঁকেও প্রথম কাজ করতে হয় একস্ট্রা হিসাবে, পরে মূকাভিনয়ের মধ্যে তাঁকে নেওয়া হয়। সে-সময়ে চেরকাশভ খুব ক্ষীণকায় ও লম্বা ছিলেন। তাই দেহটাকে তিনি খুশিমতো ঘোরাতে **পারতেন।** 'দি ইভিল ফোর্স' অপেরায় যখন তাঁকে ক্লাউন-এর ভূমিকা দেওয়া হোল, তখন তাঁর নাম প্রচারপত্রে ছিল না, কিন্তু এই নামহীন অভিনেতা সেদিন অগণিত শ্রোতাকে প্রচন্ড হাসির জোয়ারে মুখর করে তুলে-ছিলেন। কোন এক সময় এই অপেরাতেই চালিয়াপিনের সংগে একসংগে অভিনয় করতে হয়। চালিয়াপিন করছেন এরেমকার ভূমিকা, কিন্তু ক্লাউনের ছোট্ট ভূমিকায় চের-কাশভ তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন। চালিয়াপিন চিৎকার করে বললেন, 'এই ক্লাউনটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও'। চেরকাশভ নিজেই সরে গেলেন সেখান থেকে। ব্যাপারটা অতি দুঃখের সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মনে চালিপিয়ান সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাকে এতটুকু স্তিমিত করতে পারেনি। সম্ভবত চালিপিয়ানই চেরকাশভকে মঞ্চাভি-নয়ের গোপন কৌশলগুলো সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেন, আর চালিপিয়ানের শিল্প-দক্ষতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'তাঁর মত শিল্পীর তুলনা নেই।'

এরপর থেকেই **প্রকৃতপক্ষে** চেরকাশভের মঞ্চাভিনয়ে মুখর জীবন শুরু হয়। শেক্স-পীয়রের 'টুয়েলফথ্ নাইট'-এ কমেডিয়ান-রূপে আত্মপ্রকাশ করে নিজের অসাধারণ **দক্ষতায় স্বাক্ষর চিহ্নিত করলেন। সবাই প্রশংসা করলো সেই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত অভি-নয়ের,** চেরকাশভের **মন আনন্দে** ভরে **উঠলো। তারপর পরিচালক ভ্লাদিমির ম্যাক্সিমভের কাছ থেকে আহ্বান** এলো চেখভের 'আংকেল **ভানিয়াতে আস্ট্রভ-এর ভূমিকায়** অভিনয় **করার জন্য। সাগ্রহে** সেই **আমন্ত্রণকে গ্রহণ করলেন চেরকাশভ। সহজ স্বাভাবিক অভিনয়ে আস্ট্রভ চরিত্রের অন্ত-**র্নিহিত সত্যকে **বিকশিত করলেন, তাতে** মুগ্ধ হোল **সবাই। চেরকাশভ যে-একজন শক্তিশালী** অভিনেতা এ-বিষয়ে **আর কারো** মনে সন্দেহ **রইল** না। **অনেকগুলো দিন অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। চেরকাশভ** মেরিনিস্কি **অপেরা থিয়েটার থেকে স্টুডিও অফ ইয়ং ব্যালেতে চলে এলেন এবং এখানে** তাঁকে দুরূহ চরিত্রে **অভিনয় করার প্রতি** আগ্রহী হোতে হয়। **কিন্তু এই সময়ে তিনি** উপলব্ধি করলেন যে, তাঁকে **যদি একনিষ্ঠ** অভিনেতা হোতে **হয়, যদি জীবনের সংঘাত-**সমৃদ্ধ দিকগুলো **অভিনয়ের মধ্য দিয়ে** মূর্ত করে **তুলতে হয়, তাহলে তাঁকে** আরো অনেক কিছু **অনুশীলন করতে হবে। তখন** তাঁর সামনে দুটি **পথ খোলা, এক—** ইনস্টিটিউট অফ থিয়েটার আর্ট-এ তিনি আসতে পারেন, নচেৎ ইনস্টিটিউট অফ সিনেমা আর্ট-এ অংশগ্রহণ **করতে পারেন।** চেরকাশভ দুটোতেই সমানভাবে অংশ নিতে চাইলেন, **কিন্তু** মঞ্চানুরাগ **প্রবল থাকায়** জন্য মঞ্চাভিনয়ের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলেন।

যাই হোক, এই **সময়ের** মধ্যে চেরকাশভ নিজেকে **শক্তিশালী** অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। **এরপর** আমন্ত্রণ এলো লেনিনগ্রাড ইয়ং স্পেকটে-টরস থিয়েটার থেকে। চেরকাশভ আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করলেন সে-আমন্ত্রণ। তিনি বলেছেন, 'এখান থেকেই আমার পেশাদারী অভিনয়-জীবনের শুরু'। চারটি **বছর এখানে** কাটিয়েছেন তিনি, এই সময়টুকু তাঁর অভিনয়-জীবনের একটি গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। কেননা, তাঁর চিরস্মরণীয় সব চরিত্রাভিনয়ই এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথমে ডন কুইকজোটে নাম-ভূমিকায় অভিনয়। তিনি নিজে লিখেছেন, 'যেদিন আমি শুনলাম যে আমাকে এ-চরিত্রে মনো-নীত করা হয়েছে সেদিন আমার কাছে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তা আমি কোনদিন ভুলবো না'। ডন কুইকজোটের চরিত্রে চেরকা-শভের আন্তরিক নিষ্ঠা-জড়ানো অভিনয় সবার স্বীকৃতি অর্জন করতে সমর্থ হোল। প্রথম তিন বছরে প্রায় ১৫০ বার তিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ডন কুইকজোট ছাড়া আর যে-সব নাটকে তিনি এখানে অংশগ্রহণ করেন, তা হোল:
প্রভৃতি।

The Robbers, Thyl Uylenspiegel, The Escapades of Scapin, Uncle Tom's Cabin, Timothy's Mine, Underwood, etc. Young Spectator Theatre

চেরকাশভের অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যে **বিশ্বাসী হয়ে লিও টলস্টয়ের 'দি ফ্রুটস্ অফ এনলাইটেনমেন্টে জাভেজভিমৎসেভের মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রে অভিনয় করবার প্রস্তাব**

ডন কুইকজোট রূপী চেরকাশভ।

দিলো। চেরকাশভের মঞ্চরূপায়ণের মধ্য দিয়ে টলস্টয় চরিত্রের ভাব-ভাবনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এরপর তিনি অংশ নিয়েছেন ইনজেস ভারনের ক্যাপ্টেন গ্রান্টস্ চিলড্রেনে হাস্য-রসিক পথিক জ্যাকুইস প্যাগানেলের ভূমিকা, পশোকানের বীরস পড়ুডনস্তে ভার্কাম, গোগোলের ইনসপেক্টর-জেনারেলে ওসিপের ভূমিকায়। পিটার ১-এ জারেভিচ্ আলেক্স চরিত্রে মুহুর্মুহু খেয়াল ও তার নিষ্ঠুরতা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে চেরকাশভ মূর্ত করে তুলেছেন। এই ভূমিকায় অভিনয় তাঁর অভিনয়-জীবনকে আরো নতুনতর সম্ভাবনায় বিকশিত করে তুললো। তাঁর কথায় 'এই ভূমিকা আরো নতুন সংঘাত-সমৃদ্ধ সৃষ্টিশীল চরিত্রাভিনয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।' তারপর লিওনিড ডেলের বাল্টিক ডেপুটিতে অধ্যাপক পোলেঝায়েভ-এর ভূমিকায় অভিনয় তাঁর আর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। প্রগতিবাদী বিজ্ঞানী পোলেঝয়েভের প্রতিটি বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন চেরকাশভ। দি গ্রেট জার-এ ইভান দি টেরিবিল চরিত্রের মানসিকতা তাঁর দুরন্ত অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 'লেনিন ইন ১৯১৮' চিত্রে তিনি ম্যাক্সিম গোর্কি ও আলেকজান্ডার নেভস্কি-তে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেন।

চেরকাশভের লেখা 'নোটস্ অফ সোভিয়েট অ্যাক্টর' সোভিয়েট অভিনয়-শিল্পের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি অভিনয় করতে গিয়ে যা অভিনয় করেছেন, তারই আলোকে সামগ্রিকভাবে সার্থক অভিনয় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এতে নাট্যকার ও অভিনেতা, অভিনেতা ও পরিচালক, অভিনেতা ও চরিত্র, মঞ্চশিল্পীর কলাকৌশল, অভিনেতা ও রূপ সজ্জাকর, অভিনেতা ও ক্যামেরাম্যান, মঞ্চসজ্জা, অভিনেতা ও জনসাধারণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নিজের অভিনয়-জীবন থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্লেয়িং মায়াকভস্কি অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। এখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, একটি চরিত্রে প্রকৃত প্রাণস্ফূর্তি করতে গেলে কি দুস্তর সাধনা অভিনেতাকে করতে হয়। অভিনয়ের বহু আগে চরিত্রের অতলে ডুব না দিলে মঞ্চে সেই প্রাণস্পন্দনকে মুখর করে তোলা যায় না। প্রখ্যাত কবি মায়াকভস্কি জীবনকে মঞ্চে তুলে ধরার আগে সেই কবির জীবনের সবকটি মুহূর্ত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা কিভাবে চেরকাশভকে আকুল করে তুলেছিল, তার নিখুঁত বর্ণনা আছে এই অংশে। তিনি বলেছেন, 'মায়াকভস্কি আমার অন্তরের অন্দরমহলে এখন নিবিড়ভাবে প্রবেশ করলো, তাঁর ছবি আমার কল্পনাকে এমনভাবে রাঙিয়ে দিলো যে, আমি তাঁকে মূর্ত করে তুলতে চাইলাম।' এই তো যথার্থ শিল্পীর উপলব্ধি। এই উপলব্ধি যখন গভীর থেকে গভীরতর হয় তখনই শিল্প পায় প্রাণ আর শিল্পী হয়ে ওঠেন প্রাণবন্ত জীবনের রূপকার আর চিরন্তন অনুভবের সফল স্রষ্টা। সোভিয়েট নট চেরাকশভকে সেই মর্যাদা দিতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

ইভান দি টেরিবিলরূপী চেরকাশভ
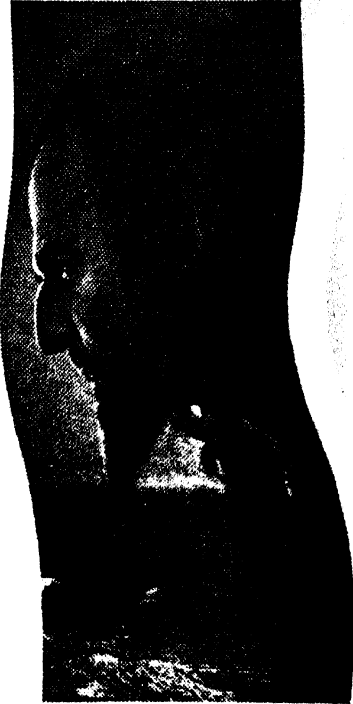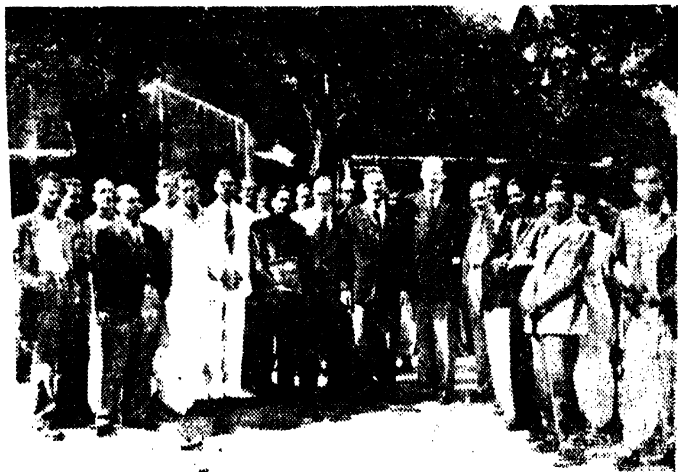
কলকাতায় পুতভকিনের সঙ্গে চেরকাশভ।

ইস্টবেঙ্গল—বি এন রেলদলের ১৯৬৬ সালের আই এফ শীল্ড ফাইনাল খেলার (প্রথম দিনের) একটি দৃশ্য। ফটো : অমৃত

দর্শক

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে বি এন রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ৯-বার আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই জয়লাভের ফলে ১৯২৪ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিকবার (৯-বার) আই এফ এ শীল্ড জয়ের রেকর্ডকে ইস্টবেঙ্গল দল আজ ধরে ফেলেছে। তাছাড়া এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল সর্বাধিকবার (৫-বার) একই বছরে আই এফ এ শীল্ড এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে। এই বিষয়ে পূর্ব রেকর্ড ছিল মোহনবাগানের (৪-বার)।

প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোল-শূন্য অবস্থায় শেষ হয়। ক্রীড়ামানের বিচারে প্রথম দিনের খেলাটি হয়েছিল নিতান্তই মামুলি পর্যায়ের। খেলা মোটেই জমেনি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের পুরো-ভাগের খেলোয়াড়দের শোচনীয় ব্যর্থতার দরুণ গোল দেওয়ার বহু সুযোগ হাত-ছাড়া করে। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলার ২৭ মিনিটের মাথায় পরিমল দে ইস্টবেঙ্গল দলের জয়সূচক গোলটি দেন।

১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতা

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ৩৭টি দল নাম দিয়েছিল—পশ্চিমবাংলার ২২টি এবং পশ্চিমবাংলার বাইরের ১৫টি। শেষ-পর্যন্ত দুটি দল—ইয়ংস্টার ক্লাব (এলাহাবাদ) এবং আর্মি সার্ভিস কোর (দক্ষিণ ব্যাঙ্গালোর) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি। বহিরাগত ১৫টি দলের মধ্যে দুটি দলের খেলা (জামসেদপুরের স্পোর্টিং এসো-সিয়েশন এবং কটক কম্বাইণ্ড) প্রথম রাউণ্ডে পড়েছিল। সরাসরি তৃতীয় রাউণ্ড থেকে খেলার গৌরব লাভ করে চারটি দল—তালিকার শীর্ষার্ধে গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল এবং পাঞ্জাব পুলিশ (জলন্ধর) এবং নিম্নার্ধে গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান এবং হায়দরাবাদ একাদশ দল। প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালের ৮টি দলের মধ্যে ৫টি ছিল স্থানীয় দল এবং ৩টি বহিরাগত দল (মধ্যপ্রদেশ একাদশ, হায়দরাবাদ একাদশ ও ইণ্ডিয়ান নেভী)। এই ৩টি বহিরাগত দলের মধ্যে একমাত্র ইণ্ডিয়ান নেভী দল সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিল। এক-দিকের কোয়ার্টার-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ০—০, ১—১, ০—০ ও ১—০ গোলে মহ-মেডান স্পোর্টিংকে এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৩—১ গোলে মধ্যপ্রদেশ একাদশ দলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকের কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলায় বি এন রেলওয়ে ২-১ গোলে হায়দরাবাদ একাদশ দলকে এবং ইণ্ডিয়ান নেভী ২—১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল। সেমি-ফাইনালে বি এন রেলওয়ে ২—১ গোলে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নেভীকে এবং ইস্টবেঙ্গল ২—১ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

✱ হ্যাটট্রিক

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত ৮ জন খেলোয়াড় 'হ্যাট্‌ট্রিক' করেছেন। এঁদের মধ্যে বাটা স্পোর্টসের অমিয় ভট্টাচার্য (উপর্যুপরি ৫ গোল), মোহনবাগানের চুণী গোস্বামী (উপর্যুপরি ৪ গোল) এবং লিডার্স ক্লাবের ইন্দর সিংয়ের (উপর্যুপরি ৪ গোল) সাফল্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অমিয় ভট্টাচার্য (বাটা স্পোর্টস) — উপর্যু-পরি ৫টি গোল, হাওড়া ডি এস এ-র বিপক্ষে ১ম রাউণ্ডে।

বি লাহিড়ী (এরিয়ান্স) — বাটা স্পোর্টস দলের বিপক্ষে ২য় রাউণ্ডে।

রামচন্দ্রন (মধ্যপ্রদেশ) — বিহার রেজি-মেণ্টাল সেণ্টার দলের বিপক্ষে ২য় রাউণ্ডে।

ইন্দর সিং (লিডার্স ক্লাব, জলন্ধর) — উপর্যুপরি ৪টি গোল, হুগলী ডি এস এ-র বিপক্ষে ২য় রাউণ্ডে।

পি মজুমদার (বি এন আর) — পোর্ট কমিশনার্স দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় রাউণ্ডে।

চুণী গোস্বামী (মোহনবাগান) — উপর্যু-পরি ৪ গোল, আর্মি সার্ভিস কোর সেণ্টার দলের বিপক্ষে ৩য় রাউণ্ডে।

প্রদীপ ব্যানার্জি (ইস্টার্ণ রেলওয়ে) — মধ্যপ্রদেশ একাদশ দলের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে।

গুরুকৃপাল সিং (ইস্টবেঙ্গল) — রাজস্থানের বিপক্ষে ৩য় রাউণ্ডে।

[illegible]

একটি খেলায় সর্বাধিক গোলে জয় :

দ্বিতীয় রাউণ্ডে মধ্যপ্রদেশ একাদশ দল ৯—০ গোলে বিহার রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দলকে পরাজিত করে এ-বছরের খেলায় সর্বাধিক গোলে জয়লাভের যে-রেকর্ড করে, তা সমান করে ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৯—০ গোলে আসাম পুলিশ দলকে ৩য় রাউণ্ডে পরাজিত করে।

একটি খেলায় ব্যক্তিগত সর্বাধিক গোল :

৫টি (উপর্যুপরি) — অমিয় ভট্টাচার্য (বাটা স্পোর্টস), বিপক্ষে হাওড়া ডি এস এ।

৪টি (উপর্যুপরি) — ইন্দর সিং (লিডার্স ক্লাব, জলন্ধর), বিপক্ষে হুগলী ডি এস এ।

৪টি (উপর্যুপরি) — চুণী গোস্বামী (মোহনবাগান), বিপক্ষে আর্মি সার্ভিস কোর সেন্টার (বাঙ্গালোর)।

ইস্টবেঙ্গল দলের আই এফ এ শীল্ড জয়

১৯৪৩ সালে পুলিশ এ সি-কে ৩—০ গোলে, ১৯৪৫ সালে মোহনবাগানকে ১—০ গোলে, ১৯৪৯ সালে মোহনবাগানকে ২—০ গোলে, ১৯৫০ সালে এস এস সি বি-কে ৩—০ গোলে, ১৯৫১ সালে মোহনবাগানকে ০—০ ও ২—০ গোলে, ১৯৫৮ সালে মোহনবাগানকে ১—০ গোলে, ১৯৬১ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী, ১৯৬৫ সালে মোহনবাগানকে ০—০ ও ১—০ গোলে এবং ১৯৬৬ সালে বি এন রেল-ওয়েকে ০—০ ও ১—০ গোলে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৯ বার আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরবলাভ করে।

শীল্ডে ইস্টবেঙ্গল দল

১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে প্রথম উঠে ১—২ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে পরাজিত হয়।

ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন রেলদলের ১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের দর্শক সমাবেশ। ফটো : অমৃত

১৯৪৩ সালের ফাইনালে পুলিশ দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে ইস্ট-বেঙ্গল দল প্রথম আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়।

ইস্টবেঙ্গল দল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠেছে ১৫ বার। খেলার ফলাফল : জয় ৯ বার (মোহনবাগান দলের সঙ্গে ১৯৬১ সালে যুগ্মবিজয়ী), পরাজয় ৪ বার এবং খেলা পরিত্যক্ত ২ বার (১৯৫৯ সালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের ফাই-নাল খেলা শেষপর্যন্ত হয়নি এবং ১৯৬৪ সালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের ফাই-নাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যাওয়ার পর পরিত্যক্ত হয়)।

আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্ট-বেঙ্গল দলের পরাজয় ৪ বার—১৯৪২ সালে ১—২ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৪৪ সালে ০—২ গোলে বি এ্যান্ড এ রেল, ১৯৪৭ সালে ০—১ গোলে মোহন-বাগান এবং ১৯৫৩ সালে ০—০, ০—০ ও ১—১ গোলে ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দলের (বোম্বাই) কাছে। ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে এক প্রতিবাদ-পত্রের ভিত্তিতে ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দল জয়ী হয়।

ইস্টবেঙ্গল—বি এন রেলদলের প্রথম দিনের ১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দলের গোলের সামনের দৃশ্য। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল ১—০ গোলে জয়ী হয়। ফটো : অমৃত

ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব নির্বাচিত '১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়' নইমুদ্দিনকে (ইস্টবেঙ্গল ক্লাব) এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কানু রায় স্মৃতি ট্রফি দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। ছবিতে দেবসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী ডি এন চৌধুরীর (ডানদিকে) হাত থেকে নইমকে মার্ফি ট্রানজিস্টার রেডিও উপহার নিতে দেখা যাচ্ছে।

আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগানেরই বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দল ৫ বার জয়ী হয়েছে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান জয়ী হয়েছে মাত্র ১ বার।

পরিমল দে

১৯৬১ সালে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র গেলে উভয় দলকেই যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

'ডাবল' খেতাব

একই বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় একই দলের পক্ষে আই এফ এ শীল্ড এবং লীগ কাপ জয়ের উল্লেখযোগ্য রেকর্ড।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (৫ বার) : ১৯৪৫, ১৯৪৯-৫০, ১৯৬১ ও ১৯৬৬।

মোহনবাগান (৪ বার) : ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬২।

মহমেডান স্পোর্টিং (৩ বার) : ১৯৩৬, ১৯৪১ ও ১৯৫৭।

আই এফ এ শীল্ড জয়

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব (৯ বার) : ১৮৯৬, ১৯০০, ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৬, ১৯১৫, ১৯২২—২৪ (উপর্যুপরি ৩ বার)।

ইস্টবেঙ্গল (৯ বার) : ১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯—৫১ (উপর্যুপরি ৩ বার), ১৯৫৮, ১৯৬১ (যুগ্মবিজয়ী), ১৯৬৫-৬৬।

মোহনবাগান (৮ বার) : ১৯১১, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬১ (যুগ্মবিজয়ী) ও ১৯৬২ (উপর্যুপরি ৩ বার)।

উপর্যুপরি তিনবার আই এফ এ শীল্ড জয়

১৯০৮—১০ : গর্ডন হাইল্যান্ডার্স

১৯২২—২৪ : ক্যালকাটা এফ সি

১৯২৬—২৮ : শেরউড ফরেস্টার্স

১৯৪৯—৫১ : ইস্টবেঙ্গল

১৯৬০—৬২ : মোহনবাগান

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

১৯৬৬-৬৭ সালের ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল পাঁচদিনব্যাপী তিনটি টেস্ট ম্যাচ নিয়ে মোট ৯টি খেলায় যোগদান করবে। ভারত সফরে তাদের প্রথম খেলা শুরু হবে ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব-বিদ্যালয় একাদশ দলের বিপক্ষে হায়দরাবাদে এবং শেষ খেলা (তিনদিনব্যাপী) আরম্ভ হবে নাগপুরে ২৬শে জানুয়ারী. ভারত-বর্ষের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট অধিনায়ক বিজয় হাজারের সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

টেস্ট খেলার তারিখ

১ম টেস্ট (বোম্বাই) : ডিসেম্বর ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮।

২য় টেস্ট (কলকাতা) : ডিসেম্বর ৩১ এবং জানুয়ারী ১, ২, ৪ ও ৫।

৩য় টেস্ট (মাদ্রাজ) : জানুয়ারী ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮।

আগামী ভারত সফরের উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নিম্নলিখিত ১৬ জন খেলোয়াড়কে ভারত সফরগামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে নির্বাচিত করেছেন।

গারফিল্ড সোবার্স (অধিনায়ক), কনরাড হান্ট, ওয়েসলী হল, ল্যান্স গিবস, রোহন কানহাই, বেসিল বুচার, সিমুর নার্স, চার্লি গ্রিফিথ, ডেভিড হলফোর্ড, জ্যাকি হেণ্ড্রিকস, ডেরিক মারে, রবিন বাইনো, ব্রায়ান ডেভিস, লেস্টার কিং, ক্লাইভ লয়েড এবং রেক্স কলিমুর।

গারফিল্ড সোবার্স

সেনানী বনাম মহারাজা

অজয় বসু

'আমি যদি ডিক্টেটর হতাম তাহলে অন্ততঃ দু বছরের জন্যে ভারতীয় ক্রীড়াবিদ দলের বিদেশ যাত্রা বন্ধ করে দিতাম'—কথাটা সখেদে ঘোষণা করেছেন জেনারল কে এম কারিয়াপ্পা।

ভারতের প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কারিয়াপ্পা আজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়া-পরিষদের চেয়ারম্যান। আর পরিষদ হলো ভারতীয় দলের বিদেশ সফর বা বিদেশী দলের ভারত সফরের বিষয় নির্ধারণে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। পরিষদের হ্যাঁ বা না শুনেই কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের বিদেশ সফরে অথবা বিদেশীদের এদেশ সফরে অনুমতি দেন।

ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ক্রীড়ামহলে অগুন্তি সফর বিনিময় করা হয়েছে। সবই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমতি নিয়ে। এতোগুলি সফর অনুমোদনের দায়-দায়িত্ব, সবই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদের। অথচ সেই পরিষদের চেয়ারম্যানই আজ সফর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুসৃত নীতিতে এবং পরিষদের কর্ণধারের উচ্চারিত ঘোষণায় মিল নেই এতোটুকু। কাজেই সাধারণ হিসেবে সমগ্র পরিস্থিতিকে গোলমেলে বলে ঠেকতে পারে। পরিস্থিতির এই অস্পষ্টতা দূর করতে জেনারেল কারিয়াপ্পার ঘোষণার গভীরে প্রবেশ করা যেতে পারে।

জেনারেল কারিয়াপ্পার মনের কথা, সফর বন্ধ করা হোক, ভারতীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়নে। জেনারেলের ধারণা, বিদেশ সফরের এবং বিদেশী খেলোয়াড়দের এদেশে আনানোর ঝোঁক আজ বিভিন্ন ভারতীয় ক্রীড়া-নিয়ামক সংস্থাকে নেশার মতো গিলে রেখেছে। কারণে, অকারণে যত্রতত্র পরিভ্রমণের সুযোগ পেয়ে পেয়ে ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থাগুলি যেন বিদেশ বিহার পরিকল্পনাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করছেন। এই পরিকল্পনাতেই তাঁরা মসগুল। কি করে যে খেলার মান বাড়ে সেদিকে মন না দিয়ে তাঁরা শুধু সফর পরিকল্পনা নিয়েই মেতে রয়েছেন।

কথাটা ফেলে দেবার মতো নয়।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে অনুন্নত ভারতের পক্ষে সাম্প্রতিককালে কতোবার বিদেশে পা বাড়ানো হয়েছে এবং আরও কতোবার যে বিদেশ থেকে বিভিন্ন দলকে এদেশে আনানো হয়েছে একদিকে সেই হিসাব রেখে অন্য দিকে সেইসব সফরের বিনিময় ভারতীয় ক্রীড়া মানের নিরিখে ক-ধাপ এগিয়েছে তার হিসাব মেলাতেই এইসব সফর নিরর্থক কিনা তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সাধারণ ভাবে আশা করা যায় যে বিদেশীদের সঙ্গে খেলার সুযোগ আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের ক্রীড়ামানের উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু গত ক'বছরে সেই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা আশানুরূপ উঁচু মানে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তাই এই সব সফরের যাথার্থ্য সম্বন্ধে জেনারেল কারিয়াপ্পার মনে স্বাভাবিকভাবে সংশয় দেখা দিয়েছে। এবং সে সংশয়ে সুস্থমনা আরও অনেকেও ভাগীদার।

সাম্প্রতিককালে প্রায় প্রতি বছরই গণ্ডা গণ্ডা টেনিস খেলোয়াড় বিদেশ সফরে বেরিয়েছেন। তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশক্রমে ভারত সরকার মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রাও মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু এই অনুমোদন ও বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেও আমরা আন্তর্জাতিক মানের কজন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়কে হাতে পেয়েছি। সেই কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিতলাল, তাঁদের সংখ্যা সেই তিনেতেই সীমাবদ্ধ।

ক্রিকেটেও উপলব্ধিও সমান। বছর বছর বিদেশী দল ভারতে এসেছে, সময় সময় ভারতীয় ক্রিকেট দল বিদেশেও গিয়েছে। সফরের ঢালাও ব্যবস্থা। কিন্তু এ সবের বিনিময়ে ভারতীয় ক্রিকেটের মান কতোটা এগোতে পেরেছে তা ভাববার বিষয়।

ফুটবল, অ্যাথলেটিক দলও এই ফাঁকে বিদেশ সফরের সুযোগ পায়নি তাও নয়।

ভারতীয় ক্রীড়া-জগতের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে তাই আজ অসংকোচে জেনারেল কারিয়াপ্পার অভিমতটিকে সমর্থন জানানো যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে, সফরের বিনিময়ে যদি ভারতীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়নের পথ পরিষ্কার না হয় তাহলে কিছুদিনের জন্যে দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণের আয়োজন বন্ধ রাখা হোক্। তাতে দুর্মূল্য বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হবে।

বলা হোক্ যে আগে নির্দিষ্ট মানে পৌঁছানো যাক্ তারপর সফরের চিন্তা। নির্দিষ্ট মানে পৌঁছবার চ্যালেঞ্জ থাকলে মানোন্নয়নের প্রেরণায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের উদ্বুদ্ধও করা যেতে পারে। আশানুরূপ মানে না পৌঁছেও যদি ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা বিদেশ সফরের পাশপোর্ট পেয়ে যান তাহলে কেনই তা তাঁরা আরও মেহনত ও আরও সাধনায় আগ্রহ দেখাবেন?

ক্রীড়া মানোন্নয়ন ছাড়া সফরের আর একটি উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো সে উদ্দেশ্য সফল হয়। কিন্তু বিদেশ সফরকারী ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের আচরণ সর্বক্ষেত্রে আদর্শ হয়ে ওঠেনি এমন অভিযোগও শোনা গিয়েছে। সম্প্রতি জ্যামাইকার কিংসটনে কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় যোগ দিয়েছিল যে ভারতীয় দল সেই দলের জনকয়েক কর্মকর্তার আচরণ ঘিরে আবার অভিযোগ উঠেছে। বে-সরকারী মহলের নয়, এবারের অভিযোগকারী স্বয়ং ভারত সরকার। এই অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলে ভারতীয় দলের বিদেশ সফরের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? বিদেশ সফর যদি ভারতীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়নে সহায়ক না হয়, বেহিসেবী কর্মকর্তাদের আচরণ যদি দু' দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে দেয় তাহলে সত্যিই সফর পরিকল্পনার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

জেনারেল কারিয়াপ্পা বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি রেখেই সফর বন্ধে সুপারিশ জানিয়েছেন। তবে আমাদের প্রশ্ন এই যে, কোনো দলের সফরের ব্যবস্থা পাকা করে তোলার অধিকার যে পরিষদের হাতে রয়েছে সেই পরিষদের কর্ণধার হয়েও জেনারেল কারিয়াপ্পা সফর বন্ধ বা সফর সঙ্কোচন করতে পারছেন না কেন? কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদে কি তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব অটুট নেই? তা যদি না থাকে তাহলে চেয়ারম্যান হিসেবে পরিষদের শোভা বর্ধন করা ছাড়া জেনারেল আর অন্য কি কাজেই বা লাগবেন?

জেনারেল কারিয়াপ্পা যে সময়ে সফর বন্ধের প্রস্তাব তুলেছেন ঠিক সেই সময়টিতেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিদায়ী সভাপতি বরদার মহারাজা ক্রিকেট সফরের আরও বাড়-বাড়ন্তের জন্যে প্রকাশ্যে ওকালতী জানিয়েছেন। শুধু ওকালতীই নয়, আরও মুঠো মুঠো বৈদেশিক মুদ্রা ক্রিকেটের প্রয়োজনে মঞ্জুর না করার জন্যে তিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে রোষে, ক্ষোভে প্রকাশ্যে ফুঁসিয়েছেন।

জেনারেল কারিয়াপ্পা ও বরদারাজ কেউই পরস্পরকে লক্ষ্য করে কোনো কথা বলেন নি, তবু দুজনের অভিমতে আকাশ-জমিন ব্যবধান থেকে গিয়েছে। জেনারেল বলছেন, সফর বন্ধ করো। আর বরদারাজের অভিমত, ক্রিকেট সফর বাড়াও এবং সেই সফরের উদ্দেশ্যে ক্রিকেট বোর্ডের হাতে মুঠো মুঠো টাকা দাও।

ক্রিকেটের প্রয়োজনে আরও বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করতে হবে? কেন?

গত আট বছরের দিকে তাকিয়ে বলা যেতে পারে যে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরের ব্যাপারে ভারত সরকার ক্রিকেটের প্রতি যে দুর্বলতা দেখিয়েছেন সে দুর্বলতার বুঝি জুড়ি নেই! এতো টাকা আর এক মুদ্রা রাখী টেনিসের প্রয়োজনেও ব্যয় করা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

গত আট বছরে চাওয়া মাত্রই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কি পায় নি?

এই আট বছরে এম সি সি ও অস্ট্রেলিয়া দল দুবার করে এবং নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্থান, সিংহল, জিম সোয়ানটনের বাছাই দল, মোহনবাগানের জুবিলি উপলক্ষ্যে আর একটি বাছাই দল, উস্টার্স কাউণ্টি, লণ্ডন স্কুল ক্রিকেট দল ভারত সফর করেছে এবং সেই সব সফরের প্রয়োজন মেটাতে ভারত সরকারকে দরাজ মেজাজে বৈদেশিক মুদ্রাও উপুড় হস্ত করতে হয়েছে। তার ওপর এ বছরেই আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারত সফর করবে।

আট বছরে ডজনখানেক বিদেশী ক্রিকেট দলের বিদেশ সফরের দৃষ্টান্ত দেখে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে ক্রিকেট সম্বন্ধে সরকারী নীতি এমন অকৃপণ কেন? কোন্ মানসিক বিলাস চরিতার্থ করতে ভারত সরকার আজ ক্রিকেটের মনোরঞ্জনে অন্য খেলার প্রতি অবিচার করছেন?

আসল কথা, জাতীয় ক্রীড়ামানের উন্নয়ন সাধনে সরকার মুখে মুখে যতোই সাধু সংকল্প উচ্চারণ করুন না কেন, রীতি-নীতি অনুসরণে সরকারী ভূমিকা খেয়ালীপনায় পরিপূর্ণ। তাই একের ক্ষেত্রে সুবিচার করলেও অন্যের ক্ষেত্রে অবিচার করতে সরকারী বিবেকে বাধে না। তাছাড়া কোন্ পথে যে মুস্কিল আসানের আবির্ভাব ঘটবে সে সম্বন্ধেও সরকারের মনোভাব অস্পষ্ট।

এই অস্পষ্টতা আছে বলেই সরকার নিযুক্ত কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ হুট বলতে যখন তখন বিদেশীদের ভারত সফর এবং ভারতীয়দের বিদেশ সফর অনুমোদন করেন। আর সেই পরিষদের কর্ণধার জেনারেল কারিয়াপ্পাকে স্বমুখে পরিষদ অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করতে হয়। এই বিরোধের লক্ষণ জাতীয় স্বার্থে কল্যাণকর নয়।

কার কথা ঠিক, জেনারেল কারিয়াপ্পার না পরিষদের? অথবা বরদারাজের? ভারত সরকার সত্যাসত্য নির্ধারণে কবে আন্তরিকতা দেখাবেন?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ছয় ।।

সে রাতে পঞ্চায়েতের সভা বসল।

প্রবোধী সাউ প্রশ্ন করল, গণপতিভাই, সুন্দরীর মেয়ের বিষয় কিছু ভেবেছ? যে স্কুলে পড়তো সেই স্কুলেই আবার পাঠিয়ে দাও। তুমি কি বল?

গণপতি উত্তর দিল—পঞ্চায়েতের রায় আমি মেনে নিতে বাধ্য।

শুনে সকলেই খুশি হল। উত্তম কথা। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। প্রায় এক কথায় সভা ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু গণপতি আবার একটি প্রশ্ন করে বসল, ওখানে কি প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হবে?

প্রবোধী ওর প্রশ্ন শুনে বিস্মিত চোখ মেলে বলল, টাকা না পাঠালে চলবে কেন? বিনে পয়সায় তো আর পড়াশোনা হয় না।

কিন্তু কত টাকা লাগবে?

প্রবোধী ওর প্রশ্ন শুনে এবার তাকাল রামাশীষের দিকে। সভার এক দিকে মেরীকে পাশে নিয়ে বসে ছিল ও। প্রবোধীর নির্দেশ মত মেরীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, প্রতি মাসে ওখানে কত টাকা লাগে। তারপর সেটা আবার নিজের ভাষায় সভাকে জানাল, মাসে দেড় শ'।

অংকটা শুনে সকলের মুখে-চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। সকলেই অবাক হয়ে অংকটাকে মুখে মুখে আড়ষ্ট উচ্চারণ করল, দেড় শ'।

আর, বিস্ময়াহত বেদনায় গণপতির কন্ঠস্বর থরথর করে কেঁপে উঠল, এত টাকা?

প্রবোধী বলল, এতে তোমার ভাবনার কি আছে? পোস্ট-অফিসেই সুন্দরীর পাঁচ হাজার টাকা ছিল। আর সে সময়ে তো কথাও ছিল যে তুমি মেরীকে দেখবে।

গণপতি প্রথমটা থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করেও থাকা যায় না। সকলেরই উদগ্রীব চোখ ওর দিকে। তাই আবার মুখ খুলতে হল, কিন্তু আমি তো সমস্ত টাকাই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি দুটো মোষ কেনবার জন্যে।

কিন্তু ওর সব কথাটা শেষ হবার আগেই প্রবোধী গর্জে উঠল, সুন্দরীর টাকা দিয়ে মোষ কেনা? পিটিয়ে তোমার হাড় ভেঙে দেব শয়তান কোথাকার!

উত্তরে গণপতি যেন কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে কোনক্রমে সামলে নিল নিজেকে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। টাকা আমি দিয়ে দেব।

এবার সত্যি সভা ভঙ্গ হল। সকলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার ঘরে ফিরল।

কিন্তু তখনো গণপতির আসল মতলবটা কেউ বুঝে উঠতে পারে নি। সকাল হতে না হতেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল...গণপতি পালিয়েছে, ওর ঘরের দরজা হাট করে খোলা। এমনিতেই জিনিসপত্তর ওর তেমন কিছু ছিল না, দেশে যাবার জন্যে একরকম তৈরী হয়েই ছিল। আশা ছিল কোম্পানীর কাছে সুন্দরীর যে বাকী টাকা এখনো পাওনা আছে, সেটা পেলেই চলে যাবে। কিন্তু তার আগেই যে এই বিপদ এসে হাজির। এখন কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচে। ইতিমধ্যে যা পেয়েছে—সে ওর জীবনে কোনদিন স্বপ্নেও সম্ভব হত কিনা বলা যায় না। আর বেশি লোভে কাজ নেই। রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চোরের মত সরে পড়েছে গণপতি।

সকালে কাজে যাবার মুখে ব্যস্ত থাকে সবাই। ঠিক হল—বিকেলের মধ্যে যদি না ফেরে গণপতি তো ছুটির পর কাজ থেকে ফিরে এসে থানায় জানাবে ব্যাপারটা। হলও তাই — বিকেলের মধ্যে ফিরল না গণপতি। থানায় খবরটা জানিয়ে এল প্রবোধী স্বয়ং। ক্রমে একদিন গেল, দুদিন গেল। সপ্তাহ কাটল, মাস শেষ হবার উপক্রম... কিন্তু গণপতি আর ফিরল না।

এখন সম্বল কোম্পানীর কাছে সুন্দরীর গ্র্যাচুইটির দরুণ শেষ পাওনা—সামান্য তেরশ' টাকা। পঞ্চায়েত উপায়ান্তর বিহীন হয়ে কোম্পানীকে জানাল, এখন থেকে সুন্দরীর টাকার ওয়ারিশ হল মেরী, আর গণপতি নয়, তারা এই মর্মে পঞ্চায়েতের আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিল।

এবার কোম্পানী বিরক্ত হল। পঞ্চায়েত এক একসময় এক একজনকে এনে হাজির করছে সুন্দরীর পাওনা টাকার ওয়ারিশ হিসেবে। আজ যে সিদ্ধান্ত নেয়, কালই আবার সেটা নাকচ করে অন্য সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে কাজ চলে না। ও-সব ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। কোর্ট মারফৎ আগে এর একটা ফয়সলা হওয়া দরকার। যতদিন না সেটা ঠিক হচ্ছে, কোম্পানী আর একটা পয়সাও দেবে না কারো হাতে।

।। সাত ।।

মেরী এখন এই শ্রমিক মহল্লার সকলের একজন। তাই সকলেরই দায়িত্ব আছে ওর সম্বন্ধে। অতএব পঞ্চায়েত ঠিক করল—সাধ্যমত সকলকে কিছু কিছু সাহায্য করতে হবে। প্রথম প্রথম উৎসাহ বেশি থাকে, অতএব সকলে রাজি হয়ে গেল। আপত্তি শুধু একজনের পক্ষে মেরীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। সত্যি, কে নেবে ওর দায়িত্ব। একবার ঘাড় পাতলে, কে জানে, হয়ত তাকেই সারাজীবন এই দায়িত্ব বহন করে যেতে হবে। তার চেয়ে যৌথ দায়িত্ব থাকাই শ্রেয়।

প্রথম কিছুদিন অবশ্য তেওয়ারির কাছেই রইল মেরী। কিন্তু ও এখানে একা থাকে, মেরীকে রেঁধে খাওয়ান ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া অনেক সময় তো চার পাঁচ দিন বাড়িতেই ফেরে না তেওয়ারি। সাহেবদের দূরে কোথাও যাবার প্রয়োজন হলে ওকেই গাড়ি নিয়ে যেতে হয়। তাই সাব্যস্ত হল এক একদিন একজনের বাড়িতে খাবে মেরী।

আগের মত মেরী আর সেই অবুঝ মেয়ে নয়। এই এক মাসেই ওর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অবস্থা মানুষকে এমনি করে।

বোধহয় গড়ে উঠতে সাহায্য করে। শিলং-এর কনভেন্টে ফিরে যাবার জেদটাই যে শুধু নেই, তা নয়, আকাঙ্ক্ষাটাও ভুলে গেছে। এখন ভোর না হতেই বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠ মেরী। সারা সকালটা এক মনে খেলা করেই মাঠে। দুপুরে খাবার আগে বারোয়ারী কলতলায় সকলের সঙ্গে ওদের মত হুড়োহুড়ি করে স্নান করে। তারপর যে বাড়িতে ওর সেদিন খাবার বরাদ্দ করা থাকে—সেখানে গিয়ে হাজির হয়।

তারপর আবার সারা দুপুর খেলা, শেষ হয় যখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে মহল্লার আনাচে কানাচে। সঙ্গী সাথীরা খেলা সাঙ্গ করে যে যার ঘরে ফিরে যায়। মেরী কেবল একা। সকলেরই রাতে মাথা গুঁজবার ঠাঁই আছে,—মেরীর তো তা নেই। এত বড় পৃথিবীতে ও শুধু একা। খেতে দিতে যদিও বা রাজি হয় কেউ কেউ—আশ্রয় দিতে চায় না কেউ। অবশ্য ওর জন্যে একটা থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে সকলে। কুস্তির আখড়াটা রাত্রে খালিই পড়ে থাকে। তিন দিকে দেওয়াল তোলা, মাথার ওপর করুগেটেও সীটের চালা তোলা একটা ঘর—রাত্রে সেখানেই শোয় মেরী।

রাতটাই মেরীর কাছে একটা জীবন্ত বিভীষিকার মত মনে হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনমানের সেই পরিচিত পৃথিবীটা যেন কোন অতলান্তে ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। নিঝুমে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে এত বড় মহল্লাটা। মাঝে মাঝে দূরে দূরে কুকুর ডেকে ওঠে। ঝিঁঝির একটানা সংগীত যেন ওর কানের কাছেই বেজে চলে। কারখানার প্রকান্ড দানবাকৃতি মেসিনগুলোর ঝকঝক শব্দ যেন থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। নিঃসীম ভয়ে বুকের মধ্যে হৃদপিন্ডটা যেন এক একসময় হঠাৎ বিকল হয়ে ওঠে।

প্রথম প্রথম রাত্রে খাটিয়ায় আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে পড়ে থাকত মেরী। এক একবার কেমন যেন সন্দেহ জাগত মনে। কম্বলটা একটু ফাঁক করে সভয়ে তাকিয়ে থাকত আখড়ার সংলগ্ন মাঠটার দিকে। না...কিছু নয়। পালোয়ান রামপ্রসাদ তোফা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। যাক তবু নিশ্চিন্ত। আবার কম্বলটাকে ভাল করে মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

রাতটা কাটলে তবে যেন প্রাণ ফিরে পায় মেরী। ভোর না হতেই বস্তির ছেলেমেয়েরা এসে জড় হয়। আজকাল ওদের ভাষাও কিছু কিছু আয়ত্ত করে ফেলেছে মেরী। ওরা ডাকে—মিরি...এ মিরিয়া... আও...চল ...খেলি।

মেরী ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে উত্তর দেয় আমি খেলব ?...

সেই খেলা শুরু হয়। এখন আর ওকে ঘিরে কারো কোন কৌতূহল নেই। আগের মত ওকে ঘিরে উৎসুক জনতার ভিড় লেগে যায় না প্রতি পদে। এখন ও সকলের একজন।

তবু ওকে এক নজরে দেখেই বোঝা যায় মেরী এদের থেকে স্বতন্ত্র, জাত আলাদা।

আজও আগের মত পায়ে জুতো পরার অভ্যেসটা ছাড়তে পারে নি। কয়েক জোড়া ভাল ভাল জুতো ছিল ওর—সেগুলোকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে। মোজাগুলো ময়লা হয়ে গেছে। কোনটা বা ইতিমধ্যে ছিঁড়ে গেছে—তাই পরিপাটি করে পরে। মাথায় বব-ছাঁট সেই সোনালী চুলের বিন্যাস আর নেই। তেলহীন রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলো তামাটে রং হয়ে কান পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। সুন্দর সুন্দর কাটছাঁটের ফ্রকগুলোর দশাও প্রায় তাই। কতদিন যে ওগুলোতে সাবান পড়েনি তার ঠিক নেই। তবু সেগুলো পরলে আজও কত সুন্দরই না দেখায় মেরীকে।

তবু যেন মাঝে মাঝে খেলায় অরুচি আসে ওর। হঠাৎ সংগী সাথীদের ওপর অকারণেই রেগে ওঠে। ও যে আলাদা, এদের একজন নয়—সেটা জাহির করার চেষ্টাও করে নিজের আচরণে। কেউ ওর কথা না শুনলেই খেপে ওঠে, তবে আমি খেলব না। বলেই খেলা ছেড়ে এক পাশে সরে এসে বসে পড়ে।

বস্তির ছেলেমেয়েরা কিন্তু ওর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন। নিজেরাই আপন মনে খেলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার অস্থির হয়ে ওঠে মেরী। নিজে থেকেই খেলা শুরু করে দেয়। কিন্তু পরের বার আর নিজে দল ছেড়ে বেরিয়ে যায় না, বরং যারা ওর কথা শোনে না তাদেরই দল থেকে তাড়িয়ে দেয় জোর করে। শুরু হয় ঝগড়া। ওরা সকলে তখন একদিকে—আর একদিকে মেরী একা। কিছুতেই একা ওদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। লেগে যায় ঝুটোপুটি, এমন কি ধুস্তাধস্তি। শেষ পর্যন্ত পরাজিত মেরী একপাশে বসে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

দিনে দুবার খাওয়া জোটে মেরীর। প্রথম প্রথম কষ্ট হত, কিন্তু এখন তাও সহ্য হয়ে গেছে। দুপুরে বারোয়ারী কলতলায় স্নান সেরে হাজির হয় নির্দিষ্ট বাড়িতে। সেখানে ওর জন্যে সযত্নে ভাত কোলে করে কেউ বসে থাকার লোক নেই! অনাদরে অবহেলায় ওর সামনে এক থালা ভাত হয়ত এগিয়ে দেয় রামপিয়ারী। উবু হয়ে বসে এক নিমেষেই হাপুস হুপুস করে নিঃশেষ করে ফেলে থালাটা। তারপর কলতলায় এসে হাত ধুয়ে আবার লেগে যায় খেলতে। রাতে জোটে রুটি। সাত-সন্ধেতেই এখানে খাওয়ার পাট চোকানই রীতি। মেরীও খেয়ে নেয়। তারপর ভয়ে ভয়ে এসে হাজির হয় নিজের আস্তানায়। হয়ত তখনো কোন পালোয়ান ডন-বৈঠক টেনে চলেছে। মাঝে মাঝে ওঠে দাঁড়িয়ে সশব্দে গা চাপড়াচ্ছে। মেরীকে দেখে নির্বিকার গলায় বলে, খাওয়া হয়ে গেছে মেরী? এবার শুয়ে পড়। ভয়ের কিছু নেই। আমি এখানেই আছি।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজের নির্দিষ্ট খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে ততক্ষণে গায়ের ওপর কম্বলটা ভাল করে টেনে দিয়েছে মেরী।

সকালে এক একদিন ঘুম ভেঙে খিদের জ্বালা অনুভব করে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে কি যেন ভাবে মনে মনে। তারপর গিয়ে হাজির হয় রামাশীষের ঘরে। একমাত্র এই লোকটাই ওকে আজও অন্য চোখে দেখে। মাঝে মাঝে খাবার জন্যে পয়সা দেয় দুটো ভাল কথাও বলে।

মেরী আব্দার করে,—চাচা...পয়সা দাও, খিদে পেয়েছে।

অবশ্য রোজ রামাশীষকে ঘরে পাওয়া যায় না। কখন আসে, কখন যায় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু একবার দেখা পেলে পয়সা না নিয়ে নড়ে না। ওর এই আব্দারের ধরন দেখে হাসে রামাশীষ। দু এক আনা পয়সা যা থাকে হাতের কাছে দিয়ে দেয় ওকে।

পয়সা হাতে এসে গেলে আর দাঁড়ায় না মেরী—একছুটে এসে হাজির হয় মহল্লার বাইরে তেলেভাজার দোকানের সামনে। গরম গরম আলুর চপ্ শালপাতার ঠোঙায় নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে। ভয় হয়, বস্তির অন্য ছেলেমেয়েরা কেউ ওকে দেখে ফেল্লেই বিপদ। ঠিক চেয়ে বসবে। অথচ না দিয়েও উপায় নেই। এমন করে চায় যে মেরী কিছুতেই না বলতে পারে না।

এখন ওদের স্বভাবটা জানা হয়ে গেছে ওর। তাই আর ওরা চাইলে, কান দেয় না। কিন্তু ওরাও ছাড়তে চায় না। এক একসময় আচমকা ওর হাত থেকে শালপাতার ঠোঙা সমেত আলুর চপ্‌টা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুটে পালায় মহল্লার মধ্যে। প্রথমটা হক্‌চকিয়ে ওঠে মেরী। তারপর বিহ্বলতাটাকে কাটিয়ে ওঠে ছুটতে শুরু করে ওর পেছন পেছন। নাগালের মধ্যে পেলেই পেছন থেকে চুলের ঝুঁটি ধরে প্রচন্ড একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই মাটিতে পড়ে যায় মেয়েটা। কিন্তু যন্ত্রণায় কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারে না—অন্তত মেরীর মুখের সেই ভোজ্য বস্তুটা যতক্ষণ না চালান করে দিতে পাচ্ছে নিজের পাকস্থলিতে।

রাগ আর প্রতিহিংসায় দপ করে জ্বলে ওঠে মেরী। দিশেহারার মত নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঞ্চির ওপর, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মারতে শুরু করে। কিন্তু খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঞ্চি ওর মারটা মুখ বুজে হজম করে যায়। তারপর এমন ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে যে সারা মহল্লার বুক তোলপাড় করে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। পাঞ্চির মা ময়না ঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। মেয়ের অবস্থা দেখে প্রথমটা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরই সক্রোধে চেপে ধরে মেরীর চুলের ঝুঁটি। এক হ্যাঁচ্‌কা টানে ওকে সরিয়ে আনে অন্যদিকে, তারপর চটাপট কীল, চড়, লাথি মেরে চলে মেরীর সর্বাঙ্গে।

যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলে মেরী। কোনক্রমে ময়নার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে দূরে ছুটে পালায়। তারপর সেখান থেকেই অভিযোগ জানায়, আমার খাবার পাঞ্চি খেল কেন?

খেয়েছে তো কি হয়েছে? ময়নাও পাল্টা অভিযোগ করে,...কাল তুই আমার বাড়িতে ভাত খাস নি? আর আজ তুই আমার মেয়েকে মারছিস। এর মজা টের পাইয়ে দেব।

ব্যাপারটা কিন্তু এইখানেই শেষ হয় না। খেলার সময় কেউ মেরীকে দলে নিতে চায় না। পণ্টি সঙ্গীদের বারণ করে।

মেরীও পিছু হটবে না কিছুতেই। বলে—আমি খেলবই।

তোকে আমরা খেলতে নেব না।

মেরী তবু সংকল্পে অটল। কেউ ওর সঙ্গে না খেলে তো তাতেই বা ওর কি! ও নিজেই খেলবে!

ওদিকে ওরাও সংকল্পে অচঞ্চল। ফলে শুরু হয় সংঘাত। ওরা মেরীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। মেরীও আঘাত হানে। আর যায় কোথায়। মুহূর্তে মারামারি লেগে যায়।

আচমকা মার খেয়ে ককিয়ে কে'দে ওঠে মেরী। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিহিংসায় খেপে ওঠে। দুহাতে এলোপাথাড়ি ঢিল ছু'ড়তে থাকে ওদের দিকে। প্রতিপক্ষের কাতরানির শব্দে মহল্লার আকাশ-বাতাস নিমেষে ভারি হয়ে ওঠে।

এরপর শুরু হয় আসল যুদ্ধ। যারা মার খেল তাদের মায়েরা দলবদ্ধভাবে ছুটে এল। কিন্তু মেরী তাদেরও সতর্ক করে দিল...খবরদার, এক পা এগুলে আজ আর রক্ষে নেই। হাতের ঢিল অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করবে।

কিন্তু মুখে যা বলল সত্যি সত্যি যে সেটা কাজে করে বসবে মেরী বোধহয় ওরাও ভাবতে পারে নি। নির্ঘাত খেপে গেছে মেয়েটা! একটা ঢিল বুলেটের মত এসে আঘাত করল পণ্টির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্তচিৎকার করে ধরাশায়ী হল পণ্টি। সারা মহল্লার যে যেখানে ছিল কান্নার শব্দ শুনে ছুটে এল। চারদিকে নিদারুণ চীৎকার চে'চামেচি শুরু হয়ে গেল।

উপস্থিত সকলে মেরীর রণং-দেহি মূর্তি দেখে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে পড়ল। তারপর সক্রোষে তেড়ে গেল ওর দিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে মেরীরও হাত চলল দ্বিগুণ বেগে। শুধু একটা নয়, পর পর ছু'ড়েই চলেছে ঢিল। ঢিল তো নয়, যেন এক একটা কামানের গোলা ছুটেছে—সামনে এগোয় কার সাধ্য!

এবার সকলের টনক নড়ল—না এভাবে মেরীকে নিবৃত্ত করা যাবে না। যে যার ঘরে ছুটে গিয়ে হাতের কাছে যা পেল, তুলে নিয়ে আবার ফিরে এল যুদ্ধক্ষেত্রে। আর মেরীও তেমনি অবিচল, উন্মাদের মত বেপরোয়া ঢিল ছু'ড়েই চলেছে। কত জন যে আহত হল, তার ঠিক নেই।

কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধটা থেমে গেল। কে যেন একজন পেছন থেকে গিয়ে সজোরে জাপ্টে ধরল মেরীকে। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল ও'র ওপর। যেন প্রতিহিংসায় টুকরো টুকরো করে ছি'ড়ে ফেলবে মেরীকে। চড়-লাথির বন্যা বয়ে চলল অবিশ্রান্ত। ভাগ্যিস সেই সময় কারখানার ছুটি হয়েছিল, পুরুষমানুষেরা হৈ হৈ করে এসে পড়তেই রণে ক্ষান্ত দিল মেয়েরা। কোনরকমে টেনে হি'চড়ে মেরীকে ওরা সরিয়ে আনল ভিড় থেকে। ততক্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে মেরীর সর্বাঙ্গ, মুখটা অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে এর মধ্যে। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। মুখের দুকষ বেয়ে তাজা রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। গায়ের জামাটা শতছিন্ন হয়ে ঝুলঝুল করছে—চেনাই যাচ্ছে না মেরীকে।

আট

এমনি করে দীর্ঘ ন' মাস কেটে গেল। শেষের দিকটা যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চোখ দুটোতে অবসন্নতার সুস্পষ্ট ছাপ। মাথায় একরাশ বিবর্ণ জটা ঝুলছে। গায়ের রং কালো হয়ে গেছে। শীর্ণ হয়ে উঠেছে ওর বাড়ন্ত দেহটা। কেবল পায়ে আজও পরে আছে একজোড়া জুতো—তবে শতছিন্ন। জুতোর সোলটা খুলে গেছে। চলবার সময় সেটা লটপট্ করে। মোজাটার অবস্থাও তাই। বোঝাই যায় না জিনিষটা আসলে কি। মনে হয় যেন কোন ঘেয়ো রুগীর পায়ের ব্যান্ডেজ। তবু ওটা পরা চাই মেরীর। তা না হলে আজও ও জুতো পরতে পারে না।

এর মধ্যে একবার নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিল মেরী। প্রবল জ্বরে যেন বেহু'সের মত রাতদিন পড়ে থাকত কুস্তির আখড়ার পাশে নিজের আস্তানায়।

প্রথম শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তীরের ফলার মত এসে ঢুকতো ঘরে। মাথার ওপর করোগেটের চালা, আর একদিকে খোলা ঘরখানায় শীতের দাপটটা যেন বেশি বেশি মনে হয় মেরীর। থেকে থেকে
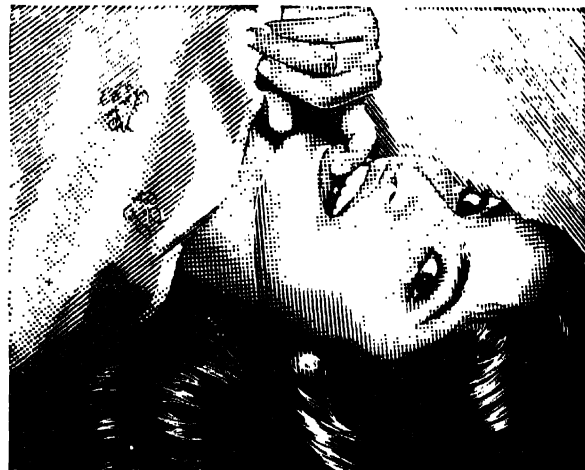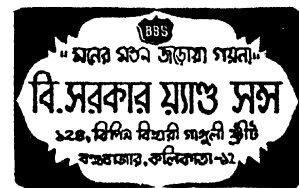
ওর অচৈতন্য দেহটা থরথর করে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু কঠিন প্রাণ বলতেই হবে ওর। তা না হলে কি করে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে জীবনটাকে ধরে রাখতে পারল। তবে মহল্লার লোকেদের কাছে মেরীর মাথা-খারাপের লক্ষণটা ধরা পড়ে সেই থেকে।

নিজের মনেই ঘুরে বেড়াত মেরী। খিদে পেলে কারো দরজায় গিয়ে হাজির হত। যদি দয়া করে কেউ কিছু দিল তো নির্বিকারভাবে খেয়ে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। না দিলেও আপত্তি নেই। আবার আপন মনেই ঘুরে বেড়াতে শুরু করত, খিদের অনুভূতিটা এমনি করেই হারিয়ে ফেলত।

চোখেও ইদানীং কম দেখত মেরী। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেই সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে উঠত চোখের সামনে। কিন্তু কেউ জানত না সে কথা। অবশ্য কারো জানবার কথাও নয়। কিন্তু পর পর দুটো ঘটনা ঘটতে দেখে সকলে তখন জানতে পারল।

কয়েকদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিনও পঞ্চায়েতের সভার কাজ চলছিল।

অবশ্য বিষয়টা আর মেরীকে নিয়ে নয়। মেরী এখন কোন এক সুদূর অতীতের একটি বিস্মৃত অধ্যায় মাত্র। তাকে নিয়ে আর আলোচনার কী আছে...।

সভার কাজ চলছিল খুব মনোযোগের সঙ্গে। হঠাৎ পঞ্চায়েত ঘরের পেছনে ভীষণ একটা শব্দ হতেই সকলে যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। কারণটা কি জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে অনেকে হ্যারিকেন হাতে তাড়াতাড়ি ছুটে এল ঘরের বাইরে। চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল। কিন্তু কোথাও তো কিছু চোখে পড়ছে না। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। পেছনটা এমনিতেই ফাঁকা—কেবল সার সার জলের কল লাগান একটা দেওয়ালের গায়ে। পাশেই মস্ত একটা হাইড্রেন্ট। আর কিছু নেই এদিকটা। না...তাহলে অন্য কিছু। সকলে একরকম ফিরেই আসছিল। হঠাৎ নর্দমার ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত থল্ থল্ শব্দ ভেসে আসতেই, ওরা আবার থমকে দাঁড়াল। তারপর নর্দমার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে উঁকি মারল—কী যেন একটা ভাসছে নর্দমার ময়লা জলের সঙ্গে? তারপরই সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল,—এ আর কেউ নয়...সুন্দরীর মেয়ে মেরী!

তাড়াতাড়ি ওকে নর্দমা থেকে তুলে এনে জোর করে বসিয়ে দিল কলতলায়, বালতি বালতি জল ঢেলে স্নান করিয়ে ওর গা থেকে ময়লা ধুয়ে দেয় হল। তারপর ওর অচৈতন্য বেহুঁস দেহটাকে সকলে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল ওর নির্দিষ্ট জায়গায়।

আরেকবার ওকে এই মহল্লার কুকুরে কামড়াল। কুকুরটার কোন দোষ নেই। সন্ধ্যের সময় রাস্তার একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ ওর গায়ের ওপর কী একটা ভারি জিনিস এসে পড়তেই আচমকা কামড়ে ধরল মেরীর পাটা। সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাহি চিৎকার করে কেঁদে উঠল মেরী। কিন্তু তবু কুকুরটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। পাগলের মত পর পর কয়েকটা জায়গায় কামড়েই চলেছে। কুকুরটাকে প্রাণ-ভয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছে মেরী আর সমানে চিৎকার করে চলেছে...মরে গেলাম বাঁচাও...

ওর চিৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে এল। তবে কিন্তু কুকুরটার তবু নড়বার নাম নেই। কামড়ে কামড়ে ওর পাটাকে ততক্ষণে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছে। কে যেন একজন তখুনি ছুটে গিয়ে একটা লাঠি নিয়ে এসে দমাদম পেটাতে লাগল কুকুরটাকে। কুকুরটাও আচমকা মার খেয়ে ওকে ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল। তারপর নিমেষে ওদিকে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ধরাধরি করে তখুনি ওকে নিয়ে গিয়ে শোয়ান হল ওর আস্তানায়। তাজা রক্তে সর্বাঙ্গ যেন ভেসে যাচ্ছে মেরীর। কারখানার হাসপাতালে ওকে দেখান হল পরের দিন সকালে। কিন্তু তাদেরও কিছু করার নেই। কেবল শ্রমিক এবং শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্যে কোম্পানীর হাসপাতালে সাহায্যের নিয়ম আছে। কিন্তু মেরী তো কারো আপনজন নয়। তাই তার চিকিৎসা করতে পারবে না ওরা,—সাফ বলে দিল। ওদের জন্যে আছে সরকারী হাসপাতাল, সেখানে যাক্।

কিন্তু কে আর সে ব্যবস্থা করে। দু'-একদিন নিজেই যন্ত্রণায় কষ্ট পেল মেরী। তারপর আবার যে কে সেই—আগের মতই মহল্লার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে সুরু করল।

অনেকের ধারণা, কুকুরে কামড়ানির পর থেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল মেরী। তা না হলে সকলকে এমন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যখন-তখন কামড়াতে তেড়ে যাবে কেন?

হয়ত বা তাই। কারণ জলের ওপর ওর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ বেড়েছে। কলতলায় মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত এসে উদয় হয় মেরী। ওকে দেখলেই আজকাল সভয়ে

সয়ে যায় সকলে। প্রাণভয়ে জল খেয়ে আবার ধীরে ধীরে কোথায় চলে যায়।

আজকাল মেরীকে সবাই ভয় করে। কে জানে, কখন কাকে কামড়ে বসে! ইতি-মধ্যে দু-তিনজনকে কামড়ে দিয়েছে। তাই যে যার ছেলেমেয়েকে সামলাতেই ব্যস্ত। সকলেই মনে মনে কামনা করে কবে এই আপদ বিদেয় হবে মহল্লা থেকে!

মাঝে মাঝে কয়েক দিন ওর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। তখন সকলে নিশ্চিন্ত হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। কিন্তু ধূমকেতুর মত আবার একদিন এসে হাজির হয় মেরী।

শুধু আতঙ্ক নয়, একটা অশরীরী কায়ার মত সারারাত মহল্লার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় মেরী। যার ঘরের সামনে দিয়ে চলে যায় সেই টের পায়। দুপায়ে ছেঁড়া দুটো জুতো হাঁটার তালে তালে সমানে ফটরপটর শব্দ করে চলেছে। নিঝুম রাতের বুক ভেদ করে ওর পেছন পেছন মহল্লার এক পাল কুকুর ডেকেই চলেছে। ক্রমে ক্রমে শব্দটা দূরে সরে যায়। তারপর এক সময় মিলিয়ে যায় দূরে থেকে দূরান্তে।

কিন্তু একবারে শেষের কয়েকটা দিন প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে ছিল মেরী। জ্বরে অচৈতন্য দেহটা থেকে থেকে হঠাৎ কেঁপে উঠত। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়া-হুড়ি ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসত। কেমন একটা দিশাহারা দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। তারপর আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ত মাটিতে। কিন্তু কেউ যদি কাছে এসে দাঁড়াত, ঠিক টের পেত মেরী। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে যেত তার দিকে!

সেদিনও হঠাৎ হাজির হল কলতলায়। তখন স্নানের ভিড় লেগে গেছে কলতলায়। মেরীকে দেখে সকলে প্রথমটা বিহ্বল হয়ে উঠল। তারপর সকলে রুখে দাঁড়াল ওর দিকে......ভাগ......ভাগ হিঁয়াসে......

অন্যদিন হলে তক্ষুণে ওদের দিকে তেড়ে যেত মেরী। আর তাই দেখে সভয়ে দূরে সরে দাঁড়াত সকলে। কিন্তু কি ভেবে কিছুক্ষণ ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার ফিরে চলল আপন মনে।

ওরা মেরীকে জল খেতে দিল না। একটু দূরেই রয়েছে গঙ্গা। সেখানেই আশ মিটিয়ে জল খেতে পারে ও। তাই বোধহয় মহল্লার পেছনের ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে হাজির হল এই নির্জন জায়গায়। সোজা এগিয়ে গেল গঙ্গার দিকে। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে দু হাত জড়ে জল তুলে নিল মুখের কাছে, চক্ চক্ শব্দ করে অনেকক্ষণ জল খেল। তারপর আবার উঠে এল জল থেকে। এসে দাঁড়াল একটা ঝোপের পাশে। আবার পেছন ফিরে তাকাল গঙ্গার দিকে। এতক্ষণে যেন নদীটাকে চোখে পড়ল।

সেদিকে অনেকক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল মেরী। তারপর আবার পেছন ফিরে তাকাল যেখানে শান্তির নিবিড় মায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বত্থ বট আর পিটুলী গাছ-গুলো।

সেদিকেও অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেরী। তারপর আবার চলতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কিন্তু তখুনি আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। শুধু একবারই নয়, হাতের ওপর ভর দিয়ে নিচু হয়ে ঝুলে পড়া মাথাটাকে সোজা করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল অনেকবার। কিন্তু আর পারল না মেরী। তারপর কখন এক সময় মাটির বুকে ঢলে পড়ল।

—শেষ—

অঙ্গনা

প্রমীলা

এবার পুজায় নতুন শাড়ী

ফ্যাশান শো

বাংলার মসলিন আজ ইতিহাসের সামগ্রী। বাগদাদ, রোম, চীন কাঞ্চনমূল্যে যে জিনিসটি ক্রয় করতো তা আমাদের চোখে দেখার সুযোগ পর্যন্ত হলো না। পূর্ব-পুরুষের এক সম্পদশালী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা। এ বঞ্চনার ইতিহাস সুবিদিত। মসলিন অবলুপ্ত হলেও শাড়ীর উত্তরাধিকারে আমরা আজও গরীয়ান। বাংলাদেশের বালুচর, টাঙ্গাইল, ধনেখালী, শান্তিপুর এক্ষেত্রে বিরাট ঐতিহ্য। কুটিরশিল্পজাত এই সম্পদ কিন্তু অশিক্ষিত অথচ বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার-প্রাপ্ত সাধারণ তন্তুবায়ের সৃষ্টি। এই অসাধারণ সৃষ্টির পশ্চাতে ছিল তাঁদের মজ্জাগত শিল্পবোধ এবং এই শিল্পবোধেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো তাঁদের সৃষ্টি—সৌন্দর্যের মাধুরীতে ঝলমল করতো। তাই মিলের শাড়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও উপযুক্ত স্থানে নিজের আসন নির্দিষ্ট রেখেছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পাল্লায় পড়ে এই শিল্প এবং শিল্পীর দল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। কয়েকটি শাড়ীর ঐতিহ্য থেকে আবার আমরা বঞ্চিত হবার মুখোমুখি হলাম।

কিন্তু এই শিল্পকে রক্ষার এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হলেন। পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু তন্তুবায় ও শিল্পীদের নিজস্ব শিল্পধারা রক্ষণাবেক্ষণে উৎসাহ এবং সাহায্য জোগালেন। ভেঙে পড়া লোকগুলো এই উৎসাহে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁরা আবার কোমর বেঁধে আসরে নামলেন। টাঙ্গাইল এবং বালুচর শাড়ীর ঝলমলানিতে আবার বরতনু সুশোভিত হলো। সেই সঙ্গে শান্তিপুর-ধনেখালী তো ছিলই। কিন্তু সর্বত্রই একটা গতিবেগ সঞ্চারের প্রয়োজন ছিল। সরকারী প্রচেষ্টায় সেই উদ্দিষ্ট গতিবেগ যে সঞ্চারিত হয়েছে তার প্রমাণ সেদিন হাতেনাতে পাওয়া গেল। 'রিফিউজী হ্যাণ্ডিক্রাফটস্'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রাক্-পুজা ফ্যাশান শো'য়ে।

চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরে পূজার উপাচার হস্তে চিরাচরিত বাঙালী গৃহবধূ যখন আসরে প্রবেশ করে তখন শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির মাধ্যমে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঐতিহ্যের এমন অকৃত্রিম প্রকাশ এবং পরিবেশ রচনায় সকলেই খুশি। তারপর শুরু হলো বর্ণাঢ্য শাড়ীর মিছিল। টাঙ্গাইল, রাজবলহাট, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, ছাপানো তসর, ধনেখালী, খাদি সিল্ক, শান্তিপুরী, বালুচর সুতী ও সিল্ক, ঢাকাই, বাটিক প্রভৃতি শাড়ী সমারোহে ফ্যাশান শো গমগম করে ওঠে। প্রাতঃকালীন, সান্ধ্য আনুষ্ঠানিক শাড়ী এবং সেই সঙ্গে গয়না ও চুলের বাহার সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আধুনিকার অঙ্গে অঙ্গে শাড়ীর শোভা শুধু মনোরম নয় মনোহরও। বিভিন্ন রঙ এবং কারুকার্যমণ্ডিত টাঙ্গাইল শাড়ীতে উচ্চ শিল্পমান রক্ষিত। বালুচর শাড়ী বিরাট ঐতিহ্যের কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়। শান্তিপুরী, রাজবলহাট, ধনেখালী এবং অন্যান্য শাড়ীগুলিও প্রশংসনীয়।

ফ্যাশান শোয়ে আন্তর্জাতিক পরিচ্ছদও প্রদর্শিত হয়। একটি কোট বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোটটি রেয়ন এবং পাট তন্তুতে প্রস্তুত। এছাড়া ব্যাগগুলিও ভালই হয়েছে। আর এসবই আমাদের ঘরের শিল্পীরাই তৈরী করেছেন।

অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। তিনি লুপ্তপ্রায় কয়েকটি শাড়ীর পুনরুজ্জীবনে রিফিউজী হ্যাণ্ডিক্রাফটস্-এর প্রশংসা করেন এবং ফ্যাশান শো'র গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রতি সকলের সহানুভূতি কামনা করেন।

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ফ্যাশান শোতে ভাষণ দিচ্ছেন। ফটো : অমৃত

পোশাকে সমন্বয়

সর্বক্ষেত্রে আজ অনুসৃত হচ্ছে সহাবস্থান নীতি। আচারে-ব্যবহারে, ভাবে-ভাষায়, শিল্প-সংস্কৃতিতে এই সহাবস্থান একটি নতুন পথের দিশারী। কিন্তু সহাবস্থান সূচনা মাত্র—শেষ পরিণতি মিলনে। সব সময় মিলন হয়তো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে রয়েছে মিশ্রণ। এই মিশ্রণের ফলে যে নতুনের আবির্ভাব ঘটবে তাকে আমাদের সাদরে বরণ করে নিতে হবে। এতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না—নতুনের মধ্যে যে রয়েছে আমাদের সবাকার তিল তিল সঞ্চয়।

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই এই মিলন এবং মিশ্রণ বিশেষ প্রচলিত। ভাবের আদান-প্রদান এর ফলে সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। এমনি করেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল গান্ধার শিল্পের। ভারত এবং গ্রীসের স্থাপত্যশিল্পের এই অভূতপূর্ব মিলন এবং মিশ্রণ ইতিহাসের পাতায় আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। সংস্কৃতির ভাবগত আদানপ্রদানের ফলে এই নবরূপ একান্ত অবশ্যম্ভাবী—মানুষের নৈকট্যকে

ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে এর অবদান অতুলনীয়। সেদিন বিস্তর বাধা ছিল, অনেক অসুবিধা ছিল। কিন্তু কোন কিছুই সে পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। আজ সুবিধা অনেক—প্রচেষ্টাও তাই বহুমুখী। শুধু কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নয় সর্বক্ষেত্রেই মানুষ মানুষের মনের কাছাকাছি দাঁড়াতে চাইছে—নিজের সঙ্গে অপরকে মেলাতে চাইছে। এই বৃহৎ প্রচেষ্টার সামগ্রিক রূপায়ণ বিলম্বিত হলেও প্রস্তুতি চলছে দ্রুততালে। আর এই প্রস্তুতি চলছে নানা-ভাবে—নানাপথে।

সম্প্রতি এরকম একটি অভিনব প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে পোশাকের ক্ষেত্রে। 'ইণ্ডিয়ান ফ্রেয়ার উইথ দি কন্টিনেন্টাল স্টাইল' শিরোনামায় সম্প্রতি একটি ইন্দো-জার্মান ফ্যাশান শো অনুষ্ঠিত হয় হাম্বুর্গে। উদ্যোক্তা ফ্যাশান স্কুলের শ্রীমতী মারিয়া মে। উদ্দেশ্য ভারতীয় শাড়ী, সিল্ক এবং সুচের কাজের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। যদিও দীর্ঘদিন ধরেই এসব জিনিসের কদর ইউরোপীয় বাজারে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। সেই সঙ্গে অন্যতম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় পোশাকের সঙ্গে ইউরোপীয় পোশাকের সমন্বয়সাধন। প্রদর্শনীতে দেখা গেছে যে উভয়ের সমন্বয়ে সান্ধ্য পোশাক এবং আনুষ্ঠানিক পোশাক বেশ মনোজ্ঞ হয়। ভারতীয় সিল্কও দর্শকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু শাড়ীর কাছে কোন কিছুই নয়। ভারতীয় শাড়ী আবার নতুন করে ইউরোপীয় রমণীকুলের মনে দোলা লাগায়।

ফ্যাশানে ঝলমল ইউরোপে কিন্তু শাড়ীর জুড়ি নেই। শাড়ী পরনে-চলনে যে মনোরম ছন্দমাধুর্যের সৃষ্টি হয় ইউরোপীয় রমণীর তা একান্ত অনায়ত্ত। সেজন্য ফ্যাশান-ডিজাইনররা শাড়ী-পরিহিত এক রমণীর চিত্র প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে স্থাপন করেন। এতে শাড়ীকে তারা কিছুটা পরিবর্তিত করেছেন। শাড়ীর যে প্রান্তটি সাধারণত কাঁধের উপর থাকে সেটা আর একটি নামিয়ে দিলেই ইউরোপীয় রমণীর সান্ধ্য পোশাক মনোরম হয়। এই প্রান্তটুকু কাঁধের উপর রাখাটা তাদের পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক। আবার কাশ্মীরী শাল এবং উলের সুক্ষ্ম
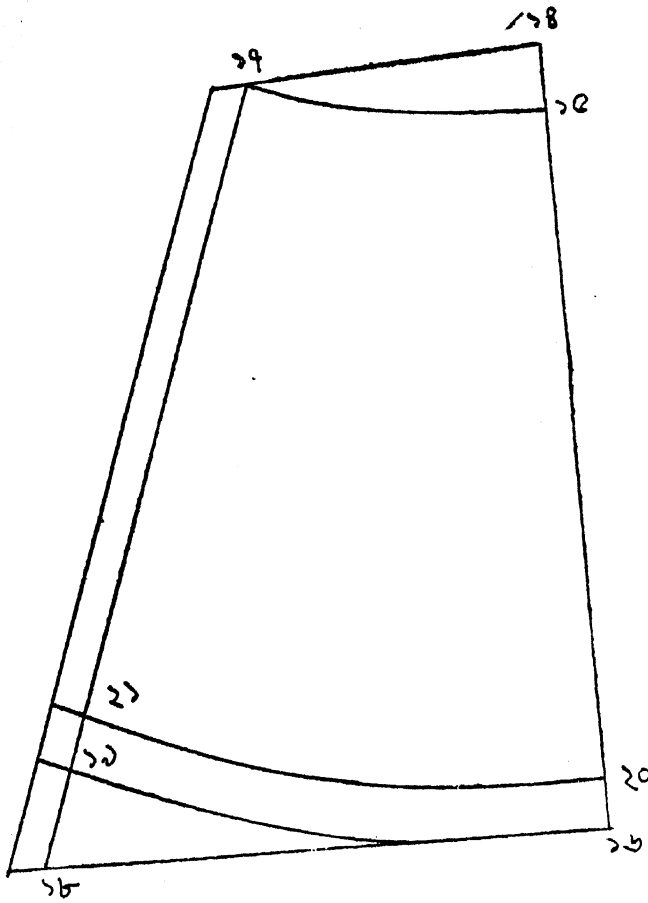
কারুকার্যে গলা, কোমর এবং জামার প্রান্তদেশ সুশোভিত করা যায়। স্কার্ট বা গাউনের সাহায্যেও কোমর এবং বুকে শাড়ীর ঢেউ খেলানো মাধুর্য আনা যায়। তবে সব কিছুর মধ্যেই একটি শিল্পনিষ্ঠ মনের প্রলেপ রয়েছে। এছাড়া এরকম সমন্বয়ও সম্ভব নয়। 'ইন্ডিয়ান ফ্লেয়ার' এবং 'কণ্টিনেণ্টাল স্টাইল' যুক্ত করে কিভাবে ভারতীয় পোশাকের ব্যবহারকে আরও ব্যাপক করা যায় প্রদর্শনীতে তাও দেখান হয়।

সেলাইয়ের কথা

(১০)

গাউন ঘের ফ্রক

মাপ :—

সেস্থ—১২"
লম্বা—২৮"
ছাতি—২৮"
পুট— ৬"
পুটহাতা—১৪"
মুহুরী— ৮"
কোমর—২৪"

পেছন পার্ট :—

১—২=সেস্থ+১"
১—৩=১"
১—৪=¼ ছাতি—১"
১—৫=পুট+½"
৫—৬=১" কাঁধের সেপ্
১—৭=১/১২ ছাতি
৪—৮=¼ ছাতি+১½"
২—৯=¼ কোমর+১"

সামনা পার্ট :—

১— ২=সেস্ত+১"
১— ৩=¼ ছাতি—১"
১— ৪=১/১২ ছাতি+১"
১— ৫=১/১২ ছাতি
১— ৬=পুট+½"
৬— ৭=১" কাঁধের সেপ্
৮—৯=½" ,, সেপ্
৩—১০=¼ ছাতি+১½"
২—১১=¼ কোমর+১"

ঘের :—

১— ২=লম্বা—সেস্থ+৪"
১— ৪=১½"
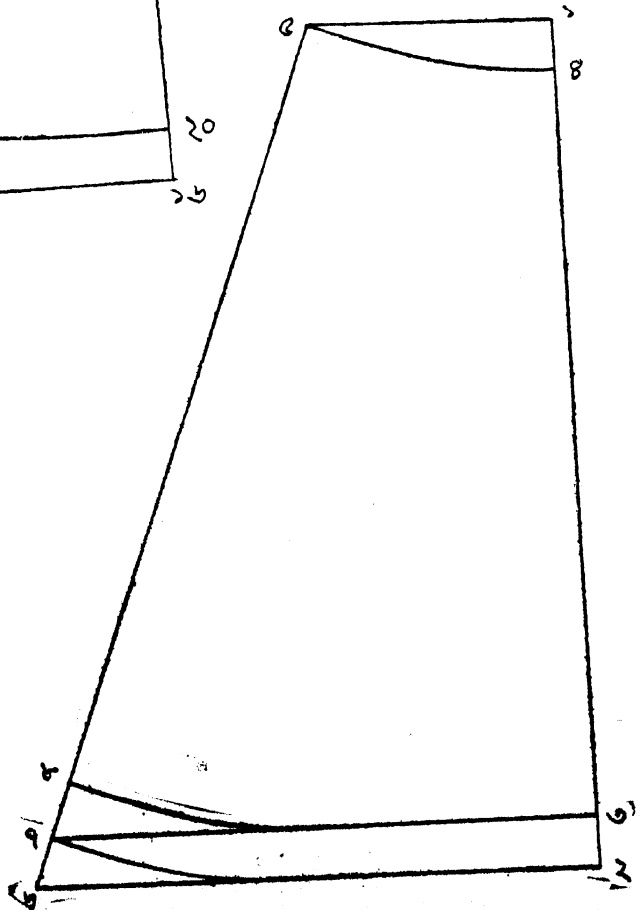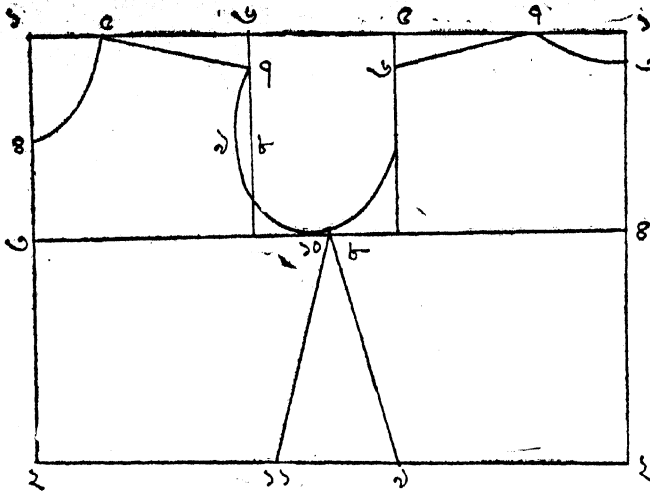
১— ৫=$\frac{1}{2}$ কোমর+১"
২— ৩=১$\frac{1}{2}$"
২— ৬=ছাতির $\frac{1}{2}$+২"
৬— ৭=১$\frac{1}{2}$"
৭— ৮=১$\frac{1}{2}$"
১৫—১৪=১$\frac{1}{2}$"
১৬—১৫=পূর্ণ দৈর্ঘ্য কোমরের উচ্চতা+$\frac{1}{2}$"
১৭-কে ১৪ হইতে বাহিরের সমকোণ বসাতে হবে।
১৭—১৪=কোমরের চতুর্থাংশ +$\frac{1}{2}$" সেলাই
১৫—১৭=চিত্রের মত সেপ্ কর।
১৮-কে ১৬ হইতে বাহিরে সমকোণ বসাতে হবে।
১৮—১৬=১৭—১৪+৮"
১৯—১৮=১৫—১৪+১$\frac{1}{2}$" বক্রাকারে চিত্রের মত।
১৯—১৬ সেপ করতে হবে।
২০—১৬=১$\frac{1}{2}$" দাউন ভাজের জন্য
২১—১৯=১$\frac{1}{2}$" দেখাতে হবে।

হাতা :—

১— ২=পুটহাতা—পুট+১"
২— ৩=$\frac{1}{2}$"
১— ৪=ছাতির $\frac{1}{4}$—১"
৫=১ ও ৪ এর $\frac{1}{2}$
৭— ৮=$\frac{1}{2}$"
২— ৬=$\frac{1}{2}$ মুহুরী +$\frac{1}{2}$"
৯—১০=$\frac{1}{4}$"
১, ১০, ৫ সেপ করা হলো।
১, ৯, ৫ তালপাতের সেপ করা হলো।

প্রগতি

'প্রগতির অনেক দুর্গতি'—কথাটা কি সত্যি? অনেকেই মানতে চাইবেন না, অনেকে আবার গুরুগম্ভীর হয়ে বলবেন, 'ওটা একটা কথার কথা।' আমরাও তাই ভাবতাম। ঠাট্টাচ্ছলেই কথাটা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলাম আমরা। কিন্তু রসিক-[illegible] বেরসিকের মত কাজ করে বসবে সেটা জানা ছিল না আমাদের। জানা থাকলে কেউ নিশ্চয়ই এরকম রসিকতা করতেন না যা কিনা গালে চড় মেরে পাওনাগণ্ডা আদায় করে নেয়। সত্যি এমন মর্মান্তিক রসিকতা বুঝি আর হয় না! প্রগতির বয়ঃসন্ধিক্ষণে দুর্গতি এসে গালে চুনকালি মাখিয়ে দিল।
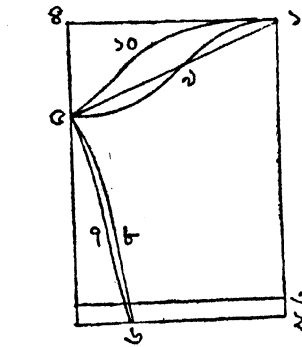
ইদানীং ভারতীয় ললনাদের প্রগতির উজ্জ্বল আভায় আমাদের আগামীদিনের চলার পথ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। এই আশার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাও খুব বেশিদিনের নয়। বরং সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বেশ অল্পদিনেরই কথা। দিনে দিনে ক্রমেই আমরা প্রগতির অনেক দূরের গতিকে প্রায় ধরে ফেলেছিলাম। আমাদের গতিছন্দে এবং উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় দূরকে নিকট করে নেওয়া খুব কষ্টকর ছিল না। কষ্ট বা দুঃখ যা পাওনা ছিল সেটুকু হাসিমুখে বরণ করেছি। কিন্তু পণ ছাড়িনি। মন্ত্রের সাধনে জীবন পণ করেছি। দুর্লভ মহিমা অর্জনের আন্তরিক তাগিদে কোনক্রমেই বেসামাল হইনি আমরা। সৌভাগ্যের এবং সুখের কথা যে মহিমা অর্জনের স্বপ্ন আমাদের সফল হয়েছে। অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু আংশিক হলেও সাফল্যের তৃপ্তিদায়ক আনন্দ ঝুলিতে [illegible] করেই নতুন দিনের নতুন কথা ভাবনার আনন্দে বিভোর ছিলাম। পিছনে যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে সেটা ভাবিনি এবং ফিরে তাকানোর প্রয়োজনও মনে করিনি। কিন্তু দুর্ঘটনা এরই মধ্যে ঘটে গেল। সকালে খবরের কাগজের পাতা উল্টাতেই নজরে পড়লো খবরটা। অপরাধের ক্ষেত্রে জনৈকা মহিলার অবিশ্বাস্য কাহিনী। বিচারকের রায়ে মহিলাটির দণ্ড হয়েছে। অপরাধ পকেট-মারা। অবিশ্বাস্য হলেও সংবাদটি বিশ্বাস না করে উপায় নেই। অপরাধের এসব ঘৃণ্য তালিকায় মেয়েদের নাম দেখলেই স্বভাবতই মন বিরূপ হয়ে ওঠে। সেই সংগে শরীরও রাগে রি রি করে ওঠে। যে মেয়েদের নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই, তাদের সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে মন চায় না। কিন্তু এখানে সমস্যার সমাধান নেই। সমাধান আরও গভীরে। তাই হঠাৎ চটে না গিয়ে বরং ঠান্ডা মেজাজে ভেবে দেখলে এর একটা সুরাহা হতে পারে।

অর্থনৈতিক দুর্গতি যে কারণ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই এর প্রতিকারের পথ খুঁজতে গেলে আর্থিক সমস্যার সমাধানের কথাও চিন্তা করতে হবে। প্রত্যক্ষ সাহায্যে এ সমস্যা মিটবে না। তাই নিয়মিত আয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা। যেখানে এরকম মেয়েরা কাজের বিনিময়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করতে পারবে। তাই শুধু হা-হুতাশ না করে সমাধানের আসল দিকটা ভেবে দেখার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

সংবাদ

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর টাউন হলে স্থানীয় মহিলা শিল্প বিদ্যালয় সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নদীয়ার জেলাশাসক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্তা ইলা পালচৌধুরী। ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীশিবানী চৌধুরী এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা শ্রীঅমিয়া দাশগুপ্ত। সম্পাদিকার বিবরণীতে কৃষ্ণনগরের সর্বপুরাতন এই মহিলা সমিতির বিভিন্ন কর্মধারার কথা ও বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশ করা হয়।

* * *

শাস্ত্রী নগরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ বলেন যে, লোকসভা এবং রাজ্যসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব দানের ক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীদের আরও পনের শতাংশ বেশী সুযোগ দেওয়া উচিত। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি মহিলা প্রার্থীদের জন্য যে কোটা কমিয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন কে?

(খ) 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' —এই গানটির রচয়িতা কে?

বিনীত
কল্পনা সরকার
কলকাতা—৫

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

(খ) কতদিন না ঘুমিয়ে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে?

(গ) পৃথিবীর ওজন কত?

(ঘ) 'নিষিদ্ধ দেশ' কথাটির অর্থ কি?

বিনীত
রেখা, দীপ্তি ও রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) গ্ল্যাডস্টোন, ডিজরেলী, লয়েড জর্জ ও স্যার উইনস্টন চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল জানতে চাই।

(খ) রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ও আইসেনহাওয়ারের পুরো নাম কি?

বিনীত
অশোককুমার ধর
ঘাটশীলা

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) আজ পর্যন্ত কোন্ কোন্ কাব্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছে?

(খ) হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেড, রাঁচীর বার্ষিক উৎপাদন কত?

(গ) ভারতীয় যুক্তরাজ্যের প্রত্যেকটি রাজ্যের শিক্ষিতের হার কত?

(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় বড় তিনটি পুস্তকালয়ের নাম কি কি?

বিনীত
সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত
রাঁচী—৪

●

সবিনয় নিবেদন,

বিদেশী মুদ্রা ও ডাকটিকিট সংগ্রহের কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে কি? প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী ও ঠিকানা কি?

বিনীত
বিনয়রঞ্জন পাল
শহীদনগর, মেদিনীপুর

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

(১) ষষ্ঠ বর্ষ ১৭শ সংখ্যার পরিমল বিশ্বাসের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, 'যুগান্তর' পত্রিকা ১৯৩৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

(খ) খ প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, নিম্নলিখিত দেশগুলি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছে।

(১) জার্মানী, (২) ডেনমার্ক, (৩) ফ্রান্স, (৪) ইংল্যান্ড, (৫) আমেরিকা, (৬) নেদারল্যান্ডস, (৭) ইতালী, (৮) সুইডেন, (৯) সুইজারল্যান্ড, (১০) ভারতবর্ষ, (১১) অষ্ট্রীয়া, (১২) জাপান, (১৩) আয়ার্ল্যান্ড, (১৪) চীন, (১৫) রাশিয়া।

ইতি বিনীত
স্বপ্রকাশ রায়।
বনপাস, বর্ধমান।

●

সবিনয় নিবেদন,

১৮শ সংখ্যায় রঞ্জিতকুমার গুহের 'খ' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোহান কানহাই ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করেন। তার রাণসংখ্যা হলো ২৫৬ এবং ভারতের পলি উম্রিগর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করেন। তার রাণসংখ্যা হলো ১৭২।

বিনীত
নিখিল ভট্টাচার্য
গৌহাটি—৮

●

সবিনয় নিবেদন,

৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা চৌধুরীর 'খ' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, গোল্ড কাপ হকি খেলা শুরু হয় ১৯৫৫ সালে।

বিনীত
প্রবীর ও প্রদীপ মুখার্জী
খড়দহ

●

সবিনয় নিবেদন,

৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'ক' প্রশ্নের প্রদীপকুমার ব্যানার্জি প্রদত্ত যে উত্তর ১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তা ঠিক নয়। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে যে ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয় তা সর্বপ্রথম নয়। এর অনেক আগে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারক হলেন উইলিয়ম ক্যাক্সটন।

বিনীত
সুবীর সেনগুপ্ত
হালতু

●

সবিনয় নিবেদন,

৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত (২২-৭-৬৬) সংগ্রাম রায়ের প্রশ্নের উত্তরগুলি জানাচ্ছি।

(ক) সেন্টো সামরিক চুক্তির পুরো নাম হলো—সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন। পূর্বে এই সংস্থাই বাগদাদ চুক্তি বা মিডল ইস্ট ট্রিটি অর্গানাইজেশন নামে খ্যাত ছিল।

যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, পাকিস্থান, ইরাক ও ইরান মোট এই পাঁচটি দেশ প্রথমে এই জোটের সদস্য ছিল।

কিন্তু গণতন্ত্র প্রাপ্তির পর (১৯৫৯) ইরাক সেন্টো সামরিক জোট পরিত্যাগ করে ও আমেরিকা এই জোটে পরোক্ষ উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে; তবে পুরোপুরি সদস্য পদ গ্রহণ করে নাই।

১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে এই জোট প্রথমে স্থাপিত হয়। ইরাককে বাদ দিয়া এই জোটের পুনঃস্থাপন হয় ১৯৫৯ সালের অগাষ্ট মাসে।

(খ) ইউনিসেফের পুরো নাম হইল—ইউনাইটেড নেশনস্ ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস্ ইমার্জেন্সি ফান্ড।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহরের শিশুদের প্রয়োজনীয় সাহায্যার্থে ১৯৫৭ সালে ইউনিসেফ স্থাপিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের সাহায্য করবার সৎ উদ্দেশ্যে ইউনিসেফ একটি স্থায়ী সংস্থারূপে গড়ে ওঠে সরকার ও জনসাধারণের সহায়তায়। ১৯৬৫ সালে এই সংস্থা শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

ইউনিসেফের প্রধান কার্যালয়—জাতিপুঞ্জ, নিউইয়র্ক।

(গ) দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত প্যাটাগোনিয়া নামক স্থানের অধিবাসী "প্যাটাগোনিয়ান"দেরই গড় উচ্চতা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

বিনীত
শ্রীমতী মীণাক্ষী ঘোষ
দুর্গাপুর—৫

●

সবিনয় নিবেদন,

১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত কমল সেনরায়ের প্রশ্নের উত্তর পীযুষকুমার গুহ ২০শ সংখ্যায় জানিয়েছেন যে, ক্যালেন্ডার সর্বপ্রথম চালু হয় রোম দেশে এবং এর উদ্যোক্তা ছিলেন জুলিয়স সীজার। কিন্তু সীজার ক্যালেন্ডার চালু করেননি। তিনি এর উন্নত সংস্করণ করেছিলেন। সীজারের বহু পূর্বে মিশরে ক্যালেন্ডার প্রচলিত ছিল। যতদূর জানা যায় মিশরের হামুর তাম্বীর-এর আমলে ক্যালেন্ডারের প্রচলন ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর নির্ভর করেই প্রথম মিশরীরা ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করেন।

বিনীত
বন্টু চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা—৪৭

●

সবিনয় নিবেদন,

২০শে সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্যার জেমস উইলিয়ম কোলভিল। 'খ' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষ হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়ার রেডসিডার গাছ। এই গাছের বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী।

বিনীত
যজ্ঞেশ্বর শেঠ
কদমতলা, হাওড়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একলা ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না জ্যোতিরাণী। বিভাস দত্ত ঘর ছেড়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরাচরিত তিক্ততা ক্ষোভ আর বিদ্বেষের জ্বলন্ত কণাগুলো তাঁর দিকে ধেয়ে আসছে। ওগুলো নেভেনি, তাঁর অস্তিত্ব থেকে চেতনা থেকে সরে যায়নি। নিভৃতের কোনো সুড়ঙ্গ-পথে ওঁত পেতে বসে ছিল, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

জ্যোতিরাণী কি করবেন? আবার তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন? আবার ধিকিধিকি জ্বলবেন আর পাশের ঘরের মানুষকে সেই আঁচে ঝলসাবার উদ্দীপনায় মেতে উঠবেন? বুকের তলায় যে-আলোর স্পর্শ পেয়েছিলেন সত্যি নয় সেটা? অন্ধতামিস্র ঘোচাবার মত জোরালো নয়?

সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে নিজেকে সংযমে বাঁধতে চেষ্টা করলেন জ্যোতিরাণী। ওটুকুই একমাত্র সত্যি, আর কিছু সত্যি নয়। রাগ রাখবেন না। বিদ্বেষ পুষবেন না।

জ্যোতিরাণী হাল ছাড়বেন না।

আলো নিভিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। আগে হলে সোজা নিজের ঘরে ঢুকতেন। ব্যবধানের ফাঁদ পেতে তার মধ্যে নিজে আগুনের শিখা হয়ে বসতেন। পতঙ্গের মত উদ্‌ভ্রান্ত হতই কেউ। পোড়বার জন্যে ছুটে আসতই।

জ্যোতিরাণী হাল ছাড়বেন না। দম্ভের খাঁচায় নিজেকে রাখবেন না। প্রাণপণ করে তিনি শুধু আলোর খবর দেবেন। একটুখানি আলো অনেক অন্ধকার ঘোচাতে পারে।

নিজের ঘরে নয়, পরদা ঠেলে সোজা পাশের ঘরে ঢুকলেন জ্যোতিরাণী।

শিবেশ্বর শয্যায় আধ-শোয়া। পাশে অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্যের বিলিতি জার্নাল গোটা-কতক। ঘরে থাকলে বেশির ভাগ সময় এগুলোই সঙ্গী। এখন পড়ছেন না। শিয়রের বালিশের ওপর পাশ-বালিশ, তার ওপর পিঠ রেখে পরিতুষ্ট মুখে ভাবছেন কিছু।

বিছানায় তাঁর গা-ঘেঁষে মুখোমুখি বসলেন জ্যোতিরাণী। শয্যার এদিকে শয়ান বলে এ-দিকের বসার পরিসর এমনিতেই ছোট। শিবেশ্বরের কোমরের দিকটা, গোটানো হাঁটু, আর পাঁজরের দিকের খানিকটা জ্যোতিরাণীর গায়ের সঙ্গে ঠেকে থাকল। এই মুখ আর এই আবির্ভাবের জন্যে যেন প্রস্তুত ছিলেন না। চোখে চোখ রাখলেন তিনিও।

গলার স্বরও বুঝি দিশাশূন্য সংযমে বাঁধতে পেরেছেন জ্যোতিরাণী। স্পষ্ট, স্বর মৃদু।—তোমাদের শোক-সভায় যাবার জন্য তুমি আমাকে ক'বার সেধেছ?

—সাধাসাধির ধার ধারি না।

—ধারো না জানি, কিন্তু একটু আগে বলে তো এলে?

কথার প্যাঁচে কোণঠাসা হবার ইচ্ছে নেই শিবেশ্বরের, চোখে চোখ রেখেই নির্লিপ্ত জবাব নিক্ষেপ করলেন, কথা মেপে বলারও ধাত নয়।

—কিন্তু খুব হিসেব করে মেপেই তো বলে এলে? তোমার সঙ্গে না গিয়ে অন্যায় করেছি বুঝতে পারছি, তা বলে একজন বাইরের লোকের সামনে আমাকে তুমি এভাবে অপমান করে এলে?

দুষ্ট গাম্ভীর্যে শিবেশ্বর অনুযোগটা বুঝতে চেষ্টা করলেন যেন। অপমান কি করা হল...আর বাইরের লোকই বা কে?

—বাইরের লোক বিভাস দত্ত, আর তুমি যা করে এলে সেটাই অপমান। ক'মাস আগেও আমাকে না জানিয়ে দরকারী পরামর্শের নাম করে ভদ্রলোককে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সামনে আমাকে অপ্রস্তুত করেছ। নিজেকে মানী লোক ভাবো তুমি, লোকের চোখে আমি ছোট হয়ে গেলে তোমার মান-সম্ভ্রম বাড়বে?

উগ্র জবাবটা মোলায়েম শ্লেষের রসে ভিজিয়ে দিলেন শিবেশ্বর।—না, তার থেকে বিভোর হয়ে তুমি অন্ধতামিস্র শুনলে বরং আমার মান-সম্ভ্রম একটু বাড়তে পারে। আর ছেলে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলে তো কথাই নেই—

পুরনো দিকে ফিরে তাকাতে চান না জ্যোতিরাণী। তবু এ কথা শোনার পর কেন যেন প্রসঙ্গচ্যুত সেই এক প্রশ্নই ঠেলে উঠতে চাইল ভিতর থেকে।...চল্লিশ বছর যে-মানুষটা এ-সংসারের সঙ্গে মিশে গেল, সেই সদা হঠাৎ ও-ভাবে চলে গেল কেন। থাক, তিনি বোঝা-পড়া করতে আসেননি। চেয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রলোককে সত্যি এত অসহ্য তোমার?

গাম্ভীর্য ঘন করে তোলার প্রয়াস, জবাব দিলেন, অসহ্য কেন হবে, অত বড় রায়টের সময় নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে—উল্টে কেনা হয়ে আছি।

—তোমার আর সিতুর প্রাণ বাঁচায়নি?

ঠোঁটের ফাঁকে তুষ্টির রেখা স্পষ্টই হল এবারে, গলার স্বর আর সুরও বদলালো শিবেশ্বরের। বললেন, আমরা ফাউ। ওই সঙ্গে বেঁচে গেছি...

পাশের বিলিত জার্নালটার দিকে ঘাড় ফেরালেন তিনি। গায়ে গা ঠেকিয়ে এ-রকম অন্তরঙ্গ ফয়সালা করে ওঠার মত তৃপ্তি কমই পেয়েছেন। বিলিতি জার্নালের বড় বড়

চকচকে হরফগুলোই যেন দর্শনীয় বস্তু আপাতত।

জ্যোতিরাণী স্থির বসে আছেন। চেয়ে আছেন তেমনি। হাত বাড়িয়ে জার্নালটা তুলে পাশের ছোট টেবিলে সরিয়ে রেখে দর্শনীয় বস্তু থেকে ওই দৃষ্টি আবার নিজের দিকে টেনে নিলেন।—আমি যা বলতে এসেছি, সে-কথাটাই আগে মন দিয়ে শুনে নাও। আগেও অনেকের সামনেই তুমি আমাকে ছোট করেছ, আজও তাই করে এলে। তবু আমি অন্যরকম আশা করব। লোকের সামনে এ-ভাবে আমাকে অপমান করতে কবে তোমার মায়া হবে এর পরেও আমি সেই অপেক্ষাতেই থাকব—বুঝলে?

উঠলেন। খুব শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন শিবেশ্বর। ভাঙার বদলে যে আঘাত বল জোগায়, সে-আঘাতের খানিকটা নিজের দিকেই ফেরে।

শিবেশ্বরের চোখে অনুতাপ নয়, শুধু তাপ।

*

মনের ইচ্ছে ষোল-কলায় পূর্ণ কমই হয়। কিন্তু সিতুর বেলায় তাই যেন হচ্ছে। না চাইতেই একের পর এক সুযোগ-সুবিধেগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে তার সামনে এসে ধরা দিচ্ছে।

এক নতুন উত্তেজনায় ভিতরটা তার টগবগ করে ফুটছে সর্বদা। সে-খবর বাড়ির কেউ রাখে না। রাখে কেবল চালবাজ দুলু আর সর্দার-মাথা সুবীর। সম্প্রতি তিনজনেই একাত্ম। উত্তেজনায় তরপুরে তারাও। এই সঙ্গে গোপনতা আর স্বাধীনতার নতুন রোমাঞ্চও কম নয়।

বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে তিনজনেই মাঝে মাঝে স্কুল ফাঁকি দিচ্ছে এখন। এর মধ্যে সিতুর স্কুলের কড়াকড়ি একটু বেশি। স্কুলে গিয়ে পালাতে হলে হঠাৎ পেট ব্যথা হতে পারে, পেট কামড়াতে পারে খুব, গা-ঘাম করতে পারে। তার ফলে টীচারকে বলে ছুটি নিয়ে আসা যায়। কিন্তু একেবারে ডুব দিতে হলে দরখাস্ত লাগে। সেটাই দরকার হয়ে পড়েছিল প্রায়ই। মায়ের ব্যস্ততার ফাঁকে সে সুযোগ পাচ্ছে। ঘটা করে প্রভুজীধামের উৎসব হয়ে যাবার পর থেকে এই ক'মাস ধরে মা সপ্তাহে খুব কম করে তিন-চার দিন অন্তত সেখানে ছোটে। কোনদিন বিকেলে ফেরে, কোনদিন সন্ধ্যায়। এদিকে ছোটদাদুও মায়ের ওই ব্যাপারেই ব্যস্ত খুব। মা তো তবু দুপুরে বেরিয়ে বিকেলে হোক সন্ধ্যায় হোক ফেরে, ছোট-দাদু ফেরেই না অনেকদিন। প্রভুজীধামেই থেকে যায়। সিতুর সেটা পছন্দ নয়, কিন্তু আজকাল পছন্দ করছে।

কারণ, সকলের অলক্ষ্যে এখন তার প্রচুর অবকাশ দরকার। এদিক থেকেই ওপর-ওয়ালা আপাতত ভারী সদয় তার ওপর। প্রথম তো ঠাকুমা বুড়ী দিব্বি ভুগতে শুরু করেছে আজকাল। সর্দি-জ্বর এটা-সেটা লেগেই আছে। ফাঁক-তালে তাকে চুপিচুপি ধরলেই ঠাকুমা স্কুল কামাইয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। মাকে বলে, সিতু দুটো দিন বাড়িতে থাক, তোমরা তো সকলেই ব্যস্ত, দরকারে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার লোক পাওয়া যায় না, শরীরটা বেশিই খারাপ লাগছে আজ—

জ্যোতিরাণী আপত্তি করেন না। সকালে আর রাত্রিতে ভিন্ন তাঁর ফুরসত নেই ঠিকই। মেঘনাকে সারাক্ষণ শাশুড়ীর কাছে বসিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু সেটা মনঃপুত হবে না। তাছাড়া মাত্র মাস-তিনেক হল নতুন ক্লাস শুরু হয়েছে ছেলের—এর মধ্যে ছুটি-ছাটা আর বাইরের নানা গণ্ডগোলে স্কুল অনেক সময় এমনিতেই বন্ধ থাকছে। অতএব সামান্য ব্যাপারে শাশুড়ীর মেজাজ চড়ুক এ তিনি চান না। ছুটি মঞ্জুর হয়ে যায়, আর তখন কামাইয়ের দরখাস্ত সামনে ধরলেই তিনি সই করে দেন।

মাঝে মধ্যে গাড়ি নিয়ে সকালেও বেরিয়ে পড়তে হয় তাঁকে। বিকেলের আগে ফিরবেন না বলেই যান। প্রভুজীধামে মিত্রাদি বীথি আর সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন, কাজ-কর্ম দেখাশুনা করেন। তাতে একাত্মতা বাড়ে। সিতুর সেদিন পেট কনকন করবে বা সেই গোছের কিছু হবে। আর ঠাকমার মারফৎ জেঠুর কানে সেটা পৌঁছুলেই স্কুল বন্ধ। জেঠুই বলবে স্কুলে যেতে হবে না। তখন দরখাস্তে জেঠুই সই করবে। মা সেদিন টেরও পাবে না ও স্কুলে গেল কি গেল না। সিতুর পক্ষে সব-থেকে সুবিধে হত ঠাকুমা ইংরেজীতে নাম সই করতে জানলে, কিন্তু সে-ব্যাপারে বুড়ী দিগ্গজ একেবারে, বাংলায় সই করতেই কলম ভাঙে।

সিতু সুবীর আর দুলুর স্কুল কামাই করা বা স্কুলে গিয়ে পালিয়ে আসার তাগিদটা নিছক ফুর্তির কারণে নয়। যে অ্যাডভেঞ্চারে মেতেছে, তার ফলে বয়সের তুলনায় দেখতে দেখতে তারা আরো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কোন্ নেশায় রক্ত গরম তাদের এখন, সেটা বাড়ির কেউ বুঝবে না। আর, কদর তো করবেই না। জানলে উল্টে বাধা দেবে।

সেই নেশা প্রথমে সিতুর মাথায় ঘুর-পাক খেয়েছে ক্রমাগত। ঘোড়া-মার্কা সমরেশ মুখে যে-দিন শুনেছিল ওর দাদা বলেছে বাইরের লোক আদালতের বিচার দেখতে যেতে পারে, তখন থেকেই কথাটা কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তার। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছোট দাদুর কাছ থেকে যখন জানা গেল কথাটা সত্যি, একটা প্রবল ইচ্ছা সে আর তখন নিজের মগজে চেপে রাখতে পারেনি। দুলুকে আর সুবীরকে বলেছে।

ব্যাঙ্ক লুঠের ডাকাতদের বিচার শুরু হয়ে গেছে। কাগজে যে-সব খবর বেরিয়েছে আর বেরুচ্ছে তাই পড়েই উত্তেজনা চেপে রাখা দায় সিতুর। আর এতদিনে সেই উত্তেজনা কিছুটা ওদের মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। দিনেদুপুরে মোটরে করে এসে স্টেনগান চালিয়ে চোখের পলকে ব্যাঙ্কের বন্দুকধারী সিপাইকে মেরে ক্যাশিয়ারকে গুলী করে আর রিভলভার উঁচিয়ে সকলকে বোবা-বানিয়ে সাতান্নহাজার টাকার বাক্স নিয়ে উধাও হয়েছিল যে-ডাকাতরা—আবার তাদের চোখে দেখতে পাওয়াই তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আর সেই লোকগুলোর কিনা বিচার হবে, আর যার খুশি সে কিনা ইচ্ছে করলে সেই বিচার দেখতেও পাবে! এমন এক রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা সিতু নিজের মধ্যে চেপে রাখে কি করে?

দু'তিন দিনের আলোচনার ফলে সুবীর আর দুলুর মধ্যেও বিচার দেখার বাসনাটা দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। শুধু লোক মারা আর টাকা লুঠ করাই নয়, আর একটু সময় পেলে যে-ডাকাতেরা সিতুর ওই মা-টিকে পর্যন্ত গাড়িতে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতই—সশরীরে তাদের চোখে দেখার লোভ হওয়াই স্বাভাবিক। তার ওপর এমন গরম এক বিচার পর্ব।

তিনজনের মধ্যে সুবীরই মাথায় একটু বড়সড়। কিন্তু ধুতি পরলেও ওকে বয়স্ক লোক বলে চালানো যায় না তা বলে। অতএব ছেলেমানুষ দেখে ঢুকতে দেবে কিনা সেই চিন্তা। মাথা খাটিয়ে চালিয়াৎ দুলুই একটা মতলব বার করল। তাদের বাড়ির সামনের স্টোভ-সাইকেল-মোটরবাইক মেরামতের দোকানের নিতাইদাকে সঙ্গে জোটাতে পারলে কেমন হয়? খুব ভালো হয়। এ-সবে খুব উৎসাহ তার। বয়েস ওদের ডবলের বেশি ছাড়া কম নয়, নিজেও গুন্ডা গোছের। মারামারি করতে সোডার বোতল আর

অ্যাসিড বাল্বে ছ‍ুঁড়তে ওস্তাদ। পাড়ায় বেশ কদর আছে তার। ওই সাইকেলের দোকানে চাকরি করে, পকেটে দ‍ু'চারটে বাড়তি টাকা এলে একট‍ু মদ-টদও খায়। আর তখন বেশ ব‍ুক ফ‍ুলিয়ে শোনার মত দ‍ু'পাঁচ কথা বলেও।

এই নিতাইদাকে পেলে আর কথা। মস্ত অভিজ্ঞ লোক, ঝামেলায় পড়ে এ-পর্যন্ত বার দ‍ুই হাজত-বাসও করেছে।

নিতাইদা শোনামাত্র রাজি। তার ওপর রেস্ট‍ুরেন্টে চপ কাটলেটের ম‍ুখ দেখার সম্ভাবনা আছে শ‍ুনে রীতিমত ফ‍ুর্তি। এই খ‍ুদেগ‍ুলো এ-ভাবে মান‍ুষ হয়ে উঠছে ভেবেও খ‍ুশি। সিতুর মা-কে সে অনেক-দিনই দেখেছে। কিন্তু সে খবর এরা কেউ রাখে না। দেখে পাড়ার অনেকের মতই তারও চোখ জ‍ুড়িয়েছে। নিতাইদার উৎসাহ বাড়াবার তাগিদে দ‍ুল‍ু বলে ছিল, ফাঁক পেলে সিতুর মা-কেও তো ধরে নিয়ে যেত এমন দ‍ুর্ধর্ষ ওই ডাকাতগ‍ুলো। নিতাইদা তক্ষ‍ুনি চোখ পাকিয়ে ব‍ুক ঠ‍ুকে বলেছে, এই শর্মাই তাহলে ওই কলকাতা চষে ওই ডাকাতদের বার করত আর একে একে মাথা-গ‍ুলো ধড় থেকে আলাদা করে দিত—প‍ুলিসের দরকার হত না।

অতএব নিতাইদাটিকে সিতুর বেশ বীর গোছের ভালো লোক মনে হবারই কথা।

ব্যবস্থামত তিনজনে স্কুলে ড‍ুব দিয়ে নিতাইদার সঙ্গে দ‍ুর‍ুদ‍ুর‍ু ব‍ুকে কোর্টে গেছে তারা। আর ফিরেছে যখন, শিরার রক্ত টগবগ করে ফ‍ুটেছে তিনজনেরই। কোথায় লাগে এর কাছে খেলা দেখা বা সিনেমা দেখা! ডাকাতদের দেখেছে, সাক্ষীসাব‍ুদদের কথা শ‍ুনেছে, উকীলদের জেরা শ‍ুনে তাক লেগেছে। আবার কবে যেতে পারবে তারা? না যেতে পারলে এই নতুন রোমাঞ্চের সমস্ত স্বাদ নষ্ট।

স‍ুযোগ আপনি এলো। মায়ের গাড়ি পাঠাতে দেরি হয়ে গেল সেদিন। প্রভুজী-ধামের জন্য একটা স্টেশন ওয়াগন কেনা হয়েছে। কিন্তু সেটা ওখানকার কাজেই আটকে থাকে। মায়ের গাড়ি আজকাল প্রায়ই দরকার হয় মিত্রামাসির। মায়ের নিজেরও দরকার বেড়েছে। তাই ছ‍ুটির পর ওকে নিতে আসার ব্যাপারে বিশ পঁচিশ মিনিট বা আধ-ঘণ্টা দেরি হয়েই যায়। মায়ের হ‍ুকুম, দেরি হলেও গাড়ি না আসা পর্যন্ত বসে থাকবি, খবরদার একা বের‍ুবি না।

ঠিক তিন দিনের মাথায় সেই স‍ুবর্ণ স‍ুযোগ। গাড়ি সেদিন পাঠানোই সম্ভব হবে না। প্রভুজীধাম থেকে গাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হবে। মা শম‍ুকে দিয়ে ওকে আনার ব্যবস্থা করছিল। সিতুর মাথায় চমকপ্রদ ব‍ুদ্ধি খেলল। সে মা-কে বলল, কারো যাওয়ার দরকার নেই, ক্লাসের ওম‍ুক বন্ধ‍ুর গাড়ি সামনের বড় রাস্তা দিয়ে তো যায়ই, কতদিন তো ওকে পৌঁছে দেবার জন্য সাধাসাধি করে। তার গাড়িতেই চলে আসবে। মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিলে হেঁটে বাড়ি আসতে তো দেড় মিনিটের পথ।

ব্যস, মা নিশ্চিন্ত। বড় রাস্তা পার করে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিলে আর কথা কি। বরং উল্টে বোকা ভেবেছে ছেলেটাকে, বলেছে, এই স‍ুবিধে আছে তো এতদিন বলিসনি কেন?

মা-কে একট‍ুও কম ব‍ুদ্ধিমতী ভাবে না সিতু, তাকে এ-ভাবে ভাঁওতা দিতে পেরে নিজের ওপর অট‍ুট আস্থা নিয়ে সে তক্ষ‍ুনি ছ‍ুটেছে দ‍ুল‍ু স‍ুবীরের কাছে। আজ আবার কোর্টে যাবে। স্কুল পালিয়েই যাবে।

এই ব্যাপারটাই চলতে লাগল মাঝে মাঝে। বিচার পর্ব সাংঘাতিক জমবে মনে হলে একেবারে ড‍ুব দেয়, নয়তো স্কুল পালায়। নিতাইদাকেও সঙ্গে নেবার দরকার হল না আর। কারণ গেলে কেউ যে ভ্রূক্ষেপ করে না সেটা প্রথম দিনই দেখেছে। কিন্তু কোর্টের বিচার এমনিই জমে উঠতে লাগল যে, স্কুল পালিয়ে বা স্কুলে ড‍ুব দিয়েও ঠিক স‍ুবিধে হচ্ছে না। ক'দিন পালাবে আর ক'দিন ড‍ুব দেবে? ড‍ুব দিলে মায়ের নজর এড়িয়ে বের‍ুতে দ‍ুপ‍ুর হয়ে যায় আবার ড‍ুব দিলেও কোর্টে পৌঁছ‍ুতে দেরি তো হয়ই। ফিরতে এক-আধসময় দেরি হয়ে যায়। তখন

মাস্টের সামনে পড়ে গেলে কৈফিয়ত দিতে হয়, বন্ধু তাদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল, খাওয়ালো-দাওয়ালো, সেইজন্যই দেরি। অতএব বেরনোটাই শুধু সমস্যা।

সমস্যা হলে সমাধানও আছেই। তিন বন্ধুর মধ্যে সমস্যা শুধু সিতুরই। ওরা দুজন যে স্কুলে পড়ে সেখানে নিয়ম সবই আছে কিন্তু সেটা রক্ষা করার কড়াকড়ি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ওদের কামাই করাও সহজ, পালানও সহজ। তিনজনে মিলে ভালো করে মাথা খেলাতেই রাস্তা বেরিয়ে গেল।

সিতু বলেছিল, বাবার নামটা সই করার মত একজন বিশ্বাসী লোক পেলেই হত।

দুলাল তক্ষুনি বলেছে, কেন, নিতাইদা তো আছে. ক্লাস নাইনে তিনবার ফেল করে পড়া ছেড়েছিল, দোকানের ও-ই শিক্ষিত লোক—একটা নাম সই করতে পারবে না?

সুবীরের খটকা লাগলো, কিন্তু স্কুলে যদি বিশ্বাস না করে?

সিতুই দুর্ভাবনার নিরসন করল, বাবার ছাপা প্যাডের কাগজ যোগাড় করি যদি তাহলে বিশ্বাস করবে না কেন?

ব্যস, এক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। নিতাইদাকে শুধু আর একদিন চপকাটলেট খাওয়ানোর দায়। ছুটির চিঠির বয়ান সিতুর খাতায় লেখাই ছিল। চারটে পয়সা খরচ করলেই টাইপের দোকানে দরখাস্ত টাইপ করে নেওয়া সহজ, হাতে লেখার ঝামেলা নেই। ওদিকে বিনা চপকাটলেটেই নিতাইদা সই লাগাতে প্রস্তুত প্রায়। একদিনের বেশি খাওয়াতেও হল না। প্রস্তাব শুনে প্রথমদিনই হেসে চোখ টিপে বলেছিল, নিতাই ঘোষ তোর বাপের হয়ে সই করবে এতো ভাগ্যের কথা রে! আ-হা, আ-হা, দে-দে—

নিতাইদার রসিকতার মর্ম না বুঝে হেসেছে তারাও। কলম বাগিয়ে নিতাইদা এস চ্যাটার্জি সই করেছে। অবিশ্বাস করার মত হয়নি। আসল দরখাস্তে সই করার আগে নিতাইদা বারদশেক এস চ্যাটার্জি সই করে নিয়েছিল।

এরপর বিশেষ বিশেষ দিনে কোর্টে হাজিরা দেওয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বইপত্র বগলে নিয়ে সিতু গাড়ি চেপে স্কুলে বেরুলো। গেটের সামনে তাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ি আড়াল হওয়া মাত্র সে স্কুল গেটের উল্টো রাস্তা ধরবে। কোথায় দেখা হবে তিন বন্ধুর সে-তো পাকা করাই আছে। আবার স্কুল ছুটির আগে আগে ফিরে এসে গেটের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকলেই হল—একটু এগিয়ে এসে গাড়ি ধরলে ড্রাইভার কি আর ভাববে। আর বন্ধুর গাড়িতে ফেরার ব্যবস্থার সুযোগ করতে পারলে অর্থাৎ গাড়ি আসা বন্ধ করতে পারলে তো কথাই নেই। তাড়াহুড়ো করে স্কুলের কাছে ফিরে আসার দায় ফুরলো। সে-ব্যবস্থার সুযোগও খুব মন্দ পাচ্ছে না।

একে একে মাস গড়াতে লাগল। খুব নির্বোধের মত কাজ করছে না ওরা। অর্থাৎ মাসের মধ্যে পাঁচসাত দিনের বেশি এভাবে ডুব দিচ্ছে না। যেদিন বিচার খুব জমবে আশা করে সেদিনই শুধু হাজির না হয়ে পারে না। কিন্তু পারুক না পারুক, এ এক নেশার মত হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু মুশকিল হল ফিরে আবার আগস্ট গিয়ে সেপ্টেম্বর আসতে। বিচারের শেষ পালা চলছে তখন। আর কত তাজ্জব ব্যাপার যে প্রকাশ হয়ে পড়ছে ঠিক নেই। সে-রকম আগেও হয়েছে। কিন্তু এই শেষের দিকের তুলনা নেই বুঝি। মেয়েছেলে পর্যন্ত আসছে সাক্ষী দিতে, উকীলের জেরায় হিমসিম খাচ্ছে। মেয়েছেলের সঙ্গেও আবার ওই ডাকাতদের কি সব সম্পর্ক আছে। ওই যে সোনা মেয়েটা, ও-তো কত কি ফাঁস করে দিয়েছে ঠিক নেই। সুবীর বলছিল, ও খারাপ মেয়েছেলে। খারাপ মেয়েছেলে বলতে ঠিক কি যে ব্যাপার সেটা কারো কাছেই একবারে অস্পষ্ট নয় যেন। অথচ মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়, মোটা-সোটা, জেরার জবাবে বয়েস বলছিল বাইশ না তেইশ। মেয়েটা ডাকাতদের একজনকে ভালবাসত, পুলিস সেই ফাঁকে তাকে মোক্ষম কলে ফেলেছে।

আর ওই যে ডাকাত দলের পাণ্ডা, ভারী ফিটফাট শিক্ষিত নিশ্চিন্ত গোছের মুখ করে ছিল এতদিন, এখন সে-ও ভেঙে ভাঙতে শুরু করেছে। হাব-ভাব এখন আর অত বেপরোয়া নির্দোষী গোছের নয়। ডাকাতদের মধ্যে শুধু একজনকেই চিনেছে সিতু, যে তাদের গাড়ির দিকে রিভলভার উঁচিয়ে ধরেছিল। সেই লোকটার তো ঝড়ো কাকের মত অবস্থা এখন। ভয়ে ত্রাসে মুখ-চোখ বসা।

এখন যে প্রায় রোজই কোর্টে আসতে না পারলে ভাতই হজম হবে না তিন সঙ্গীর। কিন্তু একটানা এভাবে কামাই করবে কি করে সিতু?

মনের এই বাসনাই ষোল আনায় পূর্ণ হয়েছে সিতুর। ওপরওয়ালা যথার্থ সদয় তার ওপর।

বলা নেই কওয়া নেই জেঠু দিন-পনেরোর জন্য দক্ষিণ ভারতের কোথায় বেড়াতে বেরুচ্ছে। গতরাতেই মা-কে বলছিল একঘেয়ে কলকাতায় ভালো লাগছে না, কাজের চাপও কম। দিন-পনেরোর জন্যে ঘুরে এলে অসুবিধে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করছিল। মা বলেছে অসুবিধে হবে না।

এদিকে ছোট দাদু এখনো আগের মতই ব্যস্ত। নিজের কাজে আর প্রভুজী-ধামের কাজে বাড়ি আসার ফুরসত কমই হয়। এলেও হুট-হাট রাত্রিতে এসে হাজির হয়। ঠাকুমা বুড়ীর শরীর এখন বিশেষ খারাপ বোধহয়, বেশির ভাগ সময় ঝিমোয় আর ঘুমোয়। মাঝে মাঝে ডাক্তার এসে বুড়ীকে দেখে যায়। তার হাঁক-ডাকও কিছু কমেছে। ওদিকে বাবার মেজাজ আগের চেয়েও বেশি টঙে চড়া মনে হয় সিতুর। মায়ের ওপর রেগে থাকলে যেমন হয়। বয়েস এগারো ছাড়িয়ে এখন বারোয় পড়তে চলল। বোঝার শক্তিও আগের থেকে এখন অনেক বেড়েছে। বাবা এ-রকম গুরু-গম্ভীর মেজাজে থাকলে মা-ও সুস্থির থাকতে পারে না খুব, আর অন্যমনস্কও হয়। মোট কথা মায়ের মনোযোগ এড়ানো তখন অনেক সহজ হয় সিতুর।...প্রভুজীধাম নিয়ে মায়ের এত ব্যস্ততা বাবার খুব পছন্দ নয় বলেই ধারণা, কিন্তু মায়ের ব্যস্ততা কমার লক্ষণ না দেখে সিতু অনেকটা নিশ্চিন্ত।

অতএব মোটমাট ভাগ্যটা যে তার আপাতত অতি ভালো তাতে আর সন্দেহ কি?

জেঠু বাড়ি থেকে বেরুবার পরই দুলু সুবীরের সঙ্গে পরামর্শ করে সিতু একটা পাকা ব্যবস্থা করে ফেলল। নিতাইদাকে দিয়ে একটানা দশ দিনের ছুটির দরখাস্ত সই করিয়ে নিল। তার মধ্যেই বিচারের ফয়সালা হয়ে যাবে আশা করা যায়।
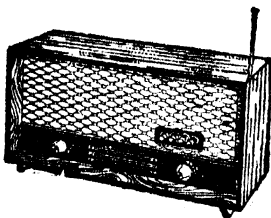
(ক্রমশঃ)

কমল চৌধুরী

জীবনস্মৃতিতে প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথঃ

"এই সন্ধ্যা সঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি, আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাব রাজ্যের অনেক দূর-দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন; তাঁহার ভালো লাগা মন্দ লাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্ব সাহিত্যের রস ভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রিয়নাথের পরিচয় হয়েছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দেরও আগেই 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে। দুজনের পরিচয় অন্তরঙ্গ হতে বেশিদিন লাগেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের বন্ধুত্ব লাভে যে কতখানি উপকৃত হয়েছিলেন, তা রবীন্দ্র জীবনী পাঠকমাত্রেই জানেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথায় আছেঃ

"When I first saw him Preonath could read French and Italian in the original, and subsequently learned other European languages Persian he learned last and I borrowed from him a splendid edition of Hafiz's poem with an English translation."

প্রিয়নাথ সংস্কৃত ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়, পারসী ভাষায় অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

প্রিয়নাথের বহু পঠিত মনের সঙ্গে সূক্ষ্ম বিচার শক্তির আশ্চর্য সুন্দর সম্মিলন ঘটেছিল। দেশ-বিদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করে তিনি পরিশীলিত মনন এবং সীমাহীন পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলা তাঁকে দিয়েছিল উদার দৃষ্টিশক্তি। কাব্য সমালোচনায় প্রিয়নাথের ছিল একটি স্বকৃত বিচাররীতি। চলিত ধারার তিনি বাহিত নন। সাহিত্য সমালোচকের তীক্ষ্ম চেতনা ছিল তাঁর বলিষ্ঠ ভাবনার অনুষঙ্গী। বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতার এক অতি-উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথের সাহিত্যকর্ম বিরাট নয়। রচনার সংখ্যা স্বল্প। ১৯২৬ খৃঃ প্রিয়নাথ মারা যান। তাঁর পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন প্রিয়নাথের রচনা সংগ্রহ করে ১৯৩৩ খৃঃ 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। একটি গল্প, বিভিন্ন কাব্য ও নাটকের আলোচনা এবং অন্যান্য রচনা আছে এতে।

প্রিয়নাথের আলোচনাগুলি পাঠ করলে বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্ব সাহিত্যের সমধর্মী ভাবনার সমাবেশে তুলনামূলক আলোচনায় প্রয়াস পেয়েছেন। দেখা যাবে বিষয়ের কত গভীরে তিনি প্রবেশ করত পেরেছিলেন। সুতীক্ষ্ম বিশ্লেষণ নৈপুণ্য অসাধারণ মেধা এবং অতি-সূক্ষ্ম রসানুভূতির জীবন্ত আলেখ্য প্রিয়নাথ। তাঁর প্রবন্ধে যেমন আছে বুদ্ধির খেলা, তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় বিচারকের নির্ভুল দৃষ্টিশক্তির।

প্রিয়নাথের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষা-রীতিতে ও বাক্য গঠনে। সার্থক কবি মনের অধিকারী হওয়ায় ধ্বনিমাধুর্য সুস্পষ্ট

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

হয়েছে রচনার মধ্যে। গদ্য স্বাভাবিক সর্ববোধগম্য। গদ্যের মধ্যে পদ্যের সুর শোনা যায়। ভাষার নিপুণ কারিকর ছিলেন দক্ষ শিল্পী। কাব্য সুষমা ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় অলংকৃত রচনা আজ বিস্মৃতির পথে। অথচ প্রিয়নাথের রচনাবৈশিষ্ট্য অনুশীলনে গদ্যরীতি ও সমালোচনা রীতির এক নতুন পথের সন্ধান মেলে।

প্রিয়নাথ তুলনামূলক আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন। বিশ্লেষণরীতিও স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। প্রিয়নাথের অপর বৈশিষ্ট্য মাত্রাবোধ। কোথাও কোন আতিশয্য প্রকাশ পেলেও মূল বক্তব্য বিষয় থেকে দূরে সরে যাননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অধ্যয়ন প্রিয়নাথকে দিয়েছিল এক উদার দৃষ্টিশক্তি। এবং তাঁর রুচিকে কেবল পরিশীলিত মাত্র করেনি, তাঁর বিচার শক্তি ছিল অ-পক্ষপাতী সংস্কার মুক্ত।

প্রিয়নাথ কেবলমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি। 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থখানি পাঠ করলে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর বিচারসীমা অনুধ্যান করা সম্ভব। কবি হিসাবেও প্রিয়নাথ খ্যাতি লাভ করছিলেন। ভারতী, প্রদীপ সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'শ্মশান' নামে যে সনেটটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

গ্রামের সুদূর প্রান্তে—ভগ্ন দেবালয়
তাহার চরণে লগ্ন—বিস্তীর্ণ শ্মশান
নীরব নির্জন। যে আপনারে লয়
করিয়াছে প্রেতভূমি সমর্পিয়া প্রাণ
শিয়রের দেবী পদে—ধ্যান নিমগনা
ঊর্ধ্বে দেখে শুধু সেই এক নভঃ—আর
মন্দিরের মহাভয়—লেলিহ রসনা—
মরণের ক্ষুদ্র ভয়ে করিছে সংহার।
আমার জীবন হোক শ্মশান প্রখর
দাঁড়াও পাবনী তাহে একা-একেশ্বরী
পুড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নশ্বর
পাপ যাহা—মৃত্যু যাহা—যাহা মৃত্যুকরী
তোমাতে নিমগ্ন লুপ্ত তুমি প্রাণময়
বিশ্বের সে চিরচিতা ধরিবে হৃদয়।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্র সাহিত্যের সার্থক প্রথম সমালোচক বলা যায় প্রিয়নাথ সেনকে। কবি এবং কাব্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি নিপুণভাবে। রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রিয়নাথের রসজ্ঞ মনের পরিচয় সব থেকে বেশি সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র সাহিত্য সেকালে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্র কাব্যের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন সেকালের কয়েকজন সমালোচক। প্রিয়নাথ তাদের সঙ্গে মসিযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সৌন্দর্যবোধ ও গভীর রসানুভূতি রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করেছে। তাঁর বিশ্লেষণ কুশলতা রবীন্দ্র কাব্যের অভিনবত্বের পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থানকে সুদৃঢ় করতে প্রিয়নাথের অবদান সব থেকে বেশি। রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনার পথিকৃতের গৌরব প্রিয়নাথেরই প্রাপ্য। প্রিয়নাথ হুগো, গোতিয়ে, মপাশাঁ, বালজাক, শেলি, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, টেনিশন, সুইবার্ণ প্রভৃতির রূপ দেখেছিলেন রবীন্দ্র সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ নিয়ে যে বিরুদ্ধতা দেখা দিয়েছিল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সেই বিরুদ্ধবাদীদেরই একজন। প্রিয়নাথ 'কাব্যকথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে সৌন্দর্যসৃষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রিয়নাথের চিন্তাভাবনা রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী এক্ষেত্রে। প্রিয়নাথ বলেছেন :

রসোদ্ভাবনই কবির মর্যাদা, কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। বস্তুসমাধানে কবির কৃতকার্যতা থাকিতে না পারে, তাহাতে আসিয়া যায়না। কিন্তু রসোদ্ভাবনে অসামর্থ অমার্জনীয়। এমন অনেক কাব্য আছে, যাহার বস্তু খণ্ডকীর্ণ—সামান্য এবং চিত্তকে আকৃষ্ট করে না; কিন্তু রসের প্রাবল্য এবং প্রাচুর্যে রসোদ্ভাবনের গুণে তাহারা সাহিত্য সংসারে এক একটি উজ্জ্বল রত্ন-বিশেষ। পদ্যকাব্যে Byron, Shelly, Keats প্রভৃতি এবং গদ্য কাব্যে Victor Hugo, Dickens, Thackeary, Ruskin, বঙ্কিম প্রভৃতি হইতে ইহার প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।......সকল কলাবিদ্যার যে কার্য যে উদ্দেশ্য রস-সাহিত্যেরও তাহাই সৌন্দর্য সৃষ্টি করা; যাহাই সৌন্দর্যের উপাদান, তাহাই সাহিত্য গ্রাহ্য। সাহিত্য-মন্দিরে কোন পদার্থেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই যদি তাহাদের দ্বারা সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়; এবং যাহাতেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তাহাতেই সাহিত্যের অধিকার—কোথাও তাহার হাত বাড়াইবার বারণ নাই। এক সৌন্দর্য-সৃষ্টির অনুমতি পত্র লইয়া ত্রিভুবনে যত্র-তত্র সাহিত্যের অবারিতগতি এবং সেই অনুমতি পত্রের বলে ত্রিভুবনে যাহা, তাহা সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং সমস্ত জীবনই সাহিত্যের ক্ষেত্র। বাস্তব ঘটনা কল্পিত ঘটনা মানব চরিত্রপ্রকৃতির দ কর্তব্যের কঠোর পথ—স্বপ্ন বা খেয়ালে আকাশকুসুম সকলই কাব্যের বিষয়। কেব সৌন্দর্যের উদ্ভাবন হইলেই হইল; অথ উদ্ভাবিত রস এবং বর্ণিত বস্তু সৌন্দর্যের আলোকে মণ্ডিত করিতে হইবে

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' প্রকাশিত হ ১৮৯০ খৃঃ (বাংলা ১২৯৭ সাল)। প্রিয়না 'মানসীর' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহি পত্রিকায় ১৩০০ সালে পৌষ সংখ্যা লেখেন :

আমাদের বিবেচনায় মানসী একখা অতি উৎকৃষ্ট, অতি অপূর্ব গ্রন্থ। এত চ সৌন্দর্যের, এত বিচিত্র কবিতার এব সমাবেশ বাংলা ভাষাতে আজ এই প্রথ দেখিলাম। অপর কোনও ভাষাতেও এরূ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচ্চদরের অ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরা দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসর ভিতর ইংরাজী বা ফরাসী ভাষায় এ কোনও কবিতা পুস্তক দেখিয়াছি বি সুইনবার্ন এবং ভিক্টর হুগোর দুই-একখা গ্রন্থ স্মরণ হইতেছে—কিন্তু মানসী পাঠ বিষয় এবং ভাবের বৈচিত্র্যগুণে এবং কা সৌন্দর্যের উৎকর্ষ নিবন্ধন জগ সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা পুস্তকই বার বার আ মনে আসিয়াছে। সে পুস্তক আর কাহা নয়, ভিক্টর হুগোর—এবং সেখানি এ অপর কোন পুস্তক নয়, তাঁহার লে কো প্লাসিও' (Les contemplations)

মানসীর ভাষা এবং ভাব—যেন এ ছাঁচে একেবারে প্রকৃতির হা হইতে বা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহার কোথ কৃত্রিমতার নাম গন্ধ নাই। এই স কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের মূলী কারণ,—তাহাদের মর্মগত সত্য। মান বড়ই সুন্দর, কেন না মানসী বড়ই সত্য কবি মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবসম অতলস্পর্শ গভীরতা মর্মে মর্মে অনু করিয়াছেন বলিয়াই, সেই চির সত্যের ভি কবিত্বের অমর সৌন্দর্যের সন্ধান পাই ছেন।...পূর্ণ প্রাণ হইতে সুন্দর এবং পরি ভাষা ও ছন্দে, উচ্ছ্বসোন্মুখ কবি মুক্তস্রোত হিল্লোলময়ী ধারায় নিঃ হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কবির বলি কথা আছে—কথা বলিবার কথা আ কথা বলিবার আড়ম্বর নাই। তাই তাঁ ভাষা সারগর্ভ, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছ এবং ভাবের পর্দার সঙ্গে সুমিলিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহিত্য পত্রি ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'চিত্রাঙ্গা বিরূপ সমালোচনা করেন। তীব্রশ্লেষ ভাষায় এই আলোচনা প্রকাশিত হ সাহিত্যের কার্তিক সংখ্যায় প্রিয় লেখেনঃ 'সম্প্রতি রবিবাবুর র 'চিত্রাঙ্গদা' নামক কাব্য সম্বন্ধে আমা প্রথম ধারণার পুনরালোচনা কর হইয়াছে। প্রকাশ হইবার কালেই আ 'চিত্রাঙ্গদা' পাঠ করি। সেই প্রথম এবং তাহার পরেও কয়েকবার পাঠক ইহা আমাদের একখানি সর্বাঙ্গ সু

প্রথম শ্রেণীর খণ্ড কাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রচনার উৎকর্ষে, ভাবাভঙ্গীর মৌলিকতায়, শব্দরচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে মনের-প্রকৃতির অভিজ্ঞতায় নাট্যগুণে এবং সর্বশেষ নিছক কবিত্বরসে সাহিত্য-সংসারে ইহাকে অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি দুর্লভ রত্ন বলিয়াই জানিয়াছিলাম। কিন্তু গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের লিখিত 'কাব্যে-নীতি' নামক প্রবন্ধে 'চিত্রাঙ্গদা'র সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহার মতে এই কাব্য দুর্নীতিমূলক এবং 'অস্বাভাবিক'। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি, আমাদের পূর্ব-ধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত পাইয়াছে, এবং আমাদিগকে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে,—যে 'দুর্নীতি' এবং 'অস্বাভাবিকতা' দ্বিজেন্দ্রবাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই কেন? সম্ভবতঃ প্রথম পাঠকালে আমাদের নীতিজ্ঞান তত জগ্রত ছিল না এবং কবির রচনার মোহমন্ত্রে আমাদের বিচারশক্তি অভিভূত বা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং 'সাহিত্যে'র পাঠকবর্গের সহিত আমরা 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য পুনর্বার পাঠ করিব এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব ধারণার এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।...

আমাদের এমন আশা আছে যে দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও এই নির্দোষ এবং মনোমুগ্ধকর 'কোর্টশিপ' শীঘ্র সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে না এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবিবাবুর এই গানগুলি যতদিন বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে।"

।। তিন ।।

মেজ বৌঠান 'বালক' পত্রিকার সম্পাদক হলেও রবীন্দ্রনাথকে প্রতি সংখ্যায় লেখার একটি গুরুদায়িত্বভার পালন করতে হত। পাশের দ্বারের ঘরটাতে ছিল অফিস। এইখানে বসে অনেক সময় কাটাতেন নবীন কবি। এই ঘরে নানা কাজে বিচিত্র মানুষ এসে দেখা করত তাঁর সঙ্গে। বন্ধু-বান্ধব এবং সাহিত্য রসিকদেরও সমাবেশ ঘটত। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেনঃ..."শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্য সমালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো-কোনোদিন দিনও এমনি করিয়া কাটিত। আসল কথা, মানুষের 'আমি' বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়, আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।"

১৮৮২ খৃঃ সার্কুলার রোডে সমালোচনা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় অন্যান্য সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে প্রিয়নাথও ছিলেন একজন নিয়মিত আগন্তুক।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"কলিকাতা ২রা আগস্ট (১৮৯৪) প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর অনেক ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই; তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনার আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই—দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোক দুঃখের মধ্যস্থলে একটা অনন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে সেখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে আপনার সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত আছি। সুখে আছি।"

'কবি কাহিনী' গ্রন্থকারে প্রকাশের প্রসঙ্গে প্রথম পাণ্ডুলিপিতে আছে ঃ বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য সমালোচনার উপলক্ষে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইহার পর ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে আমার প্রভাত সংগীতের সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ করি আমার শেষ লাভ। প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি যে রচনাকার্যে অগ্রসর হইয়াছি, একথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। ইঁহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় আমি যথার্থ বল লাভ করিয়াছিলাম—ইঁহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার রচনার আরম্ভকালে সমালোচক—সম্প্রদায় বা পাঠক—সাধারণের নিকট এ সম্বন্ধে আমি অধিক ঋণী নহি।"

১৮৯৪ খৃঃ ২ আগস্ট ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথঃ "প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই—দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোক-দুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি—সুখে আছি। সমস্ত বড় চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাস্ট্রনমি পড়ে নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়। তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগ স্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়। জীবনের সঙ্গে ভাবের সংস্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি, তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না, নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।"

কেবলমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চায় প্রিয়নাথ আবিষ্ট থাকেন নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের কতখানি অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন চিঠি থেকে জানা যায়। সুখে দুঃখে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকেই বারবার কাছে পেতে চেয়েছেন। আর্থিক অনটনে পড়ে প্রিয়নাথকেই স্মরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ "ভাই, ভাবিয়াছিলাম বৈষয়িক চিঠি লিখবো না। কানে ধরিয়া লেখাইল। আজ আমলার সাহাবাবুরা তাঁহাদের টাকাটা তুলিয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল। ১২০০০ টাকা দশ টাকা হারে

সুদ। ওদিকে সুরেন এখন বায়ু পরিবর্তনে কটকে গেছে—মহাজন টাকাটা ৯।১০ দিনের মধ্যেই চায়। আপাততঃ আপনা আপনি কারো কাছে হইতে (যথা চন্দ্র ব্রাদার্স) যোগাড় করিয়া দিতে পার? লেখাপড়ার হাঙ্গামা করিতে গেলে সুরেনকে পাইব না, আমার পক্ষেও বিষম অসুবিধা। তোমার নিজের দায় যথেষ্ট আছে, তাহার উপর পরের ঝঞ্ঝাটও তোমারি ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। যদি সুযোগ ঘটাইতে পার ধন্যবাদ দাবী করিতে পারিবে না, পারিলেও কৃতজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

পরবর্তী চিঠিতে লিখছেন : *"ভাই, বাঁচা গেল। আমার টাকার দরকার বারো হাজার, কিন্তু শুনেচি মহাজন ৬০০০ হাজারেই ক্ষান্ত থাকবে—সেটা জনশ্রুতি মাত্র। যদি ১২০০০ বা ১০০০০ পার যোগাড় কোরো, নইলে ৬০০০ হাজার। কিন্তু তুমি এতদিন আমায় বিধিমতে পরীক্ষা করে দেখলে, তবু কি করে জানলে যে, প্রমিসারী নোট কি ভাষায় লিখিতে হয় তা আমার মনে আছে। একটা খসড়া লিখে পাঠালেই ত ভাল করতে।"*

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কন্যা বেলার বিবাহ দেবেন। সেখানেও ঘটকের কাজ করবার দায়িত্ব প্রিয়নাথের। বহু চেষ্টার পর যখন বিবাহ সম্ভব হচ্ছে না তখন রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে লিখছেন : "ভাই, চলে এস আর নয়। বৃথা চেষ্টা নিয়ে, বৃথ্য কষ্টভোগ করবার দরকার কি? এক কাজ কর একদম সোজা অবিনাশের কাছে গিয়ে পরিষ্কার প্রস্তাবটা করে ফেল—যদি হয়ত হবে, না হয়ত চুকে যাক। না হবার দিকেই যখন সাড়ে পনেরো আনা সম্ভাবনা, তখন ভয় কিসের—দু' পয়সা সম্ভাবনার জন্যে এত কষাকষি করতে পারা যায় না।" প্রিয়নাথকে লেখা আর একখানি চিঠিতে আছে : "যা হোক তুমি আর যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন কর, ঘটকের কাজে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। অতএব বৃথা চেষ্টায় নিজেকে ক্ষুব্ধ কোরো না—নদী যেমন চলতে চলতে এক সময়ে সাগরে গিয়ে পড়েই সেই রকম "বেলা" যথাসময়ে তার স্বামীর কূলে গিয়ে উপনীত হবে।"

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ। বন্ধুদের কাছে পাঠালেন অভিনব নিমন্ত্রণ পত্র। প্রিয়নাথ সেনকে লিখলেন :

"প্রিয়বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ-বিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ চার ॥

'স্বপ্নপ্রয়াণ' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক কাব্য। প্রিয়নাথ এই কাব্য গ্রন্থখানির সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন : "স্বপ্নপ্রয়াণ নূতন কাব্য নয়—নিত্যনূতন যাহা কখনও পুরাতন হয় না।

'A thing of beauty is a joy for ever.' তারপর লিখেছেন : "স্বপ্নপ্রয়াণ একখানি রূপক। ইহার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় লিখিত জগতের দুইখানি উৎকৃষ্ট বা সর্বোৎকৃষ্ট রূপকের সৌসাদৃশ্য আছে। একখানি কবি Spenser কর্তৃক পদ্যে লিখিত Faerie Queene — দ্বিতীয়খানি Bunyan কর্তৃক গদ্যে লিখিত জগৎ-বিখ্যাত Pilgrim's Progress। তিনখানিই সম-শ্রেণীর এবং সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য এক না হইলেও, পরস্পরের নিকটবর্তী। তাহাদের অন্তর্গত ভাব একই। আধ্যাত্মিক বাঞ্ছিত লাভের জন্য তিনখানি কাব্যেরই নায়কের চেষ্টা এবং উদ্যম। তাহার দরুণ তাহাদের যে মানসিক সংগ্রাম, তাহা স্থূলে সংগ্রামরূপে বর্ণিত এবং তাহাই কাব্যের আখ্যানবস্তু। হৃদয়ের প্রবৃত্তিসকলও, গল্পের পাত্রপাত্রীরূপে ব্যক্তিগতভাবে রঙ্গমঞ্চে আনীত। কুপ্রবৃত্তি বা প্রতিকূল প্রভাবসকল শত্রুরূপে এবং সুপ্রবৃত্তি বা অনুকূল প্রভাব ও অবস্থাসকল মিত্ররূপে বর্ণিত।...কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মতো মানব-হৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কলাচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূরে অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এক অসাধারণ গুণ ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা শ্রেণীগত সংকীর্ণতা নাই। বাস্তবজীবনের উপর—উদার অ-সীমাবদ্ধ সত্যের উপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত। জীবনে যেমন ঘটে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে এবং সকলের উপর উজ্জ্বল কল্পনার উন্মাদিনী জ্যোৎস্নাবর্ষিত। সেই কল্পনা তুলনারহিত ভাষায় অপ্সরাচরণের নূপুরনিক্বণবৎ শ্রুতিমধুর ছন্দে এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুবিধ বর্ণে বিচিত্র শব্দ-যোজনায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক কল্পনার ঔজ্জ্বল্য এবং ছটায় শব্দ ও ছন্দের মধুর ঝংকারে স্বপ্নপ্রয়াণ বাংলা-সাহিত্যে একা—ইহার দ্বিতীয় নাই। বাংলা-সাহিত্যে শুধু কেন, ভাষা ও ছন্দ-সম্পদে, জগতের সাহিত্যে ইহার আসন—সিংহাসন! অনেকে ইহাকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারেন—কিন্তু যেকেহ কাব্যখানি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই আমার মন্তব্যকে কবির যথাপ্রাপ্য প্রশংসা বিবেচনা করিবেন। মুক্ত-কণ্ঠে এই যথাপ্রাপ্য প্রশংসা না করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রিয়নাথের সম্পর্ক যে কতদূর মধুর ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে উদ্ধৃত চিঠি দুটি থেকে।

প্রিয়বন্ধু,

তুমি স্বপন স্বপ্নপ্রয়াণের সমালোচনা-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয়। বঙ্গের **সাহিত্য-মধুপেরা drone-এর জাতি—** তাহারা রসও বোঝে না, আর ভাল জিনিসের মর্যাদাও বোঝে না। তোমার এবং আমার সাধের স্বপ্ন-প্রয়াণটি তাই এদীর্ঘকাল ধরিয়া বাজে দপ্তরের (Waste basket) আবর্জনারাশির মধ্যে মরণাপন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে—কেহ তাহাকে পোছে না। কোনো কবি গর্ভবাসকালে বিধাতাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—

"ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর—তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।।"

ইহার একটা অনুবাদ—

শত তাপ বিতর সহিব তাহা হে চতুরানন।
লিখো না লিখো না শিরে অরসিকে
রসনিবেদন।

ব্রহ্মার আশ্বাসবাণী
হইবে তোমার বন্ধু সুরসিক প্রিয়।
কবিত্বরসের ডালি তারে সঁপি দিও।।

প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেন
অভিন্নহৃদয়েষু

প্রিয়বন্ধু,

আমার সাধের স্বপ্ন-প্রয়াণটিকে তোমার কোড়ে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত। সমালোচনার কিরূপে গোড়া ফাঁদিয়াছে—আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ধীরেসুস্থে যেমন চলচে—চলুক; তুমি যখন আমার মানস-পুত্রটিকে সভারঞ্জন বেশে সাজাইয়া গুজাইয়া আসরে নাবাইবে, তখন দর্শক-মণ্ডলীর আনন্দ করতালি আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিবে—এই আশায় আমি কৌতূহলের বেগ সম্বরণ করিয়া দিন গুণিতেছি—Green-room-এ উঁকি দিয়া তোমাকে অপ্রস্তুত করিব না।
প্রিয়বন্ধু

প্রিয়নাথ সেন
অভিন্নহৃদয়েষু

শ্বাসরুদ্ধ

আশিস ঘোষ

গাড়ীটা স্টপে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ছেড়ে দিল। সুজয় একবার ভাবলো,—যাক গে, ছেড়েই দিয়েছে যখন, আর দরকার নেই উঠে. কিন্তু কেমন একটা ঝোঁক পেয়ে বসলো হঠাৎ, ট্রামটা গড়িয়ে গড়িয়ে আরও একটু এগিয়ে গেছে। খানিকটা ছুটে গিয়ে, লাফিয়ে হ্যান্ডেলটা ধরল সুজয়, কারা যেন হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নিতে চাইলো। এমনটা প্রায়ই হয়, আজও হচ্ছিল। কিন্তু পা-টা ঠিকমত পড়ল না, ফসকে গেল, আর দেহটা হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে থাকলো।

সবাই চীৎকার করে উঠলো, ট্রামের জানালা দিয়ে কয়েকটা মুখ নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো। ট্রামটা তখনো আস্তে আস্তে চলছিল তাই রক্ষে। নাহলে সুজয়ের দেহটা এতক্ষণে চাকার নিচে গড়াতে গড়াতে একেবারে থেঁতলে যেত। ট্রামটা অবশ্য থেমেই এসেছিল। কিন্তু তার আগেই একটা হাত তাকে টেনে ওপরে তুলে নিল।

দরজার সামনে হ্যান্ডেল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সুজয়। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটানোর জন্য মুখে একটা বোকা-বোকা হাসি আনার চেষ্টা করলো। একপাটি চটি কোথায় যেন পড়ে গেছে। একটা পা খালি থাকায় অস্বস্তি লাগছিল। কী মনে করে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ধীরে ধীরে আর একটা পা-ও খালি করলো। এখন তার দুটো পা-ই খালি। কপালে ঘাম জমেছিল। বুকের ভেতরটা এখনো কাঁপছে। যদি ট্রামের নিচে পড়ে যেত!—যদি পা দুটো কাটা পড়ত!—যদি বাকী জীবনটা ক্র্যাচে ভর দিয়েই কাটাতে হতো! সুজয়ের মনে হলো তার পায়ের ভিতরটা শিরশির করছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে, সে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। ভীড় ঠেলে আরও ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলা সুজয়।

দরজার সামনেই একজন জিজ্ঞেস করলো—কি মশাই, লাগটাগেনি তো? মাথা নাড়লো সুজয়।

—যাক্। তবু অল্পের ওপর দিয়েই গেছে।

সুজয় এবার মুখ টিপে হাসলো। তার-পর অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। এতক্ষণ অনেকেই তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করেছে। দু'একজন কী যেন মন্তব্যও করেছে। এ'সব আরও বেশী বিরক্তিকর। এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে রুমাল দিয়ে কপালটা মুছতে থাকে সুজয়।

ময়দানের পাশ দিয়ে ট্রামটা যাচ্ছিল। বৃষ্টিভেজা মাঠটা কেমন যেন আবছা—অস্পষ্ট। মনুমেন্টের মাথায় একটুকরো কালো মেঘ। দূর থেকে দেখলে বৃষ্টিভেজা মনুমেন্টকে মাঝেমঝে কেমন যেন অচেনা মনে হয়।

আজ শনিবার। দুপুরে স্কুল ছুটির পর আজ একবার নীহারকে দেখতে যেতে হবে। শুনেছে ওর অসুখটা নাকি একটু বাড়াবাড়ি রকমের। একবার দেখা দরকার। যদি সম্ভব হয় তো, ও-কে কয়েকটা কথা বলবে সুজয়। কী বলবে ভেবে ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু এখন সবকিছুই কেমন যেন ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে। অস্বস্তির ভাবটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

ট্রামটা একটা স্টপে দাঁড়াতেই কয়েকজন নামলো। ট্রাফিকের লাল আলোটা জ্বলতে থাকায় ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকের ফুটপাত দিয়ে কে একজন ওয়াটারপ্রুফ গায়ে হেঁটে চলেছে। লোকটার পায়ের নিচের অংশটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। পাদুটো চলতে চলতে একসময় পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়লো।

ট্রামটা আবার চলছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ছাট আসছিল জানালা দিয়ে। হাওয়ায় জলের গন্ধ। বোধহয় আরও বৃষ্টি হবে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেয়েছিল সুজয়। ঘুম থেকে উঠে আজ কার মুখ দেখেছিল কে জানে। এমন একটা বিপদের কথা কিন্তু বাড়ী থেকে বেরোনোর সময়েও মনে হয়নি একবার।—সত্যি, আর একটু হলেই কী যে হ'তো! এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে সুজয়। পিঠের ওপর ক্রমশ ভীড়ের চাপ পড়ছিল।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনটা কেমন যেন বিস্বাদ লাগছিল। ঘুমের মধ্যে কী যেন একটা স্বপ্ন দেখছিল সুজয়। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর কিছুতেই স্বপ্নটাকে মনে করতে পারছিল না। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা

মনে হচ্ছিল সবকিছু। কাল রাতে ভাল ঘুম না হওয়ায়, একটা কেমন জড়তায় পেয়ে বসেছিল। বাড়ীর এ-পাশটায় ছোট একটা মাঠ। তারপর রাস্তা। সুজয় রাস্তার পাশের মাথাকাটা নারকেল গাছটা দেখছিল ঝির-ঝিরে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। খোলা জানলা দিয়ে, বৃষ্টির ছাট আসছিল বুঝতে পেরেও, উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করেনি। পেঁজা তুলার আঁশের মতো বৃষ্টির ফোঁটা, আর এলোমেলো হাওয়া। আকাশে মেঘ জমছে তো জমছেই। সুজয় ভাবছিল, আজ স্কুলে যাবে কিনা। বৃষ্টি আর স্কুলের কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় হঠাৎ নীহারের কথা মনে পড়েছিল।

ভেবে দেখেছে সুজয়, হয়তো নীহারকে ও সত্যিই ভালবাসে। নয়তো ওর এই দুঃসংবাদে ও এতটা বিচলিত হতো না। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে সুজয়, যদি সম্ভব হয় সবকিছুই ওকে খুলে বলাই বরং ভাল। যা'হয় একটা কিছু আজ ওকে বলতেই হবে। ঘরময় আবছা অন্ধকারে পায়চারী করতে থাকে সুজয়। দরজা বন্ধ। অন্ধকার আরও জমাট বাঁধছে। ছাদের নিচের ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে অস্পষ্ট একটা মলিন আলোর রেখা উল্টো দিকের দেওয়ালে এসে পড়েছে। পাশের বাড়ীর মেয়েটি গলা সাধছে তো সাধছেই। হারমনিয়ামের শব্দ শুনতে শুনতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সুজয়।

সুজয়দের স্কুলবাড়ীটা নতুন। দোতলা বাড়ীটার পাশ দিয়ে আরও কিছু টিনের ঘর রয়েছে। স্কুলের পেছন দিকে একটা পুকুর আর তারপর আম-বাগান। প্রথম ঘণ্টায় সুজয়ের কোন ক্লাস ছিল না। ভেজা জামাটা খুলে হ্যাঙ্গারে টানিয়ে রেখেছে। ড্রয়ার খুলে এক-জোড়া হাওয়াই স্যাণ্ডেল বার করে পায়ে দিয়েছে। এই হাওয়াই জোড়া স্কুলের আল-মারীর মধ্যে রাখা থাকে। সময়ে-অসময়ে কিংবা কখনো শক হলে, স্কুলে এসে এটা পায়ে দেয়। আজ খুব কাজে লাগলো। পকেট থেকে চিরুনী বার করে চুল আঁচড়াতে থাকে সুজয়।

ঘরের এককোণে ইতিহাসের টিচার নবনীবাবু কাগজ পড়ছেন। উল্টোদিকের কাউন্টারে কেরানীবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছেন। এ'দিকটায় এখন কেউ নেই। একটু পরেই হেডমাস্টারমশাই রাউণ্ডে বেরুবেন। চোখ বুঁজে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয় সুজয়। পেছনদিকের জানলা দিয়ে জলো হাওয়া ঢুকছে। গাছের পাতার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে।

কয়েকদিন আগে নীহারকে একটা চিঠি লিখেছে। লিখেছে,—'তোমার সংগে দেখা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। হয়তো আর কোন-দিন এভাবে দেখা করতে চাইবো না।' এখন হঠাৎ চিঠিটার কথা মনে পড়তেই ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। সকালের দুর্ঘটনা যেন এই অস্বস্তিটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্লাসে বাংলা পড়াচ্ছিল সুজয়। পড়াতে একটুও ভাল লাগছিল না। ইচ্ছে করছে, চেয়ারের ওপর পা-দুটো তুলে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়। পেটের ব্যথাটা আবার যেন উঠছে। সে অনেকদিন ভেবেছে বাইরের হোটেলে আর খাবে না, স্টোভ কিনে বাড়ীতেই সব ব্যবস্থা করবে। এতে খরচও কম, আর তাছাড়া স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর রান্না করা হয়ে ওঠে না। আসলে, সে বোধহয় একটু নির্ঝন্‌ঝাট-প্রিয়।

ঘুমে চোখ বুঁজে আসছিল। আজ বোধ-হয় স্কুলে না এলেই ভাল হোত। জড়তা কাটিয়ে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে সুজয়। ছেলেগুলো কী ভাবছে কে জানে। সামনের বেঞ্চের একটি ছেলেকে ধমক দিল হঠাৎ। আর একজনকে আজকের পড়াটা রিডিং পড়তে বললো। ছেলেরা এতক্ষণ হৈ-চৈ করে এখন একটু চুপ করেছে। চোখ বুঁজে পড়া শুনছিল সুজয়। মাঝে মাঝে ঝিম এসে আবার নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসছিল।

ছুটির ঘণ্টা পড়তেই ছেলেরা সব বেরোতে শুরু করলো। ভীড়ের মধ্যে পথ করে এগিয়ে যাচ্ছিল সুজয়। টিচার্সরুমের লম্বা টেবিলটা ঘিরে নানাবয়সের শিক্ষকরা বসে আছেন। সবাই ক্লান্ত। রাজনীতি, সাহিত্য, খেলাধুলো মায় বাড়ীর রেশান আনা পর্যন্ত সবকিছুর আলোচনা চলেছে পুরো-দমে। কে যেন কী একটা রসিকতা করতেই আশপাশে সবাই হেসে উঠলো। কে যেন সুজয়ের নাম করে কী একটা বললো, সে শুনতে পেল না। বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাল বারকয়েক। তারপর অফিসঘরের দিকে পা বাড়াল। কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিতে হবে।

কাউণ্টারে দাঁড়াতেই কেরানীবাবু হাসলেন।—'কি মশাই, টাকা চাই নাকি আবার?'

মাথা নাড়লো সুজয়।

কত?

দিন, গোটা পাঁচশেক। নিচের দিকে তাকিয়ে মেঝেয় পা ঘসতে থাকে সুজয়। কেরানীবাবু তার দিকেই তাকিয়ে থাকেন।

রোজ রোজ এত টাকা দিয়ে কী করেন বলুন তো?

জুতো কিনবো।

জুতো!

হ্যাঁ, আমারটা হারিয়ে গেছে।

সেকী! কেমন করে?

এই আর কি, ট্রাম-বাসের ভীড়ে।

দূর মশাই, কি যে বলেন!

কেন?

কেন আবার কী?

যা হয়েছে তাই তো বললাম।

মানে বুঝলাম না।

আমিও বুঝলাম না।

কি বুঝলেন না?

আপনার কথা।

তা' বেশ। কেরানীবাবু হাসলেন। এই নিন।

সই করে টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখলো সুজয়। —চলি।

আসুন। এখন কী বাড়ী?

না, এই একটু এদিক-ওদিক কাজ আছে।

মিটিংয়ে থাকছেন না?

বোধহয় না।

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে আর টিচার্স রুমের দিকে গেল না সুজয়। একটা হৈ-হট্টগোলের শব্দ আসছে ওদিক থেকে। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নামতে শুরু করলো। কারুর সংগে দেখা হয়ে গেলে, আর বেরুনো যাবে না।

খোয়া ওঠা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা খানিকটা। তারপর একটা পুকুর আর আম-বাগান পেরিয়ে পাকা রাস্তা। দুপুরের এই সময়টায় এদিকটা একেবারে নির্জন। টিফিনের পর অফ্‌পিরিয়ডে প্রায়ই এখানে এসে বসে থাকে সুজয়।

এখন রোদ ছিল না। ছায়া-ঢাকা পুকুরের জল আরও ঘন আর গভীর মনে হচ্ছিল। ওপাশের রাস্তা দিয়ে ভারী একটা কোন গাড়ী চলে যাওয়ার শব্দ ভেসে এলো জলের ওপর দিয়ে। ধীরে ধীরে অগোছালো পা ফেলে ফেলে অন্যমনস্কভাবে হেঁটে যাচ্ছিল সুজয়।

নীহার একদিন বলেছিল, 'সুজয়দা' আপনি যেন কেমন মানুষ!'

মানে?

মানে আবার কি! চোখ টিপে হেসে-ছিল নীহার। —সব সময় কেমন যেন মুখ গোমরা করে থাকেন, কোনদিনি আপনাকে খুশী দেখলাম না।

খুশী হওয়ার কোন কারণ আছে কি? ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করেছিল সুজয়।

কেন নেই? কি এত দুঃখ আপনার?

এরপর আর না হেসে পারেনি সুজয়। —তুমি খুব ছেলেমানুষ নীহার!

বুঝলাম। অন্যদিকে তাকিয়ে নীহার একটু গম্ভীর হয়েছিল।

একা-একা পথ চলতে চলতে সুজয় এখন নিজের কথাই ভাবছিল। কেউ তাকে বুঝলো না। কেউ তাকে বুঝতে চাইলে না। এ' সংসারে তার কেউ নেই। আজ প্রায় কতদিন বাবাকে দেখেনি। ভিটের মায়ায় বাবা দেশেই রয়ে গেলেন। সেই কোন ছেলে-বেলায় মা মারা গেছে। মার কথা কিছু মনেই পড়ে না। মাঝে মাঝে যে বাড়ী যাবে তা-ও ঠিক হয়ে ওঠে না। আসলে, নিজেকে নিয়ে সে এত বেশী ব্যতিব্যস্ত যে, অন্যদিকে নজর দেওয়ার আর অবসর পায় না।

ছোট নর্দমাটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল সুজয়। এদিকটায় একটু রোদ পড়েছে। ভিজে রাস্তায় এলোমেলো টায়ারের দাগ কোথাও বা স্পষ্ট, সুজয় একটু তাড়াতাড়ি পথ চলার চেষ্টা করছিল এখন প্রায় বিকেল। সন্ধ্যের মধ্যেই নীহারের ওখানে পৌঁছতে হবে। সে আজ বলবে কী যেন বলবে, কী যেন...এখন কিছুতে ভেবে ঠিক করতে পারছে না। অথচ ক'দিন ভেবেছে। বলার মত কত কী ভে ঠিক করে রেখেছে। কাল প্রায় সারা রা সে ঘুমুতে পারেনি। নীহারকে আ

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই হবে। —'দ্যাখো, তোমাকে আমার খুব প্রয়োজন! তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না!' এ'কথা বলতে পারবে কী? নীহারের সামনে দাঁড়িয়ে, এ'কথা বলার সাহস তার আছে কী? কে জানে হয়তো আছে। নিশ্চয়ই আছে। তা' না হলে সে যাচ্ছেই বা কেন?

চশমার কাঁচটা পরিষ্কার করতে থাকে সুজয়। আর একটু গেলেই ট্রাম রাস্তা পাওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠতে পারলে হয়। নয়তো দেরী হয়ে যাবে। গত কয়েক মাসে নীহারের সঙ্গে যে-ক'বার দেখা হয়েছে, তা'তে ওর ব্যবহারে মনে হয়েছে যে, সুজয়কে ও হয়তো আর পছন্দ করে না। এ'ভাবে বারবার চিঠি লেখায় সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। হয়তো এবারেও হবে। কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটু সন্দেহ থেকে যায়। তাই যদি হয়, তবে চিঠি পেয়ে সে-ই বা আসবে কেন দেখা করতে। কতদিন ভেবেছে সুজয়, সত্যিই কী মানুষ এভাবে ভুলে যেতে পারে! একদিন তো সে সুজয়কেই চাইতো। আর কেনই বা চাইবে না। —'দ্যাখো নীহার, তোমার জন্যে আমি অনেক করেছি। হঠাৎ তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর তুমি যখন কোলকাতায় এলে, তোমাকে সাহায্য করতে তখন আমিই এগিয়ে এসেছিলাম। তোমার ভাইয়েরা আসেনি।' ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে সুজয় অপেক্ষা করতে থাকে। সবুজ ঘাসে ঢাকা সমান্তরাল ইস্পাতের লাইন দুটো বহুদূর অবধি চোখে পড়ে। ট্রামের তারে জড়িয়ে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি হাওয়ায় লাট খাচ্ছিল। হাওয়ার গন্ধে বুঝতে পারলো আবার বৃষ্টি নামবে, থোকা থোকা কালো মেঘ হাওয়ায় ভেসে আসছে এদিকে।

—'আশা করি, পুরোন সব কথা ভুলে যাওনি! ......এবার তোমাকে কয়েকটা কথা বলবো। ...হয়তো আর কোনদিন চিঠি লিখবো না। কিংবা কিছুই হয়তো আর বলতে চাইবো না।' চিঠির শেষের দিকে এ'সব কথা এবারেও লিখেছে সুজয়। আবার নতুন কিছুও যোগ করেছে। —'যদি কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, তা-কি আর দূর করা যায় না? যদি কোন ভুল করেই থাকি, তা-কি তুমি ভুলে যেতে পার না?' একটা ট্রাম আসছিল। হাত তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুজয়। সকালবেলার সেই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়লো। সত্যি, সে কথা ভাবলে বুকের ভেতরটা এখনো শির শির করে। আবার যদি সে-রকম হয়, এবার সে নির্ঘাৎ ট্রামের নিচে পড়ে যাবে। নয়তো আগেই হার্টফেল করবে। নীহারের সঙ্গে আর দেখা করতে পারবে না। একটু পেছনে সরে এসে, কাপড়টা গুছিয়ে ঠিক করতে করতে ট্রামটা এসে পড়লো। সুজয় একবার ভাবলো, এটা ছেড়ে দেবে কিনা। কিন্তু আবার কি ভেবে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে এক লাফে হ্যান্ডেল ধরে উঠে পড়লো। —আশ্চর্য, এবার আর কিছুই হলো না। কেউ-ই চীৎকার করলো না। কোন হাত তাকে ভিতরে টেনে নিল না। তাকে লক্ষ্য করে কেউ কোন উপদেশও দিল না! সকালের সেই ট্রামটার কেউ নেই তো এখানে! কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, আশপাশের কয়েকটা মুখ আড়চোখে দেখে নিল সুজয়। তার দিকে কেউ তাকিয়ে নেই। কেউ তার কথা ভাবছে না। তাকে কেউ চিনতেও পারেনি। ট্রামের পা-দানীতে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল সুজয়। আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছে চোখে-মুখে।

বছর কয়েক আগে, এমনি এক বৃষ্টির দিনে নীহারকে নিয়ে কী একটা কাজে বেরিয়েছিল। বৃষ্টি দেখতে দেখতে সে-কথা এখন হঠাৎ মনে পড়ল সুজয়ের। ফেরার পথে বাসে অসম্ভব ভীড়, ট্রাম বন্ধ ছিল। স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীহার এক সময় বলেছিল,—'সুজয়দা' একটা ট্যাক্সি কিংবা রিক্শা করুন। খুব দেরী হয়ে যাচ্ছে।' বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠেছিল কথাটা শুনে। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। —'না —না, ও-সব কেন! বাস ঠিক পেয়ে যাব।' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেয়েছিল সুজয়।

নীহার শোনেনি। বলেছিল,—'না, এই ভীড়ে আমি বাসে উঠতে পারবো না।'

'কি পাগলামো করছো!' একটু গম্ভীর হয়েছিল সুজয়।

নীহার কিন্তু সত্যিই একটা ট্যাক্সি থামিয়েছিল। আগে ভিতরে চলে গিয়ে মুখ বার করে ডেকেছিল, 'কই, আসুন!'

মাথা নেড়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল সুজয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কী বুঝেছিল কে জানে, ড্রাইভারকে যেতে বলেছিল নীহার।

ট্যাক্সি চলে যেতে, অনেকক্ষণ একা-একা দাঁড়িয়েছিল সুজয়। কেমন যেন ফাঁকা মনে হচ্ছিল সবকিছু। তার সারা জীবনটাই এমন ফাঁকা। কেমন যেন একটা শূন্যতার মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাকে বুঝলো না। কেউ তার পাশে দাঁড়াল না। কেউ তার কথা একবার ভেবেও দেখলো না।......একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সুজয়। নিজের কথা ভাবতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে, তবুও মাঝে মাঝে নিজের কথা ভাবার মধ্যে কেমন যেন একটা গোপন সুখ আছে। ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে সুজয়। বৃষ্টির ছাট লাগছে চোখেমুখে। —এ'ভাবে ভীড় ঠেলে দু'বেলা যাতায়াত করা আর পোষায় না, কিন্তু অন্য কিছু করার ক্ষমতাও তো নেই। চেষ্টা করে করে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। মনে মনে বলল সুজয়, সকালে একটা টুশানি করি, আর দুপুরে এই স্কুল। একরকম মন্দ কি? আর তা' ছাড়া এ'ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরর্থক বিপন্ন ভাবার মধ্যে, একধরনের রোমান্স আছে! —এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে আর এক হাতে জামার হাতা গোটাতে গোটাতে আপন মনে একবার হাসলো সুজয়। —আর তা' ছাড়া, জীবনে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেলেই কি আমার সব কিছু পাওয়া হয়ে যেত? আমি কি সুখী হতে পারতাম? ও-ভাবে বোধহয় সুখ পাওয়া যায় না। শুধু সুখ চাই, সুখ চাই বলে সারা জীবন কেঁদে মরলেও সুখ তুমি পেতে পার না।

ট্রামটা কখন যে স্টপে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করেনি সুজয়। পরিচিত পানের দোকানটা চোখে পড়তেই চমক ভাঙলো। ভীড় ঠেলে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সুজয়। দোকানে পরিচিত কেউ ছিল না। সুজয় একবার ভাবলো, এক কাপ চা খেয়ে নেবে কিনা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। যদি দেরী হয়ে যায়? বিকেল পাঁচটার মধ্যে যাওয়ার কথা। সময় হয়ে গেছে।

আসলে, ঠিক এই সময়টায় নীহারের মেসে যেতে চাইছিল না সুজয়। এখন মেসে

প্রায় কেউ-ই থাকে না। অফিস কিংবা কলেজ থেকে মেয়েদের ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। অতবড় একটা প্রায় ফাঁকা বাড়ীতে একা ঘরে বসে বসে নীহারের সংগে কথা বলতে হবে, ঐ কথা ভাবতেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সুজয়। আর তা'ছাড়া ও-এখন কেমন অবস্থায় আছে, তাই বা কে জানে!

একদিনের কথা মনে পড়লো। সেদিনও বিকেলের দিকে এমন মেঘলা-মেঘলা আর বৃষ্টির ভাব ছিল। নীহারের ঘরের কড়া নাড়তেই ও এসে দরজা খুলে দিয়ে, দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রইলো। সুজয় ও-কে সরতে বলেছিল। ও সরেনি। দু'হাত ছড়িয়ে দরজা আটকে, সুজয়ের চোখে চোখ রেখে হেসেছিল।—'ঘরে এখন কেউ নেই কিন্তু!' অদ্ভুতভাবে হাসছিল নীহার। আর ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সুজয়। ভীষণ শীত করছিল। মনে হচ্ছিল যেন জ্বর আসবে। বুঝতে পেরেছিল সুজয়, আসলে নীহার চাইছে ত'কে জোর করে দু'হাতে সরিয়ে ও ভিতরে ঢুকুক। নীহার চেয়েছিল, কিন্তু সুজয় পারেনি। 'আমি যাই' বলে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, সেই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল।

একটা চিঠি লিখেছিল সুজয়,—দ্যাখো নীহার, তুমি কি চাও আমি ঠিক জানি না। তবে আমার পক্ষে কিছু একটা করা এখন সম্ভব নয়। সুজয় লিখেছিল,—তোমার এখন বয়স অল্প। হঠাৎ উত্তেজনায় কিছু করে বসলে, পরে হয়তো পস্তাতে হবে।...

সরু গলিটা আবছা অন্ধকার। কয়েক জায়গায় জল জমেছিল। আশপাশের বাড়ীগুলো থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বেরিয়ে, গলিটাকে গুমোট করে তুলেছে। হাঁটতে হাঁটতে সুজয় একসময় নীহারদের হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঐ সময়ে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে মেয়েদের হোস্টেলে ঢোকাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। আর তা'ছাড়া ও এখনো এখানে আছে কিনা কে জানে! কি করবে বুঝতে পারছিল না সুজয়। ফিরে যাবে কি? পরে একদিন আসবে? কিন্তু এতটা রাস্তা এসে, এখন চলে যাওয়াটাও তো সম্ভব নয়। একটা কিছু আজ করতেই হবে। নীহার এখন অসুস্থ। হয়তো ও খুব রোগা হয়ে গেছে। হয়তো ওর গায়ের রং এখন পাংশু আর সাদাটে। হয়তো ওর চোখের দৃষ্টি খুব ঘোলাটে। হয়তো...হয়তো......

—বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি, অথচ ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারি না! মনে মনে ভাবতে ভাবতে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লো সুজয়। একবার নাড়লো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, আবার নাড়লো খুব জোরে। কে যেন নামছে সিঁড়ি বেয়ে। শব্দটা নামতে নামতে একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামলো। এখন এদিকেই আসছে। আবছা অন্ধকারে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না।

—কাকে চাই?

একটু যেন হোঁচট খেল সুজয়। হোস্টেলের লেডী সুপারেনটেনডেন্ট বোধ হয়। কি চাই আপনার? বয়স্কা মহিলাটি আরও কিছুটা এগিয়ে এসে একেবারে সুজয়ের সামনে দাঁড়াল।

নীহার—মানে নীহার সেনের সংগে একবার দেখা করতে চাই। একটু ইতস্তত করে সুজয়।

কে হয় আপনার?

খুব নিকট আত্মীয়। অসুস্থ শুনলাম!

হ্যাঁ, ভুগছে কিছুদিন ধরে। সুজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একপলক কী যেন ভাবলেন। বললেন, কিন্তু কই ওর বাড়ী থেকে কেউ তো আসেনি। ওর ভাইয়েরাও তো কেউ এলো না! আপনি—

এমনি-ই দেখতে এলাম। দরজা ছেড়ে একপাশে সড়ে দাঁড়াল সুজয়।

আসুন। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে থাকেন মহিলা। কিছু না বলে ভিতরে চলে আসে সুজয়। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল গায়ে। আর তা'ছাড়া এ বাড়ীটার সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে সুজয়।

আলো নেই?

ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেছে।

অন্ধকারে খুব অসুবিধে হচ্ছে কিন্তু।

প্রথম প্রথম আমাদেরও হতো, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

এরকম কতদিন থাকবে?

যতদিন না ঠিক করা হয়।

অন্ধকারে রেলিঙ ধরে ধরে ওপরে উঠতে থাকে সুজয়। কোথাও একটা হাল্কা আলো জ্বলছিল। আবছা আলোর আভা কিছুদূর অবধি নেমে এসেছে। আলোর দিকে চোখ রেখে, সাবধানে ওপরে উঠতে থাকে সুজয়।

নীহারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন, নক্ করুন, দরজা বোধহয় খোলাই আছে।

সুজয় দরজার সামনে দাঁড়াল। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলা আবার সিঁড়ির দিকে এগুলেন। আর একটু অপেক্ষা করলো সুজয়। তারপর দরজার কড়া নাড়লো।

কেউ সাড়া দিল না।

সুজয় আবার শব্দ করলো।

কোন সাড়া এলো না।

সুজয় অপেক্ষা করলো। আবার কড়া নাড়লো।

কেউ দরজা খুলে দাঁড়াল না।

কি করবে ভাবতে ভাবতে একসময় দরজায় ধাক্কা দিল সুজয়। আর প্রায় সংগে সংগেই ভেতর থেকে যেন হাল্কা একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো।

দরজা খুলতেই নীহারকে দেখতে পেল সুজয়। কেমন যেন ক্লান্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল নীহার। সুজয়ের মনে হলো, হয়তো নীহার ওকে ঠিক দেখছে না। পেছনের সাদা দেওয়ালটার দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছে।

ভেতরে আসুন।

ঘরের ভেতরে পা রাখলো সুজয়।

—কেমন আছ?

এই আর কি! আপনি কি স্কুল থেকে?

হ্যাঁ, খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো সুজয়:

এদিক ওদিক ঘুরঘুর করে কিছুক্ষণ কী যেন খুঁজলো নীহার। তারপর একসময় জানালার সামনে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়লো। খুব রোগা দেখাচ্ছিল ও-কে। তবে যতটা ভেবেছিল, ঠিক তেমন অবস্থা নয়। ভেবেছিল, হয়তো গিয়ে শোয়া অবস্থায় দেখবে। কিংবা হয়তো ওকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে।

তোমার কী যেন হয়েছিল, খুব অসুস্থ শুনেলাম? ইজিচেয়ারের দিকে তাকাল সুজয়।

ও কিছু না। মেয়েদের কতরকমের অসুখ হয়। পেছন থেকে নীহারের মুখের বাঁ পাশটা দেখা যাচ্ছিল।

আপনার কি খবর বলুন। পেছন ফিরে একবার তাকাল নীহার। দু'টো চিঠিই আমি পেয়েছি।

চিঠির কথা উঠতেই একটু নড়েচড়ে বসলো সুজয়। চিঠি লিখেছে, কেন লিখেছে, সবকিছু একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করলো। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অথচ কাল থেকে অনেক কিছুই সে ভেবেছে। এখন কিছুই মনে পড়ছিল না।

নীহার হঠাৎ বলে বসলো, আপনি কি বলবেন লিখেছেন? পেছন ফিরে তাকাল একবার।

কেন লিখেছে, কি লিখেছে, সুজয় তাই ভাবছিল। কিছুই মনে করতে পারছিলনা।

এখুনি বলতে হবে? একটু জিরিয়ে নিই না!

কোন উত্তর এলো না।

বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। জানালার পর্দা উড়ছে হাওয়ায়। নীহারের ডান হাতটা ঝুলে আছে। পা দুটো টান করা। বাইরের দিকে চেয়েই বসেছিল নীহার। সুজয় চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারছিল না। খুব গরম লাগছিল। বাইরে যে হাওয়াটা ছিল, এখানে এই ঘরের মধ্যে সেটা নেই। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, কিন্তু গায়ে হাওয়া লাগছে না। সমস্ত শরীরটা জ্বালা করছে। মনে হচ্ছে, জামা-গেঞ্জী খুলে ফেললে হয়তো ভাল লাগত।

চেয়ার ছেড়ে একসময় উঠে দাঁড়াল নীহার। জানালার শার্সিটা ভাল করে টেনে দিয়ে, চেয়ারটা একপাশে সরিয়ে, সুজয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

কই, বললেন নাতো?

কী?

কেন এসেছেন।

বললাম তো, তোমাকে দেখতে। একটু হাসার চেষ্টা করলো সুজয়। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলো নীহার। তারপর ঘরের কোণের আলমারীটার দিকে এগিয়ে গেল। কিছুই বলতে পারল না সুজয়। ফোলা ফোলা চোখ, মুখ, টিকালো নাক, চুল, শরীরের বিভিন্ন অংশ, খণ্ডদৃশ্যের মতো চোখের সামনে ভাসতে থাকল। কাল ঘুমের মধ্যে ওর গোটা শরীরটাই দেখতে পেয়েছে।

আলমারীর পাল্লা খুলে, কী যেন খুঁজছিল। মাঝে মাঝে দু'একবার পেছন ফিরে চাইছিল। —দ্যাখো নীহার, আমাকে ভুল বুঝো না।' কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে ফেলার চেষ্টা করে সুজয়। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমার খুব প্রয়োজন। কিন্তু এ-কথাটা আমি কিছুতেই বলতে পারি না। কেমন যেন গুলিয়ে যায় সবকিছু। আমি একা। নীহার, আমি ভীষণভাবে একা। চাপা অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকে সুজয়।

দেখুন, আপনি এর আগেও কয়েকবার চিঠি দিয়েছেন। দেখা করতে বলেছেন, কিংবা নিজেই এসেছেন। কথা বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় নীহার। সিঁড়িতে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ হচ্ছে। কারা যেন উঠে আসছে ওপরে।—এসব আর কেন? কি দরকার আছে আর?

সুজয়ের ইচ্ছে হলো বলে, তুমি তো সবই জান। তোমার অজানা নয় কিছুই। আমি কেন এসেছি, তুমি তা জান।

কথা বলছেন না কেন? নীহারের গলার স্বর এবার একটু যেন কর্কশ মনে হলো।

সুজয়ের ঠোঁট কাঁপছিল। —কী আর বলবো বলো?

কি বলবেন, তার আমি কি জানি? গলার স্বরে আর একটু জোর আনলো নীহার। —আবার কেন চিঠি লিখেছেন ওভাবে?

জানি না, কেন লিখেছি। নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল সুজয়ের।—আমি বোধহয় আর বাঁচবো না। আমাকে বাঁচাও নীহার! কথাটা বলেই খাট থেকে নেমে দাঁড়াল সুজয়। অস্বস্তিতে ওর চোখের পাতা কাঁপছিল।

কথাটা শুনে সোজা হয়ে দাঁড়াল নীহার। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর দরজা ছেড়ে কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। —আপনি যে কি করেন, কি বলেন, আপনি তা' জানেন না! ওর গোটা শরীরটা কাঁপছিল। —চিঠিতেও আপনি এসব কথা লিখেছেন।

কিছুই বললো না সুজয়। কিছুই বলতে পারলো না। অথচ অনেক কিছুই বলার জন্য ওর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারছিল না।

লজ্জা করে না আপনার? নীহারের চোখ দুটো খুব লাল দেখাচ্ছে। এই আপনি একদিন আমার দাদাকে গিয়ে বলেছিলেন, নীহার ভুল পথে চলেছে, ওকে বাঁচান। আমাকে বলেছিলেন, ছেলেমানুষি করছি আমি, তাই হঠাৎ কিছু একটা করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল নীহার। একটু থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা শেষ করলো,—সেই আপনি, আজ আমার বাড়ী বয়ে বলতে এসেছেন, বলছেন, নীহার, আমি আর বাঁচবো না, আমাকে বাঁচাও! আশ্চর্য! রাগে ওর গলার শিরা ফুলে উঠেছিল। স্বর কাঁপছিল। কপালে হাত ঘষতে ঘষতে ইজিচেয়ারটার দিকে এগিয়ে যায় নীহার। —আপনাকে আগেও বলেছি, এভাবে রোজ রোজ আমায় জ্বালাতন করবেন না! ক্লান্ত হয়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়লো নীহার।

সুজয়ের মনে হচ্ছিল, ঘরের ভিতরটা যেন বড় বেশী অন্ধকার। মনে হচ্ছিল, তার গোটা শরীরটা ধরে কেউ যেন দু'হাতে ভীষণভাবে ঝাঁকাচ্ছে। ঝাঁকুনির দমকে, এক-সময় তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকবে। সে হয়তো এই ঘরের মেঝেতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হাত বাড়িয়ে খাটটা ধরে ফেলে সুজয়। কিছু একটা বলার জন্য তার গোটা শরীরটা তোলপাড় করতে থাকে।

বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হচ্ছে বারবার। অস্পষ্ট কথা শুনতে পাচ্ছিল সুজয়। মেয়েরা ফিরছে বোধহয়। এখন এ ঘরে কেউ এসে ঢুকলে আরও অপ্রস্তুত হতে হবে। কী করা যায়! বেরিয়ে যাবে? আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে? ও-কি আর কিছু বলবে? নীহারকে দেখল সুজয়। ও তেমনি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল। ও-কি সময় দিচ্ছে? ও-কি চাইছে, সুজয় কিছু বলুক?

একবার পেছন ফিরে তাকাল নীহার। আর তাকাতেই সুজয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। —আপনি যান এবার। মুখ ঘুরিয়ে নিল নীহার। —মেয়েরা সব আসছে। এভাবে আমার ঘরে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করবে। আস্তে আস্তে কথাগুলো শেষ করলো নীহার।

বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। এলো-মেলো হাওয়ার ঝাপটা মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যেও এসে ঢুকছে। এখন সন্ধ্যা। আলো না জ্বালানোর ফলে অন্ধকারটা যেন একটু বেশী ঘন হয়ে উঠছে। নীহারকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে ওর হাত-পা নাড়ানোর শব্দ, ইজিচেয়ারটার শব্দ, বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ, দরজার ও-পাশে অস্পষ্ট চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আর দাঁড়াল না সুজয়। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

—আমি তাহলে চলি? একটু দাঁড়াল। অন্ধকার ঘর থেকে কোন উত্তর এলো না। ইজিচেয়ারটার ও-পাশ থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুজয়।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে সে এখন নিচে নামছে। কিছুই তার মনে পড়ছিল না। সে কেন এসেছিল? কেন? নীহার কে? সবকিছুই কেমন যেন আবছা অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। পা দুটো যেন ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সে নিচে নামছে। এরপর রাস্তা। বৃষ্টি। হাওয়া। ভিজে জবজবে হয়ে একসময় হয়তো নিজের সেই ঘরে পৌঁছবে। সেখানে সে একা। ভীষণ একা। সে ঘরটা এখন অন্ধকার। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, হয়তো এই ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে একসময় সে তার ঘরে পৌঁছবে।

বাইরের দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নামলো সুজয়। ছিটছিটে বৃষ্টি আর কাদায় পথ চলতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। আজ সকালে তার দিন শুরু হয়েছিল মৃত্যু দিয়ে।—যদি মৃত্যুতেই শেষ হ'ত! এ সংসারে তার শেষ বন্ধনটুকুও ছিঁড়ে গেল! এই গলিটা কেমন যেন গুমোট। চাপা আলোয় অন্ধকার। সুজয়ের মনে হলো, সে বোধহয় আর কোনদিন এই অন্ধকার থেকে বেরোতে পারবে না। এ সংসারে কারুর ওপর তার রাগ নেই। কোন অভিমান নেই।

বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় শব্দ করতে করতে একটা রিক্সা চলে গেল। রিক্সার নিচে লণ্ঠনের লাল আলোটা দুলছে। আলোটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুজয় ভাবছিল, তাকে মনে রাখার মতো আর কেউ রইলো না! একদিন সে জন্মেছিল, একদিন মরে যাবে। কেউ তাকে মনে রাখবে না।

কেউ তাকে মনে রাখতে চাইবে না।

মনে রাখতে পারবে না।

কারণ সে যে কি চেয়েছিল, কেউ তা বোঝেনি। বুঝতে পারেনি।

এমন কি সে সুজয়, সে নিজেও জানে না, সে কি চায়।

সে কি চেয়েছিল!

রাজকাহিনী

দিলীপ মালাকার

কথায় বলে রাজা-মহারাজাদের ব্যাপার। প্রজাদের ওসব রাজকাহিনীতে নাক গলান ঠিক নয়। বিংশ শতাব্দীতে চলেছে, গণতন্ত্রের যুগ, তাই রাজা-মহারাজাদের কাহিনী আলোচনা করার অধিকার আমাদের রয়েছে। সেই ভরসায় রাজকুমার ও রাজকুমারীদের ঘরের খবর আলোচনা করার অবকাশ। এ যুগের রাজকুমারীরা রাজতন্ত্রের হুমকীর ভয়ে ভীত নয়, তারাও গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করা শুরু করেছে। গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইউরোপীয় রাজকুমারীরা রাজকুমারদের ছাড়িয়ে অনেকদূরে অগ্রসর হয়েছে। ইউরোপীয় রাজবংশে তারাই প্রগতির পথপ্রদর্শক।

ইউরোপীয় রাজবংশে প্রথম বিপ্লব আনেন ইংলণ্ডেশ্বর ডিউক অব উইণ্ডসর। তারপরে কিন্তু আর কোনো রাজকুমার তেমন অঘটন ঘটাতে পারেন নি। তার প্রায় বিশ বছর পর রাজপরিবারে বিপ্লব আনেন রাজকুমারী মার্গারেট। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী রাজকুমারদের গলায় মালা না দিয়ে তিনি প্রথমে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এক সাধারণ সৈনিক পিটার টাউনসেণ্ডকে। সে যাত্রায় বাধা দেয় সমগ্র রাজপরিবার। তারপর প্রায় দশ বছর বাদে সেই রাজকুমারী মার্গারেট যাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেন তিনিও সাধারণ নাগরিক তবে তার ধমনীতে রাজরক্ত রয়েছে বলে ততটা আপত্তি ওঠেনি। ফটোগ্রাফার টনি আর্মস্ট্রং জোনস এখন লর্ড স্নোডাউন হয়েছেন। পেশায় তিনি এখন সাংবাদিক এবং মার্গারেটের স্বামী। মার্গারেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে পর পর কয়েক বছরের মধ্যে হল্যাণ্ড, সুইডেন ও ফ্রান্সের রাজকুমারীরা। হল্যাণ্ডের দ্বিতীয় রাজকুমারী আইরিন বছর দুই আগে রাজপরিবারের অমতে এক বিধর্মী রাজকুমারকে বিয়ে করে। হল্যাণ্ডের রাজপরিবার প্রোটেস্টাণ্টধর্মী। কিন্তু রাজকুমারী আইরিন যাকে বিয়ে করেছেন তিনি আধা ফরাসী আধা স্প্যানিশ কিন্তু ধর্মে ক্যাথলিক। সে নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারি হয় দুই রাজপরিবারের মধ্যে। তারপর এই বছরের গোড়ায় হল্যাণ্ডের প্রথম রাজকুমারী বিয়েট্রিস যা করেছেন তা আরও বিপ্লবজনক। ভবিষ্যতে তিনিই হবেন হল্যাণ্ডের রাণী। তিনি যাঁকে বিয়ে করেছেন সেই জার্মান কাউণ্ট কোনোদিন রাজা হবেন না। বিয়েট্রিসের বিয়েতে রাজপরিবার অমত করলে রাজকুমারী সন্ন্যাসিনী বনে যাবে বলে ভয় দেখায়। বিয়েট্রিসের স্বামী কোনো রাজপরিবারের সন্তান নয় তবে তার ধমনীতে আছে জার্মান রাজরক্ত। এই পর্যন্ত। রাজকুমারী বিয়েট্রিস নিজে বেছে বরমালা পরিয়ে দিয়েছেন। একালের রাজকুমারীরা আজকাল আর রাজসভা ও মন্ত্রীদের পরামর্শে কর্ণপাত করে না। তারা গণতন্ত্র যুগের রাজকুমারী বলেই এসব সম্ভব হচ্ছে। বছর খানেক আগে সুইডিশ রাজকুমারী বিয়ে করেছেন এক সাধারণ ইংরেজ প্রজাকে।

সমগ্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রে রয়েছে রাজতন্ত্র তবুও সেসব রাষ্ট্রে চলেছে সোস্যালিস্ট অর্থনীতি ও রাজনীতি। সে এক বিচিত্র শাসনব্যবস্থা। সেই ভরসায় ভর করেই ডেনমার্কের রাজকুমারী মার্গারেট যা করেছেন তাতে তাজ্জব বনে যাবার জোগাড়। প্রাচীন ভারতে রাজসভায় বসত স্বয়ম্বর সভা। সেখানে রাজকুমারী রাজকুমারদের ভেতর বেছে যার গলায় মালা পরিয়ে দিত তিনিই হতেন রাজকুমারীর স্বামী। সে নির্বাচনপর্ব সহজে সমাধিত হত না। প্রায়ই লড়াই হত স্বয়ম্বর সভায়। একালের স্বয়ম্বর সভায় সেসব ঝামেলা নেই। রাজকুমারীরা দেশবিদেশ ঘুরে তার মনের মানুষের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। রাজকুমার বা সাধারণ কুমারদের মধ্যে বাছাবাছি নেই। মনের মানুষ হলেই হল। কারণ এটা গণতন্ত্রের যুগ।

বর্তমান ডেনমার্ক রাজপরিবারে তিনটি রাজকন্যা। একটিও রাজপুত্র নেই। জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা মার্গারেট ভবিষ্যতে একদিন সিংহাসনে বসে রাজত্ব চালাবে। তিনি হবেন রাণী। তার স্বামী বেচারি কিন্তু রাজা হবে না। ডেনিশ রাজপরিবারের ছোটমেয়ে রাজকুমারী অ্যান্-মেরীর বিয়ে হয়েছে গত বছরে গ্রীসের রাজা কনস্টান্টিনের সঙ্গে। জ্যেষ্ঠাকন্যা রাজকুমারী মার্গারেট কিন্তু সাধারণ রাজকুমারী নন। তার বাপ-মা অর্থাৎ ডেনমার্কের রাজা ও রাণী তার বিয়ে দেবার জন্যে অনেক সুপাত্র এনে হাজির করে। তাদের সবাইকে সে নাকচ করে দেয়। সে চেয়েছিল তার মনের মতন মানুষ। অবশ্য সবচেয়ে অন্তরায় ছিল তার দৈর্ঘ্য। লম্বায় মার্গারেট ভীষণ ঢ্যাঙ্গা, এক মিটার তিরাশি সেণ্টিমিটার। এখন এত বড় ঢ্যাংগা মেয়ের স্বামী হতে হবে তার চেয়েও ঢ্যাংগা। অমন মাপের রাজকুমার পাওয়াও বেশ মুশকিল। এখন মার্গারেটের বয়স ছাব্বিশ। গত পাঁচ বছর ধরে ঢ্যাংগা রাজকুমারী মার্গারেট ইউরোপময় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে তার চেয়ে মাথায় একটু লম্বা সুপুরুষ রাজপুত্র। অনেক খুঁজেও যখন তিনি পাননি তখন হঠাৎ একদিন তিনি সন্ধান পান তাঁর মনের মতন মানুষের। তার মনের মানুষ তার চেয়ে লম্বায় তিন সেণ্টিমিটার বেশী। দেখতে সুপুরুষ, ভদ্র এবং সঙ্গীতচর্চা করে। এই মনের মানুষটি হল এক ফরাসী যুবক। তার ধমনীতে কোনো রাজরক্ত নেই বটে তবে তিনি একেবারে সাধারণ নন। তিনি এক কাউণ্ট পরিবারের সন্তান এবং বর্তমানে ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বয়স তার বত্রিশ। নাম ম' অঁরি লাবোর্দ দ্য ম'সাজা। সামনের বছরে এদের বিয়ে হবে। ভবিষ্যতে মার্গারেট রাণী হলে তিনি রাজা হবেন না ডেনমার্কের। তবে তাঁর স্থান হবে ইংলণ্ডের ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেনের মতন। অর্থাৎ রাণী এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবরা। এই ফরাসী যুবক ম' অঁরি লাবোর্দ দ্য ম'বাজাকে অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হবে বলে জানিয়েছে ডেনমার্কের রাজসভা। প্রথমত ম' অঁরি তার ক্যাথলিক ধর্ম পরিত্যাগ করে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত হবেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি ফরাসী নাগরিকত্ব ত্যাগ করে ডেনমার্কের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবেন।

রাজকুমারী মার্গারেট ও ম' ম'বাজার মধ্যে গোপন প্রেম চলছিল গত তিন বছর ধরে। তাদের প্রণয়কাহিনী কোনো সংবাদপত্র ফাঁস করতে সক্ষম হয়নি। তাঁদের ঘোষণায় জানা গেল এখন সরস সরস প্রেমের কাহিনী। ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলো এ নিয়ে বেশ হাহুতাশ শুরু করে দিয়েছে। বছর তিনেক আগে অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে রাজকুমারী মার্গারেট প্যারিসে এসেছিলেন কয়েক মাসের জন্যে ফরাসী ভাষা ও নৃতত্ত্ব শিখতে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে একদিন তিনি 'মুজে দ্য লোম্' নৃতাত্ত্বিক মিউজিয়মে প্রাগৈতিহাসিক মৃৎপাত্র দেখছিলেন। সে সময়ে তার পাশে আরেকজন মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ওই সব জিনিস। মৃৎপাত্রগুলোর বয়স কত হতে পারে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মার্গারেট তার পাশের অপরিচিত যুবকটিকে ডেনিশ ভাষায়। যুবকটি ডেনিশ ভাষা বোঝে না বলে সে ফরাসীতে বলে, সে ডেনিশ জানে না, সে ফরাসী। সেই সূত্রে তাদের পরিচয়। সেই যুবকটি তখন আইনের ছাত্র। নাম তার ম'ঃ অঁরি লাবোর্দ দ্য ম'বোজা। সেই প্রথম দর্শনে তাদের মনে প্রেম জেগে ওঠে। ওখানকার জের চলে লণ্ডন পর্যন্ত। কারণ তার কিছুদিন পরে মার্গারেট চলে যায় কোপেনহেগেনে। এবং ম'ঃ ম'বোজা তার পরীক্ষা সমাপ্ত করে পররাষ্ট্র দপ্তরে ঢোকে। তাকে প্রথমে পাঠান হয় লণ্ডনে ফরাসী দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারির পদে। লণ্ডনে থাকাকালে ম'ঃ ম' বাজার আবার সাক্ষাৎ ঘটে মার্গারেটের সঙ্গে। ১৯৬৪ সালে মার্গারেট লণ্ডনে যায় নৃতত্ত্ব পড়তে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে। সেখানে তাদের প্রেম দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৬৫ সালে ও ১৯৬৬ সালে তারা দুজনে অনেকবার গেছে কোপেনহেগেনে এবং রাজপরিবারের সঙ্গে তাদের আলাপ পরিচয় হয়। এসব খবর ভীষণ গোপনে রাখা হয়।

ইউরোপীয় রাজপরিবারের কোনো গোপন কাহিনী, সংবাদ বা কেলেঙ্কারি বেশী দিন চাপা থাকে না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেসব খবর সংবাদপত্র মারফৎ বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডের মার্গারেট ও তার স্বামী টনি এমনকি রাণী এলিজাবেথ ও ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেনের ঘরের খবর ছেপে চলেছে গত দু' বছর ধরে ফরাসী ও জার্মান কাগজগুলো। এগুলো লিখেছে রাজবাড়ীর প্রাক্তন কর্মচারীরা।

ইংলণ্ডে সেসব মুখোরোচক কাহিনী ছাপার জো নেই বলে তারা সেসব পারিবারিক রাজকেলেঙ্কারির কেচ্ছা ছেপেছে ফরাসী ও জার্মান পত্রপত্রিকায়। তার দরুন ওইসব রাজকর্মচারীরা পেয়েছে লাখ লাখ টাকা।

ডেনিশ রাজপরিবারের এমন মুখরোচক কাহিনী এতদিন গোপনে চাপা ছিল সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্য। রাজকুমারী মার্গারেটের গোপন প্রেমের কাহিনী যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যে কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মার্গারেটের কাকা লণ্ডনস্থ ড্যানিশ রাষ্ট্রদূত প্রিন্স জর্জ। মার্গারেটের প্রণয়-কাহিনী একমাত্র তিনিই প্রথমে জানতে পারেন এবং যাতে খবরটা রটে না যায় তার সব ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই। লণ্ডনে গোপন অভিসারে মিলিত হত মার্গারেট ও মঃ মঁবোজা। কিন্তু কোনো সম্বর্ধনা সভা বা নেমন্তন্নে গেলে মার্গারেট যেত অন্য সব রাজকুমারদের সঙ্গে। ফলে কেউই তাদের গোপন প্রেমে সন্দেহ করতে সক্ষম হয়নি। এভাবে চলার পর প্রায় বছর দেড়েক পরে রাজকুমারী মার্গারেট জানায় তার বাবা-মাকে। তাদের রাজী করাতে মার্গারেটকে অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল প্রিন্স জর্জ।

আগামী বসন্তকালে এদের বিয়ে হবে। বিয়ের ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক বাধা নেই বটে তবে ডেনিশ লোকসভা এখনও তাদের পাকা কথা দেয় নি। জানা গেল যে রাজনৈতিক দলগুলো বাধা দেবে না।

রূপকথার রাজকন্যার কাহিনীর মত শোনাবে মার্গারেটের মনের মানুষ সন্ধান। রাজপুত্র সন্ধান নয় বলেই সম্পূর্ণ ঘটনাটা কোনো নাটক-উপন্যাস বা গল্পের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। গল্পের মত শোনালেও এটি সত্যিকারের কাহিনী।

• • •

একালের রাজকুমারীর প্রণয়কাহিনী যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না যেমন করত সেকালের রাজরাজাদের আমলে। ইউরোপীয় রাজা-মহারাজাদের মধ্যে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর স্থান অনেক ওপরে। চতুর্দশ লুই-এর আমলে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল মস্কো থেকে মাদ্রিদ পর্যন্ত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে চতুর্দশ লুই-এর একাধিপত্য। তাই তার আরেক নাম "ল্য রোয়া সোলেই", অর্থাৎ সূর্যের মতন প্রখর সম্রাট। তারই আমলে আবার ফরাসী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিকাশের পথে এগোয়।

সম্রাট হিসেবে চতুর্দশ লুই ছিলেন ভীষণ বুদ্ধিমান। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণ বিলাসী। তারই আমলে গড়ে ওঠে বিরাটকায় ভার্সাই প্রাসাদ। চতুর্দশ লুই-এর

রাজকুমারী মার্গারেট এবং মঃ মঁবোজা

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে একটি সরস বই প্রকাশিত হয়েছে। এক ঐতিহাসিক গবেষক বলেছে, চতুর্দশ লুই আবার ভোজন-বিলাসীও ছিলেন। তাঁর জন্যে রান্নাঘরে সব সময়ে নিযুক্ত থাকত পঞ্চাশজন পাচক! রাজকীয় আহার পরিবেশন হলে তিনি কিন্তু সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন কড়াইশুঁটি আর ডিম সেদ্ধ।

মটন রোস্টের চেয়ে তিনি পছন্দ করতেন হ্যাম। শূকরের মাংসে যাতে লবঙ্গ দিয়ে রান্না করা হয় তার হুকুম দিতেন প্রত্যহ। লবঙ্গ ও গরমমশলার ভক্ত ছিলেন। চতুর্দশ লুই ছিলেন খামখেয়ালি রাজা। যে ঋতুতে যে ফল ও শাকসব্জী হয় না সেই ঋতুতে তিনি হুকুম করে বসতেন সেসব শাকসব্জীর রান্না। যেমন ধরুন ডিসেম্বর মাসে এ্যাসপারাগাস, জুন মাসে ফুটি, মে মাসে কড়াইশুঁটি। এগুলো জোগাড় করতে তার কর্মচারীরা হিমসিম খেয়ে যেত। তাই ভার্সাই-এর সাত বিঘে জমিতে সারা বছর ধরে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে চাষ হত এইসব ফলমূলের। তা ছাড়া সহস্র টাকা ব্যয়ে নানান ফলমূল আসত সুদূর সাইপ্রাস, তুর্কি, ইরান এমনকি চীন-জাপান থেকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ফলমূল আসত প্রতি ঋতুতে। এ সবই একজনের জন্যে। চতুর্দশ লুই-এর আমলে সবে মাত্র কমলালেবুর আমদানি হয়েছে পর্তুগাল থেকে। তাই তিনি সেই অমূল্য ফল মাঝে মাঝে উপহার দিতেন তাঁর রাজসভার সুন্দরীদের। পর্তুগাল থেকে আসত কমলালেবু শুধু সম্রাটের জন্যে।

খেয়ালি রাজা চতুর্দশ লুই-এর পাতে নিয়মিত চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পরিবেশিত হলেও তিনি একটি জিনিস শুধু চাইতেন পাচকদের কাছে সেটা হল ডিম সেদ্ধ। ডিম সেদ্ধ রাজকীয় আহার নয় বলে পাচকরা সেটা টেবিলে আনত না। কিন্তু সম্রাট রোজ খেতে বসে তিন চারটে করে ডিম সেদ্ধ খেতেন। কালিয়া কোর্মা ছেড়ে তিনি কেন ডিম সেদ্ধ খেতেন সে সম্বন্ধে কোনো হদিশ দেয়নি ঐতিহাসিক।

মুঘলচিত্রে জেবউন্নিসা

সুধা বসু

মুঘল চিত্রকলা মধ্যযুগীয় ভারতের দরবারী জীবনবিচিত্রার এক একখানি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। সম্রাট বাদশাদের দরবারের ঐশ্বর্য বীর্য ও কর্মনীতি এবং হারেম জীবনের লীলাবিলাস কিছুই বাদ পড়েনি এই চিত্রকলা থেকে। এই চিত্রভাণ্ডারের একটি সুবৃহৎ অংশ জুড়ে আছে বাদশা, বেগম, মন্ত্রী, আমির, ওমরাহ, সুবাদার, সেনাপতিদের প্রতিকৃতিসম্ভার। মুঘল-শৈলীর প্রতিকৃতি প্রতিমূর্তি মানুষের প্রকৃত রূপ, ভাবভঙ্গী ও চরিত্র প্রকাশনার এক একটি নিখুঁত নিদর্শন। চিত্রপটে কার প্রতিমূর্তি রূপবদ্ধ হয়েছে তার কোন নির্দেশ বা লেবেলের প্রয়োজন হয় না। একই বাদশা ও বেগমের বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি নানা পটের বুকে ধরে রাখা হয়েছে রং-এ রেখায়। বয়সের পরিবর্তনে চেহারার বৈষম্য দেখা গেলেও বুঝতে বিলম্ব হয় না তা কার প্রতিমূর্তি।

মুঘল শিল্পীর কলমে রূপায়িত নারীর চিত্র প্রতিকৃতি এক একটি সৌন্দর্য সুষমার আধার। কিন্তু সৌন্দর্য প্রকাশই সেখানে শেষ কথা নয়। ব্যক্তিসত্তার আসল রূপটির প্রকাশ ও নিখুঁত চরিত্র চিত্রণ হল মুখ্য কথা। নূরজাহান বেগমের বিভিন্ন বয়সের আলেখ্যরাজি এর সার্থক প্রমাণ। প্রতিকৃতি অঙ্কনে মুঘল চিত্রীদের এই অসামান্য সাফল্যের মূলে রয়েছে এই চিত্ররীতির কয়েকটি বিশিষ্টতা। যেমন, আলোছায়া পাতের সুসমঞ্জস ও সুমিষ্ট রীতি, মানুষের দেহের গড়ন ও ডোলকে হুবহু রূপায়ণ, ধরে ধরে সযত্নে রেখাঙ্কন, পরিবেশের প্রভাবকে সঠিকভাবে চিত্রপটে আনয়নের চেষ্টা, আসবাব পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে স্বাভাবিক রূপে, বাস্তববাদী পন্থায় রূপদান। সর্বোপরি চিত্রার্পিত নর-নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের অদম্য চেষ্টা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পীর তাতে সাফল্য অর্জন।

মুঘল দরবার, মুঘল হারেম শৌর্য-বীর্য, বিলাস ঐশ্বর্যের লীলাক্ষেত্র। মুঘল চিত্রকলা মুখ্যতঃ দরবারী শিল্প। সম্রাটের ইচ্ছা, আদেশ, আশা, আকাঙ্খা, দৈনন্দিন কর্মধারা,, চিন্তাপ্রণালী, এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকারযাত্রা ইত্যাদির অতি বাস্তব চিত্র অঙ্কনই ছিল দরবারী হুকুমে নিয়োজিত শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান কর্তব্য। এছাড়া বিভিন্ন সম্রাটের খেয়ালখুশির প্রভাবও এই চিত্ররাজির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। যেমন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের পশুপ্রীতি, পুষ্পপ্রীতি, শিকারযাত্রা ইত্যাদি। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে অঙ্কিত চিত্র মধ্যে হাতীর লড়াই, উটের লড়াই একটি বিশিষ্ট বিষয়বস্তু। যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিজয় অভিযান প্রভৃতি এবং আরও অন্যান্য নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপেরও প্রত্যক্ষ চিত্ররূপ রয়েছে অজস্র পরিমাণে। দুঃখ-বেদনা, বিষাদময় কাহিনী ও ঘটনাবলীর রূপায়ণও বাদ পড়েনি এই চিত্রের বিষয়বস্তু থেকে। যেমন, জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুর বন্দীদশার করুণ চিত্র। এই চিত্রে শিল্পী বন্দী খসরুকে সঠিকরূপে কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তির দীনহীন বেশে ও শোচনীয় পরিবেশসহ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু এই প্রবন্ধে আলোচ্য চিত্রখানি এর ব্যতিক্রম। এই পটখানিতে বাদাশাজাদী জেবউন্নিসার শোক প্রকাশের করুণ ঘটনা বর্ণিত হলেও পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত। শিল্পী জেবউন্নিসাকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেমনটি দেখেছেন, সম্ভবতঃ তদনুরূপই এখানে রূপদান করেছেন।

চিত্রখানির বিষয় হল নিহত প্রণয়ীর নির্জন সমাধি ক্ষেত্রে উইলো বৃক্ষের মূলে আনত ভঙ্গীতে জেবউন্নিসার শোক নিবেদন। উইলো গাছের নীচে জেবউন্নিসার এই ধরনের চিত্র কয়েকখানিই পাওয়া গেছে। এই চিত্রখানি বারাণসীর সীতারাম শাহ সংগ্রহের সম্পদ। কলকাতায় গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহেও অনুরূপ একখানি রেখাচিত্র সংগৃহীত হয়েছিল। সীতারাম শাহ সংগ্রহের এই চিত্রখানি বহুবর্ণে এবং মুঘল চিত্রশৈলীর শেষপাতের একখানি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। চিত্রের চারদিক বেষ্টন করে যে বর্ডার বা হাঁসিয়া রয়েছে, তার মধ্যে আছে নাস্তালিক অক্ষরমালায় লিখিত জেবউন্নিসার গুণগাঁথা। হস্তাক্ষর বিশারদদের মতে এই লিখনভঙ্গী অতি অসাধারণ ও অনন্য। ফলে, চিত্রখানির উচ্চ পর্যায়ের আঙ্গিক, বর্ণাঢ্য রূপ ও জমজমাটভাবের সঙ্গে লিপিমালার সৌকর্য মিলিত হয়ে একে আরও সমৃদ্ধ, আরও মনোরম করে তুলেছে। কিন্তু ঘটনার মূল সুরের সঙ্গে এই সমৃদ্ধি ও মাধুর্যের অসঙ্গতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ ঘটনাটি অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী।

জেবউন্নিসা ছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং পরম স্নেহের দুলালী। জেবউন্নিসা ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যশালিনী, তেমনি ছিলেন বিদুষী ও কাব্যপ্রতিভাসম্পন্না। সম্রাট ঔরংজেব এই কন্যার মুখে তাঁর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শুনতে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু সৌন্দর্য-সুষমা ও কাব্যকলার প্রতিমূর্তি এই বাদশাদুহিতার জীবনকাহিনী ও শেষ পরিণতি বড়ই মর্মান্তিক ও শোকাবহ। মুঘল বাদশাদের কৃত পারিবারিক প্রথা ও নিয়মানুসারে সম্রাটদুহিতাদের বিবাহ প্রথা হয়েছিল নিষিদ্ধ। শাহজাহান-কন্যা জাহানারার জীবনকথা সুবিদিত। তিনি ছিলেন বন্দী পিতার শেষ জীবনের একমাত্র সহায়িকা, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শেষ আশ্রয়স্থল।

মুঘল হারেমের ঐশ্বর্যবিলাসের দুর্দম প্রবাহে ভাসমান সম্রাটদুহিতাদের সেই বাধ্যতামূলক কৌমার্য অনেক সময় তাঁদের জীবনকে দুঃখ বেদনা ও ব্যর্থতার দুস্তর অকুল পাথারে করতো নিমজ্জিত। রূপ-ঐশ্বর্য ও বিলাসব্যসনের সীমাহীন সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হারেম কুমারীরা একদিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রভাবে ও অপরদিকে বাদশার নির্দিষ্ট কৌমার্য ব্রতের অঙ্গীকার সূত্রের বিপরীতমুখী টানে এক সঙ্কটময় জীবনদোলায় হতেন অনবরত আন্দোলিত। সেই সংকটাবর্তের মুখে পড়ে কারোর কারোর জীবন হয়ে উঠতো চরম বেদনা-সংঘাতের এক একটি মূর্ত প্রতীক। জেবউন্নিসার জীবনও সেই রকমেরই একটি।

জেবউন্নিসা একাধারে অপূর্ব সুন্দরী ও বিদূষী হওয়াতে অন্দরে ও বাইরে তাঁর গুণগ্রাহী স্তাবক ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর অভাব হল না। অনেক রাজ পারিষদ এবং উচ্চ বংশ সম্ভূত ব্যক্তিরাও তাঁর রূপে-গুণে হয়েছিলেন বিমুগ্ধ। তাঁদের মধ্যে দুটি ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপেই বাদশাজাদীর প্রণয়প্রার্থীরূপে করেছিলেন আত্মপ্রকাশ। একজন হলেন পারস্য দেশীয় কবি নাসির আলি। ইনি মুঘল দরবারে রাজ-কবির সম্মানে ছিলেন অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয় জন ছিলেন আকেল খান—জনৈক সম্ভ্রান্ত যুবক। ইনিও ছিলেন পারস্য দেশীয় এবং সুকবি ও ধনী ব্যক্তি। সুতরাং নাসির আলি ও আকেল হয়ে উঠলেন সম্রাটনন্দিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী। দুজনেই কবি এবং উভয়েই প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে কবিতার মালা রচনা করে চলেছিলেন দিনের পর দিন।

জেবউন্নিসাও ছিলেন সুকবি। তিনি নাসির আলির সঙ্গে ছোট ছোট বুদ্ধিদীপ্ত রস-রসিকতাময় কবিতার বিনিময় করতেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক আকেল খানকে। বাদশাজাদী পরিচারিকা মারফত আকেল খানের সঙ্গে পত্র বিনিময়ও করতেন। অবশেষে তিনি জেবউন্নিসার সঙ্গে হারেমে সাক্ষাৎও করতেন গোপনে। সেই গুপ্ত সাক্ষাৎ-এর কথা দুই প্রণয়ীর কোন একজনার এক শত্রু দ্বারা বাদশার গোচরে যেতে বিলম্ব হোল না। অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির অথচ অপত্যস্নেহাতুর বাদশাহ কথাটা গোড়াতে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেননি। কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির শত্রু তার চেষ্টায় কখনও বিফল হবে না এই প্রতিজ্ঞা

জেবউন্নিসা

শত্রুটির নিশ্চেষ্ট থাকার কথা নয় একেবারেই। সে ইঙ্গিতে বাদশাকে জানিয়ে দিল যে, আকেল খান তাম্র পাত্রের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। বাদশাজাদা ধীর গম্ভীরভাবে কন্যাকে স্নানে যেতে নির্দেশ দিয়ে পরিচারিকাকে হুকুম করলেন জলাধারটিকে চুল্লিতে চাপিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে। তৎক্ষণাৎ সম্রাটের হুকুম তামিল হল। তাম্র পাত্রে ফুটন্ত জলরাশিতে প্রণয়ীর জীবন্ত সমাধি জেবউন্নিসা প্রত্যক্ষ করলেন অসীম ধৈর্যসহকারে ও অবিচলিতভাবে। তাঁর কোমল হৃদয়খানি অন্তরের অন্তঃস্থলে ভেঙে চুরে খান খান হয়ে গেল, হৃদয়বিদারক শোকের নীরব হাহাকার তাঁর মনের মধ্যে প্রচন্ড ঝড় তুলল। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ হল না বিন্দুমাত্র। জলাধারে যিনি জীবন্ত দগ্ধ হলেন, তিনিও প্রেমের অপরিমেয় ঋণ পরিশোধ করে গেলেন নীরবে, নিঃশব্দে। ফুটন্ত জলরাশিকে আলিঙ্গন করলেন তিনি মৃত্যুর শীতল স্পর্শানুভূতিতে। সেই ভয়ংকর দৃশ্য ও কন্যার সংযত শান্ত সমাহিত অবস্থা এবং প্রণয়ীর সুখ-দুঃখের অনুভূতিহীন আত্মত্যাগের মহিমা দেখে সম্রাট বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। কিন্তু কঠোরতা ও রূঢ়তার প্রতিমূর্তি, কর্তব্যে অবিচল ভারত সম্রাট আলমগীর মনে করলেন যে, তিনি নীতিবাগীশ পিতা ও আইনপ্রণেতা বাদশার কর্তব্য সুসম্পন্ন করলেন অবিচলভাবে। আর স্বীয় পুত্রীর সুনাম রক্ষার জন্য সেই সংবাদদাতা শত্রুর শিরশ্ছেদের আদেশ দিতেও বিলম্ব করলেন না যাতে ব্যাপারটি বাইরে প্রকাশিত না হয়। অতঃপর জেবউন্নিসা নীরবে নিভৃতে আকেল খানের মৃতদেহকে সমাধিস্থ করালেন তাঁর উদ্যানের একটি উইলো বৃক্ষের তলায়। সেখানে প্রতিদিন নতজানু হয়ে তিনি শোক প্রকাশ করতেন। তবে বেশীদিন তা করতে পারেন নি। কিছুকালের মধ্যেই ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর যাত্রাপথে লাহোরে তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং সেখানেই তিনি শীতল সমাধিতে চির শান্তির কোলে শায়িত হন।*

নিয়ে একদিন বাদশাকে প্রত্যক্ষভাবে আকেল খানের আগমন দর্শন করাবার আয়োজন সম্পন্ন করে তুললেন।

একদা এক শীতের প্রভাতে বাদশানন্দিনী যখন স্নানের উদ্যোগে ব্যাপৃত, তখন অন্দর মহলে আবির্ভাব ঘটল তাঁর প্রণয়ী আকেল খানের। সামনেই চুল্লি ছিল প্রস্তুত। আর নিকটেই ছিল বিরাট তাম্র কলসীপূর্ণ জল। সম্রাটদুহিতার স্নানকালে তা চুল্লিতে উত্তপ্ত করা হবে। জেবউন্নিসা ও আকেল খান আলাপ-চারিতায় মগ্ন। হঠাৎ অতর্কিতে আবির্ভাব ঘটল সেখানে স্বয়ং সম্রাট আলমগীরের। পিতার আগমন ধ্বনি পেয়েই জেবউন্নিসা বিমূঢ়ভাবে ক্ষণিকের মধ্যে প্রণয়ীকে সেই বিরাট তাম্র জলাধারে আত্মগোপন করতে নির্দেশ দিলেন। পরিচারিকা সন্তর্পণে পাত্রটির আবরণ চাপা দিয়ে একটু ফাঁকা রাখলো যাতে গুপ্ত প্রণয়ীর নিঃশ্বাস রোধ না হয়। কিন্তু মুঘল বাদশার বিধান ও বিধির বিধানে বড় একটা পার্থক্য হত না। 'দিল্লীশ্বরোবা, জগদীশ্বরোবা' — কথাটি সম্রাট আকবরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত। কিন্তু সেদিন বাদশাহ ঔরংজীবও একটি নারকীয় লীলা, পৈশাচিক কর্মে তাকে যেন আবার প্রতিধ্বনিত করে তুললেন।

সম্রাট কন্যার কাছে উপস্থিত হয়ে অস্বাভাবিক কিছু অথবা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে একটু বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তখন সেই

মৃত্যু আসন্ন জেনে জেবউন্নিসা তাঁর নিজের সমাধি সৌধে উৎকীর্ণ করার জন্য পারসীক ভাষায় একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে রেখেছিলেন, যার অর্থ হোল,—'আমাদের নির্জন সমাধিতে যেন কোন ফুল কখনও ঝরে না, আলোও যেন জ্বলে না, মশা-মাছির পালকও যেন না পড়ে। আর কখনও যেন বুলবুল পাখীর গান সেখানে শোনা না যায়।' এই পদ্যে জেবউন্নিসা তাঁর প্রণয়ীর সমাধির কথাও উল্লেখ করেছেন বলেই 'আমাদের' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচ্য চিত্রখানির চারদিক ঘিরে যে কাব্য কবিতা লিপিবদ্ধ আছে, পারসীক ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে সেই জীবন্তদগ্ধ প্রণয়ী আকেল খানের রচনা থেকে উদ্ধৃত। চিত্রের উপরিভাগের পংক্তিটিতে আছে যে পারস্য দেশ ও অন্যান্য প্রাচ্য অঞ্চলে চৈনিক আদর্শের সৌন্দর্য রচনাই

হোল সেরা সৌন্দর্য। জেবউন্নিসার প্রতি-মূর্তি যে সুপটু শিল্পী অঙ্কন করেন, তিনি মুখোমুখি তাঁকে দেখতে পান এবং তাঁর মুখের ছায়া শিল্পীর মুখের উপরে পড়ে। সুতরাং প্রণয়ী ব্যক্তি শিল্পীর মুখের দিকে তাকিয়েই নিজের জীবন ত্যাগ করতে পারেন।

চিত্রের ডানদিকে যা লিখিত হয়েছে, তার মর্ম হোল—কবির মতে তাঁর প্রেমিকা এত সুন্দরী যে তাঁর প্রাসাদের দিকে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে, সেখানকার সমস্ত গাছের পাতারও একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য আছে এবং তা ঠিক তাঁরই মুখের মত। তাঁর (প্রেমিকা) মুখের সৌন্দর্যসুধার কাছে ফুলের মাধুরীও হার মানে। নায়িকা অনেকবার নায়ককে দেখা দেবেন প্রতিজ্ঞা করেও একটিবার তা রক্ষা করেন নি এবং সে প্রতিজ্ঞা পরিহাসে হয়েছে পরিণত।

নিম্নভাগে লিখিত পংক্তির বক্তব্য হোল—যখন দুজনে দেখা হোল, নায়িকা অহমিকা বশে এবং নায়ক কবি বিস্ময়বেগে বাক্-শক্তি হারিয়ে পাশাপাশি রইলেন দুটি নিশ্চল নিঃস্পন্দ মূর্তির মত।

চিত্রপটের বাঁদিকের লেখাগুলির বিষয় হচ্ছে,—যদি প্রণয়িনীর আবির্ভাব ঘটে, তবে প্রেমিক কবির মানসিক শান্তি আবার ফিরে আসবে। কারণ, তাঁর অনুপস্থিতির জন্যই তিনি শান্তি হারিয়ে বসে আছেন। সুরাপাত্রের আকর্ষণও জীবন থেকে গিয়েছে চলে। কবি আশায় আছেন প্রেমিকার আবির্ভাবে আবার গোলাপ ফুটবে। বুলবুল পাখীর আগমনে আবার উদ্যান জেগে উঠবে।

জেবউন্নিসার জীবনের শোকাবহ ঘটনাও অকালে তার অবসান এবং স্মৃতি-সৌধের জন্য লিখিত তাঁর পদাটিই হয়ত মুঘল চিত্রকরকে এই চিত্রখানি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিহত প্রণয়ীর রচিত কবিতা এবং উইলো বৃক্ষের নীচে শোক নিবেদনের রূপও শিল্পীকে আকৃষ্ট করেছিল বহুল পরিমাণেই। কিন্তু মূল বিষয় ও শোকাবহ দৃশ্যের প্রকৃত পটভূমিকা সার্থকলাভ করে নি।

চিত্রখানির রচনাশৈলী সাজাহানী যুগের অতি পরিণত রীতির যা আলমগীরশাহী যুগেও ছিল অক্ষুণ্ণ এবং তখন থেকেই তা ক্রমশঃ অবনতির মুখে হয়েছিল ধাবিত। বেশভূষা, পরিচ্ছদ, দেহাকৃতি সব মামুলি মোগলাই চালের। আনতভঙ্গীতে বৃক্ষশাখা ধরে আছেন জেবউন্নিসা। আর এক হাতে সম্ভবতঃ তাঁর রচিত কবিতার পাণ্ডুলিপি। গাছের গুঁড়িতে দেহ ন্যস্ত করে বৃক্ষশাখা ধরে থাকার ভঙ্গীযুক্ত নারীমূর্তি সুপ্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি বিশিষ্ট রীতি। মুঘল শিল্পীরা হয়ত ভারত শিল্পের ধারাবাহিত নারীদেহ ভঙ্গীকেই গ্রহণ করেছিলেন শোকমগ্না জেবউন্নিসার চিত্র রূপায়ণে। গাছের সরু পত্রালি ও ডালপালার নিম্নগতি নারীদেহের আনতভঙ্গীর সঙ্গে এক সুরে ছন্দে গ্রথিত হয়ে একটি সুমধুর ঐকতান করেছে রচনা। উন্মুক্ত উদ্যানে তৃণগুচ্ছের পেলব রূপের সঙ্গে সবুজাভ দূরাভাস ও নীল আকাশের মিতালি চিত্রপটের মাধুর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে পরিবেশে শোকোচ্ছ্বাসের ছাপ পড়েনি। সুন্দরী জেবউন্নিসার সাধারণ আলেখ্য বললে যেন সঠিক বলা হয়।

ভালোবাসার সাত-সতেরো

গৌতম বসু

কোন ছবিতে ঠিক দেখেছিলাম আজ আর তা মনে পড়ে না। সেই মুহূর্তটা কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে আছে স্মৃতিতে। আজো যেন শুনতে পাই চুড়ির শব্দের মতো ওদের হাসির উল্লাস, আশ্চর্য অনুভূতিময় সংলাপ-গুলো। রাশিয়ান ব্যালেরিনার ভূমিকায় রয়েছেন লাস্যময়ী জিনে টিয়ারনি। নদীর জোয়ারের মতো ওর বুকেও রয়েছে সুতীব্র আবেগ। একান্ত করে কাছে পেতে চায় গ্যাবেলকে। কিন্তু কি এক অজানা আশঙ্কা এসে বাসা বাঁধে তার দু চোখের উজ্জ্বল নীল মণিকোঠায়। একবার বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে তাকালেন গ্যাবেলের দিকে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনেক ভালোবেসেছেন বুঝি?' গ্যাবেল অভিনয় করছিলেন একজন মার্কিন করসপণ্ডেন্টের ভূমিকায়। মৃদু হাসলেন একবার। অবশেষে ছোট্ট করে জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই। তবে সে সব অভিনয়।' একটু

'ব্যক্তিকেন্দ্রিক'

থেমেই আবার বললেন, 'সত্যি বলছি কাউকে ভালোবাসতে পারিনি, শুধু অভিনয়ই করে গেলাম।' গ্যাবেলের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা গেল।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে একালের আরো অনেককিছুর মতোই প্রেম আর তার অভিনয়ের গোলোকধাঁধায় আমরা নাজেহাল। চারদিকে যখন ভেজালের বাড়া-বাড়িতে খাঁটি জিনিসের স্বাদ ভুলে যাচ্ছি তখন আসল প্রেমের জায়গা দখল করে বসে নকল প্রেমের সার্থক অভিনয়। ফলে অপ-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিনই হু-হু করে বেড়ে। কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায় নেই। স্বর্ণমৃগের সন্ধানেই ঘুরে মরতে হচ্ছে উদ্দীপ্ত যৌবনকে। কেন? হয়তো কেউ বলবেন, আসলে এটি হল আদিম অনুভূতি এবং চির-আধুনিক। কথাটায় যে বাড়াবাড়ি নেই তা হলফ করেই বলা যায়।

কিন্তু বিপদটা বাধে ঠিক সেখানেই, যখন ভালোবাসাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ইদানীং তাই অনেকেই জৈব আবেগের মধ্যে প্রেমের স্বরূপ খোঁজেন, দেহের মধ্যেই প্রেমের সার্থক পরিণতির সন্ধান পান।

বেশ কিছুদিন ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষে একজন ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ বলেছিলেন, মার্কিনীরা অনেকেই যেন শুধু দেহের মধ্যেই আবদ্ধ। প্রেমের রহস্যসন্ধানে এঁদের ব্যর্থতা মর্মান্তিক। পরলোকগত জেমস থার্বার অনুরূপ না হলেও দুঃখ করে বলেছিলেন, 'যৌনজীবন এবং প্রেমের পার্থক্যটা না জেনেই বোধহয় বেশিরভাগ মার্কিনী বড়ো হয়েছেন, ফলে দেহের প্রেরণাই এঁদের মূলমন্ত্র। আমরা বিবাহকে উৎসাহ দি অনেকটা সুস্থিত হবার ওষুধ হিসেবে।

শোনা যায়, ফরাসী বাগধারায় যৌন-আবেগকে 'মেকিং লভ' হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়, সেক্স সম্পর্কে বোধহয় একথা বলাই যুক্তি-সংগত হবে যে এটা হল 'মেকিং আন-লভ'। এবং এই যৌন-উন্মাদনার মূলে রয়েছে আধিপত্য বিস্তারের সুপ্ত বাসনা, জিগীষা, আত্মসন্তুষ্টি—নেই কারো প্রতি কোন গভীর অনুভূতি, সমবেদনা বা সহমর্মিতা।

তাই হালফিলের ব্যক্তিগত জীবনযাপনেই হোক আর সিনেমা, থিয়েটার কিংবা পত্র-পত্রিকা বা পুস্তকাদিতে প্রকাশিত রচনার উদাহরণই টানা হোক, দৈহিক চরিতার্থতাতেই যেন প্রেমের সার্থকতা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। জৈব আকর্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না, সম্মানবোধ উদ্রেক করতে অক্ষম, এমনকি সংহতি আনয়নে কিংবা সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভেও পারে না কোন সাহায্য করতে। এর মধ্যে কোন নীতিবোধের বালাই নেই, নেই ভবিষ্যতের জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা। তাই একে কোনক্রমেই বলা যায় না, এই-ই হল ভালোবাসা। আসলে এটা হল প্রেমের অন্ধকূপ।

বাস্তবিকপক্ষে এই যৌন জীবনবোধে কিছু দেবার কথা নেই, নেই ঝক্কি পোয়াবার দায়িত্ব, যা আছে তা শুধু 'গ্রহণনীতি'।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো কোনো আবেগ-প্রবণ মেয়ে ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে এক সময়, হতাশায় জর্জরিত হয়, অসুখী তো বটেই। এমনকি অনেক সময় আত্মহত্যাই হয়ে দাঁড়ায় শান্তি পাবার একমাত্র উপায়। জনৈক সমাজ-বিজ্ঞানী একবার সান-ফ্রান্সিসকোতে হিসেব নিয়ে দেখেছেন যে, এধরনের মেয়েদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে গেলে শিউরে ওঠেন, একটা অসুস্থতাবোধ তীব্র হয়ে ধরা পড়ে বুকের

'মেকি লভ' হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

মধ্যে। লজ্জায় মুখ ঢাকবার চেষ্টা করেন আর নিজেকে মনে করেন বিশ্বের একমাত্র অপরাধী ব্যক্তি। চোখের জল, প্রেমিকের ঘৃণা অপ্রেমের দরুণ হতাশা, পরিচিত লোকের করুণা আর আত্মনির্যাতনই হয় তখন এঁদের সম্বল।

তবু অস্বীকার করব না ভালোবাসার সঙ্গে দৈহিক কামনার নিবিড়তম সম্পর্কের

কথা। প্রেমের পরিণতি যেমন অনেক সময় বিবাহবন্ধনে এবং সেখানে সেক্সের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিবাহের পরও ঘটে ভালোবাসার বিকাশ, পরিণতি। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের চরম প্রকাশ তাই মিলনে।

অবশ্য যদি যৌনআবেগ কেবলমাত্র একক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয় তবে কোন কথাই উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রেমকে কোন-রকমেই পাপ বলা চলে না, বরং বলতে হবে পবিত্র ভালোবাসা। আসলে এসব কিছু নির্ভর করে দুজনের সম্পর্কের উপর এবং সেই অনুসারেই বলা চলে এটা প্রেম আর এটা প্রেম নয়।

বলা-বাহুল্য প্রেমের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্য-বোধের যে স্থান রয়েছে তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাই, বিয়ের আগে সচেতন এবং শিল্পীমনোভাবসম্পন্ন প্রেমিকারা কিছুতেই নিজেদের সত্তাকে প্রেমিকদের নিঃশেষে দান করতে পারে না। উভয়কেই এসময় যথেষ্ট যত্নবান হতে হয়, অন্তত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। তারপর যখন তপস্যার রাত্রির অবসান ঘটে তখনই শেষ হয় এত-দিনের তিলে-তিলে সঞ্চিত যন্ত্রণার। বাঁধা পড়ে বিবাহবন্ধনে। প্রেম হয় আক্ষরিক অর্থে সত্যে পরিণত, গভীরতর বোধেও বটে।

প্রেমের সৌরভ আসলে অন্তরঙ্গতায়। এর ব্যঞ্জনা হল দুটি হৃদয়ের একত্র মিলনে, দুটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা একধারায় পরিণত হওয়ায়, দুজনের আবেগকে একীভূত করে অপূর্বতা দানে—বিভিন্ন ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়েই ঐকতান সৃষ্টিতে।

বিবাহের ক্ষেত্রে সেক্স হল দৈহিক অন্ত-রঙ্গতার প্রকাশমাত্র। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা, আবেগ অনুভূতি এবং মানসিক একাত্মতা ছাড়া জৈব মিলনকে বায়োলজিক প্রসেস ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন কোর্টশিপ এবং ম্যারেজের ক্লাশে পরলোক-গত অধ্যাপক ফ্রাংক ডরু হফারকে বিভিন্ন প্রকারের অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীরা। তিনি যা জবাব দিয়ে-ছিলেন তা সত্যিই লক্ষ্য করার মত। বলেছিলেন:

> Intimacy involves an integrating and meshing of personalities a passionate interest in the other's ideas, hopes and aspirations; interchange of thought, respect for the other's dignity and worth.

একটি ছাত্র অমনি উঠে দাঁড়াল। অধ্যাপককে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল নতুনতর প্রশ্ন: দেহজ মিলন সম্পর্কে আপনার মত কি? অধ্যাপক হফারকে একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না, বরং তিনি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'সাধারণভাবে জৈব সম্পর্ককেই যখন অন্তরঙ্গতার সবচেয়ে বড়ো বলা হয়ে থাকে, (এবং আংশিকভাবে সত্যও বটে) তখন আমি আন্তরিকতার চরমতম প্রকাশ হিসেবে জোর দেব পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমদৃষ্টিভঙ্গি এবং সবকিছুর মধ্যে উভয়ের মতামতের সমমূল্যদান ও দান-প্রতিদানের মধ্যে। আমি বলব না, অন্তরঙ্গতার উৎস দেহজ মিলন এবং সমাপ্তিও তার চরিতার্থতায়।'

তাই দাম্পত্যজীবনে সেক্সই যে চরম এটা হলফ করে কেউ-ই বলতে পারে না। শুধু বলা যায় অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যে এটি হয়তো প্রধানতম। লস এঞ্জেলসের ফ্যামিলি সার্ভিস-এর রেকর্ডের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

একজন উকিলের কাছে একবার স্বামী-স্ত্রী দুজনে এলেন একটি বিষয়ে পরামর্শ নিতে। ব্যাপারটা কি? না, তারা কেউ-কাউকেই একান্ত আপন করে কাছে পায় না। বলা বাহুল্য তারা কোনরকমেই সেক্সুয়াল ডিসস্যাটিসফেকশনের কথা উক্ত পরামর্শ-দাতার সামনে স্বীকার করলেন না, বা প্রকাশ করতে চাইলেন না। বরং এর বদলে তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা বিস্তৃত করে বললেন। স্বামী সবকিছুতেই আধিপত্য বিস্তার করতে চান, খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তুলকালাম বাধান, স্ত্রীর মতকেও কোন আমল দিতে চান না। ফলে স্ত্রী-ব্যাচারীর পক্ষে তাল সামলানো মুস্কিল হয়ে পড়ে। সারাদিনের খাটাখাটুনির পরে মুখে কোন মধুর সংলাপও জোগায় না। কাছাকাছি শোয়া-বসাও প্রায় বন্ধ। মাঝে মাঝে যদি বা কথাবিনিময় হয়, তবে তা মুহূর্তের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিতে গড়ায়, পাড়ার লোক এসে জড়ো হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানো। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় দাম্পত্যজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল তাঁদের কাছে।

কিন্তু প্রবীণ আইনজ্ঞ তাদের সুস্থ হতে বললেন। এবং মোক্ষম দাওয়াই বাতলে দিলেন। বললেন, এরকম জীবনযাপন করে সত্যিই কোন লাভ নেই, খালি তিক্ত-বিরক্ত হতে হয়। তবে চট করে ডিভোর্স না করাই উচিত বলে মনে করি। উদার হয়ে যান একে অপরের কাছে আপনারা—নিজেদের উগ্র ব্যক্তিত্বকে ভুলে গিয়ে এসে অপরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না?

এরপর আরো অনেক কথা শুনে তাঁরা চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন। কেটে গেল বেশ কয়েক সপ্তাহ। তারপর হঠাৎ একদিন সেই স্ত্রীলোক আবার হাজির হলেন উকিলের কাছে। চমকে উঠলেন মুহূর্তের জন্যে। কি জানি এঁদের ঝগড়া হয়তো এমন চরমে উঠেছে যে বিবাহ-বিচ্ছেদেরই সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে এক্ষুনি। কিন্তু না, তা হল না। স্ত্রীলোকটি মুখে হাসির উজ্জ্বলতা এনে সমস্ত সংশয়ের সমাধান করল, বলল, বেশ আছি। আমাদের মিলনের পথে আর কোন বাধা নেই, লজ্জা নেই। উন্নত হয়েছে, মধুরতর হয়েছে চিরআকাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্তগুলো।

একথা ঠিক যে, সেক্স হল ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের একটি অন্যতম পন্থা। শিশুসুলভ ব্যক্তিত্বের কাছে এর মূল্য তেমন ধরা পড়ে না, ফলে এদের মর্যাদা হয় ক্ষুন্ন। তেমনি আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের কাছে যৌনাবেগ অনেকটা শৌখিনতা বা অবসর-বিনোদনের হাতিয়ার হিসেবেই স্বীকৃত। এঁরা কেবল শোষণ করতেই জানে, দান করতে অপারগ। স্বাভাবিকভাবেই এদের জীবন হয় দুর্বিষহ। মেয়েরা মূলত এই ধরনের পুরুষ পছন্দ করে না। এবং এজন্যে এঁদের স্ত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসুস্থতায় ভোগেন, নইলে সততার গণ্ডী ভেঙে অনায়াসে চলে আসে অসামাজিকতার জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে। কিন্তু খুব সতর্কভাবে, গোপনীয়তা রক্ষা করেন। অ্যাডাল্ট পার্সোন্যালিটির কাছে সেক্স হল দান-প্রতিদানের মাধ্যম। এঁরাই দাম্পত্যজীবনে সাধারণত সুখী হন।

কলেজ জীবনে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শুরু হয় ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের জন্যে চিন্তা-ভাবনা, তেমনি বিয়ের পরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুরু হয় ভালোবাসার সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা, স্বপ্নলোকে বিচরণ। কিন্তু কেমন ধারার বিচরণ এটা? এ প্রশ্নের সমাধান মিলবে শয়ের রচনার মধ্যে—

> When two people are under the influence of the most violent, most insane, most delusive, and more transient of passions, they are required to swear that they will remain in that excited abnormal and exhausting condition continuously until death do them part.

বাস্তবে, বিবাহ-বন্ধন এধরনের কোন চুক্তি নয়। সারাজীবন রোমান্টিকতায় বিমোহিত হবারও কোন শপথ নয়। বরং এরকম ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হবার পথ থেকে প্রেমের সম্পর্ককে উন্নততর এবং শাশ্বত করার এক প্রতিজ্ঞা বিশেষ।

কিন্তু এটা সহজ নয়।

বছর খানেকও হয়নি, এরকম একজন স্ত্রীলোক একবার তাঁর আইনপরামর্শদাতাকে বলেছিলেন, বিয়ে করার আগে ফ্রাঙ্ক এমন সব ব্যবহার করত যা দেখে আমি সত্যিই লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম। হাবে-ভাবে, কথায়-বার্তায় সে যেন এটাই প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগত যে আমি-ই হলাম পৃথিবীর একমাত্র মহিলা—অন্তত তার চোখে তো বটেই। সে সবসময়েই আমাকে বলত বিশ্বের সেরা সুন্দরী, সবচেয়ে বিস্ময়কর মহিলা, মহত্তম এবং সর্বোপরি সবকিছুর মধ্যে সেরা। কতদিন আমার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে বলেছে, আহা কি সুন্দর! চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলেছে, সত্যিই তোমার তুলনা নেই। কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় একটা বছর পার হয়ে গেল। এখন বোধহয় তার চিন্তা-ভাবনা বদলে গেছে, পরিবর্তনের রং লেগেছে চোখের কোলে। আগের মতো তাই আর কথাও বলে না, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েও ওঠে না ফ্রাঙ্ক। সে যেন তার প্রাপ্য পেয়ে গেছে। এবং এটা বেশ বুঝতে পারছি হালে অন্য কোনো মেয়ে তার চোখে ধরেছে। কেননা কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে যখনই একটু মনোমালিন্য হয়, তখন ফ্রাঙ্ক তার বন্ধুপত্নীর সঙ্গে আমাকে তুলনা করে।

অর্থাৎ সোনার সেই উজ্জ্বলতা আজ আর নেই। কিংবা বিমুগ্ধ করবার ক্ষমতাও আমার লোপ পেয়েছে।

বিবাহ হল দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শুভারম্ভ। একে চিরস্থায়ী করতে হলে বৈচিত্র্যের সন্ধানী হতে হয়, নইলে জাগে বিতৃষ্ণা—আসে ক্লান্তি। এক-ঘেয়েমির ফলে কাজে আর সাড়া জাগে না, নতুনকিছুর সন্ধানে তখন বেরিয়ে পড়তে হয় শিকারীর তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে। শিশুসুলভ চপলতা পেয়ে বসে পুরুষের মনে, নতুনতর স্বাদের ইচ্ছায় হয়ে ওঠে ক্ষিপ্র। অনেকটা তুলনা করা যায় ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে—যারা নিত্য নতুন খেলনার জন্যে বায়না ধরে, নইলে কান্নায় ভাসিয়ে দেয়।

এখানে মনোবিকার সম্পর্কে দু-এক কথা বলে নেওয়া চলে। প্রেমের জগতে এই শব্দটির বিচরণ প্রায় অবাধ। ফলে হামেশাই এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। একটি সত্যিকারের ঘটনাই বলছি। কোনো এক পুলিশ অফিসারের কন্যা হল এর নায়িকা। তিনি অফিসার হিসেবে জাঁদরেল না হলেও কথায়-বার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে হিটলারের একটি ছোট সংস্করণই বলতে হয়। এবং বাঁ-হাতের দৌলতে অভাব শব্দটি তাঁর সংসারে কোনোদিনই ঢোকেনি। ভদ্রলোকটি ভীষণ সন্দিগ্ধ স্বভাবের। ছেলেমেয়ে এমন কি স্ত্রীর প্রতিও তাঁর তেমন কোন বিশ্বাস আছে বলে মনে হত না। থানা আর কোর্টকাছারী করে ভদ্রলোকের সমস্ত বিশ্বাস উবে গেছে। ফলে যে-স্ত্রীকে একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন তার উপরও প্রবল সন্দেহ। ভদ্রলোকটি কথায়-বার্তায় নিজেকে বেশ মডার্ন হিসেবে জাহির করলেও আসলে তিনি ছিলেন একটু প্রাচীনপন্থী। এ হেন অফিসারের মেয়েই হল নায়িকা। ধরা যাক তার নাম শ্রাবণী। যখন এর বয়স চোদ্দ তখন আমার পরিচিত এক যুবকের কাছে এল চারপৃষ্ঠাব্যাপী একটি চিঠি। স্বপ্নের নেশায় মাতাল এই চঞ্চলা কিশোরীর চিঠির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে কামনার সুতীব্র আবেগ। পৃথিবীকে তখন নতুন চোখে দেখছে। ছেলেটি কিন্তু অবাক, তবু সাড়া না দিয়ে পারল না। প্রেমে পড়ল মেয়েটি। পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হল। দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় বছর দুয়েক। তখন এদের প্রেম একেবারে তুঙ্গে। এমন সময় মেয়েটির জীবনে এল নতুন তরঙ্গ। বৃহত্তর জীবনের সন্ধান মিলল। একটি ইঞ্জিনীয়ার ছাত্র মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন, প্রেমে পড়লেন। মেয়েটি চোখ-কান বুজে আগেকার ছেলেটিকে প্রত্যাখ্যান করে শেষোক্ত ছেলেটির আহ্বানে উন্দাম হয়ে উঠল। তার সত্তা-মূলকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। স্বপ্নের ঘোর লাগল দু-চোখে। সমুদ্রের মতো তখন উদ্বেলিত। বলা-বাহুল্য, এই প্রেমাকর্ষণের কোনো সামান্য সূত্র আজো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ইঞ্জিনীয়ার পাঠরত ছেলেটি শ্রাবণীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন ওকে ছাড়া সে থাকতেই পারে না। কিন্তু আঘাত এল। পাশ করে ছেলেটি যেন কেমন উড়ো-উড়ো ভাব দেখাতে লাগল। নির্লিপ্ত বাসা বাঁধল বুকে। শ্রাবণীকে প্রত্যাখান করল। রিক্ততা আর তিক্ততায় ভরে গেল শ্রাবণীর মন। কিন্তু দুর্যোগের আকাশও বেশীক্ষণ থাকে না। সুন্দরী মেয়েদের বেলায় তো বটেই। এল আবার নতুন পুরুষের আমন্ত্রণ। একজন স্কুলশিক্ষক একদিন শ্রাবণীর বাড়িতে এল তার ছোট ভাইয়ের সূত্র ধরে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন শিক্ষকটি। কিন্তু গোপনে রাখতে চাইলেন তাঁর মনস্কামনা। হাসির ঝলক দেখা গেল শ্রাবণীর মুখে। মরা গাঙে এল বান। কিছুদিন লুকোচুরি খেলার পর দীর্ঘ পত্রাঘাত এল মেয়েটির তরফ থেকে। দেহে-মনে তখন ওর সাড়া জেগেছে। আর তার প্রকাশ ঘটল চিঠিগুলোর কাব্যিক আকুলতায়। দাবি এর অনেক কিছু। একান্ত কাছে পেতে চায় ছেলেটিকে। তার উদ্ধত যৌবনকে সঁপে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে চায় বাঁচবার তাগিদে। শ্রাবণী শিক্ষিতা। তবু যুক্তিতে তার মরচে ধরল, প্রক্ষোভের

মুহূর্তের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিতে গড়ায়

সর্বগ্রাসী বন্যা উত্তাল হয়ে উঠল। ছেলেটি তার ভালোবাসার কথা অস্বীকার না করলেও মেয়েটির ঘর বাঁধবার নিমন্ত্রণে হল আশঙ্কিত।

শ্রাবণীর ভাগ্যাকাশে আবার দুর্যোগের ঘনঘটা। তবু এর থেকে শ্রাবণীর মুক্তি নেই। কেন? এর জবাব আজো কেউ স্পষ্ট করে দিতে পারেনি। তবে এই প্রেমাকর্ষণ সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেন, আসলে প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনের টাইপ অনেক সময়েই আলাদা হয়ে থাকে। যেমন ধরুন একজনের মস্তিষ্কে যখন দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য, অন্যজনের হয়তো প্রথম স্তর জোরদার। একজন যুক্তিধর্মী আর একজন আবেগপ্রবণ। সে জানে না কি করে বশ করতে হয় আবেগের দুরন্ত অশ্বটিকে, সুনিয়ন্ত্রিত করতে হয় বন্যার প্লাবনকে। অর্থাৎ একজন হল স্যাংগুইনাস অন্যজন হল ফ্লেগম্যাটিক।

বিয়ের আগে নারী এবং পুরুষ উভ[য়ে] ছিল এক-একটি সার্বভৌম সাম্রাজ্যে[র] অধিপতি। কাউকে পোয়াতে হত না [...] কারো দায়-দায়িত্ব। কিন্তু বিয়ের পর [...] বাঁধা পড়ল নিয়মের রাজত্বে, পারস্প[রিক] নির্ভরতা দেখা দিল চিরকালের জন্যে। অ[...] সমস্ত সত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। সুত[রাং] বিবাহকে বলতে পারি, এ হল সেই ধর[নের] নিবিড়তম সম্পর্ক যেখানে নারী-পু[রুষ] সবাই স্বতন্ত্র স্বাধীন, নির্ভরতা উভ[...] বোঝাপড়ার উপর অবস্থিত এবং আনু[...] হল বিনিময়যোগ্য।

বিবাহে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় [...] যে কোনো মূল্য নেই এমন কথাও [...] বলেন না। বরং এর একটা উদ্দেশ্য আ[...] মূল্যও বর্তমান। এবং সেজন্যে এটা সবস[...] নেতিবাচক নয়। একেবারে গোড়ার [...] হচ্ছে, খোলাখুলি মনোভাব এবং আন[...] উপভোগের পথে দ্বিধা দ্বন্দ্ব অনিবা[র্য] দ্বিতীয়ত উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত কর[...] সংঘর্ষের উপস্থিতি বিশেষ সহায়ক। [...] ফলে আকর্ষণ বাড়ে বৈ কমে না। [...] মনে হতে পারে।

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চির-চঞ্চল গতি;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।

বিবাহের ক্ষেত্রে যে সংকট তা অনেকটা ক্যাথারসিস বা ভাবমোক্ষণের কাজ করে আবেগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। আবার এর সাহায্যেই প্রেমের মূল্যায়ন করতে পারি।

সামান্য কলহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহিত জীবনকে মধুর-তর করে। কিন্তু বেশি ঘটলেই হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে পিটার প্যাসকো একবার বিশ্বের স্বামীদের কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্বে কতকগুলি প্রশ্ন নিজেকে করে যদি সদুত্তর পান তাহলেই ডিভোর্স করা উচিত। প্রশ্নগুলি: (১) সত্যি কি আপনার স্ত্রী বোকা, অসহনশীল? (২) কখনো কি তার মানসিক যন্ত্রণার কারণ অনুসন্ধান করেছেন? (৩) সত্যিই কি আপনার স্ত্রী আপনাকে আত্মদান করতে দ্বিধাবোধ করেন? (৪) স্ত্রীর প্যাশন অনু-ভব করে সেই অনুসারে সব কাজ কি আপনি সব সময়ে সমাধা করেন? (৫) স্ত্রী-কে কি বৈচিত্র্যের স্বাদ দিতে পেরেছেন? (৬) সত্যিই কি সমাজে মিশবার পক্ষে আপনার স্ত্রী অনুপযোগী এবং যদি তাই হয় তবে কি আপনি তাকে সঠিক পথে চলবার কোনো উপায় বাতলে দিয়েছিলেন? এ সবের উত্তর ঠিকমতো পেলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করা উপযুক্ত হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

৪০ পয়সা

Friday 14th October, 1966 শুক্রবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গত ইং ২৩।৯।৬৬ তারিখের অমৃতে প্রকাশিত চিঠিপত্র বিভাগে বারাউনির শ্রীশংকর সিং মহাশয়ের বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। আমি একজন অমৃতের নিয়মিত পাঠক। সেই হিসাবে উপরোক্ত ভদ্রলোকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে আরও একটুখানি জুড়ে দিচ্ছি।

শংকরবাবু লিখেছেন,—কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন দেড়ঘণ্টা হিন্দী ছবির গান শোনান হয়। সময়ের হিসেবটা একটু ভুল হয়ে গেছে। বেলা ১১টা থেকে ১২৷৷টা পর্যন্ত বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান এবং বিকেল ৪৷৷টা থেকে ৫টা পর্যন্ত হিন্দী চিত্রগীতি অনুষ্ঠান। মোট ২ ঘণ্টা। শুধুমাত্র হিন্দী ছবির গান শোনানোর জন্যে প্রতিদিন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রকে উপরোক্ত দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়। সে-জায়গায় বাংলা ছায়াছবির গানের জন্য সপ্তাহে মাত্র আধঘণ্টা।

এ-কথা বললে হয়তো হিন্দী গীত-প্রেমিকরা একটু মনক্ষুণ্ণ হবেন। কিন্তু তাঁদের একেবারে বঞ্চিত করার কথা বলছি না। বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান যেমনটি হচ্ছে হোক। শুধুমাত্র ৪৷৷টা থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রতিদিন হিন্দীর বদলে বাংলা ছায়াছবির গান অবশ্যই প্রচার করা সম্ভব।

কিন্তু বেতার কর্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টি-পাত করতেও নারাজ। সবিনয় নিবেদন মারফৎ শুধুমাত্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথা বিবেচনা করে দেখব। ইত্যাদি—সুললিত কণ্ঠের সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েই আমাদের মনের বোঝা হাল্কা করে দেন। শ্রোতাদের কোন যুক্তিই যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ শ্রোতা-দের রুচিমাফিক অনুষ্ঠান পরিবেশনাই কর্তব্য। গণতন্ত্রের দেশে এরকম বিমাতা-সুলভ মনোভাব কেন?

শুধু তাই নয়। আমাদের বরাদ্দের সারা সপ্তাহে মাত্র আধঘণ্টা সময় যেসব ছায়াছবির গান শোনানো হয়, অথবা ছায়া-ছবির গান শোনানোর নামে যে-প্রহসন বাঙালী শ্রোতাদের সঙ্গে করা হয়ে থাকে, তা একেবারে 'অখাদ্য', শুধুমাত্র গ্রামোফোন রেকর্ডের খস্‌খসানি ছাড়া গানের কোন কথা বোঝবার সাধ্য আর থাকে না।

আরও একটা কথা বলে এ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি। আমরা যারা কলকাতার কাছাকাছি, তথা বাংলাদেশে বাস করি, বেতারকেন্দ্র মারফৎ না হলেও, সিনেমা অথবা মাইকের মাধ্যমে বাংলা ছায়াছবির গান অনেক শুনতে পাই। কিন্তু যাঁরা প্রবাসী বাঙালী? তাঁদের কাছে বাংলা ছায়া-ছবির গান শুনবার একমাত্র মাধ্যম হলো বেতার।

তাই অন্তত তাঁদের মুখ চেয়েও আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের এই চরম অব-হেলিত দিকটায় একটু কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

বিনীত
সুধীর মজুমদার
চাকদহ, নদীয়া।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

কলকাতা ক থেকে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ১২-৩০ এই দেড়ঘণ্টা বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান প্রচারের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। শ্রোতাদের চিঠিপত্র উত্তর দেবার আসর সবিনয় নিবেদনে একাধিকবার বলতে শুনেছি যে, বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান কলকাতার নয়, সেটা সম্পূর্ণ একটি আলাদা অনুষ্ঠান। তাই যদি হয়, তবে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান 'ক'-তে শোনানো হবে কেন? তার জন্য ত কলকাতা 'গ' আছেই।

এছাড়া প্রতিদিন বেলা সাড়ে তিনটেতে ইংরেজী সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে কলকাতা গ-এ। আগে এটি কলকাতা ক থেকে হোত। হঠাৎ কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিতে দূরের শ্রোতারা ঐ সময়কার সংবাদ শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বাংলায় স্থানীয় সংবাদ প্রচারিত হয় প্রতিদিন রাত ৭-৫০ মিনিটে। পশ্চিমবঙ্গে অবাঙালী লোকের সংখ্যা কম নয়। অথচ তাঁদের জন্য ইংরেজীতে স্থানীয় সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা নেই। অবিলম্বে এই অনুষ্ঠানটি চালু করা দরকার।

বিনীত
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়,
শান্তনু সেনগুপ্ত,
কলিকাতা—৩১।

(৩)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের পত্রিকার আমি একজন সাগ্রহী পাঠিকা ও গ্রাহিকা। এই পত্রিকা মারফৎ আমার একটি বক্তব্য পেশ করতে চাই। আশা করি আপনাদের চিঠিপত্র বিভাগে এটি প্রকাশিত করবেন।

বর্তমানে আকাশবাণী দিনরাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানসূচী প্রবর্তনা করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে ব্রতী হয়েছেন। এই মনোরঞ্জনে কিছু ফাঁক পড়েছে, সেইটুকু উপস্থাপিত করিছ।

কলকাতা কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান মূলত বাঙালী শ্রোতাদের জন্য। অতএব অবশ্যই তা বাংলা হওয়া উচিত নয় কি? কিন্তু হিন্দী সংগীতের সংখ্যাধিক্য আমা-দের পক্ষে যথেষ্ট বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। ঐসব সংগীতের জন্য বিবিধ ভারতী বা রেডিও সিলোন রয়েছে, ইচ্ছামত ধরার সুবিধাও আছে।

অতএব বাঙালী শ্রোতাদের তরফ থে সনির্বন্ধ অনুরোধ, যথাসম্ভব ব অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা।

ভবদীয়া
সুনন্দা
কিরিবুরু (বিহ

রাধানাথ রাই প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন—

অমৃত ৩০শে ভাদ্র ১৩৭৩ সং সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি অধ্যায়ে ও কবির জন্মোৎসব শিরোনামায় কবি "র নাথ রাই" উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁ নাম ও পদবী 'ধারানাথ রায় (রায়বাহাদু তিনি বিগত শতাব্দী এবং বর্ত শতাব্দীর প্রথম কয় বৎসর ডিভিসন ইনসপেক্টর অফ স্কুলস ছিলেন। প্রে ডেন্সী এবং হুগলী ডিভিসনে কাজ করি ছিলেন। প্রথমে বাংলায় কবিতা প প্রকাশিত করেন 'কবিতাবলী ১ম ও দ্বি খণ্ড' এবং 'লেখাবলী'। লেখাবলী মাইকে বীরাঙ্গনা কাব্যের ধরণে অমিত্রাক্ষর ছ লিখিত। সেখানি স্বর্গত ভূদেব মু পাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের উচ্চ প্রশং লাভ করিয়াছিল। পরে ভূদেব বাবুর প মর্শমত রাধানাথ ওড়িয়া সাহিত্য সে আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক যুগের ওড়ি সাহিত্যের জনক এবং ওড়িয়ার অন্য শ্রেষ্ঠ কবিরূপে তিনি খ্যাত।

বিনীত
বিভূতিভূষণ রা
কটক—১

বিজ্ঞানের জগৎ

সবিনয় নিবেদন,

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্য জানাই। অমৃত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থে আমি নিয়মিত পাঠক। সেইসময় থে নিয়মিত বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা প্রকাশিত হ ওই সমস্ত রচনা আমার মত সাধ পাঠককে বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানসঞ্চয়ে সহা করেছে। আশাকরি এইভাবে অনেকেই উপ হয়েছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীঅজয় হো 'অঘটন আজো ঘটে' এবং শ্রীসঞ্জীব ঘোষের 'নীল সমুদ্রের নীচে' বি আকর্ষণীয়। যদিও বিজ্ঞানকে ভিত্তি রচিত হয়েছে নিবন্ধ দুটি, তবে এর থেকে অনেক কিছু জানবার এবং শে আছে। যদি এই ধরনের নিবন্ধ আপ প্রকাশ করে বিজ্ঞান প্রচারে সাহায্য ক তাহলে একটি মহৎ দায়িত্ব আপনারা করতে পারবেন।

বিনীত—
পার্থপ্রতিম
কলকাতা-৩৫

সম্পাদকীয়

ঘরে ও বাইরের সমস্যা

পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে দেবীপক্ষের সূচনা সমাগত। বাংলাদেশে শারদোৎসবের চিহ্নগুলো আজ স্পষ্ট। আকাশ মেঘ-মোছা নীলে ভরপুর। শহরে যদিও বৃক্ষলতাদির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, এই বদ্ধ সীমানা পেরোলেই প্রকৃতির সপ্রতিভ ভাবটুকু নজরে পড়বে। যেহেতু বাংলাদেশে এখন শরৎকাল। কিন্তু উৎসবের মুখে অনেক দুর্ভাবনা এসে ভীড় করেছে। যাঁরা দেশচালনা করেন তাঁদের মাথায় চিন্তার অন্ত নেই। যাঁরা শুধু সংসার চালান তাঁদের অবস্থা তো আরও সকরুণ। তবু একটা স্বস্তির কথা পশ্চিম বাংলায় প্রায় একমাসব্যাপী শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান হয়েছে। শিক্ষকরা স্কুলে ফিরে গেছেন। বইপত্রের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করে যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী কর্মহীন দিনযাপন করছিল তারা বৎসরের শেষ-পড়া করবার জন্য আবার বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করেছে। এ বৎসর পড়াশোনার যে ক্ষতি হল তা এই অল্পদিনে পুষিয়ে নেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবু ছুটি কমিয়ে, বাড়তি ক্লাশ নিয়ে বৎসরের পাঠ্যসূচী অন্তত শেষ করা দরকার। নতুবা ফেলের সংখ্যা বাড়বে এবং অকৃতকার্যতার বিক্ষোভের জের চলবে আবার সামনের বৎসর। শিক্ষকমহাশয়গণ আশা করি এই বিষয়গুলি চিন্তা করে তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

বাংলাদেশের বাইরে তাকালে ছাত্রসমাজের যে-পরিস্থিতি চোখে পড়ে তা গভীরতর দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে ছাত্র উচ্ছৃংখলতা আজ এমন মারাত্মক আকার নিয়েছে যে, ব্যাপারটা আর শিক্ষামহলের এক্তিয়ারে নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তর এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দের নেতৃত্বে একটি জোরালো কমিটি গঠিত হয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে। কমিটিতে রয়েছেন দেশমুখ, কোঠারী, রাও প্রমুখ নামকরা শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণ যাঁদের দায়িত্ব হবে বর্তমান ছাত্র উচ্ছৃংখলতার কারণ তল্লাসী করা। কিন্তু ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে, স্বরাষ্ট্রদপ্তর এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না. মাথাওয়ালা গোয়েন্দা অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছে এর অন্যদিক তদন্ত করার জন্য। প্রধানমন্ত্রীও উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেছেন যে, ছাত্র আন্দোলন সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের স্থায়ী পথ বের করা দরকার।

মোট কথা শারদোৎসবের আগের দিনগুলি এবারে উদ্বেগের মধ্যেই কাটছে। এদিকে হিমালয় সীমান্তের খবরাখবরও খুব স্বস্তির নয়। তবে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি নেপাল সফর করে এলেন সাফল্যের সঙ্গে। ঘরের সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী বাইরের দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে সমান গুরুত্বই দিচ্ছেন। বরং প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি সজাগ, আগের চেয়ে তা আরও সযত্নই বলা যায়। আফগানিস্থান, নেপাল, বার্মা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় রাখার প্রয়োজনীয়তা নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে এসে এই এশীয় ঐক্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এশিয়ার ছোট অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ দেশগুলিকে উপেক্ষা করে পশ্চিমমুখী হলে ভারতের বেশি লাভ হবে, এ আশা ভুল। গত দশ-পনেরো বছরে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। অথচ বার্মা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি একসময়ে ভারতের দিকেই তাকিয়েছিল এশিয়ার এই অঞ্চলে একটি মৈত্রী বলয় গড়ে তোলার জন্য। তা গড়া সম্ভব হলে আজ এশিয়ায় এই অযথা রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যেত এবং চীনের ভয়ে বিদেশীকে ডেকে এনে ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালাতে হত না। যাইহোক, এখন সরকারের সচেতনতা বেড়েছে এবং তার পররাষ্ট্রনীতির পরীক্ষাও বাস্তবতাসম্মত হয়েছে। উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হুসেন এই নতুন মৈত্রীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সফর করতে গেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি। তবে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানদের সফর এবং যুক্ত ইস্তাহারেই রাষ্ট্রীয় মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় হয় না। বৈষয়িক সহযোগিতা ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের কোনো ভিত্তি না থাকলে মৈত্রীর আবেগ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই ভুল আগে হয়েছিল, আশা করি বর্তমান আমলে তার সংশোধন হবে।

আমাদের আভ্যন্তরীণ সংকট দূর করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থেই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করা প্রয়োজন। দেশের আভ্যন্তরীণ চিত্রের প্রতিফলন যেমন বাইরে ঘটে, তেমনি বাইরের চিত্রের প্রতিফলনও হয় ঘরের ভিতরে। ঘরে ও বাইরে সে কারণেই আমাদের পদচারণা হওয়া দরকার সতর্ক, সুষ্ঠু ও অবধারিত। এশিয়ার অন্য অনেক দেশেই সংকট দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতাও শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বালখিল্যদের উৎপাতে সমাজজীবন তটস্থ হয়ে পড়েছিল। ভারতের ঘটনাবলীর চরিত্র অবশ্য সেরকম নয়। শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও পারিবারিক শৃংখলার অভাব ঘরের বাইরে ছাত্রদের মনোভাবের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহলেও সমস্যা কঠিন। বাইরের দুনিয়ায় মিত্রতা রক্ষা যেমন কঠিন কর্ম, তেমনি দুরূহ ঘরের ভিতরকার শান্তিরক্ষা। এই দুই কর্তব্যই আমাদের সাহস ও সহানুভূতির সঙ্গে সমাধান করতে হবে।

বিচিত্র চরিত্র

রাধাদা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল ডাঃ পার্বতী সেন এসেছিলেন। ডাঃ সেন একজন সেই ধরনের মানুষ যিনি একটি সত্যকে বুকে আঁকড়ে ধরে শত দুর্যোগের মধ্যেও এগিয়ে চলেন; ভাগবতে আছে—কংস-কারাগারে বুকে পাথর চাপানো লোহার শেকলে বাঁধা দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হল। নবজাতক মানব-সমাজের পরিত্রাতা—সেই তাঁকে বুকে নিয়ে পিতা বসুদেব সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে কংসকারাগার থেকে বেরিয়ে যমুনার তুফান পার হয়ে রেখে এসেছিলেন নন্দালয়ে—যশোদার কোলের কাছে। বসুদেবরা এইভাবেই তাদের জীবন-তপস্যালব্ধ একটি সত্যকে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বয়ে নিয়ে চলেন।

ডাঃ পার্বতী সেন হিন্দ কুষ্ঠ চিকিৎসা ও আরোগ্যোত্তর আশ্রম নিয়ে জীবনকে প্রায় উৎসর্গ করেছেন। দিন-রাত্রি এই চিন্তা ও এই কর্মেই ব্যাপৃত। আমার কাছে বেশ কয়েকদিন এসেছেন। তাঁর কাছে যে-সব গল্প শুনেছি, তা আমাদের এতদিনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন বিপ্লবাত্মক সংঘটনের ক্ষেত্রে তেমনি মর্মান্তিক। শুনে মনে হয়, এমনটা সত্য না হলেই ভাল হত।

কুষ্ঠের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। অব্যর্থ ওষুধ। কুষ্ঠ ভাল হয়ে যায়। প্রথম অবস্থাতে রোগের চিকিৎসা হলে সে-মানুষ সহজ স্বাভাবিক মানুষই হয়ে যায়, এমনকি যে-সব রোগীর আঙুলে ক্ষত হয়েছে, নাক বসে গেছে, অন্য অঙ্গে বিকৃতি এসেছে, তাদেরও প্ল্যাস্টিক সার্জারী করে সারিয়ে তোলা চলে। একটি মেয়ের বিবরণ শুনলাম। শুনলাম কেন, প্রায় চোখেই দেখলাম। তাঁর এবং তাঁর স্বামী শ্বশুরের সঙ্গে পত্রালাপের নকল দেখলাম। একদিকে পত্রগুলি নকল নয়, আসল।

মেয়েটির কুষ্ঠ গোড়াতেই ধরা পড়েছিল। ভালঘরের বউ। শিক্ষিত স্বামী। শিক্ষিত শ্বশুর। তাঁরা তাকে কুষ্ঠাশ্রমে পাঠালেন। একটি ছোট মেয়ে ছিল—তাকে নিজেরা ঘরে রাখলেন। তারপর কুষ্ঠাশ্রমের চিকিৎসায়—আধুনিক ওষুধে তাঁর অসুখ সম্পূর্ণরূপে সেরে গেল। চিকিৎসকেরা তার রক্ত—চামড়া থেকে যে-সব স্থানে কুষ্ঠ রোগের জীবাণুর সন্ধান মিলতে পারে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলেন। কোথাও কোন কিছু পাওয়া গেল না। তখন মেয়েটি চিঠি লিখল—'ওগো আমি ভাল হয়ে গেছি, এবার আমায় নিয়ে যাও। আমার বড় মন কেমন করছে তোমার জন্যে, খুকির জন্যে।'

উত্তর এল—সে আর হয় না। ও-রোগ হলে ভাল হয় না। পূর্বজন্মের মহাপাপের ফল। উপায় নেই। অবুঝ হয়ো না। ভগবানকে স্মরণ করে কাটিয়ে দাও জীবনের ক'টা দিন।

বিজ্ঞান তাঁরা স্বীকার করবেন না। বিশ্বাস করবেন না। করবারও পথ নেই, কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি আর একটি বিবাহ করেছেন।

ব্যাপারটা গড়াতে পারত অনেকদূর—কোর্ট পর্যন্ত, কারণ, ডাইভোর্স না করেই বিয়ে করেছেন। কিন্তু ঐ মেয়েটি তা করেননি। তাঁর মেয়ে রয়েছে। আদালতে গেলে প্রকাশ পাবে যে, মেয়েটির মায়ের কুষ্ঠ হয়েছিল। তাতে সে লজ্জিত হবে, হয়তো তার বিয়ে হবে না। এবং হয়তো তাঁর স্বামীর কথাও ভেবেছেন।

এখন সরকার থেকে একটা চাকরি দিয়ে তার পুনর্বাসনের চেষ্টা হচ্ছে বা হয়েছে।

আর একটি মেডিকেল স্টুডেন্টের কথা শুনলাম, তিনি প্রায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এখন সম্পূর্ণ ভাল হয়ে ডাক্তারী পাশ করে তিনি ডাঃ সেনের সঙ্গেই এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এমনিতর অনেক মানুষের অনেক ঘটনা শুনলাম।

শুনতে শুনতে মনে হল, পৃথিবীতে এ্যাটম বোমা নিয়ে যে-হিংসা-বিদ্বেষের জর্জরতার কথা শুনি, তাও নিশ্চয় একদিন এমনি কোন ওষুধে ভাল হবে। অথবা এ-জর্জরতার কথাই হয়তো মিথ্যে।

মনের মধ্যে কল্পনার খেলা চলতে থাকে। নিছক আশাবাদী কল্পনা। মানুষ পৃথিবী থেকে ব্যাধি মুছে দিচ্ছে, সুন্দরী শ্যামলা পৃথিবী—তার বুকে স্বাস্থ্যবান শিশু খল খল করে হাসছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটি জিজ্ঞাসা ভেসে আসে—ভালো আছ?

চমকে উঠলাম—প্রশ্ন করলাম—কে?

উত্তর হল—ভু-ভু-ভু ভুলে গে-গেছ? লোকটি তোতলা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল রাধাদাদাকে। ছেলেবেলা লোকে রাধাদাদাকে বলত—বাবু কার্তিক। ছোটখাটো বললেও ঠিক বলা হবে না; রাধাদা-কে বোঝানো যাবে না; ছোটখাটো বললে তবে যেন রাধাদা-র কিশোর-কিশোর গড়নটি বোঝা যাবে। সাড়ে চার ফুটের মত লম্বা, ঠিক সেই অনুপাতে হাত-পা এমনকি দেহের মেদ পর্যন্ত সামঞ্জস্য রেখেছিল। খুব কোঁকড়ানো থোকা থোকা চুল—চিরুনি দিয়ে টেনেও বাগে আসত না চুল—রীতিমত হাতের তেলো দিয়ে টেনে টেনে পালিশ দিতে হত। রাধাদা শৌখিন লোক ছিল—বুরুশও তার ছিল কিন্তু সে বুরুশেও ঠিক হত না। গায়ের রঙ ছিল দুধে-আলতায় গোলা রঙের মত, তাতে খানিকটা হলুদে মিশিয়ে নিলে একেবারে মিলে যাবে। এর সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার ছিল সমান।

বাবু কার্তিক লোকে মিথ্যে বলত না। কিন্তু বিচিত্র মানুষের ভাগ্য বা অদৃষ্ট। ভাগ্য নাই বললাম—অদৃষ্ট বললে তর্ক থাকবে না। অ-দৃষ্ট —যা দেখা যায় না। কুষ্ঠ রোগের জীবাণু সাদা চোখে তো দেখা যায় না; সে-আমলে মাইক্রসকোপ—বা—এই মাইক্রসকোপিক পরীক্ষায় মানুষ পুরো বিশ্বাস করতে পারেনি। রাধাদা-র কুষ্ঠ ব্যাধি হলে লোকে বলেছিল—অদৃষ্ট। এ-জন্মে তো ওর পাপ নেই। কোন পাপ ও করেনি। আনন্দময় পুরুষ। এ-পাপ পূর্বজন্মের।

রাধাদা-র কুষ্ঠ হয়েছিল।

* * *

কথা তো আজকের নয়। রাধাদা আমার থেকে অন্তত আট-ন' বছরের বড়। তাহলে হয় ১৮৯০-এর ওপারে—এপারে নয়। সে-আমলের সমাজ বা দেশের অবস্থা এ-আমলের লোকের কাছে অবিশ্বাসের কথা। বারো মাসে যার বারোশো টাকা আয়, সে সদগৃহস্থ পাড়াগাঁয়ে। যার পাঁচ হাজার আয় তারা ভদ্রলোক। যার আয় বিশ হাজার ছাড়ালো সে লক্ষপতি। নগদ হাজার-পাঁচেক টাকা নিয়ে যে ব্যাংকিং করেছে, তাকে লোকে বলত—টাকার কুমীর।

রাধাদা-র বাপ দুটোর একটাও ছিলেন না, কিন্তু লোকে বলত—'দু'হাতে রোজগেরে মানুষ', দু'হাত ভরে রোজগার করতেন। নিত্য সন্ধ্যায় বাড়ী এসে তাঁর গায়ের লম্বা কামিজটার দুই পাশের দুই পকেট থেকে ঢেলে পয়সা দু'আনি সিকি উজাড় করে দিতেন, তার গণা-গাঁথা ছিল না। কাঠের হাতবাক্স খুলে তার মধ্যে পুরে দিতেন।

সত্যই রোজগার ছিল অসাধারণ, সেকালে একখানি গ্রামে বসে দৈনিক চার-পাঁচ-ছয় বা সাত-আট টাকা উপার্জন সামান্য নয়। চাকরি কিন্তু সামান্যই। সাব-রেজেস্টী আপিসে কেরানীর কাজ। হেড-ক্লার্ক নয়, সেকেন্ড ক্লার্ক ছিলেন তিনি। পদে সেকেন্ড ক্লার্ক হলেও, যে-গ্রামে এই সাব-রেজেস্টী আপিস, সেই ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের কুলীন এবং মাননীয় ঘরের এই প্রবীণ ব্রাহ্মণ-সন্তানটিই ছিলেন আপিসের প্রায় বাবাখুড়ো স্থানীয় ব্যক্তি। বড় বড় চাকরে বা হাকিমেরা তাঁদের গুরু-জনদের যে-চোখে দেখে থাকেন, সেই চোখে দেখতেন। তিনিই হাকিমকে গ্রাম্য সমাজে পরিচিত করে দিতেন। সাব-রেজিস্টার তাঁর থেকে বয়সে নবীন হলে প্রণামও করতেন। তিনি হাকিম হুজুরই বলতেন কিন্তু প্রণামও নিতেন।

সাব-রেজেস্টী আপিসে আর দশটা আপিসের মত উপরি আদায় ছিল, এখনও আছে শুনতে পাই; দলিল দাখিলের সময় থেকে শুরু করে দলিল বের করে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দু' আনা চার আনা আধুলি, কেস-বিশেষ টাকা দিতে হত, সে-সব তাঁর হাতে জমা হত। এবং পরে তার একটা বাঁটোয়ারা হত। এর ভাগ ছাড়াও তাঁর হাতে লোকে খুশী হয়ে পয়সা গুঁজে দিত। মুখুজ্জেমশায়ের প্রণামী। তখনকারের সিকি দু'আনিগুলো আকারে ছিল সারিডন পিলের মত। অথচ অত্যন্ত পাতলা—চারটে সিকি বা দু'আনি উপরি উপরি রাখলে তবে সারিডনের মত মোটা হত। তাই দিয়ে দুই পকেট বোঝাই সে খুব কম নয়। তবে তামার পয়সা থাকত বেশী।

তাঁর জামার পকেট দুটো ছিল অর্ডারী পকেট। লম্বা জামার অর্ডারী পকেটদুটো পূর্ণ হলে তাঁর পদক্ষেপের সঙ্গে তাল দিয়ে দুলত। জামার দুই পাশে দুটো সজীব অন্তরীপের মত।

সুতরাং অভাব তাঁর ছিল না। এবং দু'হাতে রোজগেরে মানুষে কথাটাও মিথ্যে ছিল না। এবং এই দু'হাতে রোজগারের কল্যাণে তাঁর বাড়ীতে চলত বার মাসের দিয়তাং ভোজ্যতাং সমারোহ। সকালবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত 'চা' হত অন্তত বিশ-পঁচিশ বার। তার সঙ্গে মিষ্টান্ন। মিষ্টান্ন আসত সের সের।

রাধাদা-র ভোর রাত্রে খিদে পেত। মাথার গোড়ায় চারটি রসগোল্লা থাকত, রাধাদা উঠে রসগোল্লা খেয়ে শুতেন। তারপর সকালবেলা থেকে চা-পর্ব।

বাড়ীতে চার ছেলে, দুই মেয়ে, ছেলেদের বউ—ছেলে—পরিপূর্ণ সংসার। তার সঙ্গে ছেলেদের বন্ধুবান্ধব। সে বলতে গেলে সেকালে আমাদের গ্রামের যে-থিয়েটারের দলটি ছিল, সেই দলটির প্রায় সকলেই।

তাদের মধ্যে নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েসাজা ছেলে ক্ষুদিরাম মালাকার রাধাশ্যামদা'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গিয়েছিল। শুধু চা জলখাবার নয়, এখানেই একবেলা খাওয়াও তার বাঁধা ছিল। এছাড়া তবলার ওস্তাদ, কোন আগন্তুক গাইয়ে, আশপাশ গ্রামের সাব-রেজেস্টী আপিসের মক্কেল দু'-একজন—এ ছিল বাড়ীতে নিত্য অতিথি। তা—সে-খাওয়া যেমন তেমন নয়। এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন না হোক অন্তত সাত-আট ব্যঞ্জন ও তার সঙ্গে মাছের ঝোল মাছের অম্বল।

রাণী ভবানীর মন্দির ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

বলতে ভুল হল—আর একজন ছিলেন বাড়ীর পরিবারের একজন। তিনি নীলরতনবাবু মাস্টার। স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। গ্র্যাজুয়েট। দাড়িগোঁফওয়ালা দেবচরিত্র মানুষ। পান না, সিগারেট না, অন্য কোন নেশা না; একজন আদর্শবাদী সেকালের ইয়ং বেঙ্গল। এই স্কুলে চাকরি নিয়ে যখন এলেন, তখনই রাধাদা-র বাবা তাঁকে এনে বাড়ীতে রেখেছিলেন। বাড়ীতেই থাকবেন, খাবেন এবং তাঁর দুই ছেলেকে পড়িয়ে মানুষ করে দেবেন।

তাঁর চার ছেলের মধ্যে বড় দুজন প্রায় মাস্টারের বয়সী, ছোট দুজন—ষষ্ঠী এবং এবং রাধাশ্যাম—এদের মানুষের মত মানুষ করে তুলবার জন্য বাপের চেষ্টার শেষ ছিল না। তাই এই আত্মভোলা বিশুদ্ধ আত্মা মানুষটিকে তিনি ঘরে রেখেছিলেন। নীলরতনবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু ষষ্ঠীরাম সেকেন্ড ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠল না, রাধাশ্যামও ফোর্থ ক্লাস থেকে থার্ড ক্লাসে উঠল না কোনদিন। নীলরতনবাবুর লজ্জার অবধি ছিল না। তিনি বারবার বলতেন—মেজমশাই, এবার আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বোর্ডিং-এ যাই।

রাধাদা-র মা এবং বাবা বলতেন—মাস্টার, তুমি আমাদের পর ভাবছ? কেন? তাঁদের চোখে জল আসত।

এ-মমতার বন্ধন তিনি কাটাতে পারেননি। তাঁরও চোখে জল আসত। রাধাদা-র বাবা বলতেন—দেখ না, এইবার তুমি দেখ না। আমি কি করি তা দেখ না।

—এক রাত্রে ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে দেব আমি।

ছেলেকেও বলতেন—প্রমোশন না পেলে বলতেন—কুছ পরোয়া নেহি। দেখ না এক রাত্রে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে দেব।

এই এ'র সেবাও ছিল তার সংসারের একটি দেবসেবা। আবার এই দেবসেবার পুণ্যটুকুর সঙ্গে ব্যালান্স রাখবার জন্যই বোধ করি ছিল একপাল সুন্দর পায়রা এবং দুটো বিলিতী কুকুর। তাদের জন্য মাছ বরাদ্দ ছিল।

বাড়ীর ছোট ছেলে রাধাদা।

আমার সঙ্গে সম্পর্ক চারটে। দুটো পাতানো। আমার পিসিমা রাধাদা-র ভিক্ষে-মা ছিলেন। রাধাদা-র মা আমার ভিক্ষে-মা ছিলেন। আমাদের বাড়ীর ভাগেনবংশের একটি শাখা তাঁরা সে হিসেবে রাধাশ্যাম আমার ভাইপো হতেন, আমি খুড়ো। এছাড়া বিবাহসূত্রে আমরা ভায়রাভাই। আমার স্ত্রী এবং রাধাদা-র স্ত্রী আপন মামাতো-পিসতুতো বোন।

সেই রাধাদা-র কুষ্ঠ হয়েছিল। তাকে সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি। এ সেই বিচিত্র রাধাদা-র কথা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
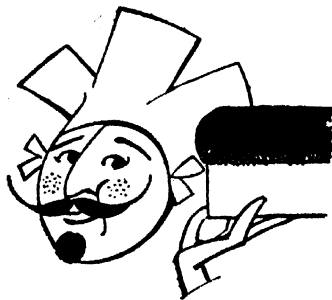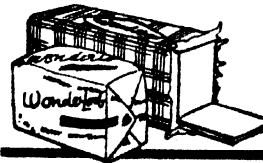
এইচ জি ওয়েলস

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার যে তাপমানযন্ত্র তার পারদ চিহ্ন যেমন সহজেই ওপরে ওঠে তেমনই আবার দ্রুততালে নীচে নেমে যায়। তুলসীদাসের ভাষায় 'সাগর লহরী সমানা' এই সাহিত্যিক খ্যাতি সাগরের বুকে উঠে আবার সাগরেই মিলিয়ে যায়। অনেক সাহিত্যিক একদা পাঠক সমাজে যে বিস্ময়কর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু তাঁরা আজ বিস্মৃত। মেরী করেলী, হল কেইনের বই বিক্রী হয়েছে লাখে-লাখে, কত-শত ভাষায় তার অনুবাদে বেরিয়েছে. কিন্তু আজ তাদের কথা কে স্মরণে রাখে। এই সেদিনও টমাস হার্ডি বা জন গলসওয়ার্দি সাহিত্যের সুবর্ণ সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন, আজ তাঁদের গ্রন্থ হয়ত স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকায় উঠেছে। আমাদের এই বাংলা দেশেও এমন ঘটনা ঘটেছে, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে আজ কে মনে রেখেছে, চারু বন্দোপাধ্যায়কে অনেকে জানেন 'রবিরশ্মি'র লেখক হিসাবে। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উত্থান-পতন অতি বিস্ময়কর।

এই মাসেই যে ইংরাজ সাহিত্যিকের জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হবে সেই হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের কথা ইতিমধ্যেই বিস্মৃতির গর্ভে। হয়ত কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং জীবনকথা আলোচিত হবে কিন্তু যদি তরুণ পাঠককে "লাভ অ্যান্ড মিঃ লুইসহ্যাম," "কিপস" এবং "মিঃ পলি" প্রভৃতির জন্য হয়ত লাইব্রেরীর প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলমারি ঘাঁটতে হবে। এইচ জি ওয়েলস। বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এবং কাহিনীর মধ্যে এইচ জি ওয়েলসের দান অপরিমিত। আজ যাঁরা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন যৌবনে তাঁরা সকলেই এইচ জি ওয়েলসের অনুরাগী পাঠক ছিলেন, অন্ধভক্ত ছিলেন অনেকে।

যেদিন তিনি কাপড়ের দোকানের কাউন্টার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই দিন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি লিখেছেন অজস্র। প্রবন্ধ, ইতিহাস, প্রচার-পুস্তিকা এবং বিশ্ব-পুনর্গঠনের কার্যসূচীর খসড়া।

উত্তরকাল যাই কেন বিচার করুক, ওয়েলস ছিলেন তাঁর কালের রুশো। ইংরাজ সমাজের বিগত যুগে ওয়েলসের সমতুল্য লেখক সংখ্যা পরিমিত। তাঁর পান্ডিত্য এবং সচেতন মানসিকতা যে কোন কালের মানুষের কাছে ঈর্ষার বস্তু।

বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আইভর ব্রাউন তাঁর যৌবনকালে এইচ জি ওয়েলস সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেই পুস্তিকার এক অংশে তিনি বলেছিলেন—

"At the time of the Armistice (1919) Woodrow Wilson had the ear of the world to an extent unknown by any living statesman before. He jailed and passed. That sovereignity over the minds of men was transferred in no small measure to H. G. Wells who found himself, at the time of the Washington Conference, with an audience measured by tens of millions."

আইভর ব্রাউন একথা লিখেছিলেন সংবাদপত্রের "সিন্ডিকেটেড ফীচার" যা একই সময়ে অনেকগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার সম্পর্কে। শান্তি এবং শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়েলস যা লিখতেন তার পাঠক সংখ্যা এত বিরাট হত না, যদি না ইতি-মধ্যেই তিনি বৃটিশ লেখক হিসাবে অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী না হতেন। প্রবন্ধ রচনায় অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতা ছিল ওয়েলসের।

এই কর্ম মুখ্যতঃ সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতার ফসল কালজয়ী হয় না, শরতের শিউলি ফুলের মত রাতে ফুটে আবার প্রাতেই ঝরে পড়ে। ওয়েলস এই সময় লিখেছেন শ্রাবণের মত অবিশ্রান্ত গতিতে।

ওয়েলসকে এই সম্মান, এই শক্তির অধিকারী হতে হয়েছে প্রচন্ড সংগ্রাম করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সামান্যই, তা ছাড়া বস্ত্র-বিপণীর কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে দিন কাটাতে কার ভাল লাগে, সেই ক্লেশকর কালও কেটেছে। সেই অবস্থা থেকে ওয়েলস লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে আসন পেয়েছেন তার বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাসের রচনাকার হিসাবে সম্ভাব্য সকল প্রকার সামাজিক বিবর্তনের আভাস দিয়েছেন।

আজ এবং আগামীকাল সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল ওয়েলসের মনে। মাথায় ছিল অজস্র আইডিয়া, তিনি পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতেন না, নতুন একটা ভাব মাথায় উদিত হলেই পুরাতনকে পরিহার করেছেন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে। ওয়েলস ছিলেন আশাবাদী। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, একদিন হয়ত বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

এই বাসনা নিয়েই হয়ত তরুণ বয়সে ফেবিয়ানদের দলে ভিড়েছিলেন ওয়েলস। ফেবিয়ান সোসাইটিতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এইচ জি ওয়েলসকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ' আর গ্রাহাম ওয়ালাস। সদস্য হওয়ার পর প্রথম আড়াই বছর ওয়েলস ফেবিয়ান সোসাইটিকে উপেক্ষা করেছেন। সিডনে এবং বিয়েট্রিস ওয়েব এ'রা স্বামী-স্ত্রী, দুজনেই ওয়েলসকে ভারী পছন্দ করতেন। ওয়েলসের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ঔপন্যাসিক হিসাবে জনপ্রিয়তা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ বিশেষ করে ওয়েব দম্পতিকে আকৃষ্ট করে। সেই কালে বার্নার্ড শ' যে ওয়েলসকে ভালবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী বার্নার্ড শ' এবং এইচ জি ওয়েলসের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। সেদিন সেন্ট জেমস থিয়েটারে হেনরী জেমসের নাটক 'গয় ডমভিলে' অভিনয় হচ্ছিল। ওয়েলস সেই সময় 'পল মল গেজেটে'র নাট্য-সমালোচক। কিন্তু এমনই তিনি সমালোচক যে, নাট্য বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না।

ওয়েলস কর্মপ্রার্থী হয়ে ঘুরছেন নানা জায়গায়, এমন সময় শুনলেন যে পলমল গেজেটের নাট্য-সমালোচকের পদটি খালি আছে। সম্পাদক ছিলেন মিঃ কস্ট। তিনি বেঁটে-খাটো ওয়েলসকে দেখে প্রশ্ন করলেন-- আপনার অভিজ্ঞতা কতটুকু? ওয়েলস বললেন—রোমিও জুলিয়েটে হেনরী আর্ভিং আর এলেন টেরীর অভিনয় দেখেছি, আর দেখেছি পেনেলীকে 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' নাটকে।

কস্ট আবার প্রশ্ন করলেন—এর বেশী আর কিছু নয়?

ওয়েলস বললেন—না, আর কিছুই ত দেখিনি।

মহাখুশী হলেন পলমল গেজেটের সম্পাদক মিঃ স্ট্যাড। তিনি বলে উঠলেন—চমৎকার। চমৎকার! তাহলে রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আপনার মতামত একেবারে তাজা, তার ভেতর খাদ নেই। খোলা মনে কাজে লেগে যান।

এই সূত্রেই বার্নার্ড শ'র সঙ্গে আলাপ হল। বার্নার্ড শ'ও সেইকালে নাট্য-সমালোচকের কাজই করেন। তিনিও অভিনয় দর্শনে গিয়েছিলেন। একসঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে দুজনের আলোচনা হচ্ছিল। বার্নার্ড শ'র মন উৎসাহ ও উত্তেজনায় পরিপূর্ণ।

ওয়েলস কিন্তু বিশেষ কথাবার্তা বলছেন না। তিনি শুনে যাচ্ছেন আর শ'কে লক্ষ্য করছেন। মুখখানা যেন জ্বলন্ত আগুন, একটি শুভ্র মুখের ওপর আগুন-রাঙা পাতলা দাড়িতে বেশ দেখাচ্ছিল বার্নার্ড শ-কে। সেদিনের কথা স্মরণ করে ওয়েলস পরে লিখেছেন—

"I liked him with a liking that has lasted a life-time."

কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ ছিল শেষ পর্যন্ত, সে কথা যথা-স্থানে উল্লেখ করা যাবে। ফেবিয়ান সোসাইটিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন ওয়েলস ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁর চেষ্টা হল সংস্কার সাধন। আর এই প্রচেষ্টার বিরোধী হলেন বার্নার্ড শ। এই বছরেই ৯ই ফেব্রুয়ারী এইচ জি ওয়েলস ফেবিয়ান সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন—"ফলট্স অব দি ফেবিয়ানস্"। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন ফেবিয়ান সমিতি তার ড্রইংরুম মার্কা আলোচনার কাল আজো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ওয়েলস তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছিলেন সেদিন। তাঁর অতৃপ্তির কারণ হল সোসাইটির আয়তন এবং অসচ্ছল অবস্থা। ওয়েলসের ধারণা ছিল ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষে একটা মহৎ কর্ম সাধন করা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই জনতা—সবই হবে বিরাট।

ওয়েলস সেদিনকার প্রবন্ধে বললেন—"ফেবিয়ান গোষ্ঠী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন চাইছেন, স্বচক্ষে আজকের এই সভার দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই ছোট্ট সভাগৃহে, দু-চারজন মাত্র সদস্য এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে,—আর বাইরে বেরিয়ে স্ট্র্যান্ডে দাঁড়ান, ব্যবসাকেন্দ্রের বিশাল প্রাসাদ-গুলির দিকে তাকান, বিজ্ঞাপনের চমক দেখুন, জনবহুল পথ-ঘাট, অসংখ্য মানুষের ভীড় ভালো করে লক্ষ্য করুন। এই সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত করেই আপনারা পরিবর্তন আনতে চান। এইবার আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার আকিঞ্চিৎকরত্ব বিবেচনা করুন।" কথাগুলি যে স্পষ্ট এবং নির্জলা সত্য তা বুঝতে সময় লাগে না। কিন্তু সেইদিনের সেই মানুষ-গুলি, ক্ষুদে মানুষটির কণ্ঠে উচ্চারিত ফেবিয়ানদের বক্তব্যের প্রতি বক্রোক্তি—

"Ill written and old fashioned, harsh and bad in tone, assertive and unwise."

ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য সংখ্যা নগণ্য হলেও তাঁদের প্রভাব কিন্তু নেহাৎ তুচ্ছ ছিল না। ফেবিয়ান সোসাইটির চেষ্টাতেই লেবর পার্টি গড়ে উঠেছিল, ফেবিয়ান সোসাইটির ওয়েলস নিন্দিত নিবন্ধ অনেকেই পড়েছেন তথাপি ওয়েলস যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গেই নিজের বক্তব্য সেদিন কোনো রকম অস্পষ্টতা না রেখে বলতে পেরেছিলেন, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সেদিন অবশ্য ফেবিয়ানরা ওয়েলসের কোনো পরামর্শই গ্রহণ করেননি।

এই সূত্রে আরেকটি তথ্য স্মরণ কর্তব্য। ওয়েলস ছিলেন ফেবিয়ান গোষ্ঠীর ওয়েব, ওয়ালাস, শ, ব্লানড এবং ওলিভিয়ারের চাইতে বয়সে দশ বছরের ছোট, অর্থাৎ দশ বছর পিছিয়ে (কিংবা এগিয়ে ছিলেন মনের দিক থেকে)। তাঁর বক্তব্য তাঁর চেয়ে যাঁদের বয়স বেশী তাঁদের অপছন্দ হওয়া স্বাভাবিক। ওয়েলসের প্রকৃতি ছিল অসহিষ্ণু। এতটুকু প্রতিবাদ, বা পরিহাস সইত না, একটুতেই চটে যেতেন। অথচ বন্ধু মহলে পরিহাসরসিক হিসাবে ওয়েলসের কদর ছিল। কিন্তু যেই কোন রকম বিতর্ক উঠল, কেউ প্রতিবাদ জানালেন তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে, আর কোথায় যায়, ওয়েলসের গলা সপ্তমে চড়ল, তিনি তখন ক্ষমাহীন ও শিষ্টাচার বিবর্জিত।

এইসব কারণে বিয়েট্রিস ওয়েব বলেছিলেন—"এইচ জি তোমার এই অশালীন অভব্যতার জন্যই কোনোদিন তুমি জন-সমাজে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করবে না।"

তবু যদি এইচ জি ওয়েলসের মেজাজ ঠিক থাকত তাহলে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ভীড় জমত। তাঁর বক্তব্যবিষয় ছিল শানিত এবং যুক্তিপূর্ণ।

বোধকরি এই কারণেই "ফলটস অব দি ফেবিয়ান" প্রবন্ধটিকে কেউ হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। সমিতির সদস্য এবং সমিতি-বহির্ভূত কয়েকজনকে নিয়ে একটা কমিটি গড়া হল, তার উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে সমিতির প্রভাব, আয় এবং কর্মধারা সম্প্রসারিত করা যায় তা বিচার করা।

এই কমিটিতে বার্নার্ড শ ছিলেন না। মিসেস ওয়েলস ছিলেন সেক্রেটারি। সার্লোট (পরে বার্নার্ড শ'র স্ত্রী) এই কমিটিতে ছিলেন। ওয়েলস পরিচালিত স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হল আর সেই সঙ্গে পাঠানো হল কার্যকরী সমিতি প্রদত্ত আরেকটি রিপোর্ট, সেই রিপোর্টটির মুশাবিদা বার্নার্ড শ করেছিলেন। সকলের মতে সে রিপোর্টটি ছিল সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ।

ওয়েলস পরিচালিত কমিটির প্রস্তাব ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা। কয়েক বছর পরে ওয়েব ও বার্নার্ড শ সেই পরিকল্পনাটি কাজে লাগিয়েছিলেন এবং সেই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম "দি নিউ স্টেটসম্যান"। ততদিনে অবশ্য ওয়েলসের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তিনি নতুন কিছুর সন্ধান করছেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ওয়েলসকৃত রিপোর্টের আলোচনা সুরু হয় এবং তার সমাপ্তি ঘটে ১৯০৭-এর ৮ই মার্চ। বলা বাহুল্য বার্নার্ড শ'র ভূমিকাই ছিল এ আসরে গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন ওয়েলস বুদ্ধির তরজা-লড়াই-এ পরাজিত হয়েছিলেন মনে হয়। ১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েলস সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। তবে তিনি এই অপমানের শোধ নিয়েছিলেন তাঁর 'দি নিউ ম্যেকিয়া-ভেলী" নামক গ্রন্থে।

ওয়েলস বলতেন বার্নার্ড শ একজন "ইগনোরান্ট সেন্টিমেন্টালিস্ট" আর শ বলেছিলেন ওয়েলসের মৃত্যুর পর "হি ওয়াজ নট এ জেন্টেলম্যান।"

ওয়েলস যখন দেখলেন যে ফেবিয়ান সোসাইটি পার্লামেন্টারি লেবার পার্টি গঠনে

সচেষ্ট তখন তাঁর ধারণা হল যে বিজ্ঞান-সম্মত সমাজবাদের আদর্শ থেকে এঁরা অনেক দূরে। তাই ওয়েলস দল ছাড়লেন, লণ্ডন ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়ে তিনি নতুন কাজে ব্রতী হলেন।

লেবার পার্টি পার্লামেন্টারি বিরোধী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফেবিয়ান সোসাইটির কাজ শেষ। পার্টির ফণ্ডে তখন অনেক টাকা। তবে সে টাকা ট্রেড ইউনিয়নের সোস্যালিস্ট অর্থ নয়।

১৯৪১-এ 'মেজর বারবারা'র অভিনয় দেখে তৃপ্ত হয়ে ওয়েলস বার্নাড শ-কে চিঠি দিয়েছিলেন—

"Whatever happen now we've had a pretty good time."

মহাযুদ্ধের বীভৎস বিপর্যয়ে হয়ত অতীত দিনের স্মৃতি ভেসে এসেছিল ওয়েলসের মনে। বার্নাড শ সেই সময় ওয়েলসকে লিখেছিলেন যে আপনি বোমা-বিধ্বস্ত লণ্ডন থেকে আমার এই পল্লী-আবাসে চলে আসুন। ওয়েলস কোনো উত্তর দেন নি।

বার্নাড শ আবার লিখলেন—ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবি এবং এইচ জি ওয়েলসের কোনো ক্ষতি আমরা সইবো না। লণ্ডনের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক, সে আমার সইবে।

এ চিঠিরও জবাব আসেনি।

হয়ত ওয়েলস ভেবেছিলেন আর সকলের অদৃষ্টে যা হবে আমারও তাই হোক। বীরের মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত।

১৯৪৪-এ বার্নাড শ'র "এভরিবডিস পলিটিক্যাল হোয়াটস্ হোয়াট—" পাঠ করে কিন্তু ওয়েলস্ বার্নাড শকে লিখেছিলেনঃ—

"I am glad that I provoked the book (The Political What's What) and later on I will send you a comment on it. In the meanwhile bless you.— H. G."

১৯৪৬-এর ১০ই আগস্ট এইচ জি ওয়েলসের মৃত্যু হয়। ওয়েলসের শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বার্নাড শ লণ্ডনে ছুটে গিয়েছিলেন, সাক্ষাতের অনুমতি মেলেনি। ওয়েলসের হিসাবে বার্নাড শ আগেই মারা যাবেন এই স্থির ছিল তাই "ডেইলী একস্প্রেসে"র তরফ থেকে বার্নাড শ'র শোক প্রশস্তি লিখে রেখেছিলেন, সেই রচনাটি বার্নাড শ'র মৃত্যুর পর 'ডেইলী একস্প্রেস' সম্পাদক ওয়েলসের পুত্রের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করেন। সারা জীবন ধরে বার্নাড শ'র প্রতি তাঁর যা বিরূপতা ছিল, সে কুৎসিত বিদ্বেষ তাঁকে দহন করেছে তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু খ্যাতির যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি বোধহয় ওয়েলসের প্রতি প্রসন্ন নন। বরং নিষ্ঠুর বলা যায়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বার্নাড শ একজন বামপন্থী নাট্যকার মাত্র থিয়েটারে তাঁর নাটক এক বিশেষ শ্রেণীর দর্শককে পরিতৃপ্ত করে। আজ বার্নাড শ'র নাটকাবলীর বিরামহীন অভিনয় চলছে লণ্ডনে ও ন্যুইয়র্কে। তাঁর অসংখ্য পত্রাবলী প্রকাশিত হবে, প্রতিদিনই তাঁর জীবনী বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা গ্রন্থ পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে প্রকাশিত হচ্ছে।

জন গলসওয়ার্দি তখন উপন্যাস লেখক এবং নাট্যকার। মৃত্যুর পর বিস্মৃত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফরসাইট সাগার আবার নতুন করে আদর হয়েছে। বি, বি, সি থেকে টি ভিতে ফরসাইট দেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, ফলে আবার তিনি বেঁচে উঠবেন।

হয়ত উপন্যাসকার হিসাবে এইচ জি ওয়েলসের আবার পুনরুজ্জীবন ঘটবে। কিন্তু প্রগতিমূলক মনোভঙ্গীর জন্য কেউ তাকে স্মরণ করবে না, কেউ মনে করবে না রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা। এইচ জি ওয়েলস কিন্তু বিশেষভাবে আজকের দিনে স্মরণীয় এই কারণে যে তিনি অধিকতর যুক্তিশীল শান্তিবাদী পৃথিবীর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে অজস্র পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। সেই সব বিবৃতি বা রাজনৈতিক পুস্তিকায় চিন্তাশীল এইচ, জি, ওয়েলসের একটি আন্তরিকতাপূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া গেছে। ভবিষ্যৎ মানব সমাজ সম্পর্কে এক নিদারুণ হতাশার মনোভাব নিয়ে তিনি পরলোকের পথে পাড়ি দিয়েছেন।

এইচ জি ওয়েলসের পরিচয় হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের তিনি 'এ মডার্ন ইউটোপিয়া' লিখেছিলেন। প্রথম যুগের সোস্যালিস্টদের মধ্যে ইউটোপিয়ান মনোভংগী এক বিরল ব্যতিক্রম। 'সেপ অব থিংস টু কাম' এর কথা স্মরণ করা যায়, সে যেন এক বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের আবির্ভাব, আর জর্জ ওরওয়েলের "১৯৮৪" একটা দুঃস্বপন। তথাপি এইসব গ্রন্থ অসংখ্য পাঠক পড়েছেন এবং মানসিক আবহাওয়া গিয়ে এই নিয়ে গড়ে ওঠেনি।

১৯৪৯-এ যখন '১৯৮৪' প্রকাশিত হয় তখন ওয়েলস আর এই জগতে নেই। তবে অন্ধকারের কাল তিনি দেখে গেছেন এবং অন্ধকারের যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেছেন। ওয়েলসের সর্বশেষ গ্রন্থটির নাম—"মাইণ্ড এ্যাট দি এন্ড অব ইটস্ টেদার"। বৈজ্ঞানিক মানস এবং নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে আণবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি তা মানস নেত্রে কল্পনা করেছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েলস লিখেছিলেন 'এ্যান্টিসিপেসানস' সেই সময় মোটরগাড়ির এই ব্যাপক প্রচলন কল্পনাতীত ছিল এবং বিমান শিল্পের নিছক শৈশবাবস্থা। এই গ্রন্থ "দি ফিউচার অব ওয়ার" নামক একটি পরিচ্ছেদে তিনি একটি ইনফ্যানট্রি ডিভিসন কি ভাবে এক ভদ্র বৃদ্ধ জেনারেল কর্তৃক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাহলে কিভাবে এই নিধনযজ্ঞ নিবারণ করা সম্ভব। তিনি সেইকালে 'ট্যাংকের' কথাও চিন্তা করেছেন, তিনি লিখেছিলেন— 'iron-clad road-fighting-machines' অর্থাৎ ট্যাংক জাতীয় যানবাহন চলেছে, তার ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান ছত্রের মত আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনো সামরিক কর্তৃপক্ষের এইচ জি ওয়েলস পড়া থাকলে হয়ত কাজে লাগত। অনেক জীবন হয়ত রক্ষা পেত। কিন্তু তখন তিনি সোস্যালিস্ট কর্মাচ হিসাবেই অবজ্ঞাত। কে তার কথায় গুরুত্ব দান করবে।

দুটি মহাযুদ্ধের ফলে আশাবাদী ওয়েলসের মনোভংগের কারণ ঘটেছে। সভ্য মানুষ এবং জগতের যুক্তিবাদী মনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। জাতীয়তাবাদের হিস্টিরিয়া সমগ্র জগৎকে গ্রাস করেছে।

এইচ জি ওয়েলসের উদ্ভট উপন্যাসগুলির মধ্যে আশ্চর্য কল্পনাশক্তি ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর 'দি ওয়ানডারফুল ভিসিট' এক আশ্চর্য পরিকল্পনা এবং তাঁর উদ্ভট কল্পনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া রংগরসপূর্ণ শ্লেষাত্মক রচনাও তিনি অনেক লিখেছেন। তাঁর "টনি বনগে" ওয়েলসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তিনি সর্বদা বলতেন আমি সাংবাদিক। তিনি শিল্পী নন। কিন্তু তাই কি এইচ জি ওয়েলসের জীবন ও সাহিত্যের অন্তিম ফলশ্রুতি।

তোমার বাগিচায় ॥ মৃগাঙ্ক রায়

ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দিবাভাগে, অন্ধকার মধ্যযামে ও।
তোমার ইচ্ছার নির্দেশ আমার সম্মুখে খোলা।
এ বাগিচা তোমারই, আমি মালাকর:
কখনো আমিই গাছ, সূর্যমুখী; কখনো আমিই ফুল মধুরূপী।
এ খেলা তোমারই, আমি খেলছি চল্লিশ বছর।
তারপর? তাও স্পষ্ট। জলের সঞ্চয় ফুরিয়ে
মরুভূমির মধ্যাহ্নে ফিরব ঊর্ধ্বগ্রীব উট।

এত দীর্ঘ পরিশ্রমে।

আশিস সান্যাল

এ কোন দিগন্তে আজ নির্বাসিত? এ কোন তিমিরে
সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ক্ষত চিহ্নিত আমার?
সব প্রেম নির্বাপিত এ কোন পৃথিবী? সর্বত্র ভীষণ
এ কোন বৃক্ষের ধ্বনি বিরাজিত? হায়, অবিরাম...
চোখের নীলিম বৃষ্টি ভালোবেসে প্রত্যাশায়
এ কোন প্রান্তরে আজ অভিশপ্ত অন্ধকারে কোথায় এলাম?

এ কোন ভয়াল রাত্রি উদ্ভাসিত? বলো তবে কার
ভালোবাসায় দগ্ধ দীর্ণ নিহত সুন্দর?
সর্বত্র তুহিন-ক্লান্তি। একদিন স্পর্শ করে মুখশ্রী তোমার
যে স্নিগ্ধ বসন্তে আমি দেখেছি নির্ঝর...
দেখেছি দিনান্তে সব মুগ্ধতায় নিযুক্ত কুমারী
অপরূপ উন্মোচিত...সেই সব তন্বী শ্যামা শিখরদর্শিনী
কোনখানে অন্তর্হিত? কতদূরে ফিরে গেছে তারা?
না-কি সব রূপময় হরিৎ অরণ্যে
মৃদঙ্গ ঝঙ্কারে তোলে বিহ্বল প্রেরণা? হায়-রে জীবনে
ক্রমাগত নিভে যায় কাঙ্ক্ষিত প্রণয়? স্মৃতির আকাশ
কেবল সুদীর্ঘ হয় শৈশবে যৌবনে কিংবা বার্ধক্যে, প্রয়াণে।

কি পেলাম হে আনন্দ সর্বস্ব ছড়িয়ে? অনেক উচ্চাশা
শুধু আজ শব্দহীন, গতিহীন অন্ধকার জটিল বিবরে।
কে রাখে হিসেব তার। যতদূর প্রতিভাত তাই
সূর্যাস্তের প্রতিধ্বনি। দুর্গম আঁধারে
নিমজ্জিত দেখ আজ প্রত্যাশার সমস্ত প্রেরণা।
এ কোন দিগন্তে তবে নির্বাসিত? এ কোন তিমিরে
সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ক্ষত চিহ্নিত আমার?
সব প্রেম নির্বাপিত এ কোন পৃথিবী? এ কি পরিণাম...
এতো দীর্ঘ পরিশ্রমে বলো আজ অন্ধকারে কোথায় এলাম?

দ্বিতীয় সংসার

অনেক দিনের অভ্যেস। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি বেলা চারটে নাগাদ, ট্রামে উঠে সোজা চৌরঙ্গীতে চলে যাই। কখনো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে যাই, পার্ক স্ট্রীট ছাড়িয়ে। কখনো মাঠে ঢুকে সোজা হাঁটতে থাকি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে। যেদিন যেমন ভাল লাগে। কোনদিন বা মানুষ ভাল লাগে, ভিড় ভাল লাগে, বড় বড় দোকানের নানা সামগ্রীর বাহার দেখতে ভাল লাগে, কোনদিন বা মানুষের ভিড় একেবারে ভাল লাগে না। ফাঁকা মাঠের বাতাস, মাথার ওপর মস্ত আকাশ, নির্জন স্তব্ধতায় মনটা বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে।

সেদিন বাড়িতে অভ্যাগতদের ভিড়ে, নানা কথায় নানা আলোচনায় মনটা বিক্ষিপ্ত বিমর্ষ হয়েছিল, তাই মাঠের দিকেই গিয়েছিলাম। রোদটা পড়ন্ত, একটু যেন ঘাম হচ্ছিল। ধীরে ধীরে মাঠের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পার্ক স্ট্রীটের দিকে হাঁটছিলাম।

এসপ্লানেডের কাছাকাছি যতটা ভিড় থাকে, এদিকের ভিড় তার চেয়ে অনেক কম। বিশেষ করে মাঠের ভেতরের দিকটায় সাধারণ পদযাত্রীদের মিছিল নেই বললেই চলে।

সূর্য তখন ডোবেনি, ফোর্টের পেছনে চোখের আড়াল হয়নি। রোদের তেজটা একটু কড়া মনে হলেও বাতাস ছিল। মাঝে মাঝে যেতে যেতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের দিকে চোখ রেখে হাওয়া খাবার সুযোগ ছিল।

খুব আস্তে হাঁটছিলাম। যেতে যেতে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিলাম। কিছু একটা দেখলে এবং ভাল লাগলে একটু সময় দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। এভাবে হাঁটতে বেশ লাগে। এ যেন নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে হাঁটা। যারা স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্য হাঁটে, তাদের হাঁটা একরকম, যারা কোথাও পৌঁছোবার জন্যে, তাদের হাঁটা আর একরকম। তাতে বেড়াবার স্বাদটা পুরো পাওয়া যায় না।

অপ্রয়োজনে অকারণে পথচলা—এ-চলার স্বাদ আলাদা। একটা স্নিগ্ধ আরামে মনটা ভরে ওঠে।

কাছাকাছি একটা গাছতলা থেকে একটা শিশুর চিৎকার কানে এল—ড্যাডি, ড্যাডি।

কোন সায়েবের বাচ্চা নাকি? ফরসা ধবধবে সায়েবের বাচ্চাদের দেখতে বেশ ভাল লাগে। রেশমের মত একমাথা চুল নিয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে, কিচির-মিচির করে কথা বলে। দেখতে বেশ ভাল লাগে। ফিরে তাকালাম।

না, কোন সায়েবের বাচ্চা নয়। একটা তামাটে রঙের ধুলোবালি মাখা নেংটি-পরা ছেলে—বছর চার-পাঁচ বয়স হবে, ছেলেটা দু' হাত তুলে প্রায় নৃত্য করছে, আর চিৎকার করছে—ড্যাডি, ড্যাডি! ওর পাশে গাছতলায় একটা ময়লা শাড়ি পরে পাদুটো ছড়িয়ে বসে রয়েছে একটা কালো মেয়েমানুষ। পাশে একটা পোঁটলা, গোটাকতক খবরের কাগজ, তার ওপর টিনের কৌটো-দুটো, এনামেলের একটা মগ, দুটো বাটি, তিন-চারখানা ইট, একখানা পুরোন ছেঁড়া চট পাতা।

ভিখিরী নিশ্চয়। এখানে-সেখানে এ-ধরনের ভিখিরী মেয়েমানুষ দুটো-চারটে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসে থাকে। অফিসের ছুটির মুখে রাস্তার ধারে গিয়ে ভিক্ষে করে।

তা না হয় হোল। কিন্তু ছেলেটার 'বাবা' ডাক না শুনে ইংরেজী শব্দ 'ড্যাডি' শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ-ধরনের ভিখিরী ছেলের মুখে তো ইংরেজী শোনা যায় না?

সাধারণত এসব ছেলের মুখে বাবা ডাক বড় একটা শোনাই যায় না। এসব ছেলেরা মাকেই চেনে। বাপকে চেনে না। মা-ও চিনিয়ে দিতে পারে না কে তার বাবা।

ছেলেটা চেঁচাচ্ছে—ড্যাডি, ড্যাডি!

ছেলেটার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। কিছুদূরে নজরে পড়ল একটা লোক হনহন করে এগিয়ে আসছে। পরনে ট্রাউজার, ছাই-রঙের একটা হাফ-সার্ট। গায়ের রং ঝকঝকে তামার মত। চুলগুলো কালচে, মাথায় একটা শোলার হ্যাট। হাতে একটা কাগজের প্যাকেট।

লোকটা মধ্যবয়সী, রোগা, গাল তোবড়ান, কিন্তু তার হাঁটার ধরনে মনে হয়, দুর্বল নয়, বেশ জোরালো ভাবভঙ্গী।

দেখে বুঝতে একটুও দেরী হয় না যে, লোকটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। পার্ক স্ট্রীট বা ওয়েলেসলী অঞ্চলে এদের হামেশা দেখা যায়।

লোকটি এগিয়ে আসছে। কপালের আর নাকের পাশের রেখাগুলো স্পষ্ট। মুখখানায় ধাতব কাঠিন্যটা স্পষ্ট। ঘামে ভেজা। মাথার পিঙ্গল রঙের চুল পাতলা দেখা গেল, যখন লোকটা হ্যাটটা খুলে বাঁ হাতে করে এগোতে লাগল।

চোখেমুখে একটা খুশীর দীপ্তি উপচে পড়ছে।

লোকটার নজর ছিল সোজা মেয়েটার দিকে আর বাচ্চাটার দিকে। আমাকে লক্ষ্যই করল না।

আমি মস্ত পুকুরের একটু দূরে বসে পড়লাম। খুব একটা কৌতুক আর কৌতূ-

হজ অনুভব করছিলাম, তাছাড়া দেখতে ভালও লাগছিল।

মেয়েটার দেহখানি বেশ মজবুত। হাত-পাগুলো মাংসল ভারী। মুখখানা গোল-গোল। চোখদুটি ছোট। মৃদু মৃদু হাসিতে মেয়েটার মুখখানা ভরে উঠেছিল।

লোকটা এগিয়ে এসে এবার চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের দিকে মুখ ফেরালাম। আমি যে ওদের লক্ষ্য করছি এটা বুঝতে পারলে হয়তো ওদের খুশীর আলো একটা সংকোচের ছায়ায় ঢাকা পড়বে।

একটু সময় পরে আবার চোখ ফেরালাম।

লোকটা উবু হয়ে বসে ছেলেটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছে। দু' আঙুলে গালদুটো টিপে ওর হাতে কি একটা খাবার দিল। লজেন্স বিস্কুট নয়—একখণ্ড মাংস-টাংস হতে পারে।

ছেলেটা লোকটার বুক ঘেঁসে দাঁড়াল।

লোকটা এবার মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করছে। মেয়েটা হাসছে। ছড়ান পাদুটো তুলে উবু হয়ে বসেছে।

কাগজের মোড়কটা মেয়েটার হাতে দিয়ে লোকটা হাসল। কি যেন বলল। কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি বেশ খানিকটা দূরে ওদের কাছ থেকে উত্তর দিকে কিছুটা পিছিয়ে ছিলাম। বাতাস দক্ষিণ থেকে উত্তর-পূবের দিকে বইছিল—তাই কথাগুলোও কানে যাচ্ছিল না।

মেয়েটা চটটা ভাল করে বিছিয়ে দিয়ে বোধহয় বসতে বলল।

লোকটা কিন্তু বসল না। হেসে কি একটা বলল।

মেয়েটা নিজে চটের ওপর আধশোয়া হয়ে মাথায় বাঁ-হাতটা রাখল। মেয়েটার কাপড় নোংরা, পরিচ্ছন্নতার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই, তবু দেহের যৌবন সুদৃঢ়, অনেক সাজাগোজা রং-চং মাখা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিকভাবে স্ফুরিত।

কাত হয়ে আধশোয়া হয়ে রয়েছে বুক আর নিতম্বের স্ফীতির কাছে কোমরটা অনেক নীচু মনে হচ্ছে, যেন একটা ঢেউ কোমরের কাছে থেমে আবার নিতম্বদেশে উত্তাল হয়ে স্ফীত মাংসল জঙ্ঘা বয়ে পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছে।

সায়েব উবু হয়ে ওর কাছাকাছি এগুলে।

আমি এবারে চোখটা ফেরাব কিনা ভাবছিলাম, এদের বিশ্বাস নেই, কি করতে কি করে বসবে।

না, তেমন কিছু নয়।

একটু এগিয়ে মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে মাথাটা নেড়ে দিয়ে সায়েব উঠল।

ছেলেটা সায়েবের দিকে তাকিয়ে সরু ক্যানকেনে গলায় বলে উঠল,—বাই, বাই, ড্যাডি, বাই-বাই।

লোকটা হাসতে হাসতে ওদের দিকে পেছন ফিরে এগোতে লাগল রাস্তার দিকে।

ছেলেটার চিৎকার তখনো শোনা যাচ্ছে।

সায়েব মাঠ পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল।

চোখ ফেরালাম। এদিকে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটা ততক্ষণে উঠে বসেছে। উবু হয়ে বসে কাগজের মোড়কটা খুলছে।

আস্তে আস্তে উঠলাম। একটু একটু করে কাছে এগোলাম।

ভারী অদ্ভুত লাগছিল ব্যাপারটা। এ-মেয়েটা, রাস্তার ভিখিরী? তা যদি তবে সায়েবটি কে? ছেলেটা অমন চিৎ করে সায়েবটাকে ড্যাডি বলে ডাকল বে তবে কি ওই সায়েবটারই ছেলে? মে কি সায়েবের স্ত্রী? না কি রাস্তার যৌ বতী ভিখারিণীর সম্পর্কে ছেলেটার জ তা যদি হয়, তবে সায়েবের তো ফুর্তি সরে পড়বার কথা। এমন তো কতই কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে এ-ধর রাস্তার মেয়েদের উপভোগ করে রা ফেলে দেয়। তার জন্যে আবার এতটা হেঁটে কে আসে দেখা করতে?

কাগজের মোড়কটা খুলে তা রয়েছে মেয়েটা। চোখে ক্ষুধার্ত লোভ।

কাগজের ভেতরে গোটাকতক প রুটির খণ্ড, আর বড় বড় শুকনো মা খণ্ড কয়েকখানা। মেয়েটা এবারে পা বসে। ছেলেটাকে পাশে বসায়। ওর হ একখানা পাঁউরুটি আর একখণ্ড মাংস ছেলেটা খেতে খেতে উঠতে চায়। বো বেড়িয়ে নেচে খাবার মতলব। মেয়েটা হাত চেপে জোর করে বসায়। কি এ ধমক দেয়।

নিজে একখানা পাঁউরুটি কামড়ে এ মস্ত হাড়ের টুকরো হাতে নেয়।

বড়ই অবাক কাণ্ড! মেয়েটার স অবৈধ সংসর্গেই যদি ছেলেটা জন্মে থা তবে কষ্ট করে এতটা পথ হেঁটে খা দিয়ে যায় কে? এ-ধরনের একটা ঘটনা থাকলে সায়েবের তো ওকে দেখে পাল কথা। এদিক মাড়াবার কথাও নয়।

হতে পারে হয়তো নিজের ছেলের ও মায়াটা ছাড়তে পারেনি সায়েব বেচ নয়তো মেয়েটাকে আরও কিছুকাল উপভে করতে চায়। আর দু'-একটা ছেলেমেয়ে হ পর পালাবে।

তাই বা কি করে হয়?

স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, লোকটার চে মুখে যেন খুশী উপছে পড়ছে। খাবার দি চলে যাবার সময় হাসি হাসি মুখে অপরিসীম তৃপ্তি, অমন কঠিন তাম মুখখানা নরম হয়ে উঠেছিল। পিঙ্গ চোখে হাসি-খুশীর নিশ্চিন্ততা ল করেছিলাম।

তবে কি ভালবাসা! এ এক প্রেম!

তাই যদি হবে, তবে মেয়েটাকে একটা ঘর ভাড়া করেও রাখতে পারত. বি করতে পারত। এভাবে রাস্তায় মাঠে প থাকে কেন?

ছেলেটার উল্লাস দেখে বোঝা যা সায়েবটা রোজই আসে। হয়তো বা ঠিক এ সময়ই আসে। রোজই হয়তো ওকে দে ছেলেটা ড্যাডি-ড্যাডি করে নাচে। রোজ খাবার দিয়ে যায়।

বাবা যখন বলছে, তখন ছেলেটা ওর ছেলে। একটা ভিখিরী মেয়ের সর্বনাশ ক লোকটা আবার যখন যাতায়াত করছে, তখ আরও কিছু সর্বনাশ করবার মতলব আছে

এখনো মেয়েটার যৌবন নিঃশেষ হ যায়নি, বয়েস মোটেই বেশী নয়। লোকটা আরও বেশী কিছু মতলব আছে বোধহয়
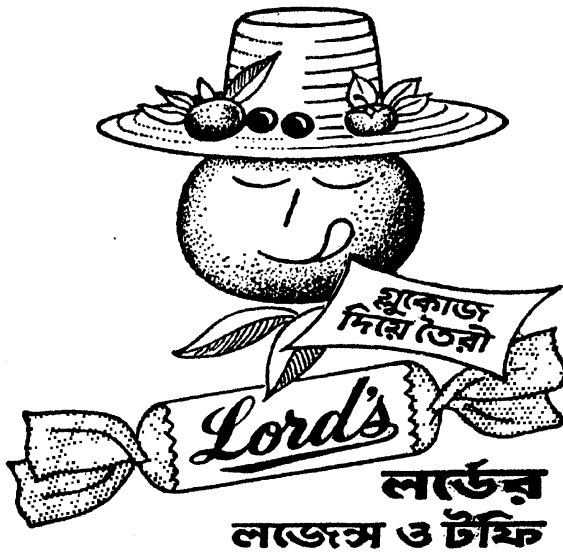
মেয়েটা রাত্রে কোথায় থাকে, কে জানে। শহরের রাস্তায় মধ্যরাত্রে পথচারীর অভাব নেই। মুখে কাপড় চেপে ধরে শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার মত জীবের অভাব নেই।

কোন্ সাহসে এই মাঠে রাত্রে পড়ে থাকে মেয়েটা! না কি সায়েবটা রাত্রে মদ গিলে ওর কাছে আসে? এই মাঠে—নির্জন রাতে ওদের কারো মনে কি একটুও ভয় জাগে না?

কি অবাক শহর এই কলকাতা!

ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছিলাম।

মেয়েটা তখন মাংসের মোটা একটা হাড় কামড়ে ভাঙবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, আবার এক-একবার চুষে হাড়ের ভেতরের শাঁসটা টেনে মুখে নেবার চেষ্টা করছে। কোনটাই হচ্ছে না।

ঠোঁটের কস্ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। জিবটা তালুতে ঠেকিয়ে চুঁ-স্-স্ করে একটা শব্দ করে লালাটা চুষে নিচ্ছে।

ছেলেটা মাংস চিবুচ্ছে। চিবুচ্ছে তো চিবুচ্ছে। চিবিয়ে মোলায়েম করতে পারছে না। মাংসটা যে পাঁঠার নয় এতে কোন সন্দেহ নেই।

আরও এগিয়ে এলাম। মেয়েটার সংগে দু-চারটে কথা বললে কেমন হয়। মেরে তো আর ফেলবে না। বড়জোর বলবে, তোমার এত খোঁজে কি দরকার?

সত্যিই তো দরকার কিছুই নেই। এমন কত কান্ডই তো কত জায়গায় হচ্ছে। কেই বা খোঁজ রাখে, কেই বা জানে! সংসারে জন্ম-মৃত্যু কাম-কার্যের ভেতরেও যে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে, কেই বা তার হিসেব রাখে। দেখবার সময় নেই। নিজেকে নিয়ে আমরা বড় ব্যস্ত। কে কি করল, না করল, চুলোয় যাক। আমার দেখবার কি দরকার, জানবার কি দরকার? নিজের বোঝা নিয়েই নাভিশ্বাস উঠছে, পরের খবরে কি কাজ?

কৌতূহলটা এক-একজনের বেশী। পরের খবরে মজা বেশী পায়।

আমিও কিছুটা মজা পাবার লোভেই এগিয়ে গেলাম।

এগিয়ে মেয়েটার সামনে উবু হয়ে বসতেই মেয়েটা তাকাল। ছেলেটার চোখ বড় বড় হোল। আমাকে দেখে যেন কিছুটা সন্দেহ করছে, একটু বা ভয় পেয়েছে।

মেয়েটা হাড়টা নিয়ে তখনো চিবোবার চেষ্টা করছিল। আমার দিকে একটু সময় তাকিয়ে হঠাৎ হাতের মোটা হাড়টা তুলে বলে উঠল,—ভাগ্ হিয়াসে। এখানে কি চাই?

হাড়টা ছুড়ে মারবে নাকি, উঠতে গিয়ে কাৎ হয়ে পড়লাম।

মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠল। বাচ্চটাও মায়ের দেখাদেখি হাসল।

আমিও হাসবার চেষ্টা করলাম।

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললাম,—ড্যাডি কোথায় গেল?

ছেলেটা আমার মুখে ড্যাডি শুনে অবাক হয়ে তাকাল। মেয়েটা অবাক হোল না। বোধহয় বুঝতে পারল আমি সব দেখেছি।

হাড়টা চুষতে লাগল।

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আবার বললাম,—ড্যাডি চলে গেল?

মেয়েটা আবার চু-স্-স্ শব্দ করে মুখের ভেতরে জিভ দিয়ে লালা টেনে নিয়ে বললে—ঘরে চলে গেছে।

মনে কি একটুও ভয় জাগে না?

বেশ ভালভাবেই কথাটা বলল।

আমি একটু প্রশ্রয় পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম—তুই গেলি না কেন?

আমি? আমি কেন যাব? ও শালা আমার কে?

কথাটা শুনতে বিশ্রী লাগল। হাজার হোক ওই লোকটারই তো ছেলে, তার সম্বন্ধে এমন ভাষা প্রয়োগ করাটা বড় বিশ্রী। শোনায়।

বললাম—কেন, তোর আদমী।

ভাগ, আমার আদমী হতে যাবে কেন? ঘরে ওর নোতুন বৌ মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে।

—কার নোতুন বৌ?

—ওই যে হারামী এসেছিল, অরই।

একটু কেমন কেমন ঠেকল কথাটা। বললাম,—এ-ছেলে তো তোর?

হেসে ফেলল মেয়েটা, আমার কেন হবে? ধুস্!

যেন আমি একটা নীরেট বোকা—এমনিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাড়টা কসের দাঁতে বেশ জোরে চাপল। এবারে হাড়টা মড় মড় করে উঠল।

ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে ঠেকল।

বললাম—তবে এ-ছেলেটা কার?

—ইস্‌মিথ সায়েবের।

স্মিথ সায়েবের ছেলে অথচ ওর ছেলে নয়। এ কেমন কথা হোল। মেয়েটার মাথার গোলমাল নেই তো? আর একটু এগিয়ে এলাম।

—তবে তোর কাছে কেন, বাচ্চাটা?

—কার কাছে থাকবে? ওর মা নেই। ইস্‌মিথ সায়েবের নোতুন বৌ—তিলে খচ্চর। ছেলেটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

ছেলেটা তাহলে স্মিথ সায়েবের প্রথম পক্ষের ছেলে! দ্বিতীয় পক্ষ বৌটা এ প্রথম পক্ষের ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাই কি স্মিথ ছেলেটাকে এই ভিখি মেয়েটার জিম্মায় রেখেছে?

মেয়েটা হাসছিল,—এ-বৌটার ভা দেমাক! চামড়াটা শাদা, বলে কালো ছে এ-ঘরে চলবে না। ওর আগের বৌটা ছি খুব কালো। আমি সব দেখেছি।

বললাম—তুই কি করে দেখলি?

—আমি যে ওদের বাড়ির সামনে গ্যারেজের ধারে চার বছর ছিলুম। আম মা ছিল, মা মরে গেল। একটা ছোট ভ ছিল—হাওয়া কাটল। ভগমান এই ছোঁড়াটা কাছে দিলে। একদিন সন্ধ্যেবেলা ইস্‌মি এর নোতুন বৌটা মারতে মারতে বার ক দিলে ছেলেটাকে। ছেলেটা ফুটপা দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। কাছে নিয়ে এলু ইস্‌মিথ ব্যাটা ভেড়ুয়া—একটা কথা বল পারলে না!

হাড়টা ভেঙে ভেতরের শাঁসটা খে হাড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বাঁ হাতের উল্টোদিকে মুখটা মু একখণ্ড পাউরুটি চিবোতে চিবোতে বললে মেরে দেবে। জানে খতম করে, আর বে দিন নেই।

—কে মেরে দেবে?

—ইস্‌মিথ। ওই বৌ-টাকে। গ টিপবে, না, বিষ খাওয়াবে কে জানে!

ছেলেটার হাতে এক টুকরো পাউরু দিয়ে পরম তৃপ্তিতে আর একখণ্ড মা নিয়ে চিবোতে শুরু করল।—তাপর ঘরে আমাকে নিয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, আমার পিতিজ্ঞে, ঘরে না নিয়ে গেলে ওকে আ ছোঁব না। ফোকটে মজা লুটতে দোব ন আমার একটা ইজ্জত আছে।

মাঝে মাঝে বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে ক বলছিল।

বললাম—তা তো বটেই।

—ডেরিক সায়েব কত ফুসলেছি আমার মাকে। পেরেছে কিছু করতে আমরা অত ফ্যালনা নই। সায়েবপাড় ভিখিরীদের ইজ্জতটা বেশ উঁচু করে তু ধরল মেয়েটা।

মাংসের খণ্ড এতক্ষণে গিলে ফেলেছে আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললে যা ভাগ্! যা নিজের ধান্ধায় যা।

তেড়ে আসতেই উঠে পড়লাম।

ভেবেছিলাম, গোটাকতক পয়সা দি আসব মেয়েটাকে, তা যেরকম ইজ্জ দেখলাম, তাতে পয়সা দিতে আর ভরস হোল না।

হাঁটতে হাঁটতে আবার এস্‌প্লানেডে দিকে ফিরে চললাম।

একটি আজব সংসার দর্শন হোল আজ

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

ছোটদের বই

কোনো কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুজোর সময় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন 'পুজোর চাই নতুন জুতো'—অবশ্য এই নতুন জুতোর প্রয়োজন এই কালে যাদের সর্বাধিক তারা হল ছোট ছেলেমেয়েদের দল, তাদের মনোরঞ্জনে আরও একটি জিনিষ পুজোর সময় চাই সেটি হল চকচকে মলাটের ঝকঝকে ছাপা কিছু মনভোলানো চোখধাঁধানো বই। য়ুরোপেও এই ব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে খ্রিসমাসের অজস্র উপহারের মধ্যে 'চিলড্রেনস বুক' উপহারের একটি উল্লেখযোগ্য অংগ। আমাদের বাংলাদেশে এই ব্যবস্থা যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। একজন প্রকাশক এই সময় বার্ষিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, কেউ বা ছোটদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক, বা এডভেঞ্চারমূলক কাহিনীও এই সময় প্রকাশ করেন, কিন্তু সে সবই কিশোর-কিশোরীদের জন্য। তাদের চেয়ে যারা ছোট তাদের কথা সবাই যেন ভুলতে বসেছে।

আমাদের বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য যেন কিশোর সাহিত্যে পরিণত, একেবারে ডবল প্রমোশন দিয়ে তাদের তাই পড়তে হয় রীতিমত গল্প উপন্যাস ইত্যাদি। কিন্তু ছেলেভুলানো রচনার যেন দিন আর নেই। যদি এই শিশুর কিঞ্চিৎ ইংরজী জ্ঞান থাকে, তা হলে অবশ্য অসুবিধা নেই, ইংরাজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রচুর পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় সোভিয়েট রাশিয়া থেকে প্রকাশিত অনেক রঙচঙে ছবিওলা সুন্দর সুন্দর গল্পের বই, তার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের গল্পও আছে।

রবীন্দ্রনাথ একদা যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন :

"ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা মাসিরা তাদের খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্ট গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে।

ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে—আমাদের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। ছেলেরা আজ বলবে, গল্প বলো—কিন্তু তাদের মধ্যে গল্প নেই।"...

গল্পের মধ্যে গল্প বিতরণের শক্তি যাদের ছিল তাঁরা আর এ যুগে উপস্থিত নেই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, সুকুমার রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কুলদারঞ্জন রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিরা আজ আমাদের মধ্যে নেই একথা সত্য, কিন্তু তাঁদের অক্ষয় কীর্তিগুলি সুলভ মূল্যে ছাপিয়ে বিতরণ করার ভার কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নেওয়া উচিত, পঃ বঙ্গীয় সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো, এই সব ব্যাপারে তাঁদের যে কোনো দায়িত্ব আছে সে কথা বুঝিয়ে দেওয়ার মত মানুষদেরও অভাব আছে। ছেলে-মেয়েরাই দেশের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বাঁধা বুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

যে সব ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা বাংলা আগেকার কালে তাদের মা-ঠাকুমারা রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনাতেন, রাম-লক্ষ্মণের বনে গমন, কিংবা দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপানের কাহিনী ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে শুনত, এই কাহিনী বার বার আবৃত্তি করতে হত। এখন আর রামায়ণ-মহাভারত কেউ জানে না।

উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'টুনটুনির বই' গ্রন্থটির নিবেদন অংশে ১৩১৭ সালে লিখেছিলেন :

"সন্ধ্যার সময় শিশুরা যেন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহ-রূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।" ইত্যাদি

উপেন্দ্রকিশোরের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের

"এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো—
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো—"

যে শিশু বাল্যকালে পড়েছে সে কি কোনো দিন ভুলবে?

বাংলাদেশে শিশু সাহিত্যের জন্য বেসরকারি প্রচেষ্টা অনেক হয়েছে, 'সন্দেশ', 'মৌচাক', শিশু সাথী, রংমশাল, শুকতারা, রোশনাই, ঝিকিমিকি, জয়রথ প্রভৃতি অনেকগুলি ছোটদের মাসিকপত্র আজো প্রকাশিত হয় সুসম্পাদিত হয়ে। অনেক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান শিশু ও কিশোর ভুলানো গল্প উপন্যাস বা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।

ভারত সরকার 'চিলড্রেনস বুক ট্রাস্ট' স্থাপন করেছেন। সম্প্রতি তাঁরা কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই প্রকাশ করেছেন। শঙ্করস উইকলীর 'শঙ্কর' লিখিত ও চিত্রিত 'সুজাতা অ্যান্ড দি ওয়াইলড এলিফ্যান্ট', 'লাইফ উইথ গ্রান্ড ফাদার', পুলক বিশ্বাস বিচিত্রিত 'টেলস ফ্রম ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকস', 'স্টোরীস ফ্রম পঞ্চতন্ত্র' রেবতীভূষণ বিচিত্রিত 'দি ক্লেভার কাফ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ও অলংকরণে বেশ আকর্ষণমূলক হয়েছে, এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য।

ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অনেক আগে থেকেই সুরু করা যায় এ কথা ভারতীয় অভিভাবকদের চিন্তা করা উচিত, শুধুমাত্র বস্তুগত যুক্তিতেও এই উক্তি সত্য। যে প্রাক-বিদ্যালয় শিশুকে কোনো কিছু পড়ে শোনানো হয়, তার মত মনোযোগী সহানুভূতিশীল শ্রোতা আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সহজবোধ্য সরল ভাষা আর সুন্দর ছবি। এই কারণে, লেখক, শিল্পী ও প্রকাশক এই তিনজনকেই একমনে একযোগে কাজ করতে হয়।

প্রকাশক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনেক কিছু আছে, আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শ্রেণী বাঁধা প্রকাশক গড়ে ওঠেনি, 'সিটি বুক সোসাইটি' বা 'সন্দেশ কার্যালয়' এককালে শুধু ছেলেদের বই প্রকাশ করতেন। আশুতোষ লাইব্রেরী ও ভট্টাচার্য এ্যান্ড সন্স (খোকাখুকুর প্রকাশক) নামক প্রতিষ্ঠান দুটিও ছোটদের জন্যই সমস্ত বই প্রকাশ করতেন। এখন যিনি যৌন-জীবনের প্রকাশক, যিনি খুন, গুমখুন, রাহাজানি, কিংবা রহস্যঘন উপন্যাসের জমজমাট প্রকাশক তিনিও কালেভদ্রে এক আধখানি ছোটদের বই প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু এইভাবে গ্রন্থ প্রকাশের ফলে সেই সব বই তেমন আশানুরূপ বিক্রী হয় না। আমাদের দেশে নতুন বই-এর বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি আজো সেই সনাতন, অর্থাৎ অন্ততঃ দুইশতখানি গ্রন্থ ও তার লেখকের নামের তালিকা। এই বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন 'সিগনেট প্রেস' কিন্তু তাঁদের অনুকরণে কেউ তেমন উৎসাহ বোধ করেননি। এই প্রসংগে উল্লেখ করা উচিত যে সিগনেট প্রেসও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীর নতুন সংস্করণ করেছিলেন, বিশেষত অবনীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের গ্রন্থাবলীর।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রকাশক মহলে এক বিশেষ ধরনের প্রকাশক আছেন যাঁরা সারা বছর ধরে ছোটদের বই প্রকাশ করে থাকেন। অনেক ক্লাসিকের সঙ্গে আধুনিক লেখকের রচনাও শোভা পায়।

বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাধর সাহিত্যিকের অভাব নেই, আজ যাঁরা খ্যাতনাম তাঁদের অনেকেই ছোটদের জন্য লিখেছেন অনেক অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ছড়ার বই

ছড়িয়ে আছে, অতি অল্পসংখ্যক পাঠক সেই সব গ্রন্থের নাম জানেন।

শিশুসাহিত্য কোনো মতেই বেঁচে থাকতে পারে না যদি না বয়স্করা শিশুদের উপস্থিতি বিষয়ে সচেতন হন। শিশুদের বয়স্ক ভ্রূণ বলে মনে করা উচিত নয়, একথা কজন স্মরণে রাখেন। ছোটরা যে ক্রমবর্ধনশীল প্রাণী, তাদের মন যে সদাই সচেতন, নতুন কিছুর জন্য সর্বদাই উৎসুক, একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতা শিশুদের বিষয় তেমন মনোযোগ দেননি, তাঁরা জানতেন শিশুরা শিশুই তাদের বয়স্ক করে তুলতে হবে। সেইভাবে শিক্ষা দিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিসেস সেরউড লিখলেন, "হিসট্রি অব দি ফেয়ার চাইল্ড ফ্যামিলী" তার উদ্দেশ্য ছিল—

'to strike the fear of hell fire into every child's soul'.

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এলেন লুই ক্যারল লুই স্টিভেনসন, আর 'টম ব্রাউনস্ স্কুল' থেকে "স্টলকি" প্রভৃতি প্রকাশিত বর্তমানকালে ... অল্পবয়স্কদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এডভেঞ্চার ব... লিখিত হচ্ছে, কিন্তু আমরা এই বাংলা... অনেক পিছিয়ে পড়েছি। "পুজোয় চাই... দের বই" এই শ্লোগান আগামী বছর... পেলে আমরা আনন্দবোধ করব।

—অ...

ভারতীয় সাহিত্য

একটি তামিল-ইংরেজি সাহিত্য পত্রিকা ॥

মাদ্রাজ থেকে একটি দ্বি-ভাষিক তামিল-ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই পত্রিকাটির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশ্রী পনারিমলাই স্বামীগল, পি কে সুন্দরন, প্রমথের রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা করেন শ্রীপি কে সুন্দরন।

কেরলের কবির জন্মদিন ॥

আধুনিক মালয়ালম সাহিত্যে শ্রীপি কুন্হিরমন নায়ার একটি পরিচিত নাম। আগামী ২২ অক্টোবর তাঁর ষাট বৎসর পূর্তি হবে। এই উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য একটা ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

শ্রীকুন্হিরমনের জন্ম হয় ১৯০৬ সালে। উত্তর মালাবারের থানানগাদে। মালাবার মালয়ালম সাহিত্যের অন্যতম কবিতীর্থ। প্রখ্যাত কবি ঔপন্যাসিক শ্রীকে এম পানিক্করের জন্মও ওই জেলায়। শ্রীকুন্হিরমন সংস্কৃত সাহিত্যেও একজন সুপণ্ডিত। জীবনের প্রথমে পটাম্বি এবং তানজোরে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরবর্তী কর্মজীবনে সম্পাদনার কাজে তিনি বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থাতে কাজ করেন। কিন্তু এসব তাঁর ভাল লাগেনি। তাই অবশেষে তিনি শিক্ষকতা বৃত্তি আরম্ভ করেন। প্রথমে কুদালি হাইস্কুলে তিনি চাকুরী নেন। বর্তমানে পালঘাটের 'রাজা হাইস্কুলে' শিক্ষকতা করছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর। দিল্লীতে ভারতীয় কবি সম্মেলনেও মালয়ালি ভাষার কবি হিসেবে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কেরল সাহিত্য আকাদমীরও তিনি একজন সদস্য। 'সারা কেরল সাহিত্য পরিষদ' তাঁকে 'ভক্তকবি' সম্মানে ভূষিত করেছেন।

একটি নতুন কানাড়ি নাটক ॥

তরুণ লেখক টি বিশ্বমন্ত রাও-এর একটি নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি কানাড়ি সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলে অনেকে মনে করেন। গ্রন্থটির নাম 'বহুবালিয় সান্নিধিয়ালি অথবা বীরা বক্কুদ'। টুলু লোককথার একটি কাহিনীকে নিয়ে নাটকটি রচিত। দাক্ষিণাত্যের তিনটি মন্দির তৈরী করতে গিয়ে রাজার সঙ্গে একজন দরিদ্র গ্রামবাসীর বিরোধের কাহিনী গ্রন্থটির কথাবস্তু। নাট্যকার কোন ঐতিহাসিক মতামতকে গ্রাহ্য করেননি। আসলে শিল্পের জন্য আত্মত্যাগের কথা বলাই ছিল তাঁর প্রধান অভিপ্রায়।

পরলোকে তরুণ কবি অনাময় দত্ত ॥

মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তরুণ কবি অনাময় দত্তের মৃত্যু সংবাদে সকলেই মর্মাহত হবেন। এত অল্প বয়সে এমন একটি সম্ভাবনাময় কবিজীবনের পরিসমাপ্তি খুবই দুঃখজনক।

অনাময় দত্তের জন্ম ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৫। তিনি স্কুল ফাইনাল পাশ করেন ১৯৬০ সালে। ইতিহাসে স্নাতক প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৬৫... এই স্বল্প জীবনে খুব বেশি রচনা তাঁর সম্ভব হয়নি। কিন্তু যে স্বল্প... কবিতা তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত রক্ষিত আছে।

বই-এর জন্য ডাক খরচ ॥

গত জুন মাসে কেন্দ্রীয় ... মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীপি এন ... মাদ্রাজ সফরে গিয়েছিলেন। ... 'সাদার্ণ ল্যাংগুয়েজ বুক ট্রাস্টের' ... তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। ঐ ... সভায় শ্রীকিরপাল বলেন, ভারতীয় গ্র... পত্র-পত্রিকাকে উৎসাহদানের জ... পাঠাবার ডাকব্যয়ের কোন নির্দিষ্ট... প্রবর্তন করা যায় কিনা, তা তিনি দেখবেন।

বিদেশী সাহিত্য

ন্যাশনাল বুক কমিটির পুরস্কার ॥

নিউইয়র্কের ন্যাশনাল বুক কমিটি প্রতি বছরই সাহিত্যের জন্য একটি করে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এবার কমিটির এই পুরস্কার 'ন্যাশানাল মেডাল' পেয়েছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এডমান্ড উইলসন। নিউইয়র্কের ট্যাল্‌কট্‌ভিলে তাঁর পৈত্রিক ভিটায় ৭১ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এডমান্ড উইলসন এই পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। তাঁর এই সাম্প্রতিক সম্মানলাভ নিঃসন্দেহেই তাঁকে বর্তমান আমেরিকার সাহিত্যজগতে অদ্বিতীয় প্রমাণ করবে।

ন্যাশানাল বুক্ কমিটির পুরস্কারের এই বিশাল অঙ্ক ৫০০০ ডলার তাঁকে দেওয়া হয় বিশেষত তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যসাধনার প্রতি সম্মান হিসেবে। গত বছরে বেরিয়েছিল তাঁর সেই অসামান্য

এডমন্ড উইলসন

তেতলপাড়করা রচনাগ্রন্থাবলী "লিটারারি ক্রনিকল্"। সম্প্রতি নিউ... প্রকাশনা সংস্থা তাঁর 'নোটস্ ফ্রম... য়োপিয়ান ডায়েরি—১৯৬৩-৬৪' ... খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ...

বহুপ্রত্ত 'জার্নাল' বা 'ডায়েরিধর্মী' ধারাবাহিক রচনাটি তিনি এখনো লিখে চলেছেন। আজ থেকে ৫৭ বছর আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার বহু আগে থেকেই তিনি তাঁর এই 'জার্নাল'টিতে হাত দিয়েছিলেন। নিজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'আমার সমস্ত বই লেখার উৎসই এই 'জার্নাল'। এর অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছিলাম এ্যামি নিল-এর ডায়েরী পাঠকালে। তাঁর সঙ্গে আমার আত্মিক সমস্যার একটি ভাবগত মিল ছিল।'

পরলোকে আঁদ্রে ব্রেতোঁ ॥

গত ২৮ সেপ্টেম্বর কবি ও শিল্পী আঁদ্রে ব্রেতোঁ প্যারিসের এক হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর দিনকয়েক আগে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে নিতান্তই আকস্মিকভাবে তিনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্যারিসে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে ভরতি করার পর তাঁর হৃদরোগ দেখা দেয়। পরদিন সকালের দিকে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

কবি ব্রেতোঁ ছিলেন সুররিয়ালিস্ট্ আন্দোলনের জনক। তাঁর আবির্ভাব ফ্রান্স শুধু না সমগ্র পৃথিবীর কাব্যজগতে এক বিস্ময়কর সন্ধিক্ষণ। বলা যায়, যখন কবিতায় চলছিল নৈরাশ্যের বিভীষিকা তখন একমাত্র ব্রেতোঁই এনেছিলেন প্রাণপ্রবাহের নতুন স্রোত। পুরোনো সমস্ত নীতিবোধের মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন সুররিয়ালিস্ট ভাবনাই কবিতার বর্তমান মুক্তিপথ। প্রথমে নানারকমের বাধার সম্মুখীন হলেও পরে দেখা গেল নতুন কবিরা, এমনকি অনেক গোঁড়া প্রতিষ্ঠিত কবিই, সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতে ব্রেতোঁ প্রবর্তিত পথেই কবিতার মুক্তিকে স্বীকার করেছিলেন। আজ একথা কেই বা না জানেন যে পৃথিবীর সবদেশের সাহিত্যেই সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে? ব্রেতোঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই আন্দোলনের প্রধান হোতাকে চিরকালের জন্য হারালাম।

ব্রেতোঁর কবিতার বই বেরিয়েছে মোটে তিনটি। এছাড়া তিনি একটি কাব্য-উপন্যাসও লিখেছিলেন। অনেকের মতে, ব্রেতোঁর কবিতাবলির চেয়ে তাঁর কাব্য-উপন্যাস 'নাদ্জা'ই অধিকতর বিখ্যাত। অবশ্য একথাও ঠিক যে আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য তিনি যেরকম কালাতিপাত করেছেন, কবিতা নিয়ে সেরকম মাথা ঘামাননি। তাই তাঁর কবিতায় সর্বজনমানসে রসসঞ্চারের একরকম অভাব অনুভব করা যায়। পরবর্তীকালে, ফ্রান্সের একজিস্টেন্সিয়ালিজম্ আন্দোলনের উদ্ভবের ফলে সুররিয়ালিজম্-এর আর কোনো প্রভাবই চিরস্থায়ী হতে পারলো না। ধীরে ধীরে তার প্রভাব হল অন্তর্হিত। সুররিয়ালিজম্ আন্দোলনের ইস্তাহারে অনেক বিখ্যাত কবিই সেদিন স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে, লুই আরাগ, দেলতেইল দেস্নো, এলুয়ার, নেভিল, সুপো, বরো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

জার্মানিতে বই ব্যবসা ॥

জার্মানিতে দিনে দিনেই বইয়ের ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকাশকরাও সংখ্যায় অগণ্য। জার্মানির প্রায় প্রতিটি শহরের অলিগলিতেই গজিয়ে উঠছে সারি সারি বইয়ের দোকান। মোটকথা, জার্মানি এখন পৃথিবীর সেরা সেরা বইব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

বর্তমানে ১,৭৫৮টি পুস্তক প্রকাশন সংস্থা রয়েছে জার্মানিতে। বইয়ের দোকান বর্তমানে সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে ৩,৪৩৫টিতে। সম্প্রতি জার্মানির 'জার্মান বুক ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন' তাঁদের একটি অতি-সাম্প্রতিক 'পুস্তক-ব্যবসা-নির্দেশিকা'য় এ তথ্যটি জানিয়েছেন। জার্মানিতে পুস্তক-ব্যবসা কোন্ পথে, কী কী বিশেষ ধরনের বই এখানকার প্রকাশকরা প্রকাশ করে থাকেন, তা থেকে জার্মান সাহিত্যের কি রকম প্রচারই বা হয়, লাভ-ই বা হয় কতো ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যাবে। যাঁরা প্রকাশক হিসেবে সবিশেষ পরিচিত ও অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কেবলমাত্র তাঁদের সম্পর্কেই এই নির্দেশিকা গ্রন্থটিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ও সুইজারল্যান্ডের জার্মানভাষী অঞ্চলগুলি ও তার চারপাশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাঁরাই এই 'অ্যাসোসিয়েশনে'র সদস্য তথা প্রকাশক বলে পরিচিত তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই প্রকাশনা-সংস্থার ইতিহাস, এর বার্ষিক আয়, সর্বমোট বিক্রয়, সঠিক অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য নানা বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সঠিক অবস্থান সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আছে তা থেকে জানা গেছে জার্মানির ১,৭৫৮জন প্রকাশক মোট ৪৪০টি শহরে ইতস্তত ছড়িয়ে আছেন, এঁদের মধ্যে আবার দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছেন ছয়টি বড়-বড় শহরে। মিউনিখে প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে ৩০০টি, পশ্চিম বার্লিনে ২১২টি, হামবুর্গে ২১৬, স্টাটগার্ট শহরের সংখ্যা ১৯৮, ফ্রাঙ্কফুর্টে ১২৮টি এবং কোলোনে ১০০টি।

শহর ও গ্রামাঞ্চল মিলিয়ে জার্মানির সর্বত্র যত বইয়ের দোকান আছে সেগুলি ১৭০০টি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে, ৩৭৯টি রয়েছে পশ্চিম বার্লিনে, ২৮০টি মিউনিখে, ২৭৪টি হামবুর্গে, স্টাটগার্টে ২০৩টি, ফ্রাঙ্কফুর্টে ১৬০টি ও কোলোন শহরে ১৩টি।

নতুন বই

সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্ভার

কালিদাসের 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার' ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গার শতক' জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ', বিল্হণের 'চৌর পঞ্চাশিকা', অমরুর 'অমরু শতক' প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের শাশ্বত উপহার।

'অমরু শতক' সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। একশত শ্লোকের সংগ্রহ এই গ্রন্থখানি কোন ধারাবাহিক বিবরণ নয়। প্রতিটি শ্লোকই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বিচিত্র বিষয়ের বর্ণনা আছে এতে। বহিঃপ্রকৃতি, ঘটনার বর্ণনা, মনের বিচিত্র ভাব, নানা বিষয়ের উপদেশ ভরে আছে এর পাতায়-পাতায়। সকলের মূলে দাম্পত্যপ্রেম। স্বামী-স্ত্রী'র ভলোবাসার মধ্যে যে আনন্দের ও সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে তারই মনোরম প্রকাশ ঘটেছে শ্লোকগুলিতে। 'অমরু-শতক'-এর শ্লোকগুলিতে এই দাম্পত্য জীবনাশ্রয়ী কামলীলার আর তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অচ্ছেদ্যরূপে সংগ্রথিত romance বা রমন্যাসের প্রকাশক একটি রত্নহার বলা চলে।

"'অমরু শতক'-এর প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকে সার্থক ও আনন্দময় দাম্পত্যপ্রেমের বিভিন্ন ও বিচিত্র পরিবেশের বা অবস্থানের উজ্জ্বল চিত্র আমরা পাই।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।) শ্লোকগুলি কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনকে তুলে ধরে না।—এ-হল সমস্ত কালেরই অক্ষয় সম্পদ।

'অমরুশতকের' বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। অনুবাদ করেছেন শ্রীবামা-পদ বসু। শ্রীবসু সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে প্রকৃত রসজ্ঞব্যক্তি। মূল সংস্কৃতের সৌন্দর্য রক্ষা করে অসামান্য অনুবাদ করেছেন শ্রীবসু। একশতটি এবং আরও কয়েকটি শ্লোক অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকটির অনুবাদ উদ্ধৃত করছিঃ

আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎ-কুণ্ডলং
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং জালকৈঃ।
তন্ব্যা যৎ সুরতান্ততান্তনয়নং বক্তং রতিব্যত্যয়ে
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহর ব্রহ্মা-দিভির্দৈবতৈঃ।।২।।

রহিয়া রহিয়া দুলিছে অলক
কুন্ডল দোলে দোলার তালে।
স্বেদজল-কণা দিল বুঝি মুছে
যতনে রচিত তিলক ভালে।
বঁধুয়ার বুকে তন্বনায়িকা
সম্ভোগ-শেষে নয়নে ঘোর—
সেই মুখচ্ছবি করুক রক্ষা
ব্রহ্মা হরিহরে কী কাজ তোর।।২।।

'দাম্পত্য জীবনাশ্রয়ী কামলীলা'র সুনিপুণ এই আলেখ্য এ-যুগের পাঠককে আকৃষ্ট করবে। গ্রন্থের দুটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পন্ডিতপ্রবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

অমরুশতক (শ্লোক)—**অমরু কবি বির-চিত। অনুবাদ বামাপদ বসু। ৪৪, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম ছয় টাকা।**

বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ

পুশকিন ডস্টয়ভস্কি, চেখফ, লিস্টারের নাম কেবলমাত্র রুশ-সাহিত্যে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। পুশকিনের 'ইশকাপনের বিবি', ডস্টয়ভস্কির 'সৎ চোর'; চেখফের 'প্রিয়া', টলস্টয়ের 'কি লাভ এতে' এই চারটি গল্পের অনুবাদ 'চতুর্দোলা'। অনুবাদ করেছেন গোলোকেন্দু ঘোষ। অনু-বাদকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক।

চতুর্দোলা— (গল্প)। **অনুবাদ : গোলো-কেন্দু ঘোষ। অগ্রণী প্রকাশনী। ১এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।**

সাধারণ জ্ঞানের বই

'আক্ষরিক আইন' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীমদন চক্রবর্তী নিজে একজন আইনজ্ঞ। এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। সভ্যতার বিকাশ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত মানুষকে নানা আইন সৃষ্টি করতে হয়েছে উন্নত সমাজ-জীবন গড়ে তোলবার জন্য। কিশোর বয়সী-দের তাই আইন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য সেরূপই। এই বইয়ে আছে বিনা আলোয় সাইকেল চালানো, জলপথে হিংস্র পশু চালানো, জনস্বাস্থ্যের সহিত পরি-র্ণত, দেওয়ালে পোস্টার মারা, অসাবধানতায় আগুন লাগা, রাস্তায় বাজী পোড়ানো, রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করা, সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করা, অ্যাম্প্লিফায়ার বাজানো, সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতা, যেখানে সেখানে গরুর প্রবেশ। বিনা টিকিটে স্টেশন এলা-কায় যাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে বেশ সহজ-বোধ্য আলোচনা। এই ধরনের বই বিদ্যালয়ে পাঠ করা উচিত।

আক্ষরিক আইন (আলোচনা)। **প্রথম ধাপঃ মদন চক্রবর্তী। নয়াপ্রকাশ। ২০৬, বিধান সরণী। কলকাতা-৬। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।**

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

যে কোন সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে তিন বৎসর অতিক্রম করাটা বেশ গৌরবের। ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'রঞ্জন'-এর সে গৌরব অবশ্য প্রাপ্য। পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষের প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন নির্মল মুখোপাধ্যায়, পিনাকীরঞ্জন গুহ, নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত সিংহরায়। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কবি বিষ্ণু দে' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গল্প লিখেছেন আশিস সেনগুপ্ত, দীনেশ সিংহ, কানাই ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন সিংহরায়।

রঞ্জন : চিররঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও নির্মল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ১৬।২, এর্‌সল্‌ভেন্ট কোয়ার্টার্স, বাটানগর, ২৪-পরগণা থেকে প্রকাশিত। দাম : ৫০ পয়সা।

'পূর্বাচল'-এর চতুর্দশ সংকলনটি বিশেষ মূল্যবান। শান্তিনিকেতনের 'বড়-মা' শ্রদ্ধেয় হেমলতা ঠাকুর সম্পর্কে একাধিক রচনার প্রকাশ বিশেষ প্রশংসনীয়। শান্তিনিকেতন ও বড়মা সম্পর্কে এ-সংখ্যা থেকে অনেক কিছু জানা যাবে। পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত কবিতার অপ্রকাশিত প্রতিলিপি। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণন, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী হেমলতা ঠাকুর, সীতা দেবী, দিনেশ দাস, জিতেন নাগ, বিমল মিত্র এবং অপর্ণা সান্যাল। এছাড়া অনেকগুলি দুর্লভ ছবিও সংকলনটির অন্যতম সম্পদ।

পূর্বাচল : অপর্ণা সান্যাল সম্পাদিত। হেস্টিংস হাউস, কলকাতা—২৭ থেকে প্রকাশিত। দাম : ১ টাকা।

[উপন্যাস]

।। বারো ।।
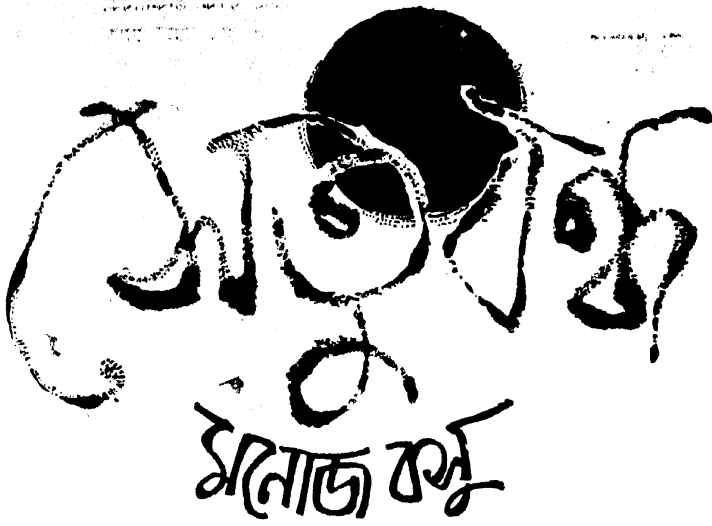
বিজয়-গর্বে স্বাতী চলল তাপসের কাছে। সবুর সইছে না মোটে। ডিস্পেন-সারীতে তাপস এখন—সুবিধা হল, একাই রয়েছে। বলে, বড় ঘাঁটি পয়লা দিনেই দখল হয়ে গেল। আর কি! চেপে বসে ওখান থেকেই পরের আক্রমণ।

বৃত্তান্ত শুনে তাপস অবাক : কী বেহায়া তুমি গো! সোজা গিয়ে উঠলে বাড়িতে? বাবার সঙ্গে যেচে আলাপ-পরিচয়?

তাই বোঝ। একে মেয়েছেলে, তার উপরে যার বিয়ে সেই মেয়ে হলাম আমিই—

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে কৃত্রিম বিষাদের সুরে বলে, অদৃষ্ট যে আমার তাই, কী করব! মা গিয়ে তো গোলমাল ঘটিয়ে এলো। তুমি সামলে দিতে পারতে—তোমার বাবা, তোমার বোন, তোমারই ঘরবাড়ি। তা আমি আবার একটা মানুষে—মুখের উপর তুমি স্পষ্ট 'না' বলে দিলে। বেহায়াপনা ছাড়া উপায় কি তখন বলো।

কয়েকটা দিন পরে স্বাতী আবার গিয়েছে। তারণ তেমনি একা আছেন। রান্নাঘরে চায়ের সরঞ্জাম সেদিন লক্ষ্য করে গিয়েছিল—তাই একেবারে মুখে নিয়ে এসেছে। বলে, চা খাবেন তো বাবা?

চা এ-সময় খাইনে মা। অফিস থেকে ফিরে পূর্নি চা বানাবে, সকলে একসঙ্গে খাবো।

স্বাতী আবদার ধরে : এখন খান, তখন আবার খাবেন। ওতে কি হয়, আমার বাবা তো যখন তখন খেতেন।

তারণ বলেন, তা বুঝেছি। তোমার নিজেরই ইচ্ছে হয়েছে খেতে—

প্রতিবাদ না করে স্বাতী মৃদু মৃদু হাসে। ভাবখানা হল, মনের কথাটা তারণ বড্ড ধরে ফেলেছেন।

তারণ উঠে রান্নাঘরের দিকে চললেন। স্বাতী হাত ধরে ফেলল : বাস রে, চা আপনি বুঝি করবেন? আমি আছি কি করতে! মেয়ে থাকতে পুরুষমানুষে করে বুঝি! বসে থাকুন—

ধমকে বসিয়ে দিয়ে স্বাতী নিজে চলল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, আমিই তো চা করে করে বাবাকে খাওয়াতাম। খুব পারি, দেখুন না।

আসল তো এই-ই। চা করাটা ক'দিন ধরে খানসামার কাছে শিখে নিয়েছে। হাতে-কলমে তৈরি করে নিজে খেয়েছে, খানসামাকে খাইয়ে তার মতামত নিয়ে নিঃসংশয় হয়ে তবে এসেছে। এবং সেই সঙ্গে দারোয়ানের বউয়ের কাছ থেকে উনুন ধরানোর প্রণালী। তোলা-উনুনটা অতএব উঠান থেকে রোয়াকে তারণের প্রায় চোখের সামনে এনে কয়লা সাজাচ্ছে। প্রত্যেকটি পর্ব স্বচক্ষে দেখে তারণের তাক লেগে যাবে, তবে তো!

তারণ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন : উনুন কেন, ইলেকট্রিক হীটার রয়েছে, হীটারে জল চাপাও।

তাই হতে দিল আর কি স্বাতী! জবাব মেয়েটার মুখে যেন জোগানো থাকে। বলে, হীটারের গরম-করা জলে চা ভাল হয় না। দেখেছি করে করে। কয়লার জ্বালের আলাদা স্বাদ। স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। চা করছি তো আজ থেকে নয়।

নাছোড়বান্দা। কাঁহাতক তারণ জোয়ান মেয়ের সঙ্গে উনুন কাড়াকাড়ি করবেন। শক্তি নেই—কন্টেসমেন্টে দু-চার পা চলাফেরা করেন, এসেই গড়িয়ে পড়েন শয্যায়। নিরুপায় হয়ে চা প্রস্তুত-প্রণালী আদ্যোপান্ত তাই দেখে যেতে হচ্ছে।

চায়ের কাপ হাতে দিয়েই স্বাতীর প্রশ্ন : কেমন হয়েছে বলুন বাবা?

যে জবাব দিতে হবে, সে তো মজুতই আছে, চা খাওয়া অবধি সবুর করার প্রয়োজন নেই।

খাসা হয়েছে মা, চমৎকার! পাকা হাত তোমার।

প্রশংসা স্বাতী তারিয়ে তারিয়ে উপ-ভোগ করে। উচিত প্রাপ্য যেন তার। বলে, চা করে করে বাবাকে কত খাইয়েছি। রান্নাও খাইয়েছি কত রকম!

বক্তব্যে জোর হবে বলে রান্নার কথা বলে ফেলেছে। বলে এখন বিপদ। এই জিনিসটাই তারণ কানে ধরে নিলেন।

কি কি রান্না জানো তুমি? একটা-দুটোর আমিও তবে বায়না ধরব মায়ের কাছে।

কিন্তু চায়ের কথায় স্বাতী একেবারে মাতোয়ারা। বেন্টিংক স্ট্রীটের বাসিন্দা বাপের এক চীনা রোগীকে স্বাতী নাকি চা দিয়েছিল একদিন। এক চুমুক খেয়ে ভদ্রলোক হেসে খুন : চিনি-দুধের সরবৎ—এর মধ্যে আবার এক টিপ চা দিতে গেলেন কেন? চীনারা খায় শুধু লিকার—বেশ সুগন্ধ, খেতে মোটেই খারাপ নয়। অভ্যাস হয়ে গেলে তারপরে আর চিনি-দুধের চা মুখে রোচে না—গা গুলিয়ে আসে।

চা যখন সবে নতুন উঠেছে, সেই যে কারা ভাত রান্নার মত চা সিদ্ধ করে ফ্যান ফেলে চা-পাতা চিনি সহযোগে খেয়েছিল, সে-গল্পও হল। হতে হতে রান্নার কথাটা উঠতেই পারে না আর সেদিন।

খাসা এক খেলা চলেছে মেয়েটার সঙ্গে। বিকালটা তারণের দিব্যি কেটে যায়।

আবার ক'দিন পরে এলো স্বাতী, এসেই সেদিনের রান্নার প্রশ্নের গড়গড় করে জবাব দিয়ে যাচ্ছে : কি কি রান্না জানি, এই তো? লুচি ভাজতে জানি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, ডিমের ওমলেট সমস্ত জানি—

সঙ্গে সঙ্গে আবদার ধরে : দিই না একটা ওমলেট ভেজে?

শুনবেই না। কম পাজ্যের! কয়েকটা ডিম কেনা আছে, চায়ের বাসন আনতে গিয়ে রান্নাঘরে সে জিনিস দেখে এসেছে। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে আজ ডিম-ভাজা। রোয়াক থেকেই বলতে বলতে আসছে, কেমন হয়েছে বলুন বাবা। ডিম ভেঙে আচ্ছা করে ফেটিয়ে নিয়ে কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে—

কথা আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে যেন বাঘ। পূর্ণিমা এসে গেছে কখন—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মারা গেছেন, সেই-জন্য সকাল সকাল ছুটি। এসে পূর্ণিমা বাপের পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে স্বাতীর কাজকর্ম দেখছে, আর হাসছে মিটিমিটি। দরজা খোলারও শব্দ পায়নি, রান্নায় স্বাতী এমন মগ্ন ছিল। কিম্বা হয়তো বাড়ি ঢুকে আজ সদর দরজা খোলা রেখে এসেছিল। নতুন রান্না শেখার আনন্দে ঐ তুচ্ছ জিনিষটা মনে ছিল না।

পূর্ণিমা খিল খিল করে হেসে উঠল : নিত্যি নিত্যি ধান খেয়ে পাখি যাও উড়ে, কি হাল তোমার করি দেখ খাঁচার মধ্যে পুরে—

টেনে নিল স্বাতীকে বুকের মধ্যে। বলে, বাবার সঙ্গে এত ভাব তোমার। আমি আসবার আগেই পালিয়ে যাও। কেন শুনি?

হকচকিয়ে গিয়েছিল স্বাতী গোড়ায়, সে-অবস্থা সামলে নিয়েছে। বলে, ভয় করে ছোড়দি-মণি। আপনি যে আমার উপর চটে রয়েছেন।

সে কী কথা বোন। কে মিথ্যে করে লাগিয়েছে তোমার কাছে? আমার ভাই নিশ্চয়। পিঠোপিঠি ভাইবোন কিনা আমরা—ঝগড়া-মারামারি সেই ছোট্টবেলা থেকে। ওর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস কোরো না।

ঠোঁট ফুলিয়ে স্বাতী বলে যাচ্ছে: আমার নাকি অনেক দোষ! সকলের বড় দোষ, আমরা বড়লোক। আমি তার কি করব ছোড়দি-মণি? মা-বাবা বড়লোক হতে পারেন—আমি তো ইচ্ছে করে চেষ্টা করে হইনি, আমার দোষটা কি তাহলে? বলুন।

বেশ মিষ্টি করে কথা বলে কিন্তু মেয়েটি। বাবার মতন পূর্ণিমাও যেন ঢলে পড়ছে তার দিকে।

স্বাতী বলতে লাগল, বড়লোক হয়ে যদি জন্মেই থাকি, চিরকাল বড়লোক থাকতে হবে তার কোন মানে আছে? গরীব কেন হতে পারব না, চেষ্টা করলে কী না হয়! শিখিয়ে-পড়িয়ে গরীব করে নেবেন তো কেউ একজন!

পূর্ণিমা বলে, না শেখাতেই তো বেশ খানিকটা হয়ে গেছ ভাই। মুড়ি খেতে পার মেঝের উপর পা ছড়িয়ে বসে, কয়লার উনুন ধরাতে পার—

স্বাতী আহত অভিমানে তারণের দিকে চেয়ে বলে, বাবা, বলে দিয়েছেন?

অপরাধী তারণ মুখ নিচু করে চায়ের কাপে মনোনিবেশ করেছেন। পূর্ণিমা কিছু গম্ভীর এবারে। বলে, শখের গরীবানা নয়—সত্যি সত্যি গরীব আমরা। দেখতে পাচ্ছ কি রকম বিশ্রী এঁদো-ঘর। গরীব হলে এমনি জায়গায় থাকতে হয়। পারবে?

স্বাতী কিছুমাত্র ভীত নয়। ঘাড় দুলিয়ে বলে, পারি কিনা দেখবেন তো পরখ করে। গোড়া থেকেই কেন অপদার্থ ধরে নেবেন? আপনারা তো দিব্যি রয়েছেন, আমিই বা কেন পারব না?

নিজের জন্য স্বাতী সমান একটা ভাগ রেখে দিয়েছে, নইলে তো তারণকে খাওয়ানো যাবে না। সেই প্লেট ধরে পূর্ণিমাকে এনে দিল। বলে, খান আপনি, খেয়ে বলুন।

হাসিমুখে পূর্ণিমা বলে, খেতে হবে তারপরে বলতে হবে—বাবার মতন না খেয়ে আগেভাগে বলা চলবে না?

স্বাতী বলে, এখন তো খেয়েছেন বাবা —বেশ, উনিই বলুন, খারাপ হয়েছে? সত্যি কথাই বলবেন. নইলে শেখা হবে কেমন করে?

তারণ বলেন, হয়েছে চমৎকার, খারাপ বলি কি করে? এই বয়সে মিথ্যে তো বলতে পারব না।

না খাইয়ে ছাড়বে না তো পূর্ণিমা ভাগাভাগি করে নিল স্বাতীর সঙ্গে। বলে, সত্যিকার ওমলেটই তো—দোকানে যেমনটি পাওয়া যায়। নাঃ, পাকা রাঁধুনি হয়ে গেছ তুমি। তা রাঁধুনিঠাকরুণ, একবার তবে তো কাশীপুরে যেতে হয়। মা, দিদি সব ওখানে। তাদের রেঁধে খাইয়ে এসো।

উঠে দাঁড়িয়ে স্বাতী আঁচলটা কোমরে বেড় দিয়ে নিল। যেতে এখনই প্রস্তুত, দৃকপাত নেই। সেকালে ভুবন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন তৈমুরলং, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন—স্বাতীও তাই যেন। গোটা শহরের সর্বজাতির মন জিনে আসতে পারে সে চা-ওমলেটের প্রতিযোগিতায়।

চলে গেলে পূর্ণিমা নিজেই বলছে, মেয়েটা ভালো—

তারণ সায় দিয়ে বলেন, বড়লোক বলে বিগড়ে থাকিসনে পুনি। বড়লোক হলেই কি আর পাজি হয় রে? খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

তোমার পছন্দ বাবা?

চোখে-মুখে কথা বলে, বানিয়ে বানিয়ে সত্যি-মিথ্যে কতরকম বলে যায়। আমার তো ছেড়ে দিতেই ইচ্ছে করছে না। ভাবি, এসে যখন পড়েছে, পুরুত ডেকে কপালে এক থাবড়া সিঁদুর মাখিয়ে মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে পুরোপুরি ঘরে নিয়ে নিই। পা ছড়িয়ে বসে বসে মুড়ি চিবোক, আর আগডুম-বাগডুম বকে যাক।

বিজয়া দেবীকে পূর্ণিমা চিঠি লিখতে বসল। যে-প্রস্তাব তিনি নিজে নিয়ে এসেছিলেন, এতদিনে তার জবাব। ভেবে ভেবে নিবিষ্ট মনে লিখছে।

তাপস এসে উঁকিঝুঁকি দেয়। তাকে কিছু বলছে না। ছেলেছোকরা কী আবার জানবে, ভাবখানা এমনি।

তাপস বলে, ওদের লিখছিস বুঝি? কি লিখলি?

পূর্ণিমা ধমক দিয়ে ওঠে: যা যা. বইটই পড়গে যা—অন্যদিন যা করে থাকিস। গুরুজনদের ব্যাপারে থাকতে নেই।

তাপস ঢিব ঢিব করে তার এ-পায়ে ও-পায়ে মাথা ঠোকে। থামে না।

পূর্ণিমা বলে, কি হল রে?

প্রণাম করছি গুরুজনকে। পুণ্য হবে।

তখন সদয় হয়ে পূর্ণিমা একটুকু বলে দেয়, আমার বরাবরের অমত, জানিস তো তুই—

বাঁচালি ছোড়দি। মুখে বড়লোকদের গালি দিস, কাজের বেলাও ঠিক তাই। কথায় আর কাজে ঠিক একরকম, এ জিনিস বড় একটা দেখা যায় না। তোর উপরে শ্রদ্ধা খুব বেড়ে গেল ছোড়দি।

আরও বারকয়েক প্রণাম ও দুহাতে পদধূলি-গ্রহণ। কলম ফেলে পূর্ণিমা তখন ভাইকে ধরে ফেলে। বলে, আমার অমতে কি হবে রে? স্বাতী জমিয়ে নিয়েছে বাবার কাছে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলে, বাবা গীতা ফেলে এখন ওর মুখের মিথ্যেকথা শোনেন। মা'র কাছে নালিশ করতে গিয়ে সেখানেও উল্টো ফল—বললেন, আমি তফাৎ হয়ে আছি, বুড়োমানুষকে একজনে এসে দেখাশুনো করছে. হাসিখুশিতে রেখেছে—মেয়েটাকে নিত্যিদিন সর্বসময়ে যাতে পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি সেই ব্যবস্থা কর। আর দিদিরও মায়ের মতে মতঃ বাপের বাড়ি কেমন যেন মরুভূমির মতো হয়েছিল, স্বাতী বউ হয়ে এলে জমজমাট হবে। মন খারাপ ঠেকলে চলে যাব তখন—

হতাশকণ্ঠে পূর্ণিমা আবার বলে, মায়া জানে স্বাতী, মায়াজাল খাটিয়ে সকলকে বশ করে ফেলেছে। নইলে এমন হবে কেন? একলা আমি এতজনের সঙ্গে কাঁহাতক লড়ে বেড়াই? অমত আমার ঠিকই—কিন্তু কি করব ভাই, সকলের মতে মত দিতে হল।

ও ছোড়দি, টের পাসনি, মায়া খাটিয়েছে তোর উপরেও—

তাপস আর্তনাদ করে ওঠে: সকলে মিলে মায়াবিনীর খপ্পরে ফেলে দিচ্ছিস, হায় হায়, কী হবে আমার!

পূর্ণিমা বলে, তোর যদি আপত্তি থাকে সেই কথা তবে লিখে দিই। চিঠি এখনো তো ডাকে ছাড়িনি—

তাপস বলে, তোর কথার উপর কবে আপত্তি করেছি বল্। ছোট্টবেলায় জ্বরজারি হলে অন্য কেউ পারত না, তোর কথায় গাদা গাদা কুইনাইন গিলেছি। এবারে বিনি-জ্বরে কুইনাইন গেলা—

গড়িয়া স্টেশন থেকে সোজা পুবমুখো—শিশির চলেছে হনহন করে। কাঁধে কন্যা কুমকুম, হাতে অবিনাশ মজুমদারের সেই চিঠি ও নক্সা। মাঝে মাঝে চিঠি খুলে পথের নিশানা মিলিয়ে নিচ্ছে।

চোখ বুঁজে চলে আসবি তেমাথার বটগাছ অবধি। সেখান থেকে ডাইনে মোড় নিবি। যাচ্ছিস, যাচ্ছিস। মাঠের পুল পার হয়ে অল্প একটু এগিয়ে দেখবি পাশাপাশি তিন তালগাছ। একটার গায়ে পেরেক ঠুকে সাইনবোর্ড আঁটা আছে—নব-বীরপাড়া কলোনি। তীরচিহ্ন দেওয়া আছে। খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, ঘাড় তুলে বাঁয়ে তাকালেই দেখতে পাবি। পুকুর কেটে সেই মাটিতে জলাজমি ভরাট করে তার উপর ঘর। বাহাট্টি ঘর বাসিন্দা আমরা পুকুরের চার পাড় ঘিরে। বীরপাড়া গাঁয়ের মাঝখানটায় বড় দীঘি—খানিকটা সেই জিনিস আর কি। আমাদের বীরপাড়াকে তুলে এনে ছোট আকারে নব-বীরপাড়ায় বসিয়ে দিয়েছি—

ঠিক দুপুরে কাল বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়েছে. পুরো রাত্তিরটা ট্রেনে কেটেছে। গোড়ার দিকে কুমকুম বড্ড জ্বালাতন করেছিল, পথের কষ্টে তারপর নেতিয়ে পড়ল। সকাল হলে জেগে উঠেছে. চারিদিক ফ্যালফ্যাল করে দেখছে।

তেমাথার বটগাছ মিলল। ডাইনে এবার। হঠাৎ কুমকুম কেঁদে উঠল। সন্ত্রস্ত শিশির লজেন্স বের করে গোটা দুই একসঙ্গে গুঁজে দিল মুখের মধ্যে। কান্না বন্ধ।

এদিকে যে সর্বনাশ, লজেন্সের ভাণ্ডার প্রায় শেষ। পকেট ভরতি কিনে কাল ট্রেনে উঠেছিল, খাওয়াতে খাওয়াতে আসছে। কতদূর আরও যেতে হবে কে জানে। পৌঁছুলে মজা তখন। মামী গরু কিনে ফেলেছেন, যত ইচ্ছে দুধ খাবি। খাওয়া কি —চান করবি দুধের মধ্যে নেমে, সাঁতার কাটবি। কিন্তু তৎপূর্বে মুখে যদি ঢোকানোর কিছু না থাকে, পথের মাঝে রক্ষে রাখবে না এ মেয়ে।

কাঠের পুল। পথের শেষ—যাক. সোয়াস্তি পাওয়া গেল। পাকা সার্ভেয়ারের

মতন মামা নক্সা এঁকে দিয়েছেন, হুবহু মিলছে। কুক করে একটু আওয়াজ দিল কুমকুম। অর্থাৎ রসদ ফুরিয়ে এসেছে, তার সিগন্যাল। বোতল ছিপি এঁটে কান্না আটকে রেখেছে, ফাঁকা পেলেই দুর্দান্ত বেগে বেরিয়ে পড়বে। সেই কান্না এক তুমুল ব্যাপার। রূপকথায় সুতোশঙ্খ সাপের কথা আছে—নাকি চেহারার সুতোর মতন, সেই সুতোর ভিতর দিয়ে শঙ্খনাদ বেরোয়। কুমকুমেরও তাই। কান্না কানে শুনে কে বলবে দেহ তার এইটুকু মাত্র।

তিন তালগাছ ঐ যে, কিন্তু—। বর্ণনা এ তাবৎ অক্ষরে অক্ষরে মিলে এসেছে, এইবারে তো গোলমাল। বাঁদিকে তাকিয়ে বিস্তর ঘরবাড়ি দেখবার কথা—কোথায়? শ'খানেক ঘর বাসিন্দা, অবিনাশ লিখেছেন—কিন্তু সিকিখানাও তো নজরে আসে না।

কাঠের পুলের উপর লাঠি হাতে পাইক-দরোয়ান গোছের কয়েকটা লোক। সেখানে গিয়ে শিশির প্রশ্ন করে : কলোনি আছে এইখানে কোথায়—

আছে বই কি! এদ্দুর এলে তো এগিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসো। তালগাছের ঐ ওধারে—

হাত তুলে সেই তিন তালগাছই দেখাল বটে। হাসছে ফ্যা ফ্যা করে। ব্যাপারটা রহস্যময় ঠেকে। ইতস্তত করে শিশির এগিয়ে চলল। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। তালগাছতলায় এসে গেল—কোনরকম সাইনবোর্ড নেই গাছের গায়ে কোথাও।

না-ই থাক সাইনবোর্ড, নিশানা মিলে গেল। ছিল কলোনি, কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। গোটা জোড়া ঘরবাড়ি ছিল, এখন ছাই। ছাই আর ছাই! কিছু আধ-পোড়া দরজা-জানলা চাল-বেড়া এবং ভাঙা টালিও পড়ে আছে এদিক সেদিক। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে, তার নিদর্শন।

উদ্বেগে শিশিরের মুখ শুকাল। পৈতৃক জমজমি ও জিনিসপত্র নামমাত্র দামে বেচে দিয়ে মামা সেই টাকায় নতুন করে গ্রাম ও বাস্তুভিটা গড়েছিলেন, অগ্নিগর্ভে গিয়েছে সব। তাঁরাই বা কোথা—কোন গতি হল তাঁদের?

পুলের উপরের লোকগুলো চেঁচাচ্ছে : দেখতে পেয়েছ কলোনি? হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন, এগিয়ে আলাপসালাপ করোগে যাও।

হো হো—করে উদ্দাম হাসি হাসছে, হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। মানুষের এতবড় সর্বনাশ নিয়ে বিদ্রূপ করে—ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে থাপ্পড় কষিয়ে দিই জানোয়ারগুলোর গালে। দিতও ঠিক শিশির—তাদের গাঁ অঞ্চলে দিয়েই তো এসেছে। কিন্তু এটা হল ভিন্ন এলাকা—নতুন আগন্তুক সে এখানে। সয়ে যেতে হবে, জোর খাটানো চলবে না।

পায়ে পায়ে শিশির ফিরে চলল। পুলের কাছাকাছি এসেছে। একজন তাদের মধ্যে বলে, পরশুও যদি আসতে মশায়, জমজমাট পাড়া দেখতে পেতে। পুকুরঘাটেই বা কত মানুষ—চান করছে, কাপড় কাচছে, বাসন মাজছে—

শিশির বলে, কোথায় আছেন তাঁরা সব?

এতো মশায় আজব জিজ্ঞাসা। গাছের ডালে মৌমাছির চাক বাঁধা দেখেছেন—সেই জিনিস। বাঁধুক না চাক মনের মতন করে—বাঁধা হয়ে থাক, মধু এনে এনে জমাক। জমে গেলে মালিক একদিন চাক ভাঙতে এসে পড়বে আগুন আর লগা-লাগি নিয়ে। মৌমাছি কোনদিকে উড়ল সে খবরে কার কোন্ গরজ? আবার জমতে না পারে, তাই আমরা মোতায়েন রয়েছি।

দৈবদুর্ঘটনা নয় বোঝা গেল, মালিক পক্ষই আগুন দিয়েছে। সঠিক কোন খবর এদের কাছে মিলবে না, জানা থাকলেও বলবে না। জিজ্ঞাসা করা মিছে—হাসবে পিত্তি-জ্বালানো ঐ রকমের হাসি।

ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে শিশির চলল। কাল দুপুরে মেয়ে ঘাড়ে তুলে বেরিয়েছে, রাত কেটে গিয়ে প্রহর বেলা হতে চলল—ঘোরাঘুরির শেষ নেই তবু। সঙ্গের জিনিষপত্র তবু তো বুদ্ধি করে শিয়ালদা স্টেশনের লেফট-লগেজে রেখে এসেছে। দেহ বইছে না আর। সিন্ধবাদ নাবিকের দশা—কাঁধের মেয়ে কোথায় কেমন করে কোন কৌশলে নামাবে ভেবে পায় না।

বিপদের উপর বিপদ—মেয়েও এই সময় ভ্যা করে কেঁদে উঠল। আরম্ভেই আকাশ-বিদারী—তার মানে মুখ খালি। পকেটের লজেন্সও একেবারে শূন্য—কী করা যায়, উপায় কি এখন? বাপ হয়ে স্বহস্তে সন্তান খুন করেছে, কখনো সখনো শোনা যায়। সে বোধকরি এমনিতরো অবস্থায়। নব-বীরপাড়া কলোনিতে মামার ঘরে উঠেই মেয়ে ছুঁড়ে দেবে মামীর কোলে, মামী আকণ্ঠ দুধ গেলাবেন আর শিশির আঃ বলে হাত-পা মেলে শয্যায় গড়িয়ে পড়বে—হয়ে দাঁড়াল উল্টোটি। ডবল জোরে হাঁটছে শিশির—হাঁটা বলে না একে, দৌড়ানো। মেয়ের কণ্ঠখানি ভরাট করবার উপযোগী বস্তু কিছু চাই—সব ভাবনার বড় ভাবনা তাই এখন। অবিলম্বে চাই।

খানিকটা গিয়ে মানুষ পাওয়া গেল। ঝোপ আড়াল করে মানুষটা তিন তালগাছের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতছানি দিয়ে শিশিরকে সে কাছে ডাকল : ডাকাত বেটারা কি বলছিল?

বলছি সব, কান রক্ষে করে নি আগে—। সকাতরে শিশির বলে, লজেন্স কোথা পাওয়া যায় সেইটে আপনি আগে বলুন।

লোকটা চোখ কপালে তুলে বলে, লজেন্স কে রাখতে যাবে? এদিগরে লজেন্স-খেকো মানুষ নেই। ভাত জোটাতে পারে না, তায় লজেন্স!

তবে কি রাখে বলুন।

কলোনির ভিতরেই দোকান ছিল, সে তো এখন ছাই। আর আছে—সে হল অনেকটা দূর এখান থেকে—মুড়ি-বেগুনি ভাজে একজন।

শিশির বলে, দূরে বলে কিছু নেই—দুনিয়ার শেষ মুড়ো অবধি যেতে পারি। মুড়ি-বেগুনি না হয়ে মিঠে জিনিস কোন রকম? মুড়ির দোকানে বাতাসাও রাখে—পথটা আপনি দয়া করে বাতলে দিন।

বাচ্চা মেয়ে যেন কত বোঝে—প্রবোধ দিচ্ছে তার পানে তাকিয়ে : সবুর যাদুমণি, মিনিট কতক একটু ক্ষমা দাও। কিছু না পেলে পথের ধুলোবালি আছে—তাই দিয়ে মুখ তোমার পাকাপাকি ভরাট করে দেবো।

চলে আসুন—বলে লোকটা নিজেই আগে আগে চলল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে : পথে পথে ঘোরা ছাড়া কাজ কি এখন? সর্বস্ব খুইয়ে এসে আশাসুখে আবার নতুন বাসা বেঁধেছিলাম, পুড়িয়ে ছারখার করল। পরিবার গাছতলায় বসিয়ে ঘোরাঘুরি করছি, কলোনির কারো কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। কোন জায়গার উপর আবার এখন চাল তুলব, সেই হল বড় ভাবনা।

সে দোকানে বাতাসা নেই, তবে জিলিপি পাওয়া গেল। তেলে-ভাজা গুড়ের রসের জিলিপি। তাই সই, খানিকটা মিঠা হলেই হল। খান দুয়েক জিলিপি মুঠোর মধ্যে গুঁড়িয়ে একসঙ্গে মেয়ের গালে ঠেলে দিল প্রতিহিংসা নেওয়ার মতো। সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিল—কান্না বন্ধ, নিঃশব্দ কুমকুম।

কথাবার্তার ফুরসত এতক্ষণে। শিশির বলে, আপনিও নিশ্চয় বীরপুর গাঁয়ের মানুষ—অবিনাশ মজুমদার বলে একজন এখানে ছিলেন—

লোকটা সসম্ভ্রমে বলে, একজন কি বলেন, তিনি সর্বজন। বড়দা। কলোনি বলতে যা-কিছু, একাধারে তিনিই সমস্ত। বড়দা যেমন, বউদিও তেমনি। সাক্ষাৎ হরগৌরী।

উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে শিশির বলে, আমার মামা-মামী। ওঁদের কাছেই এসেছিলাম। কোথায় আছেন, খোঁজ বলতে পারেন?

লোকটা বলে, বড়দা'র উপরেই বেশি আক্রোশ, সকলের আগে তাঁর ঘরের বেড়া ভেঙেছে। বেড়া ভেঙে জোর করে ধরে তাঁকে জিপে তুলল। কোথায় নিয়ে পাচার করেছে, কেউ জানে না। কলোনির মানুষজন তখন ঘুমুচ্ছিল, টের পেলে রক্তারক্তি হত। বউদি তার পরে বেহালা না কোথায় আত্মীয়বাড়ি চলে গেলেন, ঠিকানা আমি বলতে পারব না।

সর্বনাশ! চারিদিকে যে অকূল পাথার!

(ক্রমশঃ)

কেরল দর্শন

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

কেরলে প্রবেশ করে প্রথমেই যেটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। যেখানে সাধারণ মানুষের বেশ, একফালি ধুতি, যাকে ওরা বলে মুণ্ডু, হাঁটুর ওপর তোলা, গায়ে গেঞ্জী কিংবা শার্ট আর কাঁধে ছোট একটি তোয়ালে এবং আশ্চর্য এই যে, সবগুলিই ধবধবে শাদা। আমরা অন্যত্র নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের লোকেদেরও দেখেছি তাদের শাদা বেশ ধূলিধূসর। কিন্তু কেরলে মুটে-মজুর শ্রেণীর লোকেরাও যা কিছুই গায়ে দিক তা শাদা। একটু ভেতরে ঢুকলে কেরলের লোকেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আরো চিহ্ন চোখে পড়ে। সাধারণভাবে পথঘাট পরিষ্কার, বাড়ী-ঘরগুলি সাজানো-গোছানো। গ্রামের পর্ণকুটিরগুলিও দেখবার মত। উত্তর ভারতে যে শ্রেণীর মেয়েরা পথের ধারে বসে সঙ্গিনীকে দিয়ে মাথার উকুন বাছায় কেরলে সেই শ্রেণীর মেয়েরা চকচকে কালো চুলে ফুল জড়িয়ে চলে ফেরে।

আমরা যাকে বলি বে'টে খাটো, কালো কালো রোগাপটকা চেহারা — কেরলের লোকগুলি তাই। অন্যত্র, চেহারা এবং বেশ-ভূষা দেখে কে কোন্ আর্থিক স্তরের মানুষ কিছুটা অনুমান করা যায়। কেরলে কিন্তু চেহারা এবং বেশ দেখে কিছুই আন্দাজ করা যায় না। হোটেলে রেস্তোরাঁয় বারে আমাদের পাশের টেবিলে এদের নিঃসংকোচে অর্ডার দিতে দেখে বার বার অবাক হয়েছি। আমরা নিশ্চিত জানি এই চেহারা ও বেশ-ভূষার লোকেরা কলকাতায় ফারপো এবং দিল্লীতে অশোকায় ঢুকতে গেলে দারোয়ান এদের পথ আটকাবে।

কেরলে খৃষ্টানদের প্রভাব খুব বেশী, কেরলে জনসংখ্যার বিশ-পঁচিশ ভাগ খৃষ্টধর্মী — রাজ্যের শিক্ষায়তনগুলির অধিকাংশই খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব এবং পরিচালনাধীন। কিন্তু আমরা দেখে অবাক হয়েছি যে পশ্চিমী রীতিনীতি আদব-কায়দা বেশভূষা কেরলবাসীদের প্রভাবিত করতে পারে নি। ইড়ভা, নায়ার, মুসলিম খৃষ্টানের পার্থক্য যা তা নামে। বেশভূষায় তাদের এক থেকে অপরকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। কেরলে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষিত সকলেরই এক ভাষা—মালয়ালাম। নিজেদের মধ্যে তারা কখনও ইংরাজিতে কথা বলে না।

কলকাতার কোন পথ কল্পনা করতে গেলে প্রথমে মনে জাগবে মানুষের ভিড়, দিল্লীর পথ সম্পর্কে কল্পনা করতে গেলে মনে হবে যেমন সাইকেলের ভিড়, কেরলের শহর পথ তেমনি সব সময় ভরা ছাত্র-ছাত্রী দলে। সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, যখনই কেরলের যে কোন শহরে পথে বার হয়েছি চোখে পড়েছে, বই-শ্লেট হাতে বা ব্যাগ ঝুলিয়ে, খালি পায়ে দল বে'ধে ছাত্রা চলেছে [illegible] বাড়ীমুখো।

ভারতের মধ্যে কেরলে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশী, এবং শিক্ষিত বেকারের হারও।

কেরলে শিক্ষার জন্য যে খরচ হয় তার মোটা অংশ আসে সরকারী তহবিল থেকে, কিন্তু কেরলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সবই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব নেই। স্কুল বা কলেজ বোর্ড থেকে নিযুক্ত ম্যানেজারই সর্বেসর্বা। বহুক্ষেত্রে ম্যানেজারই মালিক।

যেখানে ম্যানেজার বেতনভুক কর্মচারী সেখানে এই পদের জন্য চার-পাঁচ হাজার টাকা সেলামী বাঁধা। ম্যানেজার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের কর্তা এবং প্রতিটি নিয়োগে তাঁরা দু-আড়াই হাজার টাকা সেলামী নিয়ে থাকেন। একজন গ্রাজুয়েট দেড়শ থেকে দু'শ টাকা মাইনের শিক্ষকতায় চাকরী পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

উচ্চশিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বলে কেরলে উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম নয়। মেডিকেল বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে গেলেও দু'তিন হাজার টাকার মত সেলামী দিতে হয়। এই সেলামীর ভদ্র নাম হোল ক্যাপিটেশন ফী!

মালাবারে এক কৃষক সমিতির অফিসে আমরা এক হরিজন ক্ষেতমজুরের সাক্ষাৎ পেলাম। সমিতির ইংরাজিজানা সম্পাদক দোভাষীর কাজ করলেন। ক্ষেতমজুরটির সঙ্গে আমাদের নিম্নরূপ কথাবার্তা হোলঃ

প্রশ্ন—দৈনিক মজুরী কত?

উত্তর—তিন টাকা, তবে সপ্তাহে চার-দিন কাজ পাই, তিনদিন বেকার থাকি।

প্রঃ—পরিবারে ক'জন।

উঃ—স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে পাঁচজন। বড় ছেলেটি শহরে হোস্টেলে থেকে ম্যাট্রিক পড়ছে।

প্রঃ—তার খরচ যোগাও কি করে?

উঃ—আমরা হরিজন বলে সরকার সব খরচ দেন।

প্রঃ—যখন চাষ হয় না, তখন কি করো?

উঃ—বেত বা বাঁশের কাজ করি, ২।৩ টাকা রোজ হয়।

প্রঃ—আজ যে শহরে এলে, কি করে এসেছো?

উঃ—আমাদের গ্রাম থেকে ৬।৭ কিলো-মিটার পায়ে হে'টে এসে বড় রাস্তা। সেখান থেকে চোদ্দ-পনের কিলোমিটার বাসে করে।

প্রঃ—সকালে কি খেয়ে বার হয়েছো?

উঃ—বড্ড (চাল আর টাপিয়োকার গ'ড়ো দিয়ে তৈরী বড়া) আর কফি।

প্রঃ—দুপুরে কি খাবে, রাত্রে কি খাবে?

উঃ—দুপুরে হোটেলে কোথাও ভাত খেয়ে নেবো। রাত্তিরে আমরা কিছু খাই না, পেয়ে গেলে এক কাপ কফি খেয়ে নি।

প্রঃ—[illegible] কোন সিনেমা দেখার ইচ্ছা আছে নাকি?

উঃ—পয়সা কোথায়? সেই [illegible] [illegible] দেখেছিলাম, এখন ভুলেই গেছি।

[illegible] নিম্ন [illegible] শ্রেণীর [illegible] অনেকে [illegible] খাওয়া এক [illegible] খায়। [illegible] ভাতে ফ্যান ফেলে দিই, কেরলে কিন্তু ভাতে ফ্যান ভাত মাখার [illegible] হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ খাদ্য হোল টাপিয়োক ভাতের ফ্যান ও ভাত।

এবার এর্নাকুলামে এ-আই-সি-সি অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমত ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপা শ্রীকামরাজের সম্মানার্থে বিশেষ একা নৌকা বাইচের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাংবাদি হিসাবে আমরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

গঙ্গায় যে ধরনের নৌকা-বাইচ দেখতে আমরা অভ্যস্থ, এর্নাকুলামে সমুদ্রের ব্যাক ওয়াটারে নৌকা-বাইচ তা থেকে সম্পূ স্বতন্ত্র ধরনের। প্রথম কথা, এখানে নৌকা বাইচ কেরলের জাতীয় উৎসব ওন উৎসবের অঙ্গ। তারপর, এতদঞ্চলের বাইচে নৌকা ভল্লম, লম্বা কলকাতা অঞ্চলে বাইচের নৌকার চেয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ।

সবচেয়ে বড় ভল্লমে (চন্দন ভল্ল দাঁড়ির সংখ্যা ২'শ। সাধারণ বাইচের নৌক গুলি পঁচিশ জোড়া বা ত্রিশ জোড়া দাঁড়ি হয়। দাঁড়গুলি কলকাতার তুলনায় ছোট।

বাইচ দেখার জন্যে ২ টাকা থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছি এবং হাজার হাজার লোকে ভেম্বানন্দ হ্রদে ধারে ভিড় করেছিল এই বাইচ দেখার জন্য

আমরা এ যাত্রায় কেরলে মাত্র দশদি ছিলাম এবং তাও একটা অঞ্চলে কোচি এর্নাকুলামে এবং কিছুটা সময় মালাবারে এই সময় আমরা ২টি রাজনৈতিক মিছি দেখি। একটি কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ নিয়ে মিছিল এবং অন্যটি কোচিনে জাহা নির্মাণের কারখানা স্থাপনের দাবী অকংগ্রেসী দলগুলির মিছিল। মিছি মেয়েদের সংখ্যাল্পতা দেখে আমরা কিছু বিস্মিত হই। কেরলের মেয়েরা ভারতে যে কোন অঞ্চলের মেয়েদের তুলনায় বেশ শিক্ষিত এবং স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে আম যাকে বুঝি তাও তুলনায় অনেক বেশ কিন্তু মেয়েরা বাইরের চেয়ে ঘরে থাক যেন বেশী পছন্দ করে।

এর্নাকুলামে একটি বড় রাস্তার ন দেখলাম "ব্যানার্জি রোড", কে এই ব্যানা তা খোঁজ করার কোন অবকাশ ঘটেনি। তা শুনলাম, নলিনী অথবা নীলিমা আৱাহ নামে একজন বাঙালী মহিলা স্থানীয় এক কলেজের অধ্যাপিকা এবং তিনি কেরা বাংলাভাষায় একজন উৎসাহী প্রচারিক কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও এই ভদ্রমহিল সঙ্গে আলাপের সুযোগ পাইনি।

কেরল নামের উৎপত্তি কের অথ নারকেল থেকে। আমরা কিছু কাঁচা নারকে অর্থাৎ ডাব—যা দিল্লীতে পাওয়া যায় ন কেনার জন্যে একদিন বার হয়েছিলা একটি ডাবের দাম পঞ্চাশ পয়সা। কে সফরের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কিছু (কিনে আমার উৎসাহ দাম শুনে উবে গে পাকা নারকেলের ছিবড়া থেকে তৈ পাপোষ দেখলাম কিন্তু খুব [illegible] তা কয়েকটা কিনে নিলাম।

দেশে বিদেশে

গুরুত্বপূর্ণ সফর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৪ অক্টোবর কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে পৌঁছে তাঁর 'সস্নেহ অভ্যর্থনা'র জন্যে নেপাল সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন : 'আমি পর্বতের শিশু, তাই পর্বতের দেশে এসে আমি নতুন শক্তি অনুভব করছি।"

বলেছিলেন নেপালের মন্ত্রি-পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীসূর্যবাহাদুর থাপা : "আমাদের মৈত্রী ইতিহাসের মতই পুরনো; পারস্পরিক শুভেচ্ছার দ্বারা তা পরিপুষ্ট হয়েছে।"

সফর শেষে ৭ অক্টোবর যে যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে তাতে বলা হল : ভারত-নেপাল মৈত্রীর ইতিহাসে এই সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ পথচিহ্ন।

এই সব আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা চিহ্নিত হলেও প্রধানমন্ত্রীর নেপাল সফর কেবল আবেগ ও অনুভূতির মধ্যেই শেস হয়নি। এটাই তাঁর এই সফর সম্পর্কে বড় কথা এবং এর ফলেই বলা যায় এই সফর সফল হয়েছে।

'নেপালের মহত্তম সন্তান' বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এই সাফল্যের পরিবেশ রচিত হয়েছিল। পরে দৃষ্টিভঙ্গীগত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে তিনি সাফল্যের সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন :

এক, নেপালের অর্থনৈতিক বিকাশে ভারত সাহায্য দিচ্ছে না, সহযোগিতা করছে;

দুই, ভারত ও নেপালের বন্ধুত্ব সমানে সমানে বন্ধুত্ব;

তিন, কায়রো, বেলগ্রেড ও নয়াদিল্লীর মধ্যে ২১ অক্টোবর থেকে যে আলোচনা আরম্ভ হচ্ছে, তা ঐ তিনটি দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠক নয় (অর্থ হলো, ঐ রকম কোন আলোচনায় নেপালকে নিশ্চয়ই সামিল করা হবে)।

তারপর আলোচনাকে প্রধানত অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সাফল্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হয়েছিল। এর দরকার ছিল, কারণ নেপালের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনটা জরুরী, এবং যদি সে প্রতিবেশীর দুয়ার বন্ধ দেখতে পায় তাহলে কে বলতে পারে সে অন্যত্র (সে অন্যত্র চীনও হতে পারে) তাকাবে না?

প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন যে, ১৯৬০ সালে নেপালের সঙ্গে ভারতের যে অর্থনৈতিক চুক্তি হয়েছিল,

নেপালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সম্বর্ধনা জানান হচ্ছে

ভারত সরকার তা সর্বতোভাবে পালন করবেন। এই চুক্তির মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর সীমান্ত দিয়ে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরে নেপালের মাল চলাচলের অনুমতি দান। নেপালী কর্তৃপক্ষ এই চুক্তির পূর্ব রূপায়ণের ওপরেই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

এই সঙ্গে তিনি নেপালের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের পক্ষ থেকে ৪০ কোটি টাকা দেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

তিনি কাঠমান্ডু উপত্যকায় পানীয় জল সরবরাহের সুন্দরিজল প্রকল্পের উদ্বোধন করে এসেছেন। ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পেও ভারত সাহায্য করছে। ১৯৬০ সালের পর থেকে এমনি ছোট-বড় অনেক জল সরবরাহ প্রকল্পে ভারত সহযোগিতা করেছে। জনকপুর ও রাজবিরাজে আরও যে দুটি প্রকল্প সমাপ্ত-প্রায়, তার দ্বারা ২০ হাজার লোক উপকৃত হবেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪০৫টি হ্যান্ড পাম্প বসিয়েও ভারত সাহায্য করেছে।

এই অর্থনৈতিক আতাতের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত বিবৃতির রাজনৈতিক ঘোষণাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উভয় দেশই বলপ্রয়োগের দ্বারা সমস্যার সমাধানের নীতিতে অবিশ্বাসী, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ কেউই পছন্দ করে না, এবং উপনিবেশবাদ, জাতিবৈষম্য ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উভয়েই সমর্থন করে।

এই সহমর্মিতা অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভূগোল ও ইতিহাস যদিও নেপালকে বরাবরই ভারতের কাছে কাছে রেখেছে, তবু কেবল ভূগোল ও অতীতকে আশ্রয় করে কোন বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হতে পারে না।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

বস্ত্রশিল্পের সংকটত্রাণ

ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটের জন্য দায়ী কে এবং এই সঙ্কট সত্য সত্যই কতখানি গভীর সেবিষয়ে মতভেদ আছে; কিন্তু এই শিল্পের সামনে যে কতকগুলি কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই সংকটের লক্ষণগুলি মোটামুটি এই—(১) তুলা এবং সুতা পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং উচিত মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে না। (২) কাপড়ের বিক্রী কমে যাওয়ায় মিলগুলিতে কাপড়ের স্টক জমে যাচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত যে হিসাব আছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কাপড়ের কল-গুলিতে ধুতি, শাড়ী, লং ক্লথ, ড্রিল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্রের ১ লক্ষ ১৭ হাজার গাঁট এবং যেসব কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলির ১ লক্ষ ৭৩ হাজার গাঁট জমে গেছে এবং বাণিজ্য বিভাগের হিসাবে, এটা মিলগুলির পাঁচ সপ্তাহের মোট উৎপাদনের সমান। (৩) মিলে অবিক্রীত কাপড় জমে যাওয়ায় এবং টাকার অভাবে মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক কতগুলি মিল বন্ধ হয়ে গেছে তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। শিল্পের মুখপাত্রদের মতে, এই সংকটে ৪৪টি কল বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ভারত সরকারের হিসাবে প্রকাশ যে, এই ৪৪টির মধ্যে মাত্র ১৮টি কল শিল্পের বর্তমান অসুবিধার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে; বাকীগুলির যন্ত্রপাতি পুরানো ও অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেগুলি বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

এই সঙ্কট শুধু যে বড় বড় "কম্পোজিট মিল"কে (অর্থাৎ যেসব ক একই সঙ্গে তুলা থেকে সুতা তৈরী সুতা থেকে কাপড় তৈরী করা হ সেগুলিকে) আঘাত করেছে তাই বিকেন্দ্রীকৃত পাওয়ারলুম ফ্যাক্টরী গুলিও (যারা শুল্কের দিক থেকে কিছু বেশী সুবিধা পায়) এই সংকটে বিপর্য হচ্ছে। এই বৎসরের প্রথম দিককার তুলন এইসব পাওয়ার-লুম ফ্যাক্টরীকে ২ শতাংশ বেশী দাম দিয়ে সুতা কিনত হচ্ছে। পড়তায় পোষাতে না পেরে ক কাতার আশেপাশে কয়েকটি পাওয়ার-লু ফ্যাক্টরির কাজ বন্ধ করে দিতে বা হয়েছে।

এই সংকটের জন্য ইন্ডিয়ান কট মিলস্ ফেডারেশনের কর্মকর্তারা ক্রমাগ সরকারকে দায়ী করে আসছেন। আমে বাদের সয়াজী মিলসের চেয়ারম্যান শ্রীবদ লাল লালুভাই গত ৩০ সেপ্টেম্বর ত কোম্পানীর সাধারণ সভায় যে-কথাগুলি বলেছেন সেগুলির মধ্য দিয়ে সরকারে বিরুদ্ধে এই শিল্পের মালিকদের অভিম প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীলালুভাই বলেছেন "গত কয়েক বৎসর ধরে সরকার সুতী কাপড়ের শিল্পের উপর ক্রমান্বয়ে নানা বোঝা ও ট্যাক্স চাপিয়ে গেছেন। সুতী কাপড়ের শিল্প এই সব বোঝা কতখানি বহন করতে পারবে তার কোন পরোয় তাঁরা করেন নি। বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী

শিল্প; অথচ দ্বর্ভাগ্যের কথা এই যে, এটা এই দেশের সবচেয়ে অবহেলিত শিল্প। সরকার বস্ত্রশিল্পের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন। ইতিমধ্যে কতকগ্বলি মিল বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরও কতকগ্বলি তাদের উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। যথাসময়ে যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।”

“বস্ত্রশিল্প ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প” শ্রীলালভাইয়ের এই কথায় আংশিক সত্যতা রয়েছে মাত্র। ভারতে তৈরী কাপড় বিদেশের বাজারে রপ্তানী হয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসে একথা যেমন সত্য তেমনি এটাও ভুললে চলবে না যে, তুলা, রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দরুণ বস্ত্রশিল্পকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বেশী কিছু আমদানীও করতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রার এই জমা-খরচে কাটাকাটি করলে শেষ পর্যন্ত বস্ত্রশিল্প থেকে বৈদেশিক মুদ্রার নীট আয় হয় কিনা সেবিষয়েও ইদানীংকালে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

টাকার বাট্টা হ্রাস করার পর এইসব আমদানী পণ্যের মূল্য বেড়ে গেছে; ফলে বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনের ব্যয়ও বেড়ে গেছে। তার উপর দেশের ভিতরে তুলার উৎপাদন কম হওয়ায় তুলা ও সুতা দুর্ঘট হয়ে গেছে। মিলওয়ালারা বলছেন, সরকার তুলার যে সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী দাম কবুল না করলে তুলা পাওয়া যাচ্ছে না।

এই “সঙ্কটের” প্রতিকার করার জন্য শিল্পপতিরা বেশ কিছুকাল ধরে সরকারের উপর চাপ দিয়ে চলেছেন। তাঁরা দাবী করছেন—(১) যেসব কাপড়ের দাম বেঁধে দেওয়া আছে সেগুলির উপর থেকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হোক, অথবা যদি তা করা না হয় তাহলে এইসব কাপড়ের দাম ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে এখন মোট যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হয় হয় তার অর্ধেক হচ্ছে সেই জাতের যেগুলির দাম বেঁধে দেওয়া আছে। বাকী অর্ধেকের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ নেই। বস্ত্র-শিল্পের বক্তব্য এই যে, নিয়ন্ত্রিত মূল্যের কাপড়গুলি এখন পড়তার চেয়েও কম দামে বিক্রী করতে হচ্ছে। সরকার এতদিন পর্যন্ত এই বলে শিল্পের এই দাবী ঠেকিয়ে রাখছিলেন যে, বাঁধা দামের কাপড় বিক্রী করে মিলের যদি কোন লোকসান হয় তাহলে মিলওয়ালারা অনিয়ন্ত্রিত কাপড়ের দাম চড়িয়ে সে লোকসান পুরিয়ে নিতে পারেন।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি না হলেও কতক পরিমাণে, বস্ত্রশিল্পের এই দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেছেন। গত ১লা অক্টোবর থেকে তাঁরা বাঁধা দরের কাপড়গুলির দাম কিছুটা বাড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। পুজো, দশহরা ও দেওয়ালি উৎসবের সময় যখন সারা দেশে কাপড়ের চাহিদা বাড়ছে ঠিক

স্বামী অভেদানন্দ জন্মশতবার্ষিকী

ভারতের বেদান্ত দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা স্বামী অভেদানন্দের শতবার্ষিকী উৎসব ৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির কাছে এক বাণী পাঠিয়ে বলেছেন, বেদান্ত-দর্শন জনপ্রিয় করার জন্য যে ঐকান্তিকতার সঙ্গে স্বামীজী কাজ করে গেছেন তার জন্য আমেরিকার মানুষ আজও তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে।

সেই সময়েই এই মূল্য বৃদ্ধি করা হল। এর ফলে ক্রেতা সাধারণের অসন্তোষ বাড়বে তাতে সন্দেহ কি? এমনিতেই ত' প্রতি বৎসর ঠিক পুজোর আগে রেল গুদামে কাপড়ের গাঁট জমিয়ে রেখে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়াবার কৌশল করেন এবং এবারও সেই একই খেলা দেখা যাচ্ছে। এর আগে গত দুই বৎসরের মধ্যে তিন দফায় কাপড়ের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ৬ থেকে ৮ শতাংশ বাড়ান হয়েছে। সরকার যখন তারস্বরে মূল্য স্থিতির কথা বলছেন, টাকার বাট্টা হ্রাসের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করছেন ঠিক তখনই সরকার কাপড়ের মত এমন একটা অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বাড়াবার অনুমতি দিলেন, এটা দুঃখের বিষয়।

এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটের কতটা সুরাহা হবে সেবিষয়েও সন্দেহ আছে। 'ইস্টার্ণ ইকনমিস্ট' পত্রিকা (গত ৩০ সেপ্টেম্বরের সংখ্যা) লিখেছেন, “মূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্রেতাদের আয় হ্রাস পাচ্ছে এবং তার পরিণামে ক্রেতা প্রতিরোধ গড়ে উঠছে আর এই কারণেই দেশের ভিতরে কাপড়ের বিক্রী কমে গেছে এবং কাপড়ের স্টক জমে যাচ্ছে।”

(২) বস্ত্রশিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ জারী করছেন। বস্ত্রশিল্পের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য নিযুক্ত দুটি কমিটি—স্বামীনাথম্ কমিটি ও শাহ্ কমিটি—ইতিপূর্বে সুপারিশ করেছেন যে, নূতন কাপড়ের কল খোলার জন্য অথবা চালু কল সম্প্রসারণের জন্য সরকারী লাইসেন্স নেওয়ার বাধ্য-বাধকতা তুলে দেওয়া হোক। উদ্দেশ্য হচ্ছে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সংবাদ পাওয়া গেছে যে, বস্ত্রশিল্পকে লাইসেন্সের আওতা থেকে বার করে আনার পথে প্রথম পর্যায় হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার সুতাকলগুলির জন্য লাইসেন্স নেওয়ার নিয়ম তুলে দিচ্ছেন। সরকারের আশা, এই সিদ্ধান্তের ফলে নূতন সুতাকল স্থাপিত হবে এবং সুতার অভাব দূর হতে সাহায্য হবে। শিল্পের মালিকরা অবশ্য এই বিষয়ে এখনও ততটা উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ফুল

সাধনা কর

মানুষের সৌন্দর্য-সাধনায় রুক্ষ মরু পরাজিত, শুষ্ক প্রান্তর সুশোভিত, ঋতুতে-ঋতুতে তাই শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ফুলের অন্ত নেই।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে শুধু নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ফুলের ঐশ্বর্য বিস্ময়-জাগানো।

সংস্কৃত-সাহিত্যে ফুল স্থান লাভ করেছে কেবল কাব্যের অলংকরণে।

ঋতু-বর্ণনা প্রকৃতি-বর্ণনা কিংবা বিরহ-বিরহিণীর বিরহ-বর্ণনা প্রসঙ্গেই সেখানে ফুলের কাব্য-মর্যাদা। প্রাক-আধুনিক যুগেও বাংলা-সাহিত্যে ফুলের তেমন কোন মূল্য দেখা যায় না। বৈষ্ণব-সাহিত্য বা মঙ্গল-কাব্যে সাধারণভাবে অনেক ফুলের নাম মেলে— চম্পক শোন বান্ধুলী নলিনী কমল পদ্ম তিলফুল ইত্যাদি— তবে সবই রূপ-গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। বাস্তবের নানাবিধ ফুল দেখার চোখ ফুটেছে আমাদের একেবারে আধুনিককালে। যতদূর মনে পড়ে, বাংলা-সাহিত্যে প্রথম ফুলের কবিতা দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা 'প্রভাতে পদ্ম'—

সহস্রকরের করে কিবা শোভা সরোবরে
সে-রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস বিস্তার করিয়া বাস
প্রকাশ করিছে নিজ রূপ।

এরপরে পাওয়া যায় হেমচন্দ্রের 'পদ্মফুল'।

বিহারীলাল নিসর্গ-কবি, কিন্তু ফুলের প্রতি আলাদা কোনো কবিতা লেখেননি। রবীন্দ্রযুগেই বাংলা-সাহিত্যে ফুল তার আপন মূল্যে মর্যাদা পেয়েছে এবং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথই তার প্রথম কবি।

ঠাকুর-পরিবারে ফুলের সমাদর বংশগত। হিমালয়-ভ্রমণ প্রবন্ধে মহর্ষিদেবের বৃক্ষ-লতা-পুষ্পাদি-দর্শনে গভীর ভগবৎ-ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শান্তিনিকেতনে বাস করতে এসে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর নীচু-বাংলার বাড়ির চারপাশটি সাজিয়েছিলেন ফুল-ফলের বৃক্ষলতায় এবং তাঁরই পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ সাজিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন বাড়ির চারদিক। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বউঠাকরুণ কাদম্বরী দেবী এসে ছাদের ঘরে বাগান করেছিলেন। দুপুর বেলা 'জ্যোদা' বা জ্যোতিদাদা যখন নীচের তলায় কাছারীতে যেতেন বউঠাকরুণ ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে-কেটে যত্ন করে রূপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন—'নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু-কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপ ফুলের পাপড়ি।'

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ রজনী প্রভাত হতেই তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে ছুটে যেতেন বাগানে—আমের মুকুল, বেল, নরগেস, জুঁই ফুটে থাকত পথের আশেপাশে—

—সে যে কী লাগিত ভালো
সর্বাঙ্গে সুবর্ণ-সুধা অজস্র পড়িত ঝরে
প্রভাতে ফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত
মোরে।'

তরুণ বয়সে কাব্যোন্মত্ততায় রবীন্দ্রনাথ চাদরের কোণে বেলি ফুল বেঁধে ঘুরে বেড়াতেন। একবার বেড়াতে গেলেন গাজিপুরে, শুনেছিলেন 'গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত, অমনি গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি জেগে উঠল মনে, হয়তো তারি সঙ্গে মিশে ছিল ছেলেবেলার সেই স্মৃতি'—বউঠাকরুণের দেওয়া খাবারের উপর গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো। গোলাপের মোহ তাঁকে প্রবলভাবে টেনেছিল। গাজিপুরে গিয়ে অবশ্য সে মোহ সম্পূর্ণ ভেঙেছিল। দেখেছিলেন শুধু ব্যবসাদারের গোলাপ খেত, সেখানে বুলবুল বা কবি কারুরই নিমন্ত্রণ নেই, তবু তাঁর মন ভুলেছিল গোলক-চাঁপার ঘন পল্লবে কোকিলের ডাকে, গাজিপুরে বসে লিখেছেন 'মানসী' কাব্য। 'নৌকাডুবি'র এক অংশের কাহিনী ঘটিয়েছেন সেখানে। ছেলেবয়সে ফুল নিয়ে রোমান্টিকতা কতদূর পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছেছিল সে গল্প পাওয়া যায় 'ছেলে-বেলা' গ্রন্থে। জ্যোতিদাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার শিলাইদহে গিয়েছিলেন মালী রোজ ফুল এনে সাজিয়ে দিত ফুলদানি। রবীন্দ্রনাথের খেয়াল গেল—'ফুলের রস দিয়ে কবিতা' লিখবেন। ফুল টিপে টিপে রস পাওয়া যায় অল্প—কলমের মুখে ওঠে না। একটা কল তৈরি করা চাই। পরিকল্পনা হল—

'ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাটি আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হামানদিস্তের নোড়া হলেই চলবে। সেটা ঘুরানো যাবে দড়িতে বাঁধা একটা চাকায়।'

জ্যোতিদাদার কাছে দরবার জানালেন। ভাইয়েরই দাদা—দেশপ্রীতির ঝোঁকে ফ্লোটিলা কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে ফতুর হয়েছিলেন—অনায়াসে হেসে সায় দিলেন। 'ছুতোর এল কাঠ-কোঠ নিয়ে। কল তৈরি হল। ফুলে-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুল পিষে কাদা হয়ে যায়, রস বেরোয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।'

কাব্য রচনার প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের পুষ্পপ্রীতি ছিল পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের অনুকরণে গতানুগতিক। তাঁর প্র 'বনফুল'—কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কোনো অগ্রাহ্য বনফুলের নাম নেই—শুধু বকুল জুঁই বেল ইত্যাদি। মনে হয় ফুলের ভাবার্থ মাত্র নিয়ে গ্রন্থের দেওয়া হয়েছিল—মানুষের দৃষ্টির ফোটে বনফুল, দৃষ্টির আড়ালেই শুকিয়ে; কিন্তু রসমাধুর্যে সে অ বন-কুসুমের মতোই কবিতাগুলি সুকুমার ও রসমাধুর্যপূর্ণ। পরবর্তী 'ভগ্ন-হৃদয়' গ্রন্থেও আছে কেবল সু নলিনী কামিনী। 'নলিনী' ও 'গোলাপ নাট্য ও কাব্য তাঁর সে যুগের রচনার নানা কারণে বিখ্যাত। 'ছবি ও গ কাব্যের উৎসর্গ ফুলের রূপকে—

'গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লই এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম সে-কাব্যের কবিতা-রূপ ফুল প্রতিদি ফুটে উঠেছে প্রিয়জনের নয়নকিরণপাতে প্রথম দিকের গদ্য পদ্য রচনায় কেবল পাওয়া যায়—নলিনী কুবলয় পদ্ম শতদ অরবিন্দ কুন্দ কুরুবক কেতকী করব কিংশুক অশোক মন্দার পারিজাত জ যূথী সেঁউতী মাধবী মালতী মল্লি চামেলি বকুল চাঁপা গন্ধরাজ শিরী প্রভৃতি। সাধারণ অপরিচিত বা অবহেলি ফুল নিয়ে কাব্য রচনা বহুকাল অব রবীন্দ্র-সাহিত্যেও মেলে না। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কবিগণ কেবল কয়েকটি বিশে ফুলকে কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন, ও সব ফুল ছিল অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। সাহিত সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনা বলেছেন—

'আমি জাতমানা কবিদলের নই, ত বাশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সম বেনুবেন বলে সামলে নিতে হয়েছে...ত কাব্যে কুর্চি ফুলের নাম করবার বেল কিছু ইতস্তত করেছি।'

অল্পবয়স থেকেই বাস্তবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। শিল্পী যেমন একটি সামান্য বস্তু আঁকতে গেলেও আগে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে তার বিশেষ রূপটি ফুটিয়ে তোলেন, তেমনি ভাবেই প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ দরকার কাব্য রচনার জন্যও। না হলে কাব্য সত্য ও সুন্দর হয় না; হয় কাল্পনিক ও গতানুগতিক। কুড়ি বছর বয়সে 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করে বলেছেন—

'প্রাচীনকালের কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা যূথী জাতি প্রভৃতি কতক-গুলি বাগানের ফুল ফুটিত আর কোনো ফুলকে যেন কেহ কবিতায় উপযুক্ত মনে করিত না, আজকাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্র-কায়া সাধারণ চক্ষুর অগোচর তৃণের মধ্যে প্রস্ফুটিত ফুলটি পর্যন্ত ফুটে।'

রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়কার আরেকটি প্রবন্ধে ইংরেজ-কবি শেলির কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ইউরোপের সাহিত্যে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি কত

স্তব, কত সূক্ষ্ম; কবিতা তাই গম্ভীর জীবন-রসপূর্ণ। আমাদের কবিগণের বাস্তবের প্রতি ঔদাসীন্যের অন্ত নেই। বাঙালী কবিদের একজন একটি কাননের যেরূপ বর্ণনা করেছেন আর একজনও ঠিক সেইরূপই করেছেন—'ইহাতে না আছে কাননের শরীর না আছে কাননের প্রাণ।' মালতী মল্লিকা প্রভৃতি ফুল দেখতে সুন্দর এবং কবিতায় সে-সব ফুলের নামোল্লেখ করলে ভাল শোনায়, তাই কবিগণ সে-সব ফুলের নাম ব্যবহার করে থাকেন; ফুলের প্রতি প্রীতি কিংবা প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি সেখানে নেই। আমাদের কবিতা পড়ে আমরা বস্তুরসও আস্বাদন করতে পারি না, কাব্যরসও হয় জোলো। এই জন্যেই বাংলা কবিতা অনন্য হয়ে উঠতে পারছে না এই ছিল তাঁর অভিমত। 'বাঙালী কবি নয় কেন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, সামান্য গুল্মের পর্ণ যতই সুন্দর হোক না কেন বাঙালী তথা ভারতবাসী তাকে মাড়িয়ে চলে যায়, কখনো কৌতূহলী হয়ে খোঁজ-খবর নেয় না, একবার নত হয়ে দেখেও না। 'সকলই তুচ্ছ, কিছুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার নাই।...ঐ অস্থায়ী ফুল যাহা শিক্ষা দেয় তাহা চিরস্থায়ী। সুন্দর দ্রব্যের প্রতি ভালবাসার চর্চা যেমন শিক্ষা তেমন শিক্ষা আর কী হইতে পারে?'

অল্পবয়স থেকেই বিদেশী সাহিত্য ও নিজেদের সাহিত্যের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আধুনিক ও বাস্তবমুখীন হতে পেরেছিল। প্রথম দিকে যে-সব ফুলের নাম তিনি পূর্ব-প্রচলিত রীতি-অনুসারে ব্যবহার করেছিলেন তার অনেকগুলিই তিনি বাস্তবে সঠিক জানতেন না—এখনো কি আমরা নির্ভুলরূপে জানি কোন্‌টা জাতি, কোন্‌টা মাধবী মালতী? কাকেই বা বলা হয়েছে সেঁউতি পারিজাত মন্দার? কোন্ ফুল পারুল আর কোন্‌টিই বা মল্লিকা? রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

"আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষে তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করে নেয়নি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোনো দেশেই দেখা যায় না। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গায়ের জোরে—অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে এসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং জানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নামমালায় রোজই পড়ে আসছি যূথী জাতি সেঁউতি। ছন্দ মিললেই খুসী থাকি, কিন্তু কোন্ ফুল জাতি, কোন্ ফুল সেঁউতি সে-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার উৎসাহ নেই।"

অনেক চেষ্টায় তিনি খবর পেয়েছিলেন জাতি বলা হয় চামেলিকে কিন্তু সেঁউতি-ফুলের সন্ধান পান নি। মল্লিকা ও পারুল সম্বন্ধেও যথাযথ বিবরণ দিতে পারেন নি।

'পথ পাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশী।'—

এর বেশী পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর তো মেলে না। পারুল-দিদির বনে তিনি নিমন্ত্রণে চলেছেন শরৎকালের প্রভাতে, চাঁপাজামের শাখাছায়ের তলে সবাইকে নিয়ে জুটেছেন কিন্তু পারুলের বাস্তব বর্ণনা কোথায়? অনেকে বলেন পারুল একরকমের চাঁপা ফুল। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' গ্রন্থে পারুল-ফুলের যে গাছ আঁকা আছে সেও চাঁপা বলেই মনে হয়। প্রশ্ন জাগে কোন্ চাঁপা তবে পারুল?

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে সাতটি চাঁপা ভাই
রাঙা-বসন পারুলদিদি তুলনা তার নাই।—

কবিতাটি প'ড়ে ধারণা হয় স্বর্ণ-চাঁপা বা কনক-চাঁপাকেই রবীন্দ্রনাথ পারুল বলেছেন। আরেকটি কবিতায়ও আছে—

পারুলদিদির বাসায় দোলে
কনক-চাঁপার কাঁচ কুঁড়ি।

কুটজ বা কুরচি ফুলকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বসন্তের ফুল। ওদিকে কালিদাসের বিরহী যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনে কুটজ-কুসুমের অর্ঘ্য রচনা করে নব-মেঘকে প্রার্থনা করছে দূতরূপে তার প্রিয়ার কাছে যেতে। শান্তিনিকেতনে কুটজ বা কুরচি গাছ প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে ফুলটি বসন্তেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ফোটে—গাছে একটিমাত্র পাতা থাকে না, সাদা ফুলের স্তবকে গাছ ছেয়ে যায়; সুন্দর মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। বর্ষাকাল অবধি সেই ফুলেরই অবশেষে রয়ে যায়—সবুজ-পাতার মধ্যে তখন সাদা স্তবকের শোভা। কুরচির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথের কুষ্ঠিয়া স্টেশনে—চারদিকে হাট-বাজার, রেল লাইন, গরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়, তারই পাশে সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—

'তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয় ঘোষণা করছে—উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়।'

রবীন্দ্রনাথ মাধবী আর মালতীর পরিচয় ভালভাবেই জেনেছিলেন—কিন্তু এখনো এই দুই ফুলের মধ্যে গোলমাল আমাদের সর্বসাধারণের ঘোচে নি। মাধবী নিছক বসন্তের ফুল। স্বল্পস্থায়ী, শীতের শেষে প্রথম যখন বাতাসে গরমের আমেজ লাগে ঠিক সেই সময়ে প্রথম বসন্তের স্পর্শে সে ফুটতে থাকে। অল্প দিন পরেই তার ফোটা ফুরিয়ে যায়। ফুলটি সাদা, মাঝখানে একটু হলুদের আভাস, অপূর্ব গন্ধ। ফুটবে কি ফুটবে না, এই দ্বিধা করতে করতে যেন তার ফোটার শুরু ও শেষ, রবীন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেন—

হে মাধবী, দ্বিধা কেন
আসিবে কি ফিরিবে কি।

শান্তিনিকেতনে শালবীথির মাঝখানে 'শান্তিনিকেতন' দোতলা-অট্টালিকার সোজা যে দক্ষিণ দিকের লতাবিতান তাতে মাধবী মালতী দুটি ফুলের লতাই রয়েছে। সেখানে মালতী লতারই প্রাধান্য কিন্তু প্রথম বসন্তে বায়ুকে গন্ধে আমোদিত ক'রে মাধবী গৃহ-বাসী মানুষকে বাইরে টেনে আনে। মালতী বর্ষার ফুল, তবে শরতেও ফোটে। চারটে বাঁকা পাপড়ি, ধবধবে সাদা, সুতীব্র গন্ধ। রবীন্দ্রনাথ—

আষাঢ়ের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসিও দেখেছেন—

আবার শরৎকালে 'মালতী লতার খোঁজ নিয়ে যায় মৌমাছি দুই বেলা'ও জেনেছেন। এই থেকেই জানা যায় রবীন্দ্রনাথ নিছক নামমালায় পড়া ফুল ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, ফুলের প্রত্যেকটির বিবরণ জানতেও উৎসুক ছিলেন। ডালিম-ফুলকে তিনি বসন্ত ও গ্রীষ্ম দু সময়েরই বলেছেন—

দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগলভ রক্তিম রাগে
মাধবিকা হোক সুরভি-সোহাগে
মধুপের মনোহরা।

আবার 'বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে-রাগ-রঙিগমা' সেও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। চামেলিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নানাভাবে পাওয়া যায়; বিশেষ করে শিরীষ যেমন কবিকে তার পেলবতা ও স্নিগ্ধ সুবাসের দ্বারা অভিভূত করেছে চামেলিও তেমনি মুগ্ধ করেছিল—সে যেন বাস্তবের নয়, স্বপ্ন-রাজ্যের অপরূপ ফুল — 'ঘরে বাইরে'তে বিমলার স্বপ্নলোকে যে-রাজপুত্র বিরাজ করেছিল তার দেহখানি 'যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া'; জ্যোৎস্না রাতে যে রূপ ভাসে সে 'দেহহীন চামেলি লাবণ্য-বিলাসে'। চামেলি-বিতানের ছায়ায় বসে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন কবিতা, ময়ূর এসে বসত লতার বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে—নির্ভয়ে নিঃসংকোচে কবির লেখায় করত নির্বিকার-দৃষ্টিক্ষেপ। একদিন ময়ূরটি অন্য সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কোথায় গেল চলে, কবিও চলে এলেন সেই চামেলির সুগন্ধ ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায় কিন্তু অন্তরে রয়ে গেল তার ছাপ। সে কথা কবির মনে পড়েছে যখন তিনি জানতে পেরেছেন মৃগয়া-বিলাসী ইংরেজ এক দ্বীপ থেকে ময়ূরকে ভুলিয়ে অন্য দ্বীপে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছে। আদি কবির অভিশাপ-বাণী আজকের কবি পুনরায় উচ্চারণ না করে থাকতে পারেন নি। এই কবিতাটি লেখা শান্তিনিকেতনে, কিন্তু কোথায় ছিল এই চামেলি বিতানটি, এখন কি কেউ আর বলতে পারবে?

কুন্দ-ফুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়তো স্পষ্ট ছিল না—তিনি যাকে কুন্দ বলেছেন সে-ফুল ফোটে শীতের আগে।

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এল চলি
তার পানে হায় শেষ-চাওয়া চায়
করুণ কুন্দ-কলি।

প্রকৃতপক্ষে কুন্দ ফোটে শীতের মাঝামাঝি থেকে প্রায় পুরো বসন্ত। মাঘের শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পুজোয় কুন্দফুলের মালা পরানো হয়ে থাকে। তবে ফুল-সম্বন্ধে এরকম কাল-বৈষম্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে। গতানুগতিকতার বিধিনিষেধ ভেঙে ফেলে ক্রমে-ক্রমে তিনি অচেনা ফুলকে বিশেষ বিশেষ রূপে

দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন আমাদের। অশোক পলাশ কিংশুক রঙ্গন শেফালি কাশ প্রভৃতি বিখ্যাত ফুলগুলি গাঁথা পড়েছে তাঁর হাজার গানে গদ্যে পদ্যে। ফুলকে ভালবেসে তাঁর নাটকের নাম 'রক্ত-করবী',—তার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন মৃত্যুঞ্জয়-প্রাণের রূপ, কঠিন শুষ্ক পাথর ভেদ ক'রেও যে ফুটে ওঠে আনন্দে। মানুষের প্রেমের মধ্যে যেমন আছে মাধুর্য তেমনি আছে ভয়। নন্দিনীর রক্ত-করবীর আভরণে তাই ফুটে ওঠে রঞ্জনের ভাল-বাসার রঙ; সেই রক্ত আভায় অধ্যাপকের কাছে ধরা পড়ে 'একটা ভয়-লাগানো রহস্য'। নাটকের নাম রবীন্দ্রনাথ তিনবার পরিবর্তন করে পছন্দ করলেন 'রক্তকরবী' নামটি। উপন্যাসের নাম করলেন 'মালঞ্চ'—নানা ফুলের নাম রয়েছে সেখানে। কাব্যগ্রন্থ 'মহুয়া',— যৌবন-মদিরা-রসপূর্ণ 'মহুয়া' কাব্য ফুলে-ফুলে বিকশিত। এছাড়া আছে আকন্দ ধুতুরা সজনে সেগুন জারুল সোঁদাল কন্টিকারী বাতাবী-লেবু তেঁতুল গুলঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-বাদী নন এবং কেবল অভিজাত-শ্রেণীর কবি,—এই রকম একটা ধারণা আমাদের মনে প্রায় বদ্ধমূল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো আভিজাত্যহীন-ফুলের কবি শুধু বাঙলা-সাহিত্যে নয়, যে-কোনো সাহিত্যে ক'জন মেলে? পথের ধারে অজস্র ফুটে থাকে আকন্দ কন্টিকারী জারুল সেগুন সোঁদাল। কে বা চেয়ে দেখে? অযত্নে অবহেলায় তারা আপন শোভা বিলায়। 'নীল বরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু এঁকে' ফুটে আছে যে কন্টিকারী মাটির বুকে তার 'নীল সোনালীর বাণী'র তাৎপর্য ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে; দুঃখদিনের দুর্ভাবনার প্রচন্ড পীড়নের মধ্যেও সে শান্তি এনে দেয় কবির মনে। তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেন—

'সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি
কুঁকড়ে গিয়েছে;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই।'

ক'জন কবি এমনভাবে চেয়ে দেখেছেন প্রতিটি ফুলফল গাছপালা? 'সাহিত্যের ধর্ম'-প্রবন্ধে কবি বলেছেন যে সজনে-ফুলের সৌন্দর্যের অভাব নেই, তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে-ফুলের নাম করেন না। "ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো। বকফুল, বেগুনের ফুল, ঝুমকো ফুল, এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা—কেন না পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডালনায় লাগত তাহলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হত।"

যিনি এমনি কথা লিখেছেন তিনিই সব বাধা ভেঙে ফেলে কবিতা লিখেছেন তেঁতুল ফুলের—নগণ্য অপাংক্তেয়, নিতান্তই খাদ্যবস্তুর ফুল, সাধারণেও যাকে চোখে দেখে না।

'জীবনে অনেক ধন পাইনি
নাগালের বাইরে তারা
হারিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী
হাত পাতিনি বলেই।
সেই চেনা সংসারে
অসংস্কৃত পল্লী-রূপসীর মতো
ছিল এই ফুল মুখ-ঢাকা,
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে
এই তেঁতুলের ফুল।'

লেবু চাঁপা গোলকচাঁপা কাঞ্চন কুরচি—এরা সব রূপে রসে গন্ধে কবিকে ডাক দিয়েছে বারে বারে। কিন্তু তেঁতুলের ফুল—

'লাজুক একটি মঞ্জরী
মৃদু বাসন্তী রঙ
মৃদু একটি গন্ধ
চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে'

সে সহজে কারুর চোখে পড়ে না। কবির চোখেও সহসাই একদিন ধরা পড়ল, একে-বারে প্রৌঢ় বয়সে। তেঁতুলের বৃহৎ রূঢ় আকৃতির অন্তরে যে সুন্দর-শুভ্র-নম্রতা রয়েছে সে পরিচয় জানলেন তিনি তার ফুলের পরিচয়ে। বললেন—

'তেঁতুল যেন গন্ধর্ব চিত্ররথ
যে ছিল অর্জুনবিজয়ী মহারথী',

যে গোপনে করত সংগীত ও সৌন্দর্যকলার সাধনা। তিনি বলেছেন তরুণ বয়সে সে-ফুল যদি পড়ত চোখে ফুলের মর্যাদা দিতেন প্রেমের অর্ঘ্য রচনায়—

'যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্নে
তবে একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওঠা
আঙুল দিয়ে
কোন একজনের আনন্দে-রাঙা
কর্ণমূলে'।

যে তেঁতুলকে কালিদাস শকুন্তলা-কাব্যে বিদূষকের মুখে খেজুরের চেয়েও তুচ্ছ বলে করেছেন অবহেলা, সেই তেঁতুলের ফুলকে রবীন্দ্রনাথ পরম মূল্য দিয়েছেন প্রেয়সীর কর্ণমূলে পরাবার গৌরব দিয়ে। এর থেকে এ সত্যই ধরা পড়ে যে কবির সৌন্দর্য-বোধ বস্তু-নিরপেক্ষ, খাদ্য বা পূজা—কোনো শ্রেণীর শুচিবায়ু সে মানে না। বস্তুকে বিশেষ একটি দৃষ্টিতে দেখে বরণ করে নেয় কাব্যে। যে সজনেকে কবিগণ করেছেন অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের কাছে তার বারম্বার সমাদর—'সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী' 'সজনে-ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়' প্রভৃতি পড়তে পড়তে পাঠক-মনে সজনে তার গদ্যের স্থূল-রস ধুয়ে মুছে কি কাব্যরসে অপূর্ব হয়ে ওঠে না? এছাড়া রবীন্দ্রনাথ কতখানি যে 'ব্রাত্য' সে বোঝা যায় তার 'মহুয়া' কবিতা প'ড়ে।

'বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি
নাহি ঘুচিবে কি
অশোকের অতি খ্যাতি বকুলের
মুখর সম্মান?
ক্লান্ত কি হবে না কবিগান
মালতীর মল্লিকার
অভ্যর্থনা রচি বারম্বার?
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর
লঘুধ্বনি তার
উচ্চশিরে তবু রাজ-বনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধ্বে ধরে।'

চিরদিনই কি কবিগণ মাহাত্ম্য ঘোষণা করবেন কেবল অভিজাতদের। চোখ মেলে দেখবেন না অখ্যাতকে? 'মহুয়া' নামের মধ্যে যে রোমান্টিক মদিরতা তাকে কি বুঝেছেন কোনো কবি? প্রথমে যে নারীকে ভালবেসে-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন 'নলিনী', বিয়ের পরে স্ত্রীর ভবতারিণী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হয়েছিল 'মৃণালিনী', একে-বারে শেষ-জীবনে নূতন রোম্যান্টিক আবেগ জাগিয়ে দিল 'মহুয়া'। কবি বলে উঠলেন—

যে-বধূরে ভাবি মনে, কানে-কানে কহি
আমি তোরে
যদি তার দেখা পাই ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

পরে আরো গাঢ় রসবন্ধ করে লিখলেন—

কানে -কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব ডাকিব মহুয়া
নাম ধ'রে।

'ঐকতান' কবিতায় কবি ডাক পাঠিয়ে-ছেন অখ্যাতজনের নির্বাকমনের কবিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেই কি সে-কবির অগ্রদূত বলা যায় না? অখ্যাত অজ্ঞাতদের প্রতি তাঁর যে গভীর প্রীতি ছিল তার কতটুকু হিসাব আমাদের জানা? সে-হিসাব মেলালে ধরা পড়ত আমাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তির অভাব, ধরা পড়ত সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কতখানি বাস্তববাদী ছিলেন এবং আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন কীভাবে ঘটানো উচিত। পূর্ববর্তীকে নিরখ না ক'রে পরখ না করে পরবর্তীগণ কখনোই সম্যক অগ্রসর হতে পারে না।

* * *

রবীন্দ্রনাথ অনেক দেশী-বিদেশী ফুলের নাম দিয়েছেন—মধুমঞ্জরী, নীল-মণিলতা, রক্তমুখী, হিমঝুরি, সোনাঝুরি, বনায়ন ইত্যাদি। ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। মানুষ তাকে নাম দিয়ে আপনার মনে স্থান দেয়। এমনি অনুৎসুক আমরা যে, রবীন্দ্রনাথের—দেওয়া-নামের অনেক ফুল এখনই সঠিক জানি না। কোন্ ফুলের নাম দিয়েছিলেন মধুমঞ্জরী? জিজ্ঞেস করলে অনেকেই বলতে পারবে না। কেউ কেউ বলেন বাংলায় যাকে হরগৌরী মধুমালতী প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে, রবীন্দ্র-নাথ তাকেই বলেছিলেন—মধুমঞ্জরী। একই পাপড়ির অর্ধেক অংশ লাল, অর্ধেক সাদা—তাই তার নাম হরগৌরী। কিন্তু এ-ফুল সম্পূর্ণ বিদেশী। কবিতার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এ-লতার কোনো একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে—জানি নে, জানার দরকারও করে না। আমাদের দেশের মন্দিরে এ-লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরের যে-দেবতা মুক্ত-স্বরূপ আছেন, তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত।' এই বিদেশী লতায় ফুল ফোটা দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।

'প্রত্যাশী হয়ে ছিন্‌ এতকাল ধরি
বসন্তে আজ দুয়ারে আ মরি মরি
ফুলমাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি
মধুমঞ্জরী লতা।'

কে এনেছিলেন এ-লতা আশ্রমে সে জানা নেই। আরেকটি ফুল 'নীলমণিলতা' আশ্রমে এনেছিলেন বিদেশী আশ্রমকর্মী পিয়ার্সন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীল-ফুলের স্তবকে-স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করে দিল। উন্মোধিত করলে কবিকে। নীলরঙে ছিল তাঁর গভীর আনন্দ। নীল ফুলের বাণী তার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন ছোঁয়া দিয়েছে অন্তরে। কবির দিক থেকেও কিছু বলার ইচ্ছা হত কিন্তু ফুলের নাম জানা ছিল না, সম্ভাষণে ছিল বাধা। উত্তরায়ণে পোষা ময়ূর থাকত, সে ঐ নীল ফুলের সঙ্গে মিশিয়ে দিত বাহার। কবি যখন রয়েছেন দূরে বিদেশে অচেনা পরিবেশে, অভ্যাসের সীমা ও চৈতন্যের সংকীর্ণতা যখন গেছে ঘুচে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কাব্যের প্রেরণা—

'যেদিন বিতানচ্ছায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে
একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম 'কেন এ
কে জানে?'

দুই নীলের অপরূপ মিলন—এ কার কৌতুক! রহস্যে বিস্ময়ে ভরেছে কবি-চিত্ত। বাঁশির তানে ডাক দিয়েছে তাঁকে—

'আমি আজ কোথা আছি,
প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে
তব নীল-লাবণ্যের বংশীধ্বনি
দূর শূন্যে বাজে।'

শান্তিনিকেতনে আরো দুটি ফুল আছে, প্রায় একই রকম দেখতে, হাসনাহানার মতো—একটি ফুলের গন্ধ তীব্র-মধুর, আরেকটির গন্ধ মৃদু-স্নিগ্ধ। কী তাদের প্রকৃত নাম খুব কম লোকেই জানে। আশ্রমে প্রচলিত নাম—'বনপুলক' আর 'বন-জুঁই'। রবীন্দ্রনাথই নাকি এ-দুটি ফুলেরও নামকরণ করেছিলেন। বিলিতি নিমের নাম দিয়েছিলেন হিমঝুরি বা বকায়ন। হলদে-ঝুরি-নামা ফুলের নাম হল সোনাঝুরি। মন্দিরের রাস্তার পাশে আছে বিদেশী ফুলের গাছ—রক্তমুখী, বড় বড় গাঢ় লাল ফুল।

আশ্রম থেকে যখন গেছেন দূরে, আশ্রমের নানা ফুল তাঁকে আহ্বান করেছে অন্তরে অন্তরে। বিদেশে হোটেলের এবং শহরের কোলাহল থেকে উদ্দামবেগে আসতে চেয়েছেন পালিয়ে। ভোরবেলা উঠে হোটেলের জানালায় বসেছেন, উত্তরায়ণের গাছগুলির শান্তির মধ্যে আসবার জন্যে হয়েছেন ব্যাকুল,

'মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায়; প্রথম প্রীতির বর্ণবিহীন প্রকাশরূপে দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে।' কারণ, 'পরম সুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু বিদেশী ফুলের নাম দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর কাব্যের ডালি সাজিয়েছেন বিদেশী ফুলের নানা গুচ্ছে, রঙে-রসের স্বাতন্ত্র্যে। কখনো দেখেছেন—

'ডান দিকেতে অফলা এক
পিচের শাখা ভ'রে
ফুল ফোটে আর ফুল
প'ড়ে যায় ঝ'রে।'

কখনো পথে দেরী হয়ে যাওয়াতে ঈপ্সিত ফুল ফোটা দেখা হয় না, নতুন ফুল-ফোটা দেখে মনের আনন্দ-পিপাসা মেটাতে হয়—

'পথে হল দেরী, ঝরে গেল চেরী
দিন বৃথা গেল প্রিয়া
তবুও তোমার ক্ষমা হাসি বহি'
দেখা দিল আজেলিয়া।'

বিদেশী ফুলের বিরাট নামও অনায়াসেই তিনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন—

প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ-কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোড্রেনডন-গুচ্ছ।

বিদেশী ক্যামেলিয়া ফুলকে তিনি অপরূপ মর্যাদা দিয়েছেন সাঁওতাল মেয়ের কালো চুলের শোভাবর্ধনে।

ফুলের দোসর শিশু—শুভ্রতা ও পবিত্রতার প্রতীক, সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎস। অতি ছেলেবেলা থেকে ফুলের প্রতি শিশুর প্রবল আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যে ফুল তাই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সে কেবল কবিতার ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে নি, সৌন্দর্যচ্ছবিই মাত্র অঙ্কিত করে নি, স্নিগ্ধ-মধুর কাব্য-রসের সঙ্গে সূক্ষ্ম সমন্বয় ঘটিয়ে ফুলের রূপায়ণ সার্থক করেছে।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে
সকাল-বেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।
শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এল
টগর ফুটিল মেলা
মালতী-লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুইবেলা।

শিশুর মনে লাগে ছন্দের দোলা, শরতের ছবি অন্তরে ওঠে স্পষ্ট হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে যায়—শিউলি, মালতী, শরতের ফুল।

যখন সে পড়ে—
তারাগুলি নিয়ে বাতি
জেগে ছিল সারা রাতি
নেমে এল পথ ভুলে
বেল-ফুলে জুঁই-ফুলে।

শিশু-চিত্ত ভরে ওঠে আনন্দে বিস্ময়ে। 'তাই তো, ঐ যে রাতে সারা আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে ছিল, কোথায় কোন্ সুদূরে ঝিকমিক করছিল, ভোরবেলা কি তারাই নেমে এসেছে তার আঙিনায় বেল-ফুল, জুঁই-ফুল হয়ে: তারারই মতো ফুটে আছে গাছ ভরে লতা ছেয়ে। আনন্দিত শিশু চলে যায় অনায়াসে কল্পলোকে—আলোর অশোক-ফুল চুলে গুঁজে দিয়ে রামধনু খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। শিশুর মজার অন্ত থাকে না যখন সে পড়ে—যে, 'কবে উড়ে যাবো' ভাবতে-ভাবতে ফুল একদিন সত্যি-সত্যি ডানা মেলে দিয়ে 'প্রজাপতি হল, তারে কে কাড়িবে আলা'। সৃষ্টিলীলার নিগূঢ় রহস্য অতি সহজে তার অন্তরে প্রসারিত হয়ে যায়। সৃষ্টিতে তো অসম্ভব কিছু নেই, সৃষ্টি ছাড়াও কিছু নেই। ইচ্ছা থেকেই হওয়া। ইচ্ছে,—সেই তো ভাঙছে সেই তো গড়ছে সেই তো দিচ্ছে-নিচ্ছে। স্রষ্টার ইচ্ছার সৃষ্টির রূপান্তর। এই যে গাছগুলি আগের দিনও যার ডাল ছিল খালি, আজ সে কেমন করে ফুলে-ফুলে ভরে ওঠে। গাছের ভিতর কোথায় আছে ফুলেদের বাসা, যেই বাতাসে-বাতাসে বের হবার ডাক পড়ে, গাছের পাতায় পাতায় ইচ্ছার চাঞ্চল্য জাগে, লুকানো ঘরের কোণ থেকে ছুটে আসে ফুলের দল। খোকা নিজে কোত্থেকে এলো এও যেমন একটা মস্ত জিজ্ঞাসা, ঐ ফুলগুলো কোত্থেকে আসে এও তার বিরাট প্রশ্ন। ছোট ছেলেটির মনে যে-বিস্ময় সে-বিস্ময় রবীন্দ্রনাথেরই ছেলেবেলার। মহর্ষিদেবের সঙ্গে এগার বছর বয়সে তিনি যখন হিমালয় যান তখন-কার দিনের মনোভাব 'বনবাণী'তে 'হাসির পাথেয়' কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন—

এদিকে ডানপাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্য খেত, হলদে-ফুলে ছাওয়া, দেখে-দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না—কেবল ভাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ কেন হয়।'

শেষ জীবনে সে বিস্ময় নিয়েই লিখেছেন—

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির-বিন্দু।

শুধু শৈশব নয় যৌবন-সরসী-নীরে মিলন-শতদল ফুটে টলমল করে, প্রাণী-জগতের বংশাবলী রক্ষা হয়। বস্তুগত হিসাবে ফুল বৃক্ষের বংশাবলী রক্ষার জন্য একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল না, আদি-অবস্থায় বৃক্ষের বংশবৃদ্ধিতে ফুলের কোন কাজ ছিল না। ফার্ন জাতীয় গাছে এখনো ফুল ফোটে না। বলা যায়, স্রষ্টার সৌন্দর্যা-ভিলাষে এবং বৃক্ষের সমগ্র সাধনায় ফুল বিকশিত হয়ে উঠেছে। আজ যৌবনের প্রতীক প্রস্ফুটিত ফুল, রূপে-রসে বর্ণে-গন্ধে স্পর্শে সুসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় প্রেমের উদ্বোধনে রূপ-বিকাশে সম্ভোগে ও নিবেদনে ফুলের ব্যঞ্জনা। নির্বাক-মনে কথা জেগে ওঠে,—যেদিন বনে ফুলের ভারে ভারে মাধবী শাখা নীচু, সেদিন যে-কথা আর কাউকে বলা হয় নি সে কথা বলার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'শিরীষবন নতুন পাতা-ছাওয়া
মর্মরিয়া কহিল 'গাহো গাহো'।
মধুমালতী গন্ধে-ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।'

* * *

যাবার দিনেও কবির একটি কথা—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে
যে শতদল-পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই।

ফ‍ুলকে তিনি স্বাভাবিকভাবে দেখতেই ভালবাসতেন। সাজান গাছ সুসংযত ছিল বাড়ির বাগানে, আর তারই সংগে ছিল ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি লাভ করেছে ঐ সোনাঝুরি ও ইউক্যালিপটাস—'সৌন্দর্যের মর্যাদা যার আপন মূর্তিতে।' কেন না, সেই পাওয়াই তো সত্য করে পাওয়া যা পাওয়া যায় ফুলের ডালে-পালায় মিশিয়ে।

পাতার ভিতর থেকে
তার রঙ দেখা যায় এখানে সেখানে
গন্ধ পাওয়া যায় হওয়ার ঝাপটায়
চারদিকের খোলা-বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।

তাঁর মতে ফুল মুঠোয় ধরবার জন্যে নয়, নির্লিপ্ত হয়ে, তাকে আপন স্থানে আপন সৌন্দর্যে মানবার জন্যে। ফুল হচ্ছে সুন্দরের দূত, অপ্রয়োজনের আনন্দ দানেই তার সার্থকতা। "প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধা-নির্বৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা প্রয়োজনের আনন্দ।" তাই তো মোহম্মদ বলেছেন—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

* * *

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা।
(অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

'জাপান-যাত্রী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জাপানীদের ফুলপ্রীতি সম্বন্ধে বলেছেন—

'এখানে যে লোক অত্যন্ত গরীব সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা করেও এক-আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা, এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।'

এই গৌণ আনন্দ ও সৌন্দর্য-সম্ভোগকে নিয়েই মানুষ তথা কবির কারবার—সভ্যতার নব-নব রূপে বিকাশ। কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা পণ করে বসে তখন সে 'প্রজনার্থং মহাভাগার' কথা মনেই রাখে না। এই বেহিসাবী সৃষ্টি এবং আনন্দ-রূপকেই সে সৃষ্টির ঐশ্বর্য বলে জানে। 'সমস্ত দিন কেবল সোনার তাল খুঁড়ে' এনে তারই মধ্যে 'একটু সময় চুরি করে' মানুষ চায় যাকে ভালবাসে তারই জন্যে ফুল খুঁজে আনতে। অনেক খুঁজে পেতে রক্তকরবী ফুল যখন মেলে সেই আনন্দে সকল মারের মুখের উপর দিয়ে রোজ সে ফুল জোগান দিতে চায়। কবি হতে চায় তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর মালঞ্চের মালাকর। রাজদূতের পদ, রাজ-সম্মান, ধনজন-প্রতাপ-প্রতিপত্তি সকল হয়ে যাক তুচ্ছ, সে চায় নিভৃতে একা সৌন্দর্যলোক রচনা করে প্রিয়জনকে প্রীতি দান করতে। যে অরণ্য-পথে বসন্তে শরতে প্রত্যুষে অরুণোদয়ে কল্পনা-লক্ষ্মীরূপিণী প্রিয় নারী বিচরণ করে

'সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি। পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশ-তৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে।'

ফুলের সাজে সে সুসজ্জিত করে কল্পনাময়ীকে, যে মঞ্জুমালিকাটি সে করবী বেষ্টন করে পরবে সন্ধ্যাকালে, সে মালা সুবর্ণ পাত্রে এনে দেবে বিনামূল্যে। প্রভাতে ফুলের কঙ্কণ গড়ে পদ্মকলিকাসম নারীর মূর্তিখানিতে পরিয়ে দিয়েই তার শ্রেষ্ঠ লাভ। তারপরে পুষ্প-সুষমাতেই আত্ম-সমর্পণের মাধুর্য—

অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি দিব পদতলে চরণ-অংগুলি প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার।

নিছক জৈব দেহ-রক্ষার উপরে মানুষের এই রোমান্টিক স্বর্গ-রচনা। রাজা যখন তাঁর রাজভণ্ডারের সবকিছু উজাড় করে পুরস্কার দিতে চান, কবি শুধু বলেন—

কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।

* * *

রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙলা কাব্যে 'ফুলের ফসল' ফলিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নানা রূপে, নানা ছন্দে। এ বিষয়ে গদ্যে 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যক' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তর-সাধক।

বাঙালী ফুলপ্রিয় নয়, ফুলের ভূষণে বাঙালী মেয়েরা প্রতিদিন সাজে না মারাঠী মাদ্রাজী মেয়েদের মত। ফুল দিয়ে গৃহ সজ্জিত করা আধুনিকতম ফ্যাশন হলেও সাধারণ বাঙালী শুধু পুজোয় ফুল ব্যবহার করে আর বিয়েতে করে তার ফুলশয্যা রচনা। কিন্তু তার ধর্ম সাহিত্য ও শিল্প ফুলের ঐশ্বর্যে ভরা। বিশেষ করে ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুল পদ্ম বা শতদলের ব্যবহার নানারূপে নানা অর্থ-ব্যঞ্জনায়। সাহিত্যে সংগীতে হৃদ্-কমল হৃদ্-পদ্ম চরণ-কমল চরণ-পদ্ম কমল-কলিকা করপুট মৃণাল-ভুজ, মৃণাল-বাহু প্রভৃতি বহু শব্দ প্রচলিত। ভারতীয় শিল্পে পদ্মের পাতা, পাপড়ি, মৃণাল, সকলই রূপকল্পে প্রযোজ্য। শাক্ত ধর্মে শক্তির রূপ-বিকাশ শতদল-শোভায়—

ষট্‌চক্রের চতুর্দল ষট্‌দল অষ্টদল শতদল সহস্র দলে রূপমাধুরী বিকশিত হয়ে শিব-পার্বতীর পরম মিলন। শতদল প্রেমের পরিপূর্ণতার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

মিলন-শতদলে
তোমার প্রেমের অরূপমূর্তি
দেখাও ভুবন তলে।

এই মিলন-গৌরবে সমগ্র জগতের স্থূলে সূক্ষ্মে ক্ষুদ্রে বৃহতে সকলের সংগে সকলের ঐক্য, সান্তের মধ্যে এসে মিলে অনন্ত। এই সৌন্দর্যের ঐক্য দেখেই ভিক্টর হ্যুগো গেয়ে উঠেছিলেন—মহিয়সী মহিমায় আগ্নেয়-কুসুমে যে-সূর্য তাকে দেখে তাঙা এক ভিত্তির 'পরে শুভ্রদলগুলি বিকাশ করে অতি-ক্ষুদ্র এক ফুল আনন্দে বলে ওঠে—

'লাবণ্য-কিরণ-ছটা
আমারো তো আছে।'

'লক্ষান্তরোৎকর্শচ জলেষু পদ্ম'।
একেবারে কিশোর-বয়সে 'আলোচনা' গ্রন্থে এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি যে ফুল ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গূঢ় ঐক্য আছে......যে-সৌন্দর্য ফুল হইয়া সেই সৌন্দর্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে।'

ফুলের এই বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যকে তিনি বর্ণে-গন্ধে ধ্বনিতে মিলিয়ে ঐকতান সৃষ্টি করেছেন—

'অজস্র মিশায় বিহংগম
ফুলের বর্ণের সংগে ধ্বনির সংগম।'

আরেক স্থানে বলেছেন—

'আকাশে বাতাসে—
বর্ণের গন্ধের উচ্চ হাসে
ধৈর্য নাহি রহে।'

সৌন্দর্যবিকাশের সংগে ফুলের তুলনা দিয়ে বলেছেন—

'আমার গংগাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গংগার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্ম ফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।'

যে প্রেমের তুলনা নেই তার তুলনা একমাত্র ফুল, সে অলৌকিক অনির্বচনীয়—

'তুমি আছ, তুমি এলে
এ বিস্ময় মোর পানে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।'

ফুলের মূল্য কেবল ফুলের কাছে নয়, শুধুমাত্র বস্তুগতও নয়, ইন্দ্রিয়ের পরপারে অতীন্দ্রিয়ের অনির্বচনীয়তায় তার প্রকৃত মূল্যায়ন। কতদিন তো ফুল ফুটেছিল, বৃক্ষলতায় শাখায় শাখায় দুলেছিল পশু-পাখী কীট পতংগ সকলের কাছেই ছিল তার বস্তু-মূল্য। মানুষ এসে অন্তরেন্দ্রিয়-মূল্যে তাকে পেল বস্তুর অতীতরূপে—শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণতায়। এই বাস্তব পৃথিবীর সোনার লঙ্কাপুরীতে সে সৌন্দর্যের দূত হয়ে এল সংসারপারের সৌন্দর্যলোকের খবর নিতে।

'সংসারের সোনার লংকায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি......কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ওই ফুল।' তাই যুগে যুগে সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষের উপর মানুষের শুভ্র পবিত্র কামনা —ফুলের মতো সহজ সুরে জীবন মন সুন্দর হোক্ রমণীয় হোক্। কবি মেশিন-গানের সামনে দাঁড়িয়েও ছোট একটি ফুলেরই জয় ঘোষণা করেন—

সেদিন যেন দয়া আমায় করেন ভগবান
মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান।

॥ ৩৬ ॥

তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় সেটা ১৯৪২ সালের জ‌ুন মাসের শেষাশেষি কোন একদিন। হঠাৎ দেরাদ‌ুন থেকে সাধনা ট্রাঙ্ককলে আমাকে বলল, বোম্বাইয়ের কোন এক চিত্রনির্মাতার কাছ থেকে সে একটা হিন্দি ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে প্রস্তাব পাচ্ছে; পারিশ্রমিক তারা খ‌ুব ভালই দেবে—সে কি এই প্রস্তাবে রাজী হবে?

আমি দেখলাম, আমার হাতে তখন কোন কন্ট্রাক্ট নেই; শ‌ুধ‌ু পরলোকগত শেঠ স‌ুখলাল কারনানির সঙ্গে একটা ছবির বিষয়ে সামান্য কিছ‌ু আলাপ-আলোচনা হয়েছে মাত্র। স‌ুতরাং এ অবস্থায় আমি সাধনাকে কি করে বলি, বোম্বাইয়ের কোন কন্ট্রাক্টে তুমি এখন সই করো না। মনে হল, সে যদি অন্য কোন পরিচালকের অধীনে কাজ করতে চায়, তাতে আমি বাধা দিতে যাই কেন। তাই তার ট্রাঙ্ককলের উত্তরে আমি জানালাম, তুমি যদি স্বাধীনভাবে অন্য কোন পরিচালকের অধীনে কাজ করতে চাও, তাতে আমি আপত্তি করব কেন?

ম‌ুখে তাকে এই কথা বললাম বটে, কিন্তু মন? মন কি এতে সায় দিতে পেরেছিল? না, তা পারে নি, কোন মতেই পারে নি। মন বলেছিল, সাধনা এ যা করতে যাচ্ছে, এ ঠিক নয়। সাধনার প্রতিভা আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাচে, গানে, অভিনয়ে তার মত দক্ষ শিল্পী মেলা ভার। কিন্তু সাধনার বয়স যখন মাত্র তেরো, সেই ১৯৩০ সাল থেকে মঞ্চ এবং পর্দায় অতগ‌ুলি বইয়ে সে যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে, তার প্রত্যেকটিতেই ছিল আমার পরিচালনা ও নির্দেশনা। এই দীর্ঘকাল ধরে তার সহজাত প্রতিভা আমারই নির্দেশিত পথ বেয়ে ধীরে ধীরে প‌ূর্ণ বিকাশের স‌ুযোগ লাভ করেছে বলেই সে যশের শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিল। আমি বিশ্বাস করি, মান‌ুষে যত বড় প্রতিভারই অধিকারী হোক না কেন, উপয‌ুক্ত পরিবেশ, সাহচর্য ও নির্দেশনা না পেলে সে-প্রতিভা শতদল পদ্মের মত বিকশিত না হয়ে বিনষ্ট হয়—বিশেষ করে অভিনয়ের ক্ষেত্রে। তাই আমার মনে আশঙ্কা জেগেছিল, এই যে সে অপরের পরিচালনাধীনে কাজ করতে যাচ্ছে, এতে তার স‌ুনাম হয়ত অট‌ুট থাকবে না, হয়ত প্রতিভা সত্ত্বেও সে তার গ‌ুণপনা দেখাবার সম্যক স‌ুযোগ পাবে না। বিশেষ যখন শ‌ুনলাম যে, যে প্রযোজক, সেই সাধনাকে নায়িকা করে নিজেই পরিচালক হতে চায়, তখন আমার মনের আশঙ্কা আরও বদ্ধম‌ূল হল। বিখ্যাত 'স্টার' থাকলেই যে ছবি সাফল্যমণ্ডিত হয় না, তার জন্যে আরও অনেক-কিছ‌ু যে থাকা দরকার, একথা পরিচালনা ক্ষেত্রে যে প্রথম হাতেখড়ি দিতে চলেছে, তার না জানা থথাকবারই কথা। কিন্তু যে 'স্টার', সেই 'সাধনা'র তো সেকথা হ‌ৃদয়ঙ্গম করা উচিত। স‌ুনামের চেয়ে টাকা কি বড়? কিম্বা পরপর সাফল্য লাভ করার ফলে সাধনা তখন হয়ত ভেবেছিল, সে যে ছবিতেই নাম‌ুক না কেন, মাত্র তারই জোরে ছবি সাফল্যমণ্ডিত হতে বাধ্য, পরিচালক যেই হোক।

আমার মনের গভীরে এ ছাড়াও আর একটা কারণ ক‌ুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে চাইছিল। অন‌ুভব করছিলাম, সাধনার অপর পরিচালকের অধীনে কাজ করবার মধ্যে যেন একটি ভবিষ্যৎ অমঙ্গল ল‌ুকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল, এই পথ দিয়েই হয়ত আসবে আমাদের দ‌ুজনের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদ। আমাদের জীবনে যেমনি, আমাদের কর্মক্ষেত্রেও গড়ে উঠেছিল এক অচ্ছেদ্য বন্ধন, যার ফলে মঞ্চ ও চিত্রজগতে আমাদের দ‌ুজনকে নিয়ে এক প্রবাদবাক্যই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—আমরা একাত্মা। গ‌ুর‌ুদেবও বলেছিলেন, 'মধ‌ুর সাধনা নয়, মধ‌ুর মাধবী।' মনে হল, এই যে সাধনা আজ আমাকে বাদ দিয়ে অপরের পরিচালনাধীনে কাজ করবার কথা ভাবতেও পেরেছে, এরই মধ্যে এই এতদিনের বন্ধন ছিন্ন করবার গোপন ছ‌ুরিকাটি ল‌ুক্কাইত রয়েছে এবং এই কথা অন‌ুভব করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন একটা বিরাট শ‌ূন্যতায় ভরে উঠল অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ছবি দেখে।

ইতিমধ্যে শেঠ স‌ুখলাল কারনানির সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার একথাও ঠিক হয়েছিল যে, আমি শ‌ুধ‌ু তাঁর হয়ে একখানি ছবি পরিচালনাই করব না—এম বি প্রোডাকশান্স নাম দিয়ে একটি ইউনিট করে সমস্ত স্ট‌ুডিওর ভার নেব এবং বছরে অন্তত দ‌ুখানি করে ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করব। শেঠ স‌ুখলাল এর মধ্যে ভ‌ূতপ‌ূর্ব ম্যাডান স্ট‌ুডিওটি নিজে নিয়ে তাঁর নাতি ইন্দ্রক‌ুমারের নামে নত‌ুন নামকরণ করেছিল ইন্দ্রপ‌ুরী স্ট‌ুডিও।

পার্ক স্ট্রীটের কারনানি ম্যানসনটিও ছিল শেঠ স‌ুখলাল কারনানীর সম্পত্তি। ওখানকার ম্যানেজার (তাঁর নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না) ছিলেন তখন এক ম‌ুসলমান ভদ্রলোক। তিনি প্রায় রোজই একবার করে এসে চ‌ুক্তিটা কিভাবে হবে, এই নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। মন্মথ প্রায় রোজই আসত—এসে ইন্দ্রপ‌ুরী স্ট‌ুডিওতে মধ‌ু বোস প্রোডাকসন্সের প্রথম কি ছবি হবে তার গল্পের বিষয় আলোচনা করত।

এইভাবেই চলছিল। একদিন জ‌ুলাই মাসের শেষদিকে আমার সহকারী হেমন্তর কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। দেওঘরে হেমন্ত গিয়েছিল কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে— সেখান থেকেই সে টেলিগ্রাম করছে। টেলিগ্রামে লেখা আছে: সদলবলে সাধনা এসেছে দেওঘরে। সেখানে তারা অর্থাভাবে একেবারে আটকে পড়েছে। কিছ‌ু টাকা এক্ষ‌ুনি না পাঠালে তারা কলকাতা ফিরতে পারছে না। এই সফরের দর‌ুণ শিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্রীদের অনেক টাকা বাকী পড়েছে, অতএব অবিলম্বে কলকাতায় কয়েকটা শোর বন্দোবস্ত করে তাদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি কিছ‌ু টাকা হেমন্তকে পাঠিয়ে দিলাম, এবং লিখে দিলাম সকলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে। আমি হরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অবিলম্বে সে কোন শোর বন্দোবস্ত করে দিতে পারে কিনা? হরেনকে বললাম: দেখ হরেন, আমি যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে সাধনা বহ‌ু শো করেছে এবং সব জায়গা থেকেই আমায় টেলিগ্রামে জানিয়েছে যে, প্রত্যেক জায়গাতেই শো খ‌ুব সাফল্যজনকভাবে হয়েছে। সব জায়গায় হাউস ফ‌ুল হয়েছে—অথচ এ দ‌ুর্দশা কেন? টাকার অভাবে এরকমভাবে আটকে পড়ার মানে কি? তার একমাত্র মানে হল, যে ভদ্রলোক ইম্প্রেসারিও হয়ে গিয়েছিলেন, তার কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই। দায়িত্বশীল লোক হলে দলের সঙ্গে তার কলকাতা পর্যন্ত আসা উচিত ছিল। যা হোক, এরা যে ভালয়-ভালয় ফিরে এসেছে, এইটেই ভগবানের অসীম দয়া।

হরেন ছায়া সিনেমায় সাধনার শোর বন্দোবস্ত করল ২৯ এবং ৩০ জ‌ুলাই। শ‌ুধ‌ু দ‌ুই দিন মাত্র সময়—এর মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করা, পাবলিসিটি করা, কাগজে সেগ‌ুলো পাঠান, আরও এই সংক্রান্ত আরও অনেক কাজ করতে হোল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমি আর হরেন এই নিয়েই পড়ে রইলাম। শেঠ কারনানীর ম্যানেজার রোজই আসে, কিন্তু আমার চ‌ুক্তির খসড়াটা দেখার পর সলিসিটরের কাছে যাব, তার আর সময় হয়ে ওঠে না। মন্মথ বেচারা রোজ এসে বসে বসে চলে যায়—গল্পটা নিয়ে কোন আলোচনাই করতে পারি না।

সাধনা তার দলবল নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছ‌ুল ২৭ জ‌ুলাই।

সাধনাকে জিজ্ঞেস করলাম: এত জায়গায় শো করলে—সব জায়গাতেই তো শ‌ুনছি হাউস ফ‌ুল—অথচ টাকার অভাবে দেওঘরে আটকে পড়লে কি রকম?

তাতে সাধনা বললে: টাকা আমরা যথেষ্ট পেয়েছি, তবে খরচাও করেছি প্রাণখ‌ুলে। সবথেকে ভাল হোটেলে রাজকীয়ভাবে থাকতাম। কাশ্মীরে শিকারা নিয়ে ঘ‌ুরেছি—মোটরে করে ঘ‌ুরে ওখানকার যতকিছ‌ু দেখবার সব দেখেছি। এতেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে।

আমি বললাম: এ সম্বন্ধে কাগজে কিছ‌ু কিছ‌ু রিপোর্ট আমি পড়েছি।

তাছাড়া শ্রীনগরে তুমি কাশ্মীরের প্রথম সবাক চিত্রগৃহে অমরেশ টকীজ উদ্বোধন করলে। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ব্রিজলাল নেহরু ছিলেন প্রধান অতিথি। এত সব করেও শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা!!

সাধনা বললে : দেওঘরে আমাদের আটকে পড়ার আর একটা কারণ ছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে, ফিরতি পথে আমরা কয়েকটা হাউস বুকিং পাব। কিন্তু যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা বলেই কোন চিত্রগৃহেই স্টেজ খালি পাওয়া গেল না, সেই জন্য ফেরবার মুখে যে টাকাটা আমরা পাব আশা করেছিলাম তা পাওয়া গেল না। ফলে এই দুরবস্থা।

আমি বললাম : সবই বুঝলাম, কিন্তু তোমার ইম্প্রেসারিও ভদ্রলোক যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন এটা মানতেই হবে। এতগুলো ছেলে-মেয়েকে তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাতে পৌঁছুতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিলেই সব দিক দিয়ে শোভন হত। যাক যা হবার তা হয়েছে, এখন ছায়াতে যে শো হবে সেই বিষয়ে চিন্তা করা যাক।

যাই হোক ২৮ তারিখে ছায়াতে স্টেজ রিহার্সাল হল এবং ২৯শে প্রথম শো শুরু হল।

মাত্র ২।৩ দিনের মধ্যে হরেন যতদূর সম্ভব ভাল পাবলিসিটি করেছিল। তখন সি এ পি এতগুলো শো করেছে যে, সাধনার নাম আর সি এ পি শোর নাম তখন লোকের মুখে মুখে—সুতরাং পাবলিসিটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ২৯ ও ৩০ দু দিনই হাউস ফুল পাওয়া গেল। যথারীতি সমালোচক ও দর্শকদের অভিনন্দন তো পেলামই, টাকাকড়িও ভালই পাওয়া গেল।

এরপর ৩১ তারিখ থেকে হেমন্ত, আমি আর আমার হিসাব-রক্ষক বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে সমস্ত শিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের হিসাবনিকাশ করে তাদের প্রাপ্য ঠিক করতে বসলাম। সফরে সব মিলিয়ে প্রায় ২৪।২৫জন লোক ছিল।
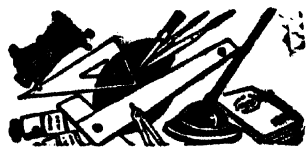
হ্যাঁ, ভাল কথা—এই বঙ্কিমবাবুর কথা আগে বলতে ভুলে গেছি। এঁর পুরো নাম বঙ্কিম মিত্র—সরকারী এ্যাকাউন্টস বিভাগে কাজ করতেন, তারপর অবসর নিয়ে আমার কাছে অনেক দিন ধরে কাজ করেছেন। যখন চৌরঙ্গী প্লেসে থাকতাম, তখনও ইনি কাজ করেছেন, আবার যখন বম্বে থেকে ফিরে এসে স্টিফেন কোর্টে থাকতাম তখন আবার এঁকে রেখেছিলাম। ভদ্রলোক ছিলেন স্বল্পভাষী, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

যাই হোক, নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে দলের সমস্ত লোকের পাই-পয়সা প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে আগস্ট মাসের ২।৩ তারিখ হয়ে গেল। এর মধ্যে বম্বে থেকে জরুরী টেলিগ্রাম এল যে, সাধনাকে তার ছবির জন্যে অবিলম্বে বম্বে চলে যেতে হবে।

কিন্তু সাধনার সঙ্গে যাবে কে? আমি এ ক'দিন এই শো-র ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে শেঠ কারনানীর ম্যানেজার এমর্নাক মন্মথর সঙ্গেই ভাল করে কথা বলবার ফুরসুৎ পাইনি। এইবার ঠিক করলাম যে কারনানীর সঙ্গে চুক্তিপত্রটা সই সাবুদ করে ফেলা যাক। মন্মথর সঙ্গে গল্পটা নিয়েও বসা যাবে এইবার। কিন্তু মানুষ ভাবে এক—আর হয় অন্যরকম। সাধনা ধরে বসল যে তার সঙ্গে বম্বে যেতে হবে—কারণ সে একলা গিয়ে প্রথমটা খুব অসুবিধায় পড়বে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার বাবা যাবেন বোম্বাই, তখন আমি চলে আসতে পারব।

কি আর করি—রাজী না হয়ে পারলুম না। মন্মথ অবশ্য অনেক করে বলেছিল : মধু, কারনানির কন্ট্রাক্টটা সই না করে যেও না। ইংরাজীতে একটা কথা—"There is many a slip between the Cup and the lip." ভবিষ্যতের কথা কি কিছু বলা যায়? আমার কথা শোন। কন্ট্রাক্টটা সই হতে ৫।৬ দিনের বেশী লাগবে না। এক সপ্তাহ পরে বম্বে গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

এদিকে বম্বে থেকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম—তারপর ট্রাঙ্ক-কল আসতে লাগল। তারা সাধনাকে চলে আসবার জন্য জোর তাগাদা দিতে লাগল। আমি ভাবলাম—ঝঞ্ঝাটটা একেবারে খতম করেই আসি। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ধীরেসুস্থে কারনানীর কন্ট্রাক্ট সই করা যাবে। সব তো ঠিকই আছে শুধু আমাদের সলিসিটরের কাছে গিয়ে সই করার অপেক্ষা। তারপর মন্মথর সঙ্গে শান্তিতে বসে ছবির গল্পটা ঠিক করা যাবে।

এই রকম ভেবে আমি সাধনাকে নিয়ে বম্বে রওনা হলাম—তারিখটা বোধ হয় ৫ আগস্ট হবে। যাবার আগের দিন পর্যন্ত মন্মথ আমায় বলেছিল : এখনও তোমায় বলছি মধু, যাওয়াটা ২।৪ দিন স্থগিত রেখে কারনানীর সঙ্গে কন্ট্রাক্টটা সই করে যাও।

আজ মনে হয়, তখন যদি মন্মথর কথা শুনতাম!

সাধনাকে নিয়ে বম্বে গিয়ে প্রথমে উঠলাম তাজমহল হোটেলে। একটা ফ্ল্যাট খুঁজতে সুরু করলাম—এখানে গিয়ে দেখি বম্বে আর সে বম্বে নেই! অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। মেরিন ড্রাইভে কিংবা মধ্য-বম্বেতে ফ্ল্যাট পাওয়া একরকম অসম্ভব। বম্বেতে তখন সেলামী বা 'পাগড়ী' প্রথা বেশ দেখা দিয়েছে। দালালরা বলতে লাগল যে উপযুক্ত 'পাগড়ী' না দিলে আজকাল বম্বেতে ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। প্রথমটা আমি 'পাগড়ী' কথার মানেটাই বুঝতে পারিনি, তাই যখন জিজ্ঞেস করলাম যে 'পাগড়ী' জিনিসটা কি—তখন তার উত্তরে জানতে পারলাম যে বাড়ীর মালিককে প্রথমে মোটা একটা টাকা নগদ দিতে হয়—যার কোনো রসিদ পাওয়া যাবে না। তারপর ফ্ল্যাটের যা ভাড়া হয় তা দিতে হবে। আমি বললাম : মোটা টাকা 'পাগড়ী' দেবার ক্ষমতা আমার নেই—আর থাকলেও আমি তা দেব না।

চেষ্টা করতে লাগলাম বিনা 'পাগড়ী'তে কোন ফ্ল্যাট পাওয়া যায় কিনা। এই সব বন্দোবস্ত করতে করতে এসে গেল ৯ আগস্ট ১৯৪২। জ্বলে উঠল আগুন চারিদিকে। ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামের এক রক্তক্ষরা অধ্যায়। সকালে কাগজ খুলে দেখি গান্ধিজী, জওহরলাল, আবুলকালাম আজাদ, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ দেশনেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চারিদিকে সুরু হয়েছে আইন-ভঙ্গের পালা। ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলা হচ্ছে। স্টেশন, ডাকঘর এবং অন্যান্য সরকারী দফতর পোড়ানো হচ্ছে—পুলিশের গুলীতে বহু লোক প্রাণ দিচ্ছে—সারা দেশে একটা থমথমে ভাব। দেশের সাধারণ জীবন-যাত্রা ব্যাহত। সমস্ত লোকের মনে এক আতঙ্ক, ভয় আর উত্তেজনা। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের দমন-নীতি হয়ে উঠল প্রবলতর।

এ অবস্থায় বেরুই কি করে? আমি বোম্বাইতে আটকে পড়লাম। মন্মথর কথা তখন বার বার মনে পড়তে লাগল! কন্ট্রাক্ট সই করে যাও মধু, ভবিষ্যতের জন্য কিছু ফেলে রেখো না। মনে হ'ল, চায়ের কাপ ও ঠোঁটের মাঝে ফাঁকটা থেকেই গেল।

আমি মন্মথকে লিখলাম : আমি তো বম্বেতে আটকে পড়েছি—চারিদিকে যে রকম অরাজকতা চলছে, ট্রাম-বাস সব জ্বলছে—রাতদিন গুলী-গোলা চলছে—স্বাভাবিক নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত—এ অবস্থায় সাধনার বাবা তো আসতে পারবেন না আর উনি যতদিন না আসেন, সাধনাকে এরকম পরিস্থিতিতে একলা ফেলে আমি যাই কি করে? পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে ওর বাবা এখানে আসবেন এবং সাধনাকে একটি ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়ে—আমি কলকাতায় ফিরব।

মন্মথর জবাব এল যে, সে কারনানির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিল। এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সবাই খুব উৎকণ্ঠা ও অশান্তির মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এখন শেঠজীকে ফিল্মের কন্ট্রাক্টের বিষয় কে বলতে যাবে? পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

মন্মথর চিঠি পেয়ে মনে হল—একবার যখন বাধা পড়েছে, তখন শেঠ কারনানির সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হবার আর হয়ত কোনো আশা নেই। (ক্রমশঃ)

চিত্র-সমালোচনা

একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য, বিষণ্ণ, বাস্তব চিত্র :

ছবিটির নাম "বিগ সিটি ব্লুজ"। এর চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজ করেছেন হল্যান্ডের চার্লস ভ্যান দে লিণ্ডেন। মাত্র চব্বিশ মিনিট হচ্ছে এর প্রদর্শনী সময়। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে দর্শকের অনুভূতিকে ছবিখানি যে তীব্রভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়, তার মনে যে গভীর দাগ কেটে যায়, তার বুঝি তুলনা নেই। অবিস্মরণীয় এই ছবি।

পুলিশ এসে একটি ছেলেকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলে গেল, একটি বাচ্চা ছেলে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে—এই হচ্ছে ছবির আরম্ভ। পুলিশের গাড়ী চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হ'ল ফ্ল্যাশ-ব্যাক। ঐ বাচ্চা ছেলেটি একটি খরগোশ নিয়ে খেলা করছে; এমন সময়ে একটি বছর বারো-তেরো বয়েসের একটি ফ্রক-পরা মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ এক সময় মেয়েটি খরগোশটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুট দিল সামনে এক প্রকান্ড ম্যানসন তৈরী হচ্ছিল, তার দিকে। ছেলেটিও তার পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু সেই বিরাট নির্মীয়মান ম্যানসনের মধ্যে দ্রুতগতিতে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মেয়েটি শিগ্গিরই ছেলেটির নাগালের বাইরে চ'লে গেল। এবং হঠাৎ গিয়ে পড়ল এমন এক জায়গায়, যেখানে দু'টি রাস্তার ছেলে মদে চুর হয়ে এলিয়ে ব'সে আছে। মেয়েটি তাদের দেখবামাত্র কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে পড়ল এবং অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের মধ্যে একটি ছেলে ধীরে ধীরে চোখ মেলে মেয়েটিকে দেখল। তার চাউনিতে যেন একটা কদর্য লোলুপতা—মেয়েটি ভয় পেয়ে পেছু হটল, ছেলেটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে টাল সামলে চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি দিল ছুট—ছেলেটিও ছুটতে আরম্ভ করল। দু'জনেই ছুটছে—একজন আর একজনের শিকার। খরগোশটি কখন যে মেয়েটির হস্তচ্যুত হয়েছে, তার ঠিক নেই। দুরন্তবেগে ছেলেটি ক্রমেই মেয়েটির নিকটবর্তী হচ্ছে। এবং শেষ পর্যন্ত এক সময় সে ওকে ধ'রে ফেলল। মেয়েটি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে ছিটকে পড়ল নীচের এক লোহার ফ্রেমের উপর—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। একটু পরে বাচ্চা ছেলেটি সেই খরগোশ নিয়ে ওখানে উপস্থিত; চেয়ে দেখল যুবকটি চ'লে যাচ্ছে, আর মেয়েটির প্রাণহীন মৃতদেহ সেই লোহার কড়িতে আটকে রয়েছে।

আবার ছবি ফিরে এল প্রথম দৃশ্যে। পুলিশের গাড়ী চ'লে যাবার পরে আবার ছেলেটি খেলতে শুরু করল তার খরগোশটিকে নিয়ে। আবার তার সামনে এসে দাঁড়াল আর একটি ফ্রক-পরা কিশোরী। আবার ঐ কিশোরী খরগোশটিকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ঐ নির্মীয়মান অট্টালিকার ভিতরে দৌড় দিল। ছেলেটিও ছুটল তাকে ধরবার জন্যে।

আশ্চর্য শটগ্রহণ, আশ্চর্য শব্দ-সংযোজনা, আশ্চর্য আবহসৃষ্টিকর যন্ত্র-সঙ্গীত। বাড়ীটির সিঁড়ি, বিরাট অসমাপ্ত ঘর, অলিন্দের বাঁক—যেন এক একটি জ্যামিতিক প্যাটার্ন! সমগ্রভাবে উপরের কাহিনীর যে চিত্ররূপ দর্শকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তার আবেদন অবর্ণনীয়।

["অমৃত"-এর ২২ সংখ্যায় এই ছবিরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিল।]

—নান্দীকর

সলিল সেন পরিচালিত **অজানা শপথ** চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

কলকাতা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবি 'এই তীর্থ'

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এই তীর্থ' কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তী ছবিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেষ করেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ ভারতের ভিজিয়ানাগ্রাম এবং সীমাচলমে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে বলে জানা গেল। ছবির ভূমিকালিপি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। শ্রীমহাবীর চিত্রমের প্রযোজনায় ছবির চিত্র গ্রহণের কাজ শীঘ্র শুরু হবে।

'ছুটি'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ

অভিনেত্রী-পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী তাঁর নির্মীয়মান ছবি 'ছুটি'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য সম্প্রতি সাঁওতাল পরগণায় যাত্রা করেছিলেন। সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ করে তিনি এ সপ্তাহে সদলবলে ফিরে এসেছেন। বিমল কর রচিত 'খড়-কুটো' অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অরুন্ধতীদেবী। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন নবাগত মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও নন্দিনী মালিয়া। পার্শ্ব চরিত্রে রয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবারতি সেন, দীপালী চক্রবর্তী, নির্মল চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা। পূর্ণিমা পিকচার্স নিবেদিত এ ছবিটি প্রযোজনা করছেন নেপাল দত্ত।

দীপক পিকচার্স-এর 'ভক্তের ভগবান' :

দিলীপ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত দীপক পিকচার্স-এর 'ভক্তের ভগবান' ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন সুরকার কালীপদ সেন। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবজন মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন ও চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত

সম্বন্ধে এই ছবির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যথাক্রমে নির্মল গুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়ের উপর।

চরিত্রচিত্রণে আছেন তন্দ্রা বর্মণ, রবীন মজুমদার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী, বিদ্যুৎ গোস্বামী, সুশীল চক্রবর্তী, সমর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, রেণুকা রায়, সোনালী রায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন রায়, প্রেমাংশু বসু ও নবাগত শিশু শিল্পী কিশলয় বসু।

রাধা ফিল্মস স্টুডিয়োতে ছবিটির চিত্রগ্রহণ চলছে।

বোম্বাই

'ঝুক গয়া আসমান'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ

প্রযোজক-পরিবেশক আর, ডি, বনশালের রঙিন হিন্দী ছবি 'ঝুক গয়া আসমান'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ গত সপ্তাহে কলকাতা অঞ্চলে গৃহীত হবার পর এ সপ্তাহে দার্জিলিং-বহির্দৃশ্য শুরু করেছেন পরিচালক লেখ ট্যান্ডন। বহির্দৃশ্য গ্রহণ উপলক্ষে এ ছবির প্রধান শিল্পী, রাজেন্দ্রকুমার, সায়রা বানু, রাজেন্দ্রনাথ, জাগীরদার ও ডেভিড কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। বাগদত্তা সায়রা বানুর সঙ্গে দিলীপকুমারও ছিলেন।

পরিচালক সুরজ প্রকাশের পরবর্তী ছবি

সাইট এন্ড সাউন্ডের দ্বিতীয় ছবির (এখনও নামকরণ হয়নি) নায়ক-নায়িকার চরিত্রে সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন শশী কাপুর ও আশা পারেখ। এ ছাড়া পার্শ্ব-চরিত্রে থাকবেন আনন্দ বকশী ও রাজেন্দ্রনাথ। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুর সৃষ্টি করবেন। ছবিটির পরিচালক হলেন সুরজপ্রকাশ।

মঞ্চাভিনয়

কানাড়া ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব

সাধারণতঃ দেখা যায় অফিস ক্লাবের সভ্যরা পুরনো নাটকই মঞ্চে পরিবেশন করেন। যে নাটক ইতিপূর্বে বহুবার মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করেছে, সেই নাটকের অভিনয়কে ঘিরেই এঁদের প্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক নাটকের বহু বিচিত্রমুখী গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু কিছু অফিস নাট্যসংস্থা নতুন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করছেন। আধুনিক জীবনের জটিল সমস্যা ও মূল্যবোধ নিয়ে যে নাটক তাই তারা মঞ্চে পরিবেশন করবার চেষ্টা করছেন। 'কানাড়া ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে শ্রীমনোজ মিত্রের 'অবসন্ন প্রজাপতি' মঞ্চস্থ করে এই প্রয়াসের একটি উদাহরণ দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'অবসন্ন প্রজাপতি'তে রূপলাভ করেছে একটি আধুনিকা মহিলার করুণ জীবন চিত্র। খেয়ালী প্রজাপতির মতো নানা রঙের নেশায় শুধু বিভোর হয়ে থাকতে চেয়েছিল এই মহিলা। কিন্তু একদিন রূঢ় বাস্তবের কশাঘাতে তাঁর সে আমেজ কেটে গেল, শুধু রঙের মদিরা পান করে জীবনে সে চলতে পারলো না। সে হেরে গেলো, সেদিন তার আত্মসমর্পণের পালা। কানাড়া ব্যাঙ্ক কর্মী শিল্পীরা এই আধুনিক বক্তব্যসমৃদ্ধ নাটকটির মঞ্চরূপায়ণে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতুল দাস নাট্য-পরিচালনায় এক আশ্চর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের নজীর সৃষ্টি করেছেন। দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন শ্যামল ঘোষ ও দীপিকা দাস। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন বলাই দাস, অনিল সরকার, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অশোক রায়, মৃণাল সাহা, প্রফুল্ল দাস, দিলীপ বোস, অজিত চক্রবর্তী, মদন মাইতি, রানু রায়, ভারতী চক্রবর্তী।

আন্তঃ কলেজ নাটক প্রতিযোগিতা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে ভারতীয় বিদ্যাভবনে ষষ্ঠদশ আন্তঃ কলেজ নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১১টি ভাষায় ৩০টি নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান শ্রী কে, এম মুন্সী শীল্ড জয় করে গুজরাটী ও মারাঠী নাটক যুগ্মভাবে, এবং বাংলা নাটক দ্বিতীয় স্থান পায়। খালসা কলেজ অভিনীত "রাজযোটক" নাটকে সদানন্দের ভূমিকায় শ্রীশ্যামল বিশ্বাস ও বিন্দুবাসিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী বাসন্তী দে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীজ্যোতির্ময় মুখার্জি।

প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি খড়দহ মুখোশ নাট্যনিকেতন আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অন্তরাল, যাত্রিক, সায়ন্তনী নাট্যসংস্থা যথাক্রমে দলগত অভিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সুব্রত লাহিড়ী ও রবীন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিবেচিত হয়েছেন। মীরা হাজরা পাবেন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

* * * *

নৈহাটী মুকুট নাট্যসংস্থা এবারও পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩০শে অক্টোবর। যোগাযোগের ঠিকানা—জীবনরতন বসু, ১৬ বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া, নৈহাটী, ২৪-পরগণা।

আগামী অনুষ্ঠান

'মালঞ্চ' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় আগামী ১৩ই অক্টোবর থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী একাংক নাটকের উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বেহালার ইউনিক পার্কে। ষোলটি একাংক নাটক এই উৎসবে মঞ্চস্থ হবে।

• • •

'মরমী' নাট্যসংস্থার শিল্পী সদস্যরা চারটি নাটকের অভিনয় করবেন আগামী পুজোতে। নাটক চারটি হোল প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'অতসী'র নাট্যরূপ, বসন্ত ভট্টাচার্যের 'ডিসমিস', মণি দত্তের 'সৃষ্টি স্থিতি লয়', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'জীবনান্ত'।

গানের জলসা

উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টার

জীবন সায়াহ্নে গৌরবদীপ্ত কর্ম-জীবনের কীর্তিস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে অতৃপ্ত ক্ষোভের সঙ্গে উদয়শঙ্কর বারবার বলেছেন "স্থায়ী কিছুই করে যেতে পারলাম না।" My creation will die with myself, হয়ত বা তাঁর স্বপনলোকে ভাসছিল আলমোড়ার উদার আকাশ, বাস্তবের রূঢ়তা, কোলাহল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত মুক্ত, ধ্যানসমাহিত, শান্ত পরিবেশ, যেখানে শিক্ষার্থী, শিল্পী সবাই শুধু সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর। সে ত এই সমস্যাকণ্টকিত, জনাকীর্ণ কলকাতায় সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির বীজ যাঁরই মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে স্বধর্মের অপরিহার্য তাগিদেই সে ফুল ফুটিয়ে যাবে। সেই সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যা ললিতা কলাবিধো—অমলাশঙ্কর।

সৃষ্টিধর্মী-প্রতিভা কখনও স্থির থাকে না, নতুন কিছু গড়বার উন্মাদনায় অস্থির চঞ্চল। এই প্রেরণার তাগিদেই মাত্র কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রীমতী অমলাশঙ্কর রবীন্দ্র-সরোবরে শুরু করেছিলেন তাঁর নৃত্যশিক্ষিকা জীবনের যাত্রা। "বড় বেশী দুঃসাহসের কাজ" অনেকেই সেদিন শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই দুঃসাহসের পথ বেয়েই দুর্লভকে পাওয়া অসম্ভব নয়—এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের লাইফ-সেক্রেটারী শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিদেশী পর্যটক আর সাংবাদিকমহল। এই যাত্রা যে জয়যাত্রাই শিক্ষার্থিবৃন্দের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, পরিদর্শক বরেণ্য শিল্পী, বিজ্ঞানী এক কথায় কলারসিক মহলের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি-লাভের মধ্যে সেই সার্থক-সুন্দর পরিণতির খবর সগৌরবে ঘোষিত হল।

মাত্র কয়েকদিন আগে রবীন্দ্র-সরোবরে অনুষ্ঠিত Parent's day ও শ্রীমতী শঙ্করের জাপানী ছাত্রী শ্রীমতী ইয়াচি-এর "ভারত-নাট্যম"-এর সভায় বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ছিল শিশুদের অনুষ্ঠান।

এখানে কথাকলি, মণিপুরী, ভারত-নাট্যম—ভারতীয় নৃত্যের তিনটি পদ্ধতিই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে উদয়শঙ্করের দীর্ঘ-দিনের সহযোগী শ্রীরাঘবন গুরু আমুবীর শিষ্য তরুণ সিং ও জ্ঞানপ্রকাশের সাহায্যে। তিনটি নৃত্যধারার বিরাট ঐতিহ্য। সমগ্র-ভাবে সবগুলি আয়ত্ত করা স্বল্পকালের মধ্যে সম্ভব নয়। তবে ভারতীয় নৃত্যের আত্মার সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্য তিনটি পদ্ধতির অংশবিশেষ তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যেটুকু শিখবে তার শুদ্ধতা ও পূর্ণতা সম্বন্ধে যাতে তারা সংশয়মুক্ত থাকে সেদিকে শ্রীমতী শঙ্কর ও গুরুদের তীক্ষ্ম সজাগ দৃষ্টি। সেদিন ছোটরা দেখালেন কথাকলির কোরক পাঠ ও নমস্কারম। মণিপুরী চালি ও নাগা নৃত্যের কিয়দংশ। বড়রা কথাকলির সারী মণিপুরী লাহারোবা, ভারতনাট্যম। উভয় দলই "Dance as you like" —অনুষ্ঠানে, তাৎক্ষণিক নৃত্যসৃষ্টির এক অভিনব উদাহরণ প্রদর্শন করলেন।

নৃত্যের দৃঢ়নিবন্ধ নিয়মকানুন শিক্ষার্থীদের মনকে সংকুচিত করতে পারে। তাই শ্রীমতী শঙ্কর জোর দিয়েছেন যে বস্তুর ওপর তা হচ্ছে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন বিকাশ। ছোটদের হাঁটতে বলছেন, ছুটতে বলছেন স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বল আনন্দে। তারা কোনো মাত্রা বা বোল অনুসরণ করবে না। তাদের পদচারণার ভঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়ে কখনও ৮ মাত্রা কখনও ১৬ মাত্রায় বোল তৈরী করলেন মৃদঙ্গবাদক। তারপর সেই বোলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাওনী, চলা, গতি যেন নৃত্যের মধ্যে নবজন্মলাভ করল। বড়দের বললেন, বৃত্তাকারে হাঁটতে, যৌবনের দুর্বার শক্তিতে। ক্রমশঃ সেই হাঁটা, বোল ও মাত্রার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হোলো। তার সঙ্গে মিশল মুদ্রা, দেহের লীলায়িত ভঙ্গী। শ্রীমতী শঙ্করের চকিত ইসারায় যেন নৃত্যের ঝর্ণাধারার উচ্ছল প্রবাহ নেমে এল এই ধুলোর ধরায়। শিক্ষা দেবার আগের মুহূর্ত অবধি শ্রীমতী শঙ্কর জানতেন না তিনি কি

শেখাবেন। শিক্ষার্থীরাও জানত না তারা কি শিখবে। অথচ নিমেষের মধ্যেই আপনহারা নদীপ্রবাহের মত যে নৃত্য সৃষ্টি হেলো তার কোনটি কথাকলি, কোনটি মণিপুরীর মধ্যে পড়ে এবং কেন পড়ে তাও শ্রীমতী শঙ্কর বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে সহজ আনন্দ ও খেলার মধ্যে জন্ম নিল নৃত্য, জড়দেহকে করে তুলল বিদ্যুতের শরিক। এ একান্তই উদয়শংকর ঘরানার বস্তু।

হংস মিথুন চিত্রে অপর্ণা দাশগুপ্ত

কিন্তু বিস্ময় সীমা ছাড়িয়েছিল যখন জাপানী শিষ্যা শ্রীমতী ইয়াহি চক্রবর্তী মাত্র এক বছরে আয়ত্ত ভারতনাট্যমের আলারিপু, জাতিস্মরম, বর্ণম, পাদম, তিলানা ও নটনাম আদিনার প্রতিটি অঙ্গ শৃঙ্খলয়ে ও ভারতনাট্যমের বিশিষ্ট আঙ্গিককে প্রদর্শন করলেন। ভারতনাট্যম ভক্তিরসাশ্রিত মন্দির নৃত্য। পরমাত্মার চরণে পূজারিণীর আত্মনিবেদন এর চরমভাব। নবরস-অনভিজ্ঞা বিদেশিনীর পক্ষে এই রস হৃদয়ঙ্গম করা এবং ব্যক্ত করা সহজ নয়। কিন্তু শ্রীমতী শঙ্করের নিষ্ঠা, গুরুর আন্তরিকতা সর্বোপরি শ্রীমতী ইয়াহি-এর অধ্যবসায় ও অনুরাগ এই অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলেছে। তাউনীর ওয়াইল্ডনেস, ক্ষিপ্রগতি লয়ে প্রাণবন্ততার কিছু অভাব যদি ক্ষমা করে নেওয়া যায় তবে শ্রীমতীর নৃত্যে আত্মবিশ্বাস ও আঙ্গিকশুদ্ধতা প্রশংসাযোগ্য কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল।

দর্শকমণ্ডলের পুরোভাগে আগাগোড়া উপবিষ্ট উদয়শংকর অনুষ্ঠানশেষে উচ্ছ্বসিত আবেগে শ্রীমতী শংকরকে অভিনন্দন জানালেন —"It is unbelievable, overwhelming"— "এর চেয়ে বড় পুরস্কৃত নিজেকে কোনোদিন মনে হয়নি।"—অমলা-শংকর উজ্জ্বল মুখে সাংবাদিকমহলকে জানালেন।

পূজার গান

এবারের পূজায় বিচিত্র স্বাদের অসংখ্য রেকর্ড বেরিয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত, ভক্তিমূলক গান, পল্লীগীতি, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রভৃতির এই বিপুল সমারোহ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবে নিশ্চয়। রেকর্ডগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল এখানে।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া রেকর্ড

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানি আধুনিক গান—"আমার জীবন যেন একটি খাতা" এবং **"চলে চলে মাঝখানে থাম**

উঠে"। গান দুটির সুর চমৎকার। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান দুটি হল—"যারে যা যা ফিরে যা" এবং "গুন গুন মনভ্রমরা"। সার্থকনামা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবারের পূজার বাজার মাতিয়ে দিয়েছেন তাঁর দুটি নতুন আধুনিক গানে—"এতটুকু আমি কতটুকু পারি দিতে" এবং "আমার হু হু করে বুক"। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এবারের গান দু'খানি অতি মনোরম। "আমার মন-রাধিকার মন ছিল যে" এবং "আমি প্রিয়া হব ছিল সাধ"। ইলা বসুর "গান ফুরালো জলসাঘরে" "আর কথা-কইতে-জানা নয়ন আমার" ভালো হয়েছে। আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি গান—"আরো কতদিন আমি খুঁজেছি তোমারে" এবং "চিনেছি চিনেছি তোমার এ মন"। নির্মলা মিশ্রের কণ্ঠে এবার দু'খানি গানে নতুনত্বের আমেজ এসেছে। "উদাস উদাস দুপুরে" এবং "যেও না এমন করে"। গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের দু'খানি ভক্তিমূলক গান মূল সুরে অতি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। গান দু'টি হল—"(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়" এবং "কুটিল কুপথ ধরিয়া"। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবারে যে দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন—"ভেবে তো পাই না" এবং "হাওয়া এসে খোঁপাটি যে দিয়ে গেল খুলে"। নবাগত পিন্টু ভট্টাচার্যের আধুনিক গান দু'টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—"আমার দুখের রজনী আমারি থাক" এবং "ফিরে যেতে চাই, যেতে চাই"। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান "নগরে বন্দরে নিথে প্রান্তরে" এবং "তুমি কাঁকন কখন বাজিয়ে গেলে"। স্বর্গীয় অনিল ভট্টাচার্যের গান—"আজানা আর মোহন বীণা" এবং "আজ থেকে সেই অনেক দিনের পরে" গেয়েছেন উৎপলা সেন। শ্যামল মিত্রের নতুন আধুনিক গান—"পর কোন এক শ্বেতপাথরের প্রাসাদে" এবং "এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে" সবারই ভাল লাগবে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের—"সুখের পৃথিবী দিয়েছে ফিরায়ে মোরে" এবং "নিশি পোহালে যেও না গো চলে" গান দু'টি প্রাণবন্ত। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের আধুনিক গান—"আরো একটুখানি কাছে থাকো না" এবং "ভালো লাগে না তুমি না এলে"। মান্না দে যে দু'টি আধুনিক গান গেয়েছেন—"এই তো সেদিন তুমি বোঝালে আমায়" এবং "দরদী গো, কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম"। "একটি এ রাত যদি কাটে না কিছুতে" এবং "আকাশে রুমঝুম, চুমকি তারা ঘুম" গান দু'টি গেয়েছেন মহেন্দ্র কাপুর। একজন নবাগতা শিল্পী মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের গান দু'টিতে তাঁর শিল্পীজীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দু'টি হল—"সেই মেয়েটির নয়ন দু'টি" এবং "এই জীবনটাকে যোগ করেছি"। সুমন কল্যাণপুরের এবারের গান দু'টি হল—"মনে করো আমি নেই" এবং "দুরাশার বালুচরে"। মৃণাল চক্রবর্তীর দু'টি মনোরম গান হল—"ওগো মরমী, শোনো মরমী" এবং "ও রঙ্গিলা পাখী"। নির্মলেন্দু চৌধুরীর উদাত্তকণ্ঠে "ও নদীরে, ও মোর তিস্তা রে" এবং "ও বনহস্তিনী, ও মেঘ-বরণী" একটি সংগ্রহযোগ্য রেকর্ড। এবার পূজার আর একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেকর্ড মুকেশের কণ্ঠে বাংলা গান—"দেহেরি পিঞ্জিরায় প্রাণপাখী কাঁদে" এবং "আবার নতুন করে"। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহকারীর চমৎকার ব্যঙ্গ—"হরিদাস পালের গুপ্তকথা" সবার ভালো লাগবে। মিন্টু দাশগুপ্তের দু'খানি প্যারডি গান "আজি এ সন্ধ্যায়" এবং "তুমি যেন সেই চিল্" চমৎকার! সুবীর সেন দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন—"তোমরা আমার গান শুনে আজ" এবং "নয় থাকলে আরও কিছুক্ষণ"। স্বনামধন্য গায়ক তালাত মামুদের বাংলা গান—"বৌ কথা কও গায় যে পাখী" এবং "অনেক সন্ধ্যাতারা" দু'টি গানই মনে দোলা লাগায়। সবিতা চৌধুরীর এবারের দুটি আধুনিক গান—"লাগে দোল দোল পাতায় পাতায়" ও "ওই ঘুম ঘুম ঘুমন্ত" অপূর্ব। এ বাদে তিনখানি ই, পি, রেকর্ডে আছেন যথাক্রমে—একটি

হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া শিল্পীগণ রবীন্দ্র সরোবরে অনুষ্ঠিত রেকর্ড জলসায় 'জনগণ-মন' গাইছেন।

রেকর্ডে অতুলপ্রসাদের গান : মঞ্জু গুপ্ত গেয়েছেন — "আয়, আয়, আমার সাথে ভাসবি কে আয়" এবং "এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায়?" অর্ঘ সেন গেয়েছেন— "তুমি মধুর অঙ্গে নাচ গো রঙ্গে" এবং "আমার মনের মন্দিরে।" আর একটি রেকর্ডে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন— "নিশি আঁধারে ছুম ছুম ওই" এবং "যামিনী হল যে ভোর"। গীতশ্রী শেফালি ঘোষ গেয়েছেন—"বাজু মোর খুলে খুলে যায়" এবং "সারা নিশি একা জেগে থাকি"। ইলেকট্রিক গীটারে জনপ্রিয় ফিল্মের গান বাজিয়েছেন—গীটারবাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আর একটি রেকর্ডে।

এবার পূজায় একখানি লং প্লেয়িং রেকর্ডে হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের বারোখানি বিখ্যাত গান গেয়েছেন — মানবেন্দ্র, হেমন্ত, শ্যামল, সন্ধ্যা, প্রতিমা ও আরতি।

এবারের পূজায় এতগুলি গান প্রকাশের জন্য আমরা গ্রা মো ফো ন কোম্পানীকে সাদর অভিনন্দন জানাই।

●

হিন্দুস্থান রেকর্ড

'হিন্দুস্থান রেকর্ডে' জনপ্রিয় এবং নতুন শিল্পীদের আকর্ষণীয় সমাবেশ ঘটেছে।

শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি রেকর্ড বেরিয়েছে। শ্রীবিশ্বাস গেয়েছেন 'বড়ো আশা করে এসেছি গো' এবং তার ইংরেজি অনুবাদ গানটি। শ্রীমতী দত্তের কণ্ঠে 'এসো শরতের অমল মহিমা' এবং 'কোথা যে উধাও হলো' রেকর্ডটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পিপাসুদের আনন্দ দেবে। একটি রেকর্ডে শোনা যাবে শ্রীপূর্ণদাস বাউলের কণ্ঠে গাওয়া 'গোলেমালে পীরিতি করো না' এবং 'সখি যমুনার জল আনতে গিয়ে' বাউল সংগীত দুটি। শ্রীমতী রাধারাণীর কণ্ঠে কীর্তন, 'চাঁদ মুখে দিয়া বেণু' ও 'যশোমতী মা আমার', শ্রীমতী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শ্যামাসংগীত 'ভবে সেই সে পরমানন্দ' ও 'মন তোমার এই ভ্রম গেল না', শ্রীহীরালাল সরখেলের কণ্ঠে ভক্তিগীতি 'বুকে তোর কান্না আছে' ও 'আর কতো ডাক', শ্রীমতী জপমালা ঘোষের কণ্ঠে পল্লীগীতি 'খঞ্জন কান্দে দোয়েল কান্দে রাধে গো তোর বিরহ জ্বালা' গান-

গর্ণল জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। শ্রীঅমর পালের প্রভাতী সংগীত 'ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ' ও পল্লীগীতি 'শোন বলি পাগলের চেলা' রেকর্ডটির আকর্ষণ কম নয়। শ্রীসুকুমার মিত্রের 'চরণে চরণ মেলাতে সখি' ও 'বোঝোনা কি', শ্রীমতী উৎপলা মুখোপাধ্যায়ের 'ও বাঁশী কেন বাজে' ও 'আহা, এই সন্ধ্যায়' এবং শ্রীদিলীপ সরকারের 'বেলোয়াড়ী ঝাড় জ্বালালো' ও 'রাতের আঁধারে কেন' আধুনিক গানের এই তিনটি রেকর্ড আধুনিক বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। গীটারে শ্রীবিদ্যুৎ বসু যে সুর বাজিয়েছেন আশা করি তা সবাইকার ভাল লাগবে। চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী জ্যোৎস্না বিশ্বাসের 'দাবী' নাটকের জন্য গাওয়া 'আকাশ আমি দেখতে পেলাম' ও 'কিছু কথা মোর গান বলবে' গান দুটি সুন্দর হয়েছে। কৃষ্ণ মোর গুরু ও 'দাদুর জ্বালায়' ব্যঙ্গ সঙ্গীত দুটি রেকর্ড করিয়েছেন শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুস্থান 'ব্লু' লেবেল রেকর্ডে বেরিয়েছে বিভিন্ন স্বাদের আটটি নতুন রেকর্ড। এর মধ্যে ছড়া-গানের রেকর্ড দুটি সব থেকে আকর্ষণীয়। 'গাংচিল গাংচিল' ও 'যাত্রাকালে পড়লো হাঁচি' গান দুটি গেয়েছেন শ্রীবীরেন দাশ এবং কুমারী মঞ্জু বসু গেয়েছেন 'তাকদুমা দুম বাদ্যি বাজে' ও 'কুমকুম তুলতুল' গান দুটি। শ্রীঅরূপকুমারের 'ঐ বসন্ত এলো বনে বনে' ও 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া', শ্রীমতী বাসন্তী ঘোষালের 'পেয়েছি তোমার লেখা' ও 'মধুবনে আজ ওগো', শ্রীনবকুমার দাসের 'ঘুম আয় আয়' ও 'প্রথম দেখায় কতো', কুমারী মঞ্জুশ্রী বসুর 'ফুলের বাজু বেঁধেছো' ও 'বাউরী হলো' এবং শ্রীরণেন সেনগুপ্তের 'একটি রাত যদি আসতো' ও 'এ মনে ভাবনা যতো পাহাড়ী নদীর মতো'— আধুনিক গানের এই চারটি রেডে শিল্পীদের আন্তরিক সুরসাধনার পরিচয় পরিস্ফুট। শ্রীঅরূপকুমার ও সহশিল্পীবৃন্দের গাওয়া দেশাত্মমূলক গান 'চলরে চল্ চল্ এগিয়ে চল্' ও 'মহামিলনের তীর্থভূমি গান দুটি সকলেরই ভাল লাগবে। রেকর্ডগুলি প্রকাশের জন্য হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিবিধ সংবাদ

পতৌদির নবাবের সঙ্গে শর্মিলা ঠাকুরের পরিণয়!

বাংলা দেশের জনপ্রিয় নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর ভারতের ক্রিকেট-নায়ক পতৌদির নবাব মনসুর আলীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। আগামী জানুয়ারী মাসে পতৌদি-শর্মিলার বিয়ের পাকা-দেখা সূচিত হবে। পূর্ব আফ্রিকায় সুখদেব পরিচালিত 'মাই লাভ' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ চলাকালীন শর্মিলা-পতৌদির প্রথম রোমান্সের সৃষ্টি হয়।

শর্মিলা ঠাকুর এক বছরের মধ্যে সমস্ত ছবির কাজ শেষ করে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে বিদায় নেবার পর পতৌদির সঙ্গে ঘর-কন্নায় মন দেবেন।

বিশ্বরূপার নতুন আকর্ষণ "জাগো":

বিশ্বরূপা মঞ্চস্থ করছেন তাঁদের নতুন নাটক "জাগো"। বনফুল রচিত উপন্যাস "ত্রিবর্ণ" অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করেছেন বিশ্বরূপার অন্যতম পরিচালক রাসবিহারী সরকার। এই নাটকটিও শ্রীসরকার প্রবর্তিত থিয়েটারস্কোপ প্রথায় (তৃতীয় পর্যায়) উপস্থাপিত হবে তাঁরই পরিচালনাধীনে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন : জয়শ্রী সেন, সুমিতা সান্যাল, শ্রাবণী বসু, আরতি দাস, অসিতবরণ, নির্মলকুমার, রূপক মজুমদার প্রভৃতি।
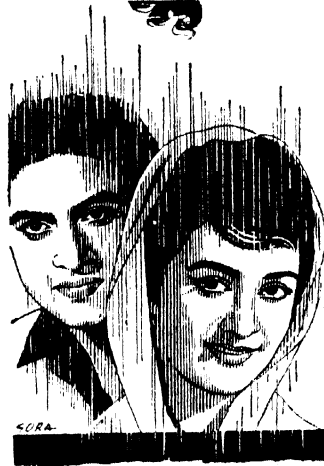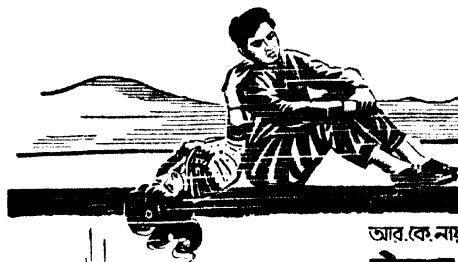
দ্বিতীয় দেখায়
প্রথম
ভালো সাজগোজ তখনি উৎরবে
যখন পায়ে থাকবে ভালো একজোড়া
জুতো। নইলে পরিপাটি বেশভূষা নিরর্থক।
আর এই জুতো নিরেস হলে চলবে না, নকশায়, গঠনে
আর ফিটিঙে হতে হবে উৎকৃষ্ট। এক কথায় বাটার
জুতো, আধুনিক পাদুকাশিল্পে যা অদ্বিতীয়। বাটার জুতো
ভালো সাজগোজের একান্ত সহায়, প্রতি
পদক্ষেপে উত্তম রুচির পরিচায়ক।
প্রেটি ১০.৯৫—১৪.৯৫
পম্পা ১২.৯৫—১৬.৯৫
অঞ্জনা ১৩.৯৫
সুলেখা ১০.৯৫
শীলা ১১.৯৫
Bata
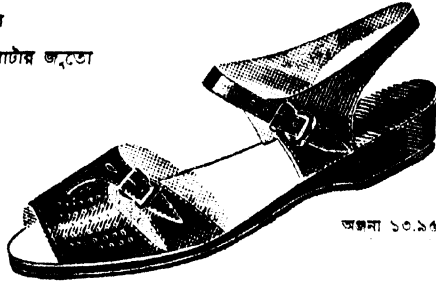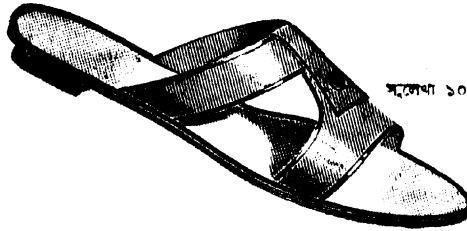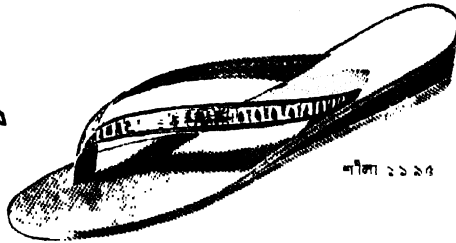
কক্ষচ্যুত তারকা মাইকেল জাজি

অজয় বসু

অবসৃত মাইকেল জাজি আজ কক্ষচ্যুত তারকা।

মাস কয়েক আগে দূরপাল্লার দৌড়ে মার্কিণ তরুণ জিম রিয়ানের ক্রমোন্নতির লক্ষণ দেখে জাজি স্বমুখে বলেছিলেন, জিম্ রিয়ান যদি মাইল দৌড়ে আমার বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দেন তাহলে রিয়ানের নজীর ভাঙতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। কিন্তু স্ব-প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখার আগেই মাইকেল জাজি অ্যাথলেটিক থেকে অবসর গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেছেন।

গত পয়লা অক্টোবর ফ্রান্স - বৃটেন - ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রি-রাষ্ট্রিক অ্যাথলেটিকে পাঁচহাজার মিটার দৌড়পথ সব প্রতিযোগীদের আগে শেষ করার পরই জাজি আবার স্বমুখে অ্যাথলেটিকস দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন, এইখানেই দাঁড়ি টানছি। আর প্রতিযোগিতা নয়। এতো-দিনে যা করতে পেরেছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট। যা পারিনি তা নিয়েও আমার কোনো ক্ষোভ নেই। মাইল দৌড়ে আমার রেকর্ডটি জিম রিয়ান ছিনিয়ে নিয়েছেন। ভালই হয়েছে। কারণ রিয়ানের সাফল্য অগ্রগতিরই প্রতীক। রেকর্ড গড়া হয় ভাঙার জন্যেই। কেউ যদি কোনো রেকর্ড না ভাঙতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে মানুষের সামর্থ ফুরিয়ে গিয়েছে।

যে অ্যাথলিট নিজের মুখেই রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলায় আরও কিছুদিন অংশ নেবেন বলে অঙ্গীকার রেখেছিলেন, জিম রিয়ানের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন কেন? ভাবতে যাঁরা আশ্চর্য বোধ করছেন তাঁদের জানিয়ে রাখি যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী দৌড়বীর মাইকেল জাজি গত ক-বছর ধরেই নিজেকে ঘিরে অনেক বিস্ময় জড়ো করেছেন। জাজি কি বলেন, কখন কি করেন তাই নিয়ে কাছের মানুষেরা আজ আর অবাক হন না। হন তাঁরাই যাঁরা জাজিকে চেনেন না, জানেন না তেমন নিবিড়ভাবে।

জাজি দুর্বোধ্য। জাজি এক হেঁয়ালী, একথা সবাইকে যে কতোবার বলতে হয়েছে! সাধারণ হিসেবে অ্যাথলেটিক জীবনের একেবারে সায়াহ্নে এসেই জাজি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়কে সবার সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর এই বিলম্বিত সাফল্য দেখে অ্যাথলেটিকের পণ্ডিতদের বলতে হয়েছিল, জাজি এক ব্যতিক্রম। প্রচলিত, পরিচিত নিয়মের অঙ্কর মিলিয়ে জাজি-প্রতিভার পরিমাপ পাওয়া যাবে না।

ব্যতিক্রমের আর কতো নজীর জাজির সমগ্র অস্তিত্ব জড়ানো।

অনুশীলন, প্রশিক্ষণ, সাধনায় আত্ম-নিমগ্ন অ্যাথলিটরা যা কখনো করে না, তা করতে জাজির বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। হুইস্কি, স্যাম্পেন গলায় ঢালতে, গভীর তৃপ্তিতে সিগারেটে টান্ দিতে, ডিনার টেবিলে বসে একটির পর আরও কটি প্লেট সাবাড় করতে, নাচ-গানের আসরে মাঝরাত্রি পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে জাজি কুণ্ঠিত নন।

অ্যাথলিটদের জীবনধারায় সংযম দরকার। জাজি সে কথা মানেন না। কিন্তু বাড়াবাড়িতে তাঁর প্রবল আপত্তি। জীবন সম্পর্কে তাঁর শিথিল মনোভাব দেখে জিজ্ঞাসু নয়নে কেউ তাঁর মুখের দিকে তাকালে জাজি বলেন, নিজে আনন্দ পেতে অ্যাথ লেটিক চর্চা করছি। আমি একজন অ্যাথ লিট। কিন্তু তার চেয়ে বড় আমি একজন মানুষ। আমি সন্ন্যাসী নই। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে শুধু অ্যাথলেটিক নিয়ে মেতে থাকায় আমি আনন্দ পাই না। যে জীবনের একদিকে বঞ্চনা, অন্যদিকে শুধু সাধনা, সেই জীবনের অনেকখানিই গোঁজামিল।

তাই, যখন খিদে পায় তখন আশ মিটিয়ে খাই। উৎকৃষ্ট পানীয়ের দিকে হাত বাড়াই। কই? এতে তো আমার অসুবিধে হয় না। হোতো যদি দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে না পারতাম। যদি নিজের মনে অস্পষ্টতার ধোঁয়া থাকতো পুরোপুরি বজায়।

জীবন সম্পর্কে, নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে মাইকেল জাজির উপলব্ধি সত্যিই আশ্চর্য।

তাঁকে দেখে দর্শকেরাও এবং অ্যাথ-লেটিক বিশেষজ্ঞরাও বিস্ময়বোধ করেও মনে মনে অনেক আনন্দ পেয়েছেন। ট্র্যাকে জাজির উপস্থিতিই এক বিচিত্র স্বাদের উৎস।

অ্যাথলেটিকের বড় বড় আসরে সাধা-রণতঃ যাঁরা হাজির হন তাঁদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা একই ধরনের। মাথার চুল-গুলি ছোট করে ছাঁটা, চোখে মুখে মনঃ-সংযোগের কঠিন রেখা। মুখে হাসি নেই। কথাও নেই। কিন্তু জাজি যেন একেবারে এক উলটো ছবি। লম্বা লম্বা কালো ঘন চুল পেছনের দিকে উলটানো, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। কথায় খই ফোটাতে কামাই নেই। ট্র্যাকের বাইরে গাঢ় রংয়ের স্যুট গায়ে, ছুঁচোলো বুট পায়ে। সাজসজ্জার পরিপাটী। সব মিলিয়ে জাজি যেন চিত্রলোক হলিউডের এক জীবনন্ত তারকা। ভুল করে অন্য মুলুকে এসে পড়েছেন।

কিন্তু ভুল করে বা না করে, যে সূত্রেই হোক, এসে পড়ার পর সেই মুলুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় জাজির এতো-টুকু ভুল হয়নি। হয়তো সময় বেশি নিয়েছেন। তা নিন্। শেষ পর্যন্ত অক্ষয় স্বীকৃতির মূলধনে মাইকেল জাজি অ্যাথলেটিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। এবং সে স্বীকৃতির উপাদান তাঁর চেহারা, তাঁর স্বভাব নয়, তাঁর কীর্তি। একালের এক বিশ্ব-বিশ্রুত অ্যাথলিট রণ ক্লার্ক প্রতি-

স্বামী মাইকেল জাজি সম্বন্ধে বলেছেন 'অ্যাথলেটিক চর্চায় আর একটু মন দিলে মাইকেল নিঃসন্দেহে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞায় অভিনন্দিত হতেন। তবে তেমন মন না দিয়েও তিনি যা হতে পেরেছেন তারই বা তুলনা কোথায়!'

মাইকেল জাজির কীর্তি মাইল দৌড়ে, দু মাইল, দু হাজার ও তিন হাজার দৌড়ে। চার চারটি বিভাগে একই সময়ে তিনি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। জিম রিয়ান, কিপকো কিনো ও রণ ক্লার্কেরা মধ্যে মধ্যে বিশ্ব রেকর্ডের সাম্রাজ্য জাজির কাছ থেকে কেড়ে নিলেও জাজি যে তাঁদের কারুর চেয়ে কম নন একথা কেই বা অস্বীকার করবে? সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য রেকর্ড তাঁর এক মাইল দৌড়ে। বিখ্যাত ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পিটার স্নেলের নজীর ডিঙিয়ে ৩ মিনিট ৫৩·৬ সেকেন্ডে এই পথ উৎরে গিয়ে-ছিলেন তিনি গত বছরে। মার্কিণ তরুণ জিম রিয়ান সম্প্রতি এই রেকর্ড ভাঙ্গার (৩ মিঃ ৫১·৩ সেঃ) পর জাজি বা রিয়ান, কে আগে মাইল দৌড়ে তিন মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডের বাধা ভাঙ্গবেন তাই জানতে যখন প্রস্তুত তখন জাজি অবসর গ্রহণ করলেন। মাতৃভূমি ফ্রান্স জাজির মতো উঁচু দরের অ্যাথলেটকে আগে কখনো অঙ্কে ধরে নি। তাই সারা দেশ যখন জাজিকে ঘিরে ওলিম্পিকে স্বর্ণ সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখছে তখন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অবসরের সংবাদ সব প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু জাজির অবসরের সিদ্ধান্ত কি সত্যিই অপ্রত্যাশিত? বয়স তিরিশের কোটা পেরিয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতার চাহিদাও দিনে দিনে সর্বাত্মক হয়ে উঠছে। পরের ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে এখন বছর দুয়েক দেরী। সবদিকে নজর রেখেই জাজি নিজের সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিদায় নেওয়া সকলের পক্ষেই অনিবার্য। তাই যাবার বেলা মাথা উঁচু রাখাই ভাল। জাজি ফ্রান্সের প্রত্যাশাকে প্রচণ্ড আঘাত হানলেও নিজের ওপর বোধহয় অবিচার করেন নি। কজন পারেন এমন রাজকীয় মর্যাদায় সরে যেতে? যখন নিজে খ্যাতির শিখরে। চারপাশে জয়-ধ্বনি সোচ্চার। ঠিক সেই লগ্নে বিদায়

মাইকেল জাজি

জানাবার সুস্থ মন অনেকেরই থাকে না। জাজির আছে। তাই তিনি নিজের পরি-চয়কে আরও উঁচুতে তুলে ধরতে পারলেন। তবে অনুসন্ধিৎসু ক্রীড়ানুরাগীদের এক-মাত্র আফশোস এই যে যথাসময়ে জাজি এবং জিম রিয়ান মাইল দৌড়ের এক আসরে পরস্পরের মুখোমুখি হলেন না।

বেশি বয়সে পৌঁছে মাইকেল জাজি তাঁর পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিভাত হলেও দৌড়ে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল যথাসময়েই। বয়স যখন মাত্র তেরো তখন থেকেই জাজি দৌড়চ্ছেন। তার আগে ফুটবল মাঠ তাকে হাতছানি দিয়েছিল। কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই মাইকেল জাজি মাঠ ভুলে ট্র্যাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করেন নি। মাঠ ছেড়ে ট্র্যাকে আসার পেছনেও একটি মজার কাহিনী আছে।

ফুটবলে সবে কিঞ্চিৎ নাম হয়েছে এমন সময় প্যারিসের এক ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে নামার ডাক এলো বন্ধুদের কাছ থেকে। বন্ধুরা নাছোড়বান্দা, বলে, তোমার শরীর মজবুত, দমও অফুরন্ত। কাজেই পরখ করে দেখো না কি হয়।

অনুরোধ এড়াতে না পেরে জাজি ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে যোগ দিলেন। তারপর আর ফুটবল মাঠে ফিরে আসেন নি। ট্র্যাক যেন জাজির মনকে নেশায় মাতিয়ে দেয়।

১৯৫৬ সাল থেকে মাইকেল জা ফ্রান্সের জাতীয় রেকর্ড গড়ে ও ভেঙে আসছেন। ক্রমে ক্রমে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইউরোপীয় ক্রীড়াভূমিতে প্রতিষ্ঠি হলেন জাজি। তারপর ১৯৬০ সালে রো ওলিম্পিকে পনেরোশো মিটার দৌ হাঙ্গেরীয় ইস্তভান রোজাভল সুইডেনের ডন ওয়ারেনকে হারি দ্বিতীয় স্থান পাবার সঙ্গে সঙ্গে জা আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক দুনিয়ায় প্রথ সারির একজন বলে চিহ্নিত হয়ে পড়েন।

রোমের পর টোকিও। সেখানে প হাজার মিটার দৌড়ে জাজি সুবিধে কর পারেন নি দেখে অনুরাগীমহলেও গভী হতাশায় জাজির অবসরের মুহূর্ত গুনে থাকার ফাঁকে ১৯৬৫ সালে একটির প আরও কটি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে জাজি তাক লাগিয়ে দেন। যাঁরা বলেছিলে জাজি ফুরিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের ভু ভাঙ্গতেই যেন জাজির পুনরাবির্ভাব।

গত চৌত্রিশ বছরের মধ্যে একম মাইকেল জাজি ছাড়া ফ্রান্সের আর কো অ্যাথলিট মাইল দৌড়ে বিশ্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি পান নি। ফলে মেক্সিকো ওলিম্পিকের পনেরোশো মিটার দৌড় স্বর্ণপদকটি ফ্রান্সের ঘরে উঠবে বলে যা ধরে নিয়েছিলেন পয়লা অক্টোবর ঘোষণায় জাজি আবার তাঁদের ভুল ধ দিলেন। জাজি মূলতঃই অপেশাদার অ্যা লিট। জয়ের বদ্ধ ধারনার দাস নন। নিজে আনন্দই তাঁর কাছেই সব। জিততে, হার এবং অবসর নিতেও তিনি নিরানন্দ নন।

জাজিকে পেয়ে ক্রীড়ামোদী ফ্রান্স অনেক দিনের পুরানো আক্ষেপ মিটো জনসাধারণ তাঁকে বীর পুজায়, দে সরকার উচ্চ সম্মানে, সম্মানিত করেছে জাজির মতো লোকপ্রিয় ক্রীড়াবিদ আ ফ্রান্সে একজনও নেই। আর এই জ প্রিয়তা তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ লাভজনক মূলধন জুগিয়েছে। এক নিঃ খনি-শ্রমিকের (জননী ফরাসী, জন পোলিশ) সন্তান মাইকেল জাজি আজ এ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগকা অফিসার। সকলের প্রিয় তিনি, তাই জন সংযোগে তাঁর জুড়িও নেই। আরও আ যখন অ্যাথলিট হিসেবে অখ্যাত, বাহিনী অশ্রুত তখন মাইকেল জাজি ছিলে বিখ্যাত ক্রীড়া-পত্রিকা লে ইকুইপ-এ ছাপাখানার কর্মী।

লে ইকুইপের সহকর্মী, ক্রীড়া সম্পাদ গ্যাসটন মেয়ারও মাইকেল জাজির মনে কথা টের পান নি। এই সেদিনেও তি জাজির ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্বন্ধে সুবিস্তৃ এক প্রবন্ধ ফেঁদে মেক্সিকো ওলিম্পিক জাজির সাফল্যের পূর্বাভাষ করেছিলেন কিন্তু ১৯৬৮ সাল তো অনেক দূরে! তা আগেই জাজি অবসর নিলেন।

এরপর কি করবেন? জাজি সম্বন্ধে আর কি কেউ নতুন পূর্বাভাষ জানাতে সাহস পাবেন? জাজি সত্যিই দুর্জ্ঞেয়। অন্যের অবোধ্য।

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা

ডর্টমুণ্ডে (পশ্চিম জার্মানী) আয়োজিত ১৬শ বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে চেকোশ্লোভাকিয়া দলগত এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। দলগত বিভাগে চেক দলের চ্যাম্পিয়ান হওয়া রীতিমত অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আলোচ্য প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগে ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান ভেরা ক্যাসলাভস্কার খেতাব জয় সম্পর্কে কারও সন্দেহই ছিল না। কিন্তু দলগত অনুষ্ঠানে টোকিও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান রাশিয়াকে যে চেকদল পরাজিত করবে, তা কেউ ভাবতেই পারেননি। চার বছর আগে প্রেগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে চেকোশ্লোভাকিয়া দলগত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। আলোচ্য বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে চেক দল ৩৮৩·৬২৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রথম হয় এবং ব্যক্তিগত বিভাগে চেক দলের ভেরা ক্যাসলাভস্কা মোট ৭·২৯৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বিশ্ব জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে গতবারের চ্যাম্পিয়ান জাপান এবারও দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। এবার তারা ৫৭৫·১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রাশিয়া (৫৭০·৯০ পয়েন্ট)। পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন রাশিয়ার মিখাইল ভোরোনিন (১১৬·১৫ পয়েন্ট)।

পশ্চিম ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে আয়োজিত পশ্চিম ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে এশিয়ান সিংগলস চ্যাম্পিয়ান এবং ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় দীনেশ খান্না স্ট্রেট সেটে ইন্দোনেশিয়ার ওয়াংপেক শেনকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করেছেন। মহিলাদের সিংগলস খেতাব পেয়েছেন ইংল্যান্ডের কুমারী এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো। গত বছর এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সিংগলস খেতাব জয়ের পর দীনেশ খান্না মাত্র দু'বার পরাজিত হয়েছেন —মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত তান আইক হুয়াং এবং জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় দীপু ঘোষের কাছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : দীনেশ খান্না (ভারতবর্ষ) ১৫-১০ ও ১৫-৩ পয়েন্টে ওয়াংপেক শেনকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

জুডি হাসম্যান (আমেরিকা)

মহিলাদের সিংগলস : এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড) ১১-৬ ও ১১-৪ পয়েন্টে ইর্মা রিটভেল্ডকে (হল্যান্ড) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : এস এন্ডারসেন এবং পি ওয়ালসো (ডেনমার্ক) ১৫-১১ ও ১৫-৭ পয়েন্টে ওয়াং পেক সেন এবং লায়ন টাং পিংকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড) এবং ইমরেগার্ড লাজ (পশ্চিম জার্মানী) ১৫-৯ ও ১৫-৫ পয়েন্টে উলা স্ট্রান্ড এবং কার্মিন জোরগেনসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : উলা স্ট্রান্ড এবং ওয়ালসো (ডেনমার্ক) ১৫-৬, ১২-১৫ ও ১৫-৯ পয়েন্টে এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো এবং আর মিলসকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

জাপানে ভারতীয় হকি দল

তিন সপ্তাহের জাপান সফরে ভারতীয় হকি দল ১০টি খেলায় যোগদান করে স্বদেশে ফিরে এসেছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের জয় ৮ এবং পরাজয় ২ (১ম ও ২য় টেস্টে)। এই জাপান সফরের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে 'রাবার' জয় করেছে। টেস্ট সিরিজের ১ম ও ২য় টেস্টে জাপান যথাক্রমে ৩-২ ও ১-০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছিল। শেষের তিনটি টেস্টে ভারতবর্ষ যথাক্রমে ৩-০, ২-১ ও ২-০ গোলে জাপানকে পরাজিত করে।

ভারতীয় হকি দলের এই সফর হকি খেলা সম্পর্কে জাপানে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে। ভারতীয় হকি দলের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, গত কয়েক বছরের মধ্যে হকি খেলায় জাপান আশাতীত উৎকর্ষতা লাভ করেছে। এই কর্মকর্তারই ভবিষ্যদ্বাণী হল, আগামী এশিয়ান গেমসে জাপান ব্রোঞ্জ পদক জয় তো করবেই, এমন কি দ্বিতীয় স্থানও পেতে পারে।

জাপান সফরে ভারতীয় খেলোয়াড়রা সর্ট কর্নার হিটে আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি, সফরের শেষদিকের খেলায় যা সাফল্যলাভ করেছিলেন।

রাজ্য স্কুল সন্তরণ

আজাদ হিন্দ বাগে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কুল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে উত্তর কলিকাতা এবং ছাত্রী বিভাগে মধ্য কলিকাতা স্কুল দল দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। রেকর্ড স্থাপনের দিক থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—উভয় বিভাগেই তিনটি করে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

ছাত্র বিভাগ : ১ম উত্তর কলিকাতা (৫০ পয়েন্ট), ২য় দক্ষিণ কলিকাতা (২৩) এবং ৩য় হাওড়া (১৬ পয়েন্ট)।

ছাত্রী বিভাগ : ১ম মধ্য কলিকাতা (২৪ পয়েন্ট), ২য় দক্ষিণ কলিকাতা (১২ পয়েন্ট) এবং ৩য় উত্তর কলিকাতা (৭ পয়েন্ট)।

নতুন রেকর্ড

ছাত্র বিভাগ

২০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল : জগৎ আইচ** (দঃ কলিকাতা), সময়—২ মিনিট **২৯·৯** সেকেণ্ড

৪০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল : জগৎ আইচ** (দঃ কলিকাতা), সময়—৫ মিনিট **২১·৪** সেকেণ্ড

১০০ **মিটার বুক সাঁতার :** পি সমাদ্দার (দঃ কলিকাতা), সময়—১ মিনিট ২৫·৮ সেকেণ্ড

ছাত্রী বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল :** অপু ব্যানার্জি (মধ্য কলিকাতা), সময়—১ মিনিট ২৯·৪ সেকেণ্ড (হিট)

১০০ **মিটার ব্যাকস্ট্রোক :** অপু ব্যানার্জি (মধ্য কলিকাতা), সময়—১ মিনিট ৩৬·৫০ সেকেণ্ড

১০০ **মিটার বুক সাঁতার :** শিখা দে (দঃ কলিকাতা), **সময়**—১ মিনিট ৪২·৮ সেকেণ্ড

ডেভিস কাপ

টোকিওর ডেনেন স্টেডিয়ামের ক্লে কোর্টে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪-১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে ইন্টারজোন সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে ভারতবর্ষ এবং জাপানের মধ্যে ৬ বার খেলা হল এবং ভারতবর্ষ ৬ বারই জয়ী হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র দেশ জাপানই ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অর্থাৎ ফাইনালে খেলেছে। জাপান ১৯২১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে

শক্তিশালী আমেরিকার কাছে ০-৫ খেলায় পরাজয়বরণ করেছিল।

প্রথম দিনের খেলা

প্রথম দিনে দুটি সিঙ্গলস খেলা হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু আলোর অভাবের দরুণ দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। প্রথম সিঙ্গলস খেলায় রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ) ২ ঘণ্টা সময়ে ৬-৩, ২-৬, ৬-২ ও ১০-৮ গেমে ওসামু ইশিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করলে ভারতবর্ষ ১-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা খেলা চলার পর দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলাটি আলোর অভাবে বন্ধ রাখতে হয়। এই সময়ে প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) এবং ওয়াতানাবের খেলার ফলাফল সমান ৩-৬, ৬-১, ৪-৬, ৬-৩ ও ৪-৪ ছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

পূর্ব দিনের অসমাপ্ত দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় কোজি ওয়াতানাবে (জাপান) ৬-৩, ১-৬, ৬-৪, ৩-৬ ও ৯-৭ গেমে প্রেমজিৎলালকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

ডাবলসের খেলায় রমানাথন কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎলাল ৬-২, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে কোজি ওয়াতানাবে এবং ওসামু ইশিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করলে ভারতবর্ষ ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়।

তৃতীয় দিনের খেলা

তৃতীয় সিঙ্গলস খেলায় ভারতবর্ষের অধিনায়ক রমানাথন কৃষ্ণান এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটের খেলায় জাপানের তরুণ খেলোয়াড় ওয়াতানাবেকে ৬-২, ৭-৫ ও ৬-০ গেমে পরাজিত করেন। শেষ সিঙ্গলস খেলায় প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) ২-৬, ৮-৬, ৭-৫ ও ১০-৮ গেমে ওসামু ইশিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

উত্তর ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

লক্ষ্ণৌতে উত্তর ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড় আমেরিকার শ্রীমতী জুডি হাসম্যানের যোগদান ভারতবর্ষের ব্যাডমিণ্টন খেলার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। শ্রীমতী জুডি হাসম্যান অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে উপর্যুপরি ১১ বার খেলে ৮ বার সিঙ্গলস খেতাব পান, এর মধ্যে উপর্যুপরি খেতাব পান ৫ বার (১৯৬০—৬৪)। সন্তানের জননী হওয়ার দরুণ তিনি পুরো এক বছর প্রতিযোগিতামূলক ব্যাডমিণ্টন খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি; ফলে ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় তাঁকে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিতে হয়েছিল। পুনরায় তিনি ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পান। সর্বসমেত তিনি অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ৯ বার সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড। মনে রাখতে হ অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিত যে কোন একটি বিভাগের খেতাব জ গৌরব—বেসরকারীভাবে বিশ্বখেতাব জ সমান।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ওয়াং পেক (ইন্দোনেশিয়া) ১০-১৫, ১৫-৩ ১৫-৬ পয়েণ্টে এস এণ্ডারসেন (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী জ হাসম্যান (আমেরিকা) ১১-৮ ও ১১ পয়েণ্টে কুমারী এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টে (ইংল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : রমেন ঘোষ এবং দ ঘোষ (রেলওয়ে) ৮-১৫, ১৫-১১ ১৫-১০ পয়েণ্টে সুরেশ গোয়েল সি ডি দেওরাজকে (রেলও পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী কা জোরগেনসেন এবং শ্রীমতী উলা স্ (ডেনমার্ক) ১১-১৫, ১৫-৭ ও ১ পয়েণ্টে এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো থিজকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী এ্যাঞ্জেলা বেয়ার এবং আর মিলস (ইংল্যাণ্ড) ১৫- ও ১৫-১০ পয়েণ্টে পারওয়ালসো শ্রীমতী উলা স্ট্র্যাণ্ডকে (ডেনমা পরাজিত করেন।

চাঁদ ও পৃথিবী

।। পৃথিবীর গঠন ও গতি ।।

শচীন্দ্রনাথ বসু

পর্দার মত মেরুজ্যোতি

এবার আমাদের আলোচ্য মানুষের ধাত্রী এই ধরিত্রী। আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার মত এই পৃথিবীর উৎপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধেও আদি কাল থেকে জল্পনাকল্পনা চলেছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক যুগের তত্ত্বাবলীও আজ অচল! এ বিষয়ে পশ্চিম জগতে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের উপর টেক্কা দিয়েছেন ধর্মযাজক আশার, তাঁর মত টিঁকে ছিল প্রায় তিন শতাব্দ। ১৬৫০ সালে তিনি ফতোয়া দেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩ অক্টোবর রবিবার সকাল নটায়। বাইবেল আদমের বংশধরদের যে তালিকা আছে, তাদের আয়ুকাল থেকে এই হিসাব তৈরি হয়েছে। আজ বিজ্ঞানের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বয়স ধরা হয় প্রায় ৪৬০ কোটি বছর।

১৬৪৪ সালে দার্শনিক দেকার্ত পৃথিবীকে কল্পনা করেন সূর্যের মত প্রজ্বলিত জ্যোতিষ্করূপে। পরবর্তী শতাব্দে কানট ও লাপলাস মনে করেন সূর্য-আবরণী এক গাসীয় নেবুলা দানা বেঁধে পৃথিবীর সৃষ্টি—এই ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনেকটা কাছাকাছি। তাঁদের পরে বিবিধ প্রকল্পে পৃথিবীকে সূর্যের সন্তানরূপে ভাবা হয়েছে; হয় বিস্ফোরণের পরে সে গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, নতুবা কাছে এসে পড়া অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষে বা আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই রকম ধারণা অল্প দিন আগে পর্যন্তও প্রচলিত ছিল, এবং ফলে লোকের মনে এই ধারণা ছিল যে অধিকাংশ তারাই নিঃসঙ্গ, গ্রহ সৃষ্টি অতি দুঃসম্ভব ও আকস্মিক ঘটনা, সুতরাং আমাদের এই পৃথিবী এবং তার এই প্রাণ এক বিশেষ গৌরবের অধিকারী।

এই সব তত্ত্বে নানা অসঙ্গতি ছিল এবং সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক চিন্তা সম্পূর্ণ নতুন পথে চলেছে। আজ অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস যে মহাকাশে শীতল গ্যাস ও বস্তুকণা জমে তারাকে ঘিরে গ্রহ পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে এবং সূর্য ছাড়াও অনেক তারার গ্রহ আছে। শুরুতে সৌরলোকে সদ্যোজাত গ্রহগুলি এখনকার তুলনায় অনেক গুণ ভারী ছিল, এই প্রাক্‌পৃথিবীর ওজন ছিল সম্ভবতঃ ৫০০ গুণ বেশী, ব্যাস ২০০০ গুণ। বহু লক্ষ বছর ধরে ভারী মৌলিক পদার্থগুলি কেন্দ্রের দিকে ডুবতে ডুবতে গুরুভার অষ্ঠি সৃষ্টি করল, তাকে ঘিরে থাকল হালকা গ্যাস, প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। ইতিমধ্যে সংকোচনরত সূর্যের ঘনতা বাড়তে বাড়তে এমন এক সন্ধিক্ষণ এল যখন ভিতরের অবপারমাণবিক প্রক্রিয়ার ফলে তাপ নির্গমন শুরু হল, সূর্য জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল, তার গা থেকে উক্ত আয়নের বৈদ্যুৎধর্মযুক্ত পরমাণু বা অণুর অংশ) স্রোত বেরিয়ে এসে নিকটবর্তী গ্রহগুলিতে যেটুকু গ্যাস তখনও জড়িয়ে ছিল তা দূর করে দিল; তা ছাড়া গ্রহগুলি নিজেরাও গরম হয়ে ওঠার ফলে গ্যাস উবে গেল। কয়েক হাজার লক্ষ বছর পরে অধিকাংশ গ্যাস চলে গিয়ে থাকল সংকুচিত সূর্যতপ্ত প্রায় নগ্ন কতগুলি নিকট গ্রহ এবং গ্যাস ঢাকা দূরে গ্রহ—যে অবস্থা বর্তমানে আমরা দেখছি।

এর মধ্যে প্রাক্‌পৃথিবীর কেন্দ্র ঘন হয়ে যখন এক অষ্ঠি গড়ে উঠল, তখন সংকোচনের ফলে এবং তাপবিকিরণী তেজস্ক্রিয় পদার্থের থেকে তার উষ্ণতা বাড়তে থাকল, এক সময়ে গলে গেল এই পৃথিবী। পরে সংকোচনী শক্তি যখন ফুরিয়ে গেল, তেজস্ক্রিয় বস্তু ক্ষয়ে গেল, তখন পৃথিবী আবার জুড়োতে আরম্ভ করল—এই ঠাণ্ডা হওয়া হয়তো এখনও চলছে। প্রথম দিকে যখন মেঘ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে, তখন দেখতে দেখতে জল উবে গিয়েছে ধোঁয়া হয়ে। যুগ যুগ পরে পাথরের খাতে খোদলে জল জমে তৈরি হল মহাসাগর। আরও অনেক পরে প্রাণ আবির্ভাবের ফলে পাথরের গায়ে মাটির প্রলেপ পড়ল।

১৭৫৪ সালে নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র ব্যবহার করে ক্যাভেন্ডিশ পৃথিবীর ওজন মোটামুটি সঠিক নির্ধারণ করেছিলেন ৬'৬ কোটি কোটি কোটি টন (৬৬-র পরে কুড়িটা শূন্য)। এই গ্রহের আয়তন প্রায় ২৬,০০০ কোটি ঘন মাইল। গড় ঘনতা ৫·৫, অর্থাৎ সব মিলিয়ে তার বস্তু জলের অত গুণ ভারী। অবশ্য পৃথিবীর বস্তু সর্বত্র সমান ঘন নয়, তার খোসার ঘনতা গড় ঘনতার অর্ধেকের কাছাকাছি মাত্র, তার থেকেই বোঝা যায় ভিতরটা অপেক্ষাকৃত ভারী।

ভূপদার্থবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বস্তু বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন। এক দলের মতে উপরের কয়েক মাইল পুরু খোলসটার নিচে আছে ১৮০০ মাইল গভীর এক স্তর, তার নিচে ১৩৭৫ মাইল গভীর বহির-অষ্ঠি এবং সব শেষে ৮০০ মাইলের ভিতর-অষ্ঠি। পৃথিবীর গর্ভে আছে নিকেল মিশ্রিত লোহা। বহির-অষ্ঠি ও ভিতর-অষ্ঠির পার্থক্য এই সংকরধাতুর রাসায়নিক ভেদজনিত হতে পারে, অথবা প্রধানত তরল ও কঠিন অবস্থান ভেদও এই পার্থক্যের কারণ হতে পারে—হয়তো অষ্ঠির কেন্দ্রে বস্তু কঠিন। পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে মানুষ অনতিবিলম্বে পাড়ি দেবে, কিন্তু এই গ্রহের অন্তর্দেশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংগ্রহ করা আজও প্রায় স্বপ্নের রাজ্যে। পৃথিবীর ব্যাস যদি আমরা কল্পনা করি, পাঁচ ফুট মাত্র, তবে তার গায়ে সামান্য কাঁটার খোঁচার সঙ্গে আমাদের গভীরতম খননও তুলনা করা চলে না। ভূমিকম্পের থেকে আন্দাজ হয়, তার অষ্ঠিতে আছে প্রধানত গলিত লোহা। তা ছাড়া, পৃথিবী যে প্রকাণ্ড চুম্বকের মত ব্যবহার করে তা সুবিদিত, স্বাবর্তন গতির ফলে তার ভিতরের তরল লোহার নড়াচড়া থেকে এই চুম্বকী ক্ষেত্রের উৎপত্তি এই রকমই সাধারণ বৈজ্ঞানিক ধারণা। উপরের দিকে আছে যে সব পাথর ভূবিজ্ঞানীরা তাদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপের পার্থক্যের থেকে পাথুরে খোলসে যে ফাটল ধরে তাতে ভূমিকম্প ঘটে। প্রতি বছর প্রায় কুড়িটা বড় ভূমিকম্প হয়, ছোটর সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, অর্থাৎ মিনিটে দুটি। গুরুতর কম্পন প্রায় সবই দুটি সরু লম্বা অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সবচেয়ে ভীষণ দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৫৫৬ সালে চীনের শেন্‌সি প্রদেশে, লোক মরে ৮৩০,০০০।

পৃথিবীর ভিতরের দিকটা ছেড়ে এবার বাইরের দিকে চোখ ফেরানো দরকার। আমাদের সব মহাসাগরে যত জল তার চেয়েও বিশাল গ্যাসের সাগরে এই গ্রহ নিমজ্জিত। মাছ ও অন্যান্য কিছু প্রাণীর জন্য জলের আবরণ অত্যাবশ্যক, কিন্তু এই বায়ুমণ্ডল বিনা পৃথিবীতে প্রাণের মেলা কোনও দিনই জমত না। তার অক্সিজেন নিশ্বাস জোগায়, বৃষ্টি ও আবহের প্রভাবে ভূমি ক্ষয় হয়ে উদ্ভিদের ক্ষেত্র মাটি সৃষ্টি হয়, উদ্ভিদ আঙ্গারিক গ্যাস থেকে শর্করা ও বৃহত্তর

কারবোহাইড্রেট তৈরি করে, তারই উপর নির্ভর করে সমগ্র পশুজগৎ। আবহের উচ্চ স্তরে ছাতার মত কাজ করে ওজোন, সূর্যনিঃসারিত মারাত্মক অতিবেগনি আলো আটকে দেয়। নানা রকম ক্ষতিকর রশ্মি ও উল্কার থেকে তো আবহ আমাদের রক্ষা করেই, উপরন্তু তা মহাকাশের শৈত্য ভিতরে ঢুকতে দেয় না এবং সূর্যের তাপকে ভিতরে ধরে রাখে।

প্রতি বছর ঘূর্ণবাত, মৌসুম, সূর্যতাপ, ইত্যাদির প্রভাবে এক লক্ষ ঘন মাইল জল আবহে উঠে যায় সাগর ও মহাদেশ থেকে। এই আবহই আবহাওয়ার জন্য দায়ী, এরই কারণে থেকে থেকে আকাশে নানা বৈচিত্র্য নানা সৌন্দর্য—যেমন সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, এমনকি ঝড় বাদলে পর্যন্ত।

এই সমগ্র গ্যাসীয় আবরণটার ভার পৃথিবীর বড়জোর দশ লক্ষের এক ভাগ। সমুদ্র পৃষ্ঠে তার চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড। উপরের দিকে অবশ্য ক্রমশঃ গ্যাসের ঘনতা কমে যাচ্ছে। কোথাও এর সুনির্দিষ্ট সমাপ্তি বা বিভাগও নেই, তবে বিভিন্ন স্তরের কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, সেই অনুসারে তার ভাগাভাগি করেছেন। এক আধুনিক রীতিতে প্রথম স্তরটিকে বলে ক্ষুব্ধ মন্ডল, তার উচ্চতা পাঁচ থেকে দশ মাইল; তার পরের দশ থেকে ১৫ মাইলের নাম স্তব্ধ মন্ডল; তৃতীয় স্তর মধ্য মন্ডল শেষ হয়েছে ৫০ মাইল উর্ধ্বে; চতুর্থ চতুর্থ স্তর আয়ন মন্ডল উঠেছে ৩৫০—৬০০ মাইল পর্যন্ত; সব শেষে বহির্মন্ডল পাতলা হতে হতে ৪০,০০০ মাইল দূরে প্রায় শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

সমগ্র বায়ু মন্ডলের তিন চতুর্থাংশ ওজন আছে ক্ষুব্ধ মন্ডলে, এই স্তরে ধূলি মেঘ ঝড় ও সব রকম প্রাণী সীমাবদ্ধ। উপাদান ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২১ শতাংশ অক্সিজেন, ০.৯ শতাংশ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আরগন, ০.০৩ শতাংশ অঙ্গারিক গ্যাস, এবং অতি সামান্য পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস; এক মাত্র জলীয় বাষ্পের পরিমাণ স্থান ও ঋতু ভেদে অল্পবিস্তর বদলায়। অবশ্য বড় শহর ও কারখানার অঞ্চলে অঙ্গারিক গ্যাসও বাড়ে।

তিন পরমাণু অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যে ওজোন তৈরি হয় এবং যা আমাদের অতিবেগনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে তা আছে স্তব্ধ মন্ডলে। মধ্য মন্ডলও আমাদের রক্ষক, অধিকাংশ উল্কা সেখানে পুড়ে ছাই হয়। আয়ন মন্ডল সভ্য মানুষের এক মস্ত বড় সহায়, তা রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত করে বলে আজ আমরা ঘরে বসে দূরের গান বাজনা শুনতে পাই; তা ছাড়া এই স্তরে দেখা দেয় আশ্চর্য সুন্দর মেরুজ্যোতি।

১৯৫৮ সালে আমেরিকার ডঃ জেমস ভ্যান অ্যালেন এবং তাঁর সহকর্মীরা এক অতি গুরুতর ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার করেন। একসপ্লোরার ও পাইয়োনিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহের সংগৃহীত তত্ত্ব থেকে এঁরা জানতে পারেন যে পৃথিবীর অনেক উপরে এবং তার চুম্বকী ক্ষেত্রের মধ্যে বিকিরণের দুটি প্রকান্ড বেষ্টনী আছে, অবিলম্বে তা আবিষ্কারকের নামে পরিচিত হয় ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশান বেলটস। পরে দেখা গেল আসলে দুটি বেষ্টনী নেই, আছে একটি লম্বা আবরণ; এর আধুনিক নাম চুম্বক মন্ডল, ৬০০ মাইল উর্ধ্বে আরম্ভ হয়ে হঠাৎ শেষ হয়েছে ৪০,০০০ মাইল দূরে, অর্থাৎ তা পার্থিব আবহের বহির্মন্ডলের অংশ।

এই চুম্বক মন্ডলও আমাদের রক্ষকের কাজ করে, মারাত্মক বিকিরণের তা এক ফাঁদ। সূর্য থেকে প্রোটন ও ইলেকট্রন ক্রমাগত পৃথিবীর চুম্বকী ক্ষেত্রে এসে পড়ছে। তারা এই বেষ্টনী পার হতে পারে না, অবশ্য পৃথিবীর চুম্বকী মেরু অঞ্চলে ছাড়া; সেখানে বিকিরণ প্রবেশের ফলে জ্বলন্ত মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়। প্রবল মহাজাগতিক রশ্মিগুলি চুম্বক মন্ডল ভেদ করে, কিন্তু দুর্বলগুলি বিক্ষিপ্ত হয়। দূরবীন ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্ব পর্যবেক্ষণের পথে আমাদের আবহ যে কত বড় বিরক্তিকর বাধা তা অনেকেরই জানা আছে, এখন দেখা গেল নানা রকম বিকিরণের বাধা হয়ে তা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে।

কিন্তু চুম্বক মন্ডল যেমন আমাদের রক্ষা করে, তেমনি এই মহাকাশ বিহারের যুগে তা বিজ্ঞানীদের মস্ত ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যাবৎ এ রকম বিহার এর নিচেই সীমিত থেকেছে, কিন্তু চাঁদে ও গ্রহে পাড়ি দিতে হলে একে অতিক্রম করতেই হবে, তখন বেশী সময় এই মন্ডলে অতিবাহিত হলে মৃত্যুর আশংকা।

এইবার আমরা কল্পনা করব মহাকাশে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন এক পর্যবেক্ষক পৃথিবীকে লক্ষ্য করছে। প্রথমেই তার নজরে পড়বে গ্রহটি সম্পূর্ণ গোল নয়। নিরক্ষ রেখার কাছাকাছি পৃথিবীর ঘূর্ণি বেগ যে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশী তার থেকে এবং বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের দৃষ্টান্ত থেকে নিউটন বলেছিলেন যে, পৃথিবীর পেটও বিস্ফারিত। বহির্মুখী গতি-জাত এই বিস্তার ১৮ শতাব্দে পরীক্ষায় সমর্থিত হয়, দেখা যায় মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত যতটা দূরে নিরক্ষ বৃত্তের ব্যাস তার ২৬.৭ মাইল বেশী। তার ফলে ভূগোলের বইতে সবাই পড়ে এসেছি যে এই ভূ ঠিক গোল নয়, 'কমলা লেবুর মত ঈষৎ চাপা'। বিগত আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষে (১৯৫৭-৫৮) ভ্যাংগার্ড কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে অনুষ্ঠিত গবেষণার এক আবিষ্কার এই যে কটিদেশের বিস্তার সর্বত্র সমান নয়, সবচেয়ে উঁচু ক্ষেত্রগুলি (অর্থাৎ প্রায় ২৫ ফুট) আছে নিরক্ষ বৃত্তের অল্প দক্ষিণে। পেটের এই স্ফীতি সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না, পৃথিবীর ব্যাস পাঁচ ফুটে পরিণত করলে তা দাঁড়াবে এক ইঞ্চির এক পঞ্চমাংশ মাত্র!

মহাশূন্যের সূক্ষ্মদর্শী পর্যবেক্ষক পৃথিবীর নানা গতির মধ্যে সবচেয়ে সহজে দেখতে পাবে তার আহ্নিক গতি বা ঘূর্ণি পাক, যার থেকে আমাদের দিন ও রাত্রির বিবর্তন। যে অক্ষকে ঘিরে এই আবর্তন তা ২৩.৫ ডিগ্রী হেলানো। পাকের বেগ সবচেয়ে বেশী অবশ্য নিরক্ষ রেখায়—ঘণ্টায় ১০৫০ মাইল।

এরপরেই উল্লেখ্য প্রদক্ষিণ গতি। ৩৬৫ দিন ছ ঘণ্টায় ৬০ কোটি মাইল দীর্ঘ পথে পৃথিবী এক পাক সূর্যকে ঘুরে আসছে, মিনিটে ১১০০ মাইল বেগে। এই কক্ষ অবশ্য বৃত্ত নয়, উপবৃত্ত; গড়ে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯.২৯ কোটি মাইল, কিন্তু তার মধ্যে পার্থক্য ঘটে ৩১ লক্ষ মাইলের। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে পৃথিবী প্রতি বছর একই উপবৃত্তের পথে ঘোরে না, উত্তর মেরু থেকে দেখলে উপবৃত্তের অক্ষে প্রতি প্রদক্ষিণে অল্প একটু ঘুরে যায় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

পৃথিবীর স্বাবর্তন ও প্রদক্ষিণ গতি দিন ও বছর নির্ধারণ করছে, আমাদের জীবনে তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু এছাড়া এ গ্রহের আরও অনেক গতি আছে যার খবর অনেকেরই অজানা। প্রদক্ষিণ কক্ষ উপবৃত্ত হলেও এই পথটা ঠিক পৃথিবীর নয়, পৃথিবী ও চাঁদের মহাকর্ষীয় কেন্দ্রের। পৃথিবী চাঁদের থেকে ৮০ গুণের বেশী ভারী, ফলে এই দুইয়ের কেন্দ্র যোগ করে এক দাগ টানলে যৌথ মহাকর্ষীয় কেন্দ্রের অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০০ মাইল দূরে। এই কেন্দ্রই শূন্যে উপবৃত্ত সৃষ্টি করে চলেছে, এবং যেহেতু চাঁদ একবার পৃথিবীর এদিকে আর একবার ওদিকে যাচ্ছে সেহেতু পৃথিবীর স্বকীয় পথটি হল সাপের মত আঁকাবাঁকা যার এক পাশ থেকে অন্য পাশের দূরত্ব প্রায় ৬০০০ মাইল।

চাঁদের মত গ্রহরাও অবশ্য পৃথিবীর উপর মহাকর্ষীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে তার কক্ষে অনুরূপ ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু তারা চাঁদের চেয়ে বড় হলেও এত দূরে যে এই ব্যতিক্রম অতীব সূক্ষ্ম।

পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতির মত তার স্বাবর্তনও নিখুঁত নয়, এবং তারও কারণ চাঁদ। চাঁদের টানে আমাদের সমুদ্রে যে জোয়ার-ভাটা দেখা দেয় তার ওজনে পৃথিবীর পাক অল্প একটু অস্থির হয়ে পড়ে। তাছাড়া, চাঁদ যখন একবার নিরক্ষ রেখার দক্ষিণে ও পরে উপরে যায় তখন পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্ফীতির উপর তার মহাকর্ষীয় প্রভাবও অক্ষটিকে টলমলিয়ে দেয়। লাটুর বেগ যখন মন্দ হয়ে আসে তখন তা যেমন প্রান্তন অক্ষটির চতুর্দিকে একটু হেলে ঘোরে পৃথিবীরও সেই দশা। সুতরাং তার অক্ষের দুই মাথা অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একই দিকে নির্দেশ না করে এক ছোট বৃত্তের পথে ঘোরে—অবশ্য এই গতি এতই মন্থর যে ২৫,৮০০ বছর কেটে

যায় বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে। একই রকম দুটি শঙ্কুর সরু মুখদুটি জুড়ে দিলে যা হয় পৃথিবীর অক্ষ এই দীর্ঘকাল তাই রচনা করে। এই গতিকে বলা হয় অনয়চলন।

পৃথিবীর স্ফীত কটির খবর জানবার অনেক আগেই মানুষ এই অস্থিরতা মেপেছে। খৃষ্টপূর্ব ১৩০ সালে গ্রীসীয় জ্যোতিষী হিপার্কাস লক্ষ্য করেন যে প্রতি বছর যখন মহাবিষুব আসে (বসন্তকালে যে তারিখে দিন ও রাত্রি সমান) তখন সূর্যের অবস্থান একটু করে পূবে সরে যায়। এই বার্ষিক পার্থক্যকে বলা হয় বিষুবের অয়নচলন।

পৃথিবীর অক্ষ যে চিরকাল একই দিকে নির্দেশ করে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বহু প্রাচীন। আজ শিশুমার তারামণ্ডলের লেজে অবস্থিত ধ্রুবতারা উত্তর মেরুর ঠিক মাথার উপরে, কিন্তু ৫০০০ বছর আগে মিশরী পুরোহিত-জ্যোতিষীরা লক্ষ্য করেন প্রকৃত উত্তরে অলফা ড্রেকোনিস নামে অন্য এক তারা। বর্তমানে উত্তর মেরু ধ্রুবতারার আরও কাছে যাচ্ছে, কিন্তু ২১০০ খৃষ্টাব্দে তা আবার সরে যেতে আরম্ভ করবে, এবং ১৪,০০০ খৃষ্টাব্দে অভিজিৎ হবে নতুন 'ধ্রুবতারা'। উত্তর আকাশে এই তারা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সুতরাং পৃথিবীর সমুদ্রে তখনও যদি নাবিকদের আনাগোনা থাকে তবে এতে তাদের সুবিধাই হবে। ধ্রুবতারা তাহলে ধ্রুব নয়, বর্তমান ধ্রুবতারা আবার সেই পদে অধিষ্ঠিত হবে ২৮,০০০ সালে, অয়নচলনের আর এক চক্র সম্পূর্ণ হলে। সুতরাং এই গতি লক্ষ্য করতে হলে আকাশের গায়ে আমাদের পর্যবেক্ষককে শুধু সূক্ষ্মদর্শী নয়, অতি দীর্ঘজীবীও হতে হবে।

কিন্তু এই অয়নচলনেও খুঁত আছে। সূর্য প্রদক্ষিণের উপবৃত্ত পথে পৃথিবীর যেমন সর্পিল গতি, তেমনি এই বৃত্ত পথে তার মেরুর চলনটা মসৃণ নয়, ঢেউখেলানো। তার কারণ এই যে পৃথিবীর সম্পর্কে সূর্য ও চন্দ্রের স্থান সর্বদা পরিবর্তনশীল, সুতরাং তাদের যেসব প্রভাব অয়নচলন সৃষ্টি করে তাও স্থির নয়। বৃত্তপথের দু পাশে পৃথিবীর এই আক্ষিক দোলনের পরিমাণ এক ডিগ্রীর ৪০০ ভাগের এক ভাগ, তা সম্পূর্ণ হতে লাগে ১৮·৬ বছর। এই দোলনের নাম অক্ষবিচলন।

এত রকম অস্থিরতার পরেও তালিকা সম্পূর্ণ হয় না। সৌর পরিবারের সন্তান হিসাবে মহাকাশে পৃথিবীর আরও দুটি গতি আছে। প্রথমত, স্থানীয় নাক্ষত্র মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্য সেকেন্ডে ১২ মাইল বেগে ছুটে চলেছে (মোটামুটি হারকিউলিস তারামণ্ডলের দিকে), আমরাও সেই গতির অংশীদার। দ্বিতীয়ত, আমরা যে ছায়াপথ নীহারিকার অধিবাসী তার চক্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার নাভিকে ঘিরে গ্রহপুঞ্জকে নিয়ে সূর্যও ঘুরছে। সূর্যের এই 'বার্ষিক' প্রদক্ষিণের গতি সেকেন্ডে ১৫০ মাইল, এক চক্র শেষ হতে লাগে ২০ কোটি বছর, লক্ষ্য আপাতদৃষ্টিতে সিগনাস তারামণ্ডল।

এর পরেও অবশ্য বিবেচ্য প্রসারণরত বিশ্বে ছায়াপথ নীহারিকার নিজের গতি। এই মহাসমুদ্রে হিসাবের থেই হারিয়ে যায়, আমরা শুধু জানি অন্যান্য বহু কোটি নীহারিকার সম্পর্কে আমাদের নীহারিকা মহাকাশে ক্ষিপ্র বেগে সরে পড়ছে—কিন্তু কোন দিকে তা কত দ্রুত তা কেউ বলতে পারে না।...

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

উল্কা ও উল্কাপাত

প্রায় পক্ষকাল আগে প্রভাতী সংবাদপত্রে একটি বিশেষ সংবাদের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। সংবাদটি হচ্ছে—একটি প্রজ্বলিত বিশালাকৃতি উল্কাপিণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অংশের ১৮০ মাইল এলাকার ওপরে পতিত হয়। ইণ্ডিয়ানার ওপরে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বার আগে এই প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ড সমগ্র এলাকায় রাত্রির অন্ধকারকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করেছিল এবং এই আলোতে বই পড়া পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল।

মেঘমুক্ত রাতে আকাশের দিকে তাকালে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই 'তারা খসে' পড়ছে। আসলে এই 'তারা খসা' ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জ্বলে যাওয়া। প্রতিদিন পৃথিবীর ওপরে অসংখ্য উল্কাপাত হয়ে চলেছে, কিন্তু সব সময় আমরা তা টের পাই না বা দেখতে পাই না।

উল্কা সাধারণত ঝাঁকে ঝাঁকে চলে। তাদের প্রদক্ষিণপথ পৃথিবীর খুব কাছে হলে পৃথিবীর আকর্ষণে তারা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। সেখানে ঘর্ষণের ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হলে উল্কার পদার্থ গ্যাসীয় আকার ধারণ করে এবং গ্যাসের পরমাণুগুলো শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় গ্যাস থেকে আলো বেরোয়। তখনই আমরা উল্কা দেখতে পাই।

বিজ্ঞানীদের হিসাবে দিনে ২০ কোটির মতো দৃশ্য উল্কা পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রবেশ করে। অধিকাংশ উল্কা পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে মাঝে মধ্যে দু-একটি উল্কাপিণ্ড যে পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে না তা নয়। ১৯০৮ সালে ৩০ জুন সাইবেরিয়ার জলাভূমিতে একটি বড় উল্কাপিণ্ড পড়েছিল। সেই উল্কাপাতের ফলে চারদিকের হাজার মাইল জায়গা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু এতে প্রাণ হারায়। এমনি উল্কাপাতের নজির আরও আছে। আমাদের দেশে ১৮৭০ সালে মাদ্রাজের ভাইজাগ জেলায়, ১৮৯৮ সালে কোদাইকানালে, ১৯৩৪ সালে মোরদাবাদ জেলায় এবং প্রায় এক বছর আগে বিহারের মজঃফরপুরে কয়েকটি বড় আকারের উল্কাপিণ্ড পড়েছিল।

আবার কখনও কখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড বৃষ্টিধারার মতো পৃথিবীর ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে। এরকম ঘটনাকে বলা হয় উল্কাবৃষ্টি। ১৮৩৩ সালের ১২-১৩ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে এরকম ব্যাপক উল্কাবৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যরাত্রি থেকে শুরু করে ঊষাকালের আগে পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা বর্ষিত হতে থাকে। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় অভিভূত হয়ে বহু সংস্কারাচ্ছন্ন লোক মনে করেছিল, পৃথিবীর লয় হতে চলেছে। গির্জায় গির্জায় তাই ঘণ্টা বাজতে থাকে। কিন্তু পরের দিন সূর্যোদয়ের পর দেখা গেল, পৃথিবী যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে।

অমাদের দেশে ১৯৩৫ সালে রাত্রিবেলায় ত্রিপুরা জেলার কয়েকটি গ্রামের ওপর উল্কাবৃষ্টি ১৫ বর্গ মাইল জায়গার ওপর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৩ সালে এক সন্ধ্যায় ঢাকা জেলার দোগাছিতেও এরকম উল্কাবৃষ্টি দেখা গিয়েছিল। আকাশে একটা জ্বলন্ত গোলক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ শব্দে বহু খণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ৬ মাইল জায়গা জুড়ে চারদিকে ছিটকে পড়েছিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ উল্কাপাত দেখে আসছে। কিন্তু কিভাবে ও কোথা থেকে এই উল্কার উৎপত্তি হয় সে সম্বন্ধে আজও সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে বিভিন্ন ধরনের উল্কা এবং তাদের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে অনেককিছু এখন জানা সম্ভব হয়েছে। এক সময় ভাবা হত উল্কা হচ্ছে পৃথিবীর আবহমণ্ডলেরই কোনো বস্তুপিণ্ড। উল্কার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'মেটিয়র' কথাটির অর্থই তাই তারপর বিভিন্ন সময়ের বিজ্ঞানীরা উল্কা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেন। নরম্যাণ্ডির ওপর একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড পতনের পর ১৮০৩ সালে ফরাসী খনিজতত্ত্ববিদ বিয়ট বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন—উল্কাপিণ্ডগুলো আমাদের পৃথিবীর কোনো পদার্থ নয়, পৃথিবীর বাইরে থেকেই এগুলো এসে থাকে। কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে—পৃথিবীর বাইরে কোথায় ও কিভাবে এই অদ্ভুত পদার্থগুলোর উৎপত্তি হয়? কারো মতে, কোন কোন আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষিপ্ত দু-একটা প্রস্তরখণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে চলে যায় এবং তারাই আবার উল্কারূপে পৃথিবীর বুকে ফিরে

১৮৩৩ সালের ১২—১৩ নভেম্বরের উল্কাবৃষ্টি সমসাময়িক শিল্পীর দৃষ্টিতে

গ্রাসে। কেউ বলেন, চন্দ্র অথবা অন্য কোন গ্রহের আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত প্রস্তর বা লৌহ খণ্ডসমূহই আমাদের পৃথিবীতে উল্কারূপে পতিত হয়। কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর নিকটবর্তী কোন বিধ্বস্ত গ্রহ বা উপগ্রহের অংশবিশেষই হচ্ছে উল্কা। আবার কারো কারো মতে, ধূমকেতুর সঙ্গে উল্কার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন ধূমকেতু হয়তো কোন কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তারই অংশবিশেষ পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে আকৃষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে উল্কারূপে দেখা দিয়ে থাকে। যেমন বলা যায়, বিয়েলার ধূমকেতুর কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। সেই ধূমকেতুর ভগ্নাবশেষ পৃথিবীর ওপরে উল্কাপাতের ঝলক তুলছে। উল্কাপিণ্ড সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—পৃথিবীর কাছাকাছি ছোট গ্রহ বা উপগ্রহের মতো কোন বিধ্বস্ত বস্তুপিণ্ডের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোই পৃথিবীর বুকে উল্কারূপে দেখা দিয়ে থাকে। খুব সম্ভব এই অজ্ঞাত বস্তুপিণ্ডটির আমাদের পৃথিবীর মতো কোন আবহমণ্ডল না থাকায় অতিদ্রুত ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে অথবা পৃথিবীর মতো বিশাল বস্তুপিণ্ডের সান্নিধ্যে আসার ফলেও সেটি বিধ্বস্ত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিধ্বস্ত হলেও সূর্যের মহাকর্ষের টানে তাকে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথেই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এর ফলে হয়তো তাকে পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করে যেতে হয়। এই সময়ে কতক কতক বিচ্ছিন্ন অংশ উৎক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর বুকে উল্কাপাত বা উল্কা-বৃষ্টির সৃষ্টি করে।

আগেই বলা হয়েছে, অধিকাংশ উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু প্রতি বছরই কয়েকটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে আঘাত করে। বৃহদাকারের উল্কাপিণ্ড যখন ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করে, তখন গহ্বরের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় জনবসতির বাইরে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশে যখন উল্কাপাত হয়, আমরা তার খবর পাই না। কিন্তু সেই উল্কাপিণ্ড যদি বৃহদাকারের হয় এবং প্রচণ্ডবেগে ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করে, তখন ভূগর্ভে পদচিহ্নের মতো ধরিত্রীর বুকে গহ্বর সৃষ্টি করে তার আঘাতের চিহ্ন রেখে যায়। ভূপৃষ্ঠে উল্কাসৃষ্ট এরকম গহ্বরের বহু নজির আছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উত্তর আমেরিকার আরিজোনা ও কিউবেক-এর গহ্বর,

উল্কাপাতে সৃষ্ট আরিজোনার গহ্বর।

সোভিয়েট রাশিয়ার এস্তোনিয়ার কালিয়ার্ভি গহ্বর, অস্ট্রেলিয়ার হেনবারি গহ্বর এবং আরবে ওয়াবার গহ্বর। আরিজোনা গহ্বরের ব্যাস ১২০০ মিটার এবং গভীরতা ১৭৫ মিটার। গহ্বরের কানায় অসংখ্য লৌহ-উল্কাপিণ্ডের ভগ্নাংশ ছড়ানো দেখা যায়।

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উল্কার আঘাত থেকে ভূপৃষ্ঠকে অনেকখানি রক্ষা করে, নইলে তার ফল হত মারাত্মক। চন্দ্র এবং চন্দ্রের মতো যে সব গ্রহ-উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল বলতে কিছু নেই, সেখানে অবিরত উল্কা পড়ে থাকে। চন্দ্রের গায়ে যে অসংখ্য গহ্বর দেখা যায় তার অনেকগুলো উল্কাঘাতে সৃষ্ট এবং বাকীগুলো অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্ট।

বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ উল্কাপাত দেখে এলেও উল্কা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ১৭৯৮ সালে দুজন জার্মান ছাত্র ব্রান্দেস এবং বেঞ্জেনবার্গ সর্বপ্রথম উল্কা প্রজ্বলনের উচ্চতা নির্ণয় করেন। এখন জানা গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০-১২০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে সাধারণত অধিকাংশ উল্কা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে। যে নক্ষত্রমণ্ডল থেকে উল্কাস্রোত প্রবাহিত হয়, সেই নক্ষত্রমণ্ডলের নামানুসারে তারা সাধারণত অভিহিত হয়। যেমন, লিওনিস নক্ষত্রমণ্ডল থেকে আগত উল্কাগুলোকে বলা হয় লিওনিড। ১৭৯৯ সালে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে বিজ্ঞানী হামবোলট লিওনিড উল্কাস্রোত পর্যবেক্ষণ করেন। স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ান অধিবাসীদের মধ্যে প্রবীণ লোকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, ১৭৩৩ ও ১৭৬৬ সালে এরকম উল্কাস্রোত দেখা গিয়েছিল। এ ঘটনা থেকে হামবোলট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ৩৩ বছর অন্তর লিওনিড উল্কাস্রোত দেখা দেয়। ১৮৩২-৩৩ সালে এই উল্কাস্রোত সত্যসত্যই পুনরায় দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, আরও বহু উল্কাস্রোত এরকম পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়।

ভূপৃষ্ঠে পতিত বিভিন্ন উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, সব উল্কাপিণ্ডের আকার যেমন একরকম নয় তেমনি তাদের রাসায়নিক সংযুক্তিও একরকম হয় না। রাসায়নিক বিচারে সাধারণত দু শ্রেণীর উল্কাপিণ্ড দেখা যায়—প্রস্তর উল্কা ও ধাতব উল্কা। প্রস্তর উল্কাপিণ্ডের সংযুক্তি অত্যন্ত জটিল, তবে ভূপ্রস্তরের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। ধাতব উল্কাপিণ্ডে সাধারণত লোহা ও নিকেলের প্রাধান্য দেখা যায়। উল্কাপিণ্ডের রাসায়নিক সংযুতির সঙ্গে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের রাসায়নিক সংযুতি বিশেষ মেলে না। এই তথ্য এবং আরও নানাবিধ জ্যোতিঃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই অভিমত পোষণ করেন, উল্কা হচ্ছে পৃথিবীর বহির্ভূত মহাজাগতিক বস্তু এবং সৌরজগতের তারা স্থায়ী বাসিন্দা।

বর্তমানে মানুষের মহাকাশ অভিযানের দরুন উল্কা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। কারণ মহাকাশের অনেক বার্তা উল্কা বহন করে আনে। আলোকচিত্র ও বেতার পদ্ধতিতে এখন উল্কা পর্যবেক্ষণ করা হয়। তবে উল্কা পর্যবেক্ষণের এখন সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে রাডার। সাম্প্রতিককালে রাডার পদ্ধতিতে জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা উল্কা পর্যবেক্ষণের সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করেছেন।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা উল্কার রহস্য আগের তুলনায় এখন অনেকটা উদ্ঘাটিত হয়েছে সত্য, তবে এখনও আরো অনেক কিছু জানার বাকি আছে।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) 'জগদীশ বোস সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ' প্রতিযোগিতায় কোন বছর থেকে শুরু হয় এবং এপর্যন্ত কতজন এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করেছেন?

(খ) ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে?

(গ) পশ্চিমবঙ্গে এপর্যন্ত কোন কোন জেলার কতজন শিক্ষক জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন?

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণাগার কয়টি আছে?

বিনীত
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ফুটবল রেফারিং পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে চাই।

(খ) শক্তিশালী একটি সর্বভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই।

বিনীত
শ্রীসুকুমার মজুমদার
কীর্ণাহার, বীরভূম

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) 'হট লাইন' কথাটির অর্থ কি?

(খ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান গভর্নর কে এবং তাঁর মাসিক বেতন কত?

(গ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দিষ্ট কোটার ক্ষেত্রে '১০০০' সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয় কেন?

বিনীত—
গণেশকুমার চক্রবর্তী
চন্দ্রকোনা

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বিশ্বশ্রেষ্ঠ ইনসাইড ফরোয়ার্ড পেলের আসল নাম কি? পেলে নামটি কেমন হলো? তিনি জাতিতে কি? তিনি ব্রেজিলের কোন ক্লাবে খেলেন?

বিনীত
অশোক মুখোপাধ্যায়
সাঁওতাল পরগণা, বিহার

●

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা চলচ্চিত্রের সবাকযুগে এযাবৎ সর্বাধিক চিত্র পরিচালনার কৃতিত্ব কার? চলচ্চিত্রগুলির নাম জানতে চাই।

বিনীত
নৃপেন্দ্রনাথ সেন
রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর

সবিনয় নিবেদন,

(ক) টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক বোলিংয়ের রেকর্ড কার?

(খ) একটি সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন কে?

বিনীত
প্রবীরকুমার সেন
নওপাড়া, বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) টর্চ-এর আবিষ্কারক কে?

(খ) পৃথিবীতে কত রকম গাছ আছে?

বিনীত
নির্মল রায়চৌধুরী, কেকা রায়,
দেবব্রত, সত্যব্রত, প্রবোধ ও
সুলেখা সান্যাল
কাটোয়া, বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ম্যাডাম কুরী কত সালে রেডিয়ম আবিষ্কার করেন?

(খ) ডঃ ভাবা, ডঃ নারলিকার ও ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য-এর জন্মদিন কবে?

বিনীত
শান্তি সুর
শিবপুর, হাওড়া

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

১৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিপ্লব দে প্রমুখের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলে ছিলেন ভরদ্বাজ ও সঞ্জীব (গোলকীপার); শৈলেন মান্না, তাজ মহম্মদ ও প্যাপেন (ব্যাক); টি গাও (অধিনায়ক) মহাবীরপ্রসাদ, এ নন্দী, কাইজার, বসির (হাফব্যাক); বজ্রভেলু, আমেদ খাঁ, এস রমন, ধনরাজ, পি পরাব, মেওয়ালাল, এস নন্দী ও রবি দাস (ফরোয়ার্ড)। ভারত প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ফ্রান্সের কাছে ২—১ পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। ভারতের পক্ষে গোল করেন রমন।

ফাইন্যালে সুইডেন ৩—১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

বিনীত
জয়ন্ত হালদার
কলকাতা—৫৬

●

সবিনয় নিবেদন,

২০শ সংখ্যায় প্রকাশিত দীপা সরকার ও অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার আসর বসে উরুগুয়েতে। ফাইন্যালে উরুগুয়ে ৪—২ গোলে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে প্রথম বিশ্বকাপ লাভ করে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে বিশ্বকাপের নতুন নাম হয় জুলে রিমে কাপ। এক্ষেত্রেও প্রথম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে উরুগুয়ে। ফাইন্যালে ব্রেজিল ২—১ গোলে উরুগুয়ের কাছে পরাজিত হয়।

বিনীত
সুনীলকুমার রায়
বনগ্রাম, ২৪ পরগণা

●

সবিনয় নিবেদন,

১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত কমলাকান্ত রায়ের 'ক' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, লীগের খেলায় সর্বপ্রথম মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯২৫ সালে। ঐ খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে জয়লাভ করে এবং ফিরতি খেলায় মোহনবাগান ১—০ গোলে জয়লাভ করে। উভয় দলের অধিনায়ক ছিলেন গোষ্ঠ পাল (মোহনবাগান) এবং মোনা দত্ত (ইস্টবেঙ্গল)।

এপর্যন্ত ৭৬ বার উভয় দলের সাক্ষাৎকার ঘটেছে। ইস্টবেঙ্গল ২৬ বার এবং মোহনবাগান ২৩ বার বিজয়ী হয়েছে। ২৫টি খেলা ড্র হয়েছে। দুটি খেলায় মোহনবাগান ওয়াকওভার পায়।

বিনীত
অশোককুমার ঘোষ
কলকাতা—১০

●

সবিনয় নিবেদন,

১৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবীরকুমারদের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ভারতে কেবল মাত্র মেয়েদের জন্য কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নেই। একটি মেডিক্যাল কলেজ অবশ্য আছে। কলেজটির নাম 'লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ', দিল্লীতে অবস্থিত।

বিনীত
কমলেন্দু গুপ্ত
রাঁচী

●

সবিনয় নিবেদন,

১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবোধ, সত্যব্রত ও সুলেখা সান্যালের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বৃটিশ পার্লামেন্টে ৬৩০টি আসন আছে। বর্তমানে শাসকদল লেবার পার্টি ৩৬৩টি আসনের অধিকারী। অন্যান্য দলের আসনসংখ্যা : রক্ষণশীল দল—২৫৩, উদারনৈতিক—১২ এবং অন্যান্য ২।

বিনীত
অসীম ঘোষ
হাওড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

২৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত কল্লোল রায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ডিগ্রী বলতে বোঝায় স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা। এবং ডিপ্লোমা বলতে বোঝায় স্নাতকপূর্ব পর্যায়ের শিক্ষা। ইঞ্জিনীয়ারিং এবং মেডিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্সে পঠনেচ্ছু ছাত্রের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় সাফল্য।

বিনীত
শিবেশ রায়
কলকাতা—৯

।। বত্রিশ ।।

সকাল থেকে জ্যোতিরাণী তাড়ার মধ্যে ছিলেন একটু। ভিতরও সুস্থির নয় খুব। গত রাতে প্রভুজীধাম থেকে বেশ দেরিতে ফিরেছেন। সকাল সকাল যাওয়া দরকার। কি করবেন, তিন-চার দিনের জন্য মিত্রাদিকে নিজেই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। আজ ফেরার কথা, ফিরলে বাঁচেন। গত ক'মাসের মধ্যে মিত্রাদি একটা দিনের জন্যেও ছুটি চায়নি। তাঁর দ্বিগুণ পরিশ্রম করেছে। সপ্তাহের মধ্যে দুই-একদিনের বেশি বাড়িতেও ফিরতে পারেনি। অবশ্য প্রধান পরিচালিকা হিসেবে আলাদা থাকার ঘর, অফিস ঘর সবকিছুর আলাদা ব্যবস্থা করেই সমর্যাদায় মিত্রাদিকে বসানো হয়েছে সেখানে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটাই কেবল পৃথক নয়, একতার সুর কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে। ক'মাস ধরে বেশ দাপটেই প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসছে মিত্রাদি, নানা বয়সের তেত্রিশটা মেয়েই তাকে ভয়ও করে, সমীহও করে। মিত্রাদির দাপটে বীথি ঘোষও সচল হয়েছে একটু আধটু। ওখানে ও-ই তার ডান হাত। অথচ উঠতে বসতে বকুনি সে-ই বোধহয় বেশি খায়। কিন্তু চাপা স্নেহটা যে তারই ওপর সকলের থেকে বেশি মিত্রাদির, তাও জ্যোতিরাণী ভালই জানেন। অথচ মিত্রাদিকে সব থেকে বেশি ভয় করে বোধহয় বীথিই। কারণ তার প্রতি ব্যাপারে মিত্রাদির শ্যেনদৃষ্টি। ঘরে বসে থাকলে রাগ, বেশি খাটা-খাটনি করলেও রাগ, বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখলে রাগ, মুখে হাসি না দেখলেও রাগ। পরিচিত শাঁসালো দুই-একজন করে ডোনার ধরে নিয়ে আসে মিত্রাদি, ঘটা করে প্রতিষ্ঠান দেখায় তাদের, কি হচ্ছে বা হবে বোঝায়, আবার অনেক সময় ব্যস্ততার অজুহাতে প্রধান সহকারিণী হিসেবে সে ভার বীথির ওপরেও ছেড়ে দিয়ে তাকে চালু করে তুলতে চেষ্টা করে। তার আড়ালে হেসে জ্যোতিরাণীকে বলে, তোমার এই মেয়েটা শামুকের মত খোলা ছেড়ে আর বেরুতেই চায় না।

কিন্তু মিত্রাদির পাল্লায় পড়ে খোলা ছেড়ে যে না বেরিয়ে উপায় নেই বীথির তাও জ্যোতিরাণী লক্ষ্য করেন আর মনে মনে হাসেন।

মেয়ের কি একটা ব্যবস্থা করার জন্য মিত্রাদির দার্জিলিং-এ যাওয়া দরকার হয়েছে হঠাৎ। জ্যোতিরাণী বাধা দেন কি করে। তবু ট্রেন বাতিল করে প্রতিষ্ঠানের টাকাতে প্লেনে যাতায়াত করতে বলে দিয়েছেন তিনি। যাতায়াতের সময়টা বাঁচলে সাত দিনের বদলে তিন-চার দিনের মধ্যেই ফেরা সম্ভব হবে। গতকাল তিনদিন পার হয়েছে, আজ বিকেলের মধ্যে ফিরবেই আশা করা যায়।

মিত্রাদি এই ক'টা দিন তাঁকে প্রভুজীধাম থাকার কথা বলেছিল। জ্যোতিরাণী বিব্রত বোধ করেছিলেন। মাসের পর মাস যে এখানে কাটাচ্ছে তাকে অসুবিধের কথা বলতে সংকোচ। আর কোন্ অসুবিধের কথাই বা বলবেন? অসুবিধে তাঁর বাড়ির বাতাসে। তবু বলেছেন, না রাত্রিতে থাকতে পারব না, শাশুড়ীর শরীর ভালো না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যতক্ষণ পারি থাকব'খন তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও।

ওই অজুহাতের মধ্যেও মিত্রাদি ফাঁকি না হোক ফাঁক দেখেছেন। ছদ্ম গাম্ভীর্যে সায় দিয়েছে, সেই ভালো, তাছাড়া তিন রাতের জন্য একেবারে গা-ঢাকা দিলে বাড়িতে কেউ আবার অন্ধকার দেখবে কিনা ঠিক কি!

হেসে জ্যোতিরাণী সেই সম্ভাবনাও প্রায় স্বীকারই করে নিয়েছিলেন।

অন্ধকার না দেখুক, অন্ধকার ছড়াবার মেজাজ কারো,—সেটা জ্যোতিরাণী প্রথম দিন সকালে বেরিয়ে আর রাতে ফিরেই অনুভব করেছেন। বারান্দা ধরে ফেরার সময় পাশের ঘরের মালিকের ধার-ধার দৃষ্টি মুখের ওপর আটকেছে। পরনের জামা-কাপড় দেখে মনে হয় বেরুনোর জন্য প্রস্তুত।

জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়েছেন। কথা বেশির ভাগ একতরফাই বলেন। বললেন, মিত্রাদি সকালে দার্জিলিং-এ চলে গেল, এ ক'টা দিন ফিরতে একটু দেরীই হয়ে যাবে, কি করি—

কি করবেন সে-সমাধানের জন্য দাঁড়িয়ে নেই শিবেশ্বর। ঘরে ঢুকলেন আর তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়েও গেলেন। মেঘনা খবর দিল, বাবু সন্ধ্যে থেকে বেরুবার জন্য তৈরি হয়েও বেরুতে পারছিলেন না। কেবল ছটফট করেছেন, আর এক-একবার ঠাকুমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাড়িতে কেউ নেই বলেই বেরুতে

পারছিলেন না বোধহয়, বিকেলে ডাক্তারকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন একবার—তার আগে বাবুর সামনে ঠাকুমা কান্নাকাটিও করেছেন।

জ্যোতিরাণী উতলা, কেন, মায়ের আবার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

মেঘনা জানে না, ডাক্তার এসে শাশুড়ীকে দেখে গেল তাই শুধু দেখেছে।

পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর ঘরে এসেছেন। শয্যায় বসেই আছেন তিনি। আফিমের ঝিমুনি ছাড়া বাড়তি কোনো উপসর্গ চোখে পড়ল না। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারকে খবর দিতে হয়েছিল শুনলাম, কি হয়েছে?

শাশুড়ীর বিরস জবাব, নতুন আর কি হবে, নাড়ির টান যার আছে সে-ই ডাক্তারকে খবর দেয়—কিছু হবার জন্য বসে থাকে না। সমস্ত দিনে ওই ছোঁড়াটার পর্যন্ত টিকির দেখা মেলে না আজকাল। কিছু হবার আশায় তো দিন গুণছি, হয়ও তো না—

ফিরে এসে কালীদার ঘর থেকে ধমকে ছেলেকে ঠাকুমার কাছে পাঠালেন তিনি। মুশকিলই হয়েছে, কালীদা বাড়ি থাকলেও এতটা অসহায় বোধ করতেন না।

বাড়ির কর্তা বেশি রাতেই বাড়ি ফিরেছেন বোধহয়, কারণ কখন ফিরেছেন জ্যোতিরাণী টের পাননি। পরদিন সকালে যতবার দেখা হয়েছে, গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন। কিন্তু না বেরিয়েই বা করবেন কি তিনি। তাছাড়া শাশুড়ীর মেজাজ যেমনই থাক, শরীর একরকমই আছে মনে হয়েছে তাঁর। তবে সেদিন রাত না করে সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতে পেরেছেন জ্যোতিরাণী। এসে একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। তিনি ফেরার পর কর্তা বেরুলেন আর আগের দিনের মতই বেশি রাতে ফিরলেন হয়ত।

এই অসময়ে বেরুনো আর অসময়ে ফেরাটা যে তাঁর ওপর রাগ করে সেটা জ্যোতিরাণী দ্বিতীয় দিনেও বুঝতে পারেননি। কারণ আগেও অনেক দিন সকালে বেরিয়ে মাঝরাতে ফিরতে দেখে অভ্যস্ত তিনি। মাঝে কিছুদিন ছেদ পড়েছিল, এই যা। কিন্তু টের পেলেন তৃতীয় দিনে, অর্থাৎ পরের রাত্রিতে। এ-দিন আবার কিছু হিসেব-নিকেশের ঝামেলায় পড়ে প্রভুজীধাম থেকে ফিরতে প্রথম দিনের থেকেও বেশি রাত হয়ে গেল জ্যোতিরাণীর। গাড়িতে বসেও ছটফট করেছেন আর ঘড়ি দেখেছেন। আর তারপর বারান্দার ওই মূর্তি দেখেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।...গাড়ির আওয়াজ পেয়েই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় বোধহয়, নইলে পরপর তিন দিনই একই গুরুগম্ভীর প্রতীক্ষা দেখলেন কি করে। একরকম নয়, মুখ আরো থমথমে।

কিন্তু এই রাতে জ্যোতিরাণী ঘুমিয়ে পড়েননি। সমস্ত দিনের পরিশ্রম সত্ত্বেও ঘুম চট করে আসেনি। পর পর দু'রাত ও-ঘরের খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, কেউ স্পর্শও করেনি। বাইরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বাড়িতে তাঁকে না হোক একজন কাউকে ডেকে বলে যান। আগে সদাকে বলতেন। রাতে ইচ্ছাকৃত উপোস চলছে কিনা সেই খটকা লাগল। তাই গত রাতে সঙ্কোচ কাটিয়ে ঘর-বদল এবং শয্যা-বদল করেছিলেন তিনি। রাত একটু বাড়তে এবং দোতলা নিরিবিলি হতে পাশের ঘরের শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিরলে টের পাবেন। খাবারটা ঢাকা থাকে কেন তাও বুঝতে পারবেন, আর দরকার মত বোঝাতেও পারবেন।

অনভ্যস্ততার দরুণ হোক বা যে জন্যেই হোক ঘুম আসতেও চায়নি চট করে। আজও যখন ফিরল না, কাল বিকেলের মধ্যে মিত্রাদি ফিরবেই। বাঁচা যায়। রাত দুটো পর্যন্ত জেগেছিলেন জ্যোতিরাণী, রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ শুনে অনেকবার উৎকর্ণ হয়েছিলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না। ঘুম ভেঙেছে বেলা ছটা নাগাদ। সঙ্গে সঙ্গে নতুন শয্যার একটা অস্বস্তি নিয়ে উঠে বসেছেন। না, আর কেউ নেই, এ-শয্যায় আর এই ঘরে একাই রাত কাটিয়েছেন তিনি। উঠে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এসেছেন। মুখ-হাত ধুয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এসেছেন আবার। দোতলার এ-দিক ও-দিক লক্ষ্য করেছেন। নীচেও ঘুরে এসেছেন একবার।

আর, তারপরেই বুঝেছেন রাগ একজনের কোন্ পর্যায় চড়ে আছে। রাতে বাড়িই ফেরা হয়নি, এই সকাল সাতটা পর্যন্তও না।

রাতে না ফেরার নজিরও আছে। বাইরে কোনো অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান থাকলে বাড়ি ফেরেননি এমন রাত অনেক গেছে। কিন্তু
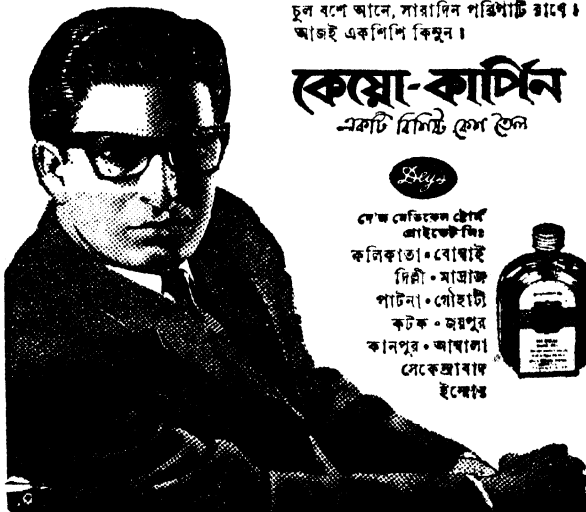
খবর না দিয়ে বাইরে থাকার নজির নেই। সে-ব্যাপারে বুড়ী মায়ের ওপর টান আছে একটু। খবর না দিয়ে বাইরে থাকেন না। তাছাড়া, কলকাতার বাইরে না গেলে যত রাতই হোক ঘরে ফেরা অভ্যাস। ওপরে ফিরে এসেই জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর তলব পেলেন। না, ছেলের রাতে বাড়ি না ফেরার খবর তিনিও আগে জানতেন না, কারণ তাঁর দর্শনমাত্রে তিনি উতলা। —শিবু রাতে ফেরেইনি শুনলাম, কিছু বলে গেছল?

শামু বা ভোলার মুখে জেনে থাকবেন শাশুড়ী। মনে মনে জ্যোতিরাণী ওদের ওপরেই বিরক্ত। মাথা নাড়লেন, কিছু বলে যাননি।

—এখনো ফেরেনি, বলি তোমার চিন্তা-ভাবনা কিছু আছে? চুপ করে বসেই আছ নাকি খোঁজ খবর করেছ?

মৃদু গলায় জ্যোতিরাণী তাঁকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন, হঠাৎ কোথাও চলে যেতে হয়েছে বোধহয়, আপনি ঠাণ্ডা হয়ে বসুন আমি দেখছি—

চলে এলেন, কারণ, সামনে থাকলেই শাশুড়ীর ক্ষোভ বাড়বে, খেদ বাড়বে। দেখার নাম করে নিজের ঘরে এসে বসলেন তিনি। দেখার কি আছে, এই অনুপস্থিতির যে পর-পর তিন দিনের প্রভুজীধাম নিয়ে তাঁর ব্যস্ত থাকার জবাব—এটা খুব ভালো করেই বুঝেছেন। আর কোনো কারণ নেই।

আজ আর সকাল সকাল বেরুনো চলবে না, সেটা বেশ বুঝতে পারছেন। সাড়ে আটটা বেজে গেল এখনো দেখা নেই। না ফেরা পর্যন্ত শাশুড়ীর ঘরের দিকে মাড়াতে পারছেন না তিনি। আলমারী থেকে টাকা বার করে মন দিয়েই গুনতে চেষ্টা করছেন। প্রভুজীধাম থেকে লোক আসার কথা, টাকা নিয়ে যাবে। পাঁচশ সত্তর টাকা মামাশ্বশুরের কাছে সকালের মধ্যেই পৌঁছে দেবার কথা—কি কি সব লাগবে, তাছাড়া আগামীকাল জন্মাষ্টমীর খরচ আছে। হিসেব করে মামাশ্বশুর ওই টাকাটাই পাঠাতে বলেছিলেন। মিত্রাদির কাছ থেকে ক্যাশ বাক্সের চাবি রাখেননি জ্যোতিরাণী, বলেছেন, ও তুমি নিয়েই যাও, অত হিসেব মাথায় আসে না, একটু এদিক-ওদিক হলেই তো তোমার মাথা গরম হবে। এদিকের যা দরকার আমি চালিয়ে নেবখ'ন, ফিরে এসে তুমি হিসেব লিখো।

মন দিয়ে গুনছেন কারণ, গোনাগুনির ব্যাপারে প্রায়ই তাঁর ভুল হয়। ও-জায়গায় ভাঙাতে অসুবিধে হয় বলেই আলমারিতে দশ-টাকা পাঁচ-টাকার নোট মজুত থাকে। দশ টাকার তিরিশখানা নোট পর্যন্ত ধৈর্য, ধরে গুনেছেন জ্যোতিরাণী, তার পরেই কান খাড়া। পাশের ঘরের লোকের ফেরা হল টের পেলেন। বলতে গেলে বাতাসেই টের পান তিনি। টাকা গোনায় মন থাকল না। আর দু'শ সত্তর দরকার। একশ টাকার দু'খানা নোট বার করলেন, মামাশ্বশুর ভাঙিয়ে নেবেন'খন। পাঁচ টাকার নোটও কিছু চেয়েছেছিলেন, মনে পড়ল। অতএব ধৈর্য ধরে আবার চৌদ্দখানা পাঁচ টাকার নোটও গুনে সরাতে হল। মোট পাঁচশ সত্তর টাকা আলাদা করে খামে পুরে আলমারি বন্ধ করলেন, টাকাটা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ভারি পরদার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সকালের ডাকের চিঠি-পত্র পড়ছেন। পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলেন। কালীদার ঘরে সিতু গভীর মনোযোগে কাগজ পড়ছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেছে টেরও পায়নি।

—বেলা ন'টা পর্যন্ত কাগজ পড়া হচ্ছে, স্কুলের পড়া নেই?

সিতু চমকে মুখ ফেরালো। —সব পড়া মুখস্ত। মা—ইয়ে, আজ বোধহয় বিচারের রায় বেরুবে!

এক বছর আগের ঘটনা জ্যোতিরাণীর মাথায় বসে নেই। —কিসের বিচার?

—বা রে! সেই যে লোক খুন করে ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর সব ধরা পড়ল—এতদিন ধরে তো তাদের বিচার চলছে!

অত আগ্রহ করে কাগজ পড়া মানে খেলার পাতায় মনোযোগ ধরে নিয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। ছেলের চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করলেন হয়ত। কিন্তু ভিতরটা তাঁর নিজেরই খুব সুস্থির নয়। বাড়ির সেই চিরাচরিত আপসশূন্য ঠাণ্ডা ভাবটা বেড়েই চলেছে। তিনি ব্যস্ত বটে, কিন্তু এত ব্যস্ততার ফাঁকেও সব-দিক বজায় রাখার চেষ্টা তো কম করছেন না। ব্যস্ত যখন ছিলেন না, তখনো এত করেননি। আঘাত পেলে তখন অতি সহজে তাঁরও ভিতর তেতে উঠত। এখন ওঠে না। উঠলেও নিজেকে তিনি উদ্ধার করেন তার থেকে। বিভাস দত্ত চলে যাবার পর সে রাতে যে সংকল্প নিয়ে ওই পাশের ঘরে ঢুকেছিলেন তিনি, তার নড়চড় হতে দেননি। দ্বিগুণ সংযমে বেঁধেছেন নিজেকে। ছেলেমানুষের মত এখন এক-একসময় মনে হয় তাঁর, ছেলেটা চট করে অনেক বড় হয়ে গেলে বেশ হত। তাঁর পিছনে দাঁড়াত, সহায় হত। ছোটদাদুর মুখে জলের জীবের সেই গল্প শোনার প্রতিক্রিয়া দেখার পর আর প্রভুজীধামে খেয়ালী শিল্পীর ওই অয়েল-পেন্টিং টাঙানোর পর ছেলের ব্যাপার মনে আর কোনো হতাশার ছায়া পড়তে দিতে চান না তিনি। তাই এ-সব ডাকাতি বা বিচারের প্রসঙ্গ ভালো লাগল না।

—আচ্ছা, এ-সব নিয়ে তোকে অত মাথা ঘামাতে হবে না। শোন্ স্কুল থেকে আজও তোর ওই বন্ধুর গাড়িতে চলে আসিস, আমার ফিরতে দেরি হবে।

সুবোধ ছেলের মতই সিতু মাথা নাড়ল। গত তিন দিন ধরেই মা এই ব্যবস্থা করছে। ভাবলে হাসিই পায় সিতুর, সে-যে কত সেয়ানা হয়েছে মায়ের যদি একটুও ধারণা থাকত। মুখখানা গম্ভীর করে বলল, আজ একটু তাড়াতাড়িই স্কুল যেতে হবে, জেঠু নেই, আগে গেলে অংক টিচার কয়েকটা অংক বুঝিয়ে দেবে—

উঁচু ক্লাসের ছেলেরা অনেকসময় আগে গিয়ে টিচারদের কাছ থেকে এটা-সেটা বুঝে নেয় এটা সে অনেকদিনই লক্ষ্য করেছে।

জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর ঘরের দিকে এগোলেন। ছেলের জন্যে চিন্তায় আছেন, ফেরার খবরটা দেওয়া দরকার। কিন্তু

মেঘনাকে সামনে দেখে নিজে আর গেলেন না, গেলেই তো পাঁচ কথার জবাব দিতে হবে আর পাঁচ কথা শুনতে হবে। মেঘনাকে পাঠালেন বাবুর ফেরার খবরটা শাশুড়ীকে বলে আসতে।

পায়ে-পায়ে এদিকেই ফিরলেন আবার। সিতু এরই মধ্যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দা ধরে খুব মন্থর পায়ে ফিরে এসে পাশের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, তারপর পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

গায়ের জামা খুলে শুধু গেঞ্জি গায়ে শিবেশ্বর শয্যায় বসে সকালের ডাক দেখছেন। মুখ শুকনো একটু, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

হাতের চিঠিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জ্যোতিরাণী চুপচাপ অপেক্ষা করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে ফিরলেই না, কোথায় ছিলে?

অন্য চিঠি তুলতে তুলতে শিবেশ্বর নির্লিপ্ত মুখে বলেছেন, ঠিকানা চাই...?

—না, বাইরে কোথাও ফাংশান-টাংশান ছিল নাকি?

শিবেশ্বর জবাব দিলেন না, অন্য খামগুলো দেখছেন।

—কিছু বলে যাওনি, মা খুব ভাবছিলেন।

শিবেশ্বর নিস্পৃহ মন্তব্য করলেন, মা যখন...একটু-আধটু ভাবারই কথা।

গম্ভীরই বটে, কিন্তু যতখানি রাগের আঁচ পাবেন ভেবেছিলেন জ্যোতিরাণী তা পাচ্ছেন না। আর চোখও এ-পর্যন্ত এ-দিকে ফেরেনি। হেসেই বললেন, তার মানে এক মা ছাড়া তোমার জন্যে বাড়িতে আর ভাবার কেউ নেই, এই তো?

মনোযোগ দেবার মতই একটা চিঠি হয়ত পেলেন শিবেশ্বর। সেটা দেখছেন বা পড়ছেন।

জ্যোতিরাণী আবার বললেন, ক'দিনের জন্য মিত্রাদি নেই কি করব বলো। ...আজই ফেরার কথা। নিজে এত করছে, কটা দিন একটু দেখাশুনো না করলে ফিরে এসে ভাববে কি।

এবারে শিবেশ্বর মুখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে।—কেউ আপত্তি করেছে?

চোখে চোখ রেখে জ্যোতিরাণী আবারও হাসলেন একটু।—করেনি বলছ?

দরজার পরদা নড়তে বাধা পড়ল। পরদার ফাঁকে শামুর বিনয়-নম্র বদন। সে জানান দিল, প্রভুজীধাম থেকে একজন লোক এয়েছেন, নীচে অপেক্ষা করছেন—

আসার কথা আছে। টাকা নিয়ে যাবে। তবু ঠিক এই মুহূর্তে না এলেই যেন ভালো হত। অগত্যা জ্যোতিরাণী বেরিয়ে এলেন। চেনা লোক, খামটা তার হাতে দিয়ে বললেন, বাবুর হাতে দিও, পাঁচশ' সত্তর টাকা আছে, দেখে নাও—

বাবু, অর্থাৎ মামাশ্বশুর। যেতে দেরি হবে এই লোকের মারফৎই বাঁথিকে জানিয়ে দেবেন ভাবলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু নোট-গোনা শেষ করে লোকটা ঈষৎ সঙ্কোচে তাকালো তাঁর দিকে।—পাঁচশ' সত্তর বলছিলেন...

—কেন, ভুল হয়েছে নাকি? দেখি—

নোটগুলো নিয়ে জ্যোতিরাণী নিজেই গুনলেন। অপ্রস্তুত তারপর। পনের টাকা কম, একটা দশটাকার নোট আর একটা পাঁচটাকার নোট।

—তাড়াতাড়ি ভুল হয়ে গেছে, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

নিজের ওপর বিরক্ত। এই রকমই কাণ্ড তাঁর। ভুল করে এক-আধখানা বেশিও তো হতে পারে, না কমই হওয়া চাই। আর একবার মামাশ্বশুরের হাতে টাকা গুনে দিয়েও এমনি অপ্রস্তুত হয়েছিলেন—একটা দশ টাকার নোট কম।

তাড়াতাড়ি আর পনেরটা টাকা এনে দিয়ে লোকটাকে বিদায় করলেন। মাঝখান থেকে তাঁর যেতে দেরি হবে সে-কথা জানানো হল না। মনে পড়তে আবার বিরক্ত।...বাঁথিকে টেলিফোনে বলে দিলেই হবে।

কিন্তু বেলা প্রায় একটা পর্যন্ত পাশের ঘরের লোককে ঘর থেকে বেরুতে না দেখে মুশকিলে পড়লেন। হুট্ করে নাকের ডগা দিয়ে বেরুতে সঙ্কোচ। কিন্তু না গেলেও নয়। অগত্যা বলেই যাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু বলতে এসেও বলা হল না। ঘুমে অচেতন, নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই জ্যোতিরাণীর ভাবনার অবসান। প্রভুজীধাম থেকে মিত্রাদির টেলিফোন।

—ফিরেছ তাহলে, বাঁচালে!

—কেন জলে পড়েছিলে না অন্ধকার দেখছিলে?

—জলেও পড়েছিলাম অন্ধকারও দেখছিলাম। তোমার দার্জিলিংয়ের খবর ভালো তো?

হ্যাঁ। আমি ফিরেছি সেই সকালের প্লেনে। বাড়ি হয়ে তারপর আরো কতকগুলো দরকারী কাজ সেরে এই মাত্র প্রভুজীধামে পা দিয়েই তোমাকে টেলিফোন করছি। ভালো কথা, তোমাদের কালীদা না বাইরে কোথায় ছিলেন শুনেছিলম, কবে ফিরলেন?

—ফেরেন নি তো! ফেরার সময় হয়েছে অবশ্য, কেন?

ওদিকে মিত্রাদির গলায় বিস্ময় ঝরল, ও-মা, আমি তো আজ স্বচক্ষে এই কলকাতাতেই দেখলাম তাঁকে। আমার বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করার জোর তাগিদ পেয়ে প্রভুজীধামে আসার পথে এক হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম, লোকটার বয়েস হলেও রস আছে দোতলার নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল আমাকে, নীচেরতলার বে-আইনী ভাড়াটে তুলে দেবার বায়না—আমাকে মাথার ওপরে রেখে নীচের ফ্ল্যাটে তার নিজের থাকার বাসনা—খুশি মেজাজে আমি আর একটু হাসতে টাসতে পারলে কিছু ভাড়াও দিতে রাজি হত বোধহয়। মিত্রাদির অস্ফুট হাসি।...যাক, লোকটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে নীচে নামতেই নিজের মুণ্ডু ঘুরে গেল। তোমাদের কালীদাকে দেখলাম আর কার সঙ্গে দিব্বি মনের আনন্দে বসে চা খাচ্ছেন, আমাকে দেখেন নি অবশ্য...সঙ্গে অন্য ভদ্রলোক দেখে আমিও আর এগোইনি।

কালীদার কোনো কাজই খুব অবাক হবার মত কিছু নয়। কলকাতায় পা দিয়েই হয়ত কোনো দরকারী কাজ সারার কথা মনে হয়েছে। অ্যাটর্নীদের মাথায় সর্বদাই প্ল্যান ঘোরে। এদিক থেকে জ্যোতিরাণী স্বস্তি জ্ঞাপন করলেন, বাঁচালে, আমি ভাবলাম কোনো ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখে তোমার মুণ্ডু ঘুরেছিল বুঝি।

ও-ধার থেকে অনুনয়ের সুরে হালকা জবাব এলো, দাও না ভাই একটা জুটিয়ে, মাথা ঠাণ্ডা হলে আমি তো হাঁপ ফেলে বাঁচি।

টেলিফোনের কথা শেষ করে জ্যোতিরাণী হাসছিলেন বটে একটু, কিন্তু মনের

শমী স্কুলে ভর্তি হয়েছে এ-বছরের গোড়া থেকেই। বাড়ির কাছের সকালের স্কুল। বেলা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসে। শমীর মুখে স্কুলের গল্প শুনে একটুও ভালো লাগেনি তাঁর। বিভাস দত্তকে বলেও-ছিলেন, দেখে-শুনে একটা ভালো স্কুলে দিলে হত না মেয়েটাকে?

বিভাসবাবু বলেছেন, বাড়ির কাছে খুব, এই ভালো। ওখানে হাজারের ওপর মেয়ে পড়ছে।

জ্যোতিরাণী মুখ ফুটে বলতে পারেন নি এজন্যেই তাঁর আপত্তি। দূরের নামী স্কুলে মেয়ে ভর্তি করলে মাইনে বেশি, স্কুল বাসের চার্জ, পোশাক-পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, এ-ছাড়াও অনেক রকমের আনু-ষঙ্গিক খরচ আছে। বাবা বেঁচে ছিলেন বলে তিনিও বড় স্কুলেই পড়েছিলেন। জানেন সব। জ্যোতিরাণী অনায়াসে সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারেন, অথচ পারার উপায় নেই বলেই অসহায়। এই খরচ টানা বিভাস দত্তর পক্ষেও অসম্ভব ভাবেন না তিনি। কিন্তু ভদ্রলোকের নীতির দৃষ্টি অন্যরকম —হাজার মেয়ের থেকে ওকে তফাতে রাখার প্রস্তাব শুনলেও উল্টে ঠেস দেবেন।

শমীকে ফোন করতে গিয়েও করলেন না। ড্রাইভারের হাতে চিঠি দিয়ে গাড়িই পাঠিয়ে দিলেন। ওকে আনার জন্যে হঠাৎ একেবারে গাড়ি হাজির দেখলে তবু একটু নরম হবে।

এক ঘন্টার মধ্যে শমীকে নিয়ে গাড়ি ফিরল। জ্যোতিরাণী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন মেয়ের গাল ফোলা। ওপর থেকে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন সিতুর স্কুলে চলে যেতে। ছুটির সময় হয়ে এলো, গাড়ি আছেই যখন অন্যের গাড়িতে আসার কি দরকার।

শমীর মান ভাঙাতে সময় লাগেনি খুব। সে-তো বিশ্বাসই করতে চায় মাসির টান একটুও কমেনি। জ্যোতিরাণী গোড়া থেকেই নিজের বয়েসটা প্রায় ওর কাছাকাছি টেনে নামালেন। অনেক দিন পরে দেখার আনন্দে প্রথমে দু'গালে চুমু খেলেন গোটাকতক, আর মাথার রিবন-বাঁধা ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো করে দিয়ে হাসতে লাগলেন। তারপর কেন আজকাল এত ব্যস্ত খুব সহজ করে সেই কৈফিয়ৎ দিতে বসলেন। মেয়েটার অনেক হারানোর ব্যথা মনে পড়ে যেতে পারে তাই সন্তর্পণে সে-দিকটা এড়িয়েই বললেন। যারা গরিব, যাদের থাকার জায়গা নেই, লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেই—তাদের জন্যে প্রভুজীধামে অনেক কিছু করা হচ্ছে। শমীই তো বড় হয়ে আর লেখা-পড়া শিখে সেটা চালাবে—মাসি তো ততো-দিনে বুড়ো হয়ে যাবে।

শমীর অভিমান জল হয়ে এলো। মাসি যে কত ভালো ঠিক নেই। এর ওপর আবার চমৎকার ফ্রকের কাপড় কিনে রাখা হয়েছে তার জন্য, আর সামনের পুজোয় খুব ভালো একখানা শাড়ি পাবার প্রতি-শ্রুতি। শাড়ির বাসনার কথা প্রকারান্তরে ও-ই মাসিকে জানিয়েছিল একদিন—বলে-ছিল তার একখানাও শাড়ি নেই।

জ্যোতিরাণী শাড়ির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেই আবার সাবধান করেছেন, শাড়ির কথা আগে কাউকে বলবি না, তোকে এখানে এনে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে-টাজিয়ে বাড়ি পাঠাব—সকলে তখন অবাক হয়ে ভাববে, এ-মেয়েটা আবার কে এলো!...আমার চিঠি কাকে দেখিয়ে এলি, জেঠিকে?

—না কাকুকে, কাকু তো বাড়িতেই ছিল।

জ্যোতিরাণী আরো শুনল, কাকু আজকাল বেশির ভাগই বাড়িতে থাকে, আর দিন-রাত মাথা গুঁজে কেবল লেখে। শমীর মান-অভিমান তো গেছেই, অনেক দিন বাদে মাসিকে এ-ভাবে পেয়ে আর একটা অভিলাষ প্রায় অদম্য হয়ে উঠেছে। এখন মাসি সেটা মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করলেই আনন্দটা এই দিনের মত ষোলকলায় পূর্ণ হয়। ব্যক্ত না করে পারল না, আজকের রাতটা সে মাসির কাছেই থেকে যেতে চায়।

না ভেবে জ্যোতিরাণী বললেন, কাল যে আবার সকালে স্কুল তোর?

—বা রে, কাল তো সকলের ছুটি, কাল জন্মাষ্টমী না?

জ্যোতিরাণীর মনে ছিল না বটে। কাল এইজন্যেই একটু সকাল সকাল প্রভুজীধামে যেতে হবে। [illegible] হবে না, ওই উপলক্ষে [illegible] দিনটা যাতে আনন্দে কাটাতে পারে [illegible] ব্যবস্থা করেছেন শুধু। অন্য দিনের থেকে ভালো খাওয়া-দাওয়া হবে একটু, বিকেলে সকলকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে একটা বাড়তি বাস ভাড়া করা হয়েছে।

জ্যোতিরাণী আরজি মঞ্জুর করলেন। —আচ্ছা, কাল তোকে আর সিতুকে প্রভুজী-ধামে নিয়ে যাব'খন, ভালো দিনেই তোকে এনেছি এখানে।

—কাকুকে ফোনে বলে দাও তাহলে। ব্যবস্থাটা একেবারে পাকা না হওয়া পর্যন্ত শমী গোটাগুটি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

—আচ্ছা সে হবে'খন। জ্যোতিরাণী উঠে দাঁড়ালেন, বোস তুই, সিতুর ঠাকুমার কিছু লাগবে কিনা দেখে আসি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে দেখলেন একনজর। ঘুম ভাঙেনি এখনো। পর পর ক'টা রাত ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে, আর কাল তো ফেরাই হয়নি। ...সেই জন্যেই, নইলে এই বেলা পর্যন্ত এমন অঘোরে ঘুমুতে বড় দেখা যায় না। অন্য-মনস্কের মত বারান্দা ধরে এগোলেন। শমীকে কথা দিয়েছেন যখন বিভাস দত্তর বাড়িতে টেলিফোন একটা করতে হবে। আরো বিকেলের দিকে করবেন, যে সময়ে ভদ্রলোক বাড়িতে নাও থাকতে পারেন। শমীর জেঠি বা আর কাউকে ডেকে বলে দেবেন।...পাশের ঘরের লোকের কাণ্ডকারখানায় এমনই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে যে টেলিফোনের সহজ যোগাযোগটুকু এড়ানোর জন্যেও ফাঁক খুঁজতে হয়।

দাঁড়িয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখে ভোলা জানালো, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে। ছুটি হবার আগেই গেছল, কিন্তু ছুটির পর সিতুদাদার দেখা পায়নি। শেষে ভিতরে খবর নিয়ে কার কাছে শুনেছে সিতুদাদা স্কুলেই যায়নি।

জ্যোতিরাণী অবাক। —ড্রাইভার সকালে ওকে গাড়ি করে স্কুলে পৌঁছে দিল আর স্কুলে যায়নি মানে?

ভোলা জানালো, ড্রাইভার সে জন্যেই ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে খবর দিতে পাঠিয়েছে।

জ্যোতিরাণী ভাবলেন একটু। —ঠিক সময়ে গেছল তো না ছুটির পরে গিয়ে হাজির হয়েছে?

—বলছে তো ছুটির দশ-বারো মিনিট আগে গেছল।

—ঠিক আছে। জ্যোতিরাণী নিশ্চিন্ত মনেই বিদায় দিলেন তাকে। ভাবলেন হয়ত কোনো কারণে এক আধ ঘণ্টা আগে ওদের ক্লাস ছুটি হয়ে গেছে। বন্ধুর গাড়িতে তাদের বাড়িতেই চলে গেছে, আড্ডা দেবার ফাঁক পেলে তো ছেলের চার পা। স্কুলে ঢুকে ড্রাইভার কার খবর নিতে কার খবর এনেছে কে জানে।

[ক্রমশঃ]

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

আনপ্রেডিকটিবল্ কথাটার বাংলা অর্থ কি হবে এই নিয়ে অনেক ভেবেও যখন কিছু বার করতে পারলাম না, তখন হঠাৎ খেয়াদার কথা মনে পড়ে গেল, কেননা খেয়াদার মত আনপ্রেডিকটেবল্ লোক আমি আর দেখিনি। খেয়াদার নামটাও বোধহয় খেয়াল থেকে এসেছে, কারণ তাঁর খেয়ালেরও সংখ্যা ছিল অগণিত। কিন্তু খেয়াল তাঁর নিজের ইচ্ছের উপর হয়ত কিছুটা নির্ভর করত, তবে তাঁর চেহারাটা নয়। তাঁর চেহারা আমি দেখেছি, কেমন যেন বদলে বদলে যেত, এবং ঘন ঘন। আর সেটারও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বছরতিনেক তিনি একবার ইয়া পুরু কাচের একজোড়া চশমা ব্যবহার করলেন, তারপর হঠাৎ দেখা গেল সেটা আর নেই, খেয়াদা খালি চোখেই ঘুরছেন। ব্যাপ্যারটা আর কিছুই নয়—হঠাৎ তাঁর খারাপ চোখ ভাল হয়ে গিয়ে আর চশমার প্রয়োজন হয়নি।

তাঁর উচ্চতা ছিল প্রায় ছ' ফুট। সেটাও খুব আশ্চর্যভাবে ঘটেছিল। তাঁর বয়স যখন পনের বছর, তখন তাঁর উচ্চতা সাড়ে চার ফুটেরও কম। তাঁর বয়সের আর সবাই তাঁর চাইতে অন্তত এক বিঘৎ লম্বা। এ নিয়ে ঠাট্টার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, এবং ঠাট্টা করাও হত। তাঁর নামই হয়ে গেল বেঁটে খেয়া, কিন্তু তাও মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য। কেননা, হঠাৎ দেখা গেল তিনি দুমদাম করে বেড়ে চলেছেন। প্রতি মাসে প্রায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি করে বেড়ে বছরখানেকের মধ্যে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের চাইতেও কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেলেন, ফলে তাঁর নামের আগে যে 'বেঁটে' কথাটা ব্যবহার করা হত, সেটা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গত কারণেই।

লম্বায় প্রায় ছ' ফুট হবার পরও কিন্তু চেহারায় নানাবিধ পরিবর্তন তাঁর ঘটত। যখন প্রথম প্রায় ছ' ফুট লম্বা হলেন, তখন তিনি হলেন অসম্ভব রোগা। এত রোগা যে কোন মানুষ হতে পারে, তা তাঁকে না দেখলে বোঝা যেত না। কিন্তু তাও কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। হঠাৎ কয়েক মাসের মধ্যে তিনি এমন দারুণ মোটা হলেন যে, তাঁর সমস্ত জামা-প্যাণ্ট কোট বদলে ফেলতে হল। কিন্তু মোটা হয়েই যে তিনি ঐভাবে থাকবেন তাও হল না। আবার তিনি রোগা হতে শুরু করলেন। আবার হঠাৎ রোগা হতে হতে মোটার দিকে চললেন। কোন সময় তাঁর ওজন হত দেড় মণ, কখনো আড়াই মণ। কয়েক মাসের মধ্যে এরকম পার্থক্য হওয়াতে আমরা সবাই নানাবিধ দুশ্চিন্তা করতাম। খেয়াদা কিন্তু খুব মজা পেতেন। এমন ভাব করতেন যেন ওটাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কারুর সম্বন্ধে হয়ত মন্তব্য করতেন, সুধীরটার আর কোন পরিবর্তন হল না, সেই পৌনে দু' মণই রয়ে গেল।
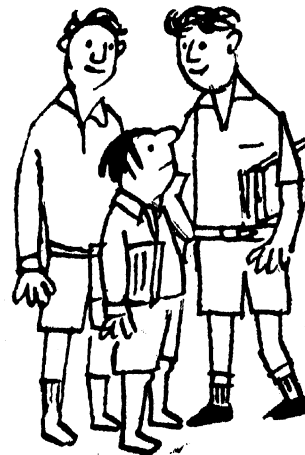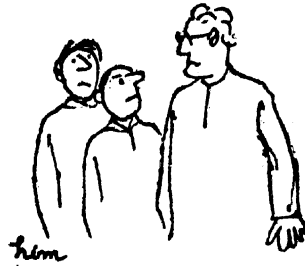
কিন্তু চেহারায় মধ্যে আরো অনেক কিছু খেয়াদার পরিবর্তন হত। সাধারণত লোকের একবার টাক পড়লে আর চুল গজায় না, তা যতই তিনি পড়শীর পরামর্শ নিয়ে মাথার চাঁদিতে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি লাগান, কিংবা ডিমের কুসুম ফেটিয়ে মাখন দিয়ে প্রলেপ দেন। খেয়াদার টাক পড়ে যেত হঠাৎ। কখনো দেখা যেত মাথাভর্তি চুল। গরমকালটা তাঁর চুলভর্তি মাথা, এবং শীতকাল এলেই সমস্ত চুল ঝরতে শুরু করত। এ-ব্যাপারে খেয়াদা খুব মজা পেতেন —কেননা তিনি বলতেন, বুঝলে হে আমি হচ্ছি এক ধরনের গাছ। গাছের পাতা যেমন শীতকালে ঝরে যায়, আমারও তাই!

এছাড়া তাঁর গায়ের রঙও সর্বসময়ে যে এক রকমের থাকত তা নয়। রোদ্দুরে গেলেই তিনি কালো হতে থাকতেন। ঘণ্টা-আন্টেক রোদ্দুরে বসে থাকলে তিনি কালো হয়ে যেতেন এমন যে, মনে হত তাঁর গায়ে কেউ আলকাতরা লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিকেল থেকে, সূর্যের আলো চলে যাবার পর থেকেই তিনি আবার ফরসা হতে শুরু করতেন। সকালবেলায় তাঁকে দেখে মনে হত তিনি একজন ইংরেজই বুঝি হবেন না। একবার তিনি একাদিক্রমে তিনদিন ঘরে শুয়েছিলেন। এত ফরসা হয়ে গিয়েছিলেন যে, কেউ তাঁকে আর চিনতে পারে না। অবশেষে রোদ্দুরে কয়েক মিনিট ঘুরে আসবার পর লোকেরা একটু-আধটু চিনতে পারল। সবচেয়ে অসুবিধে হত যখন তাঁর একদিকে আলো লাগত, অন্যদিকে লাগত না। তখন তিনি হতেন বিচিত্র-বর্ণ।

এর উপরে খেয়াদা নানারকম কাজ করতেন। কখনো এক জায়গায় বেশিদিন কাজ করতে তাঁর ভাল লাগত না। ফলে তাঁর সম্পর্কে সর্বদাই একটা অনিশ্চয়তার ভাব থাকত। তাঁর বর্ণনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হত। তিনি যে সৌভাগ্যক্রমে শান্তি-প্রিয় ছিলেন, তাই রক্ষা, নইলে তিনি বেশ ভালরকম ডাকাত কিংবা খুনে হতে পারতেন আর আদালতে সাক্ষীদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। আরো কত কি করতে পারতেন তার বর্ণনা দেবার স্থান নেই।

তবে একটি কথা—আনপ্রেডিকটেবল্ কথাটা মনে হতেই খেয়াদার কথা যে মনে পড়ে আমার সেটা নেহাৎ কথার কথা নয়, তা আশা করি আপনারা স্বীকার করবেন।

সেলাই ও কাটিংয়ের ক্লাশ

অঙ্গনা

প্রমীলা

নারী কল্যাণ বয়ন সমিতি

বলা যায় সমাজসেবার মাধ্যমেই জীবন শুরু করেছেন বেলঘরিয়া নারী কল্যাণ বয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী নলিনীপ্রভা রায়। বাল্য, কৈশোর এবং বিবাহিতা জীবনের ক্ষুদ্র অধ্যায়টুকু বাদ দিলে সারাটা জীবনই তিনি কাটিয়েছেন সমাজসেবায়। তাছাড়া একই সংগে পূর্ব ও পশ্চিমবংগে সমাজসেবার এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। জীবনের এই মধ্যাহ্নলগ্নে আজও তিনি অক্লান্তকর্মী। আবাহন এবং বিসর্জনকে জীবনে তিনি সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। নির্মম বৈধব্যকে বরণ করে নিয়ে সমাজ-সেবার মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন তিনি। আপন প্রচেষ্টায় তিনি পূর্ববংগের ময়মনসিংহ জেলার পুথিপাড়া গ্রামে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই বয়ন সমিতি। যে সমস্ত মেয়ের জীবন তারই মত মধ্যপথে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তাদের জীবনে তিনি গতির সঞ্চার করেছিলেন, স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে তিনি এখান থেকেও ছিটকে পড়লেন। দেশভাগের কোপে পড়ে নিজে হাতে গড়ে তোলা সমাজসেবার মণিদীপটি নিভিয়ে। এই দ্বিতীয়বার প্রকৃতির খেয়ালে তাঁর সাধ এবং আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু হাল ছাড়লেন না বরং শক্ত করে আশার তরীতে হাল ধরে রাখলেন। এসে আশ্রয় নিলেন আজকের জায়গায় কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে। সমাজসেবার কথাটা তখনও মনে অহর্নিশ জ্বলছে। এখানেও তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ক্ষুদ্র একটি বয়ন সমিতি। মনে মনে আশা বিরাট কিন্তু সামর্থ্য কম। তাই সাধারণভাবেই শুরু। কিন্তু অক্লান্ত উদ্যম আর নিষ্ঠা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চললো। সরকার এবং সহৃদয় মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো সমাজসেবার এই প্রতিষ্ঠানটির দিকে। সকলের সাহচর্যে বেলঘরিয়া নারী কল্যাণ বয়ন সমিতির আজ যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবং প্রতিটি দিনই সমিতিকে অল্প অল্প করে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ ক্লাশ ও লেডি ব্রেবোর্ণ ক্লাশের মেয়েরা

বয়ন সমিতি হিসেবে শুরু হলেও মেয়েদের জন্য সমস্ত রকম শিক্ষার বন্দোবস্তই এখানে আছে। টেলারিং, এম্ব্রয়ডারী, লেডী ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা, সূচীশিল্প প্রভৃতি শিক্ষা তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এই সমিতির গৃহাঙ্গনেই সকালে বসে শিশুতীর্থের আসর। কমবেশি আড়াইশো ছাত্রী এখানে বিদ্যাভ্যাস করে এবং এটি সরকার স্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়। সমিতির শিল্প বিভাগে বর্তমানে ৬০।৬৫ জন ছাত্রী নিয়মিত শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে লেডী ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমার ১৮ জন, শিল্পশিক্ষার্থী হচ্ছে ৩৫ জন এবং তাঁত বিভাগে ১২ জন। এদের সকলের মিলিত কর্মভারে সমিতি গৌরবোজ্জ্বল।

গোড়া থেকেই সমিতির লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠানটিকে একটি উৎপাদন কেন্দ্রে রূপায়ণের। কিন্তু সে পথে বাধা অনেক। আর্থিক অস্বাচ্ছল্যই প্রধান বিবেচ্য। সমিতিতে বর্তমানে তিনটি তাঁত আছে এবং অচিরেই তাঁত সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে বেড কভার, গামছা, খেস প্রভৃতি তাঁতজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বেশ। এসব জিনিস সাধারণতঃ স্থানীয় অধিবাসীরাই কিনে নেয়। বাইরে থেকে অর্ডার এলেও সরবরাহ করা হয়; শিগগিরই শাড়ী তৈরী করার পরিকল্পনাও আছে। এতদিন এটি পুরোপুরি ছিল ট্রেনিং কাম প্রোডাকসন সেণ্টার। বর্তমানে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে প্রোডাকসন সেণ্টারের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বয়ন সমিতির বয়ন বিভাগ।

সবচেয়ে বড় কথা যে সমিতি নিজস্ব জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা সমিতিকে আবাসিক পর্যায়ে উন্নীত করার। সেজন্য পাঁচ কাঠা জমি জুড়ে তাঁরা দোতলা বাড়ীর প্ল্যান করেছেন এবং একাংশ সম্পূর্ণও করেছেন। সেই অংশেই স্থাপনা করেছেন বয়ন বিভাগ। স্থানীয় অধিবাসীদের সকলেই সমিতির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। তাই কারো সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত হয়নি। বছরে দুবার সমিতির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এবং সমিতি নিজেই কৃতী শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমিতির তুলনায় বেলঘরিয়া নারী কল্যাণ বয়ন সমিতি অনেকটা কৃতিত্বের অধিকারী। বর্তমানে সমিতির যাঁরা কর্মী এককালে তাঁরাই ছিলেন সমিতির ছাত্রী। আজ তাঁরা শুধু কর্মী নয় সমিতির সভ্যাও।

ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রীজ এবং সেণ্ট্রাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে আর্থিক সাহায্য সমিতি পেয়ে থাকে প্রতি বৎসর। কিন্তু বিরাট সমিতির ব্যয়ভারের তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য। তবু অনেকের সদিচ্ছায় সমিতি আপন চলার পথ তৈরী করে দিচ্ছে ক্রমেই।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শুরু হলেও বৃহতের সহযোগিতায় তা ধন্য। বেলঘরিয়া নারী কল্যাণ বয়ন সমিতির জীবনে এই কথা একান্তভাবে সত্য। শুধু বৃহতের সহযোগিতায় নয় বৃহত্তের সম্ভাবনায়ও তা
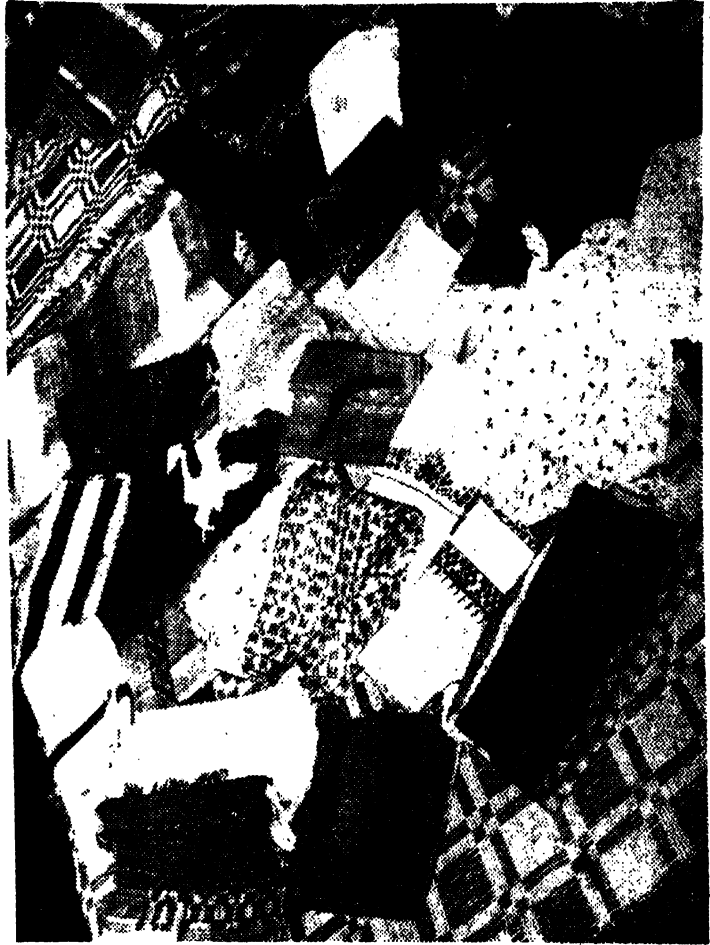
সমিতির মেয়েদের তৈরী নানা জিনিস

একান্ত উজ্জ্বল। ধীরে ধীরে যা রূপায়িত হচ্ছে—একদিন যে তা সম্পূর্ণ হবেই একথা জোর করেই বলা যায়। এই বেলঘরিয়া নারী কল্যাণ বয়ন সমিতিও একদিন সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে যাবে নিশ্চিত।

অতীত আদর্শ

অতীতকে অস্বীকার করে নয় বরং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি এবং বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের মাধ্যমেই আমাদের চলার পথ খুঁজে নিতে হবে। অতীত অস্বীকৃতির মধ্যে গৌরব কিছু নেই কিন্তু পদে পদে বিড়ম্বনা ঠিক আছে। এই বিড়ম্বনা অনেকটা ইচ্ছাকৃত আর কিছুটা আরোপিত। প্রায়ই আমরা মনে করি অতীতকে অবহেলার মধ্যেই বুঝি অতি-আধুনিক হওয়ার গুপ্তমন্ত্র লুকিয়ে আছে। ফলে বিড়ম্বনা আমাদের অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। নিজেদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে পরের অনুকরণ এবং অনুসরণ করি কিন্তু তাদের চারিত্রিক উন্নতির গোপন চাবিকাঠিটি হস্তগত করতে পারি না। তাই সবত্র হাস্যাস্পদ হতে হয়। আবার অনেক সময় অধিকাংশের চলনে-বলনে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে, অকারণে সকলকে সেই বিড়ম্বনার ভাগীদার হতে হয়। সেজন্য সর্বদিক থেকে সতর্ক হয়ে কাজ করাটাই সমীচীন, যাতে নিজেরাও বিড়ম্বনা ডেকে না আনি এবং অপরেও আমাদের বিড়ম্বিত করতে না পারে। তবে একটা কথা ঠিক যে, নিজে থেকে বিড়ম্বিত হতে না চাইলে কেউ কোনদিন বিড়ম্বিত করতে পারে না।

আজকাল আমাদের সামনে আদর্শের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন জীবনাদর্শে আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে ব্যস্ত। চোখ ঝলসানো আলোর দিকেই সকলের লক্ষ্য। কেউ আর পেছনে তাকিয়ে একবার অতীত পুরান ঘেঁটে দেখবার প্রয়োজন মনে করে না এবং সে অবসরও নেই। বিজলী বাতির তীব্র আলোর মাদকতায় আমরা সবাই বিভ্রান্ত। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে নারীর স্বাভাবিক বিকাশ এবং বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কতদূরে সরে গেছি। পবিত্রতা, সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মমতা ছিল

আমাদের নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গোড়া থেকেই এই আদর্শের চন্দ্রাতপতলেই নারী চরিত্র বিকশিত হতো। সত্যি কথা যে, আজ আর সে সুযোগ নেই। কিন্তু আদর্শগুলি আজও জীবন্ত এবং এইসব আদর্শে ভাস্বর একাধিক নারীর জীবনকথা আমাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল। তাই এই আদর্শ-গুলিকে আমরা সযত্নে লালন করতে পারি এবং অপরকে অনুপ্রাণিতও করতে পারি। যুগ এবং রুচির যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন স্বাভাবিকতা বঞ্চিত হয়ে নারীর মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর এই বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নারী চরিত্রের স্বাভাবিক দিক। স্বাভাবিকতাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অস্বাভাবিকতায় নির্ভর হয়ে থাকা তো পাগলামিরই নামান্তর। তাই পাগলামির ভয়াবহতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া;

যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেয়েদের দায়িত্ব যে অনেক বেড়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে দায়িত্বের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য চাই যোগ্য চারিত্রিক মর্যাদা। অতীত নারী চরিত্রের সেই আদর্শ ছাড়া ঈপ্সিত মর্যাদা লাভ সম্ভব নয়। তাই আলোর ঝলকানিতে বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের গড়ে তুলতে হবে অতীত আদর্শে, পবিত্রতা, সরলতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও মমতার জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে। তাহলেই স্বপ্ন বাস্তব হবে, আকাঙ্ক্ষা সত্যরূপ পরিগ্রহ করবে।

ইভ'স উইকলির উদ্যোগে এবং পল্ডস ও বোম্বে ডাইং-এর সহযোগিতায় সম্প্রতি গ্রান্ড হোটেলে আঞ্চলিক 'মিস এঞ্জেল ফেস' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'মিস এঞ্জেল ফেস' নির্বাচিত হন শ্রীমতী নীতা ভাণ্ডারী (মধ্যস্থলে)। প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্স হন শ্রীমতী মঞ্জু চুগানী এবং ভালেরী গেটফা—যথাক্রমে শ্রীমতী নীতার ডান ও বাম দিকে।

সেলাইয়ের কথা

(১১)

সাধারণ সেমিজ

এই সেমিজটি একেবারেই সাধারণ, তবু এটি ঠাকুমা দিদিমাদের পক্ষে সুবিধাজনক এবং উপযোগী এমন কি গরমকালের দুপুরে মা মাসিরাও শুধু এই সেমিজের ওপর শাড়ী পরে ঘরের কাজকর্ম করতে পারেন.' কারণ সব সময় ব্লাউজ পেটীকোট পরে গরমে সংসারের কাজ করতে খুব কষ্ট হয় তখন এই সেমিজের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

সাধারণ সেমিজ

মাপ :—

ঝুল—২২"

ছাতি—২২"

সেস্ত—৯½"

পুট— ৫"

১— ২=ঝুল=২২"

১— ৩=ছাতির ¼=৫½" মোহরা

১— ৪=পুট=৫+½" (সেলাই)=৫½"

৩— ৫=ছাতির ¼=৫½"+১½"=৭"

৭, ৪—৬=এর মধ্য বিন্দু

৭ —৮=½"

১— ৯=ছাতির ১/১২=১½+½"=২½"

১—১০=১" পিছন গলা

১—১১=ছাতির ১/১২+১"=২½"

১—১২=সেস্থ=৯½"

১২—১৩=৭½

১৩—১৪=½"

১৩—২২=১৩ এর ৩" নীচে

২—১৫=ঘের=ছাতির ½=১১"

২—১৬=১½" নীচের মুড়ির জন্য

১৬—১৭=ঘের=ছাতির ½=১১"

১৫—১৭=১½" নীচের মুড়ির জন্য

১৭—১৮=½"

১৫—১৯=½"

২০, ১৩—১৯=এর মধ্য বিন্দু

২০—২১=½"

২—২৩= ২—১৫=এর ½

১৬—২৪=১৬—১৭=এর ½

২৫=১২ থেকে ৩" ভিতরে

½" চওড়া ও ৪" লম্বা প্লিট।

—মধুমা

—"যারা বিশ্বাসকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না, আমি তাদের ঘৃণা করি।"

উৎপীড়িতা ব্যাঘিনীর মত ফুলে উঠল রতি, চোখে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের জ্বালা নিয়ে সে চীৎকার করে উঠতে চাইল। যেন, যে-কোনও মুহূর্তে রতির রক্তিতনখ আঙ্গুলগুলো নিঃশব্দে চেপে ধরবে ঈপ্সিতের কণ্ঠনালী। কি দ্রুত পরিবর্তনশীল দর্শনের যুগে আমরা বাস করছি। ঈপ্সিত ভাবল, জীবন-দর্শনে কত
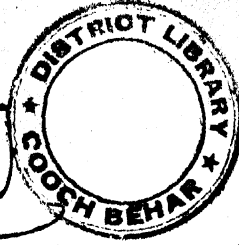
সহজে ফাটল ধরে। ঈপ্সিত দেখল রতির চোখের সবুজ আলো।

"উইমেন আর অলওয়েজ লাইক দ্যাট্" কবেকার শোনা কথাটা মনে হল ঈপ্সিতের। নারীমনের গোপনীয়তা বুঝেছে সে। প্রথম প্রকাশের লজ্জার আস্বাদ নিয়েছে। নারীর ঈর্ষা জেনেছে। কিন্তু নারীরোষের ভয়ংকর নগ্নতা এই প্রথম দেখল।

"তাদের পরিহার করে চলো।" রাঙা-কাকার ভ্রূর ওপর সেই কাটা দাগটা মনের চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল ঈপ্সিতের মনে। রাঙাকাকার চোখ দুটো এখনও যেন স্মৃতির অরণ্যে খদ্যোতের উজ্জ্বলতায় জ্বলছে।

"নারীমনের অসংখ্য গলিঘুঁজির সংবাদ তুমি কোনোদিনও পাবে না। যদি ধরা পড়, নিজেকে সমর্পণ করো। দে উইল বিট্রে ইউ। তোমাকে তারা এক্সপ্লয়েট করবে, তোমার ভালত্বের সুযোগ গ্রহণ করে তোমাকে ঠকাবে। হয় সংসারের যাঁতাকলে তোমাকে শুষে নেবে, নয়ত।—দে আর নেভার ট্রাস্টওয়ার্দি।"

ভ্রূর সেই কাটা দাগটা বিস্তৃততর হচ্ছে। মনের পটে স্পষ্ট দেখছে ঈপ্সিত।...বাইরে অঝোর বৃষ্টি, কাঁচের শার্শিতে টুপুর টুপুর নুপুর ধ্বনি। সুন্দর সাজান ঘর। গৃহকর্ত্রীর সুরুচির পরিচায়ক। রাঙা-কাকিমার অনুপস্থিতি। তিনি ক্লাবে। কাকার চোখ আগুন। নেশার আগুন। লাল। শূন্যতার গহ্বর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা পুরুষসিংহ। তীক্ষ্ণ হাসিটা এখনও সেদিনের মত হাওয়ায় হো হো ভেসে বেড়াচ্ছে।

"ভালবাসিস্ তুই? কি নাম বললি? রতি? লাভ ইজ অ্যান্ ইলিউসন। মায়া-হরিণের পেছনে ছুটে বৃথা সময় অপব্যয় করো না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জান, রক্তক্ষরণ, হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। বিহেভ্ লাইক্ এ ম্যান। পুরুষের মত জীবনকে জান, বোঝ, দেখ। একটু ভালবাসা, একটু রোমঞ্চ, তারপর বিয়ে। দেন্? বাজার, রেশন, ডালভাত-তরকারি, ছুটির দিনে বৌ নিয়ে সিনেমায় যাওয়া। টাকা থাকলে কোনো হিল স্টেশনে অথবা সমুদ্রতীরে ছুটি কাটানো, বাস্ ফুরিয়ে গেলে, শেষ হয়ে গেলে তুমি।"

—"জীবন সীমিত, পরজন্ম অনিশ্চিত। সেখানে আলুনি অলুনি জীবন-ধারণের কোনও মূল্য নেই। ঈপ্সিত, পুরুষ তুমি। পুরুষ মৃগয়া করবে, নারীকে গ্রহণ করবে, সুরাপান করবে।"

রাঙাকাকার ভেতরে অতৃপ্তি দেখেছে ঈপ্সিত। সেই অতৃপ্তির চারপাশে মাথা-খুঁড়ে মরতে দেখেছে তারা জ্বালাকে। রাঙাকাকার সব ছিল। বউ, ঘর, সংসার; কিন্তু সবই যেন ছবির মত সাজানো, ছবির মতই প্রাণের অভাব সেখানে। জীবনের ভোগের নিলামে যতটুকু মুনাফা আদায় করা চলে সবটুকু লুটে নিয়েছিলেন রাঙা-কাকা, কিন্তু শান্তি পান নি।

ঈপ্সিতের মনে হল—আজকের যুগে বেশীরভাগ মানুষই বুঝি রাঙাকাকার মত সাজানো ঘরে বসে আছে। অভ্যাস-বশে বিবাহিত জীবন যাপন করছে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে তাদের প্রাণ নেই। এবং

জীবনের গতিকে অক্ষত রাখতে তারা নেশার আশ্রয় গ্রহণ করছে।'

রাঙাকাকা। সেই সাজানো ঘর, কাকিমার অনুপস্থিতি, সব মিলিয়ে শূন্যতার বিলাপ, ইলিউসন। স্মৃতির পলিস্তর ভেদ করে রাঙাকাকার কথাগুলো মাথা তুলছে।

"তোর বাবা তো এস্কেপিস্ট।" বাবা! ঈপ্সিত যাঁর আত্মজ। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ যাঁর মূল্যবোধতে কাঁপন ধরাতে পারে নি। যুগযন্ত্রণায় যিনি কাতর হন নি কখনো, ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা যাঁর মনের শান্তি বিন্দুমাত্র হরণ করে নি। জীবনে ভালো থাকা, খাঁটি থাকার প্রতি যাঁর আজন্মের আগ্রহ। সেই বাবা, অন্য কিছু নাই হোক নিজের ভেতরে সেই বাবার প্রতিচ্ছায়া খুঁজেছে ঈপ্সিত।

বাবা বলতেন—"সৎপথে চলো, কারো ক্ষতি করো না। হয়ত মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে কিছুই লাভ করবে না। কিন্তু নিজের কাছে, নিজে খাঁটি থাকা, সেকি কম লাভ? অন্তত পক্ষে রাঙাকাকার মত ইনসোমনিয়ার রুগী হতে হবে না, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারবি।"

কিন্তু রাঙাকাকার সেই প্রশ্নটা—"আলুনি আলুনি জীবন-ধারণে লাভ কি?" মস্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে বহুদিন যন্ত্রণা দিয়েছে ঈপ্সিতকে। রাঙাকাকা এবং বাবার বিরুদ্ধ চিন্তার ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিত তৃণের মত আবর্তিত হয়েছে ঈপ্সিত। এস্কেপিস্ট হতে চায় নি ঈপ্সিত। ইনসোমনিয়ার রুগী হবারও কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না তার। সে চেয়েছিল নিজের কাছে নিজেকে খাঁটি রেখে প্রতি মুহূর্তের জন্য জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে। ঈপ্সিত তো তখনও জানত না, ভালোমন্দের ধারণাটা এত ফ্লেক্সিবল, অহংআবিষ্কারের চেতনায় পলকে পলকে ভালমন্দের ধারণা বদলায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে যা সত্য, তা রাঙাকাকার জীবন-দর্শন নয়, বাবার উপদেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও নয়, সত্য শুধু সামনের এই মেয়েটি, যার নাম রতি। সে বলছে, "তা'হলে কবে আমরা রেজিস্ট্রেশনের নোটিশ দিচ্ছি?"—

টেনে টেনে নিঃশ্বাস টানল রতি। রতির কপালে চূর্ণ অলক। পাশে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। ঘৃণিত ব্যক্তিকে বিবাহ। ভাবল ঈপ্সিত। বেশ আর্টিস্টিক শোনাচ্ছে। নট্ এ লাভম্যারেজ, বাট্ এ ম্যারেজ অফ্ হেটরেড।

"তোমার কথাগুলো একটু অসঙ্গত শোনাচ্ছে না কি?" একটু ইতস্তত করে ঈপ্সিত। বন্ধুর মত উপদেশ দিল। "এই হলাহ ঘৃণা কর, আবার—।"

"ঠিকই বলেছি। তুমি সাপের চেয়েও পিচ্ছিল, তুমি ঘৃণিত", উম্মাদ উত্তেজনায় রতিকে অসুস্থ দেখাল।

"বেশ, তবে সেই ঘৃণা নিয়ে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।"

"মুক্তি?" হযবরল অনুভূতি থেকে আত্মস্থ হবার ক্ষীণ প্রচেষ্টা করল রতি।

জীবনের নৌকো কোন্ ঘাটে নোঙর করে কে বলতে পারে? কি অপূর্ব দিন আজ। ঈপ্সিত আকাশে তাকাল। বসন্তের পবনে পবনে, নক্ষত্রের কৌতুকে, চাঁদের আলোতে পৃথিবী পরিপূর্ণ। কোথাও মৃত্যুর ইশারা নেই, নেই গতিভঙ্গের ইঙ্গিত। নাকি পরিপূর্ণতাই বহন করে আনে শেষের কথা? আর কখনও রতি রায়ের তন্বীদেহ বিদ্যুতের ঝিলিক্ তুলে উপস্থিত হবে না। সমব্যথীর দরদভরা কণ্ঠে অনুরোধ জানাবে না, "প্লিজ ঈপ্সিত, ডোন্ট বি এন্ অ্যাল্কোহলিক্ পারসন্।" কোনও ব্যথিত মুহূর্তে ক্ষণেকের জন্যও ঈপ্সিত রতির কোমল সান্নিধ্যে জীবনের পাথেয় সংগ্রহে রত হতে পারবে না।

হাটুর ওপর মুখ রেখে ঈষৎ বঙ্ক-ভঙ্গিমায় বসেছে রতি। কপালের ওপর আঙুলগুলো সাঁড়াশির মত আটকানো। মৃত্যুর মত এক ভয়ানক স্তব্ধতা লুটিয়ে যাচ্ছে চারিপার্শ্বে। রতির শারীরিক কম্পনের অনুভবে পীড়িত বোধ করল ঈপ্সিত। রতির দৃষ্টিতে সুদূর প্রসারিতা। কত দূরে পরিভ্রমণ করছে রতির চিন্তা? প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের অগ্রগতি। কেন খুঁজে পাওয়া যায় না সেই দিনগুলোকে? কেন দুঃখ এত জোরালো হয়? কেন বারংবার লাঞ্ছিত আত্মার কান্নায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে! স্মৃতি যেন বেদনামিশ্রিত মুচকি হাসি হেসে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করছে ঈপ্সিতকে। বিবেকের অঙ্কুশতাড়নায় ঈপ্সিত সেই দিনগুলোকে ভাবতে চাইল না। যে দিনগুলো এক একটা লিরিকের মত উপস্থিত হত। তারও আগে অনাবাদি হৃদয়ে ঘুরে বেড়াত ঈপ্সিত। তারপর সেই জমিতে ফসল ফলাল রতি।... মনোরাজ্যে কত মহল আছে? কত সন্তর্পণে তারা আত্মগোপন করে থাকে? মনে পড়ল সেদিনের কথা।......

"তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগে রতি"; যখন নিজেকে ধরে রাখা যায় নি হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল, তখনই বলেছিল ঈপ্সিত।

—তুমি ত গল্পের রাজা। কত বন্ধু-বান্ধবী তোমার। সেই রতি। তার দ্বিধিপ্রদত্ত ডাগর চোখে কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিল।

—রতি, তুমি জানো, মাঝে মাঝে হাজার মানুষের ভিতরে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়।

"জানি।"

"আচ্ছা রতি, বুঝতে পার কখনও কখনও অনর্গল কথা বলে মনে হয় বাজে বকলাম। কিছুই বলা হল না।"

"বুঝি।"

"বোঝ? কেন এমন হয়?"

"কেন?"

"আমাদের মন সঙ্গী খুঁজে মরে। যখন মনের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে শূন্য। অভাববোধ জেগে ওঠে।"

"ঈপ্সিত, তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছ।"

"জানি, আজকের দিনে সেন্টিমেন্টের কোনও মূল্য নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে সেন্টিমেন্টাল হতেও ভাল লাগে, নিজের হৃদয়ের কাছাকাছি আসা যায়।"

আরেক দিনের কথা।......

"তোমার আঙুলগুলো ভারি সুন্দর রতি।"

"অনেক ধন্যবাদ।"

"রতি, তোমার আঙুলগুলো একটু ছোঁব? হাতটা একটু ধরি?"

"ঈপ্সিত, আমি এন্‌গেজড্। দেখ অনামিকার এই আংটিটা, আমার এন্‌গেজমেন্ট রিং। ভদ্রলোক বিদেশে আছে। এই দেখ আমার খাতার মধ্যে ওর চিঠি।"

স্মৃতির পট-পরিবর্তনে ফুটে ওঠে আরেকটা দৃশ্য।

"তোমার সঙ্গ আমার কাম্য রতি। সিনেমা দেখবে একটা?"

"না।"

"তবে চল কোথাও ঘুরে আসি। সবুজ ঘাসের দেশ ইডেন গার্ডেন ভালই লাগবে।"

"আমি শুধু তার সঙ্গেই ঘুরতে রাজী আছি যে আমার স্বামী হবে।"

"আমি ত তোমাকে বিয়ে করতে পারি রতি।"

"আমি যে এন্‌গেজড্!"

"তাই ত।"

তারপর এল সেইদিন, যেদিন ঈপ্সিত শুনল রতির চরম ঘোষণা।

ঈপ্সিত, আমি এন্‌গেজমেন্ট ব্রেক করেছি।"

"কি বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, মনটা তো আর দুর্গ নয় যে, যে-কেউ অধিকার করলেই চলবে। অনেক ভেবেছি ঈপ্সিত। মিথ্যেকে আশ্রয় দেওয়া মানে তো অন্যকেও ঠকানো।"
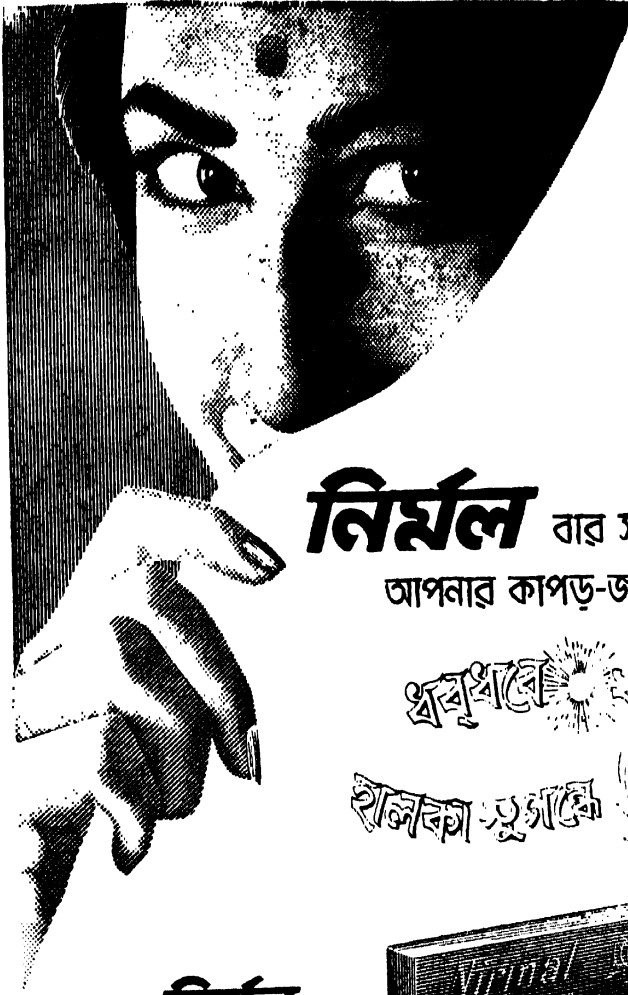
নির্মল বার সাবানে কাচালে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
নির্মল
Nirmal
BAR SOAP
নির্মল
বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে
ঝকঝকে পরিষ্কার হয়,
আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে ওঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়শুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে। নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে
JWT.K.PN 3088 A

অতীতের ছেঁড়া অংশ ল্যান্ডস্কেপ হয়ে জেগে উঠছে। সাউথের লেক—শিহরিত কালো জল—কিশোর ঈপ্সিত—নুড়ি পাথরে ছোড়াছুড়ি খেলা। কম্পিত জলে ছোট্ট আবর্ত, নুড়ি পাথরের সলিল সমাধি লাভ। মনের মধ্যে সেই খেলাটা দেখতে দেখতে ঈপ্সিত অনুভব করল যেন আজ এই মুহূর্তে নুড়ি পাথরের মতই অন্ধকার ভবিষ্যতের অথৈ জলে সে জলাঞ্জলি দিয়েছে রতি রায় নামক এই তরুণীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কামনায় বেষ্টিত প্রস্ফুটিত যৌবনকে। সেই আশংকাতেই যেন ডুকরে উঠেছিল রতি।

"কি বলছ কি বলছ তুমি! আমি বুঝতে পারছি না ঈপ্সিত। আমি বুঝতে পারছি না।" এবং রতির মনে বোধোদয়ের প্রচেষ্টায় নির্মম স্পষ্টতায় প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছিল ঈপ্সিত, "আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারছি না।"

তারপরই রতি রায়ের ফরসা মুখের রাঙা আলো নিভতে দেখেছে। দেখেছে, শিশিরভরা চোখ দুটোতে সবুজ দৃষ্টি।

মানুষ কতো সহজে প্রিমিটিভ হয়ে যায়। সভ্যতা এগিয়েছে যুগের পর যুগ। চিন্তাভাবনার এত ছড়াছড়ি। তবুও মানুষ কত সামান্য কারণে যুদ্ধ করে। পরস্পর স্বার্থরক্ষা করে চল, পিসফুল কো-এক্জিসটেন্স মেইনটেন করছি। নতুবা!—

সেই সবুজ দৃষ্টি নিয়েও আগের মত সংলগ্নদেহ হয়েছে রতি, ঈপ্সিতের বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে দুই কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করেছে, "একি তামাশা?"

"না।" অটল গাম্ভীর্যে স্থিরকল্প দেখিয়েছে ঈপ্সিতের মুখ। মুখটা কি এখন শুধুই ক্রূরতার প্রতীক?

এর পর এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে এনেছে রতি। সাপিনীর ক্রুদ্ধতায় ঘৃণা করেছে ঈপ্সিতকে। সেই ঘৃণা নিয়ে মুক্তি কামনা করেছে ঈপ্সিত।

"কিন্তু তুমি বলেছিলে যারা প্রেমের উন্মাদনাটুকু ভোগ করে দায়িত্বকে এড়িয়ে যায় তারা কাপুরুষ"। ঈপ্সিতকে স্মরণ করিয়ে দিল রতি। স্মরণ করিয়ে দিল মনের মণিকোঠায় যে দিনগুলো সযত্নে রক্ষিত তারই একটি রত্নকৌটোর ঢাকা উন্মোচিত হল।

সেদিন ঝড়ে বৃষ্টিতে তুফানে উন্মাদ কলকাতা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ওয়াই এম সি। বর্ষাতি নেই, ছাতা নেই। বৃষ্টি-স্নাত ঈপ্সিত এবং রতি, পর্দাঢাকা কেবিন, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি। কাঁধ দিয়ে কাঁধ স্পর্শ। রতির অসংবৃত চুলের দু একটি ঈপ্সিতের গালছোঁয়া। রতির শরীরের ভৌগোলিক সীমা। মোরগফুলে অধর। ঈপ্সিতের বুকে ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক। বুকের রক্তে রক্তে অসহ্য ঘূর্ণিমাতনে ঈপ্সিত তলিয়ে যাচ্ছিল। ঈপ্সিত কাঁপছিলো। হাত দুটো শক্তি হারিয়ে ফেলছিলো। ঈষৎ আনত হয়েছিল ঈপ্সিত, ঝুঁকে এসেছিলো। সে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল রতি রায়ের কোমল হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ। তারপর পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছিল। পরস্পর হাত ধরাধরি করে হেঁটেছিল। সেদিনই বলেছিল ঈপ্সিত, "যারা উন্মাদনাটুকু ভোগ করে প্রেমের দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তারা কাপুরুষ।"

বলেছিল, কারণ তখনও বুঝতে পারে নি ভালবাসা শুধু গীতি-কবিতার মতই জীবনকে সুধায় ভরে দেয় না। জানত না প্রেমের জন্ম হয় এবং মৃত্যুও। তখনও সে এফিনিটিতে বিশ্বাস করত। সত্যিই সেদিন সে চেয়েছিল তার প্রেমের কুঁড়িটা পাপড়ি মেলে হেসে উঠুক। এমন নির্মমভাবে নিজেকে ছিঁড়তে চায় নি। ঈপ্সিত বাঁচতে চেয়েছিল নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে, রতির হৃদয়ে, পারুল রায়ের চোখের আবেদনে, সুমিত্রা বসুর সঙ্গে শুধু গল্পে, কাফে-টেরিয়ার আড্ডায় রবি, সন্তোন, হিমাংশুর মাঝে, রাঙাকাকার যুগ-যন্ত্রণায়, বাবার ভালো থাকায়, শর্মির দাদা হয়ে, মার ছেলে হয়ে, ঈপ্সিত বাঁচতে চেয়েছিল, শুধু টিকে থাকতে নয়। সে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর বেঁচে উঠবার সেই দুদান্ত আগ্রহকে টেনে টেনে কবর চাপা দিয়েছিল রতি।

কানে এল, রতি আবার আজ বলছে, "তুমি অস্বীকার করতে পার? বলনি, যারা দায়িত্ব এড়ায় তারা কাপুরুষ?"

হিসেব দাখিল করতে বসেছে রতি। কি আশা করেছিলাম, কতটুকু দিয়েছে, কি পেয়েছি। সেই হিসেবের চাকায় সঁপে দিতে চাইছে রতি নিজেকে।

"না অস্বীকার করব কেন?" ঈপ্সিত বলল, "বলেছিলাম কারণ, তখন আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল, ভালবাসা ছিল।"

"এখন?" রতি রায়ের চোখে অঙ্গার আগুন। সেদিকে তাকাল না ঈপ্সিত। ওর বাহুতে তীব্র ঝাঁকুনি দিল রতি, "বল বল বল।"

"সে প্রেম তো মৃত।"

"মৃত?"

হ্যাঁ, অভ্যাস আমাদের প্রেম মেরে ফেলেছে।

"অভ্যাস?" রতির সর্বাঙ্গে রক্তের প্রদাহ।

"প্রতিদিন ঝগড়া করেছি। তিক্ত-বিষণ্ন মন নিয়ে বাড়ী ফিরেছি। প্রতিরাতে অন্ধকার কুরে কুরে ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছি। হৃদয়ে অসহ্য ভারের সৃষ্টি হয়েছে। ভারবাহী জীবের মত অভ্যাসের বশে তবুও আমরা দেখা করেছি। এর ভেতরে প্রেম কোথায়? অভ্যাস তো প্রেম নয়।" অন্যদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল ঈপ্সিত।

"ওঃ, ঈপ্সিত! এই তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম?" নিঃশ্বাসের দ্রুত স্পন্দনে রতি হাঁফিয়ে উঠল। ঈপ্সিতের বাহু ওর নখররঞ্জিত আঙুলের ডগাগুলো অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরল। এমনি করেই কবে থেকে রতি তার প্রেমের উত্তাপ দিয়ে ঈপ্সিতকে জড়িয়ে ধরেছিল। অন্ধ আবেগে রচিত আত্মসুখী বাধা-নিষেধগুলো ক্রমশঃ গেঁথে যাচ্ছিল জীবনের আকাঙ্ক্ষার ওপর আরও তীব্র আরও প্রচণ্ড বেগে। ধীরে ধীরে দিনে দিনে ঈপ্সিতের চারপাশে এমন একটি সূক্ষ্ম জাল জড়িয়ে দিতে পেরেছিল, যে জালে আটকা পড়ে ঈপ্সিতের আত্মা ক্লান্ত হয়েছে। মনে পড়ল ঈপ্সিতের আরেক দিনের কথা।

"যদি সত্যিই ভালবাস, শুধু আমাকেই ভাববে।" আবহমান কালের নারীর সেই চিরন্তন ইচ্ছাকেই প্রকাশ করেছিল রতি। ঈপ্সিত আহত হয়েছিল, শামুকের গুটানো জীবনে তার আগ্রহ ছিল না। রতি চেয়েছিল ঈপ্সিত তার বাবাকে ফেলে মাকে ভুলে শুধু রতিরই হবে।

প্রেমের কাঁটা। ঈর্ষা। লোকে বলে—নো জেলাসি, নো লাভ। একটু আধটু কাঁটার খোঁচা মন্দ নয়। কিন্তু কাঁটাটাই যদি বড় হয়ে ওঠে, ফুলকে ঢেকে দেয়। একদিন পারুল রায় আয়োজিত জলসায় ঈপ্সিত গান গেয়েছিল। সেই আসরে রতি রিং করে খবর জেনেছিল ঈপ্সিত আছে কিনা। শুনতে পেয়ে ঈপ্সিতের মাথা দপ্ দপ্ করে উঠেছিল। পরদিন রতি রায়ের মুখ থম থম। হাসি নেই, উচ্ছ্বাস নেই, ভ্রু-এর মাঝে সামান্য কুঞ্চন। গা ভাসিয়ে হাঁটছিলো দুজনে। মধ্যম পুরুষের মানসিক ক্ষুদ্রতায় ঈপ্সিতের হৃদয় সংকুচিত হয়েছিল। ভেবেছিল, কোনও ভয়ংকর কান্ড করে রতি রায়ের এই রাগের প্রতিশোধ নেবে। বুঝিয়ে দেবে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সীমা মেনে চলাই তার পছন্দ এবং সীমারেখা ইলাস্‌টিক নয় যে কারও প্রয়োজন ত বাড়তে দেওয়া চলে।

ঠিক তখুনি রতি রায়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরেছিল ঈপ্সিতের কোমর। সেই আগুন-আগুন স্পর্শে ওর মনের ইচ্ছাটা অংগার হয়ে জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ঈপ্সিতের চোখে চোখ রেখেছিল রতি, আদুরে অভিমানে গলে যেতে যেতে বলেছিল—"তুমি পারুল রায়ের সংগে মেশ কেন?"

"আমি গাইতে গিয়েছিলাম। মিশতে নয়।"

"পারুল তোমাকে পছন্দ করে।"

"ভালো কথা।"

"তুমি পারুলকে পছন্দ কর না?"

"শুধু শুধু একজনকে অপছন্দ করব কেন?"

"শুধু শুধু? বোঝ না, না? পারুলের মনে তোমার জন্য একটা সফ্‌ট্ কর্‌নার আছে।"

ঈর্ষার সর্পিল ফণা দুলতে দুলতে ছোবল দিয়েছিল। সেই বিষ-দংশনে ঈপ্সিত চারপাশ অন্ধকার দেখেছিল। আকাশটা ক্রমশঃ নীচু হয়ে আসছিল, বদ্ধ-বাতাসে শ্বাসকষ্টের মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিশ্বাস খুঁজছিল ঈপ্সিত। ঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটা একটি ঘর পার হয়েছিল রতি বাতাসের সন্ধান দিতে পারেনি। বরং বলে উঠেছিল, "তোমার ওকে অ্যাভয়েড করা উচিত।"

মাথার ওপর নেমে আসা আকাশটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার প্রবল প্রচেষ্টা করেছিল ঈপ্সিত। রতিকে দুই হাতের বেষ্টনীতে নিবিড় করে নিতে নিতে বলেছিল, "তুমি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ, পারুল আমাকে চায় না।"

"না, তুমি বল, প্রতিজ্ঞা কর আমাকে ছুঁয়ে, আর কখনও ওখানে যাবে না?"

"বাজে সন্দেহে ভালো টার্মস নষ্ট করবার কোনও অর্থ হয় না।" ক্রুদ্ধ হয়েছিল ঈপ্সিত। সন্দেহ জিনিষটাতেই প্রবল আপত্তি ঈপ্সিতের সহজ বোঝা-পড়া যেখানে হাতের মুঠোয়, সেখানে যে-কোনও লোককেই সন্দেহপ্রবণ হতে দেখলে অত্যন্ত মন খারাপ হত ঈপ্সিতের।

"সন্দেহ বলে ধরছ কেন?" রতি প্রশ্ন করে বসল।

"তাহলে ঈর্ষা ভাবতে হয়।"

"কিন্তু আমি বলছি, টার্মসের আওতায় যাবারই বা দরকার কি? আমি পছন্দ করছি না, সেটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?"

সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র সংহত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ঈপ্সিত। ওর দৃষ্টিতে তখন রতির মুখটা সন্দেহের কুটিল মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। রতি আবার বলেছিল, "পার না তুমি? এতটুকু পার না আমার জন্য? আর আমি তোমার জন্য কত স্যাকরিফাইস করেছি।"

রতির শূন্য অনামিকা নজরে পড়েছিল ঈপ্সিতের। আকাশটা একটুও উঁচু হয়নি, অজস্র হাওয়ায় ঈপ্সিত ভেসে যায়নি, শুধু মমির মত হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আচ্ছা যাব না।"

কিন্তু এই কি রতির শেষ জুলুম? থামতে পারেনি সে কোথাও। মনে পড়ল, অন্য একদিনের কথা!

"আমি চাই না যে আমার ফিউচার হাসব্যান্ড বাজে রেস্তোঁরায় আড্ডা জমায়।" সন্ধ্যার আলোয় উজ্জ্বল সেই ওদের রেস্তোরাঁ। রবি, সুকুমার, সত্যেন —সেখানকার বান্ধব-দল প্রথম পান-পাত্র তুলে দিয়েছিল ঈপ্সিতের হাতে। সিগারেটের অপর্যাপ্ত ধোঁয়া। সার্ত্রে, কামু, নিওরিয়ালিজম, সিনেমার খবর, আধুনিক কবিতা, লোন্‌লিনেস্, বোরডম, ফ্রাসট্রেশন, এসব ছুঁয়ে ছুঁয়েই গভীর চিন্তার জন্ম। সেখানকার আড্ডার গভীরতর চিন্তায় ঈপ্সিত জীবনকে ছুঁতে পেরেছে, স্বাধীন চিন্তার সীমারেখায় পৃথিবীকে বাঁধতে পেরেছে। অতীতের সংগে বর্তমানের সাঁকো তৈরী করেছে।

"আড্ডাই জীবনের নিশ্বাস", সত্যেন বলত। রতি তার অক্‌সিজেনটুকু কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

রতি কি জানত না শুধু তুমি আমি মিলে জীবন হয় না, সে ত জীবনের অপব্যয়। "ঘর একটা আমাদের চাই-ই; সারাদিনের ক্লান্তির আশ্রয়।" রাঙাকাকা বলতেন। "কিন্তু সে ঘর যদি শৃংখল হয়ে ওঠে, মানুষ শৃঙ্খল ভেঙে পালাবে।" রাঙাকাকার কন্ঠে গাম্ভীর্য ছিল। সাধারণ কথাবার্তাগুলোও তার কন্ঠে যেন সংলাপ হয়ে উঠত।

ঈপ্সিত বলেছিল সেদিন তার বন্ধুকে, "সত্যেন, রতিকে আমি ঠিক সেভাবে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রতি আমার মনের নীড় হবে। সারাদিনের ক্লান্তির শেষে ঘরের আকর্ষণ আমাকে ব্যস্ত করবে, সে-ঘরে বসে আমি আকাশ ছোঁব। কিন্তু পরিপূর্ণ নীড় হবার অনেক আগেই একটা একটা করে প্রতিটি দরজা বন্ধ করে দিল রতি।"

সেদিন সত্যেনকে সম্মুখে রেখে আত্ম-বিশ্লেষণে মেতেছিল ঈপ্সিত। বলেছিল, "রতি আমাকে অনেক দিয়েছে সত্যেন। ওর যৌবনের সান্নিধ্য আমি সম্রাট হয়েছি, কিন্তু প্রেম কি শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য দেবে? আমি চেয়েছিলাম রতির প্রেম মানসিক প্রশান্তি আনবে, সংকীর্ণ জীবনে গতি দেবে। এমন কোনও গভীর হৃদয়ে ডুব দিতে চেয়েছিলাম যে আমাকে মন দিয়ে অনুভব করবে। বুদ্ধি দিয়ে অনুশীলন করবে। কিন্তু রতি তার সন্দেহ, ঈর্ষা, একান্ত করে চাওয়া, সব মিলিয়ে ভালবাসার পংককুন্ডে গেঁথে ফেলল আমাকে। সেখানে নামতে নামতে ক্রমশঃ আমার ইচ্ছাগুলো মৃত, সূক্ষ্মতর অনুভূতি সুদূরে, এবং আমি চেতনাহীন জড়পদার্থে পরিণত হয়েছিলাম। তুমি বিশ্বাস কর সত্যেন, আই এম নাউ সারাকাম্‌সক্রাইবড্ বাই হার। ইন্ এভরি স্পেয়ার সি ট্রাইস টু ডমিনেট মি।"

হঠাৎ ফিরে এল ঈপ্সিত বর্তমানের চেতনায়। অস্পষ্ট এক শারীরিক যন্ত্রণায়

চমকিত হল সে। রতির সূতীক্ষ্ম নখরগুলি তার বাহুর ওপর চেপে বসছে, চামড়ার ওপর নখের সেই অদ্ভুত যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে শুনতে পেল রতি বলছে, "বাড়ীতে এখন আমি কি জবাব দেব? কি বলব? তোমার কি বিবেক বলে কোনও পদার্থ নেই?"

"মানে এ একটা ক্যালকুলেশন?"

"ঠিক জানি না, হয়ত তাই। কিন্তু এবার আমি পশ্চাদপসরণ করতে চাই সত্যেন।

"কি, বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে?

"হ্যাঁ।"

'সন্দেহ বলে ধরছ কেন?

সত্যেনও জানতে চেয়েছিল এই কথাই। প্রশ্ন করেছিল, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভালবাসা ব্যাপারটা শুধু হৃদয়ের এক্তিয়ারে নয়। মস্তিষ্কের সঙ্গেও তার যথেষ্ট যোগাযোগ দরকার।'

"নিশ্চয়ই।" ঈপ্সিত জোর দিয়ে বলেছিল।

"পারবে? চিন্তা করতে গিয়ে বিবেকে বাধবে না?"

"অমন হাত-ধরা পুরুষ হয়ে থাকতেই আমার বিবেকে বেশী বাধছে।" এই পেইনফুল কো-এক্সিসটেন্স সহ্য হচ্ছে না।" উত্তর দিয়েছিল ঈপ্সিত, "সত্যেন, রতি চায় সূর্যমুখী ভালবাসা। কিন্তু আমার হৃদয়ে শুধু রতিকে ঘিরেই আর্তি নেই। আমি নিজেকে পরিপূর্ণ সত্তায় বুঝতে চাই। সব ছেড়ে রতিকে চাইনি কখনো, সবকিছু জড়িয়ে ওকে কাঙ্খা করেছিলাম।"

"কিন্তু রতির ভবিষ্যৎ?" সত্যেনকেও অনেক ভাবতে হয়েছিল।

"যার ভেতরে ভালবাসার তীব্রতা একবার জেগেছে, সে দ্বিতীয় ভালবাসাতেও সাড়া দিতে পারবে।"

"যদি এমন হয় একবার ভালবেসেছে বলেই, হৃদয় তার দেউলিয়া হয়ে গেছে?"

"যদি তাও হয়, সি নিডস্ গাইডেন্স অল্সো। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এনগেজমেন্ট ব্রেক করে সে আমাকে গ্রহণ করেছিল, এক-একটা গাছ দেখেছ? লতা গাছ? যারা লতিয়ে বাঁচে? যে আশ্রয়েই তুলে আন না কেন, তারা বাঁচতে জানে।"

"রতির নখ তীক্ষ্মভাবে বিঁধে যাচ্ছিল এই মুহূর্তে ঈপ্সিতের বাহুতে। সে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, "বল, বল। বিবেকের ছিটেফোঁটাও কি নেই তোমার?"

"ধরে নাও আমার বিবেককে হত্যা করতেও আমি কুণ্ঠিত নই।" নিজের কানেই অদ্ভুত শোনাল কথাটা। বিবেক মৃত অর্থাৎ লম্পট, অর্থাৎ মনুষ্যত্বহীন। কিন্তু ঈপ্সিত ত লম্পট নয়। সে শুধু শুদ্ধ থাকতে চায় তার বিচারবুদ্ধির কাছে।

"শয়তান", দাঁতে দাঁত ঘষে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল রতি। তারপর আবার বলে উঠল, "না না না, শয়তানের ষড়যন্ত্রের শিকার আমি কিছুতেই হব না। মুক্তি অত সহজ নয়। আমি তোমাকে বাধ্য করব, ইউ আর বাউন্ড টু ম্যারি মি।"

নিষ্পলক দৃষ্টিতে রতিকে দেখল ঈপ্সিত। পঙ্গুমনে কোনও ভাবনা এল না। আলতো আঙুল বোলালে যেখানে অদ্ভুত শিহর জাগত সেই গ্রীবা দেখল। চিরকালের মত দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ঈপ্সিত। একটা বাঁকাহাসি বিদ্যুতের মত চকমকিয়ে মিলিয়ে যাবার আগে একপলক স্থির হয়ে রইল। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। বলল, "তাহলে সে চেষ্টাই করো। যেখানে স্বাধীনতা নেই, সেখানে প্রেমও থাকে না—শুধু অভ্যাসের বন্ধন। আমি নিজের সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে শুধু তোমারই চাহিদার দাবিগুলো মিটিয়ে মিটিয়ে সারাজীবন বেঁচে থাকতে পারব না। চলি।"

ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ঈপ্সিত রাস্তার দিকে। আর বৃহৎ প্রত্যাশার বৃহৎ ব্যর্থতায় বাজেপোড়া বিধ্বস্ত এক গাছের মত চারিদিকের অসীম শূন্যতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রতি।

সরকারী রেস্ট-হাউস। কর্মব্যপদেশে ত যা কখনও কখনও রাজ্য সরকারের া বিভাগীয় লোকের আনাগোনা ঘটে। র নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে রিক্রুটিং ফসারদের। পার্বত্য এলাকায় চাষ-বাদের অসুবিধায় জন্য ফৌজী জীবনের কটা আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু নিয়মের রা ছাড়াও রেস্ট-হাউসের ভিজিটর্স-বুকে মন মেলে আরেক আগন্তুক তালিকার। তে রয়েছেন একজন মার্কিনী রাষ্ট্রদূত। ছেন লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এ্যালবার্ট উজিয়মের জনৈক বিভাগীয় প্রধান। সগ্রাহী সিভিলিয়ান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ণ্ডিত-অধ্যাপক কজন রয়েছেন এদেশীয়। রকারী কাজ নয়, রসবেত্তার আগ্রহই াঁদের টেনেছে সুদূর কাংড়ার এই ভ্যান্তরে।

নিরালা নির্জন পরিবেশে সুজনপুরের স্টহাউস। পেছনে অনুচ্চ পাহাড়। সামনের রাট 'চৌখানে' আজ আর পোলো খেলা া অন্য কিছু হয় না, তবে শিবরাত্রিতে লা বসে। চৌখানের অপর দিকে সব ড়া ছাড়া বসতির পর ঢালু জমি গড়িয়ে চ্ছে খরস্রোতা বিয়াস বা বিপাশার বুকে। চু-নীচু ন্যাড়া জমি পেরিয়ে নদীর ওপারে র দিগবলয়ে নজরে আসে সমুন্নত পর্বত-র্ষ। তুষারমৌলী ধৌলধার বা ধবল রা। উপত্যকা কাংড়ার অতন্দ্র প্রহরী। ন্দেহ নেই, প্রকৃতির অজস্র শোভার সমৃদ্ধি ার ভৌগোলিক অবস্থানজনিত নিরাপত্তার রণে এখানে এক বিকাশ ঘটেছিল চিত্র-ল্পের—সুবিখ্যাত কাংড়া মিনিয়েচার বা চিত্রবল্লীর। অবশ্য রাজানুগ্রহের ব্যাপারও ল। বিগত দিনের সেই চিত্র ও চিত্রীর ৎপত্তিস্থলকে দেখা ও জানার উদ্দেশ্যে াই নানা রসিকজনের পদার্পণ ঘটে াংড়ায়—সুজনপুরে।

জাঁক-জমকের নীরব সাক্ষী আজকের জনপুর সন্নিহিত তীরা। কাংড়া চিত্রের কজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পরসিক হারাজা সংসারচাঁদের অন্যতম স্মৃতি-বিজড়িত তীরা-সুজনপুরের যুগল বসতি। কাংড়া কলমের যা কিছু সমৃদ্ধি ও সুনাম া সম্ভব হয়েছিল এই গুণী মহারাজারই ক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই দেখি পথিকৃৎ ল্পপণ্ডিত আনন্দ কুমারস্বামী থেকে শুরু রে হালফিলের সকলেই ভারতশিল্পের বিশিষ্ট অধ্যায় কাংড়া মিনিয়েচার প্রসঙ্গে মহারাজা সংসারচাঁদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন।

সমতল পঞ্জাবের গা-ঘেঁষা পার্বত্য উপত্যকা কাংড়া, বিশেষত রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতনে সমতলের বহুজনকে বহু
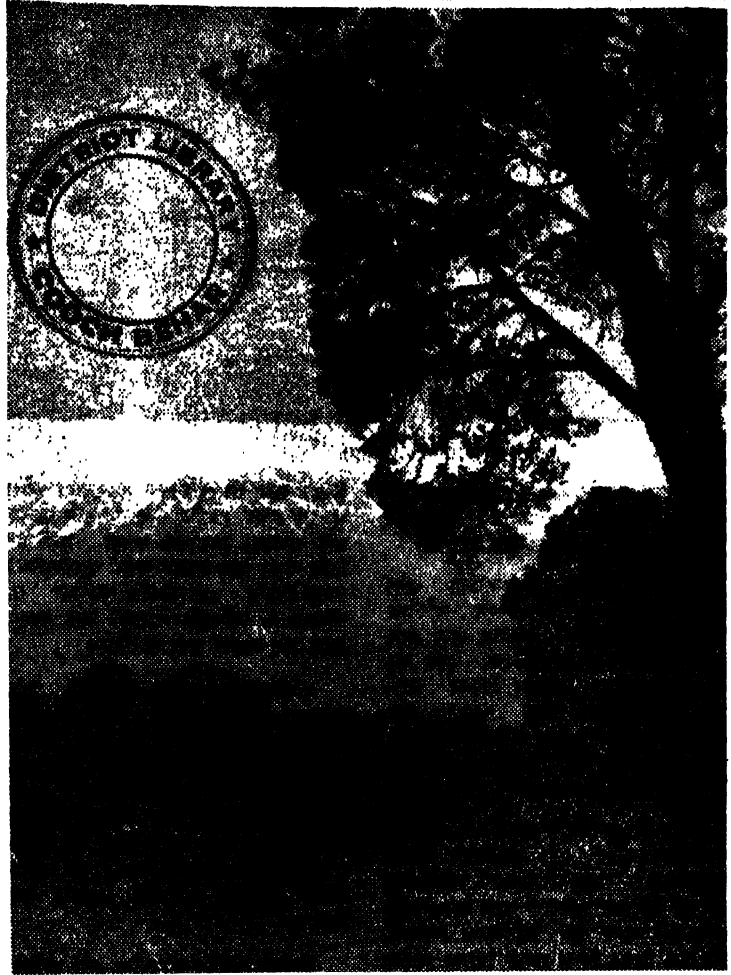
তুষারশীর্ষ ধৌলধারের দৃশ্য

অজিতকুমার দত্ত

সময়ে দিয়েছে আশ্রয়। মুঘল আমলের শেষ দশায় নাদির শাহের আক্রমণের পর কেন্দ্র-শক্তি তখন দুর্বল। দিল্লী আর কাছাকাছি সীমিত এলাকাতেই কেবল যা মুঘল আধিপত্য। দেশের অভ্যন্তরে চলছে ক্ষমতার লড়াই আর আপন আপন অধিকার বিস্তারের চেষ্টা। রাজনৈতিক এই বিপর্যয়ের কালে সমতলের অনেকেই পাহাড়ী দেশে চলে আসেন এবং নতুন উদ্যমে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে চেষ্টিত হন। এভাবে বহু ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে পার্বত্য প্রদেশে। নিজেরাই কেবল তারা রাজত্ব কায়েম করে বসেননি, আশ্রয়ও দিয়েছেন অনেককে। বহু শিল্পীও ছিলেন এসব শরণার্থীর মধ্যে। দিল্লী-পঞ্জাবের সঙ্গে একরকম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, নিজেদের জন্মগত রুচি ও চেতনা, নিসর্গ শোভা ও ভৌগোলিক নিরাপত্তা—সব মিলিয়ে সহজেই নতুন করে শিল্প-সৃষ্টির একটা আবহাওয়া ও ধারা রূপ নিল। তাই মুঘল আমলের দরবারী

দরবারকক্ষ-বারদারী (তীরা)

নর্মদেশ্বর মন্দির (সুজনপুর)

হাওয়া একরকম স্তিমিত হয়ে এলেও নতুন আরেক পরিবেশে ও মেজাজে পাহাড়ী শৈলীর দানা বেঁধে উঠতে দেরী হয়নি।

প্রধানত যাঁদের অনুকূল্যে এবং আগ্রহাতিশয্যে একটি স্বল্প পরিচিত আঞ্চলিক চিত্ররীতির অভ্যুদয় এবং ক্রমে সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হল, সেই সব পার্বত্য-প্রধানদেরই একজন ছিলেন মহারাজা সংসারচাঁদ। কিন্তু শুরুতে আর পাঁচজনের মতো হলেও, পরবর্তী জীবনের কর্মে ও পরিচয়ে তিনি যথেষ্ট স্বতন্ত্র বলে উপগণিত হতে পেরেছিলেন।

এই রাজপুত রাজার রাজত্বকাল (১৭৭৫-১৮২৩ খৃঃ) একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতামহ ঘমন্দচাঁদই রাজত্বের বুনিয়াদ পাকা করে যান। শক্তি বিস্তারের সঙ্গে শহর অট্টালিকার পত্তনেও তাঁর মন ছিল। কিন্তু পৌত্র ছিলেন আরও উচ্চাভিলাষী। পিতা অল্পবয়সে মারা যাওয়ায় বছর দশেক বয়েসে মহারাজা সংসারচাঁদ সিংহাসনারোহণ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই নিজের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। আশেপাশের রাজাদের পরাজিত করে অল্পকালের ভেতরই কাংড়ার অধামণি হয়ে বসলেন তিনি। ক্রমে দৃষ্টি গেল আরও দূরে সমতলের দিকে। তখন শিখশক্তির জাগরণের কাল। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ শিখ মিছল একত্রিত করছেন। এদিকে প্রতিবেশী রাজারা একজোট হয়ে গুর্খাদের আহ্বান করায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহারাজা সংসারচাঁদকে লাহোরের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। এই সখ্য বা যোগাযোগ নানাকারণে ফলপ্রসূ হয়নি এবং কাংড়া অধিপতির রাজত্বকালের পরবর্তী ইতিহাস হতাশা ও ব্যর্থতারই কাহিনী। পঞ্জাব বা সমভূমিতে অধিকার বিস্তার তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি, 'পাহাড়-বাদশা' পরিচয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু মহারাজা সংসারচাঁদ কেবল উচ্চাভিলাষ নয়, অন্যভাবেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি শিল্পকে, সুন্দরকে ভালবেসেছিলেন। স্থাপত্যে প্রেরণা জুগিয়েছেন তীরায়। আলমপুরে উদ্যান রচনা ও পরিবর্ধন করেছেন। কৃটির ও হস্তকলার সমৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটেছে তাঁর আমলে। সর্বোপরি কাংড়া চিত্রকলায় তিনি নতুন প্রাণ-সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন। কাংড়া-শৈলীর এত উন্নতি ঘটেছিল যে পরিচয়ে ও বৈশিষ্ট্যে পাহাড়ী আর কাংড়া কলম প্রায় সমার্থ হয়ে উঠেছিল।

তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী তাঁর দরবারেও শিল্পীদল ছিল। হয়ত প্রথমতই পিতামহের অনুসরণে সুজনপুরের সংলগ্ন তীরায় প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল। দূরাগত শিল্পী ও কারিগরদের কাজে নিয়োগের ব্যাপারেও এক হিসেবে প্রচলিত নিয়মেরই অনুসরণ ছিল। কিন্তু সব কিছুর পেছনেই বিশেষভাবে যা ছিল, সেটা মহারাজার ব্যক্তিগত রুচিবোধ, প্রেরণা এবং উৎসাহ।

ইংরেজ পর্যটক মুরক্রুফট এবং তারিখ-ই-পঞ্জাব-এ ঐতিহাসিক গোলাম মহীউদ্দিন মহারাজা সংসারচাঁদ ও তাঁর রাজত্বকালীন নানা ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষত প্রথমজন দৈনন্দিন কার্যাবলী ও মহারাজা সম্পর্কে তথ্যপ্রদান প্রসঙ্গে চিত্রশিল্পীদের কাজের উল্লেখ করেছেন। কেবল নিসর্গ-চিত্রই নয়, প্রতিকৃতি-অংকনেও শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া হত। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি অবলম্বনে শিল্পীরা সব ছবি আঁকতেন। নিয়ম করে মহারাজা সপারিষদ সেগুলো নিরীক্ষণ করতেন। ছবি আঁকার ধরণে বেশ বোঝা যায় যে সেগুলো অনেকখানি পরম্পরাগত, নিছক দেশজ নয়। অর্থাৎ শিল্পীদের অনেকেই ছিলেন দরবারীরীতির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু জনৈক কুশল বা কৌশলের নাম ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি।

ইতিহাসের তথ্যপঞ্জীতে নাদায়ুন ও কাংড়ার দুর্গ অন্যভাবে সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সৌন্দর্যরসিক সংসারচাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল তীরা-সুজনপুর ও নদীর অপর তীরবর্তী আলমপুর অঞ্চল। সে কর্মকাণ্ডের কিছু ধ্বংসাবশেষ এ দন্ডায়মান।

এককালের বর্ধিষ্ণু ঘমন্দ-চাঁদ ... ষ্ঠিত সুজনপুর এখন অপেক্ষাকৃত ... বসতি। পুরানো কীর্তির ভেতর স... চাঁদের আমলের বাঁশরীওয়ালার এবং ... এক মহিষী-প্রতিষ্ঠিত নর্বদেশ্বর (... দেশ্বর) শিবের মন্দির উল্লেখ... শেষোক্ত মন্দির-দেওয়ালে চিত্তাকর্ষক ... বলী এখনও অনেকটা সুরক্ষিত অ... বিদ্যমান। অধিকাংশই শিব-কৃষ্ণ ই... দেবদেবী বিষয়ক আর কিছু ... রাজকীয় কীর্তি-কাহিনী অবলম্বনে। ... সুন্দর প্যানেল রয়েছে রামায়ণের সে... বিষয়ে। খিলানের গায়ে দেখা যায় ... ভিন্নতর নমুনার ছবি; বিষয় পতন বা হিমালয়বাসী শিব হলেও রচনারী... এগুলো ভিন্নগোত্রের। মন্দির-দেয়াল... এ ছবিগুলি নিঃসন্দেহে শিল্পোৎসাহ সমৃদ্ধির আরেক পরিচয়।

সুজনপুরের সীমা ঘিরে এক ... পাহাড়। সেখানেই সংসারচাঁদ নতুন ... ও বসতির পত্তন করেন—তীরায়। কটি ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্নস্তূপ ছাড়া নেই, ভাঙা দেউড়ি অলিন্দের কিছু ছাড়া আর দাঁড়িয়ে আছে প্রশস্ত ... কক্ষ—বারদারী। আর রয়েছে এক মন্দির। সংসারচাঁদের অনুকৃতি ... দেহানুরূপ শিব এখানে সংসারচাঁ... নামেই পরিচিত।

আজ সব নীরব হয়ে গেছে। স... চড়াইয়ে অশ্বক্ষুরধ্বনি আর শোনা যা... প্রাসাদ-অলিন্দ জনহীন। দরবার-প্র... রোশনাই আর নূপুর-নিক্কন নেই। রয়েছে পাখীর কাকলি। শোভাময়ী ঋতুচক্রের আবর্তনে নব নব সজ্জায় ওঠে এখনও। আর রয়েছে অমর কাব্যমণ্ডিত সুষমা। কাংড়া-চিত্র ... থাকবে, মহারাজা সংসারচাঁদের ততদিন সাদরে উচ্চারিত এবং উ... নিশ্চয়ই হবে।

আলোচনাঃ

শ্রীরামপ্রসাদ ও তাঁর উত্তরাধিকার

ত্রিপুরাশংকর সেন

বাংলার অধ্যাত্ম সাধনা বিচিত্র ধারায় বাহিত হলেও, উহা মূলত তান্ত্রিক সাধনা। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনাও দেশভেদে, কালভেদে, অধিকারভেদে এবং সাধকের রুচি ও প্রবৃত্তি ভেদে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। শাক্ততন্ত্র, বৈষ্ণবীয়তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, কাশ্মীরী শৈবতন্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে অপরিসীম মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছে। শক্তিসাধনার পাদপীঠ এই বাংলায় বহু শক্তিসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সব শক্তিসাধকদের মধ্যে শ্রীরামপ্রসাদ নানা কারণেই বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। অবশ্য, কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা রামপ্রসাদকে সাধারণ বাঙালী চেনে না, কিন্তু যে রামপ্রসাদ আগমনী ও বিজয়ার গানের স্রষ্টা এবং অজস্র শ্যামাসঙ্গীতের রচয়িতা, সে-রামপ্রসাদ সমগ্র বাঙালীর জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। রামপ্রসাদের পদাবলী বাঙালীর জীবনকে যেমন স্নেহ-রসে সিক্ত করেছে, তেমনি তাকে শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, বিপদে অভয় দিয়েছে, এমনকি, মাতৃপদ আশ্রয় করে কালভয়কে অতিক্রম করতেও শিক্ষা দিয়েছে। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা', সেই দেবীকে তিনি আমাদের ঘরের স্নেহময়ী কন্যা ও করুণাময়ী জননীরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। জগদম্বা যে রামপ্রসাদের কন্যা-রূপ ধারণ করে তাঁর বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন, এ উল্লেখ তো তাঁর গানেই রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে ভারতচন্দ্র ও শ্রীরামপ্রসাদের দানের কথা স্মরণ করেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'অবনতাবস্থায়ও বঙ্গভূমি রত্নপ্রসবিনী।' কিন্তু শ্রীরামপ্রসাদ সম্পর্কে এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, তাঁর রচনাবলীকে, বিশেষতঃ তাঁর রচিত শাক্ত পদাবলীকে তাঁর সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামপ্রসাদের জীবনী সংকলন করে সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, রামপ্রসাদকে তিনি অদ্বিতীয় মহাকবি ও মহাত্মার মর্যাদা দিয়েছেন, রামপ্রসাদের পদসমূহকে রত্নাকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, রামপ্রসাদের রচনাবলী ও চিন্তাধারার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, এসকল কথাই সত্য, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর রামপ্রসাদের প্রভাব অনেকখানিই বহিরঙ্গ, বিশেষত, উভয়ের ধর্মবোধের মধ্যে সাদৃশ্য যতখানি, পার্থক্য তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। একদিন মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে লিখেছিলেন—'ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরের প্রতি পিতৃভাব ও রামপ্রসাদের জগন্মাতার প্রতি মাতৃভাবে বিশেষ পার্থক্য নাই।' এই উক্তির মধ্যে বাল্যজীবনের সাহিত্যগুরুর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধার আতিশয্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সমালোচনার কষ্টিপাথরে উক্তিটি সত্য বলে মনে হয় না। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'অমৃত' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় (৩০শে ভাদ্র, ৬ই আশ্বিন ও ১৩ই আশ্বিন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ) কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে যে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে এই কথা তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, শ্রীরামপ্রসাদ ছিলেন যুগের অগ্রগামী আর ঈশ্বরচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ধর্মভাব ছিল মূলত অভিন্ন। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে প্রবোধবাবুর অনেক উক্তিই শুধু যে গ্রহণ-যোগ্য নয়, তাই নয়, অনেকাংশে বিভ্রান্তি-কর। তাই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রবোধবাবু রামপ্রসাদ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের যে দীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, প্রথমত সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন—

'নিরাকারবাদীরা ব্রহ্ম শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার উপাসনা করেন, ইনি (রামপ্রসাদ) কালীনাম উচ্চারণকরত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন।

'যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশ উচ্চারণ করিতেন, ফলত তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশকালপাত্র বিবেচনানুসারে বাক্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন তিনি জগদীশ্বরের নিকটে দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ, জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক, সকলিই তাঁহারই উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত কর্মের হানি হয় না।'

ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি উদ্ধৃত করে প্রবোধবাবু বলেছেন—প্রতি পদেই তিনি (ঈশ্বর গুপ্ত) রামপ্রসাদের গান উদ্ধৃত করে নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি থেকে এ-কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি শ্রীরামপ্রসাদের সাধনার মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারেননি। যে রামপ্রসাদকে বাঙালী একজন সিদ্ধপুরুষ বলে গণ্য করেন, সেই রামপ্রসাদ নিরাকারবাদী হয়েও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে প্রচলিত ধর্মানুযায়ী উপাসনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এরূপ মন্তব্য যিনি করেছেন, তিনি সেই সাধকশ্রেষ্ঠের প্রতি চরম অবিচার করেছেন। বাস্তবিক শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করতেন, এ-কথা মোটেই সত্যি নয়। রামপ্রসাদ কপটাচারী ছিলেন, এ-কথা ঈশ্বর গুপ্তের মনঃকল্পিত এবং তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

ভারতীয় সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অধিকারবাদ, রাজা রামমোহনও এই অধিকারবাদের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্র এই অধিকারবাদকে স্বীকৃতি দান করে দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাবে সাধনার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তন্ত্রে গুণভেদে প্রকৃতি-ভেদের কথা আছে, ক্রমদীক্ষার নির্দেশ আছে, বহিঃপূজাকে আশ্রয় করে সাধক কিভাবে মানসপূজা বা অন্তর্যাগের অধিকারী হতে পারেন, তারও বিশদ উপদেশ আছে, ভোগের ভেতর দিয়েও মানুষ যে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে, সে-আশার বাণীও তন্ত্রই আমাদের শুনিয়েছেন। তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অথবা ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে—

'উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা'॥

ব্রহ্মসদ্ভাব অর্থাৎ সর্বভূতে ব্রহ্মের অনুভূতিটি উত্তম ভাব, ব্রহ্মের ধ্যান হচ্ছে মধ্যম ভাব, তাঁর স্তুতি ও জপ হচ্ছে অধম ভাব আর বহিঃপূজা হচ্ছে অধমের চেয়েও অধম।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বহিঃপূজা নিন্দনীয় নয়, তন্ত্রকারের উক্তির তাৎপর্য শুধু এই যে, বহিঃপূজা সাধনার প্রথম সোপান। শ্রীরামপ্রসাদ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত যেসব শাক্তসাধকদের কথা আমরা জানতে পারি, তাঁরা কেউ বহিঃপূজাকে বর্জন করেননি। আমরা অবশ্য এ-কথা স্বীকার করি না যে, বহিঃপূজার আশ্রয় গ্রহণ না করে কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন না। আমরা শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, শ্রীরামপ্রসাদ বহিঃপূজাকে অবলম্বন করেই অন্তর্যাগ বা মানসপূজার অধিকারী হয়েছিলেন। আবার এ-কথাও আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেই যে বহিঃপূজাকে ত্যাগ করবেন, এমন কোনো কথা নেই। মহানির্বাণ তন্ত্রে আরও বলা হয়েছে—

'বালক্রীড়নবৎ সর্বং নামরূপাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ'॥

রূপ ও নামাদির কল্পনা বালকের ক্রীড়ার মতো, যিনি বালক্রীড়া ত্যাগ করে ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনি যে মুক্ত হন, এ-বিষয়ে সংশয় নাই।

'মনসা কল্পিতা মূর্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা'॥

যদি মনঃকল্পিত মূর্তি মানুষের মোক্ষ সাধন করে, তাহলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারাও লোকে রাজা হতে পারতো।

'মৃচ্ছিলাধাতুদার্বাদিমূর্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা জ্ঞানং বিনা
মোক্ষং না যান্তি তে'॥

মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও দারু (কাষ্ঠ) প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত মূর্তিতে যাঁরা ঈশ্বরবুদ্ধি করেন, তাঁরা বৃথা ক্লেশ পেয়ে থাকেন, কারণ, তাঁরা জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভ করতে পারেন না।

মহানির্বাণ তন্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, আগমোক্ত বিধানে উপাসনার দ্বারাই সাধক একদিন সেই অবস্থা লাভ করেন। শ্রীরামপ্রসাদ মূর্তিপূজার মধ্য দিয়েই একদিন দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ বিশেষ গানের ভেতর দিয়ে বিশেষ বিশেষ অনুভূতিই প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাঁকে সাকারবাদী বা নিরাকারবাদী কিছুই বলা চলে না। মূর্তিপূজার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল, এমন কথা যিনি বলেছেন, সেই ঈশ্বর গুপ্তের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করা চলে না।

রাজা রামমোহন বলেন, আমাদের শাস্ত্রে মূর্তিপূজা নিম্নাধিকারীর জন্যে বিহিত। নানা শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধৃত করে রাজা রামমোহন তাঁর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, প্রতীকোপাসনা ভিন্ন কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন না, এ-কথা যেমন আমরা স্বীকার করি না, তেমনি যাঁরা মূর্তিপূজা করেছেন, তাঁরা সকলেই নিম্নাধিকারী ছিলেন, এ-কথাও আমরা স্বীকার করি না। শ্রীরামপ্রসাদ বা শ্রীরামকৃষ্ণকে নিম্নাধিকারী বলা ধৃষ্টতারই পরিচায়ক। আর এ-কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যাঁরা বাহ্যপূজা করেন, তাঁদের প্রতিও তন্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' অর্থাৎ দেবতা হয়েই দেবতার আরাধনা করবে। এইজন্যেই তন্ত্রশাস্ত্রে ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি প্রভৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ বলবেন, মানুষের দেহ ও মনের ওপর ভাবনা বা auto-suggestion-এর শক্তি কত বিপুল, তান্ত্রিক সাধকেরা তা বিশেষভাবে জানতেন। কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে—

'বিশ্বাসায় নমস্তস্মৈ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে।
যেন মৃদ্দারুদৃশদঃ ফলন্ত্যাশ্বফলং ফলং'॥

সেই সর্বসিদ্ধিদানকারী বিশ্বাসকে নমস্কার যার শক্তিতে মৃত্তিকা, দারু পাষাণও অবিফল ফল প্রদান করে। তন্ত্রশাস্ত্র এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, সাধকের বিশ্বাস এমন প্রচণ্ড হতে পারে, যার ফলে প্রতিমার ভেতর চৈতন্যময়ী দেবী আবির্ভূত হতে পারেন এবং সাধককে সিদ্ধিদান করতে পারেন।

এমন সাধক কি নিম্নাধিকারী? শ্রীরামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ তো এই শ্রেণীর সাধকই ছিলেন।

শ্রীরামপ্রসাদ আগমোক্ত বিধানে দেবীর আরাধনা করেছেন। তাঁর অনেক গানে আমরা তন্ত্রশাস্ত্রের বহু উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। শ্রীরামপ্রসাদ গেয়েছেন—

'কে জানে রে কালী কেমন
যার ষড়্দর্শনে না পায় দরশন'।

কুলার্ণব তন্ত্রেও উক্ত হয়েছে—

'ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতা পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ'॥

প্রিয়ে, পশুপাশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মূঢ়গণ ষড়্দর্শনরূপ মহাকূপে পতিত হয়ে পরমার্থ কি, তা জানতে পারে না।

শ্রীরামপ্রসাদ গেয়েছেন—

'মনরে কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা'।

রামপ্রসাদের প্রকাশ-ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব, কিন্তু 'এমন মানব-জমিন' কথাটির ভেতর এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানব-জন্ম সুদুর্লভ। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র এবং বিশেষভাবে তন্ত্রশাস্ত্র আমাদিগকে পুনঃপুনঃ এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ-বিষয়ে বিশ্বসার তন্ত্র, রুদ্রযামল তন্ত্র, নির্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি থেকে বচন উদ্ধৃত করা যায়। বিশ্বসার তন্ত্রে বলা হয়েছে—

'মনুষ্যেসদৃশং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে।
দেবতাঃ পিতরঃ সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম মানুষং॥
দুর্লভো মানুষো দেহঃ সর্ব্বদেহেষু সর্ব্বদা।
তস্মাচ্চ মানুষং জন্ম এতদুক্তং সুদুর্লভং'॥

মনুষ্যজন্মের মতো জন্ম কোথাও নেই, দেবতা ও পিতৃগণও মনুষ্যজন্মের বাঞ্ছা করেন, সকল দেহের মধ্যে মানুষদেহই দুর্লভ, এইজন্যেই বলা হয়েছে, মানুষ-দেহ সুদুর্লভ।

শ্রীরামপ্রসাদের 'শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান' গানটি তান্ত্রিক সাধকের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়—

'প্রাতরুত্থায় সায়ং বা সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্'॥

শ্রীরামপ্রসাদ জগদম্বার আরাধনা করতে করতে এক অপূর্ব অনুভূতি লাভ করে একদিন গেয়েছিলেন—

'মন! তোমার এই ভ্রম গেল না—
কালী কেমন তা চেয়ে দেখলে না।
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও
কি মন! তা জান না?
তুমি মাটির মূর্তি গড়িয়ে তাঁরে
করতে চাওরে উপাসনা।।
ত্রিজগৎ সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত
রত্ন সোনা।
তুমি সেই মাকে সাজাতে চাওরে
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত
খাদ্য নানা।
তুমি কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয়
আলোচাল আর বুট ভিজানা'।।

তন্ত্রশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলছেন—একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মানুষের মুক্তি হয়ে থাকে, আর তন্ত্রোক্ত বিধানে সাধনার দ্বারাই সাধক উপলব্ধি করেন যে, যাঁকে তিনি মৃন্ময়ীরূপে উপাসনা করেন, তিনি চৈতন্যময়ী, তিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী। এ-অনুভূতি যে শক্তিসাধক সাধনার একটি বিশেষ স্তরে লাভ করে থাকেন, সে-কথা তন্ত্রশাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবেই উক্ত হয়েছে। সুতরাং শ্রীরামপ্রসাদ যেযুগের অগ্রগামী ছিলেন, প্রবোধবাবুর এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা চলে না।

শ্রীরামপ্রসাদের রচিত উপরি-উদ্ধৃত গানটির সঙ্গে রাজা রামমোহনের রচিত একটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতের তুলনা করুন

'মন! এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার?
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহা গচ্ছ বল তাঁরে
তুমি বা কে আন কাকে, এ কি চমৎকার
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক[র]
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে, এ কি আবিচার
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য স[ব]
তাঁরে দিয়া কর স্তব এ বিশ্ব যাহার'

সাধক দিগম্বর ভট্টাচার্য কিন্তু এ[ই] গানটির পাল্টা গেয়েছেন।

'ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জনে ক্ষতি কিবা কার
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ [যায়]
বলি বায়ু আয় আয় জীবনসঞ্চার
জগন্মাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর [হই]
বলি এস ব্রহ্মময়ি! কর গো নিস্তার।
জড় জীব জড় করি, যাঁহার সাধনা ক[রি]
ধ্যান জ্ঞান জল ফল সকলি ত তাঁর'।

রামমোহনের অনুভূতির ন্যায় এও [এক] বিশিষ্ট অনুভূতি। কিন্তু এ-অনুভূতি নিম্নাধিকারীর অনুভূতি বলে আ[মরা] কিছুতেই স্বীকার কোর্বো না।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ওপর র[াম]প্রসাদের প্রভাব আমরা অস্বীকার করি[না]। প্রবোধবাবু লিখেছেন—'রামপ্রসাদের রচ[নার] যে-গুণ ও যে-বৈশিষ্ট্য, অনেক পরি[মাণে] ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষায়ও সেই গুণ [ও সেই] বৈশিষ্ট্য'। কিন্তু এই প্রভাবকে স্বী[কার] করেও আমরা বলতে চাই—এ[ছাড়াও] ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মসাধনায় রামপ্রসাদের [ও] আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব যে অধিক আমরা সে-কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা কর[ব]। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'ঈশ্বর গুপ্ত [শেষ] সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ[ে যাইতেন] ছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার [সভ্য] ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত [হইয়া] বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন।' বস্ত[ুতঃ] পক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধ[ারার] দ্বারা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং [নর]পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর প্রভাবিত [হইয়া] ছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের চিন্ত[া] বা সাধনার যথার্থ উত্তরাধিকারী [নন]। রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন গো[পাল] চৌধুরী প্রভৃতি শক্তিসাধকগণ। গো[পাল] চৌধুরীও বাহ্যপূজাকে অবলম্বন ক[রে] দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তি[নি] গেয়েছেন—

'দশভুজা দেখে মায়ের
ভেবেছে রূপের শেষ,
অন্তরে দেখিলে আবার
দেখিবে অনন্ত বেশ,
অনন্ত প্রেমলোলুপা
কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
কদচিদাকাশ কদাচিৎ প্রকাশ
অনন্ত জগদাকারে।

ধরে রে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শোনে কথা রে।
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে
দুর্গাপুরে এসেছে,
কাল দেখবে রাধারূপে
শ্যামের বামে বসেছে,
তাই বলি এই কায়া
কিছু নয় শুধু মায়া
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো
লুকায় আবার ওংকারে।'

গোবিন্দ চৌধুরীর আর একটি গান 'মাকে কে সং সাজালে বল তা শুনি' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেম ভেদ বড় অল্প।'

এই 'অল্প ভেদ' কোথায় এবং তার কারণই বা কি, বঙ্কিমচন্দ্র তার বিশ্লেষণ করেন নি।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রামপ্রসাদের গানে এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় নেই। এ বিষয়ে আমি 'ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে' 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলা কাব্যের যুগসন্ধি' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি ঈশ্বর গুপ্তের একটি কবিতার কিয়দংশ ও রামপ্রসাদের একটি গানের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছি। 'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন—

'কাতর কিংকর আমি তোমার সন্তান
আমার জনক তুমি সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কান॥
সর্ব্ব দিকে সর্ব্ব লোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব প্রবেশ না হয়॥
হায় হায়! কব কায় ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কালা'॥

রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

'মা মা বলে আর ডাকব না,
তারা দিয়েছিস দিতেছিস কতই যন্ত্রণা,
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছিস চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মাতা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে
মা বেঁচে তাহার কি ফল বলনা।
আমি ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব
ভিক্ষা মেগে খাব
মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না'॥

এই দুটি রচনার তুলনা করে আমি লিখেছিলাম—ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাটিতে অভিমানের সুর আছে বটে কিন্তু সে অভিমান আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে না।

রামপ্রসাদের গানে যে তীব্র ও মর্ম-স্পর্শী আকুলতা আছে, বিশ্বজননীর সঙ্গে যে তদাত্মতাবোধের নিদর্শন আছে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তা নাই। বাস্তবিক, ঈশ্বর গুপ্তের অভিমান জগৎ-পিতার নিকট কাতর কিংকরের অভিমান আর রামপ্রসাদের অভিমান পাগলী মায়ের কাছে দামাল ছেলের অভিমান। রামপ্রসাদ যে ভাষায় মায়ের কাছে আবদার করেছেন, যে ভাষায় অভিমান প্রকাশ করেছেন বা মাকে ভর্ৎসনা করেছেন, সমগ্র শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে তার তুলনা নাই। আমরা দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(১) সংসারে আনিয়ে মাগো
করলি আমায় লোহাপেটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি
সাবাস আমার বুকের পাটা,
• • •
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে
শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের বেটা
এবে মায়ে পোয়ে এমন ব্যাভার
ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা।

(২) আমি নই মা আটাশে ছেলে,
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে।

(৩) দূরে হয়ে যা যমের ভটা,
আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা,
বল গে যা তোর যমরাজারে
আমার মতন নেছে কটা,
আমি যমের যম হতে পারি
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা।

প্রবোধবাবু লিখেছেন—'ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দেখা বোধহয় রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তনের ফল।' আমরা যতদূর জানি, ব্রাহ্মসমাজে পিতৃভাবে ভগবানের উপাসনার প্রবর্তন করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহন নয়। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অবলম্বন ছিল বৈদিক মন্ত্র যদিও খৃষ্টধর্মেই পিতৃভাবে প্রধানতঃ ভগবানের উপাসনা বিহিত হয়েছে। বৈদিক ঋষি বলেছেন—

'ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নোঽবোধি
ওঁ নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ'।

কবি বামদেব-রচিত একটি বৈদিক স্তোত্র হচ্ছে—

'কুতো নো বোধি দদৃশান আপিরভিখ্যাতা
মর্ডিতা সোমন্যাং।
সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃতমঃ পিতৃণাং
কর্ত্তেমু লোকমুশতে বয়োধঃ'॥

ডাঃ মতিলাল দাশ এই স্তোত্রটির অনুবাদ করেছেন—

'তুমি আমাদের প্রেমময় পরিত্রাতা হও, সমস্ত দুঃখ থেকে, সকল অমঙ্গল থেকে তুমি আমাদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার অজস্র আলোক ধারার মত আসছে আমাদের দিকে। তুমি যে পরম করুণাময়, তুমি আমাদের পরিপালক পিতা—পিতার চেয়েও নিকটতম আত্মীয়, তুমি পিতৃতম—তুমি আমাদের আপন হও—আমাদের দাও বিস্তৃত লোক, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিধি হোক অসীম ও অনন্ত—দাও আমাদেরে ওজস্বিতা, দাও আমাদের বীর্যসুন্দর সামর্থ্য। *

* প্রণব, ভাদ্র, ১৩৭৩।

অবশ্য পিতৃভাবে ভগবদুপাসনা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনের পর অর্জুন তাঁর স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন—'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য' অর্থাৎ চরাচর জগতের তুমি পিতা। শৈব সাধকগণও বলে থাকেন, 'মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ'। মহাকবি কালিদাসও 'রঘুবংশের' প্রারম্ভেই জগৎ-পিতা ও জগন্মাতার বন্দনা করেছেন।

তথাপি একথা সত্য যে, বাংলার অধ্যাত্ম চিন্তায় পিতৃভাবে ভগবদুপাসনার বিশেষ কোন স্থান নাই। বৈষ্ণবের কান্তভাবে ভগবানের উপাসনা ও শাক্ত সাধকের মাতৃভাবাসক্তি—এই দুটিই হচ্ছে বাঙ্গালীর রস-সাধনার প্রধান ধারা। সেকালের বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনেও পিতার সঙ্গে সন্তানের কেমন যেন একটা ব্যবধান ছিল কিন্তু মাতার সঙ্গে সন্তানের যে তাদাত্ম্য-বোধ, যে স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্কটি ছিল, তার তুলনা নাই। আবার শাক্ত সাধকগণের মধ্যে রামপ্রসাদের মাতৃভাবাসক্তি যা অভিমান, আবদার, ভর্ৎসনা, গঞ্জনা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা অতুলনীয়। সুতরাং 'রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প,' বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু, মনে হয়, শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট বিচার না করে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। আবার তান্ত্রিক সাধনা থেকে রামপ্রসাদকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফলেই তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, রামপ্রসাদ যুগের অগ্রগামী ছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'ঈশ্বর গুপ্ত বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যহেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিকে আমরা শুধু গুরুপ্রশস্তি হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি। আমরা সাধারণত বেদান্ত বলতে শংকর-প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদকেই গ্রহণ করে থাকি। রাজা রামমোহন তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যানে অনেকটা পরিমাণে ভগবান ভাষ্যকারের (আচার্য শংকরের) অনুবর্তন করেছেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্মকে একদিন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন, সে বেদান্ত হচ্ছে উপনিষদ, শংকর-প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদকে তিনি কোন দিন গ্রহণ করেন নি। অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের ধারণা কোন দিনই স্পষ্ট ছিল না। এ জন্যেই তিনি 'নির্গুণ ঈশ্বরের' মত

দুটি পরস্পরবিরোধী কথায় প্রয়োগ করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা নির্গুণ ব্রহ্মকে বলি The Absolute of Philosophy, আর সগুণ ব্রহ্মকে বলি Personal God. The God of Religion নির্গুণ ব্রহ্মকে দূরে থেকে নমস্কার করা চলে (নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়) কিন্তু পিতৃভাবে তাঁর উপাসনা করা চলে না।

অদ্বৈত বেদান্তের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেও গুপ্ত কবির গভীর অনুপ্রবেশ ছিল না। তাই রামপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের মতবাদের আলোকে এই সাধক কবির বিচার করেছেন, এখানেই গুপ্ত কবি ভ্রমে পতিত হয়েছেন। আবার আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন যখন বলেছেন—

'রামপ্রসাদের ধর্মভূমিকার স্বরূপ ও ভূমিকা প্রথম অনুভব করেন ঈশ্বরচন্দ্র। বস্তুতঃ ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে তিনি রামপ্রসাদেরই অনুবর্তী'।

তখন রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়ের সম্পর্কেই তিনি বিচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন—'রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শ মূলতঃ অভিন্ন। উভয়ের ধর্মভাবনাই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর উভয়েই সে বিদ্যাকে নিছক তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আগ্রহী। এটাই হল আধুনিক ভারতের ধর্মসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদিক বিচার করলেও বোঝা যাবে যে, রামপ্রসাদই আপন কালের অগ্রবর্তী, ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তা বলা যায় না। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মভাবনায় যে মূলগত ঐক্য লক্ষিত হয়, তা নিতান্তই একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়।'

আমরা বলছি, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শের মধ্যে আপাত সাদৃশ্যের অন্তরালে একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য আমরা প্রদর্শন করেছি। প্রবোধবাবু বলেন উভয়ের ধর্মভাবনায় ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যায় ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা' কথাটি খুব স্পষ্ট নয়। সকলেই জানেন, আচার্য শংকর সেই সব উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন যেগুলি শ্রুতির মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে সেই সকল আলোচনাও স্ববিরোধী। যেমন ব্রহ্মকে কোথাও নির্গুণ বলা হয়েছে, কোথাও বা সগুণ বলা হয়েছে, কোথাও বা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের কথা বলা হয়েছে, কোথাও বা তাদের ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন উপনিষদের আপাতবিরোধী উক্তিসমূহের ভেতর সমন্বয়সাধনের জন্যেই বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়েছিল। বেদান্তের একটি সূত্র হচ্ছে 'তত্তু সমন্বয়াৎ'। কিন্তু আবার বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যকারের মধ্যেও যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। আচার্য শংকর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ একই বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন। তাই আমরা বলতে পারি বেদান্তসূত্র স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত কিন্তু অসন্দিগ্ধ নয়। আধুনিক কালেও রাজা রামমোহন বেদান্তের যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। অদ্বৈত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য রামমোহন গ্রহণ করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেন নি। তত্ত্ববিচারে রাজা রামমোহন শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন — আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ধর্মের উৎস। রাজা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার জন্যে মহানির্বাণতন্ত্রের 'পঞ্চরত্ন' গ্রহণ করেছেন, (তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজও সম্ভবত কিয়ৎ পরিমাণে তান্ত্রিক দিব্যচক্র বা তত্ত্বচক্রের আদর্শে পরিকল্পিত) আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তন্ত্রোক্ত স্তোত্রটিকে তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন করেছেন (যেমন তন্ত্রে যেখানে আছে—'নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়', সেখানে দেবেন্দ্রনাথ 'নির্গুণায়' শব্দটি পরিবর্তিত করে লিখলেন 'শাশ্বতায়'।) এখন প্রশ্ন হচ্ছে—'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' কথার অর্থ কি? রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি ব্রহ্মবিদ্যা বলতে একই জিনিষ বুঝেছেন? ব্রহ্মবিদ্যা বলতে আমরা কি বুঝবো? সর্ব জীবে ঐক্যানুভূতি অথবা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি অথবা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করেও প্রতিদিন উপাসনার ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং ত্যাগবুদ্ধিতে বিষয়সম্ভোগ করা? যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী হয়েও প্রতীকোপাসনাকে ত্যাগ করেন নি, তাঁরা কি ব্রহ্মজ্ঞানী নন? দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি। তারপর প্রবোধবাবু যেটাকে আধুনিক ভারতের ধর্মসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলেছেন, সেটা কি সনাতন ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নয়? শুধু অধ্যাত্ম সাধনা কেন, ভারতীয় দর্শনের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে দুঃখনিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

যে ব্যক্তি শুধু শাস্ত্রে পান্ডিত কিন্তু ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করে নি, আমাদের শাস্ত্রে তাকে চন্দনভারবাহী গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লোকহিতকর কর্মের ভেতর দিয়ে বা নিষ্কাম কর্মের ভেতর দিয়েই যে অধ্যাত্ম জগতের সত্যসকলকে উপলব্ধি করা যায় এর প্রমাণস্বরূপ আমরা ভূরি ভূরি শাস্ত্রবচন উদ্ধার করতে পারি।

ঈশ্বর গুপ্ত যে যুগের অগ্রগামী ছিলেন না, প্রবোধবাবুর একথা আমরা স্বীকার করি। যাঁরা তন্ত্রশাস্ত্রে অ[...] তাঁরা শ্রীরামপ্রসাদকেও যুগের অগ্র[...] বলবেন না। কিন্তু যুগের অগ্রগামী হলেও রামপ্রসাদের মহিমা বিন্দুমাত্র [...] হয় না। কেননা, শাক্ত পদাবলী-সাহি[...] ক্ষেত্রে শ্রীরামপ্রসাদ একক ও অনন্যসা[...] আবার তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য [...] জ্ঞানেরও তিনি হয়েছিলেন অধিক[...] তিনি অবধূতাশ্রম গ্রহণ করেন নি, [...] তিনি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।

একথা আমরা স্বীকার করি যে, শ্র[...] প্রবোধবাবু তাঁর গবেষণামূলক [...] কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্ত স[...] অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করে[...] আবার শ্রীরামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ স[...] যিনি আমাদের আলোচনার পথ [...] করেছেন, সেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের [...] আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরি[...] কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈশ্বর গুপ্ত ত[...] সাধনার আলোকে রামপ্রসাদের ধর্মা[...] স্বরূপ উপলব্ধি করার প্রয়াস পান নি[...] রামপ্রসাদ সম্পর্কে তিনি শুধু ভ্রমেই [...] হন নি, রামপ্রসাদ সম্পর্কে চরম অ[...] করেছেন। তাঁর এই বিচার-বিভ্রান্তির যে অনেকখানি আদি ব্রাহ্মসমাজের [...] আছে, সে কথাও অস্বীকার করে লাভ [...] আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহামনীষী যখন বলেছেন—'রামপ্রসাদের মাতৃপ্রে[...] ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে প্রভেদ বড় [...] তখনও তিনি রামপ্রসাদ সম্পর্কে স[...] করেন নি এবং নিজের সাহিত্যগুরু [...] অতিশয়োক্তি করেছেন। সম্প্রতি প্রবো[...] তান্ত্রিক সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে [...] প্রসাদের ধর্মচেতনার স্বরূপ [...] আলোচনা করেছেন, তাই তিনিও [...] করেছেন—'রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের [...] মূলত অভিন্ন'। এক্ষেত্রে প্রবোধ[...] বিচারে বিভ্রান্তি ঘটেছে বলে আমা[...] হয়। তাই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অ[...] করতে হল।

পরিশেষে, রামপ্রসাদ কোন[...] আপামর সাধারণ বাঙ্গালীর হৃদয়ে [...] করেছেন, সে কথাটাও আমরা ব[...] পাঠককে চিন্তা করতে বলি। রাম[...] বিদ্যাসুন্দর বা কালীকীর্তনের কথা [...] নে, আমরা বলছি, তাঁর রচিত আগ[...] বিজয়ার গান এবং শ্যামাসঙ্গীত ব[...] কোন দিনই বিস্মৃত হতে পারবে না [...] বাংলার জনচিত্তে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভ[...] আজ প্রায় বিলুপ্ত। তাই যে অর্থে [...] প্রসাদকে খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলা [...] অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে খাঁটি বাঙ্গাল[...] বলা যায় না। রামপ্রসাদী সঙ্গীতই [...] আমাদের বিবেচনায় খাঁটি মায়ের প্র[...] প্রসাদ যিনি প্রতিদিন গ্রহণ করতে [...] তিনি ধন্য, তিনি যে একদিন মাতৃচর[...] গ্রহণ করে সকল ভয়-ভাবনার হাত [...] মুক্তি লাভ করতে পারবেন, সে বিষয়ে [...] সন্দেহ নাই।

আজব আবিষ্কার

বীরু চট্টোপাধ্যায়

সভ্যতার সূচনা থেকে প্রাজ্ঞজনেরা থা মেনে এসেছেন যে, কি ধর্মে কি জ্ঞানে গোঁড়ামিই হল শ্রেষ্ঠ পন্থা। দসত্ত্বেও আবিষ্কারের ইতিহাস পর্যা-চনা করলে আমরা দেখতে পাই যে যুগে গে কিছু মানুষ এ নিয়মের ব্যতিক্রম র আসছে।

এঁরা পূর্বে গৃহীত কোন মতামতকে হ্যের মধ্যে আনেন নি। শতাব্দীর র শতাব্দী প্রচলিত নিয়মাবলীকে স্ব মতের দ্বারা নস্যাৎ করেছেন রা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ডঃ জেমস ইস এফ আর এস ছিলেন এমনই কজন প্রখ্যাত রসায়নবিদ, যিনি তাঁর িক কার্যাবলীর দ্বারা সারা বিশ্বকে ক সময় স্তম্ভিত করে ছেড়েছিলেন। যে াপারে তিনি সবাইকে হতবাক করে-লেন সে রহস্যের আজও অর্থাৎ ১৮৪ র পরেও কিন্তু কোন সমাধান হয়নি।

এ অদ্ভুত কাহিনীটি বুঝতে হলে ই সব বিদ্রোহী বিজ্ঞানীদের মতাদর্শ য়ে আলোচনা প্রয়োজন। কোন কিছুকেই রা বিশ্বাস করেন না। যে কোন ঘটনাকেই এঁরা ঘটিত বস্তুর কল্পনা লে আখ্যা দেন। এঁদের মতে যে কোন ষয় তা যত আজগুবীই হোক, সর্বথা নুসন্ধানযোগ্য।

প্রাচীন যুগে 'হেপগাইরিক ফিলজফার' মে বিশেষ এক মতাদর্শের একদল মানুষ ছলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন বিশ্বের াবতীয় ধাতু মূলত স্বর্ণ থেকে উদ্ভুত বং বিশেষ এক ধরনের প্রস্তর চূর্ণ দ্বারা াঁরা যে কোন ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত রতে সমর্থ বলে দাবী করতেন। তাঁরাই ধ কাঁর ছিলেন প্রথম অ্যালকেমিস্টের ল। এদের বিচিত্র কার্যাবলীই বোধ কবি ন্ম দেয় কিংবদন্তী আশ্রিত সেই আশ্চর্য াথর : ফিলজফার্স স্টোনের।

প্রায় এগারশ' বছর ধরে এই অ্যালকেমি-পেশা ইয়োরোপ জুড়ে খুব সম্বর্ধিত হয়। প্রতিটি রাজদরবার কমপক্ষে একজন করে এই ধরনের আজব মানুষ পোষণ করতেন, যাঁরা ইন্দ্রজাল এবং রসায়নের আজব সংমিশ্রণে স্বর্ণ প্রস্তুতে সক্ষম ছিলেন বলে কিংবদন্তী মারফৎ শ্রুত হয়ে আসছে। মধ্য যুগে হয়ত এই ধরনের বহু ঐন্দ্রজালিক এক দুর্গ থেকে অপর দুর্গে চূড়ান্ত আতিথেয়তা ও সসম্ভ্রমে ভ্রমণ করে ফিরতেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ যে কখনো প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস আজও পাওয়া যায়নি।

এরপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে দেখা দিলেন সেই বিস্ময়কর মানুষ ডাঃ জেমস প্রাইস। ইংল্যাণ্ডের কৃতবিদ্য রসায়নবিদ। তিনি তাঁর অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন বহুজন সমক্ষে একাধিক পরীক্ষা প্রদর্শনীর দ্বারা। অজস্র লোকের সামনে, সে সব লোকেরাও সর্বস্তরের : কৃষক থেকে মধ্যবিত্ত, অভিজাত, পণ্ডিত এমন কি রাজার সম্মুখে পর্যন্ত নিজ কৃতিত্ব পরি-দর্শন করলেন তিনি। ঘটনা দেখে তাবৎ দর্শকবৃন্দের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এ যে অসম্ভব ঘটনা। সপারিষদ রাজা তৃতীয় জর্জ ডাঃ প্রাইসের 'কৃত্রিম স্বর্ণ' প্রস্তুত দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞের পরীক্ষা ও প্রদর্শনীর আগে পরে সমস্ত কিছু তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে এর মধ্যে কোন সস্তা কৌশল বা ইন্দ্রজালের কোন সন্ধান পেলেন না। সেই 'যাদু-গুঁড়ো'র রহস্য আজ পর্যন্তও অনু-দ্ঘাটিত রয়ে গেছে।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই ডাঃ প্রাইস সবে যখন ইংল্যাণ্ডের তরুণ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বেশ প্রতিশ্রুতিবান হয়ে উঠেছেন, এমন সময়ই ঘটল ঘটনা। চতুর্দিক থেকে প্রশংসা ও উপাধি বর্ষিত হচ্ছে তখন তাঁর উপর. বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সংস্থা রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ-এর গৌরব অর্জন করেছেন, অক্সফোর্ড থেকে একটি অনারারি ডিগ্রীও তাঁকে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনও জমজমাট। বিশাল এক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন সবে। আর উদ্ভিন্নযৌবনা জনৈকা রূপবতী এবং অভিজাতা তরুণীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়ে গেছে—এমন সময় ঘটল সেই ঘটনা। প্রচণ্ড ধাক্কায় জীবনের গতিপথ আচম্বিতে ঘুরে গেল এক অচিন্ত্যপূর্ব পথে।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ডাঃ প্রাইস গিলফোর্ডের নিকট স্টোক নামক স্থানে ছোট্ট একটি বাড়ি কিনলেন। এ বাড়িটির পূর্বতন মালিক ছিলেন ডাঃ আইরিশ নামক এক ব্যক্তি। বাড়ির ভেতরে প্রতিষ্ঠিত এক ল্যাবরেটারিতে রহস্যজনক অবস্থায় একদা তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে প্রকাশ।

প্রাইস একদিন তাঁর ভাবী বধু ক্রেশিচনকে নিয়ে লন্ডন থেকে স্টোকে এসে উপস্থিত হলেন ভবিষ্যৎ আবাসস্থল পরি-দর্শন মানসে। সারা বিকেলটা পুরোনো বাড়ির এঘর ওঘর করে কাটালেন। সমস্ত ঘরেই ডাঃ আইরিশের আসবাবপত্রাদি রয়েছে তখনও।

একটা ঘরে একটা দেরাজ খুলে ওরা কতগুলো পুরনো হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখতে পেলেন। এর হাতের লেখা যে মৃত ডাঃ আইরিশের সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

—জেমস্‌ এই ডাঃ লোকটা কি ধরনের মানুষ ছিলেন বল তো? ভাবি বধু মাকড়সার আঁচড়ের মত হস্তলিপির পানে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

—কখনো দেখা হয়নি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তারপর দেওয়ালে টাঙানো একটি তৈলচিত্রের পানে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বললেন, ঐ তো ছবি দেখ না। তৈলচিত্রটি পুরনো হয়ে কিছুটা আবছা হয়ে গেছে। চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু ছবির চোখ দুটিতে অদ্ভুত রহস্যময় এক জ্যোতি উদ্ভাসিত হচ্ছে। বড় অদ্ভুত ও অলৌকিক সে চাহনি।

—ওঁর সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই কিছু শুনে থাকবে, ভাবী বধু বিতৃষ্ণনয়নে তৈল-চিত্রের পানে চেয়ে বললে।

—স্থানীয় কিছু গুজব মাত্র শুনেছি। তাতে অবশ্য আস্থা স্থাপন করা যায় না।

—কেন যায় না?

—ভদ্রলোকের কতগুলো উদ্ভট ধারণা ছিল আর ইনি কতগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষাও নাকি চালিয়ে গেছেন। কথিত আছে যে, ইনি শেষ পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রে আস্থা রাখতে পারেন নি। অপর কি সব ব্যাপার নিয়েও নাকি......

ক্রিশ্চিন হাসলেন, আমার মনে হয় লোকে ওঁকে ডাকিনী বলে সন্দেহ করেছিল। তুমি যদি এই ল্যাবরেটরীতে কাজ শুরু করো তাহলে তোমাকেও সবাই তাই ভাববে।

অতঃপর হাতের পাণ্ডুলিপির দিকে চেয়ে বললেন, দেখা যাক এগুলোর মধ্যেও হয়ত ভদ্রলোকের কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

উভয়ে কাজগুলো উলটে দেখতে লাগলেন। আপাত অর্থহীন অঙ্ক ও নানা-বিধ ফর্মুলা। এক সময় এসে পড়লেন চমকপ্রদ একটি প্রচ্ছদে যার নাম : 'কি ভাবে আমি গোপন শক্তির সন্ধান পেলাম'।

প্রাইস হেসে উঠলেন, গোপন শক্তি বেচারা! বুড়ো বোধহয় প্রকৃতই উন্মাদ ছিলেন।

—জেমস, এটা কি দেখ তো?

সেই কাগজের সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা একটা এনভেলাপ পাওয়া গেল। আর তার ভেতরে প্রাইস দেখলেন কতগুলো গুঁড়ো।

—বোধকরি বৃদ্ধের বাতের অষুধ হবে, বলে এনভেলাপটিকে টেবিলে রেখে পুনরায় পাণ্ডুলিপিতে মনঃসংযোগ করলেন। কিন্তু তাঁর কৌতুকোজ্জ্বল মুখ সহসা বিস্ময়ে অন্য ভাব ধারণ করলো। ক্রিশ্চিনের কাঁধের উপর দিয়ে পাণ্ডুলিপির একটি পাতার প্রতি তার দৃষ্টি যেন আটকে গেল। তাতে লেখা :

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় আমার কাছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। লোকটার গুরুগম্ভীর অবয়ব দেখে ও মিষ্টি কথাবার্তা শুনে তাকে এনে ঘরে বসালাম। কথাবার্তায় জানা গেল লোকটি একজন পরম পণ্ডিত এবং পর্যটক। লোকটি জানতে চাইলে যে আমি কখনও ফিলজফার্স স্টোন দেখেছি কিনা। আর উক্ত প্রস্তরের রং, গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত আছি কিনা তাও জিজ্ঞাসা করলেন......"

প্রাইস পরম আগ্রহভরে ক্রিশ্চনের হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। তারপর অবিশ্বাস্যার ভাব নিয়ে

একটা চেয়ারে বসে পড়তে লাগলেন। যতই পড়েন, উত্তেজনা ততই বাড়ে। আলকেমি সম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনে শৈশবেও বোধকরি তিনি এতটা রোমাঞ্চিত হন নি।

'......যখন আমি লোকটিকে জানালাম যে উক্ত প্রস্তরের নাম কয়েকবার জীবনে শুনেছি মাত্র তবে দেখবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি, অমনি লোকটা একটা অদ্ভুত বাক্স বের করে তার ভেতরে অবস্থিত চারটি বড় চুনীর মত কাঁচের টুকরা দেখালেন। আমি বহু অনুনয় করে তার থেকে কিঞ্চিৎ মাত্র চেয়ে রাখলাম। তারপরই লোকটি বিদায় নিল। আর তাঁকে কখনো দেখিনি......"

—এ সবের মানে কি জেমস? অভিভূতের মত প্রশ্ন করে ক্রিশ্চন। কিন্তু কোন কথা বুঝি প্রাইসের কানে গেল না।

পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে যে, ডাঃ আইরিশ এরপর 'কৃত্রিম স্বর্ণ' প্রস্তুতে ব্রতী হন। এই পরীক্ষার পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে তাতে। লেখা আছে......

"ওয়াক্সের মধ্যে টিনচার দেওয়া হল......ছয় গ্রাম মার্কারী......হিস হিস শব্দ......নাইট্রাস গ্যাস......পনের মিনিটের মধ্যেই মার্কারী রূপান্তরিত হল......প্রকৃত স্বর্ণে।"

ক্রিশ্চন অস্ফুটে এক চিৎকার দিয়ে প্রায় সরে বসে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইল ভাবী-স্বামীর পানে। তার রক্ষণশীল মন চমকে উঠল। এযে ব্ল্যাক ম্যাজিক......যাদু...... ইন্দ্রজাল। কিন্তু প্রাইস কোন কিছু লক্ষ্য করল না। সে যেন তন্ময় হয়ে গেছে। পাশে যে ক্রিশ্চন রয়েছে এ কথাও যেন সে বিস্মৃত হল......

"......আমি ধনী হলাম। ......কিন্তু সমস্ত টিনচার শেষ হয়ে গেল......ল্যাবরেটরী তৈরী করলাম......পরীক্ষা শুরু হল...... একই ধরনের পদার্থ প্রস্তুতে লেগে গেলাম ......অবশেষে সাফল্য এল......কিন্তু সাংঘাতিক ক্ষতির বিনিময়ে তা এল...... আমার জীবন এখন বিপন্ন......আর কাজ চালিয়ে যাবার বয়স নেই!

এখানেই বর্ণনা শেষ। সহসাই যেন শেষ হয়ে গেছে। প্রাইস মোহমুগ্ধের মত কাগজের সাদা অংশের প্রতি নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা এনভেলাপটি তুলে নিলেন; খুলে দেখলেন ভেতরে রয়েছে এক প্রকার রক্তবর্ণ গুঁড়া পদার্থ।......

প্রাইসের এ রকম মোহাচ্ছন্ন অবস্থা দেখে ক্রিশ্চন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

কম্পিত কণ্ঠে তিনি এনভেলাপটি ও গুঁড়ো-গুলো বিনষ্ট করে ফেলতে অনুরোধ জানালেন। পাণ্ডুলিপিও নষ্ট করা হোক।

প্রাইস কিছুটা গুঁড়া হাতের ওপর ঢেলে নীরবে শুধুকে দেখলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন।

—তা আমি পারব না ক্রিশ্চন, প্রাইস বললেন, সারাজীবন আমি এসব ভুলতে পারব না। বলে উঠে তিনি ল্যাবরেটরী ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

—আমার দেখতে হবে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে এ গুঁড়োগুলির গুণ গুণ...... সামান্য ......সামান্য......সাধারণ পরীক্ষা মাত্র......

ক্রিশ্চন অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকাল প্রাইসের প্রতি।

—সেকি! তুমি বলছ কি! পরীক্ষা করবে। এখন?

ল্যাবরেটরীর দরজা ধরে প্রাইস বললেন, —কেনই বা নয়। ভাল ল্যাবরেটরী, সবকিছু সরঞ্জামই আছে। বেশী সময় লাগবে না। পাণ্ডুলিপি অনুসারে......মিনিট পনের বড় জোর।

—কিন্তু ওর একটি কথাও তোমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। শয়তানী......নন-সেন্স ওগুলো।

প্রাইস ভৎসনার কণ্ঠে বললেন, মাই ডিয়ার। যতই বিচিত্র মনে হোক কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে তাকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। মন নয়, তার ল্যাবরেটরীই রায় দেবার মালিক।

—জেমস। আমি বলছি, এ সব প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ।

—প্রকৃতি কোন নিয়ম তৈরী করে না। নিয়মাদির সৃষ্টিকর্তা মানুষ।

তর্ক করা বৃথা। বাধ্য হয়ে প্রাইস যতক্ষণ ল্যাবরেটরীতে থাকে ততক্ষণ ক্রিশ্চন একটা চেয়ারে গা এলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু পরীক্ষাকার্য পনের মিনিটের অনেক বেশী সময় নিল। ল্যাবরেটরীর মধ্যে সময় যেন থেমে রইল। মুচির মধ্যে তরল পদার্থ ফুটে হিসহিস শব্দ হল, নাইট্রাস গ্যাস উত্থিত হল......অর্থাৎ ঠিক যেমনটি লিখে গেছে ডাঃ আইরিশ।

পারদ থেকে সোনা! এটা কি সম্ভব-পর? হাজার হাজার মানুষ যুগের পর যুগ এই মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে। এক-বার সম্ভব হলে সীমাহীন ক্ষমতার অধি-কার। এ আকাঙ্ক্ষার প্রলোভন মানুষের কাছে দুর্জয়। এ পাউডার ও এই ফর্মুলা কি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবে? প্রাইস বোধকরি মনে মনে এই আশাই পোষণ কর-ছিল যে নিজের কাছে এবং ক্রিশ্চনের কাছে পরীক্ষার দ্বারা এটার বিফলতা প্রমাণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কিন্তু পরীক্ষার ধারা এগোতে প্রাইস যেন তাতে সম্মোহিত হয়ে পড়ল।

প্রায় দু ঘণ্টা সময় কেটে গেছে এই-ভাবে। চেয়ারে বসা অবস্থায়ই ক্রিশ্চন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সহসা প্রায় ছুটে এলো প্রাইস সেই ঘরে—হাতে চিমটে ধরা ধূমায়মান মুচি।

প্রবল উত্তেজিত কণ্ঠে এসে বলে উঠ —ক্রিশ্চন! দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো, এটা পারদ নেই। এটা......সোনা, হ্যাঁ হয়ে গেছে। পাকা সোনা, খাঁটি সোনা।

থতমতভাবে তরুণী মুচিটার চাইল, তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। স্বামীর অভিব্যক্তি ও কণ্ঠস্বর অদ্ভুত বহু। মেয়েটি দেখলো প্রাইসের চোখে জ্যোতিপ্রভ দৃষ্টি—যা রয়েছে দে টাঙানো ডাঃ প্রাইসের তৈলচিত্রের মধ্যে।

ঘরময় উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে প্রাইস বলতে লাগলো, কি আবিষ্কার। হারানো এক বিস্মৃত কৃত্রিম সোনা প্রস্তুতের সূত্র পেয়ে গেছি।

নাইট্রিক এসিড দিয়ে পরীক্ষা হয়েছে। অপর যে কোন ধাতু তাতে লিত হত। কিন্তু ঐ মুচির ভেতরকার বস্তুটির গায়ে বিন্দুমাত্র দাগও লাগে নি

মেয়েটি এবার সোজা হয়ে ব জেমস্, আমার কথা শোন।......শপথ এ সব উদ্ভট পরীক্ষা নিরীক্ষা তুমি কখনো করবে না।

কেমন ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে ভাবী বধূর দিকে তাকালো। তারপর কণ্ঠে বললেন, তুমি ঠিক বুঝতে পার ক্রিশ্চন...এটা তোমার খারাপ লাগছে

—আমাদের এ ধরনের কোন কিছু অপরাধ, সাংঘাতিক অপরাধ, পাপ, মত ভীত কণ্ঠে ক্রিশ্চন বললে, এটা ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছু নয়।

এবার সর্বপ্রথম রেগে উঠল প্রাই

—কক্ষনো না। এটা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিণ পৌঁছই এ কাজ চালিয়ে যাওয়া পরম কর্তব্যবিশেষ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে মেয়েটি। তারপর তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে চেয়ার থেকে ক্লোকটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে তাহলে আমায় বাদ নিয়েই তুমি এটা জেমস। বিদায়......।

প্রাইস ওকে থামাবার কোন করলেন না। হাতে চিমটে সহ আচ্ছন্নের মত তেমনি দাঁড়িয়ে রই কানে এল ক্রিশ্চন কোচোয়ানকে ডাক সামনের দরজা খোলা ও বন্ধ হবার হল...তারও কিছু পরে ঘোড়ার গাড়ি যাবার আওয়াজ শোনা গেল।

এরপর প্রাইস ধীর পদে টাঙানো ডাঃ প্রাইসের তৈলচিত্রের গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ক্রমে তাঁর যেন মনে হল, ঘরে আর তিনি নেই। অদৃশ্য অপর কে যেন অশরীরীভাবে উপস্থিত হয়েছে। কি ডাঃ আইরিসের অতৃপ্ত আত্মা এল? যেন ক্রিশ্চন চলে যাওয়ার অপে সে আত্মা ছিল। সে আত্মা যেন আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করবার অভি এখানে পুনরাভির্ভূত হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে কিছুটা বুঝি নাম না জানা আতংকে প্রাইস কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হস্তধৃত মুঠির মধ্যেকার হলদে পদার্থটির দিকে তাকাতেই পুনরায় এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন ভাব এসে ভর করল তার দেহমনে। অদৃশ্য অশরীরী সেই আত্মা যেন প্রাইসকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললো ল্যাবরেটারীর দিকে। সেই বিস্ময়কর পাউডারটির অলৌকিক কার্যকারিতার চূড়ান্ত প্রমাণ করতেই হবে তাকে!...

যে মুহূর্তে প্রাইস ল্যাবরেটরীর দরজা অতিক্রম করল সেইক্ষণ থেকেই তিনি বুঝি কেমিস্ট পদ থেকে সরে গিয়ে পুরোপুরি অ্যালকেমিস্ট বনে গেলেন। এবং তখন থেকেই শুধু মাত্র যে ক্রিশ্চিনকেই হারালেন তা নয়, তিনি তাঁর পেশাগত ভবিষ্যৎকে নস্যাৎ করে নিয়ে এক অন্ধকার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। শুধুমাত্র শক্তি ও নিঃসীম সম্পদের লোভে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করলেন।

দুটি বিপরীতমুখী প্রবল টানে ভেসে চললেন প্রাইস। প্রথমটি হল বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর দ্বিতীয়টি হল স্বর্ণের প্রতি দুর্লভ লিপ্সা। যার জন্যে যুগে যুগে মানুষ দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে, মহাদেশে মহাদেশে গহীন অরণ্যে ভয়াবহ স্থানে হামলা চালিয়েছে। এই দুটি বিপরীতমুখী টানে প্রাইসের জীবনের শেষ উন্নতির রশ্মিটুকুকেও নিভিয়ে দিল!...

এরপর এক বছর কেটে গেল। প্রাইস এর মধ্যে কদাচিৎ বাইরে বেরিয়েছেন। অক্লান্তভাবে ল্যাবরেটারিতে এককভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন। তারপর শুরু হল প্রদর্শনী। প্রথমে স্থানীয় লোকদের সামনে। অতঃপর লন্ডনে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ায়—বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও রাজনীতিকদের দেখালেন তার আজব আবিষ্কার।

দর্শকবৃন্দ 'রূপান্তরিকরণের' পূর্বে ও পরে যাবতীয় সরঞ্জাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। না, কোন কৌশল আবিষ্কার করা গেল না। এ যুবক প্রকৃতই অসাধ্য সাধন করেছেন।

তাঁর 'ল্যাবরেটরিকৃত স্বর্ণের' নমুনা ইংলন্ডের সেরা সেরা বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে রায় দিলেন ওটা প্রকৃত সোনাই বটে।

রয়েল সোসাইটি প্রথমে অবিশ্বাস ও পরে এই তরুণ বয়স্ক বিজ্ঞানীর অদ্ভুত আবিষ্কারের দাবীতে এক রকম অপ্রস্তুত হয়েই প্রাইসকে আহ্বান জানালেন তাদের সম্মুখে তাঁর আবিষ্কারের পরীক্ষা দেবার জন্য। যাতে করে রাজা'র কাছে তার প্রমাণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অতুলনীয় ও অভাবিত উন্নতিসাধনে সাহায্য করতে সমর্থ হয়।

অচিন্ত্যপূর্ব সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এখন শুধু প্রাইস তার কিছু রক্তবর্ণ গুড়ো সোসাইটির হস্তে সমর্পণ করবে, সঙ্গে দেবে তাঁর ফর্মুলার পান্ডুলিপিটি।

কিন্তু তা হল না, এই শেষ প্রক্রিয়াটি করা হল না, বা করল না প্রাইস।

দুনিয়া অপেক্ষা করতে লাগল। যতই দিন যেতে লাগল কোন কাজই এগোল না। মাসের পর মাস অতিবাহিত হল, প্রাইস কিন্তু এগিয়ে এল না তার অমর আবিষ্কারের দাবী নিয়ে। প্রশংসা রূপান্তরিত হল জঘন্য সমালোচনায়। যারা ও'র 'রূপান্তরিকরণ' পদ্ধতি ইতিপূর্বে স্বচক্ষে দেখেছে তারাও নিজেদের স্মৃতি-শক্তিকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করল। ম্যাজিক দেখেনি তো?

প্রাইসকে সবাই এমন কি ঘনিষ্ঠ বান্ধবরাও পরিত্যাগ করে গেল।

শেষে এক চরম চ্যালেঞ্জের মুখে প্রাইস ঘোষণা করলেন যে তাঁর লাল-গুড়ো সব নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আর নতুনভাবে গুড়ো প্রস্তুত করতেও তাঁর ধৈর্য নেই। কেননা ঐ গুড়ো প্রস্তুত প্রণালী শুধু সুকঠিনই নয়—তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিপজ্জনক।

—ভয় হয়, আমি হয়ত পরবর্তী প্রচেষ্টা পর্যন্ত বাঁচবোই না, প্রাইস বললেন।

এটা সত্যি কথা যে ভয়াবহ পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে। এই এক বছরেই তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। আর দেখা দিয়েছে স্নায়ু বৈকল্য। প্রতিবেশীরা জানায় মাঝে মাঝে নাকি 'চন্ড ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তিনি'। রাত্রিকালে নাকি মাঠের মধ্যে উন্মত্তের মত ছুটোছুটি করেন।

একদিন, বোধকরি সেটা ৩ কি ৪ই আগস্ট ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ, স্যার ফিলিপ ক্লার্ক এবং ডাঃ স্পেন্স নামক দুইজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, রয়েল সোসাইটির সংক্ষিপ্ত এক অধিবেশনের পর একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন এসে স্টোক-এ। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রাইসকে তাঁরা শেষ অনুরোধ জানাবেন তার স্বর্ণ প্রস্তুত সক্ষম 'গুড়ো তাদের কাছে হস্তান্তরিত করতে। নচেৎ এর ফলাফল স্বরূপে তারা আইনের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়ে ফৌজ-দারী মামলা দায়ের করবেন প্রাইসের নামে তঞ্চকতার অভিযোগে।

এসে তারা বিস্মিত হলেন। দেখলেন ভগ্নস্বাস্থ্য হলেও নতুন উদ্দীপনা যেন ফিরে এসেছে প্রাইসের দেহ-মনে। প্রাইস জানালেন আরো কিছু রক্তবর্ণ গুড়ো প্রস্তুত করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন এবং সানন্দে তিনি তার স্বর্ণপ্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শনে রাজি আছেন।

এই কথা ঘোষণার পর বিশিষ্ট অতিথিদ্বয়কে অভিবাদন জানিয়ে প্রাইস শেষবারের মত ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করলেন।

তিন ঘন্টা বাদে দেখা গেল তিনি তার কাউন্টারে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।

এই ১৮০ মিনিটের অন্তিম সময়টা তিনি কিভাবে কাটিয়েছেন তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। শুধু বোঝা গেছে যে তার পরীক্ষা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়েছিল এবং ফলে হতাশ হয়ে, কেউ বাধা দেবার পূর্বেই হাতের কাছে রাখা এক বোতল প্রুসিক এসিড তিনি গলাধঃকরণ করে ফেলেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিষ চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সেটা হল ফর্মুলার পান্ডুলিপিটা ল্যাবরেটারী, বাড়ির সমস্ত ঘর এমন কি বাগান পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে সন্ধান করা হল কিন্তু সেটি যে নেই নেই-ই।

বর্তমান তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে ব্যাপারটা আজও রহস্যাবৃত হয়েই আছে। ঐ গুড়োগুলি কি তবে প্রকৃতই সেই 'ফিলজফার্স স্টোন?' ডাঃ আইরিশ ওগুলো পেলেন কি করে? সত্যিই কি কোন অপরিচিত আগন্তুক তাঁর কাছে এসেছিল? না কি ওটা তার তদানিন্তন বিকৃত মস্তিষ্কের কপোল কল্পনা!

আর, রয়েল সোসাইটিকে প্রাইস তার ফর্মুলার কথা জানাতে দ্বিধা করল কেন? সে কি স্বর্ণপ্রসবিণী হয়ে একাই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে চেয়েছিল? শেষ পর্যন্ত তাই কি সে তার ফর্মুলা চিরতরে বিনষ্ট করে দিয়ে গেছে?

ঐতিহাসিকদের মতে জীবনের শেষ সময়টা প্রাইস বোধকরি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। না কি তার পূর্বসূরীর আত্মা তাকে আচ্ছন্ন করে স্বীয় ইচ্ছামত পরিণতিতে টেনে নিয়ে গেছে?

ক্রিশ্চিন হয়ত ঠিকই আশঙ্কা করেছিল যে, প্রাইস বিজ্ঞান ছেড়ে ব্ল্যাক-আর্টের খপ্পরে পড়েছে। কে বলতে পারে কোথায় বিজ্ঞানের শেষ আর ইন্দ্রজালের শুরু।

আজকের ধাতু-বিজ্ঞানীরা 'রূপান্তরি-করণকে কবিকল্পনা আখ্যা দেন—বলেন, ওটা অসম্ভব ঘটনা।

কিন্তু জেমস প্রাইস যে স্বর্ণ প্রস্তুত করেছিল সে কথার সমর্থনে তো বহু স্বাক্ষীসাবুদ ও দলিলাদি বর্তমান। সে ঘটনার সত্যতায়ই বা সন্দেহ প্রকাশ করা যায় কি প্রকারে?

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(২০)

নৈহাটি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে অশীতিপর এক বৃদ্ধ হেলান দিয়ে বসেছিলেন; মুখে সামান্য গোঁফ-দাড়ি, মাথায় কিছু টাক, পরনে সুতীর পায়জামা ও লম্বা কুর্তা, গায়ের রং ফর্সা; বয়স আশী পার হলেও মাংসপেশীগুলিতে তখনো কুস্তিগীরের লক্ষণ প্রকাশিত। বেঞ্চের সামনে একটি টিনের বাক্স ও বেডিং, হাতে একটি বেতের ছড়ি। তাঁর পাশে বসে ৩০ বৎসরের এক বাঙালী যুবক, মুখে অল্প গোঁফের রেখা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, পরনে ধুতি পাঞ্জাবি; তার পাশে একটি সরোদ যন্ত্র ও আর এক প্রস্থ স্যুটকেশ ও বেডিং। বৃদ্ধ যুবককে জিজ্ঞাসা করছিলেন। 'বাবা গোরীপুর আর কত দূরে?' যুবক বললেন—'একরাত তো কাটলো, রাস্তায় আপনার তো কোনো কষ্ট হয়নি; আর কিছু পরেই গোরীপুরের গাড়ী আসবে।' বৃদ্ধ বললেন—'তুমি গিধরে আমাকে বললে, এক রাত্রি ট্রেনে ঘুমিয়ে কাটান, ভোরবেলা গোরীপুরে আমরা পেঁৗছে যাব। কিন্তু এখন দেখছি গোরীপুরের জন্য আবার অন্য গাড়ী আসবে। আমি বুড়া মানুষ তাই একটু ভাবনায় পড়ে গেছি।' যুবক উত্তরে বললেন—'মিয়াজান, আপনি আমার কাছে নিশ্চিন্ত থাকুন; গিধরে আপনার এক মাস সেবা-যত্ন করছি, গোরীপুরের কর্তা আপনার জন্য আমার কাছেই টাকা পাঠিয়েছেন। আপনাকে নির্বিঘ্নে গোরীপুরে পেঁৗছবার দায়িত্ব আমারই উপরে পড়েছে।' এই কথোপকথনের মধ্যে যে দুই ব্যক্তির বর্ণনা আমরা দিচ্ছি,—তার মধ্যে একজন হলেন তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর সাক্ষাৎ বংশধর, সেনী শোণিতের ও সঙ্গীতের ধারক বৃদ্ধ রবাবী মহম্মদ আলী খাঁ। অপরজন হলেন কলকাতার বিখ্যাত ধনী গুণী হরেন শীলের শিষ্য এবং মদীয় পিতৃদেবের সংগীত বিভাগের কর্মচারী ও টাউন ক্লাবের পুরানো ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গীয় কালীচরণ রায়।

নৈহাটি স্টেশনে সারাদিন গল্প-গাছায় তাঁদের দিন কাটলো; কালী রায় বৃদ্ধ ওস্তাদের যত্ন ও আহারাদির সব ব্যবস্থাই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করলেন। নৈশ আহারের পর বৃদ্ধকে সিরাজগঞ্জ মেল ট্রেনের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে তাঁর শয়নের ব্যবস্থা করলেন ও বললেন, সকালবেলাই তাঁরা গোরীপুর পেঁৗছে যাবেন। রাত্রি ফুরালো, সকাল হলো, কিন্তু ট্রেন এলো যমুনা নদীর (পূর্ববঙ্গে গঙ্গা পদ্মারূপ নেবার উত্তর অংশকে যমুনা বলা হয়) তীরে সিরাজগঞ্জ স্টেশনে। নিদ্রাভঙ্গের পর ওস্তাদ কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই কি গোরীপুর?' কালীবাবু মালপত্র এবং ওস্তাদজীকে নিয়ে বালুকাপূর্ণ জমির উপর দিয়ে ধীরে ধীরে স্টীমারঘাটের দিকে নিয়ে চললেন। ওস্তাদ বললেন,—'এ তো দেখছি সমুদ্রের কিনারায় আমাকে নিয়ে এলে।' কালী রায় উত্তরে বললেন,—'বাবাজী, এ সমুদ্র নয়, এটা একটা নদী; আপনি আরামের সহিত স্টীমারে এই নদী পার হয়ে যাবেন। স্টীমারে চা, পানি, ডিম, রুটি, মাংস সবই আপনাকে খাওয়াবো। নদীটা পার হলেই গোরীপুর পেঁৗছে যাবেন।' ওস্তাদ কালীবাবুসহ স্টীমারে উঠলেন। বয়স হলেও তাঁর শরীরে শক্তি-সামর্থ যথেষ্ট ছিল; হাঁটতে-চলতে কোনো কষ্ট পেতেন না। স্টীমারে ডিম-রুটি খেতে খেতে বললেন,—'আমি বিহারে থাকি, কোলকাতায় জাহাজ দেখেছি, কিন্তু জাহাজে ওঠা আমার এই প্রথম।' কালীবাবু বললেন,—'আপনি তো জানেন, আপনার ভাই কাসেম আলী খাঁ রবাবী পূর্ববঙ্গে বহু বৎসর ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যেও ছিলেন; পরে ঢাকার ভাওয়াল রাজ-দরবারে ওস্তাদ হন। তাঁর কবরও তো সেইখানেই, তবে আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কাসেম আলীর জাহাজে-জাহাজেই দিন কাটতো। বড় বড় নদীতে কত জাহাজেই তিনি বেড়িয়েছেন। আপনাকে বেশী সময় নদীর উপরে থাকতে হবে না, ওপারে স্টীমার থামলেই গোরীপুরের গাড়ি পেয়ে যাবেন।' স্টীমার জগন্নাথগঞ্জে ভিড়লো দুপুরবেলা; তারপর চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসে উঠে তাঁরা দুজনে সোজা গোরীপুরে পেঁৗছে গেলেন। সেখানে ওস্তাদের জন্য সাধু সিং গাড়িসহ প্ল্যাটফর্মে হাজির ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওস্তাদকে আমাদের গোরীপুরের গেস্ট-হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেখানে আমাদের সংগীতসভার দুইজন বিখ্যাত ওস্তাদ ভারতখ্যাত এনায়েৎ খাঁ সেতারী এবং বঙ্গবিখ্যাত আমীর খাঁ সরোদী বৃদ্ধ ওস্তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মহম্মদ আলী খাঁ গেস্টহাউসে পেঁৗছানোর পর তাঁকে অভিবাদন করে তাঁরা বললেন, কর্তা (ব্রজেন্দ্রকিশোর) আপনার দেখাশুনার ভার আমাদের দিয়েছেন, এখানে গোরীপুরে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। বাবার সঙ্গে যথাসময়ে খাঁসাহেবের দেখা হলো বাবার বৈঠকখানায়। আমি তখন পারিবারিক স্বাস্থ্য উন্নতিকল্পে শিলং-এ ছিলাম। বাবা আমাকে লিখেছিলেন যে, মহম্মদ আলী খাঁসাহেব গোরীপুরে পেঁৗছালেই আমাকে তিনি টেলিগ্রাম করে জানাবেন; কারণ আমার জন্যই খাঁসাহেবকে গোরীপুরে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তখন বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাচ্ছে, ১৯২৬ সালের জুলাই মাসের কথা বলছি। ঐ সময় শিলং-এর পাহাড়গুলিতে বর্ষার বারিবর্ষণ শুরু হয়েছে; আমাদেরও গ্রীষ্মাবকাশের প্রায় দুইমাস শিলং-এর হোপ-হাউস-কুঠিতে অতিবাহিত হয়েছে। ফলে আমার শিশুপুত্র বারীন্দ্রকিশোর ও পত্নীর স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতিও হয়েছে। বাবার টেলিগ্রাম পেয়েই আমি স্বপরিবারে গোরীপুরে রওনা হয়ে এলাম। ইতিমধ্যে কালী রায় খাঁসাহেবের কাছ থেকে বাবার নির্দেশ অনুযায়ী সংগীতশিক্ষা ও স্বরলিপি শুরু করে দিয়েছিলেন। বাবাসাহেব প্রথমত কালীবাবুকে হামীর কল্যাণ রাগে সংক্ষিপ্ত আলাপ ও দুটি ধ্রুপদের তালিম দিয়েছিলেন। ধ্রুপদদুটির একটি হলো 'রাম নাম সুমরণ কর' (তিলকবিহারী রাগ), আর একটি 'ঘন বার পি পর' (হামীর কল্যাণ)। ওস্তাদের অনুরোধে কালীবাবু একটি সেতার বাবার কাছে চেয়ে গেস্ট-হাউসে রেখেছিলেন। শুনলাম, ওস্তাদ মাঝে মাঝে অবসরমত সেতার বাজান, তাছাড়া একটি সরোদ-যন্ত্র রবাবের মত সুর বেঁধে তাঁর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তিনি ওই যন্ত্রেই রবাবের কাজ দেখাতেন; বৃদ্ধ হলেও তিনি যথেষ্ট চলাফেরা করতেন। গোরীপুরের বাগানের পুকুরের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাছ ধরার উৎসাহ তাঁর ছিল; তাছাড়া নিজের পছন্দমত তরকারী, মাছ, মাংস এবং মশলা প্রভৃতি কিনতে প্রত্যহই গোরীপুর বাজারে নিজে পদব্রজে নানা হাটে ঘুরে বেড়াতেন। বিচিত্র প্রকারের রন্ধন-প্রণালীতে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। মোগলাই রান্নায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর তৈরী বিরিয়ানী, পোলাও, কালিয়া, কাবাব, ফিরণী, হালুয়া প্রভৃতি খাদ্যের তুলনা ছিল না; অথচ তিনি এই সকল ঘৃত-মশলা-সমন্বিত খাদ্যে এমন সকল হজমী উপকরণ প্রয়োগ করতেন, যাতে মোগলাই রান্না বাঙালী খাদ্য অপেক্ষা কম সুপাচ্য হতো না। তিনি নিজে রান্নাঘরে বসে আমাদের গেস্ট-হাউসের ইসমাইল বাবুর্চিকে রান্না শেখাতেন। ইসমাইল আমাকে অনেকবার বলেছে যে, বুড়ো ওস্তাদটি শুধু সংগীতে নয়, রান্নাতেও এক বড় ওস্তাদ। মহম্মদ আলী সব সময়েই তাঁর কাছে তাঁর পোষ্য-পুত্র মন্নুকে সঙ্গে রাখতেন। এই মন্নুই বর্তমান বিখ্যাত সংগীতবিদ ও 'সেনী-গীতিমালা' লেখক ওস্তাদ সোকত আলী খাঁ। মন্নুকে একবেলার জন্যও তিনি না দেখে থাকতে পারতেন না।

আমি গোরীপুর থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে তিন-চার দিনের মধ্যেই শিলং থেকে

গৌরীপুরে স্বপরিবারে হাজির হলাম। তানসেনের পুত্রবংশীয় শেষ মহাগুণীর গৌরীপুরে আগমন আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। শুধু আমাদের নয়, আমাদের জ্ঞাতি জমিদাররাও এতে বিশেষ আনন্দ ও গৌরববোধ করছিলেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁদের মধ্যে কেউ-না-কেউ ওস্তাদজীর সংগ্রহের জন্য গেস্ট-হাউসে আসতেন। তাঁদের মধ্যে কালীপুরের স্বর্গীয় গুণী জমিদার জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (পূর্ববঙ্গে যাঁর নাম ছিল বাংলার ভাতখণ্ডে), রামগোপালপুরের স্বর্গীয় কাকা হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (খলিফা আবিদ হোসেন যাঁর বিখ্যাত শিষ্য ও তবলার এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী) এবং ভবানীপুরের কাকা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী (বিখ্যাত সেতারী ও 'তারের স্বপ্ন' নামক গ্রন্থের লেখক) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবার সঙ্গে ওস্তাদজীর প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দেখা হতো এবং সংগীতপ্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলতো। আমি গৌরীপুরে এসেই তাঁর নিকট সংগীতে দীক্ষা গ্রহণের দিন ও সময় নির্ধারণ করলাম এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানদাকান্ত-দাদারও ওস্তাদজীর কাছে নাড়া বাঁধার কথা ঠিক হলো। শিলং থেকে ফিরেই বিকালে গেস্ট-হাউসে ওস্তাদজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গ্রীষ্মকালে তিনি প্রায়ই খালি গায়ে একটি নেংটি পরে নিজের ঘরে বিশ্রাম করতেন। কোনো অতিথি উপস্থিত হলে কোমরে একটি ছোট ধুতি জড়িয়ে নিতেন ও গায়ে একটি গেঞ্জী পরতেন। তানসেনের পুত্রবংশীয় এঁরা আমীরি ও ফকিরী উভয়-প্রকার জীবনে অভ্যস্ত; এঁদের মনও সাধু-ফকিরদের ন্যায় সরল ও নির্ভীক। আমি খাঁসাহেবকে একটু বাজাতে অনুরোধ করলাম। আমার অনুরোধে তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত পুরানো সরোদই রবাবের মত তার বেঁধে কাঁধে তুলে ভীমপলাশী রাগের কয়েকটি তান শোনালেন। মনে হলো তাঁর যন্ত্রসংগীতের তানগুলি ঠিক ধ্রুপদ গানের তানের মত। সেইদিন সামান্য কথা-বার্তার পর নাড়া বাঁধার দিনের ও সময়ের কথা খাঁসাহেবকে বলে বিশ্রামার্থ ঘরে ফিরলাম।

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

ব্যাঙ শব্দটি সুখশ্রাব্য নয়। অথচ ব্যাঙ-এর প্রতিশব্দ দাদুরী কথাটি বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যবহনকারী। পদাবলী সাহিত্যে দাদুরীর ডাকে প্রিয়জন বিরহবেদনা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, 'ফাটি যাওত ছাতিয়া'। জাপানী ও চীনে কবিতায় ব্যাঙ-এর লাফের কবিপ্রসিদ্ধি রয়েছে। শেক্সপীয়র পর্যন্ত ব্যাঙ-এর চোখের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে লিখেছেন:

> Those eyes are among the most beautiful in the world..... the precious jewel that is the eye of the toad.

ব্যাঙ বাংলাদেশে খুবই পরিচিত জীব। সাধারণের চোখে ব্যাঙ কুরূপ। এদেশে সাধারণ গৃহস্থ যে সব ব্যাঙ-এর সঙ্গে পরিচিত তার একটা নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলেছেন। যেমন, ঘোঁতা ব্যাঙ, কুনো ব্যাং, সোনা ব্যাং, কটকটে ব্যাঙ ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকরা এই শ্রেণীবিচার বিজ্ঞানসম্মত নয় বলেন। বৈজ্ঞানিকরা এর অন্যরকম শ্রেণীবিচার করে শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ব্যাঙ-এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। দেশ, কাল, ঋতু পর্যায়ে এদের নানা রূপ, নানা আকার নানা রকমের চাল-চলন ও ব্যবহার। য়ুরোপ-আমেরিকা-এশিয়া মিলে এদের জাতি এক—তবে প্র-জাতি অনেক। এরা বিভিন্ন দেশে জাতি সম্পর্কে পরস্পর 'তুতো' ভাই—কাজিন।

এই পৃথিবীর পিঠে প্রাচীন অধিবাসী-দিগের অন্যতম এই জীবটি। এর যে ফসিল পাওয়া গেছে তা থেকে এই মেরুদণ্ডী প্রাণীটি জলের জীব থেকে কি করে ডাঙ্গার জীবে পরিণত হলেন তার চমকপ্রদ ইতিহাস পাওয়া যায়। মাছের জীবনের সঙ্গে এর সহমর্মিতা রয়েছে; অথচ জলে বসবাস তার পক্ষে সুখকর নয়। বনে-জঙ্গলে, উষ্ণভূমিতে বসবাসই তার পক্ষে সুখকর।

তবুও পুরানো জল-জীবনের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করা ব্যাঙ-এর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। জলের সঙ্গে এদের নাড়ির সম্পর্ক বড় দৃঢ়। বিশেষ করে শ্রীমতী দাদুরী ডিম্ব প্রসবের সময় জলাভূমিতেই চলে যান। শ্রীমতীর উর্বরাশক্তিও খুবই প্রবল। বৎসরান্তে তিনি ৪,০০০ থেকে ৮,০০০ ডিমসহ জেলীর মত দুটি থলি জলের ভেতর প্রসব করে রেখে আসেন। এই থলি দুটি ধীরে ধীরে জলের নীচে শেওলা ও কাদার ভেতর গিয়ে আশ্রয় লাভ করে। প্রকৃতি শেওলা ও কাদার কামুফ্লাজ অন্য জীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। জেলির থলি থেকে কয়েকদিনের ভেতরই ছোট ছোট ব্যাঙাচির আবির্ভাব হতে থাকে।

জলচর ব্যাঙাচির জীবন ৫০ থেকে ৬৫ দিন পর্যন্ত। এইবার সে ডাঙার দিকে লাফিয়ে এগিয়ে যায়। সহজাত এই উলম্ফন বিদ্যার কৌশল পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, এই ক্ষুদ্র জীবটির পেছনের পায়ের মাংসপেশীর এত শক্তি যে এক লাফে সে তার দেহের মাপের কুড়িগুণ দূরে গিয়ে নিরাপদে পৌঁছায়। এই সময়টা এদের জীবনের সবচেয়ে সংকটময়। চঞ্চল ব্যাঙশিশুরা ডাঙার দিকে নজর দিলেও জলজীবনের কথা ভুলতে পারে না। আকাশে মেঘ সঞ্চার হওয়া মাত্র আসন্ন মেঘ বর্ষণের আনন্দে ঘাসের নীচে, পাতার নীচে আড়ালে আবডালে গর্তে যে যেখানে থাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। তখনও বহিঃশত্রুর সঙ্গে পুরো পরিচয় হয়নি—অসতর্ক আনন্দে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সংগীতে মত্ত হয়ে ওঠে—আর সেই সুযোগে মাংসলোভী পাখী, তাদের গলাধঃকরণ করতে শুরু করে দেয়।

ব্যাঙ-এর ডাক বা দাদুরী সঙ্গীত দাদুরীজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গোধূলীর আলো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো শ্রীযুক্ত পুং দাদুরী দীর্ঘতালে তার সংগীত সুরু করেন। বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ-এর বিভিন্ন সুর এবং বিভিন্ন তান মান। কোন কোন জাতের ব্যাঙ-এর ডাক অতি কর্কশ কটকটে বেসুরো আওয়াজে শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করে। আবার কোন কোন জাতের ব্যাঙ-এর বিলম্বিত লয়ে এমন তাল দিয়ে

সমবেত সংগীতরস সৃষ্টি করতে পারে যে দেখা গেছে অনিদ্রারোগগ্রস্ত রোগী পর্যন্ত সে সংগীতে মধুর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে। আসলে এই সমবেত দাদুরীসংগীত একঘেয়ে এমন একটি আওয়াজ যাতে উত্তেজিত স্নায়ু আপনাআপনি শান্ত হয়ে আসে—স্নায়ু আরাম বোধ করে।

ব্যাঙ-এর ডাক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে অতি ধীরে ধীরে লাজুক কণ্ঠে অল্প কয়েকটি সুর শুরু করেছে—তারপর যতই সময় যেতে থাকে এবং রাত্রি ও অন্ধকার গভীরতর হয়ে আসতে থাকে, দেখা যায় সমবেত সংগীতে বহু স্বর ও সংগীতজ্ঞ এসে যোগ দিয়েছে। তখন মুক্তকণ্ঠের উদার সংগীতে দিগ্‌বিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে—সে কি রব! সেই সমবেত রবে একক দাদুরীর বিচ্ছিন্ন কন্ঠস্বরও ডুবে যায়।

দিনের বেলায়ও এদের সংগীতের উৎসাহ কম দেখা যায় না। ব্যাঙ বাইরের আওয়াজ শুনতে পায় কিনা সন্দেহ। কারণ তার সমবেত সংগীতের সময় কর্ণপটাহ-বিদারণকারী আওয়াজ করে ধমক দিয়েও তার সংগীতের রেওয়াজ স্তব্ধ করা যায়নি। কাজেই ব্যাঙ বধির বলেই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই সংগীতউৎসবের সময় যদি আকাশ থেকে বায়ুচর কোন শত্রুর ছায়া এসে পড়ে সেই মুহূর্তে কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যে যেখানে পারে গাঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এবং আরও আশ্চর্য এই যে যে মুহূর্তে বিপদ কেটে যাবার সংকেত পায় সেই মুহূর্তেই আবার সমবেত সংগীতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার দাদুরীজীবনে এই যে এত বড় সংগীতজলসা ঘটলো তাতে একবারের জন্যেও একটি ব্যাঙ মুখ খোলে না। মুখ বন্ধ রেখেই এই সংগীতজলসা চলে। ব্যাং-এর গলার ভেতর বেলুনের মত ফুলে উঠতে পারে এমনি একটি নরম চামড়ার থলি আছে—সেইটি হাওয়া পূর্ণ হয়ে উঠলে যে আওয়াজ হয় তা থেকেই এই সংগীতের জন্ম হয়।

এমন কি ব্যাঙ, যে জলপান করে তাও মুখ দিয়ে নয়। সে তার চামড়ার ভেতর দিয়ে জলপান করে অর্থাৎ জল শুষে নেয়। শুধু যখন সে আহার্য কোন জীবকে আক্রমণ করে সেই সময় একবার মুখ খুলে তার চটচটে জিব দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে আহার্যকে চেটে এনে মুখের ভেতর পুরে ফেলে।

অন্যান্য জীব শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়—ব্যাং বায়ু পান করে। আসলে ব্যাঙ বাইরে থেকে বায়ু পাম্প করে তার হৃদপিণ্ডে নিয়ে যায়—এবং সেটা এমনভাবে নেয় যে তাতে বায়ু তার পেটে ঢুকতে পারে না। বাইরে থেকে বায়ু শুষে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় অনেক সময় সে তার শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়। ধীর ধীরে ভেতরে বায়ু টেনে নিয়ে অনেক সময় সে একটি মস্ত বলের মত ফুলে উঠতে পারে। ফলে যদি কখনও সরু চোয়ালের কোন সাপ ব্যাঙ গেলবার চেষ্টা করে তা হলে ধীরে ধীরে ব্যাংটি বাইরের হাওয়া টেনে নিয়ে নিজেকে এমন ফুলিয়ে তুলতে পারে যে সাপ তখন হয় তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় নচেৎ তারই মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাপও এ বিষয়ে খুব সেয়ানা। সে ব্যাঙটি ধরেই তার সেই ফুলে ওঠার বেলুন যন্ত্রটি তীক্ষ্ম দন্তাঘাতে ফুটো করে দেয়।

অন্যান্য অনেক জীবের মত ব্যাঙ-এরও খাবার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তখন তার ক্ষিধে পায় না। তবে তার জীবনে সবচেয়ে বিপদ এই যে সে স্থির অচল কোন বস্তুকে ধরে খেতে পারে না সচল বস্তু ব্যতীত তাকে অভুক্ত থাকতে হয় একটি দেশলাইর কাঠি বা পেন্সিল তা সামনে নাড়া-চাড়া করলে ব্যাঙ তার জিহ্ব আস্ফালন করে তাকে ধরতে আসে কিন তার চারপাশে তারই খাদ্য হিসাবে স্থি অচঞ্চল পোকা-মাকড় থাকলে সে তা ধরবা জন্যে ব্যস্ত হয় না। ফলে অনেক সম তাকে চারদিকে খাবার থেকেও অভুক্ত থাকে হয়। কোন ক্রমেই ব্যাং-এর এই চলন বস্তুকে ধরে খাওয়ার অভ্যাস পরিবর্ত করান যায়নি। যা নড়াচড়া করে তা ব্যতী সে কিছু খেতে পারে না। চোখ দিয়ে ব্যা তার খাদ্যতালিকা বেছে নেয়।

জল ও স্থলে তার গতিবিধি ে রয়েছেই, এমন কি কোন কোন ব্যাঙ গাছে চড়ে। গেছো ব্যাং বেশ অনেকটা উঁচু থে মাটিতে অক্ষতভাবে লাফিয়ে পড়তে পারে

অত্যন্ত কুঁড়ে এই জীবটি। শী ঘুমেই এর জীবনের ৪ ভাগের ৩ ভা কাটে। পরখ করে দেখা গেছে সামান্য একা প্রয়াস লাগে এমন কাজটুকু করতেও ব্যা কোন উৎসাহ দেখায় না—ব্যাং যেন জন্ ক্লান্ত।

কিন্তু এই অলস জীবটি মানুষের ব উপকারে আসে। এই জীবটি চাষীর ব অন্তরঙ্গ বন্ধু। শস্যক্ষেত্রের পোকাজাতী যত শত্রু আছে ব্যাঙ তাদের সকলের শত্রু একে একে এই শত্রু ধ্বংস করে ব্যাং চাষী যে কত উপকার করে তার একটা হিসে পর্যন্ত সংখ্যাতত্ত্ববিদরা করে ফেলেছেন গরমের সময়ের তিন মাসের ভেতর এক একটি ব্যাঙ ১০,০০০ শস্যশত্রু কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে। এই হিসেব ধরে একটি ব্য কতটা শস্য রক্ষা করে তারও হিসেব হয়েছে তাছাড়া ব্যাঙ-এর দেহের উপর বহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়ে থাকে। কোন কোন জাতীয় ব্যাং-এর মাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চীন দেশে ও ফরাসী দেশে ব্যাঙ-এর মাংস প্রসিদ্ধ খাদ্য। কোন কোন রাঁধুনী এই ব্যাঙ-এর মাংস রান্না করে প্রসিদ্ধ সুপকার হিসাবে য়ুরোপ আমেরিকার হোটেলজগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন এবং আজও য়ুরোপ আমেরিকার খাদ্যতালিকায় ব্যাঙ প্রথম স্থান অধিকার করে আছে।
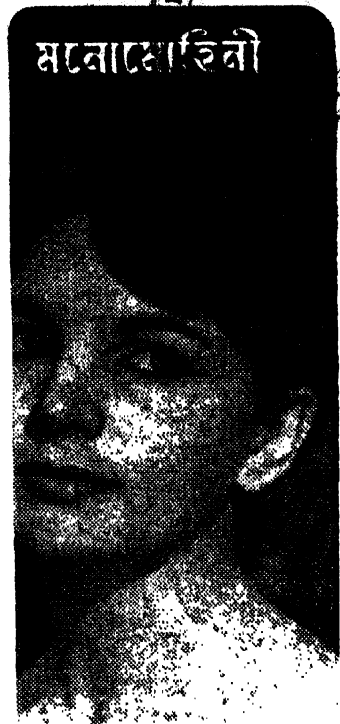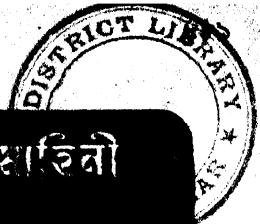
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বরবর্ণিনী

গয়া

মনোমোহিনী

দীর্ঘাকার
নতুন
আধারে
নতুন
ফর্মুলায়
তৈরী
মিহি মৃদুল
ট্যাল্‌কম

সুবাসিত ট্যাল্‌কম প্রস্তুতকারক
গয়া
প্যারিস
লণ্ডন
নিউইয়র্ক
AGC-4 BEN

পূজার অভিনন্দন
ROHTAS
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ
লিমিটেড
ডালমিয়ানগর (বিহার)
নির্মাতা
কাগজ ও বোর্ড
ভালকানাইজড্ ফাইভার শীট
সিমেণ্ট ও অ্যাসবেসটস
সিমেণ্ট। বনস্পতি।
চিনি। রাসায়নিক দ্রব্য।
ম্যানেজিং এজেণ্টস : সাহু জৈন লিঃ
১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

ষষ্ঠ বর্ষ
২য় খণ্ড

২৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 21st October, 1966. শুক্রবার, ৪ঠা কার্তিক, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

বেতারশ্রুতি

সবিনয় নিবেদন,

আকাশবাণী কলকাতার কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানসূচী নির্ধারণ করার সময়, সেটা উৎসাহী শ্রোতাদের কাছে কতটুকু গ্রহণ-যোগ্য হবে, সে-বিচারে অযথা কালক্ষেপ করা অনর্থক বলেই হয়তো মনে করেন; তা না হলে কিছুদিন পর পর তাঁদের অনুষ্ঠান-পরিচালনার ক্ষেত্রে সংযোজিত অভিনব জিনিসগুলো অগণিত শ্রোতার বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হ'ত না বলেই মনে হয়।

এটা সুবিদিত যে বিবিধ ভারতী, রেডিও সিলোন ইত্যাদির আনুকূল্যে হিন্দী ছায়াছবির গান যথেষ্ট প্রচারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ "জয়মালা", "মনোরঞ্জন", "মন্-চাহে-গীত", "বিনাকা গীতমালা" ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, হিন্দী ছায়াছবির গান প্রচারিত হবার এতগুলো মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও (রেডিও সিলোনের অনুষ্ঠানগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি) বাংলাদেশের বেতার কেন্দ্র থেকে হিন্দী ছায়াছবির গান প্রচার করার জন্য কর্তৃপক্ষের এত আগ্রহ কেন? বাংলা ছায়াছবির গান যখন সপ্তাহে একদিনের বেশী প্রচার করা "অসম্ভব" ব'লে কর্তৃপক্ষ মনে করেন, তখন তাঁরাই "চিত্রগীতি" নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রোজ আধঘণ্টা ধরে হিন্দী ছায়াছবির গান প্রচার করে চলেছেন! সত্যি সেলুকাস !

নমস্কারান্তে—
চন্দনকুমার ভট্টাচার্য,
কলকাতা—২৬।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ও ৭ই অক্টোবর তারিখের সাপ্তাহিক অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগের "বেতারশ্রুতি" শিরোনামায় প্রকাশিত পত্র দুটি পড়েছি। পত্রলেখকদ্বয়ের বক্তব্য, কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত "অনুরোধের আসরে" গায়কের নাম ঘোষণার সঙ্গে গীতিকার ও সুর-কারেরও নাম ঘোষণা করে তাঁদের প্রতি সুবিচার করা উচিত। কিন্তু তাতে কি অনুষ্ঠানটির নামগত উদ্দেশ্য কিছুটা ব্যাহত হবে না? এতে 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া' হবে। 'অনুরোধের আসরে' শ্রোতাদের পছন্দ-করা রেকর্ডগুলি বাজিয়ে তাঁদের আনন্দ দেওয়াই অনুষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 'অনুরোধের আসর' একটি প্রচার অনুষ্ঠান নয়। তাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গায়ক, গীতিকার বা সুরকার, কার নাম প্রচার হল—সে বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে অনুষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য যাতে আরও সাফল্যের সহিত প্রচারিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টিপাত করাই কর্তব্য।

আমার অনুরোধ, গীতিকার বা সুর-কারের নাম ঘোষণা করা দূরে থাক, অনুরোধকারী শ্রোতাদের নাম ঘোষণা করাও অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। ফলে অনুষ্ঠানটি আরও আনন্দদায়ক হবে—আরও অনেক বেশী বাছাই করা গান শুনতে পাব বলে।

বিনীত
কালীপ্রসন্ন ঘোষ
শিলিগুড়ি

লোকসংস্কৃতির পাতায় : পুরুলিয়া

সবিনয় নিবেদন,

গত ২১শ সংখ্যা (২৩-৯-৬৬) 'অমৃতের' চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীতারাপদ রায়ের আলোচনা পড়লাম। পড়ে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। স্বভাবতঃই মনে কতকগুলো প্রশ্ন জেগেছে আমাদের অঞ্চলের (ইচ্ছাগড়, চাণ্ডিল, সেরাইকেলা, বলরামপুর) লোকেদের মনে। আমরা শ্রীরায়ের কতকগুলো অযৌক্তিক উক্তির উদ্ধৃতি এবং তার আলোচনা এখানে পাঠকদের অবগতির জন্য পরিবেশন করলাম :—

(১) 'পুরুলিয়া জেলার আদি সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি (লেখিকা করবী রায়চৌধুরী) নিজেও যেন খুব সঠিক নন।' —এই উক্তি তাঁর নিজেরই (শ্রীতারাপদ রায়ের)। তারপর তিনি নিজেই স্বীকার করছেন—'আদি লোকসংস্কৃতির মধ্যে কেবল টুসু, ভাদু, ঝুমুর ও ছো নাচই পড়ে।' আলোচনায় 'বাকী যেগুলো' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না।

(২) আদি রূপ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'দেবীর (টুসুর) কোনো মূর্তি নেই।' কিন্তু আমাদের এধারে প্রতি অঞ্চলেই টুসুর মূর্তি আছে। মূর্তি না হলে এখানের মেয়েরা পুজোই করে না।

(৩) তিনি লিখেছেন, 'টুসুর পুজোতে বাজনা নেই।' আমাদের এ অঞ্চলে অধিকাংশ জায়গাতেই বাজনা আছে।

(৪) ঝুমুর সম্বন্ধে লিখছেন, 'নাচও নয়, গানও নয়, বাজনাও নেই, তাল-লয়-মান নেই।' একথাটা আমরা একেবারেই মেনে নিতে রাজী নই। কারণ তাঁর কথাতেই প্রমাণ—'এতে থাকে শুধু ভাব, ছন্দ আর প্রাণস্পর্শী মন-মাতানো আবেগ।' ভাব, ছন্দ আর আবেগ বলতে তিনি (শ্রীরায়) কি বোঝেন তা তিনিই জানেন। তবে আমরা এটুকু নিশ্চয়ই বলব যে, ভাব, ছন্দ আর আবেগ এই তিনটি—তাল-লয়-মান থেকে পৃথক বস্তু নয়। আর যেখানে তাল-লয়-মান থাকবে সেখানে নাচ, গান ও বাজনা থাকা অনিবার্য। আমরা বলব—শ্রীরায় ঝুমুর নাচ কোনদিন দেখেননি এবং ঝুমুর গান কোনো-দিন শোনেন নি। নতুবা তিনি অমন করে বলতে পারতেন না—'ঝুমুর নাচও ন[illegible] গানও নয়।'

(৫) ঝুমুর অশিক্ষিত সরল ম[illegible] আবেগময় কণ্ঠের স্বতঃস্ফূর্ত সুর।' জ[illegible] না তিনি 'অশিক্ষিত' বলতে কি বোঝা[illegible] চেয়েছেন। ঝুমুর গানের ভাব, ভাষা[illegible] ছন্দের (অনুপ্রাস!) দুটি নমুনা ন[illegible] দেওয়া গেলো :—

(ক) উজ্জ্বল ঊষা ভাতিল, ফুলরে[illegible]
অলি মাতি[illegible]
বহিল অনিল শীতল, পাখী প্রভাতে
গাহিল গাছে।
আর কি রজনী আছে গো—আর কি
রজনী আ[illegible]
আসার আশে বিড়ম্বনা রে সজনি! আর
রজনী আ[illegible]
—দুর্যোধন জন্[illegible]

(খ) তোমায় বিদায় দিয়ে ধনি।—
আর কেমনে রহিব আমি [illegible]
কেমনে জুড়াবে আঁখি অদর্শনে [illegible]
যাবে তো বলে দিয়ে যাও দশা কী [illegible]
গতি কি হবে মোর॥
—রামকৃষ্ণ [illegible]

(ক) চিহ্নিত সংগীত যদিও [illegible] রসধর্মী—তবু এতে বিরহজনিত [illegible] রসের ছাপ আছে, অনুপ্রাস ছন্দে গভীর ভাব এবং ব্যঞ্জনাময়!

(খ) চিহ্নিত সংগীতও শৃঙ্গার রস[illegible] হলেও তা বিরহজনিত, অপূর্ব ছন্দের এবং গভীর ভাবময়!

উক্ত কবিদ্বয়কে—আমরা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের চেয়ে কোনো অংশেই হীন করি না বা শ্রীরায় কথিত 'অশিক্ষিত' করি না—কেউ তা মনে করতে পারে[illegible]

(৬) পরিশেষে ছো নাচ সম্বন্ধে বলেছেন, 'এতে গানও নেই, ভাষাও [illegible] —আমরা সে কথা মানতে একেবারেই [illegible] নই—তা আদি রূপই হোক বা আধু[illegible] রূপই হোক। বর্তমানে আমাদের এ অ[illegible] এবং সিল্লী, ঝালদা, বাঘমুণ্ডি, [illegible] (পাতকুম), পটমদা, ধলভূম, সেরাইকেলা খোরসোয়ান রাজ্যে আদি ও আধুনিক রূপই বর্তমান আছে। অবশ্য আ[illegible] রূপটি সেরাইকেলা রাজ্যের নিজস্ব [illegible] তবু সমস্ত সীমান্ত বাংলা, বিহারের [illegible] অঞ্চল এবং উড়িষ্যার কতক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। (এ বিষয়ে ২৯শে জ[illegible] ১৯৬৬ 'অমৃতে'—সন্তোষকৃষ্ণ [illegible] আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

বলছিলাম আদি ছো নাচেও গান আ[illegible]

পরিশেষে আমরা লোকসংস্কৃ[illegible] পাতায় : পুরুলিয়া'র লেখিকা করবী চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিনীত—
সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত—টিকর (সিংভূ[illegible]
উকিল দিব্যেন্দুগোপাল বর্গা[illegible]
বি-এস-সি, বি-[illegible]
সেরাইকেলা (সিংভূ[illegible]

স্বাগত শারদোৎসব

সারা বৎসরের প্রতীক্ষা এই দিনটিতে এসে শেষ হল। দুর্গোৎসবের এই আনন্দময় দিনগুলির জন্য বাংলা দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। শরৎকালের সুন্দর পরিবেশের সঙ্গে এই উৎসব তার আনন্দের আবেদন নিয়ে মিশে যায় এক উজ্জ্বলরূপে। যত দুঃখই থাকুক, যত আশাভঙ্গের বেদনাই মন ভারাক্রান্ত করে রাখুক না কেন, শারদোৎসবে যেন নতুন যাত্রা, পিছনের অশ্রুসিক্ত দিনগুলি ভুলে আলোকিত উচ্ছল দিনের জন্য প্রার্থনায় এই উৎসব ভরপুর। দুর্গোৎসব সে-কারণেই বাঙালীর জাতীয় উৎসব।

ভারতের নানা স্থানে এই ধরনের উৎসব আছে। উত্তর ভারতে আছে দশেরা, পশ্চিম ভারতে নবরাত্রি, দক্ষিণে ওনম্—কিন্তু বাঙালীর দুর্গোৎসব আমাদের জাতীয় চেতনার সঙ্গে মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে। এর কোন বিকল্প নেই। ধর্মের সঙ্গে জীবনের এমন সুগভীর একাত্মতার জন্যই দুর্গোৎসব বাংলা দেশের সমাজ জীবনের সর্বাংশে আনন্দ, আশা ও সমৃদ্ধির প্রতীক হয়ে আছে।

লৌকিক চিন্তায় আমরা দুর্গোৎসবকে একটি বিশেষ ঘরোয়া রূপ দিয়েছি। তিনি শক্তিরূপিণী, সর্বঅমঙ্গলনাশিনী জগন্মাতা। বাঙালীর চিন্তায় তিনি মাতা এবং কন্যা দুই-ই। আশ্বিন মাসের এই সময়ে বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে শোনা যায় আগমনীর গান। এই গান বাঙালীর নিজস্ব। আপনার মনের মাধুরী দিয়ে এই প্রতিমা নির্মাণ করে গেছেন আমাদের ভক্ত কবির দল, তাঁরা সাধক এবং কবি। তাঁরা বলেনঃ "শরতের বায়ু যখন লাগে গায়, উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়। যাও যাও গিরি আন গে উমায়, উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই।" বাঙালীর ঘরে দুর্গা হয়েছেন উমা, মহেশ্বর হয়েছেন দীনদরিদ্র আত্মভোলা শিবঠাকুর। এই লোকায়ত ধ্যানেই উমার আগমন বাংলা দেশে এমন মধুর, এমন অশ্রুসজল এবং এমন হৃদয় আকুল করা। এতো বাঙালীর ঘরেরই চিত্র। সম্বৎসর পর কন্যা আসছেন পিতৃগৃহে। অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীদান করে সেকালে বাঙালী জননীর যে উদ্বেগ আকুলতা থাকত কন্যার জন্য উমার কাহিনীতে তারই প্রতিবিম্বন দেখি আমরা। পিতামাতার আদরের সন্তান, বিবাহ হয়েছে এক আত্মভোলা মানুষের সঙ্গে। জননী আকুল হয়ে থাকেন, পিতা 'আজ যাই, কাল যাই' করে বিলম্ব করেন। অবশেষে উমা সন্তান-সন্ততিসহ উপস্থিত হন পিত্রালয়ে। কোন রূপে তিনি আমাদের কাছে প্রিয়? এর উত্তরও পাই ভক্ত কবির রচনায়। তিনি বলেন ঃ "উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হইল, হিমগিরি সত্য বল, কর ছল পতি হ'য়ে।"

বাৎসল্য রসই আমাদের হৃদয়কে আপ্লুত করে রেখেছিল। তাই বাংলা সাহিত্যে গিরিকন্যা উমা, মাতা মেনকা এবং পিতা গিরিরাজের কাহিনী এত জনপ্রিয়। বৈদিক দেবাদিদেব মহেশ্বর এদেশে হয়েছেন শ্মশানে-মশানে ভ্রাম্যমান ভোলা মহেশ্বর। তাঁর চাল নেই, চুলো নেই। সম্পদে নেই আসক্তি। কিন্তু প্রেমিক মানুষ তিনি। পত্নীর জন্য ভালবাসা, সন্তানের জন্য স্নেহ-মন্দাকিনীর স্রোত তাঁর বক্ষে নিয়ত প্রবাহিত। ক্ষণেকের জন্যও তিনি উমাকে চোখের আড়াল করতে পারেন না। তাই অনাহূত হয়েই যেন তিনি উমার সঙ্গে এসে হাজির হন। অপেক্ষা করে থাকেন, কবে উমার পিতৃগৃহবাস হবে শেষ। কবি বলেন ঃ "ঐ দ্বারে বাজে ডম্বুর, হর বুঝি নিতে এল। নবমী না পোহাইতে অমনি এসে দেখা দিল। শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়, আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল।"

এই ধ্যান-ধারণাই দুর্গোৎসবকে আমাদের দেশে লোকায়ত প্রেরণার উৎস করে তুলেছে। তাছাড়া শক্তিস্বরূপিণী বলে দেবী দুর্গাকে জাতীয় শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে চিহ্নিত করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেশমাতার সঙ্গে তিনি অভিন্ন। তাই আমাদের জাতীয় চেতনা উদ্বোধনে এবং দেশপ্রেমের বিকাশেও 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'ই ছিল মূলমন্ত্র। এই শক্তির আরাধনা আসলে আত্মশক্তিরই উদ্বোধন। অকল্যাণের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই শক্তি উদ্যত প্রহরণ নিয়ে সদাজাগ্রত থাকুক। আমাদের জীবনে যে সংকট আজ ঘনায়মান তা থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে আত্মপ্রত্যয়ই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শক্তিহীনের কাছে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে যদি আত্মমর্যাদা রক্ষার শক্তি না থাকে।

আমাদের জীবনে যত দুঃখই থাকুক, একে ভুলে গিয়ে সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই আজকের এই উৎসবের আয়োজন। এই উৎসবে সবার সমান আমন্ত্রণ। যে সমাজের স্বপ্ন আমরা দেখি, বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় যে আদর্শের বাণী একদিন উদ্গীত হয়েছিল এই দেশের মাটিতে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কঠোর এবং কঠিন ব্রত আজ জাতির সামনে। শক্তিরূপিণী মাতার আবাহন মন্ত্রে সেই ব্রত আজ সার্থক হোক, উজ্জ্বল হোক।

পরিচিত চরিত্র

হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

মানুষের চরিত্র বৈচিত্র্যের প্রধান হেতু দুটি: প্রথম সে যে পারিপার্শ্বিক এবং পটভূমিতে জন্মেছে এবং দ্বিতীয় হল তার জীবনের ধাতু ও প্রবণতা। প্রথমটা তৈরী হয়েই থাকে, সমাজ রাষ্ট্র তৈরী করে রেখে দেয়; দ্বিতীয়টা তৈরী করে দেয় মহাপ্রকৃতি; তার বংশানুক্রম থেকে সংগ্রহ করে গুছিয়ে সাজিয়ে দেন তিনিই: চরিত্রের সবটাই যেন ঠিক হয়ে থাকে।

রাধাদা বাড়ীর ছোট ছেলে। এবং সে ওই পটভূমিতে জন্মেছিল, যে পটভূমির কথা আগে বলেছি। অত্যন্ত সমাদরের সন্তান। বাড়ীর বাপ-মা, ভাই-বোন, বড় ভাজ দুজনের দুলাল। লোকে পরবর্তীকালে বলেছে—অত্যধিক সমাদরে রাধাদা এমনি একটি অদ্ভুতচরিত্র মানুষ হয়ে দাঁড়াল, দুনিয়ার মূল্যের নিরিখে যে মানুষের মূল্য কষলে এক কানা কড়িও হয় না, এবং যে নাকি দুনিয়ায় এসে নিজের জীবনটা অপব্যয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার আশেপাশে যারা ছিল এবং যারা ঘটনাচক্রে এসেছে তাদের জীবনেও এই অপব্যয়-অপচয়ের হাওয়া কিছুটা-না-কিছুটা লোকসান করে দিয়ে গিয়েছে।

আমাদের ইস্কুলের প্রথম ছাত্র রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায়। পুরনো আমলের ভর্তির খাতা আছে, তাতে প্রথম নামটি রাধাদা'র। রাধাদা এই স্কুলে বছর সাত-আটেক পড়েছে, তাতে সে আগেকার ফিফথ ক্লাস, এখনকার ক্লাস সিক্সের বেশী ওঠে নি; ভর্তি হয়েছিল বোধহয় ইউ-পি ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস থ্রি বা ফোরে। অর্থাৎ ছ-সাত বছরে দুটো কি তিনটে ক্লাস সে উঠেছিল। সে ওঠা স্বাভাবিক ওঠা নয়, এর জন্য ইস্কুলে একটা নতুন নিয়ম হয়ে গেল। সে নিয়ম জারী করে দিলে রাধাদা'ই। এক ক্লাসে দু বছর থেকে তৃতীয় বছরে সে নিজে থেকেই উপর ক্লাসে গিয়ে বসল এবং বললে—এক ক্লাসে কেউ দু বছরের বেশী পড়তে পারে না, পাবেও না। মাস্টারেরা হাসলেন। তবু রাধাশ্যাম প্রতি বছর প্রাইজ পেয়েছে। সে প্রাইজ এ্যাটেন্ড্যান্স প্রাইজ। আর একটা সার্টিফিকেট রাধাদার ছিল; সেটা ড্রিল মাস্টার দিয়েছিলেন—"রাধাশ্যাম ড্রিলে ভাল।"

কালটা অবশ্য অনেক পুরনো—১৯০২।৩।৪ সাল, কিন্তু তাহলেও রাধাদার এই আচরণকে কেউ উদ্ধত আচরণ বললেন না, বা ক্রুদ্ধ হলেন না। কোথায় একটা আশ্চর্য মাধুর্য ছিল এই মানুষটির মধ্যে। সে যে-দুলালপনাই করেছে, তাই তাকে মানিয়েছে এবং অন্য মানুষেরা সস্নেহে মেনেছে!

কেউ কেউ বলত পাগল। তাই হয়ত খানিকটা সত্য। রাধাদা তামাক খেতে ধরেছিল আট-দশ বছর বয়সে। পকেটে সিগারেট থাকত, বিড়ি সে খেত না। তামাকের আড্ডার আড্ডাধারী ছিল সে। তার বৈঠকখানাতেই গ্রামের থিয়েটারের রিহার্স্যাল রুম ছিল, বাজনা শেখাবার, গান শেখাবার ওস্তাদের আড্ডা ছিল। তাসের দাবার পাশায় আড্ডা ছিল, সেখানে হুঁকো ছিল পাঁচ-ছটা, তাছাড়া দুটো গড়গড়া, তামাক সেখানে দৈনিক এক সেরেরও বেশী পুড়ত; রাধাদা একটা গড়গড়ার কণ্ঠে নল লাগিয়ে সেইটেই হাতে নিয়ে রাস্তায় বের হত, বেড়াত। বৃদ্ধ বাপও তাকে তাঁর কাল হুঁকোটা রাখতে দিতেন, নাও রাখ। হুঁকোর মাথায় থাকত ধূমায়মান কল্কে।

রাধা পিছন ফিরে তামাক টানতে বসত।

রাধাদা ক্লাস সিকস থেকে পড়া ছেড়েছিল, বাপ বলেছিলেন—দরকার নেই পড়ে; এক রাত্রে আমি তোকে সব শিখিয়ে দেব। সেই রাত্রিটার ভরসায় রাধাদা নিশ্চিন্ত হয়ে ইস্কুলোত্তর জীবনের দৈনন্দিন কার্যবিধির এক ছক ছকে নিয়েছিল। একটু ভুলই বললাম, ছকটা তার ছকাই ছিল, সেটা এবার সাধারণ্যে পাসড্ হলে ডিক্লেয়ারড হল সেদিন।

ভোর রাত্রে চারটে সন্দেশ খেয়ে আবার খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে রাধা উঠত পাঁচটার সময়; এবং বাসিমুখেই চা খেত। এক কাপ, দু কাপ, তিন কাপ খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার চা, আবার চা, আবার চা, স্নান করবার আগে, ভাত খাবার পরেই চা, বেলা আড়াইটে থেকে আবার শুরু হত চা-চা-চা, আবার চা, আবার চা।

পঁচিশবার-তিরিশবার - চল্লিশবার চাও খেত রাধাদা। সারা জীবন খেয়েছে।

তামাক সিগারেটও ওই হারে এবং বাপ তাকে হুঁকো দিতেন, আগেই বলেছি, সেই নজীরে এবং সেটা একটা বিচিত্র কালও বটে, সেই কালের নজীরে রাধাদা'র পিতামহ সম্পর্কিত যারা তারাও তাকে হুঁকো দিত, এবং রাধাদা'ও তার ভাই থেকে ভাইপো এবং ভাইপো থেকে নাতি সম্পর্কীয় যারা তাদেরও হুঁকো দিয়ে বলত—নে, খা!

আমাদের গ্রামের অতিপ্রাচীন জমিদার বংশ সরকার বংশ। মুসলমান আমল থেকে সরকার বংশের ইতিহাস। ব্রাহ্মণ সরকারেরা। এঁরাই যত বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জে চাটুজ্জে প্রভৃতিদের এনে বিবাহ দিয়ে, সম্পত্তি, বাড়ীঘর করে দিয়ে বাস করিয়েছেন। এই বংশের 'কুলদাপ্রসাদবাবু' সে আমলের একজন প্রবীণতম এবং অতিমাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। বয়সে রাধাদা'র বাবা অন্নদাবাবুর বয়সী, কিন্তু সম্পর্কে তিনি অন্নদাবাবুর অর্থাৎ রাধাদার বাবার পিতামহ ছিলেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মানুষ ছিলেন এবং কুশলী বিষয়ীও ছিলেন। ভাষা ছিল অতিসুন্দর, সে না হোক একালের কিন্তু তার এমন একটা ছন্দ এবং এমন একটা ব্যঞ্জনা ছিল, যা একালেও অচল নয়।

এঁর ছোট ছেলে যতীন্দ্রনাথ ছিল রাধাদার সমবয়সী, বন্ধু; রাধাদা তাকে বলত কাকা, যতীনকাকা। এবং তার বাবা কুলদাবাবুকেও বলত কাকা; বলত কুলদাকাকার ছেলে যতীনকাকা।

কুলদাবাবু সস্নেহে তার পিঠে চাপড় মেরে বলতেন—নে, হারামজাদা, তামাক খা। অথবা বলতেন—কই একটা বার্ডসাই দে!

আমাদের গ্রামে একটি বাড়ী ছিল, যাদের আয় বছরে সেকালে দেড় লক্ষ-দু লক্ষ টাকা ছিল। তাঁরা কয়লাখনির মালিক এবং বড় জমিদারও বটেন। তাঁরাই গ্রামে হাইস্কুল, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। থিয়েটারও তাঁদের বড়ীর ছোটছেলে নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে। কিন্তু রাধাদাদের বৈঠকখানাতেই ছিল মহল্লার আড্ডা; দৈনন্দিন আড্ডা। গান-গেয়ে নায়িকার পার্টের জন্য দুজন-তিনজন তরুণ ছিল মাইনে-করা; তারা রাধাদার ছিল অন্তরঙ্গতম। রাধাদা নিজে তোতলা ছিল, পার্ট করতে পারত না, কিন্তু থিয়েটারে যে নাটকই হোক, সে নাটক তার মুখস্থ হয়ে যেত। কলকাতায় যাতায়াত ছিল ঘন-ঘন। গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃত বোস, অমৃত মিত্তির, মহেন্দ্রবাবু, বেলবাবু, বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, অমর দত্ত, কুসুমকুমারী সবার অভিনয় রাধাদা দেখেছিল। থিয়েটারে বই নির্বাচনের দিন থেকে অভিনয়ের দিন পর্যন্ত অক্লান্ত উৎসাহে থিয়েটারের দলের কাজ করত, কিন্তু থিয়েটার কখনও করে নি।

দীর্ঘ দিন অন্তত দশ-বারো বছর নীলরতনবাবুর মত শিক্ষক বাড়ীতে থেকে

রাধাদাকে কিছু ইংরিজী শেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু রাধাদা ইংরিজী শেখেন নি।

সাত আট বছর বাজিয়ে ওস্তাদ রেখে বাজনা শিখতে চেয়েছে রাধাদা, কিন্তু তাল শুদ্ধ রেখে বাজাতে সে কখনও পারে নি।

রাধাদার বিয়ে হল গ্রামেরই 'চারুচন্দ্র-বাবুর ভাগ্নীর সঙ্গে। যখন বিয়ে হয়, তখন রাধাদা'র বয়স ১৬।১৭, রাধাদা মারা গেছে ৩০।৩২ বৎসর বয়সে; বিবাহিত এই ১৪ বা ১৬ বৎসরের মধ্যে রাধাদা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করে নি। শ্বশুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের বাড়ীতে তারা স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে শুয়েছে; আমাদের বাড়ীতে আমার পিসীমা ভিক্ষেমা হিসেবে ছেলে-বউকে এক ঘরে শুইয়েছে, কিন্তু নিজের বাড়ীতে সারাটা জীবনের মধ্যে রাধাদা'র এবং তাঁর স্ত্রীর এই ভাগ্য হয় নি। বরাবর রাধাদা তাঁর বাপের কাছে শুয়েছেন। এর থেকে ধারণা হতে পারে রাধাদা'র পরদারে আসক্তি ছিল; কিন্তু না। সে তার ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে কলহ তার কখনও হয় নি, দুণাক্ষরে শুনি নি, টের পাই নি। স্ত্রী তাঁর দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। একবার আপিং খেয়েছিল, একবার সে এক ভীষণতম পন্থায় মরতে চেষ্টা করেছিল, গরুর জন্য খড়কাটা বঁটি দিয়ে নিজের গলা কাটতে চেষ্টা করেছিল। খাদ্যনালীটা গোটাটাই কেটে ফেলেছিল। কিন্তু আশ্চর্য তার জীবনীশক্তি, অথবা ভাগ্যের দুর্ভাগ্য যে, মৃত্যু তার হয় নি, বেঁচে সে উঠেছিল, সেকালের একটি গ্রামের মধ্যে সাধারণ এক-জন এল-এম-এফে'র চিকিৎসায়।

এখানে আরও আশ্চর্যের কথা বলি, বৌদি অর্থাৎ রাধাদার স্ত্রীর বা তার বাপের বাড়ীর কারুর কোন অভিযোগ ছিল না রাধাদার বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল তরুদির ননদের উপর।

রাধাদাকে তাঁর মামাশ্বশুর গ্রামে একটা ওষুধের দোকান করে দিয়েছিলেন। রাধাদা'র তা থেকে উপার্জন মন্দ হত না, ভালই হত। ডিসপেনসারি রাধাদা সাত-আট বছর চালিয়েছিল কিন্তু সারা জীবনে কম্পাউণ্ডিং তার শেখা হয় নি।

রাধা সকালে উঠে চা খেয়ে দোকানে আসত। এসেই লোক পাঠাত একসাইজ শপে। এক টাকার গাঁজা তখন বোধহয় এক ভরি, সেই এক ভরি গাঁজা আনিয়ে ডাক্তার-খানার খলে ছেঁচে সুগন্ধি তামাকের সঙ্গে এবং সিগারেটের মিক্শার টোবাকোর, সঙ্গে মিশিয়ে রাখত এবং রাস্তার লোকজন, সে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত যাকে দেখত, তাকেই ডেকে খাওয়াতো। নিজেও খেত এবং তাতেই ছিল তার অপার কৌতুক।

রাধাদা'র কাছে কতজনের যে গাঁজা খেয়ে মাথা ঘুরেছে এবং কে যে সেকালে তার কাছে তামাক খায় নি গ্রামটিতে, তা বলতে পারব না। এবং যে নতুন ছেলেরা তার কাছে গাঁজায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তার সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, রাধাদা এক সময় নিজে ছিল বিবেকানন্দ-ভক্ত এবং সমাজসংস্কারক। একজন পাগল ডাক্তার ছিলেন সেকালে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের পর এক সংস্কার আন্দোলন করে-ছিলেন তিনি। তাতে নেশা বর্জন ছিল প্রথম দফা। দ্বিতীয় দফা ছিল ধর্মচর্চা। বৈদিক সন্ধ্যার প্রচলন করেছিলেন। শিষ্যেরা ত্রিসন্ধ্যা করতেন। সেকালের কৌলীন্য প্রথা এবং জাতিভেদের কড়াকাড়ি ওঠানো ছিল তাঁদের অন্য কাজ। তাঁরা নূতন কুল-পরিচয় বের করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের রাঢ়ী বারেন্দ্র মৈথিলী ইত্যাদি ভেদ উঠিয়ে দিয়ে তাঁরা হয়েছিলেন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। বঙ্গমেল।

রাধাদা বেশ কয়েক বছর নেশার দিক দিয়ে শুদ্ধচরিত্র মানুষ ছিল। নারী সম্পর্কিত চরিত্রের কথা বলেছি। ত্রিসন্ধ্যা করত। পরে আন্দোলন ঘুমোল, রাধাদা ওই নেশার কৌতুকে মাতল। কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা সে বরাবর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত করেছে।

একটা প্রচণ্ড আসক্তি ছিল তার হরি-নামে ও হরিনাম সংকীর্তনে। আউল-বাউল নামসংকীর্তনের দলের লোকদের নিয়ে ছিল পরমানন্দ। বছরে গ্রামে একবার বৈশাখ মাসে চব্বিশ প্রহরব্যাপী অবিরাম হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব হত, তার উদ্যোক্তা, তার প্রবক্তা ও তার কর্ণধার ছিল রাধাদা। গ্রামে লোকের বাড়ীবাড়ী ঘুরে-ঘুরে নগদ টাকা এবং চাল তুলে এই উৎসব করত রাধাদা। কুলদাবাবু ছিলেন এর প্রেসিডেন্ট, রাধাদা ছিল এর সেক্রেটারী। আর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অকালে মারা গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের গ্রামের মধ্যমবাবু (তাই বলতাম, মেজবাবু বলতাম না)। তিনি নির্মলশিববাবুর মেজদা; পণ্ডিত, চরিত্রবান, উদার, মহৎ মানুষ ছিলেন। হরিনামেও তাঁর ভক্তি ছিল এবং রাধাশ্যামকেও তিনি ভালবাসতেন। রাধাদা'র সঙ্গে একটি আশ্চর্য হৃদ্যতা ছিল তাঁর এবং চরিত্রের এক জায়গায় মিলও ছিল দুজনের।

দুজনেই ছিলেন তোতলা, এবং দুজনেরই ছিল মারাত্মক রোগ ভয়, বিশেষ করে কলেরা বসন্তকে ভয়। কলেরাকে এমন ভয় আমি দেখি নি।

সে সময় কলেরা আমাদের দেশ জুড়ে বছরে একবার কি দুবার মহামারীর মত আক্রমণ করত। গরমের সময় পুকুরে জল শুকিয়ে আসত, সেই সময়ে বৈশাখের দুপুরে খড়ের চাল জ্বলে ওঠবার মত দপ করে জ্বলে উঠত এবং বহু জীবন শেষ করে দিয়ে থামত। বিশেষ করে বাউড়ী ডোম মুচি প্রভৃতি পাড়াগুলিতে যে অবস্থা হত তা ভয়াবহ। এক-একটা বাড়ীর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যেত। তারপর বাড়ীর চালের খড় উড়ত ঝড়ে, দেওয়াল পড়ত জলে এবং অবশেষে একটা মাটির ঢিবি হয়ে পড়ে থাকত। এবং মৃত্যু হত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। ১৯০৬।৭ থেকে ১৯২৪।২৫ পর্যন্ত এইটে ছিল বৎসরের ঋতুচক্রের ফলের মত একটা নিয়মিত ফল।

রাধাদা অনন্ত খবর। কোথাও শুনেছে, পাশের গ্রামে কি এই গ্রামেই কোন একজন লোকের বারতিনেক দাস্ত এবং দু-একবার বমি হয়েছে, অমনি হন-হন করে এসে বাড়ী ঢুকত রাধাদা; পথেই পড়ত অতুলবাবুর আসর, তিনি রোয়াকের উপর খালি গায়ে গড়গড়ার নল মুখে অমৃতবাজার পত্রিকা পড়ছেন। রাধাদা থমকে দাঁড়িয়ে বলত—ম-ম-মধ্যমবা-বা-বু।

—র-র-রাধাই! ক্ ক্ ক্ কি-কি-ব্ ব্ ব্যাপার?

—চো-লো-লো লা গল।

কি লাগল বলতে হত না। প্রশ্ন করতেন কার এবং কোথায় এবং কবার। তারপর আপিংয়ের কৌটো খুলে এক ডেলা আপিং মুখে ফেলে জল খেয়ে নিতেন এবং ঘরে ঢুকতেন। লোকটা মারা গেলে বা আর এক-আধজনের হওয়া সংবাদ পেলেই রাধাদা গ্রাম থেকে ব্যাগ নিয়ে গরুর গাড়ী চেপে চলে যেতেন মামাশ্বশুরের কাছে, ঝরিয়া বা ধানবাদ অথবা কলকাতা। মধ্যমবাবুর জুড়ি বেরিয়ে যেত, সিউড়ি বা আমদপুর, সেখান থেকে কলকাতা। পালাতেন সর্বাগ্রে এঁরা। এবং যাবার আগে রাধাদা যাদের ভালবাসতেন তাদের হাতে ধরে বলতেন—থে থে-থেকো না। এ-এ-এর ম-ম মধ্যে থেকো না।

যাক হরিসংকীর্তনের কথা বলছিলাম। হরিনামে রাধাদা'র একটি নিবিড় বিশ্বাস এবং ভক্তি ছিল। এই মহোৎসবটি সে সমস্ত জীবন করিয়েছে।

এই নামযজ্ঞের মধ্যে রাধাদা নাম করত, সমস্ত বন্দোবস্ত করত, বহু লোকের

ঘোষণা

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় ধারাবাহিক রচনাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। সেগুলি আগামী সংখ্যা থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

জন্য রান্নাবান্নার সে বৃহৎ ব্যাপার—সবই রাধা নিজে করত, সংগে আরও অনেকে থাকত, তার সংগে চলত তার কৌতুক। ওই গাঁজা মেশানো তামাক বা মিকচার টোবাকোর সিগারেট খাওয়াত। তাতে তর কোন সম্পর্কে কারুর সংগেই বাধতো না। তার এক খুড়ো এসেছিলেন বাড়ী, রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজ করতেন; ফিরে যাচ্ছিলেন কলকাতা। রাধাদা পথের পাশে ওই রান্না-শালা খুলে বসে আছে। তার খুড়ো ডেকে বললে—রাধা যাচ্ছি রে।

রাধা ছুটে এল, যাচ্ছি কি? না-না-যাওয়া হবে না। বললেন তোতলা ভাষাতেই।

খুড়ো বললেন—তাই কি হয়, সরকারি চাকরী!

—তাতে কি হল? ক্যাজুয়্যাল লিভ নেবেন। কি হয়েছে।

—না-না-না। তা হয় না।

একটু ভেবে রাধাদা বললে—বেশ তা হলে তামাক খেয়ে যান।

—দেখিস যেন গাঁজামেশানে তামাক দিস নে।

—রামচন্দ্র, তাই দিতে পারি! সরকারি ব্যাপার। রাধে-রাধে। কিন্তু দিল সেই তামাক খাইয়ে। গন্ধে স্বাদে কিছু বোঝা যায় না। আতর দেওয়া তামাক। বোঝা যায় ক্রিয়ায়। খুড়ো গাড়ীতে চলতে-চলতে বুঝতে পারেন গলা শুকুচ্ছে, মাথা ঘুরছে। গোল হয়ে বন-বন করে ঘুরছে জীবন, রাইটার্স বিল্ডিংস, চাকরী, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা দেখে তাঁর খুব হাসি পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কি হবে চাকরী? তিনি বললেন—গাড়োয়ান গাড়ীটা ঘুরিয়ে নে। বাড়ী চল।

তিনি ফিরলেন—সংবাদ পেয়ে রাধাদা'র পরমানন্দ। আশ্চর্যের কথা, খুড়ো রাধাদা'র উপর রাগ করতে পারেন নি।

রাগ রাধাদা'র উপর কেউ কখনও বারেকের জন্যও করেছে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আমি জানি না। কেউ জানে বলেও শুনি নি, এমন কি তরুদিও না। মনে পড়ছে, রাধাদা'র কুষ্ঠ যখন প্রকাশ পেল, তখন আমি এবং নারাণ (তরুদির মামাতো ভাই আমার ভগ্নীপতি এবং শ্যালক) তাকে কলকাতা এনে পরীক্ষা করালাম। তখন চিকিৎসা বিশেষ ছিল না, একটা চিকিৎসায় নাম ছিল হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরের, কবিরাজ রামপ্রাণ শর্মা এর চিকিৎসা করতেন। পরীক্ষার ফল শুনে মনে পড়ছে, রাধাদা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন—হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল। ভেবে কি হবে!

তারপর হঠাৎ হেসে বললেন—দূর-দূর—কানের খানিকটা চামড়া কেটে নিলে। কিছুক্ষণ হি-হি করে হাসলে। আমাদের বিষণ্ণ দেখে বললে—দূর-দূর। কি হয়েছে। কি হয়েছে ওতে! দূর-দূর।

যেন দূর করে দিতে চাচ্ছিল চিন্তাটা।

মৃত্যু হল অকস্মাৎ। বছর খানেক পর—শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। মা-বাবা তার অনেক আগে মারা গেছেন। স্ত্রী বাপের বাড়ী থেকে আসেন নি। বাপের বাড়ী নয়, মায়ের মামার বাড়ী, এই গ্রামে সেই বাড়ীতে ছিলেন। সেবা করতেন রাধাদার বড় বউদি এবং দিদি।

একদিন মনে পড়ছে রাধাদার বড় বউদি ছুটে এসে ডাকলেন আমার মাকে। একবার এসো। রাধু ডাকছে। ও ভাই—সে সেজেছে! সেজেছে কথাটি গভীর অর্থ ব্যাপক। অর্থাৎ মহাপথের পথিকের সেজেছে।

মা ছুটে গেলেন। সংগে সংগে আ[মি।] আমার বয়স তখন ২৩।২৪।

দেখলাম রাধাদা বলছেন—হরি [বোল,] হরি বোল, হরি বোল।

মা ডাকলেন—রাধু।

—কে? শঙ্করের মা! হরি বল। শঙ্[করের] মা হরি বল। শঙ্কর হরি বল!

এই সময় ছুটে এসে ঢুকল তর[ু—] রবীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশের বধূর [মত] পায়ে পড়ল।

রাধাদা প্রশ্ন করলেন—কে? কে?

মা বললেন—বউমা। তরু।

—তরু! তরু! তরু! একটু ফুটল। তারপর বললে—তরু হরি বল বল। তরু-তরু। হরি বোল।

ওই হরিবোল বলতে বলতেই দুটি স্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য। জীবনে কখনও কারও ক্ষতি করে নি। কিছু করে নি। তবে ভাল সে বাসত দু[জনকে—] সকলকে।

রাধাদার ব্যাধি কেন হয়েছিল, কে ধরেছিল, এ জানি না। বাড়ীতে পল্লীতে পাড়াতে এ ব্যাধি ছিল না। প্রশ্ন থেকেও রাধাদাকে মনে পড়ে নি। পড়ল কুষ্ঠের কথা থেকে। মনে পড়ে একজন পরমানন্দময় মানুষের কুষ্ঠ হয়ে কুষ্ঠ তাকে মনে-প্রাণে পংগু করতে নি, বিষাক্ত করতে পারে নি। রাধাদা কারুর কুষ্ঠ হয় নি। যাক আবার কুষ্ঠের কথা আসছে। না। রাধাদা। চরিত্র রাধাদা। রাধাদা অম্লান শুচি পরমানন্দময় রাধাদা।

তখন কিভাবে যেন জিনিষটা চাওয়া হয়েছিল! আর ঐ জিনিষটার জন্যেই এতদূরে এগিয়ে এসে উভয় পক্ষ পিছিয়ে যাচ্ছিলেন! সব দাবী মেনে ঐটির দাবী না-মনার কারণ কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

আগাগোড়া সুধাংশু নেপথ্যে থাকলেও বাড়ীর লোকদের জিনিষটর প্রতি একান্ত লোভনীয়তা তার যুবক-মনে সেদিন খুবেই রেখাপাত করেছিল। জিনিষটা না হলে উদ্বাহ-বন্ধনের কি এমন ব্যতিক্রম হবে? ছোটমামী কিন্তু দাবী ছাড়েন নি, ছোট-পিসিও ঘটকীকে পালা-পড়ানর মত করে জিনিষটা অধিকন্তু যৌতুক দেবার কথা বলে দিয়েছিলেন।

বলতে গেলে শেষপর্যন্ত ফাউ হিসেবে একরকম টেনে-হিঁচড়ে আনা হয়েছিল 'জিনিষটা। কিন্তু কি প্রয়োজন মিটেছে, জিনিষটা নব দম্পতির কি কাজে লেগেছে, আজ আর ভাব যায় না! তবু একদিন জিনিষটার দাবী প্রায় তেতো হয়ে উঠেছিল! ছোটপিসি সুধাংশুর মাকে প্রলুব্ধ করে বলেছিলেন, জান বৌদি, আজকাল সবাই দিচ্ছে, এমন কিছু বেশি নয়!—খাট-বিছান দেবে আর একটা ড্রেসিং টেবিল দেবে না? আমার ভাসুরপোর বিয়েতে পেয়েছে—কেমন সুন্দর কাচ দেওয়া!

সুতরাং ভাইপোর বিয়েতেও চাই! এবং চাইলেই পাওয়া যায়, এমন সুযোগ মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে বুঝি একবারই আসে।

এখন ছোটপিসিও নেই, ছোটমাসীও নেই যে তাদের মত সাধারণ ঘরে ও জিনিষের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেবেন। সুধাংশুর বিয়ের উপলক্ষ্যে যে সব আত্মীয়রা এসেছিলেন তাদের মধ্যে জিনিষটা নিয়ে আলোচনা হতো "দরকার নেই মানে, একশবার দরকার আছে! নতুন বউ কি রান্নাঘরে গিয়ে চুল বাঁধবে, না কলঘরে গিয়ে প্রসাধন করবে? একটা ড্রেসিং টেবিল হলে কত সুবিধে, দরকার মত সব জিনিষ হাতের কাছে পাওয়া যাবে, টুলে বসে যতক্ষণ খুশি চুল বাঁধুক, মুখে পাউডার পমেড ঘসুক! সুবিধে নয়? কত সুবিধে?"

যাঁরা যেখানে খুশি যেমন-তেমন করে যখন-তখন প্রসাধন পাট শেষ করেন বা

কবরী বন্ধন করেন তাঁরা হাঁ-করে ছোট-মামীর বক্তব্য শুনে সায় দিয়েছিলেন, সত্যি নতুন বউ-এর জন্যে একটা ড্রেসিং টেবিল না হলে চলবে না! বরের বাপকে ও জিনিষ ত হলে দিতেই হয়!

ছোটপিসি বলেছিলেন, "আর ও জিনিষ চিরকাল থাকবে, এমন নয় যে আজ দিচ্ছে কাল নষ্ট হয়ে যাবে! ঘরের শোভা, আসবাবের মধ্যেও একটা!"

শোভাই বটে! আর আসবাব? আজ-কাল প্রভাময়ী তো প্রায়ই বলেন, "ঘর থেকে জিনিষটাকে বার করে দিলে তবু খানিকটা জায়গা হয়! ছেলেগুলো কি কষ্ট করে হাত মুড়ে পা মুড়ে শোয়!"

সুধাংশুই জিনিষটাকে পুতু-পুতু করে বুকে রেখেছে। চিরকাল থাকবে কিনা বলা যায় না, কিন্তু যতদিন থাকে ক্ষতি কি!

এক এক সময় সুধাংশু রাগ করে বলে, "বার করে কোথায় রাখবে শুনি, সেই তো জায়গার অভাব হবে?"

এখন প্রভাময়ী তেমনি বিরূপ জিনিষটার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "জায়গা না হয় উনুনের মধ্যে গুঁজে দাও!"

হয়তো প্রভাময়ী সে-সব কথা শোনেন নি, কি শুনেও খেয়াল করেন নি, এই ড্রেসিং টেবিলের দাবী নিয়ে তাঁর বিয়েই একদিন ভেঙে যাচ্ছিল! অগ্নিতে আহুতি দেবার জিনিষ ও নয়, স্ত্রীর অধিক মূল্য *বিবাহের যৌতুক-সামগ্রীর!*

তারপর একদিন রাগ করে সুধাংশু বলেছিলেন, তোমার কাজে না লাগুক, আমার কাজে লাগবে।

সুতরং সবার বিরাগ ভাজন হয়েও জিনিষটা ঘরের এক কোণে অবস্থান করছে। একটা বয়ে-যাওয় ছেলেকে যেমনভাবে সংসারে স্থান দিতে হয় তেমনি ভাবে ওটাকেও যেন স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রভাময়ী সময় সময় ব্যঙ্গ করে বলেন, নখের অগায় চুটকি

জিনিষটাকে নিয়ে অবশ্য দুশ্চিন্তা কারো নেই। তবে সুধাংশুর মাঝে মাঝে মনে হয়, বিয়ের যৌতুকে পাওয়া খাট-বিছানা কি আলমারীর মত যদি একটা জিনিষ হতো তাহলে এ সময় খুব উপকার হতো। সত্যি, ড্রেসিং টেবিল তাদের মত সাধারণ গৃহস্থের সংসারে আর কি দরকার! ছোট-মামী আর ছোটপিসির যেমন কাণ্ড মিছি-মিছি একটা আবর্জনা জুটিয়ে দিয়েছেন। ভাবলে এখন হাসি পায়, ড্রেসিং টেবিল না হলে একদিন বিয়েই আটকে যাচ্ছিল! কি কাণ্ড!

প্রসাধনের পাট প্রভাময়ীর অনেকদিন উঠে গেছে। সেই বিয়ের পর ছেলে-পুলে হবার আগে যা হয় একটু-আধটু চলেছিল, তাও আবার বিয়েতে পাওয়া গায়েহলুদের কি ফুলশয্যায় তত্ত্বের জিনিষ দিয়ে—স্নো, ক্রিম, পাউডার, তেল ড্রেসিং টেবিলটার ওপর সাজান হয়েছিল। তারপর আর মনেই পড়ে না কোনদিন সুধাংশু স্ত্রীর জন্যে প্রসাধন দ্রব্য নিতান্ত প্রয়োজন বোধে কিনে এনেছে কি না। সেই কবে প্রভাময়ী কুরুশ-কাটিতে বুনে মাকড়শার জাল-মত খণ্ডিপোষ দিয়ে টেবিলটার আয়নার মুখটা ঢেকে দিয়ে-ছিলেন। সেই কবে স্নো-পাউডারের পাত্র-গুলো শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কৌটোটা টেবিলের ওপর থেকে স্থানচ্যুত হয়েছিল। সেই কবে প্রসাধনদ্রব্য ছাড়া টেবিলের ওপর সংসারের আর পাঁচটা জিনিষ এসে জড় হয়েছিল, মনেই পড়ে না।

মাঝে মাঝে অবশ্য সুধাংশুর দৃষ্টি-গোচর হয়। কি করুণ দেখতে হয়েছে ড্রেসিং টেবিলটা, পালিশ উঠে ধুলো জমে কেমন যেন মলিন আর বিবর্ণ। কাছে এসে দাঁড়ালে মুখাবয়বের প্রতিচ্ছবিটও কেমন যেন বিকৃত মনে হয়।

ড্রেসিং টেবিল! প্রতিফলিত বিকৃত প্রতিবিম্বকে যেন সুধাংশু মনে মনে ব্যঙ্গ করে ওঠে, যত সব বেরো জিনিষ।

হয়তো সেইজন্যেই প্রভাময়ী অনেক-দিন থেকে টেবিলটার সামনে বসে কেশ-চর্চা করা ছেড়ে দিয়েছেন। মুখই যদি অমন কিম্ভুত বা বিকৃত দেখায় কার ভাল লাগে সামনে বসে প্রসাধন করতে? বেশ করেছেন যে-কাজের জন্যে সে-কাজ আর প্রভাময়ী করছেন না টেবিলটাকে দিয়ে। বেশ করেছেন খণ্ডিপোষ দিয়ে আয়নার মুখটা ঢেকে দিয়েছেন! না-দেবো না-দেবো, কিন্তু তা বলে অমন একটা মেলো জিনিষ চাপে পড়ে দান না করলেই হতো! চারটে সরু সরু ঠ্যাং-এর ওপর একটা সরু কাঠ পেতে দুটো টানা লাগিয়ে একটা আয়না ঝুলিয়ে ড্রেসিং টেবিল নাম দেওয়া হয়েছে। ছোট-পিসি তখন মন্তব্য করতে ছাড়েন নি, "এই কি ড্রেসিং টেবিলের ছিবি? বৌদি, তুমি একদিন দেখে এসো আমার ভাসুরপো কেমন জিনিষ পেয়েছে। এই লম্বা মানুষ-সমান আয়না লাগান।"

আবক্ষ ছবির মত বেঢপ কাঁচটা চার-চৌকো! সোজা দাঁড়ালে মাথার অনেকটা কেটে যায়, টুলে বসে বা কুঁজো হয়ে না দাঁড়ালে আবার সম্পূর্ণ দেখা যায় না।

সশাবক গাভীর মত ড্রেসিং টেবিলটার সঙ্গে একটা রেক্সিন মোড়া টুল ছিল। ছোটপিসি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি বলতে। কিন্তু টুলই বলতে সবাই। সে-টুলটার আর অস্তিত্ব নেই, এক ঠ্যাং ভেঙে সেই যে কাৎ হয়েছে আর উঠে দাঁড়ায়নি, তারপর কাঠ-কাটরার সঙ্গে মিশে করে একাকার হয়ে গেছে।

তখন সুধাংশুর জন্যে একটা ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল; সংসারে নব পরিণীত, সুতরাং সবার চোখে রমণীয়। বড় রাস্তা থেকে গলির মধ্যে দেড় বিঘৎ পরিমাপ ঘরটির আকর্ষণ কিন্তু সেদিন অনেক ছিল, সন্ধ্যা বা সকালে প্রভাময়ী এসে বুঝি ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসতেন, প্রসাধনের দ্রব্যগুলি হাতের কাছে সাজিয়ে নিতেন, তারপর পিঠের ওপর চুল ছড়িয়ে দিয়ে চুলে বিলি কাটতে আরম্ভ করতেন, হঠাৎ আয়নার একটা ছায়া দেখা যেত! প্রভাময়ীর মুখের আলোয় বুঝি মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। সুধাংশু সংকীর্ণ টুলটার ওপর বসবার জন্যে এমন ধস্তাধস্তি করতো যে একদিন অ সহ্য করতে না পেরে টুলটার প দুজনে হুড়মুড় করে পড়ে গেল! পেয়ে বাড়ীর লোক 'কি হলো? কি করে ছুটে এসেছিল, ততক্ষণে আলমারীর পাশে গিয়ে লুকিয়েছিল ময়ী অকপটে জানিয়েছিল, বসতে টুলটা ভেঙে পড়ে গেছে। অনেকদিন সুধাংশু যেন কথাটার মানে বুঝতে —তার এক প্রৌঢ় সহকর্মী একদিন সকাল বাড়ী ফেরবার উদ্যোগ সুধাংশুরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি আজ এত সকাল-সকাল যে?' অ সহাস্যে বলেছিলেন, "একদিনও চুলবাঁধা দেখতে পাই না, আজ তারা খুব হেসেছিল কথাটা কৌতুক

বোধহয় প্রসাধনরতা যুবতী আকর্ষণ সর্বাধিক, তাই ড্রেসিং দাবী! একদিন প্রায়ান্ধকার ঘরে আপনমনে প্রসাধন করতে দেখার লোভে কাণ্ড করেছে সুধাংশু—টুলটাই ভেঙে হুড়োহুড়ি করার চোটে!

তারপরেই যেন প্রভাময়ী আর টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ান নি, যেন সেই মা-মাসীর পুরনো অভ্যেস করে নিয়েছেন, কখনো রান্নাঘরের ফাঁকে চুলের কাঁটা গুঁজে রেখেছেন, চিরুনিটা ভুলে কলতলায় ফেলে এ কখনো বা মাথার ফিতে বা চুলের দড়ি ঘরের তাকের মাথায় তুলে রেখেছেন।

অনেক বাসা-বদলের সঙ্গে টেবিলটা সঙ্গে এসেছে। সংসারের অ পুরনো জিনিস বিক্রী করার সময় টেবিলটা বিক্রী করার কথা মনে আবার কি ভেবে চেপে গেছে। বাজারে একবার এক শিশি-বোতলওয়ালা জিনিসটার দাম শওয়া শ' পর্যন্ত দিতে হয়েছিল, প্রভাময়ী দিয়ে দিতেই চেয়ে সুধাংশুই শেষপর্যন্ত অমত করেছিল।

"আছে থাক না, খেতে পরতে তো দিতে হয় না!"

"তা হোক, বুকের ওপর বাঁ যেন!"

"তাতে তোমার কি!"

"আমার জিনিষ আমি বুঝবো!"

"তা হলে ওর কদর বুঝতে, উঠে আয়নায় অমন স ত পুরু ধুলো থাকতো না!"

মাঝে মাঝে নিজে হাতে ঝেড়ে ড্রেসিং টেবিলটাকে সভ্য-ভব্য করে চেষ্টা করে সুধাংশু। খণ্ডিপোষের খুলে বধূর মুখ দেখার মত দেখে। কোন কোনদিন অন্ধকার ঘরে একলা বসে থাকতে থাকতে মনে হ চুপিচুপি কে যেন এসে ড্রেসিং টে সামনে দাঁড়িয়ে চুল আলুলায়িত দিয়েছে, কেশ-পাশ-মুক্ত অন্ধকার ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে, অদ্ভুত মোহ হয়েছে সুধাংশু অলক-বন্যায়!

না, আলো জ্বেলে সুধাংশুর সব কেটে গেছে। শুধু শুধু ড্রেসিং টে

ঘরের অনেকখানি জুড়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। বিছানাপত্র, বই-খাতা, ট্রাঙ্ক-সুটকেশে ঘরটা আকণ্ঠ; তার ওপর আবার একটা পড়ার টেবিল, দুখানা চেয়ার, ঠিক যেন ট্রাম-বাসের ভিড়, দম বন্ধ হয়ে আসে।

টিকটিকির ল্যাজের মত চুলের বেণীটা হাত দিয়ে পাকাতে পাকাতে প্রভাময়ী সামনে এসে বললেন, 'কখন এলে?'

'অনেকক্ষণ!' সুধাংশু গম্ভীর হয়ে বললে।

'সত্যি টের পাইনি!' প্রভাময়ীর গলার স্বরটা যেন বয়সের তুলনায় অনেক সরল মনে হয়। সুধাংশু মুখটকা ড্রেসিং টেবিল থেকে মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে যেন অবাক হয়ে যায়, মাথার অত চুল প্রভাময়ী কি করে খোয়াল?—এইটুকু বেণীর বড়ির মত খোঁপা?

শীর্ণ খোঁপায় কাঁটা গুঁজে প্রভাময়ী বললেন, 'চা খাবে?'

'কর।' সুধাংশুর গলার স্বরটা কেমন ক্লান্ত, ক্লিষ্ট মনে হয়।

চা করে এনে প্রভাময়ী দেখলেন সুধাংশু তন্ময় হয়ে মেজের ওপর বসে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার দুটো টেনে নামিয়ে কি যেন খুঁজছে। দুটো ড্রয়ারে যত জিনিষ ছিল সব বার করে ঘরময় মেলে ছড়িয়ে দিয়েছে।

'এই চা!' প্রভাময়ী বলবার আগেই সুধাংশু যেন ফেটে পড়ল, 'এসব কি হয়েছে? এটা কি আঁস্তাকুঁড় পেয়েছ না, ডাস্টবিন?'

প্রভাময়ীকে কোন কথা বলতে না দিয়েই সুধাংশু আবার বললে, 'তোমাদের কতবার বলেছি, এটাতে শুধু আমার কাগজ-পত্র থাকে, এতে কেউ হাত দিয়ো না, তা হয় যত রাজ্যের জিনিষ এর মধ্যে এনে পোরা হয়েছে! লাটু-লেত্তি, ছুরি-কাঁচি, বঁটি-কাটারী থেকে আরম্ভ করে মাথার কাঁটা, চুলের ফিতে কিছু বাকি নেই! জুতো পালিশের বুরুশটা পর্যন্ত এর মধ্যে এনে ঢোকান হয়েছে!'

রোঁয়া-ওঠা ব্রাসটা তুলে ধরে সুধাংশু বললে, 'এঃ এটা কি?'

'কি আবার? বুরুশ!' নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রভাময়ী বললেন।

যেন ভেংচে বললে সুধাংশু, 'বুরুশ! ওটা রাখবার জায়গা কি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার? কে রেখেছে শুনি,'

'কে আবার, ছেলেরা কেউ!' তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠ প্রভাময়ীর।

'বললেই অমনি হলো ছেলেরা কেউ! কেন ওটাকে নিয়ে আলমারীর মধ্যে রাখলেই পারতে!' তেমনি বিরক্ত, রুষ্ট কণ্ঠ সুধাংশুর।

'আমাকে বলছো কেন? যারা রেখেছে তাদের বল না!' এবার প্রভাময়ী বেশ জোর দিয়ে প্রতিবাদ করেন।

'সে বলবার উপায় আছে কি, তোমার আসকারাতেই তো ওরা এমন হেঁয়াড়া, বেয়াদপ হয়েছে!'

'আমার আসকারায়?'

'নয় তো কি! তুমি বল না ড্রেসিং টেবিলটা একটা আবর্জনা, উনুনে দেবে, আগুনে দেবে, পুড়িয়ে ফেলবে? বলনি ঘরে নড়বার জায়গা নেই, আবার বাহার দিয়ে ড্রেসিং টেবিল রেখেছেন? বলনি ঘর-জোড়া করে রাখবার কোন দরকার নেই?' সুধাংশু ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রভাময়ী চুপ করে যেন কৌতুক বোধ করেন। লোকটা হঠাৎ আজ অকারণেই ক্ষেপে গেছে! আর কোন কাজ নেই এখন বসে বসে ও'র অভিযোগের জবাব দিই।

প্রভাময়ী পিছন ফিরতে সুধাংশু গম্ভীর হয়ে বললে, "আজ বলে দিচ্ছি, তোমারও কোন জিনিষ যেন এর মধ্যে না থাকে—চুলের দড়ি-কাঁটা রাখবার জায়গা আলাদা করে নেবে! ইস-স তেল লেগে লেগে ড্রয়ারটার অবস্থা কি হয়েছে!'

প্রভাময়ী যেন বলতে চাইলেন, হ্যাঁ তোমার জিনিষ তুমি বুকে করে রেখো! কি আমার এসটেটপত্তর রে তার জন্যে সবাইকে সাবধান হতে হবে! কটা পুরনো চিঠি, মাসকাবারি ফর্দ, গয়লার হিসেব এই তো?

না, প্রভাময়ী মুখ বুজেই স্বামীর অনুশাসন মেনে নিলেন। কে এখন আবার ও'র সংগে তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে ভরসন্ধেবেলায় কৈফিয়ৎ করে! খেয়ে-দেয়ে আর আর কাজ নেই।

কিন্তু এখন যেন অনেক কাজ সুধাংশুর। কাগজপত্রগুলো বেছে বেছে দেখতে হবে দরকারী অদরকারী কি আছে, সত্যিকারের আবর্জনা দূর করে দিতে হবে, একেবারে নিজস্ব করে নিতে হবে টেবিলের টানা দুটো! এবার কেউ হাত দিক, হাত ভেঙে দেবে সুধাংশু!

'যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর...আগামী ১৩ই আষাঢ়...' না, অত পুরনো নেমন্তন্নের চিঠি রাখবার কোন দরকার নেই।

'পূজনীয় মেসোমহাশয়,...অনেকদিন আপনাদের কোন খবর পাই নাই, আপনারা...' কে যেন লিখেছিল? প্রতাপ, বড়শালীর ছেলে! মাকে নিয়ে এখানে এসেছিল চোখ দেখাতে! সে তো কবেকার কথা! প্রতাপ এখন মানুষ হয়ে বড় চাকরি করছে! আর মেসোমশাইকে কি দরকার! দুনিয়াই স্বার্থপর। তখন দরকার হয়েছিল, ঘন-ঘন চিঠি লিখতো—

সুধাংশু চিঠিটাকে প্রায় দুমড়ে-মুড়ে এক ধারে সরিয়ে রাখলে। কোন দরকার নেই ও চিঠি সংরক্ষণ করে। কিছু মহামূল্য জিনিষ নয়।

"পরম পূজনীয় দাদা,...আপনাদের কুশল সংবাদ দানে চিন্তা দূর করিবেন...আজ একমাস হইল ও'র সর্দি-কাশি-জ্বর হইয়াছে, অনেক ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইয়া কিছু হয় নাই, সকলে বলিতেছে কলিকাতায় গিয়া বড় ডাক্তার দেখাইতে...কি হইবে বুঝিতে পারিতেছি না...জানি না বরাতে আমার কি আছে!"

চোখদুটো সুধাংশুর ঝাপসা হয়ে আসে। কলকাতায় আনবার আগেই সতীর স্বামী মারা গিয়েছিল, ডাক্তারের সন্দেহ হয়েছিল—যক্ষ্মা। যাক্, দেশে বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে রক্ষা, বোনের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েনি, দুটি ছেলে একটি মেয়ে। একটি ছেলে মানুষ হয়ে উঠেছে! উঃ, ভাবা যায় না এই বাজারে কেউ কারো দায়িত্ব নিয়েছে! ভগ্নিপোতের মৃত্যুর পর সুধাংশু অবশ্য বোনকে লিখেছিল চলে আসতে, কণ্টেসৃষ্টে তাদের সংগে থাকতে। না এসে সতী খুব বুদ্ধিমতীর কাজ করেছে। তাকে বাঁচিয়েছে। না, এ-চিঠি আর রেখে কাজ নেই। পুরনো শোককে যেন উসকে দেয়: অনন্তটা বড্ড তাড়াতাড়ি মারা গেল! কি আর এমন বয়স হয়েছিল!

"মহাশয়, আপনাকে জানাইতেছি যে, যে-জিনিসগুলি আপনি আমাদের এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, অবিলম্বে লইয়া যাইবেন ...বর্তমানে নূতন আইনে জিনিসগুলি আমাদের নিকট রাখা নিরাপদ নয়... সুতরাং—"

দরকারী জিনিস ফিরিয়ে দেবার জন্যে পোদ্দার রায় কোম্পানীর তাগাদা! বেটারা খুব সাধু! বে-আইনী কোন কাজ করে না, দেশে সব 'ফোর্টিন ক্যারাটের' গয়না তৈরী হচ্ছে। মানেটা সুধাংশু ঠিকই বুঝেছিল, গয়নাগুলো আধা কড়ি দিয়ে বিক্রী করে দিতে হয়েছিল। একটা মাস আরো সময় পেলে ধার-দেনা করে জিনিসগুলো ছাড়ান যেত।

দূর-র ও-চিঠি রেখে আর কি হবে! বেটারা একেবারে হারামজাদা। গয়না করতে লাভ, গয়না রেখে লাভ, আবার গয়না বেচে লাভ! আইন করে বরং ওদেরই পোয়া-বারো! কার্তিক স্যাকরা এখন ক'খানা বাড়ির মালিক, কে খবর নিচ্ছে, এদিকে আইনে জাত-ব্যবসা থেকে উদ্বাস্তু হয়েছে বলে দুখানা ট্যাক্সি পেয়েছে। মাঝখান থেকে ওগুলোকে সংগ্রহ করে সযত্নে তুলে রেখেছে! পাগলের মত ছেঁড়া কাগজ সংগ্রহের বাতিক যেন।

কিন্তু? একটা ফর্দ পড়তে পড়তে চোখ যেন স্থির হয়ে গেল। অশ্বিনীর দোকানের ফর্দ, তাদের বাজারের বড় মুদি। এই তো দুটো ফর্দের একই জিনিসের দামের সংগে কোন মিল নেই—দু'-দশ বছরে দিনকাল বাজার-দর একেবারে পাল্টে গেছে, কোনই সামঞ্জস্য নেই। কেবল যে এই অশ্বিনী, সেই অশ্বিনী! সব চোর, ডাকাত হয়েছে।

কিন্তু এ-কথাটাও সুধাংশু না ভেবে পারে না, চলছে তো ঠিক, তখনো যেমন, এখনো তেমনি। জিনিসপত্রের দাম এত বেড়েও তারা তো ঠিক বেঁচে আছে! হাহাকারটা কি তাহলে সত্যি নয়? বোধহয় নয়, তাহলে এতদিনে একটা ওলোট-পালোট হয়ে

আয়নার ওপর একটা ছায়া দেখা যেত

সুধাংশুর মত গৃহস্থদের সর্বনাশ। কি যে হচ্ছে কে জানে, সোনার দাম কি তাই কমল?

"My dear Sudhansu, just returned from USA. Enquired about you.....How do you do?"

মৃগেন বাগচী! বহুকাল একসংগে পড়েছিল, এখন কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠেছে। ঐ তো ইংরিজীর ছিরি। ছেলেও ভাল ছিল না, বি-এ পাশ করেছে কি না করেছে। পৃথিবী চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। আজকাল এই হয়েছে, যারা কিচ্ছু না, তারাই করে খাচ্ছে, সবার মাথার ওপর পা দিয়ে চলছে।

চিঠিটাকে অবজ্ঞাভরে সুধাংশু সরিয়ে রাখলে। কোন মানে হয় না ও-চিঠি যত্ন করে তুলে রাখার। চিঠিটা আদ্যন্ত হামবড়ামীতে ভরা। বেশ, তুই এই করিছিস, সেই করেছিস, এতে আমার কি দরকার! বেশ বাবা, বেশ।

তারপর যত রাজ্যের মাসকাবারি মুদির দোকানের ফর্দ, গোয়ালার দুধের হিসাব, সরস্বতী পুজোর চাঁদার বিল, ডাইং ক্লিনিং-এর রসিদ। আবর্জনা। এগুলো আবার কেউ দরকারী কাগজপত্রের সংগে রাখে নাকি? কি ভূতে পেয়েছিল, সুধাংশুও যেত। অসহ্য বললে কি হবে। এমনি করে ইংরেজ রাজত্বও চলেছিল দু'শো বছরের ওপর, কে কার কথা শুনেছে তখন!

মুদির দোকানের ফর্দগুলো ফেলে দেওয়াই ভাল। ও নিয়ে আর কি গবেষণার কাজ সুধাংশু করবে? যারা করবার তারা ঠিকই করছে, বাজার-দর কষে কত ডি-ফিল হচ্ছে। সুধাংশুর দরকার নেই।

তারপর একটা বিবর্ণ চিঠির কয়েকটা টুকরো নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সুধাংশু। চিঠিটার কোন তাল পাওয়া যাচ্ছে না। হাতের লেখাটা চেনাচেনা, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে কবে লেখা হয়েছিল, স্মৃতি তোলপাড় করে সুধাংশু মনে করতে পারে না। তার ওপর বহু টুকরো টুকরো হয়ে ভাঁজ হয়ে আছে চিঠিটা। কিন্তু প্রভাময়ী এমন করে কবে তাকে লিখেছিলেন? আশ্চর্য। মনে পড়েও যেন মনে করতে পারে না সুধাংশু। হয়তো প্রভাময়ীর অমন অনেক কথাই সুধাংশুর মনে নেই। প্রভাময়ীও কি সুধাংশুর মত তাঁদের বিবাহিত জীবনের মনোরম মুহূর্তগুলো ভুলে গেছেন? সুধাংশু যদি সে-সব কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আজ, প্রভাময়ী কি স্বীকার করবেন?

কিন্তু ছেঁড়া চিঠিটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে পড়া যায় না। কেমন যেন একটি সুকেশীর কেশ-শোভা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলার মত।

"এখান আমার একেবারে ভাল লাগে না ...সব সময় তোমার কথা মনে হয়...আর আর পারি না...যদি তুমি না আস...আমাকে আর দেখতে পাবে না...কেন আমাদের.....'

না, এত চেষ্টা করেও পাঠটা সম্পূর্ণ ব সাবলীল করা যায় না। হতে পারে প্রভাময়ী তাকে বিরহের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, হতে পারে সে-চিঠি কখন অন্যমনস্ক হয়ে সুধাংশুই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে বন্ধ করে রেখেছিলেন, হতে পারে আর কেউ যাতে পাঠ সম্পূর্ণ করতে না পারে, তার জন্যে চিঠিটা তখুনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

কিন্তু এ-চিঠি এখানে সে রাখলে কবে? ছেঁড়া চিঠি যেমন জোড়া যাবে না তেমনি জীবনের ঝরাপাতা থেকে পরা রমণীয় মুহূর্তগুলোও আর ফিরে আসবে না। প্রভাময়ী কি স্বীকার করবেন একদিন এ-চিঠি উনিই লিখেছিলেন? হয়তো অস্বীকারই করবেন ও-চিঠি ও'র নয়।

আর করলেও এই মুহূর্তে যে সুধাংশুর কাছে চিঠির টুকরোগুলো অমূল্য বলে মনে হয়। মুক্তা-হারের যেমন সুত্র ছিন্ন হয়ে মুক্তাভ্রষ্ট হয়ে বিক্ষিপ্ত হলেও মুক্তার মূল্য কমে না!

হঠাৎ নিজের ওপর সুধাংশুর বড় রাগ হয়—কেন চিঠিটা অমন করে সে ছিঁড়ে ফেলেছিল? চিঠিটা কি তখন ভাল লাগেনি না আর কারো ভয়ে এমন একটা লুকোচুরি আশ্রয় নিয়েছিল? এতদিন এত জিনিসের মধ্যে কি করে তার লক্ষ্য এড়িয়ে পড়েছিল চিঠিটা? সত্যি কি কোন অবজ্ঞা, কি ভয় কি সংকোচ জেগেছিল তখন চিঠিটা পেয়ে

আবার নিবিষ্ট মনে পিঠ বাঁকিয়ে সুধাংশু চিঠির টুকরোগুলো নিয়ে পরীক্ষা করে। না, নিঃসন্দেহে এ-চিঠি প্রভাময়ী তাকে এতদিন লিখেছিলেন, মনে পড়ে এরকম অনেক চিঠি তাঁরা পরস্পরকে লিখতেন। সেই গলির মধ্যে স্বল্প পরিসর ঘরখানায় গাদাগাদি জিনিস, আর বাড়ীর বহু সজাগ দৃষ্টিকে এড়িয়ে তাঁরা মনের যোগকে বাঙময় করতেন। তখন কারো নামে চিঠি এলে বড় লজ্জায় পড়তে হতো।

সুধাংশু চিঠির টুকরোগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল, খণ্ডিপোষে মুখঢাকা ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটায়, মনে হল একটি দুটি মুখের প্রতিবিম্ব যেন সরে গেল, জলবুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল। টান মেরে সুধাংশু ঢাকাটা সরিয়ে দিলে, প্রভাময়ী কি যে মনোভাব আয়নাটাকে ঢেকে রেখেছেন তবু আয়না আয়না! খণ্ডিপোষের চোখের মধ্যে যেন কার মুখ ভেসে উঠছে! কিন্তু ঢাকা সরিয়ে যে-মুখ দেখা যায়, তা নিজেরই —গম্ভীর, বিষণ্ণ, চিন্তাগ্রস্ত!

বোধহয় আয়নায় মুখ দেখে মোহিত হবার বয়স মানুষের একটা থাকে। মানে যে বয়সের যা! তাই বোধহয় প্রভাময়ী খণ্ডিপোষ দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের মুখটা ঢেকে রেখেছেন।

প্রতিফলিত মুখটাকে বিকৃত করে সুধাংশু নিজেকে যেন ব্যঙ্গ করলে, কত শখ যায়, আবার ড্রেসিং টেবিল! তখন যুদ্ধের বাজারে জিনিসটা বিক্রী করে দিলেই হতো। বার্মা শেগুনের তখন কি দাম হয়েছিল, বার্মা মুল্লুক বোমার আগুনে জ্বলে গিয়ে।

ড্রেসিং টেবিল প্রসঙ্গে একদিন প্রভাময়ী বুঝি টিপ্পনী করে বলেছিলেন, কত শখ যায় রে চিতে নথের আগায় চুটকি দিতে।

অর্থাৎ ঘর নেই, দোর নেই আকাঙ্ক্ষা অনেক আছে—কনের বাপের কাছ থেকে ড্রেসিং টেবিল আদায় করা হয়েছে! বলিহারি!

প্রভাময়ী যেন কেমন হয়ে গেছেন। ক্লান্ত নয়, কেমন যেন বীতস্পৃহ নিরুত্তাপ। ঐ পা-কল সেলাইয়ের মেসিনটার মত, প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সেলাই ওতে হয়, কিন্তু আগের মত সে সচলতা নেই। তেল দিয়ে ঝেড়ে-মুছে নিলে তবে চলে!

যেমন টেনে খুলেছিল তেমনি টেনে খাপপোষের পর্দাটা ঢেকে দিলে সুধাংশু। ঢাকাই যাক। অনেক দিনের অব্যবহারে কাচটাও কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে, মুখও বুঝি দেখা যায় না।

স্বামীকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রভাময়ী দোরগোড়া থেকে বললেন, "ওকি, অমন করে দাঁড়িয়ে আছ যে?"

সুধাংশুর মাথায় কি খেয়াল চাপল, স্ত্রীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরের মধ্যে এনে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে বললে, "দেখ, দেখ!"

যেন কোন সলজ্জ, অবগুণ্ঠিতার বস্ত্র উন্মোচন করে সুধাংশু দেখালে। প্রভাময়ী কেমন হকচকিয়ে ওঠেন। ও আয়নায় আবার আবার কি দেখবার আছে?

তারপর সুধাংশু হাতের মুঠোটা খুলে চিঠির টুকরোগুলো সন্তর্পণে মেলে ধরে বললে, "দেখতে পাচ্ছ? কি বল দিকি?"

বোধ হয় মুহূর্তকাল প্রভাময়ী অপেক্ষা করেন দৃষ্টি দিয়ে, তারপর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "এ তুমি কোথায় পেলে?"

সুধাংশু ড্রেসিং টেবিলের ওপর চিঠির টুকরোগুলো মেলে ধরে বললে, "কোথায় আবার, ওর মধ্যে!"

"বুড়ো বয়েসে কি ভীমরতি হ'য়েছে!" প্রভাময়ী গম্ভীর হ'য়ে বললেন।

"কেন? কেন!" হাসবার চেষ্টা করে সুধাংশু।

"না হ'লে ওগুলো আমায় আদিখ্যেতা ক'রে দেখাতে এসেচো!" তেমনি গম্ভীর আর বিরক্ত যেন প্রভাময়ী।

তবু হাসবার চেষ্টা ক'রে লজ্জাহীনের মত সুধাংশু বললে, "এতো তোমার চিঠি! তুমি লিখেছিলে—"

চিঠির টুকরোগুলো হাতের মুঠোয় সংগ্রহ ক'রে রোষকম্পিত কণ্ঠে প্রভাময়ী বললেন, "হ'য়েছে, হয়েছে! থাম! নন্দা কখন কাকে কি লিখেছিল, তাই নিয়ে ঢাক পেটাতে হ'বে না! ছেলেমেয়েরা বড় হ'য়েছে, এখন নিজেদের মান নিজের কাছে।"

তা হ'লে—কেমন যেন হতবুদ্ধি হ'য়ে যায় সুধাংশু, তার সব জল্পনা-কল্পনা মিথ্যে?

আবার আর এক ভাবনার মধ্যে পড়ে সুধাংশু। বড় মেয়ে নন্দা কাকে এমন চিঠি লিখেছিল? আর লিখেছিল যদি সেটাকে এখানে অমন করে রেখেছিল কেন? ভয়ে না, অনাবশ্যকতা বোধে?

প্রভাময়ী বললেন, "দেখ, ওটার ওপর তুমি আর মায়া করো না, যেমন আছে তেমনি থাক, ওরা যা পারে তাই করুক। দরকার কি আমাদের আঁকড়ে থেকে আরো?"

সুধাংশু কেমন যেন মতিভ্রম, আচ্ছন্নতায় পড়ে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিবিম্বিত মুখটা যেন তার নিজের নয়। উদ্বন্ধনে আয়নার কাচটা যেন মরে কাঠ হ'য়ে গেছে।
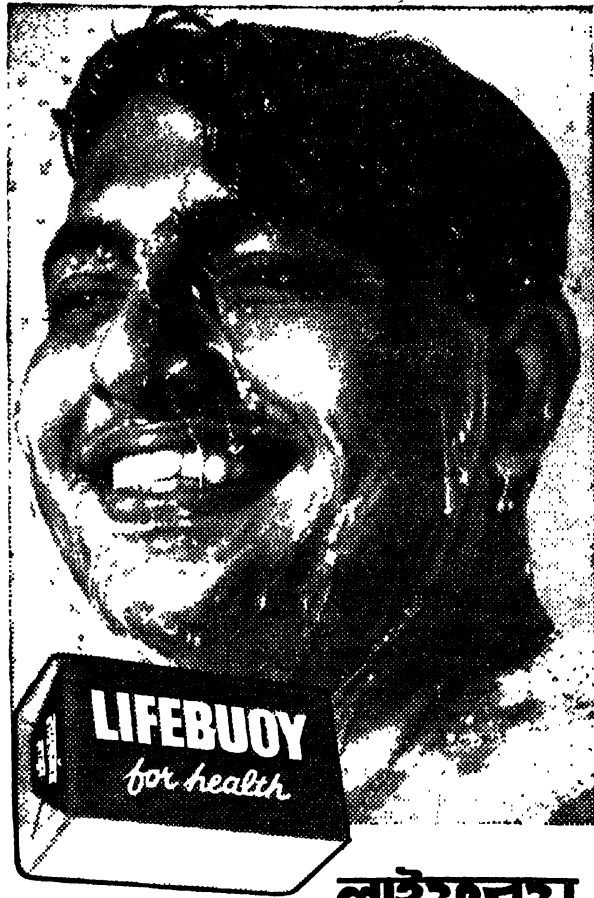
পাঠকের বৈঠক

ছুটি ছুটি ছুটি

অবশেষে পুজোর ছুটি এসে গেল। ছুটির বাঁশী বেজেছে, এই বাঁশী বাজে স্থলে-জলে আর গগনে-গগনে, আকাশের মেঘের রঙে সোনা, মেঘ এখন বিত্তবিহীন, ধারাবর্ষণের আর সেই বেগ তার নেই। পথে-পথে শোভাযাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট এবং ট্রাফিক জ্যাম সর্বদা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আজ দু-তিন মাস ধরে যে, পুজো আসন্ন। পুজো চার দিনের বটে, কিন্তু তার প্রস্তুতি চলছে সেই বৈশাখ থেকেই। এই পুজোকে কেন্দ্র করে সকল শ্রেণীর মানুষই অল্প-বিস্তর বাণিজ্য করে থাকেন, তাই পুজোর নামে এত আনন্দ, এত কলরব, এত চাঞ্চল্য।

সেই পুজো এসে গেল। ঢাকীরা পুরাতন রীতিতেই ঢাক বাজাচ্ছে, নতুন রীতির বাদ্য শোনা যাবে বিসর্জনের রাত্রে। তখন অবশ্য একটু-আধটু রক এণ্ড রোল বা টুইস্ট অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, মহাভারতে আছে যে দুধের অভাবে যখন অশ্বত্থামাকে পিটুলি গোলা জল দেওয়া হয়েছিল তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করেছিল। আমরাও সেই অশ্বত্থমার উত্তরপুরুষ। তাই পিটুলি গোলা পানে যদি একটু আনন্দ না করি তাহলে আর আনন্দ করব কিভাবে? এখন উৎসবের এই শুভলগ্নে আমাদের একটু সংযত, ভব্য এবং ভদ্রভাবে থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

যাই হোক, সামনে ছুটি, সেই ছুটি কিভাবে উপভোগ করতে হবে সেই কথাই চিন্তা করা যাক। ছুটি ক'দিনের, শুধু দু'দিনেরই খেলা, হাসতে, আর খেলতে এই সামান্য ছুটি শেষ হয়ে যাবে। তখন মনে হবে—"কখন বসন্ত এল, এবার হল না গান" — ছুটি ছলনাময়ী। ছুটির প্রথম দিকটা তাই মধুর, শেষের দিকে পৌঁছালেই সব দিক থেকে বৃশ্চিক দংশন।

যাদের হাতে প্রচুর টাকা, সে টাকা যে শুধু কৃষ্ণ বাজারেরই হতে হবে তা নয়, বোনাস হতে পারে। উপরি আয় হতে পারে। টাকা হাতে এসেছে বেশ কিছু ব্যক্তির, ব্যক্তির সংখ্যাটিও ত' শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তেমন কম নয়। তাঁরাই আজ এক মাস ধরে দোকানে, স্টলে, ফুটপাথে, সুপার মার্কেটে, চৌরঙ্গীতে, লিন্ডসে স্ট্রীটে পথরোধ করে আছেন, তাঁদের গাড়ি আমাদের চাপা দেয়, তাঁদের শাড়ি আমাদের হৃদয়ে হৃৎকম্প সৃষ্টি করে। তাঁরা হয়ত প্রিভিলেজড ক্লাস। কিন্তু যাঁরা প্রিভিলেজড নন, তাঁরাও ত' কম নন, ট্রামে, বাসে ট্যাক্সিতে ছেলে-বুড়ো মেয়ে এবং তৎসহ কোষাধ্যক্ষ কর্তৃস্থানীয়দের ভীড় ঠেলে অফিস-আদালত সামলানো দায়।

এই যে পুজোর জন্য সাজ-পোষাক ইত্যাদির তোড়জোড়, এত আয়োজন, এর ভিতর একটা মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব বর্তমান। আগে ধনীরাই শুধু জাঁকজমক করতেন। দরিদ্রদের তাঁরা নতুন বস্ত্র দান করতেন, এখন যিনি ধনী তাঁর জন্য উচ্চ-কোটির বাজার, যিনি মধ্যবিত্ত তাঁর জন্য স্টল আর ফুটপাথ।

বর্তমানকালে পুজোর বাহ্যিক আচারগুলি আমরা পালন করি কিন্তু প্রাচীন কালে ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। অমৃতলাল বসু মহাশয় আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে 'বাঙালীর দুর্গোৎসব' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'সে রকম ভূরি-ভোজন এখন আর দেখাই যায় না; সেই সদর হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশখানা গ্রাম পর্যন্ত নিমন্ত্রণ, সেই অভ্যর্থনা আপ্যায়ন; সেই দীয়তাং ভুজ্যতাং। তখন কয়েকটি পুজোর বাড়ী ভিন্ন গ্রামের অন্যান্য সকল বাড়ীতেই তিনদিন উনান জ্বলিত না।"

প্রবাসীরা ঘরে ফিরতেন, পুত্র-কন্যাদের জন্য রঙীন ছিটের জামা আসত। প্রতিটি ঘরে আনন্দের রোল উঠত।

কলকাতা শহরের অবস্থাও কম আনন্দের ছিল না, — ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"পরশু দিন সকালে সুরেশ সমাজপতির বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড় বড় বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ হাত তোলা প্রতিমা তৈরী হচ্ছে—এবং আশে-পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মত ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়গোছের পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুল-খেলা, অর্থাৎ তাতে কোন উদ্দেশ্য নেই। লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট।"

রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য। এই যে ভাবাবেগ, এই যে স্বতোপ্রণোদিত উচ্ছ্বাস, এ উচ্ছ্বাস একটা নিষ্ফল ভাবাবেগ মাত্র নয়। তিনি কারণটি একটু পরেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে humanize করে দেয়; কিছুকালের জন্য মনের এমন একটা অনুকূল আর্দ্র অবস্থা এনে দেয় যাতে স্নেহ, প্রীতি, দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে — আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্য কাব্য রচনা করে দেয়।"

মনের মধ্যে একটি আনন্দময় সৌন্দর্য কাব্য এই উৎসবের আবহাওয়ায় যেভাবে গড়ে ওঠে, এমনটি আর কোন সময়ে, কোন উপলক্ষ্যেই হয়ে ওঠে না। অমৃতলাল বসুর 'বাঙালীর দুর্গোৎসবে' একটি সুন্দর রেখাচিত্র পাওয়া যায়। জমিদার বাড়ির আভিজাত্যাভিমানীদের কথা বিশেষভাবে স্মরণে পড়ে।

তিনি বলেছেন—

"ঐশ্বর্যাভিমানে ও জাতিগর্বে রায় মহাশয়েরা সকল সময়ে বড় যার-তার সঙ্গে মিশিতেন না। মাথাটা সতত একটু উঁচু করিয়া থাকিতেন। কিন্তু এ তিনদিন অন্য ভাব; এ তিনদিন গলবস্ত্র, জোড়হস্ত, প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, গুরু-পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, নিমন্ত্রিত অতিথি-ভিখারীদিগের সম্মুখেও কৃতাঞ্জলি। আমাদের জাতিভেদ আছে, কিন্তু সে জাতিভেদ পাতের, আঁতের নয়, এক পংক্তিতে আহার করিতে আমাদের আপত্তি; কিন্তু সর্বজাতিকেই অন্তরঙ্গ করাই আমাদের প্রকৃতি। তাই রায় মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ দুলে-কাওরা, হাড়ী-বাগ্দী সকলেই নিমন্ত্রিত সকলেই প্রসাদ পাইতে আসিত এবং শুভ্রশির, তপ্তকাঞ্চনকান্তি বড় রায় মহাশয় নিজে জোড়হস্ত করিয়া তাহাদিগকে বলিতেন—"বাবা তোদের ঘর—এ কয়দিন নিজের বাড়ীতে গিয়ে যদি কেউ কিছু খাবি, তাহলে এ জন্মে আর তোদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি থাকবে না।"

এই ছবি আর দেখা যাবে না, সেই গ্রামও আর নেই, সেই রায় মহাশয়রাও আজ আর নেই। তবু বাংলা দেশ আছে, পশ্চিম আছে, পূব বাংলাও আছে। পূব বাংলার সংবাদ জানা নেই, পশ্চিম বাংলায় পুজোর পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে, প্রকরণে পার্থক্য ঘটেছে, কিন্তু মানুষের মনটা আজও কিঞ্চিৎ পুরাতন চেতনায় চঞ্চল হয়ে আছে।

দুর্গা দেবীকে উপলক্ষ্য করে, তাঁর প্রতিমার পুজো উপলক্ষ্যে তাই যে ছুটি আমরা পেয়েছি, সে ছুটি শুধু কর্ম-বিরতির নয়, হৃদয়ের সকল রকম জ্বালা থেকে, সকল উদ্বেগ থেকেও ছুটি। তাই এই ছুটি এত মধুর, এত আনন্দের। আপনাদের এই ছুটির অবসর ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

হানা পেলতাঙ্কোভা ॥

সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়ার চার্লস ইউনিভার্সিটির বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা হানা প্লেতাঙ্কোভা কলকাতায় এসেছেন। কলকাতায় একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি কার কাছে প্রথম শুনেছিলাম, তা আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু কেমন করে জানি না এ গান আমার স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কিশোরকালের এক সন্ধ্যায় যে নুপুর বাজিয়েছিল তার রেশ আজও আমার কাটেনি।' এই অনুভবই বাংলা ভাষা শিখবার জন্য তাঁকে প্রথম অনুপ্রাণিত করে। এতদিন পর তিনি বাংলাদেশ দেখবার সুযোগ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' তাঁকে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম স্বাদ এনে দেয়। তারপর চেক ভাষায় অনুদিত অনেকগুলি বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন। ডঃ লেসনীর রচনাও তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী করে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেছেন—'সে নতুন ভাব দর্শনের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের মেয়ের কাছে তার আকর্ষণ যে কি অসামান্য তা বলে বোঝানো যায় না। গুরুদেবের রচনা পড়ে মনে মনে স্থির করে ফেলি আর অনুবাদ নয়, কবির নিজের নিজের ভাষাতেই তাঁর রচনা পড়বো।' প্রাগে যাঁরা বাংলা পড়ছেন, তাঁদের অনেকেই ভারত-চেক সংস্কৃতি দপ্তরে কাজ পাচ্ছেন। শ্রীমতী হানা প্লেতাঙ্কোভা বাংলা-চেক চলতি ভাষার একটি পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করবার জন্য এখানে এসেছেন। কথায় কথায় তিনি জানান গ্রাম বাংলার মানুষ ও বাউলদের নিয়েও তাঁর গ্রন্থ রচনা করবার ইচ্ছে আছে। আধুনিক বাংলা কবিতারও তিনি একজন পাঠক। এর মধ্যেই তিনি চেক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীনের রচনা অনুবাদ করেছেন।

গোখলের জীবনী ॥

শ্রীডি বি মাথুর দীর্ঘ ছয় বৎসর পরিশ্রমের পর গোখলের একটি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি একদিক থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসেও একটি অভিনব সংযোজন। গোখলেকে নিয়ে লেখা হলেও গ্রন্থটি মূলত ১৮৮৫ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক জীবনেরও ইতিহাস। গোখলের কর্মময় জীবন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সময়ের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গোখলে ছিলেন অন্যতম প্রধান পুরুষ। গোখলের ছাত্রজীবন, রাণাডের সঙ্গে সাহচর্য এবং রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে গ্রন্থ ॥

"'পথের পাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু একটি কোকিল-কন্ঠে বসন্ত পূর্ণ হয় না। মাত্র কয়েকটি চলচ্চিত্রকে বাদ দিলে এখনও ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান অবনত।" 'কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক শ্রী এ এন ঝা 'ভারতীয় চলচ্চিত্র' নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে এই কথাগুলো লিখেছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সহৃদয় সমালোচকবৃন্দ শ্রীঝার বক্তব্যকে অস্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। প্রধানত হিন্দী চলচ্চিত্র শিল্পে প্রায়ই যৌন আবেদন প্রচারের যে প্রচেষ্টা তা চলচ্চিত্রের মান উন্নয়নে সহায়ক নয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম সত্যজিৎ রায়। 'টাইম' পত্রিকায় তাঁকে বলা হয়েছে 'চলচ্চিত্রের শেক্সপীয়র'।

আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অমিতা মালিকের 'ভারতীয় ডকুমেন্টারী ফিল্ম'এর উপর রচনাটি খুবই উপভোগ্য। এজরা মীর লিখেছেন শিশু চলচ্চিত্র সম্পর্কে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক। চলচ্চিত্র সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি খুবই সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

বিদেশী সাহিত্য

গ্রুপ ৪৭' সম্মেলন ॥

গ্রুপ-৪৭' হচ্ছে লেখক সমালোচক ও প্রকাশকদের একটি সাহিত্য-সংস্থা। সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে ও ফোর্ড ফাউন্ডেশানের অনুমোদনক্রমে এই সংস্থাটির এ বছরের বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল আমেরিকায়। এই সম্মেলনটি চলেছিল তিনদিন। একত্রিশজন লেখক ও কবি তাঁদের সাম্প্রতিক রচনা থেকে উপস্থিত শ্রোতাদের পড়ে শোনান। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক গুন্থার গ্রাস অনেকগুলি কবিতা পড়ে শ্রোতাদের অবাক করে দিয়েছেন। এছাড়া আর্ণস্ট অগাস্টিন তাঁর সবে শেষকরা উপন্যাস থেকে অংশ পড়ে শোনা। রেনহার্ড লেটো, সুইজারল্যান্ডের পিটার বিখসেল (গত বছরের 'গ্রুপ-৪৭' পুরস্কার প্রাপ্ত), অস্ট্রিয়ার পিটার হ্যান্ডকে ও গুন্থার হারবারজারও তাঁদের রচনা থেকে পড়ে শোনান। আমেরিকান শ্রোতা ও দর্শকরা নাট্যকার পিটার ওয়েসকে দেখার জন্য বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। কেননা দীর্ঘদিন ধরে ওয়েসের নাটক 'মারাট' রয়েল শেক্সপীয়র থিয়েটার কোম্পানীকে অসাধারণ সাফল্য এনে দিয়েছিল। সম্মেলনের শেষদিনটিতে একটি 'সিম্পোজিয়াম' ডাকা হয়েছিল। বিষয় ছিল 'প্রভাবশালী লেখকগোষ্ঠী'। জার্মান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গ্রাস, হ্যান্স ম্যাগনাম এনজেনসবারজার, পিটার ওয়েস, এবং অধ্যাপক হ্যান্স মেয়ার প্রভৃতি। আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও সমালোচক বক্তাদের মধ্যে অংশ নিয়েছিলেন অধ্যাপক লেসলি ফিডলার, এরিক বেনটলে, সুসান সনটাগ ও 'নিউইয়র্ক' প্রকাশনার উইলিয়াম জোভানোভিচ। প্রিন্সটনের এই সম্মেলনের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল গুন্থার গ্রাসের 'সাহিত্যের দালাল ও ভাঁড়দের' প্রতি মজার মজার উক্তি। সম্মেলনটি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল।

এডুইন ও কনোরের উপন্যাস ॥

এডুইন ও'কনোর হচ্ছেন হালের আমেরিকান সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। ইতিপূর্বে তাঁর 'দি লাস্ট হুররা' শুধু শ্রেষ্ঠই নয়, বেস্ট সেলারের গৌরবও অর্জন করেছিল। তারপর তাঁর 'দি য়েজ অব স্যাডনেস' এবং 'আই ওয়াজ ড্যান্সিং' আগেরটির মতোই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'অল ইন দি ফ্যামিলি' তাঁর সর্বশেষ ও চতুর্থ উপন্যাস। ও'কনোরের উপন্যাসের সঙ্গে যাঁদেরই পরিচয় আছে তাঁরা জানেন ধর্ম ও রাজনীতি এবং বিশেষত বস্টনের ক্যাথলিক পরিবেষ্টিত অঞ্চল তাঁকে বার বার আন্দোলিত করেছে। তবে এ বইটির যা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় তা হচ্ছে রাজনৈতিক বাস্তবতা বনাম কাল্পনিকতা। ধর্ম বিষয়ে তিনি বিশ্বাসে উপনীত হলেও রাজনৈতিক দুই বিপরীত দ্বন্দ্বের তিনি সংশয়ে দোলাচল। এ প্রসঙ্গে ও'কনোর বলেন, 'বইটিতে যথাসম্ভব একালের সংশয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস এ বইটি আমাকে আরো খ্যাতিমান করে তুলবে।'

টেলিভিশনে সাহিত্যবাসর ॥

সম্প্রতি ইতালি থেকে টেলিভিশনের মাধ্যমে এক অভিনব সাহিত্যবাসর পরিচালনার খবর পাওয়া গেছে। এর উদ্যোক্তা হচ্ছেন 'ইতালিয়ান রেডিও-টেলিভিশান কর্পোরেশন'। এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ হোল অতীতদিনের বিস্মৃতপ্রায় একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নির্বাচন করা এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ভাষান্তরিত করে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন। প্রথম অনুষ্ঠানে প্রযোজনা করেছেন ইতালিয় সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আলেকজান্দ্রো মানজোনির 'আই প্রমেজি স্পজি' গ্রন্থটি। প্রথম নিরীক্ষাতেই জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রোতা চিঠিপত্রের মাধ্যমে এধরনের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবার জন্য কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানিয়েছেন। মানজোনির উপন্যাসটি ছিল একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রখ্যাত ইতালিয়ান সমালোচকরা বলেছেন যে এধরনের অনুষ্ঠান সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁদের মন্তব্য হল, 'আই প্রমেজি স্পজি' হচ্ছে ইতালিয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস।'

প্রদর্শনী পরিক্রমা

পুজোর বাজারে চিত্রপ্রদর্শনীর বাজার কিছুটা মন্দা পড়েছে। হরতাল ও অন্যান্য গোলযোগ এর জন্যে দায়ী কিনা ঠিক বলা যায় না। তবে একক চিত্রপ্রদর্শনীর কোন বাহুল্য বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে ১৮ই সেপ্টেম্বর গগনেন্দ্রনাথের বাহান্নখানি ড্রইং-এর একটি প্রদর্শনী করা হয়েছিল। সেগুলি প্রতিকৃতি অঙ্কনের নিদর্শনস্বরূপ গগনেন্দ্রনাথের ছবির অনুরাগীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। দু একটি পেন্সিল ড্রইং ছাড়া সবগুলিই চাইনীজ ইংক তুলি দিয়ে আঁকা প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে অনেকগুলি ছবি আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ড্রইং থেকে কপি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে বাঙালী উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পুরুষদের অনেকগুলি টাইপ এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল। ছবিগুলি বেশীরভাগই পাশ থেকে মুখের স্টাডিবিশেষ। তার মধ্যে সাজসজ্জা, কেশবিন্যাস ইত্যাদির যেটুকু আভাস পাওয়া যায় তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। কয়েকটি বাঙালীবাবু এবং কয়েকটি ক্যারিকেচারধর্মী প্রতিকৃতি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। কতকগুলি সাধারণ প্রতিকৃতিতেও গগনেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসবোধের একটা সূক্ষ্ম আমেজ ছবিগুলিতে বিশেষ একধরনের চমৎকারিত্ব এনেছিল। এই প্রতিকৃতিগুলি নিশ্চয়ই শিল্পীর পরিচিত ব্যক্তিদের ছবি। তবে এগুলি কাদের প্রতিকৃতি সে সম্বন্ধে কোন হদিশ পাওয়া গেল না। গগনেন্দ্রনাথের শিল্পকলা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা যদি এ ব্যাপারে আলোকসম্পাত করতে পারেন ত ভাল হয়। কেবল দুখানি ড্রইংয়ের ওপর লেখা ছিল হয় মহাত্মা শিশিরকুমার অথবা মতিলাল ঘোষের প্রতিকৃতি। ছবিতে তারিখ দেওয়া ছিল ১৮৮৯, ৩রা ফেব্রুয়ারী। কতকগুলি নেপালী ও শিখ টাইপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলির মাউন্টিং আরেকটু ভাল হওয়া উচিত ছিল।

●

রেফুজি হ্যাণ্ডিক্রাফট্ ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁদের এসপ্লানেডের শো-রুমে যে ফ্যাশান-প্যারেড ও শাড়ির প্রদর্শনী করেছিলেন তাতে বাংলার তাঁতশিল্পের কারুকলার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী কমলা-দেবী চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৩ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রশংসনীয়ভাবেই কাজ করে আসছেন। এই ফ্যাশান শোর অনুষ্ঠানে, শান্তিপুরী, ধনেখালি, টাঙ্গাইল, মুর্শিদা-বাদী সিল্ক, তসর, বালুচর, রাজবলহাট ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের শাড়ির দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রকমের ব্যবহার দেখানো হয়। সমস্ত ফ্যাশান প্রদর্শনীর মধ্যে টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, রাজবলহাট ও মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়িগুলিই সবচেয়ে নয়নাভিরাম বলে মনে হয়। সোনালি পাড়ের শাদা টাঙ্গাইল এবং কালো জমিতে সোনালি নকশার একটি টাঙ্গাইল শাড়ি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরের শাড়ির মধ্যে সরু সোনালি ডুরে দেওয়া একটি কোটা শাড়িও নকশার পারিপাট্যে অতি চমৎকার হয়েছিল। এছাড়া কিশোরীদের আধুনিক পোষাকেরও একটি ছোট ফ্যাশন শো হয়, কিন্তু তার মধ্যে ভারতীয়ত্বের বিশেষকিছু আভাস পাওয়া গেল না। আর বিলিতী ডিজাইনের সঙ্গে তুলনা করলে এগুলির মধ্যে অভিনবত্বেরও বিশেষ কোন চিহ্ন আছে বলে

শিল্পী : সুরজিত দাস

মনে হয় না। প্রদর্শনীর চোলিগুলির একই ধরনের এবং রঙের ম্যাচিং-এর দিকেও বৈচিত্র্যের কিছুটা অভাব ছিল।

●

১লা ২রা অক্টোবর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে মুর্শিদাবাদ সঙ্ঘ তাঁদের বার্ষিক সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১লা অক্টোবর প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ এবং দ্বিতীয়দিনের নাট্যা-ভিনয়ের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা প্রবাসী মুর্শিদাবাদের জৈন সম্প্রদায় এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। সঙ্ঘের সদস্য ও সদস্যাদের হাতের চারু ও কারু শিল্পের কতকগুলি সুন্দর নমুনা দিয়ে প্রদর্শনীটি সজ্জিত করা হয়েছিল। শিল্পীদের সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে প্রতিভা দুগড়, চন্দ্রলেখা শ্রীমল, অনিতা নাহার, কমলকুমারী সিংঘি জে কে বোথরা, সলিলা সিংঘি ও মার্কো পোলো শ্রীমলের আঁকা ছবিগুলি বিশে আকর্ষণীয় হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের গজ দন্তশিল্পের অনুকরণে শ্রীবিমল সি শ্রীমলের সোলার ছিপ নৌকাটি বিশেষভা উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি এম্ব্রয়ডারী ও উল কাজ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদ বাদের জৈন সম্প্রদায়ের স্বধর্মনি পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি ও বাংলার সংস্কৃতি সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা এবং আতি থেয়তার প্রশংসা করেন। পরে 'আন্ড সেক্রেটারী' নামে একটি হিন্দী প্রহসনে অভিনয় হয়। মুর্শিদাবাদ সঙ্ঘের উদ প্রশংসনীয়—কিন্তু সমগ্র জেলার শিল্প সংস্কৃতির একটি বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যবস যদি এঁরা করতে পারেন ত সেটি আরে বেশী আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই।

●

চারুকলাভবনে ৩রা থেকে ৯ই অক্টোব পর্যন্ত ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটির উদ্যো হিরণ মিত্র ও অভি সরকারের একটি যৌ চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। উভয় শিল্পী সব সমেত প্রায় ৩৫টি ড্রইং ও পেন্টিং উপস্থি করেন। অভি সরকারের কাজগুলির মধ্যে কতকটা সুররিয়্যালিস্টিক ফ্যান্টাসীর ভা বেশী। ডেকরেটিভ এবং আধা-ফিগারেটি কাজই প্রধান। এঁর ছবির সিরিজগুলি নামকরণ হয়েছে 'রিয়্যালিটি'। হিরণ মি আরো বেশী অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এবং তিনি তাঁ সিরিজের নাম দিয়েছেন 'এক্সপ্রেশন'. উভয় কাজের মধ্যেই কিন্তু 'ডিপ্রেশনের' ছাপটা প্রধান এবং একধরনের 'ফ্যান্টাসীর' মধ্যে যেন উভয়ে বিচরণ করছেন বলে মনে হয় শ্রীমিত্রের ছবির রঙের মধ্যে কাল, সিপিয় ধূসর এবং কিছুটা লাল ও কমলার ছোঁয় প্রধান। শ্রীসরকারের আধা-ফিগারেটি ডেকরেশনগুলির মধ্যে চড়া নীল, কাল হলুদ ও লালের প্যাটার্নটুকুই চোখে পড়ে শ্রীসরকারের ছোট ড্রয়িংগুলি কিছু আকর্ষণীয় হয়েছিল।

●

প্রবাসী বাঙালী ভাস্কর শ্রীসুরজিত দ হায়দ্রাবাদের কলাভবনে ২৭ থেকে ৩০' সেপ্টেম্বর তাঁর একক ভাস্কর্য প্রদর্শ করেন। শ্রীদাসের শিল্পকর্ম বাইরের পত্রিক সমাদৃত হয়েছে। বর্তমান সামাজিক পরি স্থিতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের স তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে সেখানকার সমালোচক দেখতে পেয়েছেন। এই প্রতিবাদের মা কোন অ্যাবস্ট্র্যাকশনের আড়াল নেওয়া হয় সরল দৃষ্টিতে বলিষ্ঠতার সঙ্গেই শিল্প আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেছেন। তিক্ততা ত উপজীব্য হয়ে থাকলেও কখনো কখনো তি মাধুর্যের স্তরেও উঠতে পেরেছে 'কৈশোর' এবং 'রাস্তার ছেলে' ভাস্কর্যে ত নিদর্শন মেলে।

—চিত্ররসি

দুটো মিষ্টি মশলা দিয়ে পান, আর চারটে সিগারেট। ব্যানার্জি ওই কণ্ঠস্বর চেনে। তার খদ্দেরদের অনেকেই তার চেনা জানা। কার কি দরকার তাও জানে সে। তাই ব্যানার্জি আগে থেকেই এক একজনের বরাতমত পান জর্দা আর সিগ্রেট আলাদা করে কাগজে মুড়ে রাখে।

সব খবরই তার জানা।

রেল অফিসের ডেসপ্যাচ সেকশনের বড়বাবু বনেদীখোর। তার পানের বরাদ্দও অনেক বেশী। একটা ছোট এনামেলের কৌটা তার বাড়ীতেই থাকে ব্যানার্জি'র কাছে।

তাতে করে বাংলা পান, চুন খয়ের আর সুপারি সেইসঙ্গে স্রেফ ভাজা গুন্ডির মশলা চাই। ওসব বাহারী জর্দা দোক্তায় তার মেজাজ আসে না। ব্যানার্জি আগে থেকেই সেই ডিবেতে ছোট পানগুলো তৈরী করে সাজিয়ে রাখে।

অফিস ঢোকবার আগে রাধাগোবিন্দ-বাবু সূর্যদেবকে বার কয়েক নমস্কার করে ওই পানের ডিবেটি হাতে নিয়ে অফিস ঢুকবে।

পোর্ট কমিশনার্স'এর রাধানাথবাবু ব্যানার্জি'র অনেকদিনের চেনা বোধহয় একদেশেরই লোক। তাই বন্ধুত্বটা একটু বেশী।

অপিস ঢোকবার আগে সময় থাকলে রাধানাথবাবু জিজ্ঞাসা করেন—কি হে ব্যানার্জি, এবার কি বই ধরছ?

ব্যানার্জি'র এখন খদ্দেরের চাপ খুব বেশী। আর সবই তড়িঘড়ি ব্যাপার। অপিস বসবার মুখ।

ট্রাম বাসগুলো চারিদিক থেকে আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে এসে ডালহৌসী স্কোয়ারে খালি হয়ে যায়। কাতারে কাতারে লোকজন ছেলেমেয়েরা নেমে জি-পি-ওর বড় ঘড়িটার দিকে এক নজর চেয়ে বাস-গাড়ী থামা-থামি নেই হুড়মুড়িয়ে ছুটতে থাকে।

কেউবা একটু ধীরে সুস্থে চলেছে। ব্যানার্জি এখানকার ওই চলমান জগতে স্থাণু একটি প্রাণী।

—দাদা পান আর এক প্যাকেট সিগারেট। চট্ করে। ওদিক থেকে কে হাঁকছে।

—অ ব্যানার্জি'দা, বলি লাল ট্যাঁড়া পড়লে কি খুশী হবে। ইস্তক সারা মাসই-তো ওই লাল ট্যাঁড়া বুকে নিয়ে পড়ে আছি দাদা, দাও দিকি এক প্যাকেট সিগারেট।

সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়েই বাবু পয়সাটা ফেলে দিয়ে দৌড়লেন। রাধানাথবাবু খাতায় সই করে ধীরে সুস্থে এসেছে পান খেতে। মাঝবয়সী লোকটা, সংসারে দায় দখল নেই। ঘরই পাতল না। কোথায় একটা মেসেই জীবনের এতগুলো দিন কাটিয়ে দিল। বেশ সৌখীন। রয়ে সয়ে পানটা মুখেপুরে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে একটা ধরিয়ে টানতে টানতে এদিক ওদিক চেয়ে থাকে রাধানাথ।

বল্লে, বুঝলে ব্যানার্জি, ডালহৌসী স্কোয়ারে আমাদের বয়সে একটা শাড়ির আঁচলও দেখিনি। এখন রাস্তায় দাঁইড়ে থাকো—আঁচল ঝাপটা দিয়ে তোমায় চলে যাবে। তা হ্যাঁ— কি বই ধরলে হে?

ব্যানার্জি পানের খিলি মুড়তে মুড়তে জবাব দেয়।

—ভাবছি বর্গী এল দেশেই ধরবো এবার। দলের সবাই তাই বলছে। রাধানাথ কি ভাবছে।

হঠাৎ ওদিককার বাস থেকে কাকে নামতে দেখে একটু থতমত খেয়ে আবার অফিসের দিকে ফিরতে থাকে। ব্যানার্জি জানে ও ওদের সেকশনের বড়বাবু।

তাই রাধানাথ সরে গেল। নইলে আরও খানিকক্ষণ বকাতো এই ভিড়ের সময়। জি-পি-ও'র বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজছে।

অপিসের ভিড় কমে গেছে। ডালহৌসী স্কোয়ারের চারিদিকে বিরাট বাড়ীগুলোর মধ্যে হাজার হাজার লোক ঢুকে বসে আছে। ওই বাড়ীগুলো যেন এক একটা দৈত্য।। এতগুলো লোককে এতদিন ধরে কেবল শুষছে, দীর্ঘ বছরের পর বছর শুষে যেদিন ছেড়ে দেবে সেদিন ওরা নিঃস্ব—রিক্ত।

দিনের শেষে ওদের কর্মক্লান্ত চেহারাটাও দেখেছে ব্যানার্জি।

সেও প্রথম গ্রাম থেকে এইখানে এসেছিল চাকরীর সন্ধানে। কলকাতার দক্ষিণে ছায়াসবুজ গ্রাম, বাঁশবন আমবাগানের ছায়া নামে ক্লান্ত অলস দুপুরে। কোথায় পাখী ডাকে।

সফেদা গাছের ঘন পাতায় রোদ যেন গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। তরুণ ব্যানার্জির মনে সেই মিষ্টি স্বপ্নটা আজও জাগে এমনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

সেদিন সেও এদিক ওদিকে লক্ষ্যভ্রষ্টের মত ঘুরেছিল। আশা করেছিল তাদের গ্রামের আরও পাঁচজনের মত চাকরী একটা পাবে। কিন্তু লেখাপড়া শেখেনি। কি চাকরীই বা পাবে সে।

ঘোরাঘুরিই সার হয়। তাদের গ্রামের রাধানাথদের মেসেই দিনকতক ছিল, পয়সা কড়িও নেই। ক'দিনই বা থাকতে পারবে। এদিকে এসে দুপুরে ক্লান্ত হয়ে বসত ডালহৌসী স্কোয়ারের পলাশতলায়। চারিদিক তখন সবুজ গাছ-গাছালি। ডালহৌসী স্কোয়ারের বুকে তখন ট্রামলাইন ঢুকে সব সবুজকে তছনছ করে দেয়নি।

ঝাউ গাছের নীচে বসতো দ্বারোয়ানদের রামলীলার আসর। খঞ্জনি বাজতো। ওদিকে কোথাও কথকতা শুরু করতো কোন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত।' ব্যানার্জি ঘুরতো এদিক ওদিকে।

রেলঅফিসের বুড়ো দ্বারোয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয় এইখানেই। বুড়ো গিরিধারী সিংহ বলে,

—কুছ পান সিগ্রেট লেকে ইধার বৈঠো বেটা। ক্যা-নোকরী নোকরী করতা হ্যায়? দিন করিব পাঁচ রুপেয়া কামাই হোগা। স্বাধীন ব্যবসা। কথাটা ব্যানার্জির মনে ধরে। বলে সে,

—কিন্তু টাকা তো লাগবে সিংহজী। নিদেন টাট বাট নিয়ে বসতে হবে, কাঠের বাক্স সিগ্রেট পান টান কিনতে হবে। বিশ-পঁচিশ টাকা তো লাগবে। সিংহজীই তাকে সেই টাকা ধার দিয়েছিল।

বুড়ো সিংজীর টাকা অবশ্য ব্যানার্জি কয়েকমাসেই শোধ করে দিয়ে নিজেই কে যন্ত্রপাত করে দোকান ফেঁদেছিল।

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগেক কথা। গিরিধারী সিংকে ভোলেনি ব্যানার্জি লোকটা ভালো কথাই বলেছিল—শুধু তা নয়। তারই সুপারিশে রেল অফিসের গা একটু জায়গা পেয়েছিল।

আজ মনে হয় ভালোই হয়েছে। বছরে সে এই ডালহৌসী স্কোয়ারের জীব অনেক পরিবর্তন দেখেছে, দিন বদলে অনেক। আগেকার দিনে দেখেছে এই হাজ হাজার মানুষের স্বচ্ছল অবস্থা, আ দেখছে ওদের...

ওদের নীরব মুখে হাসির চিহ্ন নেই। কোনরকমে ধুকতে ধুকতে পথ চলে অপিস করতে আসে। ডালহৌসী স্কোয়া রং-এর অতলে বেদনা আর দৈন্যের কালো ছায়াটা ঠেলে উঠছে।

একটা অবকাশ মেলে ব্যানার্জির এ সময়। বাবুরা অপিসে ব্যস্ত। রাস্তায় ভি জমে রেল অপিস-ডক-পোস্টাফিস-কো কাজে আসা লোকদের।

ব্যানার্জির খদ্দের তারাও।

—ও ছেলে, দুটো পান দাও দিকি, এ জর্দা দিয়ে দিও কিন্তু।

ব্যানার্জি এই ফাঁকে পকেট থেকে দ ড়ানো বইটা বের করে বসেছিল। ওই একটা নেশা, গ্রামের যাত্রার দলের সে পা যাত্রার নাম শুনলে সে ঠিক থাকতে পা না। গাজনসন্ন্যাসীর মত ক্ষেপে ওঠে। পা ছিল পার্টটা। বড় পার্ট।

হঠাৎ ওই পানের খদ্দেরের ডাকে চ ভাঙ্গে।

বুড়ী বোধহয় বিশেষ কোন পা বাসিন্দা—এসেছে কোর্টে কি ঝামেলায় প সঙ্গে দু একটা কমবয়সী মেয়ে। ও মুখে চোখেও ওই নোংরা জগতের ছ পড়েছে প্রকট হয়ে। ব্যানার্জি ওদের চে চুপ করে পান দিতে থাকে।

একটা মেয়ে বলে—মোহিনী একটু ে করে দিও ভাই।

ব্যানার্জি জবাব দেয় মোহিনীর আ কি জানি। সে তো তোমাদেরই একচে গো।

মেয়েটা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। ব ধমকে ওঠে।

—থাম বাঁচি। ছেলে আমার শুধু বেচে না—লেখাপড়াও করে দেখছিস মুখরা মেয়েটা জবাব দেয়,

—তা পড়ছে, তবে পড়ার সময় দু চেপে পড়লে আর পান বেচতে হতে অপিসেই ঢুকতো গো।

কথাটা ভেবেছে ব্যানার্জি। জী একটা মস্ত ভুল সে করেছে। এ ব্যবসায় দু পয়সা রোজকার করে সে। তার স ভালোই চলে যায়। তবু লোকে হয়তো মুখে ব্যানার্জিদা বল্লে তবু আড়ালে পানওয়ালা।

ব্যানার্জি চুপ করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে পয়সা গুনে নেয়।
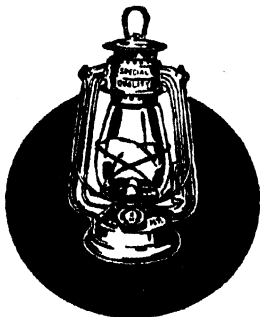
বুড়ি পান চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞাসা করে,—হ্যাগো ছেলে, বলি ওজগারপাতি কেমন হয়?

ব্যানার্জি জবাব দেয়,—চলে কোন-রকমে, যা বাজার পড়েছে।

বুড়ী সায় দেয়,

—ত যা বলেছ বাবা। বাজার সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। কারবারপত্তর তো চলে না। চলবে কোত্থেকে?

বুড়ীর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়। খারাপ যদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানতে হবে খুবই খারাপ অবস্থা।

এক প্যাকেট সিগ্রেট দিন তো? পান-খাবে রমা?

একটি তরুণ এসে সিগারেট কেনে, তার সাজপোষাকও বিচিত্র ধরণের। পরনে সরু দোনলা প্যান্ট, টেরিলিনের সার্ট, পায়ে সুচলা জুতো আর মাথার চুলগুলো সামনে একটা সিঙাড়া পাকানো। সঙ্গের মেয়েটির পরনে বগলকাটা জামা, ঠোঁটে লিপস্টিকের লালচে রং, গালে রুজ মেখেছে। শাড়ীখানা গায়ে থেকে ক্ষণে ক্ষণে উড়ে পড়ছে, ব্লাউজটা নীচের দিকে অস্বাভাবিক মাত্রায় ছোট হয়ে গেছে। দেহের বেশ কিছুটা অংশ অনাবৃত।

দুচোখে লাস্যের ঝিলিক তুলে মেয়েটি জবাব দেয়,

—ন্যাস্টি হ্যাবিট ওই পান খাওয়া। চল মিলন, প্লিজ দেরী হয়ে যাবে ওদিকে। অফিসে ফিরতে হবে না?

দুজনে এগিয়ে গেল ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে। ব্যানার্জি চুপ করে দেখে মাত্র। দেখে বুড়ীর দুচোখ নিমেষের জন্য জ্বলে উঠে। বলে সে,

—বাজার আর থাকবে কোথায় বাবা? তাই বলছিলাম আমাদের খুবই দুর্দিন।

—চল মাসী। মেয়েটির ডাকে বুড়ী এগিয়ে গেল।

ব্যানার্জি এই পরিবর্তনটাও দেখেছে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঘটে গেছে। বিরাট এই ভাঙ্গনের তেড় এসে ঠেকেছে এইখানেই।

ডালহৌসী স্কোয়ারে তখন কোন মেয়ে-দের দেখা যেতো না, বিশেষ করে কোন বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের দেখেনি ব্যানার্জি। যদি দু-চারজন মেয়েদের দেখা যেতো তারা ছিল বিদেশী না হয় এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। কোন সওদাগরি অফিসে চাকরী করতো। তাও ছিল সংখ্যায় নগণ্য।

এখন রাতারাতি ডালহৌসী স্কোয়ার মেয়েদের ভিড়েও ভরে উঠেছে। তাদের মধ্যে অনেক রকম মেয়েই দেখেছে সে। কারো মুখে চোখে অভাব আর দৈন্যের কালোছায়া মাখানো।

তারা যে নিজেদের অসহায় বাবা, মা, ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্যই চাকরীর কঠিন হাড়িকাঠে গলা দিয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। আর কিছু মেয়েদের দেখেছে তারা ওই আগেকার দেখা সেই চটুল মেয়েটির মতই।

সারা দেহে তাদের পোষাকের জৌলুষ, মুখে প্রসাধনের উদগ্র ছাপ। সারা ডালহৌসী স্কোয়ারে তারা রূপের হাট বসিয়ে পশরা মেলে ধরেছে কিসের নেশায়।

অফিসের বেয়ারাদের ভিড় জমে। বাবুরা অফিস ঢোকবার মুখে একবার দু-পাঁচটা সিগ্রেট কিনে নিয়ে যায়। আবার মাঝখানে কিছুটা অবকাশ মেলে ব্যানার্জির।

—রামরাম ব্যানার্জি।

ভুজাওয়ালা এসে বসেছে। ওদিকে কাঁচের শোকেস মাথায় করে এনে নামালো ছোলা মটরওয়ালা, ওপাশে সাইকেলে বাক্স-বসানো রুটিওয়ালা এসে রুটি আর মাখনের দোকান সাজিয়েছে। কলা বিক্রেতার দল ইতি-মধ্যে হাঁকডাক শুরু করেছে।

বিশ পয়সা, বিশ পয়সা।

সারা ফুটপাথে দোকান বসে গেছে, বাবু-দের টিফিন পর্ব এইখানে সস্তায় সারা হয়। কোন দোকানে খেতে গেলে নিদেন আটগন্ডার কমে বসা যাবে না, এখানে মুড়ি শশা শুকনো কলা না হয় দশ পয়সার কলাবেরুনো ছোলা চিবুলেই তবু পেটে খানিকটা চাপ পড়বে।

আবার বাকী সময়টুকু ফুরাতে পারবে বাবুরা। তাই এইখানেই পসরা সাজিয়ে বসে ওরা।

ওপাশে কয়েকটা ছোট বাক্সে নারকেল নাড়ু, তিলনাড়ু আর ছোট নিমকি নিয়ে আসে হরিচন্দন সিং। ওর জিনিষ বিক্রী করার একটা ছলমাত্র। আসলে ওর ব্যবসা অন্য।

লম্বা মেরজাইএর পকেট থেকে নোটবই বের করে ভাবওয়ালার কাছে তাগাদা দেয়।

—তিনরোজকা সুদ বাকী বা, এ্যাই কলা-ওয়ালা গিরীশ, তিনরুপেয়া আভি দেনে হোগা। বসন্ত ওই ভুজাওয়ালাকে বোলা। ওর চোটায় কারবার চলে এখানে। এবেলায় টাকা দেবে ও বেলায় টাকায় এক আনা সুদ। অফিসের বাবুদের মধ্যে টাকা খাটায় চড়া সুদে। তাছাড়া অদৃশ্য কোন দেবতার নৈবেদ্য দেয় সে, এদের কাছ থেকে টাকা-সিকি আধুলি আদায় করে, ওটা তার রোজকার কাম।

তাই তাকে অন্য কেউ চটাতে চায় না। হরিচন্দন সিং ব্যানার্জি'কেই কায়দা করতে পারেনি। বাবুরা তার হাতে। রেলের জায়গায় সে বসে। তাছাড়া ব্যানার্জি তার চোটার খদ্দের নয়।

তবু হরিচন্দন বলে।

বহুৎ নাফা করত হ্যায় ব্যানার্জি।

ব্যানার্জি তবু হরিচন্দনকে সেই দেবতার প্রণামী কিছু দিয়ে যায়। সেটা যে নেহাৎ দায়ে পড়েই! নইলে একজনের জন্য অন্য সকলে কেন বিপদে পড়বে।

টিফিন পিরিয়ড শুরু হয়েছে। ফিরি-ওয়ালাদের ডাকে জায়গাটা মুখর হয়ে ওঠে। দলে দলে বাবুরা বের হয়েছে, মেয়েরাও এসেছে দল বেঁধে।

কেউ কলা কেনে—ওদের মধ্যে কারোও একটু চটকদার সাজ, তারা মর্তমান কলা চড়া-দামের আপেল ডিম কিনে নিয়ে যায়। কোন মেয়েকে দেখা যায় ওই শশা আর ছোলা-ভিজে কিনতে।

সরকারী অফিসের কোন বাবু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে স্রেফ ভিজে ছোলা কাঁচালঙ্কা দিয়ে চিবুচ্ছে। কারো কারো সংগে দেখা হলে বলে,—ফ্রুটস, অল ভিটামিন আর গ্রীন চিলি। খুব পুষ্টিকর হে। তাই চিবিয়ে রাস্তার কলে একপেট জল খেয়ে গোটাকতক ঢেকুর তুলতে তুলতে ফরমাইস করে,

—ব্যানার্জি, একটা পান দিকি, আজ খাওয়াটার চাপ হয়ে গেছে হে। জোয়ান দিও দুটো আর দশ পয়সার সাদাফিতের মিঠেকড়া বিড়ি। দে-এ উ!

ব্যানার্জি জানে ওইসব কাহিনী। চুপ করে পানটা এগিয়ে দেয়।

ওপাশে গতিবাবুকে দেখে একবার মুখ-তুলে আবার মুখ নামিয়ে কাজ করতে থাকে ব্যানার্জি। গতিবাবু ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। এদিক ওদিক চাইছে। কাছে এসে বলে,

দুটো টাকা হবে ব্যানার্জি, কালই দিয়ে দোব।

ব্যানার্জি ওকে অনেকদিন থেকেই চেনে। লোকটা অমনিই। চাকরীতে ঢুকে অবধি তার অভাব গেল না। গতিবাবুর মেয়েও এই-খানে কোন অপিসে চাকরী করে।

ব্যানার্জি তার সাজপোষাকও দেখেছে। মেয়েটা যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে চলছে। ব্যানার্জি জবাব দেয়।

—টাকা আজ নেই গতিবাবু।

গতিবাবু বলে, কাল সুদ সমেত ফেরত দোব।

—ওই হরিচন্দনের কাছে যান।

গতিবাবু গজ গজ করে, ব্যাটা একেবারে চামার। কশাই বুঝলি।

হঠাৎ কাকে দেখে গতিবাবু চনমন করে ওঠে। ভিড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে আগা সাহেব কার খোঁজ করছে।

দূর থেকে গতিবাবুকে দেখে ভিড় ঠেলে ছুটে আসছে এইদিকে। গতিবাবুও নিমেষের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেছে। আগাসাহেব চীৎকার করে।

—এ ব্যানার্জি, তুম গতিবাবুকে দেখা। আভি থা, আভি গায়েব হো গিয়া। বদমাস গতিবাবু। বোলতা হ্যায় রেলমে কাম করতা হ্যায়, ঝুটা বিলকুল ঝুটে।

আগাসাহেবকেও ফাঁসিয়েছে গতিবাবু।

ব্যানার্জি জবাব দিল না। কোনদিকে বেলা বয়ে যায়। দুপুরের কাজের চাপ বেশ পড়েছে। মাসের প্রথমদিক। বাবুদের পকেট গরম। তাই বেচাকেনা ভালোই চলে।

এমন সময় কথাটা শোনা যায়।

হরিচন্দন হাসছে। ওপারে রাস্তার দিক থেকে সংবাদটা হাওয়ায় ভেসে আসে।

দুটো অক্ষর! তাতেই সারা ফিরিওয়ালা মহলে আতঙ্ক পড়ে যায়। ফলওয়ালা ঝুড়ি মাথায় দিয়ে ছুটছে। কলাওয়ালা হাওয়ায় মিশিয়ে গেছে। ছুটছে ভুজাওয়ালা।

ব্যানারজিও চকিতের মধ্যে বাকসের ডালাটা বন্ধ করে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সরে যায়।

ওদিকে গাড়ী থেকে লোকজন নেমে দু-একজন ফিরিওয়ালাকে ধরে ফেলেছে। আলু-কাবলীওয়ালার আলু মটর সেদ্ধর বারকোষটা উলটে পড়েছে রাস্তায়।

ছিটিয়ে পড়েছে মটরসেদ্ধ, কতকগুলো ভিখারী ছেলেও এসে জুটে তাই তুলে খাচ্ছে। আলুকাবলীওয়ালার তেঁতুল জল গোলা হাঁড়িটা টেনে নিয়ে গাড়ীতে তোলে।

জায়গাটা নিমেষের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায়। ক্রেতার দলই এদিক-ওদিকে ঘুরছে, সস্তায় তবু টিফিনের ব্যবস্থাটা সারা হোত এইখানে, যাহোক ঠোঙায় করে মুড়ি আর কলাইভাজা, না-হয় শশা চিবিয়ে।

কিন্তু তাও আজ হ'ল না। মাঝে মাঝে এমনি হল্লা হয়। আর অনেক বাবুকেই কলের জল খেয়ে অফিস ফিরতে হয়।

গোলমাল মিটে যেতে ছত্রভঙ্গ ফিরি-ওয়ালার দল আবার একে একে এসে জমায়েত হয়, টাট-বাট সাজিয়ে বসে যে-যার জায়গায়।

এইটাই বিশ্রী লাগে ব্যানার্জির। পয়সা দিয়েও এতটুকু ভাড়ার একটা ঠাঁই পেতে অনেক চেষ্টা করেছিল। ওপাশের কোন অপিসের গায়ে একতিল জায়গা আছে, ভাড়া লাগবে।

ভাড়া এমন কিছু নয়, তবে খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশী। দরখাস্ত করো তদ্বির তদারক করো। বাবুদের কাছে যাতায়াত তো আছেই। ফণীবাবু কথা দিয়েছেন ওটা বোধ-হয় হয়ে যাবে সামনের মাস থেকেই। কটা দিন কোনমতে এই ফুটপাথের ধারে বসে তাকে কাটাতে হবে।

হরিচন্দন সিং হাসে।

—ক্যারে ব্যানার্জি, তোর বাঁধা দোকান কবসে হোবে।

ও লোকটাই শয়তান। আড়ালে সেই খবর দেয়। তাছাড়া এখানকার সব ফিরি-ওয়ালাকেই চুষে নিচ্ছে লোকটা। ব্যানার্জিকে পারেনি।

ব্যানার্জি জবাব দেয়, দেখা যাক কবে হয়।

ওদিকে হরিচন্দন সিং বেলাশেষের হিসাব করছে। দিনের সুদের হিসেব। কলা-ওয়ালা ছোকরাকে ধরেছে,

—মুফত ব্যবসা করেগা হিয়া? ভাড়া লাগবে না? তাছাড়া পাঁচ টাকার সুদ সব মিলিয়ে এক রুপেয়া দেনে হোগা।

একদিনের লাভের সবই যাবে ওই ধূর্ত লোকটার উদরে। ছেলেটা জবাব দেয়, তোমার সুদ তো দশ টাকার উপর হয়ে গেছে। আর ভাড়া—ভাড়া চাইছ কেন? এ তো কর্পোরেশনের রাস্তা।

হরিচন্দনের মুখোমুখি দাঁড়ায় সে। অভাবের তাড়নায় সেও মারমুখী হয়ে উঠেছে। আরও ক'জন ফিরিওয়ালাও তার সংগে যোগ দিয়েছে। তারাও বলে—

—পাঁচ টাকা দিয়েছো, সুদ নিয়েছো দশ টাকার। টাকা শোধ হয়ে গেছে।

হরিচন্দন দল বেঁধে ওদের রুখে আসতে দেখে আপাতত চুপ করে। তবু গজগজ করতে ছাড়ে না,

—দেখিয়ে ব্যানার্জিবাবু, লেবার সময় কত কথা এখন বোলতা হ্যায় রুপেয়া দে দিয়া পুরা। জমানাই এইসা হ্যায়। দেখ লেগা উলোককো হম্।

হরিচন্দন সিং ওদের বিপদে ফেলবে আবার কালই।

ও সাপের জাত, এই কারবার করে শহরে একটা বস্তি করেছে—একটা ট্যাক্সিও আছে। সে কারবার ওর ভাতিজারা দেখে।
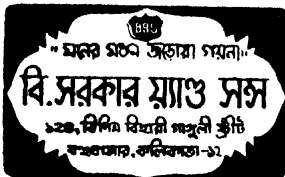
তবু সে এখনও এইখানে ওই পাড়ায় নিয়ে এসে বসে সুদের কারবার চালায়। ছেলেগুলোও হরিচন্দনকে শাসায়—

কতবড় মরদ তুমি দেখা আছে।

বৈকালের রোদ হলুদ হয়ে আসে। ব্যানার্জির একটু সময় মেলে এতক্ষণে। বিক্রী-বাটাও মন্দ হয় না। স্বপ্ন দেখে ওই

খালি কাঠের বাকসটা রেলঅফিসের দারোয়ানের ঘরে তুলে দিয়ে এইবার বাসার দিকে ফিরবে ব্যানার্জি। বাসা বলতে একটা বস্তির ঝুপড়ি ঘর। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষটা থলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

চারদিক তখন জনহীন হয়ে গেছে। দু-একটা গাড়ী বেগে বের হয়ে যায়।

পান খাবে নাকি ?

অফিসের জায়গায়, একটু দোকান করবার সুই পেয়েছে। ঘটা করে নিজে শো-কেস বানাচ্ছে। একটা টুল কিনবে। সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাজা-কোমর টনটন করে।

বিয়ে-থা করেনি। দোকানটা হয়ে গেলে একটা বাঁধা আশ্রয় হবে, ফেলে-ছড়িয়ে দু, মাসে শ-দেড়েক টাকা লাভ থাকবেই। ওদের শূন্য ঘরটা তার পূর্ণ হবে।

বিয়ে করবে এইবার। মেয়েও তার দেখা হয়ে গেছে। উত্তরপাড়ার মালতী। মালতীর বাবা তো এখনই বিয়ে দেবার জন্য রাজী হয়ে আছে। রাজী হয়নি ওই ব্যানার্জিই। স্থির হয়ে তবে ঘর বাঁধবে।

বৈকালের আলোটুকু ম্লান হয়ে আসে।

ডালহৌসী স্কোয়ারে ওই বড় বড় বাড়ী থেকে কাতারে কাতারে লোকজন মেয়ে-ছেলেরা বের হয়ে ওই দানবগুলোর সীমানা থেকে যেন যত শীঘ্র পারে পালিয়ে বাঁচছে।

ট্রাম-বাসগুলো ঠাসা বোঝাই। মেয়েরাও ভিড় মানে না। গুঁতোগুঁতি করে ঠেলা-ঠেলি করে পুরুষদের হটিয়ে দিয়ে তারাও ট্রামে বাসে উঠছে।

রাতের অন্ধকারে ডালহৌসী স্কোয়ার জনশূন্য—ফাঁকা হয়ে আসে। এর রূপ আলাদা। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে।

শেষ সন্ধ্যা অবধি থাকতে হয় ব্যানার্জিকে। তখনও দু-একটা অফিসে কাজ-কর্ম চলে, বিক্রীটা সেই সন্ধ্যার মুখে ভালোই হয়। ঝড়াত-পড়াত্তি মাল সবই প্রায় উঠে যায়।

জি-পি-ওর ঘাড়িটায় আলো জ্বলছে। জনহীন প্রশস্ত পথ পার হয়ে ব্যানার্জি ডালহৌসী স্কোয়ারে ঢুকল, ট্রামও কমে গেছে। স্টপেজেও লোকজন বিশেষ নেই।

সারাদিন যেখানে হাজার হাজার লোক গিসগিস করে সেই রাঙ্গা ডালহৌসী স্কোয়ারের এই শূন্য রূপও বিচিত্র ঠেকে। মোহময়ী সাজে সেজে দাঁড়িয়ে আছে রাতের অন্ধকারে এই রাঙ্গা ডালহৌসী। কত হাসির কান্নার সাক্ষী এর বুকে।

ক্রমশঃ দিনের আলো মুছে গিয়ে আঁধার নেমেছে। নিওন আলোগুলো জ্বলছে, নীলাভ আলোর সলাজ আভা পড়েছে ডালহৌসী স্কোয়ারের কালো জলে। ঘন বেড়া গাছগুলো আঁধারে থমথমে হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কাদের কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়াল ব্যানার্জি। হাতে সারাদিনের বিক্রীর তহবিল, অন্য একটা থলেতে কিছু সিগারেট দোক্তা-সুপারি কৌটো। কে জানে কোন বদমাইস লোকই হবে বোধহয়।

কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বেড়ার ওপাশে একটা বেঞ্চে বসে আছে একটি মেয়ে—দুহাতে তার মুখ ঢাকা—তবু একফালি আলো এসে পড়েছে ওর গালে, চিনতে পারে ওকে ব্যানার্জি।

সেই কাবুলিওয়ালার তাড়া খাওয়া গতিবাবুর মেয়ে। ওকে দেখেছে এর আগেও। সাজ-বেশে লাস্য আর কামনার ঢেউ তুলে সে এর তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

আজ দুপুরেই দেখেছিল, ওই মেয়েটিকে সেই বিচিত্র সঙ্কাম র্কা ছেলেটার সঙ্গে। এতক্ষণ কোথায় ছিল তারা কে জানে।

মেয়েটি কান্নাভিজে কণ্ঠে বলে।

—আমার আর বাঁচার পথ নেই। মুখ নেই। এই চরম সর্বনাশের জন্য তুমিই দায়ী।

হাসছে ছেলেটি—বারে! ওসব বাজে কথায় আমি নেই। ঠিক বাঁচবে তুমি। ছেলেটি দাঁড়াল না, আঁধারে কোথায় হারিয়ে গেল।

মেয়েটি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ব্যানার্জি সরে গেল।

আনমনে এগিয়ে চলে লালবাজারের দিকে—ওখান থেকে ট্রাম ধরে উত্তরের দিকে যাবে।

আবছা অন্ধকারে ঢাকা রহস্যময়ী ডাল-হৌসী স্কোয়ারের বুকে যেন কে কাঁদছে—এই কান্নার শেষ নেই।

এই ক্রন্দনময়ী রূপটাই এর সত্য, দিনের আলোয় বহুজনের ভিড়ে ক্লান্তি আর হতাশার দীর্ঘশ্বাসে এ কাঁদে।

এই চিরন্তন কান্নার শেষ নেই।

ব্যানার্জি একটা বিড়ি ধরিয়ে এইবার ফাঁকায় গলা ছেড়ে নবাব আলিবর্দির একটো শুরু করেছে। ওদের দেশে কিন্নর অপেরা পার্টির বই 'বর্গী এল দেশে' সে—পানওয়ালা শম্ভু ব্যানার্জি সাজতো নবাব আলিবর্দি।

তারই মকশো করছে সে।

হিমালয়ে শিরঃপীড়া

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফর করতে এসে তাঁর পরলোকগত পিতার উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, এতদিন হিমালয় ভারতবর্ষকে পাহারা দিচ্ছিল, এখন ভারতবর্ষকেই হিমালয় পাহারা দিতে হচ্ছে।

হিমালয় ভারতের এই শিরঃপীড়ায় কয়েকটি উদ্বেগজনক লক্ষণ ইদানীংকালে প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতের আশ্রিত রাজ্য সিকিমের "গিয়ালামো" অর্থাৎ মহারাণী, আমেরিকান কন্যা শ্রীমতী হোপ নামগিয়াল, সম্প্রতি একটি পত্রিকায় দার্জিলিং-এর উপর সিকিমের দাবীর সমর্থনে "ঐতিহাসিক নজীরের" উল্লেখ করে একটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

সেই বিতর্কের রেশ মিটতে না মিটতেই ওয়াশিংটন থেকে আর একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ এসেছে। সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকায়—পাঠিয়েছেন ঐ পত্রিকার ওয়াশিংটস্থিত সংবাদদাতা শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য, এই সংবাদে বলা হয়েছে যে, সিকিমের "ছোগিয়াল" অর্থাৎ মহারাজা পলডেন থানডুপ নামগিয়াল সস্ত্রীক আমেরিকা সফরে গিয়ে নাকি ঘরোয়া কথাবার্তায় এই বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, ভারতবর্ষ সিকিমের উপর অযথা আধিপত্য করার চেষ্টা করছে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে অভিযোগ করেছেন সিকিমে নিযুক্ত ভূতপূর্ব ভারতীয় দেওয়ান শ্রী বি প্রসাদের বিরুদ্ধে। এই দেওয়ান সাহেব নাকি "মাতব্বরি" করতেন।

বৈঠকখানায় বা ককটেল পার্টিতে সিকিমের মহারাজা কখন কি বললেন তাতে কারও কিছু এসে যেত না অথবা কেউ তাঁর কথা বিশেষ লক্ষ্য করতেন না যদি না ইতিমধ্যে তাঁর নাম আর একটি প্রসঙ্গে জড়িয়ে যেত।

সে-প্রসঙ্গটি হচ্ছে এই :—এশিয়া সোসাইটি নামে একটি বেসরকারী মার্কিণ প্রতিষ্ঠান আছে—যে প্রতিষ্ঠান বৃত্তি দিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লোকদের আমেরিকায় নিয়ে যায় এবং আমেরিকা থেকে এশিয়ায় প্রতিনিধি পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা "কাউন্সিল" আছে। সম্প্রতি প্রস্তাব এসেছে যে, এশিয়া সোসাইটিতে সিকিমের জন্যও আলাদা একটা "কাউন্সিল" স্থাপন করা হোক। সিকিমের মহারাজাকে এই "সিকিম কাউন্সিল"-এর উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়।

ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। কেননা, সিকিমকে এশিয়ার অন্যান্য যেকোন দেশের সমকক্ষ বলে গণ্য করার অর্থ হচ্ছে আশ্রিত রাজ্য হিসাবে সিকিমের সঙ্গে ভারতের যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে সেটা অস্বীকার করা। সিকিমের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারত সরকারের মারফৎ পরিচালিত হয়। স্বভাবতঃই ভারত সরকার চান না যে, এই আশ্রিত রাজ্যের সঙ্গে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের বা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি যোগ স্থাপিত হয়।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের এই কূটনৈতিক প্রতিবাদে কাজ হয়েছে। "সিকিম কাউন্সিল"-এর উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার যে-সভা ডাকা হয়েছিল শেষ মুহূর্তে তার উদ্দেশ্য বদলে বলা হল, এই সভায় সিকিমের মহারাজাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।

ভারতের সঙ্গে সিকিমের সম্পর্ক বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত হয় ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত চুক্তির দ্বারা। বৃটিশ আমলে সিকিমের মর্যাদা প্রায় অন্য যে-কোন সামন্ত রাজ্যের মতই ছিল। সিকিমের রাজা তখন অন্যান্য দেশীয় রাজার মতই "চেম্বার অব প্রিন্সেস"-এর সভ্য ছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ইচ্ছা করলে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত সিকিমকেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু প্রধানতঃ জওহরলাল নেহরুর আগ্রহেই সিকিমের স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। হিমালয়ের কোলে লালিত তিন শতাধিক বৎসরের এই পুরাতন রাজ্যের যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে তাকে রক্ষা করাই নেহরুর উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই ১৯৫০ সালে সিকিমকে ভারতের "প্রোটেকটোরেট" বা আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে ভারতবর্ষ সিকিমের সঙ্গে চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষ সিকিমের বহির্দেশীয় সম্পর্ক (রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও আর্থিক) পরিচালনার, প্রতিরক্ষার ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

সিকিমের ছোগিয়াল ইদানীংকালে এই চুক্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং চুক্তিটি সংশোধন করে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল করার জন্য দাবী জানাচ্ছেন। তাঁর দাবী এই যে, ভারতের সঙ্গে ভুটানের যে-ধরনের সম্পর্ক আছে সিকিমের সঙ্গেও সে-ধরনের সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ভারত-ভুটান চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ভারত-সিকিম চুক্তির এক বৎসর আগে। দুই চুক্তির মধ্যে তফাৎ এই যে, ভুটানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ মেনে নিয়েছে যে, সে ভুটানের আভ্যন্তর শাসনে কোন রকম হস্তক্ষেপ করবে না। (সিকিমের মহারাজা শাসন চালান একজন ভারতীয় "দেওয়ান"-এর সাহায্যে)। তাছাড়া ভুটানকে তার নিজের "শান্তি ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় বা সেই উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধের সরঞ্জাম" আমদানী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সিকিমকে এই সব অধিকার দেওয়া হয়নি। সিকিমকে রক্ষা করার ভার ভারতীয় সৈন্য দলের উপরই ন্যস্ত।

ভারতবর্ষের সঙ্গে সিকিমের এই বিশেষ সম্পর্ক অস্বীকার করার চেষ্টাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। সিকিমের নিরাপত্তা ভারতের সমগ্র উত্তরসীমান্তব্যাপী হিমালয়ের নিরাপত্তারই সঙ্গে জড়িত। সেখানে চীন নিরন্তর একটি বিপদের সৃষ্টি করে রাখছে। সিকিমের উপর অবশ্য চীনের কোন ভৌমিক দাবী নেই। কিন্তু সেখানে চীনের রাজনৈতিক দৃষ্টি আছে। চীন সিকিমকে ভারতের আওতা থেকে "মুক্ত" করার জন্য প্রচার চালাচ্ছে। তিব্বত থেকে "আশ্রয়প্রার্থী" হয়ে যারা সিকিমে এসেছে তাদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক চীনা চরও এসেছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

সিকিমকে নিয়ে ভারতের যে-উৎকণ্ঠা ভুটানকে নিয়েও কতক পরিমাণে তাই। ভুটানের মাহারাজা নিজে অবশ্য ভারতের সঙ্গে তাঁর দেশের বিশেষ সম্পর্ক অস্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু ভুটান রাজ দরবারে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা দুই দেশের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছেন।

ভুটানের ক্ষেত্রে আরও বিপদ এই যে, এই রাজ্যের উপর চীনের ভৌমিক দাবী আছে। সম্প্রতি এই রাজ্যে চীনা অনুপ্রবেশের সংবাদ পাওয়া গেছে। (অবশ্য যে-এলাকায় চীনের দাবী রয়েছে সেখানে নয়)। এই অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে।

সম্ভবতঃ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার এই ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর সম্পর্ক নষ্ট করা। ভারতবর্ষ এই চীনা অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ করে চীনের কাছে নোট পাঠিয়েছে। এটা অবধারিত যে, চীন এই "নোট" অগ্রাহ্য করবে এবং ভুটান যাতে ভারত সরকারকে এড়িয়ে চীনের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করে তার জন্য চাপ দেবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

ভূমি সংস্কার কমিটির রিপোর্ট

পরিকল্পনা কমিশনের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার রূপায়ণ সংক্রান্ত কমিটি সম্প্রতি এক রিপোর্টে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ভূমি সংস্কারে যদি "উচ্চতম গতি" অনুসরণ করা না হয়, তাহলে চতুর্থ পরিকল্পনার কৃষির লক্ষ্য গুরুতর রকমে ব্যাহত হবে।

এই কমিটি তিন বছর আগে গঠিত হয়েছিল। তিন বছর ধরে পরিশ্রম করার পর কমিটি যে সিদ্ধান্তে পেণছেছেন তাতে নতুন কথা অবশ্য কিছু নেই। তবু এই রিপোর্টের দ্বারা আমরা আরেকবার জানতে পারলাম গত ১৯ বছরের বহু সিদ্ধান্ত এবং তারও আগের বহু বছরের সংকল্পের পরেও ভারতের কৃষি ব্যবস্থার এই মৌলিক ত্রুটির দিকটি আজও কতখানি উপেক্ষিত।

সুদূর ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : "...এই (কৃষি ব্যবস্থার) সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের এবং জমির মালিকানা ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত মান্ধাতার আমলের ও শোষণধর্মী ব্যবস্থাদির আমূল পরিবর্তনের ওপর।"

পরে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এক সুপারিশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছিল যে, (১) সমস্ত জমির মালিকানা সমগ্রভাবে ভারতের জনগণের অধীনে আনতে হবে, (২) ঐ জমির ব্যবহারজনিত লভ্যাংশ বা উদ্বৃত্তও সমষ্টির অধীনে আনতে হবে, (৩) উত্তরাধিকার প্রথা বন্ধ করতে হবে, (৪) মধ্যস্বত্বভোগীদের বাতিল করতে হবে, (৫) প্রত্যেক কৃষি শ্রমিককে জীবনযাত্রার একটা ন্যূনতম মানের গ্যারান্টি দিতে হবে, (৬) নিস্ফল সমস্ত ঋণ বাতিল করতে হবে।

এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে যে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল স্বাধীনতার গোড়ার দিকেও তার কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। অর্থনৈতিক কর্মসূচী কমিটি এবং কৃষি সংস্কার কমিটিও অনুরূপ সুপারিশ করেছিলেন। অর্থনৈতিক কমিটির প্রস্তাব ছিল যে, সমস্ত জমিদার চাষবাস করেন না, তাঁদের জমি গ্রাম সমবায়ের অধীনে আনা হোক, জমির মালিকানার সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হোক, এবং উদ্বৃত্ত জমিও গ্রাম সমবায়ের হাতে দেওয়া হোক। কৃষি সংস্কার কমিটির প্রধান সুপারিশ ছিল এই যে, যে চাষী ক্রমাগত ছ' বছর ধরে জমি চাষ করে আসছে, জমির মালিকানাও স্বাভাবিকভাবেই তাকেই দিতে হবে। জমির মালিক ইচ্ছা করলে আবার ঐ জমি ফিরে নিতে পারবেন, তবে তাঁকে গায়ে-গতরে খাটতে হবে।

কিন্তু তার পরেই আদর্শের সংগে আপোষ করা আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় পর্যন্ত কয়েকটি রাজ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের বাতিলের কাজ এগোলেও পরিকল্পনা কমিশন গায়ে-খাটা চাষী ও গায়ে না-খাটা চাষীর মধ্যে কোন পার্থক্য রাখলেন না, গায়ে খাটার বাধাবাধকতা তুলে দিলেন এবং ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাছাড়া পরিকল্পনায় জমির স্বত্বের কোন সংজ্ঞা বেঁধে না দেওয়ায় ভাগচাষীরা স্বত্ব আইনের আওতার বাইরেই থেকে যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাতেও একই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার ভাষায় : "জমিদার, জাগিরদারী, ইনামদারী প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব ভোগ উচ্ছেদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে দুই কোটিরও বেশী চাষী সরকারের সংগে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এসেছে। গত কয়েক বছরে সকল রাজ্যেই জমির মালিকের প্রাপ্য কর (উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত) নিয়ন্ত্রণ করে আইন পাশ করা হয়েছে। এগারটি রাজ্যে ও সবগুলি কেন্দ্রশাসিত এলাকায় চাষীর স্বত্ব নিরাপদ করার জন্যে আইন পাশ করা হয়েছে এবং এর ফলে (১) অবৈধভাবে কাউকে উচ্ছেদ করা চলবে না, (২) মালিক ব্যক্তিগত চাষের জন্যে পুনরায় দখল নিতে পারেন, (৩) দখল নিলেও একটা ন্যূনতম এলাকা চাষীর হাতে থাকবে। চাষীদের জমির মালিকানা দেবার ব্যাপারেও কিছু কিছু কাজ হয়েছে।

ভূমি সংস্কার কমিটির রিপোর্টেও একই কথা বলা হয়েছে : গত পনেরো বছরে দুই কোটি চাষী সরকারের সংগে সরাসরি সংপর্কে এসেছে, তিরিশ লক্ষ চাষী ও ভাগচাষী সত্তর লক্ষাধিক একর জমির মালিকানা লাভ করেছে, জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার পর বিশ লক্ষ একর জমিকে উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে ও দখল নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে এই অগ্রগতি কিছুই নয়। কমিটি এই অপূর্ব লক্ষ্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং এই দিক দিয়ে রিপোর্টটি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার অগ্রগতির বিশদ পর্যালোচনা করে কমিটি দেখিয়েছেন যে, ভূমি সংস্কার আইনে এখনও ফাঁক রয়ে গেছে। ভাগচাষ প্রথায় এখনও কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক এলাকা চাষ হচ্ছে। সমর্পণের ব্যবস্থার নামে চাষীদের উচ্ছেদ এখনও অব্যাহত আছে। কয়েকটি রাজ্যে জমির কর ন্যায্য করার নির্দেশ ভালভাবে কার্যকর করা হয় নি। হস্তান্তর ও খণ্ডীকরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত আইনটি লংঘন করা হচ্ছে, এবং তার ফলে ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিলি করবার মত জমি খুব কমই পাওয়া যাচ্ছে। ব্যক্তিগত চাষের নামে ব্যাপক এলাকা এখনও কার্যত প্রজার দ্বারাই চাষ হচ্ছে।

এই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্যে কমিটির সুপারিশ হল :

(১) ব্যক্তিগত চাষের নামে বিলি করা জমি পুনরায় দখল করার নীতি এর পর থেকে বন্ধ করতে হবে;

(২) চাষীর স্বত্ব থেকে নিরাপদ করার জন্যে মালিক ও চাষীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অবসান ঘটাতে হবে;

(৩) জমির 'ভাড়া' নগদ মুদ্রায় পরিণত করতে হবে। সরকার চাষীদের কাছ থেকে ঐ 'ভাড়া' আদায় করে আদায়ের খরচা বাদ দিয়ে বাকিটা মালিককে দেবেন।

এই সুপারিশগুলির রূপায়ণের তদারক, চাষীদের স্বত্বের সঠিক রেকর্ড তৈরী এবং চাষীদের আর্থিক প্রয়োজনের ওপর নজর রাখার জন্যে কমিটি প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছেন। বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরায় এই ধরনের কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সুপারিশগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু কেবল কমিটি গঠন করলেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, তাহলে পনেরো বছর আগেই ভারতের ভূমি সংস্কার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তা হয় নি। আর হয় নি বলেই এই রিপোর্ট সম্পর্কে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় তা হল : এই সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্যে সরকার এখনও কতখানি প্রস্তুত? আমরা জানি, রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং সুবিধা-অসুবিধার মুখ চেয়ে সরকারের পক্ষে এতদিন সুপারিশগুলি কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। সেই প্রয়োজন কি এখনও নেই?

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

চাঁদা চাইতে এসেছিল পাড়ার কতকগুলি ছেলে। দাশমশাই একটা ঝকঝকে নতুন অভিধান দেখছিলেন নিবিষ্ট মনে। ছেলের দল দেখে তাঁর নিবিষ্টতা আরো বেড়ে গেল। তিনি আরো মনযোগের সঙ্গে অভিধান দেখতে লাগলেন। কিন্তু ছেলেরা এর আগে অভিধান না দেখুক, দাশমশাইকে দেখেছে বহুবার এবং তিনি যে প্রথমে চাঁদা দিতে আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত একটি টাকা দেবেন প্রতিবারকার মত তা তারা জানত। অতএব তারা বিশেষ ঘাবড়াল না। দলের সর্দার গোছের ছেলেটি বলল, এবারের চাঁদাটা......।

দাশমশাই বললেন, চাঁদাটা? ও এই যে বলে পকেট থেকে একটা দু টাকার নোট বের করে দিয়েছেন। ছেলের দলের প্রত্যেকটি নানা পর্যায়ে হাঁ করে রইল। তারপর একটু সুস্থির হয়েই চটপট একটা রসিদ লিখে দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল।

দাশমশাই অভিধান দেখতে দেখতেই বললেন, বাজে খরচ, বাজে খরচ সাংঘাতিক বাজে খরচ।

পাশে তাঁর বন্ধু বসে ছিলেন। তিনি বললেন, বাজে খরচ হলেও দিতে হয়। না দিয়ে কি উপায় থাকে। তা তুমি প্রতিবারকার মত এক টাকা দিলেই তো পারতে, দু টাকা দেবার কি দরকারটা ছিল?

দাশমশাই বললেন, চাঁদার কথা বলছি না, আমি ভাবছি এই অভিধানটার কথা। তবে তুমি যখন চাঁদার কথাটা বললেই তখন বলি, আসলে ওরা কিন্তু এক টাকাই পেল, দু টাকা নয়।

বন্ধু বললেন, আমি যে স্পষ্ট দেখলাম দু টাকার নোট?

দাশমশাই বললেন ছোকরারা তো জানে না আমি আগামী বছর পুজোর দু মাস মাদ্রাজে থাকছি অতএব এই দু টাকায় আগামী বছরের চাঁদাটাও কৌশলে দিয়ে দিলাম।

বন্ধু বললেন, তাই বল। কিন্তু অভিধান কেনা কি বাজে খরচ কথা?

দাশমশাই বললেন, নিশ্চয়। কেন না যে সব কথা তুমি জীবনে ব্যবহার করবে না সেগুলো সমেত অভিধান কেনাটাকে আমি অন্যায় অপব্যয় মনে করি।

বন্ধু বললেন অভিধানে সব কথাই থাকা দরকার। দাশমশাই বললেন, ওসব তোমার ভুল ধারণা। যেমন যে সব জিনিস তুমি কখনো ব্যবহার কর না সেগুলো কি তুমি কেনো? অবশ্য বহু লোক আছেন, যারা কিছু কিছু জিনিস কিনে রাখেন, পরে দরকার হতে পারে এই মনে করে।

—তাহলে তুমি কি করতে বলো? বন্ধু প্রশ্ন করলেন।

দাশমশাই বললেন, আমি মনে করি অভিধান কেনারই কোন অর্থ হয় না। যে সব কথা আমি রোজ ব্যবহার করছি সেগুলোর অর্থ তো আমি জানিই। আর যে সব কথা আমি জানি না, সেগুলো না হয় নাই জানলাম, ক্ষতি তো হচ্ছে না আমার। তাছাড়া এই দেখ না কেন নাসত্য কথাটা। একথা আমি বা আমরা কোনদিন ব্যবহার

করব বলে মনে হয় না। নাসত্য মানে হচ্ছে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আমি যদি একথাটা অভিধান দেখে ব্যবহারও করি তাহলেও কি কেউ বুঝবে? আর আমি ভাবতেও পারি না হঠাৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যবহার করে কথা বলবই বা কেন? তারপর ধরো গিয়ে নিচুল। আমি বেত গাছ বলতে গিয়ে নিচুল কখনোই বলব না, বললেই বা কে বুঝবে। উত্তরীয় বস্ত্র বলতে যদি চাই তাহলেও নিচুল কথাটা নিয়ে টানাটানি করব না। অথচ কথাটা অভিধানে জ্বল জ্বল করছে। যাঁরা অভিধান লেখেন বা ছাপেন তাঁদের প্রতি আমার যে বেজায় পৈশুন্য রয়েছে তাও নয়।

—পৈশুন্য? কথাটার মানে কি হে?—জিজ্ঞেস করলেন বন্ধু।

—কথাটা তুমি জানো না। আমিও জানতাম না—এই এক্ষুনি অভিধান উল্টোতে গিয়ে নজরে পড়ল। এর মানে হচ্ছে – পিশুনের ভাব বা আচরণ: খলতা, ক্রূরতা, দ্বেষ। এর মধ্যে অবিশ্যি আমি মীন করেছি দ্বেষ। আমার কোনো দ্বেষ নেই। তবে সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। আমি চাই বাজে খরচের প্রগ্রহকে টেনে ধরতে।

বন্ধু প্রশ্ন করলেন প্রগ্রহটা আবার কি, উপগ্রহ-গ্রহ কিছু নাকি?

দাশমশাই বললেন, প্রগ্রহ মানে হচ্ছে লাগাম বলগা কিংবা বাঁধবার দড়ি। এসব কথা অত্যন্ত বিনা কারণে অভিধানে রাখা হয়েছে। যে কোনো অভিধান খুঁজে দেখ তার মধ্যে দুরকম কথা আছে, একরকম - যা তুমি জানো, অতএব তার জন্য অভিধানের প্রয়োজন নেই। আর একরকম হল যা তুমি জানো না। এর মধ্যেকার শতকরা নিরানব্বুই ভাগেরও বেশি তোমার জীবনে কখনো কাজে লাগবেনা। অতএব সমস্ত জীবনে হয়ত পঞ্চাশটি কথার অর্থ প্রয়োজন হবে অভিধান থেকে। আর এই পঞ্চাশটি কথার জন্য পঁচিশ টাকা মূল্য দেওয়ার কোনো অর্থ হয়? প্রতি শব্দের জন্য পঞ্চাশ পয়সা! বাজে খরচ না তো কি?

বন্ধু বলেন, তা সঠিক বানান-টানান দেখতে কাজে লাগে তো অভিধান!

দাশমশাই একথা শুনে হেসে উঠলেন! কেবলি হাসতে লাগলেন—আর বলতে লাগলেন, সঠিক বানান? হাসালে তুমি আমাকে আমাদের দেশে বানান নানাবিধ, কোনো অভিধানই তাকে আর ঠিক করতে পারবে না। যাঁরা ভাবেন ঠিক করা যাবে তাঁরা কেবল বকাণ্ড প্রত্যাশাই করেন!

বন্ধু একথা শুনে গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। কোন কথা বললেন না। আর কিছু বলারও ছিল না। চারিদিকে বাজনা বাজছে। নীল আকাশ, সাদা মেঘ। এর মধ্যে এই সব অভিধান সংক্রান্ত আলোচনা তাঁর অর্থহীন বলেই মনে হল।

হাতঘড়ির সবুজ আলোতে রাত দুটো বেজে সাতচল্লিশ। এমন সময়ে মিসেস তমালী নন্দীর ঘুম কোন দিন ভাঙে না। আজকেও ভাঙত না—ঘুম ভাঙার পর তমালী নিজের মনে কিছুতেই স্বীকার করল না যে, অধীর কী করেছে, না করেছে এই দুশ্চিন্তা তার ঘুম ভাঙার কারণ।

এ একটা দৈব যোগাযোগ।

অধীর এতক্ষণে মিঃ বাগচীকে হয়তো সাবাড় করে দিয়েছে, হয়তো সাবাড় করতে পারে নি, এতে মিসেস তমালী নন্দীর যতই লাভ-লোকসান হোক, সে সব নিয়ে চিন্তা করবে কাল সকালে, ঘুম থেকে উঠে ঝরঝরে হয়ে।

মিসেস নন্দী সকালে কাউকেই চা-টা না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না। কারণ এরা আজ শক্তিমান পুরুষ, নানান কোম্পানীতে বড়-বড় চাকরে। এদের বুক পকেটে সেফটি ভোল্টের চাবিকাঠি। এদেরকে কখন কোন কাজে দরকার, কে বলতে পারে।

কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। ড্রাই-ডে। ওরা আজ কেউ আসবে না।

ওদের বেল টেপার কায়দাও আলাদা। ওরা টেপে যেন বাড়িতে ঢুকছে, চাকর দরজা খুলে দিতে দেরি করছে, সেজন্য ঝাঁঝালো, সুর, হলে বেল থামাতে চায় না। কেউ কেউ মিনিটখানেক পর্যন্ত বোতামে আঙুল টিপে থাকবে।

মিসেস নন্দী পাশ ফিরে শুলে পালঙ্কের পাশবালিসে ডান পা জড়িয়ে। সবুজ আলোর আভাস ছাড়া ঘর অন্ধকার। কল-কাতার অন্ধকার, আবছায়া। সবুজ আলোর ভিতর একটা সচল পোকা — সময়। দুটো বেজে ঊনষাট। একটু শীত-শীত করছে, সন্ধ্যে রাত্রে গরম থাকে, তখনকার তাপ এয়ারকুলার বাঁধা, ভোরের শীতে গায়ে বালাপোষ লাগে। আজ বালাপোষটা পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। সন্ধ্যে-রাত থেকেই তুমুল বর্ষায় ভোরের দিকে শীত লাগবারই কথা। মিঃ নন্দী আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে এখন জড়োপুটুলি। মেয়েদের গা স্বভাবতই উষ্ণ, আজ—

কক্‌খনো না, আজ মিসেস নন্দী তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মত সহজ সরল স্বাভাবিক।

কলিং বেলটা বাজল। চিরিং...চিরিং। বাজনার মধ্যে ভীরুতা স্পষ্ট। এমন কায়দায় বাজছে যেন সামান্য শব্দে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী উঠে আসে। অথবা চাকর দারওয়ান।

তমালী ভুরু কুঁচকাল না বা রাগল না।

অধীরকে বলা আছে, দায়িত্ব সেরে তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাবে। তার ফিরে যাওয়া উচিত।

অধীর ছাড়া আজ এত রাতে কেউ আসতে পারে না। এত রাত্রেও তার বাড়িতে অনেক দিন অনেক আগন্তুক এসেছে। এটা যেন বাড়ি নয়—ধর্মশালা। লোকে দরকার মনে করলেই হল, ধরমতলায় মিসেস নন্দীর বাড়ি আছে, চল ওখানে ওঠা যাক। রাত তিনটের সময় বার ও বারবণিতার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রচণ্ড মত্ত অবস্থায় অনেকেরই বাড়ি ফেরা অসম্ভব। বউ আছে, মা আছে, ছেলেপিলে পাড়াপড়শী আছে। সকালে ফিরে গেলে বুক ফুলিয়ে যাওয়া যায়। অতএব কয়েক ঘন্টা কাটাতে এবং তৈরি বিছানা পেতে মিসেস নন্দীর ধর্মশালা।

তমালী উঠল, দোতলার জানলা থেকে গেটের ভিতর দিকটা দেখা যায়। ঠাকুর, চাকর কেউ দরজা খুলে দিতে ওঠে নি। তাদের ঘর অন্ধকার। ঘরের ভিতরে এল তমালী, একবার ভাবল মিঃ নন্দীকে ডেকে তুলবে কিনা। তারপর নিজেই নেমে গেল।

মিঃ নন্দীকে ডাকতে যাওয়ার কারণ অধীরের পাগলামি। অধীর মিঃ নন্দীর সামনে কেঁচো, তার কাছে শামুক আর রাস্তায় নামকরা মাস্তান। কখনো কখনো অধীর তমালীর কাছে কচ্ছপের হাঁ বের করে এগিয়ে যায়। তমালী সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোয়। আর কচ্ছপের দাঁত দেখা যায় না।

গেটের খিল খুলতেই অধীর—হ্যাঁ অধীরই হেলে পড়ে তমালীর বুকের উপর, ঠিক এক খণ্ড কাঠের মত। তমালীর বুকে জোর ধাক্কা লাগে। অধীর তখনো জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নিঃস্পন্দে কয়েক মুহূর্ত

অর্ধবাস করে। যাক, জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে যদি ওই বুকে কিছুক্ষণ লেগে থাকতে পারে তাহলে অধীর যে আর কিছু চায় না।

কিন্তু অধীর জানে ওটা বুক নয়, হৃদয় নয়, ওটা অতিদুর্গম পাহাড়চূড়ো অথবা দূরতম দুটি গ্রহ। যার মাটিতে কেউ কোনদিন পায়ের ছাপ ফেলতে পারে না।

গ্রহ বা পাহাড়চূড়ো বলা বোধহয় ভুল। ওসব দূরেরই জিনিস, ওসব যাতায়াতের সীমার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তমালীর হৃদয় যাতায়াতের সীমার মধ্যে, খুব কাছের জিনিস। নিজের হৃদয়ের চাইতে কাছে, কেন না নিজের হৃদয়ে স্পর্শ করতে কিছু চামড়া হাড় রক্ত ও চর্বি পেরোতে হয়, তমালীর বুক পর্যন্ত পৌঁছতে দরকার সামান্য কিছু বাতাস।

সেই সামান্য কিছু বাতাস পেরোতে কত দিনের ধৈর্য লেগে গেল অধীরের। লাগুক, শেষ পর্যন্ত অধীর মিসেস তমালী নন্দীর খুব কাছে যেতে পেরেছে এ-ই তার প্রচণ্ডতম লাভ।
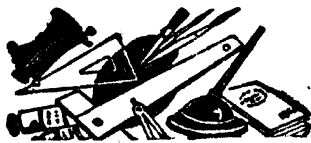
সঙ্গে সঙ্গে তমালী অধীরকে বুক থেকে সরিয়ে কাঁধের ধারে ঠেলে দিল, চাপা স্বরে বলল, হাঁটতে পারবে?

হ্যাঁ।

রক্তে যে একেবারে ভেসে গেছে।

অধীর বীরের তৃপ্তি মুখে ফুটিয়ে বলল, হ্যাঁ।

তমালী হঠাৎ ভাবতে পারল না, অধীর কী করে জখম হল। কিন্তু তমালীর চোখে-মুখে বিস্ময় ভেসে উঠল না, অথবা বুকের স্পন্দন দ্রুততর হল না। তমালী দৃঢ় পায়ে অধীরকে ডান কাঁধে প্রায় বয়ে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। নজর রাখল রক্তের ধারার চিহ্ন পথে থাকল কি না। রক্ত এখন আর তেমন ঝরছে না। চাপ চাপ রক্ত, কালো দলা পাকিয়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত জমে আছে। এখন কেমন জল কাটছে। ডান বাহুর ঠিক মাঝখানে গুলির গর্ত, এক তাড়া সাদা তুলো কালো কালিতে চুবোনোর মত থকথকে। ঝালর লাগানো বেড ল্যাম্পের পাশে ডিভানে অধীরকে বসিয়ে ওর হাতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। যতদূর মনে হচ্ছে গুলিটা মাংসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু অধীরকে খুবই কাহিল দেখাচ্ছে। পাণ্ডুর।

মিঃ বাগচীর বাড়ি থেকে এলে কীসে?

হীটারে জল গরম করতে দিয়ে বলল তমালী।

কিছুটা ট্যাক্সিতে, কিছুটা হেঁটে।

হাঁটতে গেলে কেন।

হ্যাঁ, গোটা রাস্তা ট্যাক্সিতে কিম্বা রিকসায় আসি আর লালবাবার ঘরে যাবার সুবিধে করি!

হাসল তমালী। ছোকরার বুদ্ধি লোপ পায় নি। জ্ঞান এখনো টনটনে।

অধীর সারা রাস্তায় কেবল পড়ে যাবে ভাবছিল, এই বুঝি পড়ে যাবে। আর বোধহয় হাঁটতে পারবে না। মাইল তিন পথ যতক্ষণ হেঁটেছে, হাত থেকে রক্ত ঝরেছে, প্রথমে ফিনকি দিয়ে, কী রক্ত। মনে হল প্রাণটা আর বড়জোর পাঁচ মিনিট। তার উপর তখন পাড়ার লোক জেগে উঠেছে। হৈ-চৈ, রোয়াকে রোয়াকে ভিখিরি, হিন্দুস্থানী ও গরীবদের তুলে তুলে পাড়ার ভদ্রলোক প্রশ্নে ও মারে বাবার নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে। অধীর মোড়-ফেরা চলন্ত ট্যাক্সি পিছনে চেপে কিছু পথ গিয়ে আবার কিছু দূরের মোড়ে শ্লথগতির সুযোগে নেমে পড়ে ফাঁড়া কাটিয়েছে। এমন যোগাযোগ ভাগ্যের জোর।

এখন হাতটা সেরে উঠলে হয়।

না, ধরা পড়ার ভয় তার নেই। অধীর খুব ভালো করেই জানে, সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত মিসেস নন্দীর গতিবিধি অবাধ। মিসেস নন্দী মাঝারী অবস্থা থেকে ধর্মতলায় বাড়ি কিনে ফেলেছে। মিঃ নন্দীর নাট-বল্টুর কারখানা কতটুকু ছিল, তাতে আবার চারজন অংশীদার। অবশ্য অংশীদারের টাকার জোরে কারখানা আজ ফুলে ফেঁপে ঢোল। অংশীদারদের এ ব্যবসায় টেনে এনেছে মিসেস নন্দী। দুজনকে আগেই কাগজে-কলমে সরিয়ে ফেলেছে, বাকী মিঃ বাগচী—যার পুত্র-কন্যা কেউ নেই—মরে গেলে, স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরে গেলে কোন্ কারবারনিতা মিঃ বাগচীর কোটি টাকার মালিক হত, সে আজ—

দেখেছ, মিসেস নন্দী মনে মনে হাসল। এখন পর্যন্ত অধীরকে জিজ্ঞেস করে নি, বাগচী এখনো আছে কি নেই।

গরম জলে কালো কালো রক্তের দলা সমেত তুলো দিয়ে সাফ করতে করতে তমালী বলল, কী খবর।

বাঁ হাতে জিঘাংসার মুদ্রা দেখিয়ে অধীর বলল—শে—

'শেষ' বলতে পারল না। অন্ধকারের মধ্যে গোঙানি ও ছটফটানি তার চোখে ভেসে উঠল। বাঁ হাতের মুঠোয় অধীর ডিভানের গদির গা আঁকড়ে ধরে পিষতে লাগল। কিছুক্ষণ পিষল। অনেকক্ষণ। অধীরের চোখে হত্যার ভয় ছাপিয়ে গাঢ় করুণার জলের আভাস। অধীরের বীরত্ব এবারে যেন গলা থেকে মালা খুলে ফেলল। ভাবল কী করলাম, কার জন্য করলাম। তমালীর জন্য? যে তমালীর পায়ের তলায় বসে সে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতে পারে নগ্ন হাঁটু দেখে, পোষা কুকুরের মত, তার জন্য? সে তাকে কী দিল আর কী দেবে।

মিঃ বাগচীকে শেষ করে পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসতে গিয়ে অধীর দ্বারওয়ানের গুলিতে ডান হাতটা দিতে বসেছে। বলা যায় না, প্রাণটাও দিতে হবে।

তমালী! তমালী!

কী! অমন আঁতকে উঠছ কেন!—তমালী অ্যান্টিসেপটিক লোশন ক্ষতস্থানে বুলোতে বুলোতে বলল।

আঁতকে? আমি আঁতকে উঠছি?

হ্যাঁ।

তমালীর কণ্ঠে ধিক্কার মেশানো ছিল বলে অধীরের পুরুষত্বে লাগল। যে অধীর তিলমাত্র ইতস্তত না করে প্রতিপক্ষের চোয়ালে বরাবর ঘুঁষি বসিয়ে এসেছে, যার মনের সাহস সর্বজনবিদিত, যাকে দলে পেলে পাড়ার মাস্তানরা দিগ্বিজয় করতে পারে, সে উঠবে আঁতকে?

কিন্তু শত্রুতা ছাড়া অধীর যে কারুর গায়ে হাত তোলে না। কোনো নিরীহ লোককে কখনো অপদস্থ করে না। তার আদর্শ বড় কড়া।

মিঃ বাগচীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ ছিল না। ব্যক্তিগত বিরোধ না থাকলে অধীর কারুর ক্ষতি কোনোদিন করে না, করেও নি। মিঃ বাগচীকে মেরে যে খুশী হবে যে লাভবান হবে তার সঙ্গে অধীরের সম্পর্ক যে প্রায় অচ্ছেদ্য। মানে মিসেস তমালী নন্দীর সঙ্গে। মিসেস নন্দী অধীরকে এত বড় প্রেমের পরীক্ষা দিতে না বললে সে কি এ অপকর্মে রাজী হত। কখনোই হত না।

কিন্তু পরীক্ষার ফল ভোগ করার অবস্থা আর রইল কোথায়। আর কি সে সুস্থ হাতে তমালীর কণ্ঠ বেষ্টন করতে পারবে, আর কি তার ডান হাতের মধ্য দিয়ে রক্তের জোয়ার-ভাঁটা খেলে যাবে চাঁদের আলোতে, আর কি অধীর তেজোময় আলিঙ্গনে তমালীকে খুশী করতে পারবে।

সেই ভয়ে অধীর ডাকল, তমালী! তমালী! তুমি এখানে একটু বস, আমার গা ছুঁয়ে বস!

আতঙ্ক আবার তাকে জড়িয়ে ধরছে, যদি তমালী তাকে জড়িয়ে ধরে, তাহলে বোধহয় আতঙ্ক তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। অন্তত একজনের সুস্থতা, অক্ষত প্রাণ, অনাবিল উচ্ছ্বাস তাকে ঘিরে থাকলে অধীর সোয়াস্তি পাবে। বিশেষ করে যার জন্য এমন জখম এমন রক্তক্ষয় এমন প্রাণপাত সে যদি তাকে শুধু শুশ্রূষা নয় শুধু সান্ত্বনা নয়, আরও কিছু—আরও অনেক কিছু দিয়ে ঢাকা দিতে পারে তাহলে বিকীর্ণ শীতলতা থেমে যাবে।

ডিভানের একপাশে তমালী বসল। অধীরকে প্রায় বুকের কাছে চেপে ধরল। অধীরের মাথা উষ্ণ। অস্বাভাবিক উষ্ণ। অধীর চোখ বুজে থাকল। পেটে যা দৈবাৎ মিলেছিল এখন তা মিলল তমালীর অনুমতিতে।

অধীরের খুব ইচ্ছে হল প্রশ্ন করে, তমালী, তুমি কি মিঃ নন্দীর কাছে হাসিমুখে যাও? যে নন্দী পাশের ঘরে নাক ডাকাচ্ছে সে যদি এখন দেখে তাকে তুমি কী বলবে। সে এমন বেদখল প্রেমের দৃশ্য দেখে তোমাকে কোতল করবে না?

ঠিক তখন মিঃ নন্দীর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মিঃ নন্দী উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঢুকল এ ঘরে।

আলো দেখে ভাবলাম, আলো না নিবিয়ে শুয়েছ, কিন্তু এ কী!

তমালী হাসল, ও কিছু নয়, মারামারি করে এসেছে বীরপুরুষ।

কোথায়, কার সঙ্গে!

শিলপিং সুট পরা মিঃ নন্দীর মুখে পাইপ, বয়স চল্লিশের কোঠা করে পেরিয়ে গেছে। মিঃ নন্দীকে প্রবীণ মনে হয় আজকাল।

তমালীর কিছুই মনে হয় না। তমালীকে বড় জোর কুড়ি বছর বয়সের তরুণী মনে হতে পারে। ওর রূপের ও যৌবনের যেন শেষ নেই।

মিঃ নন্দী কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, দেখি দেখি।

তমালী ধমক দিল, থাক তোমাকে আর রক্ত দেখতে হবে না। যাও।

মিঃ নন্দী সুবোধ বালকের মত যেতে যেতে বলল, মিঃ দত্তকে ফোন করব?

মিঃ দত্ত মানে ডাক্তার দত্ত। হাউস ফিজিশিয়ান।

না, এত রাতে আর বেচারাকে কষ্ট দেয় না। কাল সকালে যা হয় করা যাবে—এ এমন কিছু গুরুতর নয়। শোন—

মিঃ নন্দী পর্দার কাছে দাঁড়িয়ে বলল কী?

তুমি বরং কয়েক পেগ স্কচ ঢেলে দাও তো—

পাশের ঘরে মিঃ নন্দী নিজের ওয়ার্ডরোব খুলেছেন শব্দ পাওয়া যায়। তারপর ছিপি খোলার ও গ্লাসে ঢালার শব্দ। মিঃ নন্দী দূর থেকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেয় গ্লাসটা তমালীকে। তারপর আবার চলে যায়।

অধীর দ্রুত স্কচটা গলায় ঢেলে দেয়।

তারপর কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকে, তার হাত-পা ছড়াতে ইচ্ছে করছে, ক্ষতের কাছে অসহ্য দপদপানি কিছুটা ঝিমিয়ে আসে। বেশ কড়া হুইস্কি।

অধীর বলল, কে পারত, বড় বড় বাত সবাই বলতে পারে, ওতে তুমি ভুলতে পার, কিন্তু কাজের বেলায় এ শর্মা ভিন্ন গতি নেই।

তমালী অধীরের মাথায় চুলে পিঠে হাত বুলোচ্ছে। বুঝল এ অধীরের ঈর্ষা। তার কাছে সবাই আসে, সবাই সমান সমাদর পায়, সবাই সমান শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহ ও অভ্যর্থনা নিয়ে চলে যায়। অনেকের কাছ থেকে উপরি হিসেবে একটু আধটু অনুরাগও মেলে। কিন্তু সবাই খুশী। কারণ সবাইকে তমালী কিছু না কিছু প্রতিদানে সন্তুষ্ট করে থাকে। কে কতটা প্রতিদান পায় দ্বিতীয় ব্যক্তির জানার কোনো উপায় নেই। নিজের নিজের সীমায় সবাই মালিক, সবাই রাজা সবাই প্রথম-পুরুষ!

অধীরের এই দানছত্র পদ্ধতি অসহ্য। সে জানাতে চেয়ে এসেছে বরাবর যে সে ছাড়া আর সবাই সুখের পায়রা।

এ নিয়ে কখনো কখনো তমালীকে উত্যক্ত করেছে অধীর।

কোথাও গোপনে কারুর সঙ্গে আলাপ করছে, সেখানে চেঁচামেচি করে অধীর গিয়ে হাজির। সিরিয়াস কাজ করছে অফিসে, পাঁচজন গণ্যমান্য লোক বসে আছে মিসেস নন্দীর টেবিল ঘিরে—অধীর সুইং ডোর ঠেলে ঢুকল গরিলার মত। সবাইকে ছেড়ে দিয়ে তার কথা আগে শুনতে হবে। তমালী অধীরের ধাত চেনে। মৃদু হাসিতে তাকে ওখানে দিয়ে হয় বসতে বলে, নয় পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে নয় তার কাজ সর্বাগ্রে মিটিয়ে দেয়।

আগে তমালীর জন্য সারাদিন ছাড়া ছাড়া থাকতে হত অধীরকে। তমালী কোথাও বেরোলে অধীর বসে বসে তমালীর বাড়িতে ঝিমোত। অথবা অফিসের ওয়েটিং রুমে। আজকাল তমালী ওকে চিনে

ফেলেছে। মেরে ফেললেও অধীরের পেট থেকে কেউ একটা কথা বের করে নিতে পারবে না, তমালীর সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না ছেলেটি, বরং ওকে যে কাজ দেওয়া হয় নানান কলাকৌশলে কাজ সমাধা করে বত্রিশ পাটি দাঁত প্রকাশ করে সামনে এসে দাঁড়াবে। তমালী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে তবে শান্তি।

আজ কেবল পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে বোধহয় চলবে না।

অধীরের হিংসা—জ্বলজ্বলে চোখের তারায় আজ অন্য কোনো আভাস, অন্য কোনো রং। অধীর আতঙ্কে মাঝে মাঝে নেতিয়ে পড়লেও বড় কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

তমালী বলল, সে আমি জানি না? আমার কাজ তুমি ছাড়া আর কে করবে, আর কে আমার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে?

অথচ তুমি আমাকে কিছু দিলে না তমালী—অভিমান যেন ডান হাতের ক্ষত থেকে জল কাটল, চোখ থেকে নয়। অধীরের গলার কাতরানি মাঝপথেই থেমে গেল।

তমালী অধীরের ঠোঁটে তার হিম-শীতল ঠোঁট ছোঁওয়াল আর অধীরের পিঠ তার বুকে চেপে ধরল। অধীরের ডান হাতের ক্ষত চাপে দপদপ করে উঠল কিন্তু আর্তনাদ করল না সে। অধীরের রক্তপাত যেন এতদিনে আশ্চর্যের রাজত্ব অধিকার

করে ফেলল। অধীর বুঝতে পারছে, ডাক্তার এখুনি তার দেহে কিছুটা নতুন রক্ত ঢুকিয়ে না দিলে সে বেশিক্ষণ বাঁচবে না। ভাবল সে বলে, তমালী, ডাক্তার ডাক এখুনি। কিন্তু বলল না। ডাক্তার এলে আর সে তমালীকে এমন করে পাবে না।

কলিং বেলটা ঠিক সে সময় বাজল।

দ্রুত, ঘন-ঘন, কখনো দীর্ঘ।

মিঃ নন্দী আবার উঁকি মারল।

তুমি কি মিঃ দত্তকে ফোন করেছিলে? মিঃ নন্দী প্রশ্ন করল।

আমি এঘর থেকে ফোন করলে তুমি শুনতে পেতে না?

মিসেস তমালী নন্দীর চোখের তারা নীরব। অনুত্তেজল। মিসেস নন্দী অধীরকে ছেড়ে উঠে জানালার শার্সিতে চোখ ঠেকাল। গেট বন্ধ। প্রাচীরের ঠিক ওপারে কে ওপর দেখা যায় না। কিন্তু রাস্তার দেবদারু গাছটার গায়ে কালো রং-এর ভ্যান। মিঃ নন্দী ভ্যান দেখে ভীত চোখে তাকাল তমালীর দিকে। তমালী মুখ ঝাঁকিয়ে জানাল হতে কী। তারপর তমালী নিজে নীচে ছুটে গেল। গেট খুলে দিল।

এ পাড়ায় শাসনকর্তাদের প্রায় সবাইকে চেনে মিসেস নন্দী।

মিঃ বসাককে অভ্যর্থনা করে বসাল বসবার ঘরে। মিঃ বসাক জানাল, ট্যাক্সীর পিছনে একটি লোক বাগবাজারের মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এসে আপনার বাড়িতে ঢুকেছে। ঠিক তার কিছুক্ষণ আগে থানায় ফোন আসে মিঃ বাগচী খুন হয়েছেন। ট্যাক্সির ভিতরে তখন আমাদেরই এক লোক ছিল। কাজে যাচ্ছিল। লোকটিকে ডান হাত চেপে হাঁটতে দেখে সন্দেহ হয় এবং অনুসরণ করে। কিন্তু লোকটিকে ম্যাডাম, আপনি জায়গা দিলেন কেন?

তমালী বলল, আরে, কেউ আহত হয়ে এলে আমি তাকে শুশ্রূষা না করে তাড়িয়ে দিতে পারি! ও বললে কোথায় মারামারি করতে গিয়ে হয়েছে—এখন বুঝতে পারছি মিঃ বাগচীর সঙ্গে কিছু দিন থেকে অধীরের শত্রুতা চলছিল—ইশ, আমি হাজারবার বারণ করলাম। ইশ, মিঃ বাগচী...আপনি ঠিক জানেন মিঃ বাগচী মারা গেছেন!

খুব ভালো জানি—বড় দারোগা মিঃ বসাক জানালে। আচ্ছা, মিঃ বাগচী তো আপনার পার্টনার—মানে বিজনেস পার্টনার?

ঠিকই শুনেছেন।

মিঃ বসাক দাঁড়িয়েই ছিল। তমালী ওদের বারবার বসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেউ বসে নি। মিঃ বসাক বলল, ছোকরা কোথায়, ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে—

ওপরে—চলুন।

মিঃ নন্দীর মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। সে ওপরে বারান্দায় পায়চারি করছিল, আর বারবার সিঁড়ি থেকে উঁকি মারছিল। সিঁড়িতে পুলিশের বুট জুতোর শব্দে কী করবে ভেবে পেল না। একবার ভাবল শুয়ে পড়ি বিছানায়, একবার ভাবল দাঁড়িয়ে থাকি, একবার ভাবল করিডোরের বেতের চেয়ারে বসে বসে পাইপ টানি। তমালীর শ্রাদ্ধ করল মনে মনে। তমালী কী যে করে চলেছে ভগবানই জানেন।

মিঃ বসাককে নিয়ে তমালী এল নিজের ঘরে, ঘর পুলিশে ভর্তি। বাড়ির ঠাকুর-চাকর উঠে এসে দোতলায় ভিড় জমিয়েছে। আশ-পাশের বাড়ি থেকেও লোকজনের কৌতূহল।

ওরা যখন অধীরের কাছে গেল তখন সে ডিভানে শুয়ে পড়েছে, একটা পা মাটিতে ঝুলে গেছে অন্যটা হাতলের উপর দিয়ে ডিভানের পিঠে হেলানো। মিঃ বসাক ছুটে গিয়ে অধীরের হাতের কব্জি টিপে ধরল।

নাঃ, নাড়ি নেই।

হি ইজ ডেড—মিঃ বসাক ঘোষণা করল।

কিন্তু মিঃ বাগচীকে মারল কেন? মিঃ বসাক স্বগতোক্তি করল, বেটা মরে গিয়ে তো সব পন্ড করে গেল—এখন এ কেসের মীমাংসা করা বেশ জটিল। যাই হোক—

মিঃ বসাক তারপর তার কর্তব্যসুলভ নির্দেশে সবাইকে ঘর থেকে চলে যেতে বলল। পর দিন বেলা বারোটা পর্যন্ত জেরা চালাল। অ্যাম্বুলেন্স এল। ফটোগ্রাফার এল। ঘরের ফটো ছাপছোপ নেওয়া হল। সর্বপ্রকার পুলিশী তদন্তের পালা চুকে গেলে মিসেস তমালী নন্দী চাকরকে বলল,

বুঝল এ অধীরের ঈর্ষা।

মৃদু হাসি বিদ্যুতের মত তমালীর ঠোঁটে চমকে গেল। তমালী বলল, ইশ, বেচারা!

বেচারা কেন বলছেন?—বড় দারোগা প্রশ্ন করল।

অনেকক্ষণ থেকে কষ্ট পাচ্ছে। অনেক দিন থেকে। ও বেচারার ধারণা ছিল ওর দ্বারা অনেক কিছু সম্ভব, সেটা পূরণ হচ্ছিল না বলে ওর ভীষণ দুঃখ।

মিঃ বাগচীর সঙ্গে ওর শত্রুতার কথা কী বলছিলেন?

সে আমি ঠিক জানি না — তবে মাঝে মাঝে ছোকরা আমার কাছে এসে শাসাত, মিঃ বাগচীকে ও শায়েস্তা করবে।

আপনার কাছে কেন?

মিঃ বাগচী আমার পার্টনার আর অধীর আমাদের পাড়ার ছেলে।

ঘরটা প্রথমে ডেটল দিয়ে মুছতে, তারপর গঙ্গাজল দিয়ে ভাল করে ধুতে।

মিঃ নন্দী জীবনে প্রথম রাগল, বলল, এ সব কী হচ্ছে!

তমালী বলল, ভয় নেই, শুদ্ধ করে নিচ্ছি। এতেও যদি তোমার রাত্রে ঘুম না আসে, কী আছে, এ বাড়ি ছেড়ে দেব। মিঃ বাগচীর বাড়িটা তো এখন কোম্পানীর।

মিঃ নন্দী দু হাত তুলে প্রায় নাচতে নাচতে বলল, এ বাড়ি কেন, আমি তোমার সঙ্গে কোন বাড়িতে থাকছি না।

তমালী মিঃ নন্দীর গলা জড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, তুমি আমায় ত্যাগ করে গেলে যে আমার কেউ থাকবে না গো!

মিঃ নন্দী হতভম্ব বোকা মুখভঙ্গিতে সব দাঁতকটা বের করে বেশ গোল হাসিতে তমালীকে সজোরে জড়িয়ে ধরল।

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা ঃ

প্রতিকারের পথ ঃ

দেখা যাচ্ছে, দুর্গতিগ্রস্ত বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে বহু লোকই তাঁদের মস্তিষ্ককে ঘর্মাক্ত করে তুললেও প্রতিকারের পথা সম্বন্ধে সকলে একমত নন। কিছু-দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাংলা দেশে হিন্দী ছবির প্রদর্শন সম্পর্কে একটি বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে এ রাজ্যের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি চিত্রগৃহে বছরের কয়েকটা দিন বাংলা ছবির প্রদর্শনী বাধ্যতামূলক করার কথা রাজ্য সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

বাংলা ছবির বাজার এই পশ্চিমবঙ্গেই (পূর্ব পাকিস্তানও বস্তুত বাঙালী-প্রধান হলেও ভারতে প্রস্তুত বাংলা ছবির ঐ রাজ্যটিতে প্রদর্শিত হবার আশা বর্তমানে সুদূরপরাহত) যেভাবে ক্রমে ক্রমে সীমিত হয়ে আসছে, এই খাস শহর কলকাতার উত্তরাঞ্চল সম্পূর্ণভাবে বাঙালী অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীর মালিকানায় অন্তত দুটি চিত্রগৃহ আমাদের চোখের সামনেই যেভাবে পুরোপুরি হিন্দী ছবির প্রদর্শনী-গৃহে পরিণত হল, তাতে শ্রীনাহারের ঘোষণাকে স্বাগত না জানিয়ে পারি না। শ্রীনাহারের ঘোষণামত সরকারী ব্যবস্থায় বাংলা ছবির প্রদর্শনীক্ষেত্র নিশ্চয় কিছুটা বিস্তৃত হবে এবং ফলে ছবি অত্যন্ত জন-প্রিয় হয়েও যেখানে তার খরচ তুলতে হিমশিম খাচ্ছিল, সেখানে হয়ত কিছুটা লাভের মুখ দেখবার আশা করতে পারে। এছাড়াও বাংলা ছবির মুক্তিলাভের সমস্যারও কিছুটা সমাধান হতে পারে। ছবির মুক্তির ব্যাপারে চেন-সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে আজ এই শহরে মাত্র পাঁচখানা বাংলা ছবি একই সপ্তাহে মুক্তি পেতে পারে। নতুন সরকারী ব্যবস্থায় আরও কয়েকখানি বাংলা ছবির মুক্তিলাভ হয়ত সম্ভব হবে।

কিন্তু সরকার কর্তৃপক্ষ বাংলা ছবির এই বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী ব্যবস্থাই কি বাংলার চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দুঃখের অবসান ঘটাতে সমর্থ হবে? অনেকেই বলছেন, প্রচুর ঘষামাজা করলেও যেমন কোনো রূপহীনাকে রূপসী করে তোলা সম্ভব নয়, তেমনই বাংলা ছবির দুঃখ-দুর্দশা ঘোচাবার জন্যে এই সরকারী প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পশ্চিম-বঙ্গের শ'চারেকেরও বেশী চিত্রগৃহে যদি বছরের সব কটা দিনই বাংলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হত, তাহলেই কি আমাদের চলচ্চিত্র প্রযোজকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতেন? সন্দেহবাদীরা বলছেন, অন্য ছবি না দেখতে পেলেই যে ছবির দর্শকরা বাংলা ছবি দেখতে ছুটে আসবেন দলে দলে, এমন কথা কে বললে?

প্রশান্ত সরকার পরিচালিত **'পিপাসা'** চিত্রের মহরত দৃশ্য—নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক
ফটো ঃ অমৃত

'কোটা সিস্টেম' প্রবর্তনের ফলে ইংলণ্ডে চিত্রগৃহের সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে কমে সম্প্রতি মাত্র যে এক হাজারে দাঁড়িয়েছে, এ সংবাদটা সকলে রাখেন কি? অনিচ্ছুক ঘোড়াকে দিয়ে গাড়ী টানাবার চেষ্টা যেমন বৃথা, জোর করে বাংলা ছবি দেখানোর প্রয়াসও তেমনই অফলপ্রসূ হতে বাধ্য।

আসল কথা হচ্ছে ছবির জনপ্রিয়তা। আজ যে বাঙালী দর্শক বাংলা ছবির প্রতি বিমুখ হয়ে হিন্দী ছবি দেখবার জন্যে লালায়িত হচ্ছে, এর কারণ কি? নিশ্চয়ই, হিন্দী ছবি দেখে সে যতটা আনন্দ লাভ করে, বাংলা ছবি থেকে সে তা পায় না। অথচ এও তো সত্যি, আজ যদি কোনো

পিযূষ বসু পরিচালিত **অসামাজিক** চিত্রের একটি দৃশ্যে প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিতা বিশ্বাস। ফটো : অমৃত

প্রযোজক 'সঙ্গম' বা 'জংলী'র একটি হুবহু বাংলা সংস্করণ, যাকে বলে বাংলা কার্বন কপি প্রস্তুত করেন, তো বাঙ্গালী দর্শক আদৌ বরদাস্ত করবে না। এই তো সেদিন ও কৌন থী?'রই প্রায় সমগোত্রীয় 'গলে-মোহর' তৈরী করা হয়েছিল—তা তেমন চলল কৈ? এও এক মজার ব্যাপার! পাশের বাড়ীর মেয়ের বেহায়াপনা আমাদের দেখতে বেশ লাগে, কিন্তু নিজের বাড়ীর মেয়ে যদি ওরই দেখাদেখি বেচাল শুরু করে তাহলে আমরা জ্বলে উঠি।

তাহলে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাবার উপায় কি? একটি বৃহৎ দল—এ'দের সঙ্গে বলে উঠবেন, বাংলাদেশে বাংলা ছবি তৈরী করার সঙ্গে হিন্দী ছবি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ বাংলা ছবি তৈরী করব আমরা আমাদের শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশের জন্যে, আর হিন্দী ছবি করব আমাদের রুটি-রুজির সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে। একটি আনবে মর্যাদা, অপরটি আনবে অর্থ। অসিত চৌধুরী প্রযোজিত 'মমতা'র ব্যবসায়িক সাফল্য আমাদের ঐ পথে চলবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। কিন্তু যদি সত্যিই দেখা যায় যে, বাংলায় নির্মিত হিন্দী ছবি প্রযোজককে প্রচুর অর্থ এনে দিচ্ছে, তাহলে সেই প্রযোজক কি শুষ্ক মর্যাদালাভের জন্যে অনর্থকরী বাংলা ছবির প্রযোজনার জন্যে আর যত্নবান হবেন? এবং বাংলাদেশে প্রস্তুত হিন্দী ছবি যদি ঐ 'মমতা' ছবির মতোই বাঙ্গালীর কাছেও প্রচুর সমাদর লাভ করে, তাহলে বাংলা ছবির পক্ষে সেটা কি ভয়ের কথা হবে না? আজকাল তো প্রচার-অধিকর্তাদের সৌজন্যে কোনো ছবির শ্যুটিং শুরু হতে না হতেই তার কাহিনী, গান, সংলাপ থেকে আরম্ভ করে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক, বিভিন্ন কলাকুশলী প্রভৃতি সকলেরই নাম-গোত্র, নাড়ী-নক্ষত্র সকলেরই জানা হয়ে যায়। কাজেই সেই ছবির হিন্দী সংস্করণও হচ্ছে বা হবে কিনা, তাও জানতে তাদের বাকী থাকবে না। এবং যেইমাত্র জানবে, এর হিন্দী রূপও দেওয়া হবে এবং তাতে দেখতে পাওয়া যাবে, বৈজয়ন্তীমালা, সায়রাবানু বা শশীকাপুর কিংবা দিলীপকুমারকে অমনই তারা মূল বাংলা ছবিটির জন্যে বৃথা অর্থ ব্যয় না করে বেশী দামের টিকিট কিনে ওর হিন্দী সংস্করণটি দেখবার জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকবে। বাঙ্গালী দর্শকের কাছে আজ ছবির হিন্দীভাষা ভাত-জলেরই সামিল হয়ে গেছে, একথা ভুললে চলবে না। এ হেন অবস্থায় এই উপায়ে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প নিজের আয়ুষ্কালকে বর্ধিত করবার সুযোগ পেলেও বাংলা ছবির জীবনীশক্তিকে আরও ক্ষীণতর করে তোলবার পথে পা বাড়ানো হবে না কি? বিগত যুগে নিউ থিয়েটার্স যখন দোভাষী চিত্র প্রস্তুত করতেন, তখন দেখতে পাওয়া যেত, বাংলাদেশে বাংলা সংস্করণটি সমাদৃত হলেও হিন্দীটি দেখবার জন্যে দর্শকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ থাকত না। কিন্তু বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স অনুসৃত প্রথায় বাংলা ও হিন্দী দুই সংস্করণই একসঙ্গে প্রস্তুত হলে বহির্বাঙলায় হিন্দী সংস্করণটি আদৃত হওয়া দূরের কথা, প্রদর্শিত হওয়াই কঠিন হবে। হিন্দী সংস্করণের ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে তাতে অভিনয়ের জন্যে যেমন আমদানি করতে হবে বোম্বাই রাজ্যের জনপ্রিয় দু'-একজন শিল্পীকে, তেমনই তাকে সঙ্গীত, দৃশ্যপট প্রভৃতির দিক দিয়ে করে তুলতে হবে সুসমৃদ্ধ। কাজেই এখন সাধারণ দর্শকের কাছে হিন্দী সংস্করণের আকর্ষণ হবে বাংলা সংস্করণ থেকে অনেকাংশে প্রবল।

আর একটি উপায়ের কথা কোনো কোনো প্রযোজক চিন্তা করেছেন এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি ছবিতে সেই চিন্তা মতো কাজ করে সাফল্য লাভ করা গেছে। এই উপায় হচ্ছে, বাংলা ছবিতে বোম্বাইয়ের কোনো কোনো জনপ্রিয় শিল্পীকে দিয়ে অভিনয় করানো। 'দেয়া নেয়া' ছবিতে তনুজার অবতরণ ছবিটিকে নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল। 'পাড়ি' ছবির সাফল্যের মূলে দিলীপকুমার ও ধর্মেন্দ্রর অবদান উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের বাঙলার শিল্পীদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের শিল্পীদের যে পার্থক্যটা চট্ করে নজরে পড়ে, সেটি হচ্ছে, ওদের মধ্যে একটা আশ্চর্য প্রাণচাঞ্চল্য, উদ্দামতা বা ভিগার আছে, যা আমাদের শিল্পীদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দিলীপকুমার বা ধর্মেন্দ্রর মধ্যে যে বলিষ্ঠ পুরুষালি আছে, তনুজা বা ওয়াহিদার মধ্যে যে প্রাণের উচ্ছলতা দেখা যায়, আমাদের কোন শিল্পী সেই সম্পদের পরিচয় দিয়েছেন ছবির ভিতর? কাজেই তপন সিংহকে 'হাটে-বাজারে'র জন্যে বৈজয়ন্তীমালাকে আমদানি

ফুল আউর পাথর চিত্রে ধর্মেন্দ্র ও শশিকলা

করতে হয়েছে। একদিক দিয়ে বাংলা ও বোম্বাইয়ের শিল্পীদের একই ছবিতে একসংগে অভিনয় খুবই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে বাংগালী শিল্পীদের অভিনয়ধারার সংগে বোম্বাইয়ের শিল্পীদের যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবে, ঠিক তেমনই বাঙ্গালী শিল্পীরা বোম্বাইয়ের শিল্পীদের প্রাণোচ্ছলতা দ্বারা স্বতঃই সংক্রামিত হবেন। এতে বাংলা ছবির প্রতি দর্শক-সাধারণ অধিকতর আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু বাংলা ছবি যে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে ভারতের চলচ্চিত্র জগতের প্রতি জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, সে তার শিল্পনৈপুণ্যের জন্যে। বাংগালীর সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট বাহনরূপে এই বাংলা চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। এবং সেই কারণেই এই বিশিষ্ট শিল্পটিকে প্রয়োজনানুরূপ সরকারী সাহায্য (সাবসাইডি) দেবার জন্যে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলেন প্রবীণ পরিচালক দেবকীকুমার বসু।

বাংলা ছবি অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকুক, এ কামনা প্রতিটি বাঙ্গালীরই মনে আছে—সে যে উপায়েই হোক না কেন।

চিত্র-সমালোচনা

গল্প হলেও সত্যি!! (বাংলা) : নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটার) প্রাঃ লিমিটেড-এর নিবেদন; ৩,১২৫-২৭ মিটার দীর্ঘ এবং ১১ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : মীরা সরকার; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত পরিচালনা ও পরিচালনাঃ তপন সিংহ; চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখোপাধ্যায়; শব্দানুলেখন : অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দু অধিকারী; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনাঃ সুনীতি মিত্র; সম্পাদনাঃ সুবোধ রায়; রূপায়ণ : যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সাধন সেনগুপ্ত, মাস্টার দেবজিৎ, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, কৃষ্ণা বসু, জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়, রমা দাস প্রভৃতি। ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল বৃহস্পতিবার, মহালয়া, ১৩ই অক্টোবর থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"প্রতিদিনকার জীবনে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে কতো না দুর্লভ সম্পদ জমা হচ্ছে—গল্পের মতো মনে হ'লেও তা পরম সত্যি!"—এই সত্যকেই বিধৃত করতে চেয়েছেন কাহিনীকার তপন সিংহ তাঁর স্বরচিত প্রথম চিত্রকাহিনী 'গল্প হ'লেও সত্যি!!'-র মাধ্যমে।

অশীতিপর বৃদ্ধ হালদার মশাইয়ের যে-একান্নবর্তী পরিবারে মাত্র শুভবুদ্ধির অভাবে বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, কারুরই প্রতি আস্থা ছিল না, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে বিষনজরে ও সন্দেহের চোখে দেখত, নিত্যই খিটিমিটি এবং অশান্তি বিরাজ করত, সেই পরিবারে মূর্তিমান শুভবুদ্ধির মতো এসে হাজির হ'ল 'যে যে-কাজ করে, তার তাতেই মুক্তি'—এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী এক সর্বগুণান্বিত
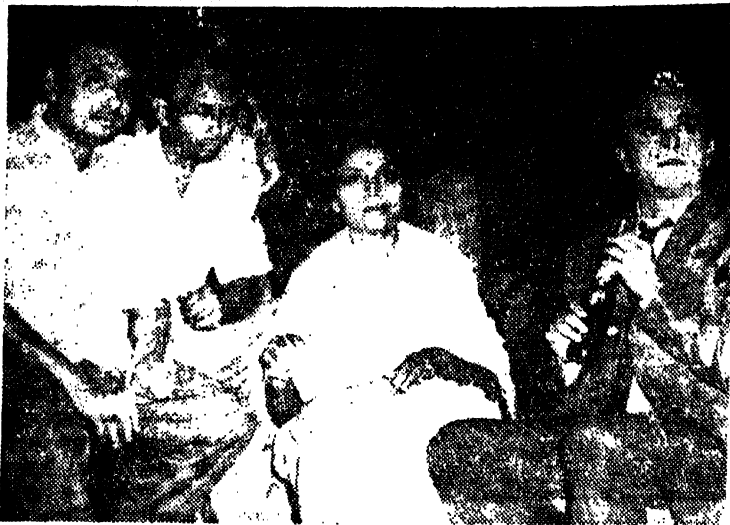
তীর ভূমি চিত্রের মহরতে নায়ক অনিল চ্যাটার্জি, পরিচালক গুরু বাগচী বুমা গুহ-ঠাকুরতা ও রবি ঘোষ। ফটো : অমৃত

সদাহাস্যময় ভৃত্য, নাম যার ধনঞ্জয়। মুহূর্তে সে সমস্ত বাড়ীটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিল। বাজার করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা এবং চা-জলখাবার-রান্না করা থেকে শুরু ক'রে নাচা, গান গাওয়া, গান শেখানো, চলচ্চিত্রের আবহসঙ্গীত রচনায় সাহায্য করা, ধর্মোপদেশ ও সৎ উপদেশ দেওয়া, বাড়ীর সকলের মনকে প্রফুল্ল করা, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সদ্ভাব জন্মানো, এমন কি বাড়ীর অবিবাহিতা তরুণীর প্রেমের পথকে সহজ ও সুগম করা— সকল রকম কাজেই সে দক্ষ ও তৎপর। মাসাধিককাল এমন বহু চাকচিক্যময় ধনঞ্জয়ের অমোঘ প্রভাবে যেদিন একান্নবর্তী হালদার বাড়ীতে সকলের মনেই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ'ল, সেদিন সে যেমন আপনিই অতর্কিতে আবির্ভূত হয়েছিল শীতের ভোরে কুয়াশা ভেদ ক'রে সূর্যোদয়ের মতো, ঠিক তেমনই সে আপনিই অন্তর্হিত হ'ল নিজের অভীষ্ট সম্পন্ন করবার পরে—মাস-মাইনে-টুকুও পাবার জন্যে সে অপেক্ষা করল না।

স্পষ্টই বোঝা যায়, তপন সিংহ পরিকল্পিত এই ধনঞ্জয় চাকর কোনো একটি নিরেট বস্তু নয়, ও হচ্ছে আসলে একটি ভাবমূর্তি— an abstract given a shape of reality. ধনঞ্জয়কে দিয়ে যে সব কাজ করানো হয়েছে—মায় জুজুৎসুর প্যাঁচে দুর্বৃত্তদের ঘায়েল করা পর্যন্ত, তা যে কোনো একটি রক্তমাংসের শরীরধারীর পক্ষে সম্ভব নয়, তা আপনার-আমার মতো শ্রীসিংহেরও অজানা নেই। এবং ধনঞ্জয় যে একটি নিছক ভাবমূর্তি, তা প্রকাশ করবার জন্যেই সম্ভবত তার ঐ অপরূপ আবির্ভাব দৃশ্যটি পরিকল্পিত হয়েছে। হালদার পরিবারটি যখন অশুভ প্রভাবে ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যাবার উপক্রম, ঠিক তখনই কুহেলি ভেদ ক'রে যেন শূন্য থেকেই তার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে; মেঘ না চাইতেই জলের মতোই সে অযাচিতভাবে হালদার বাড়ীর দরজায় হানা দিল প্রভাতী সূর্যের মতো, বিচিত্র তার বেশবাস, বিচিত্র তার ভঙ্গী! আমরা অনায়াসেই এই হালদার-গোষ্ঠীর পরিধিকে বড়ো ক'রে নিতে পারি। বলতে পারি, আজ বিশ্বময় যে অশান্তির ঘূর্ণিবায়ু মানুষকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে, সেখানে ধনঞ্জয়ের শুভবুদ্ধি যদি দৈবাৎ জাগ্রত হয়, তাহ'লে পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসতে দেরী হবে না।

অবশ্য কাহিনী রচনায় কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে। প্রথমেই বাস্তব পরিবেশের মধ্যে এই ভাবমূর্তিধর ধনঞ্জয় চাকরকে দর্শকদের কাছে যথেষ্ট বিশ্বাস্যভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। পারিবারিক শান্তি আনবার জন্যে 'চেলো'-বাজানোর গৎ পর্যন্ত শেখানো নিশ্চয়ই প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করেছে। কর্তার চা বা ভাতের থালা নিয়ে যাবার সময়ে বাড়ীর আর সকলের চোখের সামনে নাচের ভঙ্গীতে পদক্ষেপ শালীনতাবিরোধী। তার বেশ-ভূষাটিও বিশেষ কোনো অর্থব্যঞ্জক হয়ে ওঠেনি। সবশেষে ধনঞ্জয়ের আকস্মিক তিরোধানটিকেও আবির্ভাব দৃশ্যের সম-পর্যায়ভুক্ত করা উচিত ছিল—কৃষ্ণা যখন "ধনঞ্জয়দা' ধনঞ্জয়দা'" বলে ডাকতে ডাকতে পথ দিয়ে ছুটেছিল, তখন তার চোখ দিয়ে দর্শকদেরও দেখানো উচিত ছিল—ধনঞ্জয় দূরে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে; কিংবা হয়ত' আরও ভালো হ'ত, যদি দেখানো যেত, তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কাহিনীটিকে মোটের ওপর লঘু হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর করানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কাহিনীর কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য দ্রুতলয়ে ঘটানো হয়েছে ক্যামেরার সাহায্যে—ঠিক যেন নির্বাকযুগের ছবিকে আজকের প্রোজেক্টারের স্পীডে দেখানো হচ্ছে; ওরই সঙ্গে যোগ দিয়েছে আবহ-সঙ্গীত।

অভিনয়ে ধনঞ্জয়রূপী রবি ঘোষ থেকে শুরু করে বাড়ীর তিন ছেলে (প্রসাদ মুখো, বঙ্কিম ঘোষ, ভানু বন্দ্যো), দুই বৌ (ছায়া দেবী, ভারতী দেবী), অবিবাহিতা নাতনী (কৃষ্ণা), কর্তা (যোগেশ চট্টো), মিউজিক ডিরেক্টার (মৃণাল মুখো), শক্-বাদী শিল্পী (পার্থ মুখো) প্রভৃতি সকলেই কাহিনীর দাবি পূরণ করেছেন নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। গান ও আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ সুপরিমিত।

"গল্প হ'লেও সত্যি!" হাসির মাধ্যমে একটি শাশ্বত বাণী প্রচারে সমর্থ হয়েছে বলে বাঙলা হাসির ছবির জগতে একটি অভিনব সৃষ্টি।

সায়ান্স-ফিক্‌শান সিনে ক্লাব

গত রবিবার ৯ই অক্টোবর লোটাস সিনেমায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মেট্রো-গোল্ডুইন-মেয়ারের চিত্তাকর্ষক সায়ান্স-ফিকশ্যান চলচ্চিত্র 'চিলড্রেন অব দি ড্যামড' প্রদর্শিত হয়। কাহিনীটি 'ভিলেজ অব দি ড্যামড'-এর উপসংহার। জন ওয়াইন্ডহ্যাম রচিত 'দি মিডউইচ কুক্কুস' অবলম্বনে রচিত এবং এম-জি-এম কর্তৃক চলচ্চিত্রায়িত এই কাহিনীতে দেখা গিয়েছে রহস্যজনক পরিবেশের মধ্যে একটি গ্রামে ভূমিষ্ঠ হল দু'টি ছেলে এবং ছ'টি মেয়ে। টেলিপ্যাথি ছাড়াও তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। ক্রূর তাদের মনের গঠন, পৈশাচিক তাদের বাসনা। তাদের শক্তি অপরিসীম এবং তারা এ গ্রহের বাসিন্দা নয়।

'চিলড্রেন অব দি ড্যাম্‌ড' ছায়াছবিতে দেখা গেল অলৌকিক শক্তিধর এই ক্ষুদে

দেওয়া এবার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের ছ'টি ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেসব 'আশ্চর্য' পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তাই নিয়েই এই রুদ্ধশ্বাসী গল্পটি। ছেলেমেয়েগুলি এসেছে আফ্রিকা (গেরাল্ড ডেলসন, ১০), ভারত (মধু মাথাই, ১০), চীন (লী ইয়োক—মুন, ৭), রাশিয়া (রবারটা রেক্স, ১০), ইংল্যান্ড (ক্লাইভ পাওয়েল, ৮) এবং আমেরিকা (ফ্রাংক সামারস্কেল, ১১) থেকে।

রাষ্ট্রপুঞ্জেরই ইউনেসকো এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের আবিষ্কার করেছে। ছেলেমেয়েগুলি সবদিক দিয়ে স্বাভাবিক—কেবল অস্বাভাবিক মনের দিক দিয়ে। তারা আশ্চর্য মেধার অধিকারী। তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ম। যদিও তারা পৃথিবীর চারদিক থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে, তাহলেও টেলিপ্যাথির বন্ধনে তাদের চিন্তা এক, কাজ এক।

কিন্তু যে তীক্ষ্ম বুদ্ধির জন্যে তাদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, সেই বুদ্ধির ফলেই জগতের প্রত্যেকটি দেশ দারুণ দুশ্চিন্তায় জড়িয়ে পড়ল। কোথা থেকে এই ছেলে-মেয়েগুলি এল? কেন তাদের প্রত্যেকের মা তাদের বাবার কোনো খবর দিতে পারছে না? এ জগতে তাদের কি উদ্দেশ্য? তাদের টেলিপ্যাথি আর অত্যন্ত তীক্ষ্মবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সারা জগতে সর্বত্র তারা যদি ক্ষমতা বিস্তার করে ফেলে তাহলে কি হবে?

এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করার জন্য ডাক দেওয়া হল বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী আয়ান হেন্ডরীকে, জীববিজ্ঞানী ডক্টর অ্যালান বাডেলকে, আর বড় ছেলেটির কাকীমা বারবারা ফেরিসকে। দারুণ রহস্য আর বিপদ-আপদের মধ্যে দিয়ে তাদের কাজে লাগতে হল। সে সব ঘটনা রক্ত ঠান্ডা করে দেয়।

পরিচালক অ্যানটন এম লীডার দক্ষতা এবং পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয় এবং কাহিনী মনে দাগ রেখে যায়। ছবিটি ছোটদের নিয়ে হলেও সেন্সর বোর্ড বড়দের জন্য চিহ্নিত করেছেন এবং 'বড়দের' জন্যে যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে, তা ছবি দেখার পর উপলব্ধি করা যায়। একটি উৎকৃষ্ট সায়ান্স-ফিকশান ছবি দেখিয়ে উদ্যোক্তারা রসিকমহলে ধন্যবাদার্হ হলেন।

—নান্দীকর

কলকাতা

'অসামাজিক' চিত্রের শুভমহরৎ

পরিচালক পীযূষ বসু তাঁর নতুন ছবি অসামাজিকের শুভমহরৎ অনুষ্ঠান সম্প্রতি কলকাটা মুভিটন স্টুডিওয় পালন করলেন। এফ জে শর্মা রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও নবাগত প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। কলাকুশলী বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে সঙ্গীতে ওস্তাদ বাহাদুর খান, সম্পাদনায় রমেশ যোশী, আলোকচিত্রগ্রহণে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শিল্প-নির্দেশনায় কার্তিক বসু।

আকাশ ছোঁয়া চিত্রে দিলীপ মুখার্জি ও মাঃ স্বপন

'পিপাসা' চিত্রের শুভ মহরৎ

গত ১৩ অক্টোবর টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় আনন্দ চিত্রমের 'পিপাসা' চিত্রের শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত চিত্রনাট্যের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, তরুণকুমার ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় রয়েছেন বিজয় ঘোষ এবং অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এ তরফদার প্রযোজিত এ ছবিটির পরিচালক হলেন প্রশান্ত সরকার।

এ কে বি ফিল্মসের 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ'

দীপক গুপ্ত পরিচালিত এ কে বি ফিল্মসের 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালকরূপে নির্বাচিত হয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন দিলীপ রায়। সম্প্রতি বহির্দৃশ্য-গ্রহণের স্থান নির্বাচনের জন্য পরিচালক শ্রীগুপ্ত বরদা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরি-দর্শন করে এসেছেন।

'শংখবেলা' চিত্রের শুভমুক্তি

অগ্রগামী পরিচালিত ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'শংখবেলা' আজ মহা-সপ্তমীর দিন কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত

চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, শোভা সেন, তরুণকুমার, শ্রীমান বাপি ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়। সুধীন দাশগুপ্ত সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশক ছায়ালোক।

কৃষ্ণা পিকচার্সের 'মুক্ত বলাকা'

নব প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র সংস্থা কৃষ্ণা পিকচার্সের পক্ষ থেকে নবব্রতী গোষ্ঠী 'মুক্ত • বলাকা' ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয়। এ চিত্রের প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন ললিতা চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, দীপক মুখোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রাজেন সরকার।

দোভাষী চিত্র 'কে কার বউ'

একই সংগে বাংলা এবং হিন্দী ভাষায় 'কে কার বউ' ও 'এক সুরৎ দো দিল'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য। ছবি দুটির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন মলয়া সরকার, প্রবীরকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসিত সেন, তুনতুন, মধুমতী ও বদরীপ্রসাদ। আলোক চিত্রগ্রহণে রয়েছেন মনীশ দাশগুপ্ত।

কাল তুমি আলেয়া চিত্রের সেটে সুপ্রিয়া দেবী, অজয় গাঙ্গুলী ও স্বদেশ সরকার।
ফটো : অমৃত

বোম্বাই

'অভিলাষ' চিত্রের শুভমহরৎ

সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় আর ডি প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'অভিলাষ'র শুভ মহরৎ পালিত হল। মীনাকুমারী এবং নন্দাকে নিয়ে ছবির দৃশ্য গ্রহীত হয়। ক্ল্যাপস্টিক ও ক্যামেরা চালু করেন রাজেন্দ্রকুমার এবং ছবির নায়ক সঞ্জয়। এ ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন রেহমান, সুলোচনা, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুনতুন, মোহন চটি ও জন হুইস্কী। ছবিটি পরিচালনা করছেন অমিত বসু। রাহুল দেববর্মণ ছবিটির সুরকার।

'নাইট ইন ক্যালকাটা'র শুভমহরৎ

পরিচালক অমৃৎ মহেন্দ্র শ্রীসা স্টুডিওয় তাঁর নতুন ছবি 'নাইট ক্যালকাটা'র শুভ মহরৎ সম্প্রতি উদযা করলেন। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভি করেছেন সিমি, যুগলকিশোর জীবন বোস, জগদেব হেলেন ও ভগবান। সংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন উষা খান্না। প্রব স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু গেছে।

'দিওয়ানা' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

সম্প্রতি পুণা অঞ্চলের আরে কলোনীর লেকে মহেশ কাউল পরিচা রঙিন ছবি 'দিওয়ানা' চিত্রের বহির্দ গৃহীত হল। এ ছবির প্রধান চরি অভিনয় করছেন রাজকাপুর, সায়রাব ললিতা পাওয়ার, কানাইলাল, কমল কাপ রবীন্দ্র কাপুর, উল্লাস, হীরালাল ও শ মিশ্র। শংকর জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

'আই লাভ ইউ' চিত্রের শুভমহরৎ

ফিল্মীস্তান স্টুডিওয় সম্প্রতি রাদার্সের রঙিন ছবি 'আই লাভ ইউ'র শু মহরৎ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হ মহরতের পর নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ শ হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অংশগ্রহণ করে জয় মুখার্জি, মালা সিনহা, অসিত সাপ্রু, মধুমতী ও জনি ওয়াকর। ছবি পরিচালনা করছেন শ্রীরাম ভোরা।

বাপ্পি সোনীর পরবর্তী ছবি

পরিচালক বাপ্পি সোনী তাঁর ন ছবিটির (নামকরণহীন) চিত্রগ্রহণ সম্প্র শুরু করেছেন কারদার স্টুডিওয়। অ ছায়া চিত্রের এই রঙিন ছবিতে অভি

করছেন শশিকাপুর, ববিতা, ওমপ্রকাশ, রাজেন্দ্রনাথ, ধুমল ও মাধবী। আলোকচিত্র-গ্রহণ করছেন তারু দত্ত। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সংগীত-পরিচালক।

স্টুডিও থেকে বলছি

স্বাগত শারদীয়া। আজ সপ্তমী। আজকের এই শারদ প্রাতে আগমনীর সুর কার্তিকের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত। আনন্দ-হাটের নতুন সন্দেশটি হল, চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার থেকে আবার মহালয়ার পুণ্যদিনে আলোকিত হয়েছে। দীর্ঘ পঁচিশ দিনের একটানা অন্ধকারের পর প্রেক্ষাগৃহের মালিক-শ্রমিকের বিরোধের অবসানে দর্শকদের মুখে হাসি ফুটেছে। বাংলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এমন ঘটনা এই প্রথম বলা চলে। আনন্দের দিনে তাই প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহের মালিক-কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বোম্বাইয়ে নির্মিত একটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি সম্পর্কে কিছু বলি। কানু চক্রবর্তীকে নিয়ে এ কাহিনীর শুরু। সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী কানু কোনরকমে অভাবের সংসারকে ঢেকে-ঢুকে রেখেছেন। সংসারে সৎমা আর দুই অপোগণ্ড বৈমাত্রেয় ভাই বর্তমান। উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর কানু তাঁর সঙ্গীত সাধনায় কিছুটা শান্তি খুঁজে পান। অবশ্য এ প্রতিভার কথা একমাত্র ভজহরি এবং বাল্যবন্ধু জহুরী বুড়ো চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেউ জানত না। সঙ্গীত-প্রতিভার যোগাযোগটা ভজহরির প্রথম করিয়ে দেয় কানু চক্রবর্তীকে। ধনী পুরুষ অঘোর সেনাপতির সঙ্গে যোগাযোগ অঘোরবাবুর ছোট ছেলে পাগলা কানু চক্রবর্তীর কাছে গান শিখতে শুরু করে।

সঙ্গীত-শিক্ষকতায় কানু চক্রবর্তীর আর্থিক অভাব কিছুটা দূর হল। প্রথম মাসের দক্ষিণা পেয়ে যেদিন মায়ের জন্য কানু শাড়ি কিনতে গেছেন সেদিন রিকশাওয়ালার সামনে তাঁর সব টাকাটা হঠাৎ পকেট থেকে পড়ে যায়। কানু চক্রবর্তী নিরাশ মনে যখন ঘর-মুখো তখন এক অপরিচিতা সুন্দরী কন্যা তাঁর টাকাটা কুড়িয়ে ফেরত দেয়। কানু হতবাক। ধন্যবাদ দেবার সময়টুকু পর্যন্ত তিনি পান নি। হঠাৎ দোকানের ঝাঁপ মাথায় পড়ে যাওয়ায় কানু চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান।

এ ঘটনার পর মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে আজও মেয়েটির মুখ মনে পড়ে কানু চক্রবর্তীর। সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর কানু যখন অঘোর সেনাপতির বাড়িতে পাগলাকে গান শেখাতে এসেছেন তখন সেই অপরিচিত মেয়েটিকে এ বাড়িতে দেখে হঠাৎ হোঁচট খেলেন। কথায় কথায় অঘোরবাবুর স্ত্রী মানদার কাছ থেকে কানু জানতে পারেন, এই মেয়েটির নাম শিবানী। তাঁর দূরসম্পর্কের বোন। মানদার ইচ্ছে শিবানী কানুর কাছে গান শেখে। শিবানীর আসল পরিচয়টা কিন্তু মানদা দেবী গোপন রাখলেন।

দুষ্টু প্রজাপতি চিত্রে তনুজা ও কিশোরকুমার
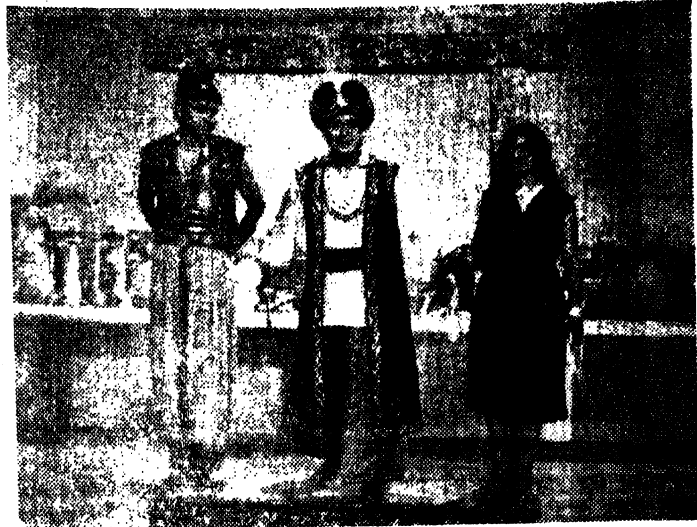
পূর্ব ঘটনার সূত্র ধরে কানু আর শিবানী পরস্পর দুজন দুজনকে চিনতে পারে। শিবানী মুগ্ধ হয়। কানুর ভাল লাগে শিবানীকে। কিন্তু কানুর গান শুনে আর একজন বিশেষ মুগ্ধ, সে হল ডেইজী মুখার্জি। উঁচু মহলের প্রতিনিধি। ডেইজী কানুকে উৎসাহ দেয়। সহানুভূতি জানায়। মনে মনে সে কানুর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

হঠাৎ এই পরিবেশে আরও দুই নতুন মুখের আবির্ভাব হল। উঁচু মহলের এই দুই প্রতিনিধির নাম বিলোল চ্যাটার্জি ও বীণা। এদের পেশা গয়না অথবা অর্থ চুরি করা। মানদা দেবীর দামী হীরের নেকলেসটা হাতাবার জন্য বিলোল শিবানীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় শুরু করে। বিলোলের এক পরিচয় হল, বিলেত ফেরৎ এবং জমিদার পুত্র, তাই বিলোলের মেলামেশায় কোন আপত্তি জানালেন না অঘোর সেনাপতি।

মানদা দেবীর হীরের নেকলেসটা তখন শিবানীর গলায় শোভা পাচ্ছে। এক গানের জলসায় হঠাৎ বীণা কার্যসিদ্ধির জন্য গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয়। সেই সুযোগে বিলোল নেকলেসটা শিবানীর গলা থেকে ছিনিয়ে নেয়। ফলে মানদা দেবী শিবানীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়াতাড়ি বিলোলের সঙ্গে বিয়ে দেবার তোড়জোড় শুরু করেন। অথচ শিবানী জানে বিলোলের আসল রূপটা কি। তাই এ বিয়ে ভেঙে দেবার জন্য শিবানী তাড়াতাড়ি ছুটে আসে কানুর কাছে। কিন্তু এখানে ডেইজীকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে শিবানী ভুল বুঝে চলে যায়।

এদিকে জহুরী বুড়ো চ্যাটার্জির দোকানে নেকলেসটা বিক্রী করে চলে যায় বিলোল। তখন বিয়ের মাত্র একদিন বাকী। খোঁজখবর নিয়ে বুড়ো এবং ডেইজী জানতে পারেন, মানদা দেবীর নেকলেসটা বিলোলই চুরি করেছে।

বিয়ের আসরে পুলিশ সেজে হাজির হয় কানু এবং বুড়ো চ্যাটার্জি। বিলোলের

সম্প্রতি মহাসমারোহে সমাপ্ত হ'ল "গীতাঞ্জলী"র (উত্তর কলিকাতা) ১০ম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে আকর্ষণ ছিল শ্রীঅজয় বসু পরিচালিত "কাঞ্চনরঙ্গ" নাট্যাভিনয়।

শঙ্খবেলা চিত্রে উত্তমকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

গ্রেপ্তারের খবর শুনে শিবানী পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছদ্মবেশী কানুর হাতে সে ধরা পড়ে যায়। আসল ব্যাপারটা জানতে পেরে কানুর সঙ্গে শিবানীর ভুল বোঝাটা দূরে হল। শিবানীর আসল পরিচয়টাও জানতে পারে কানু। সেই রাত্রে আর এক শুভলগ্নে কানু-শিবানীর বিয়েটা হয়ে গেল। আসল পুলিশ এসে বিল্লোলকে গ্রেপ্তার করল।

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত এ কাহিনীর নাম 'দুষ্টু প্রজাপতি'। বোম্বাইয়ে ছবিটির কাজ বর্তমানে শেষ করেছেন পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী। সুরসৃষ্টি এবং আলোকচিত্র পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কানাই দে। কৌশল চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত ললিত চিত্রমের এ চিত্রে প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন কিশোরকুমার, তনুজা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অসীমকুমার, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, চন্দনা ভট্টাচার্য, কবিতা বসু, কানু রায় ও কেষ্ট মুখোপাধ্যায়। পরিবেশনার ভার নিয়েছেনে বাণীশ্রী পিকচার্স।

মঞ্চাভিনয়

শিশিরকুমারের জন্মোৎসব

সম্প্রতি কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটার লাইবর দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্মোৎসব পালন করেছেন। করপোরেশন মডেল স্কুলে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান হয়। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নাট্যশালার ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু থেকে শিশিরকুমারের মঞ্চে অবতরণকাল পর্যন্ত বিবর্তনধারাকে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এই বিষয়ে থিয়েটর লাইবরের সভ্যদের নিষ্ঠা ও বাংলার নাট্য ঐতিহ্যের প্রতি নিঃসীম অনুরাগ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বাংলাদেশের নাট্যশালার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা জানতে চান তাঁদের কাছে এই প্রদর্শনী অনেক গভীর তথ্য তুলে ধরবে সন্দেহ নেই।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অবিস্মরণীয় প্রতিভা, বাংলা নাটকের যথার্থ প্রাণ সৃষ্টিতে তাঁর অবদানের কথা আলোচনা করেন প্রখ্যাত নাট্যকার নাট্যসমালোচক শ্রীদিগিন বন্দ্যোপাধ্যা[য়]। তাঁর আলোচনায় শিশিরকুমারের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদার রূপ হয়ে ও[ঠে]। মুক্ত অঙ্গনে এদিন সংস্থার শিল্পী উনবিংশ শতকের বিপ্লবী ইউরেনীয় ক[...] শেভ্‌চেঙ্কোর জীবনী অবলম্বনে কৃ[ষক] বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত একটি না[টক] মঞ্চস্থ করেন। শিল্পীদের বলিষ্ঠ অভি[নয়] নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে সাথ[ে] পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে পেরেছে।

দার্জিলিঙে নটনাট্যম্‌

আগামী ২৫শে ও ২৬শে অক্টো[বর] দার্জিলিঙে নটনাট্যম্‌ তিনটি না[টক] অভিনয় করবে। প্রথমদিনে 'দার্জিলিঙে[র] মেয়ে' ও আন্তন চেকভের 'দি প্রপোজা[ল]' থেকে রমেন লাহিড়ীকৃত 'রাজযোট[ক]' অভিনীত হবে।

দ্বিতীয় দিনের নাটকের নাম 'পাখী[র] বাসা'। প্রথম ও শেষ নাটকটি রচনা

দাদী মা চিত্রে অশোককুমার ও বীণা রায়

নির্দেশনায় আছেন জগমোহন মজুমদার। রাজযোটকের নির্দেশনায় আছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়।

প্রগতি পরিষদ

'প্রগতি পরিষদে'র সভাবৃন্দ কয়েকদিন আগে 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে তাঁদের বাৎসরিক মিলন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূকাভিনয় ও নৃত্যে ছিলেন অরুণাভ মজুমদার ও রীনা শীল। হিমাংশু বিশ্বাস যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে সলিল দত্তের নির্দেশনায় সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। শিল্পীরা এই নাট্যাভিনয়ে যোগ্যতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন : দেবব্রত রায়, দীপেশ বসাক, অলোক মুখোপাধ্যায়, তারক ধর, বিজয় শীল, শিবব্রত রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত দাস, সতীনাথ দত্ত, সত্যব্রত রায়, রমেন দত্ত ও হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়।

মেলবোর্নে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার থিয়েটার হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় 'বিসর্জন' নাটকের ইংরেজী তর্জমা 'স্যাক্রিফাইস' অভিনীত হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় তথা রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় এই প্রথম। সেখানকার স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনে এই নাটক নিয়ে নানারকম আলোচনা হয়। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন।

মেলবোর্নের প্রসিদ্ধ স্টেজ ও ফিল্ম অভিনেতারা এই নাট্যপ্রযোজনায় নানাভাবে সহযোগিতা করেন। সামগ্রিকভাবে নাটকটির অভিনয় ও বক্তব্য সবারই মন স্পর্শ করে। রঘুপতি, গোবিন্দ মাণিক্য, গুণবতী, জয়সিংহ ও অপর্ণার ভূমিকায় যথাক্রমে বার্ট কুপার, মাইকেল হানা, মিরিয়াম মান, রেমণ্ড রিচ, সু রাসেল অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

সমবায় চক্র ●

'সমবায় চক্রে'র শিল্পীবৃন্দ গত ২৭শে সেপ্টেম্বর 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে বাৎসরিক প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'স্বীকৃতি' নাটক মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহ মজুমদার আই. এ. এস ও প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রীগুরুদাস গোস্বামী আই. এ. এস। 'স্বীকৃতি' নাটকের অভিনয় উপস্থিত সবারই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন- বিমলেন্দু চক্রবর্তী, মিহিররঞ্জন চৌধুরী, নিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, মা মানস, মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ঘোষ, শিখা ভট্টাচার্য, মিতা চট্টোপাধ্যায়।

লোক সংস্কৃতি সঙ্ঘ

গত ৩রা অক্টোবর সন্ধ্যায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'লোক সংস্কৃতি সঙ্ঘের' ১৭শ

অরুণ গুহঠাকুরতা পরিচালিত **পঞ্চশর** চিত্রের সেটে রুমা গুহঠাকুরতা ও সুস্মিতা সান্যাল
ফটো : অমৃত

৮০-তে আসিও না চিত্রের একটি দৃশ্যে রুমা দেবী ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সিন ও' কেসিব 'জুনো এণ্ড দি পেকক' অবলম্বনে রচিত 'চাঁদ ও চকোর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রয়োগনৈপুণ্যে ও সুসংবদ্ধ অভিনয়গুণে নাটকটির আবেদন মোটামুটি সর্বজনগ্রাহী হয়ে ওঠে।

'চারপ্রহর'

সম্প্রতি 'রঙমহলে' স্বরাষ্ট্র ছাড়পত্র (বৈদেশিক) শাখা শিল্পীরা 'চারপ্রহর' নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন উপেন সাহা, কান্তি চৌধুরী, বীরেন দাস, ক্ষেত্র কর, মুক্তেশ-বন্ধু নিয়োগী, দিলীপ সেনগুপ্ত, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, রানু রায়।

'রেনেশাঁ ক্লাবে'র নাটক

সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকটি পরিবেশন করলেন কলকাতার বিভিন্ন পর্যটন সংস্থার কর্মীদের নিয়ে গঠিত 'রেনেশাঁ ক্লাবে'র শিল্পিবৃন্দ। প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে এই নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম হোলেও শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয় খুব খারাপ হয়নি। কয়েকজন শিল্পীকে অবশ্য আরো জড়তা কাটিয়ে ওঠা উচিত ছিল। অভিনয়ের দিক থেকে সমর সেনগুপ্তের 'চন্দ্রশেখর', রণজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'অবিনাশ', আদি ঘোষের 'মনোহর', কিরণ লাহিড়ীর 'নিত্যানন্দ' উল্লেখযোগ্য। দীপিকা দাস, মেনকা দেবী ও প্রতিমা পালের অভিনয়েও দক্ষতা পরিস্ফুট হয়েছে। বিজিত মুখোপাধ্যায়ের নাট্য-নির্দেশনাতেও যোগ্যতার পরিচয় মেলে।

ল' কলেজের অভিনয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দুটি নাটকের অভিনয় করেন। ছাত্ররা মঞ্চস্থ করেন সমীর মজুমদারের 'সূর্য ওঠার দিন' আর ছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি নাটক লিখেছি'।

'আগন্তুকে'র নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি 'আগন্তুক' শিল্পীগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব মঞ্চে শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ঝর্ণা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। সামগ্রিক অভিনয়নৈপুণ্যে নাটকটির গতি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। জয়ন্ত সেনগুপ্ত, শুভেন্দু রায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অসিত বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ দত্ত, শংকু বসু, সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিমা চক্রবর্তী। তরুণ শিল্পী পিনাকী চক্রবর্তী একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জয়ন্ত ভট্টাচার্যের নাট্যনির্দেশনায় আন্তরিক নিষ্ঠার ছাপ স্পষ্ট।

বসিরহাটে নাট্যাভিনয়

বসিরহাট সাহিত্য সঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ কিছুদিন আগে 'পাশের বাড়ীর ভাড়াটে' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। যাঁদের অভিনয় সবার মন স্পর্শ করে তাঁরা হোলেন গীতা দে, রণজিৎ তরফদার, সাধনা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দাস।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী পরিবেশিত "রথের রশি" ও "বশীকরণ" নাট্যাভিনয় :

গেল রবিবার, ২রা অক্টোবর রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে নাট্য-বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কবির "রথের রশি" ও "বশীকরণ" নাটক দু'খানি মঞ্চস্থ করে। সাংকেতিক নাটক "রথের রশি"র পরিচালনা, মঞ্চ-পরিকল্পনা, রূপসজ্জা, আলোক-সম্পাত এবং অভিনয়—সমগ্রভাবে এমন সাবলীল, ভাবদ্যোতক ও রসোত্তীর্ণ হয়েছিল যে, যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই নিজ নিজ ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হয়েছিল পুরোহিত-বেশী মুকুল দাস ও প্রথমা স্ত্রীলোকের ভূমিকায় নীলিমা বসুর অভিনয়। এ-ছাড়া শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় (৩য়া স্ত্রী), বীথিকা চট্টোপাধ্যায় (৪র্থা স্ত্রী), অনঙ্গ কুণ্ডু (সন্ন্যাসী), সমর সোম (১ম নাগরিক), আদিত্য রায় (১ম সৈনিক), শ্যামাকান্ত দাস (শূদ্র দলপতি প্রমথ চৌধুরী (কবি), সন্দীপ পাল (৩য় ধনিক) প্রভৃতিও উল্লেখ নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

"বশীকরণ" কবির একটি হাল্কা হাসির নাটিকা। ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ে এই হাল্কা সুরটি পুরোপুরি বজায় ছিল। এদের মধ্যে বিমান মৈত্র (অন্নদা), নীলিমা বসু (শ্যামসুন্দরী) ও শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় (মাতাজী) তাঁদের অভিনয়গুণে সারা প্রেক্ষাগৃহকে হাসির তরঙ্গে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

নান্দীকার গোষ্ঠীর অভিনয়

অভিনয় জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত নান্দীকার-গোষ্ঠী নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ২০ অক্টোবর, মহাসপ্তমীর দিন তাঁদের নবতম নাটক 'শের আফগান' এবং ২২-এ অক্টোবর, মহানবমীর দিন তাঁদের জনপ্রিয় অবদান 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' অভিনয় করছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত দুখানি নাটকেরই অভিনয়-সময় হচ্ছে সকাল সাড়ে দশটা।

পুজোর গান

কলিঙ্গ রেকর্ড

কলিঙ্গ রেকর্ড কোম্পানীর শারদীয় অর্ঘ্যমালায় বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে সংগীত এবং যন্ত্রসংগীত আমাদের মুগ্ধ করেছে। শিল্পীর নিষ্ঠা, ভাব ও আন্তরিকতার পরিচয়সমৃদ্ধ রেকর্ডগুলি। সুকান্ত হাজরার কণ্ঠে 'ওকে ধরিলে তো ধরা' ও 'জাগরণে যায় বিভাবরী' এবং রেবা ঘোষের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত 'দাঁড়াও আমার আঁখির' ও 'আমি হৃদয়েতে পথ' রেকর্ডদুটি সকলেরই ভাল লাগবে। আধুনিক সংগীত-গুলি অত্যন্ত রুচির পরিচায়ক, বিশেষভাবে শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ('মায়াভরা কাজল আঁখি' ও 'এলোরে ফাগুনে আমার মনে হায়'), শ্রীমতী শকুন্তলা বড়ুয়া ('ভেবেছিনু আমি মালাখানি নিয়ে' ও তোমার পাশে যেমন আছি'), শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায় ('এখানে পিয়ালের ছায়াঘেরা কুঞ্জে' ও 'নীল আকাশের সাগর পারে') গীত আধুনিক সংগীতগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গীটারে শ্রীদেবাশীষ ঘোড় ও শ্রীবটুক নন্দী পরিচালিত শ্রীনির্মল দাশ-গুপ্ত তাঁদের সুরবৈচিত্র্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। শ্রীনির্মল ঘোষের বাগগীতি, শ্রীসন্তোষ নাকুলীর কৌতুক-নক্সা, শ্রীশঙ্কু চৌধুরীর শ্যামাসংগীত, গীতশ্রী অর্চনা চট্টোপাধ্যায়ের কীর্তন, শ্রীমতী জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া গান ও শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের ভজন—এই ছটি রেকর্ডও সকলকে আকৃষ্ট করবে নিশ্চয়। কলিঙ্গ রেকর্ড কোম্পানী সম্ভাবনাময় শিল্পীদের উৎসাহদান করে সংগীত রসপিপাসু ও বিদগ্ধ-সমাজের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাঁদের প্রকাশিত রেকর্ডগুলি সংগীত অনুরাগী-দের সংগ্রহশালায় স্থানলাভের যোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

আসন্ন সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন

ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের তারকাদের নিয়ে আগামী ১লা নভেম্বর থেকে কলকাতার মহাজাতি সদনে শুরু হচ্ছে সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন। এবারকার সম্মেলনে সুররসিক শ্রোতৃসাধারণকে খুশী করার জন্যে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাঁদের চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছেন না বলে জানা গিয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, তারকাভারাক্রান্ত সম্মেলনের ব্যয়প্রাচুর্য সত্ত্বেও দর্শনীর মূল্য এঁরা খুবই কম রেখেছেন। এঁদের একখানা সীজন টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য মাত্র দশ টাকা ধার্য হয়েছে।

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের এই ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলনে স্থানীয় ও বহিরাগত যেসব বিশিষ্ট শিল্পী অংশগ্রহণ

করবেন, তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ—

কণ্ঠসংগীতে : বড়ে গোলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ, ভীমসেন যোশী, মনেব্বর আলি খাঁ, চিন্ময় লাহিড়ী, এ কানন, সুনন্দা পট্টনায়ক।

যন্ত্রসংগীতে : রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ খাঁ, বিসমিল্লা খাঁ, শারণরানী মাথুর, ভি জি যোগ, কল্যাণী রায়, সগীরুদ্দিন।

তবলা : শান্তা প্রসাদ, কানাই দত্ত, কেরামৎ খাঁ, শ্যামল বসু, বিশ্বনাথ বসু।

নৃত্যে : অধুনালুপ্ত ওড়িষী নৃত্যে শ্রীমতী মিনতি দেবী।

উদয়শংকর সম্প্রদায়ের ভারত সফর

সম্প্রতি শ্রীউদয়শঙ্কর তাঁর 'প্রকৃতি আনন্দ' এবং ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া এই দুটি অনুষ্ঠান সূচী নিয়ে সদলবলে ভারত সফরে যাত্রা করেছেন। বিহারের রাঁচী, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চল, সেখান থেকে আসাম এবং আবার পশ্চিমের পথ ধরে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে আর একবার তাঁর অনুষ্ঠানগুলি প্রদর্শন করবেন। উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক এই সফরে ব্যবস্থাপক থাকবেন শ্রীসতোন চট্টোপাধ্যায়।

নির্বাক যুগের আমেরিকান ছবির প্রদর্শনী

গেল ১৩ই অক্টোবর সকালে ইউ-এস-আই-এস প্রেক্ষাগৃহে নির্বাক যুগের কয়েকটি বিখ্যাত আমেরিকান ছবির কিছু কিছু অংশ প্রদর্শিত হয়েছিল। যারা চলচ্চিত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে উৎসাহী, বিগত দিনের এই না দেখা ছবিগুলির অংশ তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করবে। আমেরিকা তথা বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতে ডি ডাবলু গ্রিফিথ নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় নাম। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তেজক কাহিনীকে উপজীব্য করে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁরই দ্বারা নির্মিত এবং নীল হ্যামিল্টন, লায়নেল ব্যারিমুর, ক্যারল ডেমস্টার, লুই উলহীম প্রভৃতি যশস্বী শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত 'আমেরিকা' ছবির তিনটি রীল নিঃসন্দেহে গ্রিফিথের বিরাট পরিকল্পনা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। ঠিক সমানভাবেই প্রশংসিত হয় ১৯১৬ সালে তাঁরই প্রযোজিত 'ফল অব ব্যাবিলন'-এর সুবৃহৎ দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার। কাহিনীর বিশ্বাস্য প্রাচীনত্বকে রূপায়িত করবার জন্যে কি অসীম প্রচেষ্টাই না তিনি করেছিলেন!

এরই সঙ্গে আমরা আবার করে দেখলুম নির্বাক যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অভিনেতা, 'বাহাদুর' নামে খ্যাত ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস অভিনীত সেযুগের অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত চিত্র 'থীফ অব বাগদাদ'-এর তিনটি রীল। মনে হয় আজ আবার করে যদি এই কাহিনীটির রঙিন ও সবাক রূপ সার্থকভাবে দেওয়া যায়, তাহলে তাও অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

নির্বাক চিত্রের প্রদর্শনী সম্পর্কে একটি কথা। নির্বাক ছবির ক্যামেরা ও প্রোজেক্টার দুই-ই চলত সেকেণ্ডে ষোল ফ্রেম করে। কিন্তু আজ তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভাষ্য

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে কলাপীর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে "কহ্লার" শিল্পীগোষ্ঠী দেশাত্মবোধক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। ছবিতে "কহ্লার" শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

ও আবহসঙ্গীত জুড়ে তাকে দেখানো হয় সবাক ছবিতে প্রচলিত গতি বিশিষ্ট প্রোজেক্টারের সাহায্যে সেকেণ্ডে চব্বিশ ফ্রেম হিসাবে। ফলে নির্বাক ছবির গতিতন্ত্রী প্রভৃতি দেড়া স্পীডে পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে দর্শকমনে একটি অস্বাভাবিক 'কমিক'ভাবের সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, এর ফলে সে-যুগের অভিনয়ের প্রতি সুবিচার করা হয় না। এ বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

সিনেমাটোগ্রাফ এক্জিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর নবজন্ম

দশ বছর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবার পরে গেল ১০ই অক্টোবর, সোমবার মেট্রো সিনেমার ম্যানেজার মিঃ হাকেসজী ও লাইট

ইয়ে জিন্দেগী কিতনী হসীন হ্যায় চিত্রে সায়রাবানু

হাউস সিনেমার ম্যানেজার মিঃ সার্কিজ-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় সিনেমাটোগ্রাফ এক্জিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা) পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই সংস্থার বর্তমান সদস্য হচ্ছে—মেট্রো, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার গ্লোব, এলিট, টাইগার ও রিগ্যাল—মোট নটি চিত্রগৃহ। এই সংস্থাটি প্রথমেই কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের সাহায্যে (১) সিনেমা টিকিটের কালোবাজারী বন্ধ করতে চান; (২) যে-সব অস্বাভাবিক দীর্ঘ ছবি প্রত্যহ তিনটির পরিবর্তে মাত্র দুটি প্রদর্শনীতে সীমাবদ্ধ থাকে তাদের ক্ষেত্রে টিকিটের হার ন্যায্যভাবে বৃদ্ধি করতে চান; (৩) বর্তমানের চিত্রগৃহ পরিচালনার বর্ধিত ব্যয় পূরণ করবার জন্যে দৈনিক চারটি প্রদর্শনী চালু করতে চান। এছাড়া এঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে প্রমোদকর কিছু পরিমাণে হ্রাস করবার জন্যে আবেদন করবেন এবং শ্রমিক-মালিক ও ব্যবসায়ী, সরকার সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জন্যে সতত চেষ্টা করবেন। অন্য যে কোনো চিত্রগৃহ এই সংস্থার সভ্য হতে পারেন, একথাও জানানো হয়েছে।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটারের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান :

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটারের নামেই প্রকাশ যে, এটি একটি যুব সংস্থা এবং এর প্রধান কাজ পাপেট থিয়েটারের অনুষ্ঠান করা। পুতুল নাচ আমাদের দেশের একটি সুপ্রাচীন আর্ট হলেও সাম্প্রতিককালে চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আগত পাপেট থিয়েটার দলের প্রদর্শনী আমাদের শিক্ষিত সমাজকে এই বিশেষ আর্টটির প্রতি যে আকৃষ্ট করেছে, একথা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার "আলিবাবা" পুতুলনাট্যটি সাধারণকে উপহার দিয়েছেন। পুতুলগুলির ভঙ্গী, আগমন-নির্গমন প্রভৃতির সঙ্গে আবহ-

সঙ্গীত ও নেপথ্যসংলাপ পালাটিকে প্রচুর প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্য ক'রে তুলেছিল। এই সংস্থাটি নিজেদের কর্মসূচীকে মাত্র 'প্যাপেট' অনুষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ না রেখে কোমলমতি শিশুদের নৃত্য, গীত, অঙ্কন-**বিদ্যা প্রভৃতি নানা** শিল্পচর্চায় উৎসাহিত **করার গুরুদায়িত্বও বহন করছেন** সানন্দে—**এ নিদর্শনও গেল ৬ই অক্টোবরের অনু-ষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা** উপস্থিত অতিথি-**বৃন্দের সামনে** অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে **উপস্থাপিত করতে পেরেছেন।**

প্যারামাউন্টের "দি নেকেড প্রে" এবং "নেভাডা স্মিথ" :

আফ্রিকার "সফরী ক্লাব ইণ্টারন্যাশনাল" দ্বারা নির্মিত এবং প্যারামাউন্ট পরিবেশিত দুঃসাহসিক আফ্রিকা অভিযান চিত্র "দি নেকেড প্রে" খুব শিগ্গিরই কলিকাতায় প্রদর্শিত হবে। সান সেবাস্টিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনের জন্যে এই ছবি-খানিকেই নির্বাচন করা হয়েছে।

"দি কার্পেট ব্যাগার্স"-এর চরিত্রগুলি আশ্রয় ক'রে **"জন মাইকেল হেজ"** দ্বারা রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বন ক'রে হেনরী হ্যাথাওয়ে প্রযোজিত ও পরিচালিত "নেভাডা স্মিথ" ছবিখানি গ'ড়ে উঠেছে। স্টিভ ম্যাক্‌কুইন, কার্ল ম্যালডেন, ব্রায়ান কীথ, আর্থার কেনেডী, সুজান প্লেশেট প্রভৃতি অভিনীত, জোসেফ ই. লেভিন নিবেদিত এবং প্যারামাউণ্ট পরিবেশিত এই ছবিখানি টোকিও, প্যারিস, স্টকহলম, বার্লিন, বেসিল প্রভৃতি যে শহরেই মুক্তিলাভ করেছে, সেখানেই বক্স অফিস রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কলকাতাতেও ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষায়।

নবগঠিত অপেশাদার নাট্য সংস্থা থিয়েটার ওয়ার্কশপ তাঁদের প্রথম প্রযোজনা 'ললিতা' মঞ্চস্থ করবেন মুক্ত অঙ্গনে আগামী ১লা নভেম্বর। নাটকটি বিশ্ব-সাহিত্যের একটি খ্যাতনামা সাহিত্যকর্ম অনুসরণে রচিত এবং আমাদের দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যার পটভূমিকায় রূপান্তরিত। প্রযোজনায় বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন থিয়েটার ওয়ার্কশপের কর্মিবৃন্দ।

অভ্যুদয়-এর অভিনয়

'বারো ঘণ্টা' ও 'বুদ্বুদ' নাটকের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে 'অভ্যুদয়' সম্প্রদায় বাংলার নাট্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'নাম নেই' অভ্যুদয়ের সাম্প্রতিক প্রযোজনা। শ্রীকিরণ মৈত্র রচিত ও পরিচালিত এই নাট্য প্রযোজনাটি ইতিমধ্যে নাট্যামোদীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। 'টেকনি থিয়েটার' পদ্ধতিতে পরিবেশিত এই নাটকটি প্রতি মাসে একবার মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। আগামী ১১ই অক্টোবর ঐ মঞ্চে নাটকটির দশম অভিনয় পরিবেশিত হবে। শ্রীমনোরঞ্জন সোম, শংকর পাল, পরিমল দত্ত, শান্ত সান্যাল, মানব গুহ, আশীষ মুখোঃ, অলকা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিগণ এই নাটকে অংশগ্রহণ করছেন। আলোকসম্পাতে রয়েছেন শ্রীস্বরূপ মুখো-পাধ্যায়।

বেতারশ্রুতি

॥ মহিষমর্দিনী ॥

শুরু করছি 'শেষের কবিতা' থেকে **উদ্ধৃতি দিয়ে। "...ভাল** লাগার এভোল্যুশন **আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার** ভাল-লাগা, **পাঁচ বছর পরেও যদি একই** জায়গায় খাড়া **দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে** বুঝতে হবে, বেচারা **জানতে পারে নি যে,** সে মরে গেছে। একটু **ঠেলা মারলেই তার** নিজের কাছে প্রমাণ **হবে যে, সেন্টিমেন্টাল** আত্মীয়েরা তার **অন্ত্যেষ্টি-সৎকার** করতে বিলম্ব করছিল, **উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে** চিরকাল ফাঁকি **দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের** দলের এই **অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"**

অমিত রায় দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার। **তাই তার পক্ষে** সম্ভব এবং সাহস দুই-ই **হয়েছিল রবি ঠাকুরের** মত কবিকে, সময় **থাকতে মানে মানে** সরে যেতে উপদেশ **দেবার (বেশ কিছুটা** দাবীও তাতে মেশান **ছিল)।**

আমি অত্যন্ত সাধারণ এবং গতানু-গতিক **ছাপোষা বাঙালী।** সাহস করে যে **কিছু বলব,** নানা কারণে সে ভরসা পাই না। **কারণ আমার খেদ** যাঁদের প্রতি তাঁরা শুধু **সুপ্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য ব্যক্তিই নন "আকাশ-বাণীর" একান্ত** স্নেহভাজন ব্যক্তিও। **আকাশবাণী** প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের **সম্পর্কটা এত** নিবিড় যে, কান টানলে **যেমন মাথা আসে,** তেমনি একের সম্বন্ধে **বলতে গেলেই** স্বাভাবিকভাবে অপরটির **উল্লেখও অপরিহার্য** হয়ে ওঠে। নিজের **প্রাণের দায়েই তাই অমিত** রায়ের সাহায্য **নিয়েছি।**

আকাশবাণী হাতে-গোনা যে দুটি **অনুষ্ঠানের জন্যে ন্যায্যত** গর্ববোধ করতে **পারেন, মহালয়ার** দিন ভোর রাত্রিতে **'মহিষমর্দিনী'** অনুষ্ঠানটি তাদের অন্যতম। **এই অনুষ্ঠানটি** শুধু বাংলা দেশে নয়, সমস্ত ভারতব্যাপী অনেক অবাঙালীর কাছেও বিশেষ আকর্ষণীয়। শ্রোতারা এই দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে বিনিদ্র রজনী যাপন করতেও দ্বিধা করেন না—পাছে সেই শুভ লগ্ন থেকে বঞ্চিত হন। প্রচারণার প্রথম দিনটি থেকে শুরু করে, গত কয়েক দশক ধরে এই অনুষ্ঠানটির বহুল জন-প্রিয়তার মূলে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক-খানি দায়ী তাঁরা হলেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।

সারা বছরের ভেতর একটি দিনকে 'বিশেষ দিনে' রূপান্তরিত করবার কীর্তি একান্তই এঁদের নিজস্ব। তার এই কীর্তির রিফ্লেক্টেড গ্লোরীতে গৌরবান্বিত আকাশ-বাণীর চালচলনে কোথাও যদি গর্বের লক্ষণ দেখা যায়, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয় একথা স্বীকার্য। তাই আকাশবাণী যখন ইংরেজী বাংলায় মিলিয়ে বেশ কয়েক বার শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন, কবে কখন মহিষমর্দিনী অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে, তখন সেই ঘোষণার অন্তরালে যে বিরাট একটা আত্মতুষ্টি ও অহমিকা উঁকি মারতে শুরু করে, তাকে অনেক চেষ্টা করেও লুকানো যায় না। অবিশ্যি এর জন্যে আকাশবাণীকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। কারণ গর্ববোধ করার মত অনুষ্ঠান বোধকরি এদের আর একটির বেশী দুটি নেই। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলার থাকত না যদি এই দুর্বলতা আজ আকাশবাণীকে বিপথচালিত না করত।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আকাশবাণীর মত এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের ভেতর এমন একজন কর্মকর্তার দেখা পাওয়া গেল না, যাঁর এই উপলব্ধি আছে যে, 'ভাল লাগারও এভোল্যুশন আছে'—ভাল লাগার শেষও আছে। গত কয়েক দশক ধরে সেই 'নাকী-নাকী' সুরে একঘেয়ে আবৃত্তি, সেই একই ধরনের গান, একই কথা, একই সুরে একঘেয়ে সঙ্গীত-পরিবেশন'—আজ শ্রোতাদের কাছে এই অপূর্বসুন্দর অনুষ্ঠানকে মর্মান্তিক শ্রুতিকটু বস্তুতে পরিণত করেছে—সেই সহজ কথাটা বোঝাবার মত একজন লোকও কি আকাশবাণীতে নেই? শ্রোতা-দের পূর্বস্মৃতির দুর্বলতার উপর নির্ভর করে কুম্ভকর্ণের মত নাক ডাকিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে 'আকাশবাণী'। এমন সুন্দর অনুষ্ঠানটিকে আরও বেশী করে ভাল লাগার জন্যে একটু পরিবর্তন করা, একটু মুখবদল করা কি একান্তই প্রয়োজন নয়? শ্রোতাদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে কি তাঁরা এতটা অজ্ঞ না কি উদাসীন? অথবা খ্যাতির মোহ তাঁদের দৃষ্টিকে এমন ঝাপসা করে রেখেছে যে, 'দেয়ালের লিখন' তাঁদের চোখে পড়ছে না?

প্রথম দৃষ্টিতে অমিত রায়ের কথাগুলো অবান্তর মনে হলেও একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এর অর্থ কত গভীর।

ঘোষণা

দুর্গাপূজো উপলক্ষে অমৃত সম্পাদকীয় দপ্তর বন্ধ থাকবে। সেজন্য আগামী ২৮-১০-৬৬ তারিখের সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংখ্যা-গুলি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

এগিয়ে যাবার পালা

অজয় বসু

মাইল দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডটি আমেরিকা পুনরুদ্ধার করেছে। স্বদেশকে হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন উনিশ বছরের তরুণ জিম রিয়ান।

অ্যাথলেটিক দুনিয়ায় আমেরিকার সামর্থ অনস্বীকার্য। তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। আন্তর্জাতিক আসর জয় করায় এবং নানান বিভাগে নিত্য নব বিশ্ব রেকর্ড গড়ায় আমেরিকার কমাই নেই। নানান বিভাগই বলছি, সব বিভাগ নয়। কারণ প্রায় সব বিভাগে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেও মার্কিণ তরুণেরা ম্যারথন দৌড়, দূরপাল্লার অন্য বিভাগে, মায় মাইল দৌড়েও যেন দীর্ঘদিন অন্যদের পেছন থেকে তাড়াই করে এসেছেন।

এবার হয়তো অন্যদের পেছনে ফেলে নিজেরই এগিয়ে যাওয়ার পালা। ম্যারাথন দৌড়ে অবস্থার এখনও হেরফের ঘটে নি। তবে দশ হাজার মিটার বা মাইল দৌড়ের পরিস্থিতি বদলেছে। টোকিও ওলিম্পিকে মার্কিণ তরুণ বিলি মিলস স্বর্ণপদক পেয়েছেন এবং পরবর্তী ওলিম্পিক এসে পড়ার আগেই উঠতি তারকা জিম রিয়ান মাইলে নিজ মুলুকের পূর্বোবর্তীদের অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছেন।

এক মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ায় মার্কিণ তরুণেরা কোনোদিন চেষ্টার কসুর করেন নি। সে চেষ্টার শেষবারের মতো সফল হয়েছিল গ্লেন কানিংহামের কৃতিত্বে। সে কীর্তি উনত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা। কাজেই জিম রিয়ানকে পেয়ে তামাম মার্কিণ মুলুক আজ যে খুসীতে ডগমগ করবে, তা আর বিচিত্র কি!

খুসীর আরও কারণ, সঙ্গত কারণই আছে।

জিম রিয়ানের সাফল্য এক অতর্কিত ঘটনা নয়। টোকিও ওলিম্পিক উত্তরকালে জিম রিয়ান ধাপে ধাপে এগিয়েছেন। এগোতে এগোতে একেবারে শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বয়স অল্প। রিয়ানের সাধনায় কোনো ভেজাল নেই। প্রত্যয়ও অবিচল। কাজেই আমেরিকার আশা, রিয়ান দীর্ঘদিন শিখরাসীনই থাকবেন। কানিংহামের সাফল্য ছিল বড়ই স্বল্পায়ু। রিয়ান আরও বেশি দিন টিঁকবেন। যতো বেশি টেঁকসই হবেন ততোই আমেরিকার লাভ।

লাভের অঙ্ক কষতে কষতেই আজ মার্কিণ মুলুক বলছেন যে, জিম রিয়ান একদিন মাইল দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডটিকে আরো উঁচুতে তুলে ধরবেন এবং সেই দিনটি সুদূরেও নয়। কতো উঁচুতে? তিন মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডের নীচে। হয়তো আরও তলায়। এতো তলায় যে নীচের সেই মহলে আর কেউ চট করে নামতে পারবেন না। পারতে হলে যে গতিতে নিজেকে জড়াতে হয় সেই গতির হদিশ জানা নাকি অন্যের দুঃসাধ্য।

হয়তো বাড়িয়ে বলছেন ওঁরা। হয়তো ওঁদের প্রত্যাশা আকাশ ছোঁয়া। এমনি কতো ভবিষ্যৎ বক্তাই তো একালে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন। কতো জনকেই না বলতে শুনলাম যে এর পর আর এগোনো মানুষের অসাধ্য। তবু মানুষের সামর্থ পন্ডিতদের ভবিষ্যত বাণীকে ব্যঙ্গ করতেই যেন আরও এগিয়েছে। জিম রিয়ানকে সামনে রেখে আজ যাঁরা ভাবছেন যে মাইল দৌড়ে জিমের সামর্থই হলো শেষ কথা তাঁরাও নিশ্চয়ই একদিন ঠকে যাবেন। উত্তরসূরীরা আরও এগোবেন। তবে সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই হবে। আপাততঃ আলোচনার ক্ষেত্রটিকে বর্তমানেই সীমাবদ্ধ রাখা যাক।

বর্তমান প্রসঙ্গ জিম রিয়ান।

উনিশ বছরের উঠতি অ্যাথলিট রিয়ান গত জুলাইয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলেতে এডওয়ার্ডস স্টেডিয়ামে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে এবং নতুন করে গড়তে মাইল দৌড়ে সময় নিয়েছিলেন মাত্র ৩ মিনিট ৫১·৩ সেকেন্ড। মাইলে ফ্রান্সের মাইকেল জাজির রেকর্ড যা ছিল তা থেকে ২·৩ সেকেন্ড ছাঁটাই করে জিম রিয়ান মাইল দৌড়ে এক নতুন যুগ প্রবর্তন করেছেন। এই যুগের নায়কদের

জিম রিয়ান

আর কতো কম সময়ে যে এই পথ দৌড়তে দেখা যবে তা কেই বা আজ অনুমান করতে পারেন।

এডওয়ার্ডস স্টেডিয়ামের ট্র্যাক ছুঁয়ে জিম রিয়ান যেদিন উড়ে যান সেদিন স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে প্রায় হাজার পনেরো দর্শক উপস্থিত ছিলেন। রিয়ান রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করবেন, এই খবরটি মুখে মুখে ছড়িয়েছিল। তাই শুধুমাত্র তাঁকে দেখতেই যেন হাজার পনেরো ক্রীড়ানুরাগীর স্টেডিয়ামে আসা। কয়েক সপ্তাহ আগে রিয়ান জাজির কবল থেকে মাইল দৌড়ের বিশ্বরেকর্ডটি ছিনিয়ে নিতে দু দুবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। এদিকে মার্কিণ মুলুকে অ্যাথলেটিক মরশুমও শেষ হয়ে আসছে। জুলাইয়ে না পারলে আরও

এক বছরের জন্যে হাত গ্রুটিয়ে বসে থাকতে হবে। কাজেই রিয়ানের পরিকল্পনা, এই জ্বলাইয়ে যা করার তাই করতে হবে।

যা করার তাই করতে হবেই এই সংকল্পে জিম রিয়ান আগের সপ্তাহে প্রতিদিন দশ মাইল করে দৌড়েছেন। তাছাড়া দৌড়ের দিন অন্য প্রতিযোগীরা রেকর্ড ভাঙ্গায় জিম রিয়ানকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। অন্য প্রতিযোগীরা মানে টম ভন র্যুডেন, ক্যারি উইসিগার, ওয়েড বেল, রিচার্ড রোমো ও প্যাট জোর। এ'দের কেউই রিয়ানের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নন। তার তাঁদের অনিবার্য ছিল তবে রেকর্ড ভাঙ্গায় রিয়ানকে তাঁরা সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন পেস মেকারের ভূমিকা নিয়ে।

পেস-মেকারদের লক্ষ্য ছিল প্রথম পর্বে বর্ধিত গতির টানে জিম রিয়ানকে টেনে নিয়ে যাওয়া। তাঁরা সবাই শেষ পর্যন্ত ফ্বরিয়ে যাবেন। কিন্তু রিয়ান ফ্বরোবেন না। রিয়ান যদি শেষ পর্বে দ্রুত লয়ে ছুটতে পারেন তাহলে প্রথম দফার দ্রুত এবং শেষ পর্বের দ্রুততর গতি মিলিয়ে গড়ে তিনি যে সময় নেবেন তা হবে জাজির বিশ্ব রেকর্ডের চেয়ে কম।

সব ব্যবস্থাই নিখ্বত ছিল। শ্বধ্ব ভয় এই যে জিম রিয়ানের আহত পাখানি এতো দ্রুতগতির চাপ সইতে পারবে কিনা। বাঁ-পায়ের হাঁট্বর এক দিকটা মাঝে মাঝে কন-কন করে। এই কন্‌কনানি ঘিরেই যতো অস্বস্তি।

কিন্তু দৌড় শ্বর্ব হতেই জিম রিয়ান প্বরানো ব্যথার কথা ভুলে গেলেন। স্বর্বতেই এগিয়ে রইলেন ভন র্যুডেন। কাছাকাছিই ঝাঁক বেঁধে দৌড়তে লাগলেন পর্যায়ক্রমে রিচার্ড রোমো, উয়েসিগার ও রিয়ান। প্রাণপন ছ্বটলেন র্যুডেন। সিকি মাইল শেষ হলো ৫৭-৭ সেকেন্ডে।

দ্বিতীয় চক্‌করে রোমো প্বরোভাগে গেলেন এবং রিয়ান ও বেল দ্বজনেই অতিক্রম করলেন ভন র্যুডেনকে। পেস-মেকার র্যুডেন প্রথম চক্‌করেই ফ্বরিয়ে গিয়েছেন। অর্ধ মাইল পথ যখন শেষ হলো তখন বেলই সবার আগে। আর দশমিক এক সেকেন্ডের ব্যবধানে রিচার্ড রোমা ও জিম রিয়ান।

তৃতীয় চক্‌করের গোড়াতে রিয়ান রোমোকে অতিক্রম করলেন। কিন্তু চেষ্টা করেও ওয়েড বেলকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারলেন না। তখনও বেলের দম অট্বট, সামর্থ অবিচল। কিন্তু ওয়েড বেল তো পেস-মেকার। কতোক্ষণ আর এইভাবে য্বঝবেন!

সাতশ' গজ পথ বাকী থাকতে জিম রিয়ান বেলকে ধরে ফেললেন। দেখতে দেখতে এগিয়েও গেলেন। যতো এগোন ততোই যেন তাঁর গতিবেগ বাড়তে থাকে। দৌড়ের ভঙ্গী যেন যন্ত্রবৎ নিখ্বত। মান্বষটিও যেন ইস্পাত কাঠামোর মতোই শক্ত। পরের কটি সেকেন্ডে এডওয়ার্ডস স্টেডিয়ামের পনেরো হাজার দর্শক আর কোনো প্রতিযোগী বা পেস-মেকারের খবর নিতে চান নি। সমস্বরে তাঁরা শ্বধ্ব রিয়ান রিয়ান বলে গলা ফাটিয়েছেন। এক মাঠ দর্শকের পনেরো হাজার জোড়া দৃষ্টি শ্বধ্ব এই একটি মান্বষেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থেকেছে।

এই একটি মান্বষই সেদিন মাইলে হৃত সাম্রাজ্যটি মার্কিন ম্বল্বকে আবার উদ্ধার করে এনেছেন। প্রথম চক্‌কর বা সিকি মাইল দৌড়ান ৫৭-৯ সেকেন্ডে, দ্বিতীয় চক্‌কর ৫৭-৬ সেকেন্ডে, তৃতীয় চক্‌কর অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে অর্থাৎ ৫৯-৮ সেকেন্ডে। কিন্তু শেষ চক্‌কর বা শেষ সিকি মাইল ঝড়ের আগে, পাক্‌কা ৫৬ সেকেন্ডে। সব মিলিয়ে জিম রিয়ান এক মাইল দৌড়তে সময় নেন ৩ মিনিট ৫১-৩ সেকেন্ড। মাইকেল জাজির রেকর্ডের চেয়ে ২-৩ সেকেন্ড কম। সময় ও দ্বরত্বের সঠিক হিসাব করলে বোঝা যাবে যে জিম রিয়ান মাইকেল জাজির বিশ্ব রেকর্ডটিকে প্রায় পনেরো গজ পেছনে ফেলে দিয়েছেন।

দৌড় শেষে, প্বরস্কার বিতরণী অন্বষ্ঠান অন্তে কে যেন জিম রিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বা হাঁট্বর সেই প্বরানো ব্যথাটা কেমন আছে? রিয়ান বল্লেন, ব্যথা রয়েছে। তবে এর চেয়ে মিষ্টি ব্যথায় আর কোনো দিন ভুগিনি! মাইলে বিশ্ব বিজয় করার আগে জিম রিয়ান কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক আসর জয় করতে পারেন নি। যেন প্রথম লাফেই একেবারে সাগর ডিঙ্গিয়ে ফেলেছেন। তবে এই তো সবে কলির সন্ধ্যে! কি আর এমন বয়স তাঁর। বছর দ্বয়েকের মধ্যে এই তর্বণ আরও যে কতো এগোবেন তা অন্বমানেরই বিষয়।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকের [...] আছে মার্কিন তর্বণদের কৃতিত্বে [...] আঁচড়। যে দেশে বছর বছর গন্ডাখানে[...] অ্যাথলিট বিশ্ব-রেকর্ড গড়েন আর [...] সেই দেশে রেকর্ড স্বষ্টিকারীদের নি[...] বড় একটা মাথা ঘামান না। কিন্তু [...] রিয়ানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে বা[...] বাড়াবাড়িতে।

জিম রিয়ান মাইল দৌড়ে [...] জাজির রেকর্ড ভাঙ্গেন সেদিন এ[...] স্টেডিয়ামেই তাঁর রানিং স্ব-জোড়া [...] যায়। স্মারক সংগ্রহের সংকল্পে [...] জ্বতো জোড়া হাতিয়ে নিয়েছিল।

স্টেডিয়াম থেকে ক্যালিফোর্নি[...] বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ফেরার পথে [...] ফ্যানদের বাঁধন হারা আপ্যায়ন। এড়াতে রিয়ানকে আবার সেই আ[...] দ্রুতলয়ে রাজপথ দিয়ে ছ্বটতে ছ্বটতে ছ্বটতে সাততলা সিঁ[...] ওপরে উঠে ঘরে খিল আঁটার প[...] স্বস্তি। নতুন মার্কিন অন্বরাগী[...] আপ্যায়নের ধরণও যেন অন্যরকম [...] চাপড়ানিতে বা স্বাক্ষর পেয়েই তা[...] নয়। তদের চাহিদা আরও বেশি [...] জামা, ট্র্যাক স্যুট, যে যা পারে [...] টানাটানি করে। ও'দের জ্বালায় [...] ধারেই নিরাবরণ সাজতে হবে না[...] জন্বালা!

সংবাদপত্রের আর টেলিভিশনে[...] নির্মিরাও রিয়ানকে ছাড়েন নি[...] জ্বলাইয়ের পর থেকে প্রায় প্রতিদি[...] কোনো না কোনো সাংবাদিক বা টে[...] সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে আলোচনা [...] হয়েছে। সব আলোচনাই সেই [...] ঘিরে, আরও কতো কম সময়ে এ[...] দৌড়তে চান? কি আপনার প[...] এবং সব প্রশ্নের জবাবই জিম [...] কথায় সেরে দেন। দেখা যাক, উঠতে পারি!

এর বেশি কিছ্বই রিয়ান ব[...] আত্মপ্রত্যয় অট্বট থাকলেও তি[...] আত্মম্ভরিতার প্রশ্রয় দিতে রাজী ন[...] ভাষী রিয়ান তাই রীতিমতো [...] মাঝারি পাল্লার দৌড়ে তাঁর সম্ভাব[...] শেষ নেই, তেমনি কমতি নেই [...] প্রিয়তায়। মার্কিন ম্বল্বকে আ[...] স্বীকৃত পয়লা নম্বর স্পোর্টসম্যান

খেলাধূলা

দর্শক

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

পাতিয়ালায় আয়োজিত ২৩তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা বিভাগে দিল্লী, বালক ও বালিকা বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বাংলা দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। গত বছর পাকিস্থানের ভারত আক্রমণের দরুণ দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্ভিসেস দল এই জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে দল শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। গত বছরের প্রতিযোগিতায় বাংলা দল পুরুষ বিভাগে ২য়, মহিলা বিভাগে ৪র্থ এবং বালক ও বালিকা বিভাগে ১ম স্থান পেয়েছিল। এ বছরের প্রতিযোগিতার ঐসব বিভাগেও বাংলা দল গত বছরের অনুরূপ স্থান লাভ করেছে। এ বছরের চারদিনের অনুষ্ঠানে মোট ১১টি জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে—মহিলা বিভাগে ৫টি, বালক বিভাগে ৪টি এবং ১টি করে পুরুষ ও বালিকা বিভাগে। মহিলা বিভাগের পাঁচটি অনুষ্ঠানে যোগদান করে রাজস্থানের কুমারী রিমা দত্ত পাঁচটিতেই প্রথম স্থান এবং সেই সঙ্গে নূতন জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন—জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয়।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১৫৮ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিম বাংলা (৫৮), ৩য় রেলওয়ে (৫৪), ৪র্থ উত্তর প্রদেশ (২৯), ৫ম মহারাষ্ট্র (২৫), ৬ষ্ঠ পাঞ্জাব (১৯) এবং ৭ম দিল্লী (১২)।

বালক বিভাগ : ১ম বাংলা (৬৩) এবং ২য় দিল্লী (৪০)।

বালিকা বিভাগ : ১ম বাংলা (৩৬), ২য় দিল্লী (৩১) এবং ৩য় মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব (১৪ পয়েন্ট করে)।

মহিলা বিভাগ : ১ম দিল্লী (৩৬), ২য় রাজস্থান (৩৫), ৩য় মহারাষ্ট্র (৩২) এবং ৪র্থ বাংলা (৩১)।

নতুন রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

১০০ **মিটার বাটারফ্লাই :** থাম সিং (সার্ভিসেস), **সময়—২ মিঃ** ৪৩·২ সেঃ (হিট), **সময়—২ মিঃ ৪২·৮** সেঃ (ফাইনাল)।

রিমা দত্ত (রাজস্থান)

বালক বিভাগ

১০০ **মিটার বাটারফ্লাই :** রাজীব সাহা (বাংলা), সময়—১ মিঃ ১৭·১ সেঃ (হিট), সময়—১ মিঃ ১৬·৭ সেঃ (ফাইনাল)।

১০০ **মিটার ব্যাকস্ট্রোক :** সুশীল ঘোষ (বাংলা), সময়—১ মিঃ ১৮·২ সেঃ।

১০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক :** প্রীতিপদ সমাদ্দার (বাংলা), সময়—১ মিঃ ২৪·৬ সেঃ।

মহিলা বিভাগ

১০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক :** রীমা দত্ত (রাজস্থান), সময় ১ মিঃ ৩৩·৪ সেঃ।

২০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল :** রীমা দত্ত, সময়—২ মিঃ ৩৮·৭ সেঃ।

১০০ **মিটার ব্যাকস্ট্রোক :** রীমা দত্ত, সময়—১ মিঃ ৩১·৬ সেঃ।

১০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল :** রীমা দত্ত, সময়—১ মিঃ ১১·৫ সেঃ।

৪০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল :** রীমা দত্ত, সময় ৫ মিঃ ৪৩·৮ সেঃ।

সর্বভারতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

জলন্ধরে আয়োজিত এবার সর্বভারতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে উত্তর প্রদেশ পুলিশ দল মহিলা বিভাগে বাংলা এবং বালক বিভাগে উত্তরপ্রদেশ দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম উত্তর প্রদেশ পুলিশ (৫১ পয়েন্ট), ২য় পাঞ্জাব পুলিশ (২৩) এবং ৩য় বাংলা (১৬)।

বালক বিভাগ : ১ম উত্তরপ্রদেশ (৫১ পয়েন্ট), ২য় কপুরতলা সৈনিক স্কুল (১৪) এবং ৩য় জলন্ধর (৬)।

মহিলা বিভাগ : ১ম বাংলা (২৪ পয়েন্ট)

২০০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড

ফ্রান্সের প্রখ্যাত বিশ্ব রেকর্ডস্রষ্টা মাইকেল জাজি খেলাধূলোর আসর থেকে অবসর নেওয়ার প্রাক্কালে ২০০০ মিটার দৌড়ের দূরত্ব ৪ মিনিট ৫৬·১০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব বিশ্ব রেকর্ড ছিল—পশ্চিম জার্মানীর হ্যারল্ড নোরপাথের—৪ মিনিট ৫৭·৮ সেকেণ্ড।

ভারতের নিউজিল্যান্ড সফর

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের এক ঘোষণায় প্রকাশ, আগামী ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দল নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে—ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই প্রথম নিউজিল্যান্ড সফর। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল দু'বার ভারতবর্ষে সরকারীভাবে সফর করে গেছে (১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬৫)। এই দু'বারের সফরেই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল সরকারী টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের কাছে পরাজিত হয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ২—০ খেলায় (ড্র ৩) এবং ১৯৬৫ সালে ১—০ খেলায় (ড্র ৩) নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়। ভারতবর্ষ-নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ৯, ভারতবর্ষের জয় ৩, নিউজিল্যান্ডের জয় ০ এবং ড্র ৬।

ভারত-সিংহল দ্বৈত সন্তরণ

দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের সন্তরণ পুলে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের দ্বৈত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ বিপুল পয়েন্টের ব্যবধানে সিংহলকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনের ১২টি অনুষ্ঠানের ফাইনালে ভারতবর্ষ ১১টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। সিংহল মাত্র মহিলাদের ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে প্রথম স্থান পায়। প্রথমদিনে ভারতবর্ষ ৫১—২১ পয়েণ্টে অগ্রগামী ছিল। রাজস্থানের ষোল বছরের কুমারী রিমা দত্ত চারটি অনুষ্ঠানে (৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১০০ মিটার চিৎ সাঁতার, ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক ও ৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে) যোগদান করে চারটিতেই স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ দিনের ১৩টি অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ১২টি এবং সিংহল মাত্র ১টি স্বর্ণপদক জয় করে। ফলে প্রতি-

শাস্ত্রী স্মৃতি ফুটবল ট্রফি বিজয়ী কলকাতার রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন দল। বারানসীতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতার রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন দল ২—১ গোলে সেকেন্দ্রাবাদের ই এম ই সেন্টার দলকে পরাজিত করে।

যোগিতার মোট ২৫টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ভারতবর্ষের ২৩ এবং সিংহলের ২। উভয় দেশের এই প্রথম সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ১২০—৪৪ পয়েন্টে সিংহলকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের মোট ১২০ পয়েন্টে পুরুষদের সংগৃহীত ৯০ পয়েন্ট এবং মহিলাদের ৩০ পয়েন্ট ছিল। সিংহলের পুরুষরা ১৯ এবং মহিলারা ২৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন।

রিমা দত্ত শেষ দিনের দুটি অনুষ্ঠানে (১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) স্বর্ণ-পদক পান। ফলে তিনি মোট ৬টি স্বর্ণ-পদক জয়ের সূত্রে প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেন।

বৃটেনের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট

১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ বৃটিশ এ্যাথলীট নির্বাচনপর্বে পুরুষ বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন লিন ডেভিস। গত ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ডেভিস লং-জাম্পে স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৬৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং ইউরোপীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় তিনি শীর্ষস্থান লাভ করেন।

মহিলা বিভাগে বছরের (১৯৬৬) শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীটের সম্মান পেয়েছেন শ্রীমতী পাম পিয়েসি। ৮৮০ গজ দৌড়ে ইনি বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণ কলিকাতা ৫-০ গোলে হুগলী জেলা দলকে পরাজিত করে রেঞ্জার্স জুবলী কাপ জয়ী হয়েছে। বিজয়ী দলের পক্ষে সুভাষ ভৌমিক হ্যাট-ট্রিক করেন এবং প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে ভেটারেন্স ক্লাব প্রদত্ত 'বাদল ভৌমিক' ট্রফি পান।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতা

দিল্লীর সর্বভারতীয় দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতায় এ বছরে মোট ২৭টি দল যোগদানের জন্যে নাম দিয়েছিল। এদের মধ্যে দিল্লীর স্থানীয় দল ছিল ৯টি এবং বাইরের ১৮টি। সরাসরি দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে খেলবার সম্মান লাভ করেছিল এই চারটি দল : গত বছরের বিজয়ী অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ (হায়দরাবাদ), রানার্স-আপ সেণ্ট্রাল পুলিশ লাইন্স (হায়দরাবাদ), কলকাতার ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ২য় রাউন্ডে গত বছরের রানার্স-আপ সেণ্ট্রাল পুলিশ লাইন্স দল তাদের প্রথম খেলাতেই ১—৪ গোলে জলন্ধরের পুলিশ দলের কাছে হেরে যায়। গত ডি সি এম ফুটবল ট্রফি বিজয়ী অন্ধ্র পুলিশ দল (হায়দরাবাদ), ইস্ট (কলকাতা) এবং মহমেডান স্পোর্টিং (কলকাতা) কোয়ার্টার ফাইনাল বিদায় নিলে খেলার আকর্ষণ অনে যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে অ পুলিশ ০—০ ও ২—৪ গোলে ক্লাব (জলন্ধর), ইস্টবেঙ্গল ০—০ ও গোলে শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার এবং মহমেডান স্পোর্টিং দল ০—১ রাজস্থান আর্মড কনস্টেবুলারী (বিকানীর) কাছে পরাজিত হয়। এ সেমি-ফাইনালে লীডার্স ক্লাব ২—১ ও ৩—২ গোলে রাজস্থান কনস্টেবুলারী দলকে পরাজিত ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে পুলিশ (জলন্ধর) বনাম শিখ রেজি সেণ্টার দলের সেমি-ফাইনাল ১—১ ও ০—০ গোলে ড্র যায় পর্যন্ত টসে জয়ী হয়ে পাঞ্জাব পু ফাইনালে উঠেছিল।

লীডার্স ক্লাব বনাম পাঞ্জাব দলের নির্দিষ্ট দিনের ফাইনাল (১৬ই অক্টোবর) জয়-পরাজয়ের হয় নি, খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায়

মাতাহারি

রাখী ঘোষ
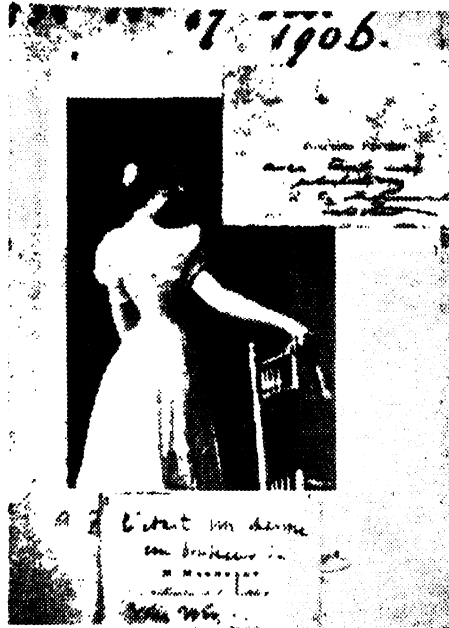
গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে মাতাহারির নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকার কারণ হল মাতাহারি শুধুই সুন্দরী গুপ্তচর ছিলেন না, সেসময়ের প্রসিদ্ধ নর্তকী হিসাবেও সাড়া জাগিয়েছিলেন। শুধু নর্তকী হলে মাতাহারির নাম ইংরাজী ভাষায় প্রবচন হয়ে দাঁড়াত না। আবার কেবলমাত্র গুপ্তচর হলে অনেক নামের ভিড়ে মাতাহারির নাম হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। মাতাহারির জীবনে দুই স্মরণীয় অধ্যায়। এক অধ্যায়ে তিনি স্বনামধন্যা নর্তকী, অপর অধ্যায়ে তিনি গুপ্তচর। মাত্র চারটি বছরের মধ্যে তাঁর জীবনে ঘটনাচক্রের এই ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিয়েছিল।

মাতাহারির আসল নাম মার্গারিটা গ্রিট্রিডা। সংক্ষেপে গ্রীট। মার্গারিটা অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত নামকরণ পছন্দ করতেন না। আড়ম্বর ও আধিক্যের দিকে ছোটবেলা থেকেই তাঁর ঝোঁক। সুতরাং বন্ধু-বান্ধবরা রফা করেছিল তাঁকে মগ্রীট বলে ডেকে। এই দরবারী আদব-কায়দা ও চালচলনের প্রতি অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন পিতা অ্যাডাম সেলোর কাছ থেকে। হল্যাণ্ডের ছোট শহর লিউওয়ার্ডেনে ১৮৭৬ সালে মার্গারিটার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তাঁর পরে আরও তিনটি ভাই। অ্যাডাম সেলোর একটি টুপীর দোকান ছিল। সমাজের উঁচুতলায় ওঠবার জন্য তাঁর অবিরাম চেষ্টা দেখে লিউওয়ার্ডেনের লোকেরা তাঁর নাম দিয়েছিল ব্যারন। মার্গারিটা অবশ্য পিতার এই নতুন নামকরণকে ভবিষ্যতে কাজে লাগিয়েছিলেন। লাইডেনে ছাত্রাবস্থায় তিনি সমপাঠীদের বলে দিলেন তাঁর মা একজন ব্যারোনেস। সত্যিই তো! ব্যারনের স্ত্রীর ব্যারোনেস না হয়ে উপায় কি?

অ্যাডাম সেলো সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ব্যবসায় ভাল আয় হওয়াতে তিনি শীগগীরই শহরের একটি অন্যতম ভাল বাড়ী কিনলেন। তবে তিনি এবং মার্গারিটা দুজনের কেউই এই বাড়ীর মালিকানা পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। মার্গারিটা পরবর্তী জীবনে নিজের শৈশবজীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বহু অলীক উপন্যাস রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হল নিজেকে কামিংহা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা। কামিংহা প্রাসাদ মার্গারিটার বাড়ীর খুব কাছে হলেও সেখানে তাঁর যাবার সুযোগ হয় নি। অবশ্য এ হল মার্গারিটার উর্বর কল্পনাশক্তির একটি সামান্য উদাহরণ। নইলে তিনি নিজেকে ভারতীয় জাভানিস বলে পরিচয় দিয়েছেন কেন?

অ্যাডাম ছিলেন খুব ফিটফাট কেতাদুরস্ত মানুষ। ছেলে মেয়েদেরও করে তুলেছিলেন তাই। তবে মার্গারিটার ওপরই বোধহয় এই প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছিল। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ অ্যাডাম সেলো মেয়েকে এক অদ্ভুত উপহার দিয়ে বসলেন। দেখা গেল মার্গারিটা এক অদ্ভুত রথে করে স্কুলে আসছেন। গাড়ীটির বৈশিষ্ট্য হল দুই শিংওয়ালা ছাগলে সে গাড়ী টানছে। মার্গারিটার পোষাক-পরিচ্ছদও ছিল জমকালো। এ সব যে শুধু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত তাই নয়, হিংসার উদ্রেকও করত।

অ্যাডাম সেলোর ভাগ্যাকাশে মেঘ দেখা দিল। ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি দেউলিয়া হয়ে গেলেন। ভাগ্যান্বেষণে অ্যাডাম গেলেন দি হেগে। মার্গারিটা মা ভাইদের সঙ্গে এক সাধারণ ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন। পারিবারিক ভাঙন দেখা দিল। শীগগীরই অ্যাডাম ও তাঁর স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল। এই ঘটনার অল্প পরেই মার্গারিটার মা মারা যান।

দুই ভাই আমস্টারডামে বাবার কাছে থাকতে গেল। অন্য এক ভাই গেল মামাদের কাছে। মার্গারিটা তখনকার মত আশ্রয় পেলেন তাঁর ধর্মপিতার কাছে। ধর্মপিতা মিঃ ভিসার মার্গারিটাকে লাইডেনে নব প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। লিউয়ার্ডেনে বন্ধুবান্ধবরা এ সংবাদে অবাক হল। মার্গারিটা শেষ পর্যন্ত বাচ্চাদের পড়াবে? আর যার সম্পর্কেই হোক মার্গারিটা বাকী জীবনটা হল্যাণ্ডের কোন নিরিবিলি স্কুলে বাচ্চাদের পড়িয়ে কাটাবেন এ তারা ভাবতেই পারত না। এ সংবাদ শুনে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো এ কাজ হল একজন আটপৌরে মেয়ের যার মধ্যে বেশ "মা মা" ভাব আছে। মার্গারিটাকে কি এ কাজ মানায়? সে হল একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ মার্গারিটার প্রেমে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না। কিন্তু তার আগেই মার্গারিটাকে লাইডেন ছেড়ে চলে যেতে হল। এবার তিনি গেলেন দি হেগে—তাঁর এক কাকার কাছে।

মার্গারিটার বয়স তখন সতেরো। তখনকার কালের হাওয়া সাংঘাতিক রোমান্টিক। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ থেকে প্রচুর সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকরা দি হেগে ছুটি কাটাতে আসতেন। অল্পদূরে সমুদ্রতীরেও প্রচুর সেনাবাহিনীর লোকেদের সাক্ষাৎকার মিলতো। বহু মেয়েদের কাছেই সামরিক পুরুষের একটা নিজস্ব আবেদন আছে। কিশোরী মার্গারেটও এই সামরিক পোষাকের প্রেমে [illegible]। সামরিক

পোষাকের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতেও তিনি বলে গেছেন, "আমি সৈনিকদের ভালবাসি।"

এই সময়েই মার্গারিটার জীবনে রুডলফ ম্যাকলিয়ডের প্রবেশ ঘটলো। সতেরো বৎসর ডাচ উপনিবেশে কাটিয়ে অসুস্থতার জন্য দুই বৎসরের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। কেশবিরল মস্তক। একজোড়া পাকানো গোঁফ। কাঠখোট্টা চালচলন। ম্যাকলিয়ডের পূর্বপুরুষ ছিলেন স্কটিশ। কিন্তু তারপর বংশানুক্রমে ম্যাকলিয়ডরা হল্যান্ডেই বসবাস করেছেন। সকলেরই পেশা ছিল সৈনিকবৃত্তি। ম্যাকলিয়ডের এক কাকা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ামের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর এবং তাঁর ছেলে ছিলেন একজন ভাইস এডমিরাল। রুডলফের মা দরিদ্র হলেও অভিজাত বংশ থেকে এসেছিলেন। সুতরাং বংশ গৌরবে , মার্গারিটার থেকে রুডলফেরই গর্ব করার কথা এবং হয়তো রুডলফের দিকে আকৃষ্ট হবার মূলে মার্গারিটার মনে এ দিকটাও রেখাপাত করেছিল।

যাই হোক এই দুই অসম চরিত্রের নরনারীর যখন দেখা হল তখন মার্গারিটার বয়স সতেরো—রুডলফের বয়স আটত্রিশ।

সতেরো বৎসর একাদিক্রমে জাভা ও সুমাত্রার অরণ্যে যুদ্ধ করার খেসারত স্বরূপ তখন তিনি ডাইবিটাস ও বাত ব্যাধিতে ভুগছেন। শরীর আর বইছে না বলেই তাঁকে বাধ্য হয়ে ছুটি নিতে হয়েছে। একুশ বছর বয়সে সকলের নিষেধ অমান্য করে তিনি দূরপ্রাচ্যে পাড়ি দেন। পরবর্তী জীবনেও তিনি এই সাফল্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও পদক তিনি অর্জন করেছিলেন।

মার্গারিটার সঙ্গে তাঁর যেভাবে যোগাযোগ ঘটে সেও এক আশ্চর্য ঘটনা। যখন তিনি আমস্টারডামে তখন বালিতে এক সংঘর্ষ বাঁধলো। ডাচ সাংবাদিকেরা বিস্তারিত ঘটনা জানবার জন্য ব্যগ্র; কিন্তু ডাচ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ভেদ করে সংবাদ পৌঁছচ্ছে না। এই সময় আমস্টারডামের একটি পত্রিকা দি নিউজ অব দি ডের একজন সাংবাদিক আরও খবর জানবার জন্য পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রত্যাগত সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে এভাবেই তাঁর যোগাযোগ হয় এবং দুজনে ক্রমশঃ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। একদিন একটি কাফেতে কফি খেতে খেতে সাংবাদিক লক্ষ্য করলেন ম্যাকলিয়ড কেমন যেন মনমরা। বন্ধুজনোচিত ঠাট্টাতামাশায় তিনি জানালেন ম্যাকলিয়ডের বিয়ে করা দরকার। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন "পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রত্যাগত সামরিক অফিসার ভাল মেয়ের সন্ধান করছেন। উদ্দেশ্য বিবাহ।"

সাধারণতঃ যেসব সৈন্যরা উপনিবেশে বহাল হত, তারা প্রায় সকলেই অবিবাহিত। পাঁচ ছয় বছর পরে যখন তারা ছুটিতে দেশে ফিরত, নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা হালকা করার জন্য সকলেই প্রায় বিবাহের চেষ্টা করত। এমনও হয়েছে যে ছুটি ফুরিয়ে আসার জন্য পাত্রকে কার্যস্থলে ফিরে যেতে হয়েছে। পাত্রী একা একাই চার্চে পাত্রের উদ্দেশ্যে বিবাহ সম্পন্ন করে (প্রক্সি ম্যারেজ) তারপর পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে রওনা হচ্ছেন। অনেকটা কলাগাছকে কন্যা সম্প্রদানের মত ব্যাপার আর কি। যাই হোক ম্যাকলিয়ডের পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের উত্তরে বেশ কিছু উত্তর এল। এর মধ্যে অনেক ধনী তনয়াও ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিজের জীবনযাত্রায় উৎসাহিত হবার কিছু ছিল না। অনেক সময়ই বিবাহ করার পরও সৈনিকদের বেতন বাড়ান হত না এবং অর্থকৃচ্ছ্রতা ও কঠোর জীবনযাত্রা বিবাহিত জীবনের সব মাধুর্য শুষে নিত। তবু এত চিঠি আসার একটাই কারণ হতে পারে সে হল বীরপূজার ঐতিহ্য অর্থাৎ সামরিক পুরুষের দিকে আকর্ষণ বা কৌতূহল। যাই হোক মার্গারিটার চিঠি এল কিছু দেরী

মার্গারিটার স্বামী ম্যাকলিয়ড ও কন্যা নন

করে। সাংবাদিক বন্ধুর অনুপস্থিতিতে ম্যাকলিয়ড চিঠি খুললেন। মার্গারিটা বুদ্ধি করে নিজের একখানা ফটো পাঠিয়েছিলেন। উনিশ বছরের মার্গারিটা তখন সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। রুডলফ মুগ্ধ হলেন এবং তাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু হল। সব ঠিক করেও চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার একেবারে বন্ধ রাখতে হল। কারণ পাত্র হঠাৎ বাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। হঠাৎ সেরে উঠলেন দুজনের প্রথম দেখা হল। দুজনের জীবনেই একটি চরম মুহূর্ত। রুডলফ দেখলেন দুটি ঘন পল্লবঘেরা গভীর কৃষ্ণচক্ষু আর অন্ধকারের মত একরাশ চুল। মার্গারিটা দেখলেন সবল সুপ্রতিষ্ঠ সৈনিকপুরুষ। দুজনেরই ভাল লেগেছিল নিশ্চয়ই। কারণ এর ছ'দিন পরেই তারা পরস্পরের নিকট বাগ্দান করেন। এর তিন মাসের মধ্যে তাদের বিবাহ হয়। বহু গুজবের মত মাতাহারি সম্পর্কে এ কাহিনীও পল্লবিত হয়ে ওঠে যে সন্তান সম্ভাবনার জন্যই ম্যাকলিয়ড ও মার্গারিটা বিবাহ করতে বাধ্য হন। তাঁদের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কিন্তু মার্গারিটার প্রথম সন্তান বিয়ের দেড় বছর পরে জন্মায়। সুতরাং এ ভিত্তি নেই। তবে খুব তাড়া তারা ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়ে মার্গারিটার জনকে লেখা চিঠিতে বোঝা যায়।

জন রুডলফের পরিবারে খু না উঠলেও এই বিবাহে তা উৎসাহও ছিল না। জনের দিনও নিষেধ করেছিলেন। মার্গারিটা প্রথমে নিজেকে অনাথ চয় দিলেও পরে বলতে বাধ্য হলে পিতা জীবিত। বিবাহ অনুষ্ঠা সেলোর উপস্থিতি আইনের দি প্রয়োজনীয়। কারণ মার্গারিটা নাবালিকা। পিতার সম্মতি ছাড় বিয়ে করতে পারেন না। এই ন জন কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন ভবে অ্যাডাম সেলো দাবী জানা জামাতাকে তাঁর কাছে সম্মা আসতে হবে এবং সাধারণ ঘোড়া এলে হবে না। কন্যা জামাতা গাড়ীতে আসে। তাই হল। মানুষে অনেক কিছুই করে জুড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে শ্বশুরের করতে গেলেন। অ্যাডাম সে থাকতেন শহরের এক দরিদ্র সেখানকার অধিবাসীরা নিশ্চয়ই চমকিয়ে গিয়েছিল । যাই হোক উপস্থিতি প্রয়োজন বলে তাঁ হল। নির্দিষ্ট দিনে অ্যাডাম তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা রাস্তায় দাঁড়াল এবং মহোল্লাসে চীৎকার দম্পতিকে সম্বর্ধনা জানাল। স্ত্রীকে নিয়ে কোনমতে সরে পড় লোকে বলে জামাতা শ্বশুরকে অন্য পথে নিয়ে যে দিয়েছিলেন।

মধুযামিনী যাপনের জন্য উইসবাডেনে গেলেন। উইসবাডে সমুদ্রতীর। এখানেই বোধহয় পেলেন ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন হবে।

ভ্রমণার্থীর চিরকালের আকা উইসবাডেন। অপূর্ব সুন্দরী দেখে যুবকরা বিশেষতঃ তরু ভিড় জমাত। স্বামীজনোচিত ম মালিকানার সঙ্গে জন তাদের বলতেন 'ভদ্রমহোদয়গণ! এই আমারই স্ত্রী।' এবং বলে আ না। মার্গারিটার হাত ধরে করতেন।

মধুচন্দ্রিমার অবসানে জ স্ত্রীকে নিয়ে এক বোনের কাছে কারণটা ছিল অর্থনৈতিক। বে থাকলে আর্থিক দিক দিয়ে হয় কিছুটা সুরাহা হত। কিন্তু ঘটা থেকেই ননদ ভাজে বনিবনা হল তাদের অন্যত্র উঠে যেতে হল। দিনে সৈন্যদের মাইনে ছিল তার ওপর পূর্বরাগ, বিবাহ যামিনীতে বেশ কিছু খরচ হয়ে সুতরাং আর্থিক অস্বাচ্ছল্য দে

...ঃ জন ও মার্গারিটার বিবাহিত জীবনে ... আর্থিক অনটন কোনদিনই ঘোচে নি। ... বাহুল্য দাম্পত্যজীবনে এর প্রভাব ... হয় নি। জন চেষ্টা চরিত্র করে ছুটি ...লেন। হল্যাণ্ডে থাকাকালে মার্গারিটার ...বনে স্মরণীয় মুহূর্ত হল রানীমাতা ...র এক পার্টিতে উপস্থিত হতে পারা। ...র হরিদ্রা বর্ণের পোষাকে, কৃষ্ণকুন্তল ... শ্যামাঙ্গী (মার্গারিটার গায়ের রং ...শের মানে চাপা) মেয়েটিই ছিলেন ...দিনের মুখ্য আকর্ষণ।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই দুজনের ...কে চিড় ধরলো। বন্ধু-বান্ধবরা অনু-... করলেন এ মিলন স্থায়ী হবে না। ... ম্যাকলিয়েডের চালচলন কথাবার্তা ...কালই ছিল কাটখোট্টা। দীর্ঘ দিন উপ-...বেশে সৈন্যদের খবরদারী করে করে ...ণী বধূর মনের খবর নেওয়ার কথা ...ই গিয়েছিলেন। বিয়ের পরই মার্গা-... অনুভব করলেন যে নববিবাহের ...াগু ও অনুভূতি এরই মধ্যে ফুরিয়ে ...ছে। স্বামী তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে-...।

বন্ধু-বান্ধবদের সকলেই একবাক্যে ...রিটাকে সহানুভূতি জানিয়েছেন। ...লবই মনে হয়েছে মার্গারিটা অনাদৃতা ... অবহেলিতা। ম্যাকলিয়েডের ব্যবহার ...বাহিত স্বামীর স্নেহময় ব্যবহার নয় ... কথাবার্তা অত্যন্ত কর্কশ ও রূঢ়। ...টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এক বন্ধুর ...না থেকে। পারিবারিক জীবনে বঞ্চিত ... অষ্টাদশ বর্ষ জন নারীসংসর্গ বর্জন

প্যারিসে নিজের বাড়ীর উদ্যানে সসম্প্রদায় ভারতীয় শিল্পী এনায়েৎ খান ও মাতাহারি। নৃত্যটির নাম চন্দ্রানৃত্য

করে কাটিয়েছেন একথা আশা করা অন্যায়। তেমনি বিয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে ফেলে স্বামী অন্য মেয়ের পিছনে ছুটছেন এও প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু জন তাই করেছিলেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বন্ধুটিকে তিনি বললেন মার্গারিটা একলা থাকবেন। সেই সন্ধ্যায় বন্ধুটি যেন তাঁকে সঙ্গ দেন। ব্যাপারটা খোলসা করবার জন্য তিনি জনালেন সেই সন্ধ্যায় তাঁর দু' দুটি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা। অতএব বাড়ী ফিরতে দেরী হবে তাঁর। বন্ধুটি জনের অনুরোধ রাখ-লেন। রাত করে বাড়ী ফিরে জন মার্গা-রিটাকে বোঝালেন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে তাঁর দেরী হয়ে গেল! ইতিমধ্যে মার্গা-রিটার সন্তানসম্ভাবনা দেখা দিল। অতএব জনের ছুটি বাড়ানো হল। ১৮৯৭ সালের তিরিশে জানুয়ারী মার্গারিটার একটি ছেলে হল। ছেলের নাম রাখা হল নর্মান জন ম্যাকলিয়ড। এই বছরেই মে মাসে জন স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে রওনা হলেন। এই যাত্রায় মার্গারিটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। নতুন দেশ, নতুন মানুষ দেখবার আনন্দে ও উৎসাহে হয়তো এই যাত্রাকে তাঁর মনে হয়েছিল অভিযান। মার্গারিটার বয়স তখন কুড়ি। জন ম্যাকলিয়েডের বয়স তখন একচল্লিশ। নতুন দেশে ঘর পাতবার পক্ষে দুজনের বয়সের এই বিরাট ব্যবধান

স্যালোমের রূপসজ্জায় মাতাহারি। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে রোমে প্রিন্স ফাউস্টিনোর বাড়ীতে এই নাচ প্রদর্শিত হয়।

খুব অনুকূল নয় বিশেষ করে পৃথিবীর এমন এক প্রান্তে যেখানে শ্বেতাঙ্গিনীরা দুর্লভ্যা বিশেষতঃ সুন্দরী শ্বেতরমণী যেখানে দুষ্প্রাপ্য।

প্রথমে একটি ছোট গ্রামে এবং পরে অপেক্ষাকৃত বড় ও ইউরোপীয় অধ্যুষিত গ্রামে তারা উঠে এলেন। সাংসারিক জীবনে অশান্তি বাড়লো বই কমলো না। এমনই সময় জন ম্যাকলিয়ড মালাক্কা প্রণালীর অপর দিকে মেডানে বদলি হলেন। জনের বদলির খবর মার্গারিটার কাছে সুসংবাদ। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও স্বামীকে একান্তে পেয়ে তিনি বেঁচে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়ের নাম হল নন্। খুব কম সময়ের নোটিশে বদলি হবার জন্য জন পরিবারকে স্থানীয় শাসনকর্তার জিম্মা করে দিয়ে চলে গেলেন। সেকালে এসব উপনিবেশে আতিথেয়তা ছিল অকুণ্ঠ ও উদার। সুতরাং স্থানীয় শাসনকর্তার বাড়ীতে মার্গারিটা পুত্রকন্যাসহ থাকতে পেলেন। এছাড়াও আসবাবপত্র বিক্রয় ব্যাপারে তদারক করার জন্যও মার্গারিটার তখন সেখানে থাকা দরকার। জনের চিঠিপত্র হয়ে দাঁড়াল অনিয়মিত। যদিও প্রতিটি চিঠির নকল রাখতে তিনি ভুলতেন না। চিঠি যতই দীর্ঘ হক না কেন প্রতিটি চিঠির হাতে লেখা নকল রাখা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। যাই হোক চিঠিতে মেডানের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা একটি তরুণী মেয়ের পক্ষে খুব আশাপ্রদ নয়। তিনি লিখছেন, 'এখানে সাংঘাতিক পোকামাকড়ের উৎপাত। বিষাক্ত বিছে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং তোমাকে খুবই সাবধান হতে হবে। প্রতিদিন তোমাকে ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে হবে, ছেলেমেয়েদের বিছানা ফুলের টব ইত্যাদি উল্টে-পাল্টে দেখতে হবে' ইত্যাদি। আর একটি চিঠিতে মার্গারিটা সম্পর্কে সদাসতর্ক ও ঈর্ষান্বিত মনের পরিচয় মেলে। জন লিখছেন, 'যে লেফটেন্যান্ট ছেলেমেয়েদের ছবি তুলেছেন সে লোকটি কে? ওখানেই বা সে কি করে গেল? একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল যে তুমি কোনদিনই এ ধরনের ব্যাপার খুলে লেখো না। অথচ তোমার বোঝা উচিত যে চিঠি পড়ে অবধি আমি ক্রমাগত চিন্তা করে চলেছি কে এ লোকটি? কি করে সে ওখানে গেল? ছেলেমেয়েদের কথা বলতে বলতে হঠাৎ তুমি এই লেফটেনান্টের প্রসঙ্গে চলে গেছ। অথচ ভুলেও আর একবার তার নাম উল্লেখ কর নি।'

এই চিঠিতেই তিনি লিখলেন, 'আর কিছুর জন্য নয়। ছেলেমেয়েদের জন্যই আমি চিন্তিত। আমি জানি আমাদের দুজনের চরিত্র একেবারেই বিপরীত।' জনের সন্দিগ্ধতার কারণ ছিল। একে তো বয়সের দুস্তর ব্যবধান। তার ওপর মার্গারিটা দিন দিন সুন্দর হয়ে উঠছিলেন। অবিবাহিত সৈন্যদের তো কথাই নেই বিবাহিত পুরুষরাও মার্গারিটার সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য উৎসুক ছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত জন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মেডানে আসার ব্যবস্থা করলেন। এখানে জন পেলেন কম্যান্ডারের পদ। নতুন পদমর্যাদার সঙ্গে নতুন দায়িত্ব যুক্ত হল। বহু অনুষ্ঠানে ডাচ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবার জন্য জন ও তাঁর স্ত্রীকে আপ্যায়নকারীর ভূমিকা নিতে হত। মার্গারিটা এ ধরনের আড়ম্বর চিরকালই ভালবাসতেন। তবে বেচারা জনের পক্ষে মার্গারিটার অত্যধিক আদব-কায়দা ও গর্বিত ভূমিকা শীগ্‌গীরই নতুন ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ এই সব অনুষ্ঠানে মার্গারিটা বয়সের কোন মর্যাদা দিতে চাইতেন না। ফলে বয়স্কা মহিলারা চটতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যের ব্যবধান হঠাৎ এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সাময়িকভাবেও অন্ততঃ কমলো। জন ও মার্গারিটার ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। নর্মান ও তার বোন নন্‌ দুজনের খাবারেই কে যেন বিষ মিশিয়ে দেয়। নন্‌কে কোনমতে বাঁচানো গেলেও নর্মানকে বাঁচানোর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এই ছেলেটি জনের অত্যন্ত স্নেহের ছিল। তার মৃত্যুতে জনের পিতৃহৃদয় মর্মান্তিক আঘাত পেল। কে যে এ কাজ করেছিল তা জানা যায় না। কেউ বলে শিশু দুটির পরিচারিকার প্রতি গৃহস্বামী কিছু দুর্বলতা দেখিয়েছিল। ফলে পরিচারিকার প্রেমিক এইভাবে শোধ নেয়। আর একটি গল্প হল একটি সৈন্যকে জন খুব মারধোর করেন। সেই প্রতিহিংসা নেবার জন্য এই কাজ করে। কিন্তু যাই হোক স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি শীঘ্রই মিলিয়ে গেল। জন ছেলের মৃত্যুর জন্য স্ত্রীকে দায়ী করতে লাগলেন। জন অপ্রত্যাশিতভাবে জাভায় বদলি হলেন। এর জন্য তিনি তাঁর উপরওয়ালার ওপর চটে গেলেন। তাঁর ধারণা হল ইচ্ছে করে তিনিই এই বদলির ব্যবস্থা করেছেন। জাভায় গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতীত আর কোন রাস্তা খোলা রইল না। কিন্তু দেশে না ফেরা পর্যন্ত তা সম্ভব ছিল না অন্ততঃ আর্থিক কারণেও দুজনকে একত্রে থাকতে হচ্ছিল। এর মধ্যে মার্গারিটার টাইফয়েড হল এবং জনের অনেক টাকা বেরিয়ে গেল। সামরিক জীবনের প্রতি ক্রমশঃই জন সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছিলেন। লেফটেন্যান্ট হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই দেখে তিনি অবসর নেওয়াই স্থির করলেন। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে অবসর নিলেও দীর্ঘকাল চাকরী করার জন্য তিনি পুরো বার্ধক্যভাতাই পেলেন। কিন্তু তবুও এই ভাতা ছিল যৎসামান্য। সুতরাং দেশে না ফিরে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেই তাঁরা আপাততঃ থাকলেন। এই জীবন মার্গারিটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো। তাঁর বয়স তখন কুড়ির ঘরের প্রথম দিকে। জনের লেখা চিঠিপত্র থেকেই বোঝা যায় কি নিঃসঙ্গ একঘেয়ে জীবন তখনকার দিনে সৈন্যদের সেখানে যাপন করতে হত। তার ওপর পোকামাকড়ের উপদ্রব। মার্গারিটা ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার জন্যে ব্যগ্র উঠলেন। প্রতিদিনই দুজনের ঝগড়া হত। পরবর্তীকালে অনেক বাগীশরা মার্গারিটার স্কন্ধে সব চাপিয়ে দিলেও তৎকালীন বন্ধু সকলেই জনকে এই বিয়ের ব্যর্থতা দায়ী করেছেন। এক বন্ধু যিনি দ মৌখিক আলাপে চিনতেম দুটি বর্ণনা দিয়েছেন। একটি পার্টিতে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। মার্গারি ছিলেন। জনের পাশ দিয়ে যাব মার্গারিটা তার উদ্দেশ্যে (যা পা স্বীকৃতি জানাবার ভদ্রতাস্বরূপ সং হয়ে থাকে) সম্ভাষণ জানালেন। জন বললেন 'গোল্লায় যাও কুত্তি ধরনের অত্যন্ত অপমানজনক : মার্গারিটাকে দশ জনের সামনে শুনতে হত। আর একবার একটি : প্যারিসের কথা উঠলো। মার্গারিট কথাবার্তায় যোগ দিলেন। প্যারিসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। জন উঠলেন, 'সেখানে যাবার যদি অতই আমার ঘাড় থেকে নামলেই তো আমিও বাঁচি।'' কে জানে জন মার মতো বদরাগী মানুষের সঙ্গে বিয়ে মার্গারিটা হয়তো সুগৃহিণী ও জননীই হতে পারতেন।

অবশেষে জন ম্যাকলিয়ড হল্যান্ডে রাজী হলেন। আবার সেই বোনের ওঠা হল। সেখানে যত সম্ভব জন্যে যদিও ফ্ল্যাট মিললো জন ম আর স্ত্রীকে সহ্য করতে পারছি একদিন তিনি কিছু না বলে কয়ে নিয়ে চলে গেলেন। মার্গারিটা দেখলেন ঘর খালি। তিনি করলেন এবং আদালত থেকে মঞ্জুর হল। মেয়ে মার্গারিটার রইলো ও জনকে তার খরচা দিতে দেওয়া হল। জন কোনদিনই দেননি। চাকরি-বাকরির ধাঁধায় হচ্ছিল বলে মার্গারিটা মেয়েকে জ সাময়িকভাবে পাঠালেন। জন স্বামী ভাল না হলেও স্নেহপ্রবণ পিতা। মেয়েকে আর ফেরত পাঠাননি। নানা ও আর্থিক কৃচ্ছ্রতার জন্য মা মেয়েকে আনার ব্যাপারে গরজ মেয়ে না থাকায় তাঁর ব্যক্তিগত আরও নিরঙ্কুশ হল। কোথাও কো না পেয়ে প্যারিসে যাওয়াই তিনি করলেন।

মাতাহারি

প্যারিসে প্রথমবার গিয়ে কিন্তু কোন সুবিধা করতে সপ্তাহখানেক পরেই দেশে ফিরে এবং জনের এক কাকার কাছে ওঠে এ ব্যবস্থায় বাগড়া দেওয়ায় মার্গারিটাকে আশ্রয়চ্যুত হতে হল আবার প্যারিসে যাওয়ার ঝুঁকি ১৯০৪ সালের প্যারিস এক অন্য ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্যে সে নৈতিক মান ভিন্ন। পরস্ত্রীর সঙ্গে

সেখানে নিষিদ্ধ নয় বরং সেটাই তখনকার দিনের ফ্যাশন। মার্গারিটা মডেল হতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। নাইট ক্লাবে হয়তো সুন্দরী মার্গারিটার চাকরি মিলতো। কিন্তু নেহাৎ কাজচালানো গোছের সামাজিক নাচের একটু-আধটু জানা থাকলেও নাচের আর কিছুই তিনি জানতেন না। ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলেন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে থাকতে। সেটা কাজে লাগলো। এক অশ্বারোহণ শিক্ষালয়ে চাকরি জুটলো। মালিক মসিয়ে মলিয়ার ফরাসী পুরুষ। অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখেই তিনি মন্তব্য করলেন এরকম তনুলতার সার্থকতা নাচে—ঘোড়ার খবরদারীতে নয়। মার্গারিটা যেন ভাগ্যের নির্দেশ শুনলেন। তিনি জানতেন তিনি সুন্দরী—অন্ততঃ পুরুষের মনোহারিণী। ভোগের অলকাপুরী প্যারিসের উদ্দাম জীবনে তাই-ই যথেষ্ট। জাভা সুমাত্রায় কিছু কিছু দেশীয় নাচ দেখবার সুযোগও তাঁর হয়েছে। সুতরাং কপাল ঠুকে তিনি মাদাম কারিভস্কি বলে এক মহিলার বাড়ীতে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হলেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর বিখ্যাত সাত মেখলার নাচ দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ কিংস উইকলি নামক কাগজ এর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছে, 'জনশ্রুতি এই যে প্রাচ্য থেকে এসেছেন এক অনন্যা নর্তকী। সঙ্গে করে এনেছেন রত্ন ও সুগন্ধির সম্ভার। রং ও ছন্দ।......তবে তাঁর সাত মেখলার নৃত্য ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হলেও তাতে যেন কিছু দুষ্টামির আভাস মেলে।' এরপর বেশ কয়েকটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই মার্গারিটা অবতীর্ণ হয়ে প্যারিসের রসিক জগতে সাড়া জাগালেন। তখনও তিনি মাতাহারি হননি। তাঁর নাম লেডী ম্যাকলিয়ড!

মাদাম কারিভস্কির আসরে যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মসিয় গিমে। এঁর নেশা ছিল প্রাচ্য নিদর্শন সংগ্রহ করা। নানা প্রাচ্য নিদর্শনে তার বাড়ীটি হয়ে উঠেছিল একটি যাদুঘর। সবাই মনে করত তাঁর মত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ খুব কমই আছে। মসিয়ে গিমে ঠিক করলেন এই সুযোগে তিনি বন্ধুবান্ধবদের কিছু খাঁটি ও অকৃত্রিম প্রাচ্য কলা দেখিয়ে আপ্যায়ন করবেন। সুতরাং তিনি এই প্রাচ্য নর্তকীকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কি নামে পরিচয় দেবেন তিনি এই নর্তকীর। মার্গারিটা গ্রীটুইজে ছিল? ফরাসী উচ্চারণেও এ নামের প্রাচ্যত্ব প্রমাণিত হবে না। লেডী ম্যাকলিয়ড? বড্ড বেশী ইংরিজি। অতএব একটি প্রাচ্য নাম চাই-ই। বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। মার্গারিটা নিজেই নিজের নামকরণ করলেন। মাতাহারির জন্ম হল। মাতাহারি কথাটা এসেছে মালয় থেকে। নামটির অর্থ সূর্য। কিন্তু এইবার আর মাতাহারিকে ভারতীয় নর্তকী বলে চালিয়ে দিতে কোন অসুবিধা রইল না। যদিও নামটির উৎপত্তি মালয়ে, ভারতে নয় কিন্তু তখন প্যারিসের সৌখীন এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রাচ্য সম্বন্ধে কৌতূহল ও জল্পনা থাকলেও এমন কেউ ছিলেন না যিনি ভাষাতত্ত্বের এই গভীরে যাবার যোগ্যতা রাখেন। আর তাছাড়া সে সব চিন্তা করার মত মানসিক স্থৈর্যই বা কোথায়? সুন্দরী রমণীর ললিত দেহ-বিলাসের মূর্ছনায় প্যারিস তখন আচ্ছন্ন। অসংখ্য ভক্তের লেখা চিঠির মধ্যে একখানি চিঠি পড়লেই এই আচ্ছন্নতা অনুভব করা যায়। মাতাহারির নেশা ছিল নৃত্য সম্পর্কিত সব কিছু বিজ্ঞাপন, অভিনন্দন, সমালোচনা ইত্যাদির কাটিংস জমানো। তার মধ্যে ভক্ত বা ফ্যানেদের লেখা চিঠিপত্র, আমন্ত্রণলিপি সবই স্থান পেয়েছে। এই চিঠিখানির বা কবিতাটির নাম 'শিবের উদ্দেশ্যে' বা (To Siva)। লেখক লিখছেন, 'হে শিব, হে ধ্বংসের দেবতা যখন তোমার সম্মুখে সে তার শেষ আবরণটুকুও ঘুচিয়ে দিল তখনও কি তোমার ধমনীতে সর্বগ্রাসী কামনার আগ্নেয় অনুভূতি সঞ্চারিত হয়নি? একবারও কি মনে হয়নি ঐ পুষ্পিত অধরের ওপর তুমি লুটিয়ে পড়। বক্ষলীনা হোক ঐ যৌবনপ্রাচুর্য আর ভালবাসায় অবগাহন কর তুমি।'

এইখানেই মাতাহারির সাফল্য। শিল্পের আবরণে তিনি তার সৌন্দর্য ও দেহ-সৌষ্ঠবকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আধুনিক স্ট্রীপটিজের চল তিনিই করেন। নিরাবরণ দেহ প্রদর্শনও এক চারুশিল্প হয়ে উঠতে পারে এ তিনিই প্রথম দেখালেন।

মসিয়ে গিমের বাসভবনে যেদিন প্রথম তিনি নাচ দেখান সেদিন আড়ম্বরও কিছু কম ছিল না। ভারতীয় ছাঁদে মন্দির তৈরী করা হল। তার পুষ্প সজ্জিত আট স্তম্ভের উপর পুষ্প-স্তবক। রোজের নটরাজের সামনে প্রতীক্ষমানা নর্তকী: বক্ষে তার মণি-মুক্তা খচিত কাঁচুলি। কটিদেশে রত্নমেখলা বেষ্টন করে নিম্নাঙ্গ আচ্ছাদন করেছে একটি সারং (মালয়ের মেয়েদের পোষাক) সর্বাঙ্গে অলঙ্কার। ভারতীয় রীতিতে সজ্জিত দীপমালা আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। পটভূমিতে জাভানীজ ও ভারতীয় সঙ্গীতের অনুকরণ মূর্ছনা সৃষ্টি করে চলেছে। নাচ আরম্ভ হলে অতিথি-বৃন্দ আরও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এ ধরনের নগ্ন নৃত্য তাঁরা আগে কখনও দেখেননি। দেখে হতচকিত, বিভ্রান্ত। এ পাশ্চাত্যে ছিল না। সুতরাং মাতাহারির প্রাচ্যত্ব নিয়ে আর কোন প্রশ্ন উঠলো না। রহস্যময় প্রাচ্যের বহু বিদ্যা বহু রহস্যের কথা শোনা গেছে। সুতরাং এ মোহিনী মায়াও সেখানকারই। জয় প্রাচ্য রমণীর। প্রাচ্য ও প্রাচ্য রমণীর গুণগানে মুখর হয়ে উঠলো প্যারিস। তাছাড়াও মাতাহারি সাধারণ স্ট্রীপটীজ নর্তকী ছিলেন না। পোষাকেও তাঁর দেহ সুষমা ঢাকা পড়ত না এবং নৃত্যশেষে যখন তিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন তখন তাঁরা দেখতেন মাতাহারি শুধু সুন্দরীই নন মার্জিত রুচিশীলা মহিলাও বটে।

মাতাহারিকে দেখতে লোক ভেঙে পড়ল। ভক্তদের পাঠানো পুষ্পে ও অলংকারে তার গৃহ ভরে গেল আর স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ প্রণয়ীদেরও আবির্ভাব ঘটলো।

এই সময়ই হল মাতাহারির জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় তাঁর প্রশস্তিতে শুধু প্যারিস নয় জার্মানী, ইটালী ও হল্যান্ড মুখর হয়ে উঠেছিল। ইসাডোরা ডানকান ও মাতাহারির তুলনামূলক সমালোচনায় প্যারিস মেতে উঠেছিল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি

১৯০৫ সালের একটি নৃত্যবেশ

অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভেবে আশ্চর্য লাগে যে হল্যান্ডেও এই ফাঁকি কেউ ধরতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই প্যারিসে কোন এক ভারতীয় বংশোদ্ভব ডাচ নর্তকীর খ্যাতি শুনে ডাচ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এসেছিলেন। কিন্তু লেওয়ার্ডেনের মার্গারিটার সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়নি। বরং নানা গুজবে সে কাহিনী আরও পল্লবিত হয়েছিল। মাতাহারি প্রচার কার্যের মূল নীতি জানতেন।

তিনি কখনও এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতেন না। এই হয়তো তিনি বলছেন, তিনি বারাণসীর গঙ্গা ও তার দুইকূলের মন্দিরের সঙ্গে আবাল্য পরিচিত। পরমুহূর্তে হয়তো বলেছেন, তিনি ডাচ পিতা ও জাভাদেশীয় মাতার সন্তান। জন্ম জাভায় হলেও হল্যান্ডে মানুষ। তাঁর স্বামী কখনও ইংলিশ লর্ড, কখনও ডাচ কলোনেল। স্বীয় কল্পনাশক্তির দ্বারা তখনও তিনি নিজের মাতামহীকে জাভার রাজকুমারী বলেছেন। কখনও বলেছেন, কিভাবে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে সমস্ত নিষেধের বেড়াজাল সন্তর্পণে অগ্রাহ্য করে তবে তাকে ব্রাহ্মণদের এইসব গুপ্ত-মণ্ডলীতে ঢুকতে হয়েছে, দিনের পর দিন অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ, দেবদাসীদের অলৌকিক আচার আচরণ। নিজের নাচকে তিনি সব সময়ই ব্রাহ্মণদের নাচ বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রায় সব নাচেই নগ্নতা ছিল প্রধান আকর্ষণ। ভারতীয় নাচের একটি প্রধান উপাদান হল তাল বা পায়ের কাজ। অথচ সেকালের বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে মাতাহারির নাচের আকর্ষণ ছিল মুখ্যত অভিনয় যা মুখে ও সর্ব অবয়বে এক অদ্ভুত মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেত। একে নাচ না বলে মূকে অভিনয় বলাই বোধহয় সঙ্গত। দ্রুতলয়ে কোন চলাফেরাই তিনি করতেন না। তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত নাচ দেবদাসীর নাচে যেখানে দেবদাসী নিজের লজ্জা যৌবন সৌন্দর্য ইত্যাদির প্রতীক ঘাগরাগু[...] একের পর এক খুলে ফেলে শেষে দেব[...] চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে সেখা[...] মূলতঃ অভিনয়ের রস ও লীলায়িত দেহ[...] দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। প্রথমে ঘরে[...] অনুষ্ঠানে পরে বিরাট জনমণ্ডলীর সা[...] তিনি আবির্ভূত হতে লাগলেন। দু-এক[...] সন্দিগ্ধ সুরে শোনা গেল। দেবদাসীরা সবার সামনে এভাবে নিজেকে অনাব[...] করে? এই কি ভারতীয় নাচ? কিন্তু তা[...] ক্ষীণকণ্ঠ জনতার উচ্ছ্বসিত করতালিতে চা[...] পড়ে গেল। তার ওপর মাতাহারি নিজ[...] পদ্ধতিতে এইসব সমালোচনার জবাব দি[...] লাগলেন। নগ্নতায় যে কোন লজ্জা [...] নগ্নতা হল স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রকাশ, [...] মধ্যে রয়েছে গূঢ়তথ্য ও প্রতীক ইত্যাদি প্র[...] দর্শনের অভিনবত্বে বেচারা পাশ্চাত্ত্য[...] বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। আর কে না জানে প্র[...] দর্শন হল এক বিরাট আশ্চর্য ব্যাপার!

তবে মাতাহারি নাচতে পারতেন। ক[...] পরে যখন তিনি "ল রো ড্য লাহো[...] অপেরায় সীতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন [...] নগ্নতার কোন সাহায্য না নিয়েও তিনি [...] অভিনন্দন পেয়েছিলেন। এই অপেরার গী[...] কার ম্যাসের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা বন্ধু[...] মাত্রা অতিক্রম করেছিল বলেই মনে হয়। [...] পর তিনি মন্টিকার্লো, মাদ্রিড ও ভিয়ে[...] অনুষ্ঠান প্রদর্শন করলেন। মাদ্রিডে [...] তিনি হ্রস্ব অধোবাস (টাইট) পরিধান [...] দর্শকদের মনোক্ষুণ্ণ করেছিলেন। নগ্নতার খ্যাতি এত ব্যপ্ত হয়ে পড়েছিল [...] ভিয়েনার দর্শকরা একবার এক সামা[...] অনুষ্ঠানে মাতাহারিকে পূর্ণবসনা [...] হতাশ হয়ে পড়েছিল। খবরের কাগজ[...] এই নগ্নতাকে সমর্থন করেনি। কিন্তু [...] দেখা গেল ব্যাপারটা মারাত্মক কিছু নয় [...] তারাও অভিনন্দন জানাল।

ইতিমধ্যে মার্গারিটার স্বামীর কানে [...] পৌঁছেছে। তিনি এবার পাকাপাকি [...] চাইলেন। মার্গারিটা স্বামীকে অত [...] রেহাই দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু [...] উকীল জানালেন যে জন ম্যাকলিয়[...] মার্গারিটার নগ্নচিত্র আদালতে দাখিল [...]বেন তখন তার পক্ষে বিচ্ছেদ পাওয়া [...] হবে না। যে কোন স্ত্রী বা মাতার এ ধরনের আচরণ অভাবনীয়। মাত[...] ডাচ আদালতের গোঁড়ামি জানতেন। ফ্র[...] পাশে হলেও হল্যান্ডে তখনও ছেলে[...] মেয়েরা সমুদ্রতীরে পৃথক পৃথক [...] রোদ পোহায়। সুতরাং তিনি বাধ্য [...] বিচ্ছেদে সম্মতি দিলেন। জন আবার [...] করলেও সে বিয়ে সুখের হয়নি। এরপ[...] তিনি আরেকবার বিয়ে করেন।

পিতা অ্যাডাম জিলও বসে ছিলেন [...] তিনি কন্যার জীবনচরিত লিখে ফেল[...] তাতে অবশ্য কন্যার কোন ক্ষতি হ[...] সম্ভাবনা ছিল না। কারণ পিতার কল্পন[...] কন্যার চাইতেও উর্বরা। তিনি পারিব[...] ঠিকুজীতে ডিউক রাজা রাজড়া কাউ[...] টানতে বাকী রাখলেন না। বইয়ের [...] কিছুই জন ম্যাকলিয়ডের পছন্দ হল না।

উকীল পাল্টা জবাব ছাপালেন। এই বিবাদ বিসংবাদে লাভবান হল এক ডাচ সিগ্রেট কম্পানী। বাজার গরম দেখে তারা মাতাহারি নাম দিয়ে এক সিগারেট বাজারে ছাড়লো। মাতাহারি তাঁর বিরাট প্যাপ মহলে এই সিগারেটের একটি বিজ্ঞাপন সাঁটতেও ভোলেন নি।

বার্লিনে মাতাহারির প্রেমিক হলেন ধনকুবের কিপার্ট। ইতালীয়ান রাশিয়ান এবং রুমানিয়ান সাংবাদিকরা এক বাক্যে তাঁকে প্রশংসা করলেন। পুরুষমুখো হওয়ার জন্যই বোধহয় তাঁদের উচ্ছ্বাস ও আধিক্যও অনেক বেশী হল। ভিয়েনার অনুষ্ঠান শেষ করে মাতাহারি ইজিপ্ট বেড়াতে গেলেন। ফিরে এসে শুনলেন রিচার্ড স্ট্রাউসের পরিচালনায় 'সালোমে' গীতিনাট্য অভিনীত হবে। সালোমের সাত মেখলার নাচ তাঁর চাইতে নিপুণভাবে কে নাচতে পারবে? সুতরাং তিনি স্ট্রাউসকে অনুরোধ করে চিঠি দিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক স্ট্রাউস এ অনুরোধ রক্ষা করেন নি। ইতিমধ্যে কিপার্টের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে। মাতাহারি প্যারিসে বসবাস করাই মনস্থির করলেন। উৎসাহী সাংবাদিকদের জানালেন দীর্ঘ দুই বৎসর তিনি মিশর ও ভারতের নির্জনপ্রায় নৃত্যকলা উদ্ধারে কাটিয়েছেন। শিখে এসেছেন নতুন নতুন নাচ। যদিও প্যারিসে মাতাহারি মাত্র এক বছর ছিলেন না এবং ভারতে তিনি পাও দেননি তবু এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠলো না। মাতাহারি আবার নৃত্যকে পেশা বলে বেছে নিলেন। কিন্তু যা তাকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো তা হচ্ছে প্যারিসের অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য নাইটক্লাব যেখানে মাতাহারির অনুকরণে নগ্ন নৃত্য প্রদর্শিত হচ্ছে। নগ্নতা আর মাতাহারির একচেটিয়া নয়। বহু মেয়েই নগ্নতাকে টাকা রোজগারের কাজে লাগিয়েছে। মাতাহারি অবশ্য এদের সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলেন, কটাক্ষ করলেন এদের নৃত্য-পারঙ্গমতা ও প্রাচ্যধর্মে অনভিজ্ঞতার প্রতি। কিন্তু তিনি সত্যই অন্য পন্থা খুঁজছিলেন। তার বয়স তখন তিরিশ ছুঁই ছুঁই। শরীরের বন্ধন মঞ্চে নগ্নদেহে অবতীর্ণ হবার মত অক্ষুন্ন আছে কিনা এ নিয়েও হয়তো তার মনে সংশয় এসে থাকবে। তাছাড়া টাকার অভাবও ছিল না। সুতরাং মাঝে মধ্যে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বা 'সাহায্য রজনীতে' অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া নাচ তিনি ছেড়েই দিলেন বলা চলে। ১৯১০ সালে নতুন কিছু করার সুযোগ এল। মণ্টিকার্লোতে একটি ব্যালেতে তিনি অংশ নিলেন। কিন্তু এই বছরের শেষে প্যারিস ব্যালেটি পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা করার সময় লাগলো গণ্ডগোল। মাতাহারির উদ্ধত স্বভাব ও অনিয়মিত আসা যাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষ মামলা করলেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন। মাতাহারি অবশ্য এই মামলায় জিতেছিলেন। এর প্রায় এক বছর মাতাহারি নিরুদ্দেশ। পরে জানা গেছে এই এক বছর স্বেচ্ছায় তিনি অজ্ঞাতবাস বেছে নিয়েছিলেন। কারণ হল প্রেম। প্যারিসের এক নির্জন গ্রামে এই এক বছর তিনি যেভাবে ছিলেন তাকে সুখের বা আরামের জীবন বলা চলে না। কথা বলবার একটি প্রাণী ছিল না। তাঁর প্রেমিক প্রতি শুক্রবার এসে শনি রবিবার থেকে যেতেন। বাড়ীটির মধ্যে স্নানাগার ছিল না—ভাল উত্তাপের ব্যবস্থা ছিল না। বিলাসিনী ও আড়ম্বরপ্রিয়া মাতাহারির পক্ষে এধরনের জীবনযাপন অত্যন্ত আশ্চর্যকর। একমাত্র অবসরবিনোদন ছিল ঘোড়ায় চড়া। ইতিমধ্যে সেই প্রেমিকের মা কি করে খবর পেয়ে মাতাহারির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। উদ্দেশ্য হল মাতাহারি যাতে বিবাহিত পুত্রের সাংসারিক শান্তি নষ্ট না করেন। কিন্তু দুজনেরই দুজনকে এত ভাল লাগলো যে বৃদ্ধা মহিলা মাতাহারিকে চলে যেতে বলা তো দূরের কথা ভালবেসেই ফেললেন। চাকরবাকরও মাতাহারির ব্যবহারে কোনদিন কোন দোষ দেখতে পায় নি। প্রশ্ন জাগে মাতাহারি কি তার মেয়ের খবর একবারও নিতে উৎসুক হননি? সমসাময়িক বিবরণীতে জানা যায় মাতাহারি মেয়েকে একবার একটি সোনার হাতঘড়ি পাঠান এবং আর একবার পরিচারিকার হাত দিয়ে একটি সোনার হার। কিন্তু দুইই জন ম্যাকলিয়ড প্রত্যাখ্যান করেন। মেয়েকে ছুটিতে কাছে আনাতেও চেয়েছিলেন একবার। কিন্তু জন রাজী হননি। একবার মাতাহারি আরব্য উপন্যাসের মত মেয়ে ননকে চুরি করে আনবার পরিকল্পনাও করেন। কিন্তু সে পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। যাই হোক এই প্রেমিকের সঙ্গেও সম্পর্কের অবসান ঘটলো। মাতাহারি প্যারিসে ফিরে এলেন।

এরপর মিলানে ও রোমে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়লো। কিন্তু তবুও তাঁর তৃপ্তি নেই। আরও খ্যাতি আরও সম্পদ তিনি চাইছিলেন। তার জন্য বিশেষভাবে একটি নৃত্যনাট্য লেখানোর জন্য তিনি বহু গীতিকারকে ধরলেন। কিন্তু সকলেরই সময়াভাব। মাতাহারি তার ইমপ্রেসারিও অস্ট্রাককে লিখলেন দার্গালিয়েভের ব্যালে দলে যাতে তিনি যোগ দিতে পারেন সেই বন্দোবস্ত করতে। অস্ট্রাক তার জন্য ভাঁসির করতে ত্রুটি করছিলেন না। সেই সঙ্গে বার্লিনেও মাতাহারির জন্য চেষ্টা করছিলেন। বার্লিন সম্পর্কে মাতাহারির একটা অনীহা ছিল। এর কারণ বোঝা যায় না। প্রথম বার বার্লিনে তিনি বেশ সাড়া জাগিয়েছিলেন। মিলান ও রোমের অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য মাতাহারি পোষাক, দৃশ্য পরিকল্পনা, সঙ্গীত নির্দেশনা ইত্যাদিতে প্রচুর খরচ করেছিলেন। এখন টাকার টানাটানি দেখা দিল। মাতাহারি স্বল্পে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তিনি নিজের বাড়ী ঘোড়া ও গাড়ী বন্ধক দিয়ে তিরিশ হাজার ফ্রাংক মত ধার পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অস্ট্রাককে লিখলেন এছাড়া তাঁর মত শিল্পীর পক্ষে নিশ্চিন্তভাবে শিল্প চর্চায় মন দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন দু-তিন বছরের মধ্যেই তিনি ধার শোধ করে দিতে পারবেন।

রাশিয়ান ব্যালের প্রশংসায় তখন সারা পশ্চিম ইউরোপ মুখর। মাতাহারির মনে অনেক সাধ—তিনি এবার প্রসিদ্ধ রুশ ব্যালে দলে যোগ দেবেন। অবশেষে রুশ পরিচালক দা মণ্টিকার্লোতে মাতাহারিকে সাক্ষাৎ করতে ডেকে পাঠালেন। সেখানে শুধু দার্গালিয়েভ নন প্রসিদ্ধ নর্তক ও পরিচালক নিজিন্স্কির সঙ্গেও তার দেখা হল। কিন্তু হলে হবে কি? দার্গালিয়েভ মাতাহারির নাচ দেখতে চাইলেন। তাঁকে নাচ দেখিয়ে তবে দলে স্থান পেতে হবে এ মাতাহারির কল্পনাতীত। তাঁর মতো প্রসিদ্ধ শিল্পীকে শেষে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে? ক্ষুব্ধ অপমানিত মাতাহারি প্যারিসে ফিরে এলেন। কিন্তু মাতাহারির নাচ যত বড় শিল্পই হোক না কেন রুশ দলের চাহিদা অনুযায়ী নয়। প্যারিসে ফিরে মাতাহারি মুশকিলে পড়লেন। উৎসাহের আধিক্যে সবাইকে তিনি জানিয়েছিলেন তিনি রুশ দলে যোগ দিয়েছেন। এখন রীতিমত লজ্জায় পড়ে গেলেন। যাই হোক দিন কারুর জন্যে বসে থাকে না। মাতাহারিকেও ঘোড়-দৌড়ের মাঠে ও আর দশটা অভিজাত সমাবেশে দেখা গেল। কারণ আর কিছুই নয়—নিজের অর্থকৃচ্ছ্রতার সংবাদ গোপন করা। গ্যাব্রিয়েল অস্ট্রাকের সঙ্গে খিটিমিটি বাধলো। তিনি কেন কাজ যোগাড় করতে পারছেন না। লণ্ডন, ভিয়েনা, যুক্তরাষ্ট্র কোথাও সাড়া না পেয়ে মাতাহারি শেষে বার্লিনেও যেতে রাজী হলেন। মাতাহারির বিচার কালে ফরাসীরা অভিযোগ জানিয়েছিল যে ১৯০৬ সাল থেকে মাতাহারির প্রভুত জার্মান বন্ধু-বান্ধব ছিল। কিন্তু ১৯১২ সালে যখন তিনি বার্লিনের অপেরা হাউসে নাচ দেখাবার পরিকল্পনা করছিলেন তখন একটি বন্ধুর ঠিকানাও তাঁর কাছে ছিল না। মরীয়া হয়ে তিনি একদা পরিচিত মাঁসিয়ে কবঁকে চিঠি দিলেন যদি তিনি কোন উপায় করে দিতে পারেন। মাঁসিয়ে কঁব তখন বার্লিনে ফরাসী রাষ্ট্রদূত। তিনি পূর্ব পরিচয় স্বীকার করলেন। কিন্তু জানালেন বার্লিন অপেরা রাজ-পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবু তিনি চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে আলিবাবা নাটকে মাতাহারি কাজ পেলেন এবং খুবই প্রশংসা অর্জন করলেন। এরপর ফলি বারজেমার। মাতাহারি স্পেনদেশীয় নৃত্য দেখাচ্ছেন। বিষয়বস্তু গয়ার একটি ছবি। ভারতের মন্দির এখন অনেক পেছনে। এরপর তাঁকে দেখা গেল সিসিলিতে। সেখানে বিখ্যাত ইটালীয়ান ধনী সেনর ফ্লোরিড ও তার স্ত্রীর দেওয়া পার্টিতে বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হত। সিসিলি থেকে প্যারিসে ফিরে আবার তিনি জাভার নাচ নিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে স্বভাববশতঃ বহু মিথ্যা কথা তিনি বলেছেন। কখনও বলেছেন তিনি নাচ ছেড়ে দেবেন। কখনও বলেছেন তার পিতামহ ভারতের মাদুরা দ্বীপের (?) রাজা—তাঁর উৎসাহেই তার নাচ শেখা। কখনও বলেছেন দেশে থাকাকালে তিনি মাটিতে পা দিতেন না। কারণ, তাঁকে দেবী জ্ঞান করে সমস্ত পুরুষরা নিজেদের গায়ের কোট খুলে মাটিতে বিছিয়ে দিত।

১৯০৭ সালে ভিয়েনায় মাতাহারি

অবশেষে ১৯১৪ সালের সেই উত্তপ্ত মুহূর্তে মাতাহারি বার্লিনে গেলেন। পূর্ব প্রেমিক কিপার্টের সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠতা হল। মাতাহারির ইচ্ছে একখানি মিশরীয় নৃত্য-নাট্য মঞ্চস্থ করবেন। এবিষয়ে তিনি প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ ও যাদুঘর ইত্যাদির সঙ্গে যোগা-যোগ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বার্লিনে নাচা তাঁর আর হল না। এক মাসের মধ্যেই প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এ-ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে মাতাহারি ভাবেন নি। বার্লিন থেকে সুইজারল্যান্ড হয়ে প্যারিসে ফিরবেন ঠিক করে জিনিষপত্র সবই আগে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সুইস সরকারও কড়াকড়ি করেছেন। মাতাহারি সুইজারল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি পেলেন না কারণ তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না। মহা মুস্কিল। মাতা-হারি এক বস্ত্র সম্বল করে বার্লিনের হোটেলে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর টাকা-পয়সা ম্যানেজার নিয়ে সরে পড়েছেন। তাঁর দামী ফারগুলি যে দোকানে কাচাতে দিয়ে-ছিলেন সে দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে এক ডাচ ভদ্রলোকের দাক্ষিণ্যে তাঁর আমস্টারডামে ফিরে যাবার টিকিট জুটলো। আমস্টারডামে ফিরে যখন তিনি সেই ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। ভদ্রলোকটির স্ত্রী ছিলেন রসিকা। তিনি মাতাহারিকে জিজ্ঞেস করলেন "আচ্ছা আপনি তো আমার স্বামীকে প্রলুব্ধ করতে পারতেন। সুযোগ পেয়েও আপনি তা করলেন না কেন?" মাতাহারি নিজস্ব ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন "আমার তখন এক-বস্ত্র সম্বল। আমার নিজেকে যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল না—তাই।" নিঃসন্দেহে মাতা-হারির সাহায্যে আবার এগিয়ে এলেন এক পুরুষ। একদিন আমস্টারডামের রাস্তায় হাঁটবার সময় মাতাহারি লক্ষ্য করলেন কেউ একজন তাঁকে অনুসরণ করছে। কিছুক্ষণ পরে একটি চার্চ থেকে বেরিয়ে আসবার পর মাতাহারি দেখলেন সেই লোকটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে এবার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো সে মাতাহারি'কে কোন সাহায্য করতে পারে কিনা। মাতাহারির তখন সাহায্যের চরম প্রয়োজন। তিনি একটু ছলনার আশ্রয় নিলেন। বললেন তিনি রাশিয়া থেকে আসছেন যেমন এসেছিলেন বহুদিন আগে জ্ঞানভিক্ষু পিটার দি গ্রেট। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। পিটার দি গ্রেটের ইতিহাস তাঁর জানা ছিল। সুতরাং পিটার দি গ্রেট যেখানে বাস করতেন সেই বাড়ীটি এই রাশিয়ান মহিলাকে দেখাতে চাইলেন। মাতাহারি তার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। এই ফাঁকে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। অবশেষে কয়েক সপ্তাহ পরে ভদ্রলোক জানতে পারলেন তার বান্ধবী আদৌ রাশিয়ান নন্। তাঁরই স্বদেশীয়া। স্বপ্নভঙ্গ হল। তিনি বিদায় নিলেন। যাবার আগে অবশ্য মাতাহারির হোটেলের বিল মেটাতে তিনি ভুলে যাননি। বহুদিন পর দেশে এসে মাতাহারির মনে বোধহয় মাতৃ-স্নেহ জাগ্রত হল। তিনি কন্যা ননকে একবার দেখতে চেয়ে স্বামীর কাছে পত্র লিখলেন। ননের বয়স তখন ষোল। মায়ের সম্পর্কে বাড়ীতে কোন আলোচনা হতে না দিলেও মাতাহারির ছবি আঁকা একটি বিস্কুটের বাক্স যে কেন তার পিতা বাড়ীতে রেখে-ছিলেন বিশেষতঃ নন যে কেন তাতে করে স্কুলে টিফিন নিয়ে যেত তা বোঝা দুষ্কর। জন ম্যাকলিয়ড রটারডামে কন্যাকে নিয়ে একটি স্বল্প সাক্ষাৎকারে রাজী হলেও পরে অর্থাভাবে সে ব্যবস্থা নাকচ করে দিলেন। দীর্ঘ পত্র চালাচালির পর মাতাহারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর উচ্চবাচ্য করলেন না। নন যখন পরে দি হেগে পড়তে যায়, তখনও সে মায়ের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেনি। যদিও মাতাহারির বাড়ী সে ভাল করেই চিনত। অন্যদিকে মেয়ে যে দি হেগেই পড়াশুনা করছে এ তথ্য মাতাহারির কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তার দিক থেকেও মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোন উদ্যম দেখা যায়নি।
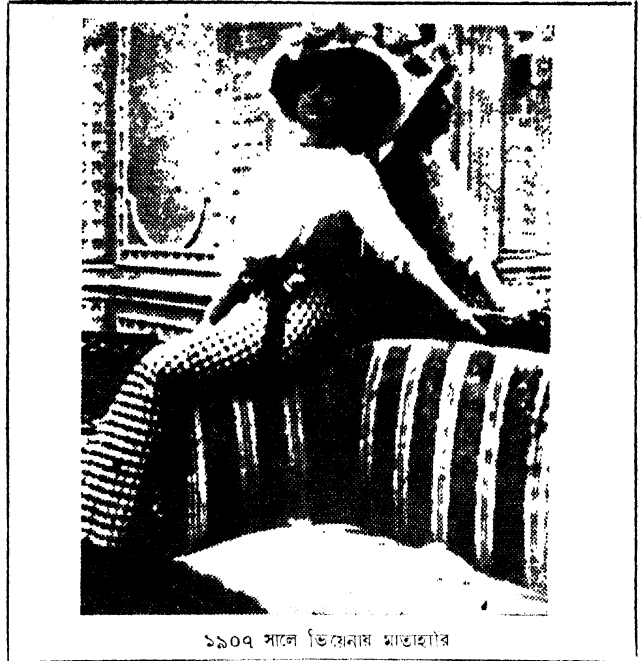
প্রথম মহাযুদ্ধের আবর্তে মাতাহারি

মাতাহারি হল্যাণ্ডে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। প্রথমত প্রায় দশ বছর তিনি দেশ ছাড়া। চালচলনে তিনি প্রায় ফরাসী বনে গিয়েছিলেন। চিঠি লিখতেন ফরাসী ভাষায়। এজন্য জন ম্যাকলিয়ড তাঁকে বিদ্রূপ করেছিলেন। তাছাড়াও প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর হল্যাণ্ডে খুব স্বস্তি ছিল না। হল্যাণ্ড যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকলেও বৃটিশ ও জার্মান সৈন্য হল্যাণ্ডে ছিল। বেলজিয়াম থেকে আসছিল উদ্বাস্তুর দল।

দুটি সুন্দর নৃত্য ভঙ্গিমায় মাতাহারি

দাবস্তুর অনটন দেখা দিচ্ছিল। তবুও তাহারি স্থানীয় অপেরার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দি হেগে ও আর্ণহেমে তাঁর ত্য প্রদর্শিত হল। জন ম্যাকলিয়ড অবশ্য রির অনুষ্ঠান দেখতে যাননি। বরং ব্যঙ্গ-রে বলেছিলেন, "তাকে যত প্রকারে দেখা ম্ভব আমি দেখেছি। আর দেখবার মত চ নেই।" নৃত্যগুলিতে জনসমাগম হলেও সময় মাতাহারির টাকা-পয়সার খুবই নাটানি যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে যখন তিনি গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হন খন বহু মিথ্যা ও অলীক ঘটনা ছড়ায়। র মধ্যে একটি হল বার্লিন ত্যাগের পর থেকেই মাতাহারি একজন উচ্চ পারিশ্রমিক-প্ত জার্মান গুপ্তচর। কিন্তু মাতাহারির অর্থকৃচ্ছ্রতা সে কথা প্রমাণ করে না। তেমনি র্লিন ত্যাগের পূর্বে তাঁর জার্মান পুলিশ হিনীর একজন অফিসারের সঙ্গে ডিনার খাওয়ারও গূঢ় অর্থ বের করা হয় এবং সেই সাধারণ অফিসারটিকে পুলিশ-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়। হল্যান্ডে মাতাহারি যার সঙ্গে থাকতেন তিনি হলেন অভিজাত ব্যারন ক্যাপলেন। ইতিমধ্যে মাতাহারি একবার স্বল্পকালের জন্য প্যারিস ঘুরে গেলেন। তখনও তিনি রুশ ব্যালেতে যোগ দেবার আশা ত্যাগ করতে পারেননি। হল্যান্ডে ফিরে গিয়ে তাঁর ভাল লাগলো না। তিনি আবার ফরাসী ও ইংরাজি ভিসার জন্য দরখাস্ত করলেন। ফরাসী ভিসা মঞ্জুর হল কিন্তু বৃটিশ কনসুলেট ভিসা দিতে রাজী হল না। মাতাহারি বিস্মিত হলেন এবং ডাচ সরকার তাঁর অনুরোধে বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করে পাঠালেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার লন্ডন থেকে কেবল করে জানালেন ইংল্যান্ডে মাতাহারির আগমন তাঁরা অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বৃটিশ সরকার অনেক আগেই মাতাহারিকে সন্দেহ করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে ফরাসী গুপ্তচর বিভাগ বলে যে প্রায় বছরখানেক আগেই লন্ডন থেকে তারা এ ধরনের খবর পায়। তবে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ কোন সঠিক তথ্য দিতে পারে নি। বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের সন্দেহের কারণ ছিল তাদের হল্যান্ডে নিযুক্ত গুপ্তচরদের দেওয়া বিবরণ। মাতাহারিকে তারা আমস্টারডামে জার্মান দূতাবাসে যেতে দেখেছিল এবং তাতেই তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। ফরাসী গুপ্তচররা সন্দিগ্ধ হয় মাতাহারির ক্রমাগত ইউরোপের এক দেশ থেকে আর এক দেশ ভ্রমণে। যুদ্ধ চলা কালেও মাতাহারির ঘুরে বেড়ানো তাঁর বেপরোয়া স্বভাবেরই পরিচয়।

মাতাহারি ফ্রান্স থেকে গেলেন স্পেনে। ফেরবার সময় বৃটিশ গুপ্তচরদের প্রভাবে ফরাসীরা তাঁকে ফ্রান্সে ঢুকতে দিল না। মাতাহারি কারণ জানতে চাইলেন। অবশেষে পুরোন বন্ধু মসিঁয়ে কব' ফ্রান্সের পররাষ্ট্র বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারীকে চিঠি লিখলেন—যদি তিনি কিছু করতে পারেন। এই চিঠিই প্রমাণ করে যে মাতাহারি তাঁর সম্পর্কে যে গুপ্তচরবৃত্তির কোন অভিযোগ আসতে পারে সে সম্বন্ধে এতটুকুও সচেতন ছিলেন না। নতুবা যে দেশ তাঁকে সন্দেহ করে সেই ফ্রান্সে ফিরে যাবার আগ্রহ তিনি দেখাতেন না। জার্মানী ও ফ্রান্স দুই দেশেরই বহু ক্ষমতাশালী লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু সে তো নেহাৎই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। তা নিয়ে যে রাজনৈতিক কোন সন্দেহ জাগতে পারে তা ছিল তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত। যাই হোক ফ্রান্সে ঢোকবার অনুমতি মিললো।

মাতাহারির জীবনে দুটি জিনিষ অপরিহার্য ছিল টাকা ও পুরুষ। বহু সময়ই দুটি অচ্ছেদ্য ছিল। বহু ধনবান পুরুষ মাতাহারির জন্য অকাতরে ব্যয় করেছেন। কিন্তু মাতাহারির প্রেমে কোন নিষ্ঠা ছিল না। অবলীলাক্রমে তিনি একজনকে ছেড়ে আরেকজনের কাছে গেছেন। অনেক সময় একজনকে পাবার জন্য অন্যজনের সাহায্য নিতেও ছাড়েন নি। তাছাড়া শেষের দিকে এ বিষয়ে কোন নীতিবোধ তাঁর ছিল না। একই সময়ে তিনি বহুগামিনী।

ফ্রান্সে থাকার সময় রাশিয়ান সৈন্য-বাহিনীর এক সুপুরুষ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ক্যাপ্টেনের নাম ভাডিস দ্য ম্যাসলফ্। মাতাহারি বিশ্বাস করতেন জীবনে একমাত্র একেই তিনি ভালবেসেছেন। অন্ততঃ তিনি বহুবার সেই কথা বলেছেন এবং একে বিয়ে করার কথাও তাঁর মনে হয়েছিল। মাতাহারির ঘরে ভাডিসের একখানা ছবি পাওয়া যায় তাতে লেখা ছিল—"আমার জীবনের কতগুলি সুন্দরতম মুহূর্তের স্মরণে যার জন্য আমি ভাডিসের কাছে ঋণী। ভাডিস আমার জীবনে সর্বাধিক প্রিয়।"

ভাডিস তখন ভিটেলে। ফরাসী সীমান্তে। মাতাহারি এই অবসরে একটি পূর্বতন প্রেমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলেন। উদ্দেশ্য ভিটেলে যাবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ। এই প্রেমিকও সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। তিনি সামরিক এলাকায় যাবার প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য মাতাহারিকে সামরিক বিভাগে পাঠালেন। কি হয়েছিল বোঝা যায় না। মাতাহারি যাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তিনি গোয়েন্দা বিভাগের

সর্বাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ল্যাদুক্স। একথা সেকথার পর ক্যাপ্টেন জানালেন যে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ তাকে সন্দেহ করলেও তিনি তা করেন না। তিনি আরও প্রস্তাব করলেন মাতাহারি ফরাসীদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে রাজী আছেন কিনা। মাতাহারি স্বভাবতঃই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাববার সময় চেয়ে নিয়ে চলে এলেন। কিন্তু মাতাহারি যে গুপ্তচরবৃত্তির পক্ষে একেবারেই নির্বোধ তা প্রমাণিত হয় সেই দিনই তার এক প্রাক্তন বন্ধুকে গিয়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করায়। মাতাহারি যথারীতি ভিটেলে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে এলেন। ক্যাপ্টেন লাদুক্সের সঙ্গে আবার দেখা হল। মাতাহারি জানালেন তিনি গুপ্তচরবৃত্তি করবেন। কিন্তু তার পারিশ্রমিক হবে এক লক্ষ ফ্রাংক। লাদুক্স নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়েছিলেন কিন্তু টাকার ব্যাপারে মাতাহারিকে ছোট নজরের অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। পরন্তু লাদুক্সকে মাতাহারি বোঝালেন এ টাকা তার চাইই। কারণ এ ছাড়া ভাডিসকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। ভাডিসের পরিবার টাকা চায়। লাদুক্সের কি জানি কেন ধারণা হল যে মাতাহারি সত্যই স্পাই। অন্তত আত্মজীবনীতে তিনি তাই লিখেছেন।

মাতাহারি লাদুক্সের নির্দেশ মত স্পেন হয়ে হল্যান্ড যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বলাবাহুল্য এক লক্ষ ফ্রাংক দূরে থাকুক একটি পেনীও এপর্যন্ত তিনি ফরাসী সরকার থেকে পান নি। লাদুক্স মাতাহারির পেছনে গোয়েন্দা লাগাতেও ভোলেন নি। সাধারণত গুপ্তচর ব্যাপারে প্রত্যেক স্পাইকেই লক্ষ্য করার জন্য অন্য স্পাই লাগানো হয়। ঘটনাচক্রে মাতাহারি স্পেন থেকে বৃটিশ জাহাজ নিলেন। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রায় পার হয়ে যাবার আগে কর্ণওয়ালের ফলমাউথে হঠাৎ বৃটিশ পুলিশবাহিনী জাহাজে চড়াও হল। মাতাহারিকে তারা মনে করলো জার্মান স্পাই ক্লেরা বেনেডিক্স এবং যথারীতি মাতাহারিকে তারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। দিন তিনেক পরে যখন তারা নিঃসংশয় হল যে যে মহিলাকে তারা ধরেছে তিনি আদৌ ক্লেরা বেনেডিক্স নন—ইনিই বিখ্যাত মাতাহারি তখন চুনোপুঁটি ধরতে গিয়ে জালে বিরাট রাঘব বোয়াল ধরা দিলে যা মনের অবস্থা হয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেরও বোধহয় তাই হল। ইতিমধ্যে মাতাহারি ডাচ লিগেশনের সাহায্য চেয়ে চিঠি দিলেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বড় কর্তা বেসিল টমসন মাতাহারির বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ কিছু পান নি। সুতরাং তিনি মাতাহারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মাতাহারি স্বভাববশে নানারকম সত্য মিথ্যা পরস্পর-বিরোধী তথ্য পরিবেশন করে চললেন। তাঁর বোধহয় তখনও খেয়াল হয় নি কি ভয়ংকর পরিণতির দিকে তিনি ছুটে চলেছেন। অবশেষে জানালেন তিনি হল্যান্ড যাচ্ছিলেন ফ্রান্সের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে। বেসিল টমসন অবাক হলেন। যে মহিলা সম্বন্ধে তিনি বহু পূর্বে ফ্রেঞ্চ গোয়েন্দা বিভাগকে সাবধান হতে বলেছেন তারা কিনা তাকেই গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে! ক্যাপ্টেন লাদুক্সের কাছে সঠিক খবর চেয়ে তিনি তার পাঠালেন। ক্যাপ্টেন লাদুক্সের মনে যাই থাক না কেন তিনি এরকম বোকা জীবনে বনেন নি! নিজের সম্মান বাঁচাতে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। স্যর বেসিলকে জানালেন এ ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না। স্যর বেসিল যেন তাঁকে স্পেনে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। মাতাহারি স্পেনে ফিরে গেলেন। হোটেল প্যালেসে যে ঘরে তিনি উঠলেন তার পাশের ঘরে ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী স্পাই মার্থা রিচার্ড। তিনি পরে মাতাহারির মামলা শুনে অনেক তথ্য পরিবেশন করেন যাতে মনে হয় মাতাহারি নির্দোষ। মার্থা রিচার্ডকে ১৯৩৩ সালে ফরাসী সরকার দেশসেবার জন্য সর্বোচ্চ সম্মান "লিজিয় অফ অনার" দেয়। তাঁর নামে বই বেরোয় সিনেমা ওঠে। এই বিখ্যাত গোয়েন্দা তখন স্পেনে জার্মান সামরিক অ্যাটাচে ভন কেলোর প্রণয়িনী। একদিন কাগজে তিনি দেখলেন মাতাহারির মামলায় বেরিয়েছে মাতাহারি ভন কেলোর প্রণয়িনী ছিলেন। ক্রুদ্ধ মার্থা রিচার্ড প্রেমিকের কাছে গিয়ে এর মানে জানতে চাইলেন। ভন কেলো জানালেন তিনি তো তাকে চেনেনই না উপরন্তু জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে মাতাহারির কোন যোগাযোগই নেই। গুপ্ত ফাইল বের করে তিনি সমস্ত স্পাইদের ছবি দেখালেন। মাতাহারির ছবি সেখানে ছিল না। কোন জার্মানই স্বীকার করেন নি যে মাতাহারি তাদের নিযুক্ত স্পাই। প্যারিসে ক্যাপ্টেন লাদুক্স অবশ্য নিঃসন্দেহ হচ্ছিলেন। কারণ ফরাসী বেতারে কতগুলি জার্মান সংবাদ ধরা পড়ে। তার মধ্যে একটি হল প্যারিসের জার্মান গোয়েন্দা জানাচ্ছে অমুক গুপ্তচরকে লন্ডনে ঢুকতে দেয় নি। সে স্পেনে আছে। সে এখন কি করবে? জার্মান কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিচ্ছেন এইচ ২১-কে স্পেন থেকে ফ্রান্সে গিয়ে কাজ চালাতে বল। তার জন্য ৫০০০ ফ্রাংক পাঠানো হল।

কিন্তু এইচ ২১ মাতাহারি কিনা সে বিষয়ে লাদুক্স কি করে নিঃসন্দেহ হলেন বোঝা মুস্কিল। যাই হোক স্পেনে মাতাহারি ফরাসী জার্মান দুই মহলেই মিশছিলেন। হঠাৎ এক স্প্যানিশ বন্ধু তাঁকে জানালেন যে জনৈক ফরাসী গুপ্তচর মাতাহারির সঙ্গে মেলামেশা করতে তাঁকে বারণ করেছে। মাতাহারি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। এসবের মানে কি? ফরাসীরা তাঁকে তাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে বলেছে। আবার তারাই পেছনে তারা গোয়েন্দা লাগাচ্ছে—বন্ধুবান্ধবদের কান ভাঙ্গাচ্ছে। বৃটিশরা তাকে ঢুকতে দেয় নি। একটা ফয়শলা করার জন্য মাতাহারি প্যারিসে গেলেন। গিয়ে সোজা তিনি ক্যাপ্টেন লাদুক্সের কাছে হাজির হলেন। ক্যাপ্টেন বিশেষ পাত্তা দিলেন না। মাতাহারির প্রেমিক ভাডিস কয়েক দিনের জন্য প্যারিসে এলেন। তিনিও জানতে চাইলেন ব্যাপার কি? তিনিও সরকারী নির্দেশ পেয়েছেন মাতাহারির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে। ভাডিস চলে গেলে মাতাহারি প্যারিসের বিলাস লীলায় গা ঢেলে দিলেন। প্যারিস তখন সামরিক পুরুষদের ছুটি কাটানোর প্রিয় ক্ষেত্র। এবং তাদের বৈচিত্র্যও সীমাহীন। ইউনিফর্মের প্রতি মাতাহারির চিরকালই আকর্ষণ। তিনি বিভিন্ন দেশীয় সামরিক পুরুষদের সঙ্গে রভসলীলায় সময় কাটাতে লাগলেন। নিজের গুরুত্ব জাহির করবার জন্য তিনি যত্র তত্র বহু জার্মান ও ফরাসী পদস্থদের নাম ও তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার বিবরণ দিয়ে বেড়িয়েছেন। এইবার তিনি নিজের জালে নিজে ধরা পড়লেন। ১৯১৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ফরাসী পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলো।

এইবার বিখ্যাত মাতাহারির মামলা শুরু হল। সরকার পক্ষের হাতে বিশেষ কোন প্রমাণই ছিল না। যা ছিল তা হল নানা রটনা, মাতাহারির বহু প্রলাপোক্তি এবং গুপ্তচরদের পরিবেশিত নানা কাহিনী। এইসব কাহিনীর বেশীর ভাগই রং চড়ানো। যেমন এক গুপ্তচর দাবী করেছিল যে, মাতাহারির সঙ্গে জার্মানদের যে যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ হল মাতাহারি দুবার স্পেনে যাবার জন্য জাহাজ 'বুক' করেও যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে তা বাতিল করে দেন এবং দুটি জাহাজই জার্মান সাবমেরিন ধ্বংস করে। অর্থাৎ মাতাহারি আগেই জানতেন যে, ঐ জাহাজ দুটি জার্মানরা নষ্ট করবে। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকলেও তা কাকতালীয় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মাতাহারির ঘরে এক টিউব অদৃশ্য কালি পাওয়া যায় এবং বিচার চলাকালে এটাই তার বিপক্ষে সবচাইতে বড় সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সে জিনিষটি আর কিছুই নয়, অক্সি সায়নাইড মার্কারি তখনকার দিনে একটি বহুল প্রচলিত প্রতিষেধক। অনেক কেমিক্যালের মত এটি দিয়েও লেখা যায় এবং আগুনের সংস্পর্শে এলে সে লেখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাতাহারি বলেছিলেন ওটি তিনি ব্যবহার করতেন শুধু মাত্র জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য। মাতাহারির গ্রেপ্তারের প্রায় দুমাস পরে প্যারিসের ডাচ লিগেশন সংবাদ পায়। মাতাহারি সাহায্য চেয়ে দি হেগে তাঁর দাসীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠি পৌঁছয় অনেক দেরীতে। বোধহয় ব্যারন ক্যাপেলেন (মাতাহারির প্রেমিক) সর্বপ্রথমে ডাচ সরকারের এ-বিষয়ে দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন এবং তারপর জাভে প্যারিসের ডাচ লিগেশন।

মাতাহারির সাক্ষাৎকার যিনি নিয়েছিলেন সেই ক্যাপ্টেন বুশারদ'র অনবরত হাতের নখ কামড়ানো, চেয়ার থেকে হঠাৎ হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো ও দীর্ঘ পায়চারি সবই মাতাহারির স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করত। তার থাকার কক্ষটি ছিল অত্যন্ত অপরিসর ও নোংরা। স্নান ইত্যাদির সুব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং মাতাহারির মনের অবস্থা কল্পনা করা যায়। এই অদ্ভুত অমার্জিত পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই যেন তিনি গড় গড় করে বলে চললেন। বার্লিনে থাকবার সময় লেফটেন্যান্ট কির্পাটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তারপর নেভাল এ্যাটাচে কুনজ, পাইলট হেনরী কেপেলের (যিনি জেপোলিন চালানোর জন্য সারা ইউরোপে বিখ্যাত ছিলেন) সঙ্গে প্রেম কিছুই বাদ দিলেন না। নিজের প্রেমজীবন সম্পর্কে তিনি একেবারেই নিঃসংকোচ ছিলেন এবং অক্সাইড মার্কারির ব্যবহার সম্বন্ধে বুশারদকে তিনিই ওয়াকিবহাল করেন। ক্যাপ্টেন কির্পাট ও অন্য দু' একজন পদস্থ জার্মান অফিসার বার্লিন ত্যাগের প্রাক্কালে রহস্যচ্ছলে বলেন, শীগগীরই প্যারিসে দেখা হবে এবং কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে মাতাহারি ফ্রান্সে পুরনো বন্ধু তখনকার যুদ্ধমন্ত্রীকে সে কথা জানান। নিজের আন্তর্জাতিকতা প্রমাণ করার জন্য মাতাহারি অজস্র লোকের নাম করে চললেন। বললেন হল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে আসেন প্রেমিক মার্কুইস দ্য ব্যুফোর্টের আকুল আহ্বানে। ইংল্যান্ডে তার হয়রানি, প্যারিসে ক্যাপ্টেন লাদুক্সের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সব কিছুই মাতাহারি বলে গেলেন।

কিন্তু ক্যাপ্টেন বুশারদ' স্থিরনিশ্চিত মাতাহারি জার্মান স্পাই এইচ ২১। ভাডিসকে দেখতে যাবার জন্য ভিটেলে যাবার অনুমতিপত্র সংগ্রহের ব্যাপারেই যে প্রথম ক্যাপ্টেন লাদুক্সের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার এবং ক্যাপ্টেনই যে তাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বলেন এ তিনি বিশ্বাস করলেন না। স্পেনে নেভাল এটাচে ডন ক্রনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পিছনে যে ফ্রান্সের জন্য গুপ্ততথ্য আহরণের উদ্দেশ্য ছিল তাও ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করেন নি। যদিও মাতাহারির যে তথ্য পেয়েছিলেন তা ক্যাপ্টেন লাদুক্স এবং ফ্রান্সের কর্নেল দাভিজকে যিনি তখন স্পেনে ছিলেন জানান ক্যাপ্টেন বুশারদ'র মতে তা হল গোয়েন্দাগিরির সাধারণ চাল। সাধারণত গোয়েন্দারা অন্য পক্ষকে কিছু সাধারণ তথ্য দিয়ে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে যে, আদৌ তারা বিরুদ্ধ পক্ষে নয়। কিন্তু মাতাহারির ব্যবহার যে আদৌ গোয়েন্দাগিরির উপযুক্ত নয় এবং এদের মধ্যে বহু লোককেই তিনি আগে থেকে চিনতেন সে কথা যেন ইচ্ছে করেই ভুলে যাওয়া হল। আর একটি প্রমাণ হল ডন কেলো স্পেন থেকে বার্লিনে এইচ ২১ সম্পর্কে বহু তার পাঠিয়েছেন। তাতে যেসব কথা আছে তা মাতাহারির কার্যকলাপের সঙ্গে মিলে যায় তাছাড়া দুবার তিনি এইচ ২১কে টাকা [illegible] জন্য জানিয়েছেন এবং তার অব্যবহিত পর পরই দুবার মাতাহারির নামে প্যারিস ব্যাংকে ৫০০০ করে ফ্রাংক জমা পড়েছে। এ বিষয়ে মাতাহারি ডন কেলোর সঙ্গে আদৌ কোন ব্যবস্থা ছিল এ কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, পরিচারিকা অ্যানাকে তিনি টাকার জন্য লিখেছিলেন। কারণ ক্যাপ্টেন লাদুক্স তাঁকে এক পয়সাও দেন নি। অ্যানা তাঁর প্রেমিক ব্যারন ক্যাপলেনের কাছ থেকেই সম্ভবত ঐ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। ডন ক্রন তাঁকে ৩৫০০ পিস্তা (স্পেনের টাকা) দেন কিন্তু সে হল তাঁর সঙ্গ-সুখের পারিশ্রমিক। এখানে বলা দরকার ডন ক্রনকে মাতাহারি ক্রমাগত ডন কেলো বলে গেছেন।

ইতিমধ্যে খবর এল ভাডিস গুরুতর আহত। উদ্বিগ্ন মাতাহারি কোনক্রমেই প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেন না, নিজের জবানবন্দীর ওপর তাঁর মনোযোগ ছিল না। যদি ফরাসীদের সব খুলে বললে কোন লাভ হয়, বোধহয় এই আশায় মাতাহারি বললেন, দি হেগ ত্যাগের আগে জার্মান দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাচে কেমার তার বাড়ীতে হঠাৎ আসেন এবং মাতাহারিকে প্যারিসে গিয়ে জার্মানদের জন্য গুপ্ততথ্য সরবরাহ করতে বলেন। তাঁর সঙ্গে কুড়ি হাজার ফ্রাংক ছিল। তারা খবর পেয়েছিলেন, মাতাহারি প্যারিসে যাচ্ছেন। মাতাহারি কি জানি কি ভেবে কুড়ি হাজার ফ্রাংক ও জার্মানদের দেওয়া অদৃশ্য কালি গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হল, তখন তিনি সদ্য বার্লিন থেকে এক বস্ত্রে দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর দামী দামী পোষাকের শোক তখনও তিনি ভুলতে পারেন নি। সুতরাং তিনি ভেবেছিলেন, জার্মানদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তাই লাভ এবং তাদের ঠকানোর অধিকার তাঁর আছে। বলা-বাহুল্য দি হেগ ছাড়ার সময়ই তিনি খালের জলে কালির শিশি ফেলে দেন এবং তারপর তিনি আর জার্মানীর দিকেও যান নি। তিনি যে ইংলন্ড হয়ে দেশে ফিরতে চেষ্টা করেন এবং প্রতিবারই সুইজারল্যান্ড এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন তার কারণই হল জার্মানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কি কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি তাদের কুড়ি হাজার ফ্রাংক নেবার?

স্পেনে তিনি ভীষণ অর্থাভাবে পড়েন এবং ডন কেলোর কাছ থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়, এই ভেবে পুরনো খবরের কাগজ থেকে কতগুলি আজে-বাজে জিনিস যা সবাই জানে, লিখে নিয়ে তাঁকে দেন এবং পারিশ্রমিক চান। ডন কেলো বার্লিনে এ তথ্য পাঠান কিন্তু জার্মানরা এর জন্য কোন টাকা দিতে অস্বীকার করে।

এসব তথ্য পেয়ে বলা বাহুল্য ক্যাপ্টেন বুশারদ'র সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। মাতাহারি জীবনের শেষ মুহূর্তের গল্প বলার মোহ ছাড়তে পারেন নি। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ছিল মনোরম। ক্যাপ্টেন বুশারদ' তার কল্পনা, উপস্থিত বুদ্ধি, শাণিত ব্যঙ্গ ও উপহাসমাখানো বাচনভঙ্গীর প্রশংসা করেছেন। সারাজীবন বড় বড় কথা বলতে অভ্যস্ত মাতাহারি শেষজীবনে ভুলে গিয়েছিলেন কাদের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। ফ্রান্সের বা জার্মানীর গুপ্তচর বিভাগ ও সাংবাদিকরা যে এক নয়, তা খেয়াল ছিল না। আর একটি লক্ষ্য করবার মত জিনিস হল, মাতাহারির অসীম ভদ্রতা ও সৌজন্য। একবারের জন্যও তিনি অশালীন হননি। অথচ ক্যাপ্টেন বুশারদ'র ক্রমাগত নিজের বক্তব্য আঁকড়ে থাকার ও

অকারণ অভিযোগের (অন্তত যে-ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা তা প্রমাণ করে না) পোনি-পুলিশকর্তা যে কোন লোককে দোষী চরিত্রের পক্ষে যথেষ্ট। সারাজীবন বিলাসিতায় অভ্যস্ত মাতাহারি জেলে বিশেষ কোন সুবিধাই চান নি। চেয়েছিলেন স্নানের ব্যবস্থা ও টেলিফোন। তাঁর বোধহয় ধারণা ছিল তাঁর অসংখ্য বন্ধুরা এই বিপদে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু সুদিনের বন্ধুরা দুর্দিনে তাঁকে ত্যাগ করলো। তাঁর সঙ্গে জড়িত হয়ে ফাঁসি বা জেলে যাবার কোনটিই তাদের অভিপ্রেত ছিল না। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যবহার হল, ক্যাপ্টেন লাদুক্স ও দাভিজের। তাঁরা নিজেদের সব পূর্ব কার্যকলাপ অস্বীকার করলেন। অথচ স্পেনে থাকার সময় কর্নেল দাভিজ'কে মাতাহারি ডন কেলো সম্পর্কে সবই বলেছিলেন।

মাতাহারির পক্ষে উকীল নিযুক্ত হলেন মেজর ক্লুনে। তিনি মাতাহারির পুরানো বন্ধু ও মাতাহারির ইচ্ছাক্রমেই তিনি মাতাহারির পক্ষে দাঁড়ান। তাঁর সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকলেও যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কারণ যেখানে কথা বলার দরকার সেখানে তিনি চুপ করে থেকেছেন,—ঠিক সময়ে আপীলের জন্য প্রার্থনা করেন নি। ডাচ লিগেশন ঠিক মত খবর পায় নি। যখন তারা সব জানতে পারে তখন খুবই দেরী হয়ে গেছে। মামলার রায় যেদিন বেরোয় ডাচ লিগেশন ক্লুনের কাছ থেকে সেদিনের খবরের কাগজ ও চিঠি পেয়ে ডাচ সরকারকে চিঠি দেয়। ১লা অকটোবর ডাচ সরকার ফরাসী সরকারের কাছে মাতাহারির প্রাণভিক্ষা চায় যদিও পঁচিশে জুলাই মাতাহারির প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হয়। কোন উত্তর না পেয়ে এবং ডাচ সংবাদপত্রে এসম্পর্কে খবর পেয়ে ১৩ই অকটোবর আবার ডাচ সরকার আবেদন জানায়। আবেদন নামঞ্জুর হয় এবং মাতাহারিকে ১৫ই অকটোবর সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে গুলী করে মারা হয়।

মৃত্যুকালে মাতাহারি খুবই শান্ত ছিলেন। যদিও জেলের ডাক্তার রিজার্ভের মতে এটাও তাঁর অভিনয় মাত্র। শান্তভাবেই তিনি পরিচ্ছদ পাল্টান, ধর্মযাজক ও ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে স্মেলিং সল্টের শিশি দেওয়া হলে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বধ্যভূমিতে যাবার আগে দুখানা চিঠি লেখবার অনুমতি চান। এই চিঠি দুখানার কি গতি হয়েছিল জানা যায় না। কারণ মাতাহারির কন্যা নন কোন চিঠি পায় নি। পরে জন ম্যাকলিয়ড কন্যার বিবাহ বা ভবিষ্যতের জন্য তার মায়ের সম্পত্তি বিশেষত অলংকারাদি সম্বন্ধে খবর চেয়ে পাঠান। ডাচ লিগেশন জানায় যে সে সবই ফরাসী সরকার মামলার খরচ চালানোর জন্য বাজেয়াপ্ত করেছেন। এখানে বলা দরকার মাতাহারির কন্যা নন একুশ বছর বয়সে হঠাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যায়। ঠিক এর আগেই পিতা-মাতার মত সেও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। মায়ের মত সেও শিক্ষকবৃত্তি বেছে নিয়েছিল এবং মন্তেশরি বিদ্যা শেষ করেছিল। এইসব কারণেই বোধহয় সম্প্রতি ইটালীতে মাতাহারির কন্যা বলে এক ছবি তোলা হয়। তাতে মাতাহারির কন্যা শুধু পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মানুষই হয় নি। সেও মায়ের পদাংক অনুসরণ করে স্পাই হয়েছিল। মাতাহারির নিজের জীবনের অলীক রটনা তার মেয়েকেও রেহাই দেয় নি।

মাতাহারির মৃত্যুর পরেও রটনা বন্ধ হয়নি। যেমন ফরাসী আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যে কোন নারীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নিজেকে গর্ভবতী বলে মনে করার কোন কারণ তার আছে কিনা। গর্ভবতী রমণীর প্রসবকাল অবধি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখা হয়। মাতাহারিকেও এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। মাতাহারি তখন আটমাস যাবৎ জেলে রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না এবং তিনি যথারীতি অস্বীকার করেন। কিন্তু কৌতূহলী রসনা ও লেখনী এত সহজে শান্ত হবার নয়। তারা যে অলীক কাহিনী রচনা করলো তাতে মাতাহারি শুধু যে গর্ভবতী তাই নয়, তার উকীল ও প্রেমিক ক্লুনে হলেন ভাবী সন্তানের জনক এবং মৃত্যুকালে দুজনের মধ্যে যে দৃশ্য অভিনীত হয় তা যেমন শোকাবহ তেমনি করুণ। মেজর ক্লুনে অবশ্য মাতাহারিকে সত্যই ভালবাসতেন এবং তাকে বাঁচাতে না পেরে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন।

যে ফ্রান্স ও ফরাসীদের মাতাহারি এত পছন্দ করতেন শেষ পর্যন্ত তাদেরই তিনি বোঝাতে পারলেন না। মৃত্যুদণ্ড পাবার পর কয়েকবার তিনি আপন মনেই এই অবুঝ ফরাসীদের সম্পর্কে স্বগতোক্তি করেছিলেন—"উঃ এই ফরাসীরা!"

মাতাহারির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, গ্রেপ্তারের ঠিক আগে এবং স্পেন থেকে ফেরার পর সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তার অবিরাম মেলামেশা। প্রায় প্রত্যেক দিনই তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অফিসারের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার মধ্যে আইরিশ, বৃটিশ, রাশিয়ান, বেলজিয়ান, ফরাসী সবই ছিল। মাতাহারি এ অভিযোগের বিরুদ্ধে যা জবাব দেন তা এক কথায় কৌতুককর এবং তাঁর চরিত্রের পরিচায়ক। তিনি বলেছিলেন সামরিক পুরুষদের তিনি ভালবাসেন। সারাজীবন তাদের ভালবেসে এসেছেন। আমি একজন ধনী ব্যাংকারের চাইতে বরং একজন দরিদ্র সৈনিকের প্রেমিকা হতে চাই। তাদের শয্যাসঙ্গিনী হবার সময় টাকার কথা আমার মনেও আসে না। তাছাড়া বিভিন্ন জাতির লোকেদের তুলনা করে দেখতে আমার ভাল লাগে। আমি শপথ করে বলছি যেসব সৈনিকদের নাম আপনারা করেছেন তাদের সঙ্গে সম্পর্কের মূলে আমার এই মনোভাবই কাজ করেছে। এই সব ভদ্রলোকেরা আমার কাছে এসেছেন এবং পরিতৃপ্ত মনে ফিরে গেছেন। আমি তাদের সাদরে আহ্বান জানিয়েছি। যুদ্ধের কথা একবারও ওঠে নি। ফরাসী গুপ্তচর বিভাগ অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করে নি। বেপরোয়া মাতাহারির জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে তারা হয়তো বুঝতো যে শান্ত সভ্য করান পোশা মানুষদের চাইতে বলগাহীন দুর্দম সৈনিকরাই তাঁকে বেশী আকর্ষণ করতো।

মাতাহারির মৃত্যুর পর তার এমন কোন সাহসী বন্ধু ছিল না যে অন্তত তাঁর মৃত দেহটি সরকারের কাছ থেকে ফেরত পাবার ও মৃতের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করবে। কোন দাবীদার না থাকায় মাতাহারির দেহ বেওয়ারিশদের লাস যেখানে যায় সেখানেই গেল। প্যারিসের কোন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে উদঘাটিত হল পৃথিবীর এক অন্যতমা চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারিণী নারীর দেহ। যে দেহ দেখবার জন্য জনতা উদগ্রীব হয়ে ভিড় করেছে, যে দেহের স্পর্শ পাবার জন্য ইউরোপের বহু ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তিরা অকৃপণ হস্তে অর্থব্যয় করেছেন সে দেহের সব মাদকতা চিকিৎসকের ছুরির সামনে অতি সাধারণ রক্ত-মাংসের পিণ্ডে পরিণত হল। পরে এই ছিন্নভিন্ন দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। মাতাহারির শেষ এক মুঠো ছাই ফ্রান্সের কোথায় বিশ্রাম করছে জানা যায় নি।
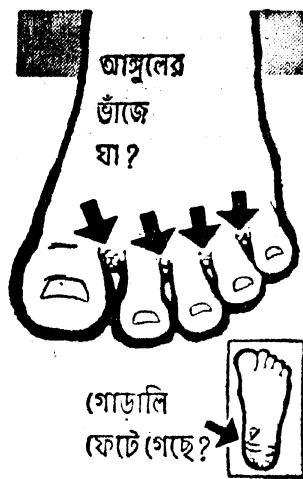
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ন তত্ত্ব-সন্ধানের গুরুত্ব—

নবম হইতে দশম শতকের মধ্যে রচিত পদকে বাংলাকাব্যমহাদেশের সহিত ছন্ন স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই মনে হয়। জাতীয় রচনার ভাবধারা ও কাব্যাদর্শের বাংলার জাতীয় জীবনে কোথায় ছিল া আমাদের নিকট ধারাবাহিক-সূত্রে পষ্ট হইয়া উঠে না। সমকালীন যে বন-ইতিহাস, ভাষাবিবর্তন ও সাহিত্য-চেষ্টার প্রতিবেশে ইহাদের উদ্ভব তাহার শনগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়া অনিশ্চিত অনুমানকে গ্রয় করিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যধারার ভব ও দিক্-পরিবর্তনের মর্মরহস্য গত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত রেন যে চর্যাপদের মত বহুশতাব্দী-রিত পরিণত মনন ও মার্জিত শরীতিতে বিশিষ্ট ও ধর্মমতবাদের তহ্যবাহী রচনা স্বয়ম্ভু হইতে পারে না। ার পিছনে একটি সুদীর্ঘ সাধনার হাস, জনমনের একটা বহু-অনুশীলিত নদর্শন সক্রিয় ছিল। তুর্কীবিজয়ের পর ার ধারা যে অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়াছিল াও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইহার ূর্বে ও পরে মঙ্গলকাব্য ও রাধাকৃষ্ণ-াহিনীর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আবির্ভাব পর্যন্ত, ঙালী মনের নানা সৃষ্টি প্রচেষ্টা, বাঙালী নার নানা আবর্তন, বহু একগোষ্ঠীভুক্ত পভাষার দ্বিধাজড়িত চর্চার মধ্য দিয়া কটি কেন্দ্রীয় ভাষার অন্বেষণ ও সমস্ত ত্তরাপথ-ব্যাপ্ত সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ য বাংলা-সাহিত্যের গতিপথকে চিহ্নিত রিয়াছিল, তাহার নিদর্শন মিলিবে। এই ানা শাখাবিভক্ত প্রয়াসের যথাসম্ভব পরিচয় ইলে একদিকে প্রাক্-চর্যাপদীয় যুগের, অন্যদিকে চর্যাপদ হইতে বড়ু চণ্ডীদাস পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী দৃশ্যতঃ ন্ধ্যা অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে নব-প্রস্তুতির অঙ্কুরোদ্গম পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে।

২

প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা-প্রাকৃত
(ক)—সংস্কৃত

বাঙলাদেশে সংস্কৃত যে আদি সাহিত্যিক ভাষা ছিল না, তাহার বহু পূর্বে যে জনসাধারণের কথিত সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যমর্যাদাসম্পন্ন ছিল ও চিরস্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন মহাস্থানগড় শিলালিপিতে বর্তমান। ইহার সম্ভাব্য কাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এই প্রাচীন যুগে সংস্কৃতের মহিমা বাঙালী সাহিত্য-চেতনায় ও চর্চায় কোন রেখাপাত করে নাই—দেবভাষার বিজয়-রথ তখনও পূর্বভারতের সীমা অতিক্রম করে নাই। প্রাকৃতের সার্বভৌমত্ব তখনও ভারতের সমস্ত অঞ্চলে, যৎসামান্য প্রাদেশিক রূপভেদ সত্ত্বেও, সর্বস্বীকৃত ভাষাতাত্ত্বিক সত্য।

তাহার প্রায় সাত শতাব্দী পরেই সংস্কৃতের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বাঁকুড়া শুশুনিয়া, ও গুপ্তবংশের সমকালীন লিপিগুলিতে, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে সংস্কৃতের প্রয়োগ। বিশেষতঃ ভাস্করবর্মার শাসনখানি রাজ-প্রশস্তিমূলক ও 'কাদম্বরী'-সুলভ অলংকারবহুল, দীর্ঘবাক্যবিন্যাসবন্ধ রীতিতে রচিত।

সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ

তাহার পরবর্তী পাল ও সেনরাজাগণের শাসনগুলিতে সংস্কৃত কাব্যপ্লাবনের অনুপ্রবেশ। ইহাদের উদ্দেশ্য কতক রাজপ্রশস্তি, কতক ইতিহাসবিবৃতি, কতক দেবস্তুতি-মূলক হইলেও ইহাদের মধ্যে বাঙালী কবির কবিত্ব-স্রোত অজস্রধারায় প্রবাহিত। বাঙালী যে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত রচনা-রীতিতে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছে ও এই নবার্জিত ধ্বনিবহুল, ও শব্দ ও অর্থালংকারের সার্থক প্রয়োগে চমৎকৃতি-উদ্দীপক ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই নিজ অন্তঃসঞ্চিত ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যবোধের মুক্তিসাধনায় রতী হইয়াছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

জয়দেবপূর্ব কৃষ্ণকথা

ইহাদের মধ্যে কয়েকটিতে কৃষ্ণলীলা ও কয়েকটিতে শিবমাহাত্ম্যের সসম্ভ্রম উল্লেখ প্রমাণ করে যে বাঙালী কবিরা শুধু সংস্কৃত কাব্যসৌন্দর্যে নয়, হিন্দুধর্মানুগত পুরাণ-চেতনায় ক্রমপ্রবীণ্যের নিদর্শন দেখাইতেছে। এখানে আমরা একটি আদিতে অনার্য জাতির আর্যসংস্কৃতিতে প্রথম দীক্ষার সূচনা দেখিতেছি। এখানেই বাঙালী কবিরা ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা কাব্যের—বৈষ্ণব, শাক্ত কবিতা ও বিষয়ের নূতনত্ব সত্ত্বেও, মঙ্গল-কাব্যের—উপাদান ও মানসিকতার ভিত্তি-স্থাপন করিতেছেন। এখানেই নিজ অন্তরে ভবিষ্যৎ রসসিক্ত কবিতার বীজ বপন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন ও কালপ্রবাহ-বিধ্বস্ত সাহিত্যকৃতির শূন্যতার উপর সেতু-রচনার মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন।

জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্বসূচনারূপে ভোজবর্মের শাসনে ব্রজলীলার উল্লেখসূচক এই শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য।

> সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ
> কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
> অর্ঘ্যঃ পুমাংশকৃতাবতারঃ
> প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ।।

শিলালিপি ও রাজপ্রশস্তি

এখানে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরূপের মিশ্রণ দেখা যায়, এবং চৈতন্যধর্মের কৃষ্ণের পূর্ণাবতারত্ব এখনও অস্বীকৃত রহিয়াছে। অবশ্য যদিও কৃষ্ণের উল্লেখ সময়ের দিক দিয়া অগ্রগামী, তথাপি মনে হয় যে শিবের প্রতি ভক্তিই বাঙালীর অন্তরে আরও গভীরতর ও উচ্চতর কাব্যপ্রেরণার উদ্দীপক। রাধাহীন কৃষ্ণ বাঙালীর অন্তরাকাশে সদ্য উদয়োন্মুখ; শিব কিন্তু মধ্যগগনারোহী সূর্যের মত পূর্ণপ্রদীপ্ত ও ভাস্বর। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে যখন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা বৈদিক ধর্ম ও উপনিষদ-দর্শনের নিন্দায় মুখর ও পুরাণ-চেতনার আভাসমাত্র তাঁহাদের ভাব-পরিমন্ডলে অনুপস্থিত, তখন রাজসভার কবিগোষ্ঠী সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পুরাণ-সংস্কৃতির গভীরে আকণ্ঠ নিমগ্ন। বাংলা-সাহিত্য এখনও এককেন্দ্রিক, কিন্তু বাঙালী মানসিকতা বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও হিন্দু ভক্তিবাদের মধ্যে স্পষ্টতঃ দ্বিধাবিভক্ত।

শিলালিপি ও তাম্রশাসন সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত নয় ও উহাদের উপলক্ষ্য কবি-প্রেরণার পরিবর্তে ধর্ম ও রাজনীতিসংশ্লিষ্ট অভিপ্রায়। তথাপি উহাদের অতিসংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও ভাবচমৎকৃতি উৎপাদনের লক্ষ্য সুপরিস্ফুট; উহাদের মাধ্যমে তৎকালীন যুগপরিচয় ও কাব্য-চিন্তারও নিদর্শন প্রচুর। রাজপ্রশস্তি ও মন্ত্রিসম্বর্ধনার অনিবার্য অতিরঞ্জন প্রবণতার মধ্য দিয়াও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ও চরিত্র-উদ্ঘাটনের পরিচয় মিলে।

খণ্ডকাব্যের প্রসার

প্রশস্তিকবিতা ক্রমশঃ শিলা ও শাসনের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া খণ্ডকাব্যের উদারতর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রয়োজনের চিহ্ন গৌণ হইয়া কবিমনোভাবের স্বাধীন ও পল্লবিত প্রসারই প্রাধান্য লাভ করিল। বিশেষ প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সাধারণ মহিমা-কীর্তনই কাব্যসৌন্দর্যকে অবলম্বন করিয়া প্রকট হইয়া উঠিল। শ্রীবাচস্পতি কবিকৃত মহামন্ত্রী-ভবদেব-ভট্টপ্রশস্তি হয়ত তৎখানিত সরোবরে স্নানার্থিনী রাঢ়সীমন্তিনীগণের যে মুখসৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছে তাহা অতিশয্যবিড়ম্বিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ একই শ্লোকে রাঢ়সীমান্তের যে জলহীন ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-সংস্থানের উল্লেখ আছে তাহা একটি খাঁটি ভৌগোলিক তথ্যের পরিচয়বহ।

৩

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত

এইবার সংস্কৃত কাব্যচর্চার মাধ্যমে মাতৃভাষাপ্রয়োগবঞ্চিত বাঙালী কবিমানসের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। অভিনন্দের 'রাম-চরিত' কাব্য বাঙালী কবির রচনা কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে দেবী মহিমার সহায়তায় রামচন্দ্রের লঙ্কা-যুদ্ধজয়বর্ণনার মধ্যে বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের ভক্তিরসার্দ্র চিত্তপ্রবণতার পূর্বাভাস আবিষ্কার করা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যটি কিন্তু নিঃসংশয়ে বাঙালী কবির রচনা ও উহার শ্লোকগুলির আদ্যোপান্ত শ্লিষ্ট প্রয়োগ সেই যুগের কবিমানসে রাজপ্রশস্তি ও দেবভক্তি-নিবেদনের যুগ্ম প্রেরণার নিপুণ সমন্বয়ের চমৎকার দৃষ্টান্ত। কবি এই উপায়ে শুধু যে স্বর্গমর্ত্য দুইদিকই বজায় রাখিয়াছেন তাহা নহে; রাজমহিমার প্রতি অর্ঘ্য সমর্পণের চিরপ্রথাগত পূজাবিধির মধ্যে নবজাত পুরাণচেতনার ভক্তিনির্মাল্য যে কেমন করিয়া মিশিয়াছে তাহার ইতিহাসটিও ইহার মধ্যে সঙ্কেতিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যের উদ্বোধন-শ্লোকেও কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনায় একই গুণবাচক শব্দাবলীর দ্ব্যর্থক আরোপ ও সমকালীন জনচিত্তে শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয়াকাঙ্ক্ষা সূচিত করে।

সদুক্তিকর্ণামৃত

কিন্তু সংস্কৃতপ্রকীর্ণ শ্লোকের ভিতর দিয়াই বাঙালীর কাব্যকৌতূহল ও জীবন-রসনিষ্ঠতার আশ্চর্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও ইহাদের মধ্যে প্রকাশিত ভাব-ধারাই ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা কাব্যের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সৌভাগ্য-ক্রমে এই প্রকীর্ণ কবিতার দুইটি সুবৃহৎ সঙ্কলন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়া দশম হইতে দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী পূর্ব-ভারতীয় কবিগোষ্ঠীর কাব্যচর্চা ও মানস-রুচির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাব্যের দিক দিয়া অগ্রবর্তী সঙ্কলনটির নাম 'সুভাষিত রত্নকোশ' (পূর্বনাম 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়')। এই সঙ্কলনের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মাবলম্বী বহু বাঙালী কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বাঙলাদেশ ও সমাজব্যবস্থার সহিত আরও নিবিড় সম্পর্কান্বিত। সঙ্কলয়িতা শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস লক্ষ্মণসেনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন ও শ্রীধর নিজেও মাণ্ডলিক শাসনকর্তারূপে সেন-শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সঙ্কলনসমাপ্তির তারিখ ১২০৭ খৃষ্টাব্দ — অর্থাৎ তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পরেই। মনে হয় সে সময় লক্ষ্মণসেন তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপ হইতে পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করিয়া শেষোক্ত স্থানে রাজ্য চালাইতেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এই অতর্কিত বিপৎ-পাতের কোন ছায়া সঙ্কলিত শ্লোকগুলির উপর নিক্ষিপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এর শ্লোকসমূহের শ্রেণী-বিভাগ প্রণালী পর্যালোচনা করিলে সমকালীন কবিগোষ্ঠীর বিষয়বৈচিত্র্য ও কাব্যভাবনাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ মোট ৪৭৬টি শ্লোক নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিন্যস্ত হইয়াছে।

অমর প্রবাহ— ৯৫
শৃঙ্গার প্রবাহ—১৭৯
চাটু প্রবাহ— ৫৪
অপদেশ প্রবাহ— ৭২
উচ্চাবচ প্রবাহ— ৭৬

অমর প্রবাহ

অমর প্রবাহে নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর, বিশেষতঃ হরগৌরী ও কৃষ্ণবিষয়ক বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলিতে প্রমাণ হয় যে আর্যসংস্কৃতিতে নবপ্রবিষ্ট প্রত্যন্তপ্রদেশ বাংলা কত অল্পকালের মধ্যে পৌরাণিক দেবদেবীমণ্ডলকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে ও উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিজ কবিকল্পনা ও অন্তরের ভক্তি-ধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষা ও ঐ দীক্ষায় দ্রুত সিদ্ধিই এই গ্রন্থে বাঙালী মানসিকতার নবপরিচয় বহন করিয়াছে। ইহাতে নারায়ণের দশাবতার প্রশস্তিজ্ঞাপন ও রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার কলাচাতুরি বর্ণনা জয়দেবের ভারতবিখ্যাত গীতিকাব্য 'গীত-গোবিন্দ'-এর প্রেরণা যোগাইয়াছে এ অনুমান সঙ্গতভাবেই করা যায়। এই প্রকীর্ণ শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতবর্ণিত ঐশী মহিমা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার গোপীনাগর ও রাধাবল্লভ রূপটিই নানা সংক্ষিপ্ত চটুল ইঙ্গিতের সাহায্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সেনবংশের রাজসভায় বল্লালসেন লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন প্রভৃতি রাজবংশীয় কবিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাধাকৃষ্ণপ্রেমের একটি রসোজ্জ্বল, প্রাকৃত কেলিবিলাস ও অধ্যাত্মভক্তিদ্যোতনার মিশ্রণগঠিত ভাবাবহ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে রচিত হইতেছে তাহা আমরা যেন চোখের সামনে দেখিতে পাই। গীত-গোবিন্দকে একটি রত্ন-প্রবাল দ্বীপের সঙ্গে তুলনা করিলে কোন্ শঙ্খচূর্ণের কণা-সমবায়ে ইহা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এই শ্লোকগুলি পড়িলে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা-সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠী—উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধন—এই প্রেমারতির উপচার যোগাইয়াছেন, এই পূজার্চনীয় শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিয়াছেন ও পুষ্পার্ঘ্যের অঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে জয়দেবকে এই রাধা আরাধনায় প্রধান পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া নিজদিগকে পূজামণ্ডপ সজ্জার গৌণ আয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। সখী পরিচর্যায় লালিত বৃন্দাবন লীলার ন্যায়, বাঙলা কাব্যে মিলিত বহু কবির সাধনার ফলস্বরূপ এই প্রেম-কাহিনীর গীতসুষমাময় রূপান্তরটি এক আশ্চর্য প্রতিবেশ-দাক্ষিণ্যে, অন্তর-বাহিরের এক অপূর্ব সহযোগিতায়, বসন্তের পূর্ণ-বিকশিত পুষ্পের মত বাঙালী মনের নবরসপুষ্ট তরুশাখায় সৌন্দর্যস্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকীর্ণ কবিতায় রাধা-কৃষ্ণ প্রেম

রাধা-কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ যে পু মহিমা হইতে প্রাকৃত জীবনরসধারায় সঞ্চারিত হইয়াছে, প্রকীর্ণ শ্লোকের বর্তিতা তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ ব মনে হয়। পংক্তিচতুষ্টয়সীমিত এই শ্লে গুলির মধ্যে যে ঐশী-বিভূতির চূর্ণব টুকু ঝিকমিক করিয়া উঠিয়াছে তা ভক্তি ও কৌতুকরস এক যৌগিক ভাবস সমন্বিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভ সুপ্রাচীন বৃক্ষকাণ্ডের উপর কৌতুকের পাতা উদগত হইয়া সূর্যকিরণের আন ও বসন্তবায়ুর ক্রীড়াশীলতাকে আ করিয়া আনিয়াছে। বিশেষণব্যূহের ঘনবিন্যস্ত পৌরাণিক ভাবগাম্ভীর্য চ কটাক্ষময় উপসংহারের প্রাকৃতরস-উদ্দী ভক্তির উপর মানবিক আবেগের জয়ে যে করিয়াছে। সংস্কৃত ধ্বনিপ্রবাহের মেঘম উপর লঘুচারিণী বিদ্যুৎরেখা একটি স্নি হাস্যের প্রসাদদ্যুতি বিকীর্ণ করিয়া ভগবান হরির কীর্তি যতই অভ্রভেদী হ না কেন, এই শ্লোকরচয়িতারা শেষে পয তাঁহাকে ব্রজবধূর প্রগলভতার নি নিরুত্তর, তাহার সৌন্দর্য-আকর্ষণের নি অসহায় ও তাহার প্রণয়চাতুর্যের নি লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িয়াছেন। শ্লোকের উ শ্লোক স্তূপীকৃত করিয়া তাঁহারা স বিজয়ী ভগবানের এই গোপীবশ্য চিত্রটি গাঢ় বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছে ভাবগত ও অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ চরি এই লঘু, প্রেমবিহ্বল রূপের উ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেখানে সম্ভ্র মূল সুর। দশম-একাদশ শতকের প্রক শ্লোকের কবিগণ সম্ভ্রমের এই অখ স্বর্ণমুদ্রাটি ভাঙ্গাইয়া ইহাকে বি লৌকিক প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য খু রেজকিতে পরিণত করিয়াছেন ও প্রা জনসমাজে এই স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া নি মধ্যবিত্তের জীবনব্যাপারেও মূল্যব ধাতুর বহুল প্রচার ঘটাইয়াছেন। ইঁহা মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়সম্পর্ক সমা চেতনায় এক নূতন তাৎপর্য প্রতিভ হইল। ইঁহাদিগকে বিদ্যাপতির অব্যবহ অগ্রজ ও চৈতন্য-প্রেমধর্মের সুদূর সঙ্কে বহরূপে অবিহিত করা যায়, আর জয়দে 'গীতগোবিন্দ' ত ইঁহাদের কল্পনাবিকী ভাবকণিকাসমূহের সঞ্চয়নলব্ধ তিলোত্ত কাব্যপ্রতিমা।

শৃঙ্গারপ্রবাহ

শৃঙ্গারপ্রবাহের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্লো গুলি প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের কাব্যসৌন্দর্য ভাবচটুলতার রোমন্থন-প্রক্রিয়ার দ্বা কবিমনে উহার অধ্যাত্ম নির্যাসটুকুর প্র সচেতনতা জাগাইতে সহায়তা করিয়াছে এইরূপে ইহারা রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার লৌকি ভাবাশ্রয়ের পটভূমিকাটি রচনা করিয়াছে কৃষ্ণকথার সহিত আলঙ্কারিক প্রণয়কল প্রশস্তির সংযোগে প্রেম উহার দৈহি স্থূলত্ব পরিহার করিয়া এক সূক্ষ্মত

দ্যোতনায় উদ্বর্তিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটির উল্লেখ করা যায়। এই শ্লোকটি এক অসতী নারীর বিবাহপূর্ব অবৈধ স্মৃতি-রোমন্থন বিষয়ক হইয়াও প্রতিবেশমাধুর্যের প্রভাবে ও সূক্ষ্ম অতৃপ্তির প্রেরণায় শ্রীরাধিকার সহিত অবস্থা-সাম্যের যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতেই ইহা বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডলে উন্নীত হইয়াছে।

প্রেমধারণার ক্রমশুদ্ধিসাধন

মামুলি কবিকল্পনাসৃষ্ট ও অভিজাত সমাজসমর্থিত প্রণয়কাহিনীর আবহাওয়ায় রাধাকৃষ্ণের দিব্যপ্রেমের দৃষ্টান্ত যে কোন মনোভাব লইয়া উপস্থাপিত হউক না কেন, তাহার অনিবার্য ফল হইবে প্রেমধারণার ক্রমবিশুদ্ধিসাধন। যে অভক্ত সেও ক্রমশঃ ভক্ত হইবে, যে ইন্দ্রিয়সুখলোলুপ সে প্রেমের মহনীয় দিকের প্রতি সচেতন হইবে, যে কবি রাজরুচিতৃপ্তির জন্যে কেলিবিলাস বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারও কাব্য সরস্বতীর বীণায় উদারতর সুরে ঝংকৃত হইয়া উঠিবে। মর্ত্যসৌন্দর্যপিপাসার স্থূল বৃন্তে দিব্য প্রণয়ের সুরভিকুসুম বিকসিত হইবে। রাধাকৃষ্ণপ্রণয়ের মধ্যে যে তত্ত্ব-গভীরতা, যে আকাঙ্ক্ষার আকূতি ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের যে ভোগবিহ্বলতা ও অলৌকিক এষণার নিগূঢ় সহমর্মিতা নিহিত, তাহা সমস্ত লৌকিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্যানুভবের সূক্ষ্ম পথে কবি-আত্মার মূল বোধিকেন্দ্রে সংক্রামিত হইবেই হইবে। এই সত্যটি আমরা সে যুগের বাস্তব কাব্য-জগতে প্রত্যক্ষ করি। তাই লক্ষ্মণ সেনের বিলাসমগ্ন, কামকলাচর্চাসক্ত রাজসভায় স্বয়ং রাজা হইতে রাজকবিগোষ্ঠী সকলেই কৃষ্ণলীলায় রসবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন ও ভোগসুখপ্রশস্তির মধ্যে তাঁহাদের কণ্ঠে দিব্য উপলব্ধির সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। জয়দেবের কণ্ঠে ও বিলাসকলাকুতূহল ও হরিকথাসরসতা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে মিথিলা রাজসভায় কবি বিদ্যাপতিরও অনুরূপ গোত্রান্তর ঘটিয়াছে। তাঁহার মানসবৃত্তি প্রাকৃতসমাজে প্রস্ফুটিত ফুলের মধুপান করিতে করিতে কখন এক অলৌকিক লীলা-সমুদ্রের গভীরে আত্মবিস্মৃত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—এও সেই গ্রাম্য লম্পটের কাহিনী, সেই পল্লীরুচির ইতর ভোগাসক্তি রাধাবিরহের অতল-গভীর লবণ-সমুদ্রের অভিষেকে অভিশাপমুক্ত আত্মার ন্যায় কোন্ এক অচিন্তনীয় দেবলোকের নীলিমায় উধাও হইয়াছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এই বহুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য শুধু বিষয়বাহিত্যে নয়, আত্মিক বিশুদ্ধিতেও সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

জীবননিষ্ঠার নিদর্শন

পুরাণকাহিনীর রসানুগত প্রয়োগ ও কৃষ্ণকথার তত্ত্ব হইতে লীলায় রূপান্তর-সাধন ছাড়াও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'—এ বাঙালী কবিমানসের কাব্যপরিধি বিস্তারের আরও প্রমাণ মিলে। চাটুপ্রবাহে রাজবর্গের প্রতিটি গুণের প্রশস্তি যুদ্ধবর্ণনা ও ক্ষাত্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্বসংকীর্তন, দান, ক্ষমা প্রভৃতি মহৎ বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ প্রভৃতি বিষয়ে রাজ-চরিত্রমহিমার বিভিন্ন দিকের সহিত কবি-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাহাদের কবিতার জীবননিষ্ঠতার নিদর্শন। এই পর্যায়ের শ্লোকগুলিতে অতিরঞ্জনপ্রবণতার সহিত বস্তুগত জ্ঞানের একটি সুষ্ঠু সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। অপদেশপ্রবাহে দেব, জ্যোতিষ্ক, নানাজাতীয় জীবজন্তু, বৃক্ষ-পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। এই পর্যায়ে পূর্বপ্রসিদ্ধির অনুসরণই প্রধান; তথাপি মাঝে মধ্যে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণেরও যে চিহ্ন নাই তাহা নয়। সর্বশেষে উচ্চাবচ প্রবাহে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃষিনির্ভর পল্লীজীবনের শস্যপ্রাচুর্যসমৃদ্ধ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য, দরিদ্র স্ত্রীর আক্ষেপ ও দরিদ্র-গৃহের জীর্ণাবস্থার বাস্তব বর্ণনা পাই। অবশ্য সংস্কৃত দেবভাষার ধ্বনিবহুল, বিশেষণ ভারাক্রান্ত রাজৈশ্বর্যের মধ্যে দীনের তুচ্ছতা যেন ভাষাবিলাসের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতঃ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য কদাচিৎ রক্ষিত হইয়াছে। শার্দূলবিক্রীড়িত মন্থরগতি ছন্দে শফরীলম্ফনকথা বিবৃত হইতে দেখা যায়। এই দিক দিয়া সংস্কৃতের কাব্যাদর্শ বাংলার পক্ষে অহিতকরই হইয়াছে—বিষয়ের বাস্তবানুসৃতি বর্ণনারীতির অতিস্ফীতিতে কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সংস্কৃত কবিতার সহিত ও প্রাকৃত ও অপভ্রংশের শব্দ ও ছন্দোবিন্যাসের তুলনা করিলেই নবাগত ভাষাগুলির অধিকতর বিষয়োপযোগিতা সহজেই বুঝা যাইবে। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলা ভাষা সর্বতোভাবে সংস্কৃত-রীতিপ্রভাবিত না হইয়া উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাষারূপগুলির প্রত্যক্ষতা ও ভাবানুগামিতার বাগ্‌বিন্যাস ছন্দকেই মুখ্যভাবে অনুবর্তন করিয়াছে। কাব্যে বাঙালীর মানসক্রিয়া নিজ অন্তর-উৎসারিত সহজ প্রকাশভঙ্গীর প্রতি উন্মুখতা দেখাইয়াছে। বরং ঊনবিংশ শতকে গদ্যের কৃত্রিম প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য বাঙালী লেখক সংস্কৃত ও পারসিক স্বধর্মবিরোধী শব্দযোজনা রীতিকেই প্রথম প্রথম আশ্রয় করিয়াছে। সংস্কৃত প্রকীর্ণ-কবিতা-সংগ্রহধৃত কবিতাগুলির অধিকাংশই প্রাক্‌মুসলমান ও চর্যাপদের সমকালীন যুগের রচনা। ইহাদের সাহায্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবপ্রসূত দুইটি সমান্তরাল ভাবধারার যুগপৎ প্রবাহ অনুমান করা যায়। কিন্তু তুর্কীবিজয়ের অভিঘাত-প্রতিক্রিয়া ইহাদের মধ্যে একেবারে নিঃস্তব্ধ। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে ম্লেচ্ছরাজপ্রশস্তিতে এই নীরবতা একবারের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে হয়, কিন্তু ইহা যদি তুর্কবিজেতার স্তুতি হয়, তবে শ্রীধরদাস ইহা তাঁহার সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করিবেন কেন?

আর্যাসপ্তশতী

অন্যান্য সংস্কৃত রচনার মধ্যে গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তসতী' আদিরসাত্মক খণ্ডকবিতার সমষ্টি। ইহাতে কবি যে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ভাষারীতির মধ্যে তির্যক ব্যঞ্জনাগুণের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাহা স্বল্পাক্ষর অর্থ-গূঢ়তায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

> বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব
> 　　　　সংস্কৃতং নীতা।
> নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যেব
> 　　　　গগনতলং।।

প্রাকৃতের রস সংস্কৃতে প্রকাশচেষ্টা যেন যমুনার নিম্নপ্রবাহিনী জলকে আকাশে ওঠানোর মত অসাধ্যসাধন। অভিজাত ও লৌকিক ভাষার এই বিভেদজ্ঞানই বাংলায় নিজস্ব রীতি-উদ্‌ভাবনের মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছে। বারাঙ্গনার বঙ্কিম চরণক্ষেপের যে লাস্যভঙ্গী তাহাও কবি নিপুণ বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন:—

> ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি
> 　　　　নিখিলনাগরাচারং।
> ইহ ডাকিনীতি পল্লপতিঃ
> 　　　　কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি।।

সাধারণতঃ আদিরসপ্রিয় সংস্কৃত কবিগোষ্ঠী অসতী রমণীর রূপবর্ণনায় যেখানে বিহ্বল-চিত্ত হইয়া নীতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান, গোবর্ধন সেই রূপবিলাসিনীকে সরাসরি ডাকিনী অপবাদে কলঙ্কিত করিয়া ও গ্রামশাসনবিধিতে দণ্ডনীয়রূপে দেখাইয়া তাহাকে সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে সমাজলাঞ্ছনার কঠোর ভূমিতলে অবতরণ করাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে জয়দেবের প্রশংসাবাণীর—শৃঙ্গাররসের সৎ ও প্রেমের রচনায় গোবর্ধন তুলনারহিত এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। কবির উদ্দেশ্য যে সৎ অথবা নীতিসমর্থিত ও তাঁহার বর্ণনা যে অতিশয্যহীন এই শ্লোকটিই তাহার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পবনদূত ও গীতগোবিন্দ

ধোয়ীর 'পবনদূত' দূতকাব্যরূপে কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর সার্থক অনুসরণ ও 'গীতগোবিন্দ'-এর পরে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠালাভে ধন্য। কালিদাসের যক্ষবর্ণিত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত যাত্রাপথ—সৌন্দর্যপরিচয় এই কাব্যে দাক্ষিণাত্য হইতে নবদ্বীপ ভ্রমণের মধ্যবর্তী ভূভাগের প্রাকৃতিক আকর্ষণের বৃত্তান্তে অনুকৃত হইয়াছে। পরবর্তী কবির বাস্তব চেতনা যে বহুশতাব্দীর ব্যবধানে তীক্ষ্ণতর হইয়াছে তাঁহার কল্পলোককল্পনায় ভারতের ভৌগোলিক সত্য যে আরও সত্যতররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের সহিত তুলনায় বাঙালী কবির ভাবপরিবেশ এতটা সার্বভৌম তাৎপর্যমণ্ডিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার কল্পনার রথ মাটির আরও কাছাকাছি আসিয়াছে। সুহ্মদেশের গঙ্গাজলবিধৌত স্নিগ্ধতা ও উহার ব্রাহ্মণ-গৃহিণীদের শশিকলানিভ কোমল তালীপত্র-রচিত কর্ণাভরণ বাস্তব সত্যের সার্থকতর পরিচয় বহন করে—উজ্জয়িনী-সৌন্দর্য ও দশার্ণ গ্রামের শ্যামশ্রীর মত সম্পূর্ণভাবে কাব্যরমণীয়তার আদর্শানুসারী নয়। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ মহিলাদের বিশেষ উল্লেখ

তাহাদের দারিদ্র্য ও সুকুমার রুচি উভয়েরই ইঙ্গিত দেয়। ব্রাহ্মণীদের যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না—শ্রেষ্ঠী পত্নীদের মত রত্নাভরণ পরিবার তাহাদের সঙ্গতি নাই। সুতরাং কাঁচ তালপাতা দিয়া তাহারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে বাধ্য হয়। আর একটি শ্লোকে বাঙালীর সৌন্দর্যসাধনারত, সৎসঙ্গ-উৎসুক, রাজদরবারে স্বীকৃতিকামী ও ভক্তিপ্রবণ জীবনাদর্শের ছবিটি—তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধক সত্য শিব ও সুন্দরের আরাধনায় উৎসর্গিকৃত জীবন-চর্যার অভীপ্সাটি—গভীর আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে।

লক্ষণসেনের রাজধানীর রুচিশিথিলতা

লক্ষ্মণসেনের রাজধানী আদিরসের লীলাক্ষেত্র, কবিকল্পনার কল্পলোক, এখানে নীতির প্রশ্ন হয়ত অবান্তর। কিন্তু প্রেম-বর্ণনায় যেখানে অশালীন আতিশয্য বা স্থূল রুচির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে কল্পলোকসৃষ্টিতেও বাস্তব জগৎ হইতে উপাদান-সংগ্রহ অনিবার্য, যেখানে প্রাচীন প্রথা ঘটমান জীবনের আশ্রয়ে নবমূর্তিতে প্রতিভাত হয়, সেখানে রুচি-শিথিলতার নিদর্শনগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। বিশেষতঃ যেখানে অচিরকাল মধ্যে ইতিহাসের অভিশাপ আকস্মিক বজ্রপাতের মত বাঙলার ভাগ্যাকাশকে বিদীর্ণ করিয়াছে, সেখানে বিলাসকলা ও প্রমোদবাসনের আতিশয্য আড়ম্বরের মধ্যে আসন্ন বিপদের পূর্বসংকেত আবিষ্কার করা অস্বাভাবিক নয়। হয়ত লক্ষ্ণৌ-এর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের ব্যসনাসক্তি তাঁহার পূর্ব-পুরুষের ধারারই অনুসরণ, কিন্তু যখন রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছে তখন প্রবণতাকে শোচনীয় পরিণতির সহিত কার্যকরণ সম্পর্কিত করিয়া দেখা অনেকটা অনিবার্যই মনে হয়। হয়ত কালস্রোতে ক্ষয়িতমূল বাঙলার রাষ্ট্রবনস্পতি বহুদিন হইতেই পতনোন্মুখ ছিল, কিন্তু যে ঝড় উহার পতনের অব্যবহিত কারণ তাহার অভ্যাগম সম্পর্কে আবহতত্ত্বের সন্ধান লইতেই হয়।

৪

(খ)—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্টসাহিত্য

বাঙালী অন্তরের প্রাকৃত প্রবাহ

কিন্তু উদীয়মান, নব প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, নব মনোভূমিতে রসান্বেষী বাংলা ভাষার নিকটতর সম্পর্ক হইল প্রাকৃত অপভ্রংশ, অবহট্ট ভাষায় লিখিত কাব্য-গোষ্ঠীর সহিত, অতীতাশ্রয়ী, প্রথাবন্ধন-জর্জর, নূতন যুগমানসের পরোক্ষবার্তাবহ সংস্কৃতের সহিত নয়। যখন প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির উদ্গাতাগণ সংস্কৃতের ভিতর দিয়া পুরাণচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন বাস্তব জীবনের রসধারা এই সমস্ত লৌকিক ভাষার মাধ্যমে জনচিত্তে প্রাত্যহিক জীবনচর্যাকে কাব্যের উপাদানে রূপান্তরিত করিতেছিল। অবশ্য সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ক্ষীণ প্রণালী বাহিয়া এই জীবন-কৌতূহলের কিছুটা সাহিত্যে সংক্রামিত হইতেছিল। তথাপি সংস্কৃতের গৌরব যে অতীতচারী ও উহার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নয়, এই প্রতীতি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতা ছাড়া সকলেই প্রায় উপলব্ধি করিয়াছিল। বৌদ্ধ সাধকেরা ধর্মপ্রচার ও তত্ত্বব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃতকে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও নবোদ্ভিন্ন বাংলা ভাষার আশ্রয় লইতেছিল। কৃষ্ণকথা, ভাগবতধর্ম ও বর্ণশংকর দেবদেবীপ্রশস্তি ক্রমশঃ বাংলার মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া যাঁহারা সংস্কৃতে লিখিতেন তাঁহারাও এই দেবভাষার মধ্যে কতটা যথার্থ কাব্য-প্রেরণা লাভ ও ভাবোল্লাস অনুভব করিতেন তাহাও সন্দেহস্থল। জয়দেব তাঁহার গীত-গোবিন্দ-এ সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে উদ্বেলিত ভক্তি ও সৌন্দর্যামিশ্র আবেগের মুক্তি দিবার জন্য শব্দগ্রন্থন, ছন্দোহিল্লোল ও সঙ্গীতময়তার অন্তঃস্পন্দ সবই জনমানসের ভাবপ্লাবিত অপভ্রংশের নৃত্যচঞ্চল গতিসুষমা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্কৃষ্ণ, বহির্গৌর দ্বৈত-রূপের ন্যায় জয়দেবের কাব্যের বাহিরে সংস্কৃতের সম্ভ্রান্ত আবরণ, ভিতরে প্রাকৃত আবেগের দুরন্ত কল্লোল। বাঙালী কবিমন আর দেবভাষার সংবৃত মহিমায়, ভাগবতের শ্লোকগাম্ভীর্যরচিত দুর্ভেদ্য অন্তরাল-বর্তিতায় সন্তুষ্ট নয়, তাহা মেঘদর্শনোৎফুল্ল ময়ূরের মত শতবর্ণ কলাপবিস্তারে ও অভিরাম নটনভঙ্গীতে নিজ অধীরমুখর আত্মাকে প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। গীতগোবিন্দ যেন সংস্কৃত লিপিতে উৎকীর্ণ দেবভাষারই অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত সমাধি—তাজমহল রচনা করিয়াছে। উহার পরেও অবশ্য চৈতন্যযুগে নবোৎসারিত ভাবানুভূতির প্রেরণায়—সংস্কৃত সাহিত্যের সাময়িক পুনর্জন্ম হইয়াছে; চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণ-লীলার যুগপৎ প্রবাহে বাঙালীচিত্তে যে ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ার জাগিয়াছে তাহা সংস্কৃত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র ধারায় ক্ষণমুক্তি লাভ করিয়াছে। ভাবের তুঙ্গতা ভাষামহিমাকে স্বভাবতঃই পুনরামন্ত্রণ জানাইয়াছে। তথাপি চৈতন্যলীলাকীর্তনে সংস্কৃতের অংশ গৌণ; পার্বত্য নির্ঝরিণী যেমন সমতল-প্রবাহিনী নদীকে পুষ্ট করিয়া তাহাতেই মিশাইয়া যায়, তেমনই সংস্কৃত রচনাগুলি বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ও মহাজন পদাবলীর আবির্ভাব সম্ভব করিয়াই নিজ-স্বতন্ত্র মর্যাদা বিসর্জন দিয়াছে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নবযুগের প্রতীক অর্জুনের নিকট দিব্যাস্ত্র সমর্পণ করিয়া নেপথ্যচারী হইয়াছে।

গাথাসপ্তশতী

এই লৌকিক ভাষাসমূহে কবিতার মধ্যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের প্রাকৃত রূপটি তির্যক-কটাক্ষ সংবর্ধিত হইয়া জনচেতনায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। হালের 'গাথাসপ্তশতী' কালের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী। ইহার রচনাকালের শেষ সীমা প্রথম শতাব্দী খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত হইলে ইহা বাংলা ভাষা উদ্ভবের বহু পূর্ববর্তী রচনা। ইহার দুইটি শ্লোকে (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গোপ-সমাজের স্থূল পরিবেশে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটিতে কৃষ্ণ মুখমারুতের দ্বারা 'রাহিআএ" চক্ষে প্রবিষ্ট গোক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা অপসারণ করিয়া অন্যান্য গোপী-গণের ঈর্ষা উৎপাদন করিতেছে। দ্বিতীয়-টিতে যশোদার চক্ষে কৃষ্ণের অনতিক্রান্ত বাল্যস্বভাবে অধিষ্ঠান কটাক্ষে কৃষ্ণমুখ-প্রেক্ষিণী গোপীগণের গোপন হাস্য উদ্রেক করিয়াছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে আর ননীচোরা দামোদর নাই, সে যে গোপীদের সহিত প্রেমচর্চানিপুণ হইয়াছে যশোদার এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা গোপীদের হাসির খোরাক যোগাইতেছে। এই দুইটি পদের মধ্যে কোন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা নাই। ইহারা প্রাকৃত আকর্ষণেরই পরিচয় দিতেছে। এই দুইটি শ্লোক প্রমাণ করে যে ভাগবত রচনার বহু পূর্বে কৃষ্ণের লৌকিক নাগরালির নায়করূপে খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হয়ত কৃষ্ণলীলার এই জন-সমাজ প্রচলিত লৌকিক বৃত্তান্তটিই তাঁহার ঐশী মহিমাপ্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী। গঙ্গাদাসের 'চন্দোমঞ্জরী' হইতে উৎকলিত বহুপরবর্তী আর একটি অবহট্ট-রচিত শ্লোকে (ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৯-এ উদ্ধৃত)।

রাঈদোহড়ী পরণ সুনি
হসিউ কণ্হ গোআল।
বৃন্দাবনঘনকুঞ্জঘর
চলিউ কমণ রসাল।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বাভাস

কবিতাটি একেবারে আমাদিগকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাবপরিমণ্ডলে সোজা পৌঁছাইয়া দেয়। প্রথমতঃ রাধা কর্তৃক ছড়ার আবৃত্তি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রবাদবাক্য-প্রাচুর্যের প্রয়োগ রীতিটির পূর্বাভাস। দ্বিতীয়তঃ 'কণ্হ গোআল' কৃষ্ণের সমস্ত দেবমহিমা অস্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রাম-তরুণসুলভ অমার্জিত প্রকৃতিটির পরিচয় বহন করে। কৃষ্ণের হাসিটিও তাঁহার ইঙ্গিতজ্ঞতার নিদর্শন। 'কমণ রসাল' বাক্যাংশটি তাঁহার সুলভ আত্মতৃপ্তিসূচক রসবিহ্বল পদক্ষেপের ইঙ্গিতদ্যোতক।

প্রাকৃতে বস্তুরস-স্ফুরণ দিদর্শন

ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত ধার শিলালিপিতে অবহট্টের মাধ্যমে সর্ব-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সৌন্দর্য-রুচিত একটি কৌতুককর তুলনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতীয় ঐক্য শুধু ধর্মব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল না। রূপ প্রতিযোগিতা বিষয়েও বিভিন্ন প্রদেশের একটি মিলনক্ষেত্র ছিল। এখানে প্রদেশের সুন্দরী নারী-সংগ্রাহক আপন রাজ্যের নারীসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়া ও অন্যান্য

রাজ্যের রুচির প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষ করিয়া বাস্তবরসস্ফুরণের এক অপূর্ব পরিচয় দিয়াছে। প্রায় সমকালীন ইংরাজ কবি চসারের তীর্থযাত্রীদের বর্ণনার মত এই পরিকল্পনাটিও ক্ষুদ্রতর পরিধিতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসাধনকলা ও পার্থক্যের ও মেজাজ-বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। কেশরচনার বিভিন্ন ছাঁদ, অলঙ্কার সজ্জার রীতিবিভেদ ও কাব্যোচ্ছ্বাসের আপেক্ষিক পরিমাণ লইয়া ইহাদের আকর্ষণ-তারতম্য নির্ধারিত হইয়াছে। অঙ্গসৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা বিশেষ নাই, তবে উপমা সাহায্যে কবির মানস উত্তেজনার পরোক্ষ প্রকাশ অনুমান করা যায়। কোন সুন্দরীর ওষ্ঠাধরপ্রান্ত দুই ফুলের ন্যায়; কাহারও বা স্তনদ্বয়ের রক্তিম উচ্চতা; টাক্কযুবতীর দোরঙা কাচাসি যেন সন্ধ্যার সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলন, আর ঘাগরা ও ওড়না কর্নাটসুন্দরীর কাছা কোঁচা-দেওয়া পরিচ্ছদ লজ্জা দেয়। বঙ্গ-কিশোরীর টেড়িকাটা কেশবিন্যাস, খোঁপার উপর অলঙ্কার যেন রাহুগ্রস্ত রবিচ্ছবি, কর্ণভূষণতাড়িপাত, রোমাবলী-সংসক্ত মুক্তার হার যেন গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের ন্যায় বর্ণ-বৈপরীত্যে শোভমান; পরিধানবস্ত্র কিন্তু শ্বেতবর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বাঙালী মেয়ের রুচিবৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। ইহার পর মালবজাতীয় রূপবণিক গৌড়িয় ব্যবসায়ীকে যে ব্যঙ্গ করিয়াছে তাহাতে কি বাঙালী সম্বন্ধে অন্য প্রদেশবাসীর ধারণার যথার্থ প্রতিফলন হইয়াছে? গৌড়ীয়ের কোপনস্বভাবের জন্য সকলেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জন করে। এই উদ্ধৃতিতে মধ্য-যুগপ্রারম্ভের কয়েকটি বিচিত্র রূপচিত্র, ভারতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে রীতি-আচার-সংস্কৃতির ঐক্যটি বর্ণাঢ্য রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই পদগুলি পড়িয়া মনে হয় যে প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভবের পূর্বে সর্বভারতীয় সংস্কৃত বা প্রাকৃত অপভ্রংশের আশ্রয়ে আমরা পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার পথে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম, প্রাদেশিক সাহিত্যচর্চার ফলে সেই সার্ব-জনীন বোধগম্যতা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছি। বিশেষতঃ প্রাকৃতের মাধ্যমে আমাদের মনে যে বস্তুরসের স্ফুরণ হইয়াছিল কৃত্রিম আদর্শ অনুসরণের ফলে আমাদের উচ্চচিন্তা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বোধের অতিলালনের জন্য তাহার সহজ প্রবাহ যে অনেকটা অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য।

অবহট্ট

অবহট্টে লেখা দোহাকোষগুলি চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক ও প্রায় একই কবিগোষ্ঠী রচিত। ভাষার দিক দিয়া ইহা চর্যাপদের ভাষার কিঞ্চিৎ পূর্বরূপ ও বাংলা পূর্বা-ভাসযুক্ত। কিন্তু উহার রচনাভঙ্গী ও সাধনাতত্ত্ব অভিন্ন। সুতরাং উহাদের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুভঙ্করীর আর্যা ও ডাকের বচনে অবহট্টের কিছু কিছু চিহ্ন ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে রক্ষিত হইয়াছে। কিছু প্রহেলিকা রচনায় ও অর্থহীন বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যেও সংস্কৃত, অবহট্ট ও বাংলার কৌতুককর সংমিশ্রণ দেখা যায়। মোটকথা, কবিরা যে ভাষানৈরাজ্যের যুগে বাস করিতেন ও বাগ্‌বিশৃঙ্খলার যদৃচ্ছ বিন্যাস হইতে তাঁহারা যে কৌতুকরস আহরণ করিতেন তাহাও এই যুগের রচনায় অনুভূত হয়।

৫

প্রাকৃতপৈঙ্গলের গুরুত্ব

'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এর সঙ্কলনকাল চতুর্দশ শতকের কাছাকাছি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা মুসলমান-বিজয়ের পরের সঙ্কলন; কিন্তু উহাতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ববর্তী রচনাই সংগৃহীত হইয়াছে। কালের দিক হইতে ও যুগোচিত কবিপ্রেরণার নিদর্শনরূপে ইহা 'সুভাষিত-রত্নকোশ' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে কিছুটা কম মূল্যবান। কিন্তু ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দোরীতিমুক্ত নবোদ্ভিন্ন বাংলা কোন্ নূতন জীবনক্ষেত্র হইতে রস আকর্ষণ করিতে উন্মুখ ছিল ও কেমন করিয়া উহার সংস্কৃত-অনুকৃতিশ্লথ, প্রথাজীর্ণ ধমনীর মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্যের কৌতূহল, ভাবানুগামী ভাষারীতির নমনীয়তা ও বিপুল ছন্দোল্লাস নবরক্তধারার ন্যায় সঞ্চারিত হইতেছিল। পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যের পুরাণানুবর্তিতা, উহার সংস্কৃত আধিপত্যের পুনঃস্বীকৃতি ও ধর্মাদর্শনিয়ন্ত্রিত জীবন-বিমুখতা উহার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃতের সহিত অন্তরঙ্গ যোগ উহার সর্বভারতীয় সম্পর্কটি স্ফুটতর করিয়াছে, কিন্তু উহার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কিয়ৎ-পরিমাণে অবদমিত করিয়াছে। যদি প্রাকৃতের রসধারাটি বাংলায় অক্ষুণ্ণ থাকিত, তবে কবির প্রত্যক্ষদৃষ্টি স্মৃতিকল্পনার ছায়াপাতে স্তিমিত হইত না, মহাকাব্য পুরাণের অনু-করণে নিজ অনুভূতিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিত না বা বৈষ্ণব পদাবলীতে বৃন্দাবনলীলার ভাবাসঙ্গস্নিগ্ধতায় বাঙলার নিসর্গদৃশ্যের বাস্তব প্রখরতা গোধূলিম্লান বা কল্পলোক-ভাস্বর হইত না। তাহা হইলে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত ব্যতিক্রম না হইয়া নিয়মই হইতেন, বৈষ্ণবসাহিত্যে স্বর্গমর্ত্যে শুধু ভাবের মিলন না হইয়া রূপেরও সমীকরণ সাধিত হইত। সাহিত্যে সরসতা কেবল আদিরসসংপৃক্ত কণ্টকল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকিত না; জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচুর-বিকীর্ণ হইত, শুধু আণুবীক্ষণিক যুক্তির সাহায্যে আবিষ্কৃত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিত না। বাহির হইতে সৌন্দর্য বোধ আহরণের ফলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাও তুচ্ছ নয়। এই মিশ্র সংস্কৃতির কৃপায় আমরা সাহিত্যসম্রাট ও কবি-সার্বভৌমকে পাইয়াছি, কিন্তু এই মুষ্টিমের সংখ্যক কোটিপতি পাওয়ার জন্য আমাদের অসংখ্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সহজ শ্রী ও সচ্ছলতা বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের রচনা-বৈশিষ্ট্য

এইবার 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এর কবিতা-গুলির একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রেম ও প্রকৃতিবর্ণনামূলক কবিতাই ইহাদের মধ্যে প্রধান। প্রেম কবিতা-গুলি সংস্কৃত আদর্শে কল্পিত, কিন্তু উহাদের শব্দবিন্যাসে ও ছন্দপ্রবাহে সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর, সমাস-সন্ধিবহুবন্ধ দীর্ঘবাক্যযোজনার পরিবর্তে পাই বর্ণনার সৌকুমার্য ও সূক্ষ্ম আকৃতির সঙ্গীত তরঙ্গায়িত প্রকাশ। প্রকৃতিবর্ণনার আবির্ভাব প্রায় প্রেমের অনুষঙ্গরূপে, কিন্তু তাহাতেও গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্তের ঋতু আবেদনের সহিত অন্তরানুভূতির স্পন্দনটি একটি অপূর্ব রাসায়নিক সংযোগে মিশিয়াছে ও দুইএ মিলিয়া একটি যৌগিক ভাবাবহসত্তা সৃষ্ট হইয়াছে। এই কবিতাগুলি যে বিদ্যাপতির পদাবলীর পূর্ব সূচনা ও প্রত্যক্ষ প্রেরণাদাতা তাহা আমরা সহজেই অনুভব করি। ইহাদের মধ্যে জয়দেবের শব্দৈশ্বর্য ও সঙ্গীত-ঝঙ্কারমুখরতা বা বড়ু চণ্ডীদাসের প্রত্যক্ষ-দর্শনের আলঙ্কারিক-রীতি-প্রভাবিত উদ্বর্তিত শিল্প-রূপ নাই। সহজ অনুভব ও সাবলীল প্রকাশ ইহাদের মধ্যে একটি অনায়াসসিদ্ধ মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই সুর শোনা যায়। কিন্তু অধ্যাত্মব্যঞ্জনার চাপা সুর ও ভক্তিরসের সর্বব্যাপ্ত গাঢ়তার জন্য এই ধ্বনির মধ্যে এক নিগূঢ়তর অনুরণন ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করিয়া অনির্দেশ্য রহস্যবোধের আকুলতা জাগায়।

প্রাকৃতপৈঙ্গলে কৃষ্ণকথা—

কৃষ্ণকথা সম্বন্ধেও বাঙালীর জ্ঞান ও অনুরাগ যে বাড়িতেছে তাহারও নিদর্শন সঙ্কলন-গ্রন্থটিতে মিলিবে। কৃষ্ণের নৌকা-বিলাসের যে অপৌরাণিক কাহিনী তাহাও যে আদিরসমিশ্র ভক্তিরসের লৌকিক কল্পনা-উদ্ভাবিত হইয়া রাধা-কৃষ্ণলীলার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা আমরা এখানে

মাছের সন্ধানে

ফটো ঃ অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানিতে পারি। সম্ভবতঃ প্রাকৃত বৃত্তি-কল্পিত এই আখ্যানটি এই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকা-কাব্যে স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণকথার অভিজাত সংস্করণ উন্নত ভাবাদর্শের সহিত নৃত্যগীত-সমন্বিত চটুল-তরল প্রণয়মুগ্ধতায় সংমিশ্রিত হইয়া 'গীত-গোবিন্দ'-এ এক পল্লবিত কাব্যরূপে ও নাট্যসংকেতময় ঘটনাবিস্তারের পরিণতি লাভ করিয়াছে। এখানে প্রাকৃত রসাকুলতা কাব্যমহিমার গগণে মর্যাদার তুঙ্গ শৃঙ্গে আরূঢ় হইয়াছে ও এক লঘু আসক্তির গীতি-উচ্ছ্বাসময় কাহিনী সর্বভারতীয় শাশ্বত ভক্তি ও সৌন্দর্যের স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছে। আর প্রাকৃত কাহিনীটি স্থূলে রুচি ও ভোগলালসার কলংকচিহ্ন সর্বাঙ্গে বহন করিয়াও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে নায়িকার বিরহবেদনার মর্মভেদী তীব্রতায় এক বিশুদ্ধতর সত্তায় উদ্বর্তিত হইয়াছে। চৈতন্যপূর্ব যুগে এই দুইখানি কাব্য রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কের দুইটি ধারার উন্নততম প্রকাশরূপে প্রতিযোগী গৌরবে অধিষ্ঠিত। তাহার পর চৈতন্য-প্রভাবের ফলে যখন এই প্রেম-কাহিনীর অধ্যাত্মীকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন প্রাকৃত ধারার মলিন প্রবাহ ভাগবতী চেতনার দিব্য জ্যোতিঃসমুদ্রে বিলীন হইয়া উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছে।

ঐশ্বর্য-মাধুর্যের সমন্বয়

প্রাকৃতপৈঙ্গল-এর কৃষ্ণবন্দনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ও মাধুর্যরূপের মধ্যে কবিচেতনায় কোন তারতম্য বোধ লক্ষিত হয় না—শক্তির দুর্ধর্ষতা ও প্রেমের স্নিগ্ধতা উভয় উপাদানই তাঁহার অলৌকিক বিভূতির মধ্যে তুল্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবানের চানুর-বধের দ্বারা নিজ কুলের কীর্তিপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার ভ্রমরবরের ন্যায় রাধামুখমধুপান একই লীলাসূত্রে গ্রথিত। এই ঐশ্বর্য-মাধুর্যের সমন্বয়ে ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-সংগীতের তরঙ্গিত গতিতে জয়দেবের সহিত সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। তবে কবি জয়দেবের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার উপাদান নাই।

প্রাক্-তুর্কী যুগের নিদর্শন

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতায় শান্ত, পরিতৃপ্ত গৃহজীবনের যে কয়েকটি চিত্র পাওয়া যায়, তাহা প্রাক্-তুর্কী বিজয় যুগের সন্তোষ-সচ্ছলতাময়, নিরুদ্বেগ, নীতিসংগত গার্হস্থ্য পরিবেশেরই সংকেত বহণ করে। যে সমাজের আশ্রয়ে এইরূপ জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইয়াছে তাহার উপর দিয়া কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসকারী ঝটিকা যে বহিয়া যায় নাই, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। বহু শতাব্দীর জীবন-চর্যার নিয়মিত ছন্দ, পুরুষপরম্পরাসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুনিশ্চিত প্রত্যয়বোধ এই পংক্তিগুলির মধ্যে গতির মসৃণতা ও শান্তরসের স্থিরতা সঞ্চার করিয়াছে। এখানে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সমস্ত অশান্ত বিক্ষোভ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জীবন-রসের পরিহাসস্নিগ্ধ উপভোগও এখানে মানস-শান্তির পরোক্ষ প্রমাণরূপে অনুপস্থিত নয়।

রচনার ঐতিহাসিক পটভূমি

এই রচনাগুলিকে যদি মুখ্যতঃ চর্যা-পদের সমকালীন বা অল্প পরবর্তীরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালী ভাবসাম্যবিপর্যয়ের কোন লক্ষণ ইহাদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইবে। তাহা হইবে চর্যাপদ ও বিদ্যাপতি বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে ব্যবধান কালে বাঙালীর কবিমানস কিরূপে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিল তাহার ইতিহাস অনুসন্ধেয়ও হইবে না। মুসলমান অভিভবের অব্যবহিত পরে যে রাজনৈতিক উৎপীড়ন ও সাংস্কৃতিক উন্মূলন বাঙালী জাতিকে দিশাহারা ও উদভ্রান্ত করিয়াছিল সেই বিরাট শূন্যতা-বোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতি কি নূতন আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। অবশ্য ইহার পরবর্তী যুগের ইতিহাস পুরাণের অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্যের নবধর্মরচনার প্রয়াসের মধ্যে নিজ স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম বিপর্যয়-যুগের কোন নিশ্চিত উপকরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বখতিয়ার-খিলজির বঙ্গ ও বিহার জয়ের প্রায় দুইশত বৎসরের পর জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি কতকটা আত্মস্থ হইয়াছে। দাবানলবেষ্টিত আরণ্য পশুপক্ষীর ন্যায় প্রচণ্ড আঘাতের প্রথম বিহ্বল, বিমূঢ়ক্ষণে ত্রস্তভীত বাঙালী পলায়নে আত্মরক্ষা খুঁজিয়াছে — তাহার পুঁথিপত্র ও ধর্ম-আচার লইয়া সে দিগ-বিদিগজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইয়াছে। তাহার এই আপৎকালীন আশ্রয়স্থলের মধ্যে নেপালের হিন্দুরাজদরবারই তাহাকে প্রধানতঃ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছে এবং সেই নেপাল দরবার হইতেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার নাস্ত সাহিত্য-সম্পদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশে হিমালয়ের পাদদেশের দুর্গম গিরিসংকটে প্রাচীনতম বাঙলা পুঁথির অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারই বিপদের গুরুত্ব ও ভীতির দূরপ্রসারী পরিধির পরিমাণ। হিমালয়শীর্ষে সামুদ্রিক প্রাণীর কংকাল-প্রাপ্তির ন্যায়ই সমতল নদীমাতৃক বাঙলার মানসফসলের নেপাল পার্বত্য অঞ্চলে সংরক্ষণ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-গত ভূমিকম্প-আলোড়নের প্রচণ্ডতার পরিচয়বাহী।

যুদ্ধাদি বর্ণনার চিত্র

অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের কিছু উল্লেখ ও বর্ণনাত্মক শ্লোক সংস্কৃত প্রাকৃত ও অবহট্ট সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ লক্ষ্মণ সেনের দিগ্বিজয়-প্রশস্তি 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এ সভাসদ কবি কর্তৃক কোন কোন রাজার প্রতিবেশী রাজ-বর্গের উপর জয়ঘোষণাও এই বিরোধী রাজাদের দুর্দশা উপভোগ, ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে অবহট্ট রচিত মিথিলাধিপতির শত্রুপরাজয় সংবর্ধনাসূচক দুইটি পদ — এগুলি যেন প্রেম ও দেবস্তুতির একাধি-পত্যের মধ্যে জীবনের কঠোরতর সংঘর্ষের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ, শ্যামশ্রীমণ্ডিত উপবন-ভূমি ও ঊর্ধ্বস্থিত আকাশনীলিমার উপ-কণ্ঠে রুক্ষ মরুর ঈষৎ দ্যোতনা। তবে এ যুদ্ধবিগ্রহবর্ণনাও প্রথানিয়ন্ত্রিত, ছাঁচেঢালা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উত্তাপহীন অলংকার-মুখরতায় রণক্ষেত্রের বিভীষিকাসঞ্চারের কৃত্রিম প্রয়াস। তুর্কী-উপপ্লবের যথার্থ নিদারুণ প্রতিক্রিয়া কেবল বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' - 'কীর্তিপতাকায়' কাব্যরূপ পাইয়াছে, উহাদের মধ্যেই আমরা জাতি-বৈরের উৎকট প্রকাশ, সংস্কৃতির মর্মমূলে আঘাতের প্রচণ্ডতা, উহার সুদূরপ্রসারী সমাজবিপর্যয় ও উদভ্রান্তির কতকটা যথার্থ ধারণা করিতে পারি। এই অবস্থা কাটাইয়া বাঙলা সাহিত্য, জীবনবোধ ও ধর্ম-সংস্কৃতিকে ছিন্ন সূত্রগুলির, আবশ্যকীয় পরিমার্জনার সহিত পুনঃসংযোজনা করিতে হইয়াছে। সুতা মেরামতের ও নবসূত্র-সংযোগের সময় উচ্চতর সাহিত্যবয়নশিল্প হয়ত সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল এরূপ অনুমান অসংগত হইবে না।

নিমাই ভট্টাচার্য

বিধাতা পুরুষের ঔদার্য অনেক কিন্তু ...পণতাও কম নয়। এই দুনিয়ার সর্বত্র ...র বদান্যতার প্রকাশ। কিন্তু সংগে সংগে ...ড়িয়ে রয়েছে কৃপণ মনোবৃত্তির পরিচয়। ...ই পৃথিবীর একদিকে যখন আলো, ...ন্যদিকে তখনই অন্ধকারের রাজত্ব চলে। ...নন্তকাল ধরে এই সনাতন নিয়ম পৃথিবীর ...কে রাজত্ব করে চলেছে। পৃথিবীর দুটি ...ক একই সঙ্গে সূর্যের আলোয় ভরে ...ঠবে না, অন্ধকারের মধ্যেও ডুব দেবে ...।

এই পৃথিবীর বুকে যে মানুষের বাস ...র জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। ...জস্র কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ভগবান ...কটি পরিপূর্ণ সুখী মানুষ তৈরী করতে ...ারেননি। জীবনের একদিকে যার আলোয় ...রে গেছে, সাফল্যে ঝলমল করে উঠেছে, ...রই জীবনের অপর দিকে নিশ্চয়ই ...ন্ধকারের রাজত্ব। সমাজ-সংসার যার মুখের ...াসির খবর রাখে, যার সাফল্যের ইতিহাস ...ানে, তার মনের কান্না, ব্যক্তিগত জীবনের ...ম ব্যর্থতার কাহিনী সবাই না জানলেও ...া সত্য। এই দুনিয়ায় কেউ প্রকাশ্যে কেউ ...ুকিয়ে কাঁদে কিন্তু কাঁদে সবাই। অত বড় ...ার্থক সাফল্যমণ্ডিত ডিপ্লোমাট মিঃ পরিমল বোসও কাঁদতেন। তবে তাঁর চোখের জলের কাহিনী, ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস কেউ জানে না, জানবেও না।

ভারতবর্ষের ফরেন সার্ভিসের সবাই পরিমল বোসকে চেনেন। তাঁর সুখ্যাতির কাহিনী ভারতের সমস্ত দূতাবাসে শোনা যাবে, শোনা যাবে দিল্লীর সাউথ ব্লকে ফরেন মিনিস্ট্রীতে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনে আসার আগে মিঃ বোস ওয়াশিংটন, কায়রো, মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস'এ কাজ করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং সর্বত্রই ভারতের পররাষ্ট্র নীতি প্রচারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই ত সেবার লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের শেষের দিন মূল ইস্তাহার নিয়ে ভীষণ মতভেদ দেখা দিল কয়েকটি দেশের মধ্যে। মার্লবোরা হাউসের কনফারেন্স চেম্বারে ঝড় বয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য মিঃ বোসের ড্রাফট্ মেনে নিলেন সবাই।

পরে ক্ল্যারিজেস হোটেলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সাংবাদিকদের সংগে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মিঃ বোসের ভুয়সী প্রশংসা করেছিলেন। দিল্লী ফিরে বিজ্ঞান ভবনে এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনেও মিঃ বোসের কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি।

কর্মজীবনে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন মিঃ বোস। সার্থক, সাফল্যমণ্ডিত ডিপ্লোম্যাট মিঃ পরিমল বোসের খবর সবাই জানেন, জানেন না তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র ও বেদনাভরা ইতিহাস।........

......রিটায়ার করার ঠিক আগের বছর সোনার বাংলা দু' টুকরো হলো। দেশ স্বাধীন হলো। প্রফুল্লবাবু সপরিবারে চলে এলেন কলকাতায়। সরকারী চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর পরই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় মধ্যমগ্রাম দেশহিতৈষী কলোনীতে কয়েক কাঠা জমি কিনলেন, ছোট্ট একটা মাথা গোঁজবার আস্তানা তৈরী করলেন। একদিন মধ্যমগ্রামের যে জমি পতিত ছিল, যে জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল মানুষের অগম্য ছিল, বছর কয়েকের মধ্যে সেইখানেই নবাগত কয়েক শ' পরিবারের কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে নানা ধরনের ঘর বাড়ী উঠে পড়ল, ছন্নছাড়া কিছু মানুষ আবার স্বপ্ন দেখল ভবিষ্যতের। প্রথম বছর সম্ভব হয়নি কিন্তু পরের বছরই দুর্গাপূজা শুরু হয়ে গেল। কলোনীর একদল ছেলেমেয়ে মিলে নববর্ষ—রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব চালু করল। কিছুদিনের মধ্যে দেশহিতৈষী পাঠাগারও গড়ে উঠল। প্রাণচঞ্চল নতুন কলোনীতে আরো অনেক কিছু হলো। মানুষে-মানুষে পরিবারে-পরিবারে হৃদ্যতার গাঁটছড়াও বাঁধা পড়ল।

বোসেদের বাড়ীর পরেই একটা পুকুর। তার ওপাশে রাখালদাদের বাড়ী। এই কলোনীতে আসার পরই রাখালদার ছোট দুটি বোনের বিয়ে হলো। কলোনীর প্রায় সবাই এসে সাহায্য করেছিলেন বিয়েতে কিন্তু পরিমলের মত কেউ নয়। জামাইরা তো প্রথম প্রথম বুঝতেই পারেনি পরিমল ওদের আপন শালা নয়।

পরিমল যখন থার্ড ইয়ারে পড়ে তখন রাখালদার বিয়ে হলো। রাখালদার বাবার সঙ্গে পরিমলই প্রথম রাণাঘাট গিয়ে তার বীথিকা বৌদিকে দেখে এসেছিল। রংটা একটু চাপা হলেও দেখতে-শুনতে বীথিকা বৌদিকে ভালই লেগেছিল। ক্লাশ নাইন থেকে টেনে উঠেই পড়াশুনা ছাড়লেও পড়াশুনার চর্চা ছিল। গান-বাজনা না জানলেও সখ ছিল। স্কুলে পড়ার সময় মাঝে মাঝে থিয়েটারও করেছেন।

বেশ ভালভাবেই রাখালদার বিয়ে হলো। প্রফুল্লবাবু বরকর্তা হয়ে গিয়েছিলেন আর পরিমলের পরই সব দায়িত্ব ছিল। বৌভাতের দিন শ' দেড়েক লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে লাউড স্পীকারে রবীন্দ্র সংগীত শোনাবার ব্যবস্থা—সব কিছুই পরিমল করেছিল। বীথিকা বৌদিকে বিয়ে করে রাখালদা বেশ সুখী হলেন। জীবনে যাঁরা আকাশকুসুম কল্পনা করে না, যাঁদের চাওয়া ও পাওয়া দুটোই সীমাবদ্ধ, মনের মতন স্ত্রী পাওয়াই তাঁদের সব চাইতে বড় কাম্য। রাখালদা বি-এ পাশ করে ফেয়ারলি প্লেসে রেলের বুকিং অফিসে মোটামুটি ভালই চাকরি করতেন। মাইনে হয়ত খুব বেশী পেতেন না কিন্তু পাকা সরকারী চাকরিতে অনেক শান্তি, অনেক নির্ভরতা। তবে খাটুনি ছিল বেশ। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তেন আর বাড়ী ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে সাতটা-আটটা বাজত। বেশীদিন সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরি করলে ছুটির-দিন তাসখেলা ছাড়া বড় একটা সখ-আনন্দ কারুর থাকে না। রাখালদার সে সখও ছিল না। তবে হ্যাঁ, রবিবার দুপুরে একটু দিবানিদ্রা ও পরে ইভনিং শো'তে একটা সিনেমা দেখা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস।

বীথিকা বৌদির জীবনটাও একটা ছকের মধ্যে বাঁধা পড়ল। ভোরবেলায় উঠে রান্না-বান্না করে স্বামীকে অফিস পাঠানই ছিল প্রথম ও প্রধান কাজ। রাখালদা অফিস চলে গেলে শ্বশুর-শাশুড়ী ও নিজের রান্না করতেন। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা রান্নাঘর নিয়ে পড়ে থাকতে তাঁর মন চাইত না। তাইতো শ্বশুর-শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়া হতে না হতেই রাত্রের রান্না শুরু করে দিতেন। নিজের খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে একটু বেলা হতো তবে ওবেলার কোন তাড়া থাকত না, এই যা শান্তি।

বেলা একটু পড়তে না পড়তেই রাখালদার মা উঠে পড়তেন। ইতিমধ্যে একটু বিশ্রাম করে বীথিকা বৌদি যেতেন পরিমলের মা, মাসিমার কাছে। একটু গল্প-গুজব করতে না করতেই পরিমল ঠাকুরপো কলেজ থেকে ফিরত। তারপর বৌদির সঙ্গে শুরু হতো কলেজের গল্প। কলকাতার কলেজে প্রতিদিন কত মজার ঘটনাই না ঘটে! বৌদি কলেজে যেতেন না কিন্তু ঠাকুরপোর কাছে গল্প শুনে সে-সব মজা উপভোগ করতেন। শুধু গল্প শোনান নয়, পরিমল ঠাকুরপোর আরো অনেক কাজ ছিল। বই পড়া ছিল বৌদির নেশা। দেশ-হিতৈষী পাঠাগারে যেসব বই আছে, সেসব অনেকদিন আগেই পড়া। কলেজ লাইব্রেরী থেকে নিত্য বই আনা ছিল পরিমল ঠাকুরপোর অন্যতম প্রধান কাজ। সাপ্তাহিক—মাসিক পত্রিকাও নিত্য আসত। বৌদির ভীষণ ভাল লাগত। বিয়ের আগে রাণাঘাট শহরের যেখানেই কোন গানের জলসা হোক না কেন, বৌদি শুনবেন। বিয়ের পর এসব সখ-আনন্দের কথা প্রথম বলে-ছিলেন পরিমল ঠাকুরপোকে 'আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমাদের কলেজে বা এদিকে কোন পাড়ায় জলসা হয় না?'

'সে-কি বৌদি! তুমি কি একটা আশ্চর্য প্রশ্ন করলে বল তো? কলকাতার কলেজে শুধু গানের জলসা কেন, বক্তৃতার জলসা, পলিটিক্সের জলসা ও আরো কত রকমের জলসা হয়। হয় না শুধু পড়াশুনার জলসা!'

'তাই নাকি ঠাকুরপো?'

'তবে আবার কি?'

ঠাকুরপো একটু চুপ করে আবার শুরু করে, 'বাল্মিকীর মত ভাল ইম্যাজিনেটিক রাইটার বা কালিদাসের মত ভাল রোমান্টিক কবি থাকলে একালে কলকাতার এক একটি কলেজ নিয়ে রামায়ণ বা শকুন্তলার চাইতে আরো মোটা, আরো ভাল বই লিখতে পারতেন।'

বৌদি একটু মুচকি হাসেন।

'তুমি হাসছ বৌদি! কিন্তু বিশ্বাস কর, কলকাতার কলেজগুলো এক-একটা আজব চিড়িয়াখানা। ছাত্র-অধ্যাপক সবাই রসিক। আদি-রস, বাৎসল্য রস, বীর-রস, ভয় রস, বীভৎস রস ও আরো অনেক রসের মশলা একত্রে যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে তা কলকাতার কলেজ।'

পরিমল ঠাকুরপোর কাছে গল্প শুনতে বেশ লাগে বৌদির। কলেজের সোস্যালের সময় জলসার দুটো কার্ড জোগাড় করে পরিমল। রাখালদাকে কার্ড দুটো দিয়ে বলে, শুধু চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন-টেনডেন্টের সেবা না করে একটু বৌদির সেবাও করো।

রাখালদার জলসা-টলসায় কোন আগ্রহ নেই। এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। বলেন, তোর বৌদির যত বাতিক! মধ্যমগ্রাম থেকে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে গিয়ে ক'টা আধুনিক গান শোনার কোন অর্থ হয়?

রাখালদাকে তবুও যেতে হয়। স্ত্রীর আব্দারের চাইতে পরিমলের আগ্রহকে অগ্রাহ্য করা তাঁর কঠিন হয়। বৌদির কিন্তু বেশ লাগে। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানান পরিমলকে।

রাখালদা নিতান্তই একজন ভদ্রলোক। কোন সাতে-পাঁচে নেই। কোন অহেতুক বাতিক নেই। কলোনীর সবার সঙ্গেই পরিচয় আছে কিন্তু একটু অতিরিক্ত খাতির কারুর সঙ্গে নেই। পরিমল ও বৌদি দুজনেই মাঝে মাঝে সুবিধামত টিপ্পনী কাটেন রাখালদার অফিস নিয়ে। পরিমল বলে, রাখালদা, তুমি মোর লয়েল দ্যান দি কিং, রাজার চাইতেও বেশী রাজভক্ত।

বৌদি বলেন, না, না, ঠাকুরপো। তোমার দাদা হচ্ছেন সি-সি-এস-এর ঘরজামাই।

রাখালদা এসব সমালোচনা মুচকি হাসি দিয়ে এড়িয়ে যান। শুধু বলেন, যার অফিস ফেয়ারলি প্লেসে সে কি করে আনফেয়ার হবে বলো?

নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে রাখালদার, কিন্তু পরিমল ঠিক তার বিপরীত। প্রতি পদক্ষেপে তার প্রাণ-শক্তির প্রকাশ। দেশ-হিতৈষী কলোনীর সব কিছুতে সে সবার আগে। মাস-তিনেকের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলোনীর ছেলেদের সাহায্যে একটা চমৎকার পার্ক করেছে এই কলোনীরই একটা পতিত জমিতে। প্রত্যেক রাস্তার নামকরণ করে বোর্ড লাগিয়েছে, কেরোসিনের টিন কেটে রং মাখিয়ে ওয়েস্ট বিন করে সব রাস্তায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। রবিবারের সাহিত্য-সভা, মেয়েদের জন্য পূর্ণিমা সম্মিলনী, বাচ্চাদের জন্য আগমনী সংসদও পরিমলের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই কলোনীতে। এত কাজ করেও নিজের পড়া-শুনায় বিন্দুমাত্র গাফিলতি নেই পরিমলের। এরই মধ্যে এক ফাঁকে মতিঝিল কলোনীতে দুটি ছেলেকে পড়িয়ে আসে।

বৌদি হচ্ছে পরিমলের প্রাইভেট সেক্রেটারি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র টাকাকড়ি জমা রাখে বৌদির কাছে। নিজের সংসারের টাকা-পয়সার কোন ঝামেলায় না থাকলেও পরিমলের অনেক সংসারের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় তাঁকে। তবুও ভাল লাগে তাঁর। নিজের সংসারের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে পরিমল হচ্ছে তাঁর একমাত্র বাতায়ন এবং এই একটি বাতায়নের মধ্য দিয়েই তিনি বিরাট দুনিয়ার কিছুটা স্পর্শ, কিছুটা আনন্দ অনুভব করেন।

দিন এগিয়ে চলে।

পরিমল ইকনমিকসে অনার্স নিয়েই বি-এ, পাশ করল। সারা দেশহিতৈষী কলোনীর সমস্ত মানুষগুলো আনন্দে আট-খানা হয়ে পড়ল। পাড়ার ছেলেরা তাদের খোকনদাকে রিসেপসন দিল, পূর্ণিমা সম্মিলনীর মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে চন্দনের তিলক পরাল। এইসব কাণ্ডের মূলে কিন্তু রাখালদা! রেজাল্ট বেরুবার দিন সবচাইতে আগে খবর নেন তিনি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে একটা চমৎকার ধুতি কিনে ট্যাক্সি করে ছুটে এসেছিলেন কলোনীতে। চীৎকার করে সারা দুনিয়াকে জানিয়েছিলেন, পরিমল অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। বৌদিকে ঠেলে বের করে বলেছিলেন, ওগো, শীগ্‌গির সবাইকে খবর দাও আমাদের খোকন অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। উত্তেজনায় শুধু বৌদির পর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। নিজেও সারা কলোনী ঘুরেছিলেন। গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, ইকনমিকসে অনার্স পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

অনেকেই খেয়াল করলেন না কিন্তু বৌদি আর পরিমল দুজনেই খেয়াল করল যে বিয়ের পর এই প্রথম রাখাল সরকার অফিস কামাই করলেন।

শান্ত, স্নিগ্ধ, রাখালদার চাপা ভাল-বাসার প্রথম প্রকাশে দুজনেই মুগ্ধ হলেন।

সবাই বলেছিলেন এম-এ, পড়তে কিন্তু বৃদ্ধ বাবার পেন্সনের টাকায় আর পড়তে রাজী হলো না পরিমল। মতিঝিল কলোনীর একটা স্কুলে পৌনে দুশো টাকায় মাস্টারী শুরু করে দিল।

ছাত্র থেকে মাস্টার হলো পরিমল কিন্তু আর কিছু পরিবর্তন হলো না। এখনও রাত জেগে পড়াশুনা করে, ছাত্র পড়ায়, কলোনীর

সব ব্যাপারে এখনও পুরো দমে মাথা ঘামায়, বৌদিকে নিয়ে আগের মতই হৈ-হল্লোড় করে। সবাই খুশী। প্রফুল্লবাবু খুশী, তাঁর স্ত্রী খুশী; পরিমল খুশী, বৌদি খুশী, রাখালদা খুশী। কলোনীর সবাই খুশী। খুশীর মধ্য দিয়েই আরো দুটো বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন পরিমল একটা নতুন স্যুট নিয়ে বাড়ী আসতেই বাবা-মা একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার রে! চিরকাল ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কাটাবার পর এখন আবার কোট-প্যাণ্ট আনলি কেন?

পরিমল বলেছিল, কলেজের পুরান বন্ধুদের সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছি। দিল্লীতে তো ভীষণ শীত, তাই কোট-প্যাণ্ট নিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ যদি ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়ি, সেই আর কি...

বাবা-মা বলেছিলেন, ভালই করেছিস।

মা সঙ্গে সঙ্গে ওবাড়ী ছুটে গেলেন, জান দিদি, জান বৌমা, খোকন দিল্লী যাচ্ছে। ওখানে তো ভীষণ শীত, তাই কোট-প্যাণ্টও কিনে এনেছে।

বৌদি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন এবাড়ী। ঠাকুরপোর হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বল্লেন, ডুবে ডুবে জল খাওয়া কবে থেকে শিখলে ঠাকুরপো? তুমি যে দিল্লী যাবে, একথা তো একটিবারও আমাকে জানালে না।

বৌদির একটু অভিমানই হয়েছিল। পরিমল বৌদির অভিমান ভাঙ্গাবার

জন্য একটু রসিকতা করে বল্লো, কি করি বল বৌদি! তোমরা তো বিয়ে-টিয়ে করে বেশ আছ। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লো, আমার তো ওসব কিছু হবে না, তাই মন ভাল করার জন্য একটু কদিনের জন্য ঘুরে আসছি।

এক মুহূর্তে বৌদির সব অভিমান বিদায় নিল। ঠোঁটের চারপাশে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লেন, আজই তোমার দাদাকে বলছি।

বেশ একটু চেঁচিয়েই পরিমল বল্লো, দোহাই তোমার, একটু তাড়াতাড়ি কর!

যাবার দিন রাখালদাই দায়িত্ব নিলেন পরিমলকে ট্রেনে তুলে দেবার। পরিমল বারবার বারণ করেছিল কিন্তু রাখালদা বলেছিলেন, তা হয় না খোকন। তুই দিল্লী যাবি আর আমি স্টেশনে যাব না?

পাঁচটার সময় অফিস ছুটি হবার পরই রাখালদা হাওড়া রওনা হয়েছিলেন। একটু ঘুরে-ফিরে ট্রেন ছাড়ার অনেক আগেই প্ল্যাটফর্মে হাজির হলেন। একবার নয়, দুবার নয়, বহুবার সমস্ত থার্ডক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট তন্নতন্ন করে খুঁজলেন কিন্তু পরিমলের দেখা পেলেন না। কি মনে করে সেকেণ্ড ক্লাশগুলোতে একবার দেখে নিলেন। তবুও পরিমলকে পেলেন না। ট্রেন ছাড়ার তখন মাত্র মিনিট পনের বাকি। একবার পুরো ট্রেনটাই ভাল করে খুঁজতে গিয়ে একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় পরিমলকে আবিষ্কার করলেন। রাখালদা তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার রে খোকন? একেবারে ফার্স্ট ক্লাশে করে দিল্লী চলেছিস!

পরিমল বলেছিল, কি আর করব? কোন ক্লাশে টিকিট না পেয়ে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কেটেছি।

'তা তোর আর সব বন্ধুবান্ধবরা কই?'

পরিমল ঘাবড়ে যায়। একটু সামলে নিয়ে বলে, ওরা সবাই কাল রওনা হবে। আমি একদিন আগে গিয়ে সব ব্যবস্থা করব কিনা, তাই......।

কয়েক মিনিট বাদেই দিল্লী মেল ছেড়ে দিল।

রাখালদা কি যেন মনে করে রিজার্ভেশন চার্ট দেখলেন। না তো, অন্য কারুর পাশ নিয়ে তো যায়নি, নিজের নামেই তো রিজার্ভেশন। তবে নামের পাশে তো টিকিটের নম্বর নয়, ওটা তো একটা সরকারী পাশের নম্বর। রাখালদা একটু আশ্চর্য হন, একবার যেন চমকে উঠেন! ফার্স্ট ক্লাশ পাশ! সে তো অনেক বড় বড় অফিসাররা পায়! তবে কি অন্য কিছু? রাখালদার মনে বেশ একটা আলোড়ন হয়।

রাত্রে শুয়ে বৌদিকে বলেন, জান, খোকন ফার্স্ট ক্লাশে করে দিল্লী গেল।

'সে কি গো?'

রাখালদা একটু চুপ করেন। আবার বলেন, তাছাড়া, টিকিট কিনে যায়নি, সরকারী পাশে গিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাশ তো খুব বড় বড় অফিসাররা পায়। তাই ভাবছিলাম খোকন বোধহয় বেড়াতে যায়নি, নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাপারে গিয়েছে।

বৌদিও একটু চিন্তিত হয়ে ওঠেন কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কেউই কাউকে কিছু বলেন না।

দিল্লী থেকে পরিমলের পৌঁছ সংবাদ এলো। দিনদশেকের মধ্যে আবার কলকাতায় ফিরেও এলো। শুধু কুতবমিনার-লালকেল্লার গল্প করল; আর কিছু বল্লো না।

মাস তিনেক আবার আগের মত সহজ সরল হয়ে কাটিয়ে দিল পরিমল। স্কুল, টিউশানি, কলোনীর লাইব্রেরী, পূর্ণিমা সম্মিলনী, আগমনী সংসদ, পার্ক-রাস্তাঘাট ও ওয়েণ্টবিনের দেখাশুনা আর বৌদিকে নিয়েই বেশ কাটাল।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজে নাম দেখেছে কিন্তু তবুও কাউকে কিছু বলেনি। যেদিন স্কুলে রেজেস্ট্রী ডাকে আসল চিঠিখানা হাতে পেল, সেইদিনই বাড়ী ফিরে সবাইকে জানাল সে ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস জয়েন করছে।

প্রফুল্লবাবু ও তাঁর স্ত্রী আনন্দে চোখের জল ফেল্লেন, রাখালদা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর খোকনকে, কলোনীর ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর বৌদি? সবার অলক্ষ্যে পরিমলকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন; বলেছিলেন, বিশ্বাস কর ঠাকুরপো, আমি জানতাম তুমি একদিন জীবনে নিশ্চয়ই উন্নতি করবে। হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন বৌদি। দু'চোখ তাঁর জলে ভরে গেল। কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। পরিমল সান্ত্বনা জানাতে চেয়েছিল কিন্তু পারল না। মনের মধ্যে এমন কান্না গুমরে উঠল যে তাঁরও স্বর বেরুলো না গলা দিয়ে।

দেখতে দেখতে দিনগুলি কেটে গেল। আবার একদিন দিল্লী মেলে চড়ল পরিমল। বাবা-মা, রাখালদা-বৌদি, কলোনীর একদল ছেলেমেয়ে ছাড়াও অনেক মাষ্টার ও ছাত্ররাও এসেছিলেন বিদায় জানাতে। ঐ ভীড়ের মধ্যেই এক ফাঁকে বৌদি একবার একপাশে একটু আড়ালে নিয়ে কানে কানে বলেছিলেন, আমাদের ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ঠাকুরপো?

'সে কথা কি মুখে না বল্লে বুঝতে পার না?'

কেমন যেন একটু ব্যাকুল হয়ে বৌ আবার প্রশ্ন করলেন, বিলেত-আমেরিকা গি কি তুমি আমাকে ভুলে যাবে?

বিদায়বেলায় বিয়োগব্যথার ঝঙ্ক বেজে উঠেছিল পরিমলের সারা মনে। বহু চেষ্টা করেও বোধহয় এ-জীবনে তোমা ভুলতে পারব না।

বৌদির সারা মনের আকাশে শ্রাবণে ঘন কালো মেঘ জমে উঠেছিল কিন্তু হঠা তারই মধ্যে একটু বিদ্যুৎ চমকে এক আলো ছিটিয়ে গেল। মুখে সামান্য এক হাসির রেখা ফুটিয়ে বৌদি বললেন, সা বলছ?

'সত্যি বলছি।'

সপ্তাহখানেক দিল্লীতে থেকে পরিম গেল লণ্ডন। কেম্ব্রিজে তিন মাসে রিওরিয়েনটেশন কোর্স করে থার্ড সেক্রেটার হয়ে চলে গেল ওয়াশিংটনে ইণ্ডিয় এম্বাসীতে। দুটি বছর কেটে গেল সেখানে তারপর সেকেণ্ড সেক্রেটারী হয়ে মস্কো কায়রোয়। তারপর আবার প্রমোশন। ফাস্ট সেক্রেটারী হয়ে প্রথমে ইউনাইটেড নেশনস এ, পরে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান হাইকমিশনে কর্মজীবনের এই চাঞ্চল্যকর পরিবর্তনে সঙ্গে সঙ্গে মনও বিচিত্র পথে ঘুরেছে। অতীতের সব হিসাব-নিকা ওলট-পালট করে দিয়েছে।

ফরেন সার্ভিসের সার্থক ডিপ্লোম্যা হয়েও পরিমল পুরোপুরি মিশিয়ে দিত পারে নি কূটনৈতিক দুনিয়ার আর পাঁচ জনের সঙ্গে। নিজের জীবন, অতীতে আদর্শ নিয়ে আজও ছিনিমিনি দেখতে শেখে নি সে। ওয়াশিংটনের পেনসিলভানিয় এভিনিউ, মস্কোর রেড স্কোয়ার, লণ্ডনের পিকাডিলি সার্কাসের চাইতে মধ্যমগ্রামের দেশহিতৈষী কলোনীকে আজও সে বেশী ভালবাসে। মিস অ্যালেন, মিসেস চোপরা মিস চৌধুরী, মিস রঙ্গনাথন, মিসেস যোশীর অনেক আকর্ষণের স্মৃতি ছাপিয়ে মনে পড়ে শুধু বৌদিকেই। আশে-পাশের অনেক মানুষের চাইতে বেশী মনে পড়ে দেশহিতৈষী কলোনীর অর্ধমৃত মানুষকে। ওয়াশিংটন, মস্কো, কায়রো, নিউইয়র্ক, লণ্ডনকে ভাল লেগেছে কিন্তু দেশহিতৈষী কলোনীর মত এদের সঙ্গে কোন প্রাণের টান অনুভব করে নি। ফরেন সার্ভিসের সহকর্মী মিস্তিরের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছে কিন্তু রাখালদার শূন্য আসন পূর্ণ করতে পারে নি। তাইতো হোমলিভ পেলে একটি মুহূর্ত নষ্ট করে নি, ছুটে এসেছে কলকাতায়, মধ্যমগ্রামের দেশহিতৈষী কলোনীতে।

ওয়াশিংটন থেকে মস্কো বদলী হবার সময় তিন মাসের হোমলিভে ছুটে এসেছিল কলকাতা। প্রায় সারা দেশহিতৈষী কলোনীর সবাই এসেছিলেন দমদম এয়ার পোর্টে। কাস্টমস এলাকার বাইরে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অন্যান্য সব প্যাসেঞ্জারের আগে বেরিয়ে এল পরিমল। অনেকেই ফিস ফিস করে বলাবলি করেছিলেন, দেখেছিস খোকনদার কি প্রেস্টিজ!

রাখালদা বলেছিলেন, ওরে বাবা, হাজার হলেও ডিপ্লোম্যাট। খোকনের মালপত্তর ছোঁবার সাহস কোন কাস্টমস অফিসারের নেই।

সবাই একবাক্যে সে কথা স্বীকার করেছিলেন।

পরে অবশ্য পরিমল বলেছিল, আমাদের মত যাদের ডিপ্লোম্যাটিক পাশপোর্ট থাকে তাঁদের সাধারণতঃ কাস্টমস কিছু বলে না। শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই ডিপ্লোম্যাটরা এই সম্মান পান।

শুনে সবাই অবাক হয়েছিলেন। প্রথমে মা-বাবা ও রাখালদাকে প্রণাম করলেন। কলোনীর ছেলেমেয়েদের একটু আদর করে চারপাশ তাকিয়ে নিলেন। বললেন, রাখালদা, বৌদি আসেন নি?

রাখালদা একটু মুচকি হেসে বলেছিলেন, এসেছে কিন্তু ভেবেছে হয়ত তুই ওকে চিনতে পারবি না বা চিনতে তোর প্রেস্টিজে বাধবে তাই ঐদিকে লুকিয়ে আছে।

'বৌদির কি মাথাটা পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে', এই কথা বলেই পরিমল ছুটে গিয়েছিল বৌদির কাছে।

প্রথমে একটু প্রাণভরে দেখেছিল তাঁর বৌদিকে, একটু হেসেছিল। তারপর বলেছিল, আমার আজকাল ভীষণ অহংকার হয়েছে। তুমি কোন সাহসে এয়ারপোর্ট এলে?

বৌদির মুখের পর দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তির হাসির ঢেউ খেলে গেল। বৌদি এবার একটু হাসলেন। 'তোমার তো অহংকার করার কারণ আছে ঠাকুরপো।' দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আজ তুমি কত বড় অফিসার, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা কর। কত টাকা রোজগার কর; সুতরাং আমার মত একটা অতি-সাধারণ মেয়ের পক্ষে তোমার কাছে আসতে সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক।'

'বাস বাস আর ঢং করো না, বাড়ী চল।'

বৌদি সেদিন মুখে এসব কথা বললেও মনে মনে অসম্ভব গর্ববোধ করতেন তাঁর ঠাকুরপোর জন্য। এই কলোনীতে তো এতগুলো বৌ আছে কিন্তু কই ঠাকুরপো তো আমার মত আর কাউকে ভালবাসে নি। আমিই তো ওর সব চাইতে প্রিয়, সব চাইতে নিকট ছিলাম। সেদিন দমদমে এয়ারপোর্টে ঠাকুরপোর ঐ কটি কথায় খুব খুশী হয়েছিলেন বৌদি। মনে মনে শান্তি পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, পরিমল বোস ডিপ্লোম্যাট হয়েও তাঁর ঠাকুরপো আছে।

মস্ত বড় অফিসার হয়ে বিলেত-আমেরিকা ঘুরে এসেও পরিমলের যে কোনই পরিবর্তন হয় নি, একথা বুঝতে দেশহিতৈষী কলোনীর একটি মানুষেরও কষ্ট হল না। সেই ধুতি, সেই গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে লেগে পড়েছিল কলোনীর কাজে।

প্রথম কদিন কি ভীষণ উত্তেজনা ও হৈ-চৈ করেই না কাটল! মা-বাবা, রাখালদা, বৌদি ও আরো কয়েকজনের জন্য অনেক জিনিষপত্র এনেছিল পরিমল। সে সব নিয়েও কম হৈ-চৈ হল না! টেপ রেকর্ডারে কথাবার্তা টেপ করিয়ে নিয়ে বাজিয়ে শোনালে উত্তেজনা প্রায় চরমে পৌঁছাল।

প্রফুল্লবাবু ও তাঁর স্ত্রী পুত্রের কল্যাণে কলোনীর সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন। জনে জনে আশীর্বাদ করলেন পরিমলকে।

রাখালদা পরের দিন নিউইয়র্কের ফিফথ এভিনিউর বিখ্যাত দোকান আলেকজান্ডারের টেরিলিন প্যান্ট-বুশ সার্ট পরে অফিস গেলেন। সি-সি-এস অফিসের প্রায় সবাই জানল, পরিমল বোস ছুটিতে বাড়ী এসেছে। বৌদি কিন্তু লজ্জায় ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ীটা পরলেন না। বললেন, না, ঠাকুরপো, এ শাড়ী পরে বেরুলে সবাই হাসবে।

একদিন পরিমল বৌদিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সেদিন ঠিকই শিফন শাড়ীটি পরেছিলেন। পরিমল জিজ্ঞাসা করেছিল, এ কি বৌদি, সবাই হাসবে যে!

একটু হেসে বৌদি জবাব দিয়েছিলেন, ফরেন সার্ভিসের পরিমল বোসের সঙ্গে বেরুলে কেউ হাসবে না, বরং বলবে কি সিম্পল। তাই না ঠাকুরপো?

রিক্সা করে দমদম এয়ারপোর্টের মোড় অবধি এসে ট্যাক্সি ধরল পরিমল। তারপর সোজা ফেয়ারলি প্লেস বুকিং অফিসে। রাখালদা তো অবাক!

'কি ব্যাপার রে খোকন?'

'কি আবার ব্যাপার। বৌদিকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি, তাই তোমাকে নিতে এলাম।'

রাখলদা বল্লেন, নারে, আমার অনেক কাজ। তোরাই যা। আমি আর তুই রবিবার যাব।

'ঠাকুরপো, সি-সি-এস'এর জামাইকে অফিস ফাঁকি দিতে বলছ? ফেয়ারলি প্লেসে কাজ করে কিভাবে আনফেয়ার হয় বল।—বৌদি টিপ্পনী কাটলেন।

রাখলদা ঠাট্টা করে বল্লেন, আরেঃ তুমি যে! এমন সেজেছ যে চিনতেই পারছি না।

পরিমল অনেক পীড়াপীড়ি করল। রাখলদা কানে কানে ফিস-ফিস করে বল্লেন, এমন হঠাৎ কাজ-কর্ম ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হবে না, তোরা আজকে যা। রবিবার আমরা তিনজনে একসঙ্গে যাব।

পরিমল বল্লো, ঠিক আছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমাদের রেলের ক্যান্টিনের ফিস ফ্রাই খাওয়াও।

রাখলদা ফিস ফ্রাই'এর অর্ডার দেবার পথে কানে কানে প্রায় সব সহকর্মীকে বল্লেন, ঐ হচ্ছে আমাদের খোকন। এখন বদলী হয়ে আমেরিকা থেকে রাশিয়া যাচ্ছে। বৌদিকে নিয়ে সিনেমায় চলেছে।

প্রায় সবাই এক ঝলক দেখে নিলেন পরিমলকে। কয়েকজন এসে আলাপও করে-

ছিলেন, রাখালের কাছে আপনার কথা কত যে শুনেছি, তা বলবার নয়।

সেদিন দুজনে সিনেমা দেখলেন, ঘুরলেন-ফিরলেন, বেড়ালেন। রাত্রিতে বাড়ী ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বসে বসে অনেক কথা দুজনে।

'জান বৌদি, তোমার জন্য ভীষণ মন খারাপ করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ছুটে চলে আসি।' একটু থেমে পরিমল বলে, অনেক মেয়ে দেখলাম, অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে কিন্তু কই তোমার মত একটিও পেলাম না।'

বৌদিও বলেছিলেন, তুমি তো তোমার দাদাকে ভালভাবেই জান। উনি আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু আমার মনের খোরাক জোগাবার দিকে তাঁর কোন নজর নেই। তাই তো তুমি চলে যাবার পর আমার বড় কষ্ট।

ভূপেন বসু এভিনিউ পিছনে ফেলে ট্যাক্সি শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা ক্রশ করল। বৌদি আবার একটু বাইরে কি যেন দেখে নিলেন। বৌদি আবার বলেন, আজ কিন্তু আমার সব দুঃখ ঘুচে গেছে। তুমি যে এত বড় হয়েও, এত দেশ ঘুরে এসেও আমাকে ভুলে যাওনি, আমাকে যে ঠিক আগের মতনই ভালবাস, সেজন্য আমি খুব খুশী।

এমনি করে দেখতে দেখতে ছুটির দিনগুলি ফুরিয়ে আসে। পরিমল আবার একদিন দমদমের মাটি ছেড়ে উড়ে যায় আকাশে, চলে যায় মস্কো।

যে আকাশ পথে পরিমল উড়ে গিয়েছিল, সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে রাখালদা স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন, পরিমল তাঁর আপন ভাই, দুজনে মিলে নতুন করে সোনার সংসার গড়ে তুলছে।

রাত্রে রাখালদা ঘুমিয়ে পড়লে বৌদি পাশ ফিরে শুয়ে জানলার মধ্য দিয়ে শিউলি গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দূরের আকাশ দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেন নিজেকে।...ঠাকুরপো তো আমার চাইতে দু'-তিন বছরের বড়ই হবে। ওর সঙ্গেও তো আমার বিয়ে হতে পারত। আমিও ঐ আকাশ দিয়েই প্লেনে করে উড়ে যেতাম বিলেত, আমেরিকা, রাশিয়া ও আরো কত দেশ! কত সুখেই আমি থাকতাম! কত আদর, কত ভালবাসাই না পেতাম! কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতো, পরিচয় হতো। ঠাকুরপোর মত আমাকে নিয়েও সারা কলোনীর সবাই মেতে উঠত।

ঐ একই আকাশের তলায় মস্কোয় নিঃসঙ্গ ডিপ্লোম্যাট পরিমল বোস স্বপ্ন দেখত, এই জীবনে যদি ঠিক আর একটা বৌদি পেতাম, তবে তাঁকে বিয়ে করে জীবনটাকে পূর্ণ করতাম। যাঁর সঙ্গে মনের এত মিল, যাঁর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি পাই, তাঁকে যদি পেতাম এই জীবনে......

মুক্ত বিহঙ্গের মত মন আরো কতদূরে যেন ভেসে চলে যায়।

পরিমল আবার হোম লিভে আসে, আবার দমদমের ভীড় ঠেলে যায় বৌদির কাছে। আবার কটি দিন হাসিতে, খেলায়, আনন্দে দুজনের মন মেতে ওঠে। বৌদির গণ্ডীবদ্ধ জীবনে হঠাৎ জোয়ার আসে, পরিমলের সংযত জীবনে একটু যেন চঞ্চলতা আসে।

এরই ফাঁকে মা বিয়ের কথা বললে পরিমল বলে, বিলেত-আমেরিকায় গেলে ছেলেরা ভাল থাকে না। অযথা বিয়ে দিয়ে কেন একটা মেয়ের সর্বনাশ করবে বল?

'তুই আজকাল ভারী অসভ্য হচ্ছিস', মা মৃদু ভর্ৎসনা করেন তাঁর ছেলেকে।

পরিমল আবার ঐ একই আকাশ দিয়ে উড়ে চলে যায়। ঐ আকাশের দিকে তাকিয়েই আবার দুটি মন, দুটি প্রাণ ভেসে চলে যায় অচিন দেশে। একজন মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্র নীল নদীর পাড়ে কায়রোয়, আর একটি প্রাণ কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে কিন্তু সবার অলক্ষ্যে দুটি প্রাণ একই স্বপ্ন দেখতে দেখতে মিলিত হয় ভূমধ্য মহাসাগরের পাড়ে কোনও এক দেশে। বৌদির সঙ্গে তাঁর অনেক মিল পরিমল জানে, বৌদিও জানে ঠাকুরপোর মনের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল কিন্তু দুজনের কেউই জানে না একই আকাশ প্রতিদিন মাঝরাতে তাঁদের দুজনকে হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যায় স্বপ্নময় এক রাজ্যে।

শেষরাতের দিকে বৌদির চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসে। ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় রাখালদা বৌদিকে একটু নিবিড় করে কাছে টেনে নেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন বৌদির বেশ লাগে সে নিবিড় স্পর্শ।

পরিমলের মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চায়, আবার মাঝে মাঝেই ভেঙ্গে পড়ে। বেড-সাইড টেবিলের ওপর থেকে বৌদির ফটোটা তুলে নেয়, অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কখন যে চোখের পাতা দুটো ভিজে ওঠে, তা টের পায় না। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে, বীথি! ইচ্ছা করে না আমার কাছে ছুটে আসতে? আদর করতে? ভালবাসতে? ইচ্ছে করে না......

হঠাৎ রাখালদার কথা মনে হয়। পরিমলের মাথাটা ঘুরে ওঠে।

তিন মাসের ছুটিতে আবার পরিমল এলো কলকাতা। দীর্ঘদিন পর দুর্গাপূজা দেখবে এবার। দেশহিতৈষী কলোনীর ছেলেরা মাতোয়ারা হয়ে উঠল আনন্দে। মা বাবা, রাখালদা, বৌদি সবাই খুশী। পূজার এক মাস বাকী কিন্তু তবুও একটি দিন নষ্ট করল না পরিমল। মেতে উঠল পূজার উদ্যোগ করতে। যশোর রোডের পর বিরাট ফেস্টুন টানান হলো, দেশহিতৈষী কলোনী সার্বজনীন দুর্গোৎসব। ব্যাপকভাবে উদ্যোগ আয়োজন হলো পূজার।

জাফরানে লোভনীয় মুখো আকাশ ছেয়ে উঠল, শরতের আকাশ হাসিমুখে দেখা দিল। বৌদির শোবার ঘরের পাশের শিউলি গাছটা ফুলে ভরে উঠল, গন্ধে মাতোয়ারা করল বৌদির মন। দশভুজা মা দুর্গা এলেন তাঁর দরিদ্র সন্তানদের ঘরে।

নবমী পূজার দিন আরতি আরম্ভ হলে পূজো প্যাণ্ডেলেই মা বকাবকি শুরু করে দিলেন পরিমলকে। 'তুই কি আশ্চর্য ছেলে বল তো? এতদিন পর পূজার বাড়ী এলি অথচ একবার বলা সত্ত্বেও একটি বারের জন্যও নতুন জামা-কাপড়টা পরলি না?

বাবা বললেন, মার পূজোর এই শেষ দিনে নিজের মাকে দুঃখ দিও না।

পাশ থেকে রাখালদা বললেন, ছিঃ খোকন! কেন এই সামান্য একটা ব্যাপারে মাসিমা-মেসোমশাইকে কষ্ট দিচ্ছ। যাও, দৌড়ে গিয়ে নতুন কাপড় পরে এসো। আরতি শেষ হবার পর পরই তো আবার থিয়েটার শুরু করতে হবে।

বাধ্য হয়ে পরিমল বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

রাখালদাদের শিউলি গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে এসে পুকুর পাড়ে আসতেই হঠাৎ বৌদির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

'কি গো বৌদি, তুমি এখনও আরতি দেখতে যাও নি?'

'আরতির পর একেবারে থিয়েটার দেখে ফিরব বলে সব ঠিকঠাক করে বেরুতে বেরুতে দেরী হয়ে গেল।'

গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছিল পরিমলের মুখে। বৌদি এক ঝলক দেখে নেন। জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এখন প্যাণ্ডেল ছেড়ে এদিকে এলে?

মাথায় একটু দুষ্ট বুদ্ধি আসে পরিমলের। বলে, তোমাকে একটু একা পাব বলে।

বৌদির মুখে একটু দুষ্টু হাসি খেলে যায়। একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পরিমল এগিয়ে যায় বৌদির কাছে। মুহূর্তের জন্য দুজনেই মৌন হয়। পরিমল যেন কেমন করে তাকায় বৌদির দিকে, বৌদি তাঁর স্বপ্নালু দৃষ্টি দিয়ে দেখেন ঠাকুরপোকে। দুজনেরই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়েছিল একই সঙ্গে। হঠাৎ একটু হাওয়ায় মিষ্টি শিউলির গন্ধ ভেসে আসে। দুজনেই যেন মাতাল হয়ে ওঠে। আরো আরো একটু নিবিড় হয় দুজনে। এক টুকরো মেঘে ঢেকে দেয় শরতের চাঁদকে। সেই অন্ধকারে জ্বলে ওঠে দুজনের প্রাণের প্রদীপ। হারিয়ে যায় স্বপ্নরাজ্যের দেশে।

বৌদি একটু পা চালিয়ে যান প্যাণ্ডেলে। কিছুক্ষণ পরে নতুন কাপড়-জামা পরে পরিমলও ফিরে যায় প্যাণ্ডেলে। কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাখালদা আরতি করতে মত্ত, কলোনীর সবাই সে আরতি দেখতে মত্ত। মত্ত হয়নি পরিমল, হয়নি বৌদি। তাঁদের দুজনের সলজ্জ দৃষ্টি বার বারই মিলেছিল মাঝ পথে।

অঙ্গনা

প্রমীলা

দুঃসময়ে

'দেশের সর্বত্র শিক্ষিত মানুষেরা আজ ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে পড়ছেন; নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা চলে যাচ্ছে। সমাজ-বিরোধীরা জাতীয় অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করছে; যুব ও ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ। কিন্তু দেশকে সঠিক পথে চালনা করতেই হবে। সমাজের সর্বস্তরে স্বাদেশিকতার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারাই তা সম্ভব এবং দেশের সমগ্র নারীসমাজকে একাজে অগ্রণী হতে হবে।' সম্প্রতি উইমেন্স কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যশাখার উদ্বোধনকালে শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ভারতীয় নারীসমাজকে দেশের গঠনমূলক কাজে আহ্বান করে এই কথা বলেন।

শ্রীমতী মেননের এই আহ্বান কিছু নতুন। ভারতে নারী জাগৃতির উন্মেষকাল থেকেই বিভিন্ন মহাপুরুষের কণ্ঠে এই আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী—ভারতবর্ষে নারী জাগৃতির উদ্গাতা যাঁরা ক্রমাগত তাঁরা ভারতের নারীসমাজের কাছে আবেদন জানিয়েছেন নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে এবং আত্মোপলব্ধির পথে দেশের কল্যাণকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করতে। একথা স্পষ্ট করতে গিয়ে তাঁরা নারী-পুরুষের সমশক্তির উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন। গান্ধীজী এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের যতখানি অধিকার, তাহারও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। তার নিজ কর্মের পরিবেশের মধ্যেও নারী সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারিণী, যেমন পুরুষ তাহার নিজ কর্মক্ষেত্রে পাইয়া থাকে।'

আজ অবশ্য নারী এবং পুরুষের কর্মগত পরিবেশে পার্থক্যের অবসান ঘটেছে। নারী এবং পুরুষের এখন সর্বত্র সমান গতি এবং গতির নিরিখে নারীসমাজের কর্তব্য ও দায়িত্বই একমাত্র বিচার্য। সেদিক থেকে বিচার করে একথা বলা বোধহয় খুব অন্যায় এবং অসংগত হবে না যে দেশের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে অন্য সব ব্যাপারে এই শতক ভারতীয় নারীসমাজ মহাপুরুষদের আহ্বানের মর্যাদা রাখতে এবং তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অনেকটা সমর্থ হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে সমস্যা-বৈতরণী উত্তরণই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সবাই যেমন নিজ নিজ সামর্থ্যের সম্ভার নিয়ে এগিয়ে আসছেন তখন নারীসমাজকেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া এই হতাশ এবং বিশ্বাসহীনতার অধ্যায় অতিক্রম করে নতুন আশা এবং বিশ্বাসের ভিৎ রচনা করা সম্ভব নয়। তাই শ্রীমতী মেনন তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন, 'সারা ভারতে আজ ভারতবাসী বলে পরিচয় দেবার লোক কমে এসেছে। একটি প্রদেশের সঙ্গে আর একটি প্রদেশের সীমান্ত নিয়ে কলহ বাধছে। খাদ্যশস্যের দাম বিভিন্ন প্রদেশ ও এলাকায় বিভিন্ন। জাতীয় সংহতির কথা আজ অবাস্তব হতে চলেছে। এইসব প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করার জন্য স্বাদেশিকতার বোধকে তুলে ধরতে হবে। এজন্য সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে দেশের নারী-সমাজকেও সচেতন হতে হবে।'

সংকট সময়ে আমাদের যোগ্যতার পরিচয়ই আমাদের আগামী দিনের সাফল্যের স্মারক সেকথা রেখেই আমাদের কর্মে ব্রতী হতে হবে।

মাতৃমঙ্গল সংবাদ

এতদিন পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানের ঝুলিতে সন্তানপ্রসবকালীন যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাই সম্বল ছিল, বেদনার মধ্য দিয়ে নতুনের আগমনকে রচনা করে নিতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে কখন যে কি ঘটে যায় কেউ আগে থেকে জানতে পারে না। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এক অত্যাশ্চর্য উপায়। এই উপায়ে প্রসবকালীন কোনরকম বেদনার স্থান নেই। এ সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলিতে অনবরত গবেষণা চলছে। তবে এক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে রাশিয়া এবং হালে সুইডেন। বেদনাহীন সন্তানপ্রসবের সুইডিশ পদ্ধতিটি সম্পর্কে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

ইউট্যারাসে অ্যানাস্থাসিয়া প্রয়োগের মাধ্যমেই এই বেদনাহীন প্রসবের মূলকথা লুকিয়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় হাজার খানেক মহিলার উপর এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য সর্বক্ষেত্রেই পদ্ধতিটির সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। এই সাফল্য একে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে। ডঃ গুস্তাভ হেডবার্গ হচ্ছেন এর জনক। তিনি আবার স্থানীয় ওষুধ কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আবিষ্কারটি সম্পূর্ণ করেন। কারণ, সেই ওষুধ কোম্পানী ইতিপূর্বে ল্যাক ৪৩ নামে একটি অ্যানেস্থাসিয়া আবিষ্কার করেছিল। প্রসবকালীন চরম যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তে এই ওষুধটির সাহায্যে শতকরা পঁচাশী ভাগ বেদনার উপশম হতো। ওষুধটির পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করে ডাঃ হেডবার্গ একে সম্পূর্ণাঙ্গ করেন এবং বেদনাহীন প্রসবের পদ্ধতিটি সঙ্গে সঙ্গে জন্মলাভ করে। বাজারে ছাড়ার আগে এটি নিয়ে বছর দুয়েক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই নবাবিষ্কৃত অ্যানেস্থাটিকটির সঙ্গে ল্যাক ৪৩ ও বাজারে চালু থাকবে। এর নতুন নামকরণ হবে মার্কেন। আমেরিকায়ও বর্তমানে এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। অনেক দেশেই আজকাল ওষুধটির কদর বেড়েছে, পুরনো ওষুধটিতে যেখানে পঞ্চাশ থেকে ষাট মিনিট মাত্র বেদনার উপশম ঘটতো সেক্ষেত্রে নবাবিষ্কৃত ওষুধটির সাহায্যে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বেদনার উপশম ঘটানো যায়।

ম্যাজিক-এর ম্যাজিক

গৃহিণীদের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই সুখবর। সেইসঙ্গে আজকালকার পোষাক-পরিচ্ছদ বিলাসী সকলের কাছেই। সাজতে-গুজতে কে আর না ভালবাসে। কিন্তু জামাকাপড় কাচার ঝামেলা পোয়াতে কেউ চায় না। সবাই এ দায়টুকু এড়িয়ে যেতে চায়। ভরসা একমাত্র ধোবীখানা। সেখানে কিন্তু জামা-কাপড়ের আয়ুষ্কাল প্রতিবারই উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অথচ একটু কষ্ট করে বাড়ীতে কেচে নিতে পারলে জামাকাপড় শুধু দীর্ঘদিন টেকে না পয়সাও বাঁচে। এদিকে নজর রেখে সম্প্রতি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী বাজারে ছেড়েছেন 'ম্যাজিক' গুঁড়ো সাবান। সেদিন গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে এক অনুষ্ঠানে সাবানটি প্রদর্শিত হয়। কোম্পানীর তরফ থেকে এই কাজটি সম্পন্ন করেন ডেপুটি এজেন্ট মিঃ সি এন গোসালিয়া।

সাবানটির গুণাগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে নানা কথা আলোচিত হয়। 'ম্যাজিক' পুরোপুরি সিন্থেটিক সাবান। এতে খাবারের তেলের উপর কোন চাপ সৃষ্টি হবে না। এছাড়া খর এবং মৃদু জলে এ সাবান সহজে দ্রবণীয়। এতে জামাকাপড় অধিকতর ফর্সা এবং ঝকঝকে হবে—সাবানও লাগবে কম। এছাড়া পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়ায় এই সাবান বেশ ভাল চলবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এরপর 'ম্যাজিক'-এর ব্যবহার এবং গুণাগুণ বিষদভাবে বুঝিয়ে দেন শ্রীমতী পাঞ্জাবী। গৃহিণীদের পক্ষে 'ম্যাজিক' কিরকম সহায়ক হবে সেকথাও তিনি নানারকম পোস্টারের সাহায্যে বুঝিয়ে দেন।

পরিবেশে শ্রীহামিদ সায়ানীর ইন্দ্রজাল সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে মাধুর্যমন্ডিত করে তোলে।

পুষ্পসজ্জা

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "অলকে কুসুম না দিও শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।' কবি কোন পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সংগীত রচনা করেছেন জানি না কিন্তু প্রসাধনে পুষ্পই অনুপম উপকরণ। মনুষ্যহৃদয়ে পুষ্পপ্রীতি চিরন্তন। ফলে মনকে

আনন্দিত করে, শরীর ও মনে শ্রী সঞ্চার করে বলে মহাভারতে 'সুমনস' নামে অভিহিত হয়েছে ।। অনুশাসন পর্বে আছে,—'যে পুষ্প হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করে, বিমর্দনে যা থেকে মধুর সৌরভ প্রসূত হয়, যা রূপ মন হরণ করে, তেমন পুষ্পই মনুষ্য-সমাজে পরম আদরের বস্তু।'

নারীর প্রসাধনের সঙ্গে পুষ্প বিশেষভাবে জড়িত। কুসুমরত্নে নিজেকে অপরূপ করে সাজাবার আকাঙ্ক্ষা রমণী-হৃদয়ে চিরন্তন। ইতিহাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুদূর মহাকাব্যের যুগেও স্নানের পর বেল, টগর, নাগকেশর, বকুল প্রভৃতি পুষ্পে সজ্জিত হবার রীতি ছিল। মস্তকে ও কণ্ঠে পুষ্পমাল্যের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। তবে সর্বক্ষেত্রেই শুক্লমালাই অধিক সমাদর লাভ করত। কোন্ কোন্ পুষ্প ধারণযোগ্য সেই বিষয়েও মহাভারতে বিধান আছে,—

রক্তমাল্যং ন ধার্যং স্যাচ্ছুক্লং
ধার্যং তু পণ্ডিতৈঃ।
বর্জয়িত্বা তু কমলং তথা
কুবলয়ং প্রভো।। ইত্যাদি
অনু ১০৪।৮৩,৮৪

মহাভারতের যুগে কণ্ঠে রক্তমাল্য ধারণ নিষিদ্ধ হলেও মস্তকে ধারণ করবার রীতি ছিল। তবে পদ্ম বা কুবলয়ের (কুমুদ) মালা পরতে মহাভারতে নিষেধ করা হয়েছে। সেযুগে সমস্ত শুভকর্মে বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে পুষ্পকে বিশেষ উপকরণ বলে গণ্য করা হত।

সমন্বেৎ পুষ্টিযুক্তেষু বিবাহেষু রহঃ সু চ।।
অনু ৯৮।৩৩

কালিদাসের কাব্যে পুষ্পাভরণা নায়িকার সাক্ষাৎ প্রায়শঃই মেলে। 'কুমারসম্ভবে' উমা যখন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় এসে গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন, তাঁর কর্ণ থেকে পল্লব এবং অলক থেকে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হয়ে পড়ল।' কালিদাসের অপর মানসকন্যা আশ্রমপালিতা শকুন্তলাকে পতিগৃহে যাওয়ার সময় অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা মঞ্জরী ও পল্লবের নানা আভরণে সাজিয়েছিল। কবি কালিদাসের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সেকাল' কবিতাতে বলেছেন :—

'কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে
কি জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।'

'সেকালের' নারী পুষ্পকে অঙ্গরাগ রূপেও ব্যবহার করেছেন। কবি তারই বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—'লোধ্রফুলের শুভ্র-রেণু মাখত মুখে বালা।'

আধুনিক কোন কোন নায়িকাকেও পুষ্প-সাজে সজ্জিতা দেখা যায়। 'রক্তকরবীর' নন্দিনী রক্তকরবীর মালা কণ্ঠে পরেছে, হস্তে ধারণ করেছে। 'শেষের কবিতার' অমিত রায় শ্রীমতী লাবণ্যকে মিলনতত্ত্ব বুঝাবার সময় 'রূপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা' রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয়ে পুষ্পের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। বোধকরি অতি আধুনিকা রমণীও বিবাহ অনুষ্ঠানে পুষ্পের অলংকার ও ফুলশয্যার লোভ সংবরণ করতে পারেন না।

রমা ধর

আদর্শ সহধর্মিণী

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদায় জার্মান নারীদের মধ্যে যার স্থান তৃতীয় তিনি হলেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার লুডভিক এরহার্টের সহধর্মিণী লুইসে এরহার্ট। বুদ্ধিমতী ও স্বামীর কঠোর সমালোচক লুইসে তার সদা-ব্যস্ত ও কঠিন কর্তব্যরত স্বামীর সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে থাকাটাই প্রধান কাজ বলে মনে করেন।

শৈশবে তাঁরা ছিলেন দুজনে দুজনের প্রতিবেশী ও বন্ধু। তারপর কিছুকাল তাঁদের মধ্যে এলো ছাড়াছাড়ি। আবার যখন তাঁদের দেখা হল তখন তাঁরা নুরেনবের্গ বাণিজ্য আকাদেমীর অর্থনীতির ছাত্রছাত্রী। ১৯২৩ সালে উভয়ে বাণিজ্যে স্নাতক হলেন এবং ঐ বছরেই শেষের দিকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। স্বামীর আয় সে সময় পর্যাপ্ত না হওয়ায় লুইসেও উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু ১৯২৬ সনে কন্যা এলিজাবেথের জন্মগ্রহণের পর লুইসে চাকরি ছেড়ে ঘরসংসারে মন দিলেন।

"আমার স্বামীর রাজনৈতিক কর্মধারার জন্য আমাদের পূর্বজীবনে সম্পূর্ণ ভাঙন ধরেছে", লুইসে একদল মহিলা সাংবাদিককে একথা বলেছিলেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন শিশুমঙ্গল ও যুবশিক্ষার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। সরকারী বাসভবনের বিলাসিতার মধ্যে থাকলেও তাঁর নিজের গৃহের কয়েকটি জিনিসের প্রতি মায়ামমতা তিনি ছাড়তে পারেননি; তার কয়েকটি তিনি সরকারী বাসভবনে নিয়ে এসেছেন যেমন একটি ছোট সোফা, একটি আরাম-কেদারা ও লাল গালার কাজকরা কাঠের একটি জাপানী বাক্স যেটিতে দরকারী কাগজপত্র থাকে। আর এনেছেন তাঁর স্বামীর বহুদিনের প্রিয় কালো চামড়ায় মোড়া আরাম-কেদারাটি।

সমাজ হিতকর কাজকর্ম নিয়ে আনন্দেই তাঁর দিন কাটে। মাঝে মাঝে নাতনীরা এসে দিদিমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে স্বামীর সঙ্গে যখন তিনি ব্যাভেরিয়ার টেগার্নসী লেকে ছুটি কাটাতে যান। বই পড়ে, স্বামীর সঙ্গে তাস খেলে কয়েকটা দিনের জন্যে স্বামীর মন থেকে রাজনীতির চিন্তা সরিয়ে দেন।

সংবাদ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বৎসরের বি এ, বি-এসসি পার্ট পরীক্ষায় ইংরাজীতে শ্রীমতী মীরা সিং (লোরেটো হাউস), সংস্কৃতে শ্রীমতী গৌরী সেন (প্রেসিডেন্সী কলেজ), হিন্দীতে শ্রীমতী মঞ্জুলা খাণ্ডেয়াল (শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ), দর্শনে জয়িতা রায় (লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ), রসায়নে শ্রীমতী জুলি চট্টোপাধ্যায়, বটানীতে শ্রীমতী আলপনা চট্টোপাধ্যায় এবং ফিজিওলজিতে শ্রীমতী রঙ্গীতা বসু (সকলেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

* * *

যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিক্ষান্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তরুণী রিমা দত্ত সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় দুটি জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে একশো মিটার বুক সাঁতারে এবং অপরটি দুশো মিটার ফ্রি স্টাইলে—সময় যথাক্রমে ১মিঃ ৩১-৯ সেঃ এবং ২মিঃ ৩৫-৮ সেঃ।

* * *

ব্যারাকপুর লাটবাগানে সম্প্রতি লাটবাগান মহিলা সমিতি এবং লাটবাগান পরিবার কল্যাণ সংস্থার যুক্ত উদ্যোগে এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, ভারতের অগ্রগতিতে নারী সমাজ আজ নানাভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছেন নারী। কর্মক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি পুলিশ বাহিনীর এই দুটি সমিতির প্রশংসা করে বলেন যে, ঘরে ঘরে হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্প স্থাপন করে প্রতিটি মানুষের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

* * *

শ্রীমতী গীতশ্রী ঘোষ দস্তিদার হিমাংশু-সঙ্গীত সম্মেলনের নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কন্ঠসঙ্গীতে সর্ববিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এ বছরের কণ্ঠসঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিবেচিত হয়ে বিশেষ পুরস্কার সাতটি পদক এবং তিনটি চ্যালেঞ্জ ট্রফি লাভ করেছেন। তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের বিভাগীয় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি

শান্তি দত্ত

মন থেকে সেই অদ্ভুত উপলব্ধিটা সমস্ত সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। পায়ের শিরা বয়ে কেমন একটা শিরশিরে কম্পনের ভাব যেন রক্তের মধ্য দিয়ে মাথার কাছে উঠে আসছিল। এটা কোন পুলক অথবা যন্ত্রণা না বুঝে কেবলই অস্থির হচ্ছিল সোমনাথ। রান্নাঘর থেকে উনুন ধরানো ধোঁয়া এসে নীচু কড়িকাঠের কোণে কোণে আটকে থাকায় ঘরের রঙ মৃত চোখের মত ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্য, কিছুতেই দরজা জানালা সব বন্ধ করেও এই ধোঁয়ার গতিকে রোধ করা যায় না। কোথায় কোন ফাঁক ফোকর ঠিক বুঝে ঘরে ঢুকে আসে নিঃশব্দে অলক্ষ্য গতিতে। ধোঁয়া নিয়ে কাব্য করতে গিয়ে মনে মনে হাসল সোমনাথ। ম্লান বিষণ্ণ আলোয় কড়িকাঠে জমা ধোঁয়াকে আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে মিলিয়ে যেতে দেখল। একদিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখে ও শরীরে একটা ঘুমের মত আচ্ছন্ন ভাব জড়িয়ে আসছিল, এমন সময় অণিমার বিরক্ত গলা কানে এল,—সন্ধেবেলা শুয়ে গড়াতে দেখলে ভীষণ রাগ ধরে, জানো। ওদের ডেকে এনে একটু পড়তে বসাতেও তো পারো।

সোমনাথ নির্লিপ্তের মত তাকাল অণিমার দিকে। কথাগুলো কানে গেছে মনে হল না। যেন সাংসারিক এমনি ব্যাপারে নিরাসক্ত থাকা তার অভ্যাস। অণিমা ওর ক্লান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ নম্র হল। বলল,

—হল কি তোমার, 'এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এমন করে শুয়ে আছ? শরীর খারাপ না কি?

অণিমা কথা বলতে বলতে দ্রুত হাতে আলনায় কাপড় জামা বাচ্চাদের শার্ট প্যান্ট ফ্রক সব গুছিয়ে রাখছিল। মনে মনে হাসল সোমনাথ। তার ভাল থাকা না থাকায় অণিমার অনেক কিছু যায় আসে। অতএব অসময়ে বাসায় ফিরে ওর শুয়ে থাকাকে অণিমা ঝড়ের সংকেত ভেবে উদ্বিগ্ন হতে পারে। তেমনি নিস্পৃহ অলস দৃষ্টিতে চেয়ে সোমনাথ অণিমাকে দেখছিল। বাচ্চাগুলো বিকেল হতেই মাঠে খেলতে গেছে, এখনো ফেরেনি। ঘরের মধ্যে শুধু সে আর অণিমা এখন। যেন অনেক দিন পরে এমন নির্বিঘ্নে এত খুঁটিয়ে অণিমার মুখ শরীর ও ভঙ্গিকে দেখতে পাচ্ছিল সোমনাথ। অসাধারণ কর্মপটু ও, সোমনাথ ভাবল, সেইজন্যে এমন চাবুকের মত শক্ত শরীর। সংসার করতে করতে বুড়িয়ে যায়নি অণিমা, শুধু চোখে মুখে ব্যস্ত গতিতে একটা লাবণ্যহীন কাঠিন্য বা নীরসতার ছোপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ এই বিকেলবেলাই অণিমা গা ধুয়ে পরিষ্কার জামা কাপড়ে পরিপাটি হয়ে রয়েছে। বিয়ের পরের অণিমার তুলতুলে চেহারা ভাবতে গিয়ে কষ্ট পেল সোমনাথ। ওর দোষ না, ভাবল সোমনাথ, আমারও না। যত দোষ দারিদ্র্যের সংসারের অভাবগুলির একটা ঘৃণিত রূপ দেখতে দেখতে অণিমা এমনি শক্ত টান টান হয়ে উঠেছে।

—শোন, সোমনাথ মিহি গলায় ডাকল।

অনেকদিন পরে এ ধরণের অবাস্তব ডাক শুনে এক মুহূর্ত থমকে গেল অণিমা। বিমর্ষ আলোয় সোমনাথের চোখ দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করল। যেন শ্রীহীন আসবাব আর পলেস্তারা-ওঠা দেয়ালগুলির সঙ্গে মিলিত-ভাবে ম্লান অসহায় কি একরকম দৃষ্টি নিয়ে ও অণিমার প্রসাদ প্রার্থনা করছিল। এতক্ষণের ব্যস্ততায় কপালে ঘামের বিন্দু জমেছিল, আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এল অণিমা। তক্তপোষের কিনারা ঘেঁষে দাঁড়াল।

—কি বলছ? রুক্ষ গলায় বলল অণিমা।

কিছু না। কিছু বলার নেই। শুধু ওর ডান বাহুমূল ধরল সোমনাথ। সন্তর্পণে চঞ্চল হয়ে উঠল অণিমা। অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখাল—উনুনটা ধরে গেছে বোধহয়। কি দরকার তাড়াতাড়ি বল।

—তোমার বড় খাটনী পড়ছে, মা? তোমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

যেন কত অবান্তর কথা বলছে সোমনাথ। ঠোঁটের কোণে সুতোর মত হাসি ঝুলিয়ে অণিমা তাড়া দিল, —খুব হয়েছে। আমার জন্যে তোমাকে আর অত ভাবতে হবে না। তুমি বরং তোমার ট্যাক্সির মালিকের তোয়াজ কর গিয়ে।

অণিমা পা বাড়াল। খারাপ লাগল, তবু হাতটা ছাড়ল না সোমনাথ। বলল—শোন না, অত ব্যস্ত কেন?

কি ভাবল কে জানে, অণিমার কপালে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। কলরব করে সদর দিয়ে বাচ্চাগুলো ঢুকছে, তার শব্দ শোনা গেল। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল অণিমা।

—এখন বসে বসে কোন কিছু শোনার সময় নেই। ওরা এসে পড়ল। একশো কাজ বাকী এখনো আমার।

ত্বরিৎ পায়ে চলে গেল অণিমা। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা একটা কুৎসিত কদর্য রূপ টেনে আনল সোমনাথের সামনে। অণিমা কি ভাবল কে জানে। ওর ঘামে পিচ্ছিল হাতটা এতক্ষণ ধরে ছিল বলে কেমন বিতৃষ্ণা জন্মাতে লাগল মনে। বাচ্চাগুলোকে বাইরে ধমক দিচ্ছিল অণিমা। দেরী করে ফেরা ও ফরসা জামা প্যান্টে ধুলোমাটি মাখার জন্যে। এখান থেকে ওর কর্কশ গলা সোমনাথের কানে আসছিল। বড় মেয়ে ও ছেলে দুটিকে ছলছল মুখে ঘরে ঢুকতে দেখে মায়া বোধ করল সোমনাথ। কিন্তু কিছু বলল না। চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে শুয়ে রইল। অন্যদিন হলে ওই বকুনি খাওয়া উদ্‌ভ্রান্ত মুখগুলোকে কাছে টেনে আনত সোমনাথ। আদর করত। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে পড়তে বসাত। ওর ইচ্ছে ছিল। অথচ একটা অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা এই মুহূর্তে ওকে আচ্ছন্ন করছিল। খানিকক্ষণ আগের সেই পুলক অথবা যন্ত্রণায় দুর্বোধ্য

উপলব্ধিটা আবার ওর শরীরের কোষে কোষে ছুঁইয়ে নামছিল। আশ্চর্য, কখনো কখনো ছোটখাট দু-একটা ঘটনা মনকে এমন শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলে, কিছুতেই তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

একটু স্নিগ্ধ হাওয়া অথবা নিরিবিলির সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সোমনাথ। বাঁ-পাশে ঘুপসী রান্নাঘরে পনেরো ওয়াটের বাতির টিমটিমে আলোয় গলদঘর্ম হয়ে রান্না করছিল অণিমা। সেদিকে বিতৃষ্ণায় চেয়ে দেখল না। আস্তে আস্তে সদর দিয়ে বেরিয়ে এল সোমনাথ। লাল সিমেন্টের বাঁধানো ঠান্ডা রোয়াকে বসল। সামনে খোলা নর্দমা। রাস্তা। রাস্তার ওপারে একটুকরো খোলা জমি। কাদের কে জানে। অবহেলায় ঝোপ জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। খুব মৃদু ঝির-ঝিরে হাওয়া জমির ওপর গাছপালায় শব্দ তুলে বয়ে এসে সোমনাথের গায়ে লাগছিল। খুব ভাল লাগছিল ওর। কয়েকটা ঝিরঝিরে সুপারি গাছ বাতাসে ঝাঁকড়া মাথা দোলাচ্ছিল। কালচে নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। অনেক দিন আগে একটা ইংরাজী ছবিতে এমনি আকাশের দৃশ্য দেখেছিল। সুপারি গাছে পাতার ফাঁকে খানিকটা ক্ষওয়া চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। আজ পূর্ণিমা না, একাদশীও না। তবু চাঁদের দিকে চেয়ে চাঁদের বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা দেখেও সোমনাথ খুশী হল। কিছু কথা মনে পড়ল, কিছু অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতরের সেই অস্বস্তিকর অস্পষ্ট আনন্দ-বেদনার দোলা ক্রমশ ঘন হয়ে সোমনাথকে ঢেকে ফেলতে শুরু করল। কিছু শব্দ, অর্থহীন কথ বার্তার গুঞ্জন সোমনাথের পৃথিবী জুড়ে গানের সুরের মত বাজতে লাগল।

—বনানী—সোমনাথ অস্ফুট একটা নাম উচ্চারণ করল। ওর সামনে এখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় সমস্ত মাঠ আকাশ পরিবেশ বিলুপ্ত হয়ে কেবল একটি মুখ চেহারা ও কণ্ঠ উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠল। কতদিন পরে বনানীকে দেখল সোমনাথ। কত পরি-বর্তন হয়েছে তার। কয়েক মুহূর্ত দেরী করেছিল সোমনাথ, তারপর কিন্তু ঠিকই চিনেছিল। এমন এক একটি পুরনো মুখ মনের ভিতরে জমাট মূর্তি হয়ে থাকে যাদের জীবনের শেষ দিনে দেখলেও চিনে নেওয়া যায়। অথচ এমনিতে বনানীর কথা কখনো মনে পড়ে না সোমনাথের। কোন নির্জনতম স্বপ্নের অবচেতনেও না। বস্তুতঃ বনানী যে কোনদিন তারই ট্যাক্সিতে সওয়ার হবে, হতে পারে, এটা কখনোই তার ধারণায় ছিল না। আজ যখন ঝকঝকে আলো-ধোয়া বিকেলে ঝলমল করতে করতে বনানী এবং সম্ভবতঃ তার স্বামী সোমনাথের গাড়ীতে উঠে এল তখন একটুক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিল সে। ওরা কিন্তু আপন আনন্দেই ভাসছিল সর্বক্ষণ। অবলীলায় পিছন থেকে বলে উঠেছিল—চলুন নিউ আলিপুর।

আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র কটি দ্যুতিময় হয়ে উঠছিল। চাঁদ তেমন উজ্জ্বল নয় তবু চারিদিকে ম্লান ঠান্ডা আলোর পর্দা বিছানো। সামনের মাঠের ঝোপঝাড়গুলি ক্রমশ দুর্লক্ষ্য হয়ে ধূসর আবছায়ার সৃষ্টি করছিল। একটানা ঝিঁঝিঁর শব্দ—কোথায় কোন গাছের বা দেয়ালের ফাঁক থেকে ধ্বনিত হয়ে যেন নীরবতাকেই ঘনিয়ে আনছিল। কদাচিত পথে লোক। সোমনাথের দিকে কেউ তাকাচ্ছিল না। রাস্তার স্বল্প আলোয় কারো মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মনে হল কেবল কতকগুলি অস্তিত্ব সন্তর্পণে সোমনাথের সামনের পথ ধরে নিঃশব্দে যাতায়াত করছিল। নিজেকে অসম্ভব নির্জনতার মধ্যে প্রোথিত ভেবে সোমনাথ শিউরে উঠল। নিজের বুকের মধ্যে চিন্তাগুলিকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছিল, এ সময় বড় ছেলেটা বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতে স্বস্তি পেল।—মা বলল, তুমি কি চা খাবে? রিনরিন করে মিষ্টি গলায় বললে ছেলে।

সোমনাথ মনে মনে হাসল। একটু আগের ব্যবহারের জন্য অণিমা হয়ত অনু-তপ্ত। অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা তাই।

—খাব। সোমনাথ উদাসীন স্বরে বলল। ছেলের গালে হাত রাখল—তোমরা খেয়েছ কিছু?

—হ্যাঁ পাউরুটি। মা দিয়েছে।

—পড়ছ তোমরা? দিদি পড়ছে?

—হ্যাঁ। তুমি আমাদের পড়িয়ে দেবে?

এটাও অণিমার ইচ্ছা, বুঝল সোমনাথ। ছেলেকে আদর করল। পড়াব। তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ছেলে চলে যেতে সোমনাথ আলস্যের ভঙ্গি করল শরীরে, যেন কি স্বপ্ন দেখ-ছিল, এইমাত্র ঘুম ভাঙল। কিরকম খারাপ লাগছিল, এক্ষুনি ওই ঘুপসি অন্ধকারে ঢুকে বসতে হবে ভেবে। তিনটি ছেলে-মেয়েকে বিদ্যা বিতরণ করতে হবে। দুর্বহ সব দায়িত্ব। অন্যসময় ভাল লাগে। এই মুহূর্তে মনে হয় ছেলেমেয়েগুলি যেন সব অন্যের। অবৈতনিক মাস্টারির মত তাদের পড়াবার নীরস কর্তব্য এখন তার ওপর বর্তেছে। খুব খারাপ লাগল ভেবে। সোমনাথ জানে এখন ওদের নিয়ে বসলেই অণিমারও পাঁচালী সুরু হবে। সংসারের ঘ্যানঘ্যানানি, বাপের বাড়ীর কথা। ওসব শুনতে আর ভাল লাগে না। অথচ সোম-নাথের চরম বিরক্তির মুখেও নির্বোধের মত ঐসব আউড়ে যেতে থাকে অণিমা। সোমনাথ ভাবে অণিমা কোন স্বচ্ছল লোকের স্ত্রী হলে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারত না। কারণ ওর স্বভাবই এমনি প্যানপেনে ভাব বিদ্যমান। অবশ্যই স্বচ্ছলতা থাকলে ওর এমন স্বভাব গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ হল সোমনাথের। যাক গে, সোমনাথ ভাবল, যে যার নিজেকে নিয়েই থাকা ভাল। আজই নয় সন্ধ্যেবেলা অসময়ে সোমনাথ বাড়ীতে, অন্যদিন তো

থাকে না। এতক্ষণ অ্যাকসিলেটরে পা স্পিডোমিটারের কাঁটা কাঁপিয়ে কত দূরে উধাও হয়ে যেত সোমনাথ। ত মনের পাশে বেড়ী থাকে না। ঘর-সং অণিমার তখন প্রান্ত বাস্তব দাঁত বের কুৎসিত রূপ থাকে না। চোখের তখন যে পৃথিবীটা দোলে সেটা স্বাচ্ছন্দ্য, পরিপূর্ণ গৃহস্থালির, ভালবাসার। তখন সোমনাথের সমস্ত একটিমাত্র স্বপ্নে পূর্ণ থাকে। গাড়ী স্বপ্ন। একটা ট্যাক্সি কিনবে সো একেবারে নিজস্ব গাড়ী। নিজেই অথবা সামর্থ্য হলে ড্রাইভার রাখবে। শক্ত পায়ে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই। তখ এমনি মশার রাজত্বে পড়ে পড়ে পচ ওরা। নিত্য অভাবের খুঁটিনাটি অশান্তি পেড়ে বসবে না অণিমা। ব পড়াবার জন্যে টিউটর থাকবে। অণিমার মুখে যে হাসিটা সবসময়ে সেটা সুখ ও স্বাস্থ্যের।

বড় মেয়েটি চা নিয়ে এল। সে চা নিল।

—মা বলল তোমায় মশা কা না?

—বল কামড়াচ্ছে, সোমনাথ গলায় উত্তর দিল, কিন্তু বেশ হা আছে। আমার মাথা ধরেছে।

ওর গাম্ভীর্য দেখে মেয়ে আর না বলে ভিতরে চলে গেল। মাথাটা ধরেছে। সোমনাথ কপালে হাত বো হাওয়াটা ভাল লাগছে এটাও মিথ্যে আসলে এই নিরিবিলি একাকীত্ব চেয়ে ভাল লাগছিল তার। বেশ লা ভিতরে বিষণ্ণ আলো, গুমোট, পরি অণিমা, অসহায় বাচ্চারা, বাইরে সোমনাথ, দায়িত্ববিমুখ, বিরক্ত গ চা খেতে গিয়ে মনে পড়ল অণিমার পিচ্ছিল হাতটার কথা। বিতৃষ্ণায় কে জানে, পেয়ালায় মুখ দিল না। রেখে দিল। অণিমা যত্ন করে প তবু ইচ্ছে করছিল না। হাত পা ছেড়ে আরো স্থিতু হয়ে বসল।

ভিতর থেকে রান্নার শব্দ আস ওদের খেতে রাত হয়। কোন কো রাত সাড়ে এগারোটা করেও সোমনাথ ফেরে। তখনো অণিমা না খেয়ে থাকে। অবশ্য বাচ্চারা তার আগেই শুয়ে পড়ে। রাত হয়ে আসছে, কিন্তু বেজেছে বোঝা যাচ্ছে না। ওরা ভাবভঙ্গি দেখে নিজেরাই লেখাপড়া নিচ্ছে। অজস্র ভুল সমন্বিত ওদের মুখস্ত করার শব্দ এখান থেকে শোনা যাচ্ছিল। লাল মাটির রোয়াক আরো ঠান্ডা হয়ে আসছিল। বাতাস মনজুড়োন। সামনের ছোট ছোট গ ঝোপে সিরসির শব্দ চারদিকের পরি ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সোমনাথের বস্তুত আবার একটু একটু করে কোন স্বপ্নের মধ্যে মগ্ন হচ্ছিল। আবার বন

কথা মনে হল সোমনাথের। পিছনের সিটে বসে অনর্গল হাসতে হাসতে কথা বলছিল। বনানী আগে এমন ভেঙ্গে ভেঙ্গে সুন্দর করে হাসতে পারত না। সাজপোষাকেও বনানী অনেক পালটেছে বলে মনে হয়েছিল। স্বাভাবিক। কারণ সঙ্গের সেই সম্ভবত স্বামী ভদ্রলোকটির চেহারা ও ভাবে সম্ভ্রান্ততা এবং বিত্তবানতা প্রতীয়মান ছিল। যদিও তাঁর সামনের টাক ও মুখচোখে বেশ বয়স্ক বলে মনে হয়েছিল। বনানীর কন্ঠস্বরের রেশ শুনে ভাবা যাচ্ছিল যে ওরা বেশ নিবিড় ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বসে আছে। ইচ্ছে থাকলেও পিছন না ফিরে ঘাড় শক্ত করে রেখেছিল সোমনাথ। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সহজাত নির্লিপ্তির মত। তবু স্টিয়ারিং-এ রাখা ওর পুরুষ হাত ঈষৎ নার্ভাস হয়ে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল কখন জানি পেছন থেকে ডেকে উঠবে বনানী—কি সোমনাথদা, চিনতেই পারছেন না যে!

সাহস করে সামনের ছোট্ট আয়নার দিকে তাকাতে পারছিল না সোমনাথ। আকাশের রং ক্রমশ বিকেলের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ঘোলাটে ও রহস্যময় হয়ে আসছিল। তখন ধু ধু মাঠের পাশ দিয়ে দুরন্ত হাওয়ার বিপরীতে গাড়ী ছোটাতে ছোটাতে যেন গুঞ্জন শুনেছিল সোমনাথ।

—আজকের বিকেলটা ভীষণ ভালো লাগছে।

ভদ্রলোকের ভারী গম্ভীর অথচ সহাস্য কণ্ঠ শোনা গেল,—কেন, আমার গাড়ীটা খারাপ হয়ে রাস্তায় পড়ে রইল বলে?

—সত্যি। এই তো কেমন দুজনে আরামে গা ঢেলে চলেছি। আর তুমি যখন অন্ধের মত গাড়ী চালাও, আমাকে চুপচাপ পাশে বসে থাকতে হয়। আমার দিকে তাকাও তখন তুমি, বল?

ভদ্রলোক হাসলেন শব্দ করে। সোমনাথের মাথার কটা শিরা দপদপ করে উঠল। বনানীর এখন বেশ বয়স হয়েছে। তার, সম্ভবত বিয়েও হয়েছে অনেকদিন। বাচ্চা আছে কিনা কে জানে। আচ্ছা, তার পরেও এমনি রসসিক্ত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারছে বনানী? হয়তো বিত্তবানের স্ত্রী বলেই পারছে। একদিনের জন্য যে ট্যাক্সি চড়ে আনন্দ পায়। অথচ এই বনানী আগে কি ছিল। প্রায় সেলাই করে দিন চালাত। ওর দাদা বিজন বেকার ছিল। বিজন সোমনাথের বন্ধু ছিল। সোমনাথ বিজনের সঙ্গে বহুদিন ওদের বাড়ী গেছে। দেখেছে হাতমেশিনে ছোট ছোট ফ্রক ব্লাউজ সব তৈরী করছে বনানী। মুখ ক্লান্ত বিষণ্ণ। সোমনাথের বাবা তখন জীবিত। ওদের অবস্থাও ভাল ছিল। তখন সোমনাথ শখ করে মোটর চালানো শিখত। ভবিষ্যতে মোটর কিনতে পারে এই আশায়। ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে হাতের কাজ শিখত। বিজনের বাড়ীতে তখন সোমনাথের খুব খাতির ছিল। কিন্তু বনানীর সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা তার কোনদিনই হয়নি।

এইসব ভাবনার মধ্যেই পিছন থেকে আবার ভারী গম্ভীর গলা শুনেছিল সোমনাথ।

—একটা ছবি দেখলে হত। আজকের সন্ধ্যাটা সত্যিই বেশ লাগছে।

—সত্যি বলছ? আনন্দে ছলছল করে উঠলো বনানীর গলা। তারপরই যেন কানের পাশ উষ্ণ ও রক্তিম হচ্ছিল সোমনাথের। চোয়াল শক্ত। বুকের নিভৃত থেকে একটা অস্থিরতার ভাব ক্রমশ মাথার দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রায় জনহীন বিস্তৃত পথে উধাও হাওয়ার বুকে শব্দ তুলে ছুটেছিল সোমনাথ। কোনরকমে কোন ঠিকানায় পৌঁছে যাবার জন্য। যেন দুর্গপথে নিহিত কোন অজ্ঞাত সুরঙ্গ বয়ে বেড়াতে বেড়াতে উদভ্রান্ত দিশাহীনের মত পালাবার চেষ্টা করছিল সোমনাথ। আমি ভুল করেছি, ভাবল সোমনাথ, আজ ট্যাক্সি নিয়ে ওদের পথের ধারে এসে পড়ে ভুল করেছি।

বেশ কিছু মুহূর্ত চলে গেলেও পিছন দিক স্তব্ধ হয়ে রইল। সোমনাথের মাথার মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হচ্ছিল। চিন্তাগুলি

'আজকের বিকেলটা ভীষণ ভাল লাগছে'

অকস্মাৎ নির্জন শান্ত নদীর মৃদু কলতান ধ্বনিত হল।

—সত্যি বলছ, আজকে তোমার ক্লাব নেই পার্টি নেই বন্ধুবান্ধব ককটেল কিছু নেই, তবু তোমার সন্ধ্যা ভাল কাটছে? ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে?

ভদ্রলোকের কণ্ঠ যেন সেই আলো-আঁধারি গোধূলির রহস্যের মত সোহাগে জড়িয়ে এসেছিল।

—তুমি আমাকে কি ভাবো, বনু?

—কি জানি আমার কেমন বিশ্বাস হয় না। অস্বচ্ছ, প্রায় শ্বাসহীন কণ্ঠে বলল বনানী, দিনের পর দিন আমার মনে হয় তুমি কেবলই দূরে চলে যাও। চেষ্টা করেও আমি তোমার নাগাল পাই না।

বনানীর কণ্ঠ সুদূরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। তারপর পিছনে নীরব, রুদ্ধশ্বাস।

জালগোলা করা সুতোর মত ক্রমশ জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। বিজনের কথা মনে হচ্ছিল। বনানীদের পুরনো বাড়ীর কথা। বিজন এখন কোথায় কে জানে। জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চেষ্টা করে ঘাড় ও কাঁধকে খাড়া করে রাখল। বিজন একদিন বলেছিল—বনানীকে তোর কেমন লাগে, সোমনাথ?

—ভাল, ভালই তো মেয়ে। সোমনাথ উদাস স্বরে বলেছিল।

—দেখেছিস তো এত অভাবেও কি করে অ্যাডজাস্ট করে চলে। আর স্বভাবও ভাল ওর।

হুঁ। নির্বোধের মত উচ্চারণ করেছিল সোমনাথ।

—আমার ইচ্ছে হয় খুব ভাল ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিই, বেশ অবস্থাপন্ন ঘরে।

সুন্দরী গাছ ফটো ঃ পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

—আমারও মনে হয় ভাল ঘরেই ওর বিয়ে হবে।

—মনে হয় কেন; বিজন প্রত্যাশায় একান্ত হয়ে উঠেছিল, তুই কাজেও তাই করতে পারিস না?

—আমি? চমকে উঠেছিল সোমনাথ। কি বলছিস?

—কেন নয়? বিজন ওর কাঁধ চেপে ধরেছিল, তোর বাবাকে আমি গিয়ে বলব। হাতে পায়ে ধরব।

—পাগল! জাতের প্রশ্ন বাবার মন থেকে মুছে দেওয়া অসম্ভব।

—তাহলে, তুই সাবালক।

—না। নিজেকে শিথিল করে নিয়েছিল সোমনাথ, বিয়ে করার ইচ্ছে আমার এখন নেই। আমি বরং বনানীর জন্যে চেষ্টা করব?

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল বিজন, সোমনাথ নিরস্ত করেছিল।

—এখন আমি কোন কথাও দিয়ে রাখতে পারব না। জানিস তো জীবনে আমার অনেক আশা। বড় হবার, মানুষ হবার। আমি টেকনিকাল লাইনে কাজ শিখব, বাইরে যাব, প্রতিষ্ঠিত হব। এর মধ্যে আর কারো ভাগ্যকে আমি জড়িয়ে নিতে চাই না, বিজন।

মুখ কালো করে সরে গিয়েছিল বিজন। সোমনাথ আশ্বাস দিয়েছিল—তুই ভাবিস না। ওর ভালো ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হবে। আমার থেকে ভালো।

এরপর সোমনাথ আর ওদের বাড়ী ঘন ঘন যেত না। বনানীও খুব একটা ওর সামনে আসত না। এলেও মাথা নীচু করে থাকত। কখনো চোখ তুলে দেখত না। তারপর থেকেই বিজনের মধ্যে কি একটা দুস্তর প্রতিজ্ঞার ভাব লক্ষ করেছিল সোমনাথ। সে বন্ধুদের সঙ্গে কম মিশত। দেখাসাক্ষাৎ কম করত সকলের সঙ্গে। সব সময় বাড়ীতেও ওকে পাওয়া যেত ন দিনের পর দিন ওর মুখে চোখে কে একটা চিন্তা ও গোপনতার ভাব স্পষ্ট হ উঠছিল। নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে নিচ্ছ বিজন। ওর ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞে করলে বলত, একটা ব্যবসার চেষ্টা দেখ ভাই। তারপর একদিন বিজন ঘোষণা কর ও সমস্ত পরিবার নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে ব্যবসাসূত্রেই যাওয়া প্রয়োজন নাকি।

নক্ষত্র-জ্বলা কালচে নীল আকাশে দিকে তাকাল সোমনাথ। সময়ের সং সঙ্গে সুপারির মাথা থেকে চাঁদ সরে স মাঝ আকাশে এসে খানিকটা জায়গায় পান্ডু আলোর বৃত্ত তৈরী করেছিল। এরক খোলামেলা চাঁদ দেখতে ভাল লাগে ন সোমনাথ চোখ নামিয়ে সামনে মাঠে অস্পষ্ট ঝোপ ও গাছপালার দিকে তাকাল ঝিরঝির বাতাসে পাতার অস্ফুট মর্ম শুনল। যেন অনেকগুলি অতীতের পা ক' মুহূর্তে গুনে নিল। বিজনরা চলে যাবা কিছুদিন পরেই সোমনাথের বাবা মারা গে হঠাৎ। সোমনাথ অনভিজ্ঞ হাতে সংসারে হাল ধরতে গিয়ে দেখল তরণী ছিদ্রসংকুল সারাজীবন উচ্চস্তরের খাওয়া পরা ও সামা জিকতার বিলাস বজায় রাখতে গিয়ে বাব সর্বস্ব খুইয়েছে। এমনকি প্রায় বস বাড়ীটাও। অগত্যা সব দুরাশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি সোমনাথ। আজও সমানে সাঁতার কে চলেছে। আজো তবু তার চোখে স্বপ্ন অন্তত একটা ট্যাক্সি কিনবে সোমনাথ পরের ড্রাইভারি আর করবে না। বিজনও এমনি স্বপ্ন দেখত। কি জানি কি উপায়ে বিজন তার লক্ষ্যে পেঁছে গেছে হঠাৎ বাইরে থেকে মাঝে মধ্যে চিঠি দিত বিজন এবং তার ভাষা ও বক্তব্যে বোঝা যেত ধাপে ধাপে সে স্বচ্ছলতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সোমনাথের বিস্ময় লাগত কিন্তু কোনদিন কিছু খুঁটিয়ে জানতে চায়নি। আজ পর্যন্ত সোমনাথের সঙ্গে বিজনের আর দেখাও হয়নি। কিন্তু আজ বনানীকে দেখলে সোমনাথ। দেখে বুঝল বনানী দিন কিনে নিয়েছে। হয়ত বিজনই তাকে কিনে দিয়েছে। বোনকে বিজন খুব ভালবাসত।

অনামনে ভাবছিল সোমনাথ। পাশে এসে জুতোর শব্দ থামল।

—অন্ধকারে বসে কি করছেন সোমনাথবাবু।

চিন্তার গভীর থেকে জেগে উঠল সোমনাথ। উপরতলার সমাদ্দারবাবু। সোমনাথের বাড়ীওলা। অতএব মধুর হেসে উঠতে হল সোমনাথকে।

—এমনি, ঘরে বড় গরম। এখানে বেশ হাওয়ায় বসে আছি।

—তা যা বলেছেন। বেশ গুছিয়ে জমিয়ে সোমনাথের পাশের জায়গাটুকুতে বসে পড়লেন সমাদ্দার। আড্ডা দেবার ভঙ্গিতে। বললেন,

—কিন্তু নিজের নিশ্বাস ছাড়া হাওয়া তো দেখছি নে কোথাও।

কৌতুকে হাসলেন সমাদ্দার। সোমনাথের বিরক্ত লাগছিল। উঠে চলে যাওয়া যায় না তাই কোনমতে অনড় হয়ে বসে রইল।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরেছেন যে আজ? গাড়ী নেননি নাকি?

—নিয়েছিলাম। শরীর ভাল লাগছিল না বলে জমা দিয়ে দিলাম। আলগা ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা বলছিল সোনাথ।

—দেখবেন এসময় খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে।

সোমনাথ সাড়া দিল না। দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—আর, মানুষের অশান্তি চারিদিকে। মানুষই অশান্তি সৃষ্টি করছে, মানুষই ভোগ করছে তা। সমাদ্দার দুঃখ করলেন, শুধু আমাদের নয়, সব দেশেই, কেউ অনাহারে, কেউ অনর্থক যুদ্ধে মরছে। শুধু শুধু যুদ্ধের বিভীষিকা ছড়িয়ে আমোদ পাচ্ছে কেউ।

হোক। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। মনে মনে ছটফট করে উঠল সোমনাথ। আপনি এখন দয়া করে উঠলেই বাঁচি। মুখে অমায়িক হল সোমনাথ।

—ঠিক বলেছেন, আজকাল অশান্তিই মানুষের নিয়তি।

—আর অসুখের কথাটা বলছেন না? ভেজাল খেয়ে হদ্দ হয়ে যাচ্ছে সবাই। এই আমার ঘরেই দেখুন—

যত সব মামুলী কথা। চেষ্টা করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল সোমনাথ। কোথা থেকে এই কর্কশ উপস্থিতি এসে ওর সমস্ত ভাবনাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। অসহ্য বিরক্তিতে অস্থির হয়ে উঠল সোমনাথ। প্রাণমন সূচীমুখ করে একটি করুণ মধুর সিক্ত ছলছল কণ্ঠস্বরকে আবার বুকের মধ্যে শুনতে চাইল। বনানী অনেক কথা পিছনে বসে বলেছিল। কিন্তু বিজনের নাম একবারও তোলেনি। একবারও সোমনাথদা বলে ডেকে উঠল না সে। অথচ ওকে বনানী চেনেনি এটা অসম্ভব। তবে কি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে চেনা ওর পক্ষে অসম্মানজনক ছিল, ওর স্বামীর সামনে? কে জানে। দক্ষিণের এক সিনেমা হলের সামনে পৌছবার এক মুহূর্ত আগে চৌকো কাঁচের মধ্য দিয়ে বনানীর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়েছিল সোমনাথ। বনানী উজ্জ্বল চোখে পথের দিকে চেয়ে ছিল। সবুজ সিল্কের শাড়ীর আঁচল এলোমেলো বাতাসে ওর গলা ও কাঁধের কাছে হুটোপাটি করছিল। ওর চোখমুখ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা এখন খুবই ভাল লাগছিল সোমনাথের, কেমন একটা মায়াময় পেলব ভাব মনে জাগছিল। কিন্তু বনানীকে মুখ ফেরাতে দেখে চোখ সরিয়ে নিল সোমনাথ।

সমাদ্দার পাশে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। তার কিছুই কানে ঢুকছিল না সোমনাথের। ওর একান্ত এই নিরালাটুকু অন্য একজন এসে কেড়ে নেওয়ায় ক্ষোভে হাত কামড়াতে চাইল সোমনাথ। দু আঙুলে কপাল টিপে ধরল।

—আপনার মাথা ধরেছে নিশ্চয়ই, সমাদ্দার বললেন, তাহলে আর ঠান্ডা লাগাবেন না। যান ঘরে গিয়ে বসুন।

সমাদ্দার উঠে দাঁড়ালেন। সোমনাথ বেঁচে গেল। পায়ে পায়ে ভিতরের উঠোন ডিঙিয়ে ঘরে এল। বাচ্চাগুলো খেতে বসেছিল। ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসি ঝুলিয়ে তির্যক তাকাল অণিমা।

—মাথা ধরা ছাড়ল?

সোমনাথ মুখের পেশীতে কুঞ্চন ফেলল ঈষৎ। কোন কথা না বলে চোখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। ভাবনা-চিন্তাহীন শূন্য মনে কাটিয়ে দিল খানিক সময়। ওদের খাওয়া হলে অণিমা নীচে বিছানা পেতে শোয়াল। একেবারে ছোটটির পাশে শুয়ে মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াল। সোমনাথ এসব কিছু না দেখলেও অণিমার গতিবিধি জানতে পাচ্ছিল। এক সময় অণিমা ডাকল—খাবে না? উঠে এসো।

—তুমিও খাবে তো? সোমনাথ বুদ্ধিহীন গলায় প্রশ্ন করল।

আমি তো রোজই তোমার পরে খাই।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে ভেঙে উঠল সোমনাথ। খেতে বসেও ঠিকমত খেতে পারল না। বনানী আজ সোমনাথকে চেনেনি। চিনল না। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে চিনে আত্মসম্মান নষ্ট করতে চায়নি। অথচ পুরনো কথা তার সব নিশ্চয়ই মনে আছে। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সোমনাথ। অণিমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। কিছু প্রশ্ন করল না। সোমনাথ নীরবে হাত ধুয়ে এসে আবার শুল। অণিমা খেল, টুকিটাকি কাজ সারল, সবই টের পেল সোমনাথ। তারপর এক সময় ঘরের আলো নেভাল অণিমা। সোমনাথের পাশটিতে এসে বসল।

—তোমার কি হয়েছে বলত?

অণিমা পান খাচ্ছে, বুঝতে পারল সোমনাথ। ভাল লাগল না। আলো উধাও পড়া বিকেলে লিপস্টিকে রাঙানো বনানীর গাঢ় টকটকে ঠোঁট দুটোর কথা মনে পড়ল। বলল,

—শরীর ভাল লাগছে না।

—মিথ্যে কথা। তোমাকে চিনি না আমি! শরীরে কিছু হলে এতক্ষণ ব্যস্ত করে তুলতে আমাকে। তোমার অন্য কিছু হয়েছে।

—কি আর হবে। সোমনাথ নিস্পৃহ গলায় বলল।

—আমার ওপর রাগ! অণিমা অভিজ্ঞ স্বরে বলল।

—না রাগ করব কেন। এমনি, হঠাৎ কোন কিছু ভাল লাগছে না।

—গাড়ীতে আজ কোন সুন্দর মেয়ে উঠেছিল বুঝি? অণিমা পরিহাসের ছন্দে হাসল। সোমনাথ ঈষৎ চকিত হল, কিন্তু চমকটা টের পেতে দিল না।

—সে তো হামেশাই ওঠে। সুন্দর কুচ্ছিৎ ধনী নির্ধন বাঙালী অবাঙালী তাতে আমার কি? কে কাকে চেনে বা মনে রাখে?

—তোমার ট্যাক্সি কেনার কতদূর হল?

অণিমা জানে এ আলোচনা সোমনাথকে উদ্দীপ্ত করে।

—সে যখন হবার তখন হবে। সোমনাথ সেই শীতল স্বরেই বলল। পাশ ফিরে অণিমার কাঁধে হাত রাখল, তোমার চেহারা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন?

—আমি ঠিক আছি, ঘনিষ্ঠ গলায় বলল অণিমা, হঠাৎ আজ এ সব পাকামি কেন?

—সত্যি, সারাদিন কাজ করে ঘরের কোণে থেকে চোখমুখ রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে তোমার। এই ঘর, একটু হাওয়া নেই, বাইরেও বেরোও না কখনো।

—তুমি চুপ কর। এই আমার ভালো। সোমনাথের গায়ে হেলান দিয়ে বলল অণিমা। আমার কাজে যেমন ফুরসত নেই, তেমনি ক্লান্তিও নেই।

—আমার নতুন গাড়ী হলে, বুঝলে অণিমা, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব।

—আহা, আমি তোমার গাড়ীতে বেড়াব?

—কেন নয়? তুমি তো তখন আর ড্রাইভারের বউ নয়, একেবারে গাড়ীর মালিক। আবেগে বলল সোমনাথ, সামনে ড্রাইভার চালাবে। পিছনে আমরা দুজন, কতদূর বেড়িয়ে আসব।

অণিমা খুশী-খুশী অথচ সংকুচিত মুখে বলল,

—বেশ তো আছ তুমি এই গাড়ী ছুটো-ছুটি বেড়ানো নিয়ে। তার মধ্যে আবার আমাকে টানো কেন?

সোমনাথ অণিমার কথা কিছু শুনল, কিছু শুনল না। আপন মনে বলল,

—আচ্ছা, এই যে আমি সারাদিন বাড়ীতে থাকি না। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কোন দিন বিকেলবেলা, এতে তোমার কি মনে হয় আমি পর হয়ে যাচ্ছি?

—বাঃ তা কেন? অণিমা বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার বেশী বাইরে থাকা মানেই তো বেশী কাজ করা, বেশী সাশ্রয় হওয়া, তাড়াতাড়ি তোমার আশা পূর্ণ হওয়া, আর সে তো আমাদের ভালোর জন্যেই। তাছাড়া, অণিমা ফিসফিস করে বলল, খুব কাছাকাছি থাকলেই বরং ঠোকাঠুকি হবার ভয়। তার চেয়ে এই ভাল, তুমি তোমার বাইরে নিয়ে আছ, আমি ঘর নিয়ে।

আর কিছু বলল না সোমনাথ, জানলার ফাঁকে চাঁদের পান্ডুর আলো দেখল। ছাই রঙ আকাশ। ঝিঁঝির একটানা রব শুনল। কোথায় যেন টুপটাপ জল পড়ার শব্দ। মাথার চুলে অণিমার আঙুলের ছোঁয়া অনুভব করতে করতে নিজের মনের ক্লান্ত বিরক্ত অবমানিত মানুষটাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলল সোমনাথ।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের সেঞ্চুরী সংখ্যা কত এবং এপর্যন্ত কটি টেস্টে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন?

বিনীত
অসিতকুমার মুখার্জী
ত্রিবেণী, হুগলী

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) সাগুদানা কি কোন গাছের ফল না রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী?

(খ) ইতিপূর্বে আমাদের দেশে ডি-ভ্যালুয়েশন হয়েছে কি?

বিনীত
কমলকৃষ্ণ কুণ্ডু
কটক—১

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ৫১ পীঠস্থানের অন্যতম ওড়িশার বিরজাক্ষেত্রে (নাভি) দেবী বিমলা ও ভৈরব জগন্নাথের অবস্থান। কিন্তু জগন্নাথ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি 'ভৈরব' হলেন কিরূপে?

বিনীত
সুরেশচন্দ্র বকসী
বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) অালটিমিটার নামক যন্ত্রটি কে আবিষ্কার করেন?

(খ) বিশ্বেবরসেরা মোটর-সাইক্লিস্ট কে?

(গ) প্যারাসুট কে আবিষ্কার করেন?

(ঘ) ট্রানসিস্টর রেডিও কে আবিষ্কার করেন এবং কোন দেশে প্রথম ব্যবহার হয়?

বিনীত
বারিদবরণ দে
চিত্তরঞ্জন

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ডাকটিকেটের প্রথম প্রচলন হয় কত খৃষ্টাব্দে?

(খ) প্রথমদিকে ডাকটিকিটগুলি কিরূপ প্রতিকৃতি সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হোত?

(গ) কোথায় এবং কোন সালে বিশ্ব ডাক-সংঘের প্রথম অধিবেশন হয়?

বিনীত
দেবদাস চট্টোপাধ্যায়
বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) কোন ভারতীয় ক্রিকেটার টেস্টে সর্বোচ্চ রান করেছেন?

(খ) ভারতীয় হকি দল কতবার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং কোন কোন সালে?

(গ) CCCP পুরো কথাটি কি?

(ঘ) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডাক-টিকিট কোন দেশের এবং কত দামের?

বিনীত
বন্ধা ও দেবাশিস ঘোষ
কলকাতা—৪

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ইস্টবেঙ্গল কি কোনবার অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?

(খ) ক্যারম খেলা কে আবিষ্কার করেন?

বিনীত
কানাই, রঞ্জিত, উৎপল, রাজু ও সুভাষ
তিনসুকিয়া, আসাম

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত শিখা ও রমা দাশগুপ্তার (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,

পূর্ব রেলওয়ে:
হেড-অফিস—কলকাতা
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীজি সি ভাল্লা
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট—শ্রীকে কে মুখার্জি
চীফ মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার—শ্রীএইচ এম চ্যাটার্জি।

পশ্চিম রেলওয়ে:
হেড-অফিস—বোম্বাই
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীও এস মূর্তি
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট—শ্রীপি কে মাধবন মেনন।
চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার—শ্রীজে এফ মুখার্জি।

দক্ষিণ রেলওয়ে:
হেড-অফিস—মাদ্রাজ
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীবি সি গাঙ্গুলী
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট—শ্রীএস রাজগোপালন
চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার—শ্রীআর ডি নাদিরশা।

মধ্য রেলওয়ে:
হেড-অফিস—বোম্বাই
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীরতনলাল
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট—শ্রীটি এন দার
চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার—শ্রীএস এস লাল

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে:
হেড-অফিস—কলকাতা
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীজি ডি খাণ্ডেল-ওয়াল
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট—এম কল
চীফ মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়র—শ্রীপি মাথুর

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে
হেড অফিস—গৌহাটি
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীবি এস বালি
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট—শ্রী ডি শংকর
চীফ মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার—শ্রীএইচ চোপরা।

(খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ব্র সেতুর দৈর্ঘ্য প্রায় এক কিলোমিটার।

(ঘ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, সভার ডেপুটি স্পীকারের নাম শ্রীকৃষ্ণ রাও এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নাম শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা।

বিন
বাবলু
গৌহ

●

সবিনয় নিবেদন,

১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্তোষ গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, সব দীর্ঘজীবী হচ্ছে তিমি মাছ। এর আয়ু ৫০০ বছর।

বিনীত
স্মৃতিকুমার গ
মেদিনীপুর

●

সবিনয় নিবেদন,

১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্তোষ গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ফ পক্ষী সর্বাপেক্ষা দ্রুত উড়তে পারে গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৩০০ মাইল।

বিনীত
সন্তোষকুমার সা
টিকর, সিং

●

সবিনয় নিবেদন,

১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত অশোক সরকা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, পৃথি প্রধান প্রচলিত ভাষা দশটি। এই ভাষার ক্রমান্বয়ে ব্যবহারকারীদের স হচ্ছে—চীনা—৪২০ মিলিয়নস, রাশিয়া ২০০ মিলিয়নস, স্পেনীয়—১৩৬ মি য়নস, জাপানী—৯৫ মিলিয়নস, আরব ৭২ মিলিয়নস, ইংরেজী—২৭২ মিলিয় হিন্দী—১৫০ মিলিয়নস, বাংলা- মিলিয়নস, জার্মানী—১২০ মিলিয় এবং ফ্রেঞ্চ ৭০ মিলিয়নস।

বিনীত—
শ্রীমঙ্গলচন্দ্র
মুরারই, বীর

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

উৎসাহ আর চেষ্টায় সব হয় ...

জামশেদপুরের প্রধান পাওয়ার হাউসে ২৭,৫০০ কিলোওয়াটের তিনটি বিরাট টার্বো-অলটারনেটর আছে। এর মধ্যে একসঙ্গে দুটি চালিয়ে টাটা স্টীল ওয়ার্কস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কলকারখানা এবং সারা জামশেদপুর শহরকে চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি টার্বো-অলটারনেটরের কয়েল-সিস্টেমে গণ্ডগোল হয়ে হঠাৎ সেটা অকেজো হয়ে পড়ে। কতকগুলো কারণে টার্বো-অলটারনেটর সারিয়ে তাড়াতাড়ি চালু করবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মেরামতের জন্য যতগুলো বাড়তি কয়েল দরকার ততগুলো জামশেদপুরে ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানী করতে গেলেও প্রায় একবছরের ধাক্কা। তাছাড়া, এতকাল এই বিরাট ও জটিল যন্ত্রগুলোর মেরামতি কাজ বিদেশী বিশেষজ্ঞ কারিগররাই করে এসেছেন।

এ জাতীয় যন্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও টাটা স্টীলের ইলেকট্রিশিয়ানরা মেরামত করার নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করে ফেললেন এবং সাধারণতঃ এগুলোর মেরামতে যত কয়েল লাগে তার মাত্র অর্ধেক বদল ক'রে এক নতুন কায়দায় যন্ত্রটিকে খাড়া করলেন। ১৯৬৬ সালের মে মাসে অচল টার্বো-অলটারনেটর আবার চালু হল।

টাটা স্টীলের এই প্রচেষ্টায় দেশের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচলো। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভারতে এই প্রথম এরকম জটিল বৈদ্যুতিক যন্ত্র মেরামতের কাজ সম্পন্ন ক'রে জামশেদপুর আবার প্রমাণ করল: উৎসাহ আর চেষ্টায় সব হয়।

টাটা স্টীল

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 3439A

ষষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

২৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 4th November, 1966 শুক্রবার, ১৮ই কার্তিক, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীধ্রুব রায়

আজকের কথা প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

প্রেক্ষাগৃহে—"আজকের কথা" প্রসঙ্গে (ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় খন্ডে) আপনারা যা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য হলেও কয়েকটি মন্তব্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

"বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী ব্যবস্থা" বাংলার চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দুঃখের (দুর্দশা?) অবসান ঘটাতে পারবে কিনা এ বিষয় আপনারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কারণ—'কোটা সিস্টেম' প্রবর্তনের ফলে ইংলন্ডের চিত্রগৃহের সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে কমে এক হাজারে দাঁড়িয়েছে।

আমার যতদূর জানা আছে—ইংলন্ডের চিত্রগৃহের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার জন্য আদৌ 'কোটা সিস্টেম' দায়ী নয়। ইংলন্ডে (যুক্তরাজ্যে) এবং অন্য অনেক পাশ্চিম দেশে টেলিভিশনের প্রচন্ড সাফল্য ও জনপ্রিয়তাই চিত্রগৃহের সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ। কাজেই বাংলাদেশে 'কোটা সিস্টেম' চালু হলে চিত্রগৃহের সংখ্যা হ্রাসের কোন সম্ভাবনা আদৌ নেই। তাছাড়া ভারতবর্ষে, এবং বিশেষ করে বাংলা দেশে, টেলিভিশন এখনও এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে না যা দ্বারা চিত্রপ্রদর্শনীর অথবা মঞ্চ অভিনয়ের ক্ষতি করতে সমর্থ হবে। এছাড়া, দিল্লীর কর্তারা আদৌ বাংলায় টেলিভিশন স্থাপন করবেন কিনা সেকথা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন! আমার মনে হয়, শুধু বাংলার চিত্র প্রযোজকদের নয়, সমগ্র বাংলাকে রক্ষা করার জন্য বাংলা দেশের সকল চিত্রগৃহগুলিকে আইন দ্বারা বাধ্য করতে হবে যাতে তারা [illegible] কমপক্ষে ২৬ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখায় এবং Protection [illegible] কর অবাংলা ছবিগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়। আমি [illegible] প্রতি বাংলাভাষী [illegible] 'বাধ্যতামূলক' প্রদর্শনী [illegible] আন্দোলন শুরু করে বাংলার সরকারকে সাহায্য করা।

[illegible]
কলিকাতা [illegible]

খৃষ্টবাণীর বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

৩০শে ভাদ্র, ২০ সংখ্যায় শ্রীসত্যবন্ধু ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের যীশু খৃষ্টের একটি বিখ্যাত বাণী—

"It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God."

সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটি পড়লাম। এই সুন্দর নীতি ব্যাখ্যায় কিম্ভুতকিমাকার উস্ট্র নামীয় জীবটির অস্বস্তিকর উপস্থিতিয় অনাস্তর অর্থ হিসাবে পর্বতশিখরে অবস্থিত সংকীর্ণ গুহা এবং তথায় উষ্ট্রের সহজে প্রবেশ করা ইত্যাদি যেসব ব্যাখ্যা শ্রীদস্তিদার উপস্থাপিত করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েও বলতে চাই যে, ঐ ব্যাখ্যাটি আমার কাছে কষ্টকল্পিত তথা ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। বরং ভুল অনুবাদ সম্পর্কে তিনি যে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেটি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শোনা যায় মূল বাইবেল থেকে ইংরাজীতে অনুবাদের সময় কিছু কিছু অনুবাদে ভুল প্রবেশ করেছে। আমার যতদূর জানা আছে ক্যামেল শব্দটি ঐরূপ ভুল অনুবাদের ফলে এসেছে। যে বাক্যটির অনুবাদে ক্যামেল কথাটি এসেছে তার অর্থ ছিল "কাছি" বা "মোটা দড়ি"। কিন্তু মূল শব্দটির সঙ্গে ধ্বনি সাম্যের জন্যই ঐ বাক্যটি ক্যামেল-এ অনূদিত হয়েছে ভুলক্রমে। এবং এরই ফলে সেই আবহমান কাল থেকে সূচের ঐটুকু ছিদ্রের ভেতর দিয়ে উষ্ট্র নামক জীবটি সহজেই যাতায়াত শুরু করেছেন ধনী ব্যক্তিটিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গানুবাদ কথাটি কেন শ্রীদস্তিদার ব্যবহার করেছেন বুঝলাম না। তাঁর সঙ্গে আমিও এই আশা করব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই বিষয়ে আরও কিছু আলোকপাত করে উষ্ট্রের এই 'অস্বস্তিকর উপস্থিতি'র একটা সমাধান করে দেবেন।

বিনীত
রবিকিরণ ভট্টাচার্য
মহীশূর

২৬শে অক্টোবর,
১৯৬৬

'রবীন্দ্রসুহৃদ প্রিয়নাথ সেন' প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের ১০শে আশ্বিনের সংখ্যায় শ্রীকমল চৌধুরীর 'রবীন্দ্রসুহৃদ প্রিয়নাথ সেন' রচনাটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। [illegible] শ্রীচৌধুরী প্রিয়নাথ সেনের [illegible] [illegible] সমালোচকরূপেই [illegible] বেশি করে তুলে ধরেছেন কিন্তু প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষ করে [illegible] ও মনোভাবনে যে [illegible] শ্রীচৌধুরীর [illegible] বস্তুতঃ তা অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ [illegible] প্রায় প্রতিটি সাহিত্যকর্ম প্রকাশের পূর্বে প্রিয়নাথের শরণাপন্ন হতেন। [illegible] [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] [illegible] প্রয়োজন দেখা দিত। প্রিয়নাথকে [illegible] [illegible] ও [illegible] জানান। "ভাই—চিরকুমার সভায় [illegible] full steam [illegible] [illegible] ছেড়ে [illegible] উত্তীর্ণ যেমন করে হোক শেষ করে দিয়ে [illegible] হবার জন্যে [illegible] উঠেছিল। তারপর যখন তোমার [illegible] ক্রমেই [illegible] হয়ে আসছে, তখন [illegible] পশ্চাতে খুব একটা কড়া [illegible] একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে...... চিরকুমার সভা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শ মতো ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্তন করে দেবার চেষ্টা করব। ... যেখানে থামা উচিত এবং যেরকমভাবে থামা উচিত তা হয়েছে কিনা নিজে বুঝতে পারছি না।" কর্মে যখনই সন্দেহ দেখা দিয়েছে, চিন্তায় এসেছে অবসাদ তখনই প্রিয়নাথকে আহবান করেছেন রবীন্দ্রনাথ আর এই কারণেই বোধহয় রবীন্দ্রচিন্তা প্রিয়নাথের বক্তব্যের সমধর্মী। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য সম্বন্ধে প্রিয়নাথ লিখেছিলেন, "মহাভারতের যেন এক তাল মাটির উপর চিত্রাঙ্গদা কথাটি লিখিয়া গিয়াছেন, রবিবাবু সেই মাটি লইয়া একটি জীবন্ত অপূর্ব রমণীমূর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।" দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বহুকথিত 'কাব্যে-নীতি' নামক প্রবন্ধে 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরূপ সমালোচনা প্রকাশের পরই প্রিয়নাথকে দেখি প্রায় একান্ত বাধ্য হয়েই কলম ধরতে। কারণ চিত্রাঙ্গদা প্রিয়নাথের কাছে প্রশংসা পেয়েছিল আগেই। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা লেখা সম্পূর্ণ করে প্রিয়নাথকে লিখেছিলেন...... "ভাই—কাল অর্থাৎ শনিবার প্রাতঃকালে আমাদের এখানে এসে মধ্যাহ্নভোজন করবে কি? কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও (চিত্রাঙ্গদার পান্ডুলিপি [illegible]) আছে—"

রবীন্দ্র-অন্তরের গভীরতায় প্রিয়নাথ ছিলেন এক আলাদা কক্ষের বাসিন্দা। অবিশ্রাম সাহিত্যচর্চার মাঝেও রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়ে উঠতো প্রিয়-সন্দর্শনে। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ভাই—[illegible] পূর্ণতোয়া পদ্মার দিকে মুখ করে [illegible] যোগে তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি যে [illegible] যদি এস তাহলে আমি আর [illegible] [illegible]...... ভৃত্যটিকে হাঁক দাও পোর্টম্যান্টো বোঝাই কর, অশ্রুমুখী গৃহিণীর কাছে বিদায় লও এবং কোনপ্রকার কৌশলে ট্রেন মিস করবার চেষ্টা কোর না।" প্রিয়নাথকে যখন কাছে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা [illegible] অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। সদ্যলেখা [illegible] রচনা নিয়ে বসেছেন প্রিয়নাথকে [illegible] শোনাতে। প্রিয়নাথ অত্যন্ত short sight ছিলেন [illegible] নিজে পড়তেন না—শুনতেন। [illegible] ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'পত্র' কবিতা প্রিয়নাথের উদ্দেশ্যেই লেখা। আর [illegible] 'গল্প'ও উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের নামে।

প্রিয়নাথের সাহিত্যকর্ম যদিও [illegible] [illegible] কোন অগ্রগণ্য গুণী সাহিত্যিকের [illegible] শ্রেণীর শরীক। পাণিনির ভাষ্যে [illegible] "সাহিত্যং অধীতে ইতি সাহিত্যিকঃ সাহিত্যং রক্ষতি ইতি সাহিত্যিকঃ"। প্রিয়নাথের [illegible] রচনার মধ্যে ইংরেজি কবিতারও সন্ধান মেলে।

"The year has found its goal,
Hope finds no work to begin
Life yawns — a barren waste,
When — when will death
close in? . . ."

প্রবীণ সমালোচক "Edmund Gosse" প্রিয়নাথের এই "At the year's end" সনেটটি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

ভবদীয়া
শুক্লা মল্লিক
১১এ, পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা—২

স্বনির্ভরতার আহ্বান

উৎসবকে জানিয়েছিলাম আমন্ত্রণ। আজ উৎসবান্তে সকলকে জানাই বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ। শারদীয় উৎসবের আনন্দে সম্পূর্ণ আত্মহারা হবার সুযোগ আমাদের সীমাবদ্ধ। কারণ, বহুবিধ সমস্যায় দেশ জর্জরিত। তার স্থায়ী সমাধান না হলে আমাদের সমস্ত আনন্দই হবে সাময়িক; তার কোনো গভীর তাৎপর্য প্রতিফলিত হবে না সমাজ-জীবনে।

দুর্গোৎসবের সময়ে দিল্লীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া ও ভারতের তিন প্রধান নেতা মিলিত হয়েছিলেন একটি ক্ষুদে 'শীর্ষ সম্মেলনে'। একে জোট-নিরপেক্ষ দেশের শীর্ষ সম্মেলন হয়তো আমরা বলতে চাই না। কিন্তু উন্নয়নশীল ও জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে এই সম্মেলনের তাৎপর্য নিশ্চয়ই অস্বীকার করা চলে না। বান্দুং সম্মেলনে যে-প্রীতির সূচনা, অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে এই তিনটি দেশের মৈত্রীর বন্ধন আজও অক্ষুণ্ন আছে। ১৯৫৬ সালে ব্রিয়োনিতে এবং ১৯৬১ সালে কায়রোতে জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে এই তিন দেশের দুটি মৈত্রী বৈঠক ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। জওহরলালের অবর্তমানে দিল্লীতে এই পর্যায়ের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

এই সম্মেলনে রাজনৈতিক ঘোষণাবলী যা উচ্চারিত হয়েছে তা বিশ্ব-শান্তি ও পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিরই অনুগামী। যুদ্ধবর্জন, উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ এবং সর্বজাতির সুখে-শান্তিতে বাস করার যে-মৌলিক নীতিতে আমরা বিশ্বাসী তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল নাসের। বলা প্রয়োজন যে, এশিয়াতেই আজ অশান্তির আশংকা বেশি। ইয়োরোপে স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। বার্লিন নিয়ে উত্তেজনাও আজ অনেকটা প্রশমিত। কিন্তু এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ভাগাহত ভিয়েৎনামে আজ যে-আগুনের খেলা চলেছে তার পরিণতি ভয়ংকর হতে পারে। দিল্লীর ত্রিশক্তি বৈঠক সে কারণেই ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসান দাবী করেছেন ন্যায্য শান্তি ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে।

শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং এই সমৃদ্ধি আজ স্বনির্ভরতা ছাড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দিল্লী সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও স্বনির্ভরতা। আজ এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জোটবদ্ধ সচ্ছল দেশগুলি বিনা স্বার্থে সাহায্য বা সহযোগিতা দেয় না। নানা দিক দিয়ে, বিভিন্ন চেহারায় চাপ আসে অর্থনৈতিক দুর্বলতায় পীড়িত নতুন স্বাধীন দেশগুলির ওপর। তার ফলে সত্যিকারের স্বাধীনতা ও জোট-নিরপেক্ষতা রক্ষা করা এদের পক্ষে অর্থহীন হয়ে পড়ে তথাকথিত সাহায্যের রাজনীতির চাপে পড়ে। এই দুর্বলতার প্রতি বলিষ্ঠ ও বাস্তবভঙ্গিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো। রাষ্ট্রসংঘের গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সচ্ছল ও সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির মোট জাতীয় আয়ের এক শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের জন্য দেওয়া হোক। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত সেই সামান্য বরাদ্দ ভাগাহীন জাতিগুলির পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি; যার ফলে ধনী দেশগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে এদের অগ্রগতি হয়েছে ব্যাহত এবং স্বাধীন সত্তার ওপর আসছে নানারকমের চাপ।

দিল্লী বৈঠকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, বিশ্বের ৭৭টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি প্রস্তুত করতে হবে। এবং উন্নত দেশগুলি যাতে এই দেশগুলি থেকে শুধু কাঁচামাল নয়, তৈরী পণ্য আমদানী করে তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সম্মেলনে যোগদানকারী তিনটি রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীরা শীঘ্রই একটি বৈঠকে মিলিত হবেন এবং নিয়মিতভাবে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা হবে। এই প্রস্তাবটি গুরুত্বসম্পন্ন এবং বৃহৎ রাজনৈতিক প্রশ্নের মতোই উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ও মূল্যবান। বিশ্বের বৃহৎ জনসমষ্টি দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় পশ্চাৎপদ থাকলে সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবীর আশা করা অর্থহীন। শান্তি যেমন অবিভাজ্য, সমৃদ্ধিও আজকের দুনিয়ায় তেমনি অবিচ্ছেদ্য। এই চিন্তা থেকেই রাষ্ট্রসংঘের আদর্শের উদ্ভব। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং সচ্ছল দেশগুলি মুখে বড়ো আদর্শের কথা বলে কার্যক্ষেত্রে তার কার্পণ্যই দেখা যায় বেশি। ক্ষুধা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গোটা মানবজাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত। তাই দিল্লী সম্মেলন এর প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সময়োচিত কাজ করেছেন।

তবে সব কথার শেষ কথা হল স্বনির্ভরতা। জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শকে যদি রক্ষা করতে হয়, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকে যদি করতে হয় কার্যকরী তাহলে তার প্রধান শক্তি আহরণ করতে হবে স্বনির্ভর অর্থনীতি থেকে। স্বনির্ভরতাই স্বাধীনতা। এবং স্বাধীনতার বাঞ্ছিত রূপ হল শান্তি ও সমৃদ্ধির রাজনীতি। ভারত, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এবং যুগোশ্লাভিয়া—তিন মহাদেশের এই তিনটি দেশ যদি সেই বাঞ্ছিত আদর্শকে পারস্পরিক সহযোগিতায় বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, আজকের অনেক সমস্যা ও দুশ্চিন্তা তাহলে তিরোহিত হবে। দিল্লী সম্মেলন তারই পথনির্দেশক।

বিচিত্র চরিত্র

যতীন কাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাধাদা'র বিচিত্র চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল আরও কয়েকজনকেই। দুজনের কথা কিছু বলেওছি, রাধাদা'র কথার মধ্যে।

প্রাচীনকালের সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান কুলদাপ্রসাদবাবুর এবং তাঁর ছোট ছেলে যতীন্দ্র সরকার ওরফে যতীন সরকারের কথা বলেছি। রাধাদা বলত, কুলুকাকার ছেলে যতীনকাকা। এবং পরম কৌতুকে হাসত।

হাসবার কথাই। সত্যই এই বিচিত্র সম্পর্কটা রীতিমত শক্ত বনিয়াদের উপর স্থাপিত। পোক্ত গাঁথনী। কোন ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ে না। প্রাচীনকালের সম্পর্কে কুলদাবাবু বয়সে বড়, গ্রাম সম্পর্কের নাতি অন্নদাবাবুকে দাদা বলতেন, সেই হিসেবে কুলদাবাবু রাধাদা'র কাকা এবং কুলদাবাবু অন্নদাবাবুর আপন খুড়তুতো ভাইদের আপন মামা হতেন বলে তিনি অন্নদাবাবুর মাতুল স্থানীয় হতেন, সে সম্পর্ক অনুযায়ী যতীন্দ্র সরকার অন্নদাবাবুর ছোট মামাতো ভাই, এই সম্পর্ক ধরে যতীন সরকার রাধাদার 'যতীনকাকা' হতেন।

কুলুকাকার ছেলে যতীনকাকা। যতীনকাকার আরও একটা নাম রাধাদা দিয়েছিল। সেটা হল 'ডাক্তার লিউকিস'।

যতীনকাকা আর জি কর মেডিকেল ইস্কুলের ফেলকরা ছাত্র। ফেল করলেও সেকালে ১৯১৪।১৫।১৬ সালে কিছু ওষুধপত্র নিয়ে পকেটে স্টেথেসকোপ গুঁজে ডাক্তার সেজে বসতে দোষ ছিল না। কেউ আপত্তি করত না। না সমাজ, না সরকার, না প্রজা, না রাজা। মানুষের জীবন তখন নিয়তির কন্ট্রোলে ছিল আঠারো আনা; তখন ডাক্তার ওষুধ এদের কোন হাত ছিল না। পরমায়ু থাকলে ওষুধ খাটত, না থাকলে খাটত না; নিয়তি সদয়া হলে ডাক্তার মিলত বা ডাক্তার রোগ ধরতে পারত, নিয়তি নিদয়া হলে—ন হরি শঙ্কর। এই অবস্থায় যেই বসুক, কেউ আপত্তি করত না। যতীনকাকা তো রীতিমত মেডিকেল ইস্কুলে পড়েছিল চার বছর। নাই বা করলে পাশ।

সে কথা এখন থাক। প্রথম থেকে শুরু করি।

প্রাচীন জমিদার ঘরের ছেলে। অনেক শরীকের বাড়ী। যতীনকাকা কুলদাবাবুর সব থেকে ছোট ছেলে। চেহারা খানি নধর-নধর; মুখে একটি মিষ্ট হাসি এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ মানুষ। এর সঙ্গে আর একটা খ্যাতি যতীনকাকার ছিল; সেটা হল যতীনকাকা খ্যাতনামা গল্পে-ব্যক্তি, যা ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় মিথ্যাবাদী তিনি ছিলেন তাই। কোন উদ্দেশ্য নেই, মতলব নেই, মিথ্যা বলে চলেছেন যতীনকাকা। অকারণ বলব না, কারণ অনেক ভেবে এই মিথ্যে বলার কারণ আমি যা বুঝেছি, তাহল একটা বিস্ময়কর, একটা আশ্চর্য কিছু জানা বা দেখা বা শোনার সৌভাগ্যে তিনি সৌভাগ্যবান এইটে তিনি প্রতিপদে প্রমাণ করতে চাইতেন। অবশ্য এ সবই ঐশ্বর্য সংক্রান্ত গল্প। এই গল্প বলতে গিয়ে যতীনকাকা প্রতি পদে ধরা পড়তেন, কারণ ধরা পড়ার মত করেই বলতেন তিনি। অসম্ভবের উপর একটা ঝোঁক ছিল যতীনকাকার। আশ্চর্য ঝোঁক।

যতীনকাকা গ্রামের ইস্কুলে পড়তেন, আট দশ বছরে গোটা পাঁচেকের বেশী ক্লাসে পড়বার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। বোধহয় ক্লাস সেভেন এইট পর্যন্ত ঠেলেছিলেন কোন রকমে; তারপর ওই ক্লাস এইটে পর-পর বছর তিনেক থেকে গ্রামের ইস্কুল ছেড়ে চলে গেলেন বহরমপুরে। যতীনকাকা সপ্রতিভ ব্যক্তি, তিনি সেখানে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে নিলেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ 'বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাটের বাড়ীতে। বৈকুণ্ঠবাবু বাড়ীতে কয়েকটি ছাত্রকে রেখে অন্নদান করতেন। যতীনকাকা কোন সুপারিশে যে এই সুবিধা সংগ্রহ করেছিলেন জানি না, তবে করেছিলেন এটা ঠিক। বছর দুই ছিলেন। কিন্তু পর-পর দু বছরই ফেল করায় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

যাই হোক গ্রামে এসে যতীনকাকা গল্প করলেন—বহরমপুরে বৈকুণ্ঠ সেনমশায়ের বাড়ীতে একটি আশ্চর্য গাই আছে।

যতীনকাকা কথা বলবার সময় 'বুয়েচ কিনা' শব্দটি বার-বার প্রয়োগ করতেন; বলতেন—বুয়েচ কিনা বাপু সে এক স্বর্গীয় ব্যাপার! কামধেনু কোথায় লাগে! কামধেনু তো বিনা বাছুরে দুধ দেয়? এও তাই, বিনা বাছুরে তো বটেই, তার উপর চার বাঁটে চার রকম গব্য বস্তু বের হয়। এক বাঁটে দুধ, এক বাঁটে ক্ষীর, এক বাঁটে দই, মানে দস্তুরমত টক-টক বুয়েচ কিনা বাপু—

যতীনকাকার সমবয়সী ছিল তাঁর সম্পর্কিত ভাইপো রামগোপাল, রাধাদার খুড়তুতো ভাই; সে একটু কাঠখোট্টা, বড় মানুষ ছিল, সে শুনে প্রথম দিনই বাধা দিয়ে বলে উঠেছিল—"হাঁ-হাঁ-হাঁ আউর এক বাঁটসে যতীন সরকার নিকালতা!"

ব্যঙ্গ করে বক্রভাবে হিন্দীতে কথা বলা রামগোপালের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। রামগোপালের এই ব্যঙ্গ এবং রঙ্গে হাসির হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল, সে হুল্লোড়ের মধ্যে যতীনকাকা গাইটার আর এক বাঁটে কি বের হয়, ঘি অথবা ননী তা বলবার অবকাশ পান নি, কিন্তু অপ্রস্তুত তিনি হন নি; সকলের হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে ছিলেন সমানে, এবং মধ্যে মধ্যে বলেছেন—মাইরী বলছি, সত্যি কথা। মাইরী, মা-কালী, মা ফুল্লরা, মা দুর্গা যার দিব্যি করতে বলবে তাই করতে পারি। সে যাকে বলে স্বর্গীয় গাই। বুয়েচ কিনা—সে এক—।

যতীনকাকার মাতুলালয় ছিল চণ্ডীদাস নানুরে। নানুরের যে মাঠে চণ্ডীদাস পাতার কুটির বেঁধে কাব্য রচনা করেছিলেন, সেই মাঠের একটা বিশেষ খ্যাতি আছে, সে মাঠে মুলো খুব ভাল হয়। আমাদের ওদিকে নানুরের মুলো বিখ্যাত।

যতীনকাকা গল্প করতেন তাঁর মামাদের ক্ষেতে আড়াই হাত লম্বা এবং এক হাত বেড়ের মোটা মুলো জন্মায়।

তবে বছরে এই একটি মুলোই এত বড় হবে। বেশী হবে না। অর্থাৎ এনে দেখাতে বললে, দেখাতে যতীনকাকা পারবেন না, কারণ এমন মুলো তো দুটো হয় না যে একটা নিয়ে আসবেন! নানুর গিয়ে দেখতে চাইলে যতীনকাকার কাজ পড়ত, যাবার সময় হত না। মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদী বললে যতীনকাকা একটু হেসে বলতেন—মাইরী বলছি, মাইরী, ঈশ্বরের দিব্যি—

বন্ধুবান্ধব বা শ্রোতারা 'যাও-যাও' রব তুলে উপেক্ষা করলে বা থামিয়ে দিলে যতীনকাকা বলতেন, ওই তো তোরা বিশ্বাস করবিনে!

যতীনকাকার জ্যেষ্ঠ সহোদর কৃতী মানুষ ছিলেন, তিনি ধমক দিতেন, প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অপমান করতেন কিন্তু যতীনকাকা হেসে বলতেন—মাইরী বলছি, মাইরী, ঈশ্বরের দিব্যি।

বড় ভাই বলতেন ঈশ্বরের দিব্যি? মাইরী? আমি জানি না? আমার মামার-বাড়ী নয়?

—হ্যাঁ বটে। তোমার মামার বাড়ী বটে। কিন্তু তাহলেও তুমি জান না। তুমি দেখ নি। আমি জানি আমি দেখেছি।

বড় ভাই ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—ড্যাম, লায়ার, ডংক, উল্লুকে অনেক নাম ছোট ভাইকে দিয়েছিলেন, ছোট ভাইয়ের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য মিথ্যে কথা বলা নয়, সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য ধমকের মুখে নরম হয়ে ধরা পড়া, তাই পড়েছিলেন যতীনকাকা এবং বলেছিলেন—কি করব? বলছে বলুক। কি করব?

একবার মনে আছে রাস্তায় দেখলাম যতীনকাকা আসছেন, খুব হাত-পা নেড়ে কথা বলতে-বলতে আসছেন। দুই হাতের চেলো জোড় করে বলছেন, এর ডবল। ডবল কেন আরও বেশী। হ্যাঁ আরও বেশী—

—কি?

—সাপের ফণা। আর এই এত বড়। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে দিলেন। চক্র কি? যেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মের পদ্ম। আরে বাপরে-বাপরে! ভীষণ ব্যাপার।

—কোথায়?

—পথে।

—সেটা কোথায়?

—ওই গোলার ওধারে। ওঃ খুব বেঁচে পালিয়ে এসেছি। খুব বেঁচে গেছি। তাঁর হাত দুখানা তখনও প্রসারিত করে রেখেছেন। বাপস্ এই ফণা, এই লম্বা। আমাদের নন্দী বেটাকে বোধহয় শেষ করে দিয়েছে। বেটা আমার পিছনে ছিল।

সত্য-সত্য হাঁপাচ্ছিলেন যতীনকাকা।

কিছুক্ষণ পর নন্দীটা এসে পেঁছুল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, বেঁচে আছিস?

সে হেসে বললে—আজ্ঞে, পেনাম। বাবু বুঝি বলছিলেন—?

—সাপটা কত বড় রে? খুব বড়?

—আজ্ঞে না। এই হাতখানেক ঢোঁকা (বাচ্চা) বটে।

—হাতখানেক?

—একটুকুন ছোটই হবে, এই এই-বারের ডিমফোটা বাচ্চা। বাবু দেখেই একবারে ছুট! হাসতে লাগল সে। অবশ্য সবিনয়ে।

কলকাতার মল্লিক বাড়ীর, লাহা বাড়ীর গল্প করতেন যতীনকাকা, বহরমপুরে, কাশিমবাজারে মহারাজা নন্দীর বাড়ীর গল্প করতেন। ঐশ্বর্যের গল্প হলেই কোন-না-কোন রকমে কথা কেড়ে নিয়ে বলতেন, সে দেখেছিলাম বুয়েচ কিনা, রাজেন মল্লিকের বাড়ী। আরে বাপরে, সে কি কান্ড। কাপাসের সুতো, রেশমের সুতো দেখেছ, সে মাইরী বুয়েচ কিনা ফাইন সোনার সুতো আর রুপোর সুতো। একটার টানা একটার পোড়েন। আরে বাপরে, সেই শাড়ী পরে যখন মেয়েরা বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চড়ত, বুয়েচ কিনা, চোখ একবারে ধেঁধে যেত।

বলতে-বলতে মাত্রা চড়ত।

বলতেন—সে যে পানের ডিবে না কি বলব, বুয়েচ কিনা; এই শাঁখ থেকে যেমন সিঁদুর কৌটো হয়, তেমনি হীরে, একেবারে কমল হীরে কুঁদে পানের ডিবে। আরে বাপরে-বাপরে।

খাওয়ার গল্প করেছিলেন, মহারাজা নন্দীর বাড়ীতে কস্তুরী ঘিয়ে ভাজা লুচি-মিষ্টির কথা। বলেছিলেন—সে কি গন্ধ? একেবারে পাড়া মো-মো করে। আরে বাপরে-বাপরে, বুয়েচ কিনা, চারখানা লুচি খেলে শরীর ভার হয়ে যাবে, ঘাম হতে থাকবে। কলকল-কলকল করে যায়। বুয়েচ কিনা, তিন-চার দিন খিদেই থাকে না।

—কি যাতা বলছ? কস্তুরী ঘি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বৎস, কস্তুরী ঘৃত। তার সঙ্গে আরও সুগন্ধি মশলা দিয়ে সেই সুগন্ধি ঘিয়ে লুচি ভাজা হয়েছিল। সেবার স্পেশ্যল দিয়েছিলেন রাজবাড়ীর ঠাকুর। জবাকুসুম তৈলের মত কস্তুরী ঘৃত। তাই নিয়ে বহু হাঙ্গামা। দেখ ঘি এনালিসিস করে দেখ, কোন খারাপ কেমিক্যাল এাবশন হল কিনা! দেখ টেস্ট কেমন হল। কলকাতা থেকে কেমিষ্ট এল। ডাক্তার এল, বুয়েচ কিনা, সে বলে—

রামগোপাল বলেছিল—[illegible] বাড়ীর সেই স্বর্গীয় গাইটার দুধের ঘিয়ে ভাজলেই পারত!

যতীনকাকা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—বলিস নে, বলিস নে, ওরে আমি নিজে ডাক্তার, আমি যা বলছি তা শোন—

—ডাক্তার? পাশ করেছিলে?

—পাশ-ফেলের ব্যাপার নেই এতে। পড়ার ব্যাপার। লোকে চার বছরে পড়ে, আমি ছ বছর পড়েছি। আমি বড় ডাক্তার।

এই কারণেই রাধাদা বলত তাকে—হাঁ-হাঁ তুমি তো ডাক্তার লিউকিস। গ্রেট ডক্টর।

রামগোপাল বলত—তবে ডাক্তারী চলল না কেন তোমার?

যতীনকাকার দাদা বলতেন — হামবাগ, ড্যাম লায়ার, উল্লুকে একটা, জীবনে কিছু শেখে নি, একটা পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে না। না এন্ট্রান্স, না ডাক্তারী, না টাইপরাইটিং, সব তাতে ফেল। আমার বাবসাতে ঢুকিয়ে নিয়েছি। গাধার মত ডংকিজ্ ওয়ার্ক দিয়েছি। তাই করেছে হতভাগা গাধা।

যতীনকাকা মৃদু-মৃদু হাসত। বলত—বেশ-বেশ! তাই বল। তাতেই যদি তুমি খুশী হও, ভাল লাগে তোমার তাই বল তুমি।

যতীনকাকার একদিনের ছবি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। যতীনকাকার একটা মামলা চলছিল বোলপুরের কোর্টে। মামলাটায় বাদী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। পিত্রালয়ের সম্পত্তি তাঁর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তাঁর বাপের জ্ঞাতিরা দখল দেয় নি। সম্পত্তি পেলে বেশ কিছু পেতেন যতীনকাকা। পাবার কথাই ছিল বার আনা কেন ষোল আনা নিশ্চিত। সেই মামলায় যতীনকাকা সাক্ষী দিলেন। বললেন—তিনি ধানের দরুণ টাকা গুনে নিতেন।

কিন্তু প্রতিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরায় জিজ্ঞাসা করলে, আপনি [illegible] বারাটমশায়ের বাড়ীতে কখনও ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ছিলাম।

—তাঁর বাড়ীতে একটা গরু ছিল আপনি দেখেছিলেন, যার এক বাঁটে দুধ পড়ত, এক বাঁটে ক্ষীর, এক বাঁটে দই, আর এক বাঁটে—কি বের হত? বলুন।

বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন যতীনকাকা।—এ্যাঁ?

—এ্যাঁ নয়, বলুন।

—এ্যাঁ? কি বলব? ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন তিনি উকীলের মুখের দিকে।

উকীল বলেছিলেন, এতো মিথ্যে গল্প?

—হ্যাঁ।

—আপনি বলেছেন এই গল্প?

—হ্যাঁ।

—আপনি মিথ্যেবাদী?

—এ্যাঁ—

—আপনি ধানের টাকা গুনে আনেন নি। আমি বলছি।

হ্যাঁ। বলে যতীনকাকা মাথা হেঁট করে সাক্ষীর ডক থেকে নেমে এসেছিলেন।

সেদিন বোলপুরের কোর্টের সামনের বটতলায় আমিও ছিলাম। ম্লান হাসিমুখে যতীনকাকা এসে পাশে বসলেন, বললেন—বিলকুল ঝুট তারাশঙ্কর, বিলকুল ঝুট। সব মিথ্যে। দূর-দূর-দূর!

লোকমাতা নিবেদিতা

নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : "মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপ্‌ল'-কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটি মাত্র শিশু হইত, তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা।"

এই লোকমাতা নিবেদিতার মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন আগামী দিনের স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে তুলবার সার্থক রূপ। তাই তিনি তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। কর্মের যজ্ঞভূমি ভারতবর্ষে। নিবেদিতারও দেরী হয়নি নিজের কর্মভূমি ও গুরুকে চিনে নিতে। বিবেকানন্দের আহ্বান সাড়া দিয়ে এদেশে এসেছেন তিনি। আর মুহূর্তের মধ্যে ভারতবাসীর দুঃখ-বেদনাকে নিজের করে নিয়েছেন। সেদিন তাঁর সমস্ত মানসলোক অধিকার করে নিয়েছিল ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ। সে পরিচয় সুস্পষ্ট তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনায়। নিবেদিতার ভারতপ্রেম অতুলনীয়। দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকার থেকে ভারতবাসীকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি শুরু করেছিলেন কঠোর সাধনা। ভারতের মুক্তি-সাধনায়ও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পরাধীনতার হাত থেকে ভারতবাসীর মুক্তির জন্য দেশের তরুণদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ভারতীয় বিপ্লববাদে তাঁর ভূমিকাও ছিল বলিষ্ঠ। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এবং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে তিনি বিজ্ঞান-সাধনা ও শিল্প-সাধনায় প্রেরণা যুগিয়েছেন। আর এ-সবই তিনি করেছেন ভারতবর্ষের প্রতি কর্তব্যের আহ্বানে এবং অকৃত্রিম ভালবাসায়।

আয়ারল্যাণ্ডের ডানগ্যানন শহরে ১৮৬৭ খৃঃ ২৮ অকটোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্ম। পবিত্র ভারতভূমিতে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সমাধি-বেদী দারজিলিং-এর চিরশান্ত কোলে আজও বিরাজমান।

লণ্ডনে ১৮৯৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজীর বক্তৃতা তাঁর সমস্ত জীবনের ধ্যান, ধারণায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর সেবাব্রত নিয়ে তিনি ১৮৯৮ খৃঃ জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষে চলে আসেন। মিস্ মার্গারেট নোবল স্বামীজীর কাছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা নিয়ে 'নিবেদিতা' নামে পরিচিত হন।

১৮৯৯ খৃঃ স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। নিবেদিতা তাঁর সঙ্গী হন। ১৯০২ খৃঃ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন নিবেদিতা। বিদেশে ভারতবর্ষের মঙ্গল-কামনায় সাহায্য প্রার্থনা করে চরম অপমানিত হয়ে, হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। ভারতবর্ষে ফিরে এসে বিরাট কর্মের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ভারতের প্রান্ত হতে প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। ঐ বৎসরেই লোকান্তর ঘটে স্বামীজীর। নিবেদিতা নতুন জাতি তৈরির স্বপ্ন নিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। ভারতের কল্যাণ চিন্তায় নিঃস্বার্থ সেবাব্রত তাঁর মহান ভূমিকাকে চিরদিনের জন্য অক্ষয় করে রেখেছে। কেবলমাত্র ভারতের নারী-জাতির নয়, সমগ্র ভারতবাসীর জন্য নিবেদিতার প্রাণশক্তি শেষ বিন্দু পর্যন্ত দান করে গেছেন। এই মহীয়সী নারীর জন্ম-শতবর্ষে সমগ্র ভারতবাসী তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

স্বামীজী মারা যাওয়ার নয় বৎসরের মধ্যে ১৯১১ খৃঃ ১২ অক্টোবর দার্জিলিঙে লোকান্তরিত হন।

লক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ

অমিতা রায়

আদিম সমাজে প্রাণশক্তি, প্রজননশক্তি-রূপিণী পৃথিবীকে ঘিরে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান, ভয়-বিশ্বাস সংস্কার গড়ে উঠেছে। প্রাক-আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মের যোগাযোগ, মিলন বিরোধের ফলে পৃথিবী-রূপিণী মাতৃশক্তিকে নির্ভর করে নতুন নতুন অনুষ্ঠান উপাচারের সৃষ্টি হয়েছে, ফলে অনেক অব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপ শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের অংগীভূত হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অনুশাসন-মুক্ত এই সব অপৌরাণিক অব্রাহ্মণ্য পূজাচার যা মূলত গুহ্য জাদু-শক্তির পূজা, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। অথর্ব বেদের সময় থেকে এই সব অনুষ্ঠানাদি 'স্ত্রীকর্ম' বলে সমাজে স্বীকৃত হয়। কৃষিনির্ভর গ্রাম্যজীবনের অনিশ্চয়তা-বোধ থেকে আত্মরক্ষার আয়োজনে এবং কামনা চরিতার্থের বাসনায় নারীসমাজকে আশ্রয় করে যে-সব জাদুবিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠানাদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালী জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, লক্ষ্মীব্রত তাদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলা, আসাম, উড়িষ্যায় লক্ষ্মীদেবীর পূজা সুপ্রচলিত। এই পূজা এখন অবশ্য প্রতিমা-পূজাভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু মূর্তিপূজার প্রচলন এই সেইদিন পর্যন্তও ছিল না। যদিও একাদশ শতকের তক্ষণ-শিল্পের স্বাধীন স্বতন্ত্র লক্ষ্মীমূর্তির চমৎকার নিদর্শন বাঙলাদেশে বিরল নয়। কিন্তু এই সব মূর্তি পূজানুষ্ঠানে প্রয়োজন হত কিনা তার প্রমাণ আমাদের জানা নেই। কিন্তু লোকস্তরে আজ পর্যন্ত ঘটলক্ষ্মী, পটলক্ষ্মী, লক্ষ্মীসরার পূজাই সাধারণভাবে গৃহীত। কালক্রমে ব্রতধর্মী লক্ষ্মীপূজা ব্রাহ্মণধর্মের অনুমোদন লাভ করে উচ্চতর সামাজিক স্তরে উন্নীত হল, সম্ভ্রান্ত পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী আদৃতা হলেন, নারায়ণের শক্তিরূপিণীরূপে বন্দিতা হলেন।

কিন্তু লোকধর্মে লক্ষ্মী রূপ-কল্পনার সঙ্গে পৌরাণিক লক্ষ্মী রূপের যথার্থ সাদৃশ্য কি কিছু আছে? লোকধর্মের লক্ষ্মী তো শুধু বিশেষ মাস বা তিথির সঙ্গে আবদ্ধ নন! বাঙালী সমাজে লক্ষ্মীপূজার ব্যাপ্তি সুবিস্তৃত। সেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার জলপূর্ণ ঘটে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে তাতে আম্রপল্লব বসিয়ে বাঙালী নারী লক্ষ্মীজ্ঞানে ঘটপূজা করে থাকেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন পড়ে না সেই পূজায়, ব্রতকাহিনী পাঠ এবং ব্রতকথা শোনাই সেই পূজার উপায়। প্রতিদিনের পূজা আরাধনায় বাঙালী নারী সমাজ আমাদের ধর্মকর্মময় সংস্কৃতির অসমাপ্ত ও অব্রাহ্মণ্য ভাবনা কল্পনা চেতনাকে এমনি-ভাবেই বাঁচিয়ে রেখেছে। তার ফলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পক্ষপুটে এসেও লক্ষ্মীদেবীর লোকায়ত কল্পনার স্বীকৃতি ও মর্যাদা এত-টুকু ব্যাহত হয় নি। একথা অবশ্য সত্য, প্রাক-আর্য ও অনার্য নরনারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ব্রাহ্মণ্য সমাজসীমায় গৃহীত হওয়ার ফলেই লক্ষ্মীর লোকায়ত কল্পনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। লক্ষ্মীদেবী বাঙলাদেশের ভাঁড়ার, উঠোন, রান্নাঘরে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে বাঙালী ঘরের ধন-ঐশ্বর্য তাই বাঁধা।

'আইলাম গোল স্মরণে লক্ষ্মীদেবীর চরণে
লক্ষ্মীদেবী দিবেন বর,
ধানে চাউলে ভরুক ঘর'

এমনকি শারদীয়া পূর্ণিমা তিথিতে ব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণায় পুষ্ট 'পরিবার দেবতার' অন্তর্গত পৌরাণিক লক্ষ্মীপূজার যে বিধি, আচার প্রচলিত, কৌমসমাজের আদিম-তম মানসরূপ তাতেও সক্রিয়। বস্তুত কোজাগর-কৃত্যের সঙ্গে পৌরাণিক লক্ষ্মীর যে যোগাযোগ তা স্পষ্টই ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলন-বিরোধের ইতিহাস ব্যক্ত করে। লক্ষ্মীপূজার উপকরণের মধ্যেই লক্ষ্মী-দেবীর যথার্থ পরিচয় নিহিত—এর এক-দিকে ধান্যশীর্ষপূর্ণ লক্ষ্মী ঘটের পূজায় কৃষি সভ্যতা ও কৃষি সংস্কৃতির সুপ্রাচীন স্মৃতি বহমান অন্যদিকে আছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-প্রভাবে লৌকিক লক্ষ্মীর পৌরাণিক

লক্ষ্মীতে বিবর্তনের ইতিহাস। লক্ষ্মী পূজায় কোন লোকায়ত ব্রাত্যধর্মের প্রভাব, কোজাগরকৃত্যে কোন আবর্ত ঘূর্ণমান, কোন শক্তি সক্রিয়, সুস্পষ্টভাবে সেকথা জানা ও বোঝা আমাদের ধর্মীয় ইতিহাস রচনার জন্য একান্তই প্রয়োজন। অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশ *ফোক রিলিজিঅন অফ বেঙ্গল* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ঋগ্বেদের পরিশিষ্টে শ্রীসূক্তে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনাদর্শে সৃষ্ট লক্ষ্মীর একটি রূপকল্পনা আছে—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ"

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি বিশ্বসৃষ্টি ক্রিয়া হেতু বিশেষ ক্লান্ত প্রজাপতির দেহ হতে অপরূপ রূপে মণ্ডিতা শ্রীদেবীর উদ্ভব। জাগতিক রূপ, গুণ, ঐশ্বর্যাদির প্রতীক-রূপে সেখানে তিনি কল্পিতা হলেন। পৌরাণিক লক্ষ্মী-প্রতিমা সেই রূপ-কল্পনা নির্ভরে সৃষ্টি হলেও, পূজা আচার, বিধি-নিষেধ সবই লৌকিক মতানুসারে—অর্থাৎ ব্রতধর্মী।

কৃষিনির্ভর জীবনে মনস্কামনা পূর্ণের আয়োজনে শস্যপ্রাচুর্যের কামনায় মাঠে হাল চালান, বীজ ছড়ান, ধান বোনা, ফসল কাটা প্রভৃতির সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছেন। কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস, শুভ-অশুভকে ঘিরেই লক্ষ্মী দেবীর অধিষ্ঠান। দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক বা শারদীয়া পূর্ণিমা তিথির পূজোচার বাদ দিলে লক্ষ্মীর পূজো বৎসরে আরো তিনবার। আশ্বিন-কার্তিক মাসে সুশস্যোদ্গমের কামনায়, অগ্রহায়ণ মাসে শস্য গোলায় তোলার সঙ্কল্পে, ফাল্গুনে নূতন শস্য বপন উপলক্ষে লক্ষ্মীব্রত অনুষ্ঠিত হয়। নবান্ন উৎসবে প্রথম ফল-ফসলকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীব্রতের যে বিধি-আচার প্রচলিত, তারও মূলে ঐ একই চিত্তধর্ম সক্রিয়। বাঙালী সমাজে, শুধু বাংলা দেশে কেন, সমস্ত পূর্ব ভারতে আজও বিশ্বাস চালের পিটুলীতে আঁকা লক্ষ্মীদেবীর পায়ের ছাপ ধরে ধরে লক্ষ্মী দেবী ঝাঁপি ভরে সম্পদ নিয়ে আসেন ঘরে, আলপনায় আঁকা কামনার সমস্ত বস্তু গৃহে জাদুশক্তির প্রভাবে তাদের ঘরে আসে। রচনাপাতিল, লক্ষ্মীসরা, নারকেল মালার কুবেরের মাথা কল্পনা, জোর নারকেলকে শাড়ী পরাবার বিধি, ধানগাছে, ধান-দূর্বা, পান-সুপারি, ঘট, ঘটের উপর আঁকা প্রতীক চিহ্ন ইত্যাদি উপাচার ও উপকরণ বাংলার আদিমতম জন এবং কোমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আদি যুগের শেষ দিকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও ধর্মাচার যখন বাঙালীর ধর্মজীবনের লোকস্তরে সুবিস্তৃত হয়েছে, তখন কোন এক সময় শারদীয়া পূর্ণিমায় পূজিতা দেবী, ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর অন্যতমা বলে গৃহীতা হলেন, পুরোহিত কোমসমাজে প্রচলিত আদিম ঘটলক্ষ্মীর পূজা, শস্যলক্ষ্মীর পূজা ব্রাহ্মণ্য মন্ত্রে সমাধা ক'রলেন—সবকিছুর মধ্যেই কিন্তু লোকায়ত মানস চিন্তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লক্ষ্মী-সরায়, রংএ, রেখায় পীনপয়োধরা অলঙ্কারবহুলা যে নারীমূর্তি রূপায়িত তা নিশ্চিতভাবে কোমসমাজে মাতৃকাতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবীরই প্রতিবিম্ব। সেই বস্তুনিষ্ঠ, সংসারগত, ইন্দ্রিয়ভাবনাপিষ্ট লক্ষ্মীদেবী আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনাদর্শে সৃষ্ট নয়; তার ডৌলে, গড়নে, আড়ষ্ট দেহভঙ্গিতে, প্রকাশ ভঙ্গিমার অন্তর্লোকে কোনো গভীর চিন্তা ও ভাবের অভিব্যক্তি নেই, বরং লোকান্তরে শিল্পীর তুলিতে ইহমুখীতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে প্রত্যক্ষ। ধানের ছড়া ও লক্ষ্মী-ঝাঁপি সমভিব্যাহারে দেবী কল্পনা, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে সুশস্য কামনায় জাদু-শক্তিতে প্রচ্ছন্ন আলপনারই অংশবিশেষ। নারীরূপে উৎপাদন শক্তির এই পূজাচারের সঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত পূজো-চারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই প্রজনন-শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তির সঙ্গে দীপ-লক্ষ্মীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। শস্য-লক্ষ্মীর অভ্যর্থনায় দীপদান উৎসব একান্তই কোমসমাজগত। মিথিলায় মধ্যভারতে, উত্তরভারতে এবং বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে দীপাবলী উৎসবের দিনে সাড়ম্বরে লক্ষ্মীপূজো করা হয়। প্রথম বাতি দেওয়া হয় শস্যক্ষেত্রে, দ্বিতীয় বাতি পড়ে গোয়ালঘরে, তৃতীয় বাতি গৃহিণীর সযত্ন-রক্ষিত অলঙ্কারের কাঠের চৌকি সিন্দুকের উপর। কিন্তু পূর্বভারতে দীপলক্ষ্মীর শস্যলক্ষ্মীরূপে তান্ত্রিক বাঙালীর মাতৃ-সাধনার কাছে চাপা পড়ে গেছে; অথচ দীপ-লক্ষ্মী পূজোপোকরণের পিছনে মানব মনের ভয় ভীতি, আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি যে অত্যন্ত সক্রিয় সেই সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

লক্ষ্মী-মূর্তি কল্পনা নানারূপে। দেবী কখনো পদ্মাসনে, কখনো পেচকাসনে, কখনো বা ময়ূরের উপর অধিষ্ঠিতা। সমুদ্রসুতা দেবী লক্ষ্মীকে কখনো গজলক্ষ্মীরূপেও কল্পনা করা হয়। এই গজলক্ষ্মীর মূর্তি কল্পনা অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্তু পূর্বভারতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের তুলনায় গজলক্ষ্মীর মূর্তির প্রচলন কম। তবে বাংলাদেশে উপকূল অঞ্চলে, গজলক্ষ্মী সরা কিছু অপ্রচুর নয়। খৃষ্টপূর্ব-খৃষ্টপরবর্তী প্রথম শতাব্দীতে লোকায়ত জীবনের বিচিত্র শোভাযাত্রার মধ্যে ব্যবহৃত সাঁচী উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ফলকে প্রাপ্ত গজলক্ষ্মী মূর্তির বহুল প্রকাশ তদানিন্তন সমাজের অর্থগত সামাজিক জীবনের পরিচয় দেয়। সামুদ্রিক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠী সমাজের কাছে সমুদ্রসুতা গজলক্ষ্মীর প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। মধ্যযুগের বাংলাদেশের লোক-সাহিত্যে বাণিজ্যকাহিনীর মধ্যে নৌকাডুবির ঘটনা তো প্রায়শঃ। ভয়কম্পিত নাবিকেরা তাই মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অশুভশক্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে—"সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত—লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত।" কাজেই বিঘ্ননাশিনী অশুভনিবারণী দেবী-লক্ষ্মী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কি কৃষিসমাজ, কি ব্যবসা বাণিজ্যে রক্ষয়িত্রীরূপে বন্দিতা হ'য়েছেন, সন্দেহ কি!

কিন্তু ধর্মইতিহাসে অশুভনিবারণী বিঘ্ননাশিনী রূপের তাৎপর্য একটু অন্য-রকম। আদিম কৌমবদ্ধ সমাজে ভয় হতে রক্ষা কামনায় ভয়ের বস্তুকে তুষ্ট করা হয়। ভয়ের মধ্যেই ভয়ের মুক্তি—এবং সেই কারণেই পূজোর প্রয়োজন। বস্তুত ধর্মানুষ্ঠানের গভীরে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে ভারত-বাসী অশুভশক্তিকে শুভশক্তির বাহক বলে বিশ্বাস করেছে। মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সেই একই ধারণা থেকে আগত। অশুভনিবারণী পৌরাণিক লক্ষ্মীর মধ্যে বহুলাংশে সমতুল্য অশুভকারিণী রূপেই ছিল। শ্রীলক্ষ্মীর জন্ম বোধহয় তার অলক্ষ্মী রূপে।

বাংলাদেশে বিশেষ করে পূর্ববাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে লক্ষ্মীপূজার প্রারম্ভিক ক্রিয়া হিসাবে গোবরে গড়া একটি নারীমূর্তিকে, বাড়ীর বাইরে—অনেক সময় জনপদসীমার বাইরে পূজা করা হয়। ধান, চুল, নখ ইত্যাদি উপকরণ উপাচারের সঙ্গে একটি শূকরের দাঁত দেবার বিধি দেখে মনে হয় উপচার হিসাবে শূকরের দাঁতের ব্যবহার সম্ভবতঃ শূকর ভয়ে ভীত দেবী স্মরণাগত-দের নির্দেশ দেয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় গোবর দিয়ে গড়া এই ভীষণা নারী মূর্তিটি কে? গৃহের বাইরে, গ্রামের উপান্তে পূজার বিধিই বা কেন? তবে কি ইনিই সেই অথর্ব বেদে বর্ণিতা 'পাপী লক্ষ্মী'—যাকে বিদায় দিলে শুভলক্ষ্মীর আরাধনা সম্ভব?

অথর্ববেদ স্পষ্টই লক্ষ্মীর দুই রূপের কথা ব'লেছে—লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, শুভলক্ষ্মী পাপী লক্ষ্মী—কিন্তু পাপী লক্ষ্মীর পূজো ব্যতিরেকে শুভলক্ষ্মীর পূজা গ্রাহ্য নয়।

বস্তুতঃ পৌরাণিক লক্ষ্মীর পূর্বতন রূপ অলক্ষ্মীর, তবে আদিম সমাজে লক্ষ্মী অলক্ষ্মী অভিন্না। কিন্তু পরবর্তী কালে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ছায়ায় অলক্ষ্মীর শুভশক্তি পৌরাণিক লক্ষ্মী পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নেন। ফলে লক্ষ্মীপুজোর প্রারম্ভিক ক্রিয়া হিসাবে আদিম সমাজে পূজিতা অলক্ষ্মীকে কুলো পিটিয়ে, শস্য পুড়িয়ে, লোহা গরম করে বিদায় করতে হয়। —'অলক্ষ্মী বিদায় হয়, লক্ষ্মী আসে ঘরে'—

এই অলক্ষ্মী বিদায়োৎসব বাংলাদেশে নানাভাবে উদযাপিত হয় এবং সর্বত্রই লক্ষ্মী বা কালীপুজোর প্রারম্ভিক ক্রিয়া হিসাবে। কলার খোলায় তৈরী ভেলাতে তিনটি মাটির পুতুল (তিন সংখ্যা কোম-সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত)—অলক্ষ্মী ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়দের সাজান হয়। নারী সমাজ এই পুজোর অধিকারিণী নয়। গৃহকর্তা অথবা ভৃত্য কিংবা পুরোহিত গৃহের বাইরে পুজা সম্পন্ন করে—অলক্ষ্মীদেবীকে তার সঙ্গিনী-সহ কুলো পিটিয়ে মন্ত্রঃপূত ছেঁড়া চুল সহকারে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন। নদীর অভাবে তাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। কালীপুজোয় বাজী পোড়ান, দীপদান অলক্ষ্মী বিদায়ের অন্যতম উপায়। আশ্বিনের সংক্রান্তি দিনে সূর্যোদয়ের আগে নারী শিশুরা পাট-কাঠির আগুন হাতে নিয়ে গৃহ প্রদক্ষিণ করে কুলো বাজিয়ে অলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীকে আবাহন করেন। পৌষের সংক্রান্তি প্রভাতে "বুড়া বুড়ী" পোড়ান—একই ভাবনা-জাত। কোজাগরী পূর্ণিমায় অলক্ষ্মী বিদায় ক্রিয়া তো বেশ বিস্তৃত ভাবেই হয়। মূলতঃ শস্যলক্ষ্মীর পূজা হলেও সমস্ত রাত্রব্যাপী অলক্ষ্মী বিদায়োৎসবই যেন এই উৎসবের প্রধান উপাচার। কোজাগর পূর্ণিমার সঙ্গে নষ্ট-চন্দ্র-রাত্রির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অলক্ষ্মী বিদায়োৎসবের অন্য রূপ। প্রতিবেশী বাড়ীতে চুরি করা, চিল ছোঁড়া, কটু কথা শোনা, অক্ষক্রীড়া ইত্যাদি কোজাগর ব্রতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

কাজেই শুভলক্ষ্মীর আগে পাপী লক্ষ্মীর পূজা, অলক্ষ্মী বিদায় শেষে লক্ষ্মীর আবাহনই চলিত রীতি। কিন্তু এই পাপী লক্ষ্মী কে? কি তার পরিচয়? ব্রতকথা থেকে মনে হয় অলক্ষ্মী লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বিষ্ণুর অবহেলিতা স্ত্রী - অশ্বত্থ গাছে তার বাস, লোকবসতির বাইরে, অশুচি স্থানে তার আনাগোনা, সংস্কৃত সাহিত্য তাকে ভীষণা, কৃষ্ণাঙ্গা, রক্তনয়না, দ্বিভুজা, দোদুল্যমান স্তনযুগল-বিশিষ্টা জম্বুলামরী রূপে এঁকেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যায় এর পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যায়। অনুমান হয় সমাজ-পরিত্যক্তা, বিতাড়িতা, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে হৃতসর্বস্ব অলক্ষ্মী আদিম মাতৃকেন্দ্রীয় কৌমজন উপাস্যা দেবী, সম্ভবতঃ আর্য-ব্রাহ্মণ ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধ্যান-ধারণার সংঘর্ষের ফলে আদিম সমাজে আরাধ্যা দেবী লক্ষ্মীর কাছে হৃতসর্বস্যা হয়ে অপাঙক্তেয় সারিতে পড়ে রইলেন। অলক্ষ্মী মূর্তিকে বাড়ীতে আনার ফলে রাজলক্ষ্মী কেমন করে

লক্ষ্মী দেবী ।। পটচিত্র

লক্ষ্মী দেবী ।। পটচিত্র

দেশের রাজাকে পরিত্যাগ করে যান এবং তার ফলে রাজাকে কিভাবে সর্বস্বান্ত হতে হয়, তার গল্প ব্রতকথায় বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্ম ইতিহাসে এই সংঘর্ষ নতুন নয়। বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ইতিহাস বিবর্তনের স্তরে স্তরে অনার্য-অব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারনার সঙ্গে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধেতিহাসের কথা আগেই বলেছি। প্রাথমিক বিরোধের পর স্বীকৃতি যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন ধর্মের প্রাণশক্তিতে কিছু কিছু পূজাচার আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনাকে ছাপিয়ে উঠে,—আবার কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণায় কুক্ষীগত হয়ে নির্জীব হয়ে বেঁচে থাকে। কোথাও কোথাও এই সংঘর্ষ আচারে নির্বাতিত হয়, লক্ষ্মী পূজায় অলক্ষ্মী বিদায়াচার এই সংঘর্ষেরই ফল।

আলো যেন চোখ ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সাঁতার কেটে কেটে বেলা প্রায় শেষ,
চিৎ সাঁতার কাৎ সাঁতার ডুব সাঁতার ইত্যাদি;
কিন্তু তীর কোথায়? তবু মনের ক্লান্তি নেই—
পরম আশ্চর্য!

ঢেউ ঢেউ খেলা চলে সাগরে গঙ্গার,
নৌকোয় প্রচন্ড দোলা ঝড়ের রাত্রিতে;
সংসারে নিজেকে নিয়ে এত যে ব্যস্ততা—
তাইতো অবাক!

এ হৃদয় বিশাল মন্দির, অসংখ্য প্রতিমা;
আত্মীয়তা খুঁজে খুঁজে ক্রমশই বাহুর বিস্তার,
স্বপ্নের পাপড়ির মতো ঝরে পড়ে সুখ—
অসীম বিস্ময়!

পাপ-পুণ্য উপকথা সুদীর্ঘ তালিকা,
অনেক জবানবন্দী নায়ক-নেত্রীর;
পুনরাবৃত্তির [illegible] নেই ইতিহাসে—
অন্ধকারে আলো যেন চোখ!

আলস্য ॥

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

বিকল্পে অতৃপ্তি বাড়ে, অনিবার্য আরেক নিদাঘ।
ইতস্তত পোড়ো জমি, ফাটলে খোলস রেখে র[illegible]
চ'লে গেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের
ছায়া নামে, ছায়া অন্তঃপুরে, দূরদেশে, ছায়া ক্ষিপ্ত ভূমণ্ডলে—
তুমি শুধু নতমুখে ব'সে আছো, নিজস্ব বিশাল
দূরের নদীকে ভয়, ভয় সেই ভিতরের স্রোতে,
কারণ অনন্য দৃষ্টি নেই, শঙ্কা, সে তো স্বাভাবিক;
স্বভাবের পরাজয় চাই, সঙ্গে, নতুবা এককে
কেবল সন্তাপ বাড়ে, বোধ নয়, বিনষ্টি; বিরাগে
নিজেকে ছড়িয়ে ফের অভিমানে একটু দূরে রাখা—
যেমন গৃহস্থবধূ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে স্ফীত অভিমানে
হাতের পুরোনো দুটি শাঁখা।

পাখি ॥

বিজয়া দাশগুপ্ত

হৃদয় নিয়ে গেল পাখি
তারপর মেঘনার ঝড়ে
নিরুদ্দেশ হল একদিন।

সেই থেকে আমি তন্দ্রাহীন
শ্রাবণে কি ফালগুন প্রহরে
জেগে থাকি নির্নিমেষ আঁখি।

হৃদয় কোথায় জানে পাখি
সেই জানে কোন্ পক্ষপুটে
আমার হৃদয় সংজ্ঞাহীন।

শূন্য চোখে কাটে রাত্রিদিন—
তার খোঁজ কেউ এ বন্দরে
বয়ে এনে দিতে পারে নাকি।

।। **প্রথম অধ্যায়** ।।

দুর্গের ভাঙা প্রাকারের অন্তরালে আর-একবার সূর্যাস্ত ঘটল।

মুখার্জি বললেন, এই চল্লিশোত্তীর্ণ জীবনটা এই সংসারকে বোঝবার পক্ষে বোধহয় যথেষ্ট সময়, আপনি কী বলেন মিস্ চৌধুরী?

মিস্ চৌধুরী অস্ফুটে কী মন্তব্য করলেন বোঝা গেল না।

এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর পেরিয়ে আমার কাছে একটি প্রধান সমস্যা, মুখার্জি একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বললেন : মানুষের। না মানুষ। কই একটা মানুষও তো দেখলাম না, সম্পূর্ণ, সুস্থ, দেহ-হৃদয়-সম্বলিত গোটা মানুষ।

মিস্ চৌধুরী ম্লান অন্ধকারে ঈষৎ হাসলেন।

অথচ প্রাণজিগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষ, তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ কিছু পাইনি। এতদিন পর আমার মনে হয় মানুষ না হয়ে যদি অন্য কোনো প্রাণী এই পৃথিবীর অধিকার পেত, তাহলে সংসারকে অনেক উন্নত, সুস্থ, শোভন করে তুলতে পারত। মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে বাসের যোগ্যতা আমরা হারিয়েছি; আমরা এই পৃথিবীকে নষ্ট করেছি, নোংরা করেছি। মাথার ওপরের ওই আকাশ, এই পাহাড়, সমুদ্রের গঙ্গা, অজস্র উদ্ভিদ্‌জগৎ—এদের কাছে আমরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি। এদের আমরা সহযোগীও করে তুলতে পারিনি। তাহলে এই অখণ্ড প্রকৃতির মানে কী! মানবপ্রকৃতির সঙ্গে **বিশ্বপ্রকৃতির মেলবন্ধন রচনা হয়নি। আপনি কী বলেন, তার ফলে আমরা বৃহৎ হতে পেরেছি, মহৎ হতে পেরেছি? পারিনি তো। ক্রমশ আমরা খর্ব থেকে খর্বতর হয়ে পড়ছি। এবং কে বলতে পারে, একদিন আমরা নেংটি ইঁদুরে পরিণত হব না?**

নেংটি ইঁদুর উপমায় পুনর্বার হাসলেন মিস্ চৌধুরী।

আপনি আমাকে পেসিমিস্ট বলতে পারেন। এই অখ্যাতিতে আমি আপত্তিও করব না। মুখার্জি আবার বললেন : আপনাদের ওই রোমান্টিক অনাগত আশাবাদের চেয়ে পেসিমিজম্ অনেক ভালো। কারণ এঁরা জীবনকে গভীরভাবে দেখেছেন, বাস্তব সম্পর্কে অনেক বেশি অবজেকটিভ।

মিস্ চৌধুরী বললেন, আপনার এই পেসিমিজম্ আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে? শেষপর্যন্ত একটা বিশ্বাস তো চাই। চাই না?

মুখার্জি বললেন, না। অবিশ্বাসটাই আমার বিশ্বাস।

তার মানে আপনি নেতি নেতি করে শান্তিতে আসতে চান। মিস্ চৌধুরী হাসলেন : যেন শেষ থেকে বই পড়া শুরু করেছেন গোড়ায় আসবার জন্যে। কিছু মনে করবেন না, মিসেস্ মুখার্জিকে আপনি ভুলতে পারছেন না।

প্লিজ ওর নাম আমার কাছে করবেন না। সী ডাজ্ নট বিলঙ্ টু মি।

কিন্তু উনি তো একদিন আপনার স্ত্রী ছিলেন?

তার আগেও সে একটি কুমারী মেয়ে ছিল। আবার যদি সে অস্ত্রী হতে চায় আমার কিছু করার নেই। অবশ্য সে আর কুমারী হতে পারবে না।

আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, দীর্ঘ দশ বছর পরে এই বিচ্ছেদ কী স্বাভাবিক? মানে—

মেয়েদের হৃদয়ে কী আছে আমার জানা নেই।

তার মানে আপনি জানবার চেষ্টা করেননি।

হবে। কিন্তু না-জেনেও এতদিন চলছিল। আমরা কবেই বা আরেকজনের সব জানতে পারি? জানা সম্ভবও নয়। আশা করি সেটাই গৃহভঙ্গের অজুহাত হতে পারে না।

মিস্ চৌধুরী বললেন, আপনি জোর করে আটকালেন না কেন?

মুখার্জি বললেন, আমি কোনো সিন্ ক্রিয়েট করতে চাইনি। আই হেট্।

কী জানেন মিস্টার মুখার্জি, আমার মনে হয় জীবনের গুরুতর সমস্যায় বল-প্রয়োগ অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে পড়ে। রিগ্রেটেবল্ নেসিসিটি। হয়তো মিসেস্ মুখার্জি আপনার কাছে এই জোরটুকুই চাইছিলেন। শক্তিমান যদি সংকটের সময় শক্তি প্রদর্শন না করতে পারেন, সেটা এক ধরনের কাপুরুষতা।

আমি তা মনে করিনে।

আপনি অদৃষ্টবাদীর মতন কথা বলছেন। তার অর্থ আপনার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নেই। এবং আপনি হয়তো মনে মনে স্বস্তি পেতে চেয়েছিলেন যে, উনি চলে যান।

ম্যারেজ আমার কাছে শুদ্ধ কণ্ট্রাক্ট্। ভদ্রলোকের চুক্তি। কেউ ভাঙতে চাইলে নিশ্চয়ই তাকে বাধা দেবো না।

মিস্ চৌধুরী বললেন, সেইটেই আপনার ভুল। দাম্পত্যজীবনকে আপনি চুক্তির ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেননি। আপনার সমগ্র সত্তার অধিকার আপনি ওঁকে দেননি। আলমারিতে রাখা চুক্তিপত্রের মতনই আপনি ওঁর সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ওঁর সম্পূর্ণ অস্তিত্বও আপনি বোধ করেননি। আপনি পুরুষমানুষ, কৃতী অফিসার, আপনার প্রতিপত্তি-মর্যাদা, আমরা বাইরের লোক তারিফ করতে পারি, কিন্তু অন্দরের মানুষের কাছে এগুলি বাহুল্য. তিনি চাইবেন পোশাকহীন সত্য মানুষটাকে।

আপনি কী বলতে চান?

আপনাকে কিছু বলবার স্পর্ধা আমার নেই, মিস্টার মুখার্জি। তবে আমার বিশ্বাস, দাম্পত্য বিষয়টা একটা শুকনো চুক্তিপত্র হতে পারে না। পাশাপাশি অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক, দুটো জীবনের বন্ধন। প্রতিদিন এ-সম্পর্ককে নিত্যনতুন করে গড়ে তোলার দরকার।

মুখার্জি বললেন, বুঝিয়ে বলুন।

মিস্ চৌধুরী হাসলেন। কী জানি হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে এটুকু বুঝি যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছি, তার ভিত্তিটা যেন প্রয়োজনের ওপর হয়। পরস্পরের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার ওপরই দাম্পত্য সম্পর্কের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। মেয়ে বলেই কুয়াশার সঙ্গে আমরা ঘর বাঁধতে সাহস করি না, আমরা ধরাছোঁয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে চাই। আমরা চাইব স্বামীর কাছে যেন প্রয়োজনীয় হতে পারি এবং তিনিও যেন আমাকে সত্যিই প্রয়োজনীয় বোধ করেন।

সেটা কী সে বোঝা যাবে?

অংক করে নয় নিশ্চয়ই। মেয়েরা এম্নিতেই বুঝতে পারে।

এটা কী আপনার অভিযোগ? মানে পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে নাকি?

মিস্ চৌধুরী বললেন, মেয়ে হয়ে জন্মেছি, সেটা ভুলব কী করে মিস্টার মুখার্জি? নাকি আপনিই আমাকে ভুলতে দেবেন? সমস্যাটা হয়েছে সমাজটা এখনো পুরুষ-শাসিত, তাই সমূহ প্রশ্নগুলো আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই যাচাই করা হয়। ফলে আপনারা এক ধরনের উচ্চমন্যতায় ভোগেন। আর, বেচারী বলির পশু মেয়েদের মুখ বুজে হাঁড়িকাঠের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

বলির পশু! ব্যঙ্গ করলেন মুখার্জি: আজকের দিনে এ-ধরনের উপমা পৌরাণিক শোনায় নাকি?

মিস্ চৌধুরী বললেন, মাফ করবেন, এটা মেয়েদের এক ধরনের সেকেলেপনা। আপনি সম্ভবত নারীপ্রগতি, স্ত্রী-স্বাধীনতার নজির তুলে পরিহাস করবেন। এটাও আপনাদের উচ্চমন্যতার ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। মেয়েরাও নিশ্চয় স্বাধীনতা চায়, তার অর্থ নিঃসঙ্গ হয়ে নয়, কোনো পুরুষের সহমর্মিতার মাঝখানেই এই স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায়। নইলে সাহারা মরুভূমিতে আমার এক লক্ষ টাকা হাতে এলেও কী লাভ?

আপনি বলতে চান মাধবী আমার কাছে সে-স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি?

জানি না। আপনি তো কোনোদিন তাঁর মন নিয়ে বিষয়টা ভাবেননি। আমার যেটুকু জ্ঞান, তাতে মনে হয়, মেয়েরা কারুর জীবনে সত্যিকার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলে কখনোই সে-জায়গা খালি করে যেতে পারে না।

এটা বুঝতে কী মাধবীর দশ বছর সময় লাগল?

সারাজীবন লাগলেও কিছু অবাক ছিল না। মৃত্যুর আগের দিন স্বামী জানল তার স্ত্রী তাকে ভালোবাসতো না। মেয়েরা যে একটা জীবনে কতকিছু চেপে রাখতে পারে আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না।

হ্যাঁ। এইজন্যেই বোধহয় ওদের রহস্যময়ী বলেছে।

আপনি রাগ করছেন। তাহলে—

মুখার্জি বললেন, আমি দুঃখিত। আমি আপনার মতন করে চিন্তা করিনি। অনেকটা আমাদের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস পড়লে যেমন লাগে, আপনার কথা শুনে সে-রকম লাগছে। না না, আমি পরিহাস করছি না। তবে মাধবীর মনের ভেতরে এ-জাতীয় জিজ্ঞাসা যেন সৃষ্টি করেছে, কোনোদিনই বুঝতে পারিনি। এত শান্ত, শীতল মেয়ে। আশ্চর্য এই দশ বছরে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা তো নিরামিষ ছিল না। সে-ব্যাপারে তার কেন বাধল না?

মিস চৌধুরী চিন্তা করে বললেন আমি জানতাম আপনি এই প্রশ্নে আসবেন। এটাও অবশ্য পুরুষের দৃষ্টিতে দেখা একটা সমস্যা। সমাজের আরো দশটা ভোগের সামগ্রীর মতনই মেয়েদের মনে-করা। রাগ করবেন না, পুরুষদের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাতারদের থেকে কিছু উন্নত হয়নি।

মুখার্জি কঠোর হয়ে বললেন, আপনি বলতে চান দেহদানের ব্যাপারে মেয়েদের নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই। দেহসম্ভোগ বিষয়টা বোধ করি উভয় পক্ষেরই অবদান।

আপনি বিষয়ান্তরে যাচ্ছেন। দাম্পত্য নিশ্চয়ই আরো বৃহৎ জিনিস। জীবনের সবকিছু বাদ দিয়ে একটি বিশেষ প্রবৃত্তিকে বড় করে দেখায় অখণ্ড সত্য নেই।

তাহলে কী বুঝতে হবে মেয়েদের কাছে দেহমন দুটো আলাদা জিনিস? এবং মনকে সিন্দুকে বন্ধ রেখে ওরা নির্বিচারে দেহের ব্যবহার করতে পারে?

আপনার একসঙ্গে দুটো প্রশ্ন হাঁপিয়ে উঠছি। এক সময় আপনারা লোহার জুতো পায়ে পরিয়ে চরণকে খর্ব করতে বলবেন তারপর যখন সে খুঁড়িয়ে হাঁটবে তখন অভিযোগ করবেন ওর চলন বাঁকা, এটা সুবিধাবাদ ছাড়া কিছু নয়।

আমরা বলেছি মেয়েদের দেহসর্বস্ব হতে?

এ-আলোচনা এবার বন্ধ করা ভালো। রাত্তির হয়ে যাচ্ছে। হোটেলে ওঁরা সব অপেক্ষা করছেন।

মুখার্জি বললেন আচ্ছা মিস চৌধুরী, অপরাধ নেবেন না, আপনি কী পুরুষের এই অবিচারের কথা ভেবে এতদিন বিয়ে করেননি?

মিস চৌধুরী শব্দ করে হেসে উঠলেন। কী জানেন, সাহস পাই না। চারদিকে যা অবস্থা দেখছি। তার চেয়ে বরং এই ভালো। জানেন আমি এখনো তাজমহল দেখিনি।

মুখার্জি বললেন, আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠবার যো নেই। তাহলে কী আপনি এই সিদ্ধান্তে আসছেন আমাদের দাম্পত্যে শারীরিকতাই প্রধান ছিল?

সেটা আমি হলফ করে কী করে বলব মিস্টার মুখার্জি? আপনারাই ভালো করে জানেন। তবে একথা বলতে পারি কোনো মেয়ের দেহের অধিকার পাওয়া মানেই মনের অধিকার পাওয়া নয়। আমরা মেয়ে হতে পারি, কিন্তু মানুষ তো একথা ভুলব কী করে বলুন?

আপনি আমাকে এখন কী করতে বলেন?

আপনি আমাকে বড় বেশি সম্মান দিচ্ছেন। আমি সত্যিই তার যোগ্য নই। হতে পারে আমি যা বলছি ভুল, হয়তো

মুখস্থবিদ্যা। সম্ভবত আপনিই ঠিক। তবে যখন চারদিকে জীবনের এত ভাঙা-চোরা দেখি তখন মনে হয় কতটুকুই-বা মানুষের আয়ু, কীই-বা আমাদের ক্ষমতা, তাই ইচ্ছে হয় যেটুকু সুখ আছে শান্তি আছে তাকে ছিনিয়ে নিই, নিজে সুখী হই, আর আমার জীবনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে তাদেরও সুখী করি। ভেবে দেখতে গেলে সুখের চেহারাটাও আমাদের বানানো, বাঁচতে হলে অনেককিছুই বানাতে হয়। নইলে অঙ্কের মতন হিসেব কষতে গেলে নিশ্চিত সুখকেই হারাব। ভাবতে গেলে একেক-জনের কাছে সুখের সংজ্ঞা একেকরকম।

আমিও তো তাই মনে করি মিস চৌধুরী। মাধবী তো সে কথা বিশ্বাস করল না।

মাধবী হয়তো কিছুই বিশ্বাস করতে পারেননি। সেই বিশ্বাসটুকুই তিনি এতদিন খুঁজছিলেন।

আপনি কী আশা করেন আমি ওর হাতেপায়ে ধরে ফিরিয়ে আনব?

আপনি হাতেপায়ে ধরলেই তিনি ফিরে আসবেন, তাহলে হয়তো তিনি আদপেই যেতেন না। মেয়েরা স্বামীকে আদর্শ পুরুষ হিসেবে দেখতে চায়। অপমানিত বিধ্বস্ত দরিদ্র হিসেবে নয়।

তাহলে আমার আর কী করার আছে।

বাইরে থেকে ঠেলা দিয়ে কাউকে চালানো যায় না। কারণ সে গতিবেগটা তার নিজস্ব নয়, ধার-করা। মানুষের প্রয়োজন এবং অভাবপূরণের প্রয়াস নিজের ভেতর থেকেই আসে। মাধবীকে আপনার প্রয়োজন না থাকলে আপনার বাইরের উৎসাহের দরকার হত না।

তার মানে আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ওর কাছেই যেতে বলছেন।

যদি বলি সেটা কী খুব অপরাধ হবে মিস্টার মুখার্জি? হয়তো এটা ঠিক আপনি বড়ো অফিসার ইচ্ছে করলে আপনি আরো অনেক মেয়ে পেতে পারেন, কিন্তু তারা কেউ মাধবীর জায়গায় আসতে পারবে না। সে-জায়গা আপনার খালিই পড়ে থাকবে। তাছাড়া কে বলতে পারে, পরবর্তী নির্বাচনও একই গোলমাল বয়ে আনবে কী না! এত নির্বাচন-খারিজ করতে গেলে এই সামান্য জীবনে যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। চলুন এবার নীচে নামা যাক। এই জঙ্গলে দু-চারটে বিষধর সাপ থাকা অসম্ভব নয়।

পাশাপাশি চলতে চলতে মুখার্জি বললেন, ব্যাপারটা কী অত্যন্ত নাটকীয় দেখাবে না মিস চৌধুরী?

কী? মিস চৌধুরীর শ্যাম্পু-করা চুলের গন্ধ নাকে আসছিল।

মুখার্জি বললেন এই, যদি মাধবীকে ফিরিয়ে আনতে যাই—

কেন?

অনেকটা সেনটিমেন্টাল উপন্যাসের কাহিনীর মতন...

সার্থক লেখক শুধু জীবনের সমস্যা উঁচিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি বর্তমানের বেড়া ডিঙিয়ে ভবিষ্যতকেও দেখতে পারেন। নইলে তাঁকে ফোটোগ্রাফার বলব, ন্যাচারিলিস্ট বলব, আর্টিস্ট বলব না। আমাদের বর্তুলাকার লেখকেরা পারিবারিক জীবনে নিরাপত্তা বোধ করেন বলেই নায়ক-নায়িকার ভাঙনের ভঙ্গিসর্বস্ব ছবি আঁকতে ওস্তাদ। সত্যি যদি তাঁদের পারিবারিক জীবনে আপনার মতনই আগুন জ্বলত দেখতাম তাঁদের বাহাদুরি।

মুখার্জি হাসির মতন একটা আওয়াজ করতে চাইলেন। তাঁর জুতোর ঠোকর খেয়ে একটা পাথরের নুড়ি গম্ভীর শব্দ তুলে নীচে গড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেল।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

দরজায় কড়া-নড়ার আওয়াজে মাধবী দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

তুমি।

মুখার্জি বললেন, অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে।

মাধবী কথা বলতে পারলেন না।

মুখার্জি বললেন, আমি কী ভেতরে যাবো?

মাধবী বললেন, এসো।

ঘরে পা দিয়ে মুখার্জি বললেন, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

এতদিন পরে।

আমার আসতে দেরি হতে পারে, কিন্তু এসেছি তো।

তা তো দেখতে পাচ্ছি।

তোমার বিরুদ্ধে আমার দুটো অভিযোগ। এক নম্বর তুমি আমাকে না-জানিয়ে চলে এসেছ। দু নম্বর দুজনের সমস্যার বিষয়ে তুমি একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছ।

মাধবী বললেন, আমি কোনো নাটক সৃষ্টি করতে চাইনি। সেটা শোভন হত না।

মুখার্জি বললেন, কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখেছ কী?

তোমার কথা!

হ্যাঁ। এই কমাসেই আমার কাছে জীবনটা, মানুষগুলো সব নেংটি ইঁদুরের মতন কূশকুটিল হয়ে উঠেছে। অথচ এই ভাবে বাঁচা যায় না। এখনো চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে, শিশু হাসে, এগুলোকে আমি বেঁচে থাকার পক্ষে মূল্যবান বলে ভাবি।

এ কথাগুলো তো তোমার মুখে আগে শুনিনি।

এখন শুনলে তো। পরে শুনলেও কথা-গুলো মিথ্যে হয়ে যায় না মাধবী।

না। তা হয় না।

ধরো আমার একটা শক্ত অসুখ হয়েছিল, তার জন্যে অসুস্থ লোককে ছেড়ে যাওয়া কী উচিত হয়েছে তোমার? দশ বছরে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারিনি একথা ঠিক, কিন্তু কোনো দিনই আর দিতে পারব না। এমন অশ্রদ্ধা আমার ওপর কী করে এল? তোমরা মেয়েরা না ভীষণ স্বার্থপর।

আমাকে একটু ভাবতে দাও।

সে ভাবাটা ফিরে গিয়েও হতে পারে। ভাবনার জন্যে পালিয়ে এলেই সমস্যা দূর হয় না। সব মানুষই যদি তোমার মতন উপায়ে ভাবনা দূরে করবার চেষ্টা করে তাহলে সংসারটা অরণ্য হয়ে যায় মাধবী। শোনো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, দেশে চলে যাব, যে সামান্য জমি আছে একটা ফার্মের মতন করে চাষবাস করব।

সে কি, চাকরি ছেড়ে দিলে!

ভালোই হয়েছে। এবার আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আর কোনো রকম জটিলতা থাকবে না। দেখলাম তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া আমার কাছে পৃথিবী পাওয়ার মতন। জীবনের উপকরণ বাড়ালেই বেড়ে যায়। বেঁচে থাকার পক্ষে বাহুল্য এ সকল।

তুমি কী সম্প্রতি রুশো পড়ছ? ন্যাচা-রাল ম্যান হতে চাও? তুমি কী সবসময় একটা চূড়ান্ত কিছু না করে পারো না?

কেন এই ব্যবস্থায় তোমার অনুমোদন নেই?

না নেই। তুমি যা পারো না তাই তুমি করতে যাবে কেন? ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে তুমি এগ্রিকালচার করতে যাবে। তাহলে আর লেখাপড়ার মানে কী হল?

তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহলে...

ওসব পাগলামি ছাড়ো।

আচ্ছা। এ বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন আগের কাজটা আগে। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলো। লক্ষ্মণকে রান্না করতে বলে এসেছি, কী করবে ওই জানে। যথেষ্ট খিদেও পেয়েছে।

এখানেই খেয়ে যাও।

মুখার্জি বললেন, তার মানে? তুমি যাবে না?

মাধবী বললেন, তা হয় না।

কেন? আমার আসার কোনো দাম নেই? আমি তেমন করে বলতে পারি না বলে—

কী জানো, আমি এখনো প্রস্তুত হতে পারছি না।

সেটা আমার দোষ নয়। তুমি কী সত্যিই ভেবেছিলে আমি আর কোনোদিন আসব না। ভাবতে পেরেছিলে একথা?

এটাই তো সাধারণক্ষেত্রে ঘটে। কাউকে আসতে দেখিনি।

কিছু অসাধারণ দৃষ্টান্তও তো ঘটে জীবনে। ফেরার পথটাকে বন্ধ করে দেয়া তো কাজের কথা নয়।

মাধবী চুপ।

আমাকে এক গ্লাস জল দেবে?

দিচ্ছি।

দ্যাখো মাধবী, আমরা কেউই অমরতার ভান নিয়ে জন্মাইনি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমরা কিছুই নই, এককোটি বিন্দু-মাত্র। আমাদের ক্ষমতা-শক্তির কোনো দম্ভই করা উচিত নয়। আমাকে ছেড়ে দিলে তুমিও কিছু স্বর্গ পাবে না, আমিও পাবো না। এই ধুলোমাটিকাদা নিয়েই বাঁচতে হবে। মুর্খতা একটা গুণই নয়!

মাধবী চুপ করে রইলেন।

মুখার্জি বললেন চুপ করে থেকো না। কথা বলো। তবে কী বুঝতে হবে তুমি আবার বিয়ে করবে?

মাধবী চমকে উঠলেন। বললেন, না।

তবে কী যোগিনী হবে? নান্?

না।

তবে কী করতে চাও তুমি?

জানি না।

অসম্ভব। আমার পদবী তুমি নেবে, আমার কারণে রোজ সিঁথেয় সিঁদুর পরবে...। সত্যবস্তু থেকে ছলনাটাই বড় হবে। তারপর একদিন বুড়িয়ে যাবে, একটা অরফান হাউসে কিংবা হাসপাতালের বেডে শুকিয়ে ঝরে যাবে। এগুলো কোনো আদর্শ নয়। এমনকি ইতিহাসও কোনোদিন তোমার এই নিঃশব্দ আত্মদানকে ধরে রাখবে না। অন্তত আমি কখনোই এই নিষ্ফল ব্যাপারের নীরব সাক্ষী থাকব না। সত্যিই যদি আমাকে তোমার জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও তাহলে সেটাই সত্যি হোক। আমার মিথ্যে অস্তিত্বের বোঝা আর তোমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না।

মাধবী শিউরে ওঠেন। কী করবে তুমি?

মুখার্জি বললেন নতুন কিছু নয়। পুরনো কৌশল। আলমারিতে খুঁজলে পটাসিয়াম সাইনাইডের শিশিটা এখনো পাওয়া যাবে।

না না। কী বলছ তুমি।

আমার মৃত্যুটা অবশ্য অকারণ মনে হবে না। একটা সান্ত্বনা থাকবে।

তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।

না। ভয় দেখাচ্ছি না। আমার কর্তব্য আমি ঠিক করে ফেলেছি। তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম। আচ্ছা চলি।

তোমার পায়ে পড়ি অমন কথা বোলো না। এইভাবে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।

তুমি তো আমাকে আগলে রাখতে পারবে না মাধবী।

আমাকে আগলে রাখতে হবে। কেন বোঝো না তুমি মরে গেলে আমি কী নিয়ে থাকব।

কেন, এখন যা নিয়ে আছ। শুকনো স্মৃতি।

না। তুমি ভুল করছ। আমি কখনোই তা চাইনি।

চেয়েছ চেয়েছ। তোমার মন চেয়েছে তুমি জানতে পারোনি। কিংবা হয়তো চিন্তা করতে গিয়ে লজ্জা পেয়েছ। কী সুন্দর তাই না? মৃত্যুও কখনো কখনো একটা সুন্দর সমাধান।

না না। আর বোলো না, লক্ষ্মীটি, আমি আর শুনতে পারছি না।

আমি চলি।

না। এই তুমি বললে তোমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, তোমার চোখমুখ কালি হয়ে গেছে, আমি তোমাকে এইভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।

আমাকে বাধা দিও না।

মাধবী ওঁর বাহুজোড়া শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন, প্রবল টানে যেন যুগলে ভেসে যাবে।

কেন তুমি এমন অবুঝ? কেন পারো না জোর করতে, কেন পারো না আমাকে শক্ত-মুঠিতে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে, বাক্য-বিশারদ, তোমার হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে কেন পারো না আমাকে শিখার মতন জ্বালিয়ে তুলতে?

মাধবী—

না, কোনো কথা বোলো না, আমি বুঝেছি, এই দশবছরে আমি এরই অন্বেষণ করছিলাম, এই উত্তাপ, এই রক্তের প্রগল্‌ভতা, এই উত্তেজিত স্পন্দন। এগুলি আমার আশ্রয়, আমার বিশ্বাস, আমার আনন্দ। এগুলি না পেলে আমার কী করে চলবে, আমি কী করে বাঁচব।

মাধবী—

আমি আমার আশ্রয় পেয়েছি। আর কোনোদিন কোনো কারণে কেউ আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। কেউ না।

পাঠকের বৈঠক

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

উৎসবান্তিক

আর একটি শারদোৎসব শেষ হল। আয়ুর আকাশ থেকে আরও একটি শরৎকালের তারা খসে পড়ল। এই বছরের মত সব কোলাহল থামল। ঢাকের বাদ্য শেষ হওয়ার সঙ্গে চারদিক কেমন থমথমে হয়ে গেছে, দেবীপ্রতিমার বিসর্জনের সঙ্গেই প্রকৃতিও অনুরূপ গ্রহণ করেছেন সকালে কুয়াশা, সন্ধ্যায় হিম, রাতে শীত-শীত। শীতের আগমন আসন্ন তা এখন থেকেই অনুভব করা যাচ্ছে।

আমাদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাদের এই সূত্রে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। তাঁদের আয়ু, আরোগ্য এবং অধিকতর যশ কামনা করি।

শরৎকালের দুর্গাপূজো অকালবোধন। তন্ত্রসাধনার দুটি অঙ্গ আছে তত্ত্ব-সাধনা ও শক্তি-আরাধনা। কুণ্ডলিনীকে মাতৃভাবে জাগ্রত করে সেই চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করে যে পূজার পদ্ধতি সেই পূজোই শারদীয় পূজো। এর নাম অকাল-বোধন, দেব-নিদ্রার কালের পূজো তাই এর নাম নবরাত্রের পূজো। মাতৃশক্তির উদ্বোধনের জন্য পিতৃপুরুষের তর্পণ করার বিধি আছে। মাতৃপূজো আত্মারই পূজো। পিতৃপক্ষের পর দেবীপক্ষ, নবরাত্রি উৎসবের আরম্ভ। অবশ্য এই কাল একদা কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের বিশেষ আনন্দের কাল ছিল, ফসল তোলার কাল, তাই দেবীর পূজোর সঙ্গে তার উৎসবের দিকটাও তেমনই জমকালো হত।

মহাপূজোর তাত্ত্বিক দিকটি এখন আর কেউ চিন্তা করে না। শারদীয় বিশেষ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি আগে আগে এই বিষয় ব্যাখ্যা থাকত, এখন ক্রমশঃ তা উঠে যাচ্ছে। তাছাড়া তত্ত্ব বা তথ্যের প্রতি মানুষের তেমন আগ্রহ নেই।

দেবীকে কন্যারূপে কল্পনা করে বাঙালীরা যেভাবে পূজো করত তার কিছু কিছু আমরাও দেখেছি। বিজয়ার প্রভাতে দর্পণ বিসর্জনের সময় পুরললনাদের সজল চোখের মিনতি, পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত—'গচ্ছ গচ্ছ মহাদেবী—পুনরাগমনায় চ—' যে শুনেছে সে কখনই ভুলবে না। প্রতিমা বিসর্জনের সময় পুরনারীরা কাতর কণ্ঠে আবেদন করতেন—'আবার এসো মা—'। গৃহকর্তার সঙ্গে সহস্র কণ্ঠ এক-যোগে শুধু 'মা-মা-মা' ধ্বনি উচ্চারণ করত ঢাকীর ঢাক বাদ্য অনুতালে, সানাই করুণ সুরে ধ্বনিত হত। পূজার মধ্যে একটা ঘরোয়া এবং আন্তরিক পরিবেশ ছিল।

নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন—

"যেও না যেও না নবমী রজনী
সন্তাপহারিণী লয়ে তারা দলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি উমা আমার
যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ
প্রভাত শিশিরে আমায় ভাসাবে
নয়ন-জলে।
প্রভাত কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ
ঊষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ অনলে।।"

দেবী এই কদিন আর পুতুল মাত্র নন, তিনি ভাবময়ী, তাঁকে আমরা কন্যারূপে আহ্বান জানাই। কন্যাকে আহ্বানের কোনো কালাকাল নেই, কন্যা যে কোনো সময় পিত্রালয়ে এসে আনন্দের বন্যায় চারিদিক প্রবাহিত করতে পারে। শরৎকালে মা ও মেয়ে একই রূপ—মার কাছে যেটুকু সংকোচ, মেয়ের কাছে তাও নেই, অথচ দুই-ই এক, তাই আমাদের প্রতিটি মেনকা-জননীর হৃদয়ে কন্যা উমা পুষ্পহার। একটি মৃন্ময়ী পুতুলের মধ্যে যেভাবে প্রাণের স্পর্শ জাগে তার মূলে কি শুধু পুরোহিতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। মাটির পুতুলের গায়ে রং দিয়েই সেটাকে কি আমরা এত সহজে প্রতিমায় রূপান্তরিত করতে পারি। এর অপরূপ ব্যাখ্যা করেছেন 'ছিন্ন পত্রাবলী'তে রবীন্দ্রনাথ—

"'আমার মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে—তারা সামান্য একটা কদাকার অসম্পূর্ণ পুতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সুখ-দুঃখে জীবিত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে চতুর্দিকবর্তী সমস্ত জিনিষ নিতান্ত কেবল জিনিষ নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের কাছে কখনই আশা করা যায় না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন যেটাকে আমরা দূরে থেকে শুস্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুল মাত্র দেখছি, সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তারপরে, আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিষই এই পুতুল।"

রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করার বস্তু। দুর্গাপূজোর অনেক গুরু-গম্ভীর তাত্ত্বিক-ব্যাখ্যার কাছে এই কয়েকটি লাইন অপরূপ বাণী বহন করে আনে আমাদের মনে।

আমরা এ কয়দিন আর বয়স্ক পরম প্রাজ্ঞ থাকি না সকলেই বয়স্ক শিশুতে পরিণত হই। আনন্দের কোনো বয়স নেই, উৎসবের কোনো বয়স নেই। শারদোৎসবের কালে সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মনে বিস্ময় জাগে।

বাংলা সাহিত্যের বিগত যুগে শারদীয় উৎসব এবং দুর্গাপূজো সম্পর্কে অনেক রম্য রচনা ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে সেগুলি বোধকরি একত্রিত করে প্রকাশ করা উচিত। পুরাতন কালের কথা সকলেই ভালোবাসেন বিশেষতঃ সেই পুরাতন দিনের যদি যোগ থাকে একালের মানুষের সঙ্গে।

এইবারকার উৎসবে দেখা গেল মানুষের ভীড়। 'পপুলেশান একসপ্লোসন' একেই বলে। পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলের তুলনা করতে চাই না, পূজোর কয়েকদিন আগে থেকে সুরু করে লক্ষ্মীপূজো পর্যন্ত যে প্রচণ্ড জনস্রোত কলিকাতার পথে পদব্রজে, বাসে ট্রামে ও ঘরের মোটরে ঘুরে বেরিয়েছে তার আদমসুমারী করার সাধ্য কারো নেই।

যেমন শারদীয় সাহিত্যের ফসল হিসাবে মোট কতকগুলি উপন্যাস এইবার লিখিত হয়েছে, কয়খানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, কয়খানি লিখতে রীতিমত কব্জির জোর প্রয়োজন হয়েছে, কয়খানি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ মাত্র সংস্করণধন্য হয়ে লেখক ও প্রকাশের কণ্ঠে বিজয় মাল্য দান করবে—এই সব কঠিন প্রশ্নের উত্তর কি কেউ দিতে পারবেন? সম্ভবতঃ নয়।

শারদীয় উৎসব দিন দিন বেশ জমে উঠছে। ৯ই অকটোবর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় "...নগরে মহামায়া মহেশ্বরী মহা মহোৎসব অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইয়াছে—"

আমরাও ১৯৬৬-তে এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলি—এই বছরও মহা-সমারোহে মহোৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

—অভয়ংকর

শতবর্ষে যোগীন্দ্রনাথ ॥

'অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, এ ছড়া আজ বাংলাদেশের সব ছেলেমেয়েরই মুখস্থ। ছড়াটি আছে 'হাসিখুশি' বইয়ে। অল্প লেখাপড়া-জানা ছেলেমেয়েদের কাছেই শুধু নয়, অনেকের কাছেই এ বইটি বড় আদরের। বাংলাদেশে এমন লোক কমই পাওয়া যাবে যাঁরা এই 'হাসিখুশি'র কিছু-না-কিছু ছড়া মুখস্থ না বলতে পারেন। অথচ এর লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পর্কে আমরা যেন তেমনভাবে আজও সচেতন হতে পারি নি। নিজের লেখার পিছনে নিজেকে তিনি আশ্চর্যরকম প্রচ্ছন্ন রেখে গেছেন। আমরাও এই মহৎ লেখককে যেন পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারি নি।

সত্যি বলতে কি, শিশুদের কাছে লেখাপড়ার আকর্ষণ জোগাবার এমন যাদুকর এদেশে আর দ্বিতীয় কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। 'হাসিখুশি'র দুটি ভাগ ছাড়াও যোগীন্দ্রনাথ যে ছড়া ও ছবি, ছবির বই, নূতন ছবি, আষাঢ়ে স্বপ্ন, খেলার সাথী, হিজিবিজি, শিশু চয়নিকা, পশুপক্ষী, ছোটদের মহাভারত, ছোটদের রামায়ণ প্রভৃতি লিখেছিলেন তা আজও শিশুসাহিত্যের সম্পদ। এ বছর হল তাঁর জন্মশতবর্ষ। এই উপলক্ষে শতবর্ষের সূচনায় 'অমৃতে'র ৫ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যায় যোগীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী লিখিত একটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্যে 'অমৃতে'র মত আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

ভারতীয় সাহিত্য

একটি সংস্কৃত নাটক ॥

সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃত পরিষদ'-এর উদ্যোগে একটি সংস্কৃত নাটক প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি বর্তমানের সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের কোন কোন নেতার মধ্যে যে নৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে নাটকটি তার বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ। ভারতের ভাষা সমস্যা, ভারত বিভাগ ইত্যাদি সমস্যাগুলিও প্রসঙ্গত নাটকে স্থান পেয়েছে। নাট্যকার ভারতের বিশ্বভ্রাতৃত্ব নীতি এবং জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিত্বের দিকটি খুবই উল্লেখভাবে পরিবেশন করেছেন। তবে মাঝে মাঝে হাসির খোরাকও দিয়েছেন তিনি। রঙ্গোজী এবং আর্জুন নামে দুটি চরিত্র এই হাস্যকর পরিস্থিতিকে সাহায্য করেছে।

মহাদেবী ভার্মা ॥

কিছুকাল আগে মহাদেবী ভার্মা এলাহাবাদ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষা হিসেবে ৩০ বৎসরকাল অতিক্রম করেছেন। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে মহাদেবী ভার্মার নাম সুপরিচিত। বিষাদ এবং বেদনাই তাঁর কাব্যের মূল সুর। রোমান্টিকতাই তাঁর কবি-মানসকে গঠিত করেছে। তাঁর কবিতায় সর্বদাই একটা সুদূর ভবিষ্যতের জন্য আকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া যায়।

মহাদেবী ভার্মার জন্ম হয়েছে উত্তর-[illegible]

খুব উল্লেখযোগ্য। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বহু স্বর্ণপদক লাভ করেন। সংস্কৃতে এম-এ পাশ করার পরেই তিনি এলাহাবাদের মহিলা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন।

তাঁর মাও ছিলেন একজন কবিতা-প্রেমিক। তিনি তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রমুখের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। মহাদেবী ভার্মার মাতামহও ছিলেন একজন কবি। এঁদের সাহচর্যও তাঁর কবি-মানস গঠনে সাহায্য করেছে।

বাংলাতে মহাদেবী ভার্মার একাধিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'নীরজা' এবং 'সন্ধ্যাগীত' গ্রন্থ দুটি হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মহাদেবী ভার্মা

বিদেশী সাহিত্য

জাঁ-পল্ সার্তের নতুন নাটক ॥

কিছুকাল নীরবতার পর জাঁ-পল্ সার্ত গ্রীক নাট্যকার ইউরোপাইডিসের কাহিনী থেকে 'দ্য ট্রোজান ওমেন' নামক একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনা করেছেন। নাটকটি ফ্রান্স শহরে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। অনেকেরই ধারণা সার্ত এই নাটকটির মাধ্যমে ইউরিপাইডিসের আমলের গ্রীকদেশীয় ট্রোজান রমণীদের ভাব-চরিত্র চিত্রিত করে ফরাসী তরুণীদের প্রতি শ্লেষাত্মক কটাক্ষ করেছেন। কোনো কোনো মহিলা প্রতিষ্ঠান থেকে তো রীতিমত লিখিত প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। অবশ্য চিঠিগুলির বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত আক্রমণ। সার্ত বলেন, আমার ধারণা অনেকে নাটকটি না পড়ে কেবলমাত্র লোকমুখে শুনেই চিঠি ছুঁড়েছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন 'নাটকটিতে আমি প্রধানতঃ গ্রীক দেব-দেবীর রূপকথার আড়ালে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা সংঘাতে ভাঙতে চেয়েছি। আমি চিরন্তন মানবিকতাকে আণবিক যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে মানুষের অসহায়তাকে পেশ করেছি। ট্রোজানের সেইসব পরমাসুন্দরী ও অবলুপ্ত দেবিকা মূর্তিই যেন আজ নৈতিক সৌন্দর্যের সাক্ষী হয়ে আছে।'

ঈরিশ্ মারডখ্-এর উপন্যাস ॥

শ্রীমতী ঈরিশ মারডখ্ হচ্ছেন ইংরেজী সাহিত্যের অতি-সম্প্রতিকালের লেখক। মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে ইতিমধ্যেই [illegible]

আগে তাঁর একটি উপন্যাস 'দি টাইম্ অব দি অ্যাঞ্জেল' বেরিয়েছে। এটি তাঁর দশম সংখ্যক উপন্যাস। অন্যান্য রচনার মত মিস্ মারডথ্-এর আলোচ্য গ্রন্থটিও চিরাচরিত ম্ল্যেবোধে আঘাত হানবে। বাস্তব পৃথিবী থেকে নিঃসঙ্গ নির্বাসন এবং তার ফল হিসেবে ঈশ্বরবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিকে বিভিন্ন চরিত্র পরিবেশের সংঘর্ষে উপনীত করেছে। উপন্যাসটিতে শ্রীমতী মারডথের বর্ণনা-বৈশিষ্ট্য, সংলাপকথন, এমনকি জীবনের নশ্বরূপায়ণে এমন একটা নতুনত্ব আছে, যা সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যে একেবারে ভিন্ন স্বাদ নিয়ে আসবে। উপন্যাসটিতে সবচেয়ে বিশিষ্ট যা, তা হচ্ছে, তিনি যেন ইচ্ছে করেই জীবনের দশ্চিন্তাহীন অতীতের ভগ্ন উপকূলে কিছু অলৌকিক ভয়াবহতাকে টেনে তোলেন, বর্তমানকে তার দ্বারা রূপান্তরিত করতে বাধ্য করেন এবং পরিণামে তা তাঁর কাহিনী ফাঁদার বৈশিষ্ট্যে গোপন হয়ে থাকে।

গ্যেটে-অভিধান ॥

গত বিশ বছর ধরে জার্মানীতে একটি গ্যেটে-অভিধানের সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ চলেছে। স্টুটগার্টের 'কোহ্লহামার-ভের-লাগ' সংস্থা জানিয়েছেন যে তাঁরা এই-রকমের ৮০টি পরিকল্পনার মধ্যে এই প্রথমটিকে এবছর বাস্তবে রূপ দিতে পারছেন। এই অভিধান রচনার জন্য উঁচু-দরের পরিকল্পনা আহ্বান করে জার্মান-সাহিত্যের একটি স্কলারশিপ ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে জার্মান সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক স্কাদেওয়াল্দৎ তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন এবং সেই অনুসারে ওই বছরেই বার্লিনে এর কাজ শুরু হয়। হামবুর্গ, লিপজিগ্ ও তুবিঙ্গেন-এর গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিও এ-কাজে সহযোগিতা করেন। দীর্ঘ গবেষণার ফলে ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ 'রেফারেন্স' তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে আবার অনেক-গুলিই ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অভি-ধানটির সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল যথাক্রমে তুবিঙ্গেন্ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক স্কাদেওয়াল্দৎ, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়ার্ণার সাইমন এবং মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলহেল্ম উইস্মান-এর ওপর।

নতুন বই

বাংলা লোক-সংগীতের কোষগ্রন্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা লোক-সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা দ্বারা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। ডক্টর ভট্টাচার্য আজ কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলা লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা দ্বারা অনেক মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। বাংলা লোক-সংগীতের বিভাগটি অত্যন্ত [illegible], এক হিসেবে বলা যায় যে, বাংলা দেশের লোক-সংগীতের মধ্যে যে বৈচিত্র্য এবং বৈভব তা ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যে নাই। ডক্টর ভট্টাচার্য এক বিরাট কর্মে ব্যস্ত আছেন। বাংলা লোক-সাহিত্যের ইতিহাস তিনি [illegible] বৃহৎ খণ্ডে রচনা করে প্রকাশ করে-ছেন, চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশ-পথে। সম্প্রতি তিনি বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ [illegible] প্রণয়ন করে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থটিও [illegible] খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা আছে। [illegible] খণ্ডের মধ্যে বাংলার লোকসংগীতের সামগ্রিক বর্ণানুক্রমিক পরিচয় এবং [illegible] করা হবে। এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধু ভারতীয় ভাষাতেই নয়, ভারতের বাইরেও এই জাতীয় কোন গ্রন্থের আজ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নি। সেই হিসাবেও [illegible] ডক্টর ভট্টাচার্য অভিনন্দনযোগ্য।

ডক্টর ভট্টাচার্য এই কর্মে প্রায় তিরিশ বছর নিযুক্ত আছেন, নানা উপাদান তিনি প্রায় তিরিশ বছর ধরে সংগ্রহ করেছেন, দীর্ঘ দিনের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে তাঁর [illegible] পরিকল্পনা আজ সাফল্য লাভ করেছে [illegible] কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁর একার প্রাপ্য।

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীত তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে সংগ্রহ করেছেন এবং কোষগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন — "বাংলা দেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে দিয়াই তত সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঙালীর সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাঙালীর ধ্যান-ধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সার্থকতম বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাঙালীর সঙ্গীত-সাধনায় যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইবে না।"

উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি বর্তমান। এই ভাবনাই তাঁকে লোক-সঙ্গীতের সামগ্রিক পরিচয়দানে [illegible] [illegible] প্রেরণা দান করেছে।

[illegible] ছ পর্যন্ত এই [illegible] সংকলিত করা হয়েছে, [illegible] [illegible] পরি-[illegible] এই প্রথম [illegible] দেখে অনুমান করা সহজ যে, এই কোষগ্রন্থ [illegible] একটি [illegible] [illegible] লাভ করবে।

[illegible] আউল, বাউল, [illegible] গীত, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], আলকাপের [illegible], [illegible] গান, [illegible] গান, [illegible] গান, কবিগান, [illegible], [illegible] গান, ঝুমুর গান, [illegible] [illegible] প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ এবং [illegible] দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গ্রন্থের সমগ্র পরিকল্পনা ও রূপায়ণের [illegible] কৃতিত্ব ডক্টর ভট্টাচার্যের। তিনি বাংলার লোকসাহিত্যের চারটি বিভাগ ছড়া, গীতি ও নৃত্য, কথা, ধাঁধা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সেই বৃহৎ গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। এই কোষগ্রন্থ প্রকাশে ডক্টর ভট্টাচার্যের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নাই। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগে এমন নিষ্ঠাবান গবেষণাও ইদানীংকালে সচরাচর দেখা যায় না। লোকসংগীত রত্নাকরের নামকরণ সার্থক হয়েছে। গ্রন্থটির মুদ্রণের ভার দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমী গ্রহণ করায় গ্রন্থটির মূল্য সুলভ করা সম্ভব হয়েছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

বঙ্গীয় লোক-সংগীত রত্নাকর

(কোষগ্রন্থ) (অ হইতে ছ) — ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রকাশক — পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিঃ—৩৪। দাম—মাত্র ছ টাকা।

শারদ সাহিত্য

প্রতি বছর শারদোৎসব উপলক্ষে বাংলা-দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বহু পত্র পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এইসব শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা ও কবিতা প্রায় সবখানি স্থান অধিকার করে থাকে, বিজ্ঞান-সম্পর্কিত রচনার স্থান সেখানে নগণ্য বললেই চলে। অথচ আজকে আমাদের জীবনে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। এজন্যে বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক-মাত্রই বহুদিন থেকে এই অভাবটি বিশেষ-ভাবে অনুভব করে আসছেন। তাঁদের কাছে এ-বছর পরম আনন্দের সংবাদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তাঁদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করে-ছেন। এই বিশেষ সংখ্যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-সম্পর্কিত রচনাই স্থান পেয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু লিখেছেন 'পুরনো দিনের স্মৃতি', অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু লিখেছেন 'গণতন্ত্র এবং ভারতীয় সমাজ', 'ক্যান্সার তত্ত্ব' সম্পর্কে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, 'অ্যান্টিবায়োটিকস্' সম্পর্কে ডাঃ

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, 'আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা' নিয়ে অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। এছাড়া আরও কয়েকটি মূল্যবান বিজ্ঞান-প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক বসু চীনের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সে সম্পর্কে বিতর্ক উঠতে পারে, কিন্তু তা অপ্রিয় সত্য এবং এ-বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের রচনাসমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটি বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকমাত্রের কাছেই সমাদৃত হবে। কয়েকটি আকর্ষণীয় চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই সংখ্যাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান পরিষদের এই শুভ প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০ টাকা।

●

দৈনিক জনসেবকের শারদীয়া সংখ্যায় পাঁচটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, দিলীপকুমার রায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মৃত্যুঞ্জয় মাইতি। জরাসন্ধের বড় গল্প 'বন্দুক' সমস্ত শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করবে। প্রবন্ধ লিখেছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ, সৈয়দ মুজতবা আলী, রেজাউল করিম ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বিশীর বিচিত্র সংলাপ, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও দক্ষিণারঞ্জন বসুর নাটক, প্রসাদ শর্মা ও কুমারেশ ঘোষের রম্যরচনা সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করেছে। গল্প লিখেছেন বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্রনাথ দাশ, চিত্রিতা দেবী, সুশীল রায়, শেখর সেন। দিলীপকুমার রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দীনেশ দাশ, ইয়েভতুশেংকো, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা বসু, আনন্দ বাগচীর কবিতা আছে। খেলাধুলো সম্পর্কে দিলীপ দত্তের লেখাটি সুন্দর।

জনসেবক—সম্পাদক : শ্রীঅতুল্য ঘোষ। ১০৫।৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪। দাম তিন টাকা।

●

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'বৈতানিক' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় প্রবন্ধ ও আলোচনা, গল্প, দেশী ও বিদেশী কবিতার সুন্দর সমাবেশ ঘটেছে। লোকনাথ ভট্টাচার্য, জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ, বিনয় সেনগুপ্ত, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, স্বপনবুড়ো, সঞ্জীবকুমার বসু, পবিত্র পাল কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ, মল ফ্ল্যানডার্স, যোগীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনাগুলি মূল্যবান। গল্প লিখেছেন বীরেশ্বর বসু, মিহির পাল, নির্মল সরকার, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল সরকার, খগেন্দ্র দত্ত। দ্যাফন দ্য মুরিয়ার এবং হেমিংওয়ের দুটি গল্প অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে আভা পাকড়াশী এবং মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, অজিত মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গণেশ বসু, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, মানস রায়চৌধুরী, রমেন্দ্র মল্লিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শিবশম্ভু পাল, শান্তনু দাস এবং আরো অনেকে। এলিনর ফার্জন, ব্রেটলট ব্রেখট, পল ভেরলেন, কমলা দাসের কবিতা অনুবাদ করেছেন মণীশ ঘটক, দীনেশ দাশ, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার অধিকারী, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

বৈতানিক—সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম দু' টাকা।

●

'সাংবাদিকে'র শারদ সংকলনে লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোজ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীল রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, **ভারতপত্রম, চিদানন্দ গোস্বামী** এবং আরো কয়েকজন।

সাংবাদিক—সম্পাদক : শ্যামলাল মিস্ত্রী। ৫৭।১, এন কে ঘোষাল রোড, কলকাতা-৪২। দাম দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

মৌচাকের শারদীয় সংখ্যাটি অন্যান্য বৎসরের মত এবারও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিমল দত্ত, অমরনাথ রায়, দুর্গাদাস সরকার, রামপদ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, বেলা দে, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার গুপ্ত, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ইন্দিরা দেবী, বাণী রায়, রাণী বসু এবং আরো কয়েকজন।

মৌচাক—**সম্পাদক** : সুধীরচন্দ্র সরকার। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

●

শুকসারী একমাত্র গল্পের পত্রিকা। বাংলাদেশের পাঠক-সমাজে ইতিমধ্যে পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমান সংখ্যায় কুড়িটি বিভিন্ন স্বাদের গল্প লিখেছেন রমেশচন্দ্র সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, বশীর আল্ হেলাল, বাসুদেব দেব, নির্মলেন্দু গৌতম, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, অমরেশ দাশ, সুজিতকুমার ভট্টাচার্য, নিখিলচন্দ্র সরকার, অজিত মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ চৌধুরী, সুনীল চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র পাল, পরাব সেনগুপ্ত, শান্তি দত্ত, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মিহির আচার্য।

শুকসারী—সম্পাদক : মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

●

'মহিলামহল' সমাজকল্যাণে নিবেদিত বাঙালী মেয়েদের মাসিক পত্রিকার ২০শ বর্ষের শারদ সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের নবীনা-প্রবীণা মহিলা লেখিকাদের নানান ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ। গল্প, কবিতা, নাটিকা, জীবনী, ভাববার কথা, দৃষ্টিপাত, প্রবন্ধ, রূপচর্চা সাধারণ বাঙালী ঘরনীদের খুশী করবে। লেখিকাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন : ডক্টর রমা চৌধুরী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, পুষ্পদল ভট্টাচার্য, কুন্তলা দত্ত, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, মীনাক্ষী চৌধুরী, নীলিমা চক্রবর্তী, সাধনা দেবী, সুরুচি সেনগুপ্ত, আরতি সেন, কনকলতা ঘোষ, জ্যোতির্ময়ী সরকার, পূর্ণিমা ব্রহ্মচারী, এ্যাডভোকেট অরুণা মুখোপাধ্যায়, করুণী বসু, বেলা দে, ডক্টর উমা দেবী, বাণী রায়, অমিতা দেবী, প্রভা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

মহিলামহল (২০শ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৩৭৩) সম্পাদিকা : অঞ্জলি বসু, এম আই-জি হাউসিং এস্টেট, হাউস নম্বর : ১২, সোদপুর, ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত। দাম : এক টাকা।

●

শারদীয় 'চতুষ্পর্ণী'য় উপন্যাস লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ ; প্রবন্ধ লিখেছেন ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, যজ্ঞেশ্বর রায়, অসিত গুপ্ত, মনোজিৎ বসু। কবিতা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, আলোক সরকার, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, আশিস সান্যাল, মৃণাল দত্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রম্যরচনাটি সকলেরই ভাল লাগবে।

চতুষ্পর্ণী—সম্পাদক : অরুণ ঘোষ। ২০এ, রাধানাথ মল্লিক লেন। কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

●

কবিতার ত্রৈমাসিক সীমান্তের শারদীয় সংখ্যায় একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ 'কাব্য সমালোচনা ও একালের বাংলা কবিতা' লিখেছেন মণীন্দ্র রায়। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, মণীন্দ্র রায়, প্রমোদ মুখো-

পাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, অমিতা চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মৃণাল দত্ত, অনন্ত দাস, গণেশ বসু, তরুণ সান্যাল ও প্রসূন বসু। রাম বসুর কাব্যনাটক 'নিশি পাওয়া' সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ। পুস্তক আলোচনা করেছেন মণীন্দ্র রায় এবং সুমন্ত আচার্য চৌধুরী। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পর্যায়ে মৃগাঙ্ক রায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও গণেশ বসুর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন বসু, আশিস সান্যাল, মৃণাল দত্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল। প্রচ্ছদ এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

সীমান্ত—সম্পাদক : তরুণ সান্যাল ও প্রসূন বসু। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯। দাম এক টাকা।

●

শতাব্দীর শারদ সংকলনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'অথবা কিন্নর' অবলম্বনে তাঁর কবিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন গোবিন্দ চক্রবর্তী। আরো দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভবানী মুখোপাধ্যায়। একটি কাব্যনাটক লিখেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনটি গল্প লিখেছেন মিহির আচার্য, বীরেন্দ্র দত্ত ও পবিত্রবল্লভ। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, সুনন্দ ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, তারাপদ রায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, মানস রায়চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

শতাব্দী—সম্পাদক : শ্রীমতী দত্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। ৬, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা কল্লোল-এর প্রথম সংখ্যাটি শারদ সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে পত্রিকাটি মাসিকরূপে প্রকাশিত হবার কথা ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশের একদা বিখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার অনুসরণে বর্তমান পত্রিকাটির নামকরণ করা হয়েছে এবং একইসঙ্গে নতুন সাহিত্য-রস আস্বাদনের প্রতিশ্রুতিও সম্পাদক দিয়েছেন। প্রথম সংখ্যাটি নানাদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। গল্প প্রবন্ধ ও কবিতায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীঅবিনাশ সাহা, অগ্নিমিত্র শ্রীবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ দত্ত এবং শ্রীসুনিশা সিংহ, কবিতা লিখেছেন শ্রীমণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জগদীশ ভট্টাচার্য ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

কল্লোল : শ্রীকৃষ্ণধন দে সম্পাদিত এবং ৬২।১, অবিনাশ ব্যানার্জি লেন, কলকাতা—১০ থেকে প্রকাশিত। দাম : ১·২৫।

●

'স্বস্তিকা'র শারদীয় সংখ্যায় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, দেবজ্যোতি বর্মণ, মাধবরাও গোলওয়ালকর, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতাংশু পাল, বিমল মিত্র, প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, রামপদ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অসীমকুমার মিত্র, বিনোদ বেরা, স্বপনবুড়ো, চণ্ডী লাহিড়ী, শিবরাম চক্রবর্তী, শ্রীবিরূপাক্ষ এবং আরো কয়েকজন লিখেছেন।

স্বস্তিকা—শ্রীসনৎকুমার ব্যানার্জির সম্পাদনায় কলিকাতা ও আগরতলা থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

●

'দীপান্বিতা'র বর্তমান শারদ সংকলনটি তাদের প্রথম বর্ষের শারদীয় অর্ঘ্য। এই সুসম্পাদিত ও সুচিত্রিত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটিতে উপন্যাস লিখেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবী। একটি রহস্য উপন্যাস লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। গল্প লিখেছেন বিমল মিত্র, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু। একটি বড় গল্প লিখেছেন বিমল কর। একটি একাংক নাটক লিখেছেন অসিত গুপ্ত। দিলীপ মালাকার, সুজাতা ও কৌশিকের আলোচনা ভাল লাগবে। অলংকরণ করেছেন চারু খান ও অসিত গুপ্ত।

দীপান্বিতা—সম্পাদক : শ্যামল চক্রবর্তী। ২৯৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম চার টাকা।

শারদীয় 'গণবার্তা'য় রোজা লুক্সেমবুর্গ, এ আর দেশাই, ত্রিদিব চৌধুরী, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অবিনাশ দাশগুপ্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ, প্রলয় সেন, নারায়ণ চৌধুরী, দিলীপ রায়চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায়, অতীন্দ্র মজুমদার, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মানস রায়চৌধুরী, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, আশিস সান্যাল, অরুণ ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, মণীশ ঘটক, অমিতাভ দাশগুপ্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রাণা বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সান হাই-এর রচনা স্থান পেয়েছে।

গণবার্তা—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৭, রিপন স্ট্রীট। কলকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

●

ইন্দ্রজালের মাসিক পত্রিকা 'মায়ামঞ্চে'র শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার দত্ত, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, পি সি সোরকার, এস ডি মুখার্জি, অশোক রায়, শংকর দাশ। তাছাড়া আছে যাদু সংবাদ ও চিঠিপত্রের জবাব।

মায়ামঞ্চ—সম্পাদক : গীতা মুখার্জি। ২১বি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। দাম এক টাকা।

●

বিচিত্রায় সমর সেন ও জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে কিরণশংকর সেনগুপ্ত এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী। বিভিন্ন বিষয়ের আরো চারটি আলোচনা আছে। জীবনানন্দ দাশ, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী এবং আরো অনেকের কবিতা ছাপা হয়েছে। গল্প লিখেছেন তারাপদ রায় এবং সুব্রত রায়। একটি উপন্যাস লিখেছেন জীবন ভৌমিক।

বিচিত্রা—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : কিরণশংকর সেনগুপ্ত, ৭-এ, মিত্র লেন, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

শিল্পকথা

ব্রোঞ্জ এবং পিতলের দেবমূর্তি

পশ্চিম বার্লিনস্থিত জার্মান ফেডারেল ল্যাবরেটরী ফর দি টেস্টিং অফ মেটেরিয়ালস-এর বিজ্ঞানীরা ৫০০টি প্রাচীন ভারতীয় ব্রোঞ্জের মূর্তির ধাতুর মিশ্রণ বিশ্লেষণের কাজে ব্যস্ত আছেন।

মূর্তিগুলি ভারত, সিংহল ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে পাওয়া গেছে এবং এগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। বার্লিনস্থিত স্টেট মিউজিয়মের ভারতীয় শিল্পকলা বিভাগের ডিরেক্টর বিজ্ঞানীদের এই মূর্তিগুলির বিভিন্ন ধাতু বিশ্লেষণ করতে বলেছেন কারণ এই ধরণের মূর্তির রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে জানতে পারা যাবে প্রাচীনযুগের মানুষের ধাতুসংক্রান্ত বিদ্যা, তাদের দেশান্তরে গমনের পথ, বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ব্রোঞ্জের মূর্তির পরীক্ষা খুবই কম হয়েছে।

ব্রোঞ্জের ধাতুগুলিকে শিল্পসংক্রান্ত ধাতুর বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট করা হয়। অ্যাসিডে দ্রবণের পর ধাতুর একটি খণ্ডকে বাষ্পীভূত

সম্প্রতি কলকাতায় গুডইয়ার কোম্পানীর সেলস ইনজিনিয়ার মিঃ এ কে সেনের করোকাট চিত্রের প্রদর্শনীতে সেলস ডিরেক্টর মিঃ এম টি মার্কলন (মধ্যে) সেলস ম্যানেজার মিঃ ভি নারায়ণ (বামদিকে) এবং মিঃ এ কে সেন (ডানদিকে)।

করা হয়। প্রজ্বলিত শিখায় ধাতুটি বাষ্পীভূত হয়ে তার বর্ণচ্ছটা বিকীরণ করে। বর্ণচ্ছটায় কতকগুলি রঙিন রেখা থাকে। ঐ রেখাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। রেখাগুলি তাদের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে সজ্জিত থাকে এবং ধাতুর উত্তপ্ত অণু যে বর্ণ বিকীরণ করে রেখাগুলিতে সেই বর্ণগুলি দেখা যায়।

বার্লিন ল্যাবরেটরীর ডঃ ও ওয়েণার বলেছেন এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টি প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতীয় ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যকে আলোকরশ্মি পরীক্ষার যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লিষ্ট করা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মূর্তিটি প্রায় ১৫০০ বছর আগে নির্মিত এবং এই সংগ্রহের মধ্যে আধুনিক কাল পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা আছে। বর্ণচ্ছটা পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এই সব দেবতা এবং সাধুসন্তদের মূর্তিগুলির জন্য ব্যবহৃত ধাতুর [illegible] গত এক হাজার বছরে বিশেষভাবে [illegible]বর্তিত হয়েছে। এগুলির মূল ধাতু তামা। টিন এবং তামার মিশ্রণজাত ধাতুকে বলা হয় ব্রোঞ্জের এবং তামা ও দস্তার মিশ্রণ পিতল হিসাবে পরিচিত। ডঃ ওয়েণার দেখেছেন যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ভারতীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলিতে টিন অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ বেশী দস্তা আছে, যার ফলে সেগুলিকে ব্রোঞ্জ না বলে পিতল হিসাবেই ধরা উচিত। সংগ্রহশালার বিজ্ঞানীরা সেই অনুযায়ী বিবরণের পরিবর্তন করবেন কিনা তা এখনও জানা যায়নি। ভারতীয় ধর্মে পিতলের দেবমূর্তি কখনোই ব্রোঞ্জের মূর্তি অপেক্ষা বেশী পূজনীয় নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহ্যে বস্তুত পিতলকে ব্রোঞ্জ অপেক্ষা বেশী সম্মান দেওয়া হয় এবং রসায়নবিদদের আবিষ্কারে শিল্পের ইতিহাস কিছুটা নিরাশ হবেন। কিন্তু বর্ণচ্ছটা পরীক্ষাই প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়েছে।

কালক্রমে ভারতীয়েরা এবং তাঁদের সংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা সম্ভবতর ধাতু পিতলের ব্যবহার আরম্ভ করেন। দস্তা আর তামার মিশ্রণ দুটি শ্রেণীতে পাওয়া যায়। কয়েকটিতে স্বল্প পরিমাণ দস্তা এবং অন্যান্যগুলিতে শতকরা ২৫ ভাগ বা আরও বেশী দস্তা আছে।

তামা এবং টিন অথবা দস্তা ছাড়া ভারতীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলিতে তৃতীয় প্রধান উপাদান সীসার সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রাচীন মূর্তিগুলিতে মোটামুটি বেশী পরিমাণেই সীসা আছে। সীসা তাড়াতাড়ি গলে যায় বলেই ঢালাইয়ের কাজের সুবিধার জন্য সীসার মিশ্রণ চালু হয়েছিল।
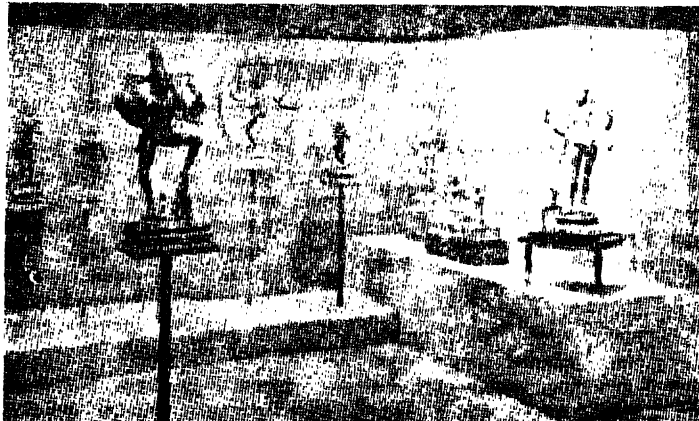
প্রাচীন ভারতীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলিতে অন্যান্য খনিজ ধাতুর সন্ধানও পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির মধ্যে একটি স্বর্ণ নির্মিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে বহু প্রাচীন ভারতীয় ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যে শতকরা ০·০০১ থেকে ০·০০৩ ভাগ সোনা খাদ হিসাবে মেশানো হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্রোঞ্জ ও পিতলের মূর্তিগুলিতে অবশ্য সোনার মিশ্রণ নেই। ৫ম শতাব্দীর প্রাচীন ভারতের গুপ্তযুগে ধর্মীয় নির্মাণকারীদের জন্য একটি ধর্মসম্পর্কিত ব্যবস্থাপত্র রচনা করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে যে, ভাস্কর্যের জন্য পাঁচটি ধাতু, যথা তামা, সোনা, রূপা, সীসা এবং দস্তার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। এই তালিকায় টিনের স্থান ছিল না, যদিও আধুনিককালে দস্তা অপেক্ষা টিন আদরণীয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় নেতাদের কাছে দস্তা ছিল বিশেষ সম্মানীয় ধাতু এবং এর সংমিশ্রণে মূর্তির সম্মান হানি হতো না।

বার্লিনের বিজ্ঞানীরা কতকগুলি ব্রোঞ্জ মূর্তিতে অধিকতর পরিমাণে সোনার মিশ্রণের সন্ধান পেয়েছেন। এর পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ০·১ থেকে ০·২ ভাগ, কোনটিতে ০·৬ ভাগ পর্যন্ত। কতকগুলি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শতকরা পরিমাণে রূপার মিশ্রণও পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় বিশেষভাবে পূজনীয় দেবতা ও সন্ন্যাসীদের মূর্তির জন্য উৎকৃষ্ট ধাতু, সোনা ও রূপার অধিকতর পরিমাণ নির্দেশ করা হোত। মোটের ওপর রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় ব্রোঞ্জ নির্মাতারা কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁদের প্রাচীন ধর্মীয় আদেশ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছিলেন।

বার্লিন আর্টগ্যালারীতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য

[উপন্যাস]

।। তেরো ।।

চারিদিকে অকূল সাগর। একলা মানুষ হলে তাড়াতাড়ি ছিল না. না হয় কিছুকাল ভেসে ভেসে বেড়ানো যেত। বিপদ কাঁধের এই ভারবোঝা নিয়ে—নিশ্চল নিঃশব্দ বস্তু হলেও হত, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষেপে উঠে এ মেয়ে ধন্দেমার লাগিয়ে দেয়।

অমিতাভ'র নাম মনে পড়ে গেল। নোটবুকে ঠিকানা আছে। কলকাতায় গেলে তার মেসে গিয়ে উঠতে হবে, এই নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণটা কিছু পুরানো, বছর পাঁচেক আগেকার। অমিতাভ তাদের ইস্কুলের এক মাস্টারের শালক, শিশিরের সমবয়সী. ঐ সময় ভগ্নীপতির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। মাছ ধরার বিষম নেশা—তারই জন্যে গিয়েছিল শিশিরের সঙ্গে—ক'টা দিন ছিল, এ-পুকুরে সে-পুকুরে রোজই দুজনে মাছ ধরে বেড়াত। শিশিরের বাড়িতেও গেছে কয়েকবার. তাদের দুটো পুকুরেই বিস্তর মাছ—ছিপ নিয়ে পুকুর পাড়ে বসত। শিশিরের তখনও বিয়ে হয়নি—শিশিরের মা ধরাগিন্নি খুব যত্ন করে খাওয়াতেন তাকে। পাঁচ বছর আগেকার ব্যাপার—অমিতাভ সেই সময় শিশিরের কথা আদায় করে নিয়েছিল. কলকাতায় যায় তো অমিতাভর কাছেই থাকবে। তার পরে আর খোঁজখবর নেয়নি কেউ কারো। কিন্তু নিমন্ত্রণ পাঁচ বছরে তামাদি হয়ে যায়, এমন আইনও কিছু নেই। এক যদি মেস ছেড়ে অন্য কোথাও সে বাসা নিয়ে থাকে। গিয়ে দেখা যাক। কূলহীন সাগরে এই ছাড়া অন্য কিছুই তো নজরে আসে না।

হাতঘড়িতে সাতটা তেত্রিশ। দু-বার বাস বদল করে তবে শ্যামবাজার। দ্রুতপায়ে বাস-রাস্তায় চলল। কাজে বেরুনোর আগে গিয়ে অমিতাভকে ধরবে।

কলোনির লোকটা পাছু ছাড়েনি এখনো। ভ্যানর-ভ্যানর করতে করতে চলেছে—বড়দা বিহনে বড়দার ভাগনেকেই দরদের মানুষ ঠাউরেছে সম্ভবত। [illegible] উঁকিঝুঁকি করে চারিদিক পানে। রাত্রে সেই অগ্নিকাণ্ডের কথা। [illegible] মালিক উমেশ সর্দার 'ভাই' ছাড়া বড়দাকে ডাকত না—সেই মানুষটার [illegible] সমস্ত। ভস্ম তৈরি হয়ে গেছে, [illegible] দুপুরে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে ঘরবাড়ি তছনছ করে দিল। এবারে অন্য কোথাও গিয়ে সেলামিতে বন্দোবস্ত করে মুনাফা পিটবে।

এত বড় সর্বনাশ ঘটিয়ে গেছে, স্বপ্নেও কেউ ভাবিনি। বেড়ার উপর দমাদম লাঠি ডাকাত পড়েছে. ভাবলাম, ঘুমের ঘোরে। চোখ মেলে দেখি [illegible] মরবি কেন—ঘর থেকে বেরিয়ে আয়। বেড়ার ফাঁকে তাকিয়ে দেখি কলোনি জুড়ে প্রলয়-তাণ্ডব। ঘরের পর ঘর জ্বলছে দাউ দাউ করে। হাওয়ার তোড়ে আগুন এচালে ওচালে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। না বেরিয়ে তখন উপায় কি! নিশিরাত্রে চারিদিকে হাহাকার আর কান্নার রোল, হাতে লাঠি-শড়কি নেড়ো-দানোগুলো হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে. ক্ষণে ক্ষণে বন্দুকের দেওড়—তার মধ্যে চোখে আধো-ঘুম নিয়ে কে কোনদিকে ছিটকে পড়লাম নিশানা করার উপায় ছিল না—

বাস এসে পড়ায় রক্ষে পেল শিশির। এত দুঃখ কান পেতে শোনা যায় না!

খুঁজে খুঁজে শিশির অমিতাভর মেসে পৌঁছল।

কলতলায় অমিতাভ স্নানে এসেছে! শিশিরকে দেখেই চিনল. হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা করে : আসুন, আসুন। এলেন তা হলে সত্যি সত্যি? কত যে আনন্দ হচ্ছে! ঐ আমার ঘর—বসুনগে ভাল হয়ে। আসছি।

হুড়হুড় করে কয়েকটা মগ মাথায় ঢেলে তাড়াতাড়ি অমিতাভ স্নান সারল। মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকেছে। ঠাকুর সঙ্গে, তার হাতে টাকা দিয়ে বলে, দই-রাবড়ি সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়ে দিও ঠাকুর। আমার ফ্রেন্ড। সময়ে কুলিয়ে ওঠে তো ডিমের একখানা স্পেশাল করে খাইও। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার সিটে বিশ্রাম করবেন, কোন রকম অসুবিধা না হয় দেখো।

ঠাকুর বলে, আমরা রয়েছি, অসুবিধা কেন হবে?

চাকরে লোকের মেস। অমিতাভও চাকরি করত গোড়ায়। আর সন্ধ্যাবেলা ল-কলেজে আইন পড়ত। আইন পাশ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন আদালতে বেরুচ্ছে। বলে, মক্কেলের বড় আকাল। কপালক্রমে আজকেই একটা পেয়েছি—রাহাজানির একটা কেস। সেই জন্যে ছুটোছুটি।

মাথা মুছে চুল আঁচড়াচ্ছিল। এইবারে কুমকুমকে ভাল করে ঠাহর হল।

এটি কে?

আমার মেয়ে?

অমিতাভ অবাক হয়ে বলে, বলেন কি মশায়। বিয়ে করলেন, মেয়ে হয়েছে—দিব্যি ডাগরসড়ো মেয়ে। ভাগ্যবান বলতে হবে। আমাদের বিয়ে করবার কথাই এখনো কেউ বলে না—

শিশির ম্লান হেসে বলে, বিয়ে করলাম, মেয়ে হল, একুশ দিনের মেয়ে রেখে বউ চলে গেল—

চুকচুক করে সহানুভূতি জানিয়ে অমিতাভ বলে, বাচ্চা সঙ্গে নিয়েই ঘুরছেন?

ঘুমিয়ে গেছে কুমকুম। অমিতাভর বিছানায় সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে শিশির বলল, নিরুপায়। ভাগ্যের সবটা তো শোনেন নি—মেয়ের মা নেই, আমার মাকে সেই দেখে এসেছিলেন তিনিও নেই। ঘর-বাড়ি জমিজমা সমস্ত গেছে। বাচ্চা কোথায় রেখে আসব বলুন, ঘাড়ে নিয়ে নিয়ে ঘুরছি।

কোর্টের সাজপোশাক করছিল অমিতাভ। তৈরি হয়ে গেছে। কথা বলার ফুরসৎ নেই। বলে, খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন এবার. ফিরে এসে সব শুনব। দেখি, সকাল সকাল যদি ফিরতে পারি—

ছুটল সে খাবার ঘরে। চপাস করে পিঁড়ি পড়ল, তা-ও শিশিরের কানে আসে। শিশির ভাগাই চাকরে লোক ছুটোছুটি করে সব বেরিয়ে পড়ছে, মেস শূন্য হয়ে যায়। স্নান সেরে শিশিরও মেয়ের পাশে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে।

ডিমের স্পেশাল বানিয়ে ঠাকুর এসে ডাকল। কুমকুমকে তুলে নিল শিশির. তাকেও কিছু ভাত গেলানো যাক, পেট পরিপূর্ণ থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমুবে সারাক্ষণ। সর্বনাশ করে রেখেছে যে হতভাগা মেয়ে, বিছানা নষ্ট করে দিয়েছে। কান্না ছাড়াও এই এক শয়তানি। প্রাণপণে ঘুম পাড়িয়ে কান্না বন্ধ করলেন তো ঘুমের মধ্যে এই কর্মটি করে বসবে ঠিক। মেয়ে-জাতের পায়ে শতকোটি প্রণাম. এত ঝামেলা কাটিয়ে হাজারলক্ষ বাচ্চা যাঁরা বড় করে তোলেন। কী লজ্জা, কী লজ্জা। সংকীর্ণ ঘরে সরু এক তক্তাপোষের উপর তোষক ও

চাদরের বিছানা—সারাদিন খেটেখুটে এসে রাত্রে এর উপর ঘুমোবে কেমন করে অমিতাভ?

রক্ষা এই, মেস নির্জন—মেম্বাররা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। শিশির তোষক টেনে রোদ্রে দিল। সকলকে খাইয়ে দিয়ে ঠাকুর-চাকর রান্নাঘরে নিজেদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আছে—ফাঁক বুঝে চাদরটা নিয়ে কলতলায় ধুতে বসে গেল।

তবু হল না—চাকরটা কোন দরকারে বেরিয়ে দেখে ফেলল : ও কি হচ্ছে বাবু? নিজের কাপড়ই ভিজিয়ে ফেলছেন, আপনারা কি পারেন এসব? রেখে দিন—খেয়ে উঠে আমি ধুয়ে দেবো।

শিশির সলজ্জে স্বীকার করে নেয় : সত্যি আমি পারিনে। এসব কাজে বড্ড আনাড়ি। জল-কাচা করে গন্ধ বোধহয় যাবে না, সাবান দিতে হবে। মেয়েলোকের কত ক্ষমতা বুঝতে পারি এবার, দুটো দিনেই আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছি।

একটা টাকা চাকরের হাতে দিল। সাবানের দাম ও কাজের বকশিস। পুরো টাকার বাজে খরচা। এমনি আরও কত হবে ঠিকঠিকানা নেই। একটা বাচ্চার খরচা যা, একটা হাতি পোষার খরচাও বোধহয় তাই।

বলেও সেই কথা : দু' দশদিন বোধহয় থাকতে হবে আমাদের। তোমায় আরও খাটাব। মেয়েটা ভারি ওস্তাদ—কী বলব তোমায়—জায়গা বুঝে সময় বুঝে টুক করে কাজ সেরে রাখে। সময় সময় সন্দেহ হয়, এ হল বজ্জাতি—আমায় জব্দ করার জন্য।

অমিতাভ এসে পড়ল। চারটে বেজে গেছে। বলে এর আগে ফাঁক পেলাম না। বলি অসুবিধে হয়নি তো? হবে না, আমি জানতাম। ঠাকুর অনেকদিনের পুরানো, ভালো মানুষ। চাকরটাও ভালো। মাঝে মাঝে বখশিস দিই, খুব খাতির করে আমায়।

নিজের কথা শিশির সবিস্তারে বলল। বলে, পাকাপাকি চলে এলাম।

এসে পড়েছেন, কী আর বলি। সুখ কোনদিকে নেই। এ হল বারো-উপোসির তেরো-উপোসি বাড়ি আসা। অর্থাৎ একজনে বারোদিন না খেয়ে একবাড়িতে অতিথ হল, তাদের ভাত জোটেনি তেরোদিন। সেখানে তবু ঘরবাড়ি জমিজমা বাগান-পুকুর ছিল, যাহোক একটু চাকরিও করছিলেন—

শিশির বলে, চাকরি এখানেও হবে। কথা পেয়েছি একরকম।

পেয়ে যান ভালোই—

একটু থেমে তিক্তকণ্ঠে অমিতাভ বলতে লাগল, বলবেন না এদের কথা। এক কড়ার মুরোদ নেই লাটবেলাট হয়ে দেশ-শাসনে নেমেছে। ওদের কথার দাম আছে নাকি? মফস্বলের মানুষ, তাই জানেন না। ধাপ্পাবাজ মিথ্যেবাদী যত সব—

দাম-কাকা আমার কাছে ধাপ্পা দেবেন বলে মনে হয় না। কী জানি!

এইবারে আসল কথা : মামা-মামির ভরসা করে এসে পড়েছি—তাঁরা নিজেরাই কোথা ছিটকে গেলেন, ঠিকঠিকানা নেই। বাচ্চা নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট, বাচ্চা না থাকলে আমি তো মুক্তপুরুষ। কোলে কাঁধে বাচ্চা বয়ে কাঁহাতক পথে পথে ঘোরা যায়। জায়গা দেখে নিতে কিছু সময় লাগবে—তাই বলছিলাম, আপনার মেসে সেই ক'টা দিন যদি সম্ভব হয়। বেশি নয়, দশ পনেরোটা দিন—খরচ-খরচার জন্যে আপাতত আটকাচ্ছে না—

বলে যাচ্ছে শিশির, অমিতাভ ঘাড় নেড়ে কেটে দিল : ঝঞ্ঝাট তো বাচ্চা নিয়েই। মেস জায়গা—এখন চুপচাপ আছে, সন্ধ্যের পর কী হৈ-হল্লা দেখতে পাবেন। পাশা পড়ে আমারই এই তক্তাপোষের উপরে—দুরন্ত আড্ডা। বাচ্চার বন্দোবস্ত করে একা চলে আসুন না, যা হোক করে নিয়ে নেবো। এই সরু ঘরে দুটো তক্তাপোষ পড়বে না—তা আমার তক্তাপোষ ছাতে তুলে দিয়ে মেজেয় বিছানা পেতে দুজনে শুতে পারব। বাচ্চার তো সেভাবে চলবে না।

কবিত্ব করে প্রত্যাখ্যানটা কিছু মোলায়েম করে দিচ্ছে : নন্দনের কুসুম ওরা—বিধাতাপুরুষ হালফিল মর্ত্যে পাঠিয়েছেন, গায়ে এখনো স্বর্গের ছোঁয়াচ আছে। আমাদের মতন করে ওদের চলে না—তোয়াজে রাখতে হয়।

শিশির বলে, কুসুম-টুসুম অন্যের বেলা—সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গিনী কোলে বয়ে ঘুরছি। গর্ভ থেকে পড়ে গর্ভধারিণীকে শেষ করল। সে কেন যে ছেড়ে গেল—সাথী করে নিয়ে গেলেই আপদ চুকত। আমার মা লক্ষ্মী-জনার্দন হেলা করে নাতনি নিয়ে রইলেন—রাতদুপুরে সুস্থ সমর্থ মানুষটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, দিল অন্ধকারে ছোবল মেরে। মামীমা দুধাল গরু কিনে চালে দোলনা ঝুলিয়ে আদর করে ডাকলেন—তা এ-মেয়ের আগে আগে পুড়ে জ্বলে সব ছাই হয়ে যায়—

থামিয়ে দিল অমিতাভ : ছিঃ, এ-সমস্ত কি বলেন! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে দেখা যাক—উপায় কি একটা বেরুবে না? এত বেশি উতলা হচ্ছেন কেন?

চাকরে চা নিয়ে এলো, চা খেতে খেতে পরামর্শ হচ্ছে। হোটেলে গিয়ে ওঠা যায়—কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে কই? এখানে তবু চেনা-জানার মধ্যে। হোটেল হলে সর্বক্ষণ মেয়ে আগলে থাকতে হবে, চাকরির জন্যে হোক বা জায়গার সন্ধানে হোক, মেয়ে ছেড়ে এক-পা বাইরে যাওয়া চলবে না—

কুমকুম পিটপিট করে তাকাচ্ছে নতুন মানুষ অমিতাভর দিকে। প্রায়-অলক্ষ্য ক্ষীণ হাসি ঠোঁটে মাখানো। মন-কাড়ানো খাসা হাসিটুকু কিন্তু। ঘরগৃহস্থালী ছেলেমেয়ের ধার ধারে না অমিতাভ—মেসের বন্ধনহীন জীবন। মনটা তবু কি রকম হল—কোলে নিয়ে নিল কুমকুমকে।

বলে, এক্ষুনি যে যেতে হচ্ছে তা নয়। আড্ডার অসুবিধে ঠিকই, তা বলে মানুষের দায়-বেদায় দেখব না, এমন তো হতে পারে না। পাশা না হয় লাটুবাবুর ঘরেই পড়বে। তিনি রাজি না হলে বন্ধ। তবে মেস-জায়গায় বাচ্চার থাকা চলে না, আপনিই সেটা একদিন দুদিনে বুঝবেন, আমায় কিছু বলে দিতে হবে না।

কুমকুমকে কোলে নিয়েই অমিতাভ উঠল। বাইরে গিয়ে হাঁকডাক করে ঠাকুর-চাকরকে এনে সকলে ধরাধরি করে তক্তাপোষটা বের করে দিল ঘর থেকে। মেজেয় ঢালাও বিছানায় আজ তিনজন—অমিতাভ, শিশির, আর মাঝখানে কুমকুম।

শিশির বলে, মাঝখানে কেন? মেয়ের গুণের ঘাট নেই—রাতদুপুরে ধারাস্নান করিয়ে দেবে কিন্তু।

অমিতাভ হেসে বলে, বেশ তো, বেশ তো। যা হবার দু'জনার একসঙ্গে হবে। ঘাবড়ান কেন, ঘুমুলে আমি মরে থাকি। স্নান তো ছার, বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও আমার হুঁশ হবে না।

শয়তান মেয়ে হাড়বজ্জাত মেয়ে, বোঝা গেল, অমিতাভকেও খানিকটা মায়া করে ফেলেছে। হলে হবে কি—মেসশুদ্ধ মানুষ বিরূপ। বাচ্চা নিয়ে মেসে এসে উঠল—এমন কথা কে কবে শুনেছে? বলি আমাদের বাড়িতে বাচ্চা নেই? দেখা যাক। এই শনিবারে যে-যার বাড়ি গিয়ে একটা-দুটো বাচ্চা ঘাড়ে করে ফিরব। বালখিল্যের মেস হয়ে যাক। ট্যাঁ-ভ্যা দিবারাত্রি, কলতলায় ভিজে-কাঁথার ডাঁই, দুধ খাওয়ানো, কপালে টিপ পরানো, হাঁটি-হাঁটি পা পা হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ানো ছাতের উপর। অমিতাভবাবু পারবেন আমাদের সঙ্গে? অবিবাহিত মানুষ—চেয়েচিন্তে বন্ধুবান্ধব ধরে ওঁকে বাচ্চা জোগাড় করতে হবে। আমাদের এক এক বাড়িতে এক ডজন দেড় ডজন করে মজুত।

মোটের উপর বেশি দিন এখানে নয়। হাসিমস্করা ছেড়ে এর পরে উগ্র বচন ছাড়বে। দামসাহেবের অফিসে নিত্য দিন যাচ্ছে। দুপুরবেলাটা—কুমকুম তখন ঘুমোয়, জেগে পড়লে ঠাকুর-চাকর দেখাশুনো করে। যত্নআত্তি করে, বখশিসের লোভে খুশি হয়েই করে তারা। চাকরি জোটানো সহজ নয়, যে না সে-ই বলে। দামসাহেবও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন তাই। তাঁর যে কোনরকম কারচুপি আছে, মরে গেলেও বিশ্বাস করিনে। এত প্রতিপত্তি থেকেও হালে পানি পাচ্ছেন না,—শিশিরের মুখোমুখি হতে লজ্জা পান হয়তো। বলেন, ঘন ঘন আসার কি দরকার? না এলে ভুলে বসে থাকব, তাই ভেবেছ? কত চেষ্টা করছি, দেখতে পাচ্ছ। তা-ও বলি, আজ হোক আর দুদিন পরে হোক, দেবোই একটা কিছু জোগাড় করে। ব্যস্ত হয়ো না।

শিশির কণ্ঠস্বর কান্নার মতো করে বলে, সে তো জানি কাকা। পদতলে এসে পড়েছি, নিষ্ফলে ফিরব না। কিন্তু আমার এদিকে অদাভক্ষ্য ধনুর্গুণ—যা-কিছু আজকেই, দুদিন পরে আর দরকার থাকবে না। যে-পথে মা গেছেন, আপনার বউমা গেছে, আমাকেও সেই পথে যেতে হবে। বাচ্চা মেয়েটাও যাবে। সামান্য পরিচয়ের এক ভদ্রলোককে ধরে মেসে এসে উঠেছি—তা কি বলব কাকা, মেম্বারগুলো এই মারে তো সেই মারে—

আবদারের সুরে বলে, নয়তো বলে দিন, মেয়ে নিয়ে সমস্যা—আপনার বাড়ি ফেলে আসি, ওটাকে। তখন আমি ফুটপাথের উপরেও পড়ে থাকতে পারব। যদ্দিনে খুশি

চাকরি দেবেন। হপ্তায় একবার গিয়ে দেখে আসব শুধু মেয়েটাকে।

দামসাহেবের অফিসে যায় শিশির। আর হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে। বিস্তর উদ্বাস্তুর ঘরবসত ঐ দুটো স্টেশনে—খানিক খানিক জায়গা দখল করে পুত্রকলত্র নিয়ে সংসারধর্ম করে। ট্যাং-ট্যাং করে শিশির তাদের মধ্যে চলে যায়, মামার সাঙ্গোপাঙ্গ কারো যদি দেখা মেলে দৈবাৎ, মামার ঠিকানা যদি পাওয়া যায়। প্রবল বৃটিশরাজের সঙ্গে সমানে লড়াই (সহিংস লড়াই, যার ফলে মামার ডান হাতের তিনটে আঙুল উড়ে গেছে, এবং সেই তিন আঙুলের বদলা পুরো একটা শ্বেত মানুষই নিয়েছিলেন শোনা যায়) চালিয়ে এসে স্বদেশী সরকারের আমলে নিঃস্ব নিরন্ন নিরাশ্রয় হয়ে সেই মানুষকে পথে উঠতে হল। কিন্তু পরাজয় মেনে নেবার মানুষ নন—অবিনাশ মজুমদারকে যারা জানে, সবাই এক বাক্যে বলবে কখনো হারেন নি, হারবেন না। আবার কোথায় কোনো নি গড়ছেন তিনি কত কত নতুন উদ্যোগে মেতে গেছেন!

কিন্তু এভাবে কতদিন আর চলবে। আশার আলো কোনদিকে দেখছে না শিশির। মেসের মেম্বাররা সত্যি সত্যি মারমুখি হয়ে উঠছে। সন্ধ্যার জমজমাট আড্ডা বন্ধ। জমিয়ে বসবার ঘর পাওয়া যায় না—তার চেয়ে বড় কথা, আড্ডার মুরুব্বি অমিতাভকে পাওয়া যায় না একেবারে। মেয়ে নিয়ে শিশিরের সঙ্গে দেয়ালা করে ঐ সময়টা। ধমকধামক আপাতত ঠাকুর-চাকরের উপর পড়ছে: ড্রাইং-ক্লিনিং-এর কাপড় আসেনি—সময় কোথা হুজুরদের? দু-চার পয়সা বখশিস মিলছে, তবে আর কি, মেসের কাজকর্ম চুলোয় যাক—ভাত ধরে যাচ্ছে, ডাল সিদ্ধ হয় না। ভেবেছ কি তোমরা শুনি?

দুপুরে খাওয়ার সময় শিশির নিরিবিলি ঠাকুরকে বলে, কী করা যায়—উপায় বাতলাও দিকি।

ঠাকুর বলে, নির্বংশ বড়লোকে অনেক সময় ছেলেপুলে খোঁজে—

সাগ্রহে শিশির প্রশ্ন করে: খোঁজে আছে তোমার এমন কেউ?

নেই এখন, খুঁজে দেখতে পারি—

একগাল হেসে বলে, যেটা লভ্য হবে, সিকি কিন্তু আমার। মোটা কমিশন ছাড়া পারব না—

হাসি দেখে মনে হয়, নির্বংশ বড়লোক সত্যি সত্যি আছে তার জানার মধ্যে। রাগে শিশিরের ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে ওঠে। সন্তান বিক্রি করবে ভেবেছে ঠাকুর—অদৃষ্টে এতখানিও ছিল! কিন্তু শহরে নতুন এসে তিলমাত্র মেজাজ দেখানো চলবে না।

ছিঃ-ছিঃ, মেয়ে বিক্রি কেন করব! কোন ভাল জায়গায় মেয়েটা রাখতে পারি—সেই ব্যবস্থা করে দাও। সাধ্যমতো আমি খরচা দিতে রাজি আছি। এখন অল্পস্বল্প দেবো, চাকরি হলে তখন ভালরকম দিতে পারব। খুঁজেপেতে দাও তুমি, তোমাকেও খুশি করব।

আড়োমোড়া কথায় ঠাকুরের উৎসাহ মিইয়ে গেছে। উদাসভাবে বলে, আশ্রম-টাশ্রম

আছে শুনেছি, তারা এইরকম রাখে। দেখি খোঁজখবর করে, আপনিও করুন। খুঁজতে খুঁজতে কি আর বেরুবে না?

দিন দুয়েক পরে শিশির তাগিদ দেয়ঃ মনে আছে আমার কথা?

ঠাকুর উদাস কণ্ঠে বলে, কতজনকে বললাম, রাজি হয় না। বলে, মাগ্গিগণ্ডার বাজার, ভগবান যেগুলো দিয়েছেন, তাই পুষতে আক্কেলগুড়ুম, বাইরের মাল কোন্ সাহসে এনে চাপান দিই!

খরচখরচা আমিই তো দেবো—

একমাস-দুমাস দিয়ে তারপরে যদি সরে পড়েন। সেই সন্দেহ করে। মেয়ে তো রাস্তায় ছুঁড়ে দিতে পারবে না তখন: কাঁচা কথায় কেউ রাজি হয় না।

একটু থেমে ঢোক গিলে বলে, একজনে রাজি আছে। কিন্তু সর্ত দিয়েছে—

আশান্বিত হয়ে শিশির বলে, কি সর্ত শুনি?

অন্তত তিনটে বছরের খরচা অগ্রিম দিতে হবে। মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে।

মানুষটা কে, আন্দাজ হচ্ছে। মোটা টাকা হাতে নিয়ে রসুই ছেড়ে ঠাকুর নিজেই বোধহয় লেগে পড়বে। শিশির ঘাড় নেড়ে বলে, না বাপু, অত রেস্ত নেই, পেরে উঠব না।

মেয়ের কাছে শিশির বলে, একটা কথা বলি তোকে কুমকুম—

মেয়ে গড়িয়ে এসে কোলের উপর চড়ে বসে। চোখ বড় বড় করে অপরূপ ভঙ্গিতে তাকিয়েছে।

তুই মরে যা, আমি বাঁচি—

নান্ না—

তবে আমিই মরি। মরে বেঁচে যাই—

নান্ না, নান্ না—

তবে কি হবে? দুজনে একসঙ্গে মরি।

কোনটাই কুমকুমের পছন্দ নয়। এদিক ওদিক ঘাড় দুলিয়ে পরম আহ্লাদে বলে যাচ্ছে, নান্ না, নান্ না। নান্ না, নান্ না—

আক্রমণটা অতঃপর স্পষ্টাস্পষ্টি। মেম্বাররা হুঙ্কার ছাড়লেন: বলি, চাকরি করো তোমরা মেসের, না, শিশিরবাবুর? সকলের অসুবিধে ঘটিয়ে এমনধারা উপরি রোজগার চলবে না। যার মেয়ে তিনিই সম্পূর্ণ দেখাশুনো করবেন, তোমরা ধারে-কাছে যাবে না। আর নয়তো কেটে পড়ো, নতুন লোক দেখি আমরা।

অমিতাভ মুখ শুকনো করে বলে, দেখছেন অবস্থা। আর চলে না। ম্যানেজার আমায় ধরে ডেকে আলাদা করে বলে দিল। হোস্টেল ছাড়া তো উপায় দেখছি নে। শিয়ালদার কাছে রয়্যাল বেঙ্গল হোটেল— ম্যানেজারের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা আমার। বলেন তো চিঠি লিখে দিই, সস্তার মধ্যে যা-হোক ব্যবস্থা করে দেবে—

বলতে বলতে অমিতাভ ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবে একটুখানি। বলে, অখিলবাবুর ওখানে গিয়ে দেখবেন নাকি? হাতিবাঁধার অখিল ভদ্র—ঘর ভাড়া দেবেন শুনেছিলাম। তাঁর কাছেও চিঠি দিতে পারি। দেখুন ভেবে। সুবিধা না হলে অগতির গতি হোটেল তো আছেই—ওখান থেকেই শিয়ালদার ট্রেনে চেপে পড়বেন। দু জায়গাতেই দুটো চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।

গিয়ে দেখতে ক্ষতি কি? ডুবন্ত মানুষের তৃণখণ্ড ধরতে যাওয়ার মতো। অমিতাভর আশ্রয়ে লভ্য তবু হল অনেক— কাঁধের বোঝা নামিয়ে দিব্যি কয়েকটা দিন জিরিয়ে নেওয়া গেল। বোঝা তুলে নিয়ে নতুন উদ্যমে নেমে পড়ো আবার পথে—ঘর খালি করে দাও, ওদের পাশার আড্ডা জমবে আজকের এই সন্ধ্যা থেকেই।

অখিল ভদ্র তিনটে পাকা কুঠুরি তুলেছেন হাতিবাঁধা গ্রামে। গ্রাম বলা ঠিক হল না—পুরোপুরি না হলেও আধা-শহর। আগে পোড়ো-মাঠ ধু-ধু করত গরু-ছাগল চরে বেড়াত, এখানে ওখানে দু-চার ঘর গোয়ালার বসতি। কলকাতার দুধ-ছানার যোগান হত এই অঞ্চল থেকে। এখন সেই-সব জায়গাজমির কাঠার মাপে বিক্রি, দর শুনে পিলে চমকে যায়। জমি পড়েও নেই এক ছটাক। বিক্রি হয়ে গিয়ে টপাটপ ঘরবাড়ি উঠছে।

অখিল ভদ্র পৈতৃক সূত্রে বিঘেখানেক জমি পেয়েছিলেন—তার মধ্যে দু-কাঠা রেখে বাকিটা ছেড়ে দিয়েছেন। সেই টাকায় আপাতত তিনটে কুঠুরি উঠেছে, ভবিষ্যতে আরও উঠবে সেই আশা। তিনের মধ্যে একটি ভাড়া দেবেন তিনি। অমিতাভকে একটি সাধুসজ্জন ভাড়াটে দেখতে বলেছেন। শিশির সেই ঘর ভাড়া নিতে পারে। অখিলের বউ নিঃসন্তান—সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে অবরে-সবরে বউয়ের কাছে মেয়ে রেখে বেরুনোও হয়তো অসম্ভব হবে না। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত কথা অবশ্য। এবং জিনিসটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে শিশিরের চালচলতির উপর।

যুক্তি মন্দ নয়, চেষ্টা করে দেখা নিশ্চয় উচিত। অতএব মেয়ে ঘাড়ে তুলল আবার —দরে না বনলে ব্যাপারি যেমন গুড়ের কলসী ঝাঁকি মেরে তুলে নেয়। চলল কোথায়? সেই হাতিবাঁধা। অমিতাভ খুব ভাল করে জায়গাটা বাতলে দিয়েছে—মামা অবিনাশ মজুমদার চিঠিতে যেমন নারকীরপাড়া কলোনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

চৌমাথায় বিস্তর হাটুরে চালা—সেইখানে নেমে বাঁয়ের রাস্তা। হাতিবাঁধা মাইল-খানেক পথ সেখান থেকে—হাঙ্গামা নেই, অঢেল সাইকেল-রিক্সা হা-পিত্যেশ করে আছে, চড়ে বসলেই হল। শ্যামবাজার থেকে ঘণ্টা-দুয়েকের পথ — চৌমাথা চিনতে অসুবিধে হয় তো বাস-ড্রাইভারকে বলে রেখো, ঠিক জায়গায় সে নামিয়ে দেবে।

ইত্যাদি বলে দিয়েছে অমিতাভ। কিন্তু পথ অতি যাচ্ছেতাই—বাস ঠিকিয়ে ঠিকিয়ে যাচ্ছে, তার উপর প্যাসেঞ্জারের অবিরত ওঠানামা। সেই চৌমাথা পেতে দুঘণ্টার স্থলে পাক্কা চার ঘণ্টা।

নেমে পড়ে শিশির 'রিক্সা' 'রিক্সা' করে হাঁক পাড়ছে।

হাটুরে চালা থেকে বেরিয়ে এসে একজনে রসিকতা করেঃ রিক্সা কেন, ট্যাক্সি ডাকুন না। কিম্বা এরোপ্লেন। যাবেন কোথা মশায়?

হাতিবাঁধা—

পথ দেখিয়ে দিয়ে লোকটা বলে, রিক্সা আসে কোন বিয়েথাওয়ার ব্যাপার ঘটলে। আর ইলেকসনের বছরে। জীপও আসে। এখন গরুর গাড়ি—খুব বেশি তো মোষের গাড়ি। তার চেয়ে পায়ে হেঁটে চলে যান। হুমহাম করে সাড়া দিতে দিতে যাবেন কিন্তু, সাপের চলাচল আছে।

মালকোঁচা সেঁটে কুমকুমকে কোলে জাপটে নিল অতএব। চলেছে। কোল খালি লাগে তো কাঁধের উপর। কাঁধ এবং পাঞ্জাবীর কাঁধের অংশটা ভিজে ধারা গড়িয়ে পড়ে। নামিয়ে আবার কোলে নিয়ে নিল। হুমহাম করতে বলে দিয়েছে, কিছুমাত্র তার প্রয়োজন নেই। মেয়েকে গালি-গালাজ করতে করতে যাচ্ছে—সেই শব্দ সাপ তাড়ানোর পক্ষে প্রচুর।

হাঁটতে হাঁটতে মিলল অবশেষে হাতি-বাঁধা এবং অখিল ভদ্রের কুঠুরিত্রয়। গ্রহ নিতান্তই বিরূপ, ভদ্রমশায় বাড়ি নেই।

দাসী গোছের একজন বেরিয়ে এসে বলে, কি দরকার?

ঘরভাড়া দেবেন, শুনলাম।

দাসী ছুটে গিয়ে মাদুর এনে রোয়াকে বিছিয়ে দিলঃ বসুন। কলকাতা গেছেন, এসে যাবেন এই ন'টার গাড়িতে। গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছেন না?

বাড়ি তিন কুঠুরির, কিন্তু অন্দর জেলখানার ঢঙে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের অন্তরালে জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। মাদুর পেতে দিয়ে দাসীও সেখানে অন্তর্হিত হল।

আছে বসে শিশির। কোলের মেয়ে মাদুরে শোয়াতে পেরেছে, এই মহাভাগ্য। ঘুমিয়ে গেছে কুমকুম, বাঁচা গেছে। ট্রেনের আওয়াজ তখনই নাকি শোনা যাচ্ছিল—ভদ্রমশায় দর্শন দিচ্ছেন না, স্টেশন কতদূর তবে?

শিশিরেরও ঝিমুনি ধরেছে। এতক্ষণে এসে গেলেন যেন—টর্চের আলো গায়ে পড়ল। অখিল হাঁক দিয়ে উঠলেনঃ কে এখানে?

আপনার কাছে এসেছি, অমিতাভবাবু চিঠি দিয়েছেন একটা।

কোন্ অমিতাভ? ও, হ্যাঁ—

চিঠি নিয়ে টর্চের আলোয় পড়ে বললেন, ভাড়া আপনি নেবেন?

মাদুরের প্রান্তে অখিল ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। কুমকুমকে দেখিয়ে বলেন, খাসা মেয়ে। মেয়ে খুব ন্যাওটা বুঝি, কাছ ছাড়ে না? আমারও ছিল, চলে গেছে। ঘর শূন্য। স্ত্রীর চোখের জল শুকোয় না।

অন্তরালবর্তিনী সেই কন্যাবিয়োগ-বিধুরাকে স্মরণ করে মনে মনে শিশিরের পুলক সঞ্চার হল।

(ক্রমশঃ)

দিল্লীতে প্রেসিডেন্ট নাসের, প্রেসিডেন্ট টিটো এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

দেশে বিদেশে

আশু কর্তব্যের আহ্বান

দিল্লীতে যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের নাসের ও ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ২১ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত যে বৈঠক হয়ে গেল, সে সম্পর্কে একটা কথা গোড়াতেই পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার : এটা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন নয়। তিনটি দেশই যদিও গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ এবং যোগদানকারী তিনজন নেতাই যদিও তাঁদের দেশের শীর্ষস্থানীয়, তবু একে তিনটি সহমর্মী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের ঘরোয়া আলোচনা বলাই অধিকতর সঙ্গত : একত্র মিলিত হয়ে বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নিজেদের পুরনো বিশ্বাসকেই নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন মাত্র। এমনিভাবে এই তিনটি দেশের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা এর আগে আরও দু'বার হয়েছিল : ১৯৫৬ সালে ব্রিয়োনিতে এবং ১৯৬১ সালে কায়রোয়।

এ কথাটি যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে দিল্লী বৈঠক সম্পর্কে কোন কোন সমালোচনা নিরর্থক মনে হবে। প্রধানত দু' রকম মন্তব্য এই বৈঠক সম্পর্কে করা হয়েছে : এক, আলোচনায় নতুন কিছু নেই, এবং দুই, এটি ব্যর্থতার সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই সমালোচকরা ভুলে যান যে, কোন বাস্তব কিছু অর্জনের জন্য নেতৃত্রয় দিল্লীতে মিলিত হন নি। সুতরাং ব্যর্থতার প্রশ্ন এখনই উঠছে না। আর নতুনত্ব? গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার আদর্শ পুরনো হতে পারে, কিন্তু নতুনত্বও একেবারে ছিল না তা নয়। কেননা নেতৃবৃন্দ ঐ পুরনো বিশ্বাসকেই নতুন করে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন, এই জন্যে যে আজকে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির সামনে এক নতুন বিপদ দেখা দিতে চলেছে, যে-বিপদ সামরিক জোটের চাইতেও মারাত্মক, যে-বিপদ গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির স্বাধীনতাকে পর্যন্ত বিপন্ন করতে পারে। ব্যর্থতার সাধনা নয়, এই নতুন বিপদের মুখে পুরনো বিশ্বাসে আরো অটুট হবার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা দিল্লীতে মিলিত হয়েছিলেন।

এই প্রয়োজনীয়তা ঘোষণার দরকার ছিল। এটা যোগাযোগ না হতে পারে, কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, দিল্লীর বৈঠক যে-দিন শেষ হয়, সেই দিনই ম্যানিলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ভিয়েৎনামের লড়াইয়ে তাঁর সহযোগী ছ'টি এশীয় রাষ্ট্রের প্রধানদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ছ'টি রাষ্ট্রই ভিয়েৎনামে সৈন্য পাঠিয়েছে এবং জনসনের তালে তাল দিয়ে ভিয়েৎকং ও উত্তর ভিয়েৎনামকে একেবারে ঠাণ্ডা করে 'শান্তি' আনবার দৃঢ়তম সংকল্প ব্যক্ত করেছে। ঐ বৈঠক এবং ঐ আলোচনার ধারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে, ঐ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্র কতখানি সংকুচিত। এদের অসহায়তা আগে আর কখনও এতখানি নগ্নভাবে হয়ত ধরা পড়ে নি। ম্যানিলা বৈঠকের সময় উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখার প্রস্তাব করে রাতারাতি ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট মার্কোসকে যেভাবে তাঁর মত বদলাতে হয়েছিল, আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। এই আবদ্ধতা শুধু 'সীটো'র (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা) বন্ধন থেকেই আসে নি, এই অসহায়তা অর্থনৈতিক প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল। বাইরের অর্থনৈতিক নাগপাশে এই দেশগুলি এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, আজ আর তাদের নিরপেক্ষ হবার কোন সুযোগই নেই। তেমন প্রবণতা দেখা দিলে বাইরে থেকে এমন চাপ আসবে যে, তারা রাতারাতি দেউলে হয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

এইটাই ম্যানিলা বৈঠকের শিক্ষা। আজো যে সব ছোট-বড় দেশ নিজেদের বিবেক ও বুদ্ধি অনুযায়ী নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করছে, তাদের এই শিক্ষা দেবার জন্যেই কি দিল্লী আলোচনার ঠিক গায়ে-গায়ে ম্যানিলা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল? হয়ত সে রকম কোন উদ্দেশ্য উদ্যোক্তাদের ছিল না, কিন্তু তাহলেও ম্যানিলা বৈঠকের এই শিক্ষা সম্পর্কে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দুনিয়া চুপ করে থাকতে পারে না। কেননা এই দুনিয়া এখনও দরিদ্র, এখনও অনগ্রসর। এই দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা দূর করবার জন্যে বাধ্য হয়েই আমাদের উন্নত ও অগ্রসর দেশগুলির সাহায্য নিতে হচ্ছে। এইভাবে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলি ক্রমশ একটা দুর্বল জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে যেখানে তাদের বাইরের চাপ রোধ করার ক্ষমতা ক্রমশ বেশি মাত্রায় সংকুচিত হয়ে পড়তে বাধ্য। এবং ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যেভাবে কঠিন হচ্ছে, তাতে এই চাপ যে প্রবল থেকে প্রবলতর হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই। ইতিমধ্যেই সেটা আমাদের কিছু কিছু মালুম হচ্ছে।

দিল্লী বৈঠকে তাই সঙ্গতভাবেই এই নতুন বিপদের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়েছিল। এ বিষয়ে বৈঠকের যুক্ত বিবৃতিতে কোন-রকম অস্পষ্টতা নেই। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে অনগ্রসর দেশগুলির লড়াইয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও নব্য-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-বর্গের বিরোধিতাই উত্তেজনা জীইয়ে রেখেছে।

বিবৃতির এই অংশটুকু উল্লেখযোগ্য : "দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বৃহত্তম বাধা হল বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুলতা। উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের মাত্র এক শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলির সাহায্যে ব্যয় করার যে বিনীত লক্ষ্য রাষ্ট্রসংঘ ধার্য করে-ছিল, তা পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, সাহায্যের জন্যে যে-সব শর্ত আরোপ করা হয় তা দুর্বলতর অর্থনীতির ওপর নতুন বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

"প্রাথমিক দ্রব্যাদির মূল্য সম্পর্কে সমৃদ্ধ দেশগুলি যে নীতি অনুসরণ করছে এবং নির্মিত দ্রব্যাদির আমদানী নীতির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সর্ত দিতে তাদের যে রকম আপত্তি দেখা যাচ্ছে, তাতে উন্নয়ন-শীল দেশগুলির পক্ষে তাদের বৈদেশিক আয় বাড়ান মুস্কিল হয়ে পড়েছে।"

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এইভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্যই হল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার। এই বিপদ সম্পর্কে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির কি করা উচিত?

এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নাসেরের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। ২৪ অক্টোবর এক যুক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলি যেন সাহায্যকারী দেশগুলির কোন চাপের কাছেই নতি স্বীকার না করে। "সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে আমরা সবরকম চাপকেই অস্বীকার করছি।" এইভাবে, তিনি বলেন, যদি অন্য সকলেই চাপকে অস্বীকার করে চলে, তাহলে উন্নত দেশগুলির পক্ষে চাপ সৃষ্টি করার কোন সুযোগ থাকবে না।

কিন্তু তার আগে উন্নয়নশীল দেশ-গুলিকে বৈদেশিক চাপ উপেক্ষা করার মত নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করতে হবে। "উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যদি তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়," বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "তাহলে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে দ্রুততর করতে হবে।" আর সেই জন্যে চাই নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের আরও বিস্তার। নেতৃত্রয় মনে করেন, দ্রুত অর্থ-নৈতিক বিকাশের যে-চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে, তার মোকাবিলা করতে হলে ব্যষ্টিগত প্রয়াসকে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যে নতুন ব্যবস্থা কিছু নিতেই হবে। তাঁরা নিজেরা এসম্পর্কে বাস্তব পন্থা গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আশা করেছেন "প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশই পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে, নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি করে, নিজেদের কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক কল্যাণমূলক বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রবর্তনে যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়ে এই প্রয়াসে সহায়তা করবে।"

এটা কি ব্যর্থতার সাধনা, না একটা আশু কর্তব্যের আহ্বান? আগামী বছর শরৎকালে ৭৭টি আফ্রো-এশীয় দেশ তাদের দ্বিতীয় সম্মেলনে মিলিত হবে। তার পরি-প্রেক্ষিতে দিল্লীর আলোচনা কি যথেষ্ট গঠনমূলক নয়?

বৈষয়িক প্রসঙ্গ — তিক্ত শর্করা

পৃথিবীর বাজারে চিনির দর সাংঘাতিক-ভাবে পড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক খোলা বাজারে এখন চিনির দাম প্রতি মেট্রিক টন ১৫ পাউণ্ড স্টার্লিং অর্থাৎ ৩১৫ টাকা। কিলোপ্রতি দর দাঁড়াল ৩১.৫ পয়সা। কলকাতায় আমরা রেশনে যে চিনি পাই তার জন্য আমাদের দাম দিতে হয় কিলো প্রতি অন্তত ১ টাকা ৩২ পয়সা। আন্তর্জাতিক বাজারদরের চার গুণেরও বেশী।

আন্তর্জাতিক দর ও দেশীয় দরের মধ্যে এই বিপুল পার্থক্যের কারণ কি? একটি কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষে চিনির উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী। ১৯৬৫ সালে সেন কমিশন ভারতবর্ষের চিনি শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতবর্ষে প্রতি মেট্রিক টন চিনি তৈরী করতে শুধু আখের দামই পড়ে অঞ্চলভেদে ৪০৩.৭০ টাকা থেকে ৬৬৮.২০ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ পৃথিবীর বাজারে যে দাম পাওয়া যায় তাতে ভারতীয় চিনি বিক্রির [illegible] কথা, আখের দামের [illegible] তোলা কঠিন হয়।

তবুও ভারতবর্ষ গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বাজারে চিনি বিক্রয় করছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০ সাল থেকে প্রতি বছর এই দেশে উৎপন্ন চিনির এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশী বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত যে-ভাবে [illegible]

প্রতি বৎসর এক লাখ মেট্রিক টন বা তারও বেশী চিনি আমদানী করেছি সে-জায়গায় আমদানী তো সম্পূর্ণ বন্ধই হয়ে গেছে, অধিকন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে আমরা বার্ষিক আড়াই লাখ থেকে চার লাখ মেট্রিক টনের মত চিনি বিদেশে রপ্তানী করছি। এবং বৎসরে ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করছি।

দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন করার উদ্দেশ্যে এই রপ্তানীতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। চিনির আন্তর্জ্জাতিক দর ও ভারতীয় দরে এত বড় পার্থক্য সত্ত্বেও যে এই রপ্তানী বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে তার দুটি কারণ আছে:—এক, দরের লোকসানটা সরকারী 'সাবসিডি'র দ্বারা পুষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দুই, আমদানীকারী দেশগুলি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ভারতীয় চিনি আমদানীর দরুণ আন্ত-[illegible] বাজারদরের চেয়ে কিছুটা বেশী দর দিচ্ছে।

অবশ্য এখানে বলা দরকার যে, আমেরিকা কিউবার চিনি আমদানী করা বন্ধ করে দেওয়ার পর পৃথিবীর বাজারে চিনির দর যেভাবে হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল তাতে ভারতীয় চিনির রপ্তানী বাণিজ্যের [illegible] সুবিধা হয়েছিল। ১৯৬৩ [illegible] চিনির আন্তর্জ্জাতিক বাজারদর [illegible] চড়েছিল—প্রতি মেট্রিক টন পিছু [illegible] পাউন্ড [illegible]—উঠেছিল। ১৯৬২-[illegible] ভারতীয় চিনির রপ্তানীও [illegible] করেছিল—[illegible] লক্ষ ১৮ [illegible] মেট্রিক টন।

কিন্তু ভারতীয় চিনির এই রপ্তানী [illegible] আসছে, খাদ্যমন্ত্রী শ্রী [illegible] গত ২৬ অক্টোবর কানপুরে এক [illegible] সম্মেলনে বলেছেন যে, চিনির আন্তর্জ্জাতিক বাজারদর [illegible] ভারতবর্ষ আর চিনি রপ্তানী করবে কিনা সেটা ভেবে দেখা হবে।

চিনির [illegible] কারণ উল্লেখ করে [illegible] বলেছেন যে, [illegible] শোষণ করার উদ্দেশ্যে [illegible] চিনির মূল্য কম করা [illegible]।

শ্রী[illegible]এর এই কথাগুলি আমাদের [illegible] আন্তর্জ্জাতিক [illegible] অভিশাপের দিকে [illegible] করেছে। কেবল চিনি নয়, [illegible] পণ্যের উৎপাদনকারী [illegible] এই একই দুর্ভাগ্যের [illegible] হতে হচ্ছে বারবার। এই সব দেশের [illegible] সেই দারিদ্র্য থেকে [illegible] তাদের আধুনিক শিল্প ও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। [illegible] এই সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ [illegible] তারা চড়া দর হাঁকে। অথচ, যেহেতু [illegible] পণ্যের উৎপাদন অনেকখানি পরিমাণে [illegible] নিয়মের অধীন, সেহেতু এই সব পণ্যের বাজারদর ভয়ানক ওঠাপড়া করে। [illegible] অনেক সময়ই দরিদ্র দেশগুলি পড়তি দরে বেচতে ও চড়তি দরে কিনতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক ধনবৈষম্য কমা দূরের কথা, সেটা আরও বাড়তে থাকে।

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জ্জাতিক তহবিলের সভায় লাইবেরিয়ার তৎকালীন অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারি মিঃ চার্লস ডানবার শেরম্যান যে-কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর যেসব সমৃদ্ধ দেশকে আমরা টাকার থলে নিয়ে সারা পৃথিবীতে দানসত্র খুলে বসতে দেখছি আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির বিচিত্র কৌশলে তারা আসলে গ্রহীতা হয়েও দাতা সাজছে। আর যেসব অনগ্রসর উন্নতিকামী দেশের প্রতিনিধিদের আমরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঐসব উন্নত দেশের রাজধানীগুলিতে ঘুরে বেড়াতে দেখি তারা আসলে দাতা হয়েও তাদের গ্রহীতা রূপেই চিহ্নিত হতে হচ্ছে। মিঃ শেরম্যান দেখিয়েছিলেন যে, উন্নত দেশগুলির ধনবান করদাতারা প্রাতরাশের টেবিলে বসে যে-খানা খান, যেসব মোটরগাড়ীতে চড়েন অথবা নিত্যকার জীবনে অন্যান্য যেসব জিনিস ব্যবহার করেন তাদের দামের কিছু অংশ উন্নতিকামী দেশগুলির দরিদ্র করদাতারা [illegible] নিজেদের পকেট থেকে যোগান দিচ্ছে।

আন্তর্জ্জাতিক কফির বাজারের দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬[illegible] সালের মধ্যে পৃথিবীর বাজারে কফির দানার দাম পাউন্ড পিছু এক টাকার বেশী কমে গেল। ফল কি হল? ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কফি রপ্তানীকারী দেশগুলির মোট ১২৮০ কোটি টাকা লোকসান হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশগুলির [illegible] কফি পান করছিলেন তখন এই একটি [illegible] আন্তর্জ্জাতিক [illegible] উপর [illegible] কোটি [illegible]।

[illegible] এই চেষ্টা [illegible] যে, দরিদ্র দেশগুলি [illegible] ধনী দেশগুলিকে [illegible] উন্নতিকামী দেশগুলি [illegible] কলকারখানায় তৈরী [illegible] দরিদ্র দেশগুলির [illegible] সংকুচিত হবে। এই [illegible] উন্নতিকামী দেশগুলির চাপে [illegible] এই আন্তর্জ্জাতিক [illegible] স্থির রাখতে [illegible] চলছে। কফির ক্ষেত্রে [illegible] উদ্যোগে আমদানীকারী ও রপ্তানীকারী দেশগুলির মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে এবং ১৯৬২ সাল থেকে এই চুক্তির দ্বারা পৃথিবীর বাজারে কফির দর স্থির রাখার চেষ্টা [illegible]।

দুর্ভাগ্য এই যে, চিনির ব্যাপারে এমন কোন আন্তর্জ্জাতিক বোঝাপড়া নেই। এর আগে ১৯৫৩ সালে ও ১৯৫৮ সালে দুটো আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির দ্বারা বিশ্বের বাজারে চিনির দর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালের পর এই চুক্তির আর কার্যকর নেই।

সুতরাং ভারতীয় চিনির স্বাদ এখন তিক্ত। ডিভ্যালুয়েশনের মধু মেখেও এই তিক্ত স্বাদ দূর করা যাবে কিনা সন্দেহ।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ভারতীয় চিনির উপর এই আঘাতের অন্যতম কারণ হল, এখানে চিনি উৎপাদনের অত্যধিক ব্যয়। আখের ফলনে আমরা অন্যান্য অনেক চিনি-উৎপাদক দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছি। যেমন, হাওয়াইয়ে একর পিছু আখের ফলন ৮০·৪০ টন, আর ভারতে ১৭·১০ টন। আখের ফলন না বাড়াতে পারলে ভারতের চিনি শিল্প অন্যান্য দেশের চিনি শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারবে না।

অথচ একটি মজার কথা এই যে, ভারতবর্ষের যেসব এলাকায় আখের ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী সেসব এলাকায় চিনিকল বেশী নেই। চিনি কলগুলির অধিকাংশ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। বিহারে আখের ফলন হয় একর পিছু ১৬ ৭৭ টন, উত্তরপ্রদেশে ১৭ ১৯ টন। অথচ, এই ভারতবর্ষের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে প্রতি একরে আখ ফলে ৩৪ ২৩ টন আর মহীশূরে ৩২ ৮১ টন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম অবশ্য কানপুরে হুমকি দিয়েছেন যে, বিহার ও উত্তর প্রদেশে আখের ফলন না বাড়লে চিনি শিল্প সেখান থেকে সরে যাবে। কিন্তু এই হুমকি সরকারী নীতি হিসাবে কোন দিন কার্যে পরিণত করা হবে কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

এমন সন্দেহ করার কারণ কি? এ বিষয়ে মহীশূরের একজন মন্ত্রীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এই মন্ত্রীর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ হেগড়ে। গত বৎসর জুলাই মাসে তিনি একটি প্রকাশ্য সভায় এই অভিযোগ করেছিলেন যে, মহীশূরে সমবায়ের ভিত্তিতে [illegible] চিনিকল স্থাপন করার জন্য মহীশূর সরকার গত দেড় বৎসর যাবৎ চেষ্টা করছেন, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চিনির মালিকদের চাপে পড়ে ভারত সরকার লাইসেন্স দিচ্ছেন না।

(৩৭)

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যখন পুরো দমে চলেছে, তখন বোম্বাই শহরে দেখেশুনে মনোমত একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করা একরকম অসম্ভব। সেপ্টেম্বর মাসে আন্দোলনে খানিকটা ভাঁটা পড়ল, সেই সময় আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। দেখলাম যে, সেলামী বা পাগড়ী ছাড়া ফ্ল্যাট পাওয়া একেবারে অসম্ভব। হতাশ হয়ে আমি শেষকালে সাধনাকে বললাম : দেখ, তোমাকে 'তাজমহল' হোটেলের সঙ্গেই মাসিক বন্দোবস্ত করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকতে হবে। শিগ্‌গীরই তো তোমার মাও আসছেন—দুজনে এইখানেই থাক তোমরা—তাছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।
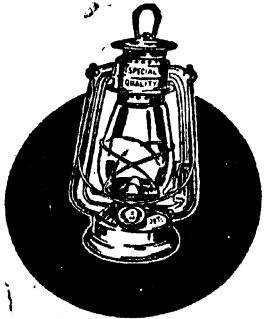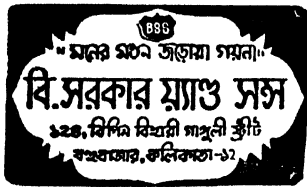
আমি যখন বিনা সেলামী বা পাগড়ীতে ফ্ল্যাটের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম ঠিক সেই সময় ভাগ্যদেবী আমার ওপর সুপ্রসন্ন হলেন। এ ধরনের ঘটনা আমার জীবনে অনেকবার হয়েছে, আবারও সেই অদৃশ্য মঙ্গল হস্তের ইঙ্গিত পেলাম।

একদিন ক্রিকেট ক্লাবে সন্ধ্যার সময় বসে গল্পগুজব করছি এমন সময় দেখা হয়ে গেল আগেকার দিনের এক বিখ্যাত চিত্রতারকা সুলতানার সঙ্গে। আমি যখন কয়েক বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে 'সেলিম' ছবি করি তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার আলাপ। সুলতানা ছিল সবাক-চিত্রের প্রথম যুগের বিখ্যাত চিত্রতারকা জুবেদার ভগ্নী। জুবেদা বিয়ে করেছিল ক্রোড়পতি ধনরাজ গিরিকে। গ্রীণস্ হোটেলের পার্শ্ববর্তী বিরাট 'ধনরাজ মহল' বাড়ীটি ছিল তাদেরই।

সুলতানার স্বামী মিঃ বাওলা ছিল সঙ্গে। মিঃ বাওলা হল ইন্দোরের অধিবাসী। এর বাবা ছিল বিরাট ব্যবসায়ী—আমি এর বাবার নাম শুনেছিলাম আগে।

ফিল্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হল—এরা রাজনর্তকী ও 'Court Dancer' দেখেছে। ছবি তাদের খুব ভাল লেগেছে, বিশেষ করে সাধনার নাচ ও অভিনয়ের তারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। এখন বোম্বায়ে আছে শুনে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল।

কথায় কথায় আমি তাদের জানালাম, আমার ফ্ল্যাট-সমস্যার কথা। আমার সমস্যার কথা শুনে সুলতানা তার স্বামীকে বলল : Worli 'Sea Face'-এর বাড়ীটাতো আমাদের খালিই পড়ে আছে—ওখানকার একটা ফ্ল্যাট দাও না মিঃ বোসকে। ভদ্রলোক বড় অসুবিধেয় পড়েছেন।

তার স্বামী একথা শুনে একটু ইতস্তত করে বলল : —মানে, আমরা তো ও বাড়ীটা কাউকে ভাড়া দিই নে—ওটা তো আমাদের নিজেদের জন্যে রেখেছি—

সুলতানা বলে উঠল—অন্য কাউকে দেওয়া আর মিঃ ও মিসেস বোসকে দেওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে তো! আর ওদের তো পুরো বাড়ীটা দরকার নেই—ওপরের ফ্ল্যাটটা হলেই চলবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে : কি বলেন মিঃ বোস—ওপরে চারখানা বড় বড় ঘর আছে, তাতে আপনাদের হবে না? আর যদি দরকার হয় নীচেতলায় একটা ঘরও পেতে পারেন। নীচের বাকী ঘরগুলোতে আমাদের বাড়তি আসবাবপত্রগুলো থাকবে।

আমি বললাম যে আমাদের ওতেই চলবে—কালই আমরা দেখতে যাবো।

পরদিন আমি আর সাধনা দুজনে গেলাম 'সুলতানবাগে' বাড়ীটা দেখতে। ঘরগুলি বেশ বড় এবং সুসজ্জিত। মনে হল ঘরগুলি সাজাতে ও রং করতে বেশ খরচ করেছে। একটি শোবার ঘরের রং ছিল নীল—সঙ্গে বাথরুম, বাথটব ইত্যাদি সব নীল মোজেক পাথরের—অপর শোবার ঘরটি গোলাপী রং-এর এবং সংযুক্ত বাথরুম গোলাপী মোজেক পাথরের। তাছাড়া একটি বেশ প্রশস্ত ড্রইংরুম ও খাবারঘর। এছাড়া ছিল রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি।

ফ্ল্যাট দেখে তো আমরা হাতে চাঁদ পেলাম, আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দ হল। সুলতানা জিজ্ঞেস করলে : কত ভাড়া হলে আপনাদের সুবিধে হয়?

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল : মাসে ৩৫০ টাকা হলে মন্দ হয় না।

সুলতান বলল : বেশ, তাই দেবেন।

যাক, গৃহসমস্যা মিটল। ভগবানের কৃপা আমার ওপর অসীম—নইলে এরকম একটি সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাট বিনা সেলামীতে পাওয়া যায় না—আর যেটা 'পাগড়ী' ছাড়াও মাসে ৫০০।৬০০ টাকার কমে পাওয়া অসম্ভব।

যাই হোক, কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতান বাগে এসে উঠলাম আমরা। আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকত তখনকার দিনের দুজন বিখ্যাত চিত্রতারকা—লীলা দেশাই ও প্রতিমা দাশগুপ্তা। 'রাজনর্তকী'র পর প্রতিমার নাম-ডাক খুবই হয়েছিল এবং বোম্বায়ের 'তারকা' পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সাধনার নতুন ছবি 'পয়গম'-শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছিল। অমর পিকচার্স ছিল এই ছবির নির্মাতা। আমি তখন কলকাতা ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন আগে মন্মথর কাছ থেকে খবর পেলাম যে শেঠ সুখলাল কারণনী আগস্ট আন্দোলনের পরে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন এবং জাপানীদের বিমান আক্রমণের গুজবের দরুণ এখন কোন নতুন ছবিতেই হাত দিতে চান না। সুতরাং স্টিফান কোর্টের অত বড় ফ্ল্যাটটা রাখবার আর কোন মানে হয় না। ঠিক করলাম, কলকাতায় এসে আসবাবপত্র সব বম্বেতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বম্বেতেই আবার ফিরে আসব। কিন্তু কলকাতায় আসব বললেই ত আসা হয় না। আগে ঠিক ছিল যে, সাধনার বাবা বম্বেতে গেলে আমি কলকাতায় চলে আসব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছুদিন আগে তাঁর সেজ বোন, অর্থাৎ সাধনার সেজপিসি ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীর একমাত্র

পুত্র ধ্রুবেন্দ্র প্লেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়, সুতরাং সাধনার বাবাকে তাঁর বোনের কাছে শিলং-এ যেতে হয়েছে—এখন আর বম্বেতে আসতে পারবেন না।

অবশ্য আমাদের 'সুলতান বাগ'-এর ফ্ল্যাটে তখন অনেকেই থাকে। বন্ধু বঙ্কিম-বাবু এসেছেন—বন্ধুবর মন্টি ঘোষও তখন এসেছে—তাছাড়া ভোম্বল, তিমিরের ভাইপো, অর্থাৎ মিহিরবাবুর ছেলেও আমাদের ওখানে আছে। এরা সকলেই নীচের একটি বড় ঘরে থাকে—তাছাড়া পুরনো চাকর-বাকর, আয়া ত আছেই। কিন্তু সাধনার সঙ্গে রাত্রে কে থাকবে? আগেই বলেছি যে লীলা দেশাই ও প্রতিমা দাশগুপ্ত পাশের বাড়ীতেই থাকত। প্রতিমাই সমস্যার সমাধান করে দিল। সে বলল: আপনি নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায় যান—আমি সাধনাদির কাছে রাত্রে থাকব, যতদিন না আপনি ফিরে আসেন।

কলকাতায় এসে আমি আর কোনও প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলাম না—দেখা করার ইচ্ছাও ছিল না। মনটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। অত বড় স্টিফেন-কোর্টের মত জায়গায় আমি একেবারে একা, নিঃসঙ্গ। সাধনাও কাছে নেই, কাজকর্মও হাতে নেই — একটা বিরাট শূন্যতা যেন আমার মনের মধ্যে চেপে বসতে লাগল। আমার এত সাধের সি এ পি ইউনিট, ফিল্ম-ইউনিট — সবেতেই ভাঙন ধরল। এইসব ভাবতে ভাবতে কোনো কাজেই মন বসাতে পারি না।

বন্ধুরা আসে, গল্প করে, খাওয়া-দাওয়া করে, কত বোঝায়, কিন্তু মনের সে আগের দিনের মত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ পাই না। মন্মথ, জজি, জ্ঞানাংকুর, হেমন্ত, বসন্ত এবং অন্যান্য আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা প্রায়ই এসে আমাকে চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করত, অন্য প্রোডিউসারের কাছে গিয়ে কাজের চেষ্টা করতে কতো অনুরোধ করত কিন্তু আমার কোন কাজেই আর মন লাগছিল না। জীবনের ওপরই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম।

এই সময় হেমন্ত একদিন প্রোডিউসার তুলসানকে নিয়ে এল আমার কাছে। তুলসান এর আগে ২।১খানা ছবি করেছিল। সে একটা নতুন ছবি আরম্ভ করছে, সেটা আমাকে দিয়ে করাতে চায়। আমার তখন কলকাতায় একদম মন টিঁকছে না — আমি তাঁর প্রস্তাবটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম: আমার বদলে আমার প্রধান সহকারী হেমন্তকে একটা সুযোগ দিন না। সে 'আলিবাবা' থেকে 'মীনাক্ষী' পর্যন্ত সব ছবিতেই আমার প্রধান সহকারীরূপে কাজ করেছে। সুতরাং সে এখন স্বাধীনভাবে ছবি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। সে কাজ ভালই করবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রথমে তুলসান অবশ্য আমার প্রস্তাবে খুব উৎসাহ দেখান নি — কিন্তু পরে যখন আমি বললাম যে, চিত্রনাট্য এবং শট বিভাগগুলি আমি দেখে দেব, তখন তিনি রাজী হলেন। এইটিই হলো হেমন্তর স্বাধীনভাবে তোলা প্রথম ছবি।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে আমি স্টিফেন কোর্টের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই চলে গেলাম।

যাবার সময় জ্ঞানাংকুর ও জজি অনেক-বার বলেছিল যে, ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে যেও না — কাউকে সাব-লেট করে দিয়ে যাও, ফিরে এসে ৩৭৫ টাকায় আর এরকম ফ্ল্যাট পাবে না। কিন্তু তখন সে কার কথা শোনে!

তারপর যখন ১৯৪৫ সালে বোম্বাই থেকে আবার কলকাতা ফিরে এলাম তখন স্টিফেন কোর্টের মালিক মিঃ এ্যারাটুনকে একটি ফ্ল্যাটের কথা বলায় তিনি আমাকে সোজা প্রশ্ন করলেন: এতদিন কোথায় ছিলেন মিঃ বোস — ভারতবর্ষে না ইউরোপে?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম: তার মানে? আমি তো বম্বেতে ছিলাম।

তাতে মিঃ এ্যারাটুন বললেন: তাহলে তো আপনার জানা উচিত মিঃ বোস, এখন ফ্ল্যাট নিতে গেলে সেলামী যাকে বোম্বাইতে বলে 'পাগড়ী' তাই দিতে হয়। আর এ প্রথা তো বোম্বাইতে অনেকদিন আগেই চালু হয়েছে।

আমি বললাম: কলকাতাতেও এ প্রথা চালু হয়েছে নাকি? আমি যখন ১৯৪২ সালে কলকাতা ছাড়লাম, কই তখন তো এ ঝামেলা ছিল না। তখন তো বিনা সেলামীতেই কত ফ্ল্যাট পাওয়া যাচ্ছিল। এই আপনাদের স্টিফেন কোর্টেই কত ফ্ল্যাট খালি ছিল।

ঠিক কথা মিঃ বোস, বললেন মিঃ এ্যারাটুন — তখন যে জাপানীদের বোমার ভয়ে বহু লোক কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়ে-ছিল — তারপর ১৯৪৪ সাল থেকে আবার যখন কলকাতায় লোক আসতে সুরু করল, বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু থেকে, তখনই হু-হু করে ভাড়া বাড়তে শুরু করল — আর তার সঙ্গেই এসে জুটল 'সেলামী' প্রথা। আচ্ছা, আপনি তো স্টিফেন কোর্টের 'টপ ফ্লোরে' দক্ষিণ-পূবে কোণের ফ্ল্যাটটায় থাকতেন না?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম: হ্যাঁ।

—ওইটিই এখানকার মধ্যে সব থেকে ভাল ফ্ল্যাট — যাকে বলে প্রাইজ-ফ্ল্যাট। জানেন তো এর আগে ওখানে ফ্রেঞ্চ-কনসুলেট থাকতো।

আমি বললাম: আমি জানি সে কথা।

মিঃ এ্যারাটুন বলতে লাগলেন: এখন ওই ফ্ল্যাটটার জন্যে এক ভদ্রলোক ত্রিশ হাজার টাকা সেলামী দিয়ে মাসে হাজার টাকা ভাড়া দিচ্ছেন। অবশ্য আপনাকে বলে রাখা ভাল যে, সে সেলামীর টাকা আমার হাতে আসে নি।

আমার চোখ তখন কপালে উঠেছে: আমি বললাম: বলেন কি মিঃ এ্যারাটুন? ত্রিশ হাজার টাকা সেলামী ও মাসে মাসে হাজার টাকা ভাড়া! আর তখন আমি দিতাম মাসে ৩৭৫ টাকা!

—হ্যাঁ মিঃ বোস। অবাক হবারই কথা। রূপকথা বলে মনে হবে। কলকাতা আর সে কলকাতা নেই। সেইজন্যেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এতদিন আপনি ছিলেন কোথায় — ভারতবর্ষে না ইউরোপে?

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। আমি যখন কলকাতার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বম্বে যাই, তখন আমার মাস্টার বুইক গাড়ীখানাও বিক্রি করে দিয়েছিলাম। একে তখন কলকাতা থেকে লোক সব জাপানী বোমার ভয়ে পালাচ্ছে — তখন গাড়ী কেনবার খদ্দের কোথায়? কিনেছিলাম গাড়ীখানা ৯০০০ টাকায় শুধু দেড় বছর আগে, আর বিক্রি করতে হল ৫০০০ টাকায়। জ্ঞানাঙ্কুর বললে : এটা কি করছিস মধু? এমন সুন্দর নতুন গাড়ী আর এই জলের দামে বিক্রি করছিস? তার থেকে গাড়ীটা আমার কাছে রেখে যা। এ অবস্থা বেশীদিন থাকবে না — আমি বেশ ভাল দরে বিক্রি করে দেব।

আমি বললাম : উপায় নেই ভাই, এত জিনিসপত্র বম্বে নিয়ে যাওয়ার খরচ আছে বিস্তর। সুতরাং টাকা দরকার। আমি জানি কলকাতায় কিছুদিন পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে — আমার বুইক রুড এর থেকে অনেক বেশী দাম পাওয়া যাবে। কিন্তু বম্বেতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে তো থাকতে পারব না। যতদিন না কোন কাজ হয় ততদিন নিজের খরচটা তো চালাতে হবে।

এর পরে আর জ্ঞানাঙ্কুরের কিছু বলার ছিল না—যদিও চুপ করে শুনলো। তারা আমার সত্যিকারের বন্ধু—আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তাদের খুব প্রাণে লেগেছে এ কথাটা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ১৯৪৫ সালে বম্বেতে আমার এক বন্ধু ১৯৪২ মডেলের 'মাস্টার বুইক' কিনল ৩৫,০০০ টাকায়।

আমি বম্বেতে ফিরে এলাম নভেম্বর মাসে। এর আগে সাধনা আমাকে লিখে জানিয়েছিল যে, সে রঞ্জিত মুভিটোনের সঙ্গে দুখানি ছবির চুক্তি করেছে 'শঙ্কর পার্বতী' এবং 'বিষকন্যা'। সে ছবির কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। যেদিন সাধনার শুটিং থাকে না, সেদিন আমাদের ওখানে গানের আসর বসে। সায়গলই প্রধান গায়ক। সেই আসর জমাত। রঞ্জিতে তখন সে 'তানসেন' ছবি করছে। এ ছবির নায়িকা ছিল খুরশীদ।

আমাদের এই গানের আসরে অবশ্য অনেকেই আসত—তার মধ্যে ছিল জ্ঞান দত্ত (রঞ্জিত মুভিটোনের নিয়মিত সঙ্গীত পরিচালক) পরিচালক চতুর্ভুজ যোশী ও কেদার শর্মা এবং আরো অনেকে। সায়গল একটার পর একটা গান গেয়ে যেত। এক-একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত গানের জলসা চলত—খাওয়া-দাওয়া চলত। আমি কিন্তু কেন জানি না এই সব গানের আসরে যোগদান করতে পারতাম না। মনের মধ্যে যে একটা নৈরাশ্যের পাথর চেপে বসেছিল, সেটাকে কিছুতেই সরিয়ে ফেলতে পারছিলাম না। বেশীর ভাগ সন্ধ্যার সময় আমি আমার ঘরটিতে একলা বসে সর্বদুঃখহরা হুইস্কির গ্লাসে মনোনিবেশ করতাম। আর পড়াশোনা নিয়ে সময় কাটাতাম। মাঝে মাঝে মিঃ ওয়াদিয়ার বাড়ী যেতাম। তিনি আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই থাকতেন।

মিঃ ওয়াদিয়া প্রায়ই বলতেন : মধু, কোন প্রোডিউসারের সঙ্গে যোগাযোগ করছ না কেন? 'রাজনর্তকী'-এর পর তোমার কণ্ট্রাক্ট পাওয়া মোটেই শক্ত হবে না। চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকলে কি চলে? লোকে জানেই না যে তুমি বোম্বাইতে আছ।

আমার কি রকম সব প্রোডিউসারদের ওপর এমন কি চিত্র-শিল্পের ওপর একটা বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে একদিন নিরঞ্জন পালের সঙ্গে দেখা। গোলাপদা মারা যাবার পর মিঃ পালও বম্বে টকীজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে বহু ছবির চিত্রনাট্য লিখে দিতেন এবং ভারত সরকারের ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন—তাঁরা যে-সব দলিল চিত্রগুলি করছিলেন তার অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে। অনেক দিন পরে পালসাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, গেলাম দুজনে ক্রিকেট ক্লাবে—এবং পানাহারের মধ্যে দিয়ে দুই বন্ধুতে বহু সুখ-দুঃখের কথা হল। পালসাহেব জানতেন যে, সাধনা রঞ্জিত মুভিটোনের হয়ে স্বাধীনভাবে দুখানি ছবি করছে—এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি একটা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমি যে বম্বেতে কোন প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে চাই না—একথাও বুঝতে পারলেন। পালসাহেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক—তিনি আমার মানসিক বিপর্যয়টা ঠিক ধরে ফেললেন।

তিনি বললেন : আমি শিগ্‌গীর দিল্লী যাচ্ছি—তুমিও চল না আমার সঙ্গে। সেখানে আমি ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং-এর মিঃ পি এন থাপার, আই-সি-এস'এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। চমৎকার লোক মিঃ থাপার। তিনি যেমনি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী—তেমনি অত্যন্ত শিল্পানুরাগী। নৃত্য-গীতের দিকে তাঁর অসীম আগ্রহ।

আমি বললাম, সবই তো বুঝলাম কিন্তু শেষকালে চাকরী করব—তার ওপর গভর্ণমেন্টের? এতদিন স্বাধীনভাবে কাজ করার পর?

মিঃ পাল বাধা দিয়ে বললেন : সেদিন আর নেই মধু। সেদিনের প্রোডিউসার আর আজকের যুদ্ধের সময়ের প্রোডিউসারের মধ্যে অনেক তফাৎ। এদের না আছে শিল্পজ্ঞান, না আছে শিক্ষা-সংস্কৃতি। এরা বোঝে শুধু একটি জিনিষ—টাকা, আর কি করে তাড়াতাড়ি প্রচুর টাকা করা যায়। এরা ভাল ডিরেক্টারের মূল্য বোঝে না। এরা ভাবে কতকগুলি বড় 'স্টার' ছবিতে থাকলেই ছবি পয়সা দেবে—ডিরেক্টার যেই হোক। তোমার মনের ধারা আমি জানি মধু—তুমি এখানে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারবে না। তার চেয়ে তোমাকে আমি বলছি তুমি ইনফরমেশন ফিল্ম অব ইণ্ডিয়াতে যোগ দাও। মিঃ থাপারকে বলে কয়ে তোমাকে যাতে বিশেষ বিশেষ ধরনের ছবি দেওয়া হয় তার চেষ্টা করব।

সব শুনে মিঃ পালকে বললুম : ঠিক আছে—আপনি দিল্লী গিয়ে মিঃ থাপারের সঙ্গে কথা বলুন। কোন সংস্কৃতিমূলক ছবি —যেমন সঙ্গীত নৃত্য, নাট্য—এই ধরনের ছবি হলে আমি করতে রাজী আছি। কোন প্রচারমূলক ছবি অর্থাৎ প্রোপাগাণ্ডা ছবি, আমার দ্বারা হবে না।

মিঃ পাল বললেন—না না—সে রকম ছবি তুমি করতে যাবে কেন? আমি মিঃ থাপারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তোমায় টেলিগ্রাম করব। টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসো। পরে যেন আবার মত বদলে ফেলো না—তাহলে কিন্তু আমি বড় অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যাবো।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : না না, আমি মত বদলাব না। আপনার টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী গিয়ে হাজির হবো।

(ক্রমশঃ)

চিত্র-সমালোচনা :

শঙ্খবেলা (বাঙলা) : অনুরোধা ফিল্মস-এর নিবেদন; ৩,৯৬১·১৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; **প্রযোজনা :** অজয় বসু এবং অনিল সাউ; **চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :** অগ্রগামী; **কাহিনী :** আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; **সঙ্গীত-পরিচালনা :** সুধীন দাশগুপ্ত; **গীতরচনা :** পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; **চিত্রগ্রহণ :** দীনেন গুপ্ত; **শব্দানুলেখন :** সুনীল ঘোষ; **শব্দ-পুনর্যোজনা :** সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; **শিল্প-নির্দেশনা :** সুধীর খান; **সম্পাদনা :** কালী রাহা; **নৃত্য-তত্ত্বাবধান :** পিটার দে; **নেপথ্য-কণ্ঠদান :** লতা মঙ্গেশকর, আরতি মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে; **রূপায়ণ :** উত্তমকুমার, বসন্ত চৌধুরী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, রণজিৎ সেন, শিশির বটব্যাল, মাস্টার বাপী, মাস্টার বিশ্বনাথ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, ইলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল বৃহস্পতিবার মহাসপ্তমী, ২০-এ অক্টোবর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখান হচ্ছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'সন্দেশ' নামে একটি ছোট গল্পকে অবলম্বন করে 'অগ্রগামী' পরিচালক গোষ্ঠী 'শঙ্খবেলা'র যে-চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন, তাতে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এসে মিলেছে রোমান্স; হাসপাতালে এ-মেয়েটি সম্পূর্ণ তার নিজের দায়িত্বে একমাত্র বালক-পুত্রের চিকিৎসা করাতে এসেছে, সেই মেয়েটির অতীত জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে তার কলেজ-জীবনের নিঃসীম প্রেম ও বিবাহিত জীবনে পানাসক্ত স্বামীর ভালবাসার জগৎ থেকে তার ক্রমাপসারণের দৃশ্যগুলিকে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হাসপাতালকে ঘিরে যে মূল কাহিনী, তারই মাঝে এ সন্তানবতী মেয়েটির অতীত কাহিনী এসেছে দুটি ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মাধ্যমে। প্রথম ফ্ল্যাশ-ব্যাক আসে, মেয়েটি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বেরোবার সময় অত্যন্ত অতর্কিতে দূর থেকে তার স্বামীকে দেখে যখন অন্যমনা হয়ে হাসপাতাল অভিমুখের বাসে না চেপে ভুল করে হাওড়াগামী বাসে চেপে বসে, তখন এবং দ্বিতীয় ফ্ল্যাশ-ব্যাক আসে, হাসপাতাল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার সুজন ঘোষের কাছে যখন হাউস-সার্জন ডাক্তার শান্তনু মেয়েটির স্বামী হয়েও নিজেই কেন তার সন্তানের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের প্রাক্কালে রিস্কবণ্ডে সই করেছে, সেই দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করছে তখন। চিত্রকাহিনী বর্ণনায় ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্য গ্রহণ চলচ্চিত্র রীতির দিক দিয়ে কিছুটা পুরাতনপন্থী হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সমর্থনযোগ্য।

উত্তরপুরুষ চিত্রে সন্ধ্যা রায়

ভালবাসার মধ্য দিয়েই বিয়ে হয়েছিল সুনীল ও তৃপ্তির। উচ্চাশা সুনীলের জীবনে প্রবল। বাড়ী, গাড়ী, সম্মান-প্রতিপত্তির মোহে ধরল মদ। এই মদই হল কাল। ইতিমধ্যে ওদের জীবনে এসেছে একটি সুন্দর পুত্রসন্তান। সুনীল হয়ে পড়েছে নেশার দাস। এভাবে সুনীলকে পেতে চায় নি তৃপ্তি। চরম অশান্তির মধ্যে ঘটল উভয়ের বিচ্ছেদ।

পুত্রকে নিয়ে দূরে সরে যায় তৃপ্তি। পুত্রের কঠিন অসুখের সময় হাসপাতালে ডাক্তারের সাহায্যে পুনর্মিলন ঘটে আবার তাদের।

অগ্রগামী গোষ্ঠী শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রেম কাহিনীকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্ররূপ দিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্র সার্থক এবং সুন্দর হয়ে জীবন্ত রূপ নিয়েছে। অন্তরঙ্গ প্রেমিক-প্রেমিকার (মাইথন) লেকের জলে প্রমোদ-তরণীর (ইয়ট-এর) ওপরে "কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম চেয়ে দেখেছি" গান যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে, তা সত্যই বাঙলা ছবির জগতে "প্রেমের দৃশ্য উত্থাপনে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে" এবং এই দৃশ্যটিকে এক কথায় বলা যায়, ছবিটির 'ট্রাম্প কার্ড'। ছবির কাহিনীর একটি বিশেষ পর্যায়ে এই দৃশ্যটি সংযোজিত হয়ে ছবিটিকে দর্শকসাধারণের কাছে দুরন্তভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

অভিনয়ে নায়ক সুনীল বেশে উত্তমকুমার প্রেমিক এবং মদ্যাসক্ত উভয়রূপেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাবলীল। নায়িকা তৃপ্তির ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায় এই প্রথমবার উত্তমকুমারের জুটি হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং প্রেমের দৃশ্যগুলিতে ওঁদের সার্থক অভিনয় দেখে অসঙ্কোচে বলতে পারা যায় যে, এই জুটি আরও বহু ছবিতে দেখবার জন্যে দর্শকসাধারণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করবে। ডাঃ সুজন (গুঞ্জন) ঘোষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বসন্ত চৌধুরী। তিনি চরিত্রটিতে যথাসম্ভব ব্যক্তিত্বদান করেছেন; কিন্তু চরিত্রটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাস্যভাবে পরিকল্পিত না হওয়ায় একটি পরিপূর্ণ রূপ সৃষ্টি হতে পায় নি। ডাঃ শান্তনুর চরিত্রে নবাগত মৃণাল মুখোপাধ্যায় একটি সহানুভূতিসম্পন্ন নবীন চিকিৎসককে রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন। বালক বাবুরূপে মাস্টার বাপী দর্শক-সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে এবং সেই অপর রোগী বালকবেশে মাস্টার বিশ্বনাথও সকলের স্মরণে থাকবে। অপরাপর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল তরুণকুমার, রণজিৎ সেন ও শোভা সেন নিজেদের নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে কি বহির্দৃশ্য, কি অন্তর্দৃশ্য—সর্বত্র আলোকচিত্রের কাজে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন দীনেন গুপ্ত। শিল্পনির্দেশনায় সুধীর খান বাস্তবধর্মী দৃশ্যপট রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সংগীত-পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত সুরযোজনা অপেক্ষা আবহসংগীত রচনায় অধিকতর সার্থক হয়েছেন।

অগ্রগামী পরিচালিত এবং অনুরাধা ফিল্মস নিবেদিত "শঙ্খবেলা" জনপ্রিয় চিত্ররূপে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ফুল ঔর পথর (হিন্দী) : রলহন প্রোডাকসন্সের নিবেদন: ৫,০৪১·০৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ: প্রযোজনা, কাহিনী ও পরিচালনা : ও পি রলহন; সংলাপ : আশান রিজভী; সংগীত-পরিচালনা : রবি; গীতরচনা : শকীল; চিত্রগ্রহণ : নরিমান ইরাণী; শিল্প-নির্দেশনা : শান্তি দাশ; সম্পাদনা : বসন্ত বোর্কার; রূপায়ণ : মীনাকুমারী, শশিকলা, ইন্দিরা বিল্লি, টুনটুন, ললিতা পাওয়ার, লীলা চিটনীস, ফরিদা, ধর্মেন্দ্র, ও পি রলহন, মদনপুরী, জীবন, মনোমোহন কৃষ্ণ, সুন্দর, রামমোহন, ইফতিকার, শ্যামকুমার প্রভৃতি। কলার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ও দোসানী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৮-এ অক্টোবর থেকে সোসাইটি, ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, কৃষ্ণা, প্রিয়া, মিত্রা, কালিকা, ছায়া, ইন্টালী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

> **।। ঘোষণা ।।**
>
> যে সব শারদীয় পত্র-পত্রিকা আমরা পেয়েছি সেগুলির মধ্যে কয়েকটি আলোচনা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল, বাকীগুলির আলোচনা প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়। আলোচনার জন্য আর কোন পত্র-পত্রিকা গৃহীত হবে না।

ধনীর প্রাসাদ বা দরিদ্রের পর্ণকুটির কিম্বা শহরের রাস্তার ধূলিময় ফুটপাথ—শিশু যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে প্রথমে থাকে ফুলেরই মত কোমল, অমলিন ও পবিত্র। কিন্তু যতই দিন যায়, যেমনই তার ধীরে ধীরে বয়ঃবৃদ্ধি হতে থাকে, অমনই সে পরিবেশের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। ফুটপাথে যে-ছেলেটি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার মাকে হারাল, সে পিতৃপরিচয়হীন ও মাতৃস্নেহবঞ্চিত হয়ে পৃথিবীর অবহেলা, অযত্ন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং অত্যাচার সহ্য করেই বেঁচে রইল সমাজের জঞ্জাল হয়ে। দেখা গেল, সে হয়ে উঠেছে মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী, প্রবঞ্চক, পকেটমার, জুয়াচোর, চোর; পরিবেশ তাকে করে তুলেছে প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয়। প্রযোজক-পরিচালক ও পি রলহন তাঁর সুদীর্ঘ রঙীন ছবি "ফুল ঔর পথর"-এর মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, এই যে ছেলেটি ফুল হয়ে জন্মে একটি কঠিন প্রস্তরে পরিণত হল—এ কার দোষে? কার অপরাধে? এর সম্পর্কে আপনার, আমার, সমাজের, রাষ্ট্রের কি কোনই দায়িত্ব নেই? কারুরই কি কর্তব্য নয় এই ছেলেটিকে সুস্থ, সহজভাবে বেঁচে উঠতে সাহায্য করা? ইত্যা... ইত্যাদি। মাত্র এই সোচ্চার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন বলেই শ্রীযুক্ত রলহ... আমাদের সকলেরই আন্তরিক ধন্যবা... লাভের অধিকারী। শ্রীরলহন তাঁর ছবি... ভিতর দিয়ে আর একটি বক্তব্য পরিস্ফু... করেছেন। সেটি হচ্ছে : পবিত্র প্রেমে... অমোঘ স্পর্শ বিপথগামীকে সুপ... আনয়ন করতে সক্ষম। এই বক্তব্যের জন্যে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শাকা ছিল এমনই একটি বিপথগাম... যুবক, সংসারের বঞ্চনা যাকে জন্ম... অপরাধী ও পাষাণহৃদয় করে গ... তুলেছে। সে এমনই একটি দুর্বল দলে গি... পড়েছিল, যার দলপতি নিজের অভী... সিদ্ধির জন্যে তাকে দিয়ে খুন, রাহাজা... চুরি প্রভৃতি সব রকম হীন-জঘন্য কা... করিয়ে নিত এবং পরিবর্তে দিত সুরা... নারী। এমনই এক নারী ছিল লাস্যময়... রীতা; সে দলপতির আদেশে 'ক্যাবা... নাচত, কিন্তু তার হৃদয়টুকু দিয়ে ফেলেছি... দুর্ধর্ষ শাকাকে। শাকা কিন্তু ... প্রতি লক্ষ্যই করে নি। সে মত্ত ছিল ... দুষ্কার্যে। কিন্তু লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে এ... ধনীগৃহে প্রবেশ করে সে এক রোগ... বিধবা তরুণী সুন্দরীর সম্মুখীন হল এ... বিধির বিধানে সেই সুন্দরী শান্তি... সাহচর্যের প্রভাবে তার জীবনে এল পরি... বর্তন। তাকে দলচ্যুত হতে দেখে দলপ... প্রমাদ গুনল; রীতার সাহায্যে সে শাকা... কৌশলে বশীভূত করবার চেষ্টা ক... শান্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার আ... থেকে। শেষ পর্যন্ত কেমন করে শা... শান্তির সন্ধান পেল এবং প্রেমেরই ... হল, তাই নিয়ে ছবির শেষাংশের উত্তেজ... দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।

নায়ক শাকা এবং নায়িকা শান্তির ভূমিকায় যথাক্রমে ধর্মেন্দ্র ও মীনাকুমারী স্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁদের না... নৈপুণ্যের চূড়ান্ত নিদর্শন উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই ছবিটিতে ধর্মেন্দ্রর মুখে কোন গান নে... এবং মীনাকুমারীও একমাত্র একটি ভজ... ছাড়া অন্য কোন গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলা... নি বা সাধারণ হিন্দী ছবিসুলভ নৃত্যগীত... বহুল প্রেমের দৃশ্যের অবতারণা করতে অনুরুদ্ধ হন নি। অথচ দৃশ্যের পর দৃশ্যে শাকা ও শান্তির মধ্যে যে পবিত্র প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তা দর্শক অনুভব করেন তাদের সংলাপে, ভাবে ও ভঙ্গীতে। এই নবতর চরিত্র-চিত্রণে ধর্মেন্দ্র ও মীনাকুমারী দুজনেই নতুন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। বাজীকর-পকেটমার সরকরামের আপাত হাল্কা চরিত্রটিকে চিত্রিত করেছেন প্রযোজক-পরিচালক ও পি রলহন স্বয়ং। নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে, বাচনভঙ্গীতে তিনি যে আশ্চর্য নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, যে-সহজ সাবলীলতার নিদর্শন দেখিয়েছেন, তাকে এক কথায় অতুলনীয় আখ্যায় ভূষিত করা উচিত। হোটেল-নর্তকী লাস্যময়ী রীতার চরিত্রে শশিকলাকে এক অভিনব মূর্তিতে দেখা

গেল। ছবিতে তাঁকে সব সময়েই এক পাশ্চাত্য সুন্দরী বলে মনে হয়েছে—এমনই তাঁর রূপসজ্জা, পোশাক-আশাক। শাকাকে রীতা যে যথার্থই ভালবাসত, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন রীতার মৃত্যুদৃশ্যের স্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে। অন্ধ ভিখারিণীর ভূমিকায় লীলা চিটনীস তাঁর অভিনয়-প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিয়েছেন। বৈদ্যরাজের স্ত্রীর ভূমিকায় স্থূলাঙ্গিনী টুনটুন অনবদ্য হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার (শাশুড়ী), জীবন (শ্বশুর), রামমোহন (দেবর কালিচরণ), সুন্দর (বৈদ্যরাজ), ইন্দিরা বিল্লি (সরকরামের প্রেমিকা কমলা), মনোমোহন কৃষ্ণ (পুলিশ ইন্সপেক্টার), মদনপুরী (দলপতি), শ্যামকুমার (সামু) প্রভৃতি যথাযোগ্য নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চশ্রেণীর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে রঙীন চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনা ছবির সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। ছবির সমবেত নৃত্যগীত—হোলিনৃত্য প্রভৃতি ও জনতা দৃশ্যগুলি পরিচালকের বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। সংগীত ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। পরিচয়লিপির অভিনবত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সম্পাদনা ছবির দ্রুতলয় রক্ষায় বিশেষ সাহায্য করেছে।

ও পি রলহন প্রযোজিত ও পরিচালিত "ফুল ঔর পত্থর" বর্তমান সমাজের একটি বিশেষ সমস্যাকে তুলে ধরার সংগে সংগে একটি পরম উপভোগ্য সার্বজনীন চিত্ররূপে আদৃত হবে।

প্যার কিয়ে যা (হিন্দী) : চিত্রালয়-এর নিবেদন: ৪,৭৫২·৭৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : শ্রীধর; সংগীত-পরিচালনা : জি বালকৃষ্ণ; চিত্রগ্রহণ : বালু; শিল্প-নির্দেশনা : গঙ্গা; সম্পাদনা : এন এম শঙ্কর; নেপথ্যকণ্ঠদান : লতা মঙ্গেশকর, ঊষা মঙ্গেকর, মোহাম্মদ রফী, মান্না দে, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে ও মহেন্দ্র কপুর; রূপায়ণ : কিশোরকুমার, শশী কাপুর, ওমপ্রকাশ, চমনপুরী, শ্যামলাল, শিবরাজ, মেহমুদ, রাজশ্রী, কল্পনা, মমতাজ প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল বৃহস্পতিবার মহালয়া, ১৩ই অক্টোবর থেকে হিন্দ, বসুশ্রী, বীণা, খান্না, গণেশ, নাজ, পার্কশো হাউস এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখান হচ্ছে।

কোন কোন চিত্রনির্মাতা দর্শকদের আনন্দ দেবার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই ছবি তৈরী করেন। তাঁদের কাছে কাহিনী একটা উপলক্ষ্য মাত্র; তার ঘটনাবলীর সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন নিরর্থক। তাঁরা তাঁদের কাহিনীতে কয়েকটি চরিত্রের সমাবেশ করেন, যারা তাদের সংলাপ, নাচ, গান, হাসি হৈ-হল্লা যথাযোগ্য এবং সময়ে-সময়ে অযথা প্রয়োগ করে সারা প্রেক্ষাগৃহকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখবে। পরিচালক শ্রীধরও হচ্ছেন এই গোষ্ঠীভুক্ত চিত্রনির্মাতা। এবং তাঁর "প্যার কিয়ে যা" দর্শকদের সমস্তক্ষণ আনন্দসাগরে মগ্ন রাখার দায়িত্ব পালন করেছে চূড়ান্তভাবে।

জমিদার রামলালের দুই কন্যা—মালতী ও নির্মলা এবং এক পুত্র আত্মা। এরা তিনজনেই প্রেমে পড়েছে। বড় মেয়ে মালতী তার কলেজের ধনী সহপাঠী শ্যামকে ভালবাসে। ছোট মেয়ে নির্মলা যাকে ভালবেসেছে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ভালবাসতে বাধ্য হয়েছে, সে কিন্তু ধনীর দুলাল নয়, নেহাৎই এক গরীব স্কুলমাস্টারের ছেলে অশোক। এই অশোক আবার নির্মলার বাবা, রামলালের দুটি চক্ষের বিষ; কারণ সে ছিল তাঁরই স্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার—অকর্মণ্যতার দায়ে তার চাকরী যায়। আর ছেলে আত্মা হচ্ছে ফিল্মের ভক্ত; নিজে "বাঃ, বাঃ, প্রোডাকসন্স" নামে একটি ফিল্ম কোম্পানী খুলে একাধারে তার পরিচালক, কাহিনীকার, সঙ্গীত-পরিচালক ও নায়ক সাজতে চায়। সম্প্রতি সে মীনা নামে এক সুন্দরীর দর্শন পেয়েছে; তাকেই সে তার ছবির নায়িকার ভূমিকার জন্য তালিম দিতে ব্যস্ত। গরীব অশোকের প্রেম যাতে সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পারে, তারই জন্যে তার বন্ধু শ্যাম বৃদ্ধ জমিদার গঙ্গাপ্রসাদের বেশে রামলালের কাছে নিজেকে অশোকের বাবা বলে পরিচয় দিল। কিন্তু

পরে যখন শ্যামের বাবা রামলালের মেয়ে মালতীর সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে পাকা করল, তখন দৈবাৎ ফাঁস হয়ে গেল সে, গঙ্গাপ্রসাদ হচ্ছে শ্যামের ছদ্মবেশ এবং অশোক হচ্ছে আসলে গরীব স্কুলশিক্ষকের ছেলে। এরও পরে কি করে তিন জোড়া প্রেম বিবাহ দ্বারা সিদ্ধ হল, তাই নিয়ে কাহিনীর শেষাংশ রচিত।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কাহিনী এখানে প্রমোদোপকরণ সাজাবার উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য আসলে হাসি, নাচ, গান, সংলাপের মাধ্যমে দর্শকদের অফুরন্ত আনন্দ দেওয়া। সেই পবিত্র কাজ যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছে, তা ছবিটির দর্শকমাত্র স্বীকার করতে বাধ্য। শ্যামরূপে কিশোরকুমার একাই একশো; তার উপর আছেন আত্মারূপী মেহমুদ এবং রামলালরূপে ওমপ্রকাশ। নির্মলার ভূমিকায় দক্ষিণ ভারতীয় রাজশ্রী, মালতীরূপে কল্পনা এবং মীনার ভূমিকায় মমতাজ—তিন প্রণয়িনীরূপে নিজেদের যথাসাধ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এরই মাঝে রোমান্টিক নায়ক অশোকের বেশে শশীকাপুরে নাচ-গানের চূড়ান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে প্রচুর নৈপুণ্যের পরিচয় বর্তমান। আশ্চর্য সব বহির্দৃশ্যের জন্যে নির্বাচিত স্থান—এমন সুরম্য বহির্দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যায়। শিল্পনির্দেশকের বাহাদুরী আছে। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালকৃত চড়া পর্দার সুরে ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ।

শ্রীধরকৃত "প্যার কিয়ে যা" সাধারণ দর্শকদের কাছে অসামান্য উপভোগ্য চিত্র।

—নান্দীকর

কলকাতা

এম বি প্রোডাকসন্সের 'প্রতিদান'

সম্প্রতি মহাঅষ্টমীর পুণ্যদিনে এম বি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় প্রয়াস 'প্রতিদান' চিত্রটির পরিকল্পনা সূচিত হল। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে এটি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন দীনেন গুপ্ত। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল গুপ্তা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায় ও রুমা গুহঠাকুরতা। সম্পাদনা ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সাধন লক্ষণপ্রসাদ।

'মন এলো' চিত্রের শুভমহরৎ

গীতাঞ্জলি ফিল্মসের 'মন এলো' চিত্রের শুভ মহরৎ সম্প্রতি মহালয়ায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন দিলীপ চৌধুরী। অরুণকান্তি সাহা রচিত এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। মহরৎ অনুষ্ঠানের পর ছবির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য গৃহীত হয়।

'প্রথম বসন্ত'র শুভমহরৎ

ছায়ারূপা সংস্থার 'প্রথম বসন্ত' চিত্রের শুভমহরৎ গত ২৭ অক্টোবর টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে পালিত হয়। প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে এটি পরিচালনা করছেন নিমাই মিত্র।

'সেতুবন্ধ' চিত্রের সঙ্গীতগ্রহণ

পরিচালক সুশীল ঘোষের নতুন ছবি 'সেতুবন্ধ'র সঙ্গীত সম্প্রতি ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে গৃহীত হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্যামল মিত্র। এম বি প্রোডাকসন্সের এ চিত্রে দুটি প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে কণ্ঠদান করেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতা সেন, শিপ্রা বসু, মঞ্জুল মিত্র ও শ্যামল মিত্র।

'তিন অধ্যায়' চিত্রের শুভসূচনা

পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী তাঁর নতুন ছবি 'তিন অধ্যায়'র শুভমহরৎ সম্প্রতি কালিকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় গ্রহণ করলেন। শৈলেশ দে রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ ও রবীন মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন গোপেন মল্লিক।

'উত্তরপুরুষ'র শুভমুক্তি

এম কে জি প্রোডাকসন্সের 'উত্তরপুরুষ' এ সপ্তাহের ৪ঠা নভেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। চিত্রকর পরিচালিত ... গাঙ্গুলীর কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রে রূপদান করেছেন বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার ও রবি ঘোষ। ... মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশক হলেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

বোম্বাই

'মাই লাভ' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ শুরু

গত সপ্তাহে পরিচালক শ্রীসুবোধ ... তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'মাই লাভ' চিত্রের বহির্দৃশ্যের জন্য নাইরোবি অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। এখানে কেনা, উগান্ডা এবং টাঙ্গানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় একমাস ধরে ছবির কাজ গৃহীত হবে। এ ছবির শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শশীকাপুর, শর্মিলা ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ, আজরা এবং মদনপুরী।

সংগীতশিল্পী মুকেশ-র নতুন প্রয়াস

দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মুকেশ সম্প্রতি দশেরার পুণ্যদিনে 'মুকেশ ...' এক পরিবেশক সংস্থার গোড়াপত্তন করেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধনে চলচ্চিত্রের ... ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। এই ... সংস্থার প্রথম ছবিটি হবে ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত শিলালয় ফিল্মসের ... ছবি 'অনুপমা'। এ চিত্রের নায়ক নায়িকা ... বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী।

'উপকার' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ শুরু

অভিনেতা, কাহিনীকার এবং পরিচালক মনোজকুমার তাঁর রঙিন ছবি 'উপকার'-এর বহির্দৃশ্যগ্রহণের জন্য সম্প্রতি দিল্লী, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। প্রায় চল্লিশদিন ধরে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন আশা পারেখ, মনোজকুমার, কামিনী কৌশল, প্রেম চোপরা, মনমোহন কৃষ্ণ, মদনপুরী, মনমোহন এবং অসিত সেন। ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

স্টুডিও থেকে বলছি

ভারতের নবজাগরণে জাতীয়তা এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যে ঋত্বিক পুরুষ একদিন বিপ্লবী বাংলার ঝড় তুলেছিলেন তা আজকের স্বাধীন ভারতের তরুণ প্রজন্ম কতখানি মনে রেখেছেন জানি না, তবে ইতিহাস সেকথা ভোলেনি। ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের মহাবিপ্লবী ঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তাঁর মহান জীবনের শততম বর্ষ পালিত হতে আর ছ'বছর বাকী। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি হয়েছে।

সেই থেকে আধ্যাত্মিকতার জগতে নতুন কোন মহাপুরুষের নবজন্ম হয়নি। অথচ আজকের এই অবক্ষয়ের সময় এক আদর্শ পুরুষের আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। তিমিরাচ্ছন্ন জীবনে যতদিন না পর্যন্ত

লিখে পাঠালেন। ১৯০৮ সালে গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশ সরকারের হাতে বন্দী হয়ে কারাজীবন গ্রহণ করেন। এইসময় থেকে শ্রীঅরবিন্দর আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। এক বছর কারাজীবনের পর তিনি মুক্তি পেয়ে ১৯১০ সালে চন্দননগর থেকে পন্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবং বৈপ্লবিক জীবনের সমাপ্তি এখানেই। তারপর পন্ডিচেরী আশ্রমে ঋষি অরবিন্দর আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হয়।

কিন্তু ছবির কেন্দ্রস্থল বৈপ্লবিক জীবনকে কেন্দ্র করে বিবৃত হওয়ায় আলোকচিত্রে ঋষি অরবিন্দর জীবনকে আমরা দেখতে পাবো না। 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন দিলীপ রায়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন যতীন্দ্র—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন—নির্মল ঘোষ, উল্লাসকর—তমাল লাহিড়ী, ঋষি রাজনারায়ণ—প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার পি কে মিত্র—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ—শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপাল বসু—রঞ্জিত সেন, শ্রীমতী ভূপাল বসু—পদ্মা দেবী, সুলতা—শমিতা বিশ্বাস, কানাইলাল—সাধন সেনগুপ্ত, সতোন বসু—অশোক মুখোপাধ্যায়, শার্য্যজি রাও—আশীষ মুখোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র—প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ছবির কলাকুশলী বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন সংগীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্রগ্রহণে দীপক দাস, শিল্পনির্দেশনায় সুনীতি মিত্র, সম্পাদনায় রমেশ যোশী এবং রূপসজ্জায় মদন পাঠক।

প্রহ্লাদ শর্মা পরিচালিত **দেশ হামারা** চিত্রের একটি দৃশ্যে বেবী গুপ্ত, ছবি দাস ও লোলিতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

'কুশীলব'

সম্প্রতি 'কুশীলব' নাট্যগোষ্ঠী 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে অনিলবরণ দত্তের 'এ কি হোল' নাটিকা মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি প্রথমার্ধে খুব জমাট বেঁধে উঠতে পারেনি, কিন্তু শেষদিকের অভিনয় প্রথমার্ধের ক্ষোভকে শান্ত করেছে। বিশেষ কয়েকটি চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বংশী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চট্টোপাধ্যায়, নিমাই দাস, রবীন ভট্টাচার্য, কুমার দত্ত, খোকন সোম, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা ভট্টাচার্য, দীপালি ঘোষ, অমল চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যনির্দেশনায় সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

'মঞ্চমিতা'

'মঞ্চমিতা'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি উমেশচন্দ্র নাগের 'জঞ্জাল' নাটক মঞ্চস্থ করেন মিনার্ভার মঞ্চে। এঁদের দলগত অভিনয়নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। সত্য মৈত্র, রমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় ভট্টাচার্য, শিশির সেন, কমল দে, কৃষ্ণধন গঙ্গোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, উর্মিলা দাশগুপ্ত, নন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝর্ণা দে নাটকটির বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

শরৎ-সাহিত্য সম্মেলন

'শিল্পীসংস্থা'র প্রযোজনায় 'মহাজাতি সদনে' সম্প্রতি শরৎ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজনে 'শিল্পী-সংস্থা'র নিষ্ঠা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কথাসাহিত্যে অপূর্ব জীবনচেতনা প্রকাশের সূত্রে যে শরৎ-প্রতিভা সবার মন ছুঁয়েছে, নাটকেও তা এনেছে এক স্বতন্ত্র আস্বাদ। বোধ হয় এই জন্যই সম্মেলনের তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে তিনটি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সে-রকম নাট্যসংস্থা পাওয়া যায়নি। যে কলকাতায় প্রায় একশোটি ভালো নাট্য-সংস্থা আছে, সেই শহরে শরৎসম্মেলনে নাটক পাওয়া যায় না কেন? এ প্রশ্ন আজ গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রতিদিন সম্মেলনে বিভিন্ন প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকরা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিখুঁত আলোচনা করেন। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন আশাপূর্ণা দেবী। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।

প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে শরৎচন্দ্রের দুটি নাটক অভিনয় করেন অ্যামেচার ইউনিট (গৃহদাহ) ও রঙ্গম্ (বড়দিদি)। দুটি নাটকের অভিনয়ই সামগ্রিকভাবে সুন্দর হয়েছে বলতে হবে। 'গৃহদাহ' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মোদক, অমর ভট্টাচার্য, অসিত ভট্টাচার্য, চিত্রা মুখোপাধ্যায়, রুণু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সুরেশে'র ভূমিকায় হিমাংশু দাসের অভিনয় মোটেই ভালো হয়নি। সুরেশ চরিত্রের গভীরতাকে

শিল্পী কোন মুহূর্তেই মূর্ত করে তুলতে পারেন নি।

'বড়দিদি'র বিভিন্ন ভূমিকায় দক্ষতা দেখিয়েছেন মধুসূদন সেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ফুলচাঁদ সেন, দেবকুমার রায়, ব্রীজমোহন খান্না, শচীন রায়, শচীন মুখোপাধ্যায়, ছন্দা দেবী, মমতা চট্টোপাধ্যায় ও তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক মানু চট্টোপাধ্যায়।

নাটমহলের মিলনোৎসব

'নাটমহলের' দশম বার্ষিক মিলনোৎসব সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হোল ক'লকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে। এই উপলক্ষে একটি সুন্দর বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় বালি সান্ধ্য-সমাজের শরৎবন্দনা ও ভক্তিমূলক দুটি গান দিয়ে। তারপর রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর লোক-সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাদল চক্রবর্তী ও কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থার বিশিষ্ট সভ্য বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য মূকাভিনয় করেন।

প্রখ্যাত নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাণ্ডুলিপি'র (একাঙ্ক) অভিনয় এই অনুষ্ঠানের এক অন্যতম আকর্ষণ ছিল। শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয়ের সংহতি নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন নীহার তালুকদার, চিত্রিতা মণ্ডল, চণ্ডীচরণ দাস, রণজিৎ রায়, সলিল ঘোষ, কৃষ্ণেন্দুপ্রসাদ রায়। নাট্য-নির্দেশনা ও আবহ-সঙ্গীতে ছিলেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ আজিজ খাঁ।

এই মিলনোৎসবের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 'নাটমহলের' সহঃ-সভাপতি অজিতকুমার ঘোষ।

বারাসতে নাট্যাভিনয়

বারাসত সরকারী কর্মচারীদের উদ্যোগে গত ৮ই ও ৯ই অক্টোবর স্থানীয় শঙ্কর রাইস মিল প্রাঙ্গণে 'স্বীকৃতি' ও 'উল্কা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটক দুটির বিভিন্ন ভূমিকায় চিত্ত চৌধুরী, বিপিন মণ্ডল, শ্যামল গাঙ্গুলী, জগা দাস, সুবোধ বসু, মৃণাল বসু, নীলরতন দাশগুপ্ত, মানসী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, ডলি মুখোপাধ্যায়, সবিতা সমাদ্দার, রীতি ঘোষ সুঅভিনয় করেন। দুটি নাটক সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করেন শ্রীনিরঞ্জন দে।

'সম্রাট অশোক'

গত ১৩ই অক্টোবর মহাজাতি সদনের মঞ্চে সুরগীতি মিউজিক কলেজের ছাত্রীরা তাঁদের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে 'সম্রাট অশোক' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। শ্রীহিমাংশু রায় নৃত্যনাট্যটির সুষ্ঠু পরিচালনায় তাঁর নিষ্ঠা এবং দক্ষতাকে প্রকাশ করতে পেরেছেন। সঙ্গীত-পরিচালনায় শ্রীতরুণ দাসও তাঁর বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করে সবার প্রশংসা অর্জন করেছেন। অশোক চরিত্রে চমৎকার রূপদান করেন গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, অনিমা দাস, পূর্ণিমা দাস, মলি দেব। সঙ্গীতাংশে ছিলেন প্রতিমা দাস, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা ঘোষ। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোক-সম্পাত নৃত্যনাট্যের প্রতিটি মুহূর্তকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছে।

প্রতিযোগিতা

নব ব্যারাকপুর 'শরৎ সঙ্ঘে'র পরিচালনায় প্রবন্ধ, কবিতা, আবৃত্তি এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ডিসেম্বর মাসে। প্রবন্ধের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে 'সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিবর্তন' (সর্বসাধারণের জন্য)। আবৃত্তি—'ফেরারী ফৌজ'—প্রেমেন্দ্র মিত্র (সর্বসাধারণের জন্য); ভজহরি'—রবীন্দ্রনাথ (ছড়ার ছবি)—১২ বৎসর পর্যন্ত। আগামী ২০শে নভেম্বরের মধ্যে সব রকম যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, শরৎ সঙ্ঘ, নব ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা।

শিশু ও কিশোর শিল্পী-সম্মেলন

আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে 'কৃষ্টি' আয়োজিত শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য, গল্প বলা, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা প্রভৃতি বিষয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসাহী শিশু ও কিশোর শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে আগামী ২০শে নভেম্বরের মধ্যে সদস্যপদ সংগ্রহ করতে হবে—সম্পাদক, 'কৃষ্টি', ২৮নং অনন্তরাম মুখার্জী লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।

গানের জলসা

বলাকা

উত্তর কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বলাকা'র দশম বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন উদ্‌যাপিত হল ৩রা সেপ্টেম্বর। এতদুপলক্ষে শ্রীপ্রেমময়ের এঁরা এক প্রাতঃকালীন জলসায় সঙ্গীত চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিমাংশু বিশ্বাসের কণ্ঠ-সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। পরিশেষে 'সাত পাকে বাঁধা' ছায়াছবি প্রদর্শিত হল।

সঙ্গীত-বীথি

১৪ই সেপ্টেম্বর সঙ্গীতবীথির ৩২তম বার্ষিক সমাবর্তন ও পুরস্কার বিতরণোৎসব পালিত হল মহাজাতি সদনে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ এক সান্ধ্য জলসার আয়োজন করেছিলেন। সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীসুহৃদ রুদ্র, প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

পণ্ডিত প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণের শাস্ত্রবাচনের পর শিশু-শিল্পীর দল কথক নৃত্যের মাধ্যমে "বাদল-বাউল" নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করেছেন। এঁদের অনেকের নৃত্যভঙ্গিতে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর ছিল।

কথক নৃত্যে শ্রীমতী মঞ্জুলিকা মাইতি, একক সঙ্গীতে স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় ও শেফালী ঘোষ ও শক্তি মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানের পর এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অধ্যাপক ভূপেন দাশগুপ্তের পরিচালনায় সমবেত গীটার ও অধ্যাপক গৌরহরি কবিরাজের পরিচালনায় সেতার ও এস্রাজে মিলিত সুর পরিবেশন করলেন।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল কবিগুরুর "সামান্য ক্ষতি" অবলম্বনে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুষ্ঠিত 'বিলাসিনী' নৃত্যনাট্য।

দিনেন্দ্র-সঙ্গীতায়তন

গত ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শ্যামবাজার মিত্রভবনে রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-রচনা থেকে উপযোগী পাঠ ও আবৃত্তিসহযোগে দিনেন্দ্র-সঙ্গীতায়তন কর্তৃক একটি বর্ষা-অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। একক সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অমূল্যকুমার দাস, বাসবী চক্রবর্তী, অঞ্জলি ঘোষ, সম্মেলক সঙ্গীতে উল্লিখিত শিল্পিগণ ও এষা রায়, অঞ্জলি পাল, তপন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পাঠ ও আবৃত্তি করেন মীরা রায়চৌধুরী ও সাধনচন্দ্র সরকার। পরিচালনা করেন প্রফুল্লকুমার দাস। অনুষ্ঠানটি সমগ্রভাবে উপভোগ্য হয়েছিল।

চিত্তগ্রাহী ঠুংরী অনুষ্ঠান

সঙ্গীতজগতের বহু বিশিষ্ট শিল্পী পরিচালিত "সাতরং" প্রতিষ্ঠান এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতের আসর উপহার দিয়েছিলেন গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ক্যানাল স্ট্রীটে। দুই নবাগত শিল্পী গোলাম আলি খান (বড়ে গোলাম নয়) ও রেবা মুহুরীকে এঁরা কোলকাতার কলারসিক মহলে এই প্রথম উপস্থিত করলেন।

গোলাম আলি খান স্বর্গত গোলাম আব্বাসের পুত্র। এঁরা আগ্রার সুবিখ্যাত নাদল খাঁর বংশধর। খাঁ সাহেব যথাক্রমে এমন, রাগেশ্রী এবং মালকোষরাগে তারাণা গেয়ে শোনালেন। সদ্য ইনফ্লুয়েঞ্জামুক্ত শিল্পীর কণ্ঠ সেদিন রোগাক্রান্ত। এটা শিল্পী শ্রোতা উভয়পক্ষেরই দুর্ভাগ্য নিশ্চয়। কিন্তু অপরিসীম মনোবল ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে, কণ্ঠের এই বিরোধিতাকে কাটিয়ে খাঁ সাহেব যেটুকু পরিবেশন করতে
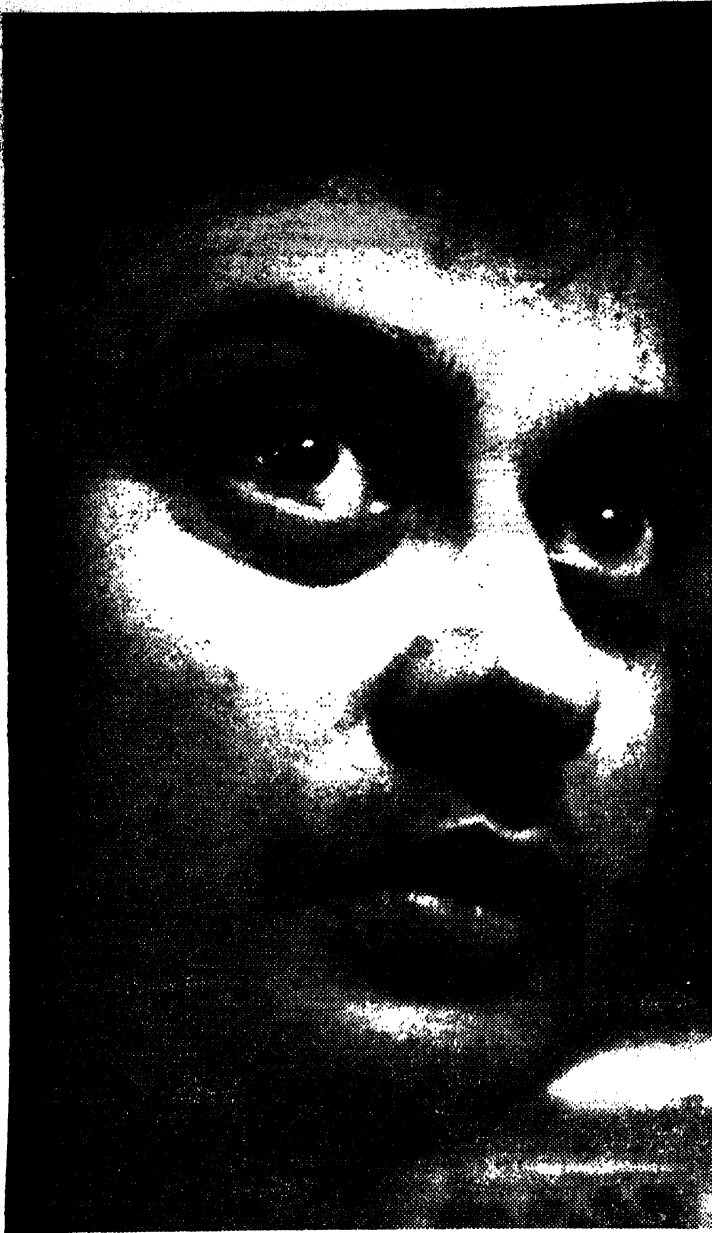
রাজেন তরফদার পরিচালিত **আকাশ ছোঁয়া** চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি

পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর শ্রমলব্ধ শিক্ষা, রেওয়াজের পরিচয় মুদ্রিত। কিছু দুঃসাধ্য তানে খাঁ সাহেবের লয়জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যও সুপরিস্ফুট। কিন্তু ভীষ্মদেবের গায়কীর মাধ্যমে, বাদল খাঁর ঘরের যে মাধুর্য, ভাবুকতা ও আঙ্গিকোত্তীর্ণ সংগীত-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশের শ্রোতা পরিচিত সেই রসবস্তুর কোনো আভাস খাঁ সাহেবের গানে পাওয়া গেল না, তাঁর আঙ্গিকদক্ষতা ও তানশৈলীর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়েই এ সত্য ক্ষোভের সঙ্গেই ব্যক্ত করছি। তাছাড়া তানের অতিরিক্ত কসরৎ ও সরগমের চকিবাজী শুধু গানের ভাবকেই ব্যাহত করে না; এতে কণ্ঠলালিত্য হানির সম্ভাবনাও থাকে।

কিন্তু সব ক্ষোভ মিটে গেল, অকস্মাৎ আবির্ভূতা অতিথিশিল্পী শ্রীমতী রেবা মুহুরীর ঠুংরী, দাদরা ও টপ্পা শুনে। একঝলক মুক্ত হাওয়ার মত যেন তিনি সভায় বসলেন। নবাগতা, কিন্তু আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়মুক্তা। "তোব কাঁয়সে যা"—গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন রঙে, রসে, আনন্দে মাধুর্যে, শ্রোতৃমহল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। যেমন প্রসন্ন 'মেজাজ', তেমনি গায়নভঙ্গী, যেমন সুরেলা তেমনই রসময়ী। প্রতিটি গানের কথায় অর্থপূর্ণ ঝোঁক নেওয়া, হঠাৎ থামার চমক আবার সহজ সুরের সূক্ষ্ম মীড়ের নিটোল দানার উজ্জ্বল্য একই কথার আবৃত্তি নতুন ব্যঞ্জনায়, বিচিত্র অর্থে সত্যিকারের শিল্পী-হৃদয়ের সুন্দর প্রকাশ। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের হার্মোনিয়ম সঙ্গত আসরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

ইনি বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ ও শিল্পী শ্রীঅমিয় সান্যালের কন্যা। অমিয়বাবু পূরব অঙ্গের ঠুংরীর নবস্রষ্টা এ সত্য সঙ্গীত-রসিক মাত্রেরই জানা। সুযোগ্য গুরুর শিক্ষার মর্যাদাজাত সংযম তার সঙ্গে যথোচিত শৃঙ্গার রসের এলায়িত লীলায়িত মাধুর্য মিশে 'ঠুংরী'র আসরের এক যোগ্য শিল্পীর জন্ম হয়েছে যেন। বহুদিন এমন ঠুংরী শোনা যায়নি। অতি কাছের, বাংলারই সম্পদ এক নূতন শিল্পীকে উপহার দেওয়ার জন্য 'সাতরং' এর কর্মকর্তারা ধন্যবাদার্হ।

পাটনায় সঙ্গীত সম্মেলন

মহাঅষ্টমীর দিন থেকে শুরু হয়েছিলো পাটনার মারুফগঞ্জ সঙ্গীত সম্মেলন। বড়ী দেবীকা—পূজা বেদীর সামনে বিস্তৃত সংগীতাসরে দুই সহস্রাধিক শ্রোতার ভীড়ে যাকে বলে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। বড়ী দেবী (পাটনাবাসীর ভাষায়), হলেন ওখানকার দীর্ঘতম আকৃতির শ্রীদুর্গাবিগ্রহ।

মহাষ্টমী ও মহানবমীর সারাদিন ও রাত্রিব্যাপী এই সংগীতানুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন পদ্মশ্রী বিসমিল্লা খাঁ ও সম্প্রদায় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক এবং দিল্লী-বোম্বের আধুনিক ও ভাঙগড়া সংগীতের শিল্পীবৃন্দ এছাড়া স্থানীয় শিল্পীবৃন্দও নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করেছেন। গভর্নর এ. এ. আয়েঙ্গার প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সংসদ

নবজাত প্রতিষ্ঠান ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি সংসদের বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে এক মনোরম সান্ধ্য জলসার আয়োজন করা হয়েছিল গত বুধবার রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে।

বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহুধা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবদানের অন্ত নেই। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অবশ্য কর্তব্য জেনে সাংবাদিকমহল, শিল্পীমহল ও বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই সভায় সাগ্রহে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা উপ-মন্ত্রী শ্রীসৌরেন মিশ্র সভার উদ্বোধন করলেন। প্রধান অতিথি শ্রীসত্যভূষণ চ্যাটার্জি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকিশোরের অক্লান্ত সেবা ও দানের উল্লেখ প্রসঙ্গে বললেন—তখনকার ওস্তাদকুল গৌরীপুর দরবারে শুধু আশ্রয়লাভই করেননি। ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক সম্বন্ধটাই বড় ছিল। পদ্মভূষণ আলাউদ্দিন খাঁ ও স্বর্গত এনায়েত খাঁর

সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তাই যেন আজও উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাউদ্দিন খাঁ ও এনায়েতের পুত্রদ্বয়ের মধুর সম্পর্কের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

অনুষ্ঠান শুরু হোলো ধ্রুপদ সঙ্গীত সঙ্গতে শ্রীমতী লিলি লাহিড়ী এবং মঞ্জু লাহিড়ীর নৃত্য দিয়ে। রাগভিরো (চৌতাল), ভৈরবী (ত্রিতাল) ও বাগেশ্রী। এই অনুষ্ঠানের ভালমন্দ বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েও এর ব্যঞ্জনাদ্যোতকতা ও তাৎপর্যকে স্বীকার করতেই হয়। ধ্রুপদ থেকেই আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্ম। আর ভারতীয় সঙ্গীত শুধুমাত্র অবসর-বিনোদনের বস্তু নয়। দেবতার চরণে শিল্পীর অন্তহীন আত্মনিবেদন। ভৈরব ভৈরবী ও বাগেশ্রী রাগের মাধ্যমে যথাক্রমে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী মহাদেব পার্বতী ও বাগদেবীর আরাধনা দিয়ে সঙ্গীতোৎসব শুরু করা যে অত্যন্ত 'এস্থেটিক' এ সত্য সন্দেহাতীত। সঙ্গীত ও অর্কেষ্ট্রা রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী অরুণা বাগচি ও বিজয়া চ্যাটার্জি।

শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী 'কেদারা' ও 'সোহিনী' রাগ পরিবেশন করলেন। শ্রীমতী চক্রবর্তী বহু যত্ন ও শ্রমের সঙ্গে উপযুক্ত গুরুর কাছে 'আগ্রা' ঘরানার আঙ্গিক শিক্ষা করেছেন। তাঁর অনুত্তেজিত ও ধীর বিস্তারে তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত। কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রশংসা করলেন।

যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন প্রবীণ শিল্পী ভি. জি. যোগ। নবীন শিল্পী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও ইমরাৎ খাঁ। সঙ্গতে ওস্তাদ কেরামত খাঁ। এঁরা নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

ভিনদেশী ছবি

জেমস বণ্ড চিত্রের যুক্তরাষ্ট্রের পুরস্কার লাভ

আমেরিকান লরেল এ্যাওয়ার্ড বার্ষিক ভোটে ব্রিটিশ গ্রন্থকার ইয়ান ফ্লেমিং রচিত জেমস বণ্ড চিত্র 'সিক্রেট এজেন্ট ০০৭' সর্বাধিক সাফল্যলাভ করেছে।

কাবি ব্রোকলি—হ্যারি স্যালটসম্যান প্রোডাকসন্স-এর 'থান্ডারবল' বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাকসন চিত্র বিবেচিত হয়েছে এবং জেমস বণ্ডের ভূমিকাভিনেতা সীন কোনারি সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাকসন তারকা বিবেচিত হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৯০০০ সিনেমা মালিক ও ম্যানেজারদের মধ্যে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। গত বছরের মত এবছরও ব্রিটিশ চিত্র ও কলা-কুশলীরা সবগুলি শাখার ভোটেই সাফল্য লাভ করেছেন।

হ্যারি স্যালটসম্যান প্রোডাকসন্স-এর অন্য একটি ছবি "দি ইপক্রেশ ফাইল" সর্বাপেক্ষা বক্স অফিস সফল বলে বিবেচিত হয়েছে। মাইকেল কেন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ তারকা (আগামী কালের) বিবেচিত হয়েছেন।

নামহীন গোত্রহীন অবাঞ্ছিত প্রাণের পদসঞ্চার শোনা যায়, তখন প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসার ইমারত যায় ভেঙে, এক অজানা ভয় তাদের পেয়ে বসে। যেকোন উপায়ে তারা ঐ অবাঞ্ছিত অতিথিকে পৃথিবীর আলো দেখতে দিতে চায় না, সমস্যার সমাধানে তারা গর্ভপাতেও পিছপা হয় না।

সমাজের এই সমস্যামূলক কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই পশ্চিম জার্মানীর ছাব্বিশ বছরের তরুণ পরিচালক উলরিষ শামোনি 'ইট' (It) নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ ছবি তুলেছেন। ছবির কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহু বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এতে বিনা মজুরিতে বিভিন্ন ভূমিকায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন যেমন স্যাবাইন, মার্সেল মারসু ইত্যাদি। 'ইট' ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ করেছেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কল্পনাপ্রবণ ক্যামেরাম্যান হল্যাণ্ডের গেরার্ড ভানডেনবের্গ। —আই, সি, এস

সর্বশ্রেষ্ঠ ড্রামাটিক অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন রিচার্ড বার্টন (দি স্পাই হু কেম ইন ফ্রম দি কোল্ড), এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ড্রামাটিক অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন জুলি ক্রিষ্টি (ডারলিং)।

বিটলদের প্রথম রঙীন চিত্র 'হেল্প' সঙ্গীতমুখর চিত্রগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

ব্রিটিশ কমেডি চিত্র 'দোজ ম্যাগনিফিসেন্ট মেন এণ্ড দেয়ার ফ্লাইং মেসিন' কমেডি শাখায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে।

বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর, পরেই রয়েছেন জুলি এ্যানড্রুজ। রিচার্ড বার্টন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শাখায় তৃতীয় স্থান পেয়েছেন।

ব্রিটেনের ডেভিড লীন বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিরেকটর বিবেচিত হয়েছেন এবং তাঁর ছবি "ডক্টর জিভাগো" শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় নৃত্য কলা মন্দিরের 'ভারত-ভূমি' নৃত্যনাট্য

নভেম্বর মাসে মহাজাতি সদনে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্য কলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা 'ভারত-ভূমি' স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হবে। নৃত্যে সহকারীরূপে অনুপশঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা।

বিশ-পঞ্চাশ ...

গত ৩০ অক্টোবর বরাহনগরের দুরের পল্লীতে কল্লোলের সভ্যবৃন্দ কিরণ মৈত্রের "বিশ-পঞ্চাশ" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অশ্রু মুখোপাধ্যায় (রামলোচন), সন্তোশ মজুমদার (অচলকুমার), দীপক ভট্টাচার্য (মর্ডানকুমার), অরুণ সেন (অসরলকুমার), গোপাল ব্যানার্জি (অরূপকুমার), কেদার দাস (অঢেলকুমার), রতন মুখার্জি (প্রথম রিপোর্টার), অমর দত্ত (দ্বিতীয় রিপোর্টার) ও বিপুল চ্যাটার্জি (পুলিশ ইন্সপেক্টার) নাটকটি পরিচালনা করেন কল্লোলগোষ্ঠী।

শীলস গার্ডেন লেন বিজয়া সম্মিলনী

গত ২৯ অক্টোবর শীলস গার্ডেন লেন আদি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ চুণীলাল বসু সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে বেতার শিল্পী সুধীন সরকার ও অমলেন্দু পাল সঙ্গীতে ও বিশ্বনাথ ঘোষ বাঁশী বাজিয়ে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দেন। এ ছাড়া শ্রীনির্মল ঘোষ (কালী), কুমারী রেবা সরকার সঙ্গীতে এবং শ্রীঅলোক চৌধুরী, শ্রীপ্রশান্ত ব্যানার্জি যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। তবলাসঙ্গতে সর্বশ্রী সমীর ব্যানার্জি,

অনিল দাস ও প্রফুল্ল ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেন।

গ্রামীণ গীতি সংস্থার 'কাজলরেখা'

গ্রামীণ গীতি সংস্থা তাঁদের দ্বি-বার্ষিক উৎসবে লোক-গীতিনাট্য 'কাজলরেখা' পরিবেশনা করে বিদগ্ধ শ্রোতৃমন্ডলের কাছে প্রশংসিত হয়েছেন। সম্প্রতি মহালয়ার শুভদিনে এটি প্রথম মহাজাতি সদনে পরিবেশিত হল। বিশেষ করে পল্লীগীতি অনুষ্ঠানে এ ধরনের গীতিনাট্য প্রয়াস নাগরিক সংগীতানুরাগীদের কাছে একটি বিশেষ সংযোজন বলে মনে হয়েছে।

বর্তমানে শহুর-জীবনে গ্রামীণ-গীতি পরিবেশনের শুচিতা বড়একটা রক্ষিত হয় না। যার ফলে সনাতনী পল্লীগীতি আজ পথভ্রষ্ট। সুতরাং এই বৈপরীত্য মাহেন্দ্রক্ষণে গ্রামীণ-গীতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে 'গ্রামীণ-গীতি সংস্থার' কৈবল্যপথ প্রতিষ্ঠিত হোক, তা কামনা করি।

রবীন্দ্ররচনায় যেমন বহু গীতিনাট্যের চলন আছে, তেমনি পল্লীগীতিতে দেখি না। গ্রামীণ গীতি সংস্থা প্রযোজিত লোক-গীতিনাট্য 'কাজলরেখা' সেদিক থেকে একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস বলবো। এটি ময়মনসিংহ গীতিকার একটি জনপ্রিয় রূপকথাজাতীয় লোকগাথা। কাজলরেখার করুণ কাহিনীকে কথকতা থেকে গীতিনাট্যে পরিণত করা হয়েছে। নীরব ভালবাসার লাঞ্ছনা এবং বেদনার প্রতিমূর্তি করুণপ্রতিমা কাজলরেখার জীবননাট্য আমাদের মুগ্ধ করে। প্রাচীন বাংলার নারীর সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা এবং আত্মত্যাগের মহৎ নিদর্শন আমরা কাজলরেখা চরিত্রে পেয়েছি। সুতরাং সেদিক থেকে 'কাজলরেখা' সার্থক বলবো।

'কাজলরেখা' গীতিনাট্য প্রযোজনার সৃষ্টির ব্যাপারে ময়মনসিং অঞ্চলের প্রচলিত ব্রতগান, বিচ্ছেদগীতি এবং পদ্মাপুরাণ অংশের কিছু সুরে সংযোজিত হয়েছে। আলোচ্য গীতিনাট্যে নাটকীয়তা ও সুরে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। ভাস্কর বসু রচিত 'কাজলরেখা'র নাট্যরূপ, অসিত চট্টোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় কৃত নৃত্যরূপ এবং দিনেন্দ্র চৌধুরী কৃত সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয় বলা চলে। উপস্থাপনায় 'কাজলরেখা' গীতিনাট্যে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছেন গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব মিত্র, জয়শ্রী লাহিড়ী, পদ্মিনী দাশগুপ্তা, শিবানী দাশগুপ্তা, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা, অমিতা দত্ত, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় বরুণ মুখোপাধ্যায়, রমেশ দত্ত, সুরেশ দত্ত ও প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতে দিনেন্দ্র চৌধুরী, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা দে, শ্যামলীধর চৌধুরী, তৃপ্তি মিত্র, সুনীতা ঘোষ, নরেন চক্রবর্তী, প্রমথ ঘোষ, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, রাণা চৌধুরী, চন্দনকুমার দাস ও শুকদেব চক্রবর্তী। ধারাভাষ্য পাঠ করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীত এবং আলোক সম্পাতে তপন দাস এবং তাপস সেন।

মূল অনুষ্ঠানের আরম্ভে সংস্থা কর্তৃক গ্রাম-বাংলার বিশেষ বিশেষ যে পল্লীগীতিগুলি পরিবেশিত হল তা সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না। বিশেষ করে শিল্পীদের কণ্ঠে তেমনি গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি। শহরে শিল্পরা যেন ভুলে না যান, শহরে বসে গাইলেও গ্রামীণ গীতি হচ্ছে গ্রাম-বাংলার গান। তার রূপ এবং রস গ্রামীণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে আলোকচিত্রশিল্পী সুধীশ ঘটক

গত ২১ অক্টোবর বিখ্যাত আলোক-চিত্রশিল্পী ও পরিচালক সুধীশ ঘটক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

সবাকচিত্রের প্রথম যুগ থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে সুধীশ ঘটক যোগদান করেন। নিউ থিয়েটার্সের বহু স্বনামধন্য চিত্রের তিনি একজন কৃতি চলচ্চিত্রকার ছিলেন। আলোকচিত্র-গ্রহণ ছাড়াও শ্রীঘটক 'রাধারাণী' ও 'পঞ্চাস্রোত' ছবি দুটি পরিচালনা করেন। এছাড়া ফিল্ম ডিভিশনের সংবাদচিত্র প্রযোজনায় তিনি আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। এই সংবাদচিত্র প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন বম্বের ঐতিহাসিক বন্দর দুর্ঘটনার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে দলিল-চিত্র গ্রহণে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন।

আলোকচিত্রগ্রহণে বহু পরীক্ষায় সার্থক শ্রীঘটকের নাম ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে লেখা থাকবে। প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতির দায়িত্ব পূর্ণ পদে তিনি গত কয়েক বছর ধরে বহন করে আসছিলেন। অসুস্থ হবার আগে তিনি বিমল রায় প্রোডাকসন্সের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীঘটক পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের অগ্রজ ভ্রাতা ছিলেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর': সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিলাভ করছে

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' অচিরেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিলাভ করছে। সম্প্রতি 'সোভেকসপোর্ত' ফিল্ম সংস্থা 'মহানগর' চলচ্চিত্রটি ক্রয় করেছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তা সারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হবে। 'মহানগর'ই হবে শ্রীরায়ের প্রথম ছবি যা সারা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে। ছবিটি এখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের ভাষায় 'ডাবিং' করা হচ্ছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর 'মহানগর' ছবিটির আসন্ন মুক্তি প্রসঙ্গে পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় কলকাতায় 'এ-পি-এন' সংবাদদাতার কাছে বলেন, 'মহানগর আমার খুব প্রিয় ছবি। আমি আশা করি এই ছবিটি সোভিয়েত দর্শকরা নিতে পারবে। নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা ও জটিলতা ছবিটিতে স্থান পেয়েছে বলে এর একটা নিজস্ব আবেদন আছে।" শ্রীরায় বলেন যে, ছবিটি মুক্তি পেলে সোভিয়েত সংবাদপত্রে সে সম্পর্কে কি আলোচনাদি বের হয়, তা জানার জন্যে তিনি উৎসুক হয়ে থাকবেন।

সম্প্রতি সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক এম কালাতোজোভ ও চলচ্চিত্র-সমালোচক আই ভেইসফিল্ড যখন ভারতে এসেছিলেন তখন "মহানগর" ছবিটি তাঁরা দেখেন।

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে শ্রীরায় আরও বলেন যে, ভারতেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আরও বেশি সোভিয়েত চলচ্চিত্র দেখানর ব্যবস্থা করা উচিত বলে তাঁর মনে হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতস্তোত্রম্

গত ২০শে অকটোবর বার্ণপুরস্থ ছোট দিয়ারী টাউন পূজা কমিটির আহ্বানে কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলীর সুপ্রাচীন সংগীত শিক্ষালয় "ঘুঙুর" (বেড়িয়া) কর্তৃক "শ্রীশ্রীচণ্ডী-গীত স্তোত্রম্" উক্ত পূজা-কমিটির পূজা মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। সংকলন, ভাষ্য ও গীত রচনা এবং গ্রন্থনায় ছিলেন শ্রীমুরারী চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীসৌরেন পালের সঙ্গীত পরিচালনায় কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সৌরেন পাল, সুষমা সিংহ, রঞ্জিৎ পাল, অঞ্জলি মজুমদার, রাধা বিশ্বাস (তবলা), শ্যামদাস বন্দ্যো (বেহালা) গোবিন্দ মতিলাল (গীটার ও মন্দিরা) ও সোমেন দে (বাঁশী)। ভক্তিমূলক এই অনুষ্ঠানটি উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়।

কল্যাণী টাউন ক্লাবে অতুলপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী

কল্যাণী টাউন ক্লাবের সভা-শিল্পীরা গত ১৩ই অকটোবর মহালয়ার পূণ্যদিনে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের ৯৫তম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে পালন করেন। প্রখ্যাত ছায়াচিত্র শিল্পী শ্রীপাহাড়ী সান্যাল প্রধান অতিথির এবং ক্লাবের সভাপতি ডক্টর সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথিরূপে শ্রীপাহাড়ী সান্যাল তাঁর ভাষণে অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলেন এবং অতুলপ্রসাদের নানা গুণাবলীর বর্ণনা দেন। যথাক্রমে সর্বশ্রী শংকর রায়, ধীরাজ বিশ্বাস, জয়শ্রী গুপ্ত, নানক চট্টোপাধ্যায়, সর্বাণী সেন, কাকলী ঘোষ, ছন্দা রায়, স্নেহ চৌধুরী, দিলীপ রায়, শেখর চৌধুরী, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য এবং সোমেন গুপ্তের কণ্ঠে গাওয়া অতুলপ্রসাদের গানগুলি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানের শেষভাগে সংস্থার বিশেষ অনুরোধে পাহাড়ী সান্যাল অতুলপ্রসাদের রচিত কয়েকটি গানের কলি গেয়ে শোনান।

প্রাচ্যের ওলিম্পিক

অজয় বসু

নয়াদিল্লী, ম্যানিলা টোকিও, জাকার্তার পর ব্যাঙককে এশীয় ক্রীড়ার আসর সাজানো হয়েছে এবার। প্রাচ্যের জনজীবনে এশীয় ক্রীড়ার গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম। কাজেই ডিসেম্বরের আসন্ন অনুষ্ঠান ঘিরে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আজ সাজ-সাজ রব সোচ্চার।

এশিয়ান গেমস প্রাচ্যের বৃহত্তম, শ্রেষ্ঠতম ক্রীড়া অনুষ্ঠান। ওলিম্পিক শব্দ ব্যবহারে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির আপত্তি রয়েছে। নইলে এশীয় ক্রীড়াকে অসংকোচে 'প্রাচ্যের ওলিম্পিক ক্রীড়া' এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা চলতো। আন্তর্জাতিক কমিটি ওলিম্পিক ক্রীড়াকে সার্বজনীন অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখতে চান। সেই মর্যাদা দিতেও এই কমিটির আগ্রহ। তাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদে ওলিম্পিক সংগঠনে আন্তর্জাতিক কমিটির প্রবল আপত্তি।

আঞ্চলিক ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলিকে আঞ্চলিক ওলিম্পিক রূপে চালু রাখলে একদিকে যেমন সার্বজনীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মর্যাদা হানির, অন্যদিকে তেমনি ওলিম্পিক শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহারের আশঙ্কা রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক কমিটির সুস্পষ্ট নির্দেশে আঞ্চলিক ক্রীড়ার নামকরণের সময় ওলিম্পিক শব্দটিকে ব্যবহার করা চলে না। তবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও এশীয় ক্রীড়া যাই হোক না কেন, বেসরকারী মর্যাদার নিরিখে এই অনুষ্ঠান প্রাচ্যের ওলিম্পিক ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কারণ এশীয় অঞ্চলে এই অনুষ্ঠান সার্বজনীন ভিত্তিতেই আয়োজিত।

ভারতের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে নতুন দিল্লীতে আনুষ্ঠানিক মর্যাদায় এশীয় ক্রীড়া সর্বপ্রথম হয় ১৯৫১ সালে। ওলিম্পিকের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং মূল কাঠামোর দিকে নজর রেখে যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল তার বাস্তব রূপ দেখা যায় দিল্লীতে। কিন্তু তার আগে বেশ কিছুদিন এশীয় অঞ্চলে এই জাতীয় একটি ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রচলনে সক্রিয় প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। সেই চেষ্টার পরিণামে প্রাক ১৯৫১ সালে এশিয়ার এখানে ওখানে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার টুকরো টুকরো অনুষ্ঠান হয়েছে। এশীয় ক্রীড়া সংগঠনের ইতিহাসে এই সব বিক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান ও বিক্ষিপ্ত উদ্যমেরও ভূমিকা রয়েছে। এশীয় ক্রীড়ার ইতিহাস স্মরণে সেই সব বিক্ষিপ্ত কাহিনীও মনে রাখা দরকার।

অন্ততঃপক্ষে দুটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের কথা স্মরণে থাকা প্রয়োজন। একটি পশ্চিম এশীয় ক্রীড়া, অপরটি দূরপ্রাচ্য ওলিম্পিক ক্রীড়া নামে পরিচিত।

পশ্চিম এশীয় ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছিল ১৯৩৪ সালে নয়াদিল্লীতে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল ভারত, আফগানিস্থান, সিংহল ও প্যালেস্টাইন। পশ্চিম এশীয় ক্রীড়া আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির স্বীকৃতিও পেয়েছিল এবং চারবছর পর প্যালেস্টাইনে এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় আসর বসার কথাও ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের গরম হাওয়ার জন্যে সে পরিকল্পনা স্থগিত তথা একেবারে বাতিল হয়ে যায়।

দূর প্রাচ্য ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান আরও প্রাচীন। আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৩ সালে ম্যানিলায় এবং এই প্রতিযোগিতার দশটি অনুষ্ঠানও হয়েছিল। এক হিসাবে এই দুটি অনুষ্ঠানকেই এশীয় ক্রীড়ার উৎস বলে মনে করা যায়।

অ্যাথলেটিক, সাঁতার, টেনিস, ফুটবল বাস্কেট, ভলি ও বেসবল, এই সাতটি বিভাগীয় ক্রীড়া ছিল প্রথম দূরপ্রাচ্য ওলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সূচীভুক্ত। ত্রিদলীয় সেই প্রতিযোগিতার সাফল্য লক্ষ্য করে দু বছর অন্তর দূরপ্রাচ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া ম্যানিলাতেই। সেই থেকেই এই অনুষ্ঠান প্রাচ্যের ওলিম্পিক নামে প্রচারিত হয়েছে এবং ১৯১৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠিত হয়েছে দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। ম্যানিলার পর সাংহাইয়ে ও তারপর পর্যায়ক্রমে টোকিও, ম্যানিলা, সাংহাই, ওসাকা, ম্যানিলা, সাংহাইয়ে দূরপ্রাচ্য ক্রীড়ার আসর বসে।

১৯২৭ সালে দূরপ্রাচ্য ক্রীড়াকে চতুর্বার্ষিকী অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয় এবং পরবর্তী দুটি অনুষ্ঠান হয় যথাক্রমে টোকিও ও ম্যানিলাতে। ১৯৩৪ সালে ম্যানিলায় দূরপ্রাচ্য ক্রীড়ার দশম অনুষ্ঠানের পরই এই আয়োজনের ওপর দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়। মাঞ্চুকুকে অনুমোদন করার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি বিভক্ত হয়ে পড়ায় দূরপ্রাচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানকে যে ভাঙন ধরে তা অবিলম্বে মেরামত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দূরপ্রাচ্য ক্রীড়া আরম্ভ হয়েছিল তিনটি দেশকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগী সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি। তাই এই অনুষ্ঠানের আশানুরূপ প্রসারও ঘটেনি। উদ্যোক্তারা মাঝে মাঝে অন্য অঞ্চলকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু সেকালের প্রতিকূল পথ-সংযোগ ও আনুষঙ্গিক অন্য অসুবিধের চাপে পড়ে আমন্ত্রিত অন্য পক্ষরা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দূরপ্রাচ্য ক্রীড়াঙ্গনে এসে হাজিরা দিতে পারেনি।

চতুর্থ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতই ১৯৩০ সালে টোকিওর অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে উপস্থিত ছিল। মালয় ও [illegible] শ্যাম সিংহল ও ফরাসী ইন্দো-চীন আমন্ত্রণ পেয়েছিল অনেকবার। কিন্তু কোনোবারেই দূরপ্রাচ্য ক্রীড়ায় যোগ দিতে পারেনি।

১৯৩৪ সালে ম্যানিলায় দূরপ্রাচ্য ক্রীড়ার দশম অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর এশীয় অঞ্চলে একটি প্রতিনিধিমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধামাচাপা পড়ে থাকে। একেই সংশিষ্ট পক্ষরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর মহাযুদ্ধ। তবে যুদ্ধান্তে ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার আয়োজন এশীয় অঞ্চলের ক্রীড়া সংগঠকদের আঞ্চলিক ক্রীড়া পরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে আলোচনা করার মতো সুযোগ জুগিয়ে দেয়।

ওলিম্পিক উপলক্ষে লণ্ডনে সমাগত এশিয়ার ক্রীড়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে এশীয় ক্রীড়া প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনার যে নির্বিঘ্ন অবকাশ ঘটবে সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়াকর্ণধার অধ্যাপক শ্রীগুরুদত্ত সোন্ধী। সোন্ধী তাই লণ্ডন ওলিম্পিকের আগে এশীয় ক্রীড়া পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারতীয় ওলিম্পিক এসোঃর অনুমোদন নিয়েছিলেন এবং জন ও রাষ্ট্র নায়ক শ্রীজওহরলাল নেহরুর আশীর্বাদও লাভ করেছিলেন।

সোন্ধীর প্রস্তাবে পণ্ডিত নেহরু থেকে সুরু করে ভারতীয় ওলিম্পিক এসোঃর কর্ণধারেরা পর্যন্ত এমনই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে বিনাকালক্ষেপে এশীয় অঞ্চলে একটি ব্যাপক ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠনে সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব তাঁরা তখনই অধ্যাপক সোন্ধীর হাতে তুলে দেন। সেই অধিকার হাতে পেয়ে অধ্যাপক সোন্ধী এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯৪৮ সালেই এশীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু লণ্ডন ওলিম্পিকের ব্যস্ততার জন্যে সেই বছরেই প্রস্তাবিত এশীয় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনেকেই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করায় অধ্যাপক সোন্ধীকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

এই প্রতীক্ষার অবসান হয় লণ্ডনে ওলিম্পিক অনুষ্ঠানকালে। লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ার নানান অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। অধ্যাপক সোন্ধীর উৎসাহে তাঁদের নিয়ে ৮ই আগস্ট মাউন্ট রয়াল হোটেলে এক সম্মেলন বসে এবং সেই সম্মেলনে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার এবং ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নতুন দিল্লীতে এশীয় অ্যাথলেটিকস প্রথম অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এশীয় ক্রীড়ার সংগঠনে লণ্ডনের এই প্রতিনিধি সম্মেলনের গুরুত্ব ঐতিহাসিক। তাই সেই সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম আজ স্মরণ করছি। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধী ও এ সি দাস (ভারত) চ্যাং চান পান ও কোসিসন (কোরিয়া), গুনসান হন (চিয়াং চীন) জর্জ বি ভার্গাস, সিমিয়ন জি টোরিবিও, ক্যান্ডিডো সি বার্টোলোমি (ফিলিপাইন) প ক্ষিন (বর্মা) ও ডব্লিউ এইচ ডি পেরেরা (সিংহল)।

লণ্ডন সম্মেলনে আরও স্থির করা হয় যে ১৯৪৯ সালে প্রস্তাবিত এশীয় অ্যাথলেটিকস হবে আমন্ত্রণমূলক ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানকে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় এশীয় ক্রীড়ার ব্যাপক কাঠামোয় রূপান্তরিত করতে হবে।

কিন্তু অনিবার্য কতকগুলি কারণে প্রস্তাবিত এশীয় অ্যাথলেটিকস ১৯৪৯ সালে হয়নি। তবে তার বদলে ১৯৪৯ সালেই (১২ই—১৩ই ফেব্রুয়ারি) নতুন দিল্লীতেই এশীয় ক্রীড়া প্রতিনিধি সম্মেলন বসে। লণ্ডনের অনুপাতে এই সম্মেলনের চেহারা ছিল বড় এবং এই সম্মেলনেই এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অনুমোদন করে ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৫০ সালে দিল্লীতে প্রথম এশীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং সেই সিদ্ধান্ত ক্রমেই এশীয় ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠান দিল্লীতেই হয়। তবে ১৯৫০ সালে নয়, পরের বছরের মার্চ মাসে।

এশীয় ক্রীড়া সংগঠনে অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধী এবং ভারতের ভূমিকা স্মরণীয়। তবু অধ্যাপক সোন্ধী ও ভারতকে জাকার্তায় রাজনীতিক মতবাদের প্রতিকূলে চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তবে জাকার্তার সেই দুঃস্বপ্নকে আজ নতুন করে স্মরণ করার দরকার নেই। রাজনীতির যে খেলায় মেতে উঠে চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ার সংগঠক ইন্দোনেশিয়া ১৯৬২ সালে ভারত ও ভারতীয় অধ্যাপক শ্রীগুরুদত্ত সোন্ধীর প্রতি অবিচার করেছিল এবং এশীয় ক্রীড়া সনদের মর্যাদাহানির কারণ ঘটিয়েছিল সেই রাজনীতির প্রভাব থেকে ইন্দোনেশিয়া আজ মুক্ত। আজকের ইন্দোনেশিয়াও জাকার্তা ক্রীড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ভুলে প্রীতি বিনিময়ের সংকল্পে আবার ভারতের কাছে আসতে চাইছে।

অলিম্পিক ক্রীড়ার মতো এশীয় ক্রীড়ারও মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি বিনিময় করা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল লক্ষ্য এশিয়ার মৈত্রী। জাকার্তা না পারলেও নতুন দিল্লী, ম্যানিলা ও টোকিও এশীয় ক্রীড়ার আর তিনটি কেন্দ্র এই লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেকটা এগিয়েছিল। বিশ্বাস করা যায় যে পঞ্চম ক্রীড়াকেন্দ্র ব্যাঙ্ককও এই লক্ষ্য থেকে এক কণাও সরে আসবে না।

১৯৫১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত, এই বারো বছরে এশীয় ক্রীড়ার প্রসারও ঘটেছে। রাজনীতিক পথ ও মতের আড়াআড়িতে দু-একটি অঞ্চল এই আয়োজন থেকে আজও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বটে। তবুও নতুন নতুন দলের যোগদানে এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান এশিয়ায় মৈত্রী প্রসারে ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়ার পথের সন্ধান করে নিচ্ছে নিশ্চয়ই।

১৯৫১ সালে নতুন দিল্লীতে এশীয় ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল মাত্র এগারোটি দেশ। চার বছর পর ম্যানিলাতে

তালকুঞ্জ — নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

আর সাতটি এবং ১৯৫৮ সালে টোকিওতে এই আসরে এসে উপস্থিত হয় সব সমেত একুশটি দেশ। রাজনীতিক মতবাদের ব্যবধানের জন্যে জাকার্তায় প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল সতেরো। তবে আগেই বলেছি যে জাকার্তার পরিস্থিতি ছিল ভিন্নতর, অস্বাভাবিক। ক্রীড়ানুষ্ঠানের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জাকার্তা রাজনীতির প্রভাবকে শিরোধার্য মেনে এশীয় ক্রীড়ার আদর্শকে প্রচণ্ড ঘা বসিয়েছিল।

চার বছর পর এশিয়ার এখানে-ওখানে রাজনীতিক বিপ্লব ঘটে যাওয়ায় এশীয় ক্রীড়ার আদর্শে যারা অবিশ্বাসী তাঁদের অবস্থাটা পিছু হটা ভাবের মতো। কাজেই ব্যাঙ্কক সম্বন্ধে আশংকার বিশেষ কিছু নেই। ব্যাঙ্কক আদর্শে অবিচল থাকুক। সুষ্ঠু সংগঠনের আশীর্বাদে এশীয় ক্রীড়ার মানকে আরও উন্নত করায় সহায়তা করুক। সারা এশিয়ার ক্রীড়ামোদী সম্প্রদায় আজ এই এই প্রার্থনাই জানাচ্ছে।

যে আদর্শ অনুসরণে একদিন এশীয় ক্রীড়া প্রথম আয়োজিত হয়েছিল সেই আদর্শই এই অনুষ্ঠানকে পথের জোগাক। এশীয় ক্রীড়া সত্যিই প্রাচ্যের অলিম্পিকের মতো সার্বজনীন ক্রীড়ানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হোক, ব্যাঙ্কককে আজ আমরা এই শুভেচ্ছাই জানাচ্ছি। প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিকের আলো জ্বলেছিল। সেই আলোতে একালের দুনিয়াও চলার পথের হদিশ জেনেছে তেমনি এশীয় ক্রীড়ার যে আলো জ্বলেছিল প্রথম ভারতেরই মাটিতেই সেই দীপ অনির্বাণ থেকে দিক-বিদিক আলোকিত করে তুলুক।

খেলাধূলা

দর্শক

মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চারদিনব্যাপী ফাইনাল খেলায় গত বছরের রানার্স-আপ স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া একাদশ দল ১৬ রানে ইণ্ডিয়ান স্টারলেটস একাদশ দলকে পরাজিত করে সুরম্য মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে। শেষ অর্থাৎ চতুর্থ দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭৫ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া একাদশ দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর দল বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। মাত্র ১৩৫ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। দলের সর্বভারতীয় খেলোয়াড় কুন্দরন (২৮ রান), হনুমন্ত সিং (১৮ রান) এবং অজিত ওয়াদেকার (১১ রান) ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। দলের সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন মিলখা সিং। সেলিম দুরানী ৩২ রানে দলের ৬টা উইকেট পান। প্রথম দিনে খেলায় স্টারলেটস দল ৫ উইকেট খুইয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করে। ব্যাঙ্ক দলের প্রথম ইনিংসের ১৩৫ রান অতিক্রম করতে তাদের আর ৪২ রানের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় দিনে ২৪৩ রানের মাথায় স্টারলেটস দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ১০৮ রানে অগ্রগামী হয়। দলের পক্ষে বোরদে সর্বোচ্চ ৪৮ রান সংগ্রহ করেন। দিনের শেষে ব্যাঙ্ক দল ১টা উইকেট খুইয়ে ১৩৮ রান তুলেছিল। কুন্দরন ৬৫ এবং অজিত ওয়াদেকার ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে ৩৬২ রানের মাথায় ব্যাঙ্ক দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। দলের সর্বোচ্চ ৮২ রান করেন কুন্দরন। স্টারলেটস দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি। তারা এই দিনে ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪০ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে স্টারলেটস দল যখন পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে তখন খেলায় জয়লাভের জন্যে তাদের ২১৫ রানের প্রয়োজন ছিল। এদিকে হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট এবং ২৩০ মিনিট সময়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে হায়দার আলী এবং চাঁদু বোরদে মূল্যবান ১১৯ রান এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং সেলিম দুরানী ৬১ মিনিটের খেলায় দলের ৯৭ রান তুলেছিলেন। বোরদে ২১০ মিনিট খেলে তাঁর ৮২ রান (বাউণ্ডারী ৬) সংগ্রহ করে ছিলেন।

হনুমন্ত সিং

ব্যাটিংয়ে চাঁদু বোরদে (স্টারলেটস) এবং বোলিংয়ে সরদ দিবাদকর (স্টেট ব্যাঙ্ক) ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

স্টেট ব্যাঙ্ক : ১৩৫ রান (মিলখা সিং ৪০ রান। সেলিম দুরানী ৩২ রানে ৬ উইকেট)
ও ৩৬২ রান (কুন্দরন ৮২, হনুমন্ত সিং ৬৩, ভি সুব্রহ্মণ্যম ৫৫, অজিত ওয়াদেকার ৫৬ এবং গোবিন্দরাজ ৫৯ রান। জয় সোলী ১১৫ রানে ৫ এবং মোহন ১১৬ রানে ৪ উইকেট)।

চাঁদু বোরদে

ইণ্ডিয়ান স্টারলেটস : ২৪৩ রান (চাঁদু বোরদে ৪৮ এবং সেলিম দুরানী ৪০ রান। দিবাদকর ৭৪ রানে ৫ এবং অশোক যোশী ৮৫ রানে ৩ উইকেট)
ও ২৩৮ রান (চাঁদু বোরদে ৮২, সেলিম দুরানী ৪৭' এবং হায়দার আলী ৪৬ রান। সরদ দিবাদকর ৭২ রানে ৬ উইকেট)।

নেহরু ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

দিল্লীতে আয়োজিত ২য় বার্ষিক নেহরু স্মৃতি ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের ফাইনালে বৈদেশিক খেলোয়াড়রাই শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল : সেমি-ফাইনালে বিশ্ববিশ্রুতা শ্রীমতী জুডি হাসম্যানের (আমেরিকা) এবং ভারতবর্ষের দুই প্রখ্যাত খেলোয়াড়—দীনেশ খান্না ও সুরেশ গোয়েলের পরাজয়। শ্রীমতী হাসম্যান হল্যাণ্ডের কুমারী উমরি রিটভিল্ডের কাছে ৯—১১ ও ৪—১১ পয়েণ্টে পরাজিত হন। ভারতীয় চ্যাম্পিয়ান সুরেশ গোয়েল ৭—১৫ ও ৫—১৫ পয়েণ্টে ইন্দোনেশিয়ার ওয়াং পেক সেনের হাতে পরাজয় বরণ করেন। অপরদিকে গত বছরের এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান দীনেশ খান্না ১৩—১৫ ও ১—১৫ পয়েণ্টে পরাজিত হন ডেনমার্কের এণ্ডারসনের কাছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ বছরেরই আন্তর্জাতিক পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় দীনেশ খান্না পুরুষ বিভাগে এবং শ্রীমতী জুডি হাসম্যান উত্তর ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয় করেছিলেন। বিশ্বের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় এই শ্রীমতী জুডি হাসম্যানের বিবিধ রেকর্ড এক অসাধারণ ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় হয়ে রয়েছে।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস : সেভেন এণ্ডারসেন (ডেনমার্ক) ১৫—২ ও ১৫—৭ পয়েণ্টে ওয়াং পেক সেনকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : কুমারী উমরাগুদ লতু (পশ্চিম জার্মানী) ১১—৪ ও ১১—৪ পয়েণ্টে কুমারী উমরি রেটভিল্ডকে (হল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী জুডি হাসম্যান (আমেরিকা) এবং কুমারী উমরি রেটভিল্ড (হল্যাণ্ড) ১৫—৮ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে শ্রীমতী উল্লা স্ট্র্যাণ্ড এবং শ্রীমতী কারিন জারগেনসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : পিয়ার ওয়ালসো এবং শ্রীমতী উল্লা স্ট্র্যাণ্ড (ডেনমার্ক) ১৫—৭ ও ১৫—৭ পয়েণ্টে সেভেন এণ্ডারসেন এবং শ্রীমতী কারিন জারগেনসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : সেভেন এণ্ডারসেন এবং পিয়ার ওয়ালসো (ডেনমার্ক) ১৫—৮

ও ১৫—১২ পয়েন্টে লিং ভুং পিং এবং ওয়াং পেক সেনকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

বালকদের সিংগলস : আর কে নারাং (ইউ-পি) ১২—১৫, ১৫—১৩ ও ১৮—১৫ পয়েন্টে কাজল সাহাকে (পশ্চিমবঙ্গ) পরাজিত করেন।

পূর্বাঞ্চল এ্যাথলেটিক্স স্পোর্টস প্রতিযোগিতা

কটকের বারবটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক পূর্বাঞ্চল এ্যাথলেটিকস্ স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই পাঁচটি দলের মধ্যে কেবলমাত্র সার্ভিসেস এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরাই স্বর্ণপদক জয় করেন। প্রতিযোগিতার মোট ২২টি অনুষ্ঠানে সার্ভিসেস ১৪টি এবং পশ্চিম বাঙলা ৮টি স্বর্ণপদক জয় করে।

পশ্চিম বাঙলার পক্ষে স্বর্ণপদক জয় করেন এই ৭ জন প্রতিনিধি : মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড় এবং লং জাম্পে কুমারী রুবি নন্দী, পুরুষ বিভাগের ১১০ মিটার হার্ডলসে এম জি শেঠি, পোল ভল্টে স্বপন দাস, লং জাম্পে শিশুতোষ মুখার্জি, জাভেলিনে মহীন্দর সিং, ২০০ মিটার দৌড়ে এ এস ভি প্রসাদ এবং সটপুটে বি মাহাতো।

জাতীয় স্কুল গেমস

মাদ্রাজে আয়োজিত ১২শ বার্ষিক জাতীয় স্কুল গেমস অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলা সাঁতার (বালক ও বালিকা বিভাগ) এবং টেবিল টেনিসে শীর্ষস্থান লাভ করে; কিন্তু ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম বাংলা দল অপ্রত্যাশিতভাবে ০—১ গোলে মণিপুর দলের কাছে পরাজিত হয়।

বিভিন্ন বিষয়ের ফাইনাল

বালক বিভাগ

ফুটবল : মণিপুর ১ : পশ্চিম বাংলা ০।

ভলিবল : পাঞ্জাব ১৫—৯, ১১—১৫ ও ১৫—৩ পয়েন্টে অন্ধ্র প্রদেশকে পরাজিত করে।

কাবাডি : পাঞ্জাব ৭৯—১৬ পয়েন্টে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে।

টেবিল টেনিস : অন্ধ্রপ্রদেশ ৩—২ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

বালিকা বিভাগ

ভলিবল : গত বছরের বিজয়ী কেরালা ১৫—৯ ও ১৫—৩ পয়েন্টে অন্ধ্রকে পরাজিত করে।

টেবিল টেনিস : গত বছরের বিজয়ী পশ্চিম বাংলা ৩—১ খেলায় মাদ্রাজকে পরাজিত করে।

খো-খো : গুজরাট ১২—১১ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

সাঁতার

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

বালক বিভাগ : ১ম—পশ্চিম বাংলা (৪৩ পয়েন্ট), ২য় ত্রিপুরা (১২) এবং ৩য়—মণিপুর (৮)।

বালিকা বিভাগ : ১ম—পশ্চিম বাংলা (২৬), ২য়—গুজরাট (১৭) এবং ৩য়—মাদ্রাজ (২)।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হুগলী জেলা দল ৪-২ গোলে জলপাইগুড়ি জেলা দলকে পরাজিত করে উমেশ মজুমদার মেমোরিয়াল কাপ এবং রামপাল সিং মেমোরিয়াল শীল্ড জয়ী হয়েছে। ইতিপূর্বে হুগলী জেলা দল ১৯৫৫ ও ১৯৬০ এবং জলপাইগুড়ি জেলা দল ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালের ফাইনালে জয়ী হয়েছিল।

সেমি-ফাইনালে হুগলী জেলা দল ০-০ ও ৩-০ গোলে নদীয়া জেলা দলকে এবং জলপাইগুড়ি জেলা দল ৪-১ গোলে মানভূম জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতা

পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত ২১তম জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ হয়। পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব সর্বাধিক (১৬টি) স্বর্ণপদক জয় করে ৬৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়। পুরুষ বিভাগে ২য় স্থান পায় সার্ভিসেস (৪৫ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্থান পশ্চিম বাংলা (৯ পয়েন্ট)।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম পাঞ্জাব (৬৪ পয়েন্ট), ২য় সার্ভিসেস (৪৫) এবং ৩য় পশ্চিমবাংলা (৯)

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (১৪) এবং ২য় উড়িষ্যা (৬)

বালক বিভাগ : ১ম মাদ্রাজ (৮) এবং ২য় বিহার (৬)

নেহরু হকি ট্রফি

নয়াদিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ ময়দানে ১৯৬৬ সালের নেহরু মেমোরিয়াল হকি টুর্নামেন্টে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের দুই দলের (ব্লুজ ও রেড দল) ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিত থেকে যায়। শেষপর্যন্ত টসের সাহায্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়, ভারতীয় হকি ফেডারেশন রেড দলের অধিনায়ক হরিপাল কৌশিক টসে ব্লুজ দলকে পরাজিত করে নেহরু-ট্রফি জয়ী হয়। রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন পুরস্কার বিতরণ করেন।

ফাইনালের প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের দশ মিনিটের মাথায় ব্লুজ দলের হরবিন্দর সিং গোল দেন। আট মিনিট পর রেড দলের বলবীর সিং গোলটি শোধ দিলে খেলার ফলাফল সমান ১—১ দাঁড়ায়। অতিরিক্ত সময়ের খেলা গোলশূন্য ছিল। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এই দুই দলে ভারতবর্ষের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টার (মীরাট) ১—০ গোলে বোম্বাই একাদশ দলকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান লাভের সূত্রে জাপান প্রদত্ত হার্ড লাইন কাপ জয়ী হয়।

একদিকের সেমি-ফাইনালে ভারতীয় হকি ফেডারেশন ব্লুজ দল ০—০ ও ২—১ গোলে গত বছরের রানার্স আপ বোম্বাই একাদশ দলকে এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় ভারতীয় হকি ফেডারেশন রেড দল ০—০ ও ১—০ গোলে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টার দলকে (মীরাট) পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৬৬ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশ দল (জলন্ধর) ০-০ ও ২-০ গোলে লীডার্স ক্লাবকে (জলন্ধর) পরাজিত করে।

দলীপ ট্রফি

প্রথম সেমিফাইনাল

পশ্চিমাঞ্চল : ৪৮৫ রান (সারদেশাই ১৫১, বোরদে ১০৫ এবং ফারনানডিজ নট আউট ৫৮ রান। রাজসিংহ ৭৯ রানে ৩ উইকেট)

মধ্যাঞ্চল : ১২০ রান (মুর্তিরাজন ২৪ এবং পি শর্মা নট-আউট ২৩ রান। যোশী ৩৪ রানে ৬ এবং নাদকার্নী ২ রানে ২ উইকেট)

ও ৯০ রান (পি পোদ্দার ৩৪ রান। নাদকার্নী ২০ রানে ৬ এবং ফারনানডিজ ১১ রানে ৩ উইকেট)

ইন্দোরে অনুষ্ঠিত দলীপ ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ২৭৫ রানে মধ্যাঞ্চল দলকে পরাজিত করেছে। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৩ ঘণ্টা আগেই খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। বাপু নাদকার্নীর ২০ রানে ৬টি উইকেট নেওয়ার ফলেই মধ্যাঞ্চল দলকে শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হয়। মাত্র ৯০ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছরের দলীপ ট্রফির ফাইনালে এই মধ্যাঞ্চল দল এক ইনিংস এবং ২০ রানে দক্ষিণাঞ্চল দলের কাছে পরাজিত হয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল।

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল

উত্তরাঞ্চল : ২০৭ রান (গোকুল ইন্দরদেব ৯০ রান। চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ৮ উইকেট)

ও ৪৪৯ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ দানী ১৭০ এবং গোকুল ইন্দ্রদেব ৮৭ রান)

দক্ষিণাঞ্চল ৪৬২ রান (৬ উইকেটে সমাপ্তি ঘোষণা। আব্বাস আলী বেগ নট-আউট ২২৪, জয়সীমা ৭৩ এবং পাতৌদির নবাব ৫২ রান)

ও ৬১ রান (২ উইকেটে)

দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সূত্রে উত্তরাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছটা বেজে গেল বিকেল। আসন্ন শীতের টান-ধরা দিনে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। জ্যোতিরাণীর ভাবনা হল ছেলে তখনো ফিরছে না দেখে। শুধু ছেলের ওপর নয়, নিজের ওপরও রাগ হচ্ছে তাঁর। কোন্ ছেলের অর্থাৎ কাদের বাড়ির গাড়িতে ফেরে, ঠিকানা কি, বাড়িতে ফোন আছে কিনা—এসব তাঁর জেনে রাখা উচিত ছিল। জানা থাকলে ফোন করতে পারতেন, লোক পাঠাতে পারতেন।

কিন্তু এ-সব তাঁর খেয়ালও হয়নি।

তবু চিন্তা করতেন না হয়ত। চিন্তার কারণ ঘটিয়েছেন শাশুড়ী। বার-কয়েক নাতির খোঁজ করে তখনো। সেদিন শুধু ভার করে বলেছেন, তুমি তো এখন ঘর নিয়ে ব্যস্ত, ছেলেটার স্কুল থেকে ফিরতেই প্রায় সন্ধ্যা হয় কেন আজকাল? জিগ্যেস করলে খেলতে গেছল পড়তে গেছল—এইসব নানানখানা বলে। রাগ করলে ফিরে চোখ রাঙায়। এ-ধারে আজই বন্ধ করে দেবে। এইটুকু ছেলে, তোমার না হয় চিন্তা-ভাবনা নেই, কিন্তু আমি তো না ভেবে পারি না। খাবারটাও অর্ধেক পড়ে থাকে, বলে পেট ঢাই করে খেয়ে এসেছে—রোজরোজ ওকে এত খাওয়াবার কুটুম্বই বা কে এলো?

এ-সবই জ্যোতিরাণীর কাছে খবর-বিশেষ। তাঁর ব্যস্ততার সুযোগে ছেলে যে এতখানি লায়েক হয়ে উঠেছে ভাবতে পারেননি। সামনাসামনি পড়লে আগের থেকে একটু শান্তশিষ্ট হাব-ভাবই দেখেছেন, আর পড়াশুনায়ও মনোযোগ বেড়েছে মনে হয়েছিল, তলায়-তলায় ও এই করে বেড়াচ্ছে ভাববেন কি করে। তার ওপর কালীদা নেই ক'দিন, খুব সুবিধে হয়েছে।

রাগ হলে শাশুড়ী তিলকে তাল করেন অনেকসময়। জ্যোতিরাণী মেঘনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্কুল থেকে সিতু প্রায়ই দেরিতে ফেরে আজকাল?

মেঘনার চোখ টান। ও-মা দেরি কি, কোনোদিন সন্ধ্যা, কোনোদিন একেবারে সন্ধ্যা পার! তোমার ফিরতে দেরি হলেই ওনারও দেরি। জিগ্যেস করতে গেলেও চিড়বিড় করে ওঠে, সেদিন তো চোখ পাকিয়ে বলে গেল, কোথায় ছিলাম রোজ রোজ তোমার সে-খোঁজে দরকার কি, ধুমসি কোথাকার—ফের এ-নিয়ে বকবক করতে শুনলে গলা টিপে দেব!

রাগ সামলাতে না পেরে জ্যোতিরাণী মেঘনার ওপরেই বিরক্ত—আমাকে বালসনি কেন?

সোজাসুজি জবাব না দিয়ে মেঘনা গজ-গজ করতে করতে চলে গেল। তার ক্ষোভের মর্ম, বাড়ির ঝি তার অতোর কথায় থাকার কাজ কি, এইটুকু ছেলে গলা টিপতে আসে, নাতির তেমন আদর-আহ্লাদ করা হয়েছে শুনলে ওই ঠাকুমা ওরও গলা কাটতে আসবে।

যা-ই হোক, তখনো জ্যোতিরাণীর ধারণা মায়ের নজর নেই বলে ছেলে তার গাড়িঅলা বন্ধুর বাড়িতেই থাকে—সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা দেয়।

সিতু বাড়িতে পা দিল প্রায় সাতটা নাগাদ। বিচারের শেষ পর্ব দেখে আর শুনে উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে ফিরেছে। মাথার ওপরে যে নিজের বিচারের খাঁড়া ঝুলছে, কল্পনাও করেনি। আপাতত তার মাথায় শুধু ডাকাতগুলোর মুখ কিলবিল করছে। বিচারকের রায় দেবার মুখে উত্তেজনায় সত্যিই বুকের ভেতরটা অসম্ভব রকম ধড়াস ধড়াস করছিল।

বাড়িতে ঢোকার আগে আচমকা একটা ধাক্কাই খেল বুঝি। মায়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে। ডাকাতেরা আর বিচারক মাথা থেকে সরতে শুরু করল। মুশকিলের ব্যাপার...মায়ের গাড়ি কেন? মায়ের তো খুব কম হলেও আটটার আগে ফেরার কথা নয়। আজ তো আরো দেরি হবে বলে গেছল! বিচার শেষ হবার পরেও সেই জন্যেই সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে বিচার আর ডাকাতদের প্রসঙ্গ এমন জমে উঠেছিল যে, কখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে খেয়ালই ছিল না। এখনো নিশ্চিন্ত মনেই পান চিবুতে চিবুতে ঢুকেছে—মা আসার আগে ভালো করে দাঁত মেজে ফেললে আর পানের দাগও থাকে না।

...কিন্তু এ আবার কি ফ্যাসাদ!

ভয়ে ভয়েই ভিতরে ঢুকল। সামনে মেঘনা।...ও তার দিকে এ-ভাবে তাকাচ্ছে কেন?

কাছে গিয়ে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, গাড়িটা দেখছি, মা ফিরেছে বুঝি?

জবাব না দিয়ে মেঘনা চেয়ে রইল তার দিকে। আক্কেল দেখা-গোছের চাউনি। আর তাইতেই সিতু বিপদের গন্ধ পেল। গলার স্বর শুধু খাটো নয়, খুব নরম। আবার জিজ্ঞাসা করল, মা কতক্ষণ ফিরেছে?

গম্ভীরমুখে মেঘনা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, কোত্থেকে ফিরবে?

...ইয়ে, প্রভুজীধাম থেকে?

মেঘনারই দিন আজ, বিচ্ছু ছেলেকে জব্দ করার মত রসদ পেয়েছে। বাড়িতে তাকে নিয়ে ঘোরালো কিছু ঘটে গেছে সেটা বোঝাবার জন্যেই গোল দু'চোখ ঘুরিয়ে

আর একপ্রস্থ দেখে নিল ভালো করে!—মা আজ কোথাও বেরোননি, সমস্ত দিন বাড়িতেই ছিলেন। ডেরাইভার ইস্কুল থেকে আনতে গিয়ে তুমি সেখানে যাওই-নি খপর নিয়ে ফিরে এসেছে—ওপরে যাও, আজ হবে'খন।

সিতুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ছোট-খাট ব্যাপার হলে আবার না-হয় খানিকক্ষণের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে থাকার চেষ্টা করত। কিন্তু শোনামাত্র মাথার ঘিলু-গুলো যেন সব অবশ হয়ে গেল। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর বিপদ-তারিণী ঠাকুমাকেই মনে পড়ল প্রথম। মুখের পান ফেলা বা নীচের থেকে মুখটা ভালো করে ধুয়ে ওপরে ওঠার কথাও মনে থাকল না। ঠাকুমার আশ্রয়ের আশায় পা-টিপে ওপরে উঠে গেল।

তারপর পাদুটো আবার মাটির সঙ্গে আটকে গেল যেন। আর ঠাকুমার আশ্রয়ের আশাটুকুও ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল।

সামনে, বারান্দার মাঝামাঝি মা দাঁড়িয়ে।

—এদিকে আয়।

নিজের অপরাধের গুরুত্ব জানে বলেই আদেশ দুর্লঙ্ঘ মনে হল। সামনে এসে মাথা গোঁজ করে দাঁড়াল।

কপালে আর চুলে একসঙ্গে হাত দিয়ে জ্যোতিরাণী তার মুখটা নিজের দিকে তুললেন। ঠোঁটের নীচে পর্যন্ত লাল করে পান চিবুতে দেখে সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল তাঁর। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই গালে ঠাস্-ঠাস্ চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তার আগে ছেলের এতটা হতচকিত ফ্যাকাশে মূর্তি দেখে খটকা লেগেছে।—কোথায় গেছলি?

সিতুকে কেউ যদি ডুবিয়ে থাকে তো সেটা করেছে মেঘনা। মায়ের যে তখনো ধারণা সে বন্ধুর বাড়িতে এতক্ষণ আড্ডা দিয়ে ফিরল, তা জানলে তো প্রাণটা নিজের হাতের মুঠোতেই আছে ভাবত। কিন্তু এসেই শুনেছে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে স্কুলে গেছল, আর সেখান থেকে খবর নিয়ে এসেছে ও স্কুলেই যায়নি। অতএব মায়ের কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়েইছে—এখন কতটা ধরা পড়েছে, কত দিনের কথা ধরা পড়েছে, তারই ওপর মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে যেন।

গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না প্রায়। বলল, কোর্টে—

রাগের মুখেই আকাশ থেকে পড়ার দাখিল জ্যোতিরাণীর। জবাবটা ধরতেই পারলেন না।—কোথায় গেছলি?

—আলিপুর কোর্টে।

—কোর্টে! কোর্টে কি?

মায়ের বিস্ময় উদ্রেক করতে পারলেও যেন ভরসা একটু।—সেই ডাকাতদের বিচারের আজ রায় হয়ে গেল, দুলু আর সুবীর স্কুলে গিয়ে ডাকল, চল্ দেখে আসি, অনেক লোক যাচ্ছে, তাই—

জ্যোতিরাণী তাজ্জব কয়েক মুহূর্ত। পুরো এক বছর আগেকার ঘটনা তাঁর মাথায়ও ছিল না আর। ছেলে নিয়ে নিজে অমন প্রাণান্তকর বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন বলেই ছেলের অপরাধ ভুলে প্রথমেই কৌতূহল।—বিচারে তাদের কি হল?

হে ভগবান! সিতুর কি তাহলে বাঁচার আশা আছে? সাগ্রহে বলল, ফাঁসি কারো হয়নি, তবু একেবারে গায়ে কাঁটা দেবার মত ব্যাপার মা! দলের সেই পাণ্ডার সমস্ত জীবন জেল, যে-লোকটা আমাদের দিকে রিভলবার উঁচিয়ে ধরেছিল, তার আর আর-একটা লোকের দশ বছর করে জেল, সন্দেহ থাকল বলে একজন খালাস পেয়ে গেল, আর ধরা পড়ে দলের যে-লোকটা পুলিসের পক্ষে গিয়ে ফাঁস করে দিল—সে ছাড়া পেয়ে গেল।

বিচারের রায় শোনার কৌতূহল মিটল, আবার ছেলেকেই চেয়ে চেয়ে দেখছেন তিনি। দিন-কাল হল কি ভেবে পাচ্ছেন না। বারো পেরোয়নি ছেলের স্কুল পালিয়ে কোর্টের ডাকাতদের বিচার দেখতে চলে গেল।

—তোমার সঙ্গে আর বড় কে ছিল?

—নি-নিতাইদা।

—নিতাইদা কে?

—ওই...ওই সাইকেলের দোকানের বেশ ভদ্রলোকের ছেলে—

—কখন গেছলি?

মায়ের গলার স্বর গম্ভীর হচ্ছে আবার, তবু ভিতরের কাঁপুনি কমেছে সিতুর। যত অন্যায় সব এই দিনটার ঘাড়ে চাপানোই ভালো। শুকনো জবাব দিল, সাড়ে দশটায়।

জ্যোতিরাণীর রাগ চড়ছে আবার, ভালো-মুখো ছেলেকে ধরে কি যে করতে ইচ্ছে করছে ঠিক নেই।—কোর্টের বিচার কখন শেষ হয়েছে?

—সা-সাড়ে চারটেয়।

—এই সাতটা পর্যন্ত কোথায় ছিলি?

দুলু উল্টোদিকের গলিতে থাকে, অতএব সুবীরের নাম করল।—সুবীরদের বাড়িতে, সকলে এই নিয়ে জিগ্যেস করছিল, জানতে চাইছিল—

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সিতু ঘাড় ফেরালো, জ্যোতিরাণীও তাকালেন সেদিকে।

ফাঁড়া কি সত্যিই কাটল সিতুর? এমন ভাগ্যও বিশ্বাস করবে? প্রথমে বাবা, তার পাশ ঘেঁষে জেঠুর হাসিমুখ।

দোতলায় পা দিয়ে কালীনাথ এমন কি শিবেশ্বরও টের পেলেন কিছু একটা দোষ করে ফেলে ছেলে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। ঘরের দিকে এগিয়েও ব্যাপার বোঝার জন্য শিবেশ্বর দাঁড়ালেন একটু।

বাপের ভরসা রাখে না, দুর্দশাগ্রস্ত করুণ মুখ করে সিতু জেঠুর দিকে তাকালো। অর্থাৎ, এ-যাত্রা রক্ষা না করলেই নয়।

শরণাগতকে রক্ষা করার চিরাচরিত রাস্তাই ধরলেন কালীনাথ। এগিয়ে এসে সিতুর বাহু ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের দিকে ফেরালেন তাকে। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠলেন, তোকে আজ আমি আস্তই রাখব না, পা থেকে মাথা পর্যন্ত আজ তোকে পালিশ করা হবে, বুঝলি? যাও ঘরে যাও, আসছি আমি—এই ক'দিনেরটা একদিনে উশুল করব!

বিপদ শিরোধার্য করেই যেন সিতু বেঁকতে বেঁকতে ঘরের দিকে এগলো।

ঠোঁটের ডগায় হাসি চেপে কালীনাথ জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরলেন।—কি করেছে?

হুমকির পরে এভাবে জিজ্ঞাসা করতে জ্যোতিরাণীও হেসেই ফেললেন। কিন্তু অদূরে প্রস্থানরত ছেলের দিকে চোখ পড়তে হাসি টেনে নিলেন। মায়ের দিকে চোখ রেখেই ঘরের দিকে চলেছে সে। মুখে হাসি দেখে যতখানি শঙ্কটে পড়েছিল ততখানিই নিশ্চিন্ত। মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পালালো।

জ্যোতিরাণী অদূরের মানুষকে শুনিয়েই রাগত সুরে বললেন, আসকারা তো দিচ্ছেন, দিনকে দিন কি যে হচ্ছে ও সেদিকে চোখ আছে কারো! গাড়ি চেপে সময়মত স্কুলে চলে গেছে, তারপর সেখান থেকে দল বেঁধে পালিয়ে কোর্টে গেছে ডাকাতদের বিচার দেখতে—এই একটু আগে ফিরল!

শুনে কালীনাথও অবাক কয়েক মুহূর্ত।—ও...সেই ব্যাঙ্ক রবারির কেস! ও স্কুল পালিয়ে দেখতে গেছল? শিবেশ্বরের দিকে তাকালেন কালীনাথ, এরই মধ্যে দিব্বি যে মানুষ হয়ে উঠেছে দেখি, অ্যাঁ।

হাসি চেপে শিবেশ্বর ততক্ষণে ঘরের দিকে এগিয়েছেন।

সকৌতুকে আবার জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরে গলা খাটো করে কালীনাথ বললেন, স্কুল আমিও পালাতাম মাঝে সাজে—তবে উঁচু ক্লাসে উঠে অবশ্য। ওর বাবা একদিনও পালাতো না বলে আমার রাগই হত, আর নাকের ডগায় সব সময় বই নিয়ে বসে থাকত বলে ইচ্ছে করত ওর বই-পত্র সব জ্বালিয়ে দিই। ওর বাবাকে না পারলেও ওর ভবিষ্যৎ ঠিক ঝরঝরে করে দেব—কিচ্ছু ভেব না।

জ্যোতিরাণীও এবারে কালীদাকেই লক্ষ্য করলেন একটু। পনের দিনে চেহারা তেমন না ফিরুক, হাওয়া-বদলের ফলে খুশির হাব-ভাব অন্তত চাপা নয়। জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সকালে না দুপুরে ফিরেছেন শুনলাম, এতক্ষণে এলেন?

—তুমি কোথায় শুনলে?

বিস্ময়ের আভাস খাঁটী কি মেকী ঠিক ধরা গেল না।—দুপুরে কোন্ হোটেলে মিত্রাদি আপনাকে দেখেছেন বললেন।

কালীনাথের মুখে হালকা গাম্ভীর্যের কারুকার্য।—ও, প্রভুজীধাম ছেড়ে তিনি কি হোটেলে বাস করছেন নাকি আজকাল?

প্রসঙ্গ কৌতুককর। কিন্তু মিত্রাদিকে নিয়ে ভাসুর সম্পর্কের লোকটির সঙ্গে এই প্রথম কথাবার্তা সম্ভবত। তাই সঙ্কোচও একটু। কিন্তু এবারে মুখ দেখে আর কথা শুনে মনে হয়েছে হোটেলে মিত্রাদিকে ইনিও দেখেছেন কোনো ভুল নেই। সহজ অনু-যোগের সুরেই বললেন, প্রভুজীধাম ছাড়া অত সহজ নয়, বাড়িঅলার সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন।

—বাড়িঅলা! কার বাড়িঅলা?

জ্যোতিরাণীর হাসিই পাচ্ছে, বাড়িঅলা নামে কোনো জীবের অস্তিত্ব এই প্রথম শুনলেন যেন।—মিত্রাদির বাড়িঅলা।

—ও...। ছদ্ম গাম্ভীর্য ঘন দেখালো আরো, যাক, তোমার প্রভুজীধামের খবর ভালো তো?

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন। ভালো।

—মামু কোথায়?

—সেখানেই।

—বেশ। কালীনাথের হৃষ্ট মুখ আবার। বাইরে থাকতে মামুর একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, অবশ্য তার আগে আমিই এমনি লিখেছিলাম তাঁকে। ভদ্রলোকের উচ্ছ্বাস কম, তবু চিঠিতে তোমার প্রশংসাই বেশ। লিখেছেন, প্রভুজীধামের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে তুমি যেভাবে মাথা ঘামাচ্ছ, এরপর অনেকে হয়ত ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে থাকতে চাইবে, আর, তোমার মনের মত প্রভুজীধাম বড় হতে থাকলে সবদিক দেখাশোনার জন্য দু'বছরের মধ্যে মামুর মত আরো জনা-দশেক লোক লাগবে।

জ্যোতিরাণী খুশিই হলেন হয়ত তবু, বিশেষ করে কালীদাকে শোনাবার জন্যেই সাদাসিধে ভাবে বললেন, আমি আর কতটুকু করছি, করছেন তো আসলে মিত্রাদি—

অতএব আর কথা বাড়ল না, কালীদা নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

জ্যোতিরাণী প্রতিষ্ঠানের এই ক'দিনের একটু হিসেবপত্র সেরে রাখছিলেন। মিত্রাদিকে কাল বুঝিয়ে দিতে হবে। খানিকক্ষণের মধ্যে বাইরে কালীদার সাড়া পেলেন। শাড়ির আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে দরজার কাছে আসতে তিনি বললেন, মামুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না, একবার ঘুরে আসি, আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন শুধু। কালীদা চলে গেলেন।

পরের দিন বাদে এসে এসময়ে প্রভুজীধামে যাওয়াটা কেন যেন নিছক মামাশ্বশুরের টানে বলে মনে হল না জ্যোতিরাণীর।

হিসেব নিয়ে বসতে আর ভালো লাগল না। শমী অনেকক্ষণ ধরে কাছে নেই খেয়াল হল; তাদের বাড়িতে যখন ফোন করেছিলেন, আশানুযায়ী বিভাস দত্ত বাড়ি ছিলেন না ঠিকই। তাঁর বড় ভাইয়ের বউকে জানিয়ে দিয়েছেন রাতটা শমী এখানে থাকবে।... অনুপস্থিতিতে ফোন করার এই রীতি নিয়ে বিভাস দত্ত মুখের ওপর একদিন ঠাট্টাও করেছিলেন। করুকগে।

শমী সিতুর সঙ্গেই আছে কোথাও। তবু কি করছে দেখে আসতে গেলেন। ছেলেটাকে নিয়ে নতুন করে আবার একটা চিন্তার ছায়া পড়ছে থেকে থেকে।...চোখের সামনে ডাকাতির সেই ভয়ানক ব্যাপারটা দেখার ফলে বিচার দেখার লোভে আর ঝোঁকের বশে সঙ্গীসাথীর সঙ্গে স্কুল পালানোটা খুব অস্বাভাবিক নয় ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি। অথচ সেই থেকে তাঁর ওঠা-বসা-চলাফেরার ফাঁকে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিও যেন ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে।

বেশি নিশ্চিন্তবোধ বিপদ ডেকে আনে। সিতুর বরাতেও সেই গোছের এক বিপদ এগিয়ে আসছে, ধারণা নেই।

আপাততঃ যত বড় গ্রাসের মধ্যে সে পড়েছিল তার থেকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসতে পারার আনন্দের স্বাদও ঠিক ততো বড়ই। এই নিশ্চিন্ততার ফলেই কালীদার ঘরে বসে শমীর মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টির উদ্দীপনায় মেতেছে। স্কুল পালিয়ে স্ব-চক্ষে আর স্বকর্ণে ডাকাতদের বিচার দেখেছে আর শুনেছে সেটা বলার মত অত বোকা নয়। কিন্তু এই বিচারপর্বে উপস্থিত ছিল এমন লোকের মুখে শোনা আর কাগজে যেটুকু বেরিয়েছে তার বিবরণ বলে চালিয়ে গোটা ব্যাপারটার একটা রোমাঞ্চকর কাঠামো দাঁড় করাতে অসুবিধে কি?

দরজার কাছাকাছি আসতে সিতুর কয়েকটা কথা ঠাস করে যেন কানের পরদায় ঘা বসালো জ্যোতিরাণীর।

সিতু বেশ বিরক্তির ঝাঁঝে বলছে, মেয়ে-ছেলেগুলোর মত অপয়া পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নেই, বুঝলি? যেখানে মেয়েছেলে সেখানে গন্ডগোল—পুলিস কোনো আসামীর মেয়েছেলেকে ধরতে পারলেই কেল্লা মাত—বাস, সব বার করে নেবে। ওই ডাকাতগুলো সব এভাবে ধরা পড়ল কেন, আর তাদের দোষও এত সহজে প্রমাণ হয়ে গেল কি করে? ওই সোনা মেয়েটা ছিল বলেই তো। তাকে ধরে যেই মোক্ষম ফাঁদ পাতলে একটা অমনি দিলে সব গল-গল করে ফাঁস করে। মেয়ে-ছেলেগুলো বিচ্ছিরি—

—সোনা কে? নিজে মেয়েছেলে সোনার এটুকু জ্ঞান আছে বলেই সম্ভবত শমীর সঙ্কুচিত প্রশ্ন।

—একটা খারাপ মেয়ে, ওই ডাকাতদের একজনের ভালবাসার লোক। নইলে ও ডাকাত দলের সর্দারটার যা মাথা না, টিকিও ছুঁতে দিতে হত না।

কানের কাছটা গরম ঠেকছে জ্যোতি-রাণীর।

—কত মাথা খাটিয়ে দলটাকে গড়েছিল জানিস? দু'বছর আগের সেই রায়টের সময় বন্দুক আর রিভল-বার টিভলবার যোগাড় করেছে। প্রাণে বাঁচার জন্য তখন তো ভালো ভালো লোকেরাই ওদের হাতে এসব জুগিয়েছে। গন্ডগোল থেমে যাবার পর ওসব হাতে পেয়েও তারা বেকার বসে থাকবে নাকি? বাছাই লোক নিয়েছে দলে, রীতিমত ট্রেনিং দিয়েছে সকলকে, একটা পড়ো-জংলা বাড়িতে আড্ডা না থাকলে আজকাল কখনো বড় ডাকাতি করা যায়! ব্যাঙ্কে ডাকাতির আগে গাড়ি কি করে যোগাড় করেছিল শুনলে তোর গায়ে কাঁটা দেবে। তারা থাকে উত্তর কলকাতায়, একেবারে দক্ষিণ কলকাতায় এসে অনেক দূরের একটা নির্জন জায়গায় ওঁত পেতে অপেক্ষা করছিল সকলে, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। একজন মিলিটারির চাকুরে একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। দু-তিনজন লোক রাস্তার মাঝে এসে হাত তুলে গাড়িটা থামাল। ওদিকে তাদের আর একজন আগে থাকতেই পথের ধারে শুয়ে কাতরাচ্ছে। ডাকাতেরা ড্রাইভারকে অনুনয় করে বলল, তাদের সঙ্গের লোক হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দয়া করে ড্রাইভার যদি তাদের তুলে নিয়ে ওই পথেই তাদের বাড়ির কাছে নামিয়ে দেয় তো তারা কেনা হয়ে থাকবে।

যে-রকম সাজিয়ে বলছে ছেলে জ্যোতি-রাণী পর্যন্ত দরজার এধারে ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন।

—ড্রাইভার রোগীসুদ্ধ তাদের তুলে নিল। ভদ্রলোকেরা বিপদে পড়েছে, আর যাবার পথেই যখন, এটুকু উপকার করবে না কেন।—সে কি আর জানত উপকার করতে গিয়ে নিজের কবর খুঁড়ছে! জায়গা বুঝে ডাকাতের সর্দার আর পিছন থেকে একজন আচমকা ধরলে তার টুঁটি চেপে, আর চোখের পলক না ফেলতে দরজা খুলে সকলে মিলে দিলে তাকে রামধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে। সর্দারটা নিজেই গাড়ি চালাতে ওস্তাদ, মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি নিয়ে হাওয়া। সেই গাড়ি আবার যখন রাস্তায় বেরুলো তখন সেটার রঙও বদলে গেছে, নম্বরও বদলে গেছে। ধরবে কে? সর্দার নিজেই তখন ও গাড়ির মালিক।

ইচ্ছে করে নয়, আপনা থেকেই জ্যোতি-রাণী ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ছেলের দিকেই চোখ। উদ্দীপনার মুখে মা-কে দেখে সিতু অপ্রস্তুত একটু। আর শমী কণ্টকিত হয়ে বলে উঠল, কি সাংঘাতিক সেই ডাকাত-গুলো মাসিমা! সিতুদা বলছে আর আমার গা কাঁপছে। তারপর কি হল সিতুদা?

কিন্তু সিতুর উৎসাহ আপাতত কম। মা আবার ও-ভাবে তার দিকে চেয়ে দেখছে কি!

জ্যোতিরাণী দেখছেন কারণ ছেলের মুখে ঘটনা শোনার ফাঁকে চকিতে একটা কথা মনে পড়েছে তাঁর। আজ এই একদিন নয় বাগত অনুযোগে শাশুড়ী তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নাতির স্কুল থেকে ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয় কেন আজকাল। তার মেঘনা বলছিল, ফিরতে সন্ধ্যা পারই হয়ে যায় এক-একদিন। মনে পড়া মাত্র কি-যেন ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি।

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই এত কথা জানলি কি করে?

মাতৃসন্নিধানে স্বস্তি বোধ করেনি সিতু, প্রশ্ন শুনেও না। তাড়াতাড়ি জবাব দিল ইয়ে, ওই নিতাইদার কাছে, আর দুলু আর সুবীরও তো কয়েকবার গেছে—আছাড়া কাগজেও তো অনেক কথা বেরিয়েছে।

শুনেও থাকতে পারে, কাগজে পড়েও থাকতে পারে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর চাপা উদ্বেগ গেল না। তিনি না থাকলেই সন্ধ্যে আর রাত করে বাড়ি ফেরে যখন...কোর্টের বিচার শুনতে আজ এই একদিনই গেছে না আরো গেছে?

...এত কথার মধ্যে খারাপ মেয়ে-ছেলের সম্পর্কে ছেলের উক্তিটা কানে লেগে আছ এখনো। কিন্তু আগে ভালো করে বুঝে বুঝে নিতে চান তিনি। সাদাসিধেভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি জানিস?

ছেলের বলার উৎসাহ কমেছে। যেটুকু বার করা গেল, তারও জটিলতা কম নয়। কিন্তু ওইটুকু ছেলের কাছে গোটা ব্যাপারটা একেবারে স্বচ্ছ, স্পষ্ট।—দলের পান্ডার সম্পর্কে কয়েকটা খবর পেয়ে পুলিস তার ওপর চোখ রাখে আর পরে সন্দেহের বশে তাকে অ্যারেস্ট করে। কিন্তু প্রমাণের ছিটে-ফোঁটাও নেই কোথাও। পুলিস তারপর সেদিককার কতগুলো মেয়েছেলের বাড়িতে হানা দিয়ে সোনা নামে একটা মেয়ের কাছে অনেক দামী গয়না-পত্র পেল। তাকে ধরে এনে ভাঁওতা দিয়ে আর ভয় দেখিয়ে পুলিস অনেক কথা জেনে ফেলল। যে খাতিরের লোক তাকে অত-সব গয়না-পত্র দিয়েছে দেখা গেল সে ওই পান্ডা লোকটার প্রাণের বন্ধু। পুলিস তাকেও ধরল। শেষে দু'জনকে আলাদা আলাদাভাবে সব ফাঁস হয়ে গেছে বলে এমন ভাঁওতা দিল যে, তাতে ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েটা আরো অনেক কিছু ফাঁস করে দিল। কিন্তু তার খাতিরের লোক এখনো স্বীকার করছে না কিছু। ভয় দেখিয়ে পুলিস তারপর দু'জনেরই সাংঘা-তিক বিপদের কথা বলে মেয়েটাকে ভয়ানক ঘাবড়ে দিল। এত ঘাবড়ে দিল যে, মেয়েটা অস্থির হয়ে কেবল কাঁদতে লাগল। তাকে বোঝানো হল তার খাতিরের লোক সব স্বীকার করে রাজসাক্ষী হলে তারা ছাড়া পাবে। পুলিস তারপর স্বীকার করাবার জন্যে লোকটাকে তার কাছে নিয়ে এলো। মেয়েটা তখন এত কাঁদতে লাগলে যে লোকটা সে-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সব স্বীকার করল, আর সরকারের সাক্ষী হয়ে প্রমাণসুদ্ধু সব বলে দিল। বিচারে দলের পান্ডার আর তার প্রধান সাগরেদের সশ্রম জীবন জেল হয়েছে, দু'জনের দশ বছর করে জেল হয়েছে, দুটো লোক এমন ফেরারী হয়েছে যে পুলিস তাদের ধরতেই পারেনি, আর সোনার যে খাতিরের লোকটা সরকারের সাক্ষী হয়েছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শমী উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। জিজ্ঞাসা করল, ওই সোনা মেয়েটাকেও তুমি দেখেছ সিতুদা?

মায়ের সামনে এই কৌতূহল কেন যেন খুব পছন্দ হল না সিতুর। মাথা নাড়ল শুধু, দেখেছে।

—খাতিরের লোককে ছেড়ে দিতে তার খুব আনন্দ হয়নি?

সিতু বিরক্ত।—আমি দেখতে গেছি? দলের লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে ওকে গুলী করে মারা উচিত।

বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব শমীর ঠিক বোধগম্য হল না। সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। এই উক্তি শুনে ছেলেকে জ্যোতি-রাণীর ধমকে ওঠার কথা, কিন্তু তিনিও কিছু বললেন না। ঘটনা যা শুনলেন, অবাক হবার মতই। কিন্তু শোনার ফাঁকে আর পরেও ছেলের মুখখানাই লক্ষ্য করেছেন তিনি। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে ওর এত কিছু জানার মধ্যে কোথায় একটা গোপনতা লুকিয়ে আছে।

শমী আর সিতু একসঙ্গে খেতে বসে ছিল। সিতু ফেলে-ছড়িয়ে খেয়ে উঠে গেল।

তার ঘুম পাচ্ছে খুব। খাওয়া দেখেও জ্যোতিরাণী বিরক্ত। কোথায় কি খেয়ে আসে—

আচমকা কি মনে হতেই জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। একটা চকিত চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় সর্বাঙ্গ অবশ যেন।... শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করছিলেন, বিকেলের খাবারও ওমনি পড়ে থাকে, রোজ-রোজ ওকে এত খাওয়াবার কুটুম্বই বা কে এলো?

এর পর ঘরে আর বারান্দায় অনেকক্ষণ ছটফট করেছেন জ্যোতিরাণী। বয়েস অনুযায়ী ছেলে অনেক বেশি পেকেছে, এটা নতুন সমস্যা কিছু নয়। বিচার দেখার নেশায় স্কুল থেকে এই একদিনই পালায়নি হয়ত। যে মারাত্মক ব্যাপার শুনলেন, ঝোঁক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জ্যোতিরাণী সে-জন্যেও ছটফট করছেন না, বাইরে কোথায় কি খেয়ে আসে, সেই দুশ্চিন্তায়ও নয়।

রাত সাড়ে ন'টার কাছাকাছি। মাসির গল্প করার মেজাজ নয় দেখে শমী ঘুমিয়ে পড়েছে।

পায়ে পায়ে জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জড়াজড়ি করে শাশুড়ী-নাতি ঘুমে অচেতন। চলে এলেন। তার এই মুখের দিকে তাকালে যে-কেউ ঘাবড়ে যেত। বিদ্যুতের ধাক্কার মত যে সম্ভাবনার চিন্তাটা মাথায় ঢুকেছে, প্রাণপণে নিজেই তিনি সেটা অবিশ্বাস করতে চেয়েছেন। পারেন নি।

ফিরে এসে জ্যোতিরাণী কালীদার ঘরে ঢুকলেন। আলনায় সিতুর জামা ঝুলছে গোটা দুই-তিন। একে একে প্রত্যেকটার পকেট হাতড়ে দেখলেন। কিছু না পেয়ে জ্যোতিরাণীর চোখে-মুখে সংকট-মুক্তির আশা। সিতুর পড়ার ছোট টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একদিকের ড্রয়ার ধরে টানলেন। খোলা গেল না, বন্ধ। পাশের ড্রয়ার ধরে টানলেন, সেটা খুলে এলো। কিন্তু ওটার মধ্যে কিছু নই।

জ্যোতিরাণী ঘরের চারদিকে তাকালেন একবার। বন্ধ ড্রয়ারটা জোরে টানলেন এবার। খোলা গেল না। সাজানো বই আর খাতার পাঁজার ফাঁকে চাবি পেলেন। ড্রয়ারের চাবি।

বন্ধ ড্রয়ারটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ কাঠ কয়েক মুহূর্ত। ড্রয়ারের মধ্যে যা দেখলেন তা তিনি দেখতে চান নি। তাঁর ভাবনা মিথ্যে হোক এটুকুই সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন তিনি।

ড্রয়ারে চারটে টাকা আর খুচরো দশ আনা পয়সা।

না, জ্যোতিরাণী এখনো বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছেন যা তিনি ভাবছেন সেটা ঠিক নয়। বাড়িতে টাকার ছড়াছড়ি, যে-কেউ নিতে পারে। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, গত সন্ধ্যায় আর রাতে যে গোপনতার পরদা ছেলের মুখের ওপর দুলতে দেখেছেন তিনি, সেটা এ পর্যন্ত গড়ায় নি। এখনো ভাবতে চেষ্টা করছেন টাকা গোনাগুনির ব্যাপারে তাঁর ভুল হয়—প্রভুজীধামে পাঠাবার জন্যে পাঁচশ সত্তর টাকার মধ্যে পনেরো টাকা কম পড়েছিল তাঁর গোনার ভুলে, আর সেবারে গুনতে ভুল করেই মামাশ্বশুরকে দশ টাকা কম দিয়েছিলেন তিনি।

পারা গেল না ভাবতে।

নিস্পন্দের মত নিজের ঘরের শয্যায় এসে বসেছেন জ্যোতিরাণী। আপনা থেকেই ড্রেসিং টেবিলের দেরাজের দিকে চোখ গেছে।...যা মনে না পড়লেও চলত, তাই মনে পড়ছে। দেরাজ খুলে অনেক সময়েই টাকা-পয়সা যা রেখেছিলেন তার থেকে কম-কম ঠেকেছে। কিন্তু কোনরকম সন্দেহ রেখাপাত করে নি। কাকে কখন কি দিয়েছেন মনে নেই ভেবেছেন।

কিন্তু এখন তাও ভাবতে পারছেন না।

পরদিন সন্ধ্যায় শুধু শমীকে নিয়ে প্রভুজীধাম থেকে ফিরলেন তিনি। রাতটা সিতু ছোটদাদুর কাছে থাকার বাসনা প্রকাশ করতে একটু ভেবে জ্যোতিরাণী রাজি হলেন। গৌরবিমলই বরং জিজ্ঞাসা করেছেন, কাল স্কুল আছে না?

মায়ের জবাব শুনে সিতু আনন্দে আটখানা। প্রভুজীধামের ওপর মায়ের টান বটে। ছোটদাদুকে বলেছে, একদিন কামাই হলে ক্ষতি হবে না।

সেখানে হয়ত বীথি তাঁকে লক্ষ্য করেছে একটু, আর মৈত্রেয়ী চন্দ একবার জিজ্ঞাসা করেছেন, গম্ভীর-গম্ভীর দেখছি, কি ব্যাপার?

জ্যোতিরাণী বলেছেন, কিছু না, শরীরটা ভালো না, তাড়াতাড়ি ফিরব।

আসার পথে শমীকে ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারতেন। তা না করে বাড়ি ফিরে ওকে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন সময় মত শিবেশ্বর আর কালীদা কাজে চলে গেলেন।

শাশুড়ীর দুপুরের পথ্য সামনে সাজিয়ে দিতে দিতে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, সিতুকে কি শিগগীর আপনি কিছু টাকা দিয়েছেন?

শাশুড়ী প্রথমে থতমত খেলেন একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ক'টাকা?

—দশ-পনের—

শাশুড়ী সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলেন, আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে ওই শিশুর হাতে অতটাকা দিতে যাব! মাঝে মধ্যে চার আনা, আট আনা নেয়, সেদিন শুধু কেড়েকুড়ে একটা টাকাই নিয়ে পালালো—তাও তো পনের দিন হয়ে গেল। কেন?

জবাব না পেয়ে বিরস মুখ তাঁর।

ঘরে এসে জ্যোতিরাণী টেলিফোন গাইড খুলে বসলেন। থমথমে মুখ। যে নম্বর খুঁজছেন পেলেন। নম্বর ডায়েল করেছেন তিনি।

সিতুর স্কুলের অফিসে টেলিফোন করলেন। সাড়া পেলেন।

নিজের পরিচয় দিয়ে আর ছেলে কোন্ ক্লাসে পড়ে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে এর মধ্যে কদিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিল।

রেজিস্ট্রি দেখে নিয়ে ওধার থেকে কেরানী জবাব দিল, আজ নিয়ে এগারো দিন সে আসছে না। তার মধ্যে দশ দিনের ছুটির দরখাস্ত দেওয়া আছে।

মাথা খুব স্থির আর ঠান্ডা রাখতে চেষ্টা করছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু পায়ের দিকটা সিরসির করছে। সামলে নেবার জন্য একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, দশ দিনের ছুটির দরখাস্ত আপনারা পেয়েছেন?

জবাব এলো, পেয়েছে।

—কার সই আছে ওতে?

দরখাস্তটা বার করার জন্যেই মিনিট খানেক সময় লাগল হয়ত। তারপর শুনলেন কার সই। এস চ্যাটার্জি, লেটার হেড-এ শিবেশ্বর চ্যাটার্জি নাম ছাপা। দরখাস্তর লেখা তাঁর ছেলে বিশেষ কারণে দিন দশেক স্কুলে আসতে পারবে না।

নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছেন না জ্যোতিরাণী। ঘরে যেন বাতাস নেই। —এর আগে আর কামাই হয়েছে?

রেজিস্ট্রির পাতা ওলটানোর শব্দ। তারপর শুনলেন, গত দুমাসের মধ্যে মাঝে মাঝেই কামাই হয়েছে।

—তারও দরখাস্ত সব ঠিক মত পেয়েছেন?

ওধারের জবাব পেয়েছে। ছেলের বাবাই দরখাস্ত পাঠিয়েছেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে জ্যোতিরাণী টেলিফোন রাখলেন।

শুয়ে আছেন। দুপুর গড়ালো। বিকেল হল। ঘড়ি দেখে জ্যোতিরাণী নিচে নেমে এলেন। চুপচাপ বসার ঘরে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। বাইরে রাস্তার দিকে সজাগ দৃষ্টি। অপেক্ষা করছেন।

আধ ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হাতের ইশারায় যে ছেলেটাকে ডাকলেন সে সুবীর। বিকেলের নৈমিত্তিক আড্ডার সঙ্গীর

খোঁজে সেও এ-বাড়ির দিকেই তাকাচ্ছিল। হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এলো।

—তোমার নাম সুবীর তো?

মাথা নাড়ল। কৃতার্থ হবে কি অবাক হবে জানে না।

খুব সহজ মুখেই জ্যোতিরাণী বললেন, ওই গলির ভিতর থেকে দুলুকে একটু ডেকে নিয়ে এসো তো।

সুবীর দুলুর খোঁজে গলির দিকে ছুটল তৎক্ষণাৎ। দুমিনিটের মধ্যে দুটি বিস্মিত মূর্তি জ্যোতিরাণীর সামনে হাজির।

—এসো।

জ্যোতিরাণী বসার ঘরে ঢুকলেন, তারা যন্ত্রচালিতের মত অনুসরণ করল।

এক মুহূর্ত ভেবে জ্যোতিরাণী বললেন, এখানে নয়, ওপরে এসো।

হতভম্বের মতই দাঁড়িয়ে গেছল তারা। জ্যোতিরাণীর সটান দু'চোখ আবার তাদের দিকে ঘুরতেই তাড়াতাড়ি ভিতরের দরজার দিকে এগলো তারা।

ছেলে দুটোকে নিয়ে দোতলায় সোজা নিজের ঘরে ঢুকলেন তিনি। কি ব্যাপার আন্দাজ করতে না পেরে শামু, ভোলা, মেঘনাও অবাক।

—বোসো। আঙুল দিয়ে খাট দেখিয়ে দিলেন তিনি।

ছেলে দুটো বসল। চোখে-মুখে অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া পড়েছে এখন। দোতলায় উঠেও সিতুকে না দেখে আরো ঘাবড়েছে। খানিক চুপ করে থেকে জ্যোতিরাণী তাদের আরো একটু ঘাবড়াবার অবকাশ দিলেন।

—কি খাবে তোমরা?

প্রায় খাবি খেতে খেতে মাথা নাড়ল দুজন, কিছু খাবে না।

—রেস্টুরেণ্ট ছাড়া খেতে ভালো লাগে না? যেখানে সেখানে খাওয়া ভালো না, তিনজনে মিলে কাল যেখানে দশ টাকার খেয়েছ তোমরা সেটা কেমন জায়গা?

নির্বাক, বিমূঢ় তারা।

—দুজনেই কানে কম শোনো তোমরা? কেমন জায়গা?

—ভা-ভালো। সভয়ে গলির দুলুই তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

—কি কি খেয়েছিলে?

ওরা ভাবল, রেস্টুরেণ্টে খেয়ে সিতুর অসুখ করেছে আর সেই কারণে এই ফ্যাসাদ। শুকনো গলায় সুবীর বলল, চপ কাটলেট মাংস.........

জ্যোতিরাণীর গলার স্বর অনুচ্চ, কিন্তু চাউনিটা কঠিন। ছেলে দুটো ঘেমে উঠেছে।

সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলেন।— গত দশ দিনের মধ্যে এই সব ক'দিন খেয়েছে?

—পা-পাঁচ ছ'দিন। দুলুর প্রাণান্ত অবস্থা, কারণ সিতুর মায়ের চোখ বেশির ভাগ সময় তার মুখের উপর।

—আর অন্য ক'দিন?

দুলু তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। সুবীর ঢোক গিলে জবাব দিল, মিষ্টি টিষ্টি।

—সবদিনই সিতু তোমাদের খাইয়েছে তো?

দুজনে এক সঙ্গে ঘাড় কাত করল।

—পর পর এই দশ দিন কোর্টে বিচার দেখতে যাওয়ার আগে মাসে ক'দিন করে গেছ?

একসঙ্গে চমকে উঠল দুজনে। সিতুর মায়ের সুন্দর মুখের মত এমন ভয়াবহ মুখ আর বুঝি দেখেনি।

—সত্যি জবাব দাও, ক'দিন?

জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে সুবীর বলল, চার পাঁচ দিন—

জ্যোতিরাণীর নিষ্পলক দৃষ্টি দুলুর দিকে ঘুরল, ও ঠিক বলছে?

দুলুর হিসেবে তাল-গোল পাকিয়ে গেল। গলা দিয়ে শব্দ বার করল কোনরকমে, পাঁচ-ছ' দিন...

—সিতুর ছুটির দরখাস্তয় এস চাটুর্জি কে সই করেছে?

দুজনেই বোবা। সত্রাসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। এতদিন বিচার দেখতে গিয়ে অনেক রকম জেরা শুনেছে। কিন্তু জেরা কাকে বলে এই যেন প্রথম টের পাচ্ছে।

তেমনি অনুচ্চ কিন্তু আরো কঠিন গলায় জ্যোতিরাণী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওর সব দরখাস্ত কে সই করে?

প্রাণের দায়ে একসঙ্গেই মুখ খুলল দুজনে, নি-নিতাইদা—

জ্যোতিরাণী মনে করতে চেষ্টা করলেন। ছেলের মুখেই এই নাম শুনেছেন।

—আচ্ছা, এসো তোমরা।

কলের পুতুলের মত একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দুজনে, ঘর ছেড়ে বেরুলো, তারপর দ্রুত প্রস্থান করে বাঁচল।

নিজের ওপর [illegible] রকমের [illegible] হয়েই যেন মাথা ঠাণ্ডা রাখছেন জ্যোতিরাণী। ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করছেন।

আঘাতে আঘাতে এ পর্যন্ত তাঁর অনেক কল্পনা মিথ্যে হয়ে গেছে। আশার সব থেকে বড় পুঁজি আর শেষ পুঁজিতে টান ধরেছে এবার।

কিন্তু এবারে এটা তিনি বরদাস্ত করবেন না। এই পুঁজিটুকু নিঃশেষ হতে দেবেন না। এই শেষ আশা তিনি ছাড়বেন না।

সিতু সন্ধ্যার পর ছোট দাদুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে কিছুই টের পেল না। পরদিন যথারীতি স্কুলে গেল এবং ফিরল। তখনো তার মনের কোণায় দুর্যোগের আভাসও পড়েনি। খেয়েদেয়ে বিকেলে বেরুলো। কেউ বাধা দিল না।

তারপর মাথায় বজ্রাঘাত। বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে দুলু আর সুবীরের দেখা পেয়েছে।

প্রথম ত্রাসে সিতু স্থির করে ফেলল আর বাড়ি ফিরবে না! যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যেতে হবে। ওই বাড়িতে আর ফিরতেই পারবে না। বিচারে যে ডাকাত দুটোর সমস্ত জীবন জেল হয়ে গেল তাদের প্রাণও সিতুর মত এমন বিপন্ন [illegible] বুঝি।

কিন্তু এই প্রাণান্তকর সংকটের মধ্যে দুর্বোধ্য বিস্ময়। একসঙ্গে [illegible] ব্যাপার ধরা পড়া সত্ত্বেও শাস্তি [illegible] দূরে থাক, গতকাল সন্ধ্যা থেকে মা [illegible] একবারও ডাকল না, কিছু জিজ্ঞেস [illegible] না পর্যন্ত। কেন?

মেরে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিলেও সিতু এত অবাক হত না বা এত অস্বস্তি বোধ করত না। শাস্তির থেকেও অনাগত শাস্তির বিভীষিকায় বুকের ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ীর ঘা পড়ছে তার।

যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাওয়ার সংকল্প ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিইয়ে যেতে লাগল। বিকেলের আলোয় টান ধরার আগেই কে বুঝি ধাক্কা দিয়ে তুলে নিল তাকে। তারপর ঠেলে ঠেলে বাড়ির দিকেই নিয়ে চলল।

দোতলার বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে। তাকেই দেখছে।

সিতু কি করবে? ওই মায়ের হাত থেকে বাঁচার তাড়নায় এখনো ছুটে পালাবে?

মায়ের ওই চাউনিটাই বুঝি সিতুকে টেনে নিয়ে চলল তাকে, তারপর দোতলায় তুলল।

ওদিকের বারান্দা ছেড়ে মা ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই মুহূর্তে সিতুর পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

মা দেখছে তাকে। শুধু দেখছেই চেয়ে। সিতু মুখ তুলতে পারছে না। মাটির দিকেও চেয়ে থাকতে পারছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। নড়তেও পারছে না। [illegible] হচ্ছে মায়ের এই দেখা বুঝি আর শেষ হবে না। [illegible] ধরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত [illegible] করে দিলেও [illegible]

—এদিকে আয়।

চমকে মুখ তুলল একবার, [illegible] পায়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

[illegible] বিকেলে বেরুবে আগে [illegible] কথাটা সরল হয়েছে। জ্যোতিরাণী আর এক দফা ভালো করে দেখে নিলেন।

—তোর অ্যানুয়াল পরীক্ষা কবে?

পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠাণ্ডা প্রশ্নটা অবাক হবার মতই অপ্রত্যাশিত।—মাস দেড়েক বাদে, নভেম্বরের গোড়ায়।

—এই দেড় মাস দুবেলা মন দিয়ে পড়বি। আর বিকেলে আমার বা বাড়ির লোকের সঙ্গে ছাড়া একদিনও বেরুবি না। মনে থাকবে?

শাস্তির ধরনটাই বড় বেশি অস্বাভাবিক লাগছে সিতুর। কলের মূর্তির মত মাথা নাড়ল। মনে থাকবে।

তারপরেই হতভম্ব বিমূঢ় সে। এমন অসম্ভব ভাগ্যও বিশ্বাস করবে? এইটুকুই শাস্তি—আর কিছুই না!

অবাক বিস্ময়ে সিতু দেখছে মা নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

দায়িত্ব ও মাতৃত্ব

কর্তব্যকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের মধ্য দিয়েই নতুন দায়িত্বভার অর্পিত হয়। কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের নারীসমাজ এক মহনীয় ইতিহাস রচনা করেছে। তাদের কাছে দেশের বিরাট প্রত্যাশার যে অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে একথা জোরের সঙ্গেই বলা চলে। শুধু সহজ এবং স্বাভাবিক সময়েই নয়, বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করার মুহূর্তেও নারীসমাজ যথেষ্ট দক্ষতা এবং প্রশংসনীয় কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। কর্তব্যের প্রতি এই নিষ্ঠা এবং দক্ষতার জন্যই দায়িত্বের পরিধিও তাদের বেড়ে চলেছে। দিনের পর দিন বেশী করে [illegible] নারীসমাজ কৃতিত্বের বহু ক্ষেত্রে সাফল্য হতে পারবে। সেজন্য এই দায়িত্বভারকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বাগত জানাতে কারও কোন সংস্কার থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই দায়িত্বের নিরিখে বৃহত্তর নারীসমাজের কৃতিত্ব যেমন ধরা পড়বে তেমনি অনেক নতুন প্রতিভার সন্ধানও মিলবে। এবং আগামী দিনের নতুন সমাজ গড়ে তুলতে এসব প্রতিভা এবং নতুনের আগমন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি এক মহিলা সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নারীসমাজকে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার মহিলাদেরই বহন করতে হবে। সবদিক ভেবে একথা বলা চলে যে মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তি এবং নারীসমাজের প্রতি কর্তব্যের এই নবতর আহ্বান যথেষ্ট নিষ্ঠাপ্রসূত। নারীর সর্বাধিক গৌরবজনক পরিচয় হচ্ছে মাতৃত্ব। এই মাতৃত্বের স্নেহ শাসনে আবদ্ধ থেকেই সে গড়ে তোলে আপন সন্তানকে ভবিষ্যতের যোগ্য করে। শিশুর সম্পূর্ণ লালনপালন এই মায়ের হাতেই ন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে কেউ [illegible] করেন না। প্রাথমিক শ্রেণীর পড়ুয়ার সবাই শিশু। শিশুদের মনস্তত্ত্ব মায়েরা যতটা বুঝবেন তত আর কেউ নয়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার যদি মেয়েদের উপর পুরোপুরি ন্যস্ত হয় সেটা সুখের এবং আনন্দেরই হবে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে গড়ে উঠবে সুসন্তান—যারা হবে আমাদের আগামী দিনে আশা-ভরসাস্থল।

মায়ের পরিচয়েই জাতির পরিচয়। একথা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নাই। প্রাচীন স্পার্টার বীর রমণীরা বীর সন্তান প্রসব করতেন—দুর্বল সন্তানের স্থান তাদের সমাজে ছিল না। সন্তান দুর্বল হলে তার প্রতিকার তারা নিজেরাই করতেন। তেমনি দেশের শিশুসমাজের দায়িত্বভার নেবার আগে তাদের গড়েপিটে মানুষ করে দেবার অগ্রিম প্রতিশ্রুতিও আমাদের সমাজকে দিতে হবে। সেজন্য আমাদের নিজেদের ভালভাবে তালিম দিয়ে নিতে হবে। আমাদের সুষ্ঠুতার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। একথা যদি আমাদের মনে থাকে এবং একথার যথার্থ মূল্যায়ন যদি আমরা করতে পারি তবেই এই দায়িত্বের গুরুত্ব আমাদের গ্রহণ করা উচিত—নতুবা নয়।

যুগে যুগে ভারতীয় নারী

(মুসলিম যুগে)

এই যুগের মুসলমান নারীদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তাঁদের বিবাহ সম্বন্ধে দু একটি কথা বোধহয় প্রথমে বলা প্রয়োজন। মেয়ের বিয়ের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হতো না। অবশ্য বংশের সম্মান থাকলে নাবালিকার বিয়ে যে একেবারে হতো না তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিয়ের আগে কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ বেশ পরিষ্কারভাবে সব বিষয়ে আলোচনা করতেন। বিবাহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না বরং তা ছিল এক চুক্তি, প্রত্যেক স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীধন দাবী করতে পারতেন। এই স্ত্রীধনের পরিমাণ বিয়ের চুক্তিতেই স্থির করা হতো। নারীর নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন জীবনযাপনের জন্য এই স্ত্রীধনের প্রয়োজন ছিল বইকি। কোন কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হলে স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে এই স্ত্রীধন দাবী করতেন।

সর্বযুগের মত সে যুগেও স্ত্রীর কর্তব্য ছিল স্বামীর সেবা, স্বামীর গৃহ সুষমামণ্ডিত করা এবং সর্বপ্রকারে দাম্পত্যজীবনকে সুখের করে তোলা। কিন্তু সে যুগের নারীর কোন স্বাধীনতাই ছিল না। সমাজ নারীকে বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ করার কোন অধিকারই দেয়নি। কোন অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টির সামনে আসবার কথা চিন্তা করাও ছিল স্ত্রীলোকের পাপ। অন্যদিকে স্বামীর কর্তব্য ছিল স্ত্রীকে সুখী করা, তার আনন্দবর্ধন করা এবং স্ত্রী কোন কারণে অন্যায় করলে বিনা নিষ্ঠুরতায় তাকে সংশোধন করা।

সে যুগে মুসলমান আইন নারীকে যে স্বত্ব ও অধিকার দিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নারী ইচ্ছা করলেই বহুক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতে পারত। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অর্ধেক অধিকার ছিল কন্যার [illegible]। সম্পত্তির উপর স্বামীর কোন অধিকারই ছিল না এবং স্ত্রী নিজের ইচ্ছামত সেই সম্পত্তি দান ও হস্তান্তর করতে পারত। সুতরাং আইনানুগ ভাবে মধ্যযুগের মুসলমান নারী অধিকারে ও মর্যাদায় পুরুষের সমকক্ষ ছিল বললেই চলে। কিন্তু দুঃখের ও অনুতাপের বিষয় এই যে সে যুগের নারীর অজ্ঞতা, অন্ধতা ও শিক্ষার অভাব তাদের অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু সেই যুগেও কয়েকজন মুসলমান রমণী সম্রাজ্ঞী হিসাবে আশ্চর্য ক্ষমতা ও বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও শাসনক্ষমতা পুরুষকেও বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় [illegible] করেছিল। শ্রদ্ধায় তাঁদের মস্তক অবনত হয়েছিল। সেই বীর রমণীদের সুলতানা রিজিয়া ও আহমেদনগরের চাঁদবিবি। সে যুগের নারী বিবাহিত জীবনকে কিভাবে সুখের করে তুলতে পারত তা আমরা জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান, শাহজাহান ও মমতাজের প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যজীবন থেকে বুঝতে পারি।

মুসলমান যুগে ভারতের নারী ছিল পর্দার আড়ালে। তবে একথা ঠিক যে প্রাচীনকাল থেকেই ভারত তার নারীদের অনাত্মীয় দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চেয়েছে। বিশেষ করে রাজপরিবারের রমণীরা চিরকালই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেছেন। মুসলমান যুগে এই পর্দাপ্রথার প্রচলন সাধারণ লোক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও অতিমাত্রায় দেখা যেত। ক্রমশঃ এই প্রথা এতই কঠোর ও অনমনীয় হয়ে পড়েছিল যে নারীর জীবন পর্দার আড়ালে হাঁপিয়ে উঠেছিল এবং বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের সব সংযোগই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান যুগের প্রথমদিকে যখন পর্দাপ্রথার চলন শুরু হয়, এক নারীই নাকি জানিয়েছিলেন প্রতিবাদ। তিনি তাঁর স্বামীর একাধিক অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর মুখ আচ্ছাদন করতে রাজী হননি। তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর সৌন্দর্যের কলম বুলিয়ে আমায় সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমার সৌন্দর্য যখন মানুষকে আনন্দ দেয়, আমি গর্ব ও আনন্দ বোধ করি ও ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রশংসা করি। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠশিল্পে যখন কোন খুঁত থাকতে পারে না, আমি কোন মতেই আমার মুখ আচ্ছাদন করব না।" কিন্তু এইরকম স্বচ্ছন্দী ও সাহসী নারী ছিল একান্তই বিরল, তাই নারী ক্রমশ পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলো। ক্রমে পর্দা প্রথা এতই কঠোর হলো যে ভদ্রপরিবারের অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলারা পর্দা ভিন্ন বাইরে যাবার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। মুখ না ঢেকে যাঁরা বার হতেন, নারীদের কোন মর্যাদাই তাঁরা পেতেন না। এই যুগের পর্দা প্রথা

সম্বন্ধে নানা গল্প শোনা যায়। তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একদিন সম্রাট শাহজাহানের সভাসদ আমীর খাঁর স্ত্রী পাল্কী চড়ে দিল্লীর সরু গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজার এক হাতী হঠাৎ ছাড়া পেয়ে ঐ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। পাল্কীবাহকেরা ভয় পেয়ে পাল্কী ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। মহিলা অগত্যা নিরুপায় হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পাল্কী থেকে লাফিয়ে পড়ে পাশের এক দোকানে আশ্রয় নেন। কিন্তু মহিলার এই কাজ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। কোন ভদ্র পরিবারের মর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী যে এইরকম কাজ করতে পারে তা' তাদের চিন্তার অতীত ছিল। রাস্তার হাজার দৃষ্টির সামনে তাঁর মুখ প্রকাশিত হয়েছে বলে, তাঁর স্বামী শাস্তি-স্বরূপ তাঁকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেন। তাঁকে এও জানিয়ে দেওয়া হয় যে এতবড় অপমানের চেয়ে মৃত্যুও তার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের অনুরোধে সে যাত্রা সেই রমণী রক্ষা পান এবং শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি সে যুগে উচ্চ সম্ভ্রান্ত ধনী-গৃহের পুরুষেরা নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে কি অদ্ভুত ধারণাই না পোষণ করতেন।

সেই যুগে রাজপরিবারের ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীরা নানারকম খেলা ও আনন্দে নিজেদের মাতিয়ে রাখতেন। ভাবতে অবাক লাগে যে পোলো খেলা তাদের বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁরা তাঁদের গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকাদের কাছে নানা বিষয়ে শিক্ষিত হতেন। তবে বাইরের জগৎ তাদের কাছে চিরদিনের জন্য অন্ধকারই থেকে যেতো। সে বিষয়ে কোন কিছু জানবার আগ্রহ প্রকাশ করাও সম্ভব ছিল না। রাজপ্রাসাদের রমণীরা অন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত এক মেলায় যোগ দিতেন। এই 'মেলা' ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান। নানারকম সাজ-সজ্জায়, মণিমুক্তায়, হীরামাণিক্যে, মেলা ঝলমল করতো। মাঝে মাঝে রাজা স্বয়ং এই মেলায় আসতেন এবং মহিলাদের সঙ্গে দরাদরি করে জিনিস কিনতেন। মূল্য দেবার সময় কিন্তু ভুলক্রমে রূপোর মুদ্রার বদলে সোনার মুদ্রা দিয়ে দিতেন। চারিদিকে হাসির, আনন্দের, উচ্ছ্বাসের ঢেউ বয়ে যেতো। এই মেলাতেই মহিলারা সাজ-পোশাকের নতুন ধরণ বা স্টাইল শিখতেন ও অন্যকে শেখাতেন। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মা, বাবা এই মেলায় নিয়ে আসতেন, বেগমদের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায়।

ভারতের মুসলমান যুগের নারীদের বিষয় বলতে গেলে রাজপুত নারীদের বিষয় উল্লেখ না করে পারা যায় না। রাজপুতানা সেদিন ছিল বীরত্বের অপূর্ব লীলাভূমি। চিতোরের রাণী পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত রমণীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা ও আত্মোৎসর্গের কথা কে না জানে! সে যুগের হিন্দু নারীর জীবনে স্বামীর স্থান ও মূল্য নিরূপণ করতে হলে সতীদাহ প্রথার ব্যাপক চলন সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা প্রয়োজন। স্বামীর জীবন-দীপ নির্বাপিত হ'লে স্ত্রীর বেঁচে থাকা সে যুগের চোখে ছিল নিরর্থক। বহু সতী নারী নির্ভীকচিত্তে স্বামীর চিতার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যেদিন বারো হাজার রাজপুতানীর সঙ্গে রাণী পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, সেদিন আকাশে বাতাসে শোনা গিয়েছিল সতী নারীর জয়ধ্বনি। নারীর অমর্যাদা অপেক্ষা নারীকে বলি দেওয়াই সমাজপতিরা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। এই সতীদাহ প্রথা শিখদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল সে যুগে। শিখগুরু অমরদাস বহুভাবে শিখ সম্প্রদা[য়কে] সতীদাহ থেকে নিরস্ত থাকতে উপ[দেশ] দিয়েও সফলকাম হননি। শিখ র[াজ]পরিবারে ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে সতী প্রথা চলিত ছিল বটে, কিন্তু মধ্য[বিত্ত] সমাজের বিধবারা যে শুধু বেঁচে থা[কতে] পারত তা' নয়, বিবাহেও তাদের কোন [বাধা] ছিল না।

ভারতের ইতিহাসে প্রাচীনকাল [থেকে] মুসলমান যুগ অবধি নারীর অধী[নতার] যুগ। তারপর থেকে শুরু হ[য়েছে] স্বাধীনতা বা মুক্তির যুগ। দিন দিন [বেড়ে] চলেছে নারীর মূল্য। নারীও সং[গ্রাম] করেছে মুক্তির জন্য। বর্তমান যুগে [নারী] স্বাধীনতার এ যুগ। পরিপূর্ণ মু[ক্তির] আলোকে আমাদের নারীসমাজ [ঝল]মল—সমানাধিকারের ভিত্তিতে [নতুন] মূল্যবোধে উদ্দীপিত। —বেলা

ভিনদেশী অভিনেত্রী

বাবা চীনা মা জার্মান—এই হলো সুষেন ত্রিসিয়াও-এর পরিচয়। এককালে চীনেই তাদের বাড়ীঘর ছিল। বসবাসও করতো সে দেশেই। কিন্তু হঠাৎ কি হলো চীন ছেড়ে তাদের চলে আসতে হলো জার্মানীতে। এসব কথা কখন আর সুষেন ভাল করে মনে করতেও পারে না। সুষেন পরে জেনেছিল রাজনৈতিক কারণেই তাদের স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে —অবশ্য পুরোপুরি বিদেশ নয়, কারণ মায়ের দিক থেকে এদেশেও তার অধিকার আছে।

জার্মানীতে এসে সুষেন কমার্শিয়াল স্কুলে ভর্তি হয়। পড়াশোনা শেষ করে সে স্টেনো-টাইপিস্ট এবং সেক্রেটারীর কাজ শুরু করে। সবদিক দিয়ে সে ছিল তার যুগের আর পাঁচটা মেয়ের মত। এরই মধ্যে একদিন খবরের কাগজে একটা খবরের দিকে দৃষ্টিটা আটকে গেল। খবরটা ছিল অভিনেত্রী-সংক্রান্ত। 'ফ্যানী হিল' চিত্রে অভিনয়ের জন্য। সুষেনের মা-বাবা তখন বেড়াতে গেছেন। কোন কিছু ভেবে উঠবার আগেই একটা আবেদন করে দিল সে। আবেদন-পত্রের সঙ্গে একটা ফটো দিতেও ভুললো না। ফটো দেখে কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়ে গেল। তাঁরা ডেকে পাঠালেন সুষেনকে ফিল্ম টেস্টের জন্য। সবকিছুই সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করলো। কর্তৃপক্ষ খুশি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরী হয়ে গেল। চুক্তি-পত্রটি নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো মা-বাবার কাছে। ঠিক যেন বিজয়িনীর মত। তাঁরাও খুব একটা আপত্তি করলেন না—বরং খুশিই হলেন বিংশোত্তরী মেয়ের এই সাফল্যে।

কথাগুলো যেন মনে হয় রূপকথ[ার] গল্পের মত। কিন্তু গল্পের মত মনে হ[লেও] এটা সত্যি এবং ঘটেছে পশ্চিম জার্মানী[তে]। এইরকম এক অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্য দিয়ে সুষেন ফিল্মী সাফল্যের প্রথম ধাপ পেরি[য়ে] এলো। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে [সে] বলে, 'আমি হচ্ছি ইউরেশিয়ান—চীনা [বা] জার্মান নয়।' তার বাবা পলিটিক্যাল ইকনমিতে ডিগ্রিধারী। জার্মান রাজধানী [বন-এর] মুক্ত এলাকায় একটি চাইনীজ রেস্তোরাঁ[র] তিনি পার্টনার। এছাড়া লেখকখ্যাতিও [তাঁর] আছে।

সুষেন পুরোপুরি আধুনিকা। সা[জ-]গোজে তার ভীষণ শখ এবং তেমনি [তার] পরিপাটি। 'ফ্যানী হিল'-এ সাফল্যের [পর] সে অভিনয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন কণ্ট্রাক্টও পেয়ে যায়। 'চেঙ্গিস খান' চিত্রে সে অভিনয় করছে রাজকুমারী চেন য়ুর ভূমিকায়। এই খেয়ালী রাজকুমারীর রূপের জৌলুসই চেঙ্গীজ খা[নের] রক্তে দোলা দেয়। অস্থির চেঙ্গীজ [খান] অবশেষে তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু সুষেন 'সিরিয়াস' অভি[নয়] করতে বেশি ভালবাসে। অভিনয়কেই [সে] জীবনে ধ্যানজ্ঞান বলে ধরে নিয়েছে। বয়সের নবীনতায় উদ্দাম এই তরুণী সাঁতার কাটা, দাঁড় টানা এবং পপ সঙ্গীতের সম[ঝদার] ভক্ত। বোলিংয়ে তার পারদর্শিতা সবিশে[ষ] প্রশংসনীয়। এজন্য অনেক পুরস্কার জ[মা] হয়েছে তার ঘরে। কিন্তু থিয়েটার দেখ[তে] সবচেয়ে সে বেশি ভালবাসে। আর এখানে রয়েছে তার সকল সাফল্যের চাবিকাঠি। সুষেন জার্মান ফিল্ম গগনে আগামী দিনে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে যে শোভা পাবে [তা] বলার অপেক্ষা রাখে না।

চাঁদ ও পৃথিবী

শচীন্দ্রনাথ বসু

আবহাওয়ার সৃষ্টিতে বায়ুমণ্ডলের প্রভাব আমরা এর আগে আলোচনা করেছি, এ সম্বন্ধে পৃথিবীর দুই প্রধান গতির অংশও বোঝা দরকার। স্বাবর্তনী পৃথিবীর গায়ে এক-এক জায়গায় এক-এক রকম বেগ—নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ১০৫০ মাইল, নরওয়ে দেশের কাছে তার প্রায় অর্ধেক। তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় বাতাসে বিভিন্ন রকম টান পড়ে, নিরক্ষ বৃত্তের দিকে পূব থেকে পশ্চিমে অবিরাম হাওয়ার স্রোত হয়, যার নাম নিয়ত বায়ু; এর দ্বারা জল-বায়ু অনেকটা নির্ধারিত হয়।

অনেকের ধারণা ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতির দ্বারা—সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৩১ লক্ষ মাইল বাড়ে-কমে, যখন তারা কাছাকাছি তখন গ্রীষ্ম, যখন দূরে তখন শীত। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, আসলে উত্তর গোলার্ধের শীতে ও দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মে সূর্য ও পৃথিবীর সান্নিধ্য সবচেয়ে ঘন। দূরত্বের এই পার্থক্যের জন্য সূর্যতাপের যেটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে তা অতি সামান্য, কিন্তু সূর্যকিরণ কতখানি কোনাকুনি পড়ছে তার উপর উষ্ণতা অনেকখানি নির্ভর করে। যেহেতু পৃথিবীর অক্ষ এক পাশে ২৩·৫ ডিগ্রি হেলান সেহেতু সূর্যকিরণের কোণ বছর কালের সঙ্গে বদলায়, সুতরাং ঋতুভেদের প্রকৃত কারণ পৃথিবীর এই আক্ষিক নতি।

উত্তর গোলার্ধে ২২ জুনের কাছাকাছি সবচেয়ে বড় এবং ২২ ডিসেম্বরের কাছাকাছি সবচেয়ে ছোট হয়, যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি। ঐ তারা গ্রীষ্মের দিনে উত্তর মেরু সবচেয়ে হেলে সূর্যের দিকে, উত্তর গোলার্ধে তখন সূর্যের আলো পড়ে সবচেয়ে কম তির্যক হয়ে, মকরক্রান্তির দিনে রোদ পড়ে সবচেয়ে কম তেরছা হয়ে। আসলে উষ্ণতম ও শীতলতম দিন আসে আগস্ট এবং জানুয়ারীতে, তার কারণ পৃথিবী গরম ও ঠাণ্ডা হতে সময় নেয়। দক্ষিণ গোলার্ধের অবস্থাটা অবশ্য সব বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত।

একই পরিমাণ রশ্মি যখন মাথার উপর থেকে সোজাসুজি পড়ে তখন মাটিতে তা সবচেয়ে কম জায়গা নেয়, যত বেশী তেরছা হয়ে পড়ে তত বেশী ছড়িয়ে যায়, সুতরাং এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি কম তাপ লাভ করে। শীতকালে যে শীত তার আর একটা কারণ তির্যক রশ্মিকে অনেকখানি বেশী বায়ুস্তর পার হতে হয়, বাতাস তাপ বেশী নিয়ে নেয়, যেমন ঘটে সূর্যাস্তের আগে। বস্তুত, যে যে কারণে প্রতিদিন দুপুর থেকে বিকালে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে ঠিক সেই কারণেই ছ মাস পরে গ্রীষ্ম ও শীত আসে। বলাবাহুল্য, মেরু অঞ্চলে যে শীত সবচেয়ে প্রবল তার কারণ সেখানে সূর্যালোক সবচেয়ে তির্যক। শীত-গ্রীষ্মে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য যে বদলায় তারও কারণ অবশ্য আক্ষিক নতি।

তবু ঋতু বিবর্তনে প্রদক্ষিণ গতিরও এক পরোক্ষ প্রভাব আছে এই যে, সূর্যের সম্পর্কে পৃথিবীর স্থান পরিবর্তন হয় বলেই প্রতি বছর দুই বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য গ্রহেও ঋতুর কারণ আক্ষিক নতি, নতির পরিমাণ যার যার অবস্থা নির্দেশ করে।

এবার আমাদের এই গ্রহের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। আজ আমরা জানি যে, পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল (৭১ শতাংশ), এক ভাগ স্থল, স্থলে কোথাও পর্বতশ্রেণী, কোথাও অপেক্ষাকৃত সমতল-ভূমি। পৃথিবীকে আবার আগের মত পাঁচ ফুট গোলকে পরিণত করে যদি এক পোঁচ রঙ লাগান হয় তবে সেই আবরণ যতটুকু পুরু হবে, এই গ্রহের স্থল জলের থেকে গড়ে তার চেয়েও কম উঁচু।

পৃথিবীর সাগর অংশ এখনও প্রায় অনাবিষ্কৃত, বৈজ্ঞানিক রহস্য ছাড়াও মানুষের প্রয়োজনীয় বহু রসদ সেখানে নিহিত আছে। মাটির নিচে লুকানো আছে প্রচুর তেল, অনেক জায়গায় সাগরতলে ছড়িয়ে আছে বিশুদ্ধ ধাতুর খণ্ড (ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট এবং তামা)। সমুদ্রে এত মাছ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী প্ল্যাংকটন আছে যে, তার থেকে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের খাদ্যে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা মেটান চলে।

কিন্তু আজ পৃথিবীর যে মানচিত্র আমাদের পরিচিত তা চিরকালের নয়, যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটেছে। জার্মেনির ভূবিজ্ঞানী ভেগেনার অনেক দিন আগে প্রস্তাব করেন যে, বর্তমান মহাদেশগুলি একদা জোড়া ছিল, ক্রমে ভাগ হয়ে সরে গিয়েছে। প্রমাণস্বরূপে তাঁর দেখিয়েছেন যে এগুলির পরস্পরের সঙ্গে বেশ ভাল খাপ খায়, যেমন দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকা। এই তত্ত্ব প্রথমে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ পাত্তা পায় নি কিন্তু সম্প্রতি সম্মানিত হয়েছে।

এ হল জল স্থল বিন্যাসে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কথা। পৃথিবী শক্ত হয়ে জমার পর থেকে আজ থেকে তার উপর অনেকগুলি ছোট-বড় ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছে: স্থল তলিয়ে গিয়েছে জলের নিচে, আবার জল ফুঁড়ে পাহাড় মাথা তুলেছে: মাত্র সাত কোটি বছর আগেও এই আকাশচুম্বী হিমালয় ছিল সাগর গর্ভে। পৃথিবীর গর্ভে যেন আছে এক বন্দী দানব, কিছুকাল পর-পর যে লাফালাফি আরম্ভ করে, বসুন্ধরার ত্বক জায়গায়-জায়গায় ফুলে ওঠে তার দাপটে, স্থল মাথা তোলার ফলে জল গিয়ে জমে শুধু গভীর সমুদ্রে। এই সব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ারও নানারকম অদল-বদল হয়। তারপর বার্থ দানব আবার বসে-বসে দম নেয়—ক্রমশ, কোটি-কোটি বছর ধরে আবার পৃথিবীর গা সমতল হয়ে আসে, বৃষ্টিতে পাহাড় ক্ষয়ে যায়, সেই পলি এসে জমে সমুদ্র গর্ভে, ঠেলে তোলে জল, তা আবার গ্রাস করে স্থল—আবহাওয়া নরম হয়ে আসে, যতদিন না জেগে ওঠে দানব। বিগত ৫০ কোটি বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত এই রোছের বড় বিপ্লব পৃথিবীকে গ্রাস করেছে তিনবার—সব শেষেরটি মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে, তার আগের দুটি যথাক্রমে ২৫ ও ৫০ কোটি বছর আগে। এই তিনটি মহা-বিপ্লবের ফাঁকে ফাঁকে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা আবার দশ এগারোটি সুনির্দিষ্ট ছোট বিপ্লবেরও নির্দেশ পেয়েছেন।

এই সব ভৌগোলিক ও আবহাওয়া সম্পর্কিত পরিবর্তন তাদের ছাপ রেখে গিয়েছে শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর পাথরের মধ্যেই নয়, প্রাণীকুলের অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যেও। মোটামুটি উপরোক্ত তিনটি ভৌগোলিক বিপ্লবের কালকে জীবতাত্ত্বিকরা তিনটি অধিকল্পে ভাগ করেছেন—পুরা-জীবীয়, মধ্যজীবীয় ও নবজীবীয়। আধুনিকতম নবজীবীয় অধিকল্পকে ভূতত্ত্বের ভিত্তিতে আরও সাতটি অধিযুগে ভাগ করা হয়—পেলিওসিন থেকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্লাইস্টোসিন ও হলোসিন পর্যন্ত। মোটামুটি এই দুটির সঙ্গেই শুরু মানুষের প্রাগৈতিহাস যাঁরা অনুশীলন করেন সেই প্রত্নবিদদের দুই যুগ—পুরা-প্রস্তর ও নবপ্রস্তর। পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় এই দুই যুগের দৈর্ঘ্য নগণ্য।

পুরাজীবীয় অধিকল্পের আগে একদা প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল, সম্ভবত প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে। প্রাণ সৃষ্টির অলৌকিক ঘটনা কি করে সম্ভব হয়েছিল তা আজও জানা নেই। এই আশ্চর্য রহস্যের মুখো-মুখি হয়ে কেউ কেউ ভেবেছে যে, প্রাণবীজ প্রথমে এখানে এসেছে মহাকাশের থেকে, উলকাকে বাহন করে। কল্পনাপ্রবণ লোকেরা এমন কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, আজ পৃথিবীবাসীরা যেমন দিক-বিদিকে রকেট পাঠাচ্ছে এই রকম কোনও বাহনযোগে গ্রহান্তর থেকে জীবাণু প্রথম পৌঁছে থাকতে পারে পৃথিবীতে। আমাদের খোঁজের ফলে যদি কোনও দিন অন্যত্র এমন প্রাণ-বস্তুর সন্ধান মেলে যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তবে এ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হবে। ১৯৬১ সালে দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী উলকাতে শেওলা জাতীয় প্রাণীর চিহ্ন পেয়েছেন বলে দাবী করেছিলেন, কিন্তু তা টেঁকে নি। এখন পর্যন্ত মনে হয় প্রাণের উদ্ভব এই পৃথিবীতেই — সেই যেখানে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল আদিম অগভীর সাগরের উষ্ণ নোনা জলে।

জীববিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন যে, নিউক্লেইক অ্যাসিড নামক এক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যেই প্রাণের চাবিকাঠি, কারণ এর এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে নিজেকে বহু-গুণিত করবার বা বাড়িয়ে চলবার—যা প্রাণী মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। এই নিউক্লেইক অ্যাসিড আছে সব প্রাণীর প্রতি দেহকোষের কেন্দ্রে, সেখানে যে বংশকণা (জেনি) প্রাণীর আকৃতি-প্রকৃতির অনেক কিছু নির্ধারিত করে এই অ্যাসিড তারই উপাদান।

প্রাণের আর একটি আবশ্যিক বস্তু প্রোটিন। প্রোটিনের অনেক রূপ, দেহের বিভিন্ন অংশে তারা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে—কোথাও তারা দেহ গঠনের উপাদান, কোথাও সাহায্য করছে প্রাণ ধারণের জন্য যে নানাবিধ পদার্থের প্রয়োজন তা বানাতে। প্রোটিনের দীর্ঘ অণু ক্ষুদ্রতর বস্তু অ্যামিনো অ্যাসিড গেঁথে গেঁথে তৈরি হয়, এই রকম অ্যামিনো অ্যাসিড আছে কুড়িটা, সুতরাং বিভিন্ন রূপে তাদের সাজিয়ে প্রকৃতি বহু-সংখ্যক বিভিন্ন প্রোটিন সৃষ্টি করতে পারে।

তেমনি নিউক্লেইক অ্যাসিড তৈরি হয় অ্যাডিনিন, সাইটোসিন, ইত্যাদি চারটি নাইট্রোজেন সম্বলিত পদার্থ জুড়ে, তাদেরই স্থান পরিবর্তন করে নিউক্লেইক অ্যাসিডে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। এই অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে লম্বা লম্বা মালা তৈরি হয়, প্রাণী দেহের কোষকেন্দ্রে বংশকণায় তাদের স্থান। কয়েক বছর আগে কেম্ব্রিজে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্রিক এদের আণবিক গঠন ব্যাখ্যা করে নোবেল পুরস্কার পান। আরও সম্প্রতি ইংলণ্ডে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা এবং আমেরিকায় নিরেনবার্গ ও ম্যাথি এর চেয়েও এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন; দেখা গেল নিউক্লেইক অ্যাসিডের মধ্যে আছে প্রোটিন সৃষ্টির রহস্য, এই অ্যাসিডের লম্বা আণবিক মালার মধ্যে নাইট্রোজেন সম্বলিত অংশগুলি কি পরম্পরায় সাজান আছে তার উপর নির্ভর করে কি প্রোটিন তৈরি হবে। যেহেতু প্রত্যেক প্রাণী পিতা-মাতার থেকে বিভিন্ন বংশকণার সমষ্টি লাভ করে সেহেতু তাদের প্রোটিন উপাদানও কিছুটা আলাদা—এই আবিষ্কারের পরে স্পষ্ট হল প্রাণীজগতে বৈচিত্র্যের রাসায়নিক ভিত্তিটা। সৃষ্টির এই মৌলিক রহস্যের চাবিকাঠি হাতে পেয়ে মানুষ ভবিষ্যতে কি আশ্চর্য কীর্তি সাধন করতে পারে তা এখনও কল্পনাতীত—হয়ত ইচ্ছামত প্রাণীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ বা জন্মগত রোগ সংশোধন সম্ভব হতে পারে। যাই হোক, এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ নেই যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এর গুরুত্ব তুলনা করা হয়েছে সার্ব মহাকর্ষ ও ডারউইনীয় ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সঙ্গে এই আণবিক জীববিজ্ঞান আজ গবেষণার অতিপ্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

পরীক্ষাগারে প্রমাণ হয়েছে যে, বিদ্যুৎ ক্ষরণ বা হ্রস্বতরঙ্গ অতিবেগনি রশ্মির সাহায্যে জলীয় বাষ্প, আলেয়া গ্যাস (মিথেন), অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ইত্যাদি সরল পদার্থের থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেন সম্বলিত অপেক্ষাকৃত জটিল জৈব উপাদানের সৃষ্টি সম্ভব। প্রকৃতির বৃহত্তর কর্মশালায় একদা আদিম বন্ধ্যা পৃথিবীর জল-কাদা, আলো-বাতাস মিলে সম্ভবত সঠিক যোগাযোগটি ঘটেছিল। প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অক্সিজেনশূন্য বাতাসে ছিল গ্যাসরূপে, জলে বিবিধ লবণ-রূপে, একেবারে যথার্থ পরিমাণে; বাতাসের তাপ ও চাপ ছিল সম্পূর্ণ উপযুক্ত এভাবে হয়ত প্রাণের প্রাথমিক ইশারারূপে মুক্ত বংশকণা জাতীয় বস্তু সৃষ্টি হয়েছে, তা নিজেকে বহুগুণিত করেছে, প্রোটিন গড়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে। ক্রমে দেখা দিয়েছে আরও জটিল কোষযুক্ত প্রাণী—প্রথমে এক-কোষ, পরে বহুকোষ। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখের এক খবর অনুসারে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে প্রাথমিক প্রাণ-অণু সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে যা নিজেকে বহুগুণিত করেছে।

প্রাণ আবির্ভাবের তারিখটা যে সঠিক জানা নেই তার কারণ সেই প্রাচীনতম প্রাণীদের ক্ষুদ্র অস্থিহীন কোমল দেহ কোনও ফসিল বা জীবাশ্ম রেখে যায় নি। এ পর্যন্ত প্রাচীনতম স্পষ্ট ও অক্ষত ফসিল যা পাওয়া গিয়েছে তার বয়স ৬০+২ কোটি বছর, যদিও ৫ নভেম্বর ১৯৬৫ সালের এক খবরে জানা যায় কানাডার মেরু দেশে নাকি ৭২ কোটি বছর প্রাচীন ক্ষুদ্র ঝিনুক জাতীয় জীবের ফসিল মিলেছে। রোডেসিয়া টাঙ্গানীকার চুনাপাথরে অস্পষ্ট সাক্ষ্য আছে ২৬০ কোটি বছর প্রাচীন শেওলা জাতীয় জীবের। আফ্রিকার অন্যত্র, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া থেকেও ২৫০—২৭০ কোটি বছর প্রাচীন প্রাণবস্তুর দাবী শোনা গিয়েছে—চিহ্নগুলি কোথাও শেওলার, কোথাও বা ক্ষুদ্রতর এককোষীয় প্রাণীর, কোথাও শুধু প্রাণীদেহের অংশ কোনও রাসায়নিক পদার্থের। বিশেষজ্ঞ মেলভিন ক্যালভিন মনে করেন ২০০ কোটি বছর ধরে আণবিক প্রাণবস্তু বিবর্তিত হওয়ার পর প্রথম জীবন্ত কোষ দেখা দিয়েছে।

আসলে প্রাক্-পুরাজীবীয় প্রাণীদের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা নেই, কিন্তু এই অধিকল্পের শুরু, অর্থাৎ মোটামুটি ৬০ কোটি বছর থেকে ফসিলের সাক্ষ্য অনেক পরিষ্কার। সেই সময় থেকে প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে নানাবিধ জলজ উদ্ভিদ, মেরুদণ্ডবিহীন জন্তু এবং অবশেষে মেরদণ্ডী মাছের প্রভুত্ব। তার পর স্থলে দেখা দিল উদ্ভিদ, উভচর জন্তু এবং অবশেষে সরীসৃপ থেকে আরম্ভ করে বিশাল ভয়ংকর ডাইনোসর, পাখি, স্তন্য-পায়ী জীব, এবং এদের চরম পরিণতি মানুষ মাত্র দশ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু এই রোমাঞ্চকর ইতিহাস বর্ণনায় জায়গা এখানে নয়, বিভিন্ন প্রাণীর সম্পর্কে মানুষের স্থান কোথায়, কি করে পাশবিক আদি মানবের থেকে সভ্য মানুষ বিকশিত হল সেই কাহিনী আছে এই লেখকেরই "প্রাগৈতিহাসের এক মানুষ" বইতে। তবে ভগ্নাংশ হিসাব করে বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসের এক অষ্টমাংশ অধিকার করে আছে প্রাচীনতম প্রাণী ফসিলে যার সাক্ষ্য আছে, মেরদণ্ডী প্রাণী অধিকার করে ১২ ভাগের এক ভাগ, আর মানুষের সভ্যতা ল' লক্ষ ভাগের এক ভাগ!

মানুষের এই অভিব্যক্তি ঘটেছে চারটি তুষার যুগের মধ্য দিয়ে। প্রথমটির শুরু প্লাই-স্টোসিন অধিযুগের গোড়ার দিকে, দশ থেকে ছ' লক্ষ বছর আগে, শেষ ৫৬০,০০০ বছর আগে। তার পর আরও তিন তিন বার উত্তুরী হিম নেমে এসে দক্ষিণে তাড়িয়ে নিয়েছে বহু বনানী পশু পাখি, জীবজন্তু আবার সরে গিয়েছে উত্তরে। বরফের ওঠানামার কারণ খুব স্পষ্ট নয়, পৃথি স্থলে জলে যে বৈপ্লবিক উত্থান ঘটেছে কয়েক কোটি বছর পরে পরে কথা আগে বলেছি) তার মত এর রহস্যে আবৃত।

পৃথিবী ও মানুষের ইতিহাস শীলনে আধুনিক বিজ্ঞানের এক গু ও কার্যকরী আবিষ্কার খুব সাহায্য ক তা হল তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় প্রাচীন বস্তুর বয়স নির্ণয়, যার করেছি আমরা আগে দু' একবার। পাথরে ইউরেনিয়ামের ক্ষয় পৃথিবীর নির্ণয়ে সাহায্য করেছে, তেজী-ক কাজে লেগেছে অপেক্ষাকৃত অল্পপ্র জিনিসের পরীক্ষায়, বিশেষ আদি সম্পর্কিত বিষয়ে। এই পদ্ধতির বৈজ্ঞ নীতিটি আসলে খুব সহজ : প্রাণী প্রধান উপাদান কারবন, তার প্রায় লক্ষ ভাগের এক ভাগ তেজস্ক্রিয়; মৃত্যুর এই তেজী-কারবন নষ্ট হতে আরম্ভ অর্ধেক ক্ষয় হয় ৫৭৬০ বছরে, চতুর্থাংশ তার দ্বিগুণ সময়ে। সুতরাং যে কোনও প্রাণীজাত বস্তুর কতখানি তেজী-কারবন বাকি আ মেপে তার বয়স নির্ণয় করা যায়, ৪০—৫০,০০০ কি বড় জোর ৭০, বছর পর্যন্ত। ভাগ্যক্রমে আরও দী মাপবার উপযুক্ত মৌলিক পদার্থও গিয়েছে। পটাসিয়ামের এক আইসো থেকে হয় আরগন, অর্ধেক ক্ষয় হতে ১৩০ কোটি বছর, এই পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে দশ থেকে তিন লক্ষ বয়স নির্ণয় করতে। থোরিয়ামের আইসোটোপ থেকে হয় সীসা, রুবিডিয়ামের এক আইসোটোপ থেকে স্ট্রনশিয়াম, অর্ধায়ু যথাক্রমে ১৪০০ ও ৬০০০ কোটি বছর। ভূবিজ্ঞানী বিশেষ কাজে লাগে ইউরেনিয়াম যার পৃথিবীর অনেক জায়গায় অনেক পাথ মেলে। একদা পৃথিবীর সব ইউরেনি সীসায় পরিণত হবে, কিন্তু এই পরিব ঘটছে অতি ধীরে, ২২৫ কোটি বছরে খণ্ড ইউরেনিয়ামের মাত্র এক-চতুর্থ রূপান্তরিত হয়।

আপাতত প্রাচীনতম পাথর গিয়েছে (টাঙ্গানীকাতে) তার বয়স ৩৬০ কোটি বছর। উল্কাখণ্ডের পাওয়া গিয়েছে ৪৬০ কোটি বছর, এগুলি অবশ্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্র সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হয়।

পৃথিবীর সম্পূর্ণ ইতিহাস যদি দশ খ এক বইতে লেখা যায় যার প্রতি খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠা, তবে বর্তমানে একমাত্র খণ্ডের সুসংবদ্ধ অনুশীলন সম্ভব। দশ লক্ষ বছরের খবর বলতে হবে মাত্র পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসে খণ্ডেও সম্পূর্ণ ভরবে না।

(আসছে সংখ্যায় শেষ।

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

মহাসম্পদের উৎস সমুদ্র

পৌরাণিক যুগে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত ও নানা মহাসম্পদ আহরিত হয়েছিল। মহাসম্পদের আকর বলেই সমুদ্রের অপর নাম 'রত্নাকর' এবং সত্যই সমুদ্র মানুষের কাছে রত্নের আকর। মহাসমুদ্রের গর্ভে কত অপরিসীম সম্পদ আছে, যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আজও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পৃথিবীর পাঁচটি মহাসমুদ্র মিলে ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার জলে উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলিয়ে জৈবসম্পদ আছে ১৬ শত কোটি এবং খনিজ সম্পদ আছে প্রায় ৪৬০ কোটি টন। এই বিপুল সম্পদের অতি সামান্য অংশমাত্রই বর্তমানে মানুষের প্রয়োজনে আহরিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমুদ্রে সম্পদ ক্রমশই বেড়ে চলছে। কারণ পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে নিত্য নতুন জিনিস সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ছে এবং উদ্ভিদ ও জলচর প্রাণীদের ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি হচ্ছে বিপুল হারে।

মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রায় সকল সামগ্রীই পাওয়া যায় সমুদ্রের জলে, যেমন নানারকম লবণ, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, গন্ধক, অঙ্গার, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, এমন কি সোনা, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম। আমরা দৈনন্দিন আহার্যদ্রব্যে যে লবণ ব্যবহার করি সেই লবণ সমুদ্রের জলে সঞ্চিত রয়েছে ৩৮০ কোটি কোটি টন। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করে আসছে। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করা নিষিদ্ধ ছিল। গান্ধীজী এই আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশে আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন। আমাদের বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন

সমুদ্রগর্ভের একটি পর্বতে গবেষণাকার্য সমাধানের পর বিজ্ঞানীরা 'ভাসমান গবেষণাগার'এ ফিরে আসছেন।

এক বিরাট রূপ নিয়েছিল। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা ও জাপানে যে লবণ ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশই তৈরী হয় সমুদ্রের জল থেকে এবং পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট লবণের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি সমুদ্রজাত। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমুদ্রের জল থেকে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম, ব্রোমিন, আয়োডিন, পটাশিয়াম ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

সমুদ্রের জৈব সম্পদ অপরিসীম। প্রতি বছর সমুদ্র থেকে ৫ লক্ষ জাহাজে কমপক্ষে ৩ কোটি টন মাছ ধরা হয়। এর সবটাই যে আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা নয়, কিছু পরিমাণ কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন-সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। মাছ ছাড়াও সমুদ্রে অন্য নানারকম খাদ্য আছে, যেমন কাঁকড়া, ঝিনুক, প্লাংকটন, ইত্যাদি। এখনও পর্যন্ত মানুষ এগুলি খুব কমই ব্যবহার করতে পেরেছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, সমুদ্রতলের নিচে যে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ সঞ্চিত আছে তা মানুষের ধারণার অতীত। তাঁরা অনুমান করেন, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে সমুদ্রের তলদেশে কয়লার খনি আছে, ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে জলের তলায় আছে অন্ততঃ ১০০ কোটি টন ফসফেট। নিউ-ফাউন্ডল্যান্ডের সমুদ্রতলে আছে ৩৫০ কোটি টন লোহা, এর কিছু অংশ এখন নিষ্কাশন করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর স্থলভাগের তুলনায় জলভাগে অনেকবেশি খনিজ তেল সঞ্চিত আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে কমপক্ষে ১০ হাজার টন ম্যাংগানিজ ধাতু আছে। এইসব খনিজ সম্পদ কিভাবে মানুষের প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার করা যায় সেবিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রবক্ষে 'ভাসমান গবেষণাগার' স্থাপনের চেষ্টা করছেন।

অপার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা থেকে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা বিজ্ঞানীরা বহুদিন

মার্কিন ও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সমুদ্রতল থেকে সংগৃহীত প্রাণী পরীক্ষা করছেন।

থেকে চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। কারণ এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে খরচ পড়ে অত্যধিক। এই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সমুদ্রোপকূলবর্তী ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানীরা নতুন পন্থা উদ্ভাবন করছেন। ১৯৬০ সাল থেকে ফ্রান্স ব্রিটানী সমুদ্রোপকূলে রানস্ নদীর মোহনায় তার প্রথম তরঙ্গশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণে রত রয়েছে। কারিগরী দিক থেকে এই প্রকল্প বিশেষ উন্নত ধরনের এবং এই বছরের শেষভাগে এই কেন্দ্র থেকে শক্তি উৎপন্ন হবে। যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে রানস্ প্রকল্পে সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হবে না, তবে এই প্রকল্পের অন্যান্য সমস্যা ফ্রান্স অতিক্রম করতে পেরেছে।

সাম্প্রতিককালে ব্রিটেন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি এবং নদীর মোহনায় বাঁধ নির্মাণে পূর্ত যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নততর পন্থা উদ্ভাবনে ব্যাপৃত রয়েছে। ফ্রান্সের পর রাশিয়া দ্বিতীয় সমুদ্রতরঙ্গ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করছে। কানাডাও এই ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়েছে। সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে তার প্রতি উন্নতিশীল দেশসমূহের বিজ্ঞানীরা আজ বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এবং এই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

আর একটি বিরাট সম্ভাবনার জন্য মানুষ আজ সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। সেটি হচ্ছে সমুদ্র থেকে নতুন ভেষজ আহরণ। গভীর সমুদ্রে এমন কিছু উপহার মানুষকে দিয়েছে যা হয়তো একদিন চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিপ্লব আনবে। এগুলির মধ্যে আছে অ্যান্টিবায়োটিক, বেদনানাশক, এমন কি ক্যান্সারের সম্ভাব্য প্রতিষেধক।

সমুদ্রজাত ওষুধের ব্যবহার বহুকাল আগে থেকে হয়ে আসছে। অ্যালজী, সমুদ্র-শৈবাল আর মাছের সাহায্যে রোগনিরাময়ের কথা গ্রাম্যগাথার মধ্য দিয়ে বহুকাল ধরেই পৃথিবীর লোক শুনে আসছে। তবে সেগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কোনদিন হয়নি এবং সামুদ্রিক ওষুধ বিজ্ঞানের অংগ বলে স্বীকৃত হয়নি।

বর্তমানে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বিজ্ঞানীরা ক্রমশ এই ক্ষেত্রে গবেষণায় লিপ্ত হচ্ছেন। অ্যান্টিবায়োটিক থেকে ক্যান্সার প্রতিষেধক মোহাচ্ছন্নকারী থেকে হৃদপিন্ড চাঙ্গা করে তোলবার ভেষজ পর্যন্ত নানা ওষুধ সম্বন্ধে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে।

সামুদ্রিক প্রাণী বা উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা প্রায়শই আকস্মিকভাবে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের পথ পেয়ে যান। ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো-তে অবস্থিত স্ক্রিপস ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফির হৃদরোগ সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষজ্ঞ ডঃ ডেভিড জেনসেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'হ্যাগফিস' নামে এক জাতীয় প্রাণী নিয়ে গবেষণাকালে লক্ষ্য করেন—এর পরস্পরবিচ্ছিন্ন তিনটি হৃদপিন্ডের মধ্যে তৃতীয়টি বাকী শরীরের সংগে স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ু সংযুক্ত নয়, অন্যদুটি হৃদপিন্ডের সংগে সমানতালে স্পন্দিত হয়। এর কারণ অনুসন্ধান কর... গিয়ে তিনি দেখেন, একটি সম্ভাবনাপূ... জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবেই ... স্পন্দিত হয়। তিনি এই পদার্থটির নাম ... 'এপাটেটিন'। হৃদপিন্ড সংক্রান্ত স্নায়ুকে... গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কিছু প্রা... দেহে এপাটেটিন প্রয়োগ করে দেখা ... হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা... পৌঁছেছে এবং একটানা বেশ কয়েক ঘন্টা ... অবস্থায় থেকেছে।

ডঃ জেনসেন মনে করেন, হৃদপি... স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন রোগীর হৃ... স্পন্দনকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার এ... সম্ভাব্য উপায় ওই পদার্থ থেকে ... অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যেতে পারে।

সামুদ্রিক প্রাণী থেকে লব্ধ ওষু... আজ এক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এ... কিছু ক্ষতিকর জীবাণু আছে যার প্রতিষে... পৃথিবীর স্থলভাগে আজও পাওয়া যায় ... কিন্তু সমুদ্র থেকে পাওয়া যেতে পারে।

মনোবিকারের একটি সফল ওষু... সম্ভাবনা পাওয়া গেছে সমুদ্র থেকে... 'সাউথ সী' অঞ্চলের আদিবাসীরা ... কয়েক ধরনের মাছ থেকে মোহগ্রস্ততার ... আসে। এই সংবাদে কৌতূহলী হয়ে ক্যা... ফোর্নিয়ার একটি গবেষণাগার এই জাত... কিছু মাছ সংগ্রহ করে। তার একটির ... দেওয়া হয়েছে 'ড্রীম ফিশ' বা স্বপ্নালু ... এই মাছ থেকে যে পদার্থটি বিজ্ঞানী... নিষ্কাশন করেছেন তা মনোবিকা... চিকিৎসায় খুবই কার্যকর হবে বলে ... আশা করেন।

ভাবী ওষুধের আরেকটি বিরাট ... হলো সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদজাত ... বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিষই উপব... ওষুধে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষের পরিচিত অত্যন্ত শক্তিশ... ওষুধগুলির অন্যতম হলো টেট্রোডোটো... 'পাফার ফিশ'-এর বিষ থেকে আহ... এই ওষুধটি জাপানে ক্যানসারের ... পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে ... অন্য কোনো চেতনানাশক ওষুধই সে... কার্যকর হয় না।

সামুদ্রিক প্রাণীর মাংস এবং দেহনি... রাসায়নিক পদার্থগুলির গবেষণা... বিজ্ঞানীরা বর্তমানে আত্মনিয়োগ করে... সামুদ্রিক জীবনের আর একটি ... দিক, তার প্রকৃতিক গুণাগুণ সম্বন্ধে পর... নিরীক্ষার জন্যে অর্থ, সময় বা জনবল এ... পাওয়া যায় নি। অথচ এই সমস্ত প্র... অজ্ঞাত এমনকি অত্যদ্ভুত সামর্থ্যের ... হয়তো নিহিত আছে জীবনের মৌলিক ... নিগূঢ় রহস্য।

নেহাত্ত বুদ্ধিহীন কিংবা পাগল না হলে কি কেউ পুজোর সময় কলকাতার বাইরে যেতে চায়, অন্তত এই হাওড়া স্টেশন দিয়ে কারুর পক্ষে বেরোনো কি সম্ভব?

কাউকে যদি সত্যি সত্যিই কলকাতার বাইরে পুজোর সময়ে যেতে হয় তা হলে তাকে আষাঢ় মাসেই রওনা হতে হবে। আর তাছাড়া অবশ্য পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। অন্তত যোগেশবাবুর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আর যোগেশবাবুর স্থিরই ছিলো না যে কোথায়, কবে যাবেন। ছোটো শ্যালিকার বিশেষ অনুরোধে তাঁকে এই মহানগরীর দুঃসময়ে কলকাতা পরিত্যাগ করতে হচ্ছে।

স্ট্র্যান্ড রোডের কাছাকাছি থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যোগেশবাবু, পাকা সোয়া দুই ঘণ্টা লাগলো স্টেশনে পৌঁছাতে. ট্যাক্সিওয়ালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো 'অন্যদিনের তুলনায় আজ খুবই তাড়াতাড়ি হলো।'

মেল ট্রেন কথাটার মানে এতকাল ভালো জানতেন না যোগেশবাবু। তাঁর ধারণা ছিলো এই সব গাড়িতে ডাক যায় বলে এগুলিকে মেল ট্রেন বলে। এবার বুঝলেন মেল ট্রেন মানে এই গাড়িগুলো ফিমেল ট্রেন নয়, সত্যিকারের খাঁটি মেল যাকে বলে ইংরেজিতে, সেই জোয়ান-মরদ ছাড়া আর কারোর সাধ্য নেই যে এর কোনোটায় উঠতে পারে।

সমস্ত ট্রেনগুলো আগের থেকেই কোন জায়গা থেকে যেন সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে আসছে। একচল্লিশ ঘণ্টা লাইন দিয়ে সাড়ে তিন টাকার ঝালমুড়ি খেয়ে, জুতো হারিয়ে, ছাতা ভেঙে একটা টিকিট সংগ্রহ করেছেন যোগেশবাবু, সুতরাং এত সহজে নিরুদ্যম হয়ে ফিরে যাবেন তিনি ভাবতে পারেন না।

যোগেশবাবু খোঁজ করতে লাগলেন কোথায় এই ট্রেনগুলো দাঁড়ায় যেখানে এত লোক ওঠে। কিন্তু এই প্রশ্নের সদুত্তর কে দিতে পারে? কেউ বললো বর্ধমান, কেউ বললো দুর্গাপুর, একজন বললো মোগলসরাই। বর্ধমান বা দুর্গাপুর কিংবা মোগলসরাই গিয়েও উঠতে রাজি আছেন যোগেশবাবু, কিন্তু তার সমস্যা ঐ সব জায়গাতেই বা এই লোকগুলো কোন্ ট্রেনে গেলো?

উত্তর পাওয়া গেলো সঙ্গে সঙ্গে। পাশে একটি কুলি দাঁড়িয়ে ছিলো, সেই আধা বাঙলা-আধা হিন্দি জবানিতে বললো, 'এরা সেখানে যাবে কেন, এরা তো সেখান থেকেই এলো।'

যোগেশবাবু অবাক হলেন, 'তাহলে এরা ট্রেন থেকে নামছে না কেন? এ ট্রেনটা তো আর হাওড়া স্টেশন পেরিয়ে কলকাতার মধ্যে ঢুকে যাবে না, এখানেই তো শেষ?'

কুলিও অবাক হলো, 'বা, এরা ফিরবে না?'

'ফিরবে, তাহলে এলো কেন?' যোগেশবাবুর এই জিজ্ঞাসায় কুলি একটু বিরক্ত বোধ করলো, বোধহয় সে ও কারণটা জানে না, সে সোজাসুজি অন্য প্রশ্ন করলো, 'আপনি যাবেন কিনা বলুন?'

যোগেশবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'যেতে তো চাই কিন্তু উঠবো কি করে?'

প্রশ্ন শুনে কুলি যা বললো তার মর্মার্থ এই যে যোগেশবাবুর সুটকেশ, বেডিং, বেতের ঝুড়ি, জলের বোতল নিয়ে কুলি যেভাবেই হোক গাড়ির ভিতরে আগেভাগে উঠে যাবে। উঠে যোগেশবাবুর জন্যে একপায়ে দাঁড়াবার জায়গা করবে। তারপর যোগেশবাবু উঠে নিজের স্থান বুঝে নেবেন।

কুলি নিজের হাত থেকে পিতলের চাকতি খুলে যোগেশবাবুর হাতে দিলো, 'এই চাকতিটা রাখুন, আমাকে না পেলে কাজে লাগবে।'

ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

কুলির প্রস্তাবে যোগেশবাবুর রাজি না হয়ে আর কিই বা উপায়? পিতলের চাকতির বিনিময়ে মালপত্র সব কুলির কাঁধে, পিঠে তুলে দিয়ে যোগেশবাবু অসহায়ের মতো প্লাটফর্মে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

দূরে হৈ হৈ রব উঠলো একটু পরেই। ছাদ-জানলা-দরজা আগাগোড়া লোকে ছাওয়া একটা গাড়ি গুটি গুটি প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে আসছে। জনতার উত্তাল সমুদ্রে যোগেশবাবুর কুলি ঝাঁপিয়ে পড়লো। যোগেশ-বাবু পড়ে রইলেন ভিড়ের ধাক্কায়। একটা ট্রাংক না কিসের কোনায় ব্রহ্মতালুতে একটা চোট খেয়ে ভিরমি খেয়ে সামনে পড়ে যাচ্ছি-ছেন, সামনের দু'হাজার লোক তাঁকে পিছনে ঠেলে দিলো। এরপরে পিছনের ধাক্কা সামনে এবং সামনের ধাক্কা পিছনে সামলিয়ে কয়েক মিনিট পরে যখন তিনি ধাতস্থ হলেন, আবিষ্কার করলেন তাঁর নিজের পায়ে এখন আর কোনো জুতো নেই, তবে হাতে একটা মেয়েদের স্লিপার কি করে এসে গেছে এবং মাথায় একটা বিছানা।

বিছানা এবং স্লিপারটা জনসমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট গাড়ির দিকে ধাবিত হলেন, অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন যোগেশবাবু। বহু কষ্টে বহু জায়গায় ঘুরে এক জায়গায় এক ভদ্রমহিলার কনুই এবং আরেক ভদ্রলোকের কাঁধের মধ্যবর্তী এক স্কোয়ার ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক দিয়ে মনে হলো যেন তাঁর কুলিকে তিনি দেখতে পেয়েছেন।

কুলিও বোধহয় দেখতে পেয়েছে তাঁকে। চেঁচিয়ে, তারপরে হাত মুখের ইসারা করে সে কি বোঝালো যেন, যোগেশবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলেও উপায় ছিলো না। মালপত্র নিয়ে কুলি ভিতরে রইলো, কিন্তু যোগেশবাবু উঠবেন কি করে?

দরজায় যারা ঝুলছে তারা আসলে প্রত্যেকে বসে আছে দুজন কিংবা তিনজন করে লোকের পিঠে। এরা বসে রয়েছে পাদানিতে, আর সেই পাদানির লোকগুলোর পা ধরে ঝুলে রয়েছে এ্যেক পায়ে দুজন করে চারজন লোক। এইভাবে সিঁড়ি ভাঙার অঙ্কের মতো ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে জনতার ডালপালা।

জানলায় কনুই এবং কাঁধের ফাঁকে এক স্কোয়ার ইঞ্চি জায়গা দিয়ে কুলিকে দেখে-ছিলেন, দরজার কোথাও সেটুকু ফাঁক পেলে যোগেশবাবু ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করতে কসুর করতেন না। কিন্তু তাও তো নেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দের মতো তীক্ষ্ণ সিটি দিয়ে মেল ট্রেন ছেড়ে দিলো। একটু ছুটলেন যোগেশবাবু ট্রেনের সঙ্গে ফর্মের সীমা পর্যন্ত, তারপর মালপত্র তাঁর কুলিকে নিয়ে তাঁর ট্রেন তাঁকে ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গেলো।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে যোগেশবাবু স্টেশনের আফিসের দিকে ছুটে দিলেন তদ্বির তদারক কিছু করা যায় কিনা আশায়।

এবার আরেকটা কুলি তাঁর পথরোধ দাঁড়ালো, 'কেয়া হুয়া?'

যোগেশবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন, ' মালপত্র লেকে কুলি চলা গিয়া।'

এই কুলির মুখে একটু হাসি উঠলো, 'কোন কুলি? চাকতি হায়?'

যোগেশবাবু চাকতিটা দেখ চাকতিটা দেখে এবার আর গোলমেলে বললো না, স্পষ্ট বাংলায় কুলি বললো, আশি নম্বর, তা হলে বিরজাবাবু এর যেতে পারলেন।'

প্রথমত স্পষ্ট বাংলা, তারপর এ অর্থহীন উক্তি—যোগেশবাবু রীতিমত হলেন, 'কে বিরজাবাবু?'

কুলি বললো, 'ঐ যিনি চলে গে এই দুশো আশি নম্বর।' যোগেশবাবু খেলেন, কুলি মানে, বিরজাবাবু মানে

কুলি যোগেশবাবুর প্রশ্নের পাশ বললো, 'আপনি তো চাকতি পেয়ে আপনি লেগে যান, আপনিও একদিন পারবেন।'

যোগেশবাবু অর্থহীন দৃষ্টিতে রইলেন। কুলি বললো, 'এই এখানে দে আমরা এখানে কেউই আসলে কুলি এখানে আটকে গিয়ে কুলি হয়েছি। আমি, আমি তো সরকারি কাজ করি, হয়ে যেতে গিয়ে এইখানে আটকে আমার মালপত্র নিয়ে নবনীবাবু চলে গে

'কিন্তু বিরজাবাবু?' যোগেশ তবুও বিমূঢ় ভাব একেবারে কাটেনি।

'বিরজাবাবু তো এই এতদিনে পারলেন, আড়াই মাস লাগলো বেরোতে, আমার তো চার সপ্তাহ হয়ে দেখি এবার যেতে পারি কিনা।' কুলির আশা-নিরাশার আলোছায়া।

'কিন্তু আমি?' যোগেশবাবুর তবু যায় না।

'আগে হোক পরে হোক আপনিও পারবেন। বিরজাবাবুর মতই আরেক মাল নিয়ে ট্রেনে উঠবেন যেদিন পারেন আর উঠতে পারবে না। কুলি ছাড়া অ উঠতে পারে?' বলতে বলতে যোগেশ হাত থেকে পিতলের চাকতিটা নিয়ে যোগেশবাবুর বাহুতে শক্ত করে বেঁধে তারপর কাঁধে একটা হাত রেখে 'কিছু ভাববেন না, এখন কাজে লেগে এইভাবেই সবাই যায়। কেউ কি আ জীবন স্টেশনে পড়ে থাকে? আমি আপনিও যেতে পারবেন। দুমাস চার মাস হোক একদিন নিশ্চয় যাবেন। বিরজাবাবুর মতই আরেকজনের নিয়ে নিশ্চয়ই একদিন চলে যেতে পা

অদ্ভিকণ্ড

হিমানীশ গোস্বামী

কীর্তি হচ্ছে একজন কমার্শাল আর্টিস্ট। সেদিন ওর বাড়িতে গিয়ে দেখি একটা কাগজের উপর একটি তুলি দিয়ে নিবিষ্টে মনে কি যেন আঁকছে। আমি গিয়ে ওকে ঐ অবস্থায় দেখে বললাম, খুব ব্যস্ত যদি থাক তাহলে চলে যাচ্ছি। কীর্তি বলল, একটু বসো। ব্যস্ত আছি, তবে তেমন নয়। একটা সিরিজের দশটি ছবি আঁকা হয়েই গেছে, এখন একটু ফিনিশিং টাচ দিচ্ছি।

আর তখনি দেখলাম একটি নীল শাড়ি পরা সুন্দরী মেয়ে, যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি টানছিল, সেই শাড়ির নানা ডিজাইন ছিল, সেটাকে নীল রঙ দিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে দিচ্ছে কীর্তি। আরো আস্তে আস্তে শাড়ির উপরকার ডিজাইন অন্তর্হিত হতে লাগল।

আমি বললাম, করছ কি কীর্তি, করছ কি। অত সুন্দর একটা মেয়ে, তার অত সুন্দর শাড়িকে তুমি কিরকম বিশ্রী করে দিচ্ছ! কীর্তি বলল, শাড়ির ডিজাইনটা তৈরি করতেই আমার লম্বা দেড়েক সময় লেগেছিল।

—ডিজাইন বদলাচ্ছ নাকি, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আরো ভাল কিছু ডিজাইন মাথায় এসেছে কি?

কীর্তি বলল, না আমি ডিজাইনটাকেই লোপ করছি। এরপর কানের যে সোনার দুল দেখছ সেটাতে ন্যুপোলিশ রঙ করে দেব। তারপর যে দেখছ হাতের লকেটটি, ওটাকেও [illegible]

আমি বললাম, কেন কেন?

কীর্তি বলল, আর কেন? বিড়ির বিজ্ঞাপনের জন্য আমাকে দশটি পোস্টার তৈরি করতে দিয়েছিলেন একজন। কথা ছিল প্রতি ছবিতে একশোটি করে টাকা পাব। ছবি যখন আঁকা সব শেষ, কেবল লেখাগুলো বাকী, তখন আমি শুনতে পেলাম আসলে আমাকে নাকি একশো টাকা করে প্রতিটি ছবিতে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে ষাট টাকা করে। আমি যদি আঁকবার আগে জানতে পারতাম তাহলে কোনো গোলমাল হ'ত না। তাহলে একশো টাকার ছবি না এঁকে ষাট টাকার ছবিই আঁকতাম।

আমি বললাম, তা বিড়ির বিজ্ঞাপনে মেয়ের ছবি কেন? কীর্তি বলল, সব বিজ্ঞাপনেই আজকাল মেয়ের ছবি দরকার, ওটাই রেওয়াজ। এখন আমি বুঝলে ভাই, ছবিগুলিকে একটু মেরামত করছি।

মেরামত করছ? আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম। কীর্তি বলল তা করছি বইকি। একশো টাকার ছবি তো আর ষাট টাকায় দেওয়া চলে না, তাই ডিজাইনটাকে বাদ দিচ্ছি শাড়ি থেকে। একটা হিসেব করে দেখছি মেয়েটি সব সমেত হাজার দুয়েক টাকার গয়না পরে ছিল, শাড়ি ব্লাউস ইত্যাদিতে আরো ধরো শ চারেক টাকা। আর ঘরের ফার্নিচারে যেগুলো ছিল তারও মূল্য হাজার দুয়েক টাকার উপর হবে। এই দেখ দূরে একটা রেফ্রিজেরেটরের অংশ দেখা যাচ্ছে। সমেত এই ছবিতে আমি প্রায় দশ হাজার টাকার জিনিস দিয়েছিলাম। এখন সেটা কমিয়ে হাজার দুয়েক টাকার জিনিসে [illegible] করাচ্ছি অর্থাৎ কিনা জিনিসপত্রের পরি[illegible] শতকরা চল্লিশ ভাগ কমিয়ে আনছি।

কীর্তি বলতে লাগল, আর এই কা[illegible] আমার প্রোগ্রামের মধ্যেই ছিল [illegible] ডিজাইন লোপ করে দেওয়া। ঐ রেফ্রিজেরেটরটা দেখছ ওটাকে আমি [illegible] কেঠো আলমারি করে দেব। ওখানেই [illegible] দেড়েক টাকা কমবে। তারপর ধরো [illegible] ফার্ণিচারের মধ্যে চারটে চেয়ার আর [illegible] ওগুলো না কমিয়ে টেবিলের পায়া [illegible] ফেটে গেছে এবং পরে মেরামত করা [illegible] দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে [illegible] করে দেব তাহলেই টেবিলের দাম [illegible] টাকা থেকে অন্ততঃ দেড়শোয় নেমে [illegible]

—তারপর ধরো গিয়ে, কীর্তি [illegible] যেন আর শেষই হয় না—এই [illegible] এই মেয়েটির ঘরে কি রকম একটা [illegible] টাঙানো রয়েছে, বুঝতে পারছ এটা [illegible] বিখ্যাত ছবি—কনেস্টবলের ছবি। ওরিজিন্যাল নয় কপি, কিন্তু [illegible] ছবিতে একশো টাকার জায়গায় [illegible] দেয় তাদের পোস্টারে কনেস্টবলের থাকবে কেন?

—তা তুমি ওটাকে কি করবে? জিজ্ঞেস করলাম।

কীর্তি বলল, ওটাকে [illegible] দিয়ে একেবারে মুছে দেব। [illegible] দেয়াল থেকে সিমেন্ট খসিয়ে [illegible] বার করে দেব।

আমি বললাম, তাহলে [illegible] হবে না—ইঁট বার করা দেয়াল [illegible] দেখাবে।

কীর্তি প্রায় [illegible] [illegible] তো [illegible] করেই [illegible] পারছ না। আর [illegible] মেয়েটিকেও [illegible] সুন্দরী [illegible] চেহারা যা বানিয়ে [illegible] হবে [illegible] বছর এখনো [illegible] আছে। চোখের কোণে কালি, [illegible] হাত-পা...ম্যালেরিয়া...

আমি বললাম, কীর্তি, [illegible] অন্ততঃ ঠিক [illegible], [illegible] মেয়েটিকে [illegible] তো কোনো [illegible] [illegible]...।

কীর্তি বলল, ওর কোনো দোষ তা জানি, কিন্তু আমি কি করব [illegible], হচ্ছি কমার্শাল আর্টিস্ট। যে রকম পাব তেমনি তো আঁকব, নাকি...।

আর তর্ক বাড়ালাম না। ওখান চলে এলাম তক্ষুনি নইলে হয়ত [illegible]টি ছবির কথা আমাকে শুনতে [illegible]। কমার্শাল আর্টিস্টদের যে এত হিসেবী হয় তা আগে জানতাম না।

নারায়ণ দত্ত

সতেরশ' চুয়াত্তরের কলকাতার সকাল। মার্চ মাস। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। এখন যেখানে হেস্টিংস স্ট্রীট, অদূরে হাইকোর্ট, পা বাড়ালেই সেণ্টজন চার্চ, সেখানের এক দোতলা বাড়ীতে কলকাতার ব্রিটিশ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সদ্য ঠাণ্ডা জলে স্নান করে এলেন। একটু আগেই 'ঘোড়েসে জিন' দিয়ে নবাব 'ওয়ারেন হেস্টিন' প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসেছেন। টেবিলে খানা দিয়ে গেছে বাবুর্চি। খেতে বসতে যাবেন লাটবাহাদুর এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল সেদিনের কাগজটা এসে গেছে। বসরা, এলেপ্পো ঘুরে স্থলপথে বিলেত থেকে যে কাগজ আসে—সেই কাগজ। কাগজের নাম—'ব্রুসেলস গেজেট'। খানা বন্ধ রেখে হেস্টিংস গেজেটটা নিয়ে বসলেন। এবং পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যে খবরটায় তাঁর চোখটা আটকে গেল—সেটা তাঁর সম্বন্ধেই। আণ্ডার এ নিউ ইনস্ট্রুমেন্ট অব গভর্ণমেণ্ট ফর দি ব্রিটিশ ডমিনিয়নস ইন ইণ্ডিয়া, দি পার্লিয়ামেন্ট অব গ্রেটব্রিটেন হ্যাজ অ্যাপয়েণ্টেড ওয়ারেন হেস্টিংস অ্যাজ গভর্ণর জেনারেল অফ বেঙ্গল।' পড়লেন। আবার পড়লেন। আর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কোম্পানীর নিযুক্ত গভর্ণর থেকে হলেন সম্রাট-নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল। ঈশ্বরের এটা আশীর্বাদ না অভিশাপ?

সেটা বোঝবার জন্যে হেস্টিংসকে অবশ্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে সেটা মাস সাতেক পরে—অক্টোবর মাসেই আঁচ করতে পারলেন তিনি। দিনটা উনিশে। অকুস্থল-চাঁদপাল ঘাট। বেলা বাড়েনি। কিন্তু ভিড় বেড়েছে বেশ। পাল্কী নামিয়ে বাহকেরা ঘাম মুছছে। সাহেবরা কোথাও দলবেঁধে, কোথাও জোড়ায় জোড়ায় ঢাউস ছাতার তলায় অপেক্ষা করছেন। ছাতাবরদাররা ঠায় দারুভূত হয়ে দাঁড়িয়ে। বিলেত থেকে জাহাজ আসবে। কিন্তু ভিড়ের সবটাই সে কারণে নয়। অন্তত ওয়ারেন হেস্টিংস আর রিচার্ড বারওয়েল সে কারণে আসেননি। তাঁদের কারণটা একটু ভিন্ন। এই জাহাজে আসছেন পার্লিয়ামেন্ট-নিযুক্ত ব্রিটিশ ভারতের দন্ডমুণ্ডের অন্য তিনজন মালিক—মেজর জেনারেল ক্লেভারিং, জেনারেল মনসন ও ফিলিপ ফ্রান্সিস।

সেদিনের সেই রৌদ্রালোকিত চাঁদপালঘাটেই হেস্টিংস বুঝতে পারলেন তাঁর ভাবী চাকরীজীবন কিভাবে কাটবে। হেস্টিংস দেখলেন তাঁর সহকর্মীরা সবাই গোমরামুখে, মুখ কালো করে জাহাজের পাটাতন থেকে নামলেন। যন্ত্রের মত করমর্দন করলেন। তাঁদের ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ থেকেই আন্দাজ করতে কষ্ট হ'ল না, আগন্তুকদের হৃদয়ের শীত কি জমাট।

অবশ্য যাঁরা মনে করেন, মাননীয় রাজপ্রতিনিধিদের জন্যে একুশবারের জায়গায় সতেরটি তোপ দাগাই ক্লেভারিং সাহেবের কুঞ্চিত ভ্রূ আর বিরসবদনের আসল কারণ, তাঁরা অনেক কিছু বলেন না। বলেন না যে শুধু কম তোপই নয়, ক্লেভারিং কোম্পানীর সম্মানে কেল্লার বরকন্দাজরা এসে কুচকাওয়াজ করেনি। যে 'গার্ড অব অনারে'র আকছার আয়োজন করা হয় সেদিনের অনুষ্ঠানলিপিতে সেটাও ছিল না। রাগ আর সাধে হয়? ভারতবর্ষের থেকে পাঠান ক্লেভারিং-এর প্রথম ডেসপ্যাচেই হেস্টিংসের এই হেনস্থার অভিযোগ ছত্রে ছত্রে পূর্ণ ছিল। হেস্টিংসের এই সমারোহ-বিমুখতার প্রচুর নিন্দা ছিল।

আর অতিথিদের এই রকমসকম দেখেই চাঁদপালঘাটের সেই বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে হেস্টিংস বুঝলেন লর্ড নর্থ তাঁকে কি বিপদেই না ফেলেছেন! তাঁর প্রশংসায় নর্থ পার্লিয়ামেন্টে যতই বলে থাকুন না কেন যে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল পদে তিনি এমন একজনের নাম সুপারিশ করছেন যিনি বহু ডামাডোলের মধ্যে একটা টাকা হাতাননি। অবশ্য ভূয়োদর্শী হেস্টিংস বুঝলেন তাঁর সুখের দিন শেষ। রেগুলেটিং অ্যাক্টে ভারতশাসনের মুখ্য দায়িত্ব তাঁর—সেটা নামেই। আসলে এই নবাগতদের সংগে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে তাঁকে। আর সেই চলা—এও বুঝলেন—বেশ শক্ত চলা। পারতপক্ষে অসম্ভব চলা।

প্রথম দিনেই হেস্টিংস এটা একটা আঁচ করেছিলেন। এবং তাড়াঘড়ি নর্থের কাছে বিশেষ ক্ষমতা চেয়েছিলেন। কিন্তু না। হেস্টিংসকে কোন বিশেষ ক্ষমতা তুলে দেননি তিনি। কেবলমাত্র 'কাস্টিং ভোট'টি ছাড়া। অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংস—গভর্ণর জেনারেল শুধু নামেই। তনখো অবশ্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার পাউন্ড। অন্য চারজন সভ্য পাবেন

প্রত্যেকে দশ হাজার করে। কিন্তু বেশি মাইনে মানেই বেশি মর্যাদা নয়। হেস্টিংসকে মেজরিটির কথা মেনে চলতে হবে। নান্য পন্থা।

লর্ড নর্থ রাজনীতির প্যাঁচ ঠিকই বুঝতেন। তিনি রাজতন্ত্র প্রধানমন্ত্রী। এমন বাধ্যমন্ত্রী রাজা তৃতীয় জর্জের ভাগ্যে আর জোটেনি। তিনি যা' চাইছিলেন, লর্ড নর্থ প্রকারান্তরে সেটিই তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এবং সে কাজ করলেন দাবাখেলার এক চালে কোম্পানীর কিস্তিমাৎ করে। ব্রিটিশ ভারতের রাজত্ব চালাবার জন্যে পার্লিয়ামেণ্ট থেকে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটা কাউন্সিল নিয়োগ করলেন তিনি। তার দু'জন সভ্য কোম্পানীর পুরাতন কর্মচারী—স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল—ওয়ারেন হেস্টিংস আর বারওয়েল। অপর দু'জন খুদ রাজা তৃতীয় জর্জের পছন্দসই লোক—ক্লেভারিং ও মনসন। পঞ্চমজন—যার ওপর এই বিচিত্র কাউন্সিলের ভাগ্যের তুলাদণ্ড নির্ভর করতে পারে—এবং যে পদের জন্যে বহু লোকের মধ্যে এডমণ্ড বার্কের নামও বিবেচনা করা হয়েছিল, সেটি হ'ল তাঁর নিজের লোক—ফিলিপ ফ্রান্সিস। কেননা, ওয়ার সেক্রেটারীর অফিসের ছাঁটাই করা কেরানী—তৎকালীন বেকার 'বিভ্রান্তচিত্ত ফ্রান্সিসের নিয়োগ অত্যন্ত রহস্যময়। অনেকে মনে করেন চাকরীটার জন্যে ফ্রান্সিস লর্ড ক্লাইভকে পাকড়েছিলেন। আর ক্লাইভের তখন লর্ড নর্থের ওপর খুবই প্রভাব। কেননা বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের মত জানাশোনা লোক আর তখন কে ছিল ইংলণ্ডে। আর ক্লাইভ তাঁর এই বাস্তব জ্ঞানের সুযোগটা বরাবরই নিয়েছিলেন। তবে প্রশ্ন থেকে যায় কেন লর্ড ক্লাইভ নিজেই আর একবার বছরে পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের চাকরীটা নিয়ে ফেরৎ এলেন না ভারতবর্ষে? আসলে প্রখর বাস্তবজ্ঞানের জন্যেই ক্লাইভ সে কাজ করেননি। কেননা, বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জেনারেল বারগোইন। এবং তাঁর দলটাও বড় ছোট ছিল না। কাজেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে ক্লাইভ নাটকের গ্রীনরুমে মুরুব্বি হয়ে বসলেন।

কিন্তু আগের কথায় ফিরে আসা যাক। 'কাউন্সিল'ই বা নিয়োগ করা হ'ল কেন? আসল কারণ কোম্পানীর একটা ভুল স্পেকুলেশন ও আর্থিক অব্যবস্থা। সতের শ' উনসত্তর সালে কোম্পানীর মোট দেনার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ষাট লক্ষ পাউণ্ডে। কিন্তু ব্যাপারটা 'ঢাকঢাক' 'গুড়গুড়' করে চাপা দিতে গিয়ে কোম্পানী সভ্যদের 'ডিভিডেন্ড' ঘোষণা করলে শতকরা সাড়ে বার ভাগ। উদ্দেশ্য—কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যে খুবই শাঁসাল—এমনি একটা ধারণা সৃষ্টি করা। কিন্তু বিধি বাম। ভারতবর্ষ থেকে নানা দুঃসংবাদের খবর ঐ সময়ে লণ্ডন পৌছাতে লাগল। একটির পর একটি। কোম্পানীর শেয়ারের দর হুড়হুড় করে পড়তে লাগল। কোম্পানীর পক্ষে তাদের আসল অবস্থা চেপে রাখা একবারে অসম্ভব

হয়ে পড়ল। অগত্য, ডিরেক্টররা ব্যাংক অব ইংলন্ডের কাছে ছয় লক্ষ পাউন্ডের দাদনের জন্যে অনুরোধ করলে। ব্যাংক সেটা বেমালুম 'না' করে দিল। আর এই খবরটা যাই না বাজারে চাউর হয়ে গেল—শেয়ারের দর একেবারে মাটি। কোম্পানীর ত ডকে ওঠবার অবস্থা। পার্লিয়ামেন্টের বহু সভ্য, তাদের আত্মীয়পরিজনের বহু টাকা রাতারাতি ফোত! সর্বত্র 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' রব। অনন্যোপায় হয়ে ডিরেকটররা ব্রিটিশ সরকারকে পরিত্রাণের জন্যে অনুরোধ করলে। এত শুধু পরিত্রাণের জন্যে আবেদনই নয়—নিজেদের সকল স্বাধীনতা অবসানের সনদেই সই করলে কোম্পানী।

লর্ড নর্থ মনে মনে এই সুযোগেরই কামনা করছিলেন। দুর্ধর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এতদিন ধরে ভারতবর্ষে যে ফলাও কারবার চালিয়েছিল—তাতে রাজার হাত ছিল কি? কিছু না। রাজার অনুগত কারও ভালো চাকরী হয়েছিল? নিয়োগের ব্যাপারে রাজার কোন কথা চলত? তেমন কিছু না। সবটাই আনুষ্ঠানিক। লর্ড নর্থ কোম্পানীর আবেদনপত্রগুলি পার্লিয়ামেন্টে পেশ করলেন। সেটার ভিত্তিতে মহাসভা একটি সিলেকট কমিটি নিয়োগ করলেন। এই প্রস্তাবটি নিয়ে আসেন ক্লাইভের আজন্ম শত্রু জেনারেল বারগোইন। অবশ্য কোম্পানীর ভিতরে যে মস্ত কিছু গলদ রয়েছে সেটা অনুমান করাটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। সেই বছর মার্চ মাসে কোম্পানী শতকরা সাড়ে বার পাউন্ড লাভ দেখিয়েছে। মাত্র চার মাস বাদে তার দু' লাখ পাউন্ড ঋণ চাহিবার উপযুক্ত কি কারণ থাকতে পারে যদি না হিসাবপত্রে কোন গোঁজামিল থাকে? খাতাপত্রে কারচুপির সন্দেহ করবার আর একটা কারণ, কোম্পানীর যদি ফেল হবার মত অবস্থা, তাহলে তারই কর্মচারীরা ভারতবর্ষ থেকে এত টাকাকড়ি নিয়ে ফিরে বিলেতে লর্ড হয়ে বসে কি করে? আসলে এইখানেই ছিল আসল গাত্রদাহ। ক্লাইভ 'ড্রেকে'র লর্ড হয়ে বসাটা ওখানের বনেদী বিত্তবানেরা ভালো চোখে নিতে পারেনি। সমাজে এ নিয়ে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে গুমরে গুমরে থাকা ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারেনি। কোম্পানীর এই দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে সেই চাপা ক্রোধ একেবারে অগ্ন্যুৎপাতের মত ফেটে পড়ল। পার্লিয়ামেন্ট আর একটা কমিটি বসাল—কোম্পানীর ফেল মারার কারণ খুঁজে বার করার জন্যে।

এর ফলে কোম্পানী তিনটি স্তরে ভাগ হয়ে গেল। এক দলে কোম্পানীর মালিকরা। এঁরা সব দোষ চাপালেন কোম্পানীর ডিরেক্টরদের ওপর। অব্যবস্থা, কোম্পানীর কাগজের বে-আইনী লেনদেন, হিসেবের গোঁজামিল প্রভৃতি অভিযোগ এঁরা ডিরেক্টরদের দায়রা সোপর্দ করতে উঠে-পড়ে লাগলেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠী—ডিরেক্টররা। তাঁরা সব দোষ চাপালেন ভারতবর্ষে নিযুক্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের। আর তৃতীয় দফায় রইলেন ভারতস্থিত কোম্পানীর ব্রিটিশ কর্মচারীরা। এই অবস্থায় যা' হবার তাই হতে লাগল। পরস্পর অবিশ্বাস, দোষারোপ, মিথ্যা আক্রমণে লিডেনহল স্ট্রীটের চারতোলা বাড়ীটার আবহাওয়া বিশ্রিভাবে বিষিয়ে উঠল।

মাসখানেক বাদে কমিটি দুইটি তাদের বহু প্রত্যাশিত রিপোর্ট পেশ করলেন পার্লিয়ামেন্টে। যেমন ভাবা গিয়েছিল—রিপোর্ট দুটি কোম্পানীর নিন্দায় ঠাসা। কোম্পানীর অকর্মণ্যতা প্রমাণের 'মাস্টারপিস'। সেকালের বিখ্যাত এম-পিরা হোরেস ও অলিপোল, লর্ড চ্যাথাম এবং জেনারেল বারগোইন কোম্পানীর বিভিন্ন ত্রুটির কথা সাতকাহন করে বললেন। বললেন, পেরুতে স্পেনিয়ার্ডরা যা করেছে, সেইমত নৃশংসতা দেখিয়েছি আমরা ভারতবর্ষে, কি তার বেশি! ভারতবর্ষকে নিষ্ঠুরভাবে দস্যুর মত শোষণের বেদনাবহ চিত্র সবাই সাশ্রুনেত্রে পরিবেশন করলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের করুণ ছবি যেটুকু বৃটিশ নেতৃবর্গের জানা ছিল সেটুকুই বারবার উল্লেখ করে অনেকেই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করলেন। আর এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতির নিদান নিস্বারিত হল—নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট। কোম্পানীর স্বাধীনতার অবসান আর বৃটিশ ভারতের শাসনের জন্যে গভর্ণর জেনারেল-ইন-কৌন্সিলকে নিয়োগ। কোম্পানীকে হুকুম দেওয়া হল ছয় মাস অন্তর তারে হিসেবপত্তর সরকারে দাখিল করতে হবে। ভারতবর্ষের সঙ্গে যে সব চিঠির আদান-প্রদান হবে, সেগুলি মন্ত্রীদের গোচরীভূত করতে হবে চোদ্দ দিনের মধ্যে। আর কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে বা সদ্যনিযুক্ত কাউন্সিলর সভ্যদের বরখাস্ত করার বিষয়ে কোম্পানীর কথা চলবে না।

হেস্টিংসের কাউন্সিলের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। আর এইটাই হেস্টিংসের এই দুঃখের দিনের একমাত্র সান্ত্বনা। কেননা, এতদিন চাকরী ছিল কোম্পানীর মর্জির ওপরে। কবে যে বিল্বপত্র শুঁকিয়ে দেয় ঠিক নেই। এবারে চাকরী পাকা। অন্তত পাঁচ বছরের জন্যে পাকা। এত বড় কম কথা নয়। কেননা, হেস্টিংসের সামনে ছিল বড় কঠিন পথ। পাঁচজনের কাউন্সিলে তিনজন নতুন এবং এক দলে। হেস্টিংসের দলে মাত্র দুজন। কাজেই তাঁর কাস্টিং ভোটের কোন মূল্যই নেই আপাতত। তা ছাড়াও আরও এক প্যাঁচ কষা হয়েছিল হেস্টিংসের বিপক্ষে। এতাবৎকাল গভর্ণর জেনারেলই থাকত বৃটিশ ভারতের প্রধান সেনাপতি। এবারে মেজর জেনারেল ক্লেভারিংকে দেওয়া হল এই অবৈতনিক পদ। সামরিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শক্তির সমর বিভাগের কর্তৃত্বটা সরিয়ে নেওয়াটা গভর্ণর জেনারেলকে নিষ্ক্রিয় করারই একটা যে ছল, এটা বোধ করি বলে বোঝাতে হয় না।

আর একটা সুখবর এল হেস্টিংসের এই দুঃখের দিনে। পরের মেলে খবর এল চারজন ব্যারিস্টার নিয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের জন্যে একটা সুপ্রীম কোর্ট নিয়োগ করা হয়েছে। আরও জানা গেল এদেরই চীফ জাস্টিস হয়ে আসছেন ইলাইজা ইম্পে—হেস্টিংসের এক জন সহপাঠী। অপর তিনজন জজ হলেন—স্যার রবার্ট চেম্বার্স, জন হাইড ও স্টিফে[ন] লেমাইস্টার।

আর এই সব সুখবরের সঙ্গে আর দুঃসংবাদ এল যে লর্ড নর্থ তাঁর গুণপনা পঞ্চমুখ হলেও পার্লিয়ামেন্টের এক প্রভাব শালী গোষ্ঠী তাঁর নিয়োগের বিরোধি[তা] করেছে। কলকাতার গভর্ণর ওয়ারে[ন] হেস্টিংসকে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারে[ল] করার প্রস্তাবে গোড়া থেকেই যিনি আপ[ত্তি] জানিয়ে এসেছেন, আশ্চর্যের কথা তি[নি] সেই বিখ্যাত আইরিস বাগ্মী এডম[ন্ড] বার্ক। কোন যুক্তিতে বার্ক একেবারে প্র[থম] থেকেই হেস্টিংসের নিয়োগের বিরোধি[তা] করলেন সে এক বিচিত্র রহস্য। বা[র্ক] অবশ্য বলেছিলেন যে পার্লিয়ামেন্টে সিলেক্ট কমিটি কোম্পানীর যে সব দে[াষ] দেখেছেন, সেগুলির কোনটি থেকে হেস্টিংসকে মুক্তি দেওয়া যায় না। অথচ একই সময়ে বার্ক লর্ড ক্লাইভকে সাহা[য্য] করতে উঠেপড়ে লেগে ছিলেন। ক্লাইভে[র] বিরুদ্ধেও ত অভিযোগ বড় কম ছিল ন[া]। ব্যাঙ্কার উমিচাঁদকে ঠকান, নবাবের স[ঙ্গে] সন্ধিপত্রে ভ্যান্সিটার্টের সই জাল, সিরা[জ]দ্দৌল্লাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র এবং এই থেকে নিজের পেট মোটা করা। হেস্টিং[সের] বিরুদ্ধে অভিযোগ মোটামুটি একই ধরণে[র]। তবু একজনকে সমর্থন করে অপরজন[কে] নিন্দা করার যুক্তিটা একমাত্র বার্ক সাহেব[ই] বলতে পারেন। তাঁর জীবনীকার এইচ মারেও এই রহস্য ভেদ করতে পারেননি।

ঘটনাপরম্পরায় বরঞ্চ বার্কের স[ঙ্গে] বন্ধুত্ব থাকলে আমরা বিস্মিত হতাম কেননা, সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যরথী দি পাল ডক্টর জনসনের সঙ্গে হেস্টিং[সের] আলাপ-দোস্তির পর্যায়ে পৌঁচেছিল। বার্ক ও হেস্টিংস উভয়েই ডক্টর জনস[নের] সাহিত্যচক্রের সভ্য ছিলেন। কাজেই সতীর্থের মধ্যে এই অহিনকুল বিরোধ এ[কটা] আশ্চর্যের কথা বইকি।

আরও বিস্ময়ের কথা বার্ক ফি[লিপ] ফ্রান্সিসের নিয়োগ সমর্থন করেছিলে[ন]। বার্কেরও যুক্তি ছিল এই যে, বৃটিশ ম[ন্ত্রী]সভা ফ্রান্সিসের নিয়োগ অনুমো[দন] করেছেন তখন হালহদ্দ সব জেনে-শু[নেই] করেছেন। আইনসভা ত হেস্টিংসকে নিয়োগ করেছিলেন। তবে? বার্কে[র] হেস্টিংসের প্রতি এই জাতক্রোধের কারণ [কি?] সেটা কি ব্যক্তিগত? একেবারে ধর্মক্ষে[ত্র] কুরুক্ষেত্রে ন্যায়ের জয়ধ্বজা ওড়াবার জ[ন্যে] বার্ক সাহেব হেস্টিংসের নিয়োগের [গোড়া] থেকেই তার শত্রুতা আরম্ভ করেছিলে[ন] এটা বোধহয় ঐতিহাসিক সত্য নয়। তবে

কারণ যাই হোক, লর্ড নর্থ রেগুলে[টিং] অ্যাক্টের প্যাঁচ কষে বা বার্ক সুদূর থেকে তাঁর শত্রুতা করে বিশেষ কায়দা ক[রতে] পারেন নি হেস্টিংসকে। দেখা গেছে, মাস আর শনিবার আশ্চর্যভাবে তাকে ত্রাণ করতে এসেছে। অদৃশ্য হাতের রাজনৈতিক জট এই শুভঙ্কর তিথি

বারে বিস্ময়করভাবে খুলে দিয়ে গেছে। হেস্টিংসের জীবন এ এক বিচিত্র যোগাযোগ।

।। দুই ।।

হেস্টিংসের সঙ্গে বার্কের ব্যাপারটা যেমন আদ্যন্ত রহস্যময়, তেমনি বিস্ময়কর মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে হেস্টিংসের সম্বন্ধ। উভয়েই পরস্পরের জাতশত্রু, রাজনীতিতে পাকা লোক। তবে কেউই দেবচরিত্র ধোয়া তুলসী নয়। নিজের নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কেউই ন্যায়-অন্যায় বড় একটা বাছবিছার করেননি। হেস্টিংস যখন মদ্রাজ থেকে কলকাতায় ট্রানসফার হয়ে এলেন বাঙলার গভর্ণর হিসেবে কার্টিআসের জায়গায়, তখন বাংলাদেশের বুক থেকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে যায়নি। নতুন গভর্ণর গদীতে বসেই দেখলেন কোর্ট অব ডিরেকটরের এক হুকুম। বাংলা ও বিহারের দেওয়ান তেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে বন্দী করার আদেশ। হেস্টিংস অনুগত ভৃত্যের মত তাঁদের বন্দী করে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় চালান করে দিলেন।

বিলেত থেকে কোম্পানীর এই হুকুমের কারণ ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে ছবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে এঁকেছেন তাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। বাংলাদেশের এই দুরবস্থার ছবি নানাসূত্রে যখন বিলেতে পৌঁছাল তখন কোম্পানীর সঙ্গে যাদের বনিবনা ছিল না তারা ত সাঙ্ঘাতিক হৈ-চৈ শুরু করে দিলে। উদার মতবলম্বী বহু ব্যক্তিও তাদের দলে ভিড়ে পড়ল এবং তাদের সম্মিলিত আক্রমণে কোম্পানীর নাস্তানাবুদ অবস্থা। কাজেই কোম্পানীর তখন একটা কিছু না করলে নয়। কোম্পানীর এই দুষ্কর্মের একটা স্কেপগোট না আবিষ্কার করতে পারলে ব্রিটিশ-বিবেক মুখ দেখাতে পারছিল না। কাজেই ডিরেকটররা রেজা খাঁ আর সিতাব রায়ের গারদের হুকুম দিলেন। অবশ্য একথা বলবার উদ্দেশ্য এ নয় যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্যে রেজা খাঁ বা সিতাব রায়ের কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। বরঞ্চ তার উল্টা। দায়িত্ব তাদের ছিল। কিন্তু আসল দোষী কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নয়? তাদেরই পক্ষচ্ছায়ায়, তাদের শোষণের প্রতিভূ হিসেবে এরা সুবে বাংলায় অবাধ শোষণ ও অনাচার চালিয়েছিলেন। কারটিআসের সরকার কি এ থেকে দু-হাতে টাকা কামায় নি?

একথা নয় যে, ওয়ারেন হেস্টিংস এটা জানতেন না। কিন্তু কোম্পানীর হুকুম তামিল করে তিনি তাঁর নিজেরও একটা ফন্দি গুছিয়ে নিলেন। রেজা খাঁ আর সিতাব রায়কে কলকতায় এনে বন্দী করে তিনি কোম্পানীর সকল শাসন ব্যবস্থা কলকতায় কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনাটি রূপ দিতে শুরু করলেন।

সেকালের বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে ক্ষণেক্ষণে উত্থানপতনের এক হিড়িক চলেছিল। আজ যে অমিতপ্রতাপ, কালই সে নিঃস্ব। রেজা খাঁর যদি কেউ পয়লা নম্বর শত্রু ছিল, সে নন্দকুমার। বাংলাদেশের দেওয়ানীর প্রতি নন্দকুমারের ছিল বরাবর লোভ। কিন্তু কিছুতেই এতকাল সুবিধা করা যায়নি। এবারে কোম্পানীর কলমের এক খোঁচায় রেজা খাঁর পতনে নন্দকুমার স্বভাবতঃই ভেবেছিলেন যে এবার ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন। তাঁর বরাত খুলল। হয়ত খুলত যদি না সেদিন বাংলার মসনদে থাকতেন হেস্টিংস। বাংলার জটিল রাজস্বপ্রথা সম্বন্ধে কাজ জানা লোকের সেদিন বড্ড দরকার ছিল কোম্পানীর। এবং হেস্টিংসের কাছে গোপন এক নির্দেশও এসেছিল এই বাঙালী বামুনকে একটা বড় কাজে নিয়োগ করবার জন্যে।

এই যখন অবস্থা, হেস্টিংস একটা মোক্ষম চাল চাললেন। চানক্য পন্ডিতের 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম'—সূত্রটি সংস্কৃত জানা সাহেব হেস্টিংস খুব জমক লোভাবে প্রয়োগ করলেন। তিনি নন্দকুমারকে নিয়োগ করলেন তাঁর আজন্মশত্রু রেজা খাঁর বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করতে। আর কোম্পানীর দেওয়ানী পদটা বেমালুম
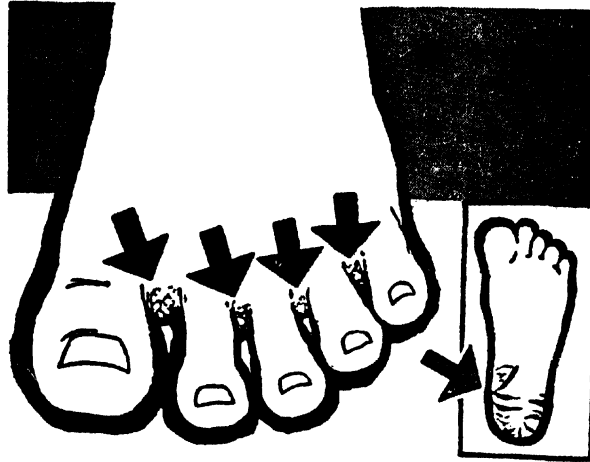
তুলে দিয়ে কলকাতায় নিজের হাতে কোম্পানীর সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করলেন। অবশ্য নন্দকুমারের এই সাহায্যের জন্যে পরোক্ষভাবে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন হেস্টিংস। বাংলার মসনদে তখন নামমাত্র নবাব মীরজাফরের শিশুপুত্র। বঙ্গশাসনের সকল দায়িত্ব কোম্পানী নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেবার জন্যে নবাবের মাসোহারা বত্রিশ লক্ষ থেকে ষোল লক্ষ সিক্কা টাকায় কমিয়ে দিলেন। আর নবালক নবাবের গার্জেন হল তীক্ষ্নবুদ্ধি মুন্নিবেগম। আর নবাবের নিজস্ব দেওয়ান হিসেবে চাকরী হল নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসের।

নন্দকুমারের প্রতি তাঁর জাতক্রোধ হেস্টিংস কোনদিন লুকান নি। কোম্পানীর কাছ থেকেও নয়। কোম্পানীকে তাঁর ডেসপ্যাচে তিনি লিখেছিলেন যে, নন্দকুমারকে সতেরশ উনষাট সাল থেকে তিনি দেখছেন। লোকটা বরাবরই তাঁর শত্রুতা করে এসেছে। কাজেই তাঁকে তিনি এখন পুরোদস্তুর শত্রু বলেই মনে করেন এবং স্বভাবতই তাঁর দ্বারা নন্দকুমারের কোন ভালো করা সম্ভব হবে না। নন্দকুমারও সব না বোঝবার মত বোকা ছিলেন না। তিনি ত অনেক দেখলেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তাঁর পেটটা ফুলে উঠেছে। হুগলীর ফৌজদার হয়ে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে আজ পর্যন্ত রাজনীতির পাশার চালের অনেক ঘোরফের দেখাই তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে। কাজেই আজকে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সুধারসের পেয়ালাটি তাঁর ঠোঁটের কাছে ধরেও যখন সরিয়ে নিলেন তখন তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না। বরং ধীর স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁকে জব্দ করার জন্যে।

আর নন্দকুমার যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে নিযুক্ত এই নতুন কাউন্সিল মহারাজ নন্দকুমারের হাতে সেই সুবর্ণ সুযোগটি তুলে দিল। একদিকে কোম্পানীর আমলের দুজন—অপর দিকে সদ্যনিযুক্ত তিনজন মেম্বার। এবং নীতিটি যখন 'রুল অব মেজরিটি' তখন ভারসাম্যটা ওয়ারেন হেস্টিংসের বিপক্ষেই চলে গেল—কূটবুদ্ধি নন্দকুমারের সেটা উপলব্ধি করতে মোটেই দেরী হল না। রতনে রতন চিনলেন। নন্দকুমার চিনলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং ও মনসনকে। আর এঁরা তিনজন চিনলেন মহারাজা নন্দকুমারকে। এঁদের পরিচয় এত দ্রুত এবং গভীর হয়ে উঠল যে, মনে হয় কারিতকর্মা লোক ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁদের কর্মধারা বিলেত থেকেই ঠিক করে এসেছিলেন। মনে মনে বোধ করি তিনি ভাবতেন, হেস্টিংসের শাসনব্যবস্থাকে নির্মম হাতে সরিয়ে তিনি একটা নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন ভারতবর্ষে। আর সেই নবরাজ্যের নায়ক হিসেবে দেশে ফিরে আসবেন তিনি। তাঁর জন্যে ব্রিস্টল বন্দরে অপেক্ষা করবে জাতীয় সংবর্ধনা। আর এই মহতী ঈপ্সা কার্যে রূপায়িত করার একটি উপায় হেস্টিংস সরকারকে ধুলায় অবলুণ্ঠিত করা। এই যদি তাঁর পরিকল্পনা হয়ে থাকে ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত ফ্রান্সিসের মনে কি হেস্টিংসের জাতশত্রু নন্দকুমারের মুখখানা ভেসে ওঠেনি? মনে হয়, উঠেছিল। নয়ত বাংলাদেশের মাটিতে পা দেবার পর পাঁচ মাস তখনও পুরো হয়নি—এগারই মার্চ, সতেরশ পঁচাত্তর—ফিলিপ ফ্রান্সিস কলকাতা কাউন্সিলকে জানালেন যে, মহারাজ নন্দকুমার গতকাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন এবং অনুরোধ করেছেন যে চিঠিখানা যেন বোর্ডের কাছে পেশ করা হয়। মিটিং ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে ফিলিপ ফ্রান্সিসের গলা শোনা গেল—চিঠির মর্মার্থ আমার জানা নেই। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করে পারিনি।' বলা বাহুল্য, সেই চিঠির শীলমোহর ভাঙ্গা হল। এবং পড়াও হল। বড় মোক্ষম সেই চিঠিখানা। সত্তর বছর বয়স্ক নন্দকুমারের পাকা মাথার মুসাবিদা করা সেই চিঠিখানায় হেস্টিংসের একেবারে শ্রাদ্ধ করা হয়েছে। হেস্টিংসের বহু অপশাসন ও কুশাসনের কথা দিয়ে শুরু করে শেষ করা হয়েছে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন লক্ষ পাউন্ড ঘুষ নেবার অভিযোগে। এই ঘুষ হেস্টিংস নিয়েছেন স্বয়ং নন্দকুমারের কাছ থেকে তাঁর পুত্র গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ানী দেবার জন্যে আর নিয়েছেন মুন্নী বেগমের কাছে—তাকে নবাবের গার্জেন পদে নিয়োগের জন্যে।

এহেন অবস্থায় হেস্টিংসের রক্ত মাথায় চড়বার কথা। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ফিলিপ ফ্রান্সিসকে—নন্দকুমারের এই সব অভিযোগ আনবার আসল উদ্দেশ্য কি? ফ্রান্সিস ঘুঘু লোক। তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন যে, অতশত তিনি জানেন না। এইটুকুই তিনি বুঝতে পারলেন যে এই পত্রে গভর্ণর জেনারেল সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্ব এবং স্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে। হেস্টিংস রাগে গরগর করতে লাগলেন। তাছাড়া আর কিইবা করতে পারতেন তিনি।

নন্দকুমারের চক্রান্তের কাছে প্রাথমিকভাবে বাস্তবিকই তিনি কতটা অসহায়, সেটা বোঝা গেল কয়েকদিন পরে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরিয়েছে—নন্দকুমার আর একটা বোমা ফাটালেন। আর একটি চিঠি এল তাঁর কাউন্সিলে। চিঠিটি অনেক সংক্ষিপ্ত। তাতে সামান্য কয়েকটি কথায় বলা হয়েছে যে গভর্ণর জেনারেল সম্বন্ধে অকাট্য কয়েকটি প্রমাণ রয়েছে তাঁর হাতে। তাঁকে যেন বোর্ডের কাছে হাজির হয়ে সেগুলি নিবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়। কাউন্সিল রুমের বিরাট টেবিলটায় সেই সামান্য চিঠিখানা কি সাংঘাতিক ঝড়েরই না সূচনা করল। ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁর নিরুত্তেজ গলায় বললেন, এ সাধু প্রস্তাবে না রাজী হবার কোন কারণই নেই। মনসনও সেই কথাই বললেন। ক্লেভারিং হাত-পা নেড়ে বেশ নাটকীয়ভাবে ঐ একই অভিমত দিলেন। ফলে হেস্টিংস ত একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তিনি ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করে বললেন সবই বুঝতে পারছি। নন্দকুমার মেজরিটি দলের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। আর এই চক্রান্তের নাটের গুরু হচ্ছে ফিলিপ ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস সব শুনলেন, তবে বিশেষ রা কাড়লেন না।

এক অস্বস্তিকর পরিবেশের উদ্ভব হল। হেস্টিংস এই সভার বৈধতা সম্পর্কেও তুললেন প্রশ্ন। আরো বললেন যে, তাঁর কাজের বিচার করবার অধিকার এ সভার আছে কিনা। অনন্যোপায় হেস্টিংস সভা ভেঙে দিয়ে বারওয়েলের সঙ্গে সভা ত্যাগ করলেন।

ক্লেভারিং সঙ্গে সঙ্গে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। এবং রায় দিলেন হেস্টিংসের সভা ভেঙে দেবার কোন অধিকার নেই। কালক্ষেপ না করে মহারাজ নন্দকুমারকে তখনি ডেকে আনবার ব্যবস্থা করা হল। বৃদ্ধ মহারাজ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সেদিনের সেই অপরাহ্নে তিনি হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মুন্নিবেগমের অভিযোগপত্রটি পেশ করলেন। সেই অভিযোগপত্রে মুন্নিবেগমের শীলমোহরটা তিনি ক্লেভারিং-এর সামনে তুলে ধরে বললেন, 'সাহেব, এ থেকে প্রমাণ হয়, অভিযোগটা যথার্থ।' সব বোঝবার ভান করে সাহেব খুব জোরে জোরে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস ও মনসন উভয়েই মুন্নিবেগমের এই অভিযোগপত্রই নন্দকুমারের আনা অভিযোগটির সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট বলে মন্তব্য করলেন। নন্দকুমার চলে যেতেই তাঁরা হেস্টিংসকে অসদর্থ গ্রহণে অভিযুক্ত করলেন এবং এই উৎকোচের পরিমাণ টাকা কোম্পানীর কোষাগারে জমা দেবার রায়ও দিয়ে দিলেন তড়িঘড়ি। ক্লেভারিং সম্বন্ধে হেস্টিংসের আর যাই অভিযোগ থাক, দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ অন্তত থাকার কোন কারণ নেই।

পরের দিন এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হেস্টিংসের ক্রোধ। ক্লেভারিংত্রয়ীর জিদ। ভোটে পরাজিত ক্ষুব্ধ হেস্টিংসের সভাকক্ষ ত্যাগ। বারওয়েলের অনুগমন। ক্লেভারিং-এর আসন গ্রহণ। বিচারের প্রহসন। তিন দিন পরে আবার সেই দৃশ্য। সেদিন আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেবার জন্যে হেস্টিংসের নিজস্ব বেনিয়ান কান্তমুদীকে তলব করা হল। হেস্টিংস আগে থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে তাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কান্তমুদী এল না। ক্রুদ্ধ ক্লেভারিং বোর্ডের আদেশ অবমাননায় তাকে একটা কঠিন শাস্তি দেবার প্রস্তাব করলেন। ঘটনাটা এমনই নাটকীয় হয়ে উঠল যে, উভয়পক্ষে প্রায় হাতাহাতি। হেস্টিংস আস্তিন গুটিয়ে বললেন যে তাঁর বিরুদ্ধে যদি তাঁদের কিছু করার থাকে তা যেন তাঁরা আদালতে করেন। নইলে এমনি বিশ্রীভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হলে, একটা হেস্তনেস্ত করতে একটুও দ্বিধা করবেন না তিনি! ঐতিহাসিকদের মতে ক্লেভারিং যদি সেদিন পিছিয়ে না যেতেন, তাহলে আলিপুরের রাস্তায় ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংসের সেই বিখ্যাত ডুয়েলের আগেই

ক্লেভারিং-এর সঙ্গে তার একপ্রস্থ হয়ে যেত! ক্লেভারিং কেন যে সেদিন লড়লেন, না, ঈশ্বর জানেন! মনে হয়, এর পিছনে ছিল ফ্রান্সিসের কূটবুদ্ধি। প্রথম থেকেই আটঘাট বেঁধে তাঁরা স্নায়ুযুদ্ধ সুরু করেছিলেন। সব কিছু মিলিয়ে হেস্টিংসকে নার্ভাস ও বেসামাল করে দেওয়াই ছিল তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

বলতে কি, তাদের এই উদ্দেশ্য প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর কি! তাঁর অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করে লর্ড নর্থকে তিনি এক আবেদন করেন এই সময়ে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে হেস্টিংসের সেই পত্রে ছিল এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার কাতর প্রার্থনা! —হয় আমায় রিকল করুন—ফেরৎ নিয়ে যান, নয়ত আমায় এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে যে বিশ্বাস সক্রিয় ছিল, যে বিশ্বাসে আমায় এই পদে নিয়োগের উপযুক্ত বলে মনে করেছেন—সেই প্রত্যয়জ্ঞাপন করে এমন ক্ষমতা আমায় দিন যাতে আপনার কাছে, আমার দেশ ও মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের কাছে আমায় সকল দায়িত্ব আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি।

"I now most earnestly entreat that your Lordship — for on you I presume it finally rests — will free me from the state that I am in, either by immediate recall, or by the confirmation of the trust and authority of which you have hitherto thought me deserving, on such a footing as shall enable me to fulfil your expectations, and to discharge the debt which I owe to your Lordship, my country and my Sovereign'.

বলাবাহুল্য এই আবেদনে কোন ফল হয়নি। হেস্টিংস চিঠিপত্র লিখতেন ভালো। দিশী ভাষাও বেশ মনোযোগ দিয়ে শিখেছিলেন। এবং চিঠিটা যদি লর্ড নর্থের কাছে গিয়ে পৌঁছাত, তাহলে কিছু হলেও বা হতে পারত। কিন্তু ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের ডেসপ্যাচ পড়বার মত মনের অবস্থা বা মেজাজ কোনটাই লর্ড নর্থের ছিল না। ঐসব কাজ করতেন তাঁর সেক্রেটারি জন রবিনসন। লর্ড নর্থ যেমন ছিলেন রাজা তৃতীয় জর্জের উপযুক্ত প্রধানমন্ত্রী, রবিনসন ছিলেন নর্থের ঠিক যোগ্য দবীরখাস। পার্লিয়ামেন্টারী রাজনীতির কুটিল গতি তাঁর অজানা ছিল না। সেকালের পার্লিয়ামেন্টে বা রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে ক্লেভারিং-মনসন গোষ্ঠীর প্রভাব তাঁর অজানা ছিল না। কাজেই এই সব চিঠি লর্ড নর্থের কাছে উল্লেখ করা তিনি প্রয়োজন বলে মনে করেননি।

যাইহোক, ঠিক এক মাস বাদে, সেই বছর এগারই এপ্রিল ক্লেভারিং যে সংক্ষিপ্ত 'মিনিট'টি তৈরী করলেন তাতে বলা হল নন্দকুমারের উদ্দেশ্য যাই হোক, তাঁর আগের অভিযোগগুলি থেকে একটা ব্যাপার দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, আড়াই বছরের মধ্যে গভর্ণর জেনারেল বিভিন্ন উপায়ে [illegible] লাখ টাকা পকেটস্থ করেছেন। যা রটে তার কিছুটা বটে। এও সেই বৃত্তান্ত। অভিযোগটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। কেননা, ওয়ারেন হেস্টিংস নিকাবিত-হেম 'মরালিস্ট' ছিলেন না। সেকালের কলকাতার ইংরেজ 'মরালে' রাজকার্যে হাতাটা-মুঠোটা টাকাকড়ি কামান কিছু বিধিবহির্ভূত ছিল না। অবশ্য, মুন্নিবেগমের শীলমোহর করা যে চিঠিটা মহারাজ নন্দকুমার স্বয়ং বোর্ডের সামনে হাজির করেন, সেটা খুব সম্ভব জাল। পরে অন্তত স্বয়ং মুন্নিবেগমই সেটা তাঁর বলে স্বীকার করেননি। কিন্তু তা' হোক, তবু এটা ঠিক যে ওয়ারেন হেস্টিংস মুন্নিবেগমের কাছে টাকা নিয়েছিলেন। আর এই টাকাটা—নন্দকুমার-ক্লেভারিং জোট বলছেন ঘুষ। মুন্নিবেগমকে নাবালক নবাবের গার্জেন পদে বসানর প্রতিদানস্বরূপ উৎকোচ। আর হেস্টিংস বলছেন, 'না। সেটা তাঁর রাহা-খরচ।' টাকার পরিমাণ দেড় লক্ষ।

সেটা সতেরশ' বাহাত্তর সালের কথা। দীর্ঘ সাত বছর পরে সেই বছর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। আর এপ্রিল মাসের শেষাশেষি বিদায়ী গভর্ণর কার্টিয়ারের কাছ থেকে ফোর্ট উইলিয়মের চাবিটা বুঝে নিলেন। বাংলার গদীতে বসে হেস্টিংস কোম্পানীর শাসনব্যবস্থা কলকাতায় কেন্দ্রীভূত করার কাজে হাত দিলেন। বাংলা বিহারের রাজস্ব সংগ্রহের দস্তুরটাও ঢেলে সাজায় মন দিলেন তিনি। কাজটা সরজমিনে তদন্ত করার জন্যে হেস্টিংস আড়াই মাসকাল মুর্শিদাবাদে থাকেন। সেই সময়ে তাঁর হাত-খরচ আমোদ-প্রমোদ, রাহা-খরচ ও বাজেখরচ খাতে ঐ টাকাটা তিনি নেন মুন্নিবেগমের কাছ থেকে। বলাবাহুল্য, মুন্নিবেগম টাকাটা নিঃস্বার্থভাবে দেননি। নাবালক নবাবের গার্জেনের পদে মুন্নিবেগমের চেয়ে নাবালক নবাবের মায়ের দাবীই বেশি ছিল। এই টাকাটা দিয়ে নবাবের এস্টেটপত্তর দেখবার অধিকার পান মুন্নিবেগম।

এই টাকাটার কথা হেস্টিংস বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু গতিক-খারাপ দেখে টাকাটা কবুল করলেন তিনি। বললেন এ ধরনের টাকা নেওয়াটা তাঁর কিছু নব-আবিষ্কার নয়। আগেকার সকল গভর্ণরই এমনি টাকা নিয়েছে তার নজির আছে। তাছাড়া কোম্পানীর কাজে তাঁর মুর্শিদাবাদ যাবার রাহা-খরচ—টি-এ বিল, হয় কোম্পানী নয় নবাব, যাকে হোক একজনকে দিতেই হয়। সেটা নবাবের কাছ থেকে আদায় করে তিনি কিছু অন্যায় করেছেন কি?

এই স্বীকৃতির ফলে ক্লেভারিং জুটির প্রাথমিক জয়লাভ—যাকে বলে 'ফার্স্ট রাউণ্ড ভিক্টরি' হয়ে গেল। এবং নন্দকুমারের দক্ষতায় হেস্টিংসের বিরুদ্ধে প্রত্যহ নিত্য নূতন সব অভিযোগ জমা হতে লাগল বোর্ডের কাছে। বাংলার রাজনীতির জল বেশ ঘুলিয়ে উঠল। মহারাজ নন্দকুমারের তখন অপ্রতিহত প্রতাপ। সত্তর বছরের বৃদ্ধ বোধ করি নেভবার আগে প্রদীপের মত দ্বিগুণ দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছিলেন। তবে তাঁর এই সর্বনাশা খেলায় তাঁর বিদেশী সহযোগীরা উঠেপড়ে লেগে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

নন্দকুমারের আনা অভিযোগগুলি ক্লেভারিং নিজে তন্ন তন্ন করে বিচার করেন। তা থেকে অভিযোগের আসলসূত্রগুলি টেনে বার করেন। মনসন নিজেই অভিযোগকারীদের বক্তব্য গ্রহণ করেন। অভিযোগপত্র মুসাবিদা করেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। ফোক সাহেব এঁদের এজেন্ট হয়ে রইলেন নন্দকুমারের সঙ্গে। নন্দকুমার সব জমিদারদের তলব করতে লাগলেন। থাকলে তাঁদের অভিযোগ টুকে নিয়ে রাখলেন। বহুদিনের পুঞ্জীভূত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার মানসে দশ হাতে কাজ করতে লাগলেন। তিনি জানতেন 'মেজরিটি' আইনের বলে তাঁর পৃষ্ঠপোষকরাই তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সর্বেসর্বা। এবং এই সুযোগে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্যে যাকে বলে সর্বাত্মক অভিযান চালাতে লাগলেন তিনি।

এই সময়ে নন্দকুমারের বোলবোলাও কথা উল্লেখ করে বারওয়েলকে লিখতে দেখা যায় যে এটা হচ্ছে তাঁর ঐশ্বর্য ও প্রভাবের স্বর্ণযুগ। এরকম সম্মানের আতিশয্য আর কখনও তাঁর বরাতে জোটেনি। প্রত্যহ সকালে বিকালে দুটি চার ঘোড়ার গাড়ীতে ক্লেভারিং আর তাঁর মিত্রগণ এসে নন্দকুমারের গরীবখানায় হাজিরা দিতেন। বাঙালী ব্রাহ্মণের পক্ষে একি কম কথা নাকি?

ক্লেভারিং মেজরিটি যে অপর ঘুঁটি রেজা খাঁকে খেলিয়ে দেখেননি তা নয়। কিন্তু নন্দকুমারের দলের লোক বলেই হোক বা হেস্টিংসের এই দুর্দৈব বেশিদিন থাকবে না—এই দূরদৃষ্টির জন্যেই হোক—রেজা খাঁ ক্লেভারিং-এর ডাকে সাড়া দেননি। তা' ছাড়াও কথা আছে। হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর হয়ে এসেই তাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় বন্দী করে চালান দেন বটে তবে তাঁকে কোনরকম অসম্মান করেননি। বরং তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী বহাল তবিয়তে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। তা' ছাড়া, মহা-

যারা নন্দকুমারের রেজা খাঁর বিরুদ্ধে কেসের অভিযোগ খাড়া করে সাজিয়ে এনেছিলেন, হেস্টিংস, এমন সবগুলিই ভিত্তিহীন বলে বাতিল করে দেন। এবং তাঁর মুক্তির ব্যবস্থাও করে দেন। এই অনুগ্রহ খুব সম্ভব রেজা খাঁ কোনদিনও ভুলতে পারেননি। কোম্পানীর ডাকে রেজা খাঁ অবশ্য সাক্ষী দিতে এলেন কলকাতায়। দিলেনও। বললেন, হেস্টিংস সাহেবকে উপহার তিনি দিয়েছেন বই কি। তবে সেটা পারশী বেড়াল। বহুৎ খুবসুরত। গবর্ণর জেনারেল পছন্দ করলেন। তাঁকে না দিয়ে করেন কি? হেস্টিংসকে দেওয়া তাঁর সুবৃহৎ বাগানবাড়ী, নানা রকমের বহু প্রস্থ মূল্যবান কাপড়-চোপড়—ইত্যাদি তিনি বেমালুম চেপে গেলেন। ক্লেভারিং অনেক খাজিয়ে দেখলেন। নন্দকুমার নীরব দর্শক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু খাঁ সাহেবের কাছে আর কোন কথা বার হ'ল না। ক্লেভারিং তাঁর আশা ছেড়ে দিলেন। রেজা খাঁ সেলাম করতে করতে কাউন্সিল হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন।

এই অসহায়তা থেকেই তাঁর প্রতিহিংসার আগুন তাঁর মনে জ্বলে উঠল। হেস্টিংস মনে হয় বুঝলেন এই বুনো ওলের জন্যে বাঘা তেঁতুলের দরকার। এদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে হ'লে প্রয়োজন আর একটা মোক্ষম ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করা। এমন ষড়যন্ত্র, যাতে এই ষড়যন্ত্রের নায়ক মহারাজ নন্দকুমারকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া যায় পৃথিবী থেকে।

হেস্টিংস এবার আঁট ঘাট বেঁধে কাজে নেমে পড়লেন। এই ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় হলেন তাঁর সহপাঠী, চীফ জাস্টিস ইলাইজা ইম্পে। তবে একটা কথা—হেস্টিংস যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করতে লাগলেন, সেটা অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে রচিত। অনেক বেশি যত্ন নেওয়া হয়েছিল বলেই প্রায় ত্রুটিহীন। এবং সুযোগটা হেস্টিংস বলতে কি একরকম কুড়িয়েই পেয়ে গেলেন।

ঘটনাটার আরম্ভ হেস্টিংস-নন্দকুমার দ্বন্দ্বের সুরু হওয়ার অনেক আগে। কলকাতার মেয়রসকোর্টে মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যবসায়ী আটচল্লিশ হাজার একুশ টাকার একটা 'বন্ড' জাল করার দায়ে নন্দকুমারের নামে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। এটা অতীতের কাহিনী। হেস্টিংসের চক্রান্তে এই মরা মামলা জীবন্ত করে মোহনপ্রসাদ। একটি ফৌজদারী মামলা হিসেবে সুপ্রিম-কোর্টে আপিল করে সে। বলাবাহুল্য এর পিছনে হেস্টিংসের উসকানি ছিল। বিলিতী জজেদের মাথা ছিল। এবং বিশে এপ্রিল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত—কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের পেয়াদা গিয়ে মহামান্য মহারাজ নন্দকুমারকে বেঁধে নিয়ে এল। কোর্টের হুকুম—ক্লেভারিং ত্রয়ী দারুভূত বৃক্ষের মত শুধু তাকিয়ে দেখলেন, সুরুতেই ক্লেভারিং তাঁকে ছাড়াবার বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। শুধু সমবেদনা জানাবার জন্যে প্রত্যহ সস্ত্রীক তাঁরা যেতেন কারাগারে। মহারাজের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর করতেন।

জালের মামলা সুরু হয় আটই জুন। রোদে সারা কলকাতা পুড়ে যাচ্ছে। আদালত ঘরে টানাপাখার রেওয়াজ তখনও। জজ সাহেবেরা সব ঘেমে গলদঘর্ম। রোজ সকাল আটটায় কোর্ট বসত। শেষ হ'ত রাত গভীর হ'লে। আটদিন ধরে বিচার চলে। স্যর ইলাইজা ইম্পেকে সাহায্য করতেন তিনজন জজ আর আটজন য়ুরোপীয় জুরী। নন্দকুমারের পক্ষে ছিলেন মুখ্যতঃ সেকালের কলকাতার বাঘা অ্যাডভোকেট ফেরার। বিচারে লর্ড চীফ জাস্টিস ইম্পে তাঁর জুরীদের মামলা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন "The prisnor stands indicted for forging a Persian Bond, with an intent to defraud Balaki Das, and also for publishing the same, knowing it to be forged . . ." মামলা বোঝানর একঘন্টা পরেই জুরীরা ফিরে এসেই তাদের মত প্রকাশ করেন—নন্দকুমার দোষী।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। জালিয়াতির সাজা ভারতীয় আইনে এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু ইংরেজ আইনে এর শাস্তি মৃত্যু। বিচারকরা অনেক বিচার করে শেষবেশ ইংরাজ আইন প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আসলে মামলায় অন্যায় যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা এইখানে। ভারতীয় ব্রাহ্মণকে ইংলিশ ল' অনুযায়ী বিচার করার যুক্তি কোথায়? ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে হেস্টিংস নিজেই কি একদা বলেন নি? তবে? এই দিকটা ছাড়া, এই বিচারের নথি পড়ে সেকালের বিশিষ্ট ব্রিটিশ আইনজ্ঞ—স্যার উইলিঅম ব্ল্যাকস্টোন লর্ড ম্যান্সফিল্ড বা লর্ড অ্যাসবার্টন অন্য কোন অন্যায় লক্ষ্য করেননি।

কিন্তু যাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ইংরেজ আইনে বিচার হওয়া উচিত নয়, তারা সে কাজ করেনি। নন্দকুমারের এই বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না ক্লেভারিং—মনসন—ফিলিপ ফ্রান্সিস। অথচ মেজরিটির প্রতাপে তাঁরা সহজেই এই ভারতীয় বৃদ্ধকে দিশী আইনে বিচারের দাবী তুলতে পারতেন। এবং তুললে ইলাইজা ইম্পের সেটা নাকচ করা অসম্ভব হ'ত। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, ফ্রান্সিস তা' করলেন না। শুধু না করা নয়, ফ্রান্সিস নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ সমর্থন করলেন। জজেদের বিরুদ্ধে বিচারের ভ্রান্তির যে অভিযোগ আনেন নন্দকুমার, ফিলিপ ফ্রান্সিস সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে জজেদেরই সমর্থন করেন। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার তাঁর শেষ চিঠিতে ক্লেভারিংকে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে আসতে কাতর অনুরোধ করলেন। কিন্তু আইনের চক্ষে অপরাধীকে সমর্থন করার মত হীনচরিত্র মেজর জেনারেল ক্লেভারিং বা তার সহকর্মীরা নন! নিরপেক্ষতার মহৎ আদর্শের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে গেল তাঁদের এককালের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী—মহারাজ নন্দকুমার। পাঁচই আগস্ট। সতের শ' পঁচাত্তর। এক ভাদ্র মাস। শনিবার। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারালেন মহারাজ নন্দকুমার। ফাঁসির দড়িতে বিদায় নিল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিবন্ধক॥

॥ তিন ॥

মনে করা গেল নন্দকুমার লোকটা শয়তান, ভণ্ড সবকিছু। কিন্তু রাজা যে-সব তথ্যগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেগুলি গভর্ণর জেনারেলের চরিত্রে আলোকপাত করবার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়? তা' যদি না হবে তবে চক্রান্ত করে' তাকে তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল কেন?—এই ধরনের চিঠি ফিলিপ ফ্রান্সিস লিখতে লাগলেন বিলেতে। এতে প্রথমত নিজের নিরপেক্ষতা, এবং পরোক্ষতঃ একটা ষড়যন্ত্র করে নন্দকুমারকে হত্যা করা হয়েছে—এমনই একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ধীরে ধীরে খাড়া করতে লাগলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস।

এবং এই ধরনের পরোক্ষ আক্রমণে যে কাজ হবে—এটা আর কেউ না বুঝুক ফিলিপ ফ্রান্সিস বুঝতেন। তিনি আরও বুঝতেন, জীবিত নন্দকুমারের চেয়ে মৃত নন্দকুমার অনেক বেশী কাজ দেবে। এবং নন্দকুমরের মৃত্যু বৃটিশ বিবেককে অত্যন্ত জোরে নাড়া দেবে। কাজেই নন্দকুমারকে তিনি মরতেই দিলেন।

তবে ক্লেভারিং সম্প্রদায়ের আক্রমণ শুধু এই কূটনৈতিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁরা নূতন করে' তাঁদের আক্রমণ রচনা করতে লাগলেন। এবারে তাঁদের বলভরসা রেজা খাঁ আর নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস। অবশ্য কূটনীতিতে গুরুদাস পিতার মত যোগ্য ছিলেন না। তবে ক্লেভারিং সম্প্রদায়ের মন জুগিয়ে চলবার জন্যে যতটা দরকার তার সবটাই ছিল। এদিকে নন্দকুমারের মৃত্যুর ক্ষতিটা খানিকটা পুষিয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় ক্লেভারিং সম্প্রদায় নবাবের গার্জেনের পদে মণি বেগমকে সরিয়ে বসালেন রাজা গুরুদাসকে। নবাব দরবারে ব্রিটিশ রেসি-

ভেণ্ট ব্যাচারী একটু মুস্কিলে বেগমের হয়ে গেয়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই ভদ্রলোক নিজেকে জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত হতে দেখলেন!

ক্লেভারিং এবারে রেজা খাঁকে বাঙলার দেওয়ানী দিয়ে দিলেন। হেস্টিংস 'ডায়ার্কি' তুলে দিয়েছিলেন। ব্যবস্থাটা বানচাল করবার জন্যে ক্লেভারিং এই পথ ধরলেন। অবশ্য কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর বিলেত থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রেজা খাঁকে যা' হয় কিছু করে পুষিয়ে দিতে। তাঁর কারাবাসের শাস্তিটা বড্ড কঠিন হয়ে গেছে! কোম্পানীর এই নির্দেশের সুযোগে ক্লেভারিং হেস্টিংসের শাসন ব্যবস্থা পাল্টে আবার দেওয়ানী পদ চালু করলেন। ফলে সেই দ্বৈত শাসন। দেশে আবার সেই ছিয়াত্তরের অরাজকতা!

ক্লেভারিং শুধু এবার হেস্টিংসের পিছনে লেগেই শান্ত হলেন না। এবার তিনি হেস্টিংস-মুখ—সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজে ইম্পেকে নিয়ে পড়লেন। বিচারকদেরও খোলাখুলি খুঁত ধরতে লাগলেন। হেস্টিংস বিচারকদের সমর্থনে বললেন দোষ যদি কিছু থাকে, সেটা আইনের। বা আইনের অভাবের। ভারতবর্ষে প্রযোজ্য পেনালকোড নেই বলেই বিচারের এই আপাতবৈষম্য। অবশ্য হেস্টিংস যে ইম্পের পক্ষে সাফাই করবেন, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। তবে বলা প্রয়োজন, ইম্পে লোক হিসেবে বড় সামান্য ছিলেন না। ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়াণ্ট। কেম্ব্রিজ-ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। দ্বিতীয় 'পুসনে' জজ চেম্বার্স অক্সফোর্ডে আইনের ভিনেরিয়ান অধ্যাপক ছিলেন। অপর দুই 'পুসনে' জজ ছিলেন সেকালের লাণ্ডনের ব্যারিস্টার।

এই সময়ে আর এক শনিবার এল ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাগ্যে। হেস্টিংসের বাঙলা দেশের জলহাওয়া সয়ে গিয়েছিল। অনেক কাল ধরে এদেশে কাটাচ্ছেন তিনি। কিন্তু ক্লেভারিং বা মনসন কারুরও স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। অবশ্য যাকে বলে ব্যক্তিত্বের সংঘাত—সেটাও ক্লেভারিং-এর দলে ফাটল সুরু করেছিল! কিন্তু বাংলাদেশের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াই প্রকারান্তরে হেস্টিংসের সাহায্যে এগিয়ে এল।

জেনারেল মনসন ছিলেন বড় ঘরের ছেলে। কলকাতার চাপা গরম তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। সেকালের কলকাতার চারটে মাস—আগস্ট থেকে নভেম্বর—সাধারণত মড়ক দেখা দিত। কলকাতার কত সাহেব যে এই সময় পার্ক স্ট্রীটের কবরে গিয়ে শান্তি পেত, তার আর ইয়ত্তা নেই। এই সময় স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে খুবই ধরাবাঁধা জীবন যাপন করতে হ'ত। বিন্দুমাত্র অসংযম মৃত্যু আমন্ত্রিত করতে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু খানদানী মানুষ মনসনের ধাতে এ'সব সইত না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এদেশে থাকলে তাঁর জীবন বেশিদিন নয়। তিতিবিরক্ত হয়ে দেশে ফেরবার জন্যে কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিলেন মনসন। কিন্তু সেই পদত্যাগ-পত্র দেশে পৌঁছবার আগেই মনসনের মৃত্যু হ'ল কলকাতায়। আর মনসনের শবানুগমন করতে করতে ওয়ারেন হেস্টিংস দেখলেন 'কাস্টিং ভোট'-এর যে শাণিত অস্ত্র এতদিন তাঁর জেবে শুধু শুধু মরচে পড়ছিল—বর্ষার জলে এবার সেটাকে শান দিয়ে নেওয়া দরকার। এবার তার প্রয়োগ আসন্ন।

এই কাস্টিং ভোটের জোরেই হেস্টিংস সুবায় সুবায় যে সব জায়গায় ক্লেভারিং তাঁর লোকেদের বসিয়েছিলেন, সেখানে ফের নিজের লোকেদের নিয়ে বসালেন। লখনৌতে ফ্রান্সিসের লোক ব্রিস্টোকে সরিয়ে বসালেন মিডলটনকে। বেনারসে ক্লেভারিং-এর দোস্ত ফ্রান্সিস ফোকের জায়গায় গেলেন টমাস গ্রাহাম। এইভাবে যখন আবার ঘর গুছিয়ে বসতে গেলেন হেস্টিংস, তখন দেখা গেল বারওয়েল দেশে ফিরতে বদ্ধপরিকর। তাঁরও ভগ্নস্বাস্থ্য। বারওয়েল চাইছিলেন যেটুকু জীবন অবশিষ্ট আছে, সেটুকু আর সঞ্চিত যা খুদকুঁড়ো আছে তাই নিয়ে মানে মানে দেশে ফিরবেন।

এমনই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ঘটনার পটভূমি সরে গেল লিডেনহল স্ট্রীটে—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দপ্তরে। কোম্পানীর কমপক্ষে ছয়জন ডিরেক্টর লর্ড নর্থের দাক্ষিণ্যে তখন বেশ বড়সড় সরকারী কণ্ট্রাক্ট লাভ করেছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও হেস্টিংসের স্বপক্ষে সদস্য সংখ্যা বড় কম ছিল না বোর্ডে। তাঁদের দলবৃদ্ধি করবার সুযোগ না দিয়েই সরকারী দল হেস্টিংসকে 'বিকল' করার প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন। ভোটের ফলাফলে দেখা গেল—দশজন হেস্টিংসের পক্ষে। বিপক্ষে এগার।

সরকারী দলের এই জয়লাভে হেস্টিংসের দলের লোকেরা মর্মাহত হলেও বুদ্ধিভ্রষ্ট হলেন না। বোর্ড অব ডিরেক্টররা তাঁদের অভিমত পার্লামেন্টে পাঠাবার আগেই তাঁরা একটা পাল্টা চাল চাললেন। কোম্পানীর সভ্যদের সাধারণ সভা ডেকে বসলেন তাঁদের অভিমত সংগ্রহের জন্যে। সতের শ' ছিয়াত্তর সালের যোলই মে এই সভা বসে। দু'দিন ধরে আলোচনা করার পর যখন ভোটাভুটি হ'ল—দেখা গেল হেস্টিংসের দলের লোকেরা বিপুল ভোটাধিক্যে জিতে গেছেন। হেস্টিংসকে স্বপদে বহাল রাখবার পক্ষে ভোট পড়েছে একশ ছয়। বিপক্ষে উনপঞ্চাশ।

যাই হোক, ভোটের খবর শুনে লর্ড নর্থ ত টেবিলে ঘুষি মেরে উঠলেন—বোর্ডকে তিনি দেখে নেবেন। আইন করে [illegible] সকল ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। [illegible] সনদ বাতিল করে দেবেন—ইত্যাদি [illegible]। আসলে নর্থ নিজেই খুব [illegible] হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে আমেরিকা অন্যদিকে ভারতবর্ষ। এ যেন তাঁর সসেমিরা অবস্থা!

তবু তাঁর বাহ্যিক তড়পানিতেই একটা মস্ত কাজ হয়ে গেল। হেস্টিংসের উকিল-বন্ধু ল্যাকলান ম্যাকলিন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকটি সম্মানজনক সর্তে তিনি হেস্টিংসের পদত্যাগপত্র পেশ করতে রাজি হলেন। সর্ত হ'ল যে—হেস্টিংসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে যাদের চাকরী গেছে, তাদের পুনর্বহাল করা হবে। এই সর্ত—কালা-ধলা হেস্টিংসের অনুগৃহীত উভয় সহকর্মীদের পক্ষেই প্রযোজ্য। এছাড়া হেস্টিংসের বন্ধুদের প্রমোশনের ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে সমান ব্যবস্থা, তাদের সম্বন্ধে কোনরূপ নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা না গ্রহণ করা, তদন্তের ব্যবস্থা না করা এবং সবার শেষে—হেস্টিংসের স্বদেশে প্রত্যাগমনে তাঁকে স্বাগত জানান ও তাঁর কাজের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান।

এইসব সর্ত-সাপেক্ষে সেই বছর নরই অক্টোবর হেস্টিংসের ইংলণ্ডের এজেণ্ট ও বন্ধু ল্যাকচান ম্যাকলিন হেস্টিংসের পদত্যাগপত্র বোর্ড অব ডিরেক্টরের হাতে হাতে তুলে দিলেন। যথাসময়ে সেটিই গৃহীত হ'ল। হেস্টিংসের জায়গায় গভর্ণর জেনারেল হলেন কোম্পানীর একজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান—এডওয়ার্ড হোয়েলার। এখানে একটা কথা বলা দরকার। ভারতবর্ষে নানা দিক দিয়ে সুদিনের মুখ দেখার সম্ভাবনা পেয়েই হেস্টিংস ম্যাকলিনকে দেওয়া তাঁর 'লেটার অব অথরিটি' নাকচ করে দেন। কিন্তু ম্যাকলেন দেখলেন—দিনকাল যা' পড়েছে তাতে একদিন না একদিন হেস্টিংসকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে আসতে হবে। কোম্পানীর কাজ তাঁর বরাতে নেই। কাজেই অব্যাহতিটা যতটা সসম্মানে হয়, সেটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

বিলেতের লিডেনহল স্ট্রীট থেকে এইবার এই বিচিত্র নাটকের দৃশ্যসংস্থান এসে গেল কলকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে। বিলেতে ফিলিপ ফ্রান্সিসের লোকজন সর্বত্র। সেখান থেকেই কানাঘুষা কেমন যেন খবরটা তাঁর কানে উঠেছিল। কিন্তু তিনি ত কলকাতা কাউন্সিলের কনিষ্ঠতম সভ্য। ক্লেভারিং তখন কলকাতা ছাড়া। ফ্রান্সিসের চিঠি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে লোক চলে গেল ক্লেভারিং-এর কাছে—'সাম শার্প, সাম ইণ্টারেস্টিং এণ্ড ভাইটাল নিউজ অ্যাওয়েটস

ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

ইউ।' ক্লেভারিং আসতেই তাঁকে একটা বিষয় জরুরী সংবাদ শোনবার জন্যে তৈরী হতে হ'ল। দুজনে সেদিন একই কোচে চেপে গেলেন কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে। আর রাস্তার কঠিন মাটিতে তেজী পারসী ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হচ্ছিল টগবগ টগবগ—আর তারই প্রতিধ্বনিতে জেনারেল ক্লেভারিং যেন শুনতে শুনতে গেলেন—জেনারেল ক্লেভারিং —নিউ গভর্ণর জেনারেল—জেনারেল ক্লেভারিং নিউ গভর্ণর জেনারেল।

ফিলিপ ফ্রান্সিসের খবর মিথ্যে নয়। কোর্ট অব ডিরেক্টরের ডেসপ্যাচের সিল খুলে দেখা গেল—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর পার্লিয়ামেন্টের সম্মতিক্রমে ওয়ারেণ হেস্টিংসের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। তার জায়গায় নিয়োগ করেছেন হোয়েলারকে। সব কিছুই ক্লেভারিং-এর মনের মত হচ্ছিল বা হত যদি না ক্লেভারিং নিজেই একটা স্বেচ্ছসেবী কাজ করে বসতেন সেই সঙ্কট মুহূর্তে।

ক্লেভারিং-এর কেমন যেন তর সইছিল না। তাঁর বহুদিনের অবদমিত কামনা আজ চরিতার্থতা লাভ করে তাকে যেন স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছিল না। সাফল্যের উৎসাহে ক্লেভারিং নিজেই নিজেকে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে ঘোষণা করলেন। কাউন্সিল হাউসের সভাপতির উঁচু চেয়ারটায় বসে হেস্টিংসকে হুকুম দিয়ে বসলেন, কেল্লা আর কোষাগারের চাবি তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্যে।

হেস্টিংস আর বারওয়েল দুজনেই ক্লেভারিং-এর অন্যায় কাজের নিন্দা করলেন। একটা চিঠি লিখে জানালেন, কেল্লার চাবি আর ট্রেজারির অধিকার দাবী করবার কোন এক্তিয়ার নেই ক্লেভারিং-এর। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিস কেউই এই ব্যবস্থায় 'না' বলতে পারলেন না। সুপ্রিম কোর্ট ক্লেভারিং-এর কাজকে বিধিহীন বলে রায় দিলেন।

কাউন্সিল হাউসে আবার মিটিং বসল। এবারে হেস্টিংস আর বারওয়েলের পাল্লা পড়েছে। তাঁরা ক্লেভারিং আর ফিলিপ ফ্রান্সিসের অন্যায় আচরণের নিন্দা করলেন এবং তাঁদের সব অধিকারকে বঞ্চিত করলেন তখন সর্বত্র হেস্টিংসের পেটোয়া লোক কোথাও কিছু করবার নেই। ক্লেভারিং শেষ বেশ সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হলেন। শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে ইলাইজা ইম্পে বললেন উভয় দলকে নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মীমাংসা করে নিতে। কোর্টের নির্দেশ' তা ছাড়াও কথা আছে। হেস্টিংস তাঁর পদত্যাগ পত্র ফেরৎ নেবার আবেদন জানিয়ে আবেগময়ী ভাষায় লর্ড নর্থকে একটা অবেদন করেছিলেন। তারও কোন জবাব আসেনি কাজেই এই সসেমিরা অবস্থায় হেস্টিংস ক্লেভারিং-এর সঙ্গে একটা সমঝোতায় এ গেলেন। ঠিক হ'ল উভয়েই এই স্থিতাবস্থা মান্য করে চলবেন।

হেস্টিংসের চিঠির কোন জবাব এল না সত্যি, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই মেজর জেনারেল ক্লেভারিং-এর জন্যে এল সম্রাট তৃতীয় জর্জের দেওয়া নাইট উপাধি। রাজসেবার পুরস্কার! বিশে জুন। সতের শ সাতাত্তর। একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাইটের মর্যাদায় ভূষিত হলেন মেজর ক্লেভারিং। কিন্তু দীর্ঘদেহী, বৃষস্কন্ধ মেজর জেনারেল যে ভার বয়েছিলেন, নাইট ক্লেভারিং তা পারলেন না। পারলেন না বাংলা দেশের অবাহাওয়ার সঙ্গে যুঝতে। ঠিক ছ' মাস পরে মারা গেলেন স্যার ক্লেভারিং কলকাতার বর্ষার বলি হলেন মেজর জেনারেল। কিন্তু মরবার সময়ও ক্লেভারিং হেস্টিংসকে ক্ষমা করতে পারেননি—এমন বিষময় হয়েছিল তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ক্লেভারিং বলে গিয়েছিলেন, তাঁকে কবর দেওয়ার পর তবে যেন গভর্ণর জেনারেলকে খবর দেওয়া হয়। ক্লেভারিং-এর মৃত্যু তিরিশে —বিশে আগষ্ট। ভাদ্র মাস—শনিবার।

।। চার ।।

এই ভাদ্রমাসই আবার ওয়ারেণ হেস্টিংসকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে ব পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেয়। অবহেলিত অনাদৃত, পৃথিবীর কাছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ছিয়াশি বছর বয়স্ক ওয়ারেণ হেস্টিং আঠার শ' আঠার সালে সকলের অজ্ঞাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কেবলমা টাইমস পত্রিকা তাঁর সংক্ষিপ্ত শোক-সংবা প্রকাশ করেছিলেন।

বলা বাহুল্য বহু ঘটনার নায় হেস্টিংসেরও মৃত্যুদিনটা পড়েছিল ভাদ্র মাসে বাইশে আগষ্ট। নয়ই সেপ্টেম্বর বিনা আড়ম্ব তারই জন্মপল্লী ডেসেলডর্ফের এক অখ্যা কবরখানায় তাঁকে অন্তিম শয্যায় শাই দেওয়া হয়। ইচ্ছে ছিল স্কুল-মাস্টার হবে হয়ে গেলেন গভর্ণর জেনারেল। ব বিতর্কিত বিচিত্র এই নায়কটি তাঁর জীব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন গুমসুটে এ ভাদ্রের দিনে। সেদিন শনিবার কিনা সঠি বলা যায় না।

হরিপদ বসু

'তোমার চৈতন্য হোক মা।'

এই উক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেদিনের স্মরণীয় সন্ধ্যার ইতিহাস।

প্রায় একশো বছর আগের কথা। তখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এতটা উন্নতি হয়নি। অভিজাত ঘরের মেয়েরা তখনো মঞ্চের পাদ-প্রদীপে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি। বাংলা থিয়েটারের অন্ধকার মুহূর্তে আলোর শিখা দেখা দিয়েছে মাত্র। এক কথায় সবে তখন সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়া-পত্তন হয়েছে। তবুও একথা একবাক্যে স্বীকার্য যে, অলৌকিক দৃশ্যাবলী সৃজনে ও সাবলীল অভিনয় সৃষ্টিতে সে যুগের শিল্পীরা এ যুগের তুলনায় মোটেই পেছিয়ে ছিলেন না।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র রসরাজ অমৃতলাল, অর্দ্ধেন্দু মুস্তোফী, অমৃতলাল মিত্র, অমর দত্ত, দানীবাবু প্রভৃতির মত অভিনেতা—তারাসুন্দরী কুসুমকুমারী, নরসুন্দরী, তিনকড়ি দাসী, প্রমোদাসুন্দরী, বিনোদিনীর মত অভিনেত্রী আজো আমাদের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অতীত গৌরবের স্মৃতি হয়ে আছে।

১৮৮৪ সালের ২রা আগস্ট স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। বর্তমানের স্টার থিয়েটার আর সেদিনের ঐ স্টার থিয়েটার কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। ঐ স্টার থিয়েটার জমিটি ছিল ৬৮নং বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত, যা পরে মনমোহন থিয়েটার নামে নামান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু এখন সে থিয়েটারের কোন চিহ্নই বর্তমান নেই।

'চৈতন্যলীলা' নাট্যাভিনয়ে সারা বাংলাদেশ তখন ভক্তির জোয়ারে দুলছে। তখনকার দিনের পাশ্চাত্য শিক্ষিত ইয়ং বেংগল, তিলকধারী বৈষ্ণব, সাধু, লম্পট সকলেই একাসনে বসে এই অভিনয়ের ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে—অভিনয় দেখতে দেখতে হৃদয়ের মুগ্ধ আবেগে হরি ধ্বনি করতে করতে অশ্রু অর্ঘ বিসর্জন দিয়েছে বার-বার।

অমৃতবাজার পত্রিকায় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ লিখলেনঃ

> "We do not know how to thank Girish Babu for his attempts to introduce pure and religious dramas into the Star Theatre. The Choitanya Lila drama should be repeated many times in the above Theatre, and every body ought to see it performed.

শুধু তাই নয় এই অভিনয়ের মধুর ঝংকার শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি নবদ্বীপধামে গিয়েও আলোড়িত হয়ে উঠল।

নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবপ্রাণ মথুরানাথ পদরত্ন 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনে আত্মহারা হয়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'গৌর তোর মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।' করেও ছিলেন তাই।

এক জীবনের বেপরোয়া বেহিসেবী গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এর আগেই ঘটেছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ। এবং তাই শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'থিয়েটার ওতেও লোক শিক্ষা হবে।' তাই রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেই গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার জীবনের চরম সার্থকতা এই 'চৈতন্যলীলা'র নাট্যাভিনয়।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়েও পৌঁছাল এই সংবাদ। আনন্দে আহ্লাদে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শ্রীভগবান। 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ঠাকুর।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রথম দেখা ১৮৭৭ সালে বোসপাড়ার দীননাথ বোসের বাড়ীতে। দ্বিতীয় দর্শন রামকান্ত বোস স্ট্রীটের বলরাম বোসের বাড়ী, (বর্তমানের বলরাম মন্দির) সেদিন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন তাঁরই বন্ধু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণব চূড়ামণি শিশিরকুমার ঘোষ।

দিনটা রবিবার ১২৯১ বঙ্গাব্দের, ৫ই আশ্বিন—ইংরাজি ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। অভিনয় তখনও সুরু হয়নি। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারের কম্পাউন্ডে পায়চারী করছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে খবর দিলেন 'গিরিশবাবু, ঠাকুর থিয়েটার দেখতে এসেছেন—' শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপার করুণার প্রতি প্রণাম জানাতে জানাতে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চল্লেন গিরিশচন্দ্র। ঠাকুর তখন গাড়ী থেকে নেমেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বসালেন, থিয়েটারের বক্স-এ এবং ঠাকুরের জন্যে একজন হাত-পাখাওয়ালার বন্দোবস্ত করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এই হল তৃতীয় দর্শন।

অভিনয় সুরু হল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হয়ে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখছেন। যখন ছদ্মবেশী বিদ্যাধরীরা গান ধরল—

> "নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি-পাখা
> রাধিকা হৃদিরঞ্জন।"

গান শুনতে শুনতে ঠাকুর ভাবে সমাধিস্থ হলেন। চোখ বেয়ে তাঁর শ্রাবণের অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগল।

অভিনয়ান্তে কৃষ্ণনামের বন্যায় ডুবে যান ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটে চলেন তাঁর বাস্তবের সঙ্গে কল্পনাকে মিলিয়ে নিতে—চিন্ময়ীর সঙ্গে মৃন্ময়ীর মহামিলন সন্ধানে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজঘর। নদে বুঝি আবার সত্যি-সত্যিই টলমল করে উঠল—পুণ্য পারিজাত নিয়ে কে যেন ছুটে এসেছে—সকলেরই দৃষ্টি এই মহালগ্নের দিকে।

—কৈগো আমার চৈতন্য কৈগো? ঠিক যেন এক চৈতন্যের সন্ধানে এসেছেন আর এক চৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে শিল্পীরা।

ঠাকুর প্রশ্ন করেন, 'হ্যাগা, আমার চৈতন্যের সঙ্গে একবার দেখা হবেনি গা? আমি যে বড় আশা করে এসেছি তাকে দেখবো—'

এবার সবাই বুঝতে পারে কেন ঠাকুর আজ এসেছেন তাদের মধ্যে—কি তাঁর জিজ্ঞাসা—তাই তারা বিনোদিনীকে দেখিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শিষ্যা এই বিনোদিনীই আজকের 'চৈতন্যলীলার' শ্রীচৈতন্য। বিনোদিনীর পরিচয় পেয়ে ঠাকুরের মনে আর আনন্দ ধরে না—ভাবাবিষ্ট কণ্ঠে তিনি বলে উঠেন, 'তাইতো বলি মা না হলে এতো ভাব কার—।

শুধু তাই নয় সেদিন বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তোমার চৈতন্য হোক মা।'

AMRITA BAZAR PATRIKA
August 7, 1884.

The Star Theatre presented a novel scene last Saturday. The drama selected to be performed on that night was entitled the "Choitanya Lila" by the well-known dramatic writer Babu Girish Chandra Ghosh. Choitanya was displayed before the audience as an incarnation of Sri Krishna, and his debut created quite a sensation. His celestial teachings were presented in a manner which called forth loud applause. Mahaprabhu Choitanya is regarded as an Avatar of love Bhakti (reverence), and the whole audience seemed to feel as if they were under his divine influence whenever the actor performing his part appeared on the stage. Many no doubt came to scoff, but they were silenced by the general feeling of devotion which seemed to prevail throughout the performance. Choitanya hated not the sinners, but wept for their depraved condition and love them with an ardour which no human mind can conceive. He touched the sinner, and through the omnipotent power of his love, he purified him. The reformation of 'Jagai and Madhai', the robber chiefs of Nuddea, by a mere touch, was one of the greatest miracles performed by Choitanya. When the part of the drama was enacted last Saturday, the whole audience appeared as if electrified. We do not know how to thank Girish Babu for his attempt to introduce pure and religious dramas into the Star Theatre. The Choitanya Lila drama should be repeated many times in the above Theatre, and every body ought to see it performed.

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন

(ক) ১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল দলের খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই।

(২) অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিচি বেনোর মোট রানসংখ্যা কত? তিনি এপর্যন্ত কয়টি সেঞ্চুরী করেছেন ও কত উইকেট পেয়েছেন?

বিনীত

চিরঞ্জীব ও চঞ্চল দাস
দমদম, কলকাতা

●

সবিনয় নিবেদন,

মোহনবাগান ক্লাব কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এপর্যন্ত কে কে ফুটবল বিভাগে অধিনায়কত্ব করেছেন?

বিনীত

উমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ঝরিয়া ধানবাদ

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ইস্টবেংগল ক্লাব কত সালে রোভার্স কাপ লাভ করে? ফাইন্যালে কে কে অংশ গ্রহণ করেন এবং গোল করেন?

(খ) বৃটেনের প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল ও রানার্স আপ লীডস ইউনাইটেড দলের খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই।

(গ) টেস্ট ক্রিকেটে একদিনে সর্বাধিক কটি উইকেট পড়েছে।

(ঘ) তাস খেলা ভারতে কবে প্রচলিত হয়? পোলো খেলায় কোন দেশ শ্রেষ্ঠ?

বিনীত

রূপময় রায় ও সুশান্ত বসু
বাঁকুড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) সম্রাট আকবর-এর মা ও স্ত্রীর নাম কি?

(খ) বাংলা সন গণনা শুরু হয় কবে থেকে?

বিনীত

বিশ্বজিৎ ঘোষ
হাজারীবাগ

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বিখ্যাত ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্যালটন কি জন্য বিখ্যাত?

(খ) জব চার্নকের জন্মদিন কবে?

(গ) 'রবিনশন ক্রুশো' কার লেখা এবং কত সালে প্রকাশিত হয়?

(ঘ) সর্বপ্রথম বাঙালী অনার্স গ্র্যাজুয়েট কে?

(ঙ) স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা সর্বপ্রথম কবে হয় এবং ঐ বৎসর প্রথম স্থানাধিকারীর নাম কি?

(চ) 'গীটার' এর আবিষ্কর্তা কে?

বিনীত

মণ্টু দত্ত ও রতন দত্ত
মুরারই, বীরভূম

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অলিম্পিক খেলায় কোন অ্যাথলীট সর্বাধিক স্বর্ণপদক পেয়েছেন?

(খ) ইণ্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ড এবং বাগদাদ চুক্তির তাৎপর্য কি?

বিনীত

পঙ্কজ বসু ও স্নেহ বসু
নৈহাটী

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) "এণ্টি-পোডস" একথার মানে কি? যুক্তিসহ প্রমাণ চাই।

(খ) "মেসিন-গান" "নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড" এবং "রেডার" এগুলির আবিষ্কারক কাহারা?

(গ) W.A.V.E.S., S.A.M., M.I.5., S.A.C. এই শব্দগুলির সম্পূর্ণ রূপ কি?

(ঘ) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান বিমান-বন্দর কতগুলি আছে? এর মধ্যে সর্ব-প্রথম কোন বে-সামরিক বিমান বন্দর?

বিনীত

রাহুল বর্মণ
আগরতলা, ত্রিপুরা

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) কাশ্মীরে চেনাব নদীর উপর যে বাঁধটি নির্মিত হয়েছে তার দৈর্ঘ্য কত এবং নাম কি?

(খ) ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার মাঠ কোনটি?

বিনীত

অনুপ রায়চৌধুরী
কলকাতা—৩৩

●

সবিনয় নিবেদন,

বৈমানিকদের স্মৃতিরক্ষার্থে সবচেয়ে বড় মেমোরিয়াল কোনটি? এর নকসা কে করেন এবং এখানে কতজন বৈমানিকের নাম উৎকীর্ণ আছে?

বিনীত

উৎপল মজুমদার
কলকাতা—৯০

সবিনয় নিবেদন,

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং স্টপার কে?

বিনীত

কানাই দাস ও রাজু চক্রবর্তী
তিনসুকিয়া, আসাম

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন

(১) গত ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত কেশব বসু মহাশয়ের প্রশ্নের (ভারতবর্ষে কোন যুদ্ধের সময় প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়) উত্তরে জানাই যে, ভারতবর্ষে পাণি-পথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খৃষ্টাব্দ) মুঘল সম্রাট বাবর সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেন ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে।

(২) গত ১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবোধ সত্যব্রত সান্যাল মহাশয়ের এবং সুলেখা সান্যাল মহাশয়ার প্রশ্নের (পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম কি) উত্তরে জানাই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম নিম্নরূপ—

১। ভারত—টাকা, ২। পাকিস্তান—টাকা, ৩। চীন—টেলবা, ৪। জাপান—ইয়েন ৫। রুশিয়া—রুবল, ৬। সিংহল—রুপি ৭। ব্রহ্মদেশ—কায়াট, ৮। ইরাণ—রিয়াল ৯। ইরাক—ডিনার, ১০। তুরস্ক—পিয়াস্তর ১১। মিশর—পিয়াস্তর, ১২। মরক্কো—দেরহাম, ১৩। ইন্দোনেশিয়া—রুপিয়া ১৪। আমেরিকা—ডলার, ১৫। ইংলণ্ড—পাউণ্ড ১৬। ইতালী—লিরা, ১৭। অস্ট্রিয়া—শিলিং ১৮। গ্রীস—ড্রাকমা, ১৯। ফ্রান্স—ফ্রাঁ ২০। আবিসিনিয়া—মেলিলিউ, ২১। মেক্সিকো—পেসো, ২২। কিউবা—পেসো ২৩। আর্জেণ্টিনা—পেসো, ২৪। কলম্বিয়া—পেসো, ২৫। চিলি—পেসো, ২৬। হল্যাণ্ড—গিলডার, ২৭। কাম্বোডিয়া—ফ্রাঁ, ২৮। লিথুয়ানিয়া—লিমাস, ২৯। স্পেন—পেসেটা ৩০। হংকং ও মালয়—বলিভার, ৩১। আলবেনিয়া—লেক, ৩২। সুইডেন—ক্রোন ৩৩। আইসল্যাণ্ড—ক্রোন, ৩৪। সুইজারল্যাণ্ড—ফ্রাংক, ৩৫। চেকোস্লোভাকিয়া—ক্রাউন, ৩৬। ফিনল্যাণ্ড—মার্ক, ৩৭। রুমানিয়া—লাই, ৩৮। জার্মানী—ডয়েচমার্ক ৩৯। ডেনমার্ক—ক্রোন, ৪০। পর্তুগাল—এস্কিউডো, ৪১। পোলাণ্ড—জ্লোটি, ৪২। বেলজিয়াম—বেলজা, ৪৩। ব্রেজিল—মিলরাইস, ৪৪। যুগোশ্লাভিকিয়া—ডিনার ৪৫। অস্ট্রেলিয়া—পাউণ্ড, ৪৬। বুলগেরিয়া—লেভ, ৪৭। হাঙ্গেরী—ফরিণ্ট, ৪৮। থাইল্যাণ্ড—রাআত, ৪৯। ল্যাটভিয়া—ল ৫০। লিথুয়ানিয়া—লিটাস।

(৩) গত ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত ব সেনরায় মহাশয়ের প্রশ্নের (ভারতে সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি) উত্তরে জানাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় জেলা ভিজাগাপটনম।

শ্রীঅশোককুমার
হাবড়া, ২৪-পরগণা

বাংলার বাউল ও বাউল-রাজা লালন ফকির

রণজিৎকুমার সেন

মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা নানা সাধক-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই; তার একটি বড় অংশ গড়ে ওঠে বাউলকে আশ্রয় করে। মধ্যযুগের ভারতীয় মরমীয়াবাদের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে এই বাউল। তারও বহু আগে থেকে বাউলের ইতিহাস রচিত হয়ে আসচে। এদের আদিপুরুষ হিসেবে ঋক্-বেদের ব্রাত্যদের ধরা যেতে পারে। বৈদিক যুগের সমগ্র আচার-বিচারের তারা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বাউলদের মধ্যেও যুগ-ব্যতিক্রমের লক্ষণ স্পষ্ট।

পরবর্তীকালে নাথযোগীদের সম্পর্কে নাথপন্থী বাংলা-সাহিত্যে যা পাওয়া যায়, তাতেও বাউলধর্মী রীতির পরিচয় মেলে। নাথযোগীরা ছিল ভ্রমণশীল সম্প্রদায়, বাউলদের মধ্যেও সেই ভ্রাম্যমাণতা লক্ষ্য করবার মতো। গোরক্ষবিজয়ে বা মীনচেতনে যে 'কায়াসাধ'-এর উল্লেখ দেখা যায়, তাও বাউলদের সাধনারই কথা। সুফী সম্প্রদায়ের সাধনাও অনুরূপ। নাথযোগীদের প্রধান ব্রত ছিল ত্যাগ, সুফীদের প্রধান ব্রত ছিল প্রেম। বাউলদের মধ্যে এই উভয় শ্রেণীরই প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই তাঁরা বস্তু থেকে ভাবে এবং ভাব থেকে মহাশূন্যতার পথে জ্যোতির্ময় আত্মার সন্ধান করেছেন। আত্মাকে না জানলে কোনো সাধনারই সিদ্ধি নেই। উপনিষদ বলেছেন ঃ 'আত্মানাং বিদ্ধি', বলেছেন ঃ 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা' অর্থাৎ—সেই পরমপুরুষকে না জানলে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার নেই। তাঁকেই বাউলেরা 'মনের মানুষ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। —'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।' এই মন-মাঝি বা মনের মানুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি নেই। নিজের অহং ছাড়তে পারলে তবে সেই পরমহংসের সাধনার সিদ্ধি। নিরন্তর তাঁরই খোঁজ করে বাউল বলেছে—

> 'আমার মনের মানুষ যে রে,
> আমি কোথায় পাবো তারে?'

তাঁরই সন্ধানে বাউল অনন্তকাল ধরে সংসার-পথ পেরিয়ে চলেছে অজানা লোকের পথে, মহাশূন্যের পথে। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ এর একটি প্রধান আধার। অধরার যে সাধনা, ধরার বন্ধনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায় না। তবু নিত্য তাঁরই সন্ধানে প্রাণ ছুটে চলে।—

> 'আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে
> মনের মানুষ যেখানে!
> অন্ধকারে জ্বলছে বাতি
> দিবারাত্র নাই সেখানে।'...

সংসারের নিত্য দাবদাহ পাছে প্রতিকূল হয়ে বাধা দেয়, চিরকাল তাই এই বাউলেরা গৃহছাড়া। লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যাবে—বৌদ্ধ দোঁহা ও বাউল শেষপর্যন্ত একস্তরে এসে মিলেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তুলনা-মূলক আলোচনা-সাহিত্যে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে —'বাংলাদেশের আউল-বাউল নিরঞ্জনীদের মধ্যেও এই শূন্যবাদ পাই। শ্রীহট্ট বিঠংগলের মঠের মতবাদে, অষ্টগ্রামী ও দক্ষিণ শাহ-বাজপুরী বাউল সমাজে, উত্তরবঙ্গের কমলকুমারী মাঝবাড়ী মধ্যমা মতে, বিক্রম-পুর নরসিংদী বাউল সমাজ এবং রাঢ়ের বাউলদের মধ্যে সর্বত্রই শূন্য ও সহজের খুব বড় স্থান।'

এই শূন্যবাদ ও সহজবাদ বিষয় দুটি জানবার প্রয়োজন। বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে শূন্যতত্ত্বের পরিচয় আছে। শূন্যপুরাণের উল্লেখ থেকে দেখা যায়—শূন্যতত্ত্ব প্রচারে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টিবাদের প্রভাব ছিল। 'অসঙ্গম, অস্পর্শম, অরূপম, অব্যয়ম' বলে উপনিষদ ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের কোনো তারতম্য নেই। বুদ্ধদেবের মতে জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড অনাত্মক। তাতে আত্মার প্রশ্ন নেই। সহজবাদ কিন্তু একেবারেই স্বতন্ত্র জিনিস। লালন ফকিরের একটি গানে এই সহজবাদের প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন—

> 'সুখ পা'লে হও সুখভোলা,
> ও মন দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা।'...

এই ভাবটিকেই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্র বাগচী দেখিয়েছেন—'সুখ বা দুঃখে চিত্তের কোনো পরিবর্তন হবে না—বাস্তব জগতের কোনো আঘাতেই মন চঞ্চল হবে না—এই উদাস অবস্থাই হচ্ছে সহজ অবস্থা। বৌদ্ধ সহজ মানে সিদ্ধারা বলেছেন —সহজে ভাব-অভাব নাই, পাপ-পুণ্য নাই, রাগ-বিরাগ নাই, সহজ স্বভাবতঃই নির্মল।

কিন্তু এই সহজবাদের পথ গুরু ভিন্ন নিরাপদ নয়। এই গুরুকে বাউলেরা আখ্যা দিয়েছেন 'সাঁই' বলে। 'মুর্শীদা' আর 'মারফতি' গান বাউলেরই দুটি বিশেষ স্তর। বৌদ্ধধর্মজাত গুরুবাদের প্রভাব পারস্যে এবং সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই বৌদ্ধ গুরুবাদের সঙ্গে সুফী গুরুবাদের মিলন ঘটেছিল ভারতবর্ষে। মুসলমান সুফীরা এবং বৌদ্ধ শ্রমণেরা একইভাবে গুরুকে শ্রদ্ধা করতেন। এই শূন্যবাদ, সহজবাদ ও গুরুবাদ মিলিয়ে তবেই বাউল তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অনেকে এই বাউলের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে বলেও অনুমান করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

> 'বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
> বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
> বাউলকে কহিও কানে নাহিক আউল।
> বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।'

এই সূত্র থেকে যদি বৈষ্ণবে ও বাউলে কিছু একটা সম্বন্ধ দাঁড় করানো যায়, তবে বোধ করি অনেকেরই আপত্তি থাকে না।

বাউলেরা সর্বত্রই কিন্তু তাঁদের নিজে-দের বাউল বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন—

> 'তাইতে বাউল হইনু ভাই,
> এখন লোকের বেদের ভেদ-বিভেদের
> আর তো দাবী-দাওয়া নাই।'

ভারতের শাস্ত্রীয় ভাববাদ ও লৌকিক-বাদের একত্র সমন্বয় ও বিস্তৃতি ঘটেছে এই বাউলে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় সর্ব-প্রথম বাউলের জন্ম। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁদের আধিক্য বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এক সময় মহাপ্রভুও যে এই বাউলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই বাউলদের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন বলেছেন ঃ 'পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণব কাঠামোর উপর চুনকাম করিয়া বাউল সাজিয়াছে, পূর্ববঙ্গে ইসলাম কাঠামোর উপর রং দিয়া ফকির সাজিয়াছে; পূর্ব-বঙ্গের বে-সরা ফকির এবং পশ্চিমবঙ্গের বাউল এক আধ্যাত্মিক মিরাসের উত্তরাধি-কারী।'

সাধারণতঃ স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যে বাউলের প্রাধান্য দেখা গেলেও কালক্রমে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বাউলের প্রাণরস বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বাংলা-সংগীতের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে এই বাউল। সমস্ত শ্রেণী থেকে তাঁরা একেবারেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। অনেকটা আপনভোলা বা উদাসী বলে লোকে তাঁদের বাতুল বলে মনে করে। কিন্তু আসলে তাঁরা তা নন। বাউল ভিন্ন তাঁদের কোনো স্বতন্ত্র জাত নেই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্র-দায়কে মিলে গড়ে উঠেছে এই বাউল সম্প্রদায়। তা বলে তাঁদের মধ্যে কোনো

রেশারেশি নেই, বরং হিন্দু-মুসলমান মিলনের তাঁরা উদ্গাতা।

বাংলার বাউল সাধকদের অন্যতম বাউল লালন ফকির। বাউল সাম্রাজ্যের রাজা তিনি। জাতিতে লালন কায়স্থবংশজাত হিন্দু ছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা চালিত না হয়ে তিনি মননবিদ্যার দ্বারা সাধনমার্গে পৌঁছান। মুখে মুখে লালন বহু সহস্র গান রচনা করে গেছেন। তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে সে-সব গান এখনও মানুষের মুখে মুখে চলে আসচে।

প্রথম জীবনে লালন হিন্দু পরিবারেই বিবাহ করেন, কিন্তু কোনো সন্তানাদি হয় না। একদা অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে নৌকোয় তিনি বহরমপুর অঞ্চলে গঙ্গাস্নানে যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তখনও এখানে রেলগাড়ীর প্রচলন হয়নি। ফিরতিপথে লালন কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হ'য়ে বেহুঁস হ'য়ে পড়ায় তাঁকে মৃতজ্ঞানে বন্ধুরা গঙ্গায় অন্তর্জলি ক'রে রেখে আসে। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। ক্রমে লালন জ্ঞান ফিরে পান এবং স্থানীয় এক নিঃসন্তান জোলাদম্পতির দ্বারা জীবন ফিরে পেয়ে যশোহরের বিখ্যাত ফকির সিরাজ সাঁই-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ক্রমে সেঁউড়িয়া গ্রামে এসে আখড়া স্থাপন ক'রে সেখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। বাউল-সাধনার পথে তিনি নতুন ক'রে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন একটি মুসলমান রমণীকে। লালনের জীবন যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি নাটকীয়। বাংলার সঙ্গীতসংস্কৃতির উপর তিনি যে প্রভাব রেখে যান, তা অসামান্য। যে উচ্চমানের দার্শনিকতা ও অনন্য ভাবময় আধ্যাত্মিকতায় তাঁর গানগুলি সমৃদ্ধ, তা অন্যত্র দুর্লভ। তাঁর সার্থক উত্তরাধিকার যদি কারুর মধ্যে পেতে হয়, তবে তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই।

রাজা রামমোহন রায় ও লালন ফকির একই বছরে ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক একশো ষোল বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি লোকান্তরিত হ'লে কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতকরী' সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন—

'লালন ফকিরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চল কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রংপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য। শুনিতে পাই—তাঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর, ইঁহাকে আমরা সচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি, কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেঁউড়িয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে।...শিষ্যগণের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন... তিনি কোনো শাস্ত্র পড়েন নাই, কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকির নিজে কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া, হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে....ইনি নামাজ পড়িতেন না, সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে....কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনার কথা ইঁহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। ...প্রকাশ, লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার কোনো আত্মীয় জীবিত নাই। তিনি অশ্বারোহণে করিতে দক্ষ ছিলেন, এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন।...'

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ ঘটে এবং প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে লালন ফকিরের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং উত্তরকালে লেখেন : 'বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি, বাউল সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকালের আধুনিক। ...শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'তো। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি।'

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন : 'লালন ফকির অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী পাঠে স্বতঃই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়। সহজ সরল ভাষার মধ্যে কি অপরূপ ভাব ও সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি জটিল ও নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জলভাবে ও সরল ভাষায় তাঁহার রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মরমীয়াবাদ তাঁহার চিত্তে প্রয়াগ-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে।...মিসেস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ার নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের শিলাইদহ অবস্থানকালে লালন প্রায়ই তাঁহাদের বোটে আসিতেন। তিনি প্রায়ই তাঁহাদিগকে গান শুনাইতেন।'

তাঁর সম্পাদিত লোকসঙ্গীতসংগ্রহ 'হারামণি' গ্রন্থে লালনের কিছু গান সন্নিবেশিত হ'য়েছে।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা কালেক্টার ছিলেন, তখন তিনি লাল[illegible] সম্পর্কিত বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। কুষ্ঠিয়ার প্রাক্তন মুন্সেফ ডক্টর মতিলাল দাশ[illegible] লালনের বহু গান সংগ্রহ ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন। এসম্পর্কে তিনি বলেন 'আমি যখন কুষ্টিয়ায় মুন্সেফ ছিলাম, তখ[illegible] শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের সহযোগিতায় সেঁউড়িয়া গ্রামের লাল[illegible] ফকিরের আখড়া থেকে লালন ফকিরের গানগুলি সংগ্রহ করি। ওইটিই সর্বাধিক সংগ্র[illegible] —৩৭১টি গান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যাল[illegible] আমার সংগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগ্র[illegible] মিলিয়ে লালনগীতিকা নামে একখানি চমৎক[illegible] বই বার ক'রেছেন। লালনের নাম আ[illegible] শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হ'লেও খুব ক[illegible] লোকেই এই রসময় সঙ্গীতগুলির রসাস্বাদ[illegible] ক'রেছেন। লালন ফকির এবং বাউলে[illegible] মানব-দেহকে দেবতার মন্দির ব'লে ম[illegible] করতেন, এই দেহ-দেউলে বাস করেন মানুষে[illegible] মনের মানুষ, সেই আত্মার উপলব্ধিই মান[illegible] জীবনের চরম কাম্য।'

একদা আমি লালন ফকিরের ভি[illegible] দর্শন ক'রে এই মহান সাধক সম্পর্কে জান[illegible] জন্য আগ্রহী হই। কার কাছ থেকে [illegible] ভাবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী জ[illegible] যায়, সে সম্পর্কে আমি অনুসন্ধানে প্রব[illegible] হই। বাংলার বাউল সম্প্রদায় সম্পর্কে লি[illegible] পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, ড[illegible] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার [illegible] প্রভৃতির রচনাবলী থেকে বহু তথ্য সং[illegible] করা গেলেও এমন বহু ঘটনা অনুদ্ঘা[illegible] থেকে গেল—যা উদ্ধার করতে না পারা পর্য[illegible] লালন-জীবনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম[illegible] নয়। আমি সেই উদ্ধারকার্যে ব্রতী হ[illegible] বিভিন্ন বাউল ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্যে আ[illegible] দীর্ঘকাল কাটালাম। অবশেষে মনে হ'লে[illegible] মণি-উদ্ধার হ'য়েছে। তাকে 'বাউলরা[illegible] নামে উপন্যাসাকারে রূপ দিতে গিয়ে শ্রী[illegible] অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী লীলা রা[illegible] সঙ্গে একদিন আমি আলোচনায় বসি। ঠা[illegible] পরিবার তাঁদের শিলাইদহের জমিদারী থে[illegible] কিছু জমি যে লালন ফকিরের আখড়ার [illegible] দান করেছিলেন, কুষ্টিয়ার কালেক্টার থ[illegible] কালে অন্নদাশঙ্কর তার জরিপ পরীক্ষা ক[illegible] ছিলেন ব'লে শ্রীমতী রায় আমাকে জান[illegible] আজ সেসব অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তা[illegible] অন্তর্গত। যে হিন্দু-মুসলমান [illegible] সাধনাকে লালন তাঁর জীবনের মহান [illegible] হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ব্রতের নি[illegible] সিদ্ধ ধারাটি পূর্বপাকিস্তানের ভৌগো[illegible] সীমায় অবলুপ্ত হ'য়ে এলেও বৃহত্তর ব[illegible] মানসক্ষেত্র থেকে যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যা[illegible] এইটেই আশার কথা।।

ডালহ্রদের ইতিকথা

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপ। আমাদের হাউস-বোটের সঙ্গে বাঁধা ছিল সেটি। একদিন ভোরে উঠে দেখি, সে দ্বীপ নেই।

অবাক লাগল। ভাবলাম, দ্বীপটি গেল কোথায়!

খোঁজাখুঁজি শুরু হল তখুনি। খানিক পরেই দেখি, সে দ্বীপ অনেকটা দূরে সরে গিয়ে অন্য এক হাউস-বোটের গায়ে লেগে আছে।

বোটের মালিক বুঝিয়ে দিল, বাঁধন আলগা ছিল নিশ্চয়। দ্বীপটি তাই ভেসে ভেসে দূরে সরে গেছে।

এই হল ডাল-হ্রদ। এমন ভাসমান দ্বীপ সে হ্রদে অনেক আছে। দ্বীপ ওখানে হামেশাই হারিয়ে যায়।

মনে পড়ে, সেই দ্বীপ-হারানো হ্রদের কথা। এগোচ্ছি ভূস্বর্গের রাজপথ ধরে। দূর-দিগন্তে বরফে-ঢাকা পাহাড় চোখে পড়ছে। আর সামনেই সবুজের সমারোহ। রাজধানী শ্রীনগর রঙ ধরেছে।

লোকে-লোকারণ্য রাজপথ। বসন্ত এল। শহর জুড়ে তাই মাতামাতি। প্রকৃতিও মেতেছে। পপলার বনে সবুজের বন্যা। চেরী ফলের গাছগুলো রসের ভারে আনত। শহরের ফুলবাগিচায় রঙ-রসের মহোৎসব। অভ্যর্থনার রাজকীয় আয়োজন সর্বত্র।

দেখতে দেখতে খানিকটা পথ পেরিয়ে এলাম। শ্রীনগরের পথ আর সব পাহাড়ী শহরের মত উঁচু-নীচু নয়। বরং সমতল। সে পথ ধরে চলতে দুশ্চিন্তা নেই কিছু, গাড়ী খাদে গড়িয়ে পড়বার ভয় নেই। সমভূমির পথের মতই তার চেহারা। অথচ দাঁড়িয়ে আছি সমুদ্রতল থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। শীত লাগছে।

দেখতে দেখতে ডাল-গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। ইতিহাস বলে, আফগানরা এই গেট নির্মাণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ডাল-হ্রদে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ।

ডাল-গেট পেরোতেই দেখি, সৌন্দর্যের এক রঙমহল। আমাদের ঠিক সামনেই ডাল-হ্রদ। ক্ষীণ থেকে ধীরে ধীরে স্থূলকায় হয়ে সে হ্রদ দূরের পাহাড়ের গায়ে মিশে গেছে। হ্রদের পূব দিক বরাবর পাঁচ-ঢালা বাঁধান পথ। যত এগোচ্ছি সে পথ ধরে, হ্রদটিকে ততই প্রশস্ত মনে হচ্ছে। ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে টলটলে নীল জল। হ্রদের পশ্চিম তীরে সারি সারি হাউস-বোট নজরে পড়ছে। চলমান শিকারার সংখ্যা বাড়ছে ক্রমেই। ক্রমেই হ্রদের জলে পপলার গাছগুলোর প্রতিবিম্ব কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে যাচ্ছে। খানিক আগেই একটি শান-বাঁধান ঘাট পেরিয়ে এলাম। অনেক শিকারা জড়ো হয়েছে সেখানে। শুরু হয়েছে অনেক লোকের আনাগোনা। শিকারায় উঠছে কেউ, কেউ নামছে। উঠে বেড়াবার আহ্বান আসছিল ওখান থেকে। মন চাইছিল ওই শিকারায় করে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু টাঙা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর একটা ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। ওখানেও নামলাম না আমরা। ডাল-হ্রদের গা ঘেঁষে সোজা এগিয়ে গেলাম। আমাদের ডান পাশে পড়ল সারি সারি হোটেল। কিন্তু এত গাছ ওখানে, এত ঘন পুষ্পোদ্যান যে হোটেলের সামনে নামগুলো যদি লেখা না থাকত তো কোনমতেই টের পেতাম না ওদের অস্তিত্বের কথা।

দেখতে দেখতে আরও খানিকটা পথ পেরিয়ে এলাম। সোজা পথ। ঝকঝকে-তকতকে। গাড়ী-ঘোড়ার ভীড় নেই। লোক-জনও অল্প। টাঙা থেকে নামলাম এইবার। পছন্দসই একটি হাউসবোট খুঁজে বের করব বলে শিকারায় উঠলাম। ডাল-হ্রদে মুক্তো রঝছে তখন। জলে রাশি রাশি মুক্তার ঝালর চোখে পড়ছে। সূর্যের আশীর্বাদ উপচে পড়ছে হ্রদে। রৌদ্রস্নান করায় দূরের পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে শুচিশুভ্র।

আমাদের ঠিক সামনেই ঝকঝকে আর একটি পর্বতশ্রেণী। পর্বতটি হ্রদ থেকে উঠেছে, না হ্রদ গিয়ে স্পর্শ করেছে পর্বতকে, প্রথম দর্শনে তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে এটুকু বোঝা যায়, ডাল-হ্রদ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। কাছের এই টলটলে জল, সামনের ওই পর্বত, আর দূরের ওই গিরিশ্রেণী; এই সব কিছুকে মিলিয়ে তার সম্পূর্ণতা। কারণ, এই যে হ্রদের তলদেশে পাহাড় চোখে পড়ছে, ঘন ঘন কাঁপছে সে পাহাড়, সামনের ওই পাহাড়-গুলো না থাকলে এ দৃশ্য আমরা কোথায় পেতাম! দূরের ওই তুষারাচ্ছন্ন ধবধবে গিরিশ্রেণী না থাকত যদি, তবে যে কাছের এই গাঢ় নীল জল ও দূরের ওই ঘন নীল আকাশ দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠতাম।

এদিকে ভাল একটি হাউস-বোটে আশ্রয় পেলাম। অতি সুন্দর সে বোট। তার সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম, ডাইনিং হল ও বেড রুম দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

এইখানে আর একটি হাউস-বোটের কথা মনে পড়ছে। সে বোটের মালিক গোলাম রসুল। বোটের নাম 'আলজিরা'। রসুল সাহেব তার 'আলজিরা'কে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়েছেন। শরৎকালেও বাহারী ফুলের সমারোহ দেখেছিলাম সেখানে। দেখে মনে হয়েছিল, বসন্তে এ বোট হয়ত ফুলের তলায় সমাধিস্থ থাকে। ফুল সরিয়ে ঢুকতে হয় তার ড্রইং-রুমে। ফুল মাড়িয়ে তার ডাইনিং-হলে যেতে হয়। আর বেড-রুমে বেড নামক সে বস্তুটি থাকে, তা নিশ্চয়ই ফুলের।

কথাগুলো অতিরঞ্জিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বসন্তের কাশ্মীরকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, ফুল নিয়ে বিলাসিতার যদি কোন জায়গা থাকে তো এই রমণীয় উপত্যকা। এমন দিনে এমন জায়গায় ফুলবিলাসী কোন মানুষ তার অভ্যর্থনার নিকেতনটিকে ফুলে-ফুলে ভরিয়ে রাখলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বসন্তের কাশ্মীরে ফুলের মহোৎসব দেখেছি। দেখেছি ডাল-হ্রদে রাশি রাশি ফুল-ভরা শিকারা। ডাল-হ্রদে ফুল ফোটে না বড়একটা। কিন্তু অজস্র ফুল দিয়ে ঋতুরাজ বসন্তের সম্বর্ধনার আয়োজন ওখানেই হয়। ভূস্বর্গের নানা জায়গা থেকে ফুল আসে; শিকারায় ভরা হয়। তারপর সেই ফুল-ভরা শিকারা এগিয়ে যায় হাউস-বোটগুলোর দিকে। বোটের মালিকরা খুশী হয়। ফুল কিনে বোটকে সাজায়। পর্যটকরা হয় স্তম্ভিত। এত বিচিত্র ফুলের এমন অকৃপণ সমারোহ এরা জীবনে দেখে নি।

কিন্তু ফুলের চেয়েও সুন্দর ফুল-ওয়ালীরা। শিকারায় ফুল তুলে নিয়ে ওরা যখন হ্রদের জলের উপর নিয়ে তর-তর করে এগিয়ে চলে, তখন ফুলের দিকে নয়, ওদের দিকেই চোখ পড়ে সকলের। অথচ ওরা নির্বিকার। রূপসাগরে ঢেউ তোলাই ওদের কাজ। সে ঢেউ গিয়ে কাকে আঘাত করল, তা দেখবার সময় নেই কারও।

শরতের কাশ্মীর মেঘমুক্ত। কিন্তু ফুল-ওয়ালীরা অদৃশ্য এক মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে তখন। কদাচিৎ তখনও হয়ত ওদের দেখা যায়। কিন্তু সে দেখা বসন্তের মত রাজকীয় নয়।

তাই বলে একথা বলা চলে না যে, শরতের ডাল-হ্রদে রূপের অভাব আছে। বরং বলা যায়, বসন্তের অনেক গয়না ফেলে দিয়ে হ্রদ তখন থাকে পরিমিত অলঙ্কারে ভূষিতা। ভাসমান উদ্যানগুলো শুকিয়ে যায় তখন। সে কারণেই ওরা যে ভাসমান দ্বীপ, সেটা স্পষ্ট নজরে পড়ে। ওদিকে পপলার বন পাতা ঝরায়। ওদের রুক্ষ পান্ডুর সৌন্দর্য ডাল-হ্রদের কমনীয়তায় বৈচিত্র্য আনে। আর বৈচিত্র্য আনে রকমারি ফল। ভূস্বর্গে শরৎকালে আপেল-আঙুর-কমলালেবুর ঋতু। ডাল-হ্রদও রঙের অভাবটা তখন রস দিয়ে পুষিয়ে নেয়। বসন্তের যে শিকারায় ফুল উঠত, শরৎকালে সেখানে আপেল চোখে পড়ে, আপেল বিক্রী করে বেড়ায় ওস্তাদ ফেরীওয়ালারা। একটু অসতর্ক হলেই ওদের কাছে আপনাকে হয়ত ঠকতে হবে।

ফুলওয়ালীদের অনেকেই কোথায় যায় তখন? লোকে বলে, ঘরে। ঘরে বসে ওরা তখন শীতের জন্যে শুকনো খাবার মজুত করে।

কাশ্মীরীদের সবাই শীতকে ভয় পায়। বড় ভীষণ সে শীত। ডাল-হ্রদ তখন জমাট বরফে আচ্ছন্ন থাকে। হ্রদের টলটলে জল জমে কঠিন হয়ে যায়। যেখানে শিকারা চলত, সাঁতার কাটত সৌখীন পর্যটকরা, সেখানে তখন বাই-সাইকেল চলে, পায়ে হেঁটে হ্রদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে অনেকে। দূরের আর কাছের পাহাড়-গুলোতে সবুজের চিহ্ন থাকে না, পপলার

গাছের পাতায়, হাউস-বোটের ছাদে বরফ বাসা বাঁধে। ভাসমান দ্বীপগুলোকে তখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। হ্রদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় সব। হ্রদের, পথের, পাহাড়ের একটিই আবরণ চোখে পড়ে শুধু। সে আবরণ ধবধবে সাদা তুষার দিয়ে গড়া। তুষার-ঝড় বইতে থাকে যখন, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া কাশ্মীরীদের গায়ে তখন ছুঁচ ফোটায়। যখন বরফ পড়ে, শুভ্র আবরণটি দেখতে দেখতে পুরু হয়ে ওঠে। কখনও আবার চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। অতি কাছের জিনিসও চোখে পড়ে না আর। জোয়ান কাশ্মীরীরাও তখন পা টিপে টিপে চলে। কদাচিৎ কখনও সূর্য চোখে পড়ে। কিন্তু সে সূর্য মুমূর্ষু। ডাল-হ্রদের বরফ গলবার মত কিরণ তা থেকে আসে না।

গোলাম রসুল বলেছিল, শীত কেমন করে ধীরে ধীরে এসে ওদের ঘিরে ধরে। ডাল-হ্রদে শীতের আসর জমে ওঠে কেমন করে। অনেক কথা বলেছিল গোলাম রসুল। সে সব আজ আর মনে নেই। তবে ডাল-হ্রদে শীত আসবার বর্ণনা আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে, ইংরেজী হিন্দী আর উর্দু মিশিয়ে আশ্চর্য এক বর্ণনা দিয়েছিল সে। বলেছিল, শীত প্রথমে চোরের মত চুপি চুপি আসে। অনেক দূরের ওই উঁচু পাহাড়গুলোতে বরফ পড়তে শুরু করে প্রথমে। তারপর কাছের সব পাহাড়ের শীর্ষ জমাট তুষারে সাদা হয়ে যায়। কনকনে হিমেল হাওয়া বয়। কুয়াশার দাপট বাড়তে থাকে। ডাল-হ্রদের জল ফ্যাকাশে রঙ ধরে। ক্ষণে ক্ষণে আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ চোখে পড়ে। তার পরেই হঠাৎ এক ভোরে উঠে সবাই দেখে, হ্রদের বুকে কে যেন পেঁজা তুলো ছড়িয়ে দিয়েছে। চারিদিক সাদা পাতলা তুষারে ঢেকে গেছে। এইভাবে আসি আসি করে হঠাৎ এক রাত্রে চোরের মত শীত আসে এখানে। দেখতে দেখতে চোর নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। প্রায় রাত্রেই আবির্ভাব ঘটে তার। তারপর দিনেও। শীতের আসর জমে ওঠে এইবার। চোর এইবার ডাকুর রূপ নেয়। চোখের সামনেই তাণ্ডব শুরু করে সে। তারপর যখন তুষার-ঝঞ্ঝা শুরু হয়, যখন ডাল-হ্রদের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে, ডাকু তখন খুনী হয়ে ওঠে। অকারণে নিরীহ মানুষের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে উদ্যত হয় সে। কিন্তু হলে হবে কি! মাথার উপরে আছেন ভগবান। খুনীকে শাস্তি দেবেন বলে তৎপর হন তিনি। সূর্যকে পাঠান বিচারক সাজিয়ে। অদ্ভুত সে বিচারকের ক্ষমতা। তার ইঙ্গিতে জমাট বরফ গলে জল হয়ে যায়। কিন্তু সহজে দস্যুবৃত্তি ছাড়তে চায় না খুনী। বিচার শুরু হবার পরেও ডাকুর বেশ ধরে যখন-তখন আগমন ঘটে তার। সুযোগ পেলেই চারিদিক সে বরফে আচ্ছন্ন করে দেয়। কিন্তু ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে তার শক্তি। খুনে-স্বরূপটি ছেড়ে দিয়ে সে তখন চোরের মত ওই সব দূরের পাহাড়ে লুকিয়ে থাকে: রাগ পুষে রাখে মনে মনে। সামনের বছর আবার কীভাবে আসবে, তারই ফন্দী-ফিকির খোঁজে।

এ গল্প শুনেছিলাম হাউসবোটের মালিক গোলাম রসুলের কাছ থেকে। রসুল শুনেছিল স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে। মাস্টারমশাই আবার অপর কারও কাছ থেকে শুনেছেন নিশ্চয়। নিশ্চয় এমন করেই শীতের গল্প ছড়িয়ে পড়েছে ভূস্বর্গের আনাচে-কানাচে,—উপত্যকায়, মাল-ভূমিতে, হ্রদে।

বসন্তে গল্প বলার সময় নেই এত। তখন গল্প করতেই সবাই ব্যস্ত। খুশীর জোয়ার আসে তখন। তখন নাচে-গানে, গল্পে-গুজবে ডাল-হ্রদ মশগুল। নৌকা-বাইচ, ঋতু-উৎসব, নাচ-গানের জলসা—সব এই বসন্তকালে।

কী গান, কী গান, গাইতে পারে কাশ্মীরীরা। বসন্তে দেখেছি, কারণে-অকারণে গান গায় ওরা। পথে চলতে চলতে, মাঠে ঘুরতে ঘুরতে, উপত্যকায় হ্রদে শিকারায়, সর্বত্র গান শোনা যায় ওদের। সারা কাশ্মীর তখন গান গেয়ে ওঠে। আর ডাল-হ্রদ জলসা-ঘরের রূপ ধরে। ওস্তাদ গাইয়েরা আসেন। নেহরু-পার্কে আসর বসে। গান চলে অনেক রাত অবধি। সেই সঙ্গে নাচও। বসন্তের মজলিসে দেখতে দেখতে সারা হ্রদ মুখর হয়ে ওঠে।

পর্যটকদের মাতামাতি প্রধানত দিনের আলোতে। ভোর হতে না হতেই শিকারার চলাচল শুরু হয়। মুঘল-উদ্যান দেখতে চলেছেন কেউ। কেউ চলেছেন প্রতিবেশী হ্রদ নাগিনে। ডাল-গেট পেরিয়ে ঝিলমে যাবেন কেউ। কেউ আবার দূরে কোথাও না গিয়ে ডাল-হ্রদের বুকেই ঘুরে বেড়াবেন। আনন্দ করবার এবং সেই সঙ্গে আনন্দকে ধরে রাখবার বিচিত্র সব উপকরণ এদের সঙ্গে। ট্রানজিস্টার রেডিও সঙ্গে নিয়েছেন কেউ। কেউ নিয়েছেন টেপ-রেকর্ডার। ক্যামেরা প্রায় সকলের হাতেই আছে: এ ছাড়া মুভিও আছে কারও কারও সঙ্গে। আনন্দ-উপভোগের ক্ষেত্রে অনেকে আবার প্রাকৃত-পন্থায় বিশ্বাসী। শিকারায় হাত-পা এলিয়ে দিয়ে গান ধরেছেন। কেউ আবার হাতে বৈঠা নিয়ে নিজেই দাঁড় টানছেন। শিকারার এক প্রান্তে বসে হ্রদের জলে দু পা ডুবিয়ে দিয়েছেন কেউ। কেউ আবার খানা-পিনায় ব্যস্ত। কলহাস্য ভেসে আসছে কোন কোন শিকারা থেকে। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী সবাই মিলে হৈ-হুল্লোড় শুরু করেছেন।

বিকেলের ডাল-হ্রদে প্রসাধনের ধুম লাগে। সেজেগুজে, রমণীয় বেশ-বাসে জল-বিহারে বেরোয় সব। কখনও আবার পাশা-পাশি দুটি শিকারার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়! কে কাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে, তাই নিয়ে বাধে তুমুল রেষারেষি। ডাল-হ্রদে থাকতে এমন কত যে 'আন অফিসিয়াল' প্রতিযোগিতা দেখেছি, সীমাসংখ্যা নেই তার। বসন্তে দেখেছি, আবার দেখেছি শরতেও। শরতে ভীড় অনেক কম: এবং সে কারণেই শান্ত বেশি। কিন্তু বসন্তের ডাল-হ্রদ অশান্ত, আনন্দে-উৎসবে মাতোয়ারা। সেই আনন্দ-পাগল উৎসব-মাতাল মানুষগুলোর দিকে তাকালে সংসারে দুঃখ নামক যে একটি বস্তু আছে, সে কথা ভুলে যেতে হয়।

মনে হয়, শুধুমাত্র আনন্দই বুঝি সত্য, শুধু আনন্দ, শুধু উল্লাস। দুঃখ নেই সংসারে, শোক নেই; তাপ নেই—বেদনা-বিরহ কিছুই নেই। আছে শুধু অবিমিশ্র উল্লাস, অফুরন্ত আনন্দ আর অনির্বাণ সুখ-ঐশ্বর্য।

রাত্রিতে অন্য এক চেহারা ডাল-হ্রদের। অপরাহ্নের আলোকে যা ছিল উল্লসিত, সন্ধ্যায় আঁধারে তা যেন ক্রমেই উদাসী হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে আশ্চর্য এক শান্ত বিষণ্ণতা নেমে আসে হ্রদের বুকে। অনেক দূরে হাউস-বোটের আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলে, সামনের পাহাড়টাকে মায়াময় মনে হয়, আর হ্রদের জল হয়ে ওঠে নিকষ-কালো। অদ্ভুত সেই কালিমা। সেদিকে তাকালে নিজের মনের দৈন্যকে খুঁজে পাওয়া যায় যেন। যা পাই নি, পেয়ে হারিয়েছি যাকে, সব কিছুকেই খুঁজে পাওয়া যায়। একবার মনে হয়েছে আশ্চর্য, আশ্চর্য এই হ্রদ। দিনের আলোয় ভূস্বর্গের বন-পাহাড় প্রতিফলিত হ[illegible] এখানে। আর রাত্রিতে প্রতিফলিত [illegible] মানুষের মন। সে মন বড় বিচিত্র, সে মন বড় অদ্ভুত। সে বলেছে, আঁধার নয় আলোক চাই। সে আলোকে রূপের [illegible] দেখতে চাই। দুঃখ নয়, সুখ চাই সে সুখের সাগরে রঙে-রসে মজে থাকতে চাই। আরও রূপ, আরও রস চাই। আরও আরও। চাই অনেক। অথচ নিজেদের [illegible] ও আকিঞ্চনের কথা মনে পড়লে [illegible] ভিতর থেকেই দুর্বল হয়ে আছি। কিন্তু তবু মন মানে না। আনন্দসাগরে [illegible] ভাসাই আবার। আবার অপেক্ষা করে থাকি অপরাহ্নের ডাল-হ্রদে অফুরন্ত আনন্দ [illegible] অনির্বাণ সুখ-ঐশ্বর্যকে দেখব বলে; [illegible] হ্রদকে দেখি। রূপতীর্থের রঙ-বদল দেখি সন্ধ্যা-সকাল ভরে। দেখি পর্যটক [illegible] স্থানীয় অধিবাসীদের, বসন্তের কোলাহলে [illegible] না দেখি, শরতের স্তব্ধতায় দেখি [illegible] চেয়েও বেশি। কী বিচিত্র জীবনলীলা [illegible] এই হ্রদটিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, [illegible] দেখে বিস্মিত হই। সবচেয়ে অবাক [illegible] স্থানীয় কাশ্মীরীদের দেখে। অদ্ভুত সর[illegible] নয় ওরা। জীবনে ওদের খুব একটা উচ্চাশা নেই। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে [illegible] নির্বিকার।

অনেককে বলতে শুনেছি, কাশ্মীরী খুব চতুর। টুরিস্টদের ঠকাবার নানারকম ফিকির খোঁজে ওরা। কথাটা যে একেবারে মিথ্যে, তা বলব না। তাই বলে এমন কথা বলব না দু-চারজন চতুর ও ফন্দীবাজ হাউস-বোটওয়ালা, টাঙাওয়ালা বা [illegible] বিক্রেতার বাইরের প্রকৃতিটা দেখেই আসল কাশ্মীরীদের চেনা যায়। কাশ্মীরীদের চিনতে হলে ওখানকার স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশতে হবে আপনাকে। যাদের সঙ্গে বিকিকিনি বা কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই মিশতে হবে এমন কারও কারও সঙ্গে। যদি মেশেন তো দেখবেন, সুন্দর ও ডাল-হ্রদের জলের মতই ওদের মনটা স্বচ্ছ। ঠকাবার ফিকির খোঁজে না ওরা বরং সবাইকে আপন ভেবে গ্রহণ করতে গিয়ে ওরা নিজেরা ঠকে।

এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম গোলাম আব্বাস। ডাল-হ্রদের এক পাশে একটি পল্লীতে সে থাকে। কাঠের জিনিস-পত্রের ব্যবসা তার। ঘর সাজাবার উপযোগী হাউস-বোট, শিকারা, বুক-স্ট্যাণ্ড, পাখি ইত্যাদি সে তৈরি করে। তার কাছে শুনেছি, একবার এক শেঠের সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে কেমন করে সে সর্বস্বান্ত হয়েছিল।

এইখানে মহম্মদ আফজলের কথা মনে পড়ছে। এক সময়ে বেশ সঙ্গতিবান ছিল সে। প্রথম শ্রেণীর একটি হাউসবোট ছিল তার। আর ছিল তার একমাত্র মেয়ে ফৈজী। একবার এক ট্যুরিস্টবাবুর মনে ধরল ওই মেয়েকে। আফজল বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ট্যুরিস্টটি সেই বাধার জবাব দিয়েছিল বোটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে। তারপর থেকে আফজলের সম্বল একটি শিকারা। ডাল-হ্রদে ওই ভগ্নপ্রায়, মুমূর্ষু ও আদিম জলযানটি চালিয়ে কোনোরকমে সংসার চালায় সে। এই ঘটনার পর ষোল বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু একবার বদনাম রটে যাওয়ায় ফৈজীর আর সাদি হয়নি। আফজল দুঃখ করে বলেছিল, পরদেশী আপনা ছেরমে চলি গেই হুজৌর, লেকিন মেরা লড়কী আপনা ঘর মে হো গেই পরদেশী।

একদিন দেখেছি ওই ফৈজীকে। ডাল-হ্রদের উপরেই জীর্ণ এক কুটিরে সে থাকে। সে-কুটির হ্রদের এক পাশে। বুনো ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা খানিকটা জলপথ পেরিয়ে ওখানে যেতে হয়। মনে পড়ে, আফজলের শিকারায় চেপে একদিন ওখানে গিয়েছি। দেখেছি, দরিদ্র আরও অনেক কাশ্মীরীর বাস ওখানে। গরীবরা ওখানে ছোটখাটো কয়েকটি পল্লী গড়ে তুলেছে। পল্লীগুলো নোংরা, স্যাঁৎসেতে। জরাজীর্ণ কুটির-গুলোকে দেখলে করুণা হয়। মনে হয়, একটিমাত্র হাউসবোটে যে ঐশ্বর্য আছে, তার অর্ধেক খরচ করলেও এদের এই একটি পল্লীর সবগুলো কুটিরকে কেনা যায়। আর বিস্ময় লাগে ভাবতে। যে ডাল-হ্রদের সামনে এত ঐশ্বর্য, তার ঠিক পিছনেই এত দারিদ্র্য! আলোর ঠিক নীচেই অন্ধকার থাকে জানি, কিন্তু সে-অন্ধকার যে এমন নিশ্ছিদ্র, তা জানতাম না। আর জানতাম না, এই ডাল-হ্রদেই ফৈজীর মতো এক হতভাগিনী থাকতে পারে। ডাল-হ্রদের তীরেই দেখেছিলাম তাকে। দেখেছিলাম ওইসব দরিদ্র পল্লীর কোনো একটিতে। এক অপরিচ্ছন্ন ঘাটে বসে কয়েকটি হাঁসকে খাবার দিচ্ছিল সে। আফজল বলেছিল, ও হ্যায় মেরী লড়কী।

দেখলাম, লড়কী নয়, বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া এক নারী। তার বাপের সঙ্গে এক আগন্তুককে আসতে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আফজল অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু কিছুতেই সে এল না। আফজল বলল, পরদেশী আদমীকো ও বহুৎ ডরতা হুজৌর।

বুঝলাম, ডরের আসল কারণটা কোথায়। হাউসবোটে আগুন ধরিয়েছিল যে, সে তার মনেও আগুন ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। আগুনকে আর কোনোদিন বিশ্বাস

করবে না ফৈজী। কোনোদিন আর কোনো পরদেশীর সামনে যাবে না।

আব্বাস, আফজল, ফৈজী—শরতের কাশ্মীরে দেখেছিলাম এদের। বসন্তে যখন এসেছিলাম, তখনও নিশ্চয় এরা ছিল। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ছিল নিশ্চয়। শরতে ভিড় কম। তাই তখন কাশ্মীরের মাটির যেমন, মানুষেরও তেমনি আসল চেহারাটা ধরা যায়। পর্যটকদের আনাগোনা কম থাকায় ডাল-হ্রদের জীবন-চিত্রও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয়, একটু কান পেতে দাঁড়াই যদি, একটু যদি একাগ্রচিত্তে প্রতীক্ষা করি, তবে হয়তো এখানকার এই জলে একসঙ্গে অনেক কলধ্বনি শুনতে পাবো। রূপলোলুপদের অনেক উষ্ণশ্বাস একসঙ্গে গায়ে লাগবে এসে। সুখনিদ্রায় বিভোর বেগমসাহেবার মুখ থেকে মদিরার উগ্র গন্ধ ভেসে আসবে। কামনার অনলে তপ্ত-হৃদয় শাহেনশাহের নিঃশ্বাস শুনতে পাবো ঘন ঘন। সহস্র পর্যটকের হাসি-আনন্দ, বিরহ-ব্যথা এসে একসঙ্গে স্পর্শ করবে। শতাব্দীর সুখ-দুঃখ কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকবে। সকলের অস্তিত্ব এক অখণ্ড অস্তিত্বের মধ্যে স্তব্ধ হবে। যুগ-যুগান্তর ধরে বিস্মৃতির রহস্য-রাজ্যের পথযাত্রী যারা, তাদের সকলে এসে একসঙ্গে বলবে, আমরা আছি। এই হ্রদের জলে-বাতাসে আছি আমরা। আছি এখানকার মাটিতে-পাথরে। শীতের আবির্ভাব-ক্ষণে পপলার আর চিনার গাছ পাতা ঝরিয়ে দিয়ে আমাদেরই বন্দনা করে। দারুণ শীতে ডাল-হ্রদ জমে গিয়ে সমবেদনা জানায় আমাদেরই। দূরের ওই পাহাড়-ছোঁয়া হিমেল হাওয়া সবাইকে এসে যখন চাবুক মারে, তখন ডাকু এল বলে ভয় পায় সবাই। কিন্তু সে-ডাকু যে আমাদের নিত্যসঙ্গী, চিরকালের মতো সে যে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, সে-খবর কেউ রাখে কি?

মনে বলে, রাখিনে। বাইরেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকি; ভিতরের খবর কখন রাখবো? বর্তমানের ভোগ-সুখের প্রাচীরটুকুই ডিঙিয়ে কখন নিরুদ্দেশ যাত্রা করবো অতীতের কান্না-হাসির দেশে? ভূস্বর্গ প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে রাখে আমাদের। রঙে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রসে মন ভরায়। রঙ-রসের এই আলোঝলমল সাগর পেরিয়ে আঁধার-ঘেরা বিস্মৃতির রাজ্যে কখন অভিযাত্রী হবো?

বর্তমানের পথ ধরে অভিসার আমাদের। বসন্তের ডাল-হ্রদ দেখে চঞ্চল হই আমরা। শরতের হ্রদ দেখে হই স্তব্ধ। এই বসন্ত আর এই শরৎকে উপেক্ষা করবো কেমন করে?

মনে পড়ে, বসন্ত-ঘেরা ডাল-হ্রদে দিনগুলো কেমন স্বপ্নের মতো কেটে গেছে। সারাক্ষণ ব্যস্ত আমরা। সন্ধ্যে-সকাল হ্রদের বুকে ঘুরে বেড়াই। চার-চিনার দ্বীপে যাই কখনও, কখনও নেহরু পার্কে বসি। মুঘল-উদ্যান দেখতে যাই কোনোদিন। কোনোদিন আবার কোথাও না গিয়ে হাউসবোটের ছাদে বসে গল্প করি।

ইতিহাস আর কিংবদন্তীর কত যে টুকরো উপাদান ছড়িয়ে আছে এই ডাল-হ্রদের আনাচে-কানাচে, পরিমাপ করতে পারিনি তার। ইতিহাসের খোলা পাতাগুলোকে সামনে দেখেও বুঝতে পারিনি, এদের পাঠোদ্ধার করলে অতীত যুগের শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি এবং প্রেম ও সৌন্দর্যসাধনার অনেক হারানো কাহিনী খুঁজে পাবো। আজ ঘরে বসে খোঁজ নিতে চাইছি সবকিছুর। তাই অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের খোলা পৃষ্ঠা দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু অনেক কথা মনে পড়ছে আজ। জোনাকির আলোকে আঁধারে পথ-চলার মতো ইতিহাসের আলোকে ডাল-হ্রদের ইতিকথার অনেকটা দূর অবধি অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হজরতবল মসজিদের কথা মনে পড়ে। মুসলমানদের ওই পবিত্র তীর্থটিকে ডাল-হ্রদের তীরে দেখেছি। ইতিহাসে বলে, আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছর আগে ওখানে তাকালে অন্য এক দৃশ্য দেখা যেত। মসজিদ ছিল না তখন। ছিল অতিসুন্দর এক ফুল-বাগিচা—মাদিক-আবাদ। ফুলবাগিচায় মসজিদ গড়া হল কালক্রমে। গড়লেন শাজাহান। হজরতবলের একটি মর্মরফলকে লেখা আছে, ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে শাজাহান নির্মাণ করেছিলেন এই মসজিদ। হজরত মহম্মদের চুল সযত্নে রক্ষিত আছে ওখানে। তবে মসজিদ গড়ার কাজ চুল আসবার অনেক আগেই পরিসমাপ্ত হয়। ইতিহাস বলে, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে মদিনা থেকে চুল আনা হয় বীজাপুরে। আনেন মহম্মদের কবর-পরিদর্শক সৈয়দ আবদুল্লা। আবদুল্লা এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই চুল বিক্রী করেন এক কাশ্মীরী সওদাগর খাজা নূরউদ্দীনের কাছে। নূরউদ্দীন চুল নিয়ে শ্রীনগরে ফিরে এলেন এবং পরে ডাল-হ্রদের তীরে গড়ে-ওঠা ওই সুন্দর মসজিদে তা রাখা হল। সেই থেকে মসজিদটিরও নাম হল হজরতবল। কাশ্মীরী ভাষায় 'বল' বলতে নদী বা হ্রদের তীরবর্তী এমন কোনো জায়গাকে বোঝায়, সেখান থেকে জলপথে সহজেই যাতায়াত করা চলে। অনেকে আবার মনে করেন, 'বল' শব্দটি বালের অপভ্রংশ। হিন্দী বা উর্দুতে 'বাল' বলতে চুলকে বোঝায়।

এসব হল ভাষাতাত্ত্বিক বিতর্ক। ইসলামধর্মীরা এদের নিয়ে মাথা ঘামান না বড়একটা। হজরতবল যে সারা কাশ্মীরের পবিত্রতম তীর্থ, এ-কথা অন্তর থেকেই ওরা বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করি আমরাও। আমরাও বলি, মুসলমানদের এমন মহান্ তীর্থ তামাম দুনিয়ায় খুব অল্পই আছে। খুব অল্প মসজিদই এমন বর্ণাঢ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে।

ডাল-হ্রদ ধরে জলপথে যাওয়া চলে ওখানে। আবার শ্রীনগর থেকে সরাসরি যাবারও ভাল রাস্তা আছে। আমরা হ্রদের পথেই গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, রূপের পাশে বসেই অরূপের অনুধ্যান করছে মানুষ। সুন্দরকে পাশে রেখে সত্যের সাধনা করছে।

যুগ যুগ ধরে এই সাধনা চলেছে না[...] পথে। ধর্মচর্চা করেছে কেউ। কেউ আব[...] জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানের অন্ধকার দূ[...] করতে চেয়েছে। প্রতিষ্ঠা করেছে জ্ঞানস[...] এই ডাল-হ্রদের তীরেই মাদ্রাসা গ[...] উঠেছে। গড়েছেন সুলতান হাসান শা[...] চকের জননী গুল খাতুন। অক্ষত থাক[...] আজ এই মাদ্রাসার বয়স হত প্রায় পাঁচ[...] বছর। সুলতান হাসান শাহ চক নিজে[...] মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হরি পর্বতের প[...] দিককার অংশে ডাল-হ্রদের মুখোমু[...] দাঁড়িয়ে ছিল ওই শিক্ষায়তন। মুঘল সম্র[...] আকবর এটিকে পরে অন্য কাজে লাগা[...] এখান থেকেই কাশ্মীরী প্রজাদের দশ[...] দিতেন তিনি। কালক্রমে এখানে এক[...] মন্দির গড়ে ওঠে। শ্রীনগরের এক সওদা[...] পণ্ডিত হর কাউল সে-মন্দিরের নির্মাত[...] হরি পর্বতের গায়ে আজও অনেকের চো[...] পড়ে এ-মন্দির।

এইভাবে ডাল-হ্রদকে ঘিরে কাশ্মী[...] ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, মন্দির-মসজি[...] অনেক কিছুর ইতিকথা প্রকীর্ণ। রা[...] বাদশাদের হাজার স্বপ্নের সাক্ষী ওই হ্র[...] কত প্রেম কত আনন্দের স্মৃতি এর এখা[...] সেখানে। আবার কত কাহিনী এর বিস্মৃ[...] অতলস্পর্শী অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গে[...] হব্বা খাতুনের কথা আজ আর কে ম[...] রাখে! বসন্তের ডাল-হ্রদে বসে আজ [...] ভাবে ইউসুফ শাহের বিবিজানের ক[...] অথচ ইতিহাস সাক্ষী, এই ডাল-হ্রদকে [...] হলে বিবিজানের চলত না। খোদা[...] ইউসুফ শাহকে সঙ্গে নিয়ে এই হ্রদের জ[...] তরী না ভাসালে মন ভরত না হ[...] খাতুনের।

গরীব ঘরের মেয়ে তিনি। কি[...] জন্মেছিলেন চাঁদের রূপ নিয়ে। ছন্দ[...] গ্রাম আলো করেছিলেন। শ্রীনগর থে[...] মাইল-দশেক দূরে ছিল ওই গ্রাম। [...] গ্রামের লোকেরা বলত, এ-মেয়ে মেয়ে [...] শাহজাদী। রাজধানীতে জাঁহাপনার [...] জন্ম নিতে গিয়ে ভুল করে এখানে এসে[...] আসমান থেকে চাঁদ নেমে এসেছে গরী[...] আঁধার ঘরে।

তাই অনেক সলা—পরামর্শের পর [...] মেয়ের নাম রাখা হল জুন অর্থাৎ চাঁ[...] যে দেখলে সে-ই বলল, হ্যাঁ, চাঁদই ব[...] ঠিক সেইরকম মিঠে জেল্লা। হুবহু [...] তেমনি খুবসুরৎ।

কিন্তু নসিব খারাপ ছিল চাঁদের। [...] সাদি হল এমন এক উজবুকের স[...] আলোতে মন ওঠে না যার, যে চাঁ[...] রোশনাইয়ের দিকে তাকাবার ফুরসৎ [...] না।

মন ভেঙে গেল চাঁদবদনীর। উজব[...] স্বামীকে তালাক দিল সে। ফিরে এল আ[...] সেই ছন্দহার গ্রামে। জাফরান ক্ষেতের পা[...] দাঁড়িয়ে আবার গান ধরল।

ছোটবেলা থেকে এই গানের সঙ্গে [...] দোস্তি ছিল তার। দুঃখে-শোকে গানে[...] মধ্যেই সে মুক্তি খুঁজে পেত।

একদিন মুক্তির রূপ ধরে জাঁহাপ[...] এলেন। হব্বার গান শুনে স্তব্ধ হ[...]

ইউসুফ শাহ। জাফরান ক্ষেতের পাশে থমকে দাঁড়ালেন।

এরপর থেকেই চাঁদবদনীর জীবন ঘুরে গেল। চাঁদের রোশনাইয়ের কদর হল। শাহেনশাহের বিবিজান হলেন হব্বা খাতুন। লোকে বলল, চাঁদবিবি।

আশ্চর্য এক চাঁদ। নিত্য ওখানে পূর্ণিমা লেগে আছে। নিত্যনতুন গান গাইছেন বেগমসাহেবা। শোনা গানে মন ওঠে না গুলবদনীর। নিজে লিখে নিজের সুরে না গাইলে মন ভরে না। কত গাইলেন তিনি! আজও তাঁর গান কাশ্মীরীদের মুখে মুখে ফেরে। আজও অনেকে গায়,

দূর—পাহাড়ের তুষার আমি ওগো,
প্রেমের তাপে—
গলছি থেকে থেকে।
পাহাড়ী এক ঝর্ণাধারা সম
তোমার টানে—
চলছি এঁকেবেঁকে।
চঞ্চল মন, উতলা আজ আমি
তোমার গানে
তোমার ডাকে ডাকে।

এ-গান দুঃখের গান। সুখী হব্বা বেগম এ-গান গাননি। গেয়েছেন দুঃখী হব্বা খাতুন। প্রিয়তম ইউসুফ শাহ অনেক দূরে গেছেন তখন। মুঘলসম্রাট আকবর তাকে কাশ্মীর ত্যাগে বাধ্য করেছেন। হব্বা সন্ন্যাস নিলেন। শ্রীনগরের খুব কাছেই এক গ্রামে চলে গেলেন তিনি। চিরকালের মতো গেলেন। ছোট্ট এক কুটির নির্মাণ করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। তার জীবনের শেষ কুড়িটি বছর শুধু দুঃখের গান গেয়েই কাটল। সে-গান আজও কাশ্মীরের পথে পথে শোনা যায়। ডাল-হ্রদের মাঝিরা আজও গায়,—দূর-পাহাড়ের তুষার আমি ওগো! কিন্তু ওই হ্রদের সঙ্গে যে হব্বার জীবনের দীর্ঘ চোদ্দ বছরের সুখ-স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সে-খবর আজ আর কেউ রাখে না।

সবাই হারিয়ে গেছেন আজ। আকবর, জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, শাজাহান, কাশ্মীরের সুলতানরা—সবাই ডাল-হ্রদের বুকে ক্ষুদ্র এক-একটি তরঙ্গের মতো নিঃশেষিত হয়ে গেছেন। অথচ সম্রাট আকবরেরও কত প্রিয় ছিল এই হ্রদ। এর তত্ত্বাবধানের জন্যে তিনি মজহরী নামে এক বহুদর্শী পর্যটক ও কবিকে নিযুক্ত করেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মজহরী ডাল-হ্রদ এবং আরও দু-একটি জলাভূমির দেখাশোনা করতেন, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।

এছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে ইতিহাসে। এদের সবকিছুকে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, অগণিত জাঁহাপনার চিরকালের প্রিয় এই ডাল-হ্রদ। তাই যুগ যুগ ধরে এর তীরে সুন্দর সব ফুলবাগিচা গড়ে উঠেছে। জাহাঙ্গীর গড়লেন শালিমার, আসফ খান রূপ দিলেন নিশাত বাগ, আর শাজাহানের চেষ্টায় গড়ে উঠল চশমা শাহী ও নাসিম বাগ, এইসব ফুলবাগিচা আজও আছে। কিন্তু ধ্বংস হয়ে-যাওয়া বাগিচার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। 'দি ভ্যালী অব কাশ্মীর' গ্রন্থে লরেন্স লিখছেন, মুঘল আমলে ডাল-হ্রদের আশেপাশে ৭৭টি উদ্যান ছিল। এদের থেকে রাজস্ব আদায় হত বছরে এক লক্ষ টাকা।

এখন ডাল-হ্রদের সে রোশনাই আর নেই। অধিকাংশ ফুলবাগিচাই এখন ধ্বংস-স্তূপ অথবা রূপ বদল করে অন্য এক চেহারায় বর্তমান। বহর-আরা উদ্যানটির কথাই ধরা যাক। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে নূরজাহান গড়েছিলেন এটি। অতি সুন্দর এক প্রাসাদ ছিল এখানে। ডাল-হ্রদের পশ্চিম তীরে গড়ে ওঠা ওই প্রাসাদ অনেকেরই মন ভোলাত। নূরজাহান ওখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎনালোকিত হ্রদটিকে দেখতেন। কিন্তু এখন প্রয়োজনের তাগিদে সে প্রাসাদ রূপ-বদল করেছে। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে কুষ্ঠরোগীদের আবাস। আজ সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক চেষ্টাতেও নূরজাহানের স্বপ্নকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জাহাঙ্গীরের আমলে শাসনকর্তা দিলওয়ার খাঁও ডাল-হ্রদের তীরে ফুল-বাগিচা গড়েন। কিন্তু আজ বাগিচার চিহ্ন নেই ওখানে। অতীতের বাগ-ই-দিলওয়ার খাঁনে আজ স্কুল বসে। ঠিক একই কথা বলা চলে বাগ-ই-মুরাদ সম্বন্ধে। শাহজাদা মুরাদ গড়েছিলেন সেটি। ডাল-হ্রদের তীরের ওই উদ্যানটিও কবে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঠিক এই রকম একটি জরাজীর্ণ উদ্যান দেখেই কাশ্মীরের এক লোকপ্রিয় কবি পীরজাদা গোলাম আহম্মদ লিখেছিলেন,

মালঞ্চকার বন্ধু আমার
ফুলবাগিচার বাদশা,
ওঠো তুমি, জাগো আবার
আবার হবে জলসা।
বুলবুলেরা গাইবে আবার
প্রেমে নবীন বর্ণা,
ফুটবে গোলাপ, ছুটবে আবার
রসে নিবিড় ঝর্ণা।
এই বাগিচা জীর্ণ যে আজ
গোলাপ হল শূন্য,
শিশির এখন কান্না ছড়ায়
এখন শুধুই দৈন্য।
সেই দীনতা ঘুচুক এবার
ফুলবাগিচার বাদশা,
ওঠো, তুমি, জাগো আবার
আবার হবে জলসা।

এ ছাড়া হ্রদের দ্বীপেও গড়ে উঠেছে কত উদ্যান। কিন্তু সে সবের অধিকাংশের কথাই আজ তার কারও মনে নেই। বাগ-ই-খিদমৎ খানের কথাও অনেকেই ভুলে গেছে। অনেকেরই আজ আর জানবার কথা নয় যে, ডাল-হ্রদের বুকে যে দুটি চিনার দ্বীপ চোখে পড়ে, সম্রাটরা ওদের গড়ে তুলেছিলেন। দুটিই কৃত্রিম দ্বীপ। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়টিকে বলা হত 'সোনা লাংক' বা সোনালী দ্বীপ। আর ছোটটির নাম ছিল 'রূপা লাংক' বা রূপালী দ্বীপ। উভয় দ্বীপের সঙ্গেই অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

সোনালী দ্বীপে সুলতান জয়নুল-আবেদীন একটি তিন-তলা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। দ্বীপটির পত্তন হয়েছিল ১৪২১ খৃষ্টাব্দে। বিপদের সময় নৌকারোহীরা যাতে আশ্রয় পায়, এই আশাতেই সুলতান দ্বীপ গড়েন ওখানে। দ্বীপটি আজও আছে; কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে প্রাসাদ বহু আগেই ধ্বংস হয়। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর ওখানে একটি কুটির নির্মাণ করেন। কিন্তু সে কুটিরও আজ আর নেই। আজ নাসীম বাগে দাঁড়ালে দ্বীপটিকে চোখে পড়ে শুধু; ডাল-হ্রদের ঠিক মাঝখানে গড়ে ওঠা অতি সুন্দর এক দ্বীপ।

'রূপা লাংক' বা রূপালী চার চিনার দ্বীপের পত্তন করেন সুলতান হাসান শাহ। শোনা যায়, এ দ্বীপটি নূরজাহানের খুব প্রিয় ছিল।

বলতে বলতে অনেকদূরে চলে এসেছি। বসন্তের ডাল-হ্রদের কথা লিখতে বসে ইতিহাসের পথ-বেয়ে বহুদূরে ঘুরে এলাম।

চার চিনার দ্বীপের কথা বলছিলাম। গিয়েছি সেই দ্বীপে। দেখেছি, ছোট্ট এক টুকরো স্থলভাগ শুধু। সে স্থলের প্রায় সবটুকু জায়গা জুড়েই উদ্যান। শুধুমাত্র মাঝখানে ছোট্ট একটি বিশ্রামকুঞ্জ। উদ্যানে রং-বেরংয়ের ফুলের সমারোহ দেখেছিলাম বসন্তে। আর দেখেছিলাম চারটি চিনার গাছ, দ্বীপটির চারদিকে চারটি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। শরতের ডাল-হ্রদে ঘুরে বেড়াবার কালে প্রহরীদের একটিকে খুঁজে পাই নি। তিনটি চিনার চোখে পড়েছিল তখন। কিন্তু দ্বীপটির নাম তখনও ছিল সেই চার চিনার। হয়তো এই নাম এখনও আছে। এখনও হয়তো বসন্তে চার চিনারে ভীড় করে পর্যটকরা। চিনার দ্বীপের ঘাটে ঘাটে নৌকা দাঁড়ায়। ওখানকার ঘাসে সবুজ কার্পেট পাতা আছে ভেবে অনেকে ভুল করে। বসন্তের দিনে চিনারের মর্মরধ্বনি শুনতে পেয়ে ঝরা-পাতার ওপর দিয়ে হাঁটে সব। খস খস শব্দ ওঠে চার চিনার দ্বীপে। পাখিরা ভয় পায়। দল বেঁধে উড়ে পালায় দ্বীপান্তরে, অথবা অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে।

ডাল-হ্রদের অপর একটি দ্বীপ নেহরু পার্কে পাখি নেই অত। অত বড় চিনারও নেই। কিন্তু যা আছে, তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, এমন কোনো দ্বীপ সহসা দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। মনে তো হয় না, পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচুতে এমন অপরূপ কোনো হ্রদের বুকে এর চেয়ে সুন্দর কোনো দ্বীপ কোনোদিন চোখে পড়েছে। দ্বীপটির ঠিক পিছনেই পপলার গাছের সারি। সামনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে চারিদিকে হ্রদের টলটলে নীল জল। পাহাড় এ দ্বীপটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। ঠিক সামনেই শংকরাচার্য পাহাড়। পিছনে হরির পর্বত। আর দূরে আকাশ-ছোঁয়া পীর-পঞ্জাল। পার্কের এখানে-সেখানে রাশি রাশি ফুল। বসবার আসন পাতা আছে যত্র-তত্র। অনেক আসন আবার লতা-পাতার আড়ালে

[illegible] তবে নেহরু পার্কে গেলে ওখানকার ফুলবাগিচা হয়তো প্রথমেই চোখে পড়বে না আপনার। প্রথমে চোখে পড়বে পার্কের সুদৃশ্য রেস্ট-হাউস এবং রেস্টুরেন্ট। সে রেস্টুরেন্টের গায়ে বড় বড় ইংরেজী হরপে লেখা NEHRU PARK; রাত্তিরে এ হরপগুলো নিয়ন আলোকে ঝলমলিয়ে ওঠে। ভাল লাগে নি ওই ঝলমলানি। মনে হয়েছে, নেহরুর নামাঙ্কিত ওই সাইন বোর্ড ওখানে না থাকলেও চলত। বরং যদি থাকত নেহরুর সুদৃশ্য কোনো মর্মরমূর্তি, তবে তাঁর প্রতি তো বটেই, পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিও অধিকতর শ্রদ্ধা দেখান হ'ত। নেহরু এসেছিলেন কাশ্মীরে, এসেছিলেন ডাল-হ্রদের *এই দ্বীপটিতেও, কাশ্মীরের যথার্থ কল্যাণ চেয়েছিলেন তিনি, এই সব কথা স্বচ্ছন্দে ওই মর্মরমূর্তির পাদদেশে লিখে রাখা যেত।* এমনকি কোনো কিছু না লিখলেও বোঝা যেত, নেহরু পার্ক সুন্দর। সামনে থেকে দেখলে মনে হয়, এই পার্কটির কাছাকাছি এসে ডাল-হ্রদ হঠাৎ প্রসারিত হয়ে গেল। ঘরবাড়ী, ছোটখাট দ্বীপপুঞ্জ আর ভাসমান দ্বীপের গা ঘেঁষে আসতে আসতে হঠাৎ যেন নিজেকে দূর-দিগন্তে মেলে ধরল। সে কারণেই এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। আবার এই হল ডাল-হ্রদের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা। এ এলাকায় থাকবার সুযোগ পেলে যে কেউ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। প্রথম শ্রেণীর হাউস-বোট এ অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। অতএব সকলেই অনুমান করতে পারবেন, বনেদী পাড়ার প্রথম শ্রেণীর বাড়ীতে যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি প্রবেশের যোগ্যতা বিত্তশালীদের জন্যে সংরক্ষিত। বসন্তে ও গ্রীষ্মে ভীড় বেশী; তাই সংরক্ষণের খুব কড়াকড়ি। মধ্যবিত্তরা তখন ওখানে থাকবার সুযোগ বড় একটা পায় না। শরতে শীত বাড়ে: ডাল-হ্রদের ভীড়ে তাই ভাঁটা পড়ে। সম্ভ্রান্ত এলাকা হাউসবোটের সামনে প্রায়ই চোখে পড়ে তখন, To Let; ভীড় কমে আসায় বোটের মালিকরা রেট কমাতে বাধ্য হয়। এবং এই হল মধ্যবিত্তদের মাহেন্দ্র লগ্ন। এই সুযোগে নেহরু পার্কের আশেপাশে ওঁরা থাকবার সুযোগ পেলে পেতেও পারেন।

নেহরু পার্কের খুব কাছেই 'আলজিরা' হাউসবোটে ছিলাম আমরা। স্পষ্ট মনে আছে বসন্তে আসি যখন, তখন ছিলাম নেহরু পার্ক থেকে প্রায় ছ' ফার্লং দূরে। খরচ একই রকম পড়েছিল; অথচ সুসজ্জিত 'আলজিরা' হাউসবোটের সঙ্গে আমাদের বসন্তের আবাসস্থলটির কোনো তুলনাই চলে না।

কিন্তু তবু বলবো, বসন্তের ডাল-হ্রদের অদ্ভুত এক মাদকতা আছে। খুশীর জোয়ার আসে তখন। আনন্দের বান ডাকে। গভীর রাত অবধি বোটের ছাদ থেকে গুঞ্জন ভেসে আসে। মনে পড়ে, আমরাও অনেক গল্প করেছি এক একদিন। হাউসবোটের ছাদে বসে আশ্চর্য এক স্বপ্নময় জগতের অধিবাসী হয়েছি। রাত এগিয়েছে দেখতে দেখতে। চঞ্চল ডাল-হ্রদ ধীরে ধীরে নিথর হয়েছে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দূরের বরফে-ঢাকা পাহাড়গুলোকে মনে হয়েছে ধূসর ও পান্ডুর। আমাদের ঠিক পিছনেই পপলার গাছ-গুলোতে রাজ্যের আঁধার বাসা বেঁধেছে। আর খানিকটা দূরেই হ্রদের গা-ঘেঁষা *আলোকোজ্জ্বল রাজপথটিকে মনে হয়েছে আঁধারের বুক চিরে বয়ে যাওয়া আলোর একটি নদী বলে।* দূরের আর কাছের হাউসবোটগুলোর আলো নিভেছে একে একে। এক এক করে শূন্য শিকারা নিয়ে মাঝিরা ঘরে ফিরেছে।

এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। সারাদিন হুড়োহুড়ি দাপাদাপির পর দুরন্ত শিশুর মতোই ডাল-হ্রদ গভীর ঘুমে অচৈতন্য। চারিদিকে নিঃসঙ্গ হিমবাহের মতো গা-ছমছমে স্তব্ধতা। রাত অনেক হয়েছে; কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। বসন্তের ডাল-হ্রদে যক্ষের মতো একা জেগে বসে আছি। থেকে থেকে ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া বইছে। পাশের পপলার বন থেকে অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে, একসঙ্গে অনেক লোক দীর্ঘশ্বাস ফেলছে বুঝি। এমন সময় অনেক দূরে কে যেন আপন-মনে গান ধরল। গানের কথা কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু সুরটা ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে এল। মোহগ্রস্তের মতো উঠে গেলাম হাউস-বোটের ছাদে। তাকিয়ে দেখলাম, খানিকটা দূরেই এক শিকারা। এক মাঝি ওতে বসে গান ধরেছে। শিকারা এগিয়ে চলেছে ভাঁটার টানে ছুটে চলা পাল-তোলা ময়ূরপঙ্খীর মতো। মনে হল, ঠিক এমনি গান জীবনে আরও অনেকবার শুনেছি। গভীর রাতে কত হ্রদ-নদীর কত শত মাঝি অনাদি-অনন্তকাল ধরে এই গান গেয়েছে। জীবনে কতবার শুনেছি এই গান। পদ্মায় শুনেছি, গঙ্গায় শুনেছি, চিল্কায় শুনেছি, আবার শুনেছি এই কাশ্মীরেরই উলার হ্রদে। সব জায়গার সব মাঝিই যেন একটি কথা বোঝাতে চেয়েছে, 'মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না'। সেদিনের সেই রাত্রি, সেই গান, সেই হ্রদ, সেই ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া এবং পপলার বন থেকে ভেসে আসা সেই দীর্ঘশ্বাস মানব-মনোলো[illegible] অখণ্ড মহাসত্যের কথা মনে কা[illegible] সবাই যেন একসঙ্গে বলে উঠল, 'ত[illegible] পারলাম না'।

কিন্তু তবু তরী বায় মানু[illegible] নতুন করে দাঁড় টানে। ভোরের [illegible] আবার জেগে ওঠে পৃথিবী। ডাল-হ্র[illegible] চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিনের পর রা[illegible] রাত্রির পর দিন। ঋতুর আবর্তন ঘ[illegible] দেখতে বছর পেরিয়ে যায়। যুগ গ[illegible] চোখের পলকে। শতাব্দীর হারি[illegible] শত-সহস্র দিন স্বপ্নের মতো মনে [illegible] দাঁড় টানা, এই গান গাওয়া, এ[illegible] পড়া, এই জেগে ওঠার খেলা চলে[illegible] কাল ধরে। *যুগে যুগে শত-সহস্র আসে এই ডাল-হ্রদে। আসে, চ[illegible] কিন্তু হ্রদ ঠিক তেমনি অচল অটল নিয়ে বিরাজ করে।* শত-শতাব্দীর [illegible] সুখের আকর হয়ে বিচিত্র সব ই[illegible] উপাদান ছড়ায়। রূপের ইন্দ্রজাল রচ[illegible] নানাভাবে। সামনের উন্নত পাহাড়[illegible] শঙ্করাচার্য মন্দির থেকে এক রূ[illegible] ভাসমান দ্বীপ, বিস্তীর্ণ জলাভূমি [illegible] বন, চিনার উদ্যান ও দ্বীপপুঞ্জকে [illegible] তখন বিচিত্রিতা। তখন আপনার [illegible] বাহির সৌন্দর্যকে একসঙ্গে তুলে ধ[illegible] হ্রদ মহিমময়। আবার চশমাশাহীর [illegible] থেকে অন্য এক রূপে ধরা দেয় সে। [illegible] দূর থেকে দেখা দেয় বলে অ[illegible] আড়ালে সে রহস্যময় ও অবগুণ্ঠিত। [illegible] বাগ থেকে খানিকটা নজরে পড়ে [illegible] গবাক্ষ-পথ দিয়ে আসা সূর্যরশ্মির ম[illegible] তার রূপরশ্মির খানিকটা পাঠিয়ে[illegible] ওখানে। আবার ডাল-হ্রদের যে অংশে[illegible] নাগিন-হ্রদ রূপরশ্মির সেখানে ঘনঘ[illegible] সেখানে আপনাকে প্রসারিত করে দূরে-মেলে ধরল। দ্বীপগুলোর কাছে হ্রদ [illegible] আনল নিজেকে। সুদূরের বস্তুটি [illegible] অদূরে এসে একান্ত আপন হল। ত[illegible] আপন হওয়াটাই ডাল-হ্রদের ই[illegible] সবচেয়ে বড় কথা।

রহস্যময় হিমালয়। রূপসাগর [illegible] অনেক। হিমতীর্থের গায়ে গায়ে [illegible] হ্রদ। হ্রদ অনেক, অনেক রূপতীর্থ। [illegible] কাছে পাই মুষ্টিমেয়কে। মাত্র কা[illegible] ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাই। সহজেই যেতে[illegible] বলে, দেখতে পারি বলে মনে চাইলেই [illegible] হ্রদ দূরে থেকেও কাছে আছে আমা[illegible]

সে হ্রদের ইতিকথা, আমাদেরই দুঃখের ইতিকথা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—[illegible] হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।